॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র ॥

৩৪ বর্ষ ১৩৭৩ ।

(১৪ সংখ্যা হইতে ২৬ সংখ্যা পর্যন্ত)

— দ —

— ধ —

— ন —

— প —

— ব —

— ভ —

— ম —

— য —

— র —

— শ —

— স —

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয় লেখক		পৃষ্ঠা
আলোচনা—	...	৭৬
আধুনিক চিত্রকলা—শ্রীশুদ্ধশীল বসু	...	৭৯
চিত্রপ্রদর্শনী—	...	৮১
অরণ্যদেব—	...	৮২
সাহিত্য সংবাদ—সনাতন পাঠক	...	৮৩
শৈলর বিকেল—শ্রীমুকুল রায়	...	৮৫
পুস্তক পরিচয়—	...	৯১
খেলার মাঠে—একলব্য	...	৯৩
ক্রীড়াকীর্তি—মুকুল	...	৯৬
রংগজগৎ—	...	৯৭
সাপ্তাহিক সংবাদ—	...	১০৪

আশাপূর্ণা দেবীর (নূতন উপন্যাস)

সুরভী স্বপ্ন	৬·০০
দুয়ে মিলে এক	৪·০০
প্রভাত মুখোপাধ্যায়	
ক্রন্দসী কাশ্মীর	১০·০০
তামসরঞ্জন রায়	
ভারত-ভগিনী নিবেদিতা	১৫·০০
শ্রীমা সারদামণি	৩·৫০
অজিত গাঙ্গুলী	
সমুদ্রের স্বপ্ন	৪·০০
গজেন্দ্রকুমার মিত্র	
বিজয়িনী	৩·৫০
মনোজ বসু	
নবীন যাত্রা	৫·০০
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	
তোমার হ'ল জয়	৭·০০
আর্য ভট্ট	
তিমির-সন্ধি	৭·০০
কি বিচিত্র এই প্রেম	৪·০০
বেলা দে	
সর্বভারতীয় রান্না ও জলখাবার	
রূপ ও শ্রী ৩·০০	৩·০০
ব্রত ছড়া আলপনা	২·০০
ইন্দিরা দেবী	
দেখা হ'লো	২·৫০
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	
সন্ধ্যা মালতী	৪·০০
অবধূত	
কৌশিকী কানাড়া	৩·৫০
লিও তলস্তয়ের (উপন্যাস)	
হাজী মুরাদ	৪·০০
দিলদার সম্পাদিত	
ছদ্মনামা	৩·৫০
শিবরাম চক্রবর্তী	
ভালবাসার অ আ ক খ	২·০০
ভালবাসার হাতে খড়ি	২·০০
যুধিষ্ঠির জানা	
বৃহত্তর তাম্রলিপ্তের ইতিহাস	১০·০০
বারট্রান্ড রাসেল	
শিক্ষা প্রসঙ্গ	৫·০০
নারায়ণচন্দ্র চন্দ	
আধুনিক শিক্ষণ সহায়িকা	৬·০০
বনের বাসিন্দা	৬·০০
পরিব্রাজক	
শিক্ষায়তন	৩·০০
নিরুপমা দত্ত	
সিঙ্গাপুরের কাহিনী	৩·০০

কলিকাতা পুস্তকালয়
৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২

কয়েকখানি অসামান্য গ্রন্থ

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস

চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্র-বাণী

বর্তমানে রবীন্দ্র-আলোচকদের মধ্যে ডঃ দাস নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থে তিনি সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যের শুদ্ধ কাব্য-সৌন্দর্যের বিচার করেছেন। রবীন্দ্র-কাব্য সম্পর্কে এই ধরনের বিচার এই প্রথম। ১২·৫০

ডঃ সুধীরকুমার করণ

লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ

"লোকায়ত রবীন্দ্রনাথ পড়েছি, বিশেষ ভালো লাগল...। এতে তোমার আশ্চর্য সরল অথচ খাঁটি প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গির প্রশংসা না করে উপায় নেই।"

—ডঃ নিকুঞ্জপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

৬·৫০

ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত

কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী

কবির সমগ্র পত্রাবলীর সংকলন। এবং এই পত্রাবলীর উপর ভিত্তি করে কবির জীবন, সাহিত্য-চিন্তা ও রচনাবলী সম্পর্কে এক অসামান্য আলোচনা এখানে করা হয়েছে। এই ধরনের প্রয়াস বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে হয়নি। ১০·০০

নাট্যকার মধুসূদন ৬·৫০

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচার ৪·০০

কবি মুকুন্দরাম ৩·৭৫

— — — — — — — — —

বোধিসত্ত্ব

ভারতের যাদুঘরে

ভারতের সমগ্র যাদুঘরসমূহের এক মনোরম আলোচনা। এ ধরনের গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে আর রচিত হয়নি।

১৫·০০

— — — — — — — — —

গ্রন্থ-নিলয়

৪৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

প্রকাশিত হ'ল

সুপর্ণ-র

পুরন্দরের তীরে

বাঁকুড়া জেলার এক অখ্যাত নদী, নাম পুরন্দর। ওরই তীরে শাল পিয়াল মহুয়ার বন। লাল কাঁকুরে উঁচু-নিচু রুক্ষ মাঠ। উভয় তীরে বাস করে বাউরী, বাগদী, সাঁওতাল আর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। তাদেরই মুখের ভাষায় গড়া এই কাহিনী পরিবেশনায় লেখকের মুন্সীয়ানার পরিচয় পাবেন পাঠক।

॥ তিন টাকা ॥

মেঘদূতম্ ॥ আট, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - বারো

সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ

মহাভারতের চরিতাবলী

মহাভারতের অমৃত কাহিনীর অনন্য উদ্ভাস। পঞ্চাশটি চরিত্রের আলোচনার মাধ্যমে তৎকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক আচারব্যবহার এবং জানা অজানা বহু প্রেমোপাখ্যান বিধৃত ॥ ১৮·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

উদ্যত খড়্গ

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রদীপ্ত জীবনী। শৈশব হতে শুরু করে জাতীয় আন্দোলনে প্রথম কারাবরণ পর্যন্ত। সেই সঙ্গে তৎকালীন সশস্ত্র বিপ্লববাদের ইতিহাস॥
প্রথম খণ্ড : ৬·৫০, দ্বিতীয় খণ্ড : যন্ত্রস্থ

কণিষ্ক

ফিরিঙ্গি হাওয়া

কোম্পানীর আমলে বহু ইংরেজ এদেশে এসেছে ভাগ্যান্বেষণে, বহু ইংরেজ সোনা কুড়িয়ে ফিরে গেছে তাদের দেশে। ফিলিপ ফ্রান্সিস চলে গেছে, মারা গেছে হেস্টিংস। সাহেব-নবাবদের যুগ শেষ। আরম্ভ হবে সিভিলিয়ানদের যুগ। এই পটভূমিকায় তখনকার ফিরিঙ্গিসমাজের নিখুঁত এক ছবি॥ ৬·০০

বনফুল

গন্ধরাজ

হিমালয়ের পাদদেশে পার্বত্যাঞ্চল দার্জিলিং-এর পটভূমিকায় রচিত গন্ধরাজের সুরভিমণ্ডিত এক সুখপাঠ্য উপন্যাস॥ ৮·০০

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

জালিয়ানওয়ালাবাগ

জালিয়ানওয়ালাবাগের তথাকথিত বেআইনী জনসভাকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবের সামরিক শাসনকর্তা জেনারেল ডায়ারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও অমানুষিক বিভীষিকার অসমাপ্ত ইতিহাস॥ ৬·০০

দীপ্তি ত্রিপাঠী

শিপ্রানদীপারে

কাশ্মীর, উজ্জয়িনী, চিতোর ও সিংহলের বিস্তৃত পটভূমিকায় সমুদ্রগুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত, বররুচি, কালিদাসের সমাবেশে রচিত প্রেমোপাখ্যান॥ ৬·০০

"ছবিটির প্রধান অংশ জুড়িয়া কালিদাসের কাব্যলোকের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। ছত্রে ছত্রে মহাকবির কালজয়ী কাব্যনির্ঝর যেন বয়ে গিয়েছে।"
— আনন্দবাজার

শ্রীপারাবত

মমতাজ-দুহিতা জাহানারা

ইতিহাসের এক অম্লান সুদূর সুগন্ধে এই উপন্যাসটি শুধু সুন্দর নয়—অগাধ হয়ে উঠেছে। মোগল-হারেম, শিসমহল, জেসমিন প্রাসাদ, অঙ্গুরি-বাগ ও তাজমহল সম্পর্কে কত রোমাঞ্চকর তথ্যের সমাবেশ, সেই সঙ্গে জাহানারার জীবনের বহু অদেখা রহস্য রেখার উন্মোচন॥ ৭·০০

পঞ্চবর্ষী

জাতিস্মরের শিল্পলোক

বিগত একশত বছরের সংগীত ও সংগীতশিল্পীদের সম্পর্কে বহু তথ্য ও ঘটনাসমৃদ্ধ রম্যরচনা॥ ৬·০০

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শত গল্প ॥ ২০·০০
রত্নাকর গিরিশচন্দ্র ॥ ৬·৫০
মৃগ নেই মৃগয়া ॥ ৪·৫০

শ্রীপারাবত

আরাবল্লী থেকে আগ্রা ১৮·০০
এম এল পম্পা ॥ ৭·০০

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শংকর-নর্মদা ॥ ১০·০০
মন মধুকর ॥ ৮·০০

কণিষ্ক

মোগল-হাটের সন্ধ্যা ॥ ৮·০০

বিজন চক্রবর্তী

বেগম সমরু ॥ ৫·০৫

আশাপূর্ণা দেবী

বৃত্তপথ ॥ ৪·০০

প্রতিভা বসু

সেতুবন্ধ ॥ ৩·০০

মিহির আচার্য

দ্বিরাগমন ॥ ৩·০০

আপনার বান্ধবীর বিয়েতে বা জন্মদিনে উপহার দিন

জ্যোতিষে মেয়েদের ভাগ্য

শ্রীভাস্কর

এই বইয়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে—লগ্নফল, রাশিফল, গ্রহের স্বরূপ, জন্ম—ক্ষেত্রফল, লগ্নভাব, নারী-চরিত্র, জন্মক্ষেত্রফল, লগ্নভাব, নারী-চরিত্র, যোটক বিচার, লগ্নপতির অবস্থিতি ফল ইত্যাদি নানা জ্ঞাতব্য বিষয়।

জ্যোতিষ সম্পর্কে যাঁরা কিছুই জানেন না, তাঁদের জন্যই বিশেষ করে লেখা এই বই আপনাকে জ্যোতিষচর্চা সম্পর্কে আগ্রহান্বিত করবে এবং বিপদে-আপদে বন্ধুর মতো সাহায্য করবে॥ ৬·০০

আনন্দধারা প্রকাশন : ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

*(সি-৪২১৬)

৩৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৪

শনিবার ২১ মাঘ ১৩৭৩

সম্পাদক

শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক

শ্রীসাগরময় ঘোষ

*

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ১

হইতে শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত

কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন

২৩-২২৪০ ২৩-৮৩৫১

*

চাঁদার হার

কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষান্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষান্মাসিক ,,	১৩.৫০
ত্রৈমাসিক ,,	৭.০০

পাকিস্তানে

(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষান্মাসিক	১৪.০০
ত্রৈমাসিক	৭.০০

ভারতের বাহিরে

(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৬.০০
ষান্মাসিক ,,	২৩.০০
ত্রৈমাসিক ,,	১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে

(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষান্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

দাম ৫০ পয়সা

আসামে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৫ পয়সা

*

DESH

Saturday 4 Feb 1967

আসন্ন নির্বাচন

দিনের হিসেবে আর সপ্তাহ তিনেক, সারা দেশ জুড়ে ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন শুরু হবে। আসন্ন নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রারম্ভিক কর্তব্য শেষ করেছে, আপাতত চলছে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রস্তুতি, শেষাঙ্ক অভিনীত হবে একেবারে নির্বাচনের দিনগুলিতে। নির্বাচনের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভেদাভেদ নেই, রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, সমাজকর্মী, আইনবিদ, রাজারাজড়া থেকে শুরু করে সাধারণ ঘরের সাধারণ মানুষকেও দেখা যাবে। কোথাও কোথাও স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, কোথাও বা ভাইয়ে ভাইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে; পিতা-পুত্রেও যে ভোটের লড়াই কোথাও হচ্ছে না—এমন কথা হলফ করে বলতে পারি না। ভোটরঙ্গের এটাই হল যাদু।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটপর্ব শুরু হচ্ছে ২১ ফেব্রুয়ারী থেকে, চলবে ২৪ পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গ থেকে চল্লিশটি লোকসভার আসনের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা একশো চল্লিশ; বিধানসভার দুশো আশিটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এক হাজার আটাত্তজন প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বড় ছোট মিলিয়ে দলের সংখ্যা কিছু কম নয়, ডজন খানেক, তার মধ্যে আবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে ভাগাভাগি হয়ে দুটি বিরোধী ফ্রন্ট তৈরী হয়েছে।

নির্বাচনের ফলাফল পশ্চিমবঙ্গে কি হতে পারে এ নিয়ে শুধু রাজনৈতিক দলগুলির নয়, সাধারণ মানুষেরও বেশ মাথাব্যথা। হাটে-বাজারে, ট্রামে-বাসে, চায়ের দোকানে, অফিসে এখন প্রধান আলোচ্য বিষয় নির্বাচন; রাস্তায় ঘাটে এবং বাড়ির দেওয়ালে হরেক রকম পোস্টার, মাঠে-ঘাটে নিত্য নির্বাচনী বক্তৃতা, ছোট ছোট দলে পথ-মিছিল ও স্লোগান। কখনও কখনও নাকি ছোটখাটো সংঘর্ষও ঘটছে। বলা বাহুল্য, যত দিন যাবে, নির্বাচনের তারিখ এসে পড়বে, ততই আবহাওয়া বেশ উত্তেজিত এবং উত্তপ্ত হতে থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কোন পক্ষের জয় আর কোন পক্ষের পরাজয় ঘটবে সে ভবিষ্যদ্বাণী করার মতন দুর্বুদ্ধি আমাদের ঘটবে না। কিছুকাল আগে, অন্তত বছর খানেক পূর্বে খাদ্য ও অন্যান্য আন্দোলনের পর কংগ্রেস-বিরোধী একটা মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল। খাদ্যাভাব, সরকারী খাদ্যনীতির গলদ, নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির সুযোগে বামপন্থী দলগুলি প্রায় একজোটে একটা আন্দোলন-ঐক্য গড়ে তুলে মনে মনে আশা করেছিলেন, '৬৭-র নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে বিশেষ কাবু করে ফেলবেন। একসময় এরকমও মনে হয়েছিল যে, সর্বদল বামপন্থী নির্বাচনী ঐক্য যদি গড়ে ওঠে, তবে কংগ্রেসকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে। কিন্তু হাওয়া পাল্টে গেল, বামপন্থী নির্বাচনী ঐক্য গড়ল না, বিরোধীদের মধ্যে গণ্ডগোল দেখা দিল, একে অন্যের দোষারোপ করতে লাগলেন, শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া তিক্ত ও ঘোরালো হয়ে উঠে বামপন্থী ঐক্য ভেঙে গেল। যে দুটি বিরোধী ফ্রন্ট নিজ নিজ স্বার্থে গড়ে উঠেছে এখন তারাই নির্বাচনে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। রাজ্য বিধানসভার দুশো আশিটি আসনের মধ্যে প্রায় একশো সত্তরটি আসনে দুই ফ্রন্টের প্রার্থী রয়েছেন এবং পরস্পরের সঙ্গে লড়ছেন। এক্ষেত্রে বিবদমান দুই বিরোধীর সমর্থকরা দুই অংশে ভাগ হয়ে গেলে তৃতীয় পক্ষের সুবিধে হবে অসুবিধে হবার কথা নয়। সাত বামপন্থী মিলে যে ফ্রন্ট গঠন করেছেন তাঁদের আশা, কংগ্রেস-বিরোধী ভোট তাঁরা পাবেন; অন্য দিকে [illegible] দ্বিতীয় ফ্রন্টটিও ওই রকম আশা রাখেন।

পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস-প্রীতি অন্যান্য বারের তুলনায় বাড়বার কথা নয়। কেননা সাধারণ মানুষ যেসব দুর্ভোগ ভুগছেন তাতে কংগ্রেসকে উদার হৃদয়ে ভোট দিতে এগিয়ে আসবেন বলেও মনে হয় না। তবু গত এক বছর ধরে বামপন্থী দলগুলি নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে উঠে ক্রমাগত আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদি এত করেছেন যে, জনসাধারণ এই দলের প্রতিও খুব সন্তুষ্ট নয়; কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরক্ত এবং বীতস্পৃহ; বিশেষ করে নির্বাচনী ঐক্যে ফাটল ধরার পর এঁদের ভিতরের দুর্বলতা যেন আরও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে কোন্ পক্ষ যে শেষ চালে বাজিমাত করবেন তা বলা মুশকিল। কংগ্রেস, না বিরোধী কাদের জয় ঘটবে সে বিষয়ে আপাতত কিছুই অনুমান না করা ভাল। তবে এই নির্বাচন যে জটিল এবং কৌতূহলপ্রদ হয়ে উঠেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

প্রকাশিত হল

"বিবর"-এর পরিপূরক উপন্যাস

স্বীকারোক্তি ॥ সমরেশ বসু

নিরন্তর নিরীক্ষায় বিশ্বাসী সমরেশ বসু "স্বীকারোক্তি" উপন্যাসে নায়কের জবানীতে উত্তমপুরুষে এক আশ্চর্য পাপের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সত্যের খাতিরে বলতেই হবে, এর রচনা-শৈলী ও বক্তব্য উভয়ই বাংলা সাহিত্যে নতুন। এখন এর ভালো বা মন্দ, মেনে নেওয়া বা না মেনে নেওয়া বিতর্কের বিষয়। কিন্তু সন্দেহ নেই, যে-কোনও পাঠককেই এ উপন্যাস ভাবিয়ে তুলবে।

'স্বীকারোক্তি', 'অস্বীকার' ও 'পাপ' তিনটি অধ্যায়ে উপন্যাস শেষ হয়েছে। তবু, মূলে, এটি একটি ভয়ংকর স্বীকারোক্তি। পাপবোধ থেকেই এ স্বীকারের উদ্ভব। অথচ সমাজে সবাই যা করছে, সেও তাই করছে। কিন্তু পাপ-চেতনাই তাকে সকলের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রুদ্ধ ও কিম্ভূত করে তুলেছে। এবং একই সঙ্গে তাকে মহৎ ও করুণও করে তুলেছে।

দাম ৫·০০

'বিবর' সমরেশ বসুর যে মানস-পর্বের ফসল, 'স্বীকারোক্তি'ও সেই পর্বের। উপলব্ধি, মনন, রচনাভঙ্গি, বক্তব্য—সব দিক থেকেই 'বিবর'-এর সঙ্গে এর আশ্চর্য আত্মীয়তা। এই মানস-পর্বের যে উপলব্ধিটুকু 'বিবর'-এ বলা হয়ে ওঠেনি, কিংবা বলা যায়নি, তা-ই যেন পরিশীলিত রূপ পেয়েছে 'স্বীকারোক্তি'তে। সে হিসেবে এই গ্রন্থটি 'বিবর'-এর পরিপূরক উপন্যাস তো বটেই, বাংলা উপন্যাসে এক উল্লেখযোগ্য দিকচিহ্নও।

০ আরও উপন্যাস ০

পাতাল থেকে আলাপ ॥ বুদ্ধদেব বসু ॥ ৫·০০

আত্মপ্রকাশ ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ ৬·০০

প্রেমের চেয়ে বড় ॥ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ ১২·০০

বেগম মেরী বিশ্বাস ॥ বিমল মিত্র ॥ ২৫·০০

সূর্যসাক্ষী ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ ১৪·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত
একমাত্র প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক

দেশ

৩৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৪
শনিবার ২১ মাঘ ১৩৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ
৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা ১
থেকে শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
২৩-৩২৪০ ২৩-৮৩৩১

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষান্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষান্মাসিক ”	১৩.৫০
ত্রৈমাসিক ”	৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষান্মাসিক	১৪.০০
ত্রৈমাসিক	৭.০০

ভারতের বাহিরে
(সাধারণ ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৬.০০
ষান্মাসিক ”	২৩.০০
ত্রৈমাসিক ”	১১.৫০

আসাম-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষান্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
অন্যত্র বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৭ পয়সা

DESH
Saturday 4 Feb 1967

আসন্ন নির্বাচন

দিনের হিসেবে আর সপ্তাহ তিনেক, সারা দেশ জুড়ে ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন শুরু হবে। আসন্ন নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের প্রারম্ভিক কর্তব্য শেষ করেছে, আপাতত চলছে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রস্তুতি, শেষাঙ্ক অভিনীত হবে একেবারে নির্বাচনের দিনগুলিতে। নির্বাচনের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভেদাভেদ নেই, রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, সমাজকর্মী, আইনবিদ, রাজারাজড়া থেকে শুরু করে সাধারণ ঘরের সাধারণ মানুষকেও দেখা যাবে। কোথাও কোথাও স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, কোথাও বা ভাইয়ে ভাইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে; পিতা-পুত্রেও যে ভোটের লড়াই কোথাও হচ্ছে না— এমন কথা হলফ করে বলতে পারি না। ভোটরঙ্গের এটাই হল যাদু।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটপর্ব শুরু হচ্ছে ২১ ফেব্রুয়ারী থেকে, চলবে ২৪ পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গ থেকে চল্লিশটি লোকসভার আসনের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা একশো চল্লিশ; বিধানসভার দুশো আশিটি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এক হাজার আটান্নজন প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বড় ছোট মিলিয়ে দলের সংখ্যা কিছু কম নয়, ডজন খানেক, তার মধ্যে আবার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে ভাগাভাগি হয়ে দুটি বিরোধী ফ্রণ্ট তৈরী হয়েছে।

নির্বাচনের ফলাফল পশ্চিমবঙ্গে কি হতে পারে এ নিয়ে শুধু রাজনৈতিক দলগুলির নয়, সাধারণ মানুষেরও বেশ মাথাব্যথা। হাটে-বাজারে, ট্রামে-বাসে, চায়ের দোকানে, অফিসে এখন প্রধান আলোচ্য বিষয় নির্বাচন; রাস্তায় ঘাটে এবং বাড়ির দেওয়ালে হরেক রকম পোস্টার, মাঠে-ঘাটে নিত্য নির্বাচনী বক্তৃতা, ছোট ছোট দলে পথ-মিছিল ও স্লোগান। কখনও কখনও নাকি ছোটখাটো সংঘর্ষও ঘটছে। বলা বাহুল্য, যত দিন যাবে, নির্বাচনের তারিখ এসে পড়বে, ততই আবহাওয়া বেশ উত্তেজিত এবং উত্তপ্ত হতে থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে কোন পক্ষের জয় আর কোন পক্ষের পরাজয় ঘটবে সে ভবিষ্যদ্বাণী করার মতন দুর্বুদ্ধি আমাদের ঘটবে না। কিছুকাল আগে, অন্তত বছর খানেক পূর্বে খাদ্য ও অন্যান্য আন্দোলনের পর কংগ্রেস-বিরোধী একটা মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল। খাদ্যাভাব, সরকারী খাদ্যনীতির গলদ, নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদির সুযোগে বামপন্থী দলগুলি প্রায় একজোটে একটা আন্দোলন-ঐক্য গড়ে তুলে মনে মনে আশা করেছিলেন, '৬৭-র নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসকে বিশেষ কাবু করে ফেলবেন। একসময় এরকমও মনে হয়েছিল যে, সর্বদল বামপন্থী নির্বাচনী ঐক্য যদি গড়ে ওঠে, তবে কংগ্রেসকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হবে। কিন্তু হাওয়া পালটে গেল, বামপন্থী নির্বাচনী ঐক্য গড়ল না, বিরোধীদের মধ্যে গণ্ডগোল দেখা দিল, একে অন্যের দোষারোপ করতে লাগলেন, শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া তিক্ত ও ঘোরালো হয়ে উঠে বামপন্থী ঐক্য ভেঙে গেল। যে দুটি বিরোধী ফ্রণ্ট নিজ নিজ স্বার্থে গড়ে উঠেছে— এখন তারাই নির্বাচনে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। রাজ্য বিধানসভার দুশো আশিটি আসনের মধ্যে প্রায় একশো নব্বইটি আসনে দুই ফ্রণ্টের প্রার্থী রয়েছেন এবং পরস্পরের সঙ্গে লড়ছেন। এক্ষেত্রে বিবদমান দুই বিরোধীর সমর্থকেরা দুই অংশে ভাগ হয়ে গেলে তৃতীয় পক্ষের সুবিধে বই অসুবিধে হবার কথা নয়। সাত বামপন্থী মিলে যে ফ্রণ্ট গঠন করেছেন তাঁদের আশা, কংগ্রেস-বিরোধী ভোট তাঁরা পাবেন; অন্য দিকে চার দলে মিলে গঠিত দ্বিতীয় ফ্রণ্টটিও ওই রকম আশা রাখেন।

পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস-প্রীতি অন্যান্য বারের তুলনায় বাড়বার কথা নয়। কেননা সাধারণ মানুষ যেসব দুর্ভোগ ভুগছেন তাতে কংগ্রেসকে উদার হৃদয়ে ভোট দিতে এগিয়ে আসবেন বলেও মনে হয় না। তবু গত এক বছর ধরে বামপন্থী দলগুলি নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে উঠে ক্রমাগত আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদি এত করেছেন যে, জনসাধারণ এই দলের প্রতিও খুব সন্তুষ্ট নয়; কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরক্ত এবং বীতস্পৃহ; বিশেষ করে নির্বাচনী ঐক্যে ফাটল ধরার পর এঁদের ভিতরের দুর্বলতা যেন আরও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে কোন্ পক্ষ যে শেষ চালে বাজিমাত করবেন তা বলা মুশকিল। কংগ্রেস, না বিরোধী কাদের জয় ঘটবে সে বিষয়ে আপাতত কিছুই অনুমান না করা ভাল। তবে এই নির্বাচন যে জটিল এবং কৌতূহলপ্রদ হয়ে উঠেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কম্যুনিস্ট বনাম কম্যুনিস্ট

কম্যুনিস্ট চীনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘরোয়া দিকটা এখনও পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না, কিন্তু বাইরের দিকে যেখানে পিকিং এবং মস্কো পরস্পর প্রত্যক্ষ বিরোধী সেখানে সংকট এখন তীব্র, এটা অনায়াসে বুঝতে পারা যায়। শেষ পর্যন্ত হয়তো জানা যাবে কম্যুনিস্ট চীনের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর পিকিং বনাম মস্কোর আন্তর্জাতিক মামলা দুই-ই এক সূত্রে বাঁধা, দুইয়েরই উৎস এক। মাও সে তুং আর তাঁর লালরক্ষী চেলাদের সঙ্গে ঘরোয়া লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ যদি হয় লিউ শাও চি ও চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির বড় একটি অংশ তবে মাও-বিরোধীদের দিকে মস্কোরও টান আছে, এখন আর সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। এক কথায়, কম্যুনিস্ট চীনের ঘরোয়া দ্বন্দ্বে সোভিয়েট ইউনিয়ন নিরপেক্ষ নয়। সোভিয়েট নেতারা কোন্ পক্ষে আগে সেটা খুব স্পষ্ট ছিল না; আগে ধরে নেওয়া হয়েছে সোভিয়েট রাশিয়া ও কম্যুনিস্ট চীনের মতবিরোধটা পাইকারী-ভাবে এই দুই দেশের কম্যুনিস্ট নেতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে। মাওপন্থীরা অবশ্য বলেছে, "সাংস্কৃতিক বিপ্লবের" শত্রুরা সবাই রাশিয়ার "শোধনবাদীদের" চর অনুচর। ওদিকে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা ব্রেজনেভ এই প্রথম খোলাখুলিভাবে বলেছেন, মাও সে তুং-এর জবরদস্তির ফলে চীনের খাঁটি কম্যুনিস্টদের চরম বিপদ। রুশ কম্যুনিস্ট বিচারে মাও-লিন পিয়াও-পন্থীদের বিরোধীরাই চীনের খাঁটি কম্যুনিস্ট; মাও-এর মতে এরা শোধনবাদী, এরা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফের চালু করতে চায়।

কম্যুনিস্ট শাস্ত্রমতে এই তাত্ত্বিক তর্কের শেষ কোথায় তা আপাতত কেউই বলতে পারে না। তর্কটা এখন মুখোমুখি ছেড়ে হাতাহাতিতে কোথায় গড়াচ্ছে, গড়াতে পারে সেটাই দেখবার জিনিস। য়ুরোপের পুরানো একটা বচন, একজন গ্রীকের সঙ্গে আর একজন গ্রীকের দেখা হলে গ্রীকে গ্রীকে লড়াই হবেই। কম্যুনিস্টের সঙ্গে কম্যুনিস্টের লড়াই হওয়াটা কিন্তু কম্যুনিস্ট শাস্ত্রমতে একেবারে ছিল কল্পনাতীত। মার্ক্স, লেনিন ইত্যাদি কম্যুনিস্ট গুরুদের মতে দুনিয়ার সব কম্যুনিস্টের লক্ষ্য এক, স্বার্থ অভিন্ন, চিন্তা আচরণ সব কিছু এক সূত্রে বাঁধা। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনই হোক, অথবা কোনও দেশের কম্যুনিস্ট পার্টিই হোক, সকলের বেলাতেই বিনা ছিদ্র প্রস্তরকঠিন ঐক্য। "মনোলিথিক" অর্থাৎ অন্তত একখানা নিভাঁজ পাথরে গড়া এই কম্যুনিস্ট ঐক্যে প্রথম মস্ত ফাটল স্টালিন-টিটো বিরোধ এবং তার ফলে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে কম্যুনিস্ট যুগোস্লাভিয়ার বিচ্ছেদ। মস্কো এবং পিকিং-এর বিরোধ কম্যুনিস্ট দুনিয়ার আরও বড় ফাটল।

কম্যুনিস্ট তাত্ত্বিক ও শাস্ত্রকাররা বলে-ছিলেন, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে স্বার্থ-সংঘাত, বাজার এবং রাজ্য দখলের প্রতিযোগিতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, এসব একমাত্র ক্যাপিটালিস্ট তথা ধনতন্ত্রী দুনিয়াতেই সম্ভব; ধনতন্ত্রের "কনট্রাডিকশন" অর্থাৎ অন্তর্নিহিত অসঙ্গতির ফলেই পৃথিবীতে নাকি যত কিছু অশান্তি, অনাচার, এবং কমিউনিজমের আওতায় এই সমস্ত দুর্ভোগ, দুর্গতির সুনিশ্চিত অবসান। সংক্ষেপে দাবি, কমিউনিজমে "কনট্রাডিকশন" তথা অসঙ্গতি নেই, সমন্বয় ও শান্তির স্বচ্ছন্দ বিস্তার। এখন দেখা যাচ্ছে কমিউনিজমের "কনট্রাডিকশন", অসঙ্গতি বিরোধও কম মারাত্মক নয়। ধনতন্ত্রী আমেরিকা এবং কম্যুনিস্ট চীনের মধ্যে বিরোধের চেয়ে কম্যুনিস্টদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ অনেক বেশী তীব্র।

যতদিন কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র পৃথিবীতে একটিও ছিল না ততদিন কমিউনিজমের তাত্ত্বিক কল্পনাগত স্বর্গের মধ্যে "কনট্রাডিকশন" তথা অন্তর্বিরোধ স্বভাবতই ধরা পড়েনি। পৃথিবীর প্রথম কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্বিরোধ ভক্তরা বহুকাল "না, না" করে উড়িয়ে দিলেও, অবশেষে ক্রুশ্চেভ প্রমুখাৎ তার নিদারুণ যন্ত্রণা ও কলঙ্কময় ইতিহাস সকলের জানা হয়ে গেছে। কমিউনিজম এখন তার চেয়েও গভীর সুদূরবিস্তৃত অন্তর্বিরোধে বিদীর্ণ।

কম্যুনিস্ট চীনের অন্তর্বিরোধে কোন্ পক্ষের হার বা জিত হবে সেটা বড় কথা নয়। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিরোধ কম্যুনিস্ট তত্ত্ব এবং আদর্শ সংকল্পের মূলে যে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে তার পরিণাম কী? মনে হয় সে পরিণাম আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে বিপর্যয়কর হতে বাধ্য। পরিচ্ছন্ন বিপ্লবের প্রবল শক্তি ও দীপ্তি কমিউনিজম কোনদিনই আর ফিরিয়ে পাবে না; সোভিয়েট শোধন-বাদী হোক অথবা মাও-পন্থী অতি-বিপ্লবী হোক, কোন পক্ষই আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনকে আর অন্তর্বিরোধমুক্ত করতে পারবে না, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে নীতিগত স্বাতন্ত্র্যও আর কখনও বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। পিকিং এবং মস্কোর মধ্যে প্রচারযুদ্ধ এখন যে আকার নিয়েছে, যে ভাষা ও ভঙ্গি ব্যবহার করছে

সেগুলি আর যাই হোক আদি কম্যুনিস্ট শাস্ত্রকারদের আদর্শানুসারী নয়। নাৎসী জার্মেনী ও কম্যুনিস্ট রাশিয়ার মধ্যে যে সময় গালিগালাজের প্রতিযোগিতা তখনকার খিস্তিকেও হার মানায় সাম্প্রতিক রুশী-চীনী পরস্পর কটূক্তির ঝাঁঝ। আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট ভ্রাতৃত্বের মার্ক্স-লেনিনবাদী তত্ত্ব কোথায় তলিয়েছে সে সন্ধান এখন পরম ভক্তরাও দিতে পারেন না। মস্কোর প্রচার-যোদ্ধারা হয়তো প্রথম দিকে কিছুটা সংযত, কিছু "রাখ-ঢাক" নীতির পক্ষপাতী ছিলেন; এখন মাও-পন্থীদের "মার, মার" কাণ্ডকারখানার ধাক্কায় মস্কোর হাওয়াও গরম। মাও সে তুং-এর বিরুদ্ধে পোস্টার মস্কোর দেওয়ালেও দেখা দিয়েছে।

কমিউনিজমের "কনট্রাডিকশন" তথা অন্তর্বিরোধের গুণেই বলতে হয়, রাশিয়া এবং আমেরিকা এখন ঠিক ততটা কাছাকাছি যতটা দূরত্ব চীন ও রাশিয়ার মধ্যে। রাশিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতি, পরস্পর সমঝোতা সম্ভব, এ কথা মস্কো এবং ওয়াশিংটন দুই পক্ষ থেকেই শোনা যাচ্ছে। অসম্ভব এখন কম্যুনিস্ট চীন ও কম্যুনিস্ট রাশিয়ার শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। পিকিং এবং মস্কোর মধ্যে বিরোধ চরম বিচ্ছেদ ঘটাবে কি না, তারপর দুই কম্যুনিস্ট মহা-রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংঘর্ষ কবে, কত দূর, এ-সব প্রশ্নও উঠবে এবং উঠছে। মস্কোর সম্ভবত আশা, মাও-বিরোধীরাই চীনে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে; মস্কোর হিসাবে চীনের মজুর ও চাষীদের বেশীর ভাগ মাওপন্থী জবরদস্ত নীতির বিরোধী, চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সংগঠন সম্পর্কেও সেই কথা। চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্যবাহিনীকে মাও-পন্থীরা কতখানি হাত করতে পেরেছে সেটাও নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। মস্কোর চেষ্টা আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট সমাজ থেকে মাও-পন্থীদের নাম-খারিজ করা; মার্শাল টিটোর সঙ্গে রুশ নেতাদের আলাপ-আলোচনা সেই উদ্দেশ্যেই। দুর্ভোগ উত্তর ভিয়েতনামের, দুই মোহান্তের লড়াইয়ের ফলে উত্তর ভিয়েতনামের অবস্থা আরও অনিশ্চিত, অসহায়।

৩০-১-৬৭

চড়াই-উৎরাই

কেতকী কুশারী ডাইসন

তদেতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্।
স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি।
অন্নবানন্নাদো ভবতি।
মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চসেন।
মহান্ কীর্ত্যা।
তবে শুনুন আপনাদের একটা ঘটনা বলি।

হাসপাতালের চড়াই পথে উঠছি কেম্প্‌টাউনের মধ্য দিয়ে;
কেম্প্‌টাউন ব্রাইটনের পূবে পাড়া, অভাবগ্রস্ত এলাকা,
রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকত্ব পায়নি,
পৌর কর্তৃপক্ষের আদর এর জোটেনি:
এক দিকে মদ চোলাইয়ের কারখানা,
অন্য দিকে মৃত গাড়ির আড়ত :
চোট-পাওয়া, গুঁতো-খাওয়া, থেঁতলে-যাওয়া,
দাঁত-খসা, থুতনি-ভাঙা দর্পচূর্ণ যানদের মহাশ্মশান;
কোথাও দোকান বাসী খাবারের :
শুকনো গাজর, অবসন্ন বাঁধাকপি,
চর্বিপিণ্ডের মাঝে মাঝে কৃষ্ণাভ মাংসের শিরা-উপশিরা;
কোথাও বিক্রি হয় ব্যবহৃত কাপড়চোপড় :
পুরোনো চাদর, পুরোনো ওয়াড়, পুরোনো সুজনি,
পুরোনো ফ্রক, শার্ট, মোজা,
যদিও খদ্দের দেখিনি কস্মিন্ কালে।

হাওয়ায় উড়িয়ে নিচ্ছে হাতের ছাতা,
আর সকালের বা সর্বকালের পাণ্ডুর আকাশ চুঁইয়ে
ধূসর বৃষ্টি ঝরছে :
টিপ টিপ টিপ।
কলকল ক'রে ঝাঁজরি দিয়ে ভূনিম্ন নর্দমায় জল পড়ছে,
ফুটপাথে লেপ্‌টে আছে ছেঁড়া খবরের কাগজ।
এ বর্ষণে মত্ততা নেই, আছে ক্লান্তি,
এ দৃশ্যে উত্তেজনা নেই, আছে নৈরাশ্য,
যদিও কদাচ এমন বাড়িও চোখে পড়ে
যা নয় মৃতকল্প, এমন কি যা কল্পনাকে করে জাগ্রত,
যা, যদিও তার দুয়ারে নেই পুষ্পশোভিত যমজ তরু,
নেই অলস পারাবত, নেই উল্লসিত শিখী,
তবুও সবুজের ফালিটুকুর গাঢ় আত্মনিবেদনে,
স্নাত পত্রস্তবকে, স্থাপত্যবৈশিষ্ট্যে
দৃষ্টিভ্রম জাগায়, বুঝি বা অন্দরে আছে বিরহিণী—
অবশ্য সদর দরজা চিরবন্ধ এবং জানলার পিছনে অন্ধকার।

কেম্প্‌টাউনের চড়াই পথে বৃষ্টি সামলে আমি উঠছি,
আমার মনে আনাগোনা করছে আপনাদের খবরাখবর,
ছাইয়ের নিচে গুমরে উঠছে আগুন লাগার অনেক দুঃসংবাদ :
ক্ষুধার আগুন, ক্রোধের আগুন, হিংসার আগুন,
লেলিহান দুরাকাঙ্ক্ষার দুঃসাহসী সর্বগ্রাসী আগুন।
আর চিন্তা করছি : আপনারা যাঁরা
গদিতে, ফরাশে, ডিভানে,
চামড়া-আঁটা আরামকেদারায় কিংবা বাগানে-আনা বেতের চেয়ারে,
অথবা ফুটপাথে, তপ্ত মেঝেতে,

রোয়াকে, খিন্ন মোড়ায়, পড়ন্ত রোদে তেতে-ওঠা বারান্দায়
জল্পনা-কল্পনা করছেন,
আপনারা কিসের প্রতীক্ষা করছেন?

জমা জল এড়িয়ে শাড়ি সামলে আমি উঠছি,
হঠাৎ দেখি
ঐ বৃষ্টিতে ঠেলাগাড়ি সাজিয়ে পথে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ বেচছেন
লবণজলের একরাশি স্নেহার্ঘ্য, সদ্যঃস্নাত রৌপ্যচিক্কণ হেরিং :
টান-টান বুক-পিঠ-পেট-লেজ, অপ্রতিহত যৌবন,
নেতিয়ে পড়েনি সুন্দর শির, রক্তে উজ্জ্বল কানকো,
দৃঢ়বদ্ধ আঁশের কোট, মণিদীপ্ত স্থিরদৃষ্টি :
আশারিক্ত ধূসর সূর্যোদয়ের আশাতিরিক্ত সমুদ্রস্বপ্ন।

হেরিং সস্তায় বিকোয়, আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই,
ইলিশেরই সুদূর জ্ঞাতি, দৈর্ঘ্যে পার্শে-পাবদার অনুরূপ।
জনা দুই বিবর্ণ বৃদ্ধা খদ্দের দাঁড়িয়ে আছেন,
কিনছেন যেন লুকিয়ে-চুরিয়ে, পাছে জানাজানি হয়ে যায়,
লজ্জায়—সস্তার মাছ—কিংবা বড্ড বেশী খরচ হয়ে গেল,
হয়তো দুইই,
আমাকে দেখে স্মিত হাসলেন ভীরু হাসি,
আঙুল বোলালেন ম্লান বর্ষাতিতে,
পেনিগুলো ঢেকেঢুকে এগিয়ে দিলেন,
যদিও আমিও সাগ্রহে ভিড়লাম তাঁদেরই দলে,
বার করলাম আমার পেনিসংগ্রহ।

'পরিষ্কার ক'রে দেবো কি ম্যাডাম?'
'না না', আমি বাধা দিয়ে উঠলাম,
কারণ এখানে পরিষ্কার করা মানে তো শুধু
মুড়োগুলো কেটে বাদ দেওয়া,
যেগুলো আমি অবশ্যই চাই,
এবং ডালায় দেখি কাটা মুণ্ড কয়েকটা পড়ে আছে,
'কিছুই ঝামেলা নয়, ম্যাডাম',
কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অন্য কথায় ভুলাই :
'না না, আমি রান্নে খাবো, আঁশ গায়ে থাকলে টাটকা থাকবে—'
এরা মাছের মুড়ো খায় না,
কী যে হারায় জানে না একেবারেই।

ফিরতি পথে আর হাঁটা নয়, এবারে বাসে,
আমার মনের কেন্দ্রে একটি উত্তপ্ত বিন্দু,
কারণ আমার ব্যাগে রয়েছে সমুদ্রের উপহার,
আর ঘরে রয়েছে সম্পূরক উদ্ভিদ-ওষধিদের সমাহার,
চাল-তেল-সব্জি-মসলা।

হে ঝঞ্ঝাপ্রিয় শীতসমুদ্রের অধিদেবতা,
আপনাকে আমি অভিবাদন করি,
হে ইংলিশ চ্যানেলের হেরিং,
তুমি আমার পূজ্য;
কারণ আরও অন্যান্য প্রবাসী বাঙালীদের মত
আমাকেও তুমি বাঁচিয়ে রেখেছো,
তোমার আত্মদানে আমার মুক্তি।

জানি না স্থানীয় অধিবাসীরা তোমাকে কিভাবে সেবা করে,
আচার তাদের সীমিত, হোম তাদের সংক্ষিপ্ত,
কিন্তু আমি ষোড়শ উপচারে তোমাকে আরাধনা করি,
ঘ্রাণে-স্বাদে-সজ্জায়, সম্মিলিত উপকরণে :
গ্রহণ করি আমার দেহে তোমার যা-কিছু গ্রাহ্য,

ন্যূনতম বর্জন করি, যেটুকু না করলে নয়,
নিবিড় প্রেমে তোমাকে আমি আপনার অংশ করি,
তোমাতে আমার জীয়ানরস,
তোমার চর্বণে আমার পুষ্টি,
তোমার রসাস্বাদনে আমার মানসের স্বাস্থ্য।

কারণ আমরাই অন্ন,
অন্নের রূপান্তরে আমাদের স্নায়ু, অস্থি, মেদ, মজ্জা,
আমাদের মস্তিষ্কের ক্ষীণ বা স্ফীত চিন্তার বহতা নদী-উপনদী,
মানিনীর ত্বক্-লাবণ্য,
যুবকের নাগর হাস্য,
আমাদের গর্বিত ইন্দ্রিয়বর্গের কোলাহল বা যুক্ত নৃত্য;
অন্নবলে আমাদের উদ্যম,
বাণিজ্য, সাম্রাজ্য, যূথচারী আস্ফালন,
মহাকাশলম্ফন, সন্তানপ্রজনন,
ট্র্যাজেডি, কৌতুক, সংগীত, বিজ্ঞান।
কারণ আজ আমি হেরিং-এর ভোক্তা
এবং কাল আমি মহাকালের ভোজ্য।
সেই মহাদংষ্ট্রায় আমি যেদিন নিঃশেষে চর্বিত হবো
আমার কোনো আক্ষেপ থাকবে না।
রূপান্তরই শাশ্বত ধর্ম।

মা গো তোমার শিলনোড়া বেয়ে এখনও হলুদজল পড়ে,
উনুনে উথলে-ওঠা ডালের ভোপ,
খুরিতে পাঁচফোড়ন, কালো জিরে,
তোলাতে কাঁচা লঙ্কার ঘ্রাণ দেহমন আকুল করে।
তোমার রান্নাঘরে নেই যন্ত্রের বাহার, বিদ্যুতের আতিশয্য,
আছে টিনের ছোট বাক্সে কালদষ্ট ছুরি, চামচ, হাতা,
আছে জালের পিছনে কৃচ্ছ্রসাধনায় সঞ্চিত
একটু তেল, একটু চিনি, একটু আটা।
কিন্তু তোমার রান্নাঘরে আছে অন্নপূর্ণার দেশের রন্ধনৈতিহ্য,
আছে প্রাণপ্রতিষ্ঠার, জীবনসম্ভোগের
নন্দিত ইতিহাসের ছিন্নপত্রে রচিত
বঞ্চিত বর্তমানের ধূমক্লিষ্ট স্বাক্ষর।
তোমারই তপ্ত কটাহে শাকান্নের শত রূপান্তর।

অথচ উদ্যম বিনা অন্ন নেই,
যেমন প্রযত্ন ব্যতীত রন্ধনে আসে না দ্রৌপদীনৈপুণ্য,
শ্রম ব্যতিরেকে কোথায় শস্যের উৎপাদন,
ভোর রাত্রের জলে হাঁটু না ডোবালে জালে ধরা দেয় না মাছ।
এক করতে হবে সূর্যের দ্যুতি আর মৃত্তিকার রস,
মাটিতে হবে পাঁক, হাতড়াতে হবে নোনা জল,
জানতে হবে সহস্র কোটি রূপান্তরের বাঁকে বাঁকে
সেই তারাতৃণজলস্পন্দভূগর্ভপ্রোথিত মহাপ্রাণকে
আপনি যার কণিকামাত্র,
যাকে না জানলে আপনারই অবক্ষয়,
কারণ উদ্যোগ বিনা সৃষ্টি নেই,
তাই একদা মেঘের উদ্দেশ্যে উঠতো মন্ত্রপূত হবির্ধূম,
অথবা ধরিত্রী সিঞ্চিত হত রক্তে;
আপনাদেরও চাই যুগোপযোগী যজ্ঞসাধন,
প্রজ্বলন : সেই অগ্নির, যা ক্ষোভের নয়, ব্রতের;
উত্তরণ : আলস্যে নয়, গুহকের মৈত্রীবন্ধ স্রোতসহিষ্ণু নৌকায়;
সেই মহাহবনের আপনারা হন হোতা;
পুরাতনের গর্ভেই তো নবজাতক সুপ্ত থাকে,
আনুন তাকে আলোকচেতন কর্মমুখর প্রাতর্বিশ্বে।

সুনন্দর জার্নাল

'কলকাতার ট্রাম'

মনে হয়েছিল, এই যাত্রাই বোধ হয় অগস্ত্য-যাত্রা, কিন্তু না—ট্রাম আবার ফিরে এসেছে কলকাতায়। তার আবির্ভাবের নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া গেল কাল সন্ধ্যে-

দরজা বেশী চওড়া। টিকিট ফাঁকি দেওয়া সহজ
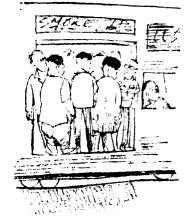
[illegible]

অফিসের পথ আরো সুগম হল কিনা, মোটরচারীদের স্বচ্ছন্দ-বিহার আরো বিঘ্নিত হল কিনা, এ-সব আলোচনারও দরকার নেই। আসল কথা ট্রামহীন কলকাতা কল্পনাই করা যায় না। যেমন ভাবা যায় না মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল বিহীন কলকাতার ফুটবল মাঠ, যেমন অকল্পনীয় তেলেভাজা-হীন বাগবাজার—ফুচকাওয়ালাবিহীন [illegible] পাদপদ্ম—পেনসনপ্রাপ্তবিহীন প্রভাতী লেক এবং তরুণ কবিবিহীন কলেজ স্ট্রীটের কফি-হাউস! ট্রাম না থাকলে কলকাতার বাস্তিচারিত্রই নেই, [illegible] কানপুর কিংবা কোয়েম্বাটুর কিংবা পুরোনো দিল্লী যা খুশি ভেবে নেওয়া চলে।

পৃথিবীর সব বড়ো শহরে ট্রাম গাড়ি এখন ব্যাক-ডেটেড, সব জায়গায় তার বিসর্জনের বাজনা বাজছে। কিন্তু আমরা অত সহজেই আমাদের ট্র্যাডিশনকে বিদায় দিতে রাজি নই। একদা এই শহরের খ্যাতি ছিল 'সিটি অভ নাববস্' বলে; আজ নবাবী নেই, কিন্তু জীর্ণবাসে এবং দীর্ণ প্যালেসে এখনো সেই মহিমার সুরভি, এখনো যেন মহারাজের কলকাতায় [illegible] হাওয়ায় ল্যাভেন্ডারের গন্ধ, [illegible] হাউসে এখনো [illegible] পদ-সঞ্চার, এখনো [illegible] ঘোড়ার খুরের শব্দ কেঁপে কেঁপে ফিরছে।

সেই ধূসর অতীতের সঙ্গে [illegible] কলকাতার ট্রাম। কেরানীদের শেয়ারের গাড়ি ধীরে ধীরে বিদায় নিলে, এল ঘোড়ায় টানা ট্রাম, তারপর দেখা দিল পাতা লাইনের ওপর সেই লাফিয়ে-চড়া সবুজ রঙের গাড়ীগুলো।

শিয়রে সর্বদাই শমন

তারপর সবুজের জায়গায় এল সাদা, মনোহর ডি-লাক্স গাড়ি, জনশ্রুতি শোনা যেত—শুধু এশিয়া কেন, সারা দুনিয়াতেই আরামে এবং সৌন্দর্যে কলকাতার ট্রাম অদ্বিতীয়।

পাঠক ইহাতে দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন, মাতৃভাষার লিখন-শৈলী বা পরিপাটীর উপরে আঘাত পড়িয়া বাঙ্গালী জাতির মনন ও চিন্তনের পক্ষে ইহা হানিকারক হইতেছে। এই নূতন পদ্ধতির সমালোচনায় আমার বিনীত প্রতিবাদ এই প্রবন্ধে নিবেদন করিতেছি।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাঙ্গলা সংবাদ-পত্রের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য, এবং বহু বৎসর ধরিয়া 'আনন্দবাজার' পত্রকারিতার মাধ্যমে বাঙ্গলা ভাষার অতন্দ্র সেবা করিয়া আসিয়াছে, সে সেবা বাঙ্গালী ভুলিবে না। বাঙ্গলা গদ্যের এ যুগের উপযোগী বিবর্তনে, 'আনন্দবাজার'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও সংবাদ-পরিবেশন বিশেষ লক্ষণীয় শক্তি সৌন্দর্য ও শালীনতা আনিয়া দিয়াছে। যে কোনও আধুনিক চিন্তাধারা ও তথ্য এবং তত্ত্ব, সহজে সাবলীল ও সুন্দর-ভাবে আমরা বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারি বলিয়া মনে-মনে যে গর্ব পোষণ করি, তাহার পিছনে আছে 'আনন্দবাজার' ও অন্যান্য বাঙ্গলা পত্র পত্রিকার পরিচালকদের মাতৃভাষার প্রতি অতুলনীয় প্রীতি ও শ্রদ্ধা এবং মাতৃভাষার চর্চা সম্বন্ধে তাঁহাদের ধীর, স্থির এবং বিচার- ও যুক্তি-পূর্ণ নিষ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, ভূদেব, চন্দ্রোদয়, কালীপ্রসন্ন, ব্রহ্মবান্ধব, পাঁচকড়ি প্রমুখ বাঙ্গলা পত্রকার-জগতের নমস্য পথিকৃৎদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এ যুগের 'আনন্দবাজার'-এর সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও প্রফুল্লকুমার সরকার এবং ইঁহাদের সহকর্মীরা, বিচার আলোচনা, তথ্যজ্ঞাপন প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষাকে কতটা না শক্তিশালী করিয়া গিয়াছেন! বিদেশী বহু বহু শব্দের কত সুন্দর সহজবোধ্য বাঙ্গলা অনুবাদ দিনের পর দিন ইঁহারা বাঙ্গলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারে আনিয়া দিয়াছেন, সেই-সব শব্দ আবার বহুশঃ সহজেই বাঙ্গালী গ্রহণ করিয়াছে, এবং লিখিত সাহিত্যের বাহিরে কথায়-বার্তায়-ও ব্যবহার করিতেছে। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, পারিভাষিক, সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় ও সহযোগিতায় আমাদের মাতৃভাষা সমৃদ্ধ হইতেছে। বাঙ্গলার লিখন-পদ্ধতিতে, —ইহার বানানে—আধুনিক বাঙ্গলার পক্ষে আবশ্যক এ-কালের উপযোগী নানা পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বাঙ্গলা বর্ণমালায় বিন্দুযুক্ত 'ড় ঢ় য়' বর্ণত্রয় স্থান পাইয়াছে, বাঙ্গলা ছাপার হরফের দেখাদেখি হিন্দীর জন্য নাগরীতে-ও 'ড় ঢ়' গৃহীত হইয়াছে (কিন্তু মারাঠী গুজরাটীতে ও দক্ষিণের দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে এইরূপ বিন্দুযুক্ত 'ড় (ঢ়)' স্বীকৃত হয় নাই)। রেফের নীচে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব, অনাবশ্যক বিধায়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনে, এখন প্রায় সর্বত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে—আমরা শত বৎসর পূর্বের মত আর 'র্ক্ক, র্ত্থ, র্গ্গ, র্ঘ্ঘ, র্চ্চ, র্চ্ছ, র্জ্জ, র্ঝ্ঝ, র্ত্ত, র্দ্দ র্দ্ধ র্ব্ব র্ব্ভ, র্ম্ম' প্রভৃতি লিখিতেছি না, ছাপা-খানাতে এই রেফযুক্ত দ্বিত্ব ক্রমে বিরল হইয়া পড়িতেছে—আমরা 'র্ক, র্খ, র্গ, র্ঘ, র্চ র্ছ, র্জ, র্ঝ, র্ত, র্দ, র্ধ, র্ব, র্ভ, র্ম' ইত্যাদি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইতেছি (যদিও আমার মতে আমরা ভুল করিয়াই 'র্য্য' স্থলে 'র্য' গ্রহণ করিতেছি—সমগ্র বাঙ্গলার উচ্চারণ বিচার করিলে 'র্য্য' লেখাই ঠিক, কারণ বাঙ্গলা 'র্য্য' উচ্চারণে ঠিক রেফের নিচে 'য' (বা 'য়')-র দ্বিত্ব নহে, ইহা হইতেছে 'র্জ্য'—অর্থাৎ রেফ-যুক্ত 'জ'-এ য-ফলা, এই য-ফলা কার্যতঃ দ্বিত্ব 'য়'-নহে, ইহা বাঙ্গলায় কোনও-না-কোনও প্রকারে রক্ষিত হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় 'ধর্ম, তর্ক, অর্থ, পার্থ' ইত্যাদির উচ্চারণ 'ধর্-ম, তর্-ক, অর্-থ, পার্-থ', কিন্তু 'কার্য্য, আর্য্য = কার্জ্য, আর্জ্য', বহুশঃ উচ্চারণে 'কাইরজ, আইর্জ'; সেইরূপ 'বাক্য, মন্য—বইক্ক মইন্ন, —য-ফলার এই বিশেষ উচ্চারণ পূর্ব-বঙ্গের কথা ভাষায় সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে রক্ষিত হইয়া আছে।) ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ বাঙ্গলা বানানে বজায় রাখিবার জন্য নূতন সংযুক্ত বর্ণ 'স্ট' বাঙ্গলা হরফে স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে (যদিও ভুল করিয়া বহু স্থলে 'ষ্ট'-এর বদলে 'স্ট' লিখিয়া খাঁটি-খাঁটী বাঙ্গালীর পাইয়া বসিয়াছে এমন বিদেশী শব্দও—যেমন 'মাস্টার, খৃস্ট, ইস্টিশন'—শুদ্ধ বাঙ্গলা রূপ 'মাষ্টার, খৃষ্ট, ইষ্টিশন' স্থলে)। ইংরেজী Z-এর ধ্বনির জন্য বাঙ্গলা বর্ণমালায় বিন্দুযুক্ত 'জ' (বা রেখাযুক্ত 'জ'), এইরূপ আবশ্যক চিহ্ন-দেওয়া নূতন হরফের ব্যবস্থাও কোনও-কোনও ছাপাখানায় করা হইয়াছে; এবং ভাষাতাত্ত্বিক ও অন্য বিশেষ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় বিন্দুযুক্ত 'খ., ঘ., ঝ., ফ., ভ., থ., ধ.,' প্রভৃতির কথাও আমরা ভাবিতেছি।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র মারফৎ বাঙ্গলা ছাপার কাজে ও সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্গলা বানানে এক অতি আবশ্যক নূতন পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে—বাঙ্গলা লিনো-টাইপ। ইহার প্রসাদে বাঙ্গলার অনেকগুলি সংযুক্ত-বর্ণ নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে বাঙ্গলা বর্ণবিন্যাসের প্রকৃতির কোনও বিপর্যয় বা হানি হয় নাই, বরং কোনও-কোনও ক্ষেত্রে এই নবীনতা সহজবোধ্যতা আনিয়া দিয়াছে। যেমন 'স্থ' স্থানে 'স্থ', 'ঙ (এঁচ)' স্থলে 'ঞ্চ' 'ঙ্ক' স্থলে 'ঙ্ক'। কিন্তু বাঙ্গলায় 'ক্ষ'-র উচ্চারণ 'খ্খ', সেইজন্য এখানে পরিবর্তনের চেষ্টা হয় নাই। —'ক্ষ' লিখিলে সংস্কৃত উচ্চারণ অনুসারে শুদ্ধ বানান হইত বটে, কিন্তু বাঙ্গলা উচ্চারণে তাহা চলিত না।

এখন যে ভাবে বাঙ্গলা বানানে ইংরেজী নাম ও শব্দ লিখিবার চেষ্টা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'তে চলিতেছে, সেটি নানা দিক্ হইতে বাঙ্গলা লিপি এবং বর্ণবিন্যাসের ও তৎসঙ্গে বাঙ্গলা উচ্চারণ-রীতির সামঞ্জস্য রাখিয়া হইতেছে না।

[১] প্রথম কথা—বাঙ্গলা লিপির পৃথক্ 'বর্ণ'গুলির প্রত্যেকটি-ই মূলতঃ একটিমাত্র ধ্বনির নির্দেশক, কিন্তু কার্যতঃ বাঙ্গলা বর্ণবিন্যাসে আবার প্রত্যেকটি 'অক্ষর' সাধারণতঃ একাধিক ধ্বনির সমাবেশ দ্যোতনা করে। অর্থাৎ মূলে ইহা alphabetic অর্থাৎ পৃথক্-পৃথক্ ধ্বনির প্রকাশক সরল বর্ণের সমবায়ে বা বর্ণমালাতে আধারিত; কিন্তু প্রয়োগে ইহা syllabic, অর্থাৎ একাধিক ধ্বনির পাশাপাশি অবস্থানের সূচনা করে এমন কতকগুলি জটিল অক্ষর লইয়া গঠিত। রোমান লিপি মূলে alphabetic, প্রয়োগেও alphabetic; অর্থাৎ কোনও শব্দের ধ্বনিমূলক বিশ্লেষণে পর-পর যে ভাবে ধ্বনিগুলিকে পাই, সেগুলির প্রকাশক বর্ণগুলিকে পর-পর লিখিয়া গেলেই, শব্দটির বানান দাঁড়াইয়া গেল। যেমন 'স্নিগ্ধেন্দু', এই শব্দটি; ইহাতে পর-পর এই কয়টি ব্যঞ্জন ও স্বর পাইতেছি—স্+ন্+ই+গ্+ধ্+এ ন্+দ্+উ—এই প্রত্যেকটি বর্ণ এক একটি পৃথক ধ্বনির নির্দেশক। রোমান লিপিতে s+n+i+g+dh+e+n+d+u, এবং রোমান লিপিতে বানানে পর-পর ধ্বনি-দ্যোতক বর্ণগুলিকে বসাইয়া দিলেই হইল—snigdhendu; কিন্তু বাঙ্গলায় অন্য রীতি—দুইটি ব্যঞ্জনের মধ্যে কোনও স্বরধ্বনি না আসিলে, সেই ব্যঞ্জনের বর্ণ দুইটিকে একসঙ্গে পিণ্ডিত করিয়া দেওয়া হয়; এবং উপরন্তু স্বরধ্বনির বর্ণ-গুলি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করিয়া, উচ্চারণে যে ব্যঞ্জনের পরে এই স্বরধ্বনি আসে, তাহার গায়ে পাশে মাথায় পায়ে স্থান পায়। ইংরেজীর strength-এর মত শব্দকে বাঙ্গলা বর্ণমালায় 'স ট র এ ঙ গ থ' লিখিতে চাহিলে, বা sergeant-কে 'স এ (বা অ) র জ এ ন ট' লিখিতে চাহিলে, বাঙ্গলা বানানের পিছনে (ব্রাহ্মী লিপি হইতে শুরু করিয়া) যে ৩।৪ হাজার বছরের একটা পরম্পরা আছে, যে পরম্পরা সুপরিচিত, সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজনমান্য, তাহাকে অস্বীকার করা হয়। তেমনি রোমান লিপিতে পূর্ণরূপ ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণ দিয়া s-t-r-i=stri, বাঙ্গলায় 'সতরঈ' বা 'স্‌ত্‌র্‌ঈ' অচল, আমরা লিখি 'স্ত্রী'। রোমান লিপিতে u-r-dh-v-a; urdhva, বাঙ্গলায় 'উ-র-ধ-ব-অ' নহে, 'ঊর্দ্ধ'।

এইভাবে বাঙ্গলা বানানকে রোমান পদ্ধতির নকলে ঢালিয়া সাজিবার প্রয়াস

দুই একবার যে না হইয়াছে তাহা নয়— বাঙলা 'বর্ণ-পরিচয়, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ' এইভাবে লিখিত ও মুদ্রিত করিবার প্রস্তাব একাধিকবার হইয়াছিল, যথা—'ব অ র ণ অ প অ র ই চ অ য় অ, প র অ থ অ ম অ ও দ ব ই ত ঈ য় অ ভ আ গ অ' এইরূপে। দেখা গেল, ইহা চলিবে না;— জটিল বাঙলা বর্ণগুলির সঙ্গে সরল রোমান হরফ সাজাইবার কায়দার গাঁঠ-ছড়া বাঁধা—ইহা হইল 'ধোবী-কা কুত্তা, ন ঘর-কা ন ঘাট-কা।' ইহার চেয়ে সোজা রোমান লিপি গ্রহণ করাই বেশি যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

বাঙলায় এবং অন্য ভারতীয় লিপিতে এগুলির আদিরূপে ব্রাহ্মী লিপির সময় হইতেই যে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলির একটা বিশেষ সার্থকতা বা উপযোগিতা আছে। দুই বা দুইয়ের অধিক ব্যঞ্জন ধ্বনির মাঝখানে যদি স্বর ধ্বনির ব্যবধান না থাকে, তাহা হইলে ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রকাশক বর্ণগুলিকে একসঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হয়। ভারতীয় লিপিতে প্রত্যেকটি স্বরবর্জিত ব্যঞ্জনবর্ণ একা থাকে না, তাহার সঙ্গে স্বভাবতঃ লাগিয়া মিশাইয়া থাকে 'অ' এই স্বরধ্বনিটি। রোমান s, t হইতেছে 'স্', 'ত্', কিন্তু বাঙলা 'স', 'ত' হইতেছে 'স্+অ, ত্+অ'। এই অকারের ধ্বনির অনুপস্থিতি দেখানো হয় দুই উপায়ে— ব্যঞ্জন-বর্ণের নিচে '্' চিহ্ন- 'বিরাম' চিহ্ন (বাঙলায় যাকে 'হসন্ত-চিহ্ন') বসাইয়া, অথবা দুইটি বা ততোধিক ব্যঞ্জন ধ্বনি এইভাবে মাঝে স্বরধ্বনির ব্যবধান না থাকিয়া পাশাপাশি আসিলে দুইটি ব্যঞ্জন-বর্ণকে জুড়িয়া দিয়া— যেমন 'স্ত' st, 'প্ত' pt. রোমান-লিপিতে যেমন। এইরূপে চিহ্নিত বা সংযুক্ত ব্যঞ্জনের রূপ, বহু শতাব্দী ধরিয়া বিবর্তনের ফলে, একেবারে অন্য প্রকারের হইয়া গিয়াছে। যেমন 'ক্+ষ=ক্ষ' (বাঙলায় অনেক উচ্চারণ বদলাইয়াছে— 'খ', 'জ্+ঞ=জ্ঞ' (বাঙলা উচ্চারণ 'গ্গঁ'); 'হ্+ম=হ্ম' (বাঙলায় 'ম্ভ')। ব্যঞ্জনধ্বনি 'র' অন্য কোনও ব্যঞ্জনের পূর্বে আসিলে, তাহার রূপ হয় 'র্' (রেফ), পরে আসিলে '্র' (র-ফলা); যেমন 'র্+ব=র্ব', 'র্+ম=র্ম' কিন্তু 'ব+র=ব্র, ম+র=ম্র'। অন্য ব্যঞ্জনের পরে 'য' তেমনি '্য' (য-ফলা) হইয়া দাঁড়ায়— 'ক্+য=ক্য, ব+য=ব্য'। এই রূপে সংযুক্ত-বর্ণের মধ্যে রেফ, র-ফলা, য-ফলা—প্রথম হইতেই বাঙলা লিপির একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া আছে। 'আনন্দবাজার'-এর এই নূতন বানানে দেখিতেছি, রেফ-এর সম্বন্ধে একটা বিশেষ বিতৃষ্ণা। আমরা তো বাঙলা বানান হইতে সংযুক্ত-বর্ণ তাড়াইয়া দিতে পারিতেছি না। সংযুক্ত-বর্ণের পরিবর্তে কেবল হসন্ত-চিহ্ন দিয়া লিখিবার চেষ্টা কি হাস্যকর এবং হৃদয়বিদারক বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা এক শ্রেণীর বাঙলা টাইপরাইটারে লেখা (বা ছাপা) চিঠি-পত্র দেখিলেই বুঝা যায়। রেফ বর্জন করিলে, বা সংযুক্ত-বর্ণ তুলিয়া দিলে, উচ্চারণের সুবিধার জন্য বাঙলা রীতি অনুসারে হসন্ত-চিহ্ন বেশি ব্যবহার করিতে হয়। ইহাতে লিখিতে অনেক বেশি স্থান লাগিয়া যায়, এবং রেফ-যুক্ত সংযুক্ত-বর্ণ স্থলে পুরো 'র' লিখিলে, কোন্ দিক্ হইতে বানানের উন্নতি হইল তাহা বুঝা যাইতেছে না, 'মোছ কামাইয়া মড়া হাল্কা করণ'-এর মত তাহা নিরর্থক এবং কষ্ট-দায়ক। শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী গত ২রা পৌষ ১৩৭৩-এর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-তে লিখিয়াছেন—'যোয়ান অব আরক ও যোয়ানের আরক এক জিনিস নয়'—অতি

সত্য কথা; কিন্তু 'যোয়ান অব আর্ক' লিখিলেই সন্দেহ থাকে না, কোন্‌টা ফরাসী নাম, আর কোন্‌টা বাঙ্গলা শব্দ।

[২] রেফ-যুক্ত ও অন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্জন করিয়া এবং হসন্তের প্রয়োগ না করিয়া, এই বানানে বাঙ্গলা উচ্চারণ-রীতি ও বাঙ্গলা বানানের সঙ্গে যে একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ বিদ্যমান তাহাকে ছিন্ন করিবার নিষ্কারণ অপচেষ্টা হইতেছে মাত্র। বাঙ্গালীর মুখে শব্দের অন্তে দুইটি ব্যঞ্জন-ধ্বনি পর-পর আসে না, আসা কঠিন। বাঙ্গলায় আগত সংস্কৃত শব্দের অন্ত্য-অ-কার বর্জনের দিকে বাঙ্গলা ভাষার (হিন্দী মারাঠী গুজরাটীর মত) একটা প্রবণতা আছে। কিন্তু শেষের অক্ষরে দুইটি ব্যঞ্জন পর-পর আসিলে, বাঙ্গলায় অন্ত্য অ-কার লুপ্ত হয় না, হিন্দী প্রভৃতিতে হয়। হিন্দী উচ্চারণে 'নন্দ=নন্দ্, চন্দ্র=চন্দ্‌র্, ধর্ম—ধর্‌ম্, বজ্র=

বজ্‌র্,

ভক্ত=ভকত্, কণ্ঠ=কণ্‌ঠ্, অর্ক=

অর্‌ক্,

কর্ম=কর্‌ম্, গৃহস্থ=গৃহস্‌থ্, সহ্য= সহ্‌য্, ন্যায়=ন্যায়্‌য্, বন্দ্য=

বন্‌দ্‌য্,

পক্ষ=পক্‌ষ্, লক্ষ্য=লক্‌ষ্‌য্' ইত্যাদি। বাঙ্গালীর মুখে এইরূপ উচ্চারণ আদৌ হয় না। বিদেশী শব্দে যদি শেষে পর-পর দুইটি ব্যঞ্জন-ধ্বনি থাকে, শব্দটি বাঙ্গলায় আসিয়া গেলে সেই শব্দের অন্ত্য দুইটি ব্যঞ্জনের পরে, তাহাদের যেন বসিবার আসন রূপে, একটি স্বরধ্বনি আনিয়া দিতে হয়; অথবা সংযুক্ত ব্যঞ্জন দুইটিকে ভাঙ্গিয়া মাঝখানে একটি নূতন স্বরধ্বনি বসাইয়া দিতে হয়। যেমন ফারসী 'ganj গন্‌জ্'=বাঙ্গলায় 'গঞ্জ=গন্‌জো'; lafz= লফ্‌জো, লব্জো; fard ফর্দ্=ফর্দ (ফর্দো); khusk খুস্‌ক্=খুস্কি; chust চুস্‌ত্=চোস্ত (চোস্‌তো); shinakht শিনাখ্‌ৎ=সনাক্ত, শনাক্ত; waqt ব্‌ক্‌ৎ=ওক্ত (ওক্‌তো); shahr শহ্‌র্=শ-হর্ (shohor); hazm=হজ্‌ম্=হজম্ (hojom); narm = নর্ম্ = নরম্ (norom); sharm শর্ম্ = সরম্, শরম্ (shorom); nazr নজ্‌র্=নজর্ (nojor); qufl কুফ্‌ল্=কুলুফ্= কুলুপ্; gharz ঘর্‌জ্=গরজ্; 'aql' অক্‌ল্=আ-কল, আক্কেল (akkel); mard মর্দ্=মর্দ, মদ্দ, মরদ (marda, madda, morod); hadd হদ্‌দ্=হদ্দ (hadda); harf হর্ফ্=হরফ্ (horoph); hast-nest হস্ত-নেস্ত=বাঙ্গলায় অ-কারান্ত 'হেস্ত-নেস্ত'—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইংরেজী নাম ও শব্দের বেলায়ও ঠিক তাই: desk বাঙ্গালীর মুখে 'ডেস্‌ক, ডেকস= desko, dekso'; box=বাক্স bakso; mutton (=matn)=মটন (matan); cotton (=kotn)=কটন (katan), cycle (=saikl)=সাইকেল (saikel); inch=ইঞ্চি (inchi); bench=বেঞ্চি (benchi); marble (mar-bl)=মারবেল (marbel); table (=tei-bl)=টেবিল (tebil); guard=গারদ (garod); mark=মার্ক (marka); gilt=গিল্‌টি (gilti); kettle (=ketl)=কেট্‌লি, কাত্‌লি; bottle=বোতল (bo.tol; পোর্তুগীস botelha-র প্রভাব থাকিতে পারে) film=ফিলিম (স্বরের আগম); lamp=লাম্প, লম্প (ল্যাম্‌পো, লম্‌পো); bolt=বোল্‌টু (boltu) ইত্যাদি।

এখানে একটা কথা লক্ষণীয়। যে কোনও সংস্কৃত শব্দকে (তাহা কোনও সংস্কৃত গ্রন্থ হইতেই হউক অথবা কোনও সংস্কৃত অভিধান হইতেই হউক) সরাসরি বাঙ্গলা ভাষায় গ্রহণ করিয়া ব্যবহার করা যায়—বাঙ্গলার প্রকৃতিই এই, ইতিহাসও এই। বাঙ্গলার সঙ্গে সংস্কৃতের একটি নাড়ীর টান বাঙ্গলা ভাষার বিকাশের পূর্বে হইতেই আছে, সেইজন্য ইহা সহজ ও সম্ভব হইয়াছে। তেমনি, খ্রীষ্টীয় পনেরোর শতকের শেষ হইতে, মুসলমান দরবারের ও বিদেশী মুসলমান রাজার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাষা বলিয়া, বাঙ্গালী যত্ন করিয়া ফারসী ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিয়া যায়, এবং আবশ্যক ও গ্রহণযোগ্য হইলে ফারসী ভাষার শব্দ বাঙ্গলায় ব্যবহার করিতে বাঙ্গালীর (বিশেষতঃ ফারসীর সঙ্গে যাহার পরিচয় ছিল—এমন শিক্ষিত বাঙ্গালীর)—আটকাইত না। তদ্রূপ, আজকাল ইংরেজীর সঙ্গে অতি-পরিচয়ের ফলে, এবং ভারতের জীবনের প্রতি স্তরে, ইংরেজীর ক্রম-বর্ধমান প্রভাবের ফলে, আমরা এখন অবলীলাক্রমে যে কোনও ইংরেজী শব্দকে আমাদের মাতৃভাষায় ব্যবহার করিতে পারি, এবং করিয়া থাকি। যাহারা ইংরেজী শিখে নাই বা জানে না, তাহারা এই সকল নবাগত ইংরেজী শব্দকে বাঙ্গালীর উচ্চারণ-মোতাবেক বদলাইয়া সেগুলিকে বাঙ্গলা শব্দ বানাইয়া লইয়া ব্যবহার করিবে। কিন্তু ইংরেজী ইস্কুলের মাধ্যমে ইংরেজী সর্বত্রই পড়া হয়, সকলেই ইংরেজী শিখিবার জন্য ও বলিবার জন্য আগ্রহান্বিত। এই ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে, মাতৃভাষায় আগত ইংরেজী শব্দগুলি যে ভোল ফিরাইয়া বাঙ্গলা বনিয়া যাইবে, তাহার বিরুদ্ধে একটি মনোভাব এখন সদা-জাগ্রত ও সর্বদা কার্যকর হইয়া আছে। বাঙ্গালীর অভ্যস্ত উচ্চারণ অনুসারে এই-সব ইংরেজী শব্দে পরিবর্তন আনিলে, বিদেশী শব্দগুলি আজও 'গাঁইয়া' বা গেঁয়ো অর্থাৎ অশিক্ষিত গ্রামীণ শব্দ হইয়া দাঁড়াইবে—শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালী তাহা সুনজরে দেখিবে না, ইংরেজী শব্দকে যথাশক্তি ইংরেজী ধরণে বলিয়া বা লিখিয়া নিজ শিক্ষার—অর্থাৎ ইংরেজী জ্ঞানের—পরিচয় দিবে। তাহা হইলেও, যেভাবেই হউক বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরেজী শব্দ মূলে ভাষার উচ্চারণের অনুগামী করিয়া লিখিবার চেষ্টা আমরা করি না কেন, অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মত, বক্তার অজ্ঞাতসারে তাহার মুখের উচ্চারণে বাঙ্গালীপনা না আসিয়া থাকিতে পারে না। নানাভাবে ইহা প্রকট হয়। কতকগুলি পুরাতন ইংরেজী শব্দ কোট-পাতলুন ছাড়িয়া বাঙ্গালী ধুতি-চাদর পরিয়া ভোল ফিরাইয়া বসিয়াছে। যেমন 'round=রোঁদ; pauper=পঁপর; doctor=ডাক্তার; hundred (weight)=হন্দর; captain= কাপ্তেন; madam, ma'am=মেম; lord=লাড, লাট; general=gen'ral =jandral=জাঁদরেল; cord=কার; attorney=টর্নী; biscuit=বিস্কুট; engine=ইঞ্জিন; school=ইস্কুল; station=ইষ্টিশন; lanthorn (lantern-এর পুরাতন রূপ)=লণ্ঠন (হিন্দুস্থানীতে 'লালটেন'); diamond=ডায়মন; platoon=পলটন' ইত্যাদি। ইংরেজী না-জানা লোকের মুখে আমরা শুনি; 'fist= ফাস্টো বা ফাস্, last=লাস্টো বা লাস' (এখানে অন্ত্য সংযুক্ত-ব্যঞ্জনকে স্বরবর্ণের আশ্রয়ে আনা, অথবা সংযুক্ত-বর্ণের একটি বা দুটিকে লোপ করিয়া দেওয়া—যেমন 'second last=সেকেন্ লাস্; এবং 'ফাস্ট, সেকেন, থাড, ফোর্থ' ইত্যাদি 'গ্রাম্য' উচ্চারণে যাহা দেখা যায়)। অনেক ইংরেজী-জানা ব্যক্তি মনে করেন, তিনি গ্রাম্যতা-দোষ পরিহার করিয়া শুদ্ধভাবে বাঙ্গলায় আগত ইংরেজী শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, কিন্তু অনেক সময়েই যে তিনি বাঙ্গালীর সাধারণ উচ্চারণের ধারা অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না, তাহা ধরিতে পারেন না; 'হয়, Zানিতি পারো না।'

শব্দের শেষে সংযুক্ত ব্যঞ্জন-বর্ণকে ভাঙ্গিয়া বা বাড়াইয়া স্বরবর্ণের আশ্রয়ে আনিয়া যে বাঙ্গলা উচ্চারণের রীতি আছে, তাহার পরিপন্থী হইতেছে ইংরেজী ভাষার উচ্চারণ-রীতি, যে রীতিতে শব্দের শেষে একাধিক ব্যঞ্জন উচ্চারণ করিতে বাধা নাই। এই রীতি অনুসারে, উচ্চারণকে বাঙ্গলা লিপিতে দেখাইবার আবশ্যকতা হইলে, সহজ উপায় আছে—বাঙ্গলা লিখন-রীতিতেই তাহা বিদ্যমান। সেটি হইতেছে, সংযুক্ত বা মিলিত ব্যঞ্জনের, এবং সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক-মত বিরাম বা হসন্ত-চিহ্নের প্রয়োগ। বাঙ্গলা বর্ণমালা ও বর্ণ-বিন্যাস-রীতি ব্রাহ্মী লিপি হইতে বাঙ্গলা ভাষা জন্মগত অধিকারসূত্রে পাইয়াছে। ইহা আমাদের নিজেদের ঘরের বস্তু। বাঙ্গলা ভাষার উচ্চারণের সঙ্গে ইহার

অচ্ছেদ্য নাড়ীর যোগ আছে। খামখা ইহাকে আংশিকভাবে বর্জন করিয়া আমরা ধাঁধার সৃষ্টি করি কেন? ইংরেজীর first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, park, post card, Christ, part, and প্রভৃতি শব্দ আমরা সুষ্ঠুভাবেই লিখিয়া আসিতেছি—"ফার্স্ট্, সেকেণ্ড্ বা সেকণ্ড্, থার্ড্, ফোর্থ্, ফিফ্থ্ (ফ্+থ—সংযুক্ত-বর্ণ নাই), সিক্সথ্, সেভেন্থ্, এইট্থ্ (ট্+থ—সংযুক্ত বর্ণ নাই), পার্ক্, পোষ্ট্-কার্ড্, পোস্ট্-কার্ড্, ক্রাইস্ট্ (খ্রীষ্ট=পোর্তুগীজ, গ্রীক ও বাঙ্গলার সংমিশ্রণ-জাত খাঁটি বাঙ্গলা রূপ; পোর্তুগীস Jesu Cristo+গ্রীক Iesous Khristos=বাঙ্গলা যীশু খ্রীষ্ট; ইংরেজী Jesus Christ=জিসস্ বা জিজস্ ক্রাইস্ট্), পার্ট্ অ্যাণ্ড্" রূপে। তাড়াতাড়ি লেখার সুবিধার জন্য আবশ্যকমত আমরা হসন্ত-চিহ্ন বর্জন করিতে পারি এবং সাধারণতঃ করিয়া থাকিও। কিন্তু যতক্ষণ অন্য সাধারণ সংস্কৃত ও সংস্কৃতের নিকট হইতে গৃহীত বাঙ্গলা শব্দে সংযুক্ত-বর্ণকে বিদায় দিতে পারিতেছি না, তখন কেবল বাছিয়া বাছিয়া ইংরেজী শব্দের বেলায় এই সম্পূর্ণরূপে অবাঙ্গালী পদ্ধতি আনিয়া অযথা বিভ্রাট্ ঘটাই কেন?

[৩] এই নূতন পদ্ধতি আর একটি কারণে আপত্তিজনক। ইহা চলতি মৌখিক বাঙ্গলার কতকগুলি অত্যন্ত বিশিষ্ট উচ্চারণ-পদ্ধতিকে অস্বীকার করিয়া, বানানের প্রারম্ভিক উদ্দেশ্যকে নষ্ট করিতেছে। প্রথম কথা আগেই বলিয়াছি। বাঙ্গালীর মুখে শব্দের শেষে সংযুক্ত-ব্যঞ্জনের ধ্বনি আসে না। যেখানে এইরূপ অ-বাঙ্গালী উচ্চারণ দেখাইবার আবশ্যকতা, সেখানে সংযুক্ত-ব্যঞ্জনের জন্য যে-সব সংশ্লিষ্ট বর্ণ আমাদের বাঙ্গলা লিপিতে আছে, সেইগুলিই ব্যবহার করিতে হইবে। গায়ের জোর এখানে চলে না। ইংরেজী east শব্দকে যদি ইংরেজী উচ্চারণের প্রকাশ করিয়া বাঙ্গলা হরফে লিখিতে হয়, তাহা হইলে 'ঈস্ট্ (ঈস্ট্)' লেখা ছাড়া গতি নাই; ঈসট বা ঈসাট্ও লিখিতে পারি। কিন্তু 'ঈসট' লিখিলে বাঙ্গালী ইহাকে 'ঈ-শট' রূপেই পড়িবে, কদাচ সঙ্গতভাবে 'ঈস্ট্' পড়িবে না। রসবোধ-যুক্ত শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন, বাঙ্গলা লেখায় 'আরক' (আ-র-ক) হইতেছে উচ্চারণে 'আ-রক্ (arok)', কখনই 'আর্ক্ বা আর্‌ক্' (ark, Arc) নহে। তদ্রূপ 'নারদ, গারদ, বালক, চালক, কারক, রাসভ, পালক' প্রভৃতির দল ছাড়িয়া 'পারক' কখনও বাঙ্গালীর মুখে 'পার্ক্' বা 'পার্‌ক্' হইবে না। উপরন্তু বাঙ্গলায় 'পারক' (=পা-রক্) শব্দও আছে। বাঙ্গালী 'লিফট, পারট, এনড, থানট, চারজ, একস-রে, স্টারট, রেকরড, ডিসক, সিমেনট, আগসট' প্রভৃতি বানান দেখিয়া, এইরূপ শব্দকে (ইংরেজীর সঙ্গে পরিচয় সত্ত্বেও) li-fot লি-ফট্, pa-rot পা-রট্, e-nod এ-নড্, Tha-not থা-নট্, cha-roj চা-রজ্ (তুলনীয়, 'জারজ'), ekas-re একস্-রে (বা Ek-so-re, এক-শ' রে!), sta-rot স্টারট্, rek-rod রেক্-রড্, di-sok ডি-সক্, si-men-ot সি-মেন-অট্, ag-sot আগ-সট্' রূপে পড়িবে; বিশেষ করিয়া বহুকাল ধরিয়া তাহার কানে মোচড় দিয়া না শিখাইলে, সে এইরূপ বানান দেখিয়া মূল শব্দগুলি যে ইংরেজীর

lift, part, end, Thant, charge, X-ray, start, record, disk, cement, August প্রভৃতি—তাহা সে বুঝিতে পারিবে না। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় Guntur 'গুণ্টুর'-কে 'গুণ্তুর' বানানে পাইয়া একজন শিক্ষিত বাঙালী পড়িলেন 'গুনো-তুরো'! এইরূপ বানানে এখন 'হরেক রকম বাজী ও বারুদের কারখানা', এই বাক্যকে—'হরে করকম্‌বা জীওবা রুদে রকা রখানা' রূপে পরিবর্তন করার মত অবস্থায় আমরা পড়িয়া যাইতেছি।

কোন্ অধিকারে বাঙ্গলা ভাষার উচ্চারণ ও বানান রীতিকে আমরা এইভাবে দুমড়াইয়া মুচড়াইয়া, তাহাকে ইংরেজী বানানের পায়ের তলায় আনিতে চাহিতেছি? ইংরেজী p-a-r-k=park, উচ্চারণে 'পার্ক', ইংরেজীতে ঠিক; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে থাকিয়া টীকা-টিপ্পনী বা ব্যাখ্যা করিয়া না দিলে, 'পারক' বাঙ্গলাতে কিছুতেই 'পার্ক' হইবে না, হিন্দী বানানেও নহে—ইহা 'পা-রক' রূপে-ই পড়া হইবে, যদিও হিন্দুস্থানী বা হিন্দীতে দুই ব্যঞ্জন-ধ্বনি পর-পর শব্দের শেষে আসিয়া থাকে। হিন্দীতে 'নন্দ'-এর উচ্চারণ 'নন্দ্', 'বন্ধ'-এর উচ্চারণ 'বন্ধ্', কিন্তু ঐ ভাষায় কেহ 'ননদ, বনধ' লিখিবেন না। উর্দুর বানানে k-r-n দ্বারা 'কর্ন্', কির্ন্, কুর্ন্, করন্, কিরন্, কুরন্, করিন্, কিরিন্, কুরিন্ ইত্যাদি ইত্যাদি এতগুলি বিভিন্ন প্রকারের শব্দ লিখা যায়—কিন্তু বাঙ্গলা বানানে 'পারক' দ্বারা সহজভাবে 'পার্ক' পাঠ করা ভাষার প্রকৃতির বিরুদ্ধেই হইবে।

আরব্ধ এইরূপ বানানের পিছনে আছে—অযথা রেফ-ভীতি। আমরা 'অর্জুন' লিখিব (এখনও 'অরজুন' দেখি নাই), কিন্তু 'আর্জি, মর্জি' লিখিলেই কি বাঙ্গলা বানানে 'প্রগতি' আমদানি করা যাইবে? 'ইন্দোনেশিয়া'কে 'ইনদোনেসিয়া' (যাহা 'ই-ন-দো-নেসিয়া' রূপে বাঙালী পড়িবে) লিখিয়া, বা 'তুর্ক' স্থলে 'তুরক' লিখিয়া, কি সুবিধা করিলাম? এদিকে 'ট্র্যাক্ট' স্থলে 'ট্র্যাকট' লিখিতেছি, 'ট্রেনিং, প্রফেসর, ব্রিটিশ, ব্রাইট' প্রভৃতি শব্দের র-ফলা বর্জন করিয়া, 'টর্যাকট, টরেনিং, পরফেসর, বরিটিশ, বরাইট' লিখিবার দুঃসাহস করিতেছি না। শুধু 'রেফ' বর্জন করিলেই, তাহার গণ্ডা-গণ্ডা অপরিহার্য সংযুক্ত-বর্ণ-সমেত বাঙ্গলা লিখন-পদ্ধতিতে কী উন্নতি হইল—বিশেষতঃ যখন সহজ-বোধ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হইল? 'ন্ড, ন্ঠ, ক্ষ, ন্ধ, ম্ম, ন্ন' প্রভৃতি তো বাদ দিতে পারিতেছি না। স্বর্গত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গলা বানানে কতকগুলি সংশোধন আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলির একটি ছাড়া আর কোনওটি গৃহীত হয় নাই। নাগরী (হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী) বানানের নকলে অনুস্বার 'ং'-এর সাহায্যে সমস্ত বর্গীয় নাসিক্য-ধ্বনি জানাইবার প্রস্তাব তিনি করিয়াছিলেন—'শংকা, সংখ্যা, বংগ, সংঘ, অংচল (=অঞ্চল, অঞ্‌চল), উংছ (উঞ্ছ=উঞ্‌ছ), অংজন (=অঞ্জন অঞ্‌জন), ঝংঝা (=ঝঞ্ঝা, ঝঞ্‌ঝা), কংটক (=কণ্টক), কংঠ (=কণ্ঠ), অংড (=অণ্‌ড, অণ্ড), মেংঢক (=মেণ্ঢক) কাংত (=কান্ত), পংথা (=পন্থা), চংদন (=চন্দন), সংধ্যা (=সন্ধ্যা), চংপা (=চম্পা), লংফ (=লম্ফ), তাংবুল (=তাম্বূল), সংভার (=সম্ভার)'—এই-ভাবে লেখা। কিন্তু 'ং'-এর উচ্চারণ বাঙ্গলায় 'ঙ্' হইয়া গিয়াছে, সে উচ্চারণ বাঙ্গলা ভাষার বানান হইতে তাড়াইয়া দেওয়া আর সম্ভবপর নহে—লোকে যোগেশ বিদ্যানিধি মহাশয়ের বানান পড়িতে লাগিল—"পংডিতে করে গংডগোল, চংদ্রে আছে কলংক"। একমাত্র ক-বর্গের পূর্বেই অনুস্বার বিকল্পে মাত্র গৃহীত হইল কারণ, 'ং' হইয়া দাঁড়াইয়াছে কণ্ঠনাসিক্য 'ঙ' মাত্র।

এইরূপ বহু ব্যাপার হইতে দেখা যাইবে, হাজার বা দুই হাজার বছর বা তাহারও অধিককাল ধরিয়া যে লিখন-ধারা চলিয়া আসিয়াছে, তাহা হেলা-ফেলা করিয়া উড়াইয়া দিবার জিনিস নহে। বাঙ্গলায় আমরা যে 'ধর্ম, কর্ম, ভক্ত, গ্রাহ্য, লিপ্ত, বর্ধন' প্রভৃতি সংযুক্ত-বর্ণময় বানান লিখি, সেগুলি উচ্চারণ করি 'ধর্-ম, কর্-ম, ভক্-ত, গ্রাজ্-ঝ (মূলে উচ্চারণ ছিল গ্রাহ্-য), লিপ্-ত, বর্ধ্-অন্' ইত্যাদি। (বেশ দেখা যাইতেছে যে, ধৃ-ধর্, কৃ-কর্, ভজ্-ভক্, গ্রহ্-গ্রাহ্, লিপ্, বৃধ্-বর্ধ্'—এগুলি ধাতু, শব্দের মূলে অংশ, এবং শেষ অংশটুকু হইতেছে প্রত্যয়। ধাতু (অবিকৃত বা পরিবর্তিত রূপ)+প্রত্যয়—এই বিশ্লেষণ অনুসারে উচ্চারণ 'ধর্+ম, লিপ্+ত' ইত্যাদি।) রোমান লিপির সাহায্যে এই অসামঞ্জস্য সহজে দেখানো যায়—dhar—ma, kar—ma, bhak—ta, grah—ya, lip—ta প্রভৃতির পরিবর্তে dha—rma, ka—rma, bha—kta, gra—hya, li—pta রূপে যদি লিখি, তাহা হইলে যেন ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণ, উভয় দিকেই ভুল হয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা—বানানে এই ভুল বা বিপরীত রীতি কেন—'ধ—র্ম, লি—প্ত, ব—র্ধন, গ্রা—হ্য' এইভাবে লিখন কেন? 'ধৃ বা ধর্, বৃধ্ বা বর্ধ্, গ্রহ্ বা গ্রাহ্'—ধাতুর অর্ধেকটা রহিয়া গেল প্রথম syllable বা অক্ষরে, এবং বাকিটা গিয়া চড়িল প্রত্যয়ের মাথায়। অথচ, বৈয়াকরণ বিশ্লেষে পাইতেছি 'ধর্+ম, ভক্+ত, গ্রাহ্+য়' ইত্যাদি, কিন্তু লিখন-রীতিতে পাইতেছি 'ধ+র্ম (র্ম), বা ভ+ক্ত (ক্ত), বা গ্রা+হ্য় (হ্য= জ্ঝ)।' অক্ষর-বিভাজনে এই অসংগতি বা অসামঞ্জস্যের কারণ কী, তাহা আমি আমার বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্ববিষয়ক বড় বইয়ে ৪০ বৎসর পূর্বে আলোচনা করিয়াছি (Origin and Development of the Bengali Language, 1926, Vol. I, pp. 251 ff.) মূল কারণ হইতেছে, আমার জ্ঞান-গোচর মত, ভারতীয় আদি-আর্য ভাষা (বা বৈদিক) যুগের অবসান ও প্রাকৃত বা মধ্যকালীন ভারতীয় আর্য ভাষার যুগের আরম্ভের সময়ে, আর্য ভাষার উচ্চারণের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য। এখানে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তেমনি, আধুনিক বাঙ্গলাতে কতকগুলি নূতন উচ্চারণ-রীতি আসিয়া গিয়াছে। একটির নাম দিয়াছি—আধুনিক বাঙ্গলা ভাষার 'দ্বিমাত্রিকতা' (Di-metrism বা Bimorism)। আমরা বাঙ্গলায় এখন দুই মাত্রার বা দুই অক্ষরের শব্দই বেশী পছন্দ করি এবং ব্যবহার করিয়া থাকি। যেমন, 'করে=ক-রে, চলুকে=চল্-উক্, দেখলে= দেখ্-লে, যাবো=যা-বো, অমর=অ-মর্, জঙ্গল=জং-গল্, নর্তক=নর্-তক্, গায়ক= গায়্-অক্, কার্য=কার্-জ', ইত্যাদি। মধ্যযুগের বাঙ্গলায় ত্রিমাত্রিক বা ত্র্যক্ষর শব্দই বেশী ছিল—আধুনিক ওড়িয়ার মত। 'ক-রি-ব=করবো, দেখিবে=দেখ্-বে, হ-ই-ল =হলো, ব-সি-তে=বসতে, রা-খি-তাম= রাইখ্-তাম, রাখতাম' ইত্যাদি ইত্যাদি। মধ্যযুগের বাঙ্গলা, নব্য বা আধুনিক কথ্য বাঙ্গলাতে পরিণত হইবার অন্যতম কারণ-রূপে, ইহার পিছনে আছে এই আধুনিক দ্বিমাত্রিকতা। অবশ্য, একাক্ষর শব্দ প্রচুর আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র অবস্থিত একাক্ষর শব্দ বাঙ্গলায় দীর্ঘ করিয়া তাহাকে দ্বিমাত্রিক করিয়া লইয়া উচ্চারণ করিয়া থাকি—যেমন, 'জল=জ—ল্, আজ=আ—জ্, রাম=রা—ম্, হাত=হা—ত্, পা=পা—; তিন=তী—ন্, দেশ=দে—শ্' ইত্যাদি।

তিন মাত্রা বা তিন অক্ষরের শব্দ এখনও বাঙ্গলায় প্রচুর পরিমাণে আছে; কিন্তু আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে, দুই মাত্রার দিকে। তিন মাত্রার 'ভারতী, পূরবী, তপতী, নির্মলা, চঞ্চলা, ছলনা, বন্দনা, বঞ্চনা' প্রভৃতি প্রচুর শব্দ (বিশেষতঃ সংস্কৃত শব্দ) আছে, কিন্তু আবার 'কম্‌লা, বস্‌তি, অম্‌লা, রু-দ-গী স্থলে রুদ্‌গী (ফারসী নামে)' শোনা যায়। এ বিষয়ে হিন্দীর প্রভাবও কিছু পরিমাণে আসিতেছে—'জন্‌তা, মম্‌তা, ভার্‌তী' ইত্যাদি।

চারি মাত্রা বা চারি অক্ষরের শব্দ বা পদকেও আধুনিক চলিত বাঙ্গলায় আমরা

বিভাগ করিয়া বা ভাঙিয়া লইয়া দুইটি করিয়া দুই মাত্রার শব্দাংশে বদলাইয়া লই। যেমন 'অপরাজিতা=অপ্‌রা-জিতা বা অপ্‌রা-জিতে, পারি-তোষিক, অবৈ-তনিক, আন্‌-মানিক, অপ-দার্থ, অপ-রাধী, নিয়্‌-মিত' ইত্যাদি। তিন মাত্রার পদকে এখনও আমরা দুই মাত্রায় পরিবর্তিত করিয়া থাকি; যথা—'চাকর (=চা-কর)+ঈ= চাকরী, চাক্‌রি; পা-গল+আ=পা-গ-লা/ পাগ্‌-লা; বাঙ্গাল+আ—বাঙ্গা্‌লা; গলৎ, গলদ+ঈ=গল্‌তী; মাকড়+ঈ=মাক্‌-ড়ী; মহেশ+আ=ময়্‌শা; নরেশ+আ=নর্‌-শা (তুচ্ছার্থে); কালিয়া=কাই-ল্যা, কেলে; অধ-ইল্ল-আ/আধেলা/আধ্‌লা; করেল/করলা, কর্‌লা' ইত্যাদি। দ্বিমাত্রিকতা বজায় রাখিবার চেষ্টায়, প্রত্যয়যোগের পরে তিন অক্ষরের শব্দটির মাঝের অক্ষরের স্বরধ্বনি লুপ্ত হইল; ইহার ফলে দুইটি ব্যঞ্জন ধ্বনি বাঙ্গালায় নূতন বা পরিবর্তিত শব্দের মধ্যে এখন পর-পর আসিয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহা **শব্দের অভ্যন্তরে, অন্তে নহে।**

দ্বিমাত্রিকতার প্রতি বাঙ্গালাভাষীর এখন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। স্বর্গত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের একটি উদাহরণের কথা ধরা যাউক।—ফারসী শব্দ 'খ্বাব্‌গাহ্‌' অর্থ 'শুইবার গৃহ, নিদ্রামন্দির' (=সংস্কৃত 'স্বাপ-গাতু'), বাঙ্গলায় লেখা হয় 'খোয়াবগা'—বাঙ্গালী পাঠক ইহাকে পড়িলেন 'খোয়া-বগা', যেন দুই অক্ষরের দুইটি খণ্ড শব্দ। বিশেষরূপে চেনা শব্দ Communist-কে 'কমিউনিসট' এইরূপ বানানে পাইয়া, অনবধানতা-বশতঃ 'ক-মিউ-নি-সট' পড়িয়া ফেলিতে শুনিয়াছি। তেমনি 'অরডন্যানস' (ordnance) অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীর মুখে 'অ-রড্‌-ন্যান্‌-অস্‌ (o-rod-nan-os)'; 'অ্যানেকস' (annexe) হইয়া দাঁড়ায় 'অ্যা-নে-কস্‌' (a-ne-kos), 'বুরুনডি' (Burundi) হয় 'বু-রু-ন-ডি' (Bu-ru-no-di), 'উগানডা' (Uganda) হইয়া যায় 'উন-গা-ন-ডা' (U-ga-no-da), ইত্যাদি।

পাঞ্জাবীর গুরুমুখী বর্ণমালা নাগরী বাঙ্গালার তুলনায় একটি অসম্পূর্ণ লিপি, তাই গুরুমুখীতে সংস্কৃত শব্দের পাঞ্জাবী বিকৃতি ধরিয়া উহারা বানান সহজ করিয়া লইয়াছে—'দরোপ্তী'='দ্রৌপদী'; 'চংদরগুপত=চন্দ্রগুপ্ত; 'পরাপত='প্রাপ্ত'; 'অতিয়াশচরজ'='অত্যাশ্চর্য'; 'পদারথ' (উচ্চারণে কিন্তু 'পদার্থ'=পদার্থ') ইত্যাদি। **বাঙ্গালা বানানকে এই দিকে টানিয়া আনিবার কী আবশ্যকতা?**

কোনও ভাষার বানানে একেবারে পুরোপুরি নিয়মানুবর্তিতা দেখা যায় না। do=ডু, so=সো—এরূপ বানানের বিভ্রাট কেবল ইংরেজীরই একচেটিয়া নহে। সুতরাং সংযুক্তবর্ণ-বর্জিত 'তরকারি' বানান লিখিলেই যে 'তর্ক' স্থানে 'তরক' লিখতে হইবে, অথবা 'তর্ক'-র দেখাদেখি 'তর্কারি' লিখিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। 'তরকারি, দরকারী, আবকারী, খোদকারি, মাসকাবারি, পিচকারী, ঘুমপাড়ানী, হিটকিরি, ঝিকমিক, ফটকারি, বা ফটকিরি, ঝিলমিলি, খিলখিল" প্রভৃতি শব্দের বানানে বাঙ্গালা উচ্চারণের রীতি অনুসারে শব্দের মধ্যে পরের অক্ষরে আ-কার বা অন্য স্বর থাকায়, আগের অ-কার স্বতঃ লুপ্ত হয়, হসন্তের বা সংযুক্ত-বর্ণের অপেক্ষায় থাকে না। শব্দের বানানেরও একটা ইতিহাস আছে। অবশ্য ভাষা শিখিবার কালে বা ভাষা প্রয়োগ করিবার কালে এই ইতিহাস টানিয়া আনিবার আবশ্যকতা হয় না বলিয়াই, এই ইতিহাসের অমর্যাদা করিতে পারি না।

আধুনিক বাঙ্গলায় 'করিতে' হইতে 'করতে', 'করিছে' হইতে 'করছে', 'বলিত' হইতে 'বলতো', 'দেখিতে' হইতে 'দেখতে' (বা কচিৎ 'দেকতে' 'দেক্তে'!) সংযুক্ত-বর্ণের প্রতি বিরাগ বা বিতৃষ্ণা নাই বলিয়া আমি দ্বিজেন্দ্রলালের অনুমোদিত বানান 'কর্ত্তে, কর্চ্ছে' লিখি না —'কর্' ধাতুর 'র'-কে চোখের সামনে পূর্ণভাবে রাখিতে চাই বলিয়া—রেফের আকারে ইহাকে গায়েব বা লুপ্তপ্রায় করিতে চাহি না। তদ্রূপ, 'ন্ত' সংযুক্ত-বর্ণ পাওয়া গেলেও, 'বন্‌তে' স্থলে 'বন্ত' লিখিব না, বা 'দেখ্‌তে' স্থলে 'দেক্তে' লিখিব না।

শিশুদের এবং বর্ণজ্ঞানহীন বয়স্কদের দোহাই পাড়িয়া সব দেশেই ভাষা-লিখনের জটিলতা বা হেরফের দূর করিবার কথা শুনা যায়, কিন্তু এদিকে কোনও প্রচেষ্টাই কার্য্যকর হয় না। সব জিনিস অতি-সোজা বা অতি-সহজ করিতে যাওয়া কাজের কথা নহে। দুরূহ বা কঠিন বস্তু কিছু-না-কিছু থাকিবেই—শিশু ও বয়স্কদের ভাষা-শিক্ষা কালে সেগুলি শ্রম করিয়া আয়ত্ত করাইতে হইবে। ভাষা সমগ্র সমাজের জন্য, ইহাতে নিহিত উচ্চাদর্শকে সমভূম করিবার প্রয়াস বিফল হইবেই। শিশু ও বর্ণহীন বয়স্কদের প্রতি সহানুভূতির আতিশয্যে ভাষাকে নীচে নামাইয়া আনিবার চেষ্টার সার্থকতা দেখি না, বরঞ্চ শিশু ও অনুরূপ বয়স্কদেরই মনের পরিপূর্ণতা সম্পাদনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। ভাষা পাঠকালে—এমন কি মাতৃভাষা পাঠ কালেও—কতকগুলি বাধা দেখা যাইবেই। সেগুলিকে জয় করিতে হইবে, অতিক্রম করিতে হইবে—তাহার ফলে, নিজের শক্তির উপরে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আসিবে; শিক্ষার ক্ষেত্রে ও জীবনের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার মূল্য অপরিসীম। যখন শিশুকালে আমরা শিখিলাম, "ঊর্দ্ধ" শব্দের শুদ্ধ বানানে দীর্ঘ-ঊ আছে, র-এর পর ধ-এ ব-ফলা আছে; 'বসিষ্ঠ' শব্দ বিকল্পে তালব্য শ দিয়া 'বশিষ্ঠ' রূপেও লেখা যায়; 'লক্ষ' ও 'লক্ষ্য' এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে; 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অবিমৃষ্যকারিতা, প্রাগল্‌ভ্য, বিচিত্রবীর্য্য, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন' প্রভৃতি দাঁত-ভাঙ্গা কঠিন শব্দ ঠিক মত উচ্চারণ করিতে ও বানান করিয়া যাইতে সমর্থ হইলাম, তখন আমাদের মনে সাফল্যের ও নূতন শক্তি অর্জ্জনের জন্য একটা আনন্দ, একটা আত্মবিশ্বাস আসিয়া গিয়াছিল, তাহার আধিমানসিক মূল্য উপেক্ষণীয় নহে। একজন ইংরেজ লেখক ও এইভাবে কোথায় লিখিয়াছিলেন পড়িয়াছি—When I first came to know that the word *committee* had two *m*-s, two *t*-s and two *e*-s, then I had a feeling of power and mastery over difficulties of writing and reading my mother-tongue, which was not *one of the least helps in acquiring a sense of self-assurance.*

দেখিতেছি, 'আনন্দবাজার'-এ Bombay 'বোম্বাই' স্থলে 'বোমবাই', Panjab 'পাঞ্জাব' স্থলে 'পানজাব', Madras 'মাদ্রাজ' স্থলে 'মাদরাজ' ছাপা হইতেছে। দুই একবার Andhra 'অন্ধ্র' স্থলে 'অনধ্র' (অর্থাৎ A-na-dhra) পাইয়াছি, 'অনধর' এখনও পাই নাই। হয়তো শীঘ্রই 'মহারাষ্ট্র'র পরিবর্তে 'মহারাষটর' পাইব। 'বন্ধ্'-স্থলে 'বনধ' (banadh) বোধ হয় দেখিয়াছি, তবে এখনও Sindh 'সিন্ধ'-এর জায়গায় 'সিনধ' (=Sinadh) দেখি নাই। 'ইন্দোনেশিয়া'-র অনুকরণে 'হিন্দু' স্থলে হয়তো 'হিনদু'-ও দেখা দিবে। ইতিমধ্যেই সংস্কৃত শব্দ 'সম্পৎ' স্থলে 'আনন্দবাজার'-এ 'সমপত' বানান স্থান পাইয়াছে, 'সম্পত্তি'-তে হাত লাগিয়া 'সমপত্তি' রূপের আবির্ভাবও অপেক্ষিত। 'চাটার্জি, মুখার্জি' আসিয়াছে। হিন্দীতে 'নন্দকিশোর' কখনও 'ননদ-কিশোর' রূপে লেখা হইবে না, যদিও 'নন্দ'-শব্দের উচ্চারণ হিন্দীতে 'নন্দ্' বা 'ননদ্'। এইরূপ বিচার না করিয়া বিদেশী নামের বেলায় বাঙ্গলার উচ্চারণের বিরোধী এইসব বানান চালাইলে, 'নন্দ' বাঙ্গলা বানানে 'ননদ' হইয়া যাইবে। সংস্কৃত শব্দ, নিখিল-ভারতের সহিত বাঙ্গলার যোগসূত্র বলিয়া যে বোধ আমাদের মনে আছে, তাহা ভুলিয়া যাইব—'চন্দ্রগুপ্ত' বাঙ্গলার এই অভিনব বানানে 'চনদ্রগুপ্ত' হইয়া যাইবে। কিন্তু বাঙ্গলাতে যে সূক্ষ্ম অর্থ-বিভেদ সমেত তিনটি পৃথক্ শব্দ আছে,—তদ্ভব 'চাঁদ', তৎসম 'চন্দ্র', এবং অর্ধ-তৎসম 'চন্দর' —তাহা ভুলিয়া গিয়া বাঙ্গলা ভাষার প্রকাশ-ভঙ্গীর বিনাশ করিব কেন? তদ্রূপ বাঙ্গলায় তিনটি বিভিন্ন শব্দ—তদ্ভব 'কাম', তৎসম 'কর্ম', অর্ধ-তৎসম 'করম'; অর্ধ তৎসম 'ধরম', তৎসম 'ধর্ম'। রেফ তাড়াইবার অজুহাতে, অর্থের সূক্ষ্ম পার্থক্য বাদে তৎসম 'কর্ম'-কে, 'ধর্ম'-কে, অর্ধ-তৎসম 'করম, ধরম'-এর সঙ্গে সমতুল করিয়া দিব?

আর একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার আছে, সেটি সূক্ষ্ম হইলেও বাঙ্গলা ভাষার লেখনা-শক্তির পক্ষে তাহার একটা বিশেষ মূল্য আছে। শিশুসুলভ মনোভাব লইয়া আমরা হয়তো বলিব—'বোম্বাই' আর 'বোমবাই', 'পাঞ্জাব' আর 'পানজাব'— উচ্চারণে তো এক, 'বোমবাই', 'পানজাব' লিখিলেই বা ক্ষতি কী? কিন্তু বাঙ্গলা উচ্চারণে 'বোম্বাই' ও 'বোমবাই', 'পাঞ্জাব' ও 'পানজাব'—এক নহে। 'ম্ব, ঞ্জ', এইরূপ সংযুক্ত অক্ষর ব্যবহার করিলে, ব্যঞ্জন দুইটির মধ্যে কোনও ফাঁকের আমেজ একেবারেই থাকে না—কোনও hiatus বা উন্মুক্ত বিরামের স্থান ইহাতে নাই। কিন্তু সংযুক্ত-বর্ণ ভাঙ্গিয়া পৃথক্ 'বোম/বাই, পান/জাব' লিখিলে, অজ্ঞাতসারে বঙ্গভাষীর অবচেতনায় একটা অস্পষ্ট বা অস্ফুট ধারণা আসিয়া যায়—বুঝি বা 'ম' ও 'ন'-কে পূর্বের syllable বা অক্ষরেরই অংশ বলিয়া ধরিতে হইবে, এবং আপনা হইতেই 'ম' ও 'ব' এবং 'ন' ও 'জ'-এর মধ্যে একটু যতির আভাস দেখা দিবে। এই হেতু উচ্চারণ তত্ত্বের দিক হইতে 'বোম্বাই' (Bo-mb-ai) ও 'পাঞ্জাব' (Pa-nj-ab) বানান, 'বোমবাই' ও 'পানজাব' (Bom/bai, Pan/jab) হইতে পৃথক। তদ্রূপ 'মাদ্রাজ' হইতেছে (Ma-dr-aj), ও 'মাদরাজ' হইতেছে (Mad-raj)। 'আনন্দবাজার' পত্রিকাতেই পাইলাম (২৮।১২।৬৬, পৃঃ ৮) 'তালুকদার কোমপানি।' 'তালুকদার' বানানে আপত্তি নাই, ইহা বাঙ্গলার উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী, 'তালুক'-এর ক'-য়ের পরে অতি সূক্ষ্ম বিরামভাব বিদ্যমান আছে। তেমনি 'বাজনদার, চড়নদার'—ঠিক বাজন্দার, চড়ন্দার' নহে। কিন্তু 'কোম্পানি'র বেলায়? বাঙ্গালীর কাছে শব্দটি তো মোটেই 'কোম্‌পানি' নহে—'কোম্পানি'। বাঙ্গলায় 'পূর্ণ'-উচ্চারিত এবং 'অর্দ্ধ-উচ্চারিত' অথবা 'নিপীড়িত' বা 'সম্বৃত' নাসিক্য ধ্বনি আছে, তেমনি অন্য স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনও আছে (আধুনিক ভারতীয়-ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় নূতন ইংরেজী পরিভাষা অনুসারে এগুলিকে বলা হয়—Reduced Nasals, Under-articulated or Unexploded Stops)। এইগুলির আধারে ধীরে-ধীরে আমাদের বানান-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া One fine morning—একদিনেই এই-সমস্তকে 'নসাৎ' করিয়া দিই?

কতকগুলি শব্দের বানানে নিশ্চয়ই সংশোধন বা পরিবর্তনের আবশ্যকতা আছে। যেমন—'লক্ষ্ণৌ' স্থলে 'লখনৌ' (হিন্দীতে 'লখনউ'—'খ' স্থলে 'ক্ষ' নিতান্ত অনাবশ্যক পরিবর্তন), 'চ্যবন' স্থলে 'চৌহান', বা 'চওহান' (মারাঠীতে চব্হাণ'), 'ন্যাটিসান' স্থলে 'নটেশন', 'পারদ্যুমান' স্থলে 'প্রদ্যুম্ন' বা 'পর্দ্দুমন', 'আজমীঢ়' স্থলে 'আজমের' (সংস্কৃত 'অজয়মেরু' হইতে); 'চিতোর' স্থলে 'চিতোড়', 'কিরকী' স্থলে 'খিড়কী', 'আল্লাহ-আবাদ' স্থলে 'এলাহাবাদ', 'ভেনকাটা' স্থলে 'বেংকট' ইত্যাদি

আবার দুই-একটি শব্দের বানানে পরিবর্তন আনিবার চেষ্টা করা সংগত হইবে না: যেমন, 'শ্রী' শব্দে—ইহাকে 'শ্‌রী' বা 'শরী' লিখিয়া বানান সহজ করিবার চেষ্টা করিলে আমাদের বাঙ্গলা calligraphy অর্থাৎ লিপিসৌন্দর্য্য যেন শ্রী-হীন হইয়া যাইবে—'শ্রী' বাঙ্গলা লিখনে যেন একটি কল্যাণ ও...মাঙ্গল্য-বাচক পৃথক অক্ষর (ideogram) হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

'শ্রী'-কে দূর করিয়া দিলে আমাদের সৌন্দর্যবোধ যেন ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে, লেখায় একটা মস্ত aesthetic বা নন্দনরসাত্মক হানি ঘটিবে। 'শ্রী'—এই বর্ণটি একটি রেখা-সুষমাময় শ্রী ও সৌন্দর্যের প্রতীক, ইহা কেবল একটি ধ্বনি-নির্দেশক বর্ণবিন্যাস নহে।

এইবার প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতেছি। পরিবর্তন জীবনের ধর্ম হইলেও, পরিবর্তন আনিবার কালে পুনর্বিচার ও যুক্তিযুক্ততা অপেক্ষিত। স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের অজ্ঞাতে নানাপ্রকারের পরিবর্তন অহরহঃ ঘটিতেছে। কিন্তু যখন সজ্ঞানে আমরা কোনও সংশোধন বা পরিবর্তন করিতে বসিব, তখন এই তিনটি প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া কাজে নামিলে, তবে সব দিক্ দিয়া সুরাহা হয় :—

[১] প্রথম প্রশ্ন—পরিবর্তনের আবশ্যকতা আদৌ আছে কিনা; [২] দ্বিতীয়—পরিবর্তনের মধ্যে যৌক্তিকতা আছে কিনা; এবং [৩] তৃতীয়— সব দিক্ বিচার করিয়া দেখিয়া, ইহার উপযোগিতা এবং উপকারিতা কোথায় তাহার নির্দেশ। কেবল বদলাইতে হইবে বলিয়াই বদলানো, ইহার কোনও অর্থ হয় না।

প্রশ্ন তিনটির উত্তর আমার কাছে যেমন প্রতিভাত হইয়াছে তাহা জ্ঞাপন করিতেছি।

[১] সমস্ত মানবিক ব্যাপারই অসম্পূর্ণ ও অসমঞ্জস, absolutely logical আত্যন্তিকভাবে যুক্তির অনুসারী নয়। বাঙ্গলা বানানেও দোষ ত্রুটী অসম্পূর্ণতা আছে। Evolutionary process বা বিবর্তনের পথে সেগুলির যথাশক্তি সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে—Revolutionary বা বৈপ্লবিক কিছু করা এক্ষেত্রে কঠিন। এক পারা যায়, সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত লিপির বর্জন, নূতন কোনও লিপির স্থাপনা। কিন্তু এ বিষয়ে নানা বাধা আছে, সেই সব বাধা দূরীভূত হইতে অনেক দেরী। সুতরাং সমগ্রভাবে পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না।

[২] যে সমস্ত পরিবর্তন জোর করিয়া ভাষার উপর চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে, সেগুলির মধ্যে কোনও জ্ঞান বা সুযুক্তি বা সুবিচার দেখিতেছি না। উপরে এ বিষয়ে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কতকগুলি আপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এই দিক্ দিয়া পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখি না।

[৩] প্রস্তাবিত পরিবর্তনে কোনও লাভ হইবে না—কাহারও উপকার হইবে না। অপিচ এই পরিবর্তন অযৌক্তিক হওয়ায়, বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষায় নানা সমস্যা দেখা দিবে; ইহার লিখনে একটা যে নিয়মানুবর্তিতা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার উপর আঘাত পড়িবে। আমার মনে হয়, এই রকম নূতন ভাবে সৃষ্টি করা বানানের ধাঁধায় আমরা যে পড়িয়া যাইতেছি, তাহার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্তী সরস প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহার নিজের নামে বইয়ের দোকানের এই রূপ বিজ্ঞাপনে —'শিব্রাম চক্‌রবর্তির বইয়ের দোকান।'

জীবনের নানা অঙ্গে আমাদের discipline বা সংহতি-শক্তি আমরা হারাইতেছি। আমরা সকলেই মহা উৎসাহে ভাঙ্গনের কাজেই লাগিয়া গিয়াছি, গড়নের দিকে কোথায় আমাদের সচেতন চেষ্টা? এই সংহতিবোধ নষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চিন্তা ও কর্মের দৃঢ়তাও নষ্ট হইতেছে। এখন আবশ্যক, কি করিয়া বাঙ্গালীকে নিয়মানুবর্তিতার সাধনার দ্বারা শক্তিশালী করিতে পারা যায়। এই ভাঙ্গনের দশায় তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পৎ এখনও হইতেছে—তাহার ভাষা, তাহার সাহিত্য। এই দুইয়ের সংরক্ষণ বাঙ্গালীর পক্ষে বাঁচিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই হেতু, বাঙ্গলা ভাষা লিখনের প্রকৃতিকে বিনষ্ট করিবার অবশ্যম্ভাবী ফল—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে একটা অরাজকতা আসিতেছে বলিয়া, এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সময় আসিয়াছে॥

বিলীয়মান বাঙালী

রঞ্জন

সাম্প্রতিক ভ্রমণে বাঙালী জাতির কতিপয় বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হলো। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ এবং চারুচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বিবিধ লেখকের রচনার সংগে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় সত্ত্বেও সম্যক ধারণা ছিল না যে, ভারতচিত্রে বাঙালীর পরিব্যাপন এত বৃহৎ ছিল। বিহারের ব্যক্তিসত্তার জন্ম এই সেদিন, ১৯১২ সালে। কিন্তু মুংগেরে-পাটনায় আজও দেখা মেলে বহু বাঙালীর সংগে যাঁরা বিহারে গিয়েছিলেন তিন পুরুষ আগে। তাঁদের বাঙালিত্ব আমাদের বাঙালীয়ানা থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। শুদ্ধতম তামিল নাকি আজকাল বলা হয় জাফনায়, সিংহলের সেই প্রান্তে যেখানে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত কয় লক্ষ মাদ্রাজাগত তামিলভাষী। জাফনা যেন রেফ্রিজারেটর। একটা বৃহৎ সম্প্রদায় নিকট প্রতিবেশের প্রতি মুখ ফিরিয়ে তার সমস্ত আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে বলছে, আমাকে একা থাকতে দাও।

প্রবাসী বাঙালীর ইতিহাস একেবারেই আলাদা। সামান্য স্বাতন্ত্র্য সে সর্বদাই রক্ষা করেছে। কিন্তু সাধারণত পরিবেশ থেকে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে নেয়নি। পরিবেশকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছে অল্পবিস্তর সাফল্যের সংগে। একাধিক হিন্দী পত্রিকার পৈতৃকতা বাঙালীতে বর্তে। বিহারে এমন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান অগণ্য যেখানে বাঙালীর হস্তাবলেপন ছিল না জন্মমুহূর্তে।

✻

অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর প্রসরণ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বশংবদ লাংগুলবাহী। ল্যাজের মাহাত্ম্য তবু বহু। শুধুমাত্র চাকরির তাড়নায় যত্রতত্র বিতরিত হয়ে বাঙালী শুধু বনের খায়নি, মোষও তাড়িয়েছে। সেই মোষই যদি আজ তাকে তাড়া করে তার কারণ অনুসন্ধানযোগ্য। সেই কারণে আছে ইতিহাসের সামগ্রী। আমার নিবেদন এই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তণ্ডুলবাহী হয়ে বাঙালীও হয়ে গেল আধা-সাম্রাজ্যবাদী। কেনিয়া থেকে কটক পর্যন্ত বাঙালীর দাপট অসহ্য হয়ে উঠল কেননা তার সাদা চামড়ার বোরখাটুকু পর্যন্ত নেই।

সাম্রাজ্যবাদীর আচরণে বৈচিত্র্য বিরল। "সমাচার দর্পণ" প্রতিষ্ঠান করেছিলেন বিদেশী মিশনারী। আজ মুংগেরে "সাচ্চী বাং" চালান দেবেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বাঙালী। মূলগত প্রভেদ তবু অনুপেক্ষণীয়। ইংরেজ শাসক ছিল, বাঙালী শুধু তল্পীবাহক। সাম্রাজ্যবাদের কথাটি ফুরোলে নটেগাছটি মুড়োবে তা ভাবিতে উচিত ছিল প্রবাসী যখন।

✻

সাম্রাজ্যের সূর্যাস্তের অপরাহ্ণেও এমন সাক্ষ্য নেই যে আমরা জানি যে, ভিন্নতর জন-গোষ্ঠীর সংগে কোন সম্পর্ক বিধেয়। শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক আজও নির্দেশিত হয়নি। অশাসক ও অশাসিতের সম্বন্ধ আরও দুরূহ। প্রবাসী বাঙালী আজ অজ্ঞান নাবিক; সম্মুখে অনন্ত ঝঞ্ঝা, গন্তব্য অজ্ঞাত। সাহস সামান্য। প্রবাসী বাঙালীর একদা উদ্ধত নরম বুক আজ সাধারণত নরম। ঔদ্ধত্যের অস্তাগমে দীর্ঘশ্বাস নিরর্থক। অনাবশ্যকও। তবু প্রবাসী বাঙালীর নব নমনীয়তায় কমনীয়তা অনধিক। পরিবেশের স্বেচ্ছাস্বীকৃতি আর বহিরাগত চাপের পায়ে আত্মসমর্পণ এক বস্তু হতে পারে না। গ্রহণে লাবণ্য আছে; সমর্পণে লজ্জা।

শুধু তাই নয়। তরুণতর প্রবাসী বাঙালীর সংগে বাঙলা দেশের যোগসূত্র প্রায় ছিন্ন হয়ে গেছে। বিহারে এবং উত্তর প্রদেশে এখন এমন বাঙালী অসংখ্য যাঁদের একমাত্র অবশিষ্ট বাঙালিত্ব শুধু নামে। বাঙলা ভাষার সংগে পরিচয় আদৌ থাকলে তা মৌখিক। বাঙলা সাহিত্যে অনাগ্রহ বিপুল। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র নিয়ে গর্বের লেশমাত্র নেই। কেউ কেউ কৌতূহলী অস্তাচলের উর্দু কবিতায়। বাকি সবাই বলে, "হ্যাঁ, ট্যাগোরকা বাং থোড়া বহুৎ শুনা হ্যায়, লেকিন উসসে তো আই এ এস নেই মিলেগা"। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় সফল পরীক্ষার্থীদের নাম-তালিকায় ব্যানার্জি চ্যাটার্জিরা অধিকাংশ প্রবাসী বাঙালী, বাংলার সংগে যোগশূন্য, সূত্রশূন্য, বাঙলার প্রতি অতি উদাসীন।

✻

সরকার তাঁদের মংগল করুন। মেধার্জিত ব্যক্তিগত সাফল্য আদৌ অশ্রদ্ধেয় নয়। নিষ্কর্মা বাঙালীপনা ক্রমে হয় হেয় কাঙালী-পনা। তার চেয়ে অবাঙালী ভালো। তবু জিজ্ঞাস্য বাঙালিত্বের সংগে বৈষয়িক সাফল্যের বৈরিতা অবধারিত কিনা, নাকি সাংসারিক সাফল্য আর বাঙালিত্বের মধ্যে লৌহ-যবনিকার অবতরণ ইতিহাসের সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা যার মধ্যে অবশ্যম্ভাবিতার পরিমাণ অকিঞ্চিৎ। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সম্পর্কের বিরোধিতার বিবরণ মানবাঃ না জানন্তি। কিন্তু সমৃদ্ধি এবং সংস্কৃতি অহি এবং নকুলের মতো বন্ধুস্বভাবাপন্ন এমন বিশ্বাস আমার মনে ধরে না। আমি তো বলি, প্রবাসী বাঙালীর সমৃদ্ধির অবক্ষয়ের গর্ভেই সঞ্জাত হয়েছে তার সাংস্কৃতিক আত্মলুপ্তি। গুটিকয় আই-এ-এস-এ কোথা তার পরিমাপ?

তবু ভাবতে ভালো লাগে যে, ১৮৬৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র, প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলে-ছিলেন বাঙলার বাইরে চাকরি করতে, কেননা ভারতবর্ষ যে এক দেশ এই ধারণা এখনও আশানুরূপ ব্যাপ্তি লাভ করেনি। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে তাই চাই আদান-প্রদান। দেবেন্দ্রনাথ সেদিন ভারতীয়ত্বের সূচনা করে-ছিলেন, রামমোহনের উদারতর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে; কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাঙলা রচনায় সাক্ষ্য রেখে গেছেন যে, কোনো ভুয়া ভারতীয়ত্বে তাঁর বাঙালিত্ব কখনও বিলীন হয়ে যায়নি। আমাদের দেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ছিল আত্মাবিষ্কার; আত্মবিস্মৃতি নয়। মাইকেল বা রবীন্দ্রনাথের শারীর বহির্ভ্রমণ আসলে ছিল মানসিক প্রত্যাগমন, স্বদেশে, স্বগ্রামে। আজকের তরুণ প্রবাসী বাঙালী সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে পারলে আনন্দের সীমা থাকত না। যোগ করতে হয়, বাঙলার প্রতি বর্তমান অনীহা একেবারে অনর্জিত নয়। জমির খণ্ডবিভাগ হতে চলেছিল ১৯০৫ সালে; ১৯৪৭ সালে তা সম্পূর্ণ। তারপর থেকে পুনরুজ্জীবনের আভাসমাত্র মেলেনি পশ্চিমবংগে। পূর্ববংগের পাকিস্তানীভবনই এর একমাত্র কারণ না হতে পারে কিন্তু দূরে সম্ভব সম্পর্ক বিবেচ্য। প্রবাসী বাঙালী সুখে প্রবাসে থাক; বাঙালিত্ব আপ্ রুচি পছন্দ্।

কলকাতার ডায়েরি

কলকাতা শহরে বাস করেন, অথচ ট্রাম-বাস ধর্মঘটে কাতর হন না, এন কেউ কি আপনার জানা আছে? জানা না থাকলে আলাপ করতে পারেন শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। বয়স ষাটের উপর, দেশ বাদুড়িয়া গ্রামে, থাকেন বেলেঘাটা অঞ্চলে।

এই যে ট্রাম আর বাসের ধর্মঘট হয়ে গেল, মিটল—কোন কিছুতেই তাঁর চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখা যায় নি। ট্রাম চলবে না?—বয়েই গেল। বাস বন্ধ?—থোড়াই কেয়ার। কেন না, ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-রিকশা—সর্বপ্রকার যানবাহনে তিনি অবিশ্বাসী, তাঁর একমাত্র ভরসা চরণযুগলে। বাড়ি থেকে অফিস—এই চার-পাঁচ মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে পার হওয়া তো নৈমিত্তিক ব্যাপার, সুযোগ আর অবসর পেলেই তিনি ত্রিশ-চল্লিশ মাইল অনায়াসে হেঁটে আসেন। ট্রাম-বাস আদৌ চড়েন নি যে, এমন নয়, গত ৬১ বছরের জীবনে শখ করে দুবার কি তিনবার ট্রাম-বাস চড়তে কেমন লাগে পরখ করে দেখেছেন।

বেঁটেখাটো কালোপানা চেহারা, পাকানো শরীর। হণ্টন-তত্ত্বে তাঁর অনুরাগ সেই ছেলেবেলা থেকেই। শিশুপাঠ্য কবিতার একটু অদল-বদল করে তিনি মুখস্থ করেছেন—'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারা দিন আমি যেন পায়ে হেঁটে চলি।' 'ভালো হয়ে চলা' আর 'পায়ে হেঁটে চলা' তাঁর কাছে সমার্থক। এবং আর একটু বড় হতেই নিজেই কবিতা বানিয়ে সন্ধ্যা সকাল আওড়ে চলেছেন—'পায়ে পায়ে পরমায়ু পায়ে চল ভাই, সুস্থ শরীর গড়তে হলে অধিক হাঁটা চাই।'

আমার সঙ্গে আলাপ করার সময় তাঁর 'আজীবন সাধনার' বিবরণ দিতে দিতে অনিলবাবু একটি ছোট্ট বই বের করলেন। তার শুরুতেই ওই কবিতাটা ছাপা। তারপর বললেন, "ওই হাঁটাই আমার ধ্যানজ্ঞান। বলতে পারেন ওটাই একমাত্র 'হবি।' এই তো কিছুদিন আগে, গত ১১ই ডিসেম্বর, দেশের বাড়িতে একটু কাজ ছিল। বিয়াল্লিশ মাইল রাস্তা। হেঁটে চলে গেলাম। পরদিন ফের কলকাতা ফিরে এলাম। যেতে ঘণ্টা দশ লেগেছিল, ফিরতে একটু বেশী—তের ঘণ্টা।"

ভদ্রলোক ফিরিস্তি দিতে শুরু করলেন কোথায় কত মাইল তিনি হেঁটেছেন।—'কোথাও কোন 'হণ্টন প্রতিযোগিতা' হলেই আমি অযাচিতভাবে ছুটে যাই, যোগ দিই। আর প্রতিযোগিতা না থাকলে এই শহরের ভিতরেই কুড়ি-পঁচিশ মাইল হাঁটি। অন্তত কুড়ি মাইল রোজ না হাঁটলে আমার মেজাজ খারাপ তো হয়ই, শরীরও খারাপ হয়ে যায়।"

ভদ্রলোকের কথা শুনে থাবড়ে যাই। শুনেছিলাম 'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকের লেখক রামনারায়ণ তর্করত্ন রোজ বিকেলে হরিনাভি গ্রাম থেকে কলকাতায় আড্ডা মারতে আসতেন এবং পায়ে হেঁটেই রোজ রাত্তিরে ফিরতেন। এখন দেখছি চরণযুগল সর্বস্ব এই বন্দ্যোপাধ্যায়-তনয় রামনারায়ণেরও চার কাঠি বাড়া।

*

সঙ্গে আনা সেই ছোট্ট বইটির পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখি হরেক রকম সংবাদ। 'নাতি-নাতনীদের চোখে দাদু' অধ্যায়ে টুকুন, বাবুন, কুচুয়া, ঘেণ্টু, হোঁতল, মনাই ভেবলা, নেড়ি, বুলেকু ইত্যাদি বাল্যখিল্যরা জানাচ্ছে—"এই তো সেদিন ৫০ মাইল পথ পা-গাড়ি চালিয়ে তের ঘণ্টার মাথায় হুগলি জেলার সংগ্রামপুর গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। মজার ব্যাপার, সেই রাত্রে সেখানে এক যাত্রা অভিনয় হচ্ছিল। সারাদিন পথশ্রান্তির পর আবার সারা রাত আয়েসে বসে দাদু সে যাত্রা গান শুনে আবার হেঁটে কলকাতা চলে এলেন।"

অন্য একটি অধ্যায়ে রয়েছে 'এক ক্যানভাস জুতার আত্মকাহিনী', ১০ টাকা ৪৫ পয়সায় কিনে এক ভদ্রলোক যাকে চার মাসে ২০৭৮ মাইল হাঁটিয়েছেন।—জুতো তার হয়রানির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছে—"মনিবের পদসেবা করা, তাঁর চরণযুগল অক্ষত রেখে তাঁকে বহন করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া আমার কাজ। মনিবের সেবা করার জন্যই আমাদের সৃষ্টি, তাতেই আমাদের জীবনের পূর্ণ সার্থকতা। তবে সহনশীলতারও একটা সীমা আছে। আমি মাত্র চার মাসকাল এঁর হাতে পড়ে (অর্থাৎ পায়ে পড়ে) কীভাবে নাজেহাল হয়েছি, তারই একটা হিসাব আপনাদের গোচরে আনছি।"

তারপরেই সেই ২০৭৮ মাইলের বিবরণ। বেচারা ক্যানভাস জুতোকে একদিনও তিনি রেহাই দেন নি। কেনার পরদিনই অর্থাৎ গত বছরের ১০ জুলাই তাকে নিয়ে চললেন তাঁর এক সহকর্মী বন্ধুর বাড়ি। মধ্যমগ্রামে। পাক্কা পঁচিশ মাইলের ধাক্কা।

অনিলবাবু নিজেকে পরিচয় দেন 'দৌড়বীর' বলে। ভদ্রলোক কাজ করেন সায়ান্স কলেজে। কিন্তু পেটে কবিত্ব আছে। বললেন—"ছেলেবেলায় বইয়ে পড়েছিলাম—'কাকের কঠোর রব বিষ ঢালে কানে।' এখন মনে হয়, ওই আওয়াজ কানে মধুবর্ষণও

করে থাকে। শীতের গভীর নির্জন নিশীথে হাঁটতে হাঁটতে যখন শরীর মন অবসন্ন হয়ে আসে, তখন মনে হয় কখন এই দীর্ঘ রজনীর অবসান হবে। এমন সময় প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী রাতের শেষ প্রহর ঘোষণা করে কাকের দল। নতুন দিনের রঙিন উষার আলো শীঘ্রই ফুটে উঠবে, এই আশায় তখন কাকের সেই 'কঠোর রব' আমার কানে বড় মধুর লাগে।" (রঙিন উষার আলো 'গভীর নির্জন নিশীথে' ইত্যাদি আমার বানানো নয়, ভদ্রলোকের নিজের।)

অলমতি বিস্তরেন। একেবারে আক্ষরিক অর্থে ভদ্রলোকের পায়ে নমস্কার।

*

কলকাতা যে সত্য সত্যই ভারতের পয়লা-নম্বর 'শিল্প-নগরী' তার পরিচয় আমরা পদে পদে পেয়ে চলেছি। বেলিয়াস রোডে নতুন কারখানা বাড়ল কিনা, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই, শহরের ফুটপাতের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায় নানা রকম শিল্পের প্রসার দিন দিন কী পরিমাণ বেড়ে চলেছে। দিনের শেষে বালতির উনুন জ্বালিয়ে সদর রাস্তার একদিকে যেমন রন্ধন-শিল্পের চর্চা চলে তেমনই অন্যদিকে মোটর সারাই, জুতো সেলাই ইত্যাদি নানা প্রকার কারুশিল্পও দিন দিন প্রসার লাভ করছে। এই ব্যবহারিক শিল্পের দৌলতে এমনিতেই যখন ফুটপাত তার প্রাথমিক কর্তব্য সম্পাদনে সংকুচিত, ঠিক তখনই তার পাশাপাশি অন্য আর একটি শিল্প (কী কুক্ষণে বাংলার আর্ট আর ইনডাস্ট্রির এই নাম) ফুটপাতের অবশিষ্ট অংশ গ্রাস করে নিয়ে বেচারা পদযাত্রীদের একেবারে বাঘ মারকা বাসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

শহরের ফুটপাতশিল্পীদের কথা বলছি। আগে দু' একটি ফুটপাতে হঠাৎ হঠাৎ তাদের শিল্পকর্মের নমুনা দেখা যেত, ইদানীং যত্রতত্র ছড়িয়ে পড়েছে। যে-কোন পাড়ায়, যে-কোন দিকে পা বাড়ালেই দেখা যাবে আধপাগলা চেহারার একটি লোক নানা রকমের রঙিন খড়ি দিয়ে ইয়া ইয়া বড় ছবি এঁকে চলেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবির বিষয় পৌরাণিক। রাম সীতা, হনুমান, হর-পার্বতী ইত্যাদি পূজনীয় পূজনীয়ারা বিশাল বপু বিস্তৃত করে পথ আগলে শুয়ে থাকেন।

ফুটপাত-শিল্পের চর্চা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, কলকাতার 'সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য' তাতে অবশ্যই পরিস্ফুট হয়, কিন্তু গাড়ি-ঘোড়ার দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচতে হাঁটারও তো একটু জায়গা থাকা দরকার। ভিড়ের সময় জামা জুতোর খদ্দে দোকান না হয় ডিঙিয়ে যাওয়া চলে, ওই ছবির গায়ে পায়ের আঁচড় পড়লে পথচিত্রদর্শনে তন্ময় শিল্পপ্রেমিক কিছু লোক যে তৎক্ষণাৎ তেড়ে মারতে আসবেন।

—চাণক্য

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

এগার

ভেবেছিলাম, বিল্বমঙ্গল অনন্ত পাশ দরজা খুলে তার দাদার বাপের ব্যাটা প্রমাণ করেই চলে যাবে। কিন্তু উপহারের ডালি যখন দাওয়ায় এসে পড়ল, অনন্ত থমকে দাঁড়াল। দেখ, অনাদির এত করে দরজা খোলানো কেঁচে যায় বুঝি। অনন্ত আবার বন্ধ দরজায় ঝাঁপ দিয়ে না পড়ে। সে-পালা শুরুর আগে এবার সরে পড়াই উচিত। ভিড় করে যারা এসেছিল, থমকানো ভাব তাদের চোখে মুখেও। একবার নজর অনন্তর দিকে, আবার উপহারের ডালির দিকে।

সেই মুহূর্তে অনাদির দলের একজন ফোড়ন দেয়, 'দেখ্ অনন্ত, হাটের মেয়েমানুষের ফরকানি দেখ্। মুখের উপর বে-ইজ্জত করে।'

ফিরে যেতে গিয়ে কথাটা কানে বেসুরো লাগে। তার থেকে বেসুরো ভঙ্গি দেখি বিল্বমঙ্গলের ভাবে। দেখি, তার বুক চিতিয়ে ওঠে, আগুন চোখে মুখে। এ যে সত্যি সত্যি মানীর মানে লেগেছে! তারপরেই শোন প্রেমিকের দাওয়া কাঁপানো হাঁক, 'কী, এত বড় আস্পদ্দা, মুখের উপর জিনিস ফেলে দিলে। আবার তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে? তবে আমিও এই পিতিগ্গে করে যাচ্ছি, শালার এ মুখো আর কোনোদিন হব না।'

বলেই সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে—দরজায় নয়, উপহারের সামগ্রীর ওপর। দু হাতে সাবড়ে তুলে নেয়।

আপন জনপদে হলে এমন সহজে দাঁড়িয়ে অপার কৌতূহলে এ দৃশ্য দেখা হত না। ওই যে সেই কথা, অপরিচয় কোনো সীমারেখার দাগ টানে না, তার কোনো দাবি-দাওয়া নেই। চেনাচিনিতেই গোলমাল, সে তখন পরিচয়ের নানান বেড়া তুলে দেয়। সেখনে ভদ্রলোকের সহবত ঘাড়ে আমার পাল্লার কাঁটার এদিক ওদিক করে। এখানে অচেনার ভিড়ে আমার সে দায় নেই।

সে দায় নেই, কিন্তু বাদার এই বিল্বমঙ্গলের ব্যাপার দেখে কোথায় যেন নিজের লজ্জা লেগে যায়। মাথা নত হয়ে পড়ে, আর একটা ধিক্কারের ধ্বনি বাজে, 'ছি ছি ছি।' কী করব, যখন আমি দর্শক, তখন আমিও যোগে যোগ হয়ে যাই। ঘর থেকে প্রেমিকের বেরিয়ে আসা তবু একরকম ছিল। তাতে চলতি স্রোতের টান দেখেছিলাম। এ যে কাদায় পাঁকে ঘুলিয়ে গেল হে।

ঘোলানোর ঘূর্ণি আরো দেখি। দড়াম্ করে দরজা খুলে যায় আবার। দুলি ফুঁসে ওঠে, 'হ্যাঁ, এ পিতিগ্গেখানিই মনে রেখো, আর এ মুখো হয়ো না, হয়ো না, হয়ো না।'

কথা শেষের আগেই দ্বিগুণ শব্দে আবার দরজা বন্ধ। কিন্তু এবার আর সন্দেহ সংশয় নেই, দুলির খর চোখে গাঙের ধারা, বাসী কাজল ধুয়ে যায়।

'হব না, হব না, হব না।'

বার বার, তিন বার, এই পিতিগ্গে আবার ঢোল-শহরত করে প্রেমিক। বুকের ওপর যাবৎ উপহার তুলে নিয়ে, দাওয়া থেকে হাঁটা ধরে। তার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন। কে যেন ছুঁড়ে দেয়, 'হ্যাঁ, ঘরের দাওয়া ঘরে নে' যাও, কাজ দেবে।'

এমন পল্লীতে দাঁড়িয়ে এমন 'মজা' আর দেখিনি। কিন্তু মজার তালে তাল লাগে না যেন। দোল লাগে না তেমন। মনের যেখানে লজ্জা লেগেছিল, ধিক্কার হেনেছিল, সেখানটা সহসা উদাস হয়ে যায়। বুকের কাছে নিশ্বাস দীর্ঘতর, ভারী ভারী লাগে। আলোর বৃত্তে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ঝমক ঝমক তালে যেমন আচমকা তারের যন্ত্রের ছড়ের লম্বা টান পড়ে যায়। চোখের সামনে ভেসে থাকে কেবল বাসী কাজলধোয়া দুটি গাঙ-চলকানো চোখ।

গাজী বলে ওঠে, 'একে বলে মরণ।'

চোখ ফিরিয়ে দেখি, গাজীর লালে ছোপানো দাঁত দেখা যায়। কিন্তু তার ইছামতী-আরশি চোখে ছায়া। সেই যে পাজী পাজী ঝিকিমিকি, তা নেই। আমার দিকে ফিরে বলে, 'বোঝলেন না বাবু, একে বলে মরণ। সেই যে মুরশেদ বলে না, "কাল্লি কাল্লি সবই কাল্লি, আ মরণ, মাল্লি কবে জানলি না" এ সেইরকম।'

আশেপাশে সবাই তখন দুলি-অনন্ত কাহিনীতে আপন বয়ান জুড়তে ব্যস্ত। কেউ তার কথা শোনে না। জিজ্ঞেস করি, 'কার মরণ?'

'যে মরেছে, তার।'

বলতে বলতে আবার গাজীর চোখের আরশি ঝিকমিকিয়ে ওঠে। দেখ, ছায়ার ছ-ও নেই। বলে, 'মরণ বোঝেন তো বাবু। তমালের ডালে ঝুলে থাকবার জন্যে যেমন একজন মরতে চেয়েছিল, সেইরকম। জ্যান্ত মরা যাকে বলে।'

ভানুসিংহের পদাবলীতে পড়েছিলাম, 'মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।' সে মরণে সুখ আছে না দুঃখ আছে, সে চেতন আমার নেই। তবে, গাজীর কথায়, মরণ যদি ঘটে থাকে, তবে হাটের মেয়ে দুলির ঘটেছে। নইলে হাটের মাঝে যে মেয়ে আপনাকে হাট করে খুলে বসেছে, সে তো নগদ বিদায়ের আশায়। মজুরি বল, উপহার বল, সব কেন সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। সে যে নিয়মে অনিয়মের তাল বজে। বুকে যে ডংকা মেরে, ফণা তুলে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে দাওয়ায়, দরজা খুলতেই তার কেন বুকের খিল খুলে যায়। তার কেন ফণা নেমে যায়, মুখে ছায়া নামে, বুকের মেঘ গলে গলে পড়ে চোখের দরিয়ায়। কোন্ জনান্তে সে গিয়ে মুখ ঢাকে ঘরের অন্ধকারে। একে কি বারোমাসের চাপা বলে।

সমাজ আছে, অনাদি-অনন্তে। মনকে বলি, আমাকে তুমি এই ক্ষণে সামাজিক হতে ব'লো না। দুলির পরাজয়ের মাঝখানে যে মন বিরাজ করে, চোখের জল পড়ে, তার শরিক কর। আজ আমার সেই মনেতে বসত, সেই মনেতে ভাসি। নিরুদ্দেশের অবুঝ ফেরার আজ আমার এইটুকু পাওয়ানা।

যে পথে চলেছিলাম, সেই পথেই চলতে চলতে বলি, 'মরণ যদি হয়ে থাকে, তবে তো মেয়েটারই।'

গাজী ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসে বলে, 'কেন বাবু। অনন্ত পাল জ্যান্ত নাকি।'

রীতিমতো বিরক্ত হয়ে বলি, 'তাই তো মনে করি। কোন্ মুখে সে ঝগড়া করে। তাতেই তো সব ঘোলা করলে।'

একটু চেতন মেনে নিজের কথা নিজে শুনলে অবাক না হয়ে উপায় ছিল না। মানী ভদ্রলোক, সে কিনা দুলি-অনন্ত নিয়ে কথা বলে। তাও একটা পথের ফকিরের সঙ্গে।

গাজীর আমার সেসব ভাবনা নেই যেন রহস্য করে, চুপিচুপি বলে, 'বাবু, ঘোলায় বলেই থিতোয়, তাই কি না বলেন।'

কথার স্রোত যেন বাঁকা। তাতে ডুব দিতে না পেরে অবাক হয়ে তাকাই। গাজী হেসে বলে, 'অই যে তখন বললাম আপনাকে, পরে সব বলব। বাবু, এই দাওয়াতে কত ফেলাফেলি ছোঁড়াছুঁড়ি কসম খাওয়াখাওয়ি দেখলাম। সব বিড়াল্লের আড়াই পা, বোঝলেন না। পুরনো কিস্যা বাবু, পুরনো কিস্যা। গপ্পের ভাবৎ লোকে জানে।'

'তার মানে, তুমি বলছ—।'

কথা শেষের আগেই গাজী বলে ওঠে, 'আমি বলব কেন বাবু। আজই রাতের বেলায় আবার যার জিনিস তার ঘরে আসবে, তখন মানভঞ্জনের পালা। তারপরেতে একেবারে ভাব সম্মিলন।'

বলে গাজী হেঁ হেঁ করে হাসে। আবার বলে, 'তয় যদি বলেন, অনন্ত ঘর থেকে বের হয়ে এল কেন, তা হলি বলতি হয়, দশজনের মধ্যি দাদার একটা মান রাখতি হয়। তেমনি আবার দুলি ছুঁড়িরও মান যায় যে দশজনের সামনে। অই বাবু ঘরের বলেন, হাটের বলেন, সব মেয়েমানুষের এক কথা, "হেই, জগতে তোমার কাছে আমি বড়, না বাপ দাদা বড়?" দুলিরও সেই কথা। বেটাছেলেকে বলতে লাগবে, "রাই, তুমি ছাড়া কী ছাই জগৎ আছে।" তাইতেই বাবু অনন্তের গোলমাল হয়েছে।'

শুনতে শুনতে এবার আমার চোখের ফাঁদ বড় হয়! ছেঁড়া তাপ্পির আলখাল্লা, ধুলোয় মাখানো, কাঁধে ঝোলা ফকির এমন মেয়েমানুষ বোঝে কেমন করে। এ তো মুরশেদের নামের মজুরের কথা নয়। সুরের সঙ্গে সঙ্গত যে করে না, সে কেমন করে বোল দেবে। এ মানুষ তবে মুরশেদের নামের মজুর নয় কেবল। ডুগকি বাজিয়ে ফেরা, পথে ঘোরা উদাসীন নয় শুধু। অন্য মজুরিও আছে। প্রকৃতি নামের মজুরানা না থাকলে, এ বোল কেন বাজবে। অথচ চেয়ে দেখ, প্রকৃতি নাম এর কোথায় আছে।

গাজী তখনো অব্যর্থ চালের বোল দিয়ে চলেছে, 'আর মান যায় বলেই, মন খেদে মরে, তখন ঝগড়া। অই আপনি যা বলেন, ঘোলা করা। তাই বলি বাবু, না ঘোলালে কি থিতোয়। তয় হাঁ, যদি দেখতেন, দাওয়ার মাল দাওয়ায় পড়ি রইল, হাঁকোড় পাকোড় নেই, অনন্ত চলি গেল, তা হলি জানতেন, ও আলগা রাশ, ছাড়াছাড়ি। তলায় তলায় বগবগায়, তাই জল ঘোলায়।'

আবার সেই পাজীর চোখে পাজীর হাসি। আর যা কিছু বাত পড়ছে, সব আমার জিভেতেই ঠেক খেয়ে যায়। যা বলার শোনার, এখানেই শেষ। তবু, ভুরু কুঁচকে লোকটার চোখের দিকে না তাকিয়ে পারি না। এ দেখছি রস-দরিয়ার পাকা মাঝি। এমনি চেয়ে দেখ দরিয়ায়, কোথায় আছে ঘূর্ণি, তোমার চোখে পড়বে না। চিনিয়ে দেবে পাকা মাঝি, দেখিয়ে দেবে উতরে যাওয়া। এ যেন সে গোত্র। আমার মনের যেখানে ছিল লজ্জা, ধিক্কারের ছি ছি ধ্বনি, সেই নির্লজ্জতাতেও পীরিতি মথিত। যখন তুমি সহজ বোঝ, তখন সে উলটো। প্রেম নামে নদী, সে চলে অদেখায়। তাকে দেখে তরী বাইবে, সে কাণ্ডারী নেই। যে আছে অদেখায়, তাই দেখে চলাই এ মাঝির দায়। কিন্তু, অবাক লাগে, এ গাজীতে সেই মাঝি কোথায়। এ আলখাল্লার ভাঁজে ভাঁজে চাপা আছে নাকি।

আমার দৃষ্টি দেখে তার একটু মন কুঁকড়ে যায় বুঝি। হাত জোড় করে বলে, 'রাগ করবেন না বাবু, এসব অচান কুচান দেখতি হল আপনারে।'

রাগ করিনি, এ কথাটা জানাবার আগেই আবার সেই, হারমোনিয়ামের সরু সুরের বেসুরো চীৎকার। তার সঙ্গে কাঁসির গলা। এবার একেবারে সামনেই। গাজী নিজের পায়ে বেগ দিয়ে বলে, 'আসেন, আসেন।'

বহুরূপী বটে, এতক্ষণে গাজী বাবুর কাছে লজ্জা পাবার অবকাশ পায়। তাই তাড়াতাড়ি এ হাট থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। একটু এগোলেই আবার বাঁয়ে বাঁক ফেরে সে। ফিরতেই নতুন দিগন্ত, সারি সারি খাবারের দোকান। যাকে বলে, মণ্ডা মেঠাই, খাজা গজা, এ তাই। এই দূরের হাট বলে অচ্ছেদ্দা করা চলবে না। রীতিমতো কাচ লাগানো আলমারিতে থরে থরে সাজানো। রসগোল্লা রাজভোগ পানতোয়া, সব আছে গামলায় গামলায়। হতে পারে অ্যালুমিনিয়ামের গামলা। কাঠের বারকোশে আছে গাল ফুলানো গজা, প্যাঁচানো অমৃতি, পেতলের বাটায় সন্দেশ। আরো দেখ, লেখা আছে, 'মিষ্টি দধি।' আড়ালে আবডালে নয়, দোকানের ভিয়েন বসেছে সামনেই। সিঙ্গাড়া নিমকির তো কথাই নেই। তবে, ছবির কথা আর বলব না। এখানেও তার রাজত্ব বেড়ায় বেড়ায়। তার সঙ্গেই ঠাকুরদের নানান বাণী।

এক নয়, কয়েকটি সারি সারি দোকান। ভিতরে বসবার জায়গা অনেক, যজ্ঞিবাড়ির খাওয়া হয়। তার আশেপাশেই রয়েছে চিঁড়া মুড়ি মুড়কি বাতাসা। চিনি মিছরি কদমার দোকান। চারদিকে মাছি পাবে পর্যাপ্ত। তার সঙ্গে বোলতা মৌমাছি। ভয়ে ভয়ে অমন করে হাত পা ছোঁড়বার দরকার নেই। তুমি যদি হুল না ফোটাও, সে তোমাকে ফোটাবে না। সকলেরই উদ্দেশ্য এক, খাবার সংগ্রহ।

এ দিগন্তে আসা মাত্র হঠাৎ গাজী ভুলে যাই। দুলি-অনন্ত ভুলে যাই। এত যে আমার বেরিয়ে পড়া অচিন পথে পথে, কেন কিসের খোঁজে তাও না জেনে, সেই রসিকের সব রস এখন দেখি জিভের রসের ধারায়। তাত্ত্বিকেরা কাকে বলেন 'মহাপ্রাণী', কে জানে। এখন দেখি, মহাপ্রাণী আমার সারা দিনের শূন্য জঠরে উপবাসে কাঁদে। হায়, এত কথা এক নিমেষে হারায়। হঠাৎ মনে হয়, সূর্য অনেক দূরে ঢল খেয়েছে, দুপুর কেটে গিয়েছে কখন। যে দিগন্তেই যাই, দানা বিনে কোন পাখিতে নাম গায়। দেখ, কেমন আষ্টেপৃষ্ঠে মানুষ, কেবল মানুষ কেন, একেবারে টায়ে-টিকে জীব, এই কথাটা কোনরকমেই ভুলতে পারা যায় না। সারা দিনের এত ক্ষুধা, কোথায় কখন এমন করে ঝিমিয়েছিল, কে জানে। এখন যেন ডাকাতের মত হাঁক দিয়ে উঠল।

কেবল যে এইসব দেখেই মহাপ্রাণী চমক খেলেন, তা নয়। রক্তে আর এক নেশা আছে, তার গন্ধও পাই। কোথায় যেন ভাতের গন্ধ ভাসে। তার সঙ্গে তরকারি ব্যঞ্জনের। এত দূরের হাটে সে আশা নিশ্চয় বৃথা। এখানে যাদের বসত, তাদেরই রান্না-বান্না হচ্ছে। তবু মুড়ি মুড়কি মিষ্টির থেকে ভাত-ব্যঞ্জনের গন্ধেই এই বাঙালী মাতি পাগল।

দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম আগেই। দু পা এগিয়ে গাজীও ফিরে তাকায়। কাছে এসে বলে, 'খাবার কিনবেন বাবু।' তা নইলে আর এ হাটে দাঁড়ানো কেন। বললাম, 'খিদে পেয়েছে, একটু খাওয়া দরকার।'

গাজীর যেন নিজের প্রাণে লাগে। বলে, 'আহ্ মুরশেদ, দোয়া কর হে। এতখানি বেলা হল, আমার ইস্তক মনে নাই। কী খাবেন বাবু।'

অভাবে যা জোটে। বললাম, 'কী আর খাব। অন্য কিছু তো পাব না, দই মিষ্টি দিয়েই মিটিয়ে নিই।'

ইতিমধ্যে এক দোকান থেকে ডাক পড়েছে, 'আসেন বাবু, ভাল রাজভোগ আছে, সন্দেশ আছে...।'

ফিরিস্তি শুনতে শুনতে পা বাড়াবো ভাবছি, তার আগেই গাজী বলে ওঠে, 'কইতি তো সাহস পাই না বাবু, দুই তিনখান ভাতের হোটেলও আছে।'

'ভাতের হোটেল?'

'এঁজ্ঞে বাবু। তার মধ্যি, নারাণদার হোটেলখানি বেশ সাফসুরত্ আছে। অই যে শোনলেন না, মাহাতো চাচা বললে, একবার নারায়ণের ঘর ঘুরি যাবে। তার মানে, চাচা চাচী ওখেন থেকে ভাত খেয়ে হাটা দেবে।'

ভাতের হোটেল শুনে শরীরে ক্রিয়া হয়, কিন্তু মন খুঁতখুঁত করে। হঠাৎ কোন দিকেই এগোতে পারি না। গাজী উৎসাহ দেয়, 'নারাণদার ঘরে আপনি চ্যার টেবুলও পাবেন, কাচের গিলাস পাবেন, চিনামাটির সান্‌কি পাবেন।'

একটু যেন মন টানে। সামান্য কথা নয়, এ দূরের হাটে চেয়ার টেবিলে বসে, ডিশে বেড়ে ভাত খাওয়া। দেখতে দোষ কী। বললাম, 'চল দেখি।'

চল বলে চলা নয়, সামনের দুটো ঘরের মাঝখানের সরু ফালি দিয়ে ঢুকেই দেখি, সামনে দরমার বেড়ার গায়ে আলকাতরা দিয়ে বড় বড় হরফে লেখা, 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ হিন্দু হোটেল।' আর কিছু লেখা নেই। মাটির দাওয়া পেরিয়ে ঘর। ঘরের ভিতর কোন জনপ্রাণীর কায়া দূরে, ছায়াও দেখি না। চ্যার টেবুলের কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না। তবে কোথায় যেন ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হয়, তার সংগে মানুষের গলা। গাজীর দিকে ফিরে তাকাই। তার নজর অন্য দিকে, সে কদম কদম এগিয়ে যায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণ হিন্দু হোটেল পেরিয়ে। এবার দেখি, দরমার বেড়ার গায়ে নয়, যথার্থ কাঠের তক্তা গোলপাতার চালার মাথায় ঝোলানো। তাতে লাল রঙ দিয়ে লেখা আছে, 'মহামায়া হিন্দু হোটেল।' নীচে স্থানের নাম। তবে, দরমার বেড়া এখানেও, এবং তা একেবারে ফাঁকা নয়। রীতিমতো ডাক দিয়ে বলা হয়েছে, 'আসুন, সর্বপ্রকার আহার পাইবেন।' আরো যেন কী সব লেখা ছিল। তার দাগ আছে, অক্ষরের অবয়বগুলো আর অটুট নেই। কালের থাবায় খুঁটে নিয়েছে, নাকি দরমা বেড়া আলকাতরা ধরে রাখতে পারে নি, তা বোঝার উপায় নেই।

সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ডাক শোনা গেল, 'গাজী যে। খেতি এলে নাকি।'

তাকিয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে বেড়া ঘেঁষে মাহাতো খুড়ো কাঁচা মাটির মেঝেয় বসে। সামনে তার কলাই করা থালায় গরম ভাতে ধোঁয়া উঠছে। তার সামনে মুখোমুখি আর একজন উবু হয়ে বসে কথা বলছে। খালি গা, রোগা রোগা লোকটা, গলায় এক গাছা পৈতা, দুই আঙুলের ফাঁকে বিড়ি। পৈতা-গাছার রঙ দেখে একখানি কেঁচো ভাববার কোন কারণ নেই। চান করার সময় মাজাঘষা না হয়, তা নয়। তবে নিত্যকার তেলে জলে একটা রঙ ধরেছে। মাহাতোর কথায় সেও ফিরে তাকায়।

গাজী বলে, 'বাবুকে একটু খাওয়াতি নে' এলাম।'

খুড়োর নজর তখন বাবুর দিকে। নিজেই ডাকে, 'আসেন না, ঘরে আসেন। ডাল ভাত টাংরা মাছের ঝাল পাবেন। আর আর যেন কী আছে বলেন নারাণ।'

সামনের কাঁকটি, আদুর গায়ে পৈতাতে হাত পাকিয়ে, বিড়িতে দুটি টান দিয়ে, মোটা গলায় জবাব দেয়, 'কুচো চিংড়ির অম্বল।'

তা না হয় শোনা গেল, কিন্তু মুকেশের নামে, চার টেবুল তো দেখি না। কাঁচের গেলাসের বদলে দেখি, মাহাতোর সামনে ছোটখাটো একখানি ঘটি। চিনেমাটির সানকির জায়গায় কলাই করা থালা। এ পোড়া চোখে যদি ছানি না পড়ে থাকে, তবে খানে খানে কলাই উঠে যাওয়া কারুকার্য অবশ্য দেখেছি।

তুমি দেখ চোখে চোখে, গাজী দেখে মনে মনে। সে বলে, 'ঘরে চলেন বাবু, চার টেবুল সব আছে ওপাশে। মস্ত বড় ঘর কি না।'

ভাবি, আগে যাবে গাজী, পিছে আমি। কিন্তু গাজী এগোয় না। এসেছি যখন, দেখে যাই। মহাপ্রাণীকে চোখ ঠারবো না, গরম ভাত, ট্যাংরা মাছের ঝাল শুনে, তার আটপৌরে বাঙলা স্বাদে রস কাটে। তবে কোথায় যেন পিছটান ফিরিয়ে নিতে চায়। গাজীকে বলি, 'চল।'

গাজী হেসে বলে, 'আমি তো যেতি পারব না বাবু, হিন্দুর হোটেল। আপনি যান, আমি ওই দরজার সামনে গে দাঁড়াই।'

বলে সে আরো কয়েক পা এগিয়ে যায়। লক্ষ্য পড়ে, আর একটা দরজা আছে ঢোকবার। কিন্তু গাজীর কথায় মনের অন্য চমক ভাঙে। গাজী যে মুসলমান, তা মনে ছিল না। তোমাদের নগরে বন্দরে, ঘরে পান্থশালায় যে ব্যবস্থা সে ব্যবস্থা। সেখানে বাবুর্চিতে জাত যায় না। তোমার জিভের রস-খসানো খানা খানার খান সাহেব। জাত দূরের কথা, তুমি খেয়ে কৃতার্থ। আর এখানে গাজী তোমার দাওয়ায় পা দিলেই ধর্ম রসাতল।

এবার নারাণঠাকুর স্বয়ং দাঁড়িয়ে আপ্যায়ন করে, 'আসেন বাবু, ভিতরে আসেন।'

দাওয়া পেরিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়াই। কী সর্বনাশ, আমার বুক ধড়াসে যায়। পায়ের কাছে, কালো চকচকে এটা কী এঁকেবেঁকে যায়! সাপ মনে করে পেছুতে যাই। নারাণ ঠাকুর হেসে ভরসা দেয়, 'ভয় পাবেন না বাবু, ওগুলোন পিপড়ে।'

'পিঁপড়ে?'

'আজ্ঞে। ডেয়ো পিঁপড়ে। আপনাকে কিছুটি বলবে না, যান, ওখেনে চেয়ারে দেয়ে যুত করে বসেন।'

এমন কিছু উমদো বাঙালীর অহংকার নেই যে, ডেয়ো পিঁপড়ে চিনি না। তা বলে, এইরকম! কোথায় কোন্ অন্ধকার কোণ থেকে যে এমন পুষ্ট কালো পিঁপড়ের সারি বেরিয়ে আসছে, ঠাহর করতে পারি না। কেবল দেখছি, কাঁচা মেঝের ওপর দিয়ে গুটি কয় বাঁকে লম্বা দাগে, উনি এক গর্তের মধ্যে নিরন্তর চলেছেন। চওড়া কম করে পৌনে এক ইঞ্চি। পাশাপাশি তিন চারজন করে লাইন দিয়েছে।

নারাণ ঠাকুর আবার ডাকে, 'আসেন, এই যে ইদিকে।'

পিঁপড়ের গণ্ডী পার হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ, যথার্থই চেয়ার টেবিল। তবে রূপের ব্যাখ্যা চেয়ো না। কিন্তু চেয়ার টেবিলের ওপাশে ভূঁয়ে কে বসে? চিনি চিনি যেন। ভাবতে ভাবতেই মাহাতো খুড়ী, তাড়াতাড়ি ঘোমটার আড়াল দেয়। আ ছি ছি, বিড়িতে লাজ নেই, তা বলে ভাতের গরাস কি পরপুরুষের সামনে তোলা যায়!

(ক্রমশ)

নেহরু যুগ : সমাজতান্ত্রিক সমাজ

প্রায় বছর তিনেক চলেছিল আমার অজ্ঞাতবাসের পালা। তারপর শ্রীনেহরু আবার নরম হলেন, এবং ১৯৫৫ সনের অগসট-এ আমিও আবার সরকারী কাজে ফিরে এলাম। রোরকেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে সরকার যে ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলছিলেন, তার দায়িত্বের একটা বড় অংশ দেওয়া হল আমার হাতে। শ্রীনেহরু যাকে বলতেন সমাজতান্ত্রিক সমাজ, তাকে গড়ে তুলবার কাজে আমি হাত মেলালাম।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক ভিতটাকে যদি পাকা করে তুলতে হয়, তা হলে সরকারী উদ্যোগগুলির পক্ষে শুধুই বিনিয়োগকারীর ভূমিকা নিলে চলে না, প্রয়োজনীয় সংগতি সৃষ্টির দায়িত্বও তাদের নেওয়া চাই। কিন্তু ভারতবর্ষে কোনও মন্ত্রী কিংবা আমলাকে যদি এ-কথা বলা যায়, তো তিনি চটে যাবেন। তার কারণ, তাঁর একটা বদ্ধমূল ধারণাকেই এর দ্বারা টলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মন্ত্রী আর আমলাদের বিশ্বাস, পণ্য উৎপাদনে ব্যয় কতটা পড়ছে, জনসাধারণের কাছে কী দামে সেটা বিক্রি করা যাচ্ছে, কিংবা বিনিয়োগ থেকে কী পরিমাণ আয় হচ্ছে, সেটা ধর্তব্য নয়: স্রেফ বড় বড় কতকগুলি শিল্পকে যদি রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসা হয় এবং তার পরিচালনা-ভার যদি আমলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তা হলেই খুব সমাজতন্ত্র হল। ভারতবর্ষ এ-পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিতে (ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া রেলপথগুলির কথা এখানে ধরা হচ্ছে না) দু হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। তার থেকে গড়পড়তায় আয় হয় শতকরা আড়াই টাকা। বেসরকারী শিল্পোদ্যোগে সে-ক্ষেত্রে গড়পড়তায় শতকরা তেইশ টাকা আয় হয়ে থাকে। আপনি যদি বলেন যে, এই আড়াই পারসেনটকে অন্তত পনর পারসেনটে তুলতে না পারলে ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়া যাবে না, তা হলে রাজনীতিকরা আপনার উপরে অসন্তুষ্ট হবেন এবং আমলারাও খুশী হবেন না। তাঁরা ভাববেন যে, আপনি বড্ডই বেয়াড়া লোক। ভারতবর্ষের অনেক 'প্রগতিশীল' রাজনীতিক এমন কথাও বলে থাকেন যে, সরকারী উদ্যোগগুলিতে তো লাভ করাই উচিত নয়। পৌর-প্রতিষ্ঠান থেকে যেমন বিনা-মুনাফায় জল-সরবরাহ ইত্যাদি ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিও তাঁদের বিবেচনায় তেমনি ব্যাপার, মুনাফার কোনও প্রশ্নই এ-ক্ষেত্রে উঠতে পারে না। এমন কী, সোভিয়েট রাশিয়াতেও শিল্পোদ্যোগের ভারপ্রাপ্ত কোনও কমিশার যদি এমন কথা বলেন তো তাঁকে বিপদে পড়তে হবে। তার কারণ, সাম্যবাদী সমাজেও সেই একই মাপকাঠিতে—অর্থাৎ লাভ-লোকসানের মাপকাঠিতে—শিল্প-বিনিয়োগের বিচার হয়ে থাকে; দ্বিতীয় কোনও মাপকাঠি সেখানেও নেই। আমাদের সমাজ-দার্শনিকরা সম্ভবত তাঁদের চাইতেও প্রগতিশীল।

১৯৫৫ থেকে ১৯৬০, এই পাঁচ বছর আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সরকারী ইস্পাত-উদ্যোগের জন্য পরিশ্রম করেছি। এই ধরনের সমাজ-দর্শনের সঙ্গে তখন প্রায়ই আমার পরিচয় ঘটত। আসলে এটা বড় বড় বুলির আড়ালে অযোগ্যতাকে চাপা দেবার চেষ্টা মাত্র। এটা আমার আদপেই ভাল লাগত না; এই ধরনের কথা শুনলে আমি দমে যেতুম। কিন্তু একইসঙ্গে এ-কথাও বলব যে, যা ছিল ফাঁকা মাঠ, তার উপরে একটু একটু করে মিলিয়ন-টনের বিরাট ইস্পাত-কারখানা, আর সেই কারখানাকে কেন্দ্র করে লক্ষ লোকের নতুন শহর গড়ে উঠছে—এই বিপুল কর্মযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত থাকার মধ্যে আনন্দ আর উত্তেজনাও ছিল অনেকখানি। একই সঙ্গে স্বতন্ত্র তিন দল বিদেশী কর্মীদের সঙ্গে তখন কাজ করেছি আমি। ওড়িশার রোরকেলা ইস্পাত-কারখানায় জারমানদের সঙ্গে, মধ্যভারতে ভিলাই ইস্পাত-কারখানায় রুশদের সঙ্গে, আর পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুরে ইস্পাত-কারাখনায় ব্রিটিশদের সঙ্গে। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। এই তিন দল কর্মীর মধ্যে আদৌ কোনও মিল ছিল না।

রোরকেলায় জারমানদের কাজে নানান রকমের ঝঞ্ঝাট দেখা দিয়েছিল। প্রথমে কাজ শুরু করেছিল তারাই। জারমানির বিখ্যাত ইস্পাত-উৎপাদক ক্রাপস প্রতিষ্ঠান এবং যন্ত্র-নির্মাতা ডেমাগ প্রতিষ্ঠান, এই দুয়ে মিলে একটি কোমপানি প্রতিষ্ঠা করে, এবং ভারত সরকারের ইস্পাত করপোরেশন হিন্দুস্থান স্টীলের সঙ্গে সেই কোমপানির একটি চুক্তি হয়। চুক্তির শর্ত ছিল এই যে, প্ল্যানট ও যন্ত্রাদি সংগ্রহ এবং কারখানা নির্মাণের

ব্যাপারে যা কিছু কারিগরী পরামর্শ প্রয়োজন, জারমান কোমপানিটিই তা দেবে। অতঃপর পুরো শিল্পোদ্যোগটি গড়ে তুলবার দায়িত্ব তেত্রিশটি পৃথক-পৃথক জারমান শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, এবং তাঁরা প্রত্যেকেই হিন্দুস্থান স্টীলের সঙ্গে পৃথক চুক্তি সম্পাদন করে। কেউ-বা কোক ওভেন গড়ে দেবে, কেউ-বা ব্লাস্ট ফারনেস; কেউ-বা স্টীল মেলটিং শপের এবং কেউ-বা রোলিং মিলের নির্মাণ-দায়িত্ব গ্রহণ করবে; কেউ-বা বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করবে, কেউ-বা জলের। বিভিন্ন অংশের নির্মাণে বেশ বিলম্ব ঘটতে লাগল, এবং সেই অংশগুলিকে জোড়া দিয়ে কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখা গেল যে, হাজার রকমের ঝঞ্ঝাট দেখা দিচ্ছে।

ইস্পাত-উৎপাদনের ব্যাপারটিকে রান্নার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এ-কাজ আপনা থেকে হবার নয়। কারখানা চালু করে দিলেন, আর হুড়হুড় করে নানান আকার আর নানান প্রকারের ইস্পাত বেরিয়ে আসতে লাগল, তা কখনও হয় না। ঠিক রান্নারই মতন, এটাও একটা অভ্যাসের ব্যাপার। বার-বার চেষ্টা করতে হয়, হাল ছেড়ে দিলে চলে না; চেষ্টা-করতে-করতে দেখা যায় যে, প্ল্যানট আর যন্ত্রপাতির কাজকর্মের ধরন-ধারন রপ্ত হয়ে এসেছে; উৎপাদনের কাজটা তখন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। পুরো উৎপাদন-ক্ষমতায় পৌঁছতে এক-একটা ইস্পাত-উদ্যোগের পাঁচ বছর পর্যন্ত সময় লেগে যায়। কতটা সময় লাগবে, কারখানার নির্মাণ-কৌশলের উপরে তা যেমন নির্ভর করছে, তেমনি তার পরিচালন-ভার যাঁদের উপরে ন্যস্ত হচ্ছে তাঁদের যোগ্যতার উপরেও সেটা নির্ভরশীল।

রৌরকেলা ইস্পাত কারখানায় যে-সব ঝঞ্ঝাট দেখা দিয়েছিল, তার দোষ গিয়ে পড়েছিল ক্রাপ-ডেমাগ প্রতিষ্ঠানের উপরে। তাঁরা খুবই দুঃখিত হয়েছিলেন এতে। রৌরকেলায় কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৫২ সনে; আর ভিলাইয়ে রুশ-কারখানাটির কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৫৫ সনে। অথচ একই সঙ্গে, ১৯৫৯ সনে, তাদের উৎপাদন শুরু হল। উৎপাদন যেদিন শুরু হয়, সেদিন থেকেই ভিলাইয়ের কারখানা ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৫৬ সনে; ১৯৬০ সনে সেখানে উৎপাদন শুরু হয়। রৌরকেলায় জারমানদের কাজে যে-সব ঝঞ্ঝাট দেখা দিয়েছিল, সেই তুলনায় দুর্গাপুরের ব্রিটিশ নির্মাতাদের অনেক কম ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে। রুশদের কাজ খুবই সফল হয়েছিল, এবং তার জন্য তারা অনেক বাহবাও পেয়েছিল। জারমান আর ব্রিটিশরা সেই তুলনায় বিশেষ খ্যাতি পায়নি। এর কারণ কী? প্রশ্নটা কৌতূহলজনক। জারমানি, ব্রিটেন অথবা মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ব্লাসট ফারনেস তৈরী হয়, সোভিয়েট রাশিয়াতেও সেই একই রকমের ব্ল্যাসট ফারনেস তৈরী হয়ে থাকে। পশ্চিম জারমানি থেকে যে প্ল্যানট, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছিল, তা প্রথম শ্রেণীর ও আধুনিক কালের উপযোগী। তার চাইতে আধুনিক উপকরণ পৃথিবীর কুত্রাপি ব্যবহার করা হয় না। বস্তুত, ভিলাই ও দুর্গাপুরের মিলের তুলনায় জারমানরা অনেক আধুনিক ধাঁচের মিল সরবরাহ করেছিল। ঠিক ছিল যে, রৌরকেলায় আমরা যাবতীয় ফ্ল্যাট প্রোডাকট, প্লেট অথ শীট উৎপাদন করব; সেই অনুযায়ী জারমানরা সেখানে এশিয়ার মধ্যে সবচাইতে আধুনিক পদ্ধতির হট স্ট্রিপ মিল আর কোল্ড রোলিং মিল তৈরি করে দেয়। দুর্গাপুরে আর ভিলাইয়ে লৌহপিণ্ড গলাবার ব্যবস্থা পুরনো ধাঁচের; সেখানে খোলা-চুল্লির ব্যবস্থা হয়েছে। রৌরকেলায় সে-ক্ষেত্রে অভিনব অস্ট্রীয়ান এল. ডি. (লিনট্‌স অ্যানড ডনাউইটস) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

আসলে, ইস্পাত-শিল্পের এই উদ্যোগটিকে গড়ে তুলবার দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন তেত্রিশটি জারমান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হয়েছিল, ঝঞ্ঝাটের হেতুটা ছিল তারই মধ্যে নিহিত। পৃথক-পৃথক ভাবে তাদের কাছ থেকে কাজ বুঝে নেওয়া, এবং সেই কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবার দায়িত্ব ছিল ভারতীয় ম্যানেজিং ডিরেকটরের উপরে। তিনি সে-দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন নি। অথচ দেশের মধ্যে এই ধারণা দেখা দিয়েছিল যে, জারমানরাই আমাদের ডুবিয়েছে। ক্রাপ প্রতিষ্ঠানের বড়কর্তা মিঃ অ্যালফ্রেড ক্রাপের সঙ্গে একদিন এই নিয়ে আমার কথা হচ্ছিল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি সক্ষোভে আমাকে বললেন যে, যে দায়িত্ব তাঁরা পালন করেন নি বলে আমরা দোষারোপ করছি, সেই দায়িত্ব আদৌ তাঁদের দেওয়া হয় নি। আসলে ক্রাপ-ডেমাগ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের চুক্তির শর্ত ছিল এই যে, কারখানা গড়বার ব্যাপারে যাবতীয় কারিগরী পরামর্শ তাঁরা দেবেন; তেত্রিশটি জারমান ঠিকাদারের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্বও যে তাঁদেরই, চুক্তিতে এমন কোন কথাই ছিল না। কাজটাকে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন জারমান প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেঁটে দিয়ে অবশ্য ভুল করা হয়নি। বরং অর্থ-সাশ্রয়ের বিচারে এই বণ্টন-ব্যবস্থা প্রশংসা লাভেরই যোগ্য। আমাদের সমন্বয়সাধন ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা সুষ্ঠু হলে এ-যুক্তি আরও অর্থবহ হত। দুঃখের বিষয়, সমন্বয়সাধনে আর তত্ত্বাবধানে ত্রুটি ছিল। তারই ফলে বাধল ঝঞ্ঝাট, আর তার দোষ গিয়ে পড়ল জারমানদের উপরে। জারমানদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েছিল ব্রিটিশরা। কাজের দায়িত্ব তারা আংশিকভাবে নেয় নি। একটি অখণ্ড কাজ হিসেবে ইস্পাত-শিল্পের পুরো উদ্যোগটা তারাই গড়ে দেবে, এই শর্তে দুর্গাপুরের কাজের দায়িত্ব নিয়ে অতঃপর—আভ্যন্তর ব্যবস্থা হিসেবে—একটি ব্রিটিশ কনসর-টিয়ামের সদস্যদের মধ্যে কাজটা তারা নিজেরাই বেঁটে দিয়েছিল। অর্থাৎ কাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্বও এ-ক্ষেত্রে তাদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল।

সেই তুলনায় ভিলাইয়ের অবস্থা ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র। কাজ করবার ঠিকা এ-ক্ষেত্রে নিয়েছিলেন স্বয়ং সোভিয়েট সরকার। একটি অখণ্ড দায়িত্ব হিসেবেই এতে তাঁরা হাত দেন। প্রকল্পের প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে শুরু করে প্ল্যানট ও যন্ত্র-সরঞ্জামের প্রতিটি অংশ নির্মাণ এবং সমস্ত কাজ মিলিয়ে তুলে উৎপাদনের কাজ শুরু করা—এই সমস্ত কিছুর অখণ্ড দায়িত্ব ছিল সর্বোচ্চ একজন রুশ টেকনিক্যাল বস্-এর হাতে। ভিলাইয়ের কাজ করবার জন্য ভি. আই. দিমসিৎসের মতন মানুষকে এ-দেশে পাঠানো হয়েছিল। ভিলাইয়ের কাজ শেষ হবার পর তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার অন্যতম ডেপুটি প্রধান-মন্ত্রীর আসনে বসেছিলেন। ভিলাইয়ের কাজটাকে যে সোভিয়েট সরকার কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এর থেকেই তা বোঝা যাবে। এটা ছিল তাঁদের কাছে একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। রাশিয়ানরা তাদের শ্রেষ্ঠ কর্মী, শ্রেষ্ঠ প্ল্যানট, শ্রেষ্ঠ যন্ত্রপাতি এবং শ্রেষ্ঠ সরঞ্জাম ভিলাইয়ে পাঠিয়েছিল। রাশিয়ার ইস্পাত-কর্মীদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়ে সেরা এগারো শো ইনজিনিয়ার আর টেকনিশিয়ানকে ভারতে পাঠানো হয়। ভিলাইয়ের শূন্য প্রান্তরে এগারো শো রুশ পরিবারের জন্য ঘরবাড়ি বানিয়ে দেওয়া হল। গ্রীষ্মকালে মধ্যভারতে দুঃসহ গরম পড়ে। কিন্তু এই রুশরা তা নিয়ে কখনও অভিযোগ করেন নি। তাঁদের আচরণ ছিল খুবই সংযত ও সৌজন্যসম্মত; জীবন ছিল অনাড়ম্বর। তাঁদের নিয়ে কখনও কোনও অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় নি। পক্ষান্তরে, রৌরকেলায় আদিবাসী নারীদের দিকে নজর দিতে গিয়ে জারমানরা মাঝে-মাঝেই ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে বসত। দুর্গাপুরে ব্রিটিশ কর্মীরা সে-ক্ষেত্রে অতিশয় ভদ্রভাবে জীবনযাপন করতেন। শুধু অসুবিধে ঘটত তাঁদের রেসিডেনট ডিরেকটরকে নিয়ে। ব্রিটিশ কনসরটিয়ামের প্রতিনিধি এই রেসিডেনট ডিরেকটর একজন অবসরপ্রাপ্ত আর্মি ব্রিগেডিয়ার। আগে তিনি ভারতবর্ষের মিলিটারি ইনজিনিয়ারিং সারভিসে কাজ করতেন। কল্পনাশক্তিরহিত রুক্ষ স্বভাবের মানুষ। ভারতীয়রা তাঁকে বরদাস্ত করতে পারতেন না। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনারকে এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হয়, এবং এখান থেকে তাঁকে ফিরিয়ে নেবার জন্য ব্রিটিশ কনসরটিয়ামকে তিনি রাজী করান। রেসিডেনট ডিরেকটরের কাজের মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে তখনও দু বছর বাকী। সেই

দ্ব বছরের বেতন চুকিয়ে দিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল। অতঃপর, খাঁটি ব্রিটিশ পদ্ধতিতে, সেই ব্রিগেডিয়ারটিকে নাইট-উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

রুশ কর্মীদের নিয়ে মাত্র একবারই আমরা অসুবিধেয় পড়েছিলাম। তার মূলে ছিল ভাষা-বিভ্রাট। এই ভিলাইয়েই সোভিয়েট রাশিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ ধাতু-বিশেষজ্ঞ ইনজিনিয়ারের মৃত্যু ঘটেছিল। তাঁর নাম ক্লানটেনকো। ইউক্রেনের এই বিশালকায় মানুষটি ১৯৫৬ সনে ভিলাইয়ে এক শোকাবহ দুর্ঘটনায় মারা যান। শীতের এক অপরাহ্ণবেলায়, কারখানার কাজের পর, মিঃ ক্লানটেনকো তাঁর বাচ্চা ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে একটি স্টেশন-ওয়াগনে উঠে ভিলাইয়ের কাছেই এক জলাভূমিতে হাঁস শিকার করতে গিয়েছিলেন। শট গানের সাহায্যে বেশ কিছু হাঁস তিনি শিকার করেন। সেগুলিকে ঝোলায় পুরবার পরে তিনি দেখতে পান যে, নিহত একটি হাঁস জলার ঠিক মাঝখানে ভাসছে। মিঃ ক্লানটেনকো ঠিক করলেন যে, সেটিকে ফেলে রেখে তিনি ফিরবেন না। জলায় নেমে সাঁতার দিয়ে তিনি হাঁসটির কাছে গিয়ে পৌঁছলেন; তারপর আবিষ্কার করলেন যে, যতটা গভীর ভেবেছিলেন, জলাটি তার চাইতে অনেক বেশী গভীর, এবং পিচ্ছিল আগাছার ভরা। যতই তিনি তার থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেন, ততই আরও সেই মারাত্মক আগাছায় তিনি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যেতে লাগলেন। মিঃ ক্লানটেনকো ছিলেন পাকা সাঁতারু; তা ছাড়া তাঁর দৈহিক শক্তিও কম ছিল না। কিন্তু জলজ আগাছার সেই সর্বনাশা আলিঙ্গন থেকে নিজেকে তিনি মুক্ত করতে পারলেন না। তাঁর বাচ্চা ছেলেটি পাড়ে বসে সাতঙ্কে সব দেখছিল। স্বচক্ষেই সে দেখতে পেল যে, তার বাবা ধীরে ধীরে জলার তলায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। প্রাণপণে দৌড়ে সে তখন কাছাকাছি একটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছল। ছেলেটি মাত্র গুটিকয়েক ইংরেজী শব্দ শিখেছিল। তারই সাহায্যে গ্রামবাসীদের সে বোঝাতে চেষ্টা করল যে, তার বাবা জলে নেমে বিপদে পড়েছেন। 'পাপা ইন ওয়াটার!' 'পাপা ইন ওয়াটার!' বারবার শুধু এই কথাটাই বলতে লাগল সে। গ্রামবাসীরা তৎক্ষণাৎ তাকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ে সেই জলার কাছে আসে, এবং অনেক চেষ্টা করে জলার মধ্য থেকে মিঃ ক্লানটেনকোকে পাড়ে তুলে আনে। কিন্তু তাঁর দেহে তখন প্রাণ নেই। মিঃ ক্লানটেনকোর এই শোকাবহ মৃত্যুতে আমরা সকলেই অত্যন্ত বেদনা বোধ করেছিলাম।

এই মৃত্যুর ব্যাপারে আইনগত যা-কিছু ব্যবস্থা নেবার দরকার ছিল, তা নেওয়া হল। স্থানীয় ম্যাজিসট্রেট এ সম্পর্কে তদন্ত করে দেখলেন, এবং যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষার পর রায় দিলেন: "আই অ্যাম স্যাটিসফায়েড দ্যাট মিঃ ক্লানটেনকো ডায়েড ইন অ্যান অ্যাকসিডেনট।" (অর্থাৎ "এ-বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, মিঃ ক্লানটেনকো দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন।") তাঁর এই রায় শুনে ভিলাইয়ে উপস্থিত রুশ প্রতিনিধিরা খুবই ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁরা বললেন, "রাশিয়ার যিনি একজন শ্রেষ্ঠ ধাতু-বিশেষজ্ঞ ইনজিনিয়ার, ভারত-রুশ বন্ধুত্বের বেদীতে তিনি প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। ভারত আমাদের বন্ধু-রাষ্ট্র। আর সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে উনি কিনা বলছেন যে, এতে উনি স্যাটিসফায়েড! এ কি একটা অমানবিক ব্যাপার নয়?" অনেক কষ্টে আমরা আমাদের রুশ বন্ধুদের সেদিন বোঝাতে পেরেছিলাম যে, মিঃ ক্লানটেনকোর মৃত্যু এই ভারতীয় ম্যাজিস-ট্রেটের পক্ষে মোটেই সন্তোষের ব্যাপার নয়। 'স্যাটিসফায়েড' হওয়ার অর্থ এখানে 'সন্তুষ্ট' হওয়া নয়, 'নিশ্চিত' হওয়া। অর্থাৎ উনি বলছেন যে, এটা যে একটা দুর্ঘটনার ব্যাপার, এ-বিষয়ে উনি নিশ্চিত। অনেক কষ্টে সেদিন একটা আন্তর্জাতিক ভুল-বোঝাবুঝির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছিল।

ভিলাইয়ে যে-সব রুশ কর্মী আমাদের কারখানা গড়ে দেন, ভারতে পাঠাবার আগে রাশিয়ার তাঁদের নিখুঁত তালিমের ব্যবস্থা

করা হয়েছিল। একে তো তাঁদের বিধি-বিধান অত্যন্তই কড়া, কমিউনিস্ট দেশে যা কিনা খুবই স্বাভাবিক; তদুপরি তাঁরা যেন সর্বদাই সচেতন ছিলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ার মান-মর্যাদা এর উপরে নির্ভর করছে। তাঁরা জানতেন, যথাসাধ্য ভালভাবে তাঁরা দায়িত্ব পালন করবেন, তাঁদের কাছে এইটেই প্রত্যাশা করা হচ্ছে। তাঁদের কর্তারাও কৃতসংকল্প ছিলেন যে, যেমন করেই হোক, উদ্যোগটাকে ষোল-আনা সফল করতে হবে। তাঁদের কর্মসূচী ছিল অত্যন্তই কড়া; তার এক চুল এদিক-ওদিক হবার উপায় ছিল না। ফলে আমরাও শশব্যস্ত থাকতুম। উপকরণ কিংবা লোকজন, যখন যেটা আমাদের সরবরাহ করবার কথা, ঠিক তখনই সেটার যোগান দেবার ব্যবস্থা করতে হত। এ-ব্যাপারে এতটুকু ত্রুটি ঘটলে দিল্লিতে রুশ রাষ্ট্রদূত অমনি সরাসরি শ্রীনেহরুর কাছে গিয়ে অভিযোগ করতেন।

এই রকমেরই একটা অভিযোগের সূত্রে শ্রীনেহরু একবার রুশ রাষ্ট্রদূত ও তাঁর সঙ্গীদের সম্মুখীন হবার জন্য ইস্পাত-মন্ত্রী, আমাদের সংস্থার চেয়ারম্যান ও আমাকে ডেকে পাঠান। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ঢুকে দেখি, বড় বড় আট-দশ বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত আগেই সেখানে গিয়ে আসন নিয়েছেন। আমরা গিয়ে আসন নেবার পর তিনি তাঁর পকেট থেকে একটি লিখিত স্মারকলিপি বার করলেন ও গম্ভীরভাবে সেটা পড়ে শোনাতে লাগলেন। "ইয়োর একসেলেন্সি, আমাদের দুই সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী যে-সময়ে (উপকরণ কিংবা লোকজন যা-ই হোক) সরবরাহ করবার কথা, সেই সময়ে সরবরাহে আপনাদের সংস্থার ব্যর্থতা যে হতাশার সঞ্চার করেছে, সংযুক্ত সোভিয়েট সোস্যালিস্ট্ রিপাবলিকের সরকার সেই হতাশার কথা আপনাকে জ্ঞাপন করবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন; এবং সংযুক্ত সোভিয়েট সোস্যালিস্ট রিপাবলিকের সরকার এ-কথা আপনাকে জ্ঞাপন করবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ভিলাইয়ে আপনাদের সংস্থা যদি না এইসব শর্ত মান্য করেন, তা হলে সোভিয়েট সরকার ধরেই নেবেন যে, আপনার সরকারের কাজ যথাসময়ে সম্পাদন করবার যে প্রতিশ্রুতিতে তাঁরা আবদ্ধ, সেই প্রতিশ্রুতি পালনের দায়িত্বও তাঁদের আর রইল না।"

প্রধানমন্ত্রী খুবই মধুরভাবে এ-কথার জবাব দিলেন। তিনি বললেন, সোভিয়েট সরকারের প্রতিনিধিরা যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ইস্পাত-কারখানার নির্মাণ-কার্য সমাপ্ত করতে বদ্ধপরিকর, এ-কথা জেনে তিনি খুবই খুশী হয়েছেন। আমাদের দুই পক্ষেরই তো এ-ব্যাপারে একই লক্ষ্য। তবে কিনা তাঁর পক্ষে যে রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের প্রতিটি খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়, তা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। খুঁটিনাটি নিয়ে যা-কিছু আলোচনা করবার, তা ইস্পাত-মন্ত্রী আর সিনিয়র অফিসাররাই করবেন; কাজের ব্যাপারে যদি কিছু অসুবিধে দেখা দিয়েই থাকে, তবে শিগগিরই যে তা মিটে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। শুনে মহামান্য রাষ্ট্রদূত এবং তাঁর সঙ্গী বিশেষজ্ঞরা দপ্তর থেকে বিদায় নিলেন। ঘর থেকে তাঁরা বেরিয়ে যাবার পর প্রধানমন্ত্রী তো আমাদের নিয়ে পড়লেন। "কোনও ওজর আমি শুনতে চাই না। ইনি যা বলে গেলেন, তা নিশ্চয়ই সত্যি। অভিযোগ ভিত্তিহীন হলে এক বিদেশী রাষ্ট্রদূত নিশ্চয়ই আমার সামনে বসে এত সব কথা বলতে পারতেন না। দয়া করে তোমরা এখন যাও; ওঁরা যা চাইছেন তা দেবার ব্যবস্থা করো। নয়ত তোমাদের সবাইকে আমি মজা টের পাইয়ে দেব।" কী আর করা। মন্ত্রী, চেয়ারম্যান আর আমি অধোবদনে বেরিয়ে এলুম। এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, জার্মান রাষ্ট্রদূত কিংবা ব্রিটিশ হাইকমিশনার কিন্তু রৌরকেলা কিংবা দুর্গাপুরের ব্যাপার নিয়ে, প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা, এমন কী ইস্পাত-মন্ত্রীর কাছে গিয়েও এই ধরনের কোনও অভিযোগ তুলতে ভরসা পেতেন না। মাঝে-মধ্যে এক-আধবার তাঁদের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কিংবা ট্রেড কমিশনার হয়ত আমাদের সঙ্গে এসে দেখা করতেন; দ্বিধা-গ্রস্তভাবে বলতেন, কারখানা-নির্মাণের কাজে কিছু অসুবিধে ঘটছে, এ-ব্যাপারে আমরা হয়ত কিছু সাহায্য করতে পারি।

বিদেশীরা যে-সব যন্ত্র গড়ে তুলতে লাগলেন, সেগুলির দায়িত্ব গ্রহণ ও পরিচালনার জন্য কর্মী সংগ্রহ করা ও তাঁদের তালিম দেবার ব্যবস্থা করাই ছিল আমার প্রধান কাজ। ছ' হাজারেরও বেশী দরখাস্ত এসেছিল তরুণ ইনজিনিয়ারদের

কাছ থেকে। তার থেকে বাছাই করে আড়াই হাজার ইনজিনিয়ার আমরা নেব। তা ছাড়া নিতে হবে আঠারো হাজার অধস্তন টেকনিসিয়ান। কাজটা সহজ নয়, সে-কথা বলাই বাহুল্য। বড় যে দুটি ইস্পাত-কারখানা আমাদের ছিলই, সেই টাটা ও ইনডিয়ান আয়রন থেকে আড়াই শো অভিজ্ঞ ইস্পাত-কর্মীকেও আমাদের নিয়ে আসবার দরকার হয়েছিল। কর্মসূত্রে যখনই আমি জামসেদপুরে যেতুম, টাটা ইস্পাত কোমপানির ম্যানেজিং ডিরেকটর স্যর্ জাহাংগীর গান্ধী তখনই আমাকে বলতেন, "কী সুধীর, এবারে কাকে কাকে কেড়ে নিতে এসেছ?" কেড়ে নেবার কোনও প্রশ্নই অবশ্য ওঠে না, কেননা সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করবার জন্য টাটা-প্রতিষ্ঠান ছিলেন সদাপ্রস্তুত। তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে সরকারী ইস্পাত-কারখানার জন্য উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না। বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁরা আমাদের এক শোরও বেশী অভিজ্ঞ ইস্পাত-কর্মী দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, যে আঠারো হাজার টেকনিসিয়ান নিয়েছিলাম আমরা, তাঁদেরও অধিকাংশকেই তাঁরা ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করেন। মহীশূরের ছোট্ট ইস্পাত-কারখানাটিতে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃহৎ কয়েকটি ইনজিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানেও কিছু টেকনিসিয়ানকে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, মেটালারজিক্যাল আর কেমিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এ ডিগরী-পাওয়া আড়াই হাজার তরুণ ইনজিনিয়ার ছাড়া আরও প্রায় হাজার খানেক টেকনিসিয়ানকে বিদেশে পাঠাবার প্রয়োজন হয়। ভারতবর্ষের যে ছটি ইনজিনিয়ারিং কলেজে ধাতুবিদ্যা পড়ানো হয়, চটপট আমাদের কিছু ধাতুবিদ্যা-জানা গ্র্যাজুয়েট তৈরি করে দেবার জন্যে তাদের প্রত্যেকেরই সাহায্য নিয়েছিলাম আমরা। আমাদের তখন অন্তত ছ' শো ধাতুবিদ্যায় ডিগরী পাওয়া গ্র্যাজুয়েট দরকার। কিন্তু তেমন গ্র্যাজুয়েট ভারতবর্ষে তখন মাত্র দুশো ছিলেন। ইনজিনিয়ারিং কলেজগুলির সংগে বিশেষ ব্যবস্থাক্রমে আমরা তাই মেকানিক্যাল অথবা কেমিক্যাল ইনজিনিয়ারিং-এর ডিগরীধারী তরুণ গ্র্যাজুয়েটদের সেখানে পাঠাতে লাগলাম; এবং মেটালারজি অর্থাৎ ধাতুবিদ্যায় এক বছরের সংক্ষিপ্ত কোর্স পড়িয়ে তাঁরা সেই ছেলেদের 'ইমারজেনসি মেটালারজিস্ট' বানিয়ে তুলতে লাগলেন।

এইসব তরুণ কর্মীকে ট্রেনিং দেবার ব্যাপারে রাশিয়ানদের আগ্রহ ছিল উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে এক হাজারেরও বেশী কর্মীকে সোভিয়েট রাশিয়ায় নিয়ে সেখানকার ইস্পাত-কারখানাগুলিতে ট্রেনিং দিতে ইচ্ছুক ছিলেন তাঁরা। সেই অনুযায়ী তাঁরা আমাদের সংগে ব্যবস্থাক্রমে একটা কর্মসূচী তৈরি করে ফেললেন। ঠিক হল, ভারতীয় ইনজিনিয়াররা রাশিয়ায় গিয়ে ইউক্রেনে কৃষ্ণসাগরের কাছে জাপোরোশে, বুদানস্ক ও আজভস্তালের ইস্পাত-কারখানায় ট্রেনিং নেবেন। সেখানকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের মানুষদের উপযোগী। ভারতীয়দের তাঁরা রাশিয়ার অন্যত্র পাঠাতে চাইলেন না এই আশংকায় যে, শীতকালে সেখানে তাঁরা হয়ত ঠাণ্ডায় দারুণ কষ্ট পাবেন। তরুণ এইসব ভারতীয় কর্মী যাতে ঠিকমত কাজ শিখতে পারেন, এবং বিদেশে তাঁদের জীবনযাত্রা যাতে মোটামুটি স্বচ্ছন্দ থাকে, রাশিয়ানরা সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের আগ্রহ ছিল আন্তরিক। বস্তুত যত লোককে আমরা রাশিয়ায় পাঠাতে চেয়েছিলাম, তার চাইতেও বেশী লোককে তাঁরা ট্রেনিং দিতে রাজী ছিলেন। তবে, বলাই বাহুল্য, আমাদের অন্য দুটি ইস্পাত কারখানার জন্য তাঁরা কাউকে ট্রেনিং দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তার কারণ, সে দুটি কারখানা জারমান আর ব্রিটিশদের গড়া। ব্রিটেনের ইস্পাত-শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা মোটামুটি দু কোটি টন; পশ্চিম জারমানির ইস্পাত-শিল্পের উৎপাদন-ক্ষমতা এক কোটি আশি লক্ষ টন। রাশিয়ার উৎপাদন-ক্ষমতা সে-ক্ষেত্রে সাড়ে ছ কোটি টন। ব্রিটেন ও পশ্চিম জারমানির পক্ষে সুতরাং স্বভাবতই আমাদের খুব বেশী কর্মীকে ট্রেনিং দেওয়া সম্ভব ছিল না; এ ব্যাপারে তাদের সাধ্য ছিল সীমায়িত। অগত্যা আমরা চেষ্টা করতে লাগলাম যাতে হাজার খানেক তরুণ ভারতীয় ইনজিনিয়ারকে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ট্রেনিং দিয়ে আনানো যায়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র বছরে চোদ্দ কোটি টন ইস্পাত উৎপাদন করবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু আমেরিকার ইস্পাত কারখানায় আমাদের কর্মীদের জন্য ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা শক্ত হয়ে দাঁড়াল। আমরা এ ব্যাপারে সেখানকার ইস্পাত কারখানাগুলির ফেডারেশনকে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু উত্তরে তাঁরা বললেন, "না।" ১৯৫৭ সনের শীতকালে তাঁদের চেয়ারম্যান মিঃ বেনজামিন ফেয়ারলেস ভারত-সফরে আসেন। মারকিন রাষ্ট্রদূতের ব্যবস্থাপনায় আমাদের স্টীল করপোরেশনের চেয়ারম্যান মিঃ ফেয়ারলেসের সংগে এ নিয়ে কথা বললেন। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হল না। মিঃ ফেয়ারলেস বললেন, বিদেশী কর্মীদের ট্রেনিং দেবার ব্যাপারে মারকিন ইস্পাত-শিল্পের অভিজ্ঞতা মোটেই মধুর নয়। ভেনেজুয়েলায় আমেরিকানরা একটি ইস্পাত-কারখানা নির্মাণ করেছিল। অতঃপর সেখান থেকে পঞ্চাশজন তরুণ কর্মীকে যুক্তরাষ্ট্রে এনে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু তাঁদের অভিজ্ঞতা এই যে, কাজ শিখতে এই তরুণ ভেনেজুয়েলানদের মোটেই উৎসাহ ছিল না; বান্ধবী জুটিয়ে ফুর্তি

করতেই তাদের আগ্রহ ছিল। কারখানার কাজকে তারা নোংরা কাজ বলে মনে করত, সে কাজে তারা পারতপক্ষে হাত লাগাতে চাইত না। তারা ছিল বিলাসী ফুর্তিবাজ ছেলে। না, বিদেশীদের ট্রেনিং দিতে গিয়ে যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে তাঁদের; আর তাঁরা তাঁদের ইস্পাত-কারখানার মধ্যে কোনও বিদেশী কর্মীকে ঢোকাতে চান না।

ব্যাপার দেখে আমরা তো মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। আমেরিকার ইস্পাত-সম্রাট মিঃ বেনজামিন ফেয়ারলেসকে যে কী করে এই ট্রেনিং-এর ব্যাপারে রাজী করাব, সেটা আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত আমি একটা উপায় ঠাওরালাম। সেই সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম আমি; তাঁর সেক্রেটারিকে গিয়ে বললাম, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। প্রধানমন্ত্রীর স্নেহচ্ছায়া ইতিমধ্যে আমি আবার ফিরে পেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না। কিন্তু দেখা করবার দরকারটা ছিল জরুরী। আমি খবর পেয়েছিলাম যে, পরদিন সকাল দশটায় মিঃ বেনজামিন ফেয়ারলেস গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। তার আগেই আমি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে রাখতে চাইছিলাম যে, ট্রেনিং-এর ব্যাপার নিয়ে অসুবিধে দেখা দিয়েছে। "প্রধানমন্ত্রীকে আপনি কি সত্যিই জরুরী কিছু জানাতে চান?" সেক্রেটারি আমাকে এই প্রশ্ন করলেন, এবং যেন কিছুটা অনিচ্ছাভরেই ভিতরে একটা চিরকুট পাঠিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল : "সুধীর ঘোষ এসেছেন।"

চিরকুট নিয়ে যে ভিতরে ঢুকেছিল,

চটপট সে বেরিয়ে এসে জানাল, প্রধানমন্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। শ্রীনেহরুর ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার কী সুধীর? তুমি এখন এখানে কেন?" বললাম, হাজার খানেক তরুণ ইনজিনিয়ারকে আমরা ট্রেনিং নেবার জন্য আমেরিকায় পাঠাতে চাই। কিন্তু তাতে অসুবিধে দেখা দিয়েছে। পরদিন সকালে তো মিঃ বেনজামিন ফেয়ারলেস তাঁর সঙ্গে এসে দেখা করবেন; তখন কি তাঁর পক্ষে মিঃ ফেয়ারলেসকে এ বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব হবে? এক হাজার শিক্ষার্থীকে আমেরিকায় পাঠানোর বিষয়ে একটা স্মারকলিপি আমার সঙ্গেই ছিল। সেটা আমি শ্রীনেহরুর হাতে তুলে দিলাম, এবং বললাম যে, ফোর্ড ফাউনডেশন এ ব্যাপারে সমস্ত খরচা দিতে রাজী হয়েছেন, এখন শুধু ট্রেনিং-এর সুবিধেটা পেলেই হয়। সেইটে পাওয়া নিয়েই সমস্যা বেধেছে। স্মারকলিপিটি ছিল দীর্ঘ। অতটা পড়ে দেখবার সময় নিশ্চয় তাঁর হবে না। তাই বললাম, স্মারকলিপির সারমর্মটা আমি তাঁকে মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বলতে পারি। শ্রীনেহরু কিন্তু পুরো স্মারকলিপিটিই পাঠ করলেন। তারপর বললেন, "তা এতে অসুবিধে কী? তুমি বলছ, এই ফেয়ারলেস লোকটি এদের ট্রেনিং-এর সুবিধে দিতে রাজী নন? বেশ, তুমি বরং এই কাগজপত্রগুলি আমার কাছে রেখে যাও।"

আমাদের বোর্ডের চেয়ারম্যান সাধারণত ঘুম থেকে একটু দেরি করে উঠতেন। পরদিন খুব ভোরবেলায় কিন্তু টেলিফোনের শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ভেবেছিলেন, টেলিফোন তুলে তিনি ধমক লাগাবেন। কিন্তু তা আর হল না। আর কেউ নন, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীই তাঁকে ডাকছিলেন। প্রধানমন্ত্রী বললেন, এক হাজার তরুণ কর্মীকে ট্রেনিং-এর জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাবার ব্যাপার নিয়ে অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি খবর পেয়েছেন। তা বেলা দশটায় মিঃ ফেয়ারলেস তো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন; চেয়ারম্যান তার মিনিট কয়েক আগে যদি প্রধানমন্ত্রীর কাছে যান তো ভাল হয়। সেই অনুযায়ী আমাদের চেয়ারম্যান তো প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে গেলেন। গিয়ে দেখেন, মিঃ ফেয়ারলেস আর মার্কিন রাষ্ট্রদূত তাঁর আগেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন; প্রধানমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারির ঘরে বসে অপেক্ষা করছেন তাঁরা। প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই আমাদের চেয়ারম্যানকে ডেকে পাঠালেন। ভিতরে ঢুকে মিনিট কয়েক বাদেই আবার বেরিয়ে এলেন তিনি। মিঃ ফেয়ারলেসের উপরে তাঁর এই আগমন-নির্গমনের যে প্রভাব অতঃপর দেখতে পাওয়া গেল, তা বিস্ময়কর। যেন মন্ত্রের মতন কাজ হল এতে। শ্রীনেহরুর ঘর থেকে ডাক পড়বার পর সেখানে ঢুকেই মিঃ ফেয়ারলেস

যা বললেন, তা হচ্ছে এই : "মিঃ প্রাইম মিনিস্টার, আপনাদের তরুণ ইস্পাত-ইনজিনিয়ারদের ট্রেনিং নিয়ে আপনার সরকার কিছুটা সমস্যায় পড়েছেন শুনতে পেলাম। এ সম্পর্কে আমি ভেবে দেখেছি। এ ব্যাপারে আপনার সরকারকে আমরা সাহায্য করতে প্রস্তুত।" মিঃ ফেয়ারলেসের কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী অনুমোদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। এ ব্যাপারে নিজে থেকে তাঁকে কিছুই বলতে হল না।

প্রথম দফায় দু শো ভারতীয় ইনজিনিয়ারকে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়। তাঁরা সেখানে ছ' মাস ট্রেনিং নেবার পরে আমেরিকা থেকে আমাদের জানানো হয় যে, বাকী আট শো ইনজিনিয়ারকেও সেখানে পাঠিয়ে দিলে তাঁরা খুশী হবেন। তরুণ এইসব ইনজিনিয়ারকে কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করে পিট্‌সবার্গ, ইয়াংস-টাউন, ক্লীভল্যান্ড আর শিকাগোতে ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা করা হয়। মারকিন ইস্পাত-নির্মাতারা আমাদের জানালেন যে, ভারতীয় তরুণেরা কাজ শিখতে খুবই উৎসাহী, কোনও কাজকেই তাঁরা নোংরা বলে গণ্য করেন না, হঠাৎ যদি কোনও মেরামতির কাজে সাহায্য করবার জন্যে ডাক পড়ে তা হলে রাত দুটো-তিনটের সময়েও কারখানায় ছুটতে তাঁদের এতটুকু আপত্তি নেই। যা-কিছু তাঁদের করতে বলা হয়, তা-ই তাঁরা হাসিমুখে করেন, এবং নিজে থেকেই আরও কাজ চেয়ে নেন। ট্রেনিং-কর্মসূচীর যেদিন সূচনা, তার বছর খানেক বাদে আমেরিকার বিভিন্ন শিল্প-কেন্দ্রে গিয়ে আমাদের এইসব তরুণ ইনজিনিয়ারের সঙ্গে আমি দেখা করি। ভারতীয় শিক্ষার্থী ও মারকিন শিক্ষকদের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় আমি কাটিয়েছিলাম। সেখানে বিভিন্ন ইস্পাত-কারখানার ম্যানেজার আমাকে জানালেন যে, এই ধরনের দক্ষ তরুণদের হাতে যদি আমাদের ইস্পাত-শিল্পের ভার পড়ে, তা হলে কোনও চিন্তাই আমাদের নেই। তাঁরা এও বললেন যে, বছর পাঁচেক যদি এইসব ছেলেকে আমরা আমেরিকায় রাখতে রাজী হই, তা হলে এঁদের প্রত্যেককেই তাঁরা তাঁদের কারখানাতেই চাকরি দিতে রাজী আছেন। শুনে তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম যে, তা হবার নয়, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এঁদের আমি এখন দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমাদের বোর্ডে যে-সব অবসরপ্রাপ্ত সরকারী অফিসার ছিলেন, তাঁরা সকলেই কিন্তু বলেছিলেন যে, এইসব তরুণ ইনজিনিয়ারকে আমেরিকায় পাঠিয়ে লাভ নেই, কারখানায় কাজে হাতে কালি মাখাতেই এঁরা রাজী হবেন না, এঁরা সবাই 'ভদ্র' কাজের পক্ষপাতী। তাঁদের আশঙ্কাটা যে সর্বৈব ভিত্তিহীন, আমাদের তরুণ ইনজিনিয়াররা তা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

(ক্রমশ)

টোকিওর চিঠি

বাংলার ছেলে, বাংলার রূপে মুগ্ধ হব, বাংলার আকাশে বাতাসে হারিয়ে যাব, এতে আর আশ্চর্য কি? পৃথিবীর বৃহত্তর শহর 'টোকিও', তার কেন্দ্রমণি 'গিনজয়'। নিজের লাস্যময়ী রূপকে পৃথিবীর চোখের সামনে তুলে ধরবার কতই না প্রচেষ্টা। তারই ছোট্ট একটা সাজান অন্ধকার ঘরে বিভূতিবাবুর অপুর হাত ধরে উন্মুক্ত প্রান্তর, আকাশ ছোঁয়া মাঠ, কাশ-ছড়ান দিগন্ত, মেঘডাকা-আকাশ, পানায় ঢাকা ছোট্ট এঁদো-পুকুরের পাড় ঘেঁষে, বাঁশ-বনের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে হারিয়ে যাওয়া বাছুর নিয়ে ফিরলাম; তার দু-চোখ ভরা বিস্ময়, না-পাওয়ার বেদনা, দিদিকে হারানর দুঃখ আমাকে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হল। সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী" আমাদের বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরের অস্তিত্বকে আমার মনে আর একবার নূতন করে "শেষ-আজান" হাঁকল। সেখান থেকে বাদ গেল না আমার চার পাশে বসা বিদেশীর দল। এই টোকিওতে চতুর্থবার যেতে হল চতুর্থজনকে নিয়ে। শেষ জাপানী বন্ধুবর একটু শিল্প-রসিক হয়ত সেই মন দিয়েই বিচার করল। বাইরে বার হয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, "I have nothing to say, realy you people, are very serious in art." আমি শুধু বললাম, "Of course when we are in real art."

আলো ঝলমল প্রাচুর্যের মধ্যে বাইরে টাঙ্গান অপুর দিদিকে হারিয়ে পুকুর-পাড়ে দাঁতে ছাই-ঘষা বড় ছবিটা আমাকে অনেকবার চলতে চলতে দাঁড় করিয়েছে। নীচে বাংলায়, ইংরাজীতে আর জাপানীতে লেখা আছে "পথের পাঁচালী"। তার নীচে দুটো নাম—'শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় আর শ্রীসত্যজিৎ রায়—শ্রদ্ধা জানিয়েছি তাঁদের অমর সৃষ্টিকে। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে এখানকার সর্বাধিক প্রচারিত ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্র "জাপান টাইমস" অনেক কিছু লিখেছে "...এ ছবি শুধু ভারতের নয়, যে কোন দেশের মানব সভ্যতার দুঃখ দুর্দশা, মান-অভিমান, স্নেহ ভালবাসা এতে ফুটে উঠেছে...।" সত্যজিৎ রায়ের একটা উক্তি তাঁর নিজের কথায় তুলে ধরা হয়েছে "আমি এই ছবি করবার পর নিজেকে নূতন করে খুঁজে পেয়েছিলাম...।"

ছাত্র জীবনে যা প্রথম দেখতে শুরু করেছিলাম, আজ বিদেশে সব মিলিয়ে সপ্তমবার দেখবার পর, আমি দেশের জন্য "মন কেমন করা" মনটা দিয়ে এত উচ্ছ্বাসের

শাড়ী পরা জাপানী মেয়ে

ভিতরেও দেশকে খুঁজে পেলাম। বিদেশে বসে দেশকে এমন করে অনুভব করবার মতন আনন্দ বোধ হয় কিছুতে নেই। এর জন্য বাঙ্গালী হিসাবে যে কোন আখ্যা নিতে আমি রাজী আছি। নূতন করে বুঝলাম দেশকে আমি ভালবাসি। ভাবলাম বিদেশে বসে দেশকে তাদেরই খারাপ লাগে—দেশে যাদের সুস্থ-পরিবেশ নেই—যাদের ভালবাসার কেউ নেই—ভাল লাগবার কিছু নেই। তাই আমি সত্যজিৎ রায়ের "পথের পাঁচালী"র কাছে ঋণী আর গর্বিত এই ভেবে যে আমার দেশবাসী পৃথিবীর কাছে সাধারণ জীবন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক মহান-মানবতাকে তুলে ধরতে পেরেছে। সেই মানবতার হাসি-কান্নাকে সকলের সঙ্গে একাকার করে দিয়েছে, সেখানে দেশ-কাল-পাত্র কোথায় হারিয়ে গেছে। আজও মানুষ মানুষের দুঃখে চোখের জল ফেলছে—এই তো অশান্ত পৃথিবীর কাছে আজ সবচেয়ে বড় আশ্বাস।

সেদিন ডেভিস-কাপের খেলা হয়ে গেল। এতদিন পর ফলাফল জানাবার মত ঔৎসুক্য আমার নেই। আমাদের ভারতীয় নাম ওইতেই একটু সাড়া জাগিয়েছিল বইকি। এরা ধরেই নিয়েছিল যে এরা হেরে যাবে। তার সূত্র ধরে আমাদেরও বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল আমরা "জিতব"। সেই মানসিক অবস্থাকে ঠিক জেতার পূর্ব মুহূর্তে পেয়ে আনন্দ হয়েছিল। এত দুঃখের মধ্যেও ভারতবাসী হিসাবে বুক ফুলিয়ে আশেপাশে তাকাতে তাকাতে বাড়ি ফিরেছিলাম। যাঁরা টোকিওর বাইরে থেকে এসেছিলেন—তারাও হাসিমুখে ফিরে গিয়েছিলেন। প্রথমদিন জাপানের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় ইসিগুরো যেভাবে কৃষ্ণনের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছিলেন তাতে আমরা প্রথমদিনে ভয়ই পেয়েছিলাম। কৃষ্ণনের অভিজ্ঞতা আর অদ্ভুত "প্লেসিং"-এর কাছে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল। তবুও তাঁর খেলাকে আমরা উৎসাহিত করতে এতটুকু কুণ্ঠা বোধ করিনি। টেলিভিশনে দেখান

হয়েছিল ভারতীয় দর্শকদের যে সময়ে তারা জাপানের খেলোয়াড়কে উৎসাহিত করছিল। ভাল লাগল এদের খেলোয়াড় সুলভ মনোভাবের পরিচয় পেয়ে। তবে কৃষ্ণানের খেলা দেখে মনে হল অভিজ্ঞতার সত্যাই একটা মূল্য আছে—আর একদিকে দুঃখ পেলাম ভারতের টেনিসকে যিনি সর্বপ্রথম বিশ্বের দরবারে একটা সত্যকারের আসনে বসাতে সক্ষম হয়েছেন তিনি আজ অস্তগামী। যে কোন শক্ত ছটফটে কম-বয়সী খেলোয়াড়ের কাছে তাঁকে মুশকিলে পড়তে হবে। জয়দীপ মুখার্জি ঘাড়ের ব্যথায় খেললেন না। আশার আলো দেখলাম প্রেমজিৎ লালের খেলায়। এঁরা রামানাথ কৃষ্ণানের স্বপ্নকে সফল করে তুলবেন একদিন। আমাদের চোখ সব সময় "খারাপটাই খোঁজে" বলে একটা বদনাম আছে। তবুও না বলে পারলাম না, প্রথমদিনে যখন একজন পার্শ্ববর্তী জাপানী ভদ্রলোক মাঠে খেলার সময় কর্মব্যস্ত জয়দীপ মুখার্জিকে দেখিয়ে বললেন "উনি কি তোমাদের team-manager, বেশ তো অল্প বয়স..." কারণ ঠিক তার পাশেই জাপানী খেলোয়াড়দের কর্মকর্তা স্বয়ং বসে তাদের উৎসাহ দিচ্ছিলেন। সেখানে আমাদের কর্মকর্তা উপর মহলের আসনের পাশে বসে মাঝে মাঝে জয়দীপ মুখার্জিকে ডেকে কিছু বলে কর্তব্য সম্পাদন করছিলেন। এমন কি খুব একটা উত্তেজিত মুহূর্তে লালের পায়ের শিরায় টান ধরায় তাঁর গড়িমসি কর্মতৎপরতা দেখে অনেকেরই দৃষ্টিকটু লেগেছিল। যদিও খেলাধুলায় এ আমাদের নূতন কিছু নয়, তবুও সাধারণ দর্শক হিসাবে বিদেশীদের চোখের সামনে একটু খারাপ লাগে বইকি। এর হয়ত একমাত্র তর্ক আছে—"মাঠে ভিড় বাড়িয়ে কি প্রয়োজন।" তারপর বলবার অবশ্য কিছু নেই। কারণ আমরা যে বেশী বুঝি।

ডঃ রাধাবিনোদ পাল তাঁর নিজের (জাপানী ভাষায় লিখিত) পুস্তকে নাম লিখে দিচ্ছেন

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত রাধাবিনোদ পাল মহাশয় তাঁর গুণগ্রাহী এক বিশেষ সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণে এখানে এসেছিলেন। তাঁকে সম্মান দেখানই তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জেনারেল তেজোর বিচারে উনিই একমাত্র বিচারক রায় দিয়েছিলেন "নট গিলটি"। ও'র কাছে সেদিনের কিছু কথা শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল—সত্যাই সেই এগারজন বিচারক যা সঠিক বলে বিচার করছেন, উনি একা ঠিক তার বিপরীত চিন্তাধারায় শুধু ন্যায় আর সত্যকে মনে করে সত্যিই কি একটুকু বিভ্রান্ত বা বিচলিত হননি? না। তিনি তা হননি। আর তারই জন্য জাপানের কাছে, বিশ্বের সুধী সমাজের কাছে ভারত হাজির হয়েছে এক বিরাট আদর্শ নিয়ে।

যেদিন উনি এলেন—হোটেলের একটা হেড-পোর্টার দেখলাম খুব ছুটোছুটি করছে। তারপরেও লক্ষ করেছি তাকে অনেক বিষয়ে ডঃ পাল মহাশয়-এর প্রতি বিশেষ একটা পরিচর্যা এবং খোঁজ খবর নিতে। কৌতূহল হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম ডঃ পাল প্রথম যখন এখানে আসেন ওই হোটেলেই ছিলেন। পোর্টারটি ছিল তখন 'রুম-বয়'। সে প্রায় বিশ বছর হল। রাজনীতি সে জানে না, শুধু মানুষ হিসাবে তাঁর প্রতি এক অপার-শ্রদ্ধা সে বহন করছে। কালের স্রোতে অনেক ইতিহাসই বিলুপ্ত হয়। সেখানে ভারতের হয়ে ডঃ পালের ঐতিহাসিক Judgementও হয়ত অধুনা জাপানী যুব সম্প্রদায়ের মন থেকে মুছে গিয়েছে। তবু সমস্ত যুক্তি তর্ককে বাদ দিয়ে আজকে তাঁর প্রতি জাপানের শ্রদ্ধাকে দেখে আমার কেন জানি মনে হয়েছে—হয়ত উনি যে সেতু গড়ে তুলেছিলেন তার উপর দিয়ে আরও বেশী কিছু "আসা-যাওয়া" হতে পারত।

—বিকাশ বিশ্বাস
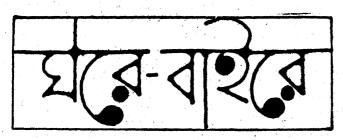
মেয়েদের বিয়ের বয়েস

কেন্দ্রীয় ফ্যামিলি প্ল্যানিং ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর কর্নেল রায়না সাহেব মন্তব্য করেছেন, মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়িয়ে দিলে পরিবার পরিকল্পনার সাহাব্য তো হবেই তার উপর মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বাড়বে, জীবিকার সন্ধান সহজ হবে। মোটের উপর মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বিয়ের বয়সটা এগিয়ে দিলে ফল পাওয়া যাবে। কনের বয়স বাড়লে সুফল হবে না কুফল হবে এ নিয়ে সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশের পর যে চিঠিপত্র পাঠকরা পাঠাচ্ছেন তাতে বিভিন্ন স্তরের জনমত, বিশেষত বাঙালী সমাজের মত সম্বন্ধে আন্দাজ করা যায়। রায়না সাহেবকে এবিষয় জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, বিপক্ষে বলার যা কিছু তাও খন্ডন করবার যুক্তি তাঁর আছে কিনা। শ্রীযুক্ত রায়না বিলক্ষণ বিচক্ষণতার সঙ্গে উত্তর দিলেন : "আমি যে আপনাদের স্বপক্ষে। মহিলা সমাজই আমার হয়ে যা কিছু বলার বলবে। ছেলে আর মেয়ে, পুরুষ আর স্ত্রী সমান মর্যাদা, সমান শিক্ষার সুযোগ আর সমান অধিকার পায় তাকি আপনারা চান না?"

কথাটা ভাববার মত। রায়না সাহেবের প্রস্তাবটি আইন হবে কিনা বা তার ভবিষ্যৎ কি আমরা জানি না, তবে সাধারণের মধ্যে যদি সচেতনতা সঞ্চার করাও সম্ভব হয় তবে তার মূল্য অনেক। একথা সত্য যে কোনও কানুন বা সামাজিক প্রথা সম্পূর্ণভাবে ভাল কি মন্দ কোনটাই হতে পারে না। সামাজিক পরিস্থিতি বিচার করে মঙ্গলের মাত্রা বিচার করা দরকার। রাজা-রামমোহন যখন বাল্যবিবাহ বর্জন করতে চেয়েছিলেন তখন পরিবার পরিকল্পনার কথা ভাবেন নি। ভেবেছিলেন বাল্যবিধবাদের কথা, ভেবেছিলেন অপরিচিত নিষ্ঠুর পরিবেশে বালিকা বধূর লাঞ্ছনার সম্ভাবনার কথা। তা বলে কি সেই বাল্যবিবাহের কোন সুফলই ছিল না। আজও ঠাকুমা দিদিমার মুখে শোনা যায়, নমনীয় নিতান্ত শিশু-বয়সে নূতন পরিবেশ সম্পূর্ণ আপন হয়ে উঠতো বলে সংঘর্ষ কম হতো। তারপর এল আধুনিক যুগের সরদা আইন। আইন করেও তো পল্লী অঞ্চলে এমন কোন সুবিধা সেদিন হয় নি। আইনকে উপেক্ষা করে অবলীলাক্রমে বহুদিন পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অল্প বয়সের ছেলে মেয়ের বিবাহ হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই আপত্তি ওঠেনি বলে ভবিষ্যতে কোনও বিপত্তিও হয়নি। শ্রীযুক্ত রায়না বলছিলেন, ঠিক অমনি করেই যদি দু-চারটে বছর আরও বাড়ানোর কথাটি ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি পায় তাতে যদি দু'চার এমন কি দশ বিশ বছর কেটে যায় তবে আগামী দিনের মেয়ে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সম্ভাবনা পাবে। হিসেব করে নাকি দেখা গেছে, মেয়েদের শিক্ষার সঙ্গে ছোট পরিবার বিশেষভাবে যুক্ত। নিরক্ষর সমাজে যদি গড়পড়তা ৬টি শিশু প্রতি পরিবারে জন্মায়, কিছু শিক্ষার সুযোগ পাওয়া মায়ের জন্মাবে ৪টি। উচ্চশিক্ষিত মা আরও ছোট পরিবার পছন্দ করবেন। কাজেই যদি বিয়ের বয়স বাড়ার জন্য শিক্ষার সুযোগ সামান্যও বেশী হয় তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির মত দারুণ সমস্যার কিছু সমাধান হবে আশা করা যেতে পারে।

সন্তান ধারণের ক্ষমতা যে বয়সে মেয়েদের হয় তার প্রথম কয়েকটা বছর অবিবাহিত থাকায় সন্তানসংখ্যা কম হবে এও এই প্রস্তাবের একটি গুরুতর প্রতিপাদ্য বিষয়। যে সময় বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল তখনও স্বামীসহবাস সম্বন্ধে সামাজিক নিয়মের কড়াকড়ি ছিল যথেষ্ট। বিবাহের পরে কন্যাকে যৌবনলক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ আলাদা রাখা হতো। বহুদিন আগের শোনা গল্প এক বৃদ্ধা তাঁর পিতামহীর কথা বলেছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে সেই পিতামহীর বিবাহ হয়। স্বামীর বয়স ছিল ২০।২৫। তার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর এটি দ্বিতীয় বিবাহ। কনের বয়স পাঁচ কিন্তু পিত্রালয়ে তার তত্ত্বাবধান করার মত কেউ ছিল না। তার মা মৃত স্বামীর চিতায় সতী হয়েছিলেন। কাজেই বাধ্য হয়ে বালিকাকে শ্বশুরঘর করতে আসতে হয়। কিন্তু যুবক স্বামীকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়া হয় যেন বালিকার যৌবনকাল না আসা পর্যন্ত তাকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখা হয়। অবশ্য সন্তানধারণের ক্ষমতার বয়স প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে স্বামীসহবাসের বিধি ছিল। অনেকের মতে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সের মাতা পিতার সন্তান সুস্থ সবল হয় এবং মায়েরও সন্তানধারণ ও সন্তানের জন্মে কষ্ট কম হয়। দেহবল ও পেশীসমূহের সহজ নমনীয়তা অনায়াস গর্ভধারণ ও প্রসব সহজ করে দেয়। পাশ্চাত্য দেশেও অল্পবয়সে বিবাহের একটা হিড়িক এসেছে। স্কুল কলেজে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীও বিবাহ করে, সন্তানের জন্মও বহু

এর্নাকুলমের I S I অধিবেশনে স্ট্যান্ডার্ড কম দি হোম অধিবেশনে শ্রীমতী নিলীমা চক্রবর্তী ভাষণ দিচ্ছেন। মধ্যে ডাঃ ঘোষ, শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন এবং শ্রীযুক্ত রাও (এই অধিবেশন সম্বন্ধে আগেই আমরা আলোচনা করেছি)

ক্ষেত্রে অল্প বয়সে হয়। কখনও বা পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সাহায্যে নূতন সংসার পাতা হয়। কোথাও বা স্ত্রীর উপার্জনে স্বামী তার শিক্ষা সমাপ্ত করে। তবে আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে subsidised marriage বা অপরের সাহায্যে সংসারপাতা অবিবেচনার কাজ। এক সময় যে যৌথ পরিবার-নির্ভর বিবাহ হতো তাও যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ায় এবং শহরমুখী কলকারখানাভিত্তিক সভ্যতায় হারিয়ে যাওয়া সমাজে সম্ভব আর রয়নি। শহরের জীবনে আপনা থেকেই মেয়েদের বিয়ের বয়স বেড়ে চলেছে। কিন্তু মূল প্রশ্ন এখন পল্লী অঞ্চল। যে পরিবারে চারটি সন্তান; দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে এবং সে ক্ষেত্রে যদি শিক্ষার সুযোগ দেবার ক্ষমতা থাকে দুটির উপযুক্ত মাত্র, তবে পিতামাতা ছেলে দুটিকেই সে সুযোগ দিয়ে থাকেন। বিয়ের বয়স বাড়িয়ে দিলে, বাড়তি কটা বছর মেয়েরা কি করবে? পিতামাতা কি তাকে ভারস্বরূপ মনে করবেন? কাজেই পল্লীসমাজে নারীর মর্যাদা ও শিক্ষার সুযোগ যথেষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সমস্যা জটিলতর হতে পারে। নৈতিক চরিত্রের বৈলক্ষণ্য, অবৈধ সন্তানের জন্ম এসব প্রশ্নও যে একেবারে আসে না তাও জোর করে বলা যায় না। আরও একটি সাধারণ সমস্যা হতে পারে। বেশী বয়সে সন্তান জন্ম পিতামাতার দায়িত্বকে বেশী বয়স অবধি টেনে নিয়ে যাবে। তবে তারও অন্য দিকে সুফল হবে। অপরিণত বয়সে দায়িত্বভার অবহেলা করার আশংকা বেশী।

অপরিণত মনের সাধারণ ভুলচুকও দাম্পত্য জীবনে সামঞ্জস্য আনার ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। নিরীহ, ছলাকলা-হীন, সরলা বালিকার প্রতি শ্বশুরকুলের অন্যায় ব্যবহারও সহজ। নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে যেদিন সে সচেতন হতে শিখবে সেদিন তার সঙ্গে অনুচিত আচরণ কঠিন হয়ে উঠবে। শিক্ষার সুযোগ যদি হয় তবে তো আত্মসম্মান আপনা থেকেই আসবে। যেসব যুক্তি বিবাহের বয়স বাড়াবার বিরুদ্ধে দেওয়া হয় তার কোনটির চেয়েই নারীর "আপন ভাগ্য জয় করিবার" অধিকার কম নয়। পরিবার পরিকল্পনার উপায়গুলির মধ্যে একটি হিসাবে দেখার চেয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলেও বিবাহের বয়স বাড়া মেয়েদের জন্য আজ দরকার হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তন একদিনে আসে না। ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে পরিবর্তনের অংকুর বেড়ে উঠে ক্রমশ তার প্রকাশ পরিস্ফুট করে। প্রত্যেক সামাজিক পরি-স্থিতির উপযুক্ত হয়ে পরিবর্তনের সূচনার সূত্রপাত হয়। বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি আমাদের দারুণ অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে জড়িত হয়ে কঠোর প্রতিবিধানের প্রয়োজনকে অপরিহার্য করে তুলছে। অমঙ্গলের প্রতি-কারে যদি সমস্যার ওঠানামার হিসাবও করি তবু দেখা যায়, অপরিণত বয়স্কা বালিকার সংসারভার গ্রহণ বা সন্তানের জননী হওয়ার চেয়ে শিক্ষিতা মায়ের শৃংখলার ঘরকন্না বেশী বাঞ্ছনীয় এবং নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত পরিবার দেশের পক্ষে একমাত্র বাঁচবার উপায়। সীমিত সন্তানসংখ্যার জন্য যে কোন কার্যত সম্ভব উপায় গ্রহণে বিন্দুমাত্র দ্বিধার সময় আর নেই।

অথ গৃহিণী কথা

বিপ্লবে বিধ্বস্ত চীন-এর তুমুল আলোড়নের গোড়ায় নাকি গৃহিণীদের প্রভাব বিশেষ প্রকট। পার্টি ও সরকারের অন্যতমা নেত্রী এখন মাও-এর অভিনেত্রী স্ত্রী শ্রীমতী চিয়াং চিং। তাঁর নির্দেশে চীন জুড়ে হইচই। ওদিকে লিউ সাও চির ঘরণীও সুন্দরী, সুশিক্ষিতা ও গুণবতী বলে প্রভুত্বশক্তিবিহীন নন। উচ্চ পর্যায়ে দুই মহিলাতে দারুণ সংঘর্ষ তো আছেই তার উপর বিনাশের রণসজ্জায় সাধারণ গিন্নীরাও দলে দলে ছবি নিয়ে, ঝাণ্ডা উড়িয়ে পথে-ঘাটে হামলা করে নূতন পাওয়া স্বাধীনতার পরাকাষ্ঠা প্রমাণে ব্যস্ত। গৃহিণী মহলের দোর্দণ্ড প্রতাপ নাকি চীনের আজ নয়। তথাকথিত পুরুষশাসিত প্রাচীন চীনেও কলহপ্রিয়, উগ্রপ্রকৃতি খাণ্ডারনীরা সমাজে নানা গল্পের প্রেরণা যোগাতেন। এরকম দুটি কাহিনী শুনেছিলাম এক আত্মীয়ের মুখে। তিনি চীনা ভাষায় সুপণ্ডিত। বেছে বেছে দুটি গৃহিণীর লংকাকাণ্ড ও অসীম ক্ষমতার নজীর বের করেছিলেন।

গ্রামের গিন্নীদের উৎপাতে কর্তারা কাবু। কাহিল স্বামীরা আনাচে-কানাচে দুঃখ করে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোড়লমশাই-এর কানে কথাটা তুললো। মোড়ল মশাই বললেন, সমিতি করে সংঘবদ্ধভাবে খাণ্ডারনীদের জব্দ করতে হবে। সমিতি গড়া হলো। তার প্রথম অধিবেশন বসবে। মোড়ল মশাই সভাপতি। বড় একটি ঘরে গ্রামের দুঃখপ্রা-জর্জর স্বামীরা একত্র হয়েছেন। সভার কাজ আরম্ভ হয় হয় এমন সময় কে এসে খবর দিল গ্রামসুদ্ধ স্ত্রী হাতিয়ার হাতে গালি-গালাজ বর্ষণ করতে করতে সভাসদদের দিকে দৌড়ে আসছেন। হাতা, খুন্তি, তপ্ত সন্দংশিকা, চিমটা কোন অস্ত্রই বাদ নেই। নিমেষে সভার সভ্যদের অন্তর্ধান। গিন্নীর দল পৌঁছে দেখে ঘরে একমাত্র প্রেসিডেন্ট তার চেয়ারে বসা, বাকি ঘর ভোঁ ভোঁ। সভাপতি মশাই আর কি করে যান? ইজ্জত, সম্ভ্রম তো রাখতে হবে! গিন্নীরা এগিয়ে এসে সভাপতিকে ভালরকম ধোলাই দিতে গিয়ে দেখেন সভাপতির প্রাণহীন দেহ মাত্র চেয়ারে বসা! ভয়ের মাত্রা তারই হয়েছিল সবচেয়ে বেশী!

অন্য গল্পটি অবশ্য স্ত্রৈণতার। রাজা মশাই রানীর অত্যাচারে নাজেহাল। সকাল সন্ধ্যা মনে শান্তি নেই। মাঝে মাঝে মনে করেন হয়তো রাজ্যপাটই তাঁর কাল হ'য়েছে। হয়তো বা গৃহস্থ ঘরে ঘরণীরা এমন দুর্দান্ত মর্দানী স্ত্রীলোক নন। রাজ-সভায় একদিন জনমত সংগ্রহ করে সান্ত্বনা লাভ করবেন ভেবে ঘোষণা করলেন স্ত্রৈণ পুরুষ যাঁরা তাঁরা সব বাঁ দিকে আর যাঁরা অত্যাচারিত নন তাঁরা ডানদিকে এমনিভাবে দুভাগ হ'য়ে দাঁড়ান। সারা সভা বাঁয়ে সরে দাঁড়াল, ডাইনে মাত্র একজন! রাজা মশাই ভাবলেন, জানতে হবে কি এর যাদুমন্ত্র। কি করে সে সবার থেকে ভিন্ন। কাছে ডেকে প্রশ্ন করে যা শুনলেন তাতে তাঁর প্রবোধের আর অভাব রইল না। সে বললো যে তার স্ত্রী বলেছে ভিড় দেখলে এড়িয়ে যেতে। তাই বাঁয়ের জনতায় যোগ দিতে পারেনি। মাও গিন্নী বা লিউ সাও চির গিন্নী প্রচণ্ডা হবেন এ আর আশ্চর্য কি?

টুকিটাকি

আঁখিপল্লব ঘন আর দীর্ঘ যদি চান তবে সামান্য ক্যাস্টর অয়েল প্রতিদিন রাত্রে লাগিয়ে শুতে যাবেন। শুনেছি সামান্য দুধের সর লাগালেও ফল হয়।

প্রতিদিন প্রাতে কাঁচা হলুদের কুচি ও আখের গুড় খালি পেটে খেলে দেহবর্ণের উন্নতি হয়। লিভারের জন্য অমোঘ ঔষধ বলেই হয়তো বর্ণপ্রসাদক হিসাবে কাঁচা হলুদের মান।

চিক্কণ, উজ্জ্বল কেশ যদি সহজে হয় তবে চেষ্টা করতে আপত্তি কি? লেবুর রস ভাল করে মাথায় মেখে কিছুক্ষণ পরে মাথা স্যাম্পু করবেন। সপ্তাহে বা দশদিনে একবার হ'লেই হবে। কিছুদিন নিয়মিত করলে ফল নিশ্চয় পাবেন।

চামড়ার বাক্স খে'তলে গেলে বা ফাটা ফাটা হ'লে ডিমের সাদার প্রলেপে উপকার পাবেন। একবার প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে গেলে আবার দেবেন, অল্প পরে আর একবার এভাবে বেশ বার কয়েক লাগালে চামড়া অনেকটা পূর্বাবস্থা ফিরে পাবে।

শ্রীমতী

বিশ্ব বিজ্ঞান

শিল্পসভ্যতার কয়েকটি সমস্যা (১)

আমাদের দেশে কাগজে কলমে বছরে ঋতু ৬টি। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে এবং আধুনিক শিল্পপ্রসারের ঠেলায় আমাদের এই কলকাতা শহরে আজকাল ৮।৯ মাস গরম, মাস দুয়েক বর্ষা আর বড় জোর মাসখানেক শীত—তাও এমন যে একটা হাতকাটা সোয়েটারেই চলে যায়। আমাদের ছেলেবেলার মত আশ্বিন মাস থেকে হিম পড়ে না, কার্তিকেও নয়। কিন্তু যে জিনিসটি আজকাল আশ্বিন-কার্তিক থেকে শহরকে প্রায় অদৃশ্যপুরী বানিয়ে ছাড়ে তা হচ্ছে ধোঁয়া আর কালি, তা শীত পড়ুক আর নাই পড়ুক। যত রকমের অবাঞ্ছিত ব্যাপার, তার প্রত্যেকটির আধিক্য ও প্রতাপ এই শহরে এবং কর্তৃপক্ষের সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। কলকাতার মাথার উপর এই যে গাঢ় ধোঁয়া, এটা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে যে কত মারাত্মক তাই নিয়ে এখানকার বৈজ্ঞানিকরা কোন গবেষণা করেন বলে আমার জানা নেই। অথচ লণ্ডন, ক্যালিফর্নিয়া ইত্যাদি পাশ্চাত্যের শিল্প কেন্দ্রগুলির পৌরসংস্থা ও বৈজ্ঞানিকরা সমস্যাটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, সুরাহা করার চেষ্টাও চলছে। কিন্তু আমাদের শহরের অভিভাবকদের সে দিকে কোন গা নেই। ইংলণ্ডে ১৯৫৬ সালে ধোঁয়া কমাবার জন্য এক আইন পর্যন্ত পাশ করা হয়েছে, যার দ্বারা কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

শিল্পকেন্দ্রে ধোঁয়ার দ্বারা দূষিত বায়ুর চরিত্র সব জায়গায় অনেকটা একই রকমের, খুঁটিনাটি ব্যাপারে পার্থক্য থাকলেও। সুতরাং লণ্ডন বা ক্যালিফর্নিয়ার গবেষকরা এই দূষিত বায়ু সম্পর্কে যেসব তথ্য ও বিশ্লেষণ দিয়েছেন সেগুলি মোটামুটিভাবে কলকাতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

বৈজ্ঞানিকরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, শিল্পকেন্দ্রের দূষিত বায়ু থেকে শরীরের বিশেষ করে বুকের নানারকম ব্যাধি হয় যা কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ পর্যন্ত হতে পারে। যাদের ফুসফুস ও হৃদযন্ত্র সুস্থ নয় তাদের ক্ষেত্রে এই ধোঁয়া এক মারাত্মক বিষ। এ থেকে এমন ব্রনকাইটিস হয় যা সারানো কঠিন।

লণ্ডন প্রভৃতি পশ্চিমের যেসব শিল্পকেন্দ্রে ধোঁয়াশার আধিক্য সেখানে হাসপাতালে ব্রনকাইটিস রোগীদের জন্য বেডের জন্য দরখাস্তগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে, শহরে ধোঁয়া বৃদ্ধির অনুপাতে ঐ জাতীয় রোগীদের অবস্থা খারাপ হয়েছে। যত ধোঁয়া হয় ততই তাদের শ্বাসযন্ত্রের নল-উপনলগুলিতে বায়ু চলাচলে বাধা হয় এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ হতে থাকে, শুরু হয়ে যায় বেয়াড়া ধরনের কাশি আর থেকে থেকে গয়ের বার হওয়া। এইভাবে ফুসফুসের এমন ক্ষতি হতে পারে যা থেকে 'এমফিসেমা' এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এ ক্ষেত্রে রোগীকে ধোঁয়ার আবহাওয়া থেকে সরিয়ে রাখতে পারলে আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা থাকে। বেশি সিগারেট খেলেও এই ধরনের ব্যাপার হয়, সিগারেট বন্ধ করলে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।
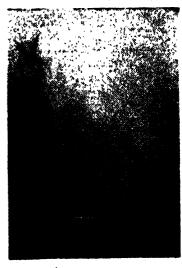
ধোঁয়াশায় সমাচ্ছন্ন লণ্ডন

কিন্তু আর এক ধরনের বিপদ আছে যা
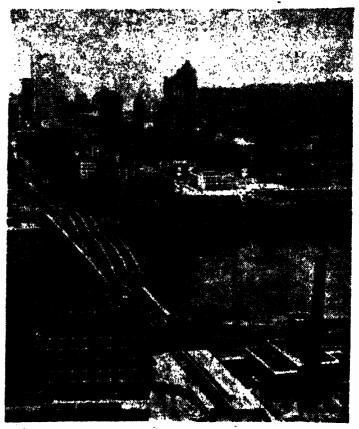
ধোঁয়া নিবারণ ব্যবস্থা চালু হবার আগেকার পিটসবার্গ শহর

ধোঁয়া নিবারণ ব্যবস্থা চালু হবার পর পিট্‌স্‌বার্গ শহর
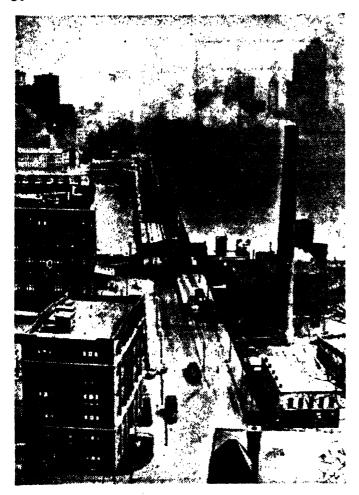
থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না বললেই চলে। দুরারোগ্য ব্রনকাইটিস যখন প্রথম পর্যায় থেকে বাড়তে বাড়তে দ্বিতীয় পর্যায়ে ওঠে তখন ঘটে ব্যাক্টিরিয়া সংক্রমণ। তার ফলে যেসব পরিবর্তন ঘটে সেগুলি সংশোধনের অতীত। তখন শ্বাসনলী ও ফুসফুসে এমন গুরুতর ক্ষতি হয় যার ফলে রোগীর হাঁফ ধরে এবং হৃদযন্ত্র ও রক্তবহাতন্ত্রের উপর ধকল পড়তে থাকে।

ধোঁয়া বা ধোঁয়াশায় কী আছে যা এইসব রোগের কারণ? আছে গন্ধকের কতকগুলি যৌগিক পদার্থ (কয়লা ও তেলের দহন-জাত) এবং রসায়ন শিল্প ও মোটরগাড়ির গ্যাসের কতকগুলি জিনিস। রান্নার কয়লার উনুনের ধোঁয়া খুবই ক্ষতিকর। কয়লা, কোক ও ভারি তৈলে গন্ধক থাকে। এগুলি জ্বালালে বার হয় গন্ধকের ডায়ক্সাইড ও ট্রায়ক্সাইড। এই গ্যাসগুলি শ্বাসনলীর ক্ষতি করে। বাতাস বইলে ধোঁয়া ও গ্যাস উড়ে যায়। কিন্তু বায়ু যদি স্তব্ধ থাকে তাহলে ঠাণ্ডা হাওয়া মাটির কাছে থাকে এবং তার উপরে গরম হাওয়ার স্তর ঢাকনার মত কাজ করে। সেই ঢাকনার নিচে যত রাজ্যের গ্যাস ও ধোঁয়া জমা হতে থাকে। হাওয়া যদি না চলে তাহলে সাধারণ অবস্থার তুলনায় সেই স্তর ১৫।২০ গুণ বেশী উঁচু পর্যন্ত জমা হয়। তার সংগে যোগ দেয় কুয়াশা। সেই গাঢ় আবহাওয়া বুকের রোগীদের দুর্বল স্বাস্থ্যের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে এবং তাদের অকালমৃত্যু ঘটে। সালফার ডায়ক্সাইড ও সালফিউরিক অ্যাসিডের একটি ধর্ম হচ্ছে ক্ষয় করা। সেইজন্য সেগুলি নিঃশ্বাসের সংগে শ্বাস-নলীতে গেলে দারুণ অনিষ্ট করতে পারে, বিশেষ করে অসুস্থ লোকদের।

কয়লার ধোঁয়ার মধ্যে এমন কতকগুলি পদার্থ থাকে যেগুলি শরীরের চামড়ার ক্যান্সারের কারণ হতে পারে বলে অনেকে সন্দেহ করেন। সেই মারাত্মক জিনিস-গুলির একটি হচ্ছে বেঞ্জপাইরিন (এটি একটি হাইড্রোকার্বন)। তাঁদের মতে যারা চিমনি সাফ করে বা আলকাতরা নিয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে এইজন্যই নাকি চামড়ার ক্যান্সার বেশি দেখা যায়। অনেকের ধারনা যে শহরে ধোঁয়া যত বেশি সেখানে ফুসফুসের ক্যান্সারও তত বেশি দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত একথা নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারেন না যে ঐ পদার্থগুলির জন্যই ক্যান্সার হচ্ছে। কারণ প্রথম কথা লণ্ডন বা কলকাতার মত শহরের সব জায়গায় ধোঁয়ার ঘনত্ব সমান নয় এবং সেই ঘনত্বের সংগে ক্যান্সারের আনুপাতিক কোন সম্পর্ক আছে, এমন কোন প্রমাণ নেই। তারপর ধরুন ইংল্যাণ্ডের তুলনায় নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ডে ধোঁয়া কম কিন্তু চামড়া বা ফুসফুসের ক্যান্সারের সংখ্যা কিছু কম নয়। আরো একটি ব্যাপার হচ্ছে যে ইংল্যাণ্ডে ১৯৫৬ সালে বিশুদ্ধ বায়ু আইন পাশ করার পর ধোঁয়া কমবার ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্য লাভ হয়েছে বটে, কিন্তু ফুসফুসের ক্যান্সার বেড়েছে বই কমেনি। তেমনি ডিজেল বা পেট্রল ইঞ্জিনের ধোঁয়াই যে ফুসফুসের ক্যান্সারের জন্য দায়ী এমন প্রমাণও নেই। বৈজ্ঞানিকরা আসলে সিগারেটকেই এই ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি সন্দেহের চোখে দেখছেন।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

সনাক্তকরণ

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

তীক্ষ্ণ একটা আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। দেখলাম, গাড়িটা পীচের রাস্তায় আধ ইঞ্চি গভীর দাগ বসিয়ে দিতে দিতে কিছু দূরে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপর লাগাম টানা ঘোড়ার মত হঠাৎ সামনের দু' চাকা শূন্যে তুলে কুর্নিশ করার ঢঙে লাফিয়ে পড়ছে। দেখলাম হাত কয়েক দূরে অদ্ভুত ধরনের কিছু একটা যেন কাতরাচ্ছে। কে হতে পারে? সেই মুখোশ পরা ছেলেটাই কি! পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে কিলবিল করে অদ্ভুত একটা অনুভূতি জাগল আমার। পাথরের মত স্তব্ধ হয়েই ফুটপাথের উপর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিন্তু ততক্ষণে চারপাশ থেকে ভিড় জমতে শুরু করেছে। যেন এমনধারা একটা দুর্ঘটনার সাক্ষী হওয়ার জন্য এতক্ষণ অনেকেই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর উৎসাহে এগিয়ে আসছে। আর এখনও আমার শিরদাঁড়ায় সেই বিচিত্র ধরনের অনুভূতিটা ঝঙ্কার দিয়ে দিয়ে উঠছে। আমি নড়তে পারছিলাম না; ভিড়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে, মুখোশ পরা ছেলেটাই চাপা পড়ল কিনা, দেখার শক্তিও আমার ছিল না, পালিয়ে যাব এমন ক্ষমতাও না। অথচ কয়েক বছর আগেও এমন ভীরু ছিলাম না আমি। বরং এমন কোন ঘটনা ঘটলে নেশা-খোরের মত আমি ছুটে যেতাম। আমার মনে আছে, রেল-লাইনের ধারে যেখানে বিষ্টু পানওয়ালার বউ দু' টুকরো হয়ে কাটা পড়েছিল সেখানে কেমন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গিয়েছিলাম। মাইল কয়েক দূরে গলায় ফাঁস দেওয়া মানুষ দেখবার লোভও আমি দমাতে পারিনি কখনো। মানুষের বিকৃত মৃত্যু দেখা এক ধরনের নেশাই হয়ে গিয়েছিল আমার। দেহ থেকে ধড় আলাদা হয়ে পড়ে আছে, কিংবা ঘরের কড়ি-বরগা থেকে ঝুলে পড়া লোহার মত শক্ত অস্বাভাবিক লাট খাওয়া দেহ অথবা জলে ডুবে ভেপসে ওঠা অথবা আগুনে ঝলসে যাওয়া ভিতরের থকথকে মাংস, কেন জানি না এসব আজকাল এড়িয়ে চলতে পারলেই স্বস্তি পাই। কিন্তু এমন একটা ঘটনা আজ অকস্মাৎ চোখের উপর ঘটে গেল, আর না দেখে আমার পালিয়ে যাওয়া কি উচিত হবে। ভাবলাম, এগিয়ে যাবার চেষ্টা করি। দেখি। হয়ত দেখব, পীচের রাস্তায় ছড়িয়ে পড়া বিক্ষিপ্ত মাংসের মণ্ডের মধ্যে এখনো

সংকোচন প্রসারণ হচ্ছে। হয়ত পাশেই কেউ ফিসফিস করে বলবে, দেখছেন দাদা, কলার-বোনটা শাঁক-আলুর মত রক্তহীন সাদা দেখাচ্ছে কেমন। কিংবা ওটা চিনতে পারছেন না, ওটা ওর ইনটেস্টাইন। কচ্ছপের খোলসার মত ওর বুকের খাঁচাটা দেখেছেন?

এইসব বীভৎস কথা মনে আসায় আমার পা কাঁপতে লাগল। ঠিক করলাম, এই মুহূর্তে এখান থেকে আমার পালিয়ে যাওয়াই উচিত। শহরের রাস্তায় এমন তো কত ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে। খবরের কাগজে তার বিবৃতি বেরুলেও আমি আর উৎসাহ বোধ করি না আজকাল। অনর্থক স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করা যে বুদ্ধিমানের কাজ নয় এ কথা যে-কোন স্বাভাবিক মানুষই স্বীকার করবে। ফলে উলটো দিকেই হাঁটবার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু দু পা না এগোতেই দুর্দান্তভাবে আমার পা ভারী হয়ে জমে এল। মনে হল, এমনভাবে পালিয়ে যাওয়ার পিছনে প্রচণ্ড কাপুরুষতা থাকে। হয়ত কাপুরুষ বলেই আমি কাপুরুষতা গোপন করবার মোহে পড়ে গেলাম। ভিড়ের দিকেই আমি পা বাড়ালাম।

আমার অনুমান মিথ্যে হল না। দেখলাম, থিকথিকে রক্ত মুঠো করে ধরে আছে ছেলেটি। যেন চুপসে যাওয়া বেলুনের পর্দা তার নখের ডগায় জড়িয়ে আছে। আর এই সময়ই বোধ হয় ছেলেটার মুখোশটাকে আমি নিখুঁতভাবে দেখতে পেলাম। দেখলাম, মুখোশে একটা হিপোপটেমাস জাতীয় জীবের চিহ্ন ফুটে আছে। চোয়াল ঝুলে পড়া, কুদে কুদে চোখ, ছুঁচলো এক জোড়া দীর্ঘ দাঁত। অথচ এত বড় সর্বনাশ ঘটে যাওয়ার পরও মুখোশটা মুখ থেকে এতটুকু সরে যায় নি। মুখোশটার জন্য ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল আমার। বললাম, ওটাকে খুলে দিন না। কিন্তু যাকে বললাম, সে একখানা বাজারের থলি হাতে, আমার দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল, খুললেই তো ওর আসল চোখ দুটো বেরিয়ে পড়বে। আসল মুখটা দেখতে চান? হয়ত দেখবেন সজল চোখের মণিদুটো খুলে রেখেছে ছেলেটা। আহা, মুখোশ জিনিসটা এই জন্য আমি একদম পছন্দ করি না। মুখোশ পরে স্টেজে অভিনয় করা চলে কিন্তু তাই বলে এইভাবে রাস্তায় বেরুনো! আসলে কেয়ারলেস বাপ মা বলেই এমন হল। বাবাকে ধরে চাবকানো দরকার। চাবুক চালিয়ে কতকগুলি আইন কানুন শেখানো দরকার কাউকে কাউকে। মুখোশ পরে হুটোপুটি করার পিছনে এবং এইভাবে রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটাবার পিছনে ছেলেটার যেন আদৌ কোন দোষ ছিল না। মুখোশের কাগজে নিজের আসল মুখটা ঢেকে রেখে ছেলেটার বাহাদুরি নেবার হক জন্মে গিয়েছিল যেন। স্টুপিড কোথাকার!

তাই বলে এখানে সবাই এইভাবে শুধু ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে কেন! একটু স্পর্শ করা উচিত নয়! ছেলেটা কিন্তু একবারও কাঁদে নি। অবশ্য আপনি হলে আপনিও বোধ হয় কাঁদতেন না। জাস্ট ঐভাবে, হাতের পাঞ্জা উলটো দিকে ঘুরিয়ে, নটিবয় শু-এর মধ্যে হাঁটুর মালাইচাকি প্লেস করে রেড সিগন্যাল দিয়ে বসে থাকতেন। তাই বলে কিছুই করবেন না কেউ! একজন ডাক্তার নেই ধারে কাছে! একটা গাড়ি দাঁড় করান না হয়।

মুখোশটা খুলে দিন না মশাই। অমন হিপোপটেমাস! হেল! আমি এগিয়ে এলাম ছেলেটার দুমড়ে যাওয়া দেহটার কাছে। হাওয়াই চপ্পলের নিচে আঠাল রক্ত কামড়ে বসল। রক্তের উপর পা পড়ায় আবার সেই শিরশিরে অনুভূতিটা আমার সর্বদেহে চলকে উঠল। আমি ভিড়ের জমাট বাঁধা লোকগুলোর দিকে তাকালাম। বুঝতে পারছিলাম না, ওরা আমাকে এইভাবে এগিয়ে যাওয়া সমর্থন করছে কিনা। অথচ এ যেন আমার কর্তব্য। কাপুরুষের কর্তব্যের মতন এগিয়ে এসে অসহায়ভাবে ছেলেটার পকেট থেকে পড়ে যাওয়া মার্বেল-গুলি কুড়িয়ে ওর জামার পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম। মুখোশটা যেন সেই মুহূর্তে আমাকে ব্যঙ্গ করে উঠল। যেন হাঃ হাঃ, আমি হিপ্পো! চিড়িয়াখানার হিপো, হালুম! সুইডেন বা ঐ ধরনের কোন দেশ থেকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাতে এসেছি। স্টুপিড! আমি ওর মুখোশের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে হঠাৎ গুটিয়ে নিলাম। যেন মুখোশটা খুলে দিলেই সমস্ত নাটকটার এখানে যবনিকা পড়ে যাবে। যেন দেখা যাবে দশ কি বারো বছরের সুন্দর মোমের মত বিশুদ্ধ একখানা মুখ, এক-জোড়া স্নিগ্ধ ভ্রূ। হয়ত কাজল পরিয়ে দিয়েছিল ওর মা, হয়ত বা দেখা যাবে স্কুলের শেষ ঘণ্টায় মাস্টারের চোখে ফাঁকি দিয়ে এক জোড়া কালির গোঁফ আঁকা, থুতনিতে নুর। কিংবা এমনও হতে পারে যে, বকুলকুঁড়ির মত এক জোড়া দাঁত ঠোঁটের উপর যন্ত্রণায় কামড়ে বসে আছে। কত রকম হতে পারে। কত বীভৎস, কত অস্বাভাবিক। আমি হাত সরিয়ে নিলাম। ওর বুকের কাছে এগিয়ে আনলাম। ওর বুকের স্পন্দন এখনো যেন ধরতে পারছি আমি।

উঠিয়ে আনুন, উঠিয়ে আনুন! এই সরে, সরে। স্টেট মেডিকেল কলেজে নিয়ে চলুন। এই মশাই, মজা দেখছেন নাকি! সরিয়ে আনুন। ভিড় সরিয়ে একটা ট্যাক্সির দরজা খুলে ধরল দুজন লোক। আমি ওর বুকের কাছ থেকে হাত সরিয়ে ওর কোমরের কাছে রাখবার চেষ্টা করলাম। যেন সমস্ত হাড়টাই ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ডিসলোকেটেড হয়ে যাওয়ায় একটা ভারী অথচ ভিস্তির ব্যাগের মত মেরুদণ্ডহীন মনে হল। ঐভাবেই ওকে আমি জড়িয়ে তুলে ধরলাম। তারপর এগোলাম। এই, এই, সরে দাঁড়ান। হাতটা পড়ে যাচ্ছে; হাতটা তুলে দিন না মশাই। হিপোপটেমাসটা তেমনি ঝুলে পড়া চোয়াল, দাঁত, কুদে কুদে চোখ বড়দিনের প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছে, হাঃ হাঃ হুররে—

সোজা মেডিকেল কলেজ চলুন। বাইরে থেকে কে যেন সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল। ড্রাইভার হর্ন দিতে দিতে গাড়ি ছাড়ল। হিপোপটেমাস আমার কোলে। যে হাতটা ঝুলঝুলে করে গড়াচ্ছিল সেটাকে আমি উপরে তুলে ওর বুকের কাছে সাঁটিয়ে রাখলাম। হাতের পাঞ্জা পাক খেয়ে উলটো দিকে ঘুরে আছে! কোথায় যেন দেহের মধ্যে ওর রক্ত আটকে ছিল, হঠাৎ ঝরঝর করে নেমে এসে আমার হাঁটু ভিজিয়ে দিতে লাগল। রক্তের উষ্ণতায় আবার আমার মধ্যে সেই বিচিত্র কম্পন শুরু হল। ড্রাইভারজী, আমি অস্ফুট গলায় ডাকলাম। ড্রাইভার পিছনে ফিরে তাকাল। বিলকুল বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে ড্রাইভারজী। ড্রাইভার কাচের শার্সি নামিয়ে দিল। খানিকটা যেন বাইরের বাতাস এবার ভিতরে আসছে। আমি হিপোপটেমাসের দিকে তাকালাম। বেচারার মুখে সেই একটাই অভিব্যক্তি। সেই অভি-ব্যক্তিতে মানুষের সঙ্গে পশুর অমিলটা যেন স্পষ্টভাবে ধরা যায়। বিশেষত হিপোর মত বুদ্ধিহীন প্রাণীর সঙ্গে মানুষের। আমি সামনের ঝুলন্ত আয়নায় ড্রাইভারের মুখ দেখতে পেলাম। নির্বিকার মুখ। ড্রাইভারজীও কি এইভাবে আমার মুখ দেখতে পাচ্ছে! আমি আমার মুখটাকে একটু সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করলাম। আমার হাঁটুর উপর থেকে টুপটুপ করে রক্ত পড়ছে আমার চপ্পলের উপর। আবার অনেকক্ষণ বিরতির পর আর এক ফোঁটা পড়ল। মনে হল, এই ফোঁটাটায় অদ্ভুত ধরনের কিছু যেন ছিল, রক্তের একটা বিস্বাদময় গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। আবার পিঠের শিরদাঁড়া আমার শিউরে উঠল। যেন ক্ষুদ্রাকৃতি বিষধর একটা সরীসৃপ আমার পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছে। চোখ বন্ধ করলাম। নিশ্বাসে রক্তের গন্ধ পাচ্ছি। ঘামের গন্ধ, গেঁজে ওঠা ভ্যাপসাম কোন মদের গন্ধ। আমি নিশ্বাস বন্ধ রেখে তীক্ষ্ণতায় নিজেকে সতর্ক রাখবার চেষ্টা করলাম। রক্তের ফোঁটা অত্যন্ত ধীরভাবে তখনও আমার চপ্পলের উপর টোকা মারছে। চপ্পল সরাবার চেষ্টা করে বুঝতে পারলাম,

আঠার মত কামড়ে বসে আছে কস্তুটি।

অগত্যা রক্তের বিবরটা আমি ভুলবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু মুখোশের ব্যাপারটা কিছুতেই স্বস্তি দিচ্ছে না। মুখোশ জিনিসটাকে কোন কালেই আমি বরদাস্ত করি না। করি না, তা সত্ত্বেও খোকনকে একবার নররাক্ষস গোছের একটা মুখোশ কিনে দিয়েছিলাম। খোকন যা দুরন্ত, ঐভাবে ওকে মুখোশ কিনে দেওয়া উচিত হয় নি আমার। ভগবান না করুন, খোকন যদি এইভাবে মুখোশ পরে পথে এসে ছুটোছুটি করত! যদি এইভাবে ওর হাতের পাঞ্জা উলটো, ভলপেটে ওগরান রক্ত ঝরত টুপ টুপ করে—

আমার একমাত্র ছেলে খোকন। আমার মত ব্যর্থ মানুষের একমাত্র সন্তান খোকন। ওকে আমি দু হাতে জড়িয়ে ধরে রক্তের উষ্ণতা অনুভব করার চেষ্টা করি। ওর চোখের গভীরে তাকিয়ে দেখি সার্থক হয়ে ফুটে ওঠবার লক্ষণগুলি, ধরা পড়ছে কিনা। কে জানে এই হিপোপটেমাসও কারোও একটিই মাত্র সন্তান কিনা। সেও ওর এই কচি নরম হাত গালের উপর চেপে ধরত কিনা। ড্রাইভারজী, ছেলেটোর বাপ-মায়ের কোন পাত্তা মিলাম না, থানা থেকেও যদি খোঁজখবর শুরু না করে, মুশকিল হয়ে যাবে।

ড্রাইভারজী লাল আলোর সামনে গাড়ি থামিয়ে ফিরে তাকাল। পাথরের মত স্থির চোখ লোকটার। খুতনি পেঁচিয়ে মাথার ঝুঁটি অবধি গোলাপী কাপড়ে ফেটি বাঁধা। হয়ত দাড়ি কোঁকড়ান করে নিজেকে আরো সুখী করবার প্রচেষ্টায় আপাতত এটুকু ক্লেশ সহ্য করছে। স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে লোকটা। যেন বোঝাতে চাইছে, নসীবের বড় কিছুই নেই দুনিয়াতে।

আমি ঐ স্থির দৃষ্টির কাছে নিজেকে অসহায় বোধ করে হাসলাম। ড্রাইভারজীও হাসল। বলল, মনে হচ্ছে বাবু আপনিও মুখোশ পরে আছেন। আয়নাতে দেখুন জী। বলেও আয়নাটকে পুরোপুরি আমার দিকে ঘুরিয়ে দিতে আমি নিজের মুখ দেখবার চেষ্টা করলাম। অর্ধাঙ্গ খোসা ছাড়ান আলুর মত ফ্যাকাশে মুখ। কিন্তু কতখানি অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে এ মুহূর্তে, সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারত শেফালি। শেফালি হয়ত এখন দোতলায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে মালিক-গিন্নীর সঙ্গে সিনেমার টিকিট কাটা নিয়ে একটা শলাপরামর্শ জুড়েছে। শেফালি যদি বিন্দুমাত্র বুঝতে পারত এখন কি গুরু দায়িত্ব নিয়ে আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। স্বচক্ষে দেখলেও বিশ্বাস করত না। বলত, তোমার মত বেড়াল-ভেজা লোকের কম্ম নয় ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়া। ড্রাইভারজী ওর উপর এতটুকু বিশ্বাস রেখো না। দেখ, চিপ করে এখনই অজ্ঞান হয়ে পড়ে তোমাকে এক বিপদে ফেলবে।

ড্রাইভার সবুজ বাতি পেয়ে আবার গাড়ি স্টার্ট দিল। আর কিছুটা এগোলেই সেন্ট্রাল এভিন্যু, তারপর সেই প্রাসাদোপম হাসপাতাল।

ছ সাত বছর আগে আর একবার আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। পীযূষের জন্য গিয়েছিলাম। পীযূষ আমার মুখোমুখি টেবিলে বসে অনেক দিন একনাগাড়ে ডেস-প্যাচ ক্লার্ক হিসাবে কাজ করেছিল। কী এক দুরারোগ্য রোগে যেন ভুগত পীযূষ। হাসপাতালে ওর দেহটার ওপর কয়েকবার অস্ত্রোপচার হল, তারপর একদিন সকালে অকস্মাৎ শুনতে পেলাম, পীযূষ নেই। যেমন-ভাবে গাছে গাছে ফুল ফোটে, ভাঁটি ছিঁড়ে নেবার পর আর থাকে না, তেমনভাবে পীযূষও আর রইল না। কিন্তু তখনও পীযূষের স্মৃতিটা আমাদের মধ্যে জীইয়ে ছিল বলে আমরা কয়েকজন রজনীগন্ধার গুচ্ছ হাতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। রজনীগন্ধা হাতে তুলতে বড় অস্বস্তি হয় আমার। একই ফুল যেমনভাবে মৃতের দেহের উপর ছড়িয়ে দেওয়ার রীতি, সেই একই ফুল কিভাবে মানুষ সানাই বাজান উৎসব-বাড়িতে বয়ে আনে! ভীষণ স্ট্রোচারাস রজনীগন্ধা। আমি ফুলদানিতে ফুল রাখার ব্যাপারটাকে পুরোপুরি বাড়ি থেকে তুলে দিয়েছি। ফুলের শৌখিনতা মানুষের সাজে না শেফালি, বরং—

সেবার হাসপতালে আমার ভয়াবহ একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। পীযূষের মৃতদেহ সরাতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, শুভ্র চাদরের নিচে ওর ক্লিষ্ট দেহটা নিরাভরণ, নগ্ন। কেবিনের কেয়ারটেকার একরাশ বিড়ির ধোঁয়া আমাদের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনারা সাধারণত মৃত্যু দেখেন না বলে এত সেনসেটিভ। আমরা দেখে দেখে পাথর। ফলে মৃতদেহের অঙ্গবাস যদি কেউ চুরি করে নিয়ে যায়, আমাদের কাছে তার এতটুকু মূল্য নেই।

তার মানে কি বলতে চান আপনি? পীযূষের এক আত্মীয় মারমুখী হয়ে এগিয়ে এল। লোকটা নির্বিকারভাবেই বলল, কমপ্লেন-বুক আছে, দু কলম লিখে রেখে যান। আমি অবশ্য ধাঙড়দের এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করব। এ ছাড়া আর কিই বা করতে পারি বলুন।

পীযূষের জন্য সে মুহূর্তে আমার ভীষণ ক্ষোভ হয়েছিল। দুঃখ হয়েছিল। হায় পীযূষ! কিন্তু পরে যখন কয়েকবার ব্যাপারটা মনে পড়ত, ভেবে দেখেছি সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই ছিল আবেগ দিয়ে বাঁধা। দুঃখ বা ক্ষোভ আসলে আবেগেরই প্রকাশ। নইলে এমন ঘটনা যদি ওর জীবিতকালে ঘটত, যদি দেখা যেত পীযূষ নামধারী অনেক যুবকের অঙ্গবাস চুরি হয়ে যাওয়ায় সে নগ্ন, নিরাবরণ, এর চেয়ে কৌতুকের কিছুই ছিল না আমাদের কাছে। আসলে পীযূষ স্মৃতি ছাড়া সে মুহূর্তে আমাদের আর কিছুই সম্বল ছিল না বলে আমরা কাতর হয়েছিলাম।

যেমনভাবে এই হিপোপটেমাস এই মুহূর্তে আমাকে কাতর করে তুলেছে। আমি অনুমানে বুঝবার চেষ্টা করলাম, এখনও কি সেই রক্তের ফোঁটা আমার হাওয়াই চপ্পলে টোকা মারছে। না, কোন অনুভূতিই যেন ছিল না আমার। রক্তের ব্যাপারটা এখন আমার কাছে অনেকখানি স্বাভাবিক। যেমনভাবে আমাদের বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য থাকে না তেমনি এখন রক্তের টোকায়ও আমার অনুভূতি বিবর্ণ। আমার মনে হল, হয়ত এ ছেলেটাকে নিয়েও হাসপাতালে সেই পীযূষের মতই কতগুলি ঘটনা ঘটবে। সেই ঘটনায় আবার আমি ক্ষুব্ধ হব, দুঃখ পাব। চীৎকার করে কতগুলি নিরর্থক প্রতিবাদ করব। তারপর আবার সেই দিনযাপন। কিন্তু এমন হয়ত কিছুই হত না, যদি স্মৃতিহীন হতে পারতাম। মানুষের থাকা না-থাকাটা যদি স্মৃতি দিয়ে যাচাই না হত, কত বড় দুঃখের হাত থেকে আমরা বাঁচতে পারতাম। মানুষ কেন স্মৃতিহীন হয়ে জন্মায় না। আমি জানি শেফালি, তুমি এখন আমাকে মিথ্যাকল্পনায়ী বলবে। বলবে, আমি এস্কেপ করতে চাইছি। এই যে এতক্ষণ আমি ছেলেটার মুখোশ সরিয়ে মুখ দেখার চেষ্টা করলাম না, এও আমার এস্কেপ করারই চেষ্টা।

ড্রাইভারজী হঠাৎ গাড়ির ব্রেক করতে করতে বলল, বাবুজী, এসে গেছি।

এসে গেছি! দেখলাম সেই পুরনো হাসপাতালের সিঁড়ি। সেই কমলালেবু আঙুরের গুচ্ছ হাতে লোক, সেই রাজ-হংসীর মত কয়েক জোড়া নার্স। বললাম, ইমারজেন্সীতে একটু খবর দাও-না ড্রাইভারজী। একটা স্ট্রেচার অন্তত—

স্ট্রেচার এল, স্ট্রেচারে ওরা বেওয়ারিশ মালের মত হিপোপটেমাসকে তুলে নিল। আমি এগোলাম। কাউন্টারের সামনে দাঁড়ালাম। আমার কাপড়ে রক্তের চাপ। চিটচিটে করছে। আলুর খোসার মত কিছু কিছু রক্ত ছাড়াচ্ছে। আপনাদের বাথরুমটা কোন দিকে স্যার?

কেরানী ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে একটা খাতা টেনে নিয়ে আমার চোখের সামনে তুলে ধরল, হাই কাটল। নাম কি বলুন আগে। রক্তটক্ত পরে ধোবেন।

কার নাম? আমি খাতার দুর্বোধ্য দাগ-গুলির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

পেশেণ্টের নাম?

নাম কি করে বলব মশাই, স্ট্রীট অ্যাক্সিডেণ্ট যে।

লোকটা বলার আগেই কি যেন লিখল। আপনার নাম বলুন। নাম আর ঠিকানা।

আমি কেন? আমি জাস্ট ছেলেটাকে কিছু একটা করা দরকার বলেই—

তবু নাম বলতে হবে। পেশেণ্ট তো আর নিজে নিজেই আসে নি।

আমি চারদিকে তাকালাম। হিপোপটেমাসকে স্ট্রেচারে দোলাতে দোলাতে কোথায় যেন চোখের বাইরে নিয়ে গেছে। ড্রাইভারজী পাশে ছিল, বলল, বোলিয়ে না! বলুন, বলুন। আমি শুকনো গলায় আমার নাম আর ঠিকানা আবৃত্তি করলাম। লিখুন, এগারো হরিপদ দত্ত লেন। লিখেছেন? আর কি করতে হবে বলুন। বাথরুমটা একটু আগে পেলে ভাল হত না দাদা।

এখানটায় সই করুন। আর এখানে লিখুন কোথায় অ্যাক্সিডেণ্ট হল, কখন হল; গাড়ির নম্বরটা জানেন তো তাও লিখে দিন, পুলিসকে আমাদের জানাতে হবে।

ভদ্রলোক বিকেলের জলখাবারের আয়োজন করেছিলেন কিছুক্ষণ আগে। এবার স্বাভাবিকভাবেই একটু ভিতর দিকে সরে বসলেন, তারপর বাটি খুলে—
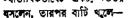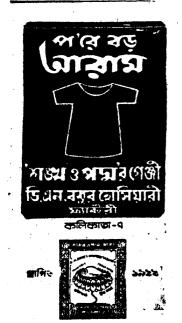
বললাম, লিখেছি। এবার কি করতে হবে?

আর কিছু নয়। এবার যেতে পারেন। ওই ডান দিকে চলে যান, জল পাবেন। ভাল কথা, আপনার ফোন থাকলে নম্বরটা লিখে যেতে পারেন।

আমি মাথা নাড়লাম, নেই। তারপর বিরক্তি দেখিয়ে বাথরুমের দিকে এগোলাম।

যেন এইটুকুই আপাতত কর্তব্য ছিল আমার। আমি হাত ঝেড়ে এখন মুক্ত। এবার আমি বাড়ি যেতে পারি। শেফালির কাছে, খোকনের কাছে। শেফালিকে আজ এক ফাঁকে সাবধান করে দেব, খবরদার, খোকনকে যেন ভুলেও কোনদিন মুখোশ কিনে দিও না। কিংবা জুতোর দোকানে ঢুকলেই যে খোকনের জন্য একটা মুখোশ নিতে হবে এমনধারা চিন্তাও ক'রো না! মুখোশ বড় খারাপ জিনিস শেফালি, মুখের আসল চেহারা লুকিয়ে চললে অমনই হয়। বিলিভ মি, মুখোশ বড় খারাপ জিনিস।

ড্রাইভারজী বলল, চলুন, আপনাকে এগিয়ে দেই। টালিগঞ্জের দিকেই যাব আমি। আজ গাড়িটাকে সটান গ্যারেজে তুলে দেব।

আমি তাকালাম।

পয়সা লাগবে না চলুন। আমার পাশেই বসুন। ও-পথের প্যাসেঞ্জার পেলে তুলে নেব।

আমি গাড়িতে উঠলাম। সেই রক্ত-বমনের গন্ধ। ঝাঁজাল। হাসপাতালের বিপুলাকৃতি খিলানগুলি পিছনে পড়ে রইল। বাইরের অশান্ত বাতাস চোখের পাতায় এসে আছড়ে পড়ছে। আমি ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ করলাম। ঘাড়টা পিছন দিকে এলিয়ে দিলাম। সামনেই সবুজ বাতি পেয়ে ড্রাইভারজী আরো স্পীডে গাড়ি ছাড়ল।

এতক্ষণও কি ছেলেটার খোঁজ শুরু হয় নি পাড়ায়। কেউ কি এখনো ওর বাবাকে বলে দেয় নি, মুখোশ-পরা একটা দশ-বারো বছরের ছেলে লাগাম-ছাড়া এক গাড়ির চাকায় পিষে গেছে। আরো তাড়াতাড়ি কেউ কি খবর দিতে পারে না। ছেলেটা যদি নাই বাঁচে আর। বাঁচলেও পঙ্গু অকর্মণ্য হয়েই বাঁচবে। আহা, এমনভাবে বাঁচা কেন! সামান্য একটু ভুলের জন্য সারাটা জীবন তার মূল্য দেওয়া কেন! বরং ধরা যাক, মৃত্যু এসে ছায়া ফেলল ওর চোখে। তারপর?

তারপর মর্গ। চওড়া টেবিলের ওপর শোয়ানো চাদর-ঢাকা দেহগুলি। কাটা-ছেঁড়া অংশগুলি সেলাই করে জুড়ে রাখা।

হ্যালো, ও মশাই, শুনেছেন? ছেলেটাকে তো খুব হাসপাতালে দিয়ে এলেন। এখন নিয়ে আসবে কে? অথবা বললেই হয়, আমরা সংকার করি। মর্গে আর কতক্ষণ ফেলে রাখা যায়।

ও: তাই বুঝি! ওর বুঝি কাউকেই পাওয়া যায় নি। চলুন তা হলে। আমি কালো রঙের আঁশটে গন্ধওলা পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকলাম। যেন বহুকালের এই স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা ঘরে হিপোপটেমাসের মুখোশ-পরা ছেলেটা একমাত্র আমার জন্যই অপেক্ষা করছে।

আমি রক্ষীকে শুধোলাম, কোথায়? কোন্ টেবিলে?

দেখে নিন, তিন-চারটে আছে ওই বয়সের। কোন্টা আপনার, দেখে নিন। লোকটা সামনের দাঁত দুটো জিভে তুলে আবার যথাস্থানে বসিয়ে নিল। আমি টেবিলে হাতড়ে হাতড়ে এগোলাম। মুখের কাপড় সরিয়ে সরিয়ে দুটো-একটা মুখ চিনবার চেষ্টা করলাম। কোথায় হে, সেই মুখোশ-পরা মুখটাকে কোথায় রেখেছ?

লোকটা হাসল। এটা দেখুন তো, চিনতে পারেন কিনা?

বললাম, না। এ যে নির্মল চোখ! মুখোশ কোথায়? মুখোশ পরিয়ে দাও, তবে যদি চিনতে পারি।

লোকটা বলল, তা হলে আমি নাচার। অফিসে যান, সাহেবকে বলুন।

আমার কি দৃষ্টিবিভ্রম ঘটল! আশ্চর্য, সামান্য মুখোশের জন্য এই বিভ্রান্তি কি! আমি টেবিলের ধারে ধারে সাদা কাপড়ে ঢাকা দেহগুলির পাশে পাশে ঘুরলাম। কাকে সনাক্ত করব আমি। এখানে সবাই যে অমলিন দেহে শুয়ে আছে। মুখোশ কোথায়? মুখোশ ছাড়া কিভাবে আমি সনাক্ত করি। সেই হিপোপটেমাসের মুখটি এখন কোথায়! সেই ঝুলে-পড়া চোয়াল, দাঁত, কুদে কুদে চোখ। সব বাজি জেতার মত সেই নির্বিকার দম্ভ এখন কোথায়?

হঠাৎ আমার চেতনা ফিরল। তাকিয়ে দেখি, টালিগঞ্জের উপর দিয়েই চলেছি।

ড্রাইভারজী, থামাও, থামাও। এইখানেই আমায় নামিয়ে দাও।

গাড়ির গতি থেমে এল। আমি দরজা ঠেলে বাইরে এলাম। তারপর ঝুঁকে বললাম, কাজটা কিন্তু ভাল হল না ড্রাইভারজী। ছেলেটার মুখোশ একবার খুলে দেখাই উচিত ছিল আমাদের। আসল মুখটা কোন-দিনই হয়ত চিনতে পারব না।

আপনি বড় থকে গেছেন বাবুজী। ঘরে যান, বিশ্রাম করুন। পিছন থেকে আর একটা গাড়ি অনেকক্ষণ হর্ন বাজাচ্ছে দেখে ড্রাইভারজী বিদায় নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

এমন সময় আমি বুঝতে পারছিলাম না, আমার চারপাশে যারা চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে তারা সকলেই মুখোশ পরে আছে কিনা। কেমনভাবে কাকে আমি সনাক্ত করি। যদি সত্যি সত্যি কোনদিন মর্গে গিয়ে কাউকে সনাক্তকরণের প্রয়োজন হয়, আমি কেবল টেবিলে সাজান মৃতদেহগুলির পাশে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কিই বা করতে পারি।

টুসু পরবে পুরুলিয়ায়

অমিয় দত্ত

॥ এক ॥

পেশা শিক্ষকতা, নেশা একটু-আধটু সাহিত্য-চর্চা। তাই সাহিত্যের পাকশালায় নতুন খাদ্যের সন্ধান পেলেই তার স্বাদ গ্রহণের জন্য জ্ঞান-রসনা কেমন যেন এক উন্মুখ আগ্রহে অধীর হ'য়ে ওঠে।

বেশ কয়েকদিন হ'ল পুরুলিয়ায় এসেছি পেশার খাতিরে। কাজের চাপে নেশার তখন বন্দীদশায় দিন কাটছে। ব্যবহারিক কাজের মধ্য দিয়ে দিনগুলো কেমন করে যে চলে যায় কে জানে? সেই অনবকাশের মুহূর্তে অকস্মাৎ একদিন মিলিত মেয়েলী কণ্ঠের সুরের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল আমার নেশার সেই বন্ধ দরজায়। প্রাত্যাহিক কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম তখন ঘরে। মন বলে উঠল—এমন গান তো কখনো শুনিনি! ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। গানের আওয়াজ ক্রমশই নিকটবর্তী হচ্ছিল। ভেসে আসা সুরের অনুসরণ করে দেখতে পেলাম, গোটা দশেক আদিবাসী মেয়ের একটা দল বরাকর রোড ধরে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে। প্রভাতের প্রথম সূর্যের কিরণে পিচের রাস্তায় একপ্রকারের মৃদু-স্নিগ্ধ মসৃণতার সৃষ্টি হয়েছে। তার ওপরে ছান্দিত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসা মেয়েদের দেহের কাঁপা কাঁপা প্রলম্বিত ছায়াগুলো দোল খাচ্ছিল। আমি যতক্ষণে সুরের নাগপাশ থেকে গানের কথাগুলোকে মুক্ত করে আনতে চাইছিলাম ততক্ষণে তারা প্রায় আমার কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ আমার মুখোমুখি হতেই লজ্জায় চুপ করে গেল সকলে। লজ্জার প্রাথমিক জড়তা কাটাতে গিয়ে হেসে ওরা কুটি কুটি হ'ল; এর গায়ে ও ঢলে পড়ল। আচমকা হাসির উচ্ছলতায় আমি একটু থ বনে গেলাম। পরে যখন বুঝলাম, ওটা তাদের লজ্জাকে গোপন করার প্রয়াস মাত্র, তখন ব্যাপারটাকে হাল্কা করে দেবার জন্য বললাম—'আরে এতে লজ্জা পাবার কি আছে? বেশ তো গাইছিলে—গাও না আর একটু শুনি?' এ-কথা শুনে ওরা আরো বেশী লজ্জা পেল—আড়ষ্ট হয়ে গেল। দলের মধ্যে উনিশ থেকে উনচল্লিশ বছর বয়সের মেয়েও ছিল। সবচেয়ে বর্ষীয়সী মেয়েটি জানাল, না তখন অন্ততঃ ওরা আর গান গাইতে পারবে না; কারণ আমা হেন বাবুকে দেখে তাদের লজ্জা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম—'কি গান গাইছিলে গো তোমরা?'

মেয়েটি উত্তর দিল—'আজ্ঞা, উ টুসু গান আছে'ন বটে।'

টুসু গান? মনের মধ্যে দপ করে যেন একসঙ্গে অনেক আলো জ্বলে উঠল। ঠিকই তো! এখানে আসার আগে লোক-সাহিত্য পড়ুয়া আমার বন্ধু-বান্ধবীদের কয়েকজনের মুখেই পুরুলিয়ার টুসুগান ও ছৌ-নাচ-প্রাচুর্যের কথা শুনেছিলাম। তখন থেকেই মনে একপ্রকারের ইচ্ছে জন্মেছিল টুসুগান কিছু সংগ্রহ করার। কিন্তু পেশাগত কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম যে, ঐ কথাটা আর মনেই ছিল না। এদের গানে আর কথায় আজ আবার তা স্মরণে এল। তাই নিজে থেকেই উৎসাহিত হয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করে এদের কাছ থেকে জানলাম যে, সমস্ত পৌষ মাস ধরেই টুসুকে উপলক্ষ্য করে এখনকার মেয়েদের [কিছু কিছু ছেলেদেরও] মুখে মুখে টুসু গান ফেরে। অগ্রহায়ণের সংক্রান্তির রাতে টুসু পাতা হয়। তা থাকে পৌষ-সংক্রান্তি পর্যন্ত। তাই গোটা পৌষ জুড়েই টুসুর অধিষ্ঠান। অগ্রহায়ণ শেষ হ'য়ে এসেছে। আর দু-দিন বাদেই টুসু পাতা হবে। এদেশের মেয়েদের গলায় তাই টুসু গানের সুরে উচ্ছল আবেগে স্পন্দিত হ'তে আরম্ভ হয়েছে। প্রায় এক বছরের অনভ্যাসকে এরা অধুনা-অভ্যাসের মূল্যে অস্বীকার করতে চাইছে।

আমার মধ্যেকার সাহিত্য-ভূতটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। বর্ষীয়সী মেয়েটিকে বলে ঠিক করলাম, অগ্রহায়ণের সংক্রান্তির রাতে তাদের বাড়ি টুসু পাতা দেখতে যাব। মেয়েগুলো প্রথমে লজ্জা পেলেও পরে সানন্দে সম্মতি জানাল। তারপর ওরা চলে গেল ওদের কাজে। সামনেই একটা বাড়ি তৈরী হচ্ছে। ওখানেই ওরা কামিনের কাজ করে। আমি ঘরে ফিরে এলাম। তখনো কিন্তু মনের মধ্যে অনুরণিত হচ্ছিল কিছুক্ষণ আগে শোনা একটানা সুরের টুসু গানটা—

ও টুসুধন দিব তোর বিয়া
তোরে দেখলে গো জুড়ায় হিয়া।

শ্রীরামের মুখ থেকে টুসুর জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নতুন একটা তথ্য পেলাম

॥ দুই ॥

অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি। সন্ধ্যেবেলা দুজন উৎসাহী সহকর্মী সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাসা থেকে মাইল দেড়েক দূরে বোঙাবাড়ি গ্রামে এসে হাজির হলাম। সেদিন যে মেয়েগুলোর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাদের বাড়ি এই গ্রামেই। বর্ষীয়সী মেয়েটির নাম পঞ্চমী। বাড়ি খুঁজে পেতে বিশেষ কষ্ট হ'ল না। ছোট-ছোট প্রায় উলঙ্গ ছেলেমেয়ের একটা দল আমাদের পঞ্চমীর বাড়ি দেখিয়ে দিল উৎসাহভরে। পঞ্চমী ভাবতেই পারেনি যে, এই ঠান্ডায় সন্ধ্যেরাতে দু মাইল পথ ঠেঙিয়ে আমরা সত্যিই এসে হাজির হব। বিস্ময়ের প্রাথমিক ঘোর কাটার পর সে আমাদের আপ্যায়নের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। একখানা খাটিয়া পেতে আমাদের বসতে দিলে। আমরা তাকে ব্যস্ত হ'তে বারণ করে উঠোনের ওপর পাতা খাটিয়াতে বসলাম। আকাশে তখন শুক্ল পক্ষের দশমীর চাঁদ। বেশ জ্যোৎস্না ফুটেছে। নিকানো মাটির উঠোনে ধবধবে শুভ্রতায় পবিত্রতার ছাপ। আমাদের ঘিরে অনন্ত কৌতূহল নিয়ে সেই ছোট ছেলে-মেয়ের দলটা দাঁড়িয়ে রইল।

বেশ-ঠান্ডা লাগছে। কিছুক্ষণ বাদে পঞ্চমী দুটো মেয়েকে নিয়ে এলো দেখলাম। তাদের দেখেই চিনলাম তাঁরা আগের দিনের দলে ছিল। তাঁদের পিছনে পিছনে আর একটি লোক এসে হাজির হল। মাথায় চাপা দেওয়া, সর্বাঙ্গে কাঁথা জড়ানো। হঠাৎ দেখলে রাত্রির আলো-আঁধারে তাকে জীবন্ত মমি বলে ভ্রম জন্মাতে পারে। এসেই কর্তাব্যক্তির মত পঞ্চমীকে বকাবকি শুরু করল। বলল আমাদের মত বাবু লোককে সে ঠান্ডায় বসিয়ে রেখেছে কেন? ঘরের মধ্যে বসালেই তো পারতে? পঞ্চমী ব্যস্ত হ'য়ে আমাদের ঘরে উঠে বসতে বলল। লোকটাও অনুনয়ের ভঙ্গিতে পীড়াপীড়ি শুরু করল। অগত্যা আমরা তিনজনে উঠে দাঁড়ালাম। কেরোসিনের কুপি জেলে একটা ছেলে সামনের ঘরের মধ্যে আমাদের এনে বসাল একটা দড়ির খাটিয়ার ওপর। চারদিকে চাপা জানালাহীন ঘর। দারিদ্র্যের চিহ্ন সর্বত্র সুপরিস্ফুট। দরজার বাইরেই দুটো গরু আর একটা মোষের বাচ্চা বাঁধা। ঘরের মধ্যে একটা কোণে কিছুটা ঘেরা জায়গায় রয়েছে গোটা পাঁচেক মোরগ-মুরগী। সমস্ত ঘরে কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ। ছেলেটা কুপিটি রাখল দেওয়ালের গায়ের কুলুঙ্গিতে। কুপিটা আলোর চেয়ে বেশি করে সৃষ্টি করছিল চাপ চাপ কালো ধোঁয়া।

ঘরের মধ্যে সর্বাঙ্গে কাঁথা-জড়ানো লোকটাও এসে হাজির হোল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তার নাম শ্রীরাম মাহাতো। পঞ্চমী তার মেয়ের মেয়ে। তাকে বসতে বলতে সে মাটির ওপরেই উবু হয়ে বসল। যে ছেলেটা কুপি এনেছিল সেও বসল সেখানে। পঞ্চমী এসে জানিয়ে গেল, টুসুর পাতার কাজ আরম্ভ হতে আরো প্রায় আধ ঘন্টাখানেক দেরি হবে। বাইরে ছোট ছেলে-মেয়েদের দলটা কলরব করে চলছে সমানে। তাদেরই মধ্যে একটি ছোট শাড়ি-পরা মেয়ে কিন্তু শ্রীরামের কাছে এসে ভীরু-ভীরু চোখ নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। পরে জেনেছিলাম, আগামী ফাল্গুনে ওর বিয়ে হবে। তাই নিজে অনেক বড় হয়ে গেছে ভেবে ছোটদের সঙ্গে ও আর খেলাধুলোয় যোগ দেয় না। একটা নকল গাম্ভীর্য দিয়ে নিজেকে ও ছোটদের থেকে আড়াল করতে চাইছে। ওর কথা শুনে আমরা তিন বন্ধুতে হো-হো করে হেসে উঠলাম। মেয়েটা এতই নাবালিকা যে, হাসির কারণ বুঝতে না পেরে সেও আমাদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল।

আসল কথায় এলাম এবার। শ্রীরামের মুখ থেকে টুসুর জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নতুন একটা তথ্য পেলাম। জানলাম, আসলে টুসু কোনো দেবতাই নয়; টুসু একটা মেয়ে। জন্ম হয়েছিল তার মোগল আমলে এক হিন্দুর ঘরে। ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটার দেহ-নদীতে কালক্রমে যখন রূপ-যৌবনের ঢল নামল তখন কোন পুরুষেরই সাধ্য ছিল না তার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নেবার। তুষার-ধবল গায়ের রঙ। ফুটন্ত পদ্মের সুগঠিত পাপড়ির মত যৌবন-শ্রীসমৃদ্ধ দৈহিক বিকাশ। গলায় মিষ্টি স্বরে বনের পাখির মধুর গান। সব মিলিয়ে টুসু আশ্চর্য—টুসু সুন্দর। মা-বাপের মনে আনন্দ আর ধরে না। টুসুর বিয়ে দেবেন তাঁরা এবার। রাজপুত্তুর জামাই আনবেন ঘরে। টুসুকে ঘিরে তাঁদের মনে হাজারো মধুর স্বপন জমা হতে থাকে।

ঠিক এমন সময়েই সব কিছু সুখ-স্বপন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সেই সময়ের এক মুসলমান রাজার দৃষ্টি পড়ল টুসুর ওপর। রূপ-মুগ্ধ রাজার টুসুকে চাই-ই—চাই। ডুকরে কেঁদে উঠলেন বাবা-মা। চোখের জলে টুসুর বুক গেল ভেসে। কিন্তু রাজার কামনার আগুন তাতে নিবলো না। রাজা তার সমস্ত শক্তি দিয়ে বাবা-মায়ের বুক থেকে জোর করে ছিনিয়ে আনতে চাইলো টুসুকে। ঘরে থাকা নিরাপদ নয় জেনে ঘর ছেড়ে পথে নামলো টুসু। আত্মগোপন করে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলো। চারদিকে খোঁজ-খোঁজ রব। রাজার তরফ থেকে খুঁজে বের করার জেদের মাত্রাটা বেশী। সর্বত্র চরদের তৎপরতা। টুসুর পক্ষে বেশী দিন আত্মগোপন করে থাকা সম্ভব হল না। একটা নদীর ধারে এসে টুসুর যখন প্রায় ধরা পড়-পড় অবস্থা তখন ইজ্জত বাঁচানোর জন্যে নিজেরই শাড়ির আঁচলে হাত-পা বেঁধে টুসু নদীর ভরা জোয়ারে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। কামুক রাজার কলুষ-হাতের স্পর্শ লাগার আগেই ফুটন্ত টুসু-পদ্ম জীবন-বৃন্ত-চ্যুত হল; তার রূপ-যৌবন-পাপড়িগুলো অকালেই ঝরে গিয়ে নদীস্রোতের চঞ্চলতার মধ্যে হারিয়ে গেল—আর আকস্মিকভাবেই মিলিয়ে গেল তার প্রাণ-সৌরভ। বাস্তব জগতের নিষ্ঠুর পাশবিক অত্যাচারের পৈশাচিকতার হাত এড়াতে সকলের চোখের আড়ালে চিরকালের জন্যে নিজেকে টুসু এইভাবে নির্বাসিত করল।

কিন্তু সতীত্ব রক্ষার জন্যে টুসুর এই আত্মদানকে ভুলতে পারেনি দেশের সাধারণ মানুষ। যেখানে টুসু ডুব দিয়ে সকল যন্ত্রণার

কুমারী মেয়েরাই সাধারণত পুজো করে

হাত এড়িয়েছিল সেখানের নাম দিয়েছে তারা সতী-ঘাট। টুসুকে দেশের মানুষেরা সতীত্বের আদর্শ জ্ঞানে দেবীর আসনে বসিয়েছে। উত্তর-পশ্চিম বাংলা ও তার পার্শ্ববর্তী বিহার রাজ্যের বেশ কিছুটা অঞ্চলের মানুষেরা তাদের বাড়ির ছোট ছোট মেয়েদের মধ্যেই টুসুর অস্তিত্বকে অনুভব করে মুখে মুখে গান বেঁধেছে। টুসুর পুজো-প্রচলনের মধ্য দিয়ে মেয়েদের সতীত্বের আদর্শে দীক্ষিত করতে চেয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত টুসুর জীবনের বিষাদ-করুণ কিন্তু গৌরবময় মৃত্যুকে স্মরণ রেখে নদীর জলেই জাঁক-জমকভাবে টুসু-ভাসানের প্রথা প্রবর্তিত করেছে। কালের আবর্তনে আজ অবশ্য অধিকাংশ আদিবাসী মানুষই প্রথাসর্বস্বতায় গা ভাসিয়ে টুসু-উৎসবে মেতে ওঠে। এই উৎসবের অভ্যন্তরের মূল অর্থটি তাদের অসংস্কৃত ও অনুন্নত জীবনের অন্ধকারের তলায় ধীরে ধীরে চাপা পড়ে হারিয়ে গেছে। এদের অজ্ঞানতা ও সরলতার পথ বেয়ে টুসুর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এলোমেলো বহু জিনিস এখন টুসু উৎসবের অংগীভূত হয়ে পড়েছে। মেয়েদের সংগে ছেলেরাও তাই এখন টুসু-উৎসবে অংশ গ্রহণ করে। টুসু গানের মধ্যে তাই নিছক রামায়ণ, মহাভারত বা রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বিষয়-বস্তুর অবাধ ও অফুরন্ত সাক্ষাৎ মেলে এবং সীমান্ত বাংলার প্রকৃতি বা সমাজ-জীবনের সুখ-দুঃখের বিভিন্ন ছবি সুস্পষ্ট রেখায় অকৃত্রিম ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে দেখতে পাই। আসলে অধুনা আদিবাসীদের বর্তমান জীবন-সমস্যাই বেশী করে টুসু-গানের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীন টুসুগানের সুরটা বজায় রেখে চলতি জীবনের বিভিন্ন বিষয়কে অবলম্বন করেই গ্রামীণ কবিরা মুখে মুখে গান তৈরি করে থাকেন। প্রতি বছরই তাই টুসুগানের মধ্যে নতুনত্বের সন্ধান মেলে।

॥ তিন ॥

শ্রীরাম মাহাতোর গল্প শেষ হবার কিছু পরেই আমাদের ডাক পড়ল। পঞ্চমী এসে আমাদের ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে উঠোনের একধারে পাতা খাটিয়ার ওপর বসাল। আমাদের মুখোমুখি প্রাচীরের দেওয়ালের গায়ে রয়েছে একটা কুলুঙ্গি। পঞ্চমী সেটা দেখিয়ে বললে যে, তারই মধ্যে টুসুর সরা পাতা হয়েছে। সামনে একটা হ্যারিকেন ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারই স্বল্পালোকে দেখলাম, কুলুঙ্গির চারাধার দেওয়ালের গায়ে লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদি রঙ দিয়ে বেশ চমৎকার ফুলকাটা নকশা আঁকা রয়েছে। সাঁওতালদের বাড়ির দেওয়ালে সাধারণত এই ধরনের ছবি আঁকা থাকতে দেখেছি। কুলুঙ্গির মধ্যে রথের মত চারপায়া-বিশিষ্ট একটা কাগজের ঘর চোখে পড়ল। ওখানকার লোকেরা একে 'চৌড়ন' বলে। এই 'চৌড়নে'র মধ্যেই বসানো রয়েছে একটা মাটির সরা। তার ভিতরে রয়েছে কয়েকটি ফুল, কিছু ধান ও দূর্বা। সরাটির বাইরের দিকের গায়ে সিঁদুরের টিপ লাগিয়ে খড়ির দাগ কেটে দেওয়ায় সুন্দর নকশার মত দেখতে হয়েছে। এই সরাটিই হল টুসুর প্রতীক। জিজ্ঞাসা করাতে পঞ্চমী বলল, অনেকে কুলুঙ্গিতে না রেখে বেদির ওপরে সরা পাতে। সমস্ত পৌষ মাস ধরে প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত ফুল দিয়ে কুমারী মেয়েরা সাধারণত পুজো করে। মন্ত্র? হ্যাঁ, মন্ত্র আছে বইকি! তবে তা সংস্কৃত ওং-হ্রীং নয়; মেয়ে এবং ছেলেদের সম্মিলিত কণ্ঠের সুরেলা টুসুগানই এই পুজোর মন্ত্র।

ইতিমধ্যে অনেকগুলি মেয়ে এবং ছেলে জুটে গেছে। আমরা পঞ্চমীকে তাড়া দিলাম —কই গো, গান এবার আরম্ভ কর? এতক্ষণ ছোট ছেলেমেয়েগুলো হইচই করছিল। তারা চুপ করে গেল গানের কথা হতেই। পঞ্চমী কুলুঙ্গির নীচে এক দিকে মেয়েদের ও অন্য দিকে ছেলেদের বসিয়ে দিল। দেখলাম, মেয়েদের মধ্যে আমার পূর্বে-দেখা কামিনদলের জন তিনেক আছে। তারা মাঝে-মাঝে আমাদের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখা-চোখি হতেই ফিক করে হেসে লজ্জায় মাথা নামিয়ে নিচ্ছিল; তখন তাদের ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছিল।

পঞ্চমী আদেশের সুরে বলল—নে গো, এবার গান ধর সবাই। কিন্তু বৃথাই মিনিট-খানেক চলে গেল; গান আর কারো গলা থেকে বের হল না। লজ্জায় যেন বোবা হয়ে গেছে সবাই। বারংবার অনুরোধ করার পর যদিও বা দু-একবার ধরতে গেল সকলে কিন্তু আগে-পরে ধরার জন্য কারো সংগেই কারো সুর বা কথা না মিলতেই ছেড়ে দিল

সবাই। শেষ পর্যন্ত সমস্ত সংশয়, লজ্জা ও কুণ্ঠা ত্যাগ করে পঞ্চমী নিজেই গলা ছেড়ে টুসু পাতায় গান ধরল :

চল্ সজনী টুসু পাতাব
আমরা টুসু পূজা করিব,
চল্ সজনী টুসু পাতাব॥

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমীর গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে মেয়ে ও ছেলের দল গানটা ধরল। কিছুক্ষণ বাদে পঞ্চমী থেমে গেল। কিন্তু ছেলে ও মেয়েরা তখন জড়তা কাটিয়ে উঠে সমানে গেয়ে চলেছে টুসুর আবাহন-গীতি :

আঘন মাসের সাঁকরাত (১) হল
টুসু মোদের ঘরে এল
ফুলের মালা গলায় দিয়ে
মোরা টুসু গায়বো লো॥
এক মাস রবে টুসু
মোদের ঘর করে আল (২)
নিত (৩) নূতন ফুল এনে
পরাব টুসুর গলে॥

আর বেশী অনুরোধ করতে হয়নি। একটা শেষ হয় তো আর একটা গান ধরে সবাই দ্বিগুণ উৎসাহে :

আয় গো তোরা, বসগো তোরা,
বস গো তোরা এখানে;
আমরা সবাই গাওন করি
শুন গো তোরা স্বকানে।

এইসব গানের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে বিষয়বস্তুর একতা নেই, ধ্বনি-সামঞ্জস্য নেই, অন্ত্যমিলের চমৎকারিত্ব নেই, অর্থের সুষ্ঠু সংগতি নেই সে কথা ঠিকই; কিন্তু সেদিন ধবধবে জ্যোৎস্নার শান্ত সমুদ্রে ডুব দিয়ে হিম-শীতল আবহাওয়া এবং খড় ও পাতায় ছাওয়া মাটির দেওয়াল-ঘেরা সজ্জাহীন একটা ছোট্ট বাড়ির গ্রামীণ পরিবেশের আওতায় বসে আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের সমবেত কণ্ঠে গাওয়া একটানা দীর্ঘ সুরের টুসুগান শুনতে শুনতে আমরা এমন এক স্বপ্নাচ্ছন্ন জগতের অধিবাসী হতে পেরেছিলাম, যেখানে সুর ও কথার অকৃত্রিমতা ও সরলতার আড়ালে টুসুগানের বহিরঙ্গগত সব ত্রুটিই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। অনেক গান শুনে বেশ কিছুটা রাত্রে পরিতৃপ্ত মন-প্রাণ নিয়ে সেদিন আমরা বাসায় ফিরে এসেছিলাম।

॥ চার ॥

এর পর সমস্ত পৌষ মাসের অনেকগুলো সন্ধ্যেই টুসুগান শুনতে শুনতে আমাদের কেটেছে বোঙাবাড়ির পাশাপাশি আরো কয়েকটি গ্রামের কারো না কারো বাড়িতে। কেবল কারো বাড়িতে গিয়েই যে টুসুগান শুনেছি তা নয়; ঘরে বসে, বেড়াতে বেরিয়ে, কাজের ফাঁকে, আলোর মধ্যে, অন্ধকারে—মাঝে-মাঝেই এই গানের ঢেউ এসে কানের ভিতর দিয়ে মরমে গিয়ে পৌঁছেছে। কখনো বা সুরের উৎস-সন্ধানে উৎসুক চিত্তে প্রবৃত্ত হয়ে দেখেছি—অনেক দূরে ধ্যান-স্তব্ধ অযোধ্যা পাহাড়ের পটভূমিকায় মহুয়া-পলাশকে বুকে করে বন্ধুর মাঠ যেখানে দিগন্তরেখাকে স্পর্শ করেছে সেখান থেকে মেয়েদের একটা দল সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে আসছে। একটা পৌষ পুরুলিয়ায় কাটিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল ঐ সময়টায় পুরুলিয়ার আকাশ-বাতাস-মাঠ ও পথ জুড়ে টুসুগানের সুর যেন নিরতই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মনে হয়েছিল ওরই মধ্যে একটা সমগ্র জাতির প্রাণ-স্পন্দন যেন কান পাতলে শোনা যেতে পারে। সত্যিই তাই। পরবর্তীকালে আমাদের সংগৃহীত অজস্র টুসুগানের প্রকৃতি-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়ে দেখেছি আমাদের প্রাক্ অনুমিতি ও অনুভূতি মোটেই মিথ্যে নয়। টুসুগানে পুরুলিয়া তার প্রকৃতির মাঠ, ঘাট নদী, পথ, আকাশ, বাতাস, গাছপালা, ফুল ফল—তার জনজীবনের মানুষ, মানুষদের আকাঙ্ক্ষা, তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা, প্রগতি-অভিমুখিনতা এবং ঐতিহ্যানুগতা ইত্যাদি নিয়ে এমন নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে যে, টুসুগানের মধ্যেই পুরুলিয়ার জীবনেতিহাসের একটা বড় অংশকে আবিষ্কার করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আপাতত, বর্তমান প্রবন্ধে পরিসরের সঙ্কীর্ণতার কথা চিন্তা করেই টুসুগানের অন্যান্য শ্রেণী-প্রকৃতির আলোচনা বাদ দিয়ে কেবল টুসু-সম্পর্কিত গানগুলোর সম্বন্ধেই দু-চার কথা বলব।

॥ পাঁচ ॥

গ্রাম্য কবি ও গীতিকারদের সরল কল্পনায় টুসুগানের মধ্যে টুসু বিচিত্র-মধুর রূপ ধরেছে। বিভিন্ন গানের মধ্যে কখনো সে নাবালিকা, কখনো যুবতী কুমারী, কখনো বিবাহিতা নারী, কখনো এক সন্তানের জননী, আবার কখনো বা গীতিকারদের ঘরেরই এক বা একাধিক মেয়ে। শাক্তপদাবলী ও বৈষ্ণবপদাবলীতে আমরা জগজ্জননী ও শ্রীকৃষ্ণের দেবত্বকে ক্ষেত্র বিশেষে তেমন আমল না দিয়ে তাঁদের ভালোবেসে যেমন আমাদের ঘরের মানুষে রূপান্তরিত করেছি, ঠিক তেমনি সীমান্ত-বাংলার মানুষেরা আত্মবিসর্জিতা টুসুকে—দেবতা না হয়েও আদর্শের ক্ষেত্রে যে দেবত্বের আসনে অধিষ্ঠিত—ভালোবেসে একান্ত আপনার জন ভেবে নিয়েছে এবং টুসুর ব্যথাহত ও বেদনাময় ট্র্যাজিক জীবনের অমুকুলিত ও অপ্রস্ফুটিত বাসনা, কামনা এবং আকাঙ্ক্ষাগুলোকে নানা রঙে রাঙিয়ে মানসক্ষেত্রে চরিতার্থতার সুধামৃত লাভের আশায় গানের তরীতে পসরা সাজিয়েছে। সেই তরী সরল আদিবাসীদের অন্তরান্বিত সুগভীর ভালোবাসার সমুদ্রে এখন নিত্য ভাসমান। অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পর্যন্ত সময়ের জন্য এই তরী আদিবাসীদের সমাজ-বন্দরে এসে নোঙর করে। আমাদের মত বাইরের লোক তখনই ইচ্ছে করলে নৌকোর ভিতরের পসরা দেখতে পায়। অন্য সময় 'নৈব নৈব চ।' হাজার মাথা খুঁড়লেও অন্য কোন মাসে আদিবাসীদের দিয়ে টুসুগান গাওয়ানো যাবে না। নীচে যে গানগুলোর উল্লেখ করব সেগুলি সবই একটা পৌষের সংগৃহীত ফসল।

টুসুগানের মধ্যে ছোট মেয়ে হিসেবে টুসুকে সব চাইতে বেশী করে ভাবা হয়েছে। সুতরাং তাকে আদর করার জন্য গান রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন কবিরা :

কে বলে রে কে বলে রে
আমার টুসু কালো রে।
বিষ্টুপুরের হলুদ আনে গা করিব আল রে॥

ছেলেমানুষ টুসু। তাই দুঁজিয়ে কাদা হয়ে যায় অনেক সময়। কিন্তু ছোট ছেলে-মেয়েদের জাগ্রত অবস্থায় দুষ্টুমির মধ্যেই তাদের সৌন্দর্যরূপের চঞ্চল প্রকাশ দেখে

১। সংক্রান্তির রাত্রি; ২। আলো; ৩। নিত্য।

বড়রা আনন্দ পায়। পাড়ার প্রতিবেশীরা এসে টুসুকে ঘুমন্ত দেখে তাই বলে :

টুসু নাকি এতই ঘুমাইছে?
টুসুকে উঠাই বসাই জাগাই দে—
টুসু নাকি এতই ঘুমাইছে!

এইবার টুসুর বায়না, আবদার ও অভিমান। বাড়ির বড় আদুরে মেয়ে টুসু। সে বায়না ধরেছে দই-চিঁড়ে ছাড়া খাবে না। তারা গরীব। অথচ গ্রামে এখন সরু চিঁড়ের দাম সের প্রতি এক টাকা। :

গাঁকে আলো (৪) সরু চিঁড়া, টাকা সের বই
মিলে না।
আমার টুসু রগড় নিল দই চিঁড়া বই
খাবো না॥

কখনো আবার উমার মত চাঁদ ধরে দেবার জন্যে কান্না আরম্ভ করে টুসু। মা তাই বলেন :

বল টুসুধন চাঁদ কোথায় পাব?
গাছের ফল বটে তুলে দিব।

কিন্তু মেয়ে সে কথা শোনে না। না খেয়ে সারারাত কাটিয়ে দেয় অভিমান ভরে। তার মানভঞ্জনের জন্য মাকে সান্ত্বনার গান গাইতেই হয় :

আমার টুসু মান করেছে মানে গেল সারারাত,
খোল টুসু মানের কবাট,
আসছে তোমার প্রাণনাথ।

টুসু আবার নিজেই কখনো মায়ের কাছে আবদার জানিয়ে তার ভবিষ্যৎ জীবন-স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণের আশা হৃদয়ে পোষণ করে :

ও মা আমি ধানবাদ যাবো
ধানপাড়া (৫) শাড়ি লিব।
উরুল্যারি (৬) চেন মাকুড়ি পরে
শ্বশুরঘর যাবো॥

অথবা,

মাকে বলবো, মাকে বলবো, মাকে বলবো
এক কথা—
মারে আমায় এনে দিবেক প্রেমঝুরি
কাজললতা।

আদুরে মেয়ে টুসু। সুন্দরী মেয়ে টুসু। তার চলনের ছন্দিত রূপ-হিল্লোলকেও গ্রাম্য গীতিকারগণ আশ্চর্য দক্ষতার সংগে অতি সরল-সহজ ভঙ্গিতে গানের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন :

এক সড়পে (৭) দু সড়পে তিন সড়পে
লোক চলে।
আমার টুসু মইধ্যে চলে বিন বাতাসে
গা ঢলে॥

গানের মধ্যে অনেক সময় একাধিক টুসুরও সাক্ষাৎ মিলেছে। আসলে বাড়ির ছোট মেয়েরাই এখানে টুসুতে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন :

তিনটি টুসু জলকে যাই মা কোন টুসুটি
ভালো গো
মাঝের টুসু ছলকদারী ভুরে আঁখি
ঠারে গো।

কুমারী টুসুর বর্ণনাও গানের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। একটি গানে টুসুকে বিয়ের কনে হিসেবে সাজানোর পরিকল্পনায় আধুনিক প্রসাধন-সামগ্রীর ব্যবহার যথেষ্ট কৌতুকের সৃষ্টি করেছে :

টুসু লো তোর ফুটল বিয়ের ফুল—
আলতা দিয়ে পা রাঙিয়ে বাঁধিয়ে দিব চুল।
বেঁকা সিঁথা পাশ-চিরুনি,
মেম খপা (৮) বাঁধ টুসুমণি,
হিমানি পাওডার মাখিয়ে ও-টুসুমণি—
চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে দেখ গা সজনী

আর একটি গানের মধ্যে টুসুর স্নান-চিত্র চমৎকার ফুটে উঠেছে :

টুসু সিনাছেন, (৯) গা দলাছেন,
হাতে তেলের বাটি;
নুয়ে নুয়ে চুল ঝাড়ছেন,
গলায় সোনার কাঁঠি।

আগেই বলেছি, টুসুর বিচিত্র রূপের সাক্ষাৎ গানের মধ্যে পাওয়া যায়। বিবাহিতা টুসুকে কখনো সন্তানবতী, আবার কখনো সন্তানহীনা হিসেবে সংগীতকারগণ কল্পনা করে গান রচনা করেছেন। একটি গানে টুসুর সন্তানহীনতার জন্য বেদনা-বোধের সংযত প্রকাশ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণের যোগ্য :

উরুল্যাতে দেখে আলম (১০)
ডালায় ডালায় দুধ-বালা।
আমার টুসুর নাইরে ছেইল্যা
কাকে দিব দুধ-বালা?

অন্য একটি গানে আবার রয়েছে :

আমার টুসুর একটি ছেইল্যা
কুলতলায় বই খেলে না।
কোন বিয়ালী ধুলো দিল
গায়ের বরণ ফিরে না॥

টুসুর শ্বশুরবাড়ির কল্পনা করা হয়েছে কখনো জলের ভিতরে, কখনো বা পুরুলিয়ারই একটি বর্ধিষ্ণু অঞ্চল মানবাজারে :

জলে খেল, জলে হেল,
জলে তুমার কে আছে—
আপনার মনটি ভেবে দেখ
জলে শ্বশুরঘর আছে।

অন্য একটি গানে অন্য কথা ব্যক্ত হয়েছে দেখতে পাই :

আমার টুসুর একটি ছেইল্যা
মানবাজারে শ্বশুরঘর।
ঘটির উপর বাটি রাইখ্যা
পালায় আসে বাপের ঘর॥

কেন পালিয়ে এল? সংগীতকার সে কথায় কোন জবাব দেন নি। বাংলা দেশের শ্বশুর-বাড়ির নির্যাতনের একটা ইঙ্গিত কি এই গানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে? এর পরের অংশটিতে একটি সুপরিচিত শাক্ত পদাবলীর সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে :

পালায় এঁসে ভালো করলে,
আর তো যেঁতে দিব না।
কোমর বান্ধে লিরাই (১১) লাগবো,
বেহাই জামাই মানবো না॥

এই অংশটি শাক্ত-পদাবলীর :

এবার আমার উমা এলে আর
উমা পাঠাবো না
মারে-ঝিয়ে করব ঝগড়া
জামাই বলে মানবো না।

ইত্যাদিকে মনে পড়িয়ে দেয়।

॥ ছয় ॥

এবার বিদায়ের পালা। 'আগমনী'র পর 'বিজয়া'র মত। তবে একটু তফাত আছে। 'বিজয়া'য় কেবল কান্না; কিন্তু টুসুর বিদায়-লগ্নে কান্নার সঙ্গে হাসিও আছে। সে হাসি গর্বের হাসি—আনন্দের হাসি; প্রাণের বিনিময়েও নারীর সতীত্ব রক্ষা করার মধ্যে যে গর্ব, সেই গর্ব—টুসুর মহান মৃত্যুকে স্মরণ করার মধ্যে যে আনন্দ, সেই আনন্দ। আদিবাসীদের মধ্যে অনেকেই হয়তো এই তথ্য জানে না। কিন্তু টুসু ভাসান দিতে যাবার সময় বেদনার গানের সঙ্গে ছেলে-মেয়েরা হই-হুল্লোড় করে আনন্দের গানও যে প্রচুর গায় তা তো আর কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এবং পূর্বোক্ত কারণেই টুসুর বিদায়কালে এই ধরনের বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।'

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন রাত্রে আমার পঞ্চমীদের বাড়ি গিয়েছিলাম। ওরা যে গান সেদিন গাইল, দেখলাম, তার মধ্যে বিদায়-লগ্নের বেদনা ও আড়ম্বর দুই-ই প্রকাশিত হয়েছে :

টুসুর জাগরণ রাতে—
খরচ করব লো রীতিমতে।
... ...
আন লো আলতা দে লো চিরুনে,
সিন্দুর দে লো কপালে
কাল সকালে চলে যাবে,
মা আলো-ঘর আঁধার করে।

৪। এলো; ৫। ধানী রঙের পাড়; ৬। পুরুলিয়ার অপভ্রংশ রূপ।

৭। সড়ক, রাস্তা; ৮। খোঁপা; ৯। স্নান করছেন; ১০। এলাম।

১১। ঝগড়া, লড়াই।

মেয়েদের মাথার ওপর টুসুর সরা—অনেকের বগলে রয়েছে ছেলে

পরের দিন ভোর হতে না হতেই যেন গোটা দেশ জেগে উঠলো। আজ পৌষ সংক্রান্তি—মকর পরব—টুসু ভাসানের দিন। আঁধার থাকতে থাকতেই পুরুলিয়ার সমস্ত গ্রাম থেকে ছেলে-মেয়ের দল টুসুর সরা মাথায় নিয়ে নদীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছে। সকলেই মুখর। আজ শেষ দিনে তাদের কণ্ঠে সাত সুরের উন্দামতা। সুরের মূর্ছনায় স্পন্দমান আমাদের পরিচিত মহালয়া-ভোরের স্মৃতিকে এই ভোরে যেন খুঁজে পেয়েছিলাম। আগের থেকে মনকে প্রস্তুত রেখেছিলাম বলেই কুয়াশার কাঁথা-জড়ানো শীত-বুড়ীর ভ্রূকুটি এবং আমার গায়ে-মোড়া লেপের কবোষ্ণ স্বাদকে উপেক্ষা করে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে নিলাম বন্ধুবর শিল্পী দিলীপকে। আমাদের বাসার পাশের বরাকর রোড ধরে তখন টুসু ভাসানের জন্য মিছিলের মত ছেলে-মেয়ের দল চলেছে। পূব আকাশ তখন লালে লাল। মেয়েদের মাথার ওপর টুসুর সরা; অনেকের বগলে রয়েছে ছেলে। তাদের গায়ে-মাথায় পূব আকাশের আবীর-আলোর ছোঁয়া। কণ্ঠে তাদের গান। আর পুরুষেরা সমানে বাজিয়ে চলেছে ঢোল, ধামসা, মাদল ও কাঁসি। ওরা সবাই চলেছে কাঁসাই নদীতে। আমরা ওদের সঙ্গী হয়ে পড়লাম। বিভিন্ন দলের মেয়েদের গলায় বিভিন্ন গান। কোন দলের গানে অন্তর্বেদনার ছোঁয়া :

তিরিশটি দিন রইলে টুসু তিরিশটি ফুল
পেলে গো।
আর রাখিতে লারব টুসু, মকর আলো
বাদী গো॥
টুসু টুসু করি আমরা টুসু নাই মা
ঘরে গো
এইবার টুসু চলে যাবে আমারে কাঁদায়ে
গো॥
এতদিন যে রইলে টুসু মা ব'লে আর
ডাকলে না।
যাবার বেলায় রগড় কর মাকে ছাড়া যাবো না॥

কোন দল বা আবার গাইছে :

এক মাস করিলি পুজা কত আশা করে গো।
টুসু রবে মোদের গেহে মোরা ধন্য হব লো॥
পৌষ মাসের সাঁকরাত হ'লো টুসুর মন
ভাঙ্গিল।
সকলে ফেলিয়ে টুসু ঐ জলেতে ভাসিল॥

ছেলেরাও কম যায় না। তাদের মুখের চেয়েও হাতের জোর বেশী। তা ফুটিয়ে তুলছে তারা ঢোলক, ধামসা, মাদল ও কাঁসিতে। ক্যান্-ক্যানা-ক্যান্ করে বাজছে কাঁসি। ঢোলক আর মাদল বাজছে ডুগ্-ডুগা-ডুগ্। আর কখনো পুরুষদের কণ্ঠে জাগছে গান :

মকর পরবে—
ছুঁড়িদের পা পড়ে না গরবে,
৫ হায়, মকর পরবে।

গান শুনতে শুনতে, হাসি-ঠাট্টা ও হট্ট-হুল্লোড়ের মধ্যে ভাসতে ভাসতে এক সময়ে কাঁসাই নদীর ধারে এসে পৌঁছে গেলাম। ঝির্ ঝির্ করে শীতের স্যাঁতা-মরা নদী বয়ে চলেছে। কোথাও হাঁটু-জল—কোথাও বা বড় জোর কোমর পর্যন্ত। মেয়েরা তারই মধ্যে টুসুর সরার সামগ্রী জলে বিসর্জন দিয়ে লজ্জা-শরমের বালাই প্রায় না রেখে সেই সরায় করেই জল তুলে স্নানের কাজ শেষ করছে। তারপর ভিজে কাপড়ে সেই সরা আবার মাথায় নিয়ে শ্লথ চরণে দল বেঁধে বাড়ি-মুখো হচ্ছে। এইখানেই এক বছরের মত টুসু পুজোর সমাপ্তি। কিন্তু না, তবু মাঝে একটু ফাঁক থেকে গেল—তা হলো মেলার আনন্দ। কাঁসাই নদীর দুই তীর জুড়ে মাইলের পর মাইল মেলার বিস্তার। যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি জনারণ্য। আর সেই মেলার মধ্যে টক-ঝাল-মিষ্টি সব রকমেরই আমদানি। কথার খই ফুটছে লোকের মুখে; ফুট কড়াইয়ের মুখে ফুটছে ফট্-ফট্ শব্দ। সব কিছু আছে—সব কিছুই। তালপাতার বাঁশি থেকে আরম্ভ করে আয়না-বসা চুড়ির ঝিলিক, এবং সব থেকে পরম রমণীয়—ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার রোমান্টিক জৌলুস।*
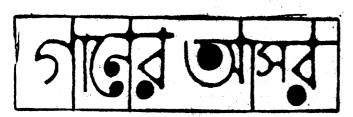
---

*প্রবন্ধের ছবিগুলি এঁকেছেন শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোষ্ঠিনিরপেক্ষ কাব্য সঙ্গীত

ঘরানা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। শিল্পীদের পারিবারিক ঐতিহ্য সত্যই গৌরবের বস্তু। তাঁরা যে এক একটি বিশিষ্ট ধারাকে সঞ্জীবিত রেখেছেন এর জন্য তাঁরা আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু সব মেনে নিয়েও আজ আর একটি জিনিস আমরা সমর্থন করি না সেটা হচ্ছে গোঁড়ামী। আমাদের আগের যুগের সঙ্গীত সমাজে এই গোঁড়ামী ছিল গর্বের বস্তু। এক ঘরানার শিল্পী অপর ঘরানার কোনো কিছুই গ্রহণ করতেন না, এমন কি খুব ভাল লাগলেও না। অনেকে আবার এত অসহিষ্ণু ছিলেন যে তাঁদের ঘরের বাইরে যে আর কিছু ভাল আছে তা স্বীকার করতেই চাইতেন না। সঙ্গীতের চিন্তাধারা কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে যাচ্ছিল। অনেকেই বহু ঘরানায় ধর্না দিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ভাবছিলেন কী করে এই লৌহ যবনিকা ভেদ করা যায়। যুগ খুব ধীরে হলেও কিছু কিছু করে পাল্টাচ্ছিল,—এমন সময় পণ্ডিত ভাতখণ্ডে অসাধ্য সাধন করলেন। বহু বিচিত্র উপায়ে এই অসামান্য সহিষ্ণু ব্যক্তিটি ব্যাপকভাবে সঙ্গীত সংগ্রহে হাত দিলেন এবং একটি যথার্থ অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির উদ্ভাবন করলেন। প্রথম দিকে অনেকে মুখ বেঁকিয়েছিলেন, তেমন প্রচারও তাঁর ভাগ্যে জোটেনি কিন্তু ক্রমে ক্রমে শিক্ষার্থীরা এল ঐকান্তিক আগ্রহ নিয়ে। তারা শিখল এবং এও বুঝতে শিখল যে একমাত্র ঘরানার দ্বারস্থ না হয়েও সঙ্গীত ভাল করেই আয়ত্ত করা যায়। এর সঙ্গে আর একটা দোষও কেটে গেল—সেটা হচ্ছে গোঁড়ামী। এখন আমরা শিল্পীকে বিচার করি ঘরানার গুণে নয় তাঁর যোগ্যতা অনুসারে। সম্পূর্ণ দলগত বা গোষ্ঠীনিরপেক্ষ হয়ে আমরা সামগ্রিকভাবে আর্টকে পর্যবেক্ষণ করি। আর্টের জগতে গোঁড়ামী যে সংকীর্ণতারই সমর্থক একথা আজ আমরা অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছি। এর ফলে সঙ্গীতে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্ভব হয়েছে। আজকাল নানারকম মিশ্ররাগ ব্যবহার করা হয় এবং সঙ্গীত জগতে যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁরাই এর প্রচলন করেছেন। এ সম্বন্ধে আমরা যে কোন কোন ক্ষেত্রে আপত্তি তুলি না তা নয় কিন্তু সাহসী পদক্ষেপকে অভিনন্দনও জানিয়ে থাকি। গোঁড়ামী বা ঘরানার প্রতি অন্ধ আসক্তি থাকলে এই রকম বলিষ্ঠ পরীক্ষণকার্যে উৎসাহ দেখা যেত না।

সঙ্গীত জগতের এই রকম একটা সংস্কার কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা আধুনিক অ্যাকাডেমিক রীতিতে সঙ্গীত শিক্ষার অগ্রণী হলেন তাঁদের মধ্যে বাঙালী শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বোধ করি ছিল সর্বাধিক। বাংলা দেশে সঙ্গীত সম্বন্ধে তেমন একটা গোঁড়ামী অবশ্য কোনকালেই ছিল না। আর তাছাড়া বাঙালী স্বভাবতই সঙ্গীতে উদারপন্থী। নিধুবাবু যথানিয়মে মার্গ সঙ্গীতে পারদর্শিতা অর্জন করেও বাংলা গান নিয়েই জীবন কাটিয়ে গেলেন। বাঙালী ওস্তাদরা হিন্দী ধ্রুপদ ধামারে দিকপাল হয়েও বাংলা গান গাইতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করতেন না,—সানন্দে সরস করে গাইতেন বাংলার রাগসঙ্গীত। কলকাতায় যে সব অবাঙালী গায়ক গায়িকা বসতি স্থাপন করেছিলেন তাঁদের মধ্যেও এর প্রভাব কম নয়। বিশ্বনাথ রাও-এর "আমার মন যে নিল সে তো আর ফিরে দিল না"—এখনও উপভোগ্য। এই ট্র্যাডিশন রাধিকাপ্রসাদ থেকে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ, ভীষ্মদেব, তারাপদ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীদের সকলের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

বাংলার কাব্যসঙ্গীতেও এর অন্যথা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর পূর্ব যুগের এবং সমসাময়িক নানারকমের গান থেকে নানা টেকনিক আহরণ করেছিলেন। রবীন্দ্রযুগের অপরাপর স্বনামধন্য সুরকার, যথা দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল—সকলেই সঙ্গীতকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখেছেন। এক সময় এঁদের অনেকে যখন জীবিত ছিলেন তখন শিল্পীগণ সকলকার গানই সমানভাবে গাইতেন। এতে দোষ অবশ্য ঘটেছে—যথা অধিকাংশ সঙ্গীতই একভাবে ঢালা হয়ে গেছে, সুরকারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে রক্ষা করা হয়নি। কিন্তু সকলেই শিল্পীদের মাধ্যমে বেঁচে ছিলেন। পক্ষপাতিত্বে বা অনাদরে হারিয়ে যাননি।

বছর পাঁচেক আগে আমাদের একথা বিশেষভাবে মনে হল যে আমাদের কাব্যসঙ্গীতের বিশেষত্বগুলিকে বাঁচাতে হবে, সুরক্ষিত করতে হবে। তখন সবে রবীন্দ্রনাথ গত হয়েছেন। স্বভাবতই রবীন্দ্রসঙ্গীতের যাতে বিকৃতি না ঘটে সে সম্বন্ধে আমরা সর্বাপেক্ষা অধিক সচেতন হলাম এবং এ বিষয়ে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অপরাপর রচয়িতাদের কথা আমরা মনে রাখিনি এবং যা হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি, অর্থাৎ বাংলার কাব্যসঙ্গীতকে সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়নি। এতে ক্ষতি হয়েছে বিস্তর—এই সময়ে আমরা যা সংগ্রহ করতে পারতুম তা হয়তো আর পারব না। কারণ প্রতিদিনই উপাদানগুলি হারিয়ে যাচ্ছে।

কাব্যসংগীত সম্বন্ধে আমাদের একটি পরিকল্পনা গঠন করা একান্ত প্রয়োজন হয়েছে বলে মনে করি এবং এটাও বিশেষভাবে অনুভব করি যে একমাত্র দলগত স্বার্থ পরিহার করতে পারলেই এটি সম্ভব হবে। মার্গসংগীতের ক্ষেত্রে যখন আর্টকে সামগ্রিকভাবে দেখা সম্ভব হয়েছে তখন কাব্যসংগীতের ক্ষেত্রেও তা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।

আমাদের কাব্যসংগীত যাঁরা গঠন করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের সংগে আমাদের পরিচিত হতে হবে, তাঁদের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে যখন আমরা অগ্রসর হব তখন দেখব কাব্যসংগীতের সামগ্রিক গতির মধ্যে বিভিন্ন সুরকারের মনোভাবের একটা ঐক্য আছে তা নইলে আর্টের একটা সুসম্বন্ধ রূপ গড়ে ওঠে না। কেবলমাত্র এই তুলনামূলক শিক্ষা দ্বারাই প্রত্যেক সুরকারের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব। একথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, যিনি আধুনিক গান করেন তিনি রবীন্দ্রসংগীতের বৈশিষ্ট্য ফোটাতে পারবেন না। অথবা, এক একটা গীত শ্রেণীকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে না রাখলে তার বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে না। কাব্যসংগীত সমগ্রভাবেই একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আর্ট, প্রত্যেকটি সুরকারের ব্যক্তিগত প্রয়াসে এটি অখণ্ডভাবে গড়ে উঠেছে। অতএব এই মনোভাবটি জাগ্রত না হলে কাব্যসংগীত সম্বন্ধে একটা উদারচেতনা জেগে ওঠাও সম্ভব নয়।

আজকের দিনে সংগীত জগতের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের এইটিই আদর্শ হওয়া উচিত যাতে করে আমাদের একটি সামগ্রিক বোধের বিকাশ হয় এবং আমরা আমাদের কাব্যসংগীতের সমগ্র ঐতিহ্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। কলকাতার আকাশবাণীকেও আমরা অনুরোধ করব তাঁরা তাঁদের শিল্পীদের মধ্যে এই মনোভাব সঞ্চারিত করুন। বিভিন্ন গানের সুরকার অনুযায়ী আলাদা আলাদা আখ্যা না দিয়ে "কাব্যসংগীত"-এর পর্যায়ে বাংলা গানকে প্রচার করতে থাকুন। প্রত্যেক ভাষায় কাব্যসংগীতকে স্বীকৃতি প্রদান করবার এইটিই প্রকৃষ্ট পন্থা।

সর্বভারতীয় সংগীত সমাজ

সর্বভারতীয় সংগীতসমাজের এবারকার সুদীর্ঘ অধিবেশনে বহু শিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল। এ'দের মধ্যে অনেকেই প্রথম শ্রেণীর নন এমন কি কেউ কেউ দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যায়েও পড়েন না। স্বভাবতই তাঁদের অনুষ্ঠানগুলি আদৌ চিত্তাকর্ষক হয়নি। অনুষ্ঠানগুলি অনেক সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারত। শিল্পী পরিবর্তনের জন্য অযথা বিলম্ব করা হয়েছে। অধিবেশন যদি দীর্ঘকাল চলে তাহলে প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানসূচী এমনভাবে নির্ধারিত করা উচিত যাতে অনুষ্ঠান রাত সাড়ে দশটা এগারটার মধ্যে শেষ হয়। প্রায় অর্ধপক্ষকাল ধরে শ্রোতারা মধ্যরাত্রে বাড়ি ফিরবেন সংগীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও এমনটা ধারণা করা অন্যায়। অতএব এই সম্মেলনটি তেমনভাবে জমতে পারেনি।

অংশ গ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে প্রথিতযশা অনেকেই ছিলেন। এ'দের অনুষ্ঠানের সুযোগ্য সমালোচনা ইতিপূর্বে বহুবারই হয়েছে, অতএব পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এ'দের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী তারাপদ চক্রবর্তী, রবিশঙ্কর, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, এ কানন, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিসার খাঁ, নারায়ণরাও ব্যোস, আর গৌতম, মুনোয়ার খাঁ, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, কুমার মুখোপাধ্যায়, রবি কিচলু, বাহাদুর খাঁ, মানস চক্রবর্তী, শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরী, সুনন্দা পট্টনায়ক, কল্যাণী রায়, মালবিকা কানন, মীরা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

নবাগত প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে ওয়াহেদ খাঁর অনুষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, তিনি রাজনট বেহাগে যে খেয়াল গেয়েছিলেন তার একটি বিশেষ প্রাচীন রূপ ছিল। আজকাল এইরকম গায়কী শোনা যায় না। হয়তো অনেকের কাছে তাঁর কণ্ঠ বা গান চিত্তাকর্ষক হয়নি, কিন্তু তিনি যে একটি বিশেষ রীতি আমাদের কাছে যোগ্যভাবে পরিবেশন করছেন এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আর একজন প্রবীণ সেতার শিল্পী শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী মহাশয়ের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সুরবাহারে বেহাগ আলাপ, জোড়, ঝালা তারপরণ এবং সেতারে খাম্বাজের ঠিমা ও দ্রুনী গৎ শুনিয়েছেন। ইনি দীর্ঘকাল এনায়েৎ খাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং তার যথার্থ পরিচয় তাঁর অনুষ্ঠানে দিয়েছেন। ঠুংরী অংগে যে এমনভাবে ঠিমাগৎ বাজানো যায় সে ধারণা বোধ করি বর্তমানে অনেক যন্ত্রী বা শ্রোতাদের নেই (অবশ্য এনায়েৎ খাঁর জীবিত শ্রোতা বাদে)। এই ধরনের নিষ্ঠাবান গাম্ভীর্যপূর্ণ সংগীত পরিবেশন বিরল হয়ে এসেছে।

আর একজন তরুণ সেতার শিল্পী আমাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছেন। ইনি হচ্ছেন শ্রীসুব্রত রায়চৌধুরী। দেশ রাগে এ'র শান্ত সর্বরসসমন্বিত চতুর এবং বিদগ্ধ বাজনা এ'র উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করছে।

নৃত্যে কুমারী বিজয়লক্ষ্মীর ওড়িশী আমাদের ভাল লেগেছে। এ'র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ আশা পোষণ করি।

তবলায় নবাগত, শান্তাপ্রসাদের পুত্র, কুমার মিশ্র কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন। শ্রীঅনিল ভট্টাচার্যের সংগীতও আচার্যের উপযুক্ত হয়েছে।

শার্ঙ্গদেব

পশ্চিম বাঙলার সাঁওতালদের নাচ

দিল্লির ডায়েরি

"নৃত্যের তালে তালে" আপনারা একদিন না একদিন "নটরাজের" জটা-খোলা নাচ দেখে থাকবেন, কিন্তু আমাদের প্রজাতন্ত্রের নৃত্য অন্য ধরনের। একেবারে নেহাত প্রজাদের নৃত্য, অর্থাৎ লোক-নৃত্য।

তারই উৎসব রাজধানীতে, প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে। দুদিন টিকিট করে, ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। নানা রাজ্য থেকে নাচের দল এসেছিল। যেমন তাদের পোশাকের বাহার তেমনি উন্মাদনাময় তাদের নাচের তাল। কোথায় লাগে টুইস্ট আর চাচা-চার তাল। এমন তাল আর সমষ্টিগত অংগচালনা যে, তাতে রয়েছে আদিমতার বিমুক্ত মানব-মানবীর ব্যঞ্জনা।

কী কারণে জানা নেই, এই উৎসব রাজধানীর মনোপলি। আরক্ষা বিভাগ থেকে লক্ষাধিক টাকা খরচ করে লোক-নৃত্যের বাছাই করা দল আনা হয় প্রত্যেক বৎসর। তাদের তাঁবু পড়ে তালকোটরা বাগিচায়। যাতায়াত, খাওয়া-দাওয়া সমস্ত আরক্ষা বিভাগের। উপরন্তু দিল্লি দর্শন।

আপসোস হয় যে অতো ভাল জিনিস দেশের অন্যান্য বড় বড় শহরে কেন দেখান হয় না। রেল কর্তৃপক্ষ যদি গোটা একটা গাড়ি কারোর কতৃত্বাধীনে দিয়ে দেন, তাহলে কি নাচের দলগুলো তাদের, উৎসবানন্দ সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারে না? যাঁরা জাতীয় সংহতি বলে লম্ফঝম্প করেন, তাঁরা এ প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখলে পারেন। তাঁরা যাই করুন, আমরা তো লোকনৃত্যের উৎসবটা দেখে নিলাম, এবং আনন্দ অর্জনও খুব কম কিছু হয়নি।

দেখা যায়, ওটা প্রধানত দুই ধরনের। একটি পুরোপুরি লোকনৃত্য, যেমন নাচে আমাদের উপজাতীয় অথবা পার্বত্য জাতীয় মেয়েপুরুষরা। নাচটা তাদের সামাজিক উৎসবের অংগ। এমন কি অনেকের প্রায় দৈনন্দিন জীবনের অংগ। তাঁদের সামাজিক জীবনে শহুরে ও "ভদ্র"-লোকদের সমাজজীবনের পায়ে বেড়ি নেই, মুখে লাগাম নেই, সমাজ শাসন থাকা সত্ত্বেও। গান গাওয়ার ইচ্ছা হলে তারা গলা ছেড়ে গান করে, সারেগামা-র ধার ধারে না। পেটে একটু তরল কিছু পড়ল, মাদল আর ঢাকের উঠল আওয়াজ, মেয়ে-পুরুষদের রক্তে আসে ছন্দ, তালে তালে পা

দেবী কামাখ্যার মহিমা ব্যক্ত করা আসামীয়াদের 'দেওধানি' নাচ

মণিপুর দলের 'ফিছা' ও 'কেইফা জাগই' নাচ

ওঠে, উরু ওঠে, কোমরে আর নিতম্বে আসে লাস্যরস।

অন্যটি হল একটু ভদ্র ধরনের। অর্থাৎ লোকনৃত্যের সাদামাঠা ধরন-ধারনকে একটু মাজাঘষা করে, সাধারণ মানুষদের স্তর থেকে উপরে তোলা হয়েছে, কিন্তু ক্লাসিক্যাল নয়। এবারকার উৎসবে দুই প্রকারের নৃত্যই ছিল, এবং দুই-ই যথেষ্ট মনোরম। কিন্তু উপজাতীয় লোকনৃত্যের প্রাণবন্ততা, তার সহজ-সরল আনন্দদান ও জীবনরস অতি চমৎকার। যেন সংক্রামক; "যেন" কেন, সত্যই সংক্রামক। আপনার অজান্তে কখন আপনার পা' উঠছে নামছে, কখন যে আপনিও তাদের দলভুক্ত হয়ে গেছেন, হয়তো জানেননি। এবং তাঁদের নাচ-গান-বাজনায় ডুবে গিয়ে অনেকে যে ঐ জীবনের জন্যে ঈর্ষান্বিত হননি, হলপ করে বলতে পারবেন না।

এবার নাচের দল এসেছে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, নেফা, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, দাদ্রা নগর হাভেলি, গোয়া, হারিয়ানা, পানজাব, হিমাচল প্রদেশ, কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, ত্রিপুরা ও উত্তরপ্রদেশ থেকে। কতো প্রকার ঢোল-ঢাক আর মাদল! কতো ধরনের সানাই! কতো ধরনের তালবাদ্য, ঘণ্টা, মন্দিরা, জগঝম্প, আর সহজ গানের সুর! প্রয়াস ও অর্থ থাকলে এ-সবের অনেক আমরা একটু আদটু অদল বদল করে শহরের অন্য স্তরের অন্য জীবনের সমাজের জন্যেও আনতে পারি। যেমন একদা এনেছিলেন উদয়শঙ্কর তাঁর নাচের দলে।

পশ্চিম বাঙলার সাঁওতালী নাচের স্বকীয়তা ও চারুময়তা রাজধানীর হাজার হাজার লোকের প্রশংসা পেয়েছে। ছিল চার ধরনের নাচ। "দানসাট", শরৎকালে পুরুষদের নাচ, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ। "করম" নাচ, উৎসব উপলক্ষে পুরুষদের নাচ; "সাহারাট" ও "দং", মেয়েদের নাচ। (উচ্চারণ জানি না, ভুল হতেও পারে।)

খুব চমৎকার ছিল বিহারের "ওরাঁও" উপজাতীয়দের মেয়েপুরুষের একসঙ্গে নাচ। যেন আনন্দের ঢেউ ঝরে পড়ছে তাদের নৃত্যভঙ্গিমায়। এবং ভাল করে দেখলে বুঝা যায় যে, তালরক্ষা ব্যাপারটাও খুব সহজ নয়। শুধু কাহারবার সহজ তাল নয়। বেশ তাল-ফাঁক। এমনকি পাঁচ-মাত্রার গতিও দেখলাম, এক ভঙ্গিমাতে। নাচের নাম, "যাত্রা লুঝির"।

মিজো দেশ থেকে এসেছিল লাল-সাদা পোশাক পরা নাচিয়েরা। মেয়েরা দেখতে ছোটখাটো। পুরুষরা লম্বা। গানের সুরে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব, ভাল তৈরি গলা। সঙ্গে বাজল গীটার আর গং, দুটো শিং দিয়ে খটখট তাল, আর অনেকগুলো বাঁশ (রাঙানো) দিয়ে তালঠোকা। আসামের অন্য নাচটি হল "দেওধানি"। কামাক্ষ্যা মন্দিরে দেবীর উদ্দেশ্যে, এবং শাক্ত-বৃত্তির ছাঁচে ঢালা। এটা একটু "ভদ্র গোছের নাচ, যেমন ছিল কেরলের" কোইসু নৃত্যম্ (দ্রিং-দ্রিং-দিনা-দ্রিনাদিন্ কথাকলি)।

মণিপুরের ছিল "ফিছা", "কেইফা জাগই" আর "ওয়াটথং লাম্"। অনস্বীকার্য মাধুর্য। পাঞ্জাবের মেয়েদের নাচ "গিদ্দা"। আটাশটি সর্দারনীর সুরূপ-সুঠাম নৃত্য-গান, এবং ত্রিপুরার "ঝুম" নাচ। নেফার ছেলেমেয়েরা নাচল "ইগু", মহীশূরের "উম্মাথাটা", মধ্যপ্রদেশের মারিয়াদের নাচ মাথায় বাইসনের শিং লাগিয়ে। গোয়ার "কুন্‌চি গুম্মট" নাচ বিয়ের নাচ। গানে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব, কিন্তু নাচে নয়। দাদ্রা নগরহাভেলি দলে ছিল অদ্ভুত অথচ সুন্দর শিংগা। অনেকটা সাপুড়েদের বাঁশীর মতো, কিন্তু অনেক বড়, অনেক বেশি আওয়াজ। সাপুড়ে বাঁশীর আরেকটা সংস্করণ দেখলাম হরিয়ানার দলে। একটা উচ্চ-গ্রামের, অন্যটি নিম্ন-গ্রামের।

নানা রঙের পোশাক, আর গুরুগুরু ছন্দধ্বনি ন্যাশন্যাল স্টেডিয়ামে নতুন জীবন এনেছিল।

খগেন দে সরকার

ভেনাসের নারীজন্ম

আশা দেবী

সৌন্দর্যের রানী ভেনাস।

তাঁরই মর্তের রূপ সুদূর অতীতের কোন্ গ্রীক ভাস্করের ছেনি-হাতুড়ি বাটালিতে ফুটে উঠেছিল অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্যে। পারীর মিউজি দ্যু লুভরে আজও তা বিশ্বের বিস্ময়। সেই মূর্তির নাম ভেনাস্ দ্য মিলো—মিলো দ্বীপের ভেনাস।

কে আবিষ্কার করেছিলেন এই মূর্তিকে, কোন্ সৌন্দর্যপাগল প্রত্নতাত্ত্বিক হাজার হাজার বছরের অতল অন্ধকারের আড়াল থেকে তুলে এনেছিলেন রূপ-লক্ষ্মী আফ্রোদিতেকে, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একালের মানুষের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে? তাঁর নাম পাওয়া যাবে ম-পারনাস্ এর সমাধিশালায়—; সেখানে একটি কবরের ফলকে উৎকীর্ণ দেখা যাবে সেই নামটি "দ্যুমো দুর্ভিল—" "মিলো দ্বীপের ভেনাসের আবিষ্কর্তা।"

কিন্তু সত্যিই কি দ্যুমো এই গৌরব দাবি করতে পারেন? মিলো দ্বীপের ভেনাস সম্পর্কে যে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা গভীর সন্ধানী, তাঁরা জানেন এর অন্তরালে একটি সকরুণ বেদনা ও অবিচারের ইতিহাস নিহিত। একটি অতৃপ্ত স্বপ্ন এবং একটি ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস এখনও ভেনাসের মর্মর মূর্তিকে ঘিরে ঘিরে প্রদক্ষিণ করে—আর কঠিন পাষাণের অন্তরালে বুঝি একটি নারীর হৃদয় সেই স্বপ্ন আর নিঃশ্বাসের স্পর্শে থেকে থেকে আকুল হয়ে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

প্রায় দেড়শো বছর আগে উজ্জ্বসূর্যের আলোয় অপরূপ হয়ে উঠেছিল নীল ইজিয়ান আর তার কয়েকটি দ্বীপখণ্ড। একটি দ্বীপের নাম মিলো। তারই অদূরে সাগরে নোঙর করা রয়েছে ফরাসী জাহাজ 'লেস্তাফ্যাত্'। এই জাহাজের এক তরুণ অফিসার ভুতিয়ে চার দিকের সৌন্দর্যের মধ্যে মনকে মগ্ন করে বসে ছিল। সৈনিক হয়েও সে একটু আলাদা ধরনের মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই সে একটু কল্পনাপ্রবণ, অতীত গ্রীস এবং রোমের প্যাগান যুগ তার মনে এক অদ্ভুত মোহ ঘনিয়ে আনত। ২৪ বছরের এই তরুণ সেনানীকে সেই জন্য জাহাজের অন্যান্য অফিসাররা নানা রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেও ছাড়তেন না।

ভুতিয়ে এক খণ্ড পাথরের ওপর বসে হয়তো সেই অতীতের স্বপ্নেই মগ্ন ছিল। তার পায়ের নীচে সূর্যদগ্ধ পাথুরে মাটি কঠিন আকাশের দিকে উদ্ধত হয়ে আছে। দূরে জলের মধ্যে থেকে উত্থিত এক একটি দ্বীপ: পারস্—গ্রীসের শিল্পীরা যেথান থেকে মর্মর আহরণ করত। দেলস্—যেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন আপোলো; সিথেরিয়া

মিলো দ্বীপের ভেনাস

—যেখানে রক্ততরঙ্গিত সাগরের বুকে শুক্তির কোলে পা রেখে আবির্ভূতা হয়েছিলেন সিথেরিনা আফ্রোদিতে—।

কবি বায়রনের মত ভুতিয়েও ভাবছিল গ্রীসের দ্বীপমালা আজ তুরস্কের অধীনে বটে কিন্তু তার আত্মা এখনো স্বাধীন। গ্রীসের মানুষ পরাধীনতার শেকল পরেছে কিন্তু তার দেবতারা আজও জেগে। এই ভাবনার মাঝখানে হঠাৎ তার চমক ভাঙল। দেখল, একটু দূরেই একজন গ্রীক কৃষক কী প্রয়োজনে কঠিন মাটিতে কোদাল চালাচ্ছিল; হঠাৎ তার পায়ের তলায় মাটি বসে গেছে অনেকখানি, কোদাল চলে গেছে তলায়, আর তার পায়ের কাছে একটা সুড়ঙ্গের মত বেরিয়ে পড়েছে।

ভুতিয়ে ছুটে গেল সেখানে। গর্তের ভেতর দিয়ে দুটো চূড়ার অগ্রভাগের মত কী যেন দেখা যাচ্ছে। সূর্যের একটুখানি আলো পড়ে যেন হঠাৎ জেগে উঠেছে সেটি।

কোনো গর্ভস্থিত মন্দির—যেখানে প্রাচীন গ্রীকেরা বিশেষ ধরনের কোন গুহ্য সাধনা করত? উত্তেজনায় ভুতিয়ের মাথায় রক্ত ছুটে গেল। কৃষকটিকে বললে, একগাছা দড়ি আনো তো শিগ্‌গির।

দড়ি আনতে দেরি হলো না।

গর্ত বড় হতে লাগল, আর তারপরেই আসল সত্যটি প্রকাশ পেল। গর্তের ভেতরে ভুতিয়ে অনুভব করল মন্দির তো আছেই, আর তার হাত স্পর্শ করছে একটি নারী-মূর্তিকে। রোদে পোড়া তপ্ত মাটির ছোঁয়ায় বুঝি ঈষৎ উষ্ণ সে মূর্তি—মুহূর্তের জন্য ভুতিয়ের মনে হল যেন জীবন্ত রক্ত-মাংসের স্পর্শ পেয়েছে সে। তার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

দুজনে মিলে মূর্তিটিকে যখন ওপরে তুলে আনল, তখন তার দিকে তাকিয়ে ভুতিয়ের চোখে আর পলক পড়ল না। গ্রীক ভাস্কর্যের সঙ্গে তার কিছু কিছু পরিচয় আছে। মহাশিল্পী প্রাক্সিট্যালের সূক্ষ্ম কাজও তার জানা, কিন্তু এ তো তা নয়। এ যে তার চেয়েও জীবন্ত তার চেয়েও আশ্চর্য সুন্দর। কোমর পর্যন্ত নগ্ন—এক অনিন্দ্য সুন্দর মোহিনী মূর্তি। কোনো দৈব-দুর্বিপাকে তার হাত দুখানি ভেঙে গেছে, কিন্তু বাকীটুকু যেন এই মুহূর্তেই গড়ে দেওয়া হয়েছে। দূরের সিথিরিয়া দ্বীপের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল—এই তো সেই আফ্রোদিতে—যিনি সমস্ত পৃথিবীকে আলোয় আর সৌন্দর্যে ভরে অতলের শয্যা থেকে উঠে এসেছিলেন: "কুন্দ-শুভ্র নগ্ন-কান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা।"

পুরোনো আমলের কোনো দেবী মূর্তি। —কৃষকটির মৃদু কণ্ঠ শোনা গেল।

দুইজনেই মুগ্ধ হয়ে মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে রইলো। ভুতিয়ের মনে হলো এতোদিন পরে যেন তার স্বপ্নমানসী হাজার বছরের ঘুম ভেঙে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। একশো টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে সে কৃষকটিকে বিদেয় করলো।

সেই সন্ধ্যায় আঞ্চলিক ফরাসী কনসাল মঁসিয়ো ব্রাকে সে খবর পাঠিয়ে দিলো: যেন মূর্তিটি অবিলম্বেই ফ্রান্সের জন্য সংগ্রহ করা হয় আর সেজন্য তুর্কী সরকারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়। আর প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার একটি কাজই দাঁড়িয়ে গেল: জাহাজ থেকে

নেমে গিয়ে অতীতের স্মৃতি সুরভিত নির্জন প্রান্তরের মধ্যে বসে অনিমেষ দৃষ্টিতে সেই মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে থাকা। প্রখর সূর্য ক্রমে ক্রমে ম্লান হয়ে সমুদ্রের জলে রক্তচ্ছটা ছড়িয়ে দিয়ে অস্ত যেত, সন্ধ্যার অস্পষ্টতায় ভেনাসের ছায়া দীর্ঘ হয়ে পড়তো, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভুতিয়ে ধীরে ধীরে উঠে আসতো সেখান থেকে।

প্রায় সতেরো দিন পরে এলেন একজন প্রথম শ্রেণীর সামরিক কর্মচারী মসিয়ে ব্র্যা তাকে পাঠিয়েছেন। এই কর্মচারীটির নাম দ্যুমো দুর্‌ভিল। দ্যুমো মূর্তিটি দেখলেন। প্রশংসাও করলেন কিন্তু বিশেষ কোন আগ্রহ না দেখিয়েই ফিরে চলে গেলেন। মনে মনে ভারি নিরাশ হলো ভুতিয়ে।

মূর্তিটির খবর এর মধ্যেই চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল। দারুণ অস্বস্তির সঙ্গে ভুতিয়ে লক্ষ করলো: আরমেনি নামে এক-জন গ্রীক ধর্মযাজক বার চারেক এসে মূর্তিটিকে দেখে গেল।- ব্যাপারটা কী? হঠাৎ এই লোকটির এমন কৌতূহল কেন?

উত্তর পাওয়া গেল কৃষকটির কাছ থেকে। আরমেনি একটা গির্জার কোষাধ্যক্ষ। সেখান থেকে সে কিছু টাকাকড়ি সরিয়েছে। এ

ব্যাপারে তার জেল হবার সম্ভাবনা। অতএব তুর্কী সরকারের একজন বড়কর্তা মুস্তাসিবেকে মূর্তিটি যোগাড় করে দিয়ে সে আইনের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে চায়।

ভুতিয়ের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বালা করে উঠলো। তার ভেনাস, তার কামনার ধন গিয়ে আলো করবে একজন বিলাসী পাশার হারেম? ভাবতেও তার বুকের শিরা ছিঁড়ে যেতে চাইলো। এই মূর্তি তার আবিষ্কার, তার জীবন, তার সর্বস্ব। কেমন করে এ অপমান সে সহ্য করবে?

কিন্তু সামান্য সেনানী সে। কাকে সে বাধা দিতে পারে? কী-ই বা করতে পারে? এর মধ্যে লেসতাফ্যা মিলো দ্বীপ ছেড়ে রওনা হলো কনস্টান্টিনোপলের দিকে। বুকের পাঁজর ফেলে রেখে ভুতিয়েকেও চলে যেতে হলো।

কনস্টান্টিনোপলে জাহাজ পৌঁছতেই ভুতিয়ে ছুটে গেল ফরাসী রাষ্ট্রদূত মারকুইস রিভিয়্যারের কাছে। মারকুইস ভুতিয়েকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন: মসিয়ো ব্রা এবং মসিয়ো দ্যুমোর সঙ্গে কথা বলে আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমাদের আতাসে ভাইকাউন্ট মারসাল্যুস শিগগিরই যাচ্ছেন ওটা কেনবার জন্যে। আমাদের রাজা অষ্টাদশ লুইকে আমরা ওটা উপহার দেব। তুমিও সঙ্গে যাবে। কারণ ওখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তুমিই যোগাযোগ করবে। দাম যা লাগে তার জন্যে ভাবনা নেই। ভুতিয়ে আনন্দে অধীর হয়ে গেলো। তার ভেনাস তাহলে সত্যি সত্যিই ফ্রান্সে চলেছে। কিন্তু মাঝখানে প্রকৃতি বাদ সেধে বসলো। প্রবল প্রতিকূল বাতাসের জন্যে লেসতাফ্যাত তৎক্ষণাৎ রওনা হতে পারলো না। তিন সপ্তাহেরও বেশী দেরি হয়ে গেল তার রওনা হতে। এর মধ্যে আর একটা দুঃসংবাদে প্রাণ কেঁপে উঠলো ভুতিয়ের। মিলো দ্বীপের ভেনাসের খ্যাতি গ্রীস ছাড়িয়ে সারা ইয়োরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। খবর এসেছে, ইংল্যান্ড থেকে "হল্যান্ড" নামে একটি জাহাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে মিলো দ্বীপের দিকে—মহিমান্বিতা ইংল্যান্ডের রানী ওটিকে সংগ্রহ করতে চান।

অতএব চলো, চলো, আর মুহূর্তেও বিলম্ব নয়! শেষ পর্যন্ত মিলো দ্বীপে যখন জাহাজ পৌঁছলো তখন দেখা গেল সেখানে আর এক জাহাজ গ্যালাক্সিডি নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে। শুধু তাই নয়, জাহাজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্বীপের কর্তাব্যক্তিদের সলাপরামর্শও চলছে। অর্থাৎ ধর্মযাজক আরমেনির উদ্দেশ্য সফল হবার উপক্রম। ভুতিয়ে চিৎকার করে উঠলো: আমার ভেনাস চুরি হয়ে যাচ্ছে! পাগলের মতো ছুটে গিয়ে সে গ্যালাক্সিডিতে উঠবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না—ক্যাপ্টেনের নির্দেশে জাহাজের নাবিকেরা বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়ালো। আরমেনি তাদের টিপে দিয়েছিল।

তারপরে মারসাল্যুর চেষ্টায় নানা আলোচনা, ভুতিয়ের পাগলের মতো প্রাণপণ চেষ্টা এবং নানা আইনের জটিলতা পার হয়ে শেষ পর্যন্ত দ্বীপের কর্তৃপক্ষ মূর্তিটি ফরাসী সরকারকে বিক্রি করতে রাজি হলেন। আট হাজার ফ্রাঁ-র বিনিময়ে কর্তৃপক্ষ ভেনাসকে ফরাসীদের হাতে তুলে দিলেন। ভুতিয়ের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো।

মূর্তি নিয়ে লেসতাফ্যাত ফ্রান্সের দিকে রওনা হলো। সাবধানতার জন্যে চটে জড়িয়ে সেটিকে জাহাজের খোলে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু স্বপ্নের রানী ভেনাসের এই বন্দিত্ব ভুতিয়ে সইতে পারতো না, তার অন্তরাত্মা কেঁদে উঠতো। প্রত্যেক দিন রাত্রে সে নেমে যেতো জাহাজের খোলে, আবরণ সরিয়ে দিয়ে তার ভেনাসের জীবন্ত সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে সে নিঃস্তব্ধ হয়ে বসে থাকতো, তার নিঃশব্দ উপাসনার মধ্য দিয়ে রাত্রি প্রভাত হয় যেতো।

পীরেতে পৌঁছে জাহাজ বদল হলো। নতুন জাহাজ "লিয়নে" চড়ে ভেনাস রওনা হলো ফ্রান্সের দিকে। ভুতিয়ে মূর্তিটির সঙ্গে তুলোঁ পর্যন্ত যাবার অনুমতি পেলো, কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপরেই ভেনাসকে বিদায় দিয়ে শোকার্ত বিরহীর মত নিজের কাজে ফিরে যেতে হলো তাকে। যাবার সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভুতিয়ে বললে: আমাকে ছেড়ে তুমি চলে যেতে চাও যাও। কিন্তু চিরকাল তুমি আমার—শুধু আমারই।

হয়তো মনের গোপনে মর্মরলক্ষ্মীর স্বপ্ন নিয়েই ভুতিয়ের বাকী জীবনটা কেটে যেতো, কিন্তু প্রায় আট ন মাস পরে পত্রিকার একটি সংবাদে যেন বজ্র ভেঙে পড়লো তার মাথায়—সংবাদে বলা হয়েছে: রাষ্ট্রদূত মারকুইস রিভিয়্যার রাজা অষ্টাদশ লুই-এর জন্য যে ভেনাসের মূর্তিটি সংগ্রহ করেছেন, সে মূর্তি লুভ্রের যাদুঘর আলো করে থাকবে, সেই অনিন্দিতা রূপলক্ষ্মীর আবিষ্কারক আর কেউ নন—তিনি হচ্ছেন—দ্যুমো দুরভিল!

বুক ফেটে গেল অভাগ্য ভুতিয়ের। তার আবিষ্কার, তার ভেনাসকে হরণ করে নিয়ে গেছেন দ্যুমো! কিন্তু কী করতে পারে সে? একজন সাধারণ নৌ-সেনানীর ওপর এই অন্যায়ের প্রতিকার হবে কেমন করে? ওপরতলার মানুষ দ্যুমো, সমাজে তাঁর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা—বিজ্ঞ বলে তাঁর খ্যাতি। কে শুনবে ভুতিয়ের কথা, কে বিশ্বাস করবে, কে দূর মিলোর সেই ইয়োরগোস পল্লীপ্রান্তরে গিয়ে ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই করবে? "রাজার হস্ত" যখন "কাঙালের ধন" চুরি করে নেয়—তখন শুধু অন্তর্জ্বালাতেই পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে সে।

তারপর এক উন্মত্ত জীবন শুরু হলো ভুতিয়ের। সব আশা, সব আনন্দ, সব লক্ষ যেন হারিয়ে গেল তার। চাকরি ছেড়ে দিল, নিজেকে ভোলবার জন্যে কবি বায়রনের মতোই তুরস্কের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিলো গ্রীকদের সঙ্গে। আর হয়তো সেই রণক্ষেত্রে তারই মতো অশান্ত উন্মাদ বায়রনের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গিয়েছিল—কে জানে?

কিন্তু ভোলা যায় না, জ্বালা নেবে না। চোখের সামনে অহর্নিশ জেগে থাকে সেই মর্মর-স্বপ্ন—যে তার জীবনে রক্ত মাংসের নারীরূপে আবির্ভূতা হয়েছিল। সেই অনিন্দ্য গ্রীবাভঙ্গি, সেই অনন্য বক্ষদেশ, সেই রেখায় রেখায় সৌন্দর্যের প্রবাহিত ধারা। নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি ভুতিয়ে একটির পর একটি মর্ত্যের মানবীর মধ্যে তার ভেনাসকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

তিনটি নারী ভেনাস হয়ে এসেছিল তার জীবনে, দুজন ফরাসী, একজন গ্রীক। কিন্তু পর পর এই তিনটি স্ত্রীর একজনও কি তার বাসনালক্ষ্মীর রূপ নিয়ে পূর্ণ হতে পেরেছিল?

তার উত্তর পাওয়া গিয়েছিল অনেক দিন পরে। দ্যুমো দুরভিলের মৃত্যুর বত্রিশ বছর পার হয়ে গেলে, বার্ধক্যে জীর্ণ ভুতিয়ে সাহসে ভর করে, প্রকাশ করলো তার "মেমোয়ার"—স্মৃতিকথা। তাতে ভেনাস আবিষ্কারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া গেল, আর পাওয়া গেল তার একতমা স্ত্রীর নাম: সে মিলো দ্বীপের ভেনাস—সিথেরিয়ার ফেনোদ্ভবা আফ্রোদিতে।

আজও দ্যুমোর সমাধিলিপিতে উৎকীর্ণ: "ভেনাস দা মিলোর আবিষ্কারক।"

কিন্তু সন্ধানী গবেষকেরা আসল সত্যের সংবাদ জানেন। আর লুভ্রে—একজন ফরাসী লেখকের ভাষায়: "ভেনাসও তার স্বপ্ন দেখে। সেকি আজও ব্যাথা পায় ভেনসের সেই শিল্পীর কথা ভেবে, যে তাকে রচনা করেছিল শ্বেত-মর্মরে? সে কি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার গুহানিহিত গোপন মন্দিরটির জন্যে, তার নিঃশব্দ শতাব্দীগুলির জন্যে? তার কী মনে পড়ে সেই প্যাগান যুগের গ্রীক তীর্থযাত্রীদের কথা—যারা তাকে অর্ঘ দিতো? নাকি তার মনে পড়ে সেই প্রভাবটির কথা—সেদিন আদিম ভেনাসের মতো সূর্যালোকে তার নব অভ্যুদয় ঘটেছিল, তার নবীন উপাসক ভুতিয়ে তার উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করেছিল প্রাচীন গ্রীসের প্রেমস্তোত্র?"

হয়তো শেষেরটাই সত্যি। কারণ—সেই প্রভাতেই তো পাষাণ-দেবতা "লাভ করেছিল নারী জন্ম।"

খাদ্যমূল্য ও কৃষি উৎপাদন
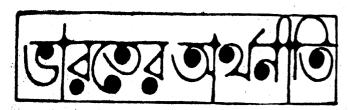
দেশের বৈষয়িক অগ্রগতি বন্ধ না করে কিভাবে খাদ্য মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যায় সেটা হচ্ছে এখন একটা পয়লা নম্বরের সমস্যা। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৬ সাল এই এগারো বছরে (সব দ্রব্যের) পাইকারী মূল্য-সূচক শতকরা ১১১ ভাগ বেড়েছে। তার ভেতর, কৃষিজাত দ্রব্য ও খাদ্য সামগ্রীর দাম শতকরা ১৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মূল্যস্ফীতি বাঁধা আয়ের লোকের সত্যকার উপার্জনের ক্ষয় ঘটিয়েছে। তাদের বেশীর ভাগ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর; সমাজ ব্যবস্থার স্থিতি রক্ষা ও দেশের উন্নয়নে এই শ্রেণী একটি মূল্যবান ভূমিকা নিয়ে থাকে। প্রশাসনের দায়িত্ব বহন, শিল্প-সম্প্রসারণে আবশ্যক কারিগরী বিদ্যায় শিক্ষিত কর্মীদের যোগান এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত ও বৃত্তিমূলক কাজকর্মের সুষ্ঠু পরিচালনায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অবদান কম নয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, তাদের স্বার্থের প্রতি আজ পর্যন্ত বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়নি।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া

একদিকে বেতনধারী মধ্যবিত্ত শ্রেণী অথবা বাঁধা আয়ের কর্মীদের যেমন প্রকৃত আয়ের ক্রমাগত অবক্ষয় ঘটেছে, অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য অনবরত বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ীরা তেমন বিস্তর [illegible] রছে এবং সেই সঙ্গে, কিছু নতুন শ্রমিক—যারা আগে বেকার ছিল—কাজের সুযোগ পেয়েছে। দ্রব্যমূল্য যখন ক্রমবর্ধমান সে সময় ঝুঁকি-বহুল কৃষি অথবা শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে মূলধন নিয়োগের চাইতে ফাটকা ব্যবসার অভিপ্রায়ে জিনিসপত্র মজুত করে রাখা বেশী লাভজনক। তাই সেদিকেই ঝোঁক দেখা গেছে।
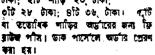
অবশ্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে গ্রাম অঞ্চলে চাষীদের ঋণের প্রকৃত বোঝা গত দশ বছরে বেশ খানিকটা কমে গেছে। তা ছাড়া, খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, তুলা, পাট আখ প্রভৃতি যাবতীয় কৃষিজাত দ্রব্যের দামের উন্নতি হওয়ায় কৃষি উৎপাদন বাড়াবার পক্ষে মূল্য আগের চাইতে উৎসাহমূলক হয়ে উঠেছে।

কিন্তু সার ও অন্যান্য উপকরণের যোগান বৃদ্ধির যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, যেখানে এখনো লক্ষ লক্ষ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট জমির দরিদ্র চাষীদের বৃষ্টিপাত বা মেঘরোদ্রের উপর নির্ভর করতে হয়, সেখানে কৃষির অগ্রগতি শ্লথ হতে বাধ্য। ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার এখনো পর্যন্ত মধ্যবর্তী-দের বিলোপ করে কৃষির অগ্রগতিকে বেগবান করতে পারেনি। কৃষির সম্প্রসারণ মন্দগতিতে হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন শিল্পবিকাশের দ্বারা অনেকখানি নিয়মিত হবে।

সুষ্ঠু বণ্টনের দায়িত্ব

বৃষ্টিপাত সম্পর্কে খুব আশাবাদী হলেও, মানতে হয় যে খাদ্যমূল্যের স্থিতি-রক্ষা, আমদানির সংকোচন এবং আর্থিক ব্যবস্থার পরিকল্পনামূলক উন্নয়ন—সবগুলি অভীষ্ট অর্জন করা সহজ হবে না। তার জন্য বণ্টন ব্যবস্থার শক্তি বৃদ্ধির দরকার। খাদ্য উৎপাদন যেখানে ধীরে বাড়ছে, সেখানে সারা দেশে খাদ্যশস্য কেনা-বেচার ব্যাপারে সরকারকে সক্রিয় এবং সব চেয়ে বড়ো অংশ নিতে হবে।

স্পষ্ট কথায়, কৃষি উৎপাদনে স্থিতির অভাব যাতে আর্থিক উদ্যোগকে ব্যাহত না করে সেজন্য শস্য সংগ্রহ ও বণ্টন ক্লেশকর হলেও অপরিহার্য। পরিকল্পনাগুলিকে প্রয়োগ করতে হলে শস্য ব্যবসাকে সরকারী ব্যবস্থায় নিয়ে আসতে হবে। না হলে, দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি বৃষ্টিপাত ও বৈদেশিক সাহায্যের মতো সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ব্যাপারের মুখাপেক্ষী থাকবে।

অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য বণ্টনের ভার সরকার গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে মূল্যবৃদ্ধি সমাজের দুর্বলতম অংশকে ততো দুর্দশা-গ্রস্ত করতে পারবে না। পল্লী ও শহর অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে আবশ্যক সামগ্রীর সুষম বণ্টনের দায়িত্ব এড়ানো যায় না। যখনই এবং দেশের যেখানেই অনটন দেখা দিক না কেন, সেটা ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর মধ্যে বিস্তারিত করে দিলে ভালো হয়।

উৎপাদনে স্থিতির অভাব

আবার, কৃষির কেবল উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করলেই চলবে না। সম্প্রতি কয়েক বছর ভারতে কৃষি উৎপাদনের যে আকস্মিক পরিবর্তন বা ওঠা-নামা দেখা গেছে তা কমিয়ে ফেলতে হবে। ষাট দশকে উৎপাদনে স্থিতির অভাবের জন্য দুটো কারণকে দায়ী করা যায়: প্রথম, প্রান্তিক জমিগুলিকে চাষের কাজে নিয়োগ; দ্বিতীয়, কৃষিকর্মে নিবিড় পদ্ধতির ব্যবহার —যার অন্যতম তাৎপর্য হচ্ছে ঝুঁকি বৃদ্ধি।

কৃষি উৎপাদনে স্থিতির অভাব কমিয়ে আনার প্রসঙ্গে কর্ষিত জমিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেসব জমিতে জল সেচ বা জলের যোগানের নিশ্চিত ব্যবস্থা আছে সেগুলিকে প্রথম বিভাগে ধরা যায়: মোট খাদ্য উৎপাদনের একের তিন ভাগ এখানে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর এলাকা হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম ঘাট এবং গাঙ্গেয় সমতলের দক্ষিণের পর্বতমালার মধ্যকার ত্রিভুজ—যা খাদ্য উৎপাদনের দুয়ের পাঁচ ভাগের জন্য দায়ী। এই অঞ্চল বৃষ্টিপাতের খেয়ালের উপর নির্ভরশীল। তৃতীয় অঞ্চল থেকে খাদ্য উৎপাদনের মাত্র একের পাঁচ ভাগ পাওয়া যায়: এখানে নির্ভরযোগ্য জলসেচও নেই, বৃষ্টিপাতও বিশেষ হয় না। স্পষ্টত, দ্বিতীয় অঞ্চলই উৎপাদনের ওঠা-পড়ার জন্য দায়ী। কৃষি-কর্মের অনিশ্চয়তা কমিয়ে আনার ব্যাপারে একাধিক সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন এখানে জরুরী। অপরদিকে, প্রথম শ্রেণীর অঞ্চলে উৎপাদন বাড়িয়ে তোলা দরকার যাতে প্রত্যেক একরে দুই বা বেশী ফসল ফলানো যায়। তৃতীয় বিভাগের জমি-গুলিতে বড়ো জোর খরা প্রতিরোধ করার মতো শস্য লাগানোর চেষ্টা করা যেতে পারে।

শান্তিকুমার ঘোষ

যারা শিকার করে

তুষারকান্তি বসু

অনেকদিন আগে এক বিখ্যাত সৈনিক তাঁর আত্মজীবনীতে সাধারণ লোকের সৈনিক জীবন বেছে নেবার কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন বলে মনে আছে। সৈনিক জীবনের সঙ্গে কেন জানি মৃত্যুর চিন্তা আগে-ভাগেই এসে পড়ে। ও-দুটো ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যেন। সৈন্য জীবন বেছে নিলেই মৃত্যুর পরোয়ানায় নাম সই করা হয়ে যায়। তবু লোকে এ জীবন বেছে নেয় এই কারণেই যে, যারা যায় তারা সবাই মরে না। তারা জানে শতকরা ৮৫ জন সৈনিক মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পারে। সংখ্যাতত্ত্বের এই নজির থেকেই সকলে ধারণা করে নেয় অধিক সম্ভাবনাময় ঐ বৃহৎ সংখ্যার মধ্যেই তার স্থান হবার সম্ভাবনা সমধিক।

মানুষের যে-কোন অসমসাহসিক কাজে এই যুক্তি অনেকাংশে প্রযোজ্য। দুর্গম পাহাড়কে জয় করার, দুঃসাহসিক অভিযানে ভেলায় চড়ে মহাসাগর পাড়ি দেবার চেষ্টা, গতিবেগের নেশা, দুর্ধর্ষ হিংস্র পশু শিকার, প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের নিজের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অনিবার্য নেশা সহজাত। প্রকৃতিকে মানুষ তার সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে নিয়তই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছে সেই কোন যুগ থেকে।

অবশ্য শিকারকে মানুষের অন্যান্য দুঃসাহসিক কর্মের সাথে তুলনা করলেও ঠিক একে অন্য পর্যায়ের দুঃসাহসের সঙ্গে তুলনা করা অনুচিত। শিকারের প্রতি মানুষের এক সহজাত আকর্ষণ আছে। পৃথিবীর আদিতে মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য নিয়ত তার নিটকতম প্রতিবেশী, মানুষের চাইতে শতগুণে শক্তিশালী হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হত। যা ছিল এককালে বাঁচার জন্য সংগ্রাম, তাই কালে মানুষের চরিত্রে নেশা হয়ে দাঁড়াল। জন্মগত নেশা। নেশা না বলে প্রবৃত্তি বলাই ভাল। সহজাত প্রবৃত্তি। একটি শিশুর পিঁপড়ে পিষে মারার মধ্যে যে প্রবৃত্তি কাজ করছে তারই ফলে পরিণত বয়সে যুগচিহ্নিত আবরণে গালভরা শিকার নামে অভিহিত হচ্ছে।

শিকার যেন মানুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ। স্মরণাতীত কালে ছিল হাতাহাতি লড়াই। সে-লড়াই ছিল সমানে সমানে। যোগ্যতমের উদ্বর্তনের নীতি রক্ষা করে মানুষকে স্থান করে দিয়ে অন্যান্যরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। আজকের জীবন সংগ্রামে মানুষ উন্নততর অস্ত্রে বলীয়ান হয়ে তার প্রতিযোগীর সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় পর্বত প্রমাণ ব্যবধান গড়ে তুলেছে। আজকের শিকার তাই [illegible]ের জীবন-সংগ্রাম নয়। পরিবর্তে [illegible]দয়ই বেঁচে থাকার সংগ্রাম। বর্তমান যুগে মানুষ যাকে স্পোর্টস অথবা অবসর বিনোদনের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করে তাকেই বনের পশুরা মনে করে জীবন-সংগ্রাম।

এতো গেল শিকারের উদ্দেশ্যের তত্ত্বগত কথা। এদিক সন্তর্পণে এড়িয়ে বলা যায় কয়েকটি স্থূল কারণে মানুষ শিকার করে। এই স্থূল কারণগুলিকে ছটি ভাগে ভাগ করা যায়। এই কারণগুলি হচ্ছে ১। আর্থিক লাভের জন্য, ২। উদর পূর্তির জন্য ৩। স্পোর্টস-এর জন্য, ৪। সময় কাটানো এবং আনন্দ লাভের জন্য, ৫। বাহাদুরি এবং প্রাধান্য লাভের জন্য এবং ৬। বাঁচার সংগ্রামের জন্য।

মোটামুটিভাবে বলা যায় প্রতিটি শিকারীই এই ছটি শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের এই শ্রেণীগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় শিকারের উদ্দেশ্য যাই হোক, শিকারীর উদ্দেশ্য এই শ্রেণীর কোন না কোনটির অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য।

শিকারীর উদ্দেশ্যের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সাধারণত দেখা যায় শিকারীর উদ্দেশ্য কোন সময়ে ব্যাহত হয় না। অর্থাৎ যে শিকারী প্রথম কারণের জন্য শিকার করে সে কোন সময়েই পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ কারণের জন্য শিকার করবে না। এগুলি নির্ভরশীল শিকারীর সাহস, চরিত্র এবং পারিপার্শ্বিকতার উপর। এই কারণগুলির উপর শিকারীর উদ্দেশ্য নির্ভরশীল বলে জঙ্গল জীবন থেকে এক শ্রেণীর পশুর অস্তিত্ব প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু শ্রেণীর অস্তিত্ব বিপন্ন। উপরোক্ত কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে এ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা হবে।

১। আর্থিক লাভের জন্য—শতকরা প্রায় সত্তরজন শিকারী এই উদ্দেশ্যে শিকার করে থাকে। এদের প্রধান এবং চরম উদ্দেশ্য যেন-তেন-প্রকারেণ পশু হত্যা। এই শ্রেণীর মধ্যে এমন লোকও আছে যাদের জীবনধারণের জন্য প্রধান এবং মুখ্য আয়ের পন্থা হচ্ছে শিকার। যে-কোন প্রকারে যে-কোন পশু হত্যায় এদের অরুচি নেই। সাপ থেকে শুরু করে হাতি গণ্ডার, বাইসন সব কিছুই এরা এদের শিকারের তালিকায় রাখে। এদের সাহস থাকলেও সব ক্ষেত্রে যথেষ্ট ঝুঁকি এরা নেয় না। ফলে এরা জঙ্গলের ক্ষতিসাধন করে সবচাইতে বেশী। এরাই হচ্ছে জঙ্গল জীবনের প্রধান শত্রু। এই সমস্ত শিকারীর বিক্রয়যোগ্য তালিকায়—সাপের চামড়া, বিষ, দাঁত, চর্বি; বাঘের চামড়া, চর্বি, শুকনো মাংস, দাঁত ও ক্যাকিবোন; শুয়োরের দাঁত, লোম এবং মাংস; হরিণের মাংস ও চামড়া ও সিং; হাতির দাঁত ও সামনের পা (সৌখীন মোড়ার জন্য); গণ্ডারের খড়্গ (ওষুধের জন্য); বাইসনের মাংস, চামড়া ও শিং ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এ-ছাড়া অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য পাখির পালক ইত্যাদিও এদের বিক্রয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। এই তালিকা এত ব্যাপক যে সহজেই অনুমান করা যায় এদের হাতে কি হারে বন্য-জীব নিধন হয়ে থাকে।

এই ধরনের একজন শিকারীকে আমি জানতাম। লোকটি ছিল পাহাড়ী উপজাতি শ্রেণীর। ভুটানে একটি গাদা বন্দুকের অধিকারী হওয়া বিশেষ কঠিন ছিল না। কয়েকটি টাকা আঞ্চলিক শাসন অধিকর্তা কাজীর হাতে ফেলে দিলেই সাদা কাগজে কাজী তাকে গাদা বন্দুক ব্যবহার করার অধিকার দিত। এই গাদা বন্দুকে যেমন ছররার সাহায্যে পাখি শিকার করা সম্ভব তেমনি গাদা বন্দুক দিয়ে হাতীও শিকার করা যায়। গাদা বন্দুকের নির্মাণ কুশলতার উপর তার শক্তি নির্ভর করত। নলের মধ্যে তিন ইঞ্চি পরিমাণ কালো বারুদ ভরে তার উপরে পাকা ইস্পাতের টুকরো ভরে দিয়ে এমনভাবে গাদানো হয় যাতে যখন কোন বড় জানোয়ারের উপর এইগুলি প্রয়োগ করা হয় তখন যেন একটির বেশী গুলি করার প্রয়োজন না ঘটে। এতে সে সুযোগ নেই বলেই একটি মাত্র গুলিকে পৃথিবীর সব চাইতে শক্তিশালী রাইফেলের তুলনীয় শক্তির অধিকারী করা হয়।

এই লোকটি ভুটান সীমান্তে বাস করত। যদিও তার বাসস্থান ছিল উত্তরবঙ্গে কিন্তু বন্দুক থাকত ভুটান সীমান্তে। কাজীর দেওয়া বন্দুক ভারতীয় অঞ্চলে গ্রাহ্য নয়। এই লোকটির অল্প কিছু চাষ যোগ্য জমি ছিল যা তার দুই স্ত্রী দেখাশোনা করত। এর প্রধান কাজ ছিল সপ্তাহের প্রায় সব কটি দিন ঘুমিয়ে কাটানো। রাত হলেই আধ মাইল দূরে সীমান্তের ওপার থেকে

বন্দুক এনে তার নৈশ-অভিসার শুরু হত। এই লোকটি অসুস্থ হলেও তার শিকার কামাই হত না। জঙ্গলে জানোয়ার চলা পথে মাটিতে এমনভাবে বন্দুক পেতে ঘোড়ার সঙ্গে সরু মুগার সুতো বেঁধে পথের মাঝে রেখে দিত যাতে ঐ পথে কোন জানোয়ার চলতে গিয়ে ঐ সুতোয় বাধা পেত। জানোয়ারের পায়ের সঙ্গে সুতোর সংযোগ হলেই ঘোড়ায় টান পড়ত এবং সঙ্গে সঙ্গে জানোয়ার সেখানে লুটিয়ে পড়ত। গড়ে লোকটি প্রতি মাসে ৫।৬ শত টাকা আয় করত। অবশ্য তার অধিকাংশই নিটকতম বাজারের এক নেপালীর মদের দোকান টেনে নিত। শুনেছি এই লোকটি একটি দু' মণ ওজনের শুয়োর এক 'শ টাকায়, সম্বর হরিণ আড়াই শ টাকায়, চিতার চামড়া চল্লিশ এবং বাঘের চামড়া পঁচাত্তর টাকায় (মাংস, দাঁত এবং লাকিবোন ছাড়া) বিক্রী করত। গণ্ডার অথবা হাতী-এর হাতে মারা পড়েছে কি না শুনি নি।

এই লোকটির মত অসংখ্য শিকারী ছড়িয়ে আছে যাদের প্রধান উদ্দেশ্য আর্থিক লাভবান হওয়া। অনেক ক্ষেত্রে এদের হাতে প্রচুর জানোয়ার আহত হয়ে হয়ত গভীর

ঘনে পরে মারা যায়। এরা প্রায়শই সেই সব আহত জানোয়ার খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিতে চায় না। ফলে এদের হাতে শিকার মারা পড়ে বেশী। এ শ্রেণীর শিকারীরা অনেক ক্ষেত্রেই বন বিভাগের কর্মচারীদের যোগসাজসে শিকার করে। এ কথা কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য নয় যে, একই শিকারী নির্দিষ্ট বন থেকে মাসের পর মাস ধরে শিকার করে যাচ্ছে অথচ রক্ষক শ্রেণীর কেউ তা জানে না।

২। উদর পূর্তির জন্য—এই শ্রেণীর সংখ্যা প্রথম শ্রেণীর ঠিক পরে হলেও এরা শতকরা পনেরো ভাগের বেশী নয়। এই শ্রেণী প্রধানত সীমাবদ্ধ এক শ্রেণীর উপজাতিদের মধ্যে। এরা প্রথম শ্রেণীর মত নির্বিচারে জীবহত্যা না করলেও এদের হাতেও নেহাত কম জীবহত্যা হয় না। এদের প্রধান গুণ হচ্ছে এরা শিকার করার সময় এমন সব শিকার বেছে নেয় যা তারা নিজেদের খাদ্য হিসেবেই গ্রহণ করতে পারে। এরা ভুলেও অসাধারণ ঝুঁকি নেয় না। এদের শিকারের মধ্যে প্রধানত হরিণ, শুয়োর, সজারু, খরগোশ এবং এই শ্রেণীর পশুই প্রধান। এদের প্রধান দোষ এরা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সর্বপ্রকার পশুই শিকার করে। গর্ভবতী হরিণ শিকার করতে এরা যেমন চিন্তা করে না তেমনি ক্ষীয়মান দুর্লভ জীব সংহার করতেও পিছপা নয়।

সৌভাগ্যের বিষয় আজকাল এ শ্রেণীর শিকারীর সংখ্যা ক্রমাগত কমের দিকে। যে উপজাতি এবং আদিবাসী শ্রেণীর লোক খাদ্যের জন্য শিকার করত তারা আজকাল পশুপালন এবং কৃষি কাজে যথেষ্ট মনোনিবেশ করায় অহেতুক জীব হত্যার কারণ অনেকাংশে কমেছে।

৩। স্পোর্টসের জন্য—এই শ্রেণীর সংখ্যা খুবই কম। চতুর্থ শ্রেণীর শিকারী যারা সময় কাটাতে এবং আনন্দের জন্য শিকার করে তারাও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকলেও সামান্য পার্থক্য বিদ্যমান। চতুর্থ শ্রেণীর শিকারীরা প্রধানত দেশীয় নৃপতি এবং অভিজাত মহল থেকে এসেছে। এরা এদের অফুরন্ত অবসর এবং প্রাচুর্যের সদ্ব্যবহার করতে শিকারকে বেছে নেয়। শিকার এদের কাছে অবসর বিনোদনের অংগ, এক প্রকার বিলাসের সামগ্রী। যারা অভিজাত মহলের অন্তর্ভুক্ত নয়, যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছে তারা শিকারকে বিলাসের সামগ্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। শিকার তাদের কাছে স্পোর্টস। তাদের কাছে শিকার বীরত্ব ব্যঞ্জক চ্যালেঞ্জ। এই দুই শ্রেণীর শিকারী কেউ নির্বিচারে পশুহত্যা করে না। এদের শিকারে নির্দিষ্ট কয়েকটি মাত্র শিকার অন্তর্ভুক্ত। এরা এমন ধরনের কোন শিকার করে না যার মধ্যে পৌরুষ নেই। পাখি কিংবা কোন নিরীহ প্রাণী এরা শিকার করতে ঘৃণা বোধ করে। এদের শিকার তালিকায় সাধারণত বাঘ, হাতী, শুয়োর ইত্যাদি থাকে। যে শিকারে যত উত্তেজনা সেই শিকারে তত আনন্দ। এদের হাতে এই কারণে নিহত পশুর সংখ্যা নগণ্য। এ ছাড়া এরা আইনানুগ ভাবেই শিকার করে। চতুর্থ শ্রেণীর শিকারীদের কাছে যেমন নির্দিষ্ট পশু শিকার আভিজাত্যের লক্ষণ তেমনি যারা স্পোর্টসের জন্য শিকার করে তারাও নির্দিষ্ট পশু ছাড়া শিকার করা লজ্জার বিষয় বলে মনে করে।

৫। বাহাদুরির জন্য যারা শিকার করে তাদের সংখ্যা খুবই কম। জীবনে কোনদিন শিকার করে নি হঠাৎ শখের বশে অথবা বাহাদুরি নেওয়ার জন্য শিকার করেছে এমন লোক পাওয়া যায়। বৃটিশ আমলে বিদেশ থেকে আগত সৈনিক বিভাগ অথবা শাসন বিভাগে যুক্ত অনেক কর্মচারী দেশে বন্ধু বান্ধবীদের কাছে বাহাদুরি নেয়ার জন্য শিকার করত। এরা অবশ্য অল্পে তুষ্ট। একটা বাঘের চামড়া অথবা সম্বরের শিং পেলেই এরা খুশী। আবার প্রতিটি ক্ষেত্রে এরা যে শুধু মাত্র শিকার পেয়েই সন্তুষ্ট তা নয়। তেমন তেমন শিকার পেলে তার উপরে দাঁড়িয়ে ফটো না তুলিয়ে এদের শান্তি নেই। এরা জংগলের ক্ষতি খুব সামান্যই করে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এখনো এই শ্রেণীর শিকারীর অভাব নেই। এই শ্রেণীর শিকারী সমাজের যে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এমন কি একজন খ্যাতনামা অভিনেতা যাঁর খ্যাতি মধ্যাহ্ন সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান তাঁর কথাও শুনেছি নিজস্ব মহলে বাহাদুরি নেওয়ার জন্য ওড়িষ্যার জংগলে বাঘ শিকার করতে গিয়েছিলেন। সাফল্য আসুক বা না-আসুক শিকারে গিয়েছে এটাই তার স্তাবক মহলে যথেষ্ট।

৬। শিকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান হচ্ছে তারা, যারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। জিম করবেট এই শ্রেণীর পর্যায়ে পড়েন। শতকরা হিসেবে এদের সংখ্যা আধজনও হয় কিনা সন্দেহ।

এই শ্রেণীর শিকারী শুধু মাত্র একটি কারণেই শিকার করে। যখন বন্য পশুর অত্যাচারে মানুষের জীবন এবং সম্পত্তি বিপদগ্রস্ত হয় তখন এই শ্রেণীর শিকারী ভয়-ভাবনাহীন চিত্তে এগিয়ে আসে। এই শ্রেণীর শিকারী নিজের লাভলোকসানের বিচার করে না। মানবিক আবেদনে এদের অন্তর সাড়া দেওয়াতে এরা শিকার করতে এগিয়ে আসে। এদের শিকারে অসামান্য ঝুঁকি নিতে হয়। নরখাদক বাঘের দৌরাত্মে যখন গ্রামের পর গ্রাম ভয়ে পালিয়ে যায় তখন উপরোক্ত সব শ্রেণীর শিকারী নিশ্চুপ থাকলেও এই শ্রেণীর শিকারী ছুটে যায় সেই অঞ্চলে। নিজের জীবনের সাথে বাজী ধরে এরা জীবন-মরণ খেলায় মেতে ওঠে। জিম করবেটের বিখ্যাত শিকার কাহিনীর সংগে যাদের পরিচয় আছে তাঁরা এর সম্যক পরিচয় পাবেন।

জিম করবেট অথবা তাঁর শ্রেণীর শিকারী জগতে দুর্লভ। এঁরা শিকার করেন মনের আনন্দে নয়—প্রয়োজনের তাগিদে। এই শ্রেণীর শিকারী সম্বন্ধে একটা মজার কথা বলা যায়। উপরোক্ত পাঁচটি শ্রেণীর শিকারীরা সহজে এই মানবিক আবেদনে সাড়া দেয় না। কিন্তু যখন হঠাৎ কোন কারণে কেউ দেন তখন তিনি শিকারের অভিধানগত অর্থে শ্রেষ্ঠ শিকারী হিসেবে পরিচিত হন। কে কত-গুলি শিকার করেছে সেই বিচারে তার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ হয় না। শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হয় শিকারীর এই আবেদনে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতার উপর।

উত্তরবংগেরই ঘটনা বলছি। বছর তিন আগেকার ঘটনা। সেন্ট্রাল ডুয়ার্সে নাগ্রাকটা-ক্যাটাগুড়ি ফরেস্টে উত্তরবংগের বিখ্যাত এমন কোন জানোয়ার নেই যা এখানে পাওয়া যায় না। এমন কি জলদা-পাড়া থেকে মাঝে মাঝে দু' চারটে গণ্ডারও হয়ত হাওয়া খেতে এসে থাকে। এই ফরেস্টে বছর তিন আগে একটা দাঁতালো হাতি ক্ষেপে যায়। এর অত্যাচার দিনে দিনে এমন বাড়তে থাকে যে শেষ পর্যন্ত জেলা শাসক এই হাতিকে মারতে হুকুম দেন।

বহু শিকারী এর পর একে মারতে এগিয়ে আসে। কিন্তু প্রত্যেকেই হাল ছেড়ে দেয়। এই সময়ে ওখানকার এক চা-বাগানের শ্বেতাংগ কর্মকর্তা এগিয়ে এলেন হাতি মারতে। এর আগে ভদ্রলোক দু চারটে হরিণ, শুয়োর এবং পাখিটাখি মেরেছেন। হাতি মারার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। তবু তিনি মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এলেন পাগলা হাতি মারতে। ফলে তাঁর বিন্দুমাত্র ভুলের মাশুল হিসেবে দিতে হল মূল্যবান জীবন।

অনেকে বলবেন এঁকে পঞ্চম শ্রেণীর দলভুক্ত করা উচিত। নিজের ক্ষমত না জেনে কোন অসমসাহসিক ঝুঁকি নেওয়া বাহাদুরি নেওয়ার নামান্তর। আমি সে কথা স্বীকার করি না। বাহাদুরি নেওয়ার একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি আছে, সেই গণ্ডি পার হয়ে এলেই শিকারী এমন এক স্থানে এসে পৌঁছায় যাকে বলা চলে সৈনিক। সৈনিক যতটুকু স্বার্থ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে এরাও ঠিক ততটা স্বার্থ নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়ে মরণ সংগ্রামে। নিঃস্বার্থ এই সমাজসেবায় যাঁরা আত্মদান করে শহীদ হন তাঁরা নমস্য।
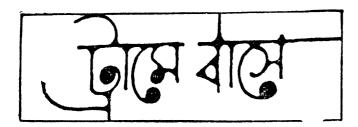
প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন "সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তুলিতে" উপদেশ দিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন

—"সেই দিব্য দৃষ্টি যাঁরা লাভ করেছেন তাঁরাই দেখেছেন, ঝোল নিজের পাতের দিকে তরতর করে বয়ে যাচ্ছে!!"

রাষ্ট্রপতি তাঁর বেতার ভাষণে আমৃত্যু অনশন ব্রত গ্রহণেরও তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।—"এর বিরুদ্ধে নিন্দে অবশ্যি আমরাও করি; তবে অন্তত গো-ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হওয়াই ভালো মনে করি—গো মাতা শুড বি অ্যাবাভ অল সাসপিশন!!" বলে শ্যামলাল।

কলিকাতার রাজপথে আবার ট্রাম চলিয়াছে। ট্রামের প্রথম পুনরাবির্ভাবকে পুষ্পমালা-পতাকা সজ্জায় অভিনন্দিত করা হইয়াছে এবং গান ও তাসাবাদ্যে রাজপথ মুখর করিয়া তোলা হইয়াছে। কর্মীরা কতটা কী লাভ করিলেন সেই প্রশ্নের উত্তরে জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"তাসা-বাদ্যের গোলমালে কর্মীদের গীত গানটি শ্রুতিগোচর হয়নি, তাঁরা গেয়েছেন—তোমার কাছে যে-হার মানি সেই তো মোর জয়।"

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন, আমেরিকার ভারতকে খাদ্য সরবরাহের শর্ত অসম্মানজনক নয়। শ্যামলাল বলিল—"আর তা হলেই বা কী আসে যায়, আমরা জানি—পিরিত না মানে জাত-কুজাত, ভুখ না মানে বাসি ভাত!!"

গৌহাটি হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে কোন এক স্থানে ইঁদুরের গর্ত হইতে নাকি ৪০ মণ ধান উদ্ধার করা হইয়াছে।—"হয়েছে, খোকা ইঁদুর বলেই, মানুষের গর্ত হলে আর উদ্ধার করতে হতো না"—বলেন সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গ হইতে লোকসভা এবং বিধান সভার প্রার্থীদের প্রতি সপ্তাহে ১০ কে. জি. করিয়া চিনি দেওয়া হইবে; তাঁহাদের জন্য কর্মরত স্বেচ্ছাসেবকদের চা-পানের জন্যই এই ব্যবস্থা।—"কিন্তু তার চেয়ে কিছু চাল আর কিছু পরিমাণ মাছ দিলেই হয়ত স্বেচ্ছাসেবকরা লুফে নিতেন, কেননা চা, চিনি ছাড়াও চলে, তাছাড়া গানও আছে—হোয়েন জাভিং সুদাস সীটস বাই মি, আই ওয়ান্ট নো সুগার ইন মাই টি—ট্রা-লা-লা-লা-লা" সহযাত্রী সুর করিয়াই গানটি শুনাইলেন।

সংবাদে প্রকাশ, এ বছর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৯ জন রাজ্যপাল নাকি অবসর গ্রহণ করিবেন। সহযাত্রী বলিলেন—"আশা করব, সর্বসাধারণের হিতার্থে

যথাসময়ে কর্মখালির বিজ্ঞাপনটি সংবাদপত্রে ছাপাতে হবে; অবশ্য এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ করেই।"

আসামে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থেই বুঝি নূতন করিয়া লোক গণনার পরামর্শ দিয়াছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীফকরউদ্দীন আলি আমেদ। শ্যামলাল সংক্ষেপে মন্তব্য করিল—"শিক্ষা মন্ত্রীর অনুমোদিত নূতন পাঠ্যক্রম।"

একটি প্রবন্ধের শিরোনামা—"ইতিহাসের পুরুষ সুভাষচন্দ্র"।—"বছরে একদিনের সত্রযজ্ঞের মতো, সেই ইতিহাস মহাফেজখানায় তুলে রেখে বছরে একদিন তা পাঠের ব্যবস্থা হলেই আমরা ঋণ-দায় মুক্ত হতে পারি"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

শ্রীমতী ইন্দিরা সম্প্রতি কোন এক সভায় বক্তৃতা দিতে দাঁড়াইলে, বিড়ালের ডাক ডাকিয়া এবং গো-হত্যা বন্ধের স্লোগান তুলিয়া তাঁহাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সংবাদদাতা বলিতেছেন,—ইন্দিরাজীর গলায় তখন

নেহরু-মেজাজের তাপ ফুটিয়া উঠে; তিনি বলেন—'স্লোগানে ইতিহাস বদলাবে না' এবং সুর সপ্তমে চড়াইয়া তিনি প্রায় তিন ঘণ্টা প্রাক্তন নৃপতিবর্গ, দক্ষিণ পন্থী স্বতন্ত্র দল এবং জনসংঘকে তুলাধোনা করিয়াছেন।—"কিন্তু ধনুরীর কাজটা বড় দেরিতে শুরু হল, শীত তো এখন যাবো-যাবো করছে"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মবার্ষিকীতে লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে তাঁর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন। সহযাত্রী বলিলেন—"একটি কণ্ঠ ধ্বনিত হলো—দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে। অবশ্য সে কণ্ঠ কেউ শোনেন নি, শুনলেও সমাধিক্ষেত্রের এই ডাকে কেবা সাড়া দেয়!!"

জনৈক বৃটিশ এম পি নাকি ভারতীয় ফিল্মে অভিনয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।—"এ দেশীয় এম পি দের এই চান্স দিলে পার্লামেণ্ট যে ফাঁকা মাঠ হয়ে যাবে। অভিনয়ে তাঁরা বড় কম যান না, শুধু মেক-আপ-এর জেল্লাটা চোখে পড়ে না!"—মন্তব্য করিলেন সহযাত্রী।

ত্রিশ

নিঃশব্দে বারান্দা পেরিয়ে মাঠে নেমে এল অবনী। মালিনী সিঁড়ির কাছাকাছি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিল, অবনী তাকে লক্ষ করল না। মাঠে নেমে কয়েক পা সামান্য দ্রুত হেঁটে আসার পর নিজের চাঞ্চল্য সম্পর্কে যেন সচেতন হয়ে যথাসাধ্য সংযত হবার চেষ্টা করল। চারপাশ তাকিয়ে দেখল, মনে হল যেন চাঁদ উঠেছে কিংবা উঠছে, ঈষৎ জ্যোৎস্না দেখা দিচ্ছে, গাছ এবং ঝোপঝাড়ের ছায়া, অন্ধ-কুটিরের দিক থেকে একেবারে দেহাতী গলায় গানের মতন একটা সুর ভেসে আসছে। নিজের মনে পায়চারি করার মতন আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল, হাঁটতে হাঁটতে একটা সিগারেট ধরাল।

চায়ের কাপটা যে কি করে হাত থেকে পড়ে গেল, অবনী বুঝতে পারছিল না। এখনও এই সামান্য ঘটনার জন্যে তার অস্বস্তি এবং লজ্জা হচ্ছিল। অবনীর মনে হল, সম্ভবত সে খুব বেশি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, চায়ের কাপ কাত হয়ে গিয়েছিল একেবারে, তারপর কোনো রকমে গরম চা চলকে তার হাতে পড়তে সে হাত থেকে কাপটা ছেড়ে দিয়েছিল। কাপটা মাটিতে পড়ে ভেঙে যাওয়ায় সে এত লজ্জিত ও বিব্রত হয়ে পড়েছিল যে তার মনে হল, এতটা অন্যমনস্ক হবার কোনো কৈফিয়ত সে হৈমন্তীকে দিতে পারবে না। তার আশংকা হচ্ছিল, হৈমন্তী অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে, কৌতূহল অনুভব করে, বা কোনো কিছু সন্দেহ করে তাকে লক্ষ করছে। অনেকটা যেন উঁকি দেবার মতন করে অবনীকে আড়ালে দেখছে—এ-রকম মনে হল। লজ্জায় এবং অস্বস্তিতে, খানিকটা বা গোপনতা প্রকাশ হতে পারে এই উদ্বেগে সে ঘামতে শুরু করেছিল। অবশ্য, অবনীর এখন মনে হল, ললিতা কমলেশকে যেসব কথা বলেছে তা মনে পড়ায় সে ওই মুহূর্তে কিছুটা উত্তেজিত এবং ক্রুদ্ধও হয়েছিল। ললিতা একটা পাঞ্জাবী না সিন্ধী সেলস ম্যানেজারের সঙ্গে বার-এ বার-এ ঘুরে মদ গিলে কাপড়চোপড় খুলে লুটোপুটি খাচ্ছে কি না, বা সেই সেলস ম্যানেজারের গলা আঁকড়ে পায়ে পা জড়িয়ে বিছানায় ঘুমোচ্ছে কি না—এ-সব ব্যাপারে অবনীর কোনো আগ্রহ নেই, রাগও নেই। কিন্তু ললিতা অন্য যেসব কথা কুমকুম সম্পর্কে কমলেশকে বলেছে, কিংবা অবনী সম্পর্কে, তাতে অবনী ক্ষিপ্ত হতে পারে, এবং হয়েছে। নিজেকে অপমানিত বোধ করলে মানুষ ক্ষিপ্ত হয়। কুমকুমের কাছে যদি ললিতা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কুৎসিত ভাবে এ-সব কথা বলে—'তোর ঠাকুমা তো থিয়েটারের মাগী ছিল; তোর বাপের জাত-জন্মের ঠিক নেই...' তবে—তবে কি হতে পারে! মেয়েটাকে ললিতা এখনও তার বাবার সম্পর্কে বিষিয়ে রাখতে চায়। এতটা বিতৃষ্ণা, বিদ্বেষ এখনও ললিতার থাকা উচিত না। যা হবার হয়ে গেছে; তারপর ললিতা নিজের মর্জিমতন, খেয়াল খুশি মতন দিন কাটাচ্ছে; তার সুখে সম্ভোগে কেউ বাধা দিচ্ছে না; সে তার পছন্দ মতন জীবনের দিকে সরে গেছে; তবু—অকারণ কেন ললিতা মেয়েটাকে তার মতন কুৎসিত কদর্য নোঙরা করতে চায়—অবনী বুঝতে পারে না। মানুষের মনে ঘৃণা কত তীব্র হতে পারে, কী ভীষণ ভাবে ভর করতে পারে প্রেতটেতের মতন, এবং তার ফলে মানুষ কতটা উন্মাদ হতে পারে ললিতা তার উদাহরণ।

অবনী থমকে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল সে হাঁটতে হাঁটতে সবজি-বাগানের দিকে চলে এসেছে। সামনে একটা পেট্রোম্যাক্স বাতি জ্বলছে। অবনী বুঝতে পারল, নতুন হাসপাতাল ঘরের সামনে সে এসে পড়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত দেখল: সরু ফালি বারান্দার মাঝামাঝি ঢালু চালের কাঠকুটোর সঙ্গে বাতিটা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে; আলোটা তেমন জোরালো নয়, বারান্দা এবং সামনের মাঠের খানিকটা আলো পাচ্ছে, নীলচে আলো। বারান্দায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না; ঘরের জানলা বন্ধ, দরজা এখনও খোলা; কোনো সাড়া শব্দ আসছিল না। অবনীর মনে হল, বাতিটা সম্ভবত আসা-যাওয়ার সুবিধের জন্যে রাখা হয়েছে। বাতাসে মাঝে মাঝে একটা উগ্র গন্ধ আসছিল, ফিনাইল বা লাইজলের হতে পারে। গন্ধটা অবনীর ভাল লাগল না। এত শান্ত, নিঃশব্দ, অসাড় হয়ে আছে ঘর দুটো যে অবনীর মনে হল, কয়েকটা মানুষ যেন বাতি জ্বালিয়ে কোনো কিছুর ভয়ে নিঃশব্দে বসে আছে।

সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে অবনী এবার ফিরল। পেছন থেকে পেট্রোম্যাক্সের আলোর সামান্য আভা আসছিল; অল্প এগিয়ে আসতেই অবার অন্ধকার, অন্ধকারে খুব পাতলা জ্যোৎস্না ধরেছে। অবনী আবার তার বিহ্বলতার কথা ভাবতে লাগল: আজকাল মাঝে মাঝেই মনে হয় নিজের জীবনের গোপনীয়তা সম্পর্কে সে বেশ উদ্বেগ বোধ করে এবং সতর্ক হয়ে পড়ছে। আগে এসব ছিল না, এতটা তো কোনোমতেই নয়। আত্মসম্মান বোধটাও এখন যেন অভিমানের মতন হয়ে উঠছে। ললিতার সঙ্গে যখন তাকে থাকতে হত তখন ললিতা এমন বহু কথা বলেছে যাতে আত্মসম্মান থাকে না; অথচ অবনী সে সময় বড় একটা ক্ষেপে উঠত না, বরং উপেক্ষা করত, পাল্টা একটা জবাব দিত—রুক্ষ, তিক্ত, পাল্টা জবাব। হয়ত তখন জবাব দেবার সুযোগ ছিল বলেই এতটা লাগত না; আজকাল লাগে। মনে হয় তাকে কেউ দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যেন নির্বিচারে আঁচড় কামড় দিয়ে মুখে থুতু ছিটিয়ে চলে যাচ্ছে—সে পাল্টা কিছু করতে পারছে না। ফলে রাগটা আরও বাড়ে, আক্রোশ হয়।

না, এ-সব কিছু না—অবনী মাথা নাড়ল: আক্রোশ, রাগটাগ সব বাজে। আসলে সে এখন নিজের জীবনের এইসব গোপনীয়তা নিয়ে কখনও কাতর, কখনও শঙ্কিত, কখনও বা বিব্রত হয়ে পড়ছে। এক এক সময় মনে হয়, যেন কেউ তার দু-হাতে হাতকড়া দিয়ে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হৈমন্তী, গগন, সুরেশ্বর তাকে দেখছে; নিজের মুখ দু-হাতে সে ঢেকে ফেলেছে অবশ্য, তবু হাতকড়ার আলগা শেকল গালে অনবরত ঘষে যাচ্ছে। নিজের মুখ ঢাকলেও

সে যে নিজেকে লুকোতে পারছে তা নয়, শুধু চোখাচোখি হয়ে যাবার ভয় বা ওদের বিস্মিত ধিক্কার-দৃষ্টি সহ্য করার প্লানি সে এড়াতে চাইছে বলে মুখ ঢেকেছে।

ঠিক কেন যে, অবনী জানে না, কিন্তু হৈমন্তীর কাছে নিজের এই গোপনীয়তা প্রকাশ করার ইচ্ছে তার হয়। মা কি ছিল, বাবা কে ছিল, কি ভাবে সে মানুষ—এসব কথা এবং ললিতা ও কুমকুমের কথা হৈমন্তীকে জানাতে পারলে ভাল হত। তার সম্পূর্ণ পরিচয় হৈমন্তী জানে না। এখন পর্যন্ত একটা লুকোচুরি থেকে গেছে। হৈমন্তীর তরফ থেকে এ-রকম কিছু নেই, যেটা ছিল—সুরেশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক—সেটা অবনীর জানা হয়ে গেছে।

তুমি এসব কথা বলার জন্যে এত ব্যস্ত কেন? অবনী যেন বিড়বিড় করে নিজেকে কথাটা শুধলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা সহজ জবাব পেল। জবাবটা সহজ হলেও তা তার মনঃপূত হল না। কয়েক পা হেঁটে এসে সে অন্য কিছু বলতে যাচ্ছিল, কাছাকাছি গলার শব্দ পেল, কে যেন ডাকল; অবনী দাঁড়াল, তাকিয়ে দেখল সুরেশ্বর।

খোলামেলা মাঠের মধ্যে দিয়ে সুরেশ্বর এল, সামান্য তফাতে ছিল বোধ হয়। অবনী খেয়াল করে দেখল তারা আশ্রমের মাঠে মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে এসে সুরেশ্বর বলল, "এদিকে কোথায়...?"

"এই একটু পায়চারি করছিলাম—" অবনী বলল, বলে কি ভেবে আবার বলল, "আপনাদের নতুন হাসপাতাল দেখে এলাম।"

সুরেশ্বর পা বাড়াল, পাশাপাশি অবনীও হাঁটতে লাগল। সুরেশ্বর বলল, "কোনো রকমে তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করা...।"

হাঁটতে হাঁটতে অবনী খানিকটা যেন ঠাট্টা করেই বলল, "আমার তো আগে বিশ্বাস হয় নি ডাক্তারটাক্তার আসবে। যাক, শেষ পর্যন্ত এসেছে। আপনার কথাই ঠিক হল।"

সুরেশ্বর কিছু বলল না।

মাঠে হালকা জ্যোৎস্না ফুটে উঠেছে, বাতাসে উগ্র গন্ধটা আর আসছিল না। কয়েকটা গাঁদা ফুলের গোল মতন একটা ঝোপ; ঝোপের পাশ দিয়ে সরাসরি মাঠ ভেঙে ওরা সুরেশ্বরের ঘরের দিকে এগুতে লাগল।

"আপনার কাছেই যেতাম", অবনী বলল, "বিজলীবাবু কিছু টাকা পাঠিয়েছেন।"

সুরেশ্বর ঘাড় ফিরিয়ে অবনীকে দেখল। যেন বলতে চাইল, টাকাটা আপনি বয়ে আনলেন, বিজলীবাবু কই?

অবনী বলল, "উনি একটু কাজেকর্মে আটকা পড়েছেন, নয়ত আসতেন।"

"ওঁর বাড়ির খবর সব ভাল?"
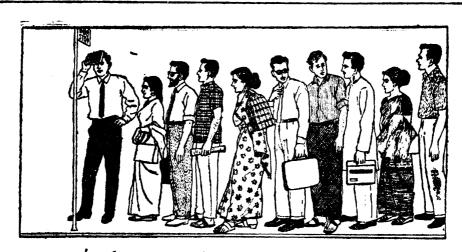
"খারাপ কিছু শুনি নি।"

দুজনেই তারপর হঠাৎ কেমন নীরব হয়ে

গেল। দমকা বাতাস এল, ঈষৎ ঠান্ডা—মরা শীতের বাতাস, অথচ শুকনো; দূরের গাছ-পালায় শব্দ হল সামান্য। মাঠেঘাটে কোথাও কুয়াশা নেই, হিমের ঝাপসা ভাবও চোখে পড়ছে না, আকাশ পরিষ্কার।

"কাল এখানে একজনের একটু বাড়া-বাড়ি গিয়েছে—" সুরেশ্বর বলল, "আজ দুপুরে থেকে অবশ্য অবস্থা বেশ ভাল। আমি তারই খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম ডাক্তারের কাছে।"

অবনী শুনল। সুরেশ্বরের নতুন হাস-পাতাল বা রোগীর কথা সে আর চিন্তা করছিল না। এমন কি বিজলীবাবু তার হাত দিয়ে টাকা পাঠানোয় সুরেশ্বর অসন্তুষ্ট বা ক্ষুণ্ণ হয়েছে কিনা—অবনী তাও ভাবছিল না। সে অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল এবং হৈমন্তীর কথা ভাবছিল। সুরেশ্বরের সঙ্গে হৈমন্তী সম্পর্কে কথাবার্তা বড় কখনও হয় নি। বা যা হয়েছে তা হৈমন্তীর ডাক্তারী হাতযশের। এখন অবনীর জানতে কৌতূহল হচ্ছিল, সুরেশ্বর হৈমন্তী সম্পর্কে আপাতত কি ভাবে! তার কোনো অনুযোগ আছে কি না। থাকা স্বাভাবিক। অথবা সুরেশ্বর নিজের ভুল সম্পর্কে কতটা সচেতন, এমন কি অনুতপ্ত কি না!

যথাসম্ভব স্বাভাবিক গলায় অবনী বলল, "উনি তো চলে যাচ্ছেন।"

সুরেশ্বর কথাটা শুনল, কোনো জবাব দিল না।

অবনী সামান্য অপেক্ষা করল, বলল, "আপনার মুশকিলই হল..."

সুরেশ্বর এবারও নীরব থাকল। অবনী বুঝতে পারল, সুরেশ্বর প্রসঙ্গটা আলোচনা করতে চায় না। বোধ হয়, অবনীর এবার মনে হল, সে ভুল করেছে; হয় সুরেশ্বর এই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে আগ্রহী নয়, না হয় সে পরাজিত-পক্ষ বলে প্রসঙ্গটায় লজ্জা অনুভব করছে।

অবনী কেমন অস্বস্তি বোধ করল। বোকার মতন এই প্রসঙ্গটা সে কেন তুলল! চুপচাপ, যেন কিছুটা বিব্রত এবং কুণ্ঠিত হয়ে অবনী হাঁটছিল।

সুরেশ্বরের ঘরের কাছাকাছি ওরা পেঁৗছে গিয়েছিল। আজ কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না, কলাঝোপের দিকে কয়েকটা জোনাকি উড়ছিল, টিমটিমে একটা লণ্ঠনের আলোও যেন সুরেশ্বরের বারান্দায় রাখা রয়েছে।

বাড়ির কাছাকাছি পেঁৗছে সুরেশ্বর হঠাৎ বলল, "হেম অনেকদিন থেকেই যাব যাব করছিল, আমিই তাকে আটকে রেখেছিলাম।"

অবনী তাকাল, সুরেশ্বরের গলার স্বর পরীক্ষা করার চেষ্টা করল। কিছু বোঝা গেল না, বোঝা গেল না, সুরেশ্বর মনে মনে বিরক্ত কি না অথবা তার কোনো অনুযোগ আছে কি না।

বাগানের মাঝ দিয়ে তারা ঘরের সিঁড়িতে এসে পা দিল।

অবনী বলল, "আপনাকে আবার দেখছি একজন ডাক্তার খুঁজতে হবে...!"

"খুঁজছি।" সুরেশ্বর অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল।

ঘরে আসার আগে সুরেশ্বর চৌকাঠের কাছ থেকে লণ্ঠনটা তুলে নিয়েছিল; ঘরে এসে টেবিলের ওপর রাখল। শিস সামান্য বাড়িয়ে দিল। বলল, "বসুন।......আমি আসছি।" বলে পাশের ঘরে চলে গেল। অবনী চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

পাশের ঘরে সুরেশ্বরের হাঁটাচলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। মনে হল না, এ-বাড়িতে আর কেউ আছে। ভরতুও বোধ হয় নেই। অবনী বসে বসে অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরাল। হৈমন্তীর প্রসঙ্গটা তুলে সে বোকামি করেছে বলে আগে মনে হয়েছিল, এখন মন হল—বোকামির কিছু হয় নি। বরং কথাটা না বললে সুরেশ্বর ভাবতে পারত, সব জেনেশুনেও সে কিছু না-জানার ভান করছে। হৈমন্তীর কাছে যার এত আসা-যাওয়া সে কি জানে না হৈমন্তী কলকাতায় চলে যাচ্ছে! জানে নিশ্চয়, জেনেও কথাটা তুলল না। সৌজন্যবশে কিংবা কথার মধ্যেও এ-কথাটা একবার বলা স্বাভাবিক ছিল। তবু অবনী কেন বলল না?

এমনও হতে পারে, অবনী ভাবল: সুরেশ্বর হয়ত মনে মনে এ-ধারণাও করতে পারে হৈমন্তীকে কলকাতায় ফেরত পাঠানোর মধ্যে অবনীর কিছুটা হাত আছে। হয়ত, অবনী এবং হৈমন্তীর মধ্যে যেরকম ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাতে অবনীর কিছু স্বার্থ থাকতে পারে; স্বার্থের জন্যে এবং সুরেশ্বর ও তার অন্ধ আশ্রমের প্রতি অবনীর বিতৃষ্ণা থাকার দরুণ হৈমন্তীকে সে আরও বিরূপ করে তুলেছে। এ-রকম একটা সন্দেহ অবনীর আগেও হয়েছে, কিন্তু সে গ্রাহ্য করে নি। গ্রাহ্য করলেও বা কি হত, তার করার কিছু ছিল না। আজ, এখন অবনীর মনে হল, সুরেশ্বর যেন তাকে এ-ব্যাপারে কোথাও দায়ি করে রেখেছে। চিন্তাটা অবনীর খারাপ লাগছিল। সে এতোদিন গোপনে সুরেশ্বরের বিরুদ্ধে কোনো শঠতা বা ষড়যন্ত্র করেছে—এ ধরনের চিন্তা অসহ্য। ...অবনী কিছু করে নি, কিছু না; তবু যদি সুরেশ্বর এ-রকম কিছু ভেবে নিয়ে থাকে তবে সেটা অন্যায়। অবনী কেমন ক্ষুব্ধ হল।

সুরেশ্বর এল; বলল, "ভরতু নেই; একটু চায়ের জল চাপিয়ে দিলে এলাম।"

অবনী বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ যেন হুঁশ হল, সুরেশ্বরকে বসতে দেখল।

সুরেশ্বর বলল, "হেম বোধ হয় দু-চার দিনের মধ্যেই যাবে।"

"আগামী রবিবার", অবনী বলল, বলে তাকিয়ে থাকল।

"হ্যাঁ, ওই রকমই হবে।"

অবনী বুঝতে পারল না সুরেশ্বর ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য দেখাচ্ছে কি না। নয়ত তার জানা উচিত ছিল হৈমন্তী কবে যাচ্ছে।

সুরেশ্বর যেন কি বলতে যাচ্ছিল, অবনী বাধা দিল, বাধা দিয়ে বলল, "উনি চলে যাওয়ায় আপনার ক্ষতি হবে না?"

"হবে প্রথম প্রথম।"

"না, সেরকম নয়—" অবনী কোনো রকমে যেন প্রসঙ্গের মধ্যে আসতে চাইছিল, "আপনি বোধ হয় অনেক আশা করে ওঁকে এনেছিলেন। এমনি একটা ডাক্তার জুটিয়ে আনা বলে আমার মনে হয় নি।"

সুরেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না, তার মুখোভাবেরও তেমন কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ল না অবনীর। পরে সুরেশ্বর বলল, "হ্যাঁ, আশা ছিল। কিন্তু কি করা যাবে—, হেম থাকতে পারল না।" বলে সুরেশ্বর অল্প থেমে যেন হৈমন্তীর অপরাধের ভার কিছু লাঘব করার জন্য বলল, "কলকাতায় হেমের বাড়ির লোকরাও ওকে ছেড়ে থাকতে পারছে না।"

অবনী মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছিল, সুরেশ্বর কিভাবে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে। সরাসরি সে কিছু বলতে চায় না। সুরেশ্বরের চোখমুখ লক্ষ করতে করতে অবনী সিগারেটের বাকিটুকু শেষ করল, করে টুকরোটা জানলা দিয়ে ফেলে দিল।

অবনী বলল, "আমি শুনেছি, আপনার ইচ্ছেতেই নাকি ওঁর ডাক্তারী পড়া...!"

"কে বলল? হেম?"

"গগন।"

"হ্যাঁ—, খানিকটা সেই রকমই। আমার আগ্রহ ছিল, ওরও অনিচ্ছে ছিল না। হেম বেশ বুদ্ধিমতী, পরিশ্রমী। ধীরে সুস্থে বিবেচনা করে দেখতেও পারে। ডাক্তার হিসেবে ভালই। তা ছাড়া ওর অভিজ্ঞতা অল্প: এই তো সবে পাশ করে বেরিয়েছে। দু পাঁচ বছর পরে আরও ভাল হবে......"

অবনী নিরাশ হল; সুরেশ্বরকে হৈমন্তীর বিষয়ে কিছু বলানো যাবে না। বললেও সুরেশ্বর যা বলবে তা অনেকটা মামুলি, যেন হৈমন্তীর চরিত্র এবং ডাক্তারী সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিচ্ছে। অবনীর পক্ষেও আর কিছু বলা সম্ভব নয়। তবু শেষবারের মতন, খানিকটা যেন ঝোঁকের মাথায় অবনী বলল, "আপনি বোধ হয় কোথাও খানিকটা ভুল করে ফেলেছিলেন।"

সুরেশ্বর তাকাল।

অবনী বলল, "আমার ধারণা, আপনি ঠিক একজন চোখের ডাক্তার চান নি এখানে; আরও কিছু আশা করেছিলেন।"

সুরেশ্বর কোনো জবাব দিল না। তার

মুখ দেখে মনে হল না, সে অসন্তুষ্ট।

অবনী বলল, "আপনার এই আশ্রমের জন্যে আপনার যত মায়া, ও'র তা ছিল না। আমার মনে হয়েছে, আপনি ডেডিকেটেড, উনি তা নন।"

"হেম খুব কর্তব্যপরায়ণ..." সুরেশ্বর আস্তে করে বলল।

"হ্যাঁ, কিন্তু আপনার মতন এই সব সেবা-টেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন নি।"

"না—", সুরেশ্বর মাথা নাড়ল; তার মাথা নাড়ার মধ্যে হৈমন্তী সম্পর্কে বিরক্তি বা অভিমান ফুটল না। বলল, "সকলের স্বভাব এক হয় না; হেমের স্বভাব আলাদা...।"

"আপনি বোধ হয় আপনার স্বভাবের মতন কাউকে চেয়েছিলেন।"

"কি জানি!" সুরেশ্বরকে এবার সামান্য বিব্রত দেখাল।

"জগতে এই একটা মজা দেখি", অবনী বলল, "অনেকে নিজের গরজটা অন্যের গরজ মনে করে নেয়।..."

সুরেশ্বর হয়ত কিছু বলত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংযত করল। তারপর যেন কথাটা হালকা করার জন্যে হেসে বলল, "গরজ বড় বালাই।...বসুন, চায়ের জল বোধ হয় ফুটে গেছে। চা নিয়ে আসি।" আস্তে করে উঠে দাঁড়াল সুরেশ্বর, চেয়ার সরিয়ে চলে গেল।

অবনী বুঝতে পারল না, সুরেশ্বরকে আজ এত নিস্পৃহ এবং উদাসীন দেখাচ্ছে কেন? সাধারণভাবে সুরেশ্বর অনেকটা নিস্পৃহ, কিন্তু কোনো কোনো সময়ে, বিশেষত সাধারণ কথাবার্তায় সে বড় নিস্পৃহ থাকে না। হৈমন্তীর প্রসঙ্গ বলেই কি সুরেশ্বর এত উদাসীন? বা, হৈমন্তী চলে যাচ্ছে—এতে সুরেশ-মহারাজের আত্ম অভিমানে যথেষ্ট ঘা লেগেছে বলেই নিজের ব্যর্থতা এবং আঘাতকে সামলাবার জন্যে ভদ্রলোক এই ধরনের উদাসীনতার আশ্রয় নিচ্ছে।

অবনীর ইচ্ছে হয়েছিল, হৈমন্তীর ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সুরেশ্বরের মনোভাব কি তার একটা আন্দাজ নেবে। নানাভাবে সুরেশ্বরকে বাজিয়েও দেখা গেল সে প্রায় বোবা হয়ে রয়েছে; কিছু বলছে না—বলবে না। সুরেশ্বরের যথার্থ মনোভাব বোঝা যাবে বলেও মনে হচ্ছে না। অথচ, অবনী সুরেশ্বরের প্রতি এখন সহানুভূতিও বোধ করছিল। শত হলেও এটা ঠিক, সুরেশ্বর অনেক আশা ভরসা করেই হৈমন্তীকে এনেছিল। শুধু ভেবে দেখে নি, তার বৈরাগ্য হৈমন্তীর চরিত্রে নেই।

পাশের ঘরে সুরেশ্বর চা তৈরি করতে করতে হঠাৎ গুনগুন করে উঠল। অবনী কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, এবং কৌতুক ও কৌতূহল অনুভব করল। সুরেশ্বর গান গাইতে জানে নাকি? সুরেশ্বর যে গান গাইছে তাও ঠিক নয়, একটা সুর গুনগুন করছে।

অবনী ঘড়ি দেখল: সাড়ে সাত। টাকার কথাটা তার খেয়াল হল। পকেট থেকে খামে মোড়া টাকাটা বের করল। ইনসিওরের পুরোনো খামে টাকাটা ভরে দিয়েছেন বিজলীবাবু, ওপরে তাঁরই নাম লেখা, পোস্টঅফিসের শিলমোহর। পাঁচ শো টাকা সুরেশ্বর ধার করল, বিজলীবাবু অন্তত তাই বললেন। টাকাটা বিজলীবাবু ধার করে এনেছেন, নাকি নিজেই দিয়েছেন—এ-বিষয়ে অবনীর সন্দেহ আছে। সুরেশ্বর যে কিভাবে এই সব টাকা ধার করে, কেমন করেই বা শোধ দেয়, কে জানে। আশ্রমের পেছনে এত খরচ মাসের পর মাস টেনে যাওয়াও কি সহজ কথা!

সুরেশ্বর দু হাতে দু কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল, ডান হাতটা অবনীর দিকে বাড়ানো।

অবনী উঠে এগিয়ে গিয়ে চা নিল, নেবার সময় মনে পড়ল, খানিকটা আগে সে হৈমন্তীর ঘরে চায়ের কাপ ভেঙে এসেছে। অকারণে এবার যেন কিছুটা সতর্ক হল।

বসতে বসতে অবনী হেসে বলল, "আপনি মশাই গানটানও গান নাকি?"

"না, গাই না; কখনও সখনও ওই একটু সাধ জাগে", সুরেশ্বরও হাসি মুখে জবাব দিল।

"এখন কি সাধ জেগেছিল?"

সুরেশ্বর হাসল সামান্য, বলল, "একটা দোঁহা মনে পড়ে গেল।" বলে সামান্য থেমে কেমন আবেশভরা গলায় বলল, "গাছের পাতা, মানুষের মতি, আকাশের মেঘ তোমার হাতে ধরা নেই; তোমার হাতে তুমিই শুধু ধরা আছ।"

অবনী চায়ে চুমুক দিল; দিয়ে তৃপ্তির শব্দ করল। "বাঃ, চা-টি তো দিব্যি করেছেন।"

"আপনার বাড়িতে আরও ভাল চা খেয়েছি।"

অবনীর মনে হল সুরেশ্বরের কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা ইঙ্গিত রয়েছে, যেন সে বলতে চাইছে—অবনীর বাড়িতে দামী চা আছে, এখানে নেই। হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে টাকার খামটা তুলে নিল অবনী, নিয়ে সুরেশ্বরের দিকে এগিয়ে দিল, "টাকাটা... পাঁচশো আছে।"

সুরেশ্বর খামটা নিল, নিয়ে পাশে রাখল।

অবনী হঠাৎ বলল, "এই আশ্রমের পেছনে আপনি মোটমাট কত টাকা ঢাললেন, মশাই?"

সুরেশ্বর তাকিয়ে তাকিয়ে অবনীর মুখ দেখল, তারপর সহজ করে মুখে হাসল, বলল, "হিসেব করি নি।"

"কেন, আপনাদের আশ্রমের তো হিসেবের খাতা আছে।"

"আছে। সে-হিসেবের মধ্যে অন্য পাঁচ-জনের টাকাও আছে।"

"তা হলে পুণ্যটাও আপনার একার নয়, পাঁচজনের।" অবনী হেসে বলল।

সুরেশ্বরও মৃদু হাসল, চা খেতে লাগল।

অবনী একটু পিঠ এলিয়ে বসল, বসে সিগারেট ধরাল। কি যেন ভাবছিল, অন্য-মনস্ক। ভাবতে ভাবতে সহসা বলল, "শুনেছি আপনি বেশ ধনী বাড়ির ছেলে।"

"এ-কথা আবার কে বলল? গগন?" হালকা করে জবাব দিল সুরেশ্বর।

"গগন কেন, বিজলীবাবু বলেছেন, হৈমন্তীও বলেছেন..."

"কথাটা বাড়িয়ে বলা; আমরা ছিলাম গ্রামের মানুষ, বাবার কিছু জমিজায়গা সম্পত্তি ছিল।"

"জমিদারী?"

"না, তেমন কিছু নয়।"

"কোথায় বাড়ি ছিল আপনাদের?"

সুরেশ্বর নাম বলল দেশের।

অবনী চায়ের কাপে বড় একটা চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল, এক মুখ ধোঁয়া নিল গলায়; তারপর বলল, "আপনার মা বাবা খুব ধার্মিক-টার্মিক ছিলেন নাকি?"

"ধার্মিক!" সুরেশ্বর কেমন বিস্মিত হয়েছিল। বাবার কথা, মার কথা মনে পড়ল। বলল, "কেন, ধার্মিক কেন?"

"না, ছেলেবেলা থেকে সে-রকম ক্লাইমেটে মানুষ হলে অনেকের এ-সব বাতিক হয়।" অবনী হালকা ভাবে হেসে হেসে বলল।

সুরেশ্বরও হাসল। কি ভেবে বলল, "আমার ছেলেবেলাটা একা একাই কেটেছে বেশী। মার নানারকম ভয়ের বাতিক ছিল। নজরে নজরে থাকতে হত।"

"ছেলেবেলা থেকেই আপনি তা হলে সুবোধ বালক!" অবনী হাসল, "ঘরের মধ্যেই বড় হয়ে উঠলেন, জগৎ-সংসার দেখলেন না।"

সুরেশ্বর অবনীর চোখে চোখে তাকাল। অবনী যেন সত্যিই ভেবে নিয়েছে সে জগৎ-সংসার দেখে নি।

"জীবনটাই চিনলেন না, মশাই।" অবনী আবার বলল, নিশ্বাস ফেলল।

সুরেশ্বর বুঝতে পারল না, অবনীর এ-রকম একটা ধারণা কি করে হয়েছে যে সংসারের কিছুই সে দেখে নি। সংসারে কাকে দেখা বলে? কি চোখে দেখলে দেখা হয়? জীবনের কোন দিকটায় তাকালে তাকে দেখা যায়?

সুরেশ্বর বলল, "আপনার এই কথাটা আমি ভাল বুঝতে পারি না। জীবনকে কি চোখে দেখতে হবে?"

অবনী প্রশ্নটার কোনো গুরুত্ব দিল না, হালকা করে বলল, "মানুষের চোখে।"

"আমি গাছ নয়।"

"আমাদের মতনও নন।"

"তফাত খানিকটা থাকে, থাকে না? আপনি আর বিজলীবাবু কি এক?"

"আমরা সংসারের মানুষ, সাধারণ মানুষের দোষগুণ, অমিল আমাদের আছে। আপনি আমাদের দলে পড়েন না।" অবনী এবারও খানিকটা পরিহাস করে বলল।

সুরেশ্বর চায়ের পেয়ালার বাকি চাটুকু শেষ করল। তারপর শান্ত চোখে মৃদু হেসে বলল, "অবনীবাবু, আপনাদের চোখে জীবনটা কেমন?"

অবনী অনেকটা আলস্যের চোখে তাকিয়ে ছিল, সিগারেটের ধোঁয়ায় মুখ ভরা। ধোঁয়া গিলে নিল অবনী, জিবের সামান্য ধাক্কায় খানিকটা ধোঁয়া বাইরের বাতাসে ছুড়ে দিল। সামান্য সময় কোনো জবাব দিল না। পরে ঠাট্টা করে বলল, "ফরাসপাতা বিছানা নয়...।" বলে সুরেশ্বরের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকল, যেন সময় দিল সুরেশ্বরকে, শেষে বলল, "আপনি ভাগ্যবান, আমার ভাগ্যটা আপনার মতন হলে কি হত বলা যায় না, তবে আপনার মতন মহারাজ হলে আফসোস থাকত। আমাদের মতন মানুষকে সংসারের পাপতাপে পুড়তে হয় মশাই, সংসারটাকে খুব একটা সুখের জায়গা বলে মনে হয় না।"

সুরেশ্বর শুনল। বলল, "সংসার কি সুখের?"

"আমি তো জানি অ-সুখের।"

"আমিও তাই জানি। দুঃখের সংসার।"

"জেনেও আপনি সুখী।"

"না; আমি সুখী নই—" সুরেশ্বর আস্তে আস্তে বলল।

"আপনি কি দুঃখী?"

"মানুষ মাত্রেই দুঃখী।"

"এ-সব হল তত্ত্বকথা। মিনিংলেস ওয়ার্ডস...।" অবনী বলল। তার হালকা এবং হাসি-ঠাট্টার ভাবটা নষ্ট হয়ে আসছিল।

সুরেশ্বর বলল, "মানুষের নিয়তির কথা যদি ভাবেন তা হলে কি মনে হয় না, দুঃখ বিনা তার পরিণতি নেই? এই বিশ্ব অনেক প্রবল, তার তুলনায় আমাদের কতটুকু সাধ্য! আমরা কত অসহায়!"

অবনী যেন সহসা কোনো আবেগ অনুভব করতে শুরু করেছিল, এবং বেদনার মতন লাগছিল তার। বলল, "আপনি দুঃখের কিছু জানেন না। বই পড়ে, হাত জোড় করে দুঃখ চেনা যায় না।...আপনি যদি এখন তত্ত্বের বুলি আওড়ান, সংসার দুঃখময় মোহময়-টয় বলেন তবে সেটা অন্য কথা। ওটা ধার্মিক দুঃখ। আমি তো আপনার কোথাও কোনো দুঃখটুঃখ আছে বলে দেখি না।"

সুরেশ্বর বিরক্ত বা ক্ষুব্ধ হল না। বলল, "আপনি দুঃখকে কোথায় চিনেছেন?"

"কেন, নিজের জীবনেই।"

"আমিও তো আমার জীবনে সেটা চিনে থাকতে পারি।"

"না--" অবনী মাথা নাড়ল, তার বিশ্বাস হল না। বলল, "ভদ্র সংসারে, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জন্মেছেন মশাই, তরতর করে জীবন কাটিয়েছেন, গায়ে কাঁটা ফোটে নি। আপনি ভাগ্যবান ব্যক্তি..."

সুরেশ্বর চোখ তুলে তাকিয়েছিল। অবনীর মুখের ভাব কেমন উত্তেজিত, তিক্ত, এমন কি বিদ্রূপভরা। সুরেশ্বর বলল, "স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আমি জন্মেছি, কিন্তু আমাদের সংসারে কোনো কাঁটা ছিল না—এ আপনি কেমন করে জানলেন?"

"বোঝা যায়। আমার মতন আপনার আঁতুড়ঘরটা নোংরা ছিল না।"

সুরেশ্বর অপলকে দেখল অবনীকে। বলল, "আমার মা আত্মহত্যা করেছিলেন। সুখের সংসারে কেউ আত্মহত্যা করে?"

অবনী কেমন যেন চমকে উঠল। চোখের পাতা পড়ল না। নিস্পন্দ হয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শেষে অস্ফুট স্বরে বলল, "আত্মহত্যা!"

সুরেশ্বর স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

সামান্য পরে কেমন যেন আত্মসংবরণহীন হয়ে অবনী বলল, "আত্মহত্যা তবু ভাল। কিন্তু আমার মা থিয়েটারের নামকরা মেয়ে ছিল। আমার বাবার শ্রাদ্ধের সময় আমি মাথা কামিয়ে নেড়া হয়েছিলাম। যদিও লোকটা আমার বাবা নয়।"

সুরেশ্বর হঠাৎ কেমন নিষ্ঠুরের মতন বলল, "আমার পিতৃ পরিচয়ও গৌরবের নয়। তাঁর উপপত্নী ছিল, অন্য সন্তান ছিল।"

অবনী স্তব্ধ, নির্বাক; নিষ্পলকে সুরেশ্বরকে দেখছিল। মনে হল সুরেশ্বর যেন তাকে বলছে, আপনার আর কি বলার আছে? আরও কোন দুঃখ দুর্ভোগ্যের কথা?

(ক্রমশ)

বাঙলা অভিধান প্রসঙ্গ

৭ জানুয়ারী, ১৯৬৭-র দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'বাংলা অভিধান প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি পড়লাম। লেখক বিষয়টি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রার্থনা জানিয়েছেন। সত্যই বিষয়টি এত ব্যাপক যে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে।

বাংলা ভাষায় কোন আদর্শ পূর্ণাঙ্গ অভিধান নেই এই কথা বলা মোটেই অন্যায় হবে না। মনে হয়, বাংলায় অভিধান প্রণয়ন পরিকল্পনাকে সংক্ষেপে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন, ১। উচ্চারণ-কোষ, ২। সর্বসম্মত চলিত ভাষার অভিধান (Standard Bengali Dictionary), ৩। প্রাচীন বাংলার ব্যুৎপত্তিগত অভিধান, ৪। মধ্য বাংলার ব্যুৎপত্তিগত অভিধান, ৫। আঞ্চলিক শব্দাভিধান, ৬। লঘু বা হালকা বা অসাধু শব্দের অভিধান (unconventional dictionary)—লিখিত এবং অলিখিত শব্দভাণ্ডার, ৭। অপশব্দের অভিধান (underworld dictionary), ৮। পরিভাষা, ৯। কিশোর অভিধান, ১০। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যেমন ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল দর্শন জীবনী বিজ্ঞানের নানাশাখাকে কেন্দ্র করে অভিধান প্রণয়ন, ১১। বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলিকে নিয়ে অভিধান প্রণয়ন, যেমন, বাংলা-হিন্দী, বাংলা-আসামী ইত্যাদি। এইভাবে বহু ধরনের অভিধানের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। জ্ঞানের এবং ভাষার প্রসারের জন্য জাতীয় জীবনে অভিধানের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। তবে এ কাজে অগ্রণী হতে হলে কোন প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানটির পিছনে থাকবে জনগণের এবং সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতি। বর্তমানে বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে সর্বসম্মত চলিত ভাষার এবং উচ্চারণভিত্তিক অভিধানের।

অভিধান প্রণয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়, তাই কেবলমাত্র বাংলা উচ্চারণ-কোষের প্রয়োজনীয়তা এবং সেই কোষ কেমনতরো হওয়া উচিত সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করছি।

বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অবাঙালী এবং অভারতীয়রা নিয়মিত অভিযোগ করে থাকেন যে, বাঙলায় বানানের সঙ্গে উচ্চারণের মিল সব সময়ে থাকছে না; সেজন্যে শিক্ষানবিশদের অসুবিধার অন্ত নেই। যদিও ইংরাজীর ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দেখা যায় তবুও পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ ইংরাজী শিখছে—শিখছে প্রয়োজনের তাগিদে। অবাঙালী এবং বিদেশীদের বাংলা শিক্ষার তেমন প্রয়োজন নেই তাই তাগিদও মোটে জোরালো নয়। বাংলা ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে এই তথাকথিত দুর্বলতা দূর করতে হলে ইংরাজীতে যেমন উচ্চারণ-কোষ (Everyman's English Pronouncing Dictionary by Daniel Jones) রয়েছে যার সংকলিত শব্দ ভাণ্ডারে আটান্ন হাজার শব্দ গৃহীত হয়েছে অনুরূপ একখানি অভিধান সংকলনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। আদর্শ উচ্চারণ-কোষ সম্পর্কে এবার আলোচনায় আসা যাক।

শব্দগুলি কি শুধু মাত্র কোন অভিধান থেকে সংগ্রহ করলেই সার্থক উচ্চারণ-কোষ তৈরি হবে? বোধ হয় নয়,—আধুনিক উচ্চারণ-কোষ সংকলন করতে হলে নানাদিক থেকে শব্দ গ্রহণ করা চাই, যেমন—গত পঞ্চাশ বছরের বাংলা সাহিত্যের কিছু বাছাই বই (গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি), প্রবন্ধ, পত্রিকা (দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক), পত্রাবলী, অনুবাদ সাহিত্য, চিত্রনাট্য, শিশুসাহিত্য, বেতার বক্তৃতা ইত্যাদি। শব্দ সংকলন যথারুচি সংগ্রহনীতি (random collection) অনুযায়ী হবে। যেমন, একখানি বই ধরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম লাইনের প্রথম শব্দটি হয়তো গ্রহণ করা হলো, এই প্রথায় শব্দ সংকলন করতে হবে এবং উচ্চারণ অনুযায়ী শব্দগুলিকে বর্ণানুক্রমে সাজানো দরকার। কী ধরনের উচ্চারণ গ্রাহ্য হবে? এ বিষয়ে শিক্ষিতজনের সর্বসম্মত চলিত ভাষার (Standard colloquial) অনুসরণ করতে হবে। Standard colloquial-এ উচ্চারণের নানান পার্থক্য থাকতে পারে, যেমন কর্তব্য, কোর্তোব্বো, কর্তোব্বো। এখানে প্রশ্ন উঠবে, কোন্ উচ্চারণটি প্রধান বলে গ্রাহ্য হবে? যে উচ্চারণটি পুনঃ পুনঃ বা বেশীবার পাওয়া যাচ্ছে সেইটিকে গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া নির্দিষ্ট কথাভাষী জনকয়ের সাহায্য নেওয়া চাই যারা নির্ভরযোগ্য informant-এর কাজ করবে।

ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে সার্থক উচ্চারণ-কোষের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ আজকের উচ্চারণ যদি নিষ্ঠার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করতে পারি তবে ভাবীকালের মানুষ তাদের পূর্বপুরুষদের উচ্চারণ এবং তার পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারবে এবং তা ধ্বনিতাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্য করবে। উচ্চারণ পদ্ধতি অনুশীলন করলে একটি নিয়ম খুঁজে পওয়া যাবে এবং ভূমিকায় নিয়মগুলির বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা থাকা বাঞ্ছনীয়। ধ্বনিতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল অভিধান, উচ্চারণ শিক্ষা, শেখানো এবং সংশোধনের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। ধ্বনিতত্ত্বের বিচারে ভাষাকে কটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে এবং অভিধান সংকলনের ক্ষেত্রে কোন্ বিভাগটিকে আদর্শ বলে মনে করবো সে সম্পর্কে দুচার কথায় কিছু আলোচনা করা উচিত। বিভাগগুলি হলো : ১। কথোপকথন, বক্তৃতা ২। পাঠ ৩। আবৃত্তি, অভিনয় ৪। সঙ্গীত। এবার প্রতিটি বিভাগ নিয়ে কিছু আলোচনা করছি।

১। কথাভাষায় উচ্চারণগত ভেদাভেদ অত্যন্ত বেশী। Standard colloquialও নানাভাবে প্রভাবিত হচ্ছে; উপভাষাগুলি প্রভাবিত করছে, তাছাড়া শিক্ষা, সংস্কার, সামাজিক এবং রাজনীতিক প্রভাবও উপেক্ষণীয় নয়, তার সঙ্গে রয়েছে একজনের নিজস্ব ভঙ্গী (idcolect) যা সব সময়ে নির্দিষ্ট ধারা মেনে চলে না। বাংলা Standard colloquial-এর জন্ম হলো মাত্র সেদিন, তাই এত শীঘ্র তার কথা এবং পঠন রূপ এক ছাঁদের হতে পারেনি। সাধু এবং চলিত ভাষার মধ্যেও এইরকম পার্থক্য রয়ে গেছে। তবে কথোপকথনে যথেষ্ট উচ্চারণ পার্থক্য লক্ষ করলে পাঠের উচ্চারণকে আভিধানিক ধরা উচিত বলে মনে হয়। সর্বসম্মত কথ্য ভাষীদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষিতজন এবং সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে উচ্চারণগত পার্থক্য রয়েছে প্রচুর। দুজনাই শিক্ষিত, তথাপি একজন কথ্যভাষা অনুমোদন করেন এবং অপরজন সাধুভাষাশ্রয়ী: উচ্চারণে তদনুযায়ী পার্থক্য এসে যেতে বাধ্য। উচ্চারণ-কোষে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের উচ্চারণ গ্রহণ করা বিধেয় নয়। কারণ এঁদের উচ্চারণ সাধারণত বাঙলীর মুখে সংস্কৃত যেভাবে উচ্চারিত হয় সেইভাবে সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা উচ্চারণ হতে পারে, তাই পাছে ভুল হয় সেজন্য informant-এর ভূমিকায় এঁদের গ্রহণ না

করা বাঞ্ছনীয়। একথা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না বা যাঁরা স্বীকার করেন না তাঁদের জানানো প্রয়োজন যে, বাংলা এবং সংস্কৃত এক নয়। বাংলা শব্দের সংস্কৃত উচ্চারণ কখনো আধুনিক বাঙালীর উচ্চারণ পদ্ধতির এনসাইক্লোপিডিয়া হবে না। কথা বলার এবং বই পড়ার সময়ে শব্দের উচ্চারণের মধ্যে মিলজুল পাওয়া গেলে মিলনের দিকটি লক্ষ্য রেখে উচ্চারণ-কোষ তৈরি করতে হবে।

২। পাঠের সময়ে উচ্চারণ পদ্ধতির একটি নির্দেশ ধরা পড়ে। বানানের ধ্বনি-গত বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে শিক্ষিত মানুষ সাধারণত পাঠ করে থাকে। শিক্ষিত উপভাষীরাও পাঠের সময়ে নির্দিষ্ট কথ্য ভাষার উচ্চারণ শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করলে ভালো হয়। বেতারে প্রচারিত বাঙলা সংবাদ, ঘোষণা ইত্যাদি লক্ষ করা যায়, সময়ে সময়ে উচ্চারণ দুষ্ট হয়ে থাকে। তাই মনে হয়, ঘোষক হয় Standard dialect ভাষী হবেন অথবা তাতে তাঁর পূর্ণ দখল থাকবে। বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীরা বেতারের বাংলা সংবাদ, ঘোষণা প্রভৃতির মাধ্যমে উচ্চারণ শিক্ষা ও সংশোধন করে থাকেন। সেজন্যে ঘোষক নির্বাচনে এ আই আর যদি বি বি সি-র নীতি গ্রহণ করেন তবে ভালো হয়।

৩। আবৃত্তি সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে, অর্থাৎ Standard উচ্চারণের ওপর নির্ভর করা উচিত।

৪। সংগীতের ক্ষেত্রে উচ্চারণ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে রবীন্দ্র সংগীতের ক্ষেত্রে একথা আমরা বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি। রবীন্দ্র সংগীত বোধ হয় শিক্ষিতজনের জন্যে, কারণ কথা এখানে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। রবীন্দ্র সংগীতের জগতে ভাব, ভাষা, গোত্র, রীতি, উচ্চারণ প্রত্যেকের নিজ নিজ ভূমিকা রয়েছে। অহরহ দেখা যায় যে, কোন গায়ক বা গায়কীর কণ্ঠস্বর সুরেলা তথাপি সংগীতের মূল ভাবটি ফুটে উঠলো না। এমনতরো কেন হলো? অনেক কারণের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ কারণ হচ্ছে উচ্চারণ অস্পষ্টতা অথবা ভুল উচ্চারণ। যে গানে কথা ভাবকে ফুটিয়ে তুলছে সেখানে কথার সঙ্গে সুর যোজনাই শেষ কথা নয়। গানের কথাগুলিকে স্পষ্ট এবং সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে, যে শিল্পীর হাতে কথাগুলি শতদল হয়ে পাপড়ি মেলেছে তিনি লোক-প্রিয় হতে পেরেছেন। রবীন্দ্র সংগীতের ক্ষেত্রে উচ্চারণ যথাযথ হওয়া চাই, যেমন অনেক সময়ে শোনা যায় শিল্পীর উচ্চারণে 'বাঁশী', পাঁচ হয়ে গেছে বাশী, পাচ। তাছাড়া শ-এর উচ্চারণ কখনো কখনো এত বেশী সূক্ষ্ম হয়ে পড়ে যা কানে বড়ো বাজে। ও-কারের অ-কারী কারণ এ্যা এবং এ-র সমস্যা তো আছেই। শিল্পী নিজে থেকেই আপনার ভুল সংশোধন করে নিতে পারেন যদি তাঁর হাতের কাছে একখানি উচ্চারণ-কোষ থাকে। উচ্চারণের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে টানটোন, ঝোঁক, পূরকধ্বনি (allophone), juncture অর্থাৎ শব্দের মধ্যভাগে বা দুটি শব্দের মাঝে থামার ক্ষণ, সুর ছন্দ। সব কিছু সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা চাই। ধ্বনি বিজ্ঞানীদের সাহায্য ছাড়া এ ব্যাপারে পদে পদে ভুল হবার সম্ভাবনা। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সংগীতের ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে নিয়মিত পাঠ নিতে হয়। রবীন্দ্র সংগীতের ক্ষেত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের কয়েকটি গান ও আবৃত্তি এখনো রয়েছে এবং ওইগুলির পুনর্মুদ্রণের একান্ত প্রয়োজন, কারণ কবির উচ্চারণকে আভিধানিক করা উচিত; এই প্রসঙ্গে স্বরলিপি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, কবি কৃত অথবা কবির জীবদ্দশায় তাঁর অনুমোদিত স্বরলিপিই একমাত্র গ্রাহ্য হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। উচ্চারণ সম্পর্কে আলোচনা কালে স্বরলিপি সম্পর্কে দুচার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উচ্চারণের আলোচনায় সংগীত সম্পর্কে কিছু বলতে হলে স্বরলিপি সংক্রান্ত আলোচনা স্বভাবিক নিয়মে এসে পড়বে। একই স্বরলিপি অনুসরণ করা সত্ত্বেও সংগীত পরিবেশনে পার্থক্য থেকে যেতে পারে। স্বরলিপি অধিকতর সূক্ষ্ম হওয়া প্রয়োজন। এ কাজ সম্ভবপর হবে ধ্বনিবিজ্ঞানী এবং সংগীত-বেত্তা যদি একই ব্যক্তি হন। পরীক্ষা করে দেখানো যেতে পারে হয়ত ধ্বনিগত সূক্ষ্মতা এবং স্বরলিপিকে বৈজ্ঞানিক করে তুলতে নতুন কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্ন আমদানি করা যায় যাতে করে ব্যাকরণগত ত্রুটি রোধ করা সম্ভব। এইভাবে স্বর-লিপিকে হয়ত আরো জোরালো ব্যাকরণের সূত্রে বাঁধা যায়, তাতে করে মনে হয়, সুরের হেরফের হবার সম্ভাবনা যাবে কমে। রবীন্দ্র সংগীত সম্পর্কে এসব সাবধানতা অবলম্বন করা চাই। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্র সংগীত বাঙালী জাতির গর্বের ধন তার সংস্কৃতির মহান প্রতীক।

আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, উচ্চারণ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে আদর্শ উচ্চারণ-কোষের একান্ত প্রয়োজন। এবিষয়ে সকলের দৃষ্টি পড়লে বাধিত হবো। অভিধান আন্দোলনের অন্যান্য দিক নিয়েও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে তবে সেসব বিষয়ে আলোচনা করা এখানে সম্ভব হলো না।

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক,
অধ্যাপক—সংস্কৃত কলেজ

বাংলা ভাষার অভিধান

ভাষাতত্ত্বের প্রযুক্তিবিদ্যা হিসাবে যে প্রয়োগ অন্যান্য দেশে হয়েছে সে সম্পর্কে কতিপয় বিশেষজ্ঞ ছাড়া আমাদের দেশে অনেকেই অবহিত নন। ভারতে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভাষাতত্ত্ব (Linguistics) স্নাতকোত্তর বিভাগে একটি পঠনীয় বিষয়। গত ৭ই জানুয়ারীর 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীআশিস সান্যাল তাঁর 'বাংলা অভিধান প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার জন্য যে সর্বাংগ সুন্দর অভিধানের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছেন তা অভিনন্দন যোগ্য। এরূপ একটি প্রকল্প গ্রহণ করলে তাতে আধুনিক ভাষাতত্ত্বের প্রয়োগ যে অপরিহার্য এ কথা নিশ্চয় স্বীকার্য। আমার যাঁরা এ দেশী ও বিদেশী অবাঙ্গালী বন্ধু-বান্ধব আছেন তাঁদের কয়েকজনের বাংলা ভাষা শেখার সাগ্রহ প্রচেষ্টা যে ভাবে পর্যুদস্ত হয় তা যদি কোন বিদগ্ধ বাঙ্গালী দেখেন তা নিশ্চয় তাঁর কাছে অভিপ্রেত মনে হবে না।

বর্ণমালার অক্ষরগুলির যথাযথ উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। যেমন 'এ' বা 'অ' স্বরবর্ণটি। 'এক', 'দেখা', 'কেমন' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দে আদিতে 'এ'-ধ্বনি না হয়ে 'অ্যা'-ধ্বনি উচ্চারিত হয়। অবশ্য অঞ্চল বিশেষে এ-ধ্বনিও শোনা যায়। 'ধরিব, করিব, চলিব' ইত্যাদি শব্দে আদির ও অন্ত্য অ ধ্বনি উচ্চারিত হয় 'ও'-ধ্বনি হিসাবে। 'ণ' বর্ণমালায় আছে কিন্তু উচ্চারণে নেই। 'স' অক্ষরটি কোন কোন আঞ্চলিক বাংলার উচ্চারণে আছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এর উচ্চারণ 'শ'-এর মতোই। 'ষ'-এর উচ্চারণে 'শ'-এর সংগে কোন পার্থক্য নেই। এবং কিছু আঞ্চলিক ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণত 'শ' 'ষ', এবং স-এ, তিনটি ক্ষেত্রেই তালব্য শ প্রধানত উচ্চারিত হয়। এগুলি নতুন শিক্ষার্থী বিদেশীর নিকট পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন।

আঞ্চলিক ও স্ট্যাণ্ডার্ড কথ্য বাংলার খুঁটিনাটি ইডিয়ম, প্রবাদ, বিশেষ বিশেষ বাক্যাংশ ও কথ্য শব্দের এবং সেই সংগে এদের উচ্চারণ ভঙ্গী ও প্রয়োগ বিধির এবং অর্থের একটি সুষ্ঠু সমীক্ষা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা দরকার। এরপর যে সমস্ত ভাষা-ভাষীদের সংস্পর্শে আমাদের বেশী আসতে হয় তাঁদের মাতৃভাষা ও বাংলা ভাষা নিয়ে পৃথক পৃথক অভিধান তৈরী করা যেতে পারে। সুধী সমাজের জন্য একটি সর্বাঙ্গীন এবং শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিশেষ অভিধান তৈরী হলে সব দিক থেকে সুবিধা হয়। সামর্থবান আগ্রহশীল ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে আহ্বান জানালে উপযুক্ত কর্মীর অভাব হবে না বলে মনে করি।

অচিন্ত্যরঞ্জন দাস
গৌহাটি-১২

ইউরোপের স্বপ্ন-রাজ্য রিভিয়েরা

২২এ পৌষের 'দেশ'-এ জুলফিকার-লিখিত "ইউরোপের স্বপ্ন-রাজ্য রিভিয়েরা" পড়ে খুব ভালো লাগল। তবে তথ্যগত কয়েকটি ভ্রান্তি চোখে পড়ায় সেগুলি জানানো কর্তব্য বলে মনে করছি। যেমন—

"দ্যোভিল (Deauville), মন্তে কার্লো, সান সেবিস্টিয়ান [Sic] প্রভৃতি স্থানগুলিতে আন্তর্জাতিক ধনী ও শৌখিন চেঞ্জারদের ভিড় লেগেই আছে।" রিভিয়েরার প্রসংগে 'দ্যোভিল'-এর নাম আসতেই পারে না। কারণ, দ্যোভিল হচ্ছে ফ্রান্সের উত্তরে নরম্যাণ্ডি উপকূলে লে হ্যাভর (Le Havre) বন্দরের ন' মাইল দূরে অবস্থিত একটি জনপ্রিয় ফ্যাশনেবল গ্রীষ্মাবাস।

(২) "কানের পরেই সম্ভ্রান্ত ধনীদের (Cote-de-azur) এটা একটা বিশেষ প্রিয় আস্তানা (Rendezvans)" —এ মন্তব্য লেখক করেছেন 'জুয়াঁ লে প্যাঁ' নামক স্থান সম্বন্ধে। মনে হয় লেখক Cote D'Arzur বলতে "সম্ভ্রান্ত ধনীদের" বুঝেছেন। কিন্তু কোৎ দা'জুর' শব্দের সংগে নীল রক্তের আভিজাত্যের কোনো সম্পর্ক নেই। এ অঞ্চলে (রিভিয়েরায়) সমুদ্রে ও আকাশে যে প্রগাঢ় নীলিমা, এ উপকূলের নামেও সেই নীলিমার ছোপ লেগেছে। Cote D'Arzur শব্দের অর্থ ' নীল তট'— Azure Coast।

(৩) "পাহাড়ের উপর দিয়ে সমুদ্রের পাশে পাশে চলেছে রাস্তা—প্রশস্ত রাজবর্ত্ম, অনেক উ'চুতে—রোমানদের এ এক অপূর্ব কীর্তি!...প্রাচীন স্থাপত্যের বিস্ময়কর নিদর্শন! এই স্থাপত্য-কার্যে খানিকটা রোমানদের পূর্ববর্তী গ্রীকদের ও পরবর্তী তুর্কী বা সারাসেনদেরও অবদান রয়েছে।"—

—রিভিয়েরার উপকূলে শৈলগাত্রে তিনটি ভিন্ন স্তরে যে 'রাজবর্ত্ম', মোটরে বেড়ানোর পক্ষে এমন চমৎকার ও রোমান্টিক', সেগুলি সত্যিই কি অত প্রাচীন? পথ তিনটির মধ্যে যেটি সর্বোচ্চ—'গ্রাঁ কর্নিশ' নামে পরিচিত—সেটি সম্রাট প্রথম নেপোলিয়ন কর্তৃক নির্মিত; একটা বহু প্রাচীন জীর্ণ রোমান রাজপথের সুসংস্কৃত নবরূপ। সর্বনিম্নবর্তী পথটি মনাকোর এক প্রিন্স ১৮শ শতকে নির্মাণ করেন। মাঝের পথটি অতি আধুনিক। ১৯৩৯ সালে এটি উন্মুক্ত হয়েছিল মোটরবিহারী বিদেশী পর্যটকদের সুবিধার জন্য।

(৪) "ক'ই ও তার সন্নিকটে সাঁ পল ও ভেন্সেতে জনকত মার্কিন চিত্রকর...... একটা আধুনিক স্কুল বা Barbizon গড়ে তুলেছেন।" —চিত্রকলার 'একটা আধুনিক স্কুল'কে লেখক Barbizon বলে কেন উল্লেখ করেছেন, বুঝলাম না। কারণ, 'বারবিজন' ১৯শ শতকের একটি বিশেষ ফরাসী চিত্ররীতির নাম। রুশো, মিলে, কোরো প্রভৃতি ফরাসী চিত্রকররা ফ'তেনব্লো (Fontaineblue)-র সমীপবর্তী বারবিজন গ্রামে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে যে-বাস্তবনিষ্ঠ নিসর্গ-চিত্রাঙ্কন রীতির প্রবর্তন করেছিলেন, তাই বারবিজন' চিত্ররীতি নামে পরিচিত।

...এক জায়গায় বাষ্পীয় বজরা'র ইংরেজী দেখছি Yatch। এটা Yacht হবে। পরিশেষে এই তথ্যবহুল মনোরম প্রবন্ধের জন্য লেখককে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীমতী বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়
কলিকাতা-৩৭

হোল-নাইট

৩৪শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা দেশে শ্রদ্ধেয় শার্ঙ্গদেব 'হোল-নাইট' (গানের আসর)-এর একটি যথার্থ চিত্র এ'কেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বক্তব্য নিবেদন করতে চাই।

মহানাগরিক জীবনযাত্রার নিছক 'ফূর্তি'র জন্য প্রতিদিনই যদি গভীর রাত্রি পর্যন্ত নৈশ-জীবন অব্যাহত থাকে তবে অন্তত এক-চতুর্থাংশ শ্রোতার অনাবিল আনন্দের জন্য সাময়িকভাবে 'হোল-নাইটে' আপত্তি কেন? সারা বছর ধরে একাধিকবার 'হোল-নাইট' (concert জাতীয়) অনুষ্ঠিত হবার মত প্রেক্ষাগৃহের অভাব নেই কলকাতা শহরে। তাতে সমালোচক সন্তুষ্ট হবেন, শিল্পীর জীবিকার চিন্তা ঘুচবে, রসিক-চিত্তের তৃষ্ণা মিটবে, সর্বোপরি হুজুগেরা কল্কে পাবে না। রসিক-মাত্রেই স্বীকার করবেন, রাত গভীর না হলে গান জমে না। তবে একরাতে বা শেষরাতেই যদি সব ওস্তাদের মার হয় তবে অতি বড় সমজদারকেও গানে ভঙ্গ দিতে হয়। পর পর যাবতীয় মোগলাই খানা পরিবেশিত হলে যেমন ভোজনবিলাসীর প্রতি সুবিচার করা হয় না।

বৎসরের একটি সময় কনফারেন্সের বাড়াবাড়ি হলে হুজুগে-শ্রোতার ভিড় বাড়বেই। যন্ত্রসংগীত এবং মার্গ-সঙ্গীতের কেরামতির প্রতিই এ'দের আগ্রহ বেশী। ফলে বিশুদ্ধ সংগীত মার খায়। সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা থাকলেই সম্মেলনে উপস্থিত শ্রোতারা রসগ্রাহী হয়ে উঠবেন আশা করা যায় না। সংগীত সম্মেলনে বারে বারে গিয়েই শ্রোতারা রসিক হন। এ সম্বন্ধে 'কলকাতার ডায়েরীর' বক্তব্য স্মরণীয়। সমালোচকের ক্ষোভের জন্য দায়ী সামাজিক অবস্থা। সিনেমা, ক্রিকেট, জলসা কোথায় না এই হুজুগ আছে? ক্রিকেট, সিনেমা ও স্টার-অধ্যুষিত জলসার আর হোল-নাইটের মধ্যে তফাত এই যে, এখানে মাথা ফাটাফাটির কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ, সমস্ত ব্যাপারটাই ধীর, স্থির, পক্ক কেশের ব্যাপার।

বাণী দত্ত
সিউড়ী

"হেস্টিংসের একটি দলিল"

গত ৭ জানুয়ারীর পত্রিকায় শ্রীযুক্ত চিত্তপ্রিয় মিত্র 'হেস্টিংসের একটি দলিল' প্রসংগে কবি জন সোরের উল্লেখ করেছেন দেখলাম। এই জন সোর সম্বন্ধেই সম্ভবত হাণ্টার তাঁর The Annals of Rural Bengal (1868) গ্রন্থে লিখেছেন— 'At the beginning of famine, a young civilian landed in Calcutta who was destined to reach the highest post that a British subject can aspire to in the East.'—

জানিনা এই কবির কাব্য গ্রন্থ এখন সংগ্রহ করা যায় কিনা? তবে যে কবিতাটি শ্রীযুক্ত মিত্র উদ্ধার করেছেন, হাণ্টার তাঁর গ্রন্থে ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ বর্ণনায় সে কবিতাটির আরো অনেকখানি বা সম্পূর্ণ অংশই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দুঃখের কথা, শ্রী মিত্রের পাঠের সংগে এই পাঠ মিলছে না। Hark এর জায়গায় Hush, the dogs fell howl -এর পরিবর্তে The dog howl, as midst the glare of day এর স্থানে 'amidst glory day, they riot এর জায়গায় আশ্চর্যভাবে The rich, dire scenes এর স্থানে Dry scenes' এবং শেষে memory's page efface এর পরিবর্তে শ্রী মিত্রের শুধু memory efface মূলে কবিতাটিকে একদম বদলে দিয়েছে।

হাণ্টার উদ্ধৃত ঐ পাঁচ লাইন কবিতাটি এই রকম:—

'Hark to the jackal's yell and vulture's cry,
The dog's fell howl as midst the glare of day'
They riot unmolested on their pray!
Dire scenes of horror, which no pain can trace,
Nor rolling years from memory's page efface'.

হাণ্টার-এর উৎস হল memoir of the life and correspondents of John Lord Teign mouth, by his son. Vol 1, pp 25, 26, 8 Vo London 1943,

এখন আমাদের প্রশ্ন কোনটি মূল?

শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
হুগলী।

রুসো কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র "স্বপ্ন"

আঁরি রুসো

সিউরা, সিনাক এবং রেদোঁর অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে অবশেষে "স্বাধীন শিল্পী সমাজ" প্রতিষ্ঠিত হল ফ্রান্সে। এই সংঘের সভ্য হতে হলে আপনার কোনো ছবি আঁকার পরীক্ষা পাস করতে হবে না, কার ছাত্র জানতেও চাইবে না কেউ, শুধু কিছু ফী চাঁদা দিতে হবে, যার বিনিময়ে চিত্রকরের প্রদর্শিত চিত্রকে রক্ষা করা হবে জুরিদের কাঁচির হাত থেকে। এর ফলে আমরা জানি কত নতুন-নতুন ব্যাপার হয়েছে ছবির জগতে, কত মহৎ শিল্পী নতুন ধাঁচ প্রবর্তন করে গেছেন, বিশ শতকের সিংহদ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। কিন্তু উল্টোদিকেও যে কিছু হয় নি তা নয়। বহু বাজে লোক শুধুমাত্র চমক দিয়ে নাম করে নিয়েছে: আধুনিকতার নামে ছেলেমানুষির অন্ত ছিল না। একটি উদাহরণ দিই।

বিশ শতকের প্রারম্ভে এই সংঘের লোলো নামক এক চিত্রকরের নাম শুনেছেন কি? লোলো মানুষ নয়, আসলে একটি গাধা (গালাগাল দিয়ে বলছি না, সত্যিই সে একটি চতুষ্পদ জন্তু)। লোলো ছিল লাপাঁ আজিল কাবারের প্রপ্রাইটারের পোষা গাধা। রোলাঁ দরজেল, মঁমার্তের এক বুদ্ধিজীবি, প্রগতিবাদী আধুনিক শিল্পী, লোলোকে ধার নেন কিছুদিনের জন্য— তার মাথায় এক নতুন চিন্তা এসেছে। তিনি লোলোকে বাড়িতে এনে একটা মোটা তুলি রঙে চুবিয়ে সেটাকে বাঁধলেন লোলোর ল্যাজে, তারপর বেশ কিছু গাজর কিনে রাখলেন তার সামনে, লোলোর তো খুব ফূর্তি গাজর খায় আর লেজ নাচায়। রোলাঁ ঠিক এটাই চাচ্ছিলেন, তিনি একটা ক্যানভাস নিয়ে ঠেকিয়ে রাখলেন সেটা লোলোর ল্যাজের সঙ্গে— ক্যানভাস রঙে ভরে গেল। সেই গ্রীষ্মেই দেখা গেল প্রদর্শনীতে লোলোর পাঁচ ছ'টি ছবি, কাগজে কাগজে লোলোর প্রশংসা, নিন্দে কত কী।

কিন্তু এই সম্প্রদায় থেকেই আবার জন্ম নিয়েছেন "আধুনিক আদিম" শিল্পীরা, যাঁদের দলের নেতা ছিলেন আজকের আলোচ্য শিল্পী রুসো।

একটা সময়ে মানুষ মূর্খ ছিল, তখন খুব সহজেই সত্যি কথা বলে দেওয়া যেত— খিদে পেলে খেতে চাইতুম, চাঁদকে সুন্দর লাগত, প্রথম দেখায় প্রেম হত, মিথ্যে ব্যাপারটা জানা ছিল না, কান্না পেলে কেঁদে ফেলতুম। কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমান হতে থাকল যত, জ্ঞান বেড়ে চলতে লাগল, চালাকির জন্ম হল। আমরা নতুন কথা বলার জন্য খেপে উঠলাম, যা আগে ছিল তারই বিরুদ্ধতা করব ঠিক হল। আদিম অনুভূতি অস্বীকার করে আমরা বুদ্ধি দিয়ে বানানো সব অনুভূতি নিজেদের মধ্যে আনার চেষ্টা করলুম, জ্যোৎস্নায় না হেঁটে অমাবস্যায় বেড়াতে বেরুলাম, মন্দিরে জুতো পরে ঢুকে সিগোরেট খেতেই হল, প্রথম দর্শনে শরীর ছোঁবার আগেই যারা বিয়ের কথা ভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসলুম। কিন্তু দক্ষ এবং অভিজ্ঞ অভিনেতারও যেমন থিয়েটার শেষ হয়ে গেলে একটা সময় মেক-আপ অসহ্য হয়, তার্পিন তেল দিয়ে রঙ তুলে পা তুলে বসে চা খেতে ইচ্ছে হয় ঠিক তেমনি দীর্ঘকাল অভিনয়ের পরে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে মানুষের আবার পুনর্বার সেই "মূর্খ-যুগ"-এ ফিরে যাবার জন্য ছটফটানি আরম্ভ হয়েছে—মদ্যপের যেমন সকাল বেলা ঠাণ্ডা জল খাবার ইচ্ছে হয় তেমনি মানুষের আবার সরল জীবন ফিরে পাবার প্রয়োজন হয়েছে। —তাই, ১৯৫০ এর পর আমরা লক্ষ করি রুসোর ছবি আমাদের কাছে এক নতুন বার্তা নিয়ে উপস্থিত।

১৮৪৪ সালে আঁরি রুসোর জন্ম হয়, পিতা ছিলেন এক সামান্য ব্যবসায়ী। ইস্কুলের পড়া শেষ করে আঁরি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং সেই সূত্রে তাঁর যেতে হয় মেক্সিকোতে। মেক্সিকো থেকে ফিরে প্যারিসে শুল্ক-বিভাগে একটি ছোট চাকরি নেন। ১৮৮৫-তে সে চাকরি ছেড়ে ফরাসী সরকারের একটি বৃত্তি যোগাড় করেন। ইতিমধ্যে তিনি প্রথম স্ত্রী হারিয়ে, দ্বিতীয়ের সঙ্গে ঘর করছেন। রুসো বেহালা বাজাতে পারতেন, বেহালা বাজিয়ে কিছু পয়সা আসত; বৃত্তি, বেহালা বাজিয়ে পয়সা, এইসব মিলে দিন চলত।

ছবি আঁকাটা তাঁর কাছে এতদিন পর্যন্ত কিন্তু নিতান্ত রবিবারের মাছ ধরতে যাবার মতো ছিল। ছবির বিষয়ও তাঁর ছিল "ছুটির

দিন"—পরিবারের লোকেরা বা বন্ধুদের ছবি সেজেগুজে বাগানে বেড়াচ্ছে, কিংবা বুলভার্দে—পিকনিক হচ্ছে, মাছ ধরছে কেউ —এমনতর। কেউই তাঁকে তখনও চিত্রকর বলে চিনতে পারে নি।

১৯০৩ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে রুসো যে-সব বড় ক্যানভাস আঁকেন সেগুলি সবার দৃষ্টি কাড়ল। গিয়োম আপলিনেয়ার মুগ্ধ হলেন তাঁর ছবি দেখে ১৯০৬-এ এবং মুখে-মুখে নাম ছড়ালো এই "আধুনিক আদিম।" শিল্পীর। ছবির বিক্রি হতে থাকল, রুসো জীবনের শেষে এসে জানলেন আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। ১৯১০-এ রুসো মারা যান, তাঁর কবরলিপি লিখেছিলেন কবি আপলিনেয়ার।

রুসোর সে-সব জিনিসই দৃষ্টি আকর্ষণ করত যেগুলি সতেজ এবং সজীব, কিংবা বহু পুরোনো জিনিসেরও মধ্যে যে দিকটা সজীব সেটা রুসো দেখতে পেতেন। তাঁর কাছে স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে কোনো তফাত ছিল না, বাস্তবের চেয়েও স্বপ্ন তাঁর কাছে অধিক সত্য ছিল। যে-স্বপ্ন সত্য বলে জানেন তিনি কখনোই হাঁপিয়ে পড়তে পারেন না, কোনো কিছুই তাঁর কাছে পুরোনো হবে না, তাই হয়তো তাঁর ছবি কখনোই পুরোনো-নতুনের দ্বন্দ্বের ফলে সীমিত হয়ে পড়েনি। "ফোক আর্টে"ও এক ধরনের একঘেয়ে স্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু রুসোর মধ্যে সেই দোষ নেই, যদিও তাঁর ছবিতে গ্রামীণ স্বাদ সুস্পষ্ট। তার কারণ বোধ হয় এই যে রুসো "স্টাইল" সচেতন ছিলেন তাঁর সম্প্রদায়ের অন্যান্য শিল্পীদের মতোই। তাঁর সব ছবিতেই এক নতুন ফর্মের সাক্ষাৎ মেলে; রঙের সমতান অতুলনীয়, ছবির মধ্যে প্রত্যেকটি অংশ সম্পূর্ণভাবে আঁকা হচ্ছে, কিন্তু সব মিলিয়েও আবার এক।

রুসোর সংগে জীবনানন্দর কোথায় যেন একটা মিল আছে। জীবনানন্দর মধ্যে এক ধরনের গ্রাম্যতা রয়েছে; বুনো গন্ধ, আদিম সত্তা তাঁর কবিতার মোটা ভাষার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে; তিনিও সৃষ্টি করেন এক ধরনের মায়ার জগৎ। জীবনানন্দর কবিতাতে প্রায়ই এমন শব্দ আসে যা কবিপ্রসিদ্ধি দোষদুষ্ট, কিন্তু ঠিক সেই জায়গায় যেন তা মানিয়ে গেছে, অন্য কোনো শব্দ ভাবাই যায় না। রুসোর ছবিতেও এমন অনেক বর্ণ-বিন্যাস, অঙ্কনপদ্ধতি দেখা যায় যা হয়তো আলাদা করে দেখলে cliche বই কিছু নয় কিন্তু পুরো ছবিটার মধ্যে এমনভাবে তা মানিয়ে গেছে, অন্যরকম কল্পনা করা অসম্ভব। দুজনের মধ্যেই "জাদু" রয়েছে, রয়েছে ঋজুকথন, গ্রাম্য মোটা তার। রুসোর "স্বপ্ন" চিত্রটিকে সামনে রেখে আলোচনা করা যেতে পারে।

চিত্রটি একটি বিশাল ক্যানভাস, দেখা যাচ্ছে মরুপ্রদেশের কোনো গভীর জংগল, হাজার রকমের গাছ, ফল, ফুল; হিংস্র জন্তু, বুনো পাখি, আদিম অধিবাসী; বাঁ দিকে এই জংগলের মধ্যেই একটি লাল সোফা, নগ্ন অবস্থায় শায়িত তাতে চিত্রকরের রক্ষিতা, এবং মাঝে দণ্ডায়মান এক বাঁশি-বাদক। এত হাজার রকমের জিনিস বাছ-বিচারহীনভাবে ক্যানভাসে উপুড় করে ফেলার জন্য সমালোচক মুখ বেঁকিয়ে "নাইভ" বলতে পারেন। কিন্তু এই সংমিশ্রণের এক গভীর তাৎপর্য আছে।

তরুণ বয়সের মেক্সিকোর অভিজ্ঞতা রুসোর মনে এক সম্পদ হয়ে ছিল, মরু-প্রদেশের এই জংগলের মধ্যে সেই অতীত স্মৃতি লুকোনো। রুসোর আরেক ভালো-বাসার বস্তু ছিল এই লাল সোফাটি, যেটা নিয়ে প্রায়ই তিনি গর্ব করতেন, বর্তমানের এই প্রিয় বস্তুটি দেখা যাচ্ছে মিশে গেছে অতীতের সংগে; এবং তাঁর রক্ষিতাকে শায়িত অবস্থায় তিনি রেখেছেন এই মরু-প্রদেশের জংগলের মধ্যে, যিনি তাঁর বর্তমানের চোখের মণি। রুসোর স্বপ্নে অতীত বর্তমান মিশে তিনি নিজের জগৎকে সম্পূর্ণভাবে আমাদের কাছে প্রকাশ করে-ছেন তাঁর তিনটি চিন্তাকে একটি দৃশ্যে মিলিয়ে দিয়ে। স্বপ্ন যে কত বাস্তব, এবং কত সত্য তা যেন প্রমাণ করে এই ছবি—কল্পনারও যে বৃহত্তর এক ধরনের কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে এই ছবি তারই প্রমাণ।

শুদ্ধশীল বসু

টেবিলের উপরে যে আধার তাতে যখন ফল সাজান হয়, তখন তা দেখতে খুব ভাল লাগে; যিনি সাজাতে একনিষ্ঠ, তাঁর মুখখানি এখন সমস্ত কেয়ারিকে কেন্দ্র করে ভেসে বেড়ায়—এবার তিনি নিজের অন্ধকারটি ধীরে সরিয়ে নিলেন যাতে করে পুরো আলো এসে পড়ে সাজানতে, যাতে করে তা অর্থাৎ কারসাজ কতটা ছবিবদ্ধ হয়েছে পরিস্ফুট হয়।

আমরা বুঝি ঐ বিষয়ে তাঁর বিচার প্রথমত রঙ এবং রঙের মুখ চেয়ে—ক্বচিৎ কোন ফল কে বাঁকাভাবে বসিয়ে সুচতুর অনৈসর্গিক একটা ভাঙা-চোরা গঠন তিনি অজানিতেই করে ফেলেন—কোনটিকে আর একটার আড়ালেও এই সূত্রে রাখা হয়ত হল।

যখন আলো এসে পড়ে তখন স্পর্শন-প্রত্যক্ষ-সম্ভব টেকসচার তার আপন স্বকীয়তা নিয়ে দেখা দেয়, তখনই সজানটা কেমন অচেনা হয়ে যায়, তখন যতই আলো আনা যাক ততই কেমন সমস্ত ব্যাপারটা বিকৃত হয়ে ওঠে।

ফলগুলির নানাবিধ টেকসচার আর সাজির বুনন বা কট-গ্লাসের কদাচ-মসৃণতা ধরে সাজান ঘটে ওঠে না—সত্যিই এ বড় ভাগর সমস্যা—বলা যেতে পারে আধুনিক শিল্প চেতনার প্রশ্ন।

"...ছন্দ ছাড়া সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে একটা সূত্র আমাদের বড় বেশী করে নাড়া দেয় সেটা হচ্ছে টেকসচারের বিভিন্নতা—স্থানের (স্পেস) টেকসচার এবং সেই স্থানে বস্তুর টেকসচার—সিগারেটের কাগজ, চীনেমাটির ফুলদানি—এরপর টেকসচারের দিক থেকে অবয়বের সম্পর্ক রঙ ও ডোলয়ের সম্বন্ধ..."—পিকাসো—

সুনীল মাধব সেন-এর চিত্র প্রদর্শনী : লর্ড সিনহা রোড

বহু প্রাচনকাল থেকেই বহুতর মাধ্যমকে শিল্প সৃষ্টির কাজে লাগানোর একটা রেওয়াজ আছে, ইদানীংও দেশে বিদেশে অনেকেই এ বিষয়ে উৎসাহী—তাদের মধ্যে সুনীল মাধব সেন একজন। ইতিপূর্বে দেখা গেছে অনেক বস্তুর চেহারা থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী খেলে উঠেছে, অর্থাৎ তাঁর রোজকার জগত যখন অনেক কিছুকে অনেক কিছুর মতন বলে সনাক্ত করেছে। এবারকার মাধ্যম তাঁর জগত-আরোপের ক্ষেত্র।

যেমন গালার কাজে দেখা যায় অনেকটা সেই ধরনের, শিরীষ-জাতীয় আঠার প্রলেপ ক্যানভাস বা বোর্ডের উপর দিয়ে তার উপর আঁচড় কেটে করা। এই প্রলেপের

মাছ

শিল্পী : সুনীলমাধব সেন

দারুণ একটা টেকসচার আছে; আবার কোথাও জলের-ছড়ায় কিম্বা ব্রাশ বুলিয়ে তিনি তারতম্য ঘটিয়ে তুলেছেন। এখন কথা উঠে যে, সেই টেকসচার তার কেয়ারির মধ্যে দিয়ে কতটা বিকাশ লাভ করছে। যে সকল অবয়ব এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে, প্রিমিটিভ : লোক-শিল্পের, স্থাপত্যের, ইত্যাদি—সে সব ঐ টেকসচারে কিভাবে রূপ নিয়েছে তা ভেবে দেখার কথা। অনেক ছবিতেই হ্যাচিঙ বা ক্রশ-হ্যাচিঙ করে উৎকীর্ণ—শুধু নং ৯ ছবিতে বৃত্তাকার করে যন্ত্র ঘোরানতে টেকসচার খুব কাজ দিয়েছে। অন্যত্রে প্রলেপের র‍্যারণ্ট সিয়ানা বা ভ্যানডাইক ব্রাউন জাতীয় রঙ সুনীল-মাধব সেনকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর ৯, ১৪, ২৩ নয়নসুখ কাজ।

ডিজি (ডি জি কুলকারনি)—চিত্র প্রদর্শনী : ফাইন আর্টস ভবন।

আদতে ডিজি বোম্বাই শহরের একজন প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট। ইনি এখন ফ্রি প্রেস জার্নালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। এই প্রদর্শনীতে তাঁর ১৮টি কাজ ছিল। যে মানুষ প্রত্যহ ছোট স্পেস মনে রেখে কাজ

ড্রইং শিল্পী : ডি জি কুলকারনি

করে যায়; তাঁর দ্বারা এত বড় ক্যানভাস কিভাবে যে জব্দ করা সম্ভব হল তা বিস্ময়কর। প্রত্যেকটি ক্যানভাসের কোথাও অবহেলা নেই। প্রায় ছবিতেই ডি জির কিছু বলার আছে; এবং রঙ তিনি ব্যবহার করেছেন সেই বশে, যথা অপসরা—এখানে গোলাপী রঙের চতুর ব্যবহার; কিম্বা বার্ড কল্পনাটিতে নীলের সঙ্গে ওকর নীচে সাইকেল জাতীয় নকসা মিলে একটা ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেক ছবিতেই তিনি রেখার প্রাধান্য দিয়েছেন—ফলে ডিসটরস্যান-গুলি ন্যায়সঙ্গতভাবে গড়ে উঠেছে।

মানবেন্দ্র বড়ুয়া-র চিত্রপ্রদর্শনী : ফাইন আর্টস ভবন।

এই প্রদর্শনীর ছবিগুলিতে জলরঙ ও তেল রঙ তিনি নানাভাবে আরোপ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর রেখার ধারণা প্রায় ক্ষেত্রে ভারতীয়।

একদিকে তাঁর একাডেমিক আলেখ্য, অন্যদিকে জলরঙের টোন কোথাও থৈ পেতে চাইছে। তাঁর উচিত কোন একটা বিশেষ পথ ধরা—কেননা তাঁর রঙে বোধ আর রেখার রূপ সম্পর্কে যথেষ্ট চেতনা আছে। তাঁর নং ৩, ও অনেকগুলি জল-রঙে যথার্থ সরলতা বর্তমান।

অরণ্যদেব লী ফক

তারপরে তো আমি-
জানি… জানি… তারপরে কী হয়েছিল…
চুপ কর্ রাজা, ওঁকে বলতে দে……

বাস্, বেধে গেল দুই বাচ্চার মারামারি
তুই আমাকে আগে মেরেছিলি!

আর নয়, বাছা! চুপ করে বসে গল্প শোন।
আঁ-আঁ-
উঁ-উঁ-

'হঠাৎ আমাকে জেগে উঠতে দেখে শিকারী দুজন তো হতভম্ব!'

'দুটো ঘুষিতেই দুজনকে ঠাণ্ডা করে দিলাম!'
!

'জুমবার উপরে এতক্ষণে আমার চোখ পড়ল। ওদিকে বন্দুকের শব্দ শুনে একদল ওয়ামবেসি যোদ্ধাও সেখানে এসে হাজির।'
!?
আহা-রে, একেবারে দুধের বাচ্চা!
৪/২১

চার-চারজন বন্দুক-ধারীকে উনি একাই শায়েস্তা করে দিয়েছেন।
তা তো করবেনই। উনি যে অরণ্যদেব!

হাতির দাঁতের লোভে যে-ভাবে নির্দয়ে ওরা হাতি শিকার করে। তার জন্য ওদের শাস্তি পেতে হবে।… আচ্ছা, এই বাচ্চাটার বয়স কত, তোমরা বলতে পারো?
দু-তিন মাসের বেশী নয়।

তার মানে রাজার বয়সী। একে যদি গুহায় নিয়ে যাই তো রাজার সঙ্গী হবে। দুজনে বড় হয়ে উঠবে।

এই হল গিয়ে জুমবার গল্প।
দ্যাখো দ্যাখো, জুমবা কীভাবে শুঁড় তুলেছে!
ও জানে, ওরই গল্প হচ্ছিল
১৫

সাহিত্য সংবাদ

মঞ্চের উপর তরুণ কবি ●

মঞ্চের ওপর সভানেত্রী দীপ্তি ত্রিপাঠী, পাশের চেয়ারে একটি লাজুক ফুটফুটে চেহারার তরুণ, দু'-একজন অল্পচেনা কবি আশপাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন বারবার, একপাশে ঝোলানো একটি বিশাল ক্লাউন ও গাধার চিত্র, ঘোষণা করছেন কবিতা সিংহ। এই রকম একটি সভায় আমরা গত সপ্তাহে উপস্থিত হয়েছিলাম।

সভাটিতে কোনো গান বাজনা ছিল না, শেষের আকর্ষণ হিসেবে নাটকের অভিনয়ও ছিল না, সভাটি শুধুই কবিতা বিষয়ে এবং আবহাওয়া বেশ নাটকীয়। কৃত্তিবাস কবিগোষ্ঠী কোনো একজন তরুণ কবিকে পুরস্কার দেবার জন্য ঐ সভা ডেকেছেন। এরকম পুরস্কারের কথা অভূতপূর্ব এবং কৌতূহলোদ্দীপক, এ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে আমরা যা জানতে পারলুম, তা হচ্ছে এই :

বাংলাদেশের পুরস্কার দেবার ব্যবস্থাগুলি তরুণদের একেবারেই মনঃপূত নয়। তার অনেকগুলি কারণের মধ্যে মূল কারণটিই খুব স্বাভাবিক, এদেশে তরুণদের জন্য কোনো পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই। এখানে যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে অনলসভাবে লেখেন, তাঁরাই লেখক, এ ছাড়া প্রতিভার কোনো আলাদা বিচার হয় না। অথচ কোনো একটা বয়ঃসীমার মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখক কিংবা এক বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অথবা কোনো লেখকের সফল প্রথম বই—এগুলিকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করার ব্যবস্থা অন্য প্রায় সব দেশেই আছে। সুতরাং কৃত্তিবাস কবিগোষ্ঠী থেকে নিজেরাই একটি নতুন পুরস্কারের প্রবর্তন করলেন, পঁচিশ বছরের নিচে বয়েস, এমন কোনো সমুজ্জ্বল কবিকে এঁরা প্রতি বছর পুরস্কার দেবেন। (ওঁরা নিজেরাই এ পুরস্কার ভাগাভাগি করে নেবেন কিনা—এমন সন্দেহ হয়, কিন্তু জানা গেল, কৃত্তিবাস কবিগোষ্ঠী বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁদের সকলেরই বয়েস সদ্য তিরিশ পেরিয়েছে।) নজন কবির একটি বিচারকমণ্ডলী নির্বাচন করেছেন। ১৯৬৬ সালের জন্য কৃত্তিবাস পুরস্কার পেলেন শামসের আনোয়ার, তিনিই সেই মঞ্চে বসে থাকা লাজুক তরুণ, আমরা সনাক্ত করলুম। একবার তিনি মঞ্চ থেকে নেমে সভাকক্ষে এলেন, এবং আমরা শুনতে পেলুম, তিনি কাকে যেন ফিসফিস করে বলছেন, আমি আর বসতে পারছি না, আমার পা কাঁপছে। শামসের আনোয়ারের বয়েস বাইশ, চোখে চশমা ও কোঁকড়ানো চুলে ঝকঝকে চেহারা, জন্ম জলপাইগুড়িতে, এখন কলকাতার একটি কলেজে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে বি এ পড়ছেন, এ পর্যন্ত তাঁর কোনো কবিতার বই ছাপা হয়নি, কবিতা রচনা করছেন মাত্র তিন বছর ধরে, কিছু পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেদিনকার সভায় ঐ যুবকটিই কেন্দ্রমণি। তাঁর কবিতা পাঠ দিয়েই সভা শুরু হলো।

সভাটিতে অনেক অনন্যতা ছিল, কিন্তু প্রথম থেকেই আমাদের মনে এক বিষয়ে খটকা থেকে গেল। তরুণদের পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা থাকা ঠিকই, কিন্তু তরুণ লেখকরা নিজেরাই পুরস্কারের ব্যবস্থার জন্য এত ব্যগ্র হয়ে উঠলেন কেন? লেখকের কাজ লেখা, পুরস্কার দেবার দায়িত্ব অপরের। তা ছাড়া তরুণ বয়েসে পুরস্কার টুরস্কারের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখানোই তো স্বাভাবিক। ওঁরা কি

তরুণ কবি শামসের আনোয়ার

শুধু এই রকম কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চান, না কি নিজেরাই সমাজের হয়ে দায়িত্ব পালনে উদ্যোগী? এর উত্তর পাওয়া গেল না। তা ছাড়া একথাও মনে হয়, ঐটুকু একটা ছেলেকে অমন সম্মান দেখিয়ে মাথাটা ঘুরিয়ে দেওয়া হবে না তো? এরপরে যদি তার অহংকারে মাটিতে পা না পড়ে এবং খুবই কমে লিখতে শুরু করে? যেমন হয়েছিল কলিন উইলসনের? সম্ভবত, এ সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের বক্তব্য এই যে, পুরস্কারের মূল্য আর কিছুই না,

কবিতা আসলে যৌবনেরই দীপ্তি এবং এই পুরস্কার সেই যৌবন ও কবিতাকেই সম্মান জানানো, এবং ঐ বিশেষ কবির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা (এখানে স্বীকার করি, ঐ সভার আগে সামশের আনোয়ারের কবিতা আমরাও লক্ষ করিনি) এবং পুরস্কার পাবার পর যদি ঐ কবির অহংকার হয় এবং খারাপ লিখতে শুরু করে, তাতেই বা ক্ষতি কি—অনেকেই তো খারাপ লেখে,—কিন্তু একজন যে নতুন রকম লেখার চেষ্টা করেছিল তারও স্বীকৃতি জানানো প্রয়োজন।

পুরস্কারের অর্থমূল্য একশো টাকা, কিন্তু টাকা না দিয়ে ঐ টাকার কেনা একটি ছবি দেওয়া হয়েছে। ছবিটি কিছুদিন আগে মৃত শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের আঁকা, মঞ্চে ঝোলানো সেই গাধার পাশে দাঁড়ানো বিষণ্ণ ক্লাউনের ছবি। অর্থাৎ এই সঙ্গে কবিরা শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। ব্যাপারটি নিশ্চিত ধরে সৎ ও শুভ, কিন্তু কৃত্তিবাসের উগ্র কবিগোষ্ঠী, যাঁদের কিছু কিছু অসমীচিন ক্রিয়াকলাপ আমাদের মনে কখনো কখনো ভীতির সঞ্চার করে, তাঁদের এ রকম আকস্মিক নির্বাচন পরিকল্পনা কিছুটা হকচকিয়ে ওঠার মতন।

সভাটির অধিনায়ক ছিলেন তারাপদ রায়, তিনি মাঝে মাঝেই ললিত গর্জনে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলছিলেন। তাঁর কাছ থেকে জানা গেল, পুরস্কার ও সভার ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তাঁদের নেই, প্রথম বছরের পুরস্কারের অর্থ সাহায্য করেছেন একজন কবিতা-অনুরাগী সম্পাদক। দ্বিতীয় বছরের অর্থ সাহায্য করার জন্য তিনি দর্শকদের মধ্যে যে-কোনো একজনকে সুযোগ দিতে রাজী আছেন। ওভারটুন হল মহিলা ও পুরুষ দর্শকে পূর্ণ ছিল, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেবার সুযোগ নিতে সেদিন অন্তত কাউকে দেখা যায়নি। সুতরাং আগামী বছরেও এ রকম একটি উপভোগ্য আসর জমবে কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ রয়ে গেল।

সেদিনকার আসরটি উপভোগ্য হয়েছিল ঠিকই। কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর বারোজন কবি কোনোরূপ বক্তৃতা না দিয়ে নিজেদের কবিতা পড়ে শুনিয়েছেন, কেউ উদাত্ত কেউ চাপা গলায়। কবিতা পাঠের মধ্যে কোনো আড়ষ্টতা বা চেষ্টাকৃত গাম্ভীর্য ছিল না, হালকা, খোলামেলা ধরনের, কখনো পড়া থামিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে কথা বলা, একজনকে অনেকগুলো পড়ার পর বলা হলো আর না, এবার থাক—তিনি বললেন, উহুঃ, আমার সাত নম্বর কবিতাটা না পড়ে আমি এখান থেকে নড়ছি না। দর্শকদের অংশও বেশ "জীবন্ত" ছিল, সরব অভ্যর্থনা, অমুককে চাই কিংবা অমুককে চাই না, অমুকের অমুক কবিতা চাই, অসময়ে হাততালি, পায়ের শব্দ এবং সবশেষে কিছু হতাশ তরুণ ফুসফুসের জোর প্রমাণ করার জন্য লম্বা লম্বা শিসও দিচ্ছিলেন। হঠাৎ দর্শকদের মধ্য থেকে উঠে অমিতাভ চৌধুরী কয়েকটি চমৎকার ছড়া শুনিয়ে হাসির হুল্লোড় বইয়ে দিলেন। দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর লিখিতভাবে সাম্প্রতিক কবিতার চুলচেরা আলোচনা করছিলেন, হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, কে বললে এখনকার কবিতায় কিছু হচ্ছে না? তিনি কৌতুহলময় উদ্ভাসিত মুখে শ্রোতাদের দিকে তাকালেন তারপর টেবিলে চাপড় মেরে বললেন, কবিতা হয়েছে! হচ্ছে! হবে! তাঁকে সমর্থন জানিয়ে সভা শেষ মনে করে সকলে উঠে দাঁড়িয়েছিল এমন সময় লাফিয়ে উঠে গেলেন সুশীল রায়, বললেন, সত্যিই কি কবিতা হচ্ছে? এ সমস্ত পুরস্কার, সভার ব্যবস্থা এ সবই তো খুব ভালো, কিন্তু কবিতা কোথায়? এখন যা লেখা হচ্ছে, তা কি কবিতা? কবিতা যদি হয় তবে তার মধ্যে ছন্দ নেই কেন? সুশীল রায়ের সমর্থন জানালেন শ্রোতাদের এক অংশ। কিন্তু কবিতা যে হচ্ছে যেন তা প্রমাণ করার জন্যই অত্যন্ত একজন অচেনা তরুণ, নাম জানা গেল অনুপম রায়, দ্রুত মঞ্চে উঠে গেলেন, এবং দুমদাম করে নিজের কবিতা পড়তে শুরু করলেন।

অধিকাংশ সাহিত্য সভাতেই এখন কোলাহল শেষে ভুল হয়, এমনই অস্পষ্ট ও গম্ভীর আশংকা থাকে। ঐ সভা থেকে যখন আমরা বেরিয়ে এলাম, তখন দেখা গেল, আমাদের মত অন্যান্য দর্শক-শ্রোতা-দেরও ঠোঁটে মৃদু হাসি লিপ্ত। সভা থেকে বেরিয়ে, ভিড়ের বাসে উঠেও অবশ্য বিরক্তি বোধ করিনি।

অনুপস্থিত কাব্যানুরাগীদের জন্য, আমরা সেই সভার স্মারকপত্র থেকে শামসের আনোয়ারের একটি কবিতা এখানে উদ্ধার করছি।

ঘোরালো সিঁড়ি বেয়ে

ভিতর ও বাহির
আমি তো ক্রমাগত এ-রকমই ভিতর ও বাহির
জীবনের ঘোরালো সিঁড়ি বেয়ে
রিটায়ারিং রুম
আমাকে বড় টানে ঐ ঘর
আমি কোথায় প্রত্যাবর্তন করবো এখন
আমার কি বয়েস হয়েছে
ঐ ঘরের ওপর রেডক্রশের আড়াআড়ি লাল দাগ
তোমার উদাস কপালের ঘোর টিকার মত
তীব্র নিশ্চুপ জ্বলে .
আমার ভীষণ ভয় হয়
আমাকে কপাল ও বুমকুম দুই-ই বড় টানে
কিন্তু আমি কোথায় প্রত্যাবর্তন করবো এখন
আমি তো ক্রমাগত এ-রকমই ভিতর ও বাহির
জীবনের ঘোরালো সিঁড়ি বেয়ে...

সনাতন পাঠক

অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হয় শৈলকে। পাঁচ বছর ধরে হাঁটছে। আরও কতোদিন হাঁটবে কে জানে। দশ পনেরো কিংবা কুড়ি। সে হিসেব এখন করেনা শৈল। হিসেব করতে বসলেই কেমন সব তালগোল পাকিয়ে যায়। চেষ্টা করেও চোখের সামনে থেকে চিন্তা বা ভাবনা নামক ধোঁয়াগুলোকে সরাতে পারে না। দৃষ্টির সামনে এসে ওগুলো সাপের মত কুণ্ডলী পাকায়। কিছু দেখতে পায় না শৈল। দেখতে দেয় না।

এই তো সেদিন। সে যেন একরত্তি মেয়ে ছিল। বেশ সুখেই ছিল। কখনও আপন মনে নাচত, গাইত, খেলা করত, কখনও বা কান্নায় ভেঙে পড়ত। সে দিন থেকে একলা অনেকটা পথ যেন এগিয়ে এসেছে শৈল। আজও মনে পড়ে শৈলর, শহরতলির এই রাস্তা দিয়ে সেই ফ্রকপরা মেয়েটা কতো হেঁটেছে। তখন তো এতো দ্বিধা ছিল না। আরও কতো মেয়ে সঙ্গে থাকতো। সকলেই তো গাঁথা রয়েছে মনে। অণিমা, শীলা, পুষ্প সুধা, রমা, মীরা, আরও কতো কতো মুখ ভেসে ওঠে স্মৃতিতে।

অণিমার গলা ভাল চমৎকার গাইতে পারতো সে। স্কুলে পড়তে পড়তে অনেক কম্পিটিসানে গান করেছে। প্রাইজ পেয়েছে। শৈল নিজেও একটু আধটু গান জানতো। জলসায় না গাইলেও অনেক বিয়ের বাসরে গাইতে হয়েছে। প্রাইজ না পেলেও প্রশংসা সে কুড়োয়নি, এমন নয়। সেবারে রাঙাকাকুর অফিসের এক বন্ধু এসেছিল বেড়াতে। কি যেন নাম।

নামটা মনে না এলেও চেহারাটা মনে আসছে। বেশ সুন্দর চেহারা। গায়ের রঙটা যেন বেশী ফর্সা। চোখ দুটো ভাসা ভাসা। নাকটা উঁচু। গোঁফটা সরু। যত্ন করেই ছাঁটা। খুব গম্ভীর নয়, আবার খুব যে হালকা, তা-ও নয়। সবকিছু মিলিয়ে রাঙাকাকুর বন্ধুকে ভাল লেগেছিল শৈলর।

রাঙাকাকু এসেই ডাকল, শৈলী শোন্।

প্রথম প্রথম লজ্জা একটু হয়েছিল শৈলর। সেও সাময়িক। ঘর থেকে পালিয়ে গিয়েও ফিরে এসেছিল।

রাঙাকাকু বসেছিল খাটে। তিনি বসে-ছিলেন চেয়ারে। এখন যেটার একটা হাতল ভাঙা এবং পায়াটা ভেঙে নড়বড়ে হওয়ায় কাউকে বসতে দেওয়া হয় না সেই চেয়ারটিতে বসেছিলেন তিনি। বসে বসে দেখছিলেন শৈলকে।

দেখবার কি ছিল। শৈল কোনদিন রূপসী নয়। বরং মায়ের চোখে সে কুৎসিত। বাবার চোখে মোটামুটি সুশ্রী। ওরই মধ্যে সেদিন একটু সেজেছিল শৈল। সাজিয়েছিল মা। এখনও মনে পড়ে শৈলর, চিরুনি দিয়ে চুলের জট ছাড়াতে ছাড়াতে মা বলেছিল, 'আহা কি ছিরি চেহেরার। যেমন ছিরি তেমনি গুণ বাছার।'

মায়ের মুখে এমনি কথা প্রায়ই শুনেছে শৈল। ব্যথা পেয়েছে একটু আধটু। মাঝে মাঝে রাগও হয়েছে। সে রূপসী নয় এতো জানা কথা। মা-ই বা কি এমন রূপসী। শৈল যা, তাই। এ নিয়ে খোঁটা দেবার অধিকার কারও নেই। রূপ তো ভগবানের হাতে। শৈলর অপরাধ কোথায়! দু একটা জলের ফোঁটা শৈলর চোখ থেকে গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল।

'স্বাজির জট পাকাবে মেয়ে। চিরুনি দিলেই এখন কান্না।'

চিরুনি দিয়ে জট ছাড়াবার দরুন যে কান্না এসেছিল তা নয়। মা কোনদিন বুঝবে না শৈলর ব্যথা কোথায়। বুঝতে গেলে মাকে আবার ছোট হয়ে তার মতো হতে হবে।

রাঙাকাকুর পাশে এসে বসেছিল শৈল। রাঙাকাকু ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, 'এই দ্যাখ আমার ভাইঝি শৈলী। বাঃ বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে।'

খুশী হল শৈল। তবে সে খুশীটা এখানে প্রকাশ করা চলে না। অতএব লজ্জায় মুখটা নামিয়ে নিতে হল।

'লজ্জা কিরে। আমার বন্ধু। এক সঙ্গে কাজ করি।'

রাঙাকাকু যেন কী। বন্ধু হোক। একসঙ্গে কাজ করুক শৈলের লজ্জার কারণটা অন্যখানে।

রাঙাকাকু বরাবর এমনি প্রশংসা করে। বাবাও করেন। করে না শুধু মা। মায়ের মুখ থেকে এমনি কথা কখনও শোনেননি শৈল। বরং শৈলকে দেখলেই যেন মায়ের মাথাটা গরম হয়। কেবল বলে, 'তোরা বাপ বেটি দুজনে মিলে আমাকে পাগল করবি।'

শৈল বোঝে না মায়ের মাথাটা সহজে গরম হয় কেন। এবং মায়ের পাগল হবার জন্যে শৈলের সঙ্গে সঙ্গে বাবাই বা দায়ী হবেন কেন। আড়ালে দাঁড়িয়ে মাকে ভেংচি কেটেছে শৈল। মনে মনে বলেছে, 'ঢঙ'। কথাটা মায়ের কাছ থেকেই শেখা। আবার মাকে ফিরিয়ে দিয়ে বেশ একটা তৃপ্তি পায় সে। শুধু দুঃখ হয় বাবার জন্যে। মায়ের স্পষ্ট অভিযোগের সামনে বাবাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেমন যেন মায়া হয় শৈলর।

মায়ের অভিযোগের কারণটা বুঝতে পারে শৈল। এ সংসারে যাদের মানুষ করবার সামর্থ্য নেই তাদের না আনলেও চলতো। শৈল বোঝে ওরা চার ভাই বোন মিলে এ সংসারের বোঝা বাড়িয়েছে। ওদেরকে আনতে চায়নি মা। এ জন্যে বাবাই সম্পূর্ণ দায়ী। শৈলর [illegible] মনটা তাই বাবার জন্যে কাঁদে [illegible]। সে যে এসেছে এজন্যে বাবার চেয়ে নিজের অপরাধটাই যেন বেশী হয়ে ওঠে।

বাবা যখন নিরুত্তর হয়ে থাকেন এবং মায়ের গলাটা উত্তরোত্তর চড়তে থাকে তখন দুঃখে ক্ষোভে এবং অভিমানে শৈলর মনটা ভরে ওঠে। [illegible] নিয়ে বাইরে [illegible] দেখে সে, পৃথিবীটা কতো বড়ো। এ ঘর, এ বাড়ি, এ [illegible] ভাল লাগে না। [illegible] মিটমিটি [illegible] করে [illegible]।

স্মৃতির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কিছু পথ এগিয়ে এল শৈল। স্টেশন থেকে অন্তত আধঘণ্টা হাঁটতে হয় তাকে। সোজা পথে গেলে একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছোনো যেত। তবে সে পথে যায় না শৈল। ও পাড়ার ছেলেগুলো তেমন ভাল নয়। দল বেঁধে রাস্তায় জটলা করে। অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে। মাঝে মাঝে দু একটা খারাপ কথাও শৈলর কানে আসে।

'কোথায় যায় বলতো?'

'কোথায় যাবে আবার...চরতে, চরাতে যায় বুঝলি।'

'কি আছে যে চরাবে।'

'ওতেই চলবে। কলকাতায় রদ্দি মালও চলে।'

'দেখছিস না কেমন রঙ পাল্টাচ্ছে দিন দিন।'

আর শুনতে পারেনি শৈল। কানে আঙুল দেওয়াই উচিত ছিল। দ্রুত পা চালাল শৈল। ঠিক সে সময় জুতোর স্ট্র্যাপটাও গেল ছিঁড়ে। এতোখানি বিড়ম্বনার মধ্যে বোধ হয় সে জীবনে কোনদিন পড়েনি বা পড়তে হয়নি তাকে। পিছন ফিরে তাকাবার মত অবস্থা নেই শৈলর। বুক কাঁপছে তার। অনেকগুলো অশ্লীল দৃষ্টি যেন তাকে অনুসরণ করে ছুটে আসছে। অগত্যা জুতোটা খুলে হাতে নিয়ে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো। এক সঙ্গে অনেকগুলো শিস শুনতে পেল। মোড়টা ঘুরে এসে বেশ কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়ল শৈল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল ছেলেগুলোকে দেখা যায় কিনা। হাঁপাতে হাঁপাতে সেদিনই শৈল প্রতিজ্ঞা করেছিল, ও পথ দিয়ে এ জীবনে আর চলবে না। এত অপমানের পরেও সে যে পালিয়ে আসতে পেরেছে এজন্যে মনে মনে বেশ কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলো।

পালিয়েছে শৈল। পালিয়েও একেবারে রেহাই পায়নি সে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথেই সাইকেল রিক্সাওয়ালাগুলো তাকিয়ে ইশারা করে। নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করে। বিশ্রীভাবে হেসে দেয়। শৈল মুখ নামিয়ে চলে। আজকাল যে পথ দিয়ে যাতায়াত করছে সে পথটা তেমন চওড়া নয়। রিক্সাগুলো যাবার সময় গা ঘেঁষে যায়। সরে দাঁড়াতে হয় শৈলকে। ওরা যাবার সময় গান গেয়ে যায়। দু একটা হিন্দী গানের কলি এসে শৈলর কানে লাগে। পান বিড়ি ইত্যাদি বা স্টেশনারী দোকান থেকে এক ঝাঁক দৃষ্টি এসে পড়ে শৈলর দিকে।

পথটা কম নয়। শৈলর চেনা পথ। ছ মাস ধরে এই পথ দিয়ে বই নিয়ে স্কুলে গেছে। তখন সে একা ছিল না। সঙ্গে শীলা ছিল। আজ আর নেই। সে যার পথ বেছে নিয়ে চলে গেছে। আজও একা শৈলকে যেতে হচ্ছে। একই পথ দিয়ে।

কদিন আগেই তো দেখা হয়েছিল শীলার সাথে। রিক্সা করে যাচ্ছিল ওরা। শীলা আর তার বর। শৈলকে দেখে ওরা দাঁড় করালো রিক্সা।

'কিরে, শৈলী না।'

'শীলা তুই..'

'হ্যারে আমি সেই শীলা। আর ইনি কে বুঝতে পারছিস নিশ্চয়।'

বুঝতে পারারই তো কথা। শীলা বেশ মোটা হয়েছে। আগের চেয়ে যেন একটু ফর্সাও হয়েছে। ওর সিঁথিতে সিঁদুর আর মাথার [illegible] ওকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। শীলার বরকে দেখল শৈল। বেশ সুন্দর। [illegible] চেহারা। [illegible] শীলা, 'আমার বন্ধু শৈল। এক সঙ্গে পড়েছি, গল্প করেছি। যায় না শৈল একদিন।'

'যাবো। তুই তো অনেক আসছিস। কদিন থাকবি।'

'বেশী দিন নয়। ওঁর আবার সময় কম। তুই বরং কাল আয়।'

'কখন যাবো?'

'এই দুপুরের আয়।'

শীলা জানে না শৈলর দুপুরটা কাটে কোথায়। ইচ্ছে ছিল না জানাতে। শীলার সাথে সাথে ভদ্রলোক [illegible] বললেন, '[illegible]'

'দুপুরের সময় হবে না শীলা। দুপুরে আমার কাজ থাকে।'

'তবে চল একদিন আমাদের কলকাতার বাসায়।'

শীলা, শীলা শীলাই ছাড়বে না শৈলকে। ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা ছাপানো কার্ড নিয়ে বললেন, 'এই ঠিকানা। আসবেন তো।'

কথা কেড়ে সম্মতি জানাতে মাথা হেলাল শৈল। ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। রিক্সাটা যতক্ষণ চোখের সামনে ছিল ততক্ষণ ঠিক [illegible] সে কার্ডটা দেখেনি। ওরা চলে যেতেই পড়ে দেখল। শীলার বর ডাক্তার। এ নিয়ে বেশ বড় শীলার গর্ব। এজন্যেই শীলা এমন করে কার্ডটা দিয়ে গেল। এর অর্থ বোঝে শৈল। কার্ডটাকে তাই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে পাশের ঐ নর্দমায় ফেলে দিল। মনে মনে সত্যই সে হাসল। শীলার বর যাই হোক না এর বেশী কি আশা করতে পারে।

আজ মনে হল শৈলর সেদিন কাজটা সে ভাল করেনি। বরং শীলার বরের সাথে আলাপ থাকলে ওর নিজেরই কাজে লাগত। বেঁচে থাকতে গেলে একজন ডাক্তারও প্রয়োজন। বাবা তো দীর্ঘদিন

ধরে ডায়াবিটিসে ভুগছে। ডাক্তার অভাবে চিকিৎসা হয় না। এখন তো শয্যাশায়ী। সংসারের সমস্ত বোঝা টানতে হচ্ছে একা শৈলকে। মা-ও বাতে প্রায় পঙ্গু। মেজ বোনটা দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া শৈলর নিজের ভেতরেও কতো রকম ব্যাধি বাসা বেঁধেছে কে জানে। প্রায়ই মাথা ঘোরে। মাঝে মাঝে অসহ্য পেটের যন্ত্রণায় বিছানায় শুয়ে ছটফট করে শৈল।

ইদানীং আয়নায় মুখ দেখে নিজেকে চিনতে কষ্ট হয় শৈলর। চোখের কোণে যেন অনেক বছর ধরে কালি জমেছে। মুখের উপর কিসের একটা ছোপ পড়ে রঙটা কেমন পোড়া পোড়া দেখায়। মাথায় সে ঘন চুল আর নেই। চিরুনিটা একবার ছোঁয়ালে ভুস ভুস করে সব চুল উঠে আসে। খুব ভাল করে দেখলে দু একটা পাকা চুলও খুঁজে পায়।

মেজ বোন টুনি তো সেদিন প্রথম আবিষ্কার করল, 'দিদি তোর চুল পেকে গেছে।'

'পাকবে না, তোর দিদির বয়েসটা তো বাড়ছে।'

'ধেৎ, তোর আবার বয়েস। উকিলের মেয়ে রেণু তোর চেয়ে না কতো বড়ো। ও কেমন সেজেগুজে বেড়ায়।'

হ্যাঁ, শৈল তা জানে। রেণুর বয়েস শৈলর চেয়ে অনেক বেশী। শৈল যখন স্কুলে পড়তো, ফ্রক পরতো, তখনও রেণুকে ঐ রকম দেখেছে। উত্তরপাড়া কলোনীর সবাই জানে রেণুর বিয়ের বয়েস পেরিয়ে গেছে। ও বিয়ে করবে না। ওর সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছে শৈল।

শৈল ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। লোকে বললে রেণুর কি আসে যায়। ও নিজে তো সুখী। এটাই বা কম কিসে। টুনি যে রেণুর পাশে রেখে দিদির জন্যে দুঃখ বোধ করছে এতে শৈলও সুখী। আর কারও কিছু যায় আসে না।

'টুনু...'

'কি দিদি।'

'তুই দিন দিন কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছিস। বড়ো হলে বিয়ে দেবো কি করে।'

'বিয়ে আমি করবো না।'

না, এতটুকু অবাক হয়নি শৈল। টুনি ঠিকই বলেছে। আজকাল সবাই বলছে একথা। কি হবে বিয়ে করে। বিয়ে তো সুখের জন্যে। কিন্তু কোথায় সে সুখ, সে শান্তি। কটা পরিবার দেখেছে শৈল যেখানে সুখ-শান্তি পুরোমাত্রায় রয়েছে। নিজের বোনকে ভাল করে দেখল শৈল। সে বোঝে। দিদিকে তোয়াজ করে টুনি, যাতে তার স্কুলের পড়াটা বন্ধ না হয়। বেশ তো, যেমন করে হোক শৈল পড়াবে টুনিকে। না হয় সন্ধ্যেবেলা একটা টুইশানী করবে শৈল। ও পড়ে পড়ুক।

হাঁটতে হাঁটতে শৈল স্কুল বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। ওর ছেলেবেলার স্কুল। স্কুলের সামনে ঘেরা মাঠ। মাঠের পাশেই গঙ্গা। এদিকে রাস্তার আলো একটু কম। এখানকার বহু লোক এদিকে বেড়াতে আসে। মেয়েরাও আসে। এমন কি ছেলেমেয়ে এক সঙ্গে এসে বসে, গল্প করে তারপর আলাদা হয়ে চলে যায়। এসব শৈলর দেখা।

ঠিক করল শৈল, গঙ্গার ধারে একটু বসবে। ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগিয়ে আটটা নাগাদ ঘরে ফিরবে। সামনেই সান বাঁধানো ঘাট। ওখানে গিয়ে বসল শৈল। একেবারে গঙ্গার মুখোমুখি। বিকেলের পড়ন্ত রোদটুকু এসে পড়েছে নিস্তরঙ্গ গঙ্গার বুকে। ঝিরঝিরে হাওয়ার আমেজ লাগছে গায়ে। সিঁড়ির ধাপে বসে শৈল দেখল, পালতুলে হাওয়ার টানে নৌকোগুলো তরতর করে এগিয়ে চলেছে। জেলে-ডিঙিগুলো জেলেরা মাছ ধরছে। গঙ্গার ওপারটা স্পষ্ট দেখা না গেলেও সেই মিলের বাঁশিটা শুনতে পেল শৈল। ঝিরঝিরে বাতাসে শৈলর মনে হল তার চুলগুলো নিয়ে কে যেন খেলা করছে। সুড়সুড়ি করছে।

এ সময় আবার শীলার কথাটা মনে পড়ল। ওর বরকে সেদিন মন্দ লাগেনি। শীলা কি চেয়েছিল। হয়ত ওরা শৈলকে দেখাতে চেয়েছিল যে সে সুখী। দেখতে চায়নি শৈল। হয়তো নিছক ঈর্ষা। সত্যিই তো, শৈল নিজে কি পেল। আজও বুঝতে পারে না শৈল কবে এসেছিল তার যৌবন, হয়ত বা অজান্তে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে। দেখতে পায়নি শৈল। অযথা আর আফসোস করে লাভ নেই।

বাবার বন্ধুর চেষ্টায় চাকরিটা পেয়েছিল শৈল। তিনি একদিন বলেছিলেন, 'চলো না শৈল একটু বেড়িয়ে আসি।'

'কোথায় যাবেন কাকু?'

'যেখানে খুশী তুমি যেখানে বলবে।'

ভেবেচিন্তে দক্ষিণেশ্বর যাওয়াই স্থির করল শৈল। ইচ্ছে ছিল চাকরি হবার জন্যে পুজো দেবে। বাবার বন্ধু খুশী হলেন। ধর্মতলা থেকে বত্রিশ নম্বর বাসে চেপে বসেছিল শৈল। বাবার বন্ধু বসেছিলেন পাশে। শৈলর কাঁধের উপর হাতটা রেখে ছিলেন তিনি। বাসটা এগিয়ে চলেছে শৈলর একটু লজ্জা করছিল। পরমুহূর্তে সে ভেবেছিল লজ্জা করাটা অন্যায়। হাজা

ও তিনি বাবার বন্ধু। বাবার সমবয়সী। মাথার চুল সবগুলিই প্রায় পেকেছে। বাসের লোকেরা কি এতখানি র চিন্তা করবে।

যেতে যেতে বাবার বন্ধুকে হঠাৎ প্রশ্ন ল শৈল, 'কাকু, আপনার মেয়ে আছে?'

'হ্যাঁ, বড়ো মেয়ের বিয়ে দিয়েছি।'

'আপনার ছেলে কি করে?'

'সে হতভাগার কথা আর বোলো না।'

ল বুঝল উনি ছেলেকে নিয়ে তেমন খী নন।

'কেন, আপনার কথা শোনেন না বুঝি?'

'সে কারও কথাই শোনে না। দিনরাত বু সেজে ঘুরছে, সিগারেট ফুঁকছে। াজগারের নামগন্ধ নেই।'

শৈল আর কিছু বলল না। এর চেয়ে ঃখের আর কি হতে পারে। ছেলের উপর তো আশা থাকে বাপ-মায়ের। শৈলর িজের যদি একটা দাদা থাকতো তাহলে ত বড়ো দায়িত্বের বোঝা তাকে এমনভাবে হন করতে হত না। নিষ্কৃতি মিলত ন্তত এ জীবনের মত।

বাসটা পেঁছোতে প্রায় একটা ঘণ্টা লাগল। শল নামল। তিনিও নামলেন। শৈল ভাবছিল, ওদের সঙ্গে বাবা থাকলে আজ তো ভাল হত। ওঁরা দুজন বন্ধু ালাপ আলোচনায় খুশী হতে পারতেন। সেই সঙ্গে সে নিজেও আনন্দ পেত।

মন্দিরে এসে প্রথমেই মিষ্টির একটা ডালা কিনল শৈল। জুতোটা খুলে রেখে টিকিট নিয়ে ভেতরে ঢুকল। পুজো দেবার যাবতীয় কাজটা তাকেই সারতে হল। বাবার বন্ধু সব কিছু দেখলেন দাঁড়িয়ে। পুজো দেওয়া শেষ করেই বলল শৈল, 'চলুন কাকু, এবারে ফিরবেন তো।'

'সে কি, এক্ষুনি ফিরবে। তার চেয়ে চলো না একটু গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি। গঙ্গার হাওয়াটা বেশ মিষ্টি। বলোতো তোমাকে পেঁছে দেবো বাড়িতে।'

'না না তার দরকার হবে না কাকু। আপনার কথাতেই চলবে।' নিজের কথাতেই শৈল নিজে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করল। সেদিন গঙ্গার মুখোমুখি বসে শৈলর কেবলই মনে পড়ছিল তার বাবার কথাটা। বাবা এখানে থাকলে সত্যিই সে খুশী হত। মরা মরা ঘাসের উপর শৈলর কাছাকাছি বসে বাবার বন্ধু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

'যাক একটা ঝামেলা কাটলো। চাকরিটার জন্যে তোমার আর আমার কম ভোগান্তি হল না।'

শৈল তা জানে। এবং জানে বলেই মানুষটার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল মনটা।

'এরপর কি করবে তুমি?'

শৈল অসহায়ভাবে তাকালো! চাকরি পর্যন্তই ওর চিন্তার সীমারেখা টানা ছিল। এরপর কি করবে তাতো সে ভাবেনি। বরং ভেবেছিল এরপর আপাতত কিছু করণীয় নেই।

'আমি বলি কি শৈল, এরপর তুমি বরং গান শেখো। তুমি তো একটু আধটু জান। শেখা হয়ে গেলে বরং আমাকেই শুনিয়ো। এককালে গান খুব ভালবাসতাম, বুঝলে।'

'শুনেছি বাবার মুখে।'

সেদিন বারবার বাবার কথাটা সব কিছুতেই মনে আসছিল শৈলর। সে জানতো সব কিছুতে বাবার কথাটা এসে পড়ায় বন্ধু হিসেবে উনিও খুশী হবেন।

'কি শুনেছো বাবার মুখে?'

ইচ্ছে করেই তিনি শৈলর একখানা হাত তুলে নিলেন। পলকের জন্য চমকে উঠল শৈল। আবার নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, শুনেছি, আপনি এককালে ভাল গাইতেন।'

শৈলর মুখ থেকে কথাটা শোনবার পর তিনি বেশীরকমের উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

'জানো শৈল, তোমার বাবাটা কেমন অকালে বৃদ্ধ হয়ে গেল।'

সত্যি। শৈলর ধারণা তার বাবাকে যেন জোর করেই বার্ধক্যের ছাপ দেওয়া হয়েছে। শুনেছে শৈল, বাবার বন্ধু বড়োলোক। বার্ধক্য আসতে তাই ভয় করছে। বাবার কথা উঠতেই শৈলর মনটা আবার কিসের বেদনায় ভরে ওঠে। বাবা সত্যিই বৃদ্ধ হয়েছেন। শুধু বৃদ্ধ হওয়া নয়, ইদানীং মানুষটা যে শয্যাশায়ী এটাও তাঁর বন্ধুকে হয়ত পীড়িত করছে। যেমন করছে শৈলকে প্রতিদিন। প্রতিনিয়ত।

এরপর অনেক কথা বলেছেন বাবার বন্ধু। সব আজ মনে পড়েছে না শৈলর। তবে সবচেয়ে বেশী বেজেছিল তখন যখন সে বুঝতে পারলো কথা কথাই। যতক্ষণ তা উচ্চারিত হয় ততক্ষণ সত্যি। তারপর কি যে এর মূল্য জানা নেই শৈলর। জানা থাকলে হয়ত ছিল ভাল।

সেদিন ঠিক এমনি আলো অন্ধকারে একটি বার্ধক্য দিয়ে আর একটি বার্ধক্য আড়াল করতে চেয়েছে নিজেকে। বাবার বন্ধু জানতে চেয়েছিলেন, 'শৈল আমি কি সত্যিই বুড়ো হয়েছি?'

শৈল কি জানতো বার্ধক্য কাকে বলে। নিজের বাবাকে যদি বৃদ্ধ বলতে হয় তবে তাঁর বন্ধুকেও বৃদ্ধ বলতে হবে। কিন্তু সেই মুহূর্তে একটি মাত্র সত্যকে সে বুঝতে পেরেছিল। অনুভব করতে পেরেছিল। যে মানুষটি আজ তার মুখোমুখি বসে সে যেন অন্য কিছু শুনতে চায়, জানতে চায়। একটু আশ্বাস। কিংবা একটু সান্ত্বনা।

'না কাকু, আপনি বৃদ্ধ নন। আসলে মানুষ বৃদ্ধ হয় মনে।'

কথাটা শুনেছে শৈল বহুবার বহু রকমে। আজও এই মুহূর্তে বিস্তারিত আকাশের নীচে গঙ্গার নিস্তরঙ্গ স্রোতের মুখোমুখি তাকিয়ে শৈলর মনে হল এইটাই ঠিক।

শৈলর কথাটায় বাবার বন্ধু সেদিন খুশী হয়েছিলেন। নিজের স্বভাব সম্পর্কে শৈল যতটুকু জানে তাতে এ পর্যন্ত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সে কাউকে আঘাত করেনি। বরং সে মানুষটাকে খুশী করার প্রয়োজনে সেদিন সত্যিই কথাটা বলতে না পারার কষ্টটুকু নিজেকেই সহ্য করতে হয়েছিল। সে জানতো বা বিশ্বাস করতো যে বাবার বন্ধু তাঁর সত্যিকার পরিচয়টুকু জানতেন। তবুও শৈলর মুখ দিয়ে যখন শুনতে চাইছেন তখন এর বেশী বলা যেত না।

মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক মশা উড়ছে ভন ভন করে। শৈলর সমস্ত ভাবনা চিন্তাগুলো যেন এই মুহূর্তে মশা মাছি কিংবা পোকা মাকড় হয়ে ওকে ঘিরে ধরছে। একটু পরেই দংশন করবে। জ্বালা ধরাবে।

সেদিন ফেরবার তাগিদ ছিল শৈলর। আজ আর কোন তাগিদ নেই। আজ ইচ্ছে করলে সে অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। গঙ্গার বুকে পাল তোলা নৌকোর মত যেমন তেমন যেদিকে খুশী চলতে পারে হাওয়ার টানে। একটু বাদেই এ পৃথিবীর রঙটুকু মুছে নেবে দিনের সূর্যখানা। আকাশের গা থেকে একটা পাতলা ছাই রঙের আবরণ ছড়িয়ে পড়বে। তারপর গাঢ় অন্ধকারে ক্রমশ ডুবে যাবে পৃথিবী আকাশ মাটি এমন কি শৈলর সমস্ত সত্তাটুকুও।

'বুঝলে শৈল, আমি বিশ্বাস করি এখনও আমি যুবক।'

অন্ধকারে সেদিন মানুষটিকে ভাল করে দেখতে পেল না শৈল। বড়ো বেশী আবরণে ঢাকা। ক্রমশ আবরণটুকু সরিয়ে যে মানুষটি বেরিয়ে এল সে যেন সম্পূর্ণ অচেনা অন্য জগতের এক মানুষ। হয়ত অন্য যুগের।

দুর্বল আবেগের মুহূর্তে বাবার বন্ধুটি

নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। ভয় পেল শৈল। সেই মুহূর্তে ভয়ে কুঁকড়ে সে এতটুকু হয়ে এসেছিল। হয়ত কোন দুর্বল মুহূর্তে একটি ঘুমন্ত অসহায় কামনাকে সে জাগিয়ে তুলেছে। মুহূর্তের জন্যে নিজেকে সবচেয়ে বেশী অপরাধী মনে হল। অপরাধ। ভয়। ঘৃণা। এর সবটুকু শৈলর নিজেরই প্রাপ্য।

'কাকু, উঠবেন না।'

শৈল, নিজেকে কেবল অপরাধী মনে হয়। সন্ধ্যার নিবিড় স্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে বৃদ্ধের করুণ কম্পিত কণ্ঠস্বর শৈলর বুকের পাঁজরে যেন ধাক্কা মারল।

'কেন?'

'তোমাকে বন্ধুকন্যা বলে ভাবতে পারি না।'

'নাই বা ভাবলেন কাকু। বরং ভাবুন না আমি আপনার মেয়ে।'

'তাই বা ভাবি কি করে! না না তার চেয়ে...'

সেই মুহূর্তে সেই বৃদ্ধ মানুষটির কণ্ঠস্বর যেন সব কিছু ছাপিয়ে উঠে আঁকড়ে ধরতে চাইল শৈলকে। দু দুটো বীভৎস বাহু মেলে দিয়ে ওকে টানতে চাইল কাছে, আরও কাছে যেখানে শৈলর সমস্ত সত্তাটুকু সহজে সরতে পারবে।

নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারবে।

সেদিন মনে হয়েছিল শৈলর তার মাথার উপরের আকাশখানা নিঃশব্দে কখন নেমে আসছে। একটু পরে হয়ত ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে চারদিকে।

এতটুকু সময়ের মধ্যেও সেদিন নিজেকে অনেক বেশী ক্লান্ত মনে হয়েছিল। এক আধদিন বা এক আধ বছরের ক্লান্তি নয়। সমস্ত জীবন ধরে যে ক্লান্তিটুকু পুঞ্জীভূত হয়ে আসছে সে যেন নিমমভাবে জড়িয়ে ধরেছে শৈলকে। নিজেকে টেনে বের করবার সাধ্য কই। বৃদ্ধের অবসন্ন চোখ দুটো জ্বলছে। হাত দুটো কাঁপছে। তবুও মানুষটা খুঁজছে। শৈলকে ভালো করে খোঁজবার লোভে উন্মত্ত। হাত দুটো তেমন শক্ত নয়। তথাপি প্রাণপণে চাইছে ধরে রাখতে শৈলর দেহটাকে। ঐচ্ছিক অবসাদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করল শৈল।

শৈল...

বৃদ্ধের মুখটা শৈলর মুখের বড়ো কাছাকাছি। ওকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল শৈল। এ অপরাধ অন্যের চেয়েও বেশী করে মনে হয় নিজের কাছে। এ বোঝা নিজেকেই বইতে হবে। যেমন করে বইছে উকিলবাড়ির রেণু কিংবা শীলা। ওদের কাউকে আজ আলাদা করে দেখতে পারে না শৈল। অথচ ওরা যা চেয়েছিল শৈল তা পারল না কেন? টুনির বিশ্বাস তার দিদি কখনও রেণুর মত হবে না।

পথ চলতে চলতে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে বাবার বন্ধু যে এমন হোঁচট খেয়ে পড়বে এ যেন স্বপ্নের অতীত। এঁকে কেমন করে টেনে তুলবে জানা নেই শৈলর। থাকবার কথা নয়। চিরকাল নিজেকে আড়াল করে এসেছে শৈল। নিজের ছোট্ট গণ্ডীটুকুর মধ্যে কখনও নিজেকে গুটিয়েছে আবার কখনও মেলে ধরেছে। আজ একটু-মাত্র ছড়িয়ে দিতেই যে বিভ্রাটের মুখোমুখি হতে হল তা থেকে কেমন করে পালাবে শৈল।

চাকরির প্রয়োজনটা আজ বড় বেশী। বাবাও আজ বড়ো দুর্বল। বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু তাই এমন করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দুরন্ত বাহু মেলে তাকে আহ্বান করছে।

সেদিন ফিরতে ফিরতে শৈল ভেবেছিল একথা কাউকে বলবে না। বাবাকেও নয়। মাকেও নয়। পৃথিবীর কেউ কোনদিন জানবে না, শুনবে না সেই অশুভ সন্ধ্যার কেমন করে ভাবনা নামক ক্ষুদে পোকাগুলো তার সত্তায় ঘুন ধরাতে চেয়েছিল।

বাবা রুগ্ন শয্যাগত। বন্ধুর এ অপমৃত্যুর আঘাতটাকে হয়ত বা পারবেন না ভুলতে। দুর্বল অসহায় শিশুর মতো ক্রোধে আক্রোশে মানুষটা কেবল শীর্ণ হাতপা ছুঁড়বেন। সেই মুহূর্তের অক্ষমতাটুকু নিয়ে সেই অসহায় অস্তিত্বটুকু যদি কাউকে পীড়িত করে তবে সবচেয়ে বেশী করবে শৈলকে।

নিজেকে সেই প্রথম ভয় করতে শিখেছিল শৈল। আজও করছে। করবে। শৈল আজ বুঝতে পেরেছে কেমন করে পালাতে হয় কেমন করে লুকিয়ে থাকতে হয় পৃথিবীর সমস্ত চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে। পালানোর অনুভূতিটুকু তাই আজ এমন মধুর লাগছে। গঙ্গার শান্ত স্তব্ধতায় শৈলর এখন কেবলই মনে হচ্ছিল সে যেন অজস্র চোখ-মুখ বা লালসা-বাসনার অন্ধকার থেকে পালিয়ে এসেছে।

জীবন থেকে অনেকদিন আগেই পালিয়ে এসেছে শৈল। সরে এসেছে অনেক দূরে। হয় সাহসের অভাব নয়তো মনের সে তরঙ্গ নেই। নেই ওঠানামা। চেনা পথ ধরে, চেনা মানুষের গা ছুঁয়ে কেবল এগিয়ে চলা। এ পথে কতোটুকু বা ভয়। রাস্তার ছোঁড়াগুলো তো কদিন বাদে সরে দাঁড়াবে। তখন ওদের শিসটুকুও শুনতে পাবে না শৈল। কানে এসে বাজাবে না ওদের অশ্লীল কথাগুলো। বরং রেণুর মত দুঃসাহস নিয়ে ওদের মুখোমুখি গিয়ে যদি দাঁড়াতে পারত শৈল। কিংবা শীলার মতো যদি ওদের সামনে দিয়ে চলে আসতে পারত নির্ভয়ে তবে আজ নিজেকে এমন মৃত বলে মনে হত না। আজ কেবলই মনে হয় সে মৃত একখণ্ড পোড়া কাঠের মতো দগ্ধ একটা শরীর নিয়ে ঘোলাজলে ভাসছে।

অনেকটা সময় কেটে গেল শৈলর। হিবেনের গা বেয়ে অজান্তে কখন সন্ধ্যা নেমেছিল খেয়াল নেই। এবার উঠে পড়ল শৈল। সমস্ত ক্লান্তি আর অবসাদকে টেনে তুলল। ওরা অনেকদিন থেকেই আশ্রয় করেছে শৈলকে। শৈল ওদেরকে সযত্নে লালন করছে। এই পাঁচ বছর ধরে ওরা শৈলর সাথী। ওদের সাথে ঘরে বাইরে অনেক অবসর কেটেছে শৈলর।

ঘরে ফেরবার পথে বাবার কথাটা মনে হল শৈলর। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে বাবা মা দুজনেই এখন ভাবছে শৈলর কথাটা। রুণি, টুনি ওরা এতক্ষণ পড়তে বসেছে। সামনে ওদের পরীক্ষা। ওরা জানে ওদের দিদি কতো কষ্ট করে পড়ায় ওদের। একদিন বলেছিল টুনি, 'দিদি তোর খুব কষ্ট হয় না?'

শৈল মাথা নেড়ে বলেছিল, 'নারে আমার একটু কষ্ট হয় না।'

'আমি বড়ো হলে খুব ভাল হয়, না দিদি। আমিও চাকরি করবো।'

'চুপ কর টুনি, এসব তোকে ভাবতে হবে না।'

শৈল জানে এসব কথা ওরা যেমন করে হোক শুনেছে। ওর আড়ালে হয়ত বাবা কিংবা মা কেউ না কেউ বলে থাকবে। সে নিজেও বিশ্বাস করে তার বোন টুনি বড়ো হবে। রুণিও বড়ো হবে। এমন কি ছোট ভাই বাবলুও বড়ো হবে। হবে না শৈল নিজে। সে আর বদলাবে না। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে কালও থাকবে সেখানে। এমন কি পরশুও।

মা-ও আজকাল আফশোস করে বলে, তুই একটু সাজতে পারিস না শৈলী।

সময় পাই না মা। এর বেশী কি বলবে শৈল। সত্যিই তো, সময়ের বড়ো অভাব জীবনে। হিসেবের খাতায় আর কটাদিন যদি বেশী থাকতো জমা।

স্টেশন থেকে বাড়ি পর্যন্ত শৈলর পথটা কম নয়। এ রাস্তাটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখান থেকে আবার মাঠের পথ শুরু। মাঠের ওপারে শৈলদের ঘর। ফেরবার সময় বহুদিনের পুরোনো ভাঙাচোরা ওদের বাড়িটা ভীরু চোখে শৈলকে দেখে। মাত্র দুখানা ঘর ওদের। ওরই মধ্যে শৈল একদিন ছোট ছিল। রুণি টুনির মতো অস্ফুট ছিল। অমনি ভীরু চোখে মাঠের দিকে চেয়ে থাকতো। ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে ডানা ঝাপটাত। আস্তে আস্তে সে বেড়ে উঠেছে। কখন করে যে এতো বড়োটি হয়েছে আজ আর মনে পড়ে না।

রাস্তাটুকু পার হয়ে মাঠের সামনে দাঁড়াল শৈল। রোজই একবার দাঁড়ায়। এর সঙ্গে ছেলেবেলার কতো স্মৃতি রয়েছে জড়ানো। ওরা সব ঘাস হয়ে রোজই দেখে শৈলকে। শৈল কেমন নিয়মিতভাবে রোগালো মাড়িয়ে যায়। ছেলেবেলায় কতো ছেলেমেয়ের সাথে এখানে খেলা করেছে। কতো রকমের খেলা। সব মনে নেই। স্মৃতির রঙ ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। আবছা আবছা মনে পড়ছে শুধু কয়েকটি মুখ। তারা সবাই ভালোবাসত শৈলকে। আজ যেন সবাই হারিয়ে গেছে। এখানে দাঁড়িয়ে শৈলর আজ কেবলই মনে হয় যদি সে আর একবার ফিরে যেতে পারত। বোধ হয় পারে না। প্রকৃতির নিয়মে সে যেন অনেকগুলো দিন বা অনেকগুলো বছর লাফিয়ে পার হয়ে এসেছে।

রুণি, টুনি, বাবলু ওরা এখনও এখানে ছুটে বেড়ায়। একটু আগে ওরা হয়ত এখানে খেলা করে গেছে। ওরা যেদিন শৈলর মত এখান থেকে সরে যাবে সেদিন হয়তো আর ফাঁকা থাকবে না এ জায়গাটুকু। এই তো পাঁচ বছর ধরে একনাগাড়ে রাস্তার দুধারে বাড়ি উঠছে। শৈল রোজই দেখে ইঁটের পর ইঁট সাজিয়ে কেমন সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরী হচ্ছে। কলকাতায় মানুষ ভীড়। ওখানে আর মানুষের জায়গা হচ্ছে না। বিশেষ করে শৈলদের মতো সাধারণ মানুষের। তাই শহর থেকে দলে দলে মানুষ এগিয়ে আসছে শহরতলীর শূন্যতাকে ভরে তুলতে। মাঠের ঘাসগুলোকে এখনও চেনা চেনা মনে হয় শৈলর। ওরা সহজে মরবে না। মাটির বুকে আঁকড়ে তার রসটুকু নিয়ে অমনিভাবে পড়ে থাকবে। শৈল কি ইচ্ছে করলে পারত না ওদের মতো অমনি করে মাটির ঘ্রাণ নিয়ে পড়ে থাকতে। পারল না। পারবার নয়। সামনে পিছনে থেকে কোন অদৃশ্য হাত যেন কেবলই তাকে ঠেলছে। ঘাসের বেলা যা হয় বা হতে পারে মানুষের বেলা তা হয় না। অন্তত শৈলর বৈচিত্র্যবিহীন জীবনের ক্লান্তিকর একঘেয়ে অভিজ্ঞতা তা মানতে চায় না।

মাথার উপরে তাকিয়ে দেখল শৈল। আকাশের তারাগুলো এখনও জ্বলছে। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তারাদের আকাশটাকে বেশ সুন্দর দেখায়। এতগুলো তারা দিনের আলোয় লুকিয়ে থেকে রাত্রে এসে ভিড় করে রোজ। দিনের শূন্যতাকে কেমন সুন্দর করে ভরে দেয়।

দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল শৈলদের ঘরটা। জানলার ফাঁক দিয়ে একফালি আলো এসে পড়ল শৈলর দৃষ্টিপথে। বোধহয় টুনি হয়ত পড়ছে। বাবা হয়ত শুয়ে শুয়ে এতক্ষণ শৈলর কথাই ভাবছে। বাড়ির কাছাকাছি এসে শৈলর মনে পড়ল বাবার ওষুধটা আজ কেনা হয়নি। এরকম ভুল কখনও হয় না শৈলর। এই পাঁচটি বছর ধরে যখন যেটা প্রয়োজন ঠিকমত এনেছে শৈল। আজকের এ ভুল অমার্জনীয়।

মা হয়ত অন্য কথা ভাবছে। শৈলর ফিরতে দেরী হলে মা কেবলই দুর্ঘটনার কথা ভাবে। ওরা সবাই ভাবে। রুণি টুনি আরও ভাবে। দিদি সকাল সকাল ফিরলে ওরা আনন্দে ফেটে পড়ে।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই সে-গন্ধটা ভেসে এল, যে গন্ধটা রোজই বুকে ঘরে ফেরে শৈল। হাসনাহানার গন্ধ। একটু উগ্র হলেও গন্ধটা বেশ মিষ্টি মনে হয়। দেহ মনের সমস্তদিনের সঞ্চিত দুর্গন্ধটা অনায়াসে পালিয়ে যায়। একটু আগে যেমন করে পালাতে চেয়েছিল শৈল। পালাতে পেরেও ছিল। আজও পারে।

বাকি পথটুকু পার হয়ে এসে শৈল এবার দাঁড়াল বাড়ির সামনে। বাইরে অন্ধকার। ঘরের ভেতরে হ্যারিকেন জ্বলছে। টুনি পড়ছে প্রাণপণে চীৎকার করে। সামনে ওর পরীক্ষা। যেমন করে হোক পাশ করতে সে বদ্ধপরিকর। শৈলও একদিন অমনি করে পড়া মুখস্ত করতো। কান পেতে শুনল শৈল। টুনি জ্যামিতির উপপাদ্য মুখস্ত করছে। শৈলর মতো ছেলেবেলা থেকে টুনিও অঙ্কে কাঁচা। বেচারা টুনি এর বেশী আর কি করবে।
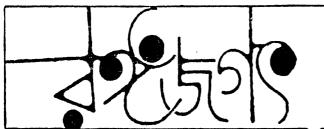
"দুরন্ত চড়াই" (পরিচালনা : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়) চিত্রের নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায় ফটো-দেশ

ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত "ঝিভাগো"

"ডকটর ঝিভাগো" শেষ পর্যন্ত এ দেশে দেখানো হচ্ছে। এই সংবাদে চিত্রামোদীরা অবশ্যই আনন্দিত। কিন্তু এই আনন্দের মধ্যেও একটু দুঃখের সুর তাঁদের মনে বেজে উঠতে পারে। ডেভিড লীনের এই ছবিটি সেন্সর বোর্ডের কাঁচির আঘাত থেকে পুরোপুরি রেহাই পায় নি। প্রথমে ভারত সরকার এই ছবিটি নিয়ে বেশ মুশকিলেই পড়েছিলেন। "ডকটর ঝিভাগো"-র কিছু অংশ, কিছু কথা কেটে বাদ দেবার জন্য সেন্সরকর্তারা খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। পরিচালক জানান, "ডকটর ঝিভাগো"-র প্রদর্শন বাতিল হোক্ সে ভাল, কিন্তু ক্ষতবিক্ষত "ঝিভাগো"কে জনসমীপে উপস্থিত করতে তিনি নারাজ। অবশেষে তিনি দিল্লি আসেন। "ঝিভাগো"কে বড় রকমের আঘাত থেকে তিনি বাঁচান। সেন্সর বোর্ড ছবি থেকে তিরিশ ফুটের একটা "সিকোয়েন্স" বা দৃশ্যে-পর্যায় বাদ দিয়েছেন। অর্থাৎ আধ মিনিটের কম সময়ের একটি দৃশ্য বাদ যাবে।

ক্ষতি হয়তো সামান্য। কিন্তু তবু সেটা ক্ষত। শিল্পের গায়ে বুদ্ধিজীবির কাঁচি, যা শিল্পসেবী বা শিল্পরসিকের মনে সন্দেহই নিয়ে যায়। সকল কাঁচা ধরা করে শিল্প বা আর্ট ফুটে ওঠে ঠিকই। কিন্তু এই বাধা, এই হস্তক্ষেপ কি না থাকলেই নয়?

চিত্র-সমালোচনা

হঠাৎ দেখা

"হঠাৎ দেখা" (শ্রীরজেশ প্রোডাকশন্স) কি প্রহসন? নাকি রোমাণ্টিক কমেডি? পুরোপুরি কোনটাই নয়। গল্প বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পরও ছবিটিকে নিছক কমেডি ভাবার কোন কারণ ঘটেনি।

চিত্র-নায়ক এক বড়লোকের নিষ্কর্মা ছেলে, অনেকটা "প্লেবয়"-এর মত টু-সিটার চালিয়ে সারা শহর সে চষে বেড়ায় ও মেয়েদের জানালায় মারে। এ-হেন "ওমানাইজার"-এর সাক্ষাৎ বাস্তবেও মেলে। এবং শক্ত মেয়ের পাল্লায় পড়লে সে কেমন জব্দ হয় ও কী-ভাবে তার প্রেমে পড়ে সিনেমার চির পুরাতন এই পর্বটি অবশ্য পরিচালক কমেডির আঙ্গিকে সাজিয়েছেন। কাহিনীর (তীর্থ চট্টোপাধ্যায় রচিত) ধরনটি গতানুগতিক, এবং প্রথমাংশে শুধু সংলাপনির্ভর নয়। শেষাংশের কৌতুক কিছুটা বোম্বাই-মাফিক। ছদ্মবেশ হলের বোম্বাই-কমেডির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এ ছবিতেও সেটা অনুসৃত। এখানে নায়ক ছদ্মবেশী হয়নি, অপর একজনকে তার বাবা সাজিয়েছে। এবং এই ঘটনার যে খুব প্রয়োজন ছিল তাও নয়। শ্লথগতি, অতিদীর্ঘ এই ছবির ক্লাইম্যাক্স কমেডির ঢঙে ফাস্ট ক্যামেরায় বিন্যস্ত, চেঁচামেচি এবং নকল-মূর্ছা ও টারা-চাইনির লঘুতায় (এখানেও বোম্বাইগতি) পর্যবসিত। অর্থাৎ, সূক্ষ্ম রসের ছবি নয় "হঠাৎ দেখা"। এর কৌতুক-উপকরণ স্থূল। নায়িকার একদা-'টেরোরিস্ট' মামাকে নিয়ে যে রসিকতা আছে তাও খুব সুখের নয়। যদি বলে দেওয়া হত সে আসলে টেরোরিস্ট ছিল না, নিজেকে শুধু ওই বলে জাহির করত তবু ...

(উপরে বাঁয়ে) গুরু গোবিন্দ সিং-এর ত্রিশত জন্মবার্ষিকী উৎসবে নির্মলেন্দু চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায় পাঞ্জাবীতে ভজন গান করেন (নিচে বাঁয়ে) ব্যারাকপুর সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আধুনিক গানের আসরের দুই শিল্পী মহম্মদ রফি ও ইলা বসু (ডাইনে) টালিগঞ্জ শান্তিপল্লীর বিচিত্রানুষ্ঠানে গান করেন মান্না দে

ফটো-দেশ

এই বক্তব্যের একটা অর্থ থাকত। অকারণে 'টেরোরিস্ট' নাম দিয়ে উপহাস দর্শককে পীড়া দেবে।

কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও "হঠাৎ দেখা"-র সময়টুকু দর্শকের মন্দ কাটবে না। কিছু আমাদের ছবি আছে যা পরে মনে থাকে না কিন্তু বসে দেখতে ভাল লাগে। "হঠাৎ দেখা"-ও তাই। ছবিটি কমেডি বলে চিহ্নিত। তাই সম্ভবত পরিচালক নিত্যানন্দ দত্ত ছবিতে কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা দেখাবার 'লাইসেন্স' নিয়েছেন। যেমন, কলকাতার পথে হুড-খোলা চলতি গাড়িতে দ্বৈত-গান, প্রণয়িনীর খোঁপায় ফুল গুঁজে দেওয়া ইত্যাদি। অবশ্য এই দৃশ্যের জন্য 'ব্যাক-প্রোজেকশান' ব্যবহৃত। কারণ সত্যিই যে তা ঘটে না। এক কথায়, "বাক্স-বদল"-এর পরিচালকের কাছ থেকে 'হঠাৎ দেখা' আশা করিনি। যদিও অস্বীকার করব না, ছবির একটি-দুটি মুহূর্তে বুদ্ধির পরিচয় আছে। ভিন্নধর্মিতার আভাস রয়েছে। যেমন, নায়কের ভাবের 'পার্চ' ও নায়িকার নামকরণ, লিফট-এর ওঠা-নামা নিয়ে রঙ্গ সৃষ্টি ইত্যাদি। এমন একটি দুটি ব্যাপার ছাড়া আর সবই প্রায় মোটা দাগের। তাতেও প্রেক্ষাগৃহে হাসির রোল ওঠে।

মূলত স্থূলধর্মী হলেও এই 'কমেডি'তে সূক্ষ্মতার মাত্রা কিছু এসেছে অভিনয়ের গুণে। প্রথমেই নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম করব। কথা বলার ধরণ, অস্থিরতা, হতভম্ব-ভাব এবং 'স্মার্টনেস'—এই সব কিছু দিয়ে চরিত্রটিকে তিনি বেশ আকর্ষক করে তুলেছেন। এবং তাঁর অভিনয় বুদ্ধিদীপ্ত। নায়িকা সন্ধ্যা রায়ও তাঁর চরিত্রের রূপটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়কের বাবার চরিত্রে পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়ও চমৎকার। শিল্পপতির ভূমিকায়, বাইরে কঠোর অন্তরে স্নেহপরায়ণ পিতার দ্বৈত রূপ শ্রীসান্যাল প্রশংসনীয়ভাবে প্রকাশ করেছেন। নায়িকার মামা হয়েছেন তরুণ রায়। অনেকদিন পরে তিনিও তাঁর সুনাম রক্ষা করেছেন, অভিনয়ের নৈপুণ্য দিয়ে। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে নাটকের সংলাপ (চাণক্যের কথা) এবং নায়কের নকল পিতা রূপে তাঁর অভিনয় বেশ উপভোগ্য। অনুপকুমারও দর্শকদের হাসাবার সুযোগ পেয়েছেন যথেষ্ট। অন্যান্য যাঁরা চিত্রনাট্য অনুযায়ী সুষ্ঠু অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে রেণুকা রায়, সুমিতা সান্যাল, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অমূল্য সান্যাল, শিশির বটব্যাল, গীতালি রায় অল্প অবকাশে সুঅভিনয় করেছেন।

সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্র সুরারোপিত কিছু গান ছবিতে আছে।

গানের অবকাশ ছিল না বললেই চলে। তবে গানের সুরে চিত্তাকর্ষক, গাওয়াও ভাল। শুনতে বেশ লাগে। আবহ সুরে পরিবেশানুগ।

বংশীচন্দ্র গুপ্তের শিল্প নির্দেশ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। শৈলজা চট্টোপাধ্যায়ের ফটোগ্রাফি সুন্দর, 'শট'-বিভাগও লক্ষনীয়।

আলোর গান

এক রীলের একটি ছবির নাম "আলোর গান"। আলো, এই ছবিতে, শান্তি ও অহিংসার প্রতীক। পরিচালক নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, আজকের ভুবন আলোয় ভরা নয়। অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অর্থাৎ হিংসা ও হানাহানিতে ক্লিষ্ট। হিংসার উন্মত্ত পৃথিবীর মুক্তি কোন্ পথে সে কথাই পরিচালক কাহিনীকার ভেবেছেন। তিনি তাঁর ভাবনাকে এই রূপকধর্মী শিশুচিত্রে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। শিশুচিত্র বলার কারণ, ছবির প্রধান দুটি চরিত্রই শিশু। একজন ভালবাসে প্রকৃতিকে, তার মন মমতায় ভরপুর। সে ছবি আঁকে, সৌন্দর্য খুঁজে বেড়ায়। অপর এক শিশুর কাঁধে রাইফেল। রাইফেলধারী শিশুর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পরিচালক এই পৃথিবীর দ্বন্দ্বের রূপটি দেখিয়েছেন। গান ও আঁকা চিত্রের সাহায্যে।

ছবিটি শান্তি-সেনাদের (ওরা কারা?) স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত। বক্তব্যও সুপরিস্ফুট। তবে বলবার বিষয়টি আরও ভালভাবে বলা যেতে পারত। অর্থাৎ পরিচালক-কাহিনীকারের মনে একটা 'আইডিয়া' এসেছে। আবার "ভিস্যুয়াল" রূপসৃষ্টির প্রেরণাও তাঁর অফুরন্ত। এই দুই বস্তুর সামঞ্জস্য ঘটেনি ছবিতে। চোখ মেলে দেখবার মত অনেক রূপবস্তু ছবিতে পেয়েছি। বিভিন্ন শট চমৎকার। এবং শিশুদের দিয়ে কথা না বলিয়ে তাদের মনের ভাব আমাদের জানানোর পরিকল্পনাটিও সুন্দর। এ ব্যাপারে তাঁকে অদ্ভুত সাহায্য করেছে শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফটোগ্রাফি। ফটোগ্রাফির গুণ সারা ছবিতে ছড়িয়ে রয়েছে। "আলোর গান" শ্রী মুখোপাধ্যায়ের প্রথম ছবি। এবং প্রথম প্রয়াসেই তিনি সুচারু ও শিল্পসম্মত প্রয়োগকর্মের পরিচয় দিতে পেরেছেন। এই সাফল্য অভিনন্দনযোগ্য। ছবিটির প্রযোজক আশিস মুখোপাধ্যায়। অমল নাগের আবহ-সংগীত এবং সামগ্রিক সংগীত পরিচালনা ছবির বিশেষ আকর্ষণ।

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের "মহজুর" চিত্রের নায়িকা গীতাঞ্জলি সেনগুপ্ত ফটো-দেশ

"হাটে বাজারে" (পরিচালনা : তপন সিংহ) ছবিতে অশোককুমার ফটো-দেশ

দেবী মুভীটোনের "আফসানা" (পরিচালনা : বিজ) চিত্রে পদ্মিনী—এ-সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে

নেপথ্যে

পেশাদার মঞ্চে নাটকের শত, দ্বিশত কিংবা ততোধিক অভিনয়ের স্মারক উৎসবে শিল্পী, কলাকুশলী, কর্মী এবং অন্যান্য সকলকে পুরস্কৃত করা হয়। এই পুরস্কার বিতরণের একটা ঐতিহ্য ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে। এবং তা অটুট থাকুক—এটাই কাম্য। এই প্রসঙ্গে একটি বৈষম্যের কথা উল্লেখ না করে পারছি না। একাদিক্রমে শত অভিনয়ে যিনি যোগ দিতে পারেন নি, একদিন অনুপস্থিত থাকলেও তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হয় না। এই রীতি পালিত হয়ে আসছে। হয়ত সব রঙ্গালয়ে নয়। এই নিয়ম অনুযায়ী অনেক নাটকের একাধিক বিশিষ্ট শিল্পী পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হয়েছেন। যেসব শিল্পী পুরস্কার পাননি টিকিটঘরে তাঁদের নামের কদর বেশী। অবশ্য এ কথা ঠিক, ভাল টিম-ওয়ার্ক ছাড়া কোনও নাটক সম্পূর্ণ সফল হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সব শিল্পীর মর্যাদাই সমান। তবু দর্শকদের প্রিয় কয়েকজন শিল্পী আছেন। বিজ্ঞাপনে তাঁদের নাম বিশেষভাবেই ছাপা হয়। তাঁদের নাম দেখে অনেক দর্শক টিকিট কেনেন। এবং কর্তৃপক্ষ তাঁদের ফিল্মস্টার জেনেই নাট্যাভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ করেন। জনপ্রিয় ফিল্ম স্টারদের আউটডোর শুটিং-এর জন্য কলকাতার বাইরে যেতে হবে এটাই স্বাভাবিক। কর্তৃপক্ষও এই ছুটি মঞ্জুর করেন। এবং এ কথাও ঠিক, এঁদের অভিনয়ের জন্য নাটক জনপ্রিয় হয়। নাট্যাভিনয়ের শত শত রজনী অতিক্রমের মূলে এঁদের দান সামান্য নয়। অতএব তাঁদের পুরস্কার না দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। কাজে অনুপস্থিত থাকা অথবা ছুটি নেওয়ার জন্য শিল্পীরা কম পারিশ্রমিক পেয়ে থাকেন। এই ক্ষতি তাঁরা হয়ত সানন্দেই মেনে নেবেন। কিন্তু একটা

মুকুর প্রযোজিত

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের

থানা থেকে আসছি

পরিচালনা : শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য

থিয়েটার সেণ্টার

৮ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার সন্ধ্যা ৭টা

(সি ৪১৩৯)

"Who, despite all these, would be interested in Daag? Young lovers, ..." 'NOW'

৫০তম রজনী রবিবার ৫ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬॥

প্রতি বৃহঃ ও শনি ৬॥ | রবি ও ছুটির দিন ৩॥ ও ৬॥

নবরূপার প্রযোজনায়
জিতেন ঘোষের

দাগ

নির্দেশনায়: বিজয় মুখার্জি

সঙ্গীত: রবীন ঘোষ (ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সুযোগ্য ছাত্র)

নৃত্য: মণি দত্ত আলো: স্বরূপ মুখার্জি শব্দ: চৌধুরী কোং

শ্রেঃ প্রবীরকুমার ॥ তমাল লাহিড়ী ॥ লতিকা দাশগুপ্ত ॥ মঞ্জুলা মুখার্জি ॥ দেবেন ব্যানার্জি রবীন ঘোষাল ॥ তৃপ্তি দাস ॥ অমিয়কান্তি মঞ্জুশ্রী চ্যাটার্জি ॥ নমিতা দাস ॥ লতা প্রণব চৌধুরী ॥ পিণ্টু ॥ মণি শ্রীমাণী

প্রতাপ মেমোরিয়াল হল

ফোন: ৫৫-৯১৬৯

(সি-৪২৯০)

[শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]

ষ্টারে নূতন নাটক

ফোন-৫৫-১১৩৩

শ্যামা

: রচনা ও পরিচালনা :
দেবনারায়ণ গুপ্ত

দৃশ্য ও আলোক : অনিল বসু
সুরকার : কালীপদ সেন
গীতিকার : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

* * * *

প্রতি বৃহস্পতি ও শনিবার : ৬॥টায়
প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন : ৩টা ও ৬॥টায়

* * * *

—ঃ রূপায়ণে ঃ—

কানু বন্দ্যো ॥ অজিত বন্দ্যো ॥ অপর্ণা দেবী নীলিমা দাস ॥ সুব্রতা চট্টো ॥ জ্যোৎস্না বিশ্বাস সতীন্দ্র ভট্টা ॥ গীতা দে ॥ প্রেমাংশু বোস শ্যাম লাহা ॥ চন্দ্রশেখর ॥ অশোধন দাশগুপ্তা শৈলেন মুখো ॥ শিবেন বন্দ্যো ॥ আশা দেবী

রঙমহল ফোন: ৫৫—১৬১৯

প্রতি বৃহঃ ও শনি : ৬॥
রবি ও ছুটির দিন : ৩—৬॥

রোমাঞ্চকর হাসির নাটক!
বিধায়ক ভট্টাচার্যের

অতএব

: পরিচালনা :
॥ হরিধন মুখোপাধ্যায় ও জহর রায় ॥

শ্রেঃ সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ॥ জহর রায় ॥ হরিধন ॥ অজিত চট্টো: ॥ অজয় গাঙ্গুলী ॥ মৃণাল মুখো: ॥ মিণ্টু চক্রবর্তী ॥ দীপিকা দাস ও সরযূবালা ॥

— অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন —

বিশ্বরূপা

বৃহঃ ও শনি ৬॥টা, রবি ৩ ও ৬॥টা

জাতির সেবায়
উৎসর্গকৃত নাটক

"বনফুল"-এর "ত্রিবর্ণ" উপন্যাস অবলম্বনে
নাটক ও পরিচালনা—রাসবিহারী সরকার
শ্রেঃ জয়শ্রী, সবিতা, অসিত, নির্মল, সত্য।

নারী-বিদ্বেষী এক পুরুষ, আরেকজন ফেরারী আসামী, তাদের সঙ্গে এক ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী — এদের নিয়ে এক নাটকীয় কাহিনী

ওরিয়েণ্ট - প্রিয়া - শ্রী - কৃষ্ণা - কালিকা - ইণ্টালী

ভবানী ০ মৃণালিনী ০ বঙ্গবাসী ০ ন্যাশনাল ০ পি-সন
অজন্তা ॥ পিকাডিলি ॥ সন্ধ্যা

স্বপ্না প্রোডাকশন্স-এর "বিবাহ বিভ্রাট" (পরিচালনা : অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবিতে লিলি চক্রবর্তী

গেল "অফ পিরিয়ড" নাচে। কমনরুমে ছাত্রীদের অবসরযাপন, গল্প ও রসিকতার মধ্যেও যেন এ'রা ছন্দ খুঁজে পেয়েছেন। সাধারণ কাজেও মানুষের 'মুভমেণ্ট' কী-ভাবে সুন্দর করে তোলা যায় তারই যেন এক 'এক্সপেরিমেন্ট' দেখা গেল এই নাচে। এই চমৎকার নৃত্যপরিকল্পনার একটি মুহূর্তে বিদেশী 'টুইস্ট'-এর ঢঙ কথাকলির আঙ্গিকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশে গিয়েছে। কোন্ নৃত্যাংশ দর্শকদের বেশী আনন্দ দিয়েছে বলা কঠিন। সব কয়টিই সুন্দর। বিশেষ উল্লেখ্য সম্ভবত কথাকলি পর্যায়ের "সারি"। সবচেয়ে বিস্ময়কর, ষাটজনেরও বেশী ছোট-বড় ছাত্রীর দুই ঘণ্টাব্যাপী সম্মেলক নাচ ব্যালের ক্রমধারার মত কিংবা নদীর ঢেউয়ের মত একের পর এক অবিচ্ছিন্ন গতিচ্ছন্দে নিয়ন্ত্রিত। অনুষ্ঠানের দুটি প্রধান আকর্ষণ ছিল কমলেশ মৈত্রের "তবলা তরঙ্গ" এবং গুরু তরুণ সিংহের মৃদঙ্গ নাচ।

শিল্পীর সম্মান

ইউনাইটেড স্টেটস ন্যাশনাল বোর্ড অব রিভিউ অব মোশান পিকচার্স এলিজাবেথ টেলরকে বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান দিয়েছেন। "হু'জ অ্যাফ্রেড অব ভার্জিনিয়া" উলফ ছবিতে অভিনয়ের জন্য শিল্পী এই পুরস্কার পেয়েছেন। ব্রিটিশ চিত্র "ম্যান ফর অল সীজনস্" শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে চিহ্নিত। এবং এই ছবির পরিচালক ফ্রেড জিনেম্যান ও ব্রিটিশ অভিনেতা পল স্কোফিল্ড যথাক্রমে পরিচালনা ও অভিনয়ের জন্য সম্মানিত হয়েছেন। শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্ররূপে গণ্য হয়েছে ফরাসীর ক্রাইম ছবি "দি স্লিপিং কার মার্ডার"।

টাইমস" ও "দি ডেইলি নিউজ" পত্রিকাগুলির বিচারে বছরের দশটি শ্রেষ্ঠ চিত্রের একটি **শেকসপীয়রওয়ালা।**

আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব থিয়েটার ওনার্স-এর "স্টার অব দি ইয়ার" পুরস্কার পেয়েছেন **সোফিয়া লোরেন।** সোফিয়া লোরেন এখন এম-জি-এম-এর "হ্যাপিলি এভার আফটার"-এ অভিনয় করছেন।

মুকুরের "থানা থেকে আসছি"

অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত "থানা থেকে আসছি" নাটকটি মুকুর নাট্য সংস্থা থিয়েটার সেনটারে প্রতি মাসে একবার করে অভিনয় করবেন। এই অভিনয় সূচীর প্রথম অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়েছে। নাটকটির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য, সবিতা মুখোপাধ্যায়, দীপা হালদার, অমলেন্দু ভট্টাচার্য, সন্তোষ নন্দী, কমল দাস এবং বীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচালনা করেছেন শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য।

ব্যারাকপুর সাংস্কৃতিক সম্মেলন

"সংস্কৃতি" সংস্থার উদ্যোগে ব্যারাকপুরে ২০—২৩ জানুয়ারি চার দিনব্যাপী একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ভারত বিখ্যাত গায়করা যোগ দেন।

প্রথম দিনের উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে গেয়েছেন ও বাজিয়েছেন বড়ে গোলাম আলি খাঁ, ভি জি যোগ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, বাহাদুর খাঁ।

পরবর্তী অনুষ্ঠানে আধুনিক সংগীত পরিবেশন করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সুমন কল্যাণপুর, মধুমতী ও মনোহর দীপক (নৃত্য), সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, ইলা বসু, মহম্মদ রফি, রুমা গুহঠাকুরতা প্রভৃতি শিল্পী।

চতুর্থ দিন নির্মলেন্দু চৌধুরীর পরিচালনায় লোকভারতীর "মহুয়া" গীতিনাট্য সকলকে প্রভূত আনন্দ দেয়।

কলকাতার বাইরে বাংলা দেশে এত বড় বিচিত্রানুষ্ঠান সম্ভবত এই প্রথম। শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেন সম্মেলন উদ্বোধন করেন। সেই আসরে সভাপতির আসনে ছিলেন ডঃ উমাপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তৃতীয় দিনের আসরে পৌরোহিত্য করেন শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়। চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন মিন্টু দাশগুপ্ত ও রমেন চট্টোপাধ্যায়।

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ "প্রতিদান" ছবিতে কাজল গুপ্ত ও

ফটো-দেশ

সূচীপত্র

স্মরণীয় ৭ই
অ্যাসোসিয়েটেড-এর
গ্রন্থতিথি

বাজি ধরলেই জিতবেন

স্বাদ-গন্ধের দৌড়ে ব্রুক বণ্ড রেড লেবেল না জিতেই পারে না। সেরা সেরা চায়ের ব্লেণ্ড। প্যাকেট পিছু ঢের বেশী কাপ মনের মত চা পাবেন। আপনার জন্য ব্রুক বণ্ড রেড লেবেল চা।

BB 3676 A

সূচীপত্র

সেরা বাছাই-করা কমলালেবুর রসে তৈরী...

আমরা শুধু চমৎকার চমৎকার কমলালেবু-গুলিই বেছে নিই—যেগুলি সূর্যের আলোয় পেকে উঠেছে, দেখতে সোনার বর্ণের মত এবং পরিপূর্ণ রসে-ভরা। তারপরে ওর রস বের ক'রে নিয়ে বিশুদ্ধ আখের চিনির সিরাপ ও অন্যান্য বিশেষ উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরী হয় অতি আরামের পানীয়—রেক্স অরেঞ্জ স্কোয়াশ!

বিনামূল্যে:

একটি সুন্দর 'প্রিন্সেস' কোস্টার পাবেন, রেক্স বোতলের প্রতি চারটি ঢাকনার বদলে।

কর্ন প্রোডাক্টস্ কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

যেমন জিনিস তেমন দাম সেরা স্কোয়াশ—রেক্স নাম

Bensons/I-316 A3 Ben

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পণ্ড্‌স
ড্রীমফ্লাওয়ার ফেস পাউডার
PONDS
আপনাকে দেবে
ফুলের
মতো
রমণীয় মুখশ্রী
পাবেন!
চীজ্‌ব্রো-পণ্ড্‌স ইন্‌ক

F 3218

সন্দেশের পুনরাবির্ভাব

নির্বাচনের মুখোমুখি সন্দেশের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে সন্দেশ-নিষিদ্ধ এলাকায়, অর্থাৎ কলকাতায়। সন্দেশ-রসগোল্লা যাঁদের প্রিয় তাঁদের কাছে এটা সুসংবাদ, মিষ্টান্ন বিক্রেতার পক্ষেও আশার কারণ। তবে হরেদরে হিসেব করলে আইনে ছানাজাত এবং ক্ষীরজাত মিষ্টান্ন প্রস্তুত কলকাতায় নিষিদ্ধ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে খাস কলকাতায় এবং উপকণ্ঠ এলাকায় এই আইনের তেমন একটা মর্যাদা ছিল না; পয়সা ফেললে গোপনে হাঁড়িভরা রসগোল্লা আর চুবড়িভরা সন্দেশ পাওয়া যেত। নিতান্ত ছোটখাট মিষ্টির দোকান বাদ দিলে পাড়ায় পাড়ায় প্রায় সমস্ত মিষ্টির দোকানে আড়ালে আড়ালে নিষিদ্ধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত এবং পরিচিতদের মধ্যে বিক্রি চলত। কাজেই মনে হয় না, সন্দেশ অথবা রসগোল্লায় যাঁদের অত্যধিক আসক্তি তাঁদের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে এতদিন। বেআইনীভাবে যেটা চলত, এখন আবার সেটা প্রকাশ্যভাবে চলবে এই যা তফাত।

অথচ এ-যাবৎ যারা দুধের কাঙাল ছিল তাদের পক্ষে সন্দেশ-সংবাদটি দুঃসংবাদ বই আর কিছু না। ছানাজাত এবং ক্ষীরজাত মিষ্টান্ন যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিষিদ্ধ করেন তখন যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, শিশু রোগী বৃদ্ধ এবং জনসাধারণের মুখে দুধ জুগিয়ে দেবার চেষ্টায় এটা করা হচ্ছে। এই যুক্তির পিছনে একটা নৈতিকতা ছিল, আইনের উদ্দেশ্যও সাধু ছিল। যদিও পশ্চিমবঙ্গের সরকারী দুগ্ধ পরিকল্পনার আদিতে এমন কথা বলা হয়নি যে, সরকার তাঁর গরু-মোষের খাটালকে নামমাত্র দাঁড় করিয়ে রেখে বাইরে থেকে দুগ্ধ সংগ্রহ করবেন। সরকারী দুগ্ধ পরিকল্পনা থেকেই দুধের চাহিদা মেটানো হবে — এটাই ছিল উদ্দেশ্য; কিন্তু সে-পরিকল্পনা যখন ব্যর্থ হতে বসল তখন বাইরের খাটাল আর গোয়ালাদের কাছ থেকে সরকার দুধ সংগ্রহ করতে শুরু করলেন; ফলে বাধ্য হয়ে সরকারী দুগ্ধকেন্দ্রে দুধের যোগান বাড়াবার জন্যে আলোচ্য মিষ্টান্ন-নিয়ন্ত্রণ আইন। সরকারী ব্যর্থতার দরুন যে আইনটি রচনা করা হয়েছিল তা নিশ্চয় সঙ্গত নয়; তবু সাধু উদ্দেশ্যের জন্যে এই আইনের একটা নৈতিকতা ছিল। একথাও স্বীকার করতে হবে, ছানা ও ক্ষীরজাত মিষ্টান্ন তৈরি নিষিদ্ধ হওয়ায় সরকারী দুগ্ধ সরবরাহ-কেন্দ্রে দুধের যোগান বেড়েছিল, শহর কলকাতার দুধের চাহিদাও আংশিকভাবে সরকারী মিল্ক সেণ্টার থেকে মেটানো হচ্ছিল। রাতারাতি কি কারণে যে দেবতার মর্ত্যে আগমনের মতন সন্দেশ-রসগোল্লাকে প্রকাশ্যে আমদানি করা হচ্ছে এবং শিশু, রোগী, অসুস্থের মুখ থেকে দুধের পাত্র সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তা আমাদের বোধ-বুদ্ধির অগম্য।

সরকারী ব্যবস্থার মাথামুণ্ড আমরা বুঝি না। সিকি বা আধ লিটার দুধ যাঁরা নিতেন তাঁদের পাওনা কমানো হয়নি, কিন্তু দেড়, দুই বা বেশি লিটার যাঁরা নিতেন তাঁদের দুধের পরিমাণ শতকরা তিরিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত কমানো হয়েছে। নিম্নমধ্যবিত্তের একটি মাঝারি সংসারে দেড়-দু লিটার দুধ মাত্রাতিরিক্ত কিছু না—বরং বাচ্চাকাচ্চা, শিশু, অসুস্থের মুখে তুলে দিতে হলে পরিমাণটা কমই। তবু এই দুধেই বহু পরিবারকে কায়ক্লেশে সংসারের চা থেকে লো-প্রেসার রোগীর কিঞ্চিৎ ছানা পর্যন্ত তৈরি করে নিতে হচ্ছিল। মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসারে অপচয় দূরে থাক প্রয়োজনই মেটে না; সেক্ষেত্রে দু লিটার দুধ সোয়া বা এক লিটার হয়ে গেলে কার মুখে কাচামচ দুধ জুটবে, আদপেই জুটবে কি না কে জানে! সন্দেশ-রসগোল্লা দিয়ে যদি দুধের অভাব মিটতো, তবে সরকার আইনই বা করেছিলেন কেন?

দোকানে দোকানে প্রকাশ্যে (শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ ছানাযোগে প্রস্তুত!) সন্দেশ-রসগোল্লা কাঁচের আড়ালে সাজানো থাকবে, মিষ্টান্ন-প্রেমিকদের তাতে চক্ষের ও রসনার তৃপ্তি ঘটবে — কিন্তু বাড়িতে রুগ্ন শিশু, সদ্যপ্রসূতি, স্কুলকলেজের ক্ষীণকায় ছাত্রছাত্রীদের মুখে সামান্য দুধও আর জোটানো যাবে না। বলা বাহুল্য, এখন যা করা হ'ল সরকারীভাবে—তাতে তেলা মাথায় তেল ঢালা ছাড়া আর কিছু হ'ল না।

প্রসঙ্গত আর-একটি কথাও বলা যায়। অনেক সময় সরকারী দুগ্ধকেন্দ্রে বাড়তি দুধ কিনতে পাওয়া গেলে বাঙালী বাড়ির মেয়েরা সেই দুধ অল্পস্বল্প কিনে এনে কখনও একটু ছানা করে ঘরে সন্দেশটন্দেশ করতেন শখ করে, পায়েস রাঁধতেন কাজেকর্মে। এটা ছিল মেয়েদের রন্ধন-বিদ্যার চর্চা, শখ, আনন্দ। এখন আর সে-চর্চা বা আনন্দের অবকাশ থাকল না। সংসারে চায়ের দুধ জোটাতেই যেখানে চোখে জল আসবে, সেখানে শখের কথা কে বা আর ভাববে!

সুকর্ণ-মর্দন
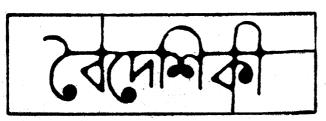
ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের এখন যাই-যাই অবস্থা; স্বেচ্ছায় বিদায় না নিলে তাঁর গতি কী হবে, সে কল্পনা মনোরম নয়। ক্ষমতা সুকর্ণের হস্তচ্যুত, আছে শুধু পদমর্যাদা—পদমর্যাদাও নয়, পদাধিকার এখন তাঁর নামমাত্র, মর্যাদা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সুকর্ণ প্রাসাদ-বন্দী, সেই প্রাসাদের চারদিকে সুকর্ণ-বিরোধী ছোকরাদের বিক্ষোভ। এই ছোকরাদের পিছনে আছে মিলিটারী কর্তাদের উৎসাহ এবং সমর্থন। চীনের লালরক্ষী ছোকরাদের পিছনে মাও সে-তুং-এর মন্ত্রণা, তাদের আন্দোলনের একটি প্রধান লক্ষ্য প্রেসিডেন্ট লিউ শাও চি; ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ-বিরোধী ছাত্র-বিক্ষোভের পিছনে তেমনই মিলিটারী কর্তাদের মন্ত্রণা। রাজনৈতিক পরিস্থিতি অবশ্য দুই দেশে দু রকম। কিন্তু কৌশল প্রায় একই ধরনের। শক্তমানুষ জেনারেল সুহের্তো ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ-বিরোধী ছাত্রদের তারিফ করেছেন; গত এক বছর এরা একতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে আন্দোলন চালিয়েছে বলে জেনারেল সুহর্ত এদের সাধুবাদ জানিয়েছেন। সুকর্ণকে অপদস্থ করার কাজটা ইন্দোনেশিয়ার মিলিটারী কর্তারা সোজাসুজি নিজেদের হাতে নিতে নারাজ। ইচ্ছা করলে তাঁরা সুকর্ণকে নিজেরাই অনায়াসে পদচ্যুত, নির্বাসিত এবং এমন কী, রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত করতে পারতেন। জেনারেল সুহর্ত এবং তাঁর সহযোগীরা এখনও অত দূর অগ্রসর হতে প্রস্তুত নন। এই সংকোচ বা সাবধানতার কারণ সম্ভবত একাধিক।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদম মালিকের কথাবার্তায় তার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ পদত্যাগ না করলে গৃহযুদ্ধ হবে। তার মানে সুকর্ণের পক্ষেও লড়াই করবার জন্য ইন্দোনেশিয়ার কিছু লোক অন্তত প্রস্তুত। সৈন্যবাহিনীর বেশীর ভাগ অবশ্য জেনারেল সুহর্তের অনুগামী; দক্ষিণপন্থী গোঁড়া মুসলিম রাজনৈতিক দলগুলিও সুকর্ণের বিরোধী। ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্টরা ছিন্নভিন্ন, ছত্রভঙ্গ এবং নেতৃত্বহীন। তবু ভাঙতে ভাঙতেও হয়তো এদের কিছু কিছু সংগঠনশক্তি এখনও কোন কোন অঞ্চলে জেনারেল সুহর্তের মিলিটারী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সক্রিয়। তবে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ এই কম্যুনিস্টদের প্রতিরোধশক্তির উপর খুব বেশী ভরসা করতে পারেন না। কম্যুনিস্টদের পরেই ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিতে শক্তিশালী ছিল ডঃ সুকর্ণের নিজের গড়া ন্যাশনালিস্ট পার্টি। এই দলটির অবস্থাও এখন অনিশ্চিত। সুকর্ণের মতই তাঁর ন্যাশনালিস্ট পার্টির নেতারা কম্যুনিস্ট পার্টি এবং কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। ১৯৬৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসের সামরিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে ন্যাশনালিস্ট পার্টি সরাসরি জড়িত হয় নি। তবে ওই ব্যাপারে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের সায় ছিল, এ সন্দেহ গত এক বছরে ক্রমশ ঘনীভূত হয়েছে। এর ফলে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ পড়েছেন জবাবদিহির দায়ে; তাঁর ন্যাশনালিস্ট পার্টিও হয়েছে বিভক্ত, সংশয়গ্রস্ত।

অতঃপর প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ কার বা কীসের ভরসায় এখনও জেনারেল সুহর্ত এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদম মালিকের হুমকি উপেক্ষা করতে পারছেন, সেটাই বিস্ময়কর প্রশ্ন। সামরিক অভ্যুত্থান ব্যাপারে তাঁর হাত ছিল কিনা প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নি। এদিকে বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত আসামীরা অনেকে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের গোপন যোগসাজসের কথা বলেছেন। সুকর্ণ-বিরোধীরা দাবি করেছে, প্রেসিডেন্টের বিচার চাই। সুকর্ণ তবুও অটল। সেনাবাহিনীর দাবি প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ চাই, সুকর্ণ নিরুত্তর। সুকর্ণের ইন্দ্রিয়াসক্তি, বিলাসিতা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তর রসাল বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এতে সুকর্ণের কতখানি সম্ভ্রমহানি ঘটতে পারে বলা যায় না। একাধিক স্ত্রী এবং রক্ষিতা পোষণে ইন্দোনেশিয়ার মিলিটারী কর্তারাও অনেকে অভ্যস্ত শোনা

যায়। জেনারেল সুহর্তের সহযোগীরা তাই সম্ভবত সুকর্ণ চরিত্রের এই দিকটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করায় বিশেষ আগ্রহী নন।

ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতার শীর্ষদেশ থেকে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের বিদায় অনিবার্য। এই বিদায়-পর্বটা কী পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে, জেনারেল সুহর্ত এবং তাঁর সহযোগীরা সেটা এতদিন ঠিক করে উঠতে পারেন নি। ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিতে ডঃ সুকর্ণ অনেক দিনের পুরনো লোক; জনসাধারণের মনে তাঁর সম্পর্কে কিছু শ্রদ্ধা বা মোহান্ধতা এখনও আছে। জেনারেল সুহর্তের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী সুকর্ণের পদত্যাগ দাবি করলেও কোন কোন সেনানায়ক এবং সৈন্যদল সুকর্ণের পক্ষপাতী। কাজেই সুকর্ণের পদত্যাগের দাবিতে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে সুকর্ণ একেবারে সহায়হীন হবেন না। কামান-বন্দুকের জোর অবশ্য জেনারেল সুহর্তের মিলিটারী-রাজের দিকে বেশী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও জেনারেল সুহর্তের প্রতিপত্তি এখন প্রবল। কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে জোট বাঁধার ফলে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা সর্বত্রই শত্রু সৃষ্টি করেছিলেন। অথচ এখন তাঁর অস্তিত্ব বিপন্ন হলেও কম্যুনিস্ট চীন থেকে তাঁর কোন সাহায্য পাওয়ার আশা নেই।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের জনপ্রিয়তার একটা মূলধন ছিল তাঁর অসাধারণ বক্তৃতা-কৌশল। বক্তৃতার জোরে জনতাকে মাতিয়ে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ অনেকবার বাজিমাত করেছেন, রাজনৈতিক সংকট ঠেকিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত আয়ত্ত করেছিলেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব। সুকর্ণের এই বক্তৃতার যাদুকরী ক্ষমতা জনতার উপর খাটানোর পথও এখন বন্ধ। মিলিটারী-রাজের ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের গতিবিধি, কথাবার্তা, বেতার-ভাষণ সবই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। কামান-বন্দুকের জোর বক্তৃতার যাদুতে ব্যর্থ করা যায় না। দলীয় রাজনীতিকদের সমর্থনও এখন সুকর্ণের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য; ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্টরা অনেকে মিশিয়েছে মাটির তলায়, অবশিষ্ট কিছু আছে অন্তরালে, ন্যাশনালিস্ট পার্টিও বিপর্যস্ত। মিলিটারী-রাজের পছন্দমত বাছাই-করা প্রতিনিধিদের নিয়ে ইন্দোনেশিয়ার পার্লামেন্টের যে ঠাটটি আছে সেখান থেকে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে বরখাস্তের প্রস্তাব পাস করিয়ে নেওয়া কঠিন নয়। জেনারেল সুহর্ত এই রাজনৈতিক পন্থায় সুকর্ণ-মর্দনের ব্যবস্থা করছেন; ঘোষণা করেছেন মার্চ মাসের প্রথমে "পিপ্লস্ কনসালটেটিভ কংগ্রেসে"র বিশেষ অধিবেশন হবে সুকর্ণ বিদায়ের পালা।

৬-২-৬৭

লিউ
মাউ
চানে লিউ-মাউ ওঠা-নামার খেলা এখনো চলছে।
কামরাজ বলেছেন কংগ্রেসের আদর্শ সমাজতন্ত্রবাদ।
নিঃসঙ্গ পর্বতারোহী
জুতো ও চটির দাম বাড়বার সম্ভাবনা।
কারণ নেতাদের নির্বাচনী সভায় এর চাহিদা প্রচুর
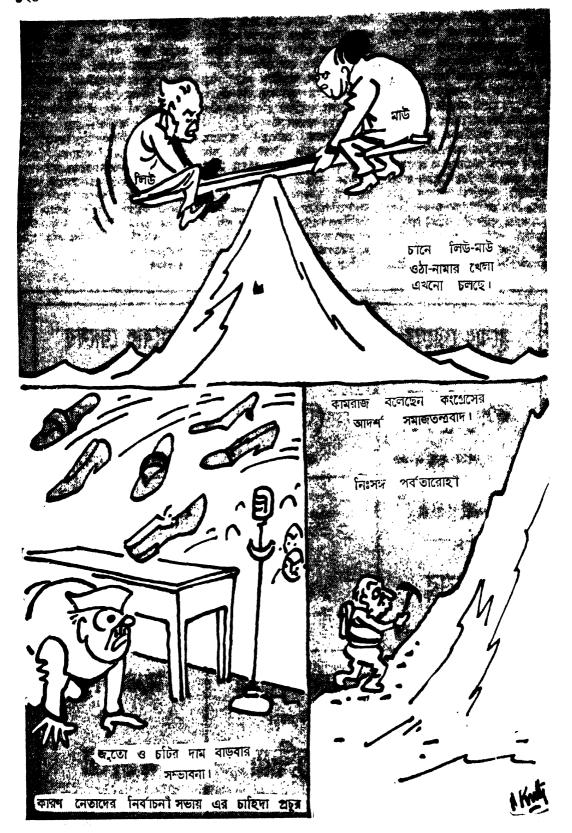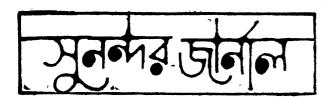
'লেখক এবং টেকস্‌ট বই'

একজন নামজাদা লেখকের একখানা বই কিনেছি ফুটপাথ থেকে। বিখ্যাত উপন্যাস। এই লেখকের যে-রকম বাজার দর, তাতে তাঁর বই ফুটপাথে আসার কথা নয়। বড় লেখকের এই ধরনের নামকরা বই মধ্যে মধ্যে ফুটপাথের দাড়ি আলো করে না, সে-কথা বলতে পারি না; অনেক সময় লাইব্রেরি থেকে লোপাট হয়, পারিবারিক সংগ্রহ থেকে প্রাজ্ঞ গৃহভৃত্য কখনো কখনো নিঃশব্দে দু-একখানা বই সরিয়ে কিঞ্চিৎ বাড়তি রোজগারের ব্যবস্থা করে, কখনো বা বাড়ির ঈষৎ পরিপক্ক বালক বা কিশোরটি কিছু কিছু বই রাস্তায় চালান করে দিয়ে সিনেমা দেখবার পয়সাও যোগাড় করে। কিন্তু এ তা নয়। এই বইখানার আরো গুটি তিনেক কপি ইতস্তত বিকীর্ণ দেখা গেল এবং আমি যেখানা কিনেছি, তার পাতা উলটেই জিজ্ঞাসার উত্তরও মিলে গেল।

বইখানির মলাট খুলতেই পুস্তানিতে চোখে পড়ল মালিকের নাম সগৌরবে লেখা আছেঃ অমুকচন্দ্র অমুক। ঠিকানার বদলে পাওয়া গেল রোল নম্বর এবং কলেজের নাম। তারও পরে ইংরেজী ভাষায় স্বরচিত কিংবা ঐতিহ্যসূত্রে লব্ধ একটি

কাব্যে হৃদয়

ছড়া, যার বঙ্গানুবাদঃ 'এটি আমার বই, কেউ চুরি করলে তাকে খুন করা হবে।' খুব নিদারুণ সংকল্প, সন্দেহ নেই। 'স্টিল'-এর সঙ্গে মিল মিলিয়ে সংকল্পের দৃঢ়তা খুব জোরালোভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বইখানার মালিকানার ব্যাপারে বালকটির হৃদয় এত কঠোর কেন, সেটা বুঝতেও বেশি দেরি হল না। দেখা গেল, তার আপাদমস্তক কালি এবং পেনসিলের দাগে বিচর্চিত, তার মার্জিনে মার্জিনে লেখা 'ইমপ, ভি ইমপ, ভি ভি ইমপ'—অর্থাৎ 'ইমপরট্যান্ট' শব্দটার বিভিন্ন ডিগ্রীর প্রয়োগ। তারও পরে মন্তব্যঃ 'চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, নাটকীয় সংঘাত, বিষবৃক্ষের সহিত তুলনা' (তাড়াতাড়িতেই বোধ হয় 'বৃষবিক্ষ' লেখা হয়েছে), ইংরেজীতে এক্সপল্‌ ('এক্সপ্ল্যানেশনে'র সংক্ষেপ), কোথাও বা 'চরিত্র ফুটিল না'। ব্যাপার আর কিছুই নয়—এই উপন্যাসটি কোনো কলেজী পরীক্ষার টেকস্‌ট বুকরূপে নির্বাচিত ছিল। পরীক্ষায় পাশ করবার ঘোরতর প্রয়োজনে গ্রন্থাধিকারীকে মালিকানার ক্ষেত্রে একেবারে রাইফেল উঁচিয়ে রাখতে হয়েছে এবং যাবতীয় কালি আর পেনসিলের দাগে কিংবা মার্জিন্যাল নোটের মনোযোগিতায় সে কোনো বিজ্ঞ

প্রকাশকের চোখে হৃদয়

অধ্যাপকের সনিষ্ঠ অনুবর্তী হয়েছে।

আমি জানি না, কোনো আধুনিক এবং জীবিত লেখক নিজেকে টেকস্‌ট বইরূপে নির্বাচিত দেখলে খুশি হন কি না। প্রকাশকের হাস্যোদ্ভাসিত মুখখানা অবশ্য মনশ্চক্ষেই দেখতে পাচ্ছিঃ 'ওটার এবার তেত্রিশ শো ইমপ্রেশ্যান দিতে হবে —অমুক ইউনিভার্সিটিতে ধরেছে।' অর্থকরী দিক থেকে এই ধরাটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—প্রকাশকের কথা ছেড়েই দিই, লেখকও নিশ্চয় তাঁর দোতলার মোজাইক আর তেতলার নতুন কনস্ট্রাকশান সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

আগেকার দিনে ঘরে ক্লাসিক না হতে পারলে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়ার দুরাশা কোনো লেখকের ছিল না। এমন কি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর জীবিতকালে এমন অবারিত ঔদার্যে স্কুল-কলেজের সিলেবাসে গৃহীত হননি। এখন বিলিতী মতে বরফ গলতে শুরু হয়েছে—জীবিত অথবা সদ্যোমৃত আধুনিক লেখকেরাও সিলেবাস আলো করে বসেছেন। অবশ্য অতি-আধুনিকেরা এখনো বিশেষ কলকে পাননি; —নাট্যকারেরাও না, তাঁদের কলেজীয় প্রতিনিধিত্ব বড়ো জোর যোগেশ চৌধুরী পর্যন্ত।

মনে প্রশ্ন জেগেছিল, লেখকেরা তাঁদের বইকে পাঠ্য-তালিকায় নির্বাচিত হতে দেখলে খুশি হন কি না। আর্থিকভাবে

পরীক্ষকের চোখে হৃদয়

নিশ্চয়ই—টাকা পেতে কার না ভাল লাগে? কল্পনা করুন—এমন একটা অলৌকিক ব্যাপার যদি ঘটে—হাতির ডানা গজানোর মতো সুনন্দর এই জার্নালের লেখাগুলোও কোনো কলেজের পাঠ্য হয়ে যায়, তা হলে তো আমি—

উঁহু, আলু-নশকর হয়ে লাভ নেই, 'ব্রাহ্মণ এবং শক্তু কলসে'র গল্পও আমার পড়া আছে। আমার পরম বন্ধু অধ্যাপক আমাকে সে আশ্বাস দেবে না, বরং যে বিশেষ ধূম্রসেবনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক

নেই, তা থেকে বিরত হওয়ার পরামর্শই দিয়ে যাবে। তার চাইতে, যোগ্যতর ভাগ্যবানদের দিকেই মনঃ-সংযোগ করা যাক।

বই টেকস্ট হল, অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও দেখা গেল। কিন্তু তারপর ?

যে-সব লেখক কেবল বিগত নন, একেবারে চিরকালের টেকস্ট বই-ই হয়ে গেছেন—যেমন ধরুন, মাইকেল বা বঙ্কিমচন্দ্র—তাঁদের নিয়ে কাঁদবার কেউ নেই—পরিতাপের জন্যেও না। কিন্তু যাঁরা এখনো সশরীরে আছেন, অথবা স্মৃতিতে যাঁরা অতি-প্রত্যক্ষ, তাঁদের অবস্থা একবার চিন্তা করে দেখুন।

কোনো 'সমারদ্রে'র সাহিত্য-ভাষ্য প্রসঙ্গে জীবনানন্দ কবিদের সম্পর্কে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেনঃ "যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক চেয়েছিলো"—/হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিলো লুটোপুটি"—তবুও আজ "অজর, অক্ষর অধ্যাপক" সেই কবিদের নিয়ে—। সুপরিচিত কবিতার বাকীটা উদ্ধৃত করতে চাই না, অধ্যাপক-বন্ধুর সঙ্গে হাতাহাতির উৎসাহও নেই—কিন্তু অধ্যাপক কবি জীবনানন্দ কলেজ-লেবরেটরির ব্যাং-কাটার কথাটা ভুলে গেলেন কেন তাই ভাবছি। বঙ্কিমের চিতার ছাই অনেক কাল আগেই পঞ্চভূতে বিলীন, মাইকেলও আর কবরের মধ্যে নড়ে উঠবেন না—কিন্তু জলজ্যান্ত এবং স্মৃতি-জীবিতেরা? তাঁরা সুকুমার-মতি বালক-বালিকাদের সামনে ব্যাঙের মতো চার-পা মেলে চিত হয়ে পড়ে থাকবেন, কখনো ইমপ, কখনো ভি ইমপ, কখনো বা ভি ভি ইমপে পরিণত হবেন; কখনো বিচক্ষণ সমালোচক তাঁকে 'এক্সপ্ল্যানেশনে' পরিণত করবেন, কখনো রসগ্রাহী আলোচনায় উত্তীর্ণ হবেন, কখনো 'শিল্পোত্তীর্ণ' হতে পারবেন না; কখনো বা 'চরিত্র সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়ে যাবেন, কখনো বা যে-বই তিনি কোনোদিন চোখেও দেখেননি, সেই বই থেকেই চুরির দায়ে ধরা পড়বেন। তিনি জ্ঞানগর্ভ 'বোধিনী'তে কখনো নিন্দিত—কখনো নন্দিত হবেন, কখনো বা বিক্ষুব্ধ অধ্যাপক ক্লাসেই ঘোষণা করবেন—"কেন যে ইউনিভার্সিটি এসব বাজে বই—"

সেইখানেই শেষ নয়। তারপরে পরীক্ষার খাতা। সেখানে নার্ভাস পরীক্ষার্থীর বিস্মরণে এবং অর্ধ-স্মরণে তাঁর বিবিধ রূপান্তর ঘটবে। তখন "কবিশঙ্কর কালিদাস রায়' 'মেঘদূত' লিখবেন, "তারাচরণ মুখোপাধ্যায়", 'ধাতু-বিধাতা' লিখে খ্যাত হবেন, তখন "বিভূতিকুমার চট্টোপাধ্যায়" 'তরণ' বইটি লিখে যশোলাভ করবেন। বিস্তৃত বিবরণ দরকার নেই—'দেশ' পত্রিকা ইচ্ছে করলে হাজার দিশেক 'হাউলার' যোগাড় করতে পারেন।

তারও পরে? সবচেয়ে নীট লাভ হচ্ছে এই যে, একবার যিনি পাঠ্যবস্তু হলেন—তিনি সারা জীবনের মতো কয়েক হাজার তরুণ-তরুণীর বিষ নজরে পড়বেন। পরীক্ষার সময় যে লোকটা এত দুঃখ দিতে পারে—তার বই আবার? উঁহু, পয়সা দিলেও পড়া চলবে না।

মাথায় থাকুক মশাই। সুনন্দর জার্নাল-গুলো যেন কখনো টেকস্ট বই না হয়।

নিমতলা শ্মশানে নববর্ষ

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

চলো যাই, দেখে আসি নতুন বছরে কারা বাড়ি এল। বেহারা পাল্কি নামাও—রাজার মুখ দেখি। গাঁদাফুলগুলি সরিয়ে দাও, দেখি রাজার দিগ্বিজয়ী বক্ষপট। বিদেশে ছিলেন কতদিন এ-অতিথি? তোমরা আত্মীয় ভেবে আঁকড়াতে চেয়েছ অকারণ, ক্ষতবিক্ষত করেছ শোকে এই দ্বিরাগমনের শুভমুহূর্তে!

সন্ন্যাসী, এসো, ভৃত্যের মতন এর শুশ্রূষা করো। চতুর্দিকে শোরগোল পড়ে যাক, কাঠে-কাঠে ধাক্কা লেগে আগুন জ্বলুক—আনন্দে নৃত্য করুক শিখারূপী সুরসুন্দরীরা, আমরা পথচারী কয়েকজন না হয় শানাই ধরছি।......

এত রাত্রে কলকাতায় কোনো গৃহস্থের দোকান খোলা নেই। নতুন বছরকে ওরা ডানপিটে ছেলের মতন কান ধরে ধর্মশালায় ঢুকিয়েছে—তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে অচেতন। ছেলেটা কাঁদছে নাকি? কেঁদে-কেঁদে নাকি দাদার পাশে ঘুমিয়েছে সে-ও।

শুধু জাগ্রত আছেন মহাগুরু নিমতলা শ্মশান; সারারাতব্যাপী নববর্ষের উৎসব চলছে সেখানে — সারারাতব্যাপী দিগ্বিজয়ী রাজপুত্রেরা আনাগোনা করছেন মখমলের পোশাক প'রে। কৌতূহলী জনতার মতো দূর থেকে তাঁদের কাছে আসতে দেখলাম; আমরা উঠে দাঁড়ালাম, অভিবাদন করলাম, বললাম—বেহারা, পাল্কি নামাও, রাজার মুখ দেখি।

বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় কোনো শোক মানায় না। শিখারূপী সুরসুন্দরীরা ঘিরে নৃত্য করছে দেখ, — চলো ওদের সঙ্গে যোগ দিই। দীর্ঘ বলবান কাষ্ঠখণ্ডগুলি আবার বৃক্ষ হয়ে দাঁড়াতে চাইছে, চলো ওদের সঙ্গে আমরাও দাঁড়িয়ে উঠি। মাথা ফাটাও চণ্ডাল, যাদের খুলির মধ্যে শুধু ঘুম, তাদের ঘুমগুলি ধুনোর আঠার মতো টপটপ করে ঝরে পড়ুক।

গরিব পথচারি আমরা জীবন্ত কয়েকজন এসেছিলাম পদব্রজে; কিন্তু চিৎকার করে বলেছিলাম—বোম্ ভোলানাথ, আজ নববর্ষে সন্ন্যাসী আমাদের শুশ্রূষা করুক।

তোমার মুখের দিকে

মানস রায়চৌধুরী

তোমার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে এত বেলা হয়ে গেল।
খর রৌদ্রে পুড়ে যায় শহরের বাস স্টপ, পিচ,
জনতাতাপিত ফুটপাথ
এত রৌদ্র, তবু তো তোমার মুখ স্পষ্টই হয় না। যেন তুমি
প্রতি মুহূর্তের কেন্দ্রে স্বপ্নের আড়ালে জ্বলতে থাকো
তোমার জ্যা-বদ্ধ ভুরু, দূরান্বিত চিবুকের ভাষা
খোঁপার বিবৃত-বাথা শরীরী আঁধার সব চির অস্পষ্টতা
এত বেলা অথচ অস্তিত্বে কিছু বোঝাই যায় না
যেন সবখানে কম্পিত ছায়ায় ঢেকে গেছে এই দিন
চেয়ে আছি ঘুমে, জাগরণে প্রতি মুহূর্তের জ্ঞানে ও নির্জ্ঞানে
তবু কুয়াশার অস্পষ্টতা
তোমার মুখে কি তবে পৃথিবীর রৌদ্রই লাগে না।

জীবন-যাত্রা

প্রভাত দেবসরকার

একেবারে ঘড়ি-ধরা হ'লেও মাঝে মাঝে সময়ের হিসেব কেমন যেন গোলমাল হ'য়ে যায়, দিশাহারার মত সদর রাস্তায় এসে সুকুমার ছোটাছুটি করে, ট্রাম-বাসের দরজায় দরজায় মাথা কোটে। কিন্তু ছুটন্ত সময়ের মত ট্রাম-বাসও নিষ্করুণ।

"ওটা থাক, পরেরটা!" সন্ধানী দৃষ্টিটা ডান দিকে ফিরিয়ে সুকুমার নিজেকে যেন প্রবোধ দিলে, বড্ড ভিড় বাসটায়!

তারপরেও ভিড়, তারপরেও ভিড়, তারপরেও—

না, আজ বোধ হয় আর আপিস যাওয়া হবে না, আর হ'লেও লেট নির্ঘাত।

"ও কি মশাই! ও কি মশাই, কি করছেন, কোথায় পা রাখবেন? আমার পা-টা যে থে'তলে গেল! নামুন, নামুন!"

নামবে, না আর কিছু! এই করে দশ বছর কেটে গেল, আরো বিশ বছর যে কাটবে না তার ঠিক কি। সুকুমার জানে, সহযাত্রীর অমন আপত্তিতে কান দিলে আপিস যাওয়া দায় হবে, আর আজকাল কারো পায়ের ওপর পা দিয়ে মাড়িয়ে না চললে কোন গন্তব্যেই পে'ৗছন যায় না।

"পা-টা একটু সরিয়ে নিন না, পা রাখতে পারছি না যে!"

"তা বলে পায়ের ওপর পা দিয়ে উঠবেন নাকি? আচ্ছা মজা তো!"

"মজা আর কোথায়, পড়ে যাচ্ছি, একটু সরান।"

"কোথায় সরাব? বেশ কথা বলছেন যা হোক!"

ডিজেল পুড়ে খাক হ'লেও, আপিস যাত্রী মানুষগুলো পোড়ে না, রাগেও না, ঠিক সময়ে আপিস-বাড়ি ছুঁয়ে দেয়; আর যদি ছুঁতে না পারে কোনদিন, ওপর-ওলার জ্ঞান লাভ করে কাচুমাচু হ'য়ে—'ভিড় তো নতুন নয়, একটু আগে থেকে বেরুলেই পারেন!'

কথাটা বেশ না হ'লেও মাঝ-পথের যাত্রীদের ঐ একই কথা বলতে হয় রোজ, তা ছাড়া বাস বা ট্রামে ওঠার উপায় কি? এক পা জলে এক পা স্থলে না হ'লে কখনো আপিস যাওয়া যায় ঠিক সময়!

কিন্তু আজ সুকুমার হেরে গেল, সহযাত্রীর পা এক চুলও নড়লো না। তর্কই সার হ'লো।

সুকুমার নেমে এল। আসন্নপ্রসবার দৈহিক অক্ষেপের মত বাসটা চলে গেল। তারপর আরো একটা বাস, গোটা দুই ট্রাম পর পর এল, গেল—সুকুমারের চোখের ওপর কেমন একটা পর্দা কাঁপতে লাগে! ইচ্ছে হল রাস্তার একটা পাথর খসিয়ে ঢাঁই করে ছুঁড়ে মেরে দৌড় দেয়। একটা বাস কি ট্রাম খালি আসতে নেই, সব দশ মাস হ'য়ে আছে, ইঃ!

সুকুমার লেটের ভাবনা ছেড়ে দিয়েছে, কতক্ষণ ধরে চেষ্টা করছে একটা কিছু ধরে হাজিরা দেয়। না, এখন পৌঁছাতে পারলে হয়। দেরি যখন, আপিসের নিয়মে পাঁচ মিনিটও যা পঞ্চাশ মিনিটও তাই!

সুকুমার উঠে ফুটপাথের ওপর দাঁড়াল। পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করলে। ভিড়ের চাপে একেবারে দুমড়ে কিম্ভূত হ'য়ে গেছে প্যাকেটটা, ভেতরে সিগারেটগুলো চিঁড়েচ্যাপটা! ইস্-স্-স্!

দুঃখটা এখন সিগারেটগুলোর জন্যে, আনকোরা প্যাকেটটা কি হ'য়ে গেছে—সিগারেট খাওয়ার সুখটাই মাটি, টেনে টেনে ধোঁয়া বার করতে বুকে ব্যথা ধরে যাবে। সুখ-টান—

টিপে টিপে একটা সিগারেট ঠিক করে ধরাতে যে সময় লাগল তাতে ধূমপানের আনন্দ বা নিশ্চিন্ততা কিছুই পাওয়া গেল না, সেই কেমন যেন অনিশ্চিত উদ্বেগ দেহ-মনকে আচ্ছন্ন করে রইল। ভোঁতা ভোঁতা লাগল!

"আপিস যাব কি, যাব না? ট্রাম-বাসের ভিড় কমছে না, পা রাখবার জায়গা নেই কোথাও!"

আধ-খাওয়া সিগারেটটা হাত থেকে ফেলে দিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে যেন সুকুমার রাগ মেটাতে চাইলে। শালা, কোনদিন একটু হাত-পা খেলিয়ে আপিস যাবার উপায় নেই! বেশ করে লোকে ট্রামবাসে আগুন ধরিয়ে দেয়! যুক্তিসংগত অনেক কারণ আছে যেন মেজাজ খারাপ করার।

সন্ধানী চোখ বুঝি একসময় স্তিমিত হয়ে আসে, সময়ের ঊর্ধ্বশ্বাস চৌরাস্তার মোড়ে কখন শান্ত হ'য়ে আসে। ট্রামবাসের জানালায় চকিতচপলার চঞ্চল চাহনি আর লক্ষ করা যায় না।

হঠাৎ সামনের বাসটায় তাড়াতাড়ি করে উঠে সুকুমারের মনে হল, এ বাস আপিস-পাড়ায় পৌঁছবার আগেই হাজিরার খাতাটা দত্ত সাহেবের টেবিলে গিয়ে পড়বে। তারপর—

বিশ্রী এই নিয়ম হাজিরা খাতায় রোজ আপন অস্তিত্ব প্রমাণ করার। দেরি হ'লে মুখে কিছু না বললেও দত্ত সাহেব মুখটা এমন করে যেন নির্ঘাৎ ফাঁসির আসামীকে নেহাত করুণা করেই ছেড়ে দিলে! বয়সেরও কোন খাতির করে না দত্ত সাহেব—বেশ মিষ্টি মিষ্টি করে শুনিয়ে দেয় হাতের কাছে পেয়ে। সেকশনে বসে অনেকক্ষণ সুকুমার মন স্থির করতে পারে না—দুনিয়াসুদ্ধ সবার ওপর বিরক্ত হয়। শালার দেশে মানুষ বাস করে! যেমন ব্যবস্থা বাজার-হাটের তেমনি ব্যবস্থা যানবাহনের! এর ওপর অধস্তনদের ওপর নানানখানি উপদেশ আছে, এটা কর, সেটা কর—বেশী খেটে কম খেয়ে টুঁ শব্দ না করে দেশের মান বাড়াও!

মাথার ওপর বাসের রড ধরে তাল সামলে সুকুমার মনে মনে যেন সংকল্প করলে, আজ যদি লেট নিয়ে কিছু বলে, আচ্ছা করে শুনিয়ে দেবে, সাহেব বলে কোন খাতির করবে না! বর্তমান জীবনযাত্রার এমন সব অসুবিধার কথা বলবে যা কোনদিন কেউ প্রতিকারের কথা ভাবেনি, যার জন্যে এই অনিয়ম, গণ্ডগোল সব জায়গায়! ভারি তো দু পয়সার চাকরি!

হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে পাশের সিটে দুই অফিসগামী মহিলাকে পরম নিশ্চিন্তে উল বুনতে আর বই পড়তে দেখে সুকুমারের গা জ্বালা করে। জ্বালাটা যেন মুখে গাঁজিয়ে ওঠে—মনে মনে সুকুমার ফুৎকার দিয়ে ওঠে, বেশ আছেন! বই পড়তে পড়তে আপিস চলেছেন! আবার 'উল' বোনা হ'চ্ছে 'বসের' গায়ে জড়াবেন বলে। যত সব!

সুকুমারের আরো মনে হ'লো, একবার জিজ্ঞেস করে দেখলে হয়, আপনাদের কখনো লেট হয় না? হাতের ঘড়িটা কত সময় বলছে? নাকি ঘড়ি বন্ধ হ'য়ে গেছে!

নিজের রাগের কথা নিজে ভেবে আবার হাসিও পায় সুকুমারের, কেননা একটা আশ্চর্য মানসিকতা অনুভব করেছে সুকুমার, যেদিনই বাসে বা ট্রামে সহযাত্রী কোন আধুনিকা তরুণী না থাকে সেদিন

যাত্রাটা ব্যথা মনে হয়, মরা-মরা লাগে। একটা গবেষণা এই নিয়ে সুকুমার যে না করেছে তা নয়—বাসে ট্রামে ভিড়ের মধ্যে আধুনিকারা ওঠা-নামা করেন বলেই না লোকে আজো অকাতরে ভিড় সহ্য করে, কার না ভাল লাগে সুন্দর মেয়ে দেখতে। সান্নিধ্য লাভ করতে। একটুকু ছোঁয়া পেতে।

তাল সামলাবার নাম করে অনেকবার সুকুমার ফিরে ফিরে মেয়ে দুটিকে দেখলে, হিজিবিজি অনেক ভাব মনে মনে ওঠা-নামা করলো—তার মধ্যে একটা (ছি ছি, শুনলে লোকে পাগল ভাববে কি, চাঁদা করে মার-ধোরই করবে!) পার্শ্ববর্তিনী কি, সহচরী হওয়ার প্রার্থনা। মানে সুকুমারের ইচ্ছে একটিকে সঙ্গী করে' আপিস পালিয়ে সারা দিন মাঠে-ঘাটে বেড়ায়, তারপর সন্ধ্যের সময় যেমন বাড়ি ফেরে তেমনি বাড়ি ফেরে।

আহা, এমন ইচ্ছে সুকুমারের আর কোনদিন হয়েছে কিনা সুকুমার খেয়াল করতে পারে না! কিন্তু আজকের ইচ্ছেটা যে গর্হিত এবং বিপরীত ভাবনার আগেই মেয়ে দুটি বই মুড়ে, উল গুটিয়ে একখানে নেমে পড়ল। মাথার ওপর লোহার রডটা না থাকলে সুকুমার হয়তো বাসের মধ্যেই বসে পড়ত। হয়, এমনি প্রতিদিন তাদের মত দলের লোকের কত ইচ্ছার মৃত্যু ঘটছে!

হঠাৎ কি মনে হল সুকুমারের। তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার মত ইচ্ছার অপমৃত্যুটা তাকে দিশাহারা করে দিলে। যেন ক্ষেপে গিয়ে পরের স্টপে হুড়মুড় করে নেমে পড়ল। 'শালা, আজ আপিসেই যাব না!'

তারপর সুস্থির হ'য়ে নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে সংশোধিতের মত আশপাশে চেয়ে দেখলে। আশ্চর্য, অদ্ভুত লাগছে দৃশ্যটা, মনের মধ্যে কেমন যেন ভাব হচ্ছে আপিসগামী ঐসব ট্রাম বাস দেখে। আরো আশ্চর্য, নিজেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত মনে হচ্ছে চলমান এই দৃশ্য থেকে।

চশমা খুলে খালি চোখে দেখতে ইচ্ছে হল—বাই-ফোকাল চশমার হয়তো ঠিক দেখা যায় না। কিন্তু না, খালি চোখেও সেই, কেমন রহস্য-রহস্য, কুয়াশা-কুয়াশা!

সুকুমার অনেক করে ভাবতে চেষ্টা করলে, ঐ ট্রামে বা বাসে সে কতদিন গাদা-গাদি হ'য়ে কত হাজারবার আসা যাওয়া করেছে, কিন্তু কই, আপন পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে কোন একদিনও তার মনোভাব এমন উপভোগ্য মনে হয়নি! সত্যি ভাল লাগছে, সুন্দর মনে হচ্ছে আপিস-টাইমের ঐ ভিড়, ট্রাম, বাস, যানবাহন, লোকজন!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুকুমার দৃশ্যটা উপভোগ করলে। হঠাৎ একটা মুক্তির আনন্দ যেন বোধ করলে। মুখ দিয়ে নিঃশব্দে একটা স্বস্তির শব্দ যেন বেরিয়ে এল—উঃ, আঃ!

এমন আরাম, এমন স্বস্তি বুঝি জ্ঞান হ'য়ে আর কখনো অনুভব করেনি সুকুমার—জীবনের স্বাদ যেন ভিন্ন, অনাস্বাদিতপূর্ব সুখকর, মনোরম, পুলকময়। শিহরিত বৃক্ষপল্লবের মত দেহের ভার লঘু হ'য়ে গেছে সুকুমারের। মুখের স্বস্তির শব্দটা বুঝি জোরেই বেরিয়ে আসে আবার।

গুটি গুটি রাস্তার কিনার থেকে সুকুমার মাঠের মধ্যে নেমে এল। গন্তব্যের উদ্দেশহীনতায় মনে কোন ভাবনাই নেই। যেন স্বচ্ছন্দে অনেক অনেক দূরে সুকুমার চলে যেতে পারে, ঐ ছুটন্ত ব্যস্ত চঞ্চল শহরে যেন সে তার প্রাত্যহিকতার

খোলসটা ছেড়ে এসেছে। অদ্ভুত মনে হচ্ছে সুকুমারের নিজেকে।

রোদ-বিছান সবুজ মাঠটা ম্যাটিং-এর মত, যেন পা ডুবে যাবে। গাছগুলো কি সুন্দর ছবির মত। একটা দার্শনিক চিন্তা সুকুমারের মাথায় আসে, এই শহরের আশপাশে যদি একটাও গাছ না থাকতো তা হলে মানুষগুলো বুঝি আর মানুষই থাকতো না, ভিন্ন পরিচয়ে ডাকতে হ'তো। গাছপালা আর মাটির সবুজের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলেই মানুষ মানুষ!

ছোট বেলায় গাছ পোঁতা সুকুমারের একটা বাই ছিল। মাটিতে কোন গাছের চারা দেখলে মনটা যেন কেমন করতো—একটা বিরাট কল্পনা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলতো। কতদিন ভোরে উঠে সে গাছের চারা দেখে দেখে মনে করত, কবে বড় হয়ে গাছটা ডালপালায় বিস্তীর্ণ হবে। তাদের গ্রামের প্রান্তসীমায় যে বটগাছটা আছে তার বয়স কেউ জানে না, কে প'তেছিল কেউ বলতে পারে না। গাছ ছাড়া ধূধূ মাঠও বুঝি দেখতে ভাল লাগে না!

একটা বড় গাছের তলায় এসে সুকুমার দাঁড়াল। ওখান থেকে একবার শহরের দিকে চেয়ে দেখল। আশ্চর্য, মনেই হয় না, এই কিছুক্ষণ আগেও সে ওখানে হাঁস-ফাঁস করেছে, ছটফট করেছে, সংগ্রাম করেছে! উঃ, খুব যেন বেঁচে গেছে পালিয়ে এসে!

আনন্দ যেন আরো উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে, সুকুমার ছুটে গিয়ে সামনে একটা পুকুর-পাড়ে দাঁড়ায়! কত আশ্চর্য যেন মাঠের মাঝে হঠাৎ একটা পুকুর! কি সুন্দর নীল আকাশের মত জল কানায়-কানায় ভরা! হঠাৎ সুকুমারের সেইখানটা মনে পড়ল—'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ'—পাড়ে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে জলে নিজের ছায়া দেখলে সুকুমার। বুঝি আয়নাতেও অত স্পষ্ট নিজের মুখ দেখা যায় না। কতক্ষণ আপন প্রতিবিম্বে বিমোহিত হ'য়ে সুকুমার দাঁড়িয়ে রইল। পাড়ে দাঁড়িয়ে জলের একটা আকর্ষণ সারা শরীরে সঞ্চারিত হয়, ইচ্ছে করে এখনই হুড়মুড় করে পুকুরের পাড় থেকে লাফ দিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মনে পড়ে, তারা গাঁয়ের ছেলে, সেই কবে মাটি আর জলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হ'য়ে গেছে! জলের পোকা ছিল তারা; কি ভালবাসতো তারা জল ঘাঁটতে! জীবনের সে এক আনন্দের দিন গেছে বটে মাটি আর জলের সাহচার্যে!

সুকুমার একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে জলে ছুঁড়ে দিলে। জলে ঢেউ উঠলো, প্রতিবিম্ব মিলিয়ে গেল। সুকুমার জলের পাড় থেকে সরে এল।

মাঠের ওপর দিয়ে সোজা একটা রাস্তা দক্ষিণে খিদিরপুর না কোথায় চলে গেছে। মহারানীর স্মৃতি-সৌধের বিরাট বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। সুকুমার পায়ে-চলা পথ ধরে হাঁটতে লাগল। খানিক হেঁটে যেতে উল্টো পথে একটা লোক দুটো বানর নিয়ে এগিয়ে এল। সুকুমার থমকে দাঁড়াল। মাঠের ওপর দিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে বানর নিয়ে যাওয়া যেন খুব একটা আশ্চর্য দৃশ্য! সুকুমারকে থমকে দাঁড়াতে দেখে বাঁদরওলা দাঁড়িয়ে পড়ল, দড়িতে বাঁধা বানর দুটো চঞ্চল হয়ে লাফালাফি আরম্ভ করলে। বাঁদরওলা ছড়ি নাড়তে লাগল।

সুকুমার সভয়ে সরে দাঁড়াল। বাঁদরওলা বললে, "কি বাবু, খেল দেখোগে ?"

সুকুমার মাথা নাড়লে, না, বানরের খেলা সে দেখবে না।

বাঁদরওলা সামনে এগিয়ে গেল। ডুগ ডুগ করে বাঁদরনাচের বাজনা বাজতে লাগল—মাঠের কতদূর থেকে শব্দটা যেন ঐ শহরের সান-বাঁধান রাস্তায় আছড়ে পড়ে প্রতিধ্বনি তুললে, ডুব-ডুব-বু-বু-ডুব! সুকুমার অদ্ভুত মাদকতা বোধ করলে।

সুকুমার এগিয়ে গেল। খানিক গিয়ে পিছন ফিরে দেখলে, বাঁদরওলা তখন মাঠ পেরিয়ে শহরের রাস্তায় গিয়ে উঠেছে, মাদী বানরটা বুঝি গাড়ি-ঘোড়ার শব্দে ভয় পেয়ে বাঁদরওলার কাঁধের ওপর উঠে পড়েছে।

সুকুমার যেন জিজ্ঞেস করতে বড় ভুলে গেছে, বাঁদরওলা কোথায় খেলা দেখাতে চলেছে—কোন পাড়ায়? সেখানে গিয়ে আর আর দর্শকের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়ালে কেমন হয়! সবার সঙ্গে সেও খেলা দেখে খুশী হয়ে দু' চার পয়সা ছুঁড়ে দেবে। ওসব খেলা তো কতদিন উঠে গেছে, রাস্তা-ঘাটে বড় একটা আর দেখা যায় না। আজ

যখন আপিস কামাই-ই করলো তখন বাঁদর-নাচ দেখলে হয়।

নিজের অদ্ভুত খেয়ালে সুকুমার মনে মনে হাসলে। প্রায়বৃদ্ধ একটা লোকের আচ্ছা শখ হয়েছে ছেলেমানুষি করার।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা চলে এল সুকুমার। মহারাণীর স্মৃতিমন্দির কত-দূরে পড়ে রইল, চূড়াটা গাছের আড়াল হল। হঠাৎ একটা রাস্তা মাঠ দিয়ে বিস্তৃত হয়ে পূব-দক্ষিণে চলে গেছে। সুকুমার রাস্তার ওপর উঠে সোজা চলতে লাগল—যেন যত দূরে খুশি যে দিকে দু' চোখ যায় চলে যেতে চায়; কোন তাড়া নেই, কোন গন্তব্যও নেই।

খানিক এগিয়ে সুকুমার থমকে দাঁড়াল। আশ্চর্য যেন দৃশ্যটা! রাস্তার ধারে একটা বিরাট গাছের গুঁড়িকে আশ্রয় করে একটা গৃহস্থালি গড়ে উঠেছে। পিতলের চকচকে কয়েকটা থালাবাটি এদিক ওদিক পরিপাটি করে গাছের শিকড়ের ওপর উপুড় করে রাখা, টিনের পাত্রে জল ধরা, একটা বেতের ধামাতে কাপড় চাপা দেওয়া কিছু জিনিসঃ পাশে একটি লোক চুপ করে বসে আছে। রঙ-ময়লা লোকটির মাথায় বিরাট টাক, মুখে বসন্তের দাগ।

সাড়া পেয়ে লোকটি নড়ে-চড়ে বসল। সুকুমার দূর থেকে গৃহস্থালিটি নিরীক্ষণ করতে লাগল। এ আবার কি ধরনের সংসার পেতেছে লোকটি মাঠের মাঝখানে লোকালয় থেকে দূরে? অতগুলি থালাবাটিই বা অমন করে গাছের গুঁড়িতে সাজান কেন? সুকুমার চেয়ে দেখলে, কাকের বাসার মত মাথার ওপর একটা আচ্ছাদনীও আছে।

লোকটি যেন হাসলে। সুকুমার অন্ত-রঙ্গতার অভিপ্রায়ে সামনে এসে জিজ্ঞেস করলে, "তুমি এখানে থাক বুঝি?"

লোকটি বললে, "নেই, ভুজা বিকাতা!"

সুকুমারের মনে পড়ল, শহর ছুঁয়ে যে-সব রাস্তা এদিক ওদিক গেছে, যেখানে কুলি-কামিনরা আসা-যাওয়া করে তার আশেপাশে এমনি দু-একটা ভুজাওয়ালার দোকান আছে। ট্রাম-বাস থেকে চকিতে কখনো বুঝি দেখেছে গাছতলায় বসে পিতলের থালায় ছাতু গুলে নুন-লঙ্কা সহযোগে পরম তৃপ্তিতে কারা যেন ভোজন-পর্ব শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎ নিজের নাকে-মুখে গুঁজে খাদ্য-গ্রহণের তাড়াটা মনে পড়ল, ভাতগুলো যেন মুখে উঠে এল! মুখের মধ্যে একটা বিস্বাদ লাগল। বেশ আছে এরা, ঐ পিতলের থালায় যেন অমৃত নিয়ে বসে, কত তৃপ্তি আর আনন্দে গ্রহণ করে।

আর সুকুমারদের খাওয়া নয় তো গেলা, এক স্বাদ, এক ভাব বারো মাস! আপিসের টাইম বলে সময় নেই! ইস্‌-স, আজ যখন আপিসেই গেল না, তখন দু' দণ্ড সুস্থির হয়ে বসে খেলেই হত। অমন বুড়ো আঙুল ঠেলে গর্ত ভর্তি না করলেই হতো। বলেছিল বটে রেবার মা, একটু বসে খাও তরকারিটা হয়ে গেল।

আর বসা? সুকুমার বাঁশি শোনার মত চঞ্চল হয়ে ছুটে সদর রাস্তায় চলে এসেছিল। এক একদিন আবার বিরক্ত হয়ে সুকুমার স্ত্রীকে মুখনাড়া দিয়ে বলেছে, তুমি খেও!

তারপর চিরাচরিত প্রথায় বেধে গেছে—ঠাকুর, চাকর, দাসদাসী ইত্যাদি ব্যবস্থার বাক্‌বিতণ্ডা।

যাক। আজ কিন্তু এই মুহূর্তে গাছ-

তলায় দাঁড়িয়ে ভুজাওলার তৈজসপত্রের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টি মেলে মনে মনে একটা ক্ষুধা যেন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ঐ চকচকে পিতলের থালায় ছাতু গুলে খেলে কেমন হয়? যেন অমৃতের আস্বাদ ওতেই পাওয়া যাবে।

ভুজাওলা কি ভেবে ছাতুর পাত্রটা ধুলে রাখলে, তেঁতুলের জলটা একটা কাঠি দিয়ে নাড়িয়ে দিলে! সুকুমারের জিভে জল এল কি না কে জানে। সুকুমার গুটি গুটি এগিয়ে গেল, তার ভদ্রতায় বাধল।......

সত্যিই আজ যেন সব কেমন কেমন লাগছে! হাঁটতে হাঁটতে এ কোথায় এসে পড়ল? মাঠ ছাড়িয়ে লোকালয়। সুন্দর লাগছে দেখতে এখানে মানুষের জীবনযাত্রা। কত স্বচ্ছন্দ সহজ যেন! কই, এখানে তো তেমন কোন ব্যস্ততা নেই কারো? সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত বটে, কিন্তু গলায়-দড়ি বা নাকে-দড়ি অবস্থা নয়—অনেক স্বাধীন, সহজ, সরল।

দড়ি ছিঁড়ে, বুড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসার মত নিজেকে মনে করে সুকুমার। বড় যেন আকর্ষণীয়, মায়াময় মনে হয় পরিবেশ। এই একটু আগে মাঠের গাছে একটি স্বচ্ছন্দ-বিহারী পাখির গতি-বিধি লক্ষ করে যে আনন্দ পেয়েছিল, এখানে আপন নিয়মে গড়ে-ওঠা লোকালয়ের নিত্যজীবনযাত্রা লক্ষ করে সুকুমার সেই আনন্দ পাচ্ছে। সত্যি বড় ভাল লাগছে এদের মধ্যে খুশিমত ঘুরে বেড়াতে। আরো কোথাও যেন এমনি-ভাবে সুকুমার বিচরণ করতে চায়! উঃ, খুব যেন বেঁচে গেছে আজ আপিস পালিয়ে!

অনেক দূরে ট্রাম-বাসের শব্দ, দুঃস্বপ্নের রেশ যেন। সুকুমার মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে পড়ে—মনে হয় যেন এইসব লোকজন, জীবন-যাত্রা সে আর কখনো দেখেনি, এরা যেন নতুন!

ধুলোর মানুষ যেন সব ধুলো-খেলা করছে! ধুলোর মধ্যে একদল লোক গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে, মধ্যে কি একটা কৌতূহলের ব্যাপার হয়েছে—অলক্ষ্যে অদ্ভুত গলায় কে যেন কি বলছে গমক দিয়ে দিয়ে।

সুকুমার ধুলোর মধ্যে পা ডুবিয়ে ধুলো-খেলা দেখতে লাগল—আলখাল্লা পরা লোকটি তখন চীৎকার করে সমবেত জনতাকে বলছে, "এ মাদারি..."

একটা টিনের কৌটোর ওপর একটা মড়ার মাথার খুলি বসিয়ে বাজিওলা বলছে, "এ ধুলা নেই, এ সোনা আছে, খানা আছে, আপকা পছন্দ যা চাই, সব আছে!"

তারপর হাতের আঙুল দিয়ে চিমটি কেটে ধুলো তুলে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে

লোকটি মুখে চু-চু শব্দ করে বললে, "কেয়া চাহিয়ে বাবুজী বলিয়ে!"

সুকুমার যেন লজ্জায় পড়ে। লোকটি নাছোড়বান্দা, সুকুমারকে কিছু একটা চাওয়াবেই।

"ফরমাইয়ে কুছ, আপকা মর্জি?"

কিছু ফরমাশ করার কথা সুকুমারের মনে পড়ে না। পাশ থেকে সুকুমারের হয়ে একজন বললে, "কুছ্ বাড়িয়া চীজ দেখাইয়ে তো?"

"কোন্ সা চীজ?" বাজিওলার হাতের মুঠোয় অদৃশ্য, আশ্চর্য জিনিসটা টগবগ করছে।

"পাকা আম লে আ-ও!"

মুঠো খুলতে সত্যি পাকা আম দেখা গেল, বাজিওলা ছুরি নিয়ে সেই আম টুকরো টুকরো করে কেটে সবাইকে খেতে দিলে। সুকুমার খেল না। তবু সবার সংগে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে সুকুমারের খুবই ভাল লাগল। আশ্চর্য, সুকুমার যেন সব ভুলে গেল, এত আনন্দ বুঝি সে জীবনে কোনদিন লাভ করেনি।

পর পর অনেক অবাক-করা খেলা দেখালে মাদারিওলা। অনেক বাক্-বিস্তার করে রগড় করলে, জায়গাটার ধুলো উড়িয়ে দিলে। একসময় সুকুমারের মনে হল, সে যদি অমন ভেলকি-খেলা দেখাতে পারতো, ইচ্ছেমত ধুলোমুঠোয় যা খুশি আনতে পারতো! আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ বুঝি কেবল কল্পনা নয়।

ভেলকিওলা একা নয়, সংগে সাকরেদ একটি মেয়ে আছে—খেলা দেখানর ব্যাপারে ভেলকিওলাকে নানাভাবে সাহায্য করছে, ধুনির পিছনে প্রতিধ্বনির মত ঘুরছে। ঘাঘরা, কাঁচুলি আর ওড়নায় অপরূপ প্রজাপতির মত দর্শকের চোখের ওপর মেয়েটি সজীব হয়ে ফুটে উঠছে। মাঝে মাঝে খেলার চেয়ে চঞ্চল মেয়েটিকেই দেখতে হয় ভেলকি চেয়ে আরো ভেলকি যেন সে! রহস্যে ভরা!

জীবন-সঙ্গিনী? এমনিভাবে কোনদিন উন্মুক্ত ধূলিমলিন মাঠের মধ্যে খেলা-দেখার নামে দাঁড়িয়ে না পড়লে হয়তো সুকুমার কোনদিন কথাটার মানে বুঝতে পারতো না। ঐ শহরে আজকাল অনেক জীবন-সঙ্গিনীকে পুরুষের পাশে দাঁড়াতে দেখা যায় বটে, কিন্তু তারা কেউ-ই এত স্বাভাবিক নয়, এত সহজ, সুস্থও নয়!

রেবা একেবারে জড়ভরত। দু' বেলা দুটি রেঁধে-বেড়ে কর্তব্য শেষ করে ফেলে! সুকুমার মনে মনে যেন সক্ষোভে বলে উঠলো, না, কিছু সাহায্য করে না। জীবন-সঙ্গিনী কিছুতে বলা যায় না!

সুকুমারের মনে হল, তার জীবন যদি অমন হত—সে যদি অনুরূপ একটি মেয়েকে জীবন-সঙ্গিনী করে মাঠে-ঘাটে খেলা দেখিয়ে বেড়াতে পারতো তা হলে যেন সার্থক হতো।

হঠাৎ ভেলকিওলা ধুলো পড়ে কি মন্তর দিলে, সাকরেদ মেয়েটি মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল—প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে নেড়ে মাথার বেণীটা সপাং সপাং করে বুকের ওপর আছড়াতে লাগল। ভেলকিওলা ডম্বরু বাজিয়ে বলছে, "বাবু-ভাইরা, পয়সা দাও, না হলে ওর ছটফটানি থামবে না!"

সুকুমার তাড়াতাড়ি পকেট থেকে আজকের বাঁচান ট্রামভাড়াটা ছুঁড়ে দিলে।

সুকুমারের মনে হল, একটা জ্যান্ত সাপ ধরে মেয়েটি যেন বুকের চূড়ায় আছড়ে মারবার চেষ্টা করছে। উঃ, কি ভয়ংকর করুণ দেখতে হয়েছে মেয়েটিকে! সত্যি মন্ত্রমুগ্ধ? ভেলকিওলা বড় নিষ্ঠুর...

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে একবার সংসার থেকে ছুটে কোথাও পালিয়ে যেতে সুকুমারের ইচ্ছে হয়েছিল, একদিন পালিয়ে-ছিলও—কিন্তু সে নিরুদ্দেশ যাত্রায় একটা কি দুটো মাঠ পেরোবার পর পায়ের জুতোর স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে যেতে মন-খারাপ হয়ে সুকুমার ফিরে এসেছিল। আজ তেমনি একটা ইচ্ছে হলেও চাকরিটার জন্যে যেন সুকুমার যেতে পারছে না। কাল আবার চাকরিতে যোগ দিতে হবে, আজ পালালে কি হবে।

এরাও তো খেটে খায়, জীবিকার জন্যে সচেষ্ট হয়? কিন্তু জীবনের গ্লানি কিছু ভোগ করে কি নিয়মতান্ত্রিকতায়? ভাবে, কি অসহ্য জীবনের বোঝা, জীবনের দায়?

হেমন্ত-শেষের মিঠে রোদ প্রকান্ড একটা অশ্বত্থগাছের তলায় ছড়িয়ে পড়েছে, গাছের পাতা নড়ায় মনে হয় রোদ কাঁপছে, আলোর ঝিলমিলি যেন। ওইখানেই লোকটি দোকান বিছিয়েছে—নানা জিনিস। যেন আশ্চর্য দ্রষ্টব্য বস্তু সব। সুকুমার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে, মনে হল এক এক করে জিনিসগুলো কিনে ফেলে। দোকানদার কিন্তু নির্বিকার, দোকান দিয়ে এক ধারে গাছের ছায়ায় চুপ করে বসে আছে, যেন জিনিস বিক্রির দায় তার নেই।

কি কিনবে কি কিনবে করে সুকুমার একটি হজমি ওষুধের শিশি তুলে দাম জিজ্ঞেস করলে। দোকানদার দাম বললে।

যেন এই জিনিসটা শহরের কোন দোকানে সন্ধান করে মিলবে না, ধন্বন্তরী, এমনি সাক্ষাৎ হঠাৎ-ই মেলে। সুকুমার খুবই খুশী হলো, যেন মূল্যের অতিরিক্ত লাভ হলো! মনে পড়ে না, ইদানীংকালে পয়সা দিয়ে প্রয়োজনীয় কোন জিনিস কিনে মনে মনে এত খুশী হয়েছে সুকুমার! কেবল মনে হয়েছে, জিনিস কেনার নামে ঠকেই যাচ্ছে।

বারবার হজমী ওষুধের শিশিটা চোখের সামনে তুলে ধরে সুকুমার ওষুধের লিখিত গুণাগুণ পড়তে লাগল। পেটের যত রকম পীড়া আছে সবই নিরাময় হয়। ভাগ্যিস আজ আপিস পালিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, না হলে এ জিনিস কোথায় পেত? খুব লাভ হয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে একটা কংক্রিটের পোলের ওপর এসে সুকুমার দাঁড়াল। দুপুরের রোদটা একটু হেলে গেছে। পোলের নীচে তিরতির করে ঘোলা জল বয়ে যাচ্ছে, কালীঘাটের ওধারে বহুদূরে যেন খাল চলে গেছে!

হঠাৎ সুকুমারের দৃষ্টি যেন আটকে গেল। মরা-স্রোত খালের জলে একটা ছায়া যেন কাঁপছিল। সুকুমার লক্ষ করে দেখলে, পোলের নিচে উত্তরণের সিঁড়ির এক ধারে এক যুগল মূর্তি ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে। সুকুমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। আশ্চর্য আড়ালটা ওরা বেছে নিয়েছে, লোয়ার পোলের নীচে জলের ধারে বসে আলাপ করবার উপযুক্ত স্থান বটে! এমন নিভৃত নির্জন আর কোথাও মিলবে না লোকালয়ে।

সুকুমারের একবার বুঝি গলা খাকারি দেবার ইচ্ছে হল। বলে দেয়, উঁহু, দেখতে পেয়েছি! জলের ধারে কেন, মনের কথা কি আর কোথাও বলা যায় না?

না থাক, ওরা ওই সিঁড়ির শেষ ধাপে বসে প্রবাহিত জলধারায় চোখ রেখে জীবনের আনন্দের আস্বাদ নিক। হয়তো আর কোনদিন এমন স্থান-কালের সন্ধান ওরা পাবে না। সব আনন্দ যেন কেমন ছুটে পালায়, ধরে রাখা যায় না!

পোলের একধারে দাঁড়িয়ে সুকুমার কেমন যেন উদাস হয়ে ওঠে। জীবনের এ দৃশ্য চিরকালের, তবু তার পক্ষে আজ যেন তা কত সুদূরের! এর দর্শনে যেমন আনন্দ আছে তেমনি বেদনাও আছে।
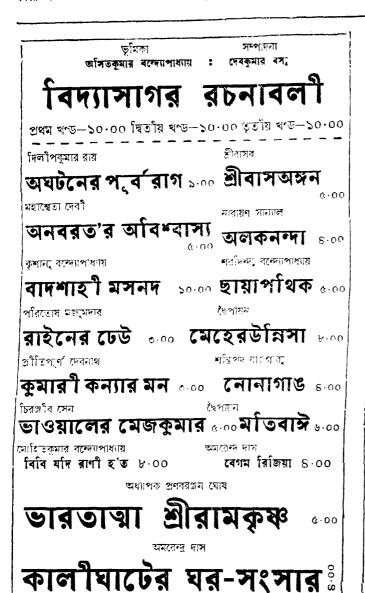
"কি সুকুমারবাবু, আপনি এখানে?" সুকুমার পিছন ফিরে তাকালে। গোলের মাঝামাঝি একটি লোক এসে দাঁড়িয়েছে, "আজ আপিস যাননি?"

সুকুমার আমতা আমতা করলে। লোকটি কাছে এসে বললে, "এদিকে কাজ ছিল বুঝি?"

"না, এমনি এসেছিলুম!"

লোকটি কৌতুক করে বললে, "বেড়াচ্ছেন!"

সুকুমার গোলের ওপর থেকে সরে রাস্তায় এসে পড়ল। লোকটি পাড়ার চেনাশোনা, সুতরাং নাছোড়বান্দা।

লোকটি বললে, "কাজ কিছু নেই যখন, আসুন না এক জায়গায় যাই।"

"কোথায়?"

"এই কোর্টে। এই কাছে।"

যারা নেহাত বাধ্য হয়ে এখানে আসে তাদের কথা সুকুমার বলতে পারে না, কিন্তু তার নিজের দিক থেকে জায়গাটা ভালই লাগছে—অদ্ভুত জীবনের হাট বসেছে এখানে। তার চেনা জানা জীবনের সঙ্গে মেলেই না!

লোকটি সুকুমারকে একখানে দাঁড় করিয়ে রেখে আসছি বলে কোথায় যেন গেল। সুকুমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগল। পাঁচিলঘেরা জায়গায় জীবনের বিচিত্র মেলা বসে গেছে!

লোকটি আর আসেই না। সুকুমার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল।

কোর্টের ঘরে ঘরে তখন বিচারের মহলা চলেছে। সুকুমার একটা ঘরে এসে ঢুকলো। ভিড়ের মধ্যে একপাশে চুপটি করে দাঁড়াল। খানিক পরে বেরিয়ে এসে আর একটা ঘরে গেল—এমনি করে অনেকগুলি এজলাসে ঢুকলো, বেরুল।

অদ্ভুত, বিচিত্র সব জীবনের কাহিনী শোনা গেল। অস্বাভাবিকতার যজ্ঞশালা যেন এই কোর্ট-কাছারি! সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ঈর্ষা-দ্বেষ, ছল-চাতুরি, শঠতা-কপটতা, খেলা-মেলা! এখানেও এক খেলা, যাদু যেন!

"এই যে সুকুমারবাবু, কোথায় ছিলেন? আপনাকে কত খুঁজলুম!" পাড়ার চেনা-জানা লোকটি হাসতে হাসতে এগিয়ে এল।

"আমি তো আপনাকে খুঁজছিলুম! আসছি বলে কোথায় যে গেলেন!"

"কোথায় আর! শালা উকিলের পেছন পেছনে ঘুরছিলুম! কাল কেস আছে, আজও তার কিছু হলো না!"

"কিসের মকদ্দমা?"

"আর বলেন কেন, যত ঝুট ঝামেলা!"

সুকুমার কিছু বললে না। ঝামেলা না হলে মকদ্দমা হবে কেন!

লোকটি কোর্টের বাইরে এসে বললে, "আপনারা বেশ আছেন, কেস্-ফেস্ আপনাদের নেই, বাঁধা মাইনে, কোন ঝামেলা নেই!"

সুকুমার কোন সাড়া করলে না। কে জানে, তারা বাঁধা মাইনের জীবন কাটায় বলে সুখে আছে কি না!

লোকটি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলে, "কোনদিন এসেছেন এখানে?"

"না।"

লোকটি সুকুমারের অনভিজ্ঞতায় যেন হাসলে। বললে, "মাঝে মাঝে আসবেন।"

"কেন?"

"এমনি। ভাল লাগবে। চিড়িয়াখানা মশাই!"

রোজ আপিস যাওয়ার মধ্যে যে ভাল-লাগা নেই সে ভাল-লাগা চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, তার কিছু যেন সুকুমার আজ উপলব্ধি করতে পেরেছে। সত্যি, ভাল লাগছে।

অন্ধকারে গলির মোড়টা কেমন যেন কালো বেড়ালের মত! সুকুমার বুঝতে পারে, বেড়ালের চোখের মতই তার ঘরে আলো জ্বলছে! কে জানে কত রাত হয়েছে। পানের দোকানটা বন্ধ মনে হচ্ছে, রাস্তায় কুকুরটাও কুণ্ডলী পাকিয়েছে। ঠিক অন্ধকারও নয়, আলোও, নয় কেমন আবছা-আবছা যেন ওদের পাড়াটা!

সুকুমারের মনে হল, অনেক দিন আগে

এমনি যেন এক আবহাওয়ার সম্মুখীন সে হয়েছিল, কিছু না—তবু মনে হয়েছিল কেমন থমথমে যেন পাড়াটা। আর আশ্চর্য, সে জন্মবার আগে তার বাবা দুপুর বেলা মারা গিয়েছিলেন! লোকে বলে, শোকের ছায়া আগে থেকেই টের পাওয়া যায়!

সুকুমার ভাবলে, সেইরকম আজ যদি হয়—তার বাড়িতে কেউ যদি মারা গিয়ে থাকে? মৃত ব্যক্তির আত্মা তার অপেক্ষায় পাড়ার ঘোরাঘুরি করছে? সে যদি—

বাড়ির দরজায় এসে সুকুমার খানিক স্থির হয়ে দাঁড়াল। মনে হল, অদ্ভুত সব কথাবার্তা আর কোলাহল সে শুনতে পাচ্ছে। চোখ দুটো কেমন যেন জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে—সেও যেন আবেগভরে অনেক কথা বলতে চাইছে!

রেবা তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিলে। সুকুমার কিছু বলবার আগেই ক্রুদ্ধ স্বরে বললে, "থাক, ঢের হয়েছে! রাত দুপুরে আর মাতলামো করতে হবে না! ছি ছি।"

সুকুমার প্রতিবাদ করলে, "কি বললে? শুধু শুধু মদ খেতে যাব কেন!"

রেবা তেমনি দৃঢ়নিশ্চয়, "সে যে খায় সে-ই জানে, শুধু শুধু কি দুধ দুধ!"

বিশ্বাস কর—সুকুমার বলতে চেষ্টা করলে।

হঠাৎ ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে রেবা ডুকরে কেঁদে উঠলো, "হায় ভগবান! এতদিনে ভগো তুমি এই লিখলে, শেষটা একটা মাতালের হাতে ফেললে!"

সুকুমারের ইচ্ছে হল, নিশুতি রাতে বাড়ি-ফেরা মাতালের মতই সে স্ত্রীকে ধরে প্রহার করে—পাড়া-পড়শীরা জেগে উঠে মজা দেখুক!

কিন্তু সুকুমার বুঝতে পারলে না, তার স্ত্রী তাকে হঠাৎ মাতাল ভাবলে কেন—কিসে তার মাতলামি প্রকাশ পেয়েছে? আজ সারাদিনের অভিজ্ঞতার কোন চিহ্ন কি তার মুখে চোখে দেখা যাচ্ছে? রোজকার মত আপিস যায়নি বলে কি সে মাতাল হয়ে গেছে?

তবুও আজ নিজেকে নতুন ভেবে সুকুমার স্ত্রীর অভিযোগ সহ্য করে।

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

বার

কিন্তু মাহাতো গিন্নীর পাত পড়েছে এমন জায়গায়, চোখ না পড়ে উপায় নেই। তার দিকে পিছন ফিরে বসব, তাতেও বিঘ্ন। চার টেবিলের ব্যবস্থা সেরকম নয়। অথচ, ঘোমটা টানা লজ্জাবতী বউ বললে কথা। আন্-পুরুষের সামনে বসে খায়-ই বা কী করে। ভেবে একটু ঠেক খাই। সেই মুহূর্তেই আবার একটু লাল ঘোমটার ফাঁক। মধ্যঋতু আশ্বিনের ঢলঢল মুখখানি চকিতে দেখা যায়। শরতের দীঘি চোখের দৃষ্টি কোন্ দিকে, বুঝে ওঠবার আগেই দেখি, বারেক ঝিলিক হেনে ওঠে। আবার ঘোমটা আড়াল পড়ে যায়।

দেখতে হবে না, নিশ্চয়ই নারাণঠাকুরকে দৃষ্টি হেনে ধমকাচ্ছে, 'আ মরণ, মিনসেকে এখানে বসতে দিচ্ছ কেন।'

সরে যাব ভাবতেই নারাণঠাকুর বলে, 'বসেন বাবু, বসেন।'

ওদিক থেকে মাহাতোর গলাও শোনা যায়, 'বসি পড়েন মশাই, অনেক বেলা হল।'

'হ্যাঁ, আর দিক্ দিক্‌কত নয়, বসি পড়েন বাবু।'

সামনের দরজায় দেখি, গাজী বাইরের বারান্দায় বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়েছে। একেবারে মুখোমুখি। সেও এক কথাই বলে। তবে মাহাতো গিন্নীর মোটা দাগের দেশী কাজল মাখা চোখ দুটিতে যে ঝিলিক হানা দেখলাম, তার কারণ কী।

যাই হোক। পথের মানুষ এসেছ ভোজনাগারে, খাবার পছন্দ হলে খাবে, চলে যাবে। তোমার অত কার্যকারণের খোঁজ কেন। সবাই যখন বলছে, আসন নিয়ে নাও। তবে দাঁড়াও, অমন নগর চালে চেয়ার টেনে বসতে গেলেই বসা যায় না। আর একটু হলেই টাল খেয়ে একেবারে ভুঁয়ে আসন নিতে হত।

এ তো আর পালিশ করা ঘরের মেঝে নয়। লেপা মোছা আছে বটে। তা বলে একটু এবড়ো-খেবড়ো থাকবে না, বা দু-একটা ছোটখাটো গর্ত-গার্তা থাকবে না, এমন হলফ কেউ করে নি। চেয়ার টেনে নিয়ে যেই বসতে গিয়েছি, দেখি সেটা কাত হয়ে টলে যায়। চার পায়ার এক পায়া একটা গর্তে বসে গিয়েছে। নারাণঠাকুর হাত বাড়ায় ধরতে। তার আগেই সামলে নিয়ে বলি, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

নিজেই টেনে তুলি চেয়ারের পায়া। তার মধ্যেই নারাণঠাকুরের ডিগডিগে রোগা শরীর থেকে গম্বুজ ফাটানো বাজখাই হাঁক বেজে ওঠে, 'ফোঁচা, অ্যাই শালা ফোঁচা।'

একে ফোঁচা, তায় শালা। দুটো শব্দই গালাগাল কি না বুঝতে পারি না। কারণ, অমন নাম আগে শুনি নি। যেন গালাগালের মতই শোনায়। ছোঁচা যদি গালি হয়, ফোঁচাই বা নয় কেন। ডাকা মাত্রই এ ঘরের পিছন থেকে জবাব আসে, 'এই যে, যাই ঠাকুর-মশায়।'

গলা শুনে মনে হয়, হাঁড়ির ভিতর থেকে শব্দ আসছে। এবং স্বর আর্ত। দুপ্ দুপ্ শব্দে, মাটি কাঁপিয়ে, পিছনের দরজা দিয়ে যে ঢুকল, সে একেবারে নারাণঠাকুরের বিপরীত। দানবতুল্য বললে দোষ হয় না। কিন্তু রঙের নিন্দে করতে পারবে না। হতে পারে তেলহীন রুক্ষ, মোটা গায়ে খড়ির দাগ। তাই যা দেখতে পাচ্ছি কোথায়, লোমেই তো অনেকখানি ঢাকা। তবু রঙটি বেশ ফরসাই বলতে হবে। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, কিংবা মহামায়া হিন্দু হোটেলের [illegible] ফ্যাকাসে হয়েছে। তামার পয়সার মত হয়ে গিয়েছে। গায়ের লোম আর মাথার চুল, কাজেই তফাত কিছুই নেই। ইস্তক ভুরুর চুল পর্যন্ত পাকানো বর্ণ। একটু বেঁটে, তবে বেশ মোটা, তেমনি বেঁটে। ডিগডিগে নারাণঠাকুরকে এক হাতে ডিগবাজি খাওয়াতে পারে। সরু ছোট ছোট চোখ দুটি পিটপিটিয়ে এদিক ওদিক দেখছে, যেন হাতীর সামনে বাঘ এসেছে। পায়ের ময়লা কাপড়টা হাঁটুর ওপরেও [illegible] তোলা।

তাকে দেখা মাত্র নারাণঠাকুর আবার সেই পাঁজরা কাঁপিয়ে বাজখাই গলায় বলে ওঠে, 'শালা, কদ্দিন না তোকে বলেছি, মাটি এনে এ গর্তটা বুজোবি।'

এখন শোন, হাতী করে চিঁ চিঁ, ব্যাঙে দেয় হাঁক। এ কি আজব দেশ নাকি, যেন সব কিছুতেই আজব খেলা, আজব মেলা। না কী জগৎ-জোড়া এমনি আজব ছড়ানো। নজর করলেই চোখে পড়ে। বেমিলেতেই ঠিক, অমিলেতেই রঙ খোলে। ফোঁচা যেন অসুরের সামনে ছাগছানা। নারাণের দৃষ্টি-ধরা হয়ে ভাঙা গলায় সরু সুরো কাটে, 'বুজিয়েছিলাম তো।'

'চোপ! তোপরাও শালা।'

ঘর কাঁপানো ধমকে আমাদেরই আবার চেয়ার ধরে টাল সামলাতে হয় প্রায়। যেন বোমা বোম ফাটে।! কী রেওয়াজ দেখ, ওহে পান্থ, যদি চেয়ার ধরে টানতে গেলে তবে তা গর্তে কেন পড়ে। তা হলে তো চেয়ারের পায়া বলবে, গর্ত কেন আছে। গর্ত বলবে, ফোঁচা কেন বোজায় নি। ফোঁচা তো জবাব দিয়েই আছে, 'বুজিয়েছিলাম তো।' সব আপদের গোড়া দেখছি, খিদে কেন পায়।

নারাণঠাকুরের গলা তখনো থামে নি, 'আবার মিছে কথা বলা হচ্ছে।'

তার রোগা রোগা হাত পা নাড়ার বহর দেখে সন্দেহ হয়, চড়চাপড় বা পদাঘাত না পড়ে। তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ফোঁচার ভাব দেখলে সেই রকমই মনে হয়। ইতিমধ্যে আর এক মূর্তি ভিতরের দরজায় উদয় হয়েছে। ময়লা ময়লা ডুরে শাড়ি, কালো-কুলো বউটি। নজর তার নারাণঠাকুরের দিকে, মনও নিশ্চয় ঘটনায় নিবিষ্ট। হাতে ধরা কোলের ওপর ছেলে। মায়ের বুক যে ঢেকে রাখতে দেয় নি। একটিতে কচি থাবা

রেখে আর একটিতে মুখ ডুবিয়ে শোষণ চলেছে। যাকে বলে, গাই বাছুরের খেলা।

মাহাতো এবার সামাল দেয়, 'যাক, যেতি দাও ঠাকুর, ওসব পরে হবে।'

ঠাকুরের গোঁসা অত সহজে শান্ত হবার নয়। বলে, 'না দ্যাখ মাহাতোদা, শালা আবার মুখের ওপর মিছে কথা বলে। এই কি গত্ত বুজোবার লক্ষণ, অ্যাঁ! শালা খাবে কাঁড়ি কাঁড়ি, কাজের বেলায় নাই। ওদিকে দ্যাখ, বাবুর আমার বউটি বছর বছর বিইয়ে চলেছেন। এত ভার সইবে কে।'

মর্মান্তিক অভিযোগ, অপরাধ অশেষ। ফোঁচার সব দিকেতেই বেশী বেশী। শুধু নারাণঠাকুর কেন, সরকার বাহাদুরের পর্যন্ত ফোঁচাকে কোতল করা উচিত। এ যুগে যে দুটোতে আঁটন শাসন, সে দুটোতে এত বাহাদুরি দেখালে চলবে কেন।

ভাববার অবকাশ মেলে না, হঠাৎ বন্ধ মুখের পাক-খাওয়া অবাধ হাসির খিল খুলে যায়। প্রথমে মাহাতো গিন্নীর। বোধ হয়, নাক-মুখ দিয়ে ভাত ছিটকে যায়। আঁচল খসে যায় ঘোমটার। খিলখিল হাসিতে এমন একটা রাগী আর ভারী আসর কোথায় ভেসে যায়। তারপরে মাহাতো খুড়ো। সেই এক অবস্থা, তবে হাসির গলায় অজস্র কাশি। যাকে বলে দম-ফাটানো। মাহাতোর সঙ্গে সঙ্গেই, বাইরে দাওয়া থেকে গাজীর হাসিও বেসামাল হয়ে উঠল। তিনের হাসি আর থামতে চায় না।

কেন। কেমন যেন একটু ধন্দ-লাগানো হাসি। যেন তলায় তলায় কী রহস্যের স্রোত বয়ে যায়। আবার ওদিকে দেখ, এ যেন সেই কথাটাই, পড়ল কথা সভার মাঝে, যার কথা তার গায়ে বাজে। হাসির লহরা বেজে উঠতেই দরজায় দাঁড়ানো বউটি হঠাৎ অদৃশ্য। আর নারাণঠাকুরের অমন যে ব্রহ্মতেজের দপদপানি, তা যেন হঠাৎ কেমন হাসির ঝাপটায় নিবু নিবু। ঝিমিয়ে-পড়া মুখ একটু বিব্রত। তবু ধমক দেয়, যদিও গলাতে আর সে জোর নেই। একটি নিটোল খেউড় করে বলে, 'আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সঙ দেখাতে হবে না। তাড়াতাড়ি ডিশ গেলাস বের কর গে যা, টেবিলটা মুছে দিয়ে যা, বাবুকে খেতে দিতে হবে।'

বলে সে এক লহমা দাঁড়ায় না। কারুর দিকে তাকায় না। যেন দৌড় দিয়ে ভিতরের দরজায় অদৃশ্যে হয়ে গেল। সেই সঙ্গে ফোঁচাও। আর তিনের হাসি আর একবার উচ্চ রোলে ঘর ভাসায়।

কেন, ব্যাপার কী। কেমন যেন একটা ভোজবাজির হাওয়া মনে হয়। ভাবতে ভাবতে চেয়ার টেনে সাবধানে বসি। তিনজনের দিকেই ঘুরে ফিরে তাকাই। মাহাতো গিন্নীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে জিভ কেটে ঘোমটা টানে। পরপুরুষ

না! বিড়ি খাওয়ার কথা এখন ভুলে যাও।

গাজী হাসতে হাসতে বলে 'জয় মুরশেদ, কী ব্যাজ দ্যাখো দিনি। কে দেয় সিঁদ, কারে কই চোর।'

মাহাতোর হাসি আরো জোরে বাজে। বলে, 'ঘাস খেয়ি যায় ঘোড়ায়, মার খায় গাধায়, সেই গোত্তর হলি।'

কর্তার কথা শুনে গিন্নী আর একবার খিলখিলিয়ে ছলকায়। গাজী বলে, 'যা বলেছ, চাচা। ওই সেই কথা হলি, ভোলার মন, আমি কার গলাতে ঝুলোবো এখন, সখী গো মদন যে তশিলদার ভারী।'

হাসিতে কাশিতে মিলিয়ে জবাব দেয় মাহাতো, 'কেন, গলায় ঝুলোবার জন্যে কোঁচাই তো আছে। এই যে বলি গেল, বউ বছর বছর বিয়োয়। তা ফোঁচাকেই তো বাপ বলি ডাকে। ঠাকুরকে তো ডাকে না।'

আবার ঘর-ভাসানো হাসি। রহস্যের বন্ধ মুখ যেন খুলি খুলি করে। ধন্দের ঘোর যেন কাটে। কিন্তু ধন্দের ঘোরে এতক্ষণ যদি বা মাহাতো আর গাজীর দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছিলাম, তা আর পারি না। কোথা থেকে লজ্জা আসে, রুচিতে বাধে। কোথায় যেন একটা দুর্নীতির কাঁটা উঁকিঝুঁকি দেয়। ব্যাপারটা ঘোরালো নিঃসন্দেহে। তবে মাহাতো আর গাজীর সঙ্গে এই আলাপের শরিক হতে চাই না।

চেয়ো না. কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি। তা বলে তুমি কারুর মুখে খিল দিতে পার না। গাজী বলে, 'তার জো নেই। ছেলেগুলোনও কত্তা বলে ডাকে। বাপ বলি ডাকলে, ওঁয়ার আবার মান যাবে যে।'

'কী মরণ গ!'

কথা আসে ঘোমটার ভিতর থেকে, তারপরে হাসি। মাহাতো বলে, 'তা মন্দ কী বল। ফোঁচাই ভাল আছে, মিনি মাগনায় একপাল ছেলের বাপ হয়ে ঘুরি বেড়াচ্ছে।'

ঘোমটার ভিতর থেকে হাসির সঙ্গে আবার কথা আসে, 'আহ্ ছি, কী মুখ গ!'

গাজী হা-হা করে হাসে। মাহাতো আবার বলে, কেন, আমার মুখের কী দোষ হল। অই হে গাজী, বল না কেন। বউ তোমার ঘর করবি, আর তার পেটের ছাওয়াল এসে বাপ বলবি আমাকে—।'

'আহ্ দুর অ!'

মাহাতো গিন্নী শুধু ঝামটা দেয় না, কাজল-কালো চোখ দেখিয়ে বিরক্তি হানে। যা বলবে তা বল, আবার নিজেকে নিয়ে টানাটানি কেন। তাতে গিন্নীর গায়ে লাগে। হ্যাঁ, আমিও মনে মনে বলি, এবার মাহাতো ক্ষান্ত দিক। এ প্রসঙ্গের মধুতে গাদ বড় বেশী। যত ঘষবে তত আঠা। জমলে আবার মাছিকে টেনে তোলা দায়। কিন্তু আমি ভাবি, খেতে এসে

এ কি রূপ দেখি। হাটের মানুষ আসে, খায়, চলে যায়। গোলপাতার এই ছাউনির তলায় সবাই দেখে, এ এক ভোজনাগার। মহামায়া হিন্দু হোটেল। কিন্তু এক রূপেতে কত রূপ। এযেন এক মঞ্চ। এখন এক পালা, অন্য সময় আর-এক পালা। এখন এই পালাতে পাঠ আলাদা, সাজগোজ ভূমিকা বেবাক ভিন্ন। নতুন পালায় নতুন সাজ। তখন নতুন ধড়াচূড়া, ভিন্ন চরিত্র। হাস্যে রহস্যে জানা গিয়েছে, ওসব মহাজন পাচক ঠাকুর প্রেমিক নাগর, দাসী প্রেমিকা। আর ফোঁচা আয়ান তখন কী করে।

ভাবতে গিয়ে বুকের কাছে হঠাৎ কেমন ফিক লেগে যায়। চোখ পিটপিটানো, তামা-রঙ সেই প্রকাণ্ড মুখখানি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ব্যথা কিছু ছিল কি না দেখিনি, একটা অ-মানবিক অসহায়তা মুখ ভরে ছিল। সে কি তখন ঘুমায়, নাকি এই নোনা গাঙের কূলে কূলে, বাঁধে বাঁধে কোন নিশির ডাকে ফেরে। কোন কূলেতে জন্ম তার, কোন দেশেতে বিয়ে। কোন ঘরের বালা তার ঘরনী হয়েছে। সেই ঘরণীর প্রাণের ঘরে কোথায় আছে তার ঠাঁই। এই জীবনের দরিয়া তার কোন প্রবাহে চলে।

বৃথা জিজ্ঞাসা। কোন্ কাব্য পুরাণ কবে জবাব দিয়েছে, আয়ান-মন-কথা। কে জানে, ফোঁচার প্রাণের বউ-সায়রে, বউ কতখানি খেলে। সেখানে অনুভূতির বোধ কত গভীরে, কতটুকু তরঙ্গ ওঠে, নাচে, কে জানে। কিছুই জানি না। সব প্রাণের কুলুপ টুক টুক করে খুলি, তেমন চাবি আমার হাতে নেই। দেখি মাত্র, রূপ দেখি। যে দেখাকে অরূপ বলে, সেই চেনাচিনি কোথায় আমার। চিনি বলে হাঁক দেব না। তাই, কে জানে, ফোঁচা নামক লোকটির প্রাণে ফুল কোথায় ফোটে, কোথায় ঝরে যায়।

সেই যে লোকটি, কালো কেঁচোর মত পইতে গলায়, ডিগডিগে শরীর, হাসির মুখে যার তেজ নিবে যায়, বিব্রত হয়, অন্তর্ধান করে সহসা, এখন তার রহস্য বুঝতে পারি। তাকে দোষ দিতে পারলে, মনের সব গোল মিটে যায়। কিংবা সেই কালো-কুলো বউটি, যে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল একটু আগে, কোলেতে যার ছেলে, সসাগরা ক্ষুধার ভাণ্ড খুলে দিয়ে ক্ষুধা মেটাচ্ছিল, যার চলে যাওয়া দেখে এখন বুঝতে পারি, সে-ই ফোঁচার বউ। মনের গোল মিটিয়ে দুষতে পারি তাকেও। কিন্তু মন বল, তাইতে কি মন সব সওয়াল জবাব শেষ। এ তো তোমার রূপের বিচার। অরূপ তুমি দেখলে না। না চিনে কার দোষ গাও। অরূপ থাকে সেই বিচিত্রে, যার মুখোমুখি তুমি চিরদিন দাঁড়িয়ে। তোমার অপার বিস্ময়ের চোখে সুখে দুঃখের অকূলের ঢল নেমে যায়। কোন জবাব কোথাও উচ্চারিত হয়নি। চির-জিজ্ঞাসা, চির-নীরবতায় কেবল ঝিকিমিকি করেছে।

আমি পথের মানুষ, একটু মাত্র ঠেক-খাওয়া এই পথের ধারে। আর নামহীনের মজুর, অচিনের খোঁজে ফেরা মানুষ। আমি কেন এসব ভাবি। বিচিত্র থাক তার বাহারে। আমি চলে যাব, নিরন্তর ঝিকিমিকি দেখে।

তবে মাহাতো ক্ষান্ত কেন হয়। শুনি,

সে তখনো লিছে, 'একবার কী হল, জান। ফোঁচাকে লাম, তোর ছেলে তো তিনটে। একটাকে আমাকে দে, আমি মানুষ করব। ব্যাটা বলে কি জান? বলে, আচ্ছা, কত্তাকে জিগ্যেস করব। সাত্যি ব জিগ্যেস করবে, তা কে জানে। এই গত সনের কথাই বলছি। আড়তদারদের কাছে টাকা আদায়ে এসিছিলাম। একটু পরেই দেখি, ঠাকুর একেবারে মারমূর্তি হয়ে এসি হাজির, হেই তুমি কোন্ সুবাদে ফোঁচার ছেলে চাও। হতি পার তুমি বড় জোতদার, টাকার মঠ থাকতি পারে তোমার ঘরে। তা বলি কি ফোঁচার ছেলেরা জলে ভেসে এসেছে। তারা কি রাস্তার কুকুর বিড়াল। বোঝো দিনি ঠ্যালাটা। মশকরা করি একটা কথা বললাম—।'

তার কথা শেষ হয় না। ঘোমটার ভিতর থেকে হাসির সঙ্গে খুশির গলা বাজে, 'বেশ করেছিল, ঠিক বলেছিল।'

গাজী বলে ওঠে, 'অই, এবার যা বোঝবার তা মনে মনে বোঝ, কোথায় কার টান। যা বল তা বল, রক্তের টান বলে একটা কথা আছে তো।'

কান পেতে আছি, মাহাতোর কথা শুনতে পাবো বলে। কোন কথাই আসে না সেখান থেকে। কিন্তু আমার চোখে তখন সহসা ডিগডিগে ঠাকুরটার মুখ ভেসে ওঠে। না, দোষগুণের বিচারে যান না। তবে কবুল করি, কেবল যে প্রেমিক নাগর মনে করেছিলাম সে বড় মিথ্যে। শুধু প্রেমিক নাগর নয়, জীবের মধ্যে মহৎ যে, সেই পিতৃদেবকে দেখি। রূপেতে নয়, অরূপে ধরা পড়েছে। নাম যাদের ফোঁচার ছেলে, তাদের বাঘের মত আগলে থাকে নারাণঠাকুর। আসলকে চেনা হলে আর রূপের ধন্দ থাকে না। মন কী যন্ত্র দেখ, ঠাকুরটাকে ভাল লেগে যায়।

কিন্তু ওদিকের নীরবতায় একটু অবাক লাগে। ফিরতে দেখি, সেই কালো-কুলো বউটি এসে ঢুকেছে। এক হাতে ছেলে ধরা, অন্য হাতে বালতি। স্বাস্থ্যটি বেশ আঁটোসাঁটো, মানুষটিও খাটোখুটো। সাজগোজ কিছু নেই তেমন। দেখলে বুঝবে, বসে খাওয়া শরীর নয়। মাহাতো গিন্নীর মুখ আমি দেখতে পাই না। কিন্তু ফোঁচার বউয়ের সংগে নিশ্চয় নজর চালাচালি হয়। তাই একটু হাসি দেখা যায় তার মুখে। বালতি সুদ্ধ এসে দাঁড়ায় টেবিলের সামনে। বালতি রেখে তার ভিতর থেকে টেনে তোলে জল-ন্যাকড়া। একে আমরা ন্যাকড়া বলি না, ন্যাতা বলি। হাত তুলে তাড়াতাড়ি সামাল দিই, 'থাক, থাক, কি করবে?'

বউ একটু চমক খায়, থমকে গিয়ে বলে, 'মুছব।'

সে আন্দাজ আগেই করেছি, তাই সামলানো। ন্যাতার রঙ দেখে আর মোছা টেবিলে খাবার ইচ্ছা নেই। তার চেয়ে অ-মোছা এই শুকনো টেবিল ভাল। যদিও অনেক দিনের তেলে-জলের ন্যাতা মোছার বাদে এই টেবিলের রঙও এখন ন্যাতার মতই হয়েছে। তবুও মাঝে মাঝে পোয়া ইঞ্চির ফাঁক। ন্যাতার এত আদর যত্নে এখনো কেন ঘুন ধরেনি, কে জানে! বললাম, 'মুছতে হবে না, এমনি থাক।'

বউটি যেন কথা ধরতে পারে না। তাই কী করবে বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক চায়। গাজী বলে ওঠে, 'বাবু যা বলে তাই কর, আর মোছামুছির দরকার নাই।'

বউ কী বোঝে না-বোঝে জানি না। ন্যাতা বস্তুটি বালতিতে ফেলে তাড়াতাড়ি নিজের শুকনো আঁচল দিয়ে টেবিলটা ঝেড়ে দেয়। একেবারে এমনি কি খেতে দেওয়া যায়। একটা নিয়ম আছে তো। তাকিয়েছিলাম বউটির মুখের দিকেই, হয়তো সে তাকাবে। চোখের দিকে দেখে তার মনটা হয়তো বুঝবো। কিন্তু সে তাকায় না। যেমন করে মাহাতো গিন্নীর দিকে তাকিয়ে হেসেছিল, তেমনি একটু হাসে আপন মনে। সেটা লজ্জা কিংবা আর কিছু, বুঝতে পারি না। বরং বলি,

(সি ৪৬৬১)

সংকোচের একটা মাধুর্য যেন আছে। কোলের ছেলেটা আঁচল টেনে খুলতে যায়। বাঁ হাত দিয়েই তাকে একটু থামিয়ে দিয়ে বালতি নিয়ে সরে যায়। মাহাতো গিন্নীর দিকে তাকিয়ে বলে, 'ন্যাতার রঙটাই অমনি।'

বলে চলে যায়। বুঝতে পারি, আমার মন তখন এক দুর্নীতির কালি খোঁজে বউটির সর্বাঙ্গে। কিন্তু কোথায় যে সেই পরকীয়ার কালো কালি, দেখতে পেলাম না।

ইতিমধ্যেই ফোঁচার আবির্ভাব। সে আমার সামনে রাখে চিনা মাটির সানকি, যার নাম প্লেট। আর কাঁচের গেলাসে জল। আবার দেখ, কী রেয়াজ! নিজেকে নিয়েই মরো তুমি, এ কি ঝামেলা। ফাটা-ফুটি মাকড়সার জাল দাগ দেখি প্লেটে, এদিক ওদিক ভাঙা। কী করব, মন পরিষ্কার হয় না যে। লজ্জা আর অস্বস্তিতে এবার করুণ স্বরেই বলি, 'কলাপাতা আছে?'

ফোঁচা একেবারে গোল হয়ে বেঁকে পড়ে। ঘাড় নেড়ে ভাঙা গলায় বলে, 'হ্যাঁ, আছে। কলাপাতায় খাবেন?'

'হ্যাঁ।'

একটু যেন অবাক হয় ফোঁচা। বলে, 'বাবুরা তো এতেই খান কি না। আচ্ছা, নিয়ে আসি।'

বলে সে প্লেট তুলে নিয়ে যায়। আমি বলি, 'পাতাটা একটু জল দিয়ে ধুয়ে এনো।'

'আজ্ঞে।'

আবার তাড়াতাড়ি বলি, 'পাতাটা যেন ন্যাতা দিয়ে মুছো না।'

'আজ্ঞে, আচ্ছা বাবু।'

জবাবটা প্রায় ভিতর-ঘর থেকেই আসে। মাহাতো হেসে উঠে বলে, 'দ্যাখ কেমন মজা। আর আমাদের এদিকি কাউকে কলাপাতায় খেতি দাও, অমনি বাবুর মেজাজ খারাপ, হেঁই, থালায় দিতে পার না।'

গাজী বলে, 'আমি আবার ভাবি, বাবুর বুঝি চিনা মাটির সানকিতেই ভাল হবে। তা—এই ভাল।'

ওদিকে মাহাতো গিন্নীর ঘোমটা একটু সরে। বুঝতে পারি, চোখাচোখি গাজীর সঙ্গে। একটু পরেই পাতা এসে যায়। ধোয়া কাঁচা সবুজ পাতায় তখনো জলের কণা। এবার চোখে ও মনে একটু ঝলক লাগে। তারপরে পিছনে পিছনেই নারাণ-ঠাকুর। হাতা দিয়ে গরম ভাত দেয় পাতে। দুটি বেগুন ভাজা পাশে দিয়ে ডাল তোলে হাতায়। রূপে গন্ধে ঠিক চিনতে পারার উপায় নেই, কী ডাল। তা ছাড়া, এবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা, কোন্ পাত্র থেকে, কী পাত্র দিয়ে ঢেলে দেয় চেয়ে দেখব না। যে ডালই হোক, ধোঁয়া দেখে বুঝেছি গরম। ডাল দিয়ে মেখে ভাত মুখে দিতে যাব, হঠাৎ গাজীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। হতেই, গাজী একটু হাসে। বলে, 'অনেক বেলা হয়ি গেছে, দেরি হয়ি গেল।'

কিন্তু আমার হাতের গরাস হাতেই থেকে যায়, মুখে তোলা হয় না। আমি নামহীনের মজুর, অচিনের সন্ধানী, তবু মনের রসের ধারা কি এই প্রাণে পাক খায় না। কেবল যে একটা মোচড় লাগে বুকে, তা নয়। শুনি কে যেন আমার মধ্যে ধিক্কার হেনে ভর্ৎসনা করে। এক মুহূর্ত চোখ ফেরাতে পারি না গাজীর মুখ থেকে। ফাটা ফাটা মুখখানি, তবু যেন হাসির তরঙ্গে তরঙ্গে ভাঁজ লেগেছে। কোথাও একটু মালিন্য নেই। কিন্তু বেলা যায়, তোমার পেট জ্বলে। মুরশেদের নামের মজুর কি মানুষ নয়। সংগীকে ভুলে যাও, এ তোমার কেমন ক্ষুধা হে। হাতের গরাস পাতে নামিয়ে বলি, 'ওহে, তুমি কী খাবে। ভাত না অন্য কিছু।'

এবার দেখ, গাজীর আরশি চোখে কেমন শিশুর লজ্জা ফোটে। তাড়াতাড়ি বলে, 'সে হবিখনে বাবু, আগে আপনি দুটো সেবা করে নেন।'

কিন্তু যদি ঠিক দেখে থাকি, তার মুখের আলোর হঠাৎ নয়া ঝলক ফাঁকি যায়নি আমার চোখে। কেবল নিজের মহাপ্রাণীটিকেই দেখেছিলাম। এখন দেখি, আর-এক মহাপ্রাণীও আমার সামনে। এখন তার চোখ দুটি যেন অনুরাগে ভর-ভরানো। বলি, 'তা হয় না, যা হবার তা একসঙ্গেই হোক। কী খাবে তা বল।'

গাজী হা-হা করে হাসে। বলে, 'বাবুর যে কথা! যা হবার তা একসঙ্গেই হোক।'

হাসি শুনে তার প্রাণের খুশি বুঝতে পারি। তার নজর ধরে, নজর করি মাহাতো গিন্নীর দিকে। ঘোমটা কিছু সরানো। আবার চোখাচোখি হয়। কাজল কালো চোখের নজর, এবার যেন একটু রকম বদলেছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে একটু দেরি হয়। ভুল দেখি, না ঠিক দেখি, কে জানে। মাহাতো গিন্নীর চোখেও যেন আমার গাজীর দৃষ্টি খেলে। তারপরে গাজীর দিকে ফিরে বলে, 'এখন আবার কী খাবে, চাড্ডি গরম গরম ভাতই খাও।'

ঘোমটা-সোমটা যাই থাক, আওয়াজ ঠিকই দিয়ে যাচ্ছে। ওদিক থেকে মাহাতো বলে, 'হ্যাঁ, এত বেলায় এখন কি আর মিষ্টি-মাস্টায় পেট বোঝে!

বলে নিজেই ডাকে, 'কই হে ঠাকুর, গাজীকেও ভাত দাও।'

গাজী বলে আমাকে, 'আপনি শুরু করেন বাবু।'

ঠাকুর ঘরে ঢুকে একবার অবাক হয়ে চায়। নতুন খদ্দের পেয়ে তেমন খুশী নয় মনে হচ্ছে। গাজীর দিকেই ফিরে বলে, 'তোমাকে ভাত দেব নাকি।'

গাজী হেসে বলে, 'তা আজ্ঞে যখন মুরশেদে দিন দিইছেন—।'

কথা শেষ করতে পারে না সে। তার আগেই নারাণঠাকুর বলে, 'কিন্তু আগেই বলে দিচ্ছি, দাওয়ায় বসে খাওয়া হবে না বাপু। দশজনের খাওয়ার জায়গা, ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয় আছে।'

যাই বল, মুখের হাসিটি নিতে পারবে না। গাজী বলে, 'নিচি বসিই খাব। একখান কলাপাতা দিতি বলেন। জল খাবার পাত্তর আমার ঝোলায় আছে।'

বলে ঝোলা থেকে বের করে এক অ্যালুমিনিয়ামের গেলাস। নারাণঠাকুর সেসব দেখে না, বলে, 'কী কী খাবে বল।'

'ওই আপনার যা আছে, সবই দেন। তবে মাছ-টাছ দেবেন না।'

ঠাকুর ভিতরে যেতে যেতে বলে, 'এদিক নেই, ওদিক আছে।'

চমক একটু আমার মনেও লাগে। গাজীর ধর্মে আটকায় কি না জানি না, কিন্তু মুসলমানের সন্তান নিরামিষাশী, এরকমটা দেখি নি। খেতে খেতে চোখ তুলি। গাজী হেসে বলে, 'আই গাজী দরবেশদের কোন মানামানি নাই বাবু। মাছ মাংসে রুচি লাগে না।'

বলে সে হঠাৎ গলা তুলেই সুর করে গেয়ে ওঠে,

'কেবা হিন্দু কেবা মুসলমান
মিলে জুলুকে কর সাঁইজী কা কাম।'

মাহাতো গিন্নী আওয়াজ দেয়, 'এ গান নয়, ভাল গান শোনাতে হবে।'

গাজী বলে, 'তা শুনোব চাচী। ওহ, কবীরের কিস্সা আগে বলি, শোন, বড় মজার। বাবু, শোনবেন নাকি?'

কবীরের কী কিস্সা শোনাতে চায়, কে জানে। বলি, 'বল।'

গাজী কবীরের কিস্সা শুরু করে।

(ক্রমশ)

ভারত ও আমেরিকার যে-সব যৌথ উদ্যোগ সবচাইতে সফল হয়েছে, ভারতবর্ষের তরুণ এক হাজার ইস্পাত-ইনজিনিয়ারকে ট্রেনিং দেবার এই কর্মসূচী তার অন্যতম। কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও দেখা গেল, ভারতবর্ষ সম্পর্কে রাশিয়ার আচরণ আর পশ্চিমী আচরণের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়। এ-ব্যাপারে রাশিয়ানদের আচরণ অনেক সূক্ষ্ম। সে-ক্ষেত্রে আমেরিকানদের আচরণে ঔদার্য যতই থাক, সূক্ষ্মতা নেই। ১৯৫৮ সনের শরৎকালে আমি আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার বিভিন্ন ইস্পাত-কারখানা পরিদর্শন করেছিলাম। আমাদের তরুণ ইনজিনিয়ারদের ট্রেনিং কী রকম চলছে, সেইটে দেখাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যেই আমেরিকা থেকে ফেরবার পথে আমি প্রথমে পশ্চিম জারমানি ও ব্রিটেনে কিছুদিন কাটিয়ে তারপর সোভিয়েট রাশিয়ায় যাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত খাদ্যের প্রাচুর্য, রাশিয়ায় তা নেই। তৎসত্ত্বেও, ভারতীয় ইনজিনিয়াররা এ-ব্যাপারে যাতে বিন্দুমাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ না করেন, রুশ কর্তৃপক্ষ সেদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন। ভারতীয়দের আরামে রাখবার জন্য তাঁদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তরুণ এইসব ইনজিনিয়ারের মধ্যে অনেকেই ছিলেন দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। তাঁরা কট্টর নিরামিষাশী। এমন কী, ডিম পর্যন্ত তাঁরা ছোঁন না। সে-ক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রধান খাদ্য হচ্ছে রুটি আর মাংস। এ দুটি খাদ্যের সেখানে কিছুমাত্র অপ্রাচুর্য ছিল না। কিন্তু তীব্র অভাব ছিল টাটকা সবজি আর ফলের। দেখে আশ্চর্য হলাম, নিরামিষাশী ভারতীয় ইনজিনিয়াররা এর জন্যে যাতে অসুবিধায় না পড়েন, সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে; পার্শ্ববর্তী আর একটি অঙ্গরাজ্য থেকে বিমানযোগে সপ্তাহে দুবার করে টাটকা সবজি এনে খাওয়ানো হচ্ছে ভারতীয় ইনজিনিয়ারদের। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষই তাঁদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু কি তাই, ভারতীয়রা যে-সব হস্টেলে থাকতেন, শুধু তাঁদের আহার-ব্যবস্থার উপরে নজর রাখবার জন্যেই সেখানে বিশেষ একদল কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল।

সর্বোপরি তাঁদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাও ছিল নিখুঁত। তরুণ এইসব ভারতীয় ইনজিনিয়ারের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল যথেষ্ট; কিন্তু হাতে-কলমে কাজ করবার সুযোগ ইতিপূর্বে পাননি তাঁরা। বস্তুত ইস্পাত-কারখানার অভ্যন্তর যে কেমন, তাই তাঁরা ইতিপূর্বে জানবার সুযোগ পাননি। দেশে ফিরে যে-কাজ তাঁদের করতে হবে, হাতে-কলমে সেইটে তাঁদের করতে দেওয়াই হচ্ছে প্রকৃষ্ট ট্রেনিং, কাজ শেখাবার এর চাইতে ভাল ব্যবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। কথা ছিল, ন মাস থেকে এক বছর তাঁরা ট্রেনিং দেবেন। উৎপাদন আর পরিচালনায় কাকে কোন্ কাজ করতে হবে, সেটা স্থিরীকৃত হয়েই ছিল। ব্যবস্থাটা ছিল এই যে, দেশে ফিরেই সেই কাজের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যের কাজ না দেখে, সেই বিশেষ কাজটা তিনি যদি হাতে-কলমে করতে পারেন, তবেই তাঁর ট্রেনিং সার্থক হয়।

রাশিয়ানরা ঠিক সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন। বেতন না পেলে কী হয়, সোভিয়েট রাশিয়ার ইস্পাত-কারখানাগুলিতে এমনভাবে তাঁদের কাজে লাগানো হল যেন তাঁরা শিক্ষার্থী নন, সেখানকারই কর্মী। রুশ কর্মীদের বলে দেওয়া হয়েছিল, ভারতীয়রা যাতে কাজে অভ্যস্ত হতে পারেন, তার জন্য তাঁরা যেন সর্বতোভাবে তাঁদের সাহায্য করেন, এবং সহকর্মী বলেই তাঁদের গণ্য করেন। ব্যবস্থাটা বেশ ফলপ্রসূ হল। রুশ কারখানা থেকে যাঁরা কাজ শিখে এলেন, স্পষ্টই বোঝা গেল যে, তাঁদের ট্রেনিংটা বেশ কার্যকর হয়েছে।

শুধু একটা ব্যাপারে আমাদের কিছুটা সন্দেহ ছিল। এই যে এত তরুণ কর্মীকে আমরা একটা কমিউনিসট দেশে পাঠাচ্ছি, ট্রেনিং-পর্বের সুযোগ নিয়ে এঁদের দীক্ষাদান করা হবে না তো? পরে বুঝলাম, আমাদের সন্দেহটা ভিত্তিহীন। দীক্ষাদানের জন্য প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোন রকমের চেষ্টাই করা হয় নি। কমিউনিসট পারটির সঙ্গে যার কোনও যোগ আছে, এমন কোনও সভা, আলোচনা-বৈঠক কিংবা সেমিনারে যোগ দেবার জন্য ভারতীয় কর্মীদের সেখানে কখনও উৎসাহ দেওয়া হত না। ভারতীয়দের উপরে শুধু সৌজন্য বর্ষণ করেই তাঁরা ক্ষান্ত ছিলেন। কিন্তু কাজ হয়েছিল তাতেই বেশী। রাশিয়ায় গিয়ে যে সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছিলেন আমাদের কর্মীরা,

তাতে রাশিয়া সম্পর্কে তাঁদের চিত্তে যথেষ্টই বন্ধুভাবের সঞ্চার হয়েছিল। প্রচারের শ্বারা, তা সে যতই সূক্ষ্ম হোক, এটা সম্ভব হত না।

পক্ষান্তরে মারকিন বন্ধুরাও আমাদের তরুণ কর্মীদের প্রতি যথেষ্ট ঔদার্য দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্য বিশেষ বাহবা তাঁরা পান নি। ভারতীয় ইস্পাত-কর্মীদের ট্রেনিং-এর জন্য ফোর্ড ফাউনডেশন থেকে যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল, তার অঙ্কটা মোটেই ছোট নয়। কিন্তু এইসব তরুণ ভারতীয়কে মারকিন ইস্পাত-কারখানার অস্থায়ী কর্মী হিসেবে গণ্য করবার উপায় ছিল না। করতে গেলে সেখানকার ইস্পাত-কর্মী ইউনিয়নই তাতে বাধা দিত। ভারতীয় কর্মীদের সত্যিকারের কাজ দিতে তাই সেখানে যথেষ্টই বেগ পেতে হয়েছিল। নিজে কাজ করা নয়, পাশে দাঁড়িয়ে অন্যের কাজ দেখা, মোটামুটি এই ছিল সেখানকার ট্রেনিং। মারকিন কর্মীরাই অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় কর্মীদের হাতে-কলমে কাজ শেখার ব্যবস্থা করে দিতেন। ভারতীয় কর্মীদের তাঁরা খুব পছন্দ করতেন; পাশে-দাঁড়ানো ভারতীয়কে মাঝে-মাঝেই তাঁরা বলতেন, "এসো ভাই, এবারে তুমি একটু হাত লাগাও, আর সেই ফাঁকে বরং আমি একটু জিরিয়ে নিই।" এটা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা। এই ধরনের ঘরোয়া ব্যবস্থায় আমাদের কর্মীরা খুবই উপকৃত হতেন; অনেক কাজে তাঁরা এইভাবেই রপ্ত হয়েছিলেন। তবে, কাজের সুযোগ রাশিয়ার কারখানায় যতটা পাওয়া যেত, আমেরিকায় ততটা মিলত না।

এইসব অসুবিধে ছাড়া আর একটা জিনিসও লক্ষ করা গেল। দেখা গেল, ইস্পাত-কর্মীদের কীভাবে ট্রেনিং দিতে হয়, মারকিন বন্ধুদের সে-বিষয়ে কিছু নিজস্ব ধারণা রয়েছে। ভারতীয় শিক্ষার্থীরা সেখানে যে-সব ইস্পাত-কেন্দ্রে শিক্ষা নিতে গিয়েছিলেন, তার প্রতিটিতেই তাঁদের জন্য বিশেষ লেকচার-কোর্সের ব্যবস্থা করা হত। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই আয়োজন হত এইসব বক্তৃতার। মারকিন সাহিত্য, মারকিন ইতিহাস, মারকিন জীবন-ব্যবস্থা ইত্যাদি ছিল তার বিষয়। ভারতীয় কর্মীদের এইসব বক্তৃতা শুনতে বলা হত। এ-সব বক্তৃতা শুনলে যে কোনও ক্ষতি আছে, তা নয়, তবে কিনা ইস্পাত-বিষয়ক শিক্ষার সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই। তবে কেন এ-সব বক্তৃতা শুনতে হবে? থিয়োরিটা এই যে, আজ যাঁরা কাজ শিখছেন, সেই তরুণ শিক্ষার্থীরা একদিন তো উচ্চপদে আসীন হবেন, সুতরাং নিতান্ত কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা না করে এ'দের জন্য একটা উদার শিক্ষা-ব্যবস্থার আয়োজন করা দরকার। কথাটা শুনতে ভাল; কিন্তু সমস্যা এই যে, ন মাস থেকে এক বছরের জন্যে এ'দের বিদেশে পাঠানো হয়েছে, সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে ইস্পাত উৎপাদন সম্পর্কে যতটা সম্ভব কাজ এ'দের শিখে আসতে হবে। তার মধ্যে ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ কই। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে হাতে-কলমে কাজ শেখা। এর মধ্যে আরও পাঁচ-রকম বিষয় ঢোকাতে গেলে অকারণে সময় আর উদ্যমের অপচয় হবে মাত্র। মারকিন বন্ধুরা কিন্তু আমাদের যুক্তি মেনে নিলেন না। বললেন, যে শিক্ষা-ব্যবস্থার আয়োজন তাঁরা করেছেন, সেটাই ভাল। অগত্যা আমাদের চেয়ারম্যান আর কী করেন; তিনি বললেন, "যে-ভাবে ওরা ট্রেনিং দিতে চায় সেইভাবেই দিক। ভিক্ষের চাল কাঁড়া না আকাঁড়া তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।"

এমনিতে কমিউনিস্টরা দীক্ষাদানে আর প্রচার চালাতে বেশ তৎপর। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সে-চেষ্টা তারা করেনি। ফলে তারা এই সুনাম অর্জন করল যে, তারা আমাদের নিঃস্বার্থ বন্ধু, অন্য দিকে নজর না দিয়ে আমাদের তরুণ কর্মীদের তারা ইস্পাত উৎপাদনে যথাসাধ্য ট্রেনিং দিচ্ছে। পক্ষান্তরে, মারকিনদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক আদর্শগত সংঘাত না থাকা সত্ত্বেও, তারা এই ধারণা সৃষ্টি করল যে, সুযোগ পেয়ে তারা মারকিনী প্রচার চালাচ্ছে। আমাদের কর্মীরা যে মারকিন ইস্পাত-কারখানায় গিয়ে ট্রেনিং নিলেন, কারখানাগুলি তার জন্য কী বাবদে কোনও অর্থ দাবি করেনি; ফলে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এ-বাবদে আদৌ অর্থব্যয় হয়নি। ব্যয় হয়েছিল অন্য বাবদে। সাহিত্য, সংস্কৃতি

ইত্যাদি বিষয়ে যে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হল, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে তার জন্য বিস্তর অর্থ দিতে হল।

ব্রিটেন আর পশ্চিম জারমানিতে ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা বেশ ভালই হয়েছিল। ব্রিটিশ কিংবা জারমান সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা শোনাতে সেখানকার কর্তৃপক্ষ আদৌ ব্যগ্র ছিলেন না। তবে ভারতীয় ইনজিনিয়ারদের তাঁরাও অস্থায়ী কর্মী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন নি। বাধা এসেছিল ইউনিয়নগুলি থেকে। ফলে, কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা সত্ত্বেও ঠিক হাতে-কলমে কাজ শেখবার ব্যবস্থা করা গেল না। তবে ব্রিটিশ আর জারমান কর্মীরাও ছিলেন মারকিন কর্মীদের মতই সহৃদয়। নিজেদের মধ্যে ব্যবস্থা করে নিয়ে ভারতীয়রা তাই অনেক সময় হাতে-কলমে কাজ শেখবার সুযোগ পেতেন। কমিউনিসট দেশে ইউনিয়নের ঝঞ্ঝাট নেই। কর্তারা যে সিদ্ধান্ত নেন, সেই অনুযায়ীই সেখানে কাজ হয়।

এক সহস্রেরও বেশী ভারতীয় কর্মীকে হাতে-কলমে কাজ শেখানো হল সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন ইস্পাত-কারখানায়। এ ছাড়া আর একটা ব্যাপারেও রাশিয়ানরা ব্রিটিশ আর জারমানদের উপরে টেক্কা দিল। ভিলাইয়ের কারখানা গড়ে তুলতে তিন বছর সময় লেগেছিল। নির্মাণের কাজ যখন শেষ হয়ে এসেছে, তখন সোভিয়েট কর্মী-দলের সর্বোচ্চ নেতা জি এফ মিচেলিভিচ্ একদিন আমার সংগে এসে দেখা করলেন। উৎপাদন আর পরিচালনার নানা ব্যাপারে যাঁদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, রাশিয়ার বিভিন্ন ইস্পাত-কারখানা থেকে বাছাই করে এমন সাড়ে তিন শো অভিজ্ঞ কর্মীর একটি তালিকা তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। সেটি তিনি আমাকে দেখালেন। তালিকায় যাঁদের নাম ছিল, তাঁরা সবাই নেহাত বিভাগীয় সুপারিনটেনডেনট কিংবা সহকারী-সুপারিন-টেনডেনট নন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ফোরম্যান, সহকারী-ফোরম্যান ইত্যাদি। রাশিয়ানরা চেয়েছিলেন যে, ভিলাই কার-খানায় উৎপাদনের কাজটা যাতে প্রথম পর্যায় থেকেই সাফল্যমণ্ডিত হয়, তার জন্য উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রতি স্তরে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ভারতীয় কর্মীদের পাশে একজন করে অভিজ্ঞ রুশ কর্মীও থাকবেন। প্রস্তাব শুনে আমাদের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা বললেন, কারখানা পরিচালনার জন্য আমাদের একটি পুরো-দস্তুর সংস্থা তো রয়েছেই, তার উপরে আবার সাড়ে তিন শো বিদেশী কর্মী নিয়োগের কোনও যুক্তি আছে বলে তিনি মনে করেন না। এ'দের নিয়োগ করতে হলে আমাদের আরও পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে হবে। অর্থনৈতিক উপদেষ্টার মতে, এটা নেহাতই অপব্যয় মাত্র। কিন্তু রাশিয়ানরা তবু অটল। তাঁরা বললেন, এ তো শুধুই ভারত সরকারের সুনাম-দুর্নামের ব্যাপার নয়, সোভিয়েট সরকারের সুনাম-মর্যাদাও এর উপরে নির্ভর করছে। সুতরাং ভিলাই কারখানার উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোনও গণ্ডগোলের ঝুঁকি তাঁরা নিতে পারবেন না। সাময়িকভাবে এই সাড়ে তিন শো অভিজ্ঞ রুশ ইস্পাত-কর্মীকে কাজে নেবার ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। যখনই কোনও ভারতীয় কর্মীর মনে হবে যে, নিজের চেষ্টাতেই তিনি কাজ চালাতে সমর্থ, তখনই তাঁর রুশ-সহকর্মীটিকে রাশিয়ায় ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে। মোট কথা, সোভিয়েট সরকারের প্রতিনিধিরা কোনও ঝুঁকি নিতে রাজী নন।

ব্যবসায়িক লাভ-লোকসানের বিচারেও তাঁদের যুক্তিটা ছিল পাকা। তাঁরা বললেন যে, রৌরকেলার মতন ভিলাই কারখানাতেও যদি উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে কাজ ভাল না হয়, এবং সেই প্রাথমিক ঝঞ্ঝাটের জের কাটিয়ে উঠতে যদি দু-তিন বছর সময় লেগে যায়, তবে কম উৎপাদনের দরুন যে-টাকা আমাদের লোকসান হবে, তা প্রায় একটা নতুন কারখানা নির্মাণের ব্যয়ের সমান হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেই তুলনায় সাড়ে তিন শো বিদেশী কর্মী নিয়োগের ব্যয় যৎসামান্য—মাত্র পঞ্চাশ লাখ টাকা। রাশিয়ানদের সংগে আমাদের অর্থনৈতিক উপদেষ্টার এই নিয়ে যে দড়ি-টানাটানি চলল, অতঃপর আমি তার একটা রফা করে দিলুম। মিচেলিভিচ আর আমি দুজনে মিলে পরীক্ষা করলুম সেই তালিকাটিকে; তারপর কর্মীর সংখ্যাকে সাড়ে তিন শো থেকে দু শো পঁচাশিতে নামিয়ে আনলুম। উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে এই রুশ-কর্মীরা যে ভিলাইয়ে উপস্থিত ছিলেন, ভিলাই কারখানার সাফল্যের সেটাই মূল কারণ। রৌরকেলায় জারমানরা যে কারখানাটি বানিয়েছে, স্বাভাবিক উৎপাদন-ক্ষমতায় পৌঁছতে তার সাত-আট বছর লেগে গিয়েছিল। দুর্গাপুরের ব্রিটিশ কারখানাটির লেগেছিল দু-তিন বছর। ভিলাইয়ের রুশ কারখানাটি সে-ক্ষেত্রে মাত্র এক বছরের মধ্যেই স্বাভাবিক উৎপাদন-ক্ষমতায় পৌঁছে যায়। কাজ শুরু হবার পর সেখানে আদৌ কোনও বিভ্রাট ঘটেনি। শুরু থেকেই সব নির্ঝঞ্ঝাট।

তবে বলাই বাহুল্য, ব্রিটিশ কিংবা জারমানদের পক্ষে তাদের নিজেদের দেশ থেকে আমাদের কারখানার জন্য শ' পাঁচেক অভিজ্ঞ ইস্পাত-কর্মী আনিয়ে নেওয়া সহজও ছিল না। জোর করে তো কাউকে সেখান থেকে আনাবার উপায় নেই; যাঁর ইচ্ছে তিনি আসবেন, যাঁর ইচ্ছে নয় তিনি আসবেন না। ভারতবর্ষে এসে একটা অস্থায়ী চাকরি নেবার জন্য সেখানকার কোনও ইস্পাত-কর্মী উৎসাহিতই বা হবেন কেন? দেশে তিনি যে বেতন পাচ্ছেন, তার চাইতে অনেক বেশী বেতন যদি দেওয়া হয়, তবে অবশ্য তিনি আসতে ইচ্ছুক হতে পারেন। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও তাঁর স্ত্রীর যদি গরম দেশে আসবার ইচ্ছে না থাকে, তা হলে তিনি আসবেন না। বিদেশে এসে ছেলেপুলেদের লেখাপড়া শেখানোটাও তো একটা সমস্যা। তা ছাড়া, এখানে আসবার আরও একটা অসুবিধে আছে। দেশে ফিরে তাঁকে হয়ত দেখতে হবে যে, আর কাউকে তাঁর জায়গায় প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে, এবং নিজে তিনি প্রোমোশন পাবার সুযোগ হারিয়েছেন। এ-সব দেশ থেকে একমাত্র তাঁরাই ভারতে আসতে ইচ্ছুক ছিলেন, চাকরি থেকে যাঁরা অবসর নিয়েছেন কিংবা অবসর নিতে যাঁদের আর সামান্যকাল বাকী। তরুণদের মধ্যেও একদল অবশ্য আসতে রাজী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা নেহাতই দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীর

কর্মী। তাঁদের আনিয়ে বিশেষ লাভ হত না।

মার্কিন, ব্রিটিশ কিংবা জারমান বন্ধুরা যে আমাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন না, তা নয়। আসলে সাহায্য করবার ব্যাপারে তাঁদের সত্যিই কিছু অসুবিধে ছিল। একটা বিষয়ে অবশ্য তাঁদের আচরণে আমরা হতাশ হয়েছি। ট্রেনিং নিতে যে-সব তরুণ ইনজিনিয়ারকে আমরা বিদেশে পাঠিয়েছিলাম, তাঁরা যখন ফিরে এলেন, কারখানা নির্মাণের কাজ তখনও শেষ হয়নি। স্বভাবতই আমরা ভেবেছিলাম যে, নির্মাণকার্য শেষ হবার পর এ'দের যাঁর যে-অংশের দায়িত্ব নেবার কথা, নির্মাণকার্য চলতে থাকাকালেই তিনি সেই বিশেষ অংশের নির্মাণকার্যের সংগে যুক্ত থাকবেন, ফলে আপনাপন কাজের সংগে আগে থাকতেই তাঁদের পরিচয় হয়ে থাকবে। এই ধরনের অগ্রিম পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য; যন্ত্রের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপার এর ফলে জানা হয়ে যায়, এবং পরে তাতে কাজের খুব সুবিধে হয়। যন্ত্র সরঞ্জামকে মেরামত করবার দায়িত্ব যাঁদের হাতে, তাঁদের পক্ষে তো এই পরিচয়ের প্রয়োজন আরও বেশী। কিন্তু বিদেশী কর্মীরা তখন তাড়াতাড়ি নির্মাণকার্য শেষ

করতে ব্যস্ত; শ'য়ে শ'য়ে তরুণ ভারতীয় কর্মী কারখানায় ছড়িয়ে থাকুন, এটা তাঁরা পছন্দ করতেন না। তাঁরা বললেন, এতে তাঁদের কাজের অসুবিধে হয়, কাজ ঠিকমত এগোয় না। যে-কারখানার দায়িত্ব একদিন তাঁদেরই হাতে পড়বে, বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তার কাজ আগে থাকতেই জেনে নিতে ভারতীয় তরুণেরা খুবই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু রৌরকেল্লা আর দুর্গাপুরের কারখানা-নির্মাতারা সেই আগ্রহকে বিশেষ আমল দেননি।

রুশ কর্মীরা এ-ব্যাপারে যে ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা সত্যিই আদর্শ হিসেবে গণ্য হবার যোগ্য। তরুণ ভারতীয় কর্মীদের সম্পর্কে এতটুকু বিরক্তি-ভাব তাঁরা কখনও দেখান নি। সত্যের খাতিরেই স্বীকার করতে হবে যে, কমিউ-নিজমের রাজনীতি যা-ই হোক, ভিলাইয়ের এই কারখানা নির্মাণের ব্যাপারে রুশেরা তাঁদের যাবতীয় কারিগরী জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে একেবারে সম্পূর্ণ-ভাবে ভারতীয় তরুণদের সামনে তুলে ধরে-ছিলেন। জারমান আর ব্রিটেনদের কাছে এই কারখানা নির্মাণের কাজটা ছিল যেন নেহাতই একটা ব্যবসায়িক ব্যাপার, একটা ঠিকা মাত্র। দুর্গাপুরের কারখানার কথাই ধরা যাক। ব্রিটিশ কনসরটিয়ামটির সঙ্গে এই কারখানার জন্য যে কন্ট্রাকট করা হয়েছিল (এগারো কোটি পাউন্ডের উপরে), এত বড় কনট্রাকট ব্রিটিশ শিল্প-জগৎ আর কখনও পায় নি। আপন দেশের শিল্প-সামর্থ্য সম্পর্কে যেমন জারমানরা, তেমনি ব্রিটেনরাও ছিল গৌরবান্বিত। যে-কাজের দায়িত্ব তারা নিয়েছিল, তাতে তারা ফাঁকিও দেয় নি। সে-কাজ তারা যথাসাধ্য ভালভাবেই করেছে। তবু একটা কথা ঠিক। সেটা এই যে, তাদের মূল প্রেরণা ছিল মুনাফা। সেটা অবশ্য অন্যায় কিছু নয়। তবে রাশিয়ানরা সেক্ষেত্রে 'না-মুনাফা না-লোকসান'-এর নীতিতে এ-কাজ করেছে। ভারতের চিত্তে রেখা পাত করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে বিচার করলে বলতেই হয় যে, তাদের সাফল্য অসামান্য।

রাশিয়া জানত, শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত প্রাগ্রসর নয় বটে, কিন্তু তার আত্মসম্মান খুব প্রবল। ভারতীয়দের সম্পর্কে রাশিয়ানদের মনোভাব ছিল মোটামুটি এই : "তোমরা ভারতীয়রা যে আমাদের কমিউনিজমকে বোঝ না, তা আমরা জানি। আমরাও তোমাদের ওই ডেমোক্রেসি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না। কিন্তু তা হোক, পরস্পরের আমরা বন্ধু। সুতরাং ডেমোক্রেসি ভাল, না কমিউনিজ্‌ম ভাল, তা নিয়ে ঝগড়া করে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তার চাইতে বরং এসো, কাজে হাত দেওয়া যাক। শিল্পে তোমাদের দেশ এখনও অগ্রসর নয়; তোমাদের মূল শিল্পগুলিকে যতক্ষণ না গড়ে তুলতে পারছ, ততক্ষণ তোমরা যথার্থ স্বাধীন হতে পারবে না। বিনা-ইস্পাতে ভারতীয় অর্থনীতির প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর তাই দশ লক্ষ টন উৎপাদন-ক্ষমতার একটা ইস্পাত-কারখানা গড়ে দেবার জন্যে ভারতবর্ষে আমরা প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি আর আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম নিয়ে এসেছি। খাতার-পত্রে আমরা লিখে রাখছি যে, তোমাদের কাছে আমাদের এত কোটি রুবল পাওনা। কিন্তু কারখানায় উৎপাদন শুরু হবার প্রথম পাঁচ বছরের মধ্যে তার কণা-মাত্রও তোমাদের মেটাতে হচ্ছে না। সুদের হার মাত্র দু পারসেন্ট। সেটা নেহাতই সারভিস চার্জ। অর্থাৎ তোমাদের কাছ থেকে আমরা কিছুই লাভ করছি না। ছ-সাত বছরের মধ্যেই তোমরা দেখতে পাবে যে, যে-কারখানাটি আমরা গড়ে দিচ্ছি, তারই আয় থেকে তোমাদের পক্ষে আমাদের দেনা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব। এর মধ্যে দয়া-দাক্ষিণ্যের কোনও প্রশ্ন নেই। আমরা তোমাদের দান হিসেবে কিছু দিচ্ছি না; তোমরাও আমাদের কাছ থেকে দান হিসেবে কিছু নিচ্ছ না।"

ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই হচ্ছে রাশিয়ার মনোভাব। এর সঙ্গে মারকিন মনোভাবের একবার তুলনা করে দেখুন। বিহারের কয়লাখনি-অঞ্চলে, বোকারোতে, ভারতবর্ষের চতুর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত-কারখানা নির্মাণের ব্যাপারে আমেরিকানরা যাতে উৎসাহী হয়, তার জন্য আমিও কিছু চেষ্টা করেছিলাম। অধ্যাপক কেনেথ গলব্রেথ তখন ভারতে মারকিন রাষ্ট্রদূত। ভারতের তিনি একজন অকৃত্রিম বন্ধু। এই ইস্পাত-প্রকল্পের ব্যাপারে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তখন মিঃ কেনেডি। ভারতবর্ষকে তিনিও গভীরভাবে ভালবাসতেন। বোকারো প্রকল্পে তিনিও ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। এমন কী, প্রকাশ্যেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারত সরকার যদি এটাকে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাই করতে চান, তবে তাতেও এর ব্যয়ভার বহনে আমেরিকার রাজী না হবার কোনও যুক্তি নেই। রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ-শিল্প গড়ে তুলবার জন্য মারকিন সরকার যদি কানাডাকে বিরাট অঙ্কের ঋণ দিতে পেরে থাকেন, তবে রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত-কারখানা নির্মাণের জন্য ভারতকেই বা আমেরিকা ঋণ দিতে পারবে না কেন? এর উৎপাদন-ক্ষমতা হবে চল্লিশ লক্ষ টন, এশিয়ায় এটিই হবে বৃহত্তম ইস্পাত-কারখানা, এটা একটা সবাইকে-ডেকে-দেখাবার-মতো ব্যাপার হবে, আমেরিকার শিল্প-সামর্থ্যের এটি হবে একটি প্রকৃত নিদর্শন—বছর খানেক ধরে কত সাংবাদিক বৈঠকে কত কথাই না মারকিন রাষ্ট্রদূত বলেছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কী দেখলুম আমরা?

সূচনাতেই বিঘ্ন ঘটল। আমেরিকানরা

দাবি জানালেন, বোকারোতে আদৌ একটা ইস্পাত কারখানা করা 'সম্ভব' কিনা, তাঁরাই সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত করবেন। কই, ভিলাইতে একটা ইস্পাত কারখানা করা সম্ভব কিনা, রাশিয়ানরা তো এমন দাবি জানাননি যে, তাঁরাই সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। কাঁচামাল, জল, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য উপকরণ কতটা থাকলে ইস্পাত কারখানা করা সম্ভব হয়, তা বুঝবার মতন কারিগরী জ্ঞান ভারতবর্ষের আছে। ভারত-বর্ষের ইস্পাত-উৎপাদন-ক্ষমতা এখন ষাট লক্ষ টন: সেটাকে নব্বই লক্ষ টনে পৌঁছে দেবার কাজ চলেছে। ১৯৭০ সনের মধ্যেই ভারতবর্ষ এক কোটি নব্বই লক্ষ টন উৎপাদন-ক্ষমতার অধিকারী হতে ইচ্ছুক। যে-দেশের লোকসংখ্যা সাতচল্লিশ কোটি, এটা তার পক্ষে এমন-কিছু বিরাট লক্ষ্য নয়। এই অবস্থায় ভারত যদি সিদ্ধান্ত করে থাকে যে, বোকারোতে দশ লক্ষ টন উৎপাদন-ক্ষমতার একটা ইস্পাত কারখানা করা সম্ভব, তা হলে সেই সিদ্ধান্তটা ঠিক হল না বেঠিক হল, আমেরিকার তো তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও দরকার ছিল না। এটা নেহাতই অনধিকার-চর্চা। বড় জোর তারা জানাতে পারত, কোন্ শর্তে তারা এতে সহযোগিতা করতে রাজী। এও তারা বলতে পারত যে, রাশিয়ানরা যেমন করেছে, তেমনি তারাও এ-ক্ষেত্রে প্রাথমিক রিপোর্ট থেকে শুরু করে উৎপাদন-পর্ব পর্যন্ত প্রতিটি কাজ তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে করবে। সেটা বলরার অধিকার তাদের অবশ্যই ছিল। কিন্তু সে-দিক দিয়ে তারা গেল না। তার বদলে 'সম্ভাব্যতার রিপোর্ট" দেবার জন্যে তিরিশ-চল্লিশ জন মার্কিন ইস্পাত-বিশেষজ্ঞকে ভারতে পাঠানো হল। মাস কয়েক পরিশ্রম করে তাঁরা তো একটি পর্বতপ্রমাণ রিপোর্ট দাখিল করলেন। তাতে বলা হল যে, এটিকে যদি লাভজনক উদ্যোগ হতে হয়, কারখানাটির উৎপাদন-ক্ষমতা তবে চল্লিশ লক্ষ টন হওয়া চাই (সে-ক্ষেত্রে শুধু বৈদেশিক মুদ্রাই লাগবে এক শো কোটি ডলার)। কিন্তু উৎপাদন-ক্ষমতা দশ লক্ষ টন হলে যে উদ্যোগটা কেন লাভজনক হবে না, সেটা বোঝা গেল না। টাটা আর ইনডিয়ান আয়রনের দৃষ্টান্ত তো রয়েছে; তাদের উদ্যোগ তো যথেষ্টই লাভ-জনক। তবে? মার্কিন বিশেষজ্ঞদের এই চল্লিশ-লক্ষ-টনী দাবির তা হলে অর্থ কী? শুধু তাই নয়, রিপোর্টে নেহাতই অযাচিত-ভাবে উপদেশ দেওয়া হল যে, এর পরিচালন-ভার কোনও বেসরকারী সংস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

এক দিকে যখন এইসব চলছে, অন্য দিকে তখনও অর্থ সাহায্য আসবার লক্ষণ নেই। বিশেষজ্ঞদের এই রিপোর্ট অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের শাসন-কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসকে জানালেন যে, মার্কিন উদ্যোগে ভারতবর্ষে একটা ইস্পাত কারখানা গড়া হবে, তার জন্য এক শো কোটি ডলার চাই। ভারতীয় বন্ধুরা কিন্তু মার্কিন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন যে, দশ লক্ষ টন উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন একটা ইস্পাত-কারখানা গড়ার জন্য তাঁরা বরং কংগ্রেসের কাছে কুড়ি কোটি ডলার বরাদ্দ প্রার্থনা করুন। সেটা তাঁরা তিন বছরে গড়ে দিতে পারবেন। তারপর বরং আবার তাঁরা কুড়ি কোটি ডলার প্রার্থনা করুন। এইভাবে দফায়-দফায় বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়ে দফায়-দফায় সেই কারখানার সম্প্রসারণ ঘটানো যাবে। কিন্তু সে-কথায় তাঁরা কান দিলেন না। তার ফল হল এই যে, ১৯৬৩ সনের গ্রীষ্মকালে সেনেটর ও কংগ্রেস-সদস্যদের কমিটীতে যখন বৈদেশিক সাহায্য বিল পরীক্ষা করে দেখা হল, একটিমাত্র খাতে সাহায্য বাবদে এক শো কোটি ডলার মঞ্জুর করতে তাঁরা তখন রাজী হলেন না। বিদেশে আমেরিকার সাহায্যের ইতিহাসে সত্যিই এ এক অভিনব ঘটনা। একজন রাজনীতিক তো বিলের মধ্যে ভারতবর্ষের নাম না করেই এই মর্মে একটি শর্ত ঢুকিয়ে দিলেন যে, কোনও উন্নয়নশীল দেশেই উন্নয়নের বিশেষ একটি খাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে দশ কোটি ডলারের বেশী বিনিয়োগ করা উচিত হবে না। বোকারোতে মার্কিন উদ্যোগে যে ইস্পাত কারখানা গড়বার কথা হয়েছিল, এইখানেই তার উপরে যবনিকা পড়ল। এবং পুনর্বার যবনিকা উঠতেই দেখা গেল যে, রাশিয়ানরা এসে মঞ্চের উপরে দাঁড়িয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্তটিকে বেছে নিয়েই যে তারা মঞ্চে ঢুকেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তারা বলল, আমেরিকানরা যদি বোকারোতে ইস্পাত কারখানা গড়তে রাজী না থাকে তো ভারতবর্ষের জন্যে তারাই সে-কারখানা সানন্দে গড়ে দেবে। তা তারা ঠিকই দেবে। এবং ভিলাইয়ের তুলনায় বোকারোর কাজের মাধ্যমে যে তারা আরও গভীরভাবে ভারতবর্ষের চিত্তে রেখাপাত করবে, তাতেও সন্দেহ নেই।
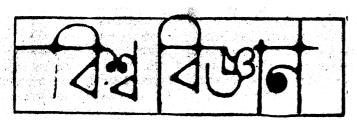
[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

শিল্প সভ্যতার কয়েকটি সমস্যা (২)

ধোঁয়ার জন্য ক্যান্সার হোক বা না হোক, অন্য নানারকম অসুখ-বিসুখ ও অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। কয়েকটি উদাহরণ দিই।

নিউইয়র্ক শহরের একাংশে হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে মহিলাদের অনেকের নাইলনের মোজা গলে গিয়ে পা বেয়ে রসের মত ঝরে পড়ছে। মোটরগাড়ির গ্যাসের (নাইট্রোজেন ডায়ক্সাইড) আধিক্য মোজার নাইলন গলিয়ে দিয়েছে। শিকাগোর কাছে একটি শহরের বাড়িগুলির রং উঠে গিয়ে দেয়ালগুলিতে এক উৎকট সবুজ রং দেখা দেয়, যেন শ্যাওলা ধরেছে। নিকটবর্তী এক রসায়ন কারখানার চিমনির ধোঁয়ার জন্যই ঐ ব্যাপার ঘটে। এইরকম বিষাক্ত বাতাস দেয়াল ও জানালায় এক রকমের চট্‌চটে পলেস্তারা পড়িয়ে দেয়, ধাতু ক্ষইয়ে দেয়, পাথরের বাড়িতে ভাঙ্গন ধরায়, আরো কতরকমের ক্ষতি যে করে তার ইয়ত্তা নেই। শহরের সেই বাতাস গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়লে গরু-বাছুরের অসুখ করে, তাদের দুধ, দুই মাখন ইত্যাদিতে দোষ দেখা দেয়, গাছপালা শুকিয়ে মরে যায়, কোন কোন ফসলের চিরমৃত্যু ঘটে।

এই বিপদের সুরাহা কোথায়? শিল্প-প্রসারের যুগে কলকারখানা নির্মাণ তো আর বন্ধ হবে না। মোটরগাড়ির সংখ্যাও বেড়েই চলবে এবং অদূর ভবিষ্যতে সেগুলি পরমাণুশক্তির দ্বারা চালিত হবে না এমন কি সাধারণ বিদ্যুৎশক্তিও খুব অল্পদিনের মধ্যে এত পরিমাণ উৎপন্ন হবে না যে সমস্ত কলকারখানা তাই দিয়ে চালানো যাবে। সুতরাং কয়লা আর তেলের রাজত্ব চলবে এখনো বেশ কিছুদিন। সেই জন্য বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছে ধোঁয়ার যে সমস্ত উপাদান বায়ু দূষিত বিষাক্ত করে সেগুলি যাতে বায়ুর সঙ্গে মিশতে না পারে সেইরকম কল-কৌশল আবিষ্কার-উদ্ভাবন করা। এই ব্যাপারে তাঁরা কিছু কিছু সাফল্য লাভ করছেন। মোটরগাড়ির গ্যাস হচ্ছে অনিষ্টের এক প্রধান কারণ। সেই গ্যাস যাতে বাইরে না বেরিয়ে আবার দহন-চেম্বারে বা অন্য একটি জায়গায় গিয়ে পুরোপুরি জ্বলে তার জন্য এক যান্ত্রিক কৌশল বার হয়েছে। এই দুই রকমের ব্যবস্থা মিলে মোটরগাড়ির এক্‌জস্ট পাইপ থেকে হাইড্রোকার্বন বার হওয়া শতকরা ৮০ ভাগ এবং কার্বন মনক্সাইড বার হওয়া শতকরা ৬০ ভাগ কমাতে পারে। এর জন্য যা বাড়তি খরচ হবে তা গাড়ির দামের শতকরা ১·৫ ভাগ। এইরকম আরো সব কলা-কৌশল বার হচ্ছে। তাছাড়া পাশ্চাত্যের নাগরিকরাও এই সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতন। তাঁরা নিজেরা, ভাল জাতের কয়লা ব্যবহার করে, কারখানার চুল্লিতে লাগানো যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে ধোঁয়ায় মিশ্রিত কঠিন পদার্থের কণাগুলি ছেঁকে বার করে নিয়ে এবং অন্যান্য কৌশলে সমস্যাটির পুরো না হলেও অন্তত আংশিক সমাধানের চেষ্টা করছেন।

জলের বিষায়ণ ও আবর্জনা

শিল্প সভ্যতার একটি অভিশাপ যেমন হাওয়া দূষিত হাওয়া, তেমনি আর একটি হচ্ছে জল দূষিত হওয়া যা থেকে নানারকম মারাত্মক ব্যাধি সংক্রামিত হতে পারে। কলকারখানা থেকে ময়লা, কালি ও নানা-রকম রাসায়নিক আবর্জনা নিয়ে প্রচুর পরিমাণ জল নদী-নালায় গিয়ে পড়ে এবং বিশুদ্ধ জল দূষিত করে। সেই জল পেটে গেলে জীবজন্তু ও মানুষের নানারকম অসুখ করতে পারে। আমাদের কলকাতায় গঙ্গার দু ধারে সারি সারি কারখানা থেকে ক্রমাগত নোংরা জল গঙ্গার জলে গিয়ে মিশছে। এ ছাড়া রাসায়নিক সার ও কীটঘ্ন ওষুধপত্রও মাটির উপরের ও নিচের জল বিষিয়ে তুলতে পারে। জল দূষিত করার আর একটি জিনিস হচ্ছে শহরের আবর্জনা।

এই সমস্যাটি নিয়ে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে মাথা ঘামানো হচ্ছে। জল দূষিত হওয়ার সমস্যার প্রতিকারের জন্য সেখানে উদ্ভাবিত হচ্ছে নানা কল-কৌশল যেগুলির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন "স্যানিটেশন কমিশনের হাতে যেমন নিউইয়র্ক—নিউ জার্সি-কানেকটিকাট ইন্টারস্টেট স্যানিটেশন কমিশন, ওহিও রিভার ভ্যালি স্যানিটেশন

খন্দে আবর্জনা ফেলা হয়েছে

আবর্জনা সারে রূপান্তরিত
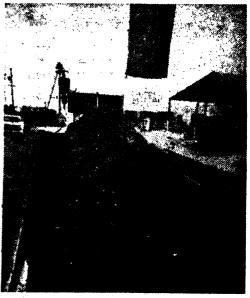
কমিশন প্রভৃতি কতকগুলি রাজ্য মিলিয়ে এক একটি কমিশন কাজ করে এবং সেগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে ট্যাফ্ট স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সেণ্টারের মত প্রতিষ্ঠান। এইসব সংস্থার চেষ্টায় ওহিওর মত চরম দূষিত নদী আজ হয়ে উঠেছে আমেরিকার বিশুদ্ধতম জলধারাসম্পন্ন নদীগুলির অন্যতম।

সিন্সিনাটির কাছে এইরকম একটি আবর্জনা পরিষ্করণ কেন্দ্র আছে যেখানে বিভিন্ন শহরের পায়খানা, ডাস্টবিন প্রভৃতির ময়লা প্রথমে বড় বড় খোলা ট্যাংকে ফেলা হয়। সেখানে আবর্জনার কঠিন অংশগুলি তলায় থিতিয়ে গেলে, তরল অংশ আলাদা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বায়ুর ঝট্‌কা দিয়ে মন্থন করলে অক্সিডেশনের ফলে ব্যাকটিরিয়া-ঘটিত কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায়। তখন রোগ সংক্রামক পদার্থগুলি সংক্রমণে অক্ষম হয়ে পড়ে। এইভাবে দূষিত জল শতকরা ৯০ ভাগ পরিষ্কৃত হলেও তার মধ্যে খাদ রয়ে যায় ১০ ভাগ। সেই ১০ ভাগ ময়লা নষ্ট করা সহজ নয়। তার জন্য তিন ভাগে বিভক্ত এক প্রক্রিয়া বার করা হয়েছেঃ—(১) ট্যালকাম পাউডারের মত পদার্থের মধ্যে দিয়ে ছেঁকে নেওয়া, (২) কাঠকয়লা দিয়ে ফিল্টার করা এবং (৩) ইলেকট্রোডায়ালিসিস।

এইসব যন্ত্রপাতির অবশ্য বেশ দাম আছে—কারখানার সাজসরঞ্জামের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। কিন্তু কলকারখানার মালিকরা যাতে সেগুলি কিনতে পারেন সেজন্য সরকার ঐসব যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ট্যাক্সের বোঝা কিছুটা হাল্কা করে দেন।

গার্হস্থ্য জঞ্জালের যেমন মাছ মাংসের কাঁটা, হাড়, পরিত্যক্ত কাগজ, তরকারির খোসা ইত্যাদি গতি করবার আরো এক রকম নতুন কায়দা উদ্ভাবিত হয়েছে যা সেই জঞ্জালগুলি নষ্ট না করে অন্যভাবে কাজে লাগাবার জন্য রূপান্তরিত করবে। লরী করে বয়ে এনে সেগুলি কন্‌ভেয়ারের সাহায্যে এক জায়গায় জমা করা হয়, যেখানে ছেঁড়া কাপড়, ভাঙ্গা কাঁচ বা প্ল্যাস্টিকস প্রভৃতি জিনিস (যেগুলি বেছে যায়) আলাদা করে নেওয়া হয়। তারপর বাকি পদার্থ প্রকাণ্ড এক জাঁতাকলে ফেলে প্রথমে গুঁড়ো করে তারপর সেই পদার্থেরই ভিতরকার ফাংগাস ও ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে গাঁজানো হয়। এইভাবে তৈরি হয় চমৎকার সার। ক্যালিফর্নিয়ার সান ফার্নাণ্ডো শহরে ঐ রকম একটি 'পাইলট প্ল্যাণ্ট' দৈনিক ৫০ টন আবর্জনা নিয়ে কাজ করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি মিনিটে মোট ২৫০ টন অর্থাৎ প্রতি দিন ৩ লক্ষ ৬২ হাজার টন জঞ্জাল জমা হয়। বছর ২০ আগে দৈনিক মাথাপিছু জঞ্জালের পরিমাণ ছিল মাত্র ১ সেরের মত। আজ সেই পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে শুধু নয়, সেই সঙ্গে লোক বেড়েছে ৫ কোটির মত।

বায়ু ও জলের বিষায়ন এবং আবর্জনা ও জঞ্জালের মারাত্মক আধিক্য শিল্প সভ্যতার প্রসারের এক অপরিহার্য অবাঞ্ছনীয় ফল। মেক্সিকো, ফেয়ারব্যাংক্স, লস এঞ্জেলেস, টোকিও, লণ্ডন, ইয়োকোহামা, প্যারিস, মস্কো, লেনিনগ্রাদ, মিল্যান, ব্রাস্‌ল্‌স, ভিয়েনা, বুনো আয়ার, সিড্‌নি, বেলগ্রেদ, কলকাতা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রত্যেকটি বৃহৎ শিল্প-কেন্দ্রই জলবায়ুর দূষিত হবার সমস্যার সম্মুখীন। তবে সমস্যাটি সম্পর্কে মানুষের টনক নড়েছে এবং কোথাও কোথাও সুরাহার জন্য চেষ্টা হচ্ছে এটা আশার কথা।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

মে-জুন মাস নাগাদ যদি এদেশে আসেন, তবে পথঘাট গোলাপের ঝরা পাপড়িতে থইথই করছে, দেখতে পাবেন। হাইওয়ে ছেড়ে একটুখানি লোকবসতির মাঝখানে ঢুকে আসুন—অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তায়। আশপাশে বাড়ির লাগোয়া বাগানে গোলাপের সমারোহ দেখতে দেখতে, চোখের চাউনি কোমল হয়ে আসবে।

বেশির ভাগ বাগানেই বেড়া দেওয়া নেই। কেন নেই? কারণ, রাস্তায় পরস্বলোলুপ বেওয়ারিশ গরু ছাগলের ভিড় নেই। আর কেন? না, গোলাপ-বাগানরা আব্রুর পরোয়া করেন না। বরং অন্তুর দৃষ্টির অভিষেকে, আরো রাঙা, আরো সজীব, আরো বেশি মনোলোভা হয়ে উঠতেই তাদের আগ্রহ।

এদেশের অনেক কিছুই আমার হিসেবে মেলে না। যুক্তিতে কুলোয় না। ভাবলে খটকা লাগে। অথচ যা হোক তা হোক একটা গোঁজামিল সমাধানেও মন সায় দেয় না।

ধরুন, বসন্ত সমাগমে, পথে, মাঠে, বিপণিতে সরণিতে অন্তর্বাসের মতন সংক্ষিপ্ত পোশাকে দেহ সাজিয়ে এখানকার নারী সমাজ কুণ্ঠাহীন ঘোরাফেরা করেন। কোনো বয়সের কোনো পুরুষের দৃষ্টি তাতে বিচলিত হয় না। এখানে এটা স্বাভাবিক; এদেশে এটা সামাজিক।

যে বাগানে বেড়া মানে প্রাচীর নয়, যে সমাজে আব্রু আর শালীনতা সমার্থক নয়, নেহাত নিন্দুক না হলে তাদের ঔদার্যের কথা একটু মানতেই হয়। জানি না এই ঔদার্যের ভিতটা আসলে কোথায়। নরনারীর সামাজিক সম্পর্কের নিষ্পাপ সারল্যে, না প্রতিবেশিসুলভ মৌলিক নিরাপত্তা-বোধের আস্থায়।

দেমাকে নয়, যান্ত্রিক উৎকর্ষের ঔপচারিক মহিমাতেই এরা মাটিতে পা দিয়ে হাঁটে না। এদের পায়ে চাকা বাঁধা। সোমবারের ভোর থেকে শুক্রবারের বিকেল পর্যন্ত ভূতের মতন খাটে। আবার সপ্তাহের বাকি আড়াইটে দিন, দক্ষযজ্ঞের প্রমথ নৃত্যের মতনই বোহিমেথী হুল্লোড়ে ধেই ধেই করে নাচে। এরা কি দুর্বার প্রাণপ্রাচুর্যে থরথর করে কাঁপছে? নাকি জৈবিক অভ্যাসের একটা ঘূর্ণনচক্রে অন্তপ্রহর পাক খাচ্ছে? কোনটা ওদের ঠিক পরিচয়, আমি বলতে পারব না।

সম্পদের প্রাচুর্য আর লোকসংখ্যার স্বল্পতা, সব মিলিয়ে এদেশে দৈন্য বা বেকার সমস্যা উৎকট নয়। ধনগত অসাম্য দস্তুর মত আছে, কিন্তু ভোগ্য পণ্য বণ্টনের নিপুণ কেরামতিতে সে বৈষম্য কেউ গায়ে মাখে না। ঋণের টাকায় এরা মোটর হাঁকায়, টি-ভি দেখে, ফার্নিচার কেনে...মুদি গয়লা থেকে নিয়ে মায় হাসপাতাল পর্যন্ত, নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধার চলে, বললে কম বলা হয়, ধার-ই চলে। কাগজে কাগজে পণ্য-সামগ্রীর অবিস্মরণীয় বিজ্ঞাপন : 'নো মানি ডাউন...চার্জ ইট...' ভেবে দেখুন একবার। কমলালয়ের পোশাক, অনন্ত মল্লিকের বিছানা, মেলডি-র হার্মোনিয়াম কি বনলতা 'স্বপনির ওষুধ, কোনোটাই নগদ দামে কিনতে হচ্ছে না—তিন বছরের মেয়াদে শোধ করছেন! নেহাত আমি আনাড়ি, আর গিন্নি আনন্দময়ী তাই, নইলে এদেশে আমার গৃহসজ্জার বহর এমন হতে পারতো, যার ছবি দেখলে, নিউ আলিপুরের অনেকেই হিংসেয় মুখ কালো করতেন। যা বলছিলুম, বান্ধবীকে রেস্তরাঁয় খাওয়ানো, সিনেমা দেখা আর পোকার খেলা ছাড়া নগদের কারবার খুবই কম। সবই ক্রেডিট চলে। তার ওপর ব্যাঙ্কগুলো রোজ রোজ ডাকটিকিট খরচ করে আপনার দোরে ধন্না দিচ্ছে—'নেবে নাকি কিছু?' বাড়ি করবে? গাড়ি কিনবে, মায়ামী বীচে সপরিষ্ঠে বেড়িয়ে আসবে? আহা বেশ তো, একবার মুখ ফুটে বলই না কত চাই?...

স্বাস্থ্যবীমা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থায়, যে নাগরিক আজ প্রসূতি আগারে ভূমিষ্ঠ হল, জীবন সায়াহ্নে তার অস্বস্তি মোচনের জন্যে 'সামাজিক নিরাপত্তার' পাকা বন্দোবস্ত রয়েছে। মাঝখানের দুস্তর সমুদ্রেও ভেলা বা বয়ার অভাবে বড় একটা কেউ ভেসে যায় না।

তবু এখানে ঘন ঘন 'হোলড-আপ' হয়, আকছার ছিঁচকে চুরি হয়। শ্বেতসদনের তোরণের সামনে, প্রকাশ্য দিনের আলোয় যাচনরত ভিক্ষুকের প্রচ্ছন্ন আকুতি, বিদেশীরও চোখে বেঁধে। শপ লিফটিংয়ের প্রাবল্যে, দোকানে দোকানে 'প্রহরী-চক্ষু' খদ্দেরকে ছাতা ব্যাগ সামলে রাখার উপদেশ...। বিদেশীভাড়াটেকে বাড়ি-ওয়ালীর সাবধান বাণী : বউকে বোলো দোরে সব সময় শেকল দিয়ে রাখতে; আজকাল পাড়ায় বড় "সেলস্‌ম্যানের" উপদ্রব। খুন জখম, নারীধর্ষণ লেগেই আছে...।

আমরা বাংলা দেশের ছেলেরা, আবাল্য হরেক রকমের ক্ষিদে সহ্য করে করে বড় হই। যৌবনের উপবনে, আমরা কেউ হ্যাংলা, কেউ নার্ভাস, কেউ বাচাল, কেউ বা হন্যে। আবার স্পর্শকাতরতার মুদ্রাদোষ নিয়ে কেউ কেউ ভয়ানক রকম একলা। এদেশের ছেলেদের তো সে সব বালাই নেই। এদের ডেটিংয়ের মধুমাস কৈশোর উত্তীর্ণ হবার অপেক্ষায় থাকে না। আমার পরি-সংখ্যানগত হিসেব জানা নেই, তবে অধিকাংশ 'টীন-এজরাই' যৌন অভিজ্ঞতায় রীতিমত পোক্ত। প্রতি সপ্তাহান্তে এদের ক্ষুধা তৃপ্তির এলাহী আয়োজন। মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকার ধরার প্রয়োজন তো এদের থাকবার কথা নয়। তবুও রাতবিরেতে একলা মেয়ে পথে বেরোতে দোনোমোনো করে। খোদ রাজধানীতেই রেপ কেস রেকর্ড ছাপিয়ে গেছে।

অনেকের মতে, ওয়াশিংটন তথা অন্যান্য বড় শহরের অধিকাংশ দুষ্কৃতির জন্যে, নিগ্রোরাই দায়ী। কাজেই নাগরিক জীবনের যত দাহ, তার ভস্মাবশেষ ঐ ভাঙ্গা কুলোতে ফেলাই নিরাপদ। ওয়াশিংটন ও পৌর এলাকার (ডিসট্রিক্ট অফ কলাম্বিয়া, সংক্ষেপে ডি সি) কালো বাসিন্দার সংখ্যা শতকরা আন্দাজ হেষট্টি-সাতষট্টি। ডি সি-র অনেক পাড়াই এখন শ্বেতগন্ধ বর্জিত। মেরিল্যান্ড স্টেট থেকে ডি সি-র প্রবেশ পথের মুখে, একটা প্রস্তরফলকে লেখা আছে : welleome to Washington. একবার একদল বিক্ষুব্ধ শ্বেতাঙ্গ ছাত্র তার ওপর কাগজ সেঁটে দিয়েছিল : welcome to Africa। এটা নির্ভেজাল বর্ণবিদ্বেষ নয়। এর পেছনে রাজনীতির ঘোঁট ছিল।

আমার স্বদেশবাসী বন্ধুরাই সখেদে উক্তি করেন : এসব পাড়া মশায়, পাঁচ বছর আগে স্বর্গ ছিল। কালোরা আসার সঙ্গে সঙ্গে সাদারা ঝেঁটিয়ে পাড়া ছেড়েছে, সেই সঙ্গে আমরাও। প্রশ্ন করলুম : কেন? বন্ধুপত্নী সক্ষোভে জানালেন : ওদের সঙ্গে বাস করা যায় না। যেমন নোংরা, তেমনি চোর......

ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। ওরা রাস্তাঘাট অপরিচ্ছন্ন করে, ঘরবাড়ি ময়লা করে, অশ্লীল ভাষায় খিস্তি করে, ওয়াশার থেকে কাপড় চুরি করে নিয়ে যায় ......এক কথায় ওদের সান্নিধ্যে বাস করা অসম্ভব।

আমি যে-পাড়ায় থাকি, সেটা নিভেজাল সেবতাঙ্গ। অথচ এদিকের ফ্ল্যাটগুলোর অসুবিধে অনেক। সারাটা শীতকাল, ম্যানেজারের অফিসে ফোন করে হীটিং-খারাপের অভিযোগ করেছি। সারা গরমকাল দাহ সহ্য করতে হয়েছে—এয়ার কণ্ডিশনারের অভাবে। অথচ, আধ মাইলের মধ্যে একটা নতুন এপার্টমেণ্ট বিলডিং হয়েছে গিয়ে দেখে এসেছি,—তার স্বাচ্ছন্দ্যের বন্দোবস্ত শেরাটন পার্ককে লজ্জা দিতে পারে. ভাড়া একই...তবুও কেউ যাবে না সেখানে। পাড়াটা কালোদের। কালো-গাইয়ের গান শুনে আহামরি করব, কালো বক্‌সারকে দেশের গৌরব বলতে দ্বিধা করব না, কিন্তু কালো পড়শি...? অসহ্য!

একবার দিন কয়েক কৌতূহল নিয়ে ঘোরাঘুরি করলুম ঃ বিষম-সংযোগ যেখানে বলে। এ-দৃশ্য প্রায় দেখাই যায় না। ছেলের-ছেলের দোস্তি কি মেয়েতে-মেয়েতে সখিত্বের ক্ষেত্রে এনতার দেখবেন, কিন্তু যাকে বলে জোড় বেঁধে কূজন করা, এমন ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটের রঙীন সমাহার নজরে পড়া শক্ত। 'শ্রীমতী বসন্তবর্ণা'-রা এর বিরল ব্যতিক্রম। সে এক মহিলার
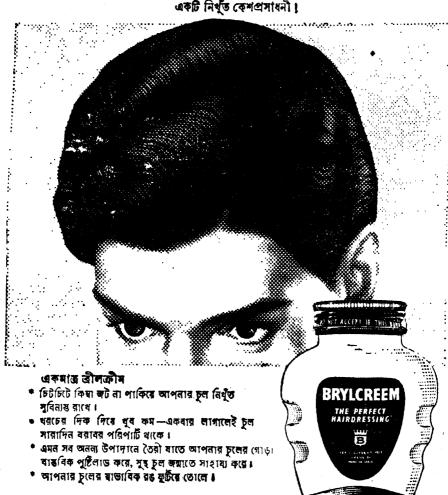
তত্ত্বাবধানে দিন দশেক বাস করেছিলুম। বয়েস চল্লিশের নিচে, বছর বারোর একটি ছেলে আছে, তাঁর আগের স্বামীর। বর্তমান গৃহস্বামী বাইরে কাজ করেন। কালেভদ্রে আসেন। মা ছেলে উভয়েই ষোলো আনা শ্বেতকায়। তাঁদের বাসা থেকে যেদিন চলে আসব, সেদিন সকালে টেলিফোন করে গৃহকর্ত্রী বিকেলে চায়ের নেমন্তন্ন করলেন।

বিকেলে গেলুম। দরজার ঘণ্টায় হাত রাখতেই দরজা খুলে গেল। হলওয়ে জুড়ে দাঁড়ালেন এক অয়স্কান্ত বৃষস্কন্ধ পুরুষ। মিন মিন করে জিগ্যেস করলুম :

মিসেস্ মে-হিউ কি...

সজোরে আমার নড়া ধরে নাড়া দিয়ে তিমিরবরণ ভদ্রলোক বললেন : হ্যাঁ আমার স্ত্রী, আমি মে-হিউ। আপনি ভেতরে এসে বসুন, ও একটু বাইরে গেছে। এক্ষুনি ফিরবে।

আমতা আমতা করে আরো একবার মুখ খুললুম,—স্টিভ কি...?

মিঃ মে-হিউ বললেন, "হ্যাঁ, আমার ছেলে। কেন বাঁদরটা নিশ্চয় শয়তানী করেছে কিছু। কী করি বলুন তো? এক একবার ভাবি কড়া শাসন করব, কিন্তু মনে জোর পাই না...একটা মাত্র ছেলে..."

আমি তা ভাবছিলুম না। স্টিভ খুবই লক্ষ্মী ছেলে! আমার ফাইফরমাশ কম খাটেনি। আমি ভাবছিলুম—এটাও তবে সম্ভব!

আমি কৃষ্ণাঙ্গপাড়ায় বাস করিনি। আমার দিশী বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা করেছেন, তাদের মধ্যে দুটি শ্রেণী। একদল, যারা আসলে সাদা-পড়শী নিয়ে ঘর করছিলেন; কৃষ্ণ সমাগম হবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়া ছেড়েছেন। তাঁদের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা বরাবরই নিগ্রোদের সঙ্গে বসবাস করছেন। তাঁরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, রঙের জেল্লা না থাকায়, ওদের মনে খানিকটা ভিজে মাটির গন্ধ আছে। তাতে নাকি আমাদের দেশের মানুষের মন একটু আরামই পায়।

সেদিন একটা পোস্ট অফিসে কয়েকজন পলাতক আসামীর ছবি আর ব্যক্তি পরিচিতি দেখছিলুম। কীর্তির দিক দিয়ে সবাই মহাপুরুষ। প্রত্যেকের নামেই, তহবিল-তছরূপ, ক্যাশভাঙা, জোচ্চুরি, জালিয়াতির মামলা ঝুলছে। খুঁটিয়ে পড়লুম। আসামীদের সবাই সাদা, সবাই ডাকঘরের প্রাক্তন কর্মচারী। মুখ ফিরিয়ে কাউন্টারের পেছনে তাকিয়ে দেখলুম। কালো গিস্‌গিস্ করছে। সতের জন কর্মীর পনেরজনই নিগ্রো। এ হিসেব কিছুই প্রমাণ করে না, জানি। তবু কেমন খটকা লাগে। আনুপাতিক হারে সাদারা সংখ্যালঘু; অথচ অপরাধের মাত্রা তাদেরই বেশি। এটা কী রকম? আর সরকার নিশ্চয় বেছে বেছে সাদাদের নামেই হুলিয়া বার করেনি...।

না, মোটেই তা করেনি। বরং এফ-বি-আই যা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের সরকারী হিসেব যা পাওয়া গেছে, তা আমার দেখা ছবির বিপরীত। গোটা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানভাসে মসীলেপনের ব্যাপারে কৃষ্ণকায়রাই বড় হিস্যা নিয়েছে। এই হিসেবের একটা সংক্ষেপিত নকশা দিচ্ছি, আপনারা চোখ বুলিয়ে নিতে পারেন :

১৯৬৫ সালে গোয়েন্দা বিভাগ যত লোককে গ্রেপ্তার করেন, তার মিলিয়ন করা (দশ লক্ষ) আনুপাতিক হার।

অপরাধ	কালো	সাদা
খুন ও নরহত্যা	৩০৬	২৪
বলপূর্বক নারীধর্ষণ	৩৮৬	৪০
ডাকাতি	১১৬৩	১৯৮
গাড়ি চুরি	২১৮০	৫৭৩
জালজোচ্চুরি	৪৫০	১৯৪
প্রতারণা	৬৮২	৩৬৫
পতিতাবৃত্তি	১৪৫৪	১১৩
অন্যান্য যৌন অপরাধ	১১৩৭	৩৪৫
নার্কোটিক প্রতিক্রিয়া	৯৯৭	১৬৫
জুয়া	৫৩০০	১৭৭
মাতলামি	২৯২৬৯	৯৫৬১
উচ্ছৃংখলতা	১৪৮৩৫	২৭৮৮

বিভিন্ন অপরাধে মোট ধৃত অপরাধীর সংখ্যা :

নিগ্রো : ১,১১,৪০৪

সাদা : ২৮,৮৮৭

মাঝে খুনের একটা মরসুম পড়ে গিয়েছিল এখানে। নারকীয় হত্যালীলার নাটকীয় খবরে—কাগজ, বেতার, টেলিভিশন কদিন ধরে সে কী সরগরম! খুন জখমের খবর এমনিতে এখানে খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেক্স ঘটিত ঈর্ষা আসক্তি, ব্যক্তিগত আক্রোশ, মনস্তাপ বা টাকাকড়ি নিয়ে খুনোখুনি তো লেগেই আছে। সে কথা নিয়ে কাহাতক আপনি মাথা ঘামাবেন, অত ফুরসৎ কই?

কিন্তু ইদানীং এখানকার মনস্তাত্ত্বিকেরা যাদের কথা ভেবে বিচলিত বোধ করছেন, তারা হল দেশের ব্যাপক বিভীষিকা—গণঘাতকেরা। অকারণে বা অজ্ঞাত কারণে এরা নিরীহ নির্দোষ লোককে অপঘাতে মারবে। আপনি সাবধান হবার সময় পাবেন না। এদের আলাদা করে চেনার উপায় নেই। পাঁচজন ডেভিড হ্যারল্ডদের মধ্যেই এরা ছড়িয়ে রয়েছে—খাচ্ছে-বেড়াচ্ছে, আমোদ ফূর্তি করছে,—ইউ-জি-এফ-এ চাঁদা দিচ্ছে—এই সব ঘুমন্ত ফুজিয়ামারা... কবে যে কী উপলক্ষ করে হঠাৎ ফুঁসে উঠবে, তার হদিস কেউ জানে না।

ধরুন রিচার্ড স্পেক বলে যে লোকটা শিকাগোর আটটি অল্পবয়সী নার্সকে কশাইয়ের মত কেটেছে, তাদের একজনেরও কৌমার্যহানির চেষ্টা সে করেনি। কিংবা কে জানে হয়ত, সুপ্ত রিরংসা নিয়েই নগ্ন নারীদেহে ছুরি চালিয়েছে—জোলার 'হিউম্যান বীস্ট'-এর এই জ্যান্ত চরিত্র। টেকসাসের মেধাবী ছাত্র হুইটম্যানের কথাই ধরুন। সেদিন সকালে, ইউনিভার্সিটির টাওয়ারে দাঁড়িয়ে যেসব লোককে সে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি করে মারল, তাদের সঙ্গে তার কোনও সংস্রব ছিল না। কেউ তার পাকা ধানে মই দেয়নি। তাই, এই সব কার্যকারণ সম্পর্ক বিহীন খুনের কিনারা করা শক্ত।

কোনো কোনো মনোবিজ্ঞানীর মতে এই সব গুপ্তঘাতকের সংখ্যা প্রতি হাজারে দুজন। অর্থাৎ মোট চার লক্ষ লোক। আবার আর এক psychiatirst আরও বড় অংকের হিসেব বাতলেছেন।

তাঁরা বলছেন, কি-বছর এক কোটি আমেরিকান মানসিক রোগে ভোগেন। গত বছর এদের মাত্র সিকি ভাগের চিকিৎসা সম্ভব হয়েছে—হাসপাতাল ও আরোগ্য নিকেতনগুলির মাধ্যমে। আর এদের মধ্যে আট লক্ষ, psycotic রুগী হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। শুনলে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।

psycotic-র সাধারণ সংজ্ঞা : যে কিছুতেই আর বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। অবিশ্যি সব সাইকোটিকই যে খুনে হবে, এমন কথা নয়। কিন্তু কারা হবে? কোন্ লক্ষণ মিলিয়ে ভাবী গণহন্তাকে খুঁজে বের করবেন? তারা কি কোন বিপদসংকেত আগেভাগে জানিয়ে রাখে? মুখে চোখে, চলনবলনে কোথাও কি ফুটে ওঠে আসন্ন রক্তডুবার চিহ্ন? না, এমনিতে বোঝার কিছু উপায় নেই। কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, ভবিষ্যতের এই পাইকারী আততায়ীরা অতীত জীবন অত্যন্ত সহজভাবে কাটিয়েছে : বাড়িতে, পাড়ায়, কলেজে কি অফিসে—সর্বত্রই, বিনয়ী, স্বল্পভাষী, পরোপকারী ও সদাশিবচরিত্র বলে সুনাম কুড়িয়েছে। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা তাদের এই আপাতসৌম্য চরিত্রের পেছনে একটা অতিপ্রাকৃত বক্র ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে শিউরে উঠেছেন। তাঁরা বলছেন, একটা ক্রুর ভয়াল-বিকৃত অ্যাটিলাকে গোপন করে রাখার প্রাণান্ত প্রয়াসই ওদের সংযমে অভ্যস্ত করায়। আর কেউ চিনতে না পারলেও, ওদের আসল সত্তাকে ওরা নিজেরা বিলক্ষণ চেনে। তাই বিস্ফোরণের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ওরা মুখোশ খোলে না। তাই প্রায়ই দেখা গেছে, এই রক্তাক্ত ভূমিকায় ওদের দেখে, ওদের পূর্বপরিচিত আত্মীয়বন্ধুরা ওদের চিনতে পারে না, অথবা এর সত্যতায় সন্দেহ করে। রিচার্ড স্পেকের এক ভাই না বন্ধু বলেছেন : "হতে পারে না, অবাস্তব : সাজানো কেসে নিরীহ বেচারাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে...।"

সমস্ত মা-বউ-প্রেমিকাদের ডাক দিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ভাল মানুষের মেয়েরা, একটু নজর রেখো গো, স্বামী-পুত্তুর-মনের মানুষের ওপর; যদি দেখ সারা-জীবনের মুখচোরা লোকটা হঠাৎ কইয়ে বলিয়ে হয়ে উঠেছে; মেয়েদের দলে শুনলে পালিয়ে যেত, এমন ল্যালাক্যাপা ছেলে যদি হঠাৎ একদিন হিরো সেজে পাশের বাড়ির জানলায় আড় চোখ শানিয়ে—"Every body has the right to be wrong" গাইতে থাকে...কিংবা বরাবরের চাপা হাবভাব ছেড়ে, হঠাৎ করে আদর-সোহাগের বান ডাকিয়ে দেয়...খামোকা খুশিতে উতলা না হয়ে, তৎক্ষণাৎ মনের ডাক্তার ডেকো। মেন্টাল হস্পিট্যালে ফোন করো...

মেন্টাল হসপিটালের কথায় মনে পড়ে গেল দক্ষিণপূর্ব ওয়াশিংটনের নিকলস্ এভেনিউয়ের ওপর, এলাহী জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড পাঁচিলঘেরা পার্ক, মাঝখানে বিশাল প্রাসাদতুল্য ইমারত—মানসিক চিকিৎসালয়। চলতিবাসে যেতে-আসতে আপনার চোখে পড়বে—পাঁচিলের ওপারে রেলিংয়ে মুখ চেপে দু'-একটি উদাস দৃষ্টি আপনাকে আলগোছে ছুঁয়ে যাচ্ছে; কিংবা দার্শনিক অন্যমনস্কতায় হাতের ছড়ি ঘোরাচ্ছে; কিংবা বেঞ্চিতে বসে অখণ্ড মনোযোগে গাছের পাতাপড়া দেখছে। সেদিন অফিসের পথে গাড়িটা আবার বিকল হয়ে পড়ল, ঠিক ঐ জায়গায়, হস্পিট্যালের সামনে। 'ট্রিপল্' এ'কে ফোন করে এসে বিপন্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছি, দেখি গরাদের ওপাশ থেকে এক সৌম্যমূর্তি ঘনঘন হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছেন। মনে দ্বিধা নিয়েই সামীপ্যে গেলুম। প্রশ্ন হোলো : কী, গাড়ি বিগড়েছে?

আমি বললুম : আজ্ঞে হ্যাঁ—

: কোথাও যাবার তাড়া ছিল?

: আজ্ঞে হ্যাঁ অফিসে বেরিয়েছি।

মূর্তি বললেন—"ঘাবড়োনা, ঠিক পঁউছে যাবে। তোমার তো ভারি ফ্লাট্-টায়ার। গড্ ড্যাম্ ইট আমার ব্যাটারিটাই ডাউন হয়ে গেছে...বাট্, ইউ শুড্ টেক ইট ইজি..."

জীবনদর্শন মন্থন করা মন্তব্য শুনে আমি অনেকক্ষণ 'থ' হয়ে রইলুম। একটা পুরোনো খবরের কাগজ মাথায় চাপিয়ে আমার উপদেষ্টা হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে ভেতরের দিকে মিলিয়ে গেলেন।

শুরু করেছিলুম গোলাপের কথা দিয়ে। সেই কথায় আসি। এদেশের গোলাপরা অত্যন্ত স্বল্পমেয়াদী আয়ুর কন্ট্রাক্ট্ নিয়ে আসে। একটি শুক্লপক্ষের মধ্যে সহস্রেক বসন্তের সমারোহ ফুটিয়ে, পথেঘাটে ডাগর যৌবন ছিটিয়ে ছড়িয়ে, ওরা যখন ঝরে নিঃশেষ হয়ে যায়, হৃতশ্রী গাছগুলোর দিকে তখন তাকাতে মায়া হয়। অথচ তখনো অনেক মধুযামিনী বাকি, চৈত্র প্রৌঢ়ত্বে পা দেয় নি।

অনেক জিনিসই বড় ক্ষণস্থায়ী এখানে। নতুন মডেলের ঝকঝকে গাড়ি, তিন থেকে চার বছরের ভেতরেই রূপ বিকিয়ে, গতি ফুরিয়ে, চাহিদার হাটে দাম হারিয়ে ফেলে। ঘর সংসারের মডেলগুলো অনেক সময়ে [illegible]। বছরখানেক এসেছি। এর [illegible] দুটো পরিবারে ভাঙন ধরলো—এই পাড়ায়। তৃতীয় একটা পরিবারে, [illegible] রক্তারক্তি থামাতে, পুলিশ ডাকতে হয়েছিল আমায়। তা বলে এখানে কি লোকে দশ বছরের পুরনো গাড়ি চড়ে না? বিশ-পঁচিশ বছর, যাবজ্জীবন একসঙ্গে ঘর করে না? খুব করে। সত্যি কথা বলতে কি, পুরনো জিনিসগুলোর গড়নেই একটা গুরুগাত্ত্ব খানদানীয়ানা থাকে, যাতে অযত্নে ধরলেও তুবড়ে যায় না।

এদেশে এখন হেমন্ত নেমে গেছে। গাছ-গাছালির অঙ্গে অঙ্গে অপরাহ্ন-ঋতুর আগুন লেগেছে। পাতারা রোজ রঙ বদলাচ্ছে। ক্যামেরার রঙীন ফিলিমে আর কত ধরে রাখবেন? তাছাড়া বাতাসের দ্বিধা সংকোচ ক্রমেই কেটে যাচ্ছে। অকটোবরের পাতা থেকে তারিখগুলো ঝরে যাওয়ার অপেক্ষা। তারপর তন্বী গাছেদের নিস্তার নেই। হাওয়ার হাতে বেআব্রু হওয়া থেকে রেহাই পাবে না তারা। ...কেবল জব্দ করতে পারবে না—আমার বাসার সামনের লনের এভারগ্রীন দুটোকে। গত বছরের ঐতিহাসিক হিমানী সম্পাতের মাঝখানেও ওদের দেখেছি—মাথায় পুঞ্জীভূত শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপন মেখে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল।

'ফল' এসে গেল। সপ্তাহান্তে পরিচিত-মহলের কাউকেই ফোনে ডাকাডাকি করে পাই না—সবাই ভিড় করেছেন স্কাইলাইন্ ড্রাইভের পথে। সেখানে এখন বর্ণাঢ্য হৈমন্তী উৎসবের শেষ জলসা। সে মেলায় যদি উপস্থিত হতে না পারেন, তবে আপনার 'ফল' বিফলেই গেল। আমি আসছে হপ্তায় যাব ঠিক করেছি। স্কাইলাইন ড্রাইভের পাহাড়ে পাহাড়ে এখন দুরন্ত রঙের আগুন। শুনতে পেলুম সেই আগুনের আভায় নাকি আদিগন্ত ময়ূরকণ্ঠী হয়ে রয়েছে...

ফল এসেছে। সামনের মাঠে ব্যাডমিণ্টন খেলা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। বৈকালিক গুলজারেও সভ্য সংখ্যা সীমিত। চেনা জানা মুখগুলি এখন কচিৎ কখনো চোখে পড়বে। শীতের ক'মাস কারোর সঙ্গে কারো যোগাযোগ থাকবে না। শুধু জানলার পরদা তুললে মাঝে মাঝে পরিচিত গাড়ি-গুলি আর চোখে পড়বে না, তার জায়গায় নতুন গাড়ি দেখব। বাড়িতে আমরা বলাবলি করব—লুইসা-রাও উঠে গেল, বুঝলে?

তারপর আবার স্প্রিং আসবে, গাছগুলোর কচি পাতা গজাবে...সামার আসবে, খালি ফ্ল্যাটগুলোতে আবার কচিগলার কাকলি শোনা যাবে। সদাচেনা পড়শীর সঙ্গে চোখা-চোখি হলে, দু'জনেই হাত তুলে হেসে বলব 'হাই।' মাঠে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী তাঁর অপটু ইংরিজীতে নতুন প্রতিবেশিনীর কাছে ইণ্ডিয়ার বর্ণনা দেবেন...টেলিফোনের নাম্বারও বদলাবে—কারণ, আমার পুরনো বাসার মেয়াদ ফুরিয়ে এলো।

এবার আমরাও বাসা বদলাব।

ধনপতি সদাগর

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার সঙ্কট

প্রদীপ নিয়োগী

পশ্চিম বাংলার শিক্ষাজগতে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় —সর্বত্রই এই অসন্তোষ আজ প্রকট। এর সঙ্গে 'ছাত্র উচ্ছৃংখলা' যুক্ত হওয়ায় সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সমাজ-জীবনের সঙ্গে শিক্ষা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। তাই শিক্ষার সঙ্কট সমাজজীবনের সর্বত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। শিক্ষার এই সংকটের প্রকৃত রূপ ও গভীরতা এবং সম্ভাব্য সমাধানের পথ অনুসন্ধান করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শিক্ষার্থে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছাত্র এবং শিক্ষকের। তারপর প্রয়োজন শিক্ষাকেন্দ্রের, অর্থাৎ শিক্ষাপ্রদান করার মত পরিবেশযুক্ত স্থল (তা বিদ্যালয় হোক বা কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ই হোক) এবং তার নিয়মানুগ পরিচালনা-ব্যবস্থা। গত কয়েক মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির এক বিরাট অংশ নানাবিধ কারণে অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে—ফলে স্বাভাবিক শিক্ষাপ্রদাম ব্যবস্থা আংশিক বা পূর্ণত ব্যাহত হয়। শিক্ষার সংকটের এটা একটা প্রধান লক্ষণ। শিক্ষা-কেন্দ্রগুলি বন্ধ থাকার জন্য, মনে হয়, নিম্নলিখিত কারণগুলি বিশেষ করে দায়ী ঃ—

(১) শিক্ষকদের অসন্তোষ; (২) "অশিক্ষক কর্মচারী" অর্থাৎ পরিচালন-ব্যবস্থাপকদের অসন্তোষ; (৩) ছাত্রদের অসন্তোষ; (৪) রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক অসন্তোষ। কারণগুলির কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রয়োজন। বিগত কয়েক বছর ধরে শিক্ষকরা তাঁদের অভাব-অভিযোগ জানিয়ে আসছেন, যার মধ্যে প্রধান হল ক্রমবর্ধমান পণ্য মূল্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পারিশ্রমিকের বৃদ্ধি। অশিক্ষক কর্মচারীদের একটি প্রধান দাবিও তাই। ছাত্রদের অসন্তোষ যে ঘটনাগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে, তাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শৃংখলার অভাব দেখা যায় বলে সাধারণত একে "ছাত্র উচ্ছৃংখলতা" বলে অভিহিত করা হয়। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে বিগত কয়েক বছরে ছাত্র অসন্তোষ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। (সম্প্রতি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ছাত্র অসন্তোষের কারণ নির্ণয়ের জন্য কমিটি গঠিত হয়েছে। তা থেকে বোঝা যায় ছাত্র অসন্তোষ কি আশঙ্কাজনক আকার ধারণ করেছে)। এই প্রবন্ধে রাজনীতিগত কারণের আলোচনা উদ্দেশ্য নয় বলে তা আলোচনা থেকে বাইরে রাখা হল। শিক্ষা ব্যবস্থার যে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংকটের সৃষ্টি করছে তার প্রতিবিধান করতে হলে সেগুলো সম্বন্ধে সর্বাগ্রে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি বিদেশীদের, চোখে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে দেখার একটা সুযোগ, এসেছে। 'Project India Scheme'-এ কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ছাত্র ভারতবর্ষে এসে দু' মাস কাটিয়ে গেলেন। তাঁরা এই সময়ে ভারতীয় ছাত্রদের সান্নিধ্যে এসেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে ছাত্র হিসেবে ক্লাসে যোগ দিয়ে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। এই দু' মাসে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের যে অভিজ্ঞতা জন্মেছে তা থেকে তাঁরা মনে করেন (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৬)ঃ—

"…. The Indian educational system is totally out of tune with the needs of the country. The students who are here under the "project India" scheme of the university of California visited various educational institutions in the country. According to them the Indian educational system does not encourage initiative on the capacity for independent thinking in the students. Examinations merely reply on students' capacity to cram notes. When students get out of college portals they find that their academic knowledge has no bearing on the problem they encounter. Nor are they trained to think independently to face new situations."

অপ্রিয় হলেও মন্তব্যগুলির যৌক্তিকতা বিচার করে দেখা দরকার। ইংরেজ রাজত্বকালে আমাদের যে শিক্ষা দেওয়া হত তা প্রধানত কেরানী বা সিভিলিয়ান তৈরির শিক্ষা। সে শিক্ষায় যে আমাদের জাতীয়জীবনের প্রয়োজন মিটত না, তা আমাদের দেশের মনীষীরা অনেককাল আগেই উপলব্ধি করেছেন। সে প্রয়োজন মেটাতে, আজ থেকে ৬০ বছর আগে কলকাতায় গড়ে ওঠে "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ" এবং "বেঙ্গল টেকনিকাল ইনসটিটিউট "—যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বীজ যার মধ্যে অঙ্কুরিত ছিল। অনুরূপ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যার বর্তমান রূপ বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়। সেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বা বিশ্বভারতীর কৃতী ছাত্ররা যখন শিক্ষা সমাপ্তির পরে লব্ধ জ্ঞান সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পান না বা কর্মহীন থাকেন, তখন মনে প্রশ্ন জাগা কি স্বাভাবিক নয় যে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সুর মেলাতে পারছে না? ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, পরীক্ষা পাসের জন্য নোট মুখস্থ করা প্রয়োজন। নোট বহির্ভূত বা চিরাচরিত প্রশ্নের বাইরে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে ছাত্ররা প্রতিবাদস্বরূপ পরীক্ষাকক্ষ

পরিত্যাগ করেন। নিজে চিন্তা করে প্রশ্নের উত্তর ভাবা বা অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন সমস্যার সমাধান করা অধিকাংশ ছাত্রেরই অভ্যাস বহির্ভূত। পরীক্ষাকক্ষে চিন্তা করে কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, এটা প্রায় সবাই স্বতঃসিদ্ধরূপে মেনে নিয়েছেন। আর পরীক্ষার ফলাফল থেকে ছাত্রের গুণগত মান সম্বন্ধে ঠিক করে কিছু বলা যায় না, বা অধিগত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের অধিকার কিরূপ তাও অনিশ্চিত থেকে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রীগুলি তাই ছাত্রদের মেধাগত মান বা স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতার নির্দেশক না হয়ে কর্মসাধনে অনাবশ্যক একটা কৃত্রিম মানের পরিচায়ক হয়।* যে কৃত্রিমতার মধ্যে আমাদের ছাত্রজীবনের শেষ হয়, সারাজীবন আমরা সেই কৃত্রিমতার বোঝা বয়ে বেড়াই।

এটা বর্তমান শিক্ষা সংকটের আর একটি লক্ষণ।

বিগত কুড়ি বছরে উপর্যুক্ত পীড়াদায়ক পরিস্থিতির সম্যকরূপে সম্মুখীন হওয়ার বা এর প্রতিবিধান করার প্রায় কোন চেষ্টাই হয় নি, যদিও অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উপাদানগুলি বাদ দিলে, ছাত্র অসন্তোষের অন্যতম উপাদানগুলি এর মধ্যে নিহিত আছে। বলা প্রয়োজন, সংশ্লিষ্ট কতকগুলি বিষয়ে দেশের শিক্ষাবিদ্রা সচেতন, যদিও তা এ পর্যন্ত কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নি। যেমন—(১) উচ্চশিক্ষায় ছাত্রদের বাছাই করে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া; (২) শিক্ষাসমাপ্তির পরে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা; (৩) ব্যাপক টিউটোরিয়াল ব্যবস্থার প্রবর্তন; (৪) পরীক্ষা-গ্রহণ পদ্ধতির কিছু পরিবর্তনও অনুমোদিত হয়েছে—যথা, যে কলেজে ছাত্র শিক্ষালাভ করেছে, সেই কলেজই ফাইন্যাল পরীক্ষার কেন্দ্ররূপে নির্দিষ্ট করা এবং যে শিক্ষকদের কাছে ছাত্ররা পড়েছেন তাঁদের "ইনভিজিলেটর" রূপে নিয়োগ করা। অনেক শিক্ষাবিদ্ আরও মনে করেন : (১) শিক্ষা প্রদান করতে গিয়ে ছাত্রদের শেখাতে চেষ্টা না করে শিখতে উৎসাহ দেওয়া, অর্থাৎ স্বকীয় উদ্যম ও প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন; (২) পরীক্ষাকক্ষে "ইনভিজিলেটর" রেখে ছাত্রদের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সাধু নাগরিক তৈরি করা সম্ভব নয়। কেবল বিশ্বাস করেই তাদের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাভাজন হওয়া সম্ভব।

আমাদের দেশের তুলনায় পশ্চিমী দেশগুলিতে উপর্যুক্ত সমস্যাদি নেই বললেই চলে। সেখানকার পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পরীক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির তুলনা করলে মোটামুটি ধারণা করা যাবে, ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি কোথায় এবং কি উপায়ে দূর করা যেতে পারে। দুটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা একটু হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা যাক। (ক) আমেরিকায় স্নাতকোত্তর ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি অধ্যাপকের (ও ছাত্রের) ইচ্ছানুযায়ী মোটামুটি তিন রকমের : (১) অধীত বিষয়ে ছাত্রকে একটি "সার্ভে" জাতীয় প্রবন্ধ লিখতে হয়—প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর উপর এ পর্যন্ত যা কাজ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা করা সম্ভব বলে ছাত্র মনে করে, তা লিখতে হয়। (২) "টেক হোম" পদ্ধতি—অর্থাৎ, অধ্যাপক ছাত্রকে কতিপয় প্রশ্ন দিয়ে থাকেন; একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (এক বা দুই সপ্তাহ) প্রশ্নগুলির সমাধান লিখে জমা দিতে হয়। অধীত বিষয়ে সাম্প্রতিক কালে যে সকল গবেষণামূলক কাজকর্ম বিভিন্ন 'জার্নালে' প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে সাধারণত প্রশ্নগুলির উত্তর পাওয়া যায়। (৩) মৌখিক পরীক্ষা অধীত বিষয়ে (পেপার প্রতি) ঘণ্টাখানেক মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা। বলা দরকার, উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলি শুধু স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ থাকে না এবং এতদ্ব্যতীত সেখানে লিখিত পরীক্ষাও চালু আছে। (খ) পশ্চিম জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি মৌখিক এবং লিখিত দুই রকমেরই—তবে শেষ পরীক্ষাগুলির প্রায় সবই মৌখিক। লিখিত প্রশ্নের উত্তরগুলি যত ভাল হোক না কেন, সাধারণত প্রথম শ্রেণীর 'নোট' (নম্বর) পাওয়া যায় না; প্রথম শ্রেণীর 'নোটের' জন্য লিখিত উত্তরের পর একটি মৌখিক পরীক্ষা দেওয়া আবশ্যক এবং অধীত সমগ্র অংশে ছাত্রের অধিকারের উপর নির্ভরশীল। লব্ধ নির্ধার অর্থাৎ assesment সম্বন্ধে ছাত্রের আপত্তি থাকলে অবিলম্বে আর একটি মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

আনন্দের কথা, ভারতবর্ষে এই জাতীয় পরীক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে বাঙ্গালোরের 'Indian Institute of Science'-এ ইতিমধ্যেই সুফল পাওয়া গেছে। সেখানে কোন বিষয়েই বাইরের পরীক্ষক (External Examiner) নিয়োগ করার নীতি নেই। যে অধ্যাপকের কাছে ছাত্র পাঠ গ্রহণ করেছে, তিনিই যে ছাত্রের মেধাগত মান নির্ণয়ে সক্ষমতম, তা সেখানে স্বীকৃত। স্নাতকোত্তর ছাত্রদের, লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা ছাড়াও সেখানে বিভিন্ন সেমিনার এবং আলোচনা চক্রে যোগ দিতে উৎসাহিত করা হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষাখাতে ব্যয় ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে গত দশ বছরে এই

* ফলস্বরূপ :—(১) বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ লাভের জন্য গণিত বা পদার্থবিদ্যা বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা ছাত্রদের দ্বিতীয়বার দিতে হয়। বিভিন্ন স্তরে আমাদের দেশে জাতীয় শক্তির যে অপচয় ঘটছে এটা তারই প্রতিফলন মাত্র।

(২) অধ্যাপক বা শিক্ষকপদপ্রার্থীদের প্রায়ই এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, যা আবশ্যিক যোগ্যতার জন্য প্রয়োজনীয় পাঠক্রমের অন্তর্গত। এর দ্বারা যে ডিগ্রী প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবমাননা হয়, সে বিষয়ে সবাই সচেতন নন।

বায় আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতালাভের পর যেখানে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা খাতে আড়াই কোটি টাকা ব্যয় হত, এখন তা বৃদ্ধি পেয়ে চল্লিশ কোটিতে পরিণত হয়েছে—অর্থাৎ প্রায় ষোল গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা-ক্ষেত্রের বর্তমান ব্যাপক অর্থনৈতিক অসন্তোষ একটু বিস্ময়কর মনে হয়। এই বিস্ময়কর পরিস্থিতি বর্তমান শিক্ষা সঙ্কটের আর একটি লক্ষণ। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের একটা বৃহত্তর অংশ নিয়োগ করা হবে। কিন্তু বর্তমান সঙ্কটের মূল উপাদানগুলি দূর করতে না পারলে তাতে কোন সুফল আশা করা যায় না।

গত প্রায় কুড়ি বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে (পশ্চিমবঙ্গে) উন্নতির নিদর্শন স্বরূপ যে তথ্যগুলি পরিবেশন করা যেতে পারে তা মোটামুটি নিম্নরূপ : (১) গত কুড়ি বছরে কলেজের সংখ্যা ৬০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭২ হয়েছে; (২) বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এক থেকে বেড়ে সাত হয়েছে; (৩) ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সংখ্যা দুই থেকে বেড়ে ছয় হয়েছে; (৪) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবর্তন ও স্থাপন; (৫) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা-বৃদ্ধি—গড়ে প্রত্যেক গ্রামের এক বর্গমাইলের মধ্যে একটি পাঠশালা স্থাপন; (৬) শিক্ষকদের বেতন-হারের উর্ধ্বতর সংশোধন।

এই কৃতিত্ব আত্মপ্রসাদ লাভ করার ইচ্ছা জাগাতে পারে, কিন্তু তাহলে শুধু সঙ্কট বাড়িয়েই তোলা হবে। শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে উপর্যুক্ত পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে— অর্থব্যয়ও হয়েছে বিপুল। মনে রাখা প্রয়োজন, উচ্চতর শিক্ষা অর্থাৎ কলেজী শিক্ষা এবং বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য ছাত্র-প্রতি বছরে প্রভূত অর্থ সরকারকে ব্যয় করতে হয়। যেমন, মাথাপিছু গড়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রের জন্য বছরে ব্যয় হয় তিন হাজার টাকা। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের জন্য মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ এর চেয়ে বেশী। (প্রাইভেট কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যয় তুলনায় কম হয়ে থাকে)। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর যদি কোন ব্যক্তি এমন কোন কর্মে নিযুক্ত হন যেখানে তাঁর লব্ধ জ্ঞানের কোন প্রয়োগ নেই বা প্রয়োজন নেই, তা হলে ধরে নেওয়া যায়, তিনি জাতীয় অর্থের ন্যূনপক্ষে পনেরো হাজার টাকা অপব্যয় করেছেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, শিক্ষাক্ষেত্রে আজ পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতবর্ষে জাতীয় অর্থের অপরিমিত অপচয় ঘটছে। বাস্তবে অপ্রতুল নয় এমন দু একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা একটু বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। (১) ধরা যাক, কোন ব্যক্তি গণিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর এম এস-সি ডিগ্রী লাভ করলেন। কর্মসংস্থানের অভাবে তিনি ঔষধ উৎপাদনকারী কোন ফার্মের সেলস্-রিপ্রেজেন্‌টেটিভ নিযুক্ত হলেন। গণিত শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি তার কর্ম-সাধনে কোন কাজেই লাগল না; অথচ তাঁর দু' বছর সময় ও শক্তি এবং জাতীয় অর্থের থেকে কয়েক হাজার টাকা এতে অপচয় হল। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, যে দু' বছর তিনি গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময় ও শক্তি বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণে নিয়োগ করলে তিনি কর্মে অধিকতর ব্যুৎপত্তি ও পটুতা দেখাতে পারতেন। (২) পদার্থবিদ্যায় প্রথম শ্রেণীতে এম এস সি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হবার পর কোন ব্যক্তি I.A.S. হলেন। পদার্থবিদ্যায় তাঁর ব্যুৎপত্তির সবটাই বৃথা গেল, আর সেই সঙ্গে ব্যর্থ হল জাতীয় অর্থের এবং শক্তির একটা বিশিষ্ট অংশ, জাতি তৈরীর ক্ষেত্রে যার পরিমাণ নগণ্য নয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পরিস্থিতি 'আরও সঙ্গিন আকার ধারণ করে, তথাকথিত "ব্রেন ড্রেনের" ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যখন এ-দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক বা ইঞ্জিনিয়ার অথবা অনুরূপ ব্যক্তিরা বিদেশে চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করা শুরু করেন। উক্ত ব্যক্তিদের শিক্ষার জন্য দেশ যে প্রভূত অর্থব্যয় করে, তার ফললাভ করে অপর একটি দেশ। ভারতবর্ষে ব্রেনড্রেন আপাতত ডাক্তার এবং বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 'আছে—তবে প্রতিকারের ব্যবস্থা না হলে শীঘ্রই ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

কিছুকাল আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, আমাদের দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে এবং প্রতি বছর তৈরী হচ্ছে। শিল্পোন্নত দেশের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, আমাদের দেশে যে-কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে (বিশেষ করে সরকারী প্রতিষ্ঠানে) দক্ষ শ্রমিক ও ডিপ্লোমাধারীদের তুলনায় ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা অনেক বেশী। বিশেষত, যে কাজ কোন ডিপ্লোমাধারী বা অন্য কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদ্বারা সুষ্ঠুতর উপায়ে সম্পন্ন হতে পারত, সেখানে হয়ত কোন ডিগ্রীধারী ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত আছেন; যদিও এর ফলে কর্মপটুতা (efficiency) কমে এবং শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনমূল্য প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। * এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য-বিষয় আরও গুরুত্ব লাভ করে। এই সঙ্গে আরও কতকগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

শিল্পোন্নত দেশে ডিগ্রীধারী ইঞ্জিনিয়াররা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে বহুলাংশেই গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কাজে নিযুক্ত থাকেন। গবেষণার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই উৎপন্নদ্রব্যের মান উন্নত হয় এবং মূল্য হ্রাস পায়। কর্মের যন্ত্রাভ্যাস অর্থাৎ "Rationalization of work" সম্বন্ধেও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সচেতন নয়। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি গবেষণা বা উন্নয়নমূলক কার্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন না। ফলে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনমূল্য গগনচুম্বী আকার ধারণ করে। শ্রমিকেরা বিদেশের তুলনায় নগণ্য পারিশ্রমিকে কাজ করে এবং তৎসত্ত্বেও বিশ্বের বাজারে আমাদের উৎপন্নদ্রব্য নিজস্ব স্থান করে নিতে পারে না বা পারছে না। বলা বাহুল্য, শ্রমিক

---

*কেন্দ্রীয় Scientist's pool-এর অনেক বৈজ্ঞানিক অভিযোগ করেছেন, তাঁদের এমন সব কার্যে নিয়োগ করা হয়েছে, যে কাজের জন্য তাঁদের প্রয়োজন নেই।

অসন্তোষ বৃদ্ধি পেলে শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

শিল্পোন্নত দেশগুলিতে শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান তা এখানে আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, পশ্চিম জর্মানীর কোন কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে ছাত্রকে আগে বিষয়সূচী-সম্পৃক্ত কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ছয় মাসের শিক্ষানবিসি করে থাকতে হয়। কোন কোন বিষয়ে এতদুপরি ভর্তি হওয়ার পর ছুটিতে সবসুদ্ধ মাস ছয়েক কাল শিক্ষানবিসি থাকতে হয়। অধ্যাপকদের অনেকেই যে বিষয়ে শিক্ষা-প্রদান করেন তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সক্রিয় গবেষণায় নিযুক্ত থাকেন এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা থাকেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ দিনের কাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও তাঁদের থাকে। ছাত্রাবস্থায় হাতে-কলমে কাজ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের বিশেষ সুযোগ আমাদের ছাত্রদের ঘটে ওঠে না—কিভাবে পরীক্ষায় ভাল ফল করা যায়, সে উপায় উদ্ভাবনে তাদের ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্ররা যে শিক্ষালাভ করে, কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনে তা খুব একটা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। কোনও ফলিত বিষয়ে শিক্ষা যদি কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনে প্রয়োগ করা না যায়, তবে তা জাতীয় অর্থের অপচয় বলেই ধরে নিতে হবে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় কি ব্যাপক। পশ্চিম-বঙ্গে শিক্ষার এমন একটিও ক্ষেত্র নেই, যা এই অপচয়ের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। শিক্ষাধিকারিক শিক্ষকদের বারংবার বলেছেন সরকারের আর্থিক সামর্থ্যের কথা। সেই সঙ্গে তাঁরা এই ভেবে খুশী হয়েছেন যে, গত কয়েক বছরে চার-পাঁচ বার শিক্ষকদের বেতন-হার ঊর্ধ্বতর সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমানের আর্থিক অসামর্থ্য যে গত কুড়ি বছরের ভ্রান্ত শিক্ষা নীতিরই ফল সে সম্বন্ধে কিন্তু শিক্ষার ভাগ্যনিয়ন্তারা নীরব। শিক্ষা-ক্ষেত্রের বিপুল ও ব্যাপক অপচয় নিরোধ করতে না পারলে যে ভবিষ্যতে কখনও উপযুক্ত আর্থিক সামর্থ্য অর্জন করা সম্ভব নয় তা উপলব্ধি করা অত্যাবশ্যক। শিক্ষা-মানের উন্নতি আশু প্রয়োজন, এ বিষয়ে শিক্ষা কমিশন এবং শিক্ষাবিদ্‌রা সকলেই সচেতন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা দৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে উচ্চতর শিক্ষার মানের উন্নতি সম্ভব নয়, এ কথা সর্ব-সর্বাদিসম্মত। শিক্ষকদের বর্তমান অসন্তোষ অব্যাহত রেখে শিক্ষার মানের উন্নতির আলোচনাও পণ্ডশ্রম মাত্র। গত কুড়ি বছরের পুঞ্জীভূত অপচয়ের মধ্য দিয়েই শিক্ষক অসন্তোষের সমাধানের পথ খুঁজতে হবে। সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া গেলে শিক্ষা সংকটের একটি মূল উপাদান দূরীভূত হবে।

এখন আমাদের আত্মসমীক্ষার সময় এসেছে। তাই প্রশ্ন জাগে, দেশের সত্তর শতাংশেরও বেশি লোক যেখানে নিরক্ষর—জ্ঞানের আলোকরেখা থেকে বঞ্চিত, সেখানে এতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কলেজ স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট অপচয় খেয়ালী শিক্ষাবিধির বিলাসিতা মাত্র নয় কি? যে শিক্ষানীতি দেশের বৃহত্তর অংশকে অবহেলিত রাখে, তাকে সুস্থ শিক্ষানীতি আখ্যা দেওয়া যায় না। তাই বৃহত্তর সংকটের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই আমাদের সুস্থতর শিক্ষানীতি অবলম্বনের সময় এসেছে।
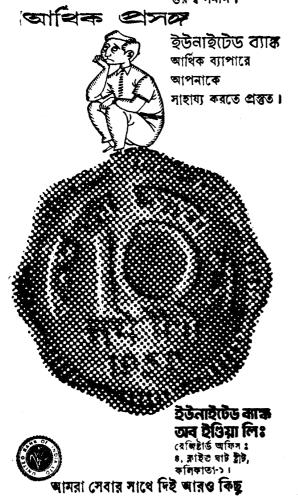
রাজ্য সরকারের মূষিক-প্রকল্পের ডাইরেক্টর ভাষণ দিচ্ছিলেন—ইঁদুরে কি নেই? ভিটামিন এ-টু-জেড্ সব পাবেন। একজন জাপানী বৈজ্ঞানিকও সেদিন রায় দিয়েছেন, ইঁদুর খাওয়া যায়, খাওয়া উচিত। ছাগল মুরগী মাছ সবকিছুই ক্রমে দুর্লভ হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় ইঁদুরেই আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিন যোগাতে পারে। পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে, এই রাজ্যে ইঁদুরের সংখ্যা পাঁচ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ নশো বাইশ। তার থেকে শিশু ও স্ত্রী বাদ দিলে নীট তিন কোটি বাইশ লক্ষ চারশো পঞ্চাশটি ভোগ্য ইঁদুর অবশিষ্ট থাকে। আপনাদের প্রধান কর্তব্য, একদিকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ইঁদুর ধরার ব্যবস্থা করা, অন্যদিকে ইঁদুর মাংস জনপ্রিয় করার জন্য ঘরে ঘরে আন্দোলন চালানো। রসনার ক্ষেত্রে সেই মহান বিপ্লবের হোতা হতে হবে আপনাদের!

উপস্থিত বি ডি ও-বৃন্দ একযোগে করতালি দ্বারা অভিনন্দিত করলেন, বক্তাকে। তারপর নিজ নিজ জীপযোগে ফিরে গেলেন স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে।

বি ডি ও-দের নির্দেশে গ্রামসেবক-সেবিকারা পাড়ায় পাড়ায় খবরটি ছড়িয়ে দিলেন। ইঁদুর ধরামাত্রই যেন নিকটবর্তী থানা বা গ্রামসেবক-কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়। প্রতি ইঁদুরের জন্য সরকার দশ পয়সা দক্ষিণা দেবেন।

গ্রামের চাষীকন্যারা অনেকদিন থেকে বেকার। ধানভানা বন্ধ। মুড়ি ভাজা ও চাল ভাজার পাটও চুকে গেছে বহুকাল। অতএব ইঁদুর ধরার কাজে উৎসাহের অভাব হল না। বিপুল উদ্যমে তারা অভিযান শুরু করল। সপ্তাহ পার হবার আগেই শত শত ইঁদুর জমা পড়তে লাগল। দুজন সরকারী কর্মচারী একজন পশু-চিকিৎসক সহ সযত্নে ইঁদুরগুলি সংগ্রহ করে জেলার সদর পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন।

এযাবৎ সবকিছু প্রোগ্রামমাফিক এগিয়ে চলেছিল। এবার বাধা এল রেলওয়ে থেকে। গরু মহিষ বহনের জন্য তাঁরা ওয়াগন দিতে পারেন। বাঘ হাতি গণ্ডার বহনেও তাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু ইঁদুর বহন সম্ভব নয়। ফলং মড়কম্। বহু ব্যয়ে সংগৃহীত ইঁদুরের পাল জেলার সদরে অনাহারে মরতে লাগল। দু একটি খলস্বভাব ইঁদুর দাঁড় কেটে খাঁচার বাইরে এসে অফিসের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ল।

মাসান্তে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছ থেকে এল কড়া নোট। বি-ডি-ওরা পাঠালেন এক বিল। ইঁদুর ধরার খরচ, তাঁদের অফিসের কর্মচারীদের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ বাবদ ব্যয়, পশু চিকিৎসকসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা অফিসারদের গ্রামাঞ্চলে অবস্থান বাবদ রাহা খরচ, মরা ইঁদুরদের সৎকার বাবদ ডোমদের মজুরী এবং অর্গলমুক্ত জ্যান্ত ইঁদুর দ্বারা অফিসের আসবাবপত্রের যে ক্ষতি হয়েছে সেটা পূরণ বাবদ, সব মিলিয়ে মোটা অঙ্কের দাবি। ফিনান্স দপ্তর মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। শতকরা নব্বইটি ইঁদুর মারা গেছে। প্রতিটি জ্যান্ত ইঁদুর যার কোনটি থেকেই একশো গ্রামের বেশী মাংস পাবার

সারমেয়কুলের আক্রমণে

উপায় নেই তার দাম পড়েছে দু টাকা অর্থাৎ এক কিলো মাংসের দাম কুড়ি টাকা। অতঃপর ফিনান্সের হুঙ্কার এবং বলা বাহুল্য এমন মহৎ উদ্যোগের প্রথম পর্বের সমাপ্তি।

মূষিক প্রকল্পের দ্বিতীয় প্রস্তাব এল জনৈক প্রবীণ আই-সি-এসের কাছ থেকে। অবসর গ্রহণের পর দেশসেবার প্রবল প্রেরণা বোধ করছিলেন কিছুদিন থেকে। মগজে আইডিয়া খেলতেই ইউরেকা বলে লাফ দিয়ে প্রবেশ করলেন মহাকরণে। ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইসর অব দি ডাইরেক্টর অব রোডেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট অ্যাণ্ড প্রোকিওরমেণ্ট পদ সৃষ্টি করে বসানো হল তাঁকে। তাঁর নূতন প্রস্তাবের সারাৎসার হল এইরকম—মানুষের চেয়ে বিড়াল ইঁদুর ধরায় অধিক পটু। সরকারী কর্মচারীদের রাহা খরচ দিতে হয়, বিড়াল নিজের খাদ্য নিজেই সংগ্রহ করে নেয়। সরকারী কর্মচারীদের ইউনিয়ন গঠনের সম্ভাবনা আছে, বিড়ালের কাছ থেকে সরকার বিরোধী কার্যকলাপের কোন আশঙ্কা নেই। অতএব প্রতি বি-ডি-ও অফিসে কিছু বিড়াল পাঠিয়ে দিলেই ইঁদুর ধরার পথ সুগম হবে। সমস্যা এই, দেশী বিড়াল মনুষ্যসঙ্গ
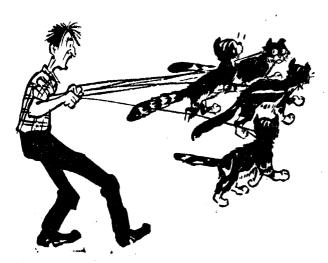
গ্রামসেবক চলেছেন ইঁদুরের সন্ধানে

দোষে পরিশ্রমবিমুখ। অতএব কাবুল থেকে ভাল শিকারী বিড়াল আমদানী করা হোক। এর ফলে ভারত-আফগান মৈত্রী দৃঢ়তর হবে। শ্যামদেশ থেকেও বিড়াল আমদানী করা যেতে পারে। উভয় দেশেই ভারতীয় মুদ্রায় মূল্য শোধ করা যেতে পারে। তদুপরি এশীয় সংহতির পথ এতে প্রশস্ততর হবে।

বিড়াল সত্যিই এল। প্রবীণ আই-সি-এসের সতর্ক তত্ত্বাবধানে অল্পক্ষণেই তাদের পাঠানো হল বিভিন্ন বি-ডি-ও দপ্তরে। গ্রামসেবকের দল তাদের অগ্রণী করে মূষিক-সন্ধানে বের হলেন। তিন সপ্তাহ আতঙ্কগ্রস্ত। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে বি-ডি-ওরা রিপোর্ট দিলেন—পল্লীর দুর্বিনীত সারমেয়কুলের আক্রমণে অধিকাংশ বিড়াল নিখোঁজ। অবশিষ্ট সামান্য কয়েকটি দেশী বিড়ালের সহযোগিতায় ইঁদুরের পরিবর্তে মাছ ও দুধের বাটিতে মনোযোগী হইয়াছে। পল্লীর গৃহিণীরা তাহাদিগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ।

অর্থাৎ মূষিক-প্রকল্পরূপ পর্বত শেষ পর্যন্ত মূষিক প্রসব করতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই প্রকল্প বাবদ যে কয়েক লক্ষ টাকার অপচয় হলো তার জন্য বিধানসভায়

আমিও খাব

বামপন্থীদের কাছে জবাবদিহি আছে। পাব্লিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটির নিন্দার আশঙ্কা আছে। উদ্ধারের জন্য বিপদ-ত্রাতা মধুসূদন প্রচার দপ্তরের ডাক পড়ল।

ডিরেক্টরের করুণ চাহনি ও মূষিক-মন্ত্রীর বিরস বদনের দিকে চেয়ে সহানুভূতিতে বিগলিত হলেন প্রচারবিদেরা। সংবাদপত্র পাঠে জানা গেল আই-সি-এস উপদেষ্টা বিপদ বুঝে ছুটি কাটাতে স্পেনে রওনা হয়েছেন।

ঢাক ঢোল কাঁধে প্রচারবিদেরা আসরে অবতীর্ণ হলেন। লক্ষ লক্ষ ব্রোসিও ফোল্ডার পোস্টার শো-কার্ড হ্যান্ডবিল ছাপা হল। রাজধানীর প্রধান সংবাদপত্রাদিতে ইঁদুর মাংসের অসাধারণ জনপ্রিয়তার সংবাদ ছাপা হল। বেতারে বেতারে ইঁদুর-মাংসের ঘণ্ট বড়ি ও আদার কুচিসহ চচ্চড়ি, পোস্ত পেঁয়াজ বাটাসহ ইঁদুরের ঝালবড়া, ইঁদুরের ব্রেইজড কাটলেট ইত্যাদি বহু অভিনব রন্ধনপদ্ধতি মধুর কণ্ঠে প্রচার করলেন জনৈকা দ্রৌপদী। বিভিন্ন চিত্রগৃহে ফিল্ম ডিভিসনের তোলা ডকুমেন্টারীতে দেখা গেল জনৈক প্রবীণমন্ত্রী ইঁদুর খাচ্ছেন। মহানগরীর সবচেয়ে অভিজাত হোটেলে অনুষ্ঠিত ফ্যাসান-প্যারেডে বাছাই করা সুন্দরীরা হাজির হলেন। ইম্প্রেসারিও তাঁদের দিকে আঙুল দেখিয়ে ঘোষণা করলেন, ইঁদুর মাংসের কল্যাণেই এরকম স্লিম হওয়া সম্ভব। আর এক শ্রীমতী মঞ্চে উঠে মধুর হেসে বললেন—আমার রূপের গোপন কথাটি হল নিয়মিত ইঁদুর মাংস সেবন। সকালে স্টু, বিকেলে ব্রথ, রাত্রে কারী। এতে মাথা ধরে না, গা ম্যাজম্যাজ করে না, আশ্চর্য সঞ্জীবনী শক্তি এর। বেতারের বিবিধ-ভারতীর অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে "মেরি জান্ চুহা চুহা, কাঁহা গেরি রে" গানটি বাজিয়ে ইঁদুরতত্ত্ব হৃদয়ের একেবারে গভীরে পৌঁছে দেওয়া হল।

সংবাদপত্র, সিনেমা, বেতার, টেলিভিসনের দামামা যখন বিপুল নির্ঘোষে বেজে চলেছে, যে অবস্থাকে ক্লাইম্যাক্স বলা হয় ঠিক সেই অবস্থায় প্রচার সচিবের নির্দেশে খাদ্যমন্ত্রী তাঁর গাণ্ডীবে টঙ্কার দিলেন। একটি বিবৃতি। তাতে জানা গেল, ইঁদুরের মাংস অসাধারণ জনপ্রিয় হওয়ার ফলে দেশে ইঁদুর দুর্লভ হয়ে পড়েছে। এদিকে ইঁদুর-মাংস নিত্য-আহার্যে পরিণত হওয়ায় খাদ্য-দপ্তর উৎকণ্ঠিত। কারণ যা স্টক আছে তাতে বড় জোর ছ'মাস চলবে। তারপর আর ইঁদুর পাওয়া যাবে না। ইঁদুর মাংসে ভিটামিনের প্রাচুর্য তদুপরি মুখরোচক হওয়ায় এখন আর জনসাধারণ ছাগমাংস খেতে রাজী হবে না। এদেশে ফুড হ্যাবিট বদলানো বড় শক্ত। তাছাড়া এদেশের মানুষ গুজবে বড় কাণ দেয়। সত্যাসত্য পরীক্ষা করে দেখে না। কে যে একবার রটিয়েছিল ছাগমাংস খেলে ডিসপেপশিয়া এবং হাঁপানী হয়, সেই গুজবেই সবাই বিশ্বাস করে বসে আছে। কেউ আর এখন সহজে ছাগমাংস খেতে রাজী হবে না। আর এই বক রাক্ষসদের জন্য লক্ষ লক্ষ ইঁদুর পাওয়া যাবে কোথায়!

মূষিক প্রকল্পের তৃতীয় প্রস্তাব এল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। রাজ্যের খাদ্য-মন্ত্রী আসন্ন মূষিক সঙ্কটের কথা উল্লেখ করে যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা মার্কিন কাগজেও ফলাও করে ছাপা হয়েছে। মার্কিন সেনেটে সে-দেশের কৃষি-সেক্রেটারী ঘোষণা করলেন যে, তাঁদের মিত্ররাষ্ট্রে ইঁদুর-সংকটের কথায় তাঁরাও চিন্তিত। এই বৎসরেই তাঁরা পি এল ৪৮০ অনুসারে গমের পরিবর্তে জাহাজ বোঝাই ইঁদুর পাঠাবেন। মস্কো থেকেও শোনা গেল একই সহানুভূতি—সাইবেরিয়ার অরণ্যে যত ইঁদুর আছে মহান সোভিয়েত জনগণ সেগুলি তাঁদের অন্তরের শুভেচ্ছা হিসাবে ভারতীয় জনগণকে উপহার দেবেন। এর জন্য তাঁরা কোন মূল্য গ্রহণ করবেন না। সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী দীর্ঘজীবী হোক।

আমার রূপের গোপন কথাটি হল ইঁদুর। আমি রোজ ইঁদুর খাই

খাদ্যমন্ত্রী প্রমাদ গনলেন। এখন উপায়? দেশী ইঁদুর সামলানো যায় না, এখন লক্ষ লক্ষ ইঁদুর যে আসতে শুরু করেছে জাহাজযোগে তাদের গতি হবে কি করে? কি করি এদের নিয়ে? প্রচার সচিব মুচকি হাসলেন, ভাববেন না স্যার, আমাদের মহাকরণে ফাইলের অভাব নেই। অসংখ্য ফাইল জমে আছে, জমে উঠছে, জমে উঠবে। তাদের এবার একটা হিল্লে হবে। লাল ফিতের কথা তুলে কেউ আর দোষ দিতে পারবে না। এবার চলুন স্যার ইতালীতে ছুটি কাটাতে।

ত্রিলোচন কলমচি

ব্ল্যাক গ্রাউণ্ড

লাইট হাউসে (Lamp Cabin) বাত্তিবাবু বসে ছিলেন শ্মশানের ঘাটবাবুর মত, দিনরাত্তিরের জমাখরচ তাঁর মোটা বাঁধানো খাতায়। চার্জ হ্যাঙগার থেকে ব্যাটারি বাঁধা ক্যাপল্যাম্প নিয়ে যাচ্ছে খাদ শ্রমিকের দল, তিনি সিরিয়াল নম্বর দিয়ে লিখে রাখছেন নাম বরাবর। এরকম সাড়ে বারো শ বাতি আছে তাঁর হেপাজতে। টিমটিমে সেফ্‌টি ল্যাম্পের বদলে টর্চের মত উজ্জ্বল এই ইলেক্‌ট্রিক ক্যাপল্যাম্পগুলি হালের আমদানি। বিলিতী আলোর বদলে স্বদেশী জিনিস। দাম এক একটার এক শো টাকা।

আমাকে ভালো দেখে একটা বাতি বেছে দিতে দিতে বললেন, 'অনেকেই আজকাল খনি দেখতে আসেন। খবরের কাগজের রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার, লেখক মানুষ, আবার ভ্রাম্যমাণ বাবুলোক। তা আপনি কি মনে করে?'

কথাটা কানে যায় নি এমন ভাব দেখিয়ে বললাম, 'খনিটা বেশ পুরনো মনে হচ্ছে, বয়স কত হবে?'

'আমাদের এই একাম্নপিটের কথা বলছেন?' আমার হাঁ দেখে বাত্তিবাবু নিজেই আবার ব্যাখ্যা করে বললেন, 'এটার বয়স একান্ন বছর হয়েছে কিনা! তা ছাড়া এই পিট্‌ খাদটি আবার যমজ, এর সহোদরা আছে আধ মাইলটাক দূরে, মুখ আলাদা কিন্তু পেটে পেটে এক। এ মুখ দিয়ে ঢুকে ও মুখ দিয়ে বেরোনো যায়! তাই বলছিলাম—'

কলিয়ারীর বয়স শুনে চমকাইনি, তবে এই রসিক ভদ্রলোকের বয়ান শুনে চমকেছিলাম। বুঝে নিলাম এই লোকই আমার আসল লোক, একে ট্যাপ্‌ করলে অনেক গুপ্ত কথা বেরোবে। সুতরাং তখন তখন আর না ঘাঁটিয়ে অফিসার্স রিটায়ারিং রুমের দিকে এগোলাম। চতুর্দিকে সাফ-সাফাই চলেছে, দেওয়ালে দেওয়ালে হলুদ রঙের পোঁচড় বোলানো হয়েছে। বেশ একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেছে মনে হল।

বাত্তিবাবু আমার ল্যাজে পড়ে গেছেন মনে হল, সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েক পদ এলেন, 'হে হে', এ স্যার সবে গায়েহলুদ হচ্ছে, আসল বিয়েটাও দেখে যাবেন দয়া করে। সেফ্‌টি উইক না দেখলে আর কি দেখলেন, গোটা কলিয়ারী তখন খানদানী বিয়েবাড়ি হয়ে উঠবে, স্যার! থেকে যান ক'টা দিন আপনার কাজ দেবে'—

এবার সত্যিই আমার পিলে চমকালো, সন্দিগ্ধ চোখে তাকালাম ল্যাম্প ক্যাবিন ক্লার্কের মুখের দিকে। মারোয়াড়ীর 'সাচ্চা' খাতার মত সেখানে কোনো ঝুটা রহস্য দেখতে পেলাম না। ধরা পড়ে গেছি কিনা ঠিক বুঝতে না পেরে শুধু একটু মশকরা করলাম, 'ঠিক হ্যায়, আগে ছাঁদনাতলাটা তো নেমে দেখে আসি!'

বণ্ডে সই করে যখন অফিসার্স রুমে পৌঁছালাম তখন সেখানে রীতিমত পাঁয়তাড়া ভাঁজা চলেছে। নস্যি মোছা ময়লা রুমালের মত ভাঁজ করা কাপড়ের বৃহৎ নক্‌শাগুলি পকেট থেকে ঘন ঘন বেরোচ্ছে। তাঁরা এখন সত্যিকারের কাজের মানুষ। ঘন ঘন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে রুট মার্চ চলেছে। চলেছে সারপ্রাইজ ভিজিট। ওভারম্যানের ওপর নির্দেশ হচ্ছে : ফোরটিন সীমের অমুক সেকশনে কিছুই কাজ হয়নি দেখছি! এয়ার রুটে এখনো খুঁটি আর টিনগুলো পড়ে আছে কেন? ওগুলো সরিয়ে ফিফ্‌থ ডীপের এয়ার পকেটটা সীল করে দিন। সাত নম্বর গ্যালারিতে হোয়াইট ওয়াশ হয়নি! বি কুইক। আর আপনার থ্রি রাই ফোরে সিলিং কয়েক জায়গায় থ্রেটনিং কণ্ডিশনে রয়েছে দেখে এলাম, ইমিডিয়েট প্যাক আপ ধরুন। এখন একটু আলার্ট হন, দিন তো এসে গেল। রুফে চাকিং হয়ে আছে দু দিন ধরে খুঁটা বসলো না এখনো, কগ্‌ লেভেল সরিয়ে আনা দরকার, একেবারে ফিতে ধরে কাজ করুন মশাই, লিগ্যাল লেংথ-ব্রেড্‌থ্‌ ক্রস্‌ করে শেষে কি হাতে দড়ি পরবেন? কি বলছেন, লোক পাচ্ছেন না? বাজে কথা! বেশ তো, ডেভেলপমেণ্ট ফ্রণ্টে প্রেসার কমিয়ে দিন,

রেইজিং চল্‌ক ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি! মনে রাখবেন, সেফ্‌টি উইক ইনস্পেকশন রিপোর্টের ওপরেই আমাদের প্রাইজ প্রেস্‌টিজ প্রমোশন প্রাইভেসি নির্ভর করছে। ডোণ্ট প্রুভ ইয়োরসেলফ্‌ ফুল। ব্যাস—

ফলে ফুল টীম আবার ডুব মারলেন, ওভারম্যান, ইলেকট্রিসিয়ান, মেকানিক্যাল ফিটার। ডিউটি অফ্‌ হয়ে উঠে এসেছিলেন, আবার নামতে হলো। নাওয়া খাওয়া ঘুচলো। বড় কর্তা উতলা হয়েছেন, মালিক মহল থেকে ঘন ঘন ট্রাঙ্ক আর কেবল আসছে। দেওয়ালে দেওয়ালে বড় বড় হরফে সেফ্‌টি স্লোগান লেখা হচ্ছে। safety in mind safety in mine, আরো কত কি! কুড়ি হাজার টাকা ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে, [illegible] ব্যাট্‌ল তাই এখন সেফ্‌টি [illegible]। [illegible] আজ ইউ লাইক, শুধু এই একটি সপ্তাহ ছাড়া। মাইন আর মাইনারদের বারোটা বাজাতে যেন আর বাকি রাখা হয়েছে কিছু!

পিট্‌ মাউথে গিয়ে দাঁড়ালাম। আচমকা একটি লোক আমার পকেটে হাত দিয়ে শুধোলো, 'ম্যাচিস্‌ ট্যাচিস্‌ আছে?'

পকেটে হাত দিয়ে দেশলাই চাওয়া, এ কোন দেশী ভদ্রতা! আমার রুদ্ধ হুঙ্কারে ওভারম্যান ছুটে এলেন, 'কিছু মনে করবেন না মশাই, ও ডিউটি করছে মাত্র।' শুনলাম বডি সার্চ করা আর ল্যাম্প চেক করাই লোকটির কাজ। এই ধরনের গ্যাসী মাইনে কোনোরকম দাহ্য পদার্থ নিয়ে নামা চলবে না, তা তুমি যেই হও না কেন। নেশারু মানুষ খনিতে আট ঘণ্টা ডিউটি দিতে গেলেই ধোঁয়ার অভাবে খাবি খাবে, ডাঙার মানে সারফেসে উঠতে চাইবে। খনির ভেতরের সেফ্‌টি নেশা তাই খইনি, পান আর নস্যি।

ব্যাঙ্কস্‌ম্যান পিট্‌বট্‌মে আগেই ঘণ্টি ফেলেছিল, এবার ডুলির (cage) জালি-ঝাঁপ নামিয়ে দিয়ে এঞ্জিনঘরে (Winding house) তিন ঘণ্টী পাঠালো। মানুষ নিয়ে ডুলি নামবে এ তারই সংকেত। বামাল খাঁচা কিংবা না-মাল খাঁচা নয়, এ একেবারে সামাল খাঁচা, এর জন্যে তাই এক নয়, দুই নয়, তিন ঘণ্টী, খাদের তলাকার বিপদের সংকেত আসে আবার সাত ঘণ্টী বাজিয়ে।

খাঁচার মধ্যে গাদাগাদি করে মানুষ আমরা দাঁড়িয়ে আছি গিনিপিগের মত। সেফ্‌টি ল্যাম্প (খনির গ্যাস পরীক্ষা করার আলো) এবং অন্য জিনিসপত্র নিয়ে ঠিকের শ্রমিক আছে কয়জন। তদুপরি আমি আর কজন ওভারম্যান। তাঁদের খাকী হাফশার্ট হাফপ্যাণ্ট, শ্রীচরণে শু আর ফুল মোজা, মাথায় হলদে হেলমেট আর হাতে ওয়াকিং স্টিক। আমারও রূপে কিছু কমতি নেই। ফুলপ্যাণ্টের চোঙা দুটো হাঁটু বরাবর গুটোনো। কোমরে তিন ইঞ্চি চওড়া চামড়ার বেল্টে পাউণ্ড পাঁচেক ওজনের ব্যাটারি পশ্চাদ্দেশে বাঁধা, নিজেকে গুরুনিতম্বিনী মনে হচ্ছে। ব্যাটারি থেকে ক্যাথেটারের মত রবারের নল গা বেয়ে হেলমেট বরাবর উঠেছে, সেখানে ললাটনেত্র মানে ইলেকট্রিক ক্যাপ-ল্যাম্প জ্বলছে। হাতে একটি রিলায়েবল ছড়ি।

লোহার খাঁচাটা হঠাৎ দুলে উঠেই আমাদের নিয়ে সবেগে পাতালমুখী হল। অন্ধকার রন্ধ্রপথে ক্রমশ তলিয়েই যেতে লাগলাম, এই তলানির যেন আর শেষ নেই। বাতাসের অদৃশ্য চাপে কানে বারবার তালা লেগে যাচ্ছে, ঢোক গিলে গিলে সে তালা আবার খুলছি। মৃদু রক্তচাপ অনুভব করছি বুকের ভিতর, দেহ যেন শিমুল তুলোর মত হাল্কা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, আমরা যেন নামছি না, ক্রমশ ওপরের দিকেই উঠছি।

পাঁচ শ' পঁয়তাল্লিশ ফিট নিচে পিটবটামে পৌঁছানো গেল একসময়। মনে হল, এক গোলার্ধ থেকে অন্য গোলার্ধে পৌঁছে গেলাম কয়েক মিনিটে। ওপরে বিকেলের রোদ্দুর দেখে এসেছি, এখানে যেন মাঝরাত্তিরে অন্ধকারে নকল আলো জ্বলছে। পিটখনি অবশ্য আরো অনেক গভীর হয়, একের পর এক কোল সীম (seam) খুঁড়তে খুঁড়তে যখন শেষ স্তরে নেমে যায় মানুষ তখন কোথাও কোথাও চার হাজার ফিট পর্যন্ত গভীর হয়। দুটি পাথরের স্তরের মধ্যে স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে রেখেছেন প্রকৃতি দেবী এই কয়লা দিয়ে। এই স্যাণ্ডউইচড কয়লার স্তরকেই সীম্‌ বলে। এই খনিটিতে আঠারোটি সীম্‌ ছিল, তার মধ্যে চারটির কয়লা ইতিমধ্যেই সাবাড় হয়েছে। এবং অন্য তিনটিতে কাজ চলেছে। এই সীম্‌-এর সংখ্যা কোথাও বা চল্লিশ পর্যন্ত, চওড়ায় আঠার ইঞ্চি থেকে পঁচিশ তিরিশ ফিট পর্যন্ত দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ায় ২৬৫ ফিট পর্যন্ত পুরু কয়লাস্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

আমারও রূপে কিছু কমতি নেই

পিটবটামেই এয়ার প্যাসেজের মুখ এসে মিলেছে। ওপরে ভেণ্টিলেশন ফ্যান হাউসে একটি অতিকায় পাখা ঘুরছে। সমস্ত খাদের স্টেল এয়ার সে শুষে নিচ্ছে মিনিটে তিন লক্ষ কিউবিক ফুট বাতাস। ফলে বাতাসের ঝড় বইছে। বিশাল ধমনীর মত এয়ার রুট্‌ সমস্ত খনি ঘুরে এসেছে। ফলে ফ্রেশ এয়ার সার্কুলেশন ঘটছে। ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপুনি ধরে গিয়েছে। আমার সুড়ঙ্গপথ এড়াবার জন্যে ট্র্যাভেলিং রোড ছেড়ে নির্জন পথে পা বাড়ালাম। এ পথে সাধারণ শ্রমিকদের চলাচল নেই। শুধু ওয়াগন চলাচলের জন্য ফিশ্‌প্লেট আর রেললাইন পাতা আছে। দু পাশে লাইনের বাইরে বোধ হয় ফুট খানেক করে জায়গা আছে। চোখ কান সজাগ রেখে টানা রেলপথ ধরে এগোচ্ছিলাম, রুফ্‌ নেমে এসেছে, মাথা নিচু করে পা চলছে লোহার শাটারে ঠুকে যাবার ভয়ে। আবার হঠাৎ গাড়ি এসে পড়লে পাথরের দেওয়ালে পিষ্ট হবার ভয়। অথচ নজর বেশী দূর চলে না, হলেজ বাঁক নিতে নিতে এগিয়ে গেছে। হঠাৎ বাতাসের ঝোড়ো শব্দ ডিঙিয়ে গুমগুম আওয়াজ শোনা যেতেই আমার ইয়োলো হেড গাইড চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শেলটার, শেলটার!'

অনেকটা দূরে দূরে পাথরের দেওয়াল কেটে আলমারি পরিমাণ পরিসর করা আছে, এগুলিকে নাকি ম্যানহোল বলে। ম্যানহোলডারও বলা যেতে পারে। আমরা কজন তার মধ্যে জড়াজড়ি করে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ভীষণ শব্দ করে সাত আটটি কয়লা-বোঝাই ওয়াগন ছুটে এল, অস্পষ্ট আলোয় মনে হল একপাল রুদ্ধ গণ্ডার ছুটে আসছে। এঞ্জিন নেই, ড্রাইভার নেই, কোন অদৃশ্য প্রান্ত থেকে হলেজ খালাসী তার ইলেকট্রিক লাটাই ঘোরাচ্ছে, আর স্টীল রোপের আকর্ষণে ওয়াগনগুলি ছুটে যাচ্ছে পিট্‌বট্‌ম অন-সেটারের ইয়ার্ডে।

টানেল ঘুরে ক্রমে অন্য পথে চলে এলাম। সুড়ঙ্গের এক কিনার দিয়ে পাহাড়ী ঝরনার মত কলধ্বনি তুলে জল ছুটে যাচ্ছে। ছাদ আরো নিচু, আমার মত

পেংগ্যুইন-ও ছত্রিশ ইঞ্চি ছড়ির ডগায় চিবুক রেখে কোমর-পড়া বুড়োর মত হাঁটছে। পথে অনেক ইতস্তত মানুষ দেখলাম। কেউ কয়লা কাটছে, কেউ টাব বোঝাই করছে, কেউ স্যান্ডস্টোয়িং আর প্যাকিং-এ নিযুক্ত। পিলার অ্যান্ড বোর্ড মেথডে এই খনি কাটা হচ্ছে, যাকে বলে স্কোয়ার কাট্। ষাট ফুট বাই ষাট ফুট কয়লার স্তম্ভ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে সমকোণী রীতিতে সুড়ঙ্গ এগিয়ে যাচ্ছে। তাই অসংখ্য গলি, গলির একেবারে গোলকধাঁধা। সেখানে কোথায় কে রয়েছে, কি কাজ করছে, ঠাহর করা শক্ত। এজন্য আছে মাইনিং সর্দার, তার ওপরে ওভারম্যান। পোশাক যেমনই হোক, টুপির রঙ আলাদা। সাদা টুপি ম্যানেজারদের, হলুদ টুপি ওভারম্যান আর মাইনিং সর্দার, সবুজ টুপি মেকানিক্যাল ফিটার আর ইলেকট্রিশিয়ানদের জন্যে, লাল টুপি শট্ ফায়ারার (যারা ডিনামাইট চার্জ করে কয়লা নামায়) আর কালো টুপি লেবারদের জন্য বরাদ্দ। এই খনির নিয়মকানুন দেখলাম একটু আলাদা।

ওপরে অর্থাৎ সারফেসে পরস্পরের সম্পর্ক যেমনই হোক, খাদের তলায় মৃত্যুর ঝুঁকির সামনে সবাই বড় কাছাকাছির মানুষ। বেলচা গাঁইতি নিয়ে যে কাজ করছে কিংবা গাড়ির অপেক্ষায় বেকার ঝুড়ির মধ্যে বসে ঝিমুচ্ছে, কিংবা প্যাকিং-এর চাটাই পেতে এক লহমা ঘুমিয়ে নিচ্ছে—আর ইঞ্জিনীয়ার ম্যানেজারের দল সবাই যেন মনে মনে পরস্পরের উত্তাপ পেতে চায়।

"আরা জিলা ঘর বা"

ভেটারেন মাইনিং সর্দারের সঙ্গে এক নবাগত ওভারম্যানের তর্কাতর্কি জমে উঠেছিল এমন সময় আমার সঙ্গী সেই আরা জেলা নিবাসী সর্দারকে স্রেফ একটি ছড়া কেটে ঠাণ্ডা করে দিলেন :

আরা জিলা ঘর বা।
কিস্ চীজ্‌সে ডর বা।
শও বিঘা পুদিনা বা॥

সঙ্গে সঙ্গে করতালি পড়লো, দেখি মাইনিং সর্দার দন্তপঙক্তি বিকশিত করে তার করতল থেকে খানিকটা সদ্য নির্মিত খইনি প্রতিপক্ষকে অফার করছে।

এই দৃশ্য থেকে আর এক দৃশ্যান্তরে নজর আটকে গেল। একটি লোক ফুট দশেক লম্বা একটি লাঠির ডগায় একটি খাঁচা ঝুলিয়ে দেখি কোথায় চলেছে, সঙ্গে একটি লোক, খাঁচার ওপর আলো ফোকাস করে সাথে সাথে চলেছে। খাদের মধ্যে খাঁচা! কৌতূহলে শুধালাম লোকটিকে, 'কি ব্যাপার, পাখি নাকি হে?'

সে ডগমগ গলায় জবাব দিল, 'হু বাবু, ই গ্যাস চিড়িয়া আছে।'

লাইড বললেন, 'গ্যাস পাখি। আসলে ক্যানারি পাখি। খনিতে কোথাও কার্বন-মনোক্সাইড গ্যাস আছে কিনা জানবার জন্যে এই পাখি আমরা ব্যবহার করি। হট্‌ৱাডকেই এই খুনী গ্যাস (Carbon-monoxide) সব প্রথম ক্যাচ করে। আর ক্যানারি হচ্ছে সবচেয়ে ছটফটে গরম রক্তের পাখি। মরবার আগে এই পাখি দুই ডানা মেলে ট্রাফিক পুলিসের মত মানুষকে স্টপ-সিগন্যাল দেয়।'

খনিতে সাত রকমের গ্যাস সাধারণত থাকে। তার মধ্যে খুনী গ্যাস আর গরম গ্যাস বা ড্যাম্প ফায়ার প্রধান। কোল ডাস্ট এক্সপ্লোশন আর একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা। অতি সামান্য পরিমাণ ভাসমান কয়লা-কণিকা তখন একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটায়। ইট অ্যাকটস্ লাইক গান্-পাউডার।

আমার ইয়েলো হেড গাইড কিছু সময়ের জন্য স্থানান্তরে গিয়েছিলেন। আর অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। পথের গোলক-ধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে যখন একটি কোল-ফেসের সামনে গিয়ে পড়েছি তখন হুঁশ হল। পাতালে এক ঋতু বলেই জানতাম, এখন দেখি দুসরি ঋতুও আছে। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে চলে এসেছি মনে হল। জায়গাটা বেশ গরম, নিশ্বাস নিতেও একটু একটু কষ্ট হচ্ছে। অথচ তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে দুটি লোক কয়লা কাটছে, ক্যাপল্যাম্প মাটিতে রাখা। সর্বাঙ্গে ল্যাঙট ছাড়া আর কিছু নেই, দরদর করে ঘামছে। আমাকে দেখে হাতের কাজ থামিয়ে দাঁড়ালো। অনেকক্ষণ সুখদুঃখের গল্প করে শেষে ওদেরই সাহায্যে কিছুটা পথ এগিয়ে এসেছি এমন সময় কাছেই কোনো গ্যালারির কোণ্ থেকে মানুষের গলা শুনতে পেলাম। রেডিও প্রোগ্রামের মত একটি গান প্রায় তখুনি যেন শেষ হল আর সঙ্গে সঙ্গে তুমুল উচ্চ কণ্ঠে কেউ যাত্রার সলিলকি আওড়াতে লাগল। সে কি ফুল ভল্যুম ইমোশনাল গলা। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে একটু এগিয়ে গিয়ে যেই উঁকি দিয়েছি, অমনি আমার ক্যাপল্যাম্পের আলোয় দুটি লোককে থতমত খেয়ে যেতে দেখলাম। একজন, যিনি একখানা চটি আকৃতির নরম মলাটের বই তাড়াতাড়ি পকেটে লুকিয়ে ফেললেন তিনিই আমার পূর্বোক্ত গাইড। লজ্জিত কণ্ঠে বললেন, 'সেফ্‌টি উইকে আবার যাত্রার নামতে হচ্ছে কিনা অথচ সময় কোথায় বলুন।'

হাসি চেপে বললুম, 'নিশ্চয়ই, একটু আধটু প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিস না থাকলে—'

তাঁবু-নগরীর মেয়েরা

ফটক পার হতেই ওর সংগে দেখা। পেমো চিজো তার নাম। হিমাচল-বাসিনী মধুরহাসিনী মেয়ে। দু' হাতে দুই ডাঁশা পেয়ারার রসে ভরপুর আনন্দের ঝলক আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে গল্প আরম্ভ করলো। ভাষায় বোধ হয় মানুষের অন্তরের আদান প্রদানে কোনই অসুবিধা হয় না। তাই পেমোর ভাষা আমার ভাষা কোথাও বাধা পায়নি। ও এসেছে নূতন দিল্লিতে গণতন্ত্র দিবসের মওকায় কিছু পসরা নিয়ে। পাথরের মালা, রূপোর বালা, ফিরোজা বসানো আংটি আরও কত কি। তাঁবুর একধারে ডেকে নিয়ে গেল তার 'চীজ' সব দেখাতে। হিমাচলের নাচের দলের সংগে পেমো কি করে এসেছে ঠিক বুঝতে না পারলেও ওর ব্যবসায় বুদ্ধিটুকু বেশ লাগলো। ঘরে বেকার স্বামী অসুস্থ। দু' চারটে কর্মপ্রচেষ্টার অভিযান বা ঝুঁকি না নিলে এই খরার শস্যহীন সাল তার কাটবে কি করে? তাঁবুর দরজার দুদিকে শীতের রোদ্দুরে পা মেলে বসেছিল আরও দুটি মেয়ে। দুজনেরই ছোট শিশু সংগে। একজন তো পিঠে ঘুমন্ত বাচ্চাকে বস্ত্রখণ্ডে বেঁধে পাউডার মাখতে ব্যস্ত। প্রসাধন পেটিকাটি অভিনব। পরিবেশনের সালপাতা! কোথা থেকে এক রাশি ট্যালকাম পাউডার সংগ্রহ করে এনে সমানে মেখে চলেছে। বিন্দুমাত্র বিরাম নেই। হিমালয়ের হিমেল হাওয়ায় ফুটন্ত গোলাপের মত গাল দুটিকে কেন সে এমন ভস্মভূষিত করছিল কে জানে! সম্ভবত প্রতিবেশীদের প্রভাব! পাশাপাশি তাঁবুতে কলেজে পড়া মেয়ের দলকে বোধহয় দেখেছে প্রসাধন করতে। বাচ্চাদের রেখে আসা সম্ভব হয় নি। তাই নাচের সময় এর ওর কাছে বুঝিয়ে দিয়ে তারা নাচের তালে নিজেকে বিলিয়ে দেয়।

তাঁবু পড়েছে শত শত। প্রত্যেক বছর গণতন্ত্র দিবসের শোভাযাত্রায়, নাচ-গানের প্রদর্শনীতে এমনি করেই ভারতের সব প্রদেশ থেকে প্রতিনিধি এসে জমা হয় নূতন দিল্লির তালকটোরা বাগানে। কোন প্রদেশ কোথায় কখন আসছে যাচ্ছে ভূগোলের পাতায় গুলিয়ে যেতে পারে, এমন কি রাজনীতির সমস্যায় উচ্চমহলকে ভাবিয়ে নাজেহাল করতে পারে, তালকটোরার তাঁবুনগরী কিন্তু পাঞ্জাব আর হারিয়ানা, পাহাড়ী আসাম আর সমতল আসামকে এক সূত্রে বাঁধে। এখানেও প্রধান বন্ধনসূত্র ভারত-বর্ষের মেয়ে। কোথাও বা তারা কলেজে পড়া কেতাবী কন্যা, কোথাও তারা বাস্তারের সুদূর পাহাড় জংগলের অবুঝমাড়ের মাড়িয়া মেয়ে কিন্তু তারা সবাই পাশাপাশি বাস করে আর গল্পগুজবে আনন্দে হাসিতে সারা বছরের সব মনকষাকষি ভাসিয়ে দেয়। একমাত্র হারিয়ানা ভিন্ন এবার সব প্রদেশ থেকে মেয়ে এসেছে অনেক। ঘুরে ঘুরে গান শুনে মনে হলো মেয়েদের কথা আর গান, সমস্যা আর সুখও যেন অনেকটা এক। কুর্গী কুমারী থেকে রাজস্থানী মেয়ে পর্যন্ত সবার জীবন সংসারের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ ঘিরে, আর আজ সে সুখ দুঃখের অনেকটাই হয়ে উঠেছে চাল আর গম, জওয়ার আর বাজরা। তা দিয়ে হবে সব কিছু এন কি "কোর" বা জরির কিনারা লাগানো কাঁচলি যে সেলাই হবে তারও জন্য চাই ক্ষেতের সোনার ফসল।

রাজস্থানের দলটিতে জয়পুরের মহারাণী কলেজের মেয়েরা এসেছে কিন্তু সবাই তারা রাজস্থানী নয়। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ সব প্রদেশের মেয়ে নিজেকে রাজস্থানীর মত মিশিয়ে দিয়েছে গানে, কথায়। শ্বাশুরী জায়ের সংসার। মনকষাকষি আছে তবে ক্ষেতের ফসল ভাল হলে আনন্দে সব রাগ অভিমান সকলেই ভুলে যায়।

"মারী দেরানীয়া, জেঠানিয়া রুস গী রে" আমার দেবর পত্নী আর ভাসুরের স্ত্রী রেগেছে কিন্তু সাসুজী অর্থাৎ শ্বাশুড়ী তাদের মানিয়ে নিয়েছেন কারণ বৃষ্টি হয়েছে ভাল, ফসল হয়েছে অপর্যাপ্ত। ভাবনা কিছুই আর নেই। গানের মধ্যেই তখন একে অন্যকে প্রশ্ন করছে

"থারী কসীক নীপজী বাজরী রে
থারী কসীক নীপজী জওয়ার বনীসা।"

কেমন হয়েছে তোমার বাজরার ফলন আর কেমনই বা হয়েছে তোমার জওয়ার। নাচের তালে জবাব আসে

হোলির রং-এর পেটিকা (মহারাষ্ট্রের ভীল মেয়ে)

যোগী আর তার সঙ্গিনী

"মারী চাঁদী সী নীপজী বাজরী রে
মারী সোনা সী নীপজী জবার রে বনীসা"

আমার বাজরা উপচে উঠেছে যেন তাল তাল চাঁদি, জওয়ার ছাপিয়ে পড়েছে যেন রাশি রাশি সোনা। "তাইতো তোমার কাঁচলির বাহার। কে সেলাই করেছে এমন কাঁচলি আর কেই বা লাগিয়েছে এমন ঝলমলে কিনারী?" "থারী কুণ সিলাই কাঁচলী কুণ লগাই জী কোর বনীসা" তখন গরবিনী গায় "মারী দেরাণী সিলাই কাঁচলী রে, মারী দেরাণী লাগাই জী কোর রে।" শস্যসম্ভার গৃহবিবাদ দিয়েছে ভুলিয়ে। যে দেওরাণী রাগ করেছিল সেই তাকে দিয়েছে এমন কাঁচলী সেলাই করে।

রাজপুতানী জয়শ্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম নাচের নাম। সে বললো, একেবারে "গাঁওয়ারু"—গ্রামের মেয়ের হাসি-কান্নার গাথা। গানের কথায় 'মারী' 'থারী' শুনে মীরার ভজন মনে আসছিল। মীরার জন্ম হয়েছিল মারওয়ারে, রাণী হয়েছিলেন মেওয়ারের আর শেষ জীবন তাঁর কেটেছিল মথুরা বৃন্দাবনে। ব্রজভূমির ব্রিজ ভাষা আর মাড়ওয়ারী মিশেছিল তাঁর গানে। এখনও তথাকথিত হিন্দি ভাষাভাষী রাজস্থানের আপন ভাষা রাজস্থানীর আঞ্চলিক রূপ বা উচ্চারণ প্রণালী বিভিন্ন। আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য সেবাও যথেষ্ট হয়।

মহীশূরের কুর্গী মেয়েরাও একইভাবে ফসলের উৎসব দেখাচ্ছিলেন নেচে গেয়ে। ফসল ফলাতে যে নদী তাদের দেয় করুণা ধারা তার বন্দনাও গানের কলিতে যোগ করা আছে। দক্ষিণের গংগা কাবেরীর উৎস কুর্গে। পুণ্যতোয়া কাবেরী যে তাদের সম্পদের কারণ সে কুর্গী কন্যা ভুলবে কি করে?

পাঞ্জাবে পুরুষের নাচ যেমন ভাংড়া, মেয়েদের বেলায় সেটা গিদ্দা। গিদ্দাও যথেষ্ট প্রাণবন্ত নৃত্য কিন্তু ভাংড়ার মত হাড় ভাঙ্গা হল্লা নয়। নটরাজের কাছে যেমন বিশিষ্ট এক নাচের ভংগীতে নর্তনরতা পার্বতী হার মেনেছিলেন, ঠিক তেমনই যেন ভাংড়ার তাণ্ডবের কাছে হার মেনে পাঞ্জাবী পল্লীবাসিনী রচনা করেছে অপেক্ষাকৃত লাস্যময়ী ধারা। গিদ্দার মহড়ার গানটিও মেয়েদের ঘরোয়া উৎসবের গাথা। পল্লীর আসন্ন বিবাহ বাসরের আয়োজন চলেছে। আত্মীয়া, কুটুম্বিনী একত্র হয়ে ঘরে ঘরে

পাঞ্জাবের মেয়েদের গিদ্দা নাচের মহড়া

যাবেন সুখের বারতা বয়ে নিমন্ত্রণ দিতে। পূর্ণকলসের মাথায় রাখা ছোট থালা। তাতে জ্বলছে দিয়া বা প্রদীপ। সেই কলসী মাথায় নিয়ে চলেছে একজন, সংগে সকলে নেচে গেয়ে জানিয়ে দিচ্ছে তাদের আগমন সমাচার। যার ঘরের সামনে যখন থামবে তার নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে গানের কলিতে- পল্লী-রচনায় এ ধরনের অদল-বদল আমাদেরও অজানা নেই।

সবচেয়ে অসুবিধায় ভাববিনিময় হলো মাড়িয়া মেয়ে যোগীর সংগে। ওর নাম যে যোগী তাও খানিকটা আন্দাজেই ধরে নিলাম। যোগীরা দল বেঁধে এসেছে তাদের "বাইসন হর্ন" নাচ দেখাতে। পুরুষরা লাগায় দুটি করে বাইসনের সিং মাথায়। বাইসন মারা শক্ত ব্যাপার। প্রাণ থাকতে এই সিং তারা হাতছাড়া করে না। মেয়েরা সুঠাম শরীরে একটি মাত্র খাটো শাড়ি জড়িয়ে নেয় অনেকটা সাঁওতালদের মত, মাথার পরে টুপির মত এক শিরোভূষণ। গায়ের উল্কির উপর হাঁসুলি আর রুপোর টাকার মালা, পায়ে খাড়ু, হাতে জসম মাড়িয়া মেয়েরা রাজধানী দেখে মহা-খুশী। অবুঝ মাড় দুর্গম দেশ। সেখানে বাস্তারের জগদ্দলপুরের ছিটেফোঁটা কাহিনী শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দেয় গাঁয়ের মোড়লরা। আর এখানে তারা সবার সংগে সমান হয়ে তথাকথিত সভ্যতার ঝলকের সংগে সংগে চলেছে। মাড়িয়া মুরিয়া সমাজে নাকি মেয়েদের সাম্য দাবি করবার দরকার হয় না। চিরাচরিত প্রথায় তারা সমাজ-তান্ত্রিক। নারী পুরুষ, বড় ছোট, সুন্দর অসুন্দর সবাইকে সমান অধিকার বেঁটে দেয় দলের বা গ্রামের মুখিয়া। মুখ ফুটে আপত্তি জানানো চলবে না। তাই লক্ষ করলাম অসংকোচ স্বাধীনতায় শবরীর দেশের মেয়েরা নেচে চলেছে তালে তালে। শহরের পাওয়া নূতন স্বাধীনতায় তাদের দরকার হয় নি, তাদের স্ববশ, স্বচ্ছন্দ বিহার চিরকালের।

হোলির নাচ নাচবে মহারাষ্ট্রের ভীল মেয়েরা। তার মহড়া চলেছে তাঁবুর সামনে। মস্ত বড় ঝাঁপি। তাতে আছে পিচকারি আর আবীর। কারও কারও মাথায় ঝাঁপি আছে, কারও বা নেই কিন্তু নাচছে সবাই রংগীন নাচ, হোলির রং লেগেছে তাদের সারা অংগে। গহনার বিচিত্রতায়, সাবলীল ভংগীতে তারাও সব আদিবাসীদের সমান।

এমনি করে একে একে বিভিন্ন প্রদেশের তাঁবুর পাশ কাটিয়ে যেতে বেশ লাগছিল। বাংলা থেকে এসেছে ঝাড়গ্রামের সাঁওতাল নাচের দল। ত্রিপুরার প্রদর্শনী দৃশ্য এবার ঝুম প্রথায় চাষের। তাতে অংশ নিতে এসেছে মেয়েরাও। মণিপুরী নাচের দলের মেয়েরা তাদের লম্বা চুলের জল ঝরাতে ঝরাতে গান করছিল। তাঁবুর ভিতর থেকে গুরু হাঁকলেন "ভুল হচ্ছে।" জিভ কেটে, গামছা সাবান হাতে মেয়েরা ছুটে পালিয়ে গেল।

তাঁবুর রাজ্যের পরিক্রমা করে ফিরবার পথে দেখলাম অনেক ক'টি হাতি। হাতিদের পোশাক এসেছে ঝলমলে। শোভাযাত্রার আগে আগে চলবে তারা। কোনও হাতিতে থাকবে সানাই-এর দল কোন হাতিতে আর কিছু। তার সংগে থাকবে হাতির পিঠে এবারকার পাঁচটি বীর বালক। Indian

council of child welfare থেকে এই পাঁচটি বালক বীরত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে আছে আমাদের অক্রেশ্বরের সারদা-পল্লীর ছোটো শংকর রায়। ঐ জমাটে রথের মত হয়ে। শংকর জন্মেছিল রথের দিনে। মাহেশ তখন জমজমাট। আদর করে শংকরের নাম তাঁর মামু রেখেছিলেন রথী। তিনি জানতেন না তাঁর রথী একদিন হবে মহারথী। রথীর বাবা যার আদি নিবাস ঢাকা জেলার তাওয়াল। রথীর মা শ্রীমতী বাণী রায় সারদাপল্লীর একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। রথী একটি শিশুকে পুকুরে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করে। অন্য চারটি ছেলেও এরকম চারটি বিপদকে উপেক্ষা করে অন্যের, প্রাণ বাঁচিয়েছে। আমাদের দেশে হয়তো এরকম বীর বালক বালিকা আরও কত আছে। তাদের বরীত্বই আগামী দিনের আশা আর আজকের দুঃখ দৈন্যের ভরসা। সার্বজনীন স্বীকৃতি সবার ক্ষেত্রে যদি নাও ঘটে, মায়ের কাছে স্বীকৃতি ও সমাদর পেলে উত্তর কালে আরও অনেক বীরত্বের নিদর্শন আমাদের বালকবালিকার মধ্যে পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই।

৩ ফেব্রুয়ারির পতাকা

...এই দ্বীপপুঞ্জে ফাদার ড্যামিয়েনের কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তের উপনিবেশের কথা পড়েছিলাম। অকাতরে অনায়াসে ফাদার তাঁর রোগীদের সেবা করতেন। সেকালে মহাব্যাধি কুষ্ঠরোগ সমাজে ঘৃণার সঙ্গে গণ্য করা হতো। তার সঙ্গ বিষের মত বর্জনীয় ছিল। রোগের সংক্রমণ সম্বন্ধে লোকের ধারণা ছিল অস্পষ্ট, অনিশ্চিত। কাজেই ফাদার ড্যামিয়েনের এই অকুণ্ঠ সেবা নিতান্ত কুণ্ঠার সঙ্গে পীড়িতের দল গ্রহণ করতেন। তারা ফাদার ড্যামিয়েনের করুণা অস্বীকার করতে পারতেন না কিন্তু সংকোচে, দ্বিধায়, লজ্জায় জড়তাজর্জর হয়ে থাকতেন। তাদের এই অপ্রতিভতায় ফাদারকে আঘাত দিত। সকাল হলে স্বল্প ব্যবস্থায় পরিচর্যা আরম্ভ হতো। জল ফুটিয়ে শুশ্রূষার নানা কাজে লাগানোর কথা। ফাদার রোজ তাই করতেন। একদিন ফুটন্ত জল তাঁর পায়ের উপর অনেকটা উপচে পড়ে গেল। রোগীর দল ছুটে এল। না জানি কি গুরুতর যন্ত্রণায় ফাদার চুপ করে আছেন! ফাদার তাঁদের স্মিতহাস্যে বিকশিত মুখে বললেন, "এতদিনে আমি তোমাদের একজন হতে পেরেছি! আর তোমাদের কুণ্ঠার কারণ নেই।" তাঁর পায়ের তখন স্পর্শবোধ ছিল না।

ফাদারের এই গল্পটি ঘুরে ফিরে কতবার কতভাবে মনে এসেছে। মাস কয়েক আগে মাদার টেরিজার শিশুভবন দেখতে গিয়ে ফাদার ড্যামিয়েনের কথা আবার মনে পড়লো। মস্ত এক মোটর ভ্যান এসে দাঁড়াল ভবনের দরজার ভিতর। একজন ব্রাদার নেমে এলেন আর এলেন তাঁর সাহায্যকারী দুজন। মাল নামলো। নানা রকমের ওষুধের বাক্স, পট্টি, খাবার ইত্যাদি। অবাক হবার অবসর না দিয়ে আমার সঙ্গিনী শ্রীমতী ঘোষ বললেন, এ'রা সারা শহর ঘুরে কুষ্ঠ রোগীদের পরিচর্যা করে এলেন। যেখানে যা প্রয়োজন সে রকম ব্যাণ্ডেজ, ওষুধ ইত্যাদির ব্যবস্থা দিয়েও আসেন। ভ্যানখানা দেখে দরজায় দেখলাম দু'-চারটি রোগী এখানেও জড়ো হয়েছে। ব্রাদারের হাতের একটি আঙ্গুল স্টিকিং প্লাস্টারে মোড়া। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কাটা আঙ্গুল নিয়ে কি করে এ সেবার কাজ করেন। সংক্রমণের আশঙ্কা কি নেই। ব্রাদার বললেন কাটা তো স্টিকিং প্লাস্টারে ঢাকা আছে। ছিদ্রপথ না পেলে দুরন্ত বীজাণু প্রবেশ করবে কি করে? কুষ্ঠব্যাধি সম্বন্ধে সমাজে যত আশঙ্কা সবটা সত্য নয়। সংক্রামক রোগ হিসাবে এ মহা-ব্যাধির চেয়ে বহু রোগই বেশী সংক্রামক। সময় মত চিকিৎসা হলে নিরাময় হবার আশাও যথেষ্ট থাকে। প্রয়োজন মাত্র যথেষ্ট সহানুভূতির।

মাদার টেরেজা ও তাঁর মিশনারিজ অফ চ্যারিটি সম্প্রদায়ের কথা নূতন করে বলবার কিছু নেই। তবে তাঁদের প্রত্যেক সেবাব্রতে সাধারণের সহযোগিতার প্রয়োজন। মাদারের নূতন পরিকল্পনা ভ্রাম্যমাণ কুষ্ঠ চিকিৎসা ভিন্ন কলকাতার ও আসানসোলের কাছে উপনিবেশ ও চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করা। অনাথ, আতুর, আশ্রয়হীন সকলেই মাদারের কল্যাণ প্রচেষ্টার আওতায় আসে। ৩ ফেব্রুয়ারী মিশনারিজ অফ চ্যারিটি তাঁদের পতাকা দিবস পালন করেছেন। এবারে শহরের বাইরেও সংগ্রহের অভিযান চালাবার ব্যবস্থা হয়েছে। আশা করা যায় সংগ্রহ আশানুরূপ হয়েছে যাতে আজকের দুর্দিনে আশ্রয়হীনের আশ্রয় মিলবে, আর্তের সেবা হবে, দুঃখীর দুঃখতার [illegible]।

শ্রীমতী

কলাভবনের চিত্র প্রদর্শনী ..

সম্প্রতি শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিনায়ক মাসোজী এবং শ্রীলীলা মুখোপাধ্যায়ের একটি সম্মিলিত প্রদর্শনী শান্তিনিকেতন 'কলাভবনে' আয়োজিত হয়। প্রদর্শনীটি ১৪ জানুয়ারী থেকে ২১ জানুয়ারী পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

শ্রীবিনোদবিহারী মু খো পা ধ্যা য়ে র সাম্প্রতিক কিছু 'ড্রয়িং' এবং বেশ কিছু রঙিন কাগজ কেটে তৈরি 'কোলাজ' প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হয়েছে। শ্রীবিনায়ক মাসোজীর কিছু কাঠখোদাই এবং রঙিন ছবি এবং শ্রীমতী লীলা মুখোপাধ্যায়ের কাঠের তৈরি কিছু ভাস্কর্য একই সংগে প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছিল।

শ্রীবিনোদবিহারীর বর্তমান চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আধুনিক চিত্রকলা সম্বন্ধে কিছু বলা ভূমিকা হিসাবে প্রয়োজনীয়। আধুনিক চিত্ররীতি মূলত আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষয়ের বদলে 'ভিসুয়্যাল' বা চিত্রগত দিকের প্রতি ঝোঁক আধুনিক চিত্ররীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইউরোপই আধুনিক চিত্র-আন্দোলনের জনক এবং বর্তমানে এটি প্রায় আন্তর্জাতিক চিত্ররীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। সাম্প্রতিক ভারতীয় শিল্পীরা অনেকেই এই আন্তর্জাতিক চিত্ররীতিতে অভ্যস্ত। কিন্তু এ কথা ঠিক, অধিকাংশ ভারতীয় শিল্পী ইউরোপীয় প্রভাব থেকে যথার্থ মোহমুক্ত হতে পারেন নি। অর্থাৎ ইউরোপে আধুনিকতা যেখানে শিল্পের রীতি-নীতির বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা—আমাদের দেশে আধুনিকতা অনেক ক্ষেত্রেই সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থূল অনুকরণ মাত্র। অনেকটা আমাদের দেশের শিল্পীরা আধুনিক চিত্রের আঙ্গিকের কতকগুলি স্থায়ী 'মোটিফ' মেনে চলছেন—ফলে প্রায়ই তা গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

শ্রীবিনোদবিহারী সাম্প্রতিক কালের শিল্পী--আধুনিক চিত্রকলার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে যথেষ্ট সুপরিচিত, কিন্তু ইউরোপের আধুনিক চিত্রের স্থূল প্রভাব তাঁর চিত্রে অনুপস্থিত। নিজস্ব এক মৌলিক আবেদনে তাঁর চিত্রকর্মগুলি সমৃদ্ধ। তিনি ভারতীয় পরম্পরাগত শিল্পকে অস্বীকার না করে এবং ইউরোপীয় আধুনিক চিত্রের বুদ্ধিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আস্থা রেখে, উভয়ের এক সুচিন্তিত সংমিশ্রণ (synthesis)-এর পক্ষপাতী।

শ্রীবিনোদবিহারীর চিত্রে তাই ভারতীয় জৈন বা রাজপুত চিত্র, চীনা 'ক্যালিগ্রাফি', বাংলা পটছবির টানটোন এবং বাংলার পুতুলের গড়নের ভাবের দেখা মেলে। অথচ তাঁর নিজস্ব ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত 'কম্পোজিশন্'-এর দৃঢ় বাঁধুনি এবং ভারতীয় চিত্রের পরম্পরার পটভূমিকায় চিত্ররচনা ভারতীয় চিত্রের আধুনিক রূপের সুচিন্তিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এ-দিক থেকে ভাবলে শ্রীবিনোদবিহারী একজন যথার্থ আধুনিক শিল্পী।

বর্তমান প্রদর্শনীতে উপস্থিত 'ড্রয়িং' বং 'কোলাজ'গুলি শিল্পীর দৃষ্টি-হারানোর রে অংকিত। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব প্রতিটি জেই দৃঢ়ভাবে বিদ্যমান। কালো এবং দামী কাগজ কেটে 'বিড়ালের' ছবিটিতে ড়ালের প্রাথমিক গড়নকে শিল্পী উপস্থিত রেছেন সহজভাবে। 'আদম' ও 'ইভের' বিটি দ্রুতসম্পন্ন 'ক্যালিগ্রাফিক' 'কনটুর ইনে'র ভিতর রঙিন কাগজ কেটে সুচিন্তিত কম্পোজিশন করেছেন। পাশপাশি খাড়াভাবে রাখা 'আদম' ও 'ইভের' ফরম্ এবং 'হরাইজ্যাণ্টাল'ভাবে রক্ষিত সাপের আঁকাবাঁকা মোচড়ান ফরম্ কম্পোজিশনে সুচিন্তিত ভারসাম্য এনেছে। কৃষ্ণ ও গোপিনীদের স্নানের কোলাজটিতে চিত্রের সমগ্র স্পেসের কেন্দ্রস্থিত লম্বা গাছ এবং সর্বোচ্চ হরাইজ্যাণ্টাল রেখায় অবস্থিত দু' পাশের চৌকো বাড়ি এবং নীচের ইতস্তত ছড়ান ফিগারের ফরম্ ভারতীয় জৈন বা কোন কোন রাজপুত চিত্রের আলংকারিক কম্পোজিশনকে মনে করিয়ে দেয়। কতকগুলি কোলাজ, সুচিন্তিত রঙিন কাগজের কম্বিনেশন এবং কখনও ছাপা হরফ্যুক্ত কাগজ কেটে বিভিন্ন রেক্ট্যাংগুলার ফরম্, ডট্ বা কাভ্ড লাইনের সাহায্যে সুসামঞ্জস
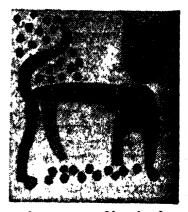
বিড়াল (কোলাজ)—শ্রীবিনোদবিহারী

নকশার সৃষ্টি করেছেন। আকারে ক্ষুদ্র হলেও এগুলি বড় ছবির স্পেস অ্যারেঞ্জমেন্টের কথা মনে করিয়ে দেয়। ড্রয়িংগুলিতে দ্রুতসম্পন্ন ক্যালিগ্রাফিক রেখার গুণ বিদ্যমান।

শ্রীবিনায়ক মাসোজীর অল্পসংখ্যক খৃষ্ট-বিষয়ক কাঠখোদাই এবং রঙিন ছবি প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিল। কাঠখোদাইগুলি সুচারু সাদা রেখায় সম্পন্ন এবং ছবিগুলি কোমল রঙ-এর সমাবেশে এবং সুললিত রেখায় শ্রীমাসোজীর প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিভাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

শ্রীমতী লীলা মুখোপাধ্যায়ের কাঠের ভাস্কর্যগুলি প্রিমিটিভ্ বা নিগ্রো ভাস্কর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। মূর্তিগুলিতে, ঋজু এবং সরল কাষ্ঠখণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন অংশে কাটাকুটি করে বিভিন্ন ফিগারের আকার দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন দিকের প্রোজেকশন খুবই সীমিত। এ ধরনের সহজ উপস্থাপন ভাস্করের দক্ষতারই পরিচয় দেয়।

—অরুণ পাল

এস্রাজ বাদক - শ্রীবিনোদবিহারী

আলো এখনও ঘুম থেকে জেগে ওঠার নির্দেশ হয়েই আমাদের কাছে আছে: সেটা নিজেই যে একটা দারুণ ঘটনা, এ সংবাদ আমরা ভুলে গেছি। নিশ্চয়ই এই ধারণা আমাদের যে, মায়ার সঙ্গেই তার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং হরাইজন-লাইন যেহেতু ইদানীংকার ছবিতে তার চিরাচরিত সচলতা নিয়ে আর দেখা দেয় না—তাই আলোর কেন কলহ নেই।

অথচ আমরা ছবি আঁকতে অনেক কিছুই মনে রেখেছি; মহামতি সোয়রা-কল্পিত ঈজিপতীয় অবয়ব-সরলতা থেকে বিভিন্নতা কিন্তু ধর্মতই আলোকসম্পাত, মানে চিত্র-সূত্রে তার যৌক্তিকতা প্রায় ক্ষেত্রেই বিস্মৃত; অথচ, আবার আরও একটু যদি ভাবি, তাহলে বুঝব সাধারণ কালো-সাদা ড্রইঙে, বিশেষত নব্যধরনে, কোথাও বা স্নায়ুকল্প রেখায় আমাদের মধ্যে কেউ আলোকে চমৎকার সম্প্রসারিত করে জবর এক গঠন এনেছে—নৌকার পাল-স্পন্দিত ছবির হাত আমাদের অন্ধকার স্পর্শ করে!

কিন্তু যখনই রঙ আরোপ করার সময় এল, তখনই বৈচিত্র্য উপস্থিত, ভাবনা রুগ্ন, সমস্ত কিছুতে ঘোর দেখা দিল, কারণ, আলোকে তেমন করে রঙে নির্ণয় ঘটে ওঠেনি। যে "শিল্পীর কাছে রঙ ছাড়া আলো অন্যরূপে নেই, কমলা যে সবুজের (ভেয়রেৎ আসিদ) থেকে উজ্জ্বল, নীলের থেকে সবুজে বেশী উজ্জলতা, এমনিভাবে মৌলিক অপরিহার্য সূত্র থেকে আমরা অজস্র জোড় বার করতে পারি"—এই সহজ স্বাভাবিকতাটা রঙ দেবার সময় মনে থাকেই না, ফলে অ্যাটমস্‌ফিয়ার-সত্তাটা গল্প হয়েই থাকে।

মানুষ : সনৎ কর

সনৎ করের প্রদর্শনী : গ্যালারী কেয়মল্ড

সনৎ করের ছবির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা, হলফ করে বলা যায়, এই প্রদর্শনীর কাজ দেখলে সনৎ করকে অচেনা বলে প্রথমটা বোধ করতেন। কেননা এখানে ১২-খানি ছবিতে তিনি অবাক বদলেছেন, দূর থেকে কাছে দাঁড়িয়ে তাঁর ছবি দেখতে হয়; রঙ তাঁর হাতে এসেছে! পূর্বে যে গীতি-কাব্যময় খুব দুলারি কাজ আমরা দেখেছি, আলোচ্য প্রদর্শনীতে তার ধর্ম যে নেই তা নয়, তবে এঁদের মধ্যে একটা গঠন করার ভূমিকা রয়েছে বলেই বাস্তবতাকে নামগত রূপ থেকে তার বস্তুগত চেহারায় আনতে, অনেক সময় সাধারণের কাছে নির্বয়ব বলে মনে হতে পারে! হয়ত রঙের অজস্র ফুলকিতে অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যেখানে যেখানে টোন আছে, সেখানে লোকে নিশ্চয়ই বুঝে নেবে যে, তিনি কি করতে চেয়েছেন। এই টোন—আর একটু বেশী ব্যবহার হলে ঘটনা নাটকীয় হত; আমরা তাঁর ৭, ৮, ৬ দেখে সত্যই আশান্বিত হয়েছি, নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আমরা তাঁকে নিয়ে গর্ব করতে পারব।

সুবীর সেন ও অরুণ মুখার্জীর চিত্র প্রদর্শনী : ফাইন আর্টস ভবন

অনেকদিন বাদে এঁদের প্রদর্শনী দেখলাম। এইখানে যে সব ছবি ছিল তাতে বুঝায় যে, এঁরা দুজনেই শিল্পকে চমৎকার ঘুম বলে ভাবেন না, নিয়তই তাঁরা দেখছেন, মুঠো করে ধরতে চাইছেন বাস্তবতাকে। অরুণ মুখার্জির এই প্রদর্শনীতে ৭খানি ছবি ছিল। তার মধ্যে বলা প্রয়োজন, ১নং ছবির ঠিক মাঝখানের খানিকটা জায়গায় যেখানে, বিষয়বস্তু বর্তমান সেখানকার কাজ তাঁর অন্যান্য ছবির সঠিক সূত্র হওয়া উচিত ছিল, এ স্থানটি বিস্ময়করভাবে গঠিত হয়েছে, এটি আলোর ঘটনা—কলার রঙ ও রেখার পাশেই আপেলের দৃশ্যমানতা আমাদের ভাল লেগেছে কিন্তু পরক্ষণেই নীচে আধ-নীল চকই (chalk) স্পাচুলার টোন কি সংগত হয়েছে? তবুও বলতে হবে এই ছবিটি খুব খুলেছে। অন্যান্য ছবিতে তিনি ১নং-এর মত ভাবনা আর দেননি বোঝা যায়। সুবীর সেন-এর এখানে ৯খানি ছবি ছিল। সুবীর সেনের কাজ মোটামুটি একটা-কিছুকে নির্মাণ করতেই চায়, তাঁর আগেকার ধরনের পদ্ধতির ছবিও ছিল, কিন্তু ১৫ নংটি সম্পূর্ণ আলাদা; বিষয়বস্তু হচ্ছে, খাঁচায় একটি টিয়াপাখি! পাখির গঠনে তিনি অবাক ব্রাশম্যানাবের পরিচয় দিয়েছেন—এবং উপরকার খাঁচার বিশ্লেষণে টিয়ার বাস্তবিক টোন আর-এক বিশেষত্ব লাভ করেছে। কিন্তু এখানে বাঁ-পাশের স্থান সাধারণের চোখে খানিক ধাঁধার সৃষ্টি করবে যে, কেন তিনি এতটা স্থান সম্ভবত বারনট-ক্রমবার জাতীয় কালচে রঙে ছেড়ে দিলেন। নিজের আঁকা ছবিকে আমরা যদি কোন কাগজ দিয়ে ঢেকে ঢেকে দেখি তাহলে এ সব বিষয়ে বিচার সুষ্ঠু হয়। তাঁর হর্স-এ আলোর ব্যবহার আমাদের ভাল লেগেছে, এই সূত্রে যদি বলা যায় তাহলে নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না যে, ১২নং ছবির দরকার ছিল না, যেহেতু ১৩নং-এ সে কাজ হয়েছে।

সুনীতা ব্যানার্জীর চিত্র প্রদর্শনী : ফাইন আর্টস ভবন

সুনীতা ব্যানার্জির কলকাতায় এই প্রথম চিত্রপ্রদর্শনী, এর আগে তাঁর বোম্বাই শহরে একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। এখানে সবসমেত তাঁর ২৫টি জলরঙ ছিল। এগুলি সবই নির্বয়ব, শুধু ব্রাশ চালনায় যে ছন্দ হতে পারে তাই আছে, রঙ বিচারে প্রায় প্রত্যেকটি নয়নাভিরাম হয়েছে। বিশেষত ১৭, ২২ ও ২৩ প্রত্যেকেরই ভাল লাগবে।
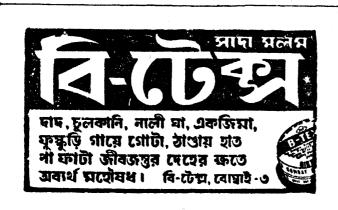
দিল্লিতে গান্ধী স্মৃতিশালা ভবন

দিল্লির ডায়েরি

গান্ধী স্মৃতিশালা ও পুস্তকাগার। রাজঘাট সমাধির অন্য পাশে রিং রোডের উপর। গান্ধীজীর মৃত্যুদিবসে আরেকবার দেখতে গেলাম।

আমাদের নিজেদের উপর করুণা জাগে, দলে দলে হাজার হাজার লোক কেন যায় না দেখতে প্রত্যহ ঐ স্মৃতিশালা? আমরা তাঁকে বছরে দুবার মনে করি, মৃত্যুদিবস ৩০শে জানুয়ারি, আর জন্মদিবস ২রা অক্টোবর। ব্যস, কর্তব্য শেষ। সভা-সমিতিতে আর নির্বাচনের ডামাডোলে মুখ থেকে দুয়েকবার তাঁর নামটা না নিলেই চলে না। ঐ পর্যন্ত। কোথায় তাঁর আদর্শ, কোথায় দেশ-নেতাদের ও আমাদের আদর্শ!

স্মৃতিশালার ঘরগুলো ঘুরতে ঘুরতে, গান্ধীজীর সহজ, সরল ও বাহুল্য বর্জিত জীবনের নিদর্শন দেখতে দেখতে অমনি প্রশ্ন আমার মতো নিশ্চয়ই অনেকের মনে এসেছে। তাঁর কাল ছিল আত্মত্যাগের, আমাদের আত্মসম্ভোগের। মাঝখানে দুস্তর পারাবার। যে-ক'জন মুষ্টিমেয় লোক দুয়ের ভিতর সম্বন্ধ স্থাপনের ব্রত নিয়েছেন, তারা নমস্য।

দোতলার ক'টি ঘরে গান্ধীজীর জীবন আলেখ্য। অনেক ফটো যার মাধ্যমে আবার উপলব্ধি করি ভারতবর্ষের ইতিহাসের অধ্যায়গুলো। সমস্ত বড় বড় নেতাদের সঙ্গে ছবি—চিত্তরঞ্জন, গোখলে, নেতাজী সুভাষ, নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, লিনলিথগো, মাউনটব্যাটেন, আব্দুল গফ্ফর খাঁ, ক্রিপস, মৌলানা আজাদ, মহম্মদ আলি, জিন্না, রাজাজী, শরৎচন্দ্র বসু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, কেউ বাদ নেই। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে গান্ধীজী; উপবাস-রত গান্ধীজী, নোয়াখালিতে গান্ধী, দিল্লির ভাংগি কলোনিতে গান্ধী, সত্যাগ্রহের গান্ধীজী। আর মাঝে মাঝে ইংরিজী ও হিন্দিতে গান্ধীজীর লেখা অথবা প্রার্থনা থেকে উদ্ধৃতি।

সকাল থেকে সেদিন রাজঘাটে স্মৃতিতর্পণ ও প্রার্থনা। একটি দিন ভারত সরকার-চালক নেতারা ভিড় করেন। এবার তাও হয় নি, কারণ নির্বাচন, তাদের অনেকেই ব্যস্ত। একদিকে ভারতের আরক্ষা বাহিনীর লোকরা বিউগল্ বাজিয়ে ঘোষণা "লাস্ট পোস্ট", অন্য দিকে চোখ বুজে লোকেরা করে প্রার্থনা। আর চলে কিছু লোকের চরকা কাটা। কালো মার্বেলের সমাধিতে ফুল। বাইরে মোটর গাড়ির ভিড়। তকমা-আঁটা ড্রাইভার। লাউডস্পীকারে গান বাজে "একলা চল একলা চল একলা চল রে।" কোথায় যেন একটা প্রবল বেসুর : আড়ম্বর আর সহজমরতা-সারল্যের।

সেদিন স্মৃতিশালাতেও বাজছিল গান্ধীজীর প্রিয় কয়েকটা গান, যার ভিতর ছিল কয়েকটি রবীন্দ্র সংগীত। আর রামধুন। "বন্ধু অথবা শত্রু, আমি কাউকে বাঁচিয়ে কথা বলব না, যদি প্রশ্ন ওঠে সম্মান-আচরণ থেকে বিচ্যুত হওয়ার।" উদ্ধৃতিটা পড়ে আশেপাশে চাইলাম দর্শক-দের দিকে। অধিকাংশই সাদাসিদে লোকেরা। তাদের চোখেমুখে শহুরে জলুস নেই, অধিকাংশই প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ। যুবক-যুবতী খুব কম। একটা ইস্কুলের একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। ভিড় নেই। মৃত্যুদিবস বলে অনেকে এসেছে।

বিশেষ আকর্ষণের ছিল একটা পিস্তল, যেটা দিয়ে নাথুরাম গডসে তাঁর প্রাণহরণ করল ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪৮। বিরলা ভবনে। রাস্তার নামকরণ হয়েছে "তিস্ জানুয়ারী মার্গ। বিরলা ভবনে ঐ স্থানটিতে একটি বেদী। ওটির উপর খোদিত আছে "হায় রাম।" রাজঘাটের সম্মান বেদীতেও তাই লেখা, যে-দুটো শব্দ গান্ধীজীর মুখে শেষ উচ্চারিত হয়েছিল।

যে-বাড়িতে "মোনিয়া" (মোহনচাঁদ করম-চাঁদ গান্ধীর ডাকনাম) জন্মেছিল ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে, তারও একটি ছবি আছে। মায়ের নাম পুতলিবাঈ, পিতা করমচাঁদ। "মোনিয়া"-র সাত বছরের একটা ছবিও আছে। আলফ্রেড হাইস্কুলে উনি পড়তেন, তারও একটা ছবি, আরও লণ্ডনে যে-বাড়িতে থেকে ব্যারিস্টারি পড়েছেন (৫২, সেণ্ট স্টিফেন্স্ গারডেন্স্), দক্ষিণ আফ্রিকায়

গান্ধী স্মৃতিশালার একটি কক্ষ

'হায় রাম' কাঠ খোদাই—গান্ধী স্মৃতিশালায় রক্ষিত

বোয়ার যুদ্ধের সময় ভারতীয় অ্যাম্বুলেনস কোরের সদস্য, এক জোড়া চপ্পলের ছবি যা কিনা গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকার নেতা স্মাটস্‌কে দিয়েছিলেন।

"আমার জীবন একটা খোলা বই-এর মতো। লুকোবার কিছু নেই।"

কাচের বাক্সে সংরক্ষিত গান্ধীজী ব্যবহার করতেন টর্চবাতি (ছোট), ঘড়ি (যা কোমর থেকে ঝুলত), জপের মালা, আর তিন-বাঁদরের পুতুল—খারাপ কথা বলব না, শুনব না, খারাপ জিনিস দেখব না। একটা জলের গেলাস, কাচের যা থেকে পানীয় নিয়ে উনি রাজকোটের উপবাস ভেঙে ছিলেন। একটা পেনসিলের অবশিষ্ট। উনি ওটাকে শেষ অবধি ব্যবহার করার জন্যে কাগজের একটা নল লাগিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর চশমা, খড়ম, নকল দাঁত, দাঁতের মাজন (লেখা আছে "বাদামকে ছিল্‌কা জ্বলাকর নমক্‌ ঔর কয়লেকে সাথ্‌ পিসা হুয়া")। একটা প্লাসটিকের কাপ-পেয়ালা। অতি সাধারণ খাবার থালা, পাথরের বাটি গেলাস (কলকাতায় ব্যবহার করেছেন), হাত পাখা ইত্যাদি।

তাঁর শিষ্যদের তুলনায়, যারা রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্যে গান্ধীজীর নাম ব্যবহার করেন, অনাড়ম্বর জীবনের কী সাক্ষ্য। নিজের কাছে যেন লজ্জা লাগে মনের গভীরে নিজেদের আবশ্যকতার লম্বা লিস্টি দেখে।

"নম্রতাহীন সেবা হল স্বার্থপরতা।"

আর সেই পিস্তলটা। খুব ছোট্ট, কালো, ঠিক যেমনটি আজকাল বাজারে হামেশা বিক্রি হয় আর বাচ্চারা পটাস পটাস করে ফোটায়। একটা পাষাণ বুলেটের আদেক। সেদিনকার পরা কাপড়টায় রক্তের ছাপ। আজ শুকনো পাতলা খয়েরি রঙের ছোপ ছোপ।

"আমি আমার কাজ শেষ করেছি। তারপর কী?" এ-কথা কটাও ওঁর বলা সেই জানুয়ারির ৩০ তারিখে, ১৯৪৮-এ।

তারপর, রাজঘাটে জ্বলেছিল চিতা। লক্ষ লক্ষ নরনারী ফেলেছিল চোখের জল। নেহরু বললেন, "আমাদের জীবন থেকে আলো নিবে গেছে, আর সর্বত্র শুধু অন্ধকার।" পরপর অনেকগুলো ছবি। তামার একটা পাত্র যাতে ছিল চিতাভস্ম। সে-ভস্ম ত্রিবেণীতে উৎসর্গ করা হয়েছিল ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮।

"আমি চলে যাওয়ার পর কোনো একজন-মাত্র লোক আমার সম্পূর্ণে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না। আমার সামান্য কিছু আপনাদের অনেকের ভিতর বেঁচে থাকবে। যদি প্রত্যেকে মূল উদ্দেশ্যকে প্রথম স্থান দেন আর নিজেকে দেন শেষ স্থান, শূন্য স্থান অনেকাংশে ভরবে।"

নিজের বাড়িতে স্মৃতিশালা খোলা হল ১৯৬১-তে। মিউজিয়ম রয়েছে মাদুরা, বোম্বাই, এবং ব্যারাকপুরে। পাটনায় একটা খোলা হবে। দিল্লির স্মৃতিশালার কাজ ১৯৪৮ থেকে আরম্ভ হয়, এবং ১৯৫১ সনে কোটা হাউসের হাটমেন্টে প্রথম খোলা হয়, তারপর যায় ৫ নম্বর মানসিং রোডে। নিজের (গান্ধী স্মারক নিধি) দোতলা ভবনে আসে ১৯৫৯-এ, কিন্তু রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ স্মার উদ্ঘাটন করেন ১৯৬১-তে, ৩১শে জানুয়ারী।

বড় লাইব্রেরি আছে, প্রায় ১০ হাজার বই। নিচের তলায় আরেকটা ঘরে নানা দেশের চরকা। উপর তলায় মিউজিয়ম। ছবিগুলোতে সন-তারিখ দেওয়া উচিত, যতগুলোতে পারা যায়। শুধু অমুক এ-আই-সি-সিতে গান্ধীজী বলাই যথেষ্ট নয়, কিম্বা "রাজকোট উপবাস" নয়, লেখা থাকা প্রয়োজন, কবে, কোন্‌ সনে, কোথায়। ইচ্ছা করলে ফটো-গুলো আরো ভালো ছাপা হতে পারে, এবং সহজ ভঙ্গিমাও। এবং আরো প্রয়োজন, পাঁচমিশালী না করে, মাস-সন অনুযায়ী তাদের সংস্থাপন করা। আশা করি সম্পাদক শ্রী এস কে দে মহাশয় নজর দেবেন।

"আমি ঘৃণা করি বিশেষ অধিকার এবং একচেটিয়া অধিকার। যা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায় না। আমার কাছে তা নিষিদ্ধ"—বাপুজী।

খগেন দে সরকার
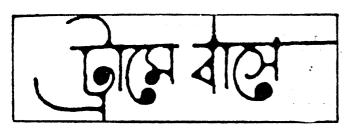
কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীকামরাজ কলিকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন, বিত্ত নয়, শ্রমের পূজো হইবে।—"পূজোর নাম করলেই আমাদের বারোয়ারির কথা মনে পড়ে এবং ওই সংগে চাঁদার প্রশ্ন মনকে নাড়া দিয়ে যায়। তাই ভাবছি, শ্রমের পূজোয় না আবার পাড়ার ছেলেরা চাঁদার খাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে"—বলেন খুড়ো।

এই বছরে রেল বা জেটে ঘাটতির কথাও আমরা শুনিয়াছি। শ্যামলাল বলিল—"এই রকম হাটে পাতিল ভাঙার

সংবাদের জন্য আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না, মনে হলো, এ যেন অন্য একটি আকস্মিক রেল দুর্ঘটনা!!"

নির্বাচনের প্রাক্কালে বিহারে নাকি একটি প্রচার-পুস্তিকা বিতরণ করা হইতেছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, কেহ যেন মাতালকে ভোট না দেন। শ্যামলাল বলিল—"কারোর নাম উল্লেখ না করেও বলা যায়, পুরনো দলিল-দস্তাবেজে এই নীতির কোন সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সে কথা থাক। মাতালরা যদি প্রতিবাদে আমরণ অ-পান ধর্মঘট করে বসেন তাহলে সরকারকে সমূহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে এবং উচ্চপর্যায়ের কমিশন বসিয়েও সমস্যার কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না!!"

নির্বাচনী সভাপ্রসংগে প্রায় প্রত্যহ খবর পাওয়া যাইতেছে, সভা পন্ড করার উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর লোক চীৎকার করিয়া এবং জুতা ছুঁড়িয়া নানা বাধার সৃষ্টি করিতেছেন। এবং যে-সব সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বুঝিতেছি, গো-হত্যা বন্ধের প্রশ্নই এই সব বিক্ষোভের প্রধান কারণ।—"বিক্ষোভকারীরা একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, গো-হত্যা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেলে পরবর্তী নির্বাচনে সভা-পন্ডের জন্য জুতো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

ট্রাম-কর্তৃপক্ষ নাকি বলিয়াছেন যে, ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি না করিলে কর্মীদের সুবিধা দেওয়া অসম্ভব।—"সুতরাং আশংকা করছি, অচিরেই হয়ত ঝিকে মেরে বউ-র পেট ভরানোর ব্যবস্থা হবে"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

এই বছরে রেল বাজেটে ঘাটতির শ্রেণীটি নাকি তুলিয়া দেওয়ার কথা চিন্তা করা হইতেছে।—"শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রেণীহীন পরিবহণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন নিশ্চয় অসংগত নয়। তবে আমাদের কথা হলো, একান্তই যদি এই পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, তাহলে দ্বিতীয়টির বদলে প্রথম শ্রেণীটি তুলে দেওয়াই হবে যুক্তি-সংগত"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

সংবাদে শুনিলাম, এখন হইতে নাকি সন্দেশ পাওয়া যাইবে।—"নির্বাচনের পূর্বে সন্দেশের পুনরাবির্ভাবের কথা আমরা আগেই 'ট্রামে-বাসে' বলেছিলাম। কিন্তু সে কথা থাক। শুনলাম, নূতন

সংস্করণের সন্দেশে নাকি ৪৫ ভাগের বেশী ছানা মেশানো চলবে না। সন্দেশে মেশানো ছানার শতকরা ভাগ সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হতে এক-একটা ল্যাবরেটরির কতদিন লাগবে তা অবশ্যি সরকারী সংবাদে প্রকাশ করা হয়নি"—বলেন সহযাত্রী।

সন্দেশের সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে—সন্দেশ মিলিবে, কিন্তু দুধ কমিবে। শ্যামলাল বলিল—"তা আমরা জানি। পান্ত আনতে লবণ ফুরায়, লবণ আনতে পান্ত-এর সংগে আমাদের পরিচয় বহুদিনের।"

আকরা হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে নাকি একটি এঞ্জিনের উপর ভূত ভর করিয়াছে; শেড হইতে অকস্মাৎ এঞ্জিনটি বাহির হইয়া পড়িয়া চালকহীন অবস্থায় ১৭ মাইল দূরে পর্যন্ত চলিয়া যায়। সকলেরই ধারণা, রেল-দুর্ঘটনায় মৃত এক এঞ্জিন-চালকের ভূতেরই এই কাজ! খুড়ো বলিলেন—"আমাদের দেশের এঞ্জিনে ভূত অবশ্য ভর করে না, তবে শাকচুন্নি ভর করায় অনেক সময় এঞ্জিন অচল হয়ে পড়ে এবং সেটা আরো ভয়াবহ এই জন্যে যে, শাকচুন্নি তাড়াবার রোজা নেই!!"

নির্বাচনী বক্তৃতায় শ্রীজগজীবন রাম বলিয়াছেন, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ দেখা

দিয়াছে একথা তিনি মানিতে রাজী নহেন। তিনি যে-সব সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন তাহাতে ১০ হাজার হইতে ১৫ হাজার শ্রোতার মধ্যে ৬ হইতে ১৬ বছর বয়সের ১৫—২০ জন গন্ডগোল করিয়াছে; ইহাকে গণ-বিক্ষোভ বলে না।—"অর্থাৎ তিনি বলতে চান, তথাপি চ্যাংড়া ন চ ভদ্রলোকাঃ!"

সুরেশ সংগীত সংসদের উদ্বোধনী সভায় সভাপতি শ্রীমান্নাকরণের সরকার বলিয়াছেন, অসংখ্য সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে, কিন্তু সংগীতের মান কি বৃদ্ধি পাইয়াছে? বিশু খুড়ো বলিলেন—"তা মান বেড়েছে বইকি। আমরা সা-রে-গা থেকে মা-রে-গায় উঠেছি!!

জনৈক পত্রপ্রেরকের অভিযোগে প্রকাশ, কলিকাতায় নাকি দানের দ্রব্য অর্থাৎ বিদেশ হইতে প্রাপ্ত বিনামূল্যে বিতরণের পণ্যের উপর দোকানদারি চলিতেছে। উদাহরণস্বরূপে তিনি গ্রীক পিপলদের নিকট হইতে প্রাপ্ত কিসমিসের কথা উল্লেখ করেন। সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা কোন-কিছু দুর্বোধ্য হলে ইংরেজীতে বলি—দিস ইজ গ্রীক টু মি—, গ্রীক পিপলরাও হয়ত ভাবছেন, দিস ইজ ইন্ডিয়ান টু মি, কেননা তাঁরা তো আর পরের ধনে পোদ্দারি কথাটার সংগে পরিচিত নন!!"

আপনি কি চুল ওঠার পাল্লায় পড়েছেন ?

বিপদের সঙ্কেত এইসব লক্ষণ থেকেই বুঝতে পারবেন

চুল পাতলা হওয়া

তরুণ ও সুস্থ সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়েও হয়ত দেখবেন যে চুল ক্রমে উঠে যাচ্ছে আর আপনার মাথায় অকালে টাক পড়ছে। এর কারণ হ'ল আপনার চুলের জীবনদায়ী স্বাভাবিক খাদ্যের অভাব।

মাথায় খুস্কি হওয়া

প্রাপ্তবয়স্কদের মাথায় খুস্কি দেখা দেয়, কখনোই তা অবহেলা করা উচিৎ নয়। চামড়া কুঁচকে যায় ও শুকনো চামড়া উঠে যায়, ফলে চুলের গোড়ায় সাদা ভাব দেখা যায়। খুস্কি থেকে পাওয়া এক বিপদের এই সঙ্কেত পাওয়া যায় যে টাক পড়তে আর দেরী নেই।

চুল সম্পর্কে অবহেলা আর অজ্ঞতা কি ভাবে চুল ওঠার কারণ হ'তে দাঁড়ায়, এই দুজনকে তার যথাযথ নিদর্শন হিসাবে ধরা যায়। এরা বিপদের সঙ্কেত পাওয়া সত্বেও তার প্রতিবিধান করছেন না এবং এরা চুলের যত্ন নিতে অবহেলা করেই চলবেন। আর ফলে অবশেষে একদিন এর জন্য এদের আক্ষেপ করতে হবে। চুলের গোড়া একবার নষ্ট হয়ে গেলে কোন চিকিৎসায়ই তার জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনা যায় না। আপনিও কি বিপদের সঙ্কেতের লক্ষণ দেখে তাকে অবহেলা করেছেন ? তাহলে এর জন্য আপনাকে কি করতে হবে জানেন ? এই সমস্যার একমাত্র উত্তর হ'ল—পিওর সিলভিক্রিন।

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, পিওর সিলভিক্রিনে আছে সেই মূল তত্ত্বের নির্যাস। এটি বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে নিয়মিতভাবে মালিশ করলে পিওর সিলভিক্রিন চুলের গোড়ায় গিয়ে তাকে স্থায়ী স্বাস্থ্যের শক্তিতে পুনর্জীবন দান করে।

সুতরাং আজ থেকেই পিওর সিলভিক্রিন ব্যবহার করতে আরম্ভ করুন। চুলের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে এর চেয়ে সঠিক উপায় কিছু নেই।

চুলের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরো কিছু জানতে হলে আপনি আজই 'অল অ্যাবাউট হেয়ার' শীর্ষক বিনামূল্যে এই পুস্তিকাটির জন্য এই ঠিকানায় লিখুন: ডিপার্টমেন্ট, D-7 সিলভিক্রিন অ্যাডভাইসরী সার্ভিস, পোষ্ট বক্স ৭২৭, বোম্বাই-১।

Silvikrin

সিলভিক্রিন—সুস্থ চুলের সঠিক উপায়

পিওর সিলভিক্রিন

চুলের গঠনের জন্য যে ১৮টি অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয়, এতে সেই মূল তত্ত্বের নির্যাস আছে। একমাসের ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট।

সিলভিক্রিন হেয়ার ড্রেসিং

সাধারণ চুল পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখবার জন্য একটি সুন্দর ড্রেসিং। চুলের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে এতে পিওর সিলভিক্রিন আছে।

SP/MP/2/66

সমাজজীবনে পরিবর্তনের দু-একটি দিক

প্রথমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ এবং পরে বৈষয়িক উদ্যোগের ফলে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থা তথা সমাজজীবনে ধীরে ধীরে হলেও সত্যকার পরিবর্তন ঘটছে। একটি প্রাচীন ঐতিহ্যভিত্তিক, প্রধানত নিস্তেজ সমাজের রূপান্তরিত হয় মন্দগতিতে। পরিবর্তনের ভালো দিকগুলির মধ্যে, দেশে পঞ্চাশটির বেশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ৮ কোটি ছেলে-মেয়েকে স্কুল-কলেজে পাঠানো সম্ভব হয়েছে। গ্রামবাসীদের অর্ধেকের মতো অংশকে বিদ্যুৎ শক্তির আওতায় আনা গেছে। আগের চাইতে অধিক সংখ্যায় ভারতীয় নারীরা অফিস, হাসপাতাল, শিক্ষায়তন, গবেষণাগার ও কারখানায় কাজ করছে এবং পুরুষদের মতোই তারা গুরু দায়িত্ব বইছে। পরিবর্তমান আমাদের সমাজে এভাবে খানিকটা স্থিতি অর্জন করার চেষ্টা চলছে।

সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সম্ভবত তাৎপর্যময় ঘটনা হচ্ছে, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, বিশেষ করে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য। ১৯৫০-৫২ ও ১৯৫৭-৫৯ এই দুই সময়ে হাসপাতালের এক-একটি আসন বা 'বেড'-এর জন্য দেশের অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২,৫০০ এবং ২,২০০। ঐ দুই সময়ে এক-একজন চিকিৎসকের (অনাধুনিক গ্রাম্য চিকিৎসক-দের কথা বাদ দিলে) উপর নির্ভরশীল ছিল যথাক্রমে ৫,৯০০ ও ৫,২০০ লোক।

লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটছে। জীবনের নতুন নতুন সম্ভাবনা সম্বন্ধে গ্রামবাসীরাও আজ আগের চাইতে বেশি সজাগ। আঞ্চলিক জাতীয়বাদ, দলীয় স্বার্থ, ভাষা, সংস্কৃতি ও উন্নয়ন স্তরের বিভেদ থেকে উৎপন্ন কেন্দ্রাতিগ শক্তিগুলি ৫০ কোটি লোকের মানসিক জাগরণই প্রমাণ করে।

নতুন অর্থনৈতিক শ্রেণীর উদ্ভব

পুরানো জাতি বা বর্ণগুলি ক্রমে নানা নতুন অর্থনৈতিক ও বৃত্তিমূলক শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। মৃত্তিকা থেকে যদি বর্ণের উদ্ভব হয়ে থাকে, তাহলে যন্ত্রপাতির ব্যবহারকারী অর্থনৈতিক সম্প্রদায় স্বভাবত গড়ে উঠবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, শিল্প ও শহর অঞ্চলের শ্রমিক বাহিনীর কথা বলা যেতে পারে। আদমসুমারি অনুসারে ১৯৬১ সালে তাদের সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৯০ লক্ষ। এদের মধ্যে অবশ্য সরকারী ও প্রশাসনিক অফিসের কেরানীরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ এবং রেজিস্ট্রীভুক্ত কলকারখানার কর্মীরা অপেক্ষাকৃত ছোট অংশ। দেশে কারিগরি বিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রয়োগ, শিল্পোন্নয়ন এবং কৃষির নির্বাচনমূলক যন্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে সনাতন বর্ণব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে শিথিল হয়ে আসবে।

কেবল বড়ো ব্যবসায়ী, আমলা এবং রাজনৈতিক দলের নিয়ন্তারা নয়, শ্রমিক সংঘ, কৃষক সমিতি ও বৃত্তিমূলক সংগঠন ক্রমে সমাজে শক্তি হিসাবে দেখা দেবে। ইতি-মধ্যেই শহর অঞ্চলের আলোকপ্রাপ্ত ছোট একটি প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রাম অংশের বৃহত্তর একটি প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের হাতে চলে আসছে।

সামাজিক মর্যাদার তারতম্য

সমষ্টি উন্নয়ন ও কৃষি সম্প্রসারণ খাতে অর্থব্যয় থেকে যেমন গ্রাম-দেশের অগ্রগণ্য ব্যক্তিরা সমৃদ্ধ হয়েছে, সেই রকম, কলকার-খানা ও শিল্পের বিকাশ শিল্পপতি বা পরিচালকদের শক্তিশালী করেছে। বিরাট বহরে নির্মাণ কর্ম দেশে এক হঠাৎ বিত্তবান বা ধনী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছে। সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আগের মর্যাদা বা প্রভাব কমে গেছে। বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রবিদ ও কারিগররা একটি নতুন সম্প্রদায় হয়ে উঠেছে। টাকা যেখানে সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তির নির্দেশক, অতিমাত্রায় বিত্তবান ব্যবসায়ী বা হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা ঠিকাদার যে সেখানে যথেষ্ট ক্ষমতাবান হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই; তা সত্ত্বেও কোনো-না-কোনো কারণে সমাজে তাদের একটু নীচু করে দেখা হয়। সম্ভবত, ভারতীয় সমাজে এখন সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার স্থান পেয়ে থাকে ক্ষমতায় আসীন রাজনীতিবিদ এবং তার পরে উচ্চ স্তরের স্থায়ী রাজপুরুষ। দেশের কোনো কোনো অংশে অবশ্য লেখক, সাংবাদিক, সামাজিক কর্মী ও ধর্মীয় নেতাদের একটা আলাদা সম্মান দেওয়া হয়।

ব্যবসানির্ণীত ধারায় সংবাদপত্রগুলির পরিচালনা, ছাত্রদের উপর শিক্ষকদের প্রভাব হ্রাস, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতার অবনতি, বেতার ও চলচ্চিত্রের ব্যাপক প্রসার প্রভৃতির ফলে বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব কমে এসেছে। রাজ-নৈতিক দলগুলির ভেতর আবার সংগঠনে নৈপুণ্য বা বিশিষ্টতা অর্জন করেছে এমন সব মাতব্বরদের প্রতিপত্তি বেড়ে গেছে।

তরুণদের সমস্যা

সমস্যা দেখা দিয়েছে মাঝে মাঝে দেশের তরুণদের নিয়ে। ১৯৬১ সালে ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৪১ ভাগ ছিল ১৪ বছরের কম বয়স্ক। যৌথ পরিবারের ভাঙন, শহরের প্রসার, শিক্ষা অন্তে কাজের সুযোগ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থির কোনো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের অভাব স্পষ্ট কোনো মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব—এই সব কারণে তরুণরা ক্রমশ শিকড়হীন হয়ে পড়ছে। তাদের সামনে অনুসরণযোগ্য কোনো আদর্শ অথবা মহৎ কোনো নেতা বা চরিত্রবান পুরুষ না থাকায় নবযুবকরা ভালো কাজে প্রেরণা বা উদ্দীপনা পাচ্ছে না : বেশ কিছু তরুণ ইতিমধ্যেই বীতশ্রদ্ধ ও উদ্দেশ্যহীন হয়ে ভেসে চলেছে।

উপাদানরাশি ও সম্পদের ব্যবহারে অব্যবস্থা ও অক্ষমতা, প্রশাসনে ব্যাপক দুর্নীতি ও স্খলন যখন প্রকট হয়ে উঠেছে, সে সময় লোকের ব্যর্থতাবোধ ও আশা-ভঙ্গের বেদনা গভীর নৈরাশ্যে পরিণত হতে পারে। দেশের অধিকাংশ মানুষ আত্ম-বিকাশের অধিকার থেকে এখনো বঞ্চিত—যেসব স্বাচ্ছন্দ্য-সুবিধা মুষ্টিমেয় লোক ভোগ করে সেগুলির প্রয়োজন বা ব্যবহার করার যোগ্যতা জনগণের আছে। দরিদ্র লোকরা দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের ভাগ চাইছে এবং তারা আর বেশি অপেক্ষা করতে রাজী নয়। কি শিক্ষা, কি বাসগৃহ ও জীবিকার ক্ষেত্রে সুযোগদানের ব্যাপারে অসাম্য বেড়ে চলেছে : এই অসাম্য কমিয়ে না আনলে সমাজের সংহতি রক্ষা দুরূহ হবে।

শান্তিকুমার ঘোষ

সাদা ডেট পরিষ্কার সাদা ক'রে কেচে দেয়

একমাত্র ডেট-ই আপনার জামাকাপড় অমন উজ্জ্বল সাদা, আর রঙীন কাপড়চোপড় সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে দেয়।

স্বস্তিক অয়েল মিলস্ লিমিটেড বোম্বাই।

[Shilpi SOM. 11 Ben

একত্রিশ

অবনী অনেকক্ষণ হল চলে গেছে।

অবনী যাবার পর মালিনী এসেছিল খাবার নিয়ে; খাবার রেখে টুকটাক কয়েকটা কাজ সারল ঘরের, বাইরের দরজা জানলা বন্ধ করল, করে চলে গেল। যাবার সময়ও দেখল সুরেশ্বর চিঠিপত্র লিখছে। বাইরে থেকে দরজাটা নিঃশব্দে টেনে দিয়ে গেল। ভরতু ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছে, এই সময় তার দেশ-বাড়িতে ক্ষেতীর কিছু কাজ থাকে; ওর ফিরতে ফিরতে সপ্তাহ তিনেক। ভরতু না থাকায় এবং সুরেশ্বরের শরীর খারাপের পর থেকে মালিনীই মোটামুটি সুরেশ্বরের দেখাশোনা করছে। অন্য দিন মালিনী যখন খাবার দিতে আসে, এসে ছোটখাট কাজকর্মগুলো সারে তখন সুরেশ্বর তার সংগে দু-দশটা কথাবার্তা বলে। সস্নেহে ও সকৌতুকে কখনও আশ্রমের অন্তঃপুরের খবর—কি রান্নাবান্না হল, কাকে কি খেতে দেওয়া হচ্ছে, ডাক্তারবাবুদের জন্যে কি ব্যবস্থা হল ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে; কখনও বা রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করে বলে—'হ্যাঁ রে মালিনী, আমার ঘরের সামনে ফুলগাছে এবারে একটাও ফুল দেখলাম না, কি ব্যাপার বল তো?' কখনও আবার হৈমন্তীর কথা শুধোয়। ...আজ খাবার রাখতে এসে মালিনী দেখল, দাদা কাজ করছেন। দু-একটা হুঁ-হাঁ ছাড়া কিছুই বললেন না। মুখচোখ গম্ভীর মনে হল; ব্যস্ত দেখাল। আবার এক এক সময় খুবই অন্যমনস্ক মনে হল, যেন কত কি ভাবছেন। খাবার আনাতে আজ খানিকটা দেরিও হয়েছিল। মালিনী হাতের কাজ সেরে চলে গেল।

মালিনী চলে যাবার সামান্য পরে সুরেশ্বর লেখা শেষ করে উঠল। রাত্রের দিকেই সাধারণত সুরেশ্বর চিঠিপত্র লেখার কাজটা সেরে রাখে। অবনীকে সামান্য এগিয়ে দিয়ে ফিরে এসে সুরেশ্বর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। কিছু করতে ইচ্ছে করছিল না। মন চঞ্চল হয়ে ছিল। পরে যেন মনকে সংযত ও স্থির করার জন্যে প্রত্যহের নিয়মমতন প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র লিখতে বসল। দুটো সাধারণ চিঠি এবং পাটনায় উমেশবাবুকে একটা চিঠি লিখল। তারপর উঠল। রাত হয়েছে; এ-সময় তার খাওয়া-দাওয়া সারা হয়ে যায়।

বাড়ির ভেতরের বারান্দায় হাত ধুতে এসে সুরেশ্বর দেখল, ভেতরে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে, বাতাসে রাত্রের এবং শীতের স্পর্শও অনুভব করা যাচ্ছে, হয়ত রাত হয়ে আসার হিম পড়ছে, চারপাশ নিস্তব্ধ, গাছের পাতায় কদাচিৎ দীর্ঘশ্বাসের মতন শব্দ উঠছে বাতাসের।

শোবার ঘরে এসে খেতে বসল সুরেশ্বর। মালিনী মাটিতে আসন পেতে, জল গড়িয়ে রেখেছে; জালতির গোল ঢাকনার তলায় খাবার; দুধের বাটিটাও গরম করে রেখে গেছে ঢাকা দিয়ে। খাবার বলতে খান-চারেক পাতলা পাতলা রুটি, বোধ হয় মালিনী নিজের হাতেই সেঁকেছে, সেদ্ধ আলু—গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে মাখানো, কড়াইশুঁটি আর টমেটো দিয়ে তৈরী একটা তরকারি।

খেতে বসে সুরেশ্বর আবার অবনীর কথা ভাবল। অবনীর সংগে যেন আরও অনেক কথা হতে পারত, হয় নি। অল্প দু-চারটে কথা অবশ্য অবনী বলেছিল পরে। সেগুলো তেমন কিছু নয়, তাতে তাপ ছিল না, ব্যাকুলতা ছিল না। বোধ হয় একেবারে অকল্পনীয় অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বিহ্বল ও বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল; কি বলবে না বলবে, কি-বা ভাববে ঠিক করতে পারছিল না; মানুষের বদ্ধমূল ধারণা অপ্রত্যাশিতভাবে নাড়া খেলে যা হয়।

অবনী যেন সহজে আর-কিছু ভেবে নিতে পারছিল না। একবার এমনও মনে হল, সে এ-সব বিশ্বাস করতে পারছে না, ভাবছে তাকে জব্দ করার জন্যে সুরেশ্বর মিথ্যে কথা বলেছে। অবিশ্বাস এবং ক্রোধ তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল, কিন্তু তা সাময়িক। বিশ্বাস না করে তার উপায় ছিল না। অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়ার মতন তখন অক্ষম হয়ে নিজের ওপরেই বিরক্ত হচ্ছিল। অবনীর আচরণকে আস্ফালন বলা যায় না, সুরেশ্বরের কাছে সে আস্ফালন দেখাচ্ছিল না—তবু, জীবন সম্পর্কে, জীবনের দুঃখ ও তিক্ততা সম্পর্কে অবনীর যেন কেমন একটা অহঙ্কারের ভাব ছিল, অবনী সেই অহঙ্কার নিয়ে বুঝি লড়তে এসেছিল, এসে দেখল তার অহঙ্কার অর্থহীন। নিজের ব্যর্থতার জন্যে সে বিব্রত, লজ্জিত ও আড়ষ্ট হয়ে গেল।

সুরেশ্বরের মনে হয়েছিল, যদি অবনী তখন অতটা বিমূঢ় ও বিক্ষুব্ধ না হত তা হলে হয়ত আরও কিছু বলত। বলার আবেগ তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল, সে উত্তেজিত হয়েছিল। কিন্তু আঘাত এবং নৈরাশ্য অবনীকে বিপর্যস্ত ও নির্বাক করে ফেলল।
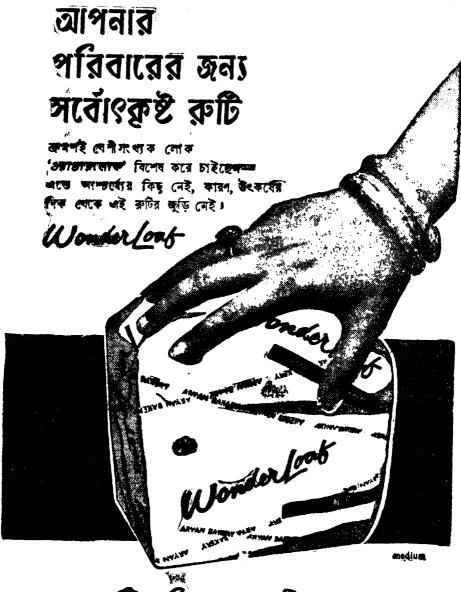
অবনীর চরিত্রে, সুরেশ্বর যতটা তাকে চিনেছে, এক ধরনের ক্রোধ ও বিরক্তি আছে যা অনেকটা আত্মগ্লানির মতন। এই আত্ম গ্লানি তাকে মাঝে মাঝে নির্দয় করে, উত্তেজিত ও অসংযত করে। সুরেশ্বর বুঝতে পারল না, নিজের সম্পর্কে গোপনে অবনীর যে হীনমন্যতা-বোধ তা থেকে এই মানসিক তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে কি না। হতে পারে এটা অন্যতম কারণ।

খাওয়া শেষ হয়েছিল সুরেশ্বরের; উঠে পড়ল। পাত্রগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখল। রাখার সময় চোখে পড়ল, মালিনী কয়েক চামচ চিনিও রেখে গিয়েছিল, দুধের বাটির পাশে কাঁচের ছোট্ট পাত্রে চিনিটুকু পড়েই থাকল।

বাইরে গিয়েছিল, হাত-মুখ ধুয়ে ফিরল সুরেশ্বর; বসার ঘরের দরজা বন্ধ করেছিল আগেই—ও-ঘরে চটের সিলিংয়ের ফাঁক-ফোকরে কাটা চড়ুই বাসা বেঁধেছে, রাত্রে মাঝে মাঝে ফরফর করে ওঠে। সেই রকম একটা শব্দ হল। শোবার ঘরে একটি জানলা খোলা, বাতাস আসছিল। সুরেশ্বর মুখে দুটি লবঙ্গের দানা ফেলে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। মাঠে নরম জ্যোৎস্না ছড়ানো, অল্প অল্প হিম ঝরেছে রাত্রে, চারপাশ অসাড়, নিস্তব্ধ। দূরের দিকে তাকালে হিম-জ্যোৎস্না মাখানো মাঠটা জলাশয়ের মতন দেখাচ্ছিল। কাছাকাছি এবং তফাতের ফুল-পাতার ঝোপ, গাছগাছালি যেন নিদ্রিত।

দূরে মাঠের দিকে তাকিয়ে সুরেশ্বরের হঠাৎ মনে হল, যাবার সময় অবনী তেমন হুঁশের মধ্যে ছিল না, বোধ হয় হেমের সঙ্গে দেখা করেও যায় নি। অস্থিরচিত্ত, বিমর্ষ, অন্যমনস্ক অবস্থায় অবনী যদি সোজা গাড়িতে গিয়ে বসে থাকে, তবে ওই অবস্থাতেই সে চলে গেছে। এত অস্থির মন নিয়ে ওই ফাঁকা দিয়ে মাঠঘাট খানাখন্দ পেরিয়ে অবনী চলে গেল ভেবে সুরেশ্বরের সামান্য দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

জানলা থেকে সরে এল সুরেশ্বর। ঘরের মধ্যে কয়েক পা হাঁটল। ঘড়ি না দেখেও বোঝা যায় রাত হয়েছে। মালিনী মশারি টাঙিয়ে পাশগুলো চালের ওপর তুলে রেখে গেছে। সুরেশ্বর মশারির কোণগুলো আরও একটু টেনে নিল, নিয়ে মশারি ফেলে বিছানার পাশে পাশে গুঁজে নিল। বাতি নিবিয়ে এসে শুয়ে পড়ল।

রাত্রে এখনও শীত আছে, র‍্যাগ গায়ে টেনে নিতে নিতে সামান্য যেন শীত-ধরার মতন লাগল, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। শুয়ে শুয়ে এই শিহরনটুকু দমন করে নিল। খুব সম্ভব সর্দিজ্বরের পর তার শরীরের দুর্বলতাটুকু এখনও পুরোপুরি কাটে নি, সামান্যতেই শীত গায়ে লাগছে।

অন্ধকারে চোখের পাতা বন্ধ করে শুয়ে থাকতে থাকতে সর্বাঙ্গ কেমন অবশ হয়ে এল, অঙ্গগুলিতে যেন সাড় থাকল না, বিছানার স্পর্শও গায়ে লাগছিল না, মনে হল তার চেতনা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। হঠাৎ, এই রকম মুহূর্তে, তন্দ্রার মধ্যে চকিতে সুরেশ্বর স্বপ্ন দেখল। স্বপ্ন দেখল: পালঙ্কের ওপর মার মৃতদেহ, পায়ের কাছে বিনুমাসি, মার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে; মার মাথার কাছে নির্মলা চুপচাপ বসে, মার মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে আছে; আর পালঙ্কের মাঝামাঝি জায়গায় বাবা দাঁড়িয়ে। বাবার হাতে মস্ত বড় একটা রক্ত-মশাল—অনেকটা বাবার শখের কাশ্মীরী ছড়ির মতন; রক্তমশালটা জ্বলছে—তার মুখ থেকে রুপোলী ফুলকি, উজ্জ্বল আভা ঝরে পড়ছে। রক্তমশালের আলোয় মার সর্বাঙ্গ দেখা যাচ্ছিল; মুখ এবং গলা ছাড়া মার সবই আবৃত ছিল। গলায় নীল একটা চওড়া দাগ, কাসসিটের চিক-হার পরে যেন মা ঘুমোচ্ছে।

স্বপ্নটা চকিতে দেখা দিয়েই যেন মিলিয়ে গেল। তন্দ্রাও কেটে গিয়েছিল। সুরেশ্বর অন্ধকারে চোখ চেয়ে আর কিছু দেখতে পেল না।

মার স্বপ্ন অনেক দিন দেখে নি সুরেশ্বর। আজ মাকে দেখতে পেয়ে তার খুব ভাল লাগছিল। যেন হঠাৎ সে বাল্যকালে ফিরে গিয়েছিল এবং বালকের মতন মার পালঙ্কের দিকে ছুটে যাচ্ছিল; কাছাকাছি এসে সুরেশ্বর বুঝতে পারল এবং দেখতে পেল, মা পালঙ্কে শুয়ে নেই—মার মৃতদেহ শোয়ানো রয়েছে। সে আহত হল। পরে সুরেশ্বর একে একে নির্মলা, বিনুমাসি এবং বাবাকে দেখতে পেল। দেখার পর সে আর বালক থাকল না, আবার বয়স্ক-মানুষ হয়ে গেল।

স্বপ্নটা বিচিত্র। মার মৃত্যুর সময় বিনুমাসি বা নির্মলার থাকার কথা নয়। বিনুমাসি তখন তাদের কাছে ছিল না, মা তাকে অনেক আগেই ছুটি দিয়ে দিয়েছিল সংসার থেকে, তীর্থে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এমন কি মার মৃত্যুর খবরও বিনুমাসি দেরিতে পাওয়ায় শ্রাদ্ধের সময় আসতে পারে নি। তবু স্বপ্নে মার মৃতদেহের সামনে বিনুমাসিকে কেমন বেন মানিয়ে গেল।

নির্মলার সঙ্গে মার কোনো রকম যোগাযোগ ঘটার কথাই ওঠে না। মার কথা নির্মলা কিছু কিছু শুনেছিল মাত্র, সুরেশ্বরই বলেছিল। সেই নির্মলা যে কি করে মার মাথার সামনে এসে বসল, কে জানে. স্বপ্নে সবই সম্ভব। তবু নির্মলাও খুব বেমানান দেখাচ্ছিল না। সবচেয়ে যা অদ্ভুত এবং বেমানান তা হল বাবা। বাবা যে কি করে ছড়ির মতন লম্বা একটা রক্ত-মশাল জ্বালিয়ে মার পালঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল, কে জানে। বাবা কি দেখাতে চাইছিল?

সুরেশ্বর যেন ভাববার চেষ্টা করল, বাবা কি বেশে দাঁড়িয়েছিল। মনে করতে পারল না। কলকাতার কাজ সেরে যখন বাবা বাড়ি ফিরত বাবার পোশাকের কিছু অদলবদল ঘটত। দামী সিল্কের পাঞ্জাবি, ফরাসডাঙ্গার ধুতি, হাতে ছড়ি, পায়ে চকচকে পাম-শু। একবার বাবা যখন কলকাতায় গিয়ে মাস খানেক পরে ফিরল, যেদিন ফিরল, পরের দিনই সকালে মাকে মার শোবার ঘর থেকে ফাঁস-খাওয়া অবস্থায় বের করে আনতে হয়েছিল। বাবা তখনও নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে. আকাশটা সেদিন মেঘে মেঘে কালো হয়ে ছিল সকাল থেকেই. বৃষ্টি পড়ছিল. থামছিল, পড়ছিল। ঝাপটা দিচ্ছিল। মেঘ ডাকছিল।

সুরেশ্বর মার মৃত্যু এবং আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলো বিচ্ছিন্নভাবে মনে করছিল এবং ভাবছিল। দেশের বাড়িতে মার নিজের ঘরটি ছিল পূব মুখো, জানলা খুললে নদীর একটা দিক দেখা যেত, আর দেখা যেত আদিগন্ত ফসলের মাঠ—নদীর ওপারে। মার ঘরে ভারী ভারী সেকালের প্রচুর আসবাবপত্র ছিল। যখন মার মাথার গোলমাল শুরু হয়ে গেল তখন একে একে এবং নিজের খেয়ালে মা সব ঘর থেকে বের করে দিতে লাগল; বিলিতী একটা কাঁচের মস্ত আয়না, শোবার পালঙ্ক আর গহনার সিন্দুক ছাড়া মার ঘরে আর কিছু ছিল না শেষ পর্যন্ত। পানের বাটা আর সোনার দাঁত-কাঠিও থাকত। মার রূপের অহংকার ছিল না, তবু যখন খুব অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ত তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সেই অসামান্য রূপ নিজেই দেখত, কোনো কোনো সময় কোনো লজ্জাও রাখত না। বাবাকে এ সময় ধারেকাছে কোথাও দেখা যেত না। অবশ্য বাবা দাম্পত্য সম্পর্ক মার সঙ্গে রাখে নি; সাংসারিক সম্পর্ক রেখেছিল। দিনের বেলায় বাবার খাবার সময় দিনান্তের মধ্যে একবার মাত্র মা বাবার সামনে এসে বসত এবং তখনই যা দেখা-শোনা কথাবার্তা হত স্বামী-স্ত্রীতে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, মা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় আত্মহত্যা করেছিল। কিন্তু সুরেশ্বরের পরে সন্দেহ হয়েছিল, মা যেদিন আত্মহত্যা করে সেদিন বাবা কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর রাত্রে মার ঘরে গিয়েছিল এবং মা ও বাবার মধ্যে কোনো রকম কলহ হয়েছিল। খুব সম্ভব মা সেদিন জানতে পেরেছিল কলকাতায় বাবার উপপত্নীর গর্ভজাত আর-একটি সন্তান আছে। মার অহংকারে এবং সম্মানে, হয়ত আভিজাত্যে এটা লেগেছিল। যদিও বাবার ভোগসুখের বিষয়ে মা অবহেলা দেখিয়েছে, অন্য রমণীর সঙ্গে বাবাকে বসবাস করতে দিয়েছে, তবু মা বাবার এই দ্বিতীয় সন্তানকে সহ্য করতে পারে নি। বাবা মাকে কি বলেছিল, কি কলহ হয়েছিল তা সুরেশ্বর জানে না। এ সবই তার অনুমান। আত্মহত্যার পর মার ঘরের দরজা ভেতর থেকে খোলা ছিল, এবং বাবা যে মার ঘরে গিয়েছিল তার প্রমাণ হিসেবে বাবার সিগারেট-কেস মার ঘরে পড়ে ছিল। পরে শ্রাদ্ধান্তে বাবা যেদিন মার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জন করছিল—সেদিন বাবা নিজের অজ্ঞাতসারে যেন কলহের বিষয় কিছু বলে ফেলেছিল। সুরেশ্বর ছাড়া অন্য কারও তা জানার কথা নয়। সুরেশ্বরও তখন ভাল বোঝে নি।

বাবা যে কেন এ-রকম একটা অবস্থায় রঙমশাল জেলে দাঁড়িয়ে থাকল সুরেশ্বর বুঝতে পারছিল না। মার মৃত্যু কি বাবার কাছে উৎসবের বিষয় হয়েছিল? [illegible] মনোরথের মতো [illegible] বাবা রঙমশাল জ্বালিয়ে[illegible] মার মৃত্যুতে বাবার লাভ বা [illegible] কিছুই হয় নি। [illegible] বাবার বাধা ছিল না, [illegible] বাবার কোনো বাধা দূর করে [illegible] মার মৃত্যুর পরে বাবা যে আবার বিবাহ করেছে, বা কলকাতার রাখা উপপত্নীকে পত্নীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে এনেছে, তাও নয়। তা হলে এমন কি আনন্দের কারণ ঘটল যাতে বাবা রঙমশাল জ্বালিয়ে মার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে!

স্বপ্নের অর্থ আবিষ্কারের জন্যে সুরেশ্বরের অস্থির বা ব্যাকুল হবার কোনো কারণ ছিল না। সে ব্যাকুল হচ্ছিল না। তবু এই অদ্ভুত বিসদৃশ ছবিটি তাকে খানিকটা অন্যমনস্ক দিচ্ছিল। আরও কিছুটা এলোমেলো ভাবনার পর তার মনে হল, বাবা যেন মার তরফের ছবিটি দেখবার
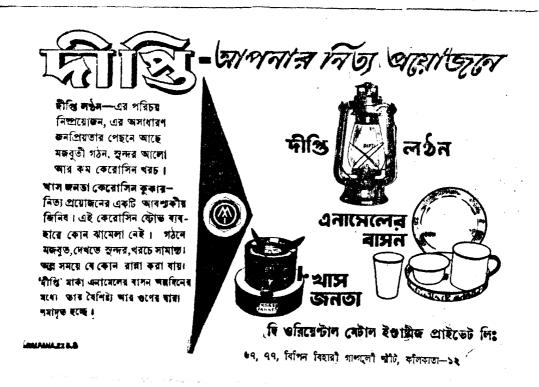
জন্যে রঙমশাল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, হুস হুস করে রুপোলী ফুলকি ছড়িয়ে যে উজ্জ্বল আলো জ্বলছিল—বাবা সেই আলো দিয়ে মাকে চেনাচ্ছিল: 'ওই তোমার মা, মূর্খ, অহঙ্কারী, পাগল; মরতে জানে, বাঁচতে জানে না। ওর সমস্ত জীবন ওইভাবে কেটেছে—পালঙ্কের ওপর চুল ছড়িয়ে শুয়ে, দাসীর হাতে আলতা পরে। তুমি ভেব না বিনু কাঁদছে, বিনু তোমার মার পায়ে আলতা পরিয়ে দিচ্ছে।'

চিন্তাটা সুরেশ্বরের যেন তেমন মনঃপূত হল না। সে অন্য কিছু ভাবতে গেল, ভাবতে গিয়ে দেখল, এই স্বপ্নের মধ্যে বাবা একটি পৃথক অংশ এবং মা, নির্মলা, বিনুমাসি অন্য অংশ; বাবা জীবনের সেই অংশ—যেখানে জীবনের অর্থ: ভোগ, স্ফূর্তি, সুখ, অপচয়, অসংযম, স্বার্থপরতা, নীচতা—এমন কি নিষ্ঠুরতা। মা, নির্মলা, বিনুমাসি—জীবনের অন্য অংশ; যেখানে মূর্খতা, অভিমান, অহংকার, নৈরাশ্য, বেদনা সহিষ্ণুতা, স্নেহ, প্রেম—এমন কি আত্মনিগ্রহ।

সুরেশ্বর এবার যেন অনেকটা সন্তুষ্ট হল। বাবা যে জীবনকে ভোগ করেছিল, এবং ভোগ করতে বসে বিবেকে কোথাও বাধা পায় নি তাতে সন্দেহ নেই। দীর্ঘকাল বাবা বাঁচে নি; যতদিন বেঁচে ছিল নিজেকে রঙমশালের মতন পুড়িয়ে ফেলেছে। তার জন্যে বাবার না অনুশোচনা, না দুঃখ। এমন কি বাবা তার উপপত্নীর এবং সেই সন্তানের জন্যেও কোনো মায়া-মমতা অনুভব করে নি, তাদের জন্যে কিছু রেখে যায় নি, দিয়ে যায় নি; ভোগের বিষয়, বস্তু ও তার পরিণতির মতন ওদের দেখেছে।... বাবার চরিত্রে নীচতা এবং নিষ্ঠুরতারও সীমা নেই।

মার মৃতদেহের পাশে নির্মলা এবং বিনুমাসি যে কেন বসে ছিল—এবার সুরেশ্বর বুঝতে পেরে আর অবাক হচ্ছিল না। মার পাশে ওদের মানায়, যদিও ওরা এক নয়। স্বতন্ত্র এবং পৃথক হলেও এই অংশে জীবনের বিষাদ এবং ব্যর্থতা, শোক ও ক্রন্দন রয়েছে। মার আত্মহত্যা, নির্মলার মৃত্যু—এরা একরকম নয়; মার ভাগ্য বিড়ম্বনা বা নির্মলার ভাগ্য এক নয়; মার মধ্যে নির্মলার সেই অদ্ভুত উদাসীনতা, নির্লিপ্তি, সহিষ্ণুতা, ঈশ্বর-বিশ্বাস ছিল না। বিনুমাসি বেচারী একেবারে সাদামাটা, স্নেহ মমতা ছাড়া তার রূপ নেই চরিত্র নেই, সন্তানের মতন লালন-পালন করেছে সুরেশ্বরকে; তবু বিনুমাসি দুঃখী; দুঃখী কারণ বিনুমাসি সারা জীবনেও নিজের জন্যে কিছু পায় নি।

সহসা স্বপ্ন-বিষয়ক চিন্তাগুলি এলোমেলো হয়ে মন থেকে সরে গেল, গিয়ে অবনীর কথা মনে পড়ল সুরেশ্বরের। এবং কেমন যেন অজ্ঞাতসারেই সে অবনীকে স্বপ্নের ছবির মধ্যে দাঁড় করাতে গিয়ে দেখল অবনীর কোথাও স্থান হচ্ছে না। বাবার পাশে অবনীকে দাঁড় করানো যায় না—যদিও বাবার চরিত্রের একটি জিনিস অবনীর মধ্যে আছে: অপচয়—জীবনকে অপচয় করার কামনা। নির্মলা, মা এবং বিনুমাসির দিকেও অবনীকে রাখা যায় না, যদিও অবনীর কোথাও গভীর কোনো বেদনা ও নৈরাশ্য রয়েছে। অবনী ওদের মতন নয়, কোথাও যেন আলাদা।

সুরেশ্বরের হঠাৎ মনে হল, অবনী তার পিতার উপপত্নীর পুত্র হতে পারত, হলে অবাক হবার মতন কিছু ছিল না; যদিও অবনী তা নয়, তার বাবার উপপত্নী থিয়েটারের অভিনেত্রী ছিল না। ভাগ্যের দিক থেকে উভয়ক্ষেত্রে একটা সাদৃশ্য রয়েছে এই মাত্র।

অবনী তাকে সংসার এবং জীবন চেনাতে এসেছিল। সুরেশ্বর যেন সামান্য বিহ্বল বোধ করল। কাতর হল। আমি কি জীবনের কিছু দেখি নি? বাল্যকাল থেকে যাদের দেখেছি তারা তো আমার জীবনের বাইরে ছিল না, তারা কেউই এই সংসারের বাইরেও নয়। আমার জন্যে কোনো আলাদা ব্যবস্থা হয় নি সংসারে, আমি ভাগ্যমন্ত ছিলুম না, সংসারের অনেক নোংরামি, কদর্যতা, হৃদয়হীনতার সঙ্গে আমার আজন্ম পরিচয়।

বালক বয়স থেকে আমি একা, আমার কোনো সঙ্গী ছিল না, আমি মার নজরে নজরে শিশুর মতন বেড়ে উঠেছিলাম। মার সব সময় ভয় ছিল আমি অপঘাতে মরব। জানি না কেন, মার মনে এই ধারণা জন্মেছিল। বাবাও আমার শত্রুতা করতে পারে—মা এরকমও ভাবত। ফলে বাবার সঙ্গে আমার পিতা-পুত্রের সম্পর্কটা কোনো কালেই আন্তরিক হয় নি। সেদিক থেকে আমাকে পিতৃহীন বা পিতার পালিত-পুত্রও বলা যায়। মাও আমার সঙ্গী ছিল না। আমার ওপর মার দৃষ্টি ছিল মাত্র, অন্তর ছিল না। একদিন মা শীতের দুপুরে রোদে চুল এলিয়ে বসে পানের বাটা পাশে রেখে বিন্তি খেলছিল, আমি কাছাকাছি জায়গায় খরগোসের খাঁচা নিয়ে বসে খেলছিলাম, খাঁচার মধ্যে থেকে খরগোসটা কি করে যেন বেরিয়ে এসে দালান বেয়ে তরতর করে পালাল; আমি ছুটে তাকে ধরতে যাচ্ছিলাম; মা বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস?' বললাম, আমার খরগোসটা পালিয়েছে। মা বলল, থাক, পালাকগে যাক্, তুই যাবি না। অন্য খরগোস আনিয়ে দেব।'...মা যতদিন বেঁচে ছিল কোনো দিনই আমার নিজের জিনিস নিজেকে ধরে রাখতে, বেছে নিতে দেয় নি। মার আঁচলের তলায় তলায় বেড়ে ওঠা ছাড়া আমার কোনো স্বাধীনতা ছিল না, মুক্তি ছিল না। আমি যে ছেলেবেলায় কিছুটা নির্জীব, সঙ্গীহীন, ভীতু ছিলাম তা মার

জন্যে। মা মারা যাবার পর আমার আশে-পাশে আর দেওয়াল থাকল না, বাবা আমায় অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিল, কারণ আমাদের মধ্যে কোনো গভীর ও আন্তরিক সম্পর্ক না থাকায় বাবার পক্ষে তখন আমায় স্বাধীনতা না দিয়ে উপায় ছিল না। আমি জীবনের সেদিকে যেতে পারলাম না—যেখানে অগণিত মানুষ স্নান-যাত্রায় চলেছে, যেখানের জল গন্ধক-কূপের মতন টগবগ করে ফুটছে। সুযোগ এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমি উল্লাসের দিক থেকে সরে থেকেছি।

ভাবনাগুলো এলোমেলো হয়ে গেল: সুরেশ্বর যেন হঠাৎ কেমন একটা ব্যবধানে সরে এল। কিছুক্ষণ আর তার উৎসাহ থাকল না, অনেকটা দূরে বসে উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকার মতন সে অতীতের দিকে তাকিয়ে থাকল, বিশেষভাবে সে কিছু দেখল না। তাকিয়ে থাকতে থাকতে খাপছাড়া ভাবে সে এটাসেটা মনে করতে এবং দু'-চারজনকে যেন দেখতে পেল। কোথাও তার মন বসল না। শুধু পুরোনো এক বন্ধু—দিবাকরকে মনে পড়ল; মনে পড়ল দিবাকর বলত : 'আমি রোজ রাত্রে একবার করে লাইফের ব্যাটারিটা চার্জ করিয়ে নি, বুঝলি; সকালে একেবারে

নিউ ব্যাটারি; শালা—কম ছুটতে হবে...।' সুরেশ্বর মনে করতে পারল, কলকাতায় হোস্টেলে থেকে বি-এ পড়ার সময় দিবাকর একদিন কোথায় পালিয়ে গেল, মাসখানেক পরে জানা গেল সে ভদ্রেশ্বরের দিকে রেলে কাটা পড়েছে। কি করে, কেন, কি কারণে এ-সব ঘটেছিল কেউ জানল না। কিন্তু দিবাকরের জীবনে দৌড়টা বেশিদিন টিকল না।

সুরেশ্বর তার যৌবনে দিবাকরের দলে ছিল না, কিন্তু সে দিবাকরের মতনই সরল, জীবন্ত ছিল, শিষ্ট ও নম্র ছিল। দিবাকর তাকে ভালবাসত, বলত: 'তুই বড় সাবধানী, হচ্ছ আর এ ক্যাটু..., তোর শালা কখনও কিছু হবে না।...ওরে সাবধানী পথিক—বারেক পথ ভোলো—; ...পোয়েট বলেছে পথ ভুলতে, তুই শালা একেবারে সিধে সড়কে চলেছিস।'

হয়ত দিবাকর ঠিকই বলেছিল, সুরেশ্বর সাবধানী ছিল। সাবধানী মানে এই নয় যে, সে জীবনের বাইরে বাইরে ছিল। তার কখনও মনে হয় নি, জীবন নিয়ে খেলা করে কিছু পাওয়া যেতে পারে। সে মধুর, সন্তুষ্ট, শিষ্ট থাকতে চেয়েছিল, এবং জীবনের প্রতি তার আবেগ ছিল সাধারণ মানুষের মতন। তার বন্ধুরা তাকে বরাবর ভালবাসত, মাস্টারমশাইরা স্নেহ করত, হেমেদের বাড়িতে সবাই তাকে পছন্দ করত।

এইভাবে যৌবনের প্রথমটা কাটল, তারপর আবার দেশবাড়িতে গিয়ে থাকতে হল, বাবা মারা গেল, সংসারে একেবারে একা, জমি-জায়গা সম্পত্তি, কলকাতা থেকে বাবার উপপত্নীর সেই সম্পত্তি দাবি করে চিঠি, মামলা করার শাসানি। সুরেশ্বর কলকাতায় চলে এল আবার।

জীবনের এই পর্বটাও সুখে দুঃখে, কখনও ক্ষোভে, কখনও রোমাঞ্চে ভরা। সম্পত্তির সমস্যাটা মিটোতে হল বলে সুরেশ্বরের কখনও ক্ষোভ হয় নি, সে স্বেচ্ছায় যা দেবার দিয়েছিল। তারপর হেম ...হেমের অসুখ...

সুরেশ্বর এখানে আবার যেন বাধা পেল এবং চিন্তা কিছুটা এলোমেলো হয়ে গেল। হেমের অসুখ, জীবন-মৃত্যুর সেই দ্বন্দ্ব, হেমের সেই অসহায়তা, তাদের সংসারের মাথার ওপর আকস্মিক সেই বজ্রপাত—এ-সব এখন অতি দূরের অস্পষ্ট ছবির মতন হয়ে গেছে। অস্বীকার করে লাভ নেই, তখন সেই বয়সে এবং অবস্থায় সুরেশ্বর হেমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। যৌবনের সেই প্রেম তাকে উদ্বেলিত করেছিল, হেমের জন্যে তার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। হেমের সাহচর্য, সঙ্গ, হেমের সুস্থতা তার একমাত্র কাম্য বিষয় ছিল। হেম যখন সুস্থ হয়ে উঠল তখন সুরেশ্বরের জীবনে এমন একটা স্বাদ এসেছিল যা আগে আর কখনও সে অনুভব করে নি। হেমের দেহমন যেন তার, হেমের নিশ্বাস যেন তার শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে মিশ্রিত, হেমের হৃদয় যেন তার হৃদয়ের অন্তর্ভুক্ত।

এই সুখ, এই স্বাদ, এই আনন্দ মনে হয় নি কোনোদিন নৈরাশ্য আনবে। অথচ কি যেন হল, হেম আর তার আনন্দের কারণ হয়ে থাকল না। কি যেন নেই, কি যেন হারিয়ে গেছে, কোথায় যেন কিছু শূন্যতা থেকে যাচ্ছে—এ-রকম একটা ভাব ছিল মনে। অবসাদ লাগত। মনে হত, এই প্রেম কি আমায় সব দিতে পারে? কেন এ-রকম হতে শুরু হয়েছিল সুরেশ্বর জানে না। তার শুধু মনে হত কোথাও যেন একটা মিথ্যা আছে। হয় তার মনে, না হয় এই প্রেমে।

এমন সময় নির্মলার সঙ্গে তার পরিচয়। নির্মলা তার পরিণত যুবক বয়সের মনটিকে যেন কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। বিশ্বসংসারে এত দুঃখ, বেদনা, বঞ্চনা, অসুস্থতা, ব্যর্থতা আছে যার বুঝি পরিসীমা নেই; তবু মানুষ কি আশ্বাসে বাঁচবে? কেন বাঁচবে? নিরর্থক জীবনধারণে কোন সান্ত্বনা আছে? নির্মলা বলত : আছে—কিছু আছে; খুঁজে দেখ না কি পাও!

নির্মলার সংস্পর্শে এসে সুরেশ্বর তার চরিত্রের নকল সাজসজ্জাকে চিনতে পেরেছিল, অনুভব করতে পেরেছিল সে কত অকর্মণ্য, কোথায় তার স্বার্থ, কী ভীষণ তার অহংকার, ভীরুতা, কত অবজ্ঞেয় তার উদারতা। জীবনের সঙ্গে তার নিষ্ক্রিয় সম্পর্ককে আবিষ্কার করতে পেরে সুরেশ্বর তখন বেদনার্ত হয়েছিল।

অন্ধকারে কে যেন সহসা বলল, 'নির্মলা তোমায় কি দিয়েছিল?'

সুরেশ্বর অন্ধকারের মধ্যে প্রায় নিশ্বাসের মতন সুরে এই প্রশ্নটি তার কানের কাছে শুনতে পেল। শুনে বিস্মিত হল না, বিভ্রান্ত হল না। নির্মলা তাকে কি দিয়েছিল এ কথা কি বলা যায়!

'নির্মলা তোমায় সংসার থেকে, জীবন থেকে, ভালবাসা থেকে দূরে সরিয়ে দেয় নি?'

সুরেশ্বরের এবার যেন হাসি পেল। নির্মলাই শেষ পর্যন্ত জীবনে যতটুকু দেবার সুরেশ্বরকে দিয়েছে।

সে আমায় এই বৃহৎ সংসারে অকস্মাৎ যেন ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেল। আমি একা, আমি নিরাশ্রয়, আমার কোনো সান্ত্বনা নেই, সাহস নেই, বিশ্বাস নেই, উদ্দেশ্য নেই। কি মূল্য তবে এই জীবনের? কেন আমি বাঁচব? কি আমি পেতে পারি?

এই শূন্যতা এবং অবিশ্বাসের মধ্যে আমি আমার জীবনের অর্থ অন্বেষণ করতে চাইছিলাম। কলকাতা ছেড়ে আমি চলে গেলাম। সেই যে—ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর—সেই রকম। আমি সাধু সন্ন্যাসী ফকির, বিদ্বান বুদ্ধিমান, ধর্ম-প্রতিষ্ঠান—নানা জায়গায় ঘুরেছি। আমার কোনো সান্ত্বনা জোটে নি। এমন কিছু পাই নি যাতে মনে হয় আমার হৃদয় জুড়োলো। অথচ আমি অনুভব করতাম, নির্মলার দেওয়া সেই শেষ আবিরটুকু আমার কপালে দিব্য চুম্বনের মতন আঁকা আছে। কিছু আমায় পেতেই হবে।

অবশেষে একদিন আমার কাছে আমার জীবনের অর্থ ধরা দিল।

'সেটা কি?'

সুরেশ্বর এবার হাসল যেন, বলল: আজ আমায় ঘুমোতে দাও।

সুরেশ্বরের চোখের পাতা বুজে এসেছিল। (ক্রমশ)

হাইনৎস মোডে

কলকাতার ডায়েরি

নরম্যান ব্রাউন

হাললে-র মারটিন লুথার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাইনৎস মোডে-র বাড়িতে যদি আপনি কোনদিন যান, তাহলে আপনাকে বসতে দেওয়া তাঁর পক্ষে একটু কঠিন হবে। না, অতিথি-বাৎসল্যে কোন ঘাটতির জন্য নয়, আসলে বসার জায়গা খুঁজে বের করাই প্রায় অসম্ভব। তার কারণ গোটা বাড়ির দেয়াল মেঝে ছাপিয়ে সর্বপ্রকার আসবাবপত্রকে পর্যন্ত গ্রাস করে বসে আছে বই। টেবিলে বই, চেয়ারে বই, খাটে বই। বাড়ির মালিকেরই এমন অবস্থা যে, বইয়ের তাড়ায় শীগগীরই ঘরছাড়া হতে হবে। মোডে আনডার গ্রাউন্ড্ একটি ঘর তৈরি করেছেন, কিন্তু তাতেও কুলোচ্ছে না।

বইয়ের অধিকাংশই ভারত বিষয়ক। ভিনটারনিৎস, লেভ্রনি, তুচি, লেভি প্রভৃতির মত এযুগের আর একজন বাঘা পণ্ডিত এই হাইনৎস মোডে। বছর কয় আগে কলকাতায় এসেছিলেন একবার, আবার আসেন সম্প্রতি। ছিলেন মহাবোধি সোসাইটিতে। তার কারণ ইদানীং তিনি বৌদ্ধধর্ম নিয়ে পড়েছেন।

শুধু বৌদ্ধশাস্ত্রে নয়, ভারত-বিদ্যার প্রায় সব দিকেই তাঁর অত্যাশ্চর্য জ্ঞান। বাংলার ব্রতকথা থেকে শুরু করে মহেনজোদারোর লিপি—সব তাঁর নখদর্পণে। মা দুর্গার আদিবাহন কী, 'মহিষ' আর 'মহিষী'-র মধ্যে সম্পর্ক আছে কিনা জানতে হলে মোডে-র অভিমত নেওয়া যেতে পারে।

বেঁটেখাট তে-হারা চেহারা, সর্বদা সীরিআস। ভারতবর্ষে মোডে-র সবচেয়ে নিকট বন্ধু বোমবাইয়ের সলিল ঘোষ। তিনিই আমাকে ১৯৬১ সালে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন এই জারমান ভারতবিদের সঙ্গে। ভারত সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে এবং আমার নিজের অজ্ঞানতার বহর দেখে ভারতবাসী হিসাবে বারবার লজ্জায় পড়েছিলাম।

এই মোডে র মতই আর একজন বাঘা ভারতবিদ নরম্যান ব্রাউন। তাঁর সঙ্গেও সেই একই সময়ে বোমবাইয়ে আলাপ হয়েছিল। দুজনেই এসেছিলেন সেখানকার রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিক উৎসবে যোগ দিতে।

ব্রাউন সম্প্রতি এসেছেন কলকাতায়। ইতিমধ্যেই নানান জায়গায় বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃতের অধ্যাপক। ভারত, বিশেষ করে বাংলাদেশের সব খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে খবর তিনি রাখেন।

মাস কয় আগে আনন্দবাজার পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক শ্রীযুক্ত সরোজ আচার্যের সঙ্গে আমেরিকায় দেখা হয়েছিল নরম্যান ব্রাউনের। ব্রাউন আনন্দবাজারের নাম শুনেই বল্লেন, 'আপনারা তো সংবাদ পরিবেষণে চলতি বাংলা চালু করেছেন।'

শ্রীযুক্ত আচার্য বিস্মিত, আরও বিস্মিত যখন ব্রাউন বললেন, 'অ-তৎসম শব্দ ভেঙে বানান সংস্কারের কাজেও তো আপনারা হাত দিয়েছেন।'

❋

আলাউদ্দিন খাঁ দীর্ঘকাল প্রবাসী তবু এখনও তাঁর নাম বাঙালীদের মনে জাদুর মত কাজ করে। অনেকদিন তাঁকে কলকাতার কোন সংগীত আসরে দেখা যায় নি, তবু অন্য কারও বাজনা শুনলেই তাঁর নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে।

সম্প্রতি-গঠিত 'সুরেশ সংগীত সংসদের' সাধারণ সম্পাদক শ্রীকানাইলাল বসু খাঁ সাহেবকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তাঁর জবাবে তিনি যে উত্তর দেন, তার প্রতিলিপি হুবহু তুলে দিলাম। দু'-একটি বাংলা বানানের ভুল, চিঠির কাগজের ফরগেট মি নট, লতাপাতা জড়ানো ফুল ইত্যাদি সব মিলিয়ে বাংলার গৌরব এই গুণীবৃদ্ধের সরলতা চমৎকার ফুটে উঠেছে ওই চিঠিতে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, আলাউদদিন খাঁ এখনও আমাদের মধ্যে বেঁচে রয়েছেন, কিন্তু শুভময় ঘোষের একখানা চটি বই বাদ দিলে তাঁর অত্যাশ্চর্য জীবন নিয়ে আজও কোন

৫.১২.৬৬.

আলাউদদিন খাঁর লেখা চিঠি
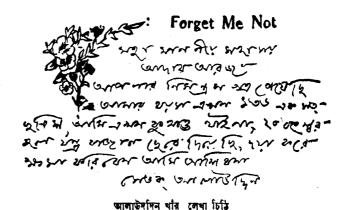
বড় বই লেখা হল না। দুটি তথ্যচিত্র তৈরি হয়েছে, তার জন্যে প্রযোজকদের ধন্যবাদ: কিন্তু বাংলা দেশের প্রকাশকরা এই ব্যাপারে এত নিরুৎসাহ কেন?

❊

ফুটবলে ক্রিকেটে ভারত এখনও জগৎজোড়া খ্যাতি আনতে পারে নি, তবু ওই দুটি খেলার মাঠে ভিড়, টিকিট নিয়ে মারামারি, কাড়াকাড়ি। আর ওদিকে হকিতে বিশ্বের এক নম্বর এবং টেনিসে দু' নম্বর দেশ হওয়া সত্ত্বেও হকি কিংবা টেনিস খেলার মাঠে যখন-তখন টিকিট পাওয়া যায়। রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামে হয়ে গেল বড় হকি খেলা, কিন্তু স্টেডিয়াম ফাঁকা।

সাউথ ক্লাবে এশিয়ান লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ দেখতে গিয়েছিলাম। ফাইন্যালের দিন শেষ মুহূর্তে গিয়েও টিকিট পেয়েছি।

ভাগ্যিস, হুজুগে-বাজদের ওদিকে এখনও নজর পড়ে নি, নইলে আমার খেলা দেখা হত না।

❊

গুরুগোবিন্দ কী ছিলেন? না পাঞ্জাবী নয়, বাঙালী। তাঁর জন্ম পাটনায়, ওই সময় বিহার বাংলা দেশের ভিতরে। অতএব শিখদের দশম গুরু গোবিন্দ সিংহও নিশ্চয়ই বাঙালী।

এই মত আমার নয়, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের। সম্প্রতি ময়দানে গুরুগোবিন্দ সিংহের ত্রিশত জন্মবার্ষিক উৎসবে বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি ওই কথা বলেছেন।

যাই হোক, গুরুগোবিন্দ বাঙালী কিনা, সে আলোচনা পরে। অনেকে বলেন, বড়-বাজার যেমন মাড়োয়ারীর, বালিগঞ্জ দক্ষিণ ভারতীয়ের, তেমনই ভবানীপুরের নাম পালটে ফিরোজপুর রাখা যেতে পারে।

তা ছাড়া অনেকে বোধ হয় জানেন না, জব চারনক আসার আগে স্বয়ং নানক কলকাতায় এসেছিলেন। খুব সম্ভব ১৫০৩ সালে।

❊

কে বলবে হাতের লেখা—একেবারে টাইপ রাইটারের অক্ষর। আমার সামনে বসেই ভদ্রলোক কলম-কাগজ টেনে চটপট লিখে গেলেন। ভুলে লোখ যেন টাইপ করা দরখাস্ত।

এই অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারীর নাম শংকর চ্যাটার্জি, থাকেন বসিরহাট। বললেন, 'অভ্যাসে সব সম্ভব।'

❊

কিছুদিন আগে চৌরংগী রোডে এক অসাধারণ পদযাত্রী ভূপর্যটককে দেখা যায়। এক পা কাঠের তবু হনহন ছুটে চলেছেন।

জর্জ পেইলোর বাড়ি প্যারিসে। ছয় বছর বয়সে এক দুর্ঘটনায় পা হারান। ১৯২৫ সালে প্রথম তিনি বিশ্বপরিক্রমায় বের হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই পরিক্রমা স্থগিত রাখতে হয়। ১৯৪৬ সালে আবার বের হন। প্রায় আশী হাজার মাইল পার করে কলকাতায় এসেছেন।

ভদ্রলোকের বয়স এখন ৬২।

❊

তারিখ আর বারের হিসাব কী কুক্ষণে লিখেছিলাম, তারপর চিঠির পর চিঠি। কেউ লিখছেন 'সব মিলছে দারুন ব্যাপার'; কেউ জানাচ্ছেন 'মিলছে না, কী করি বলুন তো?'

অনেকে জানতে চেয়েছেন, মোট যোগফল সাত দিয়ে ভাগ করার পর অবশিষ্ট যদি কিছু না থাকে, তবে কী বার হবে?—

অবশিষ্ট শূন্য হলে বার হবে শনি।

—চাণক্য

বাংলা বানানে সু-নীতি কু-নীতি

অমিতাভ চৌধুরী

বাংলা বানানে সু-নীতি কু-নীতির প্রশ্ন তুলেছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। উপলক্ষ আনন্দবাজার পত্রিকায় অ-তৎসম কিছু বানানের নতুন রীতি। গত ২১ মাঘ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় 'বাঙলা অক্ষরে ইংরেজী নাম ও শব্দ' শীর্ষক রচনায় তিনি আনন্দবাজারের "অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ" জানিয়েছেন।

সুনীতিবাবুকে ধন্যবাদ, এই নতুন রীতি চালু হওয়ার দীর্ঘ দেড় বছর পর তাঁর সুচিন্তিত মতামত জানা গেল। ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদ-অংশে যখন বানান সংস্কার আরম্ভ হয়, সাধারণ কিছু লোকের মধ্যে হইচই পড়ে, কয়েকটি কাগজে তা নিয়ে ঠাট্টা ইয়ারকিও চলে; কিন্তু পন্ডিত ব্যক্তিদের মতামত আহ্বান করা সত্ত্বেও তাঁদের নীরবতা আমার কাছে বিস্ময়কর ঠেকে। কিছু পাঠক তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন, জবাবও দেওয়া হয়; অথচ আড়ালে আলোচনা করা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কেউই তার সমর্থনে বা প্রতিবাদে এগিয়ে আসেন নি। একমাত্র ব্যতিক্রম অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন। তিনি বানান-সংস্কারে আনন্দবাজারের নতুন চেষ্টাকে অভিনন্দন করে এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। (দ্রঃ বাংলা ভাষা এবং বাংলা বানান, আনন্দবাজার পত্রিকা ২-৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।) তিনি বলেন, "১৮৬৫ সালে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের দ্বারা বাংলা ভাষার এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল, আর ১৯৬৫ সালে তার শতবার্ষিক উৎসবের প্রায় সমকালেই আনন্দবাজার পত্রিকায় চলতি ভাষার স্বীকৃতির দ্বারা আর-এক নবযুগ সূচিত হল। শুধু তাই নয়, এ স্বীকৃতির দ্বারা বস্তুত দুর্গেশনন্দিনীর শতবার্ষিক উৎসবকেই যথার্থরূপে সার্থক করে তোলা হল। ১৯৬৫ সাল শুধু ভাষা সংস্কারের জন্য নয়—বানান সংস্কারের একটি বৃহৎ প্রয়াসের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

এই 'স্মরণীয়' ঘটনার প্রতি অবশেষে দৃষ্টি পড়েছে ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের। আনন্দবাজার কীভাবে বানানে অরাজকতা চালিয়ে বাংলা ভাষার সর্বনাশ ঘটিয়ে চলেছে, তার ভূরি ভূরি উদাহরণ তিনি হাজির করেছেন। সবিনয়ে স্বীকার করি, সুনীতিবাবুর মত দিগ্বিজয়ী, অথবা আদৌ পন্ডিত আমি নই, তাঁর তুলনায় আমার ভাষাজ্ঞান ভাসা-ভাসা, তবু বলতে বাধা হচ্ছি, ভাষাচার্যের সব বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। কারণ, তিনি আগাগোড়াই ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে গিয়েছেন। পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে অকারণে "দ্বিমাত্রিক" ইত্যাদি এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক মাত্রাতিরিক্ত ও অতিসূক্ষ্ম পান্ডিত্যের ধোঁয়া ছড়িয়েছেন। যত দূর মনে পড়ে, আনন্দবাজার পত্রিকায় পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এই সংস্কারের বেলায় তৎসম শব্দের উপর হাত দেওয়া হবে না। হয়ও নি। অথচ তিনি আনন্দবাজার কর্তৃক 'সংস্কৃত' বানানে সংস্কৃত শব্দাবলীর অপদস্থ হওয়ার উদাহরণ পর পর সাজিয়ে গিয়েছেন। রসিকতা করে বলেছেন, 'নন্দ' হবে 'ননদ', 'কর্ম' 'করম', 'চন্দ্রগুপ্ত' 'চনদরগুপত' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু গত দেড় বছর ধরে দেখে আসছি, কদাচিৎ দু-একটি মুদ্রণ-প্রমাদ বাদ দিলে সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডার কোন 'অপচেষ্টাই' আনন্দবাজার করেনি।

বাকি রইল অন্য শব্দ। অ-সংস্কৃত, বিশেষ করে বিদেশী শব্দগুলির উচ্চারণ-বিকৃতি না ঘটিয়ে ভেঙে ফেলার সার্থক চেষ্টা আনন্দবাজার করেছে। তাই ইদানীং লেখা হয় মারকিন, আফরিকা, ভরতি, উসকানি ইত্যাদি। সুনীতিবাবুর ধারণা ভুল— আনন্দবাজারের বিতৃষ্ণা 'রেফ'-এর উপর নয়, অ-সংস্কৃত শব্দে রেফের খোঁচা যথাসম্ভব উপড়ে ফেলা অন্য আরও দশটি সংস্কারের একটি মাত্র। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সংস্কারকরাও তৎসম শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ করেন নি, তাঁরা নিঃসন্দেহ ছিলেন, অ-তৎসম শব্দের সংস্কার সাধনে সমতা ও সরলতা এনেই ভাষা শিক্ষার, লেখায় ও মুদ্রণের পথ সুগম করা সম্ভব। আনন্দবাজার সেই পথেই চলেছে, তার বেশী নয়।

এখন প্রশ্ন, এই বানান সংস্কারের প্রয়োজন আছে কি না। আছে। সুনীতিবাবুর কথামতই ভাষা যদি বহতী নদীর মত গতিশীল এবং প্রাণবান হয়, তা হলে তার আধার বানানও প্রয়োজনের তাগিদে পরিবর্তিত হতে বাধ্য। আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে বাংলা বানান সংস্কারের ভার নিয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথাবাগীশদের উষ্মা সত্ত্বেও বহু শব্দের অনাবশ্যক দ্বিত্ব বর্জন করা হয়েছিল। বর্ণহানি সত্ত্বেও শব্দগুলির 'দ্বিজত্ব' যায়নি, 'সূর্য' তেমনই ভাস্বর, 'পূর্ব' যথাপূর্ব। আবার ক খ গ ঘ যদি পরে থাকে, তবে পদের অন্তস্থিত 'ম' স্থানে অনুস্বারের বিধানে 'সংগীত' কিছুমাত্র মাধুর্য হারায় নি, 'সংকট' নিয়ে কেউই তেমন সংকটে পড়েন নি।

সুনীতিবাবুর প্রশ্ন, পরিবর্তনের আবশ্যকতা আছে কিনা এবং পরিবর্তনের মধ্যে যৌক্তিকতা আছে কিনা। তাঁর মতে, সব দিক বিচার করে দেখে এর উপযোগিতা ও উপকারিতা কোথায় তার নির্দেশ দিতে হবে, "কেবল বদলাইতে হইবে বলিয়াই বদলানো, ইহার কোন অর্থ হয় না।"— সুনীতিবাবু বোধ হয় ১৯৬৫ সালের ৩০ জুলাই তারিখে আনন্দবাজারে প্রকাশিত কয়েকজন পত্রলেখকের সওয়ালের জবাব পড়েন নি, পড়লে এই প্রশ্নগুলি তুলতেন না। এবং এই সংস্কার-প্রচেষ্টা যে শুধু বদলানোর জন্য বদলানো" নয়, তাও উপলব্ধি করতেন।

উপরের প্রশ্নগুলির উত্তর তিনি অবশ্য নিজেই দিয়েছেন; বলেছেন, বাংলা বানানে দোষত্রুটি অসম্পূর্ণতা আছে, তবে তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন না করে বিবর্তনের পথে যাওয়া উচিত এবং "সমগ্রভাবে পরিবর্তনের আবশ্যকতা দেখা যাইতেছে না।" শুধু তাই

নয়, তাঁর মতে পরিবর্তনগুলি জোর করে চাপানো, তাতে কোন লাভ বা উপকার হবে না।

সুনীতিবাবুর এই মতই যে জোর করে চাপানো, তা প্রমাণ করা কঠিন নয়। তবে তাঁকে ধন্যবাদ, তিনি স্বীকার করেছেন যে, "সমগ্রভাবে" পরিবর্তনের দরকার নেই, অর্থাৎ আংশিকভাবে করা চলে। আনন্দবাজার সেই আংশিক পরিবর্তনেই উদ্যোগী হয়েছে।

সুনীতিবাবুদের আপত্তির কারণ বুঝি। যে-কোনও সংস্কারে প্রথম বাধা আসে অভ্যাস থেকে। শব্দগুলির একটি করে চিত্র আমাদের মনে ছাপা আছে। নতুন রূপ তার সঙ্গে সবটা মেলে না, খটকা জাগায়। কিন্তু অভ্যাস অজরামরবৎ শাশ্বত পদার্থ নয়, বদলায়। আস্তে আস্তে সবই সয়। ক্রমে অপরিচিত রূপটিই পরিচিত হয়ে ওঠে, আর সেটি যদি সহজতর হয়, তবে আরও বেশী মনোমতও হয়ে যায়। তা ছাড়া নতুন শিক্ষার্থীদের বেলায় অভ্যাসের প্রশ্ন তো ওঠেই না। আগে থেকে জটিলতার জাল যথাসম্ভব খুলে দিলে সহজ বানান সহজ-পাঠকে সহজতর করতে পারে। আমরা যেন বিশেষ করে যারা অনাগত, যারা শিশু এবং বাংলা শেখায় আগ্রহী বিদেশীদের কথা মনে রাখি।

বাংলা হরফে লাইনো চালু করার জন্য সুনীতিবাবু আনন্দবাজারের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু আশা করি তাঁর স্মরণে আছে, লাইনো যখন প্রথম চালু হল, তখন গোড়ার দিকে অনভ্যাসের ফোঁটা কেমন চড়চড় করেছিল। আপত্তি উঠেছিল নানা দিক থেকে। কালে কালে তাও সয়ে গিয়েছে। এই নতুন বানান-রীতিও সয়ে যাবে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বানানের এই ঈষৎ সংস্কারে যিনি বিচলিত, সেই সুনীতিবাবুই ভাষাকে আরও সচল এবং বহুতরজনগ্রাহ্য রূপ দেবার জন্য রোমান হরফের দাবি জানিয়েছিলেন। নাকি হিন্দী সম্পর্কে তাঁর মত-বদলের মত এই ব্যাপারেও তাঁর বদলে গেছে মতটা?

ভাষার প্রথম দাবি সচলতার। সংযুক্তাক্ষরে বঙ্গ-ভাষার বন্ধন ঈষৎ শিথিল না হলে তার চাল-চলনের আড়ষ্টতা দূর করা অসম্ভব। ছাপাখানা এবং টাইপরাইটারের কাজে জড়িত ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন বাংলা যুক্তাক্ষর পদে পদে কী অমিত্র-অক্ষর। বাহাত্তর ইনচি বহরের আঠারো হাত ধুতি নিয়ে ট্রামে-বাসে চলার মতই যুক্তাক্ষরে জড়ানো বাংলা ভাষা পদে পদে হোঁচট খায়, দু-পা এগোতে না এগোতে জিরোতে চায়।

তাই ভাষাকে যদি সচল করতে হয়, যদি আধুনিক প্রয়োজনের উপযোগী করতে হয়, তা হলে যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। সেই কারণেই সংবাদের ভাষায় প্রথমে কথ্যরীতি প্রবর্তনের পর আনন্দবাজার এগিয়েছে অ-সংস্কৃত শব্দের যুগল-বিচ্ছেদে। তৎসম শব্দে আপাতত হাত না দিয়ে পরীক্ষা চলছে প্রধানত বিদেশী ও কিছু তদ্ভব শব্দের বানানে। 'মর্কট', কিন্তু 'করপোরেশন'। চলছে মারকিন, ইনজিনিয়ার, ট্যাকসি, সেকরেটারি।

নিশ্চয়ই প্রশ্ন উঠবে যে, বানানের এই অভিনবত্ব কেন? প্রধানত মুদ্রণের প্রয়োজনে। প্রত্যেকটি শব্দের পিছনে রয়েছে ব্যাকরণ আর উচ্চারণ। ব্যাকরণ আর উচ্চারণ ঠিক রেখে যদি মুদ্রণের প্রয়োজনে শব্দের বন্ধন ভাঙা যায়, তা হলে শুধু এতদিনকার অভ্যাসের প্রশ্নকে আমল দেওয়া উচিত নয়। বর্তমানের এই পরিবর্তনও 'বিবর্তনমূলক', 'বিপ্লবাত্মক' নয়। বিগত শতকে এবং এই শতকের প্রথম দিকে মুদ্রিত বহু গ্রন্থ সাক্ষী, কিছু দিন আগেও পূর্বসূরীরা লিখতেন 'কোর্ত্তে', 'ধর্ত্তে', 'বোল্লে'; কিন্তু এখন ভেঙে লেখা হয় 'করতে', 'ধরতে', 'বললে'। কই, কেউ তো এতদিনকার অভ্যাসের কথা এখন তোলেন না! আর যেহেতু ল+চ'-এর সমাহারে কোন যুক্তবর্ণ চলিত নেই, সেইজন্যে 'বলচে' কিন্তু বরাবরই লেখা হয়েছে বিশ্লিষ্ট করে। বিশ্বাস, কেউ ব+ল+চে করে পড়েন নি।

ঠিক তেমন বোমবাই, মাদরাজ, মসকো, হানটার ইত্যাদি লিখলেও আপত্তি তোলা সাজে না। তাতে উচ্চারণ ঠিকই থাকে, উপরন্তু সহজ হয় টাইপরাইটারে বা লাইনোতে ছাপা। কিছুদিন বাদ বাংলা টেলিপ্রিন্টারও চালু হবে। লণ্ডনকে 'লনডন' করাতে সুনীতিবাবুর আপত্তি। তাঁর মতে ওটা পড়া হবে 'লনোডনো'। মোটেই না। তাই যদি হত, তা হলে 'লণ্ডন'কেও 'লণ্ডনো' পড়া হত। কেউ কখনো পড়েছেন বলে শুনিনি। তা ছাড়া ঢনঢন করে ঘণ্টা তো 'ঢনোঢনো' করে বাজে না, 'ঢনঢন' করেই বাজে। জানি না কোন্ পাণিনির বিধানে আছে যে, ইংল্যাণ্ডের রাজধানীর নামের ড-য়ের সঙ্গে মূর্ধন্য-ণ অবশ্যই বসবে।

'খণ্ডন' আর 'লণ্ডন' এক ব্যাপার নয়। 'খণ্ডন' শব্দটিকে খণ্ড খণ্ড করা নিশ্চয়ই অনুচিত, কিন্তু লণ্ডনকে লণ্ডভণ্ড করতে আপত্তি কীসের? তা ছাড়া লনডন, আকরা, আফরিকা লেখায় যদি এতই আপত্তি, তা হলে আমরা কেন লিখি না—"ঢণ্ডন করে ঘণ্টা বাজতেই যদু স্যাক্রার ছোক্রা ছেলে জাফ্রিকাটা বেড়ার আড়ালে হাতে জাফ্রান মাখতে মাখতে ডুক্রে কেঁদে উঠল!" অদ্যাবধি কোন কবিই, কর্পূর-এর সঙ্গে মেলাতে 'ভর্পূর' সৃষ্টি করেন নি। আমরা 'কারবার' 'কারচুপিই' লিখি, 'কার্বার', কিংবা 'কার্চুপি' লিখি না। 'কারোবারো বা কারোচুপি' পড়িও না। অতএব 'হারবার' এবং মারকিন'দোষ কী করল? উচ্চারণেও এইসব শব্দের দ্বিতীয় অক্ষর স্বরান্ত হয় না। 'বারবার' যদি 'বারোবারো' না পড়ি, তা হলে লনডন কেন 'লনোডনো' পড়ব, মারকিন পড়ব 'মারোকিনো'? মূল ইংরেজী উচ্চারণের দোহাই যদি পাড়া হয়, তা হলে 'লণ্ডন' লিখলেও আদত ইংরেজী উচ্চারণের নাগাল আমরা পাব না।

সুনীতিবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন,

হিন্দীতে লেখা হয় লখনৌ, আমরা বাংলায় লিখি লক্ষ্ণৌ। এতদিন চলে আসছে বলে ওই 'লক্ষ্ণৌ' বানানটিকেই কি জিইয়ে রাখতে হবে? হিন্দীওলাদের কেউ তো কখনও লখোনউ পড়ে না। (লখনৌকে লখনউ লেখা আরও যুক্তিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গায় লিখেছেন 'মউমাছি'।) তা হলে সাধারণ শব্দকে অকারণে কেন সংস্কৃত রূপ দিয়ে অ-সাধারণ করে রাখব? সিনথি-র সংগে সৈরিন্ধ্রীর কোন সম্পর্ক নেই, তবু আমরা জটিলতা বাড়াতে জায়গাটিকে 'সিন্থি' না বানিয়ে ছাড়িনি। হায়দরাবাদকে হায়দ্রাবাদ করেছিলাম কোন্ শুদ্ধির বাতিক থেকে? অজমেরে "আজমীঢ়", এই আষাঢ়ে বানানই বা এসেছিল কেন? 'ক্ষ'-এর উচ্চারণ বাংলায় কখনই ক+ষ নয়, তবু শেক্স্‌পিয়ারকে শেক্ষপীয়র এবং ম্যাক্স্‌মুলারকে মোক্ষমূলর বানানোর চেষ্টা করেছিলেন সংস্কৃতনবিশেরা, পারেন নি। সুনীতিবাবু নিজেও 'শুদ্ধোর' আদলে 'কক্তো' না লিখে 'ককতোই' লিখেছেন। কল্কে শব্দটিকে 'কলকে' লিখলে যদি বাংলা ভাষার জাত যায়, তা হলে 'কলকাতা' না লিখে কল্কাতা লেখাই উচিত ছিল। কলকাতা-কে তো কেউ 'কলোকাতা' পড়ে না। সুনীতিবাবু তাঁর নিজের রচনাতেই (দ্রষ্টব্য : বাংলা অক্ষরে ইংরেজী নাম ও শব্দ নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার প্রথম কলমের শেষের দিকে) লিখেছেন 'নাগরী'। 'নাগ্‌রী' না লেখা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু ওটা 'নাগোরী' ভেবে বিসাম্‌ত হইনি।

পরিচিত দেশী বা বিদেশীর সরলীকরণে বিভ্রান্তির আশঙ্কা কম। অসুবিধা দেখা দিতে পারে কম চেনা এবং হাল-আমলানির বিদেশী শব্দে। সে ক্ষেত্রে কিছুকাল হসন্তের শরণ নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে উচ্চারণ ঠিক রেখে যদি অসংস্কৃত শব্দ কিছু কিছু ভাঙা যায়, তা হলে ওটাকে যথেচ্ছাচার বা অরাজকতা বলা যায় না। উচ্চারণে দেবদাস না দেবোদাস, দেবতা না দেবোতা না দ্যাবতা, মেঘনাদ না মেঘোনাদ, দেশবিদেশের নানা অঞ্চলের নানা মত, তবু তাতে হস্-চিহ্ন না দিয়েও চমৎকার কাজ চলছে। সুনীতিবাবু লিখেছেন, বাংলা উচ্চারণে বোম্বাই ও বোমবাই এক নয়। ম্ব—এই সংযুক্ত অক্ষর ব্যবহার করলে ব্যঞ্জন দুটির মধ্যে কোনও ফাঁকের আমেজ একেবারেই থাকে না, কোন উদ্ধৃত্ত বিরামের স্থান এতে নেই। তাই উচ্চারণ-তত্ত্বের দিক থেকে বোম্বাই ও বোমবাই পৃথক। সূক্ষ্ম বিচারে তাঁর কথা হয়ত ঠিক, কিন্তু 'বোম্বাই' শব্দটি কি আমরা 'বোম-বাই' উচ্চারণ করি না? ম এবং ব যুক্ত করে লিখলেও "ফাঁকের আমেজ" থেকে যায়। 'হরতাল শব্দটিতে হর এবং তাল-এর মধ্যে ফাঁকের আমেজ থাকার কথা নয়, কিন্তু কই ওটা তো কখনও 'হর্তাল' লেখা হয় না, হরতাল-ই তো চলছে। রেফের প্রতি বিরাগ আনন্দবাজারের একচেটিয়া নয়, কারবার, কারচুপি, হরতাল, চুরমার ইত্যাদি শব্দের বানানে সুনীতিবাবু সমেত অন্য সকলেই তা দীর্ঘকাল দেখিয়ে আসছেন। তা ছাড়া উচ্চারণের সূক্ষ্মতা কি আমরা সবাই মানি। মানলে অমিত, অতুল না লিখে লিখতাম 'ওমিৎ' ও 'ওতুল'। এবং 'রমণীর মন' পূর্ববঙ্গীয়রা লিখতেন 'রোমণীর মন', পশ্চিমবঙ্গীয়রা 'রমণীর মোন'। আসল কথা, উচ্চারণ চলে তার আপন পথে এক-এক অঞ্চলের অভ্যাস বশে, বানানের বেড় দিয়ে উচ্চারণকে পুরোপুরি বাগ মানানো যায় না।

সুনীতিবাবু বলেছেন, 'শ্রী' শব্দটিকে 'শ্‌রী' বা শরী লিখে বানান সহজ করার চেষ্টা করলে আমাদের বাংলা লিপিসৌন্দর্য শ্রীহীন হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই, শুধু লিপি-সৌন্দর্যের খাতিরে নয়, সংস্কৃত শব্দ বলেই ওইগুলিতে এখন হাত দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, আনন্দবাজারও হাত দেয়নি। (যদিও ইতিমধ্যেই প্রাকৃত উচ্চারণে শ্রীপদ 'ছিরি-পদ' হয়ে গিয়েছে এবং 'ছিরিছাঁদ' শব্দটি সর্বত্র চালু।) কিন্তু সংগে সংগে এই কথাও স্মরণ রাখা দরকার, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও যুক্তাক্ষরের প্রতি কম-বেশী স্বভাবজ বিরূপতা 'সারা ভারত-বর্ষেই'—'ইসকুলের' ছাত্র থেকে 'ইসটিশনের' রেলযাত্রী পর্যন্ত। এমন কি পানজাবের 'ইন্দর' ও বাংলার 'রামোচন্দোর'ও একই স্বাভাবিক ঝোঁক থেকে সহজিয়া রূপ নিয়েছেন।

সুনীতিবাবুর সংগে আমি একমত যে, নার্স-কে 'নারস', পার্ককে 'পারক' লিখলে উচ্চারণ-বিভ্রাট দেখা দিতে পারে। পার্ক সার্কাসকে 'পারক্ সারকাস' না 'পার্ক সারকাস' লিখব, প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, শব্দের অন্তে পর পর দুটি হসন্ত উচ্চারণ থাকলে তা বাংলায় অপাঠ্য হয়ে যায়। 'দস্তয়েভস্কি' তাঁর বইয়ের মতই বাংলায় সুপাঠ্য। পারক যদি 'পারোক' হয়, তা হলে 'জেমস' কী? 'জেমোস'? ম এবং স-এর তলায় হস্ চিহ্ন না দিয়েও তো আমরা তা পড়ি না। আবার জেম্স্‌-ও কেউ লেখেন না।

'জেমস'-এর সংগে সংগে মনে পড়ে 'বন্ড্'। 'বণ্ড' না লিখে আমার মতে বরং 'বনড্' লেখাই উচিত। কেননা 'বণ্ড' শব্দটি যদি হস্ চিহ্ন ছাড়া হাজির করি, তা হলে খণ্ড, ষণ্ড, ভণ্ড ইত্যাদির অনু-করণে 'বণ্ডো' উচ্চারণের প্রবণতা দেখা দেবে। তারচেয়ে 'বনড্' লিখলে ওই সম্ভাবনা থাকে না।

সুনীতিবাবু 'টরেনিং', 'বিরিটিশ', 'পর-

কেন্সর' ইত্যাদি বানানের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বিদেশী শব্দের প্রারম্ভিক যুক্তাক্ষর ভাঙার কোন চেষ্টাই আনন্দবাজারে হয়নি। তাদের খেয়ালমত করার কথাও নয়। তা ছাড়া সব ভাঙতে না পারলে কোনটাই ভাঙা উচিত নয়—এই যুক্তিও ধোপে টেঁকে না। যুক্তাক্ষরের কাঁটা কিছু সরাতে পারলেও কাজ হবে। তাতে ধীরে ধীরে গড়ে-ওঠা আমাদের বানান-পদ্ধতিকে 'ওআন ফাইন মরনিং' নস্যাৎ করে দেওয়া হয় না।

এই নতুন রীতিতে আতঙ্কিত হবারও কোন কারণ নেই, এটা সংস্কৃত যুক্তাক্ষরের প্রতি বিতৃষ্ণা নয়, আগেই বলেছি, বাংলা ভাষার লিখন-রীতিকে সরল করার চেষ্টা। এই সরলীকরণের কাজ 'ওআন ফাইন মরনিং' নয়, বাংলা গদ্যের শুরু থেকেই হয়ে আসছে। বাংলা ভাষা যতদিন পুঁথির কোটরে বন্দী ছিল, ততদিন যুক্তাক্ষর নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়নি। ছাপাখানা চালু হতেই নানা জনে এই সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। ১৭৭৮ সালে হ্যালহেড সাহেব তাঁর ব্যাকরণের ভূমিকায়ও তার উল্লেখ করেছেন। এমন কি বাংলা গদ্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায়ও নানারকম পরীক্ষা চালিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৮৬৫ সালের (আনন্দবাজারে নতুন বানান চালু করার ঠিক এক শ বছর আগে) ২২ ফেব্রুয়ারি বিদ্যাসাগর মশাইকে লেখা জন মারডকের একখানা খোলা চিঠি। চিঠিটি ছাপা হয় 'এজেন্ট্ অব দি ক্রিশ্চিয়ান ভারনাকুলার এডুকেশন সোসাইটি'তে। বাংলা শিখতে গিয়ে মারডক সাহেব অন্য আরও পাঁচজন নতুন শিক্ষার্থীর মত যে-সব বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেগুলি মোটামুটি এই:—

(১) ব্যঞ্জনের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি সর্বত্র চিহ্নিত হয় না বলে উচ্চারণের এক দিকে 'বর' 'বর্', অন্য দিকে 'তত' 'ততো।' (২) স্বরচিহ্নের দ্বিবিধ রূপ। যেমন 'উ'-কার। (৩) যুক্ত ব্যঞ্জনের সমস্যা, শতাধিক যুক্ত ব্যঞ্জন শিখেও থই পাওয়া যায় না।

তাই মারডক যুক্তাক্ষর সরল করার কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিদেশী শব্দ নয়, খোদ সংস্কৃত শব্দ ভেঙে লেখার প্রস্তাব তিনি দেন। বলেন, চিক্কণ হোক 'চিক্‌কণ', শৃঙ্খলা 'শৃঙ্‌খলা', কুণ্ঠিত, 'কুণ্‌ঠিত'। এই পরিবর্তন কেন দরকার তার উত্তরে মারডক জানান:— ক॥ প্রস্তাবিত পরিবর্তন কার্যকর হলে বাংলা লেখাপড়া সহজ হবে, খ॥ মুদ্রিত গ্রন্থপাঠ সহজ হবে, গ॥ যুক্তাক্ষরবাহুল্য কমলে রোমান হরফে ছাপার মত বাংলা মুদ্রণও পরিচ্ছন্ন হবে, এবং ঘ॥ স্বল্প ব্যয়ে বাংলা হরফের ক্ষুদ্রায়তন সাট নির্মাণ সম্ভব হবে।

মারডক পত্রের শেষাংশে লেখেন—"আমার প্রস্তাবিত বিষয়টি বর্তমানে উপহাসিত হতে পারে, কিন্তু সময়ে তার প্রবর্তন ঠিকই হবে। ইতিহাস তার সাক্ষী। বাংলার মত গ্রীক ভাষাতেও বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলি ছেদচিহ্নহীনভাবে পরস্পর যুক্ত থেকে লেখা হত, যুক্তাক্ষরও প্রচুর ছিল। গ্রীক ভাষায় তা উঠে গিয়েছে, কালে গ্রীক মুদ্রণের মত বাংলা বইতেও যুক্তাক্ষরগুলি উঠে যাবে।" [ইংরাজী ডিপথংও প্রায় উঠে গেছে।]

জন মারডকের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে সফল হয়নি, কিন্তু আমি মনে করি, আনন্দবাজারের প্রচেষ্টা বাংলা মুদ্রণকে সেই সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। লাইনো-র পর অসংস্কৃত কিছু শব্দের যুক্তাক্ষর বর্জন বাংলা ভাষায় অবিস্মরণীয় ঘটনা।

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের বক্তব্য পেশ করি। তিনি পূর্ব-বর্ণিত প্রবন্ধে লিখেছেন—

'বাংলা বানানের সবচেয়ে বড় ত্রুটি তার যুক্তাক্ষরের ক্ষেত্রেই। এই যুক্তাক্ষর প্রয়োগ যে কত অযৌক্তিক ভঙ্গীতে চলে তার ঠিক নেই। কোথায় যুক্তাক্ষর চলবে আর কোথায় চলবে না, তার কোন নির্দিষ্ট নীতি খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ যুক্তাক্ষরের প্রাবল্যে অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থী, অবাঙালী শিক্ষার্থী, টাইপরাইটার ও প্রেস—সর্বক্ষেত্রেই যে বিরাট বাধার সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ হিসাব করতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। এই যুক্তাক্ষরের প্রয়োগ যত কমানো যায়, ততই সকলের পক্ষে মঙ্গল। সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষর বর্জনের বিপদ সবচেয়ে বেশী ......কিন্তু অসংস্কৃত শব্দের বেলায় এ বিপদ অনেক কম। সে ক্ষেত্রে সংস্কার-বর্জনের একটি নূতন সংস্কারও আমাদের দেশে দাঁড়িয়ে গেছে। যেমন 'পাগলা', 'পাতলা' কিংবা বালতি প্রভৃতি শব্দে যুক্তাক্ষর না থাকাতেও কারও কোন অসুবিধা ঘটে না। বরং 'পাগলা' শব্দে যুক্তাক্ষর প্রয়োগ করাই পাগলামি বলে গণ্য হবে। কিন্তু যুক্তাক্ষর বর্জন করেও উচ্চারণ অনুযায়ী বানান রক্ষা করতে গেলে হস্ চিহ্নের বাহুল্যে বাংলা ভাষা কণ্টকিত হয়ে ওঠে। সমস্যাটি এখানেই। বাংলায় অ-বর্ণটি ব্যঞ্জনের অত্যাজ্য অঙ্গ বলেই গণ্য হয়। এটিকে বর্জন করতে গেলেই হস্ চিহ্ন দিতে হয়। কিন্তু সম্প্রতি অ-বর্ণটিকে বাংলায় অনুচ্চার্য বলে গণ্য করার রীতি স্বীকৃত হয়ে গিয়েছে। যেমন জল, গান—এই অকারান্ত শব্দগুলিকে ব্যঞ্জনান্তরূপে উচ্চারণ করি। 'তরব, চলল' প্রভৃতি শব্দের মধ্য স্বরটি অনুচ্চার্য এক সময়ে 'হস্' চিহ্ন দেওয়া চলত, এখন চলে না। অভ্যাসের সংস্কারই মানুষকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং আনন্দবাজার পত্রিকা যখন অ-সংস্কৃত শব্দের যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব বর্জনের নীতি গ্রহণ করেছেন, তখন বাংলার অনুচ্চারিত অ-কারের নবস্বীকৃত নীতির পথেই অগ্রসর হয়েছেন। কিছুকাল অভ্যাসেই বোমবাই, লখনউ, মসকো, মারকিন, পারক প্রভৃতি শব্দ অচিরকালের মধ্যে আমাদের আয়ত্তে হয়ে যাবে। অর্থাৎ এরকম বানান 'পাগলামি'র নিদর্শন বলে গণ্য হবে না। এরকম সংস্কারের নজির বিদেশেও আছে। মারকিন বানানের কথা স্মরণীয়। Color, Favor, Center, Honour প্রভৃতি শব্দের বানান সংস্কারে যাঁরা দ্বিধাবোধ করেন নি—Know, Knight প্রভৃতি শব্দের বানান সংস্কারে তাঁরা অগ্রসর হন নি। কারণ শেষ দুটি শব্দ পাশ্চাত্ত্য জগতের তৎসম (অর্থাৎ গ্রীক-লাতিন) পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু Color শব্দ তা' নয়, কাজেই সে ক্ষেত্রে বানান সংস্কার চলে। ....এই সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদেশী Know, Knight প্রভৃতি শব্দের অনুচ্চারিত ব্যঞ্জনবর্ণের ন্যায় বাংলা লখনউ বা মসকো শব্দের ক্ষেত্রে একটি করে অনুচ্চারিত 'অ' স্বীকার করে নিতে হয়। এসব ক্ষেত্রে বাংলায় অনুচ্চারিত বা silent 'অ' স্বীকার করে না নিলে 'হস্' চিহ্নের বাহুল্যে বাংলা ভাষা কণ্টকিত হয়ে উঠবে—এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকায় এই silent 'অ' বর্ণই স্বীকৃত হয়েছে। বস্তুত 'হস্' চিহ্নটা অকারহীনতারই প্রতীক। এসব ক্ষেত্রে হস্ চিহ্ন বাদ দেবার মানেই হল silent অ-কার মেনে নেওয়া। অনেককাল ধরেই ত মানা হচ্ছিল, আনন্দবাজার তার ক্ষেত্র প্রসারিত করলেন। এটাই এই সংস্কারের প্রধান কৃতিত্ব। এই কৃতিত্বের জন্য বাংলা ভাষার অনুরাগী ও সংস্কারকামী মাত্রেরই অভিনন্দন তাঁদের প্রাপ্য।"

অলমতিবিস্তারেণ। আনন্দবাজারের প্রচেষ্টা এবং অধ্যাপক সেনের অভিনন্দনের পর মারডকের প্রস্তাব মত একটি নিবেদন আছে। শুধু অ-তৎসম নয়, ভবিষ্যতে দু' একটি সংস্কৃত শব্দেরও যুক্তাক্ষর ভাঙা যেতে পারে। যেমন 'চিক্কণ' না লিখে 'চিক্‌কণ', তদ্ভব না লিখে 'তদ্‌ভব', 'উদ্যোগ' না লিখে 'উদযোগ'। ভেঙে লিখলে বরং প্রকৃত উচ্চারণের কাছাকাছি যাওয়া যায়। (স্বয়ং অক্ষয়কুমার দত্ত একদা লিখেছিলেন 'গুণ্' এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় কদাচিৎ 'ৎ' লিখতেন।) সুনীতিবাবু এই প্রস্তাবে কু-নীতি দেখতে পেয়ে নিশ্চয়ই আরও 'উদ্‌বিগ্ন' হবেন। কিন্তু গোহত্যা নিরোধ আন্দোলনকে যিনি 'বর্বরতা' বলে প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে পারেন, তাঁর মত আধুনিকের পক্ষে কোন প্রকার সংস্কার বর্জনের সংস্কার মানায় কি?

তেত্রিশ বছর বয়সে জেমস
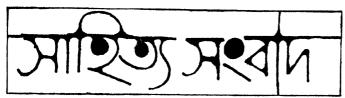
"ঈর্ষাতুর, নিঃসঙ্গ, অতৃপ্ত, অহংকারী মানুষ" আমি

১৯৫৭ সালে স্টুয়ার্ট গিলবার্টের সম্পাদনায় বেরিয়েছিল প্রথম খণ্ড, সম্প্রতি বাকি আরও দুটি খণ্ডে রিচার্ড এলম্যানের সম্পাদনায় বেরিয়েছে জেমস জয়েসের চিঠিপত্রের সংগ্রহ। সাহিত্য-উৎসুকদের কাছে অমূল্য এই সংগ্রহ, শেষ দুটি খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা যুক্তভাবে এক হাজারের বেশী, অর্থাৎ বলা যায় এতদিনে পাওয়া গেল জয়েসের ব্যাপক আত্মজীবনী।

মাত্র তো ছ-খানি বই লিখেছেন, একটি চটি কবিতার বই, একটি নাটক, একটি ছোট উপন্যাস, একটি ছোট গল্পের সংগ্রহ এবং 'ইউলিসিস' ও 'ফিনেগানস্ ওয়েক' — যে দুখানিকে কোনো বিশেষ আখ্যা দেওয়া যায় না। এই কখানি রচনার জন্য একটি সমগ্রজীবন ব্যাপৃত ছিল, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের কাছে এই লেখক বিস্ময়কর ও চিরবরণীয়। লেখকের জীবনীর চেয়েও লেখকের নিজের দেখা জীবনের কথা জানা এখন খুবই দরকার, আধুনিক সাহিত্য বুঝতে হলে, যেহেতু আধুনিক সাহিত্য মূলত আত্মকেন্দ্রিক। সুতরাং, আত্মজীবনী, ডায়েরি কিংবা চিঠিপত্র এখনকার সাহিত্য আলোচনায় অত্যন্ত জরুরি। এবং জয়েসের লেখা এমনিতেই দারুণ দুর্বোধ্য অন্য সাহায্য না পেলে বোঝা অসম্ভব। 'ফিনেগানস্ ওয়েক' টানা পড়ে কে কি বুঝেছে? উপন্যাসের জন্য মানের বই-এর কথা কেউ কখনো শুনেছে? কিন্তু কাম্বেল ও রবিনসনের লেখা বই আছে, 'এ স্কেলিটন কী টু ফিনেগানস ওয়েক'!

জয়েসের জীবনীর মধ্যে খুব বেশী বিস্ময় নেই। ডাবলিনে জন্ম, জেসুইট স্কুলের মাঝারি ছাত্র, মধুর রিনরিনে গানের গলা, (অনেকে বলেন, লেখক না হয়ে গায়ক হলেও জয়েসের কম সুনাম হতো না), ছেলেবেলা থেকেই চোখে মোটা কাচের চশমা, যৌবনে ভাষা-শিক্ষক হিসেবে ইওরোপের নানান শহরে অবস্থান, লেখা, কাটাকুটি, লেখা—শুধু ফিনেগানস্ ওয়েক লিখতেই সময় লেগেছে আঠারো বছর, ছাপার অসুবিধে, প্রকাশকের অপমান, পরে ইংরেজ মহিলার দয়ায় নির্ভাবনায় লেখার সুযোগ, স্নেহশীল পিতা ও পিতামহ, জুরিখে ১৯৪১ সালে মৃত্যু। এই তো জীবন, কিংবা জীবন এ রকম নয়, চিঠিপত্রের মধ্যে ব্যক্ত যে মানুষ—সে এক জটিল রহস্যময় কবি ও অহংকারী, নিষ্ঠুর ও অজ্ঞাতবাসী। সারাজীবন ধরে লেখার জন্য প্রস্তুত হওয়া, ধৈর্য ও মেধার সমন্বয়—জানতে পারা যায় জয়েস চেয়েছিলেন পৃথিবীর দিন ও রাত্রির ইতিহাস লিখে যেতে। ইউলিসিসে একটি সমগ্র দিন, ফিনেগানস্ ওয়েক-এ একটি রাত্রি। এই প্রস্তুতির ইতিহাস, জয়েসের প্রেম ও তীব্র ভোগ স্পৃহা, তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা—সবই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর চিঠির মধ্যে।

জয়েসের স্ত্রী

জয়েস বলেছেন, তাঁর স্ত্রীই তাঁর শিল্পের উৎস ও প্রেরণা। কী ভাবে সেই প্রেরণা কাজ করেছে—তা জানা কম বিস্ময়কর নয়। যেমন, ১৯০৪ সালের ১৬ই জুন—এই তারিখটি পৃথিবীর সাহিত্যে স্মরণীয়। বিভিন্ন দেশের বহু সাহিত্যানুরাগী ঐ দিনটিতে উৎসব করেন। ঐ তারিখই হচ্ছে ইউলিসিস উপন্যাসের সেই 'একটি দিন'। সেদিন জয়েস নিজে কি করছিলেন? চিঠিতে জানা গেল, জয়েস সেদিন এক

পাউরুটিওলার মেয়ের হাত ধরে বেড়াচ্ছিলেন। জয়েসের বয়েস তখন বাইশ, নোরা বারনাকলের সঙ্গে সামান্য পরিচয় হয়েছে, একটা ছোট্ট চিঠি লিখলেন, 'আমাকে আপনার মনে থাকে যদি, তবে আবার দেখা হলে—'। সেই বছরই নোরাকে নিয়ে তিনি দেশ ছেড়ে পালালেন এবং নোরাই তাঁর সারাজীবনের সঙ্গিনী। নোরা, 'আমার পাপ, আমার ভুল, আমার দুর্বলতা, আমার দুঃখ'—এবং 'নোরাই আমার শিল্পের উৎস'। দীর্ঘ সাতাশ বছর তিনি নোরার সঙ্গে এক সঙ্গে থেকেও বিয়ে করেন নি, 'কেন আমি ওকে পুরুত কিংবা উকিলের সামনে নিয়ে গিয়ে ওর সারাজীবন আমাকে দেবার জন্য শপথ করাবো? জয়েস লিখেছিলেন ভাই স্টানিসলাসের কাছে। এই নোরা কখনো তাঁর কাছে পবিত্রতার প্রতিমূর্তি, কখনো তাঁর যৌন বাসনার দেবী। জয়েস দেখিয়েছেন, যে প্রকৃত কল্পনা-শক্তিধর শিল্পী, সে এক নারীর মধ্যেই বহু নারীকে আবিষ্কার করতে পারে। নোরাকে তিনি লিখছেন, আজ রাত্রে আমার একটা আইডিয়া এসেছে, অন্য দিনের চেয়েও উন্মত্ততর, তুমি আমায় চাবুক দিয়ে মারবে! আমি দেখতে চাই তোমার চোখ রাগে জ্বলে উঠছে...এক মুহূর্তে আমি তোমায় দেখি কোনো কুমারীর মতন, অথবা ম্যাডোনার মাতৃমূর্তি, পর মুহূর্তেই তুমি বদলে যাচ্ছো নির্লজ্জা নারীর মতন, অবাধ্য, অর্ধ-নগ্ন, অশ্লীল!...নোরা, আমাকে চাবুক মারো, লেখাচ্ছলে নয়, সত্যি সত্যি!—এই সেই মানুষ, সেই মহান লেখকও জ্ঞানী—যাঁর জ্ঞানের সীমা বিস্তৃত হয়েছিল তিব্বতী ভাষা পর্যন্ত, যিনি শব্দের ধ্বনিকে চাক্ষুষ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত জয়েস বিয়ে করেছিলেন নোরাকে, একটি ছেলে ও মেয়ে হয়েছিল, পিতা হিসেবে তিনি কি স্নেহ-কাতর ও স্নেহপরায়ণ। নাতিকে সামনে বসিয়ে যখন তিনি ছেলে-ভুলোনো ছড়া শোনাচ্ছেন ও শব্দ জুড়ে নতুন শব্দের খেলা করছেন, সেই সময়েই প্যারিসের ট্রানজিসান কাগজে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর ভয়াবহ রকমের দুর্বোধ্য 'ওয়ার্ক' ইন প্রোগ্রেস'—যা পরবর্তীকালে ফিনেগান্স ওয়েকের রূপ নেয়।

সাহিত্য

বুদ্ধিজীবীদের নাকি স্বদেশ বলে কিছু থাকে না। জয়েস যদিও যৌবনে দেশান্তরী হয়েছিলেন, কিন্তু জন্মভূমি ডাবলিনের কথা কখনো ভুলতে পারেন নি। আয়ার্ল্যান্ড থেকেই তাঁর অনন্তকালের দিকে যাত্রা শুরু। ইউলিসিস উপন্যাসের নায়ক ইহুদী লিওপোল্ড ব্লুম ডাবলিনের রাস্তা দিয়ে ঘুরছে, কিন্তু সেই তার বিশ্বপরিক্রমা, সে ইহুদী এবং ইউলিসিস—অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ, গণ্ডিবদ্ধ থাকার নয়, তবু লেখক তাকে শুধু ডাবলিনে ঘুরিয়েই তাকে বিশ্বদর্শন করিয়েছেন। চিঠিতে জয়েস নিজেকেও বলেছেন, ভ্যাগাবন্ড, নির্বাসিত কিন্তু আয়ার্ল্যান্ডের কাছে মন বাঁধা।

আর একটা জিনিস দেখা যায়, তাঁর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। নিজের রচনা বা প্রতিভা সম্পর্কে তাঁর কোনো দ্বিধা বা দুর্বলতা ছিল না, ছেলেবেলা থেকেই হুড়হুড় করে লিখতে শুরু করেন নি, কিন্তু 'ইউলিসিস' এবং 'ফিনেগান্স ওয়েক' রচনার বীজ প্রায় ছেলেবেলা থেকেই বুকের মধ্যে লালন করেছেন। জ্ঞানের সীমা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রচনাকে বদলেছেন এবং চূড়ান্তভাবে ছাপবার আগে যে কত কাটা-কুটি করেছেন—তার আর ইয়ত্তা নেই। জয়েসের কাটা প্রুফ এবং ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলা দুমড়ানো কাগজ—এখন অনেক গবেষকের উপাদান। আত্মবিশ্বাস এবং অহংকারের সীমা ছিল না, 'আমি এ যুগের এমন একজন লেখক যে শেষ পর্যন্ত এই হতভাগ্য মানুষ জাতির আত্মায় একটা বিবেকের সৃষ্টি করে যাচ্ছে।' আমি ঈর্ষাপরায়ণ, নিঃসঙ্গ, অতৃপ্ত, অহংকারী'—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতিভায় চূড়ান্ত আস্থা। যখন মাত্র ১৯ বছর বয়েস, কিছুই লেখেন নি, তখনই তিনি ইয়েটস্ সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন 'প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট' হিসেবে এবং দাবি জানিয়েছেন, সব লেখকদের উচিত তাঁর প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া! প্রকাশকরা যখন তাঁর বই ছাপতে চান নি (এমনকি ডাবলিনার্সের গল্পগুলিও অনেক প্রকাশক ছাপতে ভয় পেয়েছিল, কারণ একটি অংশে সপ্তম এডোয়ার্ড সম্পর্কে ঈষৎ ব্যঙ্গ ছিল)—তিনি মোটেই তাদের কাছে কাকুতি মিনতি করেন নি, বরং ধমকেছেন। ইউলিসিস প্রকাশের পর ইওরোপ—আমেরিকা যখন অশ্লীলতার অভিযোগ ওঠে, তখন জয়েসের খরশানিত, তাঁর হাস্যময় মুখের ছবি কেউ এঁকে রাখে নি, রাখলে তা সত্যিকারের একটা দেখার জিনিস হয়ে থাকতো।

সনাতন পাঠক
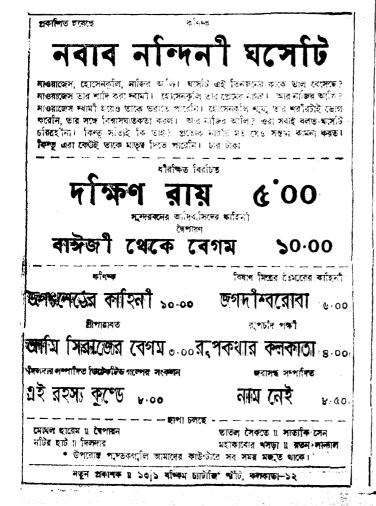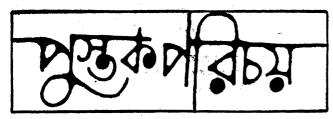
ঠাকুরবাড়ির পরিচয়

ঠাকুরবাড়ির কথা। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। বার টাকা।

রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতায় সমগ্র ভারতবর্ষকে এক মহান তীর্থক্ষেত্র-রূপে কল্পনা করা হয়েছিল; ভারতবর্ষের ভিতরে অনুরূপে কোনো পুণ্যক্ষেত্র যদি কল্পনা করা যায়, তবে তা নিঃসন্দেহে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। দীর্ঘ এক শতাব্দী ধ'রে বাংলা দেশ তথা ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটিমাত্র পরিবারের বিভিন্ন মানুষ যে নেতৃত্বের আসন অধিকার করে এসেছেন, তার তুলনা আছে কিনা জানা নেই। বাঙালীর ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ঠাকুরবাড়ির এক বিপ্লবময় ভূমিকা। এর ইতিহাস সম্পর্কে স্বভাবতই তাই কৌতূহলের অন্ত নেই। ইতস্তত বিভিন্ন গ্রন্থে বহু উপাদান ছড়িয়ে ছিল ঠিকই, কিন্তু তা একত্র করে ঠাকুর-বাড়ির কোনো একক ধারাবাহিক ইতিহাস ইতিপূর্বে রচিত হয়নি। শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য। নিজস্ব কৌতূহল ছাড়াও কর্মসূত্রে তিনি ঠাকুর পরিবারেব বহু তথ্যের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। তাই তাঁর পক্ষে এই জাতীয় একটি গ্রন্থ রচনার দুরূহ দায়িত্ব নেওয়ার অধিকার ও যোগ্যতা প্রশ্নাতীত।

কিন্তু এ কথাও স্বীকার্য, এই রকম একটি ইতিহাস রচনা খুব সহজ কাজ নয়। ঠাকুরবাড়ির আকাশে যেখানে অতগুলি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, সেখানে প্রতিটি নক্ষত্রের অবস্থান নির্ধারণ, গতি-প্রকৃতি নিরূপণ ও কাহিনীকথন নিঃসন্দেহে মাত্রাবোধ ও বর্ণনাকুশলতা দাবি করে। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় এ-কাজটি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করেছেন। তাঁর অধ্যায়-বিন্যাস বিশেষভাবে সুপরিকল্পিত। তাঁর রচনারীতির সারল্য বিস্ময়কর। এমন কি, রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনাতেও তিনি কোনো দুরূহতার আশ্রয় নেননি। রবীন্দ্র-কাব্যের ব্যাসকূট যে-ধরনের প্রাঞ্জল ভাষায় সমাধান করেছেন, তা বিরলদৃষ্ট। ফলে, 'ঠাকুরবাড়ির কথা' শেষ পর্যন্ত তথ্যসর্বস্ব নীরস প্রবন্ধে পর্যবসিত হয়নি। জীবন্ত সরস মনোগ্রাহী ইতিহাসগ্রন্থরূপে সাধারণ পাঠকের মনে ঠাকুরবাড়ির একটি স্পষ্ট পরিচয় মুদ্রিত করতে পারবে এই গ্রন্থ—এ কথা মনে করা অসঙ্গত নয়।

কিন্তু এই রকম একটি গ্রন্থ যে জাতীয় সতর্কতা ও মনস্কতা দাবি করে, দুঃখের সঙ্গে বলি, তা অর্পিত হয়নি। কয়েকক্ষেত্রে তথ্যগত অসামঞ্জস্য এত প্রবল যে, সেগুলি তথ্যগত ভ্রম, না পরিবেশিত নতুন তথ্য—সংশয় জাগে।

'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক সম্বন্ধে হিরন্ময়বাবু লিখেছেন : "গিরীন্দ্রনাথের পুত্র গণেন্দ্রনাথ নাট্যরচনা ও অভিনয়ে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। অভিনয়ের উপযুক্ত ভাল বাংলা নাটকের অভাবে, তিনি একটি নাট্য রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন। সেই প্রতিযোগিতায় রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত "কুলীন কুলসর্বস্ব' নামে নাটকখানি সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তিনি তাঁকে পুরস্কৃত করেন।" (পৃঃ ২৬০) বাংলা সাহিত্যের পাঠক জানেন, রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী বহু বিবাহের উপর ভিত্তি করে রচিত নাটকের যে-প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন, 'কুলীন কুলসর্বস্ব' তাতেই পুরস্কার পায়। (সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৫ম পৃঃ ২৯ দ্রষ্টব্য) প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে, রামনারায়ণের 'নবনাটক' নামে নাটকটির জন্য বরং জোড়াসাঁকোর নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ তাঁকে দুশ টাকা দিয়েছিলেন। প্রথমে প্রতিযোগিতা রূপে ঘোষিত হলেও রামনারায়ণকে নির্বাচিত করে নাট্য রচনার ভার তাঁকে দেওয়া হয় ও প্রতিযোগিতা প্রত্যাহৃত হয়।

২৫৭ পৃষ্ঠায় হিরন্ময়বাবুর লেখা থেকে মনে হবে, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের ক্লাস বন্ধ হয়ে যায়, ওই ব্যবস্থা হয় মেডিক্যাল কলেজে (দ্রষ্টব্য : হান্ড্রেড ইয়ারস্ অফ দি য়ুনিভার্সিটি অফ ক্যাল-কাটা, সম্পূরক খণ্ড, পৃঃ ৩৫-৩৬)। এর পরেই তিনি লিখছেন : 'দ্বারকানাথ...কলি-কাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করেই নিবৃত্ত হননি।' মেডিক্যাল কলেজ দ্বারকা-নাথেরই স্থাপিত, এ-তথ্যের সমর্থন কোথায়?

সন তারিখের গোলমালও বহু, কাশী সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত ১৭৯১-তে, নয়, ১৭৯২। সংস্কৃত কলেজ ১৮২৫ না ১৮২৪? দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৯১৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি হন, ১৯১৬ সালে নয়।

এ-ছাড়া অন্য ধরনের ভুলও কিছু-কিছু উল্লেখযোগ্য। 'তাঁর ছিলেন দুজন পুত্র' (পৃঃ ২৪৬) He had two sons, -এর মুক্তানুবাদ। ২৫৮ পৃষ্ঠার তৃতীয় অনুচ্ছেদে 'এই পত্রিকা' রূপে তত্ত্ববোধিনীর কথা বর্ণিত, কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর নাম কোথাও নেই। ১০৮ পৃষ্ঠায় : 'সবার কোলের সন্তান বলেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের ওপর সৌদামিনী দেবীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল।' সৌদামিনী দেবী না সারদা দেবী?

৩৫৪।৬৬

স্যডেনসা
অর্শের জন্য
সর্বত্র পাওয়া যায়

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা আয়োজিত চেক নিউ ওয়েভ চলচ্চিত্র উৎসবের প্রধান আকর্ষণ "এ ব্লণ্ডস লাভ" ছবির একটি দৃশ্য

গান্ধী চিত্রের প্রস্তুতি

লুই ফিশারের বইয়ের ভিত্তিতে গান্ধী-চিত্রের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে। লণ্ডন-প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ী মতিলাল কোঠারি ছবিটি প্রযোজনা করবেন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ চিত্রনাট্যকার রবার্ট বোল্ট ছবির 'স্ক্রিপ্ট' তৈরি করে ফেলেছেন। শ্রী বোল্ট ইতিমধ্যে শবরমতী আশ্রম ঘুরে গিয়েছেন। যেখানে গান্ধীজী কারারুদ্ধ ছিলেন, সেই জেলখানাটিও তিনি দেখে এসেছেন। এই চিত্রনির্মাণের প্রস্তাবে ভারত সরকার নীতিগতভাবে সম্মতি জানিয়েছেন। তবে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রক ছবির 'স্ক্রিপট'টি খুঁটিয়ে দেখবেন।

এই জীবনীচিত্রে জার্মান, ব্রিটিশ, ফরাসী ও ভারতীয় শিল্পীরা অভিনয় করবেন। গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট চিত্র-প্রযোজককে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীকে নিয়ে তোলা প্রামাণিক চিত্রের ৩৫টি রীল শ্রী বোল্ট দেখেছেন। ভারত সরকার নাকি চান, ছবিতে গান্ধীর মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে কোন নাটকীয়তা যেন রাখা না হয়। গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন এমন কয়েকজন বিদেশীকে ছবিতে দেখাবার চেষ্টা হচ্ছে। এ-ব্যাপারে চিত্রনির্মাতারা আর্ল মাউণ্টব্যাটেনের সাহায্যপ্রার্থী।

চেক 'নিউ ওয়েভ' চলচ্চিত্র

চেক "নিউ ওয়েভ" চলচ্চিত্রের উৎসব সম্পর্কে আলোচনার জন্য চেকোস্লোভাকিয়ার কনসাল-জেনারেল শ্রীজোসেফ লিমা গত সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠক আহ্বান করেছিলেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে তিনি আধুনিক চেক চলচ্চিত্রের কথা বলেন। এই পর্যায়ের সাতটি চিত্র নিয়ে সিনে ক্লাব উৎসবের ব্যবস্থা করেছেন। স্থান: প্রাচী সিনেমা। ছবিগুলি হল: "এ ব্লণ্ডস লাভ, এ জেস্টারস টেল, লেমনেড জো, ভারটিগো, এ থাউজ্যাণ্ড ক্ল্যারিওনেটস, ক্রাইমস অ্যাট গার্লস স্কুল ও সেণ্ট এলিজাবেথস স্কোয়ার"। ১০ ফেব্রুয়ারী বহুবিতর্কিত "এ ব্লণ্ডস লাভ" দিয়ে সপ্তাহব্যাপী উৎসব শুরু হচ্ছে।

দ্যাট ম্যান ফ্রম রিও

অ্যাকশন ছবির নায়করা অথবা ক্রাইম চিত্রের গোয়েন্দারা সর্বশক্তিমান। যম তাদের কাছে ঘেঁষতে বুঝি ভয় পান। দুর্বৃত্তের হাতে অমানুষিক লাঞ্ছনার পরও তারা শক্ত পায়ে উঠে দাঁড়ায়। তাদের জয় অবধারিত। অধুনা জেমস বণ্ড এই 'অতি-মানবীয়' দলের পুরোভাগে। এ-হেন চরিত্র যে-কোন "স্পাই থ্রিলার" বা অ্যাডভেঞ্চার ছবিতে দেখা যায়। অতীতেও তারা ছায়াছবিতে বিরাজ করত। এই 'অবাস্তবতা' দর্শকরা দীর্ঘকাল ধরে উপভোগ করে আসছেন। অথচ এত-বড় 'মিথ্যা'-কে নিয়ে কেউ কোনদিন উপহাস বা ব্যঙ্গ করেন, নি, শেষ পর্যন্ত এই সাহস

আশু মুক্তিপ্রতীক্ষিত বি কে প্রোডাকশন্স-এর "নায়িকা সংবাদ" (পরিচালনা : অগ্রদূত) ছবিতে অঞ্জনা ভৌমিক

উত্তমকুমার ফিল্মস-এর "গৃহদাহ" (পরিচালনা : সুবোধ মিত্র) ছবির মৃণালের ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

দেখালেন ফরাসী চলচ্চিত্রকার ফিলিপ দ্য ব্রোকার, তাঁর "দ্যাট ম্যান ফ্রম রিও" ছবিতে।

ছায়াছবির 'অতিমানব'দের তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু তা অস্পষ্ট, হয়ত কিছুটা প্রচ্ছন্ন। যদিও বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান দর্শকের কাছে পরিচালকের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। বুঝতে অসুবিধে হয় না বেলমনদোকে (তাঁর অভিনয় অসামান্য) দিয়ে তিনি কখন কাকে নিয়ে কৌতুক করছেন। পরিচালকের ব্যঙ্গবাণ অনেকের প্রতি নিক্ষিপ্ত। ড্যানি কে, লরেল-হার্ডি, এমন কি চ্যাপলিনও বাদ যাননি। অবশ্য এঁদের ক্ষণিক অনুকরণ রয়েছে ছবির রঙ্গপর্বে। পরিচালকের শ্লেষ প্রধানত সিনেমার সেই বীরপুংগবদের প্রতি, যারা শত্রুদলনে সিদ্ধ-হস্ত, নিশ্চিত মৃত্যুকেও ফাঁকি দিতে সমর্থ। বেলমনদো যে-সব অসাধ্য সাধন করেছে (সে পাইলট না হয়েও এরোপ্লেন চালিয়েছে, স্কাইস্ক্রেপারের কার্নিশ ধরে ঝুলেছে, সকলকে বোকা বানিয়ে প্লেনে গন্তব্যস্থলে চলে গিয়েছে, হোটেল দুর্বৃত্তের হাত থেকে অবলীলায় প্রেয়সীকে উদ্ধার করে এনেছে, দৌড়ে মোটরগাড়ির সংগে ও সাঁতারে লঞ্চ-বোটের সংগে পাল্লা দিয়েছে) তা 'বণ্ড-সিরিজ' নির্মাতাদের কল্পনার অতীত। এক কথায়, বুদ্ধি ও সাহসে বণ্ড তার পাশে দাঁড়াতে পারে না।

দিলীপ নাগ পরিচালিত "বধূবরণ" ছবিতে রাখী বিশ্বাস ও ভারতী দেবী—ছবির মুক্তির দিন আসন্ন

বেলমনদোর কীর্তিকলাপের মাত্রা একটু বেশী। ছবির দোষ বলতে এই একটিই। ব্যঙ্গচিত্রটি উপভোগ্য হয়েছে কৌতুকের গুণে। রোমাঞ্চক অ্যাডভেঞ্চার থাকলেও ছবিটি শিহরনের আস্বাদের চেয়ে রঙ্গরসের আনন্দেই দর্শকের মন বেশী ভরে তোলে। এবং অনুভব করা যায়, অন্যান্তর ব্যাপার কেমনভাবে সময় সময় দর্শককে মাত করে। এই আত্মসচেতনতার সুযোগ নিয়েছেন ফরাসী চিত্রপরিচালক। কোন ভূমিকা না করে, কিছু না জানিয়ে না বলে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, ফাঁকির ফাঁদ কীভাবে পাতা হয়। শিল্পী হিসাবে এখানেই ব্রেকারের কৃতিত্ব।

আফসানা

শেষ পর্যন্ত প্রায় সব হিন্দী ছবিতেই সেই একই পুরনো রীতি কেন অনুসরণ করা হয় বুঝি না। দেবী মুভিটোনের "আফসানা" বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর এই আশাই হয়েছিল যে পরিচালক ত্রিভু বুঝি আমোদ-নির্মাণের চিরাচরিত পথটি ত্যাগ করবেন। না, পরে দেখা গেল এক পাপীয়সীর (হেলেন) সেই গতানুগতিক ভিলেন। সে অপর এক পাপিষ্ঠের (আনোয়ার) হাতের যন্ত্র। তাদের শিকার নায়ক প্রদীপকুমার। বিপদে তাঁর সহায় হয়েছেন অশোককুমার, যাঁকে ছবিতে এক নতুন ধরনের ভূমিকায় দেখা যায়। তিনিও এক ক্রিমিনাল, জেল থেকে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন নায়কের নির্জন বাংলোয়। সেই থেকে তিনি নায়কের অকৃত্রিম বন্ধু। প্রদীপকুমারের নারীবিদ্বেষ যাতে দূর হয়, এবং তিনি যাতে নায়িকা পদ্মিনীকে গ্রহণ করেন সে ব্যাপারে অশোককুমার ও জগদীপের (নায়কের ভৃত্য) চেষ্টার ত্রুটি নেই। ছবির এই অংশ কৌতুকে ভরা।

নারীচরিত্রের কুৎসিত রূপ দেখার পর (প্রথমা স্ত্রী হেলেনের মধ্যে) প্রদীপকুমারের কাছে রমণীর সংস্পর্শ বিষবৎ হয়ে উঠেছে। শহর থেকে দূরে তাই তাঁর বাস। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন পদ্মিনী। পদ্মিনীকে বিয়ে করার সময় প্রদীপকুমার জানতেন, হেলেন বেঁচে নেই। তারপর দুষ্টগ্রহের মতই একদিন হেলেনের আগমন ঘটে এবং পাপাচার শুরু হয়।

ছবির প্রথমার্ধ দেখতে বেশ লাগে। ভিন্ন রকমের চরিত্রে প্রদীপকুমারের অভিনয়ও চমৎকার। যদিও রোমান্টিক মুহূর্তে তাঁকে বিশেষ ভাল লাগে না। আরও সুন্দর অশোককুমারের চরিত্রচিত্রণ। দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত পাপের রাজ্যে চিত্রকাহিনীর বিপথগমন। তবু আমাদের চিত্র হিসাবে "আফসানা"-র মূল্য কম নয়। শেষের দৃশ্যগুলিতে রয়েছে রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চের আয়োজন। দর্শকের কৌতূহল ছবিটি সর্বক্ষণ আকৃষ্ট করে রাখে। এক কথায়, সুনির্মিত এই চিত্র দর্শকের আমোদের প্রত্যাশা পূর্ণ করে। চিত্রগুপ্ত সুরারোপিত গানগুলি শুনতেও ভাল লাগে। ইস্টম্যান কলার বিশেষ সুবিধার নয়।

হমার সংসার

ভোজপুরী চিত্রের কাহিনী কী ধরনের হতে পারে দর্শকের পক্ষে তা অনুমান করা আজ আর মোটেই কঠিন নয়। বিশেষত যদি পূর্বঘোষণা থাকে যে, ছবিটি পারিবারিক মেলোড্রামা। সে-ক্ষেত্রে আপনি শরৎ-সাহিত্য-চর্বিতচর্বণ সহজেই আশা করতে পারেন। "হমার সংসার"-এর (আমসার ফিল্মস) কথাসারও তাই। এ ছবিতে আপনি "রামের সুমতি"-র পরম-স্নেহশীলা বউদির অনুকরণ পাবেন, "বৈকুণ্ঠের উইল"-এর গভীর ভ্রাতৃপ্রেমও রয়েছে। এবং শরৎ-সাহিত্যসুলভ আরও কিছু আলো-উপকরণ। শেষ মুহূর্তে যখন ছোট ভাই বিপথগামী মেজ ভাইকে টানতে টানতে ও মারতে মারতে (বড় ভাইকে প্রহার ছবিটির নিজস্ব সম্পদ!) সকলের বড় ভাইয়ের পায়ের কাছে এনে ফেলে (প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ মূর্খ, মেজ শিক্ষিত) এবং ভাঙা সংসার আবার জোড়া লাগে, তখনই দর্শকের ইচ্ছাপূরণের আয়োজন সম্পূর্ণ। নকল যদি আসলের কাছাকাছিও যেত, অর্থাৎ শরৎ-কাহিনীর স্বাদের সামান্যও যদি ছবিতে পেতাম তবে আক্ষেপের কোন কারণ থাকত না। ছবিতে আতিশয্যও কিছু আছে। সে হল চড়া সুরের অতিনাটকীয়তা, মন্থরা-

চলচ্চিত্রায়নের "আকাশ ছোঁয়া" (পরিচালনা: রাজেন তরফদার) ছবিতে অনিল চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী ও দিলীপ মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

উদয়শঙ্কর ইণ্ডিয়া কালচার সেণ্টার-এর ছাত্রীদের "পরিচয়" নৃত্যানুষ্ঠান ফটো—দেশ

সদৃশ গ্রাম্যরমণীর খলতা (যে মেজবউয়ের মনে বিষ ঢুকিয়ে সংসারে ভাঙন ঘটায়), ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন এবং যাবতীয় ফরমুলা। কলকাতার কিছু দৃশ্য ছবিতে আছে। বড় ভাই বঞ্চিত হয়ে মনের দুঃখে কৃষিকার্য ছেড়ে কলকাতায় এসে রিকশা চালায়। নাজির হোসেন (ইনি চিত্রপ্রযোজক) হয়েছেন বড় ভাই। ফিটনের ঘোড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি রিকশা চালিয়েছেন, ঘোড়া দৌড়ে পরাস্ত। ঘটনাটি সত্যিই 'উপভোগ্য'!

ছবির প্রশংসনীয় দিক গ্রাম্য পরিবেশ, কৃষকের ঘর-উঠোন ও জীবনযাত্রা। এর মধ্যে প্রামাণিকতার ছাপ আছে। পরিচালক নাসিম বেশীর ভাগ দৃশ্য আউটডোরে তুলেছেন।

প্রধান শিল্পীরা সকলেই আন্তরিকতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। নাজির হোসেন, কলকাতার লিলি চক্রবর্তী (তাঁর ভোজপুরী সংলাপ উচ্চারণ অবাক করে), অসীমকুমার, ইন্দ্রাণী মুখার্জি ও লীলা মিশ্র খুবই ভাল অভিনয় করেছেন। চরিত্রগুলি অনেকাংশে অবিশ্বাস্য হলেও তাঁদের অভিনয়ের গুণে

আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

হেলেন ও মধুমতীর নাচও ছবিতে রাখা হয়েছে। শ্যাম শর্মার সঙ্গীতপরিচালনা প্রশংসনীয়। কিছু গান শুনতে ভাল। গেয়েছেন মান্না দে, মহম্মদ রফি, লতা মঙ্গেশকার প্রভৃতি।

নেপথ্যে

'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন' ছবি হবে এ-সংবাদ অনেক দিন ধরেই ছায়াছবির দর্শকেরা শুনে আসছেন। এবার সবই প্রায় ঠিক ছিল। ছবির কাজও বেশ এগিয়েছিল। গান রেকর্ডিং, 'লোকেশান' নির্বাচন, শিল্পী নির্বাচন—কোনটাই অসম্পূর্ণ থাকেনি। তবু শেষ পর্যন্ত চিত্রনির্মাণ স্থগিত।

কেন?—এই প্রশ্ন চিত্র মোদীদের—এ-সম্পর্কে অনেক কিছুই শোনা যায়। সত্যজিৎ রায় মত পালটেছেন, এমন মনে করা ভুল হবে। এ-ছবি করার শখ তাঁর বহুদিনের। তিনি হিন্দী ছবি করার
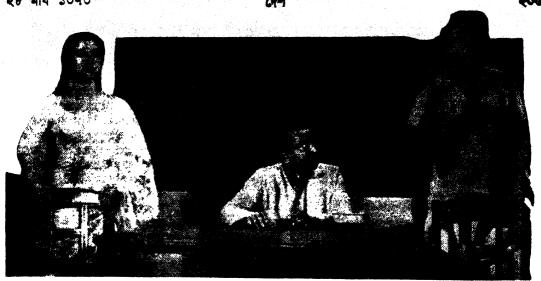
বি এম ডি মুভিজ-এর "জীবন-মৃত্যু" (পরিচালনা : হীরেন নাগ) ছবিতে সুপ্রিয়া চৌধুরী, অশোক মিত্র ও উত্তমকুমার

পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু এ-ছবির হিন্দী ও বাংলা উভয় সংস্করণেই তাঁর সম্মতি ছিল। তবু কেন প্রস্তুতিতে বাধা পড়ল, সেটা সঠিক জানা নেই।

তবে ছবিটি সত্যজিৎবাবু করবেনই। এখন না হোক, কদিন পর। হয়ত আগামী শীতে। 'গুপী গায়েন......'এর জন্য শীতকাল প্রশস্ত বলে পরিচালক মনে করেন। তা ছাড়া, শোনা যাচ্ছে, ছবির হিন্দীরূপের জন্য শশী কাপুরকে তিনি নির্বাচন করেছেন। শশীর 'ডেট' পেতে বিলম্ব হবে। অবশ্য এ-সব কথাই শোনা। এ-সম্বন্ধে শ্রী রায় নিজে কিছুই বলেননি। আর একটি খবর, এই ছবির জন্য ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশনের সাহায্য দরকার। এবং সত্যজিৎবাবু নিজেই ছবিটি প্রযোজনা করবেন। করপোরেশনের ঋণ শ্রী রায় নিশ্চয়ই পাবেন, এ-কথাও শুনেছি।

বর্তমানে শ্রী রায় অন্য একটি ছবি করবেন। সেটি হবে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত' অবলম্বনে। এই গল্পটি নিয়ে ছবি করবার কথাও তিনি অনেক দিন ধরেই ভাবছিলেন। মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা কাহিনী। হয়ত শ্রী রায়ের মতে, এই ছবি তৈরির এখনই উপযুক্ত সময়।

আগামী চৈত্র নাগাদ কি 'চৈতালি'-র কাজ শুরু হবে? পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় অন্তত তাই আশা করেন। শচীন দেববর্মণের সুরারোপে ছবির গান বোম্বাইয়ে বেশ কয়েক দিন আগেই রেকর্ড হয়েছে। শুটিং বহু আগেই আরম্ভ হতে পারত। উত্তমকুমারের 'ডেট' পাওয়াই ছিল সমস্যা। তনুজা ছবির নায়িকা।

ছোটিসি মুলাকাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে শুনে এখানকার অনেক পরিচালক ও প্রযোজকই বোধ হয় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। এখন আর উত্তমকুমারের ডেট' পেতে অসুবিধা হবে না, এটাই তাঁদের আশা। কিন্তু 'ছোটিসি মুলাকাত' মুক্তি পাবার আগেই যে বোম্বাই চলচ্চিত্র মহলে উত্তমের কদর বেড়ে চলেছে, সে-খবর বোধ হয় অনেকেই রাখেন না। "মেরা ভাই" তো আছেই, তা ছাড়াও, আরও একাধিক হিন্দী চিত্রের নায়করূপে উত্তমকে অচিরেই কাজ শুরু করতে হবে। তবে শিল্পীর পরিশ্রমের শক্তি অসাধারণ। এবং বাংলা ছবির প্রযোজকদের দাবি বরাবরই তাঁর কাছে অগ্রাধিকার পাবে, এই বিশ্বাস হারাবার কোন কারণ ঘটেনি। বোম্বাইয়ে নিয়মিত যাতায়াত সত্ত্বেও তিনি এখানে কয়েকটি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন। ছবিগুলিও সম্পূর্ণ হয়েছে। বাকীগুলিও অসমাপ্ত থাকবে না।

অঞ্জু মহেন্দ্রুকে কি বাংলা ছবিতে দেখা যাবে? খুব সম্ভব ফ্যানদের এই আশা পূর্ণ হবে। প্রযোজক শ্রী শেঠিয়া 'উর্বশী কাহানী'র মুক্তি উপলক্ষে বোম্বাই ঘুরে এসেছেন। এবং অঞ্জু ও সোবার্সকে নিয়ে সংবাদ-চিত্র তৈরির কাজেও তাঁকে বোম্বাইয়ে থাকতে হয়েছিল। তখনই তিনি তাঁর বাংলা ছবিতে অঞ্জুকে নেওয়ার ব্যাপারে কথাবার্তা পাকা করেছেন। শ্রী শেঠিয়ার ছবিটি পরিচালনা করবেন জীবন গাঙ্গুলী।

...বলরাজ সাহনীর ছেলে পরীক্ষিৎ সিনেমার অভিনেতা হয়েছেন। পিতা-পুত্রকে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'মহ্‌জুর' ছবিতে পিতা-পুত্রের ভূমিকাতেই দেখা যাবে। কাশ্মীরের কবি মহ্‌জুরের জীবনালেখ্য নিয়েই এই ছবি। কাশ্মীরে কিছু দৃশ্য তোলা হয়েছে। কলকাতায় সম্প্রতি ইনডোর শুটিংয়ে বলরাজ সাহনী, পরীক্ষিৎ সাহনী, গীতাঞ্জলি দেশাই প্রভৃতি শিল্পীরা অভিনয় করেন। উর্দু এবং কাশ্মীরী, এই উভয় ভাষায় ছবিটি তৈরি হচ্ছে।

চাণক্যর ভূমিকায় নরেশ মিত্র

দীর্ঘকাল পর আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার মহাজাতি সদনে ওল্ড ক্লাবের প্রযোজনায় নটশেখর নরেশ মিত্র আবার 'চন্দ্রগুপ্ত'র চাণক্যের ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বাধিক অভিনীত নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত'র প্রথম চাণক্য ছিলেন প্রমথনাথ ভট্টাচার্য শৌখিন সম্প্রদায়ে। পেশাদার থিয়েটারে প্রথম চাণক্য স্বর্গত দানীবাবু, এবং দ্বিতীয় চাণক্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন নরেশ মিত্র পুরোনো মিনার্ভায় ১৯২১ সালে। সেদিন নরেশ মিত্রের সঙ্গে কাত্যায়ন, চন্দ্রগুপ্ত, অ্যান্টিগোনস, সেলুকাস, মুরা, ছায়া ও হেলেনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন যথাক্রমে কার্তিকচন্দ্র দে, মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, সুশীলাসুন্দরী, কোকিলকণ্ঠী সুবাসিনী ও চারুশীলা। সেদিনকার শিল্পীদের মধ্যে একমাত্র নরেশ মিত্র ছাড়া আর কেউই জীবিত নেই। নরেশ মিত্রের সঙ্গে এবারে উক্ত ভূমিকালিপিতে থাকবেন সন্তোষ সিংহ, মহেন্দ্র গুপ্ত, দীপক মুখোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, সরযূ দেবী, সীতা দেবী ও গীতশ্রী দেবী।

পণ্ডিত রবিশংকর

কয়েকটি গানের আসরে

(সঙ্গীত সমালোচক)

সংগীত সম্মেলনে যেসব শ্রোতারা যান, তাঁরা নিশ্চয়ই আনন্দ পাবার জন্য যান। যে গান তাঁরা গাইতে পারেন না, যে যন্ত্র তাঁদের আঙুলের স্পর্শে চিন্ময় হয়ে ওঠে না, সেই না-গাওয়া গানের আনন্দ, সেই না-বাজানো যন্ত্রের পুলক তাঁরা তাঁদের প্রিয় শিল্পীদের মাধ্যমে অনুভব করেন। নইলে কেন তাঁরা একদিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ও দুটি 'হোলনাইট' অস্বস্তিকর কাঠের চেয়ারে কাটাবেন।

ডোভার লেন মিউজিক সোয়েরী সংগীত পিপাসুদের কাছে বছরের অন্যতম আকর্ষণ। এবারে উদ্যোক্তারা বেগম আখতারকে বহুদিন পরে সংগীতরসিকদের সামনে উপস্থিত করলেন। বেগমসাহেবা এখন প্রবীণা। কিন্তু তাঁর মন চিরনবীন। তাঁর দাদ্‌রা, গজল ও ঠুংরী এখনও অনন্য। ঠুংরীর কাটা কাটা সুরের আখরগুলি যেন রসে পরিপূর্ণ। কিন্তু সবচেয়ে ভাল লেগেছে তাঁর সকাল-বেলার উদাস করা ভৈরবী। আজকাল ভৈরবী গাওয়ার রেওয়াজ যেন উঠে গেছে। তেমনি আশাবরী, জৌনপুরীও কেউ গান না বা বাজান না।

খাঁটি ঠুংরীও খুব কম শোনা যায় আজকাল। মালবিকা কাননের ঠুংরীটি কিন্তু মনোগ্রাহী হয়েছিল। গোপাল মিশ্রের সুন্দর সারেঙ্গী সহযোগিতায় তাঁর ঠুংরীটি আরও উপভোগ্য হয়। তাঁর-নন্দ্‌ রাগে খেয়ালের তুলনায় তাঁর ছায়ানট খেয়ালটি শ্রোতাদের বেশী আনন্দ দিয়েছে। তাঁর সাপাট তানগুলির বৈচিত্র্য খেয়ালটিকে রংদার করে তুলেছিল।

সুনন্দা পট্টনায়কের নীলমাধব রাগে খেয়ালে ভজনের ছায়া পেলাম। তাঁর অনুষ্ঠানে কিন্তু রসের অভাব ছিল। নবাগতা গৌরী মুখার্জির মারুবেহাগ ও যোগকোষে খেয়াল প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। কিন্তু তাঁর অনুষ্ঠানটি অতিদীর্ঘ। প্রসঙ্গত খেয়ালিয়াদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য : "—থামতে জানে ত?" স্মরণীয়।

যন্ত্রসংগীতের আসরে রবিশংকরের সেতার সবচেয়ে সফল। তাঁর বিলাসখানি টোড়ির আলাপ ও ধামার অনেকদিন মনে থাকবে। রবিশংকর যে কত বড় ধ্রুপদী তার পরিচয় তাঁর বিদগ্ধ আলাপে পাওয়া গেল। পণ্ডিত কিষেণ মহারাজের যোগ্য সংগতে কখন যে সেতার ও তবলা বীণা ও পাখ্‌ওয়াজে পরিণত হয়েছে তা টের পাইনি। আহির ভৈরব ও সিন্ধু ভৈরবীর গৎও খুব পরি-চ্ছন্ন। সবচেয়ে ভাল লেগেছে তাঁর ধুন। অনেক রাগের ছায়া তাঁর বাজনায় আনাগোনা করেছে, কখনও ভাটিয়ালী, কখনও কীর্তন আবার কখনও দেশী, ঝিঁঝিট, তিলককামোদ। কিষেণ মহারাজের সংগত সুন্দর। বিশেষ করে পাখোয়াজের **বোলপরণ উল্লেখযোগ্য।**

আমজাদ আলীর সরোদে চন্দ্রধ্বনি ও যোগ সুরে ভরপুর। তাঁর হাত মিষ্টি ও তৈরী। ঝালার ও জোড়ের কাজ এবং আশ মীড় ও একহারা তানে তাঁর অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গসুন্দর। কিন্তু তিনি যেন একটু বেশী চঞ্চল, চপলও বটে। আমরা ভবিষ্যতে তাঁর আলাপে আরও গভীরতা আশা করি। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারে হেম-ললিত মন ভরাতে পারেনি। তাঁর কাছে আমাদের আশা আরও অনেক। হেম-ললিত রাগটির স্বকীয়তা অস্পষ্ট রয়ে গেছে। তাছাড়া রাগটির সঙ্গে মারোয়া ঠাটে শুদ্ধ বসন্তর মিল দেখা গেল। শুধু তিনি মাঝে মাঝে পঞ্চম ব্যবহার করছিলেন।

অন্যান্য শিল্পীরা বিশেষ রেখাপাত করতে পারেন নি। ভি জি যোগ ও শিবকুমার শর্মার বেহালা-সন্তুর দ্বৈত বাদনে শিব-কুমারের সন্তুর ভাল লেগেছে। ভাল লেগেছে নাসির ও হিলাল আমেদের ললিত খেয়াল আর মানিক বর্মা ও আমীর খাঁর কণ্ঠ-সংগীত। শিশিরকণা ধরচৌধুরীর বেহালার আওয়াজ বোধহয় মাইকের দোষে কৃত্রিম মনে হয়েছে।

*

গত ২৯শে জানুয়ারী উত্তরা সিনেমা হলে **সুরেশ স্মৃতি সংসদের** প্রভাতী অনুষ্ঠান রসিকজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। বহুদিন পরে তিমিরবরণের সরোদ ও হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের তবলা শোনা গেল। তিমিরবাবু আজ বয়সের ভারে অতীতের ছায়া মাত্র। কিন্তু এখনও তাঁর ডান হাতের টোকা ও দিরিদিরি বলিষ্ঠ ও গম্ভীর। আঁশের কাজে তাঁর টিপও লক্ষনীয়। আধুনিক সরোদীয়ার জন্য তাঁর সরোদবাদন অনুকরণীয়। হীরুবাবুর তবলা লহরায় (পঞ্চমসোয়ারী তাল) পূর্বের দাপট পুরো-মাত্রায় পাওয়া গেল। সেই ধেরেকেটের ঝরাপাতার আওয়াজ, সেই পাকা লয়কারী, সেই পুরোন বোল পরণ টুকরো ও তেহাই।

মালবিকা কানন

সুরেন্দ্র সংগীত সংসদে হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, তিমিরবরণ, চিন্ময় লাহিড়ী, সুধীর চট্টোপাধ্যায় ও কমলা ঝরিয়া

চিন্ময় লাহিড়ীর বসন্তমুখারী খুব মিষ্টি লেগেছে। ললিতে বাংলা খেয়ালটিও। সরগমের বৈচিত্র্য অসাধারণ।

*

পশ্চিমবঙ্গ শিশু কল্যাণ সমিতির সাহায্যে পদ্মভূষণ রবিশংকরের সেতার অনুষ্ঠানটি আকর্ষণীয় হয়েছিল। তিলক কামোদ ও কিরবানীতে তিনি যেন সৃজন ছন্দের আনন্দে মেতে উঠেছিলেন। কানাই দত্তের তবলা সহযোগিতা অনুষ্ঠানটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। এই

সুব্রত রায়চৌধুরী

সুযোগে পদ্মভূষণ রবিশংকর ও আলি আকবরকে অভিনন্দন জানাই। তৎসহ পদ্মশ্রী সিদ্ধেশ্বরী দেবী (তিনি কেন কলকাতার আসরে অনুপস্থিত ?) ও পদ্মভূষণ বসন্তকুমারীকে।

ম্যাক্সমুলার ভবনে অনুষ্ঠিত সুব্রত রায়চৌধুরীর সেতার বাদন তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করেছে। নন্দকোষ রোগে তাঁর ধ্রুপদাঙ্গে আলাপ, জোড় ও ঝালা এবং খেয়ালাঙ্গে মসিদখানি ও রেজাখানি গত তাঁর শিল্পী মনের সুচারু প্রকাশ। বিশেষ করে একতালের গতটি মনোজ্ঞ হয়েছে। অনিল ভট্টাচার্যের তবলাসঙ্গতে পরিমিতিবোধ লক্ষনীয়।

কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অচলাবস্থার অবসান এই সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কয়েকজন ছাত্রের বহিষ্কার আদেশকে কেন্দ্র করে ছাত্র ধর্মঘট চলতে থাকার দরুন এই কলেজ এক-নাগাড়ে ১২৩দিন বন্ধ থাকার পর আগামী সপ্তাহে খুলেবে বলে কলেজের গবর্নিং বডির সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের উপর থেকে বহিষ্কার আদেশ তুলে নেবেন, আর বহিষ্কৃত ছাত্ররাও স্বেচ্ছায় ট্রানসফার সার্টিফিকেট নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে চলে যাবেন। শাস্তি পাওয়া মোট দশজন ছাত্রের মধ্যে তিনজন পোসট গ্র্যাজুয়েট ছাত্র এবং সাতজন পারট ওয়ান এবং পারট টু-র ছাত্র। পোসট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের দুজন ইতিমধ্যেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গিয়েছেন এবং আর একজনকেও ভর্তি করে দেওয়া হবে। সাতজন ডিগরি কোরসের পারট ওয়ান এবং পারট টু পরীক্ষার্থীদের অন্য কলেজে ভর্তি করে তাদের আসন্ন পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে রেজিসট্রার ডঃ গোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আলোচনার পর চারটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংস্থা সাংবাদিক বৈঠকে প্রেসিডেন্সি কলেজের অচলাবস্থা অবসানের কথা জানান।

দেশী সংবাদ—

৩০ জানুয়ারি—শ্রীঅতুল্য ঘোষ এম পি-র সভাপতিত্বে গঠিত পুনর্বাসন পর্যালোচনা কমিটি তাঁদের প্রাথমিক কর্ম-সমীক্ষা শুরু করেছেন। কমিটির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ (যার অবশ্য দেরি আছে) ভারত সরকার বহুলাংশে মেনে নেবেন এবং তখন এই কমিটির কাজে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা সাড়ে পাঁচ লক্ষ উদ্বাস্তু উপকৃত হবেন।

কলকাতা ট্রামে যাত্রী ভাড়া বাড়ানোর বিষয়টি এখন পরিবহণ উপদেষ্টা কমিটি বিবেচনা করে দেখছেন। আর ট্রামের মালিক ও বিভিন্ন কর্মী-সংস্থার প্রতিনিধিদের আলোচনা বৈঠকে ট্রাম কোমপানির চেয়ারম্যান আভাসে ইংগিতে জানিয়েছেন, ভাড়া বৃদ্ধি ছাড়া কর্মীদের আর্থিক সুবিধা দেওয়া সম্ভব নয়।

৩১ জানুয়ারি—পুরী গোবর্ধন মঠের জগদ্‌গুরু শংকরাচার্য আজ বিকালে অনশন ভঙ্গ করেছেন। সর্বদলীয় গোরক্ষা কমিটির নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার দাবিতে গত ৭৩ দিন যাবৎ তিনি অনশনব্রতী ছিলেন।

সোভিয়েটের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য লিখিত রুশ গ্রন্থকারদের বিজ্ঞানের বইগুলি এদেশে প্রকাশ করে সুলভ মূল্যে বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সোভিয়েট পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা সংক্রান্ত ভারত-সোভিয়েট যুক্ত পর্ষদ।

১ ফেব্রুয়ারি—কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার ও তথ্য বিতরণের মুখ্য মাধ্যম প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো। চন্দ কমিটি এই ব্যুরোর কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তথ্য ও বেতার মন্ত্রককে কমিটি তার রিপোরট দিয়ে বলেছেন, সংবাদপত্রের বিশেষ ধরনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য নয়া-দিল্লি সদরে ও রাজ্য রাজধানীগুলিতে ব্যুরোর সংগঠনকে ঢেলে সাজানো উচিত।

আগামী সপ্তাহ থেকে কলকাতার খোলা-বাজারে সন্দেশ ও ছানাজাত অন্যান্য জিনিস পাওয়া যাবে। তবে এর কোনটিতেই শতকরা ৪৫ ভাগের বেশী ছানা দেওয়া চলবে না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মুখপাত্র সাংবাদিক-দের নিকট এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

২ ফেব্রুয়ারি—আজ দুপুরে একটি পাকিস্তানী জঙ্গী বিমান পানজাবের ফিরোজপুর সীমান্তে ভারতীয় এলাকায় অনুপ্রবেশ করলে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিমান ওই পাক বিমানটিকে গুলি করে নামায়। বিমানটি সন্দেহজনকভাবে ভারতীয় এলাকায় ঢুকেছিল।

দেশে জিনিসপত্রের দাম দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকায় যোজনা কমিশন ও সরকারী মহলে উদ্বেগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু মন্ত্রীরা বিভিন্ন কেন্দ্রে তাঁদের নির্বাচনী অভিযানে ব্যস্ত থাকায় প্রশাসনে প্রায় অচল অবস্থা দেখা দিয়েছে।

৩ ফেব্রুয়ারি—১৯৬৬-৬৭ সালে দেশে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ থেকে ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টনের বেশী খাদ্য উৎপাদন হবে না। ফলে সবে-পাওয়া মারকিন আশ্বাস সত্ত্বেও এ বছরের (১৯৬৭) খাদ্য পরিস্থিতি নৈরাশ্যজনকই থেকে যাচ্ছে। ঐ সংকটজনক খাদ্য পরিস্থিতির দরুন রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধির কোনই আশা নেই বলে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রকমহল থেকে জানা গিয়েছে।

গৌহাটির এক সংবাদে প্রকাশ, আগামী সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য আসামের ২৫ জন কংগ্রেস সদস্যকে ছয় বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কটক থেকে পি টি আই জানান, একই অভিযোগে বিধানসভার ৫ জন সদস্যসহ ৪৮ জন কংগ্রেসকর্মী বহিষ্কৃত হয়েছেন।

৪ ফেব্রুয়ারি—ভারত সরকার চতুর্থ পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ কৃষি উৎপাদন প্রকল্পগুলি সম্পর্কে ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য একটি কর্ম-সূচী প্রণয়নের জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তৈরি সর্বশেষ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৬৬ সালের জুন মাসের শুরুতে ভারতের পরিশোধনীয় ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৪,৫৪৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। এই ঋণ বৈদেশিক মুদ্রায় ও ভারতীয় টাকায় পরিশোধনীয়। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৬৬ সালের ৫ জুন পর্যন্ত ভারতকে দেয় ঋণের পরিমাণ মোট ৫,২৫৩ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে শোধ করা হয়েছে মাত্র ৭০৩ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। এবং সুদ দেওয়া হয়েছে ৪৫১ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা।

৫ ফেব্রুয়ারি—উত্তরপ্রদেশ সরকারের হেড কোয়ারটারে এই মর্মে এক সংবাদ পৌঁছেছে, গতকাল ডেহরিতে পুলিসের গুলিবর্ষণে একজন নিহত ও ২ জন আহত হয়েছে। প্রকাশ, জনৈক পুলিস অফিসার কর্তৃক একজন বিড়িবিক্রেতা প্রহৃত হওয়ায় স্থানীয় একটি কলেজের ছাত্রদের নিয়ে প্রায় ৬ শত লোকের এক জনতা ডেহরি থানা আক্রমণ করে।

বিদেশী সংবাদ

৩০ জানুয়ারি—চীনা গবরনমেনট সিংকিয়াং সামরিক এলাকায় অস্ত্র সম্বরণের আদেশ দিয়েছেন, রণক্ষেত্র থেকে অবিলম্বে সেনাবাহিনী সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পিকিংএ চু-এন লাইয়ের কাছে মাও নীতি স্বীকার করেছেন এবং রেড গারড নামধারী যুবক দলের দস্যু-বৃত্তি দমনের জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন।

৩১ জানুয়ারি — হংকং-এ ইংরেজী সান্ধ্য দৈনিক হংকং স্টার পত্রিকায় আজ তাদের নিজস্ব সূত্রে পাওয়া এক খবরে বলা হয়, সিংকিয়াং প্রদেশের সর্বোচ্চ সামরিক কম্যানডার জেনারেল ওয়াং এন-মাও এই বলে পিকিং সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মাও-পন্থীরা সিংকিয়াং প্রদেশ সরকার দখলের চেষ্টা করলে তিনি ওই এলাকায় চীনের পরমাণু অস্ত্রাগার দখলের নির্দেশ দিবেন।

১ ফেব্রুয়ারি—চীনে সোভিয়েট ও অন্যান্য কয়েকটি দূতাবাসের সামনে প্রতিনিয়ত যে বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে, সেজন্যই চীন থেকে সোভিয়েট নাগরিকদের পরিবারবর্গকে ক্রমশ সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সোভিয়েট দূতাবাসে যে স্কুল রয়েছে, পূর্ব ইউরোপীয় নাগরিকদের ছেলেমেয়েরা সেখানে পড়াশোনা করে থাকে। সপ্তাহান্তে সেটি বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।

২ ফেব্রুয়ারি—চীনে ক্ষমতার লড়াই-এ মাও সেতুং ও তাঁর সমর্থকদেরই জয়লাভের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বলে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। যেসব খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হয় এখন অধিকাংশ বড় শহর মাওপন্থীদের কর্তৃত্বে এসে গিয়েছে।

৩ ফেব্রুয়ারি — পাকিস্তানী ফৌজ আজ লাহোরের ছয়শত ধর্মঘটী রেল শ্রমিকের এক উত্তেজিত জনতার ওপর গুলি চালায়। বেসরকারী খবরে বলা হয়, গুলিতে বেশ কিছু লোক নিহত হয়েছেন। পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠায় পশ্চিম পাকিস্তানের গবরনর-জেনারেল মুসা আজ সৈন্য তলব করতে বাধ্য হন।

৪ ফেব্রুয়ারি—সোভিয়েট সরকার আজ চীনকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, "সোভিয়েট জনগণের সংযম ও ধৈর্যের সীমা আছে।" মস্কোস্থ চীনা দূতাবাসের এক অভিযোগের উত্তরে সোভিয়েট সরকার চীনকে আরও জানিয়েছেন, চীনে অবস্থানকারী সোভিয়েট নাগরিকদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব সোভিয়েট সরকারের এবং তা পালনে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার সোভিয়েট সরকারের আছে।

৫ ফেব্রুয়ারি—চীন ছেড়ে চলে আসার সময় সোভিয়েট নাগরিকদের প্রতি চূড়ান্ত অভদ্রতা করা হচ্ছে। নারী এবং শিশুদেরও রেহাই নেই। সোভিয়েট কূটনীতিকদের লাঞ্ছনাও বাড়ছে। চীনারা তাদের মুখে থুতু ছিটোতেও দ্বিধা করছে না।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীমতী শর্মিলা রায়

সলটার
ঘর-করণার কাজে উপযোগী
হাল্‌কা ধরনের ওজনযন্ত্র
SALTER
গুণসম্পন্নতার
নিশ্চিতি
SALTER
HANDY
HOME WEIGHER
আজকের দুর্মূল্যে ও দুষ্প্রাপ্যতার বাজারে আদর্শ গৃহিণী হতে গেলে সব কিছু ওজন করে না দেখলে চলে। "সলটার" হাল্‌কা ধরনের ওজন যন্ত্র আপনার নাগালে থাকলে —শুধু কাজের দিক থেকে নয়, দামের দিক দিয়েও বুঝবেন সংসারে এটি কত আয় দেয়। সব গৃহিণীর কাছেই এটি তাই অপরিহার্য।
* ১০ কে. জি×১০০ গ্রাম — ২২ পা.×½ পা. টা ১০.৫০
* (শীঘ্রই পাওয়া যাবে)
২৫ কে. জি×৫০০ গ্রাম — ৫৬ পা.×১ পা. টা ৬.৯৫
৫০ কে. জি×৫০০ গ্রাম — ১১২ পা.×১ পা. টা ৯.৯০
১০ কে. জি.-র যন্ত্রটি দৈনিক বাজারের জন্য: ওজনের দাগগুলি ছোট মাপে ভাগ করা। ২৫ ও ৫০ কে. জি-র যন্ত্রগুলি উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য: ওজনের দাগগুলি বড় মাপে ভাগ করা॥
একটি আদর্শ উপহার সামগ্রী
সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়
ব্যবসায়ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নয়॥
নির্মাতা:
জর্জ
সল্‌টার
ইন্ডিয়া
লিঃ
সল্‌টার, ইংলণ্ড-এর
সহযোগিতায়
বিশেষ দ্রষ্টব্য:
যাঁরা গ্যাসে রান্না করেন, তাঁদের কাছে ৫০ কে. জি.-র ওজনযন্ত্রটি থাকলে যে কোন সময় সিলিণ্ডারটি ওজন করে গ্যাস কতক্ষণ চলবে বুঝে নিতে পারেন॥ হঠাৎ ফুরিয়ে যাবার আশংকা থাকে না।
RANJIT-SHW-1.

রান্না করার সময় বাঁচে সব প্রেশার কুকারেই

কিন্তু হকিন্স বাঁচায় আরো, আরো অনেক কিছু

প্রেশার কুকার কেনার আগে, যাচাই করে নিন (৫ বছরের গ্যারান্টিযুক্ত) **হকিন্স** প্রেশার কুকার, অন্যান্য প্রেশার কুকারের তুলনায় অসাধারণ কেন? এর বৈশিষ্ট্য কি?

হকিন্স প্রেশার কুকার, অন্যান্য প্রেশার কুকারের চেয়ে স্বতন্ত্র। এর গঠন সুন্দর ও আধুনিক ব'লে **হকিন্স** আপনার রান্নাঘরে এক নবীন দীপ্তি, এক অনবদ্য শোভা নিয়ে আসবে।

হকিন্সে, খরচ অনেক কম পড়ে, এর দরুণ ইন্ধনের খরচ কমে যায় ৮০%, বারবার পার্টস বদলাবার ঝঞ্ঝাটও হবে না। গ্যাসেই হোক বা বিজলীতে, স্টোভ কিম্বা উনুনে-যে কোন অবস্থায় সুন্দর রান্না করা যায়। আর খাবারের স্বাদও হয় ভারী সুন্দর। একটুও ভিটামিন নষ্ট হয় না।

তাছাড়া, **হকিন্স** এর দরুণ খাবার নষ্ট হয় না। হঠাৎ অতিথি এসে পড়লেও চিন্তা করার কিছু নেই।

Hawkins

প্রেশার কুকার

PCA এর উৎপাদন

প্রস্তুতকারক:

প্রেশার কুকার্স অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ প্রাঃ লিঃ

পোঃ আঃ বক্স নং ১৪৫২ বোম্বাই—১

বিক্রেতা:

কিলিক, নিক্সন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

কিলিকস্ ডোমেস্টিক অ্যাপ্লায়েন্সেজ ডিভিশন

৩১, মর্জবান রোড, বোম্বাই—১

ওঁকে একটি হকিন্স দিয়ে দেখুন…এই উপহার উনি সারাজীবন মনে রাখবেন

পূর্বভারতের আঞ্চলিক ডিস্ট্রিবিউটর

আর চম্পকলাল অ্যাণ্ড কোং, ২৫ ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১

দেশ
৩৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৬
শনিবার ৫ ফাল্গুন ১৩৭৩
সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ
Saturday, Feb. 18, 1967

ভুবনেশ্বরের ঘটনা

ভুবনেশ্বরে সম্প্রতি যে লজ্জাজনক ঘটনাটি ঘটে গেছে তার কালিমা সহজে মোছবার নয়। স্বদেশে তো বটেই বিদেশেও আমরা ভদ্রজনের ধিক্কারের পাত্র হয়ে উঠেছি। নির্বাচনের ডামাডোলে কিছু তাপ, কিছু বা তিক্ততা কোথায় না সৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই উত্তেজনায় দেশের প্রধান মন্ত্রীকে ইটপাটকেল ছুঁড়ে মারার মতন অসহিষ্ণুতা আর কোনো সভ্য দেশে ইদানীং দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। এই ঘটনাটি শুধুমাত্র অসহিষ্ণুতার প্রকাশ হলেও হয়ত কথা থাকত, কিন্তু এক্ষেত্রে অসহিষ্ণুতারও বেশি, কিছু ব্যক্তির কাণ্ডজ্ঞানহীনতা, অবিবেচনা, অশ্রদ্ধা এবং উন্মত্ততা। আর সেই সঙ্গে বোধ করি হামলাবাজির আগ্রহ। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আহত হয়েছেন সামান্য, কিন্ত যাদের হাত দিয়ে ওই ইটের টুকরো নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তারা দেশ এবং জাতির মর্যাদাকে যেভাবে আঘাত করেছেন তার ক্ষত গভীর হয়ে থাকবে।

আমরা গণতন্ত্রে বাস করি, কথায় কথায় গণতন্ত্রের অধিকার চাই, গণতন্ত্রের বুলি আওড়াই। কিন্তু বহুবার, বিশেষ করে ইদানীং দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের অসীম অবজ্ঞা। গণতন্ত্রের একটি নীতি আছে, মর্যাদা আছে: প্রতিবাদ অর্থে সেখানে বর্বরতা না, মতান্তর অর্থে সেখানে দলবদ্ধ গুণ্ডামি বা হামলাবাজি নয়। সব দেশেই প্রধানমন্ত্রীর একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা থাকে, গণতান্ত্রিক দেশে তো এই মর্যাদার বিশেষ মূল্যও দেওয়া হয়। অথচ, ভাবতে অবাক লাগে, আজও আমাদের গণতন্ত্র সম্পর্কে এমনই অজ্ঞানতা যে, সাধারণ ক্ষেত্রে আমরা অসহিষ্ণুতা ও উন্মত্ততার যে পরিচয় দিই, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান শর্ত, সে যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক। আমাদের দেশে প্রায় কোথাও এর পরিচয় দেখি না। এক্ষেত্রেও, যেখানে জাতীয় মর্যাদা ও সম্মানের প্রশ্ন জড়িত—সেখানেও নয়।

পরমতসহিষ্ণু হওয়ার মতন মানসিক শিক্ষা আমাদের অল্প; সেই স্বল্পশিক্ষাও দিনে দিনে এমন একটা অবস্থার মধ্যে এসেছে যেখানে ওই বস্তুটি থাকাই যেন অপরাধ। বিশৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচার, উন্মত্ত আচরণ প্রকাশ, গুণ্ডামি, হামলাবাজি ইত্যাদিই হয়েছে আমাদের জাতীয় ভূষণ। রাজনীতিতে ভিন্ন দুই পক্ষ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দু-কথা বলার চেষ্টা করলে মাথা ফাটাফাটি হতে বাকি থাকে না। একপক্ষের আওতায় দাঁড়িয়ে কার সাধ্য নির্ভয়ে তার বিরুদ্ধ সমালোচনা করে! অর্থাৎ গণতন্ত্রে যার মর্যাদা প্রধান, আমাদের দেশে তার কোনো মর্যাদাই দেওয়া হয় না প্রায়।

ভুবনেশ্বরে যা ঘটেছে এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এবারের নির্বাচনের আগে এই ধরনের হামলাবাজি অন্যত্রও ঘটছে। বিহারের কথা ধরা যেতে পারে; সেখানে দলীয় আক্রোশ এবং উত্তেজনার মাত্রা এতই বেশি যে, রাজ্য সরকার সদাশঙ্কিত। পশ্চিমবঙ্গেও দু-একটি ঘটনা ঘটেছে যেখানে বিরোধী দলের নেতাকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। মোট কথা, নির্বাচনের মুখে সমস্ত দেশেই একটা হিংসার আবহাওয়া। বলা বাহুল্য, এবারের নির্বাচনে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব পড়েছে রাজনৈতিক দলের ওপর—অর্থাৎ জনসাধারণের হাতেই এক রকম। যদি নির্বাচনের আগেই অবস্থা এমন হিংসাপূর্ণ হয়ে ওঠে তবে সন্দেহ হয় নির্বাচনের শান্তি কতটুকু বজায় থাকবে।

একটা কথা স্পষ্ট করে বোঝা উচিত: কাউকে—কোনো রাজনৈতিক দলকে ভোট দেওয়া না-দেওয়া ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা, আগ্রহ, বিশ্বাস বা রুচির প্রশ্ন। যদি এমনই হয়, ইটপাটকেল ছুঁড়ে, বোমা মেরে, দাঙ্গা হাঙ্গামার ভয় দেখিয়ে কেউ জনসাধারণের মরজি ঘুরোতে চায় তবে তার একমাত্র পথ এই পাপাচার সহ্য না করা। গুণ্ডামিকে ভোট দেওয়ার অর্থ কি হতে পারে? তার অর্থ এই হতে পারে যে, আমরা এদেশে গুণ্ডামি ও বিশৃঙ্খলতার শাসন চাইছি। দেশে হামলাবাজি কায়েম হোক এই যদি আমাদের কাম্য হয় তবে অন্য কথা, কিন্তু আমরা তা মনে-প্রাণে চাই না। আমরা চাই সুস্থ গণতন্ত্রে মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং জনসাধারণের ইচ্ছায় একটি সুস্থ দেশ গড়ে উঠুক: এই গড়ে ওঠার মধ্যে সব রকমের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হওয়া চাই সঙ্গত, সভ্য, শালীন, শৃঙ্খলাপূর্ণ।

রাজকীয় ভোজবাজি

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন বাকিংহাম প্যালেসে রানী এলিজাবেথের সংগে ভোজ খেয়েছেন। আনুষ্ঠানিক ব্যাপার, কিন্তু দুদিক থেকেই অভিনব, বলা যায় এমন রাজকীয় আপ্যায়ন এবং সোভিয়েট তরফ থেকে প্রধানমন্ত্রী-স্থানীয় কারও এমন রাজকীয় নিমন্ত্রণ রক্ষার ঘটনা এর আগে কখনও ঘটে নি। বলশেভিকদের উপর ব্রিটিশ রাজবংশের ঘৃণা বা ক্রোধ অনেককালের; এর কারণ কেবল আদর্শগত নয়, আরও দৃঢ়মূলে, পরিবারগত। রানী এলিজাবেথের পিতামহ রাজা পঞ্চম জর্জের কুটুম্ব ও জ্ঞাতিভাই ছিলেন রুশ বাদশাহ দ্বিতীয় নিকোলাস। বলশেভিকদের হাতে মারা পড়েন এই রুশ বাদশাহ সপরিবারে। রাজা পঞ্চম জর্জ সেট কখনও ভুলতে পারেন নি, তাঁর ছেলে রাজা ষষ্ঠ জর্জও না। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী সেই বলশেভিক দল ও দলের ঐতিহাসিক কার্যাবলীর ধ্বজাবাহী, এদিকে রানী এলিজাবেথ সেই ব্রিটিশ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। বাকিংহাম প্যালেসে ভোজের টেবিলে পাশাপাশি দুজনের সাদর সহ-অবস্থান অসামান্য ঘটনা বইকি। ১৯২৪ সনে র‍্যামজে ম্যাকডোনালড যখন ব্রিটেনের প্রথম শ্রমিক দলীয় প্রধানমন্ত্রী তখন বলশেভিক গভর্নমেন্টের প্রথম প্রতিনিধিদল লণ্ডনে এসে পেয়েছিলেন বিস্তর ধিক্কার এবং বিরূপ সংবর্ধনা। সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মেইস্কি অথবা লিটভিনভ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাকাল পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজনৈতিক মহলে বিশেষ খাতির পান নি। আমেরিকায় তো সোভিয়েট গভর্নমেন্ট উত্তর-তিরিশের আগে স্বীকৃতিই পায় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব থেকে সোভিয়েটের সংগে ব্রিটিশ মার্কিন রাষ্ট্রনেতাদের করমর্দন শুরু। গরজ বড় বালাই; চার্চিল-রুজভেল্ট-স্টালিন সংবাদে তখন নতুন সুর, নতুন নতুন সংকল্প ও প্রতিশ্রুতি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে অবশ্য আবার ছাড়াছাড়ি। ঠাণ্ডা যুদ্ধ খোলা-খুলি শুরু হয় ১৯৪৭ সনে; ঘোষণা ১৯৪৬ সনে চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতায়। ব্রিটেনে যুদ্ধবিজয় উৎসব অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণরক্ষায় স্টালিন লাল ফৌজের প্রতিনিধি পাঠান নি; যুদ্ধের সময় যে ব্রিটিশ-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়, সে চুক্তিও তখন থেকে কার্যত বাতিল। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন লণ্ডনে এখন আবার সেই চুক্তি পুনর্জীবিত করার প্রস্তাব তুলেছেন; ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে স্পষ্ট সাড়া পাওয়া যায় নি, কিন্তু ঠাণ্ডা যুদ্ধ যে আপাতত স্তিমিত, স্থগিত, তাতে সন্দেহ নেই।

পরলোকে শ্রীসুধীর ঘোষ

গত ১৩ ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লিতে বাস ভবনে শ্রীসুধীর ঘোষ ৫৫ বৎসরে পরলোকগমন করেছেন। তিনি কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় তিনি গান্ধীজীর দূত হিসেবে বৃটিশ শ্রমিক সরকার, বৃটিশ

মন্ত্রী মিশন ও বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর সংগে নিজ কর্তব্য পালন করেন। তাঁর লিখিত 'গান্ধীজীর দূত'-এর কয়েকটি পরিচ্ছেদ দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে এই সংখ্যায় শেষ হল। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি শীঘ্রই আনন্দ পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত হবে। শ্রীঘোষ ভারতে ও ভারতের বাইরে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার জন্মকাল থেকে অর্ধ শতাব্দী পূর্ণ হচ্ছে এ বছর। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর মুখ এখন পশ্চিম দিকে। পূব দিকে কম্যুনিস্ট চীনের সংগে ছাড়াছাড়ি হয়তো বাড়িয়েছে সোভিয়েটের এই পশ্চিম-মুখী টান। তবে এটা ঠিক নয় যে, কম্যুনিস্ট চীনের দৌরাত্ম্যের ভয়েই সোভিয়েট রাশিয়ার সাম্প্রতিক পশ্চিমমুখী "মিত্রতা কী যাত্রা"। সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতির চেহারা বদলাতে থাকে স্টালিনের মৃত্যুর পর থেকে। অনেকে বলেন, কেবল চেহারা নয়, সোভিয়েট কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রনীতির চরিত্রও। পিকিং-এর কম্যুনিস্ট নায়করা আরও বেশী বলেন, সোভিয়েট রাশিয়ার নেতারা ক্রুশ্চভের আমল থেকে বিপ্লবের আদর্শ ছেড়েছে, ধনতন্ত্রের পথে পা বাড়িয়েছে। রানী এলিজাবেথের সংগে কোসিগিনের ভোজ খাওয়াটা মাও-পন্থী কম্যুনিস্ট শাস্ত্রীরা নিশ্চয়ই "বুর্জোয়া শোধনবাদের" জঘন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরবেন। লণ্ডনে মাও-পন্থী কম্যুনিস্টরা কোসিগিনের বিরুদ্ধে রব তুলেছে, কোসিগিন মার্ক্সকে কবর দিয়েছেন! কম্যুনিস্ট ক্রিয়া-কাণ্ডবারিধির বিধান অবশ্য এসব ব্যাপারে কোনও পক্ষেই স্পষ্ট নয়। যেমন লেনিনের নির্দেশ ছিল, আপস-মাত্রেই আদর্শবিচ্যুতি নয়; দরকার হলে আচরণ, কর্মকৌশল বদলাতে হবে। কিংবদন্তী আছে, বলশেভিক বিপ্লবের প্রথম পর্বে জার্মানীর সংগে ব্রেস্ট-লিটোভস্ক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের সময় ট্রটস্কীর মহাসমস্যা, কূটনৈতিক অনুষ্ঠানে বলশেভিক প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর পক্ষে কেতাদুরস্ত পোশাক পরা উচিত হবে কিনা। লেনিন জবাব দিয়েছিলেন, সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের জন্য প্রয়োজন হলে ট্রটস্কী মেয়েলী পেটিকোট পরলেও দোষ হবে না! অতএব রানী এলিজাবেথের সংগে কোসিগিনের ভোজ খাওয়া সম্পর্কে ভালমন্দ বিচার আক্ষরিক আচরণ নিয়ে নয়; উদ্দেশ্য কী, সার্থকতা কী, সেটাই আসল বিচার্য।

কেবল ব্রিটেনের সংগে বোঝাপড়া করায় সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর গরজ বেশী, এ কথা মনে করবার যুক্তিসংগত কারণ দেখা যায় না। ব্রিটেন এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তি। বিভক্ত পৃথিবীতে পরস্পর বিরোধী শক্তি আমেরিকা এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন, তারাই "সুপার-পাওয়ার"। ব্রিটেন হল যাকে বলা হয়েছে "সুপার-পাইক" অর্থাৎ দুই বিরোধী মহলের মাঝামাঝি বরকন্দাজ বা গেটম্যান। ব্রিটিশ টোরী রাজনৈতিক ম্যাকসাউড ব্রিটেনের এই ভূমিকাটা খুশী মনে প্রচার করেছেন, নজির দিয়েছেন গত শতাব্দীর প্রখ্যাত ব্রিটিশ রাজনৈতিক রিচার্ড কবডেনের একটি উক্তি; কবডেন বলেছিলেন, বিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে পৃথিবীতে দেখা দেবে দুটি বৃহৎ শক্তি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর রাশিয়া। কবডেনের ভবিষ্যৎবাণী মিলেছে অনেকখানি। মহাশক্তি হিসেবে চীনের উদ্ভব ঘটতে পারে সে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন নেপোলিয়ন আরও কিছু আগে। কম্যুনিস্ট চীনের রাজনৈতিক শক্তি উপেক্ষা করা যায় না, তবে তার সামরিক ক্ষমতা এখনও মহাশক্তিধরের পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে কিনা সন্দেহ। যাই হোক, কম্যুনিস্ট চীন নিয়ে ভাবনা এখন দুই মহাশক্তির; আমেরিকার সংগে কম্যুনিস্ট চীনের বিরোধ প্রথম থেকেই, সোভিয়েটের সংগে

বিরোধ শুরু স্টালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চভ আমলে। এ বিরোধে সোভিয়েট রাশিয়া আমেরিকার চেয়ে বেশী বিব্রত, বিড়ম্বিত। তার কারণ, আদর্শের দিক দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া ও কম্যুনিস্ট চীন ছিল এক গোত্রের, এমন কী, লেনিন আশা করেছিলেন রাশিয়া, চীন ও ভারতবর্ষ এক পথের পথিক হলে সারা পৃথিবীতে কম্যুনিজমের গতি হবে অপ্রতিরোধ্য। লেনিনের এই দুরন্ত আশা পূর্ণ হওয়ার এখন অন্তত কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সোভিয়েট ইউনিয়নের রাজনৈতিক চিন্তা-চরিত্রের রূপান্তর কি এর একটি কারণ? পিকিং-এর কম্যুনিস্ট নায়কদের অতি-বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সোভিয়েট নেতাদের আস্থা নেই। স্টালিনের আমলে ও এক সময় রাশিয়ার কম্যুনিস্ট মহলে আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট বিপ্লবের ধুয়ো ও কর্মকৌশল নিয়ে প্রচণ্ড মতবিরোধ ঘটেছিল। শেষ পর্যন্ত জয়ী হয় স্টালিনের সিদ্ধান্ত, "একটি মাত্র দেশেও সোস্যালিজম প্রতিষ্ঠা সম্ভব।" স্টালিন তবুও আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ঠাট বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু প্রধানত সোভিয়েট রাশিয়ার স্বার্থে। স্টালিনের পর ক্রুশ্চভ আমলে সে ঠাটও টিকিয়ে রাখা যায় নি; আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বে সোভিয়েটের একাধিপত্য এখন কেবল কম্যুনিস্ট চীন কেন, রুমানিয়া, পোলাণ্ড পর্যন্ত মানা করতে নারাজ। পশ্চিম য়ুরোপে ফ্রান্স এবং ইতালির বৃহদায়তন কম্যুনিস্ট পার্টি দুটি মোটামুটিভাবে সোভিয়েটের পক্ষে বটে, কিন্তু সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির হুকুম নির্বিবাদে এখন কেউই তামিল করে না। মার্ক্সলেনিনবাদী আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট বিপ্লবের কড়া হাঁক-ডাক এখন মস্কো থেকে দিতে পারা অসম্ভব। সোভিয়েট নেতারা আরও অনুভব করেছেন যে, স্টালিনের মত জবরদস্ত কায়দায় সোভিয়েট জনসাধারণকে বিশ্ববিপ্লবের রসদ যোগান দিতে চিরকাল বেঁধে রাখা যায় না। ধনুকের ছিলায় পঞ্চাশ বছর টান-টান বাঁধন দিয়ে টংকার দিতে গেলে সে ছিলা ছিঁড়বেই। সোভিয়েট রাশিয়ার রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে রূপান্তর অতএব অকারণে ঘটছে না। মার্ক্স-লেনিনবাদী শাস্ত্র বচন মিলিয়ে এ রূপান্তরের সংগতি কতটুকু, পরিণতি কোথায় সে প্রশ্ন আলাদা।

আপাতত সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতাদের সমস্যা—১) বিভক্ত য়ুরোপে পাশ্চাত্ত্য শক্তি-গোষ্ঠীর সংগে সম্পর্ক, (২) কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির সংগে সম্পর্ক, এবং (৩) বিভক্ত পৃথিবীতে প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন মহাশক্তিধরের সংগে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জায় প্রতিযোগিতা। ভিয়েতনামের যুদ্ধ সম্পর্কে সোভিয়েট রাষ্ট্র-নেতারা সম্ভবত খুব বেশী উদ্বিগ্ন নন। আমেরিকার তিন লক্ষ সৈন্য ভিয়েতনামে আটকে থাকায় সোভিয়েট রাশিয়ার লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। উত্তর ভিয়েতনামে বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা এখনও দেখা দেয় নি; উত্তর ভিয়েতনামকে নৈতিক সমর্থন সোভিয়েট রাশিয়া দিচ্ছে; যুদ্ধে বিপর্যয় ঘটলে সেজন্য সোভিয়েট নেতারা পিকিংকে অনায়াসে দায়ী করতে পারবেন। বিভক্ত য়ুরোপের পশ্চিম ও পূর্ব খণ্ডের মধ্যে বোঝাপড়ার চেষ্টা অগ্রসর হচ্ছে, এতে পূর্ব য়ুরোপের কতকগুলি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের উপর সোভিয়েটের খবরদারির সুযোগ কমবে; সোভিয়েট নেতারা এখন সেটাও মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন, কারণ আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনের একনায়কত্ব তাঁদের হাতছাড়া। সোভিয়েট রাষ্ট্রনীতির পশ্চিম মুখী গতি স্থায়ী হবে কিনা সেটা অবশ্য বলা কঠিন। প্রথমত, সোভিয়েট নেতৃত্বের নাটকীয় উত্থান-পতন, নীতি পরিবর্তন সব সময়েই সম্ভব; দ্বিতীয়ত, দুই মহাশক্তির আমেরিকা ও সোভিয়েটের মধ্যে বোঝাপড়ার সম্ভাবনা অনিশ্চিত; একমাত্র য়ুরোপেই পশ্চিম ও পূর্ব খণ্ডে ঠাণ্ডা যুদ্ধে ভাটার টান, কিন্তু রাশিয়ার ক[illegible] যা স্বস্তি[illegible] আমেরিকা বা চীনের পক্ষে তা স্বাস্থ[illegible] নাও মনে হতে পারে।

১৩।২।৬৭

অতুল্যবাবু শ্রীমতী ইন্দিরার উপরই বাজী ধরছেন।
'গ্যালপ দেখে মনে হয় এক ঘোড়ার বাজী'
নির্বাচন কে ধন্যবাদ, কলকাতায় প্রচুর সন্দেশ
ভোট
আমেরিকা
রাশিয়া
আমাদের নির্বাচনী ফলাফলের উপর দুই মহাজনেরই লোল চক্ষু।

সুনন্দর জার্নাল

'বসন্তে'

টবের কৃপণ মাটিতে হাসনুহানার ছোট গাছটা কখন যে কুঁড়িতে ভরে উঠেছে, চোখেই পড়ে নি। হঠাৎ সন্ধ্যায় একরাশ দক্ষিণের বাতাস এসে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। আমি দেখতে পাই নি, কিন্তু যার খবরটা পাওয়ার দরকার ছিল সে

ভোর থেকেই কোকিলের চিৎকার

ঠিকই পেয়েছে। হাসনুহানার মদির তীব্র গন্ধে বারান্দাটা আকুল হয়ে উঠল।

কলকাতায় বসন্ত। শীত যাই-যাই করছিল, রোদে ধার দেখা দিয়েছিল, লেপের পাট চুকিয়ে হালকা কম্বলটাও অসহ্য হয়ে উঠছিল প্রথম রাতে। তবুও যেন ভালো করে বসন্তের খবর মেলেনি। এই হাওয়া—এই গন্ধ—চকিতে জানিয়ে দিয়ে গেল, সে এসেছে।

এ তো বাংলা দেশের গ্রাম নয়। সজনে ফুল ঝরবার পালা নেই, পলাশের কুঁড়িতে রঙ নেই, সবুজের সমুদ্রে ফেনার মতো আমের মুকুল উছলে ওঠে নি—বুনো পথ দিয়ে একা চলতে চলতে ভাঁট ফুলের গন্ধে নেশা ধরে না; আমের বাগানে শুকনো পাতার ওপর মুকুলের মধু ফোঁটায় ফোঁটায় টুপ টুপ করে পড়ে না, সারা দুপুর ধরে পাহাড়ী মৌমাছির মাতাল গুনগুনানি শোনা যায় না, বাদাম গাছের নতুন পাতার ওপর লালচে রোদের ঝিলিক খেলে যায় না। সেই বসন্ত কলকাতায় নেই।

আর এক বসন্ত আসে ইয়োরোপে। হাতের পাশে একটা ইংরেজী গল্পের বই রয়েছে, তা থেকে খানিকটা অনুবাদের মতো করে তুলে দেবার লোভ হচ্ছে :

"দূরে দাঁ দ্যু মিদির বিপুল বিস্তার—ভয়ংকর আর বিশাল হয়ে দাঁড়িয়েছে আকাশে, পা রেখেছে পাইনের কালো অরণ্যে, তাদের তীক্ষ্ণ চূড়োগুলো প্রখর কোণিকতায় চেয়ে আছে নক্ষত্রদের দিকে।...পাহাড়ের দৈত্যাকার পাশগুলো ঘিরে ঘিরে তুষারের বেষ্টনী ছড়িয়ে আছে মাইলের পর মাইল নিশ্চল শনিচক্রের মতো। কঠোর কালো বুদবুদে ভরা রাতের হাওয়ায় শীতের সুকঠিন মায়া। মনে হচ্ছিল, এই উপত্যকার তুষার কখনো গলবে না, তপ্ত হাওয়ার স্রোত কখনো স্পর্শ করবে না একে, কোনোদিন আর পাবে না সূর্যের স্বাদ—কখনো আর লক্ষ লক্ষ ফুলের সম্ভারে ভরে উঠবে না চারদিক।"

এই রাতে, এই পরিবেশের মধ্যে চলতে চলতে নিঃসঙ্গ পথিকের হঠাৎ মনে হল, বহু দূর থেকে কে যেন আসছে। কে আসছে বোঝা যায় না, দেখা যায় না, শোনা যায় না, তবু সমস্ত অনুভূতিতে স্পন্দন জাগে : কে আসছে। আসছে গ্রামের শূন্য পথ দিয়ে পালকের মতো পা ফেলে ফেলে, আসছে সংকীর্ণ দেওয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে, আসছে নিজেকে ছড়িয়ে—বিস্তীর্ণ করে দিয়ে।

তারপর সেই আগন্তুক কাছে এল, মৃদু সঙ্গীত তুলে, শালে আর গীর্জার ভেতর দিয়ে, দ্রুত চঞ্চল পায়ে ছুটে গেল—স্পর্শ বুলিয়ে গেল পথিকের সারা গায়ে। "সে পুরুষ নয়, নারী নয়, বালিকা নয়, শিশু নয়, কোনো জন্তুও নয়"—শুধু একটা সজল সত্তা—তরল আর ব্যাপ্ত—কোনো আয়তনেই তাকে ধরা যায় না। আর তার ছোঁয়ার শীতে সংকীর্ণ সমস্ত ত্বক, সব মাংস, সব শিরাগুলো যেন হঠাৎ মুক্তি পেল

এমন দুরন্ত বসন্ত

জীবনের তপ্ত উচ্ছ্বাসে, শরীরে খেলে গেল জ্বালার বিদ্যুৎ, দেহের সব শুষ্ক আধারগুলো যেন ভরে উঠল...

কে সে? সেই চিরদিনের নব যৌবন—সেই দক্ষিণের বাতাস, সেই বসন্তের অগ্রদূত। আর সকালের আলোয় দেখা গেল ভিজে মাঠের ভেতর পত্রহীন পপলার সারির তলায় চিকচিক করছে তুষার-গলা জল, বয়ে চলেছে ঝংকৃত মৃদু স্রোতে. তার সঙ্গে মিলতে আসছে পাহাড় থেকে স্রোতের ধারা—আসছে জীবন আর বসন্ত-

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

এ বসন্ত আমাদের কাছে বইয়ের পাতায়। যখন চোখে দেখি, তখনো জানি, এ আমাদের নয়। আমাদের আমের মুকুল, নিমফুলের গন্ধ—না, কলকাতায় তাও আমাদের অচেনা।

লিখতে লিখতে রবীন্দ্র-সংগীতের গগন-ভেদী রূপান্তরে আকৃষ্ট হতে হল। পাশের বস্তির সামনে একটি ভ্যান দাঁড়িয়ে—তা থেকে মাইক-গর্জিত গান শোনা যাচ্ছে : "বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।" রবীন্দ্রনাথকে জনপ্রিয় করবার এই দানবীয় উদ্যম মনটাকে বিরূপ করে তুলল। খবরের কাগজে একটা চিঠি লিখব ভাবছি, এমন সময় দ্বিতীয় একটি গান—"শুধু তোমার বাণী নয় গো" এবং তার পরবর্তী কিঞ্চিৎ ঘটনায় ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করা গেল।

বাস্তবিক, "বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।" গানের টানে বস্তির কিছু কৌতূহলী হিন্দুস্থানী নরনারী এবং বালক-বালিকা ভ্যানটির চারপাশে জড়ো হয়েছিল। "মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিয়ো" পর্যন্ত পেঁছুতেই 'পরশ' দেবার পালা আরম্ভ হয়ে গেল। ভ্যান থেকে আচমকা লাফিয়ে পড়ল কর্পোরেশনের ভ্যাক্সিনেটরেরা এবং 'সাইরেন' রাগিণীমুগ্ধ জনতার এক-একটিকে ধরে—

তারপরের অংশটা সকরুণ। 'হাম সুঁই নেহি লেওব'—'মর্ জায়েগা'—'ছোড়্দিজিয়ে' 'ভাগ্তা হ্যায়—পাক্ড়ো', শিশুর ক্রন্দন এবং রবীন্দ্র-গীতি থামিয়ে জলদমন্দ্র ঘোষণা : 'আপনাদের পাড়াতে যাতে বসন্তের প্রকোপ না হয়, সে জন্যে অবিলম্বে টিকা নিন, নিজে বাঁচুন এবং প্রতিবেশীদের বাঁচান—"

নিঃসন্দেহে কলকাতায় বসন্ত এসেছে। নইলে এমন করে 'পরশ' দেবার দরকার হত না।

'বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা কিছু সঞ্চয়' —ভ্যাক্সিনেটর আর সংগীতের সম্ভার বয়ে কর্পোরেশনের ভ্যান এগিয়ে গেল। কিছু দূরে থেকে হিন্দী চিত্রগীত মারফত তার আহ্বান শোনা যেতে লাগল : 'ও শীলা, ও সরযূ, ও লছ্মি'—বাকীটা বোঝা গেল না। বোধ হয় ওই সব নামধারিণী বালিকাদের টিকা নেবার জন্যেই এমন মধুরভাবে ডাক পাঠানো হচ্ছে!

'আজি দখিন দুয়ার খোলা'—অতএব 'এসো হে—এসো হে—এসো হে!' শুধু টিকা নেবার জন্যেই? না—না—'হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে, ধরব তারে' এবং লিম্পের বীজে 'ভরব তারে'— শুধু তা-ও নয়। হৃদয়ের দখিন দুয়ার খুলে দিয়েছি—তুমি এসো এবং আমাকে ভোট দাও!

সেরা বসন্ত উৎসব এবারের। জেনারেল ইলেক্শান!

পোস্টারে পোস্টারে রঙের লীলা। ছড়ায় কবিতায় দিকে দিকে যা উথ্লে উঠছে—কোথায় লাগে তার কাছে হোলির গান? কোন্ চা-রা-রা-রা রব পাল্লা দিতে পারে নির্বাচনী শোভাযাত্রার সঙ্গে?

আর সেই সব উদ্দীপ্ত ভাষণ। আমিই আপনাদের একমাত্র সেবক এবং ভোটাধিকারী। কারণ, এইসব মহৎ কাজ আমি এবং আমরা করেছি—এইসব বৃহৎ কাজ আপনাদের জন্যে করব। ভবিষ্যতে যদি প্রাণ ভরে দুধ আর মধু খেতে চান, তা হলে আমাকেই এবং আমাদেরই ভোট দিন। আর ওরা এবং ওই ব্যক্তি? চিন্তা করে দেখুন—

তারপরে দোলের আর এক পর্যায়—আর এক উৎকট আনন্দলীলা! সেই পঙ্কমন্থনে কলকাতার ম্যানহোলের কোনো আবর্জনাই বাকী রইল না বোধ হয়। 'শ্বেতা বরণ', 'বাণী-বন্দনা', আর 'শুক্লা অর্চনা'র চাঁদার খাতা হাতে যে তরুণেরা বেরিয়ে পড়েছিল—তারা শুকনো মুখে ঘুরছে—ইলেকশ্যানের পোস্টারে ফেস্টুনে তাদের লাল শালু ভাসিয়ে গেল—এবার মাইক ভাড়া পেলে হয়!

আর নির্বাচনের দোললীলায় হোলির রাজা কারা? উঁহু, নাম করে বিপদে পড়তে চাই না।

তা হোক, তবুও বসন্ত। "হি কমফরটেথ্ দি আর্থ উইথ দা সাউথ্ উইন্ড!"

বাইরে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মুখে তোমার মুখ রেখেছি, বুক রেখেছি বুকের কাছে
বাদবাকি শরীরটা তোমার হাত দুখানি জড়িয়ে আছে
হৃদয় নামের শিমুল তুলো আজ হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে
মুখে তোমার মুখ রেখেছি, বুক রেখেছি বুকের কাছে।

কতো কথাই বলছি যেমন দু মুখে দুই পিঁপড়ে বলে
খরায় ভরা নিলামখানার সেই গাড়ি কি এমনি চলে
তেল বিনা এক হালকা হাওয়ায়—দুই সওয়ারি অসচ্ছলে
কতো কথাই বলছি যেমন দু মুখে দুই পিঁপড়ে বলে।

এই আমাদের মান-অভিমান সাতমহলা ইমানদারি
এই আমাদের যোগ্য বয়স তাই যেন দ্রুত দেখতে পারি
ঠুকরে খাওয়ার মস্ত মজা এক গালে খায় কোন্ পাহাড়ি
এই আমাদের মান-অভিমান সাতমহলা ইমানদারি।

বাইরে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন, সময় থাকতে বসেই পড়ুন
অন্দরে বন্দর পেতেছি জাহাজখানাও স্বপ্নে তরুণ
নীল জলে পা ভাসাচ্ছি না কীর্তি-নাটকের দরুন
বাইরে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন—সময় থাকতে বসেই পড়ুন ॥

বলা হল না

শংকর চট্টোপাধ্যায়

বলা হল না তোমায় আমার সেই মোহর কুড়োনোর গল্প
পরীক্ষামূলক সেই ধর্মযুদ্ধের কাহিনী
নিজেরই প্রেতাত্মার সামনে খোলা ছুরি হাতে দাঁড়ানোর সেই
বীরত্বের কথা।
রাস্তা বদল করে তুমি অন্য রাস্তায় গেলে।
আমার চোখের উপর সরু হয়ে এল আলো
বুকের ভেতর ঘন ঘন বিদ্যুৎপাত হল,
সাধ ছিল' বলে আমি বাসের হাতলে ঝুলে পড়লুম।

ভালো লাগে না আমার ঐ পাতা ওড়ানোর খেলা
ভালো লাগে না স্বপ্নের ভেতর তোমার মুহুর্মুহু আক্রমণ
আমি কি ফেরারী, যে সর্বক্ষণ কেঁপে উঠব তোমার পায়ের
শব্দ পেলে?

তুমি দোকানে কেনা রুমাল হলে উড়িয়ে দিতুম হাওয়ায়
সূর্য চাঁদের যাতায়াতের পথে তুমি সিগনাল দিতে।
তুমি কোষাগার হলে বার বার আমি নতুন টাকা হয়ে আসতুম
তোমার কাছে
যাচাই করে নিতে বাজারে আমার দাম আছে কিনা?
আমি জন্ম নই যে প্রতিবার তুমি মৃত্যু হয়ে আমায় কাছে টানবে
আমি ইঁট সুরকির গাঁথা ভিত নই যে তুমি বুকে
দেওয়াল তুলবে
এমন কি সাধের মখমলও নই যে ছুঁচ সুতোয় পোশাক বানাবে।

তোমাকে অনেক কথা বলা হল না বলে আমার কবিতাগুলো
তাই এমন অশান্ত
তোমাকে সহাস্য দেখলে আজকাল মনে হয়
খুব তাড়াতাড়ি মরে যাবো।

একা ঘরে চুপ করে বসেছিলাম। বিকালের আলো ঘরের মধ্যে ক্ষীণ হয়ে এলেও বাইরে বেশ আলো ছিল। রাস্তায় লোকজনের চলাচল বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পাড়ায় অনেক নতুন বাড়ি উঠেছে নতুন নতুন সব বাসিন্দা এসে বসবাস শুরু করেছেন। তাঁদের অনেককেই আমি চিনিনে। যাঁদের চিনি তাঁদের সঙ্গেও পরিচয় কত সামান্য। দু চার-জন ছাড়া কারো সঙ্গে যে আমার অন্তরঙ্গতা হয়েছে এমন দাবি করতে পারিনে। যদিও বহু চেনামুখই এই চৌদ্দ বছরে এ পড়ায় জমে উঠেছে। তাঁদের কেউ কেউ এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কারো সঙ্গে চোখাচোখি হতে মৃদু হেসে কুশল সম্ভাষণও করছিলাম কারো সঙ্গে শুধু শিরঃসঞ্চালন চলছিল।

তাই আক্ষরিক অর্থে ঠিক যে নির্জন ও নিঃসঙ্গ ছিলাম তা বলা চলে না। অথচ এই চলমান জনতার কেউ যে আমার সঙ্গী, কি কারো সঙ্গ আমি কামনা করি তা বলি কী করে।

বাড়িতে সেই সময় চাকর ছাড়া আর কেউ ছিল না। যাঁদের দ্বারা আমি পরিবৃত তাঁরা ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেখতে গিয়েছেন। আমিও আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। কিন্তু যাইনি। ফলে একটু গঞ্জনা শুনতে হয়েছে, 'থাকো তাহলে একা একা বসে। তুমি তো আজকাল একা থাকতেই ভালোবাসো।'

কথাটা কতখানি সত্য তাই ভাবছিলাম। সত্যিই কি একা থাকতে ভালোবাসি? না কি পছন্দ মত সঙ্গী পাইনে, যাদের সঙ্গ দিতে চাই তাদের মনোমত সঙ্গী হতে পারিনে বলেই একা থাকি। এই একাকিত্বের বোধ সব সময় সুখকর নয় বরং বেশির ভাগ সময়ই দুঃখের। যখন লেখা নিয়ে থাকি, তখনকার কথা আলাদা। তখন আমি ঠিক একা নই। আমার কাজ আমার সঙ্গী। আমার আত্মপ্রকাশের চেষ্টা আমার সঙ্গী। কিন্তু সব সময় কি তাই? আমার এক প্রবীণ বন্ধু একদিন বলেছিলেন 'এখন নিজেই নিজের সঙ্গী হবার চেষ্টা করতে হবে। তাই সবচেয়ে নিরাপদ।'

নিরাপদ হতে পারে। কিন্তু সেই নিরাপত্তা কি সব সময় আমাদের কাম্য? সব জেনে শুনেও আমরা বার বার বিপদসংকুল পথে পা বাড়াই। 'নতুন বন্ধুদের বৃথা আশ্বাসে' ধাবিত হই। পুরোন বন্ধনকে নবরূপে দেবার আমাদের আকাঙ্ক্ষা জাগে। যখন এগোই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই এগোতে থাকি। তারপর অনুশোচনা, পশ্চাদপসরণ, পলায়ন পর্ব।

একা একা বসে সেদিন ঠিক এই কথাগুলিই ভাবছিলাম কিনা মনে নেই। ছোট ছোট ঘটনাকেও ধরে রাখা যায় ভাবনাকে রাখা যায় না। তারা যেন ছোট ছোট তরঙ্গের মত। ওঠে আর মিলায়। দূরে আকাশে পাখির ঝাঁকের মত। দেখতে না দেখতে উড়ে পালায়।

শহরতলীর সরু রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে দু একখানা সাইকেল যাচ্ছিল রিকশা যাচ্ছিল, পর পর দুখানা ট্যাক্সিও যেতে দেখলাম। কিন্তু বড় একখানা নীলাভ রঙের গাড়ি আমার দোর অতিক্রম করল না। সামনেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি একটু অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। দোরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

বাইশ তেইশ বছরের একটি সুদর্শন যুবক ড্রাইভারের সীটে বসে আছে। সে ভিতরের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'মা এই তো বাড়ি?'

একজন ভদ্রমহিলা বললেন, 'হ্যাঁ এই বাড়ি।'

'দেখ, আমি কেমন চিনে রেখেছি। একবার মাত্র এসেছিলাম। আর তুমি বার বার আমাকে রাস্তা গুলিয়ে দিচ্ছিলে। কেবল বলছিলে এ গলি না এ গলি না।'

মহিলাটি বললেন, 'তোমার কি। তুমি তো সবজান্তা বিশ্বকর্মা পুরুষ।'

একটি তরুণীর কণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'দাদা সব ব্যাপারে নিজে বাহাদুরি নেবে। পথ চিনিয়ে কিন্তু আমি আনলাম।'

এবার একজন বৃদ্ধা সস্নেহ শাসনের ভঙ্গিতে বললেন, 'তোদের খুনসুটি বুঝি ফের আরম্ভ হল। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। ও'কে জিজ্ঞেস কর না উমা আছে কি না।'

এবার মহিলাটি গাড়ি থেকে নামলেন, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই যে ভালো আছেন তো?'

আমি তাঁর দিকে চেয়ে বললাম 'হ্যাঁ।'

'চিনতে পারছেন?'

এবার আমি দ্বিধান্বিত। মহিলাটি দীর্ঘাঙ্গী। শাড়ি গয়নার জৌলুস যত বেশি স্বাস্থ্য সম্পদ তত কম। রোগাটে শুকনো ধরনের এই মুখখানা আমি যেন কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে কিন্তু দেশকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারছিনে।

মহিলাটি বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। চিনতে পারেন নি। লেখক হলে কি এমন ভোলা মন হতে হয়? মনে করে রাখবার যত দায় বুঝি আমাদের?'

কথাগুলি তিনি হেসেই বললেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বেশ আহত হয়েছেন সে কথা বেশ বুঝতে পারলাম।

আমি অপরাধীর মত মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ও'র অভিমান ভাঙাবার মত যথা-যোগ্য জবাব আমার মুখে জোগাল না।

তিনি এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'উমা আছে? আমি উমার বউদি।'

উমা আমার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী। কিন্তু ইনি যে তার কোন ভাইয়ের স্ত্রী আমি তখনো স্থির করতে পারিনি। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আমি সম্পর্ক সূত্রটি এবার ধরে ফেলেছি। সেই সূত্র ধরে আমি এবার পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে পারি। হেসে বললাম 'না ওরা সব ম্যাটিনি শোতে গেছে। এবার এসে পড়বে। আসুন, ভিতরে এসে বসুন।'

মহিলাটি বললেন, 'কী আর হবে বসে। আপনি যখন আমাদের চিনতেই পারলেন না। অচেনাঅজানা মানুষকে ঘরের ভিতর ডেকে নেওয়া কি ঠিক?'

হেসে বললাম, 'চেনা জানা তো হয়েই গেল।'

তিনি জবাব দিলেন, 'আপনাদের চিনতেও দেরি লাগে না, ভুলতেও দেরি লাগে না।'

তারপর বৃদ্ধা মহিলাটির দিকে ফিরে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'মা ইনি সেই কল্যাণ রায়। তোমাকে যাঁর কথা বলেছিলাম।'

বৃদ্ধা তাঁর সাদা চুলের ওপর সাদা থানের আঁচল তুলে দিলেন, তারপর জোড় হাতে সসম্ভ্রমে নমস্কার জানিয়ে মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'ও ইনি। এতক্ষণ বলিস নি কেন?'

মহিলা বললেন, 'কী করে জানব তুমি এতক্ষণেও বুঝতে পারোনি? উমারা কেউ নেই। ইনি আমাদের বসতে বলছেন। বসবে একটু? না চলে যাবে?'

'বাঃ, উনি আমাদের বসতে বলছেন আর ওঁর কথা অমান্য করে আমরা চলে যাব? কী যে বলিস তুই মায়া।'

তারপর তিনি নিজেই নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার অনেকদিন ধরে ইচ্ছে ছিল আপনাকে দেখবার। এর আগে আমি কোন লেখককে এত কাছে থেকে দেখিনি। কারো সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে কথা বলিনি। মায়াকে কতদিন বলেছি নিজেদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যখন এমন একজন আছেন তুই আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল—'

বয়স কত হবে ভদ্রমহিলার? সত্তর না হলেও তার কাছাকাছি হবে। কিন্তু তাঁর সেই শীর্ণ কুঞ্চিত মুখে আমি একটি উৎসুক বালিকাকে দেখতে পেলাম।

তাঁর পাশে আর একটি তরুণী ততক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছে। সুশ্রী তন্বী।

বৃদ্ধাই পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার নাতনী। ওঁকে প্রণাম কর দীপা।'

মেয়েটি প্রণাম করতে যাচ্ছিল, আমি বললাম, 'থাক থাক। ঘরে এসো।'

যে গাড়ি চালাচ্ছিল সেই যুবকটিও নেমে এসে দাঁড়ায়।

বৃদ্ধা বললেন, 'আর এই আমার নাতি বাচ্চু, ভালো নাম সঞ্জয়। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে।'

ছেলেটি হেসে বলল, 'থাক আমার কুলকোষ্ঠী তোমাকে আর মুখস্থ বলতে হবে না, দিদা।' তারপর মার দিকে চেয়ে বলল, 'মা তোমরা বসে গল্পসল্প করো। আমি ততক্ষণে একটু ঘুরে আসি।'

মহিলাটি বললেন, 'ও মা, তুই আবার কোথায় যাবি ঘুরতে।'

'এই কাছেই এক বন্ধুর বাড়ি আছে। তার সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'কাছেই যদি তাহলে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিস কেন। মিছামিছি তেল পোড়াবি। কী যে এক নেশা হয়েছে তোর।' ছেলেটি কোন কথা না বলে গাড়িতে গিয়ে উঠল। একটু বাদেই তার গাড়ি স্টার্ট নিল।

ছেলের এই অবাধ্যতায় ভদ্রমহিলা বেশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন লক্ষ করলাম। কিন্তু তাঁর কিছু করবার নেই।

আমি বললাম, 'আসুন আপনারা ভিতরে আসুন।'

বৃদ্ধা তাঁর মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, 'চল মায়া। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কী হবে। ছেলে বড় দুষ্টু হয়েছে।'

আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন বৃদ্ধা।

মনে হল, বাচ্চুর দুরন্তপনা তার মাকে যত স্পর্শ করছে, দিদিমাকে তত করছে না।

লম্বা সোফাটায় তিনজনে এসে বসলেন। দীপা বসল মাঝখানে। তার মা আর দিদিমা দুজন দুই প্রান্তে। ঠিক সামনে নয়, কোণাকোণি আর একটি ছোট সোফায় আমি বসে পড়লাম।

আমার সামনে তিনটি নারীমূর্তি। বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, তরুণী। তিনজনই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। নিঃসম্পর্কিত শুধু আমি। স্বল্প পরিচিত একজন বাইরের মানুষ।

পিছনের পর্দার আড়াল থেকে একটি মুখ এগিয়ে এল।

আমি বললাম, 'কী হারান কী চাস তুই? সামনে আয়।'

হারান এগিয়ে এসে বলল, 'চা করব দাদাবাবু?'

অতিথিরা এলে তাঁদের চা দিয়ে আপ্যায়ন করার ব্যাপারে আমার ভৃত্যটির বেশ তৎপরতা আছে। যতবার চা করবে এক কাপ না হোক আধ কাপ করে ও নিজের বরাদ্দ ঠিক করে নিয়েছে। আমি সায় দিয়ে বললাম, 'করবি বইকি।'

ভদ্রমহিলা বাধা দিয়ে বললেন, 'ওসব ঝামেলার মধ্যে কেন যাচ্ছেন? গিন্নীরা কেউ বাড়িতে নেই—'

হেসে বললাম, 'কিন্তু গৃহীর কর্তব্য তো আছে। সাধ্যমত অতিথি পরিচর্যা করতে হবে। অবশ্য চা ছাড়া আর কীই বা দিতে পারি?'

তিনি বললেন, 'আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। সত্যি বলছি ও সবের কিছু দরকার নেই। এইমাত্র আমরা আর এক বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি। আপনি সুস্থ হয়ে বসুন।'

একটু শাসনের ভঙ্গি ফুটে উঠল মহিলাটির চোখে। একটু বা কৌতুক। তীক্ষ্ন নাক চোখ দুটিও বড়। এখন একটু কোটরগত বলে মনে হয় ভ্রূ দুটি সুন্দর সুকৃষ্ণ। একদিন ওই যুগল ভ্রূর শাসন অনেককেই মানতে হত। এখন হয়তো সেই জোর আর নেই। কিন্তু অভ্যাসটুকু আছে সংস্কারটুকু যায়নি।

হেসে বললাম 'শুধু বসে থাকলেই কি হবে?'

মহিলা বললেন, 'শুধু বসে থাকবেন কেন? আপনি কি কাঠের পুতুল?' ভদ্রমহিলা একটু হাসলেন, 'আর সঙ্গে গল্প করুন বসে বসে। মা আপনার লেখার খুব ভক্ত।'

আমি বৃদ্ধার দিকে একটু তাকালাম। তিনি বইয়ের আলমারির দিকে চেয়ে আছেন। মেয়ের কথা তাঁর কানে গেল কি না কে জানে।

গলা একটু নামিয়ে বললাম, 'শুধু মাই বুঝি ভক্ত?'

তিনি হাসলেন, 'মন উঠল না বুঝি? আমার এই মেয়েও আপনার ভক্ত। অবশ্য শুধু দুজন একজন না ওর অসংখ্য দেবতা। ও যা পায় তাই পড়ে। যা পড়ে তাই ওর ভালো লাগে। শুধু পড়ার বই ছাড়া।'

দীপা এবার চোখ তুলে তাকাল। ওর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল। সেই হাসিতে সুস্পষ্ট, মায়ের এই অনুযোগের কোন মানে নেই। সেই হাসিতে আর চোখের দৃষ্টিতে বাঙ্ময় হল ওর মায়ের জীবনে দিদিমার ভূমিকা এখন যেমন অপ্রধান প্রায় অবাস্তব, ওর কাছে ওর মাও তেমনি। একটু খুঁটিয়ে বিচার করে দেখলে দীপা তার মায়ের মত রূপবতী নয়। কিন্তু যৌবনবতী। যে যৌবন ওর দিদিমার দেহে নেই, মায়ের দেহে নেই, তা শুধু ওর তনুকেই অবলম্বন করে রয়েছে। আচ্ছা মেয়েটি কি সে সম্বন্ধে খুব সচেতন? না কি এই সচেতনতা শুধু আমারই? বিগত যৌবন এক দর্শকের। সে কথা শুনছিল তার এক সমবয়সী ভদ্রমহিলার, কিন্তু বার বার লক্ষ্য করছিল তাঁর আত্মজাকে। এমনভাবে দেখছিল যেন সেই দেখা আর কেউ না দেখে। কিন্তু চোখ তো প্রত্যেকের আছে। শুধু আমিই তো দেখছিনে। তিন জোড়া চোখে আমিও তো পরিদৃষ্ট হচ্ছি। দীপা কোন কথা বলছিল না, কথা বলবার কোন সুযোগ তাকে দেওয়া হচ্ছিল না, কি কোন সুযোগ সে নিতেও চাইছিল না। কিন্তু তার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি যেন অবাক হয়ে উঠেছিল। সে সেন্টার টেবিল থেকে একটি ম্যাগাজিন টেনে তার পাতা উলটে যাচ্ছিল। কিছু পড়ছিল বলে মনে হয় না, ম্যাগাজিনে ছবিও আছে। হয়তো ছবি দেখছিল। কিন্তু শুধু কি ছবিই দেখছিল?

বৃদ্ধা তাঁর মেয়েকে বললেন, 'ও কথা বলিস নে মায়া। দীপা আমার লক্ষ্মী। এমন মেয়ে হয় নাকি? এইতো সতেরো উতরে আঠেরোয় পা দিয়েছে। এই বয়সে অনার্স নিয়ে বি-এ পড়ছে। এবার পার্ট-ওয়ান দেবে। নাচতে জানে, গাইতে জানে। ঘর সংসারের কাজ সব জানে। বাপ হাই-কোর্টের নাম করা উকিল হলে কী হবে, মেয়ে ঘর সংসারের কাজ জানবে না, রান্না-বান্না কিচ্ছু শিখবে না এ তার পছন্দ নয়।'

যার সুখ্যাতিতে বৃদ্ধা পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন সে এবার মুখ তুলল। তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দিদা কী হচ্ছে এসব?'

কিন্তু মুখে যত আপত্তিই করুক আত্মপ্রশংসায় দীপা যে খুশি হয়েছে তা সে গোপন রাখতে পারল না। যোগ্যতার স্বীকৃতি কাকে না খুশি করে?

মহিলাটি বলেন, 'মা তাঁর নাতনীর গর্বে অস্থির।'

আমি দেখলাম দীপার মায়ের গৌরবও কম নয়। সেই মুহূর্তে বিভিন্ন বয়সী তিন নারীর মুখে আমি প্রসন্নতা লক্ষ করলাম। একই কৃতিত্বের তিন শরিক। শরিক কি? না, শরিক শব্দটির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বিচ্ছিন্নতা অংশীদারির ভার আছে। কিন্তু যেসব দুর্লভ মুহূর্তে অন্যের গৌরবকে আমি আমারই গৌরব মনে করি, তখন আমি অবিচ্ছিন্ন হই। তখন আর আমি অংশীদার নই, সমগ্র সম্পদের অধিকারী।

আমি এবার দীপাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম 'তুমি নাচতে জানো?'

দীপা বলল, 'একটু একটু। আপনি দিদার কথা বিশ্বাস করবেন না।'

'তবে কার কথা বিশ্বাস করব? তোমার!'

দীপা স্মিতমুখে একটু তাকিয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। মনে হল সে সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকতে পারে না। ও কি জানে না জানে সে সম্বন্ধে ওর চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য কথা আর কে বলতে পারে? শুধু তাই নয় শুধু নিজের সম্বন্ধেই নয় অন্যের সম্বন্ধেও অনেক অবিশ্বাস্য কথা আর কে বলতে পারে? শুধু তাই নয় শুধু শুধু নিজের সম্বন্ধেই নয় অন্যের সম্বন্ধেও অনেক অবিশ্বাস্য কথা বিশ্বাস করাবার শক্তি ওর প্রখর আছে। ওর কণ্ঠস্বর মধুর। ওর কথার যাথার্থ্য কেই বা এখন বিচার করতে যায়? বললাম, 'কোন ধরনের নাচ তোমার পছন্দ? কোন রকমের নাচ তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে?'

'আমার পছন্দে কি কিছু হয়? নাচ ও'রা কেউ পছন্দ করেন না। না বাবা না মা। আমি যেটুকু যা শিখেছি জোর করে। এখান থেকে ওখান থেকে দেখে দেখে। কিছু কিছু রবীন্দ্রসংগীতের সংগে নাচতে পারি। শিখিনি তো তেমন করে।'

ওকে অহংকারও মানায় বিনয়ও বেমানান হয় না। যে বলতে জানে, তার নেতি বচনও অস্তিত্বে ভরে ওঠে।

হেসে বললাম, 'বেশ তো, তোমার অশিক্ষিত পটুত্বই একটু দেখি।'

আমার প্রস্তাবে ওর দিদিমার সমর্থন মিলল। তিনি উল্লসিত হয়ে বললেন, 'দেখা না দিপু, সেই নাচটা দেখা ওকে। ওগো সুন্দর মরি মরি। ভারি সুন্দর হয় ওর এই নাচটি।

সংগে সংগে তাঁর মেয়ে মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা ধমক দিয়ে উঠলেন, 'কী যে আদিখ্যেতা তুমি কর মা। এখন কি ওর নাচবার সময়? ঘুঙুর নেই, কিছু নেই। তা ছাড়া সময়ই বা কোথায়? এখনই তো আমরা চলে যাব।'

বৃদ্ধা একটু হেসে বললেন, 'গাড়ি আসবে তবে তো যাবি। না হয় দেখাতই একটু নাচ। সব সময় কি আর নাচের জন্যে সাজসরঞ্জাম লাগে? তা লাগে না।'

তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'জানেন ওর ঘরোয়া নাচই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। যখন আমাদের বাড়িতে যায়, আমি বলি দিদি একটু গা দেখি। ও অমনি আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমার কানের কাছে গুন গুন করে। যখন বলি দিদি একটু নাচ তো। ও অমনি কোমরের আঁচল জড়িয়ে শুরু করে দেয়।'

তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওকে না হয় একটু নাচতে দিতিই মায়া। ও'কে দেখাত। আমাদের তো কিছু আর দেখাবার নেই, ও দেখাত।'

বৃদ্ধা যৌবনের কাছে যে ভাবে আত্মসমর্পণ করলেন, প্রৌঢ়া তা পারলেন না। তিনি রুক্ষ অসপ্রসন্ন স্বরে বললেন, 'উনি আর একদিন দেখবেন।'

দীপা এবার মুখ তুলল, আমার দিকে তাকাল, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'আপনাকে আর একদিন দেখাব।'

আমি ভাবলাম এই প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট। তা পালন না করলেও চলবে। নাচ আমার না দেখলেও চলবে। যা দেখলাম তাই কি কম?

এতক্ষণে ভৃত্যটির সুবুদ্ধি হয়েছে। ট্রেতে করে চার কাপ চা নিয়ে এসেছে হারান। আর একটি প্লেটে আট দশখানা বিস্কুট। সেণ্টার টেবিলের ওপর ট্রেটি নামিয়ে রেখে হারান আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদাবাবু, মোড়ের দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে আসব? আর কাজু বাদামের সন্দেশ নিয়ে আসব?'

লজ্জিত হলাম। এসব ব্যবস্থা আমারই করা উচিত ছিল। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিতেই ভদ্রমহিলা বাধা দিলেন, 'পাগলামি করবেন না। আমরা এই একটু আগেই আর এক বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি। তা ছাড়া এত যে চা করলেন খাবে কে?'

হেসে বললাম, 'এত কই। প্রত্যেকেরই এক কাপ এক কাপ করে।'

মহিলাটি আমার দিকে তাকালেন, 'কিন্তু প্রত্যেকে তো খাবে না। আমার মা কোন বাড়িতে গিয়ে কিছু খান না। অন্য কারো হাতে কিছু খান না।'

হারান দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'আমি পরিষ্কারভাবে করে এনেছি। বার বার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিয়েছি। এই দেখুন আমার হাত। একটু আগে কয়লা ভাঙছিলাম কেউ বলতে পারবে?'

সবাইর চোখ এবার হারানের ওপর গিয়ে পড়ল।

বাইশ তেইশ বছরের স্বাস্থ্যবান ছেলে। গায়ের রঙের সঙ্গে কয়লার সাদৃশ্য আছে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। তার মধ্যে কয়লার কুচি লেগে থাকা বিচিত্র নয়। পরনে একটা আধ ময়লা পাজামা। গায়ের জামাটা নীল রঙের বলে তার মলিনত্ব সহজে নির্ণেয় নয়। পাঞ্জাবী শিখদের মত ডান হাতে একটা লোহার বালা পরেছে। এ ভূষণ কিছুতেই আমরা ওর হাত থেকে খসিয়ে নিতে পারিনি।

বৃদ্ধা তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। মনে হল দু পাটি দাঁতই বাঁধানো। কিন্তু হাসিতে কৃত্রিমতা নেই।

তিনি বললেন, 'তুমি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাবা, তোমার কোন দোষ নেই। কিন্তু আমার অভ্যাস নেই যে। আমি কারো হাতেও খাইনে অন্য কারো কাপেও খাইনে।'

পাশ থেকে গেরুয়া রঙের বটুয়াটি তুলে নিলেন সেটি খুলে কলাইকরা ছোট একটি গ্লাস বের করলেন। সেটি দেখিয়ে বললেন, 'কোথাও গেলে যদি জলটল কিছু খেতে হয় এতে করে খাই। এটি সঙ্গে সঙ্গে রাখি।'

বৃদ্ধা গ্লাসটি নিজের পাশে রেখে দিলেন, বটুয়ার মধ্যে আর ভরলেন না লক্ষ করলাম। তাঁর এই চড়ামাত্রার শুচিতা নিয়ে আমি কোন মন্তব্য করলাম না। আমার এক বন্ধুর কথা মনে পড়ল। তিনি বহুকাল ধরে টি বি রোগে ভুগছেন। মাঝে মাঝে হাসপাতাল থেকে ছুটি নিয়ে আসতেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। তিনিও সঙ্গে অমনি একটি গ্লাস রাখতেন। তাতে চা খেতেন। এই দুটি গ্লাস দুই ভিন্ন মনোভাবের প্রতীক। যদিও একটিকে দেখে আমার আর একটির কথা মনে পড়েছে।

আমি এবার ওঁদের দিকে তাকালাম। আমার অন্য দুজন অতিথির দিকে। বললাম 'আপনারা চা নিন।'

মহিলাটি বললেন, 'নিচ্ছি। আমরা মানে আমি নেব। ছেলেমেয়েকে বড় একটা চা খেতে দিইনে। ওই সকালে এক কাপ বিকেলে এক কাপ। কোন কোনদিন মাত্র এক কাপই বরাদ্দ। ওরা দুধ খায় ওভালটিন খায়। চা যত কম খায় ততই ভাল।'

তিনি নিজের কাপটি তুলে নিলেন। মেয়ের কাপটি পড়েই রইল।

হঠাৎ আমি এক কাণ্ড করে বসলাম। একটি কাপ তুলে নিয়ে দীপার দিকে এগিয়ে দিয়ে হেসে বললাম, 'নাও না। এক কাপ চা বেশি খেলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।'

দীপা স্মিতমুখে আমার হাত থেকে চায়ের কাপটি তুলে নিল। এক পলকের জন্য চোখাচোখি তাকাল। কাজল পরা দুটি কালো চোখ। সেই চোখে আমি একটি পূর্ণযৌবনা রমণীকে দেখলাম।

ও কি দেখল ওই জানে। মৃদু হাসি দেখে মনে হল আর দুটি চোখের মুগ্ধতা ওকে খুশি করেছে।

'সহস্র হারানো মুখ' সত্যিই কি কারো চোখে খুঁজে পাওয়া যায়? যায় না। তবু পেতে ভালো লাগে, লিখতে ভালো লাগে, ভাবতে ভালো লাগে।

এবার দীপা তার মায়ের দিকে তাকাল, 'খাব মা?'

মহিলাটি ঈষৎ ধমকের স্বরে বললেন, 'কী যে খুকিপনা করিস। উনি যখন দিলেন খাবিনে কেন? গুণী মানুষ। ওঁর হাত থেকে আমরা কত কি পেয়েছি। আজ তুই চায়ের কাপও পেলি।'

ভদ্রমহিলা এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, 'যদিও আপনারা যা দেন সবই নেবার মত হয় না।'

চায়ের রসে সিক্ত তাঁর দুটি ঠোঁট চকচক করে উঠল। হাল চড়া প্রসাধন নতুন করে লক্ষ করলাম। কড়া সমালোচনায় কর্ণমূল রক্তিম হল চোখে দেখলাম না। অনুভব করলাম।

যা দিই সবই নেবার যোগ্য হয় না। কিছুই নেবার যোগ্য নয় এ কথাও একদিন শুনতে হতে পারে। এর চেয়ে মর্মান্তিক সত্য আর কী আছে? তবু না দিয়ে থাকবার জো নেই।

আমি এবার বয়োজ্যেষ্ঠা অতিথির দিকে তাকালাম।

মৃদু হেসে বললাম, 'আপনি তো কিছুই খেলেন না। দীপাকে যেমন করে চা খাওয়ালাম, আপনাকে তো তা পারব না?'

বৃদ্ধা একটু হেসে বললেন, 'আপনার যদি এতই ইচ্ছে হয়ে থাকে তা হলে —' [illegible] হাতের ছোট গ্লাসটি চঞ্চল হয়ে উঠল।

কিন্তু তাঁর মেয়ের কাছ থেকে তাঁকে একটি ধমক খেতে হল, 'না মা ও চা তোমাকে আমি খেতে দিতে পারব না। খাবে আর শেষে একটা বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড করে বসবে। তোমার গা বমি বমি করবে, মাথা ঘুরবে। তোমার এলার্জির কথা যেন কারো জানতে বাকি আছে।'

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'থাক থাক, তাহলে থাক।'

এক মুহূর্ত ঘরখানা স্তব্ধ হয়ে রইল।

মহিলাটি তাঁর মার দিকে তাকালেন 'তোমার কি ইচ্ছে করছে চা খেতে? খাবে মা?'

বৃদ্ধা একটু অভিমানের স্বরে বললেন, 'না বাপু আমার আর কোন ইচ্ছে-টিচ্ছে নেই।''

কিন্তু তাঁর মেয়ে ইচ্ছাময়ী। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। হেসে বললেন, 'আচ্ছা আমি আনছি তোমার জন্যে চা করে।'
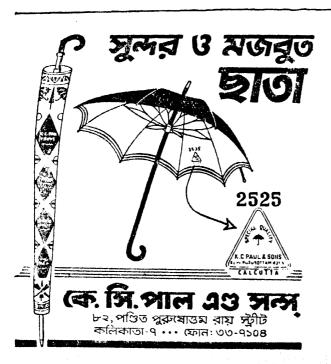
তারপর আমার দিকে তাকালেন তিনি 'কই আপনাদের হারান না নারান কে আছে। ডাকুন দেখি তাকে। সে আমাকে একটু দেখিয়ে দিক কোথায় কি থাকে টাকে।'

বলে তিনি নিজে ভিতরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমি গেলাম তাঁর পিছনে পিছনে।

বললাম, 'হারান কেন। আমিই যাচ্ছি।'

তিনি আমার দিকে তাকালেন, 'আপনাকে দিয়ে আমার কোন দরকার নেই। আমার ওই হারানকে পেলেই চলবে।'

আমি মৃদু স্বরে বললাম, 'আগে যদি জানতাম তাহলে এই হারান হয়ে জন্মাতাম।'

তিনি এবার আমার চোখের দিকে তাকালেন। তাকিয়ে হাসলেন, 'বটে। আপনাদের সাধের অন্ত নেই। আপনাদের কত কীই না হতে ইচ্ছে করে। আপনাদের মুহূর্তে মুহূর্তে নবজন্ম।'

আমি বললাম, 'আর মুহূর্তে মুহূর্তে মৃত্যু যন্ত্রণা।'

তিনি ফের আমার দিকে তাকালেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'মৃত্যু যন্ত্রণা যে কী তা যদি সত্যিই জানতেন।'

আমি একটু অবাক হলাম। এই পতি গুণবতী সচ্ছল ঘরের গৃহিণী কোন যন্ত্রণার কথা বললেন ঠিক যেন অনুমান করতে পারলাম না।

একটু বাদে তিনি বললেন, 'যান বসুন গিয়ে। আমি চা করে আনছি। না কি নির্ভর করতে পারছেন না? ভাবছেন ভাঁড়ার সব লুটপুটে নেব? বাড়ির গিন্নী এসে দেখবেন ঘর একেবারে খালি?'

আমি কোন জবাব দিলাম না। শুধু অনুভব করলাম এই মুহূর্তটিতে ও'র মন ভরে তুলতে পেরেছি।

ফিরে এলাম। কিন্তু ততক্ষণে দীপা তার নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে গেছে। দাঁড়িয়েছে বাইরের দরজার ধারে। নিজের মনেই বিড়বিড় করছে 'দাদা গেছে তো গেছেই। কখন যে আসবে—'

আমি ওর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বৃদ্ধা আমাকে ডাকলেন, 'বসুন আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলি। কথাই তো হল না।'

আমি লজ্জিত হয়ে তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম, আমরা জানি যৌবনের পরিণাম এই জরায়। তবু আজীবন যৌবনই আমাদের আকর্ষণ করে। যৌবনকেই জীবনের সিংহাসনে বসাই।

আমি বৃদ্ধার দিকে তাকালাম। তাঁর মাথায় এখন আর সেই আঁচলটুকু নেই। মাথাভরা শাদা চুলের রাশ দেখা যাচ্ছে। সেই

চুল তিনি ছে'টে ছোট করে ফেলেন নি। পিঠ ভরে ছড়িয়ে রেখেছেন দেখে ভালো লাগল। গায়ে একখানি ঘি রঙের এণ্ডি জড়ানো।

দেখে মনে হল রূপ শুধু একটি বিশেষ বয়সেই মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

আমি বললাম, 'কী বলবেন বলুন।'

তিনি বললেন, 'বলবেন তো আপনি। আমি শুনতে এসেছি।'

বৃদ্ধার এই বিনয় আমার ভারি ভালো লাগল। আসলে আমরা হৃদয় বিনিময় চাই। সেই হৃদয় বয়স নিরপেক্ষ। সেখানে নারী পুরুষের কোন ভিন্নতা নেই।

বললাম 'আপনি পড়তে খুব ভালোবাসেন বুঝি?" তিনি বললেন, 'তা বাসি। এই বয়সে বই ছাড়া আর সংগী কোথায়?'

বললাম, 'কেন ছেলেমেয়ে নাতি নাতনী—'

তিনি একটু হেসে বললেন, 'সব আছে। ভগবান আমাকে সবই দিয়েছেন। তবু তারা সবাই যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সব সময় কি আর তাদের মধ্যে গিয়ে হানা দেওয়া যায়? ছেলে অবশ্য আমার অনাদর করে না। কিন্তু আমি যে আছি এ কথা তারা সব সময় মনে রাখতেও পারে না। আগে আগে ভারি অভিমান হত। এখন ভেবে দেখেছি এই নিয়ম সংসারের। শেষ বয়সে নিজের ঘরেও মানুষকে পরবাসী হয়ে বাস করতে হয়।'

পুরোন কথা। কিন্তু পুরোন কথাও যখন কেউ অন্তরের উপলব্ধি অনুভূতি থেকে বলে তখন তা রূপকথা হয়ে ওঠে। রূপময়ী বৃদ্ধার মুখে আমি সেই রূপ-কথা শুনতে লাগলাম।

তিনি এক সময়ে বললেন, 'জানেন আমিও একটু একটু লিখতাম?'

আমি উৎসুক হয়ে বললাম, "তাই নাকি? ছেপেছেন কখনো?'

'না। স্বামী বলেছিলেন ছেপে বার করবেন। কিন্তু কাজের মানুষ। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে থাকতেন। সময় করে উঠতে পারতেন না। তারপর সময় আর পেলেনও না। চলে গেলেন। ছেলেরা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল মা আমরা তোমার লেখা ছেপে দেব। দিন কয়েক এ কাগজে সে কাগজে চেষ্টা চলল। আমি বুঝতে পারলাম ওরা সুবিধে করে উঠতে পারছে না। আমার বয়স পেকেছে কিন্তু লেখা আর পাকল না। খাতাপত্র নিজেই লুকিয়ে ফেললাম।'

বৃদ্ধা একটুখানি চুপ করে রইলেন তারপর আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'এখন আর লেখার চেষ্টা করিনে। এখন পড়ি।'

বললাম, 'পড়েন?'

তিনি বললেন 'হ্যাঁ ভেবে দেখেছি আমি যে লিখতে পারিনি তাতে দুনিয়ার কারো কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু রাগে দুঃখে যদি পড়াটাও ছেড়ে দিতাম সবচেয়ে বেশি ক্ষতি আমারই হত। এখন কারো লেখা আমার খুব ভালো লাগে, যার মধ্যে আমি একেবারে ডুবে যাই, আমি ভুলে যাই সে লেখা আমার লেখা নয়। আমি জানি আমি লিখতে জানলে ঠিক অমনি করেই লিখতাম। ও লেখা আমারও লেখা।'

বৃদ্ধার গলা আবেগে আর্দ্র হয়ে এসেছিল। আমার মনে হল চশমার আড়ালে দুটি চোখও যেন চক চক করছে।

আমি চুপ করে রইলাম। তাঁকেও খানিকক্ষণ চুপ করে থাকতে দিলাম।

দীপা কখন এসে তাঁর পাশে বসেছিল, আমি লক্ষ করিনি। গলা শুনে তার দিকে তাকালাম।

দীপা বলল, 'দিদা, তোমার আর একটা বাতিকের কথা ও'কে বললে না?'

বৃদ্ধা নাতনীর দিকে মুখ ফেরালেন, হেসে বললেন, 'কিসের বাতিক দিদি?'

'তোমার সেই ঘোরাঘুরির বাতিক?'

বৃদ্ধা এবার আমার দিকে তাকালেন, 'হ্যাঁ, আমার ঘুরে বেড়ানোটাকে সবাই বাতিক বলেই জানে। ছেলেরা মেয়েরা, বউমারা বলাবলি করে আমার ঘাড়ে একটা ভূত চেপেছে। সেই ভূত আমাকে ঘরে তিষ্ঠাতে দেয় না বাইরে বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। হয়তো তাই হবে।'

বললাম, 'কোথায় যান? মন্দিরে টন্দিরে? সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রমে?'

তিনি বললেন, 'সব সময় যে সন্ন্যাসীদের আশ্রমেই যাই তা নয়। আমাদের মত সংসারী মানুষদের গৃহাশ্রমই বরং বেশি দেখি। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, আমার বয়সীরা, আমার ছেলেমেয়ের বয়সীরা, তাদের ছেলে-মেয়ের বয়সীরা। সবাইকে দেখে দেখে আসি। পুরনো সব আত্মীয়কুটুম্ব তারা আমার কথা সব ভুলে গেছে। পরিচয়টরিচয় দেওয়ার পর তবে মনে করতে পারে। দুদিন বাদে সবাই ভুলে যাবে। তবু শেষবারের মত মনে করিয়ে দেওয়া। আমার খোঁজ কেউ নেয় না। আমিই বার বার নিতে যাই। আমার বুক আমার কাছে। একদিন তো

নিখোঁজ হয়েই যাব। কী হবে অত মান-অভিমান দিয়ে।'

দীপা নালিশের ভঙ্গিতে বলল, 'জানেন বাবার গাড়ি আছে, মামাদের গাড়ি আছে কিন্তু দিদা সহজে কারো গাড়িতে ওঠেন না। লুকিয়ে লুকিয়ে বাসে ট্রামে ঘুরে ঘুরে বেড়ান।'

বৃদ্ধা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, 'এই নিয়ে আমার ছেলেরা খুব রাগ করে। বুঝি তাদের মানসম্মানে লাগে। কিন্তু আমার মান আমার কাছে, আমার বুঝ আমার কাছে। ওদের গাড়ি যদি একদিনের বেশি দুদিন চাই ওরা মনে মনে বিরক্ত হবে। ছেলেরা মাঝে মাঝে রাগ করে বলে, মা তুমি একদিন পথেঘাটে পড়ে মরে থাকবে। আমরা কেউ দেখতেও পাব না।'

আমি বললাম, 'সত্যি, এই বয়সে ওভাবে আপনার ঘোরা উচিত নয়। আর আজকাল বাসে ট্রামে যা ভিড়। ওঠা-নামা খুবই শক্ত।'

তিনি এ কথার কোন জবাব না দিয়ে নিজের মনেই বলে যেতে লাগলেন, 'মরণের কথা ভেবে রেখেছি। মাঝে মাঝে সাধ হয় নিজের ঘরের মধ্যে ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনী সবাইর সামনে মরব। সেই মরণই সবচেয়ে সুখের। মরবার আগে সবাইর হাতের জল পাব। মরবার পরে সবাইর হাতের আগুন। আবার ভাবি আমার ইচ্ছামতই তো সব হবে না। মরণ যদি পথেঘাটেই আসে তাতেই বা ক্ষতি কি। সেই মরণই তো সব চেয়ে রোমান্টিক। কী বলুন?'

এই একটিমাত্র ইংরেজী শব্দ এতক্ষণের মধ্যে আমি তাঁর মুখে শুনতে পেলাম। মনে হল জিভ দিয়ে শব্দটির স্বাদ গ্রহণ করতে করতে তিনি যেন কথাটি উচ্চারণ করলেন।

দীপা হেসে উঠল। আমার দিকে চেয়ে বলল, 'দেখেছেন? দিদার এখনো রোমান্সের কী সাধ?'

বৃদ্ধাও হাসলেন, নাতনীর দিকে চেয়ে বললেন, 'দিদি ও সাধ কি মরবার আগে কারো মেটে?'

এতক্ষণে কেটলিতে করে চা নিয়ে এলেন দীপার মা। হারান আগের কাপগুলি ধুয়ে এনে ট্রের ওপর সাজিয়ে রাখল।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'কই মা, দাও দেখি তোমার গ্লাসটা। চা দিই তোমাকে।'

বৃদ্ধা তাঁর গ্লাসটি এগিয়ে দিলেন।

মায়ের জন্যে আলাদা একটা ঘটিতে করে জল ফুটিয়ে চা করে এনেছেন ভদ্রমহিলা।

বৃদ্ধার যে শুচিতাকে শুচিবায়ুতা মনে করে আমার মন একটু বিরূপ হয়ে উঠেছিল এখন আর সে ভাব নেই। ইতিমধ্যে আমি তাঁর রূপ দেখেছি, তাঁর মুখের রূপকথা শুনেছি। আচার-আচরণগত তুচ্ছতা কোথায় তলিয়ে গেছে।

মহিলাটি এবার আমার হাতেও এক কাপ তুলে দিলেন। হেসে বললেন, 'নিন। আপনি তো আমাকে কিছু দিলেন না, আমি দিলাম।'

আমি খানিক আগে ও'র তরুণী মেয়ের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়েছি, ও'কে দিইনি। সেই খোঁচা।

আমি ও'কে দোষ দিলাম না। আমাদের আত্মজ আত্মজা যে আমাদেরই নবীন সত্তা, আমাদেরই পুনর্যৌবন এই পৃথিবীকে শুধু তাদের মাধ্যমেই আমরা দ্বিতীয়বার উপভোগ করতে পারি, অন্য কোন পথ নেই, এই হল সবচেয়ে সেরা কায়কল্প এ কথা কি আমাদের সব সময় মনে থাকে? থাকে না। যে

আত্মজের সঙ্গে আমি এই মুহূর্তে একাত্ম, পরমুহূর্তে সে আমার পরম অনাত্মীয়। প্রত্যেকের সঙ্গেই তো আমার এই দ্বৈত সম্পর্ক। এক মুহূর্তে ভিন্ন আর এক মুহূর্তে অভিন্ন। বোধে বুদ্ধিতে অনুভবে অভিন্ন আচরণে ভিন্ন। মুহূর্তে মুহূর্তে এই মিলনবিচ্ছেদের মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ছিঁড়তে ছিঁড়তে শেষ ঘাটি পর্যন্ত এগিয়ে যেতে হবে।

বৃদ্ধা আঁচল দিয়ে গ্লাস চেপে ধরে চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'মেয়ে আমার লক্ষ্মী। রোগে ভুগে ভুগে শুধু ওর মেজাজটা খিট-খিটে হয়ে গেছে। শরীরেরও কী দশা হয়েছে দেখুন না।'

আমি বললাম, 'কী রোগ?'

বৃদ্ধা বললেন, 'হাঁপানি।'

তাঁর মেয়ে তিরস্কারের সুরে বললেন, 'মা, আবার ওসব কথা কেন তুলছ?'

বৃদ্ধা বললেন, 'তাতে কী হয়েছে! তোর অত লজ্জা পাবার কী আছে? এ রোগ তো তুই আর ইচ্ছে করে আনিসনি। আমার কাছ থেকেই পেয়েছিল। যদি কারো দোষ থাকে আমারই দোষ।'

আমি বললাম, 'অ্যাজমা আপনারও আছে নাকি?'

বৃদ্ধা বললেন, 'আছে। একেক সময় এমন ধাক্কা দেয়, মরার বাড়া করে তোলে। তিন চার দিনের মধ্যে বিছানা ছেড়ে আর নড়বার জো থাকে না।'

আমি ভাবলাম ও'র মেয়ে কি তখন এই রোগযন্ত্রণার কথা বলছিলেন?

বৃদ্ধা বললেন, 'তখন আর মরণকে শ্যাম সমান বলে মনে হয় না। দণ্ডধারী যমকেই তখন সাক্ষাৎ দেখতে পাই।' একটু থেমে বললেন, আমি ভাবি এ ব্যাধি তো আমার আছে, আমার মেয়ের হয়েছে, আবার ওর মেয়েতে গিয়েও না পৌঁছায়।'

মহিলাটি ফের তিরস্কার করে বললেন, 'মা!' অশুভ আশঙ্কায় তাঁর গলায় যেন ঈষৎ আর্তনাদ ফুটে উঠল।

দীপা ও'দের দুজনের দিকে চেয়ে বলল, 'ঈস ওই বিশ্রী অসুখ আমার হলেই হল। যদি হয়ই আমি কি তোমাদের মত জীবন-ভর অমন বিছানায় পড়ে পড়ে মরব নাকি? ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরে যাব।'

বৃদ্ধা হেসে বললেন, 'আহা, কী বীরাঙ্গনা রে! মরবি কেন? মরবি কোন দুঃখে? দুঃখ আছে বলেই মরতে হবে নাকি?'

সস্নেহে নাতনীর পিঠে হাত রাখলেন তিনি।

বাইরে হর্ন বেজে উঠল। এতক্ষণে বাচ্চু ফিরে এসেছে গাড়ি নিয়ে। সবাই এগিয়ে গিয়ে দোরের সামনে দাঁড়ালেন। আমিও গেলাম সঙ্গে সঙ্গে।

বাচ্চুর মা ছেলেকে বকতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দীপা বলে উঠল, 'দাদা, কোটের পকেটে অত বড় একটা গোলাপ ফুটল কী করে? তোমার বন্ধু, প্রণবদার বাড়িতে তো ফুলের নামগন্ধও নেই।'

বাচ্চু লজ্জিত ভঙ্গিতে একবার সবাইর দিকে তাকাল তারপর বোনকে একটু ধমক দিয়ে বলল, 'আর পাকামি করতে হবে না। গোলাপ যেন আর কোথাও পাওয়া যায় না। মা, দিদা গাড়িতে উঠে বস তাড়াতাড়ি। কত দেরি হয়ে গেল তোমাদের জন্যে।'

বাচ্চুর কথার ভঙ্গিতে তিনজনেই হাসলেন। সন্ধ্যারাগ তিনটি বিভিন্ন বয়সী নারীর মুখে আমি গোলাপের আভা দেখতে পেলাম।

পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন

শকুন্তল সেন

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি?"

পূর্ব-পাকিস্তান। ১৯৫২ সাল। ২১ ফেব্রুয়ারী। পাক-ভারত উপমহাদেশের একটি বিশেষ তারিখ, একটি স্মরণীয় দিন।
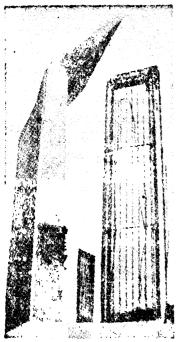
১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা ভাষা আন্দোলনে নিহত শহীদদের উদ্দেশ্যে নির্মিত শহীদ মিনার

মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য ঐদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ ঢাকা শহরের রাজপথে ভিড় করেছিল। নিহত হয়েছিল কয়েকটি কাঁচা তাজা প্রাণ। পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন একটি সংগ্রাম নয়, বরং বলা যেতে পারে একটি সংগ্রামের পরিণতি। একটু বিশদ ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায় যে, এই আন্দোলন মূলত প্রাচীন ও নবীন চিন্তাধারার দ্বন্দ্বের ইতিহাস। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব পাস হওয়ার পর এ দ্বন্দ্ব সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ঐ সময়কার তরুণ বুদ্ধিজীবী সমাজ লাহোর প্রস্তাবকে স্বাগত জানায় এই কারণে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা তাঁদের আত্মবিকাশের দ্বার উন্মুক্ত করবে। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে, এর ফলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি নিশ্চিত হবে এবং গণমুক্তির প্রথম স্তররূপে জাতীয় মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে। কিন্তু এ আশা সফল হল না। প্রাচীনপন্থীরা ঘোষণা করলেন 'পাকিস্তান হবে এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক রাষ্ট্র'। লাহোর প্রস্তাবের states শব্দটি তাঁদের ব্যাখ্যা অনুসারে হবে state। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষিত হল, Urdu and Urdu only shall be the State Language of Pakistan। পূর্ব বাংলার সাড়ে চার কোটি বাঙালীর যে একটা ভাষা আছে এবং তারা যে সমগ্র পাকিস্তানে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ এটা উর্দুর প্রবক্তারা একেবারেই বিস্মৃত হয়ে বাঙালী অবাঙালীর মধ্যে একটা বিরোধের বীজ ইচ্ছা করেই বপন করলেন, যার ফল পরবর্তী কালে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। প্রাচীন ও নবীনদের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ ঢাকার রেস-কোর্স ময়দানে, দ্বিতীয় সংঘর্ষ কার্জন হলের সুধী-সমাবেশে দেখা গেল। ক্রমশ এই সংঘর্ষের ক্ষেত্র সীমায়িত না হয়ে প্রসারিত হতে হতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হয়। সে কথা পরে বলছি।

আধুনিক তরুণ বুদ্ধিজীবীরা বিপদের সংকেত পেয়ে তাঁদের প্রস্তুতিপর্ব শুরু করলেন। কলকাতা সিটি মুসলিম ছাত্র-লীগ, শহীদ হাশিম গ্রুপের উদারপন্থী মুসলিম লীগ মহল এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ মুসলিম তরুণ সমাজের একাংশ সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করলেন আসন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবার জন্য।

আওয়ামী লীগনেতা জনাব মুজিবর রহমান

দেশবিভাগ হবার অব্যবহিত পরেই জন্ম নিল পূর্ব-পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুব লীগ (সামসুল হক ও আতাউর রহমানের নেতৃত্বে) এবং পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাংগঠনিক কমিটি (শেখ মুজিবর ও নইমুদ্দীনের নেতৃত্বে)।

১৯৪৭-এর ১৪ আগস্টের পর প্রাচীন-পন্থীরা পেলেন এক নতুন ধরনের ক্ষমতার

অমর একুশের পুণ্য প্রভাতের প্রথম কর্মসূচী প্রভাত ফেরী শহীদ মিনারের পাদদেশে আসিয়া সমাপ্ত হইলে শোভাযাত্রীদের অসংখ্য পোস্টার মিনার বেদীতে স্থাপন করা হয়। প্রতিটি পোস্টারই যেন বাঙময়— এদেশের গণমানুষের অন্তরের প্রতিধ্বনি

ন্থবাদ আর নব্যপন্থীরা পেলেন সংগঠনের হাতিয়ার, সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের স্পর্শ। উভয় শক্তির প্রথম পরীক্ষা হয়ে গেল ঢাকার রেস-কোর্স ময়দান ও কার্জন হলে। উর্দুর বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের জনমানস তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। ১৯৪৮ সাল, ১১ মার্চ। বাংলা ভাষার দাবিতে চার দিনব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট চলল সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে। অভূতপূর্ব এক নবজাগরণ আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। এক নতুন শক্তি, যে শক্তি কলকাতার দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায় বের করেছে শান্তি মিছিল, ব্রিটিশ বিরোধী স্লোগানে রাজপথ কাঁপিয়ে তুলেছে, ২৯ জুলাইয়ের সর্বাত্মক হরতাল সফল করেছে (১৯৪৬), রশীদ আলি দিবসের যৌথ নেতৃত্বের অংশীদার হয়েছে। ১১ মার্চ থেকে ১৫ মার্চ। পূর্ব-পাকিস্তানের নবলব্ধ চেতনার এক বিরাট অগ্নিপরীক্ষা হয়ে গেল। প্রাথমিক সংগ্রামে ছাত্রসমাজ জয়ী হল। নাজিমুদ্দীন সরকার অঙ্গীকার করলেন যে, বাংলাকে প্রদেশের সরকারী ভাষা অবশ্যই করা হবে এবং পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য তিনি সুপারিশ করবেন। কিন্তু সে চুক্তি কাগজে পত্রেই লেখা রইল। কার্যে পরিণত করবার এতটুকু আগ্রহ না প্রাদেশিক সরকার, না কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে দেখা গেল। নাজিমুদ্দীনকে দুর্বল ও অশক্ত বলে কেন্দ্রীয় সরকার উপহাস করলেন।

পাকিস্তান সরকার শুধুমাত্র উপহাস করলেন তা নয়, উপরন্তু উর্দুর প্রভুত্ব বিধিবদ্ধ করবার জন্য শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারক কমিটির রিপোর্টে সুপারিশ করে বললেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা (১৯৫০)।" কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের তরুণ সমাজ এই উপেক্ষা ও বিশ্বাসঘাতকতা নীরবে মেনে নিল না। ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত ভাঙবার জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে এক অনন্যসাধারণ অধিকার-চেতনা ও সংগ্রামী দৃঢ়তার দ্রুত বিকাশ লক্ষ করা গেল। ছাত্র-যুবকের আন্দোলনের সঙ্গে সর্বশ্রেণীর জনতার সংশ্রব ঘনিষ্ঠতর করার তাগিদে মুসলিম লীগ বিরোধী একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হল, আওয়ামী মুসলিম লীগ (১৯৪৯)। এদিকে আভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের দরুন মুসলিম লীগের মধ্যে এক ভাঙনের সূত্রপাত হল। একটি অংশ মুসলিম লীগ ত্যাগ করে সংগ্রামী জনতার সঙ্গে যোগ দিলেন। বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষা করার আন্দোলন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে বিস্তৃত হয়ে পড়ল। অবশ্য

প্রভাত ফেরীর গান

এর জন্য দু'টি পত্রিকার অবদান অনস্বীকার্য। একটি 'পাকিস্তান অবজার্ভার' ও অপরটি 'দৈনিক ইনসান'। ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক সহ বুদ্ধিজীবী মহল যেমন এগিয়ে এলেন তেমনি এলেন কারখানার শ্রমিক ও গ্রামের চাষী। মূলনীতি রিপোর্ট-বিরোধী ব্যাপক-ভিত্তিক কমিটি গঠিত হল আন্দোলন পরিচালনার জন্য।

লিয়াকত রিপোর্ট নাকচ করে বিকল্প রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য এক মহাসম্মেলন (গ্র্যান্ড ন্যাশনাল কনভেনশন) আহূত হল। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন প্রথমে জনাব আতাউর রহমান খান ও পরে কমরুদ্দীন আহমদ। এই মহাসম্মেলনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করা হল, বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। কেন্দ্রীয় শাসকমণ্ডলী সংকটের আভাস পেয়ে তাঁদের পূর্বের রিপোর্ট প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলেন। বাংলা ভাষা বিরোধী আর এক চক্রান্তের মৃত্যু হল।

লিয়াকত আলীর পর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ফজলুর রহমান এক ভিন্ন পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন—বাংলা ভাষা লেখা হবে আরবী হরফে। অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা তো দূরের কথা, বাংলাকে আর বাংলাই রাখা হবে না। মাথা কেটে মাথা-ব্যথা দূর করে দাও। আবার প্রতিরোধ, আবার সংগ্রাম, আবার পশ্চাদপসরণ। কিন্তু মুসলিম লীগের সুবুদ্ধির উদয় হল না। ২৬ জানুয়ারী ১৯৫২। ঢাকায় নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগ সম্মেলন। সভাপতি নাজিমুদ্দীন। তিনি ঘোষণা করলেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ আর ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারী। মাঝখানে কয়েকটি বিশ্বাসঘাতক বৎসর আর খাজা নাজিমুদ্দীন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আবার নূতন করে স্মরণ করল ১১ মার্চের কথা আর সেই সঙ্গে স্মরণ করল ১৫ মার্চের সেই চুক্তির কথা। স্মরণ করল লিয়াকত রিপোর্ট, ফজলুর রহমানী ভাষা সংস্কার প্রচেষ্টা। অনুভব করল, সংগ্রাম শেষ হয়ে যায়নি, সংগ্রাম চলবে, আরও অনেকদিন বাকি। মাত্র চার দিনের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এক প্রতিবাদ ধর্মঘটের আয়োজন করল।

সেদিন ৩০ জানুয়ারী ১৯৫২। সমগ্র প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট। বিকেলে বার লাইব্রেরীতে জনাব আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য এক সর্বদলীয় কমিটি গঠিত হল। কাজী গোলাম মাহবুব কমিটির আহ্বায়ক নিযুক্ত হলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শেখ মুজিবর রহমান তখন জেলে। তিনি ১৯৪৯ সালের মার্চ থেকেই কারাগারে আবদ্ধ। এই কমিটি স্থির করে যে, ২১ ফেব্রুয়ারী সভা-শোভাযাত্রা ও হরতালের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা দিবসরূপে পালিত হবে। ঘটনা দ্রুত গতিতে এক চরম সংগ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ১৩ ফেব্রুয়ারী 'পাকিস্তান অবজার্ভার' বন্ধ করে দেওয়া হল। সম্পাদক আবদুস সালাম গ্রেপ্তার হলেন। এ সময় সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

২০ ফেব্রুয়ারী। সন্ধ্যা ছটা। ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হল। চট্টগ্রাম, খুলনা, কুমিল্লা, রাজসাহী, পাবনাও বাদ গেল না। ঢাকা শহর ভয়ংকর উত্তেজনায় থমথম করতে লাগল। এক অজানা আশংকা, ঝড়ের সংকেত। রাত্রি গভীর হতে থাকে। এক দিকে বিশ্ববিদ্যালয়

শহীদ দিবসে ঢাকায় ছাত্রীদের বিরাট মিছিল

আবেগে উদ্বেলিত, সংকল্পে দুর্জয়—একুশের নগ্নপদ মিছিল নগরীর বনেদী সড়ক জিন্না এভেন্যু ধরিয়া অগ্রসর হইতেছে

প্রাঙ্গণে ছাত্রদের জটলা, আর এক দিকে ছাত্ররা দল বেঁধে গাইছে "ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়।" ১৯৪০-এর লাহোরের জবাব দেবার জন্য যেন প্রস্তুত হচ্ছে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী। জরুরী সভা শুরু হল পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিচার করার জন্য। ছাত্ররা একবাক্যে সিদ্ধান্ত নিল, ২১ ফেব্রুয়ারী পালন করা হবেই, ১৪৪ ধারা তারা লঙ্ঘন করবেই। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি এক বৈঠকে মিলিত হলেন। ছাত্ররা তাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটিকে।

সেদিন ২১ ফেব্রুয়ারী। সাড়ে চার কোটি বাঙ্গালী যেন অধীর আগ্রহে উন্মুখ হয়ে ছিল। সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে ছাত্র-ধর্মঘট। ছাত্ররা বেলতলায় (এখনকার বিখ্যাত আমতলা) সমবেত হল। বেলা বারোটা। বিশিষ্ট ছাত্রনেতা গাজিউল হক সভাপতি। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবার সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক এই সময় ছাত্র-নেতা আবদুস সামাদ একটি আপস প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, ছাত্ররা দশজন দশজন করে বের হয়ে গ্রেপ্তার বরণ করবে। এর ফলে ১৪৪ ধারা যেমন লঙ্ঘন করা হবে তেমনি ব্যাপক গোলমাল এড়ানোও যাবে। ছাত্ররা এ প্রস্তাব মেনে নিয়ে দশজন করে গ্রেপ্তার বরণ করতে লাগল। চারদিকে এক বিরাট উত্তেজনা। ছাত্ররা গাইছে 'আ মরি বাংলা ভাষা', গাইছে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'। স্লোগান উঠছে 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হবে।' কি উত্তেজনা! কি আবেগ! হঠাৎ কাঁদুনে গ্যাস বর্ষণ শুরু হল অকারণে। পুলিস আর ছাত্রে সংঘর্ষ শুরু হল। পুলিসবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে লাঠিচার্জ করতে আরম্ভ করে। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ল এদিকে ওদিকে। মেডিকেল কলেজ গেট, মেডিকেল কলেজ হস্টেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেল ও তার চারদিকের এলাকায়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন। বেলা ৪টা, মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণ। পুলিসের গুলিচালনা শুরু হয়। প্রথম শহীদ জব্বার আর রফিকুদ্দীন। এরপর এম-এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)-এর ছাত্র আবুল বরকত গুলিবিদ্ধ হয়ে রাত আটটায় মারা যায়।

সেদিন শুভ্র পাষাণফলকে পড়িল রক্তলিখা। বরকতের মৃত্যুর সংবাদ দাবাগ্নির মতো ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। উত্তেজিত পরিষদে জনাব খয়রাত হোসেনের মুলতুবী প্রস্তাব সমর্থন করেন সরকার-পক্ষীয় সদস্য মওলানা তর্কবাগীশ ও সম্পাদক শামসুদ্দীন সাহেব। ওদিকে নেতার দুঃখে ঢাকা নগরী ভেঙে পড়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষ চলে মেডিকেল কলেজের দিকে। সারা বিকাল—সারা রাত। বিরামহীন বিশ্রামহীন। এক পথ, এক লক্ষ্য। 'মেডিকেল কলেজে চলো, শহীদের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হবে।'

পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারী শহরে যে বিরাট শোভাযাত্রা বের করা হয়, ইতিপূর্বে ঢাকা শহরের কেউ কখনও সেরকম জনসমাবেশ দেখেনি। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হস্টেল থেকে হাই-কোর্ট পর্যন্ত তিলধারণের স্থান ছিল না। হাই-কোর্টের সামনে আবার গুলি চলে—শফিকুর রহমান নামে জনৈক আইন ক্লাসের ছাত্র নিহত হয়। এদিকে সদরঘাট এলাকায় দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। মুসলিম লীগপন্থী পত্রিকা মর্নিং নিউজে এ মর্মে সেদিন সংবাদ ছাপা হয় যে, 'ভারতীয় দালাল' ও 'হিন্দুরা' পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য আন্দোলন চালাচ্ছে। (সংবাদের শিরোনামা : Dhoties roaming streets) জনতা এ খবরে বিক্ষুব্ধ হয়ে 'মর্নিং নিউজ' ছাপাখানা ও অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। শোভাযাত্রা এর পর নবাবপুরে পৌঁছুলে পুলিস আবার গুলি চালায়। আর একজন নিহত হয়। তুমুল উত্তেজনার মধ্যে প্রাদেশিক পরিষদ বাংলাকে সরকারী ভাষা-রূপে স্বীকৃতি দেবার সুপারিশ করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে ২২ ফেব্রুয়ারী ছিল আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়। ২৩ ফেব্রুয়ারী আবার হরতাল প্রতিপালিত হয়। ছাত্ররা যেখানে বরকত নিহত হয় সেখানে রাতারাতি একটি শহীদ মিনার স্থাপন করে। শহীদ শফিকুর রহমানের পিতা শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হল নির্যাতনের পালা। ছাত্র আন্দোলনের নেতারা প্রায় প্রত্যেকেই গ্রেপ্তার হলেন, অনেকে আত্মগোপন করলেন। ২৫ ফেব্রুয়ারী থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হল।

নানা কারণে এ আন্দোলন উল্লেখযোগ্য। মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্য পাক-ভারত উপমহাদেশে ইতিপূর্বে এত বড় বিক্ষোভ কখনও দেখা যায়নি। এ আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী প্রত্যক্ষ ফল, ১৯৫৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে সকল দলের 'যুক্ত ফ্রন্ট' গঠন এবং সেই নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে মুসলীম লীগের নাম একেবারে মুছে গেল। অথচ বলা যেতে পারে যে, এই মুসলিম লীগই পাকিস্তান আদায় করেছিল।

এই ভাষা সংগ্রামের পরই ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়।

পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনে যদিও বাংলা ভাষার দাবিই মুখ্য ছিল; কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, পূর্ব-পাকিস্তানের তরুণ বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের চিন্তাধারা প্রসারিত করে দিয়েছেন দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে। কিন্তু বাংলা দেশ ও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের গভীর ভালবাসা ও মমত্ববোধের তুলনা নেই।

তাই তারাই গর্ব করে বলতে পারে,

"তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও, আমি এই বাংলার পায়ে রয়ে যাব।"

দেবী সরস্বতী

হরিবিষ্ণু সরকার

ভারতের মাটিতে অসংখ্য দেবদেবীর জন্ম হয়েছে তাদের মূর্তি বিভিন্ন রূপে কল্পনা করা হয়েছে; অথচ কালের স্রোতে অনেকেরই অস্তিত্ব আজ বিলুপ্তপ্রায়। যে-সব দেবদেবী আমাদের ধর্মীয় আচারের মধ্যে এখনো বেঁচে আছেন, তঁদেরও রূপ, গুণ, প্রকৃতির কত বিবর্তনই না যুগে যুগে ঘটেছে। শ্রীপঞ্চমীতে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর যে পূজো বাংলা দেশে হয়, তারও বিবর্তনের ইতিহাস আছে, এবং সে ইতিহাস দীর্ঘ তিন হাজার বৎসর ধরে বিস্তারিত। এই সরস্বতী শুধু হিন্দুর দেবদেবীর পরিকল্পনায় স্থান পাননি, বৌদ্ধ ও জৈনরাও এ'কে বিদ্যার দেবী হিসাবে গ্রহণ করেছে। বৌদ্ধদের কাছে সরস্বতী বিদ্যার দেবতা মঞ্জুশ্রীর পত্নী, আর জৈনধর্মে ইনি ষোড়শ শ্রুত অথবা বিদ্যা-দেবীদের মুখ্যমণি।

বর্তমানে বাংলা দেশে যেভাবে সরস্বতীর মৃণ্ময়ী প্রতিমার আরাধনা হয়, ভারতের অন্য কোথাও তার তুলনা আছে কিনা সন্দেহ। শুধু তাই নয়, শ্রীপঞ্চমীর দিনটি কিভাবে সরস্বতী পূজার সংগে সংশ্লিষ্ট হল, তা বলা শক্ত। কারণ, কোন কোন শাস্ত্রমতে এই দিনটিতে কার্তিকের সংগে লক্ষ্মীর বিবাহ হয়। অথচ আমরা এই দিনে সরস্বতীর বন্দনা করি। তবে কি গণেশ এই দিনে সরস্বতীকে বিবাহ করেন? এ প্রশ্নের সমাধান করা এখন সম্ভব নয়, কারণ, শাস্ত্রে এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তবে গণেশের সংগে সরস্বতীর বিবাহ পরবর্তী কালে পৌরাণিকদের সৃষ্টি—বৈদিক, এমন কি বেদোত্তর সাহিত্যে এ সম্পর্কে কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ নেই।

বলা নিষ্প্রয়োজন, এ সরস্বতী আর সরস্বতী নদী নন, যদিও ঋক্‌বেদে এ'কে নদী-মাতা হিসাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। সরস্বতী কথার অর্থই হ'ল হ্রদ, সরোবর অধ্যুষিত অঞ্চল। সুতরাং বিদ্যার সংগে এ'র মূলত কোন সম্পর্ক ছিল কিনা, বলা কঠিন। তবে সরস্বতী নদীর উপকূলে বৈদিক যুগে বিদ্যা আরাধনার কেন্দ্র ছিল, এবং সেই হিসাবে নদী-মাতা বিদ্যার সংগে জড়িত ছিলেন বলে দাবি নিশ্চয়ই করতে পারেন।

কিন্তু ঋক্‌বেদের যুগে বাক্‌দেবীর কল্পনা মুনি-ঋষিরা নিশ্চয়ই করেছিলেন; অবশ্য সে সময় সরস্বতীর সংগে এ'র কোন সম্পর্ক ছিল না। বাক্ সর্বভূতে বিরাজমান, ব্রহ্মার শিরোদেশে এ'র জন্ম, ইনি গৌরী—জলধারা, সমুদ্র, ক্ষরহীন অক্ষর এ'র বক্ষ থেকে প্রবাহমান। ঋক্‌বেদের বাক্‌সূক্তে এ'কে যজ্ঞের সর্বপ্রয়োজনীয় অংগরূপে বর্ণনা করা হয়েছে: জলদেশেই এ'র গৃহ, ইনি শক্তির উৎস, রুদ্রের ধনু এ'রই মহিমায় টংকারিত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, এই স্তুতির রচয়িতার নামও ছিল বাক্‌—অম্ভৃণের কন্যা বাক্। অনেকের মতে অম্ভৃণের অর্থ জল অথবা সোমরস রাখার পাত্র। ঋক্‌বেদের নবম মণ্ডলে বাক্‌কে সোমের পত্নী হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। যজ্ঞক্রিয়ার ব্যাপারেও

নয়াদিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়ামে রক্ষিত বিকানীরের জৈন সরস্বতী

যে ইনি জড়িত ছিলেন, তা দশম মণ্ডলে বৃহস্পতি রচিত স্তুতি থেকে বোঝা যায়। ঋক্‌বেদের অন্যত্র কথিত আছে যে, ব্রহ্মা বাকের সৃষ্টিকর্তা; পরে ইনি বাক্‌কেই পত্নীরূপে বরণ করেন। এমন কি, বাক্‌দেবী কোন এক যজ্ঞ-সম্পাদনে ইন্দ্রকে বাক্য দ্বারা উৎসাহিত ও উদ্দীপ্ত করেছিলেন।

বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্য-সাহিত্যে বাক্ সম্পর্কে যে-সব কাহিনী আছে, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব, সোম-আহরণ ও দেবাসুরের সংঘর্ষের সংগে জড়িত দেখা যায়। সম্ভবত সমস্ত কাহিনীগুলিরই সূত্র বৈদিক সাহিত্য থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর কাহিনীতে দেখা যায়, প্রজাপতি অথবা ব্রহ্মার সৃষ্টি করার বাসনা থেকে বাকের জন্ম। অনেক কাহিনী অনুযায়ী বাক্‌দেবী ব্রহ্মার পত্নী। এ'দের ঔরসে সোমের জন্ম, কিন্তু জন্মের সংগে সংগে বাক্ প্রজাপতির শরীরে পুনঃপ্রবেশ করেন। মৎস্যপুরাণে এই কাহিনীকেই আরো সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও সে সময় বাক্ ও সরস্বতীকে অভিন্ন বলে মনে করা হ'ত।

ব্রাহ্মণ্য-সাহিত্যের অনেক স্থলে বাক্‌দেবী বাক্‌-ক্রিয়ার মূর্ত প্রতীক। গো-পথ ব্রাহ্মণে আছে যে, দেবতাদের কাছ থেকে পালিয়ে বাক্ জলে আশ্রয় নেন; দেবতারা তাঁকে বিকৃত করবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দেবার পর তিনি আবার ফিরে আসেন। জলের সংগে বাক্‌দেবীর সম্পর্ক ঋক্‌বেদ থেকেই লক্ষ করা যায়, এবং এই জলজ প্রকৃতি কালক্রমে নদী-মাতা সরস্বতীর সংগে বাক্‌দেবীর মিলনে সহায়তা করে। মৈত্রায়নী সংহিতা, শতপথ ব্রাহ্মণ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দুই কল্পনার মিলিত প্রবাহ একেবারে অভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। ব্রাহ্মণ্য-সাহিত্যে বাক্‌দেবী যে শব্দের প্রতীক, হোম-যজ্ঞে তাঁর যে ভূমিকা, এই-সব আভাস-ইঙ্গিত থেকেই পরবর্তীকালে সরস্বতী বিদ্যা ও সংগীতের দেবীরূপে পরিগণিত হন। ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে সরস্বতী নদী যে খ্যাতি অর্জন করে, এই বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনাটি হয়ত দেবী সরস্বতীকে বিদ্যার দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

সরস্বতী পূর্ণমাত্রায় বিদ্যা-দেবী রূপে গণ্য হবার পর ব্রহ্মাকেই তাঁর স্বামী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই ব্রহ্মার মত হংস তাঁর বাহন, পুস্তক, অক্ষমালা ও কমণ্ডলু তঁর হস্তে মণ্ডিত। বিভিন্ন পুরাণে সাধারণত সরস্বতীকে "শ্বেত-পদ্মাসনাসীনাং শুক্লবর্ণা চতুর্ভুজাম্" বলা হয়েছে এবং চার হাতে পুস্তক, শ্বেত-

পদ্ম, অংকুশ, অক্ষমালা, বীণা, কমণ্ডলু ইত্যাদি দেখান হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন পুরাণকাররা সরস্বতীর যে প্রতিকৃতি কল্পনা করেছেন, তার মধ্যে অল্পবিস্তর তারতম্য দেখা যায়। এমন কি, শাস্ত্র-বর্ণিত রূপের সংগে সত্যিকারের মূর্তির মিল না থাকাটাও বিচিত্র নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হংস তাঁর বাহন হলেও কোন কোন মূর্তিতে মেষ বাহন হিসাবে দেখান হয়েছে; এই ধরনের একটি প্রতিমা রাজসাহী মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। মেষ-বাহিনী সরস্বতীর প্রতিকৃতি রূপায়ণের পিছনে কোন আখ্যান থাকতে পারে, কিন্তু এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, মেষকে অগ্নিদেবের বাহন হিসাবেও কল্পনা করা হয়েছে এবং অগ্নির আর-এক নাম ভরত। আর এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সরস্বতী ভারতী নামেও পরিচিত। আগেই বলা হয়েছে যে, বাকের সংগে যজ্ঞ-ক্রিয়ার এক নিবিড় সম্পর্ক ছিল। ঋক্‌বেদের আপ্রী স্তুতিতে ইলা, সরস্বতী ও ভারতীর প্রায় উল্লেখ দেখা যায়। হোম ও যজ্ঞের সময় এ-সব দেবদেবীর স্তুতিগান করা হত এবং এঁরা ছিলেন অগ্নির বিভিন্ন রূপের প্রতীক। ভারতী ও সরস্বতী ঋক্‌বেদে দুই পৃথক কল্পনা থেকে সৃষ্ট হলেও পরবর্তীকালে, যে-কোন কারণেই হোক, এঁরা অভিন্ন মূর্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন।

অন্ধ্র প্রদেশের মুখলিঙ্গম নামক স্থানে সিংহবাহিনী অষ্টভুজা সরস্বতীর সন্ধান পাওয়া গেছে। অথচ তামিলনাড় অঞ্চলে সরস্বতী প্রতিমার সংগে সাধারণত কোন বাহন থাকে না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিগম্বর জৈনরা সরস্বতীকে ময়ূরবাহিনীরূপে কল্পনা করে থাকে, আর শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের দেবী সাধারণত হংসবাহিনী।

কিন্তু সরস্বতীর প্রাচীন যত মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে দেবীর সংগে কোন বাহন দেখান হয়নি। বীণাহস্তে এক নারীমূর্তির যে ভাস্কর্য ভারহুত থেকে পাওয়া গেছে, তাকে অনেকেই সরস্বতীর প্রাচীনতম মূর্তি বলে মনে করেন। সম্ভবত খৃীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে এই মূর্তিটি নির্মিত হয়। খৃীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের যে নামাংকিত মূর্তিটি মথুরা থেকে পাওয়া গেছে, সেটি একটি জৈন সরস্বতী প্রতিমা। এঁর একটি হাত ভাঙা হলেও অপর হাতটিতে যে পুস্তক দেখান হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সরস্বতীর দক্ষিণে একজন অনুচর জল অথবা অমৃতভাণ্ড হাতে দণ্ডায়মান, আর বাঁদিকে আছে একটি ভক্তের প্রতিকৃতি। মূর্তির উপর উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বলা হয়েছে যে, এই প্রতিমাটি ধাতুদ্রব্যের ব্যবসায়ীদের দান। এই দুটি প্রতিমার সংগেই কোন বাহন নেই, এবং মনে হয়, বীণা ও পুস্তক সরস্বতীর সংগে অনেকদিন আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট। হস্তের ভূষণ হিসাবে অক্ষমালা, কমণ্ডলু, অংকুশ, শ্বেতপদ্ম ইত্যাদির ব্যবহার পরবর্তীকালে শুরু হয়। সরস্বতীর প্রতিমার পরিবর্তে যে ঘটপূজার পদ্ধতি বহুদিন আগে থেকে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ উত্তর প্রদেশের ভীটা ও রাজঘাটে প্রাপ্ত দুটি শীলমোহর। এই দুটি শীলমোহরেই গুপ্তযুগীয় লিপিতে সরস্বতী নাম অঙ্কিত আছে।

প্রাচীন যে দুটি শৈল-প্রতিমার কথা উপরে বলা হয়েছে, তাদের কোনটিই চতুর্হস্তা নয়। অতএব, এ কথা মনে করা যেতে পারে যে, চতুর্হস্তা সরস্বতীর কল্পনা পরবর্তীকালে শাস্ত্রকারদের সৃষ্টি।
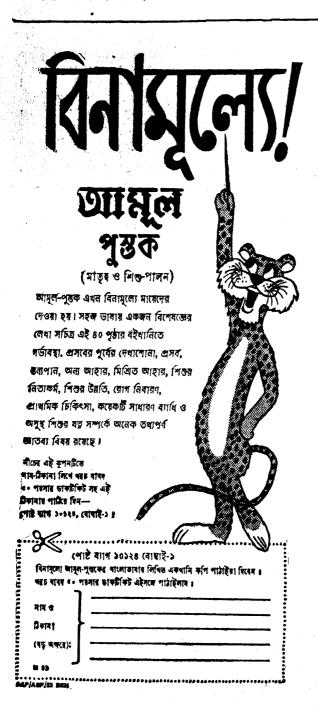
গংগাইকোণ্ডাচোলপুরমের বৃহদীশ্বর মন্দিরের সরস্বতী প্রতিমা

সম্ভবত বাহন সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। ঢাকা ও রাজসাহী মিউজিয়ামে যে কয়টি মধ্যযুগীয় মূর্তি আছে, সেগুলি সবই চতুর্হস্তা—সামনের দুই হাতে বীণা, পিছনের এক হাতে পুঁথি ও অন্য হাতে অক্ষমালা। মারকণ্ডেয় পুরাণের দেবী-মাহাত্ম্য অধ্যায়ের বিবরণ অনুসারে সরস্বতীর চারটি হাতে থাকবে বীণা, অংকুশ, অক্ষমালা ও পুস্তক। শেষোক্ত কল্পনা অনেকের মতে শিবের শক্তিরূপে রূপায়িত। মহীশূরের হেলিবিড নামক স্থানে প্রাপ্ত এক মূর্তি এই বর্ণনার সংগে প্রায় মিলে যায়। একই স্থান থেকে আবিষ্কৃত একটি নৃত্যরতা সরস্বতীর মূর্তি ভারতীয় ভাস্কর্যের একটি সম্পদ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

বিষ্ণুর সংগে সরস্বতীর বিবাহের কথা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মারকণ্ডেয় পুরাণে দেবীর যে সর্ববিরাজমান রূপের সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে সরস্বতী এই দেবীরই এক অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। দেবী-মাহাত্ম্যের দার্শনিক বর্ণনায় সমস্ত দেবী ও দেবতারা একটি মহতী শক্তিরই বিভিন্ন প্রকাশ, এবং এই মহতী শক্তির নাম দেওয়া হয়েছে মহালক্ষ্মী। তাঁর সত্ত্বগুণের যে প্রকাশ, তার নাম সরস্বতী। দেবীর মধ্যে সরস্বতীর বিলুপ্তির পর আমাদের বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী শৈবধর্মের সীমানার মধ্যে এসে পড়েন। উপরে উল্লেখিত মুখলিংগমের সিংহবাহিনী মূর্তিটি সম্ভবত দেবী-মাহাত্ম্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত।

বাংলা দেশের মনসার সংগে সরস্বতীর একটা সম্পর্ক ছিল বলে মনে করার কারণ আছে। মনসার ধ্যানে এই দেবীকেও শ্বেতাংগী ও হংসবাহিনী বলে কল্পনা করা হয়েছে—এ'র হাতে বই, অক্ষমালা ও অমৃতভাণ্ড শোভা পায়। অবশ্য মনসার উপর থাকে সাত-ফণার সর্প-ছত্র। সাপের দেবীর সংগে বিদ্যার দেবী কেমন করে জড়িত হলেন, তা বলা শক্ত। তবে মনে রাখা দরকার যে, সরস্বতীর আর-এক নাম মৃতাচি। যার অর্থ, অথর্ববেদ অনুসারে, এক ধরনের সাপ। শুধু তাই নয়, অথর্ব-বেদে সরস্বতীকে বিষনাশক দেবীরূপেও কল্পনা করা হয়েছে। এ-সরস্বতী কিন্তু শবর-কন্যা। বৌদ্ধ সরস্বতীকে কোন কোন ক্ষেত্রে শ্বেতাংগী আর্যা জাংগুলীর (শ্বেত-তারার একটি রূপ) সংগে অভিন্ন বলে মনে করা হয়। জাংগুলীর নাম স্বভাবত জংগলের সংগে এ'র সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই মনে হয়, অথর্ববেদে সরস্বতীর যে কল্পনার সৃষ্টি হয়েছে, মহাযান বৌদ্ধধর্মে সম্ভবত তা পরিণতি লাভ করে। মনসা দেবীর মূর্তি রূপায়ণে লৌকিক ধর্মের প্রভাব ছাড়াও এই সরস্বতীর কিছু দানও রয়ে গেছে।

যুগে যুগে সরস্বতীর এই যে রূপান্তর এবং প্রভাবশালী দেবতাদের সংগে নিত্য-নূতন পরিণয়-বন্ধন তার পিছনে আছে সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন। যখন যে অঞ্চলে দেবতা তাঁর প্রাধান্য বিস্তার করেছেন, শাস্ত্রকাররা কাল-বিলম্ব না করে সরস্বতীকে সেই দেবতার গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। সংগে সংগে দেবীর জন্ম-বৃত্তান্ত ও লীলা সম্পর্কিত আখ্যান এবং প্রতিমালক্ষণেরও পরিবর্তন ঘটেছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় দেবদেবীর বিবর্তনে লৌকিক ও আঞ্চলিক ধর্ম-সংস্কারের প্রভাব বহুক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হয়েছে। ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর আদিম স্বরূপ অনুধাবন করা সহজ নয়; এমন কি, বিবর্তনের জটিল সূত্রগুলি নির্ণয় করাও শক্ত। সত্যিই ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, কেমন করে নদী-মাতা সরস্বতী ও বাকের মিলিত কল্পনা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীতে পরিণত হল, আর অন্য দিকে অথর্ববেদ থেকে উদ্ভূত শবরী-তনয়া বিষ-হারিণী সরস্বতী জাংগুলী, বীণাহস্তে নাগিনী অথবা মনসায় এসে বিলীন হলেন। এই দুই রূপেরই প্রভাব বাংলা দেশে এখনো প্রবল; অবশ্য বর্তমানে

গোয়ালিয়ার মিউজিয়ামে রক্ষিত সরস্বতী প্রতিমা

আমাদের সরস্বতী ব্যক্তির গৃহ-সীমানা অতিক্রম করে এক সর্বজনীন উৎসবের কেন্দ্র হয়ে উঠেছেন।*

*আলোকচিত্র ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে।
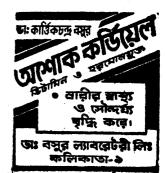
ইনি হারকিউলিস পছন্দ ক'রে কিনেছেন

"কষ্টেসৃষ্টে কিছু টাকা জমিয়ে এই হারকিউলিসখানা কিনেছি। কিনে কী ভালো-যে করেছি বলার নয়। পরিবারের একজন হ'য়ে গেছে এটি—নির্ভর ক'রে ঠকতে হয়নি, বরাবর সুন্দর চলছে।"

একটি সাইকেল কিনলে সারা জীবন চলবে
টাকার বিনিময়ে জিনিসের মত জিনিস
এই হারকিউলিস

হারকিউলিস গুণে সেরা অথচ সে-তুলনায় দাম বেশী নয়—কম দামে এমন চমৎকার সাইকেল আর নেই! আর দুনিয়াজুড়ে ১৩৫টি দেশে আজ এই সাইকেলই যে সবাই চান এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

মাদ্রাজে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে ভালো সাজ-সরঞ্জামপূর্ণ কারখানায় আন্তর্জাতিক মানে তৈরী হয় এই সাইকেল।

বিশ্বের বৃহত্তম সাইকেল নির্মাণকারী সংস্থা ইংল্যান্ডের টিউব ইন্‌ভেস্টমেন্টস লিমিটেড-এর সহযোগিতায় হারকিউলিস নিখুঁতভাবে তৈরী হয়।

যে-দিক দিয়েই দেখুন না কেন—দাম কি, জিনিস কতটুকু ভালো আর মজবুত, ফিনিশই বা কেমন, আর কদিন টেকে—হারকিউলিস কিনলে সবদিক দিয়ে পয়সা উশুল হবে।

হারকিউলিস শুধু সাইকেল নয়, সারা জীবনের সাথী

® দি হারকিউলিস সাইকেল অ্যাণ্ড মোটর কোম্পানী লিমিটেড, ইংল্যাণ্ড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেড মার্ক। ভারতে নির্মাণকারী সংস্থা: টি, আই, সাইকেল্‌স অব ইণ্ডিয়া, অম্বাত্তুর, মাদ্রাজ-৫৩। স্বত্বাধিকারী: টিউব ইনভেস্টমেন্টস অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, মাদ্রাজ ১, লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী।

উন্নয়নশীল দেশের শিল্পায়নের প্রশ্নে রাশিয়ানদের ভূমিকা খুবই সূক্ষ্ম। ভারতীয় জনমতের উপরে তারা তাই গভীরভাবে রেখাপাত করতে পেরেছে। আমি তো কমিউনিজ্‌মে বিশ্বাসী নই। কিন্তু ভারতের মূল সমস্যা কী, তার উপলব্ধিতে যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে তারা, আমিও তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। ভারতীয় ইনজিনিয়ারদের ট্রেনিং দেবার কী ব্যবস্থা হয়েছে, তা দেখবার জন্য, এবং একই সঙ্গে রুশ ইস্পাত শিল্পের পরিচালন-ব্যবস্থার বিন্যাস ও বিশেষ যান্ত্রিক দক্ষতার পরিচয় লাভের জন্য আমাদের স্টীল করপোরেশনের পক্ষ থেকে ১৯৫৮ সনের শরৎকালে আমি সরকারীভাবে রাশিয়া-সফরে গিয়েছিলাম। সেই সময়ে মস্কোয় এ সম্পর্কে তাদের সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল, তার থেকেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, সমস্যার বিচার তারা কীভাবে করে।

আমি ফিরে মস্কোয় পৌঁছবার পর মিঃ শেরমেটিয়েভের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। অন্যান্য দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রক্ষা সংক্রান্ত স্টেট কাউনসিলের তিনি চেয়ারম্যান। সোভিয়েট রাশিয়ার ইস্পাত-শিল্প সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে প্রায় ঘণ্টা তিনেক আমার কথা হয়েছিল। রুশ ইস্পাত-শিল্পের সর্বোচ্চস্থানীয় পনরজন বিশেষজ্ঞ সেই আলোচনা-বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। একজন সোভিয়েট অফিসারের সঙ্গে তাঁরা আমাকে ইউক্রেনের ইস্পাত-কারখানাগুলি দেখতে পাঠান। সে-যাত্রায় ক্রিভয় রগের লৌহখনি এবং স্তালিনো অঞ্চলের একটি কয়লাখনিও আমি দেখেছিলাম। মস্কোয় ফিরে সাক্ষাৎ হল প্রবীণ একদল মারকিন ইস্পাত-বিশেষজ্ঞের সঙ্গে; রাশিয়া-সফরে এসে তাঁরা তখন সোভিয়েট ইস্পাত-শিল্পের কর্ম-পদ্ধতিটা বুঝতে পেরেছেন। দেখে তাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন যে, রুশ ব্লাস্ট ফারনেস আর ওপেন হার্থ ফারনেসের কর্মদক্ষতা মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় শতকরা আরও পঁচিশ-তিরিশ ভাগ বেশী। বস্তুবিজ্ঞানে এই সাফল্যের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। আমি অবাক হয়েছিলাম রুশ ইস্পাত-কারখানাগুলির আবহাওয়া দেখে। ইউরোপ আর আমেরিকার ইস্পাত-কারখানার আবহাওয়ার সঙ্গে এর পার্থক্যটা একেবারে মৌলিক। প্ল্যান্টের ডিরেকটর থেকে শুরু করে সাধারণ একজন কর্মী পর্যন্ত প্রতিটি স্তরেই যেন একটা আশ্চর্য উদ্দীপনা ছড়িয়ে আছে। সেই উদ্দীপনাই হচ্ছে এদের সাফল্যের চাবিকাঠি। জবরদস্তি কাজ করিয়ে নিয়ে সাফল্য অর্জনের ব্যাখ্যাটা এখানে ধোপে টেঁকে না। মূল বেতন এবং অন্যান্য আকর্ষণের ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক দেশের মতই। এদের সমাজ শ্রেণীহীন নয়; তবে শ্রেণীর সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু সেটাও কোনও কথা নয়। সর্বোপরি একটা বাড়তি-কিছুর প্রেরণা এদের মধ্যে কাজ করছে। নেহাতই হুকুম তামিল করে কাজ করে যাচ্ছে এরা, এমন সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। বলা বাহুল্য, এদের বাক্‌-স্বাধীনতা নেই, ধর্মঘট করবার অধিকার নেই, মাইনে বাড়াবার জন্যে কর্তাদের সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু কিছু-একটা আছে। তারই প্রেরণায় এরা কাজ করে।

ইস্পাত-কয়লা অঞ্চল থেকে মস্কোয় ফিরে আসবার পর রুশ ইস্পাত-কর্তারা একটি শৌখিন রেস্তোরাঁয় আমাকে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। রেস্তোরাঁটির নাম 'প্রাহা'। অতিথিদের এ-দেশে সাধারণত হোটেলে-রেস্তোরাঁতেই আপ্যায়ন করা হয়, বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় না। বিকেল তিনটেয় মধ্যাহ্নভোজ শুরু হল, চলল ছ'টা পর্যন্ত—মস্কোতে এ অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। অসংখ্য কোর্স, তার মধ্যে ভারত আর সোভিয়েট রাশিয়ার শাশ্বত মৈত্রী কামনা করে কতবার যে টোস্‌ট করা হল, তারও হিসেব নেই। আলোচনার অন্ত্যপর্বে সোভিয়েট ইস্পাত-শিল্পের একজন বড়কর্তা—মেজর ভিনোগ্রাদভ—দোভাষীর মারফত আমাকে বললেন যে, তিনি একটি গুরুত্ব-পূর্ণ প্রশ্ন করতে চান। প্রশ্নটাকে যদি আমার অস্বস্তিজনক বলে মনে হয়, তা হলে তার উত্তর দেবার দরকার নেই। শুনে আমি বললুম, উত্তর যদি আমার জানা থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই দেব।

প্রশ্নটা সত্যি অস্বস্তিকর। মেজর ভিনোগ্রাদভ বললেন, সেরা এগারো শো রুশ কর্মী ভিলাইয়ে গিয়ে ভারতীয় কর্মীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে একটি ইস্পাত-কারখানা গড়ে তুলছেন। কাজ কেমন চলছে, ভিলাই থেকে সে-বিষয়ে তাঁরা নিয়মিত রিপোর্ট পেয়ে থাকেন। রাশিয়ানরা চীনেও এই রকমের ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলছেন, এবং

অনুরূপ রিপোর্ট সেখান থেকেও পাওয়া যায়। ভিলাইয়ের রিপোর্টে ভারতীয় ইনজিনিয়ার আর সাধারণ কর্মীদের খুবই সুখ্যাতি থাকে। রুশ কর্মীরা তাঁদের আগ্রহ আর দক্ষতায় মুগ্ধ। ভারতবর্ষে যে ইনজিনিয়ারের ঘাটতি আছে, তাও নয়। বরং ইনজিনিয়ারের তুলনায় কাজেরই ঘাটতি ছিল এতদিন; উপযুক্ত কাজ তাঁদের দিতে পারা যায় নি। সে যাই হোক, সোভিয়েট রাশিয়ার ইস্পাত-কারখানাগুলিতে যে-সব ভারতীয় ইনজিনিয়ার ট্রেনিং নিচ্ছেন, তাঁদের কাজ তো তাঁরা দেখেছেন। সন্দেহ নেই যে, চীনা শিক্ষার্থীদের চাইতে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনেক বেশী। অথচ তাজ্জব ব্যাপার এই যে, কাজটা যাতে তাড়াতাড়ি শেষ হয়, ভারতীয় ইস্পাত-কর্তাদের তার জন্য যেন তাড়াই নেই। ভারতবর্ষে যে-সব রুশ কর্মী এখন কর্মনিরত, তাঁরাই বরং সব সময়ে ভারতীয় কর্তাদের তাড়া দিচ্ছেন। চীনে কিন্তু এমনটা হবার উপায় নেই। চীনা কর্তারাই সেখানে কাজ যাতে যথাসময়ে শেষ হয়, তার জন্য রুশ কর্মীদের পিছনে সব সময় লেগে থাকেন। রাশিয়ানরা এটার অর্থ ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। ভারতবর্ষে

না আছে যোগ্য কর্মীর অভাব, না কাঁচা-মালের। দুটি সম্পদই তার প্রচুর। তা হলে এমন হবার কারণ কী? "না না মিঃ ঘোষ, চীনের সঙ্গে ভারতবর্ষের এই যে পার্থক্য, এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলবেন না যে, আপনারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী আর তারা সাম্যবাদে। এর সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শের কোনও সম্পর্কই নেই।"

ভারতবর্ষের মূল সমস্যাটা যে কী, দেখলাম যে, সেটা আঁচ করতে রাশিয়ানদের ভুল হয়নি। তাঁরা ঠিকই আন্দাজ করেছেন যে, লোকবল অর্থবল কিংবা যন্ত্রবলের অভাব আমাদের মূল সমস্যা নয়। সমস্যা আসলে নেতৃত্বের। আর তাই চীন যখন উদ্দীপনায় স্পন্দিত, ভারতবর্ষকে তখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোতে হচ্ছে। এই যে নেতৃত্বের অভাব, এই যে দিশেহারা অবস্থা—এর জন্য গণতন্ত্রকে দায়ী করা অর্থহীন।

উন্নয়নশীল দেশে ইস্পাতের মতন একটা মূল শিল্পকে যে যথাসম্ভব রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, এ নীতি যুক্তিযুক্ত। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের ইস্পাত-উৎপাদন-ক্ষমতা হচ্ছে বার্ষিক চোদ্দ কোটি টন। ইস্পাত-শিল্পকে সেখানে রাষ্ট্রায়ত্ত করবার স্পষ্টতই কোনও প্রয়োজন নেই। তার কারণ, মারকিন সমাজের যতটা ইস্পাত দরকার, এ-শিল্প বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকলেও তারা তা পাবে, এবং যে-দাম তারা দিতে পারে সেই দামেই পাবে। সেক্ষেত্রে ভারতবর্ষে আমাদের ইস্পাত-উৎপাদন-ক্ষমতাকে যদি ১৯৭০ সনের মধ্যেই আমরা এক কোটি নব্বই লক্ষ টনে পৌঁছে দিতে চাই (পরিকল্পনা সেই রকমই হয়েছে বটে, তবে কার্যত এটা হওয়া খুবই শক্ত), তা হলে ব্যাপারটাকে শুধুই বেসরকারী উদ্যোগের হাতে ছেড়ে দিলে তা সম্ভব হবে না। এর জন্যে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রয়োজনীয় মূলধন জোগাড় করতে হবে, এবং তারই জন্যে চাই সরকারী উদ্যোগ। মুশকিল এই যে, আমাদের যাবতীয় তর্ক চলে মালিকানার প্রশ্ন নিয়ে। আমাদের রাজনীতিকরা অদ্যাবধি বুঝতে পারেন নি যে, তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল সমস্যাটা নেহাত মালিকানার নয়, মূল-সমস্যা হচ্ছে পরিচালন-ব্যবস্থার এবং লক্ষ্যাভিমুখিতার।

যে আড়াই হাজার তরুণ ইনজিনিয়ারকে আমরা রাশিয়া, মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন আর পশ্চিম জারমানিতে ট্রেনিং নিতে পাঠিয়েছিলাম, ফুলের মতন তারা বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন। সরকারী শিল্প-উদ্যোগের তাঁরাই হচ্ছেন মেরুদণ্ড। বোকারোয় আর অন্যত্র যখন ইস্পাত-শিল্পের সম্প্রসারণ হবে, তখন তার দায়িত্বও তাঁদেরই হাতে পড়বে। দেখে দুঃখ লাগে যে, উপরতলার অকর্মণ্যতার চাপে তাঁদের উৎসাহ কীভাবে পিষ্ট হচ্ছে।

ভিলাইয়ের প্রধান রুশ কর্মকর্তা, রৌরকেলার প্রধান জারমান কর্মকর্তা, দুর্গাপুরের প্রধান ব্রিটিশ কর্মকর্তা, ইনডিয়ান আয়রনের চীফ ইনজিনিয়ার এবং টাটার জেনারেল সুপারিনটেনডেনটকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল; সরকারী ইস্পাত-কারখানাগুলির প্রতিটি ইনজিনিয়ারের সঙ্গে (তরুণ ইনজিনিয়ারদের সঙ্গে তো বটেই, অন্যান্য ইস্পাত-কারখানা থেকে যে দেড় শো অভিজ্ঞ কর্মীকে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাঁদের সঙ্গেও) তাঁরা দেখা করেন, তাঁর দক্ষতা বিচার করেন—এবং এইভাবে একটা হিসেব নিয়ে ডিরেকটরদের জানান যে, কর্মীদের কাকে কতটা দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। কোন্ কোন্ কাজের জন্য মোট কতজন অ-ভারতীয় কর্মী রাখা দরকার এবং কতদিনের জন্য রাখা দরকার, তা-ও তাঁরা জানিয়েছিলেন। অথচ, বিশেষজ্ঞ কমিটির (পৃথিবীর যে-কোনও দেশের যে-কোনও মানদণ্ড দিয়ে বিচার করলেও দেখা যাবে যে, ইস্পাত-উৎপাদনের ব্যাপারে অসামান্য এ'দের স্থান) এই যে রিপোর্ট, হিন্দুস্থান স্টীলের তিন ডিরেকটরকে নিয়ে গঠিত এক কমিটি এটিকে অম্লানবদনে নাকচ করে দিলেন। কী তাঁদের পরিচয়? না, তাঁদের একজন হচ্ছেন রেলওয়ের এক অবসরপ্রাপ্ত সিভিল ইনজিনিয়ার, আর একজন হচ্ছেন এক রাজ্য-সরকারের পূর্ত-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ইনজিনিয়ার, আর তৃতীয়জন হচ্ছেন অর্থ-দপ্তরের এক অবসরপ্রাপ্ত আমলা। তরুণদের হাতে কাজের দায়িত্ব তুলে দিতে তাঁরা ভরসা পেলেন না।

ইস্পাত-উৎপাদনের ব্যাপারে এ'দের একজনেরও 'ক' অক্ষর জানা ছিল না। কিন্তু তাতে কী, ক্ষমতা ছিল তাঁদেরই হাতে। আর এ'দেরই মতন সব মানুষের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিয়ে আমরা কিনা ভারতবর্ষে এক সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলছি। ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার দপ্তরের যিনি সেক্রেটারি ছিলেন, রৌরকেলা ইস্পাত কারখানায় তাঁকেই প্রথম জেনারেল ম্যানেজারের আসনে বসিয়ে দেওয়া হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি, মৎস্য, পশুপালন আর বন-সংরক্ষণ দপ্তরের সেক্রেটারিকে বসানো হল দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানায় জেনারেল ম্যানেজারের আসনে; তিনিই সেখানকার প্রথম জেনারেল ম্যানেজার। আর ভিলাই কারখানায় এখন যিনি জেনারেল ম্যানেজার, তাঁর পরিচয় কী? না, তিনি ভারতীয় অডিট অ্যানড অ্যাকাউনটস সারভিসের একজন সদস্য। তাঁকে যদি ইস্পাত-কারখানায় না পাঠিয়ে কোনও রাজ্যের অ্যাকাউনটেনট জেনারেল করে দেওয়া হত, তবে সেইটেই হত স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমাদের দর্শন হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক দর্শন; ব্রিটিশ প্রভুদের কাছ থেকে এই দর্শনের উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি। অক্সফোর্ড কিংবা কেমব্রিজ কিংবা অন্য কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি কিংবা প্রকৃতি-বিজ্ঞান কিংবা নৃতত্ত্ব কিংবা অন্য যা-হোক একটা বিষয়ে একটা ভাল ডিগরী নিয়ে যে-ছেলে বেরিয়ে এসেছে, ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নানান রকমের কাজে হয়ত লাগাতে পারেন। বাণিজ্য-দপ্তর কিংবা স্বরাষ্ট্র-দপ্তর কিংবা পেনসন-দপ্তরে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব হয়ত দিতে পারেন তাঁকে। বস্তুত, দক্ষ একজন সিভিল সারভ্যানট এত হরেক রকমের কাজ করতে পারেন যে, দেখে বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু কথা এই যে, বছর কয়েক আগে ব্রিটিশ সরকার যখন ইস্পাত-শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলেন, তখন হোয়াইট হল থেকে কোনও আমলাকে ওয়েলস কিংবা অন্য কোথাও কোনও ইস্পাত-কারখানার ম্যানেজার করে পাঠাবার

দূর্বুদ্ধি তাঁদের হয়নি। এ-ব্যাপারে আমরা ব্রিটিশ প্রভুদের উপরেও টেক্কা দিয়েছি। আসলে ভারতীয় রাজনীতিকদের একটা কথা বোঝা উচিত ছিল। সেটা এই যে, কোনও একজন সিভিল সারভ্যানটকে তাঁরা প্রথম বছরে ম্যাজিসট্রেট, দ্বিতীয় বছরে জজ, তৃতীয় বছরে সমবায় দপ্তরের রেজিসট্রার এবং চতুর্থ বছরে বন-সংরক্ষকের পদে হয়ত নিযুক্ত করতে পারেন, কিন্তু তাই বলেই যে তাঁকে পঞ্চম বছরে একটা ইস্পাত-কারখানার ম্যানেজার করে দেওয়া যাবে, এমন কোনও কথা নেই। এই সহজ কথাটাই আমাদের রাজনীতিকরা বুঝতে পারেননি। আর সেই নির্বুদ্ধিতার ফল ভুগতে হচ্ছে আমাদের। অস্ট্রেলিয়ার ইস্পাতের চাইতে ভারতীয় ইস্পাতের উৎপাদন-ব্যয় বেশী পড়ছে; ইস্পাতে যে-টাকা বিনিয়োগ করেছি আমরা, সামগ্রিকভাবে তাতে লাভ না হয়ে লোকসান হচ্ছে; রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ থেকে আয় হচ্ছে শতকরা আড়াই ভাগ। আর আমরা স্বপ্ন দেখছি যে, এই হারেই আমরা সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে পারব।

মূল দোষ অবশ্য আমলাদেরও নয়, সে-দোষ রাজনীতিকদেরই। সিভিল সারভ্যানটরা দক্ষ মানুষ; কাজে-কর্মে তাঁরা শৃঙ্খলানিষ্ঠও। ১৯৪৭ সনে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা লাভ করে, ভারতীয় সিভিল সারভিসের ব্রিটিশ সদস্যরা তখন কাজে ইস্তফা দিলেন। ব্রিটিশ আমলে ট্রেনিং পাওয়া ভারতীয় আই-সি-এসের সংখ্যা তখন দু-শোরও কম। এই স্বল্প-সংখ্যক মানুষেরাই আমাদের শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোকে সেদিন দাঁড় করিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। তাঁরা যদি না শাসনব্যবস্থার হাল সেদিন ধরে থাকতেন, তাহলে ভারত-বিভাগের ফলে উদ্ভূত অবস্থার চাপ আমরা সামলাতে পারতুম না। কিন্তু ক্ষমতার লোভ এমনই ব্যাপার যে, রক্ষা-কর্তারাই ক্রমে-ক্রমে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালেন। সংখ্যায় যাঁরা ছিলেন দু-শোরও কম, কেন্দ্র আর রাজ্যে ক্ষমতার মূল ঘাটি-গুলি চলে গেল তাঁদেরই হাতে। গুরুত্ব-পূর্ণ প্রতিটি পদ দখল করলেন তাঁরা। সংখ্যায় কম ছিলেন বলেই তাঁদের প্রত্যেকে সেদিন ডবল তে-ডবল প্রোমোশন পেয়েছেন। কিন্তু তাতেও তাঁরা খুশী হলেন না। ইস্পাত-কারখানার ম্যানেজার-পদ ইত্যাদি নতুন নতুন বৃহৎ এক-একটা পদের সৃষ্টি হতে লাগল, আর এই ব্যুরোক্রাট ইউনিয়ন (পৃথিবীতে এমন সংঘবদ্ধ ট্রেড ইউনিয়ন আর একটিও দেখা যাবে না) দাবি জানাতে লাগলেন যে, তাঁদেরই কাউকে ক্ষমতার সেই নতুন ঘাটিতে বসিয়ে দেওয়া হোক। সরকার যদি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যোগ্য কাউকে এনে এসব পদে বসাবার চেষ্টা করেন, তো ব্যুরোক্রাট ইউনিয়নের তাতে সায় মেলে না। মিলবে কী করে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মানুষেরা তো এঁদের বিচারে নেহাতই 'বহিরাগত'।

সমস্যার সমাধান করা যে খুব শক্ত ব্যাপার, তা কিন্তু নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলতে পারি, রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত-শিল্পে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, রাতারাতি তার সমাধান করা যায়। তরুণ ইনজিনিয়ারদের মধ্যে যাঁরা কিছুটা অভিজ্ঞ, তাঁদের যদি যথাসম্ভব দায়িত্ব দেওয়া হয়; বেসরকারী উদ্যোগে (ইস্পাত-কারখানায় কিংবা বৃহৎ কোনও ইনজিনিয়ারিং কারখানায়) পরিচালক-পদে যাঁরা বছর কুড়ির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তাঁদের থেকে বাছাই করে

যদি জেনারেল-ম্যানেজার পদে নিয়োগ করা হয়, এবং (অবসরপ্রাপ্ত কিংবা প্রায় সেই শ্রেণীর সরকারী চাকুরিয়াদের নিয়ে নয়) শিল্প-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ মানুষদের নিয়ে গঠিত বোর্ড অব ডিরেক্টর্স-এর হাতে যদি যথাসম্ভব ক্ষমতা তুলে দেওয়া হয়, বিদেশ থেকে ম্যানেজার না আনিয়েও তবে ইস্পাত-শিল্পের পরিচালন-সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। ভারতীয়দের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তির অভাব নেই; সমস্যাটা আসলে অন্যত্র। অত্যধিক কেন্দ্রীভূত আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ আর রাজনীতিকদের ভীরুতাই আমাদের সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁদের হাতে ক্ষমতা, সেই রাজনীতিকরা আমাদের পরিচালনা করবেন, এইটেই তো প্রত্যাশিত। কিন্তু তার বদলে তাঁরা নিজেরাই অন্যদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন।

সংসদ-সদস্যদের ধারণা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পোদ্যোগের দৈনন্দিন পরিচালন-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করাটাও তাঁদের সংসদীয় দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়, সার্বিক কর্মনীতি আর তার ফলাফলটাই যে তাঁদের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত, তা আজও তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি। একজন মন্ত্রীর পক্ষে একই সঙ্গে স্বায়ত্তশাসিত একটি সংস্থার স্বাধীনতার সংরক্ষক হওয়া এবং বৎসরান্তে সেই সংস্থার সাফল্যের হিসেব দেখিয়ে সংসদকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব। আবার তা না করে তিনি সংসদকেই একটা অছিলা হিসেবে কাজে লাগিয়ে সেই স্বয়ংশাসিত সংস্থার স্বাধীনতা হরণ করতে পারেন এবং সেই স্বয়ংশাসিত সংস্থার স্বাধীনতাকে একটা অছিলা হিসেবে কাজে লাগিয়ে সংসদকেও ফাঁকি দিতে পারেন।

ইস্পাত-শিল্পের সূত্রে যে-সব কথা বললাম, তার থেকেই বোঝা যাবে যে, শিল্প-সংগঠনের সমস্যাটা এ-দেশে কীরকম। ইস্পাত-শিল্প সম্পর্কে আমার জ্ঞান প্রত্যক্ষ; তাই তারই ভিত্তিতে সমস্যাটা আমি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। কৃষি-উৎপাদন বলুন, পরিবার-পরিকল্পনা বলুন, কিংবা অন্য যে-কোনও জরুরী বিষয়ের কথা বলুন, সর্বত্র এই একই সমস্যা। শক্তি কিংবা যোগ্যতার অভাব আমাদের নেই; অভাব সংগঠনের।

খাদ্যের উৎপাদন এবং বণ্টন-সমস্যার যদি মোকাবিলা করতে হয়, তা হলে চারটি জিনিস আমাদের চাই। (১) একটি বীজ করপোরেশন, (২) একটি সার করপোরেশন, (৩) ছোটখাটো সেচকার্যের প্রকল্পের জন্য একটি করপোরেশন, এবং (৪) একটি খাদ্য বাণিজ্য করপোরেশন। খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য আজ [illegible]

পুলিসের সাহায্যে এ-কাজ করা যায় না। রাজনীতিকদের আবেদন-নিবেদনেও এ-কাজ হবার নয়। এ-ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষমতাই হচ্ছে আসল ক্ষমতা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত হয়। সেখানকার কেন্দ্রীয় পণ্য করপোরেশন সেই উদ্বৃত্ত পণ্যের দায়িত্ব নেন। ভারতবর্ষে আজ ন্যায্যমূল্যের আশ্বাস দিয়ে কৃষি-পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে। খাদ্য-বাণিজ্য করপোরেশন এ-দেশে খাদ্যশস্যের একটা নিম্নতম মূল্যের গ্যারান্টি দিতে পারেন, এবং তার মাধ্যমে কৃষকরা যাতে সেচের জল, সার, কীটনাশক ওষুধ, গো-মহিষ আর কৃষি-সরঞ্জামের খরচা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকে, তার ব্যবস্থা করতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশ থেকে যে খাদ্যশস্য আমরা আমদানি করি, তার উপরে আভ্যন্তর উৎপাদনের শতকরা কুড়ি ভাগ যদি খাদ্য-করপোরেশন কিনে নেন, তা হলে ঘাটতি এলাকায় খাদ্যশস্য বিক্রির ব্যবস্থা করে এক দিকে এই করপোরেশন যেমন খাদ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, অন্য দিকে তেমনি অধিকতর উৎপাদনের উদ্যোগকেও উৎসাহিত করতে পারেন।

বীজ, সার আর সেচের জল সম্পর্কে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তার সমাধানের উদ্দেশ্যে যাতে সত্যিকারের কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়, তার জন্য এই সংস্থাগুলিকে যথার্থই স্বাধীন, বাণিজ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন এবং তেজস্বী হতে হবে। পরিচালন-ব্যবস্থায় সুশিক্ষিত তরুণদের হাতে তুলে দিতে হবে এর দায়িত্বভার। উপর থেকে মাত্র মূল কয়েকটি নীতিই এঁদের জানিয়ে দেওয়া হবে; প্রতিটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে, আমলাতান্ত্রিক নিয়মের নিগড়ে এঁদের যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে-রাখা না হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এমনভাবে করপোরেশন গড়ে এঁটা স্বাধীনভাবে তাদের কাজ করতে দেবে কে? সরকারী উদ্যোগের দায়িত্ব নেবার জন্যে যখনই এ-দেশে কোনও করপোরেশন কিংবা কোম্পানি গড়া হয়েছে, আমলাফিতের ফাঁসে জড়িয়ে দিয়ে তখনই তাকে সরকারেরই বাড়তি আর-একটা আমলাতান্ত্রিক দপ্তরে পরিণত করতে দেরি হয়নি। সমস্যা সেইখানেই।

ভারতবর্ষের জনসংখ্যা পঞ্চাশ কোটিতে পৌঁছতে চলল। আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে যদি না বৃদ্ধির হারকে যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনা হয়, জনসংখ্যার সমস্যা তা হলে আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে, এবং তারই চাপে কৃষি আর শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের যাবতীয় উন্নয়ন-প্রয়াস বিপর্যস্ত হবে। ভারতবর্ষের তিন শো কুড়িটি জেলাকে মোট পাঁচ হাজার চার শো ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। তার সঙ্গে শহরাঞ্চলকে যদি যুক্ত করি, ইউনিটের সংখ্যা তা হলে মোটামুটি ছ' হাজার দাঁড়ায়। প্রতি ইউনিটে প্রতি মাসে যদি মাত্র এক শোটি লুপ প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়, তা হলে প্রতি ইউনিট প্রতি বছরে বারো শো লুপ প্রয়োগ করতে পারবে; পাঁচ বছরে প্রয়োগ করতে পারবে ছ' হাজার। ছ' হাজার ইউনিটে পাঁচ বছরে সে-ক্ষেত্রে তিন কোটি ষাট লক্ষ লুপ প্রযুক্ত হবে। এ-দেশে সন্তানধারণক্ষম নারীর মোট সংখ্যার এটা শতকরা চল্লিশ ভাগ। রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে সম্প্রতি যে বিশেষজ্ঞদল ভারত-সফরে এসেছিলেন তাঁরা হিসেব করে বলেছেন যে, পাঁচ বছরে যদি একাজ করা সম্ভব হয়, তা হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রতি বছরে পঁচাশি লক্ষ কমে যাবে; দেড় কোটির ক্ষেত্রে সংখ্যাটা সে-ক্ষেত্রে পঁয়ষট্টি লক্ষ করে বৃদ্ধি পাবে মাত্র। খাদ্য-উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যার সুরাহা একমাত্র তখনই সম্ভব হবে।

এর জন্য আমাদের ছ' হাজার

ভ্রাম্যমাণ মোটর ভ্যান চাই। তাতে সাধারণ ডিসপেনসারির ব্যবস্থা তো থাকবেই, তার সঙ্গে থাকবে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। সেই ভ্যান নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরতে হবে। ঢক্কা নিনাদ না করে, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা গ্রামীণ নারীসমাজকে বুঝিয়ে বলতে হবে। এর বাবদে কারও কাছ থেকে এক পয়সাও নেওয়া চলবে না। প্রতিটি ভ্যানে থাকবেন পাস-করা দু'জন চিকিৎসক (একজন পুরুষ, একজন মহিলা), শিক্ষাপ্রাপ্ত দু'জন নার্স, এবং চারজন মহিলা সমাজ-কর্মী। ভারতবর্ষে এখন আশি হাজার মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট রয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা প্রতি বছর আরও ছ' হাজার করে বাড়ছে। তাঁদের মধ্যে দু' হাজার মহিলা, চার হাজার পুরুষ। এ-কাজের জন্য মাত্র দু' বছরের ডাক্তার, অর্থাৎ মোট বারো হাজার ডাক্তার, আমাদের চাই। ন্যায্য বেতন যদি দিতে পারি, এবং গ্রামাঞ্চলে স্বচ্ছন্দভাবে তাঁদের জীবনধারণের ব্যবস্থা যদি করতে পারি, বারো হাজার ডাক্তার পাওয়া তা হলে শক্ত হবে না। অর্থ এ-ব্যাপারে সমস্যা নয়। লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সব টাকা আমরা খরচ করে উঠতে পারি না। তা ছাড়া, পৃথিবীর প্রগতিশীল প্রতিটি দেশই এই সমস্যার মোকাবিলা করবার ব্যাপারে ভারতবর্ষকে সাহায্য করতে আগ্রহশীল। রাষ্ট্রপুঞ্জের পর্যবেক্ষকদল যে হিসেবে দিয়েছেন, তার মধ্যে অঙ্কের কিছু ভুল-ত্রুটি হয়ত থাকতে পারে। কিন্তু এই হিসেব থেকে একটা কথা অন্তত স্পষ্ট বোঝা যায়। তা এই যে, সংগঠনের ব্যবস্থা করতে পারলেই সমস্যাটাকে আমরা আয়ত্তে এনে ফেলতে পারব। কিন্তু যে সংগঠনের সাহায্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হারকে পাঁচ বছরের মধ্যে দেড় কোটি থেকে পঁয়ষট্টি লক্ষে নামিয়ে আনা যায়, সেই সংগঠন আমাদের কোথায়?

সরকারের স্টীল করপোরেশনে পাঁচ বছর আমি কাজ করেছি। বিস্তর পরিশ্রম করেছি এই পাঁচ বছরে; কিন্তু এই সাংগঠনিক সমস্যার সমাধান অর্জনে আমাদের রাজনৈতিক কর্তাদের আমি উদ্বুদ্ধ করতে পারিনি। চাকরিটা ভাল ছিল; বেতনও ভালই পাচ্ছিলাম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ১৯৬০ সনে সংসদে যোগ দিলাম আমি। ভেবেছিলাম, সংগঠন-সমস্যার সমাধানের জন্য যা আমি করতে চাই, এই নূতন ভূমিকায় তা করা হয়ত আরও সহজসাধ্য হবে।
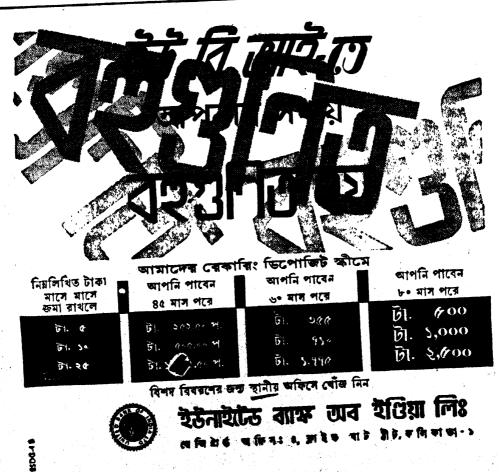
সমাপ্ত

টোকিওর চিঠি

জুতোর আওয়াজটা খট্‌ খট্‌ করে এগিয়ে এসে দরজার কাছটাতে থেমে গেল। আমরা এরই অপেক্ষায় ছিলাম, অতএব উৎকর্ণ। জুতোটা বাইরে রেখে ভিতরে আসতে তো বেশ সময় নিচ্ছে? কারণ, জুতো বাইরে না রেখে এখানে কেউ ভিতরে ঢুকবে না।

সুন্দর ব্যবস্থা। বড়-ছোট সকলেই সেই ছোটবেলা থেকে কেমন অভ্যাসটা তৈরি করে রেখেছে। একটা ছোট্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জাপানী বাড়িতে ঢুকলে এর প্রয়োজনীয়তা বুঝতে আপনার একটুও অসুবিধা হবে না। যদি আপনি জুতো-সহ ঢুকেই পড়েন, তা হলেও চারদিক তাকিয়ে কেমন বিব্রত বোধ করবেন। যেমন একটা কাগজের টুকরো বা দেশলাইয়ের কাঠি অবলীলাক্রমে রাস্তায় ফেলতে একটু চিন্তা করবেন। সামনেই সাজান সুন্দর বাড়িতে ব্যবহারের স্লিপারগুলো দেখলেই কেমন পা-গলাতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এগুলোকে দেখে আমার একটা কথা মনে হয়। ছোট ছোট চটিগুলো দেখতে কত সুন্দর। পাবেনও সস্তা দামে। আর দু মাস না যেতেই সেগুলোকে ফেলে দিতে হবে। জাপানের এই একটা দিকে ব্যবসায়ী মহল খুবই সচেতন। গত বর্ষায় একটা ছাতা কিনেছিলাম। মুড়িয়ে রাখলে বোঝবার উপায় নেই ছড়ি না ছাতা। সকলেই ফিরে ফিরে তাকায়। বুঝতে পারি, আমার শোভা বর্ধন করছে। এবার বর্ষায় ঝেড়ে-ঝুড়ে খুলতে গেলাম—ওমা, পট্‌ পট্‌ করে দুটো জঙ-ধরা শিক ভেঙে গেল। সারাবার উপায় নেই। ভেঙে গেল বা ছিঁড়ে গেল তো ফেলে দাও। কেমন যেন চুপসে গেলাম। ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরর্স-এর দিকে পা বাড়ালাম, সেই সুন্দরী মেয়েগুলো কেমন মিষ্টি করে তাকাল। কিন্তু পকেট?

যাই বলুন, এই বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু আমার বেশ লাগে। ভেঙে গেল? ফেলে দিন, আবার কিনুন। তা না হলে ব্যবসা চলবে কি করে? যেখানেই গেছি, দেখেছি, জল-খাবার পাশে কাচের গ্লাসের বদলে কাগজের ছোট ছোট ঠোঙা। জল খান, ফেলে দিন। আবার এক বাণ্ডিল হাজির। তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবি, একে

কুটিরশিল্প গড়ে উঠেছে। কত জন লোক কাজ করছে। কত সংসার ওতেই কেমন এগিয়ে চলেছে! এক ধরনের বেকার সমস্যার সমাধান হচ্ছে।

এমন কি, রাস্তায় যেতে যেতে বাড়ি-গুলির দিকে তাকান, একই অবস্থা। আসা-যাওয়ার পথে একটা পুরনো আমলের কাঠের বাড়ি রোজই এই অভিজাত পল্লীর মাঝে দৃষ্টিকটু লাগত। হঠাৎ একদিন দেখি, একটা বুল-ডোজার এসে মড় মড় করে বাড়িটা ভেঙে দিল। এক মাস না যেতেই একটা সুন্দর বাড়ি উঠে গেল। দেখলেই মনে হয় যেন একরাত কাটিয়ে আসি। আমি যে আমার ঠাকুর্দার বাড়িতে শুয়ে কড়ি-বর্গা গুণব, সে সুযোগ এ দেশে খুবই সীমাবদ্ধ।

তারপর সেই খট্‌ খট্‌ শব্দটা কিছুক্ষণ থেমে থাকল। সে-ও বোঝবার চেষ্টা করছিল ভিতরের অবস্থা। জাপানী কায়দার দরজাটা পাশ থেকে একটু ফাঁক হচ্ছে। আরক্ত একটি মুখ সেখানে হাজির। গরম সান্ধ্য-আসরকে আরও সরগরম করে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠলাম, "কি হলো কি হলো?" লজ্জায় মুখ লাল হয়ে উঠেছে, হাতে একটা ফুলের তোড়া। মেয়েটি চারদিকে তাকিয়ে একটু মিষ্টি হেসে, এক ছুটে

বসবার ঘরটা পার হয়ে ভিতরে চলে গেল।

সেদিন সান্ধ্য-আসরে এক জাপানী দম্পতির সঙ্গে বসেছিলাম। শীতের সন্ধ্যা। ছোট্ট জলচৌকির চারদিকে মোটা কাপড় কাঁথার মতন করে জড়ান। এরা বলে KOTATSU। পুরনো দিনে ভিতরে চিনেমাটির বাটিতে কাঠকয়লার আগুন দিয়ে গরম করা হত। এখন অবশ্য তার বদলে এসেছে ইলেকট্রিক হীটার। শীতের দিনে বাড়ির সকলের সঙ্গে এর ভিতর হাত-পা সেঁকলে একটা বেশ ঘরোয়া আমেজ পাওয়া যায়। গ্রাম-দেশের আগুন পোয়ানোকে বার বার মনে করিয়ে দেয়।

বেশ সুখী সংসার। ছেলেটি চাকরি করে কোন এক জাপানী প্রতিষ্ঠানে। এ দেশে বিদেশী কোমপানিতে চাকরি করে আভিজাত্যের খাতায় নাম লেখানো যায় না। ছেলেরা বেশীর ভাগই নিজের দেশের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতেই ভালবাসে। বিদেশী প্রতিষ্ঠানের চাকরিকে সমাজ উচ্চ পর্যায়ে বিচার করে নিজের দেশের প্রতিষ্ঠানকে ছোট চোখে দেখতে রাজী নয়। অপর পক্ষে নিজের দেশের কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কোন সময়ই নিজের নিজের ইচ্ছানুযায়ী তার ছেলে-ভাই বা নিকটতম আত্মীয়কে সত্যকারের কোন কর্মক্ষম বা কর্মপটু কর্মচারীকে ডিঙিয়ে হঠাৎ কোন জায়গায় বসাতে পারলেও বসাতে চায় না। কোথাও পাবেন না, মালিকের ছেলে অবশ্যই মালিক হবে। হঠাৎ কেউ উড়ে এসে জুড়ে বসবে, এমন কোন ভয়েরও কারণ এদের নেই। তারা

"Hatch Ko"—বৃহত্তর টোকিওতে সকলের জন্য মিলনের মহাযাত্রা শুরু করিয়ে"
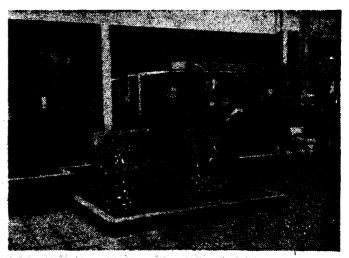
জানে, তাদের কর্মক্ষমতা অনুযায়ী একটা ন্যায্য প্রতিদান তারা পাবেই। তবে এদের একটা অদ্ভুত রীতি আছে। যোগ্যতা-অযোগ্যতার ক্ষেত্রেও ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর প্রশ্ন সর্বাগ্রে বিবেচিত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার বেতনের হার বৃদ্ধি পাবে কোন একটা মান নির্ণয়ে। তোমার বয়স অল্প, তুমি যোগ্যতা দেখিয়েছ, তাই বলে হুট্‌ করে তুমি ঊর্ধ্বতন কর্মচারীকে ডিঙিয়ে যেতে পারবে না। এইটাই এদের রীতি। এই নিয়ে কোন আন্দোলন নেই। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

আর বউটি বিয়ের আগে চাকরি করত কোন এক দূতাবাসে। বিয়ের পর ঘরের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। ছোট্ট একটি ছেলে আছে, ভারী সুন্দর। জাপানী ছোট ছেলেমেয়েদের এরা এত সুন্দর সাজিয়ে রাখে যে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। টোকিওতে ভাড়া বাড়িতেই থাকে। এখান থেকে প্রায় ঘণ্টা তিনেকের পথ ওদের দেশের বাড়ি। বাবা নেই। মা আর এক ভাই থাকে সেখানে। আর আছে ওদের এক বড় আদরের বোন "হিরোমি"। বয়স একুশ। ইউনিভার্সিটি শেষ করে একটা

চাকরি করছে। আগে বাইরে কোথায় কোন এক মেয়েদের বোর্ডিং-এ থাকত। কিছুতেই থাকতে চায়নি দাদা-বউদির কাছে। বোধ হয়, ওই ছোট ছেলেটাকে দেখে দাদার কথায় আর না করতে পারেনি। অবশ্য নিজের খরচ নিজেই বহন করে। ছেলেটিই যেন ওর সব। বাড়ির সকলেই ইংরেজী বলতে পারে। বেশ লাগে এমন একটা সুস্থ পরিবেশে কিছুক্ষণ থাকতে। কোন সমস্যা নেই, তাই সমাধানেরও কোন বালাই নেই। বেশীর ভাগই খেলাধুলার চর্চা। ভারত টেনিস-এ এদের হারিয়ে দিয়েছে—তার উপর হঠাৎ একটি ভারতীয় মেয়ে বিশ্বসুন্দরী হয়ে গেল—এইসব নিয়েই আপাতত গল্প। আর আছে গায়ক-গায়িকা, অভিনেতা-অভিনেত্রীর মুখরোচক আলোচনা। স্বভাবতই এসে পড়ে কিছুটা রাজনীতি, চার্টানির মতন। নয়তো ভারত সম্বন্ধে কিছু শোনানো চাই।

সন্ধ্যার পর হিরোমি বাড়িতে ফেরেনি—হয় না। যেদিনই গেছি, দেখেছি, সন্ধ্যার পর মেয়েটি সোজা বাড়িতে। যদি কোন-দিন দেরি হয়, টেলিফোনে তা জানিয়ে দেয়। অন্তত দেখে মনে হয়, "ছেলেবন্ধু" ধরাদের দলের একটু বাইরে।

সেদিন অমন সন্ধ্যার আসরে হিরোমিকে না দেখে ওর দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কই, হিরোমিকে দেখছি না আজ?"

হঠাৎ ওর বউ বলে উঠল: "না না, বলবে না ও'কে। হিরোমি বলে গেছে, আর যে কেউ জানুক, আপনি যেন না জানেন।"

বললাম: "কেন?"

"তা হলে আর কি রক্ষে আছে? এমনিতেই আপনার খুনসুটির ভয়ে সদা-শঙ্কিত। তার উপর এ ঘটনা।"

"তা হলে তো শুনতেই হয়।"

ওর দাদা বলে উঠল: "আরে বোঝ না, এসব ব্যাপারে একটু পিছনে লাগলে ভালই লাগে। তোমাকে আমাকে নিয়ে বন্ধুরা যখন—"

বউটি থামিয়ে দিয়ে বলল: "থাক হয়েছে।"

যাই হোক, শোনার পর ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে, গত কয়েক মাস আগে ওদের মা-র এক বন্ধুর ছেলে বিদেশ থেকে ফিরেছে। ভাল চাকরিও করছে। ওরা চায় ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হোক। অনেক দিন থেকেই কথাবার্তা চলছে।

সকলেই এ ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছেন। বাবা-মা বা অভিভাবকবৃন্দ চাইলেই তো এখানে বিয়ে হয় না। প্রথমত তাঁরা চাইলেন বা মত দিলেন, এক্ষেত্রেও সে

ও-নাকে পান করে সে এগিয়ে দেবে নব-বধূ তারই অপেক্ষায়

মেয়ে দুজনে দুজনকে দেখবে এবং আলাপ হবে।

এমনই এক পরিস্থিতিতে সাম্ভব্য পতি-দেবতার সঙ্গে মধুর গুঞ্জনের আশায় গিয়েছিল আমাদের হিরোমি। সেটুকু শুনে আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম ওদের মতামতের। প্রাথমিক পর্বটা যদি আশাব্যঞ্জক হয়, তা হলে বয়সের ধর্মে সে আপনিই আপনার পথ করে নেবে। আমাকে অমন সোল্লাসে চিৎকার করতে দেখে সে দাদা-বউদির দিকে কটমট করে চাইল।

কিন্তু আমি দেখতে পেলাম একটি ছেলে আর একটি মেয়ে কেমন করে টেলিফোনে কথা বলল।

ছেলেটা বলল—"তা হলে Shibuya-তেই দাঁড়াচ্ছি?"

মেয়েটা বলে উঠল, "দাঁড়াবে তো, কিন্তু কোথায়?" হয়ত একটু হেসেই উঠল ছেলেটার সাময়িক নির্বুদ্ধিতাকে স্মরণ করে।

:"Hatch Ko।"

:"হ্যাঁ হ্যাঁ সেই ভালো—আমার কিন্তু লাল-গাউন থাকবে।"

:"আমার হাতে একটা ফুলের তোড়া থাকবে......"

এমনি করেই ওরা একে অপরকে চিনতে পেরেছিল, দেখা হতেই জাপানী প্রথায় সমস্ত শরীর নুইয়ে দুজনেই দুজনকে শুভ-সন্ধ্যা জানিয়েছিল।

অনেক পরে হিরোমিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"তুমি প্রথম কি বললে?"

কিছুতেই কি বলতে চায়? অনেক উপরোধ অনুরোধের পর লজ্জায় আরক্তিম হয়ে বলল—"দূর, ছেলেটা কথাই বলে না। শেষে আমিই জিজ্ঞাসা করলাম, এত যায়গা থাকতে Hatch-ko বললে কেন?"

ও বলল—"জান, স্কুল আর কলেজ জীবনে এখানে দাঁড়িয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়েছি। যদিও ও একটা কুকুর তবুও আমার ভাল লাগে ওকে। কেমন জানি শ্রদ্ধা হয়। দুঃখ লাগে ওর নিঃসঙ্গতার জন্য। তুমি তো জান, জাপানে সবাই এই কুকুরটির কাহিনী জানে। তবু আমার বলতে ভাল লাগে—মনে করতে ভাল লাগে

—কুকুরটা রোজ আসত সেই অখ্যাতনামা লোকটার সঙ্গে। দাঁড়িয়ে থাকত, বিদায় জানাত লোকটার যাবার পথে। আবার বিকালে ঠিক একই সময় আসত সেই লোকটা যখন ফিরত কাজ সেরে, তাকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যেত। একদিন লোকটা আর ফিরল না। সকলেরই ধারণা সেই লোকটা দুর্ঘটনায় মারা গেছে। কুকুরটাও আর স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরল না। এই স্টেশনের ধারেই পড়ে রইল, খেল না কিছুই। এক অতৃপ্ত আশা নিয়েই সে মারা গেল। হয়ত পার্থিব জগতে তার অপেক্ষার কোন মূল্য রইল না কিন্তু সকলের বিশ্বাস তার মৃত্যুর মাঝেই সে প্রমাণ করেছে তার অপেক্ষা বিফল হয়নি। আর এক জগতে সে অবশ্যই তার প্রভুকে পেয়েছে। আজকের মানুষ তার অপেক্ষার মূল্য হিসাবে তৈরি করল সেই কুকুরটার একটা প্রতিমূর্তি। কালের গতিতে হারিয়ে গেল লোকটার নাম। সকলের মনে এক বিরাট আসন করে নিল ওই মূঢ় প্রাণীটা। তাইতো আমরা ছেলেবেলা থেকে কোন কিছু হলেই এর সামনে দাঁড়িয়ে জোর গলায় মনের ইচ্ছাটাকে সকলের সামনে প্রকাশ করি। আমরা জানাই যে আমাদের প্রার্থনার মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। যেমন বিশ্বাস করেছিল ওই প্রাণীটা যে ওর প্রভুকে ও পাবেই। আজও মৃত্যুদিবসে ছোট ছেলেরা কত মালা এনে পরিয়ে দেয় Hatch-ko-র গলায়। চারিদিকে তাকিয়ে দেখ কত জন কত জনের জন্যই না অপেক্ষা করছে। আজ বৃহত্তম টোকিওর উপর সে এক মিলনের পীঠস্থান রচনা করে নিজে একাকী স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকলেই ভাবে তাদের অপেক্ষা বিফল হবে না। কতজনের কত মধুর স্মৃতিই না জড়িয়ে আছে এই জায়গাটার সঙ্গে। ভবিষ্যতে কোন একটা দিন এর দিকে তাকিয়ে আমরাও কি ভাববনা আমাদের মিলনের প্রথম মুহূর্তটির কথা?"

আমি বললাম—"ছেলেটির এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনেই তুমি কাত হয়ে গেলে তো?"

মেয়েটি মিষ্টি হেসে বললে—"কাত যদি না-ই হতাম তাহলে আমরা যে যার সেই থেকে যেতাম। বিয়ে হত না। বাড়ি এসে বলতাম—ভাল লাগল না। ছেলেটাও বাড়ি ফিরে বলত—পছন্দ হয় নি।"

বেশ লাগল এদের এই সপ্রতিভ সারল্য। এদেশে এরই নাম "সম্বন্ধ-করে-বিবাহ" বা ইংরেজী মতে 'নেগোসিয়েশন ম্যারেজ'।

কোন বাধ্য-বাধকতা নেই, একে অপরকে জানবার সুযোগ আছে। সেটা নির্ভর করবে ছেলে বা মেয়ের ইচ্ছার উপর। এমনও দেখা গেছে এই পরিচয়ের সূত্র ধরে তিন-চার বছর পরেও বিবাহ হচ্ছে। জোর করে চাপিয়ে দেবার কোন অবাঞ্ছিত অধিকার নেই। সব থেকে ভাল লাগল ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার অধিকার কারুর নেই। এর চেয়ে বড় আশ্বাস আজকের যুব সম্প্রদায়ের কাছে আর কি হতে পারে?

ওদের বিয়েতে আমায় হাজিরা দিতে হয়েছিল। ওরা বুদ্ধ—বিবাহের প্রারম্ভিক সমস্ত বিধিই শিনটো মতে পালন করে। জাপানে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা বাড়ি আছে। এ যেন একটা বড় ধরনের সরাইখানা। মস্ত ফ্ল্যাট বাড়ি। এক-একটা ফ্ল্যাট-এ এক-একটা আয়োজন। একটি বিবাহের, একটি লোক বসবার, একটি বড় খাবার ঘর, এমনই ছোট বড় মেশান প্রয়োজন এবং আয়োজনের সমতায় ঘর সাজান আছে। একটা বড় পাঁচতলা বা সাততলা বাড়িতে এমন অনেকগুলি আয়োজন দেখতে পাওয়া যাবে। যে কেউ এর পরিচালক বা মালিকের কাছ থেকে ইচ্ছানুযায়ী ভাড়া নিতে পারে। একদিনে একটা বাড়িতে বহু বিয়েই হচ্ছে। শোরগোল সাধারণ বিয়েতে খুব একটা নেই। অধুনা ছেলে এল কিছুটা পাশ্চাত্য সজ্জায় ভূষিত হয়ে। কেউ কেউ পুরনো দিনের পোশাকও ব্যবহার করে। মেয়েকেও অনেক সময় দেখা যায় পাশ্চাত্য কায়দায় পেছনে আঁচল লুটোন সাদা পোশাক পরিহিতা, নয়ত নিজেদের দেশীয় পোশাক 'কিমনো'। সত্যই মেয়েদের এই পোশাকটার সবচেয়ে বিশেষত্ব যে চোখকে সব ছেড়ে ওর বাহারের দিকে আকর্ষণ করবে। 'কিমনো' ছাড়া জাপানী মেয়েরে সৌন্দর্য কোন ভাবেই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

এরপর জাপানের পুরাতন প্রথায় সজ্জিত ঘরে সমস্ত নিমন্ত্রিতদের সম্মুখে আমাদের দেশের মতই কোন এক পুরোহিত অনেক কিছু সংস্কার যুক্ত প্রথার মাধ্যমে এদের দেশের সব থেকে পুরাতন পানীয় বর-বধূকে ছেলেটিকে পান করতে দিল। তারই অর্ধেকটা পান করল মেয়েটা। তারপর তাদের মঙ্গল কামনায় সমবেত নিমন্ত্রিতের
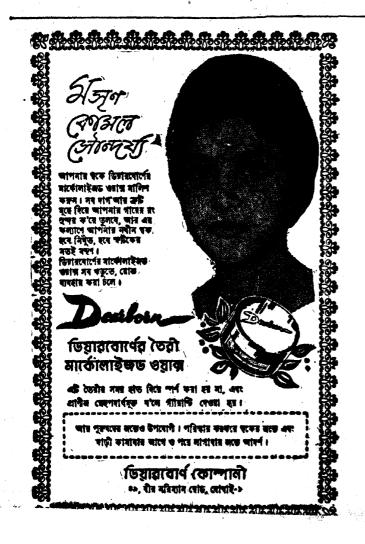
(O-Sake)। সেখান থেকে সকলে গেল যেখানে খাবার আয়োজন হয়েছে। এই আয়োজন এবং নিমন্ত্রণ অবশ্যই নিজস্ব সঙ্গতি অনুযায়ী। কোথাও বিশ-তিরিশ-জনও হচ্ছে। আবার সেদিন কোন এক স্বনামধন্য খেলোয়াড়ের বিবাহে কোন এক বৃহৎ হোটেলে এক হাজার লোকের সমাবেশ হয়েছিল।

ভোজন-পর্বের সঙ্গে সঙ্গে ছেলে বা মেয়ের গুণমুগ্ধ নিমন্ত্রিতেরা সকলেই কিছু না কিছু বলে গেলেন। আপনি থাকলে আপনাকেও উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে হবে। এখানে নিমন্ত্রিতেরা কেউ কোন উপহার হাতে করে আসে না। কে কি উপহার আনল কারটা কত দাম এর উপর কোন মান নির্ণয় হবার উপায় নেই। উপরন্তু যাঁরা গেলেন, অনুষ্ঠানের শেষে নবদম্পতি সকলের হাতে হাতে একটা উপহার তুলে দিলেন। ওইটুকুর ভিতরেই যেন ভবিষ্যতে এরা স্মরণ করতে পারে তাদের মধুর দিনটাকে। ভেবে দেখুন তো আমাদের দেশে এ রীতি চালু হলে কেমন হত?

আর আছে "রেনাই কে-ক্কোন" বা Love-marriage। আজ যেন জাপানে এই "রেনাই কে-ক্কোন"-এর মড়ক লেগে গেছে। যেদিকে তাকাও একই দৃশ্য। আজ যেন এই দলভুক্ত না হতে পারলে যুবক বা যুবতী হিসাবে তোমার কোন মূল্য নেই। আর একটা সুবিধাও আছে। কোন কিছুতে বাধ্যবাধকতা নেই। আমার এক জাপানী বন্ধু সেদিন তার বান্ধবীকে সঙ্গে করে এসেছিল। ছেলেটি বৌদ্ধ আর মেয়েটি খৃষ্টান। ছেলেটির শখ হয়েছে খৃষ্টান মতে বিয়ে করবে। অন্যান্য ভাইয়েরাও এতে খুব খুশী। তাদের বিয়ে হয়েছিল শিন্টো মতে। এবার একটু চার্চে গিয়েই না হয় আনন্দ করা গেল? সেখানে কোন পক্ষের কোন অহেতুক আভিজাত্য বোধ উথলে উঠলো না। কোন পক্ষই অযথা কোন জাতিগত বৈষম্যে নিজেকে একে অপরের চাইতে ছোট ভাবল না। এমন কোন মনে করবারও কারণ নেই ছেলেটা মেয়েটার আঁচল ধরা। এইতো সেদিন এদেশের রাজকুমারী, যাঁরা একসময় সকলের সামনে বার হত না, সাধারণ বংশের উচ্চশিক্ষিত, মার্জিত, সুপুরুষ ছেলেকে বেছে নিল জীবনসঙ্গী হিসাবে। আর বর্জন করল তার নিজস্ব রাজকীয় ভূষণ। যার পেছনে একটা অহেতুক মূল্যবোধ আঁকড়ে থাকা ছাড়া কিছুই নেই।

এমন করেই আজকের নূতনের দল ঘর বাঁধছে। এক দিকে অতি সহজ প্রকাশভঙ্গিতে তারা যেন এগিয়ে যাচ্ছে, আর-এক দিকে তার থেকে বার হয়ে আসতেও বেশী সময় লাগছে না। তাইতো

"Japan Ranks Sixth in Divorce Rate—More Divorce by Husbands"

এখানে এসেই একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। বয়স চব্বিশ কি পঁচিশ। টেলিভিশনে কাজ করে। চাকরি পেয়েই সে একটা মেয়েকে বিয়ে করল। মেয়েটি ওর চাইতে বছর দু-একের বড়। মেয়েটি একটি পানশালায় পিয়ানো বাজায়। দুজনকেই প্রায় মাস-দুয়েক দেখলাম। হঠাৎ একদিন মেয়েটির সঙ্গে দেখা, সে একা। বলল—"আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, আমরা সুখী নই। ছেলেটি বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইল। আমিও

বিবাহ-আসরে পুরোহিতের হাত থেকে "ও-সাকে গ্রহণ করছে সুপুরুষ বর

দেখলাম, বছর তিরিশের আগেই ওটা সেরে ফেলা উচিত। তা না হলে আমার পক্ষে নূতন করে কাউকে পাওয়া সম্ভব হবে না।"

প্রথম যেদিন মেয়েটি ছেলেটির বাহুলগ্ন হয়ে আমার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল, সেই দিনটির কথা মনে পড়ল। জানি না, এদের মানসিক চেতনাবোধে কোন দাগ কাটে কিনা। ভারতীয় হিসাবে এইখানেই আমি আমার তফাতটা ধরতে পারলাম। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বার হয়ে এল, যদিও তা মূল্যহীন।

আজকে বিবাহ-বিচ্ছেদের ভূমিকায় জাপান পৃথিবীর ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। প্রতি দশটি বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষের ভিতর একটি-জুটি মৃত্যুর পূর্বে আইনত বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে যাচ্ছে।

দেখা গেছে যে, ১৯৬৪ সালের বিশ্ব-ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পর আজকের নূতন যুব সম্প্রদায়ের মনে যেন একটা সম্বন্ধ-ছিন্নতার একটা নূতন উদ্দীপনা জেগে ওঠে।

সেখান থেকে শুরু আজ পর্যন্ত এই বন্ধন-ছিন্নতার পরিসংখ্যান হু-হু করে বেড়ে চলেছে। ১৯৬৪ সালের আগে পর্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদের বাৎসরিক মান ছিল সত্তর হাজারেরও নীচে। সেখানে ১৯৬৫ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ছিয়াত্তর হাজার আটাশ। শুধু তাই নয়, দিনের পর দিন আরও বাড়তির দিকেই চলেছে।

আজকের এই উদ্দীপনাকে কিন্তু নূতন বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই এই বন্ধন-চ্যুতির উদ্দীপনা দেখা দেয়। কারণ, ১৯৫৯ সালে এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল বিরাশি হাজার। হয়ত হঠাৎ একটা পাশ্চাত্য আবহাওয়া এসে পড়াও এর কারণ হতে পারে। অতএব ১৯৬৪ সালের উদ্দীপনাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ফেলাই যুক্তিযুক্ত।

১৯৬৪ সালের সরকারী নথিপত্রে দেখান হয়েছে, প্রতি হাজারে জন মাথা-পিছু নয় দশমিক নয় (৯·৯%) ভাগ হারে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে এবং শূন্য দশমিক সাত চার (০·৭৪%) ভাগ হারে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করছে। অতএব প্রতি দশটি জুটির একটি বিচ্ছিন্ন হচ্ছে।

যদিও জাপান আজ আমেরিকার অনেক পেছনে যেখানে প্রতি তিনটি জুটির একটি বন্ধন-মুক্ত হচ্ছে। তার পরই আছে ফ্রান্স, মেক্সিকো, সুইজারল্যান্ড ও পশ্চিম জারমানী।

এটা স্বাভাবিক যে, দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের হারও

[illegible] নিভীর করবে [illegible]

[illegible]। [illegible] যেখানে [illegible] সেখানে থাকবে। [illegible] অভিজ্ঞ চিন্তাশীলদের মতে, চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। জাপানের বিবাহ-বিচ্ছেদের হার যদিও সংখ্যায় সত্তর হাজার পার হয়েছে, কিন্তু গড় হিসাবে সে প্রতি ১০০০ জন পিছু শূন্য দশমিক সাত (০·৭%) থেকে শূন্য দশমিক আট (০·৮%)-এর মধ্যেই অবস্থান করছে।

কিন্তু এ বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা একটা জায়গায় আটকে যাচ্ছেন। কিছুতেই সে সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন না।

দেখা যাচ্ছে যে, আজকে এখানে বিবাহ-বিচ্ছেদের আগ্রহ প্রতিনিয়ত পুরুষদের মধ্যেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও ১৯৫৯ সালে আশি ভাগ আগ্রহই (Initiative) ছিল মেয়েদের।

এখনও অবশ্য মেয়েরা এক্ষেত্রে বেশী এগিয়ে আসছে। তবুও ১৯৫৯ সালের তুলনায় দশ ভাগ কমে গেছে। যেখানে

১৯৫৯ সালে আশি ভাগ ছিল মেয়েদের. সেখানে সত্তর ভাগ এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েদের আর বাকী তিরিশ ভাগ আগ্রহ পুরুষদের—দশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখানকার অভিজ্ঞ মহল এটাকে দুভাবে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। একদল বলছেন যে, জাপানী মেয়েরা সত্যসত্যই দিন দিন বেশী ব্যক্তিত্বসম্পন্না হয়ে উঠছে এবং তাদের স্বামীর প্রতি তাদের ব্যবহার অনেক সময় সহনশীলতার গণ্ডি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আর একদল বলছেন, যখনই মেয়েদের চাহিদা স্বামীদের ভারসাম্য অতিক্রম করে, তখনই স্বামীরা পালিয়ে বেড়ায়।

এখানকার Family Affairs Bureau-র জনৈক বিচারপতি Isao Watase বেশ সুন্দর কয়েকটি কারণ দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

প্রথম কারণ, একে অপরের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ ভাব। এবং সেটা উভয়তই ঘটে থাকে। এ দেশে মেয়েরা তাদের স্বামীদের পানাসক্তি বা জুয়ার নেশাকে অপছন্দ করলেও সহ্য করবার চেষ্টা করে, তার জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদ হবার কোন কারণ দেখা যায় না। কিন্তু যখনই স্বামী অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে, তখনই দেখা যায় ভিন্ন রূপ। সেখানেই ঘৃণা বা বিদ্বেষ ভীষণভাবে প্রকট হয়ে পড়ে।

আমি অনেককে জিজ্ঞাসা করেছি—"তোমরা যে এত রাত্রে এইভাবে টলটলায়মান অবস্থায় বাড়ি ফের, তোমাদের স্ত্রীরা কিছু আপত্তি করে না?"

উত্তর দেয়—"আরে মেয়েছেলে তো আর সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি না"

আর একদল আসে আইনকে সামনে রেখে বন্ধনমুক্ত হতে। নিজেদের দাবি সম্বন্ধে তারা খুবই সচেতন। দেখা গেছে, এই ধরনের দাবিযুক্ত বন্ধনমুক্তির আবেদনই বেশী। আইনজ্ঞ এইখানেই কিছুটা মুশকিলে পড়েন। সাধারণত পুরুষ যখন আসে বন্ধনচ্যুতির দাবি নিয়ে, তখনই বিচিত্র সমস্যা দেখা দেয়। তখনই মুশকিল হয় তাদের উভয়ের মধ্যে একটা সমতা রক্ষা করে কোন কিছু বিচার করা। দেখা গেছে যে, সন্তানবিষয়ক সমস্যাই বিচারে প্রথম এবং প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়।

যারা বিবাহের পর বেশ কয়েক বৎসর অতিক্রম করেছে, তাদের নিয়ে বিশেষ মুশকিল হয় না, কিন্তু যারা বিবাহের তিন বছরের মধ্যেই বন্ধনমুক্তির আবেদন নিয়ে এসেছে, তারাই হচ্ছে বিচারের প্রধান সমস্যা।

সাধারণত মেয়েরা কোর্ট-কাছারির ঝামেলা বেশী পছন্দ করে না। কিন্তু যখনই পুরুষের তরফ থেকে কোন অবাঞ্ছিত প্রস্তাব জোর করে মেয়েদের উপর চাপাবার চেষ্টা হয়, তখনই সমস্যা দেখা দেয়। এখানেও মেয়েরা আইনের চোখে অবশ্য সব দিক থেকে ছেলেদের সমতুল্য, কিন্তু এখনও জাপানের সমাজ-ব্যবস্থায় সম্পূর্ণভাবে তার প্রকাশ সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

আজকের জাপানে তিন রকমভাবে বিবাহবিচ্ছেদ সম্ভব। প্রথমত. উভয়ের ভিতর ব্যক্তিগত বোঝাবুঝি (Mutual-understanding) এবং স্বীকারোক্তি। উভয়ের মত থাকলে বিচারকের বিচার করবার প্রয়োজন নেই, খুঁটিয়ে দেখবেন না, সেটা সত্যিই যুক্তিযুক্ত কিনা।

দ্বিতীয়ত, এখানে একটা বিচারক সম্প্রদায় (Arbitation Committee) আছে। যাঁরা প্রথমত বিচার করবেন, সত্যই বিবাহ-বিচ্ছেদের উপর যে দাবি আনা হয়েছে এক পক্ষ থেকে, সেটা যুক্তিযুক্ত কিনা এবং তার সত্যতা আছে কিনা। যদি কোন পক্ষ এই বিচারক-সম্প্রদায়ের মতামত সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়ে, তখন সে যেতে পারে আদালতে, যেখানে আইন অনুযায়ী তারা বন্ধনমুক্ত হতে পারে।

১৯৬৪ সালে দেখা গেছে, একানব্বই (৯১.০%) ভাগ দম্পতি বন্ধনমুক্ত হয়েছে ব্যক্তিগত আপস-মীমাংসায়। আট (৮.০%) ভাগ বিচারক-সম্প্রদায়ের রায় মেনে নিয়েছে আর এক (১.০%) ভাগ ছুটেছে আদালতে।

সব দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, গড় হিসাবে এর খুব একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। যদিও বলা হয়েছে যে, পুরুষদের আগ্রহ বাড়তির মুখে, তবুও তা হচ্ছে সমগ্রতার বিচারে মাত্র শতকরা নয় ভাগ। সব দেশের মতনই ব্যক্তিগত আপস-মীমাংসার ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কারণ বোঝা যায় না।

যেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে উভয়েরই এক মত (Divorce by Mutual Consent), সেখানে স্বামী যেকোন সময় সরকারী দপ্তর থেকে সরকারী খসড়ায় নিজের ও স্ত্রীর নাম সহ বিচ্ছেদের আবেদন জমা দিতে পারেন। তাতে কোন খরচ লাগবে না। অবশ্যই সেক্ষেত্রে দু' পক্ষের স্বাক্ষর প্রয়োজন। অনেক সময় স্ত্রীর অজ্ঞাতসারেই বিবাহ-বিচ্ছেদের সরকারী পরোয়ানা ঘোষিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে স্ত্রীরও স্বাধীনতা আছে আইনের সাহায্য নেবার।

পৃথিবীতে মাত্র পাঁচটি দেশ আছে, যেখানে যুক্তিতর্কের বাইরে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্ভব। সোভিয়েট ইউনিয়ন, ডেনমার্ক এবং সুইজারল্যান্ড এদের অন্যতম। [illegible] কিন্তু [illegible] এক নির্ধারিত সময় একে অপরের দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে এবং তার প্রমাণ দেখাতে হবে। জাপানে এসবের কোন বালাই নেই। বলতে গেলে জাপানই পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যক্তিগত আপস-মীমাংসার সত্যকারের রূপ নিয়েছে।

এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এখানকার কোন এক বিখ্যাত লেখক আকিউকি নোসাকা বলেছেন—"পুরুষ মানুষ মাত্রই কিছুটা সহনশীলতার বশবর্তী। প্রথমত সে এই অনুভূতির মধ্যে গড়ে ওঠে বাল্য-জীবন থেকে—সেখানে প্রধান ভূমিকা মায়ের। সেই কারণেই এই অনুভূতির স্বাদ স্বভাবতই মধুর। পরবর্তী জীবনে স্ত্রীর সাহায্যে সে সেই একই স্বাদ আশা করে। কিন্তু মুশকিল হয় তখনই, যখন স্ত্রী নারী-পুরুষের সমতার উপর কটাক্ষপাত করে। সেখান

থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যখন থালা-বাসন পরিষ্কারের দাবি ওঠে, সমস্যা সেখানেই। তাঁর মতে, পুরুষ প্রথমত যতটা সম্ভব মানিয়ে চলবার চেষ্টা করে—কিন্তু ব্যক্তিগত সহ্যের সীমা অতিক্রম করলেই চিন্তা হয় বন্ধনমুক্তির। মজা এই যে একবার যদি জিনিসটা উত্তরের ভিতর মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তখন কেউই কারোর প্রতি বিষোদ্গার করে না।"

এখানে বিবাহ-বিচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে মেয়েরা ক্ষতিপূরণস্বরূপ পায় মাত্র তিনশ' হাজার ইয়েন, অর্থাৎ প্রায় ৬,১৫০ টাকা। এই Consolation-Money-কে বাড়াবার জন্য জাপানের House Wives Fedration উঠে পড়ে লেগেছেন।

দেখা যাচ্ছে, পুরনো দিনের চাইতে আজকের বাহ্যিক আড়ম্বর বৃদ্ধি পেলেও কোথায় যেন কি ঘটে যাওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি সুর কেটে যাচ্ছে, আলগা হয়েছে বন্ধনভিত্তি।

একটি সুন্দর সুষ্ঠু "ভারতীয় সন্ধ্যা" সবাই উপভোগ করল। ভারতীয়ই শুধু নয়, উপস্থিত ছিলেন অনেক দেশের অনেক মানুষ। উদ্যোগী হয়েছিলেন ভারতীয় ছাত্রছাত্রীরা। উপলক্ষ আমাদের জাতীয় দিবস। এক কথায় বলতে গেলে তাঁরা এই উপলক্ষে ভারতের সূক্ষ্ম রুচিবোধ এবং ঐতিহ্যকে সকলের সামনে অনেকখানি তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। উৎসাহ, উদ্যোগ আর আনন্দে ভরপুর সে অনুষ্ঠানে যদি কোন দোষ-ত্রুটি থেকেও থাকে, তা কারুর চোখে পড়েনি। একটা গর্বিত পদক্ষেপ নিয়েই সেদিন এখানকার 'তেজো-হল' থেকে বার হয়ে এসেছিলাম। কাউকে প্রধান ভূমিকায় এনে ছোট-বড় করবার কোন কারণ নেই। সমষ্টিগত উদ্যোগই প্রধান। মাননীয় রাষ্ট্রদূত এবং প্রধান অতিথি হিন্দীতে ভাষণ দিলেন। জনৈক ভারতীয় ছাত্র সংগে সংগে সেটা জাপানী এবং ইংরেজী ভাষায় তর্জমা করলেন। জাপানী মেয়ের ভারতীয় নৃত্য বেশ তৃপ্তিদায়ক। জনৈকা ছাত্রীর লেখা জাপানী ভাষার নাটকে ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করলেন। আর সুন্দর হাস্যকৌতুক পরিবেশন করলেন জাপানের চলতি গানের ব্যঙ্গ-প্রকাশে। সবটা আমি অবশ্য বুঝলাম না। দেখলাম ছোট ছোট জাপান দেশের ছেলেমেয়েও বড়দের সংগে হাসছে। বুঝলাম উপভোগ্য। সত্যই ভাল লাগল। আরও ভাল লাগল এই ভেবে যে, আজকের দিনে তারা সকলের সামনে একটা ছোট্ট সত্যকার ভারতীয় রূপকে তুলে ধরতে পেরেছে। অভিনন্দন জানাই তাদের সফলতাকে। আর অভিনন্দন জানাই ওই "তেজো-হল"-এর কর্মকর্তাদের, যাঁদের স্বার্থহীন সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছে।

আর একটা খবর না জানালে "টোকিওর চিঠি" বোধ হয় সম্পন্ন হবে না। বিজয়া-সম্মিলনীর সফলতার পর সকলে উৎসাহিত হয়েছেন সরস্বতী পুজোয়। স্বভাবতই টোকিওতে প্রথম, কিন্তু সেবারের উদ্যোক্তা আমায় দত্ত-বউদির অসুস্থতায় কিছুটা চিন্তান্বিত ছিলাম। হাল ধরলেন আমাদের ব্যানার্জি-বৌদি। সংগে আছেন বাণী-বউদি, মঞ্জুলিকা আর জয়শ্রী। এ'দেরও পেছনে রয়েছেন অন্যান্য কর্তাব্যক্তিরা। বাঙালী সংস্কৃতিকে ধরে রাখবার প্রয়াসে মেয়েদের ভূমিকা প্রশংসার দেখছি প্রথম।

সুপার বাজার—কনট্‌ সারকাস, নিউদিল্লি

দিল্লির ডায়েরি

সব কিছুই বড় হওয়া চাই, তা না হলে রাজধানী কেন, যেখানে রাজার অথবা রাজ্যের সমস্ত ধন আছে? কুতুব মিনার বড়, রাষ্ট্রপতি ভবন বড়, লালকেল্লা বড়, "সুপার বাজার"-ও বড়। অতো বড় দোকান দেশে এখনো দুটি হয়নি।

মাসের প্রথম দিকে আর শেষের দিকে কী ভিড়, কী ভিড়! ঠেলা, ধাক্কা আর কনুই-এর গোত্তা না-মেরে এগুবার জো নেই। আপনি যদি না মারেন, অন্যরা আপনাকে মারবে। সুতরাং এ ও-কে গোত্তা মারছে। পুরুষরা তো বটেই, মাঝে মাঝে জাঁদরেল সর্দারনীরাও কম যান না।

সুপার বাজার একেবারে রাক্ষুসে বাজার। সচরাচর যা প্রয়োজন, সব কিছুই পাওয়া যায়, এবং দামও শহরের অন্যান্য স্থানের অনুপাতে সস্তা—চার আনা থেকে আট আনা। ডাল, নুন, তেল, ঘি, সাবান স্নো, মাথার তেল, লিপস্টিক, তরি-তরকারি, ফল, ডিম, মাছ, মাংস বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কাপড়-চোপড়, বইপত্র, খেলনা পুতুল, রান্নাঘরের তৈজসপত্র,—একুনে বারো-চোদ্দটি বিভাগ। সাধারণত খুব ভিড় ডালের কাউন্টারে, আর শাক-সবজির প্রশস্ত হলঘরে।

গত বছর টাকার মূল্য হ্রাসের পর পর, ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করেন সমবায় সংস্থার ভিত্তিতে বড় বড় দোকান খোলার, যাতে সাধারণ লোকেরা উচিত মূল্যে জিনিস কিনতে পারে এবং অন্যায় মূল্য-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটা সক্রিয় শক্তিও দাঁড়াতে পারে। সুপার বাজার অনেকাংশে সফলকাম হয়েছে, সন্দেহ নেই। এর জন্যে কৃতিত্ব প্রধানত জেনারেল ম্যানেজার এন এন দত্ত, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবাসী, যিনি ১২ বৎসরের পরিশ্রমে দাঁড়া করিয়েছেন দিল্লির কটেজ ইনডাসট্রিজ এমপোরিয়ম (এটি ভারত সরকার গত বৎসর নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন)। বহুকাল আগে, উনি বললেন, জয়প্রকাশের রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন। অতি মিষ্টভাষী ও বাস্তবপন্থী লোক।

প্রথম খোলা হল ১৫ জুলাই, গত বৎসর। কোনো মন্ত্রী কিংবা "নেতা" মহাশয় রুপোর কাঁচি দিয়ে রেশমী ফিতে কেটে, আধ ঘণ্টা ধরে উপদেশামৃত বিতরণ করে ও তোষামোদকারীদের হাততালি দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে উদ্বোধন হয়নি। হাজার দশেক লোক, পূর্ব-ঘোষিত সময়ে দারোয়ানকে দিয়ে দরজা খুলে দেওয়ার পর, হুড়মুড় করে প্রবেশ করে গেল। উপর থেকে কয়েক মণ গোলাপের পাপড়ি বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ল।

মিস্টর দত্ত বললেন: আমি নেতা-ফিতায় বিশ্বাস করিনে। সাধারণ লোকেরা আমার ক্রেতা, তারাই করল উদ্ঘাটন। আর কী চাই। সুপার বাজারের ছ' মাস পূর্ণ হওয়াতে এই ১৫ জানুয়ারি হল একটা মোর্ট-টুগেদার, প্রীতি সম্মেলন। না, কোনো মন্ত্রী নেই, নেতা নেই, বাজিয়ে নেই। কয়েক শো নিমন্ত্রিত লোক সামিয়ানার নিচে এসে গেল, আর অনেক-গুলো কাউনটারে ভিড় করে খাবার ও পানীয় নিয়ে দিব্যি প্রীতিপূর্ণ আব-হাওয়ার সৃষ্টি করল। জেনারেল ম্যানেজারকে ঘিরে কেউ তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, কেউ অভিযোগ করছে (জিনিস-পত্র কিনতে বড্ড দেরি হয়; অমুক জিনিস রাখা হোক), কেউ কেউ নতুন নতুন প্রস্তাব দিচ্ছে। কলা কমলালেবু বিস্কুট খেয়ে, চা কফি ও সুপ (হ্যাঁ, সুপও ছিল) খেয়ে সম্মেলন শেষ।

এবং ঐ ছয় মাসে বিক্রি-অঙ্ক হল দুই কোটি ৩০ লক্ষ টাকার, সুপার বাজারে ও এদের শাখা "আপনা বাজার"-এ সফদরজংগ)। দৈনিক বিক্রির হার: সুপার বাজার ১,৩০,০০০ টাকা; আপনা বাজার ৩৫,০০০ টাকা। সুপার বাজারের কয়েকটি দ্রব্যের বিক্রয় নমুনা: ১৫ জুলাই

সুপার বাজারে কাপড়ের স্টল

থেকে ৩১ নভেম্বর অবধিঃ মুদিখানা ও প্রসাধনের জিনিস ৬০·৭৩ লক্ষ টাকা; কাপড়-চোপড় ঃ ৫৮·২৬ লক্ষ; ফল ও শাকসবজি ঃ ৯·২৩ লক্ষ; ওষুধপত্র ঃ ৪·৪৬ লক্ষ; বইপত্র ঃ ২·৭৬ লক্ষ; খেলনা ঃ ২·৯৪ লক্ষ; সাংসারিক তৈজসপত্র ঃ ১৪·৭৫ লক্ষ।

কনট্ সারকাসের এক প্রান্তে ছয়-তলা দালান সুপারবাজারের। দালানটা হয়েছিল আশেপাশের দোকানদারদের জন্যে (শংকর মার্কেটের), নাম দেওয়া হয়েছিল গোবিন্দ-বল্লভপন্থের নামে। পরিকল্পনা বদলে গেল, এবং কোঅপারেটিভ স্টোর লিমিটেড নিয়ে নিল, এবং মাত্র দু' সপ্তাহের চেষ্টায় গোড়াপত্তন করল, প্রায় এক কোটি টাকার মূলধন নিয়ে। ভারত সরকার শেয়ার কিনেছে ১৬ লক্ষ টাকার, আর ১১½ লক্ষ টাকা দিয়েছে ঋণ তৈজসপত্র কেনার জন্য।

সমবায় সমিতির সদস্য এই ছয় মাসে দাঁড়িয়েছে ৯,৬৬০। যে-কোনো নাগরিক সদস্য হতে পারেন ৫০ টাকায় শেয়ার কিনে। অন্যান্য কয়েকটি সামগ্রী কিছু কম দামে পেয়ে থাকেন, আর শেয়ারের উপর ডিভিডেন্ড শতকরা ছয় ভাগের বেশি হবে না।

সব থাকা সত্বেও কেন জানি না সুপার-বাজার ইউরোপের বড় বড় ডিপার্টমেন্টেল স্টোরের মতো দেখায় না। কোথায় যেন কিসের অভাব। প্রথমত, অত্যন্ত স্থানাভাব; দ্বিতীয়ত সুন্দর দেখানোর চেষ্টা অতোটা নেই যতোটা থাকা উচিত। না হলেও যদি অতো বিক্রি হয়, তাহলে আর খামোকা খরচ করা কেন, হয়তো এই যুক্তি। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে যাকে বলে "এলিগ্যানস", তা নেই।

জেনারেল ম্যানেজার বলেন, আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এ-বাড়ি তৈরি হয়নি। একটা আধা-তৈরি বাড়ি নিয়ে আমরা যথাসাধ্য নিজেদের প্রয়োজন মত করে নিয়েছি।

নিচে গাড়ি রাখার জায়গা, তাও বেশি জায়গা নয়। গড়ে দৈনিক আসে ৬০।৭০টি মোটরগাড়ি, ২০০ স্কুটার আর ৫০০০ সাইকেল সুপার বাজারের গ্রাহকদের নিয়ে। দিল্লিতে আরো শাখা খোলা হচ্ছে। একটি হবে প্যাটেল নগর আর পুসা রোডের গোলচক্করের কাছে, ওদের নিজেদের বাড়িতে, আসছে কয়েক মাসে। আরেকটি হয় পুরোনো দিল্লিতে, না হয়তো রামকৃষ্ণপুরমে। পরিকল্পনায় আছে ৫০টি শাখা দিল্লিতে আসছে দুই বৎসরে, যার একুনে লেনদেন হবে ১০ কোটি টাকার।

বর্তমান দুটি শাখায় কাজ করেন ১,১০০ জন লোক। সুপারবাজারে ৭৫০ জন, তার এক-তৃতীয়াংশ মেয়ে। এখানেও পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে মস্ত প্রভেদ। ওখানকার কাউন্টারে অধিকাংশই মেয়েরা। তাদের বেছে নেওয়া হয় তাদের আকর্ষণ-যোগ্য গুণাবলি দেখে, দৈহিক ও মানসিক দুই-ই। আমাদের সুপারবাজারে যারা আছেন তাদের নিয়ে মন্তব্য আমি করব না।

মিস্টার দত্ নতুন কাজে হাত দিচ্ছেন। তাহল সরাসরি উৎপাদকদের কাছে সুপার-বাজারের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্যে অর্ডার দেওয়া, বিশেষ একটা দামের ভিতরে। যেমন হয়েছে ট্রেনজিসটার রেডিয়ো। দাম ৮৫ টাকা। একদিনে বিকে গেল ২০০০ সেট্। উনি চেষ্টা করছেন এইভাবে গৃহস্থালী জিনিস দোকানে আনতে। যথা প্রেসার কুকার, বাজার দরের চাইতে ৫।১০ টাকা সস্তায়। বাড়ি-বাড়ি জিনিসপত্র সাপ্লাই করারও একটা প্ল্যান আছে।

চাঁদের কোপার্নিকাস গহ্বরের ফটো

১৯৬৬ সালে চাঁদ কতটা কাছে এল ?
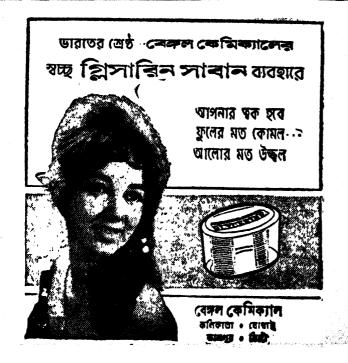
কাঁধে কাঁধে দুটি দেশ চাঁদের দিকে নেমেছে পাল্লা ছুটে। সদ্যবিগত ১৯৬৬ সালে রাশিয়া আর আমেরিকার চন্দ্র বিজয়ের অভিযানের জমা খরচের খাতায় চেহারা প্রায় একই রকম। দুজনেই অনেকগুলি বাহাদুরি দেখিয়েছে আবার ব্যর্থও হয়েছে কয়েকটি ক্ষেত্রে। তবে এটাও ঠিক যে ব্যর্থতার সিঁড়ি ভেঙেই সাফল্যে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। রাশিয়ার চাঁদে মহাকাশযান অক্ষত অবস্থায় নামাবার প্রথম চেষ্টা সফল হয়নি এবং এইরকম আরো অসাফল্যের দৃষ্টান্ত আছে। তেমনি আমেরিকার "লুনার এক্সপ্লোরার চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথ রচনায় ব্যর্থ হয়ে সম্প্রসারিত ভূকেন্দ্রিক কক্ষপথেই আবর্তন করতে থাকে। লুনার অর্বিটার-১ মহাকাশযানের এক জোড়া ক্যামেরার একটি ঠিক মত কাজ করেনি বলে শুধু অন্যটির তোলা ছবি পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। ঠিক সময়ে গতিপথ সংশোধন করতে ও ব্রেক কষতে না পারায় সার্ভেআর-২ চাঁদের পিঠে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যায়। কিন্তু এইসব ব্যর্থতা সার্ভেয়ার-১-এর সাফল্যগুলিকে এ যুগের বিস্ময় বললে অত্যুক্তি করা হবে না। লুনার অর্বিটার-২ থেকে পৃথিবীতে চাঁদের কোপার্নিকাস গহ্বরের যে ছবি এসেছে সেটিও এক ঐতিহাসিক রেকর্ড বলা যেতে পারে এবং আমেরিকানরা যদি সেটিকে "শতাব্দীর সেরা ছবি" বলেন তাতে অন্যায় হয় না।

১৯৬৬ সালে চন্দ্র বিজয়ের অভিযানে রাশিয়া ও আমেরিকার কৃতিত্ব তালিকাভুক্ত করলে এইরকম দাঁড়াবেঃ—

৩১শে জানুয়ারী	লুনা-৯
৩১শে মার্চ	লুনা-১০
৩০শে মে	সার্ভেয়ার-১
১লা জুলাই	লুনার এক্সপ্লোরার
১০ই অগাস্ট	লুনার অর্বিটার-১
২৪শে অগাস্ট	লুনা-১১
২০শে সেপ্টেম্বর	সার্ভেয়ার-২
২২শে অক্টোবর	লুনা-১২
৬ই নভেম্বর	লুনার অর্বিটার-২
২১শে ডিসেম্বর	লুনা-১৩

তালিকায় যে দশটি মহাকাশযানের নাম রয়েছে সেগুলি পাঁচটি করে দুটি দেশের ভাগে পড়েছে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটির উদ্দেশ্য ছিল চাঁদে গিয়ে নামা, অন্যগুলির লক্ষ্য ছিল লুনা-৯, লুনা-১৩ এবং উভয় সার্ভেয়ারের লক্ষ্য ছিল প্রথমটি। লুনা-৯ মহাকাশযান ইতিহাসে প্রথম চন্দ্রের ভূমি স্পর্শ করে এবং সেই কীর্তির পুনরাবৃত্তি করে সার্ভেয়ার-১। চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথ রচনার ক্ষেত্রেও লুনা-১০ই হলো প্রথম পথিকৃৎ।

লুনা-৯ মহাকাশযান থেকে আমরা পৃথিবীতে বসে চন্দ্র পৃষ্ঠের প্রথম সরেজমিনের ফটো পাই। তারপরে সার্ভেয়ার-১ চাঁদের ঝটিকা সাগরের ১১ হাজার ছবি পাঠায়। চাঁদের পরিদৃশ্যমান দিকের পশ্চিম কিনারায় বিষুব রেখার নিকটে যে বিরাট সমতলভূমি আছে তারই নাম ঝটিকাসাগর।

সার্ভেয়ার-১ মহাকাশযানের চাঁদে পুরো একটা দিন ধরে (পৃথিবীর ১৪ দিনের সমান) ছবি তোলার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সে ৪৫ দিন ধরে এক নাগাড়ে কাজ করেছিল। সেই সময়ের মধ্যে চাঁদের তাপমাত্রা ১২০° থেকে—১৫৪° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে ওঠানামা করে।

চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে থেকে চাঁদের প্রথম ছবি তোলে অর্বিটার-১। তারপর অর্বিটার-

অর্বিটার-১

২ সেই রকম কক্ষপথ থেকে চাঁদের মাত্র ২৮ মাইল দূর থেকে চাঁদের ভূ-প্রকৃতির যেসব ফটো তোলে সেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে কোপার্নিকাস গহ্বরের ছবি। ঐ ধরনের ছবি তার আগে আর তোলা হয়নি। ছবিগুলি চাঁদে আগ্নেয়ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য।

রুশ ও মার্কিন মহাকাশযানগুলির প্রেরিত এই চিত্রমালা থেকে চাঁদের ভূপ্রকৃতি ক্রমশ
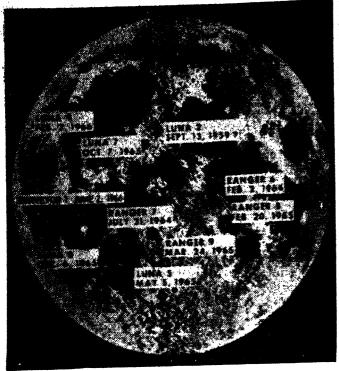
চাঁদের কোথায় কোন্ মহাকাশযান নেমেছে

আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে আসছে। আজ এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষবাহী মহাকাশযানের চাঁদে নামতে কোন অসুবিধা হবে না, কারণ চাঁদের জমির উপরের স্তরে ভস্‌ভসে ভাব বেশি গভীর পর্যন্ত নয়। সেখানে কোন আলগা ধুলোও নেই।

চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথ থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানা গিয়েছে যে চাঁদের উপরের পাথরগুলি পৃথিবীর 'বেসল্ট্' পাথরের সমধর্মী। তাছাড়া চাঁদের দুনিয়ার বিকিরণ, উল্কাবর্ষণ ও চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য [illegible]।

বিভিন্ন মহাকাশযান যেমন চন্দ্রলোকে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করছে, তেমনি আবার এই পৃথিবীতে বসেও বৈজ্ঞানিকরা রেডিও দূরবীনের সাহায্যে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ভার্জিনিয়ার গ্রীন ব্যাংক শহরে অবস্থিত মানমন্দিরে যে নতুন রেডিও দূরবীন বসানো হয়েছে তা চাঁদের যে কোন এক মাইল পরিমিত জায়গায় 'ফোকাস্' করা যেতে পারে।

১৯৬৬ সালে আমেরিকা ও রাশিয়ার স্বয়ংচালিত মহাবৈমানিক জাহাজগুলির অভিযান চাঁদকে পৃথিবীর অনেক কাছে এনে দিয়েছে। ওদিকে দুটি মানুষবাহী পাঁচটি জেমিনী মহাকাশযান মানুষের চন্দ্রলোকে যাত্রার পথে যা কিছু সমস্যা আছে সেগুলির মীমাংসার মহড়া দিয়ে ভবিষ্যতের কর্তব্য তুলে দিয়েছে অ্যাপোলো প্রকল্পের হাতে যার লক্ষ্য ১৯৬৯ সালে চাঁদে মানুষ নামানো। রাশিয়ার আগামী পরিকল্পনা সম্পর্কে আমরা কোন খবর পাইনি। সুতরাং চাঁদ ছোঁবার এই পাল্লা ছুটে কে আগে বুড়ী ছুঁতে পারে তাই দেখবার জন্য আমরা দিন গুনব সঙ্গে সঙ্গে এই আশাও নিয়ে যে মহাজগত বিজয়ের এইসব অশ্রুতপূর্ব ও অভাবনীয় যন্ত্রকৌশল যুদ্ধের স্বার্থে ব্যবহার হবে না।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

পাবো তারে

কালকূট

তেরো

এক ছিল জোলা, বাবু, তার ছিল এক জোলানী। কোন্ দেশে, তা আমি বলতি পারব না। হবি হয়তো কাশী-গয়ার কাছে কোন এক জায়গায়।'...

কোথায় গয়া, কোথায় কাশী, সে বিচারে যেও না। কথার ভাবে মনে হবে, যেন এ পাড়া ও পাড়া। নিদেন এ গ্রাম ও গ্রাম। দুই প্রদেশে, দু' জায়গার ফারাক কত দূর, কথায় তা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। নারায়ণঠাকুর ততক্ষণে তার কলাপাতায় ভাত বেড়ে দিয়ে হাঁকে, 'গল্পসল্প পরে ব'লো, আগে ভাত ভাঙ দিনি, ডাল ঢেলে দিয়ে যাই।'

গাজী ভাত ভেঙে বলে, 'দ্যান, দ্যান। গপ্পখানি তো আপনাকেও শুনোবার জন্যি বলছি ঠাকুরমশাই।'

'হ্যাঁ, আমার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নাই, তোমার ভড়কিবাজি শুনব।'

ঠাকুর খেতে দেয় না, যেন আপদ বিদায় করে। আবার ধমক দিয়ে বলে, 'আস্তে হাত চালাও, ছিটামিটা লাগবে। দশজনের খাবার জায়গা এটা। দেখি, চচ্চড়িটা নিয়ে আও।'

গাজীর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়। না, এততেও হার মানবার নয়, আরশি চোখের ঝলক ঠিক আছে। বলে, 'আমি তো আপনার এগার জন, ছিটা কখনো লাগাতি পারি।'

গাজী বলে, আবার চোখের পাতা নাচায়। সেই নাচন দেখে, চোখ নাচে মাহাতো গিন্নীরও। মাহাতো চাচীর সঙ্গে দেখছি, গাজীর একটু ভাবের খেলা আছে। হয়তো অনেক দিনের চেনা, অনেক গান গাওয়া আর শোনা। গৃহস্থের বউ আর পথের গাজীর ভাবের খেলা তার ভিতর দিয়ে খেলে। ওদিকে মাহাতোর গলা শোনা যায়। 'তারপরে, বলতে বলতে থেমে গেলে যে। জোলা জোলানীর কী হল, বল।'

ঠাকুর এতক্ষণে ছোঁয়া বাঁচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সরে এসেছে। গাজী বলে, 'হ্যাঁ, তো এক জোলা আর জোলানী, রওনা দিয়েছে, যাবে এক বিয়াবাড়ির নেমন্তন্নে। জোলার নাম নুরি, জোলানীর নাম নিমা। তো, যেতি যেতি জোলানী দ্যাখে, সামনে এক সরোবর, সরোবরে বিস্তর পদ্মফুল আর পদ্মপাতা। ড্যাঙার কাছে সেই পাতাতে এক সোন্দর ছাওয়াল ভাসছে। দেখে জোলানীর মন মানে না, মায়ের পেরাণ তো, বুইলে চাচী। জোলানী সে ছাওয়াল পদ্মপাতা থেকে নিজির বুকে তুলি নিলে।...আচ্ছা বাবু, বলেন দিনি এখন, এই যে ছাওয়াল, মানুষের সন্তান, এ'য়ার কী জাত আছে।'

দুরূহ প্রশ্ন। বাবুর কান ছিল গাজীর দিকেই, কিন্তু পাতে তখন ধুমায়িত ট্যাঙরা মাছ। ঝোলের রঙের বাহার দেখলে মেজাজ মোগলাই না হয়ে যায় না। লাল রঙ যদি মিশিয়ে না থাকে, তবে শুকনো লঙ্কা বিনে এমন ঝলক দেয় না। সে কথা ভাবতেই পেটের নাড়িতে জ্বালা ধরে যায়। তবে একেবারে অপযশ করব না। রূপ দেখে যত ভয়ই লাগুক, ঘ্রাণের ভিতর দিয়ে আদিম রিপুর একটা রিপু উথলে ওঠে। সেটা টের পাওয়া যায় জিভের জলের ধারায়। বরং এতক্ষণের সব মিলিয়ে 'মহাপ্রাণী'টির কোথায় যেন একটা বিধ্বনি বেসুর গাইছিল, সেখানটা জলের ধারায় সাফ হয়ে যায়। ওদিকে মাহাতো কর্তা-গিন্নীকে দই পরিবেশন করা হয়েছে। তাতে কারুর বিশেষ মন আছে, মনে হয় না। এদিকে প্রশ্ন, সরোবরের পদ্মপাতায় যে ছাওয়াল জলে ভাসে, তার জাত কী বল।

তবে বাবুর আগেই মাহাতো বলে, 'ছাওয়ালের বাপ কে মা কে, তাই জানা গেল না, জাত বলবে কেমন করে।'

গাজী হেসে ঘাড় দোলায়। বলে 'তয় বল, যে ছাওয়াল জলে ভাসছে, তার বাপ-মা খুঁজতি যাবে কোথায়। এখন, এ ছাওয়াল যে মানুষির, তা মানতে লাগবে। সেই জন্যি বলি কি, মানুষির কি জাত আছে। এ সেই গানের কথা হচ্ছে, ছুন্নত আর পৈতা না দিলি, জাত বানানো যায় না।'...

হঠাৎ কথা থামিয়ে একেবারে সুর করে সেই গানের কলি গেয়ে ওঠে, 'ছুন্নত দিলি হয় মোচলমান, নারী লোকের কী হয় বিধান। বামুন চিনি পৈতা ধরে, বামনী চিনি কী করে।'...

পুরো গাওয়া শেষ হয় না, নারায়ণ-ঠাকুরের হাঁক শোনা যায়, 'আরে খাও দিনি আগে। পাতে রইল ভাত পড়ে, উনি এখন বামনা বামনী বোঝাচ্ছেন।'

মাহাতো গিন্নীর হাসি বেজে ওঠে খিলখিল। তার সঙ্গে আর একটি মেয়ে গলার হাসি সংগত করে দরজার পাশ থেকে। এ সেই বউটি, যাকে ফোঁচানী বলব না নারায়ণী, বুঝতে পারি না।

ভাতে একবার হাত ঘুরিয়ে গাজী বলে, 'না, তাই বলি কী যে, মানুষের তুমি একখান নাম দিতি পারু, জাতের নাম বল মানুষ, না কি বলেন বাবু। নামে তোমাকে ডাকি, কামে তোমাকে বুঝি। আচ্ছা বলেন তো বাবু, ফুলের কি কোন জাত আছে।'

দুরূহ থেকে দুরূহতর প্রশ্ন। শুধু মানুষে হয় না, এবার ফুল ধরে টানাটানি। গাজীর মত এত ব্যাখ্যা বয়ান বাবুর জানা নেই। তবে জবাবের মুখ চেয়ে গাজী কথা বলেনি। তার কথকতার ধুয়া এখন 'বাবু'। একজনকে না ডেকে কথা বলা যায় না। বলে, 'ফুলের কোন জাত নাই। ফুল হলি ফুল, এখন কেণ্টকালি বলেন আর জুঁই টগর বলেন, সে তোমার নাম। কামে

তোমার মিঠে বাস, রূপে ঝলমল কর, তুমি ঠাকুর-দেবতার পুজোয় লাগো, তাই কি না বলেন, অ্যাঁ?'

বলতে ইচ্ছা করে, আর যখন মালা হয়ে গলায় দোলে, খোঁপার শোভা হয়, তখন? তবে, তখনো সেই কামের কথাই আসে। কামের অর্থ 'কামে'র নয়, কাজের, যাকে বলে গুণের বিচার। গলায় দোলা, খোঁপার শোভা, তাও গুণের মধ্যেই পড়ে।

নারাণঠাকুর অমনি বাণ কষে, 'তবে আর কি। যে ফুলের শোভা নাই, বদ গন্ধ ছাড়ে, তার বিষয়ে কী বলবে।'

গাজী জবাব দেয় ঝটিতি, যেন যোগানো ছিল মুখে। বলে, 'নিগুণ বলবু বুইলেন ঠাকুরমশায়, নিগুণ বলব। জাত দিয়ে গুণ বিচার হয় না। অই সেইজন্যি বলি কি, মানুষ হল ফুলির মতন, কেমন কি না বলেন বাবু। তুমি রাম হও কি রহিম হও, তাতে পেয়োজন নাই। এখন তুমি পুজোয় লাগো কি না লাগো, সেই কথাখানি ভাবো, না কি বলেন বাবু।'

বলে চোখ ঘুরিয়ে ঘাড় দোলায়, দাড়িতে নাড়া খেয়ে যায়। যেন গানের মত সুর করে বলে, 'পুজোয় লাগতি হবে, লাগতি হবে, তাইতে তোমার জাত মান।'

কথাগুলোর গায়ে তেমন ঝলক নেই। মনে তরঙ্গ ঝাঁপ খায় না। কিন্তু কোথায় যেন চমক লেগে যায়। রাম রহিমে যায় আসে না, পুজোয় লাগো কি না লাগো, তাই ভাবো। এ আবার সেই, 'কথা কইতে জানলে হয়, কথা ঘোল খাবায় বয়।' কানে শোন এক, ভিতরের ধরতাই দুস্রা। এবার ভাবো, গাজী কোন্ বায়ে যায়।

সেই এক কথা, জাতের নাম ছাড়, জীবনকে পুজোয় লাগাও।

চেয়ে দেখি, গাজীর চোখে ঝিকিমিকি। যেন ধাঁধা বলে, রহস্যে হাসে ধাঁধা বানানে-ওয়ালা। এখন কোন পুজোতে লাগবে তুমি কী তার মর্ম, তা বোঝো গে মনে মনে। কিন্তু আমি ভাবি, কাঁধে ঝোলা, গায়ে আলখাল্লা, যে নামেরই মজুর হোক, এই তালিতে ধুলোতে রুক্ষুসুক্ষু মানুষটা এক প্রকার ভিখারি ছাড়া আর কী। জীবন কাটে যার দরজায় দরজায়, পথে পথে, নামের গান করে, হাত পেতে যার ভরণপোষণ, সে এসব কথা পায় কোথায়। ভাবে কেমন করে। বিদেশের কথা জানি না। জানি না, সেখানে পথে পথে ফেরা, দোরে দোরে ঘোরা মানুষেরা এমন হাসি হেসে, এমন কথা বলতে পারে কি না। কিন্তু ভারতবর্ষের দরজা খুলে উঁকি দাও, দেখবে হাটের মাঝে, চালচুলোহীন মানুষে তত্ত্ব কথা বলে। গাছতলাতে নগ্ন মানুষ জীবন ব্যাখ্যা করে। এই দেশেতেই আছে কেবল, সোনার মুকুট ছার, রাজার ছেলে বটতলাতে রাজার রাজা সাজে। আলখাল্লা গায়ে তুলে ঊর্ধ্ববাহু নাচে। আধুনিকতার সুখের বেড়া ডিঙিয়ে চলে যায়, রাঢ়ের ছাতিম গাছের তলায়। যাকে ঘর থেকে দিয়েছি সরিয়ে, একেবারে দাওয়ার নিচে, সেও ধুলোয় বসে হেসে হেসে এমন কথা বলে। কেতাব পুঁথি রাখো, এমন জায়গায় এমন জিনিস পৃথিবীর আর কে আমাকে দেবে।

কেউ না। তাই দেখ, এই দেশেতে ধুলোর কথা আগে। এই দেশের গানে ধুলো, প্রাণে ধুলোর দাগ। এই দেশেতে তাই ধুলোয় লুটানো দেখবে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত। এই দেশ জেনেছে, সোনার চেয়ে দামী যত সব মহৎ প্রাণের জন্ম এই ধুলোয়, এই ধুলোতেই লয়। এই দেশ তাই গায়ে ধুলো মেখে মিষ্টি হাসে, তত্ত্ব ভাষে। হর্ম্যতল ছেড়ে গাছতলাতে এসে সে পরম কথা শুনিয়েছে। রূপকে অরূপ করেছে।

প্রাণের কথা প্রাণেই লাগে। নারাণ-ঠাকুরের মুখে ঠিক উল্টা কথা যোগায়নি। বিরস বিরক্তিতে বলে, 'যত বাজে প্যাচাল পাড়ে।'

ওদিকে মাহাতো খুড়োর হঠাৎ যেন ধ্যানভঙ্গ হয়। হুস্ করে এক নিশ্বাস ফেলে বলে, 'তক, কথাখানি ঠিক বলেছ। তা সে আর পুজোয় লাগাত্তি পারলাম কই।'...

দেখ, ঘরের হাওয়া কেমন বদল হয়ে যায়। হাসিখুশির দোলদোলানি হঠাৎ যেন দীর্ঘশ্বাসে ভার হয়ে ওঠে। যদিও তাতে অন্ধকারের কালি নেই। দশাসই কালো লোকটা, কোকিলের মত লাল চোখ। যার শ্রী দেখলে নজরে অরুচি। তার ওপরে মোটা মোটা কালো আঙুলগুলো পাতের দইয়ের মধ্যে ডোবানো। তবু হঠাৎ লোকটাকে কেমন করুণ লাগে। যেন এই মানুষ পৃথিবীর আদিম যুগের গুহার মুখে বাস। তার অস্ত্র খাদ্য সবই মজুত, তবু যেন কী এক পরম অসহায়তা তাকে আতুর করে তুলেছে। এখন কে জানে তার প্রাণের কথা। গাজী তার প্রাণের কোন তারেতে ঝঙ্কার দিয়েছে।

ওদিকে মাহাতো গিন্নীর ডাগর চোখ দুটিও যেন সন্ধ্যা নামা শান্ত আর গম্ভীর হয়ে ওঠে। আধখোলা ঘোমটার পাশ দিয়ে তার দৃষ্টি চলে যায় দূরে। বাইরের শূন্যতায়, হয়তো ভিতরের কোন উথালি পাথালি তরঙ্গে। আর গাজী তখন মাথা নিচু করে। মুঠো মুঠো ভাত মুখে তোলে। তার শব্দ শোনা যায়, সপ্ সপ্ সপ্।

এবার তাই আমাকেই আওয়াজ দিতে হয়, 'কিন্তু সেই গল্পটার কী হল, পদ্ম-পাতার ছেলে?'

গাজী মুখে ভাত নিয়ে ঘাড় দোলায়। তাড়াতাড়ি গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, 'অই হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম। বুইলে কি না মাহাতো চাচা...।'

মাহাতো বলে, 'হ্যাঁ বল, তারপরে।'

'তো জোলানী তো সেই ছাওয়াল বুকে করি তুলি নিয়েছে। নিয়ে জোলাকে বলে, "দেখ এক ছাওয়াল পেইচি।" তা, সেই ছাওয়াল হল একটুখানি, মায়ের পেট থেকে পড়া। আহ্ মুরশেদ, সে ছাওয়াল হঠাৎ টকটকিয়ে বলি ওঠে, "আমাকে কাশীতে নিয়ে চল।" এই যাহাতক বলা, জোলার জান খাঁচা-ছাড়া। ভাবে কী যে, এতটুকুন ছাওয়ালে এমন করি কথা বলে, এ না জানি কোন জিন্ পেরেত হবি। সে জোলানীকে ফেলি দিল দৌড়। তা বললি কী হয়, তোমার আজ মুরশেদের দিন। এক মাইল ছুটেও দ্যাখে, সামনে সেই ছাওয়ালের মুখ। ছাওয়াল বলে, "আমি জিন্ পেরেত নই, তোমার কোন অনিষ্ট হবি না। তুমি বিবির কাছে ফিরি চল।" ছাওয়ালের সুন্দর মুখখান দেখে জোলার কেমন পেত্যয় হয়। সে ফিরে আসে। তখন ছাওয়াল বলে, "তোমরা আমাকে পালন কর, ভয়ের কিছু নাই।" সেই থেকে সেই ছাওয়াল জোলা-জোলানীর ঘরে মানুষ। আর এই ছাওয়াল হলেন গে কবীর। তয়, যে কারণে বলা—"

গাজীর কথা শেষ হয় না। নারাণঠাকুর বলে ওঠে, 'ওসব গালগল্প রাখো, কবীরের বিত্তান্ত তুমি আমাকে শোনাতে এস না। ঘরে এখনো আমার বই আছে, তাতে ছাপার অক্ষরে যাবৎ লেখা আছে। চাও তো, পড়ে শুনিয়ে দিতে পারি।'

এ যে ইতিহাসের বিতণ্ডা। তাও কি না, দূরে যাবার এক হাটের ভোজনালয়ে। তার্কিক হলেন পাচকঠাকুর। আর এক রাস্তার দরবেশ।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ঐতিহাসিক কবীরের ঐতিহাসিকতা এই অধীনের তেমন জানা নেই। নিজের ঝোলা ঝেড়ে এইটুকু বলতে পারি, সম্বত শকের ষোড়শ থেকে সপ্তদশের কোন এক সময়ে তাঁর উদয় এবং অস্ত। পাঠান সেকেন্দর শা তখন বোধ হয় বাদশা। কাশীতে তখন হিন্দু রাজার রাজত্ব। কিন্তু জন্মবৃত্তান্তের হদিস আমার জানা নেই।

গাজী বলে, 'কেতাবের দরকার কী, আপনি বলেন, আমরা শুনি।'

নারাণঠাকুর তেমন সোজা পাত্র নয়। বলে, 'কবীরের গুরু ছিলেন কে বল তো।'

গাজী হেসে বলে, 'রামানন্দ ঠাকুর।'

একটু যেন ঠেক খেয়ে যায় নারাণ-ঠাকুর। তবু বলে, 'হ্যাঁ, ওই রামানন্দের কিরপাতেই কবীর তরে গেছিল।'

গাজী মাথা দুলিয়ে হাসে। বলে, 'সে কথা ছাড়েন, তার জবাব আছে। তারপর কী বলবেন, বলেন।'

ঠাকুর বলে, 'বলছি। ওই রামানন্দ ঠাকুরের এক বামুন শিষ্য ছিল। সেই শিষ্যের ছিল এক বিধবা মেয়ে। সেই মেয়েকে আশীর্বাদ করতে গিয়ে রামানন্দ

ঠাকুর বলে ফেলেছিলেন, "তুমি ছেলের মা হও।" উনি বিধবা বিবেচনা করেন নাই। অথচ গুরুদেবের আশীর্বাদ, তা না ফলে যায় না। তারপরে দেখা গেল, সেই বিধবা মেয়েরই ছেলে হয়েছে। তবে হ্যাঁ, বিধবার ছেলে, লোকে নিন্দা মন্দ করবে, তাই লুকিয়ে ছেলের জন্ম দিয়ে অন্য জায়গায় রেখে এসেছিল। সেই ছেলে কুড়িয়ে পায় এক জোলা আর জোলানী। তারা তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে মানুষ করে।'

গাজী বলে, 'তা হতি পারে, তবে কথা সেই একই।'

'কেন এক হবে। কবীর হিন্দুর ছেলে...।'

গাজী ঘাড় কাত করে জিজ্ঞেস করে, 'বাপের নামখানিও জানেন নাকি। আজ পর্যন্ত তো শুনি নাই, কবীরের বাপ কে।'

কোথায় গেল খাওয়াদাওয়া, কোথায় কিসের পরিবেশন। এখন এখানে কবীর নিয়ে লাগ্ ঝমাঝম্। নারাণঠাকুর কেবল বিরক্ত নয়, এবার ক্রুদ্ধ। গাজীর দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলে, 'দেখ তো, এই ঢোঁকিকে কী বোঝাব। শুনছ গুরুর আশীর্বাদ, তার আবার বাপ কিসের। গুরু আশীর্বাদ করেছিলেন বলেই তো ছেলে হল। তা হলেই বোঝ, হিন্দু গুরুর আশীর্বাদ, হিন্দু বিধবার পেটে জন্ম। এখন তুমি যদি জাত না মানো, তা হলে কী হবে।'

গাজী তবু হাসে। যদিও গুরু আশীর্বাদে মানুষের জন্ম, কিংবা পদ্মপাতায় আপনা থেকে ভেসে আসা ছেলে, আমার কাছে দুই বৃত্তান্তই সমান। তবে কোথায় একটা বাস্তবের ইশারা এই গল্পে উঁকি দেয়। কিন্তু গাজী কেন হাসে। হেসে হেসে সে বলে, 'আপনি বলতি চান, কবীর হিন্দু, না কি ঠাকুর মশায়।'

নারাণঠাকুর বিড়ি ধরিয়ে বলে, 'নিশ্চয়।'

গাজী বলে, 'তবে শোনেন, "জাতি পাঁতি কুল কাপড়া, এহ শোভা দিন চারি। কহে কবীর শুনি হো রামানন্দ! এও রহে ঝকমারি॥ জাতি হামারি বাণীকুল করতা ঔর নাহি। কুটুম্ব হামারে সন্ত, হ্যায় কোই মুরখ সমঝতে নহী।" হতি পারে রামানন্দ ঠাকুর ও'য়ার গুরু, তয়, কবীর জাতি পাঁতি ছাড়া। ও'য়ার কথাই ও'য়ার জাত, মনের মানুষ ওঁয়ার কুল, সাধুরা হল কুটুম। ও'য়ার কোন জাত নাই। হিঁদুও না, মোচলমানও না।'

নারাণঠাকুর আবার ঠেক খায়। চমক খাই আমি। এ যে ধুকুড়ির মধ্যে খাসা চাল। গাজীর দৌড় দেখছি অনেকখানি। মিছে মামলার কারবারী নয়, প্রমাণ দিয়ে সওয়াল করে। কেবল যে মুরশেদের নামের মজদুরি নিয়ে ফেরে, তা বলতে পারবে না। এক পাল্লায় কথা, আর এক পাল্লায় বাটখারা। ওজন ছাড়া কেবল কথার কথা নয়। কে জানে, নারাণঠাকুর আবার ছাপার অক্ষর দেখাবে কি না। কিন্তু তার ভাব-সাব একটু অন্যরকম। বলে, 'সে কথা আলাদা।'

গাজী হেসে আবার ভাত খায় সপাসপ্, তারপরে গলায় মধু ঢেলে বলে, 'আর চাট্টি ভাত দেন ঠাকুরমশায়।'

মুখ দেখলেই বোঝা যায়, নারাণ-ঠাকুরের পিত্তি জ্বলে গিয়েছে। নিজে না গিয়ে সে ঘর থেকেই হাঁক দেয়, 'ফোঁচা' বকনোতে যে ভাতগুলোন আছে, সেগুলোন একে দিয়ে যা।'

কিন্তু মাহাতো গিন্নী না হেসে পারে না। এখন তার সন্ধ্যা নামা চোখে আবার দুপুরের ঝলক। ঠাকুর আর গাজীতে তলে তলে লড়ে কোথায়, বোধ হয় ধরা পড়ে তার কাছে। গাজীর দিকে চেয়ে যেভাবে হাসে, বোঝা যায়, মান্য তার সেখানেই। বলে, 'ওই নাকি তোমার গল্প।'

গাজী বলে, 'না, আরো আছে। আসল গল্প তো বলাই হয় নাই। জাতের মজা সেখানেই।'

বলে সে ফোঁচার কাছ থেকে ভাত নিয়ে মাখতে মাখতে বলে, 'তারপরেতে কবীর তো মারা গেলেন। যেমনি মরা, অমনি মোচলমান শিষ্যরা বলে, তারা কবর দেবে। হিঁদুরা বলে পোড়াবো। দু' দলেতে ঘোর বিবাদ। এও লাঠি তোলে, সেও লাঠি তোলে। বেঁচে থেকি মানুষটা যে এত বলি গিলেন, সব পয়মাল। দুই দলে যখন মারামারি লাগে লাগে, তখন কবীর এসে দেখা দিলেন। বললেন, "বিবাদ ক'রো না, আমার মরার ঢাকা খুলি দেখ।" অমনি দুই দল গে ঝাঁপ খেয়ে প'লো। দ্যাখে, কবীর নাই। ঢাকার নিচে এক রাশ ফুল পড়ি রয়েছে। তখন নাও, কাকে পোড়াবে, কাকে কবর দেবে। তবে বিহিত তো একটা করতে লাগে। তাই, আদ্দেকখানি ফুল নিয়ি গেল কাশীর মহারাজা। সেই ফুল দাহ করি, তার ছাই রেখি দিল এক জায়গা। আর বাকী আদ্দেক নিয়ি গেল দিল্লীর বাদশা। কবর দিই রাখলে গোরখ্-পুরের এক গাঁয়ে। নাও, এবার তুমি কী জাতের বিচার করবে, কর।'

বলে মাথা নামিয়ে আবার খাওয়া আরম্ভ করে। একবারও মনে হয় না, গাজী তত্ত্বকথা বলে। যেন দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ, কেবল নারাণঠাকুরকে রাগিয়ে মনে মনে নৃত্য করে। আবার হাঁক দিয়ে বলে, 'এবার হরি হরি বল মন। ঠাকুরমশায় ফোঁচাকে বলেন একটু দই দিতি।'

একে গাজী ছাড়া আর কী বলে। নারাণঠাকুর ততক্ষণে ভিতরে অন্তর্ধান করেছে। ইতিমধ্যে আমার পাতে দই পড়েছে। মাহাতো উঠে দাঁড়িয়েছে। সে যেন এতক্ষণ গল্পের মর্ম ঠাহরের ধ্যানে ছিল।

আপন মনেই ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, 'দ্যাখ, দেখা দিয়ে নিজির ব্যবস্থা নিজিই করি গেলেন। তা নইলি তো শরীরটাকে কেটিই দুখান করত সবাই।'

মাহাতো গিন্নী পাত ছেড়ে উঠতে উঠতে বলে, 'গান কিন্তু শোনাতে হবে।'

একটা বিষয় লক্ষণীয়। মাহাতোর কথায় যেমন এই নোনা কূলের টান, গিন্নীর কথায় তা নেই। হবে হয়তো দুজনা দুই অঞ্চল থেকে এসেছে।

গাজী বলে, 'সময় কোথায়। ভোলাখালি যেতি হবে না।'

মাহাতো বউ শরীরে একটু মোচড় দেয়, হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙে। বলে, 'একটু বসে যেতে হবে। ভরা পেটে হাঁটতে পারব না।'

বলে একবার চোখের কোণে তাকায় কর্তার দিকে। কর্তা তখন দাওয়ায় পা দিয়েছে। সেখানে আঁচাবার ব্যবস্থা রয়েছে। গিন্নীও সেদিকে যায়।

গাজী আর একবার ডাক দেয়, 'ঠাকুর-মশায়, একটু দই দেন গো।'

ভিতর থেকে উচ্চ রবে রুষ্ট স্বর আসে, 'দই টই নাই, এখন ওঠ দিকিনি।'

'আচ্ছা গো মশায়, আচ্ছা আচ্ছা।'

বলে গাজী একবার আমার দিকে চেয়ে হাসে। পাতাখানি গুটিয়ে তুলে কোথায় যেন চলে যায়। বোধ হয় তার এঁটো পাতা যাতে ছোঁয়াছুয়ির এলাকা বাঁচিয়ে ফেলা হয়, সেইরকম দূরেই চলে গেল।

কিন্তু তার হাসি মুখখানি হঠাৎ কেমন করুণ মনে হয়। মহামায়া হিন্দু হোটেলের দই কিছু অমৃত নয়, আমি সবটুকু মুখে দিতেও পারিনি। আর গাজী একটু চেয়েও পায় না। এ যে শুধু পয়সার জন্যে তা নয়। এর মধ্যে আছে অন্য প্লানি, অসহায় অপমান। ওর আরশি চোখে হাসির ঝলকই কেবল দেখি, তার তলায় কি অন্য কোন স্রোত নেই। নারাণ-ঠাকুরের ওপর মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে।

কিন্তু তাই বা কেন ওঠে। তার চেয়ে গাজীর হাসন হাসি। তোমার বিরূপ হওয়ার কুরূপ অনেক পথ জুড়ে। তাকে দেখতে গেলে ঠেক খেতে। মানতে গেলে মুখ কালো। হেসে চলে যাও।

সাবধানে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। একে খাওয়া পর্বের শেষ বলব না। বরং কবীর পর্ব বলা ভাল। অবেলার শরীরে বেশ ভার লাগে। বাইরে বেলার পায়েও ভার পড়েছে বেশ। রোদের রঙ গিয়েছে ঝিমিয়ে, দিনের শেষের নিরুত্তাপে রক্তিম আর শান্ত।

(ক্রমশ)

ত্রিলোচন কলমচি

কোল-ইয়ারী কথা

ফ্রি কোয়ার্টার, ফ্রি-ওয়াটার এবং কোল-কারেণ্ট ফ্রি এ রকম ফ্রি-ল্যান্ড কলকাতায় বসে কল্পনা করা কঠিন হলেও ইত্যাকার সব পেয়েছির দেশ সত্যিই আছে

অলিম্পিক টর্চের মত টোয়েণ্টিফোর আওয়ার্স অনির্বাণ

এবং এই বাংলা দেশেই আছে। যেখানে মা-লক্ষ্মীদের চুলো অলিম্পিক টর্চের মত টোয়েন্ট-ফোর আওয়ার্স অনির্বাণ, দিনেরাতে ভুলেও কখনো সীজ ফায়ার হয় না সেখানে। বারোয়ারী পুজো প্যান্ডেলের মত গোটা বাড়ির আনাচে-কানাচে পর্যন্ত হাই পাওয়ারের বাল্ব জ্বলে, কোনো কোনো সদ্য আলোকপ্রাপ্ত গৃহস্থালিতে দিনের বেলায়ও সেগুলি জাজ্বল্যমান থাকে। উত্তাপে আলোয় এবং মৌতাতে ইস্তিরী লোকেরা সেখানে ভালোই আছেন দেখলাম। ধোলাই কর্মে পটিয়সী একজন মেমসাহেবার হদিস পেলাম যিনি মাঝরাত্তিরে হলেও খনি থেকে কার্বন কপি হয়ে ফিরে আসা স্বামীকে আবার ধোলাই নিজে হাতেই করে থাকেন। ভদ্রলোকের অরিজিন্যাল কালার নিয়েও টানাটানি পড়ে যায়, ঝামার ঘষা মুখ ঝামটা এবং ঠাণ্ডা জলের ফিনিশিং টাচ থেকে কর্তাটির্ শোনা যায় : অত রগড়ানি দিও না গিন্নী, তাহলে আরো কালো হয়ে যাবো। শোনা যায় ভদ্রলোকের পেটেন্ট লেদার নাকি কয়লার থেকেও কালো।

ওসমান সাহেবের বাংলোয় বসে কথা হচ্ছিল। অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজারের গোপনীয় ডাকনাম নাকি অ্যাস ম্যান (Ass Man), আর তা থেকেই মজদুরী অপভ্রংশ দাঁড়িয়েছে ওসমান সাহেব। আমাকে আনকোরা শ্রোতা পেয়ে প্রথমটায় তিনি কোল্ লিটারেচার ঝাড়তে শুরু করেছিলেন। আদিম অরণ্য একদিন যে প্রচণ্ড সূর্যতাপ হজম করেছিল, কুড়ি থেকে তিরিশ কোটি বছর পরে সেই তাপ ঋণই নাকি এখন সে ফিরিয়ে দিচ্ছে। কয়লার নিজের বুকের মধ্যেই যে উত্তাপ সঞ্চিত রয়েছে এ কথা লে-ম্যান আমরা (সবিনয়ে বললেন) হয়ত খেয়ালই রাখি না। মাটির তলায় দুনিয়ার মোট কয়লার পরিমাণ নাকি ৭,০০০,০০০,০০০,০০০ টন। অর্থাৎ এখনো পাঁচ হাজার বছর নাকি নিশ্চিন্দি মনে কয়লা তোলা চলবে একটানা।

এক চোখের রোমাঞ্চকর ইঙ্গিতে তাঁকে থামিয়ে আমি বললাম, 'জান্ কয়লা হয়ে গিয়েছে, আর না। এবার কিছু মানুষের কথা ছাড়ুন।'

মানুষ? তিনি অবাক হলেন। যেন ছেলেমানুষ আর মেয়ে মানুষ ছাড়া তৃতীয় কোনো মানুষের কথা তিনি শোনেন নি।

আমি হেসে প্রশ্ন করলাম, 'এখানকার প্রধান খাদ্য নাকি ঘুষ, কথাটা কি সত্যি?'

সাহেব এইবার কবুল করলেন। তাঁর কল্পনারা নিজের ভাষায় অপলাপের কর্ণ-জ্যাচের করি এবার। ঘুষে অভিযারিতে সবাই খায়। চতুর্দিকে এমন অপর্যাপ্ত ঘুষ থাকতে কে আর ঘাসে মুখ দিয়ে চলে বলুন। কোলে ঝোলটানতে সবাই চায়। দু জাতের মানুষ আছে এখানে, খানদানী আর খুনদানী। ঘুষ একা খাওয়া যায় না, খাওয়াতেও হয়। তবে ঘুষের চেহারা সর্বত্র এক নয়। কোথাও তা বহু-Rupee, কোথায় কোথাও বউরূপী, কোথাও অন্য চেহারা। মদ মুরগা থেকে শুরু করে মোটর গাড়ি-ইস্তক, হ্যাণ্ড ওভার হচ্ছে। যেমন কুকুর তেমন মুগুর, যেমন দেবতা তেমনি নৈবিদ্য।

ম্যানেজার থেকে মুনশী সবাই এই একসূত্রে বাঁধা। এই সেকেণ্ডহ্যান্ড বিজনেসে সবাই বণিক। হতদরিদ্র কাটারি কুলির কাছ থেকেও পয়সা সাঁটাবার মুনশীয়ানা এই মুনশীবাবুর আছে। তাঁরই ইচ্ছের কেউ কোল্‌ফেসে গিয়ে পাথরে মাথা খোঁড়ে,

ব্ল্যাকপ্রিন্স

বেলচা গাঁইতি ভেঙেও একগাড়ি কয়লা কাটতে পারে না, কেউ সময়মত গাড়ি না পেয়ে বেকার বসে থাকে, আবার কেউ নরম কয়লায় মজা লোটে। হাজিরা গোলমাল হয় কারো, আধগাড়ি কারো এক গাড়ি হয়ে যায় খাতায়-কলমে। সুতরাং ধাঁধা গতের মত ধাঁধা বটে, গরীব মানুষ কাড়ফেলেই তেল মাখে।

ল্যাবকেসে একজন লেফ্‌টহ্যান্ড ড্রাইভারকে

দেখে এলাম, মনে থাকবে চিরদিন। তিনি ওখানকার একটি কোলিয়ারির 'লোডিনবাবু', মানে লোডিং ক্লার্ক। কেউ কেউ অড়ালে ব্ল্যাকপ্রিন্স বলে ডাকেন। লম্বা টিকটিকে চেহারা, মাথায় শোলার হ্যাট, খাকি ফুল-প্যাণ্ট আর হাফ্‌সার্ট, পায়ে বুট। রোল্ডগোল্ড ফ্রেমের চশমা, কিন্তু চোখ নয় যেন ম্যাজিক 'আই'। কলিয়ারী হিরোইন, পঞ্চাশ বছর বয়সের ব্ল্যাকপ্রিন্সের অকথ্য ভাষায় Come in, আই মীন কামিন, নিয়েই তাঁর প্রধান কারবার। লোডিনবাবু গাড়ি দিলেই তবে তাদের কাজ, তাঁর পেয়ারের হলেই তবে তাদের ফিউচার। তাই মাইনে (হপ্তা) পেলে মাথাপিছু চার আনা এবং কোয়াটারলি বোনাসের দরুন এক টাকা এবং দরখাস্ত লেখালে আট আনা তাঁর বাঁধা রেট। এর গড়বড় নেই, দরদস্তুর নেই, এটি এখন প্রথা হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়াও এখন তখন তাঁর হুমকি আছে চাঁদা দিলিনে বিটিয়া? এই বছর দুই আগে লোডিনবাবু দ্বিতীয় দফা বউ আনতে গিয়েছিলেন, তখনও ওরা সরল মনে চাঁদা যুগিয়েছিল। ঘুষের এইখানেই হয়ত শেষ নয়, বাইরের পার্টির দৌলতে আরও কিছু কিঞ্চিৎ পকেটে আসে।

ভালো কয়লা সবাই পেতে চায়, তাই কলকারখানায় রিপ্রেজেনটেটিভরা দক্ষিণা দিয়ে যান। আবার বি-গ্রেড কয়লাকে এ-গ্রেড বলে চালানোর জন্যেও দস্তুরি আছে। ওপরে পাগড়ির মত এ-গ্রেড চাপিয়ে তলায় শেলট-স্টোন বা রিজেক্ট কোল পর্যন্ত ওয়াগন বোঝাই হয়ে চলে যাচ্ছে, কে তার হদিস রাখে।

ব্ল্যাক প্রিন্স মশাই অফ্ টাইমে সন্দরের আরাধনা করেন। বাড়ির সামনের চাতালে বসে সামনের কলতলারূপী বিউটিস্পটে সাইট সীয়িং চলে। জেনানা জনতার ফিজিক্যাল আপস্ অ্যান্ড ডাউনস্ লক্ষ করে সলিলাকি এবং সিগরেটের ছাই ঝাড়েন। এ দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

ঘুষের প্রসংগে কাকে ছেড়ে কাকে রাখি? বড়বাবু আর ক্যাশিয়ারবাবুরও প্রণামী বাঁধা। ঠিকেদারের বিল পেমেন্ট হলেই শতকরা দু' টাকা থেকে পাঁচ টাকা। মানতের টাকায় গোলমাল হলেই বিল ঈদের চাঁদের মত কোথায় লুকোবে তার ঠিক নেই, তখন 'গ্রেস' দিয়েও তাকে পাশ করানো শক্ত হবে। তবে ঘুষের প্রাচুর্য স্টোরবাবুদের কপালে। ভাঁড়ারের চাবি তাঁদের হাতে, আর চাবি মানেই তো চাবিকাঠি। রেট সাপ্লায়ারদের সংগে বখরা করাই থাকে।

কোলিয়ারীর ঘরজামাই হচ্ছেন লীডাররা। কোম্পানী এ'দের চাকুরি দিয়ে পুষেছেন। দু'হাতে এ'দের পয়সা। শ্রমিক মালিক, গাছের এবং তলার কুড়িয়ে তল্পি বাঁধছেন। এ'দের কাজ হচ্ছে দালালী। এই ছদ্মবেশী ঘুঘু কোলফিল্ডের ভিটের চরে বেড়াচ্ছেন তোফা আরামে।

বাস্তিবাবুর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, আসল রোশনাই দেখতে সুরক্ষা সপ্তাহের All India Colliery Safety Week বড'ার ক্রস করে লাভবানই হয়েছে। রংগমঞ্চ প্রত্যক্ষ করে আসার সুযোগ পেলাম। সেফ্টি উইকে ম্যানেজার থেকে জমাদার পর্যন্ত বুকে সেফ্টি উইকের প্রতীক ব্যাজ গে'থে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সেফটি উইকে সেফ্টিপিন নেই, আলপিনে চলেছে। এরকম আনসেফ্টি ব্যাপার কেন? জনৈক ওয়েলফেয়ার অফিসারকে মওকায় পেয়ে পিনপয়েন্ট করলাম। তিনি তখন কোনো পীনোন্নত বুকের দিকে তাকিয়ে মুখোরোচক হাসি হাসলেন, 'কি করবো ভাই, খরচ কমাতে হবে তো?'

এক মিনিটও যায়নি, এই শুভ প্রচেষ্টার আর একটি নমুনা দেখে আমার চক্ষু ট্যারা। গুটি তিরিশ মুরগী, নানারকম তরিতরকারি, মিষ্টি এবং কয়েক বোতল মদ প্রকাশ্যেই চলে গেল ম্যানেজারের বাংলোতে। সেখানে নাকি আজ বিরাট পিকনিক, কোম্পানীর খরচে। গেস্টদের নাম করে

সাইকেল সহ গাছের সংগে বিজয়ার কোলাকুলি...

অফিসারদের সস্ত্রীক নেমন্তন্ন সেখানে। শ্রমিকদের এদিকে বলা হয় দারু খাবে না, ওতে শরীর আর পয়সা দুই-ই নষ্ট হয়। কিন্তু অফিসাররা যখন বিনিপয়সার ভোজে প্রচুর মদ গিলে রীতিমত বেলেল্লাপনা শুরু করেন, শূন্যে হাত-পা ছোড়েন, তখন চক্ষু-লজ্জারও বাধে না সেকি দেবদারু (বিলিতি অর্থে) বলে? প্রতি বছরই এই চলেছে। সেফ্টি উইকের সংগে মদের কি সম্পর্ক ঠিক বোঝা গেল না। গত বছরের আগের বছর একজন ওসমান সাহেব তো ফিরতি পথে সাইকেলসহ গাছের সংগে বিজয়ার কোলাকুলি সেরে সোজা হাসপাতালে গিয়ে উঠেছিলেন।

এই আহার বিহারের যথেচ্ছাচার দেখে আপনাদের মনেও ভাববার কারণ নেই। যাদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমে সেফ্টি উইকের এত জলুস তারা এক কাপ চা-ও পায়।

কোনো এক বিখ্যাত শিল্প প্রতিষ্ঠানের কয়লাখনিসমূহের একজন জাঁদরেল অফিসার আবার পরস্ত্রীকাতর। সেই রমণীমোহন অফিসার যখনই খনি অঞ্চলে আসেন তখনই অফিসারদের পার্টি দেন। তবে সেই পার্টিতে সস্ত্রীক আসা কম্পালসারী। সেখানে ভাগ্যের প্রায় লটারি খেলা। মেমসাহেবের প্রতি কৃপাদৃষ্টি পড়লে সাহেব প্রমোশনের তুংগে উঠতে থাকেন। একজন ম্যানেজার স্ত্রীকে হাতে পায়ে ধরে রাজী করাতে না পেরে, সকন্যা গিয়েছিলেন। রমনীমোহন সমঝদার মানুষ, পার্টি থেকেই মেয়েটিকে নিয়ে সটান কলকাতায়। পনের দিন পরে পিত্রালয়ে ফিরে ধুমধাম সহকারে তার বিয়ে হয়ে গেল। ম্যানেজারবাবুও বিরাট লিফ্ট পেয়ে কলকাতায় চলে গেলেন। সেই এলেডিং বেলেডিং সইলো, ছড়া মনে পড়ে গেল আমার।

কোলিয়ারীর মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টে গিয়ে দেখি মজার মজার সব নিয়মকানুন সেখানে চালু। স্বামী কাজ করলে স্ত্রী বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবে কিন্তু সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য হবে না। লেবার এবং অরডিনারী স্টাফ্দের স্ত্রীরা অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেও ডিসপেনসারীতে এসে তাদের ইনজেকশন নিতে হয়, কিন্তু গরবিনী অফিসার ঘরনীর বেলায় A.P.C. বা অ্যাসপিরিন পৌঁছাতেও কম্পাউন্ডারকে ছুটতে হয়।

কোলিয়ারীর অফিসাররা অবশ্য অনেক সুবিধেই পেয়ে থাকেন। মাসে একটিন করে কেরোসিন তেল পান শুধু ঘরের মেজে পরিষ্কার করার জন্যে। ফলে সেই তেলই দোকানে দোকানে বিক্রি হয়ে যায়। সারভেন্ট অ্যালাউন্স পান, কিন্তু খুব কম লোকই চাকর রাখেন। খনি থেকেই সব চলে যাচ্ছে যখন! কোলিয়ারীর একজন ডাক্তারের কাহিনী শুনলাম। রুগীদের কাছ থেকে পাওয়া সিগারেটের প্যাকেট জমিয়ে জমিয়ে তিনি একটি নির্দিষ্ট দোকানে মাসান্তে বিক্রি করতেন। কারণ ত'ার নাকি বিবিয়ানি ছাড়া কিছু মুখে রুচতো না।

কোলিয়ারীর ডাক্তারদের অনেকেই আলকালি আর কার্মিনেটিভ মিক্সচার পর্যন্ত দৌড় (নিন্দুকে অবশ্য বলে), নড়টেপা ডাক্তার আর কি, মাসে ছ' সাতশ কামাচ্ছেন। হাসপাতালের সবচেয়ে বেশী খরচ তুলো, (প্রথম ভেবেছিলাম কানে গোঁজার জন্যে বুঝি) প্যাকেট প্যাকেট আসে আর উড়ে যায়। লোকশ্রুতি, ওগুলো নাকি মেমসাহেবীআনার জন্য মাসিক কিস্তিতে বাঁধা।

ক্রেশ্-ইন-চার্জ ভদ্রমহিলার সংগে আলাপ হল। আইবুড়ো পিসিমার মত পরের ছেলে মানুষ করে চলেছেন। কিন্তু সমস্যা ছেলে আসে কোত্থেকে। কামিনরা নারাজ, কালি কয়লার মধ্যে গড়িয়ে বেড়াবে তবু তাদের ছেলেমেয়েকে দুধঘরে (creche-এর আঞ্চলিক নাম) পাঠাবে না। ওখানে নাকি কুকুর আর শুয়োরের দুধ

খাওয়ানো হয়। এক সময় অবশ্য আমেরিকান গংড়ো দংধ দেওয়া হত, কিন্তু এখন তো খাঁটি বেহারী ভ'ইস নির্জলা চলানো হচ্ছে।

নানারকম খাবার এবং জামাকাপড়ের লোভে দংু-চার ঘর থেকে ছেলেমেয়ে আসে। তবং অনেক বেডই খালি পড়ে থাকে. ঘংম-পাড়ানী মা সিপিসির কোল ভরতে চায় না। এদিকে পরিবার পরিকল্পনার গংঁতো আসছে! ভদ্রমহিলা ম্লান হেসে বললেন, ও'রা চাইছেন ঘরে ঘরে গিয়ে আমরা ছেলে-পংলেদের কনট্রোল করি, মা জননীদের বোঝাই। এতে যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ংল মারা হবে। ক্রেশ উঠে যাবে। ছ' বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ধরে রাখতে পারি আমরা। কিন্তু ছেলে হওয়া বন্ধ হলে ছ' বছর পরে কি হবে?

অভয় দিয়ে বললাম, কোনো চিন্তা নেই! সরকার ভালোভাবেই জানেন, আজ-কালকার ছেলেমেয়েরা কনট্রোল মানে না। তাই কানাঘংষো শংনেছি রাইটার্স বিল্ডিং-এও নাকি creche খোলা হবে। কারণ সেখানেও জননীদের সংখ্যা নাকি কয়েকশ-এর ওপর উঠে গেছে!!

চিত্রপ্রদর্শনী

হেমন্ত মিশ্র-র চিত্র প্রদর্শনী ঃ আর্টইস্যাট্রি হাউস।

হেমন্ত মিশ্রর এইটি কলকাতায় তৃতীয় প্রদর্শনী। বাঙলার নব্য শিল্প-ধারা অনুশীলনে যে গোষ্ঠী প্রথম সৃষ্ট হয়, ইনি সেই ক্যালকাটা গ্রুপের সদস্য। এইখানে তাঁর ২৪টি ছবি ছিল। ভাল কাজ দেখতে পাওয়া যখন সাধারণ দর্শকদের প্রায় ভাগ্যের কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক এমন সময় তাঁর প্রদর্শনীর আয়োজন হল। প্রত্যেকটি ফ্রেমের ভাবুকতা, অ্যাটমসফিয়ার এবং মুনশীয়ানা (ক্রাফটম্যানশিপ), অর্থাৎ খেলিয়ে তোলার কৌশল আমাদের খুবই ভাল লাগে। তাঁর প্রায়-ছবিই সুররিয়ালিসম-আত্মক, এবং আমরা জানি এই সুররিয়ালিসম অনুপ্রাণিত ছবির উদ্দেশ্য সোজা মানুষের মনবুদ্ধিচিত্তে একটা ক্রিয়া করা; সেটা কখনই অপ্রাকৃতিক নয়, বিবিধরূপ নিয়ে, তার প্রাকৃতিক সম্বন্ধ ছেড়ে, এক অনৈসর্গিক সম্বন্ধ সৃজন করা—এবং এরূপ ঘটিয়ে তোলায় সুররিয়ালিস্ট কখন ডেকরেটিভ হবে না। তাঁর কবিত্বই এখানে কাজ করবে। হেমন্ত মিশ্র একজন কবি, তাঁর ছবির রঙ বিবেচনা এবং গঠন ক্ষমতা থেকে তা সাধারণেও বুঝতে পারবে যথাঃ ফ্লোটিং স্টুডিও ও অনেকগুলিতেই তার প্রমাণ আছে। এখানে ঐ আঙ্গিক ছাড়াও অন্য আধুনিক, অর্থাৎ অবয়ব আরোপে, পদ্ধতির কাজ ছিল। যথা 'টু ফর্মস'—এটি একটি চমৎকার কাজ, এখানে ঘটিয়ে তোলা ডৌলত্ব ক্রমশ ওকারবাদী রঙে আমাদের আনন্দ দিয়েছে।

বীরেন চৌধুরী-র চিত্র প্রদর্শনী ঃ আর্টইস্যাট্রি হাউস

বীরেন চৌধুরীর সম্ভবত এইটি দ্বিতীয় প্রদর্শনী। ইতিপূর্বে তিনি ল্যান্ডস্কেপ চিত্রকর ছিলেন, এবার প্রায় কাজই অবয়ব ধর্মী। এখানে তাঁর ১৪টি ছবি ছিল। প্রায় ছবিতে তিনি ছন্দকে বেশী স্থান দিয়েছেন, বহুভাবে রেখা ফ্রেমের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, আর তার মধ্যে অবয়ব। এই অবয়ব খুবই ভাঙাচোরা করে গড়া, অবশ্য যার কোন সঠিক যুক্তি নেই, অর্থাৎ সামঞ্জস্যর দিক থেকে। তবু ২নং-এর কমলা টেকস্‌চার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

অরুণ মৈত্র-র চিত্র প্রদর্শনী ঃ ফাইন আর্টস ভবন

অরুণ মৈত্র একজন পরিচিত শিল্পী। তাঁর পাকা হাত এবং দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় প্রত্যেক দর্শককেই আনন্দ দিয়েছে। তাঁর কাজের মধ্যে আমাদের জানা জগত বিস্তৃত, কোথাও তিনি অহেতুক কিছু নূতনত্ব করে তাঁর ছবিকে বিকৃত করেননি। উজ্জ্বল রঙের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা এবং সে রঙ আরোপ কৌশলে আলোকেই গঠন করেছেন। যথা নং ২০, ২২, ২৪। তাঁর কালার স্কেচও এখানে অনেক ছিল। তার মধ্যে নং ৩, ১৪, ১৬ এবং বিশেষ করে নং ৭—এটি ঠাকুর রামকৃষ্ণের শয়নকক্ষ—চমৎকার হয়েছে। কয়েকটি রেখায় কিছু রঙের ছোঁয়ায় অদ্ভুত পবিত্রভাব অর্থাৎ যথার্থ মন্দির বলেই মনে হয়।

অচিন্ত্যদেব মিত্র-র চিত্র প্রদর্শনী ঃ ফাইন আর্টস ভবন

অচিন্ত্যদেব মিত্র একজন তরুণ শিল্পী। তাঁর এখানে ২২টি ছবি ছিল। এখন মনে হয় তিনি দুয়েকটি রঙকে বোঝবার সাধনা করছেন, ফলে বিভিন্ন রঙের অপব্যবহার তিনি কোথাও করেননি। যে রঙ তিনি বেছে নিয়েছেন তার একদিকে পীত অন্য দিকে নীল ও উভয়ের সংমিশ্রণ, কোথাও আমবার জাতীয় কালচে। আপাতদৃষ্টিতে রঙের ফের নেই বলে মনে হলেও, যদি আমরা ছবিগুলি বিচার করি তাহলে দেখব তিনি চতুরভাবে ঐ রঙ দিয়ে বাস্তবতাকে বিভিন্ন কায়দায় গঠন করেছেন। যথা ৯, ১, ইত্যাদি। একমাত্র নং ২-তে অন্য রঙ ব্যবহার করেছেন—মোভ জাতীয় গোলাপীতে

টু ফরমস্‌ শিল্পী ঃ হেমন্ত মিশ্র

আলো ন্যায়সঙ্গতভাবে দেখা দিয়েছে।

মেডিক্যাল কলেজ রি ইউনিয়নের চিত্র প্রদর্শনী : মেডিক্যাল কলেজ

মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকরা কি করে যে শিল্পচর্চার জন্যে সময় করে ওঠেন তা ভেবে পাওয়া কঠিন। আরও একটি মনোজ্ঞ চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছিল। নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হবে যে, ডাঃ অরুণ চ্যাটার্জি একজন পাকা শিল্পী। সেই সঙ্গে ডাঃ শৈলেন মুখার্জির নামও করতে হয়। ঠিক এইভাবে প্রদর্শনীতে যোগ না দিয়ে তাঁরা যদি আলাদা প্রদর্শনী করেন তাহলে আমাদের পক্ষে খুবই ভাল হয়। ডাঃ চ্যাটার্জির রঙ বিচার এবং ডিজাইন করার ক্ষমতা দারুণ, যথা তাঁর পোস্ট কার্ডগুলি। আর ডাঃ মুখার্জির দৃশ্যাবলীর মেজাজ আমাদের আনন্দ দিয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে দেবাশীষ ভট্টাচার্যর কাজ, নীনার অয়েলে ল্যাণ্ডস্কেপ ও ফুল, অলফুজউদ্দিন আমেদের স্কেচ এবং কেতকীর ডেকরেটিভ কাজ আমাদের খুব ভাল লেগেছে। এখানে অনেক চমৎকার আলোকচিত্রও ছিল।

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে আরো

সামাজিক পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি দেশের আর্থিক উন্নয়নের বেগ ও উৎকর্ষের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। পুরানো শহর ও শিল্প কেন্দ্র থেকে দূরে নতুন বড়ো বহরের প্রকল্পগুলি নির্মিত হয়েছে বলে চার পাশের গ্রাম অংশের বেশ কিছু অপটু কর্মীরা কাজের সুযোগ পেয়েছে এবং ফলে দূরে অঞ্চলের অল্পপটু ও দক্ষ শ্রমিকরা নতুন প্রকল্পের এলাকা বা উপশহরগুলিতে এসে গেছে। এই অর্থে গত পনেরো-কুড়ি বছরে খানিকটা বৃত্তিমূলক ও ভৌগোলিক চলিষ্ণুতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, উপযুক্ত পরিকল্পনা অনুসারে এগোলে কমবেশি সঞ্চরনশীলতা আনা যায়। সেই রকম, দ্রব্যমূল্য-স্ফীতি থেকে আয় সম্প্রসারণ তথা ক্রয় ক্ষমতার বৃদ্ধি (সরকারী কাজ ছাড়াও) আভ্যন্তরিক বাণিজ্য ও বৃত্তিমূলক কর্মে কিছু লোককে নিযুক্ত রাখতে পেরেছে।

আগেকার জমিদারি এলাকাগুলিতে পুরানো ব্যবস্থা এবং তার দুঃখকষ্ট নিরুপায়ভাবে মেনে নেওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়—জীবন ও কাজকর্মের প্রতি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠতে সেখানে সময় লাগছে। এইসব অঞ্চলে স্ত্রী শিক্ষার প্রসার হয়েছে মন্দগতিতে।

গ্রামগুলির আপেক্ষিক অনগ্রসরতা

নতুন ধারনা বা চিন্তাভাবনা অথবা জীবনযাত্রার পদ্ধতি প্রচারিত বা গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা আবার গ্রাম সমাজের আকারের উপর বেশ খানিকটা নির্ভর করে। পূর্ব ও মধ্য ভারতের পল্লীবাসীদের একের তিন ভাগের বেশি যেখানে পাঁচশোর কম লোকের এক-একটা ছোট গ্রামে বাস করে, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে সেখানে দু হাজারের বেশি লোকের গণ্ডগ্রামে বসবাস করে পল্লীবাসীদের যথাক্রমে শতকরা প্রায় ৩৭ এবং ৫২ ভাগ। বিদ্যালয় স্থাপন, চিকিৎসা ব্যবস্থা, রাস্তা তৈরি প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়নকর্ম কত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হবে তা পল্লী সম্প্রদায়ের আয়তন দ্বারা নির্ধারিত হয়। স্পষ্ট কথায়, গ্রামগুলি আকারে ছোট হওয়ায়, কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র থেকে তাদের দূরত্ব এবং আঞ্চলিক শাসনে অক্ষমতা বা বিচ্যুতির জন্য পশ্চাদপদ রয়ে গেছে।

দু একটি বিশেষ সমস্যা

আক্ষেপের বিষয়, শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায় নি। মোট ৭৫ লক্ষ কারখানা শ্রমিকদের ভেতর মাত্র ১৭ লক্ষ লোকের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার কিছু বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কৃষি ও শিল্পে নিযুক্ত কয়েক শ্রেণীর কর্মীদের ন্যূন মজুরী দেবার জন্য আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ঐ আইন বলবৎ করা হয়নি।

শহরের জমি বা ভূসম্পত্তির দাম (অনিয়ন্ত্রিতভাবে) ক্রমাগত বেড়ে গেছে বলে নতুন একটি সুবিধাভোগী ভূস্বামী শ্রেণী দেখা দিয়েছে। এর জন্য অবশ্য দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি ও কর ফাঁকি দেওয়ার সমস্যাও কম দায়ী নয়। যৌথ পরিবারের প্রাধান্য হ্রাস এবং সম্পত্তির আগের চাইতে অবাধ বিস্তারণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের যে সংশোধন সম্প্রতি করা হয়েছে, সমাজের উপর তার ফল সম্বন্ধে এখনো কিছু বলা যাচ্ছে না।

সেই রকম, পূর্ণ অথবা আংশিক মদ্য পান নিরোধের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা সম্পর্কে কোনো ঐকমতে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ঐ নীতি বলবৎ হলে রাজ্য সরকারগুলির অর্থাগম কমে যাবে, সন্দেহ নেই; কিন্তু সেই ক্ষতির অনেকখানি পূরণ করবে প্রমোদকর, আবগারি ও বিক্রয়কর থেকে সংগৃহীত রাজস্ব। অন্য দিকে, যে বহরে এখন মদ্য-পান নিরোধ আইন ফাঁকি দেওয়া হয় সেটা বন্ধ করা হবে একটা কঠিন সমস্যা।

বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার গুরুত্ব

আসল সমস্যা হচ্ছে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা সংক্রান্ত বিপ্লবের জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত করা এবং উপযুক্ত সামাজিক সংস্থাগুলি গড়ে তোলা। শেষ পর্যন্ত, যন্ত্র নয়, মানুষ বৈষয়িক অগ্রগতির সীমা নির্ধারণ করে।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে যা সম্ভব হয়েছিল, ভারতে সেই রকম সামাজিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার তাগিদে নতুন উদ্ভাবন বা আবিষ্কার করা হয়নি। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার প্রভাব যেখানে বড়ো নগরে বেশি করে লক্ষ করা যায়, শহরে সেখানে তা দেখা যায় মাত্র, এবং গ্রামগুলিতে খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। তা সত্ত্বেও, গ্রামময় ভারতের উপর আধুনিকীকরণের প্রতিঘাত হিসাবে সংকীর্ণ উপজাতীয় মনোভাব আস্তে আস্তে বদলে যাচ্ছে। বলতে গেলে, নতুন আশা আকাঙ্ক্ষা, নতুন সম্ভাবনা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রভাবে ধীরে ধীরে লোকের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে।

চিন্তা ভাবনার দিক থেকে আমাদের ঝোঁকটা এখন সরে আসছে প্রয়োগ বিদ্যার উপর। ইংরেজী সাহিত্য, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বদলে অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও কারিগরী বা প্রযুক্তি বিদ্যার গুরুত্ব আজ উপলব্ধি করা হচ্ছে।

শহরের প্রসার ও আধুনিকীকরণের সঙ্গে একাধিক সমস্যা জেগে উঠেছে। যৌথ পরিবারের ভাঙনের ফলে নতুন সামাজিক চাপ ও টান, নাগরিক জীবনের দাবি মেটাতে গিয়ে স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, প্রমোদ, খাদ্য বেশভূষা, কর্মশৃংখলা এবং ন্যূনতম সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে ধারণাভাবনাগুলির ক্রমপরিবর্তন স্বাভাবিক।

আশংকার কথা, নগরগুলির বিস্ফোরণের আনুষঙ্গিকরূপে জনস্বাস্থ্যের অবনতি ও জীবনযাত্রার মানের উত্তরোত্তর অবক্ষয় ঘটছে। একদিকে গ্রামগুলির পত্তন শুরু হয়েছে, অপরদিকে বড়ো বড়ো নগর অধিকাংশ লোকের বাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে।

শান্তিকুমার ঘোষ

আমায় দোষী কর

অল ইণ্ডিয়া রেডিও কলকাতা কেন্দ্র থেকে যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত প্রচার করেন তাঁদের অধিকাংশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি "ওয়ারনিং" পেয়েছেন। অপপ্রচার যেখানে নিত্য নানাভাবেই হচ্ছে সেখানে একমাত্র রবীন্দ্রশিল্পীদের ওপরেই কেন যে কতকগুলি গুরুতর অপরাধ সাধারণভাবে আরোপ করা হল তার গূঢ় কারণ অনুধাবন করতে না পেরে অনেক শিল্পীই মর্মপীড়া অনুভব করেছেন এবং এ নিয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করবার জন্য আমাদের অনুরোধ করেছেন। ত্রুটি ঘটলে কোনো বিশেষ শিল্পীকে সাবধান করে দেবার অধিকার আকাশবাণীর অবশ্যই আছে কিন্তু ব্যাপারটা যেভাবে হাতে নেওয়া হয়েছে তাতে এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে আমরা একটা অশুভ প্রভাব লক্ষ্য করে শঙ্কিত হচ্ছি এবং মনে হচ্ছে কর্তৃপক্ষেরও নিজেদের হিতার্থে সাবধানতা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন। আকাশবাণীর যে পত্রের কপি আমরা পেয়েছি সেটি প্রকাশ করতে কোনও অসুবিধার কারণ দেখি না। অতএব সেটি নিম্নে মুদ্রিত হল—ঃ

We have been receiving recently criticisms from noted scholars of Rabindra Sangeet on the quality of our Rabindra Sangeet broadcasts. The main points of criticism appear to be as follows.

Firstly, it has been stated that artists distort the words of the original, substituting the correct word by one of their own choice. An error of this kind is of course a very serious matter and I trust that our artists will be extremely careful to ensure that nothing of this kind happens. It is possible, however, that in different editions of the Geeta Bitan and the Swara Bitan there may be slight variations in the words. We would request you to keep the latest authorised version of Geeta Bitan and Swara Bitan. However, should you prefer an earlier version you are requested to discuss the matter with our Music Producer in advance before recording.

Secondly, it is contended that the musical renderings of a song does not accord with the spirit and meaning of the words. It is needless to say that proper rendering of Rabindra Sangeet necessitates the complete harmonisation between the meaning of the words and the mood created by the tune. We would request you kindly to take special care to understand fully the meaning of the words and ensure that it is properly brought out in the manner and style of singing.

You are, no doubt, aware that there is a wide and critical audience for the Rabindra Sangeet broadcasts of this station. We trust, therefore, that you will spare no pains to see that your broadcasts attain the highest possible quality both in your own interest and in that of the station. Every effort is being made on our part to ensure the attendance of a qualified member of the staff at the time of your recording in order to assist you.

আকাশবাণীর প্রথম অভিযোগ এই যে শিল্পীরা ইচ্ছামত শব্দ সংযোগ করে মূলভাষাকে বিকৃত করছেন। এ সম্পর্কে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত গীতবিতান ও স্বরবিতান নিয়ে তাঁরা যা বলেছেন তা নিয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষেরও ভাববার আছে। বেতারশিল্পীদের প্রচারে এমন কোনও উদাহরণ বা ঔদ্ধত্যের প্রমাণ আমরা তো পাইনি। আমরা জানি বেতার শিল্পীরা সর্বদাই স্বরবিতান বা গীতবিতান সামনে রেখে হুবহু সেই মতই বেতার অনুষ্ঠানের সময় রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে থাকেন। তা সত্ত্বেও কিভাবে কথার পরিবর্তন হচ্ছে তা বেতার কর্তৃপক্ষ বা তদীয় পরামর্শদাতা নোটেড স্কলাররাই জানেন। কথার পরিবর্তন যদি ঘটে থাকে তবে তার কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে যার জন্য বেতারশিল্পীরা আদৌ দায়ী নন। আমরা যতদূর জানি বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ থেকে সম্প্রতি বেশ কয়েক বছর ধরে পুরোনো গানের কথার পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু, কি কারণে তা করা হল তার কোনও উল্লেখ স্বরবিতানে বা গীতবিতানে কোথাও দেওয়া হয়নি। এমনকি দেখা গেছে যে কোনও গানে যে পংক্তি ছিল না এমন পংক্তিও সুর দিয়ে স্বরবিতানে নতুন করে স্বরলিপি সহ প্রকাশ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত সুর বলে। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত গানের স্বরলিপিরও বহু পরিবর্তন করা হয়েছে বর্তমান সংস্করণে। কিন্তু, কেন তা করা হল তারও কোনও কারণ পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি। সুতরাং রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীদের মধ্যে যাঁদের কাছে পুরাতন সংস্করণের বইগুলি রয়েছে সেগুলি যখন অনুসরণ করে তাঁরা গান করেন তখন নতুন সংস্করণের সঙ্গে তার মাঝে মাঝে মিল থাকে না। এর জন্য বেতারশিল্পীরা কথা বদলের দোষে কি করে দোষী হতে পারেন তা বোঝা দুঃসাধ্য।

আকাশবাণী চিঠিতে বলেছেন গীতবিতান ও সুরবিতানের আধুনিকতম সংস্করণকেই প্রামাণিক বলে ধরতে হবে। এর দ্বারা তাঁরা পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছেন নাকি যে
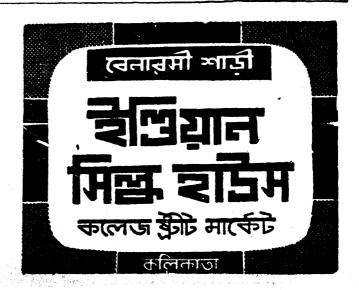
রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে যা প্রকাশিত **হয়েছে** তা প্রামাণিক নয়? এই ধরনের মত **ব্যক্ত করবার** অধিকার আকাশবাণী কোথা **থেকে অর্জন** করলেন? রবীন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্র-**নাথ,** ইন্দিরা দেবী বা রথীন্দ্রনাথ গীত-**বিতান** বা স্বরবিতান সম্পর্কে তাঁদের **কোনও** নির্দেশ দিয়েছিলেন কি? **এতদ্ব্যতীত** বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষও এই **ধরনের** অভিমত প্রদান করবার অধিকার **আকাশবাণীকে** দিয়েছেন বলে জানা **যায় না।**

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে উদিত **হচ্ছে।** রবীন্দ্রসাহিত্যে নাটকের অভাব না **থাকলেও** আকাশবাণী রবীন্দ্রনাথের বহু **ছোট গল্পের** নাট্যরূপ দিয়েছেন। এতে যে **সব সংলাপ** প্রক্ষিপ্ত হয়েছে তা বহুলাংশে **অযোগ্য।** কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর **মূল** বিন্যাসকেও পরিবর্তিত করা হয়েছে। **রবীন্দ্র** রচনার এত বড় বিকৃতি যখন ঘটে **তখন** তো কোনও নোটেড স্কলার মাথা **ঘামান** না? কেবলমাত্র ক্বচিৎ কদাচিৎ রবীন্দ্রসঙ্গীতে কোনও কথার সামান্য এদিক ওদিক হলেই তা অমার্জনীয় অপরাধ যদিচ তার জন্য শিল্পী যথার্থ দোষী কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান। রবীন্দ্রসঙ্গীতের যাঁরা অতি বড় হিতৈষী রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের এতটা ঔদাসীন্য সত্যই বিস্ময়কর। আকাশবাণীর যে বিভাগে রবীন্দ্রসাহিত্যের এই বিকৃতি ঘটছে তাদের এইরকম লিখিতভাবে শাসন করবার প্রয়োজনীয়তা বোধহয় স্টেশন ডাইরেকটর মশাই এখনও অনুভব করেননি।

বেতার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে শিল্পী-দের ভাব ও ভাষা ভাল করে অনুধাবন করে তবে গাইতে চেষ্টা করা উচিত। সাধারণত শিল্পীরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা সহকারেই রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে চেষ্টা করেন। তবে স্বরলিপি সম্বন্ধে অতিশয় সাবধানতার ফলেই অনেক সময় গান এতটা নীরস হয়ে পড়ে যে মনে হয় ভাব ও ভাষার সমন্বয় হচ্ছে না। এটাও কতিপয় শুচিবায়ুগ্রস্ত লোকের অনবরত তাগাদার ফলেই ঘটছে। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই এমন কঠিন ভাষা প্রয়োগ করেননি অথবা এমন দুর্বোধ্য করে গান রচনা করেননি যা শিল্পীদের বোঝা অসাধ্য। রবীন্দ্রনাথের বহু গান শিশুদের দিয়ে গাওয়ানো হয়, বিদেশীরা গেয়েছেন এবং এখনো গেয়ে থাকেন। গানের সাধারণ মর্মটুকু অনেক সময় ভাব ও ভাষা সমান না বুঝলেও গ্রহণ করা যায়। এটা নির্ভর করে শিক্ষার উপর। ছেলেবেলায় আমরা গাইতাম—"কেন পান্থ এ চঞ্চলতা।" শিক্ষক মশায়রা বুঝেছেন যে আমাদের সে বয়স হয়নি যখন এই গানটির সম্পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। অতএব তিনি সোজাসুজি সহজভাবে তাঁকে অনুসরণ করতে বলতেন। এতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হয়েছিল। প্রাপ্তবয়স্ক বেতারশিল্পীদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। কাব্যসঙ্গীতের কব্যাংশ সুনিশ্চিতভাবে উদ্ঘাটিত কিনা সে বিষয়ে সচেষ্টতা অবলম্বন করাটাই হচ্ছে আসল কথা। যাঁদের এই বোধ নেই বলে মনে হয় আকাশবাণী তাঁদের সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন কিন্তু সবাইকে দোষী করলে এইটাই মনে হয় যে আকাশবাণী সাধারণভাবেই শিল্পীদের মূর্খের পর্যায়ে ফেলেছেন। এইটাকি শিল্পীদের প্রতি সুবিচার?

আকশবাণী বলছেন এই কেন্দ্রেই বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে বিস্তৃত এবং সন্দিগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী বর্তমান। কিন্তু, অপরাপর সঙ্গীত সম্বন্ধে কি শ্রোতৃবর্গ উদাসীন? আমাদের কাছে প্রতিনিয়ত যেসব পত্র আসে তাতে আমরা রেডিও প্রচারিত বহুবিধ গানের বিকৃতি সম্বন্ধে সমালোচনা পেয়ে থাকি। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে যেসব তথাকথিত ত্রুটির কথা তাঁরা জানিয়েছেন অপরাপর সঙ্গীতে কি সেগুলি আরও অনেক গুরুতরভাবে ঘটছে না? ক্লাসিকাল বাংলা গান যা প্রচার করা হয় অনেক ক্ষেত্রেই তার ভাষা পরিবর্তিত করা হয়। রচয়িতাদের নাম যা ঘোষণা করা হয় তাও অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত। বহুকালের প্রচলিত সুপ্রতিষ্ঠিত সুর বা ধরণকে আজকাল অনেকে ইচ্ছামত রূপান্তরিত করছেন। প্রাচীন শাক্তপদ বা ভক্তিগীতিগুলি যথেচ্ছভাবে রূপায়িত হচ্ছে আধুনিক শিল্পীদের কণ্ঠে এবং আকাশ-বাণীর তাতে অবাধ প্রশ্রয় রয়েছে। প্রাচীন লোকসঙ্গীত নামে আধুনিক রচনা (যাকে লোকসঙ্গীত বলতে দ্বিধা হয়) প্রায় প্রতিদিনই চলে যাচ্ছে। লোকসঙ্গীতের ধরণধারণ নাগরিক চাহিদা অনুসারে পাল্টাচ্ছে। এমনকি পদাবলী কীর্তনও কখনো আধুনিক কখনো খেয়াল ঠুংরীর ধারায় ঢেলে সাজা হচ্ছে। এ সবই কি আকাশবাণীর প্রচ্ছন্ন অথবা প্রকট সমর্থন অনুসারে হচ্ছে না? অথচ এ সম্বন্ধে কলকাতার অল ইণ্ডিয়া রেডিও শিল্পীদের

কাছে সাধারণভাবে কোনও সাবধানবাণী পাঠাননি। তাঁদের মনোযোগ কেবলমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতেই কেন্দ্রীভূত যার মনে সচরাচর অপর সঙ্গীতের উপেক্ষা। এই কারণে আকাশবাণীকে সমদর্শিতার অভাবের জন্য যদি অভিযুক্ত করা হয় তাহলে আত্ম-সমর্থনে তাঁদের কি কিছু বলবার আছে?

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার কিভাবে আরও মনোরম হয় সেটি সহৃদয়তার সঙ্গে বিচার না করে তাঁরা রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে অযথা একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছেন। এ চিঠির প্রত্যক্ষ ফল হবে এই যে একজন পরীক্ষককে সামনে দেখে ভয়ের ফলে কতিপয় শিল্পী রেকর্ডিংয়ের সময় যথার্থ যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করতে অসমর্থ হবেন। তখন তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;—অথচ এই অঘটনের জন্য বেতার প্রতিষ্ঠানের কর্মধারাই দায়ী।

আন্তরিকভাবে রবীন্দ্রসংগীতের হিত-কামনায় যদি এটা করা হত তাহলে আমাদের বলবার কিছু থাকত না কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আকাশবাণী একটি কুচক্রে ধরা দিয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে পণ্য করে যাঁরা ব্যবসায়ে নেমেছেন তাঁদের কায়েমী-স্বার্থে আঘাত লাগার ফলেই এইসব অভিযোগের উৎপত্তি এবং আকাশবাণীর ওপর তাঁদের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখবারই এটি একটি চক্রের প্রচেষ্টা। নির্দলীয় উদীয়মান একটি শিল্পী অযোগ্যতার কলঙ্ক নিয়ে বিদায় নেবে আর সেই জায়গায় আসবে স্বরলিপি মুখস্থ করা বিশেষ গোষ্ঠীর ছাপমারা আর এক শিল্পী। একের পর এক এইভাবে আর্টিস্ট বদল হবে। আকাশবাণীর মাধ্যমে এই স্বার্থটি চমৎকারভাবে সিদ্ধ হবে—এই হচ্ছে সংগীত জগতের একটি সম্প্রদায়ের চমৎকার রাজনীতি।

সুরেশ সংগীত সংসদের উদ্বোধন

পরলোকগত সঙ্গীতশাস্ত্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর স্মরণে সুরেশ সংগীত সংসদ-এর উদ্বোধন হয়েছে। ২৯শে জানুয়ারী উত্তরা সিনেমাগৃহে এই সংসদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে শ্রীঅশোক-কুমার সরকার বলেন যে, গতানুগতিক পথ অনুসরণ না করে যদি সংগীতের প্রকৃত পরিবেশ রচনা করা যায় তাহলেই সংসদের আদর্শ রক্ষিত হবে। সঙ্গীত সম্মেলনের সংখ্যা এখন বহুল পরিমাণে বেড়েছে কিন্তু তার থেকে কি এমন সিদ্ধান্ত করা যায় যে সঙ্গীতের চর্চা আজকাল আগের তুলনায় বেশী হচ্ছে কিম্বা গানের মান এখন আগের চাইতে উঁচু? বলা বাহুল্য তেমন সিদ্ধান্ত আমরা করতে পারি না। গানের মান বাড়েনি। তবে কি শ্রোতার মান বেড়েছে? শ্রোতার মান যদি উন্নত হয় তাহলে গানের মানও উন্নত হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে গানের মান উন্নত হচ্ছে না। টাকাটাই যেন সবক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগেকার দিনে যাঁরা সঙ্গীত পরিবেষণার দায়িত্ব নিতেন এমনভাবে অর্থ উপার্জনের কথা তাঁরা ভাবতেও পারতেন না বরং অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের অর্থদণ্ড দিতে হত। শুধু তাই নয় শিল্পীদেরও আজকের মত এতটা অর্থাগম স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। অথচ অর্থাগমের পরিবর্তে সঙ্গীতের উন্নতি কতটা সাধিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকে যায়। শ্রীসরকার সঙ্গীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে রসের দিকে প্রাধান্য অর্পণ করতে উপদেশ দেন এবং বাহাদুরি দেখাবার উৎসাহে অপ্রচলিত উদ্ভট রাগের উদ্ভাবন বা গায়ক-তবলচির দৈত্যযুদ্ধের প্রাবল্য সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করেন। নবগঠিত সংগিতসংসদের উদ্যোগ এবং উদ্দেশ্যকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন যে, গতানুগতিক পথে পা না বাড়িয়ে তাঁরা যেন একটি সার্থক পরিবেশ রচনা করেন এবং সঙ্গীতের রসের তরণী আজ যে বিশুদ্ধ ব্যাকরণের চড়ায় ঠেকে গিয়েছে সেই বিপর্যয় থেকে তাকে উদ্ধার করতে সচেষ্ট হন।

উদ্বোধনে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় স্বর্গত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করে বলেন যে তিনি সঙ্গীতের উন্নয়নের জন্য সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ করেছিলেন এবং তাঁর বহু প্রবন্ধ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীপ্রীতিকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় সংসদের কর্ম প্রচেষ্টায় প্রশংসা করে—তাঁদের উদ্যোগ সম্বন্ধে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

সংসদের পক্ষ থেকে ১৯৬৭ সালের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্যকে "সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী স্বর্ণপদক" উপহার দেওয়া হয়। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে আটজন শিল্পীকেও উপহার দেওয়া হয়। সংসদের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীকানাইলাল বসু সংসদের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলেন এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন—শ্রীমতী কমলা অ্যাপারজন, শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী, বীণায় শ্রীসুধীর চ্যাটার্জি, সরোদে শ্রীতিমিরবরণ এবং তবলায় শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী।

রেকর্ড সমালোচনা:

গ্রামোফোন কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর চারটি 'বখ্যাত সঙ্গীত—"আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশি বাজায়", এবং "বোলোনো ভুলিতে বোলোনা," "মধুর মিনতি শুনে", এবং "যাহা কিছু মম" এক্সটেন্ডেড প্লে রেকর্ডে চমৎকার লাগল। গানগুলি আমাদের বিশিষ্ট সম্পদ। শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্তের গাওয়া চারটি রবীন্দ্রসঙ্গীত "আজ কি তাহার বারতা পেল রে," জীবনে যত পুজা হল না সারা", "ওগো শেফালী বনের মনের কামনা" এবং "অল্প লইয়া থাকি" এক্সটেন্ডেড প্লে রেকর্ডে খুবই সার্থক হয়েছে। এইভাবে জনপ্রিয় গান-গুলির সংরক্ষণ কার্যকে আমরা বিশেষ-ভাবে অভিনন্দিত করি। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের কয়েকটি বিখ্যাত গান—যথা "মন কুসুমের রং ভরা এই পিচকারিটি রাধে", "বঁধু চরণ ধরে বারণ করি" প্রভৃতি যদি এইভাবে পুনঃপ্রচার করা হয় তাহলে শ্রোতাগণ বোধ করি কৃতজ্ঞ থাকবেন। সাধারণ রেকর্ডে বিধৃত রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্যে "এলে যদি সময় নাই", "তুমি যেওনা এখনি", শ্রীধীরেন বসুর গাওয়া "আমার সকল কাঁটা ধন্য করে", "ভোরের বেলায় কখন এসে" শ্রীশৈলেন দাসের গাওয়া "একি আকুলতা ভুবনে", "বকুল গন্ধে বন্যা এলো" এবং শ্রীমতী খাতু গুহের গাওয়া "ভেঙে মোর ঘরের চাবি", "ওহে সুন্দর মরি মরি" রসোত্তীর্ণ হয়েছে এবং এই রেকর্ডগুলির বহুল প্রচার হবে আশা করা যায়।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত "বাঙালী" নামক যাত্রার পালাটি আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। বিশেষ করে এর উদ্দেশ্য সাধু এবং রচনাটি সময়োপযোগী। কলকাতার বিভিন্ন যাত্রাগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী সমন্বয়ে এই অভিনয়টি রেকর্ড করা হয়েছে। এর পরিচালনায় আছেন শ্রীপঙ্কু সেন, তদীয় সহকারী শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য এবং সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন শ্রীসবিতাব্রত দত্ত। হিন্দু মুসলমানের আত্মিক মিলনে বাংলার জাগরনের এক স্বপ্ন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই অভিনয়ে। নাটকটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শার্ঙ্গদেব

আমজাদ আলী খাঁ
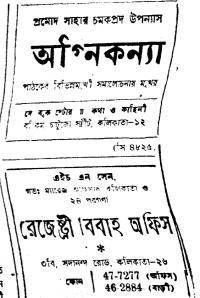
মরসুমী গানের শেষ আসর

(সংগীত সমালোচক)

কলকাতা শহরে এই মরসুমের মত গানের পালা চুকল। খতিয়ে দেখতে হলে কয়েকটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন মনে আসে। এইসব সম্মেলন থেকে সংগীতের কি কোন উন্নতি হচ্ছে? সংগীতের প্রচার ও প্রসার নিশ্চয়ই হচ্ছে। কিন্তু তা কি সঠিক পথে? অতীতের

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়

পূজারীরা যাই বলুন না কেন সাধারণ লোকেরা এখন উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্বন্ধে আগের চেয়ে অনেক বেশী উৎসুক। শিল্পীরাও অর্থের দিক থেকে অনেক স্বচ্ছল। সম্মানের দিক থেকেও। কিন্তু সত্যিই কি সংগীতের উন্নতি হচ্ছে? এ কথা সত্যি জনপ্রিয়তার সংগে সংগে লঘুতা আসবেই। তার ফলে শাস্ত্র নিশ্চয়ই লঙ্ঘিত হবে। কিন্তু তাহলে প্রচার হবে কি করে? সংগীতের উন্নতিই বা কোন পথে?

আনন্দ দানে সক্ষমতাই সংগীতের সাফল্যের মাপকাঠি। তবে নিরানন্দের সংগীত কি সার্থক শিল্প নয়? বেশী কচকচির মধ্যে না গিয়েও বলা চলে যে সদ্য অনুষ্ঠিত **পারক সারকাস সংগীত সম্মেলন** সার্থক। প্রায় সব শিল্পীরাই শ্রোতাদের আনন্দিত করেছেন। প্রথমেই মনে আসে আমীর খাঁর কথা। আমীর খাঁর সংগীত আপামর জনসাধারণের বোধগম্য নয়, খানিকটা নীরসও বটে। কিন্তু এই আসরে তাঁর হংসধ্বনি ও সাহানায় খেয়াল রসোত্তীর্ণ হয়েছে। খোলা গলায় তিনি যেসব কূট ও জটিল তানকর্তব্য করেছেন তা আজকাল শোনা যায় না। আনন্দী রাগের বিস্তারটি সমঝদারদের তৃপ্ত করেছে। ভীমসেন যোশী কিন্তু শ্রোতাদের নিরাশ করেন। তাঁর স্বভাবসুলভ মিষ্টি গলা কোন কারণ বশতঃ অত্যন্ত কর্কশ শোনায়। কখনো কখনো বেসুরোও।

যন্ত্রসংগীতের আসরে সর্বাগ্রে আমজাদ আলী খাঁর সরোদবাদন উল্লেখ্য। দরবারী কানাড়ার আলাপে রাগটির করুণ মধুর রস শ্রোতাদের মনে দোলা দিয়েছিল। সাড়ে বারো মাত্রার বেয়াড়া তালে গতটি কিন্তু আলাপের মত মনোজ্ঞ হয়নি। তবলাবাদক কানাই দত্তর সংগে বোঝাপড়ায়ও অভাব ছিল। কিন্তু তার পরের ঝিঁঝিট-কাফির আলাপে খানদানী ঘরের মিষ্টি হাতে যেন সুরের নির্ঝর বয়ে গেল। গভীর রাত্রিতে তাঁর বাজনার দ্যোতনা ও আবেদন ভোলবার নয়। তিনতালে বিলম্বিত গতে কানাই দত্তের সংগত খুব সুন্দর হয়েছে। শেষের খেয়ালাংগে সুহারাগে দ্রুত গতটি চমৎকার। সাপাট তানের বিজলীতে ও পরিচ্ছন্ন ঝালায় তিনি আসর জমিয়ে দিয়েছিলেন।

পণ্ডিত রবিশংকরের ললিতে লালিত্যের চেয়ে পাণ্ডিত্যই প্রাধান্য পেয়েছিল। আলাপ ও জোড়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। আড়াচৌতালের গতে কানাই দত্তের সংগত অসাধারণ। এ রকম সুন্দর সংগত সচরাচর শোনা যায় না। তরুণ সরোদী বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর ছায়াবেহাগে আলাপ বিশেষ ভাল হয়নি। কিন্তু তিলক-কামোদের গতটির বন্দিশে রাগরূপের সুন্দর প্রকাশ। শিল্পীর হাত বেশ তৈরী এবং ভবিষ্যতও উজ্জ্বল। ভি জি যোগের বেহালায় ইমনকল্যাণে নিষ্ঠার অভাব ছিল, যদিও বাজনা পরিচ্ছন্ন ও মিষ্টি।

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারবাদন বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। শুদ্ধ বসন্ত রাগের শাস্ত্রসম্মত রূপটি তাঁর ধ্রুপদী আলাপে ফুটে ওঠে। অনেকে শুদ্ধ বসন্তে পঞ্চম ব্যবহার করেন। কিন্তু তা শাস্ত্রসম্মত নয়। বসন্ত রাগের রূপায়ণে পঞ্চম ইচ্ছাকৃত ভাবেই বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ পঞ্চমের অভাব পূরণ করবে কোকিলের ডাক। নিখিলবাবুর রাগের প্রতি নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। হেমন্ত রাগের ধামারটিও মনোগ্রাহী। ছন্দের বৈচিত্রে অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য হয়েছিল। উলাটি ঝালা, তান কর্তব্য ও মীড়খণ্ডে তাঁর রেওয়াজী হাতের পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু বসন্ত কালে হেমন্ত কেন?

আমীর খাঁ

এ কাননের মারুবেহাগ ও হংসধ্বনিতে খেয়াল পরিচ্ছন্ন। তাঁর পরিমিতিবোধ লক্ষনীয়। সুনন্দা পট্টনায়কের যোগকোষে খেয়ালটি শ্রোতাদের তৃপ্তি দিয়েছে। তিনি ভজন না গাওয়াতে অনেকে মনোক্ষুন্ন হয়েছেন। বাহাদুর খানের সরোদবাদন শ্রোতাদের মনে বিশেষ রেখাপাত করেনি। শেষে একটা কথা : এই বসন্তে কি বাহার নেই? না শিল্পীদের মনে বাহারের অভাব?

দুই সারিতে মেয়ে ও পুরুষ ভোটদাতা

লাইব্রেরীতে বসে বই-এর পাতা উল্টাচ্ছিলাম, হঠাৎ পাশের ভদ্রলোকটি প্রশ্ন করলেন "আচ্ছা বলুন তো মনমোহিনী সাইগল কি মেয়ে?" অবাক হয়ে তাকাতেই আবার জিজ্ঞাসা করলেন "আর অমৃত কাউর কি পুরুষ?" বুঝলাম বেচারা কে মেয়ে কে পুরুষ ঠাউরে উঠতে পারছেন না! তাঁকে ভার দেওয়া হয়েছে নির্বাচনে আর নির্বাচিতের তালিকায় নারী পুরুষের সংখ্যা সন্ধান করতে। আসন্ন নির্বাচন পর্বের প্রস্তুতির কোন একটি দায়িত্ব তাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

আমি কিন্তু একটুও অবাক হইনি। প্রাক্তন ইলেকশন কমিশনার পরলোকগত সুকুমার সেন মহাশয়ের রিপোর্টে পড়েছিলাম, এই নাম বিভ্রাটই মেয়েদের ভোটদানের সবচেয়ে বড় অন্তরায় ছিল। ১৯৫১—৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আগে বহু মেয়ের নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হয়েছিল, কারণ কেউ বা তাঁদের নিজেদের নাম জানতেন না, আবার কেউ জানলেও নাম দিতে নারাজ ছিলেন। মেয়েরা নিজেরাই নামের ব্যাপারে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন। কোনও পুরুষের নামে পরিচিতি তাঁদের সম্বল—যেমন অমুকের মা, অমুকের স্ত্রী বা কন্যা। ২৮ লক্ষ মেয়ের নাম তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হয় তবু নামের হদিস করা সম্ভব হয় নি।

নাম না জানা মেয়েদের বেশীর ভাগই ছিলেন বিহার, উত্তর প্রদেশ, মধ্য ভারত, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও তদানীন্তন বিন্ধ্য-প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের অধিবাসিনী। প্রথম নির্বাচনের পরই সরকারের বিশেষ চেষ্টা ও নানা নারী কল্যাণ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে মেয়েরা এই নাম সম্বন্ধে সংকোচ ও সংস্কার কাটিয়ে উঠেছিলেন। দ্বিতীয় নির্বা-চনের আগেই নাম সংকটের পালা কেটে যায়। প্রায় শতকরা ৯৪টি মেয়ের নাম ভোটার তালিকাভুক্ত করা হয়।

ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ভোট দেবার বেলায় আশানুরূপ উপস্থিতি সর্বত্র হয়নি। এর একটি কারণ অবশ্য ভারতীয় মেয়ের স্বভাবসুলভ লজ্জা। এর ঘরের বাইরে আসবার অসুবিধা বা অনিচ্ছা হতে পারে কিন্তু অতি সহজে পাওয়া ভোটাধিকারও কিছুটা এর জন্য দায়ী। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে মেয়েরা কষ্ট করেছিলেন কিন্তু স্বাধীন ভারতে সমান অধিকারের জন্য তাঁদের বিন্দুমাত্রও কষ্ট করতে হয়নি। কনস্টিটিউশনের ৩২৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ যার বয়স ২১-এর নীচে নয় তার ভোটাধিকার আছে। বাধা কেবল "non residence, unsoundness of mind, crime or corruption" এর বেলায়। বাসভূমির অস্থায়িত্ব, মানসিক-বিকার, গুরুতর অপরাধ অথবা উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ যদি না থাকে তবে এই অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না।

পৃথিবীর তথাকথিত উন্নত, সব দেশে ভোটের জন্য মেয়েদের কত কষ্ট ও কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। ১৯০৫ সালের ইংলন্ড। তখন লিবারেল দলের শাসন চলছে। ম্যাঞ্চেস্টারে এক মিটিং ডাকা হয়েছে। স্যার এডওয়ার্ড গ্রে লিবারেল দলের ভবিষ্যৎ নীতি সম্বন্ধে বলবেন, অবশ্য যদি নির্বাচনে তাঁদের আবার জয় হয়। ক্রিস্টাবেল প্যাংকহার্স্ট এবং অ্যানি কিনি উঠে দাঁড়ালেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন লিবারেল সরকার যদি হয় তবে তাঁরা মেয়েদের ভোটদান সম্বন্ধে কি করবেন।

দুর্গম পথের যাত্রী, আগামী সরকার গঠনের দায়িত্বের ক্ষুদ্র অংশ

তাঁদের কথা তো বলতে দেওয়াই হলো না, মিটিং-এর মাঝে জোর জবরদস্তি করে হাত মুচড়ে, লাথি মেরে গ্যালারি থেকে নীচে ফেলে দেওয়া হলো। এতেও শাস্তি হয়নি। প্রায় ছুঁড়ে তাঁদের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। এঁরাও দমবার পাত্রী ছিলেন না। দাঁড়িয়ে জনতাকে উদ্দেশ্য করে দু কথা বলবার চেষ্টা করলেন। পুলিস এসে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। অবশ্য এই ঘটনাই জগতের কাছে নারীর অধিকার দাবির এক নূতন রূপ তুলে ধরেছিল।

কিন্তু বৃটিশ সরকার সে দাবি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গিয়েছিল। লিবারেলদেরও প্রত্যাবর্তন হলো, নারীর নির্বাচনে অধিকারের বিলও পার্লামেণ্টে সাতবার পরাজিত হলো। বাধা পেয়ে মেয়েরা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আন্দোলন চালাতে লাগলেন। কারাগার, অনশন কোনও কিছু বাদ রইল না। স্বাস্থ্যহানির অজুহাতে সরকার যদিবা একদলকে ছেড়ে দেন তো অন্যদল তাদের বিপর্যস্ত করে তোলে। এমনি করে ১৯১৩ সালে এমিলি ডেভিডসন ডার্বির রেসে সপ্তম এডওয়ার্ডের ঘোড়ার সামনে পড়ে প্রাণ দিলেন। তা সত্ত্বেও ১৯১৮ সালে লয়েড জর্জের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বিবাহিত মেয়ে, সম্পত্তির মালিক মেয়ে এবং ৩০ বা তার বেশী বয়সের স্নাতক মেয়ে মাত্র ভোট দেবার অধিকার পেলেন। ১০ বছর পরে ১৯২৮ সালে মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার লাভ করেন। আশ্চর্যের বিষয় যে মহারানী ভিক্টোরিয়ার নারী আন্দোলনের প্রতি অপ্রশম্য আপত্তি ছিল। ইংলণ্ডের মত মার্কিন মেয়েরও ভোটাধিকার পেতে অনেক ওজর আপত্তি বাধা বিঘ্ন কাটাতে হয়েছে। ইংলণ্ডের মতই প্রথম মহাযুদ্ধে নানা ভাবে সাহায্য করাতে মেয়েদের রাজনৈতিক পদমর্যাদা বেড়ে যায়। না হলে নিগ্রোর অধিকার আর মেয়ের অধিকার দুইই সমানভাবে দুরূহ বাধার কাছে মাথা খুঁড়ে মরেছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। ফরাসী মেয়েরা

পর্দা কেন্দ্রের ভোটযাত্রী

ভোটাধিকার পেয়েছে ১৯৪৪ সালে। সাম্যের বিপ্লবের দেশ ফ্রান্স মেয়েদের সমান চোখে দেখতে সময় নিয়েছিল অনেক। সুইজারল্যাণ্ডে আজও মেয়েরা ভোট দেন না (অবশ্য সুইস বন্ধুবান্ধবকে প্রশ্ন করলে বলেন যে ভোটের হাঙ্গামা সে দেশে এত বেশী যে মেয়েরা বিব্রত হতে চান না। কথায় কথায় ভোট, ছোট খাটো ব্যাপারে ভোট নিয়ে টানাটানি; কর্মব্যস্ত ঘরনীদের সময় কোথায় সব বিষয়ে জড়িয়ে পরার?)

তবে কোন কোন প্রদেশে মেয়েরা খুব উৎসাহী। ভোটদানে বিরতদের বাদ দিলে নারী পুরুষ প্রায় সমান সমান সংখ্যায় গত ইলেক্‌শনে ভোটদান কেন্দ্রে পৌঁছেছিলেন। মাদ্রাজ, মণিপুর ও কেরালায় তো মেয়েরাই সংখ্যায় ছিলেন বেশী। মাদ্রাজে ৯৪ লক্ষ মেয়ে ভোটদাতা ও ৯২ লক্ষ পুরুষ ছিলেন। মণিপুরে মেয়ে ২½ লক্ষ ও পুরুষ ২ লক্ষ এবং কেরালায় ৩৯·৫৫ লক্ষ পুরুষ ও ৪০·৫ লক্ষ মেয়ে ভোট দিয়েছিলেন। মহিলা ভোটাধিকার প্রাপ্তের সংখ্যা পুরুষের প্রায় সমান সমান। কাজেই এ সংখ্যাগুলি উৎসাহজনক সন্দেহ নেই। প্রত্যেক নির্বাচনের পরে দেখা গেছে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য উৎসাহের পরিমান মহিলা সমাজে বেড়ে গেছে। নির্বাচন কেন্দ্রের কার্য পরিচালনা করবার উৎসাহও কর্মী মেয়েদের মধ্যে বেশী হয়ে উঠছে। কোথাও কোথাও পরদানশীন মেয়েদের জন্য আলাদা কেন্দ্রের পর্যন্ত ব্যবস্থা হয়। সাধারণত অবশ্য কেন্দ্রে পুরুষ ও নারী দুটি আলাদা কিউ ধরে মতপত্রী ফেলার বাক্সের দিকে অগ্রসর হন। কোন কোন মহিলাকে ডাকযোগে ভোট দেবার সুযোগ দেওয়া হয়। সামরিক কর্মচারীদের পত্নী ও বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসে
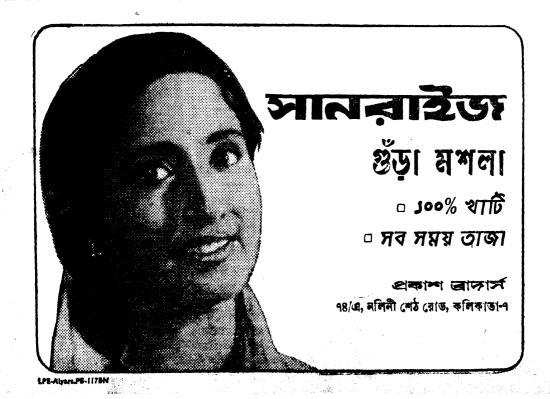
নিযুক্ত কর্মচারী পত্নী ডাকযোগে ভোট দিতে পারেন। প্রেসিডেন্ট, রাজ্যপাল, মন্ত্রী ইত্যাদিদের স্ত্রীদেরও ডাকযোগে ভোট দিতে দেওয়া হয়। এইসব মতপত্রীর খামের উপর স্পষ্ট অক্ষরে "F" লেখা থাকবে।

নির্বাচন বা ভোট দেওয়ার সারমর্ম মনোনয়ন সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। গণতন্ত্রের ভিত্ এই স্বাধীন মনোনয়নের উপর থাকে। যদিও এই মনোনয়ন সর্বজনীন হওয়া সম্ভব হয় না এবং ইতিহাসের পাতায় গণতন্ত্র আংশিক মনোনয়নের উপরই নির্ভর করে চলেছে চিরকাল। শাসন ব্যবস্থা সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতে গঠিত হয়। গণতন্ত্রের পরীক্ষাও নির্বাচনের মাধ্যমে হয়ে যায়। শান্তিপূর্ণ নির্বাচন ও নির্বাচনের পরবর্তী ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ। স্পেনে ১৯৩৫ সালের ইলেক্‌শন শান্তিপূর্ণভাবে সকলে গ্রহণ করতে পারে নি বলে গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত স্পেনে ফ্র্যাংকোর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমাদের দেশের মহিলা সমাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য না হলেও ভোটদানে বিরতদের সংখ্যা বেশী হওয়া গণতন্ত্রের অসুস্থতার পরিচায়ক। যে নাগরিক সামান্য মাত্র কষ্ট স্বীকার করে ভোট কেন্দ্রে আপনার মতপত্রটুকু পৌঁছে দিতে নারাজ সে কখনই গভীরভাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। এই নিষ্ক্রিয়, তৎপরতাহীন ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিককেই সহজে কথার ছলনায় ভুলিয়ে টেনে নেওয়া যায়। এমনি করেই জার্মানীতে হিট্‌লারের নাৎসি পার্টির প্রতিপত্তি গড়ে উঠেছিল। বর্তমান ব্যবস্থায় আস্থাহীন মানুষ আপনার অজ্ঞাতসারে বিপক্ষের মন ভোলানো বক্তৃতার ঝলকে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে। সংসদ শাসনে উদাসীন ইটালীও এক সময় ফ্যাসিস্টবাদকে ডেকে এনেছিল। আমাদের মেয়েরা রাজনীতির মারপ্যাঁচের জালে ধরা না পড়েও আপন মতামত ব্যক্ত করবার জন্য এগিয়ে আসবেন এটা আশা করা যায়। মেয়েদের দু-একটি দুঃসাহসিক বা বিপজ্জনক ভোটাভিযানের গল্প যা কানে এসেছে তাতে মনে হয়, আগ্রহের তাদের অভাব নেই। লাহুল এবং স্পিটি উপত্যকার বিপদসংকুল পথে নাকি দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে, পাহাড় আর জংগল পার হয়ে দলে দলে মেয়ে এসেছিল ভোট দিতে। নির্বাচন ব্যবস্থাকারীদের সেখানে পোঁছতে অনিশ্চিত ভাগ্যের হাতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে দুস্তর গিরিনদীপথ পাড়ি দিতে হয়েছিল। স্পিটি উপত্যকা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১২,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। তাঁরা হিন্দুস্থান তিব্বত গিরি পথে স্পিটি গিয়ে রোহ্‌টাং গিরিবর্তে লাহুলে আসেন। পাহাড়ের দুর্গম যাত্রায় তাঁরা দেখে অবাক হয়েছিলেন, আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনা অবহেলা করে, দুকূল ভাঙা পার্বত্য নদীর পাশে পাশে পিচ্ছিল

ভোট কেন্দ্রের বাইরে সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসিনীর দল

পথ বেয়ে প্রবীণা, তরুণী, বৃদ্ধা দলে দলে এসেছে ভোট দিতে। রাজনৈতিক সচেতনতা বা নাগরিক অধিকারের দায়িত্বের প্রথম স্বীকৃতি হিসাবে কম কথা নয়।

১৯৬২ সালের নির্বাচনে ২১৬,৩৭২,২১৫ ভোটদাতার তালিকার মধ্যে ১০২,৪২৭,৯৮১ জন ছিল মেয়ে। ভোট দিয়েছিলেন ৪৭,৭৬৪,১৭০ জন। পুরুষের বেলায় ছিল ১১৩,৯৪৪,২৩৪ ও ৭০,৭০৩,০৫০। গত ইলেকশনের পর মোটামুটি ২৪·৮ ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। তার অর্ধেক প্রায় মেয়ে। কাজেই মহিলাসমাজের দায়িত্ব আরও একটু বাড়লো।

শ্রীমতী

জীবনের
মধুরতম মুহূর্তে

বিশ-শতকের আরম্ভে নীল-ঘোড়সওয়ার

যে কোনো শিল্প বা সাহিত্য আন্দোলনে দেখা যায়, যে দলটি প্রচণ্ড লাফালাফি করছে তার ভেতরে হয়তো সত্যি প্রতিভাবান দু'-তিনজন আসলে, কিন্তু হইচই-এর ফাঁকে সঙ্গের ফেউরাও বেশ শিল্পী হয়ে গেল। কিন্তু জার্মানির এই "নীল-ঘোড়সওয়ার"রা ১৯১৪-র আগে প্রায় সমগ্র ইউরোপের বড়-বড় শিল্পীদের এক স্লোগানে বেঁধে-ছিল। একসঙ্গে এত সত্যিকার ভালো চিত্রকর আর কোনো আন্দোলন জড়ো করেছিল বলে তো মনে হয় না।

নীল-ঘোড়সওয়ার বলে একটি ছবি ভাসিলি কাণ্ডিনস্কি এঁকেছিলেন, সেই ছবির নাম থেকেই দলের নামকরণ। এই শতকের প্রথমে ম্যুনিখ ছিল জার্মানির কৃষ্টির পীঠস্থান, বিশেষত চিত্রকলার। ১৮৯৬ সালে কাণ্ডিনস্কি এই শহরে যখন বাসা বাঁধলেন তখন তরুণদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল, আরম্ভ হল য়ুগেন্ডস্টিল ধাঁচে চিত্ররচনা। য়ুগেনস্টিল কথাটা আসছে "য়ুগেন্ড" (যৌবন) থেকে, অর্থাৎ নতুন এক ধাঁচে ছবি আঁকায় যা তখনকার তরুণ সম্প্রদায় আরম্ভ করে। এই ধাঁচকেই ফ্রান্সে বলা হয় "আর্ট নুভো", ইংলণ্ডে "মডার্ন স্টাইল।" ব্যাপারটা আসলে বারোক এবং রোমাণ্টিক শৈলী চিত্ররচনায় ফিরিয়ে আনা—এদের কাজে দেখা যায় ক্যানভাসকে নানা ঢেউ-খেলানো ফর্মের দ্বারা সাজানোর দিকে ঝোঁক, রঙের উত্তাল ব্যবহার, চিত্রে সঙ্গীতময়তা।

১৯০২ সালে কাণ্ডিনস্কি ম্যুনিকে ছবি আঁকার ইস্কুল খুললেন এবং ফ্যালাংক্স দলের সভাপতি করে দেওয়া হল তাঁকে। ১৯০৪-এ সমস্ত ইউরোপের চিত্রকররা মিললেন এসে ম্যুনিখে এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল সেজান, ভ্যান-গ, গোগ্যাঁ এবং নিও-ইম্প্রেশনিস্টদের ছবির। এই প্রদর্শনীর ঠিক পাঁচ বছর পরে ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে দলবদ্ধভাবে নীল-ঘোড়সওয়ারদের আত্মপ্রকাশ হল টানহাউসের গ্যালারিতে—যে-সব চিত্রকারকে এই প্রদর্শনীতে দেখা গিয়েছিল সবার নাম এ-মুহূর্তে মনে নেই, যে ক'জনের ছবি সমগ্র ইউরোপে সাড়া জাগিয়েছিল তাঁরা হলেন এর্বস্লো, জলেন্স্কি, কাণ্ডিনস্কি, কানোল্ড, কুবিন, গাব্রিয়েল ম্যুন্টের, উবেনস্টাইন প্রভৃতি। এই প্রদর্শনীর পরে স্বেচ্ছায় এই দলে এসে যোগ দিলেন ফ্রান্স মার্ক, অটো ফিশের, মজিলেস্কি, কোগান প্রভৃতি। কাণ্ডিনস্কি প্যারিস থেকে ব্রাক ও পিকাসোর উচ্ছ্বসিত পত্র পেয়ে নিমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের প্রদর্শনীতে ছবি রেখে একই দলের হয়ে যাবার জন্য। ম্যুনিখে দেখা গেল পিকাসো, দেরেইন, রুয়ো, ভ্লামিংক, ব্রাক, ফন্ ডনেন প্রভৃতির ছবি। প্যারিস নয়, ম্যুনিখ হল সমগ্র ইউরোপের এখন কেন্দ্র-বিন্দু।

কিন্তু দল যখন এত বড় হয়েছে মতান্তর আসতে বাধ্য। তা ছাড়া এত লোক যে এক সঙ্গে দলবদ্ধ হল তার মূলে কি কোনো বিশেষ জীবনদর্শন কিংবা চিত্রাদর্শ কাজ করছে, না কি তা শুধুমাত্র যৌবনের উচ্ছ্বাস; "নীল-ঘোড়সওয়ার" সম্প্রদায়ের কি কোনো বিশেষ বলবার কথা আছে যা আগে বলা হয় নি?—দলনেতা কাণ্ডিনস্কি ক্রমশ ব্যাপারটার বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়লেন, মার্কের সঙ্গে "ডের ব্লাউ রাইটের" নামে এক গ্রন্থ সম্পাদনায় মন দিলেন, যার প্রচেষ্টা হবে প্রকাশ করা "নীল-ঘোড়সওয়ার"-দের নন্দনতত্ত্ব, চিত্রাদর্শ, জীবনদর্শন। কিন্তু এই বই বেরুবার আগেই এদের তৃতীয় প্রদর্শনীতে চিত্র-বিচারের ব্যাপারে আদর্শ নিয়ে মতান্তর দেখা দিল এবং আর্টিস্ট ফেডারেশন থেকে বেরিয়ে এলেন কাণ্ডিনস্কি, কুবিন, মার্ক প্রভৃতিরা। ১৯১১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর সেই টান-হাউসের গ্যালারিতে নতুন "নীল-ঘোড়-সওয়ারদের" ছবি দেখা গেল, যাঁদের মধ্যে আঁরি রুসো; দালানি, মাকে, ব্লক, কাণ্ডিনস্কি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যতদিন ব্যাপারটা ম্যুনিখের আর্টিস্ট ফেডারেশনের অধীনে ছিল ততদিন ফ্রান্সের ব্রাক-দলের শিল্পীরা কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন, কিন্তু কাণ্ডিনস্কি প্রভৃতিরা বেরিয়ে আসার পর ব্রাক, দেরেইন, পিকাসো, ভ্ল্যামিংক, লর্তির, সবাই এসে যোগ দিলেন। রাশিয়া থেকে এলেন মালেভিচ, লারিয়েনভ প্রভৃতি। পল ক্লে একটু সরে ছিলেন, হঠাৎ কিছু জল-রঙে আশ্চর্য কবিত্বময় কিছু ছবি এঁকে ঢুকে পড়লেন দলে। কাণ্ডিনস্কির সেই বিখ্যাত রচনা "কনসার্নিং স্পিরিচুয়াল ইন আর্ট" প্রকাশিত হল, মার্কের লেখা বেরুল জার্মানির সমকালীন চিত্রকরদের উপর, ডেভিড বুরলুক লিখলে রুশ "নীল-ঘোড়-সওয়ার"দের কাণ্ডকারখানা, সব মিলিয়ে হইহই।

এই সম্প্রদায়ের চিত্রাদর্শ সত্যি বলতে কোনো নন্দনতত্ত্বের নিয়ম-নির্ভর নয়, কাণ্ডিনস্কি যাকে বলতেন "অন্তরের প্রয়োজনে বিশ্বাস", তাই। এদের প্রদর্শনীর ক্যাটালগ থেকে এই লাইন ক'টি তুলে দিই—"আমরা চিত্রকলায় কোনো বিশেষ ফর্ম পরিচিত করবার চেষ্টা করছি না ঃ আমরা চাই আপনাদের দেখাতে শিল্পীরা কী-ভাবে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে অন্তরের কামনা বা বিশ্বাস প্রকাশ করছেন তাঁদের।"

১৯১৪-তে প্রথম মহাযুদ্ধে এই দল ভেঙে যায়। বোমা আর বারুদে কোথায় টান-হাউসের গ্যালারি, কোথায় সেই ম্যুনিখ।

শুদ্ধশীল বসু
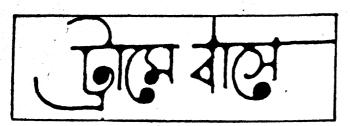
ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেবার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে লক্ষ করিয়া একটি ইট ছোঁড়া হয়; ইট তাঁর নাকে আসিয়া লাগে। রুমাল দিয়া ক্ষতস্থান মুছিতে মুছিতে শ্রীমতী ইন্দিরা বলিলেন—"আমি আমার জন্য ভাবিতেছি না; কিন্তু এই যদি দেশের হাল হয়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কী হইবে, সেই কথাই ভাবিতেছি।" বিশু খুড়ো বলিলেন—"আমাদের ট্রামে-বাসের নিজস্ব সংবাদদাতা সভাস্থল থেকে প্রেরিত সংবাদে জানাচ্ছেন, ইন্দিরাজীর কথা শুনে একটি ছেলে তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল—"হ্যাঁরে ভুঁদো, গণতন্ত্র বানান কীরে।"

আসরের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"এক ঢিলে দুই পাখি মারার একটা বাংলা প্রবাদ আছে। কিন্তু এক ঢিলে কি নেতা আর ভোট মারা সম্ভব।"

কলিকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলিয়াছেন 'আর্থিক স্বাধীনতা ছাড়া স্বাধীনতা অপূর্ণ'।

—"সে আর জানিনে, বাজার করতে গিয়ে চার আনার পয়সা বেশি খরচ হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে জবাবদিহি করতে হয়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আরো বলিয়াছেন—"চীনের ঘটনায় শিক্ষা নিন।" —"কিন্তু চীনের সেই পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য দেয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে বলে সেখানকার 'দেয়ালের লিখন' থেকে শিক্ষা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য"—মন্তব্য বলা বাহুল্য বিশু খুড়োর।

কয়েকদিন আগে ভাষণদানরত কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রী কামরাজকে ইট ছুঁড়িয়া মারা হইয়াছিল, তিনি অবশ্য বলেন যে তিনি আহত হননি। শ্যামলাল বলিল—"আমরা তাঁর কথায় অবশ্য মেরেছিস কলসীর কানা কথারই প্রতিধ্বনি শুনলাম, শুধু শুনলাম না জগাই-মাধাইরা অতঃপর কী বললেন!!"

নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা দিতে যাওয়ার সময় খালি পায়ে সভায় যান শ্রীমহাবীর ত্যাগী। সহযাত্রী

বলিলেন—"স্বীকার করতেই হবে, এ ত্যাগের তুলনা নেই। কিন্তু প্রেরণার উৎস কি শেপ অব থিংগস টু কাম!!"

নির্বাচনী অভিযানে অনেক ছড়া-কবিতা রচনা করা হইয়াছে, আমরা কতকগুলি পড়িয়াছি, কতকগুলি অন্যের মুখে শুনিয়াছি এবং মনে হইয়াছে, ভোট সংগ্রহের কাজে এই ছড়া-কবিতা কতটা কাজে আসিবে বলা শক্ত এবং বর্তমানে তরজাও অনেক সংশোধিত বলে সেখানেও এইসব অচল বলিয়াই বিবেচিত হইবে। তবু বলি, এই ছড়া-কবিতা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত হওয়া ভালো। গদিতে যাঁরাই আসুন, "অ্যাওয়ার্ড" তো উঠিয়া যাইবে না!!"

সংবাদে প্রকাশ, বারাসতে বক্তৃতা দিতে যাওয়ার সময় গাড়ি হইতে নামিলে শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয়কেও ইট ছুঁড়িয়া মারা হইয়াছে। —"ভাবছি, 'শান্তি'-পুরে যখন ডুবুডুবু, তখন নদে ভেসে যাবেই। কিন্তু ভাবছি, নির্বাচনের প্রাক্কালে এই 'ইটা'লিয়ানদের কে আমদানি করল!!"

বহুদিন পর প্রেসিডেন্সী কলেজ আবার খোলা হইয়াছে। সহযাত্রী বলেন—"খুবই ভালো কথা। তবে ভাবছি, সমাসন্ন সরস্বতী পুজোর দিন আবার ঢং ঢং করে বিদ্যারম্ভটা করলেই হতো!!"

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, চীনে নাকি সাংস্কৃতিক বিপ্লব আর জমিতেছে না। শ্যামলাল বলিল—"জমানোর জন্য মাও-মার্কা ফিক্স ব্যবহার করে দেখতে পারেন।"

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্সের সঙ্গে শ্রীমতী অঞ্জু মাহেন্দ্রুর প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে নাকি

একটি ছায়া-ছবি তোলার তোড়জোড় চলিতেছে। —"প্রণয়-ময়দানে ভারত আগেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে রাবার জিতেছে; সুভাষ গুপ্তের কথা মনে করুন"—বলেন জনৈক ক্রীড়ারসিক সহযাত্রী।

টেকসাস হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে নাকি একটি টপ-লেস মেয়ের বিবাহ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"আমাদের এই বিচিত্র দেশে তো আর তা সম্ভব নয়, হলে, বেনারসী কেনার দায় থেকে রেহাই পেতাম!!"

চন্দ-কমিটি অভিযোগ করিয়াছেন: আপৎকালে সংবাদ পরিবেশনে সরকার ব্যর্থ। —"হয়ত অপ্রিয় সত্য না-বলার নীতিই সরকারী ব্যর্থতার কারণ" —বলেন বিশু খুড়ো।

সরকারী বদান্যতায় রেশনে চাউলের বরাদ্দ ক্রমেই কিছু কিছু করিয়া বাড়িতেছে। সহযাত্রী বলিলেন—"জনসাধারণ নিশ্চয়ই অন্তত অর্ধেক পেট ভরে খাওয়ার আনন্দে মেতে উঠেছেন। চালের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেলে, বড় ঝোলার দাম যাতে না বাড়ে, সেদিকে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন!!"

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় রেলওয়ে দল সার্ভিসেস দলকে দ্বিতীয় দিনের খেলায় ২—০ গোলে পরাজিত করিয়া তৃতীয়বার সন্তোষ ট্রফি লাভ করিয়াছে। ক্রীড়ারসিক জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"যা হোক, রেলওয়ের ঘাটতি বাজেটের ক্ষতিপূরণস্বরূপ একটা কনসোলেশন প্রাইজ তো পাওয়া গেল!!"

বত্রিশ

সকালের বাসেই হৈমন্তী চলে এসেছিল। আসার সময় গুরুডিয়া থেকে লাটুঠার মোড় পর্যন্ত হেঁটে এসে বাস ধরেছে। পথটুকু এবং সকালটি এত মনোরম ও স্নিগ্ধ লেগেছিল যে হাঁটার ক্লান্তি সে অনুভব করে নি, বরং আসার সময় চোখ চেয়ে চেয়ে দেখেছে এবং অনুভব করেছে শীত যেন পিছু ফিরে তাকাতে তাকাতে অনেকটা দূরে চলে গেছে, আর তাকে দেখা যাচ্ছে না; তার বদলে বসন্ত এসে গেছে। অস্পষ্ট একটি গুঞ্জন যেন অনুভব করা যাচ্ছিল বসন্তের।

স্টেশনে এসে হৈমন্তী দেখল, সে আসবে বলে ওরা আজ অপেক্ষা করছে। বিজলীবাবুর বাড়িতেই গেল সরাসরি। সরসীদি, বিজলীবাবুর ছোট বউ, পথ চেয়ে বসেছিলেন, সদরে এসে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন : 'আসুন ভাই, সকাল থেকে চাতক হয়ে বসে আছি।' সঙ্গে সঙ্গে বিজলীবাবুর কাছে পেন্সিলে লেখা চিরকুট গেল সরসীদির।

বাকি সকাল এবং দুপুরটুকু বিজলীবাবুর বাড়িতেই কাটল। আদর-আন্তরিকতার অভাব ঘটল না কোথাও। সরসীদি যা করলেন সারাক্ষণ, মনে হল যেন দূর দেশ থেকে কোনো আত্মীয় এসেছে বাড়িতে, এসেছে হঠাৎ আবার চলেও যাবে কয়েক ঘণ্টার পর—এই সময়টুকুতে যতটা পারি আদর-যত্ন করি। 'ওমা, সে কি কথা ভাই, অমন সিল্কের শাড়িটা সারাদিন পরে নষ্ট করবেন কেন, আমি শাড়ি বের করে রেখেছি পরুন', 'আহা, আপনার যেমন কথা, চলুন না—আমি মাথা ঘষে দিচ্ছি, একটুও ঠাণ্ডা লাগবে না, দেখতে দেখতে চুল শুকিয়ে যাবে ...কী সুন্দর চুল আপনার...'। হৈমন্তী কোনো কিছুতেই বড় আপত্তি করতে পারল না। পারল না কারণ, অল্প হলেও সরসীদির সঙ্গে যতটুকু আলাপ, যে কদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে তাতে হৈমন্তী বুঝতে পেরেছিল মানুষটিকে 'না'-বলে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। গগন এসে সরসীদিকে আরও যেন নিকটজন করে দিয়ে গেছে। তাছাড়া একটা সময় ছিল যখন হৈমন্তীর পরিচয় ছিল অন্ধ আশ্রমের ডাক্তার হিসেবে, পেশাদারী গাম্ভীর্যে এই পারিবারিক অন্তরঙ্গতা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারত, সে-গাম্ভীর্যও আর নেই, পরিচয়ের দূরত্বও না। সরসীদির আদর-যত্ন, অন্তরঙ্গতা হৈমন্তীর অপছন্দও হল না; বরং অনেক দিন পরে সে এই পারিবারিক জীবনের স্বাদ ও স্পর্শ পেয়ে খুশী হল, মন স্নিগ্ধ লাগল।

বিজলীবাবুর বড় বউকে দূরে দূরে সরে সরে থাকতেই হৈমন্তী দেখেছে আগে; শুনেছে, ঠাকুর ঘরেই তাঁর সময় কাটে। যদিও সংসরের তিনিই মাথা—তাঁর কথাতেই সংসারটা চলে, তবু সংসারে পড়ে থাকতে তাঁকে বড় দেখে নি। পরিচয় থাকলেও কখনও উনি হৈমন্তীর সঙ্গে বসে সরসীদির মতন গল্পসল্প করেন নি, অল্প দু চারটে কথা বলে নিজের কাজে চলে গেছেন। দেখা গেল, আজ তিনি পুজোপাঠ এবং সংসারের সময় থেকে দু দণ্ড বাঁচিয়ে হৈমন্তীর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন।

হৈমন্তীর বরাবরই মনে মনে একটা কৌতূহল ছিল : ছোট-র সঙ্গে বড়-র ওপর ওপর যে সদ্ভাব, ভেতরেও কি সেই সদ্ভাব আছে? এই মেয়েলী কৌতূহল অনেক সময় হৈমন্তীকে ব্যগ্র করেছে, কিন্তু বোঝা যা অনুমান করার মতন সুযোগ কখনও ঘটে নি। মেলামেশা থাকলেও যে এটা সহজে বোঝা যেত তা নয়; তবু কৌতূহল ছিল হৈমন্তীর। আজ তার মনে হল, বড় অর্থাৎ সরসীদির দিদি স্বামীর দেখাশোনা দায়দায়িত্বের ভারটা সবই বোনের হাতে তুলে দিয়েছেন যেমন বাড়িতে বউ এলে ছেলের ভার মা বউয়ের হাতেই তুলে দেয়। কথাটা ভাবতে হাসি পায় অবশ্য, মজাও লাগে; কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকম। সরসীদির হাতে বিজলীবাবুকে গচ্ছিত করে উনি আড়ালে সরে গেছেন। তাঁর আলাদা ঘর; একা থাকেন। সে-ঘরে যতটুকু যা আছে সব যেন কোনো পুরোনো স্মৃতির মতন রেখে দেওয়া, এখন আর যা ব্যবহার্য নয়। বিজলীবাবুর সদ্য যুবক বয়সের ছবি, বিয়ের পর তোলা দুজনের ফটো, এমন কি কার্পেটের রাধাকৃষ্ণ—এ-সবই তাঁর পুরোনো সংগ্রহ; নতুন কিছু নেই। একার বিছানা, একটিমাত্র বালিশ। ঠাকুর-দেবতার ছবিতে দেওয়ালের অনেক-

খানি ভরা—বোধ হয় এইগুলোই তাঁর নতুন, আর কিছু নয়। সরসীদির ঘরের চেহারা আলাদা, সেখানে আসবাবপত্র সাজসজ্জা স্বতন্ত্র, পালঙ্ক জোড়া বিছানা, কাজ করা সুজনি, কাচের আলমারিতে নানা ধরনের টুকিটাকি, পুতুল, সরসীদির বড় ছবি, বিজলীবাবুর এক সময়কার সংগ্রহ হরিণের সিং ইত্যাদি। ঘরে গদিমোড়া ইজি-চেয়ার, আলনায় পাটপাট জামা কাপড়—ধুতি শাড়ি গেঞ্জি ব্লাউজে মেশামেশি। দেরাজের মাথার ওপর ফুলদানি, শাঁখ, নিকেলের ফ্রেমে বাঁধানো বিজলীবাবুর ফটো। বোঝাই যায়, এ-ঘরের সর্বত্রই দাম্পত্য জীবনের স্পর্শ, ও-ঘরে দাম্পত্যের কিছু নেই। হৈমন্তীর মনে হল, বড় যিনি তিনি বড় হয়েই থেকে গেছেন, ছোট হন নি; দুঃখ হোক বেদনা হোক তবু তিনি অশান্তি করেন নি। সরসীদির মনে মনে যে দিদির ওপর কৃতজ্ঞতা কতটা তা বোঝা না গেলেও বেশ বোঝা গেল, দিদির যেদিকে আঙুল সরসীদির সেদিকে পা।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে বেলা হল। অবনী এসেছিল; একেবারে ধুতি পাঞ্জাবি পরে। খাওয়া দাওয়া শেষ হলে সে চলে গেল; বলে গেল বাড়িতেই থাকবে। দুপুরে শুয়ে শুয়ে সরসীদির সঙ্গে অনেক গল্প হল, বাড়ির গল্প, মা মামা গগনের গল্প। সরসীদির কত কৌতূহল! একবার মজা করে বললেন, "আপনি কি তাই এই ভাবেই থাকবেন? শুধু চোখ দেখবেন, চোখে কাউকে পড়বে না?' হৈমন্তী হেসে ফেলেছিল, 'দেখি!'... দুপুর ফুরিয়ে আসতেই হৈমন্তী উঠল, বলল, এবার যাব।

আসার সময় বড় বউ নিজের ঘরে এনে বসালেন দু দণ্ড, দু পাঁচটা কথা বললেন। শেষে হঠাৎ বললেন, "সরসীকে একবার কলকাতায় পাঠাব। তুমি সবচেয়ে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে দেবে, পারবে না?...ওর তো এখনও বয়েস আছে।"

হৈমন্তী প্রথমটায় না হলেও পরে বড়-র চোখের দিকে তাকিয়ে অর্থটা বুঝল। মাথা কাত করল, হ্যাঁ—পারব। মনটা কিন্তু বিষণ্ণ হয়ে এল।

সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে সরসীদি একটু পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে শুধোলেন, "কানে কানে কি বললে ভাই, দিদি?"

হৈমন্তী হেসে বলল, "কিছু না তো?"

"মিথ্যে বলে লাভ কি ভাই, সত্যি বলুন।"

"সত্যি কিছু না। আপনি কলকাতায় যাবেন বেড়াতে..."

"কলকাতায় যাব আমি!" সরসীদি চোখ কুঁচকে হৈমন্তীকে দেখতে দেখতে যেন সব রহস্য বুঝে নিলেন। বললেন, "বয়ে গেছে। তাই যাচ্ছি!..."

বিজলীবাবু খানিকটা পথ এগিয়ে দিলেন। বিকেলের দিকটায় তাঁকে বাস অফিসে থাকতে হয়। কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, সন্ধ্যে নাগাদ পারলে তিনি অবনীর বাড়িতে যাবেন।

সাইকেলে উঠে বিজলীবাবু চলে গেলেন। এখন সবে বিকেল, বেলা বেড়েছে, রোদ আছে—মরে আসা রোদ, বাতাস এলোমেলো, খানিকটা উষ্ণতা এবং তাপ এ-সময়ে আজকাল অনুভব করা যায়। হৈমন্তীর শুকনো শুকনো এবং গরম লাগছিল; অল্প ক্লান্তি; সারাটা দুপুর গল্পে গল্পে কেটেছে, আলস্য জমেছে যেন। হাই উঠল। সরসীদির মুখটা যেন মনের ওপর ভাসতে ভাসতে চলেছে, বিজলীবাবুর মতনই স্বভাব একেবারে, রঙ্গ রসিকতায় ভরা। গোলগাল মুখ, চোখ দুটি হাসিখুশী মাখানো, নাকে পুঁতির দানার মতন নাকচাবি, ঠোঁট দুটি সব সময় পানের রসে লাল হয়ে আছে, মাথার কাপড়টুকু সরে না কখনো। সরসীদির বয়েস হয়েছে, ওর চেয়ে কিছু বড়ই, শরীরও ভারী হয়ে গেছে, তবু সরসীদির মধ্যে এখনও যেন কম বয়সের চঞ্চলতা মরে নি। আর হয়ত কোনোদিন দেখা হবে না—তবু, হৈমন্তর মনে হল, সরসীদির মুখটি মাঝে মাঝে তার মনে পড়বে। আর, হৈমন্তী ভাবল, সত্যিই যদি সরসীদি কলকাতায় যান—তবে সে সাধ্যমত ভাল ডাক্তার দেখিয়ে দেবে। বড় বউ-এর মুখটিও মনে পড়ল। সত্যি, সব থেকেও যেন ওই সংসারে কিসের অভাব একটা চাপা বেদনার মতন থেকে গেছে। হৈমন্তী খানিকটা উদাস এবং বিষণ্ণ হল।

কাঁঠাল এবং নিম গাছের ঝোপ পেরিয়ে টালি-ছাওয়া ছোট মতন বাড়িটার পাশ দিয়ে যাবার সময় হৈমন্তীর হঠাৎ মনে হল: এই রাস্তায় আজই তার শেষবারের মতন আসা, আর কখনও এখানে আসবে না; রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে চোখ তুলে চারপাশ একবার দেখল, বটের পাতা ঝরছে, মস্ত একটা আম গাছ, ঘুঘু ডাকছিল কোথাও, শালিখ এসে মিষ্টির দোকানের সামনে পাতা খুঁটছে, সামান্য দূরে দেহাতী মিঠাইঅলার দোকান, কয়েকটা বোলতা উড়ছে, কুকুর শুয়ে আছে একপাশে, গরুর গাড়ি আসছে হেলেদুলে চাকায় শব্দ তুলে। দেখতে দেখতে এই মুহূর্তে হৈমন্তীর হঠাৎ কেমন দীর্ঘশ্বাস পড়ল: এইসব ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ।

সরু পথ ধরে এগিয়ে আবার বড় রাস্তায় পড়ল হৈমন্তী। তার পায়ের কাছে ছোট মতন একটা ঘূর্ণি উড়ছিল বাতাসের, নাকে মুখে ধুলোর ঝাপটা লাগল। তারপর রেল-ফটক, দু পাশে ফসল-তোলা শূন্য শুকনো মাঠ, কাঁকর ছড়ানো উঁচু নীচু রাস্তা। আরও খানিকটা এগিয়ে আসতেই অবনীর বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল।

ফটক খুলে ঢোকার সময় বারান্দায় কাউকে দেখতে পেল না হৈমন্তী। বাগানে নতুন নুড়ি পাথর ছড়ানো হয়েছে, শব্দ উঠছিল। অবনী কি ঘুমিয়ে আছে? এই অবেলায় তার ঘুমোবার কথা নয়।

বারান্দায় উঠতেই অবনী ঘর থেকে বেরিয়ে এল। "আসুন। আমি ভাবছিলাম আপনি বোধ হয় ওখানেই থেকে গেলেন।" ঠাট্টা করেই বলল অবনী।

হৈমন্তী হেসে জবাব দিল, "তা সত্যি, উঠতে চাইলেও কি উঠতে দেন ওঁরা।"

বসার ঘরে এসে হাতের ব্যাগটা রাখল হৈমন্তী, বসতে বসতে বলল, "জল খাব। আজ খুব তেষ্টা পাচ্ছে।" বলে কি যেন ভেবে বলল, "একটু গরম গরম লাগছে, না?"

অবনী মহিন্দরকে জল এনে দেবার কথা বলতে গেল। হৈমন্তী গা এলিয়ে বসল। ক্লান্তি এবং আলস্য লাগছিল। এখন যেন তন্দ্রার মতন লাগছে, দু দণ্ড চোখ বুজে শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল। সারাটা দুপুর গল্পে গল্পে কেটেছে, খেয়ে উঠতেও বেলা হয়েছিল, তার ওপর এই গরম-পড়ে আসার মুখে শরীরে অবসাদ আসে এমনিতেই। বসে বসে হৈমন্তী হাই তুলল।

মহিন্দর জল দিয়ে গেল। হৈমন্তী জল খেয়ে বড় করে শ্বাস ফেলল স্বস্তির।

অবনী এল। বসতে বসতে হেসে বলল, "ফেয়ারওএল কেমন হল, বলুন?"

"বেশ!...চমৎকার।" হৈমন্তী হাসল।

"কিছু পেলেন টেলেন?" অবনী ঠাট্টা করে বলল, বলে সিগারেট ধরাল।

হৈমন্তী দু মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল, চোখে স্নিগ্ধ হাসি; কি যেন ভাবল, বলল, "হ্যাঁ, পেয়েছি।" বলে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা টেনে নিল। তারপর রুমাল বের করে কপাল গলা মুছল।

অবনী বলল, "আপনি যেভাবে ওটা টেনে নিলেন মনে হল কিছু বুঝি বের করে দেখাবেন।"

হৈমন্তী হেসে ফেলল। পরে বলল, "ও'রা মানুষ বড় ভাল।" বলে একটু থেমে সামান্য উদাস গলায় বলল, "কি জানি চলে যাচ্ছি বলেই কি না, সব কেমন মনে হচ্ছে। বোধ হয় কোনো জায়গা ছেড়ে যাবার সময় এই রকম। হয় না?"

অবনী বলল, "মন খারাপ?"

"তা মন খারাপই হবে হয়ত।"

অবনী কিছু বলল না, সিগারেটের এক মুখ ধোঁয়া আস্তে আস্তে বাতাসে ছড়াতে লাগল।

"কলকাতায় গিয়ে এখন কিছুদিন এখানকার কথা খুব মনে পড়বে।...আমার আবার একটা খারাপ অভ্যেস আছে, কোথাও নতুন নতুন গেলে বার বার খালি ভুল হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠব—ভাবব এখানে আছি, কতবার যে মালিনীকে ডেকে ফেলব..." হৈমন্তী বলতে বলতে হেসে ফেলল।

"মালিনীকেই দেখছি আপনার খুব মনে ধরেছে।" অবনীও হেসে জবাব দিল।

"না না, তা কেন! কাছে কাছে থাকত তো। অভ্যেস...।" হৈমন্তী থেমে বড় করে হাই তুলল। হাই ওঠার সামান্য শব্দ হল। ঈষৎ লজ্জার চোখে হাসল, "সারা দুপুর গল্প করেছি। সরসীদির গল্পের শেষ নেই। কী চমৎকার মানুষ।"

"আপনার একটা মস্ত গুণ দেখছি..." অবনী পরিহাস করে বলল।

"কি?"

"যাবার সময় মনে কোনো রকম কালি মেখে যেতে চান না। সবাইকে ভাল লেগে যায়।"

হৈমন্তী কোনো কথা বলল না, হাসিমুখে শুনল, শুনতে শুনতে হয়ত অন্যমনস্ক হল সামান্য।

আরও কয়েকটা হালকা কথাবার্তা হল। বাইরে বিকেলের আলো আছে এখনও, রোদ চোখে পড়ছিল না, বেলা ফুরিয়ে এসেছে, পাখিদের স্বর ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছিল, হৈমন্তী আরও বার কয়েক হাই তুলল। তার চোখ সামান্য জ্বালা করছে, মুখ গলা গরম লাগছিল। অবসাদ এবং গরমের ভাবটুকু কাটাবার জন্যে চোখে মুখে জল দেওয়া দরকার, আহাওয়াটা কেমন শুকিয়ে এসেছে।

হৈমন্তী বলল, "চোখ মুখ কেমন জ্বালা করছে, একটু ঠাণ্ডা জল দিয়ে আসি।"

অবনী বলল, "আসুন"।

হৈমন্তী উঠে গেল। এ বাড়ির এখন সবই প্রায় তার চেনা।

হৈমন্তী ফিরে এলে বারান্দায় গিয়ে বসল ওরা। চোখ মুখ ধুয়ে এসে ঠাণ্ডায় হৈমন্তীর অবসাদ-ভাব অনেকটা কেটেছে। আগে একটা ক্লান্তির ভাব ছিল, এখন ভিজে মুখ সতেজ দেখাচ্ছে। কপাল এবং কানের পাশের চুলগুলি গুছোনো। মহিন্দর চা দিয়ে গেছে। চা ঢেলে—শাড়ির আঁচলটা কোমরের কাছে টেনে নিয়ে চেয়ারের মধ্যে আরাম করে বসল হৈমন্তী। বিকেল ফুরিয়ে গেছে, আলো নেই, সামান্য অন্ধকার হয়ে এসেছে, বাতাস দিচ্ছিল, বাগানে তখনও পাখিদের গলা, স্টেশনের দিকে ট্রেনের শব্দ বোধ হয় আপ্-প্যাসেঞ্জার গাড়িটা এসে গেল। চা খেতে খেতে বাকি অবসাদটুকুও যেন নষ্ট হয়ে আসছিল।

কলকাতায় যাবার কথা হচ্ছিল। অবনী আর-একবার জিনিসপত্র আনা, ট্রেনের কথা বুঝিয়ে বলে দিল। এখান থেকে একটা গাড়ি যাবে, বিছানা বাক্স এটাসেটা বয়ে আনবে, এনে বাস অফিসে রেখে দেবে, বিজলীবাবু মালপত্রের ঝামেলা সামলে সব ব্যবস্থা করে দেবেন। আর অবনী বিকেল নাগাদ যাবে গুরুডিয়ায়, গিয়ে হৈমন্তীকে নিয়ে আসবে। সন্ধ্যার গাড়িটা-তেই যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, একেবারে ভোর বেলায় হাওড়া। গাড়িটা অবশ্য ফাস্ট প্যাসেঞ্জার—কিন্তু সব দিক থেকেই সুবিধে, রিজারভেসান পাওয়া যাবে, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কলকাতা। তাছাড়া এই গাড়িতে চেনা লোক যাচ্ছে বিজলীবাবুর, দেখাশোনা করবে, খোঁজ খবর নেবে। সকালের গাড়িটায় কিছু কিছু অসুবিধে ছিল, নয়ত দিনে দিনে যাওয়া যেত! অবনী কাল একটা টেলিগ্রাম করে দেবে গগনকে।

অবনী আরও একটু চা নিল। হৈমন্তী চিনি মিশিয়ে কাপটা অবনীর হাতে তুলে দিয়ে নিজের জন্যেও সামান্য নিল আবার। আর হাই উঠছিল না, শরীরের অবসাদটুকুও মরে গেছে। এখন ভাল লাগছিল। ঠাণ্ডা ফুরফুরে বাতাস বইছে, বাগানের গাছপালা এবং ফুলের মিশ্রিত একটা গন্ধ আসছিল। ক্রমে আঁধার জমে এল।

অবনী বলল, "আপনার তাড়া নেই তো?"

"না", মাথা নাড়ল হৈমন্তী, "তাড়া আর কিসের। এখন আমার সময় কাটানোই মুশকিল।"

"কলকাতায় ফিরে গিয়ে কি করবেন?"

"দেখি।"

"চাকরি বাকরি নেবেন নাকি কোথাও?"

"কিছু ভাবি নি। চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকা আর-এক যন্ত্রণা। দেখি কি করি। চাকরি করতে ইচ্ছে করে না। পাচ্ছিই বা কোথায়।...বরং আমাদের চেনাশোনা দোকান-টোকান আছে—সেখানে কোথাও বসব খানিক।" শেষের কথাটা হৈমন্তী সামান্য হেসেই বলল।

"নিজের বাড়িতেই একটা চেম্বার করে ফেলুন", অবনী হেসে বলল।

"গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না তা জানেন!" হৈমন্তী হেসে জবাব দিল, "চোখও দেখতে হবে, পয়সাও পাব না; তার ওপর বদনাম।"

"বদনাম কেন?"

"ও হয়! মেয়েদের হাতে চোখ দেখালে লোকের বিশ্বাসই হবে না।" হৈমন্তী মুখের সামনে থেকে পেয়ালাটা সরিয়ে নামিয়ে রাখল।

অবনী বলল, "তাহলে তো দেখছি এখানেই আপনার খাতির বেশি ছিল।"

"তা ছিল।"

সিগারেট ধরাল অবনী। বারান্দা বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। বাতি জ্বালাবার জন্যে উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তবু উঠল, পাশের দিকের বাতিটা জ্বালাল, বারান্দায় সামান্য আলো হল।

ফিরে এসে চেয়ারে বসতে বসতে অবনী লঘু স্বরে বলল, "এখানে যে আপনার খুব সুনাম হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। সেদিন সুরেশ্বরবাবু আপনার খুব প্রশংসা করলেন।"

হৈমন্তী তাকাল; কিছু বলল না।

অবনী কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বলল, "সুরেশ্বরবাবুর বাড়ির লোকের সঙ্গে আপনাদের মেলামেশা ছিল না?"

"না—" হৈমন্তী মাথা নাড়ল আস্তে করে, "মা এক-আধবার ওর মা-বাবাকে দেখেছে, মার দূর সম্পর্কের বোন হতেন ওর মা। আমি দেখি নি। একবার মাত্র ওর বাবাকে কলকাতায় আমাদের বাড়িতে দেখেছিলাম। ছেলেবেলায়। ভুলে গিয়েছি।"

অবনী স্থির চোখে তাকিয়ে ছিল, শুনেছিল। অবনীর জানতে কৌতূহল হচ্ছিল: সুরেশ্বরের মা আত্মহত্যা করেছিলেন কেন? স্বামীর জন্যে? স্বামীর উপপত্নীর প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষবশে? আপনি কি ভদ্রলোকের বাবার পরিচয় জানেন? সেই ছেলের কথা শুনেছেন?

অবনী বলল, "আমার ধারণা ছিল ভদ্রলোকের জীবনটা বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে কেটেছে; বোধ হয় তা নয়—।" অবনী এমনভাবে বলল যাতে মনে হবে সে স্পষ্ট করে না হলেও অস্পষ্ট করে কিছু জিজ্ঞেস করছে।

হৈমন্তী অবনীর মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে অন্য দিকে চোখ ফেরাল, তারপর বাগানের দিকে তাকিয়ে থাকল। ঘাড়ের পাশ দিয়ে শাড়ির আঁচলটা অন্যমনস্কভাবে গোছালো একটু, চেয়ারের দিকে পিঠ আরও হেলিয়ে দিল। তার মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছিল না।

অবনী যেন অপেক্ষা করছিল, শেষে বলল, "এই অন্ধ আশ্রম করার পেছনে ভদ্রলোকের কিছু যেন আছে! শখ করে করেছেন বলে আমার আর মনে হয় না। আপনার কি মনে হয়?"

সঙ্গে সঙ্গে না হলেও হৈমন্তী পরে জবাব দিল, "কি জানি, আমি জানি না।"

অবনী কিছু ভাবছিল, বলল, "তবু কি মনে হয় আপনার?"

হৈমন্তীর এই প্রসঙ্গ ভাল লাগছিল না। এখন সে আর এমন কিছু ভাবতে চায় না যাতে মন তিক্ত বিরক্ত হয়। বলল, "আমার কিছুই মনে হয় না। মানুষের নানারকম খেয়াল থাকে। কার কি খেয়ালে হচ্ছে, কেন হচ্ছে আমার তা জেনে লাভ কি।"

অবনী বুঝতে পারল হৈমন্তী বিরক্ত হচ্ছে। হেসে বলল, "যাবার সময় আপনার মন একেবারে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার, এখানেই বা ওই খুঁতটুকু কেন রাখছেন।"

"খুঁত?"

"রাগ-টাগ, বিরক্তি।"

"না—" হৈমন্তী মাথা নাড়ল; বলল, "ছেলেমানুষের মতন রাগ করব কেন! সে-বয়েস আমার নেই। আমি রাগ নিয়ে যাচ্ছি না। তা বলে আমি ভক্তি নিয়েও যাচ্ছি না।...কিন্তু আপনি যেন সুরেশ-মহারাজের মস্ত ভক্ত হয়ে যাচ্ছেন। ব্যাপার কি?"

অবনী হাসল। হাসতে হাসতে বলল, "আমার মতন ভক্ত সুরেশ-মহারাজও পছন্দ করবেন না।"

হৈমন্তী অবনীকে লক্ষ করে দেখছিল। দেখতে দেখতে বলল, "আমার কিন্তু বেশ মনে হচ্ছে আপনার মন ওদিকে টলেছে।" বলে হৈমন্তী ঠোঁট টিপে হাসল।

সরল গলায় অবনী জবাব দিল, "আমি তো আপনাকে আগেও বলেছি—কোনো কোনো ব্যাপারে খারাপ লাগলেও মানুষটিকে আমার এমনিতে ভালই লাগে।..."

হৈমন্তী যেন কেমন অপ্রস্তুত বোধ করল; যদিও অবনী তাকে কিছু জিজ্ঞেস করল না, তবু তার মনে হল অবনী যেন হৈমন্তীরও কোনোরকম মতামত চাইছে। অর্থাৎ বলতে চাইছে, মানুষটি যে ভাল এ-কথা কি আপনি অস্বীকার করেন? আজ যাবার সময় অবনীর কাছে সুরেশ্বর সম্পর্কে কোনো তিক্ততা প্রকাশ করে যাবার ইচ্ছে তার ছিল না। এখন পর্যন্ত সে এমন কিছু করে নি, বলে নি যাতে তার মনের পুঞ্জীভূত আক্রোশ, তার ঘৃণা, বিরক্তি, ব্যর্থতা, নৈরাশ্যের তীব্রতা ও গভীরতা অবনী জানতে পারে। অবনী যেটুকু জেনেছে সেটুকু গোপন করার মতন সংযম তার ছিল না, নেই। বাকি যা সবই চোখ চেয়ে দেখে অবনী অনুমান করেছে। তার অনুমান মিথ্যে নয় এইমাত্র।

হৈমন্তী অপ্রস্তুত ভাবটা কাটাবার জন্যে হেসে বলল, "আপনাদের সুরেশ-মহারাজকে খারাপ বলবে কে!" বলে একটু থেমে আবার বলল, "দেবতুল্য ব্যক্তি..."

"ঠাট্টা করছেন?"

"না না, সত্যি।...আপনারা নিঃস্বার্থে ভাল বলেন, আর আমাদের তো স্বার্থ ছিল।"

"স্বার্থ?"

"স্বার্থ—" হৈমন্তী মাথা নোয়াল আস্তে করে, বলল, "আমাদের স্বার্থ ছিল। এক সময়ে আমাদের জন্যে অনেক করেছে।"
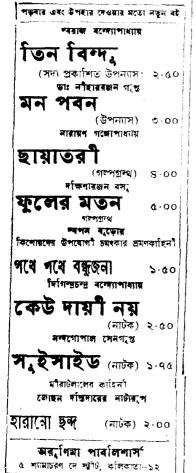
অবনী নীরব থাকল। সে সুরেশ্বর সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়েছিল মাত্র, তার বেশি নয়। অথচ এখন যেন মনে হচ্ছে হৈমন্তীকে সে অপ্রসন্ন ও বিরক্ত করে তুলেছে। অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্যে অবনী ব্যস্ত হল। ভুল করে বোকার মতন সুরেশ্বরের কথা সে কেন তুলল! বরং অবনী মনে মনে যে-কথা বলার জন্যে আজ ব্যাগ্র, উৎকণ্ঠিত, যা বলার জন্যে সে কাতর, সেই নিজের কথা কেন বলছে না!... তবে কি—, অবনীর মুহূর্তের জন্যে সন্দেহ হল, হৈমন্তীকে সে পরীক্ষা করছে? সুরেশ্বর সম্পর্কে হৈমন্তীর কোথাও কোনো দুর্বলতা আছে কি না দেখছে? অবনী অস্বস্তি বোধ করল। যেন কিছুই নয়, কোনো গুরুতর বিষয়ে তারা কথা বলছে না—এইরকম ভঙ্গিতে প্রসঙ্গটা পালটাবার জন্যে অবনী হালকা করে বলল, "যেতে দিন। তেমনভাবে দেখতে গেলে জগতে সবই স্বার্থ। আপনি যে এখানে এসেছিলেন এটাও ও'র স্বার্থ।"

"ওর স্বার্থ বই কি! আমার কিছু নয়", হৈমন্তী বলল। "তবু, কোনোদিন, বলা তো যায় না—হয়ত আমাদের স্বার্থের কথাও জানতে পারবেন। তখন হয়ত মনে হবে আমরা—অন্তত আমি খুব অকৃতজ্ঞ।"

অবনী হৈমন্তীর গলায় স্বর শুনে বুঝতে পারছিল যে কোনো কারণেই হোক সে উত্তেজিত এবং অধৈর্য হয়ে উঠেছে। অবনী বাধা দেবার জন্যে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলতে পারল না, হৈমন্তী তার বাধায় কান দিল না।

হৈমন্তী বলল, "আমাদের সমস্ত সংসার ওর কাছে কৃতজ্ঞ।...ওর দয়ায় আমি বেঁচেছি।" হৈমন্তী ঝোঁকের মাথায় যেন হঠাৎ গোপনীয় কিছু প্রকাশ করছে, প্রকাশ করতে তার কুণ্ঠা নেই, দীনতা নেই; বলল, "আমার তখন বয়স কম, সংসারের অবস্থাও তেমন ভাল না আমাদের, আমার অসুখ করল। তখন ও করেছে, ছুটোছুটি, ডাক্তার-হাসপাতাল; বাইরে টি-বি হাসপাতালে পড়েছিলাম বছর দেড়েক। তারপরেও ওর বন্ধুত্ব পেয়েছি।...আমার জন্যে টাকা পয়সা, সময় কম যায় নি ওর। এই দয়ার জন্যে আমরা আপনাদের সুরেশ-মহারাজের কাছে কৃতজ্ঞ।"

অবনী কল্পনাও করে নি, সামান্য থেকে এতটা কিছু ঘটবে। ভুল করে নিবন্ত আগুনের টুকরো যেন পড়েছিল কোথাও তার থেকেই পলকে এমন কাণ্ডটা ঘটে গেল। বিহ্বল হল না অবনী, কিন্তু লজ্জায় সংকোচে কেমন আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকল। অসহ অস্বস্তির মধ্যে সে অনুভব করতে পারল, সুরেশ্বর এবং হৈমন্তীর জীবনের একটি অতি নিভৃত ও গোপনতম হল, গগন একবার কথা প্রসঙ্গে ভাসাভাসা ভাবে অসুখের কথা বলেছিল, কিন্তু কিছুই বোঝা যায় নি, বুঝতেও দেয় নি গগন। সুরেশ্বর এবং হৈমন্তীর সম্পর্কের কি ভবে ওটাই আদি? জীবন পেয়েছিল বলেই কি হৈমন্তী সুরেশ্বরকে তার সমস্ত কিছু দিতে চেয়েছিল? নাকি সুরেশ্বর জীবন দিয়েছিল বলেই হৈমন্তীকে নিজের কাজে পেতে চেয়েছিল? এটা প্রায় ঋণ শোধবোধের মতন। হয়ত তা নয়। হয়ত সুরেশ্বর অধিকার চায় নি, সঙ্গী চেয়েছিল; হয়ত হৈমন্তী সঙ্গ চেয়েছিল, সংসার চেয়েছিল; সুরেশ্বরের বৈরাগ্য চায় নি। কে জানে! অবনী কেন যেন আজ অদ্ভুত এক বেদনা বোধ করল, তার এই বেদনার অংশীদার ওরা দুজনেই—সুরেশ্বর এবং হৈমন্তী। সে বুঝতে পারল না, হৈমন্তী কোন আবেগবশে তার জীবনের এই গোপনীয়তাটুকু প্রকাশ করল। নিছক উত্তেজনায় নয়, হৈমন্তী অত্যন্ত চাপা স্বভাবের, সংযত, শিষ্ট, ধীর। উত্তেজনার বেশি আরও কিছু কি আছে!

হৈমন্তী নিঃসাড় হয়ে বসে ছিল, স্থির, বাগানের দিকে চোখ, একটা হাত গলার কাছে, গালে আঙুলের ডগা ছুঁয়ে রয়েছে। মুখটি এখনও যেন আঁচে-ঝলসানো।

কিছু সময় এইভাবে কাটল, কেউ কোনো কথা বলল না। গুমোট লাগছিল। অবনী আড়ষ্ট, বিব্রত; হৈমন্তী নীরব, স্থির, অসাড়। শেষ পর্যন্ত অবনী মৃদু গলায় বলল, "আমারই দোষ; আমি আপনাকে অকারণে অসন্তুষ্ট করলাম। যাক গে, যেতে দিন...।" বলে সামান্য থেমে যেন হৈমন্তীর কোনো ক্ষোভ বা গ্লানি মুছে দেবার চেষ্টা করছে—বলল, "আমার ধারণা, আপনি আপনার সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন, এর বেশী করা যায় না। জগতে সবাইকে সুরেশ্বর হতে হবে এমন কথা নেই।"

হৈমন্তী কথা বলল না, কিন্তু তার দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ পাওয়া গেল। সামান্য নড়ল, গালের কাছ থেকে হাতটা নামাল।

অবনী অন্যমনস্কভাবে আবার সিগারেট ধরাল। বলল, "আপনি কি এখনও রাগ করে আছেন?" বলার মধ্যে যেন অনুশোচনার এবং সংকোচের ভাব ছিল।

হৈমন্তী মাথা নাড়ল। "না। আপনার ওপর রাগ করব কেন!"

"কথাটা আমার তোলা উচিত হয় নি।"

"ভুলে ভালই করেছেন।" হৈমন্তী যেন বুকের বোঝা হালকা করার মতন নিশ্বাস ফেলল, পিঠ একটু টান করে বসল, শেষে আবার বলল, "আমার দিক থেকে আমি হালকা হলাম।"

অবশেষে অবনী উঠল, বলল, "চলুন খানিকটা পায়চারি করা যাক বাগানে, বেশ বাতাস দিচ্ছে..."

হৈমন্তীও উঠল।

বাগানে এসে সামান্য আগুপিছু হয়ে

দুজনে পায়চারি করতে লাগল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বাতাস চঞ্চল ও স্নিগ্ধ। পাতার গন্ধ উঠছিল, বিকেলে বাগানে জল দিয়েছে মালী, মাটির একটা গন্ধ ছিল। জবাগাছের ডাল ছাঁটা হয়েছে সদ্য, লাল টিপফুলের গাছটা ফুলে ফুলে ভরা, থোকা থোকা গাঁদা এক পাশে, কিছু শুকনো মরশুমি ফুল।

এক সময় পাশাপাশি হয়ে হাঁটতে লাগল দুজনে, মন্থর পায়ে।

অবনী বলল, "মানুষের মনের কিছু ঠিক নেই।" কথাটা সে আচমকা বলল।

হৈমন্তী বুঝতে পারল না, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

অবনী হাসার চেষ্টা করে বলল, "আপনি যতদিন এখানে থাকলেন ততদিন মনে হত, অকারণে কেন পড়ে আছেন; খারাপই লাগত। এখন চলে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে— বেশ তো ছিলেন।"

হৈমন্তীর মন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছিল। ম্লান হেসে জবাব দিল, "তাই নাকি!...এদিকে তো আমায় তাড়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।"

"যাবার সময় এ রকম একটা বদনাম রটিয়ে যাচ্ছেন!" অবনী হাসল।

"ছি ছি, বদনাম রটাব কেন! আপনার সুনামই করব।" হৈমন্তী গায়ের আঁচল আলগা করে দিল, হাসল, বাতাসে সিল্কের শাড়ির আঁচল কাঁপছিল। পরে বলল, "আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাবলে সত্যিই আমার কষ্ট হয়। আপনাদের কাছ থেকে আমি কমটা কি পেলাম!......সরসীদি আজ বলছিলেন, এখান থেকে চলে যেতে আমার খারাপ লাগছে না? বললাম, খুব খারাপ। সত্যি, আমার খারাপ লাগছে।"

হৈমন্তীর গলায় বেদনা এবং দুঃখের কেমন যেন এক গাঢ়তা ছিল। অবনী এই বেদনা অনুভব করছিল। বলল, "আমরা বোধ হয় প্রায়ই আপনার কথা বলব।"

হৈমন্তী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল: স্টেশনের দিকে একটা মালগাড়ি আসছে বোধ হয়—গুমগুম শব্দ উঠছে। শব্দটা বুকে লাগছিল হৈমন্তীর।

অল্প চুপচাপ থেকে অবনী বলল, "মনে করে রাখার মতন সু-দিন আমাদের জীবনে বড় আসে না। অন্তত আমার জীবনে আসে নি। *আপনি এসেছিলেন, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, বন্ধুত্ব হয়েছিল—এ আমার ভাগ্য। আমি মনে রাখব।"*

বাতাসে হৈমন্তীর এলো আঁচল উড়ে অবনীর হাতে লাগছিল। এখনও আকাশে চাঁদ ওঠে নি, উঠে আসছে, অন্ধকার ম্লান হয়ে এল, মালগাড়ির গুমগুম শব্দটা আরও স্পষ্ট, যেন স্টেশনের কাছাকাছি চলে এসেছে, ফুলগাছের মাটির সামান্য সোঁদা ভিজে-ভিজে গন্ধ, কোনো ফুলের মৃদু সুবাস ভাসছে বাতাসে। হৈমন্তী দাঁড়াল।

অবনী সিগারেটের টুকরোটা দূরে ছুঁড়ে দিল। হৈমন্তীর ডিমের মতন মসৃণ গড়নের মুখ, টোল-তোলা নরম থুতনি, টানা টানা চোখের পাতা, সুন্দর গভীর নির্মল দুটি চোখ, মাথার পাতলা ঈষৎ রুক্ষ্ম রেশমের মতন চুলের এবং তার স্থির, অল্প শিথিল, অবনত দেহের চারপাশে একটি অব্যক্ত মায়া যেন সৃষ্টি হয়েছিল। অবনীর মনে হল, তার জীবনে এ যেন এক অন্য মুহূর্ত, যা আগে কখনও আসে নি—ভবিষ্যতেও আসবে না। সম্মোহিতের মতন হৃদয়ের কোনো আশ্চর্য তাড়নায় সে হৈমন্তীর দিকে নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকল।

হৈমন্তী এক সময় মুখ তুলল, তুলে অবনীকে দেখল। দেখল।

"মনে রাখার মতন আমারও কিছু থাকল", হৈমন্তী অস্পষ্ট গলায় বলল।

কিছুক্ষণ আর কোনো কথা হল না, দুজনেই নীরব, মালগাড়িটা এসে চলে গেল, তবু তার কম্পন যেন এখানের মাটিতে। বুক কাঁপছিল হৈমন্তীর।

কোনো রকমে নিজেকে সংযত করে হৈমন্তী বলল, "আপনি কবে কলকাতায় আসছেন?"

অবনী সামান্য সচেতন হল। "আসছে মাসে।"

"কেন যাচ্ছেন তা তো বললেন না?..."

অবনী মুহূর্তে কয় ভাবল, বলল, "বলব। ...আপনাকে আমার বলা উচিত।"

হৈমন্তী বুঝতে পারল না, তাকিয়ে থকাল।

অবনী ভেবে দেখেছিল তার যদি কোনো প্রত্যাশা থাকে, যদি প্রত্যাশা অপূর্ণও থাকে তবু কথাটা তার বলা দরকার। হৈমন্তী তাকে যতটুকু জানে, যেটুকু চিনেছে তার বেশি চেনা দরকার। গ্লানি এবং মনঃক্ষোভ, ভীতি এবং সঙ্কোচ রেখে লাভ নেই। হৈমন্তীর সামনে থেকে কোনোদিন নিজের লজ্জা বাঁচাবার জন্যে দু হাতে মুখ ঢেকে চলে যেতে তার ইচ্ছে হয় না। তার চেয়ে আমি যা তুমি আমায় সেই ভাবে দেখ। আমার কোনো গোপনতা আমি রাখব না, লজ্জা-গ্লানি লুকোতে গিয়ে ধিক্কারের পাত্র হতে আমার ইচ্ছে নেই। লুকোচুরি করে কি লাভ!

অবনী বলল, "কলকাতায় গিয়ে আমাকে একবার উকিল-টুকিল, কোর্ট-কাছারি করতে হবে।"

হৈমন্তী বুঝল না, হেসে বলল, "সম্পত্তি-টম্পত্তি আছে নাকি আপনার?"

"না; সম্পত্তি নেই।...সম্পত্তি থাকার মতন সম্ভ্রান্ত আমি নই।"

"সম্পত্তি না থাকলে সম্ভ্রান্ত হয় না?" হৈমন্তী অন্তরঙ্গ সুরে ঠাট্টা করল।

অবনী দু পলক যেন দেখল হৈমন্তীকে, তারপর বলল, "না, আমি সম্ভ্রান্ত নই। রেসপেকটিবিলিটি আমার নেই।......থাক গে, সেটা পরের কথা, পরে শুনবেন!... কলকাতায় আমার মেয়ে আছে।" অবনী বলল, গলার স্বর কাঁপল না।

হৈমন্তী নির্বাক, নিশ্চল; ঘাড় ফিরিয়ে যেভাবে চোখ তুলে তাকিয়ে ছিল সেই ভাবেই তাকিয়ে থাকল, যেন নিশ্বাস নিচ্ছে না, বিস্ময় আছে কি না তাও বোঝা যায় না।

অবনীর মনে হল, তার বুকের মধ্যে থেকে কোনো যন্ত্রণা উঠে আসতে চাইছে, গলার কাছটায় কান্নার মতন লাগছে, জীবনের কোনো ব্যর্থতা বুঝি সিসের মতন ভার হয়ে আছে হৃদয়ে। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিল অবনী, মাথার দু পাশে কপালের কাছ বরাবর জ্বালা করছিল। চোখে যেন কিছু স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছে না। বলল, "আমার জীবনে অপছন্দ করার মতন অনেক কিছু আছে; সে-সব হয়ত আপনার ভাল লাগবে না।... আমার স্ত্রী ছিল, তার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, থাকবে না। মেয়েটাকে আমি নিজের কাছে আনব।...কলকাতায় গিয়ে কিছু কাজ আছে। দেখি কি হয়...!"

হৈমন্তী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। বাতাসে তার আলগা আঁচলের অনেকটা উড়ে অবনীর গায়ে লাগছিল।

কখন যেন চাঁদের আলো ফুটে উঠেছিল।

এক সময় অবনী বলল, "রাত হয়ে যাবে, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।...একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।"

অবনী ফিরে এসে দেখল, হৈমন্তী কদম গাছের কাছে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে।

গাড়িটা কলাবাগানের দিকে দাঁড় করানো ছিল। গাড়ি ঘুরিয়ে হৈমন্তীর সামনে এনে অবনী ডাকল, "আসুন।"

হৈমন্তী উঠে এল।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কলকাতার ডায়েরী

ওঁকে এই অবস্থায় দেখে চমকে উঠেছিলাম। ছিন্ন বাস, রোগ জর্জর দেহ, জীর্ণ কম্বল জড়িয়ে তালতলা পারকের একটি বেনচিতে শুয়ে আছেন।

প্রথমে চিনতে পারিনি, তারপর মনে পড়ল ভদ্রলোক (নাম উহ্যই থাক) এক অভিজাত বংশের ছেলে। এককালে তাঁদের পরিবার ছিল পরোপকারের জন্য খ্যাত। এই কলকাতা শহরে ছিল অনেক জমিজমা, বাড়ি। তদুপরি বাবা-জ্যাঠারা চা-বাগান, প্রেস, ইনজিনিয়ারিং কারখানার মালিক, নাম-করা ইনসিওরেন্স কোমপানির ডিরেকটার। তাঁদেরই এক খ্যাতনামা মাসিক পত্রিকায় সাহিত্যজীবন শুরু করেছেন বর্তমানে বিখ্যাত বহু বাঙালী সাহিত্যিক। শুধু তাই নয়, সেকালের অনেক রাজনৈতিক নেতা নানা প্রকার সাহায্য পেয়ে এসেছেন বছরের পর বছর।

তারপর অবস্থার ফের। ব্যবসায় ভাঙনে জীবনের পরিবর্তন। ধনীর দুলালেরা নিজের বাড়িঘর ছেড়ে দিয়ে আশ্রয় নিলেন বস্তিতে, উদ্বাস্তু কলোনিতে। তালতলা পারকের বেনচিতে শুয়ে থাকা সেই ভদ্রলোক সেই হতভাগাদেরই একজন।

বড় ভাইয়ের সংগে উনি কিছুদিন ছিলেন যাদবপুরের ছোট্ট ভাড়া বাড়িতে। অর্ধাশনে, অনশনে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন আক্রমণ করল গরিবের বিভীষিকা যক্ষ্মা। চিকিৎসা নেই, পথ্য নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁটও একদিন গেল। প্রতিবেশী এবং বাড়িওলা রাজি হলেন না, একজন যক্ষ্মারোগীকে এইভাবে দশজনের মাঝখানে রাখতে। বড় ভাইয়ের কাকুতি মিনতি বৃথা গেল, কোন হাসপাতালেও ঠাঁই হল না, অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে একান্ত প্রিয়জনকে রেখে আসতে হল খোলা পারকের মাঝখানে। মৃত্যু সন্নিকট, তবু হায়, যাঁরা একদিন শত শত লোককে আশ্রয় দিয়ে শিক্ষা ও জীবিকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, তাঁদের বাড়িরই একজনকে নিরাশ্রয় হয়ে খোলা পারকের বেনচিতে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকতে হল। অথচ এই পারকের অনতিদূরে তাল-তলাতেই তাঁদের নিজের বাড়ি আলোয় হাসিতে ধনে জনে কী জমজমাটই না ছিল।

ঘটনাটি এক প্রভাবশালী ব্যক্তিকে বলতেই তৎক্ষণাৎ তিনি যোগাযোগ করলেন যাদবপুরের কুমুদশংকর রায় হাসপাতালে। ভদ্রলোকের পূর্ণ পরিচয় কিঞ্চিৎ দিতেই করুণার পাত্র-হাতে এগিয়ে গেলেন সেখানকারই চিকিৎসক ডাঃ সেন। মুহূর্তে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল, তালতলা পারকের বেনচি থেকে ভদ্রলোক স্থানান্তরিত হলেন যক্ষ্মা হাসপাতালের নিখরচার শয্যায়।

না, রাজধানী ততটা 'পাষাণ কায়া' নয়, ডাঃ সেনের মত দুচারজন মহানুভব এখনও রয়েছেন। কিন্তু আমি তো মাত্র এই একজনের দুঃখের কাহিনী জানি, কে জানে হয়ত এমন আরও অনেকে এইভাবে মৃত্যু-শয্যা পেতে আছেন পারকের বেনচিতে, ফুটপাতে, পুলের তলায় মাঠের মাঝখানে।

তাঁদের জন্যে কোন ডাঃ সেনই নেই।

*

পেশা রেলের চাকরি, নেশা ভোজবাজিতে। ভদ্রলোকের কাজ বিনা টিকিটের যাত্রী ধরা, সে কাজে তাঁর সুনামও যথেষ্ট, কিন্তু তিনি অবসর সময় কাটান নানারকম ম্যাজিকের খেলা আবিষ্কার করে।

বর্ধমান জংশনের সদর ফটকে তাঁকে অনেকেই দেখে থাকবেন। টিকিট চেকার হিসাবে নয়, শৌখিন যাদুকর বি হোড় বলেই তাঁর নামডাক—ভারতের নানা জায়গায় এবং নেপালে চমক লাগানো অনেক খেলা দেখিয়ে প্রচুর সম্মান কুড়িয়েছেন। ভারতের দড়ির খেলার উপর বইও লিখেছেন একখানা। কলকাতায় আসেন প্রায়ই, এই সেদিন যেমন এসেছিলেন। বললেন, তাঁর সবচেয়ে ভাল খেলা সকলের সামনে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

কলকাতা-বর্ধমান নিয়মিত যাতায়াত করেন এমন একজন রেলযাত্রী কথাটা শুনে বললেন, জেনে ভালই হল, জংশনের ফটকে দাঁড়িয়ে যদি ওই খেলাটা তিনি দেখান, তাহলে আমাদের বড় সুবিধা হয়, অদৃশ্য হওয়ামাত্র বিনা টিকিটেই সুড়ুৎ করে সরে আমরাও অদৃশ্য হয়ে যাব।

*

পল টেলর মারকিন দেশের একজন নামকরা নৃত্যশিল্পী। কিছুদিন আগে তাঁর সম্প্রদায় রবীন্দ্র সদনে নানা রকম বিদেশী নাচ দেখিয়ে গেলেন।

টেলরের নাচের পাঠ কানেকটিকাট কলেজে মারথা গ্রাহাম, জোস লিমন এবং ডরিস হামফ্রি-র কাছে। গোড়ায় মারথা গ্রাহামের দলের সঙ্গেও ছিলেন বছর ছয়েক।

টেলর ঘুরেছেন অনেক দেশ, সম্মান কুড়িয়েছেন অনেক, ১৯৬৪ সালে প্যারিসে 'গোল্ড স্টার' পুরস্কারও তাঁর ভাগ্যে জোটে।

বয়স বেশী না, বছর ছত্রিশ। গত তিন মাস এশিয়ার নানা দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায়। তিনি বলেন—"নাচের ব্যাপারে ভাষা অন্তরায় নয়। তাই মানুষে মানুষে, দেশে দেশে সরাসরি ভাব বিনিময়ের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম নাচ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মধ্যে মৈত্রী গড়ে তোলা যায় নাচে। আমিও তাই করতে চাইছি।"

*

নির্বাচনের প্রচার পর্ব শেষ, এখন শেষ সময়ের প্রস্তুতি। প্রার্থীরা ক্লান্ত, কর্মীরা শ্রান্ত। এই রবিবারেই নির্ধারিত হয়ে যাবে জয়ের মালা কার কার গলায় পড়বে। আশা নিরাশার দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান প্রার্থীর দল রবিবারের পর চেয়ে থাকবেন ভোট গ্রহণের অন্তিম ক্ষণের দিকে।

ভোটের লড়াই শেষ হয়ে গেলেও শহরের শরীর থেকে তার দাগ সহজে মুছবে না। বাড়ির দেয়ালের গায়ে আলকাতরার ছোপ এত পড়েছে যে, সেই 'কালিমা' দীর্ঘকাল শহরবাসীকে এই নির্বাচন যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

শহরটার এমনিতেই সুশ্রী বলে সুনাম নেই, তদুপরি পোসটার আর আলকাতার ছোপে ইদানীং এমন কদাকার রূপ নিয়েছে যে, কোন পৌরসভারই সাধ্য নেই, তড়িঘড়ি একটা ভব্য চেহারা এনে দেয়।

আমরা যাঁরা শহরটাকে আর কুশ্রী দেখতে চাই না, তাঁরা যদি এই প্রস্তাব নিই যে, আগামী পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে যিনি নিজের জয়ঢাক পেটাতে যত্রতত্র কালি ঢালবেন না, তাঁকেই সবাই ভোট দেবে, তাহলে কেমন হয়?

*

অনেকদিন পর মনুমেনটের গায় রঙ পড়ল। রঙের বদলও হয়েছে। এতকাল আমরা মনুমেনটের আগাপাশতলা হলুদ-হলুদ দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম, সম্প্রতি, তার চেহারায় গোলাপী আমেজ লেগেছে। দেখতে ভালই লাগছে।

—চাণক্য

সাহিত্য সংবাদ

কবির জীবনী

আগামী ৬ ফাল্গুনে কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মদিন। জানি না, তাঁর জন্মদিনে বাংলা দেশে কোথাও কোনো উৎসব হয় কি না. জন্মোৎসব সম্পর্কে আমরা খুব একটা আগ্রহীও নই। কিন্তু, এই উপলক্ষে তাঁর জীবন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে।

জীবনানন্দের জন্ম ১৮৯৯ সালের ৬ ফাল্গুনে, মৃত্যু ১৯৫৪ সালের বাইশে অক্টোবর। পঞ্চান্ন বছরের জীবন একজন কবির পক্ষে খুব সংক্ষিপ্ত নয়, কিন্তু তাঁর জীবন সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। মনে পড়ে, তাঁর মৃত্যুদিনের কথা। ১৪ অক্টোবর বিকেলে বালিগঞ্জে তিনি এক ট্রামের চাকার তলায় পড়ে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন. তখনই তিনি বাংলা দেশে জীবিত আধুনিক কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃত, কিন্তু তাঁর দুর্ঘটনার খবর সব সংবাদপত্রে স্থান পায়নি। দু-একটি কাগজে, পথ দুর্ঘটনার তালিকায় অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশগুপ্তের আহত হবার খবর ছিল. কেউ কেউ ভুল করে জীবনানন্দের বদলে লিখেছিলেন জীবানন্দ। আহত হবার পর, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে তিনি আট দিন ছিলেন, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন, শুনেছি., ডাঃ রায় কবি হিসেবে তাঁকে একেবারেই চিনতেন না, • গিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক সূত্রে। ২২ অক্টোবর রাত্রির পৌনে বারোটায় কবির মৃত্যু হয়, পরদিন সকাল বেলা আমরা হাসপাতালের সামনে হাজির হয়েছিলুম। আমরা তখন সদ্য যুবক, এবং জীবনানন্দের কবিতায় সদ্য মুগ্ধ হতে শুরু করেছি। শোক সেই বয়সে তাৎক্ষণিক হয় না, আমরা ছিলাম চঞ্চল শ্মশানযাত্রী, আমরা কবির শবাধারে কাঁধ ছুঁইয়ে ভেবেছিলাম মৃত্যু জিনিসটা কি রকম, রমণীয় না ভয়ংকর? এই মুখচোরা কবি কি মৃত্যু চেয়েছিলেন, না চান নি? তিনি তো লিখেছিলেন, 'হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে/রয়েছে যে অগাধ ঘুম/সে আস্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই, —অথবা তিনিই আবার লিখেছিলেন, 'চারিদিকে ভোরের কি বিকেলের কাক-জ্যোৎস্না ছায়ার ভিতরে/আহত নগরীগুলি কোনো এক মৃত পৃথিবীর/ভেতরের চিহ্ন বলে মনে হয়; তবু/মৃত্যু এক শেষ শান্ত দীন পবিত্রতা/আমাদের আজকের পৃথিবীর মানুষ নগরগুলো সে-রকম/আন্তরিকভাবে মৃত নয়।'—এই-সব লাইন ভেবে মৃত্যু আমাদের কাছে বিষাদের বদলে ধাঁধা এনে দিয়েছিল। এ লাইনগুলিও মনে পড়ছিল, 'মৃতেরা এ পৃথিবীতে ফেরে না কখনো।/মৃতেরা কোথাও নেই; আছে?/কোনো কোনো অঘ্রাণের পথে পায়চারি-করা শান্ত মানুষের/হৃদয়ের পথে ছাড়া মৃতেরা কোথাও নেই বলে মনে হয়; তা হলে মৃত্যুর আগে আলো অন্ন আকাশ-নারীকে/কিছুটা সুস্থিরভাবে পেলে ভালো হতো।' —এ তো অতৃপ্তি, নয়? কেওড়াতলার অভিমুখে আমরা শ্মশান-বন্ধুরা সেদিন হরি-ধ্বনি দেবার বদলে তাঁর কবিতা নিয়ে কানাকানি করেছিলাম।

সেদিন মৃত্যুর কথা ভেবেছি. এখন তাঁর জীবন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না বলে আমাদের গভীর অতৃপ্তি বোধ হয়। আমরা তাঁর জীবনের কথা জানতে চাই। মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখালেখি হয়েছিল, বাংলায় প্রথমবারের আকাডেমি পুরস্কার তাঁর নামে দেওয়া হয়, তারপর আর বিশেষ কিছু হয়নি।

বহু কাব্য পাঠক এবং প্রায় সমস্ত তরুণ কবিই মনে করেন, জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কবিতার প্রভাব ও প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন, রবীন্দ্র-চর্চার মতন, সুষ্ঠুভাবে জীবনানন্দ-চর্চা হওয়ারও প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ কবিকে তাঁর জীবনচরিতে খুঁজতে বারণ করেছিলেন। এ কথা নিশ্চয় এক দিক থেকে সত্য, এবং এই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, কবিকে সত্যিই তাঁর জীবনচরিতের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, সে-জন্যও কবির জীবনী তন্ন তন্নভাবে জানা দরকার। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার সঙ্গে 'জীবন-স্মৃতি'র সেই সকাল বেলা সদর স্ট্রীটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকার বর্ণনা কি এক-সঙ্গে মিলে মিশে নেই? তা ছাড়া, কবিতার আস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে কবির জীবনী জানার অন্য রকম একটা স্বাদ আছে। বস্তুত, এমন কোনো বিখ্যাত প্রিয় কবির নাম আমাদের মনেই পড়ে না, যাঁর জীবন-কাহিনী আমাদের অজ্ঞাত। একমাত্র জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কেই কিছুটা গল্প-গুজব ছাড়া আর কিছুই জানি না। এবং, এখনই যদি জীবনানন্দের কোনো বিস্তৃত জীবনী লেখা না হয়, তবে পরে যা লেখা হবে, তাতে গল্প-গুজবই বেশী থাকবে—এবং তার সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে

গবেষকদের হিমসিম খেতে হবে।

শুধু জীবনী নয়, আর একটি প্রয়োজনীয় কাজ, জীবনানন্দ দাশের একটি চিঠিপত্রের সংগ্রহ প্রকাশ করা। এখনো নিশ্চিত তাঁর লেখা চিঠি অনেকের কাছে আছে, আর কিছুদিন পর থাকবে কিনা সন্দেহ। তাঁর রচনা বিষয়ে আলোচনাও তেমন বিস্তৃত বা সম্পূর্ণভাবে এখনো হয়নি। এ পর্যন্ত, বুদ্ধদেব বসু, দীপ্তি ত্রিপাঠী ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দ দাশের কবিতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর কল্লোল-যুগে তাঁর কয়েকটি চিঠি ও চরিত্রের দু-একটি রেখা আছে, এ ছাড়া, 'একটি নক্ষত্র আসে' নামে অম্বুজ বসু জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ বই লিখেছেন। এখনো বহু দিকের আলোচনা বাকি। বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবনানন্দের কবিতা পাঠ্য হয়েছে বা হতে চলেছে, কিন্তু, হলেই বা লাভ কি? জীবনানন্দের কবিতা পড়াবার যোগ্যতা বহু অধ্যাপকের থাকা সম্ভবই না, যদি-না অনেকগুলি মর্মগ্রন্থ সুলভ হয়।

যে-সব প্রকাশক নানা বৃহদায়তন গল্প-উপন্যাস ছাপেন, তাঁরা যদি সম্মানচিহ্ন হিসেবে কিংবা সাহিত্যের প্রতি প্রীতি-বশত জীবনানন্দের জীবনী, চিঠিপত্র সংগ্রহ এবং সমালোচনা পুস্তক প্রকাশে উদ্যোগী হন—তবে তাঁরা বহু লোকের অভিনন্দন পাবেন। তাঁদের উদ্যোগ ভিন্ন, নিছক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ-কাজ করা শক্ত। এবং এ-সব বই প্রকাশ করে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনাও খুব কম, কারণ, আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি, বেসট সেলার অনেক বইয়ের চেয়েও জীবনানন্দ দাশের অন্তত দুটি কাব্য-গ্রন্থের বিক্রয়-সংখ্যা বেশী। বাংলা দেশের পাঠকদের সম্পর্কে এখনো দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ ঘটেনি।

হিন্দুরা সাধারণভাবেই ইতিহাস-নিস্পৃহ। ব্যক্তিগত সামগ্রীও যে কখনো কখনো সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারে—সে সম্পর্কে আমরা উদাসীন। আমরা শুনেছি, কেউ কেউ জীবনানন্দ দাশের চিঠিপত্র সংগ্রহের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু যাদের কাছে চিঠিপত্র আছে—তাঁরা দেখাতে চাননি। সেই সব চিঠিপত্র কি রহস্যময় বা ভয়ংকর কিছু? শোনা যায়, মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগে জীবনানন্দ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধভাবে 'দেশ' পত্রিকার সহ-সম্পাদকের কাছে এসে বলেছিলেন, কবিতা লিখে আমার কিছু হলো না—আমাকে এবার আপনার কাগজে গল্প-উপন্যাস লিখতে দিন! —কী জন্য সেই হতাশা? সত্যিই নাকি তিনি কয়েকখানি গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন— কেন যে সেগুলো এখনো প্রকাশের জন্য দেওয়া হয়নি—তার কারণ অনুমান করাই অসম্ভব। অনেক সময় তাঁর বাড়িতে গিয়ে কেউ কেউ দেখেছেন, তিনি বহু বছরের পুরনো খবরের কাগজ নিয়ে ঘাটাঘাটি করছেন। কী করতেন সেগুলো দিয়ে? হরিণ শিকার নিয়ে যে তিনি একাধিক কবিতা লিখেছেন, তিনি কি সত্যই কখনো জংগলে শিকার বাহিনীর সংগী হয়েছিলেন? কিছুদিন আগে আমরা এক ব্যক্তির মুখে শুনলুম, (তিনি বরিশালের লোক, এবং কবি হিসেবে নয়, সেই দেশ-সূত্রেই জীবনানন্দকে চিনতেন) তাঁকে সেই ট্রাম কন্ডাকটারটি নাকি বলেছিল, (যে ট্রামের তলায় জীবনানন্দ চাপা পড়েন) ওটা মোটেই দুর্ঘটনা নয়, সেই কন্ডাকটার দেখেছে যে, ভদ্রলোক (অর্থাৎ জীবনানন্দ) হঠাৎ ইচ্ছে করে ট্রামের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ ঘটনা কতখানি সত্য? অন্য দেশ হলে, সেই দিনই সাংবাদিকরা ট্রাম কন্ডাকটারটির ইন্টারভিউ নিয়ে কাগজে ছাপিয়ে দিত।

সনাতন পাঠক

"বধূবরণ" : রাখী বিশ্বাস, অজয় বিশ্বাস, গীতা দত্ত, প্রদীপকুমার, অভী ভট্টাচার্য ও বিকাশ রায় (ডাইনে) পরিচালক দিলীপ নাগ

বিরাদারি

কোন মহৎ আদর্শ হিন্দী ছবিতে বিশ্বাসযোগ্যভাবে যেন কিছুতেই রূপ নিতে চায় না। ব্যতিক্রম হয়ত আছে। কিন্তু বেশীর ভাগ ছবির ক্ষেত্রেই এই দুরবস্থা লক্ষণীয়। "বিরাদারি"র (গোপ প্রডাকশন্স) ব্যাপারটাও তাই। এই ছবির আদর্শ চরিত্র এক বৃদ্ধা মহিলা। তিনি ভাড়াটের কাছ থেকে বাড়ি-ভাড়া নেওয়াটা সম্ভবত খুব অন্যায়, গর্হিত কাজ মনে করেন। তাঁর কন্যা এক ভাড়াটের কাছে কয়েক মাসের প্রাপ্য 'কিরায়া' চেয়েছে শুনেই 'মালকিন' রীতিমত বিরক্ত। ঈর্ষার জ্বালায় জ্বলে-পুড়েই সীমা (মালকিনের একমাত্র কন্যা) এই কাজ করেছে। তার ধারণা, রাজন, যাকে সে ভালবাসে, ওই ভাড়াটের কন্যার প্রণয়-প্রার্থী। যাক সে কথা। কিরায়াদারদের মধ্যে কেউ বেকার, কেউ পঙ্গু। একজন দুধ বিক্রি করে, অপরজন রুটি। এদের প্রতি মালকিনের দয়া অপরিসীম। নিজের মেয়েকে বঞ্চিত করে তিনি তাদের অকাতরে অর্থসাহায্য করে চলেছেন। দেখা দেয়। সে চায় সুখে থাকতে, ভাল শাড়ি-গয়না পরতে। কিন্তু জননীর কাছে এ-সব আশা করা অন্যায়। এ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টির অবকাশ ছিল। কিন্তু পরিচালক রাম কমলানির লক্ষ্য তা নয়।

অতএব, প্রেম, মেলোড্রামা, ভাঁড়ামি ও খলতার চিরাচরিত অবাস্তব উপাদানেই চিত্রকাহিনীর বিস্তার ও পরিণতি। প্রেম করেছে নবাগতা ফরিয়াল (সীমা) ও শশী কাপুর। কৌতুকের জন্য আছেন মেহমুদ ও কানহাইয়ালাল। মেলোড্রামার প্রয়োজনে দেখা দিয়েছেন ললিতা পাওয়ার (মালকিন) নানা পলসিকর ও ডেভিড। খলতার জন্য প্রাণ। এ'রাই ছবির প্রধান শিল্পী। চিত্রগুপ্ত সুরারোপিত কিছু গান ছবির আকর্ষণ। মান্না দে'র গাওয়া "দেখি অনাড়ী তেরি প্রীত" খুবই সুশ্রাব্য।

শুভমুক্তি

এ সপ্তাহে দুটি বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে। বি কে প্রোডাকশন্স-এর নায়িকা সংবাদ এবং ডি এস প্রোডাকশন্স-এর বধূবরণ।

অগ্রদূত পরিচালিত "নায়িকা সংবাদ"- অঞ্জনা ভৌমিক। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে আছেন পাহাড়ী সান্যাল, সর্বেন্দর, অনুভা গুপ্ত, সুমন মুখোপাধ্যায়, অনিন্দ্য ঘোষ প্রভৃতি। প্রশান্ত দেবের কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি তৈরী। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালনা করেছেন।

"বধূবরণ"-এর কাহিনী রচনা করেছেন গীতিকার শ্যামল গুপ্ত। দিলীপ নাগ পরিচালিত এ ছবিতে তিনজন নতুন শিল্পী আত্মপ্রকাশ করেছেন। এ'রা হলেন কণ্ঠশিল্পী গীতা দত্ত, অজয় বিশ্বাস ও রাখী বিশ্বাস। এ ছাড়া, প্রদীপকুমার, বিকাশ রায়, অভী ভট্টাচার্য, ভারতী দেবী, অজয় গাঙ্গুলী, গীতালি রায় প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীরাও ছবিতে অভিনয় করেছেন। কমল দাশগুপ্ত অনেক দিন পরে এ ছবিতে সুর রচনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে রামকৃষ্ণ ফিল্মস-এর সেবা। ভোলা আঢ্য প্রযোজিত ও পরিচালিত এ ছবির কাহিনী রচনা করেছেন অনন্ত চট্টোপাধ্যায়। অভিনয় করেছেন অসিতবরন, তন্দ্রা বর্মন, রেণুকা রায়, পদ্মা দেবী প্রভৃতি। কালোবরন

বিবিধপ্রসঙ্গ

ব্রিটিশ অভিনেত্রী হেইলি মিলস ও **শশী কাপুর** একটি ইংরেজী ছবিতে শিল্পী-জোড় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছেন। ছবিটির নাম "গ্রীন পলি"। ফেব্রুয়ারী মাসেই ছবির শুটিং আরম্ভ হচ্ছে। শশী কাপুর মোট দশ সপ্তাহের 'ডেট' দিয়েছেন। সিঙ্গাপুরে আউটডোর শুটিং হবে। শশী সাজবেন 'ইউরেসিয়ান' যুবক, ব্রিটিশ ললনা (হেইলি মিলস) তাঁর প্রেমে পড়বে। ট্রেভর হাওয়ার্ড ছবির অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পী, গাই গ্রীন ছবির পরিচালক।

পরিচালক রবার্ট ওয়াইজ-এর "স্যান্ড পেবল্‌স্‌" হলিউডের বিদেশী সাংবাদিক সঙ্ঘের গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কারের জন্য আটটি বিভাগে 'নমিনেশন' পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ পরিচালনা ও অভিনয় (স্টিভ ম্যাককুইন) 'নমিনেশন'-এর অন্তর্গত।

রাজশ্রী নাকি তাঁর বাবা ভি শান্তারামকে "বুন্দ জো বন গয়ী মোতি" ছবির জন্য 'ডেট' দিতে পারছেন না। সে কারণে প্রযোজক-পরিচালক শান্তারাম মেয়ের জায়গায় মমতাজকে নায়িকার ভূমিকায় নিচ্ছেন। মমতাজ ছবির অন্য একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করছিলেন।

অভিনেতা দেব আনন্দ এবার চিত্র-পরিচালক রূপে আত্মপ্রকাশ করছেন। নবকেতন ইণ্টারন্যাশনালের পরবর্তী ছবির কাজ তাঁর পরিচালনায় শুরু হয়েছে। ছবির প্রধান শিল্পীও তিনি।

প্রাপ্তবয়স্কের জন্য

রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেলর অভিনীত "হুজ অ্যাফ্রেড অব ভার্জিনিয়া উলফ" ছবিটি ভারতে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সেন্সরের ছাড়পত্র পেয়েছে। ফিল্ম সেন্সর বোর্ড ছবিটির প্রদর্শনী নিষিদ্ধ করারই পক্ষপাতী ছিলেন। পরে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের বেতার ও তথ্য মন্ত্রকের উপদেশ চান। বেতার ও তথ্য মন্ত্রক "ভার্জিনিয়া উলফ"-কে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অনুমোদন করেছেন।
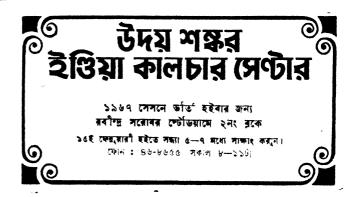
অরণ্যদেব ✯ লী ফক

রাজা আর টেমটম জলে নেমে দুষ্টুমি করছে, আর কাটিনা মহানন্দে মাছ ধরছে ····
জল ছিটিও না, খবরদার।
তুমি জল ছিটোচ্ছিস কেন?
?

ঘুমবা ডাকছে। দূর, মাছ কি একটা খাদ্য নাকি!
গরর্‌-গরর্‌!

জঙ্গলের জীবনে আনন্দের অন্ত নেই ····
গরর্‌-গরর্‌-
যেমন গরর্‌-গরর্‌ করছিলি, ঘুমবা তেমনি তোকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে কাটিনা-

দূর, লেখাপড়া আমার একদম ভাল লাগে না।
পিছনে গোল হচ্ছে, চুপ করো!

শুভদিন, অরণ্যদেব!
শুভদিন। রাজা, আমি দিন কয়েকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। তুই লক্ষ্মী হয়ে থাকবি, এই তল্লাট ছেড়ে কোথাও যাবি না।
আচ্ছা।
9/4

চলি তাহলে!

সবার সামনে আমাকে চুমু খেয়েছে! যেন এখনও আমি সেই ছোট্টটি আছি!

রাজা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল কেন?

দূরে একটা ব্যাঙ্কে ডাকাতি হচ্ছে ··· সেই হাঙ্গামায় রাজাও জড়িয়ে যাবে ·····
পালা -
আঃ!

সাপ্তাহিক সংবাদ
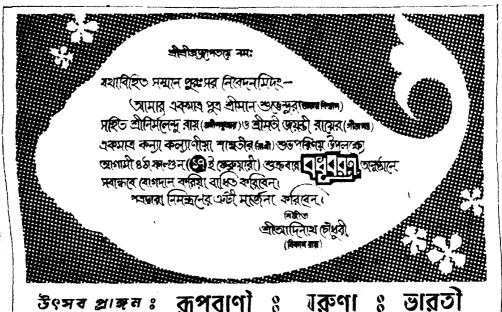
চীন দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই সপ্তাহের মুখ্য আলোচনার বিষয়। প্রেসিডেনট লিউ শাও চি এবং চীনা কমিউনিসট পারটির সাধারণ সম্পাদক তেং শিয়াও পিং, সরকার ও পারটির যেসব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এতকাল পরে তাঁদের সেই-সব পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। চীনে রুশ দূতাবাসের সম্মুখে রেড-গারডদের দিনের পর দিন বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং মাও-পন্থীদের হাতে রুশ নাগরিকদের নানা প্রকার লাঞ্ছনাভোগ সহ্যের সীমা অতিক্রম করার ফলে, পিকিং-বিরোধী জনসমাবেশ ঘটিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন এখন চীনের বিরুদ্ধে পালটা ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হয়েছে। ইতিমধ্যে চীনের বৃহত্তম নগর সাংহাইকে মাও-বিরোধী সশস্ত্র গ্রামবাসীরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, কাজেই এখানে যে-কোন মুহূর্তে সংঘর্ষ ঘটতে পারে। চীনের প্রধান-মন্ত্রী চু-এন-লাইও মাও-পন্থীদের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। মাও-পন্থীদের কার্য-কলাপের ফলে চীনের প্রশাসনে বিপর্যয় ঘটবার উপক্রম হয়েছে। রাশিয়ার প্রতি চীনের ব্যবহার বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, যে-কোন মুহূর্তে উভয়ের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। এতকাল চীনাদের বিনা-ভিসায় রাশিয়া যাওয়ার যে অধিকার ছিল, রুশ সরকার তা বাতিল করে দিয়েছেন। রাশিয়া নাকি সিংকিয়াং সীমান্তে রুশ সৈন্য সমাবেশ করেছে। গতকাল চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী লক্ষাধিক লোকের এক জনসমাবেশে বলেন, সোভিয়েট জনগণের সঙ্গে তাঁদের শত্রুতা নেই—যত নষ্টের গোড়া সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ।

দেশী সংবাদ

৬ ফেব্রুয়ারি—আগামীকাল ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে কলকাতা শহরে দুধ সরবরাহের পরিমাণ হ্রাসের যে সরকারী সিদ্ধান্ত হয়েছিল তা শেষ পর্যন্ত পালটে গিয়েছে। দুধের পরিমাণ হ্রাসের প্রস্তাব অনুসারে যে নতুন কারড ইতিমধ্যে বিলি হয়েছে তা বদলে আবার কারড দেওয়া হবে।

উত্তর প্রদেশের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ৬২ দিনের ধর্মঘট আজ প্রত্যাহার করা হয়। রাজ্য কর্মচারী যুক্ত পরিষদের সেক্রেটারী জেনারেল শ্রী পি এন সুকুল আজ অপরাহ্নে এক জনসভায় এই ঘোষণা করেন। আগামীকাল কর্মচারীরা কাজে যোগ দিবেন।

৭ ফেব্রুয়ারি—নির্বাচনী পটভূমিতে প্রাক্তন রাজা-মহারাজাদের প্রীভি-পারস বা ভাতার প্রশ্নটি আবার প্রধান হয়ে উঠেছে। জনসাধারণের ঔৎসুক্য হতে পারে, এ বাবদ প্রতি বছর কত ধন যায় ভারত সরকারের? প্রায় পাঁচ কোটি টাকা।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে পোরট পাইলটদের তিনদিনব্যাপী ধর্মঘট সম্পর্কে আলোচনার জন্য বোমবাই পোরট ট্রাসট কর্তৃপক্ষ আজ কেন্দ্রীয় পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সচিবকে আগামীকালই বোমবাই-এ আসবার জন্য জরুরী অনুরোধ জানিয়েছেন। পাইলটদের অনির্দিষ্টকালব্যাপী ধর্মঘটের আজ তৃতীয় দিনে বোমবাই বন্দরে জাহাজ চলাচলে অচল অবস্থা দেখা দিয়েছে।

৮ ফেব্রুয়ারি—আজ ভুবনেশ্বরে এক জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় এক খণ্ড ইটের টুকরার আঘাতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আহত হয়েছেন। ইটের টুকরা তাঁর মুখের উপর এসে পড়ে। তাঁর উপরের পাটির একটি দাঁত নড়েছে এবং নাকের একটি হাড়ও ঈষৎ ফেটেছে। তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বক্তৃতা শেষ করেন।

১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণ এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের সময় দেশ যে দুটি আপৎকালীন অবস্থার ভিতর দিয়ে চলেছিল, সে সময়ে কোন সংবাদ সরবরাহ ও প্রচার নীতি ছিল না বলে বেতার ও তথ্য মাধ্যম সংক্রান্ত চন্দ কমিটি সরকারের দোষারোপ করেছেন।

৯ ফেব্রুয়ারি—স্বতন্ত্র পারটির নেতা শ্রী সি রাজাগোপালাচারিয়া আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, যদি তাঁর দল ক্ষমতায় আসে এবং আর কোন যোগ্যতর ব্যক্তি পাওয়া না যায়, তবে তাঁরা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী হতে আপত্তি করবে না।

আজ প্রেসিডেনসি কলেজ খুলেছে। দীর্ঘ চার মাস পর এদিন সকাল দশটায় আবার ক্লাস-শুরুর ঘণ্টা বেজে ওঠে। এদিন ক্লাসঘর, করিডর, কমনরুম ছাত্রছাত্রীদের কল-কোলাহলে, পরস্পর পরস্পরের প্রতি কুশল প্রশ্নে মুখরিত থাকে।

১০ ফেব্রুয়ারি—আক্রান্ত না হলে নাগারা গুলি চালাবে না—আত্মগোপনকারী নাগাদের এই প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মণিপুরের নাগা এলাকায় বিদ্রোহী নাগারা ব্যাপকভাবে নাশকতামূলক কাজের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের অনুরূপ হারে মাগ্‌গি ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে শিক্ষকগণসহ মধ্যপ্রদেশ সরকারের নন গেজেটেড কর্মচারিগণ ১৩ ফেব্রুয়ারি, সোমবার থেকে সাতদিনের জন্য ধর্মঘট করবেন। কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আজ এই ঘোষণা করা হয়। অপর দিকে মধ্যপ্রদেশ সরকার আজ অত্যাবশ্যক সংস্থাগুলির কাজকর্ম বজায় রাখার জন্য একটি অরডিন্যানস জারি করেছেন।

১১ ফেব্রুয়ারি—গতকাল রাত্রে নাগাভূমি সরকারের মহাকরণ আগুনে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গিয়েছে। আগুন লাগার হেতু সঙ্গে সঙ্গে জানা যায়নি। এটি বৃহদায়তন। মুখ্য-মন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, মুখ্যসচিব ও নাগাভূমি প্রশাসনের অপরাপর সচিবদের অফিস একই ভবনে ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন আজ ঘোষণা করেন যে, ১৯৬৬ সালের ১৩ সেপটেম্বর রাজ্য সরকারের যে সব কর্মী 'গণছুটি' নিয়েছিলেন, সরকার তাঁদের ছুটি মঞ্জুর করে ওই দিনের জন্য যে বেতন কাটা হয়েছিল, তা ফিরিয়ে দেবেন।

১২ ফেব্রুয়ারি—আজ সকালে বেহালায় বাম কমিউনিসট পারটির একটি মিছিল আক্রান্ত হয় এবং বেহালা পূর্ব কেন্দ্রে ওই দলের প্রার্থী শ্রীনিরঞ্জন মুখার্জী লাঠির ঘায়ে জখম হন। বেহালায় ডান কমিউনিসট পারটির অফিসেও হামলা হয়েছে। মোট আহত ১৪ জন। পুলিস ১৪ জনকে গ্রেফতার করে।

উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বভারতে শ্রীকামরাজের নির্বাচনী সফর এইসব অঞ্চলে নির্বাচনী অভিযানকে উচ্চগ্রামে তুলে দিয়েছে এবং কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে—সেই সঙ্গে বিরোধী দলগুলিকেও তাদের নির্বাচনী অভিযানে তৎপর করে তুলেছে।

বিদেশী সংবাদ

৬ ফেব্রুয়ারি—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন আজ সপ্তাহব্যাপী সফরে লনডনে এসে বলেন: আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি একটি বিপজ্জনক পর্যায়ে উপনীত। উত্তেজনা প্রশমনের প্রয়োজন। এই কাজে ব্রিটেন বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে পারে।

৭ ফেব্রুয়ারি—অন্যান্য রাষ্ট্র যদি পুষিয়ে দেয়, তবে ৩০ লক্ষ টন পর্যন্ত মারকিন খাদ্যশস্য ভারতকে দেওয়া যেতে পারে বলে প্রেসিডেনট জনসন যে প্রস্তাব করেছেন তা সমর্থন করে কংগ্রেসের একটি যুক্ত প্রস্তাব আজ প্রতিনিধি সভা ও সেনেটে পেশ করা হয়েছে।

৮ ফেব্রুয়ারি—ইনদোনেশিয়ার তথ্যমন্ত্রী শ্রী বি এম দিয়া আজ মন্ত্রিসভার অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের বলেন যে, দেশে দ্বৈত শাসনের অবসান হয়েছে। দেশের শাসনক্ষমতা প্রেসিডেনট সুকারন-র কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে জেনারেল সুহারতোর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

৯ ফেব্রুয়ারি—চীনের সীমান্ত সন্নিহিত দেশগুলিতে সাহায্যের পরিমাণ অনেক বাড়াতে হবে। চীন সম্পর্কে নতুন মারকিন নীতি কি হওয়া উচিত, তা বলতে গিয়ে সেনেটর রবারট কেনেডি একথা বলেছেন। তিনি বিশেষ-ভাবে ভারতের প্রসঙ্গ তোলেন।

১০ ফেব্রুয়ারি—বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে রুশ ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে সপ্তাহব্যাপী আলোচনা আজ লনডনে শেষ হয়। আলোচনায় ভিয়েতনাম সমস্যা সুরাহার ব্যাপারে সত্যিকার কোন অগ্রগতি ঘটেনি।

১১ ফেব্রুয়ারি—প্রেসিডেনট সুকারনকে পদ-চ্যুত করার দাবি জানিয়ে পারলামেনটে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তা সমর্থনের জন্য চার সহস্রাধিক ছাত্র আজ জাকরতায় সমবেত হন। পারলামেনটের প্রস্তাব সুপারিশ মাত্র। কংগ্রেসই এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে। মারচ মাসের গোড়ার দিকে কংগ্রেসের অধিবেশন হবে।

১২ ফেব্রুয়ারি—ইনদোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআদম মালিক সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে, প্রেসিডেনট সুকারন-র জাপানে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনার কোন খবর সরকার জানেন না। তাছাড়া মন্ত্রিসভার অনুমতি ছাড়া সুকারন দেশত্যাগ করতে পারবেনও না।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীসমীরকুমার গুপ্ত

প্রকাশিত হল

আবেগমথিত প্রেমের উপন্যাস

সেই রাত্রি এই দিন ॥ আশাপূর্ণা দেবী

সমুদ্র আর ঊর্মি—ঊর্মিলা। একুশ আর ষোল। ভালবেসেছিল তারা — আবিষ্কার করেছিল অরূপকে পরস্পরের মধ্যে। কিন্তু সমাজের তা ভালো লাগে নি; মনে হয়েছিল পাকামি। তাদের ক্রোধ তাই পাথর গেঁথে দিতে চেয়েছিল দুজনের মাঝে, ঊর্মিকে লম্বর সংপাত্রস্থ ক'রে। আশ্চর্য এ দেশ, আশ্চর্য এর সমাজ। এখানে সব প্রেমই শ্রদ্ধেয়—ঈশ্বর-প্রেম, দেশপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, বন্ধু-প্রেম, মাতৃপিতৃপ্রেম, সন্তানপ্রেম—সব: নয় শুধু মানব-মানবীর সহজাত প্রেম, যা চিরন্তন, যা নিত্যকালের, যা সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত চলার প্রতিশ্রুতি
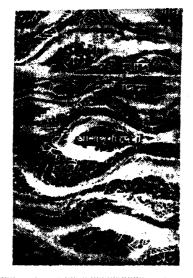
নিয়ে এসেছে। এটি শুধুই নিন্দনীয়, গ্লানিজনক, এবং ক্রোধোৎপাদক। তাই আগ্রহ আর আশীর্বাদ নিয়ে হাসিমুখে এগিয়ে আসে না সমাজ একে বরণ করতে; বরং যেমন ক'রে পারে বাধার সৃষ্টি করে এর পথে, বিনষ্ট ক'রে ফেলতে চায় প্রাণ-চঞ্চল এ স্রোতস্বিনীটিকে তার উৎসমুখেই। কিন্তু প্রাণের আবেগ থেকে উৎসারিত যে নির্মল ধারা, তাকে কি পাথর চাপা দিয়ে বিনষ্ট করা যায়? আশাপূর্ণা দেবীর নবতম উপন্যাস "সেই রাত্রি এই দিন" সেই চিরন্তন প্রশ্নের চিরন্তন উত্তর।

দাম ৫·০০

দোলনা ॥ আশাপূর্ণা দেবী

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল

বিদেশে স্বাস্থ্যোদ্ধারে এসে পথে পরিত্যক্ত সদ্যোজাত একটি শিশুকে বুকে তুলে নিয়েছিল কুমারী সুমনা। কলকাতায় ফেরার পর এই শিশুটিকে ঘিরে তার পরিচিতদের মধ্যে ঘনিয়ে উঠল এক বিশ্রী সন্দেহের ছায়া। "দোলনা" কুমারী-জীবনের বৃহত্তম সমস্যার বিষণ্ণতম বেদনাগাথা। দাম ৫·০০

আশাপূর্ণা দেবীর

সম্প্রতি প্রকাশিত আর একটি উপন্যাস

রাতের পাখি ॥ ৪·০০

"বিবর"-এর পরিপূরক উপন্যাস

সমরেশ বসুর

স্বীকারোক্তি ॥ ৫·০০

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯
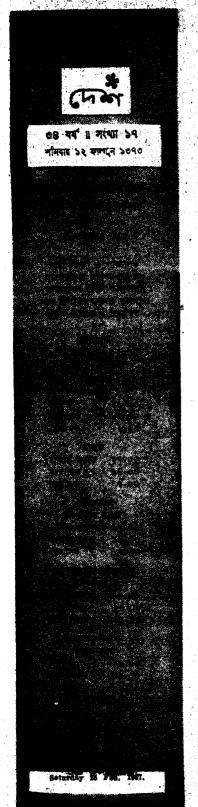
নির্বাচনের শেষে

ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত হল। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশে এই নির্বাচনের ঐতিহাসিক মূল্য কিছু কম নয়। দেশের মানুষের কাছে এ যেমন তার দায় ও দায়িত্বের প্রশ্ন ছিল, নিজের ভাগ্যমান বেছে নেবার উপায় ছিল, তেমনি বিদেশের মানুষের চোখেও ভারতের নির্বাচন ছিল কৌতূহলের বিষয়, রাজনৈতিকভাবে হয়ত লক্ষ করার বিষয়ও। বেশ কিছুকাল ধরেই তাই এদিকে চোখ ছিল সকলের, বিশেষ করে শেষের কদিন বুঝি নানা দিক থেকেই উৎকণ্ঠাপূর্ণ।

স্বদেশে এবং বিদেশে অনেকেরই অনেক রকম উদ্বেগ ও আশঙ্কা ছিল। কারও কারও বা ছিল আশা। বিদেশের সংবাদপত্রে যে-সব সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে, তা থেকে দেখা যায়, সেখানে দুটি জিনিসের প্রাধান্য বেশি, বিস্ময়ও যথেষ্ট। কোটি কোটি মানুষের এই ভারত—যেখানে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, যেখানে শতকরা ৭০ জনেরও বেশি নিরক্ষর, সেখানে কি আশ্চর্যভাবেই নির্বিঘ্নে এই নির্বাচন শেষ হল। আরও বিস্ময়, আসমুদ্রব্যাপী এই ভূখণ্ডের নির্বাচন শেষ হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবেই। দুষ্ট লোকের মতন দু-একটি দুষ্ট সংবাদপত্র হয়ত কিছু কটাক্ষও করেছে, কিন্তু সে-কটাক্ষে বিচলিত হবার মতন কিছু নেই। বরং এই ভেবেই আমাদের গর্ববোধ করার কারণ আছে যে, আমাদের জনসাধারণ তাঁদের সার্বভৌম অধিকার ক্ষুন্ন হতে দেননি।

নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তিক্ততা ঘটে। সে তিক্ততা এখন আর বাঁচিয়ে রাখা অর্থহীন। নির্বাচনে কে জিতলেন, কে হারলেন—বোধকরি তা নিয়ে বৈরিতা বজায় রাখার কারণও আর নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে, সুস্থ গণতন্ত্রের জন্যে বিরোধিতা প্রয়োজন, এবং মানুষের আদর্শ, মত, রুচি ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে যত প্রকার বিরোধিতাই হোক না কেন, তার মূল্য আছে। যিনি বিরোধী ছিলেন, তিনিও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা সাধ্যমত এই নির্বাচনের সুস্থতা বজায় রেখেছেন।

বলা বাহুল্য, সাধারণ নির্বাচনে কয়েকটি ছোটখাট গণ্ডগোল কোথাও কোথাও ঘটেছে। না ঘটলে আমরা সুখী হতাম। তবু যা ঘটেছে—এত বড় দেশে এত রকম লোক ও ভিন্ন মতাবলম্বীর মধ্যে তেমন দু-একটি ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। এর দ্বারা আমরা কিছু সমর্থন করতে চাইছি না, যা ঘটে গেছে তার ত্রুটি স্বীকার করে নিচ্ছি।

সামাজিক জীবনযাপনে যাঁরা কিঞ্চিৎ নিরীহ ও হই-হট্টগোল পছন্দ করেন না—তাঁরা অনেকেই নির্বাচনের মুখে বেশ কয়েক মাস ধরে নানাভাবে উৎপীড়িত হচ্ছিলেন। সভা, শোভাযাত্রা, দু-পক্ষের বচসা, কখনও বা আন্দোলন, কখনও বা হাঙ্গামা ইত্যাদিতে হয়ত এঁদের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছিল। বিশেষ করে নির্বাচনের মুখে পতাকায়, পোস্টারে, ফেস্টুনে, মিছিলে মিছিলে, নানা মুনির নানা ধ্বনি শুনে যাঁদের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা এবং শ্রবণেন্দ্রিয় বধির হতে বসেছিল, এবার তাঁরা ঝরাপাতার মতন পোস্টার ফেস্টুনকে ঝরে পড়তে দেখবেন, মিছিলের ধ্বনি আর কর্ণে প্রবেশ করবে না। অতঃপর সব শান্ত। এবং শান্তি।

প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার। এই নির্বাচনের ফলাফল কাউকে উৎসাহিত ও উল্লাসিত করবে, কাউকে হতাশ করবে। যাঁরা উল্লসিত হবেন, তাঁদের এবং যাঁরা বেদনাবোধ করবেন—কারও পক্ষে আমাদের কোনো সমর্থন নেই। আজ যাঁরা উল্লাস করছেন, তাঁদের উল্লাস যে আগামী নির্বাচনে বিষাদে পরিণত হবে না—এমন কথা কি কেউ জোর করে বলতে পারে। গণতন্ত্রে নির্বাচন-যুদ্ধের এটাই রেওয়াজ। আজ যে-দল শাসনদণ্ড হাতে পেল, কাল তাকে পথে নামতে দেখা যায়। প্রশ্নটা তাই আপাত জয় বা আপাত পরাজয়ের নয়; প্রশ্ন কর্তব্যের। কর্তব্যে উদাসীন হয়ে অথবা করণীয় বিষয়ে অবহেলা করে—জনসাধারণকে দীর্ঘকাল ভুলিয়ে রাখা যায় না। সে চেষ্টার ভবিষ্যৎ কি হতে পারে, তার প্রমাণ ইতিহাসে লেখা আছে। গণতন্ত্রে, বিশেষ করে আমাদের দেশে, যেখানে শতকরা সত্তরজন নিরক্ষর, সেখানে হয়ত কোনো কোনো গলদ বার করা যেতে পারে, কিন্তু এই গণতন্ত্রেই মানুষকে আপন ভাগ্য নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া আছে। আজ যদি ভুলভ্রান্তি ঘটে, তার পরিবর্তন এখানকার মানুষই করে নেবে এ-সম্পর্কে কোনো রকমের সন্দেহ রেখে লাভ নেই।
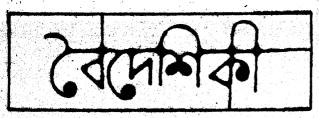
বুরিদানের গাধা

মার্কিন পরমাণু বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার মারা গেলেন। হিরোশিমার প্রথম পরমাণু বোমা নির্মাণে তাঁর উদ্ভাবন-কৌশল ওপেনহাইমারকে আইনস্টাইন, ফের্মি, নীলস বোর-এর কাছাকাছি প্রায় সমান আসনে প্রতিষ্ঠা করেছিল। ওপেনহাইমার তাঁর এই ঐতিহাসিক সাফল্যে শেষ পর্যন্ত কতদূর খুশী ছিলেন বলা যায় না। অসামান্য প্রতিভা, অন্তহীন আত্মজিজ্ঞাসা ওপেনহাইমারকে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জার পরিণাম সম্পর্কে উদ্বিগ্ন করেছিল। ফলে ওপেনহাইমার হন মার্কিন রাষ্ট্রকর্তাদের সন্দেহভাজন অবাঞ্ছিত। ওপেনহাইমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তিনি আমেরিকার হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণচেষ্টা ইচ্ছে করেই বিলম্বিত করেছেন। এক সময় কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, কম্যুনিজমের আদর্শের প্রতি তাঁর পক্ষপাত, এ সমস্ত তথ্যও মার্কিন সরকারের তদন্তের ফলে জানা যায়। ওপেনহাইমার বেশ কয়েক বছরের মত মার্কিন সরকারী মহলের বিবেচনায় আপত্তিকর গণ্য হন। প্রেসিডেন্ট কেনেডীর আমলে ওপেনহাইমার তাঁর নষ্ট খ্যাতি কিছুটা ফিরিয়ে পান, কিন্তু মার্কিন পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ কি অধিকার তিনি আর ফিরিয়ে পান নি।

১৯৪৫ সনে সেই হিরোশিমার প্রথম পরমাণু বোমা আর আমেরিকার একচ্ছত্র পারমাণবিক আধিপত্য থেকে এই ১৯৬৭ সনে পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা বহু দূর এগিয়ে গিয়েছে। ওপেনহাইমারের মনে পরমাণু বোমার বংশ ও ধ্বংসশক্তি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে শংকা দেখা দিয়েছিল সে-শঙ্কায় এখন পারমাণবিক শক্তিধররা নিজেরাও সমাচ্ছন্ন। এই সপ্তাহেই জেনিভায় বৈঠক বসছে, পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জা নিবারণ করা যায় কি উপায়ে সেই ভাবনা নিয়ে। ভাবনার শুরু প্রায় ১৯৪৫ সন থেকে; জল্পনা-কল্পনা, এ-পক্ষে ও-পক্ষে ঘুঁটি চালাচালি কম হয় নি, আরও হবে। ইতিমধ্যে পরমাণু বোমার দখল-কার ও দাবিদারের সংখ্যা বেড়েছে। আমেরিকা ও রাশিয়া, দুই মহাশক্তিধর যদিবা নিজেদের মধ্যে সংযম-রক্ষার বন্দোবস্ত মেনে নিতে রাজী হয়, কম্যুনিস্ট চীন কি ফ্রান্স তাতে রাজী হবে কেন? কম্যুনিস্ট চীনের কাছাকাছি যে-সব দেশ চীনের বেয়াড়া মতিগতিতে শঙ্কিত, তারাই বা কোন যুক্তিতে, কীসের ভরসায় নিজেরা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করার চেষ্টায় নিরস্ত থাকবে?

সমস্যা আরও নানাদিক দিয়ে জটিল। পারমাণবিক হাতিয়ারের মালিকানা কেবল আমেরিকা ও রাশিয়ার হাতে থাকলেই বা পারমাণবিক যুদ্ধ কখনও হবে না, সে-রকম নিশ্চয়তা কোথায়? ওপেনহাইমারের বিখ্যাত উপমাটা এ-ক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য—আমেরিকা ও রাশিয়া দুই পরমাণুশক্তিধর যেন ছিপি আঁটা শিশিতে ভরতি দুটি সাংঘাতিক বিষাক্ত কাঁকড়া বিছা, দুটিই একে অন্যের দিকে দাড়া উঁচিয়ে আছে, কিন্তু স্থির নিশ্চল ভঙ্গীতে, কারণ দুটিই জানে আক্রমণ মানেই তৎক্ষণাৎ পাল্টা আক্রমণ এবং যেহেতু কারোরই পিছু হটবার, পালাবার পথ নেই, তাই দুটিরই অনিবার্য মৃত্যু। একেই বলা হয় ব্যালান্স্ অব টেরর—সন্ত্রাসের সমতা। কাগজেপত্রে এই সমতার হিসাবটা চমৎকার; হয়ত এ-ও ঠিক যে, উভয় পক্ষই পারমাণবিক ধ্বংসের বিপদ সম্পর্কে সচেতন বলে পরমাণু বোমার ভাণ্ডার এখন পর্যন্ত যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হয় নি।

> **দু'টি বিশেষ আকর্ষণ**
>
> আগামী সপ্তাহ থেকে দেশ পত্রিকায় দু'টি অনন্যসাধারণ রচনা প্রকাশিত হবে।
>
> প্রথমটি, প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা-কাহিনী 'শজারুর কাঁটা'।
>
> দ্বিতীয়টি, বিশ্ববিশ্রুত প্রাবন্ধিক শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর প্রবন্ধ 'চীন-যুদ্ধে পরাজয়ের দায়িত্ব'।
>
> দু'টি রচনাই ধারাবাহিক প্রকাশিত হ'বে।
>
> —সম্পাদক 'দেশ'

ওপেনহাইমারের ছিপি-আঁটা বোতলের উপমা এবং তার উপর নির্ভর সন্ত্রাসের সেটি কিন্তু এখন নানা দিক দিয়ে বাতিল হতে বসেছে। প্রথমত কম্যুনিস্ট চীনের পারমাণবিক অস্ত্রশক্তি এই ছিপি-আঁটা বোতলের বাইরে। অতএব বোতল বিদীর্ণ করবার সম্ভাবনা রুশ-মার্কিন সন্ত্রাসের সমতার হিসাব উলটে দিতে পারে। আমেরিকার ধারণা পারমাণবিক অস্ত্র লাগ-সই মত ব্যবহারের ক্ষমতা চীনের এখনও নেই, সে-ক্ষমতা আয়ত্ত করতে আরও অন্তত তিন বছর। ইতিমধ্যে চীনের ঘরোয়া গোলমালে তার পারমাণবিক অস্ত্র-সজ্জার উদ্যোগ আয়োজন ব্যাহত, বিলম্বিত হওয়া সম্ভব। তাছাড়া পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগ ব্যাপারে আমেরিকা ও রাশিয়া যদি একমত, একজোট হয় তাহলে কম্যুনিস্ট চীনকে ঠাণ্ডা করা শক্ত কী? এখানেও হিসাবটা যার যেমন পছন্দমত মন-গড়া। চীনের সঙ্গে রাশিয়ার প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বাধলে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হলেও হতে পারে। • তবে চীন যতই বেয়াড়া হোক, রাশিয়া তার বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করলে এশিয়া আফ্রিকার বহু দেশ রাশিয়া সম্পর্কে শঙ্কিত হবে। এর সঙ্গে কম্যুনিস্ট বা অকম্যুনিস্ট পক্ষপাতিত্বের সম্পর্ক নেই। এশিয়ার পুরো-দস্তুর যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রবিস্ফোরণের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া কাছাকাছি সব দেশকেই বিপন্ন করবে। অপর পক্ষে চীনে কিম্বা ভিয়েতনামে মার্কিন পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারে রাশিয়া কোনও অবস্থাতেই খুশী হবে কি সায় দেবে মনে করা যায় না।

আমেরিকা ও রাশিয়ার নিজেদের মধ্যে মতবিরোধের নিষ্পত্তিই এখন পর্যন্ত হয় নি। ছিপি-আঁটা বোতলে দুই কাঁকড়া বিছার সন্ত্রাসের সমতায় কোন পক্ষই পুরোপুরি নির্ভর করতে পারছে না। পরমাণু বোমার ভাণ্ডার দুই পক্ষই বাড়িয়ে চলেছে। কিন্তু তাতেও স্বস্তি নেই। সুপার-পাওয়ারের মুকুট দুশ্চিন্তাদীর্ণ দুপক্ষেই। দশ মেগাটন বোমার চেয়ে একশ মেগাটন বোমার ধ্বংস-শক্তি পাটিগণিতের হিসাবে বেশী, কিন্তু দশ মেগাটনেই যখন নিউ ইয়র্ক অথবা মস্কো ধ্বংস করা যায় তখন একশ মেগাটনের বোমা দিয়ে কোন পক্ষেই সন্ত্রাসের শক্তি বাড়ে না। একশ মেগাটন নয় ফজলি-তর আম! কাজেই মজুদ বোমার তুলনামূলক হিসাব ফেলে রেখে এর পর শুরু দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা। শুধু বোমার কাজ নয়, বোমাকে তাকমত ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে চাই ক্ষেপণাস্ত্র। এই ক্ষেপণাস্ত্রের ভাণ্ডার আমেরিকার বেশী রাশিয়ার চেয়ে তিন গুণ। কিন্তু ক্ষেপণাস্ত্র তথা 'মিসাইল' যদি হয় ফজলি আম তবে 'অ্যান্টি-মিসাইল' অর্থাৎ

ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপক অস্ত্র হল বুদ্ধিমত্তার আর।

মিসাইলে রাশিয়ার দৌড় আর, যুদ্ধ সময় বিজ্ঞানীরা তাই বাড়ালা দিলেন ফর্মুলিতর আর, অ্যান্টিমিসাইল। রাশিয়ার এই অ্যান্টি মিসাইল নাকি আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্রকে মাঝপথে ধ্বংস করতে সক্ষম। আমেরিকার ভরসা ছিল দরকার হলে তার উন্নততর ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে রাশিয়ার পঞ্চাশটি শহর সে এক লহমায় ধ্বংস করতে পারবে। রাশিয়ার অ্যান্টিমিসাইল নাকি আমেরিকার এই নিশ্চিন্ত শ্রেষ্ঠত্বের গোড়ায় কোপ দিয়েছে। এখন উলটো ভাবনা, রাশিয়ার মিসাইলের আক্রমণ থেকে আমেরিকার বড় বড় শহর রক্ষা করা যায় কী উপায়ে? অ্যান্টি-মিসাইলের রক্ষাকবচ আমেরিকাও তৈরি করতে সক্ষম, তার 'নাইক্-এক্স' সৈনিক দিয়ে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু এর খরচ পর্বত-প্রমাণ; রাশিয়ার মিসাইলের আক্রমণ প্রতি-রোধের জন্য আমেরিকা যদি আংশিকভাবেও অ্যান্টিমিসাইলের ব্যূহ গড়তে যায় তবে সে-বাবদ খরচের ধাক্কা পড়বে পাঁচ বছরে কমসে-কম সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা। মার্কিন যুদ্ধবিশারদরা, অস্ত্র নির্মাণ-ব্যবসায়ীরা এতে যতই উৎসাহী হোন না কেন, মার্কিন রাষ্ট্রকর্তারা খরচের বহর দেখে থমকে আছেন।

পরমাণু বোমা, মিসাইল, অ্যান্টি-মিসাইল, এ-পক্ষে ওপক্ষে সন্ত্রাসের সমতা রক্ষায় নিখুঁত হিসাব গুলিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে অন্তহীন [illegible]। সেইটিকেই বুঝবার দুর্ভাবনা। ভাবনার [illegible] মার্কিন যুক্ত পক্ষ না হয় অ্যান্টিমিসাইলের রক্ষাকবচ ধারণ করে নিজেদের নিশ্চিন্ত করল, য়ুরোপ-এশিয়ার স্বল্প-সম্বল দেশ-গুলিকে পারমাণবিক বিভীষিকা থেকে রক্ষা করবে কে? বুরিদানের গাধাটির দুই দিকে ঠিক সমান সমান দূরত্বে সমান সমান সাইজের দুটি ঘাসের বোঝা রাখা হয়েছিল; গাধাটির চোখে দুদিকই ঠিক সমান আকর্ষণ। তাই কোন দিকের ঘাসের বোঝায় সে মুখ দেওয়ার প্রেরণা পায় নি। পরিণাম মৃত্যু। পারমাণবিক সন্ত্রাসের সমতারক্ষার প্রাণান্ত চেষ্টার পরিণামও কি তাই?

২০।২।৬৭

ভারতের বৃহত্তম জাতীয় লটারির খেলা শেষ।
প্রথম পুরস্কার কার ভাগ্যে?

সুনন্দর জার্নাল

'পূর্ব' ও পশ্চিমবাংলা সেমিনার'

এই লেখাটুকু যখন আপনাদের হাতে গিয়ে পৌঁছুবে, তখন কলকাতায় পূর্ব আর পশ্চিম বাংলা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সেই সম্মেলন কতখানি সফল হবে জানি না, কারণ যতটুকু খবর পেয়েছি, পূর্ব বাংলার লেখকেরা এতে যোগ দিতে পারবেন না। অন্তরায় মানসিকতা নয়—রাজনীতি। আর এই রাজনীতি যখন অন্ধ আর নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে, তখন তার চাইতে বীভৎসতর বস্তু আর কল্পনাও করা যায় না। প্রাণকে ধ্বংস করে দেওয়াই তখন সেই একচক্ষু গরুগনের একমাত্র লক্ষ্য।

রাজনীতি-চর্চার দুঃসাহস রাখি না। কিন্তু সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করি, এই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব বাংলার যে ইতিহাস রচিত হয়েছিল, তা সমস্ত রাজনীতি, সব সীমান্ত-সমস্যা, সব পাসপোর্ট আর ভিসা আর চেকপোস্টকে অতিক্রম করে দুই বাংলার হৃদয়কে যুক্ত করে দিয়েছিল, পদ্মার কল্লোলোচ্ছ্বাস এসে আছড়ে পড়েছিল গঙ্গার বুকে। সেই হৃদ-সংযোগ ব্যর্থ হয় নি, সুদূর কাশ্মীরের কুটিল সমস্যা তাকে আজও বিভ্রান্ত করে তুলতে পারে নি। আজ কলকাতায় পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলা সংস্কৃতি সেমিনার—কিছু বিলম্বিত হলেও, মিলিত হৃদয়ের সেই শপথকে নতুনভাবে চিহ্নিত করল। উদ্যোক্তারা দীন বাঙালী সুনন্দর অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, বেশ কয়েক বছর আগে শান্তিনিকেতনের 'সাহিত্য-মেলা'য় পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার কিছু কিছু লেখক এক আনন্দিত উৎসব-পরিবেশে একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। সেই মেলায় উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য ঘটেছিল। বাংলা বিচ্ছেদের পরে সেদিন যেন প্রথম অনুভব করা গিয়েছিল, ভৌগোলিক ব্যবধানের মধ্য দিয়ে হৃদয়কে বিভক্ত করা যায় না। এই হৃদয় হল সংস্কৃতি—মাতৃভাষা তার রক্তবাহী ধমনী।

ধর্ম মানুষকে স্বতন্ত্র করতে পারে, সম্প্রদায়বুদ্ধি এবং রাজনীতি তাকে খণ্ডিত করতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। সে তার ইতিহাস, তার উত্তরাধিকার। মানুষের পূর্ণতার ইতিবৃত্ত গড়ে ওঠে তার বিজ্ঞানচেতনা আর সংস্কৃতির বিবর্তনে আর সেই বিবর্ত-চক্রে যা একদিন ধর্মীয় সংকীর্ণতায় সীমিত ছিল, তা ঐতিহ্যের চিরকালীন সম্পদে পরিণত হয়ে যায়। হিন্দু-বৌদ্ধের বিরোধ একদা এই দেশে চূড়ান্ত তিক্ততা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সেই সাম্প্রদায়িক হিংস্রতাকে নিঃশেষ করে নালন্দা - সারনাথ - বৈশালী - কপিলাবাস্তু-নাগার্জুন কুণ্ডাকে সর্বজাতীয় তীর্থে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে, আজ বৌদ্ধ-সাহিত্যকে প্রাচীন হিন্দু সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন বলে চিন্তাও করা চলে না। একদা ক্রিশ্চিয়ান কালাপাহাড়ের দল হাতুড়ি হাতে ইয়োরোপের প্যাগান মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করবার তাণ্ডবে মেতে উঠেছিল, আজ পার্থেননের দিকে তাকিয়ে তাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে, ঈজিয়ানের নীল অতলে তারা হারানো মূর্তিগুলোর সন্ধান করে বেড়ায়। একদিন নররক্তকে চূর্ণ করবার আনন্দে যারা আলহাম্‌রার 'কোর্ট অব লায়নস'-এর শ্বেতমর্মরকে রক্তে স্নান করিয়েছিল, আজ গ্রানাদার শিল্পকলা তাদের চিরকালের গৌরব।

এই ঐতিহ্য-চেতনাকে রাজনৈতিক স্বার্থ এবং বিদ্বেষবোধ নিয়ে সমূলে বিনাশ করবার যে চক্রান্ত সেদিন পূর্ব বাংলায় দেখা দিয়েছিল, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী সে দেশের অগ্রনায়ক ছাত্র-সমাজ এবং জনসাধারণ তার সমুচিত উত্তর দিয়েছিলেন— রক্তে স্নান করিয়ে গড়ে তুলেছিলেন "শহীদ মিনার"—তাদের জয়স্তম্ভ।

এই জয় শুধু তাঁদের নয়—তা সমগ্র বাঙালীর, তা বাংলা ভাষার, বাংলার সংস্কৃতির। তাই ২১শে ফেবরুয়ারী পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলা সংস্কৃতি সেমিনার একটি জাতীয় তিথির উদ্‌যাপন।

কারণ যাই থাকুক, ভারতবর্ষকে বিভক্ত হতে হয়েছে—পাঞ্জাব এবং বাংলা দেশকে দ্বিখণ্ডিতরূপে দুই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে হয়েছে। কিন্তু যে উর্দুর আক্রমণে পূর্ব বাংলাকে একদিন আত্মরক্ষায় জীবনপণ করতে হয়েছিল, সে উর্দু আজও বিহারে, ভারতীয় পাঞ্জাবে, যুক্তপ্রদেশের একটা বৃহদংশে এবং হায়দ্রাবাদে জাগ্রত আর জীবন্ত ভাষা—উর্দুর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্ভার আজও ভারতে না পশ্চিম পাকিস্তানে রচিত হয়, তার হিসাব করতে গেলে আমরা চমকে উঠব। ফার্সী লিপিতে লেখা যে সংস্কৃত গীতা নিষ্ঠাবান পাঞ্জাবী হিন্দু আজও নিয়মিত পাঠ করে থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের অমর বাণী 'যাবনিক' অক্ষরে বিন্দুমাত্রও অপবিত্র হয়েছে এমন বোধ তাঁর স্বপ্নেরও বাইরে। ভারত নয়, পাকিস্তান নয়—উর্দু ভাষা, লিপি এবং সাহিত্য যে বিপুল মানব-মনকে অধিকার করে আছে, সেখানে মাত্র একটি সত্যেরই আধিপত্য—সে তার সংস্কৃতি, তার ঐতিহ্যগত সম্পদ।

বাংলা দেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে—হোক। কিন্তু সংস্কৃতিকে কে বিচ্ছিন্ন করতে পারে? একদিন রাজনৈতিক এবং অর্থনীতিগত প্রশ্নে নির্মম রক্তপাত আর সুকঠিন বিদ্বেষের পথ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও ইংল্যাণ্ডের নাগপাশ ছিন্ন করতে হয়েছিল, কিন্তু ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্যের উত্তরাধিকার সে এক মুহূর্তের জন্যও তো ভুলতে পারে নি। ইংরেজী ভাষার অগণ্য শ্রেষ্ঠ মনীষাকে আজ কি মার্কিনী বলে বর্জন করা সম্ভব? 'ঈস্ট কোকারে' যাঁর পূর্বপুরুষের আদিম বাস্তু, কে বিচার করবে সেই এলিয়ট ইংরেজ, না আমেরিকান—ন্যাশনালিটির নিয়ম-রক্ষা সত্ত্বেও? এবং হেন্‌রি জেমস? জর্মানীতে জাত নন বলেই কি জর্মান সাহিত্য ফ্রানৎস কাফকার ওপরে তার দাবি ছেড়ে দেবে? বেল্‌জিয়ান বলে কি এমিল ভার্‌আয়রেনের ফরাসী সাহিত্যে কোনো ভূমিকা থাকবে না? ইকবাল কি মাত্র পাকিস্তানের জাতীয় কবি—তিনি ভারতীয় সাহিত্যের কেউ নন?

তাই সব রাজনীতির বাইরে দাঁড়িয়ে, সাংস্কৃতিক ঐক্যে, চিন্তা এবং হৃদয়গত সহযোগে, পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলার মিলিত সাহিত্য সমারোহ ঘটুক। আসুক উভয় বঙ্গীয় কবি সম্মেলন, হোক যুক্ত চিত্র-প্রদর্শনী, শিল্প এবং সাহিত্যের প্রতিনিধিরা দুই দেশে 'শুভেচ্ছা সফর' করুন—আরো গভীর, আরো নিবিড়তর ভাব-বিনিময় ঘটুক।

পৃথিবীর প্রধানতম ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা একটি এই মর্মে একটি সংবাদ কিছুদিন আগে খবরের কাগজে চোখে পড়েছিল। বলা অনাবশ্যক, এই কৃতিত্ব খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গের নয়—পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রভাষাই তাকে এই গৌরব এনে দিয়েছে। এই গৌরবের দায়িত্ব বহন করতে হবে যৌথভাবে, আর দুই বাংলার সাংস্কৃতিক সংযোগই তার উপায়ন। পশ্চিম বাংলায় আমাদের মনের কথা যদি স্পষ্ট হয়ে না থাকে—২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সালে পূর্ব বাংলা তার বক্তব্য বজ্ররবে জানিয়ে দিয়েছে—ঢাকায় 'মহানগর' চল-চ্চিত্রের প্রদর্শনী সেই সংকল্পেই নতুন স্বাক্ষর রেখেছে।

এইবার আমাদের কথা বলবার সময় এসেছে। পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলা সংস্কৃতি সেমিনারের প্রথম অনুষ্ঠান তারই সূচনা। এই শুভযোগকে যেন আমরা ব্যর্থ হতে না দিই।

উদ্যোক্তাদের আবার আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মাছ ধরা
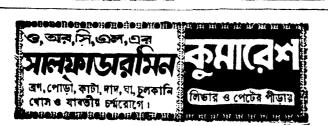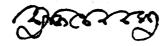
সে করে মাছের চাষ। আছে এক নিজস্ব পুকুর।
এই তার জীবিকা, বিনোদ, প্রেম, দৈনিক জোয়াল।
ছিপ ফেলে ব'সে থাকে উদয়াস্ত, যেন অনুপস্থিত, সুদূরে।
মনে হয় ঘাই মারে মহাশোল, ডিম ছাড়ে রাঘব বোয়াল।

অদ্ভুত পুষ্যির ঝাঁক! যুদ্ধে পাকা, ভাঁওতা দেয় রোজ।
তবু তারই ব'ড়শিতে বিহ্বল গলা বেঁধাবে—নচেৎ
পাতালে সেঁধিয়ে হবে বেমালুম বেপাত্তা, নিখোঁজ;
বুদ্বুদে ভঙ্গিতে ঢেউয়ে তারই জন্য বার-বার পাঠায় সংকেত।

হঠাৎ কখনো রৌদ্র দীর্ণ করে গহন অন্দর,
মুহূর্তে মিলিয়ে যায় নগ্নতার উজ্জ্বল উদ্ভাসে;
কিংবা দেয় হাওয়া, জল উল্টে যায় অবোধ উচ্ছ্বাসে,
মুহূর্তে বিলিয়ে যায় অসামান্য নিতম্ব, উদর।

—মাছ? না কি জ্বলন্ত জলের শাঠ্য? স্বপ্নে-পাওয়া ইচ্ছার উত্তর?
কিন্তু ফের কাঁপে জল রূপ নেয় বিশ্বাস্য বাস্তবে:
ঐ তো সপ্রাণ রশ্মি, লোভনীয়, বাড়ন্ত, সুন্দর,
ভেসে উঠে ডুবে যায়। তাকে আরো দক্ষ হ'তে হবে।

কিন্তু মাছ ধরা বড়ো শক্ত কাজ। দেয় হানা রাক্ষস ভোঁদড়।
মাঝে-মাঝে অজন্মা বছর যায়। কখনো বা বাতে সে অক্ষম।
কিংবা প্রতিযোগিতায় ধূর্ত মাছ আরো ধুরন্ধর।
চেষ্টা তাকে তবুও দেয় না ছুটি। চাই ধৈর্য, বড়ো বেশি শ্রম।

অগত্যা সে স্বার্থপর। দুটি কাজ অত্যন্ত জরুরি:
দৈনন্দিন খেয়ে-প'রে মোটামুটি স্বাস্থ্য ভালো রাখা,
আর এই প্রবঞ্চক দেহ নিয়ে চঞ্চল সংসারে বেঁচে থাকা।
—সব পণ্ড হবে, যদি মৃত্যু তাকে অকস্মাৎ ক'রে নেয় চুরি।

১

ভারত-বিদ্যা বা ইণ্ডোলজি এবং ব্যাপক অর্থে প্রাচ্য-বিদ্যা বা ওরিয়েণ্টালিজম প্রথম অংকুরিত হয়েছিল কলকাতায় ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। স্যার উইলিয়াম জোন্স কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে প্রাচ্যবিদ্যাকে বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেননি। এশিয়াটিক সোসাইটি বিশ্ববিদ্যালয় নয়। সোসাইটির সৃষ্টি হল 'for the purpose of inquiring into the history and antiquities, arts, sciences and literature of Asia'. সেখানে 'inquiry' হত, অধ্যাপনা হত না। অধ্যাপকের আর যত দোষই থাক, বিদ্যাকে সর্বত্রগামী করবার দায়িত্ব অধ্যাপকেরই। ছাত্রের মালাপথ দিয়ে অধ্যাপকের বিদ্যা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে, দেশ থেকে যায় বিদেশে। শুধু বর্তমান কালের মধ্যেই তা আটকে থাকে না। ছাত্রের সোপান বেয়ে সে-বিদ্যা পৌঁছয় অনাগত কালের কাছে। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটীর জমিতে তাই যে-বীজ বোনা হয়েছিল তা ফসল হয়ে ভরে উঠল তখনই, যখন প্রাচ্য-বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হল। এই ফসল ফলাবার ক্ষেত্রে প্রাচ্য-সম্পদের [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় কিছু কম করে নি—বার্লিন, প্যারিস, সেণ্ট পিটার্সবার্গ, লাইডেন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন, এককালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও এই কাজে দায়িত্বপূর্ণ অংশ ছিল। তবে যে-উদ্দেশ্যে স্যার উইলিয়াম জোন্স এবং তাঁর সহযোগীরা কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই উদ্দেশ্যকে ব্যাপকতা এবং সার্থকতা দিয়েছে একটি প্রতিষ্ঠান—'লণ্ডনের স্কুল অফ ওরিয়েণ্টাল অ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' (সংক্ষেপে স্কুল)। কলকাতার সোসাইটীতে যে-কাজের সূচনা হয়েছিল, লণ্ডনের স্কুলে সেই কাজের পূর্ণতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অসংযুক্ত ছিল বলে সোসাইটী যা করতে পারে নি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হয়ে স্কুল তাই করেছে। স্কুল সোসাইটির বর্ধিত রূপ, সম্পূর্ণ রূপ। তাই স্কুলের যথার্থ উৎস ভারতবর্ষে, কলকাতায়।

২

১৯৬৭ সালের ১৭ই জানুয়ারী স্কুলের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। এই উপলক্ষে স্কুল প্রতিষ্ঠার পূর্বইতিহাস এবং সেই প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডে প্রাচ্য বিদ্যা—বিশেষ করে ভারত-বিদ্যা—প্রসারের ইতিহাসের উপর একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটীর আদর্শে ইংল্যাণ্ডেও এশিয়াটিক সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। এই সোসাইটীর সদস্যরাই সর্বপ্রথম লণ্ডনে ওরিয়েণ্টাল স্কুল স্থাপনের আন্দোলন করেছিলেন। আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৮৫২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটীর সভায় প্রফেসর উইলসনের একটা বক্তৃতা থেকে। বক্তৃতাটির নাম 'On the present state of the Cultivation of Oriental literature'. উইলসন তখন সোসাইটীর ডিরেক্টর (এখনকার প্রেসিডেণ্টের মত)। তাঁর বক্তব্য ছিল—অচিরে ইংল্যাণ্ডে প্রাচ্য-বিদ্যা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত না হলে প্রাচ্য-বিদ্যায় ইউরোপের অন্যান্য দেশ ইংল্যাণ্ডকে ছাড়িয়ে যাবে (দ্র এশিয়াটিক সোসাইটী জার্নাল, ১৮৫২, পৃঃ ২১৪)। উইলসনের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। প্রাচ্য-বিদ্যার ভিত ইংরেজই গড়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তান্তরিত হওয়ার পর থেকে এবিষয়ে ইংরেজের আগ্রহ ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছিল। প্রাচ্য-বিদ্যার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল বার্লিন, পিটার্সবার্গ, প্যারিস। প্রাচ্য-বিদ্যার নেতৃত্ব ক্রমশ জার্মানের হাতে চলে যাচ্ছিল। নীচের নামাবলীর উপর

চোখ বোলালেই বোঝা যাবে জার্মানদের মধ্যে ভারত-বিদ্যার 'অ্যাকাডেমিক ট্রাডিশান' কি মুখ্যভাবে গড়ে উঠেছিল। Franz Bopp (১৭৯১-১৮৬৭), F. A. Rosen (১৮০৫-১৮৩৭), Otto von Bohtlingk (১৮১৫-১৯০৪), R. von Roth (১৮২১-১৮৯৫), C. Lassen (১৮০০-১৮৭৬), S. T. Aufrecht ১৮২২-১৯০৭), F. Mox-Muller (১৮২৩-১৯০০), A. Weber (১৮২৫-১৯০১), G. Buhler (১৮৩৭-১৮৯৮), L. F. Kielhorn (১৮৪০-১৯০৮), J. Eggeling (১৮৪২-১৯১৮), R. Pischel (১৮৪৯-১৯০৮), H. G. Jacobi (১৮৫০-১৯৩৭), L. von Schroeder (১৮৫১-১৯২০), K. F. Geldner (১৮৫২-১৯২৯), J. Wackernagel (১৮৫৩-১৯৩৮), H. Oldenberg (১৮৫৪-১৯২০), C. Bartholomae (১৮৫৫-১৯২৫), L. W. Guger (১৮৫৬-১৯৪০), R. O. Franke (১৮৬২-১৯২৮), M. Winternitz (১৮৬৩-১৯৩৭)। এর চেয়েও বড় কথা, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের চেয়ার হল ১৮৩৩ সালে। কিন্তু সেই চেয়ারে প্রথম ইংরেজ নিযুক্ত হলেন ১৮৮৫ সালে। এর আগে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই বিদেশী—Rossen, Goldstuker, Eggeling, Hass; এ'দের মধ্যে এক Hass ছাড়া সকলেই জার্মান। এডিনবরায়ও সংস্কৃতের চেয়ার ছিল উনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে, সেখানকার চেয়ারও বহুকাল জার্মানের অধিকারে ছিল—Aufrecht, Weber এবং Eggeling। অক্সফোর্ডের সংস্কৃতের চেয়ার Max Muller-এর প্রাপ্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির কলকাঠিতে তিনি সংস্কৃতের চেয়ার পেলেন না, তুলনা-মূলক ধর্মতত্ত্বের চেয়ার পেলেন। সেন্ট পিটার্সবার্গে Roth এবং Bohtlingk যে বৃহৎ সংস্কৃত অভিধান সংকলনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন উইলসন তার সংবাদ নিশ্চয়ই জানতেন। এইসব বিবেচনা করেই এশিয়াটিক সোসাইটীতে তাঁর বক্তৃতায় ইংল্যাণ্ডে প্রাচ্য-বিদ্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উইলসন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। উইলসন তাঁর বক্তৃতায় সূত্রটি ধরিয়ে দিলেন। কাজ বিশেষ এগোল না বটে, কিন্তু ধীরে ধীরে আন্দোলন দানা বাঁধতে লাগল। ১৮৫৭-৫৮ সালে Max Muller স্যার চার্লস ট্রেভিলিয়ানের সাহায্যে "Institution for the Cultivation of Asiatic Languages" নামে একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজে অনেক দূর এগিয়েছিলেন (দ্রঃ Raey Report, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৪৫), কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। এখানে উল্লেখযোগ্য ওরিয়েন্টাল স্কুল স্থাপনের কথাটা যখন ইংল্যাণ্ডের পণ্ডিত আর সম্ভ্রান্ত সমাজে ঘোরাঘুরি করছে তখন অক্সফোর্ডের Boden অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ামস 'for the promotion of Indian Study' অক্সফোর্ডে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য ১৮৭৫-৭৬, ১৮৭৬-৭৭, ১৮৮৩-৮৪ সালে ভারতবর্ষে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। উইলসনের ছাত্র মনিয়র উইলিয়ামস ১৮৬০ সালে উইলসন অবসর গ্রহণ করলে Boden অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সম্ভবত মনিয়র উইলিয়ামস সূত্রটি পেয়েছিলেন লণ্ডনে

ওরিয়েণ্টাল স্কুল স্থাপনের আশা সুদূর-পরাহত। অগত্যা একক চেষ্টায় ওরিয়েণ্টাল স্কুলের বিকল্প ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য তিনি অর্থ সংগ্রহের কাজে লেগে গিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের রাজা মহারাজারা প্রচুর অর্থ দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত অক্সফোর্ডে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়েছিল।
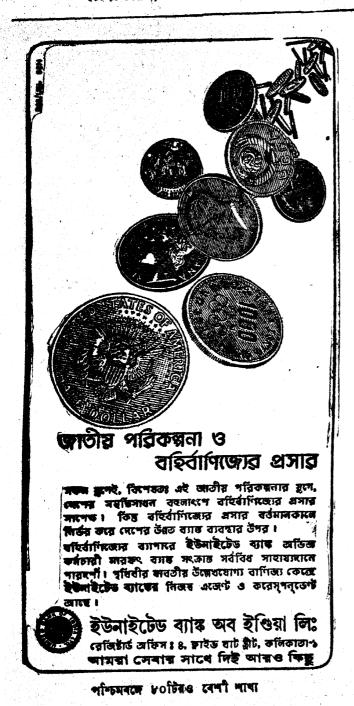
এদিকে লণ্ডনে ওরিয়েণ্টাল স্কুলের জন্য আন্দোলন চলছে, কিন্তু আশার আলো কোথাও জ্বলছে না। ১৮৮৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটীর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি Henry yule ইংল্যাণ্ডে প্রাচ্য-বিদ্যার "deplorably low ebb"-এর কথা বলে একটি কমিটী গঠন করলেন (দ্রঃ এশিয়াটিক সোসাইটী জার্নাল, ১৮৮৬, পৃঃ IV)। কমিটীর অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে দুজন হলেন—সিসিল বেণ্ডল এবং মনিয়র উইলিয়মস। কমিটীর কাজ হল: 'to Consider the best means for the promotion of Oriental Studies in England'; এখানে বলা দরকার যে কমিটী Oriental Studies অর্থে বুঝেছিলেন ভারত-বিদ্যা, প্রাচ্য-বিদ্যা নয়। অনুসন্ধানের পর কমিটী জানালেন যে, ইংল্যাণ্ডে ভারত-বিদ্যা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা যৎসামান্য। ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ব্যবস্থা আছে তা এদেশের তুলনায় ভালো। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সামান্য দু-একটা পদ আছে সেগুলি পূরণের জন্য বিদেশ থেকে লোক আনতে হয়, ইংল্যাণ্ডে যোগ্য লোক পাওয়া যায় না (দ্রঃ জার্নাল, ১৮৮৭, পৃঃ ৩৪৭)। এর পরের বছরের বার্ষিক অধি-বেশনে স্থির হল ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটের সংগে সংযুক্ত করে একটা স্কুল খোলা হবে। School of Modern Oriental Studies নাম দিয়ে স্কুল খোলা হল। জনৈক [illegible] বক্তৃতা দিয়ে Max Muller স্কুলের উদ্বোধন করলেন (দ্রঃ [illegible] Report, পরিশিষ্ট)। কিন্তু এশিয়াটিক সোসাইটীর সভারা যা আশা করেছিলেন তা হল না। যে Oriental School তাঁদের কল্পনায় ছিল বাস্তবের সংগে তা মিলল না। ১৮৯৪ সালের পর থেকে তাই সোসাইটীর জার্নালের পাতা ওল্টালেই দেখা যাবে প্রতি বার্ষিক অধিবেশনে London Oriental School সম্বন্ধে সদস্যরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, অবস্থার উন্নতির জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

১৮৯৭ সালে প্রফেসর Salmone সোসাইটীতে আবার একটা প্রবন্ধ পড়লেন। বিষয় "On the Importance to Great Britain of the establishment of a

পুরোনো বাড়িতে স্কুলের লাইব্রেরী

School of Oriental Studies in London" (দ্রঃ জার্নাল, ১৮৯৮, পৃঃ ২১২-২১)। পুরনো প্রস্তাব আবার নতুন করে গৃহীত হল। এই সময় আর একটা ঘটনা ঘটে গেল। সোসাইটীর সদস্যরা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৮৯৮'-এর প্রণেতাদের কাছে আবেদন পাঠালেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'Faculty of Oriental Languages, History and Archaeo-logy' যুক্ত করবার জন্য। সে আবেদন মঞ্জুর হল না (দ্রঃ জার্নাল ১৯০০, পৃঃ ৫৮৮)। এরপর ১৯০৫ সালে সোসাইটীর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি গ্রীয়ার্সন পুনর্বার ওরিয়েণ্টাল স্কুল প্রতিষ্ঠার 'crying need'-এর কথা সজোরে ব্যক্ত করলেন (দ্রঃ জার্নাল, ১৯০৫, পৃঃ ৫৯২)। গ্রীয়ার্সনের কথায় কাজ হল। ঐ বছরই নভেম্বর মাসে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে প্রস্তাব হল—"That a Committee be appointed to consider the re-organisation of Oriental Studies in the University and to suggest a scheme therefor." প্রস্তাব সেনেটে গৃহীত হল। তারপরের ইতিহাস সরল কিন্তু সংক্ষিপ্ত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব অনুসারে একটা কমিটী হল। সেই কমিটীর সুপারিশ আরও বহু কমিটীর হাতে হাতে ঘুরল। সেই সময় বৌদ্ধশাস্ত্র এবং পালি ভাষার সুপণ্ডিত রিসডেভিডস বৃটিশ অ্যাকা-ডেমিতে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বিষয় ছিল 'Oriental Studies in England and abroad'-এই বক্তৃতার বিষয়ও কমিটীর প্রস্তাবের সঙ্গে সরকারের কাছে গেল। প্রস্তাব নিয়ে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল প্রতিনিধি। প্রস্তাব উপস্থাপিত হল প্রধানমন্ত্রী Sir Henry Cambell-Bannerman-এর কাছে। সরকার আর একটি কমিটীর উপর অনুসন্ধানের ভার দিলেন। কমিটীর সভাপতি হলেন Lord Reay। কমিটী ইউরোপের প্রাচ্য-বিদ্যার এনসাইক্লোপিডিয়া তৈরি করলেন। অসংখ্য লোকের সাক্ষ্য নেওয়া হল। কয়েকজনের নাম বলি—সিলভ্যান লেভি, গ্রীয়ার্সন, এফ ডবলু টমাস, এল ডি বার্নেট, জে এফ ব্লুমহার্ট ইত্যাদি। একুশ দিন ধরে কমিটী বাহাত্তরজন লোককে জিজ্ঞাসা করলেন লণ্ডনে ওরিয়েণ্টাল স্কুল হওয়া উচিত কিনা, হলে কি ধরনের স্কুল হওয়া উচিত। কমিটী ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ওরিয়েণ্টাল স্কুলের বিবরণ সংগ্রহ করলেন. অস্ট্রিয়া, প্যারিস, বার্লিন, হল্যাণ্ড, ইটালী: রাশিয়া ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রাচ্য ভাষার

সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংগ্রহ করা হল—ভাষার প্রকৃতি, উপভাষা কতগুলি, কত লোকে ভাষা ব্যবহার করে, ভাষায় সাহিত্য আছে কিনা, কেন লণ্ডনে সেই ভাষা শিক্ষা দেওয়া হবে। কমিটীর সামনে যাঁরা সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং পত্রযোগে কমিটী যাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন (যেমন কলকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল ডেনিসন রস) তাঁদের কাছ থেকে কমিটী এই কয়টি বিষয় জানতে চেয়েছিলেন—লণ্ডনে ওরিয়েণ্টাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা, কি ধরনের স্কুল হওয়া উচিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া উচিত কিনা ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এশিয়াটিক সোসাইটীর সদস্যরা এতদিন ধরে যে-ওরিয়েণ্টাল স্কুলের জন্য আন্দোলন করছিলেন সে-স্কুলের স্বরূপ কিরকম হবে তা তাঁরা কোথায়ও ব্যক্ত করেন নি। কিন্তু Reay Committee (এই কমিটীকে ট্রেজারি কমিটীও বলা হয়) ভাবী স্কুলকে ভাষা-শিক্ষার স্কুল হিসাবে দেখছিলেন এবং তাঁদের মূল প্রশ্ন ছিল—প্রাচ্য ভাষা শিখে সিভিলিয়ানরা উপকৃত হবেন কিনা, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হবে কিনা। আমি যতদূর বুঝেছি তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এই সব প্রয়োজন এবং সুবিধার দিকগুলির উপর এশিয়াটিক সোসাইটীর সদস্যরা বিশেষ গুরুত্ব দেন নি। তাঁরা চেয়েছিলেন গবেষণা কেন্দ্র 'Language teaching centre' নয়। কিন্তু Reay কমিটী সরকারকে জানালেন যে শাসনকার্যে এবং ব্যবসায়িক প্রয়োজনে যাঁরা প্রাচ্যদেশে যাবেন তাঁরা প্রাচ্য ভাষায় অভিজ্ঞ হলে রাজকার্য এবং বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হতে পারবে। সেই কারণে লণ্ডনে ওরিয়েণ্টাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই স্কুলে আধুনিক কথ্যভাষা এবং ক্লাসিক্যাল ভাষা উভয়ই শিক্ষা দেওয়া হবে। এবং এই স্কুল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল হিসাবে গণ্য হবে। Reay রিপোর্ট হাউস অফ কমন্স ও হাউস অফ লর্ডস-এ গৃহীত হল। ওরিয়েণ্টাল স্কুলের জন্ম হল। পঞ্চাশ বছরের উদ্যম ও আন্দোলন সফল হল। প্রাচ্য বিদ্যার বিভিন্ন শাখা সমভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করল। গ্রীক-ল্যাটিন আর বাংলা-হিন্দী-হাউসা-সোয়াহিলী একাসনে বসল। পূর্ব আর পশ্চিম মিলল। প্রাচ্যবিদ্যার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হল।

(৩)

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরিয়েণ্টাল স্কুল স্থাপনার অনেক আগেই ভারতবর্ষে এবং ইংল্যাণ্ডে প্রাচ্য-বিদ্যা পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়েছিল। একাধিকবার ওরিয়েণ্টাল স্কুলও স্থাপিত হয়েছিল। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০-১৮৫৪) প্রাচীনতম ওরিয়েণ্টাল স্কুল। ১৫জন ইংরেজ এবং ১১০ জন দেশীয় শিক্ষক নিয়ে এই স্কুল শুরু হয়েছিল। (এই স্কুলের প্রথম চার বছরের বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যাবে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত The College of Fort William in Bengal (১৮০৫) নামক পুস্তিকায়)। সমষ্টিগতভাবে ভারতীয় ভাষার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এই প্রথম। এই স্কুল মাত্র ৫৪ বছর টিকে ছিল বটে তবে সেই অল্প সময়ের মধ্যেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ যে-কোন ভারতীয় ভাষার ইতিহাসে নতুন যুগ সৃষ্টি করেছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে বাদ দিয়ে কোন ভারতীয় ভাষার ইতিহাস লেখা হতে পারে না। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মত ইংল্যাণ্ডে হার্ট-

ফোর্ডশায়ারের হেইলবেরীতেও প্রাচ্যভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজ (১৮০৬—১৮৫৭) নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কলেজে প্রাচ্য ভাষা অধ্যাপনার জন্য ৭ জন শিক্ষক ছিলেন। ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত অন্যান্য ভাষার সঙ্গে এই কলেজে বাংলাও পড়ান হত। বাংলার অধ্যাপক ছিলেন জনসন নামে একজন ভদ্রলোক। পরে উইলসনের পরামর্শে বাংলা তুলে দিয়ে সংস্কৃত পড়াবার ব্যবস্থা হয়েছিল (দ্রঃ The Bengali Reader, (ভূমিকা), Duncun Forbes, ১৮৬২)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কলকাতায়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজ হার্টফোর্ডশায়ারে। লণ্ডনের প্রথম ওরিয়েণ্টাল স্কুল বলা যায় ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউশানকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আনুকূল্যে ১৮১৮ সালে স্কুলটি খুলেছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল John Gilchrist; তবে এই স্কুল ১৮২৬ সালের পর আর চলেনি।

অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ-এডিনবরায় সংস্কৃতের চেয়ার ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক থেকে, এ কথা আগেই বলেছি। লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজ (১৮২৬) এবং কিংস কলেজ (১৮২৯) প্রতিষ্ঠিত হলে এই দুই কলেজেও প্রাচ্যভাষা অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইউনিভার্সিটি কলেজে সংস্কৃতের চেয়ার হল ১৮৩৩ সালে। অবশ্য এই কলেজে সংস্কৃতের চেয়ার ১৮২৬ সাল থেকেই ছিল, তবে অন্য নামে। প্রথমে Oriental Literature, পরে ১৮৩১ সালে Oriental Language। ১৮২৭-এ এই চেয়ারে নিযুক্ত হয়েছিলেন একজন ২২ বছরের জার্মান যুবক, নাম F. A. Rosen। একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংস্কৃতের অধ্যাপক সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলতে চাই। Rosen সংস্কৃত শিখেছিলেন বার্লিনে। বিখ্যাত পণ্ডিত Bopp ছিলেন তাঁর গুরু। ১৮২৭ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি সংস্কৃতের প্রফেসর নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু চার বছর পরে ১৮৩১ সালে তিনি পদত্যাগ করে একাধিক কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় Haughton-এর সংস্কৃত-বাংলা অভিধানখানি তিনি সংশোধন এবং পরিবর্ধন করে প্রকাশযোগ্য করেছিলেন। Rosen আবার ইউনিভার্সিটি কলেজে যোগ দেন ১৮৩৩ সালে নূতন সংস্কৃতের প্রফেসর রূপে। মাত্র ৩২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে (১৮৩৭) তিনি ইউনিভার্সিটি কলেজের সংস্কৃতের চেয়ারে আসীন ছিলেন। Rosen-এর দুটি গবেষণাকার্য উল্লেখযোগ্য—ঋগ্বেদের লাটিন অনুবাদ (এশিয়াটিক সোসাইটী প্রকাশিত, ১৮৩৮) এবং কোলব্রুকের বিবিধ প্রবন্ধাবলী সম্পাদনা (২ খণ্ড, ১৮৩৭)। ইউনিভার্সিটি কলেজের সংস্কৃতের চেয়ারের বংশ-লতিকা এই রকম: Rosen—Goldstuker (১৮৫০)—Eggeling (১৮৭২)—Hass (১৮৮৩)—Bendall (১৮৮৫)। ১৯০৩ পর্যন্ত Bendall এই চেয়ারে ছিলেন। সংস্কৃত ছাড়া, ইউনিভার্সিটি কলেজে অন্যান্য প্রাচ্য-ভাষায় চেয়ার ও রীডারশিপ ছিল—১৮৫২ সালে হিন্দুস্থানী এবং তেলেগুর চেয়ার, এবং তার দুই বছর পরে তামিল, আরবী, ফার্সী এবং গুজরাটীতে রীডারশিপ, ১৮৫৯ সালে বাংলা এবং ভারতীয় আইনশাস্ত্রে রীডারশিপ এবং ১৮৭১ সালে পালি ও বৌদ্ধশাস্ত্রে চেয়ার। ১৮৮২ সালে ইউনিভার্সিটি

কলেজের প্রাচ্য-বিদ্যা বিভাগ নতুন করে গড়া হল। এই বছরই বাংলার অধ্যাপক হয়ে এলেন ব্লুমহার্ট। এর আগে ইউনিভার্সিটি কলেজে একাধিক বাঙালী বাংলা পড়িয়েছেন; তাঁদের একজনের নাম দেখছি গণেন্দ্র ঠাকুর। এই কলেজেই রমেশচন্দ্র দত্ত কিছুকাল ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়েছেন।

ইউনিভার্সিটি কলেজের মত কিংস কলেজেও প্রাচ্য-বিদ্যা অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। এই কলেজের প্রথম Oriental literature and language-এর অধ্যাপক ছিলেন Felix Sedda, পরে ১৮৩৭ সাল থেকে Duncun Forbes। তখনকার রীতি অনুসারে একজন অধ্যাপক একাধিক ভাষা পড়াতেন। Forbes আর কি পড়াতেন জানি না। তবে ১৮৫৭-৬০ থেকে তিনি বাংলাও পড়াতেন।

ইউনিভার্সিটি এবং কিংস কলেজ ছাড়া প্রাচ্যভাষা পড়াবার জন্য তখন লণ্ডনে বহু কোচিং ক্লাস ছিল। ভারতবর্ষে আসবার আগে বহু ইংরেজ এই কোচিং ক্লাসে ভারতীয় ভাষায় পাঠ নিতেন। ব্লুমহার্ট ইউনিভার্সিটি কলেজে, অক্সফোর্ডে এবং কেম্ব্রিজে বাংলা-হিন্দী-হিন্দুস্থানী ত পড়াতেনই, তদুপরি টিউশানি করতেন। এ ছাড়া বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ছোটখাটো ওরিয়েণ্টাল স্কুল খুলে বসত।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে এক সংস্কৃত-পালি-বৌদ্ধশাস্ত্র ছাড়া ভারত-বিদ্যার আর কোন শাখার কোনরকম 'অ্যাকাডেমিক ট্র্যাডিশন' গড়ে ওঠেনি। যাঁরা আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিখতেন তাঁরা প্রয়োজনের তাগিদেই শিখতেন। ছাত্র হিসাবে তাঁরা প্রাথমিক স্তরের, পাঠের মেয়াদ ছিল ছ মাস থেকে এক বছর। গবেষণার বা উচ্চ ডিগ্রী লাভের সুযোগও ছিল না এবং সেদিকে কারও উৎসাহও ছিলনা। যাঁরা পড়াতেন তাঁরা কেবলমাত্র ভাষা-শিক্ষক, গবেষক নন। অর্থাৎ ভারতীয় আধুনিক ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনার মধ্যে পড়ান হলেও, অধ্যাপনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী ছিল না। ছাত্র-অধ্যাপকেরাও যেসব ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী ছিল তা নয়। সে যুগের লণ্ডনের বিখ্যাত বাংলা-শিক্ষক ব্লুমহার্টের একমাত্র উল্লেখযোগ্য কাজ—ব্রিটিশ মিউজিয়ামের বাংলা বই এবং পুঁথির তালিকা। ক্যাটালগও উল্লেখযোগ্য গবেষণা-কার্য হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত বেণ্ডলের ক্যাটালগ। ব্লুমহার্টের তালিকাকে গবেষণা বলতে পারি না।

লণ্ডনে প্রাচ্য-বিদ্যার এই রকম অবস্থায় Reay কমিটী বসল ১৯০৫ সালে। কমিটী অনুসন্ধান করে জানালেন কিংস ও ইউনিভার্সিটি কলেজে প্রাচ্য-ভাষা পঠন-পাঠনের যে ব্যবস্থা আছে তা সুষ্ঠু নয়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই আয়োজন পর্যাপ্তও নয়। সুতরাং প্রাচ্য-বিদ্যার একটি কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। সেই কেন্দ্র হল ওরিয়েণ্টাল স্কুল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

খোসায় বিপদ

স্যামুএল জোসেফ অ্যাগানন

অনুবাদ : সত্যেন বসু

(মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ)

> ইহুদী লেখক Samuel Joseph Agnon এবারে নোবেল প্রাইজ পেয়ে যশস্বী হয়েছেন। এঁর লেখা থেকে একটি সংকলন ১৯৫৯ সালে জেরুসালেমের গল্প বলে ফরাসী ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পগুলি পড়ে বোঝা যায়, ভারতের বর্তমান সমস্যার সঙ্গে ইসরায়েলের নাড়ীর যোগ আছে। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু ওই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত 'খোসায় বিপদ' (La Palure) গল্পটি ফরাসী থেকে অনুবাদ করেছেন।

রাস্তায় ফেলে দেওয়া এক কমলা লেবুর খোসা! নিতান্ত সাধারণ রকমের—এর মত দশ-বিশটা পথে, নর্দমায়, উঠানে, সর্বত্র এ-শহরে দেখা যায়। অন্যমনস্ক হয়ে চলতে উপরে পা পড়লে হড়কাবেই। তখন সভাভব্য সাবধানী থেমে নিরীক্ষণ করে জুতার তলা কতটা পরিষ্কার রইল। আবার গম্ভীরভাবে চলা শুরু করে। আর যারা খুব বেহুঁশ তারা পা টেনেই চললো যেন আর কোন অসুবিধা নেই। সাত জোড়া চোখ থাকলেও রাস্তায় যত খোসা পড়ে এতো গুনে শেষ করা যাবে না! কাজেই খোসা নিজের স্থানে শান্তিতেই রইল, আর লোকেরা তার উপরে হেঁটেই চলেছে। খোসার উপর হড়কে একদিন এক বুড়ো পড়ে গেল। নিজের হাড় কটা টিপে গুনে সে আবার উঠে দাঁড়াল—চলে গেল সেখান থেকে। উপস্থিত অন্যদের বিচলিত হবার ভাব নেই। খানিক বাদে এক যুবতীর ভাগ্যে একই অঘটন। তার কোন অঙ্গহানি হল না তবে হাতব্যাগটি খুলে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো নানা সরঞ্জাম। আরশি, চিরুনি, সোনার পাউডার বাক্স, লিপস্টিকের টিউব, নখ-পালিশের ছোট শিশি, পমেড সুবাস, লোম ওঠাবার সন্না। প্রিয়বান্ধবীর স্বামীর প্রেমপত্রের গোছা—এই রকম দেহ ও মনের পরিচর্যার জন্য আজেবাজে কত কী।

যুবতীর বয়স বেশী নয়, দেখতেও কুৎসিত নন—কাজেই উপস্থিত পুরুষেরা সকলে সাহায্য করতে ছুটলো—ধরে তুলতে। সব সরঞ্জাম কুড়িয়ে গুছিয়ে দিতে লাগল। খোসা কিন্তু সরঞ্জামের মধ্যে গণ্য নয়, তাই সে যথাস্থানেই পড়ে রইল। বেশ শান্তিতেই আছে—বুঝছে না যে, সে যত নিন্দুক, হিংসুক, সংক্ষেপে রাজ্যের যত দুষ্ট-রসনার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়েছে। লোকের তো

এমন রসাল বিষয় সবদিন চোখে পড়ে না। খোসার দুষ্ট স্বভাব নিয়ে নিন্দা শুরু হল। লোককে বিপদে ফেলাতেই যেন এর আনন্দ! নিজে নড়ে না, আর শহরবাসীদের অপকার করেই চলেছে। অথচ কেউ ভাবছে না তাকে দূরে সরায়! এই ক্রুর অসংবৃত ভাবণেই লোকেরা ক্ষান্ত হলো না—ক্রমে হিংসা ও ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে সংগীদের উপর আক্রমণ শুরু হলো—যারা দেশের ও বিশ্বের মধ্যে যত অঘটন ঘটছে, তার কোন খেয়াল করে না—শুধু নিজেরা চুপচাপ, নির্ভাবনায় বসে থাকে।

খোসার তবে কপাল ভাল! কার্যকারণ থেকে পৃথক করে দেখে, দেশে এ রকম শান্ত, শিষ্ট, চিন্তাশীল লোকেরও অভাব নেই। তারা সদয়ভাবে পরীক্ষা করে সবদিক, আসামীর পক্ষে বলে—"যা কিছু ঘটেছে তার জন্য তোমরা কেন খোসাকেই দায়ী করছ? যে সব অশিক্ষিত বর্বরেরা সব সময় আমাদের দেশের মাথা হেঁট করছে, তাদের মধ্যে কেউ একজন খোসা রাস্তায় ছড়িয়েছে, প্রকৃতপক্ষে তাকেই দোষী বলতে হয়। শুধু কমলার রস পেট পুরে খেয়েই ক্ষান্ত হয় নি, সব খোসা সারা রাস্তায় ছড়িয়েছে—ফলে, এইভাবে দেখ, দেশে দুর্বলের ও আহতদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে।"

বুদ্ধিমানদের এই অভিমতে সারা দেশের লোক কিন্তু সন্তুষ্ট হলো না। যারা ভাবে, বুদ্ধি ও চিন্তার বিষয়গুলি যতটুকু রাজনীতির মধ্যে এসে পড়ে ততটুকুই তার দাম। তারা এর সংগে রাজ্য সরকারের অতীত ও ভবিষ্যতের নানা ভুলভ্রান্তির কথা তুলে সমালোচনা শুরু করলেন। এতেই নিরস্ত হলেন না, শেষে খোসার দুষ্কৃতির সব দায়িত্ব চাপালেন শহরের মিউনিসিপ্যালিটির উপর; কারণ, ওখানকার আবর্জনা সরাবার বিধিব্যবস্থা একান্ত নিন্দনীয়। তাঁরা গাইলেন—যে লোক কমলার খোসা ছড়িয়েছে তাকে দোষ দিয়ে লাভ কি? সে তো কমলাটি খেয়েছে বস্তুত ভাল কাজই করছে সে। বাহিরের আমদানি পণ্যের বদলে দেশের উৎপন্ন ফল থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করা কি অনেক ভাল কাজ নয়? সত্য সত্যই সে তো নাগরিক হিসাবে প্রশংসার পাত্র। ভগবান যেন অন্য সকলকে তার অনুরূপ দেশানুরাগী করেন। যদি আমাদের দেশের সকলে স্বদেশী জিনিসে সন্তুষ্ট থাকত বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি চাইত না, তা হলে সরকার বিদেশী অর্থ-ব্যয়ে অনেক সাশ্রয় করতে পারত! এ শেষ কথা, মিউনিসিপ্যালিটিকে দোষ দিতেই হবে কেন সে শহর পরিষ্কার করতে যথেষ্ট ঝাড়ুদার নিযুক্ত করে না। এতে তার কি হচ্ছে! ট্যাক্স আদায় করে পয়সা বাঁচাচ্ছে! আর আমাদের দিচ্ছে পয়সার বদলে কলা ও কমলার খোসা। সরকারের বুদ্ধি একটিমাত্র কর্তব্য—খালি ট্যাক্স বাড়ানো, পরিবর্তে দেশবাসীকে সে কি কিছুই দেবে না? যখন এই সব তর্ক নালিশ ও দোষারোপ চলছে—একজন পথ চলতে সেই সব শুনল। আপন মনে চেঁচিয়ে বললে, "বেশ তো! এইবার ট্যাক্স আদায় করতে কেউ এলে তাকে ঠেলে ফেলে তার নাকের ওপর দরজা বন্ধ করব। মাসুল না দিয়ে যা বাঁচাব তাতে আচমকা-আঘাত থেকে আত্মরক্ষা হিসাবে এক বীমা করব। সেদিনেও বেচারী বৃদ্ধটি খোসার ওপর হড়কে পা ভেঙেছে—তার মত আমাকে রিক্ত হস্তে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে না।"

এই কথা শেষ হবার সংগে সংগেই কৃষি-ব্যাঙ্ক-সংস্থার প্রচারক একজন, তাকে ডাকলে। অনুরোধ করলে তার ব্যাঙ্কে পয়সা খাটাতে। এ কোম্পানি কিনছে পতিত জমি, তবে চাষ না করেই পতিত রাখবে অর্থাৎ তাতে কমলাও জন্মাবে না লোকে কমলা খেতে পাবে না, অতএব খোসার ওপর বেশী করে হড়কে পড়বে না। যে লোকটি এতক্ষণ ট্যাক্সের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিচ্ছিল—সে এখন একেবারে উত্তেজিত হয়ে উঠলো—"যেই ব্যবসায়ে লোকসান হল অমনি কৃষিব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা এসে আমার পুঁজির দিকে তাক করছেন। বাবা, এদের দেহি দেহি না শুনলে দিন কাটতে চায় না। উৎসবেই বা অনশনেই বল, Paque হউক কি নববর্ষের দিনে, কোন জয়ন্তী বা কোন বার্ষিকী, এঁদের বাদ দিয়ে যাবে না। এঁরা উপস্থিত; বলেন, পুঁটলি খোল। হা ভগবান, বৎসরের মধ্যে কি একটা দিনও সৃষ্টি হয়নি যাতে আমার কাছে কেউ টাকা চাইতে আসবে না? মনে হচ্ছে, যেসব দিনে মনিব্যাগ খুলতে হয়, গুনে দেখলে তা পাঁজির তিথির সংখ্যা ছাড়িয়ে যাবে।

মশায়, কত দিচ্ছেন আমাকে? প্রচারক জিজ্ঞাসা করে।

দাও! দাও!

আপনার নামে কত শেয়ার লিখবো?

কী? আবার কত! আপনাদের কি আমি

ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দিই নি। বিশ্বাস করুন, বুঝুন; সে আবার আজকের হীনমূল্যের টাকা নয়—কি বলবো—যা বের করে নিয়েছেন সবেতেই তো সরকার লাভ করেছেন। আরও কি অভিলাষ? কেন এসেছেন? আমি কি আপনাদের কৃষি-সংস্থার সঙ্গে ভিড়তে চাইছি? আর জ্বালাবেন না আমি শান্তি চাই, আমি এখন কমলার খোসা নিয়ে ভাবছি।

এ রকম বলা চলছে এমন সময়ে এক সরকারী কর্মচারীর পত্নী সেখানে উপস্থিত হলেন। 'কমলার খোসা!' চিৎকার করে বললেন—'আমার পোড়া কপাল! ভাবুন দেখি আমার শাশুড়ী এক কমলার খোসার ওপর হড়কে—বিশ্বাস হয় আপনার, না এ কথা আর বলবেন না—যাচ্ছিলেন কোথায় জানিনে—অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না, হ্যাঁ তখন হড়কে দুম-পটাশ। কমলার খোসা কি শরবতী লেবুর হবে বা না না বুঝি কলার খোসাই, দেখুন তো—বাঁ কি ডান পা ভাঙলেন। আর বলবেন না সে কি বিপদ! ভাবুন তো সাতটা তোশক বালিশ লেগে গেল বিছানায় শুয়ে থাকতে। বুঝছেন কি দুর্ভাগ্য! আর সেরে উঠেও ভাবতে পারবেন না কি গণ্ডগোলই করছেন সকাল থেকে সন্ধ্যা, কেবল ওপর আর নীচ সব ঘর হাতড়ে বেড়াচ্ছেন আর খোঁড়াচ্ছেন, মেজের ওপর লাঠি ঠুকে। কি যন্ত্রণা—কি বলবো কি বিপদেই আছি আমি। মাঝে মাঝে ভাবি, এসব ফেলে পালাই। হায় যদি পারতাম বিদেশ যেতে, অনেক দিন তো এদেশ ছাড়তে পারিনি সেই শেষ কংগ্রেসের পর থেকে।'

কংগ্রেস শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা মোড় ঘুরল। তখন থেকে শুধু কংগ্রেসেরই কথা—এদিকে এ খোসা রাস্তাতেই পড়ে। শত বুটের চাপে কলুষিত হচ্ছে। বেচারী তার তারুণ্য ● ঔজ্জ্বল্য সবই হারিয়েছে। এখন দাঁড়িয়েছে কোঁকড়ানো তোবড়ানো বিবর্ণ তুচ্ছ এইটুকু ছোট। তবু এক হিসাবে তার সৌভাগ্যের জোড়া মিলবে না! এর সমজাতীয়েরা তো অনেক দিন আবর্জনা বা সারের স্তূপে অন্তর্ধান করেছে। এর তবু খ্যাতির সঙ্গে পরিচয় হলো।...

ব্যাকরণের এক শিক্ষক থাকতেন সেই শহরে। ভাষায় সাধুপন্থী। লোকের কথা শুনে তার ব্যাকরণ অন্বয়ের দোষ ধরে ধরে সেটা বদ্ধ অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। খোসা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে শুনে, তাঁর ভাষাশুদ্ধির কল্পনা কাজে লাগাবার প্রবৃত্তি হলো।

প্রথমে সামনে যাকে পেলেন—দেয়ালের কাছে টেনে নিয়ে জিজ্ঞাসার সুরে আরম্ভ করলেন—

তোমার খোসার বিষয়ের মতটি কি খুলে বলো তো?

এ খোসা!—কি আর বলবো আমি, এ তো অন্য সবের মতই দেখছি।

ভায়া, আমার প্রশ্নটি তুমি বুঝতে পারনি।

খোসা কি পদার্থ তা জানবার আগ্রহ নয় আমার, কথার সাধুরূপেই আমার চিন্তা। বহু বৎসর ধরে আমি বলে আসছি—এর শুদ্ধ রূপ খোলা—এইরূপে লেখা উচিত। তা এই সব বেওয়ার দল, আমার কথা শুনবে না তারা সব সময় ওই বলবেই, লিখেও চলেছে; সত্যি এসব একেবারে বন্ধ করা দরকার।

তখন সকলে সাধু ভাষা নিয়ে পড়লো। যেটি কথার মধ্যে সার সেটি সহজেই চাপা পড়ে খোসার বেলায় তাই হলো। তবে বলেছি তো এ খোসার শুভলগ্নেই জন্ম তাই সব কথাবার্তার মধ্যে কৌতূহলের কেন্দ্র হয়েই রইল। অভ্যাস দাঁড়াল লোকে তারই চারিদিকে জড় হয়ে সদা সদা ঘটনার উপর টিপ্পনী কাটে।

একজন একে প্রথম দেখেই বলে উঠলেন—আমার আশ্চর্য লাগে কেউ ভাবেনি এর ফটো কাগজে ছাপায়। বড় প্রেস-দের হাতে নেওয়ার এই তো প্রকৃষ্ট সময়। প্রবন্ধ লিখে খোসার ছবি তোলার জন্য চাঁদা ওঠাবার কথাটা পাড়তে হয়। লোকে সব সময়েই মুক্তহস্ত তারা ফটোগ্রাফারকে সাহায্য করবেই। তারাই, সাদার ওপর কালো বুলিয়ে প্রমাণ করে দেবে, এটি শহরের লোকেদের যাতায়াতে কি বিঘ্নই ঘটিয়েছে। শুধু পয়সাতে কার্পণ্য ক'রো না। সত্যকার আর্টিস্টকেই এই কাজে লাগাও—সে ছবি তো আমরা বিদেশেও বেচতে পারি। আমাদের যে শিক্ষা হচ্ছে তার ভাগ পাবে বিদেশী প্রতিবেশীরা, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এই সুন্দর দেশের ছবির তারিফ করবার আনন্দ তো আছেই। তবে এই উদ্দীপনার মাঝখানে বাধা দিয়ে একজন বললেন—বেচারী একে কেন মিথ্যা নিন্দা করছেন? আমাদের দেশের কি ক্ষতি করছে এ খোসা। বরঞ্চ উল্টোটি ঠিক। এটি তো আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক এখানে যার যা খুশি করতে পারে, কোন বাধা নেই! শুনে একজন হেসে উঠলেন, কক্ষনো শুনিনি, এটুকু শুধু বাকী ছিল হে। এ আমাদের স্বাধীনতাকে মূর্ত করেছে। কোথায় চলেছি আমরা? জাহান্নমে নয় কি?

তবে নিজের কথা বোঝাবার সময় পেলেন না তিনি। তখনই এক বৃদ্ধ বাধা দিয়ে নিন্দা করতে লাগলেন (ইনি নিজের দেশের যেখানে ভাল কাজ হচ্ছে তার খোঁজেই তৎপর থাকেন), বললেন, কে আপনাকে জাহান্নমের কথা পাড়তে বলেছে? আপনি তো আমাদের গ্রন্থ পড়েন নি—আপনি কি শিরটোপা? তা তো না! তবে যারা ধর্ম সমীহ করে তাদেরই জাহান্নমের আলোচনা করতে দেন—এই সব নাস্তাশিরেদের স্পর্ধা দেখ! সীমা পরিসীমা নেই। বাইবেল টেনে নিয়েই ক্ষান্ত নয় তারা বিশুদ্ধ তালমুদকেও দখল করতে চায়! লেখক সেই তর্কে যোগ দিয়েছিলেন, তবে ভয়ও হলো এতে ঝগড়া বেধে শেষে হাতাহাতি না হয়। তাই শেষ অবধি ঠিক করলেন যে, দ্বন্দ্ব ও ঘৃণার উৎস এই খোসাকেই সরিয়ে ফেলি! ঝুঁকে তুলে সরিয়ে দিলেন!

তখন, এক বৃদ্ধা পাশে ডেকে বলছেন—শহরে অন্য আবর্জনার বিষয় কি ভাবছেন—করবেন কি? টুকরো কাগজ, খবরের কাগজের পাকান মোড়া, সিগার-বিড়ির অবশেষ আরও কত কি আবর্জনা রাস্তায় ছড়ানো—এ গুনে শেষ হবে না। ওই কোনায় খোসার ঝুড়ি, এখানে শরবতী লেবুর টুকরো—ওই দেখো আবার কি, ছেঁড়া বই, সত্যি কি আপদ—আন্দোলনকারীরা পুস্তিকা বিলোতে ছাড়বে না সব সময় নাকে কানে গুঁজে দিচ্ছে আর রাস্তা তো ছেঁড়া পাতায় ভর্তি! আবার এ কি সর্বনাশ! একটা ভাঙা জাঁতিকল আর মরা ইঁদুর। অসম্ভব অসম্ভব ব্যাপার, প্রলয়ের শেষ দিন পর্যন্ত এ এখানে পচবে দেখছি। একজন পথিক তাকে আশ্বাস দিলে—মা! শান্ত হও, এত ব্যস্ত হ'য়ো না। শীঘ্রই দেশ তো ভাগ হতে চললো! এখনো জানা নেই কোনটা কার ভাগে পড়ে। বোধ হয় এই দিকটা শত্রুদের ভাগেই পড়ছে। তাহলে এই সব আবর্জনা স্বস্থানে ফেলে রাখাই কি বেশী ভাল নয়? দেশভাগের কথা ওঠায়

যেন বিপদের পাগলা ঘণ্টা বাজলো। সকলে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো—যে এই পরাজিত মনোভাব ব্যক্ত করেছে। তর্ক উঠলো। কোলাহল। তাঁরা কি বলতে চান—সে কি কখনও বলেছে যে সে দেশভাগ চায় —শুধু কাগজে অবিরত যা ছেপে চলেছে তারই পুনরুক্তি করেছে। অন্য লোকেরা কিন্তু তাকে ধাক্কা মেরে বেশী চেঁচাতে শুরু করলে। লেখক ভাবলেন, শেষে দেশের ভাগ্যে যাই ঘটুক—ভাগই হোক কি একই থাক বর্তমানের কথাই দরকারী সব প্রথম—নিজের দরজার সামনের রাস্তাটাও পরিষ্কার করি। তাই ঝুঁকে পড়ে আবর্জনা ঝাঁটাতে শুরু করলেন।

যেই রাস্তা পরিষ্কার করবার চেষ্টা অমনি সকলে তাঁকে নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে এলেন। কিভাবে সুন্দর করে ঝাঁট হয়। কি করে সব জড় করে তুলতে

হয়, কোথায় বা ফেলা ভাল। শেষ একজন এলেন বলতে, কিভাবে সব পর্ড়িয়ে ফেলা উচিত। ওপরে আকাশও যেন এতে যোগ দিল। হাওয়া উঠলো। যা কিছু মাটিতে উড়তে আরম্ভ করলো হাওয়ার ফুৎকার ছেঁড়া কাগজ বইয়ের পাতায় প্রবেশ করলো। এরা তো ফলের খোসার মত বস্তুমাত্রই নয়, পরিকীর্ণ আবর্জনা থেকে ভাবধারণার বাহক উঠে মুখে নাকে লাগতে লাগলো, আবার শেষে তুচ্ছ বস্তুর মতই মাটিতে পড়তে লাগলো। সকলের পরামর্শ একত্র করে লেখক সব সরিয়ে ফেলতে চাইলেন। তখন পরামর্শেও বিরোধ উপস্থিত হলো। লেখক কমলার খোসা তুলে আস্তাকুড়ে ফেলবেন, একজন বললেন, তুলুন প্রথমে শরবতীর খোলা! এসব তোলা হলো, তখন আর একজন এগিয়ে এসে বললেন; কলার খোসা সরান সকলের আগে! লেখক চেষ্টা করছেন সকলের কথাই শোনেন। কিন্তু মানুষের হাত বা করখানা—পরামর্শ আসছে তার থেকে অনেক বেশী। ভাল মানুষটি যত চেষ্টা করছেন, বিরোধী মতের সমন্বয় করতে ততবারই এই কার্যে বিফল হচ্ছেন।

রাস্তায় অবিলম্বে লোক জড় হলো! ব্যস্ত হয়ে হাত নেড়ে অঙ্গভঙ্গী করে তর্ক চললো—কোনটি প্রথম, পরে কোনটি, ঠিক কিভাবে করা উচিত। তর্কের শেষ নেই। শেষ অবধি বিরক্তি। মন বিষাক্ত হয়ে হাতা-হাতি শুরু হলো। এমন সময়ে একেবারে অতর্কিত, আশ্চর্য এক ঘটনা! (লেখক স্বীকার করছেন ঠিক এ রকম সব সময় হয় না) ঝগড়া-ঝাঁটি হয় লোকের মধ্যে এ তো চলতি ব্যাপার, বৎসরের সব দিনই হচ্ছে। তবে হঠাৎ যে সেখানে পুলিস এসে জুটবে এটা অঘটন; তবু ঘটে গেল। প্রমাণ হলো অঘটনও ঘটে। লোকে যখন মারামারি শুরু করেছে কোথা [illegible] এলো —[illegible] কে তাদের অনুমতি দিয়েছে যে খোলা রাস্তায় এতো-গুলি নিষ্কর্মা লোকে জড় হয়ে ঝগড়া করছে। দেখেই বুঝলে নিষ্কর্মারা, প্রহরী ঠিক পরিহাস করতে আসে নি। তারা দ্রুত চম্পট দিলে। চারিদিক পরিত্যক্ত, লেখক শুধু একা দাঁড়িয়ে, রাস্তার মধ্যে। ভাবলেন এইবার কাজ করা যাক অন্য কেউ আর বাধা দিতে বা বিরক্ত করতে নেই। দ্বিগুণ উৎসাহে ঝাঁট, ময়লা জড় করা। সব পরিষ্কার করার কাজে লাগলেন লেখক, তাঁর খুব ইচ্ছে হয়েছে রাস্তাটির সুন্দর করে প্রসাধন করেন। একমাত্র লেখকই রয়ে গেলেন, পালান নি, এটি সন্দেহের কথা বলে ঠেকলো প্রহরীর কাছে। ডেকে বললো, দাঁড়াও, সব কথার উত্তর দাও, ও সব সত্য করে বলো। পরে ডায়ারি বের করে লিখলে নাম তারপর জেরা শুরু হলো। কেন এই অবৈধ জনতা হলো, যাতে যাতা-য়াতের এই অসংগত অবরোধ ঘটল এবং অবশেষে এলো এতো অযৌক্তিক দাপা-দাপি। লেখক যথাসাধ্য নিজে সাফাই দিলেন। শপথ করে বলছি, দারোগা মশায়, আমি কিছুই করিনি। শুধু দেখলাম, সত্য বলছি, এই খোসা আমার রাস্তায় পড়ে রয়েছে। বুঝলাম এ তো সব সময়ে পথিকের বিপদ ঘটাতে রয়েছে আর কেউ যখন একে সরায় না, ভাবলাম আমিই করি; তুলে ফেলে দিলাম একে। এই আরম্ভই যা কিছু শক্ত ঠেকলো—পরে এই রাস্তা পরিষ্কার করছি। এই-ই যা হয়েছে—সব শপথ করে বলছি। দাঁত চেপে শিস দিয়ে কঠিনভাবে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রহরী বললে—তা হলে তুমি স্বীকার করছো এই সব আবর্জনা ঝাঁট দিতে তুমি অংশ নিচ্ছিলে?

এতো সোজা কথা, তা ছাড়া আমি তো কিছুই লুকাইনি—যা বলেছি একেবারে সত্য, আর একবার বলতে প্রস্তুত হলাম।

প্রহরী দেখতে চাইলে কাছে লেখকের মিউনিসিপ্যালিটির কোন নিদর্শনপত্র আছে কিনা যাতে আমাকে এই কাজ করতে অধিকার দেওয়া হয়েছে। তার সব যা দেখলো ও শুনলো সব লিখে নিলে। শেষে তার বিরুদ্ধে একটি দুষ্কর্মের তালিকা লিখে ফেললে। আইন যা—তাই। ছাড়পত্র ছাড়া লেখক খেলাচ্ছলে ঝাড়ুদারি করতে পারে না। এটি তার অপরাধ! তবু শেষ অবধি করুণাবশেই অপরাধীকে থানায় টানলো না। অবশ্য এদিকে দুপুর বাজল, অন্য সকলের মত প্রহরীও মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য বাড়ি যেতে ব্যস্ত হয়েছে। তাই লেখককে আবর্জনা ও সরকারের সম্পর্কের বিষয়ে গভীর চিন্তার অবসর দিয়ে চলে গেল। নানা অসঙ্গতি ও অন্যায় যে দেশের কলঙ্ক, সেখানে স্বতপ্রণোদিত হয়ে কিছুর সংস্কার করতে গেলে, তারই বিপদ!

আকাদেমি পুরস্কার সম্মানিত
মনোজ বসুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

বন কেটে বসত ১০৲

সাজবদল ৫॥ গল্প-পঞ্চাশৎ ১০৲

অনুরূপা দেবীর
মা ৭৲
মন্ত্রশক্তি ৭৲

অবধূতের
মরুতীর্থ হিংলাজ ৬৲
উদ্ধারণপুরের ঘাট ৫৲

নিরুপমা দেবীর
শ্যামলী ৫৲
অনুকর্ষ ৪৲

আশাপূর্ণা দেবীর ক্লাসিক উপন্যাস
প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৪৲

সুমথনাথ ঘোষের
নবতম উপন্যাস
বনরাজিনীলা ৭৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
কাল, তুমি আলেয়া ১২॥
(চলচ্চিত্রে রূপায়িত)

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
উপকণ্ঠে ৯৲ বহ্নিবন্যা ৮॥
প্রভাতসূর্য ৪৲ জ্যোতিষী ৩॥

জরাসন্ধের
লৌহকপাট (৪র্থ পর্ব) ৭৲
ছায়াতীর ৫৲

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কবি ৪॥ কালিন্দী ৭॥
অভিযান ৬৲ গন্নাবেগম ৮৲

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের
কঙ্কাবতী ৫·৫০

নলিনীকান্ত সরকারের
দাদাঠাকুর ৫॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
অস্তি ভাগীরথী তীরে ৭॥

প্রমথনাথ বিশীর
কেরী সাহেবের মুন্সী ৮॥

প্রবোধকুমার সান্যালের
মহাপ্রস্থানের পথে ৬৲
জলকল্লোল ৫॥ তুচ্ছ ৪॥

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পথের পাঁচালী ৬॥
অপরাজিত ৯৲

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
স্বপ্নতনু ৪॥
পা বাড়ালেই রাস্তা ৫॥

নয়ান বৌ ৬৲
মিলনান্তক ৪॥০
কথাচিত্র ৩৲
আর এক সাবিত্রী ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
ক্লাসিক উপন্যাস
স্বর্গাদপি গরীয়সী
১ম — ৫৲
২য় — ৫॥০
৩য় — ৬৲

সুমথনাথ ঘোষের
বাঁকা স্রোত ৬॥০

বিমল মিত্রের
একক দশক শতক ১৪৲

প্রমথনাথ বিশীর
লালকেল্লা ১৪৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

আপনি ফরমাইকা দিয়ে
আপনার রান্নাঘরটিকে
ঝকঝকে নতুন ক'রে
তুলতে পারেন।

৫৩ রকমের রঙ ও প্যাটার্ন থেকে আপনার পছন্দমত ফরমাইকা* ল্যামিনেট বেছে নিন!

অতি সুবিখ্যাত নাম

ফরমাইকা পৃথিবীর প্রথম ডেকোরেটিভ ল্যামিনেট··· পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে একই রকমের আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ভারতে তৈরী। কেনবার সময় প্রতিটি শিটের ওপর ফরমাইকা ছাপ দেখে নেবেন—তাহলে নিশ্চিত হতে পারবেন যে আপনি অতি নাম-করা জিনিসই কিনছেন! এই ছাপ অবশ্য ধুলেই উঠে যাবে।

দেখতেও সুন্দর, কাজেও ভালো

ফরমাইকা ল্যামিনেট সিঙ্ক ইউনিট ও স্প্ল্যাশব্যাক, কাজের কাউন্টার, রান্নাঘরের টেবিল, আলমারির শেল্ফ ও দরজা, ক্যাবিনেট ও দেয়ালের প্যানেলের জন্য চমৎকার উপযোগী। আপনার প্রয়োজনমত ম্যাট বা চকচকে ফিনিশ আপনি বেছে নিতে পারবেন। আর, খরচের কথা? আপনি যা ভাবছেন তার চাইতে কম।

দেখতেও ভালো, কাজেও ভালো, তাই ফরমাইকা ল্যামিনেটের বায়টা নিঃসন্দেহে সার্থক।

ফরমাইকা ইণ্ডিয়া লিমিটেড, পোঃ বক্স ৩৪, পুনা।

*ফরমাইকা ফরমাইকা ইণ্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এর রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক এবং ভারতে ফরমাইকা ইণ্ডিয়া লিমিটেড উহার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী।

Bensons-2824-Ben

অনুমোদিত ব্যবসায়ীগণ

■ লক্ষ্মীদাস ব্রাদার্স, ৫৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২। ■ রণবীর এণ্ড কোং, ২৫২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ■ শীলস্ ওয়ার্ক [illegible], [illegible], [illegible], আসাম। ■ [illegible] ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড সাপ্লাই কোং, [illegible] গৌহাটি-১, আসাম।

বার্লিনের চিঠি

হঠাৎ কোনদিন কোন দূরে দেশে ঘুম ভোরে আপনার ঘুম ভেঙে গেলে পাশেই অটোবান, হাইওয়েতে ঝাঁকে ঝাঁকে তীরের ফলার মত দ্রুতগতি ফোলকস্‌-ভাগেন, মার্সেডেস গাড়ির হুস্‌ হুস্‌ বাতাস কাটার শব্দে বার্লিন, ফ্রাংকফুর্ট বা হামবুর্গের যে কোন সভ্যতার যন্ত্রময় শহরে শহরে যদি ১৭ই জুন সরণি বা অটোবানের পাশেই আপনার ঘর থাকে, ভোরবেলা নতুন বর্ষের দিনে আপনি চোখ মেলে চেয়ে তাকালেন বাইরের আকাশের দিকে, সূর্য নেই, মেঘেদের অতি ব্যস্ত ছোটাছুটি নেই—আরো একটা দিন আর একটা বছরের দিন কিভাবে কাটবে, তা নিয়ে হতাশাগ্রস্ত মানুষের বিহ্বলতা নেই, ভগবানের নাম নেবার পূর্বেই আপনার আত্মা কাঁপিয়ে আমেরিকান, ব্রিটিশ বা ফরাসী পাশবিক ট্যাংকগুলিকে যদি ছুটে যেতে দেখেন, তা হলেই ভাববেন না আপনি ভিয়েৎনামের মত কোন সভ্যতাবিরোধী কোন মহাসমরের মুখে বসে আছেন। বার্লিনে বসে এসব যান্ত্রিক শব্দছন্দে ভয় পাবার কিছু নেই। যে দেশকে, যে জাতিকে যেখানেই তার দ্বি-খণ্ডিত আত্মার মাঝে রাজনীতির অসহায় ক্রীড়নক হয়ে বাস করতে হবে—কি কোরিয়ায়, কি ভিয়েৎনামে, কি ভারতে, কি ইসরাইলে আর কি জার্মানীতে—সেখানেই আমাদের প্রভাতসঙ্গীতের পরিবর্তে ট্যাংক বাহার জয়ধ্বনিকে অনুভবে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। যুদ্ধবিহীন জার্মানীর প্রান্তর থেকে এখন ব্রিটিশ, ফরাসী, আমেরিকা—সবাই যার যার সৈন্য সরিয়ে নিতে চাচ্ছে। "হাওয়ার সংগে যুদ্ধে"র মত রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামে এত বড় বড় সৈনাবাহিনীকে অকাজে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবার মত পয়সা এখন গরিব ব্রিটিশদের নেই, এই অর্থনৈতিক দুর্যোগের দিনে জার্মানদেরও নেই। আমেরিকা তার নিজের স্বার্থে, অর্থাৎ ভিয়েৎনামে পাঠাবার জন্যে সৈন্য সরিয়ে নিতে চাচ্ছে, যা কোন প্রকারেই জার্মানী ছাড়তে রাজী নয়। কেবল আমেরিকাকেই পশ্চিম জার্মানীতে তার সৈন্যবাহিনীর জন্যে পঃ জরমান সরকারকে ৪ মিলিয়ার্ডেন মার্ক অর্থাৎ ৪০০০ মিলিয়ন মার্ক দিতে হবে।

পঃ জার্মান সরকারের বর্তমানে নতুন আন্দোলন—ফরাসীদের সংগে, অর্থাৎ দ্য গলের সঙ্গে রাখীবন্ধন, স্বাধীন পঃ ইউরোপ গড়ে তোলা, পূর্ব ইউরোপের দেশ-গুলির সঙ্গে কূটনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া—কয়েক দিনের মধ্যেই তার প্রথম পদক্ষেপস্বরূপ রুমানিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রদূত বিনিময় অর্থাৎ হলস্টাইন থিয়োরী থেকে পশ্চাদপসরণ—পশ্চিম জার্মানীর বাজেটে ৪ মিলিয়ার্ডেন মার্কের ঘাটতি পূরণের জন্যে ফিনান্স ও অর্থনীতিতে কড়াকড়ি ব্যবস্থা। এর মধ্যে ৫ লক্ষ লোকের বেকারি, দেশে প্রবল আলোড়ন। তারই মধ্যে পৃথিবীর

ডান দিক থেকে—পঃ জার্মানিতে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীশিশিরকুমার বানার্জী, বার্লিনে ভারতের কনসাল জেনারেল শ্রীজৈন এবং তাঁর পত্নী বার্লিনের বর্তমান মেয়র হের আলবেরৎস্‌ ভারতের ভাস্কর্য-শিল্পী শ্রীঅমরনাথ সেহগলের শিল্প প্রদর্শনী উদ্বোধন করছেন

বাজারে জর্মান মার্কের মূল্য বাঁধা—সব কিছুই জর্মান ভূখণ্ডের মধ্যে পড়ে।

*

[illegible] দিনের মধ্যেই ভারতের আর একটা নির্বাচনী পর্ব অনুষ্ঠিত হতে [illegible]। এই সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দেব যে, আমরা এখনো গণতন্ত্রী। গণতন্ত্র ভারতের [illegible]।

ভারতের আগামী নির্বাচনের ওপর লেখা এদেশের পত্রপত্রিকায় প্রায় গত ছ' মাস ধরেই শুরু হয়ে গেছে। ভারতের এই নির্বাচনের ওপর বিদেশীদেরও অনেক কিছু হিসাব করার আছে। ভারত চীনের পথ গ্রহণ করবে না—এটাই এ-দেশের একমাত্র আশা বা দাবি। এ ব্যাপারে শুধু ইউরোপ আর আমেরিকাকে কোনদিনই হতাশ হতে হবে না। ভারত অনেকবার তা প্রমাণ করেছে। ভবিষ্যতেও করবে। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী অনাহারে আর চরম দুর্নীতিভরা সমাজব্যবস্থার যুগের পর যুগ বাস করলেও যে দেশে গান্ধী আর বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছেন, সে দেশ যে কারোর পথ নয়, সেই ধ্রুবতম সত্যের খবর আজকের এই অনাহারী অসহায় নরনারী জেনে ফেলেছে। প্রয়োজনবোধে গো-হত্যা বন্ধের আন্দোলন হবে, জগৎগুরু শঙ্করাচার্যের অনশনব্রত—তাঁকে নিয়ে বিশাল শোভাযাত্রা, নাগা-সন্ন্যাসীদের রাজধানী আগমন—ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আন্দোলন না হলেও পেছনে টেনে আনবার আন্দোলন চলবে—শুধু থেমে না থাকলেই হল। [illegible] আন্দোলন চলেছে, [illegible] ভিন্নভাবে, [illegible] হয়েছে। [illegible] না হলে?' চীন, [illegible] করে সুইডেন আর [illegible]। কোথায় না? [illegible] সংঘর্ষ একটা [illegible] পরিণত হতে চলেছে। ছাত্রদের দাবি রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা; শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আর পুলিসের দাবি—ছাত্রদের মধ্যে আরো ORDNUNG অর্থাৎ ডিসিপ্লিন চাই। গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে—প্রয়োজন হলে এই সব চীনাপন্থী ছাত্রদের পিটিয়ে পুলিস তার হাত পাকিয়ে নিতে পারে। অন্য দিকে, টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছিল—পুলিসের অধিকর্তা পুলিসের কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষভাবে বলে দিচ্ছেন—জনসাধারণ যতই অবুঝ হোক, পুলিস যেন কোন প্রকারেই তার ধৈর্য না হারায়।

অথচ এখানে যখন T. V.-তে মাঝে মাঝে দেখানো হয়—ভারতের পুলিস আর মিলিটারী কত সহজে কথায় কথায় সাধারণ মানুষকে খুন করে ফেলতে পারে, (যেমন, পার্লামেণ্টের সামনে অন্য কোনভাবে বাধা না দেবার চেষ্টা করে, সোজা সরাসরি গুলি করে নিরসহায় উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে মেরে ফেলা, গুলি খেয়েই সন্ন্যাসীর মুখ দিয়ে কিছু গলগল করে রক্ত বেরুল, সঙ্গে সঙ্গে উলঙ্গ সন্ন্যাসীটাকে হাত-পা ধরে ঝুলিয়ে পার্লামেণ্টের পাশে সরিয়ে আনা—T. V-তে সমগ্র দৃশ্যটা এক কথায় বীভৎস বলে আখ্যা দেওয়া চলে) তখন এ-দেশের কোন কোন কড়া-মেজাজের ভদ্রলোক বলে ফেলেন রাগে—আপনাদের সরকার এই গরিব লোকগুলোকে গুলি করে না মেরে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী আর অফিসারদের যদি গুলি করে মারত, তবে হয়ত আজ আপনাদের ৩০ লক্ষ মানুষকে অনাহারে এভাবে বাঁচতে হত না, খাবারের জন্যে আমেরিকা আর অন্যান্য ইউরোপের দেশগুলিতে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হত না।

খাবারের ঘটনা নিয়ে অর্থাৎ [illegible] ভারতের দুর্নীতির ওপর আমেরিকার খবরকে কেন্দ্র করে এ-দেশের পত্রিকাগুলিতে ভারতের যে চেহারা ফুটে উঠেছে, তাতে সুস্পষ্টভাবে এ কথাই মনে হয়—পৃথিবীর কোন একটা দেশকে, তার মানুষকে যদি করুণা করার আর ভিক্ষা দেবার থাকে, তবে সে হচ্ছে একমাত্র ভারত আর ভারতবাসী।

তবু আমরা কত দূর এগিয়েছি, আমাদের সভ্যতা, আমাদের গণতন্ত্র, আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতা কতটা দেশের মানুষের

মধ্যে সংবিস্তৃত হল, আমাদের মহান মাতৃ-ভূমির সন্তানরা আরো কতটা মহান হল, তার জমিন জরিপ করার দিন আমাদের। তার মাপকাঠি ব্যারোমিটারের পারদের ওঠা-নামায় যেমন হরতাল আর আন্দোলন রয়েছে এক দিকে, তেমনি অন্য দিকে রয়েছে [illegible] ভাবে সাধারণ নির্বাচন [illegible] হবার [illegible]। এ প্রসঙ্গে এ-দেশের [illegible] নির্বাচনের [illegible] মনে [illegible] গতিতে [illegible] জার্মানীতে নির্বাচন [illegible] হয়ে [illegible] তা অনুধাবনযোগ্য।

তবে প্রশ্ন উঠেছে এ-দেশে, আমাদের মত গরিব দেশে, যেখানে ভোট পয়সা দিয়ে কেনা যায়, এক পোয়া চালের বিনিময়ে পাওয়া যায়, সে-দেশে গণতন্ত্রের স্থান বা সার্থকতা কত-টুকু? অবশ্যই এ প্রশ্নে আমাদের দেশের গর্ব "ভারতসন্তান"দের জর্মনদের এই মন্তব্য তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করতে দেখেছি (আমি এই বিদেশে অনেকবার বিস্ময়াভিভূত নয়নে অবলোকন করবার সুযোগ পেয়েছি—অধ্যাপক, গুণী, জ্ঞানীজন থেকে আরম্ভ করে চোর, জোচ্চোর, চোরাকারবারী, মিথ্যা-বাদী, মন্ত্রী, বাটপার, অফিসার, রাজনৈতিক কর্মী, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, স্টুডেন্ট, প্রাক্‌টি-কান্‌ট, ব্যবসায়ী, আড়তদার, সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির, ভারত-প্রতিনিধি—সবার চোখে-মুখেই কী এক অপরিসীম গর্ব আর পরিতৃপ্তি—বুদ্ধ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ আর নেহরুর নাম ভাঙিয়ে নিজেকে একবার "ভারত সন্তান" বলে পরিচয় দেবার সুযোগ পেলে। হয়ত এদের দেখেই বিখ্যাত ভারত-তত্ত্ববিদ পণ্ডিত অধ্যাপক হেলমুথ ফন গ্লাজেনপ্‌ তাঁর ভারতবর্ষের ওপর বিখ্যাত বইয়ের মুখবন্ধে প্রথমেই লিখেছেন—"ভারতের সব কিছুই ধর্ম?")

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অন্ত নেই, ঠিক সেই বিশ্বাস হারানো দিনে যেন এক ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে এল এক খণ্ড ঝরা পাতা। একটা ঘষা পয়সার মতই একেবারে হলদে হয়ে যাওয়া অতি পুরনো কাগজের পাতা। "Die neue Literatur" নামে লাইপৎসিগ থেকে প্রকাশিত ১৯১৬ সালের জুন মাসের একটা সংখ্যা। অবিশ্বাস্য চোখে দেখলাম, সেই পত্রিকার খসে-খসে-পড়া পাতার মাঝে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম। তার থেকে যতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, সেটুকু তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। প্রবন্ধটার নাম "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" শুরু করেছেন এভাবে—"[illegible] জুড়ে, বলে তাঁর সুন্দর বইতে প্রিন্‌স্‌ উইলহেলম ফন সুইডেন লিখছেন, তাঁর প্রাচ্য দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধি, যেখানে তিনি কবির গৃহে উপস্থিত থেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ লাভ করে এসেছেন।...কোন এক কম্পিত তৈল প্রদীপশিখার আলোয় এঁকে দেখে মনে হবে, যীশুর বা অ্যাপস্‌লের [illegible] দাঁড়িয়ে আছেন [illegible] মাঝে [illegible] [illegible] সেই সঙ্গীত [illegible] হতে পারে।..."

তিনি লিখছেন—"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হলেন। স্টকহলম-এর নোবেল-কমিটি সব চাইতে গুণী ব্যক্তিকে নির্বাচন করলেন—সেই মানুষটিকে, যাঁর সম্পর্কে আমি বলতে চাই—তিনি [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible] যে [illegible] হচ্ছে, আমি যেন [illegible] এক [illegible]-

[illegible] দিয়ে হেঁটে চলেছি। আমাকে কি কেউ বিশ্বাস করবেন, যদি আমি এই ঘটনাটিকে এই বিংশ শতাব্দীতে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে মনে করি। হে আনন্দ! হে আশ্চর্য! এই পৃথিবীতে এমন একজন রাজা বেঁচে আছেন, এমন একজন সত্যের রাজা। না, না, একজন খাঁটি সত্যিকারের মানব রাজা, মহান, তাঁর সৌন্দর্যে, তাঁর ব্যক্তিত্বে, তাঁর জ্ঞানে আর তাঁর প্রতিভায়।

"গীতাঞ্জলি" পড়ে আমি বুঝতে পারলাম, এই পৃথিবীতে আমার একজন সহোদর আছেন, একজন রাজকীয় সহোদর এ পৃথিবীতে, আমি যেসব ঘটনাকে সবচেয়ে মূল্যবান মনে করি, আমার জীবনে সেইসব ঘটনার মধ্যে আমার এমন একজন সহোদর আছেন, এত [illegible] মহিমান্বিত—[illegible] ভব যেন আরো [illegible] অনুভব, যাঁই [illegible] আজ আমার [illegible] একটি অতি [illegible] ঘটনা। [illegible] আনন্দিত, আমি আজ [illegible] পেয়েছি, আমার বন্ধু—যাঁর [illegible]

এক অবিস্মরণীয় আবিষ্কার

'সিংহ' মার্কা নারকেল তেল

১৬ কেজি, ৯০০ গ্রাম, ৪৫০ গ্রাম এবং ২২৫ গ্রাম নীলকরা টিনে পাওয়া যায়।

হিন্দুস্থান কোকোনাট অয়েল মিল দ্বারা ভারতে তৈরি

তাঁর এক সুন্দর পত্রে টেগোরে আমাকে লেখেন—

'প্রত্যহই আমার মনে হয় আর অনুভব করি, আমি যেন এক বাঁশির মত—সেই বাঁশি, কোন কথাই যে বলতে পারে না, শব্দ তখনই পারে, যখন তার ভেতর প্রাণ-বায়ু প্রবাহিত করা হয়। আমার বইয়ের মধ্য দিয়ে আপনি আমাকে দেখেছেন, কিন্তু আমাদের যেদিন পরস্পরের দেখা হবে, সেদিন এভাবে নিজেকে মেলে ধরা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। যেহেতু প্রদীপের দেহ সব সময়ই অন্ধকারে, তার নিজের কোন প্রকাশ নেই, প্রকাশের ভাষা কেবল প্রদীপ-শিখায়। আমি দেখি, আমার এমন বহু বন্ধু লাভ ঘটেছে, যাঁদের সঙ্গে কোনদিনই হয়ত আমার সাক্ষাৎ ঘটবে না—কিন্তু আমার ভগবানের মধ্যে তাঁদের সাক্ষাৎ লাভ করি এবং তাঁদের অভ্যর্থনা জানাই—যেখানে আমি আমার প্রীতিপ্রদ [illegible] মাধ্যমে তাঁদের আমি আমার [illegible] ও কৃতজ্ঞতা জানাই।'

তাঁর অপূর্ব কবিতায় [illegible] রয়েছে এমনি বিনয় নম্র মহৎ কথার [illegible] সরলতা। গভীর অন্তর্দৃষ্টি, [illegible] আর ধ্যান-ধারণায় সেই মহান হার্মোনি যেন সর্ব-সৌন্দর্যে নিষ্পন্ন। সেখানে সৌন্দর্যের শেষ কথা এথিক্যাল সৌন্দর্যবোধ। এ দ্বারাই কাব্যশিল্পসাহিত্যে এথিক আর অ্যাসথেটিকের ওপর যে-কোন মতান্তরের সমাধান এখানেই। অ্যাসথেটিকের শেষ কথা এথিক—সবচাইতে মহৎ সুরসমতাবোধ সেখানেই, যেখানে সেই জীবনযাত্রা, সেই সৌন্দর্যময়তা কেবল দেখায় না, আমরা কি রকম, বরং পথ দেখায় কবিসুলভ সৌন্দর্যে —আমাদের জীবন কত সুন্দর হতে পারত।

মহৎ সঙ্গীতের অর্থ সাধারণ ভালবাসার গান, না মিস্টিক সিম্বলিজম—তা নিয়ে যখন ধর্মতত্ত্ববিদদের কলহের অন্ত নেই —টেগোরের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। "গীতাঞ্জলি" ভগবৎপ্রেমে ও পুণ্য নিবেদনে পরিপূর্ণ।

"টেগোরের লেখায় আর একটা বিশেষ সম্পদ রয়েছে, যা ভারতীয় কবিদের বেলায় সহজেই চোখে পড়ে। এমন কি বাইবেলের "মহৎ গানের" কলিতেও যা সব সময় পাওয়া যায় না—সেই নন্দনতত্ত্ব, মহৎ রুচিবোধ, গ্যোটের মতে একজন মহান কবির পক্ষে যা অপরিহার্য অঙ্গ। চীন-সাহিত্যে যাকে বলে—"Li"—সৌজন্য, শালীনতা। "টেগোরে"র রচনার ছন্দসমতা আর পরিমিতিবোধ এত উচ্চ শ্রেণীর—যা কখনই বারক (Barock) বা অত্যুক্তিময় নয়—পাশ্চাত্ত্য কাব্যে যা অতি সহজেই চোখে পড়ে।......"

সুইডেনের প্রিন্সের লেখার বাকীটুকু আমার জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথের ওপর এই লেখার পর পৃথিবীর ইতিহাস [illegible] শতাব্দী এগিয়ে গেছে। যে জার্মানীতে একদিন এই মহান কবির ওপর [illegible] সুন্দর লেখা ছাপা হত, সেই জার্মানীতে কখনো-সখনো যদি রবীন্দ্রনাথের নাম দেখা যায়, [illegible] সে সেদিনের সেই [illegible] কিন্তু [illegible] জর্মানিকেই মনে করিয়ে দেয়। আর একটা কথা, [illegible] এখানে দেখা [illegible]— [illegible] রবীন্দ্রনাথের [illegible] পাঠায় [illegible] ফেলে তাঁদের [illegible] ছাপা হয়— তখন মনে হয়, বিদেশে আমাদের সাহিত্যের কত ভুল-ভ্রান্তিময় অপপ্রচার, কত তার পদস্খলন।

[illegible]

তিনটি অমূল্য প্রাণ অকালে ঝরে গেল কেন?

জেমিনী প্রোগ্রাম নিজের কর্তব্য সমাধা করার পর মহাকাশযাত্রা যখন অ্যাপোলো প্রোগ্রামের হাতে তুলে দিয়ে যায় তখন কে ভাবতে পেরেছিল যে নতুন আগন্তুক প্রথম পদেই এত বড় শোচনীয় এক হোঁচট খাবে? কিন্তু যন্ত্র নিয়ে যেখানে কারবার সেখানে এই ধরনের আকস্মিক বিয়োগান্ত দুর্ঘটনা ঘটবে না এমন গ্যারাণ্টি কেউ দিতে পারেন না। এক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রশ্নটা কিছুই নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে তিনটি অমূল্য অসমসাহসী প্রাণের প্রশ্ন, যাঁরা স্বদেশের খ্যাতি প্রসিদ্ধির জন্য আত্মাহুতি দিয়ে মহাজাগতিক অভিযানের ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন।

দিল্লীতে এক সাক্ষাৎকারে আমেরিকার প্রথম মহাবৈমানিক মিঃ জন গ্লেন মিঃ মেলভিল ডিমেলোর কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে, মহাজাগতিক অভিযানের মত এত বড় অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসে আর ঘটেনি। সেই বৃহত্তম অভিযানের তিনজন অভিজ্ঞ সারথির এই অপঘাত মৃত্যুতে আমেরিকার চন্দ্রলোকে যাত্রার পরিকল্পনা হয়ত কিছুটা পেছিয়ে যাবে। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। কারণ ১৯৭০ সালের মধ্যে হাতে করে চাঁদ ছুঁতে না পারলে কারুরই খোল পালাবে না। আসল কথাটা হচ্ছে এই তিনটি প্রাণের অকালে ঝরে-যাওয়ার কিছু প্রয়োজন ছিল কি? গ্রিসম মহাশূন্যে যান দুবার—হোয়াইট একবার, চ্যাফির এই প্রথম যাত্রা ছিল। এবার গ্রিসমের ছিল তৃতীয় যাত্রা এবং হোয়াইটের দ্বিতীয়। কিন্তু তাঁদের শেষযাত্রায় চলে যেতে হলো। চাঁদে যাবার নেশায় এইরকম ব্যাপার যে আবার ঘটবে না এমন কথাও কেউ বলতে পারেন না। তবে এই দুর্ঘটনা থেকে যে বৈজ্ঞানিক বাদানুবাদের উদ্ভব হয়েছে তা থেকেই হয়ত বার হয়ে আসবে মহাজাগতিক যাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

আমরা জানি মহকাশযানের যাত্রীদের কামরার মধ্যেকার পরিবেশ পৃথিবীর স্বাভাবিক পরিবেশের অনুকরণে তৈরি করা হয়, অবশ্য যতটা সম্ভব। যতটা সম্ভব এইজন্য বলছি যে, সর্বাংশে খোল আমরা নকল করা নানা কারণে সম্ভব হয় না। সম্ভব হয় না বলে পুরো নকল করতে গেলে অন্যতর অসুবিধা দেখা দেয়। যেমন ধরুন, কামরার মধ্যে যাত্রীদের শ্বাসক্রিয়ার জন্য যে কৃত্রিম বায়ু সঞ্চালিত করা হয় তাতে স্বাভাবিক বায়ুর সমস্ত উপাদান থাকে না, থাকে একটি অর্থাৎ অক্সিজেন বা বড় জোর দুটি—অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। রুশ মহাকাশযানে নাকি শেষোক্ত দুটি বাষ্পের সংমিশ্রণ থাকে। কিন্তু মার্কিন মহাকাশ বৈজ্ঞানিকদের মতে কোন মহাবৈমানিক যখন মহাশূন্যে বার হয়ে পায়চারি করবেন তখন তাঁর ঘাড়ে যদি পোশাকের চাপ অত্যধিক হয় তাহলে তাঁর হাত পা আড়ষ্ট হয়ে যাবে, তিনি স্বচ্ছন্দে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়তে পারবেন না। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিশিয়ে ব্যবহার করলে সেই চাপ দাঁড়াবে প্রতি বর্গ ইঞ্চে ১৫ পাউণ্ডের মত যা অত্যধিক। সে চাপ কমাতে হলে অক্সিজেন প্রবাহ কমাতে হয় কিন্তু সেটা যাত্রীর পক্ষে বিপজ্জনক।

লিওনফের মহাকাশচারণার ক্ষেত্রে তাঁর মুখোশের মধ্যে অক্সিজেনের সঙ্গে নাইট্রোজেনের অনুপাত পরিবর্তিত করে দিয়ে তবে তাঁকে মহাকাশে নামতে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়া বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় নেয় বলে আমেরিকান বৈজ্ঞানিকরা এটা বিশেষ পছন্দ করেন না। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, কিসের মূল্য বেশি, কয়েক ঘণ্টা সময়ের না মানুষের প্রাণের?

বৈজ্ঞানিকদের বাদানুবাদ প্রধানত মহাকাশযানে ব্যবহৃত কৃত্রিম আবহমণ্ডলকে কেন্দ্র করে। একথা অবশ্য তাঁরা স্বীকার করেন যে বর্তমানে ব্যবহৃত কোনটির পূর্ণ নিরাপত্তা সম্পর্কে গ্যারাণ্টি দেওয়া যায় না। একদল মনে করেন যে, আমেরিকার গৃহীত খোল আনা অক্সিজেন উপাদান সোভিয়েটে গৃহীত জোড়া-বাষ্পের উপাদানের তুলনায় বেশি বিপজ্জনক। আমেরিকার মহাকাশ প্রোগ্রামের কর্তৃপক্ষ যে তা জানতেন না তা নয়। অক্সিজেন সর্বস্ব আবহ যে অগ্নিকাণ্ড ডেকে আনতে পারে তা শুধু তাঁরা কেন, দুনিয়ার সব দেশের বৈজ্ঞানিকরাই জানেন। কিন্তু অনেকে এই যুক্তি দিচ্ছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে অত্যুচ্চচারী মার্কিন বিমানে বৈমানিকের শ্বাসক্রিয়ার জন্য শুধু অক্সিজেন ব্যবহার (এবং মার্কারি ও জেমিনী প্রোগ্রামেও) করে কোন বিপদ যখন ঘটেনি তখন সেই ব্যবস্থার যোগ্যতা অস্বীকার করা যায় কি করে? ঐসব ক্ষেত্রে কোথাও আগুন জ্বলে যায়নি এবং ১৪ দিন মহাকাশে অক্সিজেন-আবহের মধ্যে থেকেও কোন মহাবৈজ্ঞানিকের শরীরের বা স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হয়নি।

সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের মতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিশিয়ে ব্যবহার করলে সেটি পার্থিব আবহের খুব কাছাকাছি যায়।

মরণে অমর (বাঁ দিক থেকে) গ্রিসম, চ্যাফি ও হোয়াইট। এঁদের ১৪ দিন পর্যন্ত মহাশূন্যে থাকার কথা ছিল

পৃথিবীর আবহে যে অক্সিজেন রয়েছে তা বিপুল পরিমাণ নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেনের সঙ্গে মিশে খুবই পাতলা হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে অক্সিজেন আছে মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ এবং বাকি চার ভাগ হচ্ছে নাইট্রোজেন। কিন্তু মহাকাশযানে এইরকম মিশ্রবাষ্প ব্যবহার করলে যে আগুন জ্বলার সম্ভাবনা থাকে না তা নয়। আগুন তাতেও জ্বলতে পারে তবে অবশ্য অক্সিজেনের মত অত তাড়িৎ গতিতে জ্বলবে না, জ্বলবে একটু আস্তে। সুতরাং এটা অনস্বীকার্য যে শুধু অক্সিজেনের চেয়ে মিশ্রবাষ্পের ক্ষেত্রে আগুন ধরে গেলেও যাত্রী আত্মরক্ষার চেষ্টা করার কিছুটা বেশি সময় পেতে পারেন। কিন্তু মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা বলছেন যে সেই মিশ্রবাষ্প সরবরাহের জন্য রুশ মহাকাশযানগুলির বাইরের দিকে বড় বড় ইস্পাতের ট্যাংক বয়ে নিয়ে যেতে হয়

জেমিনী প্রোগ্রামের শেষাঙ্ক রূপায়ণের পর মহাবৈজ্ঞানিক লাভেল ও অলড্রিন

যেগুলির মধ্যেকার ভালব খুলে ভিতরে বাষ্প চারিয়ে দিতে হয়। কামরার ভিতরের আবহচাপ সে ক্ষেত্রে পৃথিবীতে আবহ-চাপের প্রায় সমান হয়ে যায় বলে যাতে ভিতরের বাষ্প বেশি মাত্রায় বাইরে ঠেলে বেরিয়ে যেতে না পারে তার জন্য সোভিয়েট মহাকাশযানগুলিকে খুব পুরু বর্ম দিয়ে মুড়ে দিতে হয়। ফলে মহাকাশযানটি অত্যন্ত ভারি হয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, হলোই বা ভারি, যাত্রীর নিরাপত্তাটা কি তার চেয়ে বড় কথা নয়? তাছাড়া আমেরিকার রকেটের কি সেইরকম ওজনের জাহাজ মহাকাশে পৌঁছে দেবার মত যন্ত্র-বল নেই? সেই যন্ত্রবল যদি থাকে তাহলে যে পথ অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক সেটাই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

সমুদ্র গবেষণায় ডুবুরীরা আর এক রকমের মিশ্র বাষ্প ব্যবহার করে যা হচ্ছে অক্সিজেনের সঙ্গে হিলিয়ামের সংমিশ্রণ। হিলিয়ামে আগুন জ্বলে না। কিন্তু মার্কিন বিশেষজ্ঞরা সেটিও গ্রহণ করেন নি কারণ সেই রকম আবহের মধ্যে থেকে মহাবৈজ্ঞানিক পৃথিবীর সঙ্গে যেসব কথাবার্তা কইবেন সেগুলির শব্দ নাকি বিকৃত হয়ে যায়। ফলে পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ব্যাহত হয়ে বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু আবার সেই একই প্রশ্ন, প্রাণটাই কি সবচেয়ে বড় প্রশ্ন নয়? যোগাযোগ ব্যাহত হলেও যাত্রী হয়ত নানা কলাকৌশল করে বেঁচেও যেতে পারেন কিন্তু কামরার বদ্ধ অবস্থায় হঠাৎ বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন লেলিহান অগ্নিশিখায় আবদ্ধ হলে তাঁর রক্ষা পাবার কোন আশাই থাকে না।

গ্রিসম, চ্যাফি ও হোয়াইটের অকালমৃত্যু থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমেরিকা ও রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ যদি মহাকাশ অভিযানের নিরাপত্তার দিক সম্পর্কে আরো সচেতন হন তাহলে কারো কোন ক্ষতি হবে না। তাতে চাঁদে যাওয়ার না হয় একটু দেরিই হলো। তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকুন চাঁদ তাঁদের প্রতীক্ষায় তার বাঁধা পথেই ঘুরে চলবে।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

রিপিট

ত্রিলোচন কলমচি

ড্রামাডোল

আমি একবার ভিক্টোরিয়া ক্রস পেয়েছিলাম।

না, কোনো যুদ্ধেটুদ্ধে নয়, স্রেফ টেলিফোনে। টেলিফোনে ক্রস কানেকশন আপনারা অনেকেই কখনো না কখনো পেয়েছেন। কখনো শেয়ার মার্কেটের ভাউ, অশ্বিনীকুমারের ক্যারেকটার সার্টিফিকেট, শনিবারের মাঠে যারা না যাওয়ার হালহদিস, কখনো বা কলেজীয় প্রণয়-কথিকা শুনতে হয়েছে মুখ বুজে। আপনি যখন এমার্জেন্সিতে ছটফট করছেন ঠিক তখনই অলস অর্থহীন আলাপ আপনার কানে বাজবে, অসমসাহসী পরীহুরীর মত সার্কাসের মেয়েরা যেন অবলীলায় আপনারই কর্ণগোচর তারের ওপর দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে হেঁটে যাবে, আর আপনি পেতার বি-call হয়ে ট্রাফিক পুলিসের মত হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

আমার দু-চারজন লেখক বন্ধু নাকি, স্বপ্নাদ্য ওষুধের মতই ক্রসকানেকশন নিংড়ে অনেক কল্পিত গল্প পেয়েছেন এবং বলাই বাহুল্য সেগুলো গোগ্রাসে আত্মসাৎ করেছেন। আমি ভিক্টোরিয়া নাম্নী জনৈকা তরুণীকে ক্রসকানেকশানে (না চাহিলে যারে পাওয়া যায়) পেয়েছিলাম। সংলাপ চলেছিল জনৈক নায়কের সঙ্গে সম্ভবত, এবং আমার কানে তা যখন পৌঁছালো তখন যেন ক্লাইম্যাক্স্ পয়েন্টে পৌঁছে গেছে। নায়ক-নায়িকা উভয়েরই কণ্ঠ তখন তপ্ত।

—ভিক্টোরিয়া, এই তাহলে তোমার শেষ কথা?

—তুমি যে হুমকির সুরে কথা বলতে শুরু করলে দেখছি!

—কথার প্যাঁচ না, জবাব দাও।

—নতুন করে আর জবাব দেবার কি-ই বা আছে? যা হবার—চুকেবুকে গেছে আমাদের!

—অহ্ তাই নাকি? এবার তাহলে নতুন স্বামী নিয়ে ঘর সংসার শুরু করে দাও।

—মুখ সামলে কথা বলো, ইতর কোথাকার!—তারের অজানা প্রান্তে ফুঁসে উঠলো বিষাধরা।

কোনো আধুনিক ভগ্নপ্রণয়ের ঘরোয়ানা শুনছি, এবং অনধিকার কর্ণপাত করে শুনছি, সেই কথাই জানতাম। পাত্রপাত্রীর ভূগোল ইতিহাস জানা না থাকলেও সম্পর্ক নির্ণয় করে গল্পটা বুঝে ফেলতে কিছুমাত্র অসুবিধে হয় নি। কিন্তু সব হিসেব ভণ্ডুল হয়ে গেল পরবর্তী ডায়ালগ শুনে।

—রিপিট্। নায়ক সহজ গলায় বলল।

মুখ সামলে কথা বলো। ইতর কোথাকার

—মুখ সামলে থেকে? মুখ সামলে কথা বলো, ইতর কোথাকার! কেমন?

—সুপার্ব! আপনারা মেয়েরা বর্ন অ্যাকট্রেস।

থার্ড পার্সন-এর নিম্পুকার অরেস থ্রো করলাম এতক্ষণে, ও দাদা-দিদি, আপনারা কি বই ধরেছেন জানতে পারিকি?

—অ্যাঁ! মেয়েটি চকিত গলায় বলল, শুনেছেন? এ আবার কে কথা বলে?

নায়ক বিরক্ত কণ্ঠে বলল, ট্রেসপাসার কেউ হবে, ছেড়ে দিন।

ক্লিক্...কট্...কট্...। সব শেষ। মনে হল পেরিস্কোপ সমেত সাবমেরিন ডুব দিল।

নাটকের রিহার্সাল অনেক অসম্ভব জায়গায় এবং পরিবেশে শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। এই কয়েক সপ্তাহ আগেই পাঁচ শ' পঁয়তাল্লিশ ফিট মাটির নিচে খাদানে বচন শুনে এসেছি। কয়েক বছর আগে একটি উন্মাদ-আশ্রমে পার্ট মুখস্থ করতে দেখে জনৈক হাসপাতাল কর্মীকেই প্রথমটা সন্দেহের চোখে দেখেছিলাম। জেলখানার মধ্যেও জলজ্যান্ত রিহার্সাল শুনেছি কিন্তু এই জাতীয় রিহার্সাল পদ্ধতি কেবল অভিনব, তাই নয়, অর্থবহ-ও বটে। আমার কানের ভিতর দিয়ে ওই দুই শখের নায়ক-নায়িকা মর্মে প্রবেশ করেছিলেন সেদিন। কোন্ নাটক, কবে কোথায় মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং কেনইবা টেলিফোনে মহলাইকর্ম হচ্ছিল, তা সবই অজ্ঞাত থেকে গেল। তা যাক। কার্যকারণের তাপিশ মারতে অবশ্যই কষ্ট হয়নি। টুটা ফুটা, খাপছাড়া ধরনের গল্পের টুকরো কুড়িয়েই তো ফুল্কিপাত তৈরি করি আমরা।

কিন্তু আমি সেকথা ভাবছিলাম না। ভাবছিলাম স্ত্রীরাশ্চরিত্রম-এর কথা। নারী অনটনের বাজারে অনেক নাট্যকে ক্রমেই বাজেটে ঘাটতি। ফিমেল ক্যারেকটার-লেস নাটক আর বাংলা দেশে কখানা আছে, যে-গুলো আছে সেগুলোও কথায় কাজে প্রাপ্তবয়স্ক নয়। আসলে স্ত্রীঘটিত ব্যাপার ছাড়া কিছু নাটকই নয়। মানে নাটকীয় নয়। ঔপন্যাসিক ব্যক্তিরা সেকথা জানতেন, এবং এখনো জানেন। তাই তাঁরা গ্রন্থের ডালে ডালে (পরিচ্ছেদে) পাতায় পাতায় নারী চরিত্র ফুটিয়ে তবে অন্য কথা বলেন। ঔপন্যাসিক থেকেই আমাদের আজকের নাট্যকারের প্রায়ন জন্ম হওয়ার প্রাইভেট বাসের মতই নাটকের মধ্যে লেডিজ সীট আর খুঁজতে হয় না। অথচ নাট্য পরিচালক প্রতিনিয়ত নাকানিচুবানি খান (মফস্বলে অবশ্যই) তাঁর কন্স্টিটুয়েন্সির মধ্যে মেয়ে দাঁড় করাতে। কিন্তু তা বলে বাংলা দেশে তো আর মেয়ের অভাব নেই। হাটে-বাজারে, কোর্টে কলেজে, অফিসে কারখানায় মেয়ে থই-থই করছে,

ড্রীমফ্লাওয়ার ফেস পাউডার

আপনাকে দেবে
ফুলের
মতো
রমণীয় মুখশ্রী

পণ্ডস ড্রীমফ্লাওয়ার ফেস পাউডার সারা মুখে ফোটায় সুষম লাবণ্য···ছোটখাট খুঁতগুলো আড়াল করে···এবং কোথাও খেবড়ে থাকে না! আপনার স্বাভাবিক মুখের রঙ আরো মনোরম করে তুলতে চমৎকার রকমারি রঙে পাবেন।

চীজব্রো-পণ্ডস ইন্‌ক
(সীমিত দায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

শেষার কাছে শেখা রান্না

ওর নাম ছিল শেষা। আমাদের যেমন অন্না হতো, ফেন্তি হ'তো তেমনই ওদের হ'তো শেষা। বাপ মা মেয়ের জন্ম চাইত না কারণ অর্থনীতির মারপ্যাঁচে তারা আনতো অভিশাপ। পর পর কটি কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়ায় নেল্লোর নিবাসী তেলেগু চাষী সংসারে ওর নাম রাখা হ'লো শেষা। আর নয়, এখানেই শেষ হ'ক! জমি-জমা সামান্য, জমিদারের প্রজা হিসাবে তাদের ঘরে মজুর খেটেই দিন চলত শেষার বাপের। আমার সঙ্গে যখন শেষার দেখা তখন শেষার শেষ বয়স। জমিদারি শেষ হ'য়েছে কিন্তু শেষাদের দারিদ্র্য ঘোচেনি। কোথায়ই বা ঘুচেছে বলুন? শেষা তার স্বামীর সংসারের কথা বেশী বলে না কারণ সেখানটাই তার নীতিসংক্ষ্ম অনুভূতির মর্ম যন্ত্রণা। সন্তানের জন্ম দিতে পারেনি বলে তাকে ত্যাগ করেছে তার অক্ষম বৃদ্ধ স্বামী। বাপের ঘরেও খাবার নেই। তাই সে বহু মিনতি করে আশ্রয় নিয়েছে সেই জমি-দারেরই বাড়িতে। ক্রীতদাসী নয়। তবে বৎসরান্তে সামান্য কিছু পারিশ্রমিক। বাকি সময়টা খাওয়া পরার ব্যবস্থা। জমিদারও আর সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রজা-পালক নেই। তার ঘরের কাজে শেষাই একমাত্র সম্বল। সকাল থেকে সন্ধ্যা শেষার 'এক চক্করেতেই বাঁধা'।

আমি জানি না একবর্ণ তেলেগু আর শেষা জানে না অন্য কোনও ভাষার এক অক্ষর। তবু আমাদের কথাবার্তায় বিরাম নেই। শতছিন্ন শাড়িখানা খুলে ফেলে হাত পা নেড়ে বুঝিয়ে বলতে কসুর করত না যে ওর কাপড়-এর এই দশা। একখানা পেলে মন্দ হয় না!

শেষার রান্না রান্নার পর্বটি আমার বেশ লাগত। কোনও আধুনিক যুগের 'গ্যাজেট'-এর ছিটে ফোঁটাও নেই। বিরাট এক পাথরে মস্ত এক গর্ত। সেই গর্তে ভেজানো চাল বা ডাল দিয়ে মস্ত এক নোড়া ঘটর ঘটর করে রোজ সকালে চলত ইডলি বা দোসার আয়োজন। কখনও বা সে করত "পেসারেট"। পেসারেট জিনিসটি অন্ধ্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। রান্না আর খাওয়াই তার মেশানো ইডলি দোসা সারা দক্ষিণ ভারতের খাদ্য কিন্তু দক্ষিণীরাই তেলেগু সংসারের মুখরোচক পরিবেশন "পেসারেট"কে পরম প্রিয় পরিবেশন মনে করেন। কাঁচা মুগের ডাল দিয়ে তৈরি হয় পেসারেট। আমিষ অভাবে ক্লিষ্ট ভারতীয় খাদ্য তালিকায় পেসারেট প্রোটিন পূর্ণও বটে।

পেসারেট-এর কাঁচামুগ আগের দিন জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। কেউ বা আস্ত মুগের খোসা না ফেলে ব্যবহার করেন। তাতেও ভালই স্বাদ হয় ও খোসার সবুজ কুচি দেখতেও বেশ লাগে। হেরফের অনেক রকমই করা চলে। তবে শেষার দেওয়া মোটামুটি উপকরণের হিসেব হ'ল : মুগ-ডাল, পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা, আদা, ধনে, ধনে পাতা আর লবণ। পেসারেটের সঙ্গে খেতে হয় তেঁতুল লঙ্কার চাটনি।

১। ভেজানো ডাল মিহি করে পিষে আন্দাজ মত জল দিয়ে বেসনের গোলার মত তৈরি করুন। গোলার বেলায় খেয়াল রাখতে হবে যেন পাতলা না হয় আবার বেশী মোটা হ'লেও মুশকিল। প্যাটিসাপটা পিঠে অথবা দোসার গোলা মনে রাখলেই হবে। লবণ দেবেন। ধনে বাটাও অল্প একটু দেবেন।

২। চাটুতে তেল দিয়ে বেশ করে গোলা দিয়ে ডিমের অমলেটের মত গোলাকার করে দিন। ডালের গোলা তো ঠিক ডিমের মত নয় কাজেই গোল হাতার পিঠ দিয়ে চেপে চেপে ছড়াতে হবে।

৩। পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, ধনে পাতা, আদা সব মিহি কুচি করে উপরে ছড়িয়ে দেবেন। তলায় ভাল করে ভাজা হ'লে খুব সাবধানে উল্টে দেবেন। এইখানে পেসারেটের আসল বাহাদুরি। ডালের গোলা চট করে ভেঙ্গে যেতে চায়। দুদিকে ভাজা হ'লে ভাঁজ করবেন। দু ভাঁজ বা চার ভাঁজ যা ইচ্ছা। গরম গরম খাওয়া দরকার, না হ'লেই স্বাদের ঘাটতি। পছন্দ হ'লে পেঁয়াজ লঙ্কার কুচির সঙ্গে দুচার কুচি টোমাটো দিতে পারেন।

সঙ্গে খাবার চাটনি তেঁতুল গোলার সঙ্গে লঙ্কা ও নুন মিশিয়ে নিলেই হ'ল।

শেষার মালিকের ঘরে প্রাতরাশের পালাটাই বেশী। ভাল করে প্রাতরাশ করে ছেলেরা যায় স্কুলে, কর্তারা কাজে। দুপুরে কফির সঙ্গে একটু টুকিটাকি হ'লেই সান্ধ্য আহারটা ভাল করে জমে। পেসারেটও প্রাতরাশের পরিবেশন। মাদ্রাজের বাজারে ম্যাশনে পাওয়া চাল গম বাদ দিয়ে দিনের অনেকটা কাটাবার পক্ষেও ভাল ব্যবস্থা।

শেষা মাছও বেশ ভাল রাঁধত। খাঁটি অন্ধ্র প্রদেশীয় ধরনে মাছের তরকারিকে আমাদের মাছের অম্বলের মত কিছুটা বলা যায়। তেঁতুল দক্ষিণের পাকপ্রণালীর নিত্য সঙ্গী। কাজেই মাছের বেলায় তেঁতুল বাদ যায় না। তার উপর শেষা যে রান্না খাইয়েছিল তাতে ছিল মোটাকরেক আমের ফালি —কাঁচা আমের সুগন্ধ স্বাদুতার

খাটিয়ার নমুনায় পার্টিশন

কাঁচা আমের আচারে ওরা মিষ্টি একেবারেই ব্যবহার করে না। যথেষ্ট লংকার গুঁড়ো আর সরষের গুঁড়োর উপরেই স্বাদের তীব্রতা নির্ভর করে। তার সংগে থাকে লবণ, হলুদ আর হিং। কেউ কেউ রসুন পছন্দ করে। তারা দু'চার কোয়া রসুনও দেয়। যথেষ্ট পরিমাণ তিল তেল ভালমত গরম করে আম আর মশলা ফেলে ঠাণ্ডা হ'লে বন্ধ করে রাখলে দিনকতক পরে আচার বেশ মজে যাবে। আবাকাই সাধারণত খুব ঝাল হয়।

শেবার ভাষায় যতটুকু বুঝেছি তার রান্নাবান্নার ততটুকুই আলোচনা করলাম। পরীক্ষা করে দেখবার ভার আপনাদের উপর। সেই সংগে শেবার কথাও মাঝে মাঝে স্মরণ করবেন। ভারতবর্ষে তথাকথিত আত্মেকপ্রাপ্ত সমাজের বাইরে যে মেয়েরা বাস করে ও তাদের অনেকের একজন। আইন করে ওদের এতটুকুও সুবিধা হয়নি। কারণ ওরা দাবি করতে জানে না, সমাজ-সংস্কারে ফল হয়নি; কারণ ওদের সমাজে সংস্কার পৌঁছোয় না। ওরা অসহায় ব্যর্থতায় দিনের পর দিন কাটিয়ে হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে। সেখানে শেবার সংগে দেশের যে কোন কোণার একটি মেয়ের সংগে কোনও তফাত নেই। শেবার কানে আছে মস্ত বড় এক মাকড়ি। সোনার মাকড়ি। মালিক গৃহিণী বললেন ঐ মাকড়ি ওর শেষকৃত্যের সম্বল। মাকড়ি কান থেকে খুলে প্রতিবেশী পরিজন ওর পারের কড়ির ব্যবস্থা করবে এই ভরসায় কানের সংগে বারোমাস ওর মাকড়ির সহযোগ সহজে ছিন্ন হয় না। এ জীবনে শেষ কটা দিন কাটাবার সম্বল হচ্ছে বৎসরান্তে পাওয়া সামান্য পারিশ্রমিকের জমানো টাকা কটা। খাওয়া আর পরার পর তার আর প্রয়োজন নেই। তাই টাকা তার গচ্ছিত থাকে মনিবের কাছে। যেদিন সে আর কাজ করতে পারবে না, সেদিন তার ভার নেবে ঐ জমানো কটা টাকা, যেমন নেবে তার মাকড়ি জোড়া পরকালের দায়িত্ব।

টুকি টাকি

স্পিরিট দিয়ে ঘষলে আয়নার কাচ সহজে পরিষ্কার হয়। কাপড়ের বদলে নরম কাগজ দিয়ে ঘষলে কাজ আরও ভাল হয়। চুন দিয়ে আয়না পরিষ্কার করা যায়। চুন মেখে রেখে শুকিয়ে গেলে ভাল করে ভিজে কাপড়ে ঘষলে আয়না উজ্জ্বল হবে। সম্ভব হলে তারপর স্যাময় লেদার দিয়ে একটু মুছে দেবেন।

স্নানের ঘর বা যেখানে সব সময় জলের কাজ হয় এরূপ জায়গা যদি পিছল হয়ে ওঠে তবে চুন দিয়ে জায়গাটি ঢেকে রাখবেন। শুকিয়ে গেলে নারকেল ঝাঁটা বা নারকেলের ছোবড়া দিয়ে ঘষে ঘষে ধোবেন।

শীতের শেষের শুকনো হাওয়ায় ত্বক যখন খসখসে শুকনো হয়ে ওঠে তখন কাগজি বাদামের তেল ত্বকের কোমলতা ফিরিয়ে আনে। পাউডার যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরা লক্ষ করে থাকবেন শীতের হাওয়ায় বিবর্ণ মুখের উপর পাউডার প্রলেপ অনেক সময় হাস্যকরভাবে দৃষ্টিকটু দেখায়। তার জন্যও এক ফোঁটা বাদাম তেল বুলিয়ে তবে পাউডার বা অন্য প্রসাধনী ব্যবহার করলে সমতাপূর্ণ ও সুষম প্রসাধন করা চলে।

যাঁদের নখ সহজে ভাঙে বা ফেটে যায় তাঁরা হাতের আঙুলে গরম তেল মালিশ করলে উপকার পাবেন। নখ কাটার সময় দু'পাশে খুব গভীরে না কাটলে নখের জোর বেশী থাকবে ও অত সহজে ভাঙবে না।

আড়াল দেবার ব্যবস্থা

সামান্য একটু আড়াল দিয়ে একই ঘরকে দু'ভাবে ব্যবহার করার চলন আধুনিক শহরের স্বল্পপরিসর গৃহে খুব সাধারণ হ'য়ে উঠেছে। এমন কি একখানা ঘরের তিনটি অংশ পর্যন্ত করা হয়। বসবার আর খাবার ঘর তো আছেই, মাঝে মাঝে এই একই ঘরের এককোণা একটু আড়াল দিয়ে শোবার খাটখানাও পাততে হয়। কাজেই পার্টিশন বা আড়াল দেবার আয়োজনের নানা রকমফেরের নিত্যনূতন পরিকল্পনা চলেছে। জাপানে তো শুনেছি তাদের চিরকালের ব্যবস্থাই তাই ছিল। কাঠের বাড়ির মস্ত ঘরখানা হিসেবনিকেশ করে রংবেরং-এর আড়াল আবডালের পার্টিশন তৈরি হ'ল। ইচ্ছেমত ঘরের সংখ্যা সাজানো হ'ল যার যেমন প্রয়োজন। অতিথি এলেন, চিন্তা নেই। ঐ ঘরের এতটুকুই তো! সুন্দর পার্টিশন দিয়ে বেডরুম হ'য়ে গেল চমৎকার।

আমাদের দেশেও ভারতীয় রূপসজ্জার ধারা দিয়ে নানারকমের পার্টিশন করা চলে। একটি বন্ধুর বাড়িতে চারপাই বা দড়ির খাটিয়ার নমুনা দিয়ে করা পার্টিশন দেখলাম। ঘরখানা বড়। দুভাগ করে খাবার আর বসবার ব্যবস্থা। মাঝখানে বড় রকমের ফ্রেম। ফ্রেম বা কাঠামোর ভিতরে খাটিয়ার আকারের অংশ তৈরি করা। সবটাই সমান নয়, একভাবে বাঁধাও নয়। বৈচিত্র্য ইচ্ছামতও করা চলে। ভরাট করা হ'য়েছে খাটিয়ার বুনুনির নানা ধরন দিয়ে।

চৌকো, তেকোনা, আড়াআড়ি পাশাপাশি নানাভাবে আবরণ লাগাবেন দড়ি বা সুতলি বাঁধা হয়েছে। আড়াল করাই উদ্দেশ্য। কাজেই চারপাই-এর মত শক্ত মজবুত না হলেও চলবে। ইচ্ছা হলে রঙিন দড়ি ব্যবহার করা চলে অথবা কাঠের ফ্রেমে রং লাগানো চলে। দড়ির ঘুলঘুলির গায়ে নানা রকমের সাজাবার টুকিটাকি, পুতুল ইত্যাদি লাগানো যায়। চাঁদমালার মত বড় বড় ফুল বা কদম্ব ঝুলিয়ে দিলে বেশ সুন্দর দেখায়। ভাল ছবি ফ্রেম করে মাঝে মাঝে লাগানো চলে। আমি কয়েকটা উদাহরণ দিলাম মাত্র। গৃহকর্ত্রীর রুচি হিসাবে বহুভাবে সাজানো সম্ভব। এই পার্টিশনের সঙ্গে মিল রেখে ছোট ছোট দড়ি দিয়ে খাটিয়ার বুননের চেয়ার বা চৌকি দিয়ে ঘরের কোনও অংশ সাজানো যায়। সরু খাটিয়ার মত জিনিস ঘরের কোণে রাখলে বসবার কাজ হয় আবার দরকার হলে শয্যা হিসাবে ব্যবহার করা চলে। দিনের বেলায় নানা রংএর সুচারুকাজ কুশন পেতে রাখলে ভালই মানাবে। রাত্রে তুলোর গদি বিছিয়ে বিছানায় পেতে দিলেই চলবে।

শ্রীমতী

কবিপুত্রের পিতৃস্মৃতি

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

বিরাট মানুষকে পুরোপুরি জানতে হলে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত যেমন অত্যাবশ্যক তেমনি নানান দিক থেকে দেখা পার্শ্বচিত্র বা profile study-রও প্রয়োজন। পূর্ণাঙ্গ চরিতকথায় খুঁটিনাটি কথা অনেক বাদ পড়ে যায়। সব কথা বলা সম্ভবও নয়। দেশের এবং দশের জীবনে তাঁর যে স্থান সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত রচনা করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের কর্মকাণ্ড আবার দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশে পরিব্যাপ্ত, কাজেই সে বৃত্তান্তের ব্যাপ্তি সীমা ছাড়িয়ে যেতে বাধ্য। একথা নিশ্চিত যে সেখানে অন্তরঙ্গতার অবকাশ কম। আবার যেখানে কোন স্নেহভাজন ব্যক্তি স্মৃতিকথা লেখেন সেখানে দেশের এবং দশের স্থান সংকীর্ণ—সেখানে রবীন্দ্রনাথ ও আমি। এরও বিপদ আছে, বেশী অন্তরঙ্গ করতে গিয়ে অন্তঃপুরে অন্তরীণ করবার আশঙ্কা থাকে। তবে এরও যথেষ্ট মূল্য আছে, সব মিলিয়ে দেখলে তবে গোটা মানুষটিকে জানা যায়। বলা বাহুল্য বড়র সঙ্গে ছোটকে মিলিয়ে দেখায় বিশেষ প্রতিভার প্রয়োজন। বসওয়েল একক চেষ্টায় যা করেছিলেন এ ক্ষেত্রে অনেকের মিলিত চেষ্টায় সেটি সম্ভব হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত ভক্তদের মধ্যে অনেকে কবির স্মৃতিকাহিনী লিখেছেন। দৈনন্দিন ঘরোয়া জীবনে, নিভৃত কথোপকথনে, হাস্য পরিহাসে, আলাপে ব্যবহারে তাঁর একটি অতি অন্তরঙ্গ চিত্র তাঁরা তুলে ধরেছেন। এর প্রত্যেকটি গ্রন্থ অতিশয় সুখপাঠ্য; কারণ, এ-রকম মানুষের কথা অমৃতসমান। যিনি বলেন তাঁরও পুণ্য হয়, যাঁরা শোনেন তাঁদেরও।

সুখের বিষয় এরই মধ্যে বাংলা দেশে একটি রবীন্দ্র-পরিচয়-গ্রন্থমালার সৃষ্টি হয়েছে। আশা করা যায় ক্রমে এটির কলেবর বৃদ্ধি পাবে। কারণ তাঁকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন, জেনেছেন এমন মানুষের অভাব নেই। মনে হয় এখনও অনেক নতুন কথা জানবার এবং শোনবার আছে। সম্প্রতি কবি-পুত্র রথীন্দ্রনাথ রচিত 'পিতৃস্মৃতি'* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র পরিচয় গ্রন্থমালায় এটি অন্যতম সংযোজন এবং প্রধানতম আকর্ষণ। বলে রাখা ভালো যে, 'On the Edges of Time' নামে রথীন্দ্রনাথের ইংরেজীতে লেখা পিতৃদেবের স্মৃতিকথা কয়েক বৎসর পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থটিকে উক্ত ইংরেজী গ্রন্থের নিছক বঙ্গানুবাদ বললে ভুল হবে; কারণ, ইংরেজী গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছাড়াও বেশ কিছু নতুন জিনিস এখানে সংযোজিত হয়েছে। সংযোজন-অংশে আছে তিনটি নতুন প্রবন্ধ এবং তাঁর ডায়েরীর কিছু অংশ। এছাড়া বলা প্রয়োজন যে রথীন্দ্রনাথ নিজেই বাংলা মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে পিতার স্মৃতিকথা লিখে যাচ্ছিলেন। ইংরেজী গ্রন্থের বিষয়বস্তু অবলম্বনে লেখা হলেও একে ঠিক ইংরেজীর অনুবাদ না বলে মূল বাংলা রচনা বলে গ্রহণ করাই উচিত। কারণ এরূপ স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন ভাষা এবং মনোরম প্রকাশ ভঙ্গি নিছক অনুবাদে কখনো সম্ভব নয়। দুঃখের বিষয় তিনি স্মৃতিকথাটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। বাকী অংশ তাঁর ইংরেজী গ্রন্থ থেকে শ্রীক্ষিতীশ রায় সযত্নে অনুবাদ করে দিয়েছেন।

এই গেল গ্রন্থের ইতিবৃত্ত; কিন্তু সবচাইতে বড় কথা হল, এই গ্রন্থের বিশেষ একটি চরিত্র আছে। এটি কবির জীবনচরিত নয়, তাঁর জীবনের অন্তরঙ্গ ঘরোয়া চিত্রও নয়। এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য লেখকের নিজ চরিত্রবৈশিষ্ট্য। রথীন্দ্রনাথকে যাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে জানতেন তাঁরাই এ কথার মর্ম বুঝবেন। যে কোন পাঠক প্রথম অধ্যায়টি পড়লেই বুঝতে পারবেন, রথীন্দ্রনাথ লিখতে বসেছিলেন আত্মচরিত কিন্তু প্রথম পরিচ্ছেদেই তার পরিসমাপ্তি। নিজের অজানিতে কখন নিজেকে ভুলে গিয়েছেন, লিখতে শুরু করেছেন পিতার কথা। বলতে বলতে তাতেই মশগুল হয়েছেন, নিজের কথা আর বলা হয় নি। নিজের উল্লেখ কেবলমাত্র পিতার সহচররূপে, দেশবিদেশে তাঁর ভ্রমণসঙ্গী হিসাবে। ঐ তাঁর স্বভাব।

কারুশিল্পী রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

* রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'পিতৃস্মৃতি'। প্রকাশক—জিজ্ঞাসা; বারো টাকা।

একটি [illegible] শিল্পী : [illegible]

যদি আমরা একবার অন্তত হুনেইসাসের ছবিগুলি ঠিকমত বিশ্লেষণ করে দেখি, তাহলে শিল্পগত ধ্যান ধারণার অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ করতে নিশ্চয়ই আমরা সমর্থ হব। তখন বিরাট এক বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা বা আলোড়নের উদ্ভব হয়; অথচ আদতে, তার যথাযোগ্য, প্রাপ্য হিসাবে, যে গুরুত্ব লাভ করার কথা, তা তাকে কেউই দেয়নি। সত্যই এক অপরিমেয় সিদ্ধি সংঘটিত হয়, যাতে করে প্রিমিটিভদের বর্ণনা ধর্মী আর্ট (সে আর সেনজুপ্রতিক সে প্রামিতিক) অচল-ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

অর্থাৎ পরিপ্রেক্ষিত আবিষ্কৃত হল। এখন পরিপ্রেক্ষিত বলতে সঠিক কি বুঝায়? সেটা হচ্ছে এমন এক আর্ট তথা একটি সুবিচারিত মায়ার—ইলিউসিয়া' স্যাসীব্ল—দ্বারা মৌলিক বিশ্বাস বা সংস্কারের স্থান দখল করার আর্ট।

এখন কোন এক দৃশ্যসম্বলিত ছবির কথা ধরা যাক; যেখানে সেই দৃশ্যে গড় অর্থাৎ দুর্গ ও কুঁড়ে প্রামিতিকতা সুকৌশলে আরোপ করেছে; এই সূত্রে হুনেইসাদের মধ্যে একজনকে জিজ্ঞেস করা যদি যায় যে, ঐ ছবির মধ্যে সব থেকে কোন জিনিসটা তাকে বেশী টানে—স্পর্শ করে, তৎক্ষণাৎই সে উত্তর দেবে "আমি অভ্রান্তভাবেই জানি যে গড় হচ্ছে বিরাট আর যে একটা কুঁড়ে কিছুতেই একটা প্রাসাদকে আড়াল করতে পারে না, ঐখানে, উক্ত ছবিতে, শুধু মাত্র চূড়ান্ত আ নু পা তি ক বিশেষত্ব (প্রপোর্সিয়ন্ত-আবসেলর্) রয়েছে। যেটা ধর্মত আমাদের মনকে নাড়া দেয়, টানে, সেটা হচ্ছে এই যে, কোন বস্তুকে আমি কি চিরকাল জানি সেটাই নয়, অন্যপক্ষে—যেটা, যার বিষয়ে, সেই বস্তুর বিষয়ে—যা আমার চোখ আমাকে শেখায়! আমি যদি এমন একটি রাস্তার সামনে দাঁড়াই যার দুধারে একই আয়তনের বাড়ির সারি চলে গেছে; দেখব রাস্তা ক্রমে বিলীয়মান, সেই সঙ্গে বাড়িগুলিও যতই আমার দৃষ্টির থেকে দূরে দূরে যাচ্ছে ততই ক্রমশ আকারে অদ্ভুত ছোট, শেষে একেবারে দিগন্ত রেখায় অকিঞ্চিৎকর নামমাত্র বোধ তাদের ওতপ্রোত; এই ব্যাপারটা (ফেনোমেন) আমার কাছে বিস্ময়কর এবং এটাই আমার মনকে আকৃষ্ট করে। আমি সম্যক-রূপে জানি ঐটা একটা চোখের ভ্রম বা আমার মনের ভুল বই অন্য কিছু না। তবু আমি সেই মনের, বোধের, স্তুতি গান করব। কেননা, তা আমাকে অলৌকিক মায়া দেখতে দিয়েছে। কোন বস্তুর বিষয়ে—যে সেটা কি! এই প্রকাশ করার কাজের কারিগরী আমি সাবিত্রিক, ঐতিহ্যগত ও নীতিবাগীশদের হাতে ছেড়ে দিলাম। আর আমার নিজের দিক থেকে আমি আমার পূর্বগামীদের পন্থা পরিত্যাগ করলাম, এবং আমি তাদের খুব সহজ আর্টের বদলে, যথার্থ সত্য—পরিপ্রেক্ষিতের অতীব চতুর ভ্রান্তি বিলসিত (মরোসেজ্জের) এবং কূট রীতি-পন্থা অনুসরণ করব। আমি ঐ রীতি-পন্থাকে এমন এক গাণিতিক সূত্র-ফরমূলাতে ফেলাতে চাই—যেটা অনায়াসে আমার, পরে-যারা-আসবে, অনুগামীদের হাতে খুব সোজাভাবে তুলে দেওয়া যেতে পারে—যাদের কাছে এই রীতি-পন্থা একমাত্র ধ্রুবসত্য হয়ে দেখা দেবে।"

পাওলা উচ্চেলো কথাগুলি ঠিক এই ভাবেই বলেছিলেন, ঐ নবতম আবিষ্কারের কল্পনাটা তাঁকে এতই উত্তেজিত করে যে, তিনি কিছুতেই ঘুমাতে পারেন নি—তিনি তাঁর স্ত্রীকে জাগিয়ে তুললেন, যে উদ্দীপনা তাঁর আর সহ্য হচ্ছিল না, সদ্যনিদ্রা-উত্থিতা স্ত্রীকে মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, "পরি-প্রেক্ষিত যে কি চমৎকার জিনিস..."

শিল্পগুরু সুরেন্দ্রনাথ দাস-এর চিত্র প্রদর্শনী : ফাইন আর্টস ভবন।

আমাদের যতদূর মনে পড়ে এর আগে কখনই সুরেন্দ্রবাবুর একক প্রদর্শনী দেখিনি। অ্যাকাডেমিক কাজে তাঁর মত হাত ভারতে আর নেই বলতে পারা নিঃসন্দেহে যায়; প্রাকৃতিক টোন, পরি-প্রেক্ষিত কোথাও তাঁর খুঁত ধরবার জো নেই, এবং এই সূত্রে যেহেতু তিনি ভারতীয় তাই সাধারণত অ্যাকাডেমিক কাজের, যাকে বলা হয় বিটুমেন, তা তাঁর ছবিতে খুব কমই—তিনি উজ্জ্বল রঙ পছন্দ করেন। তাঁর এই পদ্ধতির কাজ, অজস্র আলেখ্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, যথা রাজা মহারাজাদের, শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, দেশবন্ধু ইত্যাদির আলেখ্য। এছাড়া অন্যান্য ছবির মধ্যে তাঁর ১৫নং একটি বিরাট ক্যানভাস, এখানে প্যাসটেক গুণের খেলা এবং অ্যাটমসফিয়ার অদ্ভুত চতুরতারে এনেছেন, কোচের এমারেলড গ্রীনের ব্যবহার আমাদের চমৎকৃত করেছে। এবং পূজারিণী ছবিটি ছোট—এখানে একটা বেগুনী, শাড়িতে কি অপূর্বভাবে তুলিকাভঙ্গে একটা ঘটনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গক্রমে একথা স্বীকার করতেই হবে, তিনি অ্যাকাডেমিক পদ্ধতিতে জড়িয়ে পড়েন নি। তিনি ভারতীয় বিশেষত বাঙলার ধারা থেকে নিজস্ব একটা আঙ্গিক গঠন করেছেন, যা তাঁর বুদ্ধ কল্পনায়, মহাপ্রভুতে দেখা যাবে। এখানে কোথাও প্রাকৃতিক টোন নেই, সবস্থানেই চিত্রগত ধ্যানের বিন্যাস; বললে অন্যায় হবে যে তাঁর ছবিতে বিশেষত পৌরাণিক কাহিনীমূলক—যথা শকুন্তলা ইত্যাদিতে রবি বর্মার ভাব

আছে, আমাদের বিশ্বাস সব আঙ্গিকটাই তাঁর নিজস্ব। তাঁর কালীর দৃশ্যও একটি মনোজ্ঞ নিদর্শন।

পি টি রেড্ডী-র চিত্র প্রদর্শনী : আর্টিস্ট হাউস।

অনেকদিন পর কলকাতার জনসমাজ রেড্ডীর কাজ বুঝবার সুযোগ লাভ করল। এই প্রদর্শনীতে তাঁর ২৫টি ছবি ছিল। এবং এই সব ছবিতে তাঁর মানসিকতার সুনির্দিষ্ট তথ্য আছে। বিশেষত প্লাসটিক বোধকে আরোপ করতে তিনি ইদানীং কতদূর পর্যন্ত গিয়েছেন তা উপলব্ধি করা যায়। তাঁর ১৩, ১৫, এবং ২-তে দেখা যাবে বাস্তবতার আভাস পরিষ্কার এবং রঙের দিক থেকে কিছুটা প্রাকৃতিক। এ ছাড়া আর সব ছবিতে তিনি অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এখানে [illegible] ভেঙে নষ্ট-ভ্রষ্ট করেছে। [illegible] রূপ নেই—যেমন [illegible] ছবি সকল সময়ই [illegible] কিছুতেই আবসট্রাক্ট নয়। [illegible] প্রচেষ্টা আমাদের [illegible] নং ৯, নং ২১। [illegible] রঙ দিয়ে এক একটা [illegible] সৃষ্টি করেছেন।

পাকা চুল মাথায় ছেয়ে গেলে আপনাকে কিন্তু বয়সের চাইতে বেশী দেখাবে

ট্রু-টোন চুলের কলপ লাগিয়ে দেখুন আপনার বয়েস কমই মনে হবে

হেলেন কার্টিস্-এর তৈরী বিশ্ববিখ্যাত এই কেশ-পরিচর্য্যার জিনিসটি এখন ভারতে পাওয়া যাচ্ছে

পাবো তারে

কালকূট

চোদ্দ

হাত মুখ ধোবার পরে এবার দাম চোকাবার পালা। কিন্তু নারাণঠাকুর কোথায়। নিশ্চয় অনুমানে ভুল করি নি, ঠাকুর স্বয়ং পাচক ও মালিক। আদায় উশুল হিসাব-নিকাশ তারই কাজ। এদিকে গাজীরও খবর নেই। অন্য দিকে কর্তা-গিন্নী অন্য কথা বলে। মাহাতো বলে, 'যা পাব, তাই আনব, তুই বস্ গে যা।'

এমন সময় আসে ফোঁচা। গলার স্বর সেই চিঁচিঁ, চেহারার সঙ্গে একেবারে বেমানান। আমাকে বলে, 'বাবু কি বসবেন, না যাবেন?'

বসার কোন প্রশ্ন নেই। খাওয়া হল, এবার অন্দের বিদায়। মাহাতো বলে ওঠে, 'কেন, বাবু কি জলে পড়ি গেছে, না এজলাসে হাজিরা দিতি যাবে যে, খেয়েই বিদেয় নিতি হবে।'

ফোঁচা বলে, 'তা বলি না। ঠাকুর মশায় জিগেস করতে বললেন, তাই।'

মাহাতো তো মাহাতো। বলে, 'জিগেস করাকরির কী আছে। খাওয়া হয়েছে, একটু বসে বিড়িটিড়ি টেনে যাওয়া হবে। তুমি দাওয়ায় আসন পেতি দাও দেখি একখান। তোমার ঠাকুরমশায় বুঝি খেতি বসবে এখন?'

'হ্যাঁ।'

'বসতি বল গে। খেয়ি এসে দাম নেবে।'

কার কথা, কে বলে। ফোঁচাকে আমি কিছু বলবার আগেই দেখি, যেন হুকুম-বরদার হুকুম নিয়ে চলে গেল। কিন্তু খাওয়ার পরে হোটেলের দাওয়ায় বসার রীতি আমার জানা নেই। সেই কথাটিই মাহাতো বলে, 'বসেন না একটু, মশায়, বসেন, পান বিড়ি খান। এ তো আপনাদের শহরের হোটেল নয় কি যে, খাওয়া হতি না হতি দাম মিটিয়ে চলি যেতি হবে।'

বলে আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে গিন্নীর দিকে ফেরে। জিগেস করে, 'হ্যাঁ, কী বলছিলি বল্।'

বউয়ের মুখ ফেরানো অন্য দিকে। জবাব আসে, 'বলছি, গাজীর জন্যে দুটো পান এনো।'

মাহাতোর হ্যাঁ না কোন শব্দ নেই। দাওয়া থেকে নেমে সে হাঁটা দেয়। ফোঁচা এসে একটা শীতলপাটির আসন পেতে দিয়ে চলে যায়। এখন যা করতে হয় কর। করার কিছু নেই। খেয়েছি, পয়সা না দিয়ে যেতে পারি না। তা ছাড়া গাজী যে আমাকে খাড়া করে রেখে গেল। সে না এলে যেতেও পারি না। অতএব, শীতল-পাটির আসনে অধিষ্ঠান। মাহাতো বউ দাওয়া থেকে সরে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ায়। আধখানা শরীর ঢাকা পড়ে ঘরের মধ্যে, আধখানা বাইরে। ঘোমটার আড়াল থাকলেও বুঝতে পারি, মুখ ফেরানো তার অন্যদিকে।

খাওয়ার পরে নেশা। গাজীর ভাষায় যার নাম ছিরগেট, যার গন্ধ নাকি খুবই মিঠি তাই বের করে ধরাই। মুখোমুখি কোন ঘর নেই। কাঠা দুয়েক জমি ছাড়িয়ে যে-ঘর আছে, তার দরজা অন্য দিকে। সামনে একটা বড় গর্ত, তাতে উনুনের ছাই ফেলানো, পাঁশ আবর্জনাও কম নেই। গর্তের সামনেই বড় একখানি নিবিড় ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে বড় একটা গাছ। হাটের বুকে যে কয়টি বড় গাছ আছে, এই বনস্পতি তার অন্যতম। হয়তো যবে এ জায়গা ছিল নন্দরবনের আওতায়, তখন এই নাম না জানা ঝাড়ালো বর্ষীয়ান বনস্পতি ছিল কিশোর। যার নাম সভ্যতা, তার বড় মাটির লোভ। বন কেটে সে চাষ করেছে। তার মধ্যে কোন রকমে এই গাছের গর্দান বেঁচে গিয়েছে। বয়সের হিসাবে এখন তার ঋতুরাজের কাল, না কি মধ্যঋতুর হাল, বুঝতে পারি না। পুষ্টতা আর সবলতা দেখে অনুমান হয়, বুড়ো সে হয় নি এখনো। পাতায় পাতায় ঝোপে-ঝাড়ে, গাঢ় সবুজের রঙে রঙে ঝাড়বাড়ন্ত দেখি। প্রথম শীতের ছোঁয়াতে এখনো একটি পাতা ঝরার লক্ষণ নেই। বেলা শেষের আলোয় পাতাগুলো চিকচিক করে। চোখে দেখি না, কানে শুনি, তার ছায়া ঝোপে কোন্ সব পাখিরা যেন ডাকে। চড়া গলায় নয়, নিচু স্বরে, সেই সব পাখিরা যেন আলস্যে বিলাসে কী সব বলাবলি করে।

হঠাৎ হারাই, হারিয়ে যাই কোথায় যেন। আপন বলে চিনি যাকে, অস্তিত্ব যার নাম, যে আছে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে, সে যেন নিমেষে যায় কোথায়। তার সঙ্গে চলে যায় স্থান কাল পাত্র। কোথা থেকে কোথায়, কেন এসেছি, সে কথা আমার মনে পড়ে না আর। যেন আমার কোন শুরু ছিল না। শেষ কোথায়, জানা নেই। ওই যে ছায়া, ওই যে গাছ, ওই যে পাখি আলাপ করে নিবিড় নিভৃতে, কোথায় যেন, কোন্ লোকে মানুষের অস্পষ্ট দু-একটা কথা ভেসে আসে, আর এই দরজায় দাঁড়িয়ে লাল শাড়ি জড়ানো আধখানা মূর্তি দেখা যায়, এই সব যেন এক অরূপ সায়র। আমি তাতে ডুবে যাই। কেন, তা জানি না। সংসারের মুগ্ধ বা অবাক হবার কিছু ছিল না এখানে। তবু সব মিলিয়ে এ যেন এক ঘোর। যেন কী এক সুর বাজে কোথায়, অদেখা অচিন লোকে, মানুষের অধরা সীমায়। বাজে এক নামহীন সুর। আর যেমন করে স্তব্ধ প্রহরের ঘোরে ঘন্টা বেজে যায়, তেমনি করে আমার হৃৎপিণ্ডে দুরুদুরু ধ্বনিত হতে থাকে।...

কখন যেন একটা রোগা কুকুর আসে। কালো ধলো রঙ। ছাইগাদায় নেমে বারেক সন্দেহে দেখে দাওয়ার দিকে। তারপর

হয় পাও, সে কথা তুমি বল কেন। মানত করেছ, সে কথা বল।'

আঙুরির স্বরে একটু উপেক্ষার সুর। 'সংকল্পের বল, আর যাই বল, শোনায় যেন, 'তোমার কাজ তুমি কর। ফলের বিচার অন্যায়।'

মাহাতো বলে, 'তা ঠিক, তবে দ্যাখ, আঙুর, মানুষের মন তো।'

তার গলায় নিরাশা, সুরে আক্ষেপ বাজে। এবার জানা যায়, আঙুরির আঙুর। হয়তো আঙুর শুনতে সুন্দর, তবু আঙুরি যেন আরো মিষ্টি। আঙুরি বলে, 'তা হোক। ফল পাও না, সে কথা বলতে নাই।'

মাহাতো ঘাড় নাড়ে আস্তে আস্তে। আবার একটা নিশ্বাস পড়ে। আর তার কালো মোটা ঠোঁটে হাসি দেখা যায়। বলে, 'কিন্তু, ওদিকে বেলা যে যায়।'...

কথাটা সঠিক ঠাহর বুঝার আগে প্রায় বাইরের রোদের দিকে চোখ ফেরাতে যাই। দেখি, গাজীর আরশি চোখ মাটির দিকে। তার কাটা ফাটা মুখখানিও যেন ছায়ায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে। মাহাতোর গলায় আবার শোনা যায়, 'সময়ের বস্তু সময়ে না এলি কি আর তাকে ধরা যায়? না কী বল হে গাজী।'

গাজী মুখে না তুলেই গানের কলি বলে, 'তা বটে চাচা। ওই সেস আছে না, "দোষে বাঁধাল বাঁধ গা জলে, এই কোটালে। পড়েছে মীন, ধরগা ধরা, পাবি না রে জল শুকালে।"'

মাহাতো ঘন ঘন মাথা দোলায়, বারে বারে বলে, 'এই এই এই, এই কথাখানি বল। পাবি না রে জল শুকোলি। তো আঙুরিকে সেই কথাই বলি। মন যে মানতি চায় না।'

তিনজনেই চুপ করে থাকে। দেখি, তিনজনেরই ধূমপান বন্ধ, বিড়ি নিবে গিয়েছে। এবার নিজেকেই নিজের বলতে ইচ্ছা করে, 'ওরে জন্মকানা, দেখলি না রে, আলোতে কলক খেলে যায়।' এ যেন সেই, 'কথা কয় রে, দেখা দেয় না। নড়ে চড়ে হাতের কাছে, খুঁজলে জনমভর মেলে না।' এই তিনে মিলে কী যেন এক কথা বলে যায়, আমি যার মর্ম বুঝি না। অথচ, তাদের মাঝে বসে আমি অন্য স্রোতে চলি। কী এক রহস্যময়তা যেন তলে তলে চলে। আর দেখ, আমি যে ভিন্‌ দেশী লোক, আমি যে বাইরের, তা ফুটে ওঠে এই তিনজনের ভাবে। এখন ওরা এক, আমি ভিন্ন। আমি বিস্মৃত, অস্তিত্বহীন।

আঙুরির গলা শোনা যায়, 'মন না মানলে কী করবে বল। মন না মানিয়ে আমাদের উপায় কী। তবে অই বেলা যায় বেলা যায় প্যাচাল পেড়ো না। ও তোমার মন্দ মন্দ।'

বলে সে ঘোমটাটা টেনে দেয়। মাহাতো তেমনি শব্দ না করে হাসে। সে হাসিটা যেন আঙুরি টের পায়। তাই একবার চোখ ফিরিয়ে দেখে। যদি ঠিক দেখে থাকি, তবে দেখেছি, কাজল মাখা তাগর চোখ দুটিতে জল নেই। জলের থেকে বেশী, কী একটা কষ্ট যেন অথই হয়ে পড়বার জন্যে থমকে আছে। তবু অথই হয়ে পড়ে না।

গাজীও দেখি এবার তার আরশি চোখের পাতা একটু নাচায়। মাহাতোর দিকে চেয়ে বলে, 'তাও হতি পারে। মনের ভরসে কাম লাগে, মন বাঁধ মন রসে করে। বেলা যাবার মতন বয়স তো তোমার হয় নাই চাচা।'

মাহাতোর সে কথায় কান নেই। যেন নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে, 'তাতার বাঁদাও তো কম করলাম না। ধর গে, আলিপুর কোর্টের বড় জজ উকিল মোক্তার

যে যেমন ডাক্তারির কথা বলেছে, সবারি দেখিয়েছি। তারা সব কলকাতার ডাক্তার। কালীঘাট তারকেশ্বরও তো কম হলি না। এখন কী আছে কপালে, দেখি।'

কথা শেষ হবার আগেই মাহাতোর নিশ্বাস পড়ে। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে সে পোড়া বিড়ি ধরায়। গাজীও তার কাছ থেকে ধরিয়ে নেয়। এবার যেন আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে যায়। একটা সন্দেহ নড়ে চড়ে ওঠে, একটা ধারণার মূর্তি ফুটে ওঠে। মাহাতো কি অপুত্রক পিতা। কোন একদিন কোঁচার কাছে ঠাট্টা করে ছেলে চাওয়া, কেবলমাত্র ঠাট্টা নয় তা হলে।

তারপরেই দেখি, মাহাতো জামা সরিয়ে ট্যাঁকের ভিতর থেকে কোমরের সঙ্গে সুতোয় বাঁধা একটা পকেট ঘড়ি বের করে। কখনো আশা করি নি, বিদেশী এক বিখ্যাত কোম্পানীর, বহুকালের পুরনো এক সোনার ঘড়ি এমন একটা মানুষের ময়লা কাপড়ের কষি থেকে বেরুবে। তাও এই দূরের বাজার হাটে। মনে মনে অবাক হই, প্রকাশ করতে পারি না। অথচ এই কেতাবিক আমি আমার ছকের ভাবনায় সামান্য দরিদ্র এক চাষী ছাড়া ভাবি নি। আর, কোন দরিদ্র চাষীর কাছে এমন ঘড়ি দেখলে আমার মত কোন্ মানুষের চোখে ধন্দ না লাগে। এই আমাদের মন। হঠাৎ মাহাতোর সম্পর্কে আমার মন অন্য খাতে বইতে শুরু করে।

গাজী বলে ওঠে, 'দ্যাখেন তো বাবু, নকুড়ীঠাকরুনে যার ঘরে বাঁধা, তার ভোগের মানুষ নাই।'

মাহাতো হেসে তাকায় আমার দিকে। তারপরে গাজীর দিকে ফিরে বলে, 'তাই বা আর কমনে বল। গত সনে ট্যাকসো দিইচি চল্লিশ হাজার টাকা। এ বছর আবার কত দিতে হয় দ্যাখ। সব দিকেই আমার ভরসা। কিছুই আর রেখি যেতু হবে না।'

এই কথা শেষ হতেই হঠাৎ দেখি আঙুরির মাথাটা নিচু হয়ে পড়ে। ঘোমটা খসে যায়। এবার তার ঝুমকো কানের ঝুমকো দুল ঝিকিমিকি করে। সেই সঙ্গে শরীরখানিও কাঁপে। গাজী একবার তাকিয়েই আবার চোখ নামিয়ে নেয়। মাহাতো আঙুরির কাঁধে হাত দিয়ে বলে, 'কাঁদিস না আমি তো মন্দ কিছু বলি নাই।'

সব কিছুই এমন চকিত আর আঁকাবাঁকা, খেই ধরতে পারি না। অন্তঃস্রোতের সব প্রবাহে নজর করি, তেমন শক্তি নেই। তবু সব মিলিয়ে কোথায় একটা ব্যথার ভারের সঙ্গে থমকে থমকে থাকি। ধন্দ লাগে এই কারণে, মাহাতোর শ্রেণী বুঝতে ভুল করেছি। গাজীর ভাষায়, নকুড়ীঠাকরুন যে তার ঘরে বাঁধা, তাতে ভুল নেই। অথচ এমন একজন ধনী, সেকালের সোনার ঘড়ি আর ময়লা কাপড়ের বন্ধনীতে, সে কি না এমন বেশে এমন করে এই ভোজনাগারের দাওয়ায় বসে। শুধু কি তাই। ট্যাকসো বলতে, সম্ভবত কৃষি আয়কর বুঝিয়েছে সে, তার অঙ্ক চল্লিশ হাজার টাকা। সেই লোক কি না সস্তাই বিড়ি টানতে টানতে এল মোটর বাসে করে তারকেশ্বর থেকে। এখন গাজীর কাছে বসে কাঁদে বংশধরের ক্ষুধায়। আঙুরি কাঁদে মুখ নিচু করে। তার চোখে জল। স্বামী তার পিঠে হাত দিয়ে কাঁদতে বারণ করে। লাল চোখ দুটি তার জলে ভাসে না। কিন্তু দেখি, চোখের জলের থেকে তার কান্না যেন গভীর। জলেতে যে ক্ষণেক ধোয়া, সান্ত্বনা থেকে একটু মুক্তি, সেটুকুও তার নেই।

এখন ব্যথার ভারে, সেই তো অবাক মানি, এই লোককে তুমি কেবল কৃপণ ভাববে নাকি। না কী, ভারতের এ আর এক রূপ। হয় তো সাবেকী রূপ। লক্ষ টাকা কষিতে বাঁধা, তবু আপন সমাজ পরিবার বেশবাস আচরণবিধির এদিক-ওদিক নেই। ধুলোয় চলে, ধুলোয় বসে, রাস্তায় কাঁদে। দূরের এই বাজার গঞ্জে, না কোন পথ, অচিন খোঁজে, এইটুকুও দেখা জানা পাওনা ছিল আমার।

ওদিকে গাজীর গলায় গুনগুনানি বেজে ওঠে। সে মুখ তোলে না, ফিরে তাকায় না। যেন নিজেকে নিজেই মাথা নেড়ে কী বলে, গুনগুনিয়ে সুর ভাঁজে। তারপরে নিচু স্বরে টানা সুরে গায়, নাকি কেবল সুর করে কথা বলে, বুঝতে পারি না। গান করে 'মন না হলে সোজা, ফকির সাজা কেবল রে তার বিড়ম্বনা।'

এই একটা কলি বার দুয়েক গেয়ে মাহাতোর দিকে চায় সে। মাহাতো তাকায় তার দিকে। গাজী হাত ঘুরিয়ে গায়,

'ফকিরের সজ্জা ধরে, নেত্য করে,
করছ ধর্মের আলাপনা
।(আরে দূরে হ বলে) তুমি যে আপন কাজে,
বেঠিক নিজে,
পরকে কী বোঝাও বল না।'

বলে মাহাতোর দিকে চেয়ে হাত দুটি জোড় করে হাসে। বলে, 'চাচীকেও সেই কথাখানিই বলি। কী দিয়ে যে মন বাঁধিয় বলব, তা জানি না। তয়, চাচী মন বশ না করি উপায় কী।'

বলে সে আঙুরির দিকে চায়। আঙুরি তবু মুখ তোলে না। তবে তার শরীরে আর কাঁপন দেখি না। গাজী আবার গায়,
'(গাজী বোঝে না) তুমি যে এত গান গাও,
পরকে বুঝাও
নিজে কেন তা বুঝ না
নিজে না বুঝলে পরে অন্য পরে বুঝবে কেন
তা ভাব না।
পরকে কী বোঝাও বল না।'...

বলে ঘাড় বাঁকিয়ে চেয়ে থাকে আঙুরির দিকে। ফাটা মুখের ভাঁজে ভাঁজে একটু হাসি খেলে যায়। গাজীটা করে কী। গুরু, না বশ। অবাক হয়ে দেখি, গাজীটা যেন আর এক খেলা খেলে। ওদিকে আঙুরিও দেখি মুখ তোলে। চোখের জল মোছে। গাজীর দিকে তাকাতে চায় যেন, পারে না। কেবল বলে, 'গাও।'

গাজী তৎক্ষণাৎ ধরে দেয়,
'(গাই) মনের মানুষ পেলাম না, মনে মনে
ভাবছি যে তাই
মনের দুঃখ মনেই রইল, মনে মনে
ভাবছি তাই।
বন পোড়া যায় সবাই দেখে
(বুইলে চাচী) মনের আগুন কেউ না দেখে
এখন কোন্ ছায়াতে তাপ জুড়াই।'

গেয়ে ঝোলা থেকে টান দিয়ে বের করে ডুগ্‌ডুগিটা। ডুপ্ ডুপ্ তাল দেয়, ঘাড় দোলায়। আঙুরির পান খাওয়া ঠোঁটে একটু হাসি ঝিলিক দেয়। ডাগর চোখ তুলে গাজীকে দেখে একবার।

গাজী ডুগ্‌ডুগি থামিয়ে গায়,
'কোন্ সাধনে পাই গো তারে
যে আমার জীবনধন রে
সেই আশাতে ঘুরে বেড়াই।
মন্দির মসজিদ সব ঘুরেছি
মোল্লা মুনসী সব পড়েছি
আমি তারে কোথায় পাই।'

তারপরেই সে আকাশ ফাটানো হাঁক দেয়,
'(জয় মুরশেদ!) মিরাজল কবিরা বল
ঘরের কোণে বসলা কাঁদ
ওরে দিনের কানা
রাত দেওয়ানা
দেখলি না রে তাই।'...

সে গান থামায়। আর মাহাতো বলে, 'আই হলি কথা।'

গাজী বলে, 'তয় অবুঝ কেন। আমি বলি, ছুটোছুটির দরকার কী। ভুঁয়েতে গাছ দুই খান, ফল ফলবে একখান, মনের বুঝ কর।'...

মাহাতো আর আঙুরি দুজনেই যেন দৈববাণী শোনে গাজীর দিকে চেয়ে। আমারও হলও তাই। লোকটার তাল ধরতে গিয়ে আমার চেয়ে থাকা সার। অথচ দেখ, মনের কোথায় তলিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে কখন নারাণঠাকুর এসে দাঁড়িয়েছে। ভোজনের পরে বিড়িটি সবে ধরানো। গাজীকে বলে, 'এই গানখানির গুণেই তরে গেলে।'

গাজী জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে, 'আপনার যেমন হাতের গুণে। ডাল চচ্চড়ি একেবারে অমর্ত স্বাদ হয়েছে।'

নারাণঠাকুর সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে একবার গাজীর মুখ দেখে। তারপরে বলে, যত বাজে প্যাচাল পাড়ে।

(ক্রমশ)

বাঙলা অক্ষরে ইংরেজী নাম ও শব্দ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বে বিশ্ববরণ্যে পণ্ডিত; তিনি আনন্দবাজারের বানান রীতির অযৌক্তিকতা বিষয়ে প্রায় সবদিক থেকে আলোচনা করেছেন। সেসব বিষয়ে অতিরিক্ত কিছু বলা, পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট হবে। তবে যেসব বিষয়ে তাঁর লক্ষ পড়েনি, সেইসব বিষয় সম্পর্কে আমি সামান্য কিছু আলোচনা করছি। আনন্দবাজার বিদেশী শব্দের বানান রচনায় যুক্ত-ধ্বনিকে ভেঙে আলাদা লিপির সাহায্যে লিখছে, তবে সমস্ত যুক্ত-ধ্বনিকে নয়; শব্দের মধ্য ও অন্তস্থিত যুক্তধ্বনিকে তারা ভাঙছে, আদিস্থিত যুক্তধ্বনিকে ভাঙতে পারছে না। শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীও তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, বিদেশী শব্দের প্রারম্ভে যুক্তাক্ষর ভাঙার কোন চেষ্টাই আনন্দবাজারে হয় নি। ব্যাপারটা অযৌক্তিক। একই ধ্বনির দু রকম বানান পৃথিবীর আর কোন ভাষাতে আছে? র-ফলা যদি শব্দের আদি-ধ্বনিকে আশ্রয় করে থাকে, তাহলে আনন্দবাজার তা রাখছে, আর যদি মধ্য বা অন্তধ্বনিকে আশ্রয় করে থাকে, তাহলে তা ভেঙে র-এর সাহায্যে লিখছে, যেমন স্ট্রীট, ব্রেক ও ট্রু; কিন্তু কা স ত রো, উ ড রো ও হা ম ফ রে। এবং কোথাও হস্-চিহ্নটি পর্যন্ত নেই। এমন কেন হবে? একই ধ্বনিকে এক জায়গায় রাখছি, এক জায়গায় ভাঙছি যার ফলে আজ নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

বাংলাতে র একটি ধ্বনি। ধ্বনিটির ব্যবহার তিন প্রকারের। স্বরযুক্ত হলে র বিশুদ্ধ র-রূপে উচ্চারিত হয়, যেমন রূপ রাম রেখা ইত্যাদি; স্বরহীন হয়ে পূর্ব-ধ্বনির সহিত যুক্ত হলে হয় র-ফলা (্র), এই র-ফলাযুক্ত ধ্বনি প্রায় যুগপৎ উচ্চারিত হয়, উভয়ের মধ্যে সময়ের তফাত খুব কম, যেমন ভ্রম, গ্রাম, হ্রস্ব ইত্যাদি (নম্র, গ্রাম্য ইত্যাদির বেলায় স্বতন্ত্র নিয়ম আছে); পর-ধ্বনির সহিত এই স্বরহীন র যুক্ত হলে হয় রেফ (র্), রেফ ও পরধ্বনির উচ্চারণ সময়ের মধ্যে অল্প কিছু বিরতি থাকে, অর্থাৎ ধ্বনিগুলির যুগপৎ উচ্চারণ হয় না, যেমন কর্ম, বর্ম, চর্ম ইত্যাদি। বাংলা র-এর সমতুল ইংরেজী R ধ্বনিটিও এই তিনভাবে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ ইংরেজীতেও এই র, র-ফলা ও রেফ তিনটি ধ্বনিই বর্তমান। যেমন র RUM RATION, RUTE ইত্যাদি; র-ফলা STREET, STRAIGHT, BREAK ইত্যাদি; রেফ CARD, PARK, MARK ইত্যাদি। এখন রেফ সম্পর্কে ইংরেজী ধ্বনিবিজ্ঞানে বলা হয়েছে যে, R যদি কোন VOWEL বা স্বর দ্বারা অনুসৃত না হয় তাহলে একই syllable-এর অন্তর্গত R ধ্বনিটি Mute বা silent হয়ে যাবে, সে-ক্ষেত্রে FOURTEEN, THIRTY, MART ইত্যাদির R উচ্চারিত হবেই না। কিন্তু R যদি K, G ও P ধ্বনি আশ্রিত হয় তাহলে একই syllable-এর অন্তর্গত হয়েও সিকি-মাত্রায় বা তারও কম মাত্রায় উচ্চারিত হবে, যেমন MARK, GEQRGE, SHARP ইত্যাদি। কিন্তু আনন্দবাজারের ক র টি ন, মা র ট, শা র ক ইত্যাদি বানানে তা পূর্ণরূপেই উচ্চারিত হচ্ছে অর্থাৎ আনন্দবাজারের ঐ বানান অনুযায়ী ইংরেজীতে শব্দগুলি দাঁড়াবে PARAK, MARAK, PHORTIN ইত্যাদি। কোন্ ইংরেজ শারট (SHARAT) ও মারট (MARAT) উচ্চারণ করে? FOURTEEN-এর R উচ্চারণ কস্মিন কালে শুনেছি বলে মনে হয় না। আলোচ্য ক্ষেত্রে R সর্বাংশে না হলেও MUTE। তুলনায় বাংলা মারক, ধারক, বাহক, শ্যালক ইত্যাদি। শ্রীচৌধুরী উদ্ধৃত James শব্দটির সঠিক বাংলা প্রতিরূপ হওয়া উচিত জে ম স্ জেমস নয়, জেমস লিখলে রোমানে দাঁড়াবে J A M O S। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের লোকেরা অনেক সময় বিদেশী শব্দের সবটাই উচ্চারণ করে (আমরা যেমন FATHER-এর R উচ্চারণ করি তার চেয়েও বেশি জোর এবং কম্পন দিয়ে). কোন কিছুই বাদ দেয় না, এমনকি MUTE বা নীরব ধ্বনির উপস্থিতি সত্ত্বেও, যেমন FORTY, FOURTEEN প্রভৃতি শব্দ তাদের মুখে উচ্চারিত হয় ফ র টি, ফ র টি ন-রূপে। আনন্দবাজার উদ্ভাবিত বানানে এই উচ্চারণকেই মেনে নেওয়া হয়েছে, সুতরাং তা পরিত্যাজ্য।

ইংরেজী RD একটি যুক্ত-ধ্বনি; এর বাংলা সমতুল র্ড। কিন্তু আনন্দবাজার CARD শব্দের বাংলা করে লিখছে কা র ড। এ বানান কোন মতেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। শ্রীচৌধুরী বলেছেন সরলীকরণের প্রতি আনন্দবাজারের দৃষ্টি আছে, কিন্তু আমি বলি তা থাকলে তারা সহজেই কা র্ড লিখত, কারড নয়; আর কারড-কে ঘুরিয়ে রোমানে লিখলে দাঁড়াবে KARAD। কিন্তু এ বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় বাংলা বর্ণমালা থেকে যখন রেফকে হটানো যাবে না (সে তৎসম শব্দের মুখ চেয়ে হোক বা অন্য কারণেই হোক) তখন প্রচলিত কা র্ড (কার্ড-কার) লিখলে দোষের হয় না।

যুক্তধ্বনির ব্যবহার কেবল বাংলার এক-চেটিয়া নয়। ইউরোপীয় ভাষাগুলিতেও প্রচুর যুক্তধ্বনির ব্যবহার আছে। যুক্ত-ধ্বনি প্রকাশক লিপি রোমান বর্ণমালায় নেই, কেবল একটি ছাড়া (এবং সেটি হল X), কিন্তু রোমক লিপির যে সুবিধা আছে বাংলা লিপির সে সুবিধা নেই। তাই রোমক লিপিতে পাশাপাশি বর্ণসংস্থান করে শব্দ গঠনের সহজ পদ্ধতির অনুকরণে বাংলাতে তা করতে চাইলে মস্ত ভুল হবে। আনন্দবাজার যুক্তধ্বনিকে ভেঙে তাই করছে।

শ্রীচৌধুরীর মতে কেবলমাত্র ছাপাখানার

সুবিধার জন্যে হলেও বাংলা বানানের যুক্তাক্ষর উঠিয়ে দিতে হবে। কিন্তু যুক্তাক্ষর উঠিয়ে দিলেই কি ছাপাখানায় কম্পোজিটর-দের কিছুমাত্র সুবিধা হবে? দৃষ্টান্ত হিসাবে বার্মা শব্দটি ধরা যাক। লাইনোতে শব্দটি কম্পোজ করতে ৫ বার চাবি টিপতে হয়, 'ব া ‘ ম ও া'; ভেঙে বা র মা লিখলেও ঐ ৫ বারই চাবিতে হাত দিতে হয়। তাহলে সুবিধাটা কোথায়? বরং স্থানের (SPACE) কথা যদি ওঠে তাহলে রেফের চাইতে র অনেক বেশি জায়গা নিচ্ছে বলে র রেফকে স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য। আধুনিক যুগে SPACE-এর গুরুত্ব সম্পর্কে কোনরূপ দ্বিমত নেই। এবং ছাপাখানার ব্যাপারে বেশি SPACE মানে বেশি কাগজ এবং তার মানে বেশি কালি। অর্থাৎ শ্রীচৌধুরীর বানান রীতিকে মেনে নিলে ছাপাখানাগুলির খরচ আগের চেয়ে বেশিই পড়বে। যুক্তাক্ষরের বাড়াবাড়ির জন্যে সাধারণ হ্যাণ্ডকম্পোজিশনের যথেষ্ট অসুবিধা হয় ঠিক, কিন্তু আধুনিক যুগে লাইনো কম্পোজিশনের চল ক্রমশ বাড়ছে, অচিরে হয়ত তা হ্যাণ্ড কম্পোজিশনকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে দেবে। সুতরাং শ্রীচৌধুরী যে ছাপাখানার দোহাই পেড়েছেন তার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। শ্রীচৌধুরী আরো বলেছেন: 'প্রত্যেকটি শব্দের পিছনে রয়েছে ব্যাকরণ আর উচ্চারণ। ব্যাকরণ আর উচ্চারণ ঠিক রেখে যদি মুদ্রণের প্রয়োজনে শব্দের বন্ধন ভাঙা যায়, তাহলে শুধু এতদিনকার অভ্যাসের প্রশ্নকে আমল দেওয়া উচিত নয়।' তা নয়ই ত, কিন্তু আনন্দবাজার শব্দের উচ্চারণ ও ব্যাকরণ ঠিক রেখে বানান রচনা করতে সর্বত্র পারছে কই? ইংরেজী SHIRT ও SKIRT এর R অনুচ্চারিত অথবা অতি অল্পমাত্রায় উচ্চারিত; আনন্দবাজারের শা র ট ও স্কা র ট-এ তা পূর্ণমাত্রায় উচ্চারিত। সুতরাং এখানে শব্দের উচ্চারণ ও ব্যাকরণ ঠিক থাকছে কই?

আনন্দবাজারের ভেঙে-লেখা বহু বানানের উচ্চারণ ও ব্যাকরণ ঠিক থাকতে পারে। সেসব শব্দকে আমাদের মেনে নিতে আপত্তি নেই। যেমন ল ম্ ড ন, ল খ নৌ, ম স কো, বা র লি ন ইত্যাদি স্থান নাম-গুলি। এখানে সবক্ষেত্রেই দুইটি করে স্পষ্ট উচ্চার্য সিলেবল থাকায় তা ভেঙে লেখা যায়। কিন্তু জা কা র্তা, বা র্মা ও ই র র্ক ভেঙে লেখা যায় না। কেননা শব্দ-গুলিতে আছে রেফ, র নয়। র দিয়ে লিখলে উচ্চারণ হবে JAKARATA (আমি আনন্দবাজারের জা ক র তা-র কথাই বলছি), BARAMA ও IARAK। রেফ ও র-এর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। ং আর ঙ উচ্চারণের দিক দিয়ে কতকক্ষেত্রে এক, কতকক্ষেত্রে আলাদা। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। অনেকেই অ ক টো ব র লিখে থাকে; আনন্দবাজারও এইরকমই লিখছে। কিন্তু অকটোবর লেখা যায় বলে সে প টে ম ব র লেখা যায় কোন্ যুক্তিতে। অকটোবর আর সেপ্টেম্বর কি এক? বাংলা উচ্চারণ অনুযায়ী প্রথম বানানটির সঠিক উচ্চারণ সম্ভব, কিন্তু দ্বিতীয় বানানটির পক্ষে তা সম্ভব নয়। কেননা সেপ্টেম্বর-এর ভিতর তিনটি হলন্ত অক্ষর আছে, এবং টেম অক্ষরটির উপর বল থাকায় দরুন টে এবং ব-এর মাঝখানে পড়ে ম সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। এই সংকুচিত ম-এর উচ্চারণ হস্-চিহ্নের দ্বারা সম্ভব নয়। আর ম-এর সঙ্কোচন বাদ দিলে বাংলায় বানানটির অর্থাৎ সে প টে ম ব র-এর উচ্চারণ যা দাঁড়াবে তা রোমানে s e p a t e m-b a r হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের দ্বিমাত্রিকতা ও ত্রিমাত্রিকতা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়।

শ্রীচৌধুরী তৎসম শব্দে পূর্বেও যুক্তাক্ষর ভাঙা হয়েছে দেখাতে গিয়ে রু গ্ ন. বানানটির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সবিনয়ে জানাই শব্দটির ঐটিই বানান, র-এ হ্রস্ব উ ও গ-এ মূর্ধন্য। গ এবং মূর্ধন্য-এর প্রকাশক কোন যুক্তাক্ষর বাংলা হরফে নেই বলেই এই ব্যবস্থা। এবং এতে অব্যাকরণীয় বা অবৈজ্ঞানিক কিছু নেই। গ এবং মূর্ধন্যর যুক্ত-ধ্বনিটি সহজেই হস্-চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু স্থানকালপাত্র বাদ দিয়ে যুক্তাক্ষরকে ইচ্ছামত ভাঙা যায় না।

বাংলা যুক্তাক্ষর ভাঙা প্রসঙ্গে শ্রীসেন ও শ্রীচৌধুরী উভয়েই আমেরিকান ইংরেজীর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এ দৃষ্টান্তও অচল। আমেরিকানদের ইংরেজী বানান সংস্কারে অবৈজ্ঞানিকতা বলে কিছু নেই। শ্রীচৌধুরী উদ্ধৃত COLOUR বানানটির কথাই ধরা

যাক: আমেরিকার ওটি COLOR অর্থাৎ ইংরেজী COLOUR-এর সব আছে কেবল U-টি ছাড়া। এতে উচ্চারণের কোনই আসে যায় না। আমরাও ত ঐ উপায়ে আজ বানান লিখি। বা ড়ী-র বদলে কে-না আজ বা ড়ি লেখে? বানানটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কার সমিতি কর্তৃক স্বীকৃত। ঠিক এই ভাবেই আমেরিকানরা ইংরেজী বানানের দীর্ঘত্বের বদলে হ্রস্বত্ব ব্যবহার করছে এবং কতকক্ষেত্রে তারা অনাবশ্যকত্বকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করছে। বাংলাতে আমরা কতকক্ষেত্রে তাই করছি এবং তাতে কারো আপত্তি নেই। এবং বিদেশীদের কাছে সহজ হবে এই যদি আমরা ভাবি তাহলে শুধু বানান কেন আস্ত ভাষাটাকেও ত আমরা সহজ করতে পারি। কিন্তু এরকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোথাও আছে? shakespeare-এর রচনা বিদেশী ছাত্রদের কাছে ত বটেই খোদ ইংরেজ ছাত্রদের কাছেও অতিশয় কঠিন। কই আমেরিকানরা shakespeare-এর ভাষা নিয়ে কিছু করছে? করলে তা আর shakespeare-এর ভাষা থাকবে না। এবং যা থাকবে তা কেউ কষ্ট করে পড়তে চাইবে না। আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের বানান এবং তাঁর ভাষাকে পালটে ফেলি ত যে বিদেশীরা আজ বাংলা শিখতে এত আগ্রহী কাল তাঁরাই তো ভুলতে চাইবেন।

ভাষাকে সহজ করে তোলাও কোন কাজের কথা নয়। একবার ইংরেজীর সহিত challenge দেবার জন্য 'এসপ্যারান্টো' নামে একটি অতি সহজ কৃত্রিম বিশ্ব ভাষার সৃষ্টি হয়; ভাষাটি পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনতে যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তির মাত্র ১২ ঘণ্টা সময় লাগবে। কিন্তু তবু উক্ত ভাষাটিকে হটিয়ে দিয়ে ইংরেজী আজ বিশ্ব ভাষার স্থান করে নিয়েছে। অথচ ইংরেজীকে ঠিকমত আয়ত্ত করতে খুব তুখোড় শিক্ষার্থীরও কম করে ১২ দুগুনে ২৪ বছর সময় লাগবে। সংস্কৃত ভাষা একমাত্র চীনীয় ছাড়া পৃথিবীর কঠিনতম ভাষা, তা বলে ইউরোপের লোকেরা ত এ ভাষা চর্চায় বিরত হয়নি।

শ্রীচৌধুরী কেবল ভাষাকে এবং তার বানান রীতিকে সহজ করার কথা বলেছেন। কিন্তু হাল আমলের আনন্দবাজারের বানানরীতি কি সত্যিই বাংলা বানানকে সহজ করতে পেরেছে? আগে একটি মাত্র রীতি ছিল, সেই রীতিতেই বাংলা বানান তৈরি হয়েছে। আজ আনন্দবাজার আরো দুটি রীতির সৃষ্টি করেছে, একটি তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে এবং অন্যটি বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে। তাহলে একুনে বাংলায় তিন প্রকারের বানানরীতি পাচ্ছি। পৃথিবীর কোন ভাষায় এই রকম তিন প্রকারের বানানরীতি আছে? এবং এতে কারো সুবিধা হবে? ভাষা কার? টাইপিস্টের? কম্পোজিটরের? না যে বলে তার, যে লেখে তার? ছাপাখানা ও কম্পোজিটরের কথা ভেবে বাংলা বানানকে অবৈজ্ঞানিক করে তোলা যায় না। শ্রীচৌধুরী ডি এল রায়ের বানানরীতির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কিন্তু ডি এল রায়ের বানানরীতি ত সর্বাংশে ভুল, ভুল বলে কেউ তা অনুসরণ করেনি।

বিষয়টি মোটেই বাদানুবাদের ব্যাপার নয়, এর সহিত জড়িত আছে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ। সুতরাং কাজটি করার আগে ভাষা তাত্ত্বিকদের পরামর্শ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য ছিল। ১৯৩৬ সালের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কার সমিতির মৃত্যু হয়। আনন্দবাজার ইচ্ছা করলে ঐ সমিতিকে একটি কর্মক্ষম সমিতিরূপে পুনর্জীবিত করতে পারত। অথবা অন্য কোন সংস্থা গঠন করে তার হাতে কিছু অর্থ তুলে দিলে কাজের কাজ হত। ইউরোপে ও আমেরিকায় এই রকম বহু সংস্থা এবং সমিতি আছে। প্রায় ক্ষেত্রেই ঐ সব সংস্থা ও সমিতির ব্যয়ভার বেসরকারী বিদ্যোৎসাহী প্রতিষ্ঠানেরাই করে থাকে।

সুধাংশু তুঙ্গ
কলকাতা-৬

(২)

...রেজী নাম ও শব্দের যে নতুন বানানপদ্ধতি আনন্দবাজার পত্রিকায় আজ থেকে দেড় বছর আগে প্রবর্তিত, সে-বিষয়ে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর মতামত জানিয়েছেন। এই রীতির বিরোধিতা করে তিনি যেসব প্রশ্ন তুলেছেন, তার উত্তর পাওয়া গেল দেশ-এর পরবর্তী সংখ্যায় শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীর প্রবন্ধে।

সুনীতিবাবুর বিবিধ প্রশ্নের অতি বিস্তারে পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞানের চিহ্ন সংশয়াতীত; তবু সাধারণ জিজ্ঞাসু পাঠক হিসাবে আমার কাছে সওয়ালের চেয়ে জবাবটাই স্পষ্টতর এবং স্বচ্ছতর। আলোচ্য বানান সংস্কার প্রসঙ্গে তিনটি প্রশ্ন: কী সংস্কার করা হয়েছে, কোথায় অথবা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এবং কেন। এই তিন বিষয়ই শ্রীচৌধুরীর রচনায় সহজ ভাষায় সুযুক্তির সঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে।

তবু আমার মনে হয়, এ বিষয়ে আরও আলোচনার অবকাশ আছে। তাতে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। লেখক, পাঠক এবং বিজ্ঞ জনের সন্দেহ দূর হলে এই পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়-মহলে স্বীকৃতি পেতে পারে (জানি না, কেন এত দিনেও পায়নি) এবং অদূর ভবিষ্যতে সংস্কারের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হতে পারে।

সুনীতিবাবুর যুক্তির মধ্যে কোথায় ফাঁক, শ্রীচৌধুরী তা উদাহরণসহ দেখিয়ে দিয়েছেন। মূল প্রবন্ধের দু-একটি বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে, সবিনয়ে এখানে পেশ করছি।

সুনীতিবাবু বলেছেন, "ভুল করিয়া বহু স্থলে ষ্ট-এর বদলে স্ট লিখিয়া থাকি... যেমন 'মাস্টার', 'খৃস্ট', 'ইস্টিশান'...। 'খৃস্ট' শব্দটি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু শুদ্ধ বাংলা রূপ 'মাষ্টার', 'ইষ্টিশান'—এ-কথা কি জোর করে বলা যায়? খাস পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের মুখে ওই দুই শব্দের উচ্চারণে দন্ত্য-স আসে না বটে, কিন্তু গোটা পূর্ব এবং উত্তরবঙ্গের মানুষ তো কেষ্ট--বিষ্টুর ধাঁচে শব্দ দুটি উচ্চারণ করেন না। কলকাতায় বহু লোককেই আমি প্রেস-কে 'প্রেশ', বাসকে 'বাশ' বলতে শুনেছি, তার জন্য কি বলা চলবে, এক্ষেত্রে ইংরাজী উচ্চারণের আদল রক্ষা করলে আমাদের বাঙালীত্ব লোপ পাবে?

মূল প্রবন্ধে বলা হয়েছে, থার্ড্, কার্ড্, এইট্‌থ্ ইত্যাদি শব্দ "তাড়াতাড়ি লেখার সুবিধার জন্য আবশ্যক মত আমরা হসন্ত-চিহ্ন বর্জন করিতে পারি, করিয়া থাকিও।" প্রয়োজনে যদি তা-ই পারি, যদি 'এইটথ' শব্দ চোখে ধাঁধা না লাগায়, তবে পারক, পারট, নারস, এনড-ই বা লাগাবে কেন? যুক্ত অক্ষর এবং হস্ চিহ্ন ছাড়াও শব্দগুলির প্রতিষ্ঠা সম্ভব। শুধু প্রয়োজন চোখের এবং কলমের কিছু অভ্যাস।

পারট, কারড, হারড ইত্যাদি শব্দ নিয়ে অন্য একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। ইংরাজী রীতিতে এখানে 'র'-এর উচ্চারণ খুবই চাপা। বলা হতে পারে, উপরের বানানে শুদ্ধ অথবা অভিপ্রেত ইংরাজী উচ্চারণের স্বরচিহ্ন নেই। মানলাম। কিন্তু রেফ আর হস্ চিহ্ন যুক্ত হলেও তো স্বরচিহ্নটি ত্রুটি-মুক্ত হয় না—হয় কি? আসলে ইংরাজী, ফরাসী এবং অন্য বহু বিদেশী শব্দের নিখুঁত উচ্চারণের প্রতিলিপি বাংলা হরফে দেওয়া যায় না। যেমন, জেড-এর উচ্চারণ বোঝানোর উপায় কি? 'জেনিথ', 'জিংক', 'জু' লেখা ছাড়া পথ নেই। বরিস পাসতার নাকের যে-বইটি নিয়ে বহু বিতর্ক, তার নাম বাংলায় ডকটর জিভাগো-ই লিখব। এইটেই সহজ পন্থা।

বিদেশী শব্দের নতুন বাংলা বানানে উচ্চারণ বিভ্রাট ঘটতে পারে দ্বিবিধ কারণে—(১) মূল শব্দের সঙ্গে অপরিচয় (২) অনভ্যাস। দুটি অসুবিধাই কিন্তু সাময়িক।

জ্যোতির্ময় বসু রায়
কলকাতা।

(৩)

বাংলা বানান সম্পর্কীয় যে মূল্যবান মতামত শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'দেশ' পত্রিকার ১৪ সংখ্যায় উপস্থাপিত করিয়াছেন তজ্জন্য বাংলা ভাষাভাষী সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন এবং এ ব্যাপারে তাঁহার মতই যে চরম গ্রাহ্য একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আনন্দবাজার পত্রিকা বঙ্গদেশের গৌরবের বস্তু। এই পত্রিকার মাধ্যমেই কত পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিয়াছে, কত সংস্কার ও সুরুচির প্রবর্তন হইয়াছে। বর্তমানের বানান সংস্কারও পত্রিকার একটি অনুরূপ পদক্ষেপ। এজন্য পত্রিকাগোষ্ঠী ধন্যবাদার্হ। এই নূতন বানান প্রণালী আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রবর্তিত হইলে বিভিন্ন মহল হইতে নানা ধরনের সমালোচনা কর্ণগোচর হইয়াছে। কোথাও সাধারণ মানুষের যুক্তি ভিত্তিহীনও ছিল। বর্তমানে শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের সকলের মনের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা প্রবন্ধে আকার দান করিয়া মহৎ উপকার সাধন করিলেন। এ প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য আপনাদের পত্রিকাগোষ্ঠীর সত্য প্রকাশের তথা সমালোচনা গ্রহণ করিবার সাহসিকতার প্রশংসা করিতে হয়।

এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন আমার এ পত্র লিখিবার প্রাথমিক কারণ। দ্বিতীয়ত এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার যে দুই একটি কথা মনে হইল, তাহাও স্থাপন করিলাম। প্রকাশিত হইলে বাধিত হইব।

আনন্দবাজার পত্রিকা বানান সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা দ্বারা যে নূতন কিছু, সহজ কিছু আনয়নে প্রয়াসী ও বিশ্বাসী তজ্জন্য আমরা শ্রদ্ধা প্রকাশ করি। আশা রাখি যে, বানান বিষয়ে আমাদের যাহা ত্রুটি ও আক্ষেপ তাহা দূরীভূত হইয়া এক নূতন প্রকাশ ধারায় আমরা অধিক সবল ও সচ্ছন্দ হইব। 'ক্ষ' 'হ্ম' 'ক্ত' 'জ্ঞ' প্রভৃতি যুক্তাক্ষর সত্যই নবীন শিক্ষার্থীর নিকট যথেষ্ট সংকট উৎপাদন করে। অতএব সরলীকরণ সম্ভব হইলে তাহা কর্তব্য। "ʻ ি' 'ী' 'ু' 'ূ' 'ৌ' প্রভৃতি ঊর্ধ্বে নিম্নে যে চিহ্নাদি তাহা আমাদের লিপিতে থাকায় টাইপে ও ছাপার কার্যে আমরা ইংরাজী লিপির মত সহজ হইতে পারিতেছি না। ইংরাজী পত্রে ডিক্সেনারীর যে ছাপা দেখি তেমনভাবে বাংলা অক্ষরে ছাপা অসম্ভব। তবু আমাদের লিপি আমাদের নিকট আদরণীয় এবং অপরিহার্য। আনন্দবাজারের এই সংস্কার যদি এমন প্রতিভার দ্বারা প্রভাবিত হয়, যাহাতে টাইপে ও ছাপায় আমরা উন্নততর হইতে পারি তবে তাহা ক্ষতির তুলনায় (যদি ক্ষুদ্র কিছু ঘটেও) লাভের অংশই বেশী হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। অতএব আনন্দবাজার এ ব্যাপারে যোগাজনের সাহায্যে অগ্রণী হউন ইহাই প্রার্থনীয়।

শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ২৬ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের মাঝখানে যথার্থই বলিয়াছেন, 'বাঙ্গালা বানানে পারক দ্বারা সহজভাবে 'পার্ক' পাঠ করা ভাষার প্রকৃতির বিরুদ্ধেই হইবে।" তবে তিনি আমাদের উচ্চারণে যে দ্বিমাত্রিকতার (Dimetrism) বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়াছেন তাহা দ্বারা বিদেশী শব্দের উচ্চারণে তো তাঁহার খানিক সম্মতিই লাভ করা যায়, তবে শেষের 'ক'টি স্বরাক্রান্ত ভাবিতে হয়। পারক/পার্-ক/ পার্ক। অথবা পারকে পার্কে। স্বরান্তবর্ণ পরে থাকিলে দ্বিতীয় বর্ণে হসন্ত উচ্চারণের রীতি বাংলায় আছে যথা—করব, পারলে, চাকরি, তরকারি, পিচকারি, ফটকিরি, কলকাতা ইত্যাদি। সেই জন্য মাথার উপরের রেফ্ বাদ দেওয়া সত্ত্বে(?) বিদেশী শব্দ পারকের নবীন এ বানান গ্রহণীয় হইতে পারে। তবে সংস্কৃত হইতে আগত শব্দের উচ্চারণ তৎসম শব্দের উচ্চারণের নিয়মেই হওয়া উচিত। 'পারক' যখন 'যে পারে' এই অর্থে প্রযুক্ত হইবে তখন 'র' বর্ণের যে অকার, তাহা তৎসম শব্দের উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী অকার যুক্ত হইয়াই উচ্চারিত হইবে।

বিদেশী শব্দের বানান সংস্কৃত শব্দের ন্যায় এমত নহে যে, তাহার একদা প্রচলিত বানান নবরূপে লেখা অসম্ভব। এই কিছুদিন পূর্বে তো 'দেশে' "র‍্যাঁবো" বানান লইয়া প্রচুর মতামত হইয়া গেল। অতএব উচ্চারণ অনুযায়ী বানান নবীনতর, অন্যতর হইলেও হইতে পারে; আর তাহা সর্বদা অশুদ্ধতর নাও হইতে পারে। তবে সাধারণ জনের কথা চিন্তা করিয়া পত্রিকা গোষ্ঠী বানান সংস্কার ব্যাপারে চিন্তা করিবেন। সর্ব সম্প্রদায়ই পত্রিকার পাঠক, কিন্তু সকলেই এমত তৎসম ও বিদেশী শব্দের বিভাগ সম্বন্ধে অবহিত হইতে নাও পারেন। যিনি 'কনটেম্পস' জানেন না তিনি যদি দ্বিতীয় বর্ণে হসন্ত যোগ করিয়া পাঠ করেন তবে ঠিক হয় না। আবার 'কনসট্যান্টিনোপল' শব্দে দুইটি পর পর

হসন্ত তিনিই পড়িবেন যিনি শব্দটি জানেন। সাজান অনুযায়ী যদি তৃতীয় বর্ণটি অকারান্ত উচ্চারিত হয় তবে বিপর্যয় অনিবার্য। অতএব পত্রিকাগোষ্ঠী এই সমস্ত হসন্তও যুক্তাক্ষর কোথায় অপরিহার্য তাহা বিবেচনা করিয়া সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন এবং ভাষা জননীর সেবা করিবেন—ইহাই কাম্য।

বিনয়কৃষ্ণ সরকার
কলিকাতা-৪

(৪)

ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের "বাঙলা অক্ষরে ইংরেজি নাম ও শব্দ" নামক পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণ ধর্মী প্রবন্ধ পাঠ করে আনন্দিত ও উপকৃত হয়েছি।

প্রত্যেক ভাষার যেমন নিজস্ব একটি প্রকাশভঙ্গি থাকে ঠিক তেমনই বানান ভঙ্গিও থাকে। এ-সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তব্য খুবই অনুধাবনযোগ্য। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

প্রায়ই দেখা যায় mail, train, late ইত্যাদি শব্দকে মেইল্, ট্রেইন, লেইট্ লেখা হয়। (যদিও gateকে 'গেইট্' লেখা এখনো দেখা যায় নি)। প্রশ্ন, শব্দের মধ্যে এই 'ই'-এর আগম কেন? এদের প্রকৃত শুদ্ধ উচ্চারণ কী এবং তা বাঙলা অক্ষরে কী ভাবে প্রকাশ করা হবে? দীনবন্ধু Andrews-কে কী লেখা হবে—এণ্ড্রুজ, অ্যান্ড্রুজ না এ্যান্ড্রুজ? ইংলন্ড না ইংল্যান্ড? Roosevelt-এর "Se"-টা কোন্ অক্ষরে প্রকাশিতব্য? এইসব সমস্যায় পড়েই বোধ হয় রসচূড়ামণি রাজশেখর "Zুনীতি পার না" লিখেছিলেন!

যাই হোক্, অক্ষরান্তর ঘটাতে গেলে সমস্যা অগণিত হয়ে দেখা দেয়। বিশেষত রোমান হরফের তুলনায়, যেখানে Alphabet-এর প্রয়োগও Alphabetical, বাংলা Alphabet-এর প্রয়োগের মতো Syllabic নয়। বাঙলা উচ্চারণে হসন্ত প্রবণতা শব্দের বা Syllable-এর অন্তে। বাঙলা ছন্দে, বিশেষত ছড়ার ছন্দে এর প্রভাব অপরিসীম। এ-নিয়মকে অস্বীকার করে "রেকরড"-দ্বারা "record" চালাতে চাইলে "রেকর্ড" হবে না, "রেক্‌রেড্" হয়ে দাঁড়াবেই।

অরুণাভ সেনগুপ্ত
কলিকাতা-৯

যারা শিকার করে

৪-২-৬৭ তারিখে প্রকাশিত যারা শিকার করে সম্পর্কে বসু মশায়ের লেখাটি পড়ে বেশ ভাল লাগল। যাঁরাই শিকার-টিকার করেন অথবা যাঁদের এ বিষয়ে উৎসাহ আছে সকলেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন এই প্রসঙ্গ অবতারণা করার জন্য।

দু একটি প্রসঙ্গে আমি ভিন্নমত পোষণ করি এবং সে জন্যে তা জানাচ্ছি।

বসু মশায় উত্তরবঙ্গের একজন শ্বেতাঙ্গ শিকারির বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে মৃত্যুবরণের কথা লিখেছেন। আমি যতদূর জানি, উনি (একজন অ্যাসিস্টান্ট্ ম্যানেজার) বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে মারা যাননি। বিকেলের দিকে একজন কুলিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পায়ে হেঁটে শুয়োর মারতে গেছিলেন। রোগ্ অ্যালিফ্যান্টের কাছে বাহাদুরী করার কোনো অভিপ্রায় তাঁর ছিল না—তাছাড়া তাঁর কাছে হাতি মারার উপযুক্ত কোনো হাতিয়ারও ছিল না তখন। বিনা প্ররোচনায় হাতি তাঁকে তাড়া করে। দুজনই পালাতে আরম্ভ করেন। না পালিয়ে, হাতির পায়ের নখ (বা খুব Sensitive) লক্ষ্য করে গুলি করলে হাতি হয়ত ফিরেও যেতে পারত—কিন্তু যে কারণেই হোক তিনি তা না করে দৌড়তে আরম্ভ করেন। এবং দৌড়তে গিয়ে জঙ্গলে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে যান। হাতি সঙ্গে সঙ্গে এসে তাঁকে বীভৎস ভাবে পিষে ফেলে। ওই অঞ্চলের কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজারের সঙ্গে আমার শিকার সূত্রে পরিচয় ও বন্ধুত্ব আছে। তাই একজন উৎসাহী, অল্প বয়স্ক বিদেশী শিকারীর মৃত্যুর কারণ বিকৃতভাবে পরিবেশিত হলে বন্ধুমহলে ক্ষোভের সঞ্চার হতে পারে—তাই মৃত্যুর যথার্থ কারণ অবিলম্বে জ্ঞাত করছি।

তুষারবাবু লিখেছেন যে, যেসব শিকারী "বাঁচার সংগ্রামের" জন্য শিকার করেন তাঁরা কেবল ঐ কারণেই শিকার করেন। আমার মনে হয় এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য নয়। যেসব শিকারী মানুষখেকো বাঘ মারবার যোগ্যতা রাখেন তাঁরা রাতারাতি সে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন বলে মনে হয় না। সে যোগ্যতার পেছনে অনেকদিনের অভিজ্ঞতা থাকে। এবং মানুষখেকো ব্যতীত অন্য বাঘ একাধিক না মেরে থাকলে (ব্যতিক্রম আছে) কেবল শিকারের বই পড়ে, বা গল্প শুনে, বা আরাম কেদারায় বসে সে যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। এবং আমার মনে হয়, সেই জন্যেই শিকারীদের ওয়াটারটাইট কম্পার্টমেন্টে ভাগ করা ঠিক নয়। জিম করবেটও, প্রথম জীবনে (অন্য যে কোনো প্রথম শ্রেণীর শিকারীর মতই) মানুষখেকো ব্যতীত অন্য বাঘ ত মেরেছেনই—তাছাড়াও অন্য সব রকমের পশু ও পাখি মেরেছেন।

'স্পোর্টস্' বলতে তুষারবাবু ঠিক কি বলতে চেয়েছেন জানি না, তবে যাঁরা স্পোর্টসের জন্যে শিকার করেন তাঁরা পাখি কিংবা নিরীহ প্রাণী শিকার করায় ঘৃণা বোধ করেন এ কথা পুরোপুরি বেঠিক। সে রকম শিকারী কেউ থাকলে তাঁকে উঁচুদরের জন্তুপ্রেমীর জন্যে পুরস্কার দেওয়া চলতে পারে। পৃথিবীর ডাকসাইটে বিগ-গেম শিকারীরাও পট-হান্টিং করেন। প্রকৃত শিকার জিনিসটাই একটি উঁচুদরের আর্ট। মুরগী, তিতির অথবা রাজহাঁস শিকারেও যতটুকু স্কিলের প্রয়োজন, বাইসন অথবা বাঘ মারতেও ততটুকুই স্কিলের প্রয়োজন। এবং বাঘ মারা যেমন সহজ নয়, হাঁস মারাও নয়। এ দুই শিকারের পদ্ধতিতে কেবল তফাত আছে। স্পিন-বোলিং ও বোলিং, পেস্-বোলিং ও বোলিং। স্পিন বোলার বড় কি পেস্ বোলার বড় এনিয়ে যেমন তর্ক চলে না; তেমন বাঘ-শিকারী বড় না হাঁস-শিকারী বড় এ নিয়েও কোনো শিকারী—যিনি দুইই মেরে থাকেন—হয়ত তর্ক করবেন না। কারণ শিকারের মজা বলুন, থ্রিল বলুন, ঝুঁকি বলুন, সব ঐ শিকারের মধ্যেই—। কি শিকার করা হচ্ছে সেটা অপ্রাসঙ্গিক।

আর একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় আছে। প্রকৃতি। এমন অনেক শিকারী আছেন যাঁদের 'কেন শিকার করেন?' এ কথা জিজ্ঞেস করলে, ও'রা বলবেন, জঙ্গলে যেতে পাই বলে। এ'দের কাছে শিকারটা একটা ছুতো মাত্র। আসলে প্রকৃতির একেবারে কোলের কাছে দিনে রাতে ঘুরে বেড়ানোর একটা পথ মাত্র।

আমার ধারণা যে-কোনো শিকারী, যিনি অন্তত ১৫।২০ বছর নিয়মিত শিকার করেছেন তিনি এই শেষোক্ত দলভুক্ত হবেনই। তখন ট্রিগার-টানার মধ্যে মজাটা কেন্দ্রীভূত না থেকে, ঘাসে, পাতায়, আকাশে রোদ্দুরে, পাখির ডাকে, বাইসনের পায়ের আওয়াজে; সর্বকিছুতে ছড়িয়ে পড়ে। শিকারের নেশায় সেইটেই বোধহয় শেষ পর্যায়—তখন জানোয়ার না মারলেও কেবলমাত্র শিকার ভূমিতে পৌঁছলেই, দিল খুশ্ হয়ে যায়।

বুদ্ধদেব গুহ
কলিকাতা-২৯

তেত্রিশ

আপ প্লাটফর্মে স্টেশনের অফিসঘরের কাছ থেকে গাড়ি আসার ঘণ্টি বাজল, প্রথম ঘণ্টি; গাড়ি আসতে এখনও সামান্য দেরি।

ডাউন প্লাটফর্মে যাত্রীদের ভিড় জমে উঠেছিল; এখনও লোক আসছে ওভারব্রিজ দিয়ে। শেডের তলায় ভিড়টা বেশি: টিনের সুটকেশ, কাঠের বাক্স, বোঁচকা-বুঁচকি, বস্তা, লাঠিসোঁটা আগলে দেহাতীরা বসে আছে; একপাশে কিছু নিত্য-যাত্রীর জটলা; বিড়ির ধোঁয়া, কাশি, বিচিত্র একটা গুঞ্জন ভাসছে। চাঅলা পানঅলা হেঁকে যাচ্ছিল। গাড়ি আসার প্রথম ঘণ্টিতে চাঞ্চল্য জাগল।

ওভারব্রিজের নীচে, ফাঁকায়, হৈমন্তীর মালপত্র জড় করা। সামান্য তফাতে ব্রেক-ভ্যানে তোলার জন্যে রেলকুলিরা সবজির ঝুড়ি, আলুর বস্তা, এটা-ওটা জমা করছিল। বিজলীবাবু পার্সেল-অফিসের কয়েকটা কুলিকে নিয়ে হৈমন্তীর মালপত্রের কাছে দাঁড়িয়ে চেনাশোনা লোকের সঙ্গে গল্প করছিলেন। অবনী কাছাকাছি জায়গায় পায়চারি করছিল।

সামান্য তফাতে কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় সিমেন্টের বেঞ্চিতে হৈমন্তী এতক্ষণ বসে ছিল, তারপর যেন অধৈর্য হয়ে বা বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে প্লাটফর্মে পায়চারি করতে করতে শেষ-প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরছিল।

সুরেশ্বর ফাঁকায় দাঁড়িয়ে পরিচিত এক বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিল অনেকক্ষণ, গাড়ির প্রথম ঘণ্টি বেজে যাবার পর আলাপ চুকিয়ে এপাশে এল, এসে হৈমন্তীর কাছাকাছি দাঁড়াল।

আপ এবং ডাউন প্লাটফর্মের মধ্যে রেল লাইনে কোথাও মালগাড়ি দাঁড়িয়ে নেই; ওপারের আলো এপারে আসছিল, এপারে আলো কম। ওপাশটা ফাঁকা; টি-স্টলের কাছে দু-একজন দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে; মাল-গুদোমের দিক থেকে আলকাতরা আর চুনের গন্ধ ভেসে আসছিল মাঝে মাঝে, বাতাস এলোমেলো।

হৈমন্তীর কাছাকাছি এসে, পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সুরেশ্বর বলল, "তোমার গাড়ি আজ মিনিট কুড়ি পঁচিশ দেরি করল।" বলে কি ভেবে আবার বলল, "যার সঙ্গে কথা বলছিলাম, উনি এখানকার স্টেশন মাস্টার।" যেন স্টেশন মাস্টারের কাছ থেকেই গাড়ির খবরটা এনেছে সুরেশ্বর।

হৈমন্তী কোনো জবাব দিল না। গাড়ি আসতে দেরি করছে এটা সে জানে। যখন বসে ছিল তখন অবনী এসে বলেছে, বিজলীবাবুও একবার বলে গেছেন। আজ, এখন, স্টেশনে আসার পর সে দেখছে তার বেশির ভাগ সময় একা একা কাটল, হয় একা একা, না হয় অতি তুচ্ছ কথায়। অবনী তার সামনে বা পাশে বেশিক্ষণ থাকছিল না; কখনও আসছিল, বসছিল একটু বা দাঁড়িয়ে থাকছিল, দু চারটে সাধারণ কথা বলল, আবার চলে গেল ওপাশে; সুরেশ্বরও বার কয়েক কাছে এসেছিল, কথা বলেছিল, চেনাশোনা লোক দেখে উঠে গিয়েছিল আবার। ট্রেনে ওঠার পর হৈমন্তী একা, সারাটা পথ সে একা, এই শেষ সময়টুকু তার একা থাকতে ইচ্ছে ছিল না। অথচ অনেকটা সময় একা থাকতে হল।

হাঁটতে হাঁটতে ওভারব্রিজের কাছাকাছি পর্যন্ত এল, দাঁড়াল হৈমন্তী। অবনী মুখের সিগারেট থেকে অন্য একটা সিগারেট ধরাচ্ছে, বিজলীবাবু কুলিদের কি বুঝিয়ে বলছেন, শেডের তলায় যাত্রীরা ওঠাউঠি শুরু করেছে। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে হৈমন্তী আবার মুখ ফেরাল, ফিরিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল।

কয়েক-পা হেঁটে এসে হৈমন্তী দাঁড়াল। এখানটা আধো-অন্ধকার, পাশে প্লাটফর্মের নীচে রেল লাইনের পাথরকুচি কোথাও কোথাও ছোট ছোট ঢিবির মতন পড়ে আছে। থোকা থোকা ছায়ার ফুল যেন। অন্ধকারে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা বাতাসে কাঁপছিল। আজ এখনও চাঁদ ওঠে নি, ওঠার সময় হয়ে এল।

সুরেশ্বর বলল, "একটা গরম কিছু নাও নি?"

হৈমন্তী অন্যদিকে তাকিয়ে মাথা হেলিয়ে বলল, "নিয়েছি।"

"গাড়িতে পরে নিও; রাত্তিরে ঠাণ্ডা পড়বে।"

হৈমন্তী কোনো জবাব দিল না। এ-সব তুচ্ছ কথা তার ভাল লাগছিল না।

"তোমার গাড়ি একেবারে ভোরে ভোরে হাওড়া পৌঁছে যাবে। গগনটা সময় মতন এসে পৌঁছতে পারলে হয়।...না হলেও তোমার কোনো অসুবিধে হবে না, সঙ্গে লোক আছে, মালপত্র নামিয়ে একটু অপেক্ষা করো গগনের জন্যে।"

হৈমন্তী দূরে তাকিয়ে থাকল: সিগন্যালের আলো দেখছিল যেন।

দেখতে দেখতে প্ল্যাটফর্মে চাঞ্চল্য বেড়ে একটা কলরব জেগেছে। বনের দিক থেকে রাতের বাতাস আসছে, ঠাণ্ডা, জঙ্গলের গন্ধ ভরা। স্টেশনের বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে একটা গাড়ি ক্রমাগত হর্ন দিচ্ছে, কাউকে ডাকছে বোধ হয়; ওভারব্রিজের মাথায় কয়েকটা লোক ছুটছে। গাড়ি আসার দ্বিতীয় ঘণ্টি পড়ে গেল, সামনের একটা সিগন্যাল সবুজ হল।

গাড়ি এসে গেল। সুরেশ্বর বলল, "চলো, গাড়ি আসছে।"

হৈমন্তী ফিরতে লাগল। প্ল্যাটফর্মে কলরব বেড়ে গেছে, মালপত্র মাথায় ওঠাচ্ছে কুলিরা, সামান্য ছুটোছুটি। গাড়ি আসছে, হুইসল শোনা যাচ্ছে; এঞ্জিনের শব্দ, হঠাৎ আলো এসে পড়ল, লাইনে শব্দ উঠছিল, চারপাশ প্রকম্পিত যেন।

সুরেশ্বর ওভারব্রিজের কাছে এসে হঠাৎ বলল, "আমি কলকাতায় চিঠি লিখে দিয়েছি, হেম। তোমায় কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে না।" সুরেশ্বর থামল, তারপর কি ভেবে আবার বলল, "মাসিমাকে আমি আর-একটা কথা লিখেছি, হেম; তুমি নিশ্চয় জানতে পারবে।...সংসারে তুমি যা চাও বেশির ভাগ মানুষই তা চায়; আমি তাতে দোষ দেখি না, অবজ্ঞাও করি না।...তুমি সুখী হও হেম; শান্তি পাও।"

হৈমন্তী চোখ তুলে তাকাল। তার জানতে ইচ্ছে করছিল, কি লিখেছ তুমি মাকে? কোন কথা? জানতে ইচ্ছে করলেও হৈমন্তী কিছু জিজ্ঞেস করল না; মনে হল, কথাটা এখন স্পষ্ট করে জানলে হয়ত সে অস্বস্তির মধ্যে পড়বে। এঞ্জিনের আলো প্ল্যাটফর্ম আলোকিত করে বেঁকে লাইনের ওপর পড়ল। কেবিন পেরিয়ে গাড়িটা প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছে, প্ল্যাটফর্ম কাঁপছিল।

গাড়ি থামল। বিজলীবাবু যেখানে মালপত্র জড় করিয়ে রেখেছিলেন তার কয়েক হাত তফাতেই হৈমন্তীর কামরা। অবনী উঠে গিয়েছিল; কুলিরা মালপত্র তুলে দিল একে একে; কামরার অন্যদিকে এক অবাঙালী দম্পতি, একটি বাচ্চা; হৈমন্তীর মালপত্র গুছিয়ে রাখা হল, কিছু বুঝি লাগেজ ভ্যানে দিতে হয়েছে। বিজলীবাবু সব গোছগাছ করে দিয়ে নীচে নেমে দাঁড়ালেন; সঙ্গে যাচ্ছেন দাসবাবু, দেখা-শোনা করে পাশের কোন কামরায় চলে গেলেন।

গাড়ি ছাড়তে এখনও সামান্য দেরি। পাতা বিছানায় হৈমন্তী এবার বসল, অবনী দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, এবার নামল, নেমে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে জানলার সামনে এসে দাঁড়াল।

হৈমন্তী বলল, "ওরা চলে গেছে?"

"কারা?"

"কুলিরা।"

অবনী এপাশ ওপাশ দেখল। "যায় নি। আছে।...কেন?"

"ওদের কটা টাকা দেবে।" হৈমন্তী ব্যাগ খুলে টাকা বের করতে যাচ্ছিল।

অবনী একটা কুলিকে ডাকল। কুলিটা কাছে এলে হৈমন্তী তার হাতে একটা দশ টাকার নোট দিল, বলল, "তোমরা সকলে ভাগ করে নিও।" কুলিটা হাত পেতে টাকা নিয়ে খুশী হয়ে চলে গেল, যাবার আগে কপালে হাত ঠেকাল।

অবনী এবার ঠাট্টাচ্ছলে বলল, "আমার ভাগ্যেও কিছু বকশিস আছে নাকি?"

হৈমন্তী হাসবার চেষ্টা করল। পারল না।

সুরেশ্বর এগিয়ে আসছিল; বিজলীবাবুও আসছেন। গাড়ি ছাড়ার আর বুঝি দেরি নেই। অবনী এঞ্জিনের দিকে তাকাল: সিগন্যাল সবুজ হয়েছে।

সুরেশ্বর জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। কামরাটা দেখল একবার। "ভালই হয়েছে, সঙ্গী পেয়ে গেছ। ওঁরা কতদূর যাবেন?"

"জানি না", হৈমন্তী বলল।

বিজলীবাবু পাশে এসে গেছেন, বললেন, "ওরাও কলকাতা যাচ্ছে।"

"তবে তো ভালই", সুরেশ্বর বলল। "আর খানিকটা পরে জানলাগুলো বন্ধ করে দিও। রাতের ঠাণ্ডা লেগ না।"

"দরজাটা উনি ভেতর থেকে লক করে দেবেন—আমি বলেছি—" বিজলীবাবু অবাঙালী ভদ্রলোককে ইঙ্গিতে দেখিয়ে সুরেশ্বরকে বললেন। "আর কোনো ঝামেলা নেই। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পৌঁছে যাবেন।" শেষের কথাগুলো হৈমন্তীকে বলা।

"গায়ে গরম কিছু একটা দিয়ে নিও," সুরেশ্বর বলল।

হৈমন্তী মাথা নোয়াল, "পরে নেব।"

গার্ডের সিটি বাজল।

"আচ্ছা দিদি, গাড়ি ছাড়ল—" বিজলীবাবু বিদায় জানিয়ে হাসলেন, "আবার দেখা হবে—" বলতে বলতে তিনি দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার জানালেন।

হৈমন্তী নমস্কার করল। "সরসীদিকে নিয়ে আসবেন একবার কলকাতায়। তাঁকে আমার কথা বলবেন। দিদিকে নমস্কার দেবেন।"

বিজলীবাবু হাসিমুখে দু-পা পিছিয়ে এলেন।

সুরেশ্বর গাঢ় মৃদু গলায় বলল, "কলকাতায় পৌঁছে চিঠি দিও।..."

হৈমন্তী আস্তে করে মাথা হেলাল। দেবে, চিঠি দেবে পৌঁছে। অস্ফুট স্বরে বলল, "তোমার এখানে এখনো অনেক বিসূখ, সাবধানে থেকো।"

এঞ্জিনের হুইসল বাজল আচমকা,

তারপর গাড়ি নড়ে উঠল। বিজলীবাবু খানিকটা পিছিয়ে গেলেন, সুরেশ্বর সরে দাঁড়াল। গাড়ি চলতে শুরু করেছে, অবনী পাশে পাশে হাঁটতে লাগল, হৈমন্তীর মাথা সামান্য ঝুঁকে পড়েছে, চুল এবং চিবুকের একপাশে আলো, প্লাটফর্মের একটা আলো ডিঙিয়ে গেল কামরাটা, সামান্য অন্ধকার। অবনী অন্ধকারে হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে জানলা ধরে ফেলল।

"চলি..."

"খুব খারাপ লাগছে।"

"কী যে ছেলেমানুষি...।" হৈমন্তী হাসবার চেষ্টা করল। "আবার তো দেখা হচ্ছে..."

"কি জানি।"

"বাঃ। কি জানি কি।..." হৈমন্তী আরও ঝুঁকে পড়ল, তার বুক জানলায়, ডান হাতটা হঠাৎ অবনীর হাতের ওপর এসে পড়ল, যেন কোনো কান্না চাপার চেষ্টা করছে মুখ লুকিয়ে, অবনীর হাতের ওপর হাত রেখে বুক নুইয়ে মাথা নীচু করল। তার কপাল এবং চুল দেখা যাচ্ছিল। হৈমন্তী বলল, "কলকাতায় এসে আমাদের বাড়িতে উঠবে। উঠবে না?"

অবনী বলল, "উঠব।"

তারপর আর কিছু না, হৈমন্তী মুখ ওঠাবার পর হাত সরিয়ে নিল, কামরাটা পলকে অনেকখানি এগিয়ে গেল। তারপর অন্ধকার, জানলায় ছায়ার মতন হৈমন্তী ছিল একটু, পর মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। আর কিছু দেখা গেল না। রেল লাইনের চাকার শব্দ, দু-এক ঝলক আলো, দেখতে দেখতে গাড়ি প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে গেল, গার্ডের গাড়ির পিছনের লাল আলো, ক্রমশ সেই আলো নিষ্প্রভ, ছোট ও শেষে বিন্দুবৎ হয়ে অদৃশ্য হল। অন্ধকারে চাঁদ উঠেছে, ঝাপসা চাঁদের আলোয় সামনের বন অসাড় ও ঘুমন্ত দেখাচ্ছিল, গাড়িটা তার মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, অবনী আর দেখতে পেল না।

কয়েক মুহূর্ত বনের দিকে তাকিয়ে থেকে অবনী নিশ্বাস ফেলল, হৈমন্তীর উষ্ণ হাত ও বুকের স্পর্শ অনুভব করার জন্যে তার ডান হাতটা মুখের সামনে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ফিরতে লাগল।

প্লাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল, দু একজন রেলবাবু ছাড়া বড় কেউ ছিল না; সুরেশ্বর, বিজলীবাবু এবং অবনী ফিরছিল। ওভারব্রিজের সিঁড়ি ওঠার সময় বিজলীবাবু কি যেন বললেন, সুরেশ্বর সংক্ষেপে জবাব দিল। অবনী কিছু বলল না। কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দও অনেকক্ষণ শোনা গেল না।

ওভারব্রিজ পেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বিজলীবাবু সুরেশ্বরকে বললেন, "আজকের রাতটুকু এখানে কাটিয়ে গেলেও পারতেন, মহারাজ।"

সুরেশ্বর মাথা নাড়ল। "না, বিজলীবাবু।"

"তবে চলুন; লাস্ট বাসটা আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাবে।"

অবনী এতক্ষণে যেন কথাটা খেয়াল করতে পারল। বলল, "বাস কেন। আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।"

"না না, আবার আপনি কেন যাবেন।" সুরেশ্বর আপত্তি জানাল।

"চলুন; রাস্তা সামান্য; আমার কোনো কষ্ট হবে না।"

"ক'বার আর যাবেন আসবেন? বিকেলে গিয়েছিলেন, এখন আবার..."

"ও কিছু না। চার পাঁচ মাইল রাস্তা যেতে অসুবিধের কি আছে..."

অবনীর গলার স্বর থেকে মনে হচ্ছিল তার পক্ষে যেন এখন এই যাওয়াটুকুর কোনো প্রয়োজন আছে। সুরেশ্বর অবনীকে লক্ষ করল। ওভারব্রিজের নীচে মোসাফির-খানার দিকে অবনীর জিপ দাঁড় করানো আছে। অবনী গাড়ির দিকে পা বাড়াল।

বিজলীবাবুর দিকে তাকাল সুরেশ্বর, "যাবেন নাকি?"

"না মহারাজ, আমার উপায় নেই। অফিসে ক্যাশ ফেলে এসেছি...", বিজলীবাবু হেসে বললেন, "ক্যাশ তুলতে হবে, কয়েকটা খুচরো কাজও আছে। মিত্তিরসাহেব আপনাকে বরং পৌঁছে দিয়ে আসুন।"

সুরেশ্বর বলল, "তাহলে আজ চলি, বিজলীবাবু।"

"আসুন।...আমি একদিন যাচ্ছি।... মিত্তিরসাহেব, আমি এগোই।"

বিজলীবাবু চলে গেলেন। সুরেশ্বর অবনীর পাশে পাশে হেঁটে গাড়ির কাছে এল। অবনী গাড়িতে ওঠার আগে একটা সিগারেট ধরাল।

"ক'টা বাজল?" সুরেশ্বর শুধলো।

অবনী ঘড়ি দেখল, "প্রায় আট।"

সুরেশ্বর পাশ দিয়ে উঠে বসল, অবনী উঠে পড়েছে।

গাড়িতে স্টার্ট দিল অবনী; হেড লাইট জ্বালাল, তারপর সামনের দিকে সামান্য এগিয়ে বাঁ হাতে রাস্তা ধরল।

স্টেশনের এই দিকটার আলো. বাজার, যানুষজন, দোকানপশার, শিবমন্দির যেন কয়েক পলকের মধ্যে পেরিয়ে হঠাৎ গাড়িটাকে নির্জনতা ও অন্ধকারের মধ্যে এনে ফেলল অবনী; গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে থানা এল, থানার ওপাশে বুঝি রাম-লীলা বসেছে, আলো জ্বলছে মাঠে, অল্প একটু সামিয়ানা, থানা ছাড়িয়ে একেবারে ফাঁকায় এসে পড়ল। লোকালয় বলে আর কিছু নেই, ফাঁকা নিস্তব্ধ মাঠ, ঝিঁঝিঁর ডাক, জ্যোৎস্না ধরেছে মাঠেঘাটে, বসন্তের বাতাস দিচ্ছিল, বাতাসে শব্দ হচ্ছিল ঈষৎ।

অবনী এতক্ষণ কেমন একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে ছিল। ফাঁকায়, নির্জনে এবং স্তব্ধতার মধ্যে এসে ক্রমশ যেন ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার মতন তার সেই ঘোর কেটে আসছিল। চোখ চেয়ে অবনী পথঘাট মাঠ এবার যেন দেখতে পাচ্ছিল, সামান্য আগেও তার কোনো খেয়াল ছিল না, অভ্যাস এবং অনেকটা যেন যন্ত্রের মতন সে গাড়িটাকে চালিয়ে এনেছে। এতটা অন্যমনস্ক ভাবে গাড়ি চালানোয় বিপদ হতে পারত। আশ্চর্য, হৈমন্তীর গাড়ি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যাবার পর সে এতক্ষণ কি করেছে, কি বলেছে কিছুই তার স্পষ্ট করে মনে পড়ছিল না—যেন যা ঘটেছে সবটাই কোনো ঘোরের মধ্যে, স্বাভাবিক কোনো চেতনা ছিল না। বিস্মৃত স্বপ্নের মতন তার সামান্য দাগ মাত্র লেগে আছে। অবনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল; কিছুক্ষণ মনে মনে হৈমন্তীকে দেখল: ট্রেনের খোলা জানলায় মুখ রেখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে আছে, কয়লার গুঁড়ো জমছে মুখে।

সামনের রাস্তা থেকে লাফিয়ে এক ঝলক আলো উঠে এল। উলটো দিক থেকে গাড়ি আসছে। অবনী স্বাভাবিক দৃষ্টিতে পথঘাট লক্ষ করার চেষ্টা করল, সতর্ক হল। ঢালু থেকে উঁচুতে উঠেছিল গাড়িটা—, এবার মোটামুটি সমভূমি দিয়ে আসছে। কাছাকাছি এসে গেল। অবনী গাড়ির হেড-লাইট নিবিয়ে পথের পাশে সরে গেল সামান্য, একটা মাল-লরি. পাশ কাটিয়ে চলে গেল পলকে। হেড লাইট জ্বালিয়ে আবার মাঝরাস্তায় গাড়ি আনল অবনী।

এতক্ষণ সে প্রায় কোনো কথাই বলে নি, সুরেশ্বর এক আধটা কথা কি যেন বলে-ছিল, অবনী জবাব দিয়েছে কি না তাও তার মনে পড়ল না। এবার অবনী বলল, "উনি এখানে কত দিন থাকলেন?"

"আট ন' মাস", সুরেশ্বর জবাব দিল।

"অনেক বেশি বলে মনে হয়—।" অবনীর গলার স্বর উদাস।

"বর্ষার মুখে এসেছিল।"

"বসন্তের শুরুতে চলে গেল—" অবনী হঠাৎ কেমন হালকা করে বলবার চেষ্টা করল। তারপর সামান্য চুপ করে থেকে বলল, "আসার দিনের কথাটা আমার মনে আছে।"

সুরেশ্বর সহজ গলায় বলল. "হ্যাঁ:... আপনি আমাদের লাটুঠার মোড় থেকে পৌঁছে দিয়েছিলেন।"

অবনী চুপ করে থাকতে থাকতে যেন হেসে বলল, "সেবার আপনার আশ্রমে, এবার স্টেশনে।"

সুরেশ্বরও যেন হাসল একটু।

গাড়িটা ধীর-গতি করে অবনী এবার স্বাভাবিকভাবে একটা সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ আর কোনো কথা বলল না, দু চার মুখ ধোঁয়া খেল। বলল, "আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে; যদি কিছু মনে না করেন..."

"মনে করার কি আছে!"

"না, তবু—" অবনী ইতস্তত করে বলল, "হয়ত আপনার ব্যক্তিগত বলে মনে হতে পারে...।"

"আপনি কি জানতে চান আমি তো জানি না।"

অবনী সরাসরি কিছু বলল না। ভাবছিল। সুরেশ্বর সম্পর্কে তার আগ্রহ এবং কৌতূহল নানা কারণে বেড়েছে; অবনী অনেক কিছুই জানতে আগ্রহ বোধ করে. যেমন সুরেশ্বরের মার কথা, কিংবা বাবার; জানতে ইচ্ছে করে সুরেশ্বরের এই জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। হৈমন্তীর সঙ্গে সুরেশ্বরের সম্পর্কের কোথায় শুরু, আর কেনই বা শেষ—এও তার কৌতূহলের বিষয়। নির্বোধের মতন, অথবা খেয়ালের মাথায় সুরেশ্বর হৈমন্তীকে নিজের মরজি মত চালাতে চেয়েছিল বলেও মনে হয় না। সুরেশ্বর কি চেয়েছিল? কি আশা করেছিল? কেন এনেছিল? মনে হয় না, এ-সবই একটা সাধারণ ভুল। অবনীর নানা প্রশ্ন ও সন্দেহ সত্ত্বেও সে এই ধরনের কোনো কথা তুলল না। তার মনে হল না, সুরেশ্বর তার ব্যক্তিগত ও নিজস্ব এইসব কথা পছন্দ করবে।

শেষ পর্যন্ত অবনী বলল, "আর আপনার আফসোস হচ্ছে না?"

সুরেশ্বর সামান্য মুখ ফেরাল, অবনীকে দেখল। "আফসোস?"

অবনী বুঝল না সুরেশ্বর কথাটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে কি না। বলল, "আমি ভেবেছিলাম, মনে মনে আপনি আফসোস করবেন।"

"কেন ফিরে গেল বলে—"

অবনী কিছু বলল না।

সুরেশ্বর সামান্য সময় নীরব থাকল, তারপর বলল, "হেমকে আমি নিজের স্বার্থে এনেছিলাম, স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে মানুষের লাগে।"

"আমি ঠিক স্বার্থের কথা বলছি না—" অবনী বলল, "স্বার্থ ছাড়াও কিছু থাকতে পারে। ...হারাবার আফসোসও মানুষের থাকে।"

সুরেশ্বর যেন কয়েক মুহূর্ত ভাবল, বলল, "কি জানি, তেমন কোনো আফসোস আমার নেই।" বলে সামান্য থেমে আবার বলল, "হেমকে এখানে এনে আমি কিছুই দিতে পারলাম না সে-দুঃখ আমার থাকবে।"

অবনী কথাটা কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না। সুরেশ্বর বোধ হয় মনে করে না হৈমন্তী তার প্রাপ্ত বস্তু ছিল, কিংবা প্রাপ্য বস্তু; হারাবার প্রশ্নটাও তাই তার কাছে অবান্তর।

অবনী কি ভেবে বলল, "আপনি এ-রকম যে কেন করলেন আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। ওঁকে তো আপনি চিনতেন জানতেন, বুঝতেন...।" অবনীর গলার স্বরে আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। কিছু সময় আর কোনো কথা বলল না। পরে বলল, "আপনি নিশ্চয় যা দিয়েছিলেন তা ফেরত চান নি"

"হেমকে আমি কিছু দিই নি।"

"এক সময়ে ওঁর অসুখে যথেষ্ট করেছিলেন।"

সুরেশ্বর অবাক হল। "কে বলল?"

"উনিই বলেছেন।"

সুরেশ্বর যেন বিব্রত বোধ করল। "তুচ্ছ কথাটা হেম কেন এমন করে মনে রেখেছে আমি জানি না।"

"কৃতজ্ঞতা।"

সুরেশ্বর ব্যথিত হল। বলল, "আমি কি সেজন্যে তাকে এখানে আনতে পারি!"

"আমারও মনে হয় না এ-সব হিসেব আপনি বোঝেন।"

সুরেশ্বর অন্যমনস্ক, কিছু ভাবছিল। বলল, "অসুখের সময় হেমের বয়স ছিল অল্প। সে ওই বয়সে সংসারের এমন জায়গায় গিয়ে পড়েছিল যেখানে শোক, দুঃখ, কষ্ট, অসহায়তা। আমার মনে হত, হেম দুঃখকে নিজের জীবন দিয়ে দিনে দিনে চিনে নিচ্ছে। ওর তখন কত মমতা দেখেছি, কত ভালবাসা দেখেছি। ভেবেছিলাম, ওর মধ্যে দুঃখের বোধ হয়েছে। ওর তা হয় নি। আমারও নয়। তারপর ও সুস্থ হল, ঘরে এসে বাইরের দুঃখ ভুলে গেল।...আমিও হয়ত ভুলে যেতাম, কিন্তু আর-একজন এল, যে আমায় ভুলতে দিল না; সে আমায় কোথায় যে হাত ধরে নিয়ে গেল...থাকল না...আমায় রেখে চলে গেল..." সুরেশ্বরের গলা ভরে এসেছিল, যেন কণ্ঠ নয় তার হৃদয় কিছু বলছে।

অবনী মুখ ঘুরিয়ে সুরেশ্বরকে দেখছিল, দেখতে দেখতে সে অনুভব করল কোনো অদ্ভুত বিষণ্ণতা তাকে গ্রাস করছে। এ বিষণ্ণতা তার নয়, তবু কোনো আশ্চর্য যাদুমন্ত্রে যেন সে এই সম্মোহনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। অন্যমনস্কভাবে অবনী গাড়ি প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলেছিল, এবং এত ধীরে ধীরে গাড়িটা যাচ্ছিল যেন এই নিস্তব্ধ প্রান্তরে কোনো পশুর মতন হাঁটছে তার কোনো গন্তব্য নেই, আশ্রয় নেই।

গাড়িটা দাঁড় করাল অবনী। অন্যমনস্কতা এবং এই সম্মোহন সে নষ্ট করার চেষ্টা করল। চারপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তারা অনেকটা পথ চলে এসেছে, ডানদিকে একটা বটগাছের তলায় ঢিবির মতন চুনকাম করা মন্দির, তার গা বেয়ে বাঁশের মাথায় লাল সালু উড়ছে, কোথাও জনমানব নেই, ওপাশে ঝোপে ঝোপে জোনাকি উড়ছে, পাশে বুঝি খালের নালা জ্যোৎস্নাজোড়া প্রান্তরের বুকে নালাটি ক্ষতের দাগ হয়ে পড়ে আছে। মাঠে মাঠে বাতাস ছুটছিল, সি—সি—শব্দ উঠছিল।

অবনী নিশ্বাস ফেলল দীর্ঘ করে, কয়েক দণ্ড চুপচাপ, তারপর পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করে ধরাল। হৈমন্তী এখন কতটা পথ চলে গেল, অবনী যেন মনে মনে ভাবল একবার।

গাড়ি আবার চলতে শুরু করলে অবনী বলল, "বাইরের দুঃখই কি জীবনের সব?"

সুরেশ্বর অন্যমনস্ক ছিল, শুনতে পায় নি। বলল, "কিছু বললেন?"

"বলছিলাম, বাইরের দুঃখই কি জীবনের সব?"

"যার কাছে যেমন।...হেমের কাছে তার নিজের দুঃখই বড়।"

"আপনার দুঃখের সঙ্গে তার মিল নেই।"

"না।"

"কিন্তু, মানুষ নিজের সুখ দুঃখই তো আগে বোঝে।"

"অনেক সময় সেটাই একমাত্র বোঝে; আগে যা বোঝে—পরেও তাই বোঝে। আমার বাবা তাঁর জীবনে শুধু নিজের সুখ বুঝেছিলেন, নিজের অভাবটাই তাঁর একমাত্র বোধ ছিল।"

"আপনার মা আত্মহত্যা করেছিলেন কেন?"

"নিজের দুঃখে কোনো সান্ত্বনা পান নি বোধ হয়।"

অবনী আর কিছু বলল না। তার মনে হল না, বৃথা অন্য কোনো কথার প্রয়োজন আছে। সুরেশ্বর নিজের কথা ভুলতে চায়, তার নিজের সুখ দুঃখকে সে স্বীকার করে না, হৈমন্তীর সংগে তার কোথাও মিল নেই, কোথাও নয়। কেন যে—অবনী বুঝতে পারল না—তার মার কথা মনে পড়ল; ললিতার কথা, এবং নিজের। মা শুধুমাত্র আত্মতৃপ্তি চেয়েছিল, সেই আত্মতৃপ্তির কী কুৎসিত পরিণতি! ললিতা কি চেয়েছিল, কি চায়? শুধু আত্মসুখ, সন্তুষ্টি, ভোগ। সে নিজেও ললিতার কাছে এর বেশি কিছু চায় নি। অবশ্য এ থেকে কিছু প্রমাণ করতে চাইছে না অবনী, তবু তার মনে পড়ছে। হয়ত সুরেশ্বরের কথার কতটুকু সত্য সে দেখতে চাইছিল।

লাটুঠার মোড়ের কাছাকাছি গাড়ি পেীছে গেল। ডানদিকে কয়েকটা খাপরাচালের ঘর দেখা যাচ্ছিল, ফাগুয়ার গান শুরু হয়েছে, বাতাসে একটা সুরেলা হললা ভাসছিল, খঞ্জনির শব্দ। ক্রমে লাটুঠার
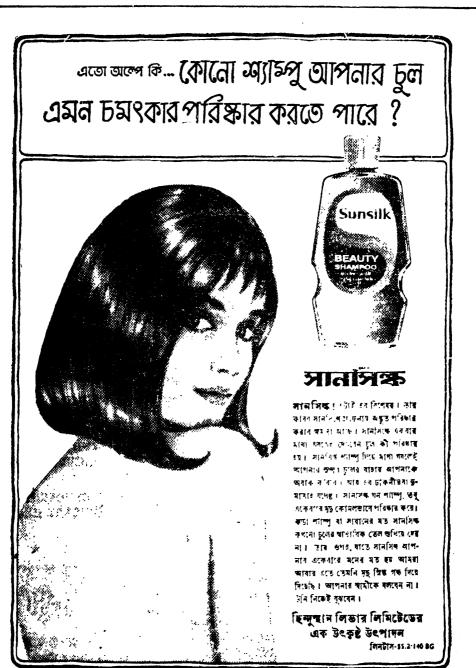
মোড় এল। একটু আলো, ছোটখাটো দু একটা দোকান, দু পাঁচজন মানুষ।

লাট্‌ঠার মোড় থেকে গাড়িটা কাঁচা রাস্তায় নামিয়ে নিল অবনী; তারপর মাঠ; আমলকি আর শালচারার ঝোপে লিটাট পোকা টিপ টিপ করে জ্বলছিল, শুকনো মাটির গন্ধ। ধুধু প্রান্তরে এসে গাড়িটা উঁচুনীচু পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে চলেছিল।

অবনী অনেকক্ষণ কোনো কথা বলে নি। এবার, নিশ্বাস ফেলে, আচমকা সুরেশ্বরকে ডাকল।

সুরেশ্বর সাড়া দিল।

অবনী বলল, "আপনার সমস্ত জীবনটা আপনি এই জঙ্গলেই শেষ করে দিতে চান?"

সুরেশ্বর কিছু বলল না, যেন বিনীত হাসি হাসার চেষ্টা করল, শব্দ হল সামান্য।

"এখানে আপনি কি পেয়েছেন?"

"এত তাড়াতাড়ি—!" সুরেশ্বর এবার হাসল, শান্ত নির্মল ধ্বনি জাগল হাসির।

"পাবার অপেক্ষায় আছেন?" অবনীও পরিহাস করে হাসল।

"তা হয়ত আছি।"

"পাবেন?"

"কি জানি; হয়ত পাব না।...বসে থাকলেই কি পাওয়া যায়!"

অবনী সুরেশ্বরের মুখ লক্ষ করল। বলল, "আপনি কি ঈশ্বর-দর্শনের আশায় বসে আছেন?"

"না", সুরেশ্বর মাথা নাড়ল।

অবনী অবাক হল। "আপনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী নন?"

"কি রকম ঈশ্বর?"

অবনী কেমন গোলমালের মধ্যে পড়ল। সে বুঝতে পারল না সুরেশ্বরের প্রশ্নের কি জবাব হতে পারে। কেমন ঈশ্বর? কেন, আস্তিক যাকে ঈশ্বর বলে তেমন ঈশ্বর। অবনী বলল, "ঈশ্বরের আবার রকম থাকে নাকি?...কি জানি আমি জানি না, মশাই।"

সুরেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে কোনো জবাব দিল না। পরে বলল, "আমার ঈশ্বর আমার নিজের।"

"বুঝলাম না..."

"বোঝানোর মতন কিছু নেই।" সুরেশ্বর সংযত শান্ত গলায় বলল, "আমার ঈশ্বর নিয়ে বড়-সড় তর্ক করা যায় না।...জগৎ আর জীবের বাইরে আমার ঈশ্বর থাকে না।"

"কিন্তু আমার ধারণা ছিল ঈশ্বর বস্তুটা এই দুইয়ের বাইরে—সাম থিং এলস্‌..."

"সে ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই।... আমার বেড়ার বাইরে যে ঈশ্বর তাকে নিয়ে আমি কি করব!"

অবনী বুঝতে পারল না। বলল, "আপনার ঈশ্বর কি?"

"কল্পনা।"

"সমস্ত ঈশ্বরই কল্পনা।"

"আমার ঈশ্বর মানুষের বোধবুদ্ধির অগম্য, অজ্ঞেয়, অনুভব-হীন কল্পনা নয়। ..মানুষের হৃদয় যা অনুভব করে আমার ঈশ্বরকে আমি তাই দিয়ে কল্পনা করেছি। মানুষ যা হতে চায়, অথচ পারে না, যা হতে পারলে সে ভাবে সে সার্থক হত, আমার ঈশ্বর তার বেশি নয়।"

অবনী ইতস্তত করে বলল, "তার দেবত্ব নেই?"

"না; সে-ভাবে নেই।" সুরেশ্বর সংক্ষেপে বলল।

গাড়ি চলছে কি চলছে না বোঝা যায় না, শব্দটা কানের সঙ্গে মিশে আছে, ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় নিঃসাড় প্রান্তর কেমন অলৌকিক মগ্নতা পেয়েছে, ঝিঁঝিঁর স্বরে এখানের শূন্যতা ভরা আছে।

সুরেশ্বর মৃদুস্বরে বলল, "মানুষ তার সমস্ত অভাব, ব্যর্থতা, অপূর্ণতা, অক্ষমতার কথা নিজে যত জানে আকাশের ভগবান তত জানে না। ঈশ্বর আমার কাছে মানুষের কাম্য ও প্রার্থিত সমস্ত গুণের সমষ্টি। আমার ঈশ্বর নির্গুণ নয়।" সুরেশ্বর কয়েক মুহূর্তের জন্যে থামল, পরে বলল, "মানুষ তার দয়া, মায়া, মমতা, প্রেম, শৌর্য, সৌন্দর্য—সমস্ত কিছুর চরম কল্পনা দিয়েছে ঈশ্বরের ওপর আরোপ করে; তাই ঈশ্বরের চেয়ে মমতাময় প্রেমময় আর কিছুকে বলি না। এই দেবত্ব মানুষ ঈশ্বরকে দিয়েছে, কারণ সে ভাবে এ-দেবত্ব বুঝি তার আয়ত্ত হবার নয়। বোধ হয়, আমার ধারণা, এই দেবত্বের অভিজ্ঞতা তার হতে পারে। সংসারে যাঁরা মহৎ, যাঁরা সাধক, তাঁদের হয়ত হয়।"

অবনী বলল, "আপনি কি দেবতা হয়ে উঠতে চান?"

"কতটা হতে পারি তার চেষ্টা করতে দোষ কোথায়! যদি ঈশ্বরের মমতা আমারই কল্পনা হয়, যদি বলি ঈশ্বরের চেয়ে সহিষ্ণু আর কিছু নয় তবে আমার পক্ষে আমার কল্পনার মত মমতাময় সহিষ্ণু হবার চেষ্টা করতে অপরাধ কিসের।"

অবনী যেন কিছু ভাবল। বলল, "আপনার ঈশ্বরে পাপ নেই?"

"না। পাপ কি মানুষের গুণ?"

"কিন্তু মানুষের মধ্যে আছে।"

"পবিত্রতা তাই আমাদের কল্পনা।"

অবনী কিছু বলল না আর। সুরেশ্বরের ঈশ্বর যে কিছুটা এলোমেলো, সাদামাটা তাতে তার সন্দেহ হল না। বোধ হয়, অবনীর মনে হল, ঈশ্বরকে রাখলে অপ্রয়োজনে রাখতে হয়, না হয় রাখতে নেই। সুরেশ্বর প্রয়োজনে ঈশ্বরকে রেখেছে। সে নির্বোধ। তবু অবনীর কোথাও যেন সুরেশ্বরের প্রতি সহানুভূতি ও মমতা হচ্ছিল।

গাড়ি অন্ধ আশ্রমের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। "...আর অল্পক্ষণ পরেই আশ্রমে পৌঁছে যাবে।" কেমন এক অবসাদ বোধ করছিল অবনী। অবসন্ন ভাবে সিগারেট ধরাল, গলা বুক ভরে ধোঁয়া নিল। কিছুক্ষণ আর কোনো কথা হল না। দু'-জনেই নীরব।

অবশেষে অবনী বলল, "আপনি এই অন্ধ আশ্রম করতে এলেন কেন? সংসারে আরও অনেক কাজ ছিল।"

সুরেশ্বর সামান্য ভেবে বলল, "এই কাজটাই আমার ভাল লাগল।"

"অন্ধ আতুর সেবা?"

"দুঃখীজনের সেবা। ...আমিও তো অন্ধ।" সুরেশ্বর সামান্য থামল, বলল, "একবার আমি এক গেঁয়ো মেলায় গিয়েছিলাম। মেলাটা বসে মাঘ মাসের পূর্ণিমায় শোন নদীর ধারে। হরিদ্বারের গঙ্গায় যেমন লোকে সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ ভাসায়—সেই রকম এই মেলাতেও অনেকে মাটির প্রদীপ ভাসাতে আসে। ভাবে এটা পুণ্য কাজ। সেবার একটা বুড়ো এসেছিল। প্রদীপ ভাসাতে গিয়ে কেমন করে যেন নদীতে পড়ে গেল। তাকে টেনেটুনে তুলল লোকে।

বুড়ো অন্ধ। আমি বললাম, তুমি নিজে অন্ধ তবু এভাবে [illegible] একলা প্রদীপ ভাসাতে এল কেন? জবাবে বুড়োটা বলল, —বেটা, আমি আজন্ম অন্ধ, আমি জানি, তবু যখন এই একরত্তি মাটির পিদিমে এক ফোঁটা আলো দিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দি, তখন বুঝতে পারি আমার ছোট্ট পিদিমটা হাজার মানুষের আলোর সঙ্গে নদীর ঘাট থেকে ভাসতে ভাসতে কোথায় যেন চলে গেল। জীবনকে এইভাবে বেছে দাও।"

অবনী অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল। "আপনি কি কোনো কিছু পাবেন? অন্ধ তো পথ পায় না।"

"মানবজীবনের একটা দিক এই রকমই। দুঃখের জগতে, যন্ত্রণার জগতে আমরা জন্মেছি। তেমন করে দেখতে গেলে ব্যর্থতাই মানুষের নিয়তি।...তবু..."

অবনী অপেক্ষা করে থাকল।

সুরেশ্বর বলল, "তবু—জগতের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে কর্ম দিয়ে যে জড়িত তার সান্ত্বনা আছে। আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে বাঁচতে পারি না। অবিশ্বাস করে, দূরে সরে থেকে, পালিয়ে যদি বাঁচা যেত আমি বাঁচতাম।"

"এই বেঁচে থাকার কিছু কি আছে?"

"আমি ভাবি আছে। মর্যাদা আছে, সান্ত্বনা আছে।"

আশ্রমের সামনে এসে গাড়িটা লাফাল। গর্ত ছিল কোথাও। অবনী ব্রেক চাপল, তারপর আশ্রমের মধ্যে ঢুকে গেল। অন্য দিনের মতনই সে গাড়িটা হৈমন্তীর ঘরের কাছাকাছি মাঠে রাখল। তার খেয়াল ছিল না হয়ত, কিংবা অভ্যাসবশেই।

সুরেশ্বর নামল, অবনীও নেমে পড়ল।

সুরেশ্বর বলল, "নামলেন? বসবেন একটু?"

"না। আপনাকে এটুকু এগিয়ে দি। পা ছাড়িয়ে নিচ্ছি আর কি!" অবনী হাসল।

মাঠ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুরেশ্বরের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল ওরা।

সুরেশ্বর বলল, "অবনীবাবু—"

"বলুন "

"হেম আমার অনেক অহঙ্কার ভেঙেছে। তার কাছে আমিও কৃতজ্ঞ।" থামল, আবার বলল, "সেই যে গান আছে ঃ যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিবে যায় বারে বারে—, আমারও তাই। নিজেকে জ্বালাতে চাই, তবু নিজেই কোথায় যেন নিবিয়ে ফেলি।"

অবনী সুরেশ্বরকে দেখল। সুরেশ্বর শান্ত পায়ে সামনের দিকে চোখ রেখে হেঁটে চলেছে। তার শরীরের কোথাও অবনত ভাব নেই, দ্রুততা নেই পদক্ষেপে, অথচ সে নম্র বিনীত। মনে হয় সে কোনো কিছু লক্ষ করছে না, অথচ সে লক্ষ করছে।

ঘরের সামনে এসে সুরেশ্বর ডান দিক দিয়ে আরও একটু এগিয়ে গেল, গিয়ে হরিতকী গাছের তলায় সিমেন্টের ছোট একটি বেদীর সামনে দাঁড়াল। বলল, "বসবেন একটু?"

"না, আর বসব না।" অবনী হাসল। [illegible] সুরেশ্বর যে এখন একা নির্জনে নিস্তব্ধতার মধ্যে মৃদু [illegible] বসে থাকতে চায় অবনী অনুভব করতে পারছিল। আর অপেক্ষা করা যায় না। অবনী বলল, "চলি, রাত হয়ে আসছে.."

"আসুন।...আবার আসবেন।"

"আসব". অবনী অন্যমনস্কভাবে বলল, "আচ্ছা চলি।"

ফিরতে লাগল অবনী। সুরেশ্বরের ঘরের সামনে দিয়ে চলে এল। আরও কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়াল ঃ সুরেশ্বরকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। পিছু ফিরে তাকাল ঃ সিমেন্টের বেদীর ওপর আসন করে সুরেশ্বর বসে আছে. পাশে হরিতকী গাছ. মনে হল সুরেশ্বরের মুখ আকাশের দিকে। ফাল্গুনের নিশীথ বাতাস ও কোমল জ্যোৎস্নার মধ্যে তাকে এখন বড় দূরের বলে মনে হচ্ছিল। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে অবনী আবার ফিরতে লাগল।

মাঠ দিয়ে অন্যমনস্কভাবে অবনী হাঁটছিল; ঘাসে বুঝি সামান্য হিম পড়ে আর্দ্র হয়েছে, করবীঝোপ মাঝে মাঝে শিহরিত হচ্ছিল. কদাচিৎ কারও গলার স্বর ভেসে আসছে, দু একটি আলো জ্বলছে কোথাও। অবনী কিছু লক্ষ করল না; সরাসরি এসে গাড়ির কাছে দাঁড়াল।

অন্যমনস্কভাবে অবনী গাড়িতে উঠল, উঠে অভ্যাসমতন গিয়ারে হাত দিল। স্টার্ট দেওয়ার পর যেন শব্দ এসে তাকে সচেতন করল। হেড্ লাইট জ্বালাল অবনী। আলোর ঢেউ যেন সামান্য ব্যবধানটুকু নিমেষে পেরিয়ে গেল, গিয়ে হৈমন্তীর ঘরের দিকে আছড়ে পড়ল। মুহূর্তের জন্যে কেমন বিভ্রম ঘটল, তারপর অবনীর মনে হল হৈমন্তী নেই, তার ঘর শূন্য পড়ে আছে। ফাঁকা, রিক্ত, নিঃস্ব মনে হল নিজেকে; বুকের কোথাও যেন কিছু নেই —সব কেমন অসাড়, শূন্য। মুখ হাঁ করে গভীর শ্বাস ফেলল। তারপর গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নেবার জন্যে সামান্য পিছিয়ে এগিয়ে নিল গাড়িটা, নিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে আনল। ঘুরিয়ে নেবার সময় হেড্ লাইটের আলো প্রথমে অন্ধনিবাস, পরে রোগী-ঘর, তাঁতঘর এবং শেষে পেট্রোম্যাক্স জ্বালা নতুন হাসপাতালের গায়ে গায়ে পড়ল, পড়ে ঘুরে এল। আর সহসা অবনীর মনে হল, এই আলো অতি তীব্র, ভীষণ; মনে হল এই আলোর কৌতূহল বড় বেশি; যেন শিকারের আগ্রহে সতর্ক হয়ে তন্ন তন্ন করে সব দেখতে চাইছে নিষ্ঠুর, নির্দয়। আর কেমন যেন অবনীর অদ্ভুত এক অস্বস্তি হল। সে আড়ষ্ট ও ভীত হল। গাড়ির আলো দুটিকে নিজের চক্ষু বলে মনে হচ্ছিল। হয়ত অবনী সুরেশ্বরের এই [illegible] আলো নিয়ে এখানকার সমস্ত কিছুকে অবজ্ঞা ও উপহাস করতে এসেছিল। হয়ত শিকার করতে।

অবনী আলো নিবিয়ে দিল। দিয়ে জ্যোৎস্নার আলোয় ধীরে ধীরে, অন্ধ আশ্রমের আর কোনো কিছুকে খণ্ডিত না করে অপরাধীর মতন মাঠ দিয়ে পথ ধরে ফটকের বাইরে জামতলায় চলে এল।

তারপর কাঁচা রাস্তায় আবার আলো জ্বালাল অবনী। গাড়ি চলছিল।

যাবার পথে অবনী বুঝতে পারল না— পিছনে যে মানুষটি একপাশে কিছু অন্ধ, অন্য পাশে কয়েকটি মড়কের মানুষ নিয়ে পড়ে আছে, সে জীবনে কি পাবে! অবনী জানে না এতে কিছু পাওয়া যায় কি না! তার বিশ্বাস হয় না। সুরেশ্বর নির্বোধের মতন সমস্ত প্রাপ্তিগুলোই একে একে ফেলে দিয়েছে। এখন, সে অন্য কিছুর অপেক্ষায় আছে। এই অপেক্ষায় সে কি কিছু পাবে? পাওয়া কি সম্ভব?

অবনীর বিশ্বাস করতে বাধছিল, এতে কিছু পাওয়া যায়। তবু কী এক বেদনায়, সহানুভূতি ও করুণায় অবনী প্রার্থনা করল ঃ ওই মানুষটি যেন কিছু পায়। কিছু পায়।

অবনী সজল চোখে অসাড় জ্যোৎস্না-প্লাবিত এই চরাচরে কিছু যেন অনুভব করার চেষ্টা করল।

সমাপ্ত
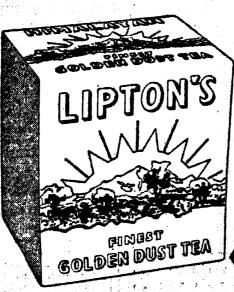
কলকাতার ডায়েরী

'অবসান কুরুক্ষেত্র রণ।'—পঞ্চবার্ষিক নির্বাচন পরিকল্পনার পরিসমাপ্তি। আবার পাঁচ বছর পর রথী মহারথীতে সম্মুখ সমর, ভ-বের উত্থান পতন। ইতিমধ্যে জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক হয়ে গত কয়েক মাস যাঁরা দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়ে বেড়িয়েছিলেন, তাঁদের শিবিরে আজ ক্লান্তি, যদিও প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পরিণাম দুই শিবিরে দ্বিবিধ। এই বসন্তকাল কারও কাছে 'রোদন ভরা', কারও কাছে জয়ের মালার ফুলে ভরা।

ক্লান্ত এই কলকাতা শহরটাও। বিষাদ আর আনন্দকে ছাপিয়ে ওটাই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। এতদিনের হইচই এতদিনের চেঁচামেচি-চিৎকার হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলে যা হয়।

এদিকে যাঁরা কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নন, যাঁরা ভোট দেওয়া বা না দেওয়া ছাড়া কোন মাতামাতির মধ্যে ছিলেন না, শহরের সেইসব 'বুদ্ধিজীবীরা' নির্বাচনের উপকারিতা আর অপকারিতা নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠেছেন। বৈঠকখানার আড্ডায়, কফিখানায়, চায়ের দোকানে এই নিয়ে আলাপ-আলোচনার অন্ত নেই।

এমন একটি আসরে আমি সেদিন উপস্থিত ছিলাম। কুণ্ডলীকৃত সিগারেটের ধোঁয়া শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করে চরম নিস্পৃহতার সঙ্গে জনৈক বুদ্ধিজীবী জানালেন, এবারও তিনি ভোট দিতে যান নি। তার চেয়ে ঘরে বসে নতুন আমদানি একটি 'অ্যাবসার্ড প্লে' পাঠ করাই অধিক শ্রেয় মনে করেছেন। ভোট দিতে যান নি কেন? তার উত্তর পরিষ্কার। গণতন্ত্রে তাঁর আস্থা ষোল আনা আছে বটে, কিন্তু এ-দেশে যেভাবে ভোটাভুটি হয় তাতে কোন সুস্থচিন্তার লোক যোগ দিতে পারে না। প্রসঙ্গত তিনি বিলিতী দু-চারটি সংবাদপত্রের নাম করলেন, যাতে তাদের ভারতস্থ সংবাদদাতারা ভারতবর্ষের নির্বাচনে কীভাবে ধর্ম, জাতিভেদ, সম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তার বিশদ বিবরণ সালঙ্কারে সাড়ম্বরে প্রেরণ করেছেন।

ভদ্রলোক বললেন, "মশাই, যেখানে ইলেকশন ম্যানিফেস্টোর ভিত্তিতে ভোটাভুটি না হয়ে 'সদগোপ প্রার্থীকে সদ্গোপেরা ভোট দিন' কিংবা 'মারোয়াড়ী প্রার্থীকে বাঙালীরা ভোট দেবেন না' ইত্যাদি প্রচার তলে তলে চলে এবং "আকাট মুখ্যু পাবলিক" তাতে সাড়া দেয়, সেখানে আমি নেই। আসুক সুস্থ পরিবেশ, সুস্থ প্রচার, আমিও আছি।"

বাধ্য হয়েই আমাকে কথা বাড়াতে হল। তৎক্ষণাৎ পাল্টা প্রশ্ন করলুম, "ইন্ডিয়া না হয় 'আকাট মুখ্যুর' দেশ, কিন্তু কোন 'এনলাইটেনড' দেশে এই ধরনের ব্যাপার ঘটে না? নির্বাচনে সম্প্রদায়, জাতি বা ধর্ম টেনে আনা নিশ্চয়ই অন্যায়, তবে তার মানে এই নয় যে, এ ব্যাপারে আমরাই একমাত্র অপরাধী।"

ভদ্রলোককে নীরব থাকতে দেখে সবিনয়ে জানালুম, পৃথিবীর সবচেয়ে এনলাইটেনড ডেমোক্রেসি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসন-গোল্ডওয়াটার লড়াই কীভাবে হয়েছে, তা আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি এবং তাতে নিজের দেশ ভারতবর্ষের গণতন্ত্র সম্পর্কে মোটেই হীন ধারণা জাগে নি। ধর্ম, সম্প্রদায়, জাতি ইত্যাদিকে নির্বাচনের কাজে লাগানোর ব্যাপারে ওরা আমাদেরও এক কাঠি বাড়া। ১৯৬০ সালে কেনেডি নিকসনের লড়াইয়ের সময় কী হয়েছিল? রিপাবলিকান না ডেমোক্রাট, সে বিচার পরে, কেনেডি আইরিশ বংশোদ্ভূত বলে গোটা মার্কিন মুলুকের তাবৎ আইরিশরা স্বজাত কেনেডিকে ভোট দিয়েছিল। কেনেডি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। শুধু এই একটিমাত্র কারণেই তিনি বহু ভিন্ন গোত্রের ডেমোক্র্যাটের ভোট হারিয়েছিলেন এবং বেশ কিছু স্বধর্মী রিপাবলিকানের ভোট পেয়েছিলেন।

কলকাতা-বোমবাইয়ের মত, উত্তর ভারত দক্ষিণ ভারতের মত ও-দেশেও রেষারেষি লস এনজেলেসে নিউ ইয়র্কে, পূর্ব উপকূলে পশ্চিম উপকূলে (উত্তর ও দক্ষিণের বিবাদ তো ইতিহাসের বিষয়)।

নিকসন পশ্চিম পাড়ার, কেনেডি পূবে পাড়ার, তাই নিকসন হাঁক দিয়েছিলেন, পশ্চিমের ভাইয়েরা এক হও। প্রেসিডেন্ট পদটা যেন মিসিসিপি নদীর ওপারের লোকেদের একচেটিয়া, এবারে ওইটি হাতে দিও না। পূবে পাড়ার কেনেডির বদলে পশ্চিম পাড়ার ভোটাররা পশ্চিমা আমাকে ভোট দাও। বলা নিষ্প্রয়োজন, জিততে না পারলেও সেই ডাক একেবারে বিফলে যায় নি।

১৯৬৪ সালেও এই ধরনের কাণ্ড ঘটেছে। জনসন-গোল্ডওয়াটারে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি কম হয় নি। ইলেকশান ম্যানিফেসটো নয়, ব্যক্তিগত কুৎসা ছিল গোল্ডওয়াটারের দলের প্রধান অস্ত্র। জনসনের শিবিরও নিরুত্তর ছিল না। নিউ-ইয়রক স্টেটের সেনেটর-এর পদ নিয়ে ববি কেনেডি আর কীটিং-এর লড়াই ছিল তারও চেয়ে চার কাঠি বাড়া। কীটিং কেনেডিকে অপদস্থ করতে তাঁর বাপ-ঠাকুরদাকে পর্যন্ত টেনে এনেছেন। এবং যেহেতু নিউইয়রক শহরে ইহুদিদের বিরাট কলোনি, ওদের ভোট বাগাবার জন্যে কে কত বেশী ইহুদি-অন্ত প্রাণ, সেটা প্রমাণ করতে কেনেডি কীটিং দুজনেই আদাজল খেয়ে মাঠে নেমে-ছিলেন। সেখানেও কিন্তু ইলেকসন ম্যানি-ফেসটো ছিল না।

এ-দেশে হিন্দু মুসলমান আর বর্ণহিন্দু তফশীলীতে বিভেদ। নিশ্চয়ই অন্যায় ব্যাপার, তবে আমেরিকাও আমাদের চেয়ে কম যায় না। কালা আদমি নিগরোদের প্রতি ওদের যা আচরণ তাতে মুখ্য কুলীন ভারতীয় ব্রাহ্মণও লজ্জা পাবেন। ইলেক-শনের সময় এই ভেদবুদ্ধিটা আবার প্রখর হয়ে ওঠে। দক্ষিণাঞ্চলের একটি রাজ্যে শতকরা পঁচিশ ভাগ নিগরোকে ভোটাধি-কারই দেওয়া হয় নি। তার কৈফিয়ত চাইলে গবরনর বাহাদুর পরিষ্কার জানিয়ে দেন, 'মাথা খারাপ, ভোটের অধিকার দিলে ওরা ইলেকশানে জিতে যাবে যে, আমিই এই আসনে থাকতে পারব না, তাই ইচ্ছে করেই ওই বন্দোবস্তটা পাকা করে রেখেছি—

আমাদের দেশে এতটা অধঃপতন হয় নি। মুসলমান মুসলমানকে মুসলমান বলেই ভোট দেয় বটে, মাহিষ্য প্রার্থীকে জেতাতে সব মাহিষ্য জোটও বাঁধে ঠিকই কিন্তু তার মানে এই নয় যে, অপরাধী একা আমরাই। যেসব বিদেশী সাংবাদিকরা আমাদের দেশ, এবং আমাদের নির্বাচন সম্পর্কে [illegible] করে, রঙ চড়িয়ে লেখা পাঠায়, তারা ভুলে যায়, ওদের দেশেও একই জিনিসের রকমফের রয়েছে। তবে ওরা যা খুশি বলুক, আপত্তি নেই, কিন্তু দুঃখের কথা, আমরাও ওদের সঙ্গে গলা মেলাই, নিজের দেশকে খাটো করে [illegible] লাভ করি।

আমার "সুদীর্ঘ ভাষণ" শেষ হতেই স্পষ্ট বোঝা গেল, উপস্থিত অনেকের কাছেই আমি বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছি। অগত্যা আমিই আসর ছেড়ে উঠে পড়লাম।

রাস্তায় পা দিতেই মনে পড়ল দিগ্বিজয়ী ব্রিটিশ ঐতিহাসিক টয়েনবির একটি কথা। লস এনজেলেস টাইমসের বিশেষ সংবাদ-দাতার সঙ্গে টেলিভিশনে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে একথা সে-কথার পর টয়েনবি জানালেন, তাঁর মতে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক মিশরের নাসের। পিরামিড নয়, মিশরীদের তিনি উপহার দিয়েছেন আসোয়ান বাঁধ। এবং টয়েনবির মতে, এই শতাব্দীর অন্যতম বৃহৎ ঘটনা ভারতবর্ষের "থ্রি জেনারেল ইলেকশান"। (সাক্ষাৎকারের সময় ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বর মাস, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন তখনও হয় নি।) তিনি বলেন, বিশ্বের প্রত্যেকটি গণতন্ত্রী দেশ যেন অন্তত এই একটি কারণের জন্যে স্বাধীন ভারতকে সম্মান করে।

দেশের অতীত সম্পর্কে নিরুৎসুক, বর্তমান সম্পর্কে উদাসীন, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী এই দেশের এক শ্রেণীর বুদ্ধি-জীবীরা, জানি না, টয়েনবির এই মন্তব্যের কতখানি গুরুত্ব দেবেন। নাকি টয়েনবিকে স্বগোত্রের বলে মানতেই তাঁরা নারাজ।

—চাণক্য

সামাজিক সংহতি

পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সাধারণত সোচ্চার হলেও নিছক মতবাদের দিক থেকে নিজেদের সামাজিক ভিত্তি হতে একরকম সম্পর্কহীন; এবং এমন কি যেখানে রাজনৈতিক অর্থে তারা প্রতিক্রিয়াশীল সেখানে তাদের মূল্যবোধ ও মনোভাব জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বলতে গেলে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের দৃঢ় ধারণা হচ্ছে যে, জনগণ মূর্খ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সংকীর্ণমনা; সুতরাং দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে তাদের আবেগ বা অনুভূতিগুলিকে অবহেলা করলেও চলে।

সংখ্যালঘু চেতনার উপস্থিতি

প্রকৃতপক্ষে, ভারতবর্ষ কেবল একটা বিশাল দেশ বা ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে আশ্চর্যরকম বিচিত্র নয়, তার জনগণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্তরে স্তরে বিভক্ত। ভারতীয় সমাজে সর্বত্র যে স্তরভেদ লক্ষ করা যায় তার একটা ফল হচ্ছে সংখ্যালঘু চেতনার ব্যাপক অস্তিত্ব। সংখ্যালঘু চেতনা সব সময় নঞর্থক বা ধ্বংসাত্মকভাবে দেখা দেয় বলে সারা দেশে অগণ্য গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে এবং গোষ্ঠীগুলির মনে ধারণা জন্মেছে যে, তারা একাধিক ব্যাপারে সুবিচার পায় নি। দৃষ্টান্ত হিসাবে, পল্লী অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে যে বর্ণগুলি ক্ষমতাশালী সেগুলির নেতা বা দলপতিরা স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের নতুন সুযোগ-সুবিধা হতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভবান হয়েছে। তার ফলে অন্য সবার মধ্যে একটা ব্যাপক অভিযোগের ভাব জেগে উঠেছে।

ইংরাজেরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়ে এসে আমাদের দেশকে সর্বপ্রথম একটি মাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিণত করে। কিন্তু তার পরে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর আকারে রাজনৈতিক সমাজের বিভাগ এবং ব্যাপক সংখ্যালঘু বোধের উপস্থিতি স্পষ্টত সংখ্যাভিত্তিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থিতিরক্ষার পরিপন্থী হয়ে উঠছে।

আক্ষেপের বিষয়, সমগ্র দেশের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড়ো অংশ সেই হিন্দীভাষী অঞ্চল হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ। এই অংশে হিন্দু মনোভাব ও আবেগ খুবই শক্তিশালী, যার অন্যতম সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে গো-হত্যা নিবারণ আন্দোলন। ঐ অঞ্চল বৈষয়িক দিক থেকে আরো সমৃদ্ধ এবং সামাজিক অর্থে অগ্রদর্শী হলে সংখ্যালঘুদের প্রতি সম্ভবত আরো উদার হতে পারতো।

পশ্চাৎপদ নির্বাচকমণ্ডলী

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোট দেবার ক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক সংগঠন সব সময় আধুনিকীকরণের অনুকূলে নয়। যেখানে নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশ নিরক্ষর ও পশ্চাৎপদ, সেখানে আধুনিকীকরণের দিকে অগ্রগতি রুদ্ধ হবার আশংকা থাকে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

ভোটদাতাদের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ যখন নিরক্ষর এবং সমান অনুপাতের লোক গ্রামবাসী, সে অবস্থায় ভাষাভিত্তিক রাজ্যের প্রতি তাদের আনুগত্য দূরকল্পনার সমগ্র রাষ্ট্র ভারতের প্রতি আনুগত্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আবার, নানা রাজ্যের মধ্যে রেষারেষির মতোই রাজ্যের ভিতরকার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে রেষারেষি বা সংঘর্ষ ক্রমশ দেখা যাচ্ছে।

এমনতর অবস্থায় আঞ্চলিক উন্নয়ন এভাবে ত্বরান্বিত করতে হবে যাতে সারা দেশে একটা সাধারণ মান অর্জন করা যায়—অর্থাৎ দশ বছর বা ঐরকম সময়ের ভেতর যাতে সব অঞ্চলগুলি উন্নয়নের একটা পূর্বনির্ধারিত স্তরে পৌঁছাতে পারে। তেমনি, শিল্প উৎপাদনের বড়ো প্রকল্প কোথায় অবস্থিত হবে তা নিয়ে বিরোধ দেখা দিলে একটা যুক্তিসম্মত নীতি অনুযায়ী তার মীমাংসা করলে ভালো হয়। দুই বা বেশী রাজ্যের মধ্যে কোনও বিবাদ সালিশের মাধ্যমে দূর করা যেতে পারে।

শুধু বিরোধী দলগুলি নয়, শাসনক্ষমতায় আসীন রাজনৈতিক দলও বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী। সরকার অতীতে কৃষি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং দেশরক্ষার ব্যাপারে অবহেলা করেছে এবং ব্রিটেনের কাছ থেকে পাওয়া আমলাতন্ত্রকে উন্নয়নশীল গণতন্ত্রের উপযোগী করে তুলতে পারে নি।

গোষ্ঠী-স্বার্থের সংঘাত

উদ্বেগের কারণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় কার্যকর হতে পারে এমন যে-কোনো উপায়ে নিজের নিজের অভীষ্ট অর্জনের চেষ্টা করছে। এখন লোকের মনে এরকম একটা ধারণা জন্মেছে যে, যখন অভিযোগ সুশৃংখলভাবে উপস্থাপিত করলে কিছু হয় না, সুতরাং বিক্ষোভ বা আন্দোলন কার্যসিদ্ধির একমাত্র পথ।

আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে জাতীয় আয় ও ধনসম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা সামাজিক স্থিতিরক্ষার একটি প্রাথমিক শর্ত। শুধু অতীতের অসাম্য সংশোধন নয়, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বর্তমানে যে বৈষম্য আছে তা যেন বেড়ে না যায় কিংবা নতুন কোনো অসমতা দেখা না দেয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। আক্ষেপের বিষয়, ১৯৫৫-৫৬ সালে জনসংখ্যার শতকরা ৭২ ভাগের গড় মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ২৫৫ টাকার কম; মোট ব্যক্তিগত আয়ে তাদের অংশ ছিল শতকরা ৪৯ ভাগ। সুতরাং জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ২৮ ভাগ যাদের মাথাপিছু উপার্জন জাতীয় গড় আয়ের চাইতে বেশী—মোট ব্যক্তিগত আয়ের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী পেয়েছে। আবার, মাসিক মাথাপিছু আয় অনুসারে ভাগ করলে জনসংখ্যার উপরের শতকরা ১০ ভাগ যেখানে ব্যক্তিগত আয়ের শতকরা ৩৯ ভাগ আত্মসাৎ করেছে, উপরের শতকরা ৫ ভাগ ব্যক্তিগত আয়ের শতকরা ২৩ ভাগ এবং সবচেয়ে ঊর্ধ্বের শতকরা ১ ভাগ আয়ের ১১ ভাগ পেয়েছে, জনসংখ্যার নীচের শতকরা ২৫ ভাগ সেখানে ব্যক্তিগত আয়ের শতকরা ১০ ভাগেরও কম উপার্জন করেছে। কাজে কাজেই, দেখা যাচ্ছে যে, আর্থিক ব্যবস্থার চূড়ায় অধিষ্ঠিত অল্পসংখ্যক ব্যক্তি আমাদের জাতীয় আয়ের একটা মোটা অংশ আত্মসাৎ করে।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জাতির সকল শ্রেণী, প্রত্যেক ব্যক্তি ও সুগঠিত গোষ্ঠীর সকল রকমের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে ব্যক্ত করার অধিকার আছে। এক দিকে, সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে, উপাদানরাশি ও সম্পদের একটা মোটা ভাগ জাতির দুর্বলতর অংশের অবস্থার উন্নতিসাধনে নিয়োগ করা জরুরী। আবার, বৈষয়িক উদ্যোগের প্রয়োজনে নির্বাচিত অগ্রাধিকারের ক্রম অনুযায়ী উপকরণসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। সামাজিক অগ্রগতির অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়ার যে তিনটি দিক অনেক সময় পরস্পর বিরোধী হয়ে দেখা দেয়, সেগুলির যথাযথ সমন্বয়সাধন ও সুসমঞ্জস বিকাশে সাহায্য করা হচ্ছে সমাজসেবী, রাজনৈতিক কর্মী তথা প্রত্যেক নাগরিকের প্রাথমিক কর্তব্য।
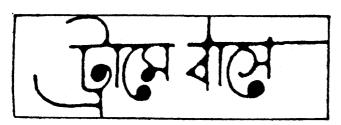
শান্তিকুমার ঘোষ

সংবাদে বলা হইয়াছে, স্বতন্ত্র পার্টি রাজা-মহারাজা, ধনিক এবং বণিকের সমর্থন লাভ করিয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"রাজা-মহারাজার খোঁজ-খবর আমরা বড়-একটা রাখিনে, তবে

আমরা শুধু একজন রাজার খবরই জানি, তিনি হলেন, রাজা অব গোপাল আচারি (হিটলারের প্রচার-সচিব গোয়েবলস-এর সৌজন্যে)!

ইলেকশনের প্রাক্কালে ছানার পুনরাবির্ভাব হইয়াছে, দুধের বরাদ্দ হ্রাস বন্ধ হইয়াছে, রেশনে চাল-গমের বরাদ্দ বাড়িয়াছে, খোলা বাজারে চাল পাওয়া যাইতেছে। গণিতের ছকে ফেলিয়া অনেকেই ইহার হিসাব মিলাইতে পারিতেছেন না। আমাদের শ্যামলাল আমাদের বুঝাইবার জন্য শুভঙ্করের আর্যা রকমফের করিয়া শুনাইল—শনের বাগেতে ইলেক মাত্র দিলে, ছানা দুধ গম চাল নিমেষেতে মিলে!!"

বুধবার হইতে ৯টি রাজ্যে ভোটদান শুরু হইয়াছে। "নির্বাচন কর্তৃপক্ষ ৯টি রাজ্যের জন্য খনার বচন গ্রাহ্য করেছেন অর্থাৎ মংগলে ঊষা বুধে পা। কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য, নিষ্ফলা রবিবারটাই তার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কয়েমবেটোর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, কোন এক স্থান হইতে বাড়ি ফিরিবার সময় দুইজন রিটার্নিং অফিসারকে নাকি ভালুকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাঁহারা কোনপ্রকারে গাছে চড়িয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। "এই ভালুক কি নির্বাচনী সভার হাংগামাকারীদের ভাড়াটে"—প্রশ্ন জনৈক সহযাত্রীর।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন, নির্বাচনের নামে হাঙ্গামা বিপজ্জনক। খুড়ো বলিলেন "আমরা জানি এবং তাই বলতে পারি আপদ আছে, জানি আঘাত আছে এবং নাকের বদলে ভোট পেলাম বলে তাকডুমাডুমডুমও করতে পারি!!"

জনৈক মনোবিজ্ঞানী নাকি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ক্যাসিয়াস ক্লে টেরেলকে সম্মোহিত করিয়া মুষ্টিযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছেন। —"ভোটের লড়াইতে ক্লের কৌশলটা সুষ্ঠু-ভাবে প্রয়োগ করলে হয়ত ভারতের ইতিহাস হত অন্যরূপ"—সহযাত্রী নাটকীয় ভংগীতে তাঁর বক্তব্য শেষ করিলেন।

লণ্ডনের হাইড পার্কে নাকি কুমারী মেয়েরা বক্তৃতা দিতেছেন। বক্তব্যঃ পাত্র চাই। শ্যামলাল বলিল—"বক্তৃতায় বর

মিলবে কিনা বলা শক্ত। তবে আমাদের মনে হয়, কোন একটা ইলেকশনের প্রাক্কালে ভোটের প্রতিশ্রুতিতে বরের প্রতিশ্রুতি পাওয়া হয়ত অসম্ভব নয়!!"

দেওঘরের একটি ফুলবাগানে তিন শ্রেণীর গোলাপের তিনটি নামকরণ করা হইয়াছে: রাজেন্দ্র প্রসাদ, রাধাকৃষ্ণন, জাকির হোসেন। —"শেক্সপীয়রের মতে অবশ্য নামে কিছু আসে যায় না কিন্তু আমাদের মতে কলিতে নামৈব কেবলম"—মন্তব্য করেন সহযাত্রী।

চীনের সংবাদে জানা গেল, রেড-গারডরা নাকি চু-তে গৃহিণীর মাথায় গাধার টুপি পরাইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাইয়া আনিতেছে। —"এবং তাতে রাস্তার দু পাশের অগণিত গর্দভরা নিশ্চয়ই পরম আনন্দ লাভ করেছে!!"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

রবিবার নির্বাচনের পূর্বে শুক্রবার হইতে নির্বাচনী সভা, শোভাযাত্রা এবং মাইক ব্যবহার বন্ধ করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"ওস্তাদের মার হিসেবে একটা শেষরাতের

স্লিপ্ট ছাড়ব বলে (যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যের বিনিময়ে) ভেবে রেখেছিলাম কিন্তু তা আর হলো না। যাঁরা নির্বাচন বৈতরণী পার হতে পারবেন না, তাঁরা পরবর্তী নির্বাচন সতিকারের বৈতরণী পার হয়ে যাবেন এবং সংগে সংগে এ বান্দাও, সুতরাং অদ্যই 'ভোট ফর' নাটকের শেষ রজনী।

মস্কোতে "রামায়ণ"-এর নাট্যরূপ সম্প্রতি জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। —"চীনে হয়ত তাই "মহাভারত"-এর কুরুক্ষেত্র রূপের মহড়া চলছে"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

সংবাদে প্রকাশ, লণ্ডন-মস্কো হটলাইন সংস্থাপিত হইয়াছে। —"এখন অনবরত "এনগেজড্" বা নো রিপ্লাই" না হলেই হয়।"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

নিমতলায় একটি বৈদ্যুতিক চুল্লী সংস্থাপিত হইতেছে। —"তাহলে এখন থেকে আর 'মৃতের' নিকট থেকে নিমতলার ঘাটও চিনি, কাশীমিত্তিরের ঘাটও চিনি শুনতে হবেনা"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সাম্প্রতিক সফরের অধিনায়ক গারফিল্ড সোবার্স সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে নাকি বলিয়াছেন যে বিবাহ করিলেও তিনি খেলিবেন। আমাদের জনৈক ক্রিকেট রসিক সহযাত্রী বলিলেন—"এই জন্যেই তো সোবার্সকে আমরা অল রাউন্ডার বলি।"

সাহিত্য সংবাদ

আকাদেমি পুরস্কার

১৯৬৬ সালে প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলিতে রচিত শ্রেষ্ঠ মনোনীত রচনার জন্য আকাদেমি পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে গত সপ্তাহে। বাংলার 'নিশিকুটুম্ব' উপন্যাসের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন প্রখ্যাত লেখক শ্রীমনোজ বসু।

শ্রীমনোজ বসুর সাহিত্যচর্চা দীর্ঘকালের। বিষয় বৈচিত্র্য তাঁর রচনার বিশেষ গুণ। প্রথম জীবনে তিনি কিছু রোমাণ্টিক সুরেলা কবিতা লিখেছিলেন, সেই সঙ্গে কয়েকটি নিখুঁত তীক্ষ্ম ছোট গল্প লিখে তিনি বহু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বাংলার অগ্নি-বিপ্লব যুগ ও সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে লেখা তাঁর করুণ-কোমল গল্প ও উপন্যাসগুলির আবেগ দীর্ঘকাল মর্মস্পর্শী হয়ে আছে। বাংলার দুর্ধর্ষ খুদে জমিদারদের হিংসা-হিংসি'র কাহিনী কিংবা সুন্দরবন, বাদা অঞ্চলের মানুষের একরোখা জীবনের ছবি ফোটাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা 'মানুষ গড়ার কারিগর' বাংলা ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য বই। তাঁর কয়েকটি নাটকও জনপ্রিয় হয়েছে।

পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'নিশিকুটুম্ব' ধারাবাহিক ভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। একটি চোরের বিচিত্র জীবন অবলম্বন করে এর কাহিনী গড়ে উঠেছে।

এ বছর ইংরেজী, গুজরাতী, কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী, তেলেগু ও উর্দু ভাষায় কোনো লেখককে পুরস্কার দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া, অন্যান্য ভাষার পুরস্কৃত গ্রন্থ বা লেখকদের সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান, বলাই বাহুল্য, প্রায় কিছুই নেই। অনেক উল্লেখযোগ্য পুরস্কারের সময়, নির্বাচন কমিটি পুরস্কৃত লেখক ও গ্রন্থ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও প্রকাশ করেন, কিন্তু আমাদের আকাদেমি পুরস্কার ঘোষণার সময়ে, সে-রকম কিছু পাওয়া যায় না। অতএব, আমরা এক প্রদেশের লোক, অপর প্রদেশের এক বছরের শ্রেষ্ঠ একটি মাত্র গ্রন্থ সম্পর্কেও অবহিত হবার সুযোগ পাই না। যাইহোক, পুরস্কৃত গ্রন্থগুলির তালিকা বিশ্লেষণ করে এই তথ্য জানা যাচ্ছে যে, এবার কবিতার বই পুরস্কার পেয়েছে তিনটি, অসমীয়া, ওড়িয়া ও সিন্ধি ভাষায়। এর মধ্যে দুজন কবিই জীবিতকালে পুরস্কার পাননি। অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার কবি যথাক্রমে অম্বিকাগিরি রায়-চৌধুরী ও গোদাবরীশ মহাপাত্র এখন বেঁচে নেই। সিন্ধি কবির নাম লেখরাজ আজিজ। এগারোটি পুরস্কারের মধ্যে বাংলা ছাড়া আর একটি মাত্র উপন্যাস পুরস্কার পেয়েছে হিন্দী ভাষায়, জৈনেন্দ্রকুমার রচিত

শ্রীমনোজ বসু

'মুক্তিবোধ'। কানাড়া ভাষায় পুরস্কৃত হয়েছে একটি গীতিনাট্য, পি টি নরসিংহ সহচর রচিত 'হংস দময়ন্তী মত্তু ইথার রূপকাগালু'। এ ছাড়া বাকি সবকটিই গবেষণাগ্রন্থ, প্রবন্ধ বা জীবনী। মৈথিলী ভাষায় যশোধর ঝা রচিত 'মিথিলা বৈভব'; মালয়ালম ভাষায় কে এম কুট্টিকৃষ্ণ মারার রচিত 'কাল জীবিতম তাঙ্গে'; মারাঠী ভাষায় টি এস সেজ্জলকার (ইনিও জীবিত নেই) রচিত 'শ্রীশিব ছত্রপতি'; ডঃ ভি রাঘবন রচিত 'ভোজ শৃঙ্গার প্রকাশ'; তামিল ভাষায় এম পি শিভজ্ঞানম রচিত 'ভল্লালার কাণ্ড ওরুমাই প্পাদু'।

কে জানে এই সব লেখকের মধ্যে কেউ কেউ অ্যালাঁ রব গ্রিয়ে, জন আপডাইক, গুন্টের গ্রাসের চেয়েও শক্তিশালী কিনা, কিন্তু নিরুপায় ভাবে আমরা এঁদের বাদ দিয়ে আরও দীর্ঘকাল গ্রিয়ে আপডাইক—গ্রাসদেরই পড়তে থাকবো।

কবিতা গ্রন্থাগার

যে-সব প্রয়োজনীয় কাজ আমাদের দেশের সরকার, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের করা উচিত এবং করছেন না, সেইসব কাজ যদি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বা সরকার নিরপেক্ষ ছোট ছোট গোষ্ঠীর উদ্যোগে হতে দেখা যায়, তবে তা নিশ্চয়ই অভিনন্দন যোগ্য। এইসব কাজের মধ্যে পড়ে, শহরের কয়েকটি স্থায়ী আর্ট গ্যালারি, ভ্রাম্যমাণ চিত্রপ্রদর্শনী, গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য আলাদা আলাদা বিষয়ের আলাদা লাইব্রেরী এবং মিউজিয়াম।

কলকাতা শহরে লাইব্রেরীর ব্যবস্থা মোটেই ভালো না। এখানে সে আলোচনার প্রয়োজন নেই, এখানে প্রাসঙ্গিক সংবাদ এই যে, কিছুকাল আগে কলকাতায় শুধু কবিতার বই নিয়ে একটি 'কবিতা গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শান্তি লাহিড়ী ও স্বদেশরঞ্জন দত্ত-র উদ্যোগে এবং লেখক সমবায় সমিতির সহযোগিতায়। গ্রন্থাগারটি রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে, (ব্লক নং ২, রুম নং ৬), প্রতি রবিবার সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে, কোনো চাঁদা নেই, যে-কেউ গিয়ে যে-কোনো কবিতার বই পড়ে আসতে পারেন। এখানে, বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় কবিতার বই, কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ, কবিদের জীবনী, পাণ্ডুলিপি, প্রখ্যাত কবিদের কণ্ঠস্বরের টেপ এবং চিঠিপত্র সংরক্ষণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এ রকম একটি গ্রন্থাগার বহু আগেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল। অনেক মূল্যবান দলিল নিশ্চিত এখন সংগ্রহ করা দুরূহ। শোনা যায়, তরুণ বয়েসে বিষ্ণু দে এবং তাঁর বন্ধুরা এই রকম একটি লাইব্রেরি স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু, সেটা টেঁকেনি। আমরা আশা করি, এই নতুন গ্রন্থাগারটি টিঁকে থাকবে এবং গবেষক ও পাঠকদের মূল্যবান সহায়ক হবে।

বহু কবি ও কাব্যানুরাগী তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বই ও পাণ্ডুলিপি এখানে দান করেছেন। এ ছাড়াও, প্রকাশক ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি এই উদ্যোগে সহ-যোগিতা করতে আহ্বান ও আবেদন জানিয়েছেন বাংলা দেশের বিশিষ্ট প্রবীণ ও নবীন কবিবৃন্দ। সেই আবেদনে স্বাক্ষর করেছেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, সুভাষ মুখো-পাধ্যায়, সুশীল রায়, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণ-কুমার সরকার, অলোক ভট্টাচার্য, কবিতা সিংহ প্রমুখ।

সনাতন পাঠক

পুস্তক পরিচয়

রামমোহন : জীবন ও কর্ম

রামমোহন—সমগ্র জীবন-সাধনা। মদনমোহন গরাই। প্রাপ্তিস্থান দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ। ৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

রাজা রামমোহন রায়কে আধুনিক ভারতের জন্মদাতা বললে অত্যুক্তি হয় না। সর্বপ্রকার কুসংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাস ও গোঁড়ামি এবং অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। রামমোহনের পৌরুষের সঠিক পরিমাপ করতে হলে যে পরিবেশে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেছেন, বড় হয়েছেন, কর্মজীবনে প্রবেশ করে প্রতিনিয়ত প্রতিকূল আবহাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, তা ভালভাবে জানা দরকার। লেখক শ্রীমদনমোহন গরাই রামমোহনের সঠিক মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন বই, প্রবন্ধ ও চিঠির সাহায্যে রাজার সমসাময়িক পরিবেশের যথার্থ ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। রামমোহনের সময়ে সামাজিক-পরিবেশ বুঝতে যাতে সুবিধা হয়, সেজন্য লেখক পলাশী যুদ্ধের পর থেকে বাঙালীর সমাজ-জীবনের ক্রমাবনতির চিত্র প্রথম অধ্যায়েই তুলে ধরেছেন।

রামমোহন পিতার তিন স্ত্রী। রামমোহন দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান। তিনি পিতৃবংশের প্রথা ও পিতার ইচ্ছানুসারে আরবী ও ফারসী ভাষা এবং মাতৃবংশের প্রথানুসারে সংস্কৃত ভাষা শেখেন। পরে তিনি ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করেন। রামমোহন ষোল বৎসর বয়সে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বই লিখলেও ধর্ম সম্পর্কিত বিতর্কে অবিচ্ছিন্নভাবে যোগ দেন অনেক পরে। ১৮০৩ সালে ঢাকা জেলায় দেওয়ান নিযুক্ত হন। ইংরেজ সরকারের অধীনে তাঁর চাকুরিও নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। ১৮০৯ সালে জনৈক ইংরেজ রাজ কর্মচারীর অপমানজনক ব্যবহারের বিরুদ্ধে তৎকালীন গভর্নর জেনারেলের নিকট প্রতিবাদ করায় রামমোহনকে রংপুরের দেওয়ানজীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। রামমোহনই প্রথম ভারতীয়, যিনি ইংরাজ রাজকর্মচারীদের ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান।

রামমোহন একদিকে বেদান্তসারের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করে হিন্দু ধর্মের মূল বক্তব্য প্রচার করেন, প্রিসেপ্টস অফ জেসাস লিখে এবং খৃষ্ট মতাবলম্বীদের সঙ্গে একসঙ্গে একেশ্বরবাদ প্রচারে ব্রতী হয়ে তিনি নিজের উদার ধর্মমতের পরিচয় দেন এবং অপর দিকে হিন্দু ও খৃষ্টানদের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে সমানভাবে মসিযুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন। সতীদাহ ও সহমরণ প্রথা বিলোপের জন্য গোঁড়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, রাজনৈতিক আন্দোলনের মুখপাত্র হিসাবে 'সংবাদ কৌমুদী' ও 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' প্রকাশ ভারতের সমাজ-বিপ্লব ও রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। ফিলিপিনে জাতীয়তাবাদের জনক জোসে রেজাল যে কারণে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দাবি করেছিলেন, রামমোহন ১৮২৩ সালে সেই একই কারণে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দাবি করেছিলেন। লেখক বর্তমান পুস্তকে রামমোহনের "প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ থেকে ভারতীয় সমাজে মেয়েদের দুঃসহ অবস্থা সম্পর্কে যে-সব লাইন উদ্ধৃত করেছেন, দেড় শো বছরের ব্যবধানে তা আজও মোটামুটি অপরিবর্তিত রয়েছে। রামমোহন তার সময়ের জনসাধারণকে প্রতারক, প্রতারিত, প্রতারক ও প্রতারিত এবং অনুগ্রহ-ধন্য, এই চার শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন। জনসাধারণ সম্পর্কে এই শ্রেণী-বিভাগ এখনও প্রযোজ্য। তবে বর্তমানে ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে রাজনৈতিক মতবাদও যুক্ত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদের সংগে আন্তর্জাতিকতাবাদের যে কোন বিরোধ নেই, রামমোহনই তার উজ্জ্বল নিদর্শন। বিভিন্ন ঘটনার মারফত বহুবার রামমোহনের এই দৃষ্টি-

জন্মের তারিখ পাওয়া গিয়েছে। লেখক রামমোহনের জন্ম তারিখ ও তিব্বত-গমন সম্পর্কে বিতর্কের আলোচনা করেছেন। রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দান এবং সারা জীবন তিনি প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে কীভাবে সংগ্রাম করেছেন, তার সঠিক চিত্র তুলে ধরে লেখক আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

(৪২৭।৬৬)

উপন্যাস

গ্রীষ্ম বসন্ত। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—১২। দাম : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আলোচ্য পুস্তকের কাহিনী বর্তমান দিনের দারিদ্র্য, হতাশা এবং মূল্যবোধের কাহিনী। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন, মুখ্য পাত্রপাত্রীদের সুস্থ এবং বলিষ্ঠ এক জীবনবোধ। তারা চরম সংকটের মধ্যে পড়েও হার স্বীকার করেনি।

ভাইয়ের মৃত্যুর পর তীর্থঙ্কর বিধবা মা ও দুটি ছোট বোন নিয়ে চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নিষ্ফল চাকরির চেষ্টা করে। অবশেষে এক বন্ধুর কিছু টাকা মা বলে নিয়ে সে উদ্দেশ্যহীন পাড়ি জমায় দিল্লির পথে। গাড়িতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ এবং তার মাধ্যমে এক উচ্চবিত্ত কর্মচারীর বাড়িতে ভৃত্যের কাজ। কর্মচারী মদ্যপ, দুশ্চরিত্র। তার নর্মসহচরী—রত্নাবলী—দেখা গেল তীর্থকে চেনে। নিজেদের মধ্যে ওরা পরস্পরের পরিচয় ব্যক্ত করে : রত্নাও তার ভাইদের মানুষ করবার জন্যে সাহেবের কাছে "চাকরি" করছে। কিছুদিন বাদে তীর্থ চাকরি পায়; বন্ধুর টাকা ফেরত পাঠিয়ে দেয়; মাকেও টাকা পাঠায়। ইতিমধ্যে ওরা দুজনে—তীর্থ ও রত্না—পরস্পরকে ভালোবেসেছে। ওদের কলকাতা ফিরে আসতে হয়। বাড়ি ফিরে তীর্থ দেখে মা ঝিয়ের কাজ করছে, ছোট বোনটি মারা গেছে, বড়টি গেছে পালিয়ে। রত্নাকে ও স্ত্রী বলে পরিচয় দেয়, গ্রহণও করে। ওদিকে জানতে পায় ওর যে-বোন পালিয়ে গিয়েছিল বলে খবর রটেছিল সে নিজের মর্যাদায় থেকে অর্থোপার্জন করছে—ইজ্জত খুইয়ে নয়।

ওরা তাই কেউ হারেনি—সাময়িকভাবে প্রচলিত নীতিবোধের সামান্য বিরুদ্ধাচরণ করেছে মাত্র।

কাহিনীর পরিকল্পনা ও জীবনদর্শন বলিষ্ঠ। কিন্তু অতি সরলীকরণে রস দানা বাঁধতে পারেনি। তাই, এ-কাহিনী মনের উপরে তেমন প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে না, যদিও তা করা উচিত ছিল।

(৪৫৮।৬৬)

প্রাপ্তি স্বীকার

Sri Sri Hansdev Avadhut, by Haridas Chatterjee/Swami Sri Niranjandev: Kailash Ashram, Jasidih. Price 5.00.

Fallen Asleep While Young, by F. E. Sillanppa/Rupa & Co.: 15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12. Price 6.00.

Mak Heritage, by F. E. Sillanpaa: Rupa & Co.: 15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12. Price 6.00.

বাংলা ও বাঙালী। কমল মজুমদার। ৪৪/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ০০·২৫।

অরণ্য কেতকী। লেখক ম্যাহ্যা। মালন প্রকাশনী : ১২, বিডন রোড, কলিকাতা-৩২। মূল্য ২·০০।

বৈরাগমী বসুন্ধরা। শ্রীসুধীরকুমার দত্ত। চিত্তরঞ্জন ভৌমিক : কল্যাণী রোড, বারাসত, ২৪ পরগনা। মূল্য ১·০০।

মনজাগানী না পারলা। শ্রীসুধীরকুমার দত্ত। গীতিকা শিল্পী গোষ্ঠী : বারাসত ২৪ পরগনা। মূল্য ১·০০।

জন্মার্থ। শ্রীসুধীরকুমার দত্ত। চিত্তরঞ্জন ভৌমিক : কল্যাণী রোড, বারাসত, ২৪ পরগনা। মূল্য ১·০০।

কবি নবীনচন্দ্র। নিখিল মুখোপাধ্যায়। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ : ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪·০০।

ভ্রম সংশোধন—দেশ পত্রিকার ৩৪ বর্ষ ১৪ সংখ্যার প্রচ্ছদপটের শিল্পী শ্রীমতী কাবেরী মুখোপাধ্যায়। নামটি ভ্রমক্রমে প্রকাশিত হয়নি।

খেলার মাঠে

হকি লীগের খেলা আরম্ভ হবার পর কলকাতা ময়দানে আবার কিছুটা প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। কিছুটা বলছি এই কারণে যে, হকিতে ফুটবলের মত প্রাণের সাড়া মেলে না। ফুটবল মরসুম শেষ হবার পর কলকাতা ময়দান এতদিন প্রায় ঝিমিয়ে ছিল। ফুটবলের পর অবশ্য ক্রিকেট খেলার আসর বসেছে। কিন্তু ক্রিকেটের সাপ্তাহিক আসরে ক্রীড়ারসিকদের আগ্রহ কোথায়। টেস্ট ক্রিকেট দেখার জন্যই ক্রীড়ারসিক এবং বে-রসিকদের পাগলামি। ক্লাব ক্রিকেটে কারো আগ্রহ নেই। সেদিক দিয়ে হকি জনপ্রিয়। তবু কলকাতার হকি ও ফুটবল খেলার জনপ্রিয়তার মধ্যে প্রায় আকাশপাতাল পার্থক্য। ফুটবলের দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতে কলকাতার স্থান সবার উপরে। কিন্তু হকিতে অনেক নীচে। অথচ এখানে প্রথম ডিভিসন হকি লীগেই ২০টি দল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ডিভিসনেও দলের সংখ্যা কম নয়। নক-আউট প্রতিযোগিতারও নানা আয়োজন। খেলোয়াড়দের যোগ্যতার প্রশ্নেও কলকাতার খেলোয়াড়রা কোন রাজ্যের পেছনে নয় যদিও কলকাতার এই সব নামী খেলোয়াড়রা এখানকার মরসুমী ফুল। ভারতের অন্য কানন থেকে অনেকেই আহৃত। কিন্তু ফুটবলেও তো এখানে অন্য রাজ্যের নাম করা খেলোয়াড়ের অভাব নেই। তবু ফুটবলকে নিয়ে যেখানে এত হইচই সেখানে হকি খেলায় ক্রীড়ামোদীদের আশানুরূপ সাড়া মেলে না কেন?

আমার ধারণা, স্বল্পস্থায়ী হকি মরসুম এবং শুধু বড় বড় শহর ছাড়া অন্যান্য জায়গায় হকি খেলায় আগ্রহের অভাব এর অন্যতম কারণ। কলকাতার হকি মরসুম ফুটবল ও ক্রিকেট মরসুমের মধ্যে পিষ্ট। পরমায়ু মাস আড়াই। তারপর হকি স্টিককে শিকেয় তুলে রাখা হয়। কিন্তু বাংলা দেশে ফুটবল চলে প্রায় সারা বছর ধরে। তাই হকি খেলাতেও বাঙালী যুবকের স্বাভাবিক বিমুখতা। অথচ হকি ভারতের গৌরবের খেলা। এই একটিমাত্র খেলায় ভারত আজও বিশ্বের অজেয় যোদ্ধা।

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি এবং শিল্পশৈলীর দিক দিয়েও হকি চমৎকার এবং আকর্ষণীয় খেলা। নিপুণ খেলোয়াড়ের স্টিক চালনার ছন্দ দর্শক চোখের তৃপ্তির খোরাক। শিল্পী-কণ্ঠে সুরের মায়াজাল সৃষ্ট হবার মত সুদক্ষ শিল্পী খেলোয়াড় স্টিক চালনার ছলাকলায় মোহময় মায়াজাল বুনে চলেন। তাই একসময় ভারতীয় হকি ছিল বিশ্বের বিস্ময়। কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। অনেক দেশই আজ প্রায় ভারতের সমকক্ষ।

মান সম্বন্ধে আমি তর্ক তুলতে চাই না। শুধু এইটুকু বলতে চাই, আন্তরিক প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় এবং সাধনায় অন্যান্য দেশ হকি খেলায় অনেক পটু হয়ে উঠেছে। ভারতও অবশ্যই ঘুমিয়ে নেই। কিন্তু মানের পার্থক্য আগে যা ছিল এখন তা নেই। বিশ্ব হকির দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের যে অবস্থা, ভারতীয় হকির বিচারে বাংলা দেশেরও সেই অবস্থা। হকিতে বাংলা অনেক দিন থেকেই পিছু হটতে আরম্ভ করেছে।

অবশ্যই এর কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। যদি কারণ অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা না করা যায়, হকির মান আরও নেমে যেতে বাধ্য। এবং ভারতের বিশ্বজয়ীর খেতাব বজায় রাখাও হবে দুঃসাধ্য।

*

হকির কথায় অ্যাথলেটিকসের কথা এসে পড়ে। আমাদের দেশে শীতকালই অ্যাথলেটিকস চর্চার উপযুক্ত সময়। শীত মরসুম শেষ হয়ে গেল। একটি বছরের হিসাবনিকাশও আমাদের হাতে এসে পৌঁচেছে। গত মরসুমে আমাদের অ্যাথলীটরা কোন কোন বিষয়ে অবশ্য রেকর্ড

২৫ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট ৮ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা এই সর্বক্ষুদ্র জলযান গ্রেট ব্রিটেনের নব আবিষ্কার। এই 'উড়ন্ত নৌকা' ঘন্টায় ৩০ মাইল বেগে জলের উপর দিয়ে উড়ে যেতে পারে। জলযানের আবিষ্কারক শ্রীপিটার নউস সস্ত্রীক মিস রেনি লেকেটের সঙ্গে যানের গতিবেগ পরীক্ষা করছেন

করেছেন। কিন্তু অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে আমাদের অ্যাথলেটিকস মানের আশানুরূপ উন্নতি হয়েছে কি?

ভারতের অ্যাথলেটিক মান আজ কোথায়—এ সম্পর্কে সম্প্রতি রাশিয়ান বিশেষজ্ঞ কোলাংসফ কয়েকটি নিষ্ঠুর মতামত ব্যক্ত করেছেন, যার উত্তর দিতে ভারত সরকার ও অ্যাথলেটিকসের কর্মকর্তারা অবশ্যই লজ্জা পাবেন। কোলাংসফ ইউরোপের প্রখ্যাত ক্রীড়া সাপ্তাহিক "অ্যাথলেটিকস উইকলি"র নিবন্ধে ভারতীয় অ্যাথলেটিকসের মানকে গত দু'বছরের সমীক্ষায় ৩২তম স্থান থেকে ৩৮ তম স্থানে নেমে যেতে দেখে হতাশ হয়েছেন। অন্যান্য ছোট দেশগুলির তুলনায় এই বিশাল উপ-মহাদেশের নেতি-বাচক ফলাফল সত্যিই শঙ্কাজনক।

উজ্জ্বলতম শেষ উদাহরণ হিসাবে গত এশীয় ক্রীড়ার ফলাফল সম্বন্ধে সকলেই অবহিত। যোগদানকারী অন্যান্য শিশু দেশগুলির ফলাফলের উৎকর্ষ ভারতীয় ক্রীড়ামানকে আরও নিষ্প্রভ করে তুলেছে। বহু কারণের অন্যতম হিসাবে ভারতীয় অ্যাথলীটদের উন্নতির গতি শম্বুক হওয়ার জন্যেই এইরূপ শোচনীয় পরিণতি।

কিন্তু দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে বিচার করলে দেখতে পাই, ভারতীয় অ্যাথলীটরা পৃথিবীর অন্য দেশের চেয়ে কোন মতে হীনবল নয়। তাঁরা সবল ও সুপটু স্বাস্থ্যের অধিকারী। তা হলে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গন হতে পিছিয়ে আসবার কারণ কি? এ সম্বন্ধে ভারতীয় অ্যাথলীট কর্মকর্তাদের পক্ষে কারণ অনুসন্ধান একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। সমস্ত দোষ কর্মকর্তাদের ও অ্যাথলীটদের উপর ন্যস্ত করলেও এমন কতকগুলি দোষ থেকে যায় যার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কর্মকর্তাদের দায়ী করা চলে না।

অন্যতম বৃহত্তর কারণ যুগোপযোগী সাজ-সরঞ্জামের অভাব। এই অভাব বৈদেশিক মুদ্রার অপ্রতুলতার সাথে তালে তালে এগিয়ে চলেছে। পোল ভল্টকে কেন্দ্র করে আলোচনা করলে দেখি যে, ফাইবার পোলের জগতে আমরা সেই সনাতন বাঁশের পোলের উপর নির্ভর করে পড়ে আছি। যা সত্যই হাস্যকর উদাহরণস্বরূপ ভারতে ফাইবার পোলের সংখ্যা অতি সহজেই গুনে বলে দেওয়া যায়।

বর্শা নিক্ষেপের বর্শার অবস্থাও আজ একই পর্যায়ে। অথচ পোল ভল্টে আন্তর্জাতিক মান অর্জনের জন্য ফাইবার পোল এবং বর্শা ছোঁড়ার জন্য অ্যালুমিনিয়ামের বর্শা অপরিহার্য। এ সম্পর্কে লেখালেখি করে বহু কাগজ-কালি খরচ হয়েছে। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি।

গত ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতীয় অ্যাথলেটিক ফেডারেশন এক সুদীর্ঘ পত্রে ভারত সরকারকে ফাইবার গ্লাস পোল, অ্যালুমিনিয়ামের বর্শা, হ্যামারের তার ও সময়রক্ষণ যন্ত্র আমদানির আবেদন জানিয়েও আজ পর্যন্ত সদুত্তর পান নি।

খেলাধুলার মানকে বিশ্ব স্তরে পৌঁছে নিতে হলে খেলাধুলার আনুষঙ্গিক সরঞ্জামগুলির কথা চিন্তা না করে পারা যায় না। কোন মতেই এগিয়েও যাওয়া যায় না। দুষ্প্রাপ্য সরঞ্জামের জন্য ভারত সরকারের আপাতত উদাসীনতা ভারতীয় অ্যাথলীটদের বিশেষভাবে নিরাশ করেছে।

যদি সাজ-সরঞ্জামই না থাকে তবে খেলা-ধুলার ব্যাপকতা সীমায়িত করে আর্থিক পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনা ও প্রতি-যোগিতা করাই উচিত। আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে পাল্লা টানার প্রশ্ন আসে না। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে অংশ গ্রহণও নিরর্থক।

*

সম্প্রতি বর্ধমানে যাদব স্মৃতি ভলিবল প্রতিযোগিতা বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে শেষ হয়ে গেল। এই উপলক্ষে সারা শহরে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। চার বছর আগে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল স্থানীয় ভলিবল অনুরাগী পরলোকগত যুবক মানব মিত্রের স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্যে। উত্তরোত্তর বাংলায় এই প্রতিযোগিতার জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিযোগিতায় দলভার হ্রাস করার জন্যে প্রাথমিক খেলাগুলি আঞ্চলিক প্রথায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ বছর মূল ফাইনালে কলকাতার বিজয়ী সংঘ ১৫—১১, ১২—১৫, ১৫—১৩, ৪—১৫, ১৫—৪ গেমে কলকাতার ছাত্র সমিতিকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে। গত তিনবারের বিজয়ী বড়বাজার যুবক সভার সেমি-ফাইন্যালে বিদায় প্রতিযোগিতার অপ্রত্যাশিত ফলাফল।

এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে, বাংলার মফস্বল শহরে ভলিবলের প্রসারে ক্রীড়ানু-রাগী মাত্রেই আনন্দিত হবেন। কেননা, বাংলা দেশের বৃহত্তর যুবক গোষ্ঠী রয়েছে কলকাতার বাইরে। বর্তমানে সমগ্রভাবে যুব স্বাস্থ্য এক শোচনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি। এর অন্যতম কারণ খেলা-ধুলার চর্চা সীমায়িত পরিসরে সীমাবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বহু দরিদ্র তরুণ প্রতিভা প্রাথমিক অবস্থায় সংগতিসম্পন্ন খেলায় পারদর্শিতা সত্ত্বেও আর্থিক প্রতিকূল অবস্থায় বিদায় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ভলিবল খেলা সেদিক থেকে বৈশিষ্ট্যময়। ভলিবল অল্প পয়সা এবং অল্প জায়গার খেলা।

শহরের নামকরা ও শক্তিশালী ভলিবল দলগুলি যে আস্তে আস্তে মফস্বলের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছে, এটাও আশার কথা। এতে প্রতিযোগিতার মর্যাদা এবং আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার জাঁকজমকই বড় কথা নয়। বেশী সংখ্যায় প্রতিযোগিতা পরিচালনা এবং গ্রাম ও মফস্বল শহরে খেলার জনপ্রিয়তা বাড়ানোই বড় কথা। এতে করে এক দিকে যুবকরা যেমন ব্যয়বহুল খেলার পরিবর্তে অল্প ব্যয়ের খেলার দিকে ঝুঁকে পড়বে, তেমন কিছু কিছু খেলোয়াড়ও বেরোবে, যারা হবে বাংলা ও ভারতের ভলিবল-ক্ষেত্রে আগামী দিনের আশা।

শুধু বড় শহরেই নয়, আজ মফস্বল শহরে এবং বহু গ্রামেও বড় মাঠের অভাব। কিন্তু বড় শহরই হোক, আর গ্রামেই হোক, ইচ্ছে থাকলে ভলিবল খেলার উপযোগী ছোট কয়েক খণ্ড মাঠ পেতে কারোই অসুবিধা হবার কথা নয়। উপকরণও সামান্য। একটি বল ও একটি নেট। সুতরাং আশা করব, বর্ধমানের মত অন্যান্য জেলা ও মহকুমা আঞ্চলিক প্রথায় ভলিবল প্রতি-যোগিতার আয়োজন করে ভলিবল খেলাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলবেন।

একলব্য
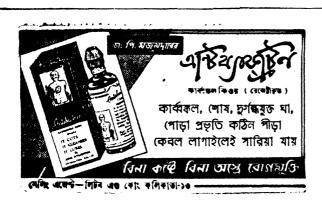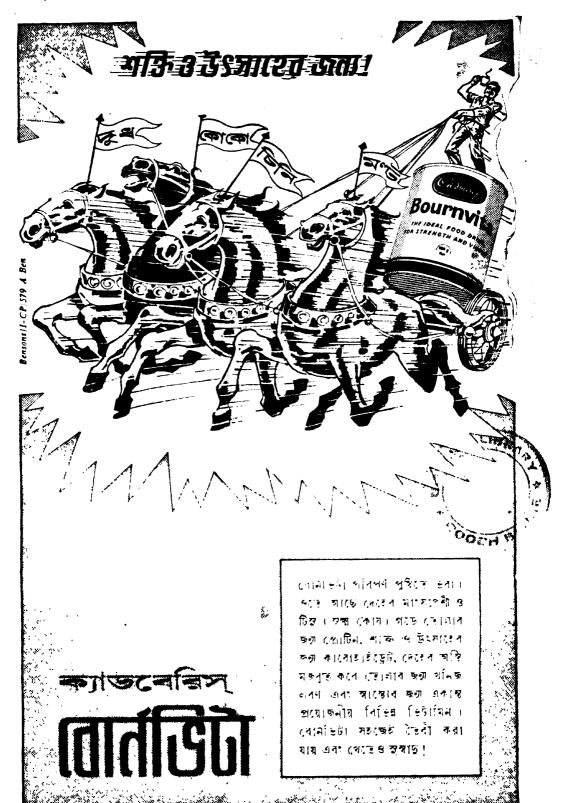
শক্তি ও উৎসাহের জন্য!
দুগ্ধ
কোকো
চিনি
মল্ট
Bournvit
THE IDEAL FOOD DR
FOR STRENGTH AND V
Bensons/I-CP/579 A Ben
বোর্নভিটা পরিপূর্ণ পুষ্টিতে ভরা। এতে আছে দেহের মাংসপেশী ও টিসু (সূক্ষ্ম কোষ) গড়ে তোলার জন্য প্রোটিন, শক্তি ও উৎসাহের জন্য কার্বোহাইড্রেট, দেহের অস্থি মজবুত করে তোলার জন্য খনিজ লবণ এবং স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ভিটামিন। বোর্নভিটা সহজেই তৈরী করা যায় এবং খেতেও সুস্বাদু!
ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা

ভেরা ক্যাসলাভস্কা

যদি প্রশ্ন করা যায়, মেয়েদের মধ্যে জিমন্যাস্টিকসে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কে, এক কথায় উত্তর—চেকোস্লোভাকিয়ার সুন্দরী কন্যা ভেরা ক্যাসলাভস্কা। চেকোস্লোভাকিয়ার জিমন্যাস্টিকসে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর ১৯৫৮ সালে মস্কোর বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপে ওর দ্বিতীয় স্থান। ১৯৫০-এ ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে বীম ব্যালান্সের স্বর্ণপদক। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকের টিম ইভেণ্ট রৌপ্যপদক পাবার পর ১৯৬২তে প্রাগে আয়োজিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ভেরার সর্বশ্রেষ্ঠ জিমন্যাস্টের সম্মান। ১৯৬৪-তে টোকিও অলিম্পিকে ভেরার বিজয়-বৈজয়ন্তী। কণ্ঠে তিনটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদক। গত বছর ডর্টমাণ্ডের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও পর্যাপ্ত প্রাধান্যের পরিচয়ে বিজয়িনীর পুরস্কার।

অথচ ভেরা ক্যাসলাভস্কার স্বপ্ন ছিল আইস স্কেটিং-এর কলা-কৌশলে কীর্তি সেদিন পায়ে প্রথম স্কেট পরে প্রাগের রিংক নামলেন সেদিন কয়েকবার আছাড় খেলেন। কিন্তু শিশু বয়সের পড়ার শিক্ষা ভেরা কাজে লাগিয়েছিলেন। সে শিক্ষা ছিল—'জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার। হাটিতে শিখে না কেহ না খেয়ে আছাড়।' সুতরাং স্বচ্ছ বরফের উপর চাকার স্কেট পরে চলতে গেলে আছাড় খাওয়া তো অনিবার্য।

ভেরা আরও শক্ত করে স্কেটসের বেল্ট পায়ে বাঁধলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করলেন ব্যালে নৃত্যের চর্চা। তার ফলে দেহে গতিময়তা এল—এল মনে-প্রাণে সুর ও ছন্দ বোধ। ১৪ বছর বয়সে জুনিয়র স্কেটারদের প্রতিযোগিতায় প্রথম অংশ গ্রহণের সময়ও দুবার ভেরার পদস্খলন। কিন্তু ওটা যে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের প্রাথমিক জড়তা সেটা বুঝতে কারোই বাকি রইল না। বরফের উপর ছন্দ, গতি ও চলার সৌন্দর্য দেখে বিশেষজ্ঞরা বললেন, ভেরার মধ্যে ভবিষ্যৎ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের ছায়া।

কিন্তু টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রেখে সহসা ভাগ্যোদয় এবং জীবনধারায় অর্থাৎ ক্রীড়াধারার পরিবর্তন। টেলিভিশনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অলিম্পিকের স্বর্ণ-পদক বিজয়িনী চেকোস্লোভাকিয়ার ইভা বোসাকোভা। তিনি টেলিভিশনে জিমন্যাস্টিকসের ছলা-কলা দেখাচ্ছিলেন আর দেশের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আহ্বান জানাচ্ছিলেন জিমন্যাস্টিকসের চর্চা করার জন্য। ইভার ডাকে সাড়া দিয়ে ভেরা চলে গেলেন ইভার জিমন্যাস্টিকস অঙ্গনে। অনেক মেয়েই সেখানে উপস্থিত। শিক্ষার্থীদের একটু আধটু ক্রিয়া প্রক্রিয়া দেখে ইভা মন্তব্য করলেন—'আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছে যে ভবিষ্যতে বিশ্ব বিজয়িনীর আখ্যা পাবে।'

দীর্ঘ ৮ ঘণ্টা ধরে যোগ্যতার যাচাই হল। ইভা ২০জন শিক্ষার্থীকে বেছে নিলেন, যার মধ্যে একজন ভেরা ক্যাসলাভস্কা। খেলা-ধূলার সাধনা শুরু হবার পর থেকে জীবনে এই প্রথম ক্যাসলাভস্কা পায়ের স্কেট খুলে বাক্সবন্দী করে রাখলেন। আরম্ভ হল ফ্রি-এক্সারসাইজ, বীম ব্যালান্স এবং প্যারালেল বার্সের অনুশীলন। শিক্ষাদাত্রী স্বয়ং ইভা বোসাকোভা। ফলে, অল্প সময়ে অভাবনীয় উন্নতি। বোসাকোভা জিমন্যাস্টিকস থেকে অবসর গ্রহণের সময় বললেন, দেশকে আমি আমার চেয়েও যোগ্য প্রতিনিধি দিয়ে গেলাম। আক্ষরিক অর্থেই সে কথা সত্য।

চেকোস্লোভাকিয়ার সুন্দরী কুমারী ভেরা ক্যাসলাভস্কা তাঁর দেশে অসাধারণভাবে জনপ্রিয়। সে জনপ্রিয়তা কিন্তু শুধু তাঁর দেহের সৌন্দর্যের জন্য নয়। জিমন্যাস্টিকসের সৌন্দর্যের জন্য। একবার ভেরা শুধু বলেছিলেন—পিকচার পোস্টকার্ড সংগ্রহ তাঁর এক হবি। ফলে, মাত্র তিন দিনের মধ্যে তাঁর প্রাগের ফ্ল্যাটের ঠিকানায় সাড়ে তিন হাজার পিকচার পোস্টকার্ড এসে পৌঁছেছিল, যে ফ্ল্যাট তাঁর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ১৭০টি মেডেল এবং অসংখ্য পুরস্কার ও প্রশংসাপত্রে সাজানো।

জিমন্যাস্টিকসের আরও শক্ত ফিগারের মধ্যে আরও সৌন্দর্য আনার জন্য ভেরার সাধনার শেষ নেই। ভেরা বলেন, '৪০ বছর আগে যেভাবে জিমন্যাস্টিকস করা হত সেই ছবি দেখে এখন সবাই হাসে, বলে কি আনাড়ীর মত ভঙ্গি। কিন্তু এতে হাসির কি আছে? আজ আমরা যা করছি কয়েক বছর পরে তাও তো সেকেলে হয়ে যাবে।' সম্ভবত এইজন্যেই ভেরার সাধনা। যাতে তাঁর ফিগার সহজে সেকেলে না হয় তার জন্য সদাজাগ্রত তৎপরতা।

তাই ২৪ বছরের সুন্দরী কন্যা এখনো কুমারী। বলেন—'বিয়ে করার সময় কোথায়? আর যদিও বিয়ে করি—মেক্সিকো অলিম্পিকের আগে নয়।'

আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে গুণী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন শ্রীঅশোককুমার সরকার...তাঁর পাশে (বাঁয়ে) পণ্ডিত রবিশঙ্কর

গুণী-সংবর্ধনা

"পদ্মভূষণ" উপাধিতে সম্মানিত শ্রীঅশোককুমার সরকার ও পণ্ডিত রবিশঙ্করকে আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার কর্মিবৃন্দ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। গত বৃহস্পতিবার রাত্রে আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রথমে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুধাংশুকুমার বসুর নাম প্রস্তাব করেন শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেন। তা সমর্থন করেন শ্রীপার্বতীনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রী বসুর প্রারম্ভিক ভাষণের পর শ্রীঅশোককুমার সরকার ও পণ্ডিত রবিশঙ্করকে মানপত্র দেওয়া হয়। মানপত্র দু'টি পাঠ করেন যথাক্রমে শ্রীসন্তোষকুমার [illegible]

[illegible] সম্মান [illegible] আনন্দবাজারের প্রতিষ্ঠা [illegible] আমি জানি, আমার প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের প্রীতি অপরিসীম, অকৃত্রিম। আজ আবার তা অনুভব করলাম।"

পণ্ডিত রবিশঙ্কর সম্পর্কে শ্রী সরকার বলেন, "কৃতী বাঙালীর সংখ্যা দিনের পর দিনই যেন কমে আসছে। সারা ভারত যাদের নিয়ে গর্ব করতে পারে, এমন বাঙালী আজ আর খুব বেশী দেখা যাচ্ছে না। এ-কালে যে দু-চারজন বাঙালীর জন্য আমরা গর্বিত, জগৎসভায় যাঁরা সম্মানের আসন পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীমান রবিশঙ্কর একজন। তাঁর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি আমি কামনা করি।"

শ্রী রবিশঙ্কর সংবর্ধনার উত্তরে বলেন, "আমি আর কি বলব।" সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর সেতারটি দেখিয়ে বলেন, "এটাই বাজাই।" তিনি বাজালেন দু' ঘণ্টার বেশী। সঙ্গে তবলা সঙ্গত করলেন শ্রীআল্লারাখা। শিল্পীর বাজনার মধ্য দিয়ে যেন তাঁর অন্তরের আবেগ ও

আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে সেতার বাজাচ্ছেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর—তাঁর পাশে শ্রীআল্লারাখা

দি গ্রামোফোন কোম্পানির শ্রীওয়ারেন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পণ্ডিত রবিশঙ্করের হাতে উপহারস্বরূপ রূপোর সেতার তুলে দিচ্ছেন। ফটো-দেশ

ধন্যবাদ ঝরে পড়েছিল। শ্রোতাদের মধ্যে সংগীত সমালোচক এবং কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন। তাঁরা এবং উপস্থিত সকলেই অভিভূত হলেন। গম্ভীর দর্শকের সংগে সেতার বাজিয়ে হাসিমুখে সকলকে নমস্কার করলেন শ্রী রবিশঙ্কর ও শ্রী আল্লারাখা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আনন্দবাজারের প্রেস ফটোগ্রাফার যে ছবি তুলেছিলেন, তার বড় প্রিণ্ট অনুষ্ঠানশেষে শিল্পীর হাতে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে তুলে দিলেন শ্রীসুধাংশুকুমার বসু। তারপর শ্রী সরকার, শ্রী রবিশঙ্কর এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন শ্রী বসু।

যে মঞ্চে বসে শ্রী রবিশঙ্কর বাজালেন, এবং যেখানে তাঁকে ও শ্রী সরকারকে সংবর্ধনা জানানো হল, তার পশ্চাতে টাঙানো হয়েছিল "পদ্মভূষণ"-পদকের বিরাট প্রতিচ্ছবি। সেটি তৈরি করেন শ্রীকানাইলাল বসু।

অনুষ্ঠানে যে বিশিষ্ট শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রী ভি জি যোগ, শ্রীপাহাড়ী সান্যাল, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীমতী ললিতা ঘোষ, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীআশিস খান, শ্রী এ টি কানন, শ্রীমতী মালবিকা কানন, শ্রীমতী দীপালি নাগ, শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকানাই দত্ত, শ্রীমতী জয়া বসু, শ্রীসুব্রত রায়চৌধুরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া শহরের বহু মান্যগণ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

গ্রামোফোন কোম্পানির অনুষ্ঠান

এইদিন সন্ধ্যায় এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে গ্রামোফোন কোম্পানি শ্রী রবিশঙ্করকে সংবর্ধনা জানান। অনুষ্ঠানে শিল্পীকে একটি ছোট রূপোর সেতার উপহার দেওয়া হয়। উপস্থিত অতিথিদের জন্য সংগীতের ব্যবস্থাও ছিল। লং-প্লেয়িং রেকর্ডে শ্রীরবিশঙ্করের সেতার ও শ্রীমেনুহিনের বেহালার [illegible] বাজিয়ে শোনানো হয়।

সুরেশ সংগীত প্রসঙ্গ

সুরেশ সংগীত সংসদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ-এর সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় সংসদ আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি, রবিবার তাঁকে সংবর্ধনা জানাবেন। এই সংবর্ধনা ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটে রাত ৮টায় অনুষ্ঠিত হবে।

রঙ্গজগৎ

রাত্রির পৃথিবী কি বিপজ্জনক?

বিভিন্ন দেশের নাইট ক্লাবের উপর তোলা কয়েকটি ছবির প্রদর্শনী কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রক নিষিদ্ধ করেছেন। যে নয়টি ছবির উপর সরকার খড়্গহস্ত তার অধিকাংশই কিন্তু এ-দেশে ইতিপূর্বে দেখানো হয়েছে। এবং ছবিগুলি সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চলেছে। নিষিদ্ধ চিত্রগুলি হল : আমেরিকা বাই নাইট, য়ুনিভার্স বাই নাইট, ওরিয়েন্ট বাই নাইট, উইমেন অব দি ওয়ার্ল্ড, প্যারিস শ্যাম্পেন, সুইট সুইট নাইটস, টোকিও বাই নাইট, কোপাকাবানা প্যালেস এবং ওয়ার্ল্ড বাই নাইট।

জানা গেছে, নৈতিক কারণেই প্রদর্শনীর ছাড়পত্র প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। সম্ভবত ছবিগুলি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যই চিহ্নিত ছিল। বিভিন্ন দেশের নাইট ক্লাবের দৃশ্য ও নাচ-গান কি প্রাপ্তবয়স্কের মনও দূষিত করতে পারে? সরকার হয়ত ভেবে দেখেননি যে, এই শ্রেণীর ছবির একটা প্রামাণিক মূল্যও আছে। কোন্ দেশের নাইট-ক্লাবের কী রীতি, এবং কী ধরনের নাচ সেখানে প্রচলিত এ-সম্বন্ধে দর্শকের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ ছবিগুলিতে আছে। কোন কোন দেশের ছবিতে লোক-নৃত্য ও সামাজিক উৎসবের পরিচয়ও মিলেছে। অতএব ছবিগুলি শুধুই নিম্ন-প্রবৃত্তি-উত্তেজক এমন মনে করার কারণ নেই। আর যদি বলা হয়, এই নৈশ নাচ-গান বিকৃত ও অসুস্থ রুচির পরিচায়ক তবুও তো ছবিগুলি দেখে আধুনিক নৈতিক অবক্ষয়ের পরিমাণটুকু বোঝা যায়। তার চেয়েও বড় কথা, প্রাপ্তবয়স্ক দর্শকের কাছে রাত্রির পৃথিবী এমন কী বিপজ্জনক বা সংক্রামক হতে পারে যে, ছবিগুলি নিষিদ্ধ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল? তা ছাড়া নিষেধের বেড়া তৈরির উৎসাহটাও খুব সুখের নয়। এই তৎপরতা আগেও ছিল। এখন যেন বেড়েছে। "ডাঃ ঝিভাগো" যে কারণে অস্ত্রোপচার থেকে রেহাই পায়নি।

নায়িকা সংবাদ

সাধারণ মেয়ের প্রেমের গল্প সিনেমায় আকছার মেলে। কিন্তু গল্পের নায়িকা যদি ফিল্ম স্টার হয়, অর্থাৎ অসাধারণ কোন মেয়ে তবে তো দর্শকের পোয়াবারো। "নায়িকা সংবাদ"-এর (বি কে প্রোডাকশন্স)

"ছোটা ভাই" হিন্দীচিত্রে নূতন

জন্য এই কারণে দর্শকের চঞ্চল হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য ফিল্ম স্টার হয়েও সে আচার-আচরণে, প্রেমের প্রকৃতিতে আর সব নায়িকারই মত।

তবে সুসংবাদ এই, "নায়িকা সংবাদ" একটি পরিচ্ছন্ন রোমান্টিক ছবি, যা দর্শককে তৃপ্তি দেবে। অগ্রদূতগোষ্ঠী কোন বাহুল্যের বালাই না রেখে সরলভাবে গল্পটি (প্রশান্ত দেব রচিত) বলেছেন। অবিশ্বাস্য হলেও একের পর এক ঘটনা বসে দেখতে ভাল লাগে। এমন কি সিনেমায় সেই অতিব্যবহৃত ব্যাপারটিও, নায়ক-নায়িকার স্বামী-স্ত্রী সেজে থাকা এবং সকলের তা মেনে নেওয়া। এক কথায়, নামকরা ফিল্ম স্টার উর্মিতার শখ করে ট্রেন থেকে নেমে পড়া ও পরে উঠতে না পেরে বৃষ্টির রাত্রিতে স্টেশনমাস্টার অলকের ঘরে আশ্রয় নেওয়ার ঘটনা থেকে শুরু করে ছবিতে যা কিছু ঘটেছে অনেকাংশে তা সাজানো হলেও পরিমিত ও সুচারু বিন্যাসের গুণে উপভোগ্য। উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠার মুহূর্তগুলি সুন্দর, রুচিসম্মত। চিত্রনাট্য সুরচিত। [illegible]

"অপরাজ মেঘ" ছবির গান রেকর্ডিং অনুষ্ঠানে আরতি মুখোপাধ্যায়, [illegible] দে ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ফটো-[illegible]

[illegible] আঢ্য প্রযোজিত-পরিচালিত "সেবা" চিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃপ্তি মিত্র

প্রয়াসটিও সফল। চিরাচরিত রীতি হিসাবে রয়েছে গানের ব্যবহার। যে-কারণে স্টেশন-মাস্টারও সুগায়ক (অবশ্য এর সাফাই সঙ্গে সঙ্গেই জানা গেছে)।

আসলে গল্পের গোলমাল অন্যত্র। ফিল্ম স্টারের প্রেম সাধারণ মেয়ের মন দেওয়া-নেওয়ার মত এত আটপৌরে হবে কেন? এই প্রেমের স্বাভাবিক জটিলতা ছবিতে উহ্য। কাহিনীর নায়িকা ঊর্মিতা বড় ফিল্ম স্টার না হলেও কোন ক্ষতি ছিল না। অন্য কোন শিক্ষিতা তরুণীও স্বচ্ছন্দে এই প্রেমোপাখ্যানের নায়িকা হতে পারত। অর্থাৎ নায়িকা ফিল্ম স্টার বলে প্রণয়ের কাহিনীতে সংঘাত কিংবা সমস্যার কোন বিশেষ সম্ভাব্য মাত্রা সংযোজিত হয় নি। এর জন্য আরও কিছুর প্রয়োজন ছিল। বিপরীত মেরুর তথা ফিল্ম স্টারের জীবন আর একটু বিশদ হলে দর্শক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া আরও বেশী পেতে পারতেন। এবং চিত্রাভিনেত্রীকে নিয়ে রচিত কাহিনীর বৈশিষ্ট্যও বেশী পরিমাণে ফুটে উঠত। স্টেশনমাস্টারের ঘরে আসার পর থেকেই

ঊর্মিতাকে সাধারণ মেয়ে মনে হয়েছে। এবং নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত তেমন রূপ নেয়নি। প্রাচুর্য ও যশের মোহত্যাগের মুহূর্তেও অভিনেত্রীর জীবনে যেমন বিশেষ দ্বন্দ্বের সূচনা নেই, তেমনি নেই তার প্রেমের প্রস্তুতি। অর্থাৎ প্রেমই সে চেয়েছিল কিনা, তার জীবনে ক্লান্তি অথবা নিঃসঙ্গতা কতটুকু ছিল এ-সম্পর্কে দর্শক কিছুই জানবার অবকাশ পায়নি। আর যদি পরশ-পাথরের স্পর্শে হঠাৎ রূপান্তরের মতই তার জীবনে প্রেম বা পরিবর্তন এসে থাকে তবুও তো পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অর্থাৎ ফিল্মস্টারের জীবনপরিবেশের সঙ্গে তার একটা স্বাভাবিক সংঘর্ষ দর্শক আশা করতে পারেন।

সুপরিচালনা ও সুঅভিনয় গল্পের ত্রুটি ঢেকে দিয়েছে। অর্থাৎ অবাস্তবতা মনকে খুব পীড়া দেয় না। উত্তমকুমার তাঁর অসামান্য অভিনয়-দক্ষতার কোন সুযোগ চিত্রনাট্যে পান নি। যেভাবে যতটুকু অভিনয় তিনি করেছেন তার মধ্য দিয়েই চরিত্রটি সপ্রাণ হয়ে উঠেছে। নায়িকার আসল পরিচয় জানার পরমুহূর্ত থেকেই উত্তমকুমারের অভিব্যক্তিতে বিষাদের ভাব অদ্ভুতভাবে ফুটে উঠেছে।

অঞ্জনা ভৌমিকের অভিনয় এ-ছবিতে আগের চেয়ে যেন আরও অনেক বেশী পরিণত। অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে অপরের জেরার সামনে তিনি যে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখিয়েছেন তা খুবই স্বাভাবিক মনে হয়েছে—অন্তত ফিল্ম স্টারের চরিত্রাঙ্কণ যেখানে তাঁর দায়িত্ব। প্রণয়, বিরহ ও মিলনের মুহূর্তগুলিতেও শিল্পী অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। মায়েদের পাতানো দাদা ও বৌদির চরিত্রে

পাহাড়ী সান্যাল ও [illegible] মনোজ্ঞ। পার্শ্বচরিত্রে [illegible] রূপ-সজ্জার জন্য রায়ের চরিত্রচিত্রণ অপূর্ব প্রশংসার যোগ্য।

গানের অবকাশ ছবিতে খুবই ছিল। তবু গানগুলি সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুন্দর সুরারোপের জন্য বারে বার শোনার মত। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও সংগীত পরিচালক স্বয়ং গানগুলি গেয়েছেন। পূর্ণদাস বাউলের একটি গান শুনতে বেশ লাগে। আবহসুর পরিবেশানুগ। ছবির ফটোগ্রাফি চমৎকার। শব্দগ্রহণ আরও ভাল হতে পারত।

বধূবরণ

ছবির নাম "বধূবরণ" (ত্রি এস প্রোডাকশন্স) দেখে অভিজ্ঞ দর্শক সহজেই অনুমান করে নিতে পারেন যে বরণ-পর্বটি

নির্মল মিত্র পরিচালনায় ফিল্মইজমের "প্রথম বসন্ত" ছবিতে পাহাড়ী সান্যাল

খুব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় নি। অর্থাৎ শুভ-পরিণতি বা শুভ বিবাহের কথা যখন আগেই জানানো হয়েছে তখন বুঝতে হবে যে প্রেম এবং প্রাক-বিবাহ ঘটনাই নিজেই গল্প। যথা সময়ে দর্শক জানতে পেরেছেন রোমান্টিক নায়িকা শকুন্তলা আসলে বিত্তবান নির্মলেন্দুর পালিতা কন্যা। তার প্রকৃত পরিচয় জানাবার জন্য দীর্ঘ ফ্ল্যাশব্যাক তথা গল্পের ভিতর আর এক গল্পের (স্টোরি উইদিন স্টোরি) অবতারণা। ওই কাহিনীতে আছে নির্মলেন্দু ও তার স্ত্রী জয়ন্তী। এরা দুজন ছাড়া আর দুই প্রধান চরিত্র হল অমিতাভ

ও নায়ক শুভেন্দুর পিতা আদিনাথ। শাশ্বতীকে পুত্রবধূ হিসাবে গ্রহণ করতে আদিনাথের প্রবল আপত্তির জন্যই বাগদান অনুষ্ঠানে নির্মলেন্দুকে অতীতের ঘটনা বলতে হয়েছে। তাতে বিশেষভাবে দুটি তথ্যই প্রকাশ পেয়েছে। এক, শাশ্বতী অমিতাভের কন্যা এবং তার জন্মের পরেই গর্ভধারিণী অর্থাৎ অমিতাভের প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গেছে। দুই, অমিতাভের প্রেয়সী জয়ন্তীকে নির্মলেন্দু এই শর্তেই বিয়ে করেছিল যে তাদের মধ্যে শুধু স্বামী-স্ত্রীর পরিচয় ছাড়া আর কোন সম্পর্ক থাকবে না।

এই অবাস্তব ও উদ্ভট ব্যাপারের জন্য নির্মলেন্দু কেন উদগ্রীব হয়েছিল, এবং অতীত উপাখ্যানে আদিনাথের কী ভূমিকা ছিল তা সবিস্তারে বর্ণনা করে লাভ নেই। সব কিছু বলতে গেলে গল্প তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে। তবে এইটুকু জানানো দরকার, বহু শাখা-প্রশাখা সমন্বিত এই মেলোড্রামাতে (শ্যামল গুপ্ত রচিত) নির্মলেন্দুর চরিত্র বাস্তব-বহির্ভূত মহত্ত্বে মণ্ডিত। অনেক চরিত্রেই সংগতি দুর্লক্ষ্য, জীবনের স্পর্শ অননুভূত। প্রণয়ীর মৃত্যুর পর প্রেয়সী বিয়ে করবার মন না খুঁজে পেতে পারে। কিন্তু ঘটনাচক্রে বিয়ে যদি হয়েই যায় তবে স্বামীকে শুধু শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে দাম্পত্যের মুখ্য দাবি দীর্ঘ বিশ বছর যাবত অস্বীকার করে যাওয়াটা কি খুব স্বাভাবিক? এ-ধরনের অনেক প্রশ্নই দর্শকের মনে জাগবে। তবু একটি আধুনিক রূপকথা হিসাবে এই অতিনাটকীয় কাহিনীটি দর্শককে কৌতূহলাবিষ্ট করতে সক্ষম। চিত্রনাট্যের সব চাইতে বেশী উপভোগ্য অংশ শাশ্বতী ও শুভেন্দুর রোমান্টিক উপকাহিনী। এবং সংলাপ, যা প্রাত্যহিককার জীবনে ব্যবহার্য না হলেও সুরচিত।

সুখের কথা, ছবির অতি বিস্তৃত নাটাংশ পরিচালক দিলীপ নাগ বেশ সুষ্ঠুভাবেই বিন্যস্ত করেছেন। দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চিত্রনাট্যটি বিন্যাস করার ক্ষেত্রে পরিচালকের সংযম লক্ষ করবার মত। এ-ক্ষেত্রে 'এডিটিং'-এর সম্পাদনায় সাহায্য পেয়েছেন পরিচালক। কয়েকটি নাটকীয় মুহূর্ত রচনার ক্ষেত্রেও শ্রীনাগের কৃতিত্ব আছে।

অভিনয় ছবিটিকে অনেকাংশে সুখভোগ্য করে তুলেছে। বিকাশ রায়, অভী ভট্টাচার্য, প্রদীপকুমার, ভারতী দেবী প্রভৃতি সুখ্যাত শিল্পীরা থাকাতে অবিশ্বাস্য কাহিনীটি অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও চিত্তাকর্ষক। এঁদের মধ্যে প্রদীপকুমারের চরিত্রচিত্রণ খুবই ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও মনোগ্রাহী। জয়ন্তী সেজেছেন গীতা দত্ত। গানেই এতদিন তাঁর সুনাম ছিল। অভিনয়েও যে তিনি পারদর্শিনী এই প্রমাণ ছবিতে মিলেছে। শিল্পীর অভিনয় মার্জিত, পরিশীলিত।

পি এম ফিল্মস-এর "এই তীর্থ" (পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে অভী ভট্টাচার্য, সুমন মুখোপাধ্যায়, মিতা দাশগুপ্ত ও প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বাংলা ছবিতে শ্রীমতী দত্ত তাঁর নিজস্ব স্থানটি সহজেই অধিকার করে নিতে পারবেন।

অবাক করে দিয়েছেন রাখী বিশ্বাস। রোমান্টিক নায়িকা রূপে প্রথম আত্মপ্রকাশেই তিনি দর্শকের মন অবলীলায় জয় করে নিয়েছেন। প্রথম চলচ্চিত্রাভিনয়ে এমন নৈপুণ্য খুব কম শিল্পীই দেখাতে পেরেছেন। শ্রীমতী বিশ্বাসের ভাবপ্রকাশের অভিব্যক্তি ও বাচনভঙ্গি দুই-ই চমৎকার। তা ছাড়া গ্ল্যামার তো আছেই। শিল্পীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাঁর প্রণয়ীর বেশে অজয় বিশ্বাসও খুব সপ্রতিভ। নায়কের ভৃত্যবেশে জহর রায়ের চরিত্রাঙ্কণ ছবির অন্য আকর্ষণ।

কমল দাশগুপ্ত অনেক দিন পর সংগীত পরিচালনার ক্ষেত্রে ফিরে এলেন। সুশ্রাব্য কয়েকটি গান তিনি উপহার দিয়েছেন। তার মধ্যে মান্না দে এবং দ্বৈতকণ্ঠে শ্যামল মিত্র ও আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গান দুটি জনপ্রিয় হবে। সৌমেন্দু রায়ের ফটোগ্রাফি এবং সত্যেন রায়চৌধুরীর শিল্পনির্দেশ উঁচুদরের।

ছোটা ভাই

শরৎচন্দ্রের "রামের সুমতি"-তে যে পরিমাণ আবেগ আছে তা সম্ভবত মাদ্রাজের ছবি "ছোটা ভাই"-এর (ভেনাস পিকচার্স) পরিচালককে তুষ্ট করতে পারেনি। তিনি তাঁর ছবিতে আবেগের পরিমাণ আরও কয়েক মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে, মূল রসের উপর উগ্র নাটকীয়তার যে স্থূল প্রলেপ পড়েছে তাতে দক্ষিণ ভারতীয় মেলোড্রামার বৈশিষ্ট্য রক্ষা পেতে পারে, কিন্তু রসোত্তীর্ণ রচনাটি অপঘাত থেকে রেহাই পায় নি।

দুই ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃজায়ার কাহিনী বলতে গিয়ে পরিচালক কে পি আত্মা দর্শককে সর্বক্ষণ রাম-লক্ষ্মণ-সীতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। ভ্রাতৃজায়া অর্থাৎ রামের বউদি কখনও আবার মা যশোদার মত দেবর রাম ও নিজের পুত্রকে কাছে বসিয়ে ননী তৈরি করছেন। স্থূলাবেগ-অন্বেষী দর্শকের মন জয়ের জন্য এই-সব উপাদান তো ছবিতে আছেই। তা ছাড়া মনোরঞ্জনের অন্যান্য উপকরণও ছবি থেকে বাদ যায় নি। ভ্রাতৃজায়ার মুখে যখন-তখন গান (রামও গান গেয়েছে), রাম-ছাগলের লড়াই, এক দম্পতি ও তাদের অসম্ভব রকম মোটা ছেলেকে নিয়ে কৌতুক ইত্যাদি বস্তুও পরিচালক নিঃসংকোচে ছবিতে ঢুকিয়েছেন। এবং রামের বউদির জননী শুধুই কুটিল নয়, যেন হিন্দী ছবির নিয়মমাফিক ভিলেন। রামের প্রতি জমিদারপুত্রের শত্রুতার ব্যাপারে ছবিটির একটি বড় অংশ জুড়ে আছে। এত সব কাণ্ডের মধ্যে "রামের সুমতি"র [illegible] চরিত্রে অবশ্য রাম বরাবরই সুমতিসম্পন্ন। [illegible] সামান্যই মেলে। তবে এমনিতে একটি আবেগসমৃদ্ধ ও উপভোগ্য নাটক হিসাবে "ছোটা ভাই" নিঃসন্দেহে জনপ্রিয় হবে।

নূতন, রেহমান, মহেশ ও ললিতা পাওয়ার ছবির প্রধান চরিত্রগুলির রূপ দিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের অভিনয়ই ভাল। বিশেষ প্রশংসা করতে হয় রামের বউদির চরিত্রে নূতনকে।

লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল সংগীত পরিচালনা করেছেন। ছবিতে অনেক গান, অকারণে প্রযুক্ত।

মুদিয়ালি ক্লাবের বিচিত্রানুষ্ঠানে গান করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, আরতি মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু, নির্মলেন্দু চৌধুরী, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ও মলয় মুখোপাধ্যায় (নিচের সারিতে মাঝখানে) যন্ত্রসংগীত ও কৌতুক পরিবেশন করেন যথাক্রমে ভি বালসারা ও জহর রায় (নিচের সারিতে বাঁয়ে ও ডাইনে)

ফটো-দেশ

বাংলার বাইরে বাঁশের বাঁশি

সংগীতশিল্পী হিমাংশু বিশ্বাস সম্প্রতি কাশ্মীর, দিল্লি, বারাণসী এবং আরও কয়েকটি স্থানে বাঁশের বাঁশিতে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করে এসেছেন। শ্রীবিশ্বাসের যন্ত্রসংগীত সর্বত্র প্রশংসা অর্জন করে। বারাণসীর আগামী সংগীত সম্মেলনে শিল্পী আমন্ত্রিত।

মুদিয়ালি ক্লাবের বিচিত্রানুষ্ঠান

মুদিয়ালি ক্লাবের বিচিত্রানুষ্ঠান গতবারের মত এবারেও খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। আমাদের আয়োজন ছিল গত বছরের চেয়েও বেশী। আসরে রবীন্দ্রসংগীত, আধুনিক গান ও কৌতুক-নকশা পরিবেশন করেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, নির্মলেন্দু চৌধুরী, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, ভি বালসারা ও সম্প্রদায়, নির্মলা মিশ্র, আরতি মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু, হিমাংশু বিশ্বাস ও তাঁর সম্প্রদায়, মলয় মুখোপাধ্যায়, মৃণাল চক্রবর্তী, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, রবীন মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব রক্ষিত, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী প্রভৃতি। এ'রা প্রত্যেকেই উপস্থিত সকলকে প্রভূত আনন্দ দিয়েছেন। প্রারম্ভে অনুষ্ঠান-সভাপতি মেয়র ডাঃ প্রীতিকুমার রায়চৌধুরী এবং প্রধান অতিথি জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সময়োচিত ভাষণ দেন।

"ইউরোপের অস্কার" নামে পরিচিত পশ্চিম জার্মেনীর গোল্ডেন ব্যাম্বি পুরস্কার পেয়েছেন সোফিয়া লোরেন। গত বছরের সবচাইতে জনপ্রিয় অভিনেত্রী হিসাবে তিনি পুরস্কারটি পেয়েছেন।

অরণ্যদেব

লী ফক

BANK
থামো, নয়ত গুলি চালাব! আ!

ব্যাঙ্ক-ডাকাতের দল! প্রহরীকে গুলি করে মস্ত-নম্বর সড়কের দিকে পালিয়েছে.....

POLICE

রাজাকে যখন ছুঁড়ে ফেললুম, তখন ও অত গম্ভীর হয়ে গেল কেন? এখন আর ও নিজেকে ছোট মনে করে না, সেইজন্যে?
৩/১১

ওদিকে ... জঙ্গলের স্কুলে .....
কীরে রাজা, এখনও তোকে খিনুকে করে দুধ খাইয়ে দিতে হয় নাকি?
তবে রে—!

থামো, থামো সবাই-

রাজা, ফিরে এসো। স্কুল এখনও শেষ হয়নি!
না, আমি ফিরব না।

ছেড়ে দে টমটম! ওদের সঙ্গে তুইও তখন হেসেছিলি!

সে তো ওই মুটকোর দুর্দশা দেখে হাসছিলুম!
দিয়েছো!

ব্যাঙ্ক-ডাকাতেরা শহর ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকেছে! অরণ্য-প্রহরী, তাদের উপর নজর রেখো!
হুঁশিয়ার রইলুম!
POLICE

শুনলে তো, এখন অরণ্য-প্রহরীদের এলাকায় এসে ঢুকেছি!
প্রহরীরাও আমাদের পাত্তা পাবে না।
হুঁশিয়ার রইলুম!

সাপ্তাহিক সংবাদ
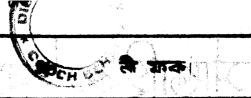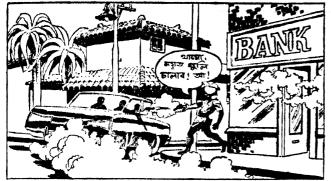
ভারত প্রজাতন্ত্রের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ভোট গ্রহণ বর্তমান সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আজ (১৯ ফেবরুয়ারি) এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনাময় শান্ত পরিবেশে সারা পশ্চিমবঙ্গে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্য বিধানসভার ২৮০জন এবং লোকসভার ৪০জন প্রতিনিধি নির্বাচন উপলক্ষে অতীতের তিনটি নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচনে রেকরড সংখ্যক ভোটদাতা ভোট দিয়েছেন বলে অনুমান করা হয়েছে। প্রদত্ত ভোটের গড়পড়তা হার ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কলকাতা ও শহরতলির বিস্তৃত নির্বাচনী এলাকায় ৫০টিরও বেশী ছোটখাট অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলেও মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট গ্রহণ হয়েছে। ভারতের ২৫ কোটি ভোটারের মধ্যে এ পর্যন্ত তিনভাগের দুই ভাগ নাগরিকের ভোট গ্রহণের কাজ শেষ হয়েছে। সারা ভারতে মোট ভোটের সংখ্যা প্রায় ২৫ কোটি।

দেশী সংবাদ—

১৩ ফেবরুয়ারি—মুঙ্গেরের তাকির গ্রামের কাছে আজ সকালে একদল লোক লাঠি ও বরশা নিয়ে রাস্তায় সংসদ সদস্য শ্রীমধু লিমায়ের (এস এস পি) জীপ আক্রমণ করে—ফলে শ্রীলিমায়ে ও ড্রাইভার সহ অপর চারজন গুরুতর আহত হন।

রাজ্যসভার ভূতপূর্ব সদস্য শ্রীসুধীর ঘোষ আজ সকালে নয়াদিল্লিতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৫১ বৎসর বয়স হয়েছিল।

শ্রীঘোষ কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং কেমব্রিজের ইমানুয়েল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনিই ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর দূত। ১৯৪৭ সালে লনডনে ভারতীয় হাই-কমিশনে শ্রীঘোষ জনসংযোগ অফিসার ছিলেন। তিনি ভারত সরকারের সহকারী উপদেষ্টা এবং ফরিদাবাদ উন্নয়ন বোরডের অ্যাডমিনিসট্রেটর ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ভারত সরকারের অধীনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর লেখা "গান্ধীজীর দূত" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১৪ ফেবরুয়ারি—বেলঘরিয়ায় শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্য আজ ব্যারাকপুরে এস ডি ও-র বাংলোয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এক বৈঠকে মিলিত হন। নির্বাচনের সময় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁরা এক যৌথ আবেদন প্রচার করেন। ভবিষ্যতে যাতে আর অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য আহ্বান জানান।

বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের ডিরেকটর জেনারেল ডঃ আত্মারাম আজ এক সাক্ষাৎকারে বলেন—নতুন সংসদে আরও বেশী সংখ্যক বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদকে নির্বাচিত করা জনসাধারণের কর্তব্য। কারণ দেশের রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করতে বিজ্ঞানীরাই পারেন।

১৪ ফেবরুয়ারি—রিজারভ ব্যাঙ্ক অব ইনডিয়ার সর্বশেষ বুলেটিনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, ভারতের ২ কোটি ৪০ লোক একবেলা খেয়ে থাকে এবং ১২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক একদিন অন্তর খায়। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে জানা যায়, পঞ্চম যোজনার শেষে ভারতে মোট ১৫ কোটি ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের দরকার হবে।

হায়দরাবাদের নিজাম মীর ওসমান আলী (৮৪) এবং তাঁর ৪০ জন বেগমের নাম ভোটার তালিকার শীর্ষে স্থান পেয়েছে কিন্তু তাঁরা কেউই ভোট দেননি। নিজামের কিং কোঠি প্যালেসে ৯৬ জন ভোটদাতা আছেন। ওরা সকলেই নিজামের হারেমের সদস্য। তাঁরাও ভোট দেননি।

১৬ ফেবরুয়ারি—ভারতের মোট নির্বাচকমণ্ডলীর অর্ধেকই নারী কিন্তু নারী প্রার্থীর সংখ্যা শতকরা দু'-এরও কম। গত নির্বাচনের তুলনায় এবারে নারী প্রার্থীর সংখ্যা বিশেষভাবে কমে গিয়েছে।

ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য ৭ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যে রাষ্ট্রসংঘ সদস্য দল সম্প্রতি ভারত সফর শেষ করেছেন, তাঁরা এই রকম সুপারিশ করেছেন যে, ভারতে রপ্তানিযোগ্য এমন ১৫টি পণ্য আছে, বিশ্বের বাজারে যার চাহিদা রয়েছে।

১৭ ফেবরুয়ারি—স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দু'দিন পিছিয়ে যাবে। সময়ের পূর্ব ঘোষিত ২৮ মারচের বদলে এই পরীক্ষা ৩০ মারচ আরম্ভ হবে। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা অবশ্য আগেকার ঘোষণা মত ২০ মারচই শুরু হচ্ছে।

ভারতকে অতিরিক্ত ২০ লক্ষ টন খাদ্য সরবরাহ সম্পর্কে প্রস্তাবিত ভারত-মারকিন চুক্তিতে কয়েকটি শর্ত লিপিবদ্ধ করার জন্য মারকিন যুক্তরাষ্ট্র জোর দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এর ফলে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে চুক্তির খসড়া প্রণয়নে দেরি হতে পারে।

১৮ ফেবরুয়ারি—রেলওয়ে ক্যানটিনে খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে হায়দরাবাদ শহরে বিক্ষোভকারী এক ছাত্রজনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস লাঠি চালনা করে। পুলিসের অভিযোগ ছাত্ররা পুলিস কর্মচারীদের ওপর ইটপাটকেল ছুঁড়ে তাদের আহত করেছে।

১৯ ফেবরুয়ারি—গৌহাটিতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ জানা যায় যে, গতকাল রাত্রি ৯টার সময় মারিয়ানি শহরের জংশনের কাছে এক বিস্ফোরণের ফলে রেল লাইনের কিয়দংশ উড়ে গিয়েছে। সংবাদে আরও জানা গিয়েছে যে, বিস্ফোরণের দরুন একটি ডাউন মালগাড়ির ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হয়। বলা হয়েছে যে, এটা যে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

বিদেশী সংবাদ

১৩ ফেবরুয়ারি—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন আটদিনব্যাপী বৃটেন সফর শেষ করে আজ দেশে ফিরে যান। সফর শেষে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয় তাতে অপ্রত্যাশিত কিছু নেই। ভিয়েতনাম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—যুদ্ধ অবসানের জন্য রাশিয়া ও বৃটেন সম্ভাব্য সকল প্রকারে চেষ্টা করবে। ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি যুক্ত কর্মসূচী গ্রহণে উভয়পক্ষে মতৈক্য ঘটেনি।

১২ ফেবরুয়ারি—পিকিং-এর প্রাচীরপত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে জাপানী সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন—জেনারেল চাং কুয়ো হুয়া এবং তাঁর সহকারী চ্যাংসেই ওয়াং-এর নেতৃত্বে পরিচালিত মাও-বিরোধীরা সশস্ত্র মাও-বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে নিরাপত্তা এজেনসি, পুলিস অফিস, লাসা মিউনিসিপ্যাল পার্টির সদর কার্যালয় এবং গণ-কমিটি দখল করে নিয়েছেন।

১৫ ফেবরুয়ারি—আগামী মাসে প্রেসিডেন্ট সুকারনোকে ক্ষমতার আসন থেকে নিশ্চিত অপসারণের পর তাঁর সমর্থকরা কোন রকম অভ্যুত্থানের চেষ্টা করলে তা চূর্ণ করে দেওয়া হবে বলে ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনী আজ এই সতর্কবাণী ঘোষণা করেছেন।

১৬ ফেবরুয়ারি—সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র প্রাভদা আজ মাও সে-তুং-কে মারকসবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করে বলেছেন যে, ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার জন্য মাও-চক্র সমাজতন্ত্রবাদ, বিপ্লব এবং চীনা জনগণের স্বার্থ পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত নয়।

১৭ ফেবরুয়ারি—ইন্দোনেশিয়ান কংগ্রেস আজ ঘোষণা করেছেন যে, প্রেসিডেনট সুকারনোকে অপসারণ করার বিষয়ে আলোচনার জন্য ৭ মারচ তারিখে ইন্দোনেশিয়ান কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। জনৈক কংগ্রেসনেতা বলেন যে, প্রেসিডেনট সুকারনোকে অপসারণ করা নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।

১৮ ফেবরুয়ারি—চীনা কমিউনিসট পার্টির কার্যত প্রচার অধ্যক্ষ ওয়াং তাও গত ৯ ফেবরুয়ারি নৈরাজ্যের বিপদ সম্পর্কে লাল-রক্ষীদের সতর্ক করেন। পিকিং-এর দেওয়াল পত্রিকা থেকে এ খবর পেয়ে টোকিওর দৈনিক আসাহি সিমবুনের পিকিংয়ের সংবাদদাতা আজ এই রিপোরট দিয়েছেন।

১৯ ফেবরুয়ারি—গতকাল আমেরিকার প্রথম আণবিক বোমা নির্মাণকারী ডঃ রবারট ওপেনহাইমারের মৃত্যু হয়।

তাঁর বয়স ৬২ বৎসর হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে আণবিক শক্তি কমিশন তাঁকে গোপন দলিলপত্র দেখাতে অসম্মত হন। কারণ কমিউনিসটদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু নয় বৎসর পরে আণবিক কমিশন বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্য তাঁকে ৫০০০০ ডলার-এর ফারমি পুরস্কার দান করেন।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীবলেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

দেশ

৩৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৮
শনিবার ১৯ ফাল্গুন ১৩৭৩

নির্বাচনের ফলাফল

ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল বোধ করি নানাদিক দিয়েই তাৎপর্য-পূর্ণ। গত কুড়ি বছর যে শাসক দল নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং গত তিনটি নির্বাচনে যাঁদের প্রাধান্য ছিল প্রভূত, বর্তমানে তাঁদের ক্ষমতায় এবং প্রাধান্যে রীতিমত ফাটল ধরেছে। কয়েকটি রাজ্য তার হাতছাড়া, কোথাও কোথাও পূর্বের তুলনায় কম জোর। নেহরুজীর জীবতকালে এ-রকম ঘটনা ঘটেনি নিতান্ত যেন তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং দূরদর্শিতার জন্যে। কিন্তু ভাঙনের শুরু তখন থেকেই। তাঁর পরলোকগমনের পর দ্বিতীয় এমন কেউ ছিল না যাঁর পক্ষে ভাঙা হাট সামলে রাখা সম্ভব। ক্ষমতা, প্রভুত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব, দলাদলি, কোথাও কোথাও [illegible] ইত্যাদি এই ক' বছরে প্রায় প্রত্যেকটি প্রদেশ কংগ্রেসের [illegible] হয়ে ওঠে। আত্ম-কলহে লিপ্ত থাকার পরিণতি আর কি হতে পারে। তাছাড়া শাসনক্ষমতা যাঁরা হাতে করেছিলেন তাঁরা দেশের মানুষকে যতটা শাসন করেছেন ততটা [illegible] অনুভব করার চেষ্টা করেন নি। বিরক্ত, বিক্ষুব্ধ মানুষের মন থেকে আজকের কংগ্রেস ক্রমশ মুছে যাচ্ছে। এই সঙ্গে একথাও বিবেচনা করতে হবে, গত কুড়ি বছরে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ক্রমশই তাঁদের জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন। এই রাজনৈতিক দলগুলির সবচেয়ে বড় গুণ তারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, করতে বাধ্য হয়। জনসাধারণের মনে এদের প্রভাব যে পড়ছে—একথা আজকের নির্বাচনেই প্রমাণ। এছাড়া আর যা, তা হল : দেশের মধ্যে এমন একটা হতাশার ভাব এসেছে যাতে সাধারণ মানুষের পক্ষে শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি শুনে দিন কাটাবার ধৈর্য আর নেই। তারা বিরক্ত ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। পরিবর্তন দেখতে চায়।

পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণ কংগ্রেসের বিপক্ষে তাঁদের রায় দিয়েছেন। অবশ্য কেউ কেউ এমন কথা বলতে পারেন, সরকারী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রায় যতটা প্রবল—কংগ্রেসী আদর্শের প্রতি ততটা নয়, না হলে সদ্যগঠিত বাংলা কংগ্রেস এত আসন পায় কি করে। প্রকৃতপক্ষে, এই রাজ্যের নির্বাচনের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি হল কংগ্রেসী এবং অ-কংগ্রেসী আদর্শের মধ্যে দ্বন্দ্ব ততটা নয়, যতটা সরকারী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষের অনাস্থা, বিরক্তি, বীতস্পৃহা। আরও সহজ করে বললে বলতে হয়, শাসক দল হিসেবে জনসাধারণের কংগ্রেসের প্রতি যতটা অভক্তি কংগ্রেসী আদর্শ সম্পর্কে হয়তো ততটা নয়।

ভাবতে ভাল লাগে, আমাদের জনসাধারণ গণতন্ত্র রক্ষার উপযুক্ত ভূমিকা অন্তত এক্ষেত্রে নিয়েছেন। যাঁদের ওপর তাঁদের গত নির্বাচনেও আস্থা ছিল বর্তমান নির্বাচনে অন্ধভাবে তাঁদের আবার নির্বাচন করেন নি। নির্বাচিতদের কাজের বিচার তাঁরা নিজেরাই করেছেন। এবং যাঁদের নতুন করে নির্বাচন করলেন তাঁদের হাতেই তুলে দিলেন নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের ভার।

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যদিও তাঁরা এই রাজ্যে একক দল হিসেবে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছেন তবু মন্ত্রিসভা গঠনের মতন নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ না করায় মন্ত্রিসভা গঠনের জন্যে অন্যের সহযোগিতা গ্রহণ করবেন না; তাঁরা বিরোধীর আসন গ্রহণ করবেন। আমরা মনে করি, জনসাধারণের রায়ের পর কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত ভালই হয়েছে।

আপাতত আমাদের কৌতূহলের বিষয় : পশ্চিমবঙ্গে নতুন মন্ত্রিসভা। বিরোধী দলগুলি নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয় আলাপ আলোচনা করছেন। প্রায় এগারো বারোটি দলের মধ্যে একটি মোটামুটি বোঝাপড়া হলে এটি সম্ভব। মনে রাখতে হবে, এই দলগুলির মত ও আদর্শ এক নয়। তবু যদি জনসাধারণের সেবার উদ্দেশ্যে তাঁরা অন্তত শাসন পরিচালনার ব্যাপারে মোটামুটি একটা বোঝাপড়ার মধ্যে আসেন তবে আমরা যে নতুন সরকার পাব তা জনসাধারণের দ্বারা অভিনন্দিত হবে।

নতুন মন্ত্রিসভার দায় দায়িত্ব কিছু কম হবে না। বিক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত মানুষকে তাঁদের অনেক কিছুই দিতে হবে। জনসাধারণকে ভাতকাপড় দেওয়া ও বেকার-সমস্যার সমাধান করাই হবে তাঁদের প্রধান সমস্যা। সাধারণ মানুষ যে তাঁদের দিকে বড় মুখ করে তাকিয়ে আছে একথা ভুললে চলবে না।

আমাদের গণতন্ত্রে একাধিপত্যের সম্ভাবনা আছে বলে যাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন তাঁদের সে ভুল ভেঙেছে। বোধ করি, এবারের নির্বাচন একটি মহৎ শিক্ষা—উভয়পক্ষেই।
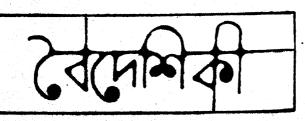
গ্রাসে গ্রাসে শান্তি!

মার্কিন দানধর্মে আন্তরিকতার অভাব নেই, অভাব সূক্ষ্ম রুচির। "শান্তির জন্য খাদ্য" (ফুড ফর পীস), "স্বাধীনতার জন্য খাদ্য" (ফুড ফর ফ্রীডম), এ সব ছাপ-মারা বচন আসলে প্রতিকর নয়, কিন্তু অন্নদাতা যদি নিত্যই নিরুপায় বুভুক্ষুদের শোনাতে থাকেন, মনে রেখো, এই যে গম-চাল গুঁড়ো দুধ এবং আরও কত কী দিয়ে যাচ্ছি তোমাদের, সে সমস্তই আমাদের দয়ার দান, তা হলে দান-গ্রহীতারা মোটেই কৃতজ্ঞ বোধ করে না। মার্কিন খাদ্যসাহায্য দানের রাজনৈতিক শর্তের ভালমন্দ নিয়ে নানা মতের রাজনীতিকরা তর্কাতর্কি চালাতে থাকুন; কিউবা, উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে ভারতবর্ষ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে কী পারবে না, মার্কিন খাদ্যসাহায্য লাভের সেই শর্তের সপক্ষে ও বিপক্ষে, দুই দিকেই নানা রকম যুক্তি হয়তো আছে। কিন্তু ওই যে আর একটি নির্দেশ মার্কিন খাদ্যসাহায্য বিতরণের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে সেটার সার্থকতা কী, সাধারণ আত্মসম্ভ্রমসম্পন্ন লোকদের কাছে সেটা কেমনই বা লাগতে পারে?

"শান্তির জন্য খাদ্য" কেবল মার্কিন সরকারের সঙ্গে চুক্তি করে নিলে হবে না, দোকানে দোকানে এই খয়রাতি মার্কিন খাদ্য বিক্রয় বা বিতরণ কেন্দ্রে দস্তুরমত বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে, এই গম, চাল ইত্যাদি মার্কিন জনসাধারণের দান। কথাটা সত্যি, মার্কিন জনসাধারণের দানই বটে;. কিন্তু কথাটা মার্কিন খাদ্যসাহায্য গ্রহীতা ভারত-বর্ষ এবং অন্যান্য দেশের শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঘোষণা না করলে মার্কিন সরকার বা মার্কিন জন-সাধারণের মন উঠবে না, এ কেমন কথা? আমেরিকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ক্ষুদ-কুঁড়ো অন্নহীন গরীব দেশের লোকদের ক্ষুধা শান্তির সহায়, ক্ষুধা-শান্তির বদান্য ব্যবস্থার ফলে অন্য নানা রকম রাজনৈতিক, সামাজিক অশান্তি এড়ান সম্ভব, এ সবই জানা কথা। কিন্তু ওই মার্কিন বদান্যতার ব্যাপারটা সত্যিই এমন করে বেচারা গরীব দেশের পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে রোজ জানিয়ে দেওয়াটা দরকার কেন?

আমেরিকা বিপুল ঐশ্বর্যশালী দেশ, তারপর খৃষ্টান ধর্মাচরণের কতকগুলি প্রশংসাযোগ্য অভ্যাসগুণও মার্কিন জন-সাধারণের যথেষ্ট আছে। তবে খাদ্যসাহায্য দেওয়া ব্যাপারে এই বদান্যতার বড়াই করা বিজ্ঞপ্তি প্রচার ব্যবস্থাটা, মোটেই খৃষ্টান আদর্শসম্মত নয়। বদান্যতার সঙ্গে এ ক্ষেত্রে মিশে আছে কিছুটা জনগৌরবভিত্তিক জাতিগত অহমিকা, আর তার চেয়েও বেশী আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন মাতব্বরির স্পৃহা। ফলে মার্কিন জন-সাধারণের চমৎকার মানবিক উদারতাটি অত্যন্ত স্থূল-রুচি বড়মানুষী আকারে পরিণত হয়েছে। গরীব দেশের দুর্দিনে মার্কিন খাদ্যসাহায্য পাওয়াটা নিশ্চয়ই স্বস্তি-দায়ক। অথচ সাহায্যদাতার উদ্ধত আত্ম-প্রচারের জিদটা গ্রহীতাদের মনে স্বস্তির চেয়ে অস্বস্তি সৃষ্টি করছে বেশী, কৃতজ্ঞতার চেয়ে বিরূপতা।

এর জন্য দায়ী মার্কিন রাষ্ট্রকর্তাদের, মার্কিন রাজনীতিক মহলের অদূরদর্শী নীতি-বাগিশ মনোভঙ্গি। এঁদের ধারণা সোভিয়েট ইউনিয়ন গরীব দেশগুলিকে নামমাত্র সাহায্য দিয়ে কিংবা একেবারে কিছুই না দিয়েও সুদ্ধ প্রচারের জোরে পৃথিবীতে সোভিয়েট প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তৃত করছে; আর আমেরিকা কিনা লক্ষ লক্ষ টন গম ইত্যাদি খয়রাত করেও গরীব দেশগুলির চিত্ত জয় করে উঠতে পারছে না। অতএব মার্কিন নীতিবাগীশ প্রচারশাস্ত্রীরা সাব্যস্ত করলেন, কেবল খয়রাতের কাজ নয়, খয়রাত যারা নিচ্ছে ও নেবে তাদের প্রতিনিয়ত জানতে ও জানাতে হবে মার্কিন বদান্যতার কৃপাতেই তারা টিঁকে আছে। একেই বলি "গ্রাসে গ্রাসে শান্তি!" না কি শাস্তি? দানধর্মের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা যে কখনও থাকবে না সেটা আশা করা যায় না। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটা অত্যন্ত স্থূলভাবে প্রকট হলে দাতা এবং দানগ্রহীতার মধ্যে সম্পর্ক অস্বাচ্ছন্দ হবেই, সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের অনটন ঘটবে। খৃষ্টান সদাচার শাস্ত্র বলে, প্রকৃত দানধর্মপালনে অহমিকা থাকবে না, আত্মপ্রচারের লেশমাত্র চেষ্টা চলবে না। তা বলে রাজনৈতিক দানধর্ম ব্যবস্থা কি খৃষ্টান সদাচার শাস্ত্রের নির্দেশ মত চলতে পারে? হয়তো এর জন্য আছে অন্যতর খৃষ্টীয় বিধান—খাবারের গ্রাস মুখে তুলবার আগে অন্নদাতা ঈশ্বরের প্রতি সকৃতজ্ঞ আবেদন—"লর্ডস্ প্রেয়ার।" খয়রাতী মার্কিন খাদ্য সম্পর্কে অন্নদাতা মার্কিন জনসাধারণের নামটা দোকানে দোকানে টাঙিয়ে দেওয়ার শর্তটি বোধ করি ●

বিমান ডাকে

বিদেশে চাঁদার নূতন হার

মুদ্রামূল্য হ্রাস হেতু ১ জুলাই হইতে বিদেশে বিমান ডাকে দেশ পত্রিকার পরিবর্তিত চাঁদার হার—

এশিয়া:	
বার্ষিক	১৮৬·০০
ষান্মাসিক	৯৩·০০
ত্রৈমাসিক	৪৬·৫০
ইওরোপ:	
বার্ষিক	২৮০·০০
ষান্মাসিক	১৪০·০০
ষান্মাসিক	১৪০·০০
ত্রৈমাসিক	৭০·০০
আমেরিকা ও কানাডা:	
বার্ষিক	৪১০·০০
ষান্মাসিক	২০৫·০০
ত্রৈমাসিক	১০২·৫০
অস্ট্রেলিয়া, ঘানা, ফিজি প্রভৃতি:	
বার্ষিক	৩২৬·০০
ষান্মাসিক	১৬৩·০০
ত্রৈমাসিক	৮১·৫০
লণ্ডন অফিস মারফত:	
বার্ষিক	১১৭·০০
ষান্মাসিক	৫৮·৫০
ত্রৈমাসিক	২৯·৫০

—সার্কুলেশন ম্যানেজার, দেশ

সেই খণ্ডায় লণ্ডন্ প্রোয়ারের মাকিনা রকমফের।

এখন প্রশ্ন, এ বিধান কি কেবল এশিয়া-আফ্রিকার গরীব দেশগুলির জন্য তৈরি? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত ইউরোপেও খাদ্য এবং অন্য নানারকম নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব কম ছিল না। পশ্চিম ইউরোপের সে অভাব পূরণে আমেরিকা অকাতর সাহায্য দিয়েছে। মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা তারই সুপরিচিত ঐতিহাসিক পর্ব। এখন জিজ্ঞাসা, পশ্চিম ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণকেও কি মার্কিন সাহায্য প্রাপ্তির সঙ্গে "গ্রাসে গ্রাসে শান্তি"র মন্ত্র নিত্য পাঠ করতে বাধ্য করা হয়েছিল? বোধ হয় নয়। এশিয়া-আফ্রিকার বাদামী ও কালো মানুষদের জন্যই সম্ভবত মার্কিন দাতাদের প্রতি নিত্য সর্বত্র কৃতজ্ঞতা স্বীকারের এই বিশেষ শর্তাধীনের ব্যবস্থা। ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণ আমেরিকানদের জাত ভাই, জাতিগোষ্ঠীভুক্ত; মার্কিন জনসাধারণের দয়ার দান পেয়েই তারা খেয়ে পরে বেঁচে আছে, এ রকম চাঁচা-ছোলা কথা মার্কিন শ্রেষ্ঠীরা পর্যন্ত শোনাতে সাহস করেন নি; রক্তের টান, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে এক জোট, শ্বেতাঙ্গ মনোভাবের এই সব ঝোঁক দান-ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যে দেখা যাবে সেটা আর বিচিত্র কী। হয় তো এশিয়া-আফ্রিকার গরীব দেশগুলির পক্ষে এক দিক দিয়ে সেটা মঙ্গলের।

... হাটবাজার দোকানে মার্কিন দাতাদের নির্দেশমত দেখতে হয় যে প্রতিটি গ্রাসে তারা মার্কিন খাদ্য-সাহায্যের উপর নির্ভর, তাহলে প্রাণধারণ ব্যাপারে এই একান্ত পর-নির্ভরতার গ্লানি থেকে যে কোন প্রকারে মুক্ত হওয়ার জন্য জনসাধারণও প্রবল তাগিদ অনুভব করতে পারে; "গ্রাসে গ্রাসে শান্তি" নয়, প্রতিটি গ্রাসে অশান্তি, অপমান এবং অতএব সে অপমান দূরীকরণের জন্য চাই সর্বাঙ্গীণ সামগ্রিক আত্মনির্ভরতা অর্জনের প্রয়াস, ভারতবর্ষ এই সংকল্পে অনতিকাল মধ্যে উদ্বুদ্ধ হবে, সে আশা কি নিতান্তই দুরন্ত কল্পনা?

২৭।২।৬৭

আথেন্স থেকে কায়রো

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বিমানের মধ্যে আমি গলার টাই খুলে ফেলে,
সিট বেল্ট সরিয়ে
উঠে দাঁড়ালুম
চিৎকার করে বললুম, কে কোথায় আছো?
আকন্দ আঠার মত ঘন সাদা দুই নারী তরলভাবে ছুটে এলো—
তখন মাথার ওপরে ও নিচে ভূমধ্য আকাশ ও সাগর
মাঝখানে নীল মেঘ ও রুপালী ফড়িং
পিছনে সন্ধেবেলার ইওরোপ জ্বলছে দাউদাউ আগুনে
সামনে প্রাচ্যদেশ জুড়ে অন্ধকার
কী নিঃসঙ্গ এই কেন্দ্রবিন্দু
আমি তীব্রকণ্ঠে জানালুম, কোথায় থাকো এতক্ষণ? আমি
আধ ঘণ্টা আগে হুইস্কি চেয়েছি
তা ছাড়া আমার খিদে পেয়েছে—
বালিকা-সাজা সেই দুই যুবতী অপ্রতিভভাবে হাসে
সেই আগুন ও অন্ধকারের মাঝখানে নারী-হাসা এত অবান্তর
তাদের শরীরের রেখা বিভঙ্গের দিকেও চোখ পড়ে না
ভূমধ্য সাগরের অন্তরীক্ষে দাঁড়িয়ে আমার অসহায় বোধ হয়
আমার চোখের মধ্যে চোখ খেলা করে, রক্তের মধ্যে রক্ত
দীর্ঘশ্বাস ও কান্নার মত যেন অকস্মাৎ সেই মুহূর্তে আমি
সরল ও সত্যবাদী হয়ে উঠবো
সেই উন্মোচন, সে কি সহনীয়? দমবন্ধ বাতাসের ভিতরে
অজস্র ফুল
দেখে ভয় হয়
ধ্বংসের আগুনে জ্বলছে ইওরোপ, সামনে ভস্মসাৎ কালো প্রাচ্যদেশ
মাঝখানে এত নিঃসঙ্গতা, উন্মোচনে ভয় হয়
আমি আরতীর হয়ে জেগে উঠে তীক্ষ্ণগলায় বারবার জানাতে চাই
আমার খিদে পেয়েছে, আমার খিদে পেয়েছে।

ধ্বনির গভীরে

হেমায়েত হোসেন

আশ্চর্য সংলাপ শুনি মাঝে মাঝে অন্তরের ধ্বনির গভীরে
যখন নিভৃতে একা,
দেখি এক অদৃশ্য মায়ায়
পেরিয়ে নগর পথ, যৌবনের চিত্রিত সংসার,
সৌখিন রূপের হাট, বিলাসের অনেক বাহার
কখন অজান্তে যেন ফিরে গেছি
কৈশোরের গ্রামের আশ্রয়ে,
যেখানে শিশির-ভেজা প্রত্যুষের ঘাসের গালিচা
এবং মসৃণ রোদ,
আর সেই রোদের প্রপাতে
একটি উজ্জ্বল পাখি স্নান করে অপার কৌতুকে:
আমার সমস্ত সাধ সেইখানে ছবি হয়ে আছে।

আমার গ্রামের সেই চেনা-চেনা পাখিটির স্বর
আমাকে উন্মনা করে এখনো নিভৃতে যেন;
এবং ধ্বনিত হয়
তার সেই রোমাঞ্চিত রহস্যের সুর
কেমন নরম কণ্ঠে   চেতনার সমস্ত তন্ত্রীতে,
রক্তের অপার স্রোতে
বাসনার সঙ্গীতের মত;
মাঝে মাঝে
অন্তরের ধ্বনির গভীরে শুনি সেই
পাখি আর রোদের সংলাপ।

আমার সমস্ত সাধ যেন সেই পাখি হয়ে আছে।

অনুরোধ

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

ভেবো না। আমার খেলনা
আরো কিছু ভঙ্গী দেখাবে,
আরো কিছু শব্দ, ঢং, আরো কিছু অঙ্গের বাহার—
আপাতত, তাকে খেলতে দাও।
যদি পিষে মারতে চাও,
আমিই তো আছি, হেঁটে যাও,
বুকের ওপরে এসে নাটকীয় পদাঘাত করো,
কিন্তু আমার খেলনা,
আমরণ রচনা আমার,
তাকে খেলা করতে দাও
ঘুরে ঘুরে, যখন যা খুশি,
শীত, গ্রীষ্ম, বসন্তে, হাওয়ায়—
তাকে একা খেলা করতে দাও॥

'মহাযুদ্ধের পর'

"নিবিয়াছে মহাঝড়; রণ-প্রভঞ্জন,
ভীম পরাক্রমে নর-মহীরুহ-চয়
উপাড়ি ধরায় শান্ত হয়েছে এখন:
সবিষাদে সমীরণ ধীরে ধীরে বয়—"

না—'পলাশীর যুদ্ধ' নয়, চলতি ভাষায় যাকে বলে ভোটযুদ্ধ এবং আরো শিষ্টমতে যার নাম সর্বভারতীয়

এবার ফিরাও মোরে

গণতান্ত্রিক নির্বাচন। কিন্তু ফল একই। অনেক 'নর-মহীরুহ' নির্বাচনী মহাযুদ্ধে উৎপাটিত হয়েছেন, অনেকে কিছু ডাল-পালা বিসর্জন দিয়ে কোনোমতে সামলে নিয়েছেন, ঝঞ্ঝাহত অরণ্যে দু-চারটি তরুণ তরুর সতেজ মাথা চোখে পড়ছে। বিজয়ীদের ঢাক-ঢোল-রামশিঙে-আনন্দ-ধ্বনিও ধীরে ধীরে থেমে আসছে। তারপর 'শান্তি পর্ব'। আপাতত 'সবিষাদে সমীরণ'—

উঁহু, তা-ও নয়। সকলেই বিষণ্ণ বাতাসে বিমূঢ় হয়ে বসে নেই, বসন্তের দাক্ষিণী হাওয়ায় ভাগ্যবানেরা ডানা মেলেছেন এখন। তাঁরা সুখে থাকুন।

আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। জানাচ্ছি সেই তাঁদের—যাঁরা নির্বাচনে হেরে গেলেন।

কথাটা বোধ হয় প্যারাডক্সের মতো বোধ হচ্ছে। কিংবা কারো কারো কানে খুব ক্রূর আর হৃদয়হীনও শোনাতে পারে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এই অভিনন্দনের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর এবং আন্তরিক। আমাদের শ্রীগীতায় শ্রীভগবান জানিয়েছেন—'যুদ্ধে জয় হলে মহী-সম্ভোগ, হত হলে স্বর্গলাভ।' আপনারা অবগত আছেন যে, রাজ্যলাভ আপাতত সুখকর হলেও আসলে ব্যাপারটি অত রমণীয় নয়—'আনইজি লাইজ দ্য হেড'—ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন সেই সুখাসন নামধেয় কণ্টকশয্যাটি টিঁকিয়ে রাখার জন্য মনের সব শান্তি 'সমূলেষু বিনশ্যতি', রাত্রি দিন দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা আর শ্রান্তিহীন শ্রম, আহার বিস্বাদ এবং বালিশ বীতনিদ্র। তার চাইতে ধর্মযুদ্ধে মৃত্যুবরণ অনেক বেশি কাংক্ষিত, পরপারে স্বর্গলাভ, আর কে না জানেন, স্বর্গে রাজনীতি নেই, ইলেকশান নেই, টাকার শ্রাদ্ধ নেই, ভোটারদের দরজায় দরজায় ভিক্ষাপাত্র হাতে ধরতে হয় না, জিতলে জ্যান্ত অবস্থায় অত্যন্ত দেবভোগ্য ভাবে সমর্থকদের কাঁধে চড়তে হয় না—লোকসভা-বিধান সভার বিরোধী পক্ষের সঙ্গে রাজনীতির দরকার পড়ে না। স্বর্গে শুধু অখণ্ড শান্তি, অনন্ত আরাম। ইসলামও বলে দিয়েছেন, ধর্মযুদ্ধে শহীদ হলেই আর কথা নেই, কোনো পারলৌকিক বিচারের দরকার পড়ে না—বীরবেশে, রক্তমাখা শরীরে শহীদ একেবারে সোজা বেহেস্তে গিয়ে প্রবেশ করতে পারেন।

নতুন ভূমিকা

গণতান্ত্রিক নির্বাচনে যাঁরা শহীদ হলেন, তাঁরা এখন সেই স্বর্গসুখ ভোগ করতে পারবেন। অন্তত পাঁচ বছর সেই অধ্যাত্ম-স্বর্গে তাঁরা অমৃতপান করতে থাকুন। ততদিনে আজকের সব আঘাত, সব চিত্তদাহ, সব পোস্টার, সব ফেস্টুন, সব বক্তৃতা, সব কোলাহল অণু-পরমাণুতে মিশে যাবে। তারপর—

তারপর আবার নির্বাচন। তখন তাঁরা সনিঃশ্বাসে বলবেন, 'পুণ্যবল হল ক্ষীণ,/আজি মোর স্বর্গ হতে বিদায়ের দিন—'

চাল যোগাবার দায় নেই

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। আপাতত শান্তি। শান্তিহনূ...

আপনি, আমি এবং আমাদের মতো যত 'কমনম্যান'—মোটামুটিভাবে এই যুদ্ধ-পর্বকে উপভোগ করেছি। কখনো কিঞ্চিৎ উত্তেজিত, কখনো বা কিছু রোমাঞ্চিত, কখনো অল্প-স্বল্প পুলকিত, কখনো বা মৃদুভাবে বিষাদিত হয়েছি। দুই যুযুধান সমর্থক দল যখন বাড়ির সামনে ইঁট আর সোডার বোতল ছুঁড়ে ক্ষাত্রশক্তির পরিচয় দিয়েছে, তখন সভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করেছি। আর বাকী সময়টা যথানিয়মে চাকরি করেছি, বাজার করেছি, রেশন এনেছি, মাসের পনেরো তারিখের পর থেকে মাথার চুল পাকাতে আরম্ভ করেছি, নিজেদের মধ্যে তর্ক করে চায়ের পেয়ালা উলটে দিয়েছি, পয়সা থাকলে সিনেমা দেখেছি আর সময় থাকলে তাস খেলেছি।

বেশ একটা হলিডে-মুড নিয়ে লম্বা কিউতে দাঁড়িয়ে, পান-টান চিবিয়ে এবং খোসগল্প করে ভোটটোট তো দিয়ে আসা গেল। কিন্তু আমি ভাবছি অন্তত কলকাতা শহরে, সাধারণ বাঙালির কাছে, কোনো প্রার্থীরই কি কিছুমাত্র প্রোপাগান্ডা করবার দরকার ছিল? প্রায়

শতকরা আটানব্বই জন পুরুষই নিজের নির্বাচন করে রেখেছিলেন, কোনো চিৎকার, কোনো ইলেকশান-লিটারেচারই কি তাঁদের নিজস্ব মনোনয়নকে বিশেষ বিচলিত করতে পেরেছে? যাঁরা দলকে দিয়েছেন, তাঁরা অন্য দলের কথায় কর্ণপাত করেননি, যাঁরা ব্যক্তিকে দিয়েছেন, তাঁরা অন্য ব্যক্তিত্বের দ্বারা কি বিশেষ অভিভূত হয়েছেন? সাধারণ বাঙালী মেয়েদের শতকরা নব্বই জন চোখ বুজে বাড়ির পুরুষের সঙ্গে একমত হয়েছেন, জনাদশেক বড়ো জোর নিজের মত খাটিয়েছেন। এই কনশাস কিংবা আনকনশাস ভোটারের কাছে কী লাভ এত প্রচার করে, কী দরকার এত পরিশ্রমের, এত অপব্যয়ের?

আমার একটি বিনীত প্রস্তাব আছে। নির্বাচনের আগে—পাড়ায় পাড়ায় পার্কে পার্কে, সমস্ত প্রার্থীরা কয়েকটি মিলিত সভা করুন। সেখানে প্রত্যেক প্রার্থী দাঁড়িয়ে উঠে নিজের যোগ্যতা, দাবি এবং প্রস্তাবিত কর্মতালিকা মিনিট পনেরোর মধ্যে পেশ করে ফেলুন। বেশ হৃদ্যতা আর সৌজন্যের মধ্য দিয়ে ব্যাপারটি সংঘটিত হোক, একটা সিম্পোজিয়মের আবহাওয়া তৈরি হোক। চিৎকার নয়, স্লোগান নয়, হাতহাতি-গালাগালি-হাত-বোমা-সোডার বোতল নয়, বাড়ির দেওয়াল বিধ্বস্ত করা এবং কুকুর-লেলানো নয়—শুধু 'ব্রাদার্স' অ্যান্ড সিটিজেনস'দের কাছে আত্মঘোষণাটুকু করলেই যথেষ্ট। 'কনশাস ভোটারের কাছে এর বেশি কিছুই দরকার নেই, তারপরে রইলেন ক্যানডিডেটরা, রইলাম আমরা আর রইল ব্যালট-বকস।

জানি, আপনারা অনেকেই প্রতিবাদ করবেন। এইসব উপলক্ষে যাঁদের প্রাপ্তি-যোগ থাকে—অর্থাৎ কর্মীর দল, প্রেস, মাইকওলা, কাগজ আর কাপড়ের দোকান, লরির মালিক, দড়ির ব্যাপারী, তাঁদের কিঞ্চিৎ আর্থিক বিপর্যয় দেখা দেবে। আর তা ছাড়া—যাকে ইলেকশনের 'টেম্পো' বলে—সেই দুরন্ত উন্মাদনা একেবারেই থাকবে না—গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচন নিতান্তই থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির মীটিংয়ের মতো পানসে হয়ে যাবে! অতএব—

অতএব, আমার প্রস্তাব কেউ কানে তুলবেন, এমন দুরাশা রাখি না। আর পাঁচ বৎসর পরের কথা ভাববার সময়ও যথেষ্ট হাতে আছে এখন। আপাতত যাঁরাই ভাগ্যবিধাতা হোন, মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী ইত্যাদি হোন, কমনম্যান সুনন্দরা তাঁদের কাছ থেকে রেশনে আরো কিছু চাল, আর একটু সস্তায় কাপড়, আরো কম পয়সায় মাছ, আরো কিছু সহজে ডাল-মসলা-ঝিঙে-বেগুন, রেল-গাড়িতে আর একটু বসবার জায়গা এবং বেকারের জন্য আরো ক'টা কাজকর্ম পেলেই ধন্য হয়ে যাবে।

হায়দরাবাদ হাউসে নির্বাচনী ফলাফল জানাবার ব্যাপক ব্যবস্থা

দিল্লির ডায়েরি

কলকাতার যারা অতি নিকটবর্তী, সন্দেহ নেই তাঁরা এই গেল ক'দিন যাপন করেছেন তীব্র নির্বাচন চাঞ্চল্য। সেই অনুপাতে এখানে হয়তো কিছুই না। কিন্তু আমাদের মতে, সাংবাদিকদের বেলায় তা হয়নি। এখানকার শ' তিনেক সাংবাদিক ব্যতিক্রম।

যে চাঞ্চল্য আর রাজনৈতিক অনুভূতি পাশ্চাত্ত্য অর্কেস্ট্রার ক্রেশেনদোর মতো উঠেছিল আর শব্দে ফেটে পড়ছিল, ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আমাদের ছেড়ে দেয়নি। অধিকাংশ দেশবাসী সরাসরি রাজনৈতিক জগতের আন্দোলনকে অনুভব করছিল, কিন্তু আমাদের বেলায় ওটা সংবাদের মাধ্যমে এসে, সংবাদ সংগ্রহ-পরিবেশন চাঞ্চল্যে পরিণত হচ্ছিল।

এই সংবাদ চাঞ্চল্যের কেন্দ্রস্থানটি ছিল রাজপথের অদূরবর্তী হায়দরাবাদ হাউস। পুরোনো ইংরাজ আমলের ঢঙে তৈরি, মাত্র বছর ত্রিশেকের পুরোনো এই প্রাসাদ, যা ছিল একদা নিজামের প্রাসাদ। তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় সেই প্রাসাদে এবার করলেন বিরাট এক তথ্য পরিবেশন কেন্দ্র যেমনটি এ যাবৎ আর কোনোদিন হয়নি। প্রশংসনীয় উদ্যম এবং প্রশংসার যোগ্য হলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রীঅশোক মিত্র এবং প্রধান তথ্য কর্মচারী শ্রী এম এল ভরদ্বাজ। এবং তাঁদের সহকর্মীরা, যথা গোবিন্দন, বাউরি, সাভুর, উমেশ তেওয়ারি, ত্রিবেদী, রামনাথন্, সুব্রহ্মণ্যম ইত্যাদি।

লম্বা হলঘর, কার্পেটে ঢাকা। ডজন ডজন সাংবাদিক ও অন্যান্যরা অনবরত কথা বলছে। কয়েক সারি টেলিফোন্। মিনিটে মিনিটে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে আকাশবাণী থেকে আর তথ্যকেন্দ্র থেকে। এখানে রেডিও ওখানে টেলিভিশন, আরো জায়গায় লাউড্স্পিকার। পাশে চলছে অনেক টেলিপ্রিন্টার সংবাদপত্র ও সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠান। অন্যপাশে পোস্ট-টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত, আপনার যেখানে খুশি তার করুন, টেলিফোন করুন (পয়সা দিয়ে), কি গৌহাটি কি ওয়াশিংটন্ কি টোকিয়ো। সমস্ত বন্দোবস্ত।

প্রবল উত্তেজনা। শ্রী ক (টেলিফোনে): "হ্যালো! লিখে নাও জল্‌দি, খাদ্যমন্ত্রী সুব্রহ্মণ্যম্ হেরে গেছেন..." রেডিয়ো: "সর্বশেষ সংবাদ এই যে, কংগ্রেস বিহার ও উড়িষ্যাতেও সরকার গঠনে অপারগ..."

মিস্টার খ: "আরে বোম্বে থেকে মেননের কিছু খবর...?" মিস্টার গ: "আরে গবেট্, চেয়ে দেখ, তোকে গিলে খাচ্ছে ঐ টেলিফোনের মেয়েটা—" মিস্টার ঘ: "কী হচ্ছে বলুন তো, এটা কি রাজনৈতিক ভূকম্প?" মিস্টার আমেরিকা: "তা হলে ইন্দিরাই হচ্ছে তো?" মিস্টর প্রাভ্দা: "তা হলে কামরাজও গেলেন?" মিস্টার সো-আন্ড-সো: "চুলোয় যাক্, আর উত্তেজনা সইতে পারছি না, চলো নিচে বারে গিয়ে বিয়ার খাই......!"

টেলিফোনে নির্বাচনের ফলাফল জানাবার জন্যে তৈরী হয়ে আছেন পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফের মহিলা কর্মিবৃন্দ

প্রাসাদে ঢুকতেই একটি কালো মার্বেল পাথরের মূর্তি, দেয়ালে ইতালিয়ান তেলরঙ ছবি। আশেপাশে কয়েকটা বোর্ড ওভার-সিজ্ কমিউনিকেশনের। নিচের তলায় মস্ত হলে সাংবাদিক বৈঠকের ব্যবস্থা। মাথার উপরে দামী কাচের ঝালর গোটা ছয়েক, পাশে আরো ছ'টা, দেয়ালে গোটা বারো বড় বড় আয়না।

কোনোদিন ছিল শোয়ার-ঘর। অনেক পরী আর হুরীরা তুড়ি মেরেছে ছোটো-খাটো আধুনিকাদের বাদশাজাদাদের নাকের উপর আর আলস্যে-লালস্যে কটাক্ষ হেনেছে উলঙ্গ আয়নায়। আর সেখানে কিনা অতি-গদ্য সাংবাদিক বৈঠক। উপরের বড় হলঘর ছিল নাচের ঘর। একদা এসেছে আপ্যায়িত হতে বহু বহু রাজকর্মচারী। সেখানে আসছে নির্বাচনের ফল। ওপাশের ঘরে, কোনোকালের বাংকোয়েট হল—সোনালী পর্দা, সোনালী চেয়ার, বহু মূল্যবান হলদে কার্পেট। সেখানে আজ শ' আড়াই কর্মচারী (প্রেস্ ইনফরমেশন্ ব্যুরোর) টেবিলে মাথা গ'ুজে টেলিগ্রাম এডিট্ করছে, গাদা গাদা ডেস্ক, এক একটি এক এক রাজ্যের জন্যে বরাদ্দ করা। বাঁ দিকে বাইরে ডজনখানেক টেলিপ্রিন্টারের কোলাহল, আর ডান দিকে মেশিনগুলোর পেট থেকে কলরব করে বেরুচ্ছে শত শত কপি, নির্বাচনের নাম আর অংক নিয়ে।

একুনে পাঁচ শো লোক কাজ করেছে তিন শিফ্‌টে ২০শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫শে। তা ছাড়া ছিল পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফের অনেক লোক : টেলিফোন, টেলিগ্রাম, টেলেক্স। এই দিকের কাজের দায়িত্ব ছিল শ্রী এস কে কাঞ্জিলালের উপর, এবং তিনি সাংবাদিকদের ধন্যবাদের পাত্র।

গত সাধারণ নির্বাচনে একটা ছোটখাটো কেন্দ্র হয়েছিল ১৯৬২-তে এখানকার সিটিয়োতে। গত বছর অমনি একটা খোলা হল হায়দরাবাদ হাউসে ত্রিশক্তি শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে। এবার এরা প্রথম চেয়েছিল সিটিয়োতে কিন্তু সেখানকার হলঘর অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল, পাওয়া যায়নি। তারপর চেষ্টা হল বিঠলভাই প্যাটেল ভবনে কিন্তু ওখানে ঘরগুলো ছোট, তথ্য কেন্দ্রের উপযুক্ত নয়। অতঃপর বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের শরণাপন্ন। প্রথম, সচিব মহাশয় "না" করেছিলেন কিন্তু অবশেষে সম্মত হলেন। মাত্র ৮।১০ দিনের প্রচেষ্টায় পোস্ট টেলিগ্রাফের লোকেরা বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেলল। ওদিকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের লোকেরাও কোমর বেঁধে লেগে গেল সংগঠনে। সকলের প্রচেষ্টা সার্থক-মণ্ডিত।

যদি ইন্দিরা গান্ধী আবার প্রধানমন্ত্রী হয়, তা হলে হায়দরাবাদ হাউস (বারোটি শয়নকক্ষ আর চারটে হলঘর) হবে প্রধান-মন্ত্রীর অতিথিশালা।

খগেন দে সরকার

চীন-যুদ্ধে পরাজয়ের দায়িত্ব

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

[এক]

জেনারেল ব্রজমোহন কলের সাক্ষ্য

চীনের সহিত ১৯৬২ সনের যুদ্ধে আমাদের সেনাবাহিনীর পরাজয় যে হইয়াছিল, তাহাতে আমি আশ্চর্য হই নাই. কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতেও পারি নাই। উপযুক্ত উদ্যোগ না থাকিলে হার হইতে পারে; কিন্তু কোনও অবস্থাতেই এই ধরনের শোচনীয় ও অপমানজনক হার হওয়া উচিত নয়। অক্টোবর মাসে যুদ্ধ বাধিবার বৎসরখানেক আগে হইতে আমাদের গভর্নমেণ্ট বারবার আশ্বাস দিতেছিলেন যে, চীন যদি আক্রমণ করে তাহা হইলে ভারতবর্ষ সমস্ত অবস্থার জন্য (for all eventualities) প্রস্তুত। এমন কি একবার যখন আমেরিকান দূত, প্রফেসর গ্যালব্রেথ, তাঁহার গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে এই কথা বলেন যে, চীনের সহিত যুদ্ধ বাধিলে আমেরিকা সহায়তা করিতে ইচ্ছুক তখন নেহরু প্রায় অপমানসূচক ভাষায় উত্তর দিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের এই সহায়তার প্রয়োজন নাই, ভারতবর্ষের নিজেকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা আছে। ইহার পর আমাদের এরূপ হার হইতে পারে, তাহা কল্পনা করি নাই, আর হারের পর আর্তনাদ করিয়া শুধু সেই আমেরিকার কাছেই নয়, সমস্ত পৃথিবীর কাছে 'রক্ষা কর', 'রক্ষা কর' বলিয়া শরণাপন্ন হইব তাহা ত স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

অন্য দেশ হইলে, অন্য জাতি হইলে এইরূপ হারের পর নিশ্চয়ই গভর্নমেণ্টের পরিবর্তন হইত, এমন কি মন্ত্রীদেরও শাস্তি হইত। পরাজয়ের জন্য যাহারা দায়ী তাহাদিগকে অনেক সময়ে অন্যায়ভাবেও শাস্তি দেওয়া হয়। বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে মাত্র একটির উল্লেখ করিব।

১৯২২ সনে মুস্তাফা কামালের হাতে পরাজয় হইবার পর ক্রুদ্ধ গ্রীকরা তিনজন ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী, দুইজন মন্ত্রী ও 'এশিয়ার বাহিনীর' প্রধান সেনাপতিকে নামমাত্র বিচারেই গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। অন্য যাহাদের শাস্তি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের বর্তমান রানীর শ্বশুর প্রিন্স অ্যানড্রুও ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের চেষ্টায় নির্বাসিত হইয়া ত্রাণ পান।

আমাদের দেশে হারের জন্য অবিচারে মারা দূরে থাকুক, সুবিচারে ভৎর্সনা পর্যন্ত করা হয় না। এই ব্যাপারে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে যাহা করি জাতিগত জীবনেও তাহাই করিয়াছি। এই অভ্যাস সম্বন্ধে একটা বাংলা প্রবাদ আছে—"কুকুর মারে, হাঁড়ি ফেলে না।" তাই আমরাও হারিবার পর কুকুর সম্বন্ধে তর্জন-গর্জন করিয়াছি, কিন্তু হাঁড়ি ফেলিবার কোনও আগ্রহ দেখাই নাই। অর্থাৎ চীনকে গালিগালাজ করিয়াছি ও করিতেছি, কিন্তু যে কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট হারের জন্য দায়ী তাহাকে একটি কথাও বলি নাই।

এমন কি এই হারের পর গভর্নমেণ্টের কাছ হইতে কোনও পরিষ্কার কৈফিয়ত পর্যন্ত চাওয়া হয় নাই। গভর্নমেণ্ট তো এই বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইলেনই না, সাধারণের পক্ষ হইতেও জেনারেল হেণ্ডারসন-ব্রুক্স-এর রিপোর্টের পর উহা প্রকাশ করিবার জন্যও কোনও আন্দোলন হইল না। গভর্নমেণ্ট শুধু এই কথা বলিয়াই খালাস হইলেন যে, উহা প্রকাশ করা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বা মঙ্গলের অনুকূল নয়। যদি রাষ্ট্র বা দেশের স্বার্থের সহিত কংগ্রেস গভর্নমেণ্টের স্বার্থ ও কল্যাণকে এক করা হয়, তাহা হইলে কথাটা সত্য, অন্য কোন দিক হইতে নয়। গভর্নমেণ্টের ভাব এই যে, আমরা যুদ্ধের ভার কনট্রাক্টরের হাতে দিয়াছিলাম, যেমন বাড়ী তৈরির ভার বা নিমন্ত্রণ খাওয়াইবার ভার দেওয়া হয়, সেই ঠিকাদার পারে নাই বা চুরি করিয়াছে, সুতরাং আমাদের কি দোষ!

জেনারেল কলের বই প্রকাশিত হইবার পর ব্যাপারটা অংশত বুঝিতে পারিয়াছি। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, এখনও সব কথা জানা যায় নাই। তবু যেটুকু জানা গিয়াছে, তাহারই উপযুক্ত আলোচনা, নিরপেক্ষ

আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু হইতেছে যাহা তাহা উপযুক্ত ত নয়-ই, নিরপেক্ষও নয়। সেই পুরাতন কুকুর মারা ও হাঁড়ি না ফেলিবার পুনরাবৃত্তি দেখিতেছি। এবারে কুকুর অবশ্য জেনারেল ক'ল।

যাঁহারা তাঁহার দ্বারা নিন্দিত বা অভিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা জেনারেলকে পাল্টা আক্রমণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তিনি নির্বোধ ও অকর্মণ্য, স্বার্থপরায়ণ ও অভদ্র, এমন কি কাপুরুষ, এইসব গালি নির্বিচারে দেওয়া হইতেছে। এইসব পক্ষপাতদুষ্ট ও দলীয় সমালোচক ছাড়া অনেক নিরপেক্ষ এবং নিঃস্বার্থ ব্যক্তিও তাঁহাকে দোষী করিতেছেন।

আমাদের দেশে একটা ভালমানুষির ধারা আছে। এই নিরীহ ভালমানুষি কোন অপ্রীতিকর গণ্ডগোল, কোন প্রবল ঘাত-প্রতিঘাত, কোন নির্ভীক সত্যভাষণ সহ্য করিতে পারে না। উহার এক কাজ নীতিকথা কপচাইয়া 'চাপা দাও', 'চাপা দাও' এই চীৎকার করা। কোনও রাজনৈতিক গণ্ডগোল সম্বন্ধে এই নীতিকথা বলা আমাদের একেবারে ধাতস্থ হইয়া গিয়াছে—যেমন সকলেই বলিতেছেন যে, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধীর নাক লোষ্ট্রাঘাতে ভাঙিয়া দেওয়া অত্যন্ত গণতন্ত্রবিরোধী অভব্য কাজ হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে ভবিষ্যতে নাকভাঙা বা গণতন্ত্রবিরোধী কাজ বন্ধ হইবে কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের কোন মাথাব্যথা নাই। নীতিকথা আওড়াইয়া মনের কষ্ট বা ভীতি ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলেই হইল। ইহা বিজ্ঞের কাজ নয়; ভীরু, মোহগ্রস্ত ব্যক্তির কাজ।

সামরিক ব্যাপারে এই ধরনের নীতিকথা আরও অপ্রাসঙ্গিক, আরও অর্থহীন। সেনাপতিদের ঝগড়া পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন নয়। দুই সেনাপতির রেষারেষি অবলম্বন করিয়াই হোমার এত বড় 'ইলিয়াড' লিখিয়াছিলেন। উহার প্রথম ছত্রেই আগামেমনন্-এর উপরে একিলিস-এর ক্রোধের কথা আছে।

আর পরাজিত হইলে এক সেনাপতির যে অন্য সেনাপতির উপর রাগ হয় তাহা বলিবারই আবশ্যক করে না। যুধিষ্ঠির কর্ণের হাতে মার খাইয়া অর্জুনকে এমনই ভর্ৎসনা ও অপমান করিলেন যে, অর্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মাথা কাটিয়া ফেলিতে উদ্যত হইলেন। নেপোলিয়ন যুধিষ্ঠিরের মত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন না, তাই ওয়াটারলুর পরাজয়ের জন্য মার্শাল গ্রুশিকে গালি দেন নাই, প্রকারান্তরে এমনই দোষী করিলেন যে, ঐতিহাসিকেরা আজও তাহার প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই।

আর সাধারণ পাঠকের বৈদগ্ধ্যের অভাব সম্বন্ধে তো কিছু বলারই প্রয়োজন নাই। জেনারেল ক'লের বইটি যে বিক্রি হইতেছে ও বহু লোক পড়িতেছেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু পড়াটা হইতেছে অসংগত উদ্দেশ্যে—মানসিক চাট খাইবার জন্য, মুখরোচক নিন্দা ও কলহের কাহিনী শুনিবার জন্য। ইহা একটা নূতন ধরনের তরজা, কবির লড়াই ও খেউড় শুনিবার আগ্রহ মাত্র। যদি বাঙালী পাঠক সত্যকার সামরিক কবির লড়াই শুনিতে চান, তাহা হইলে অন্ততপক্ষে দুইটি ইংরেজী বই পড়িতে বলিব—অ্যাডমিরাল লর্ড ফিশারের আত্মকথা ও ফিল্ড-মার্শাল স্যার হেনরী উইলসনের ডায়ারী। সেনাপতিদের পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাব ও অবজ্ঞা ন্যায্যই হউক বা অন্যায্যই হউক উহা স্বাভাবিক। এমন কি ফিল্ড-মার্শাল স্যার ডগলাস্ (পরে লর্ড) হেগ্ অতি ভদ্র হইয়াও উহার আশ্লেষ ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে ১ম ব্রিটিশ কোরের সেনাপতি হিসাবে তিনি ডায়ারীতে লিখিয়াছিলেন যে, ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ফিল্ড-মার্শাল স্যার জন ফ্রেঞ্চ এই পদের অযোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও সেনাপতিদের পরস্পর-বিরাগের কাহিনী বহু প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং নূতন করিয়া এই কাহিনী পড়িবার আগ্রহ সামরিক ইতিহাসের খোঁজ যে ব্যক্তি রাখে তাহার হইবার নয়। আমারও নাই।

তবু অন্য কারণে জেনারেল ক'লের বই মন দিয়া, বিচার করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া পড়া আমি উচিত মনে করি। উহার বিশেষ মূল্য আছে এই কারণে যে, উহাতে একটা গুরুতর প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। প্রশ্নটা এই—কোনও যুদ্ধ চালাইবার, এবং উহার পূর্বে যুদ্ধের আয়োজন-উদ্যোগ করিবার যোগ্যতা আমাদের বর্তমান গভর্নমেণ্টের ও আমাদের সেনাপতিদের কতটুকু? এই প্রসঙ্গে জেনারেল ক'ল যেসব তথ্য ও খবর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভীতিকর। কিন্তু
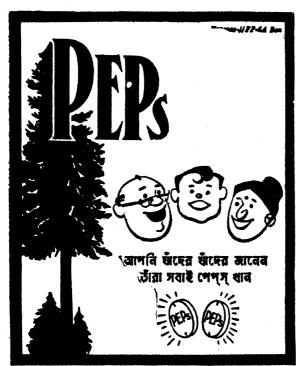
এগুলির তাৎপর্য বিচার করিবার আগে আর একটা বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দরকার—জেনারেল কাঁলের বিবরণের মূল্য কতটুকু উহা কি বিশ্বাসযোগ্য?

আমি জেনারেলের অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার আগে অভিযুক্ত পক্ষের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়াছি। আজ পর্যন্ত কোনও উত্তর আসে নাই। তিনজন তাঁহার কথার স্পষ্ট প্রতিবাদ করিতে পারিতেন। ইঁহারা শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেনন ও জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী। কেহ যুদ্ধং দেহি বলিলে তরবারি খাপে রাখিয়া অবিচলিত ধৈর্য ধরিয়া থাকিবার প্রমাণ ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী বা মেনন মহাশয় কখনও দেখান নাই। নাকে আঘাত পাইয়াও ইন্দিরা গান্ধী যাহা বলিয়াছিলেন উহা বীর রমণীর উক্তি। আর মেনন সাহেবের মৌখিক বীরত্বে তো আমেরিকা প্রায় ভারতদ্বেষী হইতে বসিয়াছিল। কিন্তু ইহাদের দুইজনেই বলিয়াছেন যে, তাঁহারা জেনারেল কাঁলের মতামত লইয়া আলোচনা করিতে চান না। আর জেনারেল চৌধুরী সামরিক পদে থাকিয়া খবরের কাগজের জন্য লিখিতেন. তিনি জেনারেল কাঁলের বিরুদ্ধে একটা কিছু বলিলে বা লিখিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইত না। তিনিও বলিয়াছেন যে, তাঁহার এ বিষয়ে কোন বক্তব্য নাই।

ইহার উপর আর একজন ব্যক্তি যাহা করিয়াছেন তাহা হাস্যকর। সমর বিভাগের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত খেরা শাসাইয়াছেন যে, তিনি ভবিষ্যতে বই লিখিয়া দেখাইবেন যে, জেনারেল কাঁল কিরূপে মিথ্যা আক্রমণ করিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিব, কোন্ কোন্ ব্যাপারে কাঁল মিথ্যা কথা বলিয়াছেন তাহা এখনই বলিয়া দিতে কি বাধা ছিল? মিথ্যাভাষী জেনারেল নিশ্চয়ই মানহানির মকদ্দমা করিয়া খেরা সাহেবের কিছু করিতে পারিতেন না। ইঁহার আস্ফালন পড়িয়া আমার 'রজনী' উপন্যাসের হীরালালের কথা মনে পড়িয়াছিল; হীরালাল শাসাইয়াছিল রজনীর নামে খবরের কাগজে আর্টিকেল লিখিবে।

কোথাও হইতে স্পষ্ট প্রতিবাদ ও খণ্ডন যখন আসে নাই, তখন আমি ধরিয়া লইতেছি যে, জেনারেল কাঁল যেসব কথা বলিয়াছেন তাহা মোটামুটি সত্য। তাহা ছাড়া, আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার যে, তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার জন্য উহাকে শাস্তি দেওয়া, এমন কি জেলে দেওয়া হইতে পারে। কোনও সরকারী কর্মচারী কর্মসূত্রে যেসব খবর বা তথ্য জানিতে পায় তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। জেনারেল এই ঝুঁকি লইয়াছেন। সুতরাং তিনি বিশ্বাসযোগ্য এই কথা আমি ধরিয়া লইব।

তবু তাঁহার নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা আমি করিব। যাঁহারা তাঁহার তথ্যের প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা জেনারেলের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের অভিযোগ আনিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এইসব কাজ করিতে পারে তাহার সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। ইহা সাক্ষীর জেরায় উকিলের নানাপ্রকার ব্যক্তিগত ও চরিত্রগত প্রশ্ন তুলিবার মত। যেহেতু এই ধরনের প্রশ্ন তোলাকে আমি অবান্তর বলিতে পারি না, সেই কারণে আমি এইসব গৌণ অভিযোগ বা ইঙ্গিত সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে চাই।

প্রথম অভিযোগ—গোপন সামরিক তথ্য প্রকাশ করিয়া জেনারেল কাঁল অত্যন্ত নীতিবিরুদ্ধ কাজ করিয়াছেন। ধরিয়া লইলাম কথাটা সত্য, কিন্তু উহাতে তাঁহার দ্বারা

প্রকাশিত তথ্যগুলি মিথ্যা হইয়া যাইবে না। কিন্তু শুধু সরকারী নিয়মাবলীর দিক দেখিলে যাহা নীতিবিরুদ্ধ, দেশের দিক হইতে দেখিলে তাহা নীতিবিরুদ্ধ নাও হইতে পারে। জেনারেল ক'লের "নীতি-বিরুদ্ধ" কাজ হইতে যে আমাদের দেশের মঙ্গল হইতে পারে উহা বলিতে আমার অন্তত কোনও সংকোচ নাই।

দ্বিতীয় অভিযোগ—জেনারেল ক'ল নেহরুর নিন্দা বা পরিবাদ করিয়াছেন। নেহরুর নিন্দা কোনও মহাপাতক নয়, কিন্তু মিথ্যা নিন্দা অন্যায়। জেনারেল ক'ল নেহরু সম্বন্ধে মিথ্যা নিন্দা প্রচার করিয়াছেন তাহা প্রমাণ হয় নাই।

তৃতীয় অভিযোগ—তিনি নিজের সাফাই গাহিয়াছেন। কোন সেনাপতি গাহেন নাই? সাফাই না গাহিয়া মুখ বুজিয়া মিথ্যা নিন্দা সহ্য করিয়াছেন, এরূপ একটিমাত্র সেনাপতির কথা আমি পড়িয়াছি। বাকী বড় সেনাপতিদের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি নিজের গুণকীর্তন একরকমে বা অন্যরকমে না করিয়াছেন।

চতুর্থ অভিযোগ—তিনি অন্যকে ছাড়াইয়া প্রোমোশ্যান পাইয়াছেন। তাঁহার সহকর্মী সেনাপতিদের মধ্যেও অনেকে এইরূপ প্রোমোশ্যান পাইয়াছেন। তাঁহাদের নাম করিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ প্রোমোশ্যান সব সেনাবাহিনীতেই হয়, না থাকিলে সেনাবাহিনী ও সমরনীতির উৎকর্ষ হয় না। শুধু সিনিয়রিটি দ্বারা প্রোমোশ্যানের মত অনিষ্টকর ব্যাপার কিছুই নাই। তবে যাঁহাদের ছাড়াইয়া প্রোমোশ্যান দেওয়া, তাঁহারা কখনই এইরূপ প্রোমোশ্যানকে ন্যায্য বলিতে পারেন না।

পঞ্চম অভিযোগ—তিনি পরিচয় ও আত্মীয়তাসূত্রে উপরে উঠিয়াছেন, যোগ্যতা দ্বারা উঠেন নাই। ব্যক্তিগত যোগাযোগ-নির্বিশেষে শুধু সামরিক যোগ্যতা বিবেচনা করিয়া প্রোমোশ্যান দেওয়া উচিত উহা খুব ন্যায্য কথা। কিন্তু ইহাও সত্য এবং অবিসংবাদিত কথা যে, সকল দেশে ও সকল কালেই ব্যক্তিগত যোগাযোগের ফলে সেনাপতিরা প্রোমোশ্যান পাইয়াছেন।

ইহার ফলে কখনও কখনও অযোগ্য ব্যক্তি সেনাপতি হইয়াছে, কিন্তু যোগ্য ব্যক্তির সেনাপতি হইতেও বাধা হয় নাই। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে সেনাবাহিনীতে হেগ্-এর ও নৌবাহিনীতে বিটির উন্নতি কিয়দংশে সামাজিক প্রতিপত্তির জন্য হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রে কার্যক্ষেত্রে কৃতিত্ব বা কৃতিত্বের অভাব না দেখা পর্যন্ত দোষগুণ বিচার করা যায় না। জেনারেল ক'লের ক্ষেত্রে এটা বলা দরকার যে, তিনি নেহরুর আত্মীয় ন'ন, এবং কোন সময়েই তাঁহার পদোন্নতি নেহরুর জন্য হয় নাই।

ষষ্ঠ অভিযোগ—তিনি যুদ্ধে কোন বড় বাহিনী পরিচালনা করেন নাই। কোনও যুদ্ধে বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হইবার জন্য আগেকার যুদ্ধে সেনাপতিত্বের অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে, নহিলে সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা নাই—ইহা কাজের কথা নয়, ইতিহাসে উহার বহু ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি।

ফিল্ড-মার্শাল মন্‌গমারীর মিশরে অষ্টম আর্মির সেনাপতি হইবার আগে যুদ্ধে বড় বাহিনী চালাইবার অভিজ্ঞতা বেশী ছিল না—১৯৪০ সনের পরাজয়ের সময়ে তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধে মাত্র ডিভিশ্যানের স্টাফ-অফিসার পর্যন্ত উঠিয়াছিলেন। রুশ বাহিনীর বিখ্যাত সেনাপতি জুকভ প্রথম মহাযুদ্ধে সাধারণ পদাতিক, পরে হাবিলদার মাত্র হইয়াছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মান পক্ষে লুডেনডর্ফের অপেক্ষা দক্ষতা কেহই দেখান নাই, বেশী খ্যাতি কেহ অর্জন করেন নাই, কিন্তু তাঁহার পূর্বেকার যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না।

নেপোলিয়ন যখন ২৭ বৎসর বয়সে ইটালীতে ফরাসী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন, তখন তাঁহার বড় বাহিনীর পরিচালনার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। যাঁহাদের মাথার উপরে তাঁহাকে বসান হইল তাঁহারা তখনই বিখ্যাত সেনাপতি, যুদ্ধে অভিজ্ঞ—মেরুরিয়ে, ওজেরো, মাসেনা, লা হার্প, সেরোঁনি। নেপোলিয়নকে দেখিয়া তাঁহারা হাসিবেন, কি কাঁদিবেন বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন, প্যারিসের রাস্তায় গভর্নমেন্টের বিরোধী দাঙ্গাকারীদের দমনের জোরে তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া আরও খারাপ কথাও বলা হইল যে, নেপোলিয়ন নিযুক্ত হইয়াছেন ডিরেক্টরদের মধ্যে অন্যতম বাররাসের
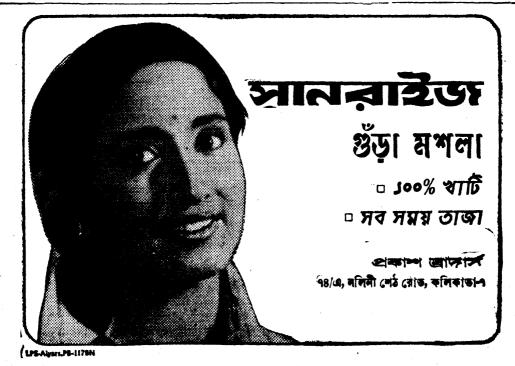
পূর্বতন উপপত্নী জোসেফিনকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া।

আমি বলিতে চাই না যে, জেনারেল ক'ল মন্‌গমারী বা জুকভ বা লুডেনডর্ফের সমকক্ষ। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, তাঁহার পূর্ব-অভিজ্ঞতার কথা তোলা অবান্তর। শুধু অভিজ্ঞতার জনাই সেনাপতি নিযুক্ত হয় না। তাহা হইলে বিখ্যাত মল্‌টকে ১৮৭০ সনে জার্মান বাহিনীর সেনাপতিত্ব করিতে পাইতেন না। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নাই, এই ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে ফ্রেডারিক দি গ্রেট বলিয়াছিলেন, "শুধু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থাকিলেই যদি বড় সেনাপতি হওয়া যাইত, তাহা হইলে প্রিন্স ইয়ুজীনের খচ্চররা সর্বাপেক্ষা বড় সেনাপতি—তাহাদের বিশটা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে।"

সপ্তম অভিযোগ—জেনারেল ক'ল বিপদ দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া দিল্লী চলিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার অপেক্ষা অন্যায় অভিযোগ কিছু হইতে পারে না। জেনারেল ক'ল ডাক্তারের পীড়াপীড়িতে ১৮ই অক্টোবর দিল্লী আসেন, চীন বাহিনী আক্রমণ করে ২০শে। তিনি যখন আসেন তখন যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা আগের অপেক্ষা ভালও নয়, মন্দও নয়—কয়েক দিন ধরিয়া একই রকম চলিয়াছে। আর আমাদের সেনাবাহিনীর দিক হইতে আক্রমণ করিবার কোন প্রশ্নই যে তখন ছিল না, তাহার আলোচনা পরে করিব। ১৮ তারিখে তাঁহার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব ছিল না যে, ২০ তারিখে চীন বাহিনী আক্রমণ করিবে।

এই অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া আসা যদি জেনারেল ক'লের পক্ষে অন্যায় হইয়া থাকে তাহা হইলে ১৯৪২ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে রমেলের পক্ষে এল আলামেনের যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া চিকিৎসার জন্য জার্মেনী যাওয়াও অন্যায় হইয়াছিল। তখন সবেমাত্র জার্মান বাহিনীর একটা গুরুতর হার হইয়াছে ও ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণের ঠিক এক মাস বাকী, পুরা আয়োজন চলিতেছে। ইহা ছাড়া বলা দরকার, ব্রিটিশ আক্রমণ আরম্ভ হইবার পর রমেল যেমন হাসপাতাল ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তেমনই ভাল হইবামাত্র জেনারেল ক'লও পূর্বোত্তর সীমান্তে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, এই যুদ্ধে আমাদের বাহিনীর জয়ের কোনও আশা নাই, এই অবস্থায় সেনাপতিত্ব ছাড়িয়া দিয়া তিনি কলঙ্ক এড়াইতে পারিতেন। তিনি তাহা করেন নাই। প্রায় বাচিয়া পরাজয়ের দায়িত্ব লইবার সাহস অন্তত তিনি দেখাইয়াছিলেন।

অষ্টম অভিযোগ—জেনারেল ক'ল হারিয়াছেন। যুদ্ধে হার-জিত দৈবের ব্যাপার। হাজার কৃতী বা অভিজ্ঞ হইলেও কেহ বলিতে পারে না যে, সে যুদ্ধে জিতিবেই। সেনাপতির কাছে হার-জিত দুই সমান। যোদ্ধা মাত্রেই জয়ের যশের জন্য যেমন উন্মুখ, পরাজয়ের কলঙ্ক বহিবার জন্যও তেমনই প্রস্তুত। উহা প্রায় ভাগ্যের কথা। হারিলে বিনা দোষেও সেনাপতিদের শাস্তি পাইতে হয়। ওয়েভেল বা অখিনলেক কেহই নিজের দোষে হারেন নাই, কিন্তু দুইজনকেই সেনাপতিত্ব হইতে অপসৃত হইতে হইয়াছিল।

নবম অভিযোগ—জেনারেল ক'ল তাঁহার লেখায় সুরুচি বা শালীনতা দেখান নাই। হয়ত বা তিনি তাঁহার বক্তব্য আরও নরম ভাবায় বলিতে পারিতেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি যাঁহাদের আক্রমণ করিয়াছেন তাঁহাদের কেহই সুরুচি বা শালীনতায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে,

শ্রীযুক্ত মেননের অশালীন ভাষা ও অভদ্র ব্যবহার জগদ্বিখ্যাত। আমাদের দেশে যাঁহারা উপরে আছেন তাঁহারা যেভাবে নিম্নতন লোকের উপর দোষারোপ ও কটূক্তি করেন, তাহাতে ভালমানুষি করিলে প্রতিকারের পথ ছাড়িতে হয়।

আমি জেনারেল কল সম্বন্ধে এত আলোচনা করিলাম এইজন্য যে, তাঁহার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমি চীন-যুদ্ধে পরাজয়ের দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাই তাঁহার কথা বিশ্বাসযোগ্য কিনা, তাঁহার চরিত্র ও কার্য-কলাপ এমন কিনা যাহাতে তাঁহার কথার কোনও মূল্য দেওয়া যায় না—এই বিষয়ে পরিষ্কার আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

আমি এই কথা বলিব—জেনারেল কল নিজের সাফাই যদিও গাহিয়াছেন তবু তিনি যেভাবে এই কাজ করিয়াছেন, যে সুরে বইখানা লিখিয়াছেন তাহার অপেক্ষা না রাখিয়া তাঁহার বক্তব্য বিচার করা উচিত। এইবার আমি তাঁহার অভিযোগের প্রসংগে চীনযুদ্ধে পরাজয়ের কারণ আলোচনা করিব।

(ক্রমশ)

উপক্রম

ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল মাস তিনেক আগে এবং কলকাতার দক্ষিণ অঞ্চলেই আবদ্ধ হয়ে ছিল।

গোল পার্কের আর-পার একটা রাস্তার কোণের ওপর একটি অস্থায়ী চায়ের দোকান। দিনের আলো ফোটবার আগেই সেখানে চা তৈরী হয়ে যায়। মাটির ভাঁড়ে গরম চা। সঙ্গে বিস্কুটও পাওয়া যায়। এই দোকানের অধিকাংশ খদ্দের ট্যাক্সি ড্রাইভার, বাস কন্ডাক্টার ইত্যাদি। যাদের খুব সকালে কাজে বেরুতে হয় তারা এই দোকানের পৃষ্ঠপোষক।

বুড়ো ভিখিরি ফাগুরাম ছিল এই দোকানের খদ্দের। সে রাত্রে ফুটপাথের একটা খোঁজের মধ্যে শুয়ে থাকত। ভোর হতে না হতে দোকান থেকে এক ভাঁড় চা আর দুটি বিস্কুট কিনে তার ভিক্ষাস্থানে গিয়ে বসত। ফাগুরামের বয়স অনেক, উপরন্তু সে বিকলাঙ্গ, তাই দিনান্তে সে এক টাকার বেশী রোজগার করত।

সেদিন ফাগুন মাসের প্রত্যূষে আকাশ থেকে তখনো কুয়াশার ঘোর কাটেনি. ফাগুরাম দোকান থেকে চায়ের ভাঁড় আর বিস্কুট নিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসল। চায়ের দোকানে লোক থাকলেও রাস্তায় তখনো লোক চলাচল আরম্ভ হয়নি।

ফাগুরামের অভ্যাস সে রাস্তার দিকে পিছন ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে খায়। সে এক চুমুক চা খেয়ে বিস্কুটে একটি ছোট্ট কামড় দিয়েছে, তার মনে হল পিছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। সে পিছন দিকে ঘাড় ফেরালো, কিন্তু স্পষ্টভাবে কিছু দেখবার আগেই সে পিঠের বাঁ দিকে কাঁটা ফোটার মত তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করল। অর্ধভুক্ত বিস্কুট তার হাত থেকে পড়ে গেল। তারপর সব অন্ধকার হয়ে গেল।

ভিক্ষুক ফাগুরামের অপমৃত্যুতে বিশেষ হইচই হল না। দিনের আলো ফুটলে তার মৃতদেহটা পথচারীদের চোখে পড়ল, তারা মৃতদেহকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তারপর লাশ স্থানান্তরিত হল। খবরের কাগজের এক কোণে খবরটা বেরুল বটে, কিন্তু সেটা মারণাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যের জন্যে। ভিক্ষুকের পিঠের দিক থেকে একটা ছয় ইঞ্চি লম্বা শজারুর কাঁটা তার হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সংবাদপত্রে যারা খবরটা পড়ল তারা এই নিয়ে একটু আলোচনা করল। ভিক্ষুককে কে খুন করতে পারে? হয়তো অন্য কোনো ভিক্ষুক খুন করেছে। কিন্তু শজারুর কাঁটা কেন? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর নেই। পুলিস এ ব্যাপার নিয়ে বেশী দিন মাথা-ঘামাল না।

মাসখানেক পরে কিন্তু ভিক্ষুকের অপমৃত্যুর কথাটা আবার সকলের মনে পড়ে গেল। আবার শজারুর কাঁটা। রাত্রে রবীন্দ্র সরোবরের একটা বেঞ্চিতে শুয়ে একজন মুটে-মজুর শ্রেণীর লোক ঘুমোচ্ছিল, আততায়ী কখন এসে নিঃশব্দে তার বুকের বাঁ দিকে শজারুর কাঁটা বিঁধে দিয়ে চলে গেছে। সকালবেলা যখন লাশ আবিষ্কৃত হল তখন মৃতদেহ শক্ত হয়ে গেছে। মৃতের পরিচয় তখনো জানা যায়নি।

এবার সংবাদপত্রের সামনের দিকেই খবরটা বেরুল এবং বেশ একটু সাড়া জাগিয়ে তুলল। ছোরাছুরির বদলে শজারুর কাঁটা দিয়ে খুন করার মানে কি! খুনী কি পাগল? ক্রমে মৃত ব্যক্তির পরিচয় বেরুল, তার নাম মঙ্গলরাম; সে সামান্য একজন মজুর, তার থাকবার জায়গা ছিল না তাই যখন যেখানে সুবিধা হত সেখানে রাত কাটাত। তার শত্রু কেউ ছিল না, অন্তত খুন করতে পারে এমন শত্রু ছিল না। পুলিস দু'-চার দিন তল্লাশ তদন্ত করে হাল ছেড়ে দিল।

তৃতীয় দিনের ঘটনাটা হল আরো দু' হপ্তা পরে। গরম পড়ে গেছে, দোকানপাট বেশ দেরিতে বন্ধ হয়। দিন বাড়ছে, রাত কমছে।

গুণময় দাসের জীবনে সুখ ছিল না। তাঁর একটি ছোট মনিহারীর দোকান আছে, একটি ছোট পৈতৃক বাস্তুভিটা আছে। আর আছে একটি প্রচণ্ড দজ্জাল বউ। তার চল্লিশ বছর বয়সেও ছেলেপুলে হয়নি, হবার আশাও নেই। তাই রসের অভাবে তাঁর জীবনটা শুকিয়ে ঝামা হয়ে গিয়েছিল। তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে মদ ধরেছিলেন। জীবন যখন শুকোয়ে যায় তখন ওই বস্তুটি নাকি করুণাধারায় নেমে আসে।

রাত্রি ন'টার সময় গুণময়বাবু দোকান বন্ধ করে বাড়ির অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে তাঁর প্রাণে কোনো উৎসাহ ছিল না, বরং বাড়ি ফিরে গিয়ে আজ তিনি স্ত্রীর কোন্ প্রলয়ঙ্কর মূর্তি দেখবেন এই চিন্তায় তাঁর

পদক্ষেপ মন্থর হয়ে আসছিল। তারপর সামনেই যখন মদের দোকানের দরজা খোলা পাওয়া গেল তখন তিনি সুট করে সেখানে ঢুকে পড়লেন।

আধ ঘণ্টা পরে দোকান থেকে বেরিয়ে তিনি আবার গড়িয়ার দিকে চললেন; ওই দিকেই তাঁর বাড়ি। যেতে যেতে তাঁর পা একটু টলতে লাগল, তিনি বুঝলেন, আজ মাত্রা একটু বেশী হয়ে গেছে। স্ত্রী যদি বুঝতে পারে, যদি মুখে গন্ধ পায়—

আরো কিছু দূর যাবার পর রবীন্দ্র সরোবরের রেলিং আরম্ভ হল রাস্তার ডান পাশে। পথে লোকজন বেশী নেই, লেকের অন্ধকার এবং রাস্তার আলো মিলে একটা অস্পষ্ট কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করেছে।

গুণময়বাবু রাস্তার একটা নিরিবিলি অংশে এসে লেকের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন, রেলিং-এ হাত রেখে প্যাঁচার মত চক্ষু মেলে ভিতরের দিকে চেয়ে রইলেন।

একটি লোক গুণময়বাবুর কুড়ি পঁচিশ হাত পিছনে আসছিল; সে গুণময়বাবুর পদসঞ্চারের টলমল ভাব লক্ষ করেছিল। তাই তিনি যখন রেলিং ধরে দাঁড়ালেন তখন সেও বিশ-পঁচিশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁকে নিরীক্ষণ করে অলস পদে তাঁর দিকে অগ্রসর হল।

লোকটি যখন গুণময়বাবুর পিছনে এসে দাঁড়াল তখনো তিনি কিছু জানতে পারলেন না। লোকটি এদিক ওদিক চেয়ে দেখল রাস্তায় লোক নেই। সে পকেট থেকে শলাকার মত একটি অস্ত্র বার করল, অস্ত্রটিকে আঙুল দিয়ে শক্ত করে ধরে গুণময়বাবুর পিঠের বাঁ দিকে পাঁজরার হাড়ের ফাঁক দিয়ে গভীরভাবে বিঁধিয়ে দিল। গুণময়বাবুর গায়ে মলমলের পাঞ্জাবী ছিল, শলাকা সটান তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করল।

গুণময়বাবু পলকের জন্যে বুকে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করলেন, তারপর তাঁর সমস্ত অনুভূতি অসাড় হয়ে গেল।

অতঃপর খবরের কাগজে তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হল। একটা বেহেড পাগল শজারুর কাঁটা নিয়ে শহরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু অকর্মণ্য পুলিস তাকে ধরতে পারছে না, এই আক্ষেপের উষ্মা কলকাতার অধিবাসীদের বিশেষত দক্ষিণ দিকের অধিবাসীদের গরম করে তুলল। বৈঠকে বৈঠকে উত্তেজিত জল্পনা চলতে লাগল। সন্ধ্যার পর পার্কের জনসমাগম প্রায় শূন্যের কোঠাতে গিয়ে দাঁড়াল।

এইভাবে দিন দশ বারো কাটল। বলা বাহুল্য আততায়ী ধরা পড়েনি, কিন্তু উত্তেজনার আগুন স্তিমিত হয়ে এসেছে। একদিন ব্যোমকেশের কেয়াতলার বাড়িতে রাত্রি সাড়ে ন'টার পর ইন্সপেক্টর রাখাল-বাবু এসেছিলেন, অজিতও উপস্থিত ছিল। স্বভাবতই শজারুর কাঁটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

অজিত বলল—'কিন্তু এত অস্ত্রশস্ত্র থাকতে শজারুর কাঁটা কেন?'

রাখালবাবু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আড়চোখে ব্যোমকেশের পানে তাকালেন; ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে বলল, —'সম্ভবত আততায়ীর পোষা শজারু আছে। বিনামূল্যে কাঁটা পায় তাই ছোরাছুরির দরকার হয় না।'

অজিত বলল—'বাজে কথা বলো না। নিশ্চয় কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। আচ্ছা রাখালবাবু, এই যে তিন তিনটে খুন হয়ে গেল, আসামী তিনজন কি একজন সেটা বুঝতে পেরেছেন?'

রাখালবাবু বললেন—'একজন বলেই তো মনে হয়।'

ব্যোমকেশ বলল—'তিনজন হতেও বাধা নেই। মনে কর, প্রথমে একজন হত্যাকারী ভিখিরিকে শজারুর কাঁটা দিয়ে খুন করল। তাই দেখে আর একজন হত্যা-কারীর মাথায় আইডিয়া খেলে গেল, সে একজন ঘুমন্ত মজুরকে শজারুর কাঁটা দিয়ে খুন করল। তারপর—'

'আর বলতে হবে না, বুঝেছি। তিন নম্বর হত্যাকারী তাই দেখে একজন দোকানদারকে খুন করল।'

ব্যোমকেশ বলল—'সম্ভব। কিন্তু যা সম্ভব তাই ঘটেছে এমন কথা বলা যায় না। তার চেয়ে ঢের বেশী ইঙ্গিতপূর্ণ কথা হচ্ছে, যারা খুন হয়েছে তাদের মধ্যে একজন ভিখিরি, একজন মজুর এবং এক-জন দোকানদার।'

'এর মধ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ কী আছে, আমার বুদ্ধির অগম্য। তোমরা গল্প কর, আমি শুতে চললাম।' অজিত উঠে গেল। তার আর রহস্য-রোমাঞ্চের দিকে ঝোঁক নেই।

রাখালবাবু ব্যোমকেশের পানে চেয়ে মৃদু হাসলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন—'সত্যিই কি পাগলের কাজ? নইলে তিনজন বিভিন্ন স্তরের লোককে খুন করবে কেন? কিন্তু পাগল হলে কি সহজে ধরা যেত না?'

ব্যোমকেশ বলল—'পাগল হলেই ন্যালাক্ষ্যাপা হয় না। অনেক পাগল আছে যারা এমন ধূর্ত যে, তাদের পাগল বলে চেনাই যায় না।'

রাখালবাবু বললেন—'তা সত্যি। ব্যোমকেশ-দা, আপনি যতই থিওরি তৈরি করুন, আপনার অন্তরের বিশ্বাস, একটা লোকই তিনটে খুন করেছে। আমারও তাই বিশ্বাস। এখন বলুন দেখি, যে

লোকটা খুন করেছে সে পাগল—এই কি আপনার অন্তরের বিশ্বাস?'

ব্যোমকেশ নিরখাস্তরে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর কি একটা বলবার জন্যে মুখ তুলেছে এমন সময় দ্রুতচ্ছন্দে টেলিফোন বেজে উঠল। ব্যোমকেশ টেলিফোন তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ শুনল, তারপর রাখালবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—'তোমার কল্।'

ফোন হাতে নিয়ে রাখালবাবু বললেন—'হ্যালো—' তারপর অপর পক্ষের কথা শুনতে শুনতে তাঁর মুখের ভাব বদলে যেতে লাগল। শেষে—'আচ্ছা, আমি আসছি' বলে তিনি আস্তে আস্তে ফোন রেখে দিলেন, বললেন—'আবার শজারুর কাঁটা। এই নিয়ে চারবার হল। এবার উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রলোক। কিন্তু আশ্চর্য! ভদ্রলোক মারা যাননি। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

ব্যোমকেশ চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলল—'মারা যাননি?'

রাখালবাবু বললেন—'না। কি যেন একটা রহস্য আছে। আমি চলি। আসবেন নাকি?'

ব্যোমকেশ বলল—'অবশ্য।'

কাহিনী

দক্ষিণ কলকাতায় ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের নতুন রাস্তার ওপর একটি ছোট দোতলা বাড়ি। বাড়ির চারদিকে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। খোলা জায়গায় এখানে ওখানে কয়েকটা অনাদৃত ফুলের গাছ।

বাড়িটি কিন্তু অনাদৃত নয়। বাড়ির বহিরঙ্গ যেমন ফিকে নীল রঙে রঞ্জিত এবং সুশ্রী, ভিতরটিও তেমনি পরিচ্ছন্ন ছিমছাম। নীচের তলায় একটি বসবার ঘর; তার সঙ্গে খাবার ঘর, রান্নাঘর এবং চাকরের ঘর। দোতলায় তেমনি একটি অন্তরঙ্গ বসবার ঘর এবং দু'টি শয়নকক্ষ। বছর চার-পাঁচ আগে যিনি এই বাড়িটি প্রৌঢ় বয়সে তৈরি করিয়েছিলেন তিনি এখন গতাসু, তাঁর একমাত্র পুত্র দেবাশিস এখন সস্ত্রীক এই বাড়িতে বাস করে।

একদিন চৈত্রের অপরাহ্ণে দোতলার বসবার ঘরে দীপা একলা বসে রেডিও শুনছিল। দীপা দেবাশিসের বউ; মাত্র দু' মাস তাদের বিয়ে হয়েছে। দীপা একটি আরামকেদারায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে ছিল। ঘরে আসবাব বেশী নেই; একটি নীচু টেবিল ঘিরে কয়েকটি আরাম-কেদারা; দেয়াল ঘেঁষে একটি তক্তপোশ, তার ওপর ফরাশ ও মোটা তাকিয়া। এ ছাড়া ঘরে আছে রেডিওগ্রাম এবং এক কোণে টেলিফোন।

রেডিওগ্রামের ঢাকনির ভিতর থেকে গানের মৃদু গুঞ্জন আসছিল। ঘরটি ছায়াচ্ছন্ন, দোর জানলা ভেজানো। দীপা চেয়ারের পিঠে মাথাটি এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে ছিল। বাড়িতে একলা তার সারা দুপুর এমনিভাবেই কাটে।

দীপার এই আলস্যশিথিল চেহারাটি দেখতে ভাল লাগে। তার রঙ ফর্সাই বলা যায়, মুখের গড়ন ভাল; কিন্তু ভ্রুর ঋজু-রেখা এবং চিবুকের দৃঢ়তা মুখে একটা অপ্রত্যাশিত বলিষ্ঠতা এনে দিয়েছে, মনে

হয় এ মেয়ে সহজ নয়, সামান্য নয়।

দেয়ালের ঘড়িতে ঠং ঠং করে পাঁচটা বাজল। দীপার চোখ দুটি অমনি খুলে গেল; সে ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে রেডিও বন্ধ করে দিল, তারপর উঠে বাইরের দরজার দিকে চলল। দরজা খুলতেই সামনে সিঁড়ি নেমে গেছে। দীপা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে ডাকল —'নকুল!'

নকুল বাড়ির একমাত্র চাকর এবং পাচক, লাবেক কাল থেকে আছে। সে একতলার খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উঁচু দিকে চেয়ে বলল—'হ্যাঁ বউদি, দাদাবাবুর জল-খাবার তৈরী আছে।'

দীপা তখন গায়ের শিথিল কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছেছে এমন সময় কিড়িং কিড়িং শব্দে সদর দরজার ঘণ্টি বেজে উঠল।

দীপা গিয়ে দোর খুলে দিল। কোট প্যাণ্ট পরা দেবাশিস প্রবেশ করল। দুজনে দুজনের মুখের পানে তাকালো কিন্তু তাদের মুখে হাসি ফুটল না। এদের জীবনে হাসি সুলভ নয়। দীপা নিরুৎসুক সুরে বলল—'জলখাবার তৈরী আছে।'

দেবাশিস কণ্ঠস্বরে শিষ্টতার প্রলেপ মাখিয়ে বলল—'বেশ, বেশ, আমি জামা কাপড় বদলে এখনই আসছি।'

সে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। দীপা মন্থর পদে খাবার ঘরে গিয়ে টেবিলের এক পাশে বসল।

লম্বাটে ধরনের খাবার টেবিল; চার-জনের মতন জায়গা, গাদাগাদি করে ছ'জন বসা চলে। দীপা এক প্রান্তে বসে দেখতে লাগল, নকুল দুটি প্লেটে খাবার সাজাচ্ছে; লুচিভাজা, আলুর দম, বাড়িতে তৈরী সন্দেশ। নকুল মানুষটি বেঁটেখাটো, মাথার চুল পেকেছে, কিন্তু শরীর বেশ নিটোল। বেশী কথা কয় না, কিন্তু চোখ দুটি সতর্ক এবং জিজ্ঞাসু। দীপা তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগল—নকুল নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে। তবু নকুলের সামনে ধোঁকার টাটি খাড়া রাখতে হয়। শুধু নকুল কেন, পৃথিবীসুদ্ধ লোকের সামনে। বিচিত্র তাদের বিবাহিত জীবন।

ধুতি পাঞ্জাবি পরে দেবাশিস নেমে এল। একহারা দীঘল চেহারা, ফর্সা সুশ্রী মুখ; বয়স সাতাশ কি আটাশ। সে টেবিলের অন্য প্রান্তে এসে বসতেই নকুল খাবারের প্লেট এনে তার সামনে রাখল, দীপার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল—'তোমাকেও দেব নাকি বউদি?'

দীপা মাথা নেড়ে বলল—'না, আমি পরে খাব।' দেবাশিসের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া এখনো তার অভ্যাস হয়নি; তার বাপের বাড়িতে অন্য রকম রেওয়াজ, পুরুষদের খাওয়া শেষ হলে তবে মেয়েরা খেতে বসে। দীপা সহজে অভ্যাস ছাড়তে পারে না; তবু রাত্রির আহারটা দুজনে টেবিলের দু' প্রান্তে বসে সম্পন্ন করে। নইলে নকুলের চোখেও বড় বিসদৃশ দেখাবে।

কিছুক্ষণ কোনো কথাবার্তা নেই; দেবাশিস একমনে লুচি আলুর দম খাচ্ছে; দীপা যা-হোক একটা কোনো কথা বলতে চাইছে কিন্তু কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। পিছন থেকে নকুলের সতর্ক চক্ষু তাদের লক্ষ করছে।

শেষ পর্যন্ত দেবাশিসই প্রথম কথা কইল, সোজা হয়ে বসে দীপার পানে চেয়ে একটু হেসে বলল—'আজ একটা নতুন ক্রীম তৈরি করেছি।'

দেবাশিসের কাজকর্ম সম্বন্ধে দীপা কখনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করেনি কিন্তু এখন

সে আগ্রহ দেখিয়ে বলল—'তাই নাকি? কিসের ক্রীম?'

দেবাশিস বলল—'মুখে মাখার ক্রীম।'

'ও মা সত্যি? কেমন গন্ধ?'

'তা আমি কি করে বলব। যারা মাখবে তারা বলতে পারবে।'

'তা বাড়িতে একটু যদি আনো, আমি মেখে দেখতে পারি।'

দেবাশিস হাসিমুখে মাথা নাড়ল—'তোমার এখন মাথা চলবে না, অন্য লোকের মুখে মাখিয়ে দেখতে হবে মুখে ঘা বেরোয় কিনা। পরীক্ষা না করে বলা যায় না।'

'কার মুখে মাখিয়ে পরীক্ষা করবে?'

'ফ্যাক্টরির দরোয়ান ফৌজদার সিং-এর মুখে মাখিয়ে দেখব। তার গালের চামড়া হাতীর চামড়ার মতন।'

দীপার মুখে হাসি ফুটল; সে যে নকুলের সামনে অভিনয় করছে তা ক্ষণকালের জন্যে বিস্মরণ হয়েছিল, দেবাশিসের মুখের হাসি তার মুখে সংক্রামিত হয়েছিল।

আহার শেষ করে দেবাশিস উঠল। দু'জনে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির নীচে এসে দাঁড়াল। দেবাশিস হঠাৎ আগ্রহভরে বলল—'দীপা, আজ উৎপলা সিনেমাতে একটা ভাল ছবি দেখাচ্ছে। দেখতে যাবে?'

দেবাশিস আগে কখনো দীপাকে সিনেমায় নিয়ে যাবার প্রস্তাব করে নি: দীপার শরীরের ভিতর দিয়ে একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ বয়ে গেল। তারপরই তার মন শক্ত হয়ে উঠল। সে অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, আমি যাব না।'

দেবাশিসের মুখ ম্লান হয়ে গেল, তারপর গম্ভীর হয়ে উঠল। সে কিছুক্ষণ দীপার পানে চেয়ে থেকে বলল, 'ভয় নেই, সিনেমা-ঘরের অন্ধকারে আমি তোমার গায়ে হাত দেব না।'

আবার দীপার শরীর কেঁপে উঠল, কিন্তু সে আরো শক্ত হয়ে বলল, 'না, সিনেমা আমার ভাল লাগে না।' এই বলে সে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। দেবাশিস ওপর দিকে তাকিয়ে শুকনো গলায় বলল, 'আমি নৃপতিদার বাড়িতে যাচ্ছি, ফিরতে সাড়ে আটটা হবে।'

সদর দরজা খুলে দেবাশিস বাইরে এল, দোরের সামনে তার ফিয়াট গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে; কাজ থেকে ফিরে এসে সে গাড়িটা দোরের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। ভেবেছিল, সিনেমা দেখতে যাবার প্রস্তাব করলে দীপা অমত করবে না। তার মন সহজে তিক্ত হয় না, কিন্তু আজ তার মন তিক্ত হয়ে উঠল। এতটুকু বিশ্বাস দীপা তাকে করতে পারে না! এই দু' মাস দীপা তার বাড়িতে আছে, কোনো দিন কোনো ছুতোয় সে দীপার গায়ে হাত দেয় নি, নিজের দাম্পত্য অধিকার জারি করে নি।

সে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল

তবে আজ দীপা তাকে এমনভাবে অপমান করল কেন?

দেবাশিস্ গাড়ির চালকের আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল। বাড়ির পিছন দিকে গাড়ি রাখার ঘর, সেখানে গাড়ি রেখে সে পায়ে হেঁটে বেরুল। নৃপতি লাহার বাড়ি পাঁচ মিনিটের রাস্তা। নৃপতির বৈঠকখানায় রোজ সন্ধ্যার পর আড্ডা বসে, দেবাশিস প্রায়ই সেখানে যায়।

দীপা ওপরে এসে আবার আরামকেদারায় এলিয়ে পড়ল। তার মনের মধ্যে দশদিক তোলপাড় করে ঝড় বইছে, সারা গায়ে অসহ্য ছটফটানি। অভ্যাসবশেই সে হাত বাড়িয়ে রেডিওগ্রাম চালিয়ে দিল; কোনো একটি মহিলা ইনিয়ে বিনিয়ে আধুনিক গান গাইছেন। কিছুক্ষণ শোনার পর সে রেডিও বন্ধ করে দিয়ে চোখ বুজে চুপ করে রইল। কিন্তু বুকের মধ্যে ঝড়ের আক্সানি কমল না। তখন সে উঠে অশান্তভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল, অস্ফুট স্বরে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল—'এভাবে আর কত দিন চলবে?'

দীপা যদি হাল্কা চরিত্রের মেয়ে হত, তা হলে তার জীবনে বোধ হয় কোনো ঝড়-ঝাপটাই আসত না।

ক্রমশ

চিত্রপ্রদর্শনী

এখন, পরিপ্রেক্ষিতে একজন দর্শককে যে কোন পরিদৃশ্যমানতার সম্মুখে ঠিক মুখবরাবর (সাঁত্রু অর্থাৎ কেন্দ্রে) জায়গায় দাঁড়াতে বাধ্য করেই, আর যে দিগন্তে আপন খুশিমত একটি বিন্দুর কল্পনা ধার্য করতেও বাধ্য করে; এবং এইভাবে সেটা—পরিপ্রেক্ষিতে, সমস্ত বাস্তবতার থেকেও চমৎকার ব্যাপার হয়ে দেখা দেয়!

এই দিক থেকে আমরা একটা সূত্র নির্ধারণ করে উঠতে পারি যে, যদিও আদতে রেনেইসাঁসের চিত্রকরদের খুবই প্রিয় পছন্দসই আঁকার বিষয় ছিল—ধর্ম সংক্রান্ত—কিন্তু তাঁদের শিল্প দেখা গেল একেবারেই ধর্মবিরোধী। অর্থাৎ বস্তু সমূহের যে সঠিক চেহারা বা তারতম্য আছে সেগুলিকে নিরপেক্ষ ভাবে আরোপিত না করে, দেখা গেল, চিত্রকর পৃথিবীর বিশেষ এক রূপকে প্রকাশ করতে আগ্রহী।

চিত্রকর নূতন অনুপাত সৃষ্টি করল, যার ভিত্তি রইল, চোখের অনুভূতির উপর, অনভিপ্রেত ঘটনার (আকসিদাঁ) উপর, পরিদৃশ্যমানতার উপর, সে আপেক্ষিক সম্বন্ধ দিয়ে চরমত্বর (আবসলাইউ) পদপূরণ করল; বস্তু ভেদের (ল'ওবজে আঁ সোয়া) বদলে বোধ-চেতনের অনৈসর্গিকতাকে বসাল।

দৃশ্যমান বিশ্বের দিকে ঘোর নাস্তিকের চোখে, অবিশ্বাসে, সে চাইল। এখন এতে করে বলা যেতে পারে যে, শিল্প যা ছিল প্রিমিটিভদের কাছে একান্ত ধর্মের যাজকীয় ব্যাপার, রুনেইসাঁর কাছে একটা নিছক খেলা হয়ে দাঁড়াল।

অবশেষে এল ইম্প্রেসিওনাসম—সে খেলাকে আরও অবাধগতি প্রশ্রয় দিতে. আমি ইম্প্রেসিওনিসৎ চিত্রকরদের আদত চেহারাটা দেখাতে এখন চেষ্টা করব—এঁরা যাঁরা প্রকৃতির প্রতি সুতীক্ষ্ণ দুর্ধর্ষ দৃষ্টিপাত করার আর্টে নবতম বিপ্লবী।

এখন ইম্প্রেসিওনিসিম কাকে বলে? ও চিত্রকরদের আদতে কোন্ বস্তু সব থেকে বেশী আকর্ষণ করেছিল এবং যাদের পরীক্ষা তত্ত্বানুসন্ধান আকডেমই-গত লোকেদের শান্ত নির্ঝঞ্ঝাট স্বভাবের মধ্যে আলোড়ন এনেছিল! বদলে দিয়ে রূপ বদল করেছিল। এই নবধারাকে ভাল ভাবে বুঝে নেওয়ার জন্য আমাদের তুলনামূলক বিচার করে দেখা উচিত।

এ ব্যাপারে প্রথমেই প্রিমিটিভদের নেওয়া যাক এবং এমন একটা বিষয় তাদের বিচারের জন্য নেওয়া যাক, যে বিষয়ের প্রতি ইম্প্রেসিওনিসৎদেরও নজর ছিল!

ছোট একটা লাল ফলের উদাহরণ নিয়ে বিচার করি। প্রিমিটিভ সেটাকে ভালভাবে নিরক্ষণ করে বুঝে নেয় যে, সেটা গোলাকার ও লাল। এবং তাই তার ছবিতে একটি বৃত্ত এঁকে সে সঠিক বর্ণাভা দিয়ে তা ভরাবে। রুনেইসাঁস বা আকডেমই-গত শিল্পী ফলটির গড়নের উপর জোর দেবে, সে ফলের যে দিকটায় আলো সে দিকে হালকা লাল দেবেই আর তার ঠিক বিপরীত দিকে খুব গভীর লাল দেবে। এইটুকু হলেই সে খুশী, তার বিবেকের কাছে আর জবাবদিহী করতে হবে না।
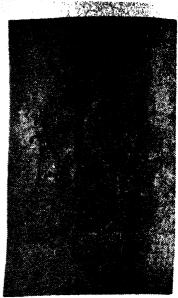
শিল্পায়ন —মাধবী ভগৎ

সংগীত : সুনন্দ সিংহ রায়

চিত্রম আর্ট গ্যালারী। ১টি মজুমদার স্ট্রীট—(টালিগঞ্জ ব্রিজের আগে মুদিয়ালীর মোড়ে)।

দক্ষিণ কলিকাতায় বড় বড় অফিস কর্মচারীদের বাস। সেখানে আর্ট, সাহিত্য বা সঙ্গীতের মূল্য দেবার সময় কারও নেই। উত্তর কলকাতারও রূপ একই। এই দু' জায়গায় কোথাও একটা আর্ট গ্যালারী ছিলনা। দক্ষিণে এই গ্যালারীর পত্তনে আমরা আনন্দিত হয়েছি।

এই গ্যালারীটি শ্রীগোপালচন্দ্র সিংহরায় মহাশয় শিল্পের জন্য করে দিয়েছেন। এখানে যে কোন শিল্পীই বিনামূল্যে (ভাড়ায়) চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করতে পারেন। অবশ্য একটা শর্তে, তা এই যে, ছবিগুলি কর্তৃপক্ষের মনোনীত হওয়া চাই।

চিত্রম গ্যালারীর প্রথম প্রদর্শনী কয়েকজন তরুণ শিল্পীদের (যাঁরা এখনও শিক্ষার্থী) ছবি নিয়ে হয়েছিল। এদের মধ্যে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, রেখা-চেতনা তার সত্যিই হয়েছে। প্রায় একই জাতের রেখায় অবয়ব গুলি ভাল ফুটেছে। মাধবী ভগতের অনেকগুলি রঙীন স্কেচ ছিল, তার মধ্যে 'শিল্পায়ন' নং ১১ কাজটি সুস্পষ্ট। জ্যোতিকা গুপ্তার ৬নং জল রঙ মোটা কাগজের উপর বেগুনী রঙের আঁকা, এখানে থামের নিপটতা বেশ এসেছে। সুনন্দ সিংহরায়ের নং ২টিতে খুব আলতো রঙের ব্যবহারে বেশ ভাল ভাবে পরিবেশ ঘটে উঠেছে। স্মৃতিকণার কাজ, ল্যান্ডস্কেপগুলিতে, মনোজ্ঞ ভাব দেখতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা কর্তব্য, এদের অনেকেই রঞ্জিৎ রায়ের ছাত্র-ছাত্রী।

আনন্দবাজার পত্রিকার সামনে ভোট-বুলেটিনের ভিড়

কলকাতার ডায়েরি

সব কৌতূহল শেষ, ভোটের ফল জানার আগ্রহ আর নেই, কার হাতে রাজ্যভার—এই প্রশ্নের উত্তর জানাজানি হয়ে গিয়েছে।

কলকাতা শহরে গত সপ্তাহটা পুরো গিয়েছে 'কে-জিতল—কে-হারল' চিৎকার করে করে। ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ, সবার মুখে কেবল একটি-মাত্র কথা—'দাদা অমুক কেন্দ্রের খবর কী?' খবরের কাগজ তো ছিলই রেডিও—টেলিফোনে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, পারকে মাইক লাগানো হয়েছিল, তদুপরি গত-বারের মত আনন্দবাজার পত্রিকা তিন জায়গায় (শ্যামবাজারে, ভবানীপুরে, অফিস ভবনে) নির্বাচনী ফল ঘোষণার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। তিন জায়গাতেই দারুন ভিড় এবং টাটকা টাটকা খবর ছাড়া মাত্র সমর্থকদের আকাশ-কাঁপানো উল্লাস। ক্লাইম্যাক্স উঠল আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রের ফল নিয়ে। কখনও মুখ্যমন্ত্রী উপরে, কখনও উপরে অজয়বাবু, মিনিটে মিনিটে, প্রহরে প্রহরে উত্তেজনা। তারপর কৌতূহল অবসান, আরামবাগ কেন্দ্রেই 'আরামবাগ গান্ধীর' পরাজয়।

যে-দেশে গণতন্ত্র, যে-দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচনী ব্যবস্থা, সেদেশে জয়পরাজয় অবশ্যই থাকবে, কিন্তু এবারের মত ফলা-ফলের বিস্ময় আমাদের দেশেও গত তিনবার ছিল না। অধিকাংশ কেন্দ্রেই প্রত্যাশার অপমৃত্যু, বিস্ময়ের পর বিস্ময়। এবং ভোটের ফল দেখে এবার বোঝা যাচ্ছে, নির্বাচনী প্রচারের সময় 'টেমপো' কেন ওঠে নি, ভোটদাতারা কেন এত চাপা ছিলেন।

ফল জানার উত্তেজনা কাটার পর এখন ঘরে ঘরে, অফিসে-বাজারে প্রধান আলোচনা—কংগ্রেস কেন পশ্চিমবঙ্গে গরিষ্ঠ দল হতে পারল না। কেউ বলছেন, 'বিপ্লব এসে গিয়েছে।' কেউ বলছেন, 'বাজে কথা, বিপ্লব পিছিয়ে গেল।' কারও মতে আবার এর সঙ্গে বিপ্লবের কোন সম্পর্কই নেই।

এদিকে কংগ্রেসের গদি ছাড়ার কারণ নিয়ে গবেষণাও শুরু হয়ে গিয়েছে। একটি আসরে সেদিন এই বিষয়ে একটি 'সারগর্ভ আলোচনা' শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আসরের যিনি মুখ্য বক্তা, তাঁর বিশ্লেষণে এই দল-বদলের মুখ্য কারণ নাকি তিনটি। প্রথমত, প্রায় কুড়ি বছর গদিতে থাকার ফলে কংগ্রেস মহলে আত্ম-তুষ্টির ভাব ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মোটা অংশের সমর্থন হারানো, তৃতীয়ত ধানের উপর লেভি। লেভি চালু করতে গিয়ে গ্রামে কংগ্রেস এক-দল জোতদারের বিরাগভাজন যেমন হল, তেমনই প্রশাসনের গলদে সবার উপর সমানভাবে লেভি আরোপ করতে না পেরে আর একদল চাষীর ভোট হারাল। বিরোধী কয়েকটি দল এই লেভির ব্যাপারটা ভাল মতই কাজে লাগিয়েছে।

ভদ্রলোকের বক্তব্য কতদূর সত্যি জানিনে, আর একজনের মত কিন্তু অনেকরকম। তিনি জানালেন, জিনিসপত্রের চড়া দামই এই ওলট-পালটের কারণ। তৃতীয় মত আরও সরল। তিনি জানালেন, মানুষের স্বভাবই

হল পুরোনো ছেড়ে নতুনকে ধরার, কয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে ভোটদাতার কাছে কংগ্রেস বড় পুরোনো হয়ে গিয়েছে। এবার-কার ঘটনা কেবল বদলের জন্যেই বদল, কিছুদিন মুখ বদলে আবার সেই কংগ্রেসকে ধরবে।

শেষোক্ত অভিমত আসরের বিতর্কবিষয় হতে না হতেই এতক্ষণ মুখ-বুজে-থাকা একজন বলে উঠলেন—'অতশত বুঝিনে মশাই, আসলে গত তিন ইলেকশনে নেহরু ছিলেন, এবার নেই, গোটা ভারতের চারদিকে তাই এই কাণ্ডটা ঘটে গেল। কোথাও জন-সংঘ, কোথাও স্বতন্ত্র, কোথাও কমিউনিস্ট, কোথাও ডি এম কে, কোথাও আবার কংগ্রেসই থেকে গেল।

ব্যাখ্যা অনন্ত। আমি সব বক্তব্যেরই কিছু কিছু মানি, কোনটাতেই পুরোপুরি সায় নেই, মনে মনে শুধু বলি, ভারতবর্ষ যে বৈচিত্র্যের দেশ একথাটা স্বাধীনতা-উত্তর রাজ্য প্রশাসনের ক্ষেত্রে এতদিন পর প্রযুক্ত হল। কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য—তৎসঙ্গে ওইটুকুও থাকবে তো?

*

টালিগঞ্জের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোডের একটি বাড়িতে যদি কোনদিন যান, দেখবেন দুটি ঘরের আটটি দেয়াল জুড়ে কেবল ছবি আর ছবি। শুধু তাই নয়, দোতলার স্টুডিও রুমে যাবার সিঁড়ি, প্রবেশ দ্বার, এ-কোণ ও-কোণ—সর্বত্র সেই একই ব্যাপার। আপনার মনে হবে রঙীন কোন জগতে এসে হাজির হয়েছেন।

এই বাড়িতেই থাকে নয় বছরের বালক শিল্পী শ্রীমান অনমিত্র চক্রবর্তী। রবীন্দ্র-সাহিত্যবিশারদ অজিতকুমার চক্রবর্তীর পৌত্র, বিজ্ঞাপন জগতে খ্যাতিমান শ্রীযুধাজিৎ চক্রবর্তীর পুত্র। অনমিত্র বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়। সে বয়সে বালক কিন্তু তার শিল্পসৃষ্টি সাবালক। প্রচলিত ধারায় কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষা তার নেই, গুরু বলেও মানে নি কাউকে তবু অসাধারণ সব শিল্পকর্ম তার তুলির টানে অনবরত বেরিয়ে আসছে। ইতিমধ্যেই সংখ্যা পেঁৗছে গিয়েছে হাজারের কাছাকাছি। এক আশ্চর্য আবেশে, অলৌকিক তন্ময়তায় অসাধারণ সব কাণ্ড সে অবিরাম করে চলেছে রঙ-তুলি-ক্যানভাসে-ইজেলে। অথচ সব সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম নিরাসক্তি, অভাবনীয় অবহেলা। টালিগঞ্জের সেই বাড়িতে গিয়ে শিল্পকর্মের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে যদি শিল্পীর খোঁজ করা হয় দেখা যাবে লোকলোচন এড়ানো ছোট্ট একটি ঘরে সে একাকী—রঙের রূপকথায় বন্দী। তারপর রঙ-পরীরা সব ঝাঁক বেঁধে আসে, স্নায়ুতে স্নায়ুতে কলরব জাগে, এবং সৃষ্টির বেদনায় অস্থির অনমিত্র ছবির পর ছবি এঁকে চলে।

আরও বছর কয়েক আগে যখন সে শিশু, তখন থেকেই এই চলছে। খেলার সাথীতে আকর্ষণ নেই, খেলনায় মন নেই, শুধু তুলির টানে টানে অতীন্দ্রিয়ের ইংগিত নিয়ে আসছে। ক্রমে উঠছে ছবির পাহাড়, আঁকা হয়ে গেলেই হেলাফেলার। দিনের পর দিন এই চলছে।

অলৌকিক প্রতিভাধর এই শিল্পীর চিত্র-কর্মের এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল গত বছর। প্রথম দর্শনেই রসিক-সমাজ প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সবাই বলেন, 'এমনটি আর দেখিনি।' এ বছরও কিছু-দিন আগে আর একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে। এবারও সেই একই বিস্ময়।

*

'ভূর্জ পাতায় নবগীত কর রচনা।'—কবিতার এই লাইন অনেকেরই মুখস্থ, কিন্তু ভূর্জপত্র জিনিসটা কেমন, সেই সম্পর্কে যাদের কোন ধারণা নেই, তাঁরা ইচ্ছে করলে এশিয়াটিক সোসাইটি বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ঘুরে আসতে পারেন। গোড়ায় ছিল প্রস্তরে উৎকীর্ণ লিপি, তারপর এল ভূর্জপত্র, তালপাতা তুলট কাগজ, তাতে কত রকমের হাতের লেখা, কত রকমের কারুকাজ। ছাপাখানা বসার আগে আমাদের সাহিত্য সৃষ্টিকে ধরে রাখার এই ছিল প্রধান অবলম্বন।

এই ধরনের পুরানো পুঁথি ছড়িয়ে আছে গ্রামে গ্রামে, হাজারে হাজারে। সে-গুলিকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রহ করার কাজে বাংলা দেশে প্রথম ব্রতী হন দীনেশচন্দ্র সেন। তারপর এগিয়ে আসেন আরও অনেকে। নানা কেন্দ্রে জমে উঠেছে মূল্যবান সব অসংখ্য পাণ্ডুলিপি, তার থেকে একে একে উদ্ধার করা হচ্ছে আমাদের অতীত গৌরব।

গবেষণার ক্ষেত্রেই পুঁথির দরকার, সেখানে প্রবেশাধিকার সাধারণ লোকের নেই, তাই পুঁথির বিষয়ে তাদের ধ্যানধারণাও সীমিত। জাদুঘরের নতুন ব্যবস্থায় এই জগতেও জনসাধারণের প্রবেশ ঘটবে। সম্প্রতি সেখানে একটি পাণ্ডু-লিপি গ্যালারি খোলা হয়েছে। সেখানে বাংলা ছাড়াও রয়েছে সংস্কৃত, ফারসি এবং আরবী পুঁথি। ৩৩টি খুব পুরোনো, এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যোগাড় করা। তার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধগ্রন্থ প্রাজ্ঞপারমিতা-র পাণ্ডুলিপি।

—চাণক্য

রপ্তানির অবস্থা

গত দশ বছরের উপর বাণিজ্য-উদ্বৃত্তের ক্রমাগত অবনতি ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার একটা বড়ো দুর্বলতা হয়ে দেখা দিয়েছে। গত জুন মাসে টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাস করা হয়েছিল প্রধানত এই আশায় যে, তাতে রপ্তানির সম্প্রসারণ এবং আমদানির সংকোচন সম্ভব হবে এবং দেশের বহির্বাণিজ্যের উন্নতি ঘটবে। ১৯৬৬ সালের শেষ পর্যন্ত আমাদের রপ্তানি মোটামুটি নৈরাশ্যজনক ছিল বলা যায়। ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে রপ্তানির (১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরের তুলনায়) প্রান্তিক বৃদ্ধি হলেও ১৯৬৬-র পুরো বছর ধরলে রপ্তানি আগের বছরের চাইতে ৫০ কোটি টাকা কমে গেছে।

রপ্তানি হ্রাসের কারণ

১৯৬৬ সালে রপ্তানি হ্রাসের জন্য একাধিক কারণ দায়ী। প্রথমত, রপ্তানি শুল্ক এবং রপ্তানি বাড়াবার উৎসাহমূলক ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকায় বিনিময় হার পরিবর্তনের পর রপ্তানি খানিকটা নিস্তেজ ছিল। দ্বিতীয়ত, দেশে উৎপাদনে বাস্তবিক ঘাটতি দেখা দিয়েছিল বলে কয়েকটি ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ ভোগের প্রয়োজন মেটাবার পর রপ্তানি-যোগ্য উ-বৃত্ত কমে গেছে। স্পষ্ট কথায়, উৎপাদন, বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনের দ্রুত সম্প্রসারণ এখন রপ্তানি বৃদ্ধি তথা আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। রপ্তানি বাড়াবার ব্যাপারে আর একটা বড়ো বাধা হল যে, রপ্তানি শিল্পের পক্ষে আবশ্যক কয়েকটি মৌল কাঁচামাল, যেমন কাঁচা তুলো, সেরকম প্রতিযোগিতামূলক নয়।

রপ্তানির বর্তমান অবস্থার উজ্জ্বল দিকগুলির মধ্যে চিরাচরিত নয় এরকম দ্রব্য, যেমন ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য, রাসায়নিক সামগ্রী, লোহ-ম্যাঙ্গানিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে টাকার বিনিময়-মূল্য হ্রাসের প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যাচ্ছে মনে হয়। এইসব জিনিসের রপ্তানি বেড়ে গেছে এবং আরো সম্প্রসারণের সম্ভাবনা আছে। নতুন যেসকল সামগ্রী রপ্তানি করার সম্ভাবনা আছে, তাদের মধ্যে ইস্পাতের পাইপ, ক্রেন, আতস কাচ, অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম, রেডিয়ো আইসোটোপ, ইলেকট্রনিক কল-কব্জার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

তার চাইতেও আশার কথা হল, রপ্তানি সংক্রান্ত শিল্পে ক্রমশ উপলব্ধি করা হচ্ছে যে, অব্যবহৃত উৎপাদন-ক্ষমতা কাজে লাগাবার একমাত্র উপায় হল রপ্তানির জন্য উৎপাদন করা। এই ধরনের মনোভাব অবশ্য সবেমাত্র দেখা দিয়েছে এবং রপ্তানিকারীরাও অনুকূল আবহাওয়া কত দিন থাকবে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত নয়।

উৎকর্ষ বৃদ্ধি ও উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস

রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস এবং তার উৎকর্ষ বৃদ্ধির উপায়গুলি সম্বন্ধে সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞদের একটি দল কয়েকটি ব্যবস্থা অনুমোদন করেছে। বলতে গেলে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম খরচে ইস্পাত উৎপাদনের সংকল্প নিয়ে আমাদের দেশ শেষ পর্যন্ত মুদ্রামূল্য হ্রাস সত্ত্বেও, সর্বাধিক উৎপাদন-ব্যয়ে ইস্পাত তৈরি করছে। প্রাগুক্ত বিশেষজ্ঞ দল তাই ভারতের বন্দরগুলির দ্রুত বিকাশ, জাহাজে মাল বহনের খরচ হ্রাস, রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শিল্পগুলির যথাযথ অবস্থিতি নির্ধারণ সুপারিশ করেছে। আভ্যন্তরিক বাজারে সহজে বিক্রয়ের সুবিধা আছে বলে বেশীর ভাগ ভারতীয় শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী বিদেশের বাজারে বিক্রির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে না। রপ্তানির জন্য উৎসাহ দিতে হলে আগে দেখতে হবে যাতে শিল্পগুলিতে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা থাকে। তা ছাড়া, আন্তর্জাতিক বাজারে অনুপ্রবেশ করতে হলে একটা জোরালো প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব অবলম্বন এবং আন্তর্জাতিক বিক্রেতাদের কৌশলগুলি আয়ত্ত করা দরকার।

শিল্পোন্নয়নের একটা শক্ত ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও ভারতকে বিদেশে কৃষিপ্রধান দেশ বলে ধরা হয়। ঐ ধারণা ভেঙে দেবার জন্য আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীগুলিতে ভারতের উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য দেখাবার বন্দোবস্ত এবং অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

বৈদেশিক ঋণের সমস্যা

আন্তর্জাতিক মূলধন নিয়োগের ব্যাপারে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ অবধি ভারত উত্তমর্ণ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোজনাকালে ভারতের অবস্থার ক্রমিক অবনতি ঘটে। ১৯৬৬ সালের মার্চে শেষ হয়েছে যে বছর তার ভিতর ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বেড়ে ৩,৭০৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

অবস্থার এই অবনতির জন্য বিরাট বহরে মূল্যবান-দ্রব্যের আমদানিকে প্রধানত দায়ী করা যায়। সরকারী অংশের কাজ-কর্মের জন্য ঐ মূলধন-সামগ্রীর বেশীর ভাগ আমদানি করা হয়েছে। বৈদেশিক ঋণের ভার বৃদ্ধি দেশের পক্ষে উদ্বেগের বিষয়, সন্দেহ নেই—মূলধন পরিশোধ ও সুদ দান দুটো কারণেই। স্পষ্টত, বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত অবস্থার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে কর্জ গ্রহণ যত দূর সম্ভব কমিয়ে ফেলতে হবে এবং তার জন্য চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে দেশের সম্পদ ও উপাদানরাশির পরিমাপ অনুযায়ী ছেঁটে ফেলার দরকার হতে পারে। কৃষি উৎপাদনের দ্রুত সম্প্রসারণ থেকে যাতে খাদ্য আমদানির হ্রাস সম্ভবপর হয়, তার জন্য সব রকমের চেষ্টা করা দরকার। শিল্প-ব্যবস্থায় নির্মিত উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণতর ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোনো প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত নয়, এরকম বৈদেশিক সাহায্যেরও প্রয়োজন আছে।

ভারতীয় দ্রব্য বিদেশে বিক্রি করার ব্যাপারে আসল অসুবিধা হচ্ছে ঐসব সামগ্রীর উৎকর্ষের অবনতি ও মূল্যাধিক্য। রপ্তানির প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার জন্য রপ্তানির উপর থেকে করভার নির্বাচন-মূলকভাবে কমিয়ে দেওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে নির্বাচিত ক্ষেত্রে আমদানির পরিবর্ত উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার। কোনো দেশের পক্ষেই পুরোপুরি স্বয়ং-নির্ভরতা অর্জন করা সহজ নয় বলে যে-সব ক্ষেত্রে ভারতের অন্য দেশের তুলনায় কম খরচে দ্রব্য উৎপাদন করার সুবিধা আছে, সেই সব অংশে আমদানির পরিবর্তকরণের চেষ্টা করতে হবে।

শান্তিকুমার ঘোষ

স্টকহলমের সিটি হল, রাজধানীর প্রতীক চিহ্ন হিসাবে বিখ্যাত
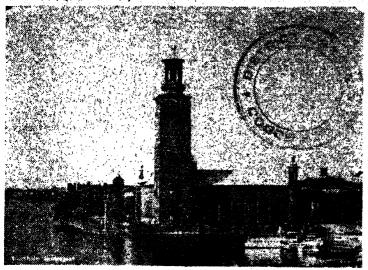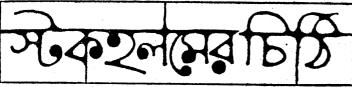
বিশ্বের অন্যতম অত্যাধুনিক শহরগুলির মধ্যেই স্টকহলম-এর স্থান। একটি ছোট দেশের রাজধানী মাত্র। এখানের লোকসংখ্যাও নেহাতই নগণ্য। মাত্র ১০ লক্ষের মত। বিশ্বের জটিল রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক থেকে সুইডেন দূরে থাকে বলে স্টকহলমে বিশেষ কোনও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বৈঠকও হয় না। এ ক্ষেত্রে স্টকহলম বিশ্ববাসীর দৃষ্টির অন্তরালেই থাকে। আমাদের নয়াদিল্লীর স্থান সে হিসাবে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্টকহলম মানবজাতির দৃষ্টি এড়ায়নি। স্টকহলমের লাবণ্যলীলার গুণগান করে গেছেন অনেক সুইডিশ সাহিত্যিক। এ নগরের রূপের বর্ণনা আমাদের দেশেও অনেকেই শুনেছেন। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে অবশ্য স্টকহলমের নামডাক শুধু তার সৌন্দর্যের জন্যেই নয়, পরন্তু একটি বিশেষ প্রাগ্রসর দেশের রাজধানী হিসাবে।

অবশ্য আজও স্টকহলমের প্রধান আকর্ষণ হল এই নগরের জলরাশিমণ্ডিত রূপ। চতুর্দিকে জল আর জল ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না। শহরটি একটি বিরাট দ্বীপপুঞ্জের উপর অবস্থিত। ২২টি দ্বীপ জুড়ে এই নগরের সীমারেখা, ৪২টি সেতুর মাধ্যমে সারা শহরের যোগাযোগ রক্ষা হয়। স্টকহলমেই এসে মিলেছে সুইডেনের সুবিস্তৃত হ্রদ "মেলারেন"। এর স্বচ্ছ নীল জলের সঙ্গে মিশেছে বালটিক সাগরের ফেনিল জল। স্টকহলমকে সুইডিশ লোকে "মেলারেনের মুক্তো" আখ্যা দিয়ে থাকে। সেলমা লাগেরলফ একটি "ভাসমান নগর" বলে স্টকহলমের গুনগান করে গেছেন। অনেকের মতে আবার স্টকহলম হচ্ছে "উত্তর ইউরোপের ভেনিস"। সেটা যে কত দূর সত্যি তা বলা কিন্তু কঠিন।

৭০০ বছর আগে এক মধ্যযুগীয় সুইডিশ রাজনীতিবিদ BIRGER JARL একটি দ্বীপের উপর এক দুর্গ স্থাপনা করেন, খুব সম্ভব ১২৫২ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু ঐ সময়ই স্টকহলমের জন্ম হয়, কারণ ধীরে ধীরে দ্বীপস্থিত দুর্গটিকে ঘিরে শুরু হয় জনবসতি এবং তা ছড়িয়ে পড়ে অন্যান্য দ্বীপগুলিতে। স্টকহলম ইউরোপের একটি প্রাচীন নগর বললেই চলে। বহু প্রাচীন প্রাসাদ, গির্জা বড় বড় প্রাচীন অট্টালিকা, বহু বিস্তীর্ণ ও সুসজ্জিত বাগিচা ও ছোট ছোট পাথরে বাঁধান অলিগলির জন্যে স্টকহলম এককালে প্রসিদ্ধ ছিল।

একটা কাল এমন ছিল, তাও খুব বেশী দিন আগের কথা নয় শুনেছি, যখন স্টকহলম-এর লাবণ্যপ্রভাকে সকলে সমস্বরে স্বীকৃতি জানাত। এ শহরের সৌন্দর্যের মধ্যে ছিল পুরোনো কালের এমন একটা ছোঁয়াচ, যাতে সত্যি একটা শিহরনের আভাস পাওয়া যেত। কিন্তু আজ সকলে এ শহরের সেই রূপ আর দেখতে পায় না। মাত্র গত ২০।৩০ বছরের মধ্যে স্টকহলমের সে রূপ যেন কোথায় মিলিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। আজকের সব আধুনিক মনোভাবাপন্ন সুইডিশ লোকে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এক আধুনিক স্টকহলম গড়ে তুলতে। এরা মরিয়া হয়ে উঠে পড়ে লেগেছে কোনক্রমে শহরটিকে তাদের মডার্ন দেশের মডার্ন রাজধানী হিসাবে মডার্ন করে তোলায়। এই "মডার্ন" শব্দটির উপর এরা খুব জোর দেয়। কিন্তু মডার্ন-এর মানেও ত সকলের কাছে এক নয়। কাজেই ২টি দল হয়েছে। একদল প্রাণপণে স্টকহলমকে নতুন রূপ দেবার চেষ্টায় মত্ত, আর একদল সেই তরুণ্য রোধ করায় ব্যস্ত। ইউরোপের আর সব দেশই যুদ্ধের সময়ে কম বেশী ধ্বংস হয়ে গেছে, কাজেই তারা নিজেদের দেশগুলিকে আধুনিক কালের হাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছে। ঐ যুদ্ধের ধ্বংসলীলার থেকে পুরোপুরি রক্ষা পেয়েছে ভাগ্যক্রমে কেবল সুইডেন। স্টকহলম-এর একটি ইটও স্থানচ্যুত হয়নি যুদ্ধের ফলে। সুইডিশ লোকে দেখল আর সব ইউরোপীয় নগরগুলি আধুনিক হয়ে উঠল, নবজন্ম পেল। স্টকহলমকে নতুন করে তুলতে তাই এরা ব্যস্ত। নিজেরাই পুরোনো বাড়ি-

স্টকহল্ম্, শহর পরিকল্পনার এক নতুন অধ্যায় শহরের ঠিক মাঝখানে অনেকগুলি পুরান বাড়ি ভেঙেচুরে, সুইডিশ রাজধানী নবরূপ ধারণ করছে
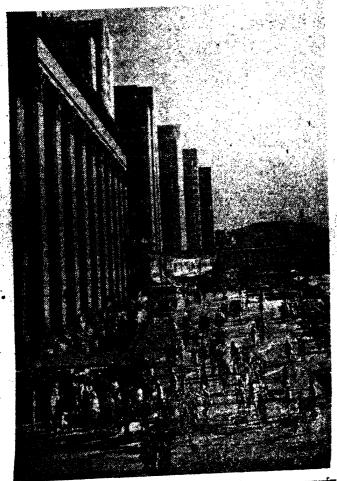
গুলিকে ভেঙে ভেঙে ইট পাটকেল স্তূপাকার করছে এখানে সেখানে। সেই সুন্দর পুরোনোকালের কারুকার্যে মণ্ডিত বাড়িগুলির জায়গায় তৈরী হচ্ছে নতুন সব আধুনিক দেশলাই-বাক্স প্যাটার্নের বাড়ি। যত উঁচু করা যায়, যতটা সোজা কাঠখোট্টা দেখায়, সেটাই হল মডার্ন। রাতারাতি বাড়ি তৈরী হয়ে যায়, কারণ মালমসলা বা অর্থ কোনটারই অভাব নেই এদের। তাছাড়া মেশিনের সাহায্যে বাড়ি তৈরীও হয় খুব কম সময়ের মধ্যে।

এইজন্যেই এখানে অনেকের ভাবনা যে, স্টকহলম হয়ত চিরতরে তার আপন ঐতিহ্যময় রূপটি হারাবে। হয়ে উঠবে নিউইয়র্কের ছোট সংস্করণ। শুধু ওটাই একমাত্র সমস্যা নয়। যেসব পুরোনো বাড়িগুলি ভাঙা হচ্ছে, সেখানের বসতি উঠিয়ে দিতে হচ্ছে। সেই লোকগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাড়িগুলিতে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হচ্ছে। কাজেই যাদের পুরোনো বাড়িও ছিল না, তাদের একটা নিজেদের মত বাড়ি বা ফ্ল্যাট পেতে বছরের পর বছর প্রায় ১২।১৫ বছর অবধি অপেক্ষা করতে হয়। বাড়ি পেলেও পাওয়া যায়, স্টকহলম থেকে অনেক দূরে। তাছাড়া ততদিনে অনেক সময়ে বাড়ির আর বিশেষ প্রয়োজনও হয় না, কারণ ছেলেমেয়েরা বড় হলে যে যার নিজেদের বাড়ির খোঁজে থাকে। এখানে বাড়ি পাওয়া সব সুইডিশ লোকেদের কাছেই একটা বিভীষিকা। পেলেও সাধারণত ২টি ঘর ও রান্নাঘরেই চালিয়ে নিতে হয়, কারণ এ বাড়িগুলির ভাড়া খুবই বেশী। একেবারে নতুন করে সব রকম সুবিধাযুক্ত বাড়িগুলি করতে খুব খরচ হয়, সেটা ভাড়াটেদের কাছ থেকে বেশ পুষিয়ে নেওয়া হয়। তাহলেও যাবতীয় সুখ-সুবিধার স্বাদ পেয়ে এখানের লোকে নতুন ফ্ল্যাট বাড়িগুলিতেই থাকতে চায়। গাঁয়ে আর কারো মন বসে না। সকলেই থাকবে শহরে—তাই স্টকহলম হলেই বেশী ভাল—তার জন্যে সব আজীবন অপেক্ষা করতে রাজী আছে।

তবে এ নতুন বাড়িগুলি সত্যিই চমৎকার। প্রত্যেকটি বাড়ির আশেপাশে সব সময়ে খোলা জায়গা থাকে, আলো-বাতাস প্রতি বাড়িতেই খেলে, ছোট সরু অন্ধকার গলির প্রশ্নই উঠে না। তার উপরে খোলা জায়গাগুলিতে সারা বছর মৌসুমী ফুল ফুটছে, সবুজ ঘাসের লন দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। এ সবের জন্য ভাড়াটেদের অর্থব্যয় খাটতে হয় না। শহরের এক একটি অংশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর রাখার ভার [illegible]দের ওপর। স্টকহলম [illegible] বিশ্বের সবচেয়ে পরিষ্কার [illegible] [illegible] দিয়ে খুবই [illegible]। [illegible] এক একটি বড় বাড়িতে প্রায় [illegible] থাকে। এই ফ্ল্যাটগুলি একেবারে স্বতন্ত্র, আর কোনও ফ্ল্যাটের সঙ্গে কোনও রকম যোগাযোগই থাকে না। বেশীর ভাগ সব ফ্ল্যাটে একটি করে খোলা বারান্দা আছে স্বচ্ছবায়ু সেবনের জন্যে। প্রত্যেকটি বাড়িতে সেন্ট্রাল হিটিং-এর ব্যবস্থা আছে। শীতের সময়ে বাইরের তাপমাত্রা —২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নামলেও বাড়ির ভিতরে পাতলা জামা কাপড় পরে থাকা যায়। গরম জামার দরকারই লাগে না। নিজেদের ঠিক যে রকম তাপমাত্রা সহ্য হয় সেরকমভাবে সেন্ট্রাল হিটিং নিয়ন্ত্রণ করা চলে। বাইরে বেরোবার আগে একটু থার্মোমিটার দেখে বা টেলিফোনে তাপমাত্রাটা জেনে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। ভিতর থেকে আন্দাজ করা যায় না, বাইরে কি রকম ঠাণ্ডা। তাপমাত্রা জানা থাকলে হিসেব-মত কয়েক কিলো গরম জামা কাপড় চাপিয়ে বেরোন যায়। সেন্ট্রাল হিটিং চলে সাধারণত ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ই মে পর্যন্ত। ঐ ২টি দিনের আগে পরে ঠাণ্ডা বা গরম পড়লে উপায় নেই। এমনই এখানের নিয়মানুবর্তিতা।

প্রত্যেকটি নতুন বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা ঠাণ্ডা গরম জল থাকে সারাটি বছর। এখানে অবশ্য জলকষ্ট হওয়ার কথাও নয়। রান্নাঘরগুলি খুবই practical ও গোছান। ইলেকট্রিক স্টোভ, ওভেন ও ফ্রিজিডেয়ার সব বাড়িতে দেওয়া থাকে। আজকাল আবার অনেক বাড়িতে "ডীপ ফ্রীজ বক্স"ও দিচ্ছে। শীতের সময়ে বেশী করে মাছ মাংস, তরকারি, ফল বাড়িতে এনে রাখা চলে। রান্নাঘরেও ঠাণ্ডা ও গরম জলের কল একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ। রান্নাঘরে কাজ করার বাসন ধোয়ার জায়গা সব স্টেনলেস স্টীল দিয়ে তৈরী। কাজেই সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও খুব ছিমছাম ব্যবস্থা। এই সব বাড়ির অন্যান্য সুবিধা
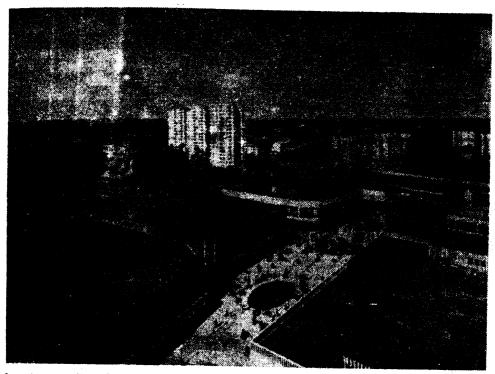
দক্ষিণ স্টকহল্মের উপনগরী Farsta। মাঝখানে সুন্দর সুন্দর দোকান পরিবেষ্টিত 'Shopping Centre', সেখানে যান-বাহনের চলাচল নিষিদ্ধ। সংলগ্ন Car Park-এ ২০০০ গাড়ি রাখার ব্যবস্থা আছে। গগনস্পর্শী ফ্ল্যাট বাড়িগুলি দেখা যাচ্ছে

চ্ছে অনেকগুলি করে দেয়াল-আলমারি ও wardrobe ইত্যাদি থাকে, তাই আলাদা সব আলমারি কিনে ঘরে রাখার দরকার হয় না। এতে অনেক জায়গা বাঁচে, ঘরে অন্য জিনিস রাখার জন্যে বা হাল্কা করে সাজানর জন্যে। এখানে কাপড় ধোওয়া ও শুকোনোর বেশ সমস্যা। রোদে দিয়ে কাপড় শুকোবার উপায় নেই, কারণ সূর্যের ওপর নির্ভর করে থাকা চলে না এখানে। এই জন্যে সব বাড়িতে সকলের ব্যবহারের জন্যে একটি কি দুইটি করে ওয়াশিং মেশিন থাকে, যেগুলি ভাগাভাগি করে সব ভাড়াটেরা ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া আছে কাপড় শুকোবার জন্যে গরম হাওয়া দেওয়া বিশেষ ঘর, যাতে ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই কাপড় শুকিয়ে যায়। এই সব কারণে স্টকহল্মে ও তার উপকণ্ঠে এবং সুইডেনের অন্যান্য বড় শহরগুলিতে মানুষের এত ভিড় বাড়ি পাবার জন্য।

বাড়ি পাওয়াটা অবশ্য সকলের পক্ষেই যে কঠিন তাও ঠিক বলা চলে না। কারণ যারা বেশ কিছু মোটা টাকা আগাম বা ঘুষ দিতে পারে, তারা বেশ সহজেই বাড়ি পেয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সুইডিশ লোকেরা অনেক সময়ে নিয়মানুযায়ী চলে না, সুবিধা মত তাদের ন্যায়নিষ্ঠ স্বভাবটা ভুলেও যায়! তবে এরকমটি সকলের ক্ষেত্রে চলে না। বেশীর ভাগ লোকেই নিজের পালা এলে বাড়ি পায়, অনেকদিন অপেক্ষার পর। সব বড় বাড়িগুলিতে বড় ছোট অনেক ফ্ল্যাট থাকায় পাশাপাশি বিভিন্ন লোকের বাস দেখা যায়। কোনও ডিরেক্টারের বাড়ির পাশে বাস ড্রাইভারের থাকাটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। এদের প্রধানমন্ত্রী এরলান্ডারও এরম একটি বাড়িতে বাস করেন অন্য সব সাধারণ প্রতিবেশীদের সঙ্গে।

শুধু কি স্টকহল্মে বাড়িরই সমস্যা। আধুনিক স্টকহল্মে অন্যান্য আধুনিক মহানগরের আরও একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেটা হল গাড়ি। স্টকহলমে এটা একটু বেশী মাত্রায় প্রকাশ পায়, কারণ ইউরোপের আর সব দেশের তুলনায় এখানে গাড়ি অনেক বেশী। এ-দেশে প্রায় প্রতি তৃতীয় কি চতুর্থ মানুষেরই গাড়ি আছে। নিজেদের থাকার সমস্যার অন্ত নেই, তার ওপর ব্যবস্থা করতে হচ্ছে গাড়ি রাখার জায়গার। অনেক সময়ে পুরোনো বাড়ি ভাঙ্গার পর সেখানে আর নতুন বাড়ি না করে বিরাট খোলা প্রাঙ্গনে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবার শহরের মধ্যে অনেকগুলি Parking Houseও নির্মাণ করা হয়েছে। এ বাড়িগুলিতে কেবল গাড়িই থাকে। সাত-আটতলা বাড়ি ভর্তি কেবল গাড়ি আর গাড়ি। তবু কি গাড়ি রাখার জায়গা কুলিয়েছে? কখনও কোথাও গাড়ি রাখার জায়গা পাওয়া যায় না। অনেক জায়গায় "Parking" মিটার বসান আছে, ১ ঘণ্টা পর্যন্ত গাড়ি রাখা যায় কিছু খুচরো পয়সা দিয়ে। যেখানে-সেখানে গাড়ি রাখলেই মুশকিল। পুলিসের কড়া নজর আছে এর ওপর। এই কাজের ভার সাধারণত মেয়ে পুলিসদের ওপরেই থাকে।

মেয়েরা এ ধরনের কাজে বিশেষ পটু। ভুল জায়গায় গাড়ি রাখলেই সঙ্গে সঙ্গে ৫০ ক্রাউন জরিমানা। কেবল গাড়ি রাখার ঝামেলাই নয়, গাড়ি চালানোরও বেশ ঝামেলা আছে। খুব বেশী গাড়ি হয়ে যাওয়াতে সকাল বিকেল অফিসের সময়ে গাড়িগুলির ঠাসাঠাসি অবস্থা ও পিঁপড়ের মত অগ্রসর হওয়ার দৃশ্যটি রোজই চোখে পড়ে। যারা গাড়ি চালিয়ে যাবেন তাঁদের অবস্থাটা বুঝুন। একে ত বাড়ি থেকে অফিস যাতায়াতে সাধারণ বাস বা 'সাবওয়ের' চেয়ে ঘণ্টা ২।৩ বেশী লাগে। তারপর গন্তব্য স্থানে পৌঁছেও যে গাড়ি রাখার জায়গা পাওয়া যাবে তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই।

অনেক সময়ে হয়ত মাইল খানেক দূরে সুবিধামত জায়গায় গাড়ি রেখে বাকিটা পথ হেঁটেই যেতে হয়। তাছাড়া ভিড়ের মধ্যে গাড়ি চালাবার শারীরিক ও মানসিক

পরিশ্রম ত আছেই। শীতকালেও গাড়ি নিয়ে খুব একটা সুখ নেই। প্রথমত সকলের পক্ষে গরম গ্যারাজ পাওয়া অসম্ভব। তাই বেশীর ভাগ গাড়ি বাইরেই পড়ে থাকে, বরফে আর হিমে গাড়িগুলি জমে একাকার অবস্থা হয়। বরফে পিছল রাস্তায় গাড়ি চালানোর মধ্যে অসুবিধা ত আছেই, বিপদও আছে। সেই জন্যে সকলেই প্রায় শীতকালে বিশেষ রকমের টায়ার ব্যবহার করে যাতে পিছলে যাবার হাত থেকে রক্ষা পায়। তবু প্রায়ই ছোট বড় দুর্ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক লেগেই আছে। গাড়ি থাকলেই যে খুব বেশী রকমের শান্তি বা সুখ-সুবিধা পাওয়া যায়, এদের অবস্থা দেখলে তা বলা যায় না।

এই সব অসুবিধা গুলির জন্যেই অনেকে গাড়ি ব্যবহার করে শুধু গরমকালে বেড়াবার জন্যে। রোজ বার করে, পরে বাস ট্রাম বা সাবওয়েতেই যাওয়া আসা করে। নতুন নতুন সব বসতি হয়েছে স্টকহলমের উপকণ্ঠে। হাজার হাজার লোকে এইসব সাধারণ পরিবহণগুলিতে শহরে আসে কাজে কর্মে। স্টকহলমের উপকণ্ঠে ২টি ছোট শহরগুলির নাম বিশেষ সুপরিচিত।

যুদ্ধের পর ইউরোপের নানা দেশ থেকে বহু আশ্রয়প্রার্থী সুইডেনে আসায় স্টকহলমের ওপর লোকসংখ্যার চাপ পড়ার বিশেষ আশঙ্কা দেখা দেয়। সেই আশঙ্কার পরিণাম স্বরূপ উৎপত্তি হল এই ২টি আদর্শ উপনগরীর। স্টকহলমের পশ্চিম দিকে গড়ে তোলা হল Vallingby উপনগরীটি। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত Vallingby ছিল একটি ছোট গ্রাম মাত্র, যেখানে ছিল কেবল ১০।২০টি ঘরের বাস। এখন সেখানেই বাস করে প্রায় ২৫ হাজার মানুষ। স্টকহলমের সঙ্গে এদের যোগাযোগ রক্ষা হয় 'সাবওয়ের' মাধ্যমে, যাতায়াতের সময় ২৫ মিনিটের মত।

Vallingby নির্মাণের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে স্টকহলমের নগরনির্মাতারা সৃষ্টি করলেন Farsta উপনগরীর। এটি নির্মাণ করা হল স্টকহলমের দক্ষিণ দিকে। 'সাবওয়ে'-তে যেতে এখানেও ২৫।৩০ মিনিট লাগে। Farsta উপনগরী আধুনিক পরিকল্পনায় তৈরী। প্রায় ৪০ হাজার লোক এখানে বাস করে, এবং তারা Vallingby-বাসীদের মতই তাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিস এখানে কিনতে পারে। স্টকহলম যাবার বিশেষ দরকারই হয় না। তিনটি বড় 'Department Store' ছাড়া, এখানে আছে ৩৫টি ছোট দোকান, ৫টি ব্যাংক, রেস্তোরাঁ, পোস্ট অফিস, পুলিস অফিস, সিনেমা, থিয়েটার, গির্জা, লাইব্রেরী এবং সব রকমের চিকিৎসার সুযোগ। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় ও আমোদ-প্রমোদের সব ব্যবস্থাই এই উপনগরীগুলিতে আছে। এইখানে যাতে মানুষে স্বচ্ছন্দে দোকানপাট দেখতে বা বাজার করতে পারে, সেই জন্যে দোকান বাজার এলাকায় যানবাহন চলাচল একেবারে নিষেধ। তবে কাছাকাছি গাড়ি রাখার সুব্যবস্থা থাকাতে কাউকে গাড়ি রাখা নিয়ে হয়রান হতে হয় না। দোকান বাজার এলাকাগুলি ফোয়ারা ও ফুল দিয়ে সুন্দর সাজানো, বিশ্রাম করার জন্যে বসার জায়গারও অভাব নেই। এই ২টি উপনগরীকে এখানে 'A B C towns' আখ্যা দেওয়া হয়। A = Arbete, অর্থাৎ কাজকর্ম। B = Bostad, অর্থাৎ বাসস্থান। C = Centrum, বাজার দোকান ও অন্যান্য সুবিধার কেন্দ্র। বিশেষ করে 'Farsta'র নক্শা ও নির্মাণে মোহিত আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা এমনও বলে থাকেন যে, ভবিষ্যতের সব উপনগরীগুলির মূল পরিকল্পনা সম্ভবত এই 'Farsta'র নমুনার উপর নির্ভর করেই করা যাবে।

আধুনিক রূপ নিতে গিয়ে স্টকহলম সত্যিই কি তার প্রাচীন রূপটি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে? তা কিন্তু নয়। স্টকহলমের ঠিক মাঝখানে আছে একটি দ্বীপ যেখানে পাওয়া যায় স্টকহলমের অতি

'Gamlastan' বা পুরান শহরের একটি সংকীর্ণ গলি। অত্যাধুনিক স্টকহলমের এই কোণটি আজও মধ্যযুগের স্থাপত্য ও কৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করে

প্রাচীন রূপ। এই জায়গাটির নাম হল "Gamlastan", অর্থাৎ 'পুরোনো নগর'। এখানে ৭০০ বছর আগে স্টকহলমের উৎপত্তি হয়। ছোট ছোট নুড়ি পাথর দিয়ে বাঁধানো সরু সরু আঁকাবাঁকা গলিগুলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলে মনে হয় না এ যুগে আছি। এক বা দুই গজ চওড়া সব সরু গলিগুলিতে গাড়ি ঢোকানো অসম্ভব। নিশ্চিন্তে হেঁটে বেড়ানো যায় এই পুরোনো কালের ভিকিংপুরে। দু ধারে ছোট ছোট অন্ধকার দোকানগুলিতে প্রাচীন কালের জিনিসপত্র ঠাসা। দরজাগুলির উপরে প্রাচীন কালের অদ্ভুত সব ছবি বা আঁককাটা। অনেক সময়ে বিক্রেতারা প্রাচীন পোশাক পরে পরিবেশটা আরও মোহময় করে তোলে। যারা আজকের কোলাহল-বহুল স্টকহলমের হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্যে রেহাই পেতে চায়, তাদের কাছে এই "Gamlastan", বোধহয় স্বর্গ। এই 'প্রাচীন নগরী', আধুনিক নগর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। স্টকহলমের এই প্রাচীন অংগটি সম্ভবত কোনও দিনও নষ্ট হবে না, কারণ বহু সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি ও সুইডিশ সংগীতের রচয়িতাদের এখানে বাস। সুইডিশ অ্যাকাডেমি, যাঁরা সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করেন—তাঁদের অফিস এবং লাইব্রেরীও এখানে অবস্থিত। এ'রা সকলে আধুনিক যুগের কোলাহল ও উদ্দেগ থেকে দূরে থাকতে চান। কোনদিনই এই দ্বীপটিতে স্টকহলমের আধুনিকতার পরশ লাগতে দেবেন না এ'রা। তাছাড়া এই দ্বীপটিতে থাকেন সুইডেনের রাজা স্বয়ং। তাঁর রাজপ্রাসাদও এইখানেই অবস্থিত। সেটিকে নতুন করে গড়ারও কোনও মতলব নেই সুইডিশ নগরনির্মাতাদের—যে দ্বীপটিতে ৭০০ বছর আগে স্টকহলমের আবির্ভাব হয়েছিল, সেখানেই তার সেই প্রাচীন রূপটি আজও আত্মরক্ষা করে আছে।*

কৃষ্ণা দত্ত

* ছবিগুলি সুইডিশ টুরিস্ট ট্রাফিক অ্যাসোসিয়েশনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
ব্যথা-বেদনা তাড়াতাড়ি দূর করবার আধুনিক উপায়

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে!

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা: 'অ্যাসপ্রো' রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়!

মাইক্রোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'-তে মেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশী সূক্ষ্ম করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ করবার শক্তি দ্বিগুণেরও বেশী সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়—অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র ব্যথা দূর করবার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুবই শীগগির শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইজন্যেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর ক'রে দেয় এবং তার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

অতি সহজেই আপনি খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি যেভাবে খুসী খেতে পারেন—শুকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের যন্ত্রণায় নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' খাবেন: ব্যথা-বেদনা . মাথাধরা . গা-ব্যথা . দাঁতব্যথা . গাঁটে বেদনা . জ্বর-জ্বর-ভাব . ফ্লু জেঙ্গু জ্বর . গলাব্যথা।

মাত্রা: প্রাপ্তবয়স্ক: দুইটি ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার খাবেন। শিশুদের জন্য: একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কিভাবে কাজ করে দেখুন

ট্যাবলেটের কণাগুলির আকার যত বড় হয়, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেরী হয়—আপনার আরাম পেতেও সময় লাগে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র প্রতিটি ট্যাবলেটে প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। তাই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে-সঙ্গে মিশে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি ব্যথার উপশম হয়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।

অন্ধ জোনাকি

নিখিলচন্দ্র সরকার

বাসটা একসময় মনসাতলায় নামিয়ে দিয়ে গেল সতীশকে। এক আঁজলা ধুলোর ঝাপটা এসে লাগল গায়। একটু সরে এসে পকেট থেকে রুমাল বের করল। ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে একটা বটগাছের ছায়ায় দাঁড়াল এসে সতীশ। হাত মুখের ময়লা মুছে রুমালটা আবার পকেটে রেখে দিয়ে সামনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল। একটা ছোট কাঁচা রাস্তা পূব দিকে চলে গেছে। দু পাশে ধানক্ষেত। নরম চারাগুলো দুলছিল খুশিতে। বিকেল হয়ে এসেছে। ঘন সোনালী আলো এসে পড়েছে ক্ষেতের সবুজ বুকে। মাঝে মাঝে একটা ছায়ার ঢেউ দোল খেতে খেতে ধানের শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে দিগন্তে মিশে যাচ্ছিল। একটা মিষ্টি নেশা নেশা গন্ধ এসে নাকে লাগল। সতীশের খুব ভাল লাগছিল। এখনও যে তার নাগালের মধ্যে এরকম একটি জগৎ রয়েছে, তা

জানা ছিল না তার। নাগরিক পরিবেশে থাকার জন্যে ঐ ছবিটাকে সে হারিয়ে ফেলেছিল। আজ আবার তাকে যেন খুঁজে পেল। রাস্তার পশ্চিম দিকে একটা বাঁশঝাড়। সেখানে বাঁশগাছের ডগায় বসে একটা পাখি ডাকছিল থেমে থেমে। সতীশ তাকাল ওদিকে। এ পাখিটা খুব ছেলেবেলায় সে দেখেছিল। নামটা এখন মনে নেই। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সতীশ, সেই বটগাছের ক হাত

দূরে একটা পানায় ভরা পুকুর। ধুলো পানা জল মাটির একটা মেশানো গন্ধ উড়ছিল বাতাসে। পুকুরটার পাড়ে ওদিকে কিছু ঝোপঝাড়, অন্য দিকে একটা ডুমুরগাছ। কিছু আশশ্যাওড়া আর কচুগাছ। ডুমুরগাছের পাতার আড়ালে দু-তিনটে পাখি ঝগড়া করছিল। ফড়িংটা কি সুন্দর কচুর পাতায় বসে রয়েছে! লোভ হচ্ছিল, ওটাকে ধরে। কিন্তু পরক্ষণেই অন্য একটা কথা মনে পড়ে গেল। নতুন এসেছে এদিকে। চিনে চিনে আজ কাজলদের বাড়ি বের করতে হবে। আর একটু আগে এলে ভাল করতো। এতটা সময় লাগবে ভাবতেই পারে নি সতীশ। সন্ধ্যের আগেই খুঁজে বের করতে হবে। কন্ডাক্টারের কাছে জেনে নিয়েছে, এখান থেকে শেষ বাস ছাড়ে সাড়ে আটটা নাগাদ। তবে অধিকাংশ দিনই দু-চার মিনিট আরো দেরি করে।

ছাড়ে। ঘড়ির দিকে তাকাল একবার সতীশ। এখন বিকেল সাড়ে চারটে।

পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল সতীশ। সিগারেট ধরিয়ে বুক পকেট থেকে কাগজের একটা টুকরো বের করে চোখ বুলিয়ে নিল। সামনের রাস্তাটা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলে একটা বড় পুকুর।

রায়-বাড়ির দীঘি নামেই এ অঞ্চলে এর খ্যাতি। ওর পুব পাড় দিয়ে একটা পায়ে চলা পথ চলে গেছে অন্য গাঁয়ে। সেই পথ ধরে কিছুটা গিয়ে একটা শীতলামন্দির। এই মন্দির পেছনে রেখে আরো মিনিট দশেক হাঁটলে নতুন কিছু মানুষের বসবাস শুরু। এখান থেকেই কলোনীর আরম্ভ। ঢুকবার মুখে একটা ভাঙা চায়ের দোকান পড়বে। 'রোহিণী টি স্টল।' তারপর থেকেই দরমার বেড়া দেওয়া গায়ে গায়ে লাগানো সব ঘরদোর। অধিকাংশেরই টালির চাল। ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে লোকে। বিনুর নাম বলতে হবে। কাজল বললে কেউ চিনবে না। আর তার নাম করাটাও ঠিক হবে না ওখানে। কাজলের দাদা বিনু। কাগজের টুকরোটা ভাঁজ করে আবার পকেটে রেখে দিল সতীশ। ওদের কথা মনে হতেই এক গভীর আবেগ জড়িয়ে পড়ল মুহূর্তে। তাড়াতাড়ি কটা টান দিয়ে সিগারেটের শেষাংশ ফেলে দিল। বহুদিন পর এদের সঙ্গে দেখা হবে। সবাইকে চমকে দিয়ে আজ একটা মজা দেখবে সতীশ। অনেক খুঁজে খুঁজে কাজলদের ঠিকানা বের করেছে। সতীশের আবির্ভাব ওদের কাছে অপ্রত্যাশিত। কাজলই আশ্চর্য হবে সবচেয়ে বেশী। বহুবার ওদের কথা ভেবেছে সতীশ। ঠিকানা সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। পারে নি। তারপর সৌভাগ্যবশতই হঠাৎ একদিন ডালহৌসীর ট্রাম লাইনের কাছে, ভিড়ের মধ্যে হরিহর কাকার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। প্রথমটায় হরিহর কাকা তাকে চিনতে পারে নি। পরিচয় দিতে চিনল। হরিহর কাকার বাড়ি দেশে কাজলদের বাড়ির পেছনেই ছিল। সতীশ ছেলেবেলায় ওদের বাড়ি গেছে কাজলের সঙ্গে। হরিহর কাকার কাছেই ওদের ঠিকানা নিল। সতীশ গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কাজলরা কেমন আছে?' জবাবে হরিহর কাকা ওদের ঠিকানা দিয়ে শেষে বলেছিল, 'তুই নিজেই গিয়ে একবার দেখে আসিস, ঠিকানা তো দিয়েই দিলাম। তোকে দেখলে ওরা খুব খুশী হবে, এখনও তোর কথা বলে ওরা।' বলে আর দাঁড়ায় নি হরিহর কাকা। এরকম ব্যবহারে একটু অবাকই হয়েছিল সতীশ। পরে ভেবে দেখেছে, এরকম একটা প্রচণ্ড ঝড়ের পর, সব কিছু হারিয়ে এখনও যে স্বাভাবিক জীবনে চলাফেরা করছে এরা, এটাই সবচেয়ে বড় সান্ত্বনার, সুখের কথা।

আসতে আসতে আবার একবার তাকাল মাঠের দিকে। বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে সবুজের মাখামাখি। মাঝে মাঝে কিছু বাবলা গাছ। শরতের অনন্ত নিঃসীম নভোতল। পরিচ্ছন্ন সাদা টুকরো মেঘ সগর্বে নীলের বুকে হেঁটে চলেছে। মন্থর, অলস শৌখিন মেজাজ। মাথার ওপর দিয়ে কিছু বক উড়ে গেল। ওরা বটগাছের ডালে রাত কাটাবার আয়োজন করতে লাগল। আরো কিছু জলের কিনারে তখনো ঘুরছিল খিদে মেটানোর জন্যে। ক্ষেতের আল-গুলোও চোখে পড়ছিল সতীশের। কচি ঘাসে ঢেকে গেছে। বিকেলের রোদ দেখতে দেখতে আরো সোনাবরন হয়ে আসছিল।

বিস্তৃত সবুজ ক্ষেতের ওপর দিয়ে রোদ্দুরের ছায়াটা দ্রুত ছুটেছিল। ধানের শীষে শীষে একটা মাতাল অবশ-করা গন্ধ। মনে হচ্ছিল, গোটা প্রান্তরটাই গভীর নেশায় মাতামাতি করছে। চরাচরে অন্ধকার নামলে বুঝি আরো বিবশ স্খলিত নিরাবরণ হবে ধীরে ধীরে। এ গন্ধ একদিন মাতাল করেছিল সতীশকে। আজো তার রেশ কাটে নি পুরোপুরি। একটু অন্যমনস্ক হলো সতীশ। আজ কাজল কি তাকে চিনতে পারবে চট করে? এতকাল পরে দেখা হবে। ওর-ও কত পরিবর্তন হয়েছে চেহারায় মনে, কে জানে! যদি না চেনে? কাজলের আর দোষ কি। হরিহর কাকাই তার অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে প্রথমটায় চিনতে পারল না তাকে! চিনুমাসী চিনবে তো? নিশ্চয়ই চিনবে। না হয় পরিচয় দেবে। শুনেছে, কাজলের আজো বিয়ে হয় নি। আর কবে হবে! সতীশের মনটা আনন্দে বেদনায় স্মৃতিমন্থনে দুলছিল। আজ কত বছর পরে ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে সে। শীতলামন্দিরের সামনে এসে একটু থমকে দাঁড়াল। এখান থেকে দুটো রাস্তা বেরিয়েছে। একটা সোজা পুব দিকে চলে গেছে। আর একটা বেঁকে দক্ষিণে। পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করে আর একবার দেখে নিল ভাল করে। দক্ষিণমুখী রাস্তাটাই ধরতে হবে। কাগজটা রেখে দিয়ে আবার একটা সিগারেট ধরালো। রাস্তার পাশে একটা বড় তেঁতুলগাছ। একটা আমলকিগাছও চোখে পড়ল সতীশের। কিছু পাখি কিচিরমিচির শব্দ করছিল আসন্ন সন্ধ্যের মুখটায়। একটু একটু শীত করছিল তার। চাদরটা গায়ে এবার জড়িয়ে নিল। আশেপাশে হিম জমতে শুরু করেছে। একটা নির্জীব নরম ক্ষীণায়ু আলোর রেখা তখনও আমলকিগাছটার মাথায় কাঁপছিল।

এবার 'রোহিণী টি স্টল' চোখে পড়ল সতীশের। একটা আঁকা-বাঁকা টিনের টুকরোর গায়ে অস্পষ্ট অপটু হাতের অক্ষর ক'টা অনেক কষ্টে আবিষ্কার করল। দোকানের ঝাঁপের নিচে দুটো চেয়ার পাতা। তিন-চারটে লোক বসে গ্লাসে করে চা খাচ্ছিল। আর দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা-কাটাকাটি করছে। কাছে এসে দেখল ক'টা অল্পবয়েসী ছেলেও বসে রয়েছে ভেতরে। সতীশের দিকে তারাও তাকিয়েছে কথা বন্ধ করে। আর একটু এগিয়ে এসে শুধলো, 'আচ্ছা, বিনয় রায়দের বাড়িটা কোন্ দিকে হবে?'

'বিনয় রায়, কি রকম দেখতে বলুন তো?'

'আমি যখন দেখেছি, তখন তো ভালই ছিল দেখতে। এখন তো ঠিক বলতে পারবো না।'

'বয়েস কত?' অন্য একজন তাকাল তার দিকে।

'আমাদের মতনই হবে।'

বেঞ্চে-বসা লোকগুলো পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছিল। ঠিক করে চিনতে পারছিল না। ভেতরে বসা একটি ছেলে এগিয়ে এসে বলল, 'ডাকনাম কি বিনু?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিনু।' সতীশ সমর্থন জানাল।

'তার এক বোন আর বিধবা মা, এই তো?' ছেলেটি চোখ তুলে একবার দেখল।

'ঠিকই ধরেছ তুমি।' এত তাড়াতাড়ি যে সতীশ ওদের খবর পেয়ে যাবে, তা ভাবতে পারে নি। খুশী মনে ছেলেটির দিকে চেয়ে বলল, 'তোমার যদি কোন অসুবিধে না হয়, একবার চলো না আমার সঙ্গে।'

দু-দণ্ড কি ভাবল ছেলেটি। তারপর হেসে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা চলুন, না চিনলে প্রথমটায় একটু কষ্টও হবে যেতে আপনার।'

'বিনুকে আবার এসময় বাড়ি পাবো তো গিয়ে?' সতীশ যেতে যেতে বলল।

'মনে তো হয় না, পাবেন। বিনুদা যে কখন কোথায় থাকেন আমরাও জানি না, উনি আমাদের সবুজ সংঘের সেক্রেটারি।'

'এমন লোককে সেক্রেটারি করেছো তোমরা?' সতীশ হাসছিল। ছেলেটি একবার চোরা চোখে তাকিয়ে দৃষ্টি নামিয়ে নিয়েছে। বুঝতে পারল, কথাটা নেহাতই কৌতুকবশে বলা হয়েছে।

'বা রে, বিনুদাই তো সব করেছেন। আমরা কিছু করবো না, অথচ করলে তার খুঁত ধরবো, অকারণে খালি ঝগড়া করবো, এই আমাদের স্বভাব বুঝলেন।'

'তুমি কি কর?' সতীশ ওর চোখে চোখে চাইল।

'এবার ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছি।' একটু থেমে বলল, 'তবে কোন চাকরি-বাকরি পেলেই আর কোন কথা নয়, এসব পড়া-টড়া ছেড়ে দেবো।'

'কেন?'

'কি হবে বলুন তো আমাদের পড়াশুনো করে? এসব জেনারেল লাইনে পড়ে কোন লাভ আছে আজকাল?' সহজ ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে গেল ছেলেটি। ওর কথার মধ্যে এক অকপট সারল্য ছিল। সতীশ বুঝতে পারল, অনেক মূল্য দিয়েই ছেলেটিকে এ অভিজ্ঞতাটুকু সঞ্চয় করতে হয়েছে। একটুক্ষণ আর কেউ কোন কথা বলল না। পরে ছেলেটি হেসে নিয়ে শুধলো, 'আপনি বুঝি এদিকে আসেন নি কোনদিন?'

'না রে ভাই।'

'ওরা আপনার কে হয়?'

একটু ইতস্তত করল সতীশ। পরে সামান্য ভেবে নিয়ে বলল, 'আত্মীয়।'

'তবে তো সবই জানেন ওদের।' ছেলেটির গলার স্বর বেদনার্ত শোনাল।

সতীশ ভাবল, ওদের সম্পর্কে কিছুই তো সে জানে না। এ ক' বছরে জানার চেষ্টা সে করেছিল, কিন্তু পারে নি। এজন্যে তারও দুঃখ বা ক্ষোভ কম নয়। আজ এমন কি ঘটতে পারে? আর তাই যদি হবে, তবে হরিহর কাকা আভাসে অন্তত তাকে বলত কিছু। ছেলেটিকে কিছু জিজ্ঞেস করবে কিনা ভাবল। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হলো, এ ব্যাপারে এই অপরিচিত ছেলেটির কাছে তার অতিরিক্ত কৌতূহল দেখানো ঠিক হবে না। কি ভাববে ওকে? কিছু না বলে হাঁটতে লাগল। একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ছেলেটি। আঙুল দেখিয়ে বলল, 'আমি আর যাবো না, ওই যে বেড়ার ধারে শিউলিগাছটা দেখছেন ওটাই বিনুদাদের বাড়ি।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমায় ভাই।'

ছেলেটি চলে গেল। এ পাড়াটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে, তার শেষ বাড়িটাই কাজলদের। মাঝে একটু ছোট মাঠের মতন। তার দু' পাশে লতাগুল্মের ঝোপ। দুর্বোঘাসে ভরা পথটা। দু-তিনটে নারকেলগাছ। একটু নিরালায় ওদের বাড়িটা। বোঝা যায়, এদিকে লোকজন খুব কম চলাফেরা করে। ক'টা ফুলগাছও চোখে পড়ছিল। ফুলও ধরেছে ভালো। তার একটা গন্ধ ছিল গাছের তলায়। নারকেলগাছের মাথায় দু-তিনটে টিয়েপাখির চীৎকার শুনতে পেল সতীশ। সূর্যের শেষ আলোটুকুও মুছে

নিচ্ছিল। সেখানে অন্ধকার নামছিল নিঃশব্দ মৃদু পায়ে। বিচিত্র এক অনুভূতির ভেতর দিয়ে এ পথটুকু পেরিয়ে এলো সতীশ। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে শিউলির গন্ধে চেতনাকে ভিজিয়ে নিল একবার। তারপর আস্তে আস্তে উঠোনে এসে দাঁড়াল। কে যেন তখনও পিচকিরি দিয়ে গোলা অন্ধকার ছিটোচ্ছিল ঘরের আশপাশে, লাউমাচানের তলায়, উঠোনে। খুব সাধারণ দুটি ঘর। বেড়ার ফাঁক দিয়ে কৃশ বিমর্ষ আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। বড় চুপচাপ। নিস্তব্ধ। কেউ কি বাড়ি নেই? বিনুকে যে এ সময় পাওয়া যাবে না এটা সতীশ বুঝতে পেরেছিল আসার পথে। ভেতরে আলো. অথচ কারো সাড়া নেই! ঘরের এক কোণে পেঁপেগাছের কাছে দু'-তিনটে লেবুগাছ দেখতে পেল। ফুল ধরেছে ডালে। তার আনাচে-কানাচে জোনাকির দল ঘুরছিল নিরুদ্দেশভাবে। দাওয়ার কাছাকাছি এসে বিনুর নাম ধরে ডাক দিল সতীশ। বার কয়েক ডাকাডাকির পর যিনি বেরিয়ে এলেন, তিনি চিনুমাসী। এ কি চেহারা হয়েছে! সতীশ ভিড়ের মাঝে দেখলে কোন দিনই চিনতো না তাঁকে। কাছে এসে প্রণাম

করে হেসে দিয়ে শুধলো, 'চিনতে পারছেন?' বলে চেয়ে থাকল সতীশ।

লণ্ঠনের আলোয় খুঁটিয়ে দেখলেন যেন একটু. মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, এখনও তাকে চিনতে পারেন নি চিনুমাসী।

'আমি কিন্তু পেরেছি, আমার নাম সতীশ।' তখনও অল্প অল্প হাসছিল ও।

'সতীশ!' একটু অবাক হয়ে তখনও খুঁজে বেড়াচ্ছেন যেন। অতীতের স্তূপীকৃত ঘটনার ভেতরে এমনভাবে নামটি আত্মগোপন করে থাকবে কে জানত।

'আপনাদের গাঁয়ের ভবতোষ নন্দীর ভাগ্নে।' হাসতে হাসতে বলল সতীশ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। এত বড় হয়ে গেছিস? আগে তো এই রোগা টিং-টিঙে ছিলি। তাই বলি, গলার স্বরটা এত চেনা চেনা লাগছে কেন! অথচ দেখ, একদম চিনতে পারছিলাম না।' একটু থেমে হেসে দিয়ে আবার বললেন, 'আমার আর দোষ কি বল।'

'আপনার চেহারায়ও তো আর চেনার কোন উপায় রাখেন নি।'

'এবার যেতে পারলে বাঁচি। আর ইচ্ছে করে না বাঁচতে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন চিনুমাসী। লেবুফুলের একটা গন্ধ পাচ্ছিল সতীশ। লেবুর কাঁটায় কাঁটা জোনাকি আটকে গেছে। এতক্ষণের মধ্যে কাজলকে তো দেখল না একবারও। বোধ হয় বাড়ি নেই। চিনুমাসীকে এখন খুব রুগ্ন করুণ দেখাচ্ছে। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। অথচ এখানে পা দেওয়ার আগের মুহূর্তেও চিনুমাসীর হাসি হাসি মুখটা ভেসে উঠেছে।

'এভাবে দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আয় ভেতরে আয়।' চিনুমাসী ডাকলেন। ঘরে এসে এক-পাশে লণ্ঠনটা রাখতে রাখতে বললেন, 'আমি ভাবতেই পারি নি যে, তোকে আবার দেখতে পাবো কোনদিন। একসময় তোর কথা আমরা প্রায়ই বলাবলি করতাম।' বলে ছেঁড়া মাদুরটা তুলে নিলেন তক্তপোশের ওপর থেকে। একটা কাঁথা বিছোতে বিছোতে শুধোলেন, 'আমাদের খোঁজ পেলি কি করে?'

'একদিন হরিহরকাকার সঙ্গে ডাল-হৌসীতে দেখা। তার কাছ থেকেই জানলাম আপনারা এখানে আছেন।' সতীশ চোখ বুলোচ্ছিল সমস্ত ঘরটায়।

'এবার ভাল করে বোস এর ওপর।' একটু থেমে বললেন, 'তোর মামারা এখন কোথায়?'

'আসামে গোহাটিতে আছে।'

'আমাদের গাঁয়ের অনেকেই তো ওদিকে গেছে।' বলতে বলতে একটু অন্যমনস্ক হলেন চিনুমাসী।

সতীশ একটু ইতস্তত শুধলো, 'বিন্দুকে দেখছি না যে!'

'বাড়ি থাকলে তো দেখবি, দিনরাত টো টো কোম্পানী।

'কাজ করে কোথায়?'

'তার কি কোন ঠিক আছে, আজ এখানে কাল ওখানে। কোন কাজই নাকি বাবুর ভাল লাগে না।' চিনুমাসীর গলায় ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছিল।

পাশের ঘরে আলো জ্বলছিল। দরজাটা ভেজানো। সতীশ একটু উসখুস করল। কাজলের কথাটা জিজ্ঞেস করবে কি করবে না ভাবছিল। ওর কথা তো একবারও বলছেন না চিনুমাসী! ও কি নেই নাকি এখানে? সতীশ জানে না কিছুই। সে জানতও না কিছু এ ক' বছর। চিনুমাসী একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছেন। চোখ দুটো বিষাদে ঢাকা। কি যেন ভাবছিলেন। তবে কি ওর অস্থিরতা, শূন্যতা চিনুমাসীর চোখ এড়ায় নি? চিনুমাসীকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল। সতীশও প্রথমটা তাঁর এ গাম্ভীর্য দেখে অবাক হয়েছিল। পরে মনে হয়েছে, তীরে পৌঁছোবার আগে মাঝপথে চিনুমাসীরা এক প্রচণ্ড ঝড়ে পড়েছিলেন; সেই ভয়াবহ দুর্যোগ তাঁদের সব কিছু হরণ করেছিল, শুধু প্রাণটুকু ফিরিয়ে দিয়েছে। তীরে পৌঁছে তাঁদের মনে হলো, এতদিনের গচ্ছিত সম্পদ শুধু লুণ্ঠিত, অপহৃতই নয়, তাঁরা নিজেরাও ক্ষত-বিক্ষত, বিধ্বস্ত। তার চিহ্ন এখন সর্বাঙ্গে প্রকট। চিনুমাসীকে দেখে সতীশেরও তাই মনে হয়েছে। ওর দৃষ্টি চিনুমাসীর মুখের ওপর স্থির। কিছুক্ষণ নীরব থেকে একসময় চিনুমাসী শুধোলেন, 'কাজলকে তোর মনে আছে?' বলে একদৃষ্টে ওর চোখে চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

সতীশ দৃষ্টি নত করেছে। চিনুমাসী আজ তাকে এরকম একটা প্রশ্ন করবে জানা ছিল না। ভাবতেও কষ্ট হচ্ছিল তার। ইচ্ছে হলো একবার, বলে : হ্যাঁ চিনুমাসী, মনে আছে, সকলের কথাই মনে আছে আমার, কাজলের কথাও। আস্তে আস্তে চোখ তুলে চিনুমাসীকে অপলকে দেখল ক' মুহূর্ত, তারপর ধীর সংযত কণ্ঠে বলল, 'ওকে তো দেখছি না, ও কি নেই এখানে?' গলার স্বরে আর্দ্রতা ছিল। বোঝা যাচ্ছিল, সামান্য আগেও যে গভীর আবেগ অনুভব করেছিল হৃদয়ে, তার তাপ এখনও অনিঃশেষ।

চিনুমাসীর চোখ দুটোও কেমন যেন ম্লান বেদনাতুর হয়ে উঠেছে মুহূর্তে। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন যেন। কিছুক্ষণ পরে খেয়াল হলো, সতীশ তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। ও অস্বস্তিবোধ করছিল। শান্ত নরম গলায় বললেন, 'আছে, এখানেই আছে, তবে আর ক'দিন থাকবে জানি না।' শেষের শব্দ ক'টা ক্ষীণ ও অস্ফুট শোনাল। চিনুমাসীর গলা কাঁপছিল। একটি দুর্নিবার বেদনা ও মথিত আবেগকে অনেক কষ্টে যেন সংযত করছেন। ঠোঁট কামড়ে ধরলেন কণ্ঠটাকে সহনীয় ও স্বাভাবিক

করার জন্যে। চোখ দুটো ঘোলা ও করুণ হয়ে উঠল আরো।

সতীশের চোখে মুখেও উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ছিল দ্রুত। চিনুমাসী কি বলতে চাইছেন? কাজল এতক্ষণ এখানেই রয়েছে? অথচ কোন সাড়া নেই তার? আর এখানেও থাকবে না বেশী দিন? কেন? সমস্ত চোখে মুখে একটা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে। সতীশ সোজা চোখে চেয়ে থেকে কাতর ও বিমর্ষ গলায় শুধলো, 'কেন? কি হয়েছে ওর চিনুমাসী?' গলার স্বর তার ক্ষীণ ও কম্পিত মনে হলো।

চিনুমাসী ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। চোখ দুটো তার জ্বালা করছিল। একটুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। সতীশের মনে হচ্ছিল, কোন নিপুণ ধীবর যেন সমস্ত ঘরময় একটি বিষণ্ণতার জাল ছড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছিল, এখন ধীরে ধীরে তা গুটিয়ে নিচ্ছে সে। চিনুমাসীরা তার মধ্যে জড়িয়ে গেছেন। বেরোবার চেষ্টা করে করে এখন ক্লান্ত, নিরুপায়। চিনুমাসীর এই ক্লান্ত নিঃসহায় রিক্ত মূর্তিটি তাকে কষ্ট দিচ্ছিল কেবল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দে ঠান্ডা ঢুকছিল ঘরে। করুণায় ভেজা চোখ দুটো দিয়ে সতীশকে দেখতে দেখতে বললেন, 'দেখবি ওকে, তবে আয় আমার সঙ্গে।' বলে ক' পা এগিয়ে গেলেন। গিয়ে ভেজানো দরজাটা সামান্য ঠেলতেই খুলে গেল। সতীশও তখন তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এক কোনায় মেঝেয় একটা লণ্ঠন টিমটিম করে জ্বলছে। শিয়রের কাছে একটা টুল। সেখানে ওষুধের শিশি, জলের গ্লাস, কাপ আর কিছু ফল। একপাশে একটা টুকরি। সতীশ অবাক হয়ে গেল। অস্ফুটে শুধলো, 'ওর কি কোন খারাপ অসুখ?'

'হ্যাঁ, ডাক্তার বলেছে ক্ষয়রোগ।' একটু থেমে আবার বললেন, 'আর জন্মে যে কি পাপ করেছিলাম, না-হয় এমন হয় রে!' নিশ্বাস ফেললেন দীর্ঘ করে চিনুমাসী। গলাটা ভেজা।

'কোন ভাল ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?' সতীশের জানা ছিল না যে, এমন একটি দৃশ্য তাকে আজ দেখতে হবে। এ আঘাত তার কাছে অপ্রত্যাশিত ও গভীর বেদনার।

'বড় ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সঙ্গতি তো আমাদের নেই।' চিনুমাসীকে বিচলিত মনে হলো। একটু থেমে ধীরে ধীরে বললেন, 'আমাদের যা সাধ্য তার বেশীই করছি। তবু কি বাঁচবে ও?' সতীশ দেখল, চিনুমাসীর চোখে জল। আঁচল দিয়ে তা মুছে নিচ্ছেন। চোখের জল মুছতে মুছতেই বললেন, 'আজ ক'দিন থেকেই কী ঘুম ঘুমোচ্ছে না! কোন চেতনা থাকে যদি।'

'থাক চিনুমাসী, ডাকবেন না ওকে, ঘুমোক একটু। আমি বরং বসি এখানে।' ওর গলাও ভেজা নরম। কথাটা বলে একটা টুল নিল সতীশ।

'তোকে দেখলে ও খুব খুশী হবে, কেউ তো আর এ ঘরে আসে না বড় একটা।' বলে কাছে এসে আস্তে করে কাজলকে ডাক দিলেন চিনুমাসী। 'দেখলি তো, এত জোর জোরে কথা বলছি, ডাকলাম, তবু যদি ঘুম ভাঙে।' সতীশের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আবার ডাকলেন, 'এই, আর কত ঘুমোবি, এবার ওঠ, দেখ কে এসেছে।' বলে কপালে হাত রাখলেন চিনুমাসী।

'ইস গায়ে বেশ জ্বর।' বলে ক'টা উড়ন্ত শুকনো বাড়তি চুল ঠিক করে দিলেন।

গভীর অচেতন ঘুম থেকে আস্তে আস্তে চোখ তুলল কাজল।

'দেখ কে এসেছে!' চিনুমাসী হাসবার চেষ্টা করলেন একটু। কাজল তখনও পুরোপুরি বুঝতে পারছিল না, মা তাকে কি বলছে। ঘুমের আবেশ জড়তা কাটিয়ে এবার পূর্ণ চোখে মার মুখের দিকে তাকাল কাজল।

'দেখ তো ওকে চিনতে পারিস কিনা?'

'আমিও যে তোমায় চিনতে পারছিলাম না কাজল!' সতীশ আর একটু এগিয়ে আনল টুলটা।

'কে?' কাজল এমনভাবে চমকে উঠল, যেন মনে হলো, বহু দিন বহু প্রতীক্ষার পর আজ অবেলায় এই পরিচিত ঈপ্সিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে। অথচ দীর্ঘ সময়ের কোলাহল মত্ততার মধ্যে এই স্বরটিকে সে তন্নতন্ন করে খুঁজেছিল অতি গোপনভাবে। মুহূর্তের মধ্যে অতীতের একটি ঝড়ো হাওয়া যেন বয়ে গেল সব কিছুকে তোলপাড় ও উদ্‌ভ্রান্ত করে। কাজল বিমূঢ় অভিভূত হয়ে কিছু সময় অপলকে তাকিয়ে থাকল সতীশের মুখের দিকে। ওর চোখ দুটি ছলছল করছিল। এবং এই সঙ্গে ওর ক্লান্ত বিষাদমাখা মুখখানায় অপরিমিত অথচ প্রচ্ছন্ন আনন্দের এক মুগ্ধ প্রসন্ন স্পর্শ ছড়িয়ে পড়ছিল ধীরে ধীরে। এক ঘন তপ্ত আবেগ যেন মুহূর্তে তাকে উদ্বেল ও অস্থির করে তুলেছিল। মনের এই অশান্ত উৎকণ্ঠিত সুখের ক্ষণটিকে সে স্বাভাবিক ও সংযত করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। চোখের দৃষ্টি আনত করেছে কাজল। ক্ষীণ দুর্বল হাত দিয়ে চোখের জল মুছল নীরবে। তার এই গভীর সংরক্ষিত বেদনা এমনি করেই চোখের জলে ভিজে ভিজে কোমল হলো একসময়। জীবনের আলোকিত অঙ্গনে যাকে প্রতিটি মুহূর্তে আশা করেছিল আসবে, সে এলো শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যের ছায়া ঘেরা বিষণ্ণ রুগ্ন ঘরে। আজ এই মানুষটিকে বরণ করার মতন ঐশ্বর্য কি তার আছে? কাজল চোখ তুলল আস্তে আস্তে।

সতীশও কোন কথা বলতে পারে নি এতক্ষণ। কি বলবে। মনে মনে যে ছবি সে তৈরি করেছিল এখানে আসার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত, এসে দেখল, তা চুরি হয়ে গেছে। এখানে তাকে আর কোনদিনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভেতরে ভেতরে এক গ্লানি ও অস্থিরতা অনুভব করেছে কাজলকে দেখে। এরকম অবস্থায় কোনদিন দেখা হবে তাদের, এটা জানা ছিল না সতীশের। মনে মনে একবার বলতে ইচ্ছে হলো তার, বিশ্বাস করো কাজল, এ অবস্থায় কোনদিন আমাদের আবার দেখা হবে, ঘুণাক্ষরেও ভাবি নি। তোমার সব কথা আজো আমার মনে আছে, কিছুই ভুলি নি। আজ যে অনেক কিছু ভেবে এসেছিলাম আমি। ঈশ্বর কি এতই নিষ্ঠুর, নির্দয়? সতীশ চোখ তুলে অপলকে দেখল কাজলকে। পরে সামান্য হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'আমি কিন্তু তোমাদের অনেক সন্ধান করেছি।'

চিনুমাসী কমলালেবুর খোসা ছাড়িয়ে বলল, 'তোর কিন্তু আর একটা বড়ি খাওয়ার সময় হয়ে গেছে কাজল।'

কাজল কোন কথা বলল না সঙ্গে সঙ্গে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে একসময় ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'সতীশদাকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও মা, এখানে বেশীক্ষণ থাকা ঠিক নয়।' এটুকু বলেই যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কাজল। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল তার। করুণ চোখে সতীশকে একবার দেখল সে।

'আমার জন্যে ভাবতে হবে না অত, বরং ওষুধটা খেয়ে নাও আগে।' সতীশ চোখে চোখে চেয়ে থাকল ক' মুহূর্তে। কাজলও ধীরে ধীরে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে ওর মুখের ওপর থেকে।

চিনুমাসী বড়িটা খাইয়ে দিয়ে একটা কাপে করে লেবুর রসটা এগিয়ে দিল ওর কাছে। বলল, 'তুই এটা খেতে খেতে একটু গল্প কর ওর সঙ্গে, আমি একটু চা আর খাবার করি ওর জন্যে। কতকাল পরে আজ এলো ও।'

চিনুমাসী চলে গেলে সতীশ আর একটু এগিয়ে আনল টুলটা।

'তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, এ বড় খারাপ রোগ।' কথাটা বলে সামান্য লজ্জা ও বেদনা বোধ করল যেন। কেমন যেন অন্তরঙ্গ আবেগস্পর্শ ছিল স্বরে। সামান্য অন্যমনস্ক হলো কাজল। খানিকক্ষণ পর আবার দুর্বল ক্ষীণ গলায় বলল, 'না, না, আর একটু সরে বসো।'

'সেটা আমি বুঝবো, তোমার অত ভাবতে হবে না।' সতীশকে অনেক সহজ ও অনাড়ষ্ট মনে হলো। দীর্ঘদিনের ব্যবধানের জন্যে সামান্য আগেও যে দ্বিধা সঙ্কোচ ও জড়তা বোধ করেছে সে, এখন তা কাটিয়ে উঠেছে।

এর জবাবে কি বলবে, কাজল বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ পর বিমর্ষ গলায় শুধু

বলল, 'ভগবান আমার সে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন।' একটু থামল কাজল। আস্তে আস্তে দম নিয়ে অনুচ্চ অথচ গাঢ় কণ্ঠে বলল, 'কারো জন্যে কিছু ভাবা আমার নিষেধ। আমার জন্যেই এখন সকলে ভাবে।' বলতে বলতে কেমন যেন উদাসীন হলো কাজল।

সতীশও দু' মুহূর্ত কিছু বলতে পারল না। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কাজলের মুখখানা বেদনায় ভরে উঠেছে। ওই রিক্ত করুণার নম্র পাণ্ডুর মুখখানার দিকে চেয়ে সতীশের খালি মনে হচ্ছিল, এমনভাবে আর ক'দিন বাঁচবে ও? জানলা দিয়ে সন্তর্পণে তখন হিম ঢুকছিল ঘরে। সতীশও এই মুহূর্তে তার মৃদু স্পর্শ পেল। মমতা জড়ানো কোমল চোখ দুটো ততক্ষণে আস্তে আস্তে সরিয়ে এনেছে সতীশ। তারপর নিবিড় সহানুভূতি ও সান্ত্বনার কণ্ঠে বলল, 'এমন করে ভাবছো কেন কাজল। তুমি ভাল হয়ে উঠবে। দেখো, আমার কথা ঠিক ফলবে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ও। ক' পা এগিয়ে গিয়ে জানলাটা ভাল করে বন্ধ করে দিল। পরে কাজলের মুখের দিকে চেয়ে সামান্য হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'কম্বলটা ভালো করে জড়িয়ে নাও। আজ বেশ ঠান্ডা পড়েছে বাইরে।' আবার টুলটায় এসে বসল সতীশ।

ধীরে ধীরে কম্বলটা টেনে নিল কাজল। একটু নীরব থেকে মৃদু গলায় বলল, 'সবাই বলে আমি ভালো হয়ে যাবো; কিন্তু আমি জানি, একটু একটু করে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি।' সামান্য থেমে একবার সতীশের মুখের দিকে করুণভাবে চাইল কাজল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে দিয়ে পলকে নিজের মধ্যে ডুবে গেল যেন ও। একটা নির্লিপ্ত নিরাসক্ত দৃষ্টি। সতীশও কাজলকে দেখল। কেউ কোন কথা বলল না খানিকক্ষণ। কি মনে পড়ায় আবার স্বাভাবিক হলো কাজল। একসময় দৃষ্টি আনত করে বসে থাকল। চোখের কোল দুটো ততক্ষণে ভিজে নরম ও আর্দ্র হয়ে উঠেছে। অস্ফুটে বলল, 'তোমার কথা শুনে এখন আমার খুব সাধ হচ্ছে বাঁচতে।' কথাটা শেষ করে চোখ তুলে ভরা প্রান্ত দৃষ্টিতে একবার দেখল সতীশকে। আবার পরমুহূর্তেই তা নামিয়ে নিল। জলে ঝাপসা হয়ে উঠেছে দৃষ্টি।

'সেই তো এলে! দু' দিন আগে এলে কি হতো!' কথাটা শেষ করতে গিয়েও শেষের শব্দটা জড়িয়ে গেল। বিষণ্ণ ও করুণ শোনাল স্বর। তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছল কাজল।

সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না সতীশ। চোখ তুলে একবার শুধু দেখল কাজলকে। তারপর হ্যারিকেনের ঘোলা আলোর দিকে চেয়ে শান্ত ধীর কণ্ঠে বলল, 'অনেক খোঁজ করেছিলাম। আর তোমরা, বিশেষ করে তুমিও তো কিছু জানাও নি আমায়।' সতীশ নির্নিমেষে চেয়ে থাকল।

'তোমাদের ঠিকানা জানতাম না।' কাজল আনত ভঙ্গিতে বসে থেকে বলল।

'কেন, সেবার চলে আসার পর আমি তো অনেকগুলো চিঠি লিখেছিলাম, পাও নি?'

'হুঁ, পেয়েছি।' মৃদুভাবে মাথা নাড়ল কাজল। সতীশের চোখে চোখে চেয়ে কি যেন ভাবল ক' মুহূর্ত। শ্রান্ত নির্জীব চোখ দুটো যেন চকিতে একবার চঞ্চল ও ত্রস্ত হয়ে উঠল। বলল, 'ঠিক সে সময়ই গ্রামসুদ্ধ লোক পালাতে লাগল। কি করবো না-করবো কিছুই আমরা ভেবে উঠতে পারি নি। সে দৃশ্য ভাবলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দেয়।' কাজলের গলাটা কাঁপছিল সামান্য। মনে হচ্ছিল, এখনও যেন চোখের সামনে সে এক প্রচণ্ড দাবানলে সব কিছু ভস্মীভূত হতে দেখছে।

'এসবের পরেও তো জানালে পারতে।'

ম্লান একটু হাসল কাজল। 'মনে হচ্ছে জানালে যেন সব কিছুর সুরাহা হয়ে যেতো আমাদের!' একটু থেমে আবার বলল, 'বুঝতে পারছো না, সব কিছু ওখানে ফেলে এসেছি আমরা। তা ছাড়া আমার রোগটাও একটু একটু করে তখন ধরা পড়ছিল।' কথাটা শেষ করে সামান্য অন্যমনস্ক হলো কাজল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে নিজের মনটাকে যেন দেখল একবার। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'তোমার কথা তখন আমার খুব বেশী মনে পড়তো। কেন যেন মনে হতো আমার, তুমি এলেই আমি বেঁচে উঠবো। এজন্যে প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো। পরে এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছি, হাজার হাজার দুঃখী মানুষের থেকে আমি আলাদা নই, আমার ভাগ্যও তাদের সঙ্গে জড়িত।' থেমে থেমে শান্ত অনুত্তেজিত ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে গেল কাজল।

'বুঝতে পারছি, এসবের ওপর আমাদের কোন হাত ছিল না। কিন্তু বিশ্বাস কর কাজল, তোমাদের কথা মনে হলে এক অস্থিরতা ও তীব্র যন্ত্রণা বোধ করেছি।' সতীশ এক গভীর আবেগ অনুভব করছিল।

'এসব বলে আজ আর আমায় দুর্বল করে দিও না।' বেদনা ও কাতরতা ফুটে উঠল কথায়।

'উঁহু, এমন করে ভেঙে পড়লে চলবে না। আরো শক্ত হতে হবে তোমায়।' সতীশ আর একটু কাছে সরে এলো। 'তোমার বোধ হয় খুব কষ্ট হচ্ছে এভাবে বসে থাকতে?' সতীশ ওর চোখে চোখে চেয়ে শুধালো।

'আজ আমার কোন কষ্ট নেই।' ভরা ও সামান্য বিচলিত দৃষ্টি দিয়ে এক পলক সতীশকে দেখল কাজল। বিলম্বিত ভঙ্গিতে একটা নিশ্বাস ফেলল। আস্তে করে একটা বালিশ কোলের ওপর টেনে নিল। আঁচলটা হাতের মুঠোয় নিয়ে সতীশের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল একবার। বলল, 'তোমার কথা তো কিছুই জিজ্ঞেস করা হলো না, কি করছো এখন?'

'বলার মতন এমন কিছু নয়, কেরানী-গিরি।'

কাজল চুপ করে থাকল শুনে। মনে হচ্ছিল, কি যেন একটা সে খুঁজছে এই মুহূর্তে। কিছুক্ষণ পর শান্ত কণ্ঠে শুধলো, 'ছেলেবেলার কথা কিছু মনে আছে তোমার?' কাজল চেয়ে চেয়ে দেখল সতীশকে।

সতীশ চোখ তুলল চমকে। মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, সব।' পরমুহূর্তেই ওর মনে হলো, কাজল কি আজ তার শৈশব কৈশোর এবং যৌবনের খানিকটা সময়ের কিছু সংরক্ষিত গোপন ছবি দেখাতে বা দেখতে চায়? ওর নিজের কাছেও তো তার কিছু কিছু ছবি রয়েছে। এখনো সেগুলো অমলিন, তবে কিছুটা পুরনো।

খুব অল্প বয়েসেই সতীশ মামার বাড়ি এসেছিল। এখানেই সে বহুদিন ছিল। পড়াশুনোর শুরুও এখানেই। কয়েকটা বাড়ির পরেই কাজলদের বাড়ি। এ অঞ্চলে বর্ধিষ্ণু পরিবার। মুন্সীবাড়ির নাম করলে সকলেই সমীহ করে। কাজলের দাদা বিনু ওর সঙ্গে পড়তো। কাজল কয়েক ক্লাস নীচে। একই স্কুলে। ওদের স্কুলটা ছিল একটু দূরে। চাকলাদার-বাড়ির বিরাট দীঘি ও নাগেদের মাঠ ছাড়িয়ে ও কিছু আমলকি জলপাই তেঁতুল আর বেতঝোপের ছায়াবৃত বন-পথের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে ওদের স্কুল।

সতীশও কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। কাজলের কথায় ওর মুখের দিকে তাকাল। ক' মুহূর্ত কি ভাবল। চোখের দৃষ্টি কোমল ও কিছুটা বেদনামলিন মনে হলো। আস্তে আস্তে বলল, 'কিছুই ভুলি নি আমি।'

কাজল কথাটা শুনল কি শুনল না বোঝা গেল না। সে তার নিজের ভাবনার মধ্যেই যেন এতক্ষণ আচ্ছন্ন ছিল। মুহূর্তে হুঁশ হলো, সতীশ কি যেন একটা বলেছে। একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'বংশীদার কথা মনে আছে তোমার?'

'হুঁ।' মাথা নেড়ে আবার বলল, 'অত সহজে কি ওই মানুষটাকে ভোলা যায়! কি ভালই না বাসতো আমাদের।' সতীশ যেন পুরনো স্মৃতির স্বাদ নিচ্ছিল একটু একটু করে।

বংশীদাস বৈরাগী। ফকির মানুষ। গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষে করে তার দিন চলে। এমন সরল সদাহাসিখুশি মানুষ এ পর্যন্ত কমই দেখেছে সতীশ। ওদের স্কুলের কাছেই হাট। হাটের পাশে এক পদ্মবনে ছাওয়া পুকুর। তার দক্ষিণ পাড়ে এক বিরাট বৃদ্ধ বটগাছ। তার তলায় ওর কুঁড়েঘর। সতীশ যেবার মামার বাড়ি ছেড়ে চলে এলো, তার ক'দিন আগে কাজল আর ও কি খেয়ালে ওখানে গিয়েছিল। সবে সারা দিন ঘোরাঘুরি করে ফিরেছে বংশীদাস। তবু ওদের দেখে হেসে দিয়ে বলেছিল, 'কি মনে করে গো তোমরা?'

'এমনি এলাম বংশীদা?' সতীশ জবাব দিয়েছিল।

'না গো, আমরা তোমার গান শুনতে এসেছি।' কাজল কথাটা বলে সতীশকে একটা চিমটি কেটেছিল। একটু থেমে বলল, 'জান বংশীদা, ও না দু'-দিন বাদে চলে যাচ্ছে।'

বংশীদাস ওদের মুখের দিকে চেয়ে হেসে দিয়েছিল। হেসে দিয়ে বলল, 'আমরাও যাবো গো দিদিভাই, সবাই একদিন চলে যাবো, কেউ থাকবো না।' একটু রহস্য করে করে কথাগুলো বলেছিল বংশীদাস। পুরো অর্থটা সেদিন ওদের কাছে অস্পষ্ট ও একটু হেঁয়ালির মতন লেগেছিল।

'আজ না-হয় থাক বংশীদা।' হেসে হেসে ডাকিয়েছিল সতীশ।

'বা রে, এ কেমন ধারা কথা গো, তুমি কিনা বৃন্দাবন আঁধার করে চলে যাবে, আর আমি দুটো গানও শোনাবো না। একটু বসো।'

সেদিন অনেক গান শুনিয়েছিল বংশীদাস বৈরাগী। চলে আসার সময় কাজলকে লক্ষ করে বলেছিল, 'দুঃখ কি রে দিদিভাই। আমার রাধারানীর কথাটা একবার ভাব দেখি।' তারপর গুনগুন করে গাওয়া দুটি কলি আবার একবার গাইল : ভোলা মন কষ্ট তোমার থাকবে না, সুখের ধানভানা।

কাজলও যেন এতক্ষণ ধরে অতীত ইতিহাসের অনালোকিত কক্ষে কক্ষে পদচারণা করতে করতে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে চোখ তুলে আর একবার দেখল সতীশকে। তারপর স্বগতোক্তির মতন বলে গেল, 'বংশীদা সেদিন কি করে যেন আমার দুর্ভাগ্যটাকে দেখতে পেয়েছিল। অত্যধিক ভালবাসতো বলেই হয়তো সান্ত্বনার কথা শুনিয়েছিল।' একটু থেমে আবার বলল, 'প্রথম প্রথম আমারও মনে হতো, এ কষ্ট থাকবে না।' তারপর ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। দু-দণ্ড কি যেন ভাবল নীরবে। আবার করুণ ও বেদনার্ত হয়ে উঠেছে মুখখানা। ওর চোখের কোলে দীর্ঘদিন ধরে লালিত একটি কষ্টকে গভীরভাবে এই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করল যেন সতীশ। সামান্য পরে একসময় একান্ত দুঃখীর মতন বলল, 'এ জন্মে আমার আর সুখের ধানভানা হলো না গো।' বলতে বলতে কাজল আবার যেন আত্মস্থ ও মগ্ন হয়ে গেল। বালিশটা সরিয়ে দিয়ে কম্বলটা মাথা পর্যন্ত একসময় টেনে দিল। নিজেকে আর সামলাতে পারছিল না কাজল।

সতীশ কি একটা কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল। ঠোঁট দুটো সামান্য কাঁপল মাত্র। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, কাজল যেন আস্তে আস্তে কেমন দূরে সরে যেতে যেতে একসময় দৃষ্টির অগোচরে চলে গেল। প্রতিদিনের ধুলো আবর্জনা বুঝি আর কোনদিনও তাকে মলিন করতে পারবে না। এমন সময় চিনুমাসী এসে দাঁড়ালো দরজায়, কোন কথা বললেন না তিনি। ইশারায় সতীশকে উঠে আসতে বললেন।

সেই অন্ধকার বিছোনো বনঝোপের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে মনে হলো সতীশের, এমন নিরালা নির্জন জায়গায় আর কখনো কি সে এসেছিল এর আগে? কি নিয়ে আজ সে ফিরে যাচ্ছে? কোন্ অভিজ্ঞতা? একটি রিক্ত বিষণ্ণ নিঃশোষিত মুখ এই মুহূর্তে বারবার ভেসে উঠছিল। ভেতরে ভেতরে এক অস্বস্তিকর যন্ত্রণা অনুভব করল সতীশ। মাথার ওপর দিয়ে কটা পেঁচা উড়ে গেল। কুয়াশা ও অন্ধকারের ভেতর দিয়ে শেষ বাসের শব্দ আসছিল কানে। ক্ষেতের পাশ দিয়ে আসতে আসতে তার মনে হলো, জায়গাটা যেন মাতাল বেহুঁশ হয়ে ঢলে পড়েছে এইমাত্র। সামনের দিকে চেয়ে দেখল, কতগুলো জোনাকি ওই জলাভূমিতে লতাগুল্মের ঝোপের ভেতর ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বেরোবার পথ পাচ্ছিল না কিছুতেই। আর কখনো কি পাবে না? দৃশ্যটা দেখতে দেখতে সতীশও ভেতরে ভেতরে অস্ফুট এক যন্ত্রণায় ছটফট করছিল শুধু।

স্কুলের নতুন বাড়ি

ওরিয়েন্টাল স্কুল

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

(৪)
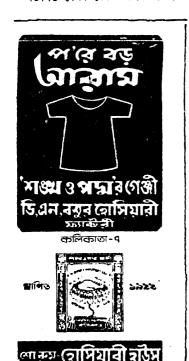
ওরিয়েন্টাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল। রাজকীয় সনদে বলা হল, ভাষা শিক্ষা দেওয়াই স্কুলের অন্যতম প্রধান কাজ হবে। কিন্তু তিন বছর পরে (১৯২০) স্কুলের প্রথম যে বুলেটিন বের হল, তাতে স্কুলের প্রথম ডিরেক্টর ডেনিসন রস্ লিখলেন, ভাষা শিক্ষা দেওয়া স্কুলের কাজ বটে, তবে একমাত্র কাজ নয়, প্রধান কাজও নয়।

"The practical side will in no way prejudice the development of the purely academic aims of the School, for it is intended that it shall become a centre of Oriental research. .. Oriental studies have as much right to a place in the ordinary scheme of education as any of those studies which now command universal attention."

ডিরেক্টরের এই মতবাদের উপরই স্কুলের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি ও শিক্ষা-নীতি প্রতিষ্ঠিত হল। আজ পর্যন্ত স্কুলে এই কর্মপদ্ধতিই চালু আছে। প্রাচ্য-বিদ্যার ক্ষেত্রে স্কুল প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্রও বটে, উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রও বটে। পৃথিবীতে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা এমন সুসামঞ্জস্য লাভ করেছে। সে-বিচারে স্কুল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আর দশটি স্কুল থেকে স্বতন্ত্র। স্কুলকে বলা যায় পৃথিবীর একমাত্র ওরিয়েণ্টাল ইউনিভার্সিটি। বর্তমানে স্কুলের এক তৃতীয়াংশ অধ্যাপক স্কুলের ভূতপূর্ব ছাত্র। এবং এঁরা নিজ নিজ বিষয়ে বিশ্বের অন্যান্য বিশেষজ্ঞের সমতুল্য। উদাহরণ স্বরূপে ব্যাশমের নাম করতে পারি। ১৯৪০ সালে ব্যাশম স্কুল থেকে বি এ পাশ করলেন। এই তাঁর প্রথম সংস্কৃত শিক্ষা, প্রথম ভারতবর্ষের সঙ্গে পরিচয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে দেখি ব্যাশম স্কুলে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে গবেষণার জন্য বৃত্তি পেয়েছেন। তারপরে ধাপে ধাপে উঠে শেষ পর্যন্ত তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে চেয়ারও পেয়েছেন। তাঁর নিজের বিষয়ে ব্যাশম বর্তমান কালের জীবিত বিশেষজ্ঞদের অন্যতম বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন। ব্যাশম যেমন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রের আরও বহু লোকের নাম করা যায় যাঁদের প্রাচ্য-বিদ্যার শিক্ষার সূচনা এবং সম্পূর্ণতা স্কুলে। এঁদের শিক্ষা-কর্ম এবং গবেষণার ভিতর দিয়েই স্কুলের প্রকৃতির যথার্থ পরিচয় উদ্ভাসিত। স্কুল একাধারে প্রাচ্য-বিদ্যার কিণ্ডারগার্টেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়।

স্যার র‍্যাল্‌ফ টার্নার

স্কুলের এই বিশিষ্টতা স্কুল প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকে। একদিকে প্রাচ্য ভাষার শিক্ষাদান, অন্যদিকে গবেষণায়, প্রবন্ধ পাঠে, গ্রন্থ-প্রবন্ধ প্রকাশে ইংল্যাণ্ডে প্রাচ্য-বিদ্যার ঐতিহ্য গড়ে তোলা। এই দ্বিবিধ কাজের মধ্যেই স্কুলের বিশেষত্ব এবং গুরুত্ব। স্কুল প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই এই দ্বিবিধ কাজ শুরু। প্রথম দিকে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্বীকৃতি তখনও মেলেনি। প্রাচ্য-বিদ্যার ঐতিহ্য তখনও ইংল্যাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ভবিষ্যতে স্কুল কি রূপ নেবে, স্কুলের ছাত্র-

স্কুলের বর্তমান ডিরেক্টর অধ্যাপক ফিলিপস্

দের কাজকর্মের মূল্য স্থায়ী হবে কিনা—এসব বিচার-বিবেচনা সময় সাপেক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয় তাই সাময়িকভাবে তিন বছরের জন্য স্কুলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল হিসাবে মেনে নিলেন। তিন বছরের কাজ দেখে পরে স্বীকৃতি দেওয়া না দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হবে। এই সময় স্কুলের অধ্যাপকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, এ'দেরও পাওয়া গেছে কিংস্ ও ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে। স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে কিংস্ ও ইউনিভার্সিটি কলেজের ওরিয়েণ্টাল ডিপার্টমেণ্ট বন্ধ হয়ে যায়, এবং অধ্যাপকেরা স্কুলে চলে আসেন।... কিন্তু সংখ্যায় এ'রা মাত্র ১৮ জন। অর্থাভাবে নতুন অধ্যাপক নিয়োগও অসম্ভব। কিন্তু স্কুলে, প্রাচ্য-বিদ্যার ঐতিহ্য গড়ে তোলা চাই, স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুলের উপযোগী হওয়া চাই। তখন এ কাজে তাঁরাই এগিয়ে এলেন যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে স্কুল স্থাপনের আন্দোলনে ছিলেন অগ্রণী। সেই গ্রীয়ার্সন্-রীস্ ডেভিডস্ এবং অন্যান্যরা। তখন স্কুলে প্রতি সপ্তাহে প্রাচ্য-বিদ্যা সংক্রান্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। সে বক্তৃতা গুলোর লেকচার হত না। স্কুলের অধ্যাপকেরা ত বক্তৃতা দিতেনই, অন্যান্য বিশেষজ্ঞরাও নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। এশিয়াটিক সোসাইটির আসর সম্প্রারিত হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে। প্রথম বছর আটটি বক্তৃতা দিলেন দুজন সুপণ্ডিত— Rys-Davids এবং L. de la Valle Poussin। এক বছরের জন্য Poussin স্কুলের অধ্যাপকও নিযুক্ত হয়েছিলেন। স্কুলের প্রাচ্য দেশের কথা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, কথ্য-ভাষা শিক্ষা দিতে গেলে ধ্বনি-বিজ্ঞান অপরিহার্য। ড্যানিয়েল জোন্স তখন ইউনিভার্সিটি কলেজে ধ্বনি-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তাঁর সঙ্গে স্কুলের যোগাযোগ স্থাপিত হল। তিনি স্কুলের দ্বিতীয় বছরে বক্তৃতা দিলেন "The Nature and use of Tones in Chinese and oterh languages." এছাড়া স্কুলের ছাত্রদেরও তিনি নিয়মিত সাহায্য করতেন। জোন্সের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে পরবর্তীকালে স্কুলের ভাষাতত্ত্ব এবং ধ্বনি-বিজ্ঞানের বিভাগটি গড়ে উঠতে পেরেছিল। এই বিভাগের সঙ্গে যাঁরা

স্কুলের প্রথম ভারতীয় ছাত্র শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

যুক্ত ছিলেন তাঁরা সকলেই ড্যানিয়েল জোন্সের ছাত্র বা ছাত্রকল্প। এই বিভাগের প্রধান Firth, ইংল্যাণ্ডের একমাত্র Linguistics-এর চেয়ারে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্কুলের উপর গ্রীয়ার্সনের অপত্য স্নেহ। বুলেটিনে গবেষণা প্রকাশ করে, ছাত্রদের কাজের তত্ত্বাবধান করে, বক্তৃতা দিয়ে স্কুলের ঐতিহ্য গঠনে তিনি সাহায্য করলেন। স্কুলের দ্বিতীয় বছরে গ্রীয়ার্সন্ পর্যায়ক্রমে কয়েকটি বক্তৃতা দিলেন। বিষয় "The Popular Literature of Northern India." বার্নেট তখন স্কুলের সংস্কৃতের অধ্যাপক। তিনি বক্তৃতা দিলেন ভারতীয় লিপি বিষয়ে। বুলেটিনে তাঁর প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকল। স্কুলের ঐতিহ্য ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। এর মধ্যে ১৯২১ সালে স্কুলের দুটি ছাত্র লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ গবেষণা ডিগ্রী ডি লিট পেলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য দেশের পণ্ডিতেরা তাঁদের গবেষণা দেখে বিস্মিত হলেন। এই ছাত্র দুটির কীর্তি দিয়ে স্কুলের যোগ্যতার প্রথম বিচার হয়ে গেল। এই ছাত্র দুটি হলেন—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সুশীলকুমার দে। স্কুল তখনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূর্ণ স্বীকৃতি পায়নি, স্বীকৃতির মেয়াদ আরও তিন বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সুশীলকুমার দে-র গবেষণা দিয়েই ভারতবর্ষে স্কুল প্রথম পরিচিত হল। এ'রাই স্কুলের প্রথম ভারতীয় ছাত্র। এ'দের মাধ্যমেই স্কুলের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সূত্রপাত হল। এর পরের বছর স্কুলের প্রফেসর হয়ে এলেন রাল্ফ্ টার্নার সংস্কৃতে, হেনরি ডডওয়েল ইতিহাসে।

৫

লণ্ডনের ওরিয়েণ্টাল স্কুলের সূচনার ইতিহাস বললুম। এর পরের ইতিহাস জটিল এবং ব্যাপক। সে-ইতিহাস বলতে

বাম হইতে : হ্যামিলটন গিব, ডডওয়েল, রস, টার্নার এবং বেইলি

গেলে অনেক জায়গা লাগবে। তাই সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলছি। স্কুলের প্রথম তিরিশ বছরের ইতিহাস আর্থিক দুর্গতির ইতিহাস। স্কুলের জন্য বার্ষিক যে অর্থ বরাদ্দ ছিল তা যথেষ্ট নয়। তথাপি স্কুলের প্রথম দুজন ডিরেক্টর স্যার ডেনিসন্ রস্ (১৯১৭-১৯৩৭) এবং স্যার রাল্‌ফ টার্নার (১৯৩৭-১৯৫৭) কোন রকমে স্কুলকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। স্কুলের অন্যান্য অধ্যাপক এবং ছাত্ররা গবেষণার ভিতর দিয়ে স্কুলের 'অ্যাকাডেমিক ট্রাডিশান' গড়ে তুলেছেন। এ-ব্যাপারে স্কুলের ভারতীয় ছাত্রদের কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্কুলের অ্যাকাডেমিক ঐতিহ্য গড়ে তোলার কাজে এই সব ভারতীয় ছাত্রের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ("Indeed, as far as university studies are concerned it (School) has provided a centre for Indians rather than for Englishmen. During 22 years, 179 Indian and only four British students have taken First or Higher Degrees in various Indian subjects." (দ্রঃ Memorandum on the Present State of Indian Studies in Great Britain, R. L. Turner, 1943 পৃঃ ৬)। তথাপি স্কুলের অধ্যাপকদের মধ্যে ভারত-বিদ্যায় বার্নেট, টার্নার, বেইলী কড্রিংটন, ইতিহাসে ডডওয়েল, ভাষাতত্ত্বে T. R. Firth, মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে Tritton, Henning, Minorsky, Sir Hamilton Gibb, আফ্রিকা বিষয়ে Ida Ward, Tucker, Lloyd James ইত্যাদি স্কুলের প্রথম তিরিশ বছরের অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন। প্রাচ্য-বিদ্যার ক্ষেত্রে এগুলি স্মরণীয় নাম। স্কুল প্রতিষ্ঠার আগে প্রাচ্য-বিদ্যার স্মরণীয় নামগুলি খুঁজতে হত এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে। এখন সেগুলি স্কুলের ক্যালেন্ডারের মধ্যে পাওয়া যায়। এটাই স্কুলের তিরিশ বছরের কীর্তি। এই তিরিশ বছরে যা হয়েছে তা এই সব বিদ্যানুরাগীর চেষ্টায়, যত্নে এবং অধ্যবসায়ে। এর জন্য সরকারী সাহায্য নাম মাত্র। ইংরেজ ছাত্রের সংখ্যা বিশেষ করে গবেষক ছাত্র—এযুগে নগণ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য-বিদ্যা স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু ইংল্যান্ডের উচ্চশিক্ষার দরবারে তখনও প্রাচ্য-বিদ্যার আসন পাকা হয়নি। তবে বিদেশে স্কুলের ঐতিহ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরনো ফিন্সবেরি সার্কাসের বাড়ি ছেড়ে স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউসের সংলগ্ন বাড়িতে উঠে এসেছে। স্কুলের লাইব্রেরী ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে। ডিরেক্টর টার্নার স্কুলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কান্বিত। ১৯৪৩ সালের Memo-

স্কুলের উচ্চারণ বিশ্লেষণ যন্ত্র

randum-এ তিনি বললেন, "...
"....the hopes aroused by the foundation of the School were in large part frustrated by the lack of adequate financial provision". আবার ইংল্যান্ডে ভারত-বিদ্যা পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি তুললেন। এককালে ইংরেজ এবং ভারতবাসীর মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগ দৃঢ় ছিল। কিন্তু ক্রমশ সে যোগাযোগের সূত্র কেটে যাচ্ছে।

"In the past there has existed between this country and the mass of Indian educated opinion a great measure of intellectual sympathy and a general community of ideals .... Of late years that influence has tended to grow less or to be obscured. .... One way, perhaps the only way, of restoring it is to foster among our own people knowledge of and symathy with, the ideals and aspirations of Indians as expressed in their history, language and literature."

একবার গ্রীয়ার্সনের কথায় কাজ হয়েছিল। এবার টার্নারের কথায় কাজ হল। আবার কমিশন বসল—স্কারবরা কমিশন। এই কমিশন সুপারিশ করলেন ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে—শুধু লণ্ডনে নয়—প্রাচ্য-বিদ্যার ঐতিহ্য গড়ে তুলতে হবে, 'an academic tradition comparable in quality and in continuitv with those of the major humanities and sciences' (ঃ Foreign Office Report on Oriental Slavonic, East European and African Studies. ১৯৪৭)

স্কুলের প্রথম তিরিশ বছরের ইতিহাস আর্থিক দুর্গতির ইতিহাস, পরের কুড়ি বছরের ইতিহাস প্রাচুর্যের ইতিহাস। এই প্রাচুর্যের ফলে প্রাচ্য-বিদ্যা আর স্কুলের মধ্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, এডিনবরা, সেণ্ট অ্যান্ড্রুস, সাসেক্স, ডারহাম, ম্যাঞ্চেস্টার প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপকভাবে এবং অন্যত্র সাধারণ ভাবে প্রাচ্য-বিদ্যার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলছে। শুধু প্রাচ্য ভাষা নয়, অধ্যয়নের বিষয়েও

ব্যাপকতা এসেছে—ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, নৃতত্ত্ব, ভাষা-বিজ্ঞান। প্রাচ্য-বিদ্যা ইংল্যাণ্ডের উচ্চ শিক্ষার রাজ-সিংহাসনে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। যা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা হবে—তার মূলে ওরিয়েণ্টাল স্কুল। ওরিয়েণ্টাল স্কুল যদি কিছুই না করে থাকে ইংল্যাণ্ডে প্রাচ্য-বিদ্যাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে এতেই তার গৌরব। পঞ্চাশ বছরের অধ্যবসায়, কৃচ্ছ্রসাধনার সার্থকতা।

৬

লণ্ডনের ওরিয়েণ্টাল স্কুল প্রাচ্য দেশের 'কালচারাল্ অ্যাম্বাসি'। পশ্চিমে জর্জিয়া থেকে পূবে জাপান পর্যন্ত, ওদিকে সমগ্র আফ্রিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপাবলী এই বিপুল ভূখণ্ডের বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর বিচিত্র জীবন-লীলা যে একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্বজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে সে-প্রতিষ্ঠানকে প্রাচ্যের 'কালচারাল অ্যাম্বাসি' ছাড়া কি বলতে পারি। এই স্কুলে দেখছি পুরাতন ঋষিবাক্যকে অসত্য প্রমাণ করে পূর্ব আর পশ্চিম কি নিবিড় ভাবে মিলেছে। বাণিজ্যিক সূত্রে নয়, রাজনৈতিক সূত্রে নয়—গভীরতর সূত্রে—সাংস্কৃতিক সূত্রে মিলেছে। অন্য মিলনের সূত্র দুর্বল, সামান্য হাওয়ায় তা ছিঁড়ে যায়। ইংরেজের আগে একাধিক ইউরোপীয় জাতি বাণিজ্য সূত্রে ভারতবর্ষে এসেছে। তাদের ক্ষীণতম পরিচয়ও আজ কোথায়ও দেখি না। তাদের সঙ্গে আমাদের শুধু পণ্যের আদান-প্রদানই হয়েছে। ইংরেজ যে আমাদের মনের সঙ্গে গভীর একাত্মতার সঙ্গে মিলতে পেরেছে তার কারণ ইংরেজের সঙ্গে আমাদের ভাবের আদান-প্রদান হয়েছে। ইংরেজের সাহিত্য আমাদের মন মজিয়েছে, আমাদের সংস্কৃতি ইংরেজের মন মজিয়েছে। এমন বহু ইংরেজ আছেন, ভারতবর্ষ যাঁর কাছে দ্বিতীয় মাতৃভূমি, এমন বহু ভারত-বাসী আছেন ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে যাঁদের অনুরূপ ধারণা। রাজনীতির কুজ্ঝটিকা এই সংস্কারকে মুছে ফেলতে পারে না। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনের এই সেতুর উপরই লণ্ডনের ওরিয়েণ্টাল স্কুল দাঁড়িয়ে আছে। সেতু দুর্বল হলে, মিলনে অপূর্ণতা থাকলে স্কুল টিকতনা। স্কুলের আদর্শ নিয়ে ওরিয়েণ্টাল স্কুল সৃষ্টি হয়েছিল কলকাতায়, হেইলবেরিতে। তারা টিকল না। তারা প্রয়োজনের সৃষ্টি। প্রয়োজনের শেষ আছে, প্রয়োজন শেষ হলে তারা উঠে গেল। আনন্দের শেষ নেই। স্কুল আনন্দের সৃষ্টি বলেই তা টিকে রইল। স্কুলের রাজকীয় সনদে একটা প্রয়োজনের কথা লেখা আছে। সেটা বাহ্য। ঐ প্রয়োজনের কথাটা না থাকলে সেদিন স্কুল সৃষ্টি হত না। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটেছে।

University of London.

The Origin and Development of the Bengali Language

Thesis submitted for D. Lit. Degree in Sanskrit

by

Suniti Kumar Chattopadhyay
School of Oriental Studies
University of London. 1921.

1921

লণ্ডন স্কুল থেকে ১৯২১ সালে যে থীসিস লিখে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ডি-লিট পান সেই পাণ্ডুলিপির প্রথম পাতার প্রতিকৃতি

সিভিলিয়ানদের প্রাচ্য ভাষা পড়াবার প্রয়োজন শেষ হয়েছে। স্কুল টিঁকে আছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিলনের সেতু হয়ে। ১৯১৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী স্কুলের উদ্বোধনের দিনে লর্ড কর্জন এই ভবিষ্যৎ-বাণী-ই করেছিলেন।—

"But in my view tihs School ought to have much more than a merely instructional or utilitarian value. I hope as time passes this place will become a sort of clearing-house of ideas between East and West—a bridge between the mind and character of Great Britain and those oriental peoples with whom she is brought into such close contact. .. great indeed will be the disappointment of many of us if this place does not bring into closer union what we may describe as the soul of the eastern and Western World."

স্কুল নিরাশ করেনি। ১৯১৭ সালের এক শীতার্ত মধ্যাহ্নে সম্রাট পঞ্চম জর্জ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাচ্য-বিদ্যা চর্চার যে দীপটি জেলে দিয়ে গিয়েছিলেন তা আজও অনির্বাণ আছে। যুদ্ধের ঝড়ে নেবেনি, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসানও সে দীপকে নির্বাপিত করতে পারেনি। প্রাচ্য-সংস্কৃতির এ দীপটি পশ্চিমের হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমের জীবনের মর্মমূল থেকে তৈল আহরণ করে এই দীপ নিষ্কম্প ঊর্ধশিখা হয়ে জ্বলছে॥

কম্পোজিশন, ১৯৩৫ সালে অঙ্কিত

ভাসিলি কান্ডিনস্কি ঃ
জন্মশতবর্ষ গত ডিসেম্বরে পূর্ণ হল

ভারতীয়দের, বিশেষত বাঙালিদের নাম আছে যে তারা নাকি বিদেশী শিল্পী-সাহিত্যিকদের জন্মশতবর্ষ, জন্মদিন, মৃত্যু, নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি, ডিভোর্স এসব নিয়ে বড় বেশী লাফালাফি করে। ইংলণ্ডের ইংরিজীর ছাত্ররা যা করেনি সমারসেট মম্ নামক গল্প লেখকের মৃত্যুদিনে আমাদের ছেলেরা তা করেছে, প্রতি ক্লাসের আগে শোকাবহ মুখে এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকেছে; রোমাঁ রোলাঁর জন্মদিনের একশো বছর পূর্ণ হলে, ফ্রান্সে বিশেষ হইচই হল না (কেন না ফ্রান্সে এখন আর কেউ রোলাঁ পড়ে না) কিন্তু কলকাতার পত্রিকাগুলো প্রবন্ধে ছেয়ে গেল; কিংবা, জাঁ-পোল সার্ত্র নোবেল প্রাইজকে আলুর বস্তা না কাঁপর বস্তা কি বলেছেন সেই নিয়ে কাফেতে রোজ হাতাহাতি। আমাদের জ্যাক রুবির মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হবে কিনা তা নিয়ে চিন্তার শেষ ছিল না, কেনেডির মৃত্যুতে কান্না থামতে চায় না, চ্যাপলিনের শেষ ছবিকে ইংলণ্ড কেন গাল দিল তা নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। এ হেন চোখকান খোলা দেশে, বাংলা দেশে, যখন দেখা যায় এমন একজন শিল্পীর শতবর্ষপূর্তি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও উপেক্ষিত যিনি বিশ শতকের শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ, কোনো কোনো দিক থেকে সর্বাগ্রগণ্য এবং এই শতকের শেষ-ভাগের চিত্রকলার ভবিষ্যৎবাণী, তখন বোঝা যায় যে, আমাদের সব মাতামাতিই আসলে কত ভিত্তিহীন, এবং হাস্যকর! যেখানে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে আজ কান্ডিনস্কির শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হচ্ছে, সেখানে বাংলা দেশের একটি পত্রিকাতেও বেরুলো না তাঁর বিষয়ে কিছু—এমনকি খবরটা পর্যন্ত দিল না কোনো কাগজ।

১৮৬৬ সালে ৪ ডিসেম্বর ভাসিলি কান্ডিনস্কি মস্কো শহরে জন্মগ্রহণ করেন; পিতার পরিবার আসছে সাইবেরিয়া থেকে এবং মা নাকি কোন এসিয়ার রাজবংশধর—অবশ্য কয়েক পুরুষ ধরে তাঁরা রাশিয়াতেই আছেন।

কান্ডিনস্কি ছেলেবেলায় খুব সঙ্গীতে উৎসাহী ছিলেন; কিন্তু তা অধ্যয়ন বা অভ্যাস করা কখনোই ইস্কুলের গন্ডি অবধি যায়নি। কুড়ি বছর বয়সে আইন এবং অর্থনীতি পড়তে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ, এবং তখনই বিশ্ববিদ্যালয় মুজিয়মে প্রাচীন রাশিয়ার চিত্রকরদের ছবি দেখে এই শিল্পমাধ্যম বিষয়ে তিনি উৎসাহিত হয়ে পড়েন। বিশেষত মধ্যযুগের আইকন তাঁকে মুগ্ধ করে এবং তার প্রভাব তাঁর সমগ্র শিল্পীজীবনেই লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া লোকশিল্প বিষয়েও তাঁর খুব উৎসাহ হয়। এই শহরেই আবার তাঁর প্রথম পরিচয় ওল্ড-মাস্টারদের ছবির সংগে ১৮৮৯-এর এক চিত্রপ্রদর্শনীতে।

এই বছরেরই শেষের দিকে কান্ডিনস্কি বেরিয়ে পড়েন—এদিক-ওদিক ঘুরে প্যারিসে এসে তাঁর মাথা ঘুরে যায়। তখন তো প্যারিস ঝলমল করছে—রাস্তায়-রাস্তায় মস্তো মস্তো সব ছবির প্রদর্শনী, কাফেতে-কাফেতে আড্ডা, একেবারে জমজমাট ব্যাপার। কিন্তু ভাসিলি বেশী ভিড়লেন না প্যারিসের

ল্যান্ডস্কেপ (ক)

আস্তায়, সামান্য দিনের স্মৃতি নিয়ে ফিরে এলেন মস্কোতে। কিন্তু এ এমনই শহর শিল্পীকে জাদুর মত টানে, ১৮৯২তে তল্পিতল্পা গুটিয়ে আমাদের ভাসিলিকে আবার দেখা গেল তখনকার পৃথিবীর রাজধানীতে। এর কয়েকদিনের মধ্যেই আইনের ডিগ্রিটা তাঁর হাতে এল। ১৮৯৫ কান্ডিনস্কির এক স্মরণীয় বছর, ইম্প্রেশনিস্টদের ছবির এক অভাবনীয় সমাবেশ হয় প্যারিসে, তাদের উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো ক্যানভাস মুগ্ধ করে বরফ আর ধূসর আকাশের দেশের এই যুবককে। ১৮৯৫ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত তিনি ম্যুনিকে কঠোর চিত্রাভ্যাস করেন এবং সেখানকার রয়্যাল আকাদমির ডিপ্লোমা পেয়ে বেরিয়ে পড়েন পুনর্বার।

১৮৯৬ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত কান্ডিনস্কির বলা যায় অন্বেষণের পর্যায়। ১৯০২-এর হেমন্ত প্যারিসে, ১৯০৩ কাটল টিউনেসিয়ায়, ১৯০৪-এ রাপেল্লো ইটালী। শহরে তিনি ছবি দেখছেন, ড্রেসডেনে চলে এলেন, ১৯০৬-এ এক বছরের জন্য আবার প্যারিস, বার্লিনে কাটল ১৯০৭, ম্যুনিকে এসে ১৯০৮-এ ভাবলেন এবার একটু বসা যাক। এই বারো বছর অনেকগুলো ধাপ তিনি পেরিয়েছেন —ফ্রানৎস স্টাকের কাছে কঠোর শিল্পাভ্যাস হাতে তুলি শক্ত করেছে; তারপর ফোক্‌ আর্ট নিয়ে পড়লেন কিছুদিন; সেখান থেকে ইম্প্রেশনিজম; পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্টদের মত ছবি আঁকলেন তারপর; এবং এসব সেরে নিজের চিত্রদর্শন এখন খুঁজে নেবার পালা। ১৯১২-তে মোনের "খড়গাদা" ছবিটি দেখে হঠাৎ যেন এক মুহূর্তে নিজের উদ্দেশ্য এবং শিল্পের আদর্শ স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁর কাছে। কিন্তু মোনের এ ছবির ভূমিকা কান্ডিনস্কির চিত্রাদর্শের দরজা খুলে দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করলেও মোনের কাছ থেকে তাঁর খুব কিছু পাওয়ার ছিল না। তিনি বরঞ্চ পিকাসোর ফর্ম এবং মাতিসের বর্ণের কাছে ঋণী, যে দুইয়ের মিলন সাধনই তার ছিল তখন উদ্দেশ্য।

১৯১৪তে যুদ্ধের দামামা। ম্যুনিখ থেকে পালিয়ে কান্ডিনস্কি ফিরলেন মস্কোতে, ফেলে এলেন এক গুচ্ছ পরীক্ষামূলক চিত্র ব্যাভ্যারিয়ায়। এসব ছবি দেখা যাবে ম্যুনিখের স্ট্যুডিখ্‌ গ্যালারিতে। এই গ্যালারিটি বড় সুন্দর—ম্যুনিখ শহরের দুদিকে গাছের সারি দেওয়া এক শীতল রাস্তার উপর একটি নির্জন সাদা দোতালা বাড়ি, যতদূর মনে পড়ে শুধু কান্ডিনস্কি আর পোল ক্লের ছবি ছাড়া সেখানে কিছু নেই, দর্শকের ভিড়ে ক্লান্ত হতে হয় না, এবং ছবিগুলি সাজানো হয়েছে সুসমানুবর্তিতার দিকে নজর রেখে যার ফলে শিল্পীর মানসিক গতিটা ধরা যায়।

ল্যান্ডস্কেপ (খ)

কান্ডিনস্কির এই চিত্রগুলি প্রধানত এষণা-নির্ভর (মোটিফ), বেশীর ভাগ সময়ই তা কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য যার মধ্য দিয়ে, কিংবা যাকে ভেঙেচুরে তিনি কোনো অন্তর্লীন আবেগ প্রকাশ করতে চাইছেন। ছবিগুলি পরপর দেখে গেলে মনে হয় শিল্পী খুব ধীরে ধীরে তাঁর এষণাকে ভাঙছেন কিংবা তার শরীরের অংশটাকে বাদ দিচ্ছেন। একটা ডিম ভেঙে বাটিতে রাখলে স্পষ্ট আমরা দেখতে পাই দুই পাশে স্বচ্ছ সাদা অংশের ভিতরে টুকটুকে লাল কুসুমটি নিজের দেহ নিয়ে স্পষ্ট গোল। আমি চামচে দিয়ে তাকে নাড়তে শুরু করলাম, গতি আরোপিত হল। নাড়তে-নাড়তে

ঘূর্ণি এল, কুসুম ভাঙল। একটু ফেনা, তলায় তরল। আরো ফেনা, হাল্কা হল। ধীরে ধীরে ফুলে উঠছে পাত্র, এবং খুব নাড়লে পুরোটাই ফেনা, হয়ে যেতে পারে। ঠিক এই তুলনাটা আমার মনে পড়েছিল যখন কান্ডিনস্কির এই ছবিগুলি দেখছিলুম। প্রথমে ল্যান্ডস্কেপে কেমন স্পষ্ট বাড়ি, ঘর, আকাশ, গাছ। কিন্তু ক্রমশ সব শরীর হারিয়ে ফেলছে, গতির ভাব, যা আরোপিত হচ্ছে শিল্পীর হৃদয় থেকে, মিশিয়ে দিচ্ছে কিছু নিংড়ে নিচ্ছে শরীর। উদাহরণস্বরূপ আমি মুদ্রিত করছি দুটি ল্যান্ডস্কেপ—ল্যান্ডস্কেপ (ক) আঁকা হয়েছে ১৯০৯-এ ল্যান্ডস্কেপ (খ) ১৯১০-এ। প্রথম ল্যান্ডস্কেপটি আমরা কিছুটা কম্পন দেখছি কিন্তু বাড়ি, গাছ, মাঠ, ফুল সামনে বেড়া, দূরে পাহাড় সবই স্পষ্টভাবে বেশ নিজের নিজের জায়গায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু ঈষৎ কম্পন কেন? শিল্পী নিজের মানসিক অস্থিরতা—যার কারণ হয়তো প্রথম মহাযুদ্ধের কোনো আশংকা, যা আরোপিত হচ্ছে এষণা ল্যান্ডস্কেপের ওপর। এখনো শিল্পীর কাছে এষণার স্বকীয় দেহ রক্ষা করা কর্তব্য মনে হচ্ছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-প্রকাশেরও কিছুটা প্রয়োজন কিন্তু ছবি (খ), যা আঁকা হয়েছে শিল্পীর এক অস্থিরতম মুহূর্তে, প্রথম মহাযুদ্ধ প্রায় যখন আসন্ন, সমগ্র ইয়ুরোপে বিশৃঙ্খলা, আমরা দেখতে পাচ্ছি দৃশ্য নিজের প্রায় শরীর হারাতে বসেছে, হয়ে দাঁড়িয়েছে শিল্পীর মানসিক অবস্থার আধার মাত্র। দৃশ্যকে টুকরো-টুকরো করে ভেঙে তার দেহহীন আত্মাকে শুষে নিচ্ছেন শিল্পী এবং তা সাজাচ্ছেন এমনভাবে ক্যানভাসে যা প্রকাশ করছে তাঁর অন্তরের অবস্থা। কান্ডিনস্কির এক্সপ্রেশনিজম থেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজমের দিকে যাত্রা এই পর্যায়ের ছবিতে লক্ষণীয়।

কিন্তু পাঠক যেন না ভাবেন যুদ্ধোত্তর যুগে কান্ডিনস্কির নন্-রিপ্রেজেন্টেশনাল ছবিগুলি এই পথ বেয়েই এগিয়ে আরো কিছুটা দূরের কোনো বিন্দু। আগের ছবিগুলি যতই বস্তু থেকে দূরে চলে যাক, অ্যাবস্ট্রাক্ট হোক, তার ভিতরে এষণা সর্বদাই রয়েছে, কিন্তু তাঁর পরবর্তী অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবির মধ্যে মৌরি লজেন্সের মধ্যে মৌরির মতো কোনো এষণা লুকিয়ে নেই। এখন কান্ডিনস্কির ঘর, বাড়ি, মাঠের কাছ থেকে রঙ ও রেখার কাঠামো ধার করতে হয় না। রঙ ও রেখা আছে, আছে অন্তর্লীন কোনো দেহহীন আবেগ, ক্যানভাসে রঙ ও রেখা সাজিয়ে এমন একটি মুড তৈরি করতে হবে যা ধরে রাখবে শিল্পীর মানসিক অবস্থা। এই সময়কার ছবিতে দেখা যাবে কান্ডিনস্কি আর ছবির কোনো নাম দিচ্ছেন না, "ইম্প্রোভাইজেসন" বা "কম্পোজিসন" ছাড়া। বাস্তববাদের যেটুকু অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিজম পর্যন্ত ছবির ভেতরে লুকিয়েছিল, কিন্তু কান্ডিনস্কি তাকে একেবারে দূরে করে দিলেন তাঁর যুদ্ধোত্তর যুগের ছবি থেকে, যা সাহিত্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও সম্ভব হল না। এই পর্যায়ের ছবির উদাহরণ হিসেবে উপস্থিত করছি ১৯৩৫-এ আঁকা "কম্পোজিসন।" এ ছবির কোনো ব্যাখ্যা নেই, কিংবা কোনো সবাইকার জন্য এক ব্যাখ্যা নেই, আপনার ছবিটি দেখে নিজের যা মনে হবে তাই এ ছবি, খবরদার কোনো শরীর, বাস্তবতা, খুঁজতে যাবেন না এতে, তাহলেই গুলিয়ে যাবে সব, কেননা শিল্পীর জগৎ, শিল্পীর বস্তু, যেখানে আছি, থাকি, থাই সেটা নয় সম্পূর্ণ অন্য।

এ-সব কথা বোঝা খুবই শক্ত যদি কান্ডিনস্কির শিল্প বিষয়ে মূল থিওরিটি মনের কাছে পরিষ্কার না থাকে। ১৯১৩-তে ভের স্টুরম পত্রিকায় তিনি প্রথম তাঁর চিত্রাদর্শ প্রকাশ করেন একটি প্রবন্ধে যার নাম "আত্মা ধর্মী শিল্প বিষয়ে।" আমি একটি অংশ অনুবাদ করছি সে প্রবন্ধ থেকে : "যে কোনো শিল্পের মধ্যে দুটি উপাদান থাকে, অন্তর্লীন এবং বহিরাগত। শিল্পীর আত্মায় নিহিত থাকে অন্তর্লীন আবেগ; এই আবেগ দর্শকের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

"শরীরের সঙ্গে যুক্ত হলে ইন্দ্রিয়ে আবেগ সঞ্চারিত হয়—এই শিল্পীর অনুভব। অনুভূতির ফলে আবেগ উচ্চকিত হয়ে ওঠে। অতএব অনুভূতিটি হল সাঁকো, যোগাযোগ স্থাপন করছে বায়বীয় সত্তার সঙ্গে শরীরের; সাঁকোটি হল আবেগ। এই সাঁকো নির্মাণ হলেই শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয় এবং দর্শকের আত্মায় আবেগ সঞ্চার হয় শিল্পীর অনুভূতির মাধ্যমে।

"পথটা অনেকটা এই রকম : আবেগ (শিল্পীর আত্মায়)—অনুভূত (শরীরে)—শিল্পসৃষ্টি—অনুভূত (দর্শকের)—আবেগ (দর্শকের)।

"সঙ্গীতের সঙ্গে চিত্রকলার কোনো তফাৎ নেই : দুই-ই দাঁড়িয়ে আছে এক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে।"

*

কান্ডিনস্কি বিষয়ে অনেক বলার থেকে গেল কিন্তু তাঁর সব দিক নিয়ে আলোচনা নানা কারণে সম্ভব নয়, বিশেষত বর্ণ বিষয়ে কিছুই বলা যাবে না যদি না রঙিন ছবি চোখের সামনে থাকে। ভ্যান গ বা গোগ্যাঁ হলে আশা করা যায় তাঁদের ছবির বই বইয়ের দোকানে বা গ্রন্থাগারে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু কান্ডিনস্কির ছবি বিরল এ দেশে। তা না হলে তাঁর জন্মশতবর্ষে মুখর বাংলা দেশে অন্তত চাপিয়াতি করেও কেউ কিছু লিখল না।

শুদ্ধশীল বসু
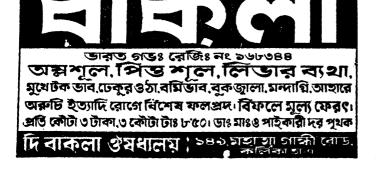
কলেরার নতুন ওষুধ

আমাদের এই কলকাতা শহরে প্রতি বছর কলেরা (বিসূচিকা) যেভাবে মহামারীর রূপ নেয়, এমন ভারতের অন্য কোন শহরে ঘটে কিনা সন্দেহ। তাই এই মরঘাতী ব্যাধি থেকে আরোগ্য হবার কোন নিশ্চিত ওষুধ বার হয়েছে শুনলে মনটা একটু খুশী হয়। ওষুধটা কিন্তু আমাদের দেশে অপরিচিত নয়। চরক সুশ্রুতের আমলে লিখিত আয়ুর্বেদে এর উল্লেখ আছে উদরাময় ও যকৃৎপীড়ার ওষুধ হিসাবে এবং আমাদের আমলেও পেটের গণ্ডগোলে এই বার্বেরিন নামে ওষুধটির ব্যবহার হয়ে আসছে। তবে বার্বেরিনের (বার্বেরিস আরিস্টাটা নামে এক ওষধির মূলারিষ্ট) কলেরানাশক গুণের কথা এর আগে জানা ছিল না। সে কথা প্রথম জানা যায় ১৯৬২ সালে হাফ্‌কিন ইন্সটিটিউটের ডঃ এন কে দত্তের গবেষণার এক রিপোর্টে। তিনি এবং ডঃ পান্‌সে খরগোশের দেহে কলেরাবীজ সংক্রামিত করে বার্বেরিনের সাহায্যে তাদের আরোগ্য করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, খরগোশের এবং মানুষের কলেরা সমগোত্রীয়। ডঃ দত্ত ও ডঃ পান্‌সে দেখেন যে, বার্বেরিন, ক্লোর‍্যামফেনিকল ও টেট্রাসাইক্লিনের (এগুলি অ্যাণ্টিবায়োটিকস) মতই কাজ দিচ্ছে। আমাদের দেশজ এই নতুন ওষুধটি যদি কলেরা সারাতে পারে তা হলে ভবিষ্যতে কলেরার চিকিৎসা অনেক সহজ হবে, খরচও অনেক কম পড়বে। কারণ, অ্যাণ্টিবায়োটিক্সের তুলনায় এই ওষুধের দাম অনেক কম হবে। তা ছাড়া অ্যাণ্টিবায়োটিক্স জাতীয় ওষুধ প্রয়োগে অনেক সময় অন্য ধরনের বিষক্রিয়া (যেমন টক্সিসিটি), অ্যালার্জি প্রভৃতি অবাঞ্ছিত উপসর্গ দেখা দেয়, বার্বেরিনের ক্ষেত্রে সেসব ঝামেলার কোন সম্ভাবনা নেই।

CHOLERA IN 1958

১৯৫৮-তে ভারত ও পাকিস্তানে কলেরা-আক্রান্ত এলাকা
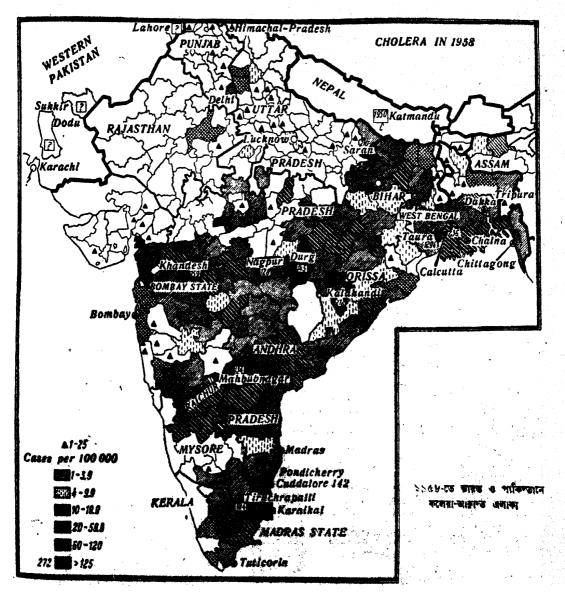
দুনিয়ায় বীজাণুজাত রোগ আছে ৭০০-এর মত। তার মধ্যে কলেরা মহামারীটি প্রধানত এশিয়ার বাসিন্দা। সেকালে মানুষের অসুখ-বিসুখ সম্পর্কে যতই কুসংস্কার থাকুক তখনকার বিজ্ঞানীরা রোগের প্রতিষেধ ও আরোগ্য নিয়ে মাথা ঘামাতেন। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ শতকে ভারত ও চীনে বসন্তের টিকা দেবার ব্যবস্থা ছিল বলে শোনা যায়। সেই জায়গায় আজ আমাদের বিদেশ থেকে টিকা আমদানি করতে হচ্ছে এবং বহু পরে কাজ আরম্ভ করেও প্রতীচ্য যেসব মহামারী চিরকালের মত নির্মূল করে ফেলেছে সেই সব রোগ আজও আমাদের দেশে প্রতি বছর বহু প্রাণ অকালে ঝরিয়ে দিচ্ছে।

কলেরা রোগ কোন কালেই পৃথিবীর সব দেশে হত না। এশিয়া ও আফ্রিকাই এর প্রধান আড্ডা। কারণ, আর্দ্র আবহাওয়া ও ভিজা মাটি হচ্ছে কলেরা বীজাণুর অনুকূল জমি। যে মাধ্যমে সেই বীজাণু গজায় তা যদি নিরপেক্ষ বা সামান্য একটু ক্ষার-ধর্মী হয় তা হলেই বীজাণুর পোয়া বারো। শুকনো জায়গায় বা অম্লধর্মী মাধ্যমে সে সুবিধা করতে পারে না। এশিয়া ও আফ্রিকাই কলেরার আড্ডা হলেও তার প্রধানতম ঘাঁটি হচ্ছে বাংলা দেশ (পশ্চিম ও পূর্ব) যেখান থেকে সেকালে তীর্থ-যাত্রী ও বণিক দলের মাধ্যমে রোগটি অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়ত। শিল্পসভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোগটিও জাহাজে জাহাজে গিয়ে দেশদেশান্তরে হানা দেয় এবং এইভাবে একই সঙ্গে একাধিক দেশে রোগটি মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। যেমন ঘটেছিল ১৮১৭ থেকে ১৮২৩ সাল, ১৮২৬ থেকে ১৮৩৭, ১৮৪৬ থেকে ১৮৬২, ১৮৬৪ থেকে ১৮৭৫, ১৮৮৩ থেকে ১৮৯৬ ও ১৯০২ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত এবং ১৯৪৭ সালে। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানে প্রায় ৪ লক্ষ লোক কলেরায় মারা যায়।

কলেরার বীজাণু জলের দ্বারাই সবচেয়ে বেশী সংক্রামিত হয় এবং সেই ক্ষেত্রে রোগ চরম আকার ধারণ করে। যেমন বলা যায় যে, ১৮৯২ সালে পানীয় জলের সঙ্গে বীজাণুমিশ্রিত পায়খানা মিশে হামবুর্গ শহরে যে কলেরা মহামারীর বিস্ফোরণ ঘটে তাতে প্রতিদিন সহস্রাধিক লোক আক্রান্ত হয়েছিল এবং ২০ হাজার লোক মারা গিয়েছিল। এ ছাড়া আঢাকা কাটা ফল, পচা খাবার ইত্যাদি থেকে রোগের সংক্রমণ ঘটে থাকে।

কলেরা-বিরোধী সংগ্রামে বার্বোরিনের ভূমিকা কী সেটা বুঝতে হলে রোগটির প্রাথমিক মারাত্মক লক্ষণগুলির কথা মনে রাখতে হবে। কলেরায় আক্রান্ত হলে প্রথমেই প্রচন্ড উদরাময় ও বমি হয় অর্থাৎ শরীরের জলীয় অংশ বেরিয়ে যেতে থাকে। তাই রোগীকে লবণমিশ্রিত জল ইন্‌জেক্‌শন করা হয়। বার্বোরিন ওষুধটির উপ-যোগিতা প্রধানত এইখানে। সেটি উদরাময় ও বমি বন্ধ করে শরীরের জলীয় অংশ আর বেরিয়ে যেতে দেয় না, যে কাজ কোন অ্যাণ্টিবায়োটিকসের করবার ক্ষমতা নেই। ঐসব ওষুধের শরীরে জমা হয়ে রোগ-বীজাণু নাশ করতে যে সময় লাগে তার মধ্যে রোগীর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ে। কিন্তু বার্বোরিন অতি অল্প সময়ের মধ্যে উদরাময় ও বমি বন্ধ করে রোগীর জীবনী-শক্তি রক্ষা করতে সাহায্য করে এবং সেই জন্য রোগীর সুস্থ হয়ে বল ফিরে পেতেও অপেক্ষাকৃত কম সময় লাগে।

কিন্তু অন্যান্য ওষুধের তুলনায় বার্বো-রিনের শ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে নিশ্চয় করে বলার সময় বোধ হয় এখনো আসেনি। কারণ, ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে কলকাতার কলেরা মহামারীর সময়ে বার্বোরিন প্রয়োগ করে চমকপ্রদ সাফল্য লাভ হলেও দুই বছরের ফল ঠিক এক রকম হয়নি। ১৯৬৪ সালে অন্য ওষুধগুলির তুলনায় বার্বো-রিনের ক্ষেত্রে মৃত্যুর হার অপেক্ষাকৃত কম হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৫ সালে ফলাফল ছিল সমান সমান। ১৯৬৪ ও ১৯৬৫ সালে মোট ৩৫৬ জন রোগীকে বার্বোরিন এবং ২৬৪ জনকে ক্লোর‍্যামফেনিকল দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছিল। তাতে নাকি ইরাইথ্রোমাইসিন ও টেট্রাসাইক্লিনের তুলনায় ক্লোরামফেনিকলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয়েছে (এবং সেই সঙ্গে বার্বোরিনেরও)। ঐসব অ্যাণ্টিবায়োটিক্সের উপকারিতা হচ্ছে এইখানে যে, সেগুলি রোগবীজাণু ধ্বংস করে শরীরকে অধিকতর ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। তার বেশী কিছু নয় এবং সেগুলি অসুখের স্বাভাবিক ধারাও ব্যাহত করতে পারে না। কিন্তু ডঃ ফিংক্রুস্টাইন ১৯৬৪ সালে কলেরার উদরাময়ের মূল হিসাবে ভাইব্রিয়ো কলেরি নামে যে বীজাণুর সন্ধান দিয়েছেন সেটিকে অকেজো করে দেবার ক্ষমতা রাখে বার্বোরিন। শুধু তাই নয়, যেসব ক্ষেত্রে পায়খানায় কলেরার এই বীজাণুটি ধরা পড়ে না সেখানেও নির্ভয়ে বার্বোরিন ব্যবহার করা যায় এবং ভাল ফল পাওয়া যায়। শিশুদের কলেরায় বার্বোরিন চমৎকার ফল দিয়েছে।

এই গেল বার্বোরিনের কথা। কিন্তু আমাদের পৌরপিতারা কি শহরে প্রতি বছরের কলেরা মহামারীর প্রতিকার বার্বোরিন দিয়ে করবেন বলে আশা করেন? বার্বোরিন হচ্ছে রোগ আরোগ্যের ওষুধ, রোগ নিবারণের নয়। বীজাণুদুষ্ট পানীয় জল, রাস্তায় খোলা অবস্থায় কাটা ফল ও খাবার বিক্রি, এসব ব্যাপারের কি গতি হবে? পাশ্চাত্ত্যের দেশে দেশে কোনো ওষুধের সাহায্যে কলেরা নির্মূল হয়নি, নির্মূল হয়েছে এইসব বীজাণু সংক্রমণের উৎস নষ্ট ও নিষিদ্ধ করে। আরোগ্যের চেয়ে প্রতিষেধটাই বেশী কাজের এই হচ্ছে মহা-পুরুষদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশে সবই উল্টো। তবে অনেকে হয়ত ভাবতে পারেন যে, প্রতিষেধের উপর আরোগ্যকে প্রাধান্য দিলে মলথুসীয় সমস্যার কিছুটা সমাধান আপসে হয়ে যেতে পারে।

ত্রিলোচন কলমচি

পোলাট্রি (roll-tree)
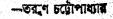
হাওড়া জেলার মানচিত্রের দিকে তাকালে কারো যদি মিনিয়েচার চেহারার নির্লঙ্কা হিন্দুস্থান বলে মনে হয়, আমি তবে অসংস্কৃত একটি হৃদ্‌পিন্ডাকার জেলার কথাই বলছি। ধরে নিতে পারেন, রাঙামাটির এই জেলায় ভোটের রঙ লেগেছে প্রায় মাস দেড়েক আগে থেকেই। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার, গাছের গুঁড়ি এবং গাড়ির গায়েও হাত পড়েছে। বিরাট, বিরাটতর, বিরাটতম জনসভার হাঁকডাক চলেছে। রাজনীতির ধুরন্ধরেরা সফরে আসবেন, সফরির দলও নফর-সংকীর্তনে বেরিয়েছে। রেস্ট হাউস গেস্ট হাউস আর সার্কিট হাউস নামাঙ্কিত; ফরেস্ট বাংলোগুলো পর্যন্ত হট্টমন্দির হয়ে উঠেছে। জল থেকে জঙ্গল সর্বত্র জীপের দৌড়।

কিন্ত এহ বাহ্য, এ-দৃশ্য ত সকলেরই দেখা। কানের কাছে পার্টি-প্রচারকরা মশার মত গান শুনিয়ে যাচ্ছেন। কি মশাই দিচ্ছেন ত? খবরের কাগজের অত্যুৎসাহী ইণ্টেলেকচুয়াল ইয়ং-বেঙ্গলরা আসছেন, এই অজব বঙ্গদেশ জরীপ করে যাচ্ছেন, আলগা আলগা দু-চার কথা বলে পড়ে যাচ্ছেন ভোটার চরিত্তির। পরদিনের পরদিন খবরের কাগজের পাতা জুড়ে তাঁদের লিটারেচার পড়ছি। সেই সঙ্গে জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করে আনা লোকসংগীত; তরজা, খেউড় হাফ্‌-আখরাই। মোট কথা, সব মিলে জমে উঠেছে ভোট-পর্ব।

এতে আমার অবাক হবার কিছু ছিল না। বয়স দোষে ইতিপূর্বেকার ত্রিরঙ্গও নয়নগোচর হয়েছে। ভোটের মধ্যে সত্যিকার উত্তেজনা রাজনৈতিক না অর্থনৈতিক; এও একটা বৃহত্তম ঘোড়দৌড়ের মাঠ কিনা ইত্যকার প্রশ্ন নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবী। তবু আমি অবাক হলাম তখনই, যখন দেখলাম শহরাঞ্চলের স্কুল-টাইমের চৌকিদারের দল কোথায় অদৃশ্য হয়েছে। যথানিয়মে স্কুল শুরু হচ্ছে, যথানিয়মে বেণী দুলিয়ে স্কুল ছুটিও হচ্ছে, কিন্তু সেই অলি-গলি রাস্তার মোড়ে মোড়ের স্ট্যান্ডবাইরা কোথায়, তাদের সাইক্লিক অর্ডারে আনা-গোনাও দেখছি না।

পুলিস-বন্ধুর কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, তারা সব নির্বাচনী অফিসে বেকারত্ব বিসর্জন দিয়েছে। চা-সিগারেট, বিস্কিট-টোস্ট সহযোগে নিশ্চিহ্ন করে তারা কেস্ট-বিস্টুর মত বসে বসে বৈঠক দিচ্ছে। তাদের কথাও না হয় থাকলো, বরাতের শিকে ছিঁড়লে বারোয়ারী পুজোর মওকার থেকেও বড়ো দাঁও হয়ত তারা মারতে পারবে। গুছিয়ে নিতে পারবে নিজের নিজের আগামী দিন।

কিন্তু আসল কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে সরকারী বৃক্ষ শাখায়-শাখায়। দু-মাস আগে থেকেই জেলা সদরে চঞ্চলতা পড়ে গিয়েছিল। ক্যালেন্ডারে সকলেরই চক্ষুস্থির। কেন্দ্রের রহস্যাধুপী থেকে যত সার্কুলার আসবে, যত চিঠি-চাপাটি, সব কিছুই রক্তাক্ষরেই মোক্ষম মোঁডাসিন যেন লিখিত রয়েছে: Caution, Election Ahead। অর্থাৎ বাঁকের মুখে আস্তে চালাও।

জেলা শাসকের দরবারে প্রায় নিত্য বৈঠক। তামাম জেলার ব্লকহেডস্‌ অর্থাৎ বি ডি ও ব্রাদার্স সেই বৈঠকখানায় রোজ হাজির। জেলা পরিষদ কাজে কলমে সরগরম।

সদরে সরকারী অফিসারদের যে টিফিন-ক্লাবটি ছিল, সেটি অনেকদিনই বেহাতী হয়েছে। সেখানে বসেছে ইলেকশন অফিস। ফলে সাব-ডিভিশনাল অফিসার আর ডেপুটি, হাফ-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের অবসরকালীন বাস্তুহীন বসতি ইতস্তত ভেসে বেড়াচ্ছে। সেখানে এখন উঠিতে কিশোরী এবং বসিতে কিশোরী। নানা প্রকার ইলেকশনী খোসগল্প, আদেশ-নির্দেশ নিরীক্ষা এবং ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনাকল্পনা। প্রতিটি ফাইলের মধ্যে কি ক'রে ইলেকশনের উড়ো ভূত ঢুকেছে, তার সালতামামী। Boss-কর্তা উইংসের পাশ থেকে কি প্রম্পটিং করছেন, কাকে কি-কর্মে লাগাচ্ছেন, কাকে কানে কানে, 'বুঝছেন Kমন?' কনফিডেন্সিয়াল ফিনিশিং টাচ দিয়েছেন, আমি হেন আগন্তুকও সেকথা অবহিত হতাম।

...সফরির দলও নফর-সংকীর্তনে বেরিয়েছে

Boss-কর্তা উইংসের পাশ থেকে কি প্রম্পটিং করছেন

জুতোর সোল থেকে বুকের Soul পর্যন্ত ইলেকশন টেনশনে টনটন করছে অফিসারদের। নাম ভূমিকায় যাঁরা আছেন এবং প্রথম সারিতে যাঁরা, নিজের দপ্তরে পাত্তাড়ি প্রায় অনেক দিনই বেঁধে ফেলেছেন। এখন অন্তিম সময়ে তাঁদের প্রজাপতির মতই কোথাও এক জায়গায় বসন্ত অবস্থায় পাওয়া ভার। কেউ গিয়েছেন ব্লক টুরে, কেউ গিয়েছেন স্থানীয় স্কুল কলেজে সদ্য-পরিণীত প্রিজাইডিং অফিসারদের ইনস্ট্রাকশন ক্লাস নিতে। মাস্টার মহাশয় এবং অন্য বাবু মশায়দের পাখি পড়ানোর এবং খাঁচা (Ballot box) খেলানোর এমন সুবর্ণ সুযোগ আর কি সহজে হবে।

একজন আমাকে বললেন, 'আপনারা সুখের পায়রা, স্লে আছেন মশাই।'

বিচলিত কণ্ঠে বললাম, 'কেন আপনার আবার কি হল?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আর কি হল! আগামীকাল কলকাতায় চলেছি প্রায় তিরিশ লক্ষ ব্যালট পেপার আনতে! কয়েকরাত ধরে বিছানায় স্ত্রী এবং ঘুম কেউ কাছে ঘেঁষতে পারছে না।'

'কিন্তু আমি তো মশাই', জনৈক কাউন্টিং অফিসার জানালেন, 'রাতে আজকাল ইংরেজি ভেড়ার বদলে বাংলা ব্যালট পেপার গুনতে গুনতে ঘুমিয়ে পড়ছি।'

বাট ইয়োর ডেভ্জ আর কামিং।' মিঃ ঘোষ জানালেন, তিনি ইলেকশন অফিসের একজন হর্তা-ব্যক্তি। কুলোকে ডাম্পিং গ্রাউন্ড বলছে আড়ালে। উদয়াস্ত সেই যে টেলিফোন মুখে দিয়ে পড়ে থাকেন, টিফিন-কালেও দাঁতে কুটোটি কাটেন না।

সত্যি, দিন তো ঘনিয়ে এল। রণাঙ্গন বঙ্গদেশে ২২৮৪০টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র হয়েছে। তার জন্যে বজ্র আঁটুনি এবং সরকারী গেরোর আর অন্ত নেই। ৩ ব্যাটেলিয়ান কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিস এসে গেছে। তা ছাড়া নিজস্ব সশস্ত্র পুলিস আছে ১৯০০। তদুপরি ৪০০০ জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক ও হোমগার্ড এবং ১৭০০০ চৌকিদার ও দফাদার। প্রায় লক্ষাধিক সরকারী কর্মচারিকে এই শুভ কর্মে সংকেত স্থানে পেঁছে দেবার জন্যে চাই বাস-ট্রাক জিপ ইত্যাদি। গাড়ি-গাড়ি গাড়ি জড়ো করা হয়েছে সদরে, সিরিয়াল নম্বর সাঁটা হয়েছে মুখের ওপর। দুদিন আগেই দুরদুর্গমে রওনা হয়ে যাচ্ছেন পোলিং পার্টিরা।

গিয়েছিলাম একটি জংলী ব্লকে। চার-পাশে ফরেস্ট। ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসাররাই গ্রাম বাংলার তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। পোলিং সেন্টার এবং পোলিং পার্টির এই দুদিনের আড়াইদিনের খাওয়া পরা শোওয়ার দায়িত্ব তাঁর নিজের স্কন্ধে। কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বেশ চিন্তিত মনে

—তেরা জুতি কিত্না মিল্ কভার কিয়া, ইয়ার?

হল তাঁকে। আমার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কখানা গাড়ি পাচ্ছি, স্যার? চোদ্দখানার রিকুইজিশন দিয়েছিলাম আমি।'

সবাই Block aid চাচ্ছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত Blockade হবে কিনা আমি জানি না। প্রয়োজন মাফিক গাড়ি হয়ত শেষ পর্যন্ত পেঁছোবে না। অনাদায়ে একটি হর্তাকি দেবার মত শেষ পর্যন্ত গো-শকট দিয়েও নাকি কোটা পূরণ করা হতে পারে।

অবিশ্যি এমন অনেক ভোট গ্রহণ কেন্দ্র দেখে এলাম যেখানে পালকি ডুলি এবং পায়দল ছাড়া অগমনীয়। তবে সময়কালে পঙ্গুও নাকি গিরি লঙ্ঘন করে, পোলিং পার্টিও পগার পার হবে ঠিকই। আমি শুধু এম পি মশাইয়ের বাংলোয় বসে বসে শঙ্করকানা হোমগার্ড আর স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর দিনকয়েক আগের পরম উল্লাস দেখছিলাম।

—তেরা জুতি কিত্না মিল্ কভার কিয়া, ইয়ার? মেরা তো পাঁচ মিল্ কিয়া!

ইয়ার তখন বুক ফুলিয়ে রাহা খরচা থেকে 'লম্বার টেন' ফুঁকছে। তক্‌মা আর পোশাকের সুড়সুড়ি ওদেরও লেগেছে। আর জুতো মানেই তো পদমর্যাদা। তার ওপর যে জুতোর এমন মচ্‌মচ্ খট্‌খট্ বোলচাল।

একজন গ্রাম্য যুবক পুলিস স্টোর থেকে রিয়্যাল চামড়ার চকচকে দু দুখানা জুতো পেয়ে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে, চোখে মুখে মুগ্ধবোধ ছড়ানো। সরস্বতী ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে ইতিমধ্যেই কুড়ি-বাইশ জন নাকি পা মচকে নিয়েছে শুনলাম।

গানের আসর
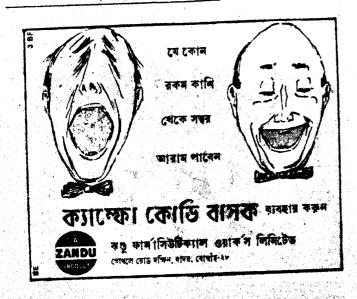
সরস্বতী পুজোর দিন সন্ধেবেলায় ধ্রুপদ-শিল্পী শ্রীউদয়ভূষণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁদের বৈঠকখানায় বসে কথা হচ্ছিল। এই বৈঠকখানাটির একটি ঐতিহ্য আছে, সেই কথাই বলছিলেন। শতাধিক বৎসর কত গুণী শিল্পী এইখানে বসে আলাপ-আলোচনা করেছেন, সংগীত শিখেছেন, অধ্যাপনা করেছেন। উত্তর কলকাতার একটি সুপ্রাচীন পল্লীতে উদয়বাবুর নিবাস। এখানকার ধারে কাছে কোথাও ফাশনদুরস্ত সোসাইটির নামগন্ধ নেই। পরিবেশও যে সংগীতের অনুকূল এমন নয় তথাপি উদয়বাবুর ছাত্রীরা সামনের চত্বরে বসে যখন ধ্রুপদের মধুর আলাপ করছিলেন তখন মনে হচ্ছিল একটি প্রাচীন যুগের কথা যখন উত্তর কলকাতার এইসব স্থানে বড় বড় বিত্তবান ব্যক্তিদের গৃহে সন্ধ্যাগুলি এইরকম ধ্রুপদালাপে মুখর থাকত।

উদয়ভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়কে কেবলমাত্র শিল্পী না বলে সংগীতাচার্য বলাই সংগত। তিনি প্রবীণ হয়েছেন—বহু ছাত্রছাত্রী তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আচার্যের উপযুক্ত গুণ সবই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান। এ ছাড়া গাম্ভীর্য, বিনয় এবং সারল্য—এই তিনটির উপযুক্ত সমন্বয়ও তাঁর মধ্যে দেখা গেল। এ যুগে কেবলমাত্র ধ্রুপদের শিক্ষা এবং চর্চাকে অবলম্বন করতে খুব কম ব্যক্তিকেই দেখা যায়। এদিক দিয়ে উদয়বাবুর মনোবল এবং দৃঢ়তা অতুলনীয়। সত্যিই অবাক হলুম যখন তিনি বললেন—"বিশ্বাস করুন কেবলমাত্র ধ্রুপদের অধ্যাপনা করেই আমি চালিয়ে আসছি—অনেকে এ কথা বিশ্বাস করতে চান না।" কিন্তু অবিশ্বাসের কোন কারণ থাকবে না যখন উদয়বাবুর সার্থক শিষ্য শিষ্যাদের গান শোনা যাবে এবং বোঝা যাবে যে উদয়বাবু তাঁদের যে সন্ধান দিয়েছেন তা দুন, চৌগুন, গমক আর বাট নয়, ধ্রুপদের ঘন রসনিবন্ধ রূপ যা একটি সামগ্রিক সৃষ্টির সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করে, কেবলমাত্র টেকনিকের চাতুর্যে বিভ্রান্ত করে না। বর্তমানে ধ্রুপদ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কলকাতায় বেশী আছে কি না অথবা আদৌ আছে কিনা জানি না, তবে উদয়বাবু সার্থকভাবে তাঁদের "ভারত সংগীত বিদ্যালয়"কে বহু বৎসর ধরে উজ্জীবিত রেখেছেন। আর তিনটি বৎসর পরেই এই বিদ্যালয়ের অর্ধ-শতাব্দীকাল পূর্ণ হবে।

এই বিদ্যালয় সম্পর্কে আমার ঔৎসুক্য জেগেছিল বেশ কয়েক বৎসর আগে বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলনের একটি অনুষ্ঠানে। ধ্রুপদের এত মনোহর সম্মেলক গীত অনুষ্ঠিত হতে পারে এ ধারণা আমার ছিল না। তা ছাড়া মেয়েদের এত সুষ্ঠুভাবে ধ্রুপদ গাইতেও এর আগে শুনিনি। অনুষ্ঠানটি শ্রোতৃসমাজে সমাদৃত হয়েছিল। এর পরে কৌতূহল সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হয়নি। এর পরেও এঁদের অনুষ্ঠান বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে হয়েছে। উদয়বাবুর কাছ থেকে শোনা গেল ইন্দিরা দেবী তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদভাঙা গানের একটি অনুষ্ঠান করতে। এই অনুষ্ঠানটিও ইনি বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে করেছিলেন। মূল হিন্দী গানের সঙ্গে রবীন্দ্র সংগীত খুব মনোজ্ঞ হয়েছিল বলে শোনা গেল। এই অনুষ্ঠানটি কিন্তু এঁরা ইন্দিরা দেবীকে শোনাতে পারেননি কেননা প্রস্তুতির অল্পকালের মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করেন।

উদয়ভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে তাঁদের পরিবারের ঐতিহ্য শোনা গেল। ঘরানা সম্বন্ধে আমি বিশেষজ্ঞ নই; অতএব সব তথ্য প্রমাণ সহ স্থাপন করতে পারব না। যেটুকু শুনলাম সেটুকু বলি। এঁরা খাণ্ডারবাণী পর্যায়ের গান করেন বলে এঁদের বিশ্বাস। যতদূর জানা যায় তাঁদের ঘরের আদিগুরু দিল্লীর নাসির আহম্মদ নামক জনৈক ওস্তাদ। ইনি কোন ঘরানার গাইয়ে ছিলেন সে সম্বন্ধে উদয়বাবু আলোকপাত করতে অসমর্থ। এঁরই শিষ্য ছিলেন প্রসিদ্ধ গায়ক গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায় যিনি সাতুবাবুর বাড়িতে আসরে গাইতেন। পাথুরেঘাটার হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন গঙ্গানারায়ণবাবুর শিষ্য। হরপ্রসাদ কেবলমাত্র সংগীতেই পারদর্শী ছিলেন না, ইনি নাকি বহু ভাষাও যত্ন করে শিখেছিলেন। শোনা যায় হরপ্রসাদের বাড়ির সম্মুখে একটি মিষ্টির দোকানে যদু ভট্ট ছিলেন একজন হালুইকর। একদিন হরপ্রসাদের গানে আকৃষ্ট হয়ে তিনি নাকি ঝাঁঝরি হাতে দোকান থেকে সোজা আসরে এসে উপস্থিত হলেন। এতে অনেকেই অসন্তুষ্ট হলেন কিন্তু হরপ্রসাদ একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তাঁর ধারণা হল যে, বিশেষ আকর্ষণ বা পারদর্শিতা না থাকলে কেউ এইভাবে সম্বিৎ হারাতে পারে না। লোকজন চলে গেলে তিনি যদু ভট্টকে জিজ্ঞাসা করলেন

যে সংগীতে কোনও অভিজ্ঞতা আছে কিনা। উত্তরে যদু ভট্ট বললেন, অভিজ্ঞতা কতটা আছে তা তিনি ঠিক বলতে পারেন না তবে হরপ্রসাদের গাওয়া গানটি তিনি নাকি গেয়ে দেখাতে পারেন। হরপ্রসাদ বিস্মিত হয়ে তাঁকে সেই গানটি গাইতে অনুরোধ করলে তিনি নাকি সেটি সম্পূর্ণ তাঁর মত করেই গেয়ে শোনালেন। হরপ্রসাদ তখন তাঁকে রন্ধনশালা থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের বাড়িতে এনে রাখলেন এবং তাঁকে নিজে গান না শিখিয়ে গুরু গঙ্গানারায়ণের কাছে শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করলেন। ঘটনাটি কিছু অতিরঞ্জিত বলে মনে হয় তবে যদু ভট্ট তাঁর পারদর্শিতার একটা চমকপ্রদ পরিচয় নিশ্চয়ই দিয়েছিলেন—এটুকু অন্তত আমরা আন্দাজ করতে পারি। যে তানপুরায় হরপ্রসাদ গান গাইতেন এবং যদুভট্টও গেয়েছেন সেটি উদয়বাবু সযত্নে রক্ষা করছেন এবং উক্ত সন্ধ্যায় এই তানপুরে সহযোগেই তিনি আমাদের কয়েকটি মনোরম ধ্রুপদ ধামার গেয়ে শোনালেন। তানপুরাটির বৈশিষ্ট্য আছে। এই ধরনের লাউ আজকাল দেখা যায় না। তানপুরাটি হরপ্রসাদের পৌত্র কালীপ্রসাদ উপহার দিয়েছেন।

উদয়ভূষণের পিতা কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য মহাশয় হরপ্রসাদের কাছে গান শিখতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু চার বৎসরের অধিক সে সুযোগ লাভ করেননি কারণ তারপরেই হরপ্রসাদের দেহাবসান ঘটে। পরে দীর্ঘকাল তিনি হরপ্রসাদের পুত্র দুর্গাপ্রসাদের কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। এ ছাড়া জগদীশ মিশ্র তাঁকে ঠুংরী শিখিয়েছিলেন। ইনি এবং এঁর ভাই গুরুপ্রসাদ মিশ্র নাকি এই বৈঠকখানাতেই থাকতেন। পরে এঁরা পাইকপাড়া রাজবাটীতে ছিলেন। কৃষ্ণধন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর বাড়িতে ১৯২০ সালে "ভারত সংগীত বিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত করেন। আজ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব ধারায় সুপরিচালিত হয়ে আসছে। উদয়ভূষণ তাঁর পিতার কাছেই সংগীত শিক্ষা করেছেন। এঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী ইতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনেও মুগ্ধ হয়েছি।

আজকের দিনে যথার্থ ধ্রুপদের শিক্ষা আমরা অত্যাবশ্যক বলে মনে করি। তার কারণ সংগীতের কলিনিবদ্ধ রূপ, ক্রমিক বিস্তার তাল লয় সম্বন্ধে উপযুক্ত বোধ একমাত্র ধ্রুপদ শিক্ষা থেকেই অর্জন করা সম্ভব। আমাদের সংগীতে যেমন একদিকে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে অপরদিকে উচ্ছৃংখলতার পরিচয়ও কম পাওয়া যাচ্ছে না। এর একটি প্রধান কারণ যথানিয়মে শিক্ষার অভাব। প্রকৃত ধ্রুপদের সঙ্গে পরিচয় ঘটলে এই পরিমিতি বোধ আপনিই আসে এবং সংযমেরও অভাব ঘটে না। অবশ্য ধ্রুপদীয়াদের মধ্যেও কাণ্ডজ্ঞানহীনতা যে দেখা যায় না এমন নয়। কোন কোন শিল্পীকে দেখি আলাপের পরই তিনি তাল নিয়ে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিচ্ছেন। ফলে যে ধ্যানগম্ভীর পরিবেশ তাঁরা আলাপে সৃষ্টি করেন তা তালের কলরোলে একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়। শ্রীঅশোককুমার সরকার মহাশয় সম্প্রতি তাল নিয়ে এই অশোভন কাণ্ডকারখানার সমালোচনা করেছেন। এটি আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি বলেই বার বার এই অপ্রীতিকর প্রথা সম্বন্ধে শিল্পীদের সচেতন করে দিতে চাই।

ভারত সংগীত বিদ্যালয়ে ধ্রুপদের একটি পূর্ণাঙ্গরূপ এবং মধুর পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির আমরা উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

গোষ্ঠীনিরপেক্ষ কাব্যসঙ্গীত

মহাশয়,

শার্ঙ্গদেব "গানের আসর" বিভাগে গোষ্ঠী নিরপেক্ষ কাব্য সংগীত সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছেন সে সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করতে চাই।

ঘরানার বিরুদ্ধে মতবাদ অনেকদিন ধরেই চলে আসছে। বিরুদ্ধ মতবাদ চালিয়েছিলেন ভাতখণ্ডে স্বয়ং এবং অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির পুরোধাবর্গ। আমাদের প্রশ্ন এই যে, ঘরানা পদ্ধতির স্থলে অ্যাকাডেমিক পদ্ধতির প্রচলনে কোনও শিল্পী কি এ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে অ্যাকাডেমিক পদ্ধতিকে সফল করতে পেরেছেন? অনেক শিল্পী আছেন যাঁরা ঘরানা পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করে পরে অ্যাকাডেমিক পদ্ধতিতে ডিপ্লোমা লাভ করেছেন—তাঁদেরও ঘরানাপন্থী মনে করতে হবে।

যে সমস্ত মহান শিল্পী নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নতুন রাগমিশ্রণ অথবা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে সমাজের শীর্ষদেশে অবস্থিত তাঁরা সকলেই ঘরানাপন্থী এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাঁদের মধ্যে একজনও অ্যাকাডেমিক পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত নন। এটা সাধারণ কথা যে ৬ বছরে অ্যাকাডেমিক ডিপ্লোমা পাওয়া যায় কিন্তু শিল্পী হওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

আর একটি নিবেদন—ঘরানা গোষ্ঠিবর্গ একটু গোঁড়াপন্থী হবেনই কারণ এক একটি বিশেষ বিশেষ ঘরানা বিশেষ বিশেষভাবে চিহ্নিত থেকে ইতিহাস রচনা করে থাকে, সেখানে ভাল জিনিস অন্য ঘরানা থেকে যদি গ্রহণ করা যায় তবে সেই শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রশংসা অথবা লোকপ্রিয়তা বৃদ্ধি হতে পারে কিন্তু ঘরনার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং শিল্পীর ব্যক্তিগত লোভ সংবরণ করা একান্ত আবশ্যক এবং এই কারণেই ওস্তাদবর্গ একটু বেশি রকম গোঁড়া ছিলেন। বিভিন্ন ঘরানার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যই ঘরানাগুলিকে পৃথক সত্তা নিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং এর দরকারও আছে। অপর—গুরুভক্তিসম্পন্ন একনিষ্ঠ শিষ্যরা গুরুর কাছে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করতে পারতেন নিঃসন্দেহে কিন্তু গুরুভক্তিহীন অথবা রসহীন শিষ্যকে পূর্ণ শিক্ষা দান করতে কোনো গুরুই প্রেরণা পান না। অ্যাকাডেমিক পদ্ধতিতে সে বিচার নেই—স্কুল কলেজের মত ভর্তি হয়ে শিক্ষালাভ করে ডিপ্লোমা পাওয়া যাবে—কিন্তু শিল্পী হওয়া যাবে না।

বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী।
কলকাতা—২৫

লেখকের বক্তব্য

শিল্পী যিনি হবেন তিনি সেটা নিজ গুণে হবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস—ঘরানা বা অ্যাকাডেমিক প্রসংগ এখানে বড় কথা নয়। তবে ঘরানার অবহেলা থেকেই অ্যাকাডেমিক প্রচেষ্টার উৎপত্তি। অনেক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ঘরানার লাঞ্ছনায় অধীর হয়েই শিক্ষার একটি ভদ্র পন্থা অবলম্বন না করে পারেননি। শিক্ষাকে যুগের উপযোগী না করে উপায় নেই—এইটা উপলব্ধি করেই সংগীত সম্পর্কে একটি উদারনীতি অবলম্বন করা হচ্ছে। শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন ঘটছে এক্ষেত্রেও কিছুকালের মধ্যেই সেই সুফল পাওয়া যাবে এটা সুনিশ্চিত।

—শার্ঙ্গদেব

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

গাজীর হাসি বাজে চড়া সুরে। মাহাতো বলে, 'না, অই বললাম আর কী।'

বলে সে পোড়া বিড়ি আবার ধরায়। ঝুঁকে পড়ে আগুন দেয় গিন্নীকে। গিন্নী যতটা সম্ভব আমাকে আড়াল করে ধরিয়ে নেয়। গাজীও তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে মাহাতোর দিকে। মাহাতোর হাতের কাঠির শেষ আগুনটুকু কাজে লেগে যায়। কিন্তু দু পা পিছিয়ে বসে নারাণঠাকুর। আর

পনের

নারাণঠাকুরের কথা শুনে আর মুখের ভাব দেখে আঙুরি হাসে খিলখিলিয়ে। এখনো বুঝি চোখের জল শুকোয় নি। অথচ দেখ, প্রাণের যত বন্ধ দরজা যেন হঠাৎ হাওয়ায় খুলে যায় ঠাস্‌ঠাসিয়ে। অন্ধকার যায়, আলো বিরাজ করে। যত জলে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতানি, সব শুকু শুকু, ঝরঝরিয়ে ওঠে। কিন্তু আমি কেবল গাজীর দিকেই দেখি। লোকটা গুণে জানে, না তুক জানে, কে জানে। এই দাওয়ার হাওয়ায় যে-রকম মেঘ ছেয়ে এসেছিল, গুমোট ঘনিয়ে-ছিল, সব সাফ-সুরতের কারিগরী যে লোকটার ঝোলা ভরে ছিল, এতটা বুঝতে পারিনি। কেবল যে গানে গানেই এই ডুবুরি মুক্তা তোলে, তা নয়। আবার বলে, 'ভুঁয়েতে গাছ দুইখান, ফল ফলবে একখান, মনের বুঝ কর।' অর্থাৎ, কোথায় কর ছুটোছুটি, কার কাছে বা মানত মানসিক। তোমার সব যে ঘরের কোণে বাঁধা। তুমি দিনকানা, রাত-দেওয়ানা, চেয়ে দেখ না। এবার বল, বিজ্ঞানের কী যুক্তি দেবে তোমরা। কেন, এর কি ভগবান নেই। তা সে আল্লা, খোদা-তাল্লা, যে নামই হোক। মানত মানসিক দোরধরা সব তো সেখানেই হয়। এ যে অন্যরকম গায়। শুধু গায় না, এই ভিয়েনে জ্বাল দেয় রহস্যের রস দিয়ে। তাইতে বন্ধ্যা নারীর কান্না যায়, অপুত্রকের সান্ত্বনা হয়। তবু, এই যে মাহাতো, যাকে বলি বাদার এক লক্ষপতি, তার কাছে ওর কোন চাটুকারের চাওয়া নেই। যা বলে, যা করে, সবই স্ব-ভাবের বশে। তার ধন-মানের প্রার্থনা নেই। একটি বিড়ি পেয়েই ধন্য।

কেন, এই যুগের বাতাস কি ওর প্রাণে তুফান তোলে না! আমরা যখন পদে পদে মরি বাঁচি, তখন এই আলুথালু উড়িয়ে এমন নিটুট হেসে ঝলকায় কেমন করে। ওর কি যুগোত্তরের প্রাণ নাকি? ধরা-ছোঁয়ার বাইরে যদিও, তবু যেন কিসের এক স্পর্ধা-অহংকারে একেবারে ডগমগিয়ে আছে। কিসের নেশা করেছে গাজী? আমাদের জীবনস্রোতের আঁকাবাঁকায় যেন কিছুই যায় আসে না ওর। আবার এখন দেখ, কথা একেবারে ঠোঁটের ডগায়। হাত জোড় করে এমন কথা বলে নারাণঠাকুরকে, ঠাকুর সন্দেহে ভুরু কুঁচকে থাকে। আর গাজী নিজে মিটি-মিটি হাসে। কেবল আঙুরির খিলখিলিয়ে ঝরে। এবার মাহাতোও তাল দেয়। ঘাড় দুলিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'তা সে কথা-খানি মিছে নয় ঠাকুর, তোমার হাতখানি ভাল। অনেক মেয়েমানুষের অমন পাকের হাত হয় না।'

এ আর গাজীর প্রশংসা নয়, স্বয়ং মাহাতোর। নারাণও এবার আসর নিয়ে মাটিতে বসে বলে, 'তা তোমাদের দশজনে খেয়ে যেমন বলবে, সেইরকমই হবে।'

ঠাকুর যেন একটু থতিয়েই পড়ে। মাহাতো ততক্ষণ গিন্নীর দিকে চোখ ফিরিয়েছে। নজরে ভুল করিনি, আঙুরির চোখের কোণও যেন একবার স্বামীকে ছুঁয়ে যায়। মাহাতো তাড়াতাড়ি বলে, 'অই গ, দেখিস্ বাপু, তা বলি আমি তোর কথা বলি নাই। তোর হাতের খাটন না হলি আমার দিন চলে না, সব্বাই জানে।'

আঙুরি অমনি ঝামটা দেয়, 'অহ্ ছি, কী কথার ছিরি, দ্যাখ দিকি। আমি কি তা বলেছি নাকি।'

একটু হলেই গাজীর সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যেত। গাজী চেয়ে দেখে না, আপন মনে বিড়ি টেনে চলে।

তখনই আবার এসে দেখা দেয় ফোঁচা। কিন্তু বলে না কিছু, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে। তৎক্ষণাৎ নারাণের মুখে বিরক্তি দেখা দেয়। ডিগডিগে শরীরটাকে টান করে কোমরের কোথা থেকে বের করে একটা বিড়ি। সেটা ছুঁড়ে দেয় ফোঁচার দিকে। ফোঁচা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। কোন দিকেই তাকায় না। এবার যা বোঝবার তা বুঝে নাও। বলতে গেলে অনেক কথা। মোদ্দা কথা, ফোঁচার খাওয়া হয়ে গিয়েছে। মনিবের কাছ থেকে পাওনা নিয়ে সে চলে গেল।

কোথায় গেল। সেই কালো-কুলো আঁটো-খাটো বউটির কাছে নাকি। তা সে যেখানেই যাক, এখানে এই দেশেতে, এই মানুষদের কী যেন একটা ছন্দ আছে। আমার চোখে যা ছন্দোহীন বাজে, এখানে তা নয়। তাই ফোঁচার আসা ও চলে যাওয়ায় কেউ কিছু বলে না। সবাই আপন মনে বিড়ি টানে। তবু, কেন জানি না, আঙুরির চোখে একটু ঝিলিক খেলে যায়।

মাহাতো হাই তুলে বলে, 'বেলা গেল, এবার ওঠা দরকার।'

তার কথাতেই নিজের কথা মনে পড়ে যায়। তাড়াতাড়ি নারাণকে জিজ্ঞেস করি, 'আমার কত হল?'

নারাণঠাকুর প্রস্তুত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলে, 'আপনার হয়েছে দু' টাকা দু' আনা।'

বলে কী লোকটা! সেই যে কী বলে এক দল মানুষকে, যাদের নাম ড্যান্‌চিবাবু, আমি তা নই। এ যুগের বাঙলায় বাস করে ড্যাম্ চীফ উচ্চারণ আমার সাজে না। ড্যাম চীফ্‌ওয়ালা হতেও পারিনি। তবু দুটো মানুষের পেট ভরা খাওয়া যদি দু' টাকা দু'আনায় হয়, তবে তো না বলে পারি না, এ বঙ্গে যে আসে, কপাল তার সঙ্গেই থাকে।

ওদিকে নারাণঠাকুর তখন হিসাব দিতে শুরু করেছে, 'আপনার হল গে ভাতডাল তরকারি আট আনা, মাছ চার আনা দই দু' আনা, এক টাকা।'

হাতের কর গুনে সে হিসাব দেয়। তার কোন দরকার ছিল না। বোধ হয় আমার অবাক হওয়া দেখে সে কড়া ক্রান্তির হিসাব বলে। কিন্তু মাছ দই খেলাম আমি, আমার হল এক টাকা। গাজীর কেন এক টাকা দু' আনা।

সে হিসাবের রহস্যও নারাণ ফরসা করে দেয়, 'আর এর হল গে আপনার আট আনার ডাল ভাত তরকারি, তার সঙ্গে আরো দশ আনার ভাত।'

'বুঝেছি।' বলে আমি টাকা বাড়িয়ে দিই।

গাজী বলে, 'ওরে, [illegible] হিসাব [illegible] না। আপনি কি [illegible]?'

ঠাকুর বলে, 'তুমি থাম তো। [illegible] না, কী করে চলে?' 'না, মাহাতোর [illegible] আছি। তোমার আর কী। হিসাব দেওয়া আমার কাজ, লোক ভোলানো না।'

বলতে বলতে ঠাকুর পয়সা গোঁজে কষিতে। মাহাতো পয়সা বের করে জামার ভিতরে জামার পকেট থেকে। তার মধ্যেই গাজী বলে, 'তা যদি বলেন ঠাকুরমশায়, অমন একখানি হাত থাকলি, লোককে আমি গাছের পাতা খাওয়াতাম। হাতের গুণে তাইতিই লোকে ভুলি যেত।'

বলে হেঁ হেঁ করে টেনে টেনে হাসে। আবার বলে, 'তয় বলেন, লোক ভুলনো সবার কাম কিনা। তয় হ্যাঁ, কাম দিয়ি জোলাতি হয়, আমার মতন খালি ফক্কিকারি নয়।'

দেখ, কোথায় লাগি মারে। কথা বহে কোন স্রোতে। নারাণঠাকুর যেন খোঁচা খেয়ে ফুঁসে ওঠে, 'কেন, আমি কি বলেছি তুমি ফক্কিকারি করছ? ভারী খচ্চর তো লোকটা।'

ঠাকুরের মুখখানি বেশ পালিশ দেওয়া। শ্রীমুখের বচনে কোন রাখ্ ঢাক নেই। গাজীটা নিতান্তই পাজী। এমন একটা রুষ্ট গলার গালাগাল শুনে আমার হাসি সামলানো দায় হল। কিন্তু আঙুরির সে দায় নেই। সে গাজীর দিকে চেয়ে গলা ছেড়ে হেসে ওঠে। এ সময়ে কেমন যেন রঙ্গিনী রঙ্গিনী লাগে এই অঙুরকে। মধ্য ঋত আশ্বিনেও শরীরের বাঁধুনিটি কোথাও টোল খায় নি। এখনো যত টান, তত অধরা অকূলে। লাল শাড়ির বাঁধনে তাকে ধরে রাখা যায় না যেন। অনাবাদী জমি কিনা, এ দেহ এখনো বন। দেখলে ঠাহর হয়, এ মৃত্তিকা ভেদ করে ফসল ফলে নি, ছাঁদ ছন্দ গড়ে নি, তাই সে বন্য। একটু বাতাস লাগলেই এমন দুলে ওঠে, না জানি কত প্রাণে তুফান লেগে যায়। তখন টের পাওয়া যায় না, এ শরীরে এক মেয়ে কাঁদে মা হবার জন্যে। তার ওপরে, ধূমপানের নেশা থাকলেও গলাখানি মেয়েলী মিষ্টতা হারায় নি। বরং আঙুরির খিলখিল হাসি যেন কেমন এক মোহ ছড়িয়ে দেয়।

সন্দেহ হয়, গাজীও গলা খুলে হাসতে চায়। ঠাকুরের রোষ দেখে থমকে যায়। বলে, 'আহা, আপনি বলবেন কেন, আমিই তো বলছি। তয় চুপ দিয়ি থাকি, আর কিছু বলব না।'

বলে গাজী অন্য দিকে তাকায়। মাহাতো বলে, 'তুমিও যেমন হয়িছ ঠাকুর। ওর কথায় এত রাগ করলি হয়। নাও, আমাদের হয়েছে আড়াই টাকা, না কী?'

নারাণের রাগ তখনো যায় নি। বলে, 'না, দেখ তো মাহাতোদা, এমন এক একটা [illegible] আমার [illegible] থাকে।'

গাজীর কথায় তখন সেই [illegible] গুনগুনোনি, 'যেজন প্রেমের ভাব জানে না, তার সঙ্গে কিসের লেনা দেনা...।'

মাহাতোর হাত থেকে ঠাকুর তখন পয়সা নিতে নিতে বলছিল, 'তোমার কি আর হিসাবে ভুল হবে মাহাতোদা। আড়াই টাকাই হয়েছে।'

কিন্তু সে কথা শেষ হবার আগেই গাজীকে সে আবার খেঁকিয়ে ওঠে, 'আরে রাখ তোমার লেনা দেনা। তোমার সঙ্গে প্রেম করার জন্যে আমি একেবারে মরে যাচ্ছি কি না।'

গাজী বলে, 'এইটা আবার কী বলেন ঠাকুরমশায়। আমার সঙ্গে প্রেম করার জন্যি আপনি মরবেন কেন। তা বলি না। তয়, "প্রেম আছে কোনখানে? প্রেম তোমার মনে মনে।" প্রেম আপনার আমার সকলির মধ্যি আছে। আপনি প্রেমের ভাব জানেন না, তাই কি আমি বলতি পারি। ছি মুরশেদ! ছি!'

মাহাতোর দেওয়া টাকাও কষিতে গুঁজতে গুঁজতে ঠাকুর রুষ্ট চোখে ঠোঁট উলটায়। কোন জবাব দেয় না। কিন্তু আঙুরির হাসি যে অধরা। সে হাসতে হাসতে বলে, 'গানটা শোনাও না।'

গাজী গান ধরবার আগেই আসে ফোঁচার বউ। কোলে সেই ছেলেটি আছে। তবে বংসের জন্য বুকখানি মঠের মত খোলা নয়। ডুরে শাড়ির ঢাকা আছে সেখানে। সে দু খিলি পান বাড়িয়ে ধরে নারাণঠাকুরের দিকে। ঠাকুর পান নিয়ে বলে, 'দোক্তা আন নি?'

ফোঁচাকে বলে তুই, তার বউকে বলে তুমি। বলতেই হয়, স্ত্রীলোক তো। বউ বাঁ হাত থেকে, ডান হাতে দোক্তা নিয়ে ঢেলে দেয় ঠাকুরের বাড়ানো হাতে। বউটির মুখেও পান, পিকের ধারা চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঠোঁটে তার রক্তাভা লেগেছে। এ সময়ে আঙুরি তার দিকে তাকায়। বউটি পান সামলে, ঠোঁট টিপে একটু হাসে। মাহাতো চোখ ঘুরিয়ে বলে, 'বাঃ, খালি ঠাকুরই পান খাবে, আমরা খাব না?'

বউ তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঁচল তুলে বলে, 'খাবেন, সেজে নিয়ে আসব?'

মাহাতো হেসে বলে, 'এমনি বললাম, এই তো খেলাম।'

গাজী তখন গান ধরেছে,

> 'কানা চোরে চুরি করে
> ঘর থাকতে সিঁদ কাটে পগারে
> শুধু বেগার খেটে মরে
> কানার ভাগ্যে ধন মিলে না।
> তার সঙ্গে কিসের লেনা দেনা।'

গান থামিয়ে গাজী ডুপ্‌কিতে আস্তে আস্তে তাল দেয়। আঙুরির দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে হাসে। আঙুরি তো হেসেই [illegible] পরেই, [illegible] গাজীটা আমাকে [illegible] করে। এবার [illegible] না থামিয়ে, তান দিয়ে দিয়েই গায়,

> 'নিমগাছ কাটিয়ে রোপণ
> শত ভার দুগ্ধ সিঞ্চন—
> তবু কী তার স্বভাব যায় দূরে
> ভিতরে মিঠা ঢুকতে পায় না
> যেজন প্রেমের ভাব জানে না।...
> ওরে, উল্লুকের হয় উদগ্ধ নয়ান
> সে দ্যাখে না সূর্য্যিকিরণ
> (অথচ) দ্যাখ, পিঁপড়েতে পায় চিনির মর্ম
> রসিক হলে যাবে জানা।
> যেজন প্রেমের ভাব জানে না...।'

গান তখনো শেষ হয় নি, নারাণঠাকুর উঠে

[illegible] খাড়া। ভিখারিদের শরীরে, পেটটা এখন একটু আগে বেড়ে এসেছে। তার ওপরে গাইতেলাগছি। নইলে বলা যেত, অলোয়ার খাড়া হল। ডান হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলে, 'তোমার ওই ছাতার গানের মর্ম ও কেউ বুঝবে না। গান না শালা খাচ্ছিলাম।'

বলে সে দরজা দিয়ে ভিতরে চলে যায়। আর একটু হলে ধাক্কা লেগে যেত ফোঁচার বউয়ের সংগে। বউ একটু অবাক হয়ে সকলের দিকে তাকায়। তারপর সেও ঠাকুরের পিছু পিছু চলে যায়। ইতিমধ্যে আঙুরি হাসিতে ঢলে পড়ে।

গাজীর চোখে দেখি ঝলক, অথচ যেন বড় মনোকষ্টে বলে, 'ঠাকুরমশায় আমাকে দু চোখি দেখতে পারেন না।'

মাহাতোও হাসে। হেসে বলে, 'তুইও বড় ব্যাদড়া গাজী। ঠাকুর চটেই বা কেন।'

মাহাতোর গলায় যেন কেমন স্নেহ ঝরে পড়ে। গাজী বলে, 'ওই যে দ্যাখ, উনি ভাবেন কি যে, আমি বুঝি ও'য়ারে শুনেয়ে গাচ্ছি।'

মাহাতো বলে, 'তাই তো গাস্।'

গাজী হাত জোড় করে, 'মুরশেদের নাম করি বলছি চাচা, তা গাই না। একটা কথা জানবে চাচা, যা গাই তা নিজির জন্যি, নিজিকে শুনেয়ে গাই। তয় হ্যাঁ, বলতি পার কি যে, ঠাকুরমশায়কে দেখলি অনেক গান মনে পড়ি যায়।'

আঙুরি তৎক্ষণাৎ হেসে ওঠে। সংগে সংগে বলে, 'আর একখানা গাও।'

মাহাতো তৎক্ষণাৎ হাত তুলে বলে, 'না, আর না। উদিকি দ্যাখ, রোদ কখন চলি গেছে, এবার হাঁটা দেব।'

বলতে বলতে সে একেবারে উঠে দাঁড়ায়। দরজার কাছে ঘরের ভিতরেই তার কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ আর চাদর ছিল। এগিয়ে গিয়ে চাদরটাকে আগের মতই কোমরে বাঁধে। ব্যাগ হাতে তুলে নেয়। বলে, 'নেহাত জ্যোছনা ফুটবি, সেই আশা। নইলি অন্ধকারে চলা দায় হত।'

গাজী বলে, 'তা চাচা, হাঁটা ধরবে কেন। গাড়ি আসতি বল নাই?'

'না, তা আর বলতি পেরিচি কই। আসবার দিনক্ষণ ঠিক ছিল না। তারকেশ্বরে তিন দিন কেটি গেছে। তারপরে ভেবি-ছিলাম, কালীঘাটে যাব। এ যাত্রা আর তা হলি না। কাজ কম্মো অগাধ পড়ি রয়িছে।'

যত ভাবনা, সব যেন গাজীর। বলে, 'যেতি পারবে জানি, তা হলিও ভোলাখালি তক যাওয়া, দু কোশ রাস্তা।'

মাহাতো বলে, 'চলি যাব ঠিক। তবে মাজাটা আজকাল একটু আধটু ব্যথা করে।'

এ গাড়ির প্রসঙ্গ নিশ্চয় গরুরগাড়িই কোথায়। কিন্তু এই প্রথম যেন টের পাওয়া গেল, মাহাতোর বয়স হয়েছে। চুলে তেমন পাক ধরেনি। মস্ত কালো মুখখানি, লাল চোখ, শরীরের বাঁধুনি দেখলে এমনি হঠাৎ টের পাওয়া যায় না। তবে এ রোদ এখন পশ্চিমে চলে গিয়েছে। মাহাতোর কথাটাই আবার মনে পড়ে, 'এদিকে বেলা যে যায়।'

ইতিমধ্যে আমিও উঠে দাঁড়িয়েছি। অজানা গাছের ছায়া কখন চারদিকেই দিন-শেষের ছায়ায় নিবিড় হয়ে এসেছে, খেয়াল করি নি। যদিও সন্ধ্যা বলা যাবে না, তবে আসন্ন সন্ধ্যা। রোদের চিহ্ন নেই। এই দাওয়াতেও ছায়া ঘন হয়ে এসেছে। হাত তুলে ঘড়ি দেখি, পাঁচটা বাজতে দেরি নেই।

মাহাতো আমার দিকে ফিরে বলে, 'আপনিও উঠলেন? যাক, আপনার সংগেও দেখা হয়ি গেল। তা, আজ আপনার থাকা হবি কমনে?'

থাকব কেন। নিজের কাপড়ের ঝুলি সামলাতে সামলাতে বলি, 'থাকব না, এবার ফিরব।'

মাহাতো তার কোকিল চোখে একটু যেন অবাক হয়ে তাকায়। বলে, 'কোথায় কমনে ফিরবেন।'

জবাব দেয় গাজী। 'বসিরহাট। বসির-হাট থেকি বাবুকে কলকাতার মোটর ধরিয়ি দেব।'

মাহাতো বিস্ময়ের ঝোঁকে তার কাঁধের শহুরে ঝোলাটাই নামিয়ে ফেলে। আঙুরির দিকে চেয়ে বলে, 'অই দ্যাখ্ আঙুরি শোন্, মাকড়াটা বলে কী। বসিরহাট যাবি কেমন করি তুই?'

আমার বুকটা ধক করে ওঠে। গাজী নির্বিকারে বলে 'কেন, ওপারে ন্যাজাটের মোটরে করি যাব।'

মাহাতো শরীর দুলিয়ে, মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, ন্যাজাটের মোটর তোমার মুর-শেদের গাড়ি কি না, সে এখনো বসি আছে। তার তো চারটেয় চলি যাবার কথা। তাও—।'

কথা শেষ হয় না তার। গাজীর আরশি চোখে এই প্রথম দেখি ঝলক খেলে না। গোঁফদাড়ি সহ গোটা মুখখানি চুপসে যায়। কেবল মুখ দিয়ে আওয়াজ আসে, 'অ্যাঁ?'

কিন্তু আমার শুধু বুক ধড়াসে যায় না। হঠাৎ যেন অগাধ জলে পড়ে যাই। দুশ্চিন্তায় আর উদ্বেগে বুকের কাছে নিশ্বাস আটকে যায়। সহসা নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। ভুলে যাই কোথায় এসেছিলাম, কেন এসেছিলাম। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে এই অচেনা দিগন্ত। আর মনে হয়, কেউ যেন আমাকে স্বজনহারা করে নির্বাসনে ফেলে দিয়ে যায়। আমি গাজীর দিকে তাকাই।

মাহাতো আরো বলে, 'তাও কি, ন্যাজাট থেকি বসিরহাটের রাস্তা তোমার জন্যি একেবারে [illegible] ? তবে আমি [illegible] এলাম কেন?'

গাজী [illegible] বলে, 'কেন?'

মাহাতোর [illegible] আবার আঙুরি। বলে, 'অই শোন্ [illegible]। গাজী [illegible] কথা শোন্। রাস্তা [illegible] হচ্ছে আজ দু হপ্তা ধরি। সাহা দিনি দু তিনবার যাতায়াত হয় কিনা ঠিক নাই, উনি এখন বাবুকে নিয়ি বসিরহাট রওনা দিচ্ছেন।'

মাহাতো যত বলে, তত আমার বুক শুকোয়। বিদেশ বলে ভয় নেই। কিন্তু এই ভেড়ি বাঁধের সীমানায়, মানুষখেকো কামটের আবাস নোনা গাঙের কূলে, বাদার গঞ্জে, কোথায় বা আশ্রয়, কোথায় রাত্রিবাসের ঠাঁই। দূরে চেয়ে অচেনাকেই ভয় বেশী। আমি দিশেহারা চোখে একবার গাজীর দিকে চাই, আর একবার মাহাতোর দিকে।

গাজীর আরশি চোখ যেন কাঁচের মত ধোয়া, তাতে ছায়া খেলে না। বলে, 'তা হলি?'

হঠাৎ দেখি, আঙুরি হেসে ওঠে। একবার চোখ তুলে তাকায় আমার মুখের দিকে। তারপর গাজীকে বলে, 'তা হলি আবার কী গো, এ দেশে কি মানুষ থাকে না?'

এ হাসির একটা গুণ আছে। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার মধ্যে, কেমন যেন ভরসা হয়ে বাজে। কথার মধ্যেও তাই। মন না মানুক, তবু ভুলে যাই কেন, এ দেশেও মানুষ বাস করে।

ঘোমটার ফাঁক থেকে আর একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আঙুরি বলে, 'তোমার বাবুকে নিয়ে না হয় ভোলাখালি চল।'

ভোলাখালি! দুই কোশ দূরে! তার চেয়ে তবু জানি, গাঙের কূলে আছি, যখনই হোক লঞ্চ পেয়ে যাব। কিংবা, খেয়া পার হলেই ন্যাজাট। মোটর না থাক, রাস্তা তো আছে। আমি বলে উঠি, 'তার চেয়ে বরং ওপারে যাই, গিয়ে দেখি যদি বাস থেকে থাকে।'

যেন অসহায়ের তৃণকুটোর আশ্রয়। বাস্তবের খেয়াল থাকে না। মাহাতো আর তার বউ দুজনেই হেসে ওঠে। মাহাতো বলে, 'পাগল হলেন নাকি মশায়। বাস চললিও চারটের সময় বেরিয়ে গিয়েছে। তবে যদি গরীবির বাড়ি যেতি চান, চলেন। গোলপাতার ঘরে দুটো ডাল ভাত খেয়ি থাকবেন।'

শুনে আবার উদ্বেগ আরো বাড়ে। আমি যেন দেখি, আমার ডিঙা চলে যায় বুড়ী গঙ্গার দিকে, আমি তাকে ধরে রাখতে পারি না। আমি যাত্রা করেছি, যে যাত্রা আমার অচিন কূলে আছে। ফেরা আমার হাতে নেই। সেই ছেলেবেলার বুড়ীগঙ্গা আমাকে সারা জীবনে কখনো ছেড়ে যায় নি।

ক্রমশ
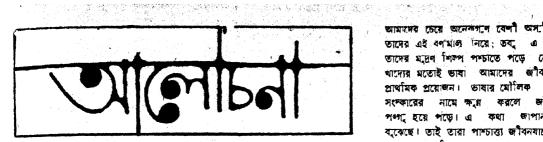
বাঙলা অক্ষরে ইংরেজী নাম ও শব্দ

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙলা অক্ষরে ইংরেজী নাম ও শব্দ' প্রবন্ধটি পড়লাম। অধুনা আনন্দবাজার পত্রিকা অ-সংস্কৃত বিশেষ করে ইংরেজী ভাষা থেকে উদ্ভূত যুক্তাক্ষর শব্দগুলোকে ভেঙে ফেলে বাংলা বানানের যে সংস্কার সাধন করতে চলেছে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার এই প্রবন্ধে তার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় আনন্দবাজার পত্রিকা কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যের দিক লক্ষ্য রেখে এই বানান সংস্কারে উদ্যোগী হয়েছে। সেজন্য আমাদের দেখতে হবে এই উদ্দেশ্যগুলি সং কিংবা সেগুলি বাংলা ভাষার পক্ষে হিতকর কি না ?

বাংলা যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দ সমষ্টি দ্রুত মুদ্রণের প্রতিকূল। সেজন্য বাংলা মুদ্রণ বা টাইপের মধ্যে যদি সাবলীলতা-সজীবতা আনয়ন করতে হয়—তাকে যদি যুগোপযোগী করতে হয় তবে যুক্তাক্ষর বর্জন করাই বিধেয়। বিশেষত অ-সংস্কৃত শব্দগুলিকে অনায়াসেই ভেঙে লেখা যেতে পারে। এর একটি অপ্রত্যক্ষ ফলও আছে; তা হচ্ছে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বাংলা ভাষাকে দ্রুত আয়ত্ত করা সম্ভব হবে।

ইংরেজী পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং সমৃদ্ধশালী ভাষা। অথচ এই ইংরেজী ভাষাতেও সুবিধার জন্য একই শব্দকে একাধিক বানানে লেখার রীতি প্রচলিত আছে; যেমন—"Chatterjea", "Chatterjee" এবং "Chatterji"; "Coomar" এবং "Kumar"; "Organization", এবং "Organisation"; "Connexion" এবং "Connection" ইত্যাদি ইত্যাদি অতএব দ্রুত মুদ্রণ এবং ভাষাকে যুগোপযোগী করার জন্য বাংলা বানানেরও সংস্কার সাধন করা যেতে পারে। অবশ্য নূতন কিছু প্রবর্তন করতে গেলে তার জন্য ব্যঙ্গোক্তি অথবা প্রতিবাদের সম্মুখীন হওয়াই স্বাভাবিক। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যুগান্তকারী কবি মধুসূদন যখন নতুন ছন্দে, নতুন ভাষায় কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তখন তাঁকেও বক্রোক্তি শনুতে হয়েছিল। তাঁর অমর সৃষ্টি "মেঘনাদ বধ কাব্যের" ভাষা ও রচনাশৈলীকে বিদ্রূপ করে সেকালে "ছুছুন্দরী বধ কাব্যও" রচিত হয়েছিল।

সমীরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সোদপুর।

২

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা বানান সম্পর্কে প্রবন্ধের উত্তর দিয়েছেন ১১ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যার দেশ পত্রিকায়। ভাষা সংক্রান্ত আলোচনা এখন বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং যাঁর ভাষা-বিজ্ঞানে পারদর্শিতা আছে তিনিই যথোচিতরূপে সুনীতিবাবুর বক্তব্যের আলোচনা করতে পারেন। অমিতাভবাবুর যে সে যোগ্যতা নেই তা তাঁর প্রবন্ধ থেকেই প্রমাণিত হয়। অমিতাভবাবুর প্রবন্ধ পড়ে মনে হল তাঁকে বানানের এই নতুন রীতিতে প্রেরণা যুগিয়েছেন খৃষ্টান মিশনারি জন মার্ডক। ভাষা বিজ্ঞানে মার্ডকের কোনো দানই নেই। খৃষ্টধর্ম সম্পর্কিত বাংলা বইএর একটি তালিকা সংকলনই তাঁর একমাত্র কৃতিত্ব। বিদেশী হিসেবে বাংলা ভাষা শিখতে তাঁর কিছু অসুবিধা হয়েছিল। তেমন অসুবিধা ইংরেজী শিখতে আমাদেরও হয়। আমাদের সুবিধার কথা মনে করে 'লণ্ডন টাইমস' ইংরেজী বানান সংস্কার করবার কথা কল্পনাও করতে পারে কি ? কিন্তু আমরা উদার। তাই স্বদেশের বিশেষজ্ঞের কথা উপেক্ষা করে একশ' বছর আগে কোন এক মিশনারি কি বলেছিলেন তার উপর নির্ভর করে মাতৃভাষার নিয়ম-কানুন ভাঙতে দ্বিধা করি না।

অমিতাভবাবুর প্রধান যুক্তি এই যে, আনন্দবাজার প্রবর্তিত বানান--সংস্কার ছাপার কাজ সহজ করবে। ভাষার নিয়ম আর ছাপার পদ্ধতি ভিন্ন পথে চলে। ভাষারই প্রাধান্য। ভাষার নিয়মকে মেনেই বইপত্র ছাপতে হয়। শুধু ছাপার সুবিধা কেন, ছাত্রদেরও কত সুবিধা হত যদি শ ষ স; ড় ঢ় র; ি ী ইত্যাদি কমিয়ে একটি করে রাখা যেত। ভাষাকে পঙ্গু না করে তা যখন হবার উপায় নেই তখন এটা মেনে নিতেই হবে। জাপান সবদিক থেকে এত অগ্রসর; অথচ বর্ণমালার অসুবিধা আজ পর্যন্ত তারা দূর করতে পারল না। আমাদের চেয়ে অনেকগুণ বেশী অসুবিধা তাদের এই বর্ণমালা নিয়ে; তবু এ জন্য তাদের মুদ্রণ শিল্প পশ্চাতে পড়ে নেই। খাদ্যের মতোই ভাষা আমাদের জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজন। ভাষার মৌলিক ধর্ম সংস্কারের নামে ক্ষুণ্ণ করলে জীবন পঙ্গু হয়ে পড়ে। এ কথা জাপানীরা বুঝেছে। তাই তারা পাশ্চাত্ত্য জীবনযাত্রাকে প্রায় পুরোপুরি গ্রহণ করলেও ছাপাখানার ম্যানেজারের মুখ চেয়ে ভাষার ধর্মকে রূপান্তরিত করবার অপচেষ্টা করে নি।

অমিতাভবাবু বললেও আসলে আনন্দবাজারের ছাপার কজ সহজ না হয়ে কঠিন হয়েছে। কম্পোজিটর ও প্রুফরীডাররা স্বভাবতই বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। প্রমাণ দেখুন ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায়। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, রবিবাসরীয় পৃষ্ঠা ক'টি এবং বিজ্ঞাপনের ম্যাটারে মোটামুটি পুরনো বানানই বজায় রয়েছে। অন্যান্য পৃষ্ঠায় (সংবাদ) বহু পুরনো বানান ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন, স্টেনোগ্রাফার, ইণ্ডিয়া, কার্ডিওলজিক্যাল, কংগ্রেস, স্পোর্টস, রেজিস্ট্রার, ডক্টরেট, কেমব্রিজ, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি। দেড় বছরের অধিককাল চেষ্টা করেও আনন্দবাজার বানানে এক নিয়ম চালু করতে পারেন নি। ফলে আনন্দবাজারের কর্মী ও পাঠকরা বিভ্রান্ত হন। মাত্র কয়েকটি বিদেশী শব্দকে ভেঙে কম্পোজ করলেই ছাপার কাজ সহজ হবে? প্রকৃতপক্ষে কঠিন হয়েছে। প্রতিদিন আনন্দবাজারের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় একই শব্দের বিভিন্ন রূপ দেখে বেদনা বোধ করি।

রমেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
কলিকাতা—৩৩

৩

১৫শ সংখ্যা দেশে অমিতাভ চৌধুরীর প্রবন্ধে বানান ও উচ্চারণের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে কয়েকটি যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ কথা নেই, এমন বলব না তবু এ কথাও না বলে পারছি না যে সুনীতিবাবুর মতো দেশ-বিদেশ খ্যাত প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের নাম নিয়ে যেভাবে তিনি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করেছেন তা যে একজন শিক্ষিত সমালোচকের (যিনি একটি প্রবন্ধের নীতিগত ও তত্ত্বগত সমালোচনা করতে বসেছেন) কলম থেকে বেরুবে তা আমি আশা করতে পারিনি। সুনীতিবাবুর এই ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনাটি কিছুটা দীর্ঘ সন্দেহ নেই, এবং তার কোন কোন অংশ হয়তো প্রাসঙ্গিকও নয়, কিন্তু তাই বলে সারা বিশ্বে যাঁর পাণ্ডিত্য স্বীকৃত তিনি যে 'পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে অকারণে...

অপ্রাসঙ্গিক মাত্রাতিরিক্ত পাণ্ডিত্যের ধোঁয়া ছড়িয়েছেন' এমন ধারণা তিনি করলেন কি করে?

অমিতাভবাবু লিখেছেন যে 'তিনি (সুনীতিকুমার) আনন্দবাজার কর্তৃক 'সংস্কৃত' বানানে সংস্কৃত শব্দাবলীর অপদস্থ হওয়ার উদাহরণ পর পর সাজিয়ে গিয়েছেন।' —কিন্তু দুঃখের বিষয়, 'পর পর সাজানো' এরকম কোন উদাহরণ-মালা সুনীতিবাবুর প্রবন্ধের কোথাও পেলুম না। 'সম্পৎ' শব্দটি সম্মত বানানে ছাপা হয়েছে—এটুকুই কেবল তিনি বলেছেন। 'তদ্ভব' শব্দগুলিকেই যে আনন্দবাজার স্বরচিত বানানে লিখেছে, এ কথাও তো সুনীতিবাবু বলেছেন। তবে তাঁর ঘাড়ে অনর্থক অন্যায় দোষ চাপিয়ে লেখকের এই যে ব্যঙ্গের প্যাঁচ মারার দুশ্চেষ্টা—এটিই কি লেখকের 'ছায়ার সঙ্গে লড়াই' নয়?

১৮৯ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে শব্দচয়নের সস্তা ও বাহুল্য চাতুর্য দেখাতে দেখাতে অমিতাভবাবু লিখেছেন—'আবার ক খ গ ঘ যদি পরে থাকে, তবে পদের অন্তস্থিত 'ম' স্থানে অনুস্বারের বিধানে "সংগীত" কিছুমাত্র মাধুর্য হারায় নাই।' কিন্তু যোগেশ বিদ্যানিধির বানান-সংশোধন প্রচেষ্টার আলোচনার শেষে সুনীতিবাবু নিজেই তো এই কথা বলেছেন (পৃঃ ২৬, ৩য় কলম)। সুতরাং এ কথা আবার নতুন করে উল্লেখের কী দরকার ছিল?

১৯০ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে অমিতাভ বাবু লিখেছেন 'কিছুদিন আগে পূর্ব-সুরীরা লিখতেন 'কোত্তে' ধত্তে', বোল্লে'; কিন্তু আমরা তো জানি দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য বিশেষ কারো লেখাতেই এই ধরনের বানান দেখা যেত না, তা হলে নির্বিশেষে পূর্বসুরীদের ঘাড়ে এই অভিযোগ চাপান কতখানি যৌক্তিক হয়েছে?

অমিতাভবাবু রসিকতা করে লিখেছেন যে "জানি না কোন্ পাণিনির বিধানে আছে যে ইংল্যাণ্ডের রাজধানীর নামে 'ড' এর সঙ্গে মূর্ধণ্য-ণ অবশ্যই বসবে।" কিন্তু যার নামের বানানই হোক, পাণিনীর ব্যাকরণে যে লেখা আছে, একই উচ্চারণ স্থান থেকে উৎপন্ন বলে যুক্ত ব্যঞ্জনে ড'-এর সঙ্গে 'ণ'-ই হবে 'ন' নয়—অন্যথায় উচ্চারণ সম্ভব হবে না—ভাষাচার্যের ভুল সংশোধনে অগ্রণী অমিতাভ বাবুর এটুকু ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান থাকা উচিত ছিল না কি?

বাংলা 'লক্ষ্ণৌ' শব্দটিকে যে 'লখনৌ'তে পরিবর্তনের আবশ্যকতা আছে তা তো সুনীতিবাবু নিজেই বলেছেন (২৮ পৃঃ ৩য় কলম), তবে এক্ষেত্রেও আবার অভিযোগ এনে অমিতাভবাবুর সেই 'ছায়ার সঙ্গে লড়াই' কেন? হিন্দী রচনায় যে হস-চিহ্ন প্রায় ব্যবহৃত হয় না এবং হস-চিহ্ন না থাকলেও 'লখনৌ' বা এই ধরনের শব্দগুলিকে হিন্দীতে 'লখনৌ'-রূপে উচ্চারণ করা হয়—এটুকুও কি তাঁর জানা নেই?

যাই হোক, এবার বানান সংশোধনের প্রয়োজন ও পথ সম্পর্কে আমার মত ব্যক্ত করি। মুদ্রণ কাজের সুবিধা সাধনই যে প্রচেষ্টার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, সে প্রচেষ্টাকে আমি গুরুত্ব দিই না। আর বাংলা ভাষার একটি প্রধান ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য এর যুক্তাক্ষর, সুতরাং ভাষা শিক্ষার প্রকৃত নিষ্ঠাবানেরা এই সাময়িক দুরূহতার জন্য নিশ্চয়ই পেছিয়ে যাবে না। এর সর্বাত্মক সরলীকরণের তাই প্রয়োজন দেখি না। আর বাংলা ভাষার তৎসম শব্দেরই যদি যুক্তাক্ষর না সরানো হয় বা যায়, তবে অ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে সে প্রচেষ্টারও কোন প্রয়োজন দেখি না। কারণ, তা হলে 'প্রেস' থেকে তো যুক্তাক্ষর একেবারে দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই যুক্তাক্ষর যখন তৎসম শব্দের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, তখন অ-তৎসম শব্দের যুক্ত-ধ্বনিকে যুক্ত ব্যঞ্জনের সাহায্যে উচ্চারণের সহজ সুবিধা থেকে সাধারণ পাঠক ও ভাষা শিক্ষার্থীকে বঞ্চিত করা সমীচীনও নয়, বুদ্ধিমানোচিতও নয়। আনন্দবাজারের বানান পড়ে কারো পক্ষেই প্রথম শোনা বিদেশী শব্দের মূল উচ্চারণের কাছাকাছি যাওয়া যে প্রায় অসম্ভবই—এ কথা কোন বিবেচক ব্যক্তিই তো অস্বীকার করতে পারেন বলে মনে হয় না।

'হস্'-চিহ্নের দ্বারা কণ্টকিত হবার ভয় থাকলেও একটা বিদেশী শব্দের মূল উচ্চারণের কাছাকাছি যেতে হলে এই চিহ্ন ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন উপযুক্ত পথ তো দেখি না। আমার তো মনে হয়, বিদেশী শব্দ—যে শব্দের কোন প্রকৃতি প্রত্যয় হয় না, সেই শব্দের বানান লিখতে গেলে এইটুকুই মাত্র খেয়াল করা উচিত—যেন এই বানান থেকে তার প্রকৃত উচ্চারণের যথাসম্ভব নির্দেশ দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে 'হস্'-এর কণ্টক বরণ শ্রেয়। আমাদের প্রচলিত বাংলা ভাষায় এ-ত্রুটি আছে বলেই আমি মনে করি। যেমন, Inspector শব্দের মাটামুটি ঠিক উচ্চারণ জানাতে গেলে ইনসপেকটর বা ইনসপেক্টর লেখা উচিত, কখনই 'ইনসপেকটর' নয়। কারণ, শেষের বানানের একাধিক উচ্চারণ সম্ভব। সেরকম James শব্দটি বাংলায় লিখতে গেলে জেম্‌স্‌ কিংবা জেম্‌স্‌ লেখাই উচিত, জেমস বা জেম্‌স বা জেম্স কিংবা জেমস কোন-মতেই নয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এরকম উচ্চারণের নির্দেশ কোথাও দেখিনি। তাই আমার মনে হয়, বিদেশী শব্দের বানানের সংস্কার একান্ত প্রয়োজন বটে, কিন্তু সরলীকরণ যদি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে, তবে যথার্থ (যতদূর সম্ভব) পথের দিশা পেতে হলে এই রকম একটু আপাতদুরূহ উপায়কে বরণ করতে হবে। মুদ্রণের অসুবিধার দোহাই পাড়া এখানে একদেশদর্শিতা, অদূরদর্শিতা ও অবিবেচনাই মনে হয়। তা ছাড়া, স্ট্রীট, স্কুল, স্ক্রু, প্লেটো, প্লেগ প্রভৃতি শব্দের যুক্তাক্ষর তো মুদ্রণের শত অসুবিধা সত্ত্বেও কোনমতেই ভাঙা সম্ভব নয়। তাই কিছু শব্দে যুক্তাক্ষর যখন রাখতেই হবে, ছাপাখানায় যুক্তাক্ষর যখন ব্যবহার করতেই হবে, তখন আর কিছু শব্দে ব্যবহার না করে উচ্চারণে সংশয় বাড়ানোর প্রয়োজন কী, আর তাতে লাভই বা কী?

করুণাময় মুখোপাধ্যায়
দক্ষিণ বারাশত

৪

২১শে মাঘ, ১৩৭৩ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি প্রত্যেক চিন্তাশীল বাংলা ভাষা প্রেমীর মনের কথাটি ব্যক্ত করেছে।

'পাঞ্জাব' বা 'বোম্বাই' কে 'পানজাব', 'বোমবাই' লিখলে শব্দ দুটির প্রকৃত উচ্চারণের সঙ্গে পাঠকের অতি পরিচয়ের জন্য হয়তো পড়তে ততটা অসুবিধা হয় না (যদিও যুক্তাক্ষরে উচ্চারণ যতটা সংশ্লিষ্ট, এখানে সে উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত শিথিল হয়ে পড়ে), কিন্তু পারটি (পার্টির স্থলে), টেসট (টেস্ট), কোরট (কোর্ট), কমিউনিসট (কম্যুনিস্ট), গারড (গার্ড), চারজসিট (চার্জসিট), ডাইরেকটার (ডিরেক্টর), সেনট্রাল (সেন্ট্রাল), সারভিস (সার্ভিস), ইংলনড (ইংলন্ড), মাদরাজ (মাদ্রাজ), আফরিকা (আফ্রিকা), কলমবো (কলম্বো), মসকো (মস্কো) প্রভৃতি বানান উচ্চারণে পদে পদেই অসুবিধা ঘটছে।

বাংলা টাইপরাইটারের 'কি বোর্ড' কিভাবে তৈরি করা যায় সেটা একটা বড় সমস্যা। কিন্তু 'আনন্দবাজার' যে বানান চালু করছেন তাতে সে সমস্যার আদৌ কোনও সমাধান মিলছে না। বরং জটিলতা অহেতুকভাবে আরও বাড়িয়ে তুলছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকার' ন্যায় প্রভাবশালী দৈনিক পত্রিকা বাংলা ভাষা গঠনের ক্ষেত্রে ভালো বা মন্দ উভয় দিকেই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এই গুরুদায়িত্বের কথা মনে রেখেই তাকে আরও সাবধানতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। এখন পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত সর্বশেষ বানান পদ্ধতি (মে, ১৯৩৬) সকলেরই মেনে চলা যুক্তিযুক্ত। ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর একটি বানান-

সংস্কার কমিটি গঠন করে নতুন সংস্কার বিষয়ে বিধি নির্দেশ চালু করতে পারে।

প্রসঙ্গত, এ প্রবন্ধে সুনীতিবাবু বাংলা শব্দ উচ্চারণে দ্বিমাত্রিকতার যে আলোচনা করেছেন (এ কথা ১৯২৬ এই origin and development of Bengali language গ্রন্থেও উল্লেখ করেছিলেন) সে সম্বন্ধে একটি কথা বলতে চাই। 'জঙ্গল' (জং-গল) শব্দে দুটি সিলেবল আছে ঠিক, কিন্তু দুই সিলেবল শব্দ 'জঙ্গল' আর এক-সিলেবল শব্দ রাম, হাত—এগুলির মাত্রা সমকক্ষ কি মেনে নেওয়া যায়? অন্তত কাইমোগ্রাফের (Kymograph)-এর উচ্চারণ দূরত্ব পরিমাপে (Measurement of duration) জঙ্গল যেখানে তিন কাল-মাত্রা (time-unit) হাত বা রাম উচ্চারণে সেখানে দুই কালমাত্রার মাপ পাচ্ছি। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য, চার, পাঁচ বা ছয় মাত্রার শব্দকে দ্বিধা বিভক্ত করে দুই+দুই, দুই+তিন বা তিন+তিন এই ধরনের দুই শ্বাস-পর্বে পঠনের সহজাত একটা প্রবণতা আমাদের রয়েছে।

আর একটি কথা সবিনয়ে বলতে চাই। সুনীতিবাবু 'কার্য' লেখার বদলে 'কার্য্য' লেখার পক্ষপাতী। কারণ কার্য লিখলে য-ফলার যে উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য মূল সংস্কৃতে ও কিছু কিছু বাংলা উপভাষায় রয়েছে সেটা রক্ষিত হয় না। তাঁর যুক্তির সারবত্তা মেনেও বলতে চাই ওই সূক্ষ্ম উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যটুকুর বিনিময়ে বানানের যে সরলতা এসেছে এবং গত তিরিশ বছরে সেটা যখন ভালভাবে চালু হয়ে গেছে তখন আর পিছনে বানানের জটিলতায় ফিরে যাওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। উচ্চারণানুগ বানান লিখতে গেলে তিনটি শ, ষ, স-এর ব্যবহারে পরিবর্তন আনতে হয়; জ, য-এর বানানেও নতুন রীতির কথা ভাবতে হয়। সেখানে তো আবার মূল সংস্কৃত rootগুলি হারাবার আশংকা। বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা একথা সকৃতজ্ঞে মেনে নিয়েও কিছু কিছু মায়ের অনাবশ্যক বোঝা কাঁধ থেকে নামাতে হবে, নইলে নতুন ভার বহন সম্ভব হবে কি করে? শ, ষ, স-এর মায়ের বোঝাটি কাঁধে চাপিয়ে বেড়াচ্ছি, কিন্তু S উচ্চারণের বর্ণের অভাব, Z-উচ্চারণের বর্ণও চাই। দুটি 'ব' রয়েছে, কিন্তু 'ওয়া' উচ্চারণের বর্ণের অভাব। জ, য—উচ্চারণে এক হয়ে গেছে, অথচ 'ইয়' উচ্চারণের বর্ণ নেই।—একদিনে কোনও বৈপ্লবিক উপায়ে এসব বর্ণসংস্কার সম্ভব নয় মানি। কিন্তু মুক্ত মনে ভাষার বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকে এ-নিয়ে ভাববার সময় এসেছে।

নীলরতন সেন
নিউ দিল্লী-৫

কবির জীবনী

সনাতন পাঠকের লেখা 'কবির জীবনী' (দেশ ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭ 'সাহিত্য সংবাদ' দ্রষ্টব্য) পড়ে জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা মনে পড়ল। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলা দেশে অন্য কোনো কবির জীবনতথ্য বিষয়ে লেখক ও পাঠক-দের ইদানীং কোনো আগ্রহ দেখি না। রবীন্দ্রনাথের পূর্বগ মধুসূদন অবশ্য ব্যতিক্রম। তাঁর জীবনও কবি-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যই সম্ভবত আলোচনা, নাটক ও চলচ্চিত্রের বিষয় হয়েছিল।

জীবনানন্দকে আমরা অনেকেই দেখেছি। বয়সের ব্যবধান হেতু তাঁর সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্য করবার সুযোগ পাই নি। এখনও জীবনানন্দ বিষয়ে তাঁর অঞ্চলবাসী (বরিশাল) শিক্ষিত লোকদের মুখে অদ্ভুত কথা শুনে বিস্মিত হই। ওঁরা জীবনানন্দকে একজন অবাস্তব জগতের অধিবাসী, ব্যবহারিক দিক দিয়ে ব্যর্থ এবং দুর্বোধ্য কবিতার লেখক হিসেবেই জানেন। জীবনানন্দের মুখে তাঁর অনেক বিখ্যাত কবিতার আবৃত্তি শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল বছর চৌদ্দ আগে শ্রীদিলীপ গুপ্ত আয়োজিত সেনেট হলের কবি সম্মেলনে। সে-সম্মেলনে আমরাও কবিতা পড়েছিলুম। জীবনানন্দ স্বপ্নচালিতের মত কবিতা পড়তেন। কোনো কবিতা তাঁর মুখস্থ ছিল বলে মনে হয় না। তিনি বই দেখেই কবিতা পড়েছিলেন এমন কি বিখ্যাত 'বনলতা সেন' পর্যন্ত। একমাত্র তাঁর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যেত যে, এই মানুষটি একটু স্বতন্ত্র, আর সবার মতো নয়।

জীবনানন্দ কিছু গদ্যও লিখেছেন। তাঁর ইংরেজী লেখা হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে বেরিয়েছিল বলে মনে পড়ছে। তিনি একটি খবরের কাগজে সাময়িকী বিভাগের সম্পাদনাও করেছিলেন কিছুকাল। সে-সময়ে তাঁর সহযোগীরা এই অসামান্য কবির সম্পাদন-দায়িত্বের মেজাজ সম্পর্কে বোধ হয় কিছু বলতে পারবেন। য়ুনিভার্সিটিতে পড়ার সময় (১৯৪৮) আমার একটি ছোট্ট কবিতার বই বেরিয়েছিল। বেরোবার কিছু-কাল পর একদিন বিস্মিত হয়ে দেখলুম যে, হুমায়ুন কবিরের কাগজ 'চতুরঙ্গ'তে তার একটি সমালোচনা বেরিয়েছে। পত্রিকার সর্বশেষ পৃষ্ঠায়, সর্বশেষ বিষয়-সূচিতে লেখাটির জায়গা হয়েছিল। সমা-লোচকের নাম জীবনানন্দ দাশ। একজন অখ্যাত তরুণ কবির সামান্য একটি কবিতা-গ্রন্থ সম্পর্কেও তিনি সেদিন তাঁর স্বকীয় গদ্যে চমৎকৃত হবার মত কিছু বলেছিলেন। যে-কোনো তরুণ কবির পক্ষেই সেদিন সেটা ছিল দুর্লভ পুরস্কার।

জীবনানন্দের মৃত্যুর সংবাদ পাই সকালের রেডিয়ো মারফত। ঠিক কোন জায়গায় তাঁর মৃতদেহ রাখা হয়েছিল জানতুম না। আমি একগুচ্ছ ফুল হাতে নিয়ে গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়েছিলুম। এমন সময় একটি গাড়ি থামল সামনে। গাড়ির ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে এক ভদ্রলোক জিগ্যেস করলেন, ১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কোন জায়গাটা হবে? আমি চকিত হয়ে বললুম, আপনিও কি জীবনানন্দ দাশের বাড়ি খুঁজছেন? আমিও তো। ভদ্রলোক আমাকে গাড়িতে তুলে নিলেন। দুজনে একসঙ্গে গেলুম কবিকে শেষ দেখা দেখবার জন্য। গাড়ির আরোহীর নাম সজনীকান্ত দাস। দোতলার ঘরে এক শুভ্র-শয্যায় তিনি শুয়েছিলেন। শান্ত, সমাহিত এবং নিশ্চিন্ত। ঘরে তখন নিচু গলায় রবীন্দ্রনাথের গান গাইছিলেন কয়েকজন রমণী। বাইরে উঠোনে তখন বকুল ঝরছিল।

জীবনানন্দকে এ যুগের পরমাশ্চর্য কবি বলে মনে হয়। আশ্চর্য সচেতনতা ছিল তাঁর সমসাময়িকতা বিষয়েও। আমরা যাঁরা বিশুদ্ধ কবিতা ছাড়াও অন্য ধরনের কবিতার মনোযোগী পাঠক তাঁরা ভেবে বিস্মিত হই, এই 'নির্জনতার কবি' কীভাবে অসামান্য কুশলতায় তাঁর সমসাময়িকতাকে কবিতার শরীরে নিবিষ্ট করেছিলেন। 'মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে সমস্ত দুপুর ভ'রে এশিরার আকাশে-আকাশে শকুনেরা চরিতেছে', 'কুইসলিং বানালো কি নিজ-নাম—হিটলার সাত কানাকড়ি দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হয়ে গেল লাল। মানুষেরই হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল।' 'মুসৌ, সাভারকার, নরীম্যান তিন দৃষ্টি-কোণ থেকে নেমে এসে দেখে গেল,' ইত্যাদি বহু ছত্রে জীবনানন্দের সমসাময়িক চেতনার, যা বিশুদ্ধ কাব্য বিষয়ের বাইরের উপকরণ, পরিচয় মেলে। কবির জীবনী রচনার সময়ে এই বিষয়গুলো যেন বর্জিত না হয়।

কৃষ্ণ ধর
কলকাতা—৫৪

আকাশবাণীর রবীন্দ্র সঙ্গীত

দেশ পত্রিকার ১৬ সংখ্যায় শ্রীশার্ঙ্গদেবের "আমায় দোষী কর" কালোপযুগী এক নির্ভীক সমালোচনা। বহুদিন ধরে একশ্রেণীর ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিসম্পন্ন রবীন্দ্রসঙ্গীতের 'তথাকথিত ধারক ও বাহক সম্প্রদায়' এক ধরনের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন যে তারা যা বলবেন বা তারা যে-ভাবে গাইবেন তাই রবীন্দ্রগীতি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গুণমুগ্ধদের একজন হয়ে তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা—রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার ও প্রসার কি সত্যিই তাদের কাম্য, না তাদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাজার হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়? শুধু কি ভাবা ও স্বর-লিপিই গান না গানের মধ্যে শিল্পীসত্তারও

বিকাশ ঘটে? আমরা জানি যে বিভিন্ন শিল্পীর গলাতে একই গান ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রাণ পায়। একেই ক্লাসিকেল গানে স্টাইল বা ঘরানা বলা হয়। রবীন্দ্র-গীতিতেও শান্তিনিকেতনী স্টাইল অন্য কোন স্কুলের গায়কীর ঢং হতে আলাদা। ভাষা বা স্বরলিপিতে দু' দলই ঠিক। রবীন্দ্র-গীতিতে নূতন নূতন গায়কী ঢং ক্রমেই বাড়বে, যত রবীন্দ্র-গীতির প্রসার ঘটবে। রবীন্দ্র-সংগীতের হিতকামীদের (যাঁদের হস্তক্ষেপে রেডিও শিল্পীদের ভর্ৎসনা লাভ) কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, তাঁরা তাঁদের ঘরানাকে শুদ্ধ রাখুন ক্ষতি নেই, কিন্তু শোধনবাদের নামে রবীন্দ্র-সংগীতের অপমৃত্যু যেন ডেকে না আনেন। রবীন্দ্র-গীতি আজ মুষ্টিমের গণ্ডি পেরিয়ে দেশকালের সীমানা পার হচ্ছে। গানের পণ্য হিসাবে রবীন্দ্র-সংগীত আজ এক অমূল্য সম্পদ। যদি এই গানকে কোন চক্রের মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায়, তা হলে সেই চক্রের লাভের অঙ্ক কম হবে না। আমাদের কি এখন ধরে নিতে হবে যে, রবীন্দ্র-সংগীতের "ধারক-বাহক সম্প্রদায়" সেই প্রচেষ্টায় শিল্পীসত্তার গলা টিপে ধরেছেন?

ডক্টর রজত চৌধুরী
কলিকাতা-১৯

॥ ২ ॥

দেশ পত্রিকায় শ্রীশার্ঙ্গ দেবের লেখা পড়ে মনে হলো বেতারে রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার সম্বন্ধে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ একটু সজাগ হওয়াতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন।

শ্রীশার্ঙ্গদেব বলতে পারতনে যে, রবীন্দ্র-সংগীতের সঠিক প্রচারের ব্যাপারে আকাশ-বাণীর কর্তৃপক্ষ যেরূপ সচেতন হয়েছেন অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রচারের বেলায়ও তাদের সেইরূপ সজাগ হওয়া উচিত। কিন্তু শ্রীশার্ঙ্গদেবের লেখা পড়ে মনে হলো তিনি বলতে চাইছেন যে অন্যান্য অনুষ্ঠানের বেলায় আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ যখন উদাসীন তখন রবীন্দ্র সংগীতের বেলায় তাঁরা সচেতন হবেন কেন?

আকাশবাণীর উল্লিখিত পত্রে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রচারের উন্নতি বিধানের জন্যে শিল্পীদের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেটা ঠিক মত করা হয়েছে কি না এবং সেই নির্দেশগুলির যৌক্তিকতা নিয়ে তর্ক ও আলোচনা চলতে পারে। কিন্তু আকাশবাণী রবীন্দ্রসংগীতের সঠিক প্রচারের ব্যাপারে মনোযোগী হয়ে একটা গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছেন—শ্রীশার্ঙ্গদেবের এরূপ বিচিত্র মনোভাবের কারণ কি? তিনি কি বলতে চান যে, বেতারে রবীন্দ্রসংগীত যেভাবে প্রচারিত হচ্ছে তা ঠিক মতোই হচ্ছে ও তার উন্নতি বিধানের আর কোনো অবকাশ নেই?

শ্রীশার্ঙ্গদেব আকাশবাণীর রবীন্দ্র-সংগীতের উন্নতির এই প্রচেষ্টার ভেতর একটা কুচক্র ও কায়েমী স্বার্থের প্রভাব আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রে বলে যে, যখন কেউ সাদা জিনিসকেও হলুদে দেখতে শুরু করে তখন বুঝতে হবে যে তার কোনো গুরুতর পীড়া হয়েছে। তখন তার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কর্তব্য হলো তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

অরবিন্দ রায়
কলিকাতা—৩৬।

বাংলা অভিধান প্রসঙ্গে

'দেশ' পত্রিকায় বাংলা অভিধান প্রসঙ্গে যে আলোচনা চলছে, তা' অত্যন্ত সময়োচিত। আমরা বাঙালী বলে নিজেদের পরিচয় দিই, কিন্তু আর বোধ হয় পুরো-পুরি বঙ্গভাষী নই। বাংলা ভাষা সম্পর্কে একদিকে দেখা দিয়েছে অবজ্ঞা, অবহেলা এবং অশ্রদ্ধা, আর অন্যদিকে রাষ্ট্রভাষা এবং ইংরেজীর ঠেলে-ওঠা জোয়ারে বঙ্গসরস্বতীর রত্নডিঙা টলমল করছে। "বোঝাপড়া" কিংবা "আপোস" আমরা এখন আর করি না। এখন যা হয়, সেটা "সমঝোতা।" "বন্দের" পরিবর্তে 'বন্‌ধ্‌' লেখাই রীতি। কোনো প্রস্তাব বর্তমানে আর 'উত্থাপন' করা হয় না, সেটা "রাখা" হয়।

ভাষার ব্যাপারে আমাদের এই দৈন্যের একটা কারণ আমাদের শব্দভাণ্ডারে ঘাটতি পড়েছে। যথাসময়ে যথোপযুক্ত শব্দটি যোগায় না বলেই একাধিক ভাষার জগাখিচুড়ি না পাকিয়ে দু-মিনিটও কথা কইতে পারি না।

এই শব্দকৃচ্ছ্রতা হয়তো কথঞ্চিৎ হ্রাস করতে পারে প্রতিশব্দের একখানি অভিধান। প্রতিশব্দ কিংবা সমনাম বলতে পূর্বসুরীগণ একটি শব্দের পরিবর্তে আর একটিমাত্র শব্দই ব্যবহার করতেন। কিন্তু আমার সবিনয় জিজ্ঞাস্য এই যে, বিকল্পে যদি খুব লাগসই গোছের একটা জুড়ি-বাঁধা শব্দ কিংবা বাক্যাংশ প্রয়োগ করা হয়, সেটা কি চলবে না? মুখের কথায় এই কর্ম আমরা নিতাই করে থাকি, অভিধানে তাদের স্থান দিলে ক্ষতি কি? অকর্মণ্যের পরিবর্তে "ঠুঁটো জগন্নাথ" অথবা অপদার্থের বদলে "ষাঁড়ের গোবর" খুবই খারাপ হবে কি?

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, পরিশ্রম করে শব্দ সংগ্রহ না হয় করা গেল, ছাপবে কে? এই রকম একখানি পুঁথি নিশ্চয়ই হু-হু করে কাটবে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু বলতে পারি, এ-হেন বই-এর প্রকাশক পাওয়া অসম্ভব হয়তো নয়, কিন্তু দুঃসাধ্য।

শ্রীবিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ
কলিকাতা ৩১

॥ ২ ॥

শ্রীযুক্ত আশিস সান্যাল মহাশয় গত ৭ জানুয়ারির 'দেশ' পত্রিকায় একটি সুলিখিত প্রবন্ধের মাধ্যমে বাংলা ভাষা তথা সাহিত্য চর্চার একটি গুরুতর অসুবিধার প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার দু-একটি বক্তব্য নিবেদন করিতেছি:—

(১) লেখক অভিযোগ করিয়াছেন যে, কোন বাংলা অভিধানেই যথেষ্ট আঞ্চলিক শব্দ স্থান দেওয়া হয় নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত 'ব্যবহারিক শব্দকোষ'এ প্রচুর পরিমাণে আঞ্চলিক, বিশেষত মুসলমানী শব্দ রহিয়াছে।

(২) তাঁহার দ্বিতীয় অভিযোগ, বাংলা অভিধানে সঠিক উচ্চারণ-নির্দেশের অভাব। ইহা বাংলা অভিধানের একটা বিশেষ ত্রুটি সন্দেহ নাই; কেননা, ছোট-বড় যে-কোন ধরনের ইংরেজী অভিধানেই উচ্চারণ-সংকেত পাওয়া যাইবে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা বলিয়া শব্দের যথেচ্ছ উচ্চারণ করিবার অধিকার আমাদের নিশ্চয়ই নাই। বিশেষত যেখানে জেলায়-জেলায়, এমন কি, মহকুমায়-মহকুমায় উচ্চারণে পার্থক্য রহিয়াছে, সেক্ষেত্রে একটা Standard উচ্চারণ-নির্দেশ একান্ত আবশ্যক। তবে, এদিকে উল্লেখযোগ্য কোন প্রচেষ্টা হয় নাই, এ কথা বলা চলে না। স্বনামধন্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ মহাশয় তৎকৃত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান'-এ সুন্দরভাবে প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ-নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার নির্দিষ্ট উচ্চারণ আজিও প্রামাণ্য বলা চলে। শব্দের বিবর্তনের ধারা-নির্দেশও তাঁহার অভিধানে যথাসম্ভব রহিয়াছে। ঐ মূল্যবান অভিধান-খানির আদ্যোপান্ত সংস্কার এবং আধুনিকীকরণ দ্বারা বাংলা অভিধানের ক্ষেত্রে একটা গুরুতর অভাব পূরণ করা যাইত।

(৩) লেখক বলিয়াছেন, 'Cane, Come' Cult-এর 'C'-এর উচ্চারণ বিভিন্ন। কিন্তু ইংরেজী উচ্চারণতত্ত্বের একজন সামান্য ছাত্র হিসাবে আমার যত দূর জানা আছে, তাহাতে এই তিনটি শব্দের বেলায় 'C'-এর উচ্চারণ প্রতি ক্ষেত্রেই তো 'K'—সুতরাং বিভিন্নতা কোথায়? উপস্থিত আমার সামনে, Daniel Jones-এর 'English Pronouncing Dictionary' এবং Hornby প্রভৃতির 'The Advanced Learner's Dictionary of Current

English' রহিয়াছে। ইঁহাদের প্রামাণিকতা তর্কাতীত। উক্ত গ্রন্থেই উপরিউক্ত তিনটি শব্দে 'C'-এর উচ্চারণ K' নির্দেশ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই উক্ত অভিধানই International Phonetic Association প্রবর্তিত উচ্চারণ-রীতি অনুগামী।

পরিশেষে বক্তব্য, বাংলা ভাষার একখানা পূর্ণাঙ্গ অভিধান প্রণয়ন কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সুধীসমাজের প্রচেষ্টায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। উভয় বঙ্গের পণ্ডিতদের মিলিত প্রচেষ্টায়ই শুধু এই দুরূহ কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। কেননা বাংলাভাষীদের বৃহৎ অংশ পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম সমাজ; তাঁহাদের ব্যবহৃত ভাষা উপযুক্ত স্থান না পাইলে কোন বাংলা অভিধানই পূর্ণাঙ্গ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক হইতে পারে না। State level-এ অথবা University level-এ এইরূপ একটা যুগ্ম প্রচেষ্টার ব্যবস্থা নিতান্ত অসম্ভব কি?

করুণাময় ঘোষ
শিক্ষক, ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম,
২৪ পরগনা।

"ব্ল্যাক গ্রাউণ্ড"

ত্রিলোচন কলমচি-র নিকট দুরে পর্যায়ে "ব্ল্যাক গ্রাউণ্ড" প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করছি। যথাঃ প্রসঙ্গ-ক্রমে পিটখনির গভীরতা সম্বন্ধে ৪,০০০ ফিটের কথা বলা হয়েছে। আমাদের দেশে কিন্তু গভীরতম কয়লাখনি মাত্র ২,২০০ ফিট। চিনাকুড়ি ১ ও ২ পিট। অবশ্য স্বর্ণখনি ১১,০০০ ফিটেরও বেশী গভীরতায় গিয়ে পৌঁচেছে। চ্যাম্পিয়ান রীফ্—কোলার গোল্ডফিল্ড-এ।

বর্ণিত কয়লাখনিতে লেখক ১৮টি সীমের কথা বলেছেন। আবার কোন কোন কয়লাখনিতে উনি ৪০টি পর্যন্ত সীমের আশা রাখেন। যদিও আমাদের দেশে সব-চেয়ে বেশী সংখ্যক কোলসীম (২৫টি) ঝরিয়া কোলফিল্ডেই বর্তমান তবুও একটি কলিয়ারীতে কখনই সব সীমগুলি পাওয়া যায় না।

লেখকের ধারণায় আমাদের দেশে ৩০ ফিটের বেশী পুরু সীম নেই। এটা ভুল। আমাদের অনেক সীমই ৩০ ফিটের অনেক বেশী পুরু। আমাদের দেশের বোকারো ফিল্ডের কারগলি সীম প্রায় ১৪৭ ফিট পুরু। অবশ্য এটিই আমাদের দেশে সব-থেকে বেশী পুরু সীম।

'সেফ্‌টি উইক্'-এর প্রস্তুতির ছবি লেখক মন্দ আঁকেননি। তবে ওভারম্যান, ইলেক্‌ট্রিসিয়ান, মেকানিক্যাল ফিটার প্রভৃতির মাওয়া খাওয়া ঘুচিয়ে তাদের যে শিক্ষিত দক্ষ খনিতে নামিয়েছেন তাতে একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে।

কয়লার প্রস্তুতিতে 'ডিনামাইট' চার্জের কথা উল্লেখিত হয়েছে। মাইনিং-এ অনেক প্রকারের বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহৃত হয় বটে কিন্তু 'ডিনামাইট' ব্যবহৃত হয়না।

কতকগুলি শব্দের যথাযথ ব্যবহারের অভাবে নিখুঁত বর্ণনায় একটু ত্রুটি হয়েছে। যেমন—চর্জ হ্যাঙ্গার (চার্জিং র‍্যাকের ক্ষেত্রে), রিটায়ারিং রুম (Pit top office-এর ক্ষেত্রে), বন্ড (Declaration-এর ক্ষেত্রে); এয়ার রুট্ (এয়ার ওয়েজের ক্ষেত্রে) ইত্যাদি। কতকগুলি শব্দ যেমন—এয়ার পকেট (সম্ভবতঃ Goaf-এর ক্ষেত্রে), সিলিং (সম্ভবতঃ Roof-এর ক্ষেত্রে) ইত্যাদি ভারতীয় কয়লাখনিতে ব্যবহৃত হয় না।

হরেন কর্মকার
মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার-পুরুলিয়া

নীল ঘোড়সওয়ার

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারির "দেশ" পত্রিকায় 'আধুনিক চিত্রকলা' শীর্ষক তথ্যবহুল রচনায় শ্রীশুভ্রশীল বসু বেশ কিছু ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। শ্রীবসু লিখেছেন "কাণ্ডিনস্কি অঙ্কিত 'নীল ঘোড়-সওয়ার' নামক একটি ছবি থেকেই দলের নামকরণ। একথা ঠিক নয়। নীল ঘোড়-সওয়ার (Blue Rider বা Blaue Reiter দলের নামকরণের পেছনে যদি কিছু কৃতিত্ব থেকে থাকে সেটুকু কাণ্ডিনস্কির একার নয়। শিল্পী ফ্রান্‌ৎস্ মার্ক (শ্রীবসু ভুল করে যাঁকে পরে দলে এসে যোগ দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন) এবং কাণ্ডিনস্কি ১৯১১ সালে (শ্রীবসুর উল্লেখ অনুসারে ১৯০৯ সালে, যেটি ভুল) যুগ্মভাবে মিউনিখে ঐ দলের নামকরণ এবং গোড়াপত্তন করেন। মার্ক এবং কাণ্ডিনস্কি দুজনেই নীল রং ভালবাসতেন, তার মধ্যে মার্কের পছন্দ ছিল ঘোড়া এবং কাণ্ডিনস্কির ভাল লাগত ঘোড়-সওয়ার, ফলে জন্ম নিয়েছিল 'নীল ঘোড়সওয়ার'।

জার্মানীর য়ুগেণ্ডস্টিল (Jugendstil) আন্দোলনের সঙ্গে শ্রীবসু কাণ্ডিনস্কির সম্পর্ক কি করে খুঁজে পেলেন জানি না। Art nouveau'র অনুকরণে য়ুগেণ্ড-স্টিল মূলত স্থাপত্য এবং আভ্যন্তরিক সাজ্জকরণের (interior decoration) আন্দোলন। ১৮৯৬ সালে কয়েকজন তরুণ স্থপতি 'য়ুগেণ্ড' (Jugead) নাম দিয়ে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তার থেকেই য়ুগেণ্ডস্টিল আন্দোলন। অথচ কাণ্ডিনস্কি প্রথম বিমূর্ত (abstract) ছবি এঁকেছেন ১৯১০ সালে এবং তাঁকে নিয়ে মাতামাতিও শুরু হয়েছে ১৯১০ সালের পরে। আইন চর্চায় ইস্তফা দিয়ে ১৮৯৬ সালে তিনি সবেমাত্র ছবির দিকে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে পেরেছেন এবং ছবি নিয়ে কোনরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা তখনো তাঁর মস্তিষ্কে বাসা বাঁধেনি।

'কনসার্নিং স্পিরিচুয়াল ইন আর্ট' নামে কাণ্ডিনস্কির কোন রচনার কথা কখনো শুনিনি। অথচ শ্রীবসু এটিকে 'বিখ্যাত' আখ্যা দিয়েছেন। নীল ঘোড়সওয়ার আন্দো-লনকে কেন্দ্র করে চিত্রকলা সম্পর্কে ১৯১২ সালে কাণ্ডিনস্কি একটিমাত্র বইই লিখে-ছেন, ১৯১৪ সালে যার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির নাম 'দি আর্ট অব স্পিরিট্যুয়াল হার্মনি'।

সমীর রায়
হাওড়া

এণ্ডির চাষ

কিছুদিন পূর্বে শ্রীমতী লিখিত 'ঘরে বাইরে' বিভাগের মাধ্যমে নানা দেশের বয়নশিল্প ও চারুকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্রীমতীর এই তথ্য পরিবেশনে যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে, তবে এক জায়গায় ভুল দেখিয়া একটু সমালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন এণ্ডি পোকার চাষ ময়-মনসিংহে হয় কিন্তু আমার মনে হয়, ইহা ততটা উল্লেখযোগ্য নয়, আমরা চিরদিনই জানি যে আসাম এণ্ডি-পোকার চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। এবং পাট মুগা ও এণ্ডির জন্য আসাম সর্বজনবিদিত।

ঊর্মিলা দাস
শিলং

ভেনাস ডি মেলো

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর 'দেশ'-এ প্রকাশিত শ্রীমতী আশা দেবীর সুলিখিত 'ভেনাসের নারীজন্ম' লেখাটি পড়ে মনে হল, দুটো হাত ব্যতিরেকে ভাস্কর্যশিল্পের এই অপরূপ নিদর্শনটি প্রায় অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। অথচ, E O Christen Sen সাহেব তাঁর The History of Western Art' গ্রন্থে লিখেছেন,—

"It (venus of Melos) was discovered in 1820 in a grotto on the island of Melos, in two parts which fitted together." [The new American Library Publication; A Mentor Book, Page—75]

লুভর-এ ভেনাস ডি মেলো চাক্ষুস দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। খুব কাছের থেকে লক্ষ করেও বুঝতে পারি নি যে, মূর্তিটি অখণ্ড নয়।

দ্বিতীয়ত জানতে ইচ্ছে করে, এই প্রবন্ধের শেষাংশে উল্লিখিত ফরাসী লেখকের মধুর উদ্ধৃতিটি লুভর্-এ কোথায়

সংরক্ষিত আছে। ভেনাস ডি মেলো-র মূর্তির আশে পাশে একটি সাধারণ পরিচয়লিপি ব্যতীত অন্য কিছু তো চোখে পড়েনি।

সুব্রত সেনগুপ্ত
রাঁচি

নেতাজীর কণ্ঠস্বর

গত ২৮শে জানুয়ারীর সাপ্তাহিক 'দেশে' শ্রীখগেন দে সরকারের দিল্লীর ডায়েরী পড়লাম। তাঁর এবারের রচনায় 'স'-এ-লুমিয়ে' সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। একটা জিনিস খুব দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করেছি যে, আমাদের নেতাজীর কোন কণ্ঠস্বর থাকা ত' দূরের কথা, আজাদ-হিন্দ-ফৌজের নামও যেন, এতে কোনরকমে নেহাত দায়ে পড়ে করা হয়েছে। আমার মনে হয়, আপনারা যদি এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন, তবে নিঃসন্দেহে সকলের ধন্যবাদার্হ হবেন।

প্রদীপকুমার দে
নয়াদিল্লি ৩

ভারতের অর্থনীতি

আপনার দেশ পত্রিকায় শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ মহাশয় লিখিত "ভারতের অর্থনীতি" আমি নিয়মিত পাঠ করি।

গত ১৪ মাঘ সংখ্যায় মহাশয় লিখিত "গবাদি পশু সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা" পাঠ করলাম। ইনি লিখেছেন : ১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুসারে ভারতের গো-মেষাদি পশুর সংখ্যা ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ সাল এই পাঁচ বছরে শতকরা প্রায় ১০ ভাগ বেড়েছে।"

আদমসুমারি অনুসারে পশুর সংখ্যা নির্ণয় কথাটা কি ঠিক? আদম অর্থে মানুষ জানি। শব্দটা কি বেখাপ্পা শুনায় না?

শ্রীগদুলাল বসাক
দিনহাটা

চেংগিস+লেনিন=নেহরু

গত ২১শে জানুয়ারীতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় "কলকাতার ডায়েরী" পড়লাম। "চেংগিস+লেনিন-নেহরু" প্রসঙ্গে শ্রীএরডেনের কথা শুনে শ্রীচার্নক্য থ খেয়েছেন এবং বলেছেন, "ভাগ্যিস নেহরু বেঁচে নেই, এই পরিচয়ের কথা শুনলে নির্ঘাত মূর্ছা যেতেন।"

চেংগিস+লেনিন=নেহরু কেমন করে হয় একথা আমি জানি না কিন্তু আমাদের শ্রীনেহরু মঙ্গোলিয়ার ন্যাশনেল হিরো চেংগিস খানকে বাস্তবিক শ্রদ্ধা করতেন এবং তিনি অন্তত কখনও তাঁকে ইণ্টার-ন্যাশনেল ডেভিল মনে করতেন না। শ্রীনেহরু তাঁর কন্যা ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীকে ২৫শে জুন ১৯৩২ তারিখে দেরাদুন থেকে "Chengiz Khan shake up Asia and Europe"
শীর্ষক যে পত্রটি লিখেন তা পড়লেই আমার এ কথার সত্যতা প্রমাণ হবে, তাই তার খানিকটা উল্লেখ করছি। অসংগত মনে না করলে প্রকাশ করবেন। তিনি লিখেছেন :—

"Strong men and women they were, these nomads from Mongo, lia, used to hardship, and living in tents on the wide steppes of northern Asia. But their srtength and hard training might not have availed them much if they had not produced a chief who was a most remarkable man. This was the person who is known as Chengiz Khan. He was born in 1155 A.C. and his original name was Timuchin. His father, Yesugei-Bagatur, died when he was a little boy. "Bagatur", by the way, was a favourite name for Mongol nobles. It means "hero" and I suppose the Urdu bahadur comes from it. Although just a little boy of ten, with no one to help him, he struggled on and on, and ultimately made good. Step by step he advanced till at last the great Mongol Assembly, called the kurultai, met and elected him the Great Khan or Kagan or Emperor. A few years before he had been given the name of Chengiz. Chengiz was alrady fifty-one years of age when he became the Great Khan or Kagan. He was not very young and most people at this age want peace and quiet. But this was only the beginning of his career of conquest. This is worthy of notice, as most great conquerors do their conquering when fairly young. This also reminds us that Chengiz did not simply dash across Asia in a fit of youthful enthusiasm. He was a cautious and careful middle-aged man, and every big thing he did was preceded by thought and preparation."

শ্রীনেহরুর চোখে চেংগিস আলেকজানদার অথবা সীজার-এর চেয়ে অনেক উঁচু ছিলেন। তাঁর দক্ষতার বিষয়ে তিনি লিখেছেন :—

"If they won great victories on the field of battle, it was not because of their numbers but because of their discipline and organization. And above all it was due to the brilliant captainship of Chengiz. For Chengiz is, without doubt, the greatest military genius and leader in history. Alexander and Caesar seem petty before him. Chengiz was not only himself a very great commander, but he trained many of his generals and made them brilliant leaders. Thousands of miles away from their homelands, surrounded by enemies and a hostile population, they carried on victorious warfare against superior numbers. Chengiz died in 1227 at the age of seventy two. His empire extended from the Black Sea in the west to the Pacific Ocean, and it was still vigorous and growing. His capital was still the little town of Karakorum in Mongolia. Nomad as he was, he was an extremely able organizer, and he was wise enough to employ able ministers to help him. His empire, so rapidly conquered, did not break up at his death."

সর্বশেষে চিঠিটা তিনি এই লিখে শেষ করলেন :—

"I have given you more details and information about Chengiz Khan than was perhaps necessary. But the man fascinates me. Strange, is it not, that their fierce and cruel and violent feudal chief of a nomadic tribe should fascinate a peaceful and non-violent and mild person like me, who is a dweller of cities and a hater of everything feudal."

আর পাশ্চাত্যদেশের হিরো আলেকজান্দার-এর সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন, তারও খানিকটা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বোধ হয় অসংগত হবে না। নৈনিতাল-এর জেল থেকে ২৪ জানুয়ারি, ১৯৩১ তারিখের চিঠিতে তিনি লিখেছেন :—

"Alexander is called "the Great", and he is very famous in history. But a great deal of what he did was made possible by the careful work of his father Philip before him. Whether Alexander was a really great man or not is a doubtful matter. He is certainly no hero of mine."

শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী দাস
পুনা

সাম্প্রতিক সাহিত্য

"সাম্প্রতিক সাহিত্য" লিখে শ্রীনরেন্দ্র দেব আমার মত যারা ভাল-মন্দ নির্বিচারে সত্য ভালবাসে তাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন। সমাজের ভালর মত মন্দ-দিকটাও সম্পূর্ণ নির্ভয়ে পাঠকদের চোখের সামনে তুলে ধরবার পূর্ণ স্বাধীনতা সাহিত্যিকদের থাকা দরকার। তবে যে সব মানুষ বিপথে বা মন্দ পথে গিয়েছে তাদের সৎপথে ফিরিয়ে আনাবার আশার আলো দেখাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য সাহিত্যিকদেরই।

আলোক রায়
কলকাতা—২৬

শশধর সিংহ

(১)

গত মহাযুদ্ধের সময় আমি লণ্ডনে ছিলাম। তখন আমার বইয়ের দোকান ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে একটা বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হাতে কাজ না থাকাতে এ'দের অনেকে আসতেন সেখানে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে সময় কাটাতে, রাজনীতি চর্চা করতে, আর সময় সময় সামরিক মতবাদ বা যুদ্ধের দৈনন্দিন প্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে।

এদিকে "The phoney war" বা মেকী যুদ্ধের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক আলোচনা বেড়ে চলতে লাগল, বলা বাহুল্য। ইতিমধ্যে ১৯৪২ সালে ভারতীয় ছাত্রদের সুবিধার জন্য আমি "The Defence of India" শীর্ষক একটা তুলনামূলক প্রবন্ধ লিখি "Indian writing" পত্রিকার জন্য। এই যুদ্ধকালীন ভারতীয় ত্রৈমাসিকটা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের নিকটবর্তী আমার দোকান থেকেই প্রকাশিত হত বন্ধুবর লণ্ডনের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ইকবাল সিং-এর উৎসাহে ও উদ্যোগে।

এই প্রবন্ধে আমার বক্তব্য বিষয় ছিল সামরিক মতবাদ ও বিভিন্ন দেশের যুদ্ধ-পদ্ধতি সম্বন্ধে। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বেসরকারী সামরিক সমালোচক হিসাবে আমার খ্যাতি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমন কি তখন অনেকেই যুদ্ধ সম্বন্ধে আমার মতামত জানতে উৎসুক হয়ে থাকতেন।

এ'দের অধিকাংশেরই ধারণা ছিল যে, জর্মন ও জাপানীদের অদম্য সামরিক পরাক্রম ও জয়যাত্রা দেখে আমিও এ'দের সঙ্গে একমত হব। বস্তুত ভারতীয় ছাত্ররা অনেকেই স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিলেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অ্যাক্সিস শক্তিত্রয়ের জয় অবশ্যম্ভাবী। সত্যি কথা বলতে কি, অ্যাক্সিস-এর সামরিক সাফল্য দেখে এ'দেরই বা দোষ দিই কি করে? আমাদের দেশের নেতৃস্থানীয় অনেকেই একই রকম মত পোষণ করতেন।

সুতরাং, যুদ্ধের পরিণতি সম্বন্ধে যখন আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করা হল, নিঃসন্দেহ, আমার উত্তর অনেকেরই মনঃপূত হয়নি। কিন্তু আমি সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য হলাম যে, আধুনিক যুদ্ধ হল মূলতঃ "war of material" অর্থাৎ সামরিক মালমসলার যুদ্ধ। এই পরিপ্রেক্ষিতে জর্মনী, জাপান ও ইতালী সম্মিলিত শক্তি-পুঞ্জের তুলনায় অনেকাংশে নিকৃষ্ট। আমি আরও বললাম যে, আমেরিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও গ্রেট ব্রিটেন যদি যুদ্ধে কিছু দিন টি'কে থাকতে পারে এবং আমেরিকা ও ব্রিটেন যদি কালে দ্বিতীয় প্রান্তে যুদ্ধ করতে স্বীকৃত হয়, তা হলে এদের জয় সুনিশ্চিত হবে। জর্মন ও জাপানীদের সামরিক কৌশল ও শৌর্য থাকা সত্ত্বেও।

জর্মনরাও এই সত্যটা জানত। তাই বৈদ্যুতিক যুদ্ধ (blitzkrieg) বা যুদ্ধের হ্রস্বতা এদের সামরিক পরিকল্পনায় একটা প্রধান ভিত্তি ছিল। জাপানীদের সম্বন্ধেও একই বক্তব্য।

যুদ্ধের পরিণতি এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করেছে।

এবার, আমার প্রবন্ধের মোদ্দা কথা ও পরবর্তী ঘটনাবলী সম্বন্ধে অনেকে হয়ত শুনতে চাইবেন।

বর্তমান কালে ইংরেজ ও ফরাসীদের সামরিক চিন্তা প্রায় একই পর্যায়ে ছিল। এরা উভয়েই যত দূর সম্ভব নিজেদের দেশে বা দেশের নিকটে যুদ্ধ করতে রাজী ছিল না। তার জন্য ইংরেজ সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা এ যাবৎ চেষ্টা করে এসেছেন শক্তিসাম্য (balance of power) ও অন্যান্য অসামরিক প্রথা অবলম্বন করে যুদ্ধের গতি স্বদেশ থেকে অন্য দিকে চালনা করতে।

ফরাসীরাও ম্যাজিনো লাইন গঠন করে ও তাকে সুরক্ষিত করে ভেবেছিল যে, এই উপায়েই দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব হবে। এই মনোভাবের কি পরিণাম হয়েছিল তা কারো অজানা নেই। তাই ব্যঙ্গ করে এই স্থিতীয় (static) মানসতাকে "Maginot mentality" আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এরা দুই জাতিই এ পর্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ

করে এসেছে মুখ্যত তাদের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য। তাই এইগুলিকে ঔপনিবেশিক যুদ্ধ বলা হয়।

গত মহাযুদ্ধে ইংরেজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। কারণ, এদের আর্থিক, শিল্পোদ্যোগ ও লোকবলের শক্তি ছিল সীমাবদ্ধ। ফরাসীদের ক্ষেত্রেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। এদের পরাজয় হয়েছিল অংশত রাজনৈতিক কারণে, যদিও আর্থিক, সামরিক মালমসলার উৎপাদন ও লোক-বলের হীনতাই এদের হারের প্রধান কারণ।

মার্শাল পেতাঁকে অনেকে ফ্রান্সের পরাজয়ের জন্য দায়ী করেছেন, কিন্তু যথার্থত ইনি ছিলেন ফরাসীদের নৈতিক অধোগতি অর্থাৎ যুদ্ধে বিতৃষ্ণার প্রতীক মাত্র। প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের এত লোক ক্ষয় হয়েছিল যে, সেখানকার অধিকাংশ লোকের কাছেই শান্তিরক্ষা একটা প্রধান কাম্যবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং যুদ্ধ চালনায় ফরাসীদের অনিচ্ছা সহজেই বোধগম্য।

ইংলণ্ডেও শান্তিস্পৃহা ফ্রান্স অপেক্ষা কম ছিল না। গত যুদ্ধের সময় যাঁরা ঐ

দেশে ছিলেন তাঁরা এ বিষয় অবগত আছেন। কিন্তু প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, এমন ক্ষেত্রে ইংরেজরা জার্মানদের সঙ্গে মিটমাট করল না কেন? আগেই বলা হয়েছে যে, মার্কিন ও রুশ দেশের উপর এত নির্ভরশীল হওয়ার দরুন ইংলণ্ড প্রথম থেকেই জ্ঞাত ছিল যে, "war of material"-এ মার্কিন ও রুশ দেশের বিজয় অবশ্যম্ভাবী হবে। প্রকৃতপক্ষে, ইংরেজদের প্রধান সামরিক শক্তি ছিল পরস্মৈপদী—আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার।

এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, ফরাসীদের মধ্যেও এক দল লোক ছিলেন যাঁরা স্থিতীয় যুদ্ধে কোন আস্থা স্থাপন করতেন না। তখনকার দিনে জেনারেল দ্য গল্ ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। ইনিই হলেন প্রতিরোধ (resistance) আন্দোলনের প্রকৃত স্রষ্টা। পরে তিনিই স্বাধীন ফরাসীদের নেতা হিসাবে ইংলণ্ডে আগমন করেন। তখন তিনি বাণী দিয়েছিলেন, "লড়াইয়ে হার হয়েছে, সংগ্রাম চলল।"

এই মন্ত্রে তিনি স্বাধীন ফরাসীদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সুতরাং অবশেষে এরাই উত্তর আফ্রিকায় সংগ্রাম চালিয়েছিল এবং ফ্রান্সকে জার্মানদের কবল থেকে মুক্ত করার যুদ্ধে মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগদান করেছিল।

দ্য গল নিজে গতিশীল (mobile) যুদ্ধের পরিপন্থী ছিলেন। তাঁর দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, জার্মানদের গতিশীল সমর পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আক্রমণই একমাত্র প্রতিষেধক হতে পারে। সেইজন্য তিনি ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য সাঁজোয়া বাহিনী ও বিমানপোতের বহুল ব্যবহারে বিশ্বাসী ছিলেন।

রুশ দেশের সামরিক পরিকল্পনা ও যুদ্ধপদ্ধতি অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ থেকে একটু পৃথক। প্রথমত রুশীয় সামরিক নেতারা সর্ব সময়েই অবগত ছিলেন যে, তাঁদের মত এত বিরাট দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা কঠিন। সুতরাং, এঁরা আক্রমণ ও প্রতিরোধের যথা গেরিলা যুদ্ধের, একটা সমন্বয় খুঁজেছেন। সেইজন্য এঁরা শত্রুর প্রবেশ ও দেশের কোন কোন স্থান অধিকারকে অনেক সময় অগ্রাহ্য করেছেন। গত মহাযুদ্ধের সময়েও। কারণ, এই প্রবেশ ও অধিকারের ফলে শত্রুপক্ষেরও সমস্যা বেড়েছে বই কমেনি। প্রথমত, এত বৃহৎ দেশকে অধিকার করতে গিয়ে এদের লোকক্ষয় ও সামরিক মালমসলার প্রভূত লোকসান ঘটেছে। আর প্রধান সামরিক ঘাটি থেকে শত্রুর দূরত্ব যতই বর্ধিত হয়েছে, এদের যাতায়াত ও সরবরাহের অর্থাৎ logistics-এর সমস্যাও ততই বেড়েছে। সর্বশেষে, রুশ দেশের প্রচণ্ড শীতও রুশদের পক্ষে একদা বড় সামরিক সুবিধার কারণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এসব সমস্যা নেপোলিয়নের সময়েও উঠেছিল, তা যাঁরা টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পীস' পড়েছেন তাঁরাই জানেন। হিটলার ভেবেছিল যে, blitzkrieg (blitz = বিদ্যুৎ, krieg = যুদ্ধ) করে জার্মানরা সোভিয়েটদের অতি সহজে পরাজিত করতে পারবে, কিন্তু তা যখন সম্ভব হল না এবং হিটলার দীর্ঘকালীন যুদ্ধ করতে বাধ্য হল, তখন সর্বদেশের চিন্তাশীল সামরিক সমালোচক মাত্রই একমত হলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কি পরিণতি হবে বা হতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক প্রয়াস প্রধানত সুদূর প্রাচ্যে নিবদ্ধ ছিল। গোড়ার দিকে জাপান অনেক দেশ দখল করেছিল সত্য, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও সামরিক ক্ষতি কম হয় নি, কিন্তু আমেরিকানরা যখন যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করল না ও আপস করতে রাজী হল না, তখন থেকেই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হল। প্রথমত, নৌ ও বৈমানিক যুদ্ধে জাপানীদের নৌবহর ও বাণিজ্যপোত ধ্বংস হওয়ার এবং ফলে কাঁচা মালের সরবরাহের সমস্যা বৃদ্ধি হওয়ার দরুন জাপানীরা তাদের সামরিক প্রচেষ্টা ও শিল্পোদ্যোগ অনেকাংশে কমিয়ে

দিতে বাধ্য হল। আর দেশে শীতোষ্ণের ও খাদ্যের পরিস্থিতি এমন উত্তুঙ্গ হয়ে উঠল যে, সাধারণ জাপানী নরনারীদের কষ্টের অবধি রইল না। আর মার্কিনদের বৈমানিক আক্রমণের ফলে অনেক জাপানী শহরের ঘরবাড়ি ও কারখানা ধ্বংস বা পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। এই সম্পর্কে অধ্যাপক জি, সি, অ্যালেন তাঁর Japan's Economic Recovery (Oxford, Reprint, 1960) গ্রন্থে লিখেছেন :

"The amount of physical destruction is estimated to have been equivalent to about twice the national income of the fiscal year 1948-49........ In 1945 the people were short of food, clothing, fuel, housing and all other necessaries of life."

য়ুরোপে দুই অ্যাক্সিস শক্তি ছিল। এদের মধ্যে জর্মনীর যেমন ছিল সামরিক অসমসাহসিকতা, তেমনি ছিল তার শিল্পে পারদর্শিতা। শিল্পোদ্যোগে জর্মনীর স্থান ছিল অতি উচ্চে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই। সেই তুলনায় য়ুরোপীয় অন্য অ্যাক্সিস শক্তি ইতালী ছিল অতি দুর্বল সর্ব বিষয়ে। প্রকৃতপক্ষে, জর্মনীর সাহায্য ব্যতীত ইতালীর যুদ্ধে নামা বাতুলতা মাত্র হত। ইতালীর সামরিক পরিকল্পনা ও পদ্ধতি ছিল ঔপনিবেশিক যুদ্ধের উপযোগী, মহাযুদ্ধের জন্য নয়।

জর্মনীর সামরিক পরিকল্পনায় দুটি জিনিস লক্ষ করবার বিষয়। প্রথমত, এটা ছিল আচম্বিতে আক্রমণের উপর স্থাপিত। সুতরাং জর্মনদের সামরিক চিন্তায় স্ট্যাটিক পরিকল্পনার কোন স্থান ছিল না। তার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে জর্মনীর সামরিক নেতারা প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাঁদের আর্থিক, ভৌগোলিক ও লোকবলের পরিস্থিতিতে বহুকাল ব্যাপী যুদ্ধ এ'দের পক্ষে চালনা করা সম্ভবপর নয়। বস্তুত এটাকে যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে ও সামগ্রিকভাবে চালনা করতে পারলেই, কালে শত্রুবাহিনীর বিনাশ সাধন ও পরাজয় সম্ভব হতে পারে। এই হল বৈদ্যুতিক যুদ্ধ (ব্লিংসক্রীগ)-এর উৎস।

১৮৭০ সালের ফরাসী-প্রুশীয় যুদ্ধের সময় হতেই জর্মনদের নব্য সামরিক মতবাদের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে শ্লিফেনের নাম অনেকের কাছে সুপরিচিত। এই নতুন গতিশীল পরিকল্পনায় আক্রমণ একটা বিশেষ রূপ ধারণ করেছিল। এই মতবাদ অনুসারে শত্রুর বিনাশ সাধনই হল সামরিক প্রয়াসের প্রথম ও প্রধান কথা। দ্বিতীয় কথা হল এটাকে কিভাবে সাধন করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, শত্রুর দুর্বলতা আবিষ্কার করাই এর প্রথম সোপান। তৎপরে শত্রুবাহিনীর দুর্বলতম স্থলে সমগ্র সামরিক শক্তি একত্রিত করে সেখানে আক্রমণ করা। দ্বিতীয় সোপান হল শত্রুবাহিনীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে সেই অংশগুলিকে পরিবেষ্টিত ও ধ্বংস করা।

অবশ্য এটাও স্বীকার করতে হবে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অনেক পরিবর্তন ঘটে ছিল। যথা গত মহাযুদ্ধে বিমানপোত, ট্যাংক প্রভৃতি সাঁজোয়া বাহিনীর প্রভূত ও ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই উপলব্ধি করা যাবে যে, ১৮৭০ সালের পর হতে জর্মন সামরিক চিন্তায় কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি, অর্থাৎ আচম্বিতে আক্রমণ, পরিবেষ্টন ও শত্রুর বিনাশসাধন নীতি পূর্ববৎই বলবৎ রয়েছে। অধুনা, সামরিক মালমসলা ব্যবহারের পরিসর বেড়েছে মাত্র।

ডুবো জাহাজের ব্যাপক ব্যবহার ও শত্রুকে সর্বপ্রকার যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত করা জর্মনদের সামরিক পদ্ধতির একটা প্রধান উপকরণ ছিল ১৯১৪-১৮ সালেও। গত মহাযুদ্ধে এই পদ্ধতির প্রয়োগ বহুগুণে বেড়েছিল মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটিও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, অবিচ্ছিন্ন ডুবো জাহাজ ব্যবহারের নীতি (uninterrupted submarine warfare) এক পক্ষে জর্মনদের সামরিক দুর্বলতারই পরিচায়ক। এরা ভেবেছিল যে, কাঁচা মালের সরবরাহ হতে শত্রুকে বঞ্চিত করলে পর নিজেদের সামরিক ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত দৃঢ়ভূত হবে। এই ধারণাটা আপাতদৃষ্টিতে যতই সত্য হোক না কেন, এই মনোভাব মূলক নঞর্থক, এই প্রকার সামরিক প্রণালীকে শক্তির চিহ্ন বলা যায় না।

(২)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, জাপানী ও জর্মন সমরনীতি মোটামুটি এক এবং একই কারণে। জাপান ক্ষুদ্র দেশ ও তার কাঁচা মালের সম্ভার ও শিল্পোদ্যোগের ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। যথার্থত অধিকাংশ সামরিক ও অন্যান্য কাঁচা মালের জন্য জাপানীরা ছিল পরমুখাপেক্ষী। সেইজন্য যুদ্ধের দ্রুততা সব সময়েই এদের সামরিক পরিকল্পনায় প্রধান স্থান অধিকার করে এসেছে। দীর্ঘকালীন যুদ্ধ যে এদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, সে সম্বন্ধে এরা একেবারে অজ্ঞ ছিল না।

১৯০৪-৫ সালের রুশ-জাপানী যুদ্ধে এই সত্যতা প্রথম প্রমাণিত হয়। ঐ সময়ে জাপানী সেনানী অপূর্ব বীরত্বের খ্যাতি অর্জন করেছিল বটে, কিন্তু এদের সামরিক সাফল্য ও বিজয়ের এটা একটা গৌণ কারণ মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে, এই যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল দুই কারণে। প্রথমত, সমরপ্রাঙ্গণ থেকে জাপানের নৈকট্য। এই স্থানীয় সুবিধার জন্য জাপানীদের যাতায়াতের সমস্যা ছিল নগণ্য। এই হেতু জাপানীরা তাদের রণসম্ভার একত্রিত করে অপেক্ষাকৃত সহজে সমর চালনা করতে সমর্থ হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, আচম্বিতে আক্রমণ করার

সুযোগ এদের যত বেশী ছিল, শত্রুর পক্ষে তেমন ছিল না।

বলা বাহুল্য, জাপানের তুলনায় রুশ দেশের সামরিক শক্তি বেশী বই কম ছিল না। কিন্তু যুগপৎ এ কথাটাও বলা উচিত যে, তাদের সামরিক অসুবিধাও কম ছিল না। প্রথম, তৎকালে রুশ দেশ ছিল অন্তর্বিপ্লবে বিপর্যস্ত। দ্বিতীয় রুশদের ভৌগোলিক পরিস্থিতিও তাদের একটা প্রকাণ্ড অন্তরায় হয়েছিল। পাঁচ হাজার মাইলের অধিক দূর থেকে যুদ্ধ চালনা করা কত কঠিন তা বলা নিষ্প্রয়োজন। অধিকন্তু ঐ সময়ে সাইবেরীয় রেলপথে একটি মাত্র লাইন ছিল। এমন ক্ষেত্রে, সৈন্য চলাচল রুশদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুদূর প্রাচ্যে এদের নৌবাহিনীও জাপানের তুলনায় অতি তুচ্ছ ছিল। সুতরাং রুশদের বাল্টিক নৌবাহিনী যখন সুয়েজ প্রণালীর পথে সুদূর প্রাচ্যে এদের সাহায্যার্থে এসে উপস্থিত হল, তখন জাপানের সমগ্র সামুদ্রিক শক্তি ইহাকে আক্রমণ করে অতি সহজে বিনাশ করতে সমর্থ হল।

কিন্তু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, জাপানীরা তাদের যথার্থ সামরিক ক্ষমতা সম্বন্ধে অবিদিত ছিল না। মনে রাখা দরকার যে, এদের সামগ্রিক সামরিক প্রচেষ্টা তাদের এত দুর্বল ও পরিশ্রান্ত করে তুলেছিল যে, প্রথম সুযোগেই জাপানী নেতারা রুশদের সঙ্গে আপস করতে প্রস্তুত হলেন। সুতরাং প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের মধ্যস্থতায় যখন জাপানী ও রুশ প্রতিনিধিরা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে স্বীকৃত হলেন এবং রুশেরা কোন ক্ষতিপূরণ দিতে নারাজ হল, তখন বোঝা গেল যে, মূলত মনে মানে জাপানীরা শান্তি স্থাপন করতে চেয়েছিল, রুশদিগকে অপদস্থ করতে নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা তাদের দীর্ঘকালীন যুদ্ধ চালনায় অক্ষমতারই পরিচায়ক।

গত মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৬ সাল থেকে জাপানের সামরিক নেতারা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মানচুকুয়ো ও উত্তর চীন অঞ্চলে আধুনিক ভিত্তিতে সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলতে লাগলেন। এই বিপুল প্রচেষ্টার ফলে যুগপৎ এ'দের আর্থিক ও শিল্পোদ্যোগের ক্ষমতা ও ভৌগোলিক সুবিধা দৃঢ়ীভূত হল এবং এই উপায়ে জাপানীরা সমগ্র চীনকে করায়ত্ত করবার জন্য প্রস্তুত হল। বলা বাহুল্য, এই অভিপ্রায়ই ছিল জাপানের রাজস্ব ও সমরনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

জাপানী সামরিক নেতারা ভেবেছিলেন যে, চীন দেশকে দখল করতে পারলে পর সমস্ত পূর্ব এশিয়া স্বতই এ'দের কবলে এসে পড়বে। অধিকন্তু, এ'রা সত্যই বিশ্বাস করতেন যে, এই উপায়ে জাপানের আর্থিক সমস্যা চিরকালের জন্য সমাধান হবে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের এই হল উৎস।

এই প্রসঙ্গে এ কথাটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদান করা জাপানীদের পক্ষে মাত্র একটা গৌণ কারণ ছিল।

১৯৩৬ সাল থেকে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েও চীন যখন জাপানের সঙ্গে মিটমাট করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করল, তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নামা ব্যতীত জাপানের অন্য কোন উপায় থাকল না।

এখন সমস্যা হল, যুদ্ধের গতি কোন দিকে চালনা করা প্রয়োজন—উত্তরে, না দক্ষিণে?

উত্তর প্রান্তে যুদ্ধ করার বিপদ এ'দের কাছে অজানা ছিল না। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষ এর একটা ফল হতে পারত। এইরূপে আক্রমণ হিটলারীয় জর্মনীর পক্ষে সুবিধার কারণ হত সন্দেহ নেই, কিন্তু জাপান সোভিয়েটদের সঙ্গে বিবাদ করতে মোটেই উন্মুখ ছিল না। কিছু দিন আগেই সোভিয়েট সামরিক পরাক্রমের নমুনা জাপান পেয়েছিল সোভিয়েট মাঞ্চুরিয়ার সীমান্ত প্রদেশে।

কিন্তু জাপানী সামরিক নেতৃবৃন্দ এ কথাটাও জ্ঞাত ছিলেন যে, দক্ষিণ দিকে আক্রমণ করার একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে ওলন্দাজ, ফরাসী ও ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি। এইরূপে সামরিক প্রচেষ্টা জাপানী নৌবহর ও সেনানীদের পক্ষে নিঃসন্দেহ সুগম হত এবং এই এলাকায় জয়ী হতে পারলে জাপানের কাঁচামালের সমস্যাও অপেক্ষাকৃত সহজে সমাধান হত।

কিন্তু বিপদ হল এই যে, এই অবস্থায় আমেরিকার পক্ষে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকা অসম্ভব হত, শ্বেতজাতির প্রতিনিধি ও রক্ষক হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে, য়ুরোপীয় উপনিবেশগুলিকে জাপানীদের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই গ্রহণ করেছিল।

এই কারণে জাপানীদের সঙ্গে আমেরিকার সংঘর্ষ প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। যদিও জাপানী রাজদূত ও অন্যান্য রাজ-প্রতিনিধি শেষ পর্যন্ত শান্তি রক্ষার জন্য অনেক প্রয়াস করেছিলেন, কিন্তু এঁদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ, এই দুই দেশের বিরোধের মূলে ছিল জাতীয় স্বার্থের মৌলিক সংঘাত। সুতরাং জাপান ও আমেরিকার পক্ষে কোন আপস সম্ভব হত না।

এই হেতু জাপানী সামরিক নেতারা শেষে স্থির করলেন পার্ল হারবার আক্রমণ করে প্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌ ও বিমান বাহিনী ধ্বংস করতে। এই উপায়ে এঁরা আমেরিকার পক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব করতে চেয়েছিলেন। এই হল আমেরিকা-জাপান যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমিকা।

বলা বাহুল্য, জাপানীদের পক্ষে প্রধান ভাবতে ভুল হয়েছিল যে, আমেরিকা এত দ্রুত তাদের ক্ষতিপূরণ করতে সমর্থ হবে এবং এত শীঘ্র এদের সামুদ্রিক ও বিমান বাহিনী পুনরুত্থিত হবে। মার্কিন শিল্পোদ্যোগের ও উৎপাদনের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অতি অল্পকালের মধ্যেই জাপানীরা নিঃসন্দিহান হল এবং এই হেতু আধুনিক মালমসলার যুদ্ধে এদের পরাজয়ও সুনিশ্চিত হল। আণবিক বোমা নিক্ষেপ না করলেও আমেরিকানরা এই যুদ্ধে জয়ী হত নিশ্চিত।

এইসব কারণে সকলেই উপলব্ধি করবেন যে, বর্তমান জগতে ক্ষুদ্র দেশের কোন সামরিক স্থান নেই। এদের পক্ষে অন্য কোন বৃহৎ শক্তির আওতায় থাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

এবার আমাদের দেশ ও চীন সম্বন্ধে বলেই লেখা শেষ করব।

প্রথমে, চীনা গেরিলা বা ক্ষুদ্র যুদ্ধ-প্রণালীর কথা সকলে শুনেছেন। বস্তুত, গত মহাযুদ্ধ পর্যন্ত লাল চীনাদের এই প্রকার যুদ্ধ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। এদের ক্ষমতা ছিল অল্প এবং শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করা ও তাদের যাতায়াত ও সরবরাহের ক্ষমতা যতভাবে সম্ভব সীমাবদ্ধ করাই তখন ছিল লাল চীনাদের প্রধান সামরিক লক্ষ্য ও পন্থা।

এ থেকে দুটো জিনিস প্রমাণিত হয়। প্রথমত যে, যুদ্ধের মালমসলার হীনতা সত্ত্বেও যুদ্ধ চালানো যায়; যদিও এই উপায়ে প্রকৃত জয়লাভ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, এই প্রকার যুদ্ধ করে পুরাদস্তুর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া যায় ও হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ফলেও তাই হল। গেরিলা যুদ্ধের পর্যায়ে চীনা কম্যুনিস্টরা যদি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করতে সমর্থ হত ও কালে কুমিনটাং সেনাবাহিনীর সঙ্গে পুরামাত্রায় যুদ্ধ না করতে পারত, তা হলে ১৯৪৯ ইংরেজীতে লাল চীনাদের বিজয় কিছুতেই অবশ্যম্ভাবী হত না বললে ভুল হবে না।

এই সম্পর্কে এ কথাটাও মনে রাখা কর্তব্য যে, কুমিনটাং দলের পরাজয়ের প্রধান কারণ হল রাজনৈতিক। এদের শাসনের ফলে দেশব্যাপী অবিচার, অনাচার ও নৈতিক অধোগতি এমন স্তরে এসে পৌঁছেছিল যে, কুমিনটাং নেতারা দেশবাসীর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন এবং কম্যুনিস্টরা এই পরিস্থিতির সম্পূর্ণ সুযোগ নিতেও পিছপাও হয় নি।

সুতরাং গেরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত মনোভাব পোষণ করা অবাঞ্ছনীয়। এটা বৃহৎ সামরিক প্রচেষ্টার একটা সাময়িক উপকরণ মাত্র হতে পারে।

ইংরেজ আমলে ভারত রক্ষা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষারই নামান্তর মাত্র ছিল। স্বাধীনভাবে ভারত রক্ষার যে কোন প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে তা ব্রিটিশ শাসকদের হাস্যকর বস্তু বলে মনে হত। তার জন্য ব্রিটেনের রুশ বা আফগাননীতি ছিল মূলত সাম্রাজ্যবাদ নীতি। অর্থাৎ রুশ ও আফগান আক্রমণের অজুহাতে এঁরা ভারতবর্ষের খরচায় ব্রিটিশ সেনবাহিনী ও তার অনুচর ভারতীয় সৈন্যদের সামরিক শিক্ষা ও কৌশল আয়ত্ত করবার সুযোগ নিতেন ও ব্যবস্থা করতেন।

প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় ও ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্যবহার হত দুই প্রকারে। প্রথমত, ভারতবর্ষের আভ্যন্তর শান্তি রক্ষা, প্রধানত রাজনৈতিক আন্দোলন দমন করা। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সৈন্যের প্রয়োগ হত ব্রিটেনের [illegible] [illegible] কাবে এশিয়া ভূখণ্ডে ও [illegible]। ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক [illegible] [illegible] সাক্ষ্য দেয়।

স্বাধীন ভারত [illegible] বিভক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু এই বিভাগ সত্ত্বেও এর প্রতিরক্ষা সমস্যার কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। যুদ্ধের আগে চীন ছিল দুর্বল এবং এই সামরিক দুর্বলতার জন্য তাকে মিত্র শক্তি বলে ধরে নেওয়া হত এবং তখন ভারত-বিদ্বেষী পাকিস্তানেরও জন্ম হয় নি। তথাপি, এ কথাটা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে মৈত্রী ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপনই আমাদের নিরাপত্তার একটা বিশিষ্ট উপকরণ। বস্তুত, কালে চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গেও আমাদের মৈত্রী স্থাপিত হবে বলে আমাদের অনেকের বিশ্বাস।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও বলে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতবর্ষের পক্ষে আন্তর্জাতিক মৈত্রী হল মুখ্যত নঞর্থক অর্থাৎ negative সুবিধা। কেবল মৈত্রীর উপর কোন দেশের প্রতিরক্ষা নীতি স্থাপিত হতে পারে না। ভারতবর্ষের সামরিক শক্তি, উৎপাদন ও অন্যান্য উপায়ে বর্ধন করাই আমাদের প্রধান কর্তব্য, যার ফলে আমাদের সৈন্যরা সব সময়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে এবং যাতে করে এরা সর্বপ্রকার সর্বাপেক্ষা আধুনিক সামরিক হাতিয়ার ও অন্যান্য উপাদান থেকে বঞ্চিত না হয়।

অধিকন্তু আমাদের দেশের সামরিক শিক্ষার সার্বিক আয়োজন করাও দরকার, যাতে সব স্বাস্থ্যবান ও স্বাস্থ্যবতী নরনারী সর্ব কালে ও সর্ব সময়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে। এটা জাতীয় কর্তব্য হিসাবে গণ্য করা প্রয়োজন। এইভাবেই দেশের স্বাধীনতা প্রকৃত স্বাধীনতায় পরিণত হবে। পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে ও প্রতি মুহূর্তে দেশ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে না থাকতে পারলে পর আমাদের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরাধীনতা কস্মিনকালে ঘুচবে না। আমরা নিরর্থক ধনে প্রাণে মরব মাত্র।

পরিশেষে, এ কথাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সার্বিক অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যতিরেকে আমাদের সামরিক স্বাধীনতাও কখনই সাধিত হবে না। পরের মুখে ঝাল খাওয়া আর কতদিন চলবে?

সেই কারণে দেশের নিরাপত্তার জন্য আজ যথাসম্ভব স্বয়ম্ভর (self-reliant) হওয়া প্রয়োজন। অধিকন্তু সামরিক ও অসামরিক জাতের প্রভেদও আমাদের দেশ থেকে ঘুচাতে হবে। রাজনৈতিক কারণে আজ এর কোন অজুহাত নাই। যদিও প্রকৃতপক্ষে এই প্রভেদ এখনও ঘুচে যায় নি।
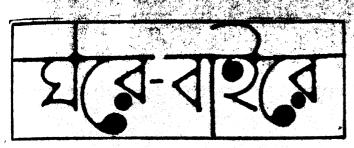
বাটিক এখন সারা ভারতবর্ষে তো বটেই, বলতে গেলে সারা দুনিয়ার একটি পরম আদরের "বাতিক"। বরং বলা যেতে পারে এই প্রবল শখটি ব্যাপক ভাবে চর্চা করে বাজারে পণ্য হিসাবে গণ্য করতে ইন্দোনেশিয়ার পরই আমাদের স্থান।

এদেশী একটি বাটিকের নকশা

বাতিকের জন্ম কোথায় কবে কে জানে। নানাভাবে নমুনা নকশার উপর 'বাধা' বা resist দিয়ে রং ছোপ আমাদের দেশেও বহুকাল ধরে চলে এসেছে। বাংলা দেশের বাটিক এর নাম ছিল 'মোমিন'। মোম থেকে মোমিন। আজও রাজস্থানের কোথাও কোথাও মাটির প্রলেপ দিয়ে ঢেকে রং করার রীতি আছে। দাক্ষিণাত্যবাসীরা তো জোর করেই বলেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে উন্নত ধরনের বাতিক জাতীয় কাজ কৃষ্টির অঙ্গ হিসাবে জমে বসেছে তার প্রথম পত্তন হয়েছিল তাঞ্জোর অঞ্চলের বাতিকের আওতায়। তাঞ্জোরের নাগপট্টনম্ গ্রামে এখনও প্রাচীন শিল্পীদের উত্তরপুরুষ দু'এক জনের খোঁজ পাওয়া যায়। নারকেলের ছিবড়ে দিয়ে তুলি অথবা কাঠবেড়ালীর লেজের লোম ব্যবহার করে মাটি, চালের গুঁড়ো, মোম ইত্যাদির resist দিয়ে বাটিক ছাপা হ'তো। সেই বাটিকের লুঙ্গি বা সারঙ্গ যেত ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশে। সেখানে সৌন্দর্য্যপিপাসু শিল্পী সেই ধারা ধরে নিয়ে নূতন নূতন রূপ দিয়েছেন, উন্নততর কৌশল আবিষ্কার করেছেন। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শিল্পধারাকে দিয়েছেন ঐতিহ্য। অভিজাত সংসারের মহিলারা গর্বের সঙ্গে আপন আপন বৈশিষ্ট্য রচনা করতেন। বিভিন্ন সুলতানদের ঘরে বিভিন্ন কারুকার্যের নমুনা বাটিকের শিল্প-সার্থকতায় বৈশিষ্ট্যমূলক স্বতন্ত্রতার সৃষ্টিও করেছিল। বাটিক-যোগজা অর্থাৎ যোগজাকার্তার বাটিক, সুরাকর্তার শহর সোলোর বাতিক এইভাবে আলাদা আলাদা ছিল তার পরিচিতি।

সুরাকর্তার সুলতানপ্রাসাদেই নাকি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে বাটিকের গন্ধ পেয়েছিলেন। রেজিন-প্যারাফিন-মোম মেশানো গন্ধ। এই মিশ্রণ গরম করে বাটিকের শিল্প রচনা চলছিল। সঙ্গে ছিলেন প্রতিমা দেবী। তাঁর আগ্রহেই সে শিল্পধারা আনা হ'লো শান্তি-নিকেতনের দেওয়া নেওয়ার ফলপ্রসূ অঙ্গনে। সেই থেকে আবার ভারতীয় নকশা, নমুনা, ফুল, পাখি দিয়ে বাটিক সৃষ্টি হ'লো। রচনা কৌশলেও শিল্পী ভারত নিজস্ব 'টেকনিক' নিয়ে নিলেন। ইন্দোনেশিয়ার চ্যাণ্টিং-এর বদলে এল বড় ছোট তুলি। তুলির আঁচড় দিয়েই ভারতীয় নমুনার নমনীয়তা বজায় রইল। ইন্দো-নেশিয়ার চ্যাণ্টিং অনেকটা কেক তৈরি করে আইসিং সাজাবার জন্য যে পিচকারি ব্যবহার হয় তার মত। তাতে সূক্ষ্ম কাজের সুবিধা আছে। জ্যামিতির নমুনায় বাটিকের সূক্ষ্ম রেখাগুলি সহজে আসে তাতে।

বাটিক শব্দটিই যবদ্বীপের ভাষা 'টিক' শব্দমূলের সঙ্গে জড়িত। যবদ্বীপবাসীরা মনে করেন পারস্য বা মিশর থেকে কোনদিন বাটিক শিল্পের আমদানি হয়েছিল বটে কিন্তু আজ এ ধারা একান্ত ভাবেই তাদের। সারা দুনিয়ায় যবদ্বীপের পরিচিতি নিয়ে শব্দটি পর্যন্ত পৌঁছেছে। 'টিক্' কথাটির মানে 'টুক্' বলা যায়। একটুখানি, ফুটকি বিন্দু বা ফোঁটা বোঝায়। এই শব্দ মূল যবদ্বীপের ভাষায় অন্যান্য কথায়ও পাওয়া যায়। ত্রিটিক্ বা তারিটিক্ মানে যে কাপড়ে এমন নমুনা আছে যা বিন্দু দিয়ে গড়া। বাটিকের একটি নমুনার নাম নিটিক্। নিটিক নমুনায় ফুটকি ফুটকি থাকে। বাটিকের অনুবাদ করলে কথাটির মানে যা দাঁড়ায় তা হলো ফুটকি করে ফেলা মোমের দ্বারা নমুনা যে কাপড়ের বাহার।

সাধারণ বাটিক নমুনা একটি রং দিয়েও হতে পারে। চির খাওয়ানো রং-এর বাহার একটি রং দিয়েও চলে। তবে দুটি বা তিনটি রং নিয়েই শিল্পীরা রচনা করেন তাঁদের রূপের দুনিয়া। খুব শৌখীন

শিল্পী শোনা যায় কুঁড়িটি রং দিয়ে, কুড়িবার মোম দিয়ে ঢেকে জটিল নকশাও তোলেন। মোম দিয়ে ঢাকা অংশ বাদে একটির উপর আর একটি করে রং উঠিয়ে নূতন থেকে নূতনতর বর্ণবিন্যাস হয়। তাই বাটিক শিল্পী রংকে জানতেন সবদিক থেকে সম্পূর্ণভাবে।

পাশ্চাত্য জগতে বাটিক একেবারেই শখের শিল্প। আপন অন্তরের অভিব্যক্তি বা প্রকাশের জন্য কলকারখানা ভিত্তিক সভ্যতায় সভ্য মানুষ পথ খুঁজে মরছে। সময় নেই এতটুকু, এতই যন্ত্রিক যুগের ব্যস্ততা। তার মধ্যে অবসর খুঁজে মানুষ নিজস্ব বিকাশ চায়। চারু ও কারু শিল্পের জয়ও এখানে। আমাদের প্রত্যেকের মনে যে সৃষ্টির আগ্রহ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সেই আগ্রহ একদিন বিদ্রোহ করে জানিয়ে দেয় যে আপনাকে জানার মাধ্যম মেশিনের মধ্যে নেই, আছে সৌন্দর্য রচনায়। যা আমরা দেখি, যা আমরা স্পর্শ করি, সবের সঙ্গেই যন্ত্র জড়িত থাকে, তা পশ্চিমের মানুষকেও যেন ক্লান্ত করে তোলে। বাটিকও এমনি একটি ক্লান্তিহর কাজ হয়েছে তাদের কাছে। বাজারের পণ্য হিসাবে তুলে ধরার অবকাশ নেই। মনের সাধ মেটাতে তাঁরা বাটিকে রং দিয়ে ছবির পর ছবি এঁকে চলেন। ছোটখাটো জিনিস। শাড়ি নয়, সারং নয়—বড়জোর একটি

ক্লোয়াং পুনুহান—একটি ইন্দোনেশীয় বাটিকের নকশার নাম

সরু স্কার্ফ অথবা ফ্রেম করে টাঙিয়ে রাখবার জন্য চৌকোনা একটি টুকরো। অর্থনৈতিক সংকট, যুদ্ধ, মহাশূন্যে অভিযান প্রভৃতি কোনটাই সেই ছোট্ট শিল্প-সৃষ্টির জীবনকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। এককালে হয়তো সৌন্দর্য সৃষ্টির অবসর ছিল বেশী, সময় আর অর্থের ছিল প্রাচুর্য, তবে রসিকজন মনে করেন সেদিনের চেয়েও আজ মানুষ হিসাবে মানুষের আত্মপরিচয়ের জন্যই হাতের কাজের দরকার হয়েছে বেশী।

যবদ্বীপ থেকে বাটিক ইউরোপে গিয়েছিল ওলন্দাজ বণিকদের হাতে হাতে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য জগতে বাটিকের পরিচয় হলো। বাটিক নমুনায় ছাপা অল্প দিনেই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো কিন্তু বাটিকের কাজ ঠিক ছাঁব অ কার মতই শিল্পীসমাজে সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। ছোট ছেলে পর্যন্ত এই শিল্প নিয়ে খেলা করে, কিন্তু সে শুধু রং নিয়ে তুলি নিয়ে আত্মবিকাশের আর-এক খেলা। আম পাতা আর জবাফুল এঁকে শিশু-শিল্পী যেমন সৌন্দর্য-সচেতন হয়ে ওঠে তেমনই।

যবদ্বীপেও বাটিকের ব্যাপকতায় বাটিকের মোম ঢালার ব্লকের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও টুলি বা হাতে আঁকা কাজের কদর অনেক বেশী, তবু Tjap বা চ্যাপ-এর চল হয়েছে বলেই বছরে প্রায় ৪০,০০০,০০০ গজ বাটিক তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। হাতে আঁকা বাটিকের গজ দুই করতেই ৩০ থেকে ৫০ দিন সময় লাগে। এক সময় তো অত্যন্ত অভিজাত ধনী ঘরে ভিন্ন এই বাটিক ব্যবহার অসম্ভব ছিল। এখন এই টুলি বাটিকের টুকরো গৃহসজ্জার অংগ হিসাবে চলন হয়েছে ধনী পাশ্চাত্য সমাজে।

Tjanting বা চ্যান্টিং বাদ দিয়ে তুলির ব্যবহার যে কেবল ভারতবর্ষে হয়েছে তা নয়, সারা বাটিক শিল্পিসমাজ যবদ্বীপের কৌশলের এটুকু হেরফের মেনে নিয়েছেন। তুলির টানে যে স্বাধীনতা ও সাবলীলতা থাকে, তাতে শিল্পিমন সহজে নকশায় আপন ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তন করতে পারেন। চিত্রে যেমন রূপের বিকাশের সংগে সংগে শিল্পী তার রেখার হেরফের মানিয়ে নিয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দান করে, তুলি দিয়ে বাটিকও সেরকম বৈশিষ্ট্যময় করে তোলা যায়। শিল্পসৃষ্টির বলিষ্ঠতা শিল্পীর ক্ষণিক স্পর্শে জেগে ওঠে বলেই ধরাবাঁধা নমুনায়, সাবধানে ছেপে নেওয়া নকশায় জ্যামিতির মত নিয়মমাফিক কায়দায় সে স্বতঃস্ফূর্ততা কম থাকে। প্রথম শিক্ষার্থীও সেজন্য পর পর কয়েকটি পরীক্ষা করে আসল কাজে হাত দিতে পারেন। সব সৃষ্টিই ক্রমবিকাশসাপেক্ষ। রং-এর রেখা টানতে আরম্ভ করে তবে শিল্পী ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে। বাটিকের বেলায়ও সেই এগিয়ে যাওয়ার নিয়ম বাদ যাবে কেন? থাক না শিল্পীর সামান্য স্বাধীনতা। সৃষ্টির শেষে বোঝা যাবে সেই স্বাধীনতা শিল্পকে সার্থক করেছে, বৈশিষ্ট্য দিয়েছে।

কাগজের বাটিক একটি সহজ পদ্ধতি যা ছোট ছেলেমেয়েরা সহজে শিখে নিতে পারে। সামান্য খরচে রং-এর রচনা ছেলেমেয়েদের মুগ্ধ করবে এবং

তুলির বদলে ইন্দোনেশীয়রা চানটিং ব্যবহার করে। 'চানটিং' হাতল ও মোমের পাত্র আলাদাভাবে দেখান হয়েছে। হাতলটি বাঁশের ও পাত্রটি তামার
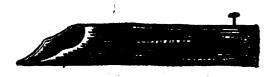
সৌন্দর্য-সচেতন করবে। মোম দিয়ে ঢেকে তুলির টানে অথবা মৃদুভাবে থাবড়িয়ে কাগজের বাটিক হয়। কাগজের রং-এর উপর বাটিকের রং অনেকটা নির্ভর করে। সাদা কাগজেই প্রথম শিক্ষার্থী ছেলেমেয়েরা বাটিকের কাজ আরম্ভ করতে পারে। ক্রেয়ন দিয়ে চমৎকার 'বাটিকের Resist তৈরি করে আঁকার কাজ চলতে পারে।

বাটিকের ব্যবহার তাই সূক্ষ্ম শিল্পী-সমাজে সীমাবদ্ধ না রেখে যেমন করে রঙীন সুতোর ফুল তোলার খেয়াল শেখানো হয়, যেমন করে আর-দশটা সৌন্দর্যবোধের চর্চা হয়, তেমনি সকলের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে সুন্দরকে আপন করে রাখবার ইচ্ছা হবে। ছোট ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে এ কথা আরও বেশী করে প্রযোজ্য।

টুকিটাকি

ঘরে সাধারণভাবে ফুল সাজানোর ব্যাপারে দু-একটি কথা মনে রাখলে ভাল ফল পাবেন। আমাদের আসবাব-পত্র, সাজানোর ধরনে মিতব্যয়িতার অভাব আছে। কাজেই জাপানী ধরনের ফুল সাজানোর সৌন্দর্য সব সময় ফুটে ওঠে না। যেভাবে সবাই ফুলদানিতে ফুল রাখেন, তার সম্বন্ধেই দু-একটা কথা তাই বলছি।

যেভাবের ফুল সাজানোই চ'ক, ফুলের পাতা অনেকগুলি জলের ভিতরে না থাকাই ভাল। পাতা সহজে পচে যায় এবং ফুলও তাতে শীগগির শুকিয়ে ওঠে। পচা পাতায় জল অপরিষ্কার হয় এমনকি, দুর্গন্ধ হয়। কাজেই লম্বা ধরনের ফুলদানিতে ফুল সাজাবার সময় ফুলের পাতা যতটা জলের তলায় থাকবে, ততটার পাতা ফেলে দিলে ভাল হয়।

বড় মুখের ফুলদানিতে ফুল সাজাতে একটি পিন হোল্ডার এবং একটুকরো তারের জালি খুব কাজে লাগে। তারের জালি ফুলদানির গলার ভিতরে মুচড়ে মুচড়ে মাপমত রাখুন, তার উপর পিন-হোল্ডার মাঝখানে রেখে দিন। এভাবে খুব লম্বা ডাটাওয়ালা ফুল না হলেও গভীর ফুলদানি সাজাতে সহজ হবে। ফুলের ডাঁটা কিছু পিনহোল্ডারে বিঁধিয়ে মাঝখানে ফুল উঁচু করে দেবেন। আশে-পাশে তারের জালি (যে রকম জালিতে আমরা মুরগী হাসের ঘর বানাই) থাকবে অন্য ফুল সাজিয়ে দিতে।

এ ধরনের ফুল সাজানোতে একটি বিপদ থাকে। আমরা নিত্য ফুলের জল বদলাই না, যদিও বদলানো ভাল। হয়তো বা আমাদের অলক্ষে জলের লেভেল কিছু নেমে গেল। ফুলগুলি গেল শুকিয়ে। এজন্য একটি উপায়ে কাজ হয়। বস্ত্রখণ্ড জলে বেশ করে ভিজিয়ে তার পুঁটুলি বানিয়ে ঐ তারের উপর রেখে বস্ত্রের এক দিক ঝুলিয়ে জলে দেবেন। তাতে বস্ত্রে যে জল শোষণের ব্যবস্থা হবে, তাতে ফুলের কিছু উপকার হবে। কিন্তু কাচের ফুলদানি যার ভিতরটা বাইরে থেকে দেখা যায়, তাতে হয়তো এরকম রাখা ভাল দেখাবে না।

মস্ত বড় ফুলদানি কখনও ছোট ছোট ডাঁটা ফুলের সাজ সইবে না। ফুলের দৈর্ঘ্য অন্তত ফুলদানির দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড় হওয়া দরকার। আবার পাখার আকারে ছড়িয়ে থাকা যে ফুলের সাজ তার বেলায় দেখবেন যেন কলসীর আকারের ফুলদানির তলদেশের পরিধির চেয়ে ছোট না হয়, ফুলসাজের পরিধি। বিলিতী ধরনের ফুলসজ্জায় বলে যে, ব্যাস রেখা ফুলদানির সবচেয়ে মোটা অংশের যা হবে তার এক চতুর্থাংশ হিসাব করুন। পুষ্পাধারের ব্যাসার্ধ আর ঐ এক চতুর্থাংশ যোগ দিয়ে ব্যাসার্ধ হিসাব করে পুষ্পসজ্জার বৃত্ত রচনা করুন। কেউ অবশ্য কম্পাস নিয়ে বসে ফুল সাজাবেন না। মোটামুটি হিসাবে বলা যায় ফুল সাজ যেন পুষ্পাধারকে ছাপিয়ে যায়।

ঘরের যেখানে ফুল রাখবেন, লক্ষ্য করবেন ঘরের মানুষ ফুলকে কোন দিক থেকে দেখবেন। সেদিকে ফুলের বাহার করে দেবেন বেশী। না দেখা দিকে বাহারের সামান্য কমবেশীতে আসে যায় না। দেওয়ালের কোণ হলে, কোণের দিকটা ফুল অত বেশী না হলেও চলবে।

সাধারণভাব ফুল সাজানোতেও নানা নকশা নমুনা সম্ভব। খুব লম্বা ডাঁটা-ওয়ালা ফুল যেমন গ্ল্যাডিওলাস, রজনী গন্ধা ইত্যাদি নীচু, লম্বাটে পুষ্পাধারে একটি বা একাধিক পিন হোল্ডার রেখে পাশাপাশি সাজিয়ে দিয়ে সামনে ছোট ফুল, ছোট পাতার বাহার দিয়ে ভরাট করে তুললে ভাল হয়।

খুব অল্প ফুলকেও পিন হোল্ডারে আকার অনুক্রমে পর পর রাখলে বেশ সুন্দর দেখাবে।

শ্রীমতী

সাম্প্রতিক নির্বাচনে বাংলার গণ-মানসের গতি-প্রকৃতিই সূচীত হইয়াছে; "হতে পারি দীন তবু নহি মোরা হীন" গান অ-গীত থাকিয়াও সোচ্চার হইয়াছে; এখন "ভারত গগনে পুনঃ আসিবে সুদিন" হইলেই নির্বাচিত এবং নির্বাসিত উভয়েই খুশি হইবেন, সেই সঙ্গে আমরাও। বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রের বৃহৎ জয় হউক, সকলেরই তো কাম্য।

সাম্প্রতিক নির্বাচনটাকে অনেকেই যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। যুদ্ধ শেষে বিশুখুড়ো কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ পর্বের কথা স্মরণ করাইয়াই বুঝি বলিলেন "যদা শ্রোষং অজয়-তীরে শুধু কেঁদুলি নয়, কোঁদলও বিদ্যমান, তদা না শংসে বিজয়ায়।"

কংগ্রেসের অভাবনীয় পরাজয়ে কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করিলে শ্যামলাল বলিল "রাজনীতি এবং ঘোড়-দৌড়ে আপসেট আছেই, এক সপ্তাহ

আগেই 'সিমপল সাইমন' ঘোড়া মাঠে তা প্রমাণ করে দিয়েছে; রাজনীতির বাজিতেও তার প্রমাণ মিলে গেল।" স্টেক ওয়ার্কের খবরা-খবর না রেখে যাঁরা শুধু হ্যাণ্ডি-ক্যাপ করেছেন, ভুল করেছেন তাঁরাই।

শ্যামলাল উক্ত প্রসঙ্গের জের টানিয়া বলিল—"যদা শ্রোষং নির্বাচন-কেন্দ্রে ভোটদাতাদের বাম তর্জনীতে কালি চিহ্ন দেওয়ার রীতি পরিবর্তিত হলনা তর্জনীর ইঙ্গিত তখনই পেয়েছিলাম এবং তদা না শংসে বিজয়ায়।!"

নির্বাচন যুদ্ধের প্রাক্কালে সমস্ত যুদ্ধ কেন্দ্র হইতেই যোদ্ধারা স্ব স্ব দলের শক্তি সম্পর্কে চিরাচরিত রীতি অনুসারেই নানা দম্ভোক্তি করিয়াছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"কাঁঠালটি তখনো গাছে ঝুলছিল, শুধু সর্ষপ তেলের আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধিতে গোঁফে তৈল-মর্দনদা তাঁরা করেননি।"

এক সংবাদে প্রকাশ, পাক-প্রেসিডেন্ট জনাব আয়ুব খাঁ নাকি চীনা সাংস্কৃতিক বিপ্লব লইয়া পাকিস্তানে গান

রচনা করিবার ফরমাস দিয়াছেন। —"অর্থাৎ গান হবে দীপক রাগে, ঘরাণা চীন" বলিলেন বিশুখুড়ো।

মন্ত্রিসভা গঠনের তোড়জোড় প্রসঙ্গে বিশুখুড়োও ঘোড়দৌড়ের উদাহরণ টানিয়া আনিলেন, বলিলেন "তিনটি ঘোড়-দৌড় কেন্দ্রের সেরা-সেরা ঘোড়াগুলিকে নিমন্ত্রণ করে আনা হয় এবং তাদের দৌড়ের জন্য যে-কাপ-এর বাজি অনুষ্ঠিত হয় তার নাম "ইনভিটেশন কাপ"। শুনলাম মন্ত্রি-নির্বাচনে সেরাদের এখনো নিমন্ত্রণপত্র ইস্যু করা হয়নি, হলেই বিধান-সভায় ইনভিটেশন কাপ জমে উঠবে।!"

রায়বেরিলির রায়ে জানা গেল প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অনেক ভোটে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া নির্বাচনে জয়ী হইয়াছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"ট্রামে-বাসের কানুন অনেক সময় পুরুষ যাত্রীকে 'লেডীস সীট ছোড় দিজিয়ে' নির্দেশ মানতে হয়, কিন্তু মেয়ে যাত্রীদের হয়না। তাই তাঁর পরমানন্দে 'স্কার্ফ' ক্যাম্পার বুনতে বুনতেই ভ্রমণ করতে পারেন। ইন্দিরাজীর ভ্রমণও যাতে বিঘ্নিত না হয় সেই কামনাই করি।"

কুডালো হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সেখানে তাড়ি খাইয়া নাকি নয়জনের মৃত্যু হইয়াছে। জনৈক সহযাত্রী জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"মরতেই হবে। তাড়ি-চোলাই-তে এই হয়" এবং পরে বলিলেন "ওরে মূর্খ, ইহা দেখি শিক্ষ।!"

"নাইট"-মার্কা কয়েকটি ছায়া ছবির প্রদর্শনী সরকারী নির্দেশে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। —"ইতিমধ্যে অনেকেই হয়ত 'যামিনী না যেতে' সেই সব ছবি দেখে নিয়েছেন"- বলেন সহযাত্রী।

একটি সংবাদ-শিরোনামা—'চীন অরাজকতার মুখে'। শ্যামলাল বলিল "তাহলে বলা যায় সত্যিকারের রাজতন্ত্রের অবসান চীনই চায়।"

জার্মানীর হাসপাতালে নাকি আর সেবিকার প্রয়োজন নাই। শুনিলাম যন্ত্রের সাহায্যেই রোগীর সেবা চলিবে। —"তা তো যেন হল, কিন্তু 'হাত দুখানি বাড়িয়ে আন, দাওগো আমার হাতে'-গো আর যন্ত্রকে শোনান যাবেনা"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

কেরালাতে কংগ্রেসের পরাজয় প্রসঙ্গে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বের কথায় আমাদের জনৈক সহযাত্রী আবার ঘোড়-দৌড়ের কথাটা টানিয়া আনিলেন এবং বলিলেন—"কলকাতায় এই রেসের মরসুমে 'কেরালাশ্রী' নামে একটি ঘোড়া আমদানি করা হয়েছে, সে কিন্তু এখনো কোন বাজি

মারতে পারেনি। তাই ভাবছি 'ন মৌক্তিকং গজে গজে' কথাটা মিথ্যে নয়।"

সংবাদঃ—নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে ইন্দিরাজী কেন্দ্রীয় প্রবীণ মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। —"অতঃপর প্রগ্রেস রিপোর্ট নিশ্চয়ই দেখতে হবে" কথাটি বলিয়া সহযাত্রী গল্প বলিলেন: "জনৈক অবাঙ্গালী পিতার পুত্র ইংরেজি পরীক্ষায় এক শতের মধ্যে আশি পেয়েছে অভিভাবক—ঔর বিশ কোন্ জায়গারে বলে ছেলেকে পেটাতে শুরু করেন। সেরকমধারা কিছু হবেনা বটে তবু— — —!!"
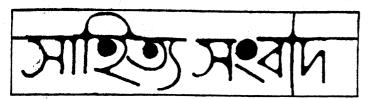
এক নদীর দুই শাখা

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার দাবিতে যে রক্তপাত ও প্রাণ-বিসর্জন ঘটেছিল ঢাকা শহরে, তারই স্মরণে কলকাতায় গত সপ্তাহে দু' দিন আলোচনাচক্র ও সাহিত্যবাসর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই উপলক্ষে একটি 'স্মরণী' সংকলন প্রকাশিত হয়েছে মনকুমার সেন-এর সম্পাদনায়, 'ধ্বনি' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছে।

'স্মরণী' ও 'ধ্বনি'-তে পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন লেখক ও বুদ্ধিজীবীর রচনা প্রকাশিত হয়েছে। আজকাল পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আমরা কানাঘুষোই মাত্র শুনতে পাই, চাক্ষুষ প্রমাণ খুব কম, বই বা পত্র-পত্রিকা দুর্লভ। পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের বাংলা ভাষার প্রতি অসাধারণ ভালোবাসার কথা আমরা শুনেছি, কিন্তু সেই বাংলা ভাষা এখানকার বাংলার চেয়ে আলাদা কিনা কিংবা কতখানি আলাদা —সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা আমাদের গড়ে ওঠেনি। এই রচনাগুলিতে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের অত্যন্ত সুস্থ সাহিত্যবোধ এবং অভিনন্দনযোগ্য ভাষা-প্রীতির পরিচয় পাওয়া গেল।

দেশ ভাগ হবার অব্যবহিত পরে কিছুটা উগ্রতা প্রকাশ পেয়েছিল। বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হবার চেষ্টায় পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষাকে সমূলে পশ্চিমবঙ্গের ভাষা থেকে আলাদা করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল এক মহলে। 'বাঙালী' শব্দে নিছক কোনো অঞ্চলের অধিবাসী বোঝায় না, বাংলা ভাষা-ভাষীদেরই বোঝায়, সেইজন্য পূর্ব-পাকিস্তানের অনেকে নিজেদের বাঙালী বলতেও দ্বিধা করতে শুরু করেছিলেন সেই সময়। আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে-হেতু প্রধানত গঙ্গা নদীর অববাহিকারই ভাষা, তাই পূর্ব-পাকিস্তানের পদ্মপারের একটা আলাদা ভাষা তৈরি করার চেষ্টা হয়েছিল। এবং ওখানকার বাংলার চাক্ষুষ রূপও বদলাবার জন্য প্রস্তাব উঠেছিল পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা ভাষা লেখা হবে উর্দু হরফে। বলাই বাহুল্য, এসব ভুল চেষ্টা শুরু করেছিল মুষ্টিমেয় একদল উগ্র ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। এবং এসব অপচেষ্টার প্রতিবাদ করার জন্য বহু সংখ্যক শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির অভাব হয়নি পূর্ব-পাকিস্তানে।

সাম্প্রদায়িকতার জ্যাবজেবে রং এবং ঘিনঘিনে গন্ধ তো প্রথম প্রথম দু' দিকেই ছিল, তা ছাড়া কিছু ভুল বোঝাবুঝিও হয়েছিল। আমাদের ধারণা হয়েছিল যে, সংস্কৃত যে আর্য ভাষাগোষ্ঠীর জননী এ কথাটা ভুলে গিয়ে, সংস্কৃত যে হিন্দুদের দেব-দেবীর পূজার মন্ত্রের ভাষা—শুধু এ কথাটাই মনে রেখে ইসলাম রাষ্ট্র পাকিস্তানের বাংলা ভাষা থেকে ওরা সমস্ত সংস্কৃত শব্দের উচ্ছেদ ঘটিয়ে হুড় হুড় করে আরবী ফারসী শব্দ ঢোকাচ্ছে। আমাদের এ ধারণা অনেকখানিই ভুল ছিল। সেইরকম, ওদেরও ধারণা হয়েছিল, পশ্চিম বাংলার ভাষা থেকে সমস্ত চলতি আরবী ফারসী শব্দ তাড়িয়ে শুধু সংস্কৃত দিয়েই ভরানো হয়েছিল। (ওদেরও এ ধারণা ভুল, কেননা এ-রকম চেষ্টা পশ্চিমবঙ্গে কখনো হয়নি, একমাত্র পরিভাষা তৈরির সময়ই চলতি সহজ শব্দের ব্যবহার না করে খট-মট সংস্কৃত শব্দই নেওয়া হয়েছিল এবং তার ফলে পারিভাষাগুলো একেবারেই জনপ্রিয় বা ব্যবহৃত হয় না)। এ-রকম কৃত্রিম আলাদা চেষ্টা চলতেই পারে না, গঙ্গা ও পদ্মার পারে দু'রকম ভাষা হতেই পারে না, কারণ ওরা একই নদীর দুই শাখা। পূর্ব-পাকিস্তানে আরবী লিপি ব্যবহারের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ শহীদুল্লাহ লিখেছিলেন,

যদি পূর্ব-বাংলার বাইরে বাংলা দেশ না থাকত, আর যদি গোটা বাংলা দেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না থাকত, তবে এই অক্ষরের (আরবী) প্রশ্নটা এত সংগীন হতো না। আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সংগে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্যভাণ্ডার থেকে আমাদের বঞ্চিত হতে হবে।

...আমাদের মনে রাখতে হবে, ভাষার ক্ষেত্রে গোঁড়ামি বা ছুঁৎমার্গের কোনও স্থান নেই।

এই তো গেল আরবী লিপির বিরুদ্ধে যুক্তি। এর পর বাংলার আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহারের প্রশ্ন। প্রথম দিকে, পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষার আরবী-ফারসী শব্দ নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করা হয়েছিল, শোনা

যায়,' 'পাখি সব করে রব' কবিতাটিও আরবী-ফারসী শব্দে ভরিয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে দু' দিকেই আরবী-ফারসী হঠাও আওয়াজ উঠেছিল। বস্তুত, আরবী-ফারসী হঠাবার কোনো প্রশ্নই আসে না, বাংলা ভাষার প্রতি-নিয়তই নতুন শব্দ আসছে, সুবিধেমতন শব্দ যেখান থেকেই আসুক না. তা গ্রহণ-যোগ্য, তা আরবী-ফারসী-ইংরেজী পোর্তুগীজ, মোঙ্গোলিক বা এস্কিমদের ভাষা—যাই হোক না। নরুল মোমেন প্রবন্ধ লিখে দেখিয়ে-ছিলেন যে, বাংলায় কিছু কিছু আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ ভাষাকে চমৎকারী ও প্রাণবন্ত করেছে। তিনি কৃত্তিবাস, ভারত-চন্দ্র, মোহিতলাল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা থেকে এ-রকম সার্থক প্রয়োগের উদাহরণ দেখিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,

আরবী-ফারসী শব্দ বাংলা সাহিত্যে আমদানি করতে হলে তাকে এ-রকম রূপ দিতে হবে যে, তাকে গ্রহণ করে ভাষা সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে শুধু। নইলে পায়েসে কাঁকরের দানার মত দাঁতের নিচে পড়ে তাল ভঙ্গ করবে মাত্র।

অবশ্য, নরুল মোমেন তাঁর নিজের লেখাটিতে 'জল' কথাটির বদলে 'পানি' লিখেছেন বারবার। জলের বদলে পানি আমাদের কানে খট্ করে লাগে, এখানে যেন হিন্দু-মুসলমানে একটা আলাদা করার ব্যাপার আছে। সংলাপে 'পানি' চলতে পারে, কিন্তু বর্ণনায় 'পানি' ব্যবহার অসাহিত্য, এবং জোর করা। জলে যে একরকম সুখাদ্য ফল হয়, তাকে আমরা জলফল না বলে পানিফলই বলি, পশ্চিমবঙ্গে পানিফলকে কোন দিন 'জলফল' বলা হবে না পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যিক ব্যবহারে 'পানি' শব্দটির প্রয়োগের তাৎপর্য আমি বুঝতে পারি না। অনেকেই 'অশ্রু' পর্যন্ত লেখেন, কিন্তু পানি লেখেন না। যেমন, সৈয়দ আলী আহসানের একটি চমৎকার কবিতা এই রকম: অশ্রুবিন্দু মুক্তার মতো এবং আমি শুনেছি/তখন তোমাকে সুন্দর দেখানো/কিন্তু সে রাত্রে তুমি অবাক হয়ে ভাবছিলে/

কেন তোমার চোখে পানি নামলো না—
যন্ত্রণায় একটি বিমুগ্ধ তন্ময়তায়/তুমি আমাকে জন্ম দিলে,/রোরুদ্যমান অসহায় মানবশিশু,/তোমার স্তনের ছায়ায় নিদ্রিত হলো।

কবিতাটি সত্যিই সুন্দর, আরও চার লাইন উদ্ধৃতি দিতে ইচ্ছে হচ্ছে; মা, আমি বড় হয়ে তোমার ইচ্ছাকে/পূর্ণ করতে পারলাম না,/বাতাসে প্রদীপশিখার মতন অসহায় আমি/মহাপুরুষ হতে ভয় পেলাম—।

বাংলা ভাষার জন্য প্রথম প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন ঢাকায় আবুল বরকত। তাঁকে এবং ঢাকা শহরের ২১শে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন প্রত্যেক বাংলা-ভাষী সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করবেন। কলকাতায় স্মরণ অনুষ্ঠান অত্যন্ত অভিনন্দনযোগ্য।

ভারতে জার্মান লেখক

জার্মানির সঙ্গে ভারতবর্ষের সাহিত্যিক যোগাযোগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একাধিক জার্মান প্রকাশক ভারতীয় সাহিত্যের সংকলন অনুবাদ করিয়ে বার করেছেন এবং ভারতীয় সাহিত্য, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্য জার্মান পাঠকদের মধ্যে বেশ জন-প্রিয় হয়ে উঠছে।

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রও ভারতের সংস্কৃতি বিনিময়ের অঙ্গ হিসেবে ভারতীয় শিক্ষা দপ্তরের আমন্ত্রণে একজন প্রখ্যাত জার্মান সাহিত্যিক দু' মাসের জন্য এ দেশে এসেছেন। সম্প্রতি তিনি কলকাতা ঘুরে গেলেন।

উইলি মেইনক জার্মানির খুব জনপ্রিয় শিশু-সাহিত্যিক। তাঁর জন্ম ১৯১৪ সালে, জীবন শুরু করেছিলেন ছাপাখানার শিক্ষানবিশ হিসেবে এবং তখন থেকেই তাঁর লেখক হবার স্বপ্ন। ১৯ বছর বয়েসে নাৎসীদের আমলে তিনি ফরাসী দেশে পালিয়ে যান, সেখানে শুরু হয় ছন্নছাড়া জীবন, কখনো নিজের আঁকা ছবি বিক্রি করে, কখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান গেয়ে জীবিকানির্বাহ করেছেন, জাহাজ বন্দরে মজুরি এবং যুদ্ধে সৈনিকজীবনের অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে।

যুদ্ধের পর দেশে ফিরে এসে তিনি ইতিহাসচর্চা এবং লিখতে শুরু করেন। তাঁর ভাষা অত্যন্ত মধুর ও কবিত্বময় বলে শিশু পাঠকদের সব সময় টেনে রাখে।

মার্কো পোলোর অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে লেখা দুই খণ্ড তাঁর বই সারা ইয়োরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ও জনপ্রিয়। এ ছাড়াও তাঁর অন্য কয়েকটি বিখ্যাত বইয়ের নাম 'লাল মুক্তো', 'গোপন আলো', 'দ্বিতীয় জীবন'। তিনি বিভিন্ন দেশের গল্প উপকথা প্রবাদ নিয়ে লিখেছেন, এ দেশ ঘুরে যাবার পর ভারতবর্ষ কেন্দ্রিক কোনো বইও লেখার সম্ভাবনা আছে।

সনাতন পাঠক

পুরাতন স্মৃতিকথা

পুরাতন প্রসঙ্গ। বিপিনবিহারী গুপ্ত। সম্পাদক : বিশু মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১৭+৩৮৮ বিদ্যাভারতী। ৪-সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা-৯। বারো টাকা।

আমাদের অনেকেরই নিশ্চয় মনে মনে আছে—কিছু কিছু পুরোনো বই এই মুহূর্তে আবার আশু পুনর্মুদ্রিত হওয়া দরকার। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে একটি। অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল বইটি ছাপা ছিল না। কিন্তু তাহলেও পুরাতন প্রসঙ্গের পরিচয় নতুন করে দেবার কিছু নেই, বাঙলা বিদ্যার যে কোনো আগ্রহী পাঠকই অন্তত পরোক্ষভাবে এই বইয়ের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে বিশেষ অধ্যায়ের কথা এবং যে বিশেষ মানুষগুলির কথা এই বইয়ে আছে, সেই সময়ের সম্বন্ধে আর সেই ব্যক্তিদের বিষয়ে পরবর্তী কালে যত গুরুত্বের রচনা লেখা হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই এই পুস্তকের সাক্ষ্য সংগৃহীত হয়েছে। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত সে যুগের সাতজন প্রতিনিধিস্থানীয়ের স্মৃতিচারণ পরম নিষ্ঠাভরে এক সময়ে সংকলন করে রেখেছিলেন, একত্রিত হবার পর ঐ স্মৃতিচারণগুলি সেই সময়কার অপরিহার্য একখণ্ড সামাজিক ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায়। সেই সময়কার আশা-আদর্শ কর্ম-প্রযত্ন শিক্ষা-দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তার সার্বভৌম একটি পরিচয় ঐ স্মৃতিকথাগুলিতে আত্মগত ও খণ্ডিত পরিসরের মধ্যেই চমৎকার ফুটে ওঠে, যার জন্য বিপিনবিহারী গুপ্তকে শুধু সংকলক বলে তৃপ্তি হয় না, ঐতিহাসিক বলতে ইচ্ছা করে।

এই বইয়ে বিপিনবিহারী গুপ্তের কৃতিত্ব এতদূর স্বপ্রমাণিত যে, এতদিন পরেও এই মুহূর্তে তা নিয়ে আড়ম্বর করে আর বলার কোনো অর্থ হয় না। শ্রুতিলিখনের ভিতরেও তাঁর রচনা নিপুণতা বড় অদ্ভুতভাবে উৎসারিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেই রচনা-নৈপুণ্যের চেয়েও বেশি কৃতিত্ব বোধ করি তাঁর ব্যক্তিনির্বাচনে। যে সাতজন স্মৃতি-কথককে তিনি এই বইয়ের জন্য গ্রহণ করেছেন, সেই সময়কার বাঙলা দেশের চিন্তা-জগতের চতুঃসীমা তাঁদের দ্বারা রন্ধ্রহীন-ভাবেই বেষ্টিত হওয়া সম্ভব। এঁদের মধ্যে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য—যিনি এই বইয়ের দশ আনা পরিমাণ অংশের কথক—সেই সময়ের অন্যতম স্বনামধন্য মনীষী। সুশিক্ষিত সুতার্কিক ও যুক্তিনিষ্ঠ এই ব্যক্তিটি ছিলেন কোঁত-এর শিষ্য—পজিটিভিস্ট ব্রাহ্মণ সন্তান যিনি যৌবনে নিরুদ্দেশে বেরিয়েছিলেন, অসহায় মুহূর্তে বালকের মতো কোঁতকে ব্যক্তিগত দুঃখের পত্র লিখেছিলেন, বিদ্যাসাগরের পরমভক্ত ও অনুরাগী হয়েও চক্ষুষ্মানজনের মতো বিদ্যাসাগরকে বিচার করতে গিয়ে এমনকি অভিযুক্ত করতে কুণ্ঠা করেন নি, এবং বিহারীলালের অবোধবন্ধু কাগজে এমন দূরাভিলাষী রোমাঞ্চক বৃত্তান্ত লিখেছিলেন যা কিশোর রবীন্দ্রনাথকে কল্পনাতুর করে তুলেছিল। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু ও রাধামাধব কর বঙ্গরঙ্গ মঞ্চের আদি ও মধ্যপর্বের সঙ্গে ভয়ানক প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। আর রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তখন বাঙালী-জীবনের যোগ এত কাছের এবং এত প্রত্যক্ষ ছিল যে আজকের দিনে তা অনুমান করে বুঝতে হয়। ব্রজমোহন মল্লিক ও উমেশচন্দ্র দত্ত ছিলেন যথাক্রমে পুরোনো হিন্দু কলেজের ও কৃষ্ণনগর কলেজের কৃতী ছাত্র এবং উত্তরজীবনের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ্। আর সবশেষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যিনি ছিলেন [illegible] আত্মসমাহিত [illegible], এবং এক জায়গায় সুদূরপিয়াসী কবি (কৃষ্ণকমল তাঁকে শেলি-র সঙ্গে তুলনা করেছেন-পৃঃ ৪৪)—প্রতীচ্য ভাবধারার তরঙ্গসমারোহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিবিড় মমতায় যিনি প্রাচ্য ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ এই বইয়ে সেই সময়কার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার অন্তরবগূঢ় সাক্ষ্যদান করেছেন।

সেই সময়কার চিন্তাজীবীদের, সেই সময়কার সংস্কৃতিজীবীদের যা কিছু অধ্যাত্ম ও বহিরঙ্গ সমস্যা, সেই সময়কার জনচিত্তের যত জিজ্ঞাসা ও প্রবণতা, সেই

বিজ্ঞপ্তি

দেশ (সাপ্তাহিক)

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (সেণ্ট্রাল) রুলস-এর ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত সংবাদ প্রকাশিত হইল।

১। প্রকাশের স্থান—
৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১
২। প্রকাশকাল—
সাপ্তাহিক
৩। মুদ্রাকরের নাম—
শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
জাতি—
ভারতীয়
ঠিকানা—
১, বলরাম মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫
৪। প্রকাশকের নাম—
শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
জাতি—
ভারতীয়
ঠিকানা—
১, বলরাম মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫
৫। সম্পাদকের নাম—
শ্রীঅশোককুমার সরকার
জাতি—
ভারতীয়
ঠিকানা—
প্লট নং ৬, সি আই টি স্কীম নং ৫১
কলিকাতা—৫
৬। শতকরা এক ভাগ বা তাহার বেশী অংশের মালিকগণ—
১। শ্রীঅশোককুমার সরকার
২। শ্রীযুক্তা অলকা সরকার
৩। শ্রীঅভীককুমার সরকার
৪। শ্রীঅরূপকুমার সরকার
৫। নাবালক পুত্র শ্রীমান অধীপকুমার সরকারের পক্ষে অভিভাবিকা শ্রীযুক্তা অলকা সরকার

আমি, শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপর্যুক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর :
প্রকাশক—শ্রীসীতাংশুকুমার দাশগুপ্ত
তারিখ ১।৩।৬৭

সময়কার জাতীয় চরিত্র এবং সেই সময়কার সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অন্তঃস্রোত এই সাতজনের কথা থেকে অনেকখানিই ফুটে উঠেছে। যেসব উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ও যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঐ সময়কে স্মরণীয় করেছে তার অনেকগুলি সবই এখানে রয়েছে—আরো ভিতর থেকে প্রতিপাদিত হয়ে রয়েছে। সেই সময় বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় ১৮২৯ সাল থেকে শুরু হওয়া সময়, এই স্মৃতি কথাগুলির সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ কথক উমেশচন্দ্র দত্তের জন্মসাল ঐটি। আর ১৯১৩ সালে যখন এই সমাচারগুলি প্রকাশলাভ করে সেই সময় পর্যন্ত ধরা যায় ঐ কালের সীমা। কিন্তু মনে হয় মোটামুটিভাবে সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর হৃদয়স্পন্দন যেন এই বইয়ের পাতায় বেজেছে। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর আংশিক অন্তরঙ্গ আত্মপরিচয় হিসেবেও এই বইখানির উপরে অনেকখানিই যে নির্ভর করা যেতে পারে, তার প্রমাণ পরবর্তীকালের গবেষকেরাও কম দেননি।

কিন্তু শুধু তথ্যের খাতিরে নয়—তথ্যের দিক থেকে এতদিনে এই বইকে নিশ্চয় নানাদিক থেকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিবর্জন করার সুযোগ তৈরি হয়েছে—বিশুদ্ধ সাহিত্যকীর্তি হিসাবেই এই বইয়ের দাবি আমরা বিবেচনা করতে ইচ্ছা করি। বিপিনবিহারী গুপ্তের অভিপ্রায় মূলত কতদূর ঐতিহাসিক ছিল আমরা জানি না, কিন্তু এই বইয়ে নিছক ইতিহাসের থেকে অনেক বেশি তিনি লিখে ফেলেছেন। যেসব ব্যক্তিকে এখানে প্রসঙ্গত বর্ণনা করা হয়েছে তাঁরা সব জায়গাতেই অচিরে ইতিহাস থেকে সাহিত্যের চরিত্র হিসাবে নেমে এসেছেন। বিদ্যাসাগর বিহারীলাল দ্বারকানাথ মিত্র তারক পালিত থেকে শুরু করে যাঁদের কথা আরো কম জায়গা জুড়ে আছে সেই নবীন সেন হেমচন্দ্র অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রসন্ন সর্বাধিকারী প্রভৃতি সবাই অল্প দুয়েকটি কথা জীবন্ত চরিত্রের মতো আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কথকেরা যে ভাবে তাঁদের কথা বিবৃত করেছেন তার মধ্যে তাঁদেরও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের উত্তাপ পাওয়া যায়। বইয়ের মধ্যে বেশ কয়েকটি জায়গা স্পর্শাতুর সাহিত্যের মতো আমাদের ধরে রাখে। দ্বিজেন্দ্রনাথের ঘরের জন্য অনিবারণীয় পিছুটান, শ্রীরামপুরে স্টেশনে নিঃসঙ্গ দণ্ডায়মান দর্শনশাস্ত্রের অকৃতকার্য অধ্যাপক ডাক্তার জর্জ স্মিথ, রাধামাধব করের উক্তি : 'আমার পড়াশুনো শেষ হইয়া গেল; আমিও বাঁচিলাম; বই ফেলিয়া বাঁশি ধরিলাম', 'দীর্ঘকাল বিপুল বলিষ্ঠ গিরীশ ঘোষ'-এর জীবন ও মৃত্যু—এই রকম অবিস্মরণীয় অংশ বইয়ের মধ্যে বোধ করি আরো মিলবে। আর যা সব জায়গায় সমান বহমান তাহলো নিরঙ্কুশ ক্লান্তিহীন মস্তিষ্কচর্চা। এই সংস্করণের ভূমিকাকার যথার্থই বলেছেন, 'এ যেন ইতিহাস পড়া নয়, ইতিহাসের স্রোতের মধ্যে দিয়ে অবাধে সন্তরণ।'

দীর্ঘ তিপ্পান্ন বছর পরে পুরাতন প্রসঙ্গ পুনর্মুদ্রিত হলো। এর জন্য আমরা এই নতুন সংস্করণের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায়ের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। গোড়ায় দু খণ্ড আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, এখন সেই দু খণ্ড এবং তৎসহ অপ্রকাশিত তৃতীয় খণ্ড একত্রে মুদ্রিত হয়েছে। জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য এই সংস্করণে অধিকতর পরিমাণে পাদটীকা সংযোজিত হয়েছে এবং পরিশেষে বইয়ে-উল্লিখিত কতিপয় ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অধিকন্তু এই বইয়ের জন্য অনবদ্য একটি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী। বিপিনবিহারী গুপ্ত যেভাবে অব্যবহিত আগের ইতিহাসের সূত্রগুলি আদায় করেছিলেন এবং সংরক্ষণ করেছিলেন, সেই পদ্ধতিটি যে আমরা কখনোই স্মৃতি থেকে হারিয়ে ফেলিনি, এই বই পড়ে ওঠার পর সে কথা মনে আসা সম্ভব। পাঠক এর জন্য প্রায়-সমজাতীয় দু একটি বইয়ের কথা নিশ্চয় মনে মনে ভাববেন। অচিন্ত্য কুমারের কল্লোলযুগ সম্ভবত একটি। সুশীল রায় মনীষী-জীবন-কথা নামে যে বইখানি রচনা করেছিলেন, তার কথা। তা বাদে, পাঠকদের স্মরণে থাকতে পারে কিছুদিন আগে দেশ পত্রিকার পাতায় এইভাবের ধারাবাহিক কয়েকটি রচনা মুদ্রিত হয়েছিল। এই সব রচনার সাক্ষ্যে আমাদের মনে হয়েছে এই বইটিকে সব সময়েই বোধ হয় আমরা সযত্নে স্মৃতিতে রেখেছিলাম, এখন সশরীরে আবার হাতের কাছে পেয়ে আরো ভালো লাগলো।

প্রবন্ধ

রুশ সাহিত্যের রূপরেখা। গোপাল হালদার। এ মুখার্জি এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য : ১০·০০ টাকা।

বিশ্বসাহিত্যে রুশ সাহিত্যের স্থান আজ নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। ইংরেজী, ফরাসী ও জর্মন সাহিত্যের সমপর্যায়ের এ সাহিত্য—এ বিষয়ে সাহিত্যরসিকেরা বোধ হয় দ্বিমত নন। রুশ সাহিত্য বিচিত্র, বিশাল। সাহিত্যের সকল শাখায়—কাব্য, নাটক, কথা-সাহিত্য এবং অন্যান্য-এর যা অবদান তার তুলনা কেবলমাত্র উপর্যুক্ত তিনটি সাহিত্যের সঙ্গেই চলে। অথচ, পশ্চিম ইয়োরোপের ঐ তিনটি ভাষা ও জাতির সঙ্গে রুশ ভাষা ও রুশ জাতির মৌল প্রভেদ।

আজকের দিনে রুশ দেশ পৃথিবীর দুটি শ্রেষ্ঠ দেশের একটি। কিন্তু সে তো নিতান্ত আধুনিক কালের ব্যাপার। জারতন্ত্র খতম হবার আগে পর্যন্ত রুশ দেশ সম্পর্কে আগ্রহ ও অবহিতি এমন সার্বজনীন ছিল না। ইয়োরোপীয় অন্যান্য প্রধান দেশের তুলনায় এ-দেশ ছিল পশ্চাদপদ, অনুন্নত। কিন্তু, সাহিত্যে নয়। প্রমাণ, তলস্তয়, পুশকিন, গোগোল, তুর্গেনেফ, দস্তো-য়েফ্‌স্কি, চেখফ্‌।

রুশ সাহিত্যের জন্ম প্রায় হাজার বছর আগে। রুশদেশী সাহিত্য ছাড়া আর কোনো সাহিত্য নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশি প্রাচীনত্ব দাবি করতে পারে না।" অবশ্য এই হাজার বছরের আগেও রুশ-ভাষা ও রুশ সাহিত্য বর্তমান ছিল, তবে তা লিখিত নয়, মৌখিক লোকগাথা, লোক-সঙ্গীতের রূপে।

এই হাজার বছরের রুশ সাহিত্যের এক ধারাবাহিক পরিচিতি ঘটিয়েছেন বিদগ্ধ সাহিত্যিক শ্রীগোপাল হালদার মহাশয়। বিশটি বিস্তৃত পরিচ্ছেদে তিনি রুশ সাহিত্যের প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে সোভিয়েত রুশ সাহিত্যের বর্তমান কাল পর্যন্ত এক তথ্যপূর্ণ অসামান্য ইতিহাস রচনা করেছেন। পৌনে চারশো পৃষ্ঠার পুস্তকে বৈচিত্র্যময় রুশ সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা অবশ্যই সম্ভব নয়। শ্রীহালদার তা দাবিও করেননি; তিনি রুশ সাহিত্যের 'রূপরেখা' রচনা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য বাংলা ভাষায় রুশ সাহিত্যের প্রাথমিক পরিচয়-সাধন। কিন্তু রেখায় আঁকা হলেও রুশ সাহিত্যের প্রকৃত আদলটি তাঁর রচনায় একান্তভাবেই পরিস্ফুট। আর এ-ধরনের পরিচয়-সাধন বাংলা ভাষায় তথা ভারতীয় কোনো ভাষায় এই প্রথম।

প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে শ্রীহালদার এক একটি পরিচ্ছেদে রুশ সাহিত্যের এক একটি যুগ ও তার বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় তিনি মুখ্যত সাহিত্য এবং তৎসঙ্গে সংস্কৃতির অন্যান্য পরিচয় বিবৃত করেছেন। এক এক যুগের প্রধান প্রধান সাহিত্যসাধক, তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবন, চিন্তাধারা, সৃষ্ট সাহিত্য, সেযুগের ঐতিহাসিক পটভূমিকা, সমাজ-চিন্তা, রাজনৈতিক পরিবেশ, সমসাময়িক অন্য দেশীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকের প্রভাব ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত পরিসরে যতোটা সম্ভব বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রুশ সাহিত্যের, তথা বিশ্বসাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কসমূহ—পুশকিন, তলস্তয়, গোগোল, তুর্গেনেফ, দস্তোয়েফস্কি, চেখফ, গোর্কি—তাঁর আলোচনায় সঙ্গতরূপেই বেশি স্থান অধিকার করেছে। এবং এই সমস্ত দিক-পালদের কোনো রচনাই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি।

সোভিয়েত রুশ সাহিত্য সম্পর্কে এক দীর্ঘ পরিচ্ছেদে তিনি বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত সাহিত্যের মূল রূপটি এবং এর টানাপোড়েন অতি সরল ভাষায় সুন্দররূপে তুলে ধরেছেন। এই পরিচ্ছেদ ও পরবর্তী পরিচ্ছেদে সাহিত্যে সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা, যুদানভী অপচার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি যে-স্পষ্টভাষণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্রীহালদারের আলোচনা আগাগোড়াই অবজেকটিব—সম্পূর্ণ অস্পষ্টতা-বিবর্জিত।

"...রুশ সাহিত্য শুধু এক বিশাল মানব-সমাজেরই মনের বাহন নয়। মানুষের ইতিহাসে তা মানব-সংস্কৃতির, মানবাত্মার ও মানব-সৃষ্টির এক প্রধান প্রকাশ ও এক মহৎ গৌরব। বাস্তব-জীবনের স্বীকৃতিতে, সুগভীর মানব-মমতায়, সাধারণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধায় তা মহিমান্বিত। তাই সকল মানুষেরই তা গৌরব। তার পরিচয়ে প্রত্যেক জাতিরই আত্মপরিচয় গভীরতর হয়, প্রত্যেক সাহিত্যেরই সৃষ্টি-চেতনা নূতন দিগন্তের সন্ধান পায়।"। লেখকের এই বক্তব্যের যাথার্থ্য স্বীকার করে সেই মহান সাহিত্যে সম্যক্ পরিচিতি ঘটানোর কাজে তাঁর অবদানকে সাদরে বরণ করি। (৩৯৬/৬৬)

প্রাপ্তি স্বীকার

কৃষ্ণকুমারী ও নাট্যকার মধুসূদন। অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় সাহিত্য পরিষদঃ ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·৫০।

পর্যটনের চিত্রমালা। চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। যুগ সাহিত্য মন্দিরঃ ৩৭, কুটিঘাট রোড, কলিকাতা-৩৬। মূল্য ১·০০।

Divine Light—(A collection about Srimat Swami Yatiswarananda. Srimat Swami Yatiswarananda Study Circle: 11, D. S. Road, Calcutta-33. Price Rs. 5.00.

Cricket Delightful—S. Mustaq Ali. Rupa & Co: 15, Bankim Chatterjee St., Calcutta-12. Price 15.00.

Sarcar Maharajah of Magics. All India Magic Circle: 276-1 Rashbehari Avenue, Calcutta-19. Price Rs. 15.00

আইনস্টাইন। শ্রীমতী অতসী দেবী। অরিন্দম : ১৩ জুবিলী পার্ক, কলিকাতা। মূল্য ১·৭৫।

লোহার ঘোড়া চালাল যারা। এডিথ ম্যাককর্। অনুবাদ : ইন্দিরা দেবী। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী : এ১৩২-১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০।

চিন্তাশীল বাঘ। শৈল চক্রবর্তী। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানীঃ এ১৩২-১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০।

[illegible] রত্নেশ্বর হাজরা। বাংলা কবিতা প্রকাশনী : ১৪ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য ২·৫০।

[illegible]। শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী। কৃত্তিবাস প্রকাশনীঃ ৩২।২ যোগীপাড়া রোড, কলিকাতা-২৮। মূল্য ৩·০০।

শুক্র তাপসী। অমিয় চট্টোপাধ্যায়। জলসা পাবলিকেশনসঃ ১১২এ বালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলিকাতা-১৯। মূল্য ২·৫০।

মহাবঙ্গের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসঃ চট্টগ্রামী। শ্রীমৎ দীপককুমার সেনগুপ্ত। বিশ্বমন্দির প্রকাশনী : ৪৪এ সাহেবান বাগিচা (ক্লাইভ কলোনী), দমদম, কলিকাতা- ২৮। মূল্য ২·০০।

[illegible]। সামসুল হক। বাংলা কবিতা প্রকাশনী : ১৪ পদ্মপুকুর রোড, কলিকাতা-২০। মূল্য ৩·০০।

বিকল্প অর্ঘ্য। অসীম সোম। নবপত্র প্রকাশন : ৫৯ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·০০।

আকাশ ও মাটি। সঞ্জীব বসু। প্রতিমা পুস্তকঃ ১৩, কলেজ রো কলিকাতা-৯। মূল্য ১·৫০।

অন্য দেশের কবিতা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। অরুণা প্রকাশনীঃ ৭, যুগল-কিশোর দাস লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য ৩·০০।

ভুখ মিছিল। দিনেশ দাস। এভারেস্ট বুক হাউসঃ এ।১২।এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·০০।

হেমন্তকুমার প্রযোজিত "বিবি ঔর মকান" (পরিচালনা: হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়) এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—ছবির তিন-জন শিল্পী (বাঁ-দিক থেকে) কল্পনা, বিশ্বজিৎ ও শবনম

চলচ্চিত্রপঞ্জী

নির্বাক ও সবাক যুগের যে-সব চিত্র এ-দেশে তৈরি হয়েছে সে-সব ছবি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সম্বলিত একটি চলচ্চিত্রপঞ্জী প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দি ন্যাশনাল ফিল্ম আরকাইভস অব ইণ্ডিয়া। দুই খণ্ডে এই চলচ্চিত্রপঞ্জী প্রকাশ করা হবে। একটি নির্বাক চিত্রের, অপরটি সবাক ছবির। প্রতি ছবির শিল্পীতালিকা এবং বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার সহ যাবতীয় তথ্য এতে থাকবে। সংবাদে প্রকাশ, ১৯১৩ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত যত নির্বাক চিত্র তৈরি হয়েছে তার সব কয়টি সম্পর্কে আরকাইভস ইতিমধ্যেই তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

আরও জানা যায়, 'নাইট্রেট'-এ তোলা অতীত যুগের যে-সব ছবি নষ্ট হতে চলেছে **আরকাইভস সে-সব ছবির অনুসন্ধান** করেছেন। ইতিমধ্যে ২৭টি বিদেশী চিত্র সহ মোট ১৯৫টি ছবি আরকাইভস সংগ্রহ করেছেন। ভারতের স্বাধীনতালাভের আগে যুদ্ধের উপর তোলা ইনফরমেশন ফিল্মস অব ইণ্ডিয়া-র কিছু তথ্যচিত্র আরকাইভস ব্রিটেনের কাছ থেকে পেয়েছেন। সংস্থার সম্প্রতিক সভায় স্থির হয়েছে যে, নানা স্থানে লাইব্রেরী, সিনেমা, ল্যাবরেটরি প্রভৃতি স্থাপন করা হবে। এজন্য জমি ও গৃহের সন্ধান চলছে। এবং চলচ্চিত্রের উপর গবেষণার জন্য এবং চলচ্চিত্র-অনুশীলনের প্রসারের উদ্দেশ্যে আরকাইভস নগদ টাকার পুরস্কারের কথাও ভাবছেন।

বিদেশে ভারতীয় ছবির ব্যবসা

ভারতীয় ছবিতে আন্তর্জাতিক শিল্পী **না থাকলে, এবং এর প্রযোজনা-পরিকল্পনায়** রূপান্তর না ঘটলে পশ্চিম ইউরোপ **এবং** আমেরিকায় ভারতীয় ছবির ব্যবসার বিস্তার অসম্ভব। হলিউডের কিং ব্রাদার্স প্রোডাকশনস-এর সভাপতি শ্রীফ্র্যাঙ্ক কিং বোম্বাইয়ে এক সাংবাদিক-সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেন। শ্রীফ্র্যাঙ্ক কিং এবং তাঁর ভ্রাতা চিত্রপ্রযোজক শ্রীমরিস কিং কয়েকটি টেলিভিশন চিত্র নির্মাণের জন্য ভারতে এসেছেন। তাঁরা ইতিপূর্বে "মায়া" ছবির শুটিংয়ের জন্য এদেশে এসেছিলেন। তাঁদের মতে, পশ্চিমের ব্যবসা-ক্ষেত্রের জন্য ভারতীয় ছবির কলাকৌশলের মান যথেষ্ট উন্নত নয়। শ্রীফ্র্যাঙ্ক কিং বলেন, ভারতীয় চিত্রে আট-দশটি গান ছবির গতি ব্যাহত করে। এই অত্যধিক গানই ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি মারাত্মক দোষ।

সেণ্ট এলিজাবেথ স্কোয়ার

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা আয়োজিত চেক নিউ ওয়েভ চলচ্চিত্র উৎসবের একটি উল্লেখযোগ্য উপহার ছিল "সেণ্ট এলিজাবেথ **স্কোয়ার"। উপন্যাসের ভিত্তিতে ছবিটি**

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা আয়োজিত চেক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয় 'ভারটিগো' (উপরে বাঁয়ে), "ক্রাইম অ্যাট গার্লস স্কুল" (ডাইনে) এবং (নিচে) "ইফ এ থাউজ্যান্ড ক্ল্যারিনেটস"

তৈরী। তাই এতে গল্পের আবেদন আছে, এবং কিছু পরিমাণে নাট্যক্রিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে পরিচালক ভ্যাদিমির বাহ্না নাৎসী নির্যাতনের একটি চিত্র এঁকেছেন। যে-সব ইহুদী ও অ-ইহুদীরা চিরকাল বন্ধু ও প্রতিবেশী রূপে পাশাপাশি বাস করে এসেছে তারাই একদিন পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠল। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নাৎসী নীতিতে নিয়ন্ত্রিত। স্বার্থান্ধ কুচক্রীরা অন্যায়ের সঙ্গে হাত মেলাতে বিলম্ব করে নি। শাস্তি পেল কিছু সংখ্যক অসহায় নরনারী।

চিত্রকাহিনী স্লোভাকের একটি ছোট শহরে বিন্যস্ত। চিত্রনাট্যে রয়েছে অনেক চরিত্র। এদের মধ্যে প্রধান হল ইগোর ও ইভা নামে প্রণয়ী-যুগল। তাদের নিয়েই পরিচালক অতীতের এক বিরাট ট্র্যাজেডির গভীরতা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর প্রয়াস সার্থক। ছবিটি দর্শককে স্তব্ধ করে রাখে। তার বক্তব্য উপস্থাপনে এবং ব্যঞ্জনা প্রয়োগে পরিচালকের পরিমিতিবোধের অভাব দেখা গেল। ছবিতে আবর্তিত কালের প্রতীক হিসাবে বড় ঘড়ির ঘূর্ণায়মান চাকার ক্লোজ-আপ বারে বারে দেখানো হয়েছে। ভ্যাদিমির বাহ্না নাকি আগে প্রামাণিক চিত্রকার ছিলেন। পরিবেশের প্রামাণিকতা সৃষ্টির ব্যাপারে তাই সম্ভবত তাঁর বিশেষ নজর লক্ষ করার মত।

অল্প দিনের দুটি চেক ছবি দেখেছি। "দি হ্যাণ্ড" এবং "দি বেট"। "দি হ্যাণ্ড" (জিরি ট্রংকা পরিচালিত)। একটি রূপক-ধর্মী 'পাপেট' ছবি। মূর্তিকার হাতের 'পাপেট' হতে রাজী নয় এই ছবির 'পাপেট'টি। অপরের হস্তক্ষেপ তার কাছে অসহ্য।

'দি বেট' তরুণ-তরুণীর প্রাণপ্রাচুর্যের ছবি। বন্ধুর সঙ্গে বাজি ধরা, অপরিচিতা মেয়ের সঙ্গে ভাব করার গল্প নিয়ে এই ছবি। এক কথায়, নিষ্পাপ বন্ধুদের কাহিনী। ছবিটির প্রসাদগুণ মনকে অবশ করে।

ডারলিং

যে উল্লেখযোগ্য ইংরেজী ছবিটি গত সপ্তাহে এখানে মুক্তি পেয়েছে তার নাম "ডারলিং"। পরিচালক শ্লেসিঙ্গার গতানুগতিক রীতিতে ছবিটি পরিচালনা করেন নি। "ডারলিং"-এর নায়িকার পুরুষে পুরুষে অভিসার। কিন্তু সুখ ও শান্তি সে পায় নি। জীবন খুঁজতে গিয়ে বাঁচার আনন্দ তার অনাস্বাদিত রয়ে গেল। নায়িকার মুখ থেকেই দর্শক তার কাহিনী শুনেছেন। চিত্রনাট্যের এক একটি বাঁকে নেপথ্যভাষণ রয়েছে। পরিচালক নাটকীয়তার প্রচলিত পদ্ধতি বর্জন করে জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা স্রোতের মত, অনেকটা "রিপোর্টাজ"-এর ভঙ্গিতে, এক প্রমত্তা নারীর সুখাভিলাষ এবং ট্র্যাজেডি বিন্যস্ত করেছেন। দর্শকের কাছে এই অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নতুন নয়। তবে চিত্রপরিচালনার বৈশিষ্ট্য সবিস্ময়ে লক্ষ করার মত।

নায়িকার চরিত্রের রূপ দিয়েছেন জুলি

ক্লিন্ট অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন। ছবিতে তার দ্বিতীয় প্রণয়ী ডার্ক বোগার্ডের চরিত্রচিত্রণও অনবদ্য।

মোট তিনটি বিভাগে (চিত্রনাট্য ও কাহিনী নিয়ে) ছবিটি অস্কার পুরস্কারে সম্মানিত।

দিল-নে ফির ইয়াদ কিয়া

স্ত্রীর চেয়ে কি বন্ধু বড়? দুরূহ প্রশ্ন সন্দেহ নেই। "দিল-নে ফির ইয়াদ কিয়া"-র (রাওয়াল ফিল্মস) দুই নায়ক তথা দুই বন্ধুর মধ্যে আমজাদ (রেহমান) সহজেই প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বন্ধুর কাছে স্ত্রী কেউ নয়। ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত অশোককে (ধর্মেন্দ্র) সুস্থ করে তোলার জন্য আমজাদ নির্দ্বিধায় তার স্ত্রী শবনমকে (নূতন) বলে দিয়েছে, তুমি অশোকের প্রেয়সী সেজে তাকে সঙ্গ দাও, সেবা কর। আমজাদ জেনেছে, অশোকের প্রেয়সী আশো, যে ট্রেন-দুর্ঘটনায় নিহত, দেখতে ছিল হুবহু শবনমের মত। বলা বাহুল্য, নূতনের দ্বৈত ভূমিকা এ ছবিতে। পরে প্রকাশ পেয়েছে, ওরা ছিল যমজ বোন এবং শিশুকাল থেকেই আশো ছিল নিখোঁজ। যাক্, এদিকে শবনমের অবস্থা অনুমেয়। আমজাদ ও শবনম ভালবেসেই বিয়ে করেছিল। [illegible] বলেছে, যেদিন তাকে অন্যের মেহ্‌বুবা সাজতে হবে সেদিন যেন খোদা তাকে বাঁচিয়ে না রাখেন। কিন্তু বন্ধুপ্রেমে আমজাদ অটল। স্ত্রীর কাছে তার কঠোর দাবি, বন্ধুকে বাঁচাতেই হবে।

বন্ধু বাঁচল, শবনমকে আশো ভেবে আমজাদের সঙ্গে সাময়িক ঝগড়াও হল। পরে সব কথা জেনে এবং বন্ধুর আত্মত্যাগের পরিচয় পেয়ে তার অনুশোচনার শেষ নেই। সব জানাজানির পর অবশ্য অশোক বন্ধু-দম্পতির সঙ্গে সুখেই বাস করতে পারত। কারণ তার মনে শবনমের জন্য কোন অনুরাগ থাকার কথা নয়, এবং এর ইঙ্গিতও কিছু নেই। (এ ধরনের জটিলতা বুঝি আশা করাও অন্যায়।) কিন্তু বিরহী প্রেমিকারূপে নায়ক হিন্দী ছবিতে বেঁচে থাকতে পারে না। অতএব অশোককে মরতে হল তার খলচরিত্র সংভাইয়ের হাতে —যে আশোর পিছনে দুষ্টগ্রহের মত বরাবর ঘুরেছে এবং শবনমকে আশো ভেবে তাকে অপহরণ করতে চেয়েছিল। অশোকের মৃত্যুর সঙ্গে অবশ্য ভিলেনেরও বিনাশ ঘটেছে। শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, মৃত্যুর ওপার থেকে আশো গাইছে 'মেহ্‌ দিল হৈ মুহব্বতকা আজা'।

এই আজব কাহিনী সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পরিচালক সি এল রাওয়াল বহির্দৃশ্যস্থল সুন্দর নির্বাচন করেছেন। ইস্টম্যান কালারও ভাল। এবং নূতনের অভিনয় চমৎকার। তা ছাড়া ছবিতে আছে একগাদা গান। অবশ্য সোনিক ওমির সুরারোপিত দু-একটি গান জনপ্রিয় হতে পারে।

ছবির পর ছবি

"চিড়িয়াখানা" সত্যজিৎ রায় নিজেই পরিচালনা করছেন। ছবির শুটিং প্রায় শেষ। গত সপ্তাহে চিড়িয়াখানা আউট ডোরের কাজ আরম্ভ হয়েছে। কলকাতার অদূরে আউটডোর শুটিং-এর জন্য 'গোলাপ কলোনি' নামে একটি কলোনি বহু অর্থব্যয়ে তৈরী হয়েছে। কাহিনীর (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত) প্রধান ঘটনার দৃশ্য ওই কলোনিতেই নেওয়া হয়েছে। উত্তমকুমার ছবির নায়ক।

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "এই তীর্থ"-র চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "এই তীর্থ" কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক।

অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, সন্ধ্যারানী, জহর রায়, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাগতা মিতা দাশগুপ্ত, লক্ষ্মণ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম ঘোষ প্রভৃতি ছবির প্রধান শিল্পী। সংগীত পরিচালক হলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ছবির গানে কণ্ঠদান করেছেন শ্রী মুখোপাধ্যায়, মান্না দে ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছায়ারূপার প্রথম নিবেদন "প্রথম বসন্ত" ছবির কাজ নির্মল মিত্রের পরিচালনায় দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

প্রথম বসন্ত ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। সংগীত পরিচালনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, অনিল চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অজয় গাঙ্গুলী, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, ভারতী দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

এম বি প্রোডাকশন্স-এর দ্বিতীয় প্রয়াস "প্রতিদান"। 'মধ্যরাতের পরিবার' ও 'উত্তর-পুরুষ'-খ্যাত অজিত গাঙ্গুলী ছবিটি পরিচালনা করছেন। ভূমিকায় আছেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কাজল গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী, অনুভা গুপ্ত, ছায়া দেবী ও রুমা গুহ-ঠাকুরতা। শৈলেন মুখোপাধ্যায় ছবির সুরকার।

প্রতিদান

মাতৃমন্দির ছায়াচিত্রমের "মা ছিন্নমস্তা" ছবিটি দ্রুত সমাপ্তির পথে। ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সন্তান পরিষদের পক্ষে ভূপেন রায় এবং সংগীত পরিচালনা করেছেন রথীন ঘোষ।

মা ছিন্নমস্তা

চরিত্র রূপায়ণে আছেন মিহির ভট্টাচার্য, অসীমকুমার, সুবীরা রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সমিত বসু, প্রিয়া চট্টোপাধ্যায়, গীতা দে, লীলাবতী দেবী (করালী), গঙ্গাপদ বসু, জীবন ঘোষ, স্বপনকুমার, গোপা ভৌমিক, রথীন মজুমদার, শঙ্করনারায়ণ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, সীমা রায়চৌধুরী ও ডাঃ তপন চট্টোপাধ্যায়।

সম্প্রতি এই গোষ্ঠী রাজারাপ্পায় মা

আর ডি বনশালের "ঝুক গয়া আসমান" ছবির নায়ক-নায়িকা রাজেন্দ্রকুমার ও সায়রা বানু

ছিন্নমস্তার মন্দির এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ছবিটির বহির্দৃশ্য তুলে ফিরে এসেছেন।

"সুভাষচন্দ্র"-র পর এ কে বি ফিল্মস-এর নতুন প্রয়াস "মহাবিপ্লবী অরবিন্দ"-র শুটিং আরম্ভ হয়েছে। সম্প্রতি শেখর চট্টোপাধ্যায় ও শমিতা বিশ্বাসকে নিয়ে ছবির একটি বিশেষ দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। শ্রী চট্টোপাধ্যায় ছবিতে এক পুলিস ইনসপেকটরের ভূমিকায় রয়েছেন। শমিতা বিশ্বাস যে ভূমিকায় অভিনয় করছেন তা বাহ্যত বারবণিতার হলেও আসলে দেশপ্রেমিকার। দীপক গুপ্ত চিত্রপরিচালক। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের।

মহাবিপ্লবী অরবিন্দ

শচীন ভৌমিক চিত্রপ্রযোজক-পরিচালক হচ্ছেন [illegible] চিত্রনাট্যকার হিসাবে এতদিনে তিনি সুপরিচিত হলেন। তাঁর রচিত "অনুরাধা" রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক পেয়েছিল। তাঁর পরিচালনা ও প্রযোজনায় যে ছবিটি তৈরি হচ্ছে তাতে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবেন বিশ্বজিৎ ও কল্পনা। রাহুল দেববর্মণ সুরকার।

ফিল্ম ক্র্যাফট-এর "পঞ্চশর" (পরিচালনায় : অরুণ গুহঠাকুরতা) ছবির নায়িকা রুমা গুহঠাকুরতা [illegible]

[illegible] "যশ"

[illegible]

অভিনয়-দক্ষতা দেখিয়েছেন। কয়েকটি প্রধান চরিত্রে রয়েছেন মণি শ্রীমানী, তমাল লাহিড়ী, দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়। এঁদের প্রত্যেকের অভিনয়ই উচ্চস্তরের। অমিয়কান্তির কৌতুকাভিনয় এবং টাইপ চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা খুবই প্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্রে কল্পনা ভট্টাচার্য, রবীন ঘোষাল, প্রণব চৌধুরী, জগৎপতি মুখোপাধ্যায়, পিন্টু চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সু-অভিনয় করেছেন।

মঞ্চসজ্জা অনাড়ম্বর। রবীন ঘোষ রচিত আবহসুর নাট্যমর্মানুগ।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনীচিত্র

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-কাহিনী নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তৈরী হচ্ছে। ফিল্ম ইণ্টারন্যাশনাল ছবিটির প্রযোজক। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, যেখানে স্বামীজী গিয়েছিলেন ও বক্তৃতা করেছিলেন, ছবির দৃশ্য গ্রহণ করা হবে। অল্পকালের মধ্যেই চিকাগোতে দৃশ্য তোলার জন্য একটি ইউনিট আমেরিকা রওনা হচ্ছেন। ছবির দুটি মুখ্য চরিত্রে থাকবেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্যোতির্ময়।

সাংস্কৃতিকী

'দরবেশ' নাট্যসংস্থার সভ্যরা হাতীবাগানে নতুন গৃহে প্রবেশ উপলক্ষে এক ঘরোয়া বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন। মঞ্চ ও চিত্র জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সংস্থার সম্পাদক এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে কীভাবে এঁরা জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তার উল্লেখ করেন। আমেরিকা সফরকালে নাট্যাচার্য শিশির-কুমারের অভিনয় সম্বন্ধে যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ওদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার ফটোস্টাট কপি এই অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করেন আর্কাইভসের পক্ষ হতে শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়। বীরেন বসু, জ্ঞান বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বাতী দত্তর কণ্ঠসংগীত এবং জগন্নাথ চৌধুরীর কৌতুক পরিবেশন বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শেষে ঘোষণা করা হয় যে, সংস্থার পরবর্তী নাট্যপ্রয়াস বিনয় লাহিড়ী রচিত "ডিউটি"। রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট গল্প এই নাটকের ভিত্তি।

লক্ষ্ণৌতে বেঙ্গলী ক্লাব ও যুবক সমিতি আয়োজিত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি নাট্য প্রতিযোগিতা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বসমেত ১৬টি নাট্য সংস্থা প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন। যাযাবর

চলচ্চিত্রায়ণের "আকাশ ছোঁয়া" (পরিচালনা : রাজেন তরফদার) ছবির নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরী

ছায়াছবি প্রতিষ্ঠানের "প্রস্তর স্বাক্ষর" (পরিচালনাঃ সলিল দত্ত) ছবির নায়িকা সন্ধ্যা রায়

গোষ্ঠী (দিল্লী) প্রযোজিত 'ক্যাম্প থ্রী' প্রথম পুরস্কার ও অযান্ত্রিকের (চিত্তরঞ্জন) 'শুধু ছায়া' দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করে। সপ্তস্বরার (চিত্তরঞ্জন) রতন চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠ পরিচালনা ও 'কবে বসন্ত আসবে' নাটকে বংশীর ভূমিকায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার লাভ করেন। রূপচক্র (কলিকাতা) প্রযোজিত "সম্রাট" নাটকে তরঙ্গের ভূমিকায় মমতা চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, 'ক্যাম্প থ্রীর' চ্যাটার্জির ভূমিকায় দিলীপ ঘোষ শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা এবং 'শুধু ছায়া' নাটকে দীপার ভূমিকায় ইলা ঘোষ শ্রেষ্ঠ সহ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করেন। পদ্মভূষণ ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বিচারপতি ও উর্দু কবি পণ্ডিত আনন্দ-নারায়ণ মুল্লা

পাঠকের চোখে

ওয়ালট ডিজনি, জুলি অ্যানড্রুজ এবং 'অসকার'

'দেশে' ওয়ালট ডিজনি প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে—"ডিজনি মোট ৩৯ 'অসকার' এবং প্রায় ৮০০ অন্যান্য পুরস্কার লাভ করেন।" 'নিউ ইয়র্ক' হেরালড ট্রিবিউন' জানিয়েছেন —"he received more than 900 awards including 31 Oscars." আবার 'নিউ ইয়র্ক' টাইমস' ডিজনিকে 'গৌরবান্বিত' করেছেন "Winner of 27 Oscars" বলে। অসকার-বিষয়ক একটা বইতে লেখা আছে ডিজনী মোট ২৫টা অসকার (১১টা কারটুনে; ৭টা লাইভ অ্যাকশন শর্ট সাবজেক্ট-এ; ৪টা ডকুমেণ্টারি ফিচারে এবং ৩টা ডকুমেণ্টারি শর্ট-এ) লাভ করেন। এখন কোন্ খবরটা অভ্রান্ত বলে ধরবো?

'দেশে' "সাউণ্ড অব মিউজিক" ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে—" জুলি অ্যান্ড্রুজ (এই ছবির অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর 'অসকার' পেয়েছেন)..."

এটা ঠিক নয়। "সাউণ্ড অব মিউজিক" ১৯৬৫-র ছবি। এতে অভিনয়ের জন্যে কেউ 'অসকার' পান নি, তবে এ ছবি ৫টা অসকার লাভ করেছিল (বেস্ট পিকচার, বেস্ট ডিরেক্টর, বেস্ট সাউণ্ড, বেস্ট এডিটিং এবং বেস্ট মিউজিক্যাল স্কোর)। জুলি অ্যান্ড্রুজ শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর অসকার পান আগের বছর। সেও ওয়াল্ট ডিজনিরই ছবি "মেরি পপিনস"-এ। 'সাউণ্ড অব মিউজিক' পরের বছরের (১৯৬৫) ছবি। এ বছর যিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর অসকার পান তাঁর নামও জুলি—জুলি ক্রিস্টি। যে-ছবিতে অভিনয়ের জন্যে এ পুরস্কার, তার নাম "ডার্লিং"।

অরুণকুমার মিত্র
কলিকাতা-৬

বিবিধ প্রসঙ্গ

চল্লিশটি দেশের চিত্র সমালোচকরা চার্লি চ্যাপলিনের "গোল্ড রাশ"কে এ পর্যন্ত তৈরী সকল কমেডি ছবির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে চিহ্নিত করেছেন। এই ভোটের ব্যবস্থা করেছিলেন ক্যানাডিয়ান ফিল্ম আরকাইভস।

ইটালিতে কার পারিশ্রমিক কত? বর্তমানে সোফিয়া লোরেন নিচ্ছেন ১,০০০,০০০ ডলার। মার্চেলো মাস্ত্রোয়ানির দক্ষিণা ২৫০,০০০ ডলার। তাঁর পরেই রয়েছেন ভিত্তোরিও গ্যাসম্যান—২০০,০০০ ডলার। ক্লদিয়া কার্দিনাল ও ভিরনা লিসি নিচ্ছেন ৩০০,০০০ ডলার। জিনা লোলোব্রিজিদা ও মণিকা ভিত্তির পারিশ্রমিক ২০০,০০০ ডলার। পরিচালকদের মধ্যে সব চাইতে বেশী পারিশ্রমিক ফেদারিকো ফেলিনির। তিনি নেন ৩৭০,০০০ ডলার। ডি সিকা, পিয়েত্রো জার্মি ও সার্জিও লিওন নেন ২৫০,০০০ ডলার। ভিসকন্তি, আন্তোনিওনি ও রোজির পারিশ্রমিক ১৬০,০০০ ডলার।

"তীরভূমি" (পরিচালনাঃ গুরু বাগচী) ছবিতে জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

অরণ্যদেব লী ফক

ব্যাঙ্কক-ডাকাতরা পালাচ্ছে ---
এ কী রাস্তা রে বাবা, গাড়ি চালাব কী করে?
প্রায় এসে পড়েছি।

এই তো জো! ঘোড়াও রয়েছে!
সাবাশ জো!

এই তো ব্যাঙ্ক-ডাকাতদের গাড়ি! এখান থেকে ঘণ্টা তিন-চার আগে তারা ঘোড়ায় উঠে পিটটান দিয়েছে।
গাড়ি করে তাদের পিছু নেওয়া অসম্ভব। না হলে, তারা এখন আমাদের এলাকাও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এ কী জায়গা রে বাবা!
চি-হি-হি-হি-
মাল পুঁতে রেখে এখন সরে পড়া যাক।
না না, আর-একটু এগোতে হবে।

এইখানে মাল পুঁতে রাখা যাক।
হ্যাঁ, ওই খুলির মতন গুহাটা দেখে জায়গাটাকে পরে চেনা সহজ হবে।
৩/৪

এখন মাল পুঁতে রাখি। পরে, সুবিধেমতন এখানে ফিরে এসে ওটা তুলে নেওয়া যাবে।
কুড়ি লক্ষ ডলার!
রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাব-

ব্যাপার কী! ঘোড়াগুলো অমন করছে কেন?
নিশ্চয় কোনও বন্য জন্তুর গন্ধ পেয়েছে!
চি-হি-হি-

কাছেই কাটিনার পিঠে রাজা আর টমটম।
ঘোড়া!

কাছেই হবে, কাটিনার গন্ধ পেয়ে চেঁচাচ্ছে।
কার ঘোড়া? রাজা, আমার ভাল লাগছে না, ফেরা যাক।

সাপ্তাহিক সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বিধান সভার সদস্য নির্বাচন এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই সপ্তাহের মুখ্য আলোচনার বিষয়। এই রাজ্যে বিধান সভার মোট সদস্য-সংখ্যা ২৮০। তন্মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ১২৭টি আসন; বাকী ১৫৩টি আসনের মধ্যে বাম কম্যু—৪৪, ডান কম্যু—১৬, ফঃ ব্লঃ—১৩, বাংলা কংগ্রেস—৩৪, পি এস পি—৭, এস এস পি—৭, আর এস পি—৬, এস ইউ সি—৪, এল এম এস—৫, গোরখা লীগ—২, ওয়ারকারস পার্টি—২, জনসংঘ—১, স্বতন্ত্র—১, ফঃ ব্লঃ মাঃ—১, নির্দল—১০টি আসন লাভ করেছে। কংগ্রেস শুধু যে নিরংকুশ 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়েছে এমন নয়, মুখ্যমন্ত্রী সহ একাধিক কংগ্রেস দিকপালেরও পতন ঘটেছে। এবারের নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেসের সাফল্য রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং কংগ্রেসের প্রতি জনগণের সামগ্রিক অনাস্থার বহিঃপ্রকাশ ও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রসংগত উল্লেখ করা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভার ৪০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস মাত্র ১৪টি আসন পেয়েছে এবং বাংলা কংগ্রেস সহ অন্যান্য বামপন্থী ফ্রন্ট বাকী ২৬টি আসন লাভ করেছে।

দেশী সংবাদ—

২০ ফেব্রুয়ারি—ভারতের জরুরী খাদ্য চাহিদা মেটাবার জন্য ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পাবে। এ সম্পর্কে আজ উভয় সরকারের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নতুন চুক্তি অনুসারে ভারত ১২ লক্ষ টন গম, ৮ লক্ষ টন মাইলো এবং সয়াবিন তৈল ও চর্বিজাতীয় পদার্থ ৩০ হাজার টন করে পাবে।

২১ ফেব্রুয়ারি—গত কয়েকদিন ধরে সশস্ত্র বৈরী নাগারা ব্রহ্ম সীমান্তবর্তী মণিপুরের টেংনুপল মহকুমার চাকপিকারং গ্রামে গ্রামবাসীদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি ও থানা চড়াও করতে থাকায় সৈন্য দলকে চাকপিকারং-এ পাঠানো হয়েছে।

কলকাতা শহরে বে-আইনী বাড়ি তৈরি রোধ বা ভাংগা অভিযানে কলকাতা পৌর-কর্তৃপক্ষকে পুলিস সহযোগিতা করতে বাধ্য—এই মর্মে ডিরেকটর অফ পাবলিক প্রসিকিউশন এক অভিমত দিয়েছেন। অভিমতে বলা হয়েছে যে, এ সহযোগিতা পুলিসের অন্যতম ডিউটি।

২২ ফেব্রুয়ারি—বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য যোজনা কমিশন পঞ্চাশ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে সম্মত হয়েছেন। তবে চূড়ান্ত অনুমোদন এখনও হয়নি। আজ বেংগল চেমবার অব কমারস অ্যানড ইনডাসট্রির সাধারণ বার্ষিক সভায় ভাষণকালে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই মন্তব্য করেন।

ভারতে যে সব দোকানের মারফত পি এল ৪৮০ অনুযায়ী আমদানি করা খাদ্যশস্য বিক্রি করা হবে, সেগুলিতে এই মর্মের নোটিস টাঙ্গাতে হবে যে, সুবিধা দরে আমেরিকার দেওয়া 'শান্তির জন্য খাদ্য' বিক্রি করা হচ্ছে। ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, এটি তার অন্যতম শর্ত।

২৩ ফেব্রুয়ারি—আজ রাত্রে চলন্ত ট্যাকসি থেকে একজন বন্দুকধারী লোক আসামের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির প্রহরীদের উপর গুলি চালায়। পুলিস-সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, দুর্বৃত্তেরা পাঁচটি গুলি ছুঁড়েছিল।

গতকাল শহরে একদল অজ্ঞাত পরিচয় দুর্বৃত্ত একটি খাসি খণ্ডজাতি বালককে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছিল।

কেরলে সপ্তদলের যুক্ত ফ্রনটের স্রষ্টা ও মারকসবাদী কমিউনিসট পার্টির নেতা শ্রী ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ আজ এরনাকুলমে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, কেরলে যুক্ত ফ্রনটের পার্টিগুলির কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা আগামী দশদিনের মধ্যে গঠিত হবে।

২৪ ফেব্রুয়ারি—"ভারতের ১৪টি ভাষাকেই সরকারী ভাষা বলে গণ্য করার জন্য এবং অনির্দিষ্টকাল ইংরেজীকে যোগসূত্রের ভাষা রাখার জন্য যাতে উপযুক্তভাবে সংবিধান সংশোধন করা হয়, দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম দল সেই দাবি আবারও জোরের সংগে জানাবে।" নির্বাচনে বিজয়ী মাদ্রাজের দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাগাম দলের নেতা মিঃ সি এন আন্নাদুরাই আজ সাংবাদিকদের কাছে এই সিদ্ধান্ত জানান।

হায়দরাবাদের নিজাম আসফজাহ মুসাফিরুল-মুল্‌ক-ওয়াইমিলাক নবাব স্যার ওসমান খাঁ বাহাদুর ফতেজং আজ ৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। কোন স্কুল-কলেজে তাঁর শিক্ষালাভ ঘটেনি। স্বগৃহে ইংরেজ শিক্ষক এবং মৌলবীর নিকট তিনি শিক্ষালাভ করেন। একদা তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনীব্যক্তি বলে পরিচিত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে ভারত হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে পুলিসী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণার সংগে সংগে সমস্ত সরকারী ভবনে পতাকা অর্ধনমিত হয়। তিনি ২১বার তোপধ্বনি পাবার অধিকারী ছিলেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি—পশ্চিম বাংলায় নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয় আলোচনার জন্য রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, আজ সকালে নতুন বিধানসভার অ-কংগ্রেসী সদস্যরা এক সভায় মিলিত হয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায়কে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের নেতা নির্বাচিত করেছেন।

ওড়িশায় স্বতন্ত্র জনকংগ্রেস গোষ্ঠী রাজ্য বিধানসভায় নিরংকুশ গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এবং এই রাজ্যে প্রথম অ-কংগ্রেসী কোয়ালিশন সরকার গঠনের সংকল্প গ্রহণ করেছে। ওড়িশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজু পট্টনায়ক পাতকুড়া বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র থেকে শ্রীচক্রধর সংপাথির (পি এস পি) কাছে পরাজিত হয়েছেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি—বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পানজাবে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠন সম্পর্কে বিরোধী দলগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলছে এবং এ সম্বন্ধে উদ্যোগ আয়োজনও শুরু হয়েছে। কেরলে সাতটি দল নিয়ে গঠিত সংযুক্ত বাম-ফ্রনট সরকার গঠন করবেন এবং বাম কমিউনিসট দলের নেতা শ্রী ই এম এস নামবুদিরিপাদ এই মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করবেন।

যে মন্ত্রিসভায় বাম কি দক্ষিণ যে কোন রকমের কমিউনিসট থাকবে তাতে আমরা যোগ দেব না। বিহারের নব-নির্বাচিত জনসংঘ ও পি এস পি এম এল এ-রা এই মনোভাব নিয়েছেন।

বিদেশী সংবাদ

২০ ফেব্রুয়ারি—এককালে ইনদোনেশিয়ার সর্বেসর্বা, বর্তমানে মারদেকা প্রাসাদে প্রায় অন্তরীণ প্রেসিডেনট সুকর্নর ভবিষ্যৎ আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে জানা যাবে। একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার জন্য রেডিও ও সংবাদপত্রগুলিকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

২১ ফেব্রুয়ারি—চীন সরকারের শীর্ষস্থানীয় নেতারা আজ স্বীকার করেছেন যে, পিকিং, সাংহাই এবং ভিয়েন-সিনের মত গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে চেয়ারম্যান মাও সে-তুংয়ের সপক্ষে ক্ষমতাদখল সম্পূর্ণ হয়নি, জানাচ্ছেন রয়টার।

২২ ফেব্রুয়ারি—জয়ন্তী শিপিং কোম্পানীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীধর্মতেজাকে আমেরিক্যান ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ নিউইয়র্কে গ্রেফতার করেছেন। কয়েকটি অভিযোগ সম্পর্কে তার নামে শমন আছে। ভারতে পাঠাবার জন্য তেজাকে হাজতে রাখা হয়েছে। শ্রীমতী তেজাকেও ঐ সংগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাঁকে এক হাজার ডলারের জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি—প্রেসিডেনট কেনেডির হত্যাকারী সন্দেহে জেলা এটর্নি জিম গ্যারিসন যাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করছিলেন, তাঁদের মধ্যে মুখ্য সন্দেহভাজন শ্রীডেভিড ফেরীরকে আজ তাঁর ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

২৪ ফেব্রুয়ারি—সোভিয়েট সংবাদ সংস্থা 'টাস' গতকাল জানিয়েছেন যে চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর সমর্থকরা এখন চীনের বাইশটি প্রদেশের মধ্যে খুব বেশী হলে আটটি প্রদেশ, আর মাত্র গোটা কয়েক শহর দখল করে আছে। 'টাস' আরও বলেছে যে, বহু অঞ্চলে লালরক্ষীরা প্রতিরোধ ভাঙতে পারছে না।

২৫ ফেব্রুয়ারি—"আসাহি শিমবুনের" ফরমোজাস্থ সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মাও-বিরোধীরা হোনান প্রদেশের কাইকেং, চেং চাউ, লয়াং এবং নানিয়াং শহরে দখল করেছে। লালফৌজ এই কাজে তাদের সমর্থন করে।

২৬ ফেব্রুয়ারি—মার্কিন সামরিক কমানড ঘোষণা করেছেন যে, সপ্তম নৌবহর উত্তর ভিয়েতনামের অভ্যন্তরে সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর নিয়মিতভাবে গোলাবর্ষণ শুরু করবে।' এছাড়া বোমাবর্ষণও চলতে থাকবে।

সূচীপত্র

স্মরণীয় ৭
অ্যাসোসিয়েটেড-এর
প্রকাশিত

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীমতী উমা দাশ

F 3218

৩১ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৯

শনিবার ২৬ ফাল্গুন ১৩৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
আনন্দবাজার পত্রিকা [illegible]
[illegible]
[illegible]
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিফোন
[illegible]

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

ভারতে

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক "	১৪.০০
ত্রৈমাসিক "	৭.০০

পাকিস্তানে
(ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক সডাক	২৭.০০
ষাণ্মাসিক "	১৪.০০
ত্রৈমাসিক	৭.০০

ভারতের বাইরে
(জাহাজ-ডাকে)

বার্ষিক সডাক	৪৬.০০
ষাণ্মাসিক "	২৩.০০
ত্রৈমাসিক "	১১.৫০

এশিয়া-অঞ্চলে
(বিমান-ডাকে)

বার্ষিক	৩১.০০
ষাণ্মাসিক	১৬.০০
ত্রৈমাসিক	৮.০০

দাম ৫০ পয়সা
ভারতে বিমান মাশুল (অতিরিক্ত) ৫ পয়সা

DESH

Saturday 11 March, 1967

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি নতুন পর্বের সূচনা হল। বাংলা কংগ্রেসের নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হল অ-কংগ্রেসী সরকার। এবারে নির্বাচনের পর অনেকগুলি রাজ্যেই কংগ্রেসদলের বিপর্যয় ঘটেছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে।

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে নতুন অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হল তার মধ্যে বামপন্থী বিভিন্ন দলগুলির একাধিক নেতা ছাড়াও রয়েছেন বর্ষীয়াণ, প্রবীণ নেতা নির্দলীয় ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। মন্ত্রিদপ্তরের যে দায়দায়িত্ব বিভিন্ন নেতার হাতে অর্পণ করা হয়েছে তার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ছাড়াও ডঃ ঘোষের প্রশাসন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে। অন্যদের যদিও তা নেই তবু শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, শ্রীহেমন্তকুমার বসু-র মতন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে প্রশাসনের দায়িত্ব বহন গুরুভার হবে না বলেই মনে করি।

অ-কংগ্রেসী সরকার তাঁদের কর্মনীতি মোটামুটি ঘোষণা করেছেন। এটা বোঝাই যায়, ভিন্ন আদর্শ ও লক্ষ্যের মধ্যে একটা মোটামুটি মিল বা কাজ করার একটা মিলিত কর্মসূচী আগে স্থির করে নিতে না পারলে তাঁরা কাজ করতে পারতেন না। বলা বাহুল্য, সেইভাবে এঁরা একটি মিলিত কর্মসূচী স্থির করে নিয়েছেন। এই কর্মসূচীর অনেকগুলি দফা—তার মধ্যে প্রধান হল: দুর্নীতির উচ্ছেদ, খাদ্য, বস্ত্রের ব্যবস্থা করা, শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যও। বাসস্থানের প্রতি দৃষ্টি এইরকম কয়েকটি। এর মধ্যে বেকার সমস্যার সমাধান, উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনও ধরে নিতে হবে।

একটা বিষয় সম্পর্কে আমাদের প্রথমাবধি নির্মোহ হওয়া ভাল। পশ্চিমবঙ্গ নানা সমস্যায় জর্জরিত একটি রাজ্য। এর ব্যাধি যদি একটি হত তবে তার প্রতিকার যে-কোনো শাসকদলের পক্ষে অচিরাৎ করে ওঠা সম্ভব ছিল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা যখন নয়, সমস্যা বহু, এবং তার সমাধানও জটিল তখন রাতারাতি কিছু হবার উপায় নেই। পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাবস্থার—যে যাই বলুন—এক রাত্রের নোটিশে উন্নতি করা সম্ভব না। বা এ-রাজ্যে যে ভয়াবহ বেকার সমস্যা রয়েছে তার সমাধানও অক্লেশে করা সম্ভব নয়। আমরা মনে করি, আমাদের মতগুলি প্রধান সমস্যা তার কোনোটিই সহজে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করার মতন নয়। কাজেই নতুন মন্ত্রিসভা যে শাসনভার হাতে নিয়েই কোনো যাদু দেখাতে পারবেন এমন আশা করা উচিত না। তাঁদের পক্ষে সবদিক সামলাতে সময় লাগবে, এবং সে সময়টুকু অপেক্ষা করে থাকার ধৈর্য আমাদের দেখাতে হবে। অবশ্য, একথাও ঠিক, যা পূর্বে ছিল যদি পরেও তাই থাকে—তবে এই স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যে নতুন সরকার কোনো প্রশংসা দাবি করতে পারবেন না। পরিবর্তন আমরা চাই, নতুন সরকার সে-পরিবর্তনের আশ্বাসও দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে ধৈর্য ধরে সম্ভাব্য একটা সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করাই উচিত। তাতে লাভ বই ক্ষতি হবে না।

নতুন সরকারের একটি প্রধান নীতি দুর্নীতির পঙ্কিলতা থেকে প্রশাসনকে উদ্ধার করা। এর সঙ্গে অন্যান্য দুর্নীতিও যে আছে তা আমরা মনে করে নিতে পারি। কিন্তু দুর্নীতি জিনিসটা প্রকাশ্য ক্ষত ঠিক ততটা নয় যতটা তা গুপ্ত ও প্রসারিত। বোধ করি এর তুলনা সরল ক্ষত নয়। কর্কট রোগের সঙ্গেই এ বস্তু তুলনীয় হতে পারে। কংগ্রেসী শাসনে যদি দুর্নীতি প্রশাসনের ও বাইরের সর্বত্র বিস্তৃত হয়ে থাকে তবে সেই ব্যাধি যে কি করে আরোগ্য করা হবে তা সমস্যার বিষয়। কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব গেছে বটে কিন্তু ছাতার তলায় যারা এযাবৎ দুর্নীতিতে পুষ্ট হয়েছে তারা তো থেকেই গেছে, তার জের সংখ্যা কিছু কম নয়। তবু, আশা করব, পশ্চিমবঙ্গের নতুন মন্ত্রিসভা এই জটিলতম ব্যাধিও আরোগ্য করতে পারবেন।

নির্বাচনে জয়ী হয়ে যে যুক্তফ্রন্ট অধিকাংশ জনসাধারণের আশা-ভরসার স্থল হয়ে উঠেছেন, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দীর্ঘকাল যাবৎ জীবনযাত্রা নির্বাহে ক্লান্ত মানুষ কামনা করছে তাদের প্রাণধারণের গুরুভারের যেন কিছুটা লাঘব হয়। সাধারণ খাদ্য, মোটা বস্ত্র, কিছুটা শিক্ষা, মাথা বাঁচানোর মতন কোনো আশ্রয়, বেঁচে থাকার মতন একটা কাজ—এইরকম কিছু কিছু অভাব যদি পূরণ হয়, তবে মনে করি নতুন মন্ত্রিসভা এই রাজ্যের প্রপীড়িত সাধারণ মানুষের সমর্থন কোনো দিনই হারাবেন না। দীন দরিদ্রের শুভেচ্ছা ও শুভ কামনায় তাঁদের কর্মক্রিয়ায় চলার পথ সুসহ হবে। আমরাও সর্বান্তঃকরণে নতুন মন্ত্রিসভার শুভযাত্রা কামনা করি।

বৈদেশিকী

বিভীষিকা না প্রহেলিকা?

প্রেসিডেন্ট কেনেডী নিহত হন তিন বছর তিন মাস আগে টেকসাস স্টেটের ডালাস শহরে। ওই শহরেই কেনেডীর হত্যাকারী সন্দেহে ধৃত অসওয়ালড নিহত হন কয়েক দিন মাত্র পরে জ্যাক রুবীর গুলীতে। অসওয়ালডের হত্যাকারী রুবী সম্প্রতি মারা গেছেন পুলিসের জিম্মায় হাসপাতালে: রোগটা নাকি ক্যানসার, মারা গেছেন ব্রংকাইটিস জাতের কোন অসুখে। অন্তত এই হল পুলিস রিপোর্ট। মরবার সময় জ্যাক রুবী বলে গেছেন, ডালাস পুলিসই তাঁর শরীরে ক্যানসার রোগ ঢুকিয়েছে। এটা মৃত্যুকালীন অপ্রকৃতিস্থ আক্ষেপ হওয়া অসম্ভব নয়। তবে ব্রিটিশ আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, আসামীর মৃত্যুকালীন উক্তির তদন্ত হওয়াটাই আইনের বিধান। মার্কিন মুলুকের বিচার-আচার তদন্ত এবং পুলিসী ব্যবস্থার ধরন হয়তো আলাদা। নতুবা কেনেডী হত্যারহস্য সম্পর্কে এখনও এত জল্পনা-কল্পনা, বাদ-বিতণ্ডা কেন? ওয়ারেন কমিশন দু বছর আগেই কেনেডী হত্যা সম্পর্কে তদন্ত শেষ করে রায় দিয়ে রেখেছেন, কেনেডির হত্যাকারী অসওয়ালড ছাড়া আর কেউ নয়, অসওয়ালডের একটিমাত্র বুলেটে কেনেডী নিহত এবং টেকসাসের গভর্নর কনোলী আহত হন; অসওয়ালডের সঙ্গে আর কেউ ছিল না, তার এই কাজের পেছনে কোন ষড়যন্ত্র বা কুচক্রীদল ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

প্রেসিডেন্ট জনসন ওয়ারেন কমিশনের রায় স্বচ্ছন্দে মেনে নিয়েছেন, মেনে নিয়েছিলেন আমেরিকার গণ্যমান্য আরও অনেকে। কিন্তু মার্কিন জনসাধারণ ওয়ারেন কমিশনের রায় চূড়ান্ত বা সন্তোষজনক মনে করতে পারে নি। কেনেডীর সঙ্গী গভর্নর কনোলী, যিনি গুলীতে আহত হন, তাঁরও বিশ্বাস একটিমাত্র বুলেট নয়, অন্তত দুটি বুলেট, একটিতে কেনেডী নিহত, আর একটিতে তিনি নিজে আহত হন। মার্কিন এবং ব্রিটিশ মহলের নিরপেক্ষ তদন্তকারী অনেকে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, ওয়ারেন কমিশন কেনেডী হত্যারহস্য চাপা দিয়েছেন, আবিষ্কার করতে পারেন নি অথবা আবিষ্কার করায় উদ্যোগী হন নি। কমিশনের রায় সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ [illegible] পারত না। [illegible] কেনেডী হত্যার পরবর্তী ঘটনাবলী আরও রহস্যজনক না হত। সে রহস্য এখনও জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। এমন সব অদ্ভুত ঘটনা পর পর ঘটেছে এবং ঘটছে যা নিতান্ত দৈবাৎ মনে করা যায় না, রহস্য রোমাঞ্চের চেয়েও বিস্ময়কর বেপরোয়া সুচতুর মহাশক্তিশালী অদৃশ্য চক্রীদল যেন কেনেডী হত্যা রহস্যের সমস্ত সূত্র নিশ্চিহ্ন করছে।

সব শেষের দিকের ঘটনা, নিউ অর্লিনসের সরকারী উকিল জিম গ্যারিসন সম্প্রতি ঘোষণা করেন, কেনেডী হত্যাকারী অসওয়ালডের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কিউবার কয়েকজন বিদ্রোহীর, জিম গ্যারিসন এদের সন্ধান শুরু করেছেন। নিউ অর্লিনসের একজন বেসরকারী বৈমানিক ডেভিড ফেরির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়। জিম গ্যারিসনের গোয়েন্দারা ফেরির উপর নজর রাখছিল, কিন্তু গত সপ্তাহে ফেরি হঠাৎ মারা গেছেন, ঠিক কী কারণে সেটা এখন পর্যন্ত পরিষ্কার সাব্যস্ত হয় নি। ফেরির মৃত্যু হয়তো স্বাভাবিক কারণেই, কিন্তু কেনেডী হত্যা রহস্য তদন্ত ব্যাপারে কোন-না-কোনভাবে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে কমপক্ষে একুশজন এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নয়। টেকসাসের একখানি দৈনিক কাগজের সম্পাদক পেন জোনস, আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর কিছু শিক্ষা আছে, তিনি এই একুশটি লোকের মারা যাওয়ার ব্যাপারটি অনুধাবন করেছেন এবং সবগুলি মৃত্যু স্বাভাবিক মনে করতে পারেন নি।

পেন জোনস সংকলিত এই রহস্যজনক মৃত্যুর তালিকা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। কেনেডী হত্যার পর অথবা ঠিক প্রায় ওই সময় ডালাসের পুলিস কর্মচারী টিপেট গুলীতে নিহত হন। পলায়নপর আততায়ীকে দেখেছিলেন রেনলডস এবং রাসেল। কিছুদিন পরেই রেনলডস অদৃশ্য শত্রুর গুলীতে আহত হন, সেরে ওঠার পর তাঁর জবানবন্দীর ধারা উলটিয়ে যায়। রাসেল পাগল হয়ে যান, কিন্তু তাতেই শেষ নয়। ১৯৬৫ সনের জুলাই মাসে ডালাস পুলিসের ডাণ্ডার আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। ডমিনিগো বেনভিডিস ছিল আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী, তার বিশ্বাস ডালাসের পুলিসম্যান টিপেটকে যে গুলী করেছিল সে-লোকটি অসওয়ালড নয়। ডমিনিগো বেনভিডিস এখনও মারা পড়ে নি তবে অদৃশ্য শত্রুর গুলীতে ভুল করে মারা পড়েছে তার ভাই এডওয়ার্ড বেনভিডিস। বেটী ম্যাকডোনাল্ড ছিল জ্যাক রুবীর পানশালার নর্তকী; ডালাস জেলের নির্জন কক্ষে দেখা গেল, গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় সে মারা পড়েছে। জ্যাক
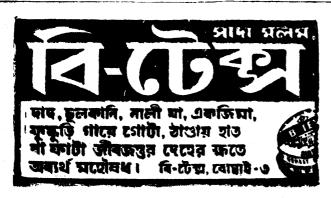
রুবীর আর এক দোস্ত ... ... গোয়েন্দা বাহিনী এফ বি আই তাকে বিস্তর হয়রান করতে থাকে: ১৯৬৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের এক রাতে পথের ধারে কিলামকে পাওয়া গেল গলাকাটা অবস্থায়। সাংবাদিক বিল হাণ্টার জ্যাক রুবীর বন্ধু জর্জ সেনেটার-এর সংগে যোগাযোগ রেখেছিলেন খবরের জন্য। হাণ্টার গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা গেলেন ক্যালিফোর্নিয়ার লংবীচে একটা পুলিস স্টেশনেই; বলা হল, এটা দুর্ঘটনা।

পেন জোনসের তালিকা এবং বিবরণ পুরোপুরি তুলে দেওয়ার দরকার নেই। ফেরিকে নিয়ে কেনেডী হত্যারহস্যে জড়িত একুশজন মরেছেন—এ'দের মধ্যে ছয়জন গুলীতে, একজনের গলায় ফাঁস; চারজন পুলিসের ডাক্তার ... ... বিষ বা বিষাক্ত পানীয় খেয়ে। জোনসের বিশ্বাস, কেনেডী হত্যারহস্যে জড়িত আরও অনেকের উপর অদৃশ্য শত্রুর মৃত্যু পরোয়ানা ঝুলছে। প্রেসিডেণ্ট জনসন তবুও ঘোষণা করেছেন, ওয়ারেন কমিশনের তদন্তে কেনেডী হত্যা রহস্য জলের মত পরিষ্কার। মার্কিন জনমত এবং মার্কিন সংবাদপত্র মহলের ধারণা কিন্তু অন্য রকম। অসওয়ালড একমাত্র আততায়ী; তার একটিমাত্র বুলেটে কেনেডীর মৃত্যু এবং গভর্নর কনোলীর দেহ-বিদ্ধ, ওয়ারেন কমিশনের এই সিদ্ধান্তে অনেকেরই কিছুমাত্র আস্থা নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদন্ত এবং বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে এই প্রসংগে ... ... অসওয়ালডকে গ্রেপ্তার করার পর ডালাস পুলিসের কর্তারা ক্রমাগত রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রচার করেছিলেন, অসওয়ালডই হত্যাকারী সে-বিষয়ে তাঁরা নিঃসংশয়। অন্য কোন গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে অপরাধী সন্দেহে ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এরকম দেশজোড়া প্রচার চলে না। ডালাস পুলিসের জিম্মায় অসওয়ালডের বহু লোক এবং টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে জ্যাক রুবীর হাতে নিহত হওয়াটাও অদ্ভুত এবং গভীর সন্দেহউদ্দীপক। কেনেডী হত্যা একটি শোকাবহ ঘটনা, কেনেডী হত্যা রহস্যের ঘনীভূত অন্ধকার যেন ক্রূর কুটিল বিভীষিকা।

৬।৩।৬৭

রাখার কঠিন খেলায়।
অজয় মুখার্জি
জ্যোতি
১৩টি দল
Kutty

সুনন্দর জার্নাল

'কাকু যদি মন্ত্রী হত'

তেরো বছরের ভাইপো এসে বললে, 'কাকু, একটা বাংলা রচনা লিখব। কী নিয়ে লিখব, বলে দাও।'

আমি সকালের কাগজ খুলে নতুন মন্ত্রি-সভার শপথ গ্রহণের বিবরণ পড়ছিলুম। মনোযোগ তাতেই নিবিষ্ট ছিল। ফস করে

মন্ত্রীর জন্য

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: 'লেখ—আমি যদি মন্ত্রী হইতাম।'

ভাইপো খুশী হয়ে বললে, 'সত্যি তাই লিখব?'

ওর হাত এড়াবার জন্যে বললুম, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই লিখে নিয়ে আয়।'

ভাইপো চলে গেল। তারপর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই গোটা গোটা হরফে এক রচনা নিয়ে হাজির।

রচনার দিক চোখ পড়তেই আমি হতবাক। তার শিরোনামা: 'কাকু যদি মন্ত্রী হত।'

কী সর্বনাশ! 'আরে, আমি কেন! তোকেই তো মন্ত্রী হতে বলেছিলুম।'

ভাইপোর শীর্ণ মুখে এক টুকরো লজ্জার হাসি ফুটে উঠল। বললে, 'ধেৎ, আমি মন্ত্রী হবো কী করে? আমি তো ছেলে-মানুষ। তুমি হলে ভীষণ ভালো হয়।'

সেটা নিশ্চয়ই হয়, ভাইপোর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। এবং, যতদূর অনুমান করছি, এ ব্যাপারে খোকার কাকিমার সঙ্গেও মতান্তর ঘটবে না। কিন্তু ওই পর্যন্তই—খোকার মা-বাবাকেও দলে পাওয়া যাবে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। একটা হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস চেপে যেতে হল।

অগত্যা খোকার রচনাতেই মনোনিবেশ করা গেল। দেখা যাক, আমি মন্ত্রী হলে খোকা আমার কাছে কী কী প্রত্যাশ করে থাকে।

ভাইপোর রচনাটির মোটামুটি বক্তব্যগুলো এখানে পেশ করা গেল। অবশ্য অনিবার্য কারণেই তার ভাষা, ব্যাকরণ এবং বানান কিছু কিছু সংশোধন করে নিতে হয়েছে। আর এই সঙ্গে বলা দরকার—যাঁরা খুব সীরিয়াস পাঠক, অবোধ বালকের এই রচনা তাঁদের না পড়লেও ক্ষতি নেই।

'কাকু যদি মন্ত্রী হত'—এই শিরোনামার পরেই সে কতগুলো সর্বজনসম্মত ভালো ভালো কথা লিখেছে। এগুলো তার বড়োদের মুখ থেকে শোনা, খুব সম্ভব বাংলা খবরের কাগজও সে কিছু কিছু পড়ে থাকে। তা ছাড়া নির্বাচনের উত্তেজনাতেও তার জ্ঞানভাণ্ডার বেশ কিছু সমৃদ্ধ হয়েছে বোঝা গেল। গোড়াতেই সে জানাচ্ছে: 'আমার কাকু মন্ত্রী হলে প্রথমেই তাকে দেশসেবার জন্যে জীবনপণ করতে হবে। (নিশ্চয়, সন্দেহ কী!) দেশের সব দুঃখ তাকে দূর করতে হবে। সব চোরাকারবারী-দের জেলে পাঠাতে হবে (অবশ্য যদি আমাকেই তারা জেলে না পাঠায়)। ভেজাল বন্ধ করতে হবে (কী বিপদ, তাহলে সুনন্দর জার্নাল লিখব কী করে!) ঘুষ নেওয়া দূর করতে হবে (আপত্তি নেই, কারণ আমাকে

নট (এইখানে একটু থামতে হল, যেহেতু অফিসে ওই একটি মাত্র কর্তব্যই আমি নিষ্ঠাভরে করে থাকি) এবং সবসময় ভারত-

জনসাধারণের জন্য

মাতার জন্যে ভাবতে হবে। তাই কবি বলে-ছেন—(রচনা লেখার প্রথা অনুযায়ী খোকা এখানে দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে একটি উদ্ধৃতি

দিয়েছে ঃ 'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা' —ইত্যাদি।)

তারপর নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির গৌরব-গাথা স্মরণ করতে বলা হয়েছে। এই অংশটি খুব ভাব-গম্ভীর, ভাষা বেশ জলদমন্দ্রিত, কোনো রচনা বই থেকে স্বীকৃতি না দিয়েই সংগৃহীত বলে মনে হল। (এটাও দুর্নীতির পোষকতা—খোকাকে সেটা বুঝিয়ে বলা দরকার) তারপর সিদ্ধান্ত করা হয়েছে, কাকু যেন মন্ত্রী হয়ে এ'দের আদর্শ সর্বদা মনে রাখে। (মনে রাখতে বাধ্য হই, কারণ এ'দের এবং আরো অনেকের উপলক্ষে চাঁদা না দিলে পাড়ায় বাস করা অসম্ভব।)

এ পর্যন্ত গতানুগতিক, তারপরেই খোকার মৌলিক প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। এবং সর্বজনীন থিয়োরী থেকে একেবারে প্রত্যক্ষভাবে চলে এসেছে আমাদের বাড়িতেই। যথা—সেদিন দুপুরে বাড়িতে একটি মেয়েলোক চাল বেচতে এসেছিল। মা আর কাকিমা সেই চাল কিনছিল দেখে আমি বললাম, তোমরা ব্ল্যাকে চাল কিনো না, এ খুব অন্যায়। মা বললে, তোকে পাকামো করতে হবে না। কাকিমা বললে, কী করব খোকন, দাদার—(মানে আমার বাবার) আটা একেবারে সহ্য হয় না। আর রেশনে তো কিছুই দিচ্ছেই না বলতে গেলে। আর সেই মেয়েলোকটি কেঁদে ফেলে বললে, কী করব খোকাবাবু, চাল না বেচলে যে উপোস করতে হবে। তাতে আমার খুব কষ্ট হল। কাকু মন্ত্রী হলে—বাবার মতো যাদের আটা সহ্য হয় না, তাদের সকলকেই চাল দিতে হবে,

কর্মচারীদের জন্য

আর সেই মেয়েলোকটির মতো যারা—তাদের কাউকে যাতে উপোস করতে না হয়, তাও করতে হবে। (খোকা নিজেও জানে না যে তার এই সরল এবং তরল দাবিটি কী মারাত্মক! এ দাবি মেটাতে পারলে এবারের নির্বাচনে কি একজন মন্ত্রীও উদ্বাস্তু হতেন!)

পরিবারের সীমা পেরিয়ে খোকা এরপর চলে এসেছে তার ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত সমস্যার ভেতরে। 'কাকু মন্ত্রী হলে'—স্কুলের ছেলেদের সব বই কিনবার ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত। ফুটপাথ থেকে পুরোনো বই নিয়ে গেলে স্যারেরা রাগ করেন, বলেন, 'ওতে হবে না, নতুন এডিশন চাই।' আর নতুন বইয়ের কথা বললে বাবা চটে যান, আমরা দাদাদের বই নিয়ে পাশ করেছি, আর তোদের বেলাতেই যত—। যদি মাইনের সব টাকা তোমার বইয়ের পেছনেই ঢালি, তবে পেটে দেব কী!' আমারই তো কটা বই কেনা হয়নি। কিন্তু

বাবার প্যান্টগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে—টাকার অভাবে নতুন করাতে পারছেন না, সেও তো দেখছি। কাকু মন্ত্রী হলে সব ছেলেমেয়েদের পড়ার বই কিনে দিতে হবে, বাবার মতো যাদের প্যান্ট ছিঁড়ে যাচ্ছে তাদের—

(হুঁ, অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা সব একসংগে! রীতিমতন বিপজ্জনক দেখতে পাচ্ছি!)

'কাকু মন্ত্রী হলে'—ভাইপো আবার তার বক্তব্য পেশ করছে: 'আমাদের বুড়ী ঝি মণির মা-কে আগে হাসপাতালে দিতে হবে। সে চোখে ভালো দেখতে পায় না, আরো কী-সব অসুখ আছে। সেদিন কেঁদে কেঁদে বলছিল—'হাসপাতালে জায়গা হলোনি মাগো, গরিবের জন্যে কেউ নেই।' কাকু মন্ত্রী হলে মণির মা-র মতো বুড়ীরা যাতে সবাই—

(তার মানে, আরো হাসপাতাল চাই! কে বলে, খোকা ছেলেমানুষ?)

আমাদের পাড়ায় একটাও পার্ক নেই। আমরা ফুটপাথে খেলি। পাড়ার লোকের জানলায় বল লাগে, তারা রাগ করে। কাকু মন্ত্রী হলে আমাদের জন্যে পাড়ায় পাড়ায় পার্ক হবে, খেলার মাঠ হবে। আমাদের ব্যাট, বল, হকিস্টিক এইসব কিনে দেওয়া হবে। আমাদের লাইব্রেরিতে ছোটদের বই খুব কম —কাকু মন্ত্রী হলে সারা দেশ জুড়ে ছোটদের জন্যে লাইব্রেরি হবে, সেখানে আমাদের বিনি-পয়সায় ওয়ালট ডিজনির জন্তু-জানোয়ারের ছবি—

নাঃ, অসম্ভব, এসব প্রলাপ আর পড়া চলে না। এতেই মাথা ঘুরছে।

আমার মন্ত্রী হয়ে দরকার নেই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা

গত ২রা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকালে স্বাধীন বাঙলার প্রথম অ-কংগ্রেসী সরকারের পক্ষ থেকে যুক্ত ফ্রন্টের দলনায়ক শ্রীঅজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর কাছে শপথ গ্রহণ করেন। নীচে শপথ গ্রহণকারী মন্ত্রীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

অজয় মুখোপাধ্যায়

উত্তরপাড়ার জমিদার বংশের সন্তান। জন্ম মেদিনীপুরের তমলুক শহরে ১৯০১ সনে। শিক্ষা মেদিনীপুর, উত্তরপাড়া এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে।

১৯২১ সনে কলকাতায় বি এস-সি পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই থেকেই একটানা দেশসেবা করে আসছেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র মুখ্যত গ্রামাঞ্চলে।

১৯৫২তে শ্রীমুখোপাধ্যায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিমণ্ডলীতে যোগদান করেন সেচ-মন্ত্রী হিসেবে। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের মন্ত্রিসভাতেও তিনি ওই একই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। কামরাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৬৪-তে রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু পর বৎসরই তাঁকে বিতাড়িত করা হয়। গত বছর তিনি বাংলা কংগ্রেস গঠন করেন। তিনি তমলুক এবং আরামবাগ দুটি কেন্দ্র থেকেই জয়লাভ করেন। অকৃতদার শ্রী মুখোপাধ্যায় স্বরাষ্ট্র ও সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের ভার নিয়েছেন।

ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ

স্বাধীন পশ্চিম বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের জন্ম ১৮৯১ সনে ঢাকা জেলার মালিকান্দা গ্রামে। রসায়ন শাস্ত্রে পি এইচ ডি পাবার পর কিছুকাল তিনি কলকাতার টাঁকশালে চাকরি করেন। পরে গান্ধীজীর ডাকে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধী শিষ্যরূপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্য বহুবার তিনি জেল খেটেছেন। দীর্ঘকাল তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে বাঙলার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কিছুকাল তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকরূপেও কাজ করেন।

১৯৪৭-এর ১লা জুলাই তিনি মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণ করেন। গদি ত্যাগ করেন ১৯৪৮-এর ১৪ জানুয়ারি। ১৯৫০-এ তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে গঠন করেন কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি। নতুন মন্ত্রিসভায় ডঃ ঘোষ নিয়েছেন খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের ভার।

জ্যোতি বসু

জন্ম ১৯১৪ সনে কলকাতা শহরে। সেণ্ট জেভিয়ার্স ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা সমাপনান্তে লণ্ডনে গিয়ে ব্যারিস্টারি পাশ করে আসেন ওখানকার মিডল টেম্পল বার থেকে। ১৯৪০-এ হাইকোর্টে যখন যোগ দেন সে সময় থেকেই একজন বিশিষ্ট কম্যুনিস্টরূপে পরিচিত। ১৯৪৬ সন থেকেই তিনি বিধান পরিষদের সদস্য। প্রাক্তন পরিষদে তিনি ছিলেন বিরোধী দলের নেতা। ভাল বক্তা এবং সংগঠক হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসুর দপ্তর থাকবে অর্থ ও পরিবহণ।

বিভূতি দাশগুপ্ত

পুরুলিয়ার লোকসেবক সংঘের সদস্য শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত ভার নিয়েছেন পঞ্চায়েৎ, সমাজ উন্নয়ন দপ্তরের। তেষট্টি বৎসর বয়স্ক শ্রী দাশগুপ্ত তাঁর পিতা বিখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা শ্রীনিবারণ দাশগুপ্তের কাছেই রাজনীতিতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯২১ সনে আইন অমান্য আন্দোলন থেকে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগদান। অকৃতদার শ্রী দাশগুপ্ত ১৯৪৯ সনে কংগ্রেস ছেড়ে লোকসেবক সংঘে যোগদান করেন।

হেমন্তকুমার বসু

অক্লান্ত কর্মী ও বিরামহীন সংগ্রামী হিসেবে সারা দেশে পরিচিত। বাহাত্তর বছর বয়স্ক এই প্রবীণ নেতার রাজনীতির সঙ্গে যোগ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে। উত্তর কলকাতার জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন দীর্ঘ বারো বছর। দুবার হয়েছিলেন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধ্যক্ষ। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহচররূপে বিশেষ পরিচিত। ১৯৩৯ সনে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। এখনও তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের সর্বভারতীয় সংস্থার চেয়ারম্যান। মন্ত্রীরূপে তিনি গ্রহণ করেছেন পূর্ত দপ্তরের ভার।

জাহাঙ্গীর কবির

বর্তমান মন্ত্রিসভার উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও বন বিভাগীয় দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীজাহাঙ্গীর কবিরের আদিবাস ফরিদপুরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের স্নাতক। '৪২ সনে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে যোগদান থেকে আইন ব্যবসায়ে ইস্তফা এবং পাকাপাকিভাবে রাজনৈতিক জীবন অবলম্বন। বাংলা কংগ্রেস গঠিত হওয়ার পর তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে ওই দলে যোগ দেন।

ননী ভট্টাচার্য

পঞ্চাশ বছর বয়স্ক স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্যের জন্ম মুর্শিদাবাদের খাগড়া শহরে। কৈশোরেই তিনি বিদ্যালয় ছেড়ে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। বহুবার তিনি অন্তরীণ হন এবং ১৯৪০ সনে নিরাপত্তা আইনে কারারুদ্ধ থাকাকালে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ওই বছরই

গান বিপ্লব। সমাজবাদী দল গঠন করেন 'গণবার্তা'-র সম্পাদনাও করেন কিছুকাল।

সোমনাথ লাহিড়ী

আটান্ন বছরের কম্যুনিস্ট নেতার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হয় ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলন থেকে। এরপর ১৯৩০-এ বি এস-সি পড়ার সময় পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক জীবন বরণ করেন। ১৯৪০ পর্যন্ত কংগ্রেসে ছিলেন বামপন্থীদের দলে। সে সময়ে তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিরও সদস্য ছিলেন। কংগ্রেস ছাড়েন স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে। ১৯৪৪ থেকে চার বছর ছিলেন পৌরসভার সদস্য। নতুন মন্ত্রিসভায় সংসদীয় বিভাগ ও প্রচার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত শ্রীলাহিড়ী সুবক্তা ও সুলেখক।

সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম চব্বিশ পরগণায় ১৯১৮ সনে। সারা জীবনই তিনি রাজনৈতিক কাজ নিয়ে আছেন। বহুবার কারাদণ্ডও ভোগ করেছেন। ১৯৫২, থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত বিধানসভার সদস্য ছিলেন। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়ার পলিটিকাল ব্যুরোর সদস্য এবং 'সোস্যালিস্ট ইউনিটি'র এবং 'গণদাবি' পত্রিকার প্রধান সম্পাদক। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রম দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

জ্যোতি ভট্টাচার্য

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য লেখক এবং বক্তা হিসেবে সুখ্যাত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা এবং লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীতে এম-এ। পনের-ষোল বছর আগে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা থেকে শিক্ষক জীবনের শুরু। সেখান থেকে যোগ দেন গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। রাজনীতিতে যোগদান করেন ডেমক্রেটিক ভ্যানগার্ড দলের নেতা শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়।

অমর চক্রবর্তী

আইন মন্ত্রী শ্রী চক্রবর্তীর আদি বাস চট্টগ্রাম। ১৯৩৭ সনে তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন এবং এর দু' বছর পর ফরোয়ার্ড ব্লকের চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে বহুবার কারারুদ্ধ হয়েছেন। শ্রীচক্রবর্তী ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসাবে ইউরোপের বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন।

দেওপ্রকাশ রাই

নতুন মন্ত্রিসভার কনিষ্ঠতম মন্ত্রী হচ্ছেন দার্জিলিঙ থেকে নির্বাচিত গোর্খা লীগের প্রতিনিধি শ্রীদেওপ্রকাশ রাই। উপজাতি উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত এই মন্ত্রীর বয়স মাত্র সাইত্রিশ। দেশভাগের পূর্বে শ্রীরাই বাংলা সরকারের শ্রম বিভাগে ফিল্ড ইন্সপেক্টরের পদে নিযুক্ত হন কিন্তু রাজনৈতিক কাজের জন্য তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি সেনা বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। এক্ষেত্রেও রাজনৈতিক কাজের জন্য মালয়েশিয়ায় গ্রেপ্তার হন। শ্রীরাই বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসছেন ১৯৫৭ থেকে।

সুশীলকুমার ধাড়া

বাংলা কংগ্রেস দলভুক্ত এবং বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রীধাড়ার জন্ম ১৯১০ সনে মেদিনীপুরের মহিষাদল থানার অন্তর্গত টিকারামপুর গ্রামে। বাংলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় স্কুলে পড়ার সময় থেকে। ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতির সঙ্গে যোগ। লবণ সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করেন এবং ১৯৪২-এ শ্রী অজয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যুৎ বাহিনীর পুরোভাগে ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে জীবিত বা মৃত ধরে দেবার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

নিরঞ্জন সেন

১৯০৪ সালে জন্ম বরিশালে। নতুন মন্ত্রীসভার ত্রাণ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী কৈশোরেই স্কুল ছেড়ে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। সারা ভারত ছাত্র সংগঠনের সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘকাল। বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে বি এস-সি'র টেস্ট পরীক্ষার সময় রাজনীতিক অপরাধে গ্রেপ্তার হন। ১৯২৯ সনে মেছুয়াবাজার বোমা মামলায় পাঁচ বছর কারাবাসে দণ্ডিত হন এবং তাঁকে আন্দামানে পাঠানো হয়। ১৯৩৮ থেকে কম্যুনিস্ট দলের সদস্য।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

অগ্রজ শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের মতোই অল্প বয়সে রাজনীতিতে যোগদান করেন। প্রথম কারাবাস ১৯২৮এর আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য। পর বৎসরই মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে নির্বাসিত হন এবং সেখানেই কম্যুনিজমে দীক্ষা নেন। ১৯৩৯-এ মুক্তি লাভের পর শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেন। শ্রীমুখোপাধ্যায় সেচ ও জলপথ দপ্তরের ভার নিয়েছেন।

হরেকৃষ্ণ কোঙার

মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট নেতা শ্রীকোঙার বর্ধমানের মেমারি শহরে এবং পরে কলকাতায় শিক্ষালাভ করেন। কলেজে পড়ার সময় রাজনৈতিক কাজে যোগদানের অপরাধে দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে নির্বাসিত হন। শ্রীকোঙারেরও কম্যুনিজমে দীক্ষা আন্দামানে থাকা কালে। বন্দী অবস্থায় তিনি অনশন আরম্ভ করেন যার ফলে আন্দামান থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের ফিরিয়ে আনা হয়। মুক্তির পর ১৯৩৮ সনে তারকেশ্বর খাল সত্যাগ্রহে অংশ গ্রহণ করেন। কম্যুনিস্ট দলভুক্ত শ্রীকোঙার মুখ্যত কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। বর্তমান মন্ত্রিসভার ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব দপ্তরের তিনি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

এবারের এই নির্বাচন

নিখিল সরকার

অন্ধকারের প্রবক্তারা' মিথ্যা প্রমাণিত। স্বদেশে এবং বিদেশে—সর্বত্র নিশ্চয় তাঁরা এখন নৈরাশ্যে। সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল। কুড়ি বছরে চতুর্থ পরীক্ষা। ফলাফলও ঘোষিত। দলগত, ব্যক্তিগত ফলের কথা পরে, প্রথম খবর,—ভারত সসম্মানে পাশ। বিরাট দেশ, প্রায় পঁচিশ কোটি ভোটার, অগণিত প্রার্থী, অসংখ্য দল; এমন দুরূহ প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে পর পর চারটে পাশ দেওয়া যেমন তেমন ছাত্রের কাজ নয়। গণতন্ত্রী ভারত এজন্য নিশ্চয়ই গর্ববোধ করতে পারে। শিখা এখনও অনির্বাণ।

এর প্রথম কৃতিত্ব অবশ্যই এদেশের জনসাধারণের প্রাপ্য। ভারতীয় গণতন্ত্র যে ওপর থেকে চাপানো একটা অজ্ঞাত প্রক্রিয়া নয় আবার তা প্রমাণিত হল। তথাকথিত 'শিক্ষাহীন' জনসাধারণ প্রমাণ করলেন—এই গণতন্ত্রের পিছনে একটি সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক ভিত আছে। দরবার নিরপেক্ষ গ্রামীণ পঞ্চায়েতগুলো একদা সে-ই সত্যই ঘোষণা করত। দ্বিতীয় কৃতিত্ব ক্ষমতাসীন দলের। যে কোন পর্যবেক্ষককে মানতেই হবে অন্য রকম আচরণের পক্ষে আবহাওয়া এবার অনুকূল ছিল। এশিয়ার পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ইদানীং বিশেষ রেওয়াজ নেই। আয়ুব-সুকর্নদের কথা বাদ-ই দিচ্ছি। নাসের-নিয়েরেরের মত গণতন্ত্রে আস্থাবানেরাও ক্রমেই এক-দলীয় গণতন্ত্রকে বেছে নিচ্ছেন। অ-কম্যুনিস্ট প্রগতিশীল নায়কদের মধ্যে 'ওয়ান পার্টি ডেমোক্র্যাসি' একটি লোভনীয় বিকল্প হয়ে দাঁড়াচ্ছে যেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কুড়ি বছর একটানা রাজত্বের পরেও গণতন্ত্রীদের পক্ষে সে জাতীয় বিপদ হয়ে দাঁড়াননি, এটা নিশ্চয়ই তাঁদের রাজনৈতিক চরিত্র দৃঢ়তায় পরিচায়ক। বিশেষ করে, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের আগে এ জাতীয় চেহারা ধারণ কংগ্রেস সরকারের পক্ষে কঠিন হত না। অজুহাত চারপাশে অনেক ছড়ানো ছিল। চীনা আক্রমণ, পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, দেশের সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক নাগা-মিজো বিদ্রোহ, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, নানা ধরনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সেদিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে না তাকিয়ে নিঃসন্দেহে দেশবাসীকে জানাতে পেরেছেন গণতন্ত্রের মন্ত্র তার কাছে ভেক নয়। সন্দেহ নেই, বিরোধী দলগুলো এ ব্যাপারে প্রহরীর কাজ করেছে। কিন্তু কংগ্রেসের প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতার কথা ভাবলে সন্দেহ থাকে না, গণতন্ত্রের প্রতি অনড় আস্থা তার ছিল। বিরোধী দলগুলোর কৃতিত্ব তাঁরা এই মহান জাতীয় অনুষ্ঠানে সাড়া দিয়েছেন, গণতন্ত্রকে একটা স্থায়ী জাতীয় ধ্যানে পরিণত করার কাজে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। আমাদের কৃতজ্ঞতা তাঁদের কাছেও।

এবারকার নির্বাচনের ফলাফল দেখে বিশ্বময় চাঞ্চল্য। চাঞ্চল্য দেশেও। কেউ বিস্মিত, কেউ ভাবিত, কেউ আনন্দিত। সব প্রতিক্রিয়ার সার—ফলাফল অভাবিত। অভিপ্রেত, অনভিপ্রেত—ইত্যাদির কথা পরে, তার আগে অতিশয় জরুরী এই 'অভাবিত' শব্দটা। আগেই বলা হয়েছে এশিয়া-আফ্রিকায়, অর্থাৎ পরিবর্তনশীল দরিদ্র পৃথিবীতে ব্যালট-বক্স-এর মহিমা আজ ম্রিয়মান। এ সময়ে ভারত জানাল—সেটা অহেতুক, যথাযথভাবে ব্যবহার করলে ব্যালট বাক্সও 'বিপ্লব' ঘটাতে পারে। অর্থাৎ, তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। তাৎপর্যপূর্ণ বলছি এজন্য যে, ১৯২৪, '২৯, কিংবা '৪৫ সনে ব্রিটেন-এ শ্রমিক দল বিজয়ী হওয়ার পর কেবল মাত্র মন্ত্রীদের নাম বদল হয়নি। ঠিক তেমনই ১৯১২ সনে দীর্ঘ শাসনের পর আমেরিকায় রিপাবলিকানদের পরাজয় ফলও কেবল মাত্র আনুষ্ঠানিক ছিল না। দলীয় নীতি এবং লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট থাকলে ব্যালট-এর রায়ও অনেক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সেদিক থেকে ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল গণতন্ত্র বনাম অন্যান্য নানাবিধ তন্ত্রের তর্কে গণতন্ত্রের সপক্ষেই সওয়াল করে।—নয় কি?

চমকের হেতু কয়েকটি রাজ্যে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের পরাজয় এবং কেন্দ্রে কংগ্রেসের বলহানি। কেন তা হল সে গবেষণা এখানে অবান্তর। আমাদের বক্তব্য, তা হতে পারে, হয়। য়ুরোপ আমেরিকা দূরের নজীর। প্রথম সাধারণ নির্বাচনেই পাকিস্তানে তা হয়েছে। হয়েছে—সিংহলেও। পাকিস্তানে মুসলিম লীগ রাতারাতি লুপ্ত হয়ে যাবে কেউ বোধ হয় ভাবেননি। বন্দরনায়েক-এর শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি ভোটাভুটির মাধ্যমে সিংহলে গদীয়ান হবে যাবে সে কথাও জ্যোতিষীরা কখনও ভাবতে পারেননি। সুতরাং প্রশ্ন সেটা নয়; আসল প্রশ্ন আমরা এই ফলাফলকে কী ভাবে কাজে লাগাতে পারি তা-ই। যে দুটি প্রতিবেশী দেশের কথা উল্লেখ করা হল—নির্বাচনের চমক দুদেশে একভাবে কাজ করেনি। পাকিস্তানে সেই বিশৃঙ্খলার জের হিসাবেই আবির্ভূত হয়েছেন সামরিক উর্দীপরা নায়ক আয়ুব। সিংহলে গণতন্ত্র ক্রমে আরও স্বাস্থ্যবান। ভারতে শেষ পর্যন্ত

পালন করার ব্রত নিয়েছিল কংগ্রেস সরকার। যথা : দেশের ঐক্য পুনরুদ্ধার, যেসব অঞ্চলে আগে কার্যত কোন শাসন ছিল না সেখানে শাসন-প্রবর্তনের চেষ্টা (যথা : উত্তর পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল), ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠন, জাতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষা সন্ধানের চেষ্টা, ভূমি এবং সমাজ সংস্কারের প্রাথমিক কাজ, শিল্পায়নের ভিত স্থাপন, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রগতিতে যাঁরা আস্থাবান তাঁরাও এই কর্ম সূচীর যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। তবুও কংগ্রেস সরকার এবার আশানুরূপ জন সমর্থন পেলেন না, কারণ এক মাত্র নির্বাচন নামক অনুষ্ঠানটি ছাড়া আর কোথাও তাঁরা এই বিরাট দেশের জনতাকে দেশের রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রত ভাবে জড়াতে পারেননি। কী দলীয় স্তরে, কী সরকারী দফতরে এই লক্ষ্যে কোন উপযুক্ত সংগঠন তাঁরা গড়ে তুলতে পারেন নি। জাতীয় স্তরে নেতৃত্বের লক্ষ্য হয়ত অস্পষ্ট ছিল না, কিন্তু নীচের স্তরে সাধারণ মানুষের হাতে তাকে পৌঁছে দেওয়া কিংবা এক-ই লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করে তোলার মত কোন রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক উদ্যোগ ছিল না। ফলে সংস্কারমূলক ব্যবস্থাগুলো (যথা : অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ) সবই কম বেশি বাইরে থেকে চাপানো বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়। উদ্দেশ্য যেখানে সফল হয়েছে সেখানে দলের চেয়েও বেশি কৃতিত্ব পেয়েছেন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী। অথচ, এই প্রক্রিয়ার পরোক্ষ ফল হিসাবে একদিকে যেমন দলের ভিতরে ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনই দেশবাসীর মনে প্রত্যাশার দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে। আমাদের মনে হয় এবারকার 'না-সূচক' ভোটের পিছনে এটা একটা অন্যতম কারণ। একজন পশ্চিমী লেখক লিখেছেন : নেহরুর অন্যতম কৃতিত্ব তিনি ভারতীয় জনতাকে তৃপ্তির-ঘোর থেকে কাটিয়ে তুলেছেন। এবারকার নির্বাচনে কংগ্রেসের হারানো ভোটগুলো কিছু পরিমাণে হলেও তারই জের।

এবার প্রশ্ন : এই অতৃপ্তি তৃপ্তি খুঁজেছে কোথায়? এ ব্যাপারে সব বিরোধী দলের সমান উল্লসিত হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। বাংলায় যদি বামপন্থীরা কিছু এগিয়ে গিয়ে থাকেন, তবে মাদ্রাজ, রাজস্থান উত্তরপ্রদেশ কিংবা পাঞ্জাবে দক্ষিণপন্থীরাও এগিয়েছেন। ভোটের শতকরা হিসাবে কী বলছে সে অঙ্কে আমরা এখন যাচ্ছি না। শুধু এটুকুই দেখতে পাচ্ছি জনসাধারণের ওই নৈরাশ্যকে তথাকথিত দক্ষিণপন্থীরা এবার যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন বামপন্থীরা তা পারেন নি। '৫২ সনের নির্বাচনে জনসংঘ কার্যত ছিল না বললেই চলে। '৫৭ সনের নির্বাচনে তারা এবং গণতন্ত্র পরিষদ ইত্যাদি দলগুলো লোকসভায় রীতিমত অস্পষ্ট; বামপন্থীদের দখলে যখন ৪৬টি আসন,

তাদের দখলে তখন ৭৭টি। '৬২ সনের নির্বাচন শেষে লোকসভা বামপন্থীরা যদি ৫১টি আসন দখল করে থাকেন তবে দক্ষিণপন্থীদের অধিকারে ছিল ৮২টি আসন। এবার তাঁরা আরও এগিয়ে গিয়েছেন। চরম বামপন্থীদের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী কংগ্রেস এবং কংগ্রেস বিরোধী নানা ধরনের সমাজতন্ত্রীদের যদি দক্ষিণপন্থী হিসাবে বন্ধনীভুক্ত করা যায় তবে বামপন্থীদের অবস্থা এখনও ভারতে শোচনীয়। তাঁরা হয়ত নিজেদের ভিতকে কিছু প্রসারিত করতে পেরেছেন, কিন্তু সমগ্র ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণপন্থীদের তুলনায় শক্তি ওঁদের অনুল্লেখযোগ্য। অন্তত ভোটের ফল তাই বলে। সুতরাং এই পরিবেশে 'পোলারাইজেশন' সত্যি সত্যিই কার্যকর হলে ফলাফল বামপন্থীদের পক্ষে মারাত্মক হতে পারে।

গণতন্ত্র কোন চরম পন্থারই পৃষ্ঠপোষক নয়। তাহলে নির্বাচনের মত একটা প্রক্রিয়ার সুযোগ তাতে থাকত না। ভারতে এখনও তা আছে। দেশের জনসাধারণ চতুর্থ বারের মত এই প্রক্রিয়াকে অনুমোদন করেছেন। সুতরাং, এই নির্বাচনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ফলগুলো নিয়েও কিছু বলা দরকার। নির্বাচন সাধারণ নাগরিককে শাসন-প্রক্রিয়ায় আগ্রহ বাড়ায়। সেদিক থেকে এক একটি নির্বাচন মানে নাগরিক চেতনার আরও বিকাশ, কিংবা সংস্কার। অন্যদিকে নির্বাচন কতকগুলো অশুভ বস্তুও আমদানি করতে পারে। সব গণতন্ত্রেই তার সম্ভাবনা থাকে। স্বীকার করতেই হবে, ভারতেও নির্বাচনকে উপলক্ষ করে তার কুৎসিত মুখ দেখা গেছে। আমরা শুধু রাশি রাশি টাকা ছড়াবার জের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করছি না, ধর্ম, আঞ্চলিকতা, বর্ণ—ইত্যাদিকে কাজে লাগাবার চেষ্টার কথাও বলছি। এটা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ, কিংবা গণতন্ত্র কোন কিছুর পক্ষেই গৌরবের নয়। ব্রিটেন-এ এই সেদিন বর্ণ বিদ্বেষী বিজয়ীকে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল—'পার্লামেণ্টারী লেপার।' পরের নির্বাচনে ভদ্রলোক আর জয়ী হতে পারেন নি। শুধু নতুন মুখ কত এল, নারীর অনুপাত কী দাঁড়াল, তাই নয়, কে কীভাবে এলেন—গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের প্রশ্নে সেটাও গুরুতর প্রশ্ন। নির্বাচন কমিশন সব ত্রুটি সংশোধন করতে পারবেন না। সব তাঁদের আওতায়ও আসে না। এ ব্যাপারে গণতন্ত্রী দলগুলোর দায়িত্ব অনেক। তার চেয়েও বেশি দায়িত্ব ভোটারের। ভোটার অনেক জায়গায় দায়িত্ব পালনে সমর্থ হয়েছেন, কোথাও কোথাও পারেন নি। সেটা আমাদের ত্রুটি।

এই ত্রুটির পেছনে একটা কারণ—অন্য বিচার্যের অভাব। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ভিত্তি যে চারটি বস্তুর ওপর তার মধ্যে অন্যতম একাধিক বড় দলের অস্তিত্ব। দল যত সংখ্যায় বেশি হবে ততই গোষ্ঠীগত আবেদনের সম্ভাবনা বাড়বে। গণতন্ত্র একমাত্র তখনই সুষ্ঠুভাবে অবয়ব লাভ করতে পারে, যখন প্রতিটি দল ভোটারের সামনে নিজেদের নীতি এবং কর্মসূচী সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন। অনেক দলই ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়েও ভাষায় অস্পষ্ট থেকে গেছেন। ফলে বক্তব্য বা কর্মসূচীর চেয়ে নির্বাচনে অন্যান্য দিকে আলোকপাত হয়েছে বেশি।

গণতন্ত্রের পক্ষে কর্মসূচী হাতে বিরোধী দলের উপস্থিতি ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় গুরুতর। প্রথমত, গরিষ্ঠের শাসন অধিকারকে আদর্শ হিসাবে মেনে নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, আপন আচরণে লঘিষ্ঠকে জানাতে হবে সাময়িকভাবে গরিষ্ঠের শাসন মেনে নিতে সে অনিচ্ছুক নয়। তৃতীয়ত, ওই বিরোধী দলের উপস্থিতি, এবং চতুর্থত—দেশে সচল রাজনৈতিক মতামতের অস্তিত্ব। গণতন্ত্র হয়ত সম্ভাব্য সেরা শাসন ব্যবস্থা নয়। কিন্তু চার্চিল-এর ভাষায়—"Worst system in the world until you look at any of the others", অর্থাৎ, আর যে সব ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে সেরা। তাকে যদি গ্রহণ করা যায়, তবে এই শর্তগুলোও গ্রহণ না করে উপায় নেই। নির্বাচন এই শর্তগুলোকে কীভাবে পালন অথবা লংঘন করেছে এক নজরে তা তাকিয়ে দেখা যাক।

গরিষ্ঠের সাময়িক শাসনের অধিকার লঘিষ্ঠ ইতিপূর্বে সব সময় বাস্তবে মানতে চায়নি। (যথা—অন্ধ্রে কম্যুনিস্ট আন্দোলন কিংবা কেরলে কম্যুনিস্ট-রাজ বরখাস্ত।) তত্ত্বগত বিচারে এতে অবশ্যই গণতন্ত্রের মহিমা ক্ষুণ্ন হয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি হলে গণতন্ত্রের ক্ষতি নিশ্চিত। শুধু ভোট গুণে গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিলে চলে না। গণিতের বাঁধন এড়িয়ে বিরোধীদের কথাও শুনতে হয়। বিরোধীরা যদি জানেন ব্যাপক আন্দোলন কিংবা বিভ্রাট সৃষ্টি না করলে তাঁদের কথা ক্ষমতাসীন দল শুনবে না তবে তাঁরা ওই পথে পা বাড়াবেন বই কি। বিভ্রাট সৃষ্টি যাঁদের মতলব তাঁদের কথা স্বতন্ত্র, গণতন্ত্রের সুস্থতা যাঁদের কাম্য তাঁদের এ ধরনের কোন সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। অতীতে অনেকবার তা দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে ক্ষমতাসীন দলগুলো আরও সজাগ না হলে বিশৃংখলা সম্ভব। দেশে চলমান, অর্থাৎ অনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতামতের অর্থ নাগরিকদের একাংশের মধ্যে অন্তত গোঁড়া, অনড় মতামতের অভাব। সব নাগরিক দুই বা তিন রাজনৈতিক তন্ত্রে স্থায়ীভাবে বিশ্বাসী হলে—নিরপেক্ষ বিচারের সুযোগ থাকে না। গৌরবের কথা ভারতীয় ভোটারেরা পরীক্ষার এই পদ্ধতিতে বহুকাল উত্তীর্ণ। নির্বাচনে কংগ্রেসকে ভোট দিয়ে, উপ-নির্বাচনে সে ভোট কেড়ে নিতে তাঁরা ইতঃস্তত করেন নি। এবার যা দেখালেন তা আরও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির পরিচয়। ভবিষ্যতে তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে—এ কথাটা মনে রাখলে সকলেরই ভাল। ভারতীয় গণতন্ত্র এই লক্ষণে নিঃসন্দেহে আজ সবলতর।

সবলতর আরও কয়টি লক্ষণেও। একটি দলের একচেটিয়া ক্ষমতা কমেছে। এর ফলে শুধু যে বিরোধীদের নৈরাশ্য দূর হয়ে গণতন্ত্রের বিকাশ সহজতর হবে তা-ই নয়, আশা করা যায় রাষ্ট্রীয় চরিত্রও ক্রমে আরও সুস্পষ্ট হবে—শাসনতন্ত্র যথার্থে অনুদিত হওয়ার সুযোগ পাবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা নতুন তাৎপর্য লাভ করবে, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নতুনভাবে প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ আসবে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা গণতন্ত্রের স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল। এবারকার নির্বাচন সে-ই সুযোগই এনে দিল। ভারত নতুন পরিস্থিতিতে ব্যর্থ হবে এমন মনে করার কোন সংগত কারণ নেই। চারদিকে রাজতন্ত্রের পতন দেখে শংকিত সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড আপন পুত্রকে অতিথিদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতেন—এই হচ্ছে ইংল্যাণ্ড-এর শেষ রাজা, 'লাস্ট কিং অব ইংল্যাণ্ড।' আমরা জানি, পঞ্চম জর্জ ইংল্যাণ্ড-এর শেষ রাজা নন। রাজার ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়নি। গণতন্ত্রে আস্থাবানরা সতর্ক থাকলে রাজকীয় খবরের কাগজ —'টাইমস'-এর ভবিষ্যৎবাণীও ব্যর্থ হতে বাধ্য—চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন ভারতের শেষ নির্বাচন হওয়ার কোন কারণ নেই।

ধ্বস

০ অমিতাভ দাশগুপ্ত

> চতুর্থ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের রাজনীতির চেহারায় যে পরিবর্তন ঘটেছে, তার কারণ বিশ্লেষণ করে তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন লেখক। প্রথম প্রবন্ধে গত ২০ বছরে নির্বাচকদের মন ক্রমশ কোনদিকে ঝুঁকছে তারই তথ্যপূর্ণ আলোচনা।

১

উনিশ শ' সাতষট্টি সালের ফেব্রুয়ারী মাসটা ভারতের জনসাধারণ বহু দিন মনে রাখবে। কারণ, রাজনৈতিক জীবনে ধ্বস নেমেছিল। উনিশ শ' সাতষট্টি সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে বহু মহীরুহ উৎপাটিত হয়েছে। রাজনীতির চেহারাটা আশ্চর্যজনকভাবে বদলে গিয়েছে। বিগত কুড়ি বছরের কংগ্রেস শাসন বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে। ধ্বসটা নেমেছিল কংগ্রেসের গা ঘেঁষে।

এটা কি তা হলে পরিবর্তনের পূর্বাভাস? এ প্রশ্নটা অনেকেই করেছেন। কোন কোন মহলে মন্তব্য করতে শুনেছি, এটা 'কোট' বদল, বা কুর্তা বদল। কুড়ি বছর ধরে জহর মার্কা কুর্তার বদলে যদি আজ নতুন ধরনের কুর্তা কাঁধে ওঠে ক্ষতি কি? না, ক্ষতি নেই। কিন্তু কুর্তার রংটা কি? যদি জহর কুর্তা হয় খাদি মার্কা সাদা, নতুন কুর্তার রংটা কিছু ফিকে লাল, বেশীটা গাঢ় কাল। কালটা রং নয়; রঙের দুর্ভিক্ষ।

কিন্তু এতে তাজ্জব বনে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। মার্কিন কাগজে হতাশা মিশিয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। ভারতের ভবিষ্যৎ খুব দুর্বল। বিলিতী কাগজে মন্তব্য বেরল, 'ভারত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে সর্বদিকে।' রিপাবলিকান পার্টির জায়গায় ডেমোক্র্যাট বসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল হয় না। চার্চিলের নেতৃত্বে যুদ্ধজয়ের পর কনজারভেটিভদের সরিয়ে লেবার পার্টি ক্ষমতায় বসলে ব্রিটেন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় না, শুধু ভারতে কংগ্রেসকে সরিয়ে বামপন্থী কোন দল কোন প্রদেশে ক্ষমতা পেলেই ভারত গুঁড়িয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে যুক্তিটা অদ্ভুত।

নিঃসন্দেহে চতুর্থ নির্বাচন চমকে দিয়েছে। নিঃসন্দেহে চতুর্থ নির্বাচন মনে রাখার মত। নিঃসন্দেহে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বনিয়াদ মজবুত করে দিয়েছে।

নির্বাচন-পর্বকালে অনেকেরই হয়ত আশঙ্কা ছিল যে, ভোটদাতারা হয়ত ভোট দেবার জন্য খুব উৎসাহিত বোধ করবে না। হয়ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। নির্বাচন পণ্ড হবে। হয়নি। কোনটাই হয়নি। ভোট দেবার জন্য এত বিপুল উৎসাহ আর কোন নির্বাচনে দেখা যায়নি। বিশৃঙ্খলা ব্যাপকভাবে কোথাও বাধা ঘটায়নি। নির্বাচন পণ্ড হয়নি।

তবু গত তিনটে নির্বাচনের তুলনায় এটাই ছিল বৃহত্তম। ভারতীয় সংবিধানে বলা আছে যে, কোন নির্বাচনের পূর্বে যদি লোকগণনা হয় এবং সেই গণনার ফলাফল যদি সরকারীভাবে প্রকাশিত হয়, তবে সে নির্বাচন হবে লোকগণনার ফলাফলের ভিত্তিতে। অর্থাৎ যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তা হলে আনুপাতিকভাবে নির্বাচন কেন্দ্র বৃদ্ধি করতে হবে লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভার আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করে। ১৯৬১ সালে যে লোকগণনা হয়, তার ফলাফল ১৯৬২ সালের তৃতীয় নির্বাচনের আগে সরকারীভাবে প্রকাশ করা হয়নি। কারণ, নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব ছিল না।

নির্বাচনের পর লোকগণনার ফল প্রকাশ করা হয় এবং সে অনুপাতে লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্যে বিধানসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়। ডিলিমিটেশন কমিশন সারা দেশ ঘুরে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করেন এবং সেই সঙ্গে নির্বাচন কেন্দ্রও।

তৃতীয় নির্বাচনে ১২টি রাজ্যে বিধানসভার জন্য মোট আসনসংখ্যা ছিল ২,৮৫৫টি; তার মধ্যে ৪৩৫টি তফসীল জাতি ও ১৯২টি তফসীল উপজাতির জন্য সংরক্ষিত ছিল। এর মধ্যে কেরালা ও উড়িষ্যা রাজ্য ধরা হয়নি; কারণ, এই দুই রাজ্যে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন আগেই হয়েছিল। এই দুই রাজ্য এবং চারটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ধরে সারা দেশে লোকসভা আসনের জন্য মোট কেন্দ্র ছিল ৪৯১টি। মোট নির্বাচকের সংখ্যা ছিল ২১ কোটি ৬০ লক্ষ।

এবারের চতুর্থ নির্বাচনে বিধানসভার জন্য নির্দিষ্ট ছিল (উড়িষ্যা ও কেরালা সহ) মোট ৩,৫৬৩টি আসন (এর মধ্যে ছয়টি আসন মনোনীত সদস্যের জন্য সংরক্ষিত)। মোট আসনের মধ্যে ৫০৩টি তফসীল জাতি ও ২৪৭টি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত। লোকসভার জন্য ছিল মোট ৫২১টি আসন। তার মধ্যে ৭৭টি তফসীল জাতির জন্য এবং ৩৭টি উপজাতির জন্য।

আসন-সংখ্যা এবারের নির্বাচনে নিঃসন্দেহে অনেক বেশী ছিল; কিন্তু প্রার্থী-সংখ্যা ছিল আরও বেশী। গত নির্বাচনে ২,৮৫৫টি বিধানসভা আসনের জন্য প্রার্থী-সংখ্যা ছিল ১২,৬৪৬; আর এবারের ৩,৩৯৪টি আসনের জন্য প্রার্থী-সংখ্যা ছিল ১৫,৮৭০। আর লোকসভার জন্য গত নির্বাচনে প্রার্থী-সংখ্যা ছিল ১,৯৮৫। আর এবার ছিল ২,৩১৬।

প্রার্থী-সংখ্যা থেকে মোটামুটি একটা ধারণা করে নেওয়া খুব কঠিন নয় যে, এবার নির্বাচন পটভূমিকা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিরোধকে আরও তীব্র করে তুলেছিল। যে পটভূমিতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে এটাই অনুমান করা হয়েছিল যে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রকৃতপক্ষে ছিলও তাই; কিন্তু নির্বাচনের পূর্ব-মুহূর্তে হঠাৎ দেখা গেল, নির্দলীয় প্রার্থীর ভিড় প্রতি রাজ্যে। যেমন লোকসভার জন্য, তেমনি বিধানসভাগুলির জন্য। কিন্তু সবাই বোধ হয় নির্দলীয় ছিল না। এদের মধ্যে অনেক প্রার্থী ছিল দলভাঙা দলের সদস্য, নতুবা কোন দলের মনোনয়ন পায়নি, এমন নির্দলীয়। কংগ্রেসবিরোধী প্রার্থীদের মনে ধারণা ছিল, কংগ্রেসের বিরোধিতাই নির্বাচনের পক্ষে যথেষ্ট।

কংগ্রেসবিরোধী দলগুলির মধ্যেও সেই-রকম একটা মনোভাব দেখা গিয়েছিল। তার কারণও হয়ত ছিল, কিন্তু বিরোধী দলগুলির প্রধান দুর্বলতা ছিল জোট বাঁধতে না পারা। বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক মতভেদ বিভেদ সৃষ্টি করেছিল। তাই নানা রাজনৈতিক দলের চিহ্ন নিয়ে বিভিন্ন প্রার্থী নির্বাচনের আসরে নেমেছিল। হয়ত সে কারণেই প্রার্থী-সংখ্যা এবার ছিল অনেক বেশী।

এর মধ্যে সবচাইতে বেশী ব্যগ্রতা দেখা দিয়েছিল জনসংঘের মধ্যে। গত নির্বাচনে বিধানসভার জন্য এদের প্রার্থী-সংখ্যা ছিল এক হাজারের কিছু বেশী, কিন্তু এবার ছিল ১৫ শতের বেশী। এবং জনসংঘের নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং হরিয়ানা। সবচাইতে বেশী ছিল উত্তরপ্রদেশে ৩৯৯ জন (৪২৫টি আসনের মধ্যে); বিহারেও ছিল ২৬৫ জন প্রার্থী এবং মধ্যপ্রদেশে ২৬৫ জন।

অপর দল স্বতন্ত্র পার্টি। এদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল গুজরাট, রাজস্থান এবং ওড়িশা। এই তিনটি রাজ্যে এই দলের ৩৫৩ জন প্রার্থী ছিল; এ ছাড়া ২০৯ জন ছিল উত্তরপ্রদেশে এবং ১৩৫ জন বিহারে। সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টিরও অধিকাংশ প্রার্থী ছিল উত্তরপ্রদেশে এবং বিহারে। প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টিরও বিহারে প্রার্থী-সংখ্যা ছিল ১৮৩।

এই দল কটির প্রার্থী-সংখ্যা থেকে ধরে নিতে অসুবিধা হয় না যে, প্রথম থেকেই এদের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং ওড়িশা। এই কয়টি রাজ্যে কংগ্রেসের দুর্বলতার যে অংশটা নির্বাচকদের সামনে তুলে ধরা সহজ হবে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই হয়ত এই দলগুলি তাদের নির্বাচন পদ্ধতিটা স্থির করে ফেলেছিল।

এদের বাদ দিলে বাকী থাকে ডান ও বাম কম্যুনিস্ট পার্টি দুটো। এই দুটো দল এদের নির্বাচনী কার্যক্রম প্রধানত সীমাবদ্ধ রেখেছিল পশ্চিম বাংলা ও

তালিকা ঃ—বন্ধনীর মধ্যে ১৯৬২ সালের ফলাফল দেওয়া [illegible]

<table>
<tr><th></th><th>কং</th><th>স্বতন্ত্র</th><th>জনসংঘ</th><th>পি-এস-পি</th><th>এস-এস-পি</th><th>ডান কম্যু</th><th>বাম কম্যু</th><th>নির্দল ও অন্যান্য</th></tr>
<tr><td rowspan="2">অন্ধ্র প্রদেশ</td><td>১৬৫</td><td>২৯</td><td>৩</td><td>x</td><td>১</td><td>১০</td><td>৯</td><td>৭০</td></tr>
<tr><td>(১৭১)</td><td>(১৯)</td><td>(x)</td><td>(x)</td><td>(২)</td><td colspan="2">(৫১)</td><td>(৫১)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">আসাম</td><td>৭৩</td><td>২</td><td>x</td><td>৫</td><td>৪</td><td>৭</td><td>x</td><td>৩৩</td></tr>
<tr><td>(৭৯)</td><td>(x)</td><td>(x)</td><td>(৬)</td><td>(x)</td><td colspan="2">(x)</td><td>(২০)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">বিহার</td><td>১২৮</td><td>৪</td><td>২৬</td><td>১৮</td><td>৬৭</td><td>২৪</td><td>৪</td><td>৪৭</td></tr>
<tr><td>(১৮৫)</td><td>(৫০)</td><td>(৩)</td><td>(২৯)</td><td>(৭)</td><td colspan="2">(১২)</td><td>(৩২)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">গুজরাট</td><td>৯২</td><td>৬৪</td><td>১</td><td>৩</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>৭</td></tr>
<tr><td>(১১৩)</td><td>(২৬)</td><td>(x)</td><td>(৭)</td><td>(x)</td><td colspan="2">(x)</td><td>(৮)</td></tr>
<tr><td>হরিয়ানা</td><td>৪৮</td><td>৩</td><td>১২</td><td>x</td><td>x</td><td colspan="2">x</td><td>১৮</td></tr>
<tr><td>কেরালা</td><td>৯</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>১৯</td><td>১৯</td><td>৫২</td><td>৩৪</td></tr>
<tr><td rowspan="2">মধ্যপ্রদেশ</td><td>১৬৭</td><td>৭</td><td>৭৮</td><td>৯</td><td>১০</td><td>১</td><td>x</td><td>২৪</td></tr>
<tr><td>(১৩৯)</td><td>(২)</td><td>(৪১)</td><td>(৩৩)</td><td>(১৪)</td><td colspan="2">(১)</td><td>(৫৫)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">মাদ্রাজ</td><td>৪৯</td><td>২০</td><td rowspan="2">x</td><td>৪</td><td>২</td><td>২</td><td>১১</td><td>*১৪৫</td></tr>
<tr><td>(১৩৯)</td><td>(৬)</td><td>(x)</td><td>(১)</td><td colspan="2">(২)</td><td>(৫৮)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">মহারাষ্ট্র</td><td>২০২</td><td rowspan="2"></td><td>৪</td><td>৮</td><td>৪</td><td>১০</td><td>১</td><td>৪০</td></tr>
<tr><td>(২১৫)</td><td>(x)</td><td>(৯)</td><td>(১)</td><td colspan="2">(৬)</td><td>(৩৩)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">মহীশূর</td><td>১২৬</td><td>১৬</td><td>৪</td><td>২০</td><td>৬</td><td>২</td><td>x</td><td>৪২</td></tr>
<tr><td>(১৩৮)</td><td>(৯)</td><td>(x)</td><td>(২০)</td><td>(১)</td><td colspan="2">(৩)</td><td>(৩৭)</td></tr>
<tr><td>ওড়িশা</td><td>২৯</td><td>৪৯</td><td>x</td><td>২০</td><td>২</td><td>২</td><td>১</td><td>২৯</td></tr>
<tr><td rowspan="2">পাঞ্জাব</td><td>৪৮</td><td>x</td><td>৯</td><td rowspan="2">x</td><td>১</td><td>৫</td><td>৩</td><td>৩৮</td></tr>
<tr><td>(৯০)</td><td>(x)</td><td>(৮)</td><td>(৪)</td><td colspan="2">(৯)</td><td>(৪০)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">রাজস্থান</td><td>৮৯</td><td>৪৯</td><td>২২</td><td rowspan="2">x</td><td>৮</td><td>১</td><td>x</td><td>১৫</td></tr>
<tr><td>(৮৭)</td><td>(৩৬)</td><td>(১৫)</td><td>(৫)</td><td colspan="2">(৫)</td><td>(২৫)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">উত্তর প্রদেশ</td><td>১৯৮</td><td>১২</td><td>৯৭</td><td>১১</td><td>৪৩</td><td>১৪</td><td>১</td><td>৪৬</td></tr>
<tr><td>(২৪৯)</td><td>(১৫)</td><td>(৪৯)</td><td>(৩৮)</td><td>(২৪)</td><td colspan="2">(১৪)</td><td>(৪১)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">পশ্চিম বাংলা</td><td>১২৭</td><td>১</td><td>১</td><td>৭</td><td rowspan="2">৭</td><td>১৬</td><td>৪৩</td><td>৭৮ (ক)</td></tr>
<tr><td>(১৫৬)</td><td>(x)</td><td>(x)</td><td>(২)</td><td colspan="2">(৫০)</td><td>(৪০)</td></tr>
</table>

* এর মধ্যে ডি-এম-কে'র ১৩৮টি আসন ধরা আছে। (ক) এর মধ্যে বাংলা কংগ্রেসের ৩৪টি আসন ধরা আছে

কেরালায়। অন্যান্য রাজ্যেও এদের প্রার্থী ছিল, কিন্তু এই দু'টি রাজ্যে বিশেষভাবে জোর দেবার সবিশেষ কারণ ছিল। দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থী-সংখ্যা ছিল ৬১৬ এবং বাম কম্যুনিস্টদের ছিল ৪৯৭। কেরালায় এদের মধ্যে একটা সাময়িক সমঝোতা ছিল; কিন্তু পশ্চিম বাংলায় এরা ভিন্ন দল ও ভিন্ন গোষ্ঠী হিসেবেই নির্বাচনের আসরে নেমেছিল।

দক্ষিণ কম্যুনিস্টদের সবচাইতে বেশী সংখ্যক প্রার্থী ছিল অন্ধ্র প্রদেশে। বাম কম্যুনিস্টদেরও এখানে কম সংখ্যক প্রার্থী ছিল না। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারেও এদের প্রার্থী ছিল।

প্রার্থী-সংখ্যা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এবারের নির্বাচনে প্রতিটি রাজনৈতিক দল এককভাবে সর্বভারতীয় দিকে দৃষ্টি রেখেই কার্যধারা নির্ধারিত করেছিল। অবশ্য এটা ঠিক যে, কোন রাজনৈতিক দল এককভাবে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আসরে নামেনি। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রতিটি দল কংগ্রেস শাসনকে ক্ষুণ্ণ করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল।

নির্বাচন-পূর্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই তার ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল থেকে নিশ্চয়ই মনে হবে না যে, সে ইঙ্গিত এত তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এই ফলাফলের তালিকা থেকে দেখা যাবে, আটটি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসতে সমর্থ হয়নি। এই রাজ্য ৮টি হল বিহার,

পশ্চিম বাংলা, কেরালা, মাদ্রাজ, ওড়িশা, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং উত্তরপ্রদেশ। এর মধ্যে কেরালায় কংগ্রেস শাসন ছিল না, ছিল রাষ্ট্রপতির বিধান। বাকী সব কয়টি রাজ্যে নির্বাচকরা কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। শুধু তাই নয়, প্রতি রাজ্যে একাধিক কংগ্রেস নেতা ব্যক্তিগতভাবে পরাজিত হয়েছেন।

যেমন হয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মাদ্রাজে। তাঁকে হারিয়ে দিয়েছে একটি ছাত্র। দুর্ভাগ্য বোধ হয় একা আসে না; তাই বোম্বাই-এ পরাজিত হলেন দুর্ধর্ষ কংগ্রেস নেতা শ্রী এস কে পাতিল। পশ্চিম বাংলায় হেরে গেলেন কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। বিহারে হারলেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে বি সহায়। উত্তরপ্রদেশে পরাজয় স্বীকার করলেন শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠী। পরাজিত হলেন ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরী, খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম এবং আরও অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য। কংগ্রেস মহলে প্রগতিশীল বলে যাঁরা পরিচিত, যেমন কে ডি মালব্য এবং শ্রীমতী সুভদ্রা যোশী, তাঁরাও বাদ গেলেন না।

তেমনি পরাজিত হলেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেনন কংগ্রেস-প্রার্থী শ্রী বার্ভের হাতে। বোম্বাই-এর এই কেন্দ্রটিতে ছিল শ্রী পাতিল এবং শ্রী মেননের পক্ষে মর্যাদার লড়াই।

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কেন্দ্র-শাসন-ব্যবস্থা নিয়ে কংগ্রেসী নেতাদের উদ্বেগ। লোকসভার নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত সামান্য সংখ্যাধিক্যে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। কিন্তু সংখ্যায় দলের চেহারা ছোট হয়ে গিয়েছে। শুধু কেন্দ্রেই নয়, বিভিন্ন রাজ্যেও কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেও খুশী হতে পারেনি। বিরোধী পক্ষের লাভটাই বেশী।

তবে, একটা বিষয় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, একমাত্র মাদ্রাজ ছাড়া অন্য কোন রাজ্যে কোন বিশেষ দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি। মাদ্রাজে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম। কেরালায় সংযুক্ত ফ্রন্ট মিলিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে এবং এই ফ্রন্টের অংশীদার হিসাবে সবচাইতে বেশী আসন পেয়েছে বামপন্থী কম্যুনিস্টরা।

নির্বাচন ফলাফলের এটাই হ'ল এবারের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এর সম্ভাবনাটা খুব আশাপ্রদ নয়। যে কয়টি রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসতে পারেনি, সে-সব রাজ্যে ক্ষমতা দখলের জন্য কংগ্রেস বিরোধী দলের মধ্যে দলাদলির অবসান ঘটবে কিনা, সুনিশ্চিত বলা সম্ভব নয়। কেরালা ও মাদ্রাজের প্রশ্ন ওঠে না; কারণ, মাদ্রাজে ডি এম কে নতুন সরকার গঠন করার অধিকারী এবং কেরালায় ক্ষমতায় বসবে যুক্ত ফ্রন্ট। অন্য ছয়টি রাজ্যে, কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলো একত্রিত না হ'লে সংবিধানগত প্রশ্ন উঠতে পারে। পশ্চিম বাংলায় অবশ্য বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতা ইতিমধ্যেই হ'য়ে গিয়েছে।

নির্বাচনোত্তরকালে ভারতের রাজনৈতিক চেহারাটা অদ্ভুতভাবে বদলে গিয়েছে। সেটা খানিকটা বোঝা যাবে নির্বাচনের ফলাফল সমগ্রভাবে বিচার করলে। নীচের তালিকা দেখলেই তা খানিকটা ধারণা করা সম্ভব।

এই তালিকাটা দেখলে সর্বভারতীয় চিত্রটা বেশ পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। দেখা যাচ্ছে, এবারের নির্বাচনে মোট আসন-সংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও কংগ্রেসের যেমন আসন-সংখ্যা কমেছে, তেমনি কমেছে প্রজা-সোস্যালিস্ট পার্টির। যে-সব দলের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের মধ্যে আছে স্বতন্ত্র পার্টি, জনসংঘ, সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি, ডি এম কে, এবং কম্যুনিস্ট পার্টির দুই অংশ।

গতবারের বিধানসভা নির্বাচন এবং এবারের নির্বাচনে যা দাঁড়াল, তার তুলনামূলক চিত্রটা এইরকম।

	১৯৬২ (মোট আসন ২৮৫৫)		১৯৬৭ (মোট আসন ৩৫৬৩)
কংগ্রেস	১৭৫৯		১৫৩৪
স্বতন্ত্র	১৬৬		২৫৬
পি-এস-পি	১৪৯		১১৩
জনসংঘ	১১৬		২৫৫
এস-এস-পি	৫৯		১৮৫
ডি-এম-কে	৫০		১৩৮
কম্যুনিস্ট	১৫৩	(ডান)	১১৬
		(বাম)	১২৮

লোকসভা নির্বাচনের চিত্রটাও প্রায় একই রকম। যেমন :—

	১৯৬২ (নির্বাচনের জন্য আসন-সংখ্যা ৪৮৫)		১৯৬৭ (নির্বাচনের জন্য আসন-সংখ্যা ৫১৯)
কংগ্রেস	৩৫৮		২৭৯
স্বতন্ত্র	১৮		৪৪
পি-এস-পি	১২		১০
জনসংঘ	১৪		৩৫
এস-এস-পি	৬		২৩
ডি-এম-কে	৭		২৫
কম্যুনিস্ট	২৯	(ডান)	২২
		(বাম)	১৯

(অন্যান্য ছোটখাট দলের হিসাব নিষ্প্রয়োজন)।

লোকসভায়ও এই চিত্র পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। সমগ্র চিত্র থেকে যেটা নির্মম সত্য বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, সেটা এই যে, চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলোর শক্তি যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কংগ্রেসের শক্তিক্ষয় হয়েছে সম-অনুপাতিক। কম্যুনিস্ট দল দুটো, যে-কোন কারণেই হোক, তেমনভাবে শক্তিবৃদ্ধি করতে পারেনি। প্রত্যক্ষভাবে হয়ত আসন এই দুই দল কিছু বেশী পেয়েছে, কিন্তু মোট আসন যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই হারে এদের শক্তি-বৃদ্ধি হয়নি। বামপন্থীদের মধ্যে যে দলটি বিশেষভাবে এবারের নির্বাচনে নির্বাচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে, তা হ'ল সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টি।

কাজেই এটা স্বীকার করতেই হবে যে, এবারের নির্বাচনে নির্বাচকদের ঝোঁক যা "সুইং" অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ছিল চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলোর দিকে। রাজনৈতিক চেতনা বোধের দিক থেকে হয়ত এটা আশাপ্রদ নয়, তবু স্পষ্ট কথাটা মেনে নেওয়া ভাল। এটা মেনে নিলে দেখা যাবে যে, কংগ্রেসের মধ্যে এবার যে ধস নেমেছে, তার মূল কারণ চরম দক্ষিণপন্থীদের প্রতি নির্বাচকদের ঝোঁক।

অর্থাৎ গত কুড়ি বছরের ঝোঁকটা হঠাৎ মোড় নিয়েছে চরম দক্ষিণপন্থীর দিকে। কেন ?

(ক্রমশ)

কলকাতার ডায়েরি

এই লেখা যখন ছাপা হবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নতুন অধিবেশন শুরু হয়ে গিয়েছে। অধিবেশন-কক্ষের চেহারাও নতুন। একক গরিষ্ঠ হয়েও কংগ্রেসীরা এবার বিরোধী আসনে। পুলিসের দাপট, খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়ের সমাধানে সরকারের ব্যর্থতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ একদা-মন্ত্রীদের মুখে কেমন লাগবে শোনার জন্যে সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। অবশ্য এই ধরনের সমালোচনা এখনই বিরোধী পক্ষ থেকে আদৌ শোনা যাবে কিনা, সে বিষয়েও গবেষণা চলছে। আবার অন্যদিকে এতদিন যাঁরা "জ্বালাময়ী বক্তৃতায়" পুলিসের নির্যাতনের অভিযোগ এনে এনে সভাকক্ষ সরগরম করে রেখেছিলেন, তাঁরা কীভাবে পুলিসের সমর্থনে এগিয়ে আসেন তা শোনার জন্যেও অনেকে উৎসুক হয়ে আছেন।

এই ঔৎসুক্য স্বাভাবিক হলেও অহেতুক। বিরোধী আসনে বসা কংগ্রেসের নতুন নয়, বরং নিষ্ফল কংগ্রেসীর খ্যাতি ওই আসন থেকেই ছড়িয়েছে। আর ইংরেজ শাসনের পর বিরোধী কংগ্রেসীরা যখন ট্রেজারি বেঞ্চে বসে সরকার সমর্থক হয়ে গেলেন তখনও তা কোনমতে ঠেকেনি।

এক্ষেত্রেও অনেকটা তাই। পরিষদীয় গণতন্ত্রে যাঁদের বিশ্বাস, তাদের এই পট পরিবর্তনে বিস্মিত হবার কিছু নেই। সাধারণ নির্বাচনের অর্থই জনমত যাচাই করে নেওয়া এবং সব দলকেই শাসন করার সুযোগ দেওয়া। ইংল্যানডে, আমেরিকায়ও তাই। তবে এই দুটি দেশের সঙ্গে ভারতের তফাত, লেবার-টোরি এবং ডেমোক্র্যাট-রিপাবলিকানের মত এদেশে দুটি সর্ব-ভারতীয় বড় দল নেই। থাকার মধ্যে একটিই—কংগ্রেস। কংগ্রেস গদি হারালে অন্য দশটি দলকে হাত মেলাতে হয়।

একমাত্র ব্যতিক্রম মাদরাজ। সেখানে ডি-এম-কে একাই নিরঙ্কুশ। তাছাড়া যেসব রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হচ্ছে, সব জায়গাতেই নানা দলের মিলন। পশ্চিমবঙ্গ সবার বাড়া। এখানে দুটি বা তিনটি নয়, মোট চৌদ্দটি দল নিয়ে নতুন সরকারকে কাজে নামতে হচ্ছে।

যত দল, তত মত। কিন্তু সুখের কথা, আপাতত 'যুক্ত ফ্রন্ট' নাম নিয়ে সব দলই একটি যুক্ত কর্মসূচীতে জড়ো হয়েছেন। এই যুক্ত উদ্যোগ টি'কে থাকলেই ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় আগ্রহী এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রত্যেকটি মানুষ খুশী হবেন। যে দলই আসুক, সাধারণ মানুষ চায়, খাওয়াপরার স্বাচ্ছন্দ্য, চাকরি-বাকরির সুবিধা, চিকিৎসার সুযোগ এবং দেশের সম্মান বজায়। মন্ত্রীদের ঘরে এয়ার-কনডিশন থাকল কি থাকল না, মন্ত্রীরা লিফটে উঠলেন না কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন, সেটাই বড় কথা নয়, যুক্তফ্রন্ট সরকার যদি উপরের ওই ন্যূনতম দাবিগুলি পূরণ করতে পারেন এবং তাঁদের প্রতি-শ্রুতিমত দুর্নীতির উচ্ছেদ করতে পারেন, তাহলে সবাই সাধুবাদ দেবে। তাছাড়া কংগ্রেস পক্ষ যদি বিরোধী দল রূপে তাঁদের প্রতিশ্রুতিমত আজগুবি অভি-যোগের বদলে সংযত ও গঠনমূলক সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে তাঁরাও সকলের প্রশংসা অর্জন করবেন। আশা করি উভয় পক্ষই সাধারণ মানুষকে নিরাশ করবেন না।

নির্বাচনী প্রচারের সময় এই সেদিনও অকংগ্রেসী দলগুলির মধ্যে কুৎসা বিনিময়ের ঘাটতি ছিল না। কম্যুনিস্টদের ডাইনে-বামে ঝগড়া সুন্দ-উপসুন্দের লড়াইকেও হার মানিয়েছিল। তাছাড়া বাংলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও কুৎসা প্রচার ছিল অনর্গল। আক্রোশ বেশী ছিল অজয়বাবু আর ডান কম্যুনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ীর উপর। দলীয় পত্রিকায় তার স্বাক্ষর এখনও জ্বলজ্বল করছে। তবু বাম কম্যুনিস্টরা যে "প্রদেশ কংগ্রেসের ওপিঠ" বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব মেনে নিলেন এবং সোমনাথবাবুর সঙ্গে হাত মেলালেন, তাতে অসম্ভব সম্ভব হওয়ার বিস্ময় থাকলেও আনন্দিত হওয়ার কথা। সবচেয়ে আনন্দিত অবশ্য হয়েছেন সংবাদপত্রের রিপোরটাররা। তাঁরা বলছেন, —'যাক বাবা বাঁচা গেল, এখন কিছুদিন আর হরতাল, অবস্থান ধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হবে না।

✻

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর গত সপ্তাহে গোটা শহরে আলোচনার একমাত্র বিষয় ছিল নতুন মন্ত্রিসভা। এই লেখা ছাপা হওয়ার আগেই নতুন মন্ত্রিসভার চেহারা পরিষ্কার ফুটে উঠবে। তবে গত কদিন বিষয়টি নিয়ে ট্রামে-বাসে-রোয়াকে—আড্ডায় গবেষণার অন্ত ছিল না।

তার মধ্যে আবার খাদ্য দফতরটি কার হাতে যাচ্ছে, তা নিয়ে বেশী জল্পনা কল্পনা। সব সংবাদপত্রে এই দফতর নিয়ে নতুন সরকারের দুর্ভাবনার খবর ছাপা হওয়াতে জনসাধারণের মনেও তা সঞ্চারিত হয়। তার লক্ষণ প্রকাশ পায় ট্রামে-বাসের আলোচনায়।

সেদিন ট্রামে বসেই শুনতে পেলাম "সারগর্ভ" আলোচনা। একজন বলছেন, "খাদ্য দফতরটি জ্যোতিবাবুরই নেওয়া উচিত। বিরোধী দলের বিচক্ষণ নেতা হিসেবে তিনিই তো কংগ্রেসী খাদ্যনীতিকে তুলোধুনো করেছেন, এবার তাঁরই উচিত সেই আগের বক্তৃতার আদলে সমস্যার সমাধান করা।"।

আর একজনের মন্তব্য, উনি ওটা নেওয়া উচিত ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের। তিনি বলে এসেছেন কনট্রোল তুলে দিলেই আপসে খাবার মিলে যাবে। এবার তিনি তাই করে

আমাদের শস্তায় বেশী খাবার দিন।"

তৃতীয় গ্রামবাসীর বক্তব্য অন্য রকমের। জ্যোতিবাবু নয়, ডকটর ঘোষও নয়, তাঁর মতে খাদ্য দফতরের ভার নিজের থেকেই নেওয়া উচিত এস-এস-পি নেতা শ্রীকাশীকান্ত মৈত্রের। বললেন, "পরিষ্কার মনে পড়ছে বিধানসভার বহু খাদ্য বিতর্কে প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে তিনি বাকযুদ্ধে নেমেছেন এবং হিসেব কষে দেখিয়ে দিয়েছেন, খাদ্য ঘাটতি ব্যাপারটা 'কংগ্রেসী ধাপ্পা', আসলে পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যের ব্যাপারে সারপ্লাস। সুতরাং দফতরটি মৈত্র মশায়েরই পাওনা। এবং আমরাও সারপ্লাস স্টেটের নাগরিক হিসেবে শস্তায় গাদাগাদা চাল পাব।"

চতুর্থ ভদ্রলোক এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। হঠাৎ সব আলোচনা স্তব্ধ করে দিয়ে বললেন, "মশাই, এ রাজ্যের খাদ্য সমস্যার সমাধান এঁদের কারও কর্ম নয়, বিরোধী দলে থেকে লম্বা লম্বা কথা বলা সোজা, কাজে নামলে অন্য রকম। আমার প্রস্তাব গেস্ট মিনিস্টাররূপে ওই প্রফুল্লচন্দ্র সেনকেই ডেকে আনা হোক, তাঁকেই দেওয়া হোক ওই দফতর।"

ভদ্রলোকের কথায় সবাই থ। আমিও। প্রস্তাবটা সীরিয়াস না রসিকতা, ঠিক ঠাহর করতে না পেরে বয়স্ক একজন আমতা আমতা করে বললেন—"তা বটে, কিন্তু ডাকলেই বা তিনি আসবেন কেন?"

সহযাত্রী আরও কয়েকজন কিন্তু এমন দৃষ্টিতে তাকালেন ওই ভদ্রলোকের দিকে, দাঁতে দাঁত ঘষলেন এমন ভঙ্গীতে মনে হল এখনই ঠোঁট ছেড়ে বেরিয়ে আসবে তিন অক্ষরের একটি শব্দ —'দালাল।'

বেরোল না, তবু একখুনি একটা কিছু অঘটন ঘটতে পারে এই আশংকায় তাড়াতাড়ি পরের স্টপে নেমে পড়লাম।

*

বিশ্বনিন্দুক ও সন্দেহবাতিক লোকের অভাব নেই এই কলকাতা শহরে। তাঁদেরই একজন আমার পরিচিত উমাপতিবাবু। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা যখন ছিল, তখন তিনি ছিলেন তার কড়া সমালোচক, এখন অকংগ্রেসী নতুন মন্ত্রিসভা হওয়ার পরও তাঁর খুঁতখুঁতে স্বভাব গেল না।

সেদিন এসেই বললেন, "দেখলেন তো কাণ্ডটা, প্রথম দিনেই কেমন অন্য রকম ব্যাপার ঘটে গেল।"

'অন্য রকম তো হবেই—' আমি বিস্ময় প্রকাশ না করে স্বচ্ছন্দে জবাব দিই।

"আরে না না তা নয়"—উমাপতিবাবু গড়গড় করে বলে চলেন—"চৌদ্দমিশেলী দল তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু দেখলেন তো একমাত্র হেমন্তবাবু রাইটার্স বিলডিংসে যাবার আগে 'নেতাজী ভবনে' গেলেন, অন্য কোন নতুন মন্ত্রী গেলেন না। তার মানেটা কী দাঁড়ায়? তিন তিনটে শহীদ বেদীতে সবাই যেতে পারলেন, অথচ নেতাজীভবনে গেলেন একা হেমন্তবাবু! নেতাজী একা ফরওয়ার্ড ব্লকের না সারা ভারতের?"

ভদ্রলোকের উত্তেজনা থামিয়ে আমি বলি, "নেতাজীভবনে না যাওয়ার অর্থ নেতাজীকে অস্বীকার করা নয়, আপনি ভুল বুঝেছেন উমাপতিবাবু।"

উমাপতিবাবু থামবার পাত্র নন। আবার বলেন, "এখন মুশকিলটা কী হবে দেখুন। মন্ত্রিসভার মধ্যে নেতাজী, গান্ধীজী, ব্রেজনেভ, মাও, লিউ—সবার মতের সমর্থক সদস্য আছেন। এখন তেইশে জানুয়ারি সরকারী ছুটির দিনে সব মন্ত্রীই কি উৎসবে যোগ দেবেন? দোসরা অকটোবর বা তিরিশে জানুয়ারি সব মন্ত্রী কি যেতে চাইবেন বারাকপুরের গান্ধীঘাটে? রাশিয়া থেকে কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি দমদমে নামলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানাতে বাছাই করে কি মন্ত্রী পাঠাতে হবে দমদমে? দেখুন তো দিকি আমাদের নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে কী সমস্যারই না পড়তে হবে।"

উমাপতিবাবুকে নিরস্ত করে দিয়ে বললাম—"নেই কাজ তো খই ভাজ, আপনারও তাই। দেশে সমস্যার অন্ত নেই, ওই ছোটখাট সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে না ভাবলেও চলবে। দয়া করে সরে পড়ুন।"

বিশেষ আমল না পেয়ে খুঁতখুঁতে ভদ্রলোকটি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলেন সবেগে। আমিও বাঁচলাম।

*

সত্যি মিথ্যে জানিনে, খবর পেলুম, পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ মুখ্যমন্ত্রী হতে অভিলাষী কিছু অবিবাহিত কংগ্রেসী ও অ-কংগ্রেসী রাজনীতিবিদ স্থির করেছেন, তাঁরা আর বিয়েই করবেন না, চিরকুমার থাকবেন।

—চাণক্য

বাংলা বানান

দেশ পত্রিকার ১৫ সংখ্যায় শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীর প্রবন্ধ থেকে জানা গেল, আনন্দবাজার পত্রিকা বাংলা শব্দের চেহারার আমূল পরিবর্তন করে ফেলতে চান। আপাততঃ তাঁরা তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দে হাত না দিয়ে অতৎসম শব্দের উপর দিয়েই পরীক্ষা চালাচ্ছেন। তাঁদের যুক্তি—অমিতাভবাবুর ভাষায়—(১) সংযুক্তাক্ষরা বঙ্গ ভাষার চালচলন আড়ষ্ট, (২) ছাপাখানা এবং টাইপরাইটারের কাজে অসুবিধা সৃষ্টি হয়, (৩) বাংলা শেখায় আগ্রহী বিদেশীদের অসুবিধা হয়। এই যুক্তির ভিত্তিতে আনন্দবাজার প্রথমে অতৎসম শব্দে যুক্তাক্ষর বর্জনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা এই 'বৈপ্লবিক' সংস্কারের কাজে এগিয়ে এসেছেন "অনাগত শিশু এবং বাংলা শেখায় আগ্রহী বিদেশীদের কথা" মনে রেখে।

এখন দেখা যাক এই ধরনের সংস্কারের কোন দরকার আছে কি? যুক্তাক্ষর টাইপ-রাইটার এবং ছাপাখানায় কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করে ঠিকই, কিন্তু মানুষ কি যন্ত্রের দাস, না যন্ত্র মানুষের দাস? টাইপরাইটারের মুখ চেয়ে আমরা বহু শতাব্দীর পরিচিত শব্দরূপকে ভেঙে ফেলব? সভ্য মানুষের মেধা কি যন্ত্রের উৎকর্ষ বাড়াবার দিকে না গিয়ে নিজেকে যন্ত্রের প্রয়োজনে ভেঙে ফেলায় নিয়োজিত হবে? যান্ত্রিক ছাপা-পদ্ধতির জন্য আমরা পরিচিত ভাষাকে দূরে করে দিয়ে রেখাক্ষর বর্ণমালা কিংবা মোর্স পদ্ধতিও অবলম্বন করতে পারি। অমিতাভ-বাবু কি এতদূরে এগিয়ে আসতে রাজি আছেন?

বাংলা শেখায় আগ্রহী বিদেশীরা সংখ্যায় কজন? অঙ্গুলিমেয় কয়েকজন বিদেশীর প্রয়োজনে একটা ভাষাকে ভাঙতে হবে? আর ভাঙলেই কি দলে দলে বিদেশীরা এসে বাংলা ভাষা শিখতে শুরু করবে? যাঁরা আন ভাষা শিখতে চান তাঁরা ঐ ভাষার খুঁটিনাটি বৈচিত্র্য ও জটিলতাকে মেনে নিয়েই ঐ ভাষা শিখবেন—এটাই তো নিয়ম জানি। ভারতীয়দের ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য ইংরেজি ভাষার নিয়মকানুন কোথাও পরিবর্তিত হয়েছে বলে তো আমাদের জানা নেই। ...

দের প্রতি এত সুযোগ-সুবিধা দেবার প্রশ্ন আসছে কেন?

বাংলা লিপিতে সংযুক্ত অক্ষর থাকার ফলে বাংলা ভাষার চালচলন আড়ষ্ট—এ তথ্য অমিতাভবাবু পেলেন কোথায়? বাংলা সাহিত্যের যাঁরা দিকপাল তাঁরা যদি কোন অসুবিধা না বোধ করে থাকেন এবং তাঁদের লেখা পড়ে যদি বাংলাভাষী অগণিত পাঠক আড়ষ্টবোধ না করে থাকেন তবে অমিতাভ-বাবু আড়ষ্টবোধ করছেন কেন? তিনি লিখেছেন, "বাহাত্তর ইঞ্চি বহরের আঠারো হাত ধুতি নিয়ে ট্রামে-বাসে চলার মতই যুক্তাক্ষরে জড়ানো বাংলা ভাষা পদে পদে হোঁচট খায়, দু-পা এগোতে না এগোতে জিরোতে চায়।" উপমাটি অত্যন্ত কষ্ট-কল্পিত। আঠারো হাত ধুতি বাজারে পাওয়া যায় কিনা জানি না। জানতে ইচ্ছা হয় এই রকম ধুতি পরে অমিতাভবাবু কখনও হোঁচট খেয়েছেন কিনা। আরো জানতে ইচ্ছা হয় অমিতাভবাবু দশ হাত ধুতি পরেন কিনা কিংবা ধুতি পরা আদৌ পছন্দ করেন কি না? বাংলা দেশেরই একজন মন্ত্রী ধুতির বদলে হাফ প্যাণ্ট পরতে উপদেশ দিয়েছিলেন সবাইকে। তাঁর উদ্দেশ্য সাধু ছিল সন্দেহ নেই এবং তাঁর উপদেশমত চললে আর্থিক সাশ্রয়ও আমাদের যথেষ্টই হত, কিন্তু বাংলা দেশের লোকেরা এতে কোন গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিল কি?

প্রত্যেক জীবন্ত ভাষা নিজের সংস্কার নিজেই করে নেয়। দীর্ঘ ঋ এবং হ্রস্ব-দীর্ঘ ঌ-কে বর্ণ পরিচয় থেকে তুলে দেবার জন্য কোন আন্দোলনের দরকার হয়নি, তারা অব্যবহারের লজ্জায় নিজেরাই বিস্মৃতির অতলে চলে গেছে। অমিতাভবাবু যতই প্রথাবাগীশদের নিন্দে করুন না কেন মানুষ সর্বব্যাপারে প্রথা মেনে চলারই পক্ষপাতী। প্রথা মেনে চলি বলেই শ্রবণ ও স্রবন এই দুটো শব্দের বাংলায় একই উচ্চারণ।

তাহলেই প্রশ্ন আসছে—লণ্ডনকে লনডন, ইস্টার্নকে ইসটারন, মাদ্রাজকে মাদরাজ, বোম্বাইকে বোমবাই করার দরকার কেন? এতে শব্দগুলোর নতুন চেহারা হচ্ছে বটে, কিন্তু বাড়তি সুবিধে কি হচ্ছে? শিশুরা বানান শিখবে সহজে? কিন্তু তার পাশেই যে দেখছি রয়েছে ব্রহ্মাণ্ড, সম্মার্জনী আর ঘণ্টাকর্ণ। সংস্কৃত বলে কি এরা শিশু-দের কাছে কঠিন ঠেকবে না? আসল কথা, এ ভাঙার শেষ কোথায়? জর্জকে জরজ

করলাম, কোম্পানী কোমপানি হল, নাদকার্নি নাদকারনি হল। দেখাদেখি বস্তা বসতা, আন্দাজ আনদাজ, উর্দু উরদু, গীর্জা গিরজা হবে। যুক্তাক্ষর ভেঙে নতুন বানান-রীতি চালাতে গিয়ে আমরা কি বর্ণপরিচয়ের জল পড়ে পাতা নড়ের যুগেই ফিরে যাবো? ভাত-মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়ে দুধসাবুতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হবে আমাদের?

আনন্দবাজার পত্রিকা যুক্তাক্ষর ভাঙতে চান, কিন্তু শব্দের প্রথমেই যদি যুক্তাক্ষর থাকে তাহলে ভাংগবেন না। যেমন চীফ রিপোরটার। কেন ভাংগবেন না? উচ্চারণে বিকৃতি ঘটবে বলে? কিন্তু হায়দ্রাবাদকে হায়দরাবাদ লিখলে উচ্চারণ ঠিক থাকে কি? লক্ষ্ণৌকে নাকি লখনউ লেখা যুক্তযুক্ত। কেননা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'উটমাছি'। রবীন্দ্রনাথ তো ওয়ার্ডসওয়ার্থকে লিখে-ছিলেন 'বার্ডস্বার্থ'। এটা আনন্দবাজার গ্রহণ করবেন কি? আর অমিতাভ চৌধুরী মশায়কে জিজ্ঞাস্য, তিনি নিজের পদবীর বানান কেন 'চউধুরি' রূপে লিখছেন না? আনন্দবাজারে তো 'বানারজি' 'মুখারজি' চলছে।

বাংলা ভাষার সংস্কার হোক এটা সবাই

৩

১৫-সংখ্যক 'দেশ'-এ (শনিবার, ২৮ মাঘ) শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীর 'বাংলা বানানে সু-নীতি ও কু-নীতি' বিশ্ববন্দিত ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'বাংলা অক্ষরে ইংরেজী নাম ও শব্দ' (দেশ, ২১ মাঘ) রচনার প্রতিবাদে লেখা। বাংলা সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল 'দেশ'-এর অগণিত পাঠক-পাঠিকা শ্রী চৌধুরীর যুক্তিবিন্যাসে যতটা না প্রীত হবেন, ততোধিক বেদনা অনুভব করবেন, শ্রদ্ধেয় শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের রচনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি যে শ্লেষ ও ব্যংগাত্মক ভাষারীতির আশ্রয় নিয়েছেন তার জন্য। 'দেশ'-এর পাঠক কেবল বাঙালীই নন, ভারতে তার অ-বাঙালী পাঠকের সংখ্যাও গণ্য করবার মতো। আর শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের নামটিও ভারতের সকল ভাষাভাষী শিক্ষিত ও মননশীল মনের নিকট পরম শ্রদ্ধার সম্পদ। তাই যে-ভাষাভংগী এই রচনাটিতে শ্রী চৌধুরী অনুসরণ করেছেন, তাতে যুক্তির চেয়ে ব্যংগই যেন সমগ্র রচনার অতিমাত্রায় প্রকট। অন্য ভাবেও তিনি অক্লেশে সুন্দরতরভাবে তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করতে পারতেন।

'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাংলা তৎসম শব্দ ভিন্ন অন্যান্য শব্দের বানান যুক্তাক্ষর ভেঙে ব্যবহার করবার রীতি প্রচলন করেছেন। মনে হয়, এই উদ্দেশ্যের অনেকটাই প্রেসের প্রয়োজনে। যাই হোক, এর স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক কথাই বলার আছে। তবে সকল আলোচনার শেষে এ কথাই বলতে হয় যে, তাতে বাংলা শব্দের উচ্চারণকে প্রভাবিত করবেই। আর যাঁরা শিক্ষকতায় নিযুক্ত আছেন, তাঁরা জানেন, ছাত্রছাত্রীদের মন থেকে বাংলা বানানের এই হেরফের দূর করা কী কষ্টকর ব্যাপার। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র অবলম্বিত পদ্ধতি কেবল শিক্ষিত ও পরিণত মনেরই জন্য। বিশেষত স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের নিকট তা রীতিমতো ধাঁধা ছাড়া আর কিছু নয়।

অজিতকুমার সাহা
আসাম।

নীল ঘোড়সওয়ার

১৮ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত আমার আধুনিক চিত্রকলা পর্যায়ে "নীল ঘোড়সওয়ার"দের বিষয়ে আলোচনায় শ্রীসমীর রায় অনেক ভুল দেখেছেন। তা ছাড়া, মাঝে মাঝেই তিনি উত্যক্ত হয়েছেন, এমন সব বইয়ের নাম কিংবা তথ্যে, যা তিনি জানতেন না—এটা তো স্বাভাবিকই, যা আমরা জানি না, তাকে সত্য বলে মানতে ইচ্ছে হয় না।

আমি নাচার এবং কাণ্ডিনস্কির দুর্ভাগ্য যদি শ্রী রায় অস্বীকার করেন, কাণ্ডিনস্কি 'নীল ঘোড়সওয়ার' নামে কোনো ছবি এঁকেছিলেন এবং তা থেকেই এই দলের নামকরণ। ছবিটা সত্যিই ভালো, সেটাকে শ্রী রায় সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড থেকে মুছে না দিলেই পারতেন।

নীল ঘোড়সওয়ারদের সংঘবদ্ধভাবে প্রথম দেখা যায় ১৯০৯-এ টানহাউসের গ্যালারিতে—এ কথা লিখেছিলুম আমি। সমীরবাবু তাতে ভুল দেখেছেন—এই দলের নামকরণই হয়তো ১৯১১তে, তার আগে কী করে এদের অস্তিত্ব থাকে? শ্রী রায় এই অভিযোগের মাধ্যমে এক বিরাট প্রশ্ন তুলেছেন। মানুষের জন্মাবার দিন তো কোনো নাম থাকে না, কিন্তু তবু কেন বলা হয় না, সমীর বা শুদ্ধশীলের জন্ম হয় অত সালে; যেদিন জন্ম হয়, সেদিন সমীরবাবু সমীর ছিলেন কিনা, জানি না, শুদ্ধশীল নাম তো আমার সাত বছর বয়সে হয়েছে। শ্রী রায়ের নির্দেশ অনুসারে "নীল ঘোড়সওয়ার" নাম নেবার আগে পর্যন্ত এই দল সংঘবদ্ধভাবে যাই করুক না কেন, আমরা তাদের নীল ঘোড়সওয়ার বলতে পারব না—নির্দিষ্ট করতে হবে "ওই চিত্রকররা, এই শিল্পী গোষ্ঠী," এ-সব বলে। যেমন কাল থেকে বাবলুকে আর বলা যাবে না ১৯৪৮-এ জন্মেছিল, কেননা, ১৯৫২-র আগে তো তার নামকরণই হয়নি।

ফ্রানৎস মার্ক এ-দলে পরে যোগ দেন, এ কথাতে কী ভুল আছে? ১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে এই দলের সবার ছবি একত্র হয়ে দেখা যায় মুনিখে, কিন্তু সেখানে মার্ক ছিলেন না। ১৯১১তে মার্ক দলে যোগ দেন এবং "Der Blau Reiter" পুস্তকের আংশিক সম্পাদনা করেন কাণ্ডিনস্কির সংগে। তিনি পরে আসাতে শ্রী রায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন—আমি কী করব, উনি ১৯০৯-এ না এসে ১৯১১-তে এলে? আমি তো তাঁকে টেনে নিয়ে আসতে পারি না। এবিষয়ে আমার ওপর রাগ করার কোনো মানে হয় না।

জার্মানীর য়ুগেন্ডস্টিল আন্দোলনের সংগে কাণ্ডিনস্কির সম্পর্ক খুঁজে পাওয়ায় সমীরবাবু অবাক হয়েছেন। কিন্তু তিনি কি ভুলে গেলেন যে, ১৮৯৬তে কাণ্ডিনস্কি যখন মুনিখে এলেন, তখন য়ুগেন্ডস্টিলের প্রভাব সবার ওপরে? শুধু কাণ্ডিনস্কিই নয়, ভ্যান-গ, সিউরা, গোগ্যাঁ, ভালাত ম্যুংখ, হোডলার, ককশকা, পিকাসো, মাতিস, ব্রাক সবাই য়ুগেন্ডস্টিলের প্রভাবে বিশ শতকের গোড়ার দিকে হঠাৎ ক্যানভাসকে "সজ্জিত-করণের" দিকে মন দিয়েছিলেন। শ্রী সমীর রায়ের মতো তথ্য-সচেতন ব্যক্তির এরকম ভুল হওয়া উচিত না।

সমীরবাবু লিখেছেন, "কনসার্নিং স্পিরিচুয়াল আর্ট" নামে কোনো রচনার কথা তিনি শোনেননি। আচ্ছা, সত্যিই কি কোনো কাণ্ডিনস্কি বা ডস্টোয়েভস্কির কিছু এসে যায়, কোথাকার কে শুদ্ধশীল বসু না সমীর রায়, তাদের "কনসার্নিং স্পিরিচুয়াল আর্ট" বা "ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট"-এর নাম শুনল কি না তাতে? শ্রী রায় এই বইটার নাম না শোনার এত আকুল হচ্ছেন কেন, বইটা তো আছে, থাকবেও, আজ না শুনলেও সময় তো চলে যায়নি। তা ছাড়া, এই গত সংখ্যাতেই কাণ্ডিনস্কি বিষয়ে পৃথক আলোচনায় "কনসার্নিং স্পিরিচুয়াল আর্ট" থেকে কয়েক ছত্র অনুবাদ করেছি—সমীরবাবু সেটা দেখতে পারেন ইচ্ছে হলে।

শুদ্ধশীল বসু
কলকাতা-৪৭

বহু-বিতর্কিত জুলিয়াস ওপেনহাইমার

হালে এক প্রবন্ধে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য ম্যাকস্ বর্ন যুদ্ধে পাইকারী নরমেধের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের ইতিহাসের এক রূপরেখা আঁকেন। প্রবন্ধটির নাম, "আশা কি নেই?" সেই প্রবন্ধে তিনি গত মহাযুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে আমেরিকায় পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের প্রচেষ্টার সমর্থনে বলেন যে, তখন জানতে পারা গিয়েছিল যে, হিটলারী জার্মানী ঐ অস্ত্র তৈরি করার চেষ্টা করছিল। সেইজন্য আত্মরক্ষার তাগিদেই মিত্রপক্ষকে ঐ অস্ত্রলাভের দিকে যেতে হয়েছিল (ম্যাকস্ বর্ন অবশ্য জাপানে ঐ অস্ত্র প্রয়োগ সমর্থন করেন নি)। সেদিন আমেরিকার পারমাণবিক অস্ত্র গবেষণা পরিচালনার দায়িত্ব যাঁর হাতে ছিল, সেই বিজ্ঞানাচার্য জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহাইমার ৬২ বছর বয়সে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ইহজগৎ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্ববিজ্ঞানের এক বিরাট ক্ষতি হল, এ কথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন, কারণ, তিনি শুধু অ্যাটম বোমার অন্যতম স্রষ্টা ছিলেন না, সেই সংগে ছিলেন মস্ত বড় একজন বিজ্ঞানের পণ্ডিত। এত বড় এক মারণাস্ত্রের স্রষ্টা হয়েও মনে-প্রাণে তিনি ছিলেন যুদ্ধবিরোধী। তিনি পারমাণবিক রাজনীতি বা কূটনীতি সমর্থন করতেন না বলেই ১৯৫৪ সালে তাকে মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশনের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল এবং ঐ কমিশন তখন তাঁকে 'সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স' দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে আমেরিকার সমকক্ষ হয়ে পড়ার পর ঐ ধরনের বাধানিষেধ নিরর্থক হয়ে দাঁড়াল। ফলে ১৯৬৩ সালে মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশন ওপেনহাইমারকে কমিশনের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। হোয়াইট হাউসে এক উৎসব সভায় প্রেসিডেন্ট জনসন পদার্থ-বিজ্ঞানে এবং পারমাণবিক শক্তির সামরিক ও বেসামরিক প্রয়োগে তাঁর সুদূরপ্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তাঁকে এনরিকো ফের্মি পুরস্কার দেন।

জার্মান ইহুদী বংশজাত ওপেনহাইমারের পারিবারিক অবস্থা বেশ সম্পত্তিপন্ন ছিল। তিনি ভূমিষ্ঠ হন নিউ ইয়র্কে। তাঁর মা ছিলেন চিত্রশিল্পী। তাই বিজ্ঞানসাধক হয়েও ওপেনহাইমার শিল্পকলা ভালবাসতেন এবং তার আচার-ব্যবহারে ছিল শিল্পসুলভ সলজ্জ কোমলতা। শোনা যায় যে, গোড়ায় নাকি তাঁর একই সংগে কবি, স্থপতি ও বৈজ্ঞানিক হবার সাধ ছিল। বই পড়ার দুর্বার নেশা ছিল তাঁর। একবার রেলে করে সানফ্রান্সিসকো থেকে নিউ ইয়র্ক যেতে যেতে পথেই তিনি 'রোম সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন বইখানি আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলেছিলেন।

ওপেনহাইমার যখন হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হন, তখনো তিনি নিজের পথ ঠিক করতে পারেন নি। তাই প্রথমে তিনি রসায়ন-শাস্ত্রের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু তারপরেই তীনি বুঝতে পারেন যে, রসায়ন তাঁর রাস্তা নয়। তখন তিনি পদার্থবিদ্যার দিকে মোড় নেন। তারপর হার্ভার্ড থেকে তিনি যান কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিশ লেবরেটরীতে, যেখানে তিনি লর্ড রাদারফোর্ডের সাহচর্যে গবেষণা শুরু করেন।

কেম্ব্রিজের পর ওপেনহাইমার চলে যান জার্মানীর গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে আচার্য ম্যাকস বর্নের সঙ্গে তিনি কাজ করতে থাকেন কোয়াণ্টাম তত্ত্ব নিয়ে। সব শেষে জুরিখ ও লীডেন ঘুরে তিনি ১৯২৮ সালে আমেরিকায় ফিরে পরবর্তী ১৮ বছর ক্যালিফর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি ও ক্যালি-ফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটান।

ওপেনহাইমার ১৯৪২ সনে নিউ-মেক্সিকোর লস সালামস লেবরেটরীর

এক প্রবাসী জার্মানের পুত্র
ডঃ জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহাইমার

জন্ম : ২২শে এপ্রিল, ১৯০৪ — মৃত্যু : ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭

অধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত হন। সেইখানে তিন বছর গবেষণার পর ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী মিলে এক প্রাথমিক পারমাণবিক যন্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং তার বিস্ফোরণ-পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করেন। নিউ-মেক্সিকোর আলামাগর্ডো নামক জায়গায় সেই পরীক্ষা চালান হয়েছিল।

১৯৪৭ সাল থেকে প্রিন্সটন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড্ স্টাডিজ'-এর অধ্যক্ষ পদে বহাল থাকার পর গত বছর তিনি ঐ পদে ইস্তফা দিয়ে "মানবজীবনে বিজ্ঞান কী এনে দিয়েছে"—এই সম্পর্কে দার্শনিক ও ঐতিহাসিক গবেষণায় ব্রতী হন। বিজ্ঞান মানুষের ভাল করছে না খারাপ করছে, এ সম্পর্কে তাঁর মনে সংশয় দেখা দেওয়া থেকেই এই গবেষণার উদ্ভব। অ্যাটম বোমার আবিষ্কর্তা হিসাবে হয়ত তাঁর মন অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত হয়েছিল, এবং সেইজন্যই হয়ত তিনি হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি কিছু রুশ কূটনৈতিককে পারমাণবিক বোমার গোপন তথ্য দিতে চেয়েছিলেন এই অভিযোগে তাঁকে এক দীর্ঘ শুনানীর সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যার ভিত্তিতে হালে লণ্ডনে এক নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। হয়ত ওপেনহাইমার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুধ্যমান রাশিয়ার কাছে সেই তথ্য গোপন করতে চাননি। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন যে, যখন আমেরিকা ও রাশিয়া দুজনেরই যদি সেই তথ্য জানা থাকে, তা হলে হয়ত পারমাণবিক অস্ত্র-নির্মাণের চাপাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে দুনিয়া রেহাই পাবে। এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে কি আনুগত্যের অভাবের অভিযোগ আনা যায়? জার্মানীর বিরুদ্ধে আমেরিকা আর রাশিয়া দুজনে যখন হাত মিলিয়ে লড়ছিল, তখন সেই দুটি দেশের মধ্যে কোন সামরিক তথ্য নিয়ে লুকোচুরি খেলাটা তাদের যুদ্ধকালীন মিত্রতার সঙ্গে খাপ খায় না। আসল কথাটা সেই মিত্রতাটা ছিল নেহাতই যুদ্ধকালীন, পরবর্তী শান্তিকালে যা শত্রুতায় রূপান্তরিত হয়। সোভিয়েত-মার্কিন সম্পর্কের মধ্যে এই যে স্ববিরোধী দ্বৈত উপাদান ছিল, এটাই ওপেনহাইমারের আচার ও বিচারকে স্ববিরোধী করে তুলেছিল। কিন্তু সেজন্য তাঁর দেশপ্রেম বা মানব-প্রেমকে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। তাঁর দেশপ্রেমে সন্দেহ করলে বিজ্ঞানাচার্য জোলিও কুরীকেও দেশপ্রেমিক বৈজ্ঞানিক বলা যাবে না।

প্রকৃতিকে উপলব্ধি করার গোটা ভিত্তিটাই ওপেনহাইমার যতখানি পরি-বর্তিত করে দেন, ততখানি অন্য কেউ তাঁর আগে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। আরো যে অনন্য ব্যাপারটি আমরা এই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর মধ্যে দেখতে পাই, তা হচ্ছে যে, ৪০ বছর বয়সের আগে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রকাশমান ও পরিস্ফুর্ত হয়নি। বিজ্ঞানের ইতিহাসে যাঁরা অক্ষয় কীর্তি রেখে গিয়েছেন, তাঁদের প্রতিভার পরিপ্রকাশ দেখা গিয়েছে সাধারণত যুবা বয়সে।

আগেই বলেছি, ডঃ ওপেনহাইমার ছিলেন বিরাট এক সাহিত্য-রসিক। তা ছাড়া, অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বিদেশী ভাষা রপ্ত করতে পারতেন। লাইডেনে গিয়ে মাত্র ছয় সপ্তাহ পরে তিনি ওলন্দাজ ভাষায় চমৎকার এক বক্তৃতা দেন। ওপেনহাইমার সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন এবং গীতা পড়েছিলেন। তাঁর প্রথম পার-মাণবিক বিস্ফোরণের প্রচণ্ড দ্যুতি দেখে তিনি মোহিত হয়ে গীতার একটি শ্লোক থেকে একটি পদ উদ্ধৃতির সাহায্যে সেই দ্যুতির বর্ণনা করেন, যার বাংলা অর্থ—সহস্র সূর্যের চেয়েও জ্যোতিষ্মান।

ডঃ ওপেনহাইমারের মনের মধ্যে যে দার্শনিক ও রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপটা দেখা দিয়েছিল, সে সম্পর্কে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তিনি যে সংঘাতময় যুগের মানুষ, সেই ঝড়-ঝাপটা সেই যুগেরই প্রতিফলন।

ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়

চীন-যুদ্ধে পরাজয়ের দায়িত্ব

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

[দুই]
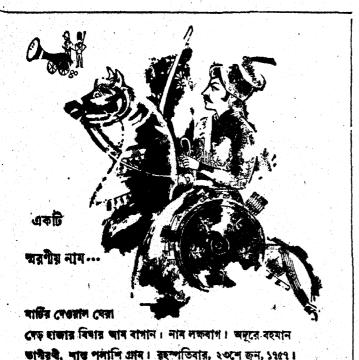
নেহরুর আচরণের রহস্য

জেনারেল কল ১৯৬২ সনের যুদ্ধের উপক্রমণিকা সম্বন্ধে যেসব খবর দিয়াছেন তাহার তাৎপর্য অতি গুরুতর এরূপ অবিমৃষ্যকারিতা কোনও জাতি বা গভর্নমেন্ট দেখাইতে পারে তাহা কল্পনা করা কঠিন। আমি আমাদের বর্তমান-শাসকদের কোনও অকর্মণ্যতা, অন্যায়, বা মিথ্যাচারে আশ্চর্য হই না। আমার কাছেও এই কাহিনী অবিশ্বাস্য মনে হইয়াছে। নিতান্ত অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই, তাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছি।

প্রথম অবিশ্বাস্য ব্যাপার নেহরুর আচরণ। কোনও দেশের প্রধানমন্ত্রী, তাহার উপর আবার তাঁহার মত ব্যক্তি যে এইরূপ দায়িত্বহীনতা দেখাইতে পারেন তাহা সাধারণ বুদ্ধির অতীত, ইতিহাসে বিরল। জেনারেল কলের বই হইতে নেহরু সম্বন্ধে যেসব সংশয় জাগে সেগুলি এইরূপ—

১। তিনি চীনের সহিত ভারতবর্ষের সম্পর্ক কি হইতে পারে, কখনও স্থির-ভাবে বিবেচনা করিয়া দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন নাই: একদিকে নিজের মানসিক ঝোঁকের প্রভাবে ও অন্য দিকে জনমতের ভয়ে যখন যাহা সুবিধাজনক, তাহাই করিয়াছেন বা বলিয়াছেন, কোনও অবস্থাতেই চাপিয়া হাল ধরিবার চেষ্টা করেন নাই।

২। চীনের সহিত যুদ্ধ সম্ভব জানিলেও যুদ্ধের আয়োজন উদ্যোগ সম্বন্ধে কোনও সংবাদ নিতে উৎসাহ দেখান নাই, প্রিয়পাত্র মেননের উপর সমস্ত ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।

৩। নিজে চীনের সহিত মিত্রতা রাখার সপক্ষে হইলেও নিজের মত নির্ভীক-ভাবে প্রকাশ করিয়া দেশবাসীকে শান্ত করিতে চেষ্টা ত করেনই নাই, পক্ষান্তরে জনমতের উত্তেজনা দেখিয়া' ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের চিৎকার শুনিয়া বিনা বিচারে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন।

এইসব কোনও রাজনীতিবিদের আচরণ নয়, ইংরেজীতে যাহাকে 'ডেমাগোগ' বলে তাহার, অর্থাৎ জনগণের মূঢ় স্তাবকের আচরণ। কিন্তু ইহার পরেও নেহরু আর একটা চরম অবিবেচনা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন। উহা প্রকাশ পাইয়াছিল তাঁহার ১৯৬২ সনের ১২ অক্টোবর তারিখের ঘোষণাতে, যাহাতে তিনি দেশবাসীকে জানাইয়াছিলেন যে, চীনাদের নেফা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার হুকুম তিনি সেনাবাহিনীকে দিয়াছেন। ১৩ তারিখ সকালে আমার সংবাদপত্রে আট-কলমে হেডিং-এর নীচে খবরটা পড়িয়া আমি হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম। ব্যাপারটা আমি তখন বুঝিতে পারি নাই, হারের পর আরও দুর্বোধ্য মনে হইয়াছিল। তাই আমার নূতন বই 'দি কন্টিনেন্ট অব সার্সি'-তে আমি উহার বিস্তারিত আলোচনা করি। উহা হইতে খানিকটা উদ্ধৃত করিব। কিন্তু তাহা করিবার আগে নেহরুর উক্তিটা দিতে হয়। স্টেটস্‌ম্যানে যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল (যাহার কথা এইমাত্র উল্লেখ করিলাম), উহার অনুবাদ দিতেছি।

"নেফাতে সামরিক অভিযান আরম্ভ হইবার পর এই প্রথম মিঃ নেহরু সুস্পষ্ট ভাষায় বলিলেন যে, সেনা-বাহিনীকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহারা যেন চীনা আক্রমণকারীদের নেফা হইতে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দেয়।

"তিনি বলিলেন, 'আমাদের ভূমি শত্রু-মুক্ত করা হউক, ইহাই আমাদের নির্দেশ।' কিন্তু যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, এই মুক্তি কখন ঘটিবে, তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি কোনও

তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারি না। উহা একেবারে সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করে।' "

এইবারে আমার মন্তব্যের অনুবাদ দিতেছি।

"এই ঘোষণা ১৮৭০ সনে প্রুশিয়ার সহিত যুদ্ধঘোষণা প্রসঙ্গে ফরাসী রাজনৈতিক নেতা অলিভিয়ারের কথাগুলি মনে করাইয়া দেয়: 'আজ হইতে এক গুরুতর দায়িত্ব আরম্ভ হইল; আমরা উহা লঘুচিত্তে গ্রহণ করিলাম।'

"কিন্তু ভারতবর্ষে কেহই ছিল না যে, তিয়র যে-ভাবে এই বিপজ্জনক কাজের সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহা করিতে পারে: 'আপনারা কি ইহাই চান যে, সমগ্র ইউরোপ বলিবে, মূল ব্যাপারে আপস হওয়ার পরও শুধু লিখিত স্বীকৃতি কি হইবে, তাহার জন্য রক্তের স্রোত বহাইতে আপনারা মনস্থির করিয়াছেন? যে-যুদ্ধের কারণ এত তুচ্ছ, তাহার জন্য সব দায়িত্ব আমি

প্রত্যাখ্যান করিতেছি।'

"মণিদিয়ানের উক্তির জন্য তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের অবসান হইয়াছিল, এবং তিয়র তাঁহার বক্তৃতার জন্য পরজীবনে যে-পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাহা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষে যখন হারের পর হারের সংবাদ আসিতে লাগিল, তখন কেহই নেহরুর উক্তি স্মরণ করিয়া এই পরাজয় সম্বন্ধে যে-সব প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হইত, তাহার উত্থাপন করিল না। ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ পাইবার পরও [চীনাদের আক্রমণে] বিস্মিত হইল? এই অবস্থায় চীনাদিগের বিরুদ্ধে কি করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা যায়? আমাদের সেনাবাহিনী কি নির্দেশ পালন করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল? যদি না করিয়া থাকে—কেন করে নাই? আর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীই বা কেন স্বদেশের নির্দেশের উপর কাজ হইবার পরেই সেই নির্দেশের কথা সাধারণে প্রকাশ করিয়াছিলেন?"

—দি কন্টিনেন্ট অফ্ সার্সি, ১২০—১১ পৃঃ।

এখন জেনারেল কলের বই হইতে যাহা জানিলাম, তাহাতে দেখিতেছি, নেহরুকে যে-ভাবে দায়িত্বহীন ভাবিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা তাঁহার দায়িত্বহীনতা বহুগুণ বেশী, প্রায় গুরুতর রাজনৈতিক অপরাধ। নেহরু এই কাজ কেন করিলেন, তাহা পরে আলোচনা করিব, কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, উহা অমার্জনীয় বুদ্ধির ত্রুটি।

এখন জানা যাইতেছে যে, ১২ তারিখে নেহরু যখন সেখানে নূতন অভিযানের সংকল্প ঘোষণা করেন, তাহার আগে ১১ তারিখ রাত্রিতে আক্রমণ করিবার আদেশ বাতিল করা হয়। সুতরাং জেনারেল কলের বিবরণ যদি অসত্য না হয়—উহা যে অসত্য, তাহা কেহই বলেন নাই—তাহা হইলে নেহরু দেশবাসীর কাছে যুদ্ধবিগ্রহের মত গুরুতর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। এই প্রশ্নটার সবিস্তারে আলোচনা কেন হইল না, তাহা আমি একেবারেই বুঝিতে পারিতেছি না। সেজন্যই আমি যতটুকু স্পষ্টভাবে পারি করিব। এই প্রশ্নটা এড়াইবার উপায় নাই। জেনারেল কল এবিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমি যখন সন্ধ্যা আটটা নাগাদ পালাম এয়ারপোর্টে পৌঁছিলাম, তখন খবর পাইলাম যে, প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে সেই রাত্রিতে পরে একটি মিটিং হইবে এবং সেখানে আমাকে যাইতে হইবে।

"সেখানে গিয়া দেখিলাম যে, নেহরু সভাপতিত্ব করিতেছেন। অন্য যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দেখিলাম আছেন, কৃষ্ণ মেনন, সেনাবাহিনী ও বিমান বাহিনীর অধ্যক্ষগণ, ক্যাবিনেট, করেন ও ডিফেন্স বিভাগের সেক্রেটারিগণ। আমি ঢোলা অঞ্চলে কিছু আগে চার দিন কাটাইয়া আগের দিন একটা যুদ্ধ দেখিয়া আসিয়াছি। সেখানে যাহা দেখিয়াছি, তাহার বর্ণনা করিলাম ও আমাদের সৈন্যদের যে-সব জিনিসের অভাব ও চীনাদের নানা বিষয়ে যে-সব সুবিধা আছে, তাহার কথা বলিয়া আমি আমাদের অবস্থানের অসুবিধার ব্যাখ্যা করিলাম—নামকাচু নদীর ধারে ধারে আমাদের অবস্থানের জায়গাটা একটা খাদ, সেখানে পরিচালনার কোন জায়গা ছিল না, চীনারা উহার উপরে থাকিয়া উহা বিপর্যস্ত করিতে পারে, সুতরাং উহা অধিকারে রাখা আমাদের সৈন্যদের পক্ষে সম্ভব নয়। অবশেষে আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইলাম যে, এই অবস্থায় আমরা যদি চীনাদের আক্রমণ করি, তাহা হইলে পরাজয় হইতে বাধ্য। সুতরাং আমাদিগকে এই জায়গা হইতে সরিয়া আসিয়া যুদ্ধ করিবার পক্ষে আরও সুবিধাজনক জায়গায় যাইতে হইবে, যেখান হইতে আমরা আরও ভাল করিয়া লড়িতে পারি।"

এইসব কথা বলিয়া জেনারেল কল তিনটি প্রশ্ন করিলেন—

"(ক)। আমি এই জায়গাতেই থাকিয়া সৈন্য সমাবেশ বাড়াইতে থাকিব কিনা, এবং চীনাদের বেশী শক্তি থাকা সত্ত্বেও পরাজয়ের সম্ভাবনা জানিয়াও আক্রমণ করিব কিনা?

(খ)। অথবা আক্রমণের নির্দেশ বাতিল করা হইবে কিনা, এবং বর্তমান অবস্থানেই থাকিব কিনা?

(গ)। অথবা অন্য কোথাও আরও সুবিধাজনক জায়গায় সরিয়া যাইব কিনা?

ইহার পর কি ঘটিয়াছিল, তাহার বিবরণ জেনারেল কল দিতেছেন—

"যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে আমি বলিলাম যে, আমার সৈন্যরা যেরূপ আদেশ দেওয়া হইবে, তাহাই করিতে প্রস্তুত। কিন্তু ফল কি হইতে পারে, তাহা গভর্নমেন্টকে মনে রাখিতে হইবে।

"নেহরু থাপার ও সেনের মতামত জানিতে চাহিলেন, তখন তাঁহারা (খ) প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন, কিন্তু (গ)-এর নয়।

"নেহরু তখন বলিলেন যে, আমাদের বিরুদ্ধে যদি এত অসুবিধাই থাকে এবং যুদ্ধস্থলে সেনাপতি হিসাবে আমার মনোভাব যদি এই হয়, তাহা হইলে এই অবস্থায় চীনাদের আক্রমণ না করিয়া, শুধু বর্তমান জায়গা আঁকড়াইয়া থাকিলেই হইবে।"

—'দি আনটোলড স্টোরি', ৩৮৫ পৃঃ।

এই বিবরণটা একটা গল্পের ব্যাপার বলিয়া মনে হয়—অথচ এইরূপ বিস্তারিত বিবরণ যদি একেবারে রচা কথা বলিয়া না ধরা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ১১ তারিখ রাত্রির পর আর চীনাদের উপর আক্রমণের কোন প্রশ্নই ছিল না। তবু ১২ তারিখে নেহরু স্বয়ং এই সংকল্পের কথা, আক্রমণের নির্দেশের কথা সদম্ভে প্রচার করিলেন। এই ঘোষণাকে মিথ্যা ভাষণ ভিন্ন আর কিছু বলা কোনক্রমে সম্ভব নয়।

১৩ তারিখে তেজপুরে এই বিবৃতির কথা পড়িয়া জেনারেল কল অবাক হইলেন, নেহরু আগের দিন রাত্রিতে তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা জনসাধারণের কাছে কেন বলিলেন, তাহা তিনি বুঝিলেন না। আমিও আমার সামান্য বুদ্ধিতে বুঝি না।

এই আচরণের কারণ সম্বন্ধে জেনারেল কল কিছু জল্পনা-কল্পনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, নেহরু ভাবিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ হুমকি দেখাইলে চীন ভয় পাইয়া আর কিছু করিবে না; অথবা ভারতবর্ষের জনসাধারণকে খুশী করিবার জন্য অ-যথার্থ হইলেও এই ঘোষণা করিবার পরামর্শ তাঁহার কোন পরামর্শদাতা দিয়াছিল। আমি এই কথা বলিব, নেহরু যদি সত্যই ভাবিয়া থাকেন যে, চীনারা ভয় পাইবে, তাহা হইলে তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না; আর যদি শুধু জনপ্রিয়তার জন্য কথাটা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিজের বিবেকবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই।

জেনারেল কল নেহরুর উক্তির একটা ফলেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, চীনারা এই উক্তিতেই উদ্দীপিত হইয়া আক্রমণ করিয়াছিল, ইহা অসম্ভব নয়। অর্থাৎ ঘোষণার ফল চীনের দিক হইতে যাহা হইয়াছিল, তাহা আমাদের হিসাবের বিপরীত।

আমার নিজের মনে হয়, নেহরু জনপ্রিয় হইবার জন্য, বিরুদ্ধ রাজনৈতিক দলের নিন্দা অপ্রমাণ করিবার জন্য, নিজের গভর্নমেন্টের আসর গরম রাখিবার জন্য কু-পরামর্শে পড়িয়া ঘোষণাটা করিয়াছিলেন। কাহারা তাঁহাকে কু-পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামও শুনিয়াছি। তবে উহা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু এই পরামর্শ নেহরু গ্রহণ করিলেন কেন? তাঁহার কাছে ভারতবর্ষের জনসাধারণ ও ভারতীয় সেনাবাহিনী, দুই-এরই স্বার্থ বিবেচনা করিলে অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তিনি অনেক চাপে নিজের মনোভাবের বিরুদ্ধে কাজ করিতে কখনই বিমুখ হন নাই। নেহরুর যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু মেননের এই শক্তির কোনও প্রয়োজন ছিল না, তিনি নেহরুর স্বপক্ষে। তাই একদল কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকের নিকট জনপ্রিয় হইয়া নিজের নাম বাড়াইবার জন্য তিনি চীনকে হুমকি দিয়াছিলেন।

ইহার উপর চীন সম্বন্ধে তাঁহার উদার নিজের মনোভাবেরও একটা প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। তিনি নিজের চিত্তে সর্বদাই চীনের সহিত মৈত্রী রাখিতে আগ্রহশীল ছিলেন, এবং যুদ্ধ একেবারেই চান নাই। সুতরাং চীন যে আক্রমণ করিতে পারে, এই সম্ভাবনাটাকেও তিনি বেশী আমল দেন নাই।

এর পরেও আর একটা তামাশার ব্যাপার আছে মনে হয়। নেহরু সামরিক ব্যাপারে তাঁহার বন্ধু লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কথা অত্যন্ত মানিতেন। এই বিলাতের রাজবংশের কুটুম্ব সেনাপতিটি নেহরুকে যে চীন সম্বন্ধে মিথ্যা ভরসা দিয়াছিলেন, তাহা আমার সম্ভব বলিয়া মনে হয়। অন্ততপক্ষে ১৯৫৯ সনে আমেরিকাতে একটি বক্তৃতাতে লর্ড মাউন্টব্যাটেন যে ভারতবর্ষের চীনকে বাধা দিবার উপযুক্ত ক্ষমতা আছে, তাহা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিয়াছিলেন। সাউথ ক্যারোলাইনার এক সামরিক কলেজে সেই বৎসরের ১২ অক্টোবর তারিখে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"চীনের সহিত সামরিক ব্যাপারে

একমাত্র ল্যাকমে ট্যাল্ক-এ পাবেন

✲ চাররকমের অপরূপ সুগন্ধ

✲ অতি সূক্ষ্ম পাউডার···

সারাদিনের জন্য এক নতুন ধরণের স্নিগ্ধতা এনে দেবে!

অপরূপ সুগন্ধের রকমারি, প্রত্যেকটি অতি সূক্ষ্ম পাউডারের সঙ্গে সুন্দরভাবে মেশানো—তাই ল্যাকমে ট্যাল্ক আপনার জন্যে সেরা। এই পাউডার বেশ হাল্কা এবং শুষে নেবার ক্ষমতাও বেশী··· আপনার কর্মব্যস্ত দিনের শেষ পর্যন্ত আপনাকে শীতল ও স্নিগ্ধ রাখবে!

ল্যাকমে ট্যাল্ক—অতি সূক্ষ্ম পাউডার···এবং আপনার জন্য একই মাত্র!

ল্যাভেণ্ডার
স্যাণ্ডাল
নির্বাণ
ভেটিভার

ত্রিলোচন কলমচি

উনিশ-বিষ

অবশেষে দিনগত পাপক্ষয় হল। ট্র্যাংকুইলাইজার আটচল্লিশ ঘণ্টার নিরুত্তাপ প্রহরগুলিও পায়ে পায়ে ফুরিয়ে এল বঙ্গবাসীর কাছে। সভা-সমিতি এবং ধ্বনি মিছিল শেষ. মাইক্রোফোন ডাউন। পোস্টার-পেস্টাররা হাতের কালি আর সেঁট ওঠাচ্ছে। গাড়ি আর বাড়ির দেওয়ালে এখনো কিছু কলংক চিহ্ন রয়ে গেছে। দোলের বিকেলের মত। কিছু ছাপছাপালি। ব্যানার আর শালুর লে-আউট মোক্ষম হেড-পীসের মত পথে পথে শোভা পাচ্ছে। ক্যান্ডিডেটদের পরদ্বারগমন অনেকদিন শেষ হয়েছে। ভলেনটিয়ার-ভলেনটিয়ারনীদের ঘরে ঘরে ক্যানভাসিং অভিসার শেষ। হ্যান্ডবিল, ছাপানো পোস্টকার্ড আর ক্যালেণ্ডার বিতরণ সমাপ্ত। মোটকথা টেস্ট-ক্রিকেটের দুর্লভ টিকেট দিয়ে যে মনোহরণ-ক্রিয়া শুরু হয়েছিল, কুশল-জিজ্ঞাসা আর নাটকীয় নমস্কার আর পশুজনোচিত ঘাড় বাঁকানির মধ্য দিয়ে তা শেষ হতে চলেছে।

ইলেকশন-ফ্রণ্ট এখন ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় প্রায় অন্তর্ঘাতী, বাইরে প্রশান্তির মুখোশ পরা। বহু প্রতীক্ষিত সাধারণ নির্বাচন এসে গেল, বহু উপেক্ষিত সাধারণের নির্বাচন। একটা জাতির স্বয়ংবরণ সভা। আঠারো গিয়ে উনিশে পা দিলাম আমরা। এখন শুধু নব্বুই মিনিটের অপেক্ষা। বুথ খোলা এবং পোল শুরু হওয়ার প্রাক্ মুহূর্ত।

গত পরশু দিনের কথা মনে পড়লো। কোনো জেলা-সদরের দৃশ্য। স্যর-জেলের সামনে বিরাট প্যান্ডেলের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার তাঁর গুপ্ত যৌতুকের ভান্ডার খুলে বসেছেন। সেই প্যান্ডেলের ভেতরে বাইরে আশায়ী এবং বিদায়ী মানুষের উত্তেজিত, ব্যস্ত, দ্রুত ভিড়।

গাছতলায় পথের ওপর হেথা হোথা ঐতিহাসিক শ্যালদা স্টেশনের মত চট বিছানো হয়েছে। তার ওপর সাংসারিক জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে এক একটি সস্ত্রীক পার্টি (অনেক পোলিং পার্টির মধ্যেই একজন করে স্ত্রীলোক আছেন) পরিকল্পিত পরিবারের মত বসে গেছেন। অফিসাররা সত্যিই আজ পথে বসেছেন। এত দিনের ইনস্ট্রাকশন ক্লাস আর নোট মুখস্থ করা শেষ. এখন হাতে কলমে পরীক্ষা। আন্ডিল-আন্ডিল জাল কারেন্সি নোটের মত অজস্র নিরুত্তাপ ব্যালটপেপার সিরিয়াল-টোটাল মিলিয়ে নিচ্ছেন তাঁরা। তারপর বাইরে যাঁরা যাবেন, দু কেজি করে চাল আঁচলে বেঁধে গুটিচারেক ক'রে লণ্ঠন সম্বল একটু পরেই চালান হয়ে যাবেন।

বটতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। জেল ফটকের সাইড পকেট ঠারে ঠোরে একটু খোলা। নিকটে দূরে আমারই মত অনেক নিঃস্পৃহ দর্শক ব্যাকে খেলছিলেন। তাঁরা কেউ প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নে পুলিস, সিকিউরিটি চার্জে আছেন। ভেহিকল্‌ কনট্রোল দাঁড়িয়েছেন ক্রিকেট আম্পায়ারের মত। সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা নানা বয়সের নানা আকারের স্ট্যান্ডবাই গাড়ি-গুলোর ডিজেলহার্ট ড্রাইভার ফিল্ডিংখাটার জন্য প্রস্তুত। কাদাখোচা বকের মত কেরানীকুল নিমগ্ন।

সব ব্যাপারেই উনিশ-বিশ থাকে, ফেব্রুয়ারীর উনিশও শেষ পর্যন্ত অনেকের কাছেই বিষতুল্য হয়ে পড়েছে সন্দেহ নেই। স্পেকুলেশন-ক্যালকুলেশনের ছাঁদাবাঁধা অনেকদিন শেলুট হয়েছে. এবারে সরাসরি ড্রইং—লটের লটু মানে লুটের লটারি: লট কাকে লাটে তোলে আর কাকে লাট বানায় তারই উলটপুরাণ পাঠের অপেক্ষা।

কনস্টিটিউয়েন্সির বাউন্ডারী ওয়াল পর্যন্ত যে ইলেকশন টাউটরা ঢাড়ুরা পিটিয়ে বেড়িয়েছে—পোস্টার, পয়সা এবং প্রলাপ ছড়িয়েছে: খোদ কর্তার নামের পাশে ব্যালট পেপার-মার্জিনে রেডক্রস রুপী ঢ্যাঁরা পড়বে তাতে নিতান্তই যারা সন্দেহ করেনি এবার তারাও যেন একটু কাহিল।

দক্ষিণ হস্ত বলেছিল, 'আসুন দাদা-হুজুর, এইখানে দাঁড়ান। কাঁকর মাটি হলেও এ খুব রিল্যায়েবল্। পাঁচশো কর্মী আছে আমার হাতে, সাড়ে চার হাজার

ক্যাপ্টেন চৌধুরী, ম শাটের জামা করে দেন— তার তলায় তো রয়েছে 'আপনার কীর্তি-কলাপ আর আমাদের হাতবল।' হাকিম হুজুর নিজের ডান হাতের গুলি ফোলাতে ফোলাতে বললেন, 'এখানে আপনার শিওর থাকবেন্‌।'

দাদা-হুজুর দেখলেন কথাটা মন্দ বলেনি। এখানকার 'আউট হাউস'-টা নফর কুন্ডুর হেফাজতে পড়ে আছে অনেকদিন থেকে। পাঁচ ভূতে খাচ্ছে, নষ্ট পন্ড করে দিচ্ছে। ইলেকশন ভিজিট দিতে এসে দিনকতক করে স্বামীয়ানা খাটিয়ে যাওয়া যাবে। দাঁও মারা যাবে, দেহরক্ষাও হবে—

দাঁড়ালেন। স্ট্যান্ড আপ অন দি বেঞ্চ হওয়ার মত অনেকখানি উঁচু হয়েই দাঁড়ালেন। ভাত ছড়ালে আবার কাগের দুক্খু, টাকা ছাড়লে আবার ভোট মেলে না। টেন্ডার কল দিলেন, প্লি পার ফিগার, মানে আঙুল পিছু তিন টাকা দর উঠলো। পারচেজ সেক্রেটারী জনালেন, 'কিছু কিনে রাখা ভালো, স্যার। অধিকিন্তুতে কিন্তু কিন্তু করার কিছু নেই।'

হুজুর পরমানন্দে হুঙ্কার ছাড়লেন, 'আচ্ছি কিনু লেও।'

নফর এখানে তাঁর ঘরে-বাইরের সর্বেসর্বা। বিগলিত কণ্ঠে দু'হাত কচলে জানালো, 'দাদা হুজুর শহরের নীট পাঁচশো রিকশো রিজার্ভ ক'রে ফেলেছি, ভোটের দিনে ভোটার ক্যারি করার জন্যে। সে এক অতুলনীয় ব্যাপার হবে'—

কিন্তু তখনো কি তিনি স্বপ্নে

ভোটিং কম্পার্টমেন্ট নয়, যেন কনজারভেটিভ কনসালটিং রুম

ভেবেছিলেন, সেটা মিস ক্যারেজই হবে! রিকশো শেষ পর্যন্ত রিস্‌ক কভার করবে না

ওদিকে পোলিং বুথগুলিতে ততক্ষণে খেল শুরু হয়ে গিয়েছে। একটি বুথে গিয়ে দেখি প্রিসাইডিং অফিসার ম্যাজি-সিয়ানের মত কুর্নিশী ভঙ্গিতে পোলিং এজেন্টদের খালি ব্যালট বাক্স দেখাচ্ছেন, এই দেখুন জেন্টলমেন, খালি বাক্‌সো, ভেতরে কুচো কাগজটি পর্যন্ত নেই। নেই কেমন? এই অ্যাড্রেস টাগ্‌ ড্রপ করলাম এর ভেতরে, অ্যা...অ্যা...অ্যা...এই বন্ধ হল বাক্‌সো

এইবার পালিয়েদের ... কেউ হাঁক...

আর এখানে অফিসার ... এতদিন বহুজনের হয়েছিলেন, এবার তাঁর গলা শুকিয়ে এসেছে। জল খন খন খাচ্ছেন, আর প্রতি মিনিটেই ম্যানুয়াল ঘাঁটাচ্ছেন। এতদিনে সব নিয়মকানুন গোল পাকিয়ে দিয়েছে। অন্ধ ভোটারকে, চ্যালেঞ্জড ভোটকে, প্রাইভ ভোটারকে কি ভাবে চেক করবেন, টেন্ডার করবেন, হ্যানোতানা অনেক প্যাঁচ কষেছেন এতদিন। কোথা কি রকম ঘোরালো সৃষ্টি হতে পারে, ব্যাকরণে স্ত্রীং এবং পুং ছাড়াও আর একটি মারাত্মক অনুস্বর আছে—সে যদি মূর্তিমান হয়ে দেখা দেয়—আইন তার কোনো বিধান তো দেয় নি, তখন কি হবে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন শিরে সংক্রান্তি, অফিসারগিরির মোহও ঘুচে গিয়েছে, যখন দেখেছেন সরকারী অফিসের আর্দালী পিওন পর্যন্ত থার্ড পোলিং অফিসার হয়ে বসে আছে। পদ্মশ্রী পদ্মভূষণের মত, অধিকারী বিচার নেই, মুড়ি ভি আছে মিছরি ভি আছে। মাথা থেকে যাবতীয় দায়িত্বের খাঁড়া ঝুলছে প্রিসাইডিং অফিসারের মাথার ওপর। নাওয়া খাওয়ার ঠিক ছিল না এতদিন, আজ বুঝি ওপাট একেবারেই লোপাট হয়ে যায়! নিশ্ছেদ ভোটার আসছে যে ভাবে, নিশ্বাস ফেলার সময় কই।

যত বেলা বাড়ছে ততই হাওয়া বদলাচ্ছে পোলিং বুথগুলির। এক জায়গায় দেখি একটি ক্যাচ উঠেছে। সশরীরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ঘোস্ট ভোটার, ফার্স্ট অফি-সারকে পার হতে না হতেই ধরা পড়ে গেলেন। বাপের নাম আগেই ভুলেছিলেন এবার নিজের নামটিও যাতে সহজে ভুলতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা হল। পুলিসের হাতে উচ্ছুগ্‌গু করা হল।

ফোর্থ-ফিফথ্‌ অর্থাৎ বকস্‌ অফিসারদের গলা প্রায় বসে গেছে। ভোট দেবার কায়দা কানুন বোঝাতে বোঝাতে ভরেস চেঞ্জড হয়ে যাবার দাখিল। তবু অবুঝ ভোটারকে বোঝায় কার সাধ্যি। ভোটিং কম্পার্টমেন্টের মধ্যে ঢুকলেই তাদের মাথায় গোলমাল শুরু হয়ে যায়। এক এক রকম কীর্তি করে বসেন এক একজন।

শাশুড়ী-পুত্রবধু লোকসভা আর বিধান-সভায় ছাউনির মধ্যে ঢুকেছেন। দুখানা মাত্র চট দিয়ে ঘর দুটি আলাদা গিয়ে স্বভাবতই পাশাপাশি তাদের স্থান করা হয়েছে। সুতরাং সভা দুটির সাংবিধানিক দূরত্ব যতখানিই হোক মেটিরিয়ালিস্টিক ইকনমি একখানা চটের ব্যবধানে রেখেছে। শাশুড়ী বউ দুজনেই অনেকক্ষণ বেরোন না দেখে উঁকি দেওয়া গেল। ভেতরের কান্ড দেখে মনে হল, ভোটিং কম্পার্টমেন্ট নয়, যেন কনজারভেটিভ কনসালটিং রুম। টেনে

হিঁচড়ে পর্দা সরিয়ে শাশুড়ী বউমার কাছ থেকে চাপা গলায় ইশারায়-টিশারায় কিছু অ্যাডভাইস নিচ্ছেন। ধমকে তাঁদের সরিয়ে আনা হল।

পরে আর একজনকে অনেক কষ্টে ভোটিং কম্পার্টমেন্টে রাখা টেবিলের তলা থেকে টেনে বার করা হল। তিনি সেখানে কিসের অন্বেষণে ঢুকেছিলেন, সঠিক বোঝা গেল না, বোধ হয় কোনো ছিদ্রান্বেষণ করতে।

সংক্ষিপ্ত নির্দেশ কত মারাত্মক হতে পারে, অপর একটি বুথে চোখে পড়ল। একটি মারাত্মক রকম জোয়ান দুই হাতে মুষলের মত রবার সীল উঁচিয়ে ভোটপত্র পিটাচ্ছেন। বুঝলাম সংক্ষেপে বলা হয়েছিল ভেতরে গিয়ে টেবিলে রেখে যাকে খুশি মারুন।

পোস্ট অফিসের কোনো পিওন কিনা জানি না, ভোটিং কম্পার্টমেন্টে নীচু হয়েছে, অর্গান খটাখট আওয়াজ। ছুটে গিয়েও শেষ রক্ষা করা গেল না। পর পর চারজন ক্যান্ডিডেটকে ছাপিয়ে সে তখন ব্যালট-পেপারের উলটো পিঠে ভাগ করছে।

স্পেশাল ভোটগুলো অনেক কাহিনী। সেসব গল্প লেখার মত অবকাশ নেই এখানে। শুধু আর দুজন ভোটারের কথা বলে শেষ করি।

একজন সম্পূর্ণ বিপরীত একটি সাঁওতাল। লিস্টে নামটি তার নেই, কিন্তু আশ্চর্য এই বিগত স্ত্রীর নামটি ছাপা আছে। তাতে সাঁওতালের উৎসাহ বিন্দুমাত্র কমেনি। সে সত্যিকারের দাতা, স্ত্রীর ভোটটিও নিজে হাতে দাতব্য করতে এসেছে। অনেক কষ্টে তাকে বোঝানো হল, স্ত্রীর ভোটে তার অধিকার নেই।

সাঁওতাল তার সরল চোখ দুটি বড় বড় করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, এ তো কি নিয়ম করেছুস বাবুরা, তোর নিজের স্ত্রীর জিনিসে কি তুর অধিকার নাই? বল্‌—

দ্বিতীয় ঘটনাটি আর একটু রহস্যময়। একটি সুসজ্জিতা রমণী এসেছে। চোখে মোটা করে সুর্মা পরেছে, শরীরে শাড়িতে আরো ছোটো খাটো কাজ আছে। স্বামীর নাম কথায় আর ছাপায় মিলছে না, নিজেরও পদবীর গোলমাল হচ্ছে। অথচ ভাবগতিক দেখে কেসটি জেনুইন মনে হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি। প্রিসাইডিং অফিসার নিরুপায়-কণ্ঠে বললেন, কি করবো বলুন, আইন তো মানতে হবে। আপনাকে তো আর আমরা চিনি না। ও'রা কি কেউ আপনাকে চেনেন? পোলিং এজেন্টদের দিকে ইংগিত করে প্রিসাইডিং অফিসার জানতে চাইলেন।

টেবিলে রেখে মারুন

এই ঘাড় কাত-করা রমণীয় হাসি ফুটিয়ে

—'চেনেন আপনারা?'

—'ও মানে!' এজেন্টদের দুজন ফিক করে হেসে জানালেন, কি বলতে চান আপনি?

কাউন্টিং হচ্ছে ঘোর জেলের মধ্যে। বাইরে কয়েক হাজার স্ট্যান্ডিং জনতা। অবস্থান ধর্মঘটীর মত দিন-রাত্তির মাটি কামড়ে পড়ে আছে। ভিতরে ঢুকে দেখি, চমৎকার প্যান্ডেল। দু' দিকেই দুই লাইনে ছয়-ছয় বারো, ছয়-ছয় বারো টেবিল পাতা হয়েছে। মানে বিধান সভা লোকসভা গনা হচ্ছে দুটি অঞ্চলের। কাউন্টিং অফিসারস, সুপারভাইজার, আর কাউন্টিং এজেন্টরা এক-একটি টেবিল ঘিরে বসে আছেন। একপাশে সর্টিং-ট্রে, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো নয়, রীতিমত খোপ-খোপ করা। পাশে একটা বড় স্কোরবোর্ড, ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাতে টোটাল বাড়ছে। ক্যান্ডিডেটের নাম বরাবর লাইনগুলো যেন রেসিং-ট্র্যাক। আগু-পিছু সমান ছাড়িয়ে ছুটছে অদৃশ্য ভোটের ঘোড়া, চকখড়িতে তার ফুট নোট ফুটছে। কাউন্টিং অথরিটি বসে আছেন কাগজপত্র আর ইন-আউট লেখা দুটো করে মাইক্রোফোন পাশে নিয়ে।

এক রাউন্ড করে ব্যালট-বাকসো ফুরোলে টেম্পোরারি রেজাল্ট হট-লাইনে হ্যান্ড-ওভার করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাংক-কেবল্ ছুটছে, প্রেস-ম্যাজিশিয়ানরা তুরন্ত নোট পাঠাচ্ছে। বাইরে জনতার সামনে লাউডস্পীকার দু-চার লাইন উষ্ণবার্তা ছুঁড়ে দিচ্ছে।

ভেতরে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস কথাবার্তা চলছে, ইতস্তত মৃদু জটলা।

প্রতি ঘণ্টায় গ্রাহক যন্তর বদলাচ্ছে

—হোয়াটস্ অ্যাবাউট হারলট?

ঘুঘু চৌধুরীর প্রশ্নে রিটার্নিং অফিসার আপাদমস্তক চমকে উঠে 'আঁও' করে একটি শব্দ করলেন।

ফিচেল হাসি হেসে চৌধুরী আবার শেষ শব্দটিকে থেমে থেমে টুকরা করে উচ্চারণ করলেন।

'ওঃ, তাই বলুন!' রিটার্নিং অফিসার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঘণ্টা দুই আগে সবাইকে ওভারটেক করে বেরিয়ে এসেছেন, নাও শী ইজ লীডিং—'

'অমুকের খবর কি?'

'অ্যাকচুয়ালি সিংকিং—সিংকিং বাই ফোর নটস্!'

'দশ হাজার ভোটে তলিয়ে যচ্ছেন, বলেন কি! তা, এখনো তো কাউন্টি-এর অনেক বাকি আছে।'

'টোয়েণ্টি পি, এস, ইয়েট টু উন্ট। দ্যাট মীনস, আপনার হল গিয়ে কুঁড়ি ইনটু চার ইনটু তিন, মানে বাণ্ডিল এখনো দুশো চল্লিশটা বাকসে বাকি। তবে আশা কম মশাই, খুব কম ওঁর নিজের পকেট এরিয়াগুলো তো তিমধ্যেই খতম হয়ে গিয়েছে—'

'হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ, পিক-পট হয়েছেন বলুন।'

'আর দে-মশাইয়ের অবস্থা কিরকম আন্দাজ করছেন?'

'হি উইল নট সারভাইভ লং। ফুটে যাবে। আর বেশিক্ষণ নেই—দেখুন না।'

জেলখানার বাইরে ক্রমশ টেম্পো উঠছে। আরো বাইরে, মানে চোখের বাইরে, অন্য কোথাও মুহুর্মুহু টেলিফোন বাজছে— ফাটকাবাজারী দমকা খবর আসছে! আর প্রতি ঘণ্টায় গ্রাহক যন্তর বদলাচ্ছে। বডিগার্ড ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান রি-কাউণ্টিং-এ বসেছেন। তিনি গুণছেন, পালস...রেসপিরেশন...টেম্পারেচার...

॥ ২ ॥

দীপা বনেদী বংশের মেয়ে। একসময় খুব বোলবোলাও ছিল, তালুক-মুলুক ছিল, এখন অনেক কমে গেছে; তবু মরা হাতী লাখ টাকা। বোলবোলাও কমলেও বংশের মর্যাদাবোধ আর গোঁড়ামি তিলমাত্র কমেনি। দীপার ঠাকুরদা উদয়মাধব মুখুজ্জে এখনো বেঁচে আছেন, তিনিই সংসারের কর্তা। এক সময় একটি বিখ্যাত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন, হঠাৎ পঙ্গু হয়ে পড়ার ফলে অবসর নিতে হয়েছে। বাড়িতেই থাকেন এবং নিজের শয়নকক্ষ থেকে প্রচণ্ড দাপটে বাড়ি শাসন করেন।

ঠাকুরদা ছাড়া বাড়িতে আছেন দীপার বাবা-মা এবং দাদা। বাবা নীলমাধব বয়স্ক লোক, কলেজে অধ্যাপনা করেন। মা গোবেচারি ভালমানুষ, কারুর কথায় থাকেন না, নীরবে সংসারের কাজ করে যান। দাদা বিজয়মাধব দীপার চেয়ে চার পাঁচ বছরের বড়, সে সংস্কৃত ভাষায় এম-এ পাস করে কলেজে অধ্যাপনার কাজে ঢোকবার চেষ্টা করছে। দীপার বাবা এবং দাদা দুজনেই তেজস্বী পুরুষ। কিন্তু তাঁরা বাড়িতে উদয়মাধবের হুকুম বেদবাক্য মনে করেন এবং বাইরে বংশ-গৌরবের ধ্বজা উচ্চে তুলে বেড়ান। বংশটা একাধারে সম্ভ্রান্ত, উচ্চশিক্ষিত এবং প্রাচীনপন্থী।

এই বংশের একমাত্র মেয়ে দীপা। তাকে মেয়ে-স্কুল থেকে সীনিয়র কেম্ব্রিজ পাস করানো হয়েছিল। তারপর তার পড়াশুনো বন্ধ হল; তার জন্যে পালটি ঘরের ভাল পাত্র খোঁজা আরম্ভ হল। কাল ধর্মে তাকে পর্দার মধ্যে আবদ্ধ রাখা গেল না বটে, কিন্তু একলা বাইরে যাবার হুকুম নেই। বাইরে যেতে হলে বাপ কিংবা ভাই সঙ্গে থাকবে।

দীপা বাড়িতেই থাকে, গৃহকর্মে রান্নাঘরে মাকে সাহায্য করে; অবসর সময়ে গল্প উপন্যাস পড়ে, রেডিওতে গান শোনে। কিন্তু মন তার বিদ্রোহে ভরা। তার মনের একটা স্বাধীন সত্তা আছে, নিজস্ব মতামত আছে; সে মুখ বুজে বাড়ির শাসন সহ্য করে বটে, কিন্তু তার মনে সুখ নেই। মেয়ে হয়ে বাংলা দেশে জন্মেছে বলে কি তার কোনো স্বাধীনতাই নেই। অন্য দেশের মেয়েদের তো আছে।

ঠাকুরদা উদয়মাধব, পঙ্গুতার জন্যেই বোধ হয়, বাড়িতে বন্ধুসমাগম পছন্দ করতেন, লোকজনকে খাওয়াতে ভালবাসতেন। একটা কোনো উপলক্ষ পেলেই নিজের প্রবীণ বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করতেন; নীলমাধব এবং বিজয়মাধবের বন্ধুরাও নিমন্ত্রিত হতেন। বৃদ্ধেরা তিনতলায় সমবেত হতেন, প্রৌঢ় অধ্যাপকেরা বসতেন দোতলায় এবং একতলায় বৈঠকখানায় বসে ছেলেছোকরার দল গানবাজনা হইহুল্লোড় করত। মাসে দু'মাসে এইরকম অনুষ্ঠান লেগেই থাকত।

দীপা অতিথিদের সকলের সামনে বেরুত, কোনো বারণ ছিল না। ঠাকুরদার বন্ধুরা নাতনী সম্পর্কে তার সঙ্গে সেকেলে রসিকতা করতেন, বাপের বন্ধুরা তাকে স্নেহ করতেন, আর দাদার বন্ধুরা তাকে নিজেদের সমান মর্যাদা দিত, মেয়ে বলে অবহেলা করত না। সে প্রয়োজন হলে তাদের সঙ্গে দুটি চারটি কথাও বলত। তাদের মধ্যে যখন গান বাজনা হত তখন সে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে শুনত। এই সব ক্রিয়াকর্মে তার মন ভারি উৎফুল্ল হয়ে উঠত, যদিও বাইরে তার বিকাশ খুব অল্পই চোখে পড়ত। দীপা ভারি চাপা প্রকৃতির মেয়ে।

এইভাবে চলছিল, তারপর একদিন দীপার মানসলোকে একটি ব্যাপার ঘটল, নবযৌবনের স্বভাবধর্মে সে প্রেমে পড়ল। যার সঙ্গে প্রেমে পড়ল সেও তার অনুরাগী। কিন্তু মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, প্রেমিকের জাত আলাদা।

দুপুরবেলা যখন বাড়ি নিষুতি হয়ে যায় তখন দীপা নীচের বসবার ঘরে দোর ভেজিয়ে দিয়ে টেলিফোনের সামনে বসে,

চোখে প্রতীক্ষা নিয়ে বসে থাকে। টেলিফোন বাজলেই সে যন্ত্র তুলে নেয়। সাবধানে দ্‌-টি চারটি কথা হয়, তারপর সে টেলিফোন রেখে দেয়। কেউ জানতে পারে না।

সন্ধ্যেবেলা দীপা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে; সামনের ফুটপাথ দিয়ে তার প্রেমিক চলে যায়, তার পানে চাইতে চাইতে যায়। এইভাবে তাদের দেখা হয়। কিন্তু কাছে এসে দেখা করার সুযোগ নেই, সকলে জানতে পারবে।

এদিকে দীপার জন্যে পাত্রের সন্ধান শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু পালটি ঘর যদি পাওয়া যায় তো পাত্র পছন্দ হয় না, পাত্র যদি পছন্দ হয় তো ঠিকুজি কোষ্ঠীর মিল হয় না। বিয়ের কথা মোটেই এগুচ্ছে না।

পৌষ মাসের শেষের দিকে একদিন দুপুরবেলা দীপা টেলিফোনে তার প্রেমিকের সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ করল,

তারপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঠাকুরদার [illegible]

দীপা [illegible] মেয়ে, [illegible] তার সাহসের [illegible] [illegible] [illegible] মেশানো আছে। ঠাকুরদার [illegible] তার সম্বন্ধ বড় বিচিত্র, সে ঠাকুরদাকে বড় ভাল-বাসে, বাড়িতে আর কাউকে এত ভালবাসে না। কিন্তু সেই সঙ্গে সে ঠাকুরদাকে ভয়ও করে। তিনি তার কোনো কাজে অসন্তুষ্ট হবেন এ কথা ভাবতেই সে ভয়ে কাঁটা হয়ে যায়। তাই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে তার উরু আর হাঁটু ঝপ ঝপ কাঁপতে লাগল।

উদয়মাধব মুখুজ্জে একদিন বুড়ো বয়সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যান, তাঁর মেরুদণ্ডে গুরুতর আঘাত লাগে। এই আঘাতের ফলে তাঁর নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে যায়, চলে ফিরে বেড়াবার ক্ষমতা আর থাকে না। এ ছাড়া তাঁর স্বাস্থ্য বেশ ভালই। দোহারা গড়নের শরীর, মুখের চওড়া চোয়ালে প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ। সত্তর বছর বয়সেও মানসিক শক্তি বিন্দুমাত্র কমেনি। যে দাপট নিয়ে তিনি কলেজের অধ্যক্ষতা করতেন সেই দাপট পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান আছে। তাঁর চিরদিনের অভ্যাস হুঙ্কার দিয়ে কথা বলা। এখনো তিনি হুঙ্কার দিয়েই কথা বলেন।

দীপা তেতলায় দাদুর ঘরে ঢুকে দেখল তিনি বিছানায় আধ-শোয়া হয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন। তিনি প্রত্যহ দুটি খবরের কাগজ পড়েন; সকালবেলা ইংরেজী কাগজ আর দুপুরের দিবানিদ্রার পর বাংলা।

দীপাকে দেখে উদয়মাধব কাগজ নামালেন, হুঙ্কার দিয়ে বললেন—'এই যে দীপঙ্করী। আজকাল তোমাকে দেখতে পাই না কেন? কোথায় থাকো?'

দীপার নাম শুধুই দীপা, কিন্তু উদয়-মাধব তাকে দীপঙ্করী বলেন। ঠাকুরদার চিরপরিচিত সম্ভাষণ শুনে তার ভয় অনেকটা কমল, সে খাটের পায়ের দিকে বসে বলল। 'আজ সকালেই তো দেখেছেন দাদু। আমি আপনার চা আর ওষুধ নিয়ে এলুম না?'

উদয়মাধব বললেন—'ওহো, তাই নাকি! আমি লক্ষ করিনি। তা এখন কী মতলব?'

দীপা হঠাৎ উত্তর দিতে পারল না, মাথা হেঁট করে বসে রইল। যে কথা বলতে এসেছে তা সহজে বলা যায় না।

উদয়মাধব কিছুক্ষণ তার পানে চেয়ে অপেক্ষা করলেন। তারপর স্বভাবসিদ্ধ হুঙ্কার ছাড়লেন—'কী হয়েছে?'

দীপা তার মনের সমস্ত সাহস একত্র করে দাদুর দিকে ফিরল, তাঁর চোখে চোখ রেখে ধীরস্বরে বলল—'দাদু, আমি একজনকে বিয়ে করতে চাই, কিন্তু তার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

উদয়মাধব [illegible] জন্যে যেন হত-বুদ্ধি হয়ে গেলেন, তারপর ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে হুঙ্কার দিলেন—'কি বললে, একজনকে বিয়ে করতে চাও! এসব আজকাল হচ্ছে কি? নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করবে! তুমি কি ম্লেচ্ছ বংশের মেয়ে?'

দীপা নতমুখে চুপ করে বসে রইল। উদয়মাধব হুঙ্কারের পর হুঙ্কার দিয়ে বক্তৃতা চালাতে লাগলেন। একটানা হুঙ্কার শুনে নীচে থেকে দীপার মা আর দাদা বিজয়মাধব ছুটে এল, দু-একটা ঝি-চাকরও দোরের কাছ থেকে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগল। দীপা কাঠ হয়ে বসে রইল।

আধ ঘণ্টা পরে লেকচার শেষ করে উদয়মাধব বললেন, 'আর যেন কোনো দিন তোমার মুখে এ কথা শুনতে না পাই। তুমি এ বংশের মেয়ে, আমার নাতনী, আমি দেখে শুনে যার সঙ্গে তোমার দিয়ে দেব, তাকেই তুমি বিয়ে করবে। যাও।'

দীপা নীচে নেমে এল; বিজয়ও তার সঙ্গে সঙ্গে এল। দীপা নিজের শোবার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, বিজয় কটমট তাকিয়ে কড়া সুরে বলল—'এই শোন্। কাকে বিয়ে করতে চাস্?'

জ্বলজ্বলে চোখে দীপা ফিরে দাঁড়াল, তীব্র চাপা সুরে বলল—'বলব না। মরে গেলেও বলব না।' এই বলে নিজের ঘরে ঢুকে দড়াম করে দোর বন্ধ করে দিল।

অতঃপর দীপা বাড়িতে প্রায় নজরবন্দী হয়ে রইল। আগে যদি-বা দু-একবার নিজের সখীদের কাছে যাবার জন্য বাড়ির বাইরে যেতে পেত, এখন আর তাও নয়। সর্বদা বাড়ির সবাই যেন শতচক্ষু হয়ে তার ওপর নজর রেখেছে। কেবল দুপুর-বেলা ঘণ্টাখানেকের জন্যে সে দৃষ্টি-বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। তার মা নিজের ঘরে গিয়ে একটু চোখ বোজেন, তার দাদা বিজয় কাজের তদ্বিরে বেরোয়। বাবা নীলমাধব দশটার আগেই কলেজে চলে যান, ঠাকুরদা তেতলায় নিজের ঘরে আবদ্ধ থাকেন। সুতরাং দীপাকে কেউ আগলাতে পারে না। দীপাও বিদ্রোহের কোনো লক্ষণ প্রকাশ করে না।

বস্তুত বাড়ির লোকের ধারণা হয়েছিল, পিতামহের লেকচার শুনে দীপার দিব্য-জ্ঞান হয়েছে, সে আর কোনো গোলমাল করবে না। দুপুরবেলা যে টেলিফোন সক্রিয় হয়ে ওঠে, তা কেউ জানে না।

তারপর একদিন—

ঘটনাচক্রে বিজয় দুপুরবেলা সকাল-সকাল বাড়ি ফিরছিল। সে আজ যার সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীপা বাড়ি [illegible] [illegible] [illegible] বাদিকের [illegible] [illegible] [illegible] বিজয়ের চোখ দুটো [illegible] [illegible] উঠল। একলা দীপা কোথায় যাচ্ছে? দীপার বান্ধবী শুভ্রার বাড়িতে? কিন্তু শুভ্রার বাড়ি তো এদিকে নয়, ঠিক উলটো দিকে; অন্য কোনো বান্ধবীও এদিকে থাকে না। বিজয় সজোরে পা চালিয়ে দীপাকে ধরবার উদ্দেশ্যে চলল।

'এই, কোথায় যাচ্ছিস্?'

তীরবিদ্ধের মত দীপা ফিরে দাঁড়াল। সামনেই দাদা। বিজয় কড়া সুরে বলল—'একলা কোথায় যাচ্ছিস?'

দীপার মুখে কথা নেই; সে একবার ঢোক গিলল। বিজয় গলা আরো চড়িয়ে বলল—'কার হুকুমে একলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস? চল্, ফিরে চল্!'

এবার দীপার মুখ থেকে কথা

বিজয় কড়া সুরে বলল—একলা কোথায় যাচ্ছিস?

বেরল—'যাব না।'

রাস্তায় বেশী লোকচলাচল ছিল না, যারা ছিল, তারা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে লাগল। দীপা দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিজয় বলল—ভাল কথায় যাবি, না চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যাব?'

দীপার বুক ফেটে কান্না এল। রাস্তার মাঝখানে এ কি কেলেঙ্কারি! এখনি হয়তো চেনা লোক কেউ দেখতে পাবে। দীপা কোনো মতে দুরন্ত কান্না চেপে বঁড়শির মাছের মত বাড়ির দিকে ফিরে চলল।

বিজয় বাড়িতে ঢুকে মা মা বলে দুবার ডাক দিয়ে বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকল; দীপা আর দাঁড়াল না, দোতলায় উঠে নিজের ঘরে দোর বন্ধ করল।

বিজয় বসবার ঘরে ঢুকতেই তার নজরে পড়ল টেলিফোন যন্ত্রের নীচে এক টুকরো সাদা কাগজ চাপা রয়েছে। কাছে গিয়ে কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে পড়ল, তাতে লেখা রয়েছে—'আমি যাকে বিয়ে করতে চাই, তার সঙ্গে চলে যাচ্ছি। তোমরা আমার খোঁজ করো না। —দীপা।'

এতটা বিজয়ও ভাবতে পারেনি। সে চিঠি নিয়ে সটান ঠাকুরদার কাছে গেল। বাবা মাও জানতে পারলেন। কিন্তু ঝি-চাকরের কাছে কথাটা লুকিয়ে রাখতে হল। উদয়মাধব গুম হয়ে রইলেন, হুঙ্কার দিয়ে বক্তৃতা করলেন না। ভিতরে ভিতরে দীপার ওপর পীড়ন চলতে লাগল—যার সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিলি, সে কে? নাম কি? দীপা কিন্তু মুখ টিপে রইল, নাম বলল না।

নিভৃত পারিবারিক মন্ত্রণায় স্থির হল, সর্বাগ্রে দীপার বিয়ে দেওয়া দরকার; যেখান থেকে হোক, পালটি ঘরের সৎ পাত্র চাই। আর দেরি নয়।

বাড়ির মধ্যে সকলের চেয়ে বিজয়ের দুশ্চিন্তা বেশী। তার স্বভাব একটু তীব্র গোছের। তার বোন কোনো অজানা লোকের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল এ লজ্জা যেন তারই সবচেয়ে মর্মান্তিক। সে উঠে পড়ে লেগে গেল পাত্র খুঁজতে।

পাড়ার নৃপতি লাহার বাড়িতে কয়েকটি যুবকের আড্ডা বসত, আগে বলা হয়েছে। বিজয় এই আড্ডায় আসত, এখানে অন্য যারা আসত তাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল, নৃপতি লাহার সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল।

নৃপতি লাহারা সাত পুরুষে বড়মানুষ, কিন্তু বর্তমানে সে ছাড়া বংশে আর কেউ নেই। তার বয়স এখন আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বছর, নিঃসন্তান অবস্থায় বিপত্নীক হবার পর আর বিয়ে করেনি। সে উচ্চশিক্ষিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, সারাদিন লেখা-পড়া নিয়ে থাকে, সন্ধ্যার পর আড্ডা জমায়।

বিজয়মাধব একদিন বিকেলবেলা নৃপতির কাছে এল। তখনো আড্ডা জমার সময় হয়নি, নৃপতি বাড়ির নীচের তলার বৈঠকখানায় বসে একখানা বই পড়ছিল। এই ঘরটিতেই রোজ আড্ডা বসে।

ঘরটি প্রকাণ্ড, সভাঘরের মত। সাবেক কালে এই ঘরে বাবুদের নাচগানের মুজরো বসত, একালে ঘরটি সোফা চেয়ার প্রভৃতি দিয়ে সাজিয়ে ড্রয়িংরুমে পরিণত করা হয়েছে বটে, কিন্তু সেকালের গদি-মোড়া তক্তপোশ এখনো আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। তা ছাড়া টেবিল হারমোনিয়ম আছে, পিয়ানো আছে, রেডিওগ্রাম আছে। আর আছে তাস পাশা ক্যারাম প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম।

বিজয় ঘরে ঢুকে দেখল নৃপতি একলা আছে, বলল, 'নৃপতিদা, তোমার সঙ্গে আড়ালে একটা পরামর্শ আছে, তাই আগেভাগে এলাম।'

নৃপতি বই মুড়ে বিজয়কে একটু ভাল করে দেখল, তারপর সোফায় নিজের পাশে হাত চাপড়ে বলল—'এস, বসো।'

বিজয় তার পাশে বসে কথা বলতে ইতস্তত করছে দেখে নৃপতি বলল, 'কিসের পরামর্শ?'

বিজয় তখন বলল—'নৃপতিদা, দীপার জন্যে পাত্র খোঁজা হচ্ছে কিন্তু মনের মত পাত্র কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তুমি তো অনেক খবর রাখো। একটা ভাল পাত্রের সন্ধান দাও না।'

নৃপতি হাত বাড়িয়ে নিকটস্থ টেবিল থেকে সিগারেটের টিন নিল, একটি সিগারেট ঠোঁটে ধরে বলল, 'হুঁ। দীপার এখন বয়স কত?'

'সতেরো। আমাদের বংশে—'

নৃপতি দেশলাই জ্বালবার উপক্রম করে বলল, 'তোমাদের বংশের কথা জানি। গৌরীদান করতে পারলেই ভাল হয়। তা কি রকম পাত্র চাও? বিদ্বান হবে, পয়সাকড়ি থাকবে, চেহারা ভালো হবে, এই তো?'

বিজয় বলল—'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি আসল কথাটাই বললে না। পালটি ঘর হওয়া চাই।'

সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নৃপতির ঠোঁটের কোণে একটু ব্যঙ্গ-হাসি খেলে গেল। সে বলল, 'তাও তো বটে। বংশের ধারা বজায় রাখতে হবে বইকি। তা তোমরা হলে গিয়ে মুখুজ্জে, সুতরাং চাটুজ্জে বাঁড়ুজ্জে গাঙ্গুলি কিংবা ঘোষাল চাই। বারেন্দ্র চলবে না?'

'না, নৃপতিদা, জানোই তো আমরা আজ পর্যন্ত সাবেক চাল বজায় রেখে চলেছি।'

'জানি বইকি। তোমরা হচ্ছ আরশোলা গোষ্ঠীর জীব।'

'আরশোলা গোষ্ঠীর জীব মানে?'

'আরশোলা অতি প্রাচীন জীব, কোটি কোটি বছর আগে জন্মেছিল; তারপর জীবজগতে অনেক বিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু আরশোলা আরশোলাই রয়ে গেছে। তাই আজকাল আর তাদের বেশী কদর নেই।'

'সে যাই বল, বর্ণাশ্রম ধর্ম আমি মেনে চলি। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, চাতুর্বর্ণ্যং—'

নৃপতি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল; সিগারেট টানতে টানতে সে বোধ করি মনে মনে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করছিল। সিগারেট শেষ করে সে বলল, 'একটি ছেলে আছে, কিন্তু তোমাদের পালটি ঘর কিনা খোঁজ নিতে হবে। তুমি আজ বাড়ি যাও, কাল খবর পাবে।'

'আচ্ছা' বলে বিজয় চলে গেল।

নৃপতি কব্জির ঘড়িতে দেখল পাঁচটা বেজেছে। সিগারেটের টিন পকেটে নিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তার গন্তব্যস্থল বেশী দূরে নয়, পাঁচ মিনিটের রাস্তা।

দেবাশিসের সদর দরজার ঘণ্টি টিপতেই নকুল এসে দোর খুলল। নৃপতি বলল, 'দেবাশিসবাবু আছেন?'

নকুল বলল, 'আজ্ঞে, তিনি এইমাত্র ফ্যাক্টরি থেকে বাড়ি ফিরেছেন—'

এই সময় দেখা গেল দেবাশিস সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। সে সদর দোরের কাছে এলে নৃপতি একটু হেসে বলল, 'আমাকে আপনি চিনবেন না, আপনার বাবা শুভাশিসবাবুর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল। আমার নাম নৃপতি লাহা।'

দেবাশিসের মুখেও হাসি ফুটল—'আপনাকে চিনি না বটে কিন্তু নাম জানি। আপনার বাড়িও দেখেছি। আসুন।' সে নৃপতিকে বসবার ঘরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে থমকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল—'বসবার ঘরে না গিয়ে চলুন খাবার ঘরে যাই। চায়ের সময় হয়েছে।'

নৃপতি বলল—'বেশ তো।'

দুজনে খাবার ঘরে গিয়ে টেবিলে বসল। দেবাশিস বলল—'নকুল, আমাদের চা জল-খাবার দাও।'

নৃপতি বলল—'আমার চা হলেই চলবে।'

খেতে খেতে দুজনের কথা হতে লাগল। বছর ছয়-সাত আগে দেবাশিসের বাবার সঙ্গে নৃপতির পরিচয় হয়েছিল; দেবাশিস তখন কলকাতায় থাকত না, দিল্লীতে পড়াশুনো করতে গিয়েছিল। শুভাশিসবাবু একদিন নৃপতির বাড়ির সামনে ফুটপাথের ওপর পা পিছলে পড়ে যান, নৃপতি তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ফার্স্ট এড্ দিয়েছিল। তারপর শুভাশিসবাবু তাঁর ফ্যাক্টরিতে তৈরী প্রচুর কেশতৈল সাবান কোল্ড্ ক্রীম প্রভৃতি তাকে উপহার দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তার বাড়িতে এসে তত্ত্ব-তল্লাশ নিতেন। বছর দুই পরে তিনি যখন মারা গেলেন তখন নৃপতি খবর পেল না, একেবারে খবর পেল মাস তিনেক পরে। এমনি কলকাতা শহর। শুভাশিসবাবুর মৃত্যুসংবাদ নৃপতিকে জানাবে এমন লোক কেউ ছিল না।

দেবাশিস দিল্লীতে তার বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে থেকে কলেজে পড়াশুনো করছিল। বাল্যকালেই তার মা মারা গিয়েছিলেন। বাবার বন্ধুটি ছিলেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা বিজ্ঞান-অধ্যাপক। দেবাশিস এম্ এস্‌সি পাস্ করে দিল্লী থেকে চলে এল। তার মাসখানেক পরেই তার বাবা মারা গেলেন।

নৃপতি প্রশ্ন করল—'আপনার বাড়িতে আর কে আছে?'

দেবাশিস বলল—'আর কেউ নেই, আমি একা। কিংবা আমি আর নকুল বলতে পারেন। নকুল এ বাড়িতে আমি জন্মাবার আগে থেকে আছে।'

'বিয়ে করেন নি?'

'আমি লেখাপড়া শেষ করে ফিরে আসার পরই বাবা মারা গেলেন, তারপর আর হয়ে ওঠেনি।'

'হুঁ। ভাল কথা, আপনার উপাধি যখন ভট্ট তখন নিশ্চয় ব্রাহ্মণ। গোত্র জানা আছে কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, শাণ্ডিল্য গোত্র। বাঁড়ুজ্জে।'

'বাঃ, বেশ। আচ্ছা, আমি যদি ঘটকালি করি, আপনার আপত্তি হবে কি?'

দেবাশিস মুখ টিপে একটু হাসল, উত্তর দিল না। নকুল এতক্ষণ ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল, এখন এগিয়ে এসে বলল—'হ্যাঁ বাবু, আপনি করুন। ঘরে একটি বউ দরকার। আমি বুড়ো মানুষ আর কত দিন সংসার চালাব।'

'তাই হবে।' নৃপতি চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল—'আজ চলি। আমার বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা আড্ডা বসে, পাড়ার ছেলেরা আসে। আপনিও আসেন না কেন?'

'আচ্ছা যাব।'

'আজই চলুন না।'

দেবাশিস একটু ইতস্তত করে বলল—'আজই? বেশ, চলুন।'

ক্রমশঃ

এখন দেখা যাক প্রিমিতিফ এবং হ্নেইসাঁদের থেকে ইম্প্রেস্যনইস্‌টরা কোন সত্যে পেঁছাল।

ইম্প্রেসানইস্‌টদের কথা উল্লেখ করা যাক্, প্রথমটা মনে হবে যে প্রিমিতিফদের থেকে খুব যে একটা বিশেষ মনোজ্ঞ চোখে ফলটির প্রতি নেত্রপাত করেছে এমন নয়, আদতে সেই ফলটি—যেটি একটি লাল গোলকাকার—সেটি নিজেই তাদের আকর্ষণ করেনি, অন্যপক্ষে (যতটা ভাবিয়েছিল) আপেলের আশপাশই যত মুশকিলে ফেলেছিল—বাধা দিয়েছিল অর্থাৎ আশ-পাশ বলতে টেবিল ক্লথ ও তার প্রতিফলন যেটা সোজা চকচকে ফলটির উপর এসে পড়ছে।

সেই কারণে, আপেলের টোনে গভীরতা ও প্রতিক্রিয়ার যোজনা বা প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে; এ ছাড়া আৎমসফিয়ার অর্থাৎ অসংখ্য নির্ণয় অতীত স্পন্দন যা বস্তুর রঙকে অসংপৃক্ত করছে। এবং এই সূত্রে, আপেলটিকে বিশ্লেষণ করে ইম্প্রেসানাইস্‌-টরা এটাই আবিষ্কার করতে সমর্থ হয় যে, তার আপেলের, কোন অংশ বা দিক থেকে, তাদের কাছে তার স্বকীয় টোন নিয়ে আর ঠিকভাবে বিদ্যমান হয় না।

এবং আলোর যোগে ও প্রতিফলনের রূপক-কল্পে (ফ্যানটাজি) আপেলে কখনও নীলারুণ, কখনও ধূসর, আবার পিঙ্গল রঙ প্রদীপ্ত হয়, আর একটু বিশেষ করে অল্প কথায় বলা যায়, প্রিজম (সংভবর্ণ) তার মধ্যে খেলে উঠেছে।

এই তত্ত্বটাই আমাদের প্রিমিতিফ ত বটেই এমন কি হ্নেইসাঁদের কেউই কল্পনাও করতে পারেনি। অতএব আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি—আধা-ধর্মীয় ভাবের, কাজের থেকে বহু দূরে, প্রিমিতিফদের সরল বিশ্বাসের ব্যাপার থেকে যথেষ্ট দূরে। এখন অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, ইম্প্রেসানইস্‌টরা তাদের আগেকার লোকেদের থেকে প্রকৃতির দিকে খুব একটা মনোযোগ সহকারে দেখে কি?

তার উত্তর হচ্ছে, সে আর একভাবে দেখে, এইটুকু বললে যথার্থ হবে; যেমন হ্নেইসাঁরা দুর্গের দিকে প্রিমিতিফদের থেকে একেবারে অন্য চোখে চেয়েছিল। এরা সেই অনর্গল রহস্যময় ও দুর্গম প্রকৃতিকে অনুসন্ধান করে দেখে আবিষ্কার করেছে বিভিন্ন পরস্পর বিরোধী উপাদান এবং তা বাস্তব।

সম্ভবত মনে পড়বে আমি পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে আগে বলেছি যে, আমাদের বোধ দ্বারা কোন কিছুকে ভুল বোঝবার আর্ট; তথা কোন বস্তু ঠিক কি রকম সেটা না প্রকাশ করে সেটা আমাদের চোখে কিরকম দৃশ্যমান, এটাই প্রকাশ করবে আর্ট। এবং ইম্প্রেসানইস্‌টদের প্রচেষ্টা ব্যাপারে যে সব তত্ত্বায়ত করেছি, যদিও যে হ্নেইসাঁদের ধারা থেকে তা স্বতন্ত্র, তবু বলতেই হবে তাদের প্রচেষ্টা হ্নেইসাঁদের একটা সম্প্রসারিত রূপ।

মিসেস উমা দাস-এর চিত্রপ্রদর্শনী: ফাইন আর্টস ভবন

অনেকদিন আগে শ্রীমতী দাসের চিত্র-প্রদর্শনী কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় (১৯৫৮), তারপর এ বছর আবার আমরা তাঁর কাজ দেখার সুযোগ পেলাম। ফলে আগের থেকে তিনি কতখানি বদলেছেন, এ স্মৃতি আমাদের নেই। অবশ্য এই প্রদর্শনীতে তাঁর ১৫টি নূতন কাজ এবং পূর্বতন কাজ ছিল ৩টি। এই তিনটি কাজে তিনি খুবই বক্ররেথায় একটা ছন্দ এনেছেন, যা সংগীতাত্মক। এবারকারগুলিতে জ্যামিতিক সরল-রেখার বৈচিত্র্যে অধিক, কিন্তু কোথাও তিনি আলো ভুলে যাননি, যদিও অবয়বে কোথাও প্রাকৃতিক টোন নেই, প্রত্যেকটি নিজস্ব রঙ বিচার আছে। আবার কোথাও কোথাও পশ্চাৎ-পটে তিনি বিশেষ অবিকলবাদী—যথা সামনে জ্যামিতিক

দি গ্রীণ ইয়ার্স — শ্রীমতী উমা দাস

অবয়ব পিছনে জলের চেহারা। তাঁর ৭নং ছবিটি বেশ নয়ন সুখকর হয়েছে।

সবিতা (গোষ্ঠী) অনুষ্ঠিত চিত্রপ্রদর্শনীঃ আর্টইন্ডাস্ট্রি হাউস

ভারতীয় ধারা আমরা প্রায় ভুলে যেতে বসেছি; সবিতা গোষ্ঠীর এই অনুষ্ঠান আমাদের সত্যই ভাল লেগেছে, এতে দশজন শিল্পী যোগদান করেছিলেন। প্রত্যেকের হাত তুলি ধরায় অভিজ্ঞ, অবশ্য কোথাও কোথাও অ্যানাটমির ভুল আছে; কিন্তু ভাব ও বিন্যাসের জন্য অনেকেরই নিশ্চয়ই চোখে পড়বে-না। ৪নং, নাড়ুগোপালের রেখাতে বালক ভাবটি বড় আকর্ষণীয়, ৫নং মনুশোরী একেবারে অন্যধারার কাজ। নমস্ক ছবিটি খুবই সূক্ষ্ম। এখানে মোমবাতির হলুদ রঙ বেশ মানানসই হয়েছে। কালীয়-দমনের রেখার বৈচিত্র্যও, জগন্নাথদর্শন ও মাতাপুত্র ও সেই সঙ্গে নিশ্চয় নাম করা যায়। একলব্য, গিরিধারী, বসন্ত ও মহাবীর উল্লেখযোগ্য কাজ। বেহুলা ছবির কবির প্রত্যেককেই স্পর্শ করবে। কপালকুণ্ডলার গাছের টেকস্চারে, যা আঠা দিয়ে করা, বিশেষ চাতুর্য দেখা যায়।

শিশির লাহিড়ী

পরী

মা ডাকেন শৈল বলে, বাবা ডাকেন শেলী। সেই শৈল আজ দু মাস বাদে শ্বশুরবাড়ি থেকে আসবে। অষ্ট-মঙ্গলায় যা ওরা দুজন জোড়ে এসে-ছিল। সুদীপ আর শৈল। তারপর আর আসেনি।

গিরিবালা বললেন, যাও আর দেরি ক'রো না। হাজার হোক, নতুন বেয়াই-বাড়ি।

মুরারিবাবু বললেন, যাচ্ছি।

যাচ্ছি না, যাও। যা গে'তো মানুষ তুমি।

আচ্ছা জ্বালা। সময় হলে যাব ত?

না-হয় দু'পাঁচ মিনিট আগেই গেলে। আমি ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলি। গিরিবালা উঠে চলে গেলেন। মুরারিবাবু শুধু তাকিয়ে দেখলেন এক-বার, আর মুখে একটা চিক করে শব্দ করলেন। তারপর উঠে পড়লেন।

শৈল বারান্দা থেকে তাকিয়ে দেখল, বাবা এসেছেন। কাল সুদীপ চলে গিয়েছে। রাতে শাশুড়ীর কাছে শুয়ে মার কথা মনে পড়ছিল শৈলর। শাশুড়ী মাথা হাত দিয়ে বললেন, উসখুস করছ কেন মা? ঘুম আসছে না!

শৈল জিভ কাটে! শাশুড়ীর চোখ দুটো যেন মনে মনে হাসছে।

মুরারিবাবু বললেন, বেয়ানঠাকরুন, অনুমতি করুন। মাকে আমার ক'দিনের জন্যে নিয়ে যাই।

মাথায় ঘোমটা টেনে শৈল দরজার পাল্লায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। মুরারিবাবু তাকিয়ে দেখলেন। মেয়ে ত নয়, দুর্গা প্রতিমা।

বেয়ানঠাকরুন হেসে হাত জোড় করলেন। যাবে বইকি। একা-একা নতুন বিয়ের কনে, মন বসবে কেন? আপনি সময় দেখুন বেয়াই-মশাই।

গাড়িতে উঠে শৈল মাথার কাপড় ফেলে

দিল। পিছনের সীটে আরাম করে শুল। আঃ! বাঁচলুম!

মুরারিবাবু হেসে উঠলেন। তুই এখনও সেই ছোট্টটিই রয়ে গেলি শৈলী।

শৈলর বয়স উনিশ। রং উজ্জ্বল শ্যাম। ঢলঢল মুখ। কুচকুচে একঢাল কাল চুল। আলগা শ্রীভরা, ভরাট শরীর। শৈল দুপদাপ হাঁটে। সমানে কথা বলে। শৈল দামাল মেয়ে। বিয়ের জল পেয়ে এখন আবার টলটল করছে। মেয়ে ত নয়—আগুনের খাপরা।

ফাল্গুনের শেষ সপ্তাহে বিয়ে হয়েছে, আজ বৈশাখের সাতাশে। ফর্সা-ফর্সা রোগা-রোগা সন্দীপ। ব্যাকব্রাশ চুল। চওড়া কপাল। ঠোঁটের কোণে আলতো একটু দুষ্টু হাসি। যেন রেডিওর গান, শৈল আছে, চাবি ঘোরালেই বেজে উঠত। সন্দীপ গেল ফিল্ড ট্রেনিং নিতে দেরাদুনে আর ছুটি মিলল শৈলর।

[illegible] কেশটা তখন বাতাসে [illegible] স্বাধীন। শৈল বলল—ওগো হাঁদো [illegible] পারব না। এই তোমাকে কি বলে ডাকব। —ইঞ্জিনীয়ার।

ইয়েস, প্রাইম মিনিস্টার।

প্রাইম মিনিস্টার। চোখ কপালে তুলল শৈল।

সন্দীপ হাসল, প্রাইম মিনিস্টার অব হার্ট।

শৈল খিলখিল করে হাসল। তা হলে মাঝে মাঝে চেঞ্জ হবার চান্স আছে।

সন্দীপ ওর ঠোঁটে চুমু রাখল। —তুমি নমিনেটেড ক্যান্ডিডেট। তোমার সারভিস জীবনভর।

গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল শৈল। গিরিবালাকে জড়িয়ে ধরল। —মা-মণি! মা-মণি!

কি মোক্ষদা, কেমন? আরে হরিবাবু যে, ভাল? দূরের বারান্দায় ঠাকুর দাঁড়িয়ে ছিল চেয়ে হাসল। তারপর চোখ পড়ল শশীপদর দিকে।

শশীপদ বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল মুখে নিয়ে যেন চুষছিল। গাছ-কোমর বেঁধে কাপড় পরা। গায়ে আধ-ময়লা গেঞ্জি। কদমছাঁট চুল। পানপাতা মুখ। আর বিস্ময় ভরা সরল দুটো বড় বড় চোখ।

শৈল চোখ বড় বড় করে তাকাল। ওমা, এটা আবার কে রে?

থুতনিতে চুমু খেয়ে গিরিবালা বললেন, বল দিকিনি।

বাপির নতুন সেক্রেটারি, বুঝি। শৈল হাসল।

ষাট। বালাই। ও তোর সতী মাসিমার ছেলে। নে শশী, প্রণাম কর।

শশীপদ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। শৈলর কপালে কনে-চন্দন, সিঁথিতে সিঁথিমৌর। চুলে জরির ফিতে। চোখে কাজল। গলায় চিক হার। হাতে বাজুবন্ধ, চুড়ি রুলি। আঙুলে আংটি। পরনে জংলা বেনারসী। শৈল যেন রাজকন্যা।

থাক। শৈল হাত ধরল শশীর। কিছু মনে করনি ত। তারপর গিরিবালার দিকে চাইল। মা, তুমি বুঝি খেতে দাও না শশীকে। বুড়ো ছেলে আঙুল খাচ্ছে।

হো-হো করে হাসল সকলে। লজ্জায় মাথা নিচু করে হাত লুকোল শশী। —এমনি।

খেতে বসে শৈল বলল, বাপি, আমি যেতে-না-যেতেই ভেকেন্সি ফিল্ড আপ।

মুরারিবাবু হেসে উঠলেন। আমি কিসসু জানি না শৈলী। সব তোমার মা জানেন।

বড় [illegible], মন্দ [illegible]। গিরিবালা বললেন। তুমি বললে না, সতীদির ছেলেটাকে নিয়ে আসি। ছেলেটাও মানুষ হবে। আর [illegible] [illegible] [illegible] করে বাঁচবে।

শৈল খিলখিল করে হেসে উঠল। বাপি, তুমি কিন্তু ধরা পড়ে গিয়েছ।

গিরিবালা হাসতে হাসতে বললেন, দিনরাত হয়কে নয় করলে ধরা পড়বে না।

শশীপদ কান খাড়া করে ওদের কথা শুনেছিল। সতী-মা, তার বাবা, সে কখনও একসংগে খায়নি, হাসেনি, গল্প-গুজব করেনি। তারা যেন সব খোপের পাখি। কোনটা বাজ। কোনটা পায়রা। কোনটা বা চড়ুই।

মাছের কাঁটা চুষতে চুষতে শৈল বলল —তুমি কিছু খাচ্ছ না, শশী। থালায় আঁক কাটছ শুধু।

শশীপদ মুখ তুলে তাকাল। টোপ টোপ দু' ফোঁটা জল চোখের কোলে টলটল করছে।

কি রে! মার জন্যে মন কেমন করছে বুঝি? গিরিবালা বললেন।

না। শশীপদ হাসল। সে হাসিটা কান্নার মত দেখাল। শৈল দেখল।

শশীপদর ঘরে এল শৈল। এই, পড়ছ বুঝি!

না। শশীপদ ঘাড় নাড়ল।

তবে কি করছ? শৈল ওর পাশে জানালায় এল।

গংগা! কি সুন্দর গংগা! শশীপদ বলল। কি নরম! আর কি ঠান্ডা! দূরের আলোগুলো যেন জোনাকি।

বাঃ! তুমি বেশ মিষ্টি করে বলতে পার।

কি?

কথা।

লজ্জা পেল শশীপদ। [illegible]

পাতা বিছানায় ভাঁজ হয়ে বসল শৈল। যেন পটের প্রতিমা—তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

শশীপদ হাসল, বাঃ! কি [illegible] আপনি। আলাপ হয়ে গিয়েছে।

কখন?

সেই বিকালে। আপনি যখন [illegible] ধরলেন। আর বললেন, [illegible] কিছু মনে করনি ত।

বাব্বা! একেবারে মুখস্থ। শৈল [illegible] ঢাকতে বলল। তোমার চুল কদম-ছাঁট কেন?

মাথায় হাত বোলাল শশীপদ। ন্যাড়া হয়েছিলাম।

কেন? উকুন হয়েছিল? শৈল হাসল।

না। বাবা মারা গিয়েছেন।

আহা রে! শৈলর মুখটা করুণ করুণ দেখাল।

মার কোলের কাছে শুয়ে শৈল জিজ্ঞেস করল, মা সতী-মাসীমা কে?

আমার বাপের বাড়ি সম্পর্কে বোন হয়। বড্ড ভাল মেয়ে। কিন্তু কপাল মন্দ।

কেন মেসোমশাই বুঝি—

তা কেন হবে। গিরিবালা বললেন। তবে লোকটা হাবাগোবা [illegible] সোকা ধরনের। জ্ঞাত-গুষ্ঠিরা [illegible] ভিখারী করে ছাড়ল। শেষ অবধি মরে বেঁচেছে। কি যে বিপদে পড়েছিল [illegible] কি বলব! আমি না দেখলে হয়ত [illegible] পর্যন্ত ছেলেটাও ভেসে যেত।

শশী তোমাকে মা বলে ডাকে? শৈল বলল।

গিরিবালা মেয়ের দিকে চোখ [illegible] তাকালেন। চাকরে-বাকরেও মা বলবে [illegible] ও মাসী বলবে; এটা আমার পছন্দ নয়, শৈল।

আমি কি তাই বলেছি। শৈল মাকে দু হাতে জড়াল। আমার একটা নিজের ভাই থাকলে, বেশ হত, মা।

তুই আর জ্বালাস নে শৈল। গিরিবালা হাসলেন। আমার কি ছেলের অভাব? তুই একাই এক শ'। তার ওপর সন্দীপ রয়েছে। আমার অমন ছেলে।

শৈল লজ্জা পেল। অমন ছেলে, না হাতি।

পাগলী! মাথায় হাত দিতে দিতে গিরিবালা হাসলেন। ভাবলেন, নিজের ষোল আনা ছাড়তে সব মেয়েরই কি একই কষ্ট!

শশীপদ পড়ছে। শৈল বিছানায় ঠেস দিয়ে বসে পা দোলাচ্ছে।

শশীপদ বলল, মেয়েমানুষের পা দোলাতে নেই, শৈলদি।

শৈল খিলখিল করে হাসল। ওমা, তুই এতও জানিস।

জানব না। শশীপদ বলল। কি যে বল। আমার ঠাকমা বলে, কত করে বুড়ীকে শেখাত। এই ঠ্যাং ছড়িয়ে খাস না, দূরে শ্বশুরবাড়ি হবে। পা দোলাস না, লক্ষ্মী চঞ্চলা হবেন।

থাম, ঢের হয়েছে। এবার পড়। নইলে মা বকে শেষ করবে।

শশীপদ পড়তে শুরু করল। কিন্তু আজ আর পড়ায় মন বসছে না। খালি গল্প করতে ইচ্ছে করছে।

মুখের পানটা ভাল করে চিবিয়ে, টুকটুকে লাল জিভটা দুটো ঠোঁটের ওপর বোলায় শৈল। নিচের দিকে নজর রেখে, ছুঁচোল জিভ বার করে দেখল, কেমন লাল হয়েছে। [illegible] মত চুনি-চুনি না [illegible]।

শশীপদ হাসল।

হাসছিস কেন?

শশীপদ ঘাড় নাড়ল। না, বাবা। বলব না। তুমি বকবে।

না রে, বকব না। বল না।

সত্যি বলছ।

সত্যি। সত্যি। সত্যি। শৈল আঙুল মটকাল।

জান শৈলদি, ঠাকমা বলত, পান খেয়ে যে মেয়ের ঠোঁট লাল হয়, সে মেয়ে স্বামী-সোহাগী হয়।

হেসে গড়িয়ে পড়ল শৈল। এ কথায় তুই মানে বুঝিস?

শশীপদ বড় বড় চোখ করে তাকাল। তুমি আমায় একদম গেঁয়ো ভাব, শৈলদি।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায় শৈলর। আর খুব ঝরঝরে হালকা লাগে। আগে বড্ড দেরি হত শুতে। সদাশিবটা বা খুনসুটি করত। কিছুতেই ঘুমোতে দিত না। আর ঘুম ভাঙত না সকালে। বড্ড লজ্জায় পড়তে হত শাশুড়ীর কাছে। আর সারা দিন গা টিসটিস করত।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল শৈল। ভোরের ফুটিফুটি আলোয় মালকোঁচা এঁটে বাগানে কোদাল চালাচ্ছে শশীপদ।

এই, কি হচ্ছে?

মাটি করছি। বেল-চারা বসাব।

গায়ে তোয়ালে, পায়ে ঘাসের চটি। শৈল নেমে এল।

শশীপদর পাতলা শরীর। আড়া চওড়া। চওড়া কপাল। মাটিমাখা টানধরা বুক। লম্বা লম্বা হাতগুলো পাকাচ্ছে। পিঠের পেশী ফুলেছে দড়ির মত। শৈল তাকিয়ে দেখল। খুব ছোট ছোট কালচে একটু গোঁফের রেখা। মেয়েদের মত সরু সরু পা। হাঁটুর ওপর থেকে উলটো মুগুর। টসটসে ঘামে ভেজা পিচ্ছিল শরীর।

কি দেখছ? শশী বলল।

কিছু না। শৈল প্রশ্ন করল, তোর বয়স কত, শশী?

পনেরো।

ওর ঘামে ভেজা নরম পিছল পিঠে শৈল একটা আঙুল রাখল। একটু বা পরিমাপ করল উষ্ণতার। তোকে ঠিক পাঁচিশের মত দেখাচ্ছে। শৈল বলল। পাঁচিশের মত।

বুকের নিচে বালিশ দিয়ে শুয়ে শুয়ে শৈল চিঠি লিখছিল। দোরের গোড়ায় শশী এসে দাঁড়াল।

আসব?

মুখ ঘুরিয়ে তাকাল শৈল। আয়। কি ব্যাপার?

এই কবিতাটা একটু বুঝিয়ে দেবে?

বইটা হাতে নিল শৈল। কোন্ ক্লাসে পড়িস।

এইট।

ভুরুটা বেঁকে গেল শৈলর। এইট? ওমা. এত বড় ছেলে।

লজ্জার মুখ নিচু করল শশীপদ। জান, শৈলদি, আমার এমন লজ্জা করে! আমার চেয়ে কত ছোট ছোট ছেলে আমাদের ক্লাসে পড়ে।

শৈল আড়মোড়া ভাঙল। হাই তুলল। পড়াশুনোয় আবার লজ্জা কি? কই? দেখি, কি কবিতা

"নববর্ষের পুণ্য বাসরে কালবৈশাখী আসে—

হোক সে ভীষণ ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে।"

উফ! কি শক্ত রে। শৈল বলল।

তুমি না কলেজে পড়।

পড়ি, না ছাই। অ্যাটেন্ড করি। শৈল হাসল।

আমারও কলেজে পড়তে ইচ্ছে করে।

ইচ্ছে করবে বইকি। মন দিয়ে পড়। টপাটপ পাস দে। কলেজে পড়বি।

জান শৈলদি, কলেজে না পড়লে জ্ঞান-বুদ্ধি হয় না। আমি খাসে লেখা দেখেছি। —নো নলেজ, উইদাউট কলেজ।

শৈল হাসল। শশীপদ হাসল। ঘাড়ের কাছটা চুলকে দে তো, শশী। ঘামাচি হয়েছে। শৈল বলল।

চুলের গোড়ায় আঙুল রাখল শশী। আমি খুব ভাল ঘামাচি মারতে পারি। মার কত মেরেছি। শশী বলল।

সেতারের তারে সুর বোনা টানের মত নখের টান দিল শশী। পুট পুট করে শব্দ হচ্ছে। নুনছাল উঠে উঠে যাচ্ছে।

লেখাপড়া হচ্ছে সিঁড়ি। শৈল বলল। বড় হতে হলে লেখাপড়া শিখতে হবে। মানুষ হতে হবে।

শশী চোখ মোছে। তুমি কত সুন্দর করে বল।

শৈল এলো হাসি হাসে। যেন নাটকের ডায়লগ বলছে শৈল : সুন্দরের সাধনাই যে জীবনের চরম সাধনা শশী।

গিরিবালা বললেন, ছাড় মা! একবার ওপরের ঘরটা ঘুরে আসি।

আমার কিন্তু খুব হিংসে হচ্ছে মা।

বালাই। ষাট! তোর শত্তুরের হিংসে হোক! গিরিবালা হাসলেন।

তেতলার ছোট সিঁড়ির ঘরটা শশীপদর। একপাশে চৌকিতে টানটান পরিপাটি বিছানা পাতা। জলচৌকির উপর একটি ছোট্ট টিনের সুটকেশ। টেবিলে বইখাতা, দোয়াত-কালি। কুলুঙ্গিতে পোড়া মাটির সরস্বতী। দেওয়ালে আয়না ঝুলছে।

একটু আগে শশীপদ স্কুলে গিয়েছে। যাবার সময় ধূপ দিয়েছিল। অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধে ঘরটা ভরে আছে।

টেবিলের ড্রয়ার ধরে টান মারল শৈল। নাও, কি গোছাবে, গোছাও। ড্রয়ার থেকে চিঠিটা বার করল। (শ্রীচরণেষু, মা, আমি খুব ভাল আছি। আপনি আমার জন্য চিন্তা করিবেন না। মাসীমা আমাকে সন্তানের অধিক ভালবাসেন। কয় দিন হইল শৈলদি আসিয়াছেন। শৈলদি খুব ভাল। তিনি আমাকে বলিয়াছেন—)

ছেলেটা সবই নিজের হাতে করে নেবে। জানিস শৈল, ও মনে করে যা পাচ্ছে, সবই বুঝি বাড়তি পাওনা। গিরিবালার দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

(যে, আমাকে মানুষ হইতে হইবে। তাঁহার কথায় আমি চোখের জল রাখিতে পারি নাই।)

চিঠিটা রেখে দিল শৈল। তা হলে ওর বুদ্ধির দোষ দিতে পারি না, মা!

না। আমার কপালের দোষ। আমিই বোধ হয় ওকে আপন করে নিতে পারিনি।

শৈল মায়ের গলা জড়াল। তুমি যাকে আপন করতে পারবে না, মা, সে কোন দিনও কারও আপন হবে না।

বিকেলের দিকে আসব। শমিতা বলল। সন্ধ্যের আগেই। কবিতার জবাব।

শৈল বলল, শশী, ফুল আনতে পারবি?

এখখুনি। শশীপদ কোমরে কাপড় বেঁধে তৈরী। কি ফুল আনতে হবে, বল।

যা পাবি। আমার দুজন বন্ধু আসবে কিন্তু।

তোমার বন্ধুরা কি ফুল পছন্দ করবে, আমি কি করে জানব, শৈলদি।

আঃ! জ্বালাস নে শশী। তোর নিজের হলে কি ফুল আনতিস। ঘেঁটু?

শশীপদ হাসল। কি যে বল। ফুলের মত ফুল আনবো আমি।

দেখিস আবার। শৈল বলল। বোকার মত আনিস না।

ওরা দুজনেই হেসে উঠল একসঙ্গে। একই লহরে।

গিরিবালা রাঁধতে বসলেন। কি রে, ওদের খেয়ে যেতে বলেছিস ত?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ! শৈল বলল। খেতে না বললেও তোমার হাতে রান্না খেত।

তোকে বলেছে। গিরিবালা হাসলেন। একটা পরম পরিতৃপ্তি সে হাসিতে ফুটে উঠল। নে, তুই আবার তৈরী হয়ে নে।

নিজের ঘরে এসে শৈল ভাল করে দেখল। শাড়ির আঁচলে সুদীপের ফটোটা মুছল একবার। জানালার পর্দাগুলো টানল। অকারণে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ঘষে মেঝেয় দেখল ময়লা আছে কি না! তার পর গুনগুন সুর তুলে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল শৈল।

ওদের মিলিত কলহাস্যে সিঁড়িটা গমগম করে ওঠে। মাসীমা। মাসীমা।

গিরিবালা আঙুলে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে আসেন। যা, তোরা ওপরে যা। ঠাণ্ডা হয়ে বোস।

তুমি আসবে না, মাসীমা। শমিতা বলল।

আমার আর ফুরসত কোথায়, মা। এদের সংসারে খাটতে খাটতেই হাড়মাস কালি।

আবার হেসে উঠল ওরা। ওদের সে হাসির অনুরণন ইলশেগুঁড়ির মত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরল।

ঘরে এসে খাটের ওপর শুল শমিতা। বাজু ধরে দাঁড়াল কবিতা।

শৈল বলল, বোস্।

বসছি। তুই বোস আগে। ডান হাতে শৈলর কোমর জড়ায় কবিতা।

বল।

কি বলব।

আমাদের যা নেই, তোর যা আছে।

কি আছে।

আহা, জানিস না!

কি শুনবি।

সব।

ফুল এনে চৌকাঠের সামনে এসে দাঁড়ায় শশীপদ। চেঁচিয়ে ডাকতে যায়। আবার থমকে চুপ করে। একটি ফুলের তিনটি পাপড়ি যেন। লুকোচুরি খেলার সময় ঠিক অমনি ফিসফিস করত ওরা। শশীপদ ভাবল। কি মজা।

কবিতা বলল, একটা কথার উত্তর দে আগে।

কি?

কেমন লাগে?

হেভেনলি। শৈল হাসে।

ফুল এনেছি। ফুল। শশীপদ বলল। খোঁপায় জড়িয়ে নাও। একদম হেভেনলি।

দমকা হাওয়ার মত হাসিতে ফেটে পড়ল ওরা। হাসতে গিয়ে বিষম খেল। কপট রাগে চোখ পাকাল শৈল। —দূর বোকা।

লজ্জায় কাণের গোড়া অবধি লাল হল শশীপদর।

ফুলের ডালিটা নামিয়ে রেখে শশীপদ চলে এল। দ্রুতপায়ে তীরবেগে হাঁটল। কি করেছে সে? শশীপদ ভাবল—কি করেছে? দুজন অচেনা-অজানা মেয়ের সামনে বকলে লজ্জা হয় না বুঝি। ওর চোখের সামনে শৈলর চোখ দুটো ফুটে উঠল। সে চোখ হাসিতে-কৌতুকে, বিদ্রূপে-বিভ্রমে কেমনতর কোমলে কঠিন।

কি হয়েছে শশীর। লাটাইয়ের সুতোর মত কিছুতেই যেন নিজের মনটাকে গুটিয়ে নিতে পারছে না শশীপদ। কেবল দমকা হাওয়ায় ঢিল পেয়ে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

কেবলই মনে পড়ছে অকস্মাৎ সেই হাসিতে ফেটে-পড়া। —দূর বোকা। আর শৈলদির সেই চোখ। হাসিতে-কৌতুকে, বিদ্রূপে-বিভ্রমে কোমলে-কঠিন।

আলোটা নিবিয়ে দেয় শশী। কালো চুলের অরণ্যের মত একরাশ অন্ধকার ঢেকে ফেলল শশীকে। আঃ! শশীপদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। এখন যেন হালকা লাগছে একটু। বকুনিটা ঠিক বকুনির মত বোধ হচ্ছে না। দুষ্টু ছেলেকে প্রশ্রয় দেওয়া তাড়নার মত অনেকটা। হাতে মাথা রেখে শশীপদ চুপচাপ শুল। শুয়ে শুয়ে শুনল, নিচে গান হচ্ছে। শৈলদির গান।

মুরারিবাবু বললেন, তুই আবার যাবি, মা?

বাঃ! শৈল বলল, কত দিন বাদে একটু দেখাশোনা।

মুরারিবাবু হাসলেন। গিরিবালা হাসলেন। শমিতা কবিতা হাসল। শশীপদ দেখে চোখ নামিয়ে নিল। তার চোখেও হালকা হাসির ছোঁয়া লাগে।

দেখ, বুড়ো মেয়ের কাণ্ড দেখ। গিরিবালা বললেন। তা বাপু ওদের নামিয়ে দিয়ে আসার সময় একলা একলা আসবি কেন? শশীকেও সঙ্গে নিয়ে যা।

কি রে, যাবি?

শশীপদ ঘাড় নাড়ল।

শশীপদর মনে হল, সবার অলক্ষ্যে শৈলদি যেন চিমটি কাটল একটা।

শমিতা বলল, সুদীপবাবু, ইণ্টারেস্টিং। তার চেয়ে বেশী ইণ্টারেস্টিং ও'র চিঠি। দুখানা দেখেছি। থার্ডটা ডিউ। কবে দেখাচ্ছিস?

আসুক আগে।

ওসব শুনছি না। আমি ফোন করব তোকে।

কবিতা বলল, আচ্ছা শমি, একটা পুরুষ একটা মেয়েকে এত অসভ্য—আই মিন—ইয়ে লিখছে, এ কথা ভাবতে পারিস তুই।

অসভ্য কি না! আর লিখলেই অসভ্য হল। শমিতা বলল। কিরে শৈল, তোর কি মত?

আমার আবার মত কি? মাঝে মাঝে পড়ি আর নিজেকে যাচাই করি। অপাঙ্গে তাকাল শৈল। আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল। আগে হোক তখন বুঝবি।

ড্রাইভারের পাশে বসে প্রত্যেকটা শব্দ গিলছে শশীপদ। অনথ্যায় জীবনে যেন নতুন পাঠ নিচ্ছে। টক-ঝাল-মিষ্টি একটা আচারের মনোলোভা গন্ধ মন তাতিয়ে তুলছে অথচ স্বাদের আস্বাদ পাচ্ছে না শশী। জিভটা সুড়সুড় করছে। শশীপদর মনে পড়ল, একদিন লুকিয়ে লুকিয়ে পাঁজির বিজ্ঞাপন পড়েছিল। মা দেখতে পেয়ে ওকে মেরেছিলেন। হতভাগা ছেলে, আর কিছু না পেয়ে ওগুলো পড়ছো। পড়া ঘোচাচ্ছি তোমার। শশীপদর বেশ মনে আছে। হাত থেকে পাঁজিটা কেড়ে নিয়েছিলেন মা। শশীপদ আশ্চর্য হয়েছিল। বাবা, ঠাকুরদা, পণ্ডিতমশাই পড়লে দোষ হয় না। শুধু সে পড়লেই দোষ। কান দুটো জ্বালা জ্বালা করছে। শশীপদ ঠিক বুঝতে পারছে না, কি হচ্ছে! শুধু বোধ হচ্ছে, সেদিনের সেই পাঁজি পড়ার মত কোন গুরু দোষ করতে চলেছে নিশ্চয়ই।

শৈল ডাকল, আয়, ভেতরে এসে বোস।

শশী পাশে এসে বসল। তুমি এত ভাল গান কর, শৈলদি।

কে বলল।

বাঃ! বাঃ! আমি শুনিনি যেন।

তোর পছন্দ হয়েছে?

খু-উ-ব। শশী বলল। একটু চুপ করল শশী। গাড়ির চাকার শব্দ উঠছে। একটানা গোঁ-গোঁ আওয়াজ হচ্ছে ইঞ্জিনের। ফুল তোমার পছন্দ হয়েছিল?

খু-উ-ব। শশীকে নকল করল শৈল।

সত্যি বলছ?

হ্যাঁ রে, হ্যাঁ! শশীপদর ঘাড়ে মাথা রাখল শৈল। হাওয়ার হলকা লাগছে। ঘুম পাচ্ছে। চুপ কর। একটু ঘুমুতে দে। শৈল বলল।

অজানা ফগের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধে ভুর-ভুর। দু'-চার গুছি চুল হাওয়ায় উড়ে শশীপদর কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। আশ্চর্য শান্ত একটি নরম উষ্ণ পরিমণ্ডলে শৈলদি ঘুমিয়ে আছে। অতি প্রশান্ত নিশ্চল নির্বিকার ভঙ্গী। ধীরে ধীরে বুকটা ওঠা-নামা করছে। মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ছে। এক একবার টাল খাচ্ছে।

শশীপদর মনে পড়ল, একদিন সে গরম রসগোল্লার রস চুরি করে খেয়েছিল। যত মিষ্টি লেগেছে তার চেয়ে বেশী গলা জ্বলেছে। অথচ গলা জ্বলেছে বলে সে রস খেতে ছাড়েনি। ঠিক সেদিনের মত জ্বালাভরা আনন্দে শশীর চোখ দুটো দীর্ঘায়ত হ'ল। কোঁচার খুঁটে ফুঁপি পাকিয়ে কানে দিল। আরামে চোখ বুজে এল শশীর।

খুব আস্তে নরম-নরম সুরে ডাকল। টোপলাইব।

উঃ।

দ্বৰ্গীদায় চিঠিগুলো আমার একটু পড়তে দেবে?

তন্দ্রা-জড়া চোখ দুটো অতি কষ্টে টেনে টেনে একবার খোলে শৈল। —আচ্ছা। আবার ঘুমে ঢোলে।

রাত্রে শুয়ে গিরিবালা মেয়ের গায়ে হাত রাখলেন। কি রে! ঘুমিয়ে পড়লি?

না। শৈল হাসল। গাড়িতে একটু চটকা লেগেছিল। এখন কেটে গিয়েছে। গরম হচ্ছে মা।

জামাটা ছেড়ে শো।

থাক। শৈল বলল।

ছেলেটাকে কেমন দেখছিস?

না বাবা, বলব না। শৈল হাসল। তোমার বুড়ো বয়েসের ছেলে।

ঋণ রাখ, শৈলী। গিরিবালাও হেসে ফেললেন।

এমনি, খুব সাদাসিধে। তবে, কেমন একটু বোকা-বোকা যেন।

গাঁ থেকে এসেছে, তাই একটু ওরকম মনে হয়। না হলে শিশুর মত সরল। তা ছাড়া, হালচাল হবে কোত্থেকে? আমিও কারও সঙ্গে মিশতে দিইনে ওকে। হাজার হোক পরের ছেলে।

কিন্তু মানুষ করছ নিজের ছেলের মত সাধ আহ্লাদ চুকিয়ে।

সে বরাত করে কি এসেছে, মা। দীর্ঘশ্বাস পড়ল গিরিবালার। আছে পরের বাড়িতে। যাতে মন বসে, তা একটু দেখতে হবে না?

শৈল গিরিবালাকে জড়াল। কোলের মেয়ের মত বুকে মুখ গুঁজল। মা-মণি! লক্ষ্মী মা আমার! তুমি কিচ্ছু ভেব না, দেখ, সব ঠিক হয়ে যাবে।

মেয়ের আদরে আদরে মাখনের তালের মত গলে গেলেন গিরিবালা। হ্যাঁ রে, সুদীপের খবর পেয়েছিস?

অন্ধকারে শৈল ঠোঁট ওলটাল। তোমার ওই এক রোগ। খালি সুদীপ আর সুদীপ।

গিরিবালা মুখ টিপে হাসলেন।

বিছানায় শুয়ে ঘুম আসেনা শশীপদর। গরম লাগছে। এপাশ ওপাশ করল বার-কয়েক। উঠে এক গ্লাস জল খেল। দূর ছাই। ছাতে যাই, শশী ভাবল।

আঃ! মৃদু মৃদু বাতাস বইছে। গা জুড়িয়ে যাচ্ছে। মাদুরটা পাতল শশী। নির্মেঘ আকাশ। শশীপদ তাকিয়ে দেখল, কালচে নীল, উজ্জ্বল ঘষা-কাঁচের মত। মাঝে মাঝে তারার চুমকি। ওটা সপ্তর্ষি আর ওটা কালপুরুষ।

গ্রামের বাড়ির কথা মনে পড়ল শশীপদর। এরকম গরমের দিনে ঘরের দাওয়ায় শুত ওরা। ঠাকুমা গল্প বলতেন, রূপকথার গল্প। নিজের অধীত বিদ্যায় বুড়ীর ওপর মাস্টারি ফলাত শশীপদ। ভুলভাল বোঝাত।

বুড়ী বলত, চুপ কর। তোকে আর মাস্টারি করতে হবে না। মিথ্যুক। মিথ্যুক কোথাকার।

শশীপদ স্বাগত। প্রথমে বকত, তারপর মার।

ওরকম করলে তোকে ঘরে বন্ধ করে রাখব শশী। মা রেগে বলতেন। এক একদিন সত্যি সত্যি রেগে যেতেন। হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে তুলতেন। হতভাগা ছেলে, জ্বালিয়ে খেলে। তারপর ঘরের মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে শেকল তুলে দিতেন দরজায়। —মর! পচে মর গরমে।

অন্ধকার সেই ঘুপচি ঘরে শশীপদর মনটা আঁকুপাঁকু করত। একান্ত অসহায় বন্দীর মত বিচ্ছিন্ন মনে হত। কষ্ট পেত শশীপদ আর কাঁদত।

আজও ঠিক তেমনি কষ্ট হচ্ছে। শশীপদ বুঝতে পারছে না। কেন? কি জন্যে? সেই অসহায় বন্দিত্বের বিচ্ছিন্ন একাকিত্বে নিজেকে নির্জন বোধ করছে। অথচ কি আশ্চর্য, কি শান্ত, কি গম্ভীর আকাশ। কি মধুর শীতল বাতাস।

ঢং! ঢং! ঢং! শশীপদ চমকে উঠল। দ্রুত ধাবমান ঘণ্টার ধ্বনি, একটানা সুরে বেজে ছুটে গেল। দমকল। শশীপদ ভাবল। আগুন লেগেছে কোথাও।

চুলের গোছা হাতে নিয়ে মোক্ষদা বলল, কি হাল করেছ, দিদিমণি। এমন এক ঢাল চুল। কোথায় একটু তেলজল দেবে, না, সব সময় ফরফর করে উড়ছে।

[illegible] মোক্ষদা, হল? না, তুই বকবকই করবি?

সাধে কি আর বলা! মেয়েমানুষের শরীর, একবার পাত হলেই গেল। ও মা, [illegible] ও যে ছ্যাঁকছোঁক করছে। বলি জ্বর-টর হয়নি তো?

[illegible] না ছাই। বেলা অবধি ঘুমিয়েছি। [illegible] ম্যাজম্যাজ করছে।

হ্যাঁ! তুমি সেই মেয়ে কি না! টংগস-টংগস করে এই রোদে হ্যানটান করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আবার বলে, বেলা অবধি ঘুমিয়েছি।

শৈল রাগ করতে গেল। রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলল। চুপ কর মোক্ষদা, আমি ঘাট মানছি।

আঙুলের নখ দাঁতে করে কাটে শৈল। [illegible] তিন দিন হল সন্দীপের চিঠি আসেনি। [illegible] সময় কড়ার ছিল নিত্য চিঠির। [illegible] বোসো, শৈল ভাবল, মজা দেখাচ্ছি [illegible]। তোমার শাস্তি তিন দিন [illegible]। তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল!

[illegible] শিথিল হাতে শুল শৈল। [illegible] বাতাস বইছে। কোথাও [illegible] হয়েছে বুঝি।

শশীপদ ছাতে এল। শরীর খারাপ [illegible]

[illegible] বললে?

[illegible] শৈলদি।

[illegible] আজই [illegible]। শুধু [illegible] করা।

[illegible] হবে না।

[illegible] মাথা।

[illegible] মুখ করে শশীপদ তাকাল। [illegible] দেব একটু।

[illegible] খিলখিল করে হেসে উঠল। [illegible] অমন কি দোষ করল?

[illegible] হলে মাথা কনকন করে। [illegible] শৈলদি, সেবা করতে আমার খুব ভাল [illegible]।

[illegible] হাত ধরল শৈল। তুই সেবা [illegible] আমার অসুখ হবে নাকি? [illegible] সেবা করবার লোক আসুক। [illegible]। শশীপদ বলল।

শশীপদ।

উঁ! মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল শশী।

আর থাক। খুব হয়েছে।

[illegible] ওপর মাথাটা আলতো চেপে [illegible] শশীপদ। এই সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে [illegible] এক মুগ্ধ চিত্তের তন্ময়তা যেন শশীপদর আঙুলের কলিতে কলিতে কাঁপছে। শশীপদ অবাক চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। শৈলদি যেন পটে আঁকা সরস্বতী।

শৈলর দুগালে টোল। কি সুন্দর! শশী ভাবল। দুধের খুব পাতলা সর মেয়েরা যেমন আঙুলে কেটে মুখে মাখে, তেমনি একটু আলতো আঙুলে ছোঁবার বাসনা হল শশীর। শশীপদ কেঁপে কেঁপে উঠল।

কি রে! কি হয়েছে? শৈল বলল।

কিছু না। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল শশীর। তুমি কত সুন্দর, শৈলদি।

চোখ মেলে চাইল শৈল। শশীপদর লজ্জা-লজ্জা ডাগর দুটি চোখ বিষাদ-করুণ, নির্মল-শান্ত। যেন অতল জলের দীঘি। তুই আমাকে খুব ভালবাসিস, না রে, শশী!

শশীপদ ঘাড় নাড়ল। হুঁ।

কিরকম ভালবাসিস?

বাঃ! ভালবাসার আবার রকমফের আছে নাকি? শশীপদ অবাক হল।

আছে বইকি! শৈল বলল। ধর, মাছ। একই মাছের ঝাল হয়, ঝোল হয় টক হয়। তা বলে কি তিনটে পদই খেতে এক?

শশীপদ হা হা করে হেসে উঠল। তুমি কিচ্ছু বোঝ না শৈলদি। সেগুলো সব মাছই তো!

শৈল হাসল না। বিস্মিত হল। আর ভাবল, কি আশ্চর্য!

গিরিবালা বললেন, দিনরাত বাড়ি বসে বসে কর কি? যাও না, মেয়েটাকে কোথাও একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এস।

শুধু মেয়ে কেন? মেয়ের মাও চলুক।

শৈল বলল, সকলে যাব আমরা।

আমাকে আবার কেন? আমি মোটা মানুষ বাপু।

তোমাকে যে মোটা বলে, সে রোগা কখনও দেখেনি। মুরারিবাবু বললেন। সকলে হেসে উঠল, এমন কি শশীপদও।

শৈল বলল, কোথায় যাবে, বাপি? আমি কিন্তু মরে গেলেও তোমার পরেশনাথ কি বোটানিকস্ যাব না।

তবে কোথায় যাবি? গিরিবালা বললেন।

শৈল বাবার গলা জড়াল। সে বাপি ঠিক করবে।

ঘন কেয়ারি করা বকুলগাছের তলায় জাজিম বিছিয়ে বসে পড়লেন গিরিবালা। মুখে পান নিয়ে নিশ্চিন্ত বিলাসে চিবোতে শুরু করলেন। পাইপ ধরিয়ে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লেন মুরারিবাবু। এখন আমার ছুটি।

শৈল এসে শশীপদর আঙুলে আঙুল জড়াল। হাত দুলিয়ে রোদ্দছায়ায় ঘুরে বেড়াল খানিক।

কি, কথা বলছ না যে!

মনটা যখন পূর্ণ থাকে তখন আর কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। শৈল বলল। কলসীটা জলে কাণায় কাণায় ভরতি থাকলে ঠনঠন আওয়াজ ওঠে?

তুমি কত সুন্দর, কত গুছিয়ে কথা বল, শৈলদি। এক এক সময় মনে হয়, তুমি যেন বই থেকে বলছ।

শৈল হাসল। আমার মনটা এখন হাতের মুঠোয়। আর তোর হাওয়ায় ছড়ান। দানা বাঁধেনি। যখন বাঁধবে, তখন তুই অনেক বড় হয়ে যাবি।

বড় হওয়ার অনেক জ্বালা। শশী বলল। আমি বড় হতে চাই না,, শৈলদি।

শৈল শশীকে দেখল। দেখছে, আর বিস্মিত হচ্ছে।

আমের গাছে আম। শশীপদ নাক উঁচু করে শোঁকে। কাঁচামিঠে।

কই? কোথায়?

উঁচু একটা গাছ দেখিয়ে বলল, ঐ যে। খাবে?

তালুতে জিভ ঠেকিয়ে টকাস করে শব্দ তুলল শৈল। নিশ্চয়ই। কিন্তু, পাড়বে কে?

কেন? আমি!

শেষকালে পড়ে হাত-পা ভাঙো আর কি! দস্যি ছেলে কোথাকার!

ইস্। ভাঙলেই হল। তরতর করে গাছে উঠল শশীপদ। চেঁচিয়ে বলল, শৈলদি তুমি যদি এখান থেকে ঝাঁপ দিতে বল, তাও পারি। দেব? দেব? ডাল ধরে দোল খেল শশীপদ।

এই! এই! চমকে চিৎকার করল

শৈল। শশী যেন সেই গল্পের হরিণ। কচি কচি শিং উঠেছে সবে। এ সম্পদ নিয়ে কি করবে, ভেবে পাচ্ছে না সে। শৈলর গায়ে কাঁটা দিল। ঊর্ধ্বমুখ হয়ে সে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। নির্ভয়ে এ ডাল থেকে ও ডালে কাঠবেড়ালীর মত ঘুরছে শশী, যেন হাওয়ায় ভাসছে।

এধারে ঝোপঝাড়, কাঁটাগাছ, আগাছায় ভর্তি। ওধারে কোথায় চলেছিস? ঐ বনের ভেতর!

—এস না। শশীপদ বলল। দেখ, দেখ, কি সুন্দর একটা মূর্তি।

শৈল তাকিয়ে দেখল বিকালের পড়ন্ত লাল আলোয় সিঁদুরে গোলা একটা মূর্তি। ঈষৎ আনত অপূর্ব সে নারীমূর্তি। ডান হাত উরুমূলে। বাঁ হাত বুকে চাপা। এখনই বুঝি মহাশূন্যে উড়ে যাবে।

শশীপদ অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। মেয়ে। অদ্ভুত একটা অস্ফুট গুঞ্জন ঘিরে ফিরছে শশীপদকে। মাথা ঝিমঝিম করছে। শশীপদ চমকে উঠল। দেহের সমস্ত রক্ত ছলাত করে লাফিয়ে যেন মুখে উঠেছে। মাছের পাখনার মত তিরতির করে কাঁপছে কানের লতি, নাকের ডগা, বুকের ভেতর গুড়গুড় শব্দ হচ্ছে। শশীপদ বুঝল, শশীপদর শরীর শক্ত হয়ে উঠছে, পাকা বাঁশের লাঠির মত। নিঃশ্বাস গরম ঠেকছে। শশীপদ ভাবল, জ্বর হয়েছে। রোদে-পোড়া বালির মত অসহ্য তাতে জ্বলছে চোখ। শশীপদ দেখল, পাথরের পরী। পরী নয় মেয়ে।

অপূর্ব! শৈল বলল, সুপার্ব!

সংবিৎ পেয়ে শশীপদ ঘুরে দাঁড়াল।

আঙুল তুলে ডাকল শশীপদ।

কি?

মূর্তির পায়ের কাছে ঠেস দিয়ে দাঁড় করাল শৈলকে।

কি দেখছিস?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল শশীপদর। ওই মূর্তিটা যদি তুমি হতে, শৈলদি।

আর একবার চোখ মেলে শৈল চাইল। ও চোখে যেন সন্দীপের চোখ। এই প্রথম শশীপদর কাছে কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করল শৈলর।

লজ্জা কাটাতে জোর কদমে হাঁটল শৈল। আমি চলি।

দাঁড়াও। আমিও যাব।

না। শৈল বলল। আমি যাচ্ছি।

ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। আমি কিন্তু ছুটে ধরে ফেলব।

ইস্। তাই নাকি! আমি যেন ছুটতে জানি না। শৈল কৌতুকে মাতল। জানিস, কলেজে আমি এক শো মিটারে ফার্স্ট।

শশীপদ মাটি কাঁপিয়ে ধাপ দিল, রেখে দাও তোমার কলেজ।

বেশ। হাসল শৈল। তারপর ছুটল। ধনুকের ছিলা থেকে বেরিয়ে আসা তীরের মত শশীপদ ছুটছে। কে পারে কাকে ধরতে। শৈলর হাসি পাচ্ছে। পাখির মত হাওয়া কেটে, মাছের মত পাখনা মেলে শৈল যেন ছুটছে। উত্তেজনায় গলে গলে যাচ্ছে দুজনে। খালি পা, মাটি। চুল উড়ছে। রেণু রেণু ধুলোর পাউডার মুখে মাথায় চুরচুর করে ছড়িয়ে পড়ছে।

শৈল থমকে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছে শৈল। গা-গতর ভারী হয়েছে। বুকটা ঘন ঘন উঠছে পড়ছে। হা হা করে নিশ্বাস নিল শৈল। মেটে সিঁদুরের মত লাল দেখাচ্ছে গাল।

শৈলদি, পালাও। শশী বলল, ধরে ফেলব কিন্তু।

ধর দেখি। শৈলকে যেন খেলায় পেয়েছে।

শশী এগিয়ে আসছে। একটু। আর একটু। তারপর শেষ। শৈল ভেঙে পড়ল। আর পারছে না সে। জিভ শুকিয়ে আসছে। গলায় টান ধরছে। ঘামে ভেজা শরীরটা চলকে ছলকে উঠছে।

হাত বাড়িয়ে দিল শশী। নরম আর গরম বোধ হল শশীপদর।

টুপ! টুপ! আওয়াজ উঠছে। আর ছোট ছোট বৃত্ত থেকে বৃহত্তর এক একটা বৃত্ত-বলয় গড়ে উঠছে। এক থেকে অসংখ্য। দীঘির পাড়ে বসে জলে কাঁকর ফেলছিল শশীপদ আর ঘাসের শীষ নিয়ে দাঁতে কাটছিল শৈল।

স্বপ্নের একটা সিঁড়ি দিয়ে হাঁটছিল শশী। সে সিঁড়িটা পায়ের তল থেকে হঠাৎ সরে গিয়েছে। শশী ভাবল। আর চড়কের দিনে গাজনের সন্ন্যাসীর মত তাকে জ্বলন্ত আগুনে মাড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। সীমাহীন সংখ্যাতীত সূচিমুখ জ্বালায় পুড়ছে অথচ প্রত্যাসন্ন জীবনের অধীর আনন্দ বিসন্ন মোহ পাগল করছে শশীকে।

শৈল বলল, চল। সন্ধ্যে হয়ে এল।

শশীপদ মিনতি করল, আর একটু বসো, শৈলদি।

প্রজাপতি। শৈল তাকিয়ে দেখল। নরম-নরম পাখা মেলে ফুরফুরে হাওয়ায় হেলে দুলে উড়ে বেড়াচ্ছে। ফুলের পাপড়ির মত ভাসছে।

প্রজাপতি। শৈল বলল, আমার যদি পাখা থাকত!

তা হলে তোমাকে পরীর মত দেখাত।

পরীরা মানুষ নয়। শৈল হাসল। দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়।

যাক্। শশীপদ বলল। সেও ভাল।

শৈল অনুভব করল, উত্তপ্ত একটা দৃষ্টির স্পর্শ ধূপের ধোঁয়ার মত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে।

শশীপদ ভাবল, রহস্যের রাংতা মোড়া সবুজ পৃথিবী, পিঁয়াজের কোয়ার মত একটু একটু আবরণ খুলছে। শতদল পদ্মের মত একে একে পাপড়ি মেলছে মন। আনন্দ হচ্ছে শশীপদর, ভীষণ আনন্দ।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। শশীপদ দেখল। কি নরম! শশীপদ ভাবল, আনন্দে গোল, সুধায় ভরপুর, মিষ্টি আলো ছড়ানো। ঐ চাঁদটা যেন শৈলদি। ফিনকি দেওয়া আলোর জোছনায় রাঙিয়ে তুলেছে।

শশীপদর মনে হল, অনেক বড় হয়ে গেছে সে। বোতলের সেই দৈত্যটার মত যেন বোতল থেকে ছাড়া পেয়েছে। সমস্ত ভুবন ভরেছে। পৃথিবী অনেক ছোট হয়ে এসেছে।

ঘরে এসে ধূপ জ্বালাল শশীপদ। হাঁটু মুড়ে প্রার্থনায় বসল। হে ভগবান! হে মা কালী। মঙ্গল কর শৈলদির। খুব ধীরে ধীরে অস্ফুটে উচ্চারণ করল, মঙ্গল কর।

হালকা লাগছে। অনেক হালকা। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল শশীপদ। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, শৈলদি যেন পরী। বাগানের সেই নিঃসঙ্গ পাথরের মূর্তিটার অনাবরণ নিটোল স্বাস্থ্য নিটুট যৌবনে টলমল করছে। শৈলদির চোখে জল। মুখে হাসি। হিলহিলে আরামের রেশম ছোঁয়া রেশ ঝুরেঝুরে চুলের গোড়া বেয়ে সারা শরীরে শিথিল একটা আবেশ সৃষ্টি করছে। মন ভরে উঠছে শশীর। বুকের কোষ ভারী হচ্ছে আলসে আমেজে। একটা ভিজে ভিজে আঠাল স্পর্শে ঘুমের মধ্যে চমকে উঠল শশীপদ। পাশ ফিরে শুল। ক্লান্ত অথচ তৃপ্ত দেখাল শশীকে। ঘুমের অতল তলে তলিয়ে গেল। শশীপদর নাক ডাকছে।

খুব সকালে শৈল ঘাটে এসে দাঁড়াল। ঘুম-ঘুম ফোলা-ফোলা চোখ। এরই মধ্যে বাগানের কাজ সেরে পুকুরে এপার ওপার করছে শশীপদ। পানকৌড়ির মত ডুব গেল এ-ঘাট ও-ঘাট। শৈল আশ্চর্য হল। শশীপদ যেন শশীপদ নয়, আশ্চর্য মাছ।

তুমি সাঁতার জান? শশীপদ জিজ্ঞেস করল।

না।

শিখতে ইচ্ছে হয়?

হয়।

তবে শেখ না কেন?

ভয় করে।

কিসের ভয়। শশীপদ কুলি করে জলের ফোয়ারা তুলল। হাতের চেটো সাপের ফণার মত জলে আঘাত করে জল-পিচকারি ছোঁড়ে। আমি আছি। শশীপদ বলল।

শশীপদ যেন শশীপদ নয়। মস্ত একজন মানুষ। শৈল ভাবল। আশ্বাসে ভরা তার নিশ্বাস। বাহুতে অমিতশক্তি। নিঃশঙ্ক নির্ভয় চিত্ত। শৈল হাসল।

ভয় নয়, লজ্জা করে।

লজ্জা! শশীপদ হো-হো করে হেসে

উঠল। আমাকে লজ্জা! জল ছেড়ে উঠে এল শশী। শৈলের হাত ধরল। চল।

আজ নয়, লক্ষ্মীটি! পরে। শৈল অনুনয় করে।

পরে নয়। আজই। শশীপদর গলায় অনেক জোর।

শৈলের এলো খোঁপা। মিষ্টি চুলের গন্ধ। একটা কাল পদ্মের কুঁড়ি যেন ফুটি ফুটি করছে। আর শশীপদ ভ্রমর।

শৈল বলল, আমরা যেন প্রতাপ আর শৈবলিনী।

তারা আবার কে? শশী প্রশ্ন করল।

জানি না। অকারণে উচ্চগ্রামে হেসে উঠল শৈল।

ফুল বড় ভালবাসে শৈলদি। শশীপদ বলেছিল, আমার গাছে যত ফুল হবে সব তোমার। ফুলের কুঁড়ি ধরেছে কিন্তু ফোটেনি এখনও। একটু বৃষ্টি পড়লেই তারা আলোর মত ফুটবে। গন্ধে পূর্ণ হবে বাতাস।

টিনের সুটকেশ থেকে গুনে গুনে পাঁচটা বার করল শশীপদ। শৈলদির জন্যে ফুল কিনতে হবে। বাকি রইল একটা টাকা। ওই থাক। শশীপদ ভাবল। চটিটায় একটা [illegible] লাগা।

বেলের গোড়ে, চাঁপা আর রজনীগন্ধা। শশীপদ ফুল কিনল। শৈলদি খুব অবাক হবে। ভাবল শশীপদ, আর খুশী। আর খুশী-খুশী শৈলদির মুখখানা কি মধুরই না দেখতে হবে।

শশী ঘরে ঢুকল। শৈলদি।

গিরিবালা বললেন, ও মা, তুই?

ফুলগুলো কোথায় রাখি বল ত, মা?

দে। হাত বাড়িয়ে নিলেন গিরিবালা। ভালই হল। সুদীপ এসেছে।

কে? সুদীপদা।

হ্যাঁ রে! হ্যাঁ। তুই কি ভাবলি? কেন?

শশীপদ হাসল। গিরিবালা ভাবলেন, ছেলেটা সরে গেল কেন?

পা টিপে টিপে নামল শশী। অন্ধকার বারান্দার কোণে এসে দাঁড়াল। শৈলদির ঘরে নীলাভ আলোর রোশনাই। চোরের মত হাঁটল। নিজের নিশ্বাসকেও বিশ্বাস নয়। বুক চেপে দেওয়ালে ঠেস দিল শশী।

শৈলদি হাসছে। জলতরঙ্গের মত সে হাসিটা বারান্দায় ছড়িয়ে পড়ল। সাহস ভর করে অল্প একটু মাথা তুলল শশী। বেলের গোড়ে খোঁপায় জড়ানো। শৈলদির কপালে চন্দনটিপ। সুদীপদার হাতের সিগারেট নীলচে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

জবর-জবর মনে হচ্ছে শশীপদর। টং! টাং! চুড়ির আওয়াজ হচ্ছে যেন। কে যেন জল খেল। আচমকা হাসল। অসভ্য! শৈলদি বলল।

উঁচু পায়ে ডিঙি মারল শশীপদ। শশীপদ রুদ্ধশ্বাস। সুদীপদা যেন বাঘ। আর শৈলদি? চোখে হাত চাপা দিল শশী।

হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকল শশী। কুকুরের মত হাঁফাল। নির্জন দুপুরে ঘুঘুর কান্নার মত করুণ বোধ করল নিজেকে। শৈলদির হালকা, নরম, শীতল, উষ্ণ দেহটির জন্য মায়া হল শশীপদর।

চোখ করুণ, মুখে থমথমে উত্তেজনা। কেমন ধারা আদুল-আদুল ভাব। গা এলানো উদাস-উদাস। কিছু যেন হারিয়েছে শশীর। গিরিবালা লক্ষ করলেন। ছেলেটা কেমন অন্যমনস্ক। ভাল করে খায় না পর্যন্ত।

গায়ে মাথায় হাত বোলালেন গিরিবালা।

—কি হয়েছে, শশী?

কিছু হয়নি। শশী হাসল। তুমি মিছেমিছেই ভাব।

আমার চোখের দিকে চা। সত্যি করে বল, কি হয়েছে?

শশীপদ চোখ নামিয়ে নিল। ঠোঁট দুটো কাঁপল শশীর। গলা বুজে এল। শৈলদি চলে যাবে, মা?

যাবে না? গিরিবালা হাসলেন। পাগল আর কাকে বলে। এতো বড়ো ছেলে হলি, শশী—গিরিবালা বললেন, বুদ্ধি হল না। ওর ঘর সংসার নেই! সাধ আহ্লাদ।

অসহায়। বিমূঢ়। আচ্ছন্ন চৈতন্য।

মুরারিবাবু তাড়া দিলেন। অস্থির পায়ে পায়চারি করল সুদীপ। কনেচন্দন পরানো শেষ হল। আঁচলে চোখ মুছে গিরিবালা বললেন, সাবধানে থাকিস, মা। মনে করে চিঠি দিস।

দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরল শৈল। মা, কাল থেকে শশীকে [illegible]

পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গিরিবালা বললেন, তোর ওপর বড্ড মায়া বসেছে, শৈল।

মা।

কি রে? কি হল?

কিছু না। তোমার হল? শৈল উঠে দাঁড়াল। কোমরে কাপড়টা গুঁজে বলল, আমি আসছি।

শশী। শৈল ডাকল।

দূরে গঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শশী। ওর কাঁধে হাত রাখল শৈল। আমার সঙ্গে কথা বলবি না, শশী?

না। না। না। অভিমান, আহত উষ্মায় শশীপদ যেন জ্বলছে। শৈল অনুভব করল, শৈলের চোখে জল। শশীপদ যে স্বপ্নের মায়াপুরীতে বর্ণালী আলোর ফোয়ারায় আলোকসুধা আকণ্ঠ পান করেছে। লক্ষ্মীটি। মুখ ফেরা। শৈল বলল।

আমি মরে যাব, শৈলদি। আমি মরে যাব।

শৈলের গলা কাঁপা কাঁপা শোনাল।

দু হাতে শশীপদকে বুকে টেনে নিল শৈল।—ছিঃ। তুই না পুরুষমানুষ, শশী!

দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে গিরিবালা দেখলেন, শশীপদ কাঁদছে। ফুলে ফুলে কাঁদছে। নিঃশব্দে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলেন তিনি। শশীপদ যেন উপাসনায় বসেছে। চোখের জলে প্রার্থনা।

হালকা আঙুলে চোখ মুছলেন গিরিবালা। নিঃসঙ্গ নির্জন বাড়িটায় পা ফেলে হাঁটলেন। পাছে শব্দ ওঠে।

পোল সেজান : প্রথম জীবনের ছবি

পাঠকের মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক ঠিক কোন ব্যক্তি এই সাঁকো; ইম্প্রেশনিজম তো ফর্মকে সম্পূর্ণ ভুলেছিল, ছবিকে করে তুলেছিল এক বায়বীয় সৌন্দর্য-অভিজ্ঞতা, কিন্তু কে সেই ব্যক্তি যিনি আবার সচেতন করলেন শিল্পীদের যে বস্তুপুঞ্জ বায়ু নয়, তা নিরেট, শূন্যতার ফাঁককে ভরে তোলা শীতল অস্তিত্ব মাত্র।—আলোচনায় আমি নদীর ওপারের শিল্পীদের, অর্থাৎ বায়ুপুঞ্জক উনিশ-শতকী ইম্প্রেশনিস্টদের বিষয়ে কিছুটা বলেই চলে এসেছিলাম এক্সপ্রেশনিস্ট এবং তা থেকে আবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেশনিস্ট কান্ডিনস্কি পর্যন্ত, যাঁরা আছেন নদীর এপারে বিশ শতকে, কিন্তু যিনি মাঝের এই ফাঁক, নদী, পার করলেন আমাদের সেই পোল সেজানকে কিন্তু ভুললে চলবে না। তাঁর সমগ্র শিল্পীজীবন একটিমাত্র আলোচনায় যেহেতু সম্ভব নয় সেহেতু এ-সপ্তাহে তাঁর জীবন ও বারোক পর্ব নিয়ে কিছু বলে ইচ্ছে রইল সামনের সপ্তাহে এই শিল্পীর বিশ শতকে যাবার সাঁকো নির্মাণের কাহিনী বর্ণনা করা।

একস্‌-অঁ-প্রভঁস-এ ১৮৩৯ সালে পোল সেজানের জন্ম। সেই সেখানেই মৃত্যু ১৯০৬-এ। টুপির ব্যবসা করে বড়লোক হয়ে বাবা ব্যাঙ্কার হন এবং ছেলেকেও স্কুলে পাঠান এই আশা নিয়ে যে, সে আইনজ্ঞ হয়ে বাবার ব্যবসার ভার নেবে ভবিষ্যতে। কিন্তু স্কুলে গিয়ে এমিল জোলার সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার পোল ঠিক করলে শিল্পী হব—বাবা বললেন "ওহে, প্রতিভা নিয়ে মানুষ মরে, অর্থ থাকলে মানুষ খেতে পায়—এসব ছবিটবির দিকে খবর্দার যেও না, একেবারে মারা পড়বে।" কিন্তু জোর করে কি আর এসব ব্যাপারে বোধ কিছু করতে পারে, ১৮৬১ সালে সেজান রওনা হলেন প্যারিসে। রাজধানীতে কিন্তু তাঁর একেবারেই সময়টা ভাল গেল না—ভর্তি হলেন আকাদেমি স্যুইসে, কিন্তু আসলে চেয়েছিলেন একোল দ্য বোজার্তে ঢুকতে, সেখানে হল না। [illegible] মতে "সেজানের ছবিতে বর্ণের আধিক্য মাত্রাতিরিক্ত এবং উদ্দামতা বেশি"। পোলের বিষয়ে যখন এত সব আপত্তি হতে লাগল স্বাভাবিক ছিল এমিল জোলা, তার পুরোনো বন্ধু, এগিয়ে আসবে উৎসাহ দিতে, কারণ এমিলের তখন প্যারিসে বেশ নামডাক; কিন্তু বন্ধুর কাছ থেকেও যখন পোল নিরাশ হলেন তখন ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে এলেন আবার এইস-এ।

কিন্তু তাই বলে কি বাবার ব্যাঙ্কে যোগ দেব? বাবা আবার চেষ্টা আরম্ভ [illegible] ভবিষ্যৎ শিল্পীর জন্ম হচ্ছে" যৌবন থেকে আশা ছেড়ে দিলেন পুত্রের। ১৮৬২ সালে পোলকে পুনর্বার দেখা গেল প্যারিসে, আকাদেমি স্যুইসে পরিচিত হলেন পিসারো, গিয়োমাঁ, দেগা, বাজিল, মোনে, রেনোয়া-সিসলে প্রভৃতির সঙ্গে—কিন্তু তাঁর অস্বাভাবিক লাজুক স্বভাবের ফলে ঠিক বন্ধুত্ব করতে পারলেন না। বরঞ্চ, লাজুক লোকের যা হয়, কথা ভেবে না পেয়ে উল্টো-পাল্টা কী বলে চটিয়ে দিলেন অনেককে। তাছাড়া এই সময়ে তার আঁকা ছবিও এদের কারুর ভালো লাগেনি। কারণ বর্ণোদ্দীপ্ত বারোক ঢঙ এদের কারুরই পছন্দ ছিল না। ১৮৬৩-তে পোল সেজান পুনর্বার একোল দ্য বোজার্ত থেকে প্রত্যাখ্যাত হলেন, তার তিন বছর পরেও ১৮৬৬-তে সালঁ তার ছবি নিতে রাজি হল না। ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৬ পর্যন্ত সেজান অবিরাম অবহেলায়

আত্মপ্রতিকৃতি

'আধুনিক অলিম্পিয়া'

আর নিন্দে ছাড়া কিছু শোনেননি, মাঝে-মাঝে এই বিরুদ্ধতা অসহ্য লাগত তাঁর, প্যারিস থেকে ফিরে আসতেন সবুজ এই স-এ—কয়েকদিনের শান্তি, তারপরেই আবার প্রতিভাস্ফুরণের দায়িত্বে ফিরে যেতে হত প্যারিসে। তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন, নিজেকেই নিজে পরীক্ষা নিতেন, নিজেকেই নিজে বিপদে ফেলতেন, তুলির খেলায় নিজেই শিষ্য নিজেই গুরু। একা একা ঘরে বসে ছবি এঁকে দিন কেটে যেত, অনেক কথা থাকত বলবার কিন্তু বন্ধু কোথায়, কে বন্ধু হবে এমন উদ্ভট অপ্রতিভ লোকের সঙ্গে।—১৮৭০-এ যখন যুদ্ধ লাগল সেজান মার্সেই-এর কাছে এস্তাকে বসে তখন প্রাকৃতিক দৃশ্য "স্টাডি" করছেন। কিন্তু সেখানে বেশীদিন থাকতে পারলেন না, প্যারিসে না ফিরে পন্তোয়ার কাছে ছোট্ট গ্রাম অভের সুরওয়াতে চলে গেলেন; পিসারোও তখন সেখানে ছিলেন।

এই অভের সুরওয়াতেই প্রথম দীক্ষা নিলেন সেজান ইম্প্রেশনিজমে। পিসারোর নির্দেশে ছবি আঁকা আরম্ভ করলেন। পিসারোর সংস্পর্শে আসার আগে তার ছবি ছিল বারোক ধারার—তিনতেরেত্তো, মাগনাসকো, ক্রেসপি, গোইয়া, দামিয়ে প্রভৃতির প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। উত্তাল রঙ, ভয়াবহ মুখ, অবাস্তব শরীর, এই সবের মধ্য দিয়ে এই পর্যায়ের ছবিতে ফুটে উঠত তাঁর মনের চাপা কামনাগুলো। ছবির বিষয় হত মৃত্যু, উন্মত্ত উৎসব কিংবা ভয়াবহ-ভাবে আঁকতেন তিনি সেই সব—পশ্চাৎপটে সর্বদাই থাকত গভীর রঙ, তার ওপরে হালকা সাদা কিংবা উজ্জ্বল রঙে শরীর-গুলো প্রেতাত্মার মত ভেসে বেড়াত। আসলে এতদিন তিনি সচেতন শিল্পী ছিলেন না, অস্বাভাবিক লাজুক এবং ভয়ানক ইন্দ্রিয়-গ্রস্ত মানুষ বলে সমস্ত বিদ্রোহী কামনা তিনি উগরে দিতেন ক্যানভাসে। তা ছাড়া তো আত্মপ্রকাশের আর কোনো রাস্তা জানা ছিল না সেজানের।

কিন্তু পিসারোর সঙ্গে দু' বছর থাকার পর তাঁর ছবির শৈলী সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। বর্ণে সমতান এবং ঔজ্জ্বল্য, ক্যানভাসের পরিসর পূরণে নিখুঁত সমতা, হাল্কা রেখাঙ্কন—সুস্পষ্টভাবে ইম্প্রেশনিজমের সূচনা দেখা গেল সেজানের ছবিতে। ক্রমশ ইম্প্রেশনিজমের মধ্যে গভীরতর ডিসিপ্লিন আনার চেষ্টা আরম্ভ করলেন সেজান, যা মোনে কিছুটা ওপর ওপর করেছিলেন। সেজান বলতে আরম্ভ করলেন "ইম্প্রেশনিজমকে শক্ত খুঁটিতে দাঁড় করাতে হবে, দায়িত্ব হবে চিত্রকরের ভাবি-কালের কথা স্মরণ রেখে ছবি আঁকার।"—সেজানের বারোক পর্যায়ের একটি ছবি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

"আধুনিক অলিম্পিয়া" চিত্রটি সেজান এঁকেছিলেন ১৮৭২ সালে, ইম্প্রেশনিজমে দীক্ষা নেবার আগে। ছবিটির মধ্যে প্রথম যে জিনিস আপনি লক্ষ করবেন তা হল, এই ক্যানভাসে কোনো রিলিফ নেই। যে কোনো ভালো ছবির মধ্যে লিরিকের একটা অংশ থাকে, জলের শব্দের মত প্রবাহিত হয় তা সমস্ত ছবির মধ্য দিয়ে, কিন্তু এ ছবিটা কেমন যেন দম বন্ধ করা, বড় মোটা তারে বাঁধা। শিল্পীর উচ্ছ্বাস, বর্ণব্যবহার এবং বিষয় বিন্যাসের সংযম অতিক্রম করে ক্যানভাসকে করে তুলেছে বড় উদ্দাম, বিশ্রামহীন, জবড়জং। ১৮৭৪ সালে মাসিয় দ্য মঁতিফো এই ছবিটি বিষয়ে লিখেছিলেন, "এই ভয়ংকর দৃশ্য এক ছোপ গোলাপী উলঙ্গ মাংসপিণ্ড...এই মেকি স্বর্গের দুঃস্বপ্ন, দুর্দান্ত সাহসীরও ভয়ে গলা বন্ধ করে দেবে। মঁসিয় সেজানের ছবি দেখলে মনে হয় জ্বরের ঘোরে কিংবা উন্মাদ অবস্থায় তাঁর এই সব ক্যানভাস আঁকা হয়েছে।"—আসলে সেজানের অনেক কমপ্লেক্স ছিল, অনেক চাপা বাসনা, রাগ, অভিমান তাকে যন্ত্রণা দিত। সেই সব কিছু ফেটে বেরুত তাঁর ক্যানভাসে। এই ছবিটিতে দোমিয়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, বিশেষত তাঁর ধোবানী ছবিটির কথা ভাবুন, একই ধরনের মোটা তারে বাঁধা গতি লক্ষ করবেন ক্যানভাসে।

পরবর্তী সংখ্যায় পোল সেজানের পোস্ট ইম্প্রেশনিস্ট পর্যায়ের ছবি নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল।

[illegible]শীল বসু

লোকসভা বিধানসভায় এবার কম মহিলা আসছেন

সব রাজনৈতিক পণ্ডিতদের সমস্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী ব্যর্থ করে দিয়ে ভারতের ভোটার প্রজাতন্ত্রের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা প্রমাণ করে দিয়েছে। স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র সকলের যথেষ্ট সন্দেহ ছিল যে গণতন্ত্রের মেয়াদ বুঝিবা এদেশে আর বেশীদিনের নয়। ইংলণ্ডের বিখ্যাত সংবাদপত্র লণ্ডন টাইমস্ তো জোর গলায় প্রচার করে দিলেন, জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালনা করা সরকার ভারতে আর টিকলো না। এদেশেও অনেকেই মনে করেছিলেন হয়তো বা সাধারণ ভোটদাতা ভোটই দিতে যাবে না। এই ভোট দিতে না যাওয়া ব্যাপারটি যে কি সাংঘাতিক তাও নানাভাবে নানা লোকে বুঝিয়ে দিতে কসুর করে নি। ভোট না-দেওয়া ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধি মানেই লোকতন্ত্রের শেষ আর রক্ত-বিপ্লব। এমনি করেই নাকি জগতে চিরকাল রক্ত বিপ্লবের পূর্ব লক্ষণের পরিচয় পাওয়া গেছে। এখন দুশ্চিন্তার সমাপ্তি হয়েছে। ভারতের ২৫০ কোটি মতদাতাদের অন্ততঃ ১৫০ কোটি তাঁদের মত ব্যক্ত করেছেন। দৃঢ়, স্থির, অনমনিত জনসাধারণ এই ৪র্থ ইলেকশনে তাঁদের ভোট এবং সেই ভোটের ক্ষমতা সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের অজ্ঞ ভারতবাসী, দরিদ্র-ভারতবাসী, মূর্খ ভারতবাসীর আপন অধিকার বোধ আর ফিরিয়ে নেবার নয়। তাই গণতন্ত্রও ভারতের দরজা থেকে আর ফিরে যাবার নয়।

পৃথিবীর ইতিহাসে যেখানে যত গণতন্ত্র এসেছে গিয়েছে, তার তালিকার আবহমান কাল থেকে ভারতের স্থান আছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে অসংখ্য ছোট ছোট গণতন্ত্রের খবর পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে আমাদের দেশে ক্ষুদ্রক-মল্ল সঙ্ঘ নামে এক প্রজাতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র বা Republican Federtion ছিল। ক্ষুদ্রকমল্লসংঘ আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ করে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। গ্রীকদের বর্ণনায় আরও বহু গণতন্ত্রের কথা পাওয়া যায়। হিন্দু রাজনৈতিক সংগঠনে নির্বাচন মতদান, মতপত্রী, গণভোট, কোন ব্যাপারে মীমাংসায় জন্য সরাসরি জনমত গ্রহণ ইত্যাদির বহু উল্লেখ আছে। এইসব রাজ্য-শাসনের বিস্তারিত বিধির সন্ধান নেই বটে তবে এ কথা দেখা যায় যে কোন কোন গণতন্ত্রে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের মতদানের অধিকার ছিল এবং মতদান প্রত্যক্ষভাবে হতো বলে পরিষদে তারা উপস্থিত থাকতে পারতেন। ক্রমশ সামাজিক জীবন জটিল হয়ে উঠলো, প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত থেকে প্রত্যেক ব্যাপারে মতপ্রকাশ করার পক্ষে জনসংখ্যা বেশী হলো। তখনই প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের পত্তন হলো। ভোটের নাম ছিল ছন্দ। ছন্দ মানে ইচ্ছা অথবা অভিপ্রায়। এই স্পষ্ট অর্থপূর্ণ শব্দটিতে সাধারণের স্বাধীন ইচ্ছায় মতদান হতো তাও বোঝা যায়। বিধানসভায় ভোট গ্রহণ হতো শলাকার দ্বারা। যিনি এই শলাকা দ্বারা ভোট গ্রহণের কার্য পরিচালনা করতেন তাঁর নাম ছিল শলাকা গ্রাহক।

গণতন্ত্রের আর একটি সার্থক নমুনা ভারতবর্ষের গ্রামে গ্রামে ছিল। স্বায়ত্ত-শাসিত গ্রামীণ সংস্থা অন্যান্য নানা যুগের রাজশাসনের মধ্য দিয়ে আজ পর্যন্ত চলে

পরিচিতিপত্র হাতে ধানবাদ জেলার তোপচাঁচির ওরাও' মহিলা

এসেছে। ভোট বা ব্যালট বাক্সের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ না থাকা সত্ত্বেও গ্রামের বহু ব্যাপারে এই স্বায়ত্তশাসন সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিকভাবে চলতো। ভারতবর্ষের এই সহজাত প্রতিভার আধুনিকতম প্রকাশ গ্রাম পঞ্চায়েৎ। গ্রাম পঞ্চায়েৎ পল্লীজীবনের উপর অতিশয় প্রভাবশালী। গ্রাম পঞ্চায়েৎ অন্যান্য নানা ক্ষেত্রের মতই মহিলাদের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছেন। পল্লী-সমাজের পক্ষে নারীর মর্যাদার সার্থক স্বীকৃতি। ভারতবর্ষে আজ এমন পঞ্চায়েৎ অনেক আছে যার প্রত্যেকটি সভ্য মহিলা। গ্রামের প্রত্যেক খুঁটিনাটি সুবিধা অসুবিধা, ভালমন্দ এই মহিলামণ্ডলের বিচার ও দায়িত্বের মুখাপেক্ষী। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে তথাকথিত শিক্ষিত নাগরিক-দের তুলনায় গ্রামের নিরক্ষর নারী পুরুষ বিচক্ষণ বিচারে কোন অংশে খাটো নন। নিরক্ষরতার জন্য সাধারণ নির্বাচনে চিহ্ন বা Symbol-এর ব্যবহারও কোন ক্ষতির কারণ তাই হয়নি। সামান্য কিছু অংশ ভোট বাতিল হয়েছে বটে কিন্তু সে অজ্ঞতা দূর করার ব্যবস্থা কমিশনের পক্ষে করা কিছুই কঠিন ছিল না।

অন্যান্য বারের তুলনায় মহিলা ভোট-দাত্রী এবার বেশী বই কম আসেনি। বৃদ্ধা, দৃষ্টিহীনা, চলতে পারে না এ রকম শত শত দৃষ্টান্তের কথা খবরের কাগজে রোজ লক্ষ করেছি। দুর্গম পথ বেয়ে, আপনজনের হাত ধরে কত না মেয়ে এসেছে ভোটদান কেন্দ্রে। আসন্নপ্রসবা মায়ের সন্তান জন্ম হয়েছে ভোট দিতে এসে, এমনও একাধিক উদাহরণ আছে। অপ্রত্যাশিত, চমক লাগানো ফলাফলের জন্যও নিশ্চয়ই মহিলাদল অনেকাংশে দায়ী। ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য আর র‍্যাশন ব্যবস্থায় খাদ্যের পরিমাণের নিম্নগতি যেমন করে ঘরের মেয়েকে কাবু করেছে তেমন করে আর কাকে করেছে বলুন? ভোটের দরুন ভবিষ্যৎ কি হবে আজ বলা কঠিন হলেও এ কথা জোর করেই বলা চলে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে

১৯৬৭র নির্বাচনে বনহুগলীর একটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের মহিলা ভোটার

'আপত্তি' প্রকাশ করেছে দেশের মেয়েরাও। বিরুধ নগরের বিপুল পরাক্রান্ত কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট কামরাজকে পরাজিত করেছে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সের আইনের ছাত্র শ্রীনিবাসন। শ্রীনিবাসন মনে করেন তাঁর এই জয়ের জন্য দায়ী মহিলা সমাজ।

ভোটার হিসাবে মহিলা সমাজ তাঁদের শক্তি দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই কিন্তু লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে মোটামুটি হিসাবে এবার মেয়ের সংখ্যা অনেক কম। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে একই অবস্থা। কেন? একটি কারণ অবশ্য হতে পারে যে, মহিলা প্রার্থী সংখ্যা কংগ্রেসের ছিল সবচেয়ে বেশী। কংগ্রেসের অভাবনীয় সব পরাজয়ের ফলে মহিলা সংখ্যায় অনেকটা টান পড়েছে। যেমন ধরুন মাদ্রাজ। দুটি মহিলা কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী সহ গুটি দশেক লোকসভার কংগ্রেসপ্রার্থী মহিলা পরাজিত হয়েছেন। সে স্থান পূর্ণ করার মত প্রার্থী মহিলা অন্য দলে নেই। কংগ্রেসের মহিলা শাখা বহুদিনের প্রচেষ্টায় প্রার্থী সংখ্যার যে অংশ অর্জন করেছিলেন এবারের বিপর্যয়ে অনেকটাই বিফল হয়ে গেল। কংগ্রেসের পরই কমিউনিস্ট দক্ষিণ ও বামপন্থী দলে মহিলা প্রার্থী আছেন কিছু। বাংলাদেশে শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তীর পরাজয় তার একটি আসন হারানো। তবে কংগ্রেসপ্রার্থী উমা রায় মালদা থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। ইনি আগে এম এল সি ছিলেন। অবশ্য এই কেন্দ্রে আগেও মহিলা এম-পি ছিলেন। শ্রীমতী রেণুকা রায় কংগ্রেসের তরফ থেকে মালদহের এম-পি নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৬২ সালে। অবশ্য দার্জিলিং-এ এবার নির্দলীয় মহিলা প্রার্থী মৈত্রেয়ী বসুর জয় হওয়ায় লোকসভার মহিলা সংখ্যা বজায় রইল অন্তত বাংলা থেকে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়ও কংগ্রেসের দারুণ পরাজয়ের দরুন বহু মহিলা স্থানচ্যুত হয়েছেন। পূরবী মুখোপাধ্যায়, আভা মাইতি, নুরুন্নেসা সাত্তার, বিভা মিত্র শাকিলা খাতুন প্রভৃতি কয়েকজন ভিন্ন কংগ্রেসপ্রার্থী মহিলাদের নূতন বিধানসভায় স্থান হয়নি।

অন্যান্য দলের দু একজন নেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাঁরা মহিলাপ্রার্থী সম্বন্ধে এত উদাসীন কেন। উত্তরে তাঁরা বলেছিলেন, এবার কংগ্রেসের হাত থেকে নির্বাচনের জয় ছিল নিতান্ত কঠিন কাজ। অক্লান্ত পরিশ্রমে সে ব্রত সাধন করতে নেমে ভেবেছিলেন মহিলাদের পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর হবে প্রার্থী পদে মতদাতাদের মানিয়ে নেওয়া। আগামী দিনে হয়তো কাজ এত কঠিন থাকবে না।

মহিলাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ভোটে জয়ী হয়েছেন কংগ্রেস বিরোধী গোয়ালিয়রের রাজমাতা ইন্দিরা রাজে সিন্ধিয়া। সর্বভারতীয় অনুক্রমেও তাঁর স্থান দ্বিতীয়। প্রথম স্থান প্রতিরক্ষামন্ত্রী যশোবন্ত রাও চৌহানের। দুই লক্ষের উপর ভোটে রাজমাতা তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করেছেন। আবার মহিলাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ভোটে হেরে গেছেন কেরালার মাঞ্জেরী নির্বাচন কেন্দ্রের মহিলা কংগ্রেস দলীয় প্রার্থী নফীসৎ বিবি। তিনি তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুশ্লিম লীগের প্রার্থী মহম্মদ ইসমাইল অপেক্ষা প্রায় ১ লক্ষ দশ হাজার ভোট কম পেয়েছেন। নফীসৎ বিবি এক সময় কিছুকাল কেরালা বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার ছিলেন।

এই বিরাট উপমহাদেশের ভোটার সমুদ্র মন্থন করে কতটুকু অমৃত আর কতটুকু গরল এবারে উঠেছে তার প্রমাণ দেবে আগামী দিনের জনজীবন। নানা আশংকায় দোলায়মান চিত্ত সাধারণ লোকের যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুর জন্যই তার মতামত, আশা নিরাশা। বেশ কয়েকটি রাজ্যের অকংগ্রেসী সরকার নিয়ে ভারতের কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্যা কি হবে না হবে আমরা জানি না। তবে মহিলা সমাজের তরফ থেকে বলতে পারি তাঁরা চান যে সরকারই যেদিন আসুক তাঁদের নিজেদের প্রিয়জনের মঙ্গল হক। রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণের হার কমে যাওয়ার লক্ষণ সম্বন্ধে হয়তো সাধারণ মেয়ে এত চিন্তিত নয়। রাজনীতি সব মেয়ের পক্ষে সমান উপযুক্ত ক্ষেত্রও হয়তো নয়। তবে এতদিনের এতটুকু এতটুকু করে পাওয়া অধিকার সামান্য ক্ষুন্ন হওয়াও এক রকম হার বই কি। শুধরে নেবার চেষ্টাও হয়তো তাঁরা করবেন। সময় নেবে একটু এই যা।

শ্রীমতী

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

ষোল

যখন আশা যায়, তখন আচ্ছন্নতা আসে। ভুলে যাই পাত্র পরিবেশ। কয়েক মুহূর্ত যেন কোন এক অচৈতন্যের অন্ধকারে ডুবে যাই। আমার যাত্রা নিরুদ্দেশের পথে নয়। তবু যেন নিরুদ্দেশের পথ আমাকে টেনে নিয়ে যায়।

গায়ে হাতের স্পর্শে সম্বিৎ ফিরে পাই। মাহাতো আমার কাঁধে হাত রেখেছে। ফিরে তাকাতেই সে বলে, 'অ মশায়, আপনি যে সত্যি সত্যি জলে পড়ি গেছেন বলি মনে হচ্ছে গো। এত উতলা কেন। ফিরতি না পারলি কি অনেক ক্ষতি হয়ি যাবে।'

ক্ষতি? কই, তেমন কোন ক্ষতির দায় তো রেখে আসিনি পিছনে। সময়ের হিসাবে একটা রাত্রি, কত আর ক্ষতি করতে পারে। তবে, সেই যে কথা, মন গুণেই ধন, তাকে নিয়ে বিড়ম্বনা। মনে মনে গড়ছি এক, ঘটনা ঘটে অন্যরকম। তাতেই ঠেক খেতে হয়। কিন্তু, তিন-জনেরই মুখের ভাব এমন হয়েছে, যেন সবাই আমার কাছে কী ধার ঠেরে বসে আছে। গাজীর দাড়ির গোছা মুঠি পাকিয়ে ধরা, মুখখানি নত। মাহাতো-বউ আঙুরি আমার দিকে তাকিয়ে। নজর করে দেখি, সেই হাসিটুকু নেই এখন মুখে। বরং কাজল-কালো ডাগর চোখ দুটিতে একটু যেন উদ্বেগের ছায়া। তার সঙ্গে কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা। মাহাতোর লাল চোখেরও সেই ভাব। তাড়াতাড়ি বলি, 'না ক্ষতি আর কী। ফিরে যেতে পারব বলেই ভেবেছিলাম কিনা। যাই হোক...।'

কথা শেষ করতে পারি না। মাহাতো বলে ওঠে, 'না, আপনার অবস্থা দেখি আমরা চিন্তায় পড়ি গেছি। ভাবি, কী বলে, কী জানি, ফিরতি না পারলি ভদ্দরলোকের আবার ক্ষতি-টতি হয়ি যাবে কিনা।'

আঙুরি আওয়াজ দেয়, 'আহা, ফিরে যাবার উপায় নেই, ও কথা ভেবে কী হবে।'

'সে কথা ঠিক।' মাহাতো বলে, 'তা হলি, শোনেন বলি, আমার বউও বলছে, আপনি ভোলাখালিতিই চলেন।'

আমার জবাবের আগেই আঙুরি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'তবে, শহরের মানুষ, হাঁটা অভ্যাস নেই। কষ্ট হবে কিন্তু।'

এর থেকে কী বোঝা যায়, বুঝি না। আঙুরি যেতে বলে, আবার কষ্টের কথাও স্মরণ করায়। যদিও দূর বলে হাঁটার ভয় পাই না। কিন্তু কূল ছেড়ে যেতে আমি নারাজ। সময়ের হিসাবে যখন এক রাত্রিকে আমি অকূলে ছেড়ে দিতে পেরেছি, তখন নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের সন্ধান আর আমার নেই। এই হাটে যে ভেড়ি বাঁধে, কোথাও এক রাত্রি কেটে যাবে। জানি, আসন্ন এ রাত্রি চিররাত্রি নয়। সে আঁধার নিয়ে নামে আবার দিনের আলোয় হারাবে বলেই। সূর্য কেবল ছায়াকে আলিঙ্গন করে থাকে না। উষায় তাদের ছাড়াছাড়ি। ছায়া তখন বিরহিণী। মন একবার পিছন ফিরে দেখুক, এমন কত রাত্রি কত অকূলে ভেসে গিয়েছে। জীবনে এমন ঘটনা এই প্রথম নয়। এবার আমি সোজাসুজি আঙুরির দিকে তাকাই। বলি, 'দু' ক্রোশ হাঁটতে পারি, তাতে ভয় পাই না। কিন্তু রাত পোহালে আবার তো ফিরতে হবে এখানেই।'

জবাব দেয় মাহাতো, 'হ্যাঁ, তা ফিরতি

হবে। তবে যদি আপনি সন্দেশখালির ওদিক দিয়ে ফিরতি চান, তা হলি আর...।'

মনে মনে বলি, 'না, ভোলা বা সন্দেশ, আর কোন 'খালি'-ই দরকার নেই। তার চেয়ে এই কালীনগর থেকে ফেরাই ভাল। এ যাত্রায় আর কোন অজানাতে নয়। বলি, 'না, থাক মাহাতো মশাই, এখানেই রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে দেব।'

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখি, মাহাতোর ঘোমটা-টানা বউটির মুখে একটু ছায়া। তবু হাসতে চায়। বলে, 'রাত তো ভোলাখালিতেও কাটানো যায়।'

মনেতে যে অবাক মানি না, তা বলব না। আলাপ-পরিচয়ের চৌহদ্দি বাদ দাও, সোজাসুজি কথা যার সঙ্গে নেই, সেই এক মাহাতো-গিন্নী এমন অবলীলায় ডাকে কেমন করে। মাহাতোর সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আর্থিক অবস্থা জানতে বাকী নেই। এমন কর্তার কর্ত্রীকে যে স্বাধীন জেনানা ভাববো, তা পারি না। স্বৈরিণী বলার সাহস ক'রো না। এই মাত্র জানা গিয়েছে, স্বামী-স্ত্রী মানত করে ফিরছে তারকেশ্বর থেকে। অথচ ঝিলিক ঝলক যা-ই থাক, আঙুরের চোখে কোথাও ছলনার 'ছ' নেই, চাতুরির চ' নেই। যেন এক ছোট অবুঝ মেয়ে আবদার করে, যার সমাজ সংসারে দায়-দায়িত্বের বোধ নেই।

মাহাতো হেসে উঠে আমার দিকে তাকায়। বলে, 'অই এক ওর দোষ, বুইলেন, লোকজনের হাল-হদিস বোঝে না, সবাইকি নিয়ি টানাটানি। বাড়ি যেয়ি দ্যাখেন, আজ এই, কাল সেই, লেগিই আছে। তা হলিই কি তোমার সব ফাঁক ঘুচি যায়?'

বলেও মাহাতো টেনে টেনে হাসে। কিন্তু স্ত্রীর দিকে তাকায় না। আর সহসা আমার মনে পড়ে যায়, এ অনাবাদী জমি, এ দেহ বন, একটু বাতাসেই বড় দোলা লেগে যায়। পিছনে আছে এক শূন্যতা, সেখানে আছে কান্না। তোমাকে যে ডাক দিয়ে নিয়ে যেতে চায়, সেই ডাক আসে শূন্যতা থেকে। তা বলে কি অজানা অচেনা ভাল-মন্দ নেই। হেসে বলি মাহাতোকে, 'কিন্তু আমাকে আর কতটুকু চেনেন যে, বাড়ি নিয়ে যেতে চান।'

মাহাতো মুখ খোলবার আগেই দেখি, আঙুরি তার স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে চোখ নাচিয়ে হাসে। বলে, 'কেন, আমরা কি মানুষ চিনি না। আমাদের আবার ভয় কি! গাজীর বাবুর যেমন ভয় দেখলাম, তাতে বাবুকে আর ভয় পাই না। আমরাও মানুষ চিনি।'

বলে আঙুরি একবার ফেরে গাজীর দিকে, আবার দেখে আমার দিকে। সারল্যেও যে কেমন রঙের ঝিলিক হানে, তা এই আঙুরিকে না দেখলে সবটুকু জানা যায় না। তোমার মনে আঁধার যত থাকুক, তার দায় তোমার। যে বহে যায় অনাবিল স্রোতে, সে যায় আপন প্রাণের টানে। তাতে তুমি যা-ই ছুঁড়ে দাও, সে থামে না। তার ঝলক হারায় না। তাই, ওই চোখ দুটির দিকে চেয়ে যে কেবল কৃতজ্ঞতা মানি, তা নয়। প্রাণের সাহস দেখে এই বিড়ি-খাওয়া মাহাতো-বউটিকে কেমন যেন শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে। শুধু, তা-ই বা কেন, অকূলে হারানো আমার প্রাণে কী এক সুর যেন বাজে। সুরের উৎস যেখানে, সেই চোখ দুটিতে দেখি, বন্ধুত্ব বাজে কালো তারায় তারায়। তার নিরালা মনে অজস্র বন্ধুর ডাক। সে কেবল আপনাকে ভরে না। যেন বলে, 'যদি কিছু থাকে, এস, তা দিয়ে তোমাকেও ভরিয়ে দিই।' সে কেবলই ফাঁক ভরাতে চায়। সে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে চায়, অকূলের মানুষকে কূল দিতে চায়। যদি তার ঘরে গিয়ে দেখ, ঘর ভেঙে যাওয়া, ডানা-ভাঙা পাখিকে সে কোলে বসিয়ে দানা খাওয়ায়, কোথাকার হারিয়ে যাওয়া ছাগল-ছানা তার ঘরে বৃদ্ধি পায়, স্বজন-ছাড়া কূল-হারানো ছেলেমেয়ে যত্নে মানুষ হয়, তবে অবাক হ'য়ো না।

আঙুরির চোখের দিকে চেয়ে, হেসে অপরাধ ভঞ্জন করি। বলি, 'বুঝেছি। কিন্তু সে কথা থাক, দেরি হয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে ভোলাখালির পথে হেঁটে সঙ্গে যাই, একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।'

এবার আঙুরি ঘোমটা টানে। তার চেয়ে বেয়াজ দেখ, তার মুখ ভার হয়ে আসে। বলে, 'ঘরের লোকেরা ঘরে যাবে, তাদের আবার এগিয়ে দেবার কী দরকার। পথ আমাদের চেনা।'

গাজী এতক্ষণ হাসতে ভরসা পায়নি।

[illegible] না [illegible]

কথাটা [illegible]

হঠাৎ [illegible]

বাবুকে, [illegible]

তোমায় [illegible]

বাবুকে [illegible]

মোষের গাড়িতে করে [illegible]

ভয় নেই।"

যে অবস্থায় ঠেকেছি, তার বল, [illegible] বল, সেই অবস্থাকে। মন যেন অনেকক্ষণ আগেই চলে গিয়েছে মাহাতো দম্পতির সঙ্গে। মনের এই গতিতে কোথায় যেন নিজেকেই অপরাধী বোধ হয়। আঙুরির চোখে এখনো আশা ঝিলিক দেয়। এতই দুর্ভাগ্য, পথের ধারে পড়ে পাওয়া এমন নিমন্ত্রণ মাথা পেতে নিতে পারি না। সহজ হওয়া এত সহজ নয়। প্রাণে কত শক্তি থাকলে এমন সহজ হওয়া যায়, অল্পক্ষণের দু-চার কথার আলাপেও, রাগের দাবি করে। আঙুরি যেন সত্যি আঙুর। তেমনি করেই সে সহজ। এখন তার প্রাণে যে সুধা আছে, আর মধুর গন্ধ, তা চাও কি না, পাও কি না, সে খবর সে চায় না। সে তার আপন রূপে, আপন ধর্মে, দোলদোলায়, টস্‌টসায়। আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বলতে পারি না।

মাহাতো বলে ওঠে, 'নে, তুই আর

মানুষকে ভয় করিস না। কিন্তু, যাবার আগে তা হলি একটা ব্যবস্থা করি যেতি হয়।'

এবার গাজী উৎসুক চোখে তাকায় মাহাতোর দিকে। মাহাতো আমার দিকে চেয়ে বলে, 'আমি বলি কি, আপনি [illegible] থাকেন। কাজে [illegible] [illegible] [illegible] দিন। নারাণঠাকুরের এ [illegible] থেকিচি। বিছানাপত্তর, দড়ির খাট, সবই আছে, মশারিও পাবেন। কোন ভয় নাই, মেলাই টাকা পয়সা নিয়ি এখেনে থেকিচি আমি। রাত্তির দুটো গরম ভাতও জুটিব খনে। একটা রাত্তির তো মামলা।'

আমাকে গাজীর দিকে ফিরে তাকাতেই হয়। মিথ্যে বলব না, লোকটার ওপর কখন থেকে যেন বিরক্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছিলাম। না জেনে সে কেন এমন জায়গায় এনে ঠেকালে। কিন্তু, ইচ্ছে করে নয়। সে তার [illegible] মতলব দিয়েছিল। তবে মনুষ্যের যদি গোলমাল করে তার কী উপায় আছে। তার অপরাধের জন্য [illegible] [illegible], এতক্ষণ ধরে সে তার [illegible] [illegible] [illegible] মনে [illegible] ফুটে [illegible]।

গাজী মাহাতোর দিকে [illegible] বলে, 'এর চেয়ে আর [illegible] [illegible] [illegible] না।'

না, নারাণঠাকুরের [illegible] দিকে চেয়ে দেখব না। গর্ত দিয়ে ইঁদুরে [illegible] কিংবা ডেয়ো পিঁপড়ে [illegible] গায়ের মাংস চিবিয়ে খাবে, সে ভাবনা ভেবে লাভ নেই। তবু লোকটাকে একটু-আধটু বোঝা গিয়েছে। ক্ষণেকের হলেও তার ঘরে থেকেছি, তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক বুঝতে পারি। নতুনের থেকে এই পুরনোই ভাল। আর কোথাও নয়।

মাহাতো একটু হেসে আবার বলে, 'তবে এই হাটে-গঞ্জে রাত কাটাবার জায়গার অভাব হবি না। সে জায়গাডি হাটুরে বাটুরে জন মহজনরা আপনা থেকিই চিনি যায়। তা বলি আপনাকে তো সে পথ দেখাতে পারি না।'

বলেই হাঁক দিয়ে ডাকে, 'কই হে ঠাকুর, গেলে কমনে?'

মাহাতোর কথার মধ্যে যে কথা, হঠাৎ তা ধরতে পারি না। কেবল গাজী বলে ওঠে, 'তোবা তোবা।'

এদিকে দেখি, আঙুরি যেন চোখ পাকিয়ে তাকায় মাহাতোর দিকে। অনেকটা নিঃশব্দে মুখ ঝামটা দেবার মত মুখ ফিরিয়ে ভুরু কুঁচকে চোখ ফেরায় গাজীর দিকে। গাজী যেন বড় লজ্জা পায়, বলে, 'চাচার কী কথা বল দিকি নি।'

আঙুরির পান খাওয়া লাল ঠোঁট দুটি একবার বেঁকে যায়। নিচের ঠোঁটটি তারপরেই উলটে যায়। দৃষ্টি উদাস। যেন এসবে তার কিছুই যায় আসে না। তাই সে চুপচাপ।

'দেখি, ঠাকুরটা আবার গেল কমনে।' বলতে বলতে মাহাতো যায় ঘরের ভিতর। কিন্তু তার প্রকাণ্ড কালো মুখে, মোটা মোটা ঠোঁটে হাসি একটু লেগেই থাকে। ততক্ষণে আমি যেন মাহাতোর কথার মধ্যে কথাটির ইশারা পেয়ে গিয়েছি। আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুকুরধারে দুলিদের ঘরগুলো। হাটুরে বাটুরে জন মহাজনেরা যে কোথায় রাত কাটাতে যায়, তারপরে আর স্পষ্ট করে না বললেও চলে। অনেক বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাহাতোর হাসিতে, গাজীর তোবা তোবা আওয়াজে, আঙুরির ভ্রূকুটি বিরক্তিতে। মাহাতো রসিকতা করে বলেছে বটে, তাতে চেনা জানার বাস্তব অভিজ্ঞতা ফুটে উঠেছে।

বিশ্ব-সংসারের এই কালের এই নিয়ম। তাকে নির্দয় বল, রুচিহীন বল, মানুষের নিজের হাতে গড়া নিয়ম। ভোজনাগার পান্থশালার সঙ্গে সঙ্গে সে বারোবাসর ছাড়িয়ে রেখেছে। তাতে আপনাকে সুখী করতে চেয়ে আমরা কোথায় কালি মেখেছি, তা দেখা যাবে নিজের মধ্যে এক [illegible]। মাহাত্তোর [illegible] কৃতজ্ঞতা [illegible]। আর যা-ই করুক, [illegible] পারে না। এইটুকু তার [illegible]।

কিন্তু মনটা বিমর্ষ হয়ে ওঠে আঙুরির দিকে চেয়ে। হয়তো তার মত একটি আত্মীয়া থাকা অসমীচীন ছিল না আমার। বউদি কিংবা অন্য কোনরকম। সেরকম কিছুই নয় সে। অথচ দেখ, মানুষের প্রাণের টান তাকে কোথায় নিয়ে যায়। কেবল সম্পর্কের কথা মেনেছি। কিন্তু সম্পর্ক গড়ে ওঠার কত যে বিচিত্র বিস্ময় রহস্য, সময়ের আশ্চর্য মাপজোক, তা যেন এমন করে জানা ছিল না। 'এখন মনে হয়, আঙুরির সঙ্গে আমার কোথায় একটা চেনাচিনি হয়ে গিয়েছে। আমার সঙ্গে তার যেন কী এক সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সে সম্পর্কের কোন নাম নেই, শুরু নেই, শেষ নেই। যে সম্পর্কের খোঁজ পাবে না এই সমাজের শাস্ত্রে বিধানে। এতে তুমি যে রঙ-ই মাখাতে চাও, রঙ ধরবে না। এই পরিচয় আছে অচিনে বিচিত্রে।

কিন্তু আঙুরি এমন মুখ ভার করে থাকলে ভাল লাগে না। তার চোখের ঝিলিক আর খিলখিলে হাসি এতক্ষণ সব কিছুকে সজীব করে রেখেছিল। তার পিছন ফেরানো মুখের দিকে চেয়ে বলি, 'যেতে পারলে সত্যি বেশ ভাল লাগতো।'

আঙুরি আমার দিকে তাকায় না। তাকায় গাজীর দিকে। যেন সে তাকে কিছু বলেছে। গাজীর দিকে চেয়ে সে গাজীকেই বলে, 'পথের মানুষকে ঘরে ডেকে নিয়ে যাওয়া তো আমার কাজ নয়। তবে এই কেমন যেন মনে হল, তাই।'

গাজী যেন কেমন অসহায় হয়ে পড়ে। আমার দিকে একবার চোরা চোখে দেখে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, সেই তো কথা।'

কথা যে কোনদিকে মোড় নেয় ধরতে পারি না। তবে এটা বুঝতে পারি, আর মুখোমুখি কথা নেই। যা বলা কওয়া আছে, এখন তার সাক্ষীগোপাল গাজী। সে হচ্ছে মধ্যবর্তী মানুষ। কিন্তু পথের মানুষ ঘরে ডেকে নেওয়া যে মাহাত্তো বউয়ের কাজ নয়, সে কথা এমন করে শোনায় কেন। এতক্ষণে তাকে কি সেটুকুও বুঝতে পারিনি? বলে উঠি, 'আমি সে সব কিছু ভাবিনি।'

কিন্তু আঙুরি [illegible] [illegible]

চেয়ে আগের মতই বলে, 'তোমার বাবু, তখন থেকে দেখছি কি না, কেমন যেন মনে হল। তাই ভাবলাম, এখানে কোথায় কী ভাবে থাকবে, সেইজন্যে বলা। তা বলে তোমার বাবু যা ভাবছে, তা নয়।'

বলে, এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় আঙুরি, যেন আমার বুকে বিঁধিয়ে যায়। আমাকে [illegible] করে দেয়। তার কথার ইঙ্গিতটা আমার বুঝতে অসুবিধা হয়নি। অথচ অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জানে না, সে ভুল ভেবেছে। আমি কিছু বলবার আগেই গাজী বলে ওঠে, 'না চাচী, আমার বাবু তা কিছু ভাবে নাই, সেটা হলফ করি বলতি পারি।'

আঙুরি মুখ ফিরিয়ে বলে, 'মিছা কথা বলো না।'

একবার চোক তুলি দ্যাখ দি'নি।'

আঙুরি চোখ তুলে দেখে না। সে আশা আমি করি না। বরং ফিরে তাকাই ঘরের দিকে, নারাণ ঠাকুরের আশায়।

গাজী কিন্তু বলে যায়, 'আর তুমি হলি মা দুগ্গা, তোমাকে কি আন্ ভাবা যায়।'...

বলে আমাকে ডেকে বলে, 'জানেন বাবু, চাচী আমার ডাকাত হত্যে করিছে।'

হত্যা করেছে! ফিরে তাকাই গাজীর দিকে। গাজীর আরশি চোখে আলোর ঝলক, ফাঁদ বড় হয়ে ওঠে। বলে, 'তিন বছর মামলা চলিছিল বাবু, জানেন। তা হবি পেরায় আট ন' বছর আগের কথা। মাহাতো চাচার ঘরে ডাকাত পাড়িছিল। তা, খালি যে টাকা লোটাব মতলবে তারা এসেছিল, তা নয়। চাচীকেও ধরি নিয়ি যেতি চেয়িছিল। চাচীর হাতে তখন কাটারি। একেবারে এক কোপেতে বল হরি হরি বোল্। একটার মুন্ডু গিয়িছিল আধখান, আর একটার গোটা হাত। চাচীর সেই মূর্তি দেখি, বাছাধনদের আর কুক্ পাড়তি হয় নাই। টাকা পয়সা সুদ্ধ মরা আর আধমরাগুলোকে ফেলি দে দৌড়।'...

গাজীকে বাধা দিয়ে মুখ না ফিরিয়েই যেন লজ্জা পেয়ে আঙুরি বলে ওঠে, 'আহ্, চুপ কর দিকিনি।'

গাজীর কথা শুনতে শুনতে চোখ পড়ে গিয়েছিল রক্তাম্বরীর দিকে। এ কালো মেয়ে যে সত্যিই শ্যামা সর্বনাশী, তা এক-বারও ভাবি নি। দেবীকাহিনী শুনেছি, কালী দুর্গার প্রতিমা দেখেছি। তাতে আমার কাজ অকাজের জীবনে তেমন ঢেউ লাগে নি। কিন্তু আমি যেন চর্মচক্ষে সেই কাহিনীর নায়িকাকে দেখি। রূপান্তরে সেই প্রতিমা আমার সামনে। মনে থাকে না, বন্ধ্যা নারী মানসিক করে ফেরে তারকেশ্বর থেকে, একে দেখেছিলাম হাসনাবাদের পথে, বাসের মধ্যে ঘোমটার আড়ালে বিড়ি খেতে। এ যে সত্যি রক্তাম্বরী! সহজ প্রাণের পিছনে যে পথ, এবার যেন তার সঠিক হদিস পাই। অথচ দেখ, নিচু মুখ ফিরিয়ে কেমন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আবার লজ্জা পেয়ে লজ্জাবতী গাজীকে চুপ করতে বলে। যেন এ মেয়ে সে মেয়ে নয়, রক্তে ধোয়া প্রাণ যার নারীত্বে জ্বলজ্বলানো। রক্তে যার গঙ্গা-স্নানের পবিত্রতা।

গাজী বলে, 'না, তাই বলি আর কী, চাচী তোমাকে কি আন্ ভাবা যায়।'

অবাক হয়ে ভাবি, শক্তি কোথায় বসত করে এই আঙুরকে দেখে যেন তার ঠিকানা পাই না। অথচ সে এমন ভুল করে। করে বলেই বোধ হয় এ নায়িকা মানবী। এইটুকু প্রবোধ মেনে চোখ ফেরাতে যাই। হঠাৎ আঙুরি আমার দিকে ফিরে তাকায়। তাকিয়ে ফিক্ করে একটু হাসে। দেখি, তার কাজল কালো চোখে আবার সেই হাসির ঝিকিমিকি। গাজীর দিকে ফিরে বলে, 'আর সেই মামলাতে যদি খুনী বলে আমাকে চালান দিত, তা হলে তো রাক্কুসী বলতে।'

গাজী দাড়ি দুলিয়ে বলে, 'না চাচী, হাজার চালান দিলিও তুমি আমাদের মা দুগ্গো থাকতে।'

বলে ঘাড় কাত করে চোখ নাচিয়ে হঠাৎ সুর করে বলে ওঠে, 'আমি কি আটাশে ছেলে? ভয়ে ভুলব নাকো চোখ রাঙালে।'

সুর করে গেয়ে গাজী হাত নেড়ে দেয়। আঙুরি হাসে খিলখিল করে। বলে, 'কী বলে দ্যাখ, দুর অ।'

আঙুরি চকিতে একবার আমার দিকে তাকায়। একটু আগের গুমসোনি গুমোটে আবার হাওয়া লেগে যায়। হায়, কে বা করে মনের বিচার। কোথা দিয়ে হাওয়া আসে, কে জানে।

গাজী আঙুরির দিকে চেয়ে তৎক্ষণে অন্য সুরে গুনগুন করে ওঠে, 'দুগ্গো নাম তরী, মস্তকেতে ধরি, যতন করিয়ে রাখব। আমার অন্তে শমন এলে, অজপা ফুরোলে, দুগ্গো দুগ্গো বলে ডাকব।' ..

এবার আর সাঁই দরবেশের দেহতত্ত্ব নয়, দাড়িওয়ালা গাজী শাক্ত পদাবলী গায়। এও জানা আছে লোকটার! কিন্তু আঙুরি হাসতে হাসতে ভুরু কোঁচকায়। বলে, 'আহ্ না, ছি। আমাকে নিয়ে ওরকম ঠাকুর দেবতার গান করো না। কী এক পাপ এসেছিল কোনকালে। ভাবলে এখনো রাতে ঘুমোতে পারি না। ওসব আর ব'লো না।'

গাজী হেসে কী বলতে যায়। মাহাতো ফিরে আসে নারাণঠাকুরকে নিয়ে। আসতে আসতেই ঠাকুর বলে, 'এর আর বলাবলির কী আছে। কোন অসুবিধা হবে না।'

আমার দিকে তাকিয়ে ঠাকুর অভয় হাসি হাসে। বলে, 'আমিও তো তখন থেকে ভাবছি। শুনতে পাচ্ছি, বেড়াতে এসেছেন, ভাবলাম, কোন ব্যবস্থা ট্যবস্থা করে এসেছেন।'

বলেই গাজীর দিকে ফিরে মুখ বিকৃত করে সে। প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে, 'কেন, বড় যে ফড়ফড়ানি। বিদেশী ভদ্দরলোককে মিঠে মিঠে কথা বলে নিয়ে তো এসেছ, এখন যাও ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আবার বলে, বসিরহাটে নিয়ে যাবে। কত ওস্তাদি!'

গাজী একেবারে জোড় হাত। বলে, 'আর বলবেন না ঠাকুরমশায়, মুরশেদের পরজার আমার মুখে।'

একেই বোধ হয় 'খোসামুদে রামপেসাদে' বলে। কোন রকমেই ঠেক খাওয়াতে পারবে না। কিন্তু ঠাকুর সে কথা শুনলে তো। বলেই চলে, 'তাই তো বলি, এমন হুজ্জোত কে বাঁধাবে। দুটো গান গাইতে পারে বলে উনি একেবারে সব জেনে বসে আছেন।'

গাজী তাড়াতাড়ি বলে, 'না ঠাকুরমশায়, কিরা কেটি বলতি পারি, আমি দিনকানা, রাত দেওয়ানা। শুধু, একটা কথা বলি রাখি, আজ রাত্তিরি কিন্তু আপনার এই দাওয়াতি আমাকে শুতি দিতি হবে।'

ঠাকুরের জবাবের আগেই আঙুরির গলায় হাসি ঝরে পড়ে। ঠাকুর রেগে কিছু বলতে যায়। মাহাতো বলে ওঠে, 'তা শোবে, তাতি আর কী। ঘরে গিয়ি তো শচ্ছে না। এবার আমরা যাই। চল্ গো আঙুরি, যাই।'

নারাণঠাকুরের যে কথাটা মুখে আটকে গিয়েছিল, সে কথাটাই রূপান্তরে শোনায়, 'খালি বাজে—।'

আঙুরি বলে ওঠে, 'প্যাচাল পাড়ে।'

বলেই, হাসির ঝড়ে ঝরে পড়ে। গাজী মুখ ফিরিয়ে আওয়াজ দেয়, 'জয় মুরশেদ!'

তারপর নিজেই আগে দাওয়া থেকে নেমে হাঁটা ধরে। আমি মাহাতোর সঙ্গ ধরে বলি, 'চলুন, আপনাদের সঙ্গে একটু যাই।'

কথাটা কেবল মাহাতোকে বলি নি। আর যার উদ্দেশে, সেই আঙুরি একবার চোখ তুলে চায়। এখন তার ঠোঁটে একটি প্রীতির হাসি ঝলকায়।

ক্রমশ

আর্থিক সমস্যা ও রাজনৈতিক দল

নির্বাচনের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে দেশের নিরাপত্তা, বৈষয়িক ও সামাজিক উন্নয়ন এবং জনসাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য একসংগে কাজ করতে হবে। দেশের মৌল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতির যে পার্থক্য এখন লক্ষ করা যায়, তার একটা সমন্বয় সম্ভব কি না, দেখা দরকার। কেননা, এক দিকে ক্ষমতায় আসীন দল এবং অন্য দিকে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলির বিরোধী দলসমূহের মধ্যে উপযুক্ত সহযোগিতা না থাকলে নানা সমস্যার সমাধান দুরূহ ও বিলম্বিত হয়ে পড়বে।

চতুর্থ নির্বাচনের সময় দেখা গেছে যে, আর্থিক ও সামাজিক উদ্যোগের মূল নীতি সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির ভেতর যথেষ্ট মতভেদ আছে। প্রধান কয়েকটি দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে বর্তমান আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে এবং সেই সংগে সমস্যা সমাধানের নিজের নিজের কৌশল, নীতি বা উপায়গুলির কথা বলা হয়েছে।

স্বতন্ত্র দল ও জনসংঘকে অনেক সময় দক্ষিণপন্থী বলা হয়। আবার, স্বতন্ত্রকে প্রায়ই শিল্পপতি ও বিত্তবানদের দল হিসাবে উল্লেখ করা হয়। স্বতন্ত্র দল বর্তমান আকারের চতুর্থ যোজনাকে একেবারে বাতিল করে দিতে এবং পরিকল্পনা কমিশনকে তুলে দিতে চায়। এই দল কৃষি ও শিল্প—আর্থিক ব্যবস্থার উভয় ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের উপর কোনো রকম বাধা-নিষেধ আরোপ বা নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী নয়ঃ যে-সব নিয়ন্ত্রণ এখন বলবৎ আছে, সেগুলির বিলোপ সাধন তার কার্যসূচীর অন্তর্গত।

জনসংঘ পরিকল্পনামূলক আর্থিক উদ্যোগের বিরোধী না হলেও পাঁচ বছরের বেশী সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বর্তমান পরিকল্পনা কমিশনের জায়গায় বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি ছোট কমিটি গঠনের কথা বলেছে। স্বতন্ত্র দলের চাইতে জনসংঘের সংগে কংগ্রেসের অর্থনৈতিক সমস্যার ব্যাপারে সাধারণ একটা নীতিগত মিল আছে, মনে হয়। অবশ্য খাদ্য নীতি প্রসংগে জনসংঘ এখনকার খাদ্য এলাকা বিভাগ এবং বেশ কয়েকটি নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার সপক্ষে।

তথাকথিত বামপন্থী দলগুলি স্বভাবতই আর্থিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা-মূলক উন্নয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের উপর জোর দিয়ে থাকে। প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল তার নির্বাচনী ইস্তাহারে বৈষয়িক উদ্যোগের উপর আস্থা স্থাপন করে সেই সংগে বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ঐ দলের মতে, সরকারী ব্যবস্থায় শিল্প-বাণিজ্য ক্রমাগত কেন্দ্রীভূত হলে নানা অসুবিধা ও বিচ্যুতি দেখা দেয়। জেলা শাসনব্যবস্থা জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারে এবং তার একটা গণতান্ত্রিক ভিত্তি আছে বলে সেটাকে আর্থিক পরিকল্পনার প্রধান অবলম্বন হিসাবে নিলে ভালো হয়। অন্য কথায়, বৈষয়িক উদ্যোগ একেবারে ভিত্তি থেকে উপরের দিকে গড়ে তুলতে হবে।

গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

অন্য দিকে, মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট দলের মতে, কংগ্রেসের সব উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা পুরোপুরি ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ছাড়া আর কিছু নয়। বৈদেশিক সাহায্যের উপর দেশকে অতিমাত্রায় নির্ভরশীল করে তোলার জন্য কম্যুনিস্ট দল কংগ্রেসকে দায়ী করে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি যে ভূমি-ব্যবস্থার আমূলে সংস্কার ব্যতিরেকে সম্ভব নয়, এ কথা কম্যুনিস্টরা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছে। দক্ষিণ কম্যুনিস্ট দল চতুর্থ যোজনার খসড়া-লিপির বদলে একটি জনগণের পরিকল্পনা রচনা ও প্রয়োগ বিশেষ করে সরকারী ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। কমিউনিস্ট দলে কার্যসূচীর মধ্যে একচেটিয়া ব্যবসা বা শিল্পের দমন এবং ব্যাংক প্রভৃতির জাতীয়করণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক আদর্শ

গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতর ক্রমে একটি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন হচ্ছে কংগ্রেস দলের অভীষ্ট। এই দলের ঘোষিত নীতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, সরকারী ব্যবস্থায় শিল্পের উপর গুরুত্বদান, কৃষির আধুনিকীকরণ এবং দ্রব্যমূল্যের স্থিতিরক্ষা। বলতে গেলে, চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া-লিপি হচ্ছে কংগ্রেস দলের নির্বাচনী ইস্তাহার। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দলের কাছে আজ এটা স্পষ্ট যে, বৈষয়িক উন্নয়ন শ্লথ হয়ে পড়েছে উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে এবং তার চেয়ে বেশী, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে আয়, সম্পদ ও নতুন সুযোগ-সুবিধার সুষম বণ্টন বজায় না রাখলে সামাজিক সংহতি রক্ষা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, কমিউনিস্ট দলের কাছে আর্থিক ব্যবস্থার গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তন সাধন সবচেয়ে জরুরী। জাতীয় পরিকল্পনাকে বাস্তবে অনূদিত করার জন্য ঐ দল বৈপ্লবিক ব্যবস্থা অবলম্বন সুপারিশ করে।

সামাজিক বৈষম্য হ্রাস

সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল তার ইস্তাহারে বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যগুলি দূর করার সংকল্প ঘোষণা করেছে। এদিক থেকে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের সংগে তার দৃষ্টিভংগীর মিল দেখতে পাওয়া যায়। প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের ইস্তাহারে অভিযোগ করা হয়েছে যে, বৈষয়িক অগ্রগতির সুযোগ-সুবিধাগুলি থেকে প্রধানত ধনী বা ভাগ্যবান শ্রেণী লাভ করেছে।

দেখা যাচ্ছে, দেশের মুখ্য রাজনৈতিক দলগুলি এবিষয়ে আজ একমত যে, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান হচ্ছে প্রাথমিক কর্তব্য। কিন্তু কোন পথ বা উপায় গ্রহণ করলে সমস্যার নিরসন হবে সে সম্বন্ধে তাদের ভেতর কমবেশি বিরোধ আছে। আবার, প্রায় সব কয়টি দল দুর্নীতি অপসারণ এবং প্রশাসন-ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। এরকম ক্ষেত্রে, সর্বদল-সম্মত একটি জাতীয় কার্যসূচী রচনা এবং সেটাকে সফল করার জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করা সম্ভব কি না, তা দেখতে হবে।

শান্তিকুমার ঘোষ

উৎসবে
উপযুক্ত
নির্ব্বাচন
টমের চা

দিল্লির ডায়েরি

আধুনিক ট্র্যাক্টর চালনায় ভারতীয় চাষী

এই মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে যখন দেশ জোড়া নির্বাচনের ঢাক বাজছিল, রাজনীতির কোলাহলময় জগত থেকে বাইরে গেলাম অন্যান্য কয়েকজন সাংবাদিকদের সংগে। হিমাচল প্রদেশের পর্বতসংকুল একটি জেলায়। নাম তার মাণ্ডি।

বেশ কিছুকাল আমরা শুনে আসছিলাম দুটো শব্দ, "মাণ্ডির অলৌকিকতা"।

গগনচুম্বী ভুট্টার ক্ষেত

সেখানকার পাহাড়ে জমিতে পশ্চিম জার্মানীর কতিপয় বিশেষজ্ঞের সহায়তায় কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত কাজে নাকি অপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে মাত্র চার বছরের ভিতর। কী এমন হতে পারে দু হাত তুলে নৃত্য করতে হবে? ঐ ছিল প্রশ্ন। ভাবলাম, দেখা যাক কেমন সেই অলৌকিকতা যার দৌলতে মাণ্ডি জেলার চেহারা গেছে ফিরে।

পশ্চিমবঙ্গের নতুন সরকার কৃষিকাজের ও গ্রামীণ উন্নতিকে প্রথম স্থান দিচ্ছেন। মাণ্ডি জেলার কাজ দেখে আজ মনে হয় যে, পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য দপ্তর ভাল কয়েকজন কর্মচারী ও বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে সেখানকার কাজকর্ম থেকে উদাহরণ নিতে পারেন। অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে ও হাতেনাতে কৃষি উন্নতির কাজ করলে চেহারা না বদলে পারে না। মাটি তো মা: সেবাযত্নে সে কি সন্তানের দিকে মুখ তুলে না-চাইতে পারে? মাণ্ডি দেখলাম এটিই প্রমাণ করেছে, যার জন্যে রাজধানীর হাজার টাকা তংখাওয়ালা কর্মচারীদের মাথাব্যথার অন্ত নেই। এবং মাথাব্যথা সত্ত্বেও বিদেশের দুয়ারে "ফেন দাও ভাত দাও" ভিক্ষার অন্ত নেই।

বিদেশী অনেক দেখেছি, নানা দেশের। জার্মানীর লোকদেরও অনেক দেখেছি, কেউ প্রফেসর, কেউ কূটনীতিক, কেউ ছাত্র সাংবাদিক, কোটিপতি কি মজুর। কিন্তু মাণ্ডিতে যে-কজন দেখলাম এমন বিদেশী খুব কম, অনেকটা মিশনারীদের মতো। তফাত এই যে, ধর্ম বদলিয়ে "সাহেব" তৈরি করার স্বার্থ তাদের নেই। জমি থেকে গরীব কৃষকরা বেশি ফসল পেলেই তারা নিজেদের ধন্য মনে করে।

ডক্টর গুইলডিস আর মিস্টার ইয়েনটশ্ ১২।১৪ জন জার্মানদের দুজন। ঘণ্টা পাঁচেক ওঁদের সংগে পাহাড়ে-গ্রাম আর জমি আর তার ফসল দেখলাম। এখানে ওখানে লোকেরা তাদের নমস্কার জানাচ্ছে,

ফলের গাছ সংরক্ষণের শিক্ষা

মাণ্ডিতে চাষীদের স্বহস্তে নির্মিত কয়েকটি যন্ত্র

কিম্বা তারা জানাচ্ছে নমস্তে। কৃষকদের যেন ঘরের লোক। একটি ভারত-জার্মান চুক্তি হয় ১৯৬২-তে। সেই অনুসারে জার্মান সরকার প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র ও কৃষি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে সহায়তা করেছেন। কিন্তু ভারতে তো কোটি টাকার অঙ্ক ছাড়া আজকাল রাজধানীর তথাকথিত পরিকল্পনাকারীরা কথাই বলেন না। তহলে ঐ সহায়তায় হঠাৎ ভাল ফল কী করে হল?

জার্মানরা এমন কিছু দেশ থেকে আনেনি যা ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা দেখেনি অথবা শোনেনি এবং যে সমস্ত জিনিস ভারতের অনেক স্থানেই ব্যবহার করা হচ্ছে। কিনা—সার, উন্নত ধরনের বীজ, ভাল গরু-মুরগী ও ভালভাবে পোষণ, উন্নত ধরনের লাংগল আর হাতিয়ার (খুব কিছু অবাক হওয়ার নয়), পোকা-বিনাশের কেমিক্যালস ইত্যাদি অর্থাৎ সচরাচর যা যে-কোনো বিশেষজ্ঞ উপদেশ দিয়ে থাকেন। "তাহলে তোমরা কী করলে যাতে লোকেরা মাণ্ডি-মাণ্ডি বলে কীর্তন আরম্ভ করেছে?" জিজ্ঞেস করলাম।

ডক্টর গুইলডিস বললেনঃ "কিছু না, কোনো অলৌকিক কিছু নয়। আমরা শুধু হাত দিয়ে কাজ করে কৃষকদের দেখিয়েছি, বাস্তবে দেখিয়েছি আমাদের কথা অনুসারে কাজ করলে তারা ফসল পায় বেশি। গরু থেকে দুধ পায় বেশি। মুরগীর ডিম হয় বেশি ও বড়। বাস, তখন থেকে চাষীরা নিজেরাই এগিয়ে এল। আমরাও পেলাম আরো উৎসাহ। কাজও চলল এগিয়ে।"

অথচ জার্মানরা কিন্তু কাজ চালাচ্ছে প্রধানত ভারতীয় গ্রামসেবক ও সেবিকাদের মাধ্যমে। তাহলে অন্য স্থানে অনুরূপ ফল হচ্ছে না কেন? একটা উদাহরণ দিয়ে উনি বললেন: "একজন ভারতীয় কৃষি-কর্মচারী গ্রামের চাষীদের সার ব্যবহার সম্বন্ধে লেকচার দিলেন। আমরা তাকে জমিতে নিজের হাতে সার ছড়িয়ে দেখাতে বললাম কী করে সার দিতে হবে। উনি জানালেন, নিজে বাস্তব ক্ষেত্রে তা কোনোদিন করেননি, তাই জানেন না। আমরা তখন জমিতে গিয়ে সার ছড়িয়ে কৃষককে দেখিয়ে দিলাম।"

এই পুঁথি-ব্যাধি ভারতের সব জায়গায়। যে-জন্যে উন্নয়ন ব্লকে আর যাই হোক উন্নতি সচরাচর হয় না। হলেও গুটিকয়েক ধনী চাষীদের হয়। মাণ্ডিতে তা হয়নি। ষাট হাজার পরিবারের মধ্যে আজ পঞ্চাশ হাজার লাভবান হয়েছে মাণ্ডি পরিকল্পনায়। এবং আরো একটি কারণ আছে মাণ্ডির সাফল্যের পেছনে। তা হলো দুর্নীতির অভাব। চাষীদের নাম করে কেউ টাকা মেরে দিচ্ছে না এবং দেওয়ার উপায়ও নেই।

আর তাই চার বছরে পেয়েছে কী ফল সার ব্যবহার বেড়েছে ২৪ গুণ। ভুট্টা বেড়েছে শতকরা ৪৫ ভাগ, গম ২৩ ভাগ আর ধান ৭৭ ভাগ। খাতাকলমে মোটেই নয়। একেবারে বাস্তবে।

ধরুন ফলের বাগান (আপেল, বিলিতী কুল ইত্যাদি)। চারশো একর থেকে বেড়ে এখন প্রায় ৮,৪০০ একর। গোটা একশো একর জমিতে শাকসব্জি মাত্র একটা এলাকায় এবং ফুলকপির বীজ হচ্ছে অনেকটা জায়গায়। এই বছরে প্রায় দুই লক্ষ টাকার বীজ এরা দেবে ন্যাশনাল সিড করপোরেশনকে। জেলাতে প্রায় পাঁচ হাজার একর জলো জমি আছে। এরা চাষের জন্যে উদ্ধার করেছে ২৫০ একর। (খরচ হয়েছে প্রতি একরের জন্যে ১,২০০ টাকা, কিন্তু জার্মান বিশেষজ্ঞদের আশা আছে ওটা কমিয়ে একর প্রতি ৪০০ টাকায় আনা যাবে)।

ভাংগ্রুটুতে দেখলাম ওদের ছোট্ট একটা কারখানা, একটা আধুনিক গোশালা যেখানে আছে জার্মানী থেকে গোটা ২৫।৩০ গরু-ষাঁড়। কয়েক মাইল দূরে হচ্ছে একটা ডেয়ারি। এই সবকিছুই একটা সমবায় সমিতির অন্তর্গত। এরা দুধ কিনে নিচ্ছে আর সরবরাহ করে নিকটবর্তী শহরে অন্য প্রদেশে।

"এ চাষী বিলিতী সার নেবে না। আমরা তার পাশের জমিতে সার দিয়ে গম ফলিয়ে দেখালাম যে, ফসল প্রায় দেনা। সে তখন নিজে থেকে এগিয়ে এল সার কিনতে। এই আমাদের কাজের ধরন", বললেন ডক্টর গুইলডিস।

আমার মনে হয়, মাণ্ডির মতো সমস্ত প্রদেশে কয়েকটা করে গড়ে উঠলে আমেরিকার দিকে মুখ চেয়ে আর বসে থাকতে হবে না। কিন্তু আসলে চাই দুটো জিনিসঃ হাতে কাজ করে কৃষকদের দেখানো ও দুর্নীতির অভাব। এই অবধি আমাদের কৃষকরা শুধু ধান-গম চাষ করেই খালাস। বড়জোর নিজের জন্যে একটা ছোট্ট গোয়াল আর দু চারটে মুরগী হাঁস। আধুনিক কৃষিতে সব মিলিয়ে কৃষক পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের চেষ্টা হচ্ছে। মিকসড ফার্মিং। মাণ্ডিতে তাই।

মাণ্ডি দেখে একদিনে মোটর ভ্রমণ প্রায় ৩৫০ মাইল, আদ্ধেক পাহাড়ের ওঠানামায়। দিল্লি এসে পৌঁছলাম রাত সাড়ে তিনটে। গাড়িটা ছাড়া সকলেই প্রায় অর্ধমৃত।
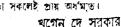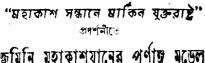
খগেন দে সরকার

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য সংবাদ

রবীন্দ্র পুরস্কার : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

"তুঙ্গভদ্রার তীরে", পুজো সংখ্যা আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছিল। পুজোসংখ্যা আনন্দবাজারের ওজন টেলিফোন ডাইরেক্টরির চেয়ে কোনো অংশ কম নয় এবং প্রচুর বিখ্যাত লেখকের রচনা থাকে, কিন্তু আমাদের চেনাশুনো এমন একজন লোককেও দেখিনি যিনি সে বছর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "তুঙ্গভদ্রার তীরে" পড়ে শেষ করার আগে অন্য কোনো রচনার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। আমি অবশ্য করেছিলাম, আমি "তুঙ্গভদ্রার তীরে" দু এক পাতা পড়েই নিজের প্রতি কড়া শাসন এনে অন্য রচনায় চলে যেতাম, কেননা, একটানা পড়লেই তো শেষ হয়ে যাবে—ছেলেবেলায় মিষ্টান্নের পাত্রে একটি মাত্র আঙুল ডুবিয়ে ডুবিয়ে বহুক্ষণ ধরে চেখে খাওয়ার মতন। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা পেলেই আমি কৃপণের মতন প্রতিদিন এক পাতা দু পাতা [illegible] খরচ করি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এ বছর রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন—এ খবরে নিশ্চিত বাংলা দেশের আপামর লেখক-পাঠক সাধারণ খুশী হবেন। যতদূর জানি, তিনি নিঃশত্রু লোক, কারণ আর কোনো লেখকের সঙ্গে তো তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, তিনি আলাদা; তিনি একাই একটা স্কুল। গোয়েন্দা গল্প তো বাংলা দেশে কত লোকই লিখছে, কিন্তু শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট আর সবাই থার্ড ক্লাস। ঐতিহাসিক উপন্যাসও অনেকে লিখছেন, সেখানেও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ফার্স্ট ক্লাস গোল্ড

মেড্যালিস্ট। সুতরাং প্রতিযোগিতার অন্যদের মধ্যে তিনি আলাদা, তাছাড়া কলকাতা এবং বাংলা দেশ থেকে বহুদূরে থাকেন বলেও হয়তো তিনি অন্যান্য বাঙালী লেখকদের থেকে আলাদা। তিনি যে-লেখাই যখন লেখেন, প্রতিটি লেখাই নিষ্ঠাপূর্ণ, এ ব্যাপারটি আজকাল বহু লেখকের মধ্যে দুর্লভ।

কিন্তু শুধু নিষ্ঠা নয়, আর একটি যাদু তাঁর আয়ত্তে, যে যাদুবলে তাঁর সমস্ত রচনা, প্রতিটি লাইন তীব্রভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। রচনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমান টানে বাঁধা—এরকম আর দেখা যায় না। অথচ তাঁর 'বুমেরাং' নামে একটি ছোট গল্প সংকলনের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়লো, সেই বইয়ের মুখবন্ধে তিনি বলেছিলেন যে, সে বইয়ের সবকটি গল্পই এক সময় সম্পাদকদের কাছ থেকে অমনোনীত হয়ে ফেরত আসা—অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের অস্ত্র বুমেরাং যেমন যে-ছোড়ে আবার তার কাছেই ফিরে আসে। আশ্চর্য লাগে না শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাও এক সময় সম্পাদকরা ফেরত দিয়েছেন। আজ বুঝি তাই তিনি প্রতিশোধ নিচ্ছেন, সম্পাদকরা তাঁর লেখার জন্য হন্যে, কিন্তু তিনি বছরে একটি-দুটির বেশী লিখতে চান না।

ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক সবই তিনি লিখেছেন এক সময়, কিন্তু আজ তাঁর গোয়েন্দা গল্প, ঐতিহাসিক গল্প এবং ভূতের গল্পের আকর্ষণই সবচেয়ে বেশী। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ আর পরলোকতাত্ত্বিক বরদা—সব বাঙালী পাঠকদের চেনা। এবং এই পাঠকদের কোনো শ্রেণীভেদ নেই, চরম বুদ্ধিজীবী এবং নাকউঁচু পাঠক থেকে শুরু করে সাধারণ গল্পখোর পাঠক—সবারই তিনি প্রিয়। যাদু না জানলে এ জিনিস সম্ভব না, চার্লি চ্যাপলিন যে-রকম যাদু জানেন।

অথচ, গোয়েন্দা গল্প, ভূতের গল্প ঐতিহাসিক গালগল্প (শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিকে ঠিক গবেষণামূলক বা ক্লাসিক ধর্মী বলা যাবে না, ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি এবং গল্প রসই প্রধান) এগুলিকে ঠিক সৃষ্টিশীল সাহিত্যের বিষয় বলা যায় না—কারণ সৃষ্টিশীল সাহিত্যের বিষয় তাই—যার সঙ্গে পাঠক কোনো না কোনো সূত্রে একাত্মবোধ করবেন, এগুলোর সঙ্গে তা যায় না। জানি, এসব বিষয় নিয়ে লিখেছেন এমন অনেক দুর্ধর্ষ সাহিত্যিকের নাম করবেন অনেকে এ-প্রসঙ্গে, যেমন এডগার অ্যালান পো, ভিক্টর হুগো, জি কে চেস্টারটন প্রভৃতি—কিন্তু এসব মিছে তর্ক, কেননা—আমরা জানি ওসব লেখকের এইসব বিষয় নিয়ে লেখাই বেশী জনপ্রিয় হলেও তাঁদের মূল খ্যাতির কারণ অন্য। তবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সর্বজনপ্রিয় শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক কেন?

কারণ, বিষয়বস্তু যাই হোক, তাঁর অনেকগুলি চরিত্রসৃষ্টি চিরকালের সংগ্রহশালায় স্থান পাবার যোগ্য। যে-পাঠক কখনো মরুভূমিতে যাননি, সেও যেমন কোনো মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়া একজন 'তৃষ্ণার্ত' মানুষের সার্থক বর্ণনা পড়ে নিজের তৃষ্ণার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারে—সেইরকম শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবাস্তব বা অলৌকিক কাহিনীর মধ্যেও যে-সমস্ত চরিত্র উপস্থিত হয়, তাদের চলার ভঙ্গি থেকে কথা বলার মুদ্রাদোষ—কিছুই টিপিক্যাল নয়, তারা আলাদা সৃষ্টি এবং শিল্পের সুষমামণ্ডিত এবং শিল্প হবার ফলেই তাদের মধ্যে সার্বজনীনত্ব আসে।

এ ছাড়া তাঁর ভাষা। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা আশ্চর্য ধ্বনিময়, প্রতিটি লাইনের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে চাপা হিউমার, এবং সেইগুলিই বাক্যের সেতুবন্ধন। তাঁর রসিকতার মধ্যে কোথাও লৌহ শলাকা নেই, কালো রং নেই, আদি রসাত্মক কৌতুকগুলিও চমকপ্রদ ও সূক্ষ্ম। প্রকৃতি বর্ণনায় তাঁর শব্দের মধুর ঝংকার রোমান্টিক কবিদেরও হার মানায়। 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' উপন্যাসের প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা, যেখানে নদীর বর্ণনা, শব্দের রস ও ব্যঞ্জনায় অপূর্ব, ঐ অংশটুকু আমাদের মতে টেকস্ট বুকে স্থান পাওয়া উচিত, কারণ টেকস্ট বুকে থাকলে ছাত্রো ভাষা ব্যবহার শিখতে পারবে—এবং অনেক অংশ তাদের মুখস্থ হয়ে যাবে। ঐ গদ্য অংশ মুখস্থ রাখারই যোগ্য। এই গুণের জন্যই তাঁর অনেক বই বারবার পড়া যায়, এমন কি তাঁর ডিটেকটিভ গল্পগুলিও বারবার পাঠযোগ্য।

তাঁর প্রতিটি রচনার গল্পরসও নিঃসন্দেহ কিন্তু আমার ধারণা তাঁর চরিত্রসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও ভাষা ব্যবহারেই তাঁর বেশী কৃতিত্ব এবং সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তাঁর সুখপাঠ্যতা। অনেক সমালোচক হয়তো বলবেন, সুখপাঠ্যতা খাঁটি সাহিত্যের পক্ষে কোনো গুণ নয়, বরং দোষ। কারণ সমালোচক প্রশংসিত বেশীর ভাগ বইই তো দুষ্পাঠ্য ও খটমটে। ভাগ্যিস আমি সমালোচক নই, নিছক পাঠক মাত্র! এবং তাঁর রচনাগুলির প্রতি আগ্রহ আমাদের চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে। এবং একথাও আমরা জেনে গেছি যে, সব সমালোচকের চেয়েও সেই একজন পাঠক বড়, যাঁর নাম আলটিমেট রীডার।

সনাতন পাঠক

উপন্যাস

গন্ধরাজ। বনফুল। আনন্দধারা প্রকাশন, ৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য আট টাকা।

ইংরেজীতে "প্যালেস ক্রিক" বলে দিলেই যথেষ্ট। প্রসঙ্গ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যায়। বাংলায় যদি বলি 'রাজ-অন্তঃপুরের ষড়যন্ত্র' তবে বিষয়বস্তুর ধরনটা খুব স্পষ্ট হবে বলে মনে হয় না। তাই ইংরেজীর সাহায্য নিয়ে বলি, বনফুলের "গন্ধরাজ" 'প্যালেস ক্রিক'-এর কাহিনী, তথা একটি পুরো উপন্যাস।

আর এল স্টিভেনসনের 'প্রিন্স অটো'-র ভিত্তিতে লেখক উপন্যাসটি রচনা করেছেন। এই ধরনের গল্পপাঠে একটা তাৎক্ষণিক সুখ পাওয়া যায়। এই সুখের পরিমাণ বেড়েছে বনফুলের রচনাশৈলীর গুণে। কাহিনীকাল এবং পাত্র-পাত্রীরা বিগত যুগের হলেও তাদের মধ্যে সময় সময় যে মনুষ্য ও জীবনবাসনা প্রকাশ পেয়েছে তা এ যুগের লক্ষণাক্রান্ত।

হিমালয়ের পাদদেশে এককালে যে সব রাজার রাজত্ব করতেন তাদেরই একজন, গঙ্গানগ্রাম স্বাধীন রাজ্যের কুমার গন্ধরাজ, এই কাহিনীর নায়ক। মেরুদণ্ডহীন, স্বাবিরোধী এই চরিত্রকে লেখক রাজ্যের অন্তর্বিরোধের মাঝখানে এনে ফেলেছেন। এবং বিভিন্ন ঘটনার কষ্টিপাথরে তাকে বিশ্লেষণ করেছেন। গন্ধরাজ রানী সুরূপিণীর ভালবাসা পায়নি। স্বৈরাচারিণী এই রমণী যাকে প্রণয় নিবেদন করেছিল এবং যার হাতের পুতুল হয়ে রাজ্য শাসন করে যাচ্ছিল সে কপিঞ্জল। কপিঞ্জলকে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে হত্যা করার পরই সুরূপিণী তার স্বামীর ভালবাসার সন্ধান পায়।

এই ধরনের উপন্যাসে বঙ্কিম-রচনার প্রভাব এসে যাওয়াটা বোধ হয় স্বাভাবিক। আর কিছু না হোক, রঞ্জাবতীর চরিত্রটি এই প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। সুচতুরা রঞ্জাবতী তার বিশ্বাসঘাতকতায় যেমনি নির্মম, অনুরাগে তেমনি কোমল। কপিঞ্জলের গোপন-প্রেয়সী হয়েও সে গন্ধরাজের সহায় হয়েছে। গন্ধরাজের প্রতি তার দুর্বলতার স্পষ্ট ইঙ্গিত লেখক যথা সময়ে পাঠককে দিয়েছেন। রঞ্জাবতীর সন্দেশ ও ধূর্ততা কাহিনীর অবশ্যম্ভাবী পরিণামকে ত্বরান্বিত করেছে। রাজ্যে গণ-জাগরণের প্রস্তুতি অবশ্য কাহিনীর শুরু থেকেই ছিল।

বিদেশী উপন্যাসের ভাবানুবাদ হলেও উপন্যাসে মৌলিকত্ব আছে। সুখপাঠ্য কাহিনী হিসাবে "গন্ধরাজ" পাঠকমহলে আদৃত হবে। ৩০৮।৬৬

পুরানো কাহিনী

রাজসিক। শ্রীপান্থ। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। চার টাকা।

বাংলা সাহিত্যে শ্রীপান্থ একটি বিশিষ্ট নাম। পুরনো দিনের গল্প অসম্ভব নতুন করে বলার ক্ষমতায় তিনি প্রায় অদ্বিতীয়। ইতিহাসের পাতা ছিঁড়ে নানান গল্প এমন সুন্দর করে সাহিত্য করে তিনি বলেন যে, ছেলেবেলায় ঠাকুরদার ঝুলির অম্বুরী তামাকের গন্ধমেশানো স্মৃতি মনে পড়ে যায়। বাংলা সাহিত্যের বাজারে যখন ঝুড়ি-ভর্তি গল্পকেচ্ছার যথেচ্ছ আমদানি পূতিগন্ধ ছড়াচ্ছে, তখন একগুচ্ছ টাটকা গোলাপ উপহার দিলেন শ্রীপান্থ।

রাজসিকে রয়েছে দশটি গল্প। অনৈতিহাসিক রাজন্যবর্গ ও নবাববর্গের বিচিত্র উপাখ্যান থেকে শুরু করে পুরনো কলকাতার বড়দিন, রাজধানী বদল, সেন্ট-জ্যাভিয়ারের শবাধার, মহেঞ্জোদারোর শেষ দিন প্রভৃতি অদ্ভুত কৌতূহলজনক কাহিনী। এ-বইয়ের বিশেষ স্বাদের দুটি রচনা হল মেমসাহেব ও হারেম। শ্রীপান্থের লেখায় যে-চুম্বক লুকানো থাকে রাজসিকেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ফলে শুরু করতেই যা দেরি, শেষ না করে থামা যাবে না। ৩৪৩।৬৬

কবিতা

শেক্সপীয়রের সনেট। অনিল বিশ্বাস। পূর্বাশা প্রকাশন, ৩২ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা-৯। চার টাকা।

শেক্সপীয়রের ৪০০তম জন্মশত-বার্ষিকীতে বাংলা ভাষায় শেক্সপীয়র-অনুবাদের প্রাবল্য দেখা গিয়েছিল। তারপর, সব হুজুগের মতই এখন সেই স্রোত মিলিয়ে গিয়েছে। বহু অনুবাদের ভিড়ে অনেকগুলি সং[illegible] তখন আলাদা করে চেনা যায় নি। পরে কয়েকটি সংকলন স্থায়ী সাহিত্য উপহার হয়ে থেকে গেছে। এই মুহূর্তে শ্রীমণীন্দ্র রায়ের অনুবাদ গ্রন্থটির নাম মনে পড়ছে। শেক্সপীয়রের সনেটের যথার্থ সং কিছু অনুবাদ করেছিলেন শ্রী রায়। হুজুগে এই ধরনের কিছু-কিছু লাভও হয়েছে। এ বড় কম নয়।

শ্রীঅনিল বিশ্বাস অপরিচিত নন। পূর্বাশা-পত্রিকায় তাঁর কবিতা ছাপা হত। তিনি শেক্সপীয়রের সনেটের অনুবাদের যে-গ্রন্থটি রচনা করেছেন তার প্রথম বৈশিষ্ট্য—এটি সম্পূর্ণাঙ্গ। শেক্সপীয়রের সনেট ছাড়াও নাটকের অন্তর্গত সনেট-গুলির অনুবাদ তিনি করেছেন। এ-ছাড়া ভূমিকায় তিনি শেক্সপীয়রের সনেটের আলোচনা ও প্রাসঙ্গিক বহু তথ্যের সমাবেশ করেছেন। তাঁর অনুবাদ-কর্ম, সাধারণভাবে বলতে গেলে, সরল ও মূলানুগ। সাধারণ পাঠকের মনেও মূল সনেটের স্বাদ যাতে পৌঁছোয় সেদিকে

নিশ্চয়ই লক্ষ্য ছিল তাঁর। তবে কিছু কিছু অবাঞ্ছিত প্রয়োগ বর্জন করা যেত। ছন্দও দু-এক জায়গায় চিড় খেয়েছে, যেমন—'চাওয়া পাওয়ার ফারাকে' (৩০ নং) 'যাবৎ না ধর্মীয় মিথ্যা (৭২) 'সৌন্দর্যের সংবিধি তো তুমিই যে করবে গ্রহণ' (১৩৪) 'আরেক পর্বের যৌবনকে' (১১০) ইত্যাদি। কিন্তু সব মিলিয়ে তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক একথা অবশ্যস্বীকার্য।

২৩৮।৬৬

২৯শে জুন। মুকুল নিয়োগী। ক্যারেক্ট প্রকাশন, ৬৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯। দু টাকা।

ক্ষুধার কাব্য। বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী। টাইমস ডিস্ট্রিবিউটরস, ৮বি কলেজ রো, কলকাতা-৯। এক টাকা।

মুকুল নিয়োগীর কবিতা আগে দেখেছি ... ২৯শে জুনের বই কবিতাতে ... একজন কবির পরিচয় ... মুকুল নিয়োগী এক ... নিয়ে ... জীবনানন্দের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর কবিতা তা বলে অবশ্য জীবনানন্দ প্রভাবিত নয়। অনপনেয় হয়েও নিজস্ব একটি কণ্ঠস্বরে যে তিনি কথা বলতে চাইছেন তা বোঝা যায়। তবে গদ্য কবিতায় তাঁর হাত তত উতরোয় নি।

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত মেজাজের। তাঁর বিশ্বাস:

এখনও জগতে লেখা হয় নি কো কবিতা
কবিতার নামে যা হয়েছে লেখা—
সে শুধু কথার ভণিতা
সব কবি দেখে কবিতা লেখার স্বপ্ন,
হায় রে জগৎ কবিতা দেখে নি এখনো।
(প্রথম কবিতা)

এবং এর ফলে 'ক্ষুধার কাব্য/লেখা শুরু হয়েছে বুকের রক্তে গোটা স্বদেশ জুড়ে/কবিতা লিখছি পোস্টারে আর ইস্তাহারে তারই সুরে।' পাঠক হিসেবে শুধু মুশকিল সব পোস্টার এবং ইস্তাহারকেই কবিতা বলে মেনে নেওয়া। ২১।৬৭, ১৯৬।৬৬

সঙ্গীত

দশটি ভারতীয় রাগ অবলম্বনে রচিত অর্কেস্ট্রা। ভি বালসারা। প্রকাশক—শ্রীমতী ধানলওয়াক। ১৬ অক্রূর দত্ত লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা।

লঘু যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করে ভি বালসারা প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজিয়েও তিনি শ্রোতাদের সাধুবাদ পেয়েছেন। কিছুকাল আগে তিনি অর্কেস্ট্রায় রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস"-এর মর্মরস ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু ফিল্ম কিংবা অন্যান্য জনপ্রিয় গানের সুর বাজানোই কি অর্কেস্ট্রার কাজ? পশ্চিমের যন্ত্রে কি ভারতের রাগ ধ্বনিত হওয়া সম্ভব নয়? এই প্রশ্ন শিল্পীর মনে জেগেছিল। শ্রীবালসারা মনে করেন, শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন রাগ ও তালে সমবেত যন্ত্রসংগীতের উপযোগ্য সুর রচনা করা যায়। এবং তিনি এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন। দশটি ভারতীয় রাগে তিনি অর্কেস্ট্রার স্বরলিপি রচনা করেছেন। আশাবরী, খাম্বাজ, কাফি, ভৈরবী, ইমন, মালকোষ, পূরবী, টোড়ি, বিলাওল, ভৈরব প্রভৃতি রাগে রচিত অর্কেস্ট্রার স্বরলিপি যন্ত্র-সংগীতশিল্পীর কাছে আদরণীয় হবে।

সলটার
ঘর-করণার কাজে উপযোগী
হাল্কা ধরনের ওজনযন্ত্র
SALTER
গুণসম্পন্নতার
নিশ্চিতি

রঙ্গজগৎ

চলচ্চিত্রলোকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাঁরা নির্বাচনে জয়ী

ফিল্ম জগতের সঙ্গে একদা যুক্ত ছিলেন এবং এখনও আছেন এমন কয়েকজন এবার লোকসভা ও বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রথমেই মাদ্রাজের ডি এম কে নেতা শ্রী সি এন আন্নাদুরাইয়ের নাম করা যেতে পারে। একদা তিনি ছায়াছবির গল্প লিখতেন। লোকসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত শ্রী কে জগদীশ (অন্ধ্র প্রদেশ) এবং রাজস্থানের শ্রীঅমৃত নাহাতা। শ্রীজগদীশ তেলেগু অভিনেতা। শ্রীনাহাতা হিন্দী গল্প লেখক। শ্রীভূপেন হাজারিকা আসামের বিধানসভায় নির্দল প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীহাজারিকা চিত্রপরিচালক - কাহিনীকার - সংগীতপরিচালক-সুগায়ক। চলচ্চিত্রলোকের সঙ্গে যুক্ত যেকয়জন বিধানসভায় নির্বাচিত তাঁদের কয়েকজন হলেন শ্রী এম জি রামচন্দ্র, শ্রীচিট্টি বাবু, শ্রীরাম আরংগনাল, শ্রী এ ভি পি আসাইথাম্বি, শ্রী এম করুণানিধি এবং শ্রী এ ওয়াই এস পরিসুথা নাদার।

"দুরন্ত চড়াই" (পরিচালনাঃ জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়) ছবিতে সবিতা চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

শ্রীরামচন্দ্র ডি এম কে প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত। রাজস্থানের শ্রীনাহাতা (কংগ্রেস) চিত্রপ্রযোজক শ্রী বি কে আদর্শের ভাই। তিনি "সন্ত জ্ঞানেশ্বর" ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন। শ্রীআন্নাদুরাই কয়েকটি তামিল ছবির কাহিনী ও সংলাপ রচনা করেছেন। তার মধ্যে "ওলু ইরাভু" "বেংগলে বাধ", "ভাই মগালকে, কাঞ্চিত্তর থালি" উল্লেখযোগ্য। শ্রী এম করুণানিধি কাহিনীকার-চিত্রপ্রযোজক হিসাবে পরিচিত। শ্রীরাম অরংগনাল ও শ্রী এ ভি পি আসাইথাম্বি ও শ্রীকরুণানিধি ডি এম কে প্রার্থীরূপে নির্বাচিত। শ্রীনাদার কংগ্রেসের সভ্য। এঁরা সকলেই কাহিনীকার হিসাবে খ্যাতিসম্পন্ন। শ্রীকরুণানিধি প্রথমে মডার্ন থিয়েটার্স-এর কাহিনী বিভাগে কাজ করতেন। তিনি প্রায় চোদ্দটি ছবির সংলাপ লিখেছেন। এখন তিনি "ভাকিল ভিরুন্ধু" নামে একটি ছবি প্রযোজনা করছেন।

চিত্র-সমালোচনা

বিবি ঔর মকান

দর্শকের আস্থাভাজন হওয়া যে-কোন চিত্রপ্রযোজকের পক্ষেই গৌরবের কথা। হেমন্তকুমার এই সৌভাগ্যের অধিকারী। তাঁর হিন্দী ছবিতে নতুন কিছু মিলবেই —এই বিশ্বাস দর্শকের জন্মে গিয়েছে। হেমন্তকুমার প্রযোজিত গীতাঞ্জলির "বিবি ঔর মকান" কমেডি ছবিটিও দর্শকের প্রত্যাশা অটুট রেখেছে।

পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় এই হাসির ছবিতে একটি সুন্দর এক্সপেরিমেণ্ট করেছেন। অপেরার আঙ্গিকে গল্পবস্তু

বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে "খেয়া"-র নায়িকা মাধবী মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

"সেবা" চিত্রে তৃপ্তি মিত্র, জহর রায় ও কৃষ্ণা বসু

কিংবা সংলাপ পরিবেশনের রীতি আধুনিক বিদেশী চিত্রে দেখা যাচ্ছে। এবং কমেডি ছবিতে তা খুবই ফলপ্রসূ। শ্রীমুখোপাধ্যায় অপেরা-পদ্ধতির সাহায্যে কৌতুকের একটি নতুন মাত্রা ছবিতে যোগ করতে পেরেছেন। এ দেশের কাহিনীচিত্রে অপেরার আস্বাদ ও অভিজ্ঞতা এতদিন অলভ্য ছিল। "বিবি ঔর মকান"-এর এটা অতিরিক্ত আকর্ষণ। এবং তা-ছাড়া ছবিটি আরও একটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সংগীতবহুল প্রেমের ছবি এর আগে আমরা দেখেছি। কিন্তু "মিউজিক্যাল" কমেডি চিত্র আমরা বেশী দেখিনি। সেদিক থেকেও "বিবি ঔর মকান" চিত্তাকর্ষক। হিন্দী ছবির প্রায় সব ক'জন নামকরা প্লে-ব্যাক শিল্পীই এ ছবিতে গান করেছেন। একজন সংগীত পরিচালকের নিজের ছবিতে এতজন কণ্ঠশিল্পীর গান এর আগে শোনা যায়নি।

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় বাংলা ছবি "জয় মা কালী বোর্ডিং"-এর কাহিনীই (শৈলেশ দে রচিত) কিছুটা ঢেলে সাজিয়ে অনাবিল ও অবিরাম হাসির স্রোত বইয়ে দিয়েছেন "বিবি ঔর মকান"-এ। পরিচালকের বাহাদুরি এই, তিনি বিশ্বজিৎ ও কেষ্ট মুখার্জিকে ছবিতে বেশ কিছু সময়ের জন্য মহিলার সাজে সাজিয়ে রেখেছেন। এবং এই দুই মহিলা-বেশী অভিনেতাকে ঘিরে বেশ কিছু কৌতুকপূর্ণ ঘটনা আবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ অভিনেতাদের মহিলার বেশ ধারণের সঙ্গে সঙ্গেই রঙ্গরসের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। ছদ্মবেশ খসে পড়েছে ছবির ক্লাইম্যাক্সে। দীর্ঘস্থায়ী এই তো দূরের কথা বরঞ্চ মিথ্যা আবরণের ও আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে পরিচালক স্বচ্ছন্দে একটির পর একটি মজার ঘটনার সূত্র ধরে কাহিনীকে বাঞ্ছিত পরিণতিতে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। পাঁচ বন্ধু বাড়ি ভাড়া পাবার জন্য দু'জনকে দু'জনের বিবি সাজিয়ে কেমন করে দিব্যি ভাড়াটে হয়ে গেল এবং কতরকম ঝামেলা তাদের পোহাতে হল তা নিয়েই শচীন ভৌমিকের সুগ্রথিত চিত্রনাট্যটি রূপায়িত।

স্থূল রসিকতা বা কিছুটা ভাঁড়ামি ছবিতে নেই বলব না। বক্স-অফিস জয়ের জন্য কিছু অস্ত্রও সুকৌশলে নিক্ষিপ্ত। দুই নায়িকা যে কাহিনীতে সেখানে দুটি প্রেমোপাখ্যান তো থাকবেই। রোমাণ্টিক ঘটনা বিন্যাসে হিন্দী ছবির কিছু সুলভ ও গতানুগতিক উপকরণও এসে গিয়েছে। নাচ-গান তো আছেই। কিন্তু ছবির উপভোগ্যতা কোন কিছুতেই খর্ব হয়নি। কমেডির আয়োজনের সঙ্গে সহজেই খাপ খেয়ে গেছে। এবং বরাবরই কৌতুকের উপাদান অক্ষত রয়েছে। যার ফলে প্রায় প্রতি দৃশ্যেই প্রেক্ষাগৃহে হাসির রোল ওঠে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দমফাটা হাসিতে প্রাণ ভরে উপভোগ করার মত এমন কমেডি ছবি বোম্বাই থেকে এর আগে বেশী এসেছে বলে মনে পড়ে না।

ছবির সাফল্যের মূলে শিল্পীদের দানও কম নয়। কমেডির রাজা মেহমুদ তো আগাগোড়া হাসিয়েছেন। কমেডি ছবিতে বিশ্বজিৎ এত সুন্দর সাবলীল অভিনয় করতে পারবেন ভাবিনি। এবং মহিলার বেশে তাঁর ও কেষ্ট মুখার্জির অভিনয় ও হাব-ভাব যা [illegible] ছেন তার বুঝি তুলনা নেই। কেষ্ট মুখার্জি যে একজন দক্ষ অভিনেতা এ-প্রমাণ ছবিতে আবার পাওয়া গেল। রোমাণ্টিক নায়ক রূপেও বিশ্বজিৎকে ভাল লাগে। অপর দুই বন্ধুর চরিত্রে আশিসকুমার ও জগদেব চমৎকার অভিনয় করেছেন। এই হিন্দী ছবিতে আশিসকুমারের অভিনয় তাঁর সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের সূচনা করে।

দুই নায়িকা সেজেছেন কল্পনা ও শবনম। ও'দের দুজনই প্রাণোজ্জ্বল। শবনমের অভিনয় আগের চেয়ে পরিণত। কল্পনা সহজেই দর্শকের মন জয় করবেন। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে পদ্মা দেবী, বদরিপ্রসাদ, কুমারী পদ্মা, মণি চ্যাটার্জি, অজিত চট্টোপাধ্যায় (কলকাতা) প্রভৃতি সুঅভিনয় করেছেন। আগেই বলেছি, ছবিতে গান [illegible]। হেমন্তকুমারের চমৎকার সুরারোপের গুণে গানগুলি সুশ্রাব্য। সুরকার বেশী প্রশংসা পাবেন অপেরা-ধর্মী দৃশ্যের গানের সুর-রচনার জন্য।

টি বি সীতারামের ফটোগ্রাফি এবং [illegible] দাইমাদের সম্পাদনা উঁচুদরের।

সেবা

[illegible]র নাম "সেবা", তাতে সেবাধর্মের [illegible] ভাবং [illegible] বিদায়ার [illegible] একবারই তো [illegible]। ছবির [illegible] নায়ক। [illegible] জন সেবা[illegible] [illegible] গ্রামে [illegible]সেবা [illegible] [illegible] [illegible]রিক প্রভাবে দুই [illegible] সংসার জোড়া লাগে, দজ্জাল পুত্রবধূরা শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবায় লেগে যায়, [illegible]-খোর তার গচ্ছিত টাকা জনসেবায় বিলিয়ে [illegible] [illegible] সমবায় কবির পত্তন হয়।

অপর নায়ক চালকলের ম্যানেজার হতে না হতেই শ্রমিককল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। শ্রমিকের বেতন বাড়ে, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং চালে কাঁকরমেশানো থেকে আরম্ভ করে 'রাইস মিলে'র যাবতীয় দুর্নীতি দূর হয়।

ছবির বিভিন্ন পর্যায়ে থেকে দুই নায়কের এইসব লোকহিতকর কার্যাবলীর পরিচয় পেতে অসুবিধা হয় না। শেষের দিকের কয়েকটি দৃশ্যে দেখা যায়, প্রথম নায়ক (অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়) তার প্রণয়িনীর (তন্দ্রা বর্মণ) পাণিগ্রহণ করেছে এবং দ্বিতীয় নায়ক (অসিতবরণ) তার হারিয়ে যাওয়া স্ত্রীর (মলয়া সরকার) সঙ্গে (বন্যার পর) মিলিত হয়েছে। স্ত্রী তখন মৃত্যুপথযাত্রী। স্বামীর পুনর্বিবাহের সংবাদেই তার এই দুরবস্থা। খুব কাছাকাছি থেকেও ওরা এতদিন মিলিত হবার অবকাশ পায়নি। রাইস মিলের মালিক তথা জমিদারের (শিশির মিত্র) একমাত্র কন্যা অর্থাৎ প্রথম নায়কের প্রেয়সীর সঙ্গেই দ্বিতীয় নায়কের বিয়ের কথা হয়েছিল। এই ভণ্ডুল কীভাবে ঘটতে যাচ্ছিল তার ফিরিস্তি দিয়ে লাভ নেই।

তবে ছবি থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা গেছে, প্রযোজক-পরিচালক ভোলা আঢ্য সেবাপরায়ণতার আদর্শটি ফোটাবারই আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে শ্রমিক-দম্পতি (কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃপ্তি মিত্র) যেভাবে অসিতবরণকে শক্ত অসুখ থেকে বাঁচিয়ে তুলেছে তার দৃষ্টান্ত বিরল। এবং পরে শ্রমিক-ঘরণী (ওরা সাঁওতালী কি?) যেভাবে

“ডিয়ার লায়ার”-এ জর্জ বার্নার্ড শ ও শ্রীমতী ক্যাম্পবেলের ভূমিকায় যথাক্রমে ডেভিড ম্যাকিমিড ও এ্যাপেল জাম

বাবুজীর সেবায় লেগে গিয়েছে (বাবুজীর বাড়িতে তার আগমন সর্বদাই সন্ধ্যার পর) তাও কম অস্বাভাবিক নয়। দুষ্ট লোক ছবিতে দুই-একজন দেখা যায়নি তা নয়। তবে ভাল মানুষদের চাপে ওরা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। কারণ এ ছবিতে প্রযোজক-পরিচালক সাধারণ মানুষদের দুঃখ-কষ্টের কথাই বেশী ভেবেছেন। সেই সঙ্গে দর্শকদের কথা একটু ভাবলে আর কোন ক্ষোভ থাকত না।

এই ছবিতে শিল্পীদের যতটুকু করণীয় ছিল তাঁরা সকলেই তা নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন। ছবির কলাকৌশলের দিকের উল্লেখ করে লাভ নেই। তবে উল্লেখ্য, সংগীত পরিচালক কালোবরণ সুরারোপিত কিছু গান—যেগুলি শুনতে ভাল লাগে।

প্রিয় মিথ্যাবাদী

সমগ্র ইংরেজ জাতকে বাক্যবাণে জর্জরিত করে রেখেছিলেন আজীবন একজন প্রখর আইরিশম্যান, অথচ সেই ইংরেজ জাতই তাঁর লেখার জন্য পাগল। হয়ত এ এক ধরনের মর্ষকাম, কিংবা খুব সম্ভবত, ভেতরের মানুষটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্পর্শকাতর একটি হৃদয় সব রচনার মধ্যে কৌতুক বিদ্রূপ ছাপিয়ে জেগে ওঠে; তাই জর্জ বার্নাড শ-এর শিকার মাত্রই ভক্ত।

মাছির জন্য চুপ করে বসে থাকা মাকড়সার সঙ্গে নারীর তুলনা করেছেন, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াচ্ছে এমন একটা সাপের সঙ্গে,—বার-বার বলেছেন, প্রেম নয়, সন্তান পাবার জন্য স্ত্রীলোক পুরুষকে অধিকার করতে চায়, প্রেমের ভান করে, ছলনা বিস্তার করে। তবু আমরা জেনেছি, এই অদ্ভুত প্রিয় মিথ্যাবাদীটির সঙ্গে এক অসামান্য মহিলার প্রণয় ছিল দীর্ঘকাল যিনি এই সংজ্ঞায় পড়েন না। বিখ্যাত অভিনেত্রী এই মহিলাটি সর্বস্ব ছেড়েছিলেন অভিমানে, কিন্তু কোনোদিন শ-এর করুণা গ্রহণ করেন নি।

মিসেস প্যাট্রিক ক্যাম্পবেল ও বার্নার্ড শ-এর মধ্যে চল্লিশ বছর ব্যাপী লিখিত চিঠিপত্র থেকে নির্বাচিত অংশ নিয়ে গাঁথা এই আবেগবর্জিত নাটক Dear Liar বৃটিশ কাউন্সিল পরিবেশন করলেন হিন্দী হাইস্কুল মঞ্চে তিনবার মাত্র। তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ-এর সময় থেকে শুরু করে হিটলার-তাড়িত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে সামাজিক, রাজনীতিক, সাংস্কৃতিক যে-সমূহ সমস্যা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল —মাত্র আড়াই ঘণ্টার নাটকে আমরা সেই অপরূপ রোমান্সের সুঘ্রাণ পেলাম।

বৃস্টল ওল্ড ভিক গোষ্ঠীর দুজনমাত্র নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে নাটকটি লণ্ডনে দেখানো হয়েছে ইতিপূর্বে; কলকাতা শহরে

অজয় করের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ "কখনো মেঘ" ছবিতে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণ ঘোষাল

... অনেকে এই অসাধারণ ... না। মিসেস ক্যাম্বেলের ভূমিকায় ... ডান এবং শ'এর ভূমিকায় ... খুব স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। ওঁরা যে তারিখ ব'লে-ব'লে চিঠি পড়ছেন, অভিনয়ের গুণে তা একবারও মনে হয়নি। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সৌজন্যে কিছুকাল আগে আমরা অনুরূপ আর একটি অনুষ্ঠান শুনেছিলাম —এমলিন উইলিয়াম্স-এর ডিকেন্স-পাঠ: এই সব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলা মঞ্চেও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে পারে, মিস্টার এরিক ক্লোন্‌সের মতন উদ্যোগী পরিচালক নিশ্চিত কোথাও-না-কোথাও লুকিয়ে আছেন বাংলাদেশে।

অস্কার পুরস্কারের নমিনেশন

আমেরিকার অস্কারের জন্য "হুজ অ্যাফ্রেড অব ভার্জিনিয়া উল্‌ফ" ১৩টি 'নমিনেশন' পেয়েছে। এত বেশী 'নমিনেশন' আর কোন ছবি পায় নি। দুটি ছবি ৮টি 'নমিনেশন' পেয়েছে। ছবিগুলি হল : "এ ম্যান ফর অল সীজনস" ও "দি স্যান্ড পেবলস"। শ্রেষ্ঠ চিত্র, অভিনয়, চিত্রনাট্য, পরিচালনা ছাড়াও "ভার্জিনিয়া উলফ" কলাকৌশলের ছয়টি বিভাগে "নমিনেশন" পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ চিত্রের অস্কার পেয়েছে "অ্যালফি", "এ ম্যান ফর অল সীজনস", "দি রাশিয়ানস আর কামিং", "দি স্যান্ড পেবলস" এবং "ভার্জিনিয়া উলফ"।

আন্তোনিওনির "ব্লো-আপ" (ব্রিটিশ) এবং ফ্রান্সের "এ ম্যান অ্যান্ড এ ওম্যান" ছবি দুটিও নমিনেশন পেয়েছে।

নেপথ্যে

"খেয়া"-র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন রূপক-গোষ্ঠী। ইউনিট-এ কারা আছেন সে সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। গোষ্ঠীতে রয়েছেন ছবির শিল্পী ও কলাকুশলীরা। 'সবে মিলি করি কাজ'-এর মত। প্রযোজক-সংগীত পরিচালক শ্যামল মিত্রকে রূপক গোষ্ঠির একজন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'খেয়া' শুরু হয়েছিল। কোন বিশেষ কারণে শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। ছেড়ে দেওয়ার প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে শ্যামল মিত্র নীরব। ব্যাপারটা তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়েই রেখেছেন।

অঞ্জু মহেন্দ্রু দমদম এয়ারপোর্টে কিছুক্ষণের জন্য ছিলেন। বোম্বাইয়ের প্লেন থেকে নেমে দার্জিলিং রওনা হবার আগে কিছু সময় তিনি এয়ারপোর্টে কাটিয়ে যান। অঞ্জুর সঙ্গে তাঁর মা শান্তি দেবীও ছিলেন। "জুয়েল থিফ" ছবির আউটডোর শুটিং-এর জন্যই তিনি দার্জিলিং হয়ে সিকিম যাচ্ছেন।

উসকি কহানী ছবিতে অঞ্জুকে দেখলাম। পরিচালক বাসু ভট্টাচার্য ছবির একটা 'প্রিণ্ট' নিয়ে গত সপ্তাহে কলকাতায় এসেছিলেন। শ্রীভট্টাচার্য স্টার-সিস্টেম-এর বিরোধী। তাই নতুন শিল্পী খুঁজতে গিয়ে তিনি অঞ্জুকে আবিষ্কার করলেন। বাসুবাবু প্রথম তাঁকে দেখেছিলেন বোম্বাই এয়ারপোর্টে। ছবির নায়িকা মনে মনে তখনই তিনি পছন্দ করে নিলেন। কিন্তু পরিচালকের এমনি কপাল, ছবি রিলিজের আগেই সোবার্স-প্রণয়িনী রাতারাতি স্টার হয়ে গেলেন। তবে ফিল্ম স্টার তিনি নিশ্চয়ই হবেন। ছবি মুক্তি পেলেই সেটা দেখা যাবে। এখন এর বেশী ওঁর অভিনয় বা গ্ল্যামার সম্বন্ধে কিছু বলা ঠিক হবে না।

"উসকি কহানী" ছবিটি এক্সপেরিমেণ্টাল। বোম্বাইয়ে সম্পূর্ণ নতুন শিল্পীদের নিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ আউটডোরে এত অল্পব্যয়ে আর কোন হিন্দী ছবি সম্ভবত তৈরী হয়নি। ছবির বাড়ি-ঘরও 'রিয়্যাল', সেট নয়। সংগীত পরিচালক কানু ঘোষ এবং আলোকচিত্রশিল্পী ননী ভট্টাচার্যও নতুন। রবীন্দ্রনাথের "ভেঙেছে মোর ঘরের চাবি"-র সুর ছবির থিম মিউজিক। ছবিতে অঞ্জুর মা শান্তি মহেন্দ্রুকেও কয়েকবার দেখা গেছে। নায়ক ও তার জননীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন তরুণ ঘোষ ও বীণা গান্ধী। ছবিতে এঁরা দুজনেই নবাগত। হেমন্তকুমার ও গীতা দত্তর গাওয়া দুটি গান ছবিতে আছে।

বোম্বাইয়ে ইতিমধ্যে সোবার্স ও অঞ্জুকে নিয়ে অল্পদৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করে ফেলেছেন বাসু ভট্টাচার্য। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারা দিনের শুটিং-এও কখনও ক্লান্তিবোধ করেননি সোবার্স। নানা জায়গায় ওঁদের নিয়ে গিয়ে ছবির শট নিয়েছেন পরিচালক। কখনও পার্টিতে, কখনও হোটেলে। বাগদান-অংগুরীয় ও ক্রিকেট পিচ-এর ক্লোজআপ তো আছেই। বাসুবাবু মনে করেন, সোবার্স তাঁর প্রণয়ের ব্যাপারে খুব সীরিয়স।

শ্মশানের উপর লেখা নরেন্দ্র ঘোষের একটি গল্পের কথা ভাবছেন বাসু ভট্টাচার্য। এই গল্পটি নিয়ে পরবর্তী ছবি করবার ইচ্ছা তাঁর। বাসুবাবুর ছবিতে স্টার থাকবে না ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম ছবি 'তিসরী কসম'-এ অবশ্য দুজন স্টার তাঁকে নিতে হয়েছিল। রাজ কাপুর ও ওয়াহীদা রেহমানকে। কিন্তু ছবিতে তাঁদের উপস্থিতি গ্ল্যামার স্টার হিসেবে নয়। রাজ কাপুরকে কীভাবে নেওয়া হল সে ঘটনা বাসুবাবু বলেছেন।

ছবিটির প্রযোজক ছিলেন গীতিকার শৈলেন্দ্র। রাজ কাপুরের সংগে শৈলেন্দ্রর হৃদ্যতা ছিল গভীর। শৈলেন্দ্র ছবি করছেন জেনে রাজ কাপুর বললেন, আমি তোমার ছবিতে কাজ করব। এমন 'অফার' পাওয়া যে-কোন প্রযোজকের পক্ষে ভাগ্যের কথা। বাসুবাবুকে শৈলেন্দ্র সুসংবাদ দিলেন। কিন্তু পরিচালকের তরফ থেকে বিশেষ কোন উৎসাহ না দেখে শৈলেন্দ্র চুপ করে গেলেন। পরে একদিন কথায় কথায় বলেই ফেললেন রাজকে। রাজ কাপুর একদিন রাত্রে চলে এলেন বাসু ভট্টাচার্যের বাড়িতে। এসেই সরাসরি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি আমাকে শিল্পী মনে করেন না?" উত্তর দিলেন শ্রীভট্টাচার্য, "শুধু একজন শিল্পীই নয়, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলেই মনে করি আপনাকে।" ...বাসুবাবু পরে বললেন, রাজ কাপুরকে তাঁর সমস্যার কথা। শুটিং-এর

"জুয়েল থিফ" ছবির শুটিংয়ের জন্য সিকিম রওনা হচ্ছেন অঞ্জু মহেন্দ্রু—দমদম বিমান বন্দরে তাঁর এই ছবি তোলা হয়

ফটো—দেশ

কলকাতায় নির্মীয়মাণ "দেশ হামারা" চিত্রের একটি দৃশ্য গ্রহণের আগে নাজ ও বেবী গুপ্তাকে নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক প্রমোদ শর্মা।

ফটো—দেশ

অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত "নয়ে রাস্তে" ছবিতে কেশব ও মিঠু

আগে বললেন, "আমি সর্বক্ষণ মনে রাখব আপনি রাজ কাপুর। আপনি সম্পূর্ণ ভুলে যাবেন যে, আপনার রাজ কাপুর।"

মেরা ভাই হিন্দী ছবির শুটিং (মণিহার-এর হিন্দী) কলকাতায় শুরু হচ্ছে কয়েক দিনের মধ্যেই। মেহমুদ ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। দুই ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন উত্তমকুমার ও দেব মুখার্জি। এ'দের মাঝখানে নায়িকা হবেন কে? সায়রা বানু কি? এমন একটা কথা শোনা যাচ্ছে।

শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী নিয়ে **দিলীপকুমার** ছবি প্রযোজনা করছেন। ছবির পরিচালক তিনিই হবেন। এবং নায়ক। নায়িকা হবেন তাঁর স্ত্রী সায়রা বানু। শচীনবাবু এই সংবাদ দিয়ে বললেন, ছবির শুটিং আরম্ভ হতে আর বিলম্ব নেই। তখন আমাকেও আবার যেতে হবে।

পতৌদির নবাব ও শর্মিলার পরিণয়

পতৌদির নবাব মনসুর আলী এবং শর্মিলা ঠাকুর সম্প্রতি তাঁদের বিয়ের 'এনগেজমেণ্ট' ঘোষণা করেছেন। কোথায় তাঁদের বিয়ে হবে তা এখনও জানা যায়নি। কিছুদিন আগে কলকাতায় এক সাংবাদিক সাক্ষাতকারে শর্মিলা ঠাকুর বলেছিলেন, এবছরেই তাঁদের বিয়ে হতে পারে। তাঁদের প্রণয় নিয়ে চলচ্চিত্র মহলে এতদিন জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। দুই স্টারের আসন্ন পরিণয়ের সংবাদে এখন সব কৌতূহলের অবসান হবে।

বিবিধপ্রসঙ্গ

"অ্যালফি" ছবির মাইকেল কেইন "স্টার অব দি ফিউচার" পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব থিয়েটার ওনারস্ এই পুরস্কারের প্রবর্তক।

জাঁ-লুক গদারের "এ ম্যারিড ওম্যান" ছবির অভিনেত্রী মাশা মেরিল (২৬) চিত্র-প্রযোজনায় আত্মনিয়োগ করছেন। "আমার জীবনটা গড়ে তোলার কথা অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম। আমার উপর বন্ধুদের আস্থা আছে। টাকাও জুটে গেল"—বলেছেন শিল্পী। এখন তিনি বুনুয়েলের একটি ছবিতে অভিনয় করছেন।

দিনো দি লরেন্তিস-এর "দি বাইবেল" ইণ্টারন্যাশনাল মার্টিন বুবার পুরস্কার পেয়েছে। ছবির পরিচালক জন হাস্টনকেও এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। দার্শনিক মার্টিন বুবারের স্মৃতিরক্ষাকল্পে ইণ্টারন্যাশন্যাল মার্টিন বুবার সোসাইটি স্থাপন করা হয়। সোসায়েটি চলচ্চিত্রের এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। বাইবেলের কাহিনীর উপর তৈরী শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে 'দি বাইবেল' পুরস্কৃত।

রাজেন্দ্রকুমার ও শর্মিলা ঠাকুর সর্বপ্রথম নায়ক-নায়িকা রূপে অভিনয় করছেন "গোল্ড মেডেল" ছবিতে।

মূকাভিনয়

সম্প্রতি মূকাভিনেতা দিলীপ বসু আগরতলা যুব সংঘের আমন্ত্রণে মূকাভিনয় পরিবেশন করে এসেছেন। ওই অঞ্চলে মূকাভিনয় শ্রীবসুই প্রথম প্রদর্শন করলেন এবং প্রতিটি স্কেচেরই দর্শকরা প্রশংসা করেন। বিশেষ করে 'কাপিং বয়', 'লেক অ্যাণ্ড লাভার', 'লেডিজ টয়লেট'স 'সাইকেলিং' এবং 'ফিশিং'। আগরতলা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শ্রী বসু বর্ধমান বিবেকানন্দ কলেজ, শান্তিপুর কলেজ, হাওড়া নরসিংহ কলেজ এবং চারুচন্দ্র কলেজে (সান্ধ্য বিভাগ) মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। চারুচন্দ্র কলেজের প্রাক্তন ছাত্রগণ শ্রীবসুর অনুষ্ঠান দেখে তাঁকে পুরস্কার প্রদান করেন। শ্রীবসুর সাথে সংগীতে সহযোগিতা করেন সমীর গুপ্ত।

সর্বভারতীয় চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল এবং পরিস্থিতি বর্তমান সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়। ভারত-ইউনিয়নের ষোলটি অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িষ্যা, মাদ্রাজ, কেরালা, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং রাজস্থান—এই আটটি রাজ্যে সম্মিলিত বাম ফ্রনট নির্বাচনে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এবং বাকী আটটি রাজ্যে কংগ্রেস সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৬জন সদস্য বিশিষ্ট যুক্ত ফ্রনট মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। কেরালা ও মাদ্রাজে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। বিহারে সংযুক্ত অ-কংগ্রেসী দলের নেতা মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। ওড়িষ্যায় স্বতন্ত্র ও জন কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব এবং রাজস্থানের অবস্থা এখনও অনিশ্চিত। রাজ্যপাল রাজস্থানে কংগ্রেস দলের মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানানোর ফলে সেখানে বিরোধী দলের বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি চলছে এবং নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেসপন্থী কোন কোন রাজ্যে এখনও মন্ত্রিসভা গঠিত হয় নি। তোড়জোড় চলছে মাত্র। লোকসভার সদস্য নির্বাচনে কংগ্রেস সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জন করলেও নেতা নির্বাচনে এখনও কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি।

দেশী সংবাদ—

২৭. **ফেব্রুয়ারি**—আজ রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গের বিদায়ী মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠকের কর্মসূচীতে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। তবে জানা যায়, দেশের খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা হয়। প্রকাশ যে, খাদ্যশস্যের যে মজুত বর্তমান সরকার রেখে যাচ্ছেন, তা দিয়ে বিধিবদ্ধ রেশনিং এলাকায় আগামী ছয় সপ্তাহ রেশনিং ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হবে।

হায়দরাবাদের নতুন নিজাম হয়েছেন শাহজাদা মুকাররম জাং—পরলোকগত নিজামের নাতি। তাঁর নতুন নাম হবে মীর বরকত আলি খান বাহাদুর। ভারত সরকার নতুন নিজামের স্বীকৃতি দিয়ে তাঁর বাৎসরিক ভাতা ২০ লক্ষ টাকা ঠিক করেছেন। এতদিন ছিল ৪৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

২৮ **ফেব্রুয়ারি**—সরকার আজ বিদায়ী লোকসভার ভাঙা-হাট অধিবেশন বাতিল করে দিয়েছেন। এ সিদ্ধান্ত আকস্মিক; কিন্তু বিরোধীদের মনঃপূত। প্রকৃতপক্ষে, বিরোধী তরফ থেকেই প্রস্তাবটি উঠেছিল। এজন্য রাষ্ট্রপতি একটি অরডিন্যান্স জারী করবেন।

শ্রী ই এম এস নামবুদিরিপাদের নেতৃত্বে কেরলে যে যুক্ত ফ্রনট মন্ত্রিসভা গঠন করা হচ্ছে, তাতে ১৩ জন সদস্য থাকবেন। সাতটি দল নিয়ে এই ফ্রনট গঠিত। ফ্রনটের জনৈক মুখপাত্র বলেন, কে কে মন্ত্রী হবেন তা অবশ্য এখনও পাকাপাকিভাবে ঠিক হয়নি।

১ **মারচ**—আজ কংগ্রেস ভবনে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভায় এগারোজন সদস্যের এক তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের জন্য সাংগঠনিক ত্রুটিবিচ্যুতি এবং কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের কাজকর্ম কতখানি দায়ী, তা কমিটি বিচার করে দেখবেন।

আজ ময়দানের জনসমুদ্রের সৈকতে দাঁড়িয়ে যুক্ত ফ্রনটের নেতৃবৃন্দ একের পর এক শপথবাণী উচ্চারণ করেছেন। প্রথম শপথ সর্বস্তরে দুর্নীতির উচ্ছেদ। দ্বিতীয় শপথ খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার অগ্রাধিকার। তৃতীয়—ধান চালের পাইকারী ব্যবসার রাষ্ট্রীকরণ।

২ **মারচ**—কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসাদিক আলি আত্মতুষ্টি এবং দলের মধ্যে রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সাধারণ নির্বাচনে দলের বিপর্যয়ের হেতু বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কেন্দ্রে জাতীয় কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব তিনি সমর্থন করেন না।

বুধবার শেষরাত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের লামডিং-মরিয়ানী সেকশনের তিতাবর ও খারিকাটিয়া স্টেশনের মধ্যে এক বিস্ফোরণের ফলে একখানি 'সারচলাইট স্পেশ্যাল' পাইলট ট্রেন লাইনচ্যুত হয়। পাইলট ট্রেনখানি আজ আসাম মেলকে নিয়ে যাচ্ছিল। এই বিস্ফোরণের ফলে রেলরক্ষী বাহিনীর একজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন। লাইনের এক স্থানে ১৫ ফুট লাইন উড়ে গিয়েছে।

৩ **মারচ**—পশ্চিমবঙ্গে প্রথম অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন এবং মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বণ্টনের কাজ আজ শেষ হয়েছে। আজ মধ্যরাত্রে বিভিন্ন বামপন্থী দলের প্রতিনিধিদের বৈঠক সমাপ্ত হয়। আগামীকাল এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য পুনরায় বৈঠক বসবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী চ্যবন আজ বোমবাই-এ বলেন যে, এবার কংগ্রেস পার্টিকে গুরুতর দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। কারণ, এবার জনসাধারণ কংগ্রেস এবং অকংগ্রেস সরকারের কাজকর্ম তুলনামূলকভাবে বিচার করবে।

৪ **মারচ**—পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রনট মন্ত্রিসভায় আরও দশজন সদস্য আগামীকাল রাজভবনে শপথ গ্রহণ করবেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় আজ রাজ্যপালের নিকট এই দশজনের নাম পেশ করেছেন। এ ছাড়া নতুন বিধানসভায় স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যথাক্রমে শ্রীবিজয় ব্যানার্জি ও শ্রীহরিদাস মিত্র যুক্ত ফ্রনটের প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন।

রাজস্থানের রাজ্যপাল শ্রীসম্পূর্ণানন্দ আজ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা শ্রীমোহনলাল সুখাদিয়াকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বানের সিদ্ধান্ত করেছেন। এই ঘোষণায় বিরোধী দলগুলির মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জয়পুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জয়পুর শহরে ৭ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হয়।

৫ **মারচ**—চার পাঁচ হাজার লোকের এক জনতা আজ পুরুলিয়ার আনন্দমার্গ আশ্রম আক্রমণ করে আশ্রমের পাঁচজন আবাসিককে হত্যা করেছে বলে এক সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে কিছুদিন যাবৎ আশ্রমবাসীদের গণ্ডগোল চলে আসছিল।

বিদেশী সংবাদ

২৭ **ফেব্রুয়ারি**—পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজুলফিকার আলি ভুট্টো আজ পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন যে, গণতন্ত্রের নাম করে আয়ুব পাকিস্তানে [illegible]বাদী শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। শ্রী ভুট্টো এ[illegible]ধে এক মাসের মধ্যেই বিক্ষোভ সংগঠিত [illegible] তোলার জন্য বিরোধী দলগুলিকে ও বিরো[illegible] দলভুক্ত রাজনীতিকদের আহ্বান জানিয়েছেন।

২৮ **ফেব্রুয়ারি**—উত্তর কোরিয়া কমিউনিস্ট চীনের আওতা থেকে হয়তো বেরিয়ে আসবে—এমন লক্ষণ দেখা দিয়েছে। উত্তর কোরিয়ার কনসাল জেনারেল লিজাং হোয়া আজ একটি বৈঠকে বলেন, চীনের লালরক্ষীরা ইসতাহারে এবং দেওয়ালপত্রে তাঁর দেশকে এবং উত্তর কোরিয়ার কমিউনিসট পারটিকে যেভাবে অপমান করছে তাতে তাঁর দেশ তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

১ **মারচ**—'স্টার' পত্রিকায় আজ বলা হয়েছে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব বন্ধ করার জন্য এবং চীনের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনে যে কার্যকরী ক্ষমতা থাকা দরকার, চেয়ারম্যান মাও সে-তুং প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাইকে তা পুরোপুরি দিয়ে দিয়েছেন।

২ **মারচ**—হংকং-এর 'স্টার' পত্রিকায় আজ এই খবর বেরিয়েছে যে, যে সব উচ্চপদস্থ লোক চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বলিস্বরূপ বিতাড়িত হয়েছিলেন, চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই আবার তাঁদের নিজ নিজ পদে বহাল করেছেন। চীনা প্রধানমন্ত্রী সমস্ত অপমানজনক শাস্তি বন্ধ রাখারও আদেশ দিয়েছেন।

৩ **মারচ**—বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ হ্যারল্ড উইলসন এবং তাঁর শ্রমিক সরকার সাংঘাতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। একদিকে ২,২০৫ মিলিয়ন পাউণ্ড প্রতিরক্ষা বাজেট এবং ৬৬০ মিলিয়ন পাউণ্ড অতিরিক্ত বাজেটের বিরুদ্ধে কঠোর অসন্তোষ জেগে উঠেছে। অন্য দিকে আইনের সাহায্যে দ্রব্যমূল্য এবং ব্যক্তিগত আয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার সরকারী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রায় আন্দোলনের পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

৪ **মারচ**—রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব উ থানট গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রেঙ্গুনে হ্যানয়ের কনস্যুলেট জেনারেলে উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে আজ তথ্যাভিজ্ঞ মহলের খবরে বলা হয়েছে বলে রয়টার জানাচ্ছেন।

৫ **মারচ**—তিব্বতের মুক্তি ফৌজের মাও বিরোধী কম্যাণ্ডার, চ্যাং কিউ হুয়ো তিব্বতের রাজধানী লাসার শাসন ক্ষমতা দখলের পর থেকে লাসায় সামরিক আইন চালু রয়েছে। পিকিং-এ প্রচারিত এক প্রাচীর-পত্রে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

যেট খাই—ষোল আনা তৃপ্তি চাই!
নির্বাচনী গরমে
১ নির্বাচনী গরম করেছেন? আমার তো এদিকে রোদে ঘুরে মন্ত্রিত্বী হবার যোগাড়। আর সাংবাদিকদের হামলাই এই!
আরে বসুন মশায়—দুদণ্ড জিরিয়ে নিন। এক কাপ চা? আর এই নিন, একটা সিজার্স ধরান। আমার আবার সিজার্স ছাড়া চলে না। খাসা সিগারেট!
২ আমিও তো সিজার্সেরই মক্কেল। সত্যি, সিজার্স ধরার আগে সিগারেটে যে এত তৃপ্তি তাই জানতাম না।
হবেই তো—সিজার্সের স্বাদই আলাদা—অন্য কোনো সিগারেটেই এমন স্বাদ পাবেন না। সেইজন্যেই সিজার্স সব সময় তৃপ্তি দেয়।
W.D.&H.O. WILLS
SCISSORS
সিজার্স-এর স্বাদই আলাদা—
সব সময় তৃপ্তি দেয়

সূচীপত্র

আমাদের মধ্যে একটা কথা···

আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে তা আর কি বলবো

প্রসবের সময়েও এতটুকু কষ্ট পেতে হয়নি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তাছাড়া লেডি ডাক্তারটিও খুব চটপটে এবং সহৃদয়া ছিলেন।

আমার বয়স যখন তোমার মতো ছিলো তখন আমার দিদি সন্তান প্রসবের সময় মারা যান। দাই ঠিক মতো প্রসব করাতে পারেনি। ১৫ মাইলের মধ্যে কোন হাসপাতাল ছিলোনা। অবশ্য যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি সহর থেকে লেডী ডাক্তারকে আনা হয়েছিলো কিন্তু তিনি এসে পৌঁছুবার আগেই দিদি মারা যান। ওঁর নিজের গাড়ী ছিলো, কিন্তু তখন আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত কোন রাস্তা ছিলোনা বলে হেঁটে আসতে হয়। আমাদেরই দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

সেটা বোধ হয় ১৯৪৪ সাল ছিলো, সেই বছরেই আরও কতকগুলি দুর্ঘটনা ঘটে। আমার দুইজন কাকা ম্যালেরিয়াতে মারা যান। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন উমার বাবা। আমার মাসতুতো ভাই অরুণের বাড়ীর সকলের বসন্ত হয়। আমাদের তখন ভগবানকে ডাকা ছাড়া অন্য উপায় ছিলোনা। তবে ভগবানের আশীর্ব্বাদে কেউ মারা না গেলেও, সকলের দেহেই রোগ তার স্থায়ী চিহ্ন রেখে যায়। সকলের ছোট বেনুকান্তর দুটো চোখই খারাপ হয়ে যায়।

আজকাল অবশ্য আমরা অকাল মৃত্যুর কথা বেশী শুনিনে, সে জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ। [illegible] কথা হ'ল সময় অনেক বদলে গেছে।

	১৯৫১	১৯৬৫
হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারি	৮,৬০০	১৫,০০০
ডাক্তার	৫৬,০০০	১০৩,০০০
মেডিকেল কলেজ	২৯	৮১
জন্মের পর আয়ুসীমা	৩২	৫০

(সি-৬২৭৬)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীসুধীর বৈরাগী

DISTRICT LIBRARY
COOCH BEHAR

বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন

পশ্চিমবঙ্গে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের পর বিধানমণ্ডলীর যুক্ত অধিবেশনেরও উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে। এই অধিবেশনের অনেক কিছুই আকর্ষণীয় ও নতুন। এই প্রথম অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার আমলে বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন বসল, এই প্রথম রাজনৈতিক নাগরদোলার দোলনাটি কংগ্রেসকে বিরোধীদের আসনে ঠেলে দিয়ে পূর্বতন বিরোধীদের সরকারী আসনে এনে ফেলল, আর বোধ করি এই প্রথম রাজ্য বিধানসভার সামনে কৌতূহলী, উৎসুক ও আনন্দে অধীর জনসমুদ্রের জোয়ার এসে একটি নতুন দিনের সূচনা করে গেল। এ ছাড়াও অনেক কিছু ঘটেছে যা পুরোনো প্রথার সঙ্গে খাপ খায়নি।

রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইড়ু বিধানমণ্ডলীর যুক্ত অধিবেশনের উদ্বোধন করতে এসে যে সংক্ষিপ্ত ভাষণটি দিয়েছেন সেটিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই ভাষণ অতি সংক্ষিপ্ত, অত্যন্ত সংযত। ভাষণে রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইড়ু নতুন সরকারের কয়েকটি নীতিগত দায়িত্বের কথাই মুখ্যত বলেছেন। এই দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে খাদ্য পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে নতুন একটি খাদ্যনীতি রচনা, বেকার সমস্যার জটিলতা অনুধাবন করে এই সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা, পুনর্বাসন ব্যবস্থার তৎপরতা ও উন্নতি, কলকাতার সমস্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়া ইত্যাদি। মোটামুটিভাবে রাজ্যপাল এই রকম আশ্বাস দিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেণীর লোক—শিক্ষক, চাষী, ক্ষেত-মজুর, কারখানার শ্রমিক, নিম্ন-আয়ের সরকারী কর্মচারী সমেত সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের উন্নতির চেষ্টাই হবে নতুন সরকারের লক্ষ্য। 'এই সমস্যাসংকুল রাজ্যে এক স্বয়ংনির্ভর ও সমৃদ্ধিশালী অর্থনীতি গড়ে তোলার' দায়িত্ব তিনি নতুন সরকার ও দেশের যাঁরা জন-প্রতিনিধি, তাঁদের সকলের হাতে তুলে দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের যেসব গুরুতর সমস্যার কথা রাজ্যপাল উল্লেখ করেছেন, সেই সমস্যাগুলি আমাদের কারও অজানা নয়। দীর্ঘদিন বারে বারে এই সমস্যার কথা তোলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সমস্যাটি সম্পর্কে সচেতন থেকেও কোন কাজ কতটা হয়েছে, তা বিচার্য। সাধারণভাবে মনে হবে যা হয়েছে তা সমস্যা লাঘবের পক্ষে এমন কিছু নয় যা মনে রাখা যেতে পারে।

এ-কথা বললে বোধ হয় বেশি বলা হবে না যে, পুরোনো সরকার যেসব সমস্যা মাথায় নিয়ে বসে কাজ করেছেন নতুন সরকারকেও তার মধ্যে বসে কাজ করতে হবে। সমস্যাগুলি জটিল এবং তার আশু সমাধান সহজ নয়। যাই হোক, আমরা জানি, নতুন সরকারের মধ্যে যদিও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতামত ও আদর্শে বিশ্বাসীরা রয়েছেন, তবু তাঁরা একটি বিষয়ে একমত, এক-লক্ষ্য। এই রাজ্যের জনসাধারণের দুর্গতি ও ক্লেশ তাঁরা নিবারণ করবেন, সাধারণ মানুষের মঙ্গল করবেন—এই তাঁদের প্রধান ও মূল নীতি। বলা বাহুল্য, যদি এই চিন্তা—মানুষের দুঃখক্লেশ নিবারণ ও মঙ্গল করার চেষ্টাই—তাঁদের একমাত্র চিন্তা হয়, তবে আশা করব পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সমর্থন তাঁরা কখনই হারাবেন না।

এত দ্রুত আমাদের পক্ষে কিছুই বলা উচিত নয়। দেখতে হবে, প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র সমস্যা কিভাবে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা বিচার করেন এবং কোন্ নীতি ও কাজ দিয়ে তাঁরা সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, জনসাধারণকে খানিকটা ধৈর্য ধরে থাকতে হবে এখন, নতুন সরকারকে কাজ হাতে নেবার ও কাজ করার সময় দিতে হবে। আমরা মনে করি, আপাতত কিছুটা ধৈর্য সকলেরই প্রয়োজন।

নতুন খাদ্যনীতির বিষয়ে এখনও আমরা কিছু জানতে পারিনি। হয়ত এ-কারণে অনেকেই চঞ্চল হয়ে আছেন। খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ খাদ্য-বিষয়ে তাঁর প্রারম্ভিক কাজগুলি সারছেন, সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন, অচিরেই তাঁর খাদ্যনীতি ঘোষণা করবেন। ইতিমধ্যে কিছু গুজব বাজারে সৃষ্টি হয়ে থাকলেও তার কোনো মূল্য নেই। মনে রাখতে হবে, ডঃ ঘোষ এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, অনাহারে কাউকে মরতে দেওয়া হবে না।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বিধানসভায় তাঁর বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেট পূর্বতন সরকার কর্তৃক রচিত, এবং আগামী মাস চারেকের মত ব্যয়বরাদ্দের হিসাবই তার বড় কথা। বস্তুত নতুন সরকারের নিজেদের তৈরি বাজেট আমরা পরে দেখতে পাব। সেই বাজেটটি অবশ্যই আমাদের কাছে আকর্ষণীয় বিষয় হবে, কেননা তার দ্বারা বা তার মধ্যে নতুন সরকারের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়বে।

সুকর্ণ, স্বেতলানা

একজনের তিরোভাব, আর একজনের আবির্ভাব: কোনটাই আক্ষরিক অর্থে নয়। সুকর্ণকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে যবনিকার আড়ালে; স্ট্যালিন-কন্যা স্বেতলানা বেরিয়ে এসেছেন সোভিয়েট রাষ্ট্রযন্ত্রের নাগালের বাইরে। সুকর্ণ স্বনামধন্য, স্বেতলানার সম্বল পিতৃ-পরিচয়। প্রথমে সুকর্ণের কথা। একুশ বছর ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার "বিপ্লবের মহান্ নেতা", স্বাধীন ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি পদ থেকে সুকর্ণ এখন বিতাড়িত, তিনি প্রায় রাষ্ট্রদ্রোহীর সামিল। "জনগণের উপদেষ্টা পরিষদে"র সিদ্ধান্ত মত প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ ইতমান, পদচ্যুত। এই উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান জেনারেল নাসুশন; ১৯৬৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কর্নেল উনতুং-এর সামরিক অভ্যুত্থানে তাঁর প্রাণ যায়-যায় হয়েছিল, তাঁর ছোট মেয়েটি রক্ষা পায়নি, ছয়-ছয়জন ফৌজী নেতাও মারা পড়েন উনতুং-এর বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হাতে। জেনারেল নাসুশন এবং তাঁর সহযোগী সেনানায়করা এর "বদলা" নিয়েছিলেন সারা ইন্দোনেশিয়ায় লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যার ব্যবস্থা করে। বাকী ছিলেন প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ, তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজী নায়কদের অভিযোগ ঃ উনতুং-এর সামরিক অভ্যুত্থান ও সেই সঙ্গে কম্যুনিস্টদের ক্ষমতা দখল চেষ্টার পিছনে সুকর্ণের সায় ছিল। সুকর্ণ অস্বীকার করেছেন; ১৯৬৫ সনের সেপ্টেম্বর-বিদ্রোহে জড়িত সন্দেহে ধৃত অনেকে সামরিক আদালতে কিংবা পুলিশের কাছে নানারকম স্বীকারোক্তি করেছেন, কিন্তু কয়েক দিন আগেও জেনারেল সুহর্ত বলেন, উনতুং-বিদ্রোহের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের হাত ছিল, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ অপদস্থ, ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন, এটা প্রত্যক্ষ সত্য, কী কারণে তাঁর এই পরিণতি, সেটা পরিষ্কার নয়। জেনারেল নাসুশনের সভাপতিত্বে "জনগণের উপদেষ্টা পরিষদ" সুকর্ণকে বরখাস্ত করেছেন, এটা মোটেই আশ্চর্য নয়। এই উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা ফৌজী নায়কদের বাছাই করা; জেনারেল সুহর্ত-নাসুশন-আদম মালিক ক্ষমতা-চক্রের বিরোধী সদস্যরা উপদেষ্টা পরিষদ থেকে অনেক আগেই বিতাড়িত হয়েছেন, রাস্তায় কিংবা বন্দীশালায়। এক হিসেবে সুকর্ণ তাঁর স্বকৃত কর্মেরই পুরস্কার পেয়েছেন; "নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রে"র সূত্র তাঁরই রচিত, বশম্বদ লোকদের নিয়ে "জনগণের উপদেষ্টা পরিষদের" ঠাটও তাঁরই রাবার-স্ট্যাম্প মারবার ব্যবস্থা। রাবার-স্ট্যাম্প তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন ফৌজী নায়করা। ফলে টেবিল উলটিয়েছে; "নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের কর্ণধার", চিরস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ এখন টের পাচ্ছেন, রাজনীতিতে কারও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই শেষ পর্যন্ত টেঁকে না।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট সীংম্যান রী ছিলেন এককালে জনসাধারণের পরম-পূজ্য নেতা। নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকার পেয়ে প্রেসিডেন্ট সীংম্যান রী চালিয়ে-ছিলেন অত্যাচার-অনাচারের অভূতপূর্ব মহোৎসব। তারপর জনতার রোষে রী হলেন পদচ্যুত এবং প্রাণের দায়ে দেশ-ত্যাগী। দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট দিয়েমের মৃত্যু আরও ভয়াবহ। মুসোলিনির দৃষ্টান্ত অনেকটা আলাদা প্রকৃতির। আজ যখন সুকর্ণ ইন্দো-নেশিয়ার দীনতম নাগরিকের চেয়েও দুর্দশাগ্রস্ত, তখন তাঁর কর্মজীবন সম্পর্কে ভালো-মন্দ সব দিক সাধারণত বিচারে দোষ নেই। ইন্দোনেশিয়ার রাজ-নৈতিক গগনে সুকর্ণ হঠাৎ ধূমকেতুর মত দেখা দেননি। সব ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েও স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ইন্দোনেশিয়ার প্রতিষ্ঠায় সুকর্ণের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের গুণ স্বীকার না করে উপায় নেই। সুকর্ণের বাগ্মিতা, জনপ্রিয়তা অসামান্য, যে-কারণে ফৌজী নায়করা সুকর্ণকে মুখ খোলবার সুযোগ দিতে সাহস পাচ্ছেন না। সুকর্ণের ব্যক্তিগত জীবনে বিলাস-লালসার আতিশয্য দেখা দেয়, এটা প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর প্রশ্নাতীত প্রতাপ-প্রতিপত্তিরই শোচনীয় পরিণতি।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদকে সুসংগঠিত করবার কৃতিত্ব অনেকখানি সুকর্ণের প্রাপ্য। এক হাজারেরও বেশী ছোট-বড় দ্বীপময় দেশ, নানা ভাষা, বহু গোষ্ঠী। সুকর্ণই এগুলিকে একসূত্রে বেঁধেছিলেন এক প্রাণ, এক জাতি ও দেশীয় প্রজাতন্ত্রকে। পাশ্চাত্ত্য শক্তি-গোষ্ঠীর সঙ্গে সুকর্ণ মানিয়ে চলতে পারেন নি; কম্যুনিস্ট চীন অথবা ইন্দো-নেশিয়ার কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তাই সুকর্ণের ঘনিষ্ঠতা হয় অনেকটা কূটনৈতিক কারণে। সুকর্ণকে প্রচ্ছন্ন কম্যুনিস্ট সন্দেহ করার কারণ নেই; তাঁর রাষ্ট্র-নেতৃত্বেই অন্তত দুই-দুইবার, ১৯৪৮ সনে এবং ১৯৫৪ সনে ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্টদের বিদ্রোহ-আন্দোলন কঠোর-ভাবে দমন করা হয়। সম্ভবত পাশ্চাত্ত্য শক্তিগোষ্ঠীর চাপেই সুকর্ণ আত্মরক্ষার তাগিদে ক্রমে ক্রমে কম্যুনিস্ট চীন ও ইন্দোনেশীয় কম্যুনিস্টদের দিকে ঘেঁষতে থাকেন। তার আগে সুমাত্রায় দারুল ইসলামপন্থী স্বাতন্ত্র্যকামী বিদ্রোহীদের বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিল বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সি আই এ। আধা-সরকারী এবং বে-সরকারী মার্কিন মহলের খবর থেকে আরও জানা যায়, ইন্দোনেশিয়ার ফৌজী নায়কদের মধ্যে একটি ক্ষমতালোভী গোষ্ঠীর সঙ্গে সি আই এ-র যোগাযোগ ছিল আগাগোড়া। কিছুদিন আগের খবর, পাশ্চাত্ত্য গোষ্ঠীর কোন কোন রাষ্ট্রের কূটনীতিকরা জেনারেল সুহর্তকে আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন, সুকর্ণকে তড়ি-ঘড়ি ক্ষমতাচ্যুত করা চাই, নতুবা বিদেশী অর্থসাহায্য ইত্যাদি ইন্দোনেশিয়া পাবে না। সুকর্ণের পদচ্যুতি ব্যাপারটা উপর-উপর ইন্দোনেশিয়ার ঘরোয়া রাজনীতি মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তা নয়।

স্ট্যালিনের প্রতিদ্বন্দ্বী ট্রটস্কী সোভিয়েট ভূমি থেকে নির্বাসিত হন ১৯২৮ সনে; স্ট্যালিন-কন্যা স্বেতলানা সোভিয়েট দেশ ছেড়ে এলেন এই ১৯৬৭ সনে, যে-বছর কিনা বলশেভিক বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর পূর্তি। ট্রটস্কীর নির্বাসন আর স্ট্যালিন-কন্যা স্বেতলানার দেশত্যাগ, এ-দুটির মধ্যে সাদৃশ্য অবশ্য নামমাত্র। ট্রটস্কী ছিলেন অদ্ভুতকর্মা বিপ্লবী, স্বেতলানার পরিচয় স্টালিন-কন্যা ছাড়া আর কিছু নয়। রাজনৈতিক মতামত তাঁরও থাকতে পারে, তবে স্টালিন-কন্যা সোভিয়েট রাজ-নীতিতে কখন কোন সক্রিয় অংশ নিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। স্টালিন-পরিবারে স্টালিনেরই ছিল রাজনীতিতে একচ্ছত্র অধিকার। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু সম্পর্কে নানারকম কিংবদন্তী প্রচলিত। স্টালিন তাঁকে খুন করেন কিংবা তিনি নিজেই আত্মহত্যা করেন, এই দুটি কিংবদন্তী ছাড়া আরও একটি আছে। স্টালিন-গৃহিণীকেও কাজ করতে হত, মস্কোর একটি ফ্যাক্টরীতে কাজ। অতি-শ্রমে অথবা অন্য কোন কারণে তিনি

স্টালিনকে ভয় বা অতিমাত্রায় সমীহ করতেন, তাই রোগের কথাটা বহুদিন চেপে রাখেন। সময়মত চিকিৎসার অভাবে তাঁর মৃত্যু; শোনা যায়, তাঁর সমাধিস্থলে স্টালিন কখন কখন যেতেন।

স্টালিন-কন্যা স্বেতলানার প্রথম বিয়েটা স্টালিনই ভেঙে দেন, এটা অনায়াসে বিশ্বাস করা যায়, প্রমাণ অন্ধের "স্টালিন" সুন্দরায়া কর্তৃক কেরালের শ্রীমতী গৌরী টমাসকে স্বামীর ঘর-ছাড়া হওয়ার হুকুম। স্বেতলানার দেশত্যাগের রহস্যটা ঘোরাল। সোভিয়েট দেশে তিনি নিজে নির্যাতিত হয়েছেন, এমন কোন অভিযোগ শোনা যায় না। কিন্তু তাঁর মানসিক ক্লেশটা কী গভীর যন্ত্রণা ও হতাশা সৃষ্টি করতে পারে, সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। "মহান" স্টালিনের আদর্শ কল্পমূর্তি সোভিয়েট দেশে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে, অনেকের পক্ষে এটা স্বস্তির। কিন্তু স্টালিন-কন্যা স্বেতলানার পক্ষে পিতৃ-নিন্দার এই নিরন্তর প্রবল পীড়ন নিশ্চয়ই যথেষ্ট মনোকষ্ট এবং আত্মগ্লানি সৃষ্টি করেছে। তারপর তাঁর স্বামী অথবা প্রণয়ীর মৃত্যু। স্বেতলানা সম্ভবত এই সব কারণে সোভিয়েট দেশে অনুভব করেছেন অসীম রিক্ততা। তার ফলেই হয়তো দেশত্যাগ। এছাড়া রাজনৈতিক কারণ যদি কিছু থাকে সে-সব আপাতত ধরাছোঁয়ার বাইরে। রাজনৈতিকভাবে স্বেতলানা নির্যাতিত হয়েছিলেন মনে করা শক্ত, স্টালিনের দোসর মলোটভ এখনও মস্কোয় বহাল তবিয়তে বিচরণ করতে পারছেন। যাই হোক, আপাতত পিকিং-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবীদের মস্ত সুযোগ; তারা বলতে পারবে, সোভিয়েট "শোধনবাদীদের" জ্বালায় সাচ্চা কমিউনিজমের দিকপাল "মহান" স্টালিনের কন্যা পর্যন্ত দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।

১৩-৩-৬৭

চীনের সঙ্গে
চুক্তি
চাই॥
আমাদের
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী মহামায়া
প্রসাদ একজন মল্লবীর।
মহেশবাবু,
খুব সাবধান!
দলীয় নেতা নির্বাচনে বড়ুয়া পরাজিত।
'বন্ধুরা যত স্বপ্নের মত বাসা ছেড়ে
দিল ভঙ্গ।'
বড়ুয়া

সুনন্দর জার্নাল

'এই শিল্পীরা'

একটি ছিমছাম-কেজো চেহারার তরুণ দেখা করতে এলেন। পরনে আধময়লা খাকি ট্রাউজার, একটি হাফশার্ট। বললেন, 'আমি বালিগঞ্জ থেকে আসছি।'

'বেশ, বলুন।'

'যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ডক্টর অমুক'—জনৈক অধ্যাপকের নাম করলেন তিনি: 'আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে আপনি নিশ্চয় চেনেন।'

বললুম, 'না, দুঃখিত। চিনতে পারলুম না।'

তরুণটি আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

'বলেন কি—তিনি যে বললেন, আপনার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় আছে।'

আমি লজ্জিত হলুম। একজন কৃতবিদ্য অধ্যাপক আমাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে চেনেন অথচ আমার মতো তুচ্ছ ব্যক্তি তাঁকে স্মরণ করতে পারলুম না, নিজের এই স্মৃতির দীনতা আমাকে বিদ্ধ করল।

'হয়তো মুখ দেখলে নিশ্চয়ই চিনতে পারব। সব সময় নামটা'—আমি কুণ্ঠিত-ভাবে বললুম, 'বলুন, তাঁর জন্যে আমি কী করতে পারি।'

'দরকারটা ঠিক তাঁর নয়, আমার নিজেরই কিছু কথা ছিল।'

'বলুন।'

তারপর একটি সংক্ষিপ্ত কাহিনী শুনতে হল। তরুণটি বি এস-সি পাশ। কোনো একটি নামজাদা এন্‌জিনীয়ারিং ফার্মে চাকরি করতেন। সেখান থেকে ছাঁটাই হয়ে যান। এরপরে কষ্টের সীমা নেই—কোনো কোনোদিন পেট ভরে খাওয়া পর্যন্ত জোটে না। সম্প্রতি একটি প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা দিয়ে—আউট অব থ্রী হানড্রেড্ যে পঁচিশজন নির্বাচিত হয়েছেন, 'লাকিলি' তিনি তাঁদেরই একজন। আজই তাঁর রাউরকেলা যাওয়া দরকার। মুশকিল হয়েছে 'প্যাসেজ-মনি' নিয়ে। আমি যদি—

বললুম, 'খুব ভালো কথা। যা পারি, নিশ্চয় দেব। তবে অনুগ্রহ করে আর একটি কাজ করুন। যিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছ থেকে, তাঁর নিজস্ব লেটার-প্যাডের একটি চিঠি নিয়ে আসুন। আর তিনি কত দিচ্ছেন, সেটাও যেন লিখে দেন।'

তরুণটি বললেন, 'তা হলে তো আবার বেহালা যেতে হয়।'

'ঘুরে আসুন না। আমি দশটায় অফিসে বেরুব। এখনো প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় আছে।'

'আমাকে বিশ্বাস করছেন না বোধ হয়।'

তরুণটি ক্ষুব্ধ হলেন: 'তার মানে, এর আগে আপনি "চীটেড্"—বললুম, 'হ্যাঁ, এরকম অভিজ্ঞতা কিছু আছে। আপনি চিঠিটা নিয়ে আসুন, দশটা পর্যন্ত আমি আছি।'

তিনি চিঠিটা আনতে গেলেন। আর ফেরেননি। ফিরবেন না যে, আগেই অনুমান করেছিলুম।

এই আর এক উপজীবিকা।

সামাজিক মানুষের সহজ সহৃদয়তা, তার

প্রথমে সাধারণভাবে বিশ্বাস ... পরিবেশকারের আত্মতুষ্টি—এদের ওপরেই এইসব জীবিকার মূল। কখনো ধীরে সুস্থে, কথার জাল ছড়িয়ে—সমস্ত ব্যাপারটিকে পরম বিশ্বাস্য করে তুলে কার্যসিদ্ধি, কখনো বা বৈদ্যুতিক আক্রমণ—মর্মভেদী একটি পরিস্থিতি রচনা করে মানুষের আবেগকে একেবারে অভিভূত করে ফেলা। একান্ত যুক্তিবাদী এবং পরম ক্ষুরধার বুদ্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তিও এঁদের কাছ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন কিনা, তাতে সন্দেহ আছে।

নানা রূপে এঁদের আবির্ভাব ঘটে। কখনো রাত এগারোটায় খটখট করে বাড়ির কড়া নড়ে, দেখা দেন অশ্রুমুখী কোনো মহিলা। তাঁর স্বামীর অবস্থা সাংঘাতিক, হাসপাতালে আছেন এখুনি রক্ত কিনতে হবে ব্লাড-ব্যাঙ্ক থেকে, অতএব অবিলম্বে কুড়িটি টাকা চাই। দুপুর বেলায় 'আর্ট' স্কুলের একটি ছাত্র উস্ক-খুস্ক মূর্তিতে হাজির বাড়ির মেয়েদের কাছে, তার বগলে খানকয়েক ছবি। আজই তার ফীজ দেবার শেষ দিন, দুটোর মধ্যে টাকা জমা দিতেই হবে, সুতরাং—। চলতি পথে জীর্ণ বেশধারী একজনের আবির্ভাব, হাতে ছিন্নপ্রায় একটি প্রেসক্রীপশন—এই মুহূর্তে তার ওষুধ কেনা দরকার, অথচ—। কেউ বা সামান্য 'স্কুল-শিক্ষক'—ভারতীয় দর্শনের ওপর খুব জটিল বই লিখছেন (প্রমাণ স্বরূপ পাণ্ডুলিপি গোছের কিছু আছে সঙ্গে): 'কেউ তো প্রকাশ করবেনা এ-সব বই, নবেল-টবেল না হলে—তা আপনি যদি কিঞ্চিৎ'—

কিংবা সেই রকম শীর্ণকায় একজন, যাঁর ছেঁড়া জামা এবং ভাঙা ছাতা—কথায় কথায় যাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ে। যাঁর নাম হয়তো সুধীররঞ্জন চক্রবর্তী, যিনি ইংরেজীতে এম-এ, পাকিস্তানে যাঁর বইয়ের ব্যবসা ছিল, কিন্তু গুণ্ডার হাতে যিনি সম্প্রতি সর্বস্ব হারিয়েছেন, স্ত্রী পাগল হয়ে গেছেন, যাঁর এম-এস-সি পাশ মেয়ে লাঞ্ছিতা হয়েছে—যার গায়ে ছুরির ঘা নাকি এখনো শুকোয়নি—যিনি 'হাইলি কনেকটেড' হলেও ভিক্ষে চান না কারুর কাছে, কেবল সেই মুমূর্ষু মেয়েটিকেও যদি একটি চাকরি—

মেয়েটিকে চাকরি দেওয়া তৎক্ষণাৎ হয়তো সম্ভব হবে না, কিন্তু ভিক্ষে না চাইলেও সেই দুর্ভাগা ভদ্রলোককে আপনি উপযাচক হয়েই সাহায্য করবেন, তারপর মেয়েটির চাকরির ব্যাপারে একটু খোঁজ-খবর করতে গিয়েই জানবেন—

কী জানবেন, তা আর বলবার দরকার নেই। সমবেদনার ওপরে ডাকাতি কাকে বলে, সেই মুহূর্তে মর্মে মর্মে অনুধাবন করবেন আপনি।

কেন মানুষে এই জীবিকা বেছে নেয়, তার হয়তো সামাজিক এবং মনস্তত্ত্বঘটিত বিবিধ গুরুতর কারণ আছে। হয়তো অভাব, হয়তো নিরুপায় পরিবেশ, হয়তো সঙ্গদোষ, হয়তো স্বভাব-দুর্বৃত্তবৃত্তি—বিশেষজ্ঞেরা তার পুরো বিশ্লেষণ করতে পারবেন। কিন্তু সন্দেহ নেই, এরা অনেকেই প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। ইমাজিনেশ্যান এবং রিপ্রেজেন্টেশ্যান, দুইয়েতেই একেবারে সিদ্ধ সাধক এবং সাধিকা। আমার কাছে মজা যে তরুণটি ঘুরে গেল সে এখনো পুরো শিল্পী হতে পারেনি, এখনো তার মহড়া চলছে মনে হয়।

আমি ভাবছি এদের ওপরে আমার রাগ করা উচিত কিনা। পয়সা দিয়ে উপন্যাস যখন কিনে পড়ি, তখন জানি তার সবটাই বানানো গল্প—কিন্তু খুব খারাপ না লাগলে পয়সার অপচয় হয়েছে বলে মনে করিনা—যা সত্যের ভান তা-ই আমার মনকে দোলায়, চোখে জল আনে। ছবি দেখতে যাই, নায়িকার মৃত্যুদৃশ্যে পকেট থেকে রুমাল বের করি, কিন্তু চলচ্চিত্র-পত্রিকার কল্যাণে জানি এ-ভাবে নদীতে ঝাঁপ দেবার পাত্রী তিনি নন—তার হাতে এই মুহূর্তে আরো আটটি বইয়ের কনট্রাক্ট। তখন এ-সব প্রশ্ন মনে জাগেনা যে, আগাগোড়া মিথ্যার পশরা সাজিয়ে দিয়ে কেউ আমাকে ঠকিয়ে গেল, একবারও ভাবতে ইচ্ছে করেনা—এই নাটকের অন্ধ বাউলকে পরশুই এক চীনা-রেস্তোরায় প্রাণপণ 'চাউ-চাউ' খেতে দেখেছি।

আসলে, সাজানো মঞ্চ আর ছাপানো বইয়ের ইলাস্ট্রেশন না থাকলেই আমরা রিয়ালিস্ট। তখন অভিনয় মাত্রেই জুয়াচুরি। তখন বুদ্ধির একবিন্দু অভিভবও দুঃসহ। তখন ভ্যানিটির কণ্টকশয্যায় অধিষ্ঠান।

না হলে, এই শিল্পীদের জেলে পাঠাবার কথা না ভেবে, তাদের গলায় বরমাল্য পরাতুম আমরা॥

প্রতীকী সংলাপ

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

"দিনমান তো বৃথাই গেল, এখন আমার যুদ্ধ:
এখন আমার অস্ত্রসজ্জা সব কিছুর বিরুদ্ধে।"
বলেই তিনি হাত বাড়িয়ে নিলেন পদ্মফুল।

"এটা কেমন যুদ্ধ? সাদা পদ্মফুলের কান্তি
যে বস্তুটার প্রতীক, সেটা নিতান্তই যে শান্তি।"
দ্বিতীয়জন তন্মুহূর্তে ধরিয়ে দিলেন ভুল।

"তবে বৃথাই বর্ম আঁটো, সাজাও চতুরঙ্গ,
এখন আমি সন্ধি করব ঈশ্বরের সঙ্গে।"
বলেই তিনি পদ্ম ফেলে গোলাপ তুলে নিলেন।

"এটা কেমন সন্ধি? জানে সবাই জগৎসুদ্ধ
গোলাপ ঝরায় রক্তধারা, গোলাপ মানেই যুদ্ধ।"
দ্বিতীয়জন পুনশ্চ তাঁর ভুল ধরিয়ে দিলেন।

আমরা দেখছি, খেলায় মত্ত প্রতীকী উদ্‌ভ্রান্তি।
রৌদ্রে ভাসে চবুতরা, ছায়ায় ভাসে খিলেন।
ভুল ঠিকানায় ঘুরে বেড়ায় যুদ্ধ এবং শান্তি।

এই বসন্তে বৃষ্টি হবে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার যে সব লক্ষ্যগোচর তুমি আমায় এমনি ভাবো
শিখর থেকে নখ অবধি পারলে এক লহমায় খাবো—
যেমন খেতো বক-রাক্ষস, সাল-পুরোনো ম্যাজিকঅলা,
আমার বুকের ওপর ভিজছে, তাই ভেজেনি বুকের তলা—
এই কি তোমার বৃষ্টিবাদল? আকাশ দেখছি হরিদ্রাভ—
আমার যে সব লক্ষ্যগোচর, তুমি আমায় এমনি ভাবো!

দরজা খুলে দিচ্ছি কপাট, সব ঘাটে কি থামছে তরী?
ওপর-নিচ পারদের ফোঁটা—এই তো' সময়, গলার দড়ি
বসছে আলিঙ্গনের মধ্যে যেমন বসে অধর-ওষ্ঠ।
দূরদেশী ও রাখাল-ছেলে, কই ধেনু, উচ্ছন্ন গোষ্ঠ,
কই মেলা, সাপ খেলার বাঁশি? বাউল-ক্ষেপা-বাসরঘরী?
দরজা খুলে দিচ্ছি কপাট—সব ঘাটে কি থামছে তরী?

ত্যাগে আমার ভাগ বসেছে—এই বসন্তে বৃষ্টি হবে,
আকাশ মেঘে করবে তাথৈ, মন বসে সাঁওতাল-পরবে
লক্ষ্মীটি, ওই খাগরা-বরন পরজাপতি পুচ্ছ তুলে
আয় বিদেশে বাস্তু করি—চাল-চুলো-চৌকাঠটা খুলে
নীল দিগন্তে ফুলের আগুন—সেই আগুন পোড়াচ্ছে কবে?
ত্যাগে আমার ভাগ বসেছে, এই বসন্তে বৃষ্টি হবে।

নতুন ফর্মুলায় তৈরী গয়া। আপনার
কল্পলোকের মনোমোহিনী ট্যাল্‌কম্‌।
কুয়াশার মত মিহি-মৃদুল,
অন্য যেকোনো ট্যাল্‌কমের চেয়ে
ঢের বেশী সুচারু, ঢের বেশী
লঘুভার।
গয়া-র শিল্পীদের সৃষ্টি
এই মধুগন্ধ পাউডার
আপনাকে সারাদিন সুরভিত
সারাদিন তাজা রাখবে।
ভিন্‌দেশী **ব্ল্যাক রোজ**,
টাটকা ফুলেল **গার্ডেনিয়া**
আর মনমাতানো **পাসপোর্ট**—
যেটা ইচ্ছে বেছে নিন।
মনে রাখবেন, তিন রকম পাউডারই
পাবেন নতুন দীর্ঘাকার আধারে।
এগুলি বেশীদিন চলবে।

অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিঃ
(ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)

**নতুন দীর্ঘাকার
আধারে
নতুন ফর্মুলায়
মিহি-মৃদুল ট্যাল্‌কম**

পশ্চিমবঙ্গে — নির্বাচন ও তারপর —

[illegible]

এ [illegible] রাজনীতি [illegible] খানেক আগেও কোনও রাজনৈতিক [illegible] যা ভাবতে পারেন নি, আজ তাই হয়েছে ঃ নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত এবং বাংলা কংগ্রেস থেকে আরম্ভ করে বাম কমিউনিস্ট পার্টি পর্যন্ত প্রায় সব অ-কংগ্রেসী দলকে নিয়ে রাজ্যে কোয়ালিশন সরকার প্রতিষ্ঠিত।

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের জয় অবশ্যম্ভাবী বলে প্রায় সবাই ধরে নিয়েছিলেন। কংগ্রেসী নেতারা তো নিশ্চয়ই, বিরোধীরাও। ব্যতিক্রম ছিলেন অবশ্য দুজন, অধ্যাপক হুমায়ুন কবির এবং শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত। কংগ্রেস ত্যাগের মুখে অধ্যাপক কবির নাকি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে বলে এসেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস কিছুতেই জিততে পারবে না। আর ভোটভুটির দিনও শ্রীদাশগুপ্তের মনে কংগ্রেসের পরাজয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না।

কিন্তু রাজ্যের রাজনীতির দ্বিতীয় পরিবর্তনটা এরা দুজনেও কল্পনা করতে পারেন নি। অধ্যাপক কবিরের ভবিষ্যৎবাণী ছিল ঃ নির্বাচনে কংগ্রেস হারবে। তবে, অকংগ্রেসীরাও কোয়ালিশন গঠন করতে পারবেন না। ফলে, চালু হবে রাজ্যপালের শাসন। এবং তারপর যে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেস একক গরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করবেন। শ্রীদাশগুপ্ত মনে করেছিলেন ঃ কংগ্রেস একক গরিষ্ঠতা পাবে না এবং ফলে বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ারড ব্লক, ডান কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনে বাধা হবে।

দুজনেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কংগ্রেস হারবে। কিন্তু অ-কংগ্রেসীরা কারা কীভাবে জিতবেন সে বিষয়ে দুজনে বিরাট মত পার্থক্য ছিল। অধ্যাপক কবির শেষ দিন পর্যন্ত আশা করেছিলেন তাঁদের দল বাংলা কংগ্রেস অন্তত ৫০টি বিধানসভা আসন পাবেন। আর শ্রীদাশগুপ্ত ধরেই নিয়েছিলেন, বাম কমিউনিস্ট প্রভাবিত সংযুক্ত ফ্রন্ট ১০০টি আসন পাবেই।

ময়দানের জনসমাবেশে জনতাকে অভি[illegible] শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়

[illegible]।

[illegible] দের মধ্যে সবার ছোট হলেও স্বাতী এখন আর তেমন ছোট নেই। একুশটি শ্রাবণ পার করে স্বাতী এখন সাবালিকা।

রোজ সকালে যেমন এসে ডাকে, তেমনি-ভাবে মশারি তুলতে তুলতে উঁচুগলায় ডাকল—ও দাদু, ওঠো, কখন সকাল হয়েছে, রোদ উঠেছে।

—চশমাটা দে, হরিকে তামাক দিতে বল্।

—আজ আর বাসি মুখে হুঁকো নিয়ে বসো না, আজ কত লোক আসবে, তুমি এখন এক ঘণ্টা বসে খক্ খক্ করে কাশবে, থুথু ফেলবে, হুঁকো টানবে, ছিঃ, আমার ভারী লজ্জা করবে।

—থাম্, বাজে বকিস্ নি, হরিকে ডাক্।

লেপটা সরিয়ে উঠে বসলেন ভবতোষবাবু।

স্বাতী একটু সামনে ঝুঁকে পিঠে হাত বুলিয়ে বললো—লক্ষ্মী দাদু আমার, আজকের দিনটা একটু কষ্ট করো।

—কেন বাজে কথা বলছিস, তুই তো জানিস, সকালবেলা তামাক না খেলে পেট কেমন ভার ভার হয়ে থাকে, গলায় কফ বসে যায়।

—সে তো জানি—দাদুর গায়ে আলোয়ান দিতে দিতে বললো স্বাতী—আজ এমন একটা দিন, [illegible]

—তোমার আমাকে [illegible]

—ছিঃ, [illegible] জন্মদিন, কত মানুষের [illegible] দিন আসে বলো তো। দাদুর গলায় মাফলার জড়িয়ে দেবার সময় বললো স্বাতী—বাবা তোমার জন্য নতুন আলবোলা কিনে এনেছেন, বৈঠকখানা বাজার থেকে ভাল বিষ্ণুপুরী তামাক এনেছেন, তুমি দামী শাল গায়ে আয়েশ করে আলবোলা টানবে, তখন আমি তোমার কপালে চন্দনের টিপ এঁকে দেবো, গলায় ফুলের মালা দেব।

ভাল তামাকের খবর শুনে একটু প্রসন্ন হলেন ভবতোষবাবু।

কাঁপা কাঁপা হাতে পুরু কাঁচের চাঁদির চশমাটা তুলে চোখে দিলেন।

সাদা ভুরু, সাদা দাড়ি, শনের মত সাদা পাতলা চুল। মাথাটা একটু একটু কাঁপে। চশমার ভেতর দিয়ে বড় বড় চোখে স্বাতীর সুন্দর মুখের দিকে তাকালেন, ফোকলা মুখে একটু হেসে বললেন—তুই আমার গলায় মালা দিবি, তোর সুজিতবাবু শুনলে কি বলবে।

—যাও, বাজে কথা ব'লো না। ভুরু কুঁচকে ধমক দিল স্বাতী—আজ অনেক লোক আসবে, [illegible] আজে বাজে [illegible]।

[illegible] ভবতোষবাবু। [illegible]

—[illegible] দাদু—[illegible] দিকে চেয়ে ডাকল স্বাতী—এই হরি, তামাক দিয়ে যা।

আগে থেকেই তৈরী ছিল হরিচরণ। কল্কেতে ফুঁ দিতে দিতে ঢুকে এল। হাসি হাসি মুখে হুঁকোটা নিলেন ভবতোষবাবু। সকালবেলাই নাতনীকে জব্দ করতে পেরে বেশ খুশী হয়ে উঠলেন।

সারাদিন এই ব্যাপার চলে। স্বাতী তার নিজের নিয়মে, নিজের হুকুমমত দাদুকে চালাবার চেষ্টা করে আর দুষ্টু ছেলের মতো ভবতোষবাবু নানা কৌশলে সেই হুকুম অমান্য করেন, সমস্ত নিয়মকানুন ভেঙে দেন। হুঁকোতে কয়েকটা টান দিয়ে খক্ খক্ করে কাশতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি পিকদানিটা সামনে ধরল স্বাতী, পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। তারপর পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে বড় বড় গোল চোখে তাকিয়ে বললেন—তুই যে বললি অনেক লোক আসবে—একটু থেমে আবার কয়েকটা টান দিলেন, ধোঁয়া, খকখক্ কাশি, থুথু ফেলার পর—তা কারা কারা আসবে শুনি?

—কেন, কাছাকাছি যারা আছে অনেকেই আসবে, সবাইকে তো বলা হয়েছে। স্বাতী জানে, ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীরা যে যেখানে আছে সবাই এসে একসঙ্গে জড়ো হলে দাদু খুব খুশী হয়, তাই গড়গড় করে বলে গেল—মেজ জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ির সবাই আসবে, মেজদা কাল বাবাকে ফোন করে বলেছে, জেঠিমণির শরীরটা তেমন ভাল নেই, তা ছাড়া সোদপুর থেকে এত দূর আসা, তিনি না এলেও মেজদা, বউদি, জেঠীমা, তিনু-পিনু, শান্তাদি, শান্তাদির বর নিখিলবাবু, তাদের ছেলেমেয়েরা।

আঙুলের কর গুনে গুনে বললো স্বাতী—বড় পিসীমার বাড়িরও সবাই আসবে, বাবার চিঠি নিয়ে দাদা গিয়েছিল পরশু দিন পিসীমা, পিসেমশাই, সুধীরদা, বউদি, লতুদি, বাচ্চু, খুকীদি, জীবন জামাইবাবু, তারপর ছোট পিসীমার বাড়ির—

—তোর ছোট পিসী আসবে না।

—কি করে বুঝলে তুমি?

—দেখিস তুই, আমি বললাম, আসবে না—একটু উত্তেজিতভাবে হুঁকোতে আরো কয়েকটা টান দিলেন। একটু একটু হাত কাঁপছে, মাথা নড়ছে।

স্বাতী কিছু কিছু জানা থাকলেও [illegible] ভান করে [illegible]

করল স্বাতী—কেন, আসবে না কেন?

হ্‌কোটা পাশে নামিয়ে মুখ [illegible]
সোজাসুজি স্বাতীর [illegible] দি[illegible]
বললেন [illegible]
তোর ঠাকুমার [illegible]
কেমন [illegible]
সঙ্গে [illegible]
চলে গেল।

—ছি দাদু, [illegible]
আর তুলো না।

—কেন তুলবো না, ওই [illegible] তোমার
জন্য রেখেছি, তোর বিয়ের সময় দেখ, তোর
ছোট পিসীকে কি কম জিনিস দিয়েছি,
ছোট মেয়ে বলে সবচেয়ে বেশী আদর ওই
পেয়েছে।

—আহা দাদু, চুপ করো।

স্বাতীর কথা শুনতে শুনতে দেবতোষ
ঢুকল—কি রে, কি বলছে দাদু?

—দেখো না দাদা, সকাল থেকেই বক্‌বক্‌
বকুনি শুরু করেছে, কোন কথা শুনছে
না।

—গ্র্যাণ্ড ড্যাড আমার—বলতে বলতে
পাশে বসে দু' হাতে দাদুকে জড়িয়ে ধরল
দেবতোষ—আজ তোমার জন্মদিন, জন্ম-
শতবার্ষিকী, এ কি সোজা কথা, ক'টা লোক
এক শো বছর আয়ু পায়!

—আমার ঠাকুমা পেয়েছিলেন—হাসি
মুখে নাতির দিকে তাকালেন ভবতোষবাবু,
—আমার ঠাকুমা তোর কি হল?

—দাঁড়াও বলছি—ভেবে ভেবে বললো
দেবতোষ, তোমার বাবা হলেন প্রপিতামহ,
তোমার ঠাকুমা তা হলে বৃদ্ধ প্রপিতামহ,
কেমন ঠিক নয়?

—প্রপিতামহ নয়, প্রপিতামহী, তোর
এখনো লিঙ্গের জ্ঞান হল না—

—আহা দাদু, এখন ওসব কথা থাক—
স্বাতী বাধা দিল—সকালবেলা উঠেই মুখ
খারাপ ক'রো না।

নাতনীর কথা গ্রাহ্য না করে আবার
জিজ্ঞেস করলেন—বৃদ্ধ প্রপিতামহীর
ইংরেজী বল্‌!

নাতির সঙ্গে এই এক খেলা ভবতোষ-
বাবুর। স্বাতীর চেয়ে বছর তিনেকের বড়
দেবতোষ।

যেহেতু কলেজে ইংরেজী পড়ায়, মধ্যে
মধ্যে দাদুর কাছে চেনা-অচেনা বাংলা শব্দের
ইংরেজী বলায় পরীক্ষা দিতে হয়। জবাব
দিল—গ্রেট-গ্রেট গ্র্যাণ্ডমাদার।

—পানকৌড়ি পাখির ইংরেজী বল্‌!

—করমোর‍্যাণ্ট।

—সেদিন পারিস নি কিন্তু।

—সব সময় মনে পড়ে নাকি।

—দাদাকে ছেড়ে দাও, বাজারে যাবে—
স্বাতী বাধা দিল—ওঠো, এখন তোমার জল
গরম হয়ে গেছে।

—দেবু যাবে কেন, তোর বাবা কোথায়?

—বাবা কোন সকালে বেরিয়েছে, আজো

[illegible] দেখো না।

—তাঁদের [illegible]

চোখে ভাল দেখি না, কানে কম শুনি, হাত-পা কাঁপে, এক একদিন বিছানা-পত্তর তোলপাড় করে ফেলি, আমার জন্য স্বাতীকে কত ভুগতে হয়, কত কষ্ট হয়।

—না দাদু, আমার মোটেই কষ্ট হয় না—তাড়াতাড়ি বললো স্বাতী—তুমি যে বেঁচে আছ, এতে আমাদের কত আনন্দ।

—শুধু বেঁচে আছি, যমরাজাকে ফাঁকি দিয়ে কোন রকমে টিকে আছি, তার জন্য এত আয়োজন।

—তা কেন—স্বাতী কি বলবে ভেবে পেল না।

—তা ছাড়া আর কি, আমি সামান্য মানুষ, চৌধুরীবাবুদের কাছারিতে গোমস্তা হয়ে ঢুকেছিলুম, পরে মেজকর্তা কাজ-কর্মে খুশী হয়ে নায়েব করে দিলেন, পাটুয়াখালির সেরেস্তায় তিরিশ বছর নায়েবি করেছি, জায়গা-জমি কিছু ছিল, তা তো সব পাকিস্তানের পেটে গেছে, আমি আর তেমন কি করতে পেরেছি বল্‌।

দেবতোষ বললো—তুমি আদর্শ গৃহস্থ, নিষ্ঠার সঙ্গে সংসারধর্ম পালন করেছ, এ কি সামান্য কথা! ছেলেদের মানুষ করেছ, মেয়েদের ভাল বিয়ে দিয়েছ, কত বড় পরিবার হয়েছে, আমরা কত নাতি-নাতনী তোমার।

—দাদু, এখন ওঠো, বেলা হয়ে যাচ্ছে—স্বাতী আবার তাড়া দিল—একটু পরেই হয়তো সব আসতে শুরু করবে, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনীরা একসঙ্গে হলে তুমি তো খুশী হও, সব সময় তো সম্ভব হয় না, আজ এই উপলক্ষে—বলতে বলতে দাদুর হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে হরিচরণকে দিল।

একটুকাল তরুবালার ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করে যেন আপন মনেই আবার বলতে লাগলেন ভবতোষবাবু—সবাই কি আর আসবে—।

—কেন আসবে না, দেখো তুমি, খবর যারা যারা পাবে, সবাই আসবে।

—আমার দুঃখ তুই বুঝবি না দিদিভাই, যাদের সঙ্গে সংসার শুরু করেছিলুম, তারা তো আর আসবে না, তোর বড় জ্যাঠাকে তুই দেখিস নি, আমার বড় ছেলে প্রাণতোষ সে তো আর আসবে না। ভবতোষবাবুর কথা শেষ না হতেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল দেবতোষ।

দাদু এখুনি কান্না শুরু করবে। কান্না-কাটি মোটে সহ্য হয় না দেবতোষের।

তখনো তরুবালার ছবির দিকে চোখ রেখে বিড়বিড় করছিলেন ভবতোষবাবু—তিরিশ বছরের জোয়ান ছেলে দক্ষিণ শাহাবাজপুরের মহাল থেকে খাজনা আদায় করে ফিরে আসছিল নৌকোয়, নদীর নাম আড়িয়াল খাঁ, ফাল্গুন মাস, একটু হাওয়া নয়, একটু বৃষ্টি নয়, আমার এমন কপাল, অসময়ে বাতাস উঠল, দাঁড়ি-মাঝি নিয়ে আটজন লোকসুদ্ধ নৌকো নিখোঁজ, মাঝির নাম ছিল করমুদ্দিন, ওই শুধু প্রাণে বেঁচেছিল, দশ দিন পরে খবর পেলুম, তোর ঠাকুরমার সে কি লুটোপুটি কান্না, তোদের বড়দা মনোতোষের বয়স তখন তিন বছর, বাপ-মরা ওই নাতিকে বুকে করে তোর ঠাকুমা—ভবতোষবাবুর গলা ধরে এল। কাঁপা কাঁপা হাতে চশমাটা নামালেন।

স্বাতী তাঁর চোখের নিচের কোঁচকান চামড়া আলতোভাবে মুছে দিয়ে বললো—কেঁদো না দাদু, ওসব কথা ভেবো না।

—হ্যাঁরে, মনোতোষকে তোরা খবর দিয়েছিলি?

—বাবা ক-বে চিঠি দিয়েছে, বোম্বে থেকে এত দূরে আসা, তা ছাড়া অফিসের ছুটি—বলতে বলতে দাদুর হাত ধরে বারান্দায় নিয়ে এল স্বাতী।

ভবতোষবাবু বাথরুমে গেলেন। হরিচরণ জলের গাড়ু-গামছা এগিয়ে দিল।

কিছু সময় পরে বারান্দায় মোড়ার উপর এসে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসলেন।

স্বাতী গরম সরষের তেলের বাটি নিয়ে এল। খুব যত্নের সঙ্গে দাদুর আলোয়ান, গরম গেঞ্জী খুলে দিল। বসবার ঘরের দেয়ালঘড়িটায় টং-টং করে সাতটা বাজল।

দেবতোষ এসে বললো—দাদু, বাজারে যাচ্ছি, তোমার জন্য কি আনব, মাংস খাবে?

কথার শেষে মুখ টিপে হাসল। আসলে এটা ঠাট্টার কথা। দাদুর দাঁত নেই। মাংসের ঝোল আর দু'-এক টুকরো মেটুলি ছাড়া বাকি সবটাই নাতি-নাতনীকে দিয়ে দেন।

সেই কথাই বললেন ভবতোষবাবু—আমার নাম করে মাংস আনলে তোর খাওয়ার সুবিধে হবে, তোর চালাকি আমি বুঝি না ভাবিস!

—তা হলে কী আনবো—

—মাছ আনবি, জ্যান্ত ইলিশ, কিংবা পাকা রুই।

দাদুর ফরমায়েশ শুনে বললো স্বাতী—ইলিশ তোমার সহ্য হয় না, সে দিনের কথা মনে আছে, না রে দাদা—

মুখ তুলে দাদার দিকে তাকিয়ে—ভাল মাগুর বা সিঙ্গি মাছ পেলে আনিস—

—রোজ রোজ রুগীর পথ্য খেতে ভাল লাগে না, আজ আমি মাগুর মাছ খাব না, খাব না, খাব না। অবুঝ ছোট ছেলের মত মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন ভবতোষবাবু, তারপর হঠাৎ একগাল হেসে—কইমাছ খাওয়াতে পারিস? ফুলকপি আর ডালের বড়ি দিয়ে কইমাছ, আমার ছোট মাসীমার হাতের রান্না, আহা-হা, এখনো যেন মুখে লেগে আছে।

একটু শুকনো গলায় জবাব দিল দেবতোষ—দেখি যদি পাই, আজকাল মাছের বাজারের যা অবস্থা, সব দিন সব রকম মাছ জোটানো মুশকিল। যদি বা পাওয়া যায়, দাম হাঁকবে সাত টাকা কিলো।

—তোরা কিলোর দরে মাছ কিনিস, আমাদের সময় ওসব কিলো-ফিলো ছিল না, আমরা কুড়ি হিসেবে মাছ কিনতুম, এক আনায় এক কুড়ি কইমাছ, একটা ফাউ নেবার জন্য দাশু জেলের সঙ্গে কেমন ঝুলোঝুলি করতুম, বললে বিশ্বাস করবি না, এক একটা মাছ এই এত বড়। ডান হাতখানা চিত করে একটু সামনে এগিয়ে কব্জির নিচে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে টিপে ধরে মাছের মাপ দেখালেন ভবতোষবাবু।

দেবতোষ বাজারে চলে গেল। দাদুর হাতে পায়ে বুকে পিঠে অনেকক্ষণ ধরে ভালভাবে তেল মাখাল স্বাতী। তারপর উঠোনের রোদে জলচৌকিতে বসে গরম জল আর সুগন্ধি সাবান মেখে স্নান করলেন ভবতোষবাবু। বসবার ঘরের মস্ত সোফায় এসে বসলেন।

স্বাতী গলায় মালা পরিয়ে দিল, কপালে চন্দনের টিপ। নতুন ধুতি, নতুন পাঞ্জাবি, নতুন শাল। পায়ের কাছে নতুন লাল রঙের বিদ্যাসাগরী চটিজোড়া রাখার সময় একটা গাড়ি থামার শব্দ শুনতে পেল স্বাতী। তাড়াতাড়ি বাইরে গেল। বড় পিসীমা এসেছেন। হাত ধরে পিসীমাকে নামতে সাহায্য করল।

পেছনে পিসেমশাই শশধরবাবু। নিচু হয়ে দুজনেরই পায়ের ধুলো নিল স্বাতী।

সত্তরের মতো বয়স হয়েছে শশধরবাবুর। পাতলা গড়ন, চুলের রঙ এখনো বেশ কালো। বরং চন্দ্রবালার সমস্ত চুল সাদা। বড় সিঁদুরের ফোঁটা, চওড়া টকটকে লাল সিঁথি। মোটাসোটা থলথলে শরীর। ষাটের উপর বয়স। থপ থপ করে ঘরে ঢুকে দাদাকে [illegible]—কেমন আছ, দাদা?

ভবতোষবাবুর প্রথম কথা—আমার জন্য

কি এনেছিস?

—নলেন গুড়ের সন্দেশ, এই নাও।

সন্দেশের বাক্সটা দু' হাতে আঁকড়ে ধরে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন ভবতোষবাবু।

—সন্দেশ! সন্দেশ পেলি কোথায়, ওরা যে বলে সন্দেশ-রসগোল্লা নাকি উঠে গেছে, আর পাওয়া যায় না?

—আমাদের মধ্যমগ্রামে পাওয়া যায়, সন্দেশ-রসগোল্লা থেকে সব রকম ছানার মিষ্টি।

—তোদের মধ্যমগ্রাম তো বেশ ভাল জায়গা বলতে হবে। বলতে বলতে স্বাতীকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সন্দেশের বাক্সটা লুকিয়ে ফেললেন ভবতোষবাবু, শালের নিচে চাপা দিলেন। পিসতুতো দাদা সুধীরের ছোট ছেলে বাচ্চুকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল স্বাতী, পিসীমাকে উদ্দেশ্য করে বললো—সুধীরদা, বউদি, লতুদি এরা এলেন না?

—ওরা শেয়ালদা বাজারে গেল খাবার জন্য কিছু ফল-টল কিনে আনবে। পিসীমার জবাব শোনার পর দাদুকে লক্ষ করে গম্ভীর সুরে—লুকুলে কি হবে, আমি দেখতে পেয়েছি, অতগুলি মিষ্টি তুমি খাবে না, দাদু।

—কই, কোথায় মিষ্টি—খালি হাত দু'খানি বার করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বললেন ভবতোষবাবু—এই দেখ, আমার হাতে কিছু নেই।

চারুবালা হাসতে লাগলেন। তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে চাপা সুরে বললো স্বাতী—কি যে খাই-খাই বাতিক হয়েছে, সে কথা আর তোমাকে কি বলবো পিসীমা, খালি এটা খাব, ওটা খাব আর এ-বেলা যা খাবে ও-বেলা ভুলে যায়।

স্বাতীর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন ভবতোষবাবু, বললেন—আমার নামে লাগাচ্ছিস, চুপিচুপি বললে কি হবে, আমি সব শুনতে পেয়েছি।

স্বাতী এবার স্বাভাবিক গলায় বললো—এই হয়েছে আর এক জ্বালা, কোন কথাটা শুনতে পাবে, কোনটা পাবে না, বোঝা দায়, ডান দিকেরটা একটু ধরে গেছে, ডান পাশে বসে কথা বললে তেমন শুনতে পায় না।

—আমার নামে নিন্দে করলে আমি ঠিক শুনতে পাই।

—সন্দেশের বাক্সটা আমার হাতে দাও—স্বাতী হাত বাড়াল।

—না, দেব না, সব আমার—ভবতোষবাবু বাক্সটা দুই হাতে কোলের মধ্যে আঁকড়ে ধরে মেয়ের কাছে নালিশ করলেন—দেখ চারু, ওরা আমাকে সন্দেশ-রসগোল্লা এনে দেয় না, আমার কাছে মিথ্যে করে বলে, ছানার মিষ্টি নাকি আর পাওয়া যায় না। গবরমেণ্ট নাকি আইন করে—

—এ মা, ছিঃ ছিঃ—কপালে একবার হাত ছোঁয়াল স্বাতী—দাদু, কী বলছো তুমি, সুধীরদা নিজে মাথা তোমার জন্য বারাসতের থেকে সন্দেশ নিয়ে এসেছিল।

এতক্ষণ পরে হাতের সিগারেট শেষ করে শ্বশুরমশাইয়ের সামনে এলেন শশধরবাবু।

প্রণাম করে বললেন—কেমন আছেন?

জামাইকে দেখে কেমন যেন কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন ভবতোষবাবু, নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই সন্দেশের বাক্সটা স্বাতীর হাতে তুলে দিলেন। মুখ টিপে একটু হাসল স্বাতী। সান্ত্বনার সুরে বললো—তোমার জন্যই তোলা থাকবে, একটু একটু করে খেও, কেমন?

নাতনীর কথা যেন শুনতে পাননি, এমনি ভাবে জামাইকে আপ্যায়ন করার জন্য ব্যস্ত

অফিসে আসতে হয়, তুমি কিছু না বলে শুধু শুধু কাঁদো কেন, এই দেখো তোমার জন্য কেমন আপেল এনেছি, কত বড় কমলালেবু, তুমি তো কমলালেবুর রস খেতে ভালবাসো, এখন দেবো রস করে—

একরাশ আপেল আর কমলালেবু দেখে শান্ত হলেন ভবতোষবাবু। শুধু একটি আপেল হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন, নাকে শুঁকলেন। সুধীরের ছোট বোন লতিকা সামনে এসে বললো—দাদা-মশাই, আমার কথা তো একবারও জিজ্ঞেস করলেন না?

—আরে লতুদিদি, আমি সকাল থেকে তোর কথা ভাবছি।

—ছাই ভাবছেন, কই একবারও তো, জিজ্ঞেস করতে শুনলুম না।

—না রে সত্যিই ভেবেছি, আমার গলায় আজ বুকে ব্যথা দেখে, কার ব্যথা আগে দেখ, স্বাতীর না লতিকার—

—বাজে কথা রাখুন—শিক্ষিকার কাজ করে লতিকা। স্বাতীর চেয়ে বছর তিনেকের বড়।

গোলগাল ফর্সা মুখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, নীতিবোধ প্রখর। দাদামশাইয়ের মুখে অশ্লীল রসিকতা শুনলে বেশ লজ্জা পায়। স্বাতীর মত কাছাকাছি থাকতে হয় না বলে খারাপ কথা শুনতে তেমন অভ্যস্ত নয়। চামড়ার ব্যাগ থেকে এক জোড়া সাদা পশমের মোজা বের করে বললো—দেখুন, আপনার জন্য বুনে এনেছি, কেমন হয়েছে?

স্বাতী বললো—বাঃ, বেশ হয়েছে তো, আমাকে কিন্তু শেখাতে হবে, লতুদি।

উল বোনার খুব বাতিক লতিকার। সারাটা শীতকাল উলের কাঁটা, উল সুতোর গোলা চামড়ার ব্যাগের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। দাদামশাইয়ের পায়ের কাছে বসে মোজা পরিয়ে দিল। ভবতোষবাবু খুব খুশী —বাঃ, সুন্দর বুনেছিস, বেশ গরম, দেখি দেখি তোর হাতখানা—লতিকার নরম ফর্সা গোলগাল গড়নের হাত দুখানি ধরে নাকের সঙ্গে ঠেকিয়ে বললেন—ইস, তোর গায়ে ব্যাটাছেলের গন্ধ কেন রে, কোন ব্যাটার গায়ে গায়ে ঘষেছিস—তারপর জামাইকে লক্ষ্য করে—মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করো বাবাজী, না হলে কার সঙ্গে ভেগে—

লতিকার সারা মুখে সিঁদুরের রঙ—ছিঃ ছিঃ, কি অসভ্য—তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল। পেছন পেছন এসে বললো স্বাতী—তুমি কিছু মনে ক'রো না লতুদি, জানোই তো দাদুর কথাই ওই-রকম, আমার তো চব্বিশ ঘণ্টা শুনে শুনে

কান পাচে গেল।

এদিকে হইহই করে বাজার নিয়ে ফিরল দেবতোষ। দুটো ঝাঁকামুটের মাথা ভর্তি জিনিস। স্বাতীর আর নিশ্বাস ফেলারও সময় নেই। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কাজ করতে হবে। আবার দাদুর ফাই-ফরমাশ। আজ না-হয় পিসেমশাইয়ের সঙ্গে গল্পে মশগুল। অন্য দিন তো স্বাতীকে ডেকে ডেকে হয়রান করে তোলেন। সুধীরের বউ বঁটি পেতে কুটনো কুটতে বসেছে। স্বাতীও আর একটা বঁটি নিয়ে পাশে বসেছিল।

দাদুর ডাক শুনতে পেল—ও স্বাতী, স্বাতী—

—কি বলছো? উঠে যেতে হল।

—আমাকে আপেল কেটে দিলে না?

—এই যে দিচ্ছি। একটু বাদে দুটো প্লেটে কাটা আপেল এনে একটা পিসে-মশাইয়ের সামনে আর একটা দাদুর সামনে রাখল স্বাতী।

শশধরবাবু বললেন—আমাকে আবার আপেল কেন, এই তো চা খেলুম, ডিম-ভাজা খেলুম।

—খাও বাবাজী, খাও, তোমাদের বয়সে

—বলতে বলতে এক টুকরো মুখে দিলেন ভবতোষবাবু, শক্ত মাড়ি দিয়ে চেপে চেপে রস বের করলেন, থুথু করে পিকদানে ছিবড়ে ফেলে আবার বললেন—রায়চৌধুরী-দের মেজকর্তা হরেশ্বরবাবু খুব আমুদে লোক ছিলেন, পটুয়াখালির কাছারিতে তার সামনে একবার থালি ধরে আস্ত একটা পাঁঠার মাংস আমি একা খেয়েছিলুম, তখন আমার বয়স পঞ্চাশের ওপরে।

স্বাতী আবার কাজের মধ্যে ফিরে এল। হাসতে হাসতে বললো—দাদুর খালি খাওয়ার গল্প, কবে, কোথায়, কত সস্তায় কী খেয়েছিলেন সেই গল্প হাজারবার শোনাবেন একেবারে বাচ্চা ছেলের মত, এই হয়তো হাসছেন, ঠাট্টা-তামাশা করছেন, পর-ক্ষণেই হয়তো ফোঁতফোঁত করে কেঁদে উঠলেন।

চারুবালা বললেন—ওই বয়সে সকলেরই ওরকম হয়, তোদেরও অমন হবে।

—এ ম্যাগো—ঠোঁট উল্টে শিউরে ওঠার ভঙ্গি করল স্বাতী—অত বুড়ী হয়ে আমরা বাঁচতে চাই না, চুল পাকবে, দাঁত পড়ে যাবে, ম্যাগো, ভাবতেও পারি না কি বলো, লতুদি?

বারান্দার একপাশে রোদ্দুরে বসে উল বুনছিল লতিকা, মুখ টিপে একটু হাসল শুধু।

দাদুর ডাক শোনা গেল—ও স্বাতী, স্বাতী—

—কি হল আবার? দরজার মুখে এসে পর্দা সরিয়ে দাঁড়াল।

—সুধীর কোথায়? মুখ তুলে তাকালেন ভবতোষবাবু, মাথাটা একটু একটু কাঁপছিল।

—সুধীরদা অফিসে চলে গেছে।

—অফিসে কেন, ছুটি নেয়নি?

—ছুটি পায়নি, অফিসে হাজিরা দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসবে।

—আর তো কেউ এলো না?

—আসবে, আসবে, তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন।

—তোর বাবা কখন আসবে?

—বাবা বোধ হয় ভাল মাছের জন্য গড়িয়াহাটা বাজারে গেছেন।

—এদিকে আমার কাছে আয়, একটা কথা বলবো চুপি চুপি। ভবতোষবাবু মিটি-মিটি হাসলেন।

—এখন আমার অত কথা শোনার সময় নেই দাদু—অনিচ্ছার সঙ্গে কাছাকাছি গেল স্বাতী।

নাতনীর কানে কানে মুখ লাগিয়ে ফিস ফিস করে গোপন কথা বললেন ভবতোষ বাবু—তোর সুজিতবাবু কখন আসবে?

একটু লাল হল স্বাতী। আড়চোখে পিসেমশাইয়ের দিকে তাকাল। ওপাশে একটা সোফায় খবরের কাগজে মুখ ডুবিয়ে

বসেছিলেন শশধরবাবু।
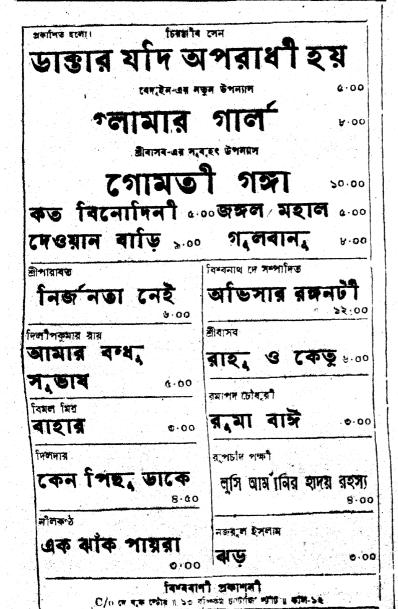
—আমার পেছনে লেগো না দাদু, ভাল হবে না, তোমার বাজে কথা শোনার সময় নেই এখন। তাড়াতাড়ি বারান্দায় ফিরে এল স্বাতী। ভবতোষবাবু হাসতে লাগলেন। কলেজে দেবতোষের সহপাঠী ছিল সুজিত। বিলিতী কোম্পানীর মোটা মাইনের চাকুরে। স্বাতীর সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে আছে। দাদুর শততম জন্মদিনের উৎসবে তার উৎসাহ কম নয়। আসার কথা ছিল অনেক আগেই। কিন্তু সুজিত এসে পৌঁছল সন্ধ্যার পরে। তখন নিমন্ত্রিতদের শেষ দল খেতে বসেছে।

বাড়ি ফেরার আয়োজনে ব্যস্ত সবাই। দেবতোষ প্রথমে চেঁচিয়ে উঠল—তুই এত দেরি করে এলি?

—কি করব, অফিস থেকে বেরিয়ে কেনা-কাটার জন্য গেলুম নিউমার্কেটে। লাজুক মুখে হাসল সুজিত। নিখুঁত কোট, প্যান্ট, টাই। দীর্ঘ দোহারা গড়ন। সঙ্গে দামী ক্যামেরা। গোলাপফুলের তোড়া আর কেকের বাক্সটা ভবতোষের সামনে নামিয়ে রাখল। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। চারপাশে একরাশ ফুল, ফুলের মালা আর নানা উপহার দ্রব্যের মধ্যে মস্ত সোফার উপর প্রায় সারাদিন বসে আছেন ভবতোষবাবু। কেমন ক্লান্ত অবসন্নের মত আধশোয়াভাবে ঝিম মেরে বসেছিলেন।

সুজিতকে দেখে উৎসাহে নড়েচড়ে উঠলেন, এই যে, সাহেববাবু এলেন! কই আমার জন্মদিনের কেক কোথায়?

কারুকাজ-করা রুপোর রেকাবির উপর মস্ত কেকটা সাজিয়ে আনল স্বাতী। দেবতোষ মোমবাতির বান্ডিল খুলে একশোটা মোমবাতি রেকাবিটার চারপাশে সাজাল। একটা একটা করে জ্বালিয়ে দিল স্বাতী। কয়েকটা ফুঁ দিয়ে নেবালেন ভবতোষবাবু। একদমে সব কটা পারলেন না। বাকিগুলি স্বাতী আর দেবতোষ ভাগাভাগি করে নেবাল।

রুপোর ছুরি দিয়ে কাঁপাকাঁপা হাতে কেক কাটলেন ভবতোষবাবু।

নাতি-নাতনী, নাত-বউ, নাত-জামাইরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। কয়েকঝলক ফ্লাশ-বাল্বের আলো। সুজিত ঘরের এপাশে-ওপাশে ঘুরে ঘুরে সুবিধেমত কোণ থেকে কয়েকটা ছবি তুললো। দেবতোষ ঠাকুমার তেল-রঙের মস্ত ছবিটা এনে পাশে রাখল।

সুজিত আবার ফটো নিল। প্রায় সবাই এসেছে।

তবু ভবতোষবাবু এক এক সময় জিজ্ঞেস করছেন—ও শিবু, তোর বাবা এলো না কেন?

শিবতোষ জবাব দিল—কতবার তো বললুম, বাবার শরীরটা ভাল নেই, একটু সুস্থ হলেই আপনাকে এসে দেখে যাবে।

ভবতোষবাবু সুস্থির হলেন না। কিছুক্ষণ পরেই আবার আর এক নাতিকে ধরলেন—এই অনিল, তোর মা এলো না কেন?

—মায়ের শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না।

—ওসব বাজে কথা আমাকে বোঝাসনি, আমার মেয়েকে আমি চিনি না, আমার উপর তেজ করে আসে নি, সেবার তোর ঠাকুমার মটরমালা হারছড়া—

—আহা, দাদু চুপ করো—স্বাতী ছুটে এসে ধমক দিয়ে থামাল। তুমি কিছু মনে ক'রো না, রাঙাদা, জানো ত দাদুর কথা-বার্তাই ওইরকম—

অনিল ম্লানমুখে একটু হাসল শুধু। ভবতোষবাবুর হাত ধরে বললো স্বাতী—চলো, এবার শোবার ঘরে চলো, অনেক রাত হয়েছে—

—সুজিত কোথায়, ওকে খেতে দিয়েছিস?

—খাওয়া হয়ে গেছে, মুখ ধুয়ে আসছে, তুমি ওঠো ত এবার।

নাতনীর হাত ধরে আস্তে আস্তে শোবার ঘরে এলেন ভবতোষবাবু।

সুজিত পেছন পেছন এসে বললো—আমি এবার চলি, দাদু—

—একটু বসো, কথা আছে।

দাদুর কথা শুনে আপত্তি করল স্বাতী—না আর কথা নয়, এবার শুয়ে পড়ো, অনেক রাত হয়েছে।

রাত দশটা বেজে গেছে। আত্মীয়-স্বজনরা চলে গেছেন সব। বাড়িটা কেমন চুপচাপ হয়ে গেল। ভেতরের বারান্দায় দেবতোষ খেতে বসেছে। স্বাতীর বাবা শেষ দলের নিমন্ত্রিতদের বড় রাস্তা পর্যন্ত

[illegible] দেকো।

[illegible] স্বাতী।

[illegible] —তোরা একবার বিয়েটা করে ফেল্, আর [illegible] কদিন [illegible]। ও স্বাতী, শোন্‌ শোন্‌, পালাস নে।

স্বাতী তাড়াতাড়ি বারান্দায় পালিয়ে এল।

—দেখলে, পাগলীটা আমার কথা না শুনেই পালিয়ে গেল।

সুজিত বললো—স্বাতী এখন বিয়ে করতে চায় না—

—কেন, বিয়ে করতে চায় না কেন! তোরা যদি আরো দেরি করিস, তাহলে তোদের বিয়েটা আমি আর দেখে যেতে পারবো না।

—সেই তো হয়েছে মুশকিল—সুজিত বললো—স্বাতী কি বলে জানেন?

—কি বলে? ভবতোষবাবু মুখ তুলে সুজিতের দিকে তাকালেন।

—বলে, আমি বিয়ে করে চলে গেলে দাদুর খুব কষ্ট হবে, দাদুকে সব সময় দেখাশোনা কে করবে, আমি এখন দাদুকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবো না।

ভবতোষবাবু যেন পাথর হয়ে গেলেন। যবা কাঁচের মত ধোঁয়াটে চোখে একটুকাল [illegible]। [illegible] বললেন—স্বাতী বলেছে এই কথা! স্বাতী আমার জন্য বিয়ে করতে পারছে না! আমার জন্য তোদের বিয়ে আটকে আছে!

সুজিত কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। দাদুর জন্য স্বাতীর ভালবাসা, স্বাতীর দায়িত্ববোধ বোঝাতে গিয়ে ভয়ঙ্কর সত্যি কথাটা যে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, বুঝতে পারে নি সে। আমতা আমতা করে বললো—আপনি যে এভাবে কথাটা নেবেন—

—না ভাই, তুমি ঠিকই বলেছ, আমি বড় অন্যায়ভাবে বেঁচে আছি। কান্নাভেজা গলায় ডাকলেন ভবতোষবাবু—স্বাতী, ও স্বাতী—

ডাকার কোন দরকার ছিল না। সব কথা শুনতে শুনতে হাতের কাজ ফেলে বারান্দা থেকে ছুটে এল স্বাতী, সুজিতকে লক্ষ্য করে বললো—ছি, তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, এসব কথা কি এমনভাবে বলতে হয় কখনো! যাও তো, এখান থেকে যাও, ও ঘরে গিয়ে দাদার সঙ্গে কথা বলো।

লজ্জিত, বিব্রত সুজিত কোনরকমে [illegible]।

[illegible] স্বাতী [illegible] না, কেবো [illegible]—

—না রে, [illegible]। ভবতোষবাবুর চোখের কোণে [illegible] জল, কাঁপা কাঁপা গলায় [illegible] বললেন—আমার এখন চলে যাওয়াই ভাল।

—না দাদু, আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবে তুমি? স্বাতীর গলাও ভারী হয়ে এল।

—যাব, যেখানে তোর ঠাকুমা আছেন, আজ পঁচিশ বছর আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন, যেখানে তোর বড় জ্যাঠামশাই, আমার বড় ছেলে প্রাণতোষ রয়েছে, তাকে তো আমরা খুঁজে পাই নি, এক এক সময় ভাবি, আজ এতদিন পরে সে যদি সামনে এসে দাঁড়ায়, বাবা বলে ডাকে, আমি কি তাকে চিনতে পারবো—?

শিশুর মত দাদুকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে স্বাতী শুধু বলতে পারলো—চুপ করো, চুপ করো।

বাইরে তখন ভবতোষবাবুর শততম জন্মদিনের রাত আরো হিম আরো কুয়াশার মধ্যে নিঝুম হয়ে গেছে।

কলকাতার ডায়েরি

কলকাতার

এতদিন ছিল রেশনের লাইন, খেলা দেখার লাইন, সিনেমা-থিয়েটার-সার্কাসের লাইন, সম্প্রতি তার সংগে যুক্ত হল জমি কেনার লাইন। বউবাজার স্ট্রীটে রাজ্য উন্নয়ন দফতরের এসটেট অফিস, সেখানে কিছুদিন আগে কল্যাণীতে জমি কেনার জন্যে আগের রাত থেকে লাইন দিয়েছিলেন আবালবৃদ্ধবনিতা। আগে শুনতাম, কল্যাণীর নাকি তেমন কদর নেই, বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়েও সেখানকার জমি-বাড়ির খদ্দের মেলে না। এখন দেখছি অন্য ব্যাপার। রাতারাতি কী হয়ে গেল কলকাতার লোকদের? নাকি অন্য কোথাও কেনার মত জমি আর নেই, বাকি রয়েছে কেবল কল্যাণী?

মধ্যবিত্ত বাঙালীর মধ্যে ইদানীং জমি কেনাটা অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। দুজনে দেখা হলেই একথা সেকথার পর অনিবার্য প্রশ্ন—"কী, কোথাও জমি-টমি নিয়েছেন নাকি? আমি তো বারুইপুরের কাছে কিনে ফেললাম সাত কাঠা। দেখি লোন-টোন নিয়ে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই তুলতে পারি কিনা।"

দ্বিতীয় জন জানাবেন, তিনি এখনও কেনেন নি তবে দমদমের কাছে একটা জায়গা দেখে এসেছেন।—"টাকা কোথায় ভাই, নইলে সল্ট লেকে কাঠা চারেক নিয়ে নিতাম।"

এই ধরনের আলোচনা, চালের দর বাড়ের দর যতই বাড়ুক, জমি কেনা চাই-ই চাই—রীতিমত 'ল্যান্ড র‍্যাশ'। বছর দুই আগেও এমন ছিল না, হিড়িকটা সর্বাধুনিক। অতএব কল্যাণীর জমি কেনার লাইন কে আটকায়। এ ব্লকের আরও ছ' হাজার নতুন প্লট শীগগীরই তৈরি হবে, সেগুলোও নিমেষে বিলি হয়ে যাবে।

চার হাজার একর জোড়া কল্যাণী উপনগরীতে চারটি ব্লক—এ-বি-সি-ডি। তার মধ্যে প্রথম দুটি আবাসিক এলাকা। সি ইউনিভারসিটি ক্যামপাস এবং ডি শিল্প এলাকা। সবার আগে তৈরি করা হয় বি ব্লক, এখন হচ্ছে এ-ব্লক। রেল স্টেশন থেকে বি ব্লক মাইল তিন দূরে, এ ব্লক স্টেশনের কাছাকাছি।

বি ব্লকে মোট প্লটের সংখ্যা ৫৬৮৮। তার মধ্যে বিলি হয়ে গিয়েছে ৪৯৪১টি। বাকি জায়গায় আছে কিছু সরকারী অফিস, বি টি কলেজ, ইনডাসট্রিয়াল ট্রেনিং ইনসটিটিউট, ওয়ার্ক-কাম-ওরিয়েনটেশন সেনটার, ডাকঘর, থানা ইত্যাদি।

এ ব্লকের ২৭০০টি প্লট ছাড়া হয়ে গিয়েছে। এই ব্লকেই আছে ৫০০ শয্যার হাসপাতাল, ভারত সরকারের খাদ্য গুদাম, স্টাফ কোয়ারটার, একজিকিউটিভ এনজিনিয়ারের অফিস ইত্যাদি। ডি ব্লকের কলকারখানার মধ্যে রয়েছে ২৮টি ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান, কল্যাণী স্পিনিং মিল ইত্যাদি। উপনগরীর গায়েই বিরাট লেক, পিকনিক গারডেন—দেখে চোখ জুড়ায়।

বর্তমানে কল্যাণীর মোট জনসংখ্যা ১৫ হাজার। তার মধ্যে ১০ হাজার আবাসিক, বাকি ৫ হাজার কারখানা-শ্রমিক আসা-যাওয়া করেন।

কল্যাণীতে জমির জন্যে এই চাহিদার অন্যতম কারণ কম দর, তা ছাড়া আর একটি কারণ এ ব্লকের প্লট রেল স্টেশনের কাছেই। তবে শুনতে পাচ্ছি, রেল লাইন টেনে নিয়ে

শহরের মাঝখানে, যেখানে [illegible] যেমন হয়েছিল, আর একটি [illegible] প্রস্তাব হয়েছে।

হলে ভাল, কল্যাণীর দিকে [illegible] আরও যাবে, কলকাতার [illegible] কিছু পাওয়া যাবে।

✻

ছোটবেলায় পড়েছিলাম শঙ্কাশিকের গল্প 'কঙ্গোর জঙ্গলে'। সেই জঙ্গল থেকে ধরে আনা হয়েছে এক গরিলা—আড়াই বছরের পশু-দানব। এই গরিলাকে দেখা যাচ্ছে কলকাতায়, জেমিনির সারকাসে। গরিলাটির দাম? ষাট হাজার টাকা। ওই টাকায় কেনা যায় দশটা হাতি। ('মরা হাতি লাখ টাকা' কথাটা তাহলে সত্যি নয়?)।

গত কয়দিন থেকে জেমিনি সারকাস আসর জমিয়েছে শহরে। এই সারকাস পার্টির বয়স মাত্র চৌদ্দ, কিন্তু এরই মধ্যে তার নাম ডাক দেশের চৌহদ্দি ছেড়ে বিদেশে। এই তো কিছুদিন আগে এঁরা ঘুরে এসেছেন রাশিয়া। ওরা পাঠাল বলশই থিয়েটারের নাচের দল, আমরা পাঠালাম জেমিনি সারকাস।

দলের সদস্য সংখ্যা পাঁচ শয়ের উপর, জীবজন্তু প্রায় দু' শ'—অর্থাৎ ছোটখাট একটা চিড়িয়াখানা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। গরিলাটা নতুন যোগাড় করা, তা ছাড়া আছে হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভালুক, হিপপো।

দলের বেশীর ভাগ লোকই কেরলের, বাঙালীও আছেন দু'-চার জন। এক নম্বর ক্লাউন যিনি, চৌদ্দটি ভাষা বলতে পারেন অনর্গল। তার মধ্যে অন্যতম রুশ। সারকাস পার্টি যখন সোভিয়েট দেশ সফরে যায়, তখন নিশ্চয়ই ভদ্রলোকের এই ভাষাজ্ঞান দলের কাজে লেগেছে।

✻

ক্র্যাথান রস বিদায় নিয়েছেন, তার জায়গায় ইউ-এস-আই-এস-এর নতুন [illegible] এসেছেন মিঃ [illegible]।

এভানসের [illegible] পরিচয় [illegible] ইনফরমেশন অফিসার মিলটার [illegible]। [illegible] আগন্তুক, এভানস হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, হাইডেলবার্গেও পড়াশোনা করেছেন কিছুদিন। আগে কাজ করতেন ওয়াশিংটনের ব্যুরো অব ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সে, ইউ-এস-আই-এস-এ যোগ দিয়েছেন মাস তিন আগে, ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে। এভান্স কলকাতায় এসেছেন সস্ত্রীক। এঁদের দুজনকে স্বাগত জানাই।

তবে সামনেই এপ্রিল মাস, 'হট হিউমিড হরিবল' গ্রীষ্মের জন্যে এভানস-দম্পতি এখন থেকেই প্রস্তুত হোন।

✻

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় নতুন ধরনের একটি প্রদর্শনী শুরু হয়েছে—পূর্ব জারমানির চিড়িয়াখানা। এই ধরনের প্রদর্শনী ভারতে এই প্রথম। ওদেশে কী-ভাবে পশু পাখির যত্ন নেওয়া হয়, তার পরিচয় পাওয়া যাবে নতুন ধরনের এই প্রদর্শনীতে।

দুই জারমানিই চিড়িয়াখানার জন্যে বিখ্যাত। তার মধ্যে সবার সেরা পশ্চিম জারমানিতে হামবুর্গের হাগেনবেক চিড়িয়াখানা। যুদ্ধে জারমানির প্রায় সব চিড়িয়াখানাই নষ্ট হয়ে যায়। পূর্ব জারমানির ভাগে ড্রেসডেন, লাইপৎসিগ ও হালে-র তিনটি চিড়িয়াখানা পড়ে, কিন্তু পশু পাখি তেমন কিছু ছিল না। যুদ্ধের পর সব নতুন করে তৈরি করা হয়েছে, ওই তিনটি ছাড়া আরও চিড়িয়াখানা হয়েছে বারলিন, রসটক, মাগডেবুর্গ, এরফুর্ট ও কটবুস-এ। সব কয়টির ব্যবস্থাই চমৎকার এবং আধুনিক।

✻

শুনেছিলাম, কলকাতা শহরের জন্যে

ওয়াশিংটনের চিঠি

'আপনি কি পাকিস্তানী?'

এ প্রশ্ন প্রায়ই শুনতে হয়। অচেনা সদ্য চেনা দশজন মার্কিনীর মধ্যে সাত জনের মুখেই এই একই প্রশ্ন। কৌতুক বোধ করেছি; অপ্রসন্ন মুখে নেতিবাচক ঘাড় নেড়েছি। আবার কখনো বা জবাব দিয়েছি; —'হ্যাঁ, আপনি প্রায় ঠিকই ধরেছেন। আপনি যেমন ক্যানাডিয়ান, আমিও তেমনি পাকিস্তানী।'

প্রশ্ন কর্তার কোনো অপরাধ নেই। চেহারায়, গায়ের রঙে মুখের আদলে, ভাষায়, মেয়েদের শাড়িতে, আমাদের দুই দেশের বাসিন্দাদের আলাদা করে চেনার কোনো উপায় ভগবান রাখেন নি। অথচ আমরা ভীষণ রকম আলাদা। এই স্বাতন্ত্র্যের কথা বুঝিয়ে বলতে সময় লাগে। এক ভাষা, একই সংস্কৃতি, একই ভৌগোলিক অখণ্ডতা—অথচ মানচিত্রে দুটো আলাদা রাষ্ট্র, আলাদা নেশন, কেন? এর পেছনে যে বেদনার ইতিহাস, গত দুই দশকের প্রলেপ উঠিয়ে সেই অতিগভীর, অতি ডেলিকেট ক্ষতস্থান বিদেশীকে দেখানো যায় না। তাই হাসি-মুখেই উপমা দিয়েছি : কানাডা আর যুক্ত-রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের মতন আমাদেরও আপাত সাদৃশ্যের আড়ালে রয়েছে দুটো পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। অত তত্ত্ব সবাই বোঝে না। তাই মারলো হাইটসের কাফেটেরিয়ার সদ্য পরিচিতা বন্ধুর মুখে আবার শুনতে পাই সবিস্ময় উক্তি : 'তুমি ভারতীয়! কী আশ্চর্য। ইউ লুক একজ্যাক্টলি লাইক এ পাকিস্তানী।'

আমার ক্ষোভের কারণ অন্য। সাবেক কালের ভারতবর্ষের খোঁজ রাখে না কেউ, সদ্যোজাত পাকিস্তানের কথা সবায়ের মুখে মুখে। কারণটা কী? নিশ্চয়ই ভারতের প্রচার তেমন জোরালো নয়। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র-নাথ, গান্ধী-নেহরুর ভারত আমেরিকার মনে মৌরসীপাট্টা গেড়ে আছে, এই ভেবে আত্মসন্তুষ্ট ভারত নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে।

হ্যাঁ, এখানকার খবরের কাগজে, টেলি-ভিশনে ভারত সম্পর্কে তথ্য হামেশাই প্রচার করা হয়। বেচারারা বড়ই দুর্ভিক্ষে ভোগে, গমটম পাঠিয়ে জনসন সাহেব কাজের কাজ করছেন। তাছাড়া আরো আছে। বিশ্বের স্বনামধন্যা নারীদের মধ্যে, মার্কিন মহিলা সমাজে, জ্যাকেলিন কেনেডি আর লেডি বার্ড জনসনের পরেই, জনপ্রিয়তার শীর্ষ-দেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম। নির্বাচনী সভায় শ্রীমতী গান্ধীর আহত হবার খবর পেয়ে, অনেকে আমায় টেলি-ফোনে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

আমার খুঁতখুঁত করার বোধ হয় সত্যি কোনো কারণ নেই। ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগের একজন কর্তাব্যক্তি সম্প্রতি এদেশে সফর করেছেন। আমার এই পয়েন্ট নিয়ে শুনলুম তিনিও মার্কিন শিক্ষাব্রতী মহলে কথা তুলেছিলেন। তিনি তো বিপরীত উত্তরই পেয়েছেন বললেন। আসলে এদেশে নাকি ভারতেরই বহুল পরিচিতি। ভারতের প্রাচীনত্ব, তার ঐতিহ্য, তার বৈচিত্র্যমণ্ডিত সংহতির সাধনা, এ যে কেবল মননশীল গোষ্ঠীতে তাই নয়, যাকে বলে আপামর জনসাধারণ, সেই সমাজেও নাকি সুবিদিত। বরং পাকিস্তানই হাল আমলের আমদানি, তাই কৌতূহলের ঝোঁকটা তার দিকেই বেশি।

তা এসব অবিশ্যি খুব আশান্বিত হবার মতন কথাই। তবে কি জানেন? দেশে থাকতে যেমন শুনতুম, তাতে মনে হত, স্বামী বিবেকানন্দর নাম একবার করলেই বুঝি আমেরিকার জনে জনে হাত জোড় করবে। কই, সেরকম তো কিছু মনে হলো না। যেসব লোক রিটায়ারড লাইফে ফুল-

[illegible] আন্তর্জাতিক জানে না। কী বলেন : 'এরা ধর্মগোঁড়া, ওই যে ধরে আছে রোমান ক্যাথলিসিজম, তার বাইরে কিছু পড়বে না, এক পা নড়বে না, কোনো কথায় কান দেবে না' তবে সেটা কোনো আলা সত্যি কথা হবে না। ধর্ম বলে না হোক, শাস্ত্র বলে না হোক, অন্য কোনো পন্থায় চেষ্টা করতে দোষ কি?

ব্যায়াম হিসেবে আসন-প্রাণায়ামে এদের আগ্রহ আছে। বইপত্র ছাপা হয়, ক্লাস হয়, টিভিতে রোজ আধ ঘণ্টা যোগশিক্ষার প্রোগ্রাম হয়। যোগের ব্যাকগ্রাউণ্ড দিয়ে ভারতের অতীত দিনের সলিড ভৌতিক সমৃদ্ধির কথা তুলে ধরতে পারলে, মনে হয় ক'টা ডলারও কামানো সম্ভব।

এ দেশে অনেক বুক্‌ক্লাব আছে। রকমারী বইয়ের পশরা সাজিয়ে তারা ভালোই বেসাতি করে। হেন কাগজ নেই, হেন ম্যাগাজিন নেই, যাতে তাদের বিজ্ঞাপন বেরোয় না। আর, সে কী চটকদার আকর্ষণ! নিরানব্বই সেন্ট, এক ডলার মূল্যের বিনিময়ে তারা খদ্দেরকে দিচ্ছে—তিন চার সেট বই, এক এক সেটে তিন, ছয় বার ন' ভল্যুম করে বই। বারনারড্‌ শ'র কমপ্লিট ওয়ারক্‌স্‌, চারচিলের যুদ্ধ-স্মৃতি...জগদ্বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের নামকরা উপন্যাস, নাটক, ছোট গল্প...সেক্‌সপীয়ার, তলস্তয়, ওয়েলস্‌, মম্‌, কিপলিং, হেমিংওয়ে, বাক্‌...কত নাম করব। সে সব বইয়ের ভালো বাঁধাই, শক্ত মলাট, সুন্দর

প্রচ্ছদ, সস্তা পেপারব্যাক্ বা সংক্ষেপিত সংস্করণ নয়। পয়লা কিস্তির নামজাদা বইয়ের লেজ্ড়ু ধরে তারপর আবিশ্যি এনতার বাজে বইয়েরও আমদানি হতে থাকে। তা সে তখন বেছেগ্নছে নেওয়া দরকার। বুক অব দি মান্থ এবং ডাবল্-ডে নামের বুকক্লাবের আমি মেম্বার। এদের এই সব বইয়ের ভেতর একবার একখানা যোগবিদ্যার কেতাব পেলুম। না, ঠিক পতঞ্জলির যোগদর্শন অরবিন্দের যোগভাষ্য বা স্বামীজীর রাজযোগ জাতের বই নয়। এটা একটু আলাদা ধাঁচের।

জেস্ স্টারন বলে এক সাংবাদিক ভদ্রলোকের লেখা। বস্টনের এক মহিলা যোগী তাঁর গুরু। মহিলা জাতে মারকিন, বিশ্বাসে একেশ্বরবাদী, আচারে ও নিষ্ঠায় যোগব্রতী। যোগবিদ্যায় তাঁর হাতেখড়ি হয় কালিমপঙ শহরে এক বাঙালী ব্যবসায়ীর কাছে। তিনশো বিরানব্বই পাতার সচিত্র ও সুখপাঠ্য এই বইখানির নাম : যোগ-যৌবন-জন্মান্তর। এতে নেই হেন কথা নেই। আসনমুদ্রারত মারকিন মহিলার বিভিন্ন পোজের ছবি; যোগাভ্যাসীর জন্যে অনেকগুলি সচিত্র উদাহরণ,

মেঘ আর শৈত্যের [illegible] যোগে ওয়াশিংটনে তুষার-পাত

প্রাণায়ামের নিয়মকানুন, সূর্য নমস্কার, ক্রিয়া ইত্যাদি হঠযোগের বিভিন্ন প্রণালী। এককালে বিষ্ণুচরণ ঘোষ, নীলমণি দাশ প্রমুখ ব্যায়ামবীরেরা শারীরচর্চার অঙ্গ হিসেবে যে যৌগিক ব্যায়ামের প্রচলন করেন, এ বইও সেই একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে। সেদিক দিয়ে এর উপযোগিতা অস্বীকার করার উপায় নেই। উপরন্তু এই একটি বইয়ে কত যে বিচিত্র তথ্যসম্ভার তার ইয়ত্তা নেই। জ্যোতিষশাস্ত্র, পুনর্জন্ম রহস্য বাটকের অলৌকিক শক্তিতে মেঘ তাড়ানো, ইত্যাদি তো আছেই। তারও পর রয়েছে মারসিয়া মুর ও তাঁর প্রাক্তন স্বামীর ভারত পর্যটনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা। ভারতের প্রবল প্রতাপ কমিউনিসট কুলের কঠিন বেড়াজালে পড়ে তাঁরা কীভাবে নাজেহাল হয়েছেন, ভিসা পেতে হয়রানি ভোগ করতে হয়েছে নিউয়র্ক, ইংল্যানড, পাকিস্তান, সর্বত্র তাঁদের ভিসা আটকেছে। শেষে নাকি রামকৃষ্ণ মিশন উদ্যোগী হয়ে, তাঁদের জামিন দাঁড়িয়ে ভারতের বেড়া পার করেন। মারসিয়া আশৈশব ভারতভক্ত, তিনি পূর্ব জন্মে ভারতের মন্দিরে দেবদাসী ছিলেন, এ জন্মে ভারতকেই তার আধ্যাত্মিক তীর্থ বলে মানেন। অত্যন্ত ক্ষোভ ও খেদের সঙ্গে তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন : 'সত্যই কি বিচিত্র এই দেশ!' এ দেশে একদিকে মারকিন গৌরী সেনের অজস্র ডলারপ্রপাত, অন্য দিকে তার প্রতি রোমকূপে কমিউনিসট আসক্তি! হায় রে অকৃতজ্ঞতা। আবার মজা দেখুন। ঠিক তার আগের পাতাতেই লেখা, খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচার-ব্যর্থতার উল্লেখ করে মন্তব্য করা হয়েছে : "ভারতের ধূলি-কণায় তার সনাতনী ঐতিহ্যের তেজস্ক্রিয় পদার্থের মাত্রা এক বিন্দু বা বহিঃশক্তির অনুপ্রবেশকে সার্থকভাবে ঠেকিয়ে রেখেছে।" তবে আবার কোন্ রন্ধ্রপথে কমিউনিজম ঢুকলো ম্যাডাম? সেটা কি ভারতের সনাতনী ঐতিহ্য? এটা আমার সবিনয় জিজ্ঞাসা।

অবিশ্যি এ বইয়ে নিজের দেশের সরকারকেও বেশ এক হাত নেওয়া হয়েছে। যথা : মারকিন সহায়তার স্বরূপ : শান্তি-নিকেতনে এক বাক্সো চিজ্ পাঠানো হয়েছিল বুভুক্ষুদের জন্যে। সে চিজ নাকি শেষ পর্যন্ত এক য়ুরোপীয় মহিলার ছাত্রাবাসে সদ্ব্যবহারে লাগে।

ভারতের দৈন্য, ভারতের স্বার্থমলিন ঔদাসীন্য, সংকীর্ণ চিন্তাধারা, প্রতিবেশীর প্রতি মমতা বোধের অভাব, ভারতের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় তার সুমহান দার্শনিক ঐতিহ্যের অনুপস্থিতি সব মিলিয়ে মারসিয়ার এক প্রচণ্ড নৈরাশ্য দিয়ে এ বইয়ের একটি পুরো অধ্যায় ঠাসা। তবে সব কিছু ছাপিয়ে একটা সত্য আমার নজরে পড়েছে। ভারতের অধ্যাত্মদর্শন : যোগ এবং বেদান্তে মারসিয়ার নিবিড় অনুরাগ, ও ঐকান্তিক ভক্তি। এ কথাটা আমি সীরিয়াসলিই বলছি।

ভারত সম্পর্কে এই হাফ্‌জান্তা গ্রন্থ রচনা আর অর্ধ সত্য প্রচারই, আমার মতে, ভারতের প্রতি বিদেশের ধারণা খারাপ করে দিচ্ছে। আর কিছু কিছু পণ্ডিতম্মন্য ভারতীয় লোকের এ বাবদে অসীম কনট্রি-বিউশন। এমনই একজনের নাম : খুশবন্ত সিং।

ভারতে সদ্য অনুষ্ঠিত গোহত্যা-পাগলামিকে কেন্দ্র করে, সিংজী নিউয়র্ক টাইমসের এক সংখ্যায় বাজিমাত করেছেন। ভারতের সমস্ত সাধুসন্তগোষ্ঠীকে তিনি, কয়েকটি একক এবং গ্রুপ চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, এবং সযত্নে, সানন্দে পাশ্চাত্যের টেবিলে পরিবেশন করেছেন। প্রবন্ধটি ইচ্ছাকৃত অজ্ঞতা ও ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। সংক্ষেপে, সাধুসমাজ বলতে তিনি গোমাতার উন্মত্ত সন্তানদেরই বোঝাতে চেয়েছেন। রাস্তাঘাটে, ছাইমাখা ফেরারী আসামী, দাগী চোর, আর পেট-বৈরাগীরাই তাঁর মতে ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতিনিধি। আর যে দু'একজন উচ্চশিক্ষিত, ইংরেজী অভিমানী সন্ন্যাসী আছেন—খুশবন্ত সিংয়ের মতে, তাঁরাও প্রতিক্রিয়াশীল, বিকৃত বুদ্ধি, ধর্মান্ধ এবং প্রগতির পরিপন্থী। এমন দু'একজনের দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছেন।

উপসংহারে লেখকের একটি সদর্প বিবৃতি : "ঐতিহ্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, সেদিন আমরা নৈশ আসরে স্কচ্ গিললুম, পুরো দমে বীফের স্যানডুইচ্ খেলুম। আমাদের হোস্‌ট বন্ধু বললে, এটা পবিত্র গোমাংস নয়, বিদেশের আমদানি...'

অর্থাৎ, গোমাংস ভক্ষণ ও মদ্য পান নিষেধ : ভারতীয় সনাতন ধর্মের মৌলিক সত্য ও তত্ত্বকে তিনি এই একটি সমীকরণ থিওরিতে দাঁড় করিয়েছেন।

পরিশেষে, তাঁর নৈশ আসরের স্বাগতিক বন্ধুটির মুখ দিয়ে যে নাতিক্ষুদ্র বক্তৃতাটি আওড়েছেন, সেটি সংক্ষেপে তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না :

"শোনো হে বৎসগণ, ভারতীয়রা যতই উচ্চশিক্ষিত হোক, আর তারা যে ধর্মেরই উপাসক হোক, গরুর মাংস খেতে গেলেই তার স্মরণবোধ জাগ্রত হবে—যত বজ্জাত

বলেই জানুক, তবু খাপমনিায় ভয়ে সাধুমাত্রকেই সমীহ করে চলবে—মুখে যতই স্বস্তীপাদের নিন্দে করুক, 'সন্তী' অর্থাৎ সহমৃতার প্রতি একটা ভক্তির ভাব পোষণ করবেই। এ সব ভাবা, আমাদের হাড়ে মজ্জায় মিশিয়ে রয়েছে। চার হাজার বছর ধরে, একি সহজে যায়? এর শেকড় আমাদের যুক্তিবাদের চেয়ে অনেক শক্ত।"

ধন্য ভারত আবিষ্কার!

ভাবলে অবাক লাগে। আজ থেকে কত বছর আগে আমেরিকায় এসে কাজ করেছেন বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ। দলে দলে উচ্চ শিক্ষিত মনীষী সন্ন্যাসীরা এসেছেন মঠ মিশনে। এ দেশেও তাঁরা কম পাড়ি জমান নি। কিন্তু কাজ কী করেছেন? সীমিত সংখ্যক পণ্ডিতদের মধ্যে উপনিষদের চুল-চেরা ব্যাখ্যা, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গা কালী পুজো, আর আর পাঁচটা ঠাকুর-দেবতার মতন রামকৃষ্ণ পরমহংসের মূর্তির সামনে দর্পণ নাড়া, দেশে কাঙালীভোজন, আর বিদেশে পাগড়িবাঁধা...আর কী বলব? মহারাজেরা অপরাধ নেবেন না। এই কি স্বামীজীর মিশন? কেবল জাতি সূক্ষ্ম তর্কজাল সূক্ষ্মতর লোকোত্তর হাসির

[illegible] ও শিশুদের পার্ক

তাঁগ! একটা পণ্ডুজোর মুক্তমাবকে কোনো মতে কনভিন্স্ করে এমন একটা সহজ বই কি বাজারে ছাড়া যেত না—যাতে পাঁচজন সাধারণ হুজুগে আমেরিকানও শুনতে পেত, যে জীবমাত্রেই শিব, যে তারাও অমৃতের সন্তান, যে ভারত মানেই ন্যাংটো সাধু, সাপের বাঁশি, বুজরুকি মন্তর আর মার্কিন খাদ্য-জাহাজের মুখাপেক্ষী কাতারে কাতারে বুভুক্ষু ভিখিরি নয়......?

কাগজে, টিভিতে, মুভিতে, ভারত বলতেই কেবল রাজস্থানের মরু পল্লীতে একটা টিউবওয়েল আবক্ষ লম্বিত ঘোমটায় কুণ্ঠিতা, বিড়ম্বিতা নারী, খাপরার চালের নিচে আধমরা গরু, অসহায়, অর্ধনগ্ন শিশুর বোবা চাউনি, আর খিদে...গম... অনাবৃষ্টি...মার্কিন দান—ঔদ্ধত্য—পিঠ-চাপড়ানি...আর কাঁহাতক সহ্য হয়।

ভ-য়ে ভারত, ভ-য়ে ভবিষ্যৎ, ভ-রে ভণ্ডামি। আরো আছে—ভ-রে ভামিনী, ভ্যালেনটাইন—ভিয়েতনাম। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। অত্যন্ত দুঃসাহসী দৌড়বাজ না হলে, ভিয়েতনামের মৌচাকে ঢিল মারা উচিত নয়। ঐ একটি মাত্র প্রশ্নের ভেতরে হাজার হাজার হুল, যে যার, সেলে বসে গজরাচ্ছে। জহুরী সদাগরের 'চিকেন্-হার্টে' এত হিম্মৎ নেই। আমি হালের দুটি স্থানীয় খবর পেশ করছি।

কিছুদিন আগে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলুম। বিজ্ঞাপনের ভাষাটা অনেকটা এইরকম:

...একদা এক শিশুর জন্মমুহূর্তে শান্তির শঙ্খ ধ্বনিত হয়েছিল।...আর এই শিশুগুলি? এদের জীবনে শান্তির অধিকারকে কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? আমাদের নিজেদের জীবনে—?

যুদ্ধ কি কখনো মহৎ হয়, ন্যায় হয়? যুদ্ধ কি কখনো আবশ্যক হতে পারে? যুদ্ধ মানুষের জীবনে এই বিভীষিকার লাঞ্ছন এঁকে দেয়!

এর পাশাপাশি কয়েকটা ছবি। দুটি ফুলের মত শিশু গলা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে, আর মার্কিন নাপাম বোমায় ক্ষত-বিক্ষত একটি শিশু, দুটি অর্ধমৃত দেহ...

এর নিচেই একটি আবেদন: মায়েরা বিশ্বাস করেন শান্তি নিশ্চয়ই সম্ভব... রাষ্ট্রপতি কি তাতে সায় দেবেন?

যদি দেন তাহলে:

* বিনাশর্তে বোমাবর্ষণ বন্ধ করুন
* লড়াইয়ে যারা সরাসরি সংশ্লিষ্ট, তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলুন। শান্তি অন্বেষায় তাঁর আন্তরিকতার প্রমাণ দিন।

'উইমেন স্ট্রাইক ফর পীস'—এই অভিযান চালাচ্ছেন। জনমত সংগ্রহের জন্যে বিজ্ঞাপনের নিচেই একটি নাম-ঠিকানার ঘর-কাটা ফর্ম।

পোটোম্যাক নদীর ধারে প্রতিরক্ষা দপ্তরের বিশাল বাড়ি—পেনটাগন। সেদিন পেনটাগনের বন্ধ দরজার প্রায় আড়াই হাজার নারীর এক বিক্ষুব্ধ মিছিল আছড়ে পড়লো। তাদের হাতে আন্দোলিত প্ল্যাকারড, কণ্ঠে স্লোগান: লড়াই থামাও। অফিসের বন্ধ দ্বারে ঘনঘন ধাক্কা। দপ্তরের নাম-ফলকের ওপর একজন হাতে লেখা একটা কারডবোরড ঝুলিয়ে দিলেন: ধ্বংস বিভাগ।'

প্রতিরক্ষা সচিব রবারট ম্যাকনামারার অফিসঘরে হানা দিয়ে নারী বাহিনী হাঁকলেন: বেরিয়ে এসো। শোনা গেল তিনি লানচে গেছেন। ইতিমধ্যে শান্ত্রী-দের নাকি হুকুম দেওয়া ছিলো ঘরদোর বন্ধ করে রাখার; কারণ ঐ সুবিশাল নারী প্রবাহে মোটে দেড় কুড়ি পুরুষ গারড, কুটোর মতন ভেসে যাবে। মেয়েরা বিশেষ উৎপাত করেন নি। কেউ কেউ শুধু অম্বররঞ্জনী দিয়ে চানঘরের আয়নায় আয়নায় শান্তির বাণী দাগিয়ে দিলেন।

সচিব মশায়ের হুকুমে আধ ঘণ্টাটাক পরে, তাঁর আপিস খোলা হলো। মহিলা প্রতিনিধিদের সংগে সহকারী সচিবের সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করা হলো।

জানা গেল দূরদূরান্তর থেকে রাজ-ধানীতে এসেছেন এই নারীফৌজ 'লড়াই থামানোর লড়াই' করতে। আন্দোলনের উদ্যোক্তা—'উইমেন স্ট্রাইক ফর পীস।' একটি করে নীলরঙের বাক্সার করা থলে তাঁদের হাতে, তার গায়ে লেখা: 'মায়েদের হুকুম, ভিয়েতনামে যুদ্ধ বন্ধ করো।' চীৎকার করে তাঁরা আওয়াজ তুলেছেন: আমাদের বুক খালি করে আমাদের ছেলেদের টেনে নিয়ে যেতে পারে না..." "বোমা না ফেলে রাস্ককে ফেলো, ম্যাকনামারাকে ফেলো।"

খুচরো কিছু মজার দিকও ছিলো। লং আয়ল্যানডের এক ভদ্রলোক এই দলে জুটেছিলেন, স্ত্রীর অনুগামিনী হয়ে। তিনি বললেন, "আমারো একটা স্লোগান আছে—বোমা ফেলা বন্ধ করো, বাড়ি ফেরা শুরু করো।" আসলে ভদ্রলোকের প্ল্যাকারড তৈরীর ব্যবসা। ওয়াশিংটনে এসেছিলেন একটা মিটিং-এ। পথ-দেখা কলা-বেচা দুই-ই হলো।...

কিছু দিন আগে খবরের কাগজের রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্রে আরো একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলুম। ওপরে এক বর্ষীয়সী মহিলার ছবি। চোখ দুটিতে মনস্বিতার বেদনা।

"কাল রাত্তিরে একটি ছোট্ট শিশুর কান্না শুনেছেন কি?" প্রশ্ন দিয়ে বিজ্ঞাপন শুরু। জাপানে কোরিয়ায়, ভিয়েতনামে—মারকিন সেপাইদের ঔরসজাত অগণিত এশীয় শিশুর জীবনরক্ষার জন্যে এতে আবেদন জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে: "...এরা আমাদেরই আপনার জন, আমাদেরই রক্তের ধন। এদের বাপেরা এদের কথা ভুলে গেছে, প্রাচ্যের পরিবারভিত্তিক সমাজের চাপে, মায়ের বুকে এদের ঠাঁই নেই। ছন্নছাড়া, পরিত্যক্ত এইসব গোত্রহীন শিশুদের রূপ আছে, মেধা আছে...তবু বিদেশের মাটিতে এরা অবহেলায়, অনাদরে, লাঞ্ছনায় অজ্ঞতায় বেড়ে উঠছে। তাতে আমেরিকার মর্যাদা বাড়ছে না। আমেরিকান নারী হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, এইসব শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্নেহ আর সযত্ন পরিচর্যায় জন্মগত অধিকার আছে। আমি আশা করি, ভাবীকালে এরাই হবে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সম্প্রীতির সার্থক সেতুনির্মাতা।" পাঠকদের কাছে যথাশক্তি সাহায্যের আবেদন ও ধন্যবাদ জানিয়ে বিজ্ঞাপন শেষ হয়েছে। তলায় নাম সই: পার্ল এস্. বাক্।

দোকানে দোকানে পান আঁকা কারড, পানের আকারের লাল টুকটুকে বাক্সের ক্যানডি থেকে নিয়ে তাবত মন ভোলানো উপহার সামগ্রী। এসব হলো ভ্যালেন্-টাইন্ ডে উপলক্ষে। ঐ পান—প্রেমে জরজর হৃদয়ের প্রতীক, তা আমাদের দেশ-গাঁয়েও সবাই জানে। মনের লেনদেনের ব্যাপারে, হৃৎশিল্পের বাজারে চোদ্দই ফেব্রুয়ারী তারিখটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিথি। সম্রাট ক্লডিয়াসের আমলে, এই দিনে সন্ত ভ্যালেনটাইন শহীদ হয়ে-ছিলেন। তা সাধুসন্ন্যাসির দেহরক্ষার সংগে কন্দর্পপুজোর কী সম্পর্ক! মদনভস্ম তো আর এই দিনে হয় নি? না সেরকম কোনো সম্পর্ক নেই। তবে একটা পুরনো প্রবাদ আছে—বিহংগ সমাজের স্বয়ম্বর সভা নাকি এই দিন থেকে শুরু হয়। সেই ধারণা থেকেই ভ্যালেনটাইন্ ডে—প্রেমিকদের উৎসবতিথি।

প্রেসিডেনট কেনেডির হত্যা নিয়ে আবার

নতুন আবেদন প্রথা দিচ্ছে। সিটি অরলিয়ানসের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি সম্প্রতি প্রমাণ পেয়েছেন—হত্যাকাণ্ডের পেছনে একটা ঘোরতর চক্রান্ত ছিল। লী অস্‌ওয়াল্ড ছাড়াও আরো অনেকে জড়িত ছিল এর সংগে। ওয়ারেন কমিশনের রিপোর্টকে তিনি নির্ভুল বলতে পারছেন না। বলেছেনঃ আরো লোককে গ্রেপ্তার করা হবে। ওয়ারেন কমিশনের জনৈক সদস্য বলেছেনঃ তথ্য-প্রমাণ যদি সত্যিই কিছু পাওয়া গিয়ে থাকে, তা অবিলম্বে অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে পাঠানো উচিত, এবং তাঁর উচিত তৎক্ষণাৎ সেসব প্রেসিডেন্টের গোচর করা। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির নাম মিঃ গ্যারিসন। কথায় কথায় 'প্রেসিডেন্টের মৃত্যু' বইটার কথাও ওঠে। লেখক এক জায়গায় বলেছেনঃ অসোয়াল্ড একাই খুনী। সে সম্পর্কে গ্যারিসন বলেনঃ ম্যানচেস্টার বা আমি কেউই খুনের সময় ছিলুম না। তবে তার তদন্তের চেয়ে আমার তদন্ত জোরালো। একজন দৈহিক শক্তিমান ও বিপজ্জনক প্রকৃতির কিউবা-বাসীকে এই ব্যাপারে তল্লাস করা হচ্ছে। লোকটি ফেরার হয়েছে। এই ঐতিহাসিক দুর্ঘটনার আপাতত এইটিই সর্বশেষ দৃশ্য। এরপর যবনিকা উঠলে আশা করি আততায়ী ছায়াপথিকদের দেখা পাওয়া যাবে।

মার্কিন সরকারের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ মার্কিন মুলুকের জাতীয় ছাত্র সম্প্রদায় এন এস এ একদা কী করিয়া মিলন হ'ল দোঁহে...এই মিলনের সন্দেশ প্রচার করল ক্যালিফর্নিয়ার র‍্যামপার্ট পত্রিকা। টনক নড়ে গেল ছোট বড় মাঝারি কর্তাদের। খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। সব টিকিতেই টান পড়ল। একটা জিনিস মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার না করলে অপরাধ হবে। সেটা এদের অকপট স্পষ্টভাষা আর ঢাক ঢাক গুড়গুড় না করে দোষঘাট সব হাটে হাঁড়ি ভেংগে জাহির করা। যেই জানা গেল সি আই এ থেকে এন এস এ-কে টাকা পয়সা দেওয়া হয়েছে, ওমনি সবাই চেপে ধরলো, 'কেন দিয়েছ বল?' জানা গেল, বাইরে ছাত্রসমাজে কমিউনিস্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিহত করার সাধু সংকল্প নিয়েই এটা করা হয়েছে। এমনিতে এরা প্রচণ্ড কমিউনিস্ট বিরোধী। কিন্তু এটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। ছাত্র সমাজ কমিউনিজমের প্রসার রোধ করুক, আনন্দের কথা। তা-বলে ঘুষ দেওয়া কেন?

প্রেসিডেন্টের কড়া হুকুম সংগে সংগে জারি হয়ে গেল। অবিলম্বে ছাত্রমহলে অর্থ-সাহায্য দেওয়া বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলো সি আই এ-কে। সমস্ত ব্যাপারটা খতিয়ে তদন্ত করার জন্যে প্যানেল তৈরিরও আদেশ দিলেন জনসন সাহেব। বললেনঃ এমন আইনটি কোথাও অনুমোদন কোরো না, যাতে ছাত্রসমাজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা বা সংহতি ক্ষুন্ন করার মত কোনো কাজ, কোনো হস্তক্ষেপ করার অধিকার কেন্দ্রীয় কোনো সংস্থার না থাকে। বিভিন্ন দপ্তরের সব হোমরা চোমরারা এই তালিকায় আছেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট মিস্টার হামফ্রিও খুব বকাবকি করেছেন। আবার কংগ্রেসে কিন্তু দু'রকম মতামতই পাওয়া যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছেনঃ বেশ করেছে, টাকা দিয়েছে, আরবং দেবে। গোয়েন্দাগিরি করার জন্য মোটেই টাকা কবুলানো হয়নি। জাতির স্বার্থের খাতিরে, বিপন্ন স্বাধীনতাকে রক্ষা করার খাতিরে এক সময় এর জরুরী প্রয়োজন ছিলো। ১৯৫৩ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত সি আই এ-র কর্তা ছিলেন জনৈক ডালেস্। তিনি জোর গলায় বলেছেনঃ রাশিয়া মিলিয়ন মিলিয়ন রুবল ঢালছে—বিশ্ব ছাত্র আন্দোলনকে কবজা করার জন্যে। তার প্রতিকার করতে হলে উপযুক্ত ছাত্র প্রতিনিধির পৃষ্ঠপোষকতা করতেই হয়। আমরা যা করেছি, তার প্রতিটি পেনির সদ্ব্যবহার হয়েছে।...এপক্ষের প্রশ্ন হলো—সমস্যা এখনো একই রয়েছে। তা ডলার যদি বন্ধ করো, তবে কী দিয়ে ছেলে ভুলোবে? বিশ্বের ছাত্র নেতারা কাজ করবে কী করে?

...এইসব খবর দেখে শুনে জনৈক একটা দিকনেত্র খুলে যাচ্ছে।

আপনাদের একটা সুখবর দিই। জনমত জরীপ করে দেখা যাচ্ছেঃ প্রেসিডেন্ট জনসন এখনো বেশ লোকপ্রিয়। অবিশ্যি তাঁকে যারা 'জোরালো সমর্থন' জানাতো তাদের সংখ্যা কমেছে, তবে তেমনি যারা তাঁকে আদৌ পছন্দ করে না, তাদের সংখ্যাও রীতিমত কমে গেছে।

খুচরো খবর : রাজধানী ওয়াশিংটনে অপরাধের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। ব্যবসায়ীরা কাগজে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে আকুল আবেদন ছুড়েছেন—'ত্রাহি'—প্রেসিডেন্টের কাছে তাঁরা নিরাপত্তা প্রার্থনা করছেন। একটা নামকরা ওষুধের দোকান বলছে ঃ গত এক বছরে সশস্ত্র ডাকাতের হামলায় এক লক্ষ বোলো হাজার ডলার আমরা খুইয়েছি। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হলো, আমাদের লোকজন আর খদ্দেরদের জীবন ও নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে উঠেছে।...

জানেন, আমাদের এখানে সরস্বতী পুজো হচ্ছে। দেশে থাকতে বিজ্ঞ নাস্তিক সেজে পুজোমণ্ডপে যেতুম না। আজ মা কানে মোচড় দিয়ে পায়ে মাথা খুঁড়িয়ে নিচ্ছে। বুকের মধ্যে এখন থেকেই ডাক

শুনতে পাচ্ছি ঃ যা কুন্দেন্দু তুষার হার ধবলা...বিশ্বের জাড্য দূর কর মা।
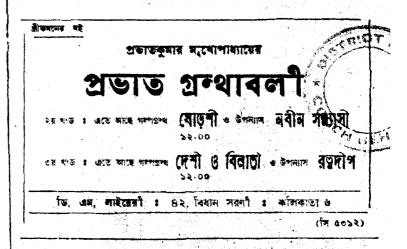
ওয়াশিংটন বড় খামখেয়ালী। এই গরম, এই ঠাণ্ডা। মাঝে ক'দিন এতই গরম পড়লো মনে হলো সামার-স্যুট নামাবার সময় হয়েছে। তারপর আবার মেঘ, আবার ঠাণ্ডা ...হিমাংকের নিচে তাপমাত্রার অধঃপতন, মেঘ আর শৈত্যের মণিকাঞ্চনযোগে আবার তুষারপাত। গত পরশুদিন, তার আগের দিন বরফ পড়েছে। তার শবদেহের এখনো সৎকার হয়নি। পেছনের মাঠে, সারারাত ক্ষুধিত নেকড়ের মতন বাতাস সেই শব ধরে টানাটানি করেছে, আর আহ্লাদে গর্জন করেছে।

সেই গর্জন শুনেই বোধ হয় খুব ভোরে আজ ঘুম ভেঙে গেল। গোলাপী কমলা মেশা একটা আলোর আভাস দিগন্তে ছড়িয়ে রয়েছে। আজ একটা স্মরণীয় দিনের শুরু। আজ বাইশে ফেব্রুয়ারী। মার্কিন জাতির জনক জর্জ ওয়াশিংটনের পুণ্য জন্মতিথি।

জহুরী সদাগর

চীন-যুদ্ধে পরাজয়ের দায়িত্ব

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

[তিন]

সামরিক উদ্যোগের অসম্পূর্ণতা

পূর্ব প্রবন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি তাহা মোটা কথায় এই—১৯৬২ সনের ১২ই অক্টোবর তারিখে নেহরু যখন ঘোষণা করেন যে তিনি নেফা হইতে চীনাদের গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য হুকুম দিয়াছেন, তখন তিনিই এই আদেশ পূর্বরাত্রে নাকচ করিয়া আসিয়াছিলেন। অর্থাৎ আক্রমণের সংকল্প ত্যাগ করা হইয়াছিল, তবু উহা বলবৎ আছে সে-কথা প্রচার করা হইয়াছিল।

ব্যাপারটা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। কোনও দেশের প্রধানমন্ত্রী শুধু নিজের দলকে জনপ্রিয় রাখিয়া গভর্নমেন্টের কর্তা থাকিবার জন্য, একটা অজ্ঞ ও উত্তেজিত জনসমষ্টিকে স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া শান্ত করিবার জন্য সম্পূর্ণ অলীক ঘোষণা করিতে পারে, তাহার অন্য কোনও দৃষ্টান্ত আমি পৃথিবীর ইতিহাসে পাই নাই।

কিন্তু যদি ঘোষণাটা সত্যের উপরও প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলেও উহাতে মিথ্যা প্রচার না থাকিলেও দায়িত্বহীনতা কম থাকিত না, উহার অবিমৃশ্যকারিতার ইতরবিশেষ হইত না। যখন চীনাদের বাহির করিয়া দিবার সংকল্প সদম্ভে প্রকাশ করা হইল, তখন এই কাজের জন্য উপযুক্ত আয়োজনের কথা দূরে থাকুক, চীনাবাহিনী যদি আক্রমণ করে তাহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষারও কোনও উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের নেতারা উহাকে তামাশা বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন।

একটি বিদেশী লেখিকা ১২ অক্টোবর তারিখেই নেহরুর সহিত মাদ্রাজে যান। তখন তিনি আমাদের মন্ত্রীদের যে হাবভাব দেখিয়াছিলেন তাহার কথা একটি নব-প্রকাশিত বই-এ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি জানিতেন না যে, ঘোষণাটা মিথ্যা। তাই [illegible] এ জন্য রাজ-পুরুষদের মুখে নিশ্চিন্ততার চিহ্ন দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন। এই চাপল্য তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

ভাবনা থাকিবে কেন? কীলোৎপাটি বানর কি বুঝিয়াছিল সে কি কুকর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে? যুদ্ধের আগে দূরে থাকুক, যুদ্ধে হারের পরেও, কোনও দায়িত্ববোধ যে আছে, তাহার পরিচয় আমাদের নেতারা দেন নাই। চীনারা আক্রমণ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার কয়েকদিন পরে—এখন আমাদের বাহিনীর [illegible] বেশ একটু—তখন এক পার্টিতে আমি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেননকে দেখি। তিনি লোকজনের সঙ্গে হাসিহাসি মুখে ঘুরিতেছিলেন। তাহাতে আমি আশ্চর্য হইয়াছিলাম। তবে আমার মান-অপমানবোধ একটু অসাধারণরকমে উগ্র। হয়ত বিলাতে শিক্ষিত শ্রীযুক্ত মেনন মনে করিয়াছিলেন, যুদ্ধে হারজিত ক্রিকেট বা ফুটবলে হারজিতেরই মত,

উঁহাতে স্পোর্টসম্যানের মত মনোভাব দেখান উচিত।

যুদ্ধের আয়োজন উদ্যোগ সম্বন্ধে যাহাদের কোনও জ্ঞান আছে, তাহাদের এই ধরনের লঘুমতি কখনও হয় না, উদ্যোগ থাকিলেও হয় না, উদ্যোগ না থাকিলে ত কথাই নাই। আমাদের কোনও উদ্যোগই ছিল না।

যুদ্ধের উদ্যোগ দুই প্রকার—১। সাধারণ উদ্যোগ অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য সৈন্যসংখ্যা বাড়ানো, অস্ত্রশস্ত্র তৈরি বা সংগ্রহ; ২। কোনও বিশেষ যুদ্ধ বা অভিযানের জন্য সেনাবাহিনী ব্যুহস্থ করা, যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম রাখা এবং আক্রমণ ও রক্ষার জন্য প্ল্যান করা। না প্রথম, না দ্বিতীয় কোনও দিকেই আমাদের গভর্নমেণ্টের কোনও ভাবনা ছিল না।

এই দুই ধরনের উদ্যোগ সম্পূর্ণ না করিয়া কেহই যুদ্ধে অগ্রসর হয় না, রাজনীতির দিক হইতে যুদ্ধ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িলেও করে না। ইহাতে জাতির ক্ষতি হইতে পারে, অপমানও হইতে পারে, কিন্তু উপায়াভাবে মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হয়। তবে যে-জাতির পদার্থ আছে, সে শুধু সহ্যই করে না, প্রাণপণ শক্তিতে উদ্যোগ করিতে থাকে।

এইরূপে সহ্য করার ও উদ্যোগ করার বহু দৃষ্টান্ত দিতে পারিতাম, শুধু একটি দিব, কারণ এইটিই এই ব্যাপারের সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—উহা জাপানের আধুনিক ইতিহাস হইতে। ১৮৯৪ সনে চীনকে হারাইবার-পর হইতেই রুশিয়ার সহিত জাপানের বিরোধের সূত্রপাত হয়। রুশিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পোর্ট আর্থার দখল করে, মাঞ্চুরিয়াতে কায়েমী হইয়া বসে ও কোরিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। রুশ শক্তির ও সাম্রাজ্যের এইরূপ অগ্রগতি জাপানের পক্ষে জীবনমরণের ব্যাপার। তবু জাপান দশ বৎসর চুপ করিয়া ইহা সহ্য করিয়াছিল।

কেন? —আয়োজন সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া। জাপানী গভর্নমেণ্ট ও সামরিক নেতারা স্থির করিয়াছিলেন যে, পূর্ব এশিয়াতে রুশিয়া ট্রান্স-সাইবিরিয়ান রেল-পথে যত সৈন্য আনিতে পারিবে, তাহার দ্বিগুণ সেনাবাহিনী উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইবার আগে তাঁহারা যুদ্ধের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন না। তাই দশ বৎসর অর্থাৎ ১৯০৪ সন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যেদিন আয়োজন উপযুক্ত হইল সেদিনই রুশিয়াকে আক্রমণ করিলেন।

তারপর যুদ্ধে নামিয়াও তাড়াতাড়ি জিতিবার লোভে কোনও হঠকারিতা করেন নাই। জাপানী সেনাপতিদের এই বিবেচনা ও ধৈর্য প্রণিধান করিবার মত ব্যাপার। ১৯০৪ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী যুদ্ধ আরম্ভ হয়, মার্চ মাসের মধ্যে জাপানী বাহিনী কোরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত বিনা বাধায় অগ্রসর হয়। ইয়ালু নদীর তীরে তীরে তখন বিক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট জেনারেল জাসুলিচের অধীনে ১৯০০০ রুশ সেনার বিরুদ্ধে, জেনারেল কুরোকির অধীনে ১ম জাপানী আর্মির প্রায় ৪০,০০০ সৈন্য সন্নিবিষ্ট। তবু কুরোকি আক্রমণ করিলেন না। জাপানী প্রধানসেনাপতি ও তিনি জানিতেন যে, এই প্রথম এশিয়ার একটা দেশ ইউরোপের এক বিরাট দেশ ও বিরাট এবং প্রতিষ্ঠার অদ্বিতীয় ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, উহাতে জিতিতে না পারিলে কলঙ্কের সীমা থাকিবে না। তাই সমস্ত ব্যবস্থা নিখুঁত করিয়া ১লা মে তারিখে কুরোকি আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। জাপানী বাহিনীর জয় যে হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। ইয়ালুর যুদ্ধের পর সারা জগতে এশিয়া সম্বন্ধে একটা নূতন ধারণা জন্মিল। আর আমরা ছেলেখেলা করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে সুনাম হইয়াছিল তাহাও যুদ্ধের পরে হারাইলাম।

আমাদের কর্তৃপক্ষ যখন সেনাবাহিনীকে নেফাতে আক্রমণ করিতে আদেশ দেন তখন এই আক্রমণ সফল হইতে পারে, তাহার কোনও ব্যবস্থাই করেন নাই, সেনাবাহিনী জিতিতে পারে তাহারও কোনও সুযোগ দেন নাই। এই অভিযানের পিছনে প্ল্যান বা ব্যবস্থা কিছুই ছিল না। শুধু রাজনৈতিক সুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা মূঢ় বা চপলমতি ব্যক্তির মত একটা গুরুতর ব্যাপারে হাত দিয়াছিলেন।

প্রথমে সাধারণ উদ্যোগের অসম্পূর্ণতার কথা বলিব। পুরা আলোচনা এখানে সম্ভব নয় আভাসমাত্র দিব।

আমি পূর্ব প্রবন্ধের গোড়াতেই বলিয়াছি যে, ১৯৬২ সনে আমাদে
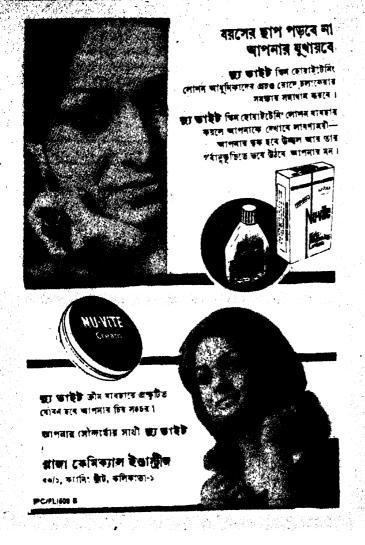
বাহিনীর পরাজয়ে আশ্চর্য হই নাই। ইহার কারণ বলিতেছি। কংগ্রেস দলের রাজনৈতিক নেতাদের যুদ্ধের আয়োজন করিবার বা যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা কোনও দিন হইবে তাহা আমি কখনও বিশ্বাস করি নাই, এখনও করি না। মহাযুদ্ধের পর আমাদের সেনাবাহিনী গঠন সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ পাইতেছিলাম, তাহাতে ইহাও আমার ধারণা হয় নাই যে, আমাদের সেনানীদের কোনও প্রকারের বিশিষ্ট কৃতিত্ব বা যোগ্যতা আছে। কোনও যুদ্ধ বাধিলে তাঁহারা গতানুগতিক ধারার বাহিরে যাইতে পারিবেন না ইহাই আমি মনে করিয়াছিলাম।

আমাদের যুদ্ধব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আমি ১৯৫৫ সনের প্রথম দিকে দিল্লিতে প্রকাশিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'থট'-এ ছয়টি প্রবন্ধ লিখি। সবদিকই উহাতে আলোচনা করি এবং ৫ই মার্চ তারিখের পত্রে আমি স্থল বাহিনী সম্বন্ধে লিখি। এই প্রবন্ধটির নাম দিয়াছিলাম—"এ স্টাগনেটিং আর্মি" অর্থাৎ "এঁদোয়-পড়া" সেনাবাহিনী। ইহাতে আমার বক্তব্য এই ছিল যে, গভর্নমেণ্ট বা সেনানীরা এই বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়া আধুনিক রণনীতি অনুযায়ী শিক্ষা দিয়া কালোপযোগী সংগঠন ও সন্নিবেশ করিয়া যুদ্ধের উপযুক্ত করিবার কোনও চেষ্টা করেন নাই, আমাদের বাহিনী যেভাবে যুদ্ধের পর ছিল সেইভাবেই উহাকে অচলায়তন করিয়া রাখা হইয়াছিল।

অন্য ব্যাপারের মধ্যে উহার একটি আয়োজনের অসম্পূর্ণতার কথা লিখিয়াছিলাম। জেনারেল কলও উহার উল্লেখ করিয়াছেন, তাই এই বিষয়ে আমি কি লিখিয়াছিলাম তাহার পুনরাবৃত্তি করিব।

জেনারেল কল লিখিয়াছেন, ১৯৬১ সনে চিফ-অফ-স্টাফগণ রাইফেল তৈরি করিবার কারখানাকে আধুনিক করিবার জন্য ১ কোটি টাকা চান, কিন্তু গভর্নমেণ্টের কাছ হইতে তাহা পান নাই। আমাদের রাইফেলকে যে আধুনিক করা কত আবশ্যক হইয়াছে, তাহা আমি ১৯৫৫ সনে সবিস্তারে লিখি। আমার ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

"নেটো-সংস্থার সমস্ত দেশ এখন তাহাদের বন্দুক জাতীয় অস্ত্র (স্মল-আর্মস) এক ধরনের (স্টাণ্ডার্ডাইজ) করিতে চাহিতেছে, এবং সৈন্যদের এমন একটা অস্ত্র দিতে চাহিতেছে যাহা দ্বারা সকল কাজ চলে—অর্থাৎ যাহা দ্বারা বন্দুকের মত একটা একটা করিয়া গুলি করা যাইবে, আবার অল্পক্ষণের জন্য ক্রমাগত গুলিও চালান যাইবে। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকার মধ্যে বন্দুকের নলের ব্যাস কি হইবে এই লইয়া মতভেদ হওয়াতে পরিবর্তন আপাতত বন্ধ আছে। ইংরেজরা ·২৮০ (অর্থাৎ ২৮০/১০০০ ইঞ্চ) ব্যাসের নলের পক্ষে—উহা ব্রিটিশ ই এম-২ বা বেলজিয়মের এফ এন হইতে পারে। পক্ষান্তরে আমেরিকানরা তাহাদের ·৩০ নল ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়—উহারা শুধু কার্তুজের দৈর্ঘ্য কমাইয়া উহাতে একটা নূতন বিস্ফোরক (প্রপেলেণ্ট এক্স-প্লোসিভ) ব্যবহার করিতে চায়। ...কিন্তু আগেই হউক আর পরেই হউক নেটো-সংস্থায় বন্দুকজাতীয় অস্ত্র এক হইয়া যাইবে। তখন যাহা লইয়া মতভেদ সেই ·২৮০ নল আর ৩০ নল এ দুয়ের যে কোনটাই গৃহীত হউক না কেন, আমাদের ·৩০৩ নলের রাইফেল অব্যবহার্য হইয়া পড়িবে। সেই সঙ্গে আমাদের রাইফেল সম্পূর্ণ পিছনে পড়িয়া থাকিবে।"

এই কথাগুলি আমি লিখি ১৯৫৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৯৬২ সনের অক্টোবর মাসে, পরাজয়ের পর এই ·২৮০ নলের রাইফেলই আমাদিগকে আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের গভর্নমেণ্ট বিমান-যোগে ইউরোপ হইতে আনিয়া দিয়াছিল। ইহা আমার দুর্ভাগ্য, আমাদের সেনা-বাহিনীর দুর্ভাগ্য ও দেশের দুর্ভাগ্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদের ডিফেন্স-ডিপার্টমেণ্টের লজ্জার ব্যাপার নয়। সেই তামাশার কথা বলি।

প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইবার পর, ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্টের কর্মচারিগণ সাড়ম্বরে এগুলির প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া "ফাইল, আনইনফর্মড" এই মন্তব্য করিয়া নথিভুক্ত করিয়াছিলেন। অপরং বা কিং ভবিষ্যতি॥

ইহার পর এই মূঢ় শাসকগণ যাহাই বলুক না কেন, উহা অবিশ্বাস করার ক্ষমতা আমার জন্মিয়াছিল। কিন্তু নেহরুর ঘোষণার পিছনের আত্মপ্রত্যয় দেখিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম হয়ত বা ডিফেন্স-ডিপার্টমেণ্টের চরিত্র সংশোধন হইয়াছে, হয়ত বা এইবার আংশিকভাবে হইলেও আয়োজন হইয়াছে। কিন্তু আসলে কোন আয়োজনই হয় নাই। এই কথাটা বুঝাইবার জন্য একটু বাগ্‌-বিস্তারের আবশ্যক আছে।

নেহরু যখন আক্রমণের পরিকল্পনার সংবাদ দিলেন তখন যাহারই সামরিক ব্যাপারে কোনও জ্ঞান আছে সে, এমন কি দেশের জনসাধারণও আয়োজন সম্বন্ধে কয়েকটা মোটা ব্যাপার ধরিয়া লইতে পারিত। প্রকৃতপক্ষে এই ধারণা করাই স্বাভাবিক, কারণ যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া কেহ এই সব অবশ্যপালনীয় ব্যবস্থা করে নাই, উহা অবিশ্বাস্য। এই অবশ্যকর্তব্য ব্যবস্থাগুলি নিম্নলিখিতরূপ হওয়া উচিত ছিল। আমি দফা দফা উহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

১। যুদ্ধক্ষেত্রে যিনি সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাকে হয় প্রধানমন্ত্রী বা সমর-সচিব স্পষ্টভাষায় কোথায়, কি উদ্দেশ্যে, কি

রক্ষের জন্য যুদ্ধ করিতে হইবে সে-বিষয়ে নির্দেশ দিবেন।

২। দিল্লি হেডকোয়ার্টার্স এবং যুদ্ধের হেডকোয়ার্টার্স এই দুইএ মিলিয়া যুদ্ধ চালাইবার—অর্থাৎ যুদ্ধপরিচালনা, যুদ্ধ-রীতি ও সৈন্য অস্ত্রশস্ত্র গোলাগুলি ও মাল-পত্র চলাচলের জন্য যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ প্ল্যান করিবেন এবং এই প্ল্যান নিম্নতন সেনাপতিদিগকে জানান হইবে।

৩। যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য বিশেষ করিয়া একজন সেনাপতি নিযুক্ত হইবেন; তাঁহাকে উপযুক্তসংখ্যক সহকর্মী দেওয়া হইবে; তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাধারণ যে সংস্থান আছে তাহার অন্তর্ভুক্ত না হইয়া দিল্লিতে প্রধান সেনাপতির নেতৃত্বে যুদ্ধ চালাইবেন।

৪। শত্রুর যে সেনা ও দ্রব্যসামগ্রী আছে তাহার সহিত সমানভাবে যুদ্ধ করিবার মত উপযুক্তসংখ্যক সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রব্যসামগ্রী থাকিবে। তাহাদের যুদ্ধশিক্ষা ভাল হইবে।

৫। গোলাগুলি ও অন্য সামগ্রীর ভাণ্ডার পিছনে থাকিবে ও যথেষ্ট হইবে।

৬। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর সন্নিবেশ এরকম হইবে যে, আক্রমণের ধাক্কা বজায় রাখিবার জন্য একদল সৈন্যের পিছনে বহুদূর পর্যন্ত অন্য দল থাকিবে। এইরূপ সন্নিবেশে সাধারণত তিন ভাগ থাকে—(১) একেবারে সম্মুখবর্তী সেনা যাহারা শত্রুপক্ষকে ঠেকাইয়া রাখে; (২) আক্রমণের প্রধান বাহিনী ও (৩) রিজার্ভ—যাহারা ২য় বাহিনী ক্লান্ত হইয়া পড়িলে আক্রমণ করিতে পারে।

৭। বিমান বাহিনীর সহিত সহযোগিতার পূর্ণ ব্যবস্থা।

৮। যুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে অর্থাৎ আসামের সমতলভূমির শেষে ও পার্বত্য অঞ্চলের নীচের দিকে রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা। চীন সেনা যদি কোনওক্রমে আমাদের বাহিনীকে পরাজিত করিয়া অগ্রসর হইয়া আসে, তাহা হইলে দেশরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন।

৯। আসামে উপরোক্ত সেনাবাহিনীর অতিরিক্ত সৈন্য ও দ্রব্যসামগ্রী—যাহাতে যুদ্ধের ক্ষতি তাড়াতাড়ি পূরণ করা যায়।

১০। আসামের জাহাজে, রেলে ও রাস্তায় চলাচলের ব্যবস্থা একেবারে নিখুঁত রাখা।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এত আয়োজনের প্রয়োজন কি, ১৯৬২ সনের আক্রমণের প্রস্তাবে এত উদ্যোগ প্রত্যাশা করিবারই সংগত কারণ কি? তাহার উত্তর দিব।

নেহরু যেভাবে আক্রমণের সংবাদটা দিয়াছিলেন তাহাতে এই কথা অনুমান করা অসংগত হইত না যে, আক্রমণটা সাধারণ সীমান্ত রক্ষার ব্যাপার নয়, বড় একটা অভিযান বা অফেন্সিভের ব্যাপার। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য নেফাকে শত্রুমুক্ত করা—ইহা স্পষ্টভাষায় বলা হইয়াছিল। সুতরাং সমস্ত নেফা জুড়িয়া বা অন্ততপক্ষে চীনা-বাহিনী যেখানে সদলবলে আছে সেই জায়গায় একটা বড় অভিযান হইবে ইহা মনে করা স্বাভাবিক। নেহরুর কথা শুনিয়া কেহ যদি ভাবিত যে, আফ্রিকায় (মিশরে) পরপর ওয়েভেল, অখিনলেক ও আলেক-জাণ্ডার যে ধরনের আক্রমণ করিয়াছিলেন সে-ধরনের একটা ব্যাপার ঘটিতে যাইতেছে, তাহা হইলে এই ধারণাকে কিছুমাত্র উত্তেজিত কল্পনা বলা যাইত না। আসলে উহা আরও বড় ব্যাপার হইবে ইহা মনে করাই সংগত হইত।

প্রথম কারণ, মিশরের প্রান্তে যুদ্ধক্ষেত্রের তুলনায় নেফার যুদ্ধক্ষেত্রের প্রসার ও বিস্তার অনেক বেশী ছিল। দ্বিতীয় কারণ, প্রতিপক্ষ চীন, সামরিক দিক হইতে অবজ্ঞার পাত্র নয়। গোয়া অধিকার করিয়া যদি কাহারও বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে যে, ঠিক তেমনই সহজে চীনকে পরাজিত করা যাইবে, তাহা হইলে উহাকে শিশুসুলভ কল্পনা ছাড়া কিছু বলা যাইতে পারে না।

চীন কোরিয়াতে আমেরিকাকে প্রায় বিপদের মুখে আনিয়াছিল, ইন্দোচীনে ফ্রান্সের পরাজয়ের পিছনেও ছিল চীন, চীন বহুদিন ধরিয়া নেফাতে নিজের দাবি করিয়া আসিতেছিল এবং এই দাবিকে একটা ইজ্জতের ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছিল, সর্বোপরি আমাদের সেনাপতিরা সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, নেফাতেই চীনাদের চার ডিভিশন বাহিনী আছে, তিব্বতে আরও দশ ডিভিশন আছে, ইহার উপর অঞ্চলের রাস্তা-ঘাটও ভাল করিয়া তৈরি করিয়াছে। এই সব কথা জানিয়া কেহ যদি চীনের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া থাকে, সে উপযুক্ত আয়োজন করিয়াই অগ্রসর হইয়াছে, ইহা মনে করাই স্বাভাবিক।

এইরূপ ব্যবস্থা যে সকলেই করে, কাণ্ডজ্ঞান যাহার আছে সে-ই করে, তাহা পরের প্রবন্ধে দেখাইব, এবং আমাদের দিক হইতে যে দশটি ব্যবস্থার কোনও ব্যবস্থাই করা হয় নাই তাহাও বলিব। (ক্রমশ)

২

মূল কারণটা নিঃসন্দেহে ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃংখলা। যদি সামগ্রিকভাবে গত পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক চিত্রটা বিচার করা যায়, দেখা যাবে, সাধারণ মানুষের মনে কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব রাতারাতি দানা বেঁধে ওঠেনি। এই পরিবর্তনটা আসছিল ধীরে ধীরে। ধাপে ধাপে।

প্রথমেই ধরা যাক খাদ্যের কথা। গত দু' বছর ধরে খরার তাপে এবং অন্যান্য কারণে দেশ জুড়ে অজন্মার পালা গেছে। ফসলের ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। ফলে গত চার-পাঁচ বছর ধরে গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে খাদ্যশস্যের আমদানি ক্রমাগত কমে আসছে। তার প্রধান কারণ —উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলে গ্রামাঞ্চলে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ছাড়া, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ত' আছেই।

সরকারী হিসেব থেকে দেখা যায় যে, ১৯৬১-৬২ সালে গ্রামাঞ্চল থেকে খোলা বাজারে চাল, গম ও জোয়ার এসেছিল প্রায় ১৮·৬ লক্ষ টন। তারপরের বছরও বাজারে শস্যের পরিমাণ তেমন বিশেষ কিছু কমে নি। কিন্তু ১৯৬৩-৬৪ সালে খোলা বাজারে শস্য বিক্রয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫·৪ লক্ষ টন। ১৯৬৪-৬৫ সালে সেটা আরও কমে হয় ১২·৮ লক্ষ টন। কৃষি উৎপাদনের একটা বড় অংশ শহরাঞ্চলেই বিক্রি করতে হয়। কাজেই উৎপাদন কমে গেলে তার ধাক্কা শহরের মানুষদেরই সহ্য করতে হয়। তাছাড়া, গ্রামের মানুষের চাহিদা বেড়েছে। শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই নয়, মাথাপিছু আয়ের হার সামান্য বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যও বটে।

শহরাঞ্চলের এই ঘাটতি যদি গোটা দেশের খাদ্য ঘাটতির নির্দেশক হয়, তবে দেখা যাবে প্রতি বছর ঘাটতির পরিমাণ জমতে জমতে আজ প্রায় ১৭ কোটি টন-এ এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ প্রতি বছর ঘাটতির জের টানতে টানতে প্রত্যক্ষভাবে যে চাপ সৃষ্টি করেছে তা আমদানি করা শস্য দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। সতের কোটি টনের চাপটা থেকেই যাবে।

এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, খাদ্য-শস্য ঘাটতি হলে দাম বাড়বেই এবং তা সাধারণ মানুষকে সহ্য করতে হয়। এই সহনশীলতা নিশ্চয় অসীম নয়। দর বৃদ্ধি বিভিন্ন দেশেও দেখা দিয়েছে; কিন্তু বোধ হয় এদেশের মত কোথাও না। গত দশ বছরে পাইকারি দর ব্রিটেনে বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২৭·২; আমেরিকায় শতকরা ৯·৭; পশ্চিম জার্মানীতে শতকরা ১০·৩; পাকিস্তানে শতকরা ১৮; আর ভারতে বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৭৬·৮।

অন্য দিকে দেখা যাবে, তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনার সারা দেশে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১২৫; কিন্তু জাতীয় আয় বেড়েছে শতকরা ৭০। পরিকল্পনার জন্য ব্যয় বৃদ্ধির ফলে টাকার ঘাটতির পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে ১৪০০ কোটি টাকা। কিন্তু সম-অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৬৫-৬৬ সালে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ৩·৮; কিন্তু তার পূর্বে চার-পাঁচ বছর ধরে বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৭ থেকে ৮-এর মধ্যে।

মোট কথা, উৎপাদন আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল না; বরং কমেই আসছিল; মূল্য বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে; শহরাঞ্চলে খাদ্যশস্যের আমদানি কমে এসেছে; এবং শিল্পোৎপাদন কমে আসার ফলে বেকারির হার ক্রমেই ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠেছে।

পরিস্থিতিটা নিশ্চয়ই নির্বাচনের সময় যে-কোন শাসক পার্টির পক্ষে অভিপ্রেত নয়। বরং যে-কোন শাসক পার্টির প্রচেষ্টা হবে এই অবস্থাকে এড়িয়ে নির্বাচনের সম্মুখীন হওয়া। সে দিকে নজর রেখেই গত বছর জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকার টাকার মূল্য কমিয়ে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। ডিভ্যালুয়েশন মূল্যমানের ঊর্ধ্বগতি হয়ত রোধ করতে পারত। কিন্তু সে নীতি কার্যকরী করার জন্য যে-সব পন্থা নেওয়া উচিত ছিল, তা নেওয়া হয় নি। ফলে, মূল্যমানের ঊর্ধ্বগতি আরও ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেল; কারণ, আমদানির মূল্য দিতে হল বেশী, শিল্পে উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পেল অথচ রপ্তানি বৃদ্ধি করা সম্ভব হল না।

নির্বাচনের মুখে এসে দেখা গেল অর্থনৈতিক আবহাওয়া সাধারণভাবে কংগ্রেসের প্রতিকূল। প্রতিকূল আবহাওয়া দেশে বেশ কিছুদিন থেকেই বইছিল। সে-হাওয়াটা ওঠে খাদ্য ঘাটতির অবস্থা থেকে। ঝড়টা প্রথম উঠল পশ্চিম বাংলায় গত বছর ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৯৪২-এর আগে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন "এক জ্বালামুখী স্ফুটোগ।" ১৯৬৬-র হাওয়াতেও ছিল সেই জ্বালামুখীর আভাস। অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েনি সত্য; কিন্তু মানুষ অশান্ত হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়।

না হলে কলকাতার আশেপাশে দাবানল জ্বলত না ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে। ডিভ্যালুয়েশন সে অশান্তিকে শান্ত করতে পারল না। বরং দেখা গেল পশ্চিম বাংলায় যে ঢেউ উঠল, তার ধাক্কা লাগল উত্তর-

প্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে, বিহারে। উড়িষ্যায় আগুন জ্বলেনি সত্যি, কিন্তু অনাহারক্লিষ্ট মানুষের ভিড় দেখা গেল গ্রামে গ্রামে, গঞ্জে। কংগ্রেসকে জ্বালামুখীর মুখে বসে নির্বাচকদের সম্মুখীন হতে হল।

"এই প্রতিকূল হাওয়াটা বইছিল সারা দেশে। এ-ছাড়াও বিশেষ বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন প্রান্তে, যার ধাক্কাও কংগ্রেসকে সহ্য করতে হয়েছে।

৩

প্রথম বড় ধাক্কা এসেছিল দক্ষিণ থেকে। মাদ্রাজে। ধাক্কাটা এল হিন্দী ভাষাকে কেন্দ্র করে। কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত করল—১৯৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে সারা ভারতে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হবে। ইংরাজী বর্জিত হবে। ভারতকে ভাষার ভিত্তিতে "এক" করে নিতে হবে।

সংবিধানের নির্দেশ ছিল। সেই অনুসারেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। শুধু সিদ্ধান্তই নয়, কিভাবে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে চিঠিপত্র হিন্দীতে আদান-প্রদান হতে পারে তারও নির্দেশনামা তৈরি হয়ে গেল।

স্বভাবতই, এর পিছনে যে রাজনৈতিক কোন তাড়া ছিল তা ধরে নিতে অসুবিধা হয় না।

আপত্তিটা এসেছিল হিন্দীভাষী অঞ্চল থেকে এবং বিশেষ করে জনসঙ্ঘ ও সংযুক্ত সোস্যালিস্ট পার্টির কাছ থেকে। কংগ্রেসের ভিতরেও হিন্দীভাষী অঞ্চলের কয়েকজন নাম-করা নেতা এর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। কারণ, গত নির্বাচন থেকে শুরু করে জনসঙ্ঘ ও এস-এস-পি [illegible] হিন্দী ভাষার মর্যাদা নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই চালিয়ে আসছিল। [illegible] ছিল চতুর্থ নির্বাচনের দিকে। তখনও গো-হত্যা বন্ধের প্রশ্নটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি।

প্রধানত রাজনৈতিক কারণেই হিন্দী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেবার ব্যগ্রতা দেখা দিয়েছিল। সেই ব্যগ্রতাকে দূর করার জন্যই ভারতের অ-হিন্দীভাষী অঞ্চলে বিক্ষোভের ঢেউ দেখা দেয়। এই বিক্ষোভ প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়ল মাদ্রাজে, দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাঘামের নেতৃত্বে। কংগ্রেসের ভিতরে যে-সব দক্ষিণ ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন তাঁরা যে খুব নিশ্চিন্ত বোধ করছিলেন তা নয়, তবু নেতৃত্ব দিতে পারেন নি। প্রথম দিনের বিক্ষোভেই রক্তক্ষয় হল। সৈন্য তলব করা হল। স্বাভাবিক নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। এই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দুই মন্ত্রী পদত্যাগ পত্র দাখিল করলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়ল।

তখন স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী। লালবাহাদুরজী প্রতিশ্রুতি দিলেন ভাষার প্রশ্নটা পুনর্বিবেচনা করে দেখা হবে। আন্দোলন প্রশমিত হল। নেহরু প্রতিশ্রুতির দোহাই মেনে ভাষা সংক্রান্ত আদেশ সংশোধন করা হল। ইংরাজী সরকারী ভাষার মর্যাদা নিয়ে বেঁচে গেল। অন্য দিকে, রাজনীতির লড়াইয়ে মাদ্রাজে ডি-এম-কে প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে মর্যাদা পেল।

তামিল ভাষায় 'দ্রাবিড়' অর্থে 'তামিল-ভাষীদের দেশ'। এটা [illegible] মনের কথা। তাই ডি-এম-কে জনসাধারণের কাছে রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃতি পেল। ভাষা প্রশ্ন ডি-এম-কের কাছে প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে গণ্য হল। প্রথমাবস্থায় ডি-এম-কের রূপ যাই থাক না কেন, নির্বাচনের সময় ভাষার প্রশ্নে কংগ্রেসকে প্রতিহত করা অনেক সহজ হয়ে গেল।

তাছাড়া, স্বতন্ত্রনেতা শ্রীরাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বও, মাদ্রাজের নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের অন্যতম কারণ। তাঁরই নেতৃত্বে নির্বাচনের পূর্বে ডি-এম-কে, স্বতন্ত্র পার্টি, বাম কম্যুনিস্ট, মুসলিম লীগ, এস-এস-পি, পি-এস-পি ইত্যাদি নানা কংগ্রেস বিরোধী দলের মধ্যে একটা সমঝোতা সম্ভব হয়েছিল। তবু বলা যায় যে একমাত্র রাজনৈতিক সমঝোতার জন্যই ডি-এম-কের পক্ষে নির্বাচনে জয়লাভ সম্ভব হয় নি, সম্ভব হয়েছে কংগ্রেস বিরোধী মনোভাবের জন্য। নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি বলেই ছাত্র নেতার কাছে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজকে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয়েছে। মাদ্রাজের নির্বাচকদের কাছে কংগ্রেস আর হিন্দী এক হয়ে মিশে গিয়েছিল নির্বাচনের অনেক আগে।

(৪)

অন্যদিকে দেখা যাবে এই হিন্দী ভাষার ভিত্তিতেই জনসঙ্ঘের মত দলের পক্ষে সম্ভব হয়েছে কোন কোন রাজ্যে কংগ্রেসকে বিপর্যস্ত করতে। যেমন মধ্যপ্রদেশে (যদিও কংগ্রেস এখানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে), বিহারে, উত্তরপ্রদেশে, হরিয়ানায়, এবং রাজস্থানে। এই অঞ্চলগুলো মূলত হিন্দীভাষী অঞ্চল। এবং পরিসংখ্যান আলোচনা করলে, দেখা যাবে মধ্যপ্রদেশে ১৯৫৭ সালে জনসঙ্ঘ পেয়েছিল ১০টি আসন, এবারে পেয়েছে ৭৮টি। বিহারে গত নির্বাচনে, পেয়েছিল ৩টি আসন, এবার ২৬টি। রাজস্থানে ১৯৫৭ সালে পেয়েছিল ৬টি আসন, এবার পেয়েছে ২২টি। আর উত্তরপ্রদেশে ১৯৫৭ সালে পেয়েছিল ১৭টি আসন, এবার পেয়েছে ৯৭টি।

এই কয়টি রাজ্যে জনসঙ্ঘের সাফল্য উল্লেখযোগ্য বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। মাদ্রাজ আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দী সম্বন্ধে যে সংশোধিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল জনসঙ্ঘ তা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছিল। শুধু হিন্দী ভাষাই নয়, কোন কোন রাজ্যে, যেমন উত্তরপ্রদেশে জনসঙ্ঘ ধীরে ধীরে তার প্রভাব নানাভাবে বিস্তার করে আসছিল। বিশেষ করে যে-সব অঞ্চলে শিক্ষিতের হার তেমন বেশী নয়। তাছাড়া অন্যান্য রাজ্যে, যেমন মধ্যপ্রদেশে, প্রাক্তন রাজন্যবর্গের সহানুভূতি ও প্রত্যক্ষ

সমর্থনও জনসঙ্ঘের প্রতি ছিল।

শুধু জনসঙ্ঘের সাফল্য প্রধানত এসেছে গো-হত্যা নিরোধ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। নির্বাচন যখন আসন্ন তখনই এই প্রশ্নটিকে [illegible] সর্বভারতীয় প্রশ্ন হিসাবে [illegible] সামনে তুলে ধরার চেষ্টা [illegible] গো-হত্যা বন্ধের প্রতি-[illegible] ছিল, এবং জনসঙ্ঘ [illegible] সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি, [illegible] হয়, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গো-হত্যা আইন করে বন্ধ করা হোক।

প্রধানত সাধু সমাজের কাছ থেকে এই দাবির পক্ষে আন্দোলনের তাগিদ আসে। এই সাধু সমাজের একটা অংশ কংগ্রেসের তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গুলজারি-লাল নন্দের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। ভারত সাধু সমাজ শ্রী নন্দের প্রেরণায় [illegible] যদিও তার উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক সংস্কার।

এই সাধু সমাজের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় এবং জনসঙ্ঘের সমর্থনে নির্বাচনের কয়েক মাস আগে গো-হত্যার প্রতিবাদে দিল্লীতে এক বিরাট সমাবেশ আহ্বান করা হয়। এই সমাবেশ উপলক্ষে জানা যায় যে, নাগা সাধুদের দিল্লী আসার জন্য কোন কোন সরকারী মহল থেকে বিনা ভাড়ায় [illegible] বন্দোবস্তও করা হয়েছিল। [illegible] শঙ্করাচার্য দিল্লীতে আসেন [illegible] নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। [illegible] সভার [illegible] আসেন।

[illegible] ছিল, এবং [illegible] হয়ে গিয়েছিল। জনমতের [illegible] গুলজারি-লাল নন্দ অপসারিত হলেন। কিন্তু আন্দোলনের গুরুত্ব বন্ধ হল না। বরং নতুন পথে একে জোরদার করার চেষ্টা করা হল। ঠিক এর পরেই গো-হত্যা বন্ধ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় দুজন আমরণ অনশন শুরু করেন। এই অনশন নির্বাচনের পূর্বকাল পর্যন্ত চালান হয়েছিল। যদিও গোরক্ষা সমিতি এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল, তবু জনসঙ্ঘ এর মধ্যে সক্রিয়-ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল।

তারই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল কলকাতার বড়বাজারে। কংগ্রেস নেতাদের এই অঞ্চলে নির্বাচনী ভাষণ দিতে গিয়ে জনসঙ্ঘ পরি-চালিত বিক্ষোভ মিছিলের সম্মুখীন হতে হয়। বিক্ষোভ মিছিলের ধ্বনি ছিল, 'গো-হত্যা বন্ধ কর।' প্রত্যক্ষভাবেই জনসঙ্ঘ 'গো-হত্যা বন্ধ কর' আন্দোলনকে নির্বাচনী স্লোগান হিসাবে ব্যবহার করেছে। পশ্চিম বাংলা অথবা অন্যান্য অধিকাংশ রাজ্যেই হয়ত নির্বাচকরা এই স্লোগানের তেমন মর্যাদা দেয়নি, কিন্তু হিন্দীভাষী অঞ্চলে এই স্লোগান যে নির্বাচকদের প্রভাবিত করেছিল তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

মধ্যপ্রদেশে যদিও কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে এবং জনসঙ্ঘের ২০৫জন প্রার্থীর মধ্যে ৭৮জন নির্বাচিত হয়েছে, তবু বৃহত্তম বিরোধী দল হিসাবে জনসঙ্ঘের স্বীকৃতি উপেক্ষণীয় নয়। অবশ্য এটাও ঠিক যে, মধ্যপ্রদেশে জনসঙ্ঘের কিছুটা আশাভঙ্গ হয়েছে। কারণ, এখানে রাজন্যবর্গ অত্যন্ত প্রভাবশালী। এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে দেখা গেল যে, গোয়ালিয়রের মহারানী কংগ্রেস ছেড়ে বিরোধী দলে যোগ দিয়েছেন। এমনি ছোট বড় রাজন্যবর্গের পরিবার থেকে অনেকেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আসরে নেমেছিলেন। আশা ছিল, জনসঙ্ঘ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে এবার ক্ষমতায় বসবে। নির্বাচকরা তা হতে দেয়নি।

মধ্যপ্রদেশ ছোট বড় ৭৭টি প্রাক্তন রাজন্য-বর্গ শাসিত অঞ্চল। এদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ—রাজপরিবারের জন্য বার্ষিক ভাতা ('প্রিভি পার্স') অন্যায়-ভাবে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এদের পক্ষ থেকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, রাজায় রাজায় চুক্তি করেই তাদের রাজ-

রাজ্য বর্তমান ভারত সরকারের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়েছিল। এতে কংগ্রেস পক্ষের হস্তক্ষেপের কোন সুযোগ নেই।

প্রধানত এই কারণেই রাজন্যবর্গ [illegible] প্রবলভাবে এবং [illegible] দিয়ে [illegible] পরাজিত করার চেষ্টা করেছিল। [illegible] হয়ত এদের [illegible] কিন্তু অন্যান্য [illegible] ওড়িশায় এবং বিহারে [illegible] জনক্রান্তি দলের [illegible] দুর্বল করতে সক্ষম হয়েছে।

(৫)

চরম দক্ষিণপন্থী দল হিসাবে জনসঙ্ঘের সাফল্য যেমন বিশেষ বিশেষ রাজ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ঠিক তেমনি স্বতন্ত্র পার্টিরও শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে বিশেষ পরিস্থিতিতে। স্বতন্ত্র পার্টি বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করেছে গুজরাটে ৬৪টি আসন পেয়ে। গত নির্বাচনে এখানে এই পার্টির আসনসংখ্যা ছিল ২৬। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য, অন্ধ্রে পেয়েছে ২৯টি, মাদ্রাজে ২০টি, মহীশূরে ১৬টি, উড়িষ্যায় ৪৯টি; এবং রাজস্থানে ৪৯টি।

গুজরাটে স্বতন্ত্র পার্টি বিশেষভাবে চেষ্টা করেছিল কংগ্রেসকে পরাজিত করার জন্য। গুজরাটে স্বতন্ত্র পার্টি সঙ্ঘবদ্ধও বটে। কারণ, স্বতন্ত্র পার্টির পূর্বসূরী হিসাবে লোকপক্ষ এবং কৃষিকার লোক পার্টি গুজরাটে কংগ্রেস-বিরোধী সংগঠন গড়ে তুলেছিল। এদের প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয়নি সত্যি, কিন্তু এদের সমর্থকের দল ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই সমর্থকদের মধ্যে বেশীর ভাগই রায়তারী জমিদার শ্রেণীর লোক। এরা জমির মালিকানা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন এবং যখনই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ভূমি সংস্কারের প্রচেষ্টা হয়েছে তখনই এরা প্রবলভাবে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে।

এই শ্রেণীর জমির মালিকদের নিয়েই স্বতন্ত্র পার্টির মূলে সংগঠন গড়ে ওঠে। এর পর ধীরে ধীরে বড় বড় ব্যবসায়ীরা এই দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়ে এবং প্রবলভাবে সমর্থন করতে শুরু করে। প্রাক্তন রাজা, নবাব এবং ঠাকুরবংশের অভিজাতদের সমর্থন পেতে স্বতন্ত্র পার্টির কোন অসুবিধাই হয় না।

সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, ধনিক শ্রেণী ও প্রাক্তন শাসক পরিবারবর্গের প্রকাশ্য ও সক্রিয় সমর্থন লাভ করেছিল বিশেষভাবে এই দুটি চরম দক্ষিণপন্থী দল। ওড়িশারও ঠিক এইভাবেই স্বতন্ত্র পার্টি কংগ্রেসকে বিপর্যস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। অথচ বর্তমান নির্বাচনের ফলাফল সব কটি রাজ্য মিলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টি যে-সব রাজ্যে কংগ্রেসের প্রভাবকে ক্ষুন্ন করতে সক্ষম হয়েছে সে-সব অঞ্চলে প্রগতিপন্থী দলগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে নির্বাচকদের প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হয়নি। যেমন [illegible] পেয়েছে ২১টি। [illegible] নির্দলীয় একটি অন্যতম পার্টি। রাজস্থানে স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসঙ্ঘ যথাক্রমে পেয়েছে ৩১টি এবং ২২টি আসন, কম্যুনিস্টরা পেয়েছে ১টি এবং এস-এস-পি ৮টি।

পশ্চিম বাংলা ও কেরালাকে বাদ দিলে সারা দেশের যে চিত্রটা নির্বাচনের পর ফুটে ওঠে, তা থেকে দেখা যাবে, চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলো যেমন প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনি ক্ষীণ হয়ে এসেছে কম্যুনিস্টদের প্রভাব। সে তুলনায় সংযুক্ত সমাজবাদী দল তাদের প্রভাব বেশ কিছুটা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে এস-এস-পির সাফল্য যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি অন্যান্য রাজ্যেও এদের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়, যদিও সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে অনুল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন থেকে যায়, চরম দক্ষিণপন্থী ও প্রগতিপন্থী দলগুলো একত্রভাবে যদি সীমাবদ্ধ সাফল্য লাভ করে থাকে তা হলে কংগ্রেস বিপর্যস্ত হল কি করে? স্বভাবতই, দৃষ্টি পড়বে কংগ্রেস-ভাঙ্গা দলগুলোর দিকে। দেখা যাবে, মূলত এবং প্রধানত এই মধ্যপন্থী দলগুলোই যারা কংগ্রেসের নামে কংগ্রেস-বিরোধিতা করেছে তারাই বিশেষভাবে ক্ষুন্ন করেছে কংগ্রেসের প্রভাবকে।

(৬)

নির্বাচনের এই অবস্থা আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় কলকাতার একটি বিশেষ ঘটনাকে। কারণ, সে ঘটনার মধ্যে হয়ত ভবিষ্যতের কিছু ইঙ্গিত ছিল।

ঘটনাটি ঘটে ১৯৬৫ সালের ১০ই এপ্রিল। ঐদিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীনন্দ আসেন কলকাতায়। দমদমে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে যান শ্রমমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহার। শ্রীনাহার অপ্রস্তুত হয়ে ফিরে আসেন; কারণ, নন্দজী যে গাড়ি চড়ে শহরে আসছিলেন তাতে শ্রীনাহারের স্থান হয়নি। 'ভিড় বাড়বে' এই অজুহাতে শ্রীনাহারকে সে গাড়িতে নেওয়া হয়নি এবং শ্রীনন্দও আপত্তি জানান নি।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেদিনই শ্রীঅতুল্য ঘোষ নন্দজীকে একটি কড়া চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে শ্রী ঘোষ প্রশ্ন করেন —"কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা যদি সহকর্মীদের উপেক্ষা করে শিল্প-বাণিজ্যে নিযুক্ত বন্ধুদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান, তা হলে দেশের ভবিষ্যৎ কী?"

ঐদিন সন্ধ্যায় শ্রীনন্দ স্থানীয় বণিক-সভায় বক্তৃতা দেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কোন মন্ত্রী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। [illegible] ব্যবসায়ীরা [illegible] কংগ্রেসকে সাহায্য করেছে, টাকা দিয়েছে, আজ সেই ব্যবসায়ীরাও অনেক নেতার দৃষ্টিতে সমাজের শত্রু।

একজন নিষ্ঠাবান ও অনুগত কংগ্রেসী হিসাবে তিনি ব্যবসায়ীদের এবং কংগ্রেস সরকারকে ও দলকে কাছাকাছি আনার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না সরকারের জন্য। সরকারের ব্যবহারে, কথায়-বার্তায় তাঁরা ক্ষুব্ধ। "তিনি নিজে এখনও কংগ্রেসের সমর্থক; কারণ, কংগ্রেসের বিকল্প নেই বলে।"

তবু শ্রীবিড়লা মনে করেন, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করার ভাবনা বা চেষ্টা ব্যবসায়ীদের পক্ষে মারাত্মক; কারণ, কংগ্রেসের জায়গায় জনসঙ্ঘ বা স্বতন্ত্র পার্টি ক্ষমতায় আসবে না, আসবে কম্যুনিস্টরা।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত)

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার
ব্যথা-বেদনা তাড়াতাড়ি দূর করবার আধুনিক উপায়

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে!

যে কোনো ব্যথা-বেদনায় আরামের জন্য: 'অ্যাসপ্রো' রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়!

মাইক্রোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'-তে মেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশী সূক্ষ্ম করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ করবার শক্তি বিদ্যুতের চেয়েও বেশী তাড়া শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়—অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র ব্যথা দূর করবার সক্রিয় উপাদানটি আরো সহজেই এবং খুবই তাড়াতাড়ি শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৪ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইজন্যেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে দেয় এবং তার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

অতি সহজেই আপনি খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি যেভাবে খুশী খেতে পারেন—শুকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের যন্ত্রণায় নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' খাবেন: ব্যথা-বেদনা • মাথাধরা • দাঁত-ব্যথা • স্নায়ুব্যথা • বাতের বেদনা • জ্বর-জ্বর-ভাব • ফ্লু • সর্দি • গলাব্যথা।

মাত্রা: প্রাপ্তবয়স্ক: দুটি ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার খাবেন। শিশুদের জন্য: একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কিভাবে কাজ করে দেখুন

ট্যাবলেটের কণাগুলির আকার বড় বড় হয়, তাই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেরী হয়—আপনার আরাম পেতেও সময় লাগে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র প্রতিটি ট্যাবলেটে প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। তাই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে-সঙ্গে মিশে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি ব্যথার উপশম হয়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।

পশ্চিম জার্মানীর বিজ্ঞানবার্তা

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রকল্প

আমাদের বাংলা দেশের মত জার্মানীর পশ্চিমাংশ কয়লাসমৃদ্ধ। কিন্তু তবু এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাই হোক বা জার্মানী হোক, কোথায়ই কয়লা অফুরন্ত হয়। কিছুকাল বাদেই মাটির নিচে কয়লা শেষ হয়ে যাবে। তাই যে-কোন দেশের অর্থনীতির ভাবী পরিচালিকা শক্তি হবে বিদ্যুৎ এবং সেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান হাতিয়ার হবে পারমাণবিক শক্তি। অন্যান্য অগ্রগামী দেশের মত পশ্চিম জার্মানীও এই ব্যাপারে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। বন্ থেকে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ যে, ১৯৮০ সালের মধ্যে পশ্চিম জার্মানীর অর্থনীতির বৈদ্যুতিক চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ উৎপন্ন হবে পারমাণবিক শক্তি থেকে, যে ক্ষেত্রে বর্তমানে হয় মাত্র ১ শতাংশ অর্থাৎ ৩ লক্ষ কিলোওয়াট (তিনটি রিঅ্যাক্টর থেকে)। ১৯৮০ সালের মধ্যে রিঅ্যাক্টরের সংখ্যা ৫০টি পর্যন্ত দাঁড়াতে পারে, অন্তত ৩০টি তো বটেই। পশ্চিম জার্মানীর অর্থনীতির ঘাড়ে এজন্য নতুন খরচের বোঝা তো চাপবেই না, বরং বিদ্যুৎ উৎপাদনের পড়তা খরচা তার অনেক কমে যাবে। কারণ, কানাডা, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ মহাদেশ থেকে ইউরেনিয়াম আমদানি করতে যা খরচ হবে তার চেয়ে অনেক বেশী আয় করা যাবে অন্যান্য দেশে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র রপ্তানি করে।

মহাবিশ্ব-বিজয়াভিযানের যুগধাতু

এই রূপার মত ঝকঝকে ধাতুটিকে প্রকৃতির রাজ্যে একা দেখতে পাওয়া যায় না। অক্সিজেন ও লোহার সঙ্গে মিলেমিশে এর খনিতে বসবাস। তা ছাড়া, এতকাল এটিকে আলাদা করে নিয়ে নিকাশ করাও সহজসাধ্য ছিল না। ধাতুটির নাম টিটানিয়াম। এসেন শহরে ক্রুপ কোম্পানীর যে কারখানা আছে, হালে সেখানে নাকি প্রকৃতির এই মহামূল্য অবদানটি আলাদা করে তাই দিয়ে হরেকরকমের সামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে; যেমন হাল্কা অথচ অত্যন্ত মজবুত মোটরগাড়ি, হাওয়াই জাহাজ ইত্যাদি। মহাকাশযানের বিভিন্ন অংশ তৈরি করার এমন উপযোগী উপাদান বোধ হয় আর নেই। তাই টিটানিয়ামকে বলা হয় মহাবিশ্ব-বিজয়াভিযানের যুগধাতু।

ওরিগ্‌হাইম/নেক্কার শহরে নির্মীয়মান যে পারমাণবিক বিজলী ঘর ১৯৬৮ সাল থেকে ২৮৩০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে তারই প্রতিকৃতি এই ছবিতে দেখানো হয়েছে

কারখানা-শিল্পের ময়লা জল কাজে লাগানোর ব্যবস্থা

লুডহিব্‌সহাফেন শহরের অবস্থিতি কোলোন থেকে ১২৫ মাইল দূরে। শহরটি একটি শিল্পকেন্দ্র। হালে সেখানে কারখানার আবর্জনায় পূর্ণ অপরিষ্কার

কারখানায় টিটানিয়াম দিয়ে তৈরি সিলিণ্ডার

[illegible] ময়লা জল নিষ্কাশন করার নালা

রোলিং মিলের যান্ত্রিক মস্তিষ্ক

জল জমা করার জন্য এক বিরাট জলাধার নির্মাণ করা হচ্ছে যার মধ্যে জমা করা যাবে চার লক্ষ ঘনমিটার জল। এইভাবে ঐ ময়লা জল আর রাইন নদীকে দূষিত করতে পারবে না, যেমন কলকাতায় গঙ্গার তীরবর্তী কারখানাগুলি গঙ্গার জল দূষিত করে। পশ্চিম জার্মানীর এই জলাধারে সঞ্চিত অপরিষ্কার জল যান্ত্রিক কৌশলে পরিস্রুত করে আবার যাতে কারখানায় ব্যবহার করা যায় তারও বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। আমাদের এই কলকাতা শহরেই বা কেন এই স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা করা হবে না?

কারখানার যান্ত্রিক মস্তিষ্ক

শিল্পনগরী হিসাবে ডুসেলডর্ফের নাম আমরা সবাই শুনেছি। সেখানকার কল-কারখানা স্বয়ংচালিত করার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা হচ্ছে। সেখানকার এক লোহার কারখানার রোলিং মিলের যাবতীয় ক্রিয়া-প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য সীমেন্স কোম্পানীর তৈরী একটি কম্পিউটার বসানো হয়েছে, যার ফলে পড়তা খরচ কমিয়ে বাড়ানো সম্ভব হয়েছে উৎপাদনের হার। স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্ক যেমন দেহের কাজকর্ম পরিচালনা করে, কম্পিউটারও ঠিক তেমনি ভালভ্ ও তারের সাহায্যে কারখানার কাজকর্ম আয়ত্তে রাখে।

দা ভিঞ্চির চরকা

আমাদের দেশের আপামর জনসাধারণ চরকার সঙ্গে পরিচিত। চরকার উদ্ভাবক কিন্তু গান্ধীজী নন, ইতালীর যুগমানব লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। আজ থেকে ৪০০ বছর আগে তিনি এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন। তাঁর সেই চরকার নকশার ভিত্তিতেই তৈরি হয়েছে এ যুগের সুতাকাটার কল। জার্মানীর নুরেমবার্গ শহরের সংগ্রহালয়ে দা ভিঞ্চির চরকার একটি মডেল রক্ষিত আছে।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

॥ ৩ ॥

দুজনে বেরুল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। নৃপতির বাড়ির সামনে এসে তারা শুনতে পেল বৈঠকখানায় কেউ মধুর আঙুলের স্পর্শে পিয়ানো বাজাচ্ছে।

বৈঠকখানা ঘরে তিনটে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। কেবল একটি মানুষ ঘরে আছে, দেয়াল-ঘেঁষা পিয়ানোর সামনে বসে আপন মনে বাজিয়ে চলেছে।

নৃপতি দেবাশিসকে নিয়ে ঘরে ঢুকল, বলল,—'ওহে প্রবাল, দ্যাখো, আমাদের আড্ডার একটি নতুন সভ্য পাওয়া গেছে। এ'র নাম দেবাশিস ভট্ট।'

প্রবাল নামধারী যুবক পিয়ানো থেকে উঠে এল। নিরুৎসুক স্বরে বলল,—'পরিচয় দেবার দরকার নেই।'

নৃপতি বলল,—'আগে থাকতেই পরিচয় আছে নাকি?'

প্রবাল বলল,—'সামান্য। গরীবের সঙ্গে বড়মানুষের যতটুকু পরিচয় থাকা সম্ভব ততটুকুই।'

প্রবাল আবার পিয়ানোর সামনে গিয়ে বসল। টুং টাং করে একটা সুর বাজাতে লাগল। তার ভাবভঙ্গী দেখে বেশ বোঝা যায় সে দেবাশিসকে দেখে খুশী হয়নি। সে বয়সে দেবাশিসের চেয়ে দু'এক বছরের বড়, মাঝারি দৈর্ঘ্যের বলিষ্ঠ চেহারা, মুখের গড়নে বৈশিষ্ট্য না থাকলেও জৈব আকর্ষণ আছে; চোখের দৃষ্টি অপ্রসন্ন। কিন্তু তার চেহারা যেমনই হোক সে ইতিমধ্যে গায়ক হিসেবে বেশ নাম করেছে। তার কয়েকটা গ্রামোফোন রেকর্ড খুব জনপ্রিয় হয়েছে; রেডিও থেকেও মাঝে মাঝে ডাক পায়।

প্রবালের সঙ্গে দেবাশিসের অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। এক সময় তারা এক-সঙ্গে স্কুলে পড়ত, জানাশোনা ছিল; তারপর দেবাশিস স্কুল থেকে পাস করে দিল্লিতে পড়তে চলে গেল। কয়েক বছর পরে এই প্রথম দেখা। এই কয় বছরের মধ্যে দেবাশিসের বাবা 'প্রজাপতি প্রসাধন' নামে শৌখীন টয়লেট্ দ্রব্যের কারখানা খুলে বড়মানুষ হয়েছেন। আর প্রবালের বাবা হঠাৎ হার্ট ফেল্ করে মারা যাওয়ার ফলে তাদের সম্পন্ন অবস্থার খুবই অধোগতি হয়েছে। প্রবাল গান গেয়ে কোনো মতে টিকে আছে।

প্রবালের কথা বলার ভঙ্গিতে দেবাশিস বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল, নৃপতি তাকে ঘরের এক কোণে নিয়ে গিয়ে সোফায় পাশা-পাশি বসে গল্প করতে লাগল। বলল,—'আমার আড্ডায় পাঁচ ছয় জন আসে। কিন্তু সবাই রোজ আসে না। আজ আরো দু'-তিনজন আসবে।'

নৃপতি দেবাশিসের সামনে সিগারেটের টিন খুলে ধরল, দেবাশিস মাথা নেড়ে বলল,—'ধন্যবাদ। আমি খাই না।'

নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে নৃপতি খাটো গলায় বলল,—'প্রবাল শুধু গাইয়ে [illegible] দেবাশিস, আপনি [illegible] তিন বছর [illegible]।'

এই [illegible] প্যান্ট ও [illegible] চেহারা, ধারালো মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ, বেশ দৃঢ় চরিত্রের ছেলে বলে মনে হয়; বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। তাকে দেখে নৃপতি বলল, —'এই যে কপিল। এস পরিচয় করিয়ে দিই: কপিল বোস—দেবাশিস ভট্ট।'

নমস্কার প্রতিনমস্কারের পর কপিল বলল, —'নৃপতি-দা, তোমার টেলিফোন একবার ব্যবহার করব। রাস্তায় আসতে আসতে একটা জরুরী কথা মনে পড়ে গেল।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়।'

কপিল পাশের ঘরে চলে গেলে নৃপতি বলল,—'কপিল ছেলেটা ভাল, বাপ অগাধ বড়মানুষ, কিন্তু ওর কোনো বদ্ খেয়াল নেই। লেখাপড়া শিখেছে; টেনিস বিলিয়ার্ড খেলে দিন কাটায়, রাত্তিরে দূরবীণ লাগিয়ে

দেয়াল ঘেঁষা পিয়ানোর সামনে বসে আপন মনে বাজিয়ে চলেছে

আকাশের তারা গোনে। কেবল একটি দোষ, বিয়ে করতে চায় না।'

প্রবাল হঠাৎ পিয়ানো ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। নৃপতির দিকে তাকিয়ে বলল,—'আজ চললাম নৃপতিদা।' দেবাশিসকে সে লক্ষ্যই করল না।

নৃপতি বলল,—'চললে? এত সকাল সকাল? রেডিওতে গাইতে হবে বুঝি? কাগজে যেন দেখেছিলাম আজ রাত্রে তোমার প্রোগ্রাম আছে।'

প্রবাল বলল,—'প্রোগ্রাম আছে। কিন্তু গান আগেই রেকর্ড হয়ে গেছে, আমাকে স্টুডিও যেতে হবে না। আমি বাসায় যাচ্ছি।'

নৃপতি বলল,—'বাসায় যাচ্ছ! তোমার বউ-এর খবর ভাল তো?

প্রবাল উদাস কণ্ঠে বলল,—'তোমাদের [illegible] নৃপতিদা, বউ মাসখানেক আগে মারা গেছে। হার্টের রোগ নিয়ে জন্মেছিল; ডাক্তারেরা বলে বারো চৌদ্দ বছর বয়সের মধ্যে অপারেশন না করালে এ রোগে কেউ একুশ বাইশ বছরের বেশি বাঁচে না। আমার শ্বশুর রোগ লুকিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন।—আচ্ছা চললাম।'

নৃপতি ও দেবাশিস স্তব্ধ হয়ে রইল। স্ত্রী মারা গেছে অথচ আড্ডার কাউকে কিছু বলেনি; আপন মনে পিয়ানো বাজায় আর চলে যায়। নৃপতি জানত প্রবালের স্ত্রীর মরণান্তক রোগ, কিন্তু খবর শুনে হঠাৎ তার মুখে কথা যোগালো না।

এই সময় কপিল পাশের ঘর থেকে ফিরে এসে তাদের কাছে দাঁড়াল। সে প্রবালের কথাগুলো শুনতে পায়নি, তার দিকে তাকিয়ে বলল,—'বেশ তো পিয়ানো বাজাচ্ছিলে, চললে নাকি? একটা গান শোনাও না।'

[illegible] পায়ের [illegible] বলল,—'আমার [illegible] বিনা পয়সায় [illegible] হয় না। পয়সা [illegible] করতে হয়।'

কপিল [illegible] প্রবালের [illegible] প্রস্তুত ছিল না। সে একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর [illegible] হেসে উঠল। বলল,—'পয়সা খরচ করেই যদি গান শুনতে হয় তাহলে তোমার গান শুনব কেন? তোমার চেয়ে অনেক ভাল গাইয়ে আছে।'

প্রবাল আর দাঁড়াল না, হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কপিল একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ধরালো; নৃপতি অপ্রতিভ মুখে বলল,—'আজ প্রবালের মেজাজটা ভাল নেই।'

কপিল বলল,—'প্রবালের মেজাজ সর্বদাই পর্দায় চড়ে থাকে। ধাতুগত বিকার।'

'ওর স্ত্রী মারা গেছে।'

কপিল চকিত হয়ে বলল,—'তাই নাকি! আমি জানতাম না। ছি ছি, অসভ্যতা করে ফেলেছি।'

নৃপতি বলল,—'থাক গে। তুমি কেমন আছ বলো। কয়েকদিন তোমাকে দেখিনি।'

কপিল বলল,—প্ল্যান করেছিলাম ব্যাঙ্গালোরে বেড়াতে যাব, কিন্তু প্ল্যান ভেস্তে গেল।'

'ভেস্তে গেল কেন?'

'আমার সঙ্গে যার যাবার কথা ছিল সে যেতে পারল না। একলা বেড়িয়ে সুখ নেই।'

'তা বটে। কিন্তু তুমি বিয়ে করছ না কেন? বিয়ে করলে তো একটি চিরস্থায়ী সহযাত্রী পাবে।'

কপিল হেসে উঠল, থিয়েটারী কায়দায় বাহু প্রসারিত করে বলল,—'কবি বলেছেন, হব না তাপস নিশ্চয় যদি না মেলে তপস্বিনী। আমিও কবির দলে।'

নৃপতি বলল,—'কিন্তু শুনেছি তোমার বাবা তপস্বিনী জোটাবার ত্রুটি করেন নি, গোটা পঞ্চাশেক সুন্দরী তপস্বিনী দেখেছেন। একটিও তোমার পছন্দ হল না?'

কপিল একটু গম্ভীর হয়ে বলল,—সুন্দরী মেয়ে অনেক আছে নৃপতিদা, কিন্তু শুধু সুন্দরী হলেই তো চলে না। আমি এমন বউ চাই যার মন হবে আমার মনের সমান্তরাল, অর্থাৎ সমানধর্মা।—কথাটা বুঝেছেন?

'বুঝেছি। তুমি হুঁশিয়ার লোক। তা নিজে পছন্দ করে বিয়ে কর না কেন? তোমার বাবা নিশ্চয় অমত করবেন না।'

কপিল হেসে বলল,—'সেই চেষ্টাতেই আছি।'

তারপর সাধারণভাবে কথা হতে লাগল। দেবাশিস এতক্ষণ কেবল নিশ্চেষ্ট শ্রোতা ছিল, এখন সেও কথাবার্তায় যোগ দিল। দেবাশিসের পূর্ণতর পরিচয় শুনে কপিল

[illegible]

প্রবাল বলল,—'এখানেই ছিলাম, কিন্তু নৃপতিবাবুর সঙ্গে আলাপ ছিল না।'

অতঃপর খানিকক্ষণ গল্পগুজব হল। চাকর এসে ছোট ছোট পেয়ালায় কফি দিয়ে গেল। তখন আটটা বাজল। নৃপতি বলল,—'আজ বোধ হয় আর কেউ আসছে না?'

দেবাশিস বলল,—'আজ উঠি।'

কপিল বলল—'এরি মধ্যে! আমাদের আড্ডা ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত চলে।'

দেবাশিস হেসে বলল,—'আবার আসব।'

নৃপতি জিগ্যেস করল,—'কাল আসতে পারবেন?'

দেবাশিস বলল,—'আচ্ছা কাল আসব।'—

পরদিন দেবাশিস একটু দেরি করে এল। ইচ্ছে ছিল সাড়ে আটটা ন'টা পর্যন্ত থেকে গল্পগুজব করবে। বাড়িতে রোজ সন্ধ্যে-বেলা একলা বিজ্ঞানের বই আর সাময়িক পত্র পড়ে কাটে, এখানে নতুন লোকের সংগ পাওয়া যাবে। প্রবালের অসামাজিক ব্যবহার সত্ত্বেও নৃপতির আড্ডাটি তার ভাল লেগে-গিয়েছিল।

সাড়ে ছ'টার সময় নৃপতির বৈঠকখানায় গিয়ে দেবাশিস দেখল প্রবাল পিয়ানোর সামনে বসে চাবির ওপর আঙুল বুলোচ্ছে, কপিল এবং আর একটি ছেলে তক্তপোশের পাশে বসে পাঞ্জা লড়ছে; নৃপতি এবং অন্য একটি যুবক সোফায় পাশাপাশি বসে গল্প করছে। নৃপতি তাকে হাত তুলে ডাকল।

দেবাশিস কাছে গেলে নৃপতি বলল,—'বসুন এখানে। পরিচয় করিয়ে দিই। দেবাশিস ভট্ট—বিজয়মাধব মুখুজ্জে।। বিজয় হচ্ছে অধ্যাপক বংশের ছেলে, সম্প্রতি সংস্কৃতে এম এ পাস করে অধ্যাপনার কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে।' দেবাশিসের পূর্ণ পরিচয় নৃপতি আগেই বিজয়কে দিয়েছিল, আর পুনরাবৃত্তি করল না।

বিজয় উৎসুক চোখে দেবাশিসকে দেখতে

লাগল। ... থেকে উঠে পড়ল, বলল,—তোমরা ... কর, আমি আসছি।'

বিজয় দেবাশিসের দিকে একটু ঘেঁষে বসল। বলল,—'এক পাড়াতে থাকি, অ্যাদ্দিন আলাপ পরিচয় হয় নি, কি আশ্চর্য বলুন দেখি!' চেহারা দেখেই দেবাশিসকে তার পছন্দ হয়েছিল ও কথায় ...

বহুদিন কলকাতা শহরে পাশাপাশি বাড়িতে বাস করেও আলাপ পরিচয় না হওয়াতে আশ্চর্য কিছু নেই, তবু দেবাশিস হাসিমুখে বলল,—'আশ্চর্য বইকি।'

ওদিকে রূপিকা আর অন্য ছেলেটির পাঞ্জা লড়া শেষ হয়েছিল, নৃপতি তাদের ... বলল,—... তোমার ... আছ?'

খড়্গবাহাদুর ... বলল,—'কথা তো ছিল নৃপতি-দা, কিন্তু যাওয়া হল না।'

খড়্গবাহাদুর নেপালী যুবক। তার মা বাঙালী। তাই তার মাতৃভাষাও বাংলা। চমৎকার চেহারা, যেমন পাকা সোনালী রঙ তেমনি লম্বা ছিপছিপে গড়ন। তার মুখে চোখে মঙ্গোলীয় রক্তের ছাপ এত অল্প যে ধরা যায় না। বর্তমানে সে বাংলা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড়; পায়ের কাছে বল পেলে সে যাদুকর বনে যায়। কলকাতার সব চেয়ে নামজাদা ফুটবল ক্লাবের সে খেলোয়াড়। তার খেলা দেখবার জন্যে লক্ষ লক্ষ দর্শক মাঠে জমা হয়। কিন্তু তার চরিত্রে বিন্দুমাত্র গুমিরাতি নেই। উচ্চবংশের ছেলে, কিন্তু ভারি বিনয়ী। বয়স তেইশ কি চব্বিশ।

নৃপতি বলল, 'কেন, যাওয়া হল না কেন?'

খড়্গবাহাদুর বলল 'কাঠমণ্ডুতে বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়েছিল, হঠাৎ তার পেলাম কীসব গণ্ডগোল হয়েছে, বিয়ে পেছিয়ে গেছে।'

নৃপতি বলল, 'তার মানে এক বছরের ধাক্কা। ফুটবল সীজন এসে পড়ল, এরপর তুমি তো আর নেপালে গিয়ে বসে থাকতে পারবে না।'

খড়্গবাহাদুর চোখে কৌতুক এবং মুখে ... বিষন্নতা নিয়ে মাথা নাড়ল।

চাকর বড় একটি ট্রে'র ওপর কয়েক পেয়ালা কফি নিয়ে এল, সকলেই এক এক পেয়ালা তুলে নিল। এই সময় সদর দরজার কাছ থেকে আওয়াজ এল, 'ওহে আমিও আছি, আমার জন্যে এক পেয়ালা রেখো।'

একটি যুবক প্রবেশ করল। রজতগৌর বর্ণ, মুখের ছাঁচ কেষ্টনগরের পুতুলকেও হার মানায়; চোখ দুটি উজ্জ্বল, ক্ষৌরিত মুখে একটু হাসি লেগে আছে। বয়স সাতাশ-আটাশ।

নৃপতি বলল, 'এস সুজন।'

সুজন মিত্র একজন উদীয়মান চিত্র নক্ষত্র: দু' তিনখানা ছবি করেই বেশ নাম করেছে। যেমন গম্ভীর ভূমিকার অভিনয় করতে পারে, তেমনি হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতাও আছে। সব চেয়ে বড় কথা হঠাৎ খ্যাতি ও অর্থ লাভ করেও তার মেজাজ বিগড়ে যায়নি। নিজের কথা সাত কাহন করে বলতে সে ভালবাসে না। বস্তুত তার সম্বন্ধে কেউ বড় কিছু জানে না। স্ত্রী-জাতির প্রতি তার আসক্তির কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। এমন কি সে বিবাহিত কি অবিবাহিত তাই কেউ জানে না। দক্ষিণ কলকাতার একান্তে একটি ছোট বাড়িতে

এক্ষেত্রে [illegible] ঘর। [illegible] এবং অপ্রকট তার জীবন।

সুজন [illegible] উঁচু করে একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে বলল, 'ঠিক সময়ে এসেছি, আর একটু হলে ফাঁকি পড়তাম।'

কাঁধটা একটি চুমুক দিয়ে সে তার উজ্জ্বল অভিনেতার চোখ দুটি ঘরের চারিদিকে ফেরালো। তারপর দেবাশিসকে দেখে মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, 'নৃপতিদা, নতুন অতিথির আগমন হয়েছে দেখছি।'

নৃপতি বলল, 'হ্যাঁ, এস তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। খড়্গ, তুমিও এস।'

পরিচয় বিনিময়ের পর সুজন মিটিমিটি হেসে বলল, 'দেবাশিসবাবু, এখন বলুন দেখি আপনি ফুটবল খেলা দেখতে ভালবাসেন? না সিনেমা দেখতে ভালবাসেন?'

দেবাশিস বলল, 'দুই-ই ভালবাসি। খেলার মাঠে এবং রুপালী পর্দায় আপনাদের দু'জনকে অনেকবার দেখেছি।'

তারপর সকলে মিলে খানিকক্ষণ হাসি-গল্প চালাল। প্রবাল কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগ দিল না, নিজের মনে টুংটাং করে পিয়ানো বাজিয়ে চলল।

রাত আন্দাজ নটার সময় সভাভঙ্গ হল। দেবাশিস বেশ প্রফুল্ল মনে বাড়ি ফিরে এল।

এইভাবে কয়েকদিন কাটবার পর এক রবিবারের সকাল বেলা বিজয়, তার বাবা নীলমাধব এবং নৃপতি দেবাশিসের বাড়িতে দেখা করতে এল। দেবাশিস তাদের খাতির করে নীচের তলার বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালো এবং নকুলকে চায়ের হুকুম দিল।

নীলমাধব মুখুজ্জে অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির লোক। তিনি আগে বিজয়ের মুখে দেবাশিস সম্বন্ধে সব কথা শুনেছিলেন এবং তত্ত্বতল্লাসও নিয়েছিলেন। এখন পাত্রটিকে সংপাত্র মনে হওয়ায় তিনি স্বচক্ষে দেখতে এসেছেন। তিনি দেবাশিসকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করলেন এবং নৃপতির দিকে ঘাড় নেড়ে সন্তোষ জ্ঞাপন করলেন।

ইতিমধ্যে চা এসে পড়েছে। নৃপতি চা খেতে খেতে নিপুণভাবে বিয়ের প্রস্তাব তুলল। নৃপতির ঘটকালির দিকে বিশেষ দক্ষতা আছে।

আধ ঘণ্টার মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা-পাকি হয়ে গেল। দেবাশিসের ঠিকুজি কোষ্ঠী ছিল না তাই জোতিষের যোটক বাদ দিতে হল। নৃপতি বলল, 'দেবাশিস, দীপাকে তোমার অপছন্দ হবে না জানি, তবু একবার দেখা দরকার। আজ বিকেলে আমি এসে তোমাকে এঁদের বাড়িতে নিয়ে যাব। কেমন?'
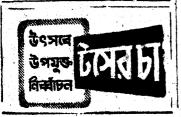
দেবাশিস সম্মত হল। বলা বাহুল্য এই কদিনে নৃপতি ও দেবাশিসের ঘনিষ্ঠতা 'তুমি' ও নৃপতিদার পর্যায়ে নেমেছে।

সেদিন অপরাহ্ণে নৃপতি এসে দেবাশিসকে দীপাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। বৈঠকখানা ঘরে আসর হয়েছিল; আড়ম্বর কিছু নয়, টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে এক গুচ্ছ ফুল, তক্তপোশের ওপর মখমলের আস্তরণ এবং মোটা তাকিয়া। বিজয় তাদের নিয়ে গিয়ে ঘরে বসাল, তারপর নীলমাধব এসে দেবাশিসকে ভেতলার ঘরে নিয়ে গেলেন। নীলমাধব তার সঙ্গে দু'চারটে কথা বললেন; তাঁর মুখ দেখে বোঝা গেল ভাবী নাতজামাই দেখে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

তারপর নীলমাধব দেবাশিসকে নিয়ে আবার নীচে নেমে এলেন। পাঁচ মিনিট পরে বিজয় গিয়ে দীপাকে নিয়ে এল, দীপা এসে টেবিলের কাছে দাঁড়াল। পরনে আটপৌরে শাড়ি ব্লাউজ, কানে ছোট ছোট দুটি সোনার আংটি, গলায় সরু হার, হাতে তিনগাছি করে চুড়ি। কনে দেখানো উপলক্ষে তাকে সাজগোজ করানো হয়নি, কিম্বা সে নিজেই সাজগোজ করেনি। তার সারা দেহে প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ। একবার সে পলকের জন্যে চোখ তুলে দেবাশিসের দিকে চেয়ে আবার চোখ নীচু করল। ভ্রূর ঋজু রেখার নীচে চোখের দৃষ্টি খর।

দেবাশিসের কিন্তু দীপাকে খুব ভাল লেগে গেল। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা শূন্য বললেই হয়, তবু দীপাকে দেখে তার মনে মাধুর্যের সঞ্চার হল, মনে হল একে স্ত্রীরূপে পেলে সে সুখী হবে।

দু' মিনিট পরে বিজয় বলল, 'দীপা, তুমি এবার যাও। দেখা হয়েছে।'

দীপা চলে গেল। তারপর মিষ্টিমুখ করে দেবাশিস সলজ্জ সম্মতি জানাল।

দু'হপ্তার মধ্যে সব ঠিকঠাক, বিয়ে হয়ে গেল। এই দু'হপ্তার মধ্যে দীপা যে তার প্রেমিকের সঙ্গে চুপিচুপি টেলিফোন মারফত বাক্যালাপ করেছে সতর্ক পাহারা সত্ত্বেও কেউ জানতে পারল না।

বিয়ের রাত্রে ক'নের বাড়িতে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে নৃপতির বাড়ির আড্ডাধারীরাও এল, কারণ তারা বিজয়ের বন্ধু। আবার বউ-ভাতের রাত্রে যারা দেবাশিসের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে এল তাদের মধ্যে প্রজাপতি ফ্যাকটরীর সহকারীদের সঙ্গে নৃপতির দলও এল, কারণ তারা দেবাশিসের বন্ধু।

সংগীতশিল্পীর ব্যক্তিত্ব সত্তা

কবি এবং অধ্যাপক ডক্টর মানস রায়-চৌধুরীর সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ Studies in Artistic Creativity যখন হাতে পড়ল তখন ভয় হয়েছিল বোধ করি উপলব্ধি করা কঠিন হবে। বইটি বৈজ্ঞানিক এবং সাইকলজির পরিভাষায় সমাচ্ছন্ন। বস্তুত এটি একটি থিসিস যাতে সংগীত-শিল্পীর ব্যক্তিত্ব সত্তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে—গ্রন্থকার যাকে বলেছেন—Personality structure of the musicians। কিন্তু পড়তে আরম্ভ করে বিষয়বস্তুতে এতটা আকৃষ্ট হয়ে পড়লুম যে পারিভাষিক বাধা সত্ত্বেও শেষ করে ফেলতে বিলম্ব হল না;—বিশেষ করে বিবিধ শিল্পীর সংগে তাঁর সাক্ষাৎকারের বিবরণটি একাধিকবার পাঠ করে নিজের ধারণার সংগে যাচাই করবার অবকাশও ঘটেছে।

সৃষ্টি-চেতনা বিষয়টিই মনোবিজ্ঞানের একটি জটিল সমস্যা। এর একটি সহজ ব্যাখ্যা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে। স্রষ্টা শিল্পীদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা বহু দিন থেকেই আগ্রহশীল এবং এ বিষয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা তাঁদের অভি-মতও ব্যক্ত করেছেন; কিন্তু স্রষ্টা শিল্পীদের মানসকে সম্পূর্ণ অধিকার করে বহুধা বিশ্লেষণের চেষ্টা প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় নি। পাশ্চাত্ত্য জগতে তবু বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কাজ হয়েছে, আমাদের দেশে এ বিষয়টির প্রতি আদৌ আলোকপাত করা হয় নি। এই অবহেলাই গ্রন্থকারকে এই দুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থটিতে শিল্পী-মানস সম্পর্কিত প্রচলিত সাহিত্যের একটি নিরীক্ষিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে এবং সেই সংগে লেখক স্বীয় সিদ্ধান্তও যোগ করেছেন।

সংগীতশিল্পীদের ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন অভিব্যক্তি নিরূপণের জন্য লেখককে নানান ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। এই সমস্ত তথ্যের অধিকাংশই পরীক্ষামূলক বা অভিজ্ঞতালব্ধ। এর জন্য ব্যাপকভাবে বহু শিল্পীর সংগে সাক্ষাৎ করে তাঁদের জীবনকাহিনী, আত্মবিশ্লেষণ এবং অভিজ্ঞতার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা প্রয়োজন হয়েছিল। এই তথ্যগুলি থেকে গ্রন্থকার যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা কেবলমাত্র চিত্তাকর্ষকই নয় চমকপ্রদও বটে। আর্টিস্টদের সম্বন্ধে আমাদের যে সব চিরাচরিত ধারণা আছে এই গ্রন্থপাঠে সেগুলি যে অনেক স্থলে ভ্রান্ত তাই প্রতিপন্ন হবে। আমাদের অনেকের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে, সংগীতশিল্পীদের মধ্যে কতকগুলি প্রভাব বা বৃত্তি বংশপরম্পরায় চলে আসছে যাকে বলে biological inheritence। গ্রন্থকার যে সমস্ত প্রমাণ, সাক্ষ্য সংগ্রহ করেছেন তা থেকে এটা প্রায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এই ধারণা ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা চলে না। বহু স্রষ্টা শিল্পী আছেন যাঁরা পিতৃসূত্রে কোনরকম শিল্পী-সুলভ গুণ অর্জন করেন নি, এমনকি তাঁদের আত্মীয়দের মধ্যেও এই রকম আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নি।

এই প্রচেষ্টায় কিছু বাধা যে না ঘটেছে তা নয়;—প্রশ্নগুলির উত্তর অনেকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন, কেউ কেউ যেটুকু না বললে নয় তাই বলেছেন, কেউ কেউ আবার সত্যগোপন করতে চেষ্টাও করেছেন। তা সত্ত্বেও অধিক শিল্পীই সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। উত্তরদাতাদের সকলের নামই গোপন রাখা হয়েছে।

সাক্ষ্য প্রমাণ অনুসারে দেখা যায় যে, সুরশিল্পীদের পিতা শিল্পী এমন সংখ্যা শতকরা দশ ভাগেরও কম। পক্ষান্তরে হিসেব নিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, শিল্পী নন এমন ব্যক্তিরাই অধিক ক্ষেত্রে তাঁদের পিতৃ-প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। এক্ষেত্রে পিতারা সকলে সাধারণ অফিসের রুটিন-মাফিক কাজ করে থাকেন। এতে আরও একটা ব্যাপার প্রমাণিত হচ্ছে যে শিল্পী নন এমন পর্যায়ের ব্যক্তিরাই সাধারণত পেশা নির্ধারণের জন্য পিতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন।

এই প্রসংগে ঘরানার কথা স্বতই মনে উদিত হয়। এটা আমাদের সাধারণ বিশ্বাস যে ভারতীয় সংগীত প্রাচীনকাল থেকে পুরুষ পরম্পরা চলে আসছে। কথাটা বহুল পরিমাণে সত্য;—কিন্তু দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এমন ভাবে হয়েছে যে এই রকম পুরুষানুক্রমে সংগীতচর্চা আর সহজসাধ্য নয়। অতএব পারিবারিক পেশা হিসেবে সংগীত আর আবশ্যিক নয়। গ্রন্থকার অনুসন্ধানের ফলে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন—

"With the sociocultural and political changes and with the emergence of a new social order based on nervous competition and economic struggle, the hereditary musicians as a class are on the decline. Moreover, the social outlook for musical pursuit as a familial skill is fast changing."

শিল্পীরা সকলেই আজকাল আশা করেন না যে তাঁদের সন্তানগণ তাঁদের পেশাই অবলম্বন করবে। আবার এটাও সাক্ষ্যানুসারে প্রমাণিত হয়েছে যে, শিল্পী নন এমন পিতামাতা আর্থিক অনির্দিষ্টতা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের সৃষ্টিমূলক বৃত্তিতে বাধা প্রদান করেন না। এ বিষয়ে পিতৃপ্রভাব নির্ণয় করবার জন্য একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রদান করা যাক। পুরুষানুক্রমে শিল্পী,—এমন একজন বলছেন:

"আমার বাবা ছিলেন পেশাদার সংগীত-শিল্পী। কিছুকাল তিনি একটি দেশীয় রাজ্যের সভাগায়কও ছিলেন। বাবা আমাকে

কখনও গাইতে বলেন নি,—গাও না। আমি বাবাকে সংগীত অভ্যাসে রত থাকতে দেখতাম। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তিনি নানান ধরনের সুরের জাল বুনতেন। আমাদের বাড়ি সংগীতে মুখর থাকত। যেমন তীক্ষ্ণ সেই আওয়াজ তেমনি বিরক্তিকর জটিল তার প্রকৃতি। এই সংগীতে মাঝে মাঝে অধীর হয়ে আমার মা বলতেন—"অসহ্য বীভৎস এই গোলমাল, এর চেয়ে চুপচাপ থাকা অনেক ভাল।" পরে আমি ভেবেছি সত্যিই জীবনে এই সব ধ্বনির তাৎপর্যই বা কি—এটা কি আমার বাবার একটা অভ্যাসেরই দোষ? পরবর্তীকালে এই চিন্তাটা আমার মনে পিতার প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাব জাগিয়ে তুলেছিল। অথচ তিনি আমাকে সংগীতশিল্পী হবার জন্য কখনও পীড়াপীড়ি করেন নি।"

এই সংগীতশিল্পীই তাঁর পুত্রের বৃত্তি সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এই ভাবে:

"আমার ছেলেকে আমি ইঞ্জিনীয়ার, বৈজ্ঞানী বা এই রকম জবরদস্ত একটা কিছু হতে চেয়েছি কিন্তু সে ওস্তাদ হবে এটা আমি কখনও চাইনি। আমি জানি একবার যদি রাগরাগিনী তোমার মর্মে গিয়ে পৌঁছোয় তা হলেই তোমার সব গেল। তখন তোমাকে এই সুরের ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে। তখন দিন রাত্তির গান গাওয়া ছাড়া আর গতি নেই। তার চেয়ে অন্য একটা যোগ্যতর কিছু আমার ছেলে বেছে নিক এটাই ছিল আমার কামনা। অবশ্য আমি তাকে কোনভাবেই প্রভাবান্বিত করতে চাই না। তার প্রকৃতি অনুসারেই তার পথ নিয়ন্ত্রিত হোক এটাই ছিল আমার ইচ্ছা।"

কেন যে পিতামাতার কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকা সত্ত্বেও একজন শিল্পীই হলেন অপর, আর একজন সম্পূর্ণ অন্য পেশা অবলম্বন করলেন এটা সত্যই বিস্ময়কর।

হিসেব নিয়ে দেখা গেছে অধিকাংশ স্রষ্টা শিল্পী উচ্চ-আয়সম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর্থিক কারণে যদি ব্যাপৃত থাকতে না হয় তাহলে পরিবারের ছেলে-

মেয়েরা এমন কতকগুলি নন্দনতত্ত্বে মনো-নিবেশ করতে পারে যা অর্থাগমের দিক থেকে খুব লোভনীয় নয়। কিন্তু এমন উদাহরণও রয়েছে যেখানে শিল্পী বাল্যে কঠোর দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন —যদিও তার সংখ্যা কম।

আরও একটি মতবাদ গ্রন্থে দেখা গেল। সেটি হচ্ছে এই যে, নগরাঞ্চলেই অধিকাংশ শিল্পীর অভ্যুদয় ঘটে থাকে। গ্রন্থকার বলছেন :

—the new urban family is more democratic, permisive, culturally affluent and puts more emphasis on individuality, self-development, independence as well as affection and companionship. All these emerging characteristics sum to foster creative role which is basically independence seeking, non-conformist and autonomous.

অনেক সময় স্রষ্টা শিল্পীদের বাল্যে বা তারুণ্যে পারিবারিক ব্যবস্থায় সুখী হতে দেখা যায় না। এমন কি সেটা কোনও কোনও ক্ষেত্রে অসহনীয়ও হয়ে পড়ে। নানা কারণেই মতবিরোধ ঘটে। একজন যন্ত্রবাদকের উক্তিতে এই রকম একটি কারণের উল্লেখ আছে। তিনি বলছেন :

"আমার ছেলেমেয়েদের সুযোগ-সুবিধে দেখে সত্যিই আমার হিংসে হয়। তারা বড় বড় শিল্পীদের গান-বাজনা গ্রামোফোন রেকর্ড, রেডিও, টেপ ইত্যাদি থেকে শুনতে পায়। এখন আবার নানান কনফারেন্স হচ্ছে সেখানে তারা যত খুশী যেতে পারে। ছেলেবেলায় একবার মাত্র আমাকে আমার ওস্তাদ ছাড়া অপর একজন সেতারীর বাজনা শুনতে দেওয়া হয়েছিল। আমার যে কী কষ্ট তা কি তুমি কল্পনা করতে পার? আরও বড় বড় প্রতিভার গান-বাজনা শোনবার জন্য আমার চিত্ত উন্মুখ হয়ে থাকত। কিন্তু, 'না না, ওরকম করলে তোমার বাজনা খারাপ হয়ে যাবে। তোমার ওপর ওদের প্রভাব এসে পড়বে যার ফলে তোমার নিজের ঘরানা থেকে তুমি বিচ্যুত হবে।' আমার বাবা (যিনি আমার ওস্তাদ ছিলেন) তিনিই এই কথা বলতেন। এই যে একটা দেয়াল আমাকে বাইরের সংগীতজগৎ থেকে আলাদা করে রেখে দিয়েছিল তাকে আমি ভেঙে ফেলতে চাইতাম। সত্যিই আমার জীবন ছিল বড়ই দুঃখের—সে দুঃখ অবশ্য এই সীমাবদ্ধতারই কষ্ট, আর কিছু নয়।"

শিল্পীরা সাধারণত বাপের চেয়ে মাকেই বেশী স্নেহপ্রবণ বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ আছেন যাঁদের কাছে বাপ-মা কাউকেই তেমন স্নেহশীল বলে মনে হয়নি। তথাপি সাধারণভাবে পিতার চেয়ে মাতাই শিল্পীদের কাছে বেশী আদরণীয়। শিল্পী-দের অন্তরের সব শ্রদ্ধা কিন্তু কেড়ে নিয়েছেন আর একজন তিনি হচ্ছেন গুরু বা ওস্তাদ। শিল্পীদের জীবনে এঁদের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। দুঃখে, সুখে এঁরা গুরুকেই স্মরণ করেন এবং গুরুর স্মৃতিই এঁদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র। এই প্রসঙ্গে একজন শিল্পীর উক্তি :

"আমার বাপ ছিলেন বদমেজাজী, অসহিষ্ণু ব্যক্তি। তাঁকে আমার ভয় করত; যেন সব সময় একটা মারের ভয় আমাকে তাড়া করে নিয়ে যেত। স্বভাবতই বাবাকে আমি দেখতে পারতাম না। প্রায়ই ইচ্ছে হত পালিয়ে যাই, গেছিও দু-একবার। পালিয়ে যেতাম আমার এক বয়স্ক বন্ধুর কাছে যিনি আমাকে শান্তিময় সঙ্গীত-জগতের সন্ধান দিয়েছিলেন। এই বন্ধুটি আমাকে তাঁর ওস্তাদের কাছে নিয়ে যান। ওস্তাদ ছিলেন খুব বুড়ো, [illegible], সুন্দর সাদা দাড়ি ছিল তাঁর। সৌম্য হাসিতে উদ্ভাসিত মুখে তিনি আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন, পরে ডেকে নিয়েছিলেন তাঁর অন্তরে। সেদিন থেকে আমি শান্তির সন্ধান পেলাম। ওস্তাদ আর দু' বছর মাত্র বেঁচেছিলেন। তার পরে সেই বন্ধুটিই হলেন আমার সবচেয়ে আদর্শ শ্রদ্ধাস্পদ। যা কিছু আমার আজ দেখতে পাচ্ছ সবই সেই বয়স্ক বন্ধু ভাইসাহেবের কাছ থেকে পাওয়া।"

অনেক সংগীতশিল্পীই যেন গুরুর মধ্যে পিতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যা তাঁরা পরিবারে পান নি অথচ চেয়েছেন তাই তাঁরা পেতে চেষ্টা করেছেন গুরুর কাছ থেকে।

শিল্পীরা চান স্বীকৃতি, খ্যাতি এবং সম্মান। কিন্তু অনেকেই যা পেয়েছেন তাতে সুখী নন। তাঁদের স্বপ্ন যেন সফল হয়নি। তাঁরা শ্রোতাদের যা দিয়েছেন তা যেন তেমন সমাদরে গৃহীত হয়নি। এ দুঃখ তাঁদের লেগেই আছে আর সেই কারণেই সমাজের ওপর তাঁদের একটা অভিমান আর অভিযোগও সর্বদাই থেকে যাচ্ছে। এ ছাড়া গ্রন্থকার বলছেন :

—the gradual disappearance of royal and burgeois patronage and the subsequent emergence of a nervous competition to satisfy the mass audience and its capricious taste, seem to have thrown the creative musician of this era into a bewildering job-situation.

আর্থিক এবং সামাজিক দিক থেকে বর্তমান স্রষ্টা সংগীতশিল্পী একটা জটিল পরি-স্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন যা আদৌ স্থিতিশীল নয়। যদিচ সরকারী খেতাব, পুরস্কার, বৃত্তি বা সম্মাননা এঁদের লোক-চক্ষে কিছুটা গৌরব প্রদান করেছে তথাপি শিল্পীদের বিশ্বাস যে তাঁদের সৃষ্টির গভীরতা শ্রোতারা তেমনভাবে উপলব্ধি

[illegible] কি এবং তাঁদের যোগ্যতার উপযুক্ত বিচারও হয়নি। তথাপি তাঁরা সব সহ্য করেও সংগীতের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক শান্তির অন্বেষণ করেছেন।

এই রকম আরও কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা গ্রন্থটিতে করা হয়েছে যা কৌতূহলোদ্দীপক এবং চিন্তার উদ্রেক করে। এই গ্রন্থটি পাঠ করে অনেকে লেখকের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হবেন, অনেকে হবেন না। কিন্তু সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা হিসাবে এর একটি স্থায়ী মূল্য রয়েছে। এই নিবন্ধটি গতানুগতিক থিসিস নয়, যথার্থ সত্যান্বেষণ এবং নির্ভীক মূল্যায়ণ। বর্তমান ভারতবর্ষে সংগীত-জগতে একটা আলোড়ন দেখা দিয়েছে—আর সেই সঙ্গে শিল্পীমহলেও একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে—তাঁদের মনোজগতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তনও সূচিত হয়েছে। এই সময়ে বিজ্ঞানীর চোখে এর একটা নিরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থকার সেই প্রয়োজনটিই মিটিয়েছেন।"

শার্ঙ্গদেব

Studies in Artistic creativity Manas Roychaudhuri, Rabindra Bharati.

ঘরে-বাইরে

কারও চেয়ে কম নন

সপ্তমী পুজোয় চমলক্ষম-চৌরিখানায় জড় জনতায় পুজোমণ্ডপের পরিচিতি। "আছি পরিচিত সুধাদির গৃহপ্রাঙ্গণ"। কে এই সুধাদি যার গৃহপ্রাঙ্গণ এতই পরিচিত যে, প্রবাসী বাঙ্গালীর কাছে বিশেষ এক পথনির্দেশের চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে? মাদ্রাজ শহরে সবাই বলেন রাস্তার নাম, বাড়ির নম্বর সবের চেয়ে সহজ সুধাদির নামে হদিস করা। বাঙ্গালী ছেলেরা দল বেঁধে পুজো করবে। সুধাদির অঙ্গন তো মাত্র নয়, সঙ্গে সঙ্গে আছে অনেক উপরি পাওনা। শ্রীমতী সুধা চক্রবর্তীর অদম্য উৎসাহ, অসামান্য সাহায্য আর অফুরন্ত স্নেহ।

শ্রীমতী চক্রবর্তীর গৃহ মাদ্রাজের উত্তর উপকণ্ঠে কোডম্বাকমে। কোডম্বাকম মাদ্রাজের ফিল্ম রাজ্যের রাজধানী। তামিলে 'বাকম্'-এর অর্থ মহল্লা বা পাড়া। যেমন একটি মহল্লার নাম নুঙ্গামবাকম। নুঙ্গু অর্থাৎ তাল। তালগাছের চিহ্ন এখন নেই, তবু নুঙ্গামবাকম আছে। আমার দক্ষিণী বন্ধু বললেন, কোডম কথাটিও হয়তো কোন তামিল শব্দের অপভ্রংশ। কোডম হলো ঘড়া বা কলসী। কোনদিন হয়তো মস্ত এক জলাশয় ছিল। সেই সরসীতে কলস ডুবিয়ে ঘরে নিয়ে যেত পাড়ার গৃহস্থবউ। আজ আছেন সুধা চক্রবর্তী আর তাঁর অফুরন্ত হৃদয়ের উৎস। যার যখন দরকার পূর্ণ করে নিয়ে যাবে তার যা কিছু দরকার। দূর দূর থেকে বাঙ্গালী দু'-দিনের জন্য মাদ্রাজে এসে আপন হয়ে ওঠেন সুধা দেবীর সংসারে, আবার যে বাঙ্গালী মাদ্রাজ শহরে বসে আত্মীয়ের সন্ধান চায় তারও নিত্য আসা যাওয়া সুধা চক্রবর্তীর অঙ্গনে।

অথচ এই সুধায় ভরা সুধাদির নিজের জীবনকাহিনী বড়ই বিচিত্র। দূর প্রবাসে কঠিন সংগ্রাম করে সংসারকে রক্ষা করেছেন যেসব মহিলা তাঁদের কারও কারও সঙ্গে পরিচয় হবার সুযোগ হয়েছে আমার। সেই সেকালের পেশোয়ারে, কঠিন তার মাটি, সেখানে হঠাৎ স্বামী হারিয়ে বাঙ্গালী ঘরের নরম কোমল মেয়ে ছোট্ট শিশুর হাত ধরে কোন আত্মীয়ের আশ্রয় না খুঁজে কেমন করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন দেখেছি, আবার রাজস্থানের মরুভূমিতে সামান্য শিক্ষিত বঙ্গমহিলা কেমন করে বিপদের পর বিপদ অতিক্রম করে সংসার গড়ে তুলেছেন তাও নজর এড়ায়নি। এঁরা রাজনীতি করেন নি, ঘরের বাইরের চোখ ঝলসানো চাকচিক্যের দিকে চেয়ে দেখেন নি। অথচ এঁরা কারও চেয়ে কম নন। যে অসীম সাহস দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামকে জয় করতে পারে যে সাহসে ভেজাল দেবার কোনও উপায় নেই। সেজন্যই শ্রীমতী চক্রবর্তীর কথা আজ আপনাদের বলতে ইচ্ছে হয়েছে।

সুধা চক্রবর্তীর ছোট মেয়ে সুনীপার কাছে শোনা তাঁর জীবনের দু'-চারটে কথা খবরের কাগজে চমক লাগানো হেড লাইনের মত নয়। ঘরোয়াভাবে কোমল অথচ বজ্রের চেয়েও কঠোর। সুনীপা বলে, তার মায়ের প্রিয় গান "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে"। একলা চলেই তার মা আজ সবাইকে কাছে পেয়েছেন। একলা চলার সাহস তাঁর জীবনে আদর্শ, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার তীব্র দহনে উৎসাহ আর প্রেরণা। তাঁর বাবা মাদ্রাজ শহরে চাকরি করে ১৯৫২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরের অল্প পরেই তিনি দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়েন। পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা পরিবার, কোথাও সাহায্যের সম্ভাবনা নেই। আয়ের পথ বন্ধ। যা কিছু সঞ্চয় ছিল, শেষ হতে বেশী দিন লাগেনি। তারপর? তারপর কপর্দকহীন পরিবার। চারটি মানুষের খাওয়াপরা, দুটি নাবালিকা কন্যার শিক্ষার খরচ কোথা থেকে আসবে জানা নেই। সুধাদেবী শুনে-

শ্রীমতী সুধা চক্রবর্তী

ছিলেন, বিদেশে পেয়িং গেস্ট রেখে মহিলারা অনেক সময় কিছু কিছু উপার্জন করেন। তিনি ভাল রান্না করতে পারতেন। সহজাত দক্ষতাটুকু কাজে লাগিয়ে যদি কোনভাবে সমস্যার সমাধান হয়, মন্দ কি? ১৯৫৩ সালের ১লা মার্চ এই দিশেহারা পরিবারের দরজার প্রথম অতিথি এলেন।

কেউ এতটুকু সাহায্য করেনি, কেউ এতটুকু উপকার করেনি, কিন্তু বাধা দেবার লোকের অভাব ছিল না। ছি ছি, ভদ্রঘরের মেয়ে পয়সা নিয়ে অতিথি রাখবার ব্যবসায় করবে? মর্যাদার হানি হবে যে! লোকেই

বা কি বলবে। হিতাকাঙ্ক্ষীরা এটুকু বলেই শান্ত হননি। কেউ বা ভয় দেখালেন। মেয়েমানুষের কি আর হিসাবপত্র বজায় রেখে ব্যবসায় করার মাথা থাকে? লোক-জনের আশঙ্কায় মুহ্যমান কুটুম্ব বললেন, অমন কাজে হাতই দিও না। আবার দু-চার-জন ডেকে বললেন, "ওমা, এ যে ঘরের ভিতর বাইরের লোক ঢোকানোর ব্যবস্থা। একান্ত আপন যা কিছু সব পরের সামনে একাকার হবে, তাই কি ভাল?" আত্মীয়স্বজন খবর পাঠালেন, মানুষের মত দূর প্রবাসে জীবন কাটবার পরিকল্পনা! হায় হায়, মরতেও তো সেখানেই হবে! তার চেয়ে দেশে ফিরে উপবাস কর। সুধা দেবী এততেও টলেন নি। সুনীপা তাই বলছিল, এই পরবাস আমাদের দিল ঠাঁই, বুকে তুলে নিয়ে দিল আশ্রয়। ঘর তখন অনেক দূরে, আপনজনের কাছে আশা করবার সুযোগ মোটেই হয়নি।

আন্দাজ করতে পারেন, প্রথম অভিযান সহজ ছিল না। বিজ্ঞাপন দেবার খরচ সংগ্রহ করা হয়নি। একমাত্র বিজ্ঞাপন—লোকের মুখে মুখে সুধা চক্রবর্তীর "প্রবাসী কুটীর"-এর কথা। অতিথি যাঁরা এসেছেন তাঁরা বন্ধুবান্ধবকে সুধা দেবীর গল্প করেছেন। কিন্তু প্রথম বছরের দিনগুলি ছিল অতি ধীর, দারিদ্র্যে ভরা। তবু সে দারিদ্র্য গোপন করতে হবে। সংসারের শেষ পয়সাটি দিয়ে সাজিয়ে তুলতে হবে সুখাদ্য। অতিথি যে এখন একমাত্র ভরসা। অতিথিকে তাই তুষ্ট করতে হবে তো! শহরে যেখানে দু-চার পয়সা সস্তায় কেনাকাটা যায়, সুধা দেবী সেখানে দু-তিন মাইল পায়ে হেঁটে নিত্য যেতেন। মুশকিল হতো ফেরার পথে। হাত ঘাড়ের উপর বোঝা অথচ মুটে নেবার সাধ্য নেই, বাসে উঠবার খরচা নেই। দূরে থেকে দেখে অনেকেই মনে করেছিলেন, সুধা দেবীর সংসার সীমানার আর বৃদ্ধি বাকী নেই। কিন্তু কাজ যত কঠিন, তিনি তত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দুঃখ সমস্যাও কম নয়। অক্লান্ত পরিশ্রমে কাজ শিখিয়ে একটু সাহায্যের উপযুক্ত হলেই সহৃদয় প্রতিবেশীর প্রলোভন তারা কাটাতে পারতো না।

সামান্য মাত্র লাভ থেকে অল্প অল্প করে সুধা দেবীর আয়োজনের আসবাব ও অন্যান্য ব্যবস্থা গড়ে উঠতে লাগলো। তারপর তিনি স্বামী হারালেন। এবার সবাই নিশ্চিত জানলো, পুরুষবিহীন সংসারে সুধা চক্রবর্তী অসহায় হয়ে উঠবেন। হোন বা পঙ্গু, হোন না দুর্বল রুগ্ন অশক্ত, তবু একটি পুরুষ অনেক সমস্যার কিনারা। কিন্তু বিপদে বিচলিত হবার মানুষ তিনি নন। বিপদ তাঁকে নতুন করে শক্তি দেয়। বিপদ অতিক্রম করা তাঁর সাধনা। সহায়হীনা বিধবাকে ঠকাবার লোকের অন্ত ছিল না। কেউ বা একটি মহিলাকে স্বাবলম্বী হতে দেখে নানাভাবে জব্দ করার চেষ্টা করতেন। কখনও বা এমন দিন গেছে যে, একটিও অতিথি নেই অথচ আয়োজন খর্ব করবার উপায় নেই। সঞ্চিত শেষ কড়িটুকু গেছে বিরাট ব্যবস্থার নিষ্ফল কবলে। মাদ্রাজ শহরের অলিগলি খুঁজেও যখন চাল মিলতো না তখনও সুধা দেবীর সংগ্রহ বজায় থাকতো; কারণ, তাঁর ত্রুটি হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। রেশন আরম্ভ হবার পর দিনের পর দিন কিউতে দাঁড়িয়ে কাটিয়েছেন। কখনও বা নিরাশ হয়ে ফিরেছেন। হোটেলের জন্য সরকারী কোটা আছে, কিন্তু সুধা দেবীর তো হোটেল নয়।

তবু সুধা দেবী দমেন নি। কঠিন কাজ তাঁকে পরাস্ত করতে কখনও পারে নি। সমস্ত দিন গরম ছোট্ট রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে নিজে হাতে রান্না করেন। তিনটি উনুন আর তিনটি স্টোভ তাঁর চারদিকে জ্বলে। কেউ বা সকালে সাড়ে আটটায় ভাত খেয়ে অফিস যান, কেউ বা দুপুরে মধ্যাহ্নভোজন চান, কারও বা খাবার টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে পাঠাতে হয়। সবার শেষে বেলা গড়িয়ে গেলে সুধা দেবী স্নানাহার করেন, কিন্তু বিশ্রামের জন্য নয়। তারপরই আছে রেশনের দোকান, মাছের বাজার অথবা জ্বালানি কাঠের গুদাম। রাতের রান্না আগেই কিছুটা এগিয়ে রাখেন। কিন্তু রাতের খাবার পালা শেষ হয় সাড়ে এগারোটার আগে নয়। রাতের শো দেখে ফেরা শেষ অতিথিটিকে খাইয়ে তাঁর ছুটি। তখন কোন দিন বাজে বারোটা, কোন দিন আরও বেশী। আবার সেই ভোর থেকে উঠে কাজের সমুদ্রে ডুবে যান। অসুস্থ শরীর, ডাক্তারের মানা, সবই হারিয়ে যায় কাজের ভিড়ে।

এখন মাঝে মাঝে সুধা দেবী ১৪ বছরের ইতিহাস স্মরণ করে তৃপ্তিতে ভরে ওঠেন। নেহাত বেঁচে থাকার তাগিদে তাঁর কাজের শুরু আর আজ তা পরিচিত প্রতিষ্ঠান। ছাত্র থেকে নিয়ে নাম-করা চিত্রতারকা সকলে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছে। সুনীপা বলছিল, অশোককুমার, বিশ্বজিৎ, নূতন সবাই তার মায়ের মিঠে হাতের রান্নার পরম ভক্ত। বাঙ্গালীরাই বেশী আসেন, তবে আসামী, পাঞ্জাবী, সিংহলবাসী বাদ কেউ পড়েন নি। কলাকার আসেন, সাহিত্যিক আসেন আবার সাধারণ লোকও আসেন। একদিন যাঁর বাসের খরচা জুটতো না সেই মহিলার আয়োজনে আজ অভাব কিছুই নেই। কখনও বা কেউ বলেন, অনেক পরিশ্রমের পর সুধা দেবীর এবার একটু বিশ্রাম দরকার। সুধা দেবী বিশ্রামে নেহাত নারাজ। গড়ে তোলার সার্থকতায় তাঁর কাজ আজ শিল্পীর কাছে তার শিল্পের মত, মায়ের কাছে শিশুর মত। কুড়িয়ে পাওয়া নয়, এতটুকু এতটুকু করে তিলে তিলে বড় করা। তাকে বাদ দিয়ে বাঁচা অসম্ভব। সুধা দেবীর দুই মেয়ে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, তার রসদ যুগিয়েছে তাঁর এই প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠান তাঁর তৃতীয় সন্তানের মত। মা হয়ে তাকে ফেলবেন কি করে?

এমনি করেই সুধা দেবীর মালাইকারি আর মাছের ঝোল প্রবাসে ঘরের সুবাস এনে দেয়। এমনি করেই ছোট বড় সকলে তাঁকে পরমাত্মীয়ের মত ভালবাসে। এমনি করেই দিনের পর দিন কাটে সহৃদয় পরবাসের একান্ত আপন করা আত্মীয়তায়। রাজনীতির দোলায় পরিবর্তন আসে যায়। কত তার অদলবদল। কিন্তু কোডমবাকমে যান, দেখবেন সুধাদির সেই হাসিমুখ। এতটুকু বদলায় নি এত দিনে। যেসব মেয়ে দুরন্ত বাধার সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হয়েছে তারা খুব সম্ভব সবাই এরকমই। আত্মপ্রত্যয়ের আনন্দে ভরা এক একটি স্বীকৃতি। ভবিষ্যতের ইতিহাস এঁদের হয়তো চিনবে না, কিন্তু এঁরাই রচনা করেন আগামী দিনের মহিলাসমাজের ভিত।

শ্রীমতী

চিত্রপ্রদর্শনী

[illegible] যদি সামনেই কুঁড়ে ঘর থাকে [illegible] জানালার থেকে বড় [illegible] এই মত নির্ণয় করতে পেরে, [illegible] থেকে দৃষ্টিগত মায়াকেই বড় বলে ধরে নিল।

ঠিক একই রকমভাবে, একজন ইম্প্রেশ্যানিস্ট বাস্তবিক পক্ষে একটি আপেল নিছক লাল জেলের মত রকমারি টোন হতে পারে তা আরোপ করতে চাইলে, সুতরাং সে রঙগত সত্যের থেকে দৃষ্টিগত মায়াকেই বড় বলে স্থির করলে।

এবং আমরা দেখতে পাব, যে রঙের রাজ্যে ইম্প্রেশ্যানিস্ট খুব তাদের অভিনবত্ব এনেছে, অবিকল যেটা ইতালীয় পরিপ্রেক্ষিত অবয়ব এবং বোধ বা ডাইমেনসনের ব্যাপারে এনেছিল।

এখন বলা যেতে পারে, রঙের পরিপ্রেক্ষিতের উপরই ইম্প্রেশ্যানইস্টদের আর্ট-এর ধনেদ।

তবু, ঐ দুটি এইসথেটিক তত্ত্বই, যে কোন বিচারক্ষম মনের কাছেই, দুটি সন্দেহবাদের ধারা হিসাবে দেখা দেবে। ঐ ধারা দুটি শিল্পীদের শেখায় যে পরিদৃশ্যমান বাস্তবতার দিকে,—বস্তুকে মেনে নিয়ে তার প্রতি নিবিষ্টমনা হয়ে,—কখনই ভাবপ্রবণতা নিয়ে এগোন উচিত নয়, এবং শুধু মাত্র একটি ব্যাপারই আর্টের দিক থেকে ধরা যেতে পারে যথা, মায়া বা বস্তুই ঘটায়, (সে ইলল্যুজিও' কা দোন ল'ওবজে), অলীক আভাস যা সেটাই আমাদের দেয়। (সে আল্যুসিন্‌আসিও' কিল ন্যু প্রকিউর)।

এইটাই হচ্ছে আধুনিক শিল্পীদের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য (এরিতাজ)। যদি এখন ফ্লেমিংসাসের শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা হয়, তাহলে তারা বলবে, একটা প্রাসাদ যে সব সময়ই একটা কুঁড়ে ঘরের থেকে বড় এটাই বিশ্বাস করে বসে থেক না; এটাই বিশেষ করে জেনে রেখো যে, কোন বস্তু বড় বা কোন বস্তু ছোট একটা ঠিক নয়; সমস্ত কিছুই আপেক্ষিক। চিত্রকর্মে দেখা যাবে, বিশেষত, প্রথম দিকের গুলি স্বভাবতই শেষ আসে শেষেরগুলি প্রথম হয়ে ওঠে।

এখন যদি ইম্প্রেশানইস্টদের উপদেশ দেওয়া যায়, তারা বলবে, ...সাবধান, আগে-ভাগেই বিশ্বাস করে বস না যে আপেলের রঙ লালই; সাতাকায়ের লাল, এবং একটা সাদা বাড়ি সত্যই যে সাদা ভেব না; একথা সব সময়ই ধ্রুব জেন যে তোমার পালেটে, রোদে উদ্ভাসিত সাদা দেওয়াল আঁকার মত সঠিক টোন অর্থাৎ রঙই নেই। রঙের ব্যাপারে, সমস্ত কিছুই আপেক্ষিক। সামনের ডালপালা দেখ; সেটা নীল—তাই নয়? এবার খানিক ঘুরে এসে; মিনিট পাঁচেক বাদে এসে দেখবে, সেটা গোলাপী! আবার তোমার যদি সত্যিই কিছু ধৈর্য থাকে তা হলে ঘণ্টাখানেক ঘুরে এসে দেখ সেটাও—সেই রঙও উধাও হয়েছে।

ভারী — সুধী

ইত্যাকার বিচারের পর আমরা জানতে চাইব, ইদানীং শিল্পীর প্রকৃতির উপর কি-ভাবে তার বিশ্বাস ও বস্তুর প্রতি, তার, আকর্ষণ রয়েছে? "তারা বলবে—যেহেতু পাহাড়, বাড়িঘর, গাছগাছড়া ইত্যাদি একটা মায়িক ডাইমেনশনের সৃষ্টি করে যা কখনই সঠিক নয় (আইডেনটিক্যাল) ফলে আমার যেমন ভাল মনে হবে সেই মত আমি তাদের আকার ও আয়তন দেব; যেহেতু ডালপালা অনবরত, থেকে থেকে, রঙ বদলায়, যেহেতু আমার সে ডালপালাকে নীল বলে নির্ণয় করার পরই সেগুলি গোলাপী হয়ে দেখা দেয়, আমি আমার নিজের মত চলব, আমি আমার খুশী মত টোনে রঙে সেগুলি আঁকব।"

কে-যোর (গোষ্ঠী)-র চিত্র প্রদর্শনী। আর্টিস্ট্রি হাউস ভবন।

[illegible] ছবি ছিল। ইনি [illegible]। [illegible] বাঁধেই [illegible] যা দেখা যাবে আছে, এবং এটা। এক্ষেত্রে তাঁর রঙ নির্বাচনায়, বিশেষত তাঁর [illegible] একটি সুন্দর ছবি—এটির নিয়ম চেয়ারে আসীনা কোন মানের রমণী দেহ—সমস্ত ব্যাপারটা গঠিত হয়েছে সযত্নে, এবং পশ্চাতের কালচে লালে, মনে হবে রঙই ক্রমে সম্প্রসারিত হয়েছে, সমস্ত গড়নে কোথাও প্রাকৃতিক টোন নেই। অথচ কোন সূত্রেই বিরূপতার সৃষ্টি করেনি, রেখার বহমানতাও মনোজ্ঞ। ইনি ছাড়া বাকি তিনজন নিরবয়ববাদী হলেও রামমোহন সরকারের কাজ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, কেন না তার হাত খুবই চতুর, এখানে তাঁর ৫টি ছবি ছিল, এগুলি একটি সিরিজের বিভিন্ন রূপ, নং ১টি নীল, সবুজ ও গাঢ় নীলে রচিত একটি মানসিকতা, 'এরপর, ভূষণ কাউল, এর ছবিগুলির রঙ কিছু উঠে উঁচু হয়ে আছে, দেখলে মনে হয় ফুলের বিকাশ, ফ্রেমগুলি জাপানী ছোট স্ক্রলের মত। বেশ নয়ন সুখকর যথা নং ১১, ১৫। অবশেষে ভুবনেশ রাইনার ছবিতে জ্যামিতিক আরোপই সব, তাঁর পেল মনে ছবিটি মন্দ খোলেনি, এটিতে কিছু মোমের ব্যবহার আছে 'অন্যত্র ১৭টি দর্শকদের ভাল লাগবে।

সুধীর চিত্র প্রদর্শনী। শোভনা অ্যান্ড হোটেল আরকেড।

বিদেশে সুধী অনেকদিন ছিলেন, এবং সেখানে নানা প্রকার কাজ শিখেছেন, এই

প্রদর্শনী তাঁর নবতম ধরনের কাজে কিছুটা ভস্মা ছিল। এই সব কাজে সোজা ভারত বা বাঙলার সঙ্গে যোগ আছে এমন নয়, তবে খানিকটা আদল আসে। ইতিপূর্বে বাঙলার পট নিয়ে কাজ করেছেন—ঠিকভাবে ব্যবহার করেছেন সুনয়নী দেবী, আর অনেকেই নকল করেছেন। সুধী দেখা যাবে রঙ আরোপে ভিন্ন প্রকৃতির, এক এক স্থানে রঙ চমৎকার গঠিত হয়েছে, যথা মণিপুরে নর্তকীর ঘাঘ্‌রার নীল কালো রেখায়, ৫নং পাখার রঙ আরোপে। এর চোখ আঁকা ঠিক সাধারণত পট পাটা ইট বা কাঁথার মত নয়। অবশ্য একথা ঠিক, সব সময়ই একটু বেশী মাত্রার কেরামতি করা মনে হতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে একথা বললে অন্যায় হবে না যে, যেখানেই পশ্চাৎ-ভাগে চড়া রঙ আছে যথা নং ১৯তে ক্রোম হলুদ সেখানে অতটা মনে হয় না. সব থেকে তাঁর শ্রীশ্রী মা'র (সারদা দেবী) ছবিখানি সত্যই ভক্তিপূর্ণ মনে আঁকা, আমাদের খুব ভাল লেগেছে। তাছাড়া নং ৩, নং ২, এবং স্কেচগুলি উল্লেখযোগ্য।

সতের

আঙুরির ঠোঁটে যে কেবল প্রীতির হাসি ঝলকায়, তা নয়। আবার পিছন ফিরে নারাণঠাকুরের দিকে দেখে। ঠাকুরের মুখের বুলি কেড়ে নিয়ে, সে যে বুলি পূরণ করে দিয়েছে, সেই থেকে ঠাকুরের বাত্ গারেব। মুখের হাঁ বন্ধ হয় নি। জরদা গুন্ডি বিড়ির ধোঁয়ায় কালো হয়ে যাওয়া জিভটা পর্যন্ত দেখা যায়, নড়ে চড়ে না। ভুরু গিয়েছে কুঁচকে, দৃষ্টিতে ভাব নেই। আমার সঙ্গ নেওয়া দেখে আঙুরি অসংশে শালীন হেসে অনুমতি করে। কিন্তু পিছন ফিরে ঠাকুরের দিকে চেয়ে আবার খিলখিলিয়ে ঝরে।

কেবল যে ঝরে, তা নয়। দেখ, কেমন ঝোঁকা লাগে শরীরে। ঘোমটা রয় না মাথায়, রক্তাম্বরীর আঁচল খসে পড়ে। এবার বল, এ শরীর কি কেবল মধ্যঋতু আশ্বিনে টইটম্বুর। তার চেয়ে বেশী দেখ, অধরা উদ্ধত। জামার ছাঁটকাটে, সাজেগোজে, খাঁজে-খাঁজে ঠেকা দিয়ে সাজানো বানানো নয়। এ বনে বনান্তা, প্রকৃতি নিজের হাতে সাজিয়েছে। এ আর এখন মাহাতো গিন্নী নয়, যেন এক ডাগরী যুবতী, তাহে রঙ্গিণী। যে-ডাকাতের মুণ্ডু ঘুরেছিল, আর মুণ্ডু বলি গিয়েছিল, সে বেচারীর দোষ কতটুকু। মরণ কী আর এমনি ধরে। তবে অসুরে বেগে এলে বলি যাওয়া ছাড়া উপায় কী।

এতক্ষণে নারায়ণঠাকুরের মুখের হাঁ বন্ধ হয়, দাঁত দেখা যায়। তারপর দাওয়া থেকেই বলে, 'আচ্ছা গো মাহাতো বোঠান, খুব একখানা দিয়ে গেলো।'

আঙুরি দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় নাচিয়ে বলে, 'কেন, কী দিয়ে গেলাম।'

ঠাকুরও ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, 'বুঝতে পেরেছি গো, বুঝতে পেরেছি।'

আঙুরি ভুরু কাঁপিয়ে খানিকটা ধমকের সুরে বলে, 'কী যে খালি বাজে প্যাচাল পাড়ো।'

বলেই আবার খিলখিলিয়ে হাসি। হাসির [illegible]
[illegible]
[illegible]
মুলো পর্যন্ত [illegible] পারে। [illegible] বলে, 'বুঝেছি গো বোঠান, বুঝেছি।'

মাহাতো খুশি হোক। তবে বাউল-মাগুনের একটা ভাব আছে। বয়েসেরও ভারে বোঝছে। বউয়ের সঙ্গে তেমন তাল দিতে পারে না। কিন্তু মুখ টিপে হাসে। ডাক দেয়, 'আয় গো বউ, তাড়াতাড়ি আয়। বেলা একেবারে চলি গেল।'

আঙুরি ফিরে আবার সঙ্গ ধরে। মাহাতো আমার দিকে চেয়ে বলে, 'নারাণ-ঠাকুর বড় মজার লোক।'

আমি বলি, 'গাজীর ওপরে একটু রাগ আছে।'

আমার কথার জবাব দেয় আঙুরি, 'তা নয়, ঠাকুরের ওইটাই ভাব।'

মাহাতো বলে, 'ঠিক বলিছ। লোকটাই

[illegible]

…করে কথা বলে।'

তখন আঙুরি হাসে। আমার দিকে চায়। বলতে চায় আমারে চিনি। এ আর কথা শাস্ত্রের চরিত্র ব্যাখ্যা নয়, যেমন কেতাবে হয়। যেমন দেখা বোঝা, তেমনি বলা। আমার কানে লেগে থাকে, 'এঁড়ে লাগা ছেলের মতন' ব্যাখ্যাখানি। যার কোন কিছু, মনের মতন নয়। যে হাত পা ছুঁড়েই আছে। আর এঁড়ে লাগা ছেলের যত বায়নাক্কা, সবই আপন ভাইয়ের সঙ্গে। আর কারুর সঙ্গে নয়। তাতে বোঝা গেল, নারাণঠাকুর আর গাজী আসলে পরস্পরে অনেক বেশী কাছাকাছি। কিন্তু যা হওয়া যায় তাগো ঘটে নি, সেই আঙুরি তুলনা দিতে গিয়ে কেমন করে এঁড়ে লাগা ছেলের কথা বলে! মনটা বুঝি কেবল মাতৃভাবের স্রোতে আনাগোনা করে।

আঙুরি আবার বলে, 'তাই দেখ না, গাজী যেমন করে, ফোঁচার বউও সেরকম করে। ঝগড়া বিবাদ করে না, মুখ ফিরিয়ে হাসে। ও লোকের সঙ্গে আবার কেউ ঝগড়া করে নাকি।'

[illegible] নাকি আমি?'

[illegible]

বলে আঙুরি আমার দিকে চেয়ে হাসে। এই প্রথম সোজাসুজি সম্বোধনে সোজা-সুজি কথা। মাহাতোও আমার দিকে চেয়ে হাসে। বলে, 'তা কী জানি। বলা তো যায় না। ফোঁচার বউয়ির কথা যে রকম বললি।'

আঙুরি তার ডাগর চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে পরিষ্কার জিভ ভেংচে দেয়, শব্দ করে, 'অ্যা হ্যা হ্যা।'

মাহাতো যেন নেশা করে হাসে হ্যা হ্যা শব্দে।

ইতিমধ্যে পেরিয়ে যাই হাটের সীমানা। সামনে খানিকটা ধান কাটা মাঠ। মাঠ পেরিয়ে রাস্তা। এতক্ষণে গাজীর দেখা মেলে। দেখি, ধানকাটা মাঠের একটা সবুজ উঁচু আলপথের ওপর সে দাঁড়িয়ে

[illegible]

এতক্ষণ ধরে গাজীর ডাক চাপা পড়েছিল আঙুরির হাসির আওয়াজে। কিংবা গাজী-গতরেরাই কান পেতে ফোঁচার বউয়ের হাঁস শুনেছিল। এখন হঠাৎ পিছন থেকে হাটের গাজে তাদের ডাক শোনা যায়। ওপারে ন্যাজাটের আকাশের এক কোণে বুঝি সূর্য অস্ত গিয়েছে। প্রথম শীতের নীলা আকাশে পশ্চিমের কোণটা রাঙিয়ে গিয়েছে। কোথা থেকে দু-চারটি হালকা মেঘের টুকরো এসেছে। যেন তাদের সকল টান টকটকিয়ে যাওয়া পশ্চিমের রাঙা থানে। তাতে লালের ঝলক দেখায় যেন লম্বা লম্বা পোঁচড়ার মত। আর সেই লালেরই ঝলক দেখ সবার গায়ে মুখে। কেবল মানুষের নয়, ধান-কাটা মাঠের ধুলায়, না-কাটা পাকা ধানের মাঠে, আর ওই যে দূরান্তে পথ চলে যায়, সে তো যেন এয়োস্ত্রীর সিঁথির মত টকটকিয়ে উঠেছে।

গাজীর কাছাকাছি হতেই সে বলে, 'আমি

[illegible]

আমাকে [illegible] পাশাপাশি [illegible] নয়। আমি [illegible]। আঙুরি আবার আসে। আমি তার মুখ দেখতে পাই না। তার গলা শুনতে পাই, 'বলে কি আমাকে? তুমি দিয়ে যাও না, তারপর তোমাকে দেখাবে বলেছে।'

গাজী যেন সত্যি দুশ্চিন্তায় পড়ে। বলে, 'কেন চাচী, আমি তো কিছু বলি নাই।'

আঙুরির গলা শোনা যায়, 'বল নি তো কী, বলি বাজে প্যাচাল পাড়ো।'

গাজী তখনো তাকিয়েছিল আঙুরির দিকে। দেখি, দেখতে দেখতে তার চোখের ছায়া সরে। তারপরে তার আর আঙুরির মিলিত গলায় হাসি বেজে ওঠে মাঠের মাঝখানে। কোন্‌খানে যেন তখনো কয়েকটা পাখী, কৃষকের ফাঁকি পড়া চোখের দানা খুঁটছিল মাঠে। তারা তরাসে ডাক দিয়ে উড়ে যায় কয়েক হাত দূর থেকে। আর সেই হাসির চল সামলাতে আঙুরির পা হয়ে যায় বেসামাল। সে চল খেয়ে নেমে যায় মাঠে।

মাহাতো হেঁকে ওঠে, 'দেখ, দেখ, করে কী, আছাড় পিছাড় খাবি নাকি।'

বলে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। আঙুরি হাসতে হাসতে বলে, 'না, পড়ব না।'

কথা শেষ না করেই আবার দৌড়ে ওঠে আলের ওপর। তাতে কেবল যে ঠিনঠিনিয়ে চুড়ি বেজে যায়, তা নয়। ঘোমটা-খসা খোঁপায় গোঁজা ঝুমকো কাঁটাগুলোও ঝুন-ঝুনিয়ে বাজে।

মাহাতোর গলার বিরক্তিতে স্নেহ ঝরে। বলে, 'পড়বি যখন, তখন বুঝবি। লোকি বলবি, মাহাতোর দজ্জাল বউটা মাঠ দিয়ি দৌড়য়।'

আঙুরির শাড়ি তখন মাহাতোর আগে, গাজীর কাছে। বলে, 'বলুক গে, তোমাদের লোকগুলোকে চিনি।'

বলে সে একবার মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চায়। দেখে নিতে চায়, আমিও সেই লোক কি না, যে লোকগুলোকে সে চেনে।

কিন্তু আমি তখন দেখছিলাম মাহাতো গিন্নীকে নয়, কোন দজ্জাল বউকেও নয়। আমি দেখছিলাম, দুরন্ত ডগমগ একটি কিশোরীকে। যাকে দেখে বয়সের কথা আর মনে থাকে না। সামনে যার হেমন্তের শুকু শুকু টানের দিন। আলতা পরা তেলতেলে কালো পায়ের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, বাড়া তো শুরু কেবল। কার্তিকের চড়াই উতরাই ভেঙে এ পায়ে শেষ দাগ পড়তে [illegible]

[illegible] ফিরিয়ে চলতে চলতে বলে, [illegible] মতন [illegible] চাচী। [illegible] দোহাই ধরিছি, কালা এখন গোকুল ছেড়ি, নন্দের ধুলোর ধুলোট খেলে।'

কথা কোন্‌ খাতে বহে, ধরতে পারি না। প্রসঙ্গ আমাকে নিয়ে, সেটা অনুমান করতে পারি। কিন্তু চোখ বেঁধে কী ধরা গেল, তাতে কালা ছাড়ে গোকুল কিংবা নন্দীরাম ধুলোট খেলে, সে হাস্যের অর্থ কী, বুঝতে পারি না।

আঙুরি আবার একবার ফিরে চায়। তারপরে আবার যেন কী বলে, কানে শুনতে পাই না। যে বলে, সে শোনাতেও চায় না। অমনি গাজী গান ধরে দেয় :

'ওগো, যে কালা সে কালাই আছে,
তারে কি চিনতি পেলে।
কালা এখন গোকুল ছেড়ি, নন্দের ধুলোর
ধুলোট খেলে।'.....

গান থামিয়ে বলে, 'জানলে চাচী, বাবুকি পেত্থম যখন জিগেস করলাম কী যে, "বাবু আপনাকে তো চিনতি পারলাম না। ইদিকে দেখি-টেখি নাই। তা যাবেন কমনে?" বাবু বললেন, "তা তো জানি না।" কথা শুনি ভারী মজা লাগে, ভাবি, এ তো বড় মজার বাবু। কমনে কোথায় যাবেন, তাই জানেন না। তারপরে বললেন, "এই একটু বের হয়ে পড়েছি।" তা হলিই বোঝ, এ মানুষ কেমনতর। অই তুমি যা বললে, আমারো তাই মনে হয়েছিল।'

কী মনে হয়েছিল গাজীর। কথা বলে আমাকে নিয়ে, অথচ আমি জানতে পারি না। বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে কেতাবী সভ্যতা যে এদের বোঝাবো, সে উপায় নেই। এ মানুষেরা সব আপন খাতে চলে। মনে যেমন জাগে, তেমনি ভাবে। তা চলুক, ভাবুক, আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে নিয়ে কেন। এমনি করে বললে কৌতূহল দুঃসহ হয়। দেবতা তো নই। অথচ জিজ্ঞেস করতে পারি না কোন মতেই।

আঙুরি আবার ফিরে চায়। মাহাতো বলে ওঠে, 'দেখ, আবার পড়ে যাবি।'

যেন সে এক পাল ছেলেমানুষ নিয়ে চলেছে। সে সব কথা শোনে না, শোনবার কৌতূহলও নেই। বাচ্চাগুলো কী নিয়ে ক্যালোর-ব্যালোর করে, ধাড়িটা যেমন শুনেও শোনে না, কেবল হুঁশিয়ার করে নিয়ে যায়।

গাজী তখনো কথার জের টেনে চলেছে, 'চোক দেখি মনে হল, এই সবে সোমসারে পা পাড়িছে। কোলের ছাওয়ালের মতন যা দেখে, তাই মন টেনি নিয়ি যায়। যেন [illegible]

[illegible] হয়েছিল।'

গাজী বলে, 'হ্যাঁ, বলি, চাচী বলে কি না, বাবু নাকি ছোট ছাওয়ালের মত চায়। যেন হাঁ করে খেলা দেখে আর মনে মজা হাসে। তাই বলি, হাসে এক, দেখে আর এক। বাবুকে পেয়ি বড় মজার লেগেছে। তবু মনে মনে ভাবি কি যে, বাবু কি খেলতি বের হয়িছেন, ছোট ছাওয়াল যেমন ঘর থেকি পলায়। না কি পথে ঘের হরি হারিয়ে গেছেন।'

এই বলে সে পিছন ফিরে তাকায়। আমি চোখ ফিরিয়ে নিই। কিন্তু গাজীর শেষের কথাগুলো আমার ভিতরে কোথায় বাজতে থাকে। এই যে মুহূর্ত, এই রাঙা সন্ধ্যা, ধান কাটা মাঠ, দূরে দিগন্তে ঠেকে থাকা আকাশ, আর এই সব নরনারী, যাদের মাঝখানে, আমার মনে পড়ে না, কোথা থেকে এলাম, কে আমি। কোথায় যাই, কিসের সন্ধানে। সেই ছেলেবেলার কথাই মনে পড়ে যায়। যখন আমার আমিতে আজকের কোন পরিচয় লেখা হয় নি। অথচ থাকে থাকে মনে হয়, সেই আমিকে কোনদিনের তরে ছাড়িয়ে যেতে পারি নি। যে আমি ঘর থেকে পালিয়েছি খেলতে, খেলতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছি কোন এক অচিনে। যেখানে সকলই বিস্ময়, অথচ চোখের জল মুছতে হয়েছে।

আমাকে নিয়ে কথা বলুক, তা চাই না। কিন্তু গাজীটা কে। ও যেন সবই ভিতর থেকে দেখে। ও কি আমার জন্মলগ্নের সাক্ষী। ও কি চিরদিন ধরে চেনে আমাকে। ও কি সেই মাঝি নাকি, যে আমাকে নিয়ে এসেছিল সুড়ীগঙ্গার মোহানা থেকে। ও কি গুলেশ্বরী তীরের চর মজবুদী গ্রামের সেই রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধু, যিনি একবার আমার চিবুক তুলে ধরে মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। পায়ের গোড়া দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়েছিলেন, পারেন নি কেবল চোখের কূলের বিস্ময় আর কৌতূহল মুছিয়ে দিতে। আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে তাকে হেসে বলেছিলেন, 'চল, তোমাকে নিয়ে আজ তোমার আত্মীয়ের কাছে।'...

আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে শুধু সেদিনের গুলেশ্বরীর তীর থেকে তিন মাইল দূরে এক গ্রাম। নাম তার চারগ্রাম। দেখি, এক ছেলে তার দিদিমার আঁচল ধরে টানে আর কাঁদে। বলে, 'দিদিমা মুখে [illegible]

আইজ যাইতে যাও বেজেরহাট?'

দিদিমা ধমক দিয়ে বলে, 'না, বেজেরহাটের ভিড়ে তুই হারাইয়া যাবি। সেইখানে পোলা চুরি যায়।'

সেখানে ছেলে চুরি হয় এই ভয় দেখায় দিদিমা। কিন্তু নাতি না শোনে বুড়ী দিদিমার কথা। তাঁর থানের আঁচল নিয়ে টানাটানি করে। এদিকে বাড়ির চাকর, সমঃশদ্দুর ইন্দির ধামা মাথায় পা বাড়ায় বাড়ির বাইরে। তখন সেই ছেলে ডাক ছেড়ে চীৎকার করে, দিদিমার কোমর জড়িয়ে ধরে কাঁদে। দিদিমার প্রাণ তাতে না গলে পারে না, ডাক দেন, 'ইন্দির, শোন্। অরে লইয়া যা, দেখিস্ না হারায়। যখন হাট করবি, কুতুর চাউলের গদিতে পোলারে বসাইয়া রাখিস। দুপুরের আগে ফিরিস, নাতি কিন্তু না খাইয়া থাকে।'

ছেলেটি ভাবে, ইন্দির আর একটু হলেই বিশ্বাসঘাতকতা করে চলে যাচ্ছিল। কারণ, বেজেরহাট, ব্রজের হাট যার নাম, সেই পৃথিবীর পরম বিস্ময় বাজারের গল্প ইন্দিরই তাকে শুনিয়েছিল। বলেছিল, দিদিমাকে বলে সে-ই তাকে নিয়ে যাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ব্যাপার ঘটছিল আলাদা। এখন ইন্দির হাত বাড়ায় ছেলের হাত ধরবার জন্যে, ছেলে শোনে না। সে এসেছে ঢাকা শহর থেকে চারগ্রামে, দিদিমার কাছে বেড়াতে। প্রাণে তার এই সাধ, একদিন যাবে সে পশ্চিম দিকে দু মাইল দূরে ব্রজেরহাটের হাট দেখতে। ইন্দির হাত ধরবার আগেই ছেলে দৌড় দেয়। যেন বাঁধা বাছুর ছাড়া পেয়ে ছোটে গাভীর স্তনের তৃষ্ণায়। যে স্তন ছড়ানো সবুজ রবিশস্যের মাঠে মাঠে, আর আল পথে। যে স্তন ছড়ানো সকালের রোদে, মাথা তুলে রোদ পোহানো বিশাল হিজলের বনে, বেত-ঝোপের মাথা দোলানো ডগায় ডগায়। এক দৌড়ে সে মাঠ পেরিয়ে বাঁক নেয় কুলাই-চন্ডীতলা থেকে। বুড়ো হিজলের জটায়, আঁধার আঁধার ছায়ায়। ছেলেটি এক মুহূর্ত দাঁড়ায়। গাটা একটু ছম্ ছম্ করে, মানে একটা ভয়ের দুরুদুরু। কিম্ভূতাকৃতি এক সিঁদুর মাখানো হিজলের গুঁড়ির দিকে চেয়ে দেখে। সবাই বলে, ওইখানে প্রথম দেবী কুলাইচণ্ডীর থান। এখান দিয়ে যে যায়, সে-ই নমস্কার করে। কুলাইচণ্ডীর মূর্তি কেমন, তা সে জানে না। হয়তো কোন প্রতিমা আছে। কিন্তু ছেলেটির চোখে কুলাইচণ্ডী চিরদিনই দলামোচড়া পাকানো সাপের মত, যেমন সেই হিজলের সিঁদুর মাখানো গুঁড়িটা। ছেলেটিও হাত তুলে নমস্কার করে। তারপরে আবার দৌড় দেয়। ইতিমধ্যে ইন্দিরও তার বড় বড় পায়ে দৌড়ে এসে গৃহকর্ত্রীর নাতিকে ধরে ফেলে। ধমক দিয়ে বলে, 'শহরের পোলা তুমি, গেরামের রাস্তা যদি হারাইয়া ফ্যালাও, তারপরে? তখন কী হইব?'

তারপরে কী হবে, শহরের ছেলেটির জানা ছিল না। সে কেবল ইন্দিরের মুখের দিকে তাকায়। তখন ইন্দির তাকে শোনাতে থাকে, এইসব মাঠের পথে, বড় বড় গাছে, খালের ধারে কত সব ছায়ারা ঘুরে বেড়ায়। তারপরে সেই গল্পটা বলে, যে গল্পের নায়কের পরিচয় আর নেই। স্থান কাল পাত্র, সকলই ইতিহাসের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে। গ্রামের উত্তর পাড়ার স্বয়ং গোরাই দত্তের নাম দিয়ে কাহিনী বলে। বলে, 'গোরাই দত্ত সিরাজদিখির থেইক্যা বাড়ি ফিরতে আছিল, রাইত তখন মন্দটা। বড় জবর আন্ধাইরা রাইত। গোরাই দত্তের হাতে প্রকান্ড এক রুইমাছ। আসার রাস্তায় পড়ে কাদিশালের খাল।'...

...তারপরে, গোরাই দত্ত যখন কাদিশালের খালের ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলেন, তখন তাঁর মনে হয়, পিছনে শুকনো পাতায় পা ফেলে ফেলে আর একজন যেন কে আসে। তখন গোরাই দত্ত কী করেন, শহরের পোলাটি বলতে পারে কি? গোরাই দত্ত পিছন ফিরে তাকাবেন? সর্বনাশ, তাই কখনো হয় নাকি। তা হলেই তো মট্ করে ঘাড় মটকে ধরবে। অতএব শহরের ছেলেটি জেনে রাখুক, এমনি অন্ধকার রাত্রে একলা খালের ধার দিয়ে চলতে চলতে বা যে-কোনখানেই হোক, পিছনে যদি কারুর শব্দ পাওয়া যায়, খবরদার, যেন ফিরে না তাকায়। তাই গোরাই দত্তও সেটা বুঝতে পেরেছিলেন, কে তাঁর পিছন আসে। তাই তিনি ফিরে তাকান নি।

কিন্তু যে পিছনে পিছনে আসছিল, সে যখন দেখেবে, গোরাই দত্ত ফিরেও চান না, তখন হঠাৎ শোনা গেল, কে যেন তাঁর আগে আগে যায়। পায়ের শব্দ শোনা যায়। অথচ তাকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু গোরাই দত্ত থামেন না, সমানে চলতে থাকেন। কেন? না, তখন থামলেই ঘাড়টি মট্ করে ভেঙে পড়বে। তখন হঠাৎ গোরাই দত্ত দেখেন, খালের জল থেকে একটা লম্বা হাত উঠে আসে। হাতে এক চিমটি মাংসের বালাই নেই। কেবল সাদা ধবধবে হাড়। অথচ সেই হাতে সোনা-রুপোর চুড়ি। হাতের সঙ্গে চুড়িগুলো ঠকঠকিয়ে বাজে। আর শোনা গেল মেয়েমানুষের নাকি নাকি গলা, 'অঁত বঁড় রুঁই মাঁছ দেঁইখ্যা নোঁলা দিলা, অঁকা গঁড়ো। অঁ দঁত্ত মঁশাই, মাঁছখান খাঁইতে দিঁয়া যাঁন।'

তখন দত্ত মশাই কী করলেন। কিছুই না, আরো শক্ত হাতে মাছখানি ধরে জোরে জোরে হাঁটেন। না তাকান ডাইনে, না বাঁয়ে, না পিছনে। তাঁর নজর সামনের দিকে, যে পথে যেতে হবে। এদিকে সেই এক কথা জল থেকে বারে বারে ডেকে বলে। আর অন্ধকারের মধ্যে সেই হাড়ের হাতখানি, সোনারূপোর চুড়ি যে হাতে ঠকঠকিয়ে বাজে।

তারপরে খালপারের রাস্তা শেষ হয়ে যখন ডাইনে মোড় নিয়ে গ্রামের দিকে চলেন, তখন শুনতে পান, খালের জলে যেন হাতী দাপাতে থাকে। মনে হয়, এই বুঝি একটা প্রকাণ্ড দৈত্য জল থেকে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। অথচ কিছুই পড়ে না। গোরাই দত্ত বেশ খানিকটা চলে যাবার পর হঠাৎ সব শব্দ থেমে যায়। আর মেয়েমানুষের সরু চড়া নাকি গলা শোনা যায়, 'আঁইচ্ছা, আঁইজ্জ তঁর ডাঁইনেঁর দিঁন, তঁাই বাঁইচা গেঁলি, আর এঁকদিঁন তঁর ঘাঁড় মঁটকামু।'

কাদিশালের খালের ধারে পশ্চিমপাড়ার গোরাই দত্তের এই বিস্ময়কর কাহিনী শুনিয়ে ইন্দির জানতে চায়, শহরের পোলা কি বলতে পারে, কে গোরাই দত্তর পিছু নিয়েছিল? শহরের ছেলেটি তখন সকাল বেলার শীতের রোদে ইন্দিরের মোটা বড় হাতটি কষে ধরে আছে। জানালো, না, সে জানে না।

ইন্দির জানালো, 'ওইটা হইল মাউচ্ছা পেত্নী।'

অর্থাৎ মেছো পেত্নী। তার পরেই ইন্দিরের প্রশ্ন হল, 'আইচ্ছা, কও তো, গোরাই দত্ত তখন মনে মনে কী কইছিল?'

ছেলেটি বলে, 'জানি না।'

ইন্দির বলে, 'ক্যান্, এইটা তো সবাই জানে।'

বলে ছড়া কাটে,

'ভূত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি,
রাম লক্ষণ সঙ্গে আছে, করবি আমার কী!'

ইন্দিরের হাত ধরে থাকা ছেলেটি ঠোঁট নেড়ে নেড়ে মুখস্থ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে একবার ভেবে দেখে নি, তার ছুট্ খাওয়া অবাধ্যতা কখন পোষ মেনে গিয়েছে। ইন্দির কখন যে কেমন করে কী বাঁশী বাজিয়ে দিয়েছে, সে টের পায় নি। বাঁশীর গুণে ছেলে তখন মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত ইন্দিরের সঙ্গে তালে তালে চলে। সেদিন টের পাওয়া যায় নি। টের পাওয়া গিয়েছে পরে, চারগ্রামের ইন্দির এক মস্ত বড় শিল্পী।

ক্রমশ

পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতি

বর্তমান আর্থিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এমন সন্দেহ হওয়া বিচিত্র নয় যে, বৈষয়িক অগ্রগতির জন্য ভুল নীতি বা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এখন এরকম প্রশ্ন তোলা স্বাভাবিক যে, মূলধন সংক্রান্ত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াবার প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়। নিম্ন মানের আর্থিক ব্যবস্থায় অনটন, বিশেষ করে পরিপূরক সামগ্রীগুলির অপরিবর্তনশীল যোগান যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সমস্যার সৃষ্টি করে সেটা কোনো অর্থেই গৌণ নয় এবং তার সমাধান আপনা থেকে হয় না।

জন-সম্পদের পূর্ণনিয়োগ

তৃতীয় যোজনা আরম্ভ করা হয়েছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে পূর্ব-নির্ধারিত উৎপাদনে পৌঁছাবার আশা নিয়ে। কিন্তু সে সময় দেশে যে ৯০ লক্ষ থেকে ১ কোটি পূর্ণ বেকার এবং প্রায় ২ কোটি আংশিক বেকার ছিল তাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয় নি। কর্মসংস্থানের ব্যাপারে যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজ শেষ না হওয়া এবং কারখানা-শিল্প ধীরে ধীরে গড়ে না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করার নীতি উদ্যোগকৌশল হিসাবে বিপজ্জনক, সন্দেহ নেই।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মাথাপিছু যোগান ভীষণ কমে গেছে। তার চেয়ে বেশী পরিকল্পনা-মূলক বৈষয়িক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেশে আয়-বণ্টনে অসাম্য তীব্র হয়ে উঠেছে। জন-সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, কৃষির পক্ষে পর পর কয়েকটি দুর্বৎসর, প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়—এ সবই মাথাপিছু উৎপাদন অথবা জন-প্রতি আয়ের অবনতির জন্য অংশত দায়ী।

জনগণের কাছে মাথাপিছু উৎপাদন বলতে মূলত যা বোঝায় সেই খাদ্য বৈষয়িক উদ্যোগের প্রধান বিষয় হবে, এটা আশা করা সঙ্গত। পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন কর্ম-সংস্থান এবং উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য : ভারতের গ্রামদেশে আর্থিক উন্নয়ন বেগবান করতে একটা অন্যটাকে সাহায্য করবে।

খাদ্যে স্বাবলম্বন

স্বাধীনতা লাভের আগে থেকেই ভারত খাদ্যশস্যে ঘাটতি ছিল। ফলে, মাথাপিছু ঘাটতি অপরিবর্তিত থাকলেও (অর্থাৎ জন-সংখ্যা বৃদ্ধি ও খাদ্যশস্য বৃদ্ধির সমতা বজায় রাখলে) বৃহৎ ও বৃহত্তর জনসমষ্টির উপর প্রযুক্ত হলে আভ্যন্তরিক চাহিদা ও খাদ্যশস্য উৎপাদনের মধ্যকার বৈষম্য ক্রম-বর্ধমান হবে। তার উপর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ বৈষম্য আরো বেড়ে গেছে। উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে বলে ঘাটতির সময় খাদ্য-চাষীরা শিল্প ও শহর অঞ্চলে যোগান কম করেছে (অবস্থাপন্ন কৃষকদের শস্য মজুত করে রাখার ক্ষমতা বেড়ে গেছে)। ফলে, দেশকে আমদানির উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল হতে হয়েছে। (প্রসংগত সাম্প্রতিক চুক্তি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতীয় টাকার বিনিময়ে ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে। কানাডা, সোভিয়েট রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া হতে প্রাপ্ত খাদ্যসাহায্য এই সঙ্গে ধরলে মোট খাদ্যের পরিমাণ থেকে জুন পর্যন্ত চালানো যাবে, মনে হয়।) খাদ্যে স্বয়ং-নির্ভরতা অর্জন এখন আর আমাদের ইচ্ছার ব্যাপার হয়ে নেই, একটি অবশ্য-করণীয় কাজ হয়ে উঠেছে।

আসলে, কৃষির সম্প্রসারণ প্রত্যাশিত অগ্রগতির চাইতে কম হয়েছে। প্রকৃত উৎপাদন সম্ভাব্য উৎপাদনের পিছনে পড়ে আছে। পরিকল্পনামূলক কৃষি উন্নয়নের বিচ্যুতি স্বভাবত উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে।

১৯৪৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত গড় জাতীয় আয় বছরে ২৫০ টাকা হতে বেড়ে ৫০০ টাকায় পৌঁছেছে। কিন্তু আঠারো বছর আগের তুলনায় আজ লোকের ক্রয়-ক্ষমতা অনেকখানি কমে গেছে। ঐ সময়ের ভেতর শতকরা প্রায় ১৪০ ভাগ দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি ঘটেছে। ১৯৪৮ সালে ২১০ টাকার যা ক্রয়-শক্তি ছিল; আজ ৫০০ টাকার ক্রয়-ক্ষমতা তা-ই। জনগণ আগের চাইতে আরো দারিদ্র হয়ে পড়েছে।

বৈদেশিক সাহায্যের তাৎপর্য

অল্প সময়ের ভেতর বৈদেশিক সাহায্য খুব কাজে লাগে। আজকের আর্থিক জীবন-যন্ত্রের অভাব বা কষ্টগুলি বৈদেশিক সাহায্যের কল্যাণে সহনযোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু দীর্ঘকাল বিদেশ থেকে সাহায্য নেওয়ার ফল খারাপ হতে পারে : আয় বণ্টনে মাত্রাতিরিক্ত বৈষম্য না ঘটিয়ে দেশের বৈষয়িক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার দিকে আমাদের সব উদ্যম ও সংকল্প শিথিল হয়ে যাবার আশংকা আছে। (প্রসঙ্গত ১৯৬৬ সালের জুন মাসের গোড়ায় ভারতের পরি-শোধ্য বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৪,৫৪৯ কোটি টাকা।) বৈদেশিক সাহায্য থেকে যদি আর্থিক ব্যবস্থায় যথাযথ গঠন-তান্ত্রিক পরিবর্তন আনা সম্ভব না হয় তা হলে মোট সঞ্চয় ও মূলধন নিয়োগ বাড়িয়ে তোলা এবং অব্যবহৃত অথবা অল্প-ব্যবহৃত শ্রমসম্পদ উৎপাদনশীল কাজে লাগানো দুরূহ হবে।

আভ্যন্তরিক সঞ্চয়ের হার যখন কম, সরকারী ব্যয় ক্রমবর্ধমান এবং বৈদেশিক সাহায্যলাভ অনিশ্চয়তার ব্যাপার, সে সময় চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক যোজনার মতো উচ্চাশা-মূলক পরিকল্পনাকে বাস্তবে অনুদিত করা যাবে কিনা সন্দেহ। পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতি যা-ই হোক না কেন, পরিকল্পিত উৎপাদন স্থির করার সময় একটা বাস্তব-নিষ্ঠ দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করতে হবে—যাতে পরিকল্পনায় নির্ধারিত উৎপাদনে বাস্তবিক সময়মতো পৌঁছানো যায়।

শান্তিকুমার ঘোষ

আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্র

আকাশবাণী। এখন প্রচারিত হচ্ছে সর্ব-ভারতীয় সংবাদ, পড়ছি...।" "দিস ইজ অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো, হিয়ার ইজ... গিভিং ইউ দ্য নিউজ।" এমনি ধরনের কথা-গুলোর সঙ্গে কে পরিচিত নন? গত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর থেকে এবং গত সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে তো কথাই নেই। আকাশবাণীর বাণীর জন্যে বহু রেডিয়ো-শ্রোতা কান পেতে থাকে।

তাই ভাবলাম তিনজন সংবাদ-পাঠকের কথা লিখি, যে তিনজনের নাম বহুজন পরিচিত: সুরজিৎ সেন, নীলিমা সান্যাল ও ইভা নাগ। সুরজিৎ এদের সকলের ভিতর সিনিয়র, ডিমেলোর পরেই। এবং ডিমেলো সাধারণ ফিচার ইত্যাদি নিয়ে থাকায় সুরজিৎই হলেন সংবাদ-পঠন বিভাগের সিনিয়রমোস্ট। তাঁর অভিজ্ঞতাও প্রচুর, সুতরাং তাঁর কথা বলার আগে 'লেডিজ ফার্স্ট' নীতি অনুসারে অন্য দুজনের কথা পাড়ছি।

দিল্লির আকাশবাণীর কেন্দ্রীয় অফিসে একটা কিছু হয়েছে যা শ্রোতাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। যারা বহুকাল সুনামের সঙ্গে বাঙলায় খবর পড়ে আসছিলেন হঠাৎ আর তাঁদের কোনো পাত্তা নেই। যেন বেমালুম উবে গেলেন। নতুন যাঁরা পড়ছেন তাঁরাও হয়তো পড়তে পড়তে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সুনাম অর্জন করবেন, কিন্তু সেটা সময় সাপেক্ষ। ততদিন যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁদের ঐ ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া হল কেন?

অনেকেই আছেন কিন্তু আমার মনে পড়ছে বিজন বোস, নীলিমা সান্যাল, ইভা নাগ, সত্য মিত্র ও প্রশান্ত। বেতার-বার্তারও একটা সাংবাদিকতা আছে যার বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য ও যা আমাদের সাংবাদিকতার চাইতে একটু আলাদা। উপরন্তু, বাঙলায় যাঁরা সংবাদ পড়েন (হয়তো অন্যান্য ভারতীয় ভাষার পাঠকরাও), সম্পাদিত সংবাদগুলো তাঁদেরই অনুবাদ করে নিতে হয়। অন্তত তাই হতো, আগে। ঐ হিসেবে বিজনবাবুর বেতার-

দিল্লীর আকাশবাণী ভবনে একটি রেকর্ডিং কক্ষ

আকাশবাণীর জনৈক ব্রডকাস্টার
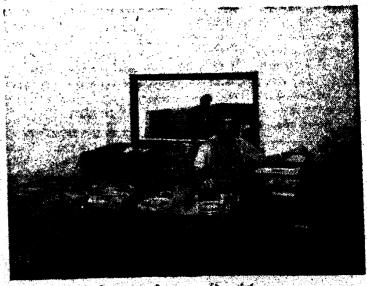
সাংবাদিকতায় অবদান প্রচুর। শুনলাম উনি রিটায়ার করেছেন। কিন্তু এখানকার আকাশবাণীর উচ্চকর্তৃপক্ষ তাঁর সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালে আকাশবাণীর মঙ্গল বই অপকার হতো না। বয়সের জন্যে পঠনকার্য নাও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু অনুবাদ দেখাশোনার কাজ?

তাও না-হয় তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া গেল। কিন্তু অন্যদের? নীলিমা সান্যাল কলকাতার মেয়ে। সেই মহাযুদ্ধের সময় থেকে কাজ করে আসছেন। কলকাতায় অতি সুপরিচিত। পঠন কাজ ছাড়াও নাটক, ছেলেমেয়েদের অনুষ্ঠান, গান, নানাভাবে উনি আকাশবাণীর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এবং লণ্ডনেও শিক্ষা নিয়েছিলেন। মনে হয় প্রায় বছর কয়েক হল দিল্লি থেকে বাঙলায় খবর পড়ে আসছেন। ইভা নাগও এখান থেকে খবর পড়ছিলেন ১৯৫৬ থেকে কি অমনি। বি বি সি-র কমল বসু মহাশয় এদের দুজনাকেই প্রশংসার পাত্র হিসেবে গণ্য করেছেন বিশেষত বাঙলা উচ্চারণের দিক থেকে। কিন্তু আকাশবাণীর মহিমা অপার! যাঁরা এই বিশেষ কাজে অভিজ্ঞ, তাদের এখন খবর পড়তে দেওয়া হয় সপ্তাহে মাত্র একদিন। ব্যাখ্যা কি আর দেওয়া যায় না? আকাশবাণীর লাল-ফিতাতেও একটা ব্যাখ্যা খুঁজেপেতে তাঁরা হাজিরও করবেন হয়তো, কিন্তু হাজার-লক্ষ শ্রোতার কাছে তা শুধু লাল-ফিতাই থেকে যাবে, বড়জোর কোনো উঁচু আসনস্থ (খুব উঁচু নয়) কর্মচারীর খামখেয়ালি। মোটেই বিস্মিত হব না যদি আগামী বাজেট অধিবেশনে আকাশবাণীর উপেক্ষাকৃত স্টাফ আর্টিস্টদের তরফ থেকে অভিযোগ শোনা যায়। বিশেষ কোনো লোকজনের প্রতি বন্ধু-বাৎসল্য দেখানোর অর্থ এই নয় যে, যাঁরা এতকাল ভালভাবে কাজ করে আসছেন তাঁদের আসল কাজ থেকে হটিয়ে অন্য কাজে বহাল করতে হবে।

তবে আকাশবাণী কিনা। ওখানে কী সম্ভবপর নয়! নিয়ম আছে, নিয়ম ভাঙার নিয়ম আছে, বোর্ড আছে বোর্ড এড়ানোর কৌশল আছে, পার্ট-টাইম করিয়ে ফাঁকি দেওয়া আছে এবং আছে অনুগ্রহ বিতরণ মহাপর্ব।

*

ইংরেজিতে সংবাদ-পাঠকদের ভিতর খুব উচ্চ স্থান সুরজিৎ সেনের। ইস্কুলের (রাঁচি, সেণ্ট জেভিয়ার, পাটনা, দার্জিলিং নর্থ পয়েণ্ট) পড়া শেষ করে সুরজিৎ প্রায় ঢুকে গেছলেন সৈন্য বিভাগে, কিন্তু এক ইংরাজ-পুংগবের হঠকারিতা সহ্য করতে না পারায় তাকে ছ' মাস শিক্ষালয়ের পর বলা হয় যে, ওখানে স্বদেশপ্রেমের (গত বিশ্বযুদ্ধ তখনো চলছে) স্থান নেই।

এবং মানুষের জীবনে কীভাবে যে স্রোত আসে! বিলেতে গিয়ে একটি ফার্মে কাজ নেওয়ার সব ঠিক। একজন সন্দিচ্ছাকারী হঠাৎ একদিন বললেন, "তোমার গলা ও উচ্চারণ এতো ভাল, রেডিয়োতে ঢোকো না কেন?" ব্যস্, ঢুকে গেলেন ১৯৪৭-এর অগস্ট মাস থেকে।

গলা ভাল রাখার একটা "রিসিপি" আছে সুরজিতের। তিনি নিজে বহু বৎসর এটি ব্যবহার করেছেন। [illegible] যাঁরা পরীক্ষা করে [illegible] আস্ত গলার ভিতরে এটুকু চালিয়ে দেওয়া। তারপর কাঁচা একটি ডিম, সাদা-হলদে সমস্ত অংশটুকু চুষে করে গিলে ফেলা।

ইনি বলেন যে, বেতার জগতের কয়েকটি লাইনে শিক্ষা দেওয়ার প্রচুর সুযোগ আছে। সংবাদপাঠক ও ভাষ্যকারদের বিশেষত। যদি ১৮।১৯ বছরের শিক্ষার্থীরা বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষা নেয়, তাহলে তাদের অনেকেই চমৎকারভাবে বেরিয়ে আসবে। "কেচ দেম্ ইয়ং", তা না হলে হয় না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বেতার ভাষণকারীদের শিক্ষা দেওয়ার কোনো কেন্দ্র নেই। আধা-সরকারী ইনস্টিটিউট অব্ মাস্ কমিউনিকেশান্ বলে যে-সংস্থা এখানে আছে, সেখানেও কোনো ইলোকিউশান শাখা নেই। বস্তুত, দেশের সবগুলো মহানগরে অন্তত একটি করে ইলোকিউশান স্কুল থাকা উচিত। অন্যথায় যে-যার মতো গলাবাজি করে আকাশবাণীর বাজার মাত্ করবে, ভাষাকলার আর টিকাকার অনুগ্রহ ও স্বজনপোষণের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে যেতে থাকবে।

আকাশবাণীর আসল রোগ আমার মতে রয়েছে ইংরাজ-দত্ত একটি প্রণালীতে। এর দৌলতে পরিশাসকরা ছড়ি ঘোরায় বেতার-ভাষণকারী অর্থাৎ ব্রডকাস্টারদের উপরে। যদ্দিন ব্রডকাস্টাররা নিজেরাই পরিশাসক না-হবেন, তদ্দিন আকাশবাণীর সেই উন্নতি হবে না যা হয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকায়। এখানে কেউ হয়তো খেলাধুলার ভাষ্য করেন বছরে দু চার বার। তিনি নিশ্চয়ই বি বি সি-র পেকন্ ভেনিং হতে পারবেন না। পেকন্ ভেনিং রোজ দুবার বেতারভাষ্য দেন খেলাধুলো নিয়ে।

ধরুন, আমাদের সংবাদপত্র জগত। একজন রিপোর্টারকে অনেক ঘাটের অনেক জল খেয়ে, অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে করতে ঐ বিদ্যাটি শিখতে হয়। আকাশবাণীর সে ধরনের কোনো শিক্ষাপদ্ধতি নেই যার দৌলতে কেউ টেপ্ রেকর্ডার নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে খেলার মাঠে, কি জনসভায়, কি সংগীত সম্মেলনে, কি কবির লড়াইয়ে, নিজে তৈরি করতে পারে বেতার উপযোগী ভাষ্য। ভাল না হয়, টেপ মুছে ফেল। ভাল হয় তো ভালটুকু আকাশে ছেড়ে দিন। আসল কথা মাঠে নামিয়ে কাজ শেখানো।

সুরজিতের ভগ্নী শ্রীমতী লতিকা বক্সীও ইংরাজীতে খবর পড়েন। এদের পারিবারিক গুণ হল উচ্চারণ। পিতা ললিত সেন ব্যবসার কৌশলে সুরজিতকে ইংরাজীর উচ্চারণ শেখাতেন সিন্দু বয়স থেকে।

"যদি কেউ বেতারভাষ্যকার হতে চায়, সকালের শরীরচর্চা যেন অবহেলা না করেন, এবং যৌবনকাল থেকে চেষ্টা করতে", সুরজিতের উপদেশ।

—অলোক দে সরকার

টকে ঝালে

পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রন্টের মন্ত্রী মহোদয়গণ শপথ গ্রহণান্তে শহরের কয়েকটি শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। বিশ্বখুড়ো বলিলেন—"খুব ভালো। বিদেহী শহীদগণ কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাবেন এই মনে করে যে তাঁরা এখনো মানুষের মন থেকে মুছে যাননি। এই প্রসঙ্গে শুনলাম, ময়দানের প্রান্তের একটি শহীদ-বেদী থেকে সেইদিন রাতের অন্ধকারে একটি গান নিঃসঙ্গ আকাশের গায়ে গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে,—যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে। আমরা অবশ্য এইসব ভূতুড়ে কাহিনী বিশ্বাস করিনি!!"

ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের ভার লইয়াছেন—"আমরা এই দফতর বণ্টনে অত্যন্ত আশ্বস্ত হয়েছি। মনে পড়ে, প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করে যখন ডঃ ঘোষ চলে যান, তখন সহযোগী স্ট্যাটসম্যান

সম্পাদকীয় লিখেছিলেন—এ গুড ম্যান গোজ। আমরা যেন এবারে বলতে পারি—এ গুড ম্যান রিটার্নস"—মন্তব্য করেন বিশ্বখুড়ো।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শুভারম্ভের পর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি মহাশয় সভাকক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া অপেক্ষমান বিরাট জনতার সম্মুখে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন, তাঁহাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন এবং জনগণকে "সুপ্রীম কোর্ট" বলিয়া অভিহিত করেন। শ্যামলাল বলিল—"সুপ্রীম কোর্টের রায় মেনে নিলে জনগণ উপকৃত হবেন। কিন্তু ভেবে দেখলাম, জনগণের একটি 'রায়' (অবশ্য এখনও প্রকাশিত হয়নি) মুখার্জি-ক্যাবিনেট মেনে নিতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে—সেটি হলো একটি ক্যালকাটা স্টেটিজম।"

পঃ বঙ্গ যুক্ত ফ্রন্টের মন্ত্রিসংখ্যা বর্তমানে ১৬, শুনিলাম আরও দুই জন মন্ত্রীর যোগদানের সম্ভাবনা আছে। সহযাত্রী বলিলেন—"দুজনের পরিবর্তে এক জন নিলেই হয়ত যথেষ্ট। বখতিয়ার খিলজির সতের জন অশ্বারোহী সৈন্যের আগমন সংবাদেই লক্ষণ সেন নাকি রাজধানী ত্যাগ করে আত্মরক্ষা করেছিলেন!!"

সংবাদে প্রকাশ, বিহার মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রীসহ নাকি তিনজন কুস্তিগীর আছেন। "তাই কও, পালোয়ানদের

দলের সৌজন্যে কাজলায় বাহাত্তর!"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"অতশত বুঝিনে বাবা। তবে এটা ঠিক, ভাবষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পদ-প্রাপ্তি সম্বন্ধে যাঁরা মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করেন, তাঁদের নির্ঘাত অবিবাহিত জীবনযাপন করতে হবে, চার-চার বার সে কথাটার প্রমাণ পাওয়া গেছে।"

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য নাকি ঘাম চাই, তাই আমেরিকায় ঘাম এখন অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে, সিকি গ্যালন

ঘামের দাম তিন হাজার দুইশত সত্তর টাকা। —"বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটা

বিশ্বখুড়ো।

মাদ্রাজের রাজ্যপাল নাকি বলিয়াছেন, —নাকি মাদ্রাজের কাজাগমের নেতা শ্রীআন্নাদুরাই সত্যিই খুব ভাল মানুষ। শ্যামলাল বলিল—"অথচ একদিন কিন্তু আমরা আম্মা-আপ্পাই শুধু শুনেছি—বাংলার আয়ারাকালীদের কথা স্মরণ করুন।"

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী মহাশয়দের বেতন ছাঁটাই হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পড়িলাম। সহযাত্রী বলিলেন—"ছাঁটাইর কাজটা বেশ সহজেই করে ফেললেন, কেননা কর্তৃপক্ষ জানেন, 'চলবে না—চলবে না'-র দিন আর নেই।"

ডালের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বাতিল হইয়া গিয়াছে—"হতেই হবে, মৎস্যমুখী হবার যখন উপায় নেই—এবং সত্যিই নেই, মর্মান্তিক মন্ত্রীমশাই বিশ্বাস করুন, আর নাই করুন—তখন ডালমুখী না হলে যে হরিমটর"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

অনন্তনাগে ভূমিকম্পের কারণ নির্ণয়ের নিমিত্ত ভূতত্ত্ব এবং খনি বিভাগের বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হইয়াছে। —"কিন্তু তত্ত্বের বাইরেও একটা তথ্য আছে। অনন্তনাগের অন্য নাম বাসুকি এবং তাঁর মাথায় তিনি পৃথিবী ধারণ করে আছেন। পৃথিবীর এত ওলট-পালটের পর অনন্তনাগের নড়চড় বসাটা এমন কিছু আশ্চর্য নয়"—বলেন বিশ্বখুড়ো।

সংবাদে প্রকাশ, হরিয়ানায় মেয়েদের আঁটোসাঁটো পোশাক পরিয়া সরকারী অফিসে আসা নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"তোমার চোখে কাজল দিয়ো হরিণলোচনা, সেই কাজলে আমরা করি কাজরী রচনা—আর বুঝি বলা গেল না"—শ্যামলাল বুঝি এখনো জানে বসন্তের ঘাস ফুরাইয়া যায় নাই; কুঁজোর চিৎ হইয়া শুইবার সাধ বুঝি ইহাকেই বলে!!

কেরলে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ বলিয়াছেন, উদ্বোধন এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে মন্ত্রীদের যোগদানের অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত, কেননা উহাতে সময় এবং সরকারী অর্থ দুইয়েরই অপব্যয় হয়। —"মুখার্জি মন্ত্রিসভা শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ ব্যাখ্যাত নীতি গ্রহণ করলে কালী-দুর্গা-সরস্বতী পুজোর সংখ্যা হ্রাস হবে এবং জনগণের চাঁদার খরচ হ্রাস হবে —Q E D।"
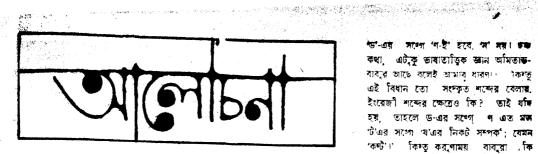
বাংলা বানানের যুক্তাক্ষর

সম্পাদক সমীপেষু,

বাংলা বানানের যুক্তাক্ষর নিয়ে আপনার কাগজে জোর লড়াই চলছে দুপক্ষে। বেশীর ভাগ পত্রলেখকই দেখতে পাচ্ছি অমিতাভ চৌধুরীর উপর মহা খাপ্পা। তার কারণ, তিনি বিশ্ববরেণ্য ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন। যেন খ্যাতিমান ব্যক্তি হলেই তাঁর সব কথাই মেনে নিতে হবে।

রমেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের (কলকাতা-৩৩) ক্রোধ এই কারণে যে, অমিতাভবাবু মারডক নামক পাদরির কথা তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে টেনে এনেছেন। "স্বদেশের বিশেষজ্ঞের কথা উপেক্ষা করে একশ বছর আগে কোন এক মিশনারি কি বলেছিলেন" তার উপর নির্ভর করা ভীষণ অন্যায়। রমেন্দ্রবাবুর এই কথা লেখার সময় কেরী মার্শম্যান প্রমুখ পাদরির নাম বোধ হয় মনে ছিল না। দক্ষিণ বারাসতের করুণাময় মুখোপাধ্যায় অমিতাভবাবুর প্রবন্ধে যুক্তি খুঁজে পেয়েছেন, বলেছেন, সুনীতিবাবুর আলোচনাটির "কোন কোন অংশ হয়ত প্রাসঙ্গিক নয়" কিন্তু "যুক্তাক্ষর যখন রাখতেই হবে ছাপাখানায় যুক্তাক্ষর যখন ব্যবহার করতেই হবে", তখন কিছু শব্দ ভেঙে লাভটা কী? অদ্ভুত যুক্তি, আমার মাথায় পাঁচ মণ বোঝা, তার মধ্যে দু মণ নামানোর সুযোগ থাকলেও তা করা ঠিক হবে না। কেন না, বোঝা যখন পুরো নামানোই যাচ্ছে না, তখন খানিক কমিয়ে দরকার কী? তাঁর মতে যেহেতু সব যুক্তাক্ষর বাদ দেওয়া যাচ্ছে না তাই কোন কিছু ভাঙার দরকার নেই। করুণাময়বাবু অমিতাভ চৌধুরীর ভাষাজ্ঞান নস্যাৎ করতে লনডন শব্দের প্রসঙ্গে আর এক জায়গায় বলেছেন পাণিনির বিধানে লেখা আছে 'ড'-এর সঙ্গে 'ণ-ই' হবে, 'ন' নয়। ভাল কথা, এটুকু ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান অমিতাভবাবুর আছে বলেই আমার ধারণা। কিন্তু এই বিধান তো সংস্কৃত শব্দের বেলায়. ইংরেজী শব্দের ক্ষেত্রেও কি? তাই যদি হয়, তাহলে ড-এর সঙ্গে ণ এত মজ 'ট'এর সঙ্গে 'ষ'এর নিকট সম্পর্ক; যেমন 'কষ্ট'। কিন্তু করুণাময় বাবুরা কি জানেন. রাজশেখরবাবু, সুনীতিবাবুরাই বিধান দিয়েছেন ইংরেজী শব্দের বেলায় স্টাফ, স্টেশন, স্টার—'ষ' নয়, 'স'।

নিউদিল্লি থেকে নীলরতন সেন জানাচ্ছেন, বোম্বাইকে বোমবাই লিখলে অতি পরিচয়ের জন্যে তাঁর পড়তে অসুবিধে হয় না, কিন্তু মাদরাজ আফরিকা, মসকো সারভিস প্রভৃতি "বানান উচ্চারণে পদেপদেই অসুবিধা ঘটছে।" বোমবাই লিখলে অসুবিধা নেই, মাদরাজ লিখলে অসুবিধা, এটা কোন্ ধরনের যুক্তি আমি বুঝতে পারলাম না। বোমবাই যদি অতি পরিচিত শব্দ হয়, তাহলে 'মাদরাজ'-ও কি তা-ই নয়? প্রসূন দত্ত (কলকাতা —৩৩) লাইনো মেশিনে অসুবিধার কথা বলেছেন; কিন্তু এক লাইনো অপারেটরকে তাঁর চেনা এক লেখককে বলতে শুনেছি— "দাদা, 'দিল্লী' না লিখে 'দিললি' লিখলে আমাদের বড় সুবিধে হয়। কলকাতা থেকে

দিশারি মানচিত্রে সর্বখানি, 'দ' আর ক্ষ তার চেয়ে অনেক বেশী দূরে। প্রসূনবাবু রেফ র-ফলা ঋকার ইত্যাদি হাস্যকর ভাবে দূরে দূরে চলে যাওয়ার কথা যে বাক্যে বলেছেন, পরবর্তী বাক্যেই তা প্রত্যাহার করে জানাচ্ছেন, "লাডলো টাইপে বাংলা শিরোনামার অক্ষর শিরঃপীড়া ঘটায় নি।" দেখা যাচ্ছে মুদ্রণশিল্পে না হোক, অক্ষর-বিজ্ঞানে তাঁর জ্ঞানও ভাসাভাসা। আসাম থেকে অজিতকুমার সাহা অমিতাভবাবুর বক্তব্যে ব্যথিত হয়ে অবশেষে বলেছেন, "আনন্দবাজার পত্রিকার অবলম্বিত পদ্ধতি কেবল শিক্ষিত ও পরিণত মনেরই জন্য।" "এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি আবিষ্কার করতে পেয়েছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ। ভূপেশ দাস (কলকাতা ৪১) ক্ষুব্ধ যেসব কারণে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে "হায়দ্রাবাদকে কেন আনন্দবাজার 'হায়দরাবাদ' লিখছে। ভীষণ অন্যায় ও যার নামে জায়গাটির নাম, তিনি যে "হায়দর আলি" নন, হায়দ্ আলি' একথা আনন্দবাজারের জানা উচিত ছিল, তবে ভূপেশবাবুর একটি অনুরোধ অমিতাভবাবু রাখুন আর না-ই রাখুন, আমি রাখলাম।

অতঃপর আমি—

অসিতবরণ চউধুরী
কলিকাতা -১৪

আকাশবাণীর রবীন্দ্রসংগীত

গত ৫ই ফাল্গুনে (১৩৭৩) তারিখের 'দেশ' পত্রিকার 'গানের আসর'-এর পৃষ্ঠায় "আমায় দোষী কর" শীর্ষক লেখাটি প্রকাশ করে জনসাধারণকে রবীন্দ্রসংগীত-প্রচারের বর্তমান বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে জানবার এবং ভাববার যে সুযোগ দিয়েছেন তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি—এবং লেখক 'শার্ঙ্গদেব' মশায়ের লেখার মধ্যে যে সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায় তিনিও সেই জন্য আমাদের বিশেষ অভিবাদনযোগ্য।

বেতার কর্তৃপক্ষ কথিত—'নোটেড স্কলার'দের অভিযোগ এবং তার অসারতা সম্পর্কে শ্রীশার্ঙ্গদেব বলিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। কিন্তু ঐসব অজ্ঞাতনামাদের [বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁদের নাম প্রকাশ করে একটি ব্যাপক সামাজিক উপকার করবেন কী?] অসার অনুযোগ উপলক্ষ করে বেতার কর্তৃপক্ষ যে অনুচিত নির্দেশ জারি করেছেন, এখানে তার স্পষ্ট এবং তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনের সুযোগ পেলে কৃতার্থ বোধ করব।

শ্রীশার্ঙ্গদেব উদ্ধৃত পত্রের এক জায়গায় কলিঃ বেতার কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীদের নির্দেশ দিচ্ছেনঃ

'We would request you to keep the latest authorised version of Geeta Bitan and Swara Bitan."—এটা নিঃসন্দেহে বিভ্রান্তকর এবং বিভ্রান্তি-মূলক। কেননা এই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই জানতে ইচ্ছা করে: তা হলে আগের versionগুলো কি unauthorised? —এর জবাবে শ্রীশার্ঙ্গদেব যা যা লিখেছেন তার প্রত্যেকটি কথা অতি সত্য এবং বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমরাও বলি, মাননীয় বেতার কর্তৃপক্ষ প্রকৃত নিষ্ঠা ও সহানুভূতি নিয়ে আরো বেশি অনুসন্ধান করুন—দেখবেন, বিশেষ করে 'লেটেস্ট' স্বরবিতান-গুলো কী অসম্ভব রকমেই না পরিবর্তিত এবং তা মূলত ঘটেছে কবিগুরুর জীবদ্দশায় তাঁরই অনুমোদিত প্রামাণ্য নির্দেশের যথেচ্ছ বিরোধিতা করে; বস্তুত তাঁর তিরোধানের পর। প্রাসঙ্গিক বোধে বিনীতভাবে একটি কথা জানাতে চাই—'লেটেস্ট' স্বরবিতানগুলির সংকলন তথা পাঠান্তর ও সুরান্তর বিন্যাসই যে কত বেশি অ-নির্ভরযোগ্য [প্রাচীনগুলিই যথার্থ রবীন্দ্র-শিল্পীচেতনার অনুমোদন ধন্য] সেই সম্পর্কে কিছুকাল আগে প্রচুর তথ্য এবং প্রমাণ সহযোগে বর্তমান পত্র-লেখকের একটি বিস্তারিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল (দ্রঃ 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ'—শ্রাবণ সংখ্যা ১৩৭৩) এবং পরিশেষে কলিকাতাস্থ 'টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটুটে' গত ২১-১-৬৭ তারিখে বহু বিশিষ্ট বিদ্বজ্জন ও সুরবিশারদ-এর সমক্ষে তা পঠিতও হয়। এমতাবস্থায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় তাঁরই অনুমোদন ক্রমে মুদ্রিত হয়ে যে স্বরলিপি এককালে প্রকাশিত হয়েছিল—তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আজ প্রচ্ছন্ননামা 'স্কলার'দের নির্দেশানুযায়ী আধুনিকতম সংস্করণে প্রকাশিত স্বরলিপিকে (যা নাকি প্রায়শ পরিবর্তিত এবং অনির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত তাকেই) একমাত্র প্রামাণিক বলে ধরে নিয়ে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতে হবে এ যুক্তির সারবত্তা সম্পর্কে নিরপেক্ষজন কিছুতেই নিঃসন্দেহ হতে পারেন না। এ বিষয়ে দায়িত্বশীল বেতার কর্তৃপক্ষকে সমস্যার মূলে প্রবেশ করতে অনুরোধ করি—রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনে 'নিতান্তনত্ব' সৃষ্টির 'বিশেষজ্ঞোচিত' মায়াজাল রচনার সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে নিষ্ঠামগ্ন শিল্পীদের মর্যাদাহানিতে বদ্ধ-পরিকর যেন তাঁরা না হন!

কিরণশশী দে
কলিকাতা-৩২

(২)

গত ৩৪ বর্ষ ১৩ সংখ্যার (৫ ফাল্গুনে ১৩৭৩) পত্রিকায় প্রকাশিত 'আমায় দোষী কর' শীর্ষক নিবন্ধে শার্ঙ্গদেব যেসব বিষয়ের অবতারণা করেছেন তার মধ্যে কয়েকটি সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

শার্ঙ্গদেব লিখেছেন, "আমরা জানি বেতার-শিল্পীরা সর্বদাই স্বরবিতান বা গীতবিতান সামনে রেখে হুবহু সেই মতই বেতার অনুষ্ঠানের সময় রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে থাকেন।" এরকম অভ্যাসহ দুষণীয়। কারণ, প্রথম কথা, গীতবিতান বিশেষ করে স্বর-বিতান সামনে রেখে গাওয়া মানেই এই বোঝায় যে গান শিল্পীর কণ্ঠস্থ তথা আয়ত্ত হয়নি। যে গান আয়ত্তে আসেনি তার পরিবেশনে আড়ষ্টতা স্বভাবত আসেই। দ্বিতীয় কথা, সর্বদাই স্বরবিতান বা গীত-বিতান সামনে রেখে গাওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্রসংগীতের যে নমুনা শোনা যায় তাতে তাঁদের স্বরলিপির জ্ঞান ও শিক্ষার মান সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জাগে। তাছাড়া এসব সাবধানতা সত্ত্বেও কোনো কোনো শিল্পীর কণ্ঠ বেতারে প্রচারিত রবীন্দ্রসংগীতের এমন পাঠ ও উচ্চারণ শোনা যায় যার সন্ধান কোনো স্বরবিতান বা গীতবিতানে পাওয়া যায় না। শার্ঙ্গদেব তাঁর নিবন্ধে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট-ভাবে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেন নি। বরং প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে খানিকটা অস্পষ্টতার আভাস জাগিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখে-ছেন, "আমরা যতদূর জানি বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ থেকে সম্প্রতি বেশ কয়েক বছর ধরে পুরোনো গানের কথার পরিবর্তন করা হয়েছে...রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে প্রকাশিত গানের স্বরলিপিরও বহু পরি-বর্তন করা হয়েছে বর্তমান সংস্করণে।" "সম্প্রতি বেশ কয়েক বছর ধরে" বলতে শার্ঙ্গদেব কী বোঝাতে চাইছেন তা ঠিক ধরা গেল না। তিনি আরো একটু স্পষ্ট ভাষায় বললে বোঝার পক্ষে সুবিধে হত। কথা হচ্ছে, রবীন্দ্রসংগীতের মুদ্রিত পাঠান্তর ও সুরান্তরের বিষয়টি রবীন্দ্র-নাথের জীবিতকালেই বর্তমান ছিল, গানের পুরোনো পাঠ ও স্বরলিপি পর্যালোচনা করলেই তার সন্ধান মেলে। বর্তমানে প্রচলিত, স্বরবিতান গ্রন্থমালায় প্রকাশকালে সেইসব সংশ্লিষ্ট স্বরলিপির সম্পাদনা করে-ছেন এমন রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাঁদের সম্পর্কে কোনো অধিকারের কথা তোলা ধৃষ্টতা প্রকাশের নামান্তর। তাঁরা যা সিদ্ধান্ত করে দিয়েছেন তাই "সম্প্রতি বেশ কয়েক বছর ধরে" পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে।

উপসংহারে একটা কথা না বলে পারছি না। শার্ঙ্গদেব নিবন্ধের এক বিশেষ জায়গায় "কুচক্রে" "রবীন্দ্রসংগীতকে পণ্য করে" "কায়েমী স্বার্থে" প্রভৃতি উল্লেখের মাধ্যমে তাঁর যে অভিমত প্রকাশ করতে চেয়েছেন, মনে হয়, তা যথার্থই অসংগত ও অসমীচীন।

বন্দনা দে
কলিকাতা-১২

(৩)

'দেশ' পত্রিকায় শ্রীশার্ঙ্গদেবের "আমায় দোষী কর" নামে বেতার কর্তৃপক্ষের নির্দেশ-নামার কপি সহ আলোচনা এবং গত ১৯শে ফাল্গুন ১৩৭৩ তারিখের সংখ্যায় ডক্টর

রজত চৌধুরী ও শ্রীঅরবিন্দ রায়ের সমালোচনা পড়ে ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটি কথা জানাতে চাই। অনুগ্রহ করে আমার চিঠিটি প্রকাশ করে আমাকে বাধিত করবেন।

"দেশে" আকাশবাণীর নির্দেশনামাটি পড়ে অনেকেরই ধারণা হয়েছে যে, আকাশবাণীর কাছে "নোটেড স্কলার্স" হিসেবে যাঁরা অভিযোগ পাঠিয়েছেন আমিও তার মধ্যে একজন। এ বিষয়ে আমি পরিষ্কার ভাষায় জানাই যে এই নির্দেশনামার সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। আকাশ বাণীর কর্তৃপক্ষ নির্দেশনামাটি প্রচারের আগে আমাকে কিছুই জানান নি। "দেশ" পত্রিকায় শার্ঙ্গদেবের চিঠি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষকে লিখিত ভাবে জানিয়েছি যে রবীন্দ্রসংগীত বিষয়ে যে অভিযোগগুলি "নোটেড স্কলার্স"-রা এনেছেন তার সঙ্গে আমি একমত নই। নিজের ইচ্ছামত কথা বসিয়ে কোন শিল্পী রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছেন বলে আমার অন্তত জানা নেই। যদি কেউ তা করে থাকেন তবে অবিলম্বে বিস্তারিত তথ্যের দ্বারা তার নাম প্রকাশ করা উচিত।

ডাঃ রজত চৌধুরী যা জানিয়েছেন সে বিষয়ে বলব যে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনো "শান্তিনিকেতনী স্টাইল অন্য কোন স্কুলের গায়কীর ঢং হতে আলাদা" এই রূপ কথা কোন দিনই ভাবেন নি। অন্য নানা ঢং-এর গাইয়েদের তিনি নিজে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে উৎসাহিত করেছেন। উদাহরণ হিসেবে গুরুদেবের জীবিতকালের উল্লেখযোগ্য মাত্র দুটি ঘটনার কথা বলব।

খ্যাতনামা পাঞ্জাবী গায়ক ও চলচিত্রাভিনেতা 'সাইগল ছিলেন মূলত হিন্দী গজল ও ঠুংরির গাইয়ে। চলচ্চিত্রে গান গেয়েই তিনি বিখ্যাত হন। পরে যখন তিনি বাংলা চলচ্চিত্র ও এইচ এম ভি-র রেকর্ডের জন্যে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে শুরু করলেন তখন গুরুদেব তাঁকে গাইতে বারণ করেন নি। রেকর্ডের সব গান শুনে প্রচারের অনুমতি দিয়েছিলেন গানগুলিতে সাইগলের গজল ও ঠুংরি গাইবার অবাংগালী গলার পরিচয় থাকা সত্বেও। পাশ্চাত্য দেশবাসী ভারতীয় সংগীত প্রেমী ডাঃ আর্নল্ড বাকে প্রায় ১২ বছর শান্তিনিকেতনে থেকে গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের কাছে নানা রকমের রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলেন। তিনি পিয়ানো যন্ত্রের সাহায্যে প্রায়ই সে সব গান গুরুদেব ও শান্তিনিকেতনবাসী সকলকে গেয়ে শোনাতেন। উচ্চারণে, কণ্ঠস্বরে ও গাইবার ঢং-এ তাঁর গলার গান রবীন্দ্রসংগীত বলে মনে হতো না কারুরই। তা সত্বেও গুরুদেব কখনো তাঁকে এ গান গাইতে মানা করেননি। ডাঃ বাকে ভারতের বিভিন্ন শহরে ও কলকাতায় সে সব গান সর্বদাই গেয়ে শোনাতেন। এ কাজে গুরুদেবই তাঁকে উৎসাহ দিতেন। গুরুদেব অন্য ঢং-এর গায়কদের রবীন্দ্রসংগীত গাইতে কেন মানা করতেন না তা তাঁরই একটি লিখিত উক্তি তুলে আপনাদের জানাই। তিনি লিখেছেন:—

"গানের গতি অনেকখানি তরল, কাজেই তাতে গায়ককে খানিকটা স্বাধীনতা তো দিতেই হবে, না দিয়ে গতি কী? ঠেকাবে কী করে? তাই, আদর্শের দিক দিয়েও আমি বলিনে যে, আমি যা ভেবে অমুক সুর দিয়েছি তোমাকে গাইবার সময়ে সেই ভাবেই ভাবিত হতে হবে। তা যে হতেই পারেনা। কারণ, গলা তো তোমার এবং তোমার গলায় তুমি তো গোচর হবেই। তাই এক্সপ্রেশনের ভেদ থাকবেই, যাকে তুমি বলছ ইন্টারপ্রেটেশনের স্বাধীনতা। বলেছিলে বিলেতেও গায়ক-বাদকের এ স্বাধীনতা মঞ্জুর। মঞ্জুর হতে বাধ্য। সাহানার (সাহানা দেবী পণ্ডিচারী) মুখে যখন আমার গান শুনতাম তখন কি আমি শুধু আপনাকেই শুনতাম? না তো। সাহানাকেও শুনতোম; বলতে হত; আমার গান সাহানা গাইছে।"

নিজের গান সম্বন্ধে গুরুদেবের এইরূপ একটি উদার মনের পরিচয় আমরা পেয়েছি।

তৃতীয় চিঠিতে শ্রীঅরবিন্দ রায় গানের উন্নতি-বিষয়ে যা বলতে চেয়েছেন তা সকলেরই কথা। কিন্তু আকাশবাণীর ঐ নির্দেশনামার দ্বারা গানের মান উন্নতির পথে কি কোন সাহায্য করবে? নির্দেশনামাটি পড়ে সকলেরই মনে হবে যে, বেতারে রবীন্দ্রসংগীতে শিল্পীরা যথেচ্ছাচার করে যাচ্ছেন। কথাটা কি ঠিক?

আমি আকাশবাণীর দ্বারা প্রচারিত নানা অনুষ্ঠান শুনে থাকি। আকাশবাণীর দ্বারা দেশের সাংস্কৃতিক বিকাশের যে ব্যাপক সুযোগ দেশবাসী পায় এমন আর অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্ভব নয়। তাই আকাশবাণীর সব প্রচেষ্টার প্রতিই আমার সমর্থন আছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু যে না ঘটে তা নয়, কিন্তু তাকে আমি খুব একটা বড় অপরাধ বলে গণ্য করি না। সব বৃহৎ কাজেই সে রকম কিছু না কিছু ঘটে থাকে। গুরুদেবের গানের উন্নতিকল্পে আকাশবাণী যে চেষ্টা করছে না তা নয়। গত দশ বছরে বেতারে ভাল গায়কের সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে। গীতপদ্ধতিরও উন্নতি হয়েছে বেশ খানিকটা। তবে উৎকৃষ্ট গায়ক বা গায়িকার সংখ্যা তুলনায় কম একথা মানতেই হবে। তা হলেও তা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ দেখিনা। বেতারে ক্লাসিকেল ও অন্যান্য সংগীতেরও সেই একই অবস্থা। বহুশত গাইয়ে, কিন্তু ভাল গাইয়ের সংখ্যা কি তেমন বেশী? গুরুদেবের গানের বেলাতে এ সত্যকে মানতেই হবে।

যে ফুল ফোটবার তা আপনিই ফোটে। জোর করে ফোটানো কী সম্ভব? তবে লক্ষ রাখতে হবে সম্ভাবনার প্রতি। আজকের দিনে রবীন্দ্রসংগীতের গানে যাঁরা খ্যাতিমান, বেতারে প্রথম গানের বেলায় সেই সম্ভাবনার পরিচয়টুকুই কি তাঁরা দেননি? মনে রাখতে হবে যে, গায়ক বা গায়িকার সংখ্যা যত বাড়বে ততই অধিক পরিমাণে উন্নত-মানের গাইয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে। সাধারণ গাইয়ের সংখ্যা যত কমে আসবে ভাল দরের গাইয়ের অভাবও তত দেখা দেবে। গান জিনিসটা এমন যে, কে যে কখন গানের রসের গভীরে পেঁছিতে পারবে তা আগে থেকে কেউ বলে দিতে পারে না। গুরুদেবের কার্যকলাপে এদিক থেকে যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে দেখেছি যে, তাঁর গান ভালবেসে সকলে গাইবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। সকলেই যে উন্নত মানের গাইয়ে হবে এ তিনি কোন দিনই ভাবেন নি। গানে ভালমন্দের ব্যবধান থাকবেই। এই কারণেই শান্তিনিকেতনে তিনি কাউকেই গান গাইতে কখনো বারণ করেন নি। কিন্তু সকলকেই কি তিনি তাঁর গানের উৎকৃষ্ট গায়ক বলে মনে করতেন? তা কখনই নয়।

এই কথা বলে আজ শেষ করবো যে, গুরুদেব তাঁর গানের বিষয়ে নিজে যা ভাবতেন শান্তিনিকেতনের গাইয়েদের মধ্যে সেই চিন্তার প্রসার হোক আমরা সেই চেষ্টাই করি। এখানকার এবং বাইরের গাইয়েদের মধ্যে গুরুদেবের গান নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব বা বিদ্বেষ দেখা দেবে তা তিনি কখনো চাননি বলে আমরাও তা চাইনা। আমরা চাই ভালবেসে সকলেই গান গাইবে, একজনে আর-একজনের গান শুনবে। গানের দ্বারা মিলনের সেতু রচিত হবে। তা না হয়ে যদি গুরুদেবের গান নিয়ে কেবল বিভেদের সৃষ্টি হয় তবে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে।

শান্তিদেব ঘোষ
শান্তিনিকেতন

'কোল-ইয়ারী'

দেশ পত্রিকায় ত্রিলোচন কলমচি তাঁর "কোল ইয়ারীতে" যে পরিমাণ ইয়ার্কি দিয়েছেন তাতে কিছু সংশোধন করার আছে। ইদানীং যে সব কলিয়ারীতে উনি 'ইয়ার' জুটিয়ে এসেছেন তার মধ্যে জাতীয় কয়লা উন্নয়ন পরিষদ পড়ছে না, এই কথাই তাঁকে বিশেষ করে জানাতে চাই।

ফ্রি-ল্যান্ডের রূপকথা শুনিয়ে আজকের দুঃখিনী ভারতীয় বোনেদের মনে কষ্ট

দিয়ে ত্রিলোচন দাদার কি লাভ হলো—জানতে ইচ্ছে করে। না-কি এরই মধ্যে ত্রিলোচনে ছানি পড়তে শুরু করেছে? তা ত্রিলোচন দাদার 'ফ্রি-ল্যান্ড' রূপকথার বদলে কিছু কিছু জেনে রাখা ভালো।

জেনে রাখা ভালো যে শতকরা দশটি টাকা হারে—তাঁর অনেক ভগ্নিপোতেরা তাদের কোয়ার্টারের ভাড়া দিয়ে থাকেন। আর সেই কোয়ার্টারের ইলেকট্রিক মিটারটির গোল চাকতিটা যখন বন বন করে ঘোরে—তা দেখলে—(অবশ্য যদি ছানি না থাকে)—ত্রিলোচন দাদার মাথাটাও না ঘুরে যায়।

দেখুন—কয়লার দেশে জান-প্রাণ খাটিয়েও যদি ফ্রি-কয়লাটা পেতাম—তবে দাদার মুখে (ছানার) সন্দেশ পড়ুক এই কামনা নিশ্চয় জানাতাম। বাছাই করা পাথুরে কয়লাও যখন বাবা-বাছা করে—"ফ্রি" হয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছয় না—তখন বাছাদের হাতে কুলি ভাড়া—নয়তো গাড়িভাড়াটা আগে ধরে দিতে হয়, তবে আপনার অর্থাৎ ত্রিলোচন দাদার—লক্ষ্মী বোনেদের চুলো ধরে। চুলো তো ধরলো—কিন্তু জানেন তো আজকের দিনে—"চাল-চুলো"—দুটোই বজায় রাখা কত সমস্যা। কাজেই অলিম্পিক চুলোর বদলে—'রাবণের চিতা' বলুন—ভালো শোনাবে।

শ্রীমতী মিলি গুহ
কুমারিয়া কলিয়ারী
মধ্যপ্রদেশ।

ভেনাস ডি মেলো

গত ৪ঠা মার্চের 'দেশ'-এ 'ভেনাস ডি মেলো' সম্পর্কে শ্রীসুব্রত সেনগুপ্ত যে চিঠি দিয়েছেন, সে প্রসঙ্গে জানাই যে, সাধারণভাবে কেউ-ই ভেনাসের খণ্ডিতরূপে প্রাপ্তিকে বিশেষভাবে নির্দেশ করেন না। তাই আমার লেখাতেও তা উল্লিখিত হয়নি।

তাঁর দ্বিতীয় জিজ্ঞাসার উত্তরে জানাচ্ছি—উক্ত উদ্ধৃতিটি লুভরে কোথাও পাওয়া যাবে না। প্রবন্ধটি একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে—"একজন ফরাসী লেখকের ভাষায়"—। ওই রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল ফরাসী পত্রিকা "Constellation"-তে, ১৯৬৩ সালের জুলাই সংখ্যায় (Juillet, 1963) লেখাটির নাম : "Quand la Vénus de Milo était femme"; লেখকের নাম : Jacque de Sugny।

উদ্ধৃতি ওই ফরাসী প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদের অনুবাদ।

আশা দেবী
কলিকাতা-৯

ভ্রম সংশোধন

আমি চীনযুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনার প্রথম কিস্তিতে জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করিয়াছিলাম, তাহাতে খানিকটা নিন্দার ভাব ছিল। আমি পরে সংবাদ লইয়া জানিয়াছি যে, জেনারেল চৌধুরী কোনও অবস্থাতেই রীতি বিরুদ্ধ কাজ করেন নাই।

প্রথমত তিনি স্টেটসম্যানের সামরিক সংবাদদাতা হইবার সময়ে গভর্নমেন্টের অনুমতি লইয়াছিলেন। সুতরাং এ-বিষয়ে গভর্ণমেন্ট কিছু জানিতেন না, এই কথাটা অমূলক। দ্বিতীয়ত, তিনি তাঁহার বই-ও লিখিত অনুমতি লইয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

তৃতীয়ত, তিনি জেনারেল কাউলের বই সম্বন্ধে ভারতীয় গভর্নমেন্টের রাজপুরুষ হইয়া কিছু বলিতে পারেন না।

সুতরাং আমার নিন্দাসূচক ইঙ্গিত সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করিতেছি।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

সাহিত্য সংবাদ

ম্যাক্সমূলার ভবনের উদ্যোগে সাহিত্য প্রতিযোগিতা

বিদেশী দূতাবাসগুলি নানাবিধ কারণে আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে মাঝে মাঝে অংশ গ্রহণ করেন। তবে, এ-দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহের নিদর্শন প্রায়ই হয় এলোমেলো, কখনো অনর্থক আড়ম্বরপূর্ণ এবং উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার প্রকট হয়ে পড়ে।

ম্যাক্সমূলার ভবন একটি রাজনীতি-নিরপেক্ষ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান। জার্মান ভাষা শিক্ষা এবং ভারত-জার্মান সংস্কৃতি বিনিময়ই এঁদের কার্যক্রম। ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জার্মানদের আগ্রহ বহুবিদিত। কলকাতার ম্যাক্সমূলার ভবন ভারতীয় সংগীত, চিত্রকলা এবং সাহিত্য সম্পর্কে সারা বছর ধরেই বহু অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন। সেই সংগে জার্মান সংস্কৃতির নানা দিকও আমাদের কাছে তুলে ধরছেন।

কিছুকাল আগে এঁরা একটি কবিতা পাঠের আয়োজন করেছিলেন, জার্মান কবিতার বাংলা অনুবাদ ও বাংলা কবিতার জার্মান অনুবাদ, এ ছাড়া, বাংলা ভাষাতেই কিছু গল্প ও কবিতা। বাংলা সাহিত্যের প্রতি এঁদের সশ্রদ্ধ আগ্রহের পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায়। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, মিউনিখ শহর থেকে অসিত দত্তের উদ্যোগে 'কল্লোল' নামে একটি পত্রিকা নিয়মিত বেরুচ্ছে, তাতে অনেক বাংলা লেখার জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে—এবং সে কাজে সহযোগিতা করছেন অনেক জার্মান ছাত্র ও লেখক।

সম্প্রতি এঁরা একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। কোনো বিদেশী সংস্থা কর্তৃক এ-রকম ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিযোগিতা আহ্বানের দৃষ্টান্ত অভূতপূর্ব। প্রতিযোগিতা ছিল সাহিত্যের নানা বিষয়ে এবং বিষয়বস্তু নির্বাচনের কোনো শর্ত ছিল না। প্রতিযোগিতার বিভাগ ছিল দুটি, (ক) ছোট নাটক, বেতার নাটক, চলচ্চিত্র নাটক, (খ) ছোট গল্প এবং প্রবন্ধ। প্রতি বিভাগের প্রথম পুরস্কার এক হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার পাঁচ শো টাকা।

পুরস্কারের ফলাফল বিষয়ে বলার আগে প্রতিযোগিতা পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে একটু বলা যাক, আমাদের কাছে তা কিছুটা শিক্ষণীয়। বিষয়বস্তু নির্বাচনে কোনো শর্ত ছিল না; কিন্তু এ কথা স্পষ্ট বলা ছিল যে, রাজনীতি সম্পূর্ণ বাদ। রচনার ভাষা বাংলা, ইংরেজী অথবা জার্মান এবং কোনো ভাষারই অগ্রাধিকার নেই। প্রতিযোগীদের বয়েস পঁচিশের ওপরে হতে হবে এবং রচনা ছ হাজার শব্দে সীমাবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনো রচনাতেই প্রতিযোগীদের নাম লেখা থাকতে পারবে না—নাম থাকবে রচনার সংগে পাঠানো আলাদা খামে, যাতে বিচারকরা লেখক-লেখিকার নাম না জানতে পারেন। প্রতিযোগীদের অবশ্যই ভারতের নাগরিক এবং পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী হতে হবে। পুরস্কৃত রচনার কপিরাইট লেখকেরই থাকবে, এবং পুরস্কার ছাড়াও সেই রচনা এ দেশে ও জার্মানিতে প্রকাশের প্রতিশ্রুতি ছিল।

গত শনিবার ম্যাক্সমূলার ভবনে পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন পাঁচজন, ইংরেজীর অধ্যাপক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, ম্যাক্সমূলার ভবনের পরিচালক গেয়র্স লীসনার, গবেষক ম্যানফ্রেড ফেলজসীপার (ইনি বাংলা লিখতে, পড়তে এবং বলতে ভালো জানেন) এবং কবি শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। অনুষ্ঠানের সময় সারা বাড়ির বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে আলো নিবে গিয়েছিল, সুতরাং মোমবাতির আলোয় একটি নরম নীরব সভা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল।

দুটি বিভাগেই বাংলা রচনা পুরস্কৃত হয়েছে, প্রতিযোগিতায় বাংলা লেখাই এসেছিল অধিকাংশ। বাংলা লেখার জন্য কোনো প্রতিযোগিতায় এক হাজার টাকার প্রথম পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা এ-দেশে আর একটিও নেই। সুতরাং, এই প্রতিযোগিতাটি বেশ উল্লেখযোগ্য মনে করি।

কিন্তু, বিচারকরা দুঃখের সঙ্গে জানালেন, প্রতিযোগিতায় রচনার মান মোটেই উঁচু ছিল না। হয়, প্রতিযোগিতার কথা ভালোভাবে প্রচারিত হয়নি, অথবা বাঙালী লেখকরা প্রতিযোগিতায় নামতে এখন উৎসুক নন। বিনা শর্তে একটিমাত্র ছোট গল্পের জন্য এক হাজার টাকা পাওয়া যে-কোনো তরুণ গল্পকারের কাছেই প্রলুব্ধ হওয়ার মতন ঘটনা। এবং বাংলা দেশে ছোট গল্পের মান এত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও এমন কোনো ছোট গল্প এই প্রতিযোগিতায় আসেনি, যা প্রথম পুরস্কার পাবার যোগ্য। সুতরাং, উদ্যোক্তারা একটি ছোট গল্প ও একটি প্রবন্ধের জন্য 'খ' শাখায় দ্বিতীয় পুরস্কার ভাগ করে দিয়েছেন। নাটকের শাখা, শোনা গেল, কিছুটা আশাপ্রদ। অর্থাৎ বাংলা দেশের তরুণ সাহিত্যিকরা এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে অনবহিত বা অনাগ্রাহী ছিলেন, বোঝা গেল; এতে যোগ দিয়েছেন মূলত শৌখিন লেখক-লেখিকারা। সব মিলিয়ে রচনা এসেছিল ১৬৫টি মাত্র।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে প্রেমেন্দ্র মিত্র ভারত-জার্মান সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হবার আবেদন জানিয়ে আশা প্রকাশ করেছেন যে, এই রকম প্রতিযোগিতা প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হবে এবং রচনার মান আরও উন্নত হবে। এ বছরের পুরস্কার পেয়েছেন, বেতার নাটকের জন্য শ্রীমতী মানসী দাশগুপ্তা, বিশেষ পুরস্কার এস বসু। গল্প ও প্রবন্ধের জন্য যুগ্ম দ্বিতীয় পুরস্কার শ্রীমতী দেব সরকার ও পরিমলকান্তি দাশগুপ্ত। প্রবন্ধের জন্য বিশেষ পুরস্কার এস এন দাশগুপ্ত।

"ফিনেগান্‌স ওয়েক"-এর সহজ সংস্করণ

জেমস জয়েসের 'ফিনেগানস ওয়েক' নামক ৬২৮ পৃষ্ঠাব্যাপী জটিল দুর্বোধ্যতা এক টানা পড়ে শেষ করতে পেরেছেন, এমন পাঠকের সংখ্যা, সত্যিকথা বলতে কি, সারা পৃথিবীতেই খুব কম। গত ২৮ বছর ধরে এই বইখানি বহু সাহিত্য পাঠকের এক শিরঃপীড়া হয়েছিল, বাতিল করাও যায় না, পড়ে সব বোঝাও যায় না—এমন বই। মদের দোকানের মালিক পোর্টার, ঘুমের ঘোরে যে হয়ে যায় হামফ্রি চিম্‌পডেন ইয়ারউইকার—তার এক রাত্রির ব্যাপী ঘুম ও তন্দ্রাস্বপ্নের মধ্যে কী কী আছে—তার বদলে কী নেই, এইটাই প্রধান প্রশ্ন হয়ে ওঠে। পৃথিবীর অন্তত ১২টি ভাষার শব্দ ঢুকেছে এই বর্ণনায় এবং সমালোচকের মতে, 'এক ঘুমে সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস।'

সম্প্রতি অ্যানটনি বার্জেস এই ভয়াবহ বইখানির একটি সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করেছেন, মূল ৬২৮ পাতার বইখানিকে তিনি ছোট করেছেন ২৫৬ পৃষ্ঠায় এবং আপত্তি করার জন্য জয়েস যে-হেতু এখনো বেঁচে নেই, সেইজন্য তিনি অনেক শব্দের অর্থও ছাড়িয়েছেন। এবং একটি বিস্তৃত ভূমিকায় তিনি জয়েসের শব্দে শব্দে বিবাহ-বন্ধন প্রক্রিয়া কিছুটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেমন, এই বইয়ের নামের 'ফিনেগান্‌স'-এর মর্মার্থ সম্ভবত ফিনিশ এবং এগেন-এর সন্ধি, তারপর ওয়েক, অর্থাৎ সভ্যতার জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জাগরণ।

সনাতন পাঠক

অঙ্গে-অঙ্গে অপরূপ সৌন্দর্য্য...
চলার ছন্দে অপরূপ ভঙ্গিমা...

সুঠাম গড়ন···সুঠাম অঙ্গসৌষ্ঠব···অতি সুন্দর— র‍্যালিফ্যান! যে কোন দিক থেকেই দেখতে চমৎকার, দিব্যি স্ট্রীমলাইনড্। শান্ত সহজ ছন্দে চলে···ঘরের সবাইকে শীতল রাখে। দিব্যি হাল্কা···বেশ সহজেই ঘোরানো-ফেরানো যায়···ওর বিশেষধরণের হাতলটি দিয়ে। অপরূপ স্টাইলের র‍্যালিফ্যান আপনি চাররকমের আরামের রঙে পাবেন—নীল, সবুজ, হাতীর দাঁতের মত সাদা ও ধূসর।

আপনাকে অনেক বেশী শীতল রাখে!

র‍্যালি গ্রুপের তৈরী

র‍্যালিফ্যানের রকমারিতে পাবেন সিলিং, পেডেস্টেল, দেয়ালে লাগাবার ও এক্সহস্ট ফ্যান।

র‍্যালিফ্যান সম্বন্ধে **বিনামূল্যে** বর্ণরঞ্জিত সচিত্র পুস্তিকার জন্য সঙ্গের কুপনটি ভ'রে এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন— র‍্যালিস ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ২১ র‍্যাভেলিন ষ্ট্রীট, বোম্বাই-১।

নাম ______________________________

ঠিকানা ______________________________

মনে রাখবেন, প্রত্যেক র‍্যালিফ্যানের জন্য তৈরীর খুঁত সম্পর্কে ২ বছরের গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।

Bensons 278 A-24 Ben.

আসামের ডিস্ট্রিবিউটর: **কিলবার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড** ১ ফেয়ারলি প্লেস, পোস্ট বক্স নং ৬১, কলিকাতা। বিহার উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরার ডিস্ট্রিবিউটর: **র‍্যালিজ ইণ্ডিয়া লিমিটেড**, ১৬ হেয়ার স্ট্রীট, পোস্ট বক্স নং ১৯৮, কলিকাতা।
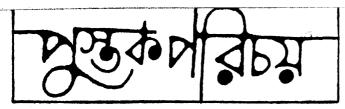
· নাট্যসাহিত্য

নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার। ১ম খণ্ড। ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম : ১০·৫০।

বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য : ১২·৫০।

যে-কোনো দেশের শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে নাটকের স্থান সর্বোচ্চে। নাটকের ভূমিকা দ্বৈত : এক, সাহিত্য; দুই, শিল্প। ইংরেজী থেকে শুরু করে যে-কোনো প্রধান সাহিত্যের এক বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে তার নাটক। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। এক শতাব্দীর অধিক নাট্যান্দোলনে বাংলা দেশে নাটকের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা নিশ্চয়ই অবহেলার বস্তু নয়। বাঙালীর নাট্যপ্রীতি অকৃত্রিম। আর বাংলা নাটকের ঐতিহ্য স্বল্পকালীন হলেও সুদৃঢ়।

কিন্তু ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তারাচরণ শিকদারের "ভদ্রার্জুন" নাটক, বা ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের রামনারায়ণ তর্করত্নের প্রখ্যাত নাটক "কুলীনকুলসর্বস্ব" প্রকাশের পর থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন নাট্যকারের বহু নাটক প্রকাশিত ও অভিনীত হলেও —সুয়েজ খালের এদিকে বোধ হয় একমাত্র বাংলা দেশেই দীর্ঘকালের সাধারণ রংগালয় রয়েছে—সাহিত্যের অংশ হিসাবে বাংলা নাটক আদৃত হয়নি। আর সেজন্যেই সৎ সাহিত্য সমালোচকের দৃষ্টিপাত ঘটেনি এই একটি বিরাট শিল্প-সাহিত্যের শাখার উপরে। সুখের কথা, একেবারে সাম্প্রতিক কালে বাংলা নাটক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা-গবেষণা শুরু হয়েছে। এবং এই আলোচনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু পণ্ডিত ও গুণী অধ্যাপকেরা নিষ্ঠার সংগে যোগদান করেছেন। উপর্যুক্ত দুই অধ্যাপকের স্থান তাঁদের শীর্ষে। সেই সংগে জাতীয় সাহিত্য পরিষদের ন্যায় প্রকাশভবন এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে বাংলা দেশে নাটক সংক্রান্ত আলোচনায় এক নতুন দিগ্‌দর্শন ঘটিয়েছেন। এঁদের প্রচেষ্টা সাধুবাদ পাবার যোগ্য।

ডঃ সাধন ভট্টাচার্যের "নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার" পুস্তক পাঁচ খণ্ডে রচনা করবেন স্থির করেছেন। এ পুস্তকমালা পূর্বপ্রকাশিত পুস্তকগুলির পুনর্মুদ্রণ নয়; এগুলি হবে স্বতন্ত্র রচনা। লেখকের ইচ্ছা, রামনারায়ণ থেকে আরম্ভ করে অতি আধুনিক নাট্যকার পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রধান প্রধান রচনার সমালোচনা করে নাট্যকারদের প্রতিভার ও নাট্যসাহিত্যের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করবেন। লেখকের উদ্দেশ্য, এই গ্রন্থগুলিতে একাধারে নাট্যতত্ত্ব ও নাটক সমালোচনা সূত্র এবং বিশেষ বিশেষ নাটকে সেই সূত্রের প্রয়োগ সবিস্তারে আলোচনা করে উপযুক্ত মূল্যায়নের প্রয়াসী হওয়া।

আলোচ্য প্রথম খণ্ডে লেখক পাঁচখানি প্রখ্যাত নাটক—দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ", গিরিশচন্দ্রের "প্রফুল্ল" ও "জনা", দ্বিজেন্দ্রলালের "মেবার পতন" ও ক্ষীরোদপ্রসাদের "নরনারায়ণ" সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সহৃদয় আলোচনা করেছেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা নাট্যকারদের মধ্যে এই চারজন একেবারে প্রথম শ্রেণীর আর এই নাটক কখানিই তাঁদের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত। পাঁচখানির মধ্যে দুখানি সামাজিক, দুখানি পৌরাণিক ও একখানি ঐতিহাসিক নাটক। সামাজিক দুখানির মধ্যে যেমন প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে, পৌরাণিক দুখানির মধ্যে আছে চারিত্রিক ভেদ।

ডঃ ভট্টাচার্য প্রতিটি নাটক সম্বন্ধে তাঁর বিস্তৃত আলোচনায় আধুনিক পাশ্চাত্ত সমালোচকদের ধারা অনুসরণ করে নাট্যকার, তাঁর পরিবেশ, সেই যুগে, তাঁর শিল্পী-মানসে সে যুগের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া এবং আলোচ্য নাটককে সেই পটভূমিকায় বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। আলোচ্য নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে পূর্ববর্তীগণের বিচার ও মত তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও বিশ্লেষণ করে নিজের সিধান্তে উপনীত হয়েছেন। সে সিদ্ধান্তকে তিনি মোটেই জোর করে চাপাননি। বিভিন্ন মতের আলোচনার মধ্য দিয়ে পাঠক সে-সিদ্ধান্তে নিজে থেকেই করে নিতে সক্ষম হন। ডঃ ভট্টাচার্যের আলোচনা এতো বিস্তৃত এবং এমন নিখুঁত যে, এ সম্পর্কে কোনো বিশেষণ প্রয়োগ বাহুল্য মাত্র। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক তথা অবজেকটিভ। নাট্য-সাহিত্যের আলোচনায় ডঃ ভট্টাচার্যের এ পুস্তকমালা এক অভিনব সংযোজন হবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুস্তকখানিতে বাংলা নাটকে সামাজিক জীবনের একটি প্রধান বিষয়—বিবাহ ও তার ক্রমবিকাশের ধারা নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। বিবাহের রীতি সহজে পরিবর্তিত হয় না; সমাজ-জীবনের কোন্ কোন্ অবস্থা বিপর্যয়ে এই রীতি পরিবর্তিত হয়েছে বাংলা নাটক ও প্রহসনের অনুসরণ করে, তিনি তা তুলে ধরেছেন। রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীনকুলসর্বস্ব"—যা বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সামাজিক নাটক—থেকে শুরু করে একেবারে একালের "প্রেয়সী, দাবি" প্রভৃতি পর্যন্ত নাটকের আলোচনায় ঐ বিবাহ ও আনুষঙ্গিক রীতির ক্রমবিবর্তনটি পরিস্ফুট করা হয়েছে। ১৮৫৪ সালের নাটকে সামাজিক সমস্যাটি হল বহু-বিবাহ; ১৯৬৪ সালের নাটকে তা বিবাহ-বিচ্ছেদে রূপান্তরিত। বহুবিবাহ, বাল্য-বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অসম বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, অ-সামাজিক বিবাহ, প্রেমজ বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রভৃতির সংগে সংগে পণপ্রথা, মদ্যপান, নৈতিক ব্যভিচার ইত্যাদি সামাজিক গলদ—যা বিবাহ তথা নরনারীর সম্পর্কের সহিত ওতপ্রোত জড়িত, কীভাবে এক শ' বছরের উপর ধরে বিভিন্ন নাটক ও প্রহসনে তুলে ধরা হয়েছে, সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন লেখক। বহু নাটক ও প্রহসন থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃতিযোগে লেখক তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট করেছেন। মাইকেলের "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ", "একেই কি বলে সভ্যতা", দীনবন্ধুর "জামাই বারিক", "সধবার একাদশী" ইত্যাদি প্রখ্যাত নাটক-প্রহসন এ পুস্তকে স্বভাবতই আলোচিত হয়েছে। আশুতোষবাবুর আলোচনা অবশ্যই সাধনবাবুর পর্যায়ের নয়; কারণ, দুজনের উদ্দেশ্য পৃথক। নাটকে এক বিশেষ সামাজিক সমস্যার রূপায়ণের বিবর্তনটি এবং তৎসম্পর্কে সমাজ তথ্য-পরিবেশনা আশুতোষবাবুর লক্ষ্য।

জীবন ও সমাজের প্রতিফলন নাটকে যতোটা পাওয়া যায়, ততোটা সাহিত্য-শিল্পের আর কোনো শাখায় পাওয়া দুষ্কর। শুধু বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনা হলে কী হবে, আশুতোষবাবুর পুস্তকে বাংলা দেশের সমাজের অন্যান্য বিষয়ের পরিচয়ও নেহাত কম ফুটে ওঠেনি।

(৩৮২।৬৬, ৩৮৬।৬৬)

—সংশোধন—

গত সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীনিখিল সরকার লিখিত "এবারের এই নির্বাচন" রচনাটিতে একটি মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। রচনার শেষ অংশে যেখানে রাজা "অষ্টম এডোয়ার্ড" আছে সেখানে হবে—"সপ্তম এডোয়ার্ড"।

আপনার প্রিয় চিত্রাভিনেতা ও তাঁর প্রিয়

মারফি ট্র্যানজিস্টর

বিশিষ্ট চিত্রাভিনেতা ধর্মেন্দ্র বাড়ীতে আরাম করবার সময় পাশে রাখেন তাঁর মারফি মডেল ৮১৬। এই বিশিষ্ট রেডিও মডেল ৮১৬ এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে রেডিও শোনার আনন্দ আরও অনেক বেশী পাবেন।

আপনার কাছাকাছি মারফির দোকানে আজই এই মডেলটি দেখে আসুন--- মারফি ট্র্যানজিস্টরের নানা রকমারি দেখতে পাবেন বেছে নেবার জন্যে।

মডেল টিবি ০৫৭৯ মডেল টিবি ০৫৮১ মডেল টিবি ০৮১৬ মডেল টিবি ০৫০৯

মারফি ট্র্যানজিস্টর

Murphy sets the standard

মঞ্জু দে প্রযোজিত-পরিচালিত "অভিশপ্ত চম্বল" এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। ছবির তিনটি রোমাঞ্চক দৃশ্যের দু'টিতে (নিচে) প্রযোজিকা-পরিচালিকা শ্রীমতী দে'কে দেখা যাচ্ছে—বাঁ-দিকের ছবিতে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নতুন বছরে বাংলা ছবি

বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেকেই আশংকান্বিত। নতুন বছরে অতি অল্প ছবির কাজ শুরু হয়েছে। যে কয়টি ছবির কাজ চলছে তার অধিকাংশই শুরু হয়েছে গত বছরে। আরম্ভের পর বন্ধ হয়ে গেছে এমন ছবির সংখ্যাও কম নয়। শোনা যাচ্ছে, অল্পকালের মধ্যেই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ছবির শুটিং আরম্ভ হবে। কিন্তু 'প্রোডাকশন'-এর সংখ্যা যে কমে আসছে তাতে সন্দেহ নেই

কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্র প্রযোজকের নাকি তাঁদের প্রতিজ্ঞা, বাংলা ছবি তাঁরা আর করবেন না। কারণ তাঁদের মতে, বাংলা ছবি 'কমার্সিয়াল প্রপোজিশন' নয়। এই উক্তির সপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তিই দেওয়া চলে। বক্স অফিসের আনুকূল্য পেয়েছে এমন ছবি সম্প্রতি আমরা দেখেছি। ভাল গল্প ও ভাল অভিনয়ের সমন্বয়ে টিকিটঘর যে সহজেই জয় করা যায় সে প্রমাণ বিরল নয়। অনেকের ধারণা খুব নাম করা স্টার না নিলে ছবি চলে না।

এদিকে বাংলা ছবির স্টারের সংখ্যাও অল্প। যদিও ভাল অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভাব আছে এ কথা বলা চলে না। এবং পরিচালকের কৃতিত্ব যদি থাকে তবে তাঁদের মধ্য থেকেই স্টার তৈরি হতে পারে।

এক শ্রেণীর প্রযোজকের যুক্তি অন্যরূপ। যেহেতু বাংলা ছবি তৈরির খরচ বেড়ে গেছে তাই হিন্দী চিত্র নির্মাণই লাভজনক। কলকাতায় হিন্দী চিত্র নির্মাণের সম্পর্কে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। কলকাতা যদি আবার সারা ভারত থেকে ঘরে পয়সা নিয়ে আসতে পারে, নিউ থিয়েটার্স'-এর যুগে যা হত, তবে তো ভালই। এ প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সাধুবাদার্হ। কিন্তু ভুললে চলবে না, নিউ থিয়েটার্স বাংলা ছবিও সমপরিমাণেই তৈরি করে গেছেন। বাংলা চিত্র বন্ধ করে দিয়ে হিন্দী ছবি নিয়ে মেতে পড়েননি। এখন যদি উৎসাহের পাল্লা হিন্দী চিত্রের দিকেই ভারী হয় তবে দুশ্চিন্তার কারণ আছে বইকি। বাংলা ভাষা

ও সংস্কৃতির প্রশ্নকে তো উপেক্ষা করা উচিত নয়।

আর এক একটি কথা। নিউ থিয়েটার্সের কালে স্টারের সংখ্যা ছিল অনেক। কিন্তু স্টার সিস্টেম ছিল না। একই সংগে চলচ্চিত্রাকাশে অনেক তারকাই উপস্থিত ছিলেন। এবং গল্পের বা চরিত্রের প্রয়োজনে তাঁদের ছবিতে নেওয়া হত। প্রতিভা বিকাশের অবকাশও ছিল প্রচুর। ফলে একই কালে একই সংগে বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় শিল্পীকে বিভিন্ন ছবিতে দেখা যেত। বাংলা ছবির ব্যবসাও চলত ভাল। তখন হয়ত এমন রক্ষণশীল পরিবারও ছিল যাঁরা সিনেমায় যাওয়াটা খুব পছন্দ করতেন না। তা সত্ত্বেও সিনেমার ব্যবসার কোন বিশেষ ক্ষতি হয়নি। আজ ছায়াছবির এত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও ব্যবসা নিয়ে এত দুশ্চিন্তা কেন? শুধু ছবি তৈরির খরচ বেড়েছে বলেই কি এত দুর্ভাবনা? আজ এত আর্থিক টানাটানির মধ্যেও কি মানুষের সিনেমা দেখা কমেছে? আমোদ-কর বেড়েছে বলে সিনেমা তো দর্শকরা বর্জন করেননি। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের উপস্থিতির হার নিম্নগামী এমন তথ্যও তো পেশ করা হয়নি।

হিন্দী ছবির দর্শক বেশী, বাংলা ছবির কম—এই কথাই হয়ত প্রত্যুত্তরে অনেকেই বলবেন। কিন্তু বাংলা ছবির দর্শক কেন কমছে তার উত্তরের জন্য মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। ভাল ছবি বেশী হচ্ছে না, ছবি দেখে মানুষ আনন্দ পাচ্ছে না—এটাই একমাত্র সরল জবাব। কী-ভাবে ভাল ছবি করা যায় তা বাংলা দেশের পরিচালকরা অতীত যুগে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এ যুগের পরিচালকরাও দেখাতে পারেন। এবং দেখিয়েছেন। এর জন্য কিছু গতানুগতিক ফরমুলা বা স্টার সিস্টেম-এর উপর অন্ধ আস্থা না রাখলেও চলে। বাংলা দেশে কৃতী শিল্পী বা সুন্দর গল্পের অভাব নেই। অথচ এমন বিলাপও শুনতে পাই, এই দুয়েরই নাকি দুর্ভিক্ষ। আসলে ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্পী এবং উৎকৃষ্ট গল্প খুঁজে নেবার ইচ্ছা ও ক্ষমতার অভাবটাই আজ বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে।

আমাদের বড় স্টাররা বড় অভিনেতা-অভিনেত্রী সন্দেহ নেই। এমন অনেক ভূমিকা আছে যা তাঁদের না হলে চলে না। সেখানে তাঁদের ব্যক্তিগত ভূমিকা স্টারের নয়, শিল্পীর। কিন্তু বাংলা দেশে আজ এমন পরিচালকেরও অভাব নেই যাঁরা শিল্পী তৈরি করতে সক্ষম। এ প্রসংগে আর একটি দুঃখের কথা এই, কিছু সংখ্যক গুণী চিত্র পরিচালক আজ অবসরযাপন করছেন। শিল্পসম্মত, এক্সপেরিমেণ্টাল ছবি তৈরির ক্ষমতা তাঁদের আছে। কিন্তু তাঁদের পৃষ্ঠপোষক নেই। এক দল চিত্র-ব্যবসায়ী এর উত্তরে হয়ত বলবেন, আমরা ছবি তৈরি করি পয়সার জন্য। কিন্তু ফরমুলার হাত দিয়েই কি তাঁরা লাভবান হন? ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন-এর যে ঢেউ এসেছে তা তো অস্বীকার করা যায় না।

আবার এ কথাও বলি, নতুন স্বাধীনচেতা চলচ্চিত্রকারদের যে একেবারেই সুযোগ দেওয়া হয়নি তা নয়। তাঁদের কেউ কেউ এই সুযোগের অপব্যবহার করেছেন। নিষ্ঠা এবং বুদ্ধির অভাবও কেউ কেউ দেখিয়েছেন। তাঁদের হাতে ছবি তৈরির ভার তুলে দিয়ে চিত্রব্যবসায়ী বা প্রযোজক কেন বারবার ঠকবেন না সে দাবি একমাত্র অদৃষ্টের পক্ষেই সম্ভব। এবং "পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী" এই শ্রেণীর পরিচালকের জন্য আর সব শিল্পস্রষ্টাদেরও অনেক সময় দুর্ভোগ ভুগতে হয়। বাংলা ছবির সমস্যা যে অসংখ্য তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। যা নিয়ে আলোচনা করা গেল তার বাইরেও অনেক কিছু ভাববার আছে। এখন শুধু প্রয়োজন, আশঙ্কার বীজগুলোকে খুঁজে বের করা। কী-ভাবে সেগুলি নির্মূল করা যায় সে পথ চলচ্চিত্রসেবীরাই ভাল বলতে পারবেন। এর জন্য সর্বাগ্রে চাই সংস্কারমুক্ত মন এবং উদার দৃষ্টিভংগী।

উত্তমকুমার ফিল্মস-এর "গৃহদাহ" (পরিচালনা : সুবোধ মিত্র) ছবিতে পাহাড়ী সান্যাল (কেদারবাবু) ও সুচিত্রা সেন (অচলা)

ছবির পর ছবি

আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনী অবলম্বনে রাধারানী পিকচার্স-এর "বালুচরী" তৈরি হচ্ছে। পরিচালনায় রয়েছেন অজিত গাংগুলী। গত সপ্তাহে রাজেন সরকারের সংগীত পরিচালনায় ছবির দুটি গান রেকর্ড করা হয়। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গানে কণ্ঠদান করেন শ্যামল মিত্র ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। ছবিতে অভিনয়ের জন্য এ পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, অনুপকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, রেণুকা রায়, জহর রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গংগাপদ বসু ও হরিধন মুখোপাধ্যায়।

বালুচরী

ইকনমিক প্রোডাকশন্স-এর দ্বিতীয় নিবেদন "পরিশোধ"-এর শুটিং নির্বিঘ্নে চলছে। সম্প্রতি পরিচালক অর্ধেন্দু সেন মাইথনে ছবির কিছু বহির্দৃশ্য গ্রহণ করেন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। এঁরা নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছেন। ছবির কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে রয়েছেন তরুণকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনন্দা চৌধুরী, জহর রায় প্রভৃতি। বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি তৈরি হচ্ছে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সংগীত পরিচালক।

পরিশোধ

"রক্তরেখা"-র শুটিং প্রায় শেষ। পরিচালক উমাপ্রসাদ মৈত্র ইতিমধ্যে দার্জিলিঙে ছবির নায়ক-নায়িকা বিজয়া চৌধুরী (বোম্বাই) ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে কিছু আউটডোর দৃশ্য গ্রহণ করেছেন। ললিতা চ্যাটার্জি, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, দ্বিজু ভাওয়াল, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি ছবির অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পী। নচিকেতা ঘোষ সুরকার।

রক্তরেখা

স্ট্রীট সিংগার

নাম "স্ট্রীট সিংগার" হলেও এই হিন্দী ছবির নায়ককে খুব বেশীকাল রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গান করতে হয়নি। ছবি শুরু হবার কিছুক্ষণ পরেই আওয়ারা ও পিতৃ-পরিচয়হীন নায়ক এক ধনী কন্যার সুনজরে পড়ে। তারপর সে অপর এক শেঠের পুত্রপ্রতিম হয়ে ওঠে। কেমন করে তার ভাগ্য পরিবর্তন হয় ও কী-ভাবে সে একজন নাম-করা গায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায় এবং তার চরিত্রের রূপান্তর ঘটে ও জীবনে প্রেম আসে তা বিস্তৃতভাবেই দেখানো হয়েছে। পরের ঘটনা মধ্যাহ্ন প্রেমের। নায়িকার বাবা নায়কের পূর্ব পরিচয় জানতেন। তাই তিনি তার কন্যার পাণিপ্রার্থীকে কটু ভাষায় গালি দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেন। ওই মুহূর্তেই ছবির ইণ্টারভ্যাল।

ইণ্টারভ্যালের দৃশ্যটি সত্যিই চমৎকার। সিঁড়ি দিয়ে নায়ক নামছে, নায়িকাও সিঁড়ির মাথায় এগিয়ে এসেছে। ফ্রিজ শটে দেখানো হয়েছে দৃশ্যটি ভেঙে দুভাগ, দুজন দু' দিকে চিত্রার্পিত। তাদের পৃথিবী যেন ভেঙে চুরমার।

উঁচুদরের ছবিতেও এমন দৃশ্য কল্পনা কম দেখা যায়। প্রযোজক পরিচালক-কাহিনীকার চন্দ্রশেখর ছবির আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে পরিচালনার বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন।

প্রয়োগের কোন গুণই বুঝি কাজে লাগল না। কারণ বিরতির ওই সুন্দর দৃশ্যের পর ছবিতে একের পর এক যা ঘটেছে তা সবই গতানুগতিক। কর্মজীবনে নায়কের অসাধারণ উন্নতির পর নায়িকার বাবা অবশ্য তার হাতে কন্যা সম্প্রদানে প্রবল আগ্রহই বোধ করেছেন। কিন্তু নায়কের বিধি বাম। দুষ্টদমন করতে গিয়ে নায়ক ছোরার আঘাতে আহত হয়, তারপর বাক্‌শক্তি হারায়। শেষ পর্যন্ত নায়িকার চেষ্টাতেই যে সে বাক্‌শক্তি ফিরে পেয়েছে তা বলা নিষ্প্রয়োজন। উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে নায়িকাকে নিচে ঝাঁপ দিতে উদ্যত দেখে নায়কের কণ্ঠ আর রুদ্ধ থাকতে পারেনি।

নাচ-গানের আতিশয্য ও অর্থহীন দৃশ্য ছবিতে অনেক আছে। অবাস্তব ব্যাপারের তো শেষ নেই। তার উপর আছে মানবতার বাণী—যা কাহিনীতে গোড়া থেকেই আরোপিত। এতসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ছবিটি দেখতে বেশ ভালই লাগে। সুপরিচালনার গুণে ছবিটি খুবই গতি-সম্পন্ন। চিত্রনির্মাতা চন্দ্রশেখর সেজেছেন

ধরমদেব কাশ্যপ পরিচালিত "দুলহন এক রাত কী" চিত্রে নূতন—এ সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে

দেশে নবাগতা সরিতাও সু-অভিনয় করেছেন। আগা একটি ভিন্নধর্মী চরিত্রে ভাল অভিনয় করেছেন। তাঁর কৌতুক পরিবেশন অবশ্যই আছে।

সুরজ সুরারোপিত ছবির একাধিক গান 'হিট' করবে।

নেপথ্যে

অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর চলচ্চিত্রমহলে নানারকম জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেছে। ইদানীং যে কয়টি

ছিল একটি। সে হল; অজয়-মন্ত্রিসভা। এবং এই মন্ত্রিসভার আমলে ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির কী গতি হবে সেটা অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। চিত্রপ্রযোজকরা মনে করেন, তাঁদের কিছু কিছু অভাব-অভিযোগ হয়ত এবার দূর হবে। যাঁরা শুধুই চিত্র-প্রযোজনা করেন, এবং অন্য কোন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, সরকার-সমীপে এবার আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে। প্রযোজকদের দুঃখ-দুর্দশা বর্তমান সরকার নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন, এটাই তাঁদের আশা।

স্ট্রীট সিংগার-নির্মাতা চন্দ্রশেখর গত

চন্দ্রশেখর দক্ষিণ ভারতীয়, তেলুগু তাঁর মাতৃভাষা। হায়দরাবাদে তাঁর ছোটবেলা কেটেছে। তাই তেলুগুর চেয়ে উর্দু তিনি বেশী ভাল বলতে পারেন। সিনেমায় অভিনয় করছেন তেইশ বছর ধরে। চার বছর আগে তিনি ব্রিটেন থেকে নাচের ডিপ্লোমা নিয়ে ফিরেছেন। তিনি বলরুমে নাচের ডিপ্লোমা পেয়েছেন। কথায় কথায়

প্রযোজক আর ডি বনসাল তাঁর পুত্র কমলের বিবাহ উপলক্ষে গত সপ্তাহে এক প্রীতিসম্মেলনের আয়োজন করেন; চলচ্চিত্রলোকের বহু শিল্পী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে যোগ দেন—ছবিতে (বাঁদিক থেকে) রুমা গুহঠাকুরতা, কানন দেবী, কমল, তনুজা ও নববধূ সরোজকে দেখা যাচ্ছে

চন্দ্রশেখর বললেন, হিন্দী ছবিতে যে-সব বিলিতী নাচ দেখানো হয় সেগুলি ভেজাল। আসল বিলিতি নাচ অন্যরকম। "স্ট্রীট সিংগার" তাঁর দ্বিতীয় ছবি, প্রথমটি ছিল "চা চা চা"। তিন নম্বর ছবি হবে "ড্যান্স বেবি ড্যান্স"। অল্প খরচের আমুদে ছবি তৈরি করাই তাঁর উদ্দেশ্য। চন্দ্রশেখর বললেন, আমার ছবিগুলির নাম ইংরেজীতে হলেও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ এ-দেশের। কলকাতার চন্দ্রশেখরের "ফ্যান" অনেক। তাঁদের অধিকাংশ সেই সব তরুণ-তরুণী যাঁরা হোটেলে নাচতে ও নাচ দেখতে ভালবাসেন। দুজন ফ্যানকে সেদিন চন্দ্রশেখরের ঘরে দেখলাম। প্রেস কনফারেন্সের সময় এক কোনায় চুপচাপ বসেছিলেন। ও'রা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তরুণী।

বিবি ঔর মকান পার্টিতে কথা হল পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি মনে কোন দ্বিধা না রেখেই আমাকে বললেন, "অনুপমা" আমার শ্রেষ্ঠ ছবি। হৃষীবাবু নিজেই 'অনুপমা'-র কাহিনীকার। "অনুপমা" নায়কের লেখা একটি নভেলের নাম। ধর্মেন্দ্র ও শর্মিলা ঠাকুর নায়ক-নায়িকা। হৃষীবাবু আরও বললেন, শর্মিলাকে একটা নতুন 'ইমেজ'-এ ছবিতে দেখাবার চেষ্টা করেছি। পার্টিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। সদালাপী শিল্পী সকলকে অভ্যর্থনা জানালেন। ছবির নায়ক-নায়িকাদের কেউ কলকাতায় আসেননি। তবু পার্টিতে গ্ল্যামারের অভাব হয়নি। তনুজা, সুমিতা সান্যাল, বিদ্যা রাও, ভারতী রায় প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। বিদ্যা রাওকে ছবিতে যত না দেখি তার চেয়ে বেশী দেখি চলচ্চিত্রলোকের নানা অনুষ্ঠানে। দক্ষিণ ভারতের এই শিল্পী একটি বাংলা ছবিতে বেশ ভালই অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁকে ছবিতে কম দেখি কেন? সুমিতা সান্যালের সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁরা তাঁকে 'মঞ্জু' বলেই ডাকেন। অনেকে আবার সর্বজনপরিচিত নামে কাউকে ডাকা বুঝি পছন্দ করেন না। তাই প্রায়ই তাঁদের মুখে সুচিত্রা সেনের বদলে রমা, সুপ্রিয়ার পরিবর্তে বেণু, তরুণকুমারের জায়গায় বুড়ো, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে পুলু, অরুন্ধতীর বদলে নুকু ইত্যাদি শোনা যায়। যাঁরা সত্যজিৎ রায়ের ঘনিষ্ঠ তাঁরা বরাবর মানিকবাবু অথবা মানিকদাই বলেন। শশী কাপুরকেও 'মানিকদা' বলতে শুনেছি। একজন বলছিলেন, যাঁরা "প্রোগ্রেসিভ" মনোভাবাপন্ন তাঁরা কিছুতেই সত্যজিৎবাবু বলবেন না, বলবেন মানিকদা। অগ্রদূতের বিভূতি লাহা এবং অগ্রগামীর সরোজ দে কিন্তু তাঁদের ডাকনামেই পরিচিত—যথাক্রমে খোকাবাবু ও কালুবাবু। অল্প বয়সে বিভূতিবাবু যখন সিনেমায় কাজ শুরু করেন তখন কোন প্রবীণ ব্যক্তি নাকি তাঁকে 'খোকা' বলে ডাকতে শুরু করেন। সেই থেকেই বিভূতিবাবু খোকাবাবু হয়ে গেলেন।

নামপর্ব ছেড়ে এবার পার্টির কথায় আসি। 'বিবি ঔর মকান' যত মজার ছবিই হোক না কেন, পার্টিতে সবাই কিন্তু ছিলেন বেশ "সীরিয়স"। প্রয়োজনের বেশী কথা কিংবা হাসি-ঠাট্টা ছিল না বললেই হয়। বেশী গম্ভীর ছিলেন তনুজা। অনেকবারই দেখেছি, এক জায়গায় চুপচাপ বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন।

ওস্তাদ আলী আকবরের বিদেশ সফর

"সংগীতের শিক্ষককে আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রীরা গভীর শ্রদ্ধা করেন। তাঁদের সংগীত শিক্ষার আগ্রহই এতে প্রকাশ পায়। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও দিনের পর দিন বাড়ছে।" বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে এক সাংবাদিক বৈঠকে ওস্তাদ আলী আকবর খান এই কথা বলেন। আমেরিকান সোসায়েটি ফর ইস্টার্ন আর্টস-এর "সামার স্কুলে" শিক্ষকতার জন্য পর পর দু' বছর আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ওস্তাদ আলী আকবর খান। ১৯৬৬ সালে আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সামার স্কুলে ৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর ক্লাস নেন। সরোদ, সেতার ও বীণা এবং কণ্ঠসংগীত—এইসব বিভাগেরই তিনি শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ শ্রীমতী বালাসরস্বতীর কাছে ভরতনাট্যমে দীক্ষা নিয়েছেন। তবলা শেখাবার ভার নিয়েছিলেন পণ্ডিত মহাপুরুষ মিশ্র।

এ বছরেও (জুন থেকে নভেম্বর) সামার স্কুলে বাজনা শেখাবার জন্য ওস্তাদ আলী আকবর খান আমেরিকা রওনা হবেন। "এবার আর একা নয়, আশিস ও নিখিলকেও সঙ্গে নিতে হবে," তিনি সংবাদিকদের বলেন। কারণ, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে। ক্লাস-রুম এবং কার্যসূচীর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সংগীতে যাঁরা বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেছেন এবং যাঁরা সবে শেখা আরম্ভ করেছেন তাঁদের জন্য পৃথক ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। ফ্লোরে খালি পায়ে নিস্তব্ধ আসনে ও'রা বসেন। উপরের ক্লাসে সকাল থেকে

অধিক রাত্রি পর্যন্ত ১৫টি রাগ শেখানো হয়। তা ছাড়া সংগীত সম্পর্কে আলোচনা এবং 'থিয়োরেটিক্যাল' ক্লাসেরও ব্যবস্থা

বার্কলে (ক্যালিফোর্নিয়া) সাদার স্কুলে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সংগীত শিক্ষা দিচ্ছেন ওস্তাদ আলী আকবর খান (পিছনে)

আছে। ক্লাস-রুমে ছাত্র-ছাত্রীরা খালি পায়ে এসে ফ্লোরে নিজেদের আসনে বসেন। বসে বাজাবার সুবিধার জন্য অনেকেই পায়জামা পাঞ্জাবি পরে আসেন।

বিদেশে থাকাকালে ওস্তাদ আলী আকবর খানকে টেলিভিশনের জন্য বহুবারই বাজাতে হয়। তা ছাড়া বিভিন্ন সংস্থা, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির আহ্বানে আমেরিকা ও ইয়োরোপের নানা জায়গায় অসংখ্য সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশন করতে হয়। সর্বত্রই ভারতীয় সংগীতের প্রতি শ্রোতাদের অনুরাগ তিনি লক্ষ করেছেন। ১৯৬৬ সনের ১০ জুলাই তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন। প্রথমে যান সিঙ্গাপুরে। সেখানে টেলিভিশন ও রেডিও প্রোগ্রাম সহ তিন দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি সরোদ বাজান। তাঁর সঙ্গে তবলায় শ্রীমিশ্র এবং তাম্বুরায় রাজদুলারী খান সহযোগিতা করেন। সেখান থেকেই শিল্পীর বিশ্ব-পরিক্রমা শুরু হয়। আমেরিকা ও ইয়োরোপের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর বাজনা ও শিক্ষকতার প্রশংসা করা হয়। শিল্পীর একটি অনুষ্ঠান সম্পর্কে "নিউ ইয়র্কার" পত্রিকার সংগীত সমালোচক বলেন

"I have heard and admired the playing of Indian musicians both here and in India but I have never before encountered quite the degree of virtuosity that was displayed by Ali Akbar".

শোক সংবাদ

বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত অনাদিনাথ বসুর সহধর্মিণী এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্রসেবী ও ফিল্ম ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার ভূত-পূর্ব সভাপতি শ্রী অজিত বসুর জননী শ্রীমতী প্রফুল্লনলিনী দেবী গত ৪ মার্চ কলকাতায় ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি অপর দুই পুত্র বিখ্যাত চিকিৎসক শ্রীঅমল বসু ও চিত্রপ্রযোজক শ্রীঅরুণ বসু এবং দুই কন্যা রেখে যান। বৃহস্পতিবার (১৫ মার্চ) তাঁর পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি

আমেরিকার তিনটি নির্বাক চিত্র (গার্ডেন অব ইডেন, হানচব্যাক অব নতারদাম এবং দি জেনারেল) দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি। ২০ মার্চ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে ছবি-গুলি দেখানো হবে। প্রাচী সিনেমায় ২৪ মার্চ সোসায়েটি দেখাবেন চেক ছবি "লেমনেড জো" এবং ২৭ ও ২৮ মার্চ অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হবে হাঙ্গেরির ছবি "কারেণ্ট" এবং "স্কাইলার্ক"।

অরণ্যদেব লী ফক

খুলি-পাহাড়ে অরণ্যদেবের গুহার কাছে ব্যাঙ্ক-ডাকাতের দল ...
এবারে কোথায় যাব ম্যাক?
গাড়ির কাছে ফিরে যাব। তারপর দিন কয়েক কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকব। তারপর সুযোগ-মত এখানে ফিরে এসে লুকোনো-মাল নিয়ে যাব।
ওই গুহা দেখেই জায়গাটা চিনে নিতে পারব আমরা।

ব্যাপার কী-ম্যাক?
আমার কোটটা ভুলে ফেলে এসেছি!

তাড়াতাড়ি চলে এলাম। তাড়াহুড়োর মধ্যে কোটটা নিয়ে আসা হয়নি।
তাতে হয়েছেটা কী! ভারী তো একটা কোট। ছোঃ!

আরে ওই কোটের পকেটে আমার ড্রাইভারি লাইসেন্স রয়েছে! ওটা কারও হাতে পড়লে তো আমি মারা পড়ব!

তা ছাড়া কোটের কাছে আলগা-মাটি দেখে যদি কারও সন্দেহ হয়! কার্ল, চল যাই, কোটটা নিয়ে আসাই ভাল —
তোমরা গাড়িতে বসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো।
তা করব। কিন্তু তোমরা আবার সিংহের পেটে যেও না।
10/2

রাজা, ওরা হয়ত এখানে কাউকে কবর দিয়েছে।
ওও হতে পারে টমটম। ব্যাপারটা তাহলে
জানাব।
* অরণ্যদেবকে রাজা বলে

আরে মাটির নীচে একটা বাক্স!
নিশ্চয়ই গুপ্তধন!

কে জানে, এর মধ্যে হয়ত অনেক মণিমুক্তো সোনাদানা আছে।
তা থাকতেই তো পারে।

আরে!
এ তো শুধুই কাগজের তাড়া!

সাপ্তাহিক সংবাদ

কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচন এই সপ্তাহের বিশেষভাবে আলোচ্য বিষয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সর্বসম্মতিক্রমে আবার কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। শ্রীমোরারজী দেশাই তাঁর নাম প্রস্তাব করেন এবং শ্রীজগজ্জীবন রাম প্রস্তাব সমর্থন করেন। কংগ্রেস সভাপতি শ্রী কামরাজ বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন। কংগ্রেস সংসদীয় দলের ৪৩৩ জন সদস্য অদ্যকার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে নতুন সরকার গঠন এবং নতুন মন্ত্রিসভায় নিয়োগের জন্য সদস্যদের নাম সুপারিশ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৩ মারচ রাষ্ট্রপতির কাছে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নামের তালিকা পেশ করবেন বলে জানা গিয়েছে। আগামী ১৪ মারচ নতুন মন্ত্রিসভা শপথ-গ্রহণ করবেন। শ্রীমোরারজী দেশাই ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের মধ্যে কয়েকদিন যাবৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। নির্বাচন শেষে শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, খাদ্য ও মূল্যবৃদ্ধিই তাঁর নতুন সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা। এ দুটির মোকাবিলা করাই হবে তাঁদের প্রথম ও প্রধান কাজ।

দেশী সংবাদ—

৬ মারচ—বিরোধী এম পি ও রাজস্থানের এম এল এ-দের এক প্রতিনিধি-দল আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতির হাতে এক স্মারকলিপি দেন। ওই স্মারকলিপিতে রাজ্যের সংযুক্ত দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান না করায় রাজস্থানের রাজ্যপালের সমালোচনা করা হয়।

উত্তর বোমবাই পূর্ব নির্বাচন কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত লোকসভার সদস্য শ্রী এস জি বারভে আজ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় মারা গিয়েছেন।

শ্রী বারভে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের এক উত্তেজনাপূর্ণ নির্বাচনে প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেননকে পরাজিত করেছিলেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস হতে বিদায় নিয়ে বারভে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং মহারাষ্ট্র মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হন। মৃত্যুকালে তাঁর ৫৩ বৎসর বয়স হয়েছিল।

৭ মারচ—পুলিস আজ বিকালে জয়পুরে জহুরি বাজারে এক জনতার উপর গুলি চালালে ছয়জন নিহত হয়েছে। একজন সরকারী মুখপাত্র বলেন, শহরের কয়েকটি অংশ থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের তিন ঘণ্টা পর এই ঘটনা ঘটে। সেনাদল শহরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। শহরে ২৪ ঘণ্টার জন্য কারফু জারি করা হয়েছে।

৮ মারচ—আজ পশ্চিমবঙ্গের নবনির্বাচিত বিধানসভার প্রথম অধিবেশনের দিনে ৩৬ বছরের ওই ভবনের ভিতরে-বাইরে জন-উৎসাহের যে জোয়ার জাগে তাতে এক ইতিহাস সৃষ্টি হলো। অদম্য উৎসাহ ও কৌতূহল সত্ত্বেও তাঁদের সংযমের সীমা কদাচিৎ লঙ্ঘিত হয়েছে।

১৫ জন সদস্যযুক্ত উড়িষ্যা কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা আজ অপরাহ্নে রাজভবনে শপথ গ্রহণ করেন। উড়িষ্যায় এই প্রথম অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হলো। রাজ্যপাল স্বতন্ত্র দলের নেতা রাজেন্দ্রনারায়ণ সিং দেও-র নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করান।

৯ মারচ—খাদ্যশস্য সমেত নিত্যব্যবহার্য পণ্যগুলির অগ্নিমূল্য ও প্রশাসনিক দুর্নীতির দরুন জনসাধারণের ব্যাপক অসন্তোষ আর দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বই নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের কারণ বলে প্রায় সব প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিই মনে করেন।

১০ মারচ—এস এস পি দলের শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র আজ রাজভবনে রাজ্যপালের নিকট পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার নতুন সদস্য হিসাবে মন্ত্রগুপ্তি ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন।

তিনি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প, পশুপালন ও মৎস্য দফতরের ভারপ্রাপ্ত হয়েছেন। অবিভক্ত বঙ্গের কংগ্রেস নেতা স্বর্গীয় পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের সুযোগ্য পুত্র শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র কলকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী। পি এস পি প্রার্থী হিসাবে তিনি ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় প্রথম নির্বাচিত হন। বিধানসভায় সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ আলোচনায় যাদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁদের মধ্যে শ্রী মৈত্র অন্যতম। বিভিন্ন শ্রমিক ও কর্মী ইউনিয়নের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট।

১১ মারচ—ভুপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা দেওয়ার আশায় কলকাতার ৩ হাজার ছাত্র প্রতারিত হয়েছে। আজ বড়বাজার, জোড়াবাগান ও জোড়াসাঁকো এলাকায় ১৩টি কোচিং ইনসটিটিউশনে তল্লাসী চালিয়ে পুলিস এই প্রতারণার রহস্য উদ্‌ঘাটন করে।

১২ মারচ—পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যনীতি সম্পর্কে যুক্ত ফ্রন্ট কমিটির পক্ষে আজও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলেও মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মুখোপাধ্যায় এবং খাদ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ বৈঠকে উপস্থিত থাকতে না পারায় খাদ্যনীতিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া যায়নি।

বিদেশী সংবাদ

৬ মারচ—ইরানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ গোলাম মহম্মদ মোসাদেক ৮৮ বছর বয়সে গতকাল পরলোকগমন করেন। ডঃ মোসাদেক ইরানের এক অভিজাত পরিবারের সন্তান হলেও বিপ্লবী রাজনীতির পথ বেছে নেন। এর জন্য তাঁকে বার বার কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। ১৯৫১ সালে মোসাদেক প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে শাহের সঙ্গে বিরোধের ফলে ডাঃ মোসাদেক ক্ষমতাচ্যুত ও বন্দী হন। দেশদ্রোহিতার দায়ে তাঁর তিন বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল। মুক্তিলাভের পরে তাঁকে এক গ্রামে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল।

৭ মারচ—ইনদোনেশিয়ার সমর নেতা জেনারেল সুহারতো আজ গণ-কংগ্রেসের নতুন অধিবেশনে ঘোষণা করেন, যে সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তাতে বোঝা যায় প্রেসিডেনট সুকারন ১৯৬৫ সালের ব্যর্থ কমিউনিসট অভ্যুত্থানের নেপথ্য নায়ক ছিলেন না। তবে তিনি সবই জানতেন। বুঝেছিলেন এর ফলে সারা দেশে রক্তবন্যা বয়ে যাবে।

৮ মারচ—সোভিয়েট আরমেনিয়ার দুজন মহিলা জ্যোতির্বিজ্ঞানী একটি অতিকায় বিস্ফারিত তারকা আবিষ্কার করেছেন বলে ইজভেসতিয়া আজ জানান। সংবাদে আরও বলা হয়েছে : গত মাসে বাইউরাকান মানমন্দির (ককেশাস পর্বতে অবস্থিত) থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদ্বয় নতুন তারকাটির ছবি তুলেছেন।

৯ মারচ—মধ্য জাভায় এক প্রচণ্ড সংঘর্ষে ৮০ জন কম্যুনিসট নিহত হবার পর জেনারেল সুহারতোর অনুগত দুই ব্যাটেলিয়ন ঝানু সৈন্য (প্যারা কমাণ্ডো) পাঠানো হয়েছে। এই সংঘর্ষে কিছু সংখ্যক সৈন্যও নিহত হয়েছে বলে প্রকাশ।

১০ মারচ—পরলোকগত সোভিয়েট নেতা শ্রীজোসেফ স্টালিনের কন্যা শ্রীমতী স্বেতলানা স্টালিন ভারতের মারকিন দূতাবাসের মাধ্যমে পশ্চিমে চলে গিয়েছেন। শ্রীমতী স্টালিনকে বিমানে করে ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং তিনি বর্তমানে রোমে আছেন বলে শোনা যায়।

১১ মারচ—প্রেসিডেনট সুকারনকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল সুহার্তোকে প্রেসিডেনট পদের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করতে ইনদোনেশিয়ার সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক সংস্থা গণউপদেষ্টা কংগ্রেসের একটি বিশেষ কমিটি আজ সুপারিশ করেছে।

১২ মারচ—সমরনায়ক জেনারেল সুহারতো আজ ইনদোনেশিয়ার অস্থায়ী প্রেসিডেনট হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

জেনারেল সুহারতোর শপথ গ্রহণের আগে কংগ্রেসের সচিব লেঃ করনেল আবদুল কাদের বেসার কংগ্রেসের প্রস্তাব পাঠ করেন। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে : প্রেসিডেনট সুকারন তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, সংবিধান অনুযায়ী কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করা তাঁর কর্তব্য ছিল কিন্তু তিনি তা করতে পারেননি। সেজন্য কংগ্রেস তাঁকে প্রদত্ত সমস্ত ক্ষমতা প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন।
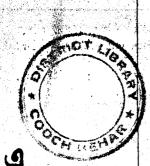
এ বছরের সব চেয়ে ভাল বই

মিত্র ও ঘোষ

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অমৃত সমান ৪৷৷

প্রমথনাথ বিশীর

বঙ্কিম সরণী ১০৲

"কর্মীরা সংসারের পথে ভারী পায়ের ছাপ ফেলে যায়, যোদ্ধাদের ফৌজী জুতোর ছাপ তুলু পদ-চিহ্নের চেয়ে গভীর; এসব মুছলে ওঠে না। এইসব ছাপের লৌকিক নাম ইতিহাস। কবি ও ভাবুকদের পায়ের ছাপ আলগোছে পড়ে, সব সময় চোখে পড়তে চায় না, সযত্নে রক্ষা করতে গেলে অপটু হস্তক্ষেপের বিড়ম্বনায় অনেক সময় মুছে যায়। এই আলতো পায়ের ছাপগুলি তাঁদের রচনা ও চিন্তা। প্রত্যেক সাহিত্যিক সংসারের পথে পদাবলী গেঁথে চলে যান। সেগুলি অনুসরণ করলে লেখকদের গতিপ্রকৃতি ও লক্ষ্য বুঝতে পারা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের এই পদাবলী জানার নামই বঙ্কিম সরণী। কবিরে মিলিবে কবির জীবন চরিতে, যদি সে জীবনচরিত কবির জীবনী হয়। বিশেষ স্বয়ং কবি কর্তৃক যদি রচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী এমনি একখানা জীবনচরিত।...বঙ্কিম-চন্দ্রের মতে, কাব্যকে জানা উত্তম, কবিকে জানা অধিকতর উত্তম। বঙ্কিমচন্দ্রের মন বা কল্পনা, প্রবন্ধাদি ও উপন্যাসে তিনে এক; তিন একসূত্রে স্থাপিত করে দেখতে পারলে তবেই বঙ্কিমচন্দ্রকে যথার্থ করে দেখা। এই সূত্রটির নাম বঙ্কিমসরণী।"

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নূতনতম উপন্যাস

নগরপারে রূপনগর ১৬৲

"—অথচ বদলাবার কথা। শুধু কলকাতার নয় সমস্ত দেশের। কারণ, বহু কালের বহু যুগের বহু সহস্র দিন থেকে এই দিনটার অনেক তফাৎ। ঘড়ির নির্ভুল হিসেব ধরলে ঠিক এই দিনটার নয়, পরের দিনটার। যে দিন রাত বারোটায় শুরু হবে। কিন্তু ভাবের দিক থেকে আজকের এই দিনটার সঙ্গেই এক বিশেষ লগ্নের যোগ। আর এক দিন নয়, আজই—আজই রাত বারোটার পর।...বহু প্রত্যাশার এক বিপুল আলো দপ করে জ্বলে উঠবে। সেই আলোর বন্যায় গোটা দেশ ভেসে যাবে। দু'শ' বছরের জমাট বাঁধা অন্ধকার খান খান হয়ে ইতিহাসের পাতায় মিলিয়ে যাবে। পলাশীর পাপের কাল শেষ হবে।...এই দিনে এই সন্ধ্যায় হঠাৎ একটি হারানো হৃদয় খুঁজে পেয়েছেন জ্যোতিরাণীও। সেই হৃদয় তাঁর নিজেরই।"

জ্যোতিরাণী বাংলা সাহিত্যের এক আশ্চর্য নারী চরিত্র।

আশাপূর্ণা দেবীর রবীন্দ্র পুরস্কার বিজয়ী গ্রন্থের নায়িকার কন্যার কাহিনী
নবতম উপন্যাস

সুবর্ণলতা ৯৲

"একাল-সেকাল নিয়ে তর্ক তো চিরকালের, কিন্তু কেমন করে চিহ্নিত করা যায় সেই 'কাল'কে? এক-একটা কালের আয়ু শেষ হলেই কি এক-একটা যবনিকা পড়ে? যেমন যবনিকা পড়ে নাট্যমঞ্চে?—না, যবনিকার অবকাশ কোথায়? অবিচ্ছিন্ন সেই স্রোত। শুধু 'একাল সেকাল, এ যুগ সে যুগ' বলে অভিহিত করা হয়। সমাজ মানুষের রীতিনীতি চালচলন, এরাই ধরে রাখে কালের এক একটা ইতিহাস—নাম দেয় 'অমুক যুগ তমুক যুগ'।...কিন্তু কালকেও অতিক্রম করতেও থাকে বৈকি কেউ কেউ নইলে কারা এগিয়ে দেবে এই প্রবহমান ধারাকে? সে ধারা মাঝে-মাঝেই স্তিমিত হয়ে যায়, নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়। তবু এরা বর্তমানের কাছে লাঞ্ছনা পায়, এরা লাঞ্ছিত হয় উপহসিত হয়, বিরক্তিভাজন হয়। এদের জন্য কাঁটার মুকুট। এদের জন্য ভর্ৎসনার মালা।—" সুবর্ণলতা এদেরই একজন!

অ-কৃ-ব'র নবতম উপন্যাস

ম্যারিনা ক্যান্টিন ১০৲

নূতন এক জগতের কাহিনী—নূতন মানুষের নূতন গল্প

দক্ষিণারঞ্জন বসুর

এক আকাশে অনেক তারা ৬৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীগোপাল দে

আপনার
দায়িত্ব যে হারে
বাড়ে
সঞ্চয়ের
প্রয়োজনীয়তাও
বেড়ে চলে
সেই হারে

জনসন*

প্রিক্‌লি হীট সাবান এবং পাউডার
দুটি ২ ভাবে কাজ ক'রে দ্রুত আরাম দেয়

ঘামের গ্রন্থিগুলোর মুখ বুজে যখন প্রদাহের সৃষ্টি হয় তখনি দেখা দেয় ঘামাচি। ঘামাচির এই মূল কারণের প্রতীকার করতে হলে চাই জনসন্স প্রিক্‌লি হীট সাবান। মৃদু ঔষধযুক্ত জনসন্স প্রিক্‌লি হীট সাবানের স্নিগ্ধ ফেনা ভেতরে ঢুকে ঘামের গ্রন্থিগুলোর মুখ পরিষ্কার করে দেয় ও প্রদাহ নিবারণ করে। জনসন্স প্রিক্‌লি হীট সাবানে আপনার গা জুড়িয়ে যাবে, শরীরটি ঝরঝরে লাগবে।

চামড়ার ওপরের প্রদাহ নিমেষে কমিয়ে দেয় জনসন্স প্রিক্‌লি হীট পাউডার। জনসন্স প্রিক্‌লি হীট পাউডার ঘাম শুষে নিতে অদ্বিতীয়। এর শোষণক্ষমতা খুব বেশী। এতে প্রদাহ মিলিয়ে যায়। দুঃসহ গ্রীষ্মের দিনেও আপনি তোফা আরাম পাবেন।

জনসন অ্যাণ্ড জনসন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড ৩০ ফর্জেট স্ট্রীট, বোম্বাই-২৬

*ট্রেডমার্ক

JJ 5777A

"বাবা দেখ, এই বইতে কি লিখেছে, ৬০×৫ নাকি ৩৫৪!"
"হ্যাঁ, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের
রেকারিং ডিপোজিট পরিকল্পনা অনুযায়ী তাই হয়।"

হ্যাঁ, এটা সত্য। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের রেকারিং ডিপোজিট পরিকল্পনা অনুযায়ী ৬০ মাস ধ'রে প্রতি মাসে যদি ৫ টাকা করে জমা দেওয়া যায় তাহলে সঞ্চয়ের পরিমাণ হয়ে দাঁড়াবে ৩৫৪ টাকা।

নিয়মিতভাবে সঞ্চয় করা কি রকম চমৎকার ফলদায়ক!

দেখুন কিভাবে বাড়ে

মাসিক কিস্তি	নির্দিষ্ট সময়ের পর মোট প্রাপ্য টাকা		
	৩৬ মাস পরে	৪৮ মাস পরে	৬০ মাস পরে
টাকা ৫	১৯৭	২৭১	৩৫৪
টাকা ২০	৭৯০	১০৮৪	১৪১৮
টাকা ৫০	১৯৭৫	২৭১০	৩৫৪৫
টাকা ১০০	৩৯৪৯	৫৪১৯	৭০৯০
টাকা ৫০০	১৯৭৪৫	২৭০৯৫	৩৫৪৫০

PR/PN/6632 BN-1

এই রকমভাবে সঞ্চয় করা যেমন সহজ তেমনি যথেষ্ট লাভজনক।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় যথা ৩৬, ৪৮ বা ৬০ মাসের জন্য প্রতি মাসে ৫ টাকা বা ৫ টাকার গুনিতকে সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়। নির্দিষ্ট সময়ের পর আপনি যে শুধু আপনার সঞ্চিত টাকা ফেরৎ পাবেন তাই নয়, সঙ্গে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদও পাবেন…ভবিষ্যতের সংস্থানের জন্য এটি একটি শ্রেষ্ঠ উপায়।

এবারে আপনার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী স্বপ্ন দেখতে পারেন আর সেই স্বপ্ন যে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

রেকারিং ডিপোজিট পরিকল্পনা

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্তী শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করুন

গাত্রবর্ণ নির্মল রাখতে হলে আপনার ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন

নিকো

পার্ক ডেভিস উৎপাদন

নিকো একটি পরীক্ষিত গুণসম্পন্ন আসল বীজাণু-নাশক সাবান। নিকো সাবান একই সঙ্গে তিন রকমের উপকার দেয়—পরিষ্কারক, বীজাণুনাশক, রক্ষাপ্রদ…আপনার ত্বক পরিষ্কার ও সুস্থ রাখে এবং ফুস্কুড়ি, মেচেতা ও অন্যান্য ছোটখাট ত্বকের রোগ থেকে আপনাকে মুক্ত রাখে। আর নিকো সাবান মেখে স্নান করলে ঘামাচির উপদ্রব থেকে একটা স্বস্তিদায়ক আরাম পাওয়া যায়।

নিকো-শ্যাম্পু হিসাবে
নিয়মিতভাবে শ্যাম্পু হিসাবে ব্যবহার করলে নিকো সাবানের বীজাণুনাশক ফেনা মরামাস বা মাথার খুস্কির একটি ভাল প্রতিষেধক… অন্যান্য ছোটখাট রোগ থেকেও মাথাকে মুক্ত রাখে।

নিকো-দুর্গন্ধনাশক হিসাবে
নিকো সাবান মেখে স্নান করলে গায়ের দুর্গন্ধ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। নিকো সাবান অন্যান্য সাধারণ সাবান ও দুর্গন্ধনাশকের মত নয় বলেই, দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী বীজাণুগুলিকে সার্থকভাবে হ্রাস করে আপনাকে স্নিগ্ধ ও নির্মল রাখতে সাহায্য করে।

প্রতিদিনেই—আপনার ত্বকের প্রয়োজনীয় যত্ন নিন…নিকো দিয়ে— পার্ক-ডেভিস উৎপাদন

HA&B b242c

প্রকাশিত হ'ল

প্রবন্ধ

সুকুমার সেন
অন্নদাশঙ্কর রায়
সরোজ আচার্য
সন্তোষকুমার ঘোষ
কালিদাস রায়

গল্প

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
আশাপূর্ণা দেবী
শিবরাম চক্রবর্তী
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
বিমল কর
বুদ্ধদেব গুহ
গৌরকিশোর ঘোষ
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ইন্দ্রমিত্র
পার্থ চট্টোপাধ্যায়
সুজাতা
বরেন গঙ্গোপাধ্যায়
দিব্যেন্দু পালিত
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
প্রফুল্ল রায়
অরুণ বাগচী
হিমানীশ গোস্বামী

কবিতা

দিনেশ দাস
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
পরমানন্দ সরস্বতী
আলোক সরকার
তারাপদ রায় প্রভৃতি

দোল পূর্ণিমায় **বার্ষিক সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৭৩**

....

নতুন কলমে নতুন স্বাদ

উদীয়মান কথাশিল্পী মতি নন্দীর

উপন্যাস

দ্বাদশ ব্যক্তি

... কেউয়ের মত দলের পিছনে ... করতেও পারবে না, শুধু খাটুনি ... বাঁচাতে বা ... আনবে না, সেই সাধারণ অতি-সাধারণ ...

দীপংকরের তথ্যনিবন্ধ

রাণী এলিজাবেথের প্রজা

... লেখা আজকের বিলেতে ... বিষয়ে সরস রচনা।

অমিতাভ চৌধুরীর দীর্ঘ রচনা

গি র মি টি য়া

... একটি উপেক্ষিত শ্রেণীর ওপর আলোকপাত।

সলিল ঘোষের

নবীর কাব্য

সুজাতা গুহর বড়গল্প

হলুদ বসন্ত

হলুদবসন্ত একটি পাখির নাম। এবং পাখির মত সুন্দর অথচ অসহায় একটি মেয়ে।

বিমল করের স্নিগ্ধ সরস বড়গল্প

কেমিস্ট্রি ও কালিদাস

আর এক ঈশ্বরের বিচার ঃ নাট্যালোচনা ঃ সূত্রধারকৃত

.............আনন্দমেলা.............

দাম ২·৫০

৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা

নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিনা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবার প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন কি পারবেন না এই সন্দেহ অনেকেরই ছিল। শ্রীমোরারজী দেশাই প্রথম দিকে বেশ অনমনীয় ছিলেন। শাস্ত্রীজীর পরলোকগমনের পর থেকে তিনি নিজের দাবি সম্পর্কে প্রায় স্থির এবং নিশ্চিত হয়ে আছেন। তবু গতবার, শাস্ত্রীজীর আকস্মিক মৃত্যুর পর, কংগ্রেসের কর্ণধারদের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরার সমর্থকদের গলা যেরকম উঁচু ছিল তাতে মোরারজীর পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ত বিড়ম্বনাই হত। এবারে অবস্থা কিছুটা অন্যরকম হয়ে পড়ে। মোরারজীও সহজে পথ ছেড়ে দেবেন বলে মনে হয়নি। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে তিনি মত পালটে নেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন না। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সর্বসম্মতিক্রমেই কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হবার পরই সকল কৌতূহলের অবসান হয়।

প্রধানমন্ত্রীরূপে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর যে নতুন মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করেছেন সেখানে মোরারজীর সহকারী প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীরূপে ঠাঁই হয়েছে। পরে এ রকমও জানা গেছে সহকারী প্রধানমন্ত্রী হলেও মোরারজীর হাতে বিশেষ কোনো ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ ইন্দিরা মন্ত্রিসভায় তাঁর দু নম্বর স্থান হয়েছে এই মাত্র, তার অতিরিক্ত কিছু নয়। তার চেয়েও বড় কথা—অনেকে এ-রকম অনুমান করছেন, কংগ্রেসের মধ্যে পুরোনো রক্তের তেজ এখন কমে এসেছে।

ইন্দিরা-মন্ত্রিসভার দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায় এবারে ঝরাপাতার সংখ্যা কম নয়, নতুন পাতাও বহু। অবশ্য '৬৭-র নির্বাচন অনেক সহজে পাতা ঝরিয়ে শ্রীমতী গান্ধীকে পরোক্ষে সাহায্যই করেছে; নয়ত অনুমান করি মন্ত্রিসভা গঠনে তাঁকে কিছুটা বিব্রতই হতে হত। মনে হয়, শ্রীমতী গান্ধী অনেকটা স্বস্তির সঙ্গেই তাঁর নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন।

নতুন মন্ত্রিসভার চেহারাটি কেমন দাঁড়িয়েছে আপাতত তার সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। শ্রীচাবন, সর্দার স্বর্ণ সিং, শ্রীচাগলা, শ্রীঅশোক মেটা, শ্রীজগজীবন রামের মতন পাকাপোক্ত মন্ত্রীরা যেমন আছেন, তেমনি আছেন বহু নবাগত। কাজ বিনা নবাগতদের সম্পর্কে ধারণা করে লাভ নেই। তবে গুজব এই যে, মন্ত্রী-নির্বাচনের ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামী এবং সহকর্মীদের সাহায্য যতটা নিয়েছেন, ততটা নাকি কংগ্রেসী কর্মকর্তাদের নয়। এ জন্যে কংগ্রেসমহলে নাকি একটা ক্ষোভের সঞ্চার ঘটেছে। এমন কি কংগ্রেস সভাপতির পরামর্শও তেমন কিছু নেওয়া হয়নি। এটা ভাল অথবা মন্দ হয়েছে কি না জানি না। তবে ডঃ ত্রিগুণা সেনের মতন যোগ্য ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের ভার দিতে দেখে যেমন কিছু আশা হয়, সেই রকম কোনো কোনো ক্ষেত্রে দপ্তর-বণ্টন প্রায় বিস্মিত করে। তবু, আশা করব এই নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা শ্রীমতী গান্ধীর উদ্দেশ্য সফলে সহায় হবে।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হবার পর শ্রীমতী গান্ধী যে সব বিবৃতি ও ভাষণ দিয়েছেন তার মধ্যে প্রধান হল, এবারের নির্বাচনের পর যেখানে যেখানে অকংগ্রেসী রাজ্যে সরকার গঠিত হয়েছে সেই রাজ্য সরকারদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্ক কি রকম হবে—তার আভাস। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, কেন্দ্র এঁদের সঙ্গে গঠনমূলক সব কাজেই সহযোগিতা করবেন, পরিবর্তে কেন্দ্রও অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারদের সহযোগিতা কামনা করেন। বক্তব্য হিসেবে এটি যথাযথ এবং সংগত। কিন্তু কেন্দ্র এবং অকংগ্রেসী রাজ্য সরকারদের মধ্যে এখনও কোনো কাজের পালা শুরু হয়নি; যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ উভয় পক্ষের 'দেওয়া-নেওয়া'র যথার্থ মনোভাব আমরা জানতে পারছি না। ইতিমধ্যেই রাজস্থানের ঘটনা অনেককে বিচলিত করেছে, যদিও তা দেওয়া-নেওয়ার পর্বে পৌঁছয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশেও দেখা গেছে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার ভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্বাধীনে থাকলেও জাতীয় প্রশাসনে বিশেষ কিছু ইতরবিশেষ হয় না; পরস্পর সহযোগিতায় দিব্য একটি দেশের সব রকম কাজই চলে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই ধরনের বোঝাপড়া ও সহযোগিতা নানাদিক থেকেই মূল্যবান ও নীতিসম্মত। যদি আমাদের রাজ্য সরকারগুলি জাতীয় স্বার্থ মনে রেখে এবং সমগ্র দেশের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, আর কেন্দ্রও কংগ্রেস অকংগ্রেস মন্ত্রিসভা সম্পর্কে কোনো রকম পক্ষপাত না দেখিয়ে দেশের ও জনসাধারণের স্বার্থ বিচার করে রাজ্য সরকারগুলির সহযোগিতা করেন, তবে আমাদের মঙ্গল বিনা অমঙ্গল হবার কথা নয়।
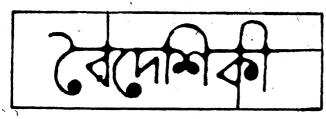
লর্ড ঘরানা !

আমাদের যেমন লোকসভা, রাজ্যসভা, ব্রিটেনের তেমন হাউস অব্ কমনস্, হাউস অব্ লর্ডস্। তফাত এই যে, হাউস অব্ লর্ডস্ বংশ-কুলীনদের আসর; লর্ডসের অধিকাংশ সদস্যই বংশ-গৌরবের উত্তরাধিকারী হিসেবে এ আসরে আসন পেয়ে থাকেন। আমাদের রাজ্যসভার সদস্য-দের তবু যা হোক পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হতে হয়; লর্ড ঘরানাদের সেটুকু পরোক্ষ জনসমর্থনও লাগে না' তাঁরা বেশীর ভাগ ডিউক, আর্ল, মার্কুইস, ভাইকাউন্ট, ব্যারন-পদবীগৌরবে বংশানুক্রমে হাউস অব লর্ডসে সমাসীন। ব্রিটেনের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের চূড়ায় প্রথম থাকে রাজবংশ, তার নিচেই বংশকুলীন লর্ড ঘরানারা।

গত সপ্তাহে হাউস অব কমন্সে একজন লেবার সদস্য একটি বিল এনেছিলেন এই বিলাতী বংশকুলীন ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার জন্য—একেবারে এক চোটে নয়, ক্রমে ক্রমে। এমরিস হিউয়েস কিছুটা বামপন্থী ঘেঁষা লেবার সদস্য; লর্ড ঘরানাদের আসর গুটিয়ে আনার প্রস্তাব করে বিল এনেছিলেন তিনিই। তিনি বলেন, প্রাচীন অভিজাত শ্রেণীর দিন ফুরিয়েছে, এ'দের এখন বিদায় দেওয়া উচিত। এমিরস হিউয়েস কারো মাথা কাটতে বলেন নি· তিনি বলেন, এখন থেকে আইন হোক, কোনও লর্ডের মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারীকে আর সে পদবী দেওয়া হবে না; এইভাবে ক্রমে ক্রমে ডিউক, আর্ল, মার্কুইস, ভাইকাউন্ট, ব্যারনদের পদবী লুপ্ত হবে, উপরন্তু নতুন করে লর্ড পদবী দেওয়ার প্রথাও নিষিদ্ধ করতে হবে।

এমিরস হিউয়েসের এই বিল হাউস অব কমন্স মঞ্জুর করেনি; লেবার সদস্যরাই না-মঞ্জুর করেছেন। লেবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রয় জেনকিন্স্ বলেন, এ বিল পাস করা হলে ব্রিটেনের পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা আগা-গোড়া পালটে যাবে; অতএব, মাননীয় কমনস্ সদস্যগণ, আপনারা এমন সর্বনাশ ডেকে আনবেন না! কাজেই লেবার, টোরী, লিবারেল সকলেই লর্ড ঘরানাদের পুরোনো কেল্লা রক্ষায় এমরিস হিউয়েসের "গণতন্ত্র-বিরোধী" (!) বিলখানি খতম করেছেন। আমাদের অবশ্য এ নিয়ে বেশী বিদ্রূপ করা শোভা পায় না। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে সামন্ত রাজদের রাজ্যপাট লোপ পেয়েছে, কিন্তু তাঁদের রাজা মহারাজা নবাব পদবী আছেই, সে গুলির উত্তরাধিকারীও প্রজাতন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করে থাকেন; তা ছাড়া আছে এইসব রাজবংশীয় কুলীনদের রাজকীয় ভাতা বরাদ্দ; আর এমনই কাণ্ড যে, এই প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের আকাশবাণীতে এখনও এই রাজবংশীয় কুলীনদের "হিজ হাইনেস" বলে সম্বোধন করা হয়। হয়তো এ বিষয়ে লোকসভায় প্রশ্ন তুললে কোন ভারতীয় রয় জেনকিনস জবাব দেবেন, এদের ব্যবস্থা আদবকায়দা বাতিল করা হলে ভারতের পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের সর্বনাশ ঘটবে!

বিলাতী হাউস অব লর্ডসের পুরো সদস্য-সংখ্যা প্রায় ন শো। কিন্তু লর্ডদের অধিবেশনে গড়পড়তা পঞ্চাশজনের বেশী হাজির হন না। প্রাচীন থাকবন্দী সামাজিক ঐতিহ্যের আকর্ষণ ব্রিটেনে প্রবল; তাই হাউস অব লর্ডস এখনও টি'কে আছে। কেবল টি'কে নেই শ্রমিক, বণিক, ধনিক, অনেকের লোভ লর্ড ঘরানায় উন্নীত হয়ে হাউস অব লর্ডসের দরবারী পোশাক ও পদবী-মর্যাদায় ভূষিত হওয়া। সে সুযোগ বর্ষে বর্ষে ঘটে থাকে। ঘটবার আরও একটি কারণ: হাউস অব লর্ডসের সদস্যরা লেবার, টোরী, লিবারেল দলে বিভক্ত। লর্ড ঘরানারা সাধারণত বেশীর ভাগ টোরী। লেবার দল যখন ক্ষমতাসীন হয় তখন হাউস অব লর্ডসে বিল পাস করানোর জন্য চাই যথেষ্ট সংখ্যায় লেবার লর্ড। কাজেই, লেবার গভর্নমেন্টও তাদের পক্ষের কিছু কিছু লোককে লর্ড পদবী দিয়ে হাউস অব লর্ডসে পাঠিয়ে থাকে।

র‍্যামজে ম্যাকডোনালডের প্রথম লেবার গভর্নমেন্টের সময় থেকে এই রেওয়াজ। তার আগে ব্রিটিশ লেবার দলের মনোভাব ছিল হাউস অব লর্ডসের প্রতি বিরূপ। কেবল হাউস অব লর্ডস কেন, ব্রিটিশ রাজবংশের উপরও লেবার দলের প্রথম যুগের অনেক নেতা খাপ্পা ছিলেন, তাঁদের ঝোঁক ছিল প্রজাতন্ত্রী। হাউস অব লর্ডসের রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে, কিন্তু লর্ডরা এখনও হাউস অব কমন্সে পাস করা কোন কোন বিল আইনে পরিণত হওয়ায় বাধা দিতে, বিলম্ব ঘটাতে পারেন। এ নিয়ে হাউস অব লর্ডসের সঙ্গে সর্ব-প্রথম লড়াই চালান লিবারেল প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ। লয়েড জর্জ চরমপন্থী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর দাবি ছিল হাউস অব কমন্সের জনপ্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তের উপর বংশকুলীনদের হুকুমত চলতে দেওয়া যেতে পারে না। লয়েড জর্জ একবার সম্রাট পঞ্চম জর্জকে বলেন, একজন ডিউককে পোষার চাইতে একখানা যুদ্ধজাহাজ রাখার ঝামেলা অনেক কম; যুদ্ধজাহাজ অকেজো হলে বাতিল করা যায়, ডিউককে বংশানু-ক্রমে পুষতে হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জ কথাটা শুনে রুষ্ট হন' বলেন তাঁর প্রধান অমাত্যের মুখে এরকম মারাত্মক সোস্যালিজমের বচন তিনি বরদাস্ত করতে পারেন না।

এমন "মারাত্মক সোস্যালিজম" অবশ্য ইংরেজদের ধাতে সয় না। ফরাসীরা বলে, ইংরেজরা অতিমাত্রায় বশংবদ জাত। রাজা-রানী, ডিউক, ভাইকাউন্ট, ব্যারন ইত্যাদির নামেই তারা বিগলিত। লর্ড ছাড়া লেবারও অচল! প্রথম লেবার প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনালড লেডী লণ্ডনডেরীর করমর্দনে ধন্য। বঙ্কিমের মুচিরাম গুড় তার মনিব হোম সায়েবকে খুশী করে বলেছিল, "আপ তো লর্ড ঘরানা হ্যায়।" সেই হোম

ছিলেন কোন এক লর্ড হোমের দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি মাত্র। অমন যে প্রচণ্ড হাউস অব লর্ডস-বিরোধী জননেতা লয়েড জর্জ, তিনিও মৃত্যুর কিছু দিন মাত্র আগে আর্ল উপাধি নিতে রাজী হন, তবে শোনা যায় সেটি তাঁর পুত্রের আবদার পূরণের জন্যই। উইনস্টন চার্চিলকে আমরা জানি গোঁড়া রক্ষণশীল বলে; তিনি ছিলেন লর্ড বংশের ছোট ছেলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চার্চিলকে একাধিকবার ডিউক পদবী ভূষিত করার প্রস্তাব হয়; চার্চিল প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি আজীবন হাউস অব কমন্সের মহারথী, "গ্রেটেস্ট কমনার", শ্রেষ্ঠতম জননেতা, হাউস অব লর্ডসের দরবারী প্রলোভন তাঁর চিত্তবিক্ষেপ ঘটাতে পারে নি। কে রক্ষণশীল, কেই বা প্রগতিবাদী, দলীয় লেবেল দেখে সব সময় সেটা বিচার করা চলে না।

ব্রিটিশ লেবার দলপতিদের রেকডই সেদিক দিয়ে বিস্ময়কর। অ্যাটলির আর্ল পদবী নেওয়াটা লেবার দলেরও অনেকে পছন্দ করেন নি। লণ্ডনের পুলিসম্যানের ছেলে লেবার দলের অন্যতম নেতা হার্বার্ট মরিসনও স্বচ্ছন্দে হয়েছেন লর্ড মরিসন। লেবার দলের তরফ থেকে একটা যুক্তি দেখানো যেতে পারে—হাউস অব লর্ডস যতদিন আছে ততদিন সেখানে প্রয়োজনমত লেবার লর্ডের সংখ্যা না বাড়িয়ে উপায় নেই। কিন্তু সেজন্য কি অ্যাটলি, মরিসনের মত নেতৃস্থানীয়দের লর্ড ঘরানা হওয়া একান্তই দরকার? র‍্যামজে ম্যাকডোনালডের আমলে সিডনী ওয়েব হাউস অব লর্ডসে লেবার গভর্নমেণ্টের মুখপাত্র হওয়ার প্রয়োজনে লর্ড পদবী গ্রহণ করেছিলেন; তাঁর স্ত্রী বিট্রিস ওয়েব কিন্তু লেডী পদবী কখনও ব্যবহার করতে রাজী হন নি। হ্যারলড উইলসনের আমলে বিজ্ঞানী-কথাশিল্পী সি পি স্নো লর্ড পদবী নিয়ে নিজের প্রতিশ্রুতি নিজেই খেলাপ করেছেন। ফেনার ব্রকওয়ে, সোরেনসেন প্রমুখ বামপন্থীঘেঁষা লেবার সদস্যরাও লর্ড পদবী নিয়েছেন, তবে লর্ড বংশবৃদ্ধির জন্য নয়, তাঁদের জীবনকালের জন্য মাত্র; সেটা নাকি হাউস অব লর্ডসে লেবার দলের প্রয়োজনমত সদস্য-সংখ্যা পূরণের জন্যই। লর্ড ব্রকওয়ের নিজস্ব অভিমত, শোনা যায়, হাউস অব লর্ডস তুলে দেওয়ার পক্ষে।

হাউস অব লর্ডস বাতিল করায় দেখা যাচ্ছে লেবার দলেরই আপত্তি। লেবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রয় জেনকিনসের মতে, লর্ড ঘরানা বংশকুলীনদের মজলিস-বিহনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রই অচল। অথচ এমরিস হিউয়েসের বিলটা এমন কিছু বৈপ্লবিক রক্তারক্তির ব্যাপার ছিল না, লর্ড পদবীগুলি ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হলে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে সাংঘাতিক উলট-পালট ঘটত না। এমরিস হিউয়েসের প্রস্তাবটা বেয়াড়া মনে করবার কারণ নেই। তার একটি প্রমাণ—হাউস অব লর্ডসের টোরী দলনেতা লর্ড ক্যারিংটনের সাম্প্রতিক সতর্কবাণী। লর্ড মজলিসের সদস্যদের সম্বোধন করে তিনি বলেছেন, "আপনাদের এই মজলিসের গঠনকে (অর্থাৎ বংশ-কৌলীন্যের সমাবেশকে) বিদ্রূপের বিষয় করা যায়।"

("The composition of Your Lordships" House can be held up to ridicule".)

২০-৩-৬৭

বেশ্যার মৃত্যু

তারই বোন-সতিনেরা কাঁধে ক'রে নিয়ে এলো তাকে :
মাথা হেঁট, চোখে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম, দুর্বল পা ফেলা,
গুটিকয় গম্ভীর বালিকা যেন, অকস্মাৎ ভুলে গেছে খেলা;—
ঈষৎ সন্ত্রস্ত হ'লো আকাশ ও লোকজন দেখে।

দিনের বিশাল রৌদ্র বদলে দিলো তাদের চেহারা :
সব মুখ এক যেন, সব দেহ বাতাসে বিব্রত;
অচেনা, অস্বস্তিকর, আশাতীত লজ্জায় আবৃত,
পরস্পরে ভর দিয়ে কুঁকড়ে ছোটো হ'য়ে গেলো তারা।

—হারালো অস্তিত্ব এই ভিন্ন দেশে, নিঃস্ব হ'লো নারীত্ব, যৌবন,
যেহেতু কোথাও আর নেই যেন কামুক পুরুষ।
এক বোবা, নিশ্চল দুপুর শুধু; আর, যেন মদ গিলে বিলুপ্ত, বেহুঁশ,
অনাক্রমণীয় ঘুমে মগ্ন একজন।

তার সব সজলতা চেটে নেয় বিদগ্ধ আগুন,
ছড়িয়ে রসিক জিহ্বা গ্রাস করে স্তন, জানু, যোনি;
যে-সব গোপন রন্ধ্রে কোনো মত্ত নাগর নামেনি,
সেখানেও লালসায় খুঁটে খায় অবশিষ্ট নুন।

এদিকে শহরে সন্ধ্যা, অন্য ক-টি ঘরে ফিরে চলে,
চোখ টেপে ল্যাম্পোস্ট, গলির গন্ধ উৎসাহ বাড়ায়;
পায়ে শক্ত মাটি পেয়ে নিষ্ঠাবতী ভগিনীরা আবার দাঁড়ায়
দগ্ধ হ'তে ক্ষুদ্রতর ক্ষুধার অনলে।
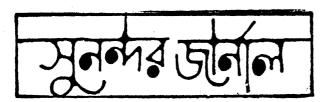
'ইতিহাস থেকে ইতিহাসে'

'কলকাতার জন্য মন্ত্রী চাই'—এই মর্মে একটি আলোচনা মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ছে। অর্থাৎ শহর কলকাতাকে আরো উন্নত, আরো পরিচ্ছন্ন, আরো শ্রীমতী করে তুলতে হবে। বিদেশীদের কাছে এই শহর

বিভীষিকা, নেতাদের কাছে 'দুঃস্বপন', ভিন্ন প্রদেশীয়ের কাছে আহরণের তীর্থ। কলকাতার গুরুত্ব আছে, গৌরব নেই। তাই মাননীয় অতিথিদের সরকারী সফরের তালিকায় কলকাতার নাম প্রায়ই বাদ পড়ে, অদূরে শান্তিনিকেতন এবং কলকাতার ওপর দিয়ে দার্জিলিঙ-শিলঙের হাতছানি যদি না থাকত, তা হলে খুব সম্ভব এই 'অভিশপ্ত' শহরকে ট্যুরিস্টরাও একেবারে বর্জন করতেন।

'কলকাতার জন্যে একজন আলাদা মন্ত্রী চাই'—এই আবেদনের ভেতরে একটা মর্মভেদী আকুলতা আছে। কলকাতা উন্নয়নের জন্যে কেন্দ্রের কাছে বার বার দরবার করছি আমরা—কিন্তু 'দিল্লি অনেক দূর', আন্তর্জাতিক মহিমার জন্যে তার নিজস্ব অঙ্গসজ্জার প্রয়োজন আছে, বাণিজ্যের স্বর্গলোক মহারাষ্ট্রের কথা ভাবতে হয়, তাকে দক্ষিণের অভিমান ভাঙাতে হয় (অন্ধ্রের 'রিফাইনারী' তাণ্ডব স্মরণীয়), অনুন্নত অঞ্চলের জন্যে মাথা ঘামাতে হয়। কলকাতার চিৎকার বড় জোর মোগলসরাই পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে, তারপর যুক্তপ্রদেশের হাওয়া লাগতে না লাগতেই তা শূন্যে মিলিয়ে যায়। অতএব কলকাতার কথা এখন আমাদেরই ভাবতে হবে।

কত মানুষের বাস এই শহরে? হিসেব মতো, উনত্রিশ লক্ষের কিছু বেশি। কিন্তু ছুটির দিনগুলো বাদ দিলে ভোর পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত আরো বহু লক্ষ পদধ্বনি বাজতে থাকে কলকাতায়। হাওড়া-শেয়ালদা স্টেশন থেকে, হাজার

> **পাঠকদের প্রতি নিবেদন**
>
> অপ্রত্যাশিত কারণে এ-সপ্তাহে কালকূটের 'কোথায় পাবো তারে' প্রকাশ করতে না পারার জন্য পাঠকদের মার্জনা চাই। আশা করছি আগামী সপ্তাহ থেকে নিয়মিতই প্রকাশিত হবে।
>
> —সঃ দেশ

হাজার বাস আর বাজারের লরী বেয়ে মানুষের স্রোত বন্যার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে এখানে। কলকাতা অফিসের জন্যে, কলকাতা ব্যবসার জন্যে, কলকাতা দালালীর জন্যে, কলকাতা জীবিকার জন্যে।

অফিসকে কে ভালোবাসে—যেখানে সম্পর্ক শুধু চাকরি আর মাইনের সঙ্গে? বাজারের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কার দুশ্চিন্তা —যদি লাভ-লোকসানটাই শেষ কথা হয়? কলকাতা খাবারের থালা সাজিয়ে দেয়—পেট পুরে খেয়ে উঠে পড়লেই হল, এঁটোকাটার কী গতি হবে সে কথা না ভাবলেও চলে। যেমন বটানিকসে কাগজের গ্লাস আর কেকের মোড়ক ছড়িয়ে দিয়ে আসা, যেমন ডায়মণ্ডহারবারের পিকনিক-পার্ক ডিমের খোলা, সন্দেশের বাক্স, কমলালেবুর ছিবড়ে আর শালপাতায় সাজিয়ে দেওয়া।

বৃক্ষরোপণ উৎসবের একমাত্র সার্থকতা

আমাদের সবচেয়ে গভীর দুঃখ, অবাঙালীরা বাংলা দেশের জন্যে ভাবেন না —কলকাতার জন্যে তাঁদের মাথা-ব্যথা নেই। আমাদের যদি বটানিকস্—ইডেন গার্ডেন-এর জন্যে ভাবনা না থাকে, তাঁদেরই বা কেন থাকবে? তাঁরা তো কলকাতাকে শহর বলে জানেন না—বাজার বলেই চেনেন। শেয়ালদা কিংবা গড়িয়াহাট মার্কেটের পরিচ্ছন্নতার

জন্যে আমাদের তো বিশেষ চিন্তিত হতে দেখা যায় না।

আসলে কলকাতাকে ভালোবাসতে হয়, তার ইতিহাস, তার ট্রাডিশ্যান দিয়ে, হয়তো তার সংগে একটু ইমোশ্যানেরও দরকার পড়ে। মনে করতে হয় সেই দিনগুলোকে—যেদিন এই শহরের মাটিতেই আমাদের র‍্যানাসাঁস—আমাদের নবজন্ম দেখা দিয়েছিল; মনে করতে হয় রামমোহন রায়-রাধাকান্ত দেবকে, হিন্দু কলেজকে—'ইয়ং বেঙ্গল'দের— রিচার্ডসন-ডিরোজিও-দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়-রামগোপাল ঘোষ-মধুসূদন দত্ত এবং আরো অনেককে; স্মৃতিতে জাগিয়ে তুলতে হয় বিদ্যাসাগরকে, রবীন্দ্রনাথকে, বিবেকানন্দকে, দেশবন্ধুকে। মনে আনতে হয় ব্রাহ্মসমাজকে, শিবনাথ শাস্ত্রী-কেশবচন্দ্র সেনকে, 'ভারতসভা'কে, অরবিন্দ-সুরেন্দ্রনাথকে, 'অমৃতবাজার', শিশির ঘোষ, 'সঞ্জীবনী', 'ফরোয়ার্ড'কে; জাগিয়ে রাখতে হয় উত্তাল এক-একটি আন্দোলনের স্মৃতিকে, বঙ্গ-ভঙ্গ রাখীবন্ধনের দিনগুলোকে, একটি একটি স্মরণীয় রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক অধিবেশনের গৌরববোধকে।
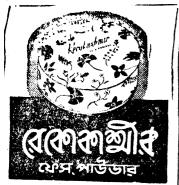
অবাঙালীদের দোষ নেই। এই স্মৃতি তাঁদের নয়, তাঁদের শতকরা একজনও সম্ভবত এই গৌরবের কথা স্মরণ করেন না। তাঁরা জানেনও না—কারণ হাটে যাঁরা বেচাকেনা করতে আসেন, হাটের ইতিহাস চর্চার সময় তাঁদের নেই।

কলকাতা এবং সেই সংগে বাঙালীর নতুন যুগের ইতিহাসকে জানবার এবং ভালোবাসার দায়িত্ব ছিল আমাদেরই। আমরা তো তীর্থের মতো সেই মাটি এবং ইতিবৃত্তকে আগলে রাখিনি। 'কলকাতার উন্নয়ন চাই'—এই দাবিটা কোন্ দিকে? আরো ভালো রাস্তা চাই, যানবাহনের আরো সুবন্দোবস্ত চাই, আরো পরিচ্ছন্নতা চাই, আরো পার্ক চাই, আরো বড় বড় বাড়ি চাই, আরো বসবাসের সুব্যবস্থা চাই? যে-কোনো আধুনিক শহরের জন্যে এগুলো যে

প্রাথমিক প্রয়োজন সে-কথা মানি। কিন্তু কলকাতা তো শুধু ইনডাসট্রিয়াল সিটি নয়। সে কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য-বন্দর-কারখানা নিয়ে ম্যামথ হয়ে ওঠেনি, তার একটা যুগস্রষ্টা ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস-চেতনা যদি আমাদের থাকত, তা হলে শুধু বই পড়ে আমাদের কলকাতাকে জানতে হত না, এক-একটা ভাঙন-ধরা জীর্ণ বাড়িতে ক্বচিৎ কখনো দু-একটা অস্পষ্টপ্রায় ফলক দেখে দাঁড়িয়ে পড়তে হত না, পাথরের মূর্তিগুলো কাকে চিলে বীভৎস করে রাখত না, তার অতীত আমাদের স্মরণে ও শ্রদ্ধায় দীপালির আলোয় ঝলমল করত।

কলকাতার উন্নয়ন।

সুনন্দের এই পাতায় যাঁদের অনুগ্রহ-দৃষ্টি পড়ে, তাঁদের স্মরণে থাকতে পারে একদা রামমোহন রায়ের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়িটি নিয়ে কিছু আলোচনা করেছিলুম—বাঙালী-সাধারণ পরম ঔৎসুক্যে সে আলোচনায় সাড়া দিয়েছিলেন। সে বাড়ির গতি কী হয়েছে জানি না, কিন্তু আজও তার জীর্ণ দেওয়ালে রামমোহনের নাম চোখে পড়ে। কিন্তু সে বাড়ির পাশ দিয়ে আপনি হাঁটতে পারবেন না—কলকাতা কর্পোরেশনের কয়েকশো মণ আবর্জনা সেখানে স্তূপীকৃত—সেই উৎকট দুর্গন্ধে ভরা বীভৎসতার মধ্যে 'ভারতপথিক'কেও বিসর্জন দিয়েছি! আমাদের মনের চেহারা তো এই!

কলকাতা-মন্ত্রী মন্ত্রণা দিতে পারেন, পথ-ঘাট-পার্কের উন্নতিও ঘটাতে পারেন, কিন্তু কলকাতাকে ভালোবাসার ইতিহাস-চৈতন্য জাগাতে পারেন—এমন মন্ত্র কি তিনি জানেন?

অথবা, কলকাতাকে হয়তো আবার আমরা ফিরে পাব। ফিরে পাব সেই দিন—যেদিন মজা গঙ্গার ধারে এই মরা শহরের আলোগুলো নিবে গিয়ে নতুন ইনডাসট্রিয়াল সিটি ঝকমক করবে দুর্গাপুরে, হলদিয়ায়; কারণ সেদিন সেই মৃত নগরে ইতিহাস ছাড়া আমাদের কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না।

কেন্দ্রের নতুন মন্ত্রিসভা

১২ই মার্চ রবিবার কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টি সর্বসম্মতভাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে দলের নেতৃত্বের ভার অর্পণ করেন। পরদিনই শ্রীমতী গান্ধী রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম পেশ করেন। নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য ৩৬ জন, যার মধ্যে মন্ত্রী ১৯ এবং প্রতিমন্ত্রী ১৭ জন। মন্ত্রীদের মধ্যে একেবারে নতুন মুখ—ডঃ ত্রিগুণা সেন, ডঃ ভি কে আর ভি রাও এবং ডঃ করণ সিং, শ্রী কে কে শাহ এবং ডঃ চেন্না রেড্ডী। পূর্বতন মন্ত্রিসভার ৫ জন প্রতিমন্ত্রীকে পূর্ণ মন্ত্রীত্বের পদ দেওয়া হয়েছে। এঁরা হলেন—শ্রীদীনেশ সিং, শ্রী সি এম পুনচা, শ্রীপানামপল্লী গোবিন্দ মেনন, শ্রীজয়সুখলাল হাতি ও শ্রীরামসুভগ সিং। প্রতিমন্ত্রীতে নবাগত হলেন ডঃ এস চন্দ্রশেখর, শ্রী কে সি পন্থ, শ্রীরঘুনাথ রেড্ডী, অধ্যাপক শের সিং, ডঃ ফুলরেণু গুহ, শ্রীপরিমল ঘোষ, শ্রীএম এস গুরুপদস্বামী, শ্রীভগৎ ঝা আজাদ ও শ্রীআই কে গুজরাল। মন্ত্রীদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীসহ ১৩ জন লোকসভার নির্বাচিত সদস্য এবং ৩ জন রাজ্যসভার। বাকি ৩ জন—ডঃ ত্রিগুণা সেন, ডঃ করণ সিং এবং ডঃ চেন্না রেড্ডী দুটির কোনটিরই সদস্য নন। প্রতিমন্ত্রীদের ১৩ জন লোকসভার এবং ৪ জন রাজ্যসভার সদস্য।

মন্ত্রীদের গড়পড়তা বয়স হচ্ছে ৫৫·৭। বয়স্কতম মন্ত্রী হচ্ছেন শ্রীমোরারজী দেশাই (৭১) এবং কনিষ্ঠতম ডঃ করণ সিং (৩৬)। প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে বয়স্কতম হলেন ডঃ কে এল রাও (৬৫) এবং কনিষ্ঠতম শ্রী কে সি পন্থ (৩৬)। নবনির্বাচিত মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া গেল:—

ইন্দিরা গান্ধী

১৯৬৬-র জানুয়ারীতে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক তিরোধানে সে-সময়কার তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

জন্ম ১৯১৭-র ১৯ নভেম্বর। শিক্ষা প্রথমে সুইজারল্যান্ড এবং সেখান থেকে শান্তিনিকেতন; পরে অক্সফোর্ডের সমারভিল কলেজে। পিতা জহরলাল নেহরুর সঙ্গে পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। পিতার একান্ত সচীবের কাজও করেছেন বহু বৎসর। একুশ বছর বয়সে কংগ্রেসের সদস্য হন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় তের বার কারারুদ্ধ হন। কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য, কংগ্রেসের মহিলা বিভাগের সভানেত্রী, কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ড এবং যুব উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য। ১৯৫৯ সনে কংগ্রেসের

সভানেত্রীর পদেও অধিষ্ঠিত হন। পিতার মৃত্যুর পর লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মন্ত্রিসভায় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

মোরারজী দেশাই

নতুন মন্ত্রিসভায় উপ-প্রধানমন্ত্রী। দায়িত্ব নিয়েছেন অর্থ দপ্তরের, যে পদে তিনি কামরাজ পরিকল্পনা মন্ত্রিত্ব ত্যাগ কর পর্যন্ত অধিষ্ঠি ছিলেন ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত।

শ্রীদেশাইয়ের জন্ম ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৬। বোমবাইয়ে উইলসন কলেজে শিক্ষা সমাপান্তে বোমবাই প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে যোগদান করেন। ১৯৩০ সনে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এবং সরকারী চাকরিও ত্যাগ করেন। কারাভোগ করেন ১৯৩০, ১৯৩২, ১৯৪০ এবং ১৯৪২-এর আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায়। ১৯৩৭ থেকে '৩৯ বোমবাই বিধানসভার সদস্য ছিলেন। ১৯৪২ থেকে '৪৫ পর্যন্ত তাঁকে অন্তরীণ রাখা হয়। অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য, গুজরাত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন ১৯৩১ থেকে '৩৭ পর্যন্ত। দেশ স্বাধীন হতে বোমবাইয়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন (১৯৫২-৫৬)। পরে ১৯৫৬-তে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ১৯৫৭ পর্যন্ত। ১৯৫৮-তে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেন বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী রূপে।

সর্দার শরণ সিং

জন্ম ১৯০৭ সনে। লাহোরের সরকারী কলেজে শিক্ষা অন্তে ১৯৩২-এ জলন্ধরে অ্যাডভোকেট হন। পাঞ্জাবের বিধানসভার সদস্য হন ১৯৫৩-তে। ১৯৪৬-এ পাঞ্জাব মন্ত্রিমণ্ডলীতে উন্নয়ন ও বেসামরিক সরবরাহ দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নির্বাচিত হন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন ১৯৪৭ থেকে '৪৯ পর্যন্ত। ১৯৫২-তে পরিকল্পনা ও বিদ্যুৎ দফতরের মন্ত্রী। ওই বছরই তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন গৃহনির্মাণ ও সরবরাহ দফতরের মন্ত্রী হিসাবে। ১৯৫৭-তে তিনি হন ইস্পাত, খনি ও জ্বালানি দফতরের মন্ত্রী। ১৯৬২-তে রেলমন্ত্রী এবং পরে নির্বাচিত হন বহির্বিষয়ক দফতরের মন্ত্রী। গত বছর প্রতিরক্ষা দফতরের ভার পেয়েছেন এবং সেই পদেই তিনি বহাল আছেন।

মহম্মদ আলি কারিমভাই চাগলা

জন্ম ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০০। বোমবাইয়ের সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষা অন্তে লণ্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে আসেন ১৯২২ সনে। ১৯২৭ থেকে '৩০ গভর্নমেণ্টাল কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪১ থেকে '৪৭ পর্যন্ত ছিলেন বোমবাই হাইকোর্টের
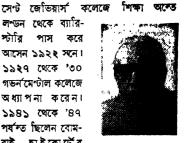
বিচারপতি। এর পর তিনি হন প্রধান বিচারপতি এবং ১৯৫৮ পর্যন্ত ওই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯৪৭-এ বোমবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ থেকে '৬০ পর্যন্ত হেগে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বিচারক থাকেন। ১৯৫৮-তে জীবনবীমা তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান; ১৯৫৮-৬১ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত, ১৯৬২-৬৩ গ্রেট ব্রিটেনে ভারতীয় হাই-কমিশনার। বহুবার তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশনে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেছেন। ১৯৬৫-তে রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৬৩-তে শিক্ষা দপ্তরের ভার নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। গত বছর শ্রীগুলজারিলাল নন্দ পদত্যাগ করার পর শ্রীচাগলা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার পান এবং এবারও ওই পদেই তিনি বহাল থাকছেন।

যশোবন্তরাও চবন

বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের সাতারা জেলায় জন্ম ১৯১৪-র ১২ মার্চ। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান

রেন ১৯৩২-এ। তক হন ১৯৩৪-এ এবং ১৯৪১-এ আইন পাস করেন। '৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে গুপ্ত-বাহিনীর পরিচালনা করেন। মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য তিনি ১৯৪০ থেকে। ১৯৪৬-এ বোমবাই বিধানসভার সদস্য। ১৯৫২ থেকে '৫৭ পর্যন্ত ছিলেন ওই রাজ্যের অসামরিক সরবরাহমন্ত্রী। এর পর মহারাষ্ট্র পৃথক একটি রাজ্যে পরিণত হলে তিনি ওখনকার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন ১৯৫৭ সনে। ১৯৬২ পর্যন্ত ওই পদে থাকার পর তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে। গত বছর তিনি ভার নেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এবং বর্তমানে তিনি ওই পদেই বহাল থাকছেন।

অশোক মেহতা

বোমবাইয়ে জন্ম ১৯১১-র ২৪ অক্টোবর। ১৯৩৪-এ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রী মেহতা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে বহুবার কারাবরণ

করেন। '৩৯ পর্যন্ত দলীয় মুখপত্রের সম্পাদনা করেন। পরে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল গঠিত হলে শ্রী মেহতা প্রথমে তার সম্পাদক এবং পরে ১৯৫৯ থেকে '৬৩ পর্যন্ত চেয়ারম্যানের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। লোকসভার সদস্য হিসেবে তিনি খাদ্যশস্য তদন্ত কমিশনের চেয়ারম্যান এবং পরে পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস্-চেয়ারম্যান ছিলেন। শ্রীমতী গান্ধী প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়া থেকেই শ্রী মেহতা তাঁর মন্ত্রিসভায় পরিকল্পনা মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত। এখন পরিকল্পনার সঙ্গে পেট্রল ও রাসায়নিক দফতরের ভারও তিনি পেয়েছেন।

কোকরদাস কালিদাস শাহ

গত সাত বছর ধরে শ্রী কে কে শাহ লোকসভার সদস্য এবং জীবনবীমা অফিসার্স ইউনিয়ন, অয়েল ইণ্ডিয়া অফিসার্স ইউনিয়ন প্রভৃতি কতকগুলি সংস্থার সভাপতি। নতুন মন্ত্রিসভায় তথ্য ও বেতার মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সঙ্গে ইউনিয়নগুলির সঙ্গে সংস্রব তাঁকে ত্যাগ করতে হয়েছে। তবে বোমবাইয়ের 'ফুটপাথ পার্লিয়ামেণ্ট'-এর সভাপতিত্ব তিনি ছাড়বেন না। দেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য বোমবাইয়ের অন্তর্গত বুলেশ্বরের ফুটপাতে এই পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন বসে মাসে একবার।

মহারাষ্ট্রের গোরেগাঁও জেলার কোলাবাতে শ্রীশাহর জন্ম ১৯০৮-এ। প্রথম জীবনে ছিলেন বোমবাইয়ের পোদ্দার হাই স্কুলের শিক্ষক। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন এবং 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় কারারুদ্ধ হন। এর পর তিনি আইনে স্নাতক হয়ে প্র্যাকটিস করতে থাকেন। বোম্বাই কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন দীর্ঘকাল এবং পরে ১৯৫৭ থেকে '৬০ পর্যন্ত সহঃ সভাপতি ও সভাপতিও ছিলেন। অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক পদেও কাজ করেছেন।

ডঃ ত্রিগুণা সেন

জন্ম সিলেটের (বর্তমান পূর্ব পাকিস্তান) বীরশ্রী গ্রামে ১৯০৫-এর ২৪ ডিসেম্বর। কলকাতায় শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি জার্মানী যান এবং ওখানে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডক্টরেট লাভ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং এর জন্য তাঁকে বহুবার কারাবাস করতে হয়, এমন কি তাঁকে বাঙলা দেশ থেকে অন্তরীণ করাও হয়। ১৯৪৩-এ শ্রীসেন যাদবপুরের

কলেজ অব ইনজিনীয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজিতে যোগদান করেন আডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হিসেবে। পরে তিনি অধ্যাপক থেকে ওখানকার অধ্যক্ষ হন এবং ১৯৫৬-তে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়া থেকে তিনি ওখানকার উপাচার্য থাকেন ১৯৬৬ পর্যন্ত। যাদবপুরে তাঁর কার্যকাল সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত করা হয়। মন্ত্রী হওয়ার আগে পর্যন্ত এই পদেই তিনি বহাল ছিলেন। বিভিন্ন দেশের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ঘুরেছেন। ১৯৫৮ ও '৫৯এ তিনি কলকাতার মেয়র ছিলেন। ইনজিনীয়ারিং ও টেকনিক্যাল সংক্রান্ত বহু প্রতিষ্ঠানে শ্রীসেন সভাপতির কাজ করেছেন।

জগজীবন রাম

নতুন মন্ত্রিসভার খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের জন্ম ১৯০৮ সনে। বারাণসী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। ১৯৩৮-এ বিহার হরিজন সেবক সংঘের সম্পাদক। ১৯৩৬ পর্যন্ত অখিল ভারত অনুন্নত সম্প্রদায় লীগের

সম্পাদক এবং ওই বছরই নির্বাচিত হন সভাপতি, যে পদে তিনি অধিষ্ঠিত থাকেন ১৯৪৬ পর্যন্ত। কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ থেকে '৩৯ পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় ছিলেন সংসদীয় সচিব। ১৯৪৬-এ বিহারে মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৭-এ কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভায় ছিলেন শ্রমমন্ত্রী। ১৯৫৭-তে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার অধিবেশনে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ১৯৫৭-'৬২ ছিলেন রেলমন্ত্রী, ১৯৫৮-৬৩ সংযোগ ও পরিবহণ মন্ত্রী। ১৯৬৬-তে ছিলেন শ্রম, কর্ম-সংস্থান ও পুনর্বাসন মন্ত্রী।

ডঃ ভি কে আর ভি রাও

পুরো নাম ডঃ বিজয়েন্দ্র কস্তুরী রঙ্গ ভরদারাজ রাও। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একটি নতুন মুখ। এর আগে তিনি ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনে কৃষি ও শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য। লোকসভায় নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য তিনি ওই পদে ইস্তফা দেন। শ্রীরাওয়ের জন্ম ১৯০৮-এ। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ এবং কেমব্রিজের পিএইচ ডি। ১৯৬৩-তে পরিকল্পনা কমিশনে যোগদানের পূর্বে

বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। জনপরিসংখ্যানবিদ হিসাবে তিনি সুখ্যাত। ১৯৪৪ থেকে '৬৪ পর্যন্ত ভারত সরকারের খাদ্য দপ্তরে পরিসংখ্যান ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা ছিলেন। ১৯৪৭ থেকে '৫০ পর্যন্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সংগঠন অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাব-কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। দিল্লীর স্কুল অব ইকনমিস-এর প্রতিষ্ঠাতা-ডিরেক্টর ছিলেন ১৯৪২ থেকে '৫৭ পর্যন্ত। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও তিনি ছিলেন।

ডঃ এম চেননা রেড্ডী

সপ্তাহকাল মাত্র আগে শ্রীরেড্ডী অন্ধ্র রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন, কিন্তু কার্যভার গ্রহণ করার পূর্বেই তাঁর ডাক আসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করার। অন্ধ্রতে তাঁর খ্যাতি ছিল খনিজ দ্রব্যের উন্নয়ন মন্ত্রী হিসেবে। কেন্দ্র তাঁর সেই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার জন্য তাঁকে দিয়েছেন ইস্পাত, খনি ও খনিজ সামগ্রী দপ্তরের দায়িত্ব।

ডঃ রেড্ডী ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-বি-বি-এস পাশ করেন, কিন্তু নিজামী শাসনের উচ্ছেদে গণ-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য ডাক্তারি ছেড়ে দেন। ১৯৫০-এ তিনি অস্থায়ী লোকসভার সদস্য ছিলেন। পরে হায়দ্রাবাদের প্রথম মন্ত্রিসভায় যোগদান করার জন্য লোকসভার সদস্য পদে ইস্তফা দেন। অন্ধ্র প্রদেশ গঠিত হতে তিনি পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান হন। পরে ওই রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রিসভায় পরিকল্পনা, অর্থ ও শিল্প দপ্তরের ভার নেন।

দীনেশ সিং

পূর্বতন মন্ত্রিসভায় বহির্বিষয়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নতুন মন্ত্রিসভায় ভার পেয়েছেন বাণিজ্য দপ্তরের। শ্রীসিংয়ের জন্ম ১৯২৫-এর ১২ জুলাই যুক্ত প্রদেশের কলাকাংকরে। দেরাদুনের দুন স্কুল এবং লখনৌয়ের কলভিন কলেজে শিক্ষা। প্রধান মন্ত্রীর একান্ত সচিব, লণ্ডন ও প্যারিস দূতাবাসে সচিব, ২য় লোকসভার এস্টিমেট কমিটির সদস্য, ইউ এন ও-র খাদ্য বিষয়ক সম্মেলনে প্রতিনিধি, পরিভ্রমণ উগ্রয়ন সংসদের সদস্য প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬০-এ তিউনিসিয়ায় এবং ১৯৬১-তে কায়রোতে অনুষ্ঠিত অখিল আফ্রিকা গণ সম্মেলনে যোগদান করেন। বিভিন্ন কাজে তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশ ঘুরেছেন।

জয়সুখলাল হাতি

জন্ম ১৯০৯ সনের ১১ জানুয়ারী। আইন পাশ করে বোম্বাই হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট হন। পরে [illegible]

জেলা ও সেশন জজ হন। ১৯৪৬ থেকে '৪৭ গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। লোকসভায় আসেন ১৯৫৭-তে। পরের নির্বাচনে (১৯৬২) আবার রাজ্যসভার সদস্য হন। ১৯৬৪ থেকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে প্রতিমন্ত্রীর পদে কাজ করে আসছেন। মাঝে ১৯৫২ থেকে দশ বছর তিনি শ্রম দপ্তরে প্রতিমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৬২-র এপ্রিল থেকে নভেম্বর ছিলেন শ্রম দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। এর পর ১৯৬৪-র মার্চ পর্যন্ত ছিলেন সরবরাহ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী।

ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ

পূর্বতন মন্ত্রিসভার শিক্ষা দপ্তর থেকে এবার শ্রীআহমেদ স্থানান্তরিত হয়েছেন শিল্প উন্নয়ন দপ্তরে। ১৯৬২ থেকে ছিলেন আসামের অর্থমন্ত্রী। শ্রীআহমেদের জন্ম ১৯০৫-এর ১৩ মে। শিক্ষা দিল্লীর গভর্নমেন্ট হাই স্কুল ও সেন্ট স্টিফেন কলেজ, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং লণ্ডনের ইনার টেম্পল। ১৯৩০-এ পাঞ্জাব হাই কোর্টে অ্যাডভোকেট এবং পরে আসামে চলে আসেন। ১৯২৮ থেকে কংগ্রেসের সভ্য। স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর কারাবাস হয়। ১৯৪৬-৪৭ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। ১৯৩৭ থেকে '৪৫ পর্যন্ত আসাম বিধানসভার সদস্য এবং বরদলই মন্ত্রিসভায় ছিলেন অর্থ ও রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্রী। ১৯৪৬-৫২ আসামের অ্যাডভোকেট জেনারেল। ১৯৫৪-৫৭ রাজ্যসভার সদস্য। ১৯৫৫-তে যুগোশ্লাভিয়াগামী আইনজীবী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। ১৯৫৭-তে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ অধিবেশনে ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৭ থেকে আসাম বিধানসভার সদস্য এবং মন্ত্রী থাকেন ১৯৫৮ থেকে '৬৬ পর্যন্ত।

সত্যনারায়ণ সিংহ

সংসদীয় বিষয় ও সংযোগ দপ্তরের মন্ত্রী এবার হয়েছেন দপ্তরবিহীন মন্ত্রী। কেন্দ্রে তিনি আছেন স্বাধীনতার পর গঠিত [illegible] থেকে। [illegible] তিনি [illegible]

কংগ্রেস দলের প্রধান সচেতক। ১৯৪৯-৫২ ছিলেন সংসদীয় বিষয়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। ১৯৬৩-৬৪ ছিলেন তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী। ১৯০০ সনে দ্বারভাঙ্গায় শ্রীসিংহের জন্ম। শিক্ষালাভ করেন পাটনাতে। অল্প বয়স থেকেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং এজন্য তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। ১৯২৬-৩০ তিনি বিহার বিধানসভার সদস্য ছিলেন।

ডঃ রামসুভগ সিং

জন্ম ১৯১৭-র জুলাই। শিক্ষা আরা টাউন স্কুল, বারাণসীর শ্রীকাশী বিদ্যাপীঠ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়। বারাণসীর তিনি শাস্ত্রী এবং মিসৌরীর সাংবাদিকতায় পি এইচ ডি। লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে আসছেন '৫২ থেকে প্রতিবার। লোকসভায় কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য। ১৯৬১ থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। ১৯৬২-তে কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চাউল কমিশনের অষ্টম অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা; ১৯৬৪-তে একই স্থানে অনুষ্ঠিত ইন্দো-এশীয় গ্রাম পুনর্গঠন সম্মেলনের সদস্য ছিলেন। ১৯৬২-র মে থেকে ১৯৬৪-র জুন পর্যন্ত কৃষি দপ্তরে প্রতিমন্ত্রী। ডঃ সিং এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বহু দেশ ঘুরেছেন।

ডঃ করণ সিং

জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল পদে ইস্তফা দিয়ে ডঃ করণ সিং পর্যটন ও অসামরিক বিমান পরিবহণ দফতরের পূর্ণ মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছেন। কাশ্মীর রাজবংশের উত্তরাধিকারী ডঃ সিং ১৯৪৯-এ ওই রাজ্যে অন্তবর্তিকালীন শাসক নিয়োজিত হন। ১৯৬২-তে হন সদর-ই-রিয়াসং। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ডঃ সিংয়ের কবিখ্যাতিও আছে। ডঃ সিং জম্মু ও কাশ্মীর এবং [illegible] বিশ্ব-[illegible]

সি এম পুনাচা

কুর্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সি এম পুনাচা গণপরিষদে সদস্য ছিলেন। পরে রাজ্যসভার সদস্য হন। ১৯৬৫-র ডিসেম্বরে তিনি অর্থ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পদে যোগদান করেন। শ্রীমতী গান্ধীর প্রথম মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন পরিবহণ, বিমান, জাহাজ ও পর্যটন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। এবার রেল দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী। শ্রীপুনাচার জন্ম ১৯১০ সনে। ম্যাঙ্গালোরে তিনি শিক্ষালাভ করেন। কুর্গের 'কোদাগারু' সাপ্তাহিকের সহ-সম্পাদকও ছিলেন কিছুকাল। ১৯৩২ থেকে '৪২ স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় বহুবার কারাবরণ করেন।

ডঃ চিদাম্বর চন্দ্রশেখর

স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ডঃ চিদাম্বর চন্দ্রশেখরের জন্ম ১৯১৯-র অকটোবর। শিক্ষা নাগপুরে, লন্ডন এবং আমেরিকার হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাহিত্যে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ। জন পরিসংখ্যানবিদ হিসাবে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি। রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীন পৃথিবীর জনসমষ্টি সমীক্ষা সংস্থার ডিরেকটর ছিলেন চার বছর। ১৯৫৫-তে বানডুংয়ে অনুষ্ঠিত জনসংখ্যা আলোচনাচক্রে নেতৃত্ব করেন। অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হেলথ অ্যাণ্ড হাইজিন, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পরিসংখ্যান বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থার বিভিন্ন পদে তিনি কাজ করেন। আমেরিকার প্ল্যানারি ফাউণ্ডেশনের খরচে জনপরিসংখ্যান বিষয়ে শ্রীচন্দ্রশেখর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং আমেরিকার ত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। আংশিক পরিসংখ্যান, জন পরিসংখ্যান, পরিবার পরিকল্পনা এবং চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে মৌলিক গবেষণামূলক প্রায় ৬০টি মৌলিক থিসিসের তিনি রচয়িতা।

গোবিন্দ মেনন

খ্যাতিমান আইনবিদ শ্রীমেনন এবার কেরল থেকে লোকসভায় নির্বাচিত একমাত্র কংগ্রেস সদস্য। শ্রীমতী গান্ধীর প্রথম মন্ত্রিসভায় তিনি খাদ্য ও কৃষি দফতরের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন। নতুন মন্ত্রিসভায় তিনি পূর্ণ মন্ত্রীতে উন্নীত হয়েছেন এবং তিনি ভার নিয়েছেন আইন দফতরের।

ডঃ ফুলরেণু গুহ

জন্ম কলকাতায় ১৩ আগস্ট ১৯১১। স্বাধীনতার যোদ্ধা অশ্বিনীকুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ দত্ত এঁর পিতা। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্বর্গীয় ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ ছিলেন এঁর স্বামী। শিক্ষালাভ করেন সিলেট, কলকাতা, লন্ডন এবং প্যারিসে। কলকাতার এম-এ এবং প্যারিসের সোর্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যে ডক্টরেট। অল্প বয়স থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হন। স্কুলে এবং কলেজে পড়ার সময় ছাত্র আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। ১৯৩০ এবং ১৯৪১ --দুবার তিনি আত্মগোপন করেন। গত তিন দশক ধরে আর্ত ত্রাণ, শিশু কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা, উদ্বাস্তুদের সাহায্য এবং বহু নারীকল্যাণ সংস্থার সঙ্গে শ্রীমতী গুহ সংশ্লিষ্ট। পশ্চিম বাংলার সমাজ উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিষ্ঠা থেকেই তিনি তার সঙ্গে জড়িত। সমাজ উন্নয়ন ও শিক্ষামূলক কাজে তিনি ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশ ঘুরেছেন। বর্তমানে তিনি অখিল ভারত নারী সম্মেলনের ভাইস চেয়ারম্যান এবং পশ্চিমবঙ্গ শিশু উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান। শ্রীমতী গুহ রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন ১৯৬৪-তে।

পরিমল ঘোষ

রেল দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীপরিমল ঘোষ গত দশ বছর জলপাইগুড়ি থেকে লোকসভার সদস্য। হিমালয় পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস ও হিমালয় পেপার (মেশিনারী) প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা এবং যথাক্রমে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ডিরেক্টর শ্রীঘোষের জন্ম ১৯১৭-র ১৫ মার্চ। ১৯৪০-এ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পাশ করেন। ভারতীয় চা শিল্পের সঙ্গে উত্তরাধিকারসূত্রে সংশ্লিষ্ট। তাঁদের পরিবারের নিজস্ব সংস্থা জলপাইগুড়ি [illegible] টি কোম্পানীর তিনি একজন ডিরেক্টর। ১৯৪৪ থেকে বহু সমাজ কল্যাণ ও দাতব্য সংস্থার সঙ্গে জড়িত। আগের দুবার তিনি তিনি তাঁর জন্মস্থান জলপাইগুড়ি থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। এবার নির্বাচিত হয়েছেন ঘাটাল থেকে।

প্রকাশচন্দ্র শেঠি

জন্ম ১৯২০-তে রাজস্থানে। ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতির সংস্পর্শে আসেন। '৪২-এর আন্দোলনে যোগদান করেন কলেজে পড়া ছেড়ে দিয়ে। দু' বছর কারাবাসের পর আবার পড়াশুনা ধরেন এবং ১৯৪৮-এ ইন্দোর থেকে স্নাতক এবং আইনে ডিগ্রী লাভ করেন। কংগ্রেসের শ্রমিক শাখা আই এন টি ইউ সি'-র প্রথম সারির নেতা। ১৯৫১ থেকে এ আই সি সি'র সদস্য। মধ্যভারত প্রদেশ কংগ্রেসে দায়িত্বশীল পদে ছিলেন বহু বৎসর। রাজ্যসভার সদস্য ১৯৬১ থেকে। '৬২-তে প্রথম প্রতিমন্ত্রী হন। এবার তিনি যোগ দিয়েছেন ইস্পাত ও খনি দপ্তরে।

বলীরাম ভগৎ

জন্ম ১৯২২-এ পাটনা শহরে। ছাত্রাবস্থা থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। ছাত্রনেতা হিসেবে জনপ্রিয় ছিলেন। একজন খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ। '৫৭, '৬২ এবং '৬৭ তিনবারই তিনি বিহার থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৫৬-তে কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরে উপমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৬৪-তে ওই দফতরেই তিনি প্রতিমন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হন এবং শ্রীমতী গান্ধীর প্রথম মন্ত্রিসভায় তিনি একই পদে বহাল থাকেন। এবার তিনি স্থানান্তরিত হয়েছেন প্রতিরক্ষা দফতরে।

শের সিং

হরিয়ানা রাজ্যের রোহটক জেলার জাসপুর গ্রামে জন্ম উনপঞ্চাশ বছর আগে। কায়রোঁ মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি মন্ত্রী। শিক্ষা দপ্তরের নতুন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক শের সিং বেসিক শিক্ষার একজন সমর্থক এবং কৃষি, পশুপালন ও ওষুধ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন নানা রকম পরীক্ষা চালিয়ে আসছেন। ১৯৬২-তে তিনি হরিয়ানা লোক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। হরিয়ানা একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হওয়ার আগে তিনি আবার কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করেন।

ডঃ কানারু লক্ষ্মণ রাও

স্বাধীন ভারতের প্রায় সবকটি নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা রূপায়ণের হোতা শ্রীরাও একজন কৃতবিদ্য ইঞ্জিনীয়ার। দেশের এবং বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী তাঁর আছে। একসময় শ্রী রাও কেন্দ্রীয় সরকারের চীফ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। ১৯৬০-তে পদ্মভূষণ উপাধি পান। ওই বছরই তিনি কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি দফতরে প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন। লোকসভায় প্রথম সদস্য হন ১৯৬২-তে। জন্ম ১৯০২-তে। শিক্ষা মাদ্রাজ ও বার্মিংহামে। এবারও তিনি সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি দফতরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।

কে সি পন্থ

কংগ্রেস সংসদ দলের সম্পাদক শ্রী কে সি পন্থ স্বর্গীয় নেতা গোবিন্দবল্লভ পন্থের পুত্র। ছত্রিশ বছর বয়স্ক শ্রীপন্থ কংগ্রেস সংসদীয় দলের একমাত্র কর্মকর্তা যিনি এবারকার নির্বাচনে জয়লাভ করতে পেরেছেন। সার সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ এবং এবিষয়ে তাঁর একটি পুস্তিকাও আছে।

জগন্নাথ রাও

পূর্বতন মন্ত্রিসভাতেই শ্রী রাও প্রতিমন্ত্রী থেকে পূর্ণমন্ত্রীপদে উন্নীত হন। তখন তিনি ছিলেন শ্রম, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী। এবার পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও সরবরাহ দপ্তরের ভার নিয়েছেন। জন্ম ১৯০৯ সনে। অন্ধ্র ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে আইন ব্যবসা অবলম্বন করেন। কিছুদিন সুপ্রীম কোর্টেরও অ্যাডভোকেট ছিলেন। ১৯৫৭তে ওড়িশার কোরাপুট থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হন। ১৯৬২-তে নির্বাচিত হন নওরংগপুর কেন্দ্র থেকে এবং ওই বছরই তিনি প্রতিমন্ত্রী হন।

রঘুনাথ রেড্ডী

জন্ম অন্ধ্র প্রদেশের নেলোর জেলার বিরুর গ্রামে ১৯২৪-র সেপ্টেম্বর মাসে। অর্থশাস্ত্র ও দর্শনে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন ১৯৪৫-এ। লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থশাস্ত্র ও সমাজবিজ্ঞানে এম-এ এবং ওখান থেকেই আইনও পাশ করেন। প্রথমে মাদ্রাজ হাইকোর্ট এবং পরে সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিশ করেন। ইদানীং তিনি ছিলেন অন্ধ্র হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট। ১৯৬২-তে তিনি রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৬-র কমনওয়েলথ সম্মেলনে রাজ্যসভার প্রতিনিধিত্ব করেন।

কে রঘুরামাইয়া

জন্ম মাদ্রাজে ১৯১২-তে। শিক্ষালাভ করেন লখনৌ এবং ইংলণ্ডে। অন্ধ্রপ্রদেশে অ্যাডভোকেট খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫১-তে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ১৯৫২ থেকে প্রতি নির্বাচনেই শ্রীরঘুরামাইয়া লোকসভায় সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসছেন। ১৯৫৭-তে তিনি প্রতিরক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী নিযুক্ত হন। '৬২ থেকে প্রতিমন্ত্রী। এবার তিনি পরিকল্পনা, সমাজ কল্যাণ পেট্রোলিয়ম ও রসায়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী।

আন্নাসাহেব সিন্ধে

খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রীআন্নাসাহেব সিন্ধের জন্ম ১৯২২ সনের জানুয়ারিতে মহারাষ্ট্রের নাসিক জেলার অন্তর্গত [illegible] গ্রামে। পূর্বতন মন্ত্রীসভায় ছিলেন খাদ্য, কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায় দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। শ্রীসিন্ধের শিক্ষা আমেদাবাদে এবং পুণার আইন কলেজে। কৃষিজীবি ও আইন ব্যবসায়ী শ্রীসিন্ধে গুজরাতি সাপ্তাহিক 'জনসত্তা'-র সম্পাদক। '৪২-এর আন্দোলনে তিনি আত্মগোপন করেন। পরে গ্রেফতার হয়ে '৪৪ পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকেন। শ্রীসিন্ধে ১৯৫০ পর্যন্ত ছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য।

বিদ্যাচরণ শুক্লা

স্বর্গত পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্লার পুত্র। জন্ম মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে ১৯২৮-র ২ আগস্ট। নাগপুরের মরিস কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করে ওখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পাস করেন। ১৯৫৭ থেকে তিনি লোকসভার সদস্য। আগে তিনি ছিলেন সংসদীয় বিষয় ও যোগাযোগ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। নতুন মন্ত্রিসভায় তিনি স্থানান্তরিত হয়েছেন স্বরাষ্ট্র দফতরে।

ললিতনারায়ণ মিশ্র

প্রথম লোকসভা থেকেই শ্রীমিশ্র একজন সদস্য। ১৯৫৭-তে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা, শ্রম ও কর্মসংস্থান দপ্তরের সচীব নিযুক্ত হন। উপমন্ত্রী তৃতীয় লোকসভা থেকে। পূর্বতন মন্ত্রিসভায় ছিলেন সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি দফতরে, এবার শ্রম ও পুনর্বাসন দফতরে। জন্ম ১৯২৩-এ। বিহারের বহু ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত থাকায় দুবার কারাবরণ করেছেন। কংগ্রেসের সদস্য ১৯৩৯ থেকে। শ্রী মিশ্র অর্থনীতিতে এম-এ।
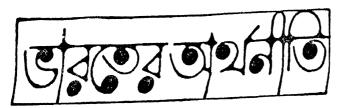
সামনের সমস্যা

কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে নবগঠিত সরকারসমূহের সামনে এখন পয়লা নম্বরের সমস্যা হচ্ছে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। পাইকারী মূল্য গত এক বছরে শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে—যার মধ্যে খাদ্যের দাম বেড়েছে সব চাইতে বেশী। ফলে, শহর ও শিল্পকেন্দ্রগুলিতে লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় শতকরা ১০ ভাগ বা তার বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। এতদিনে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মূল্যের ঊর্ধ্বগামিতা বন্ধ করতে হলে উন্নয়ন ছাড়া অন্য খাতে (অর্থাৎ উৎপাদনশীল নয় এ রকম ক্ষেত্রে) সরকারী ব্যয় একেবারে কমিয়ে ফেলা দরকার। মুদ্রা স্ফীতির সাহায্যে বাজেটের ঘাটতি পূরণের যে সহজ কৌশল বা নীতিতে সরকার এ যাবৎ অভ্যস্ত ছিল, অন্তত সামনের কয়েক বছরের মতো সেটা পরিহার করতে হবে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোজনা কালে প্রয়োজনীয় অর্থসংগতির অভাব পূরণ করা হয়েছিল অর্থ সম্প্রসারণ থেকে। সেটা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে, সন্দেহ নেই। সেই রকম, গত এক বছরে দেশে ৪০০ কোটি টাকার বেশী মুদ্রা স্ফীতি ঘটেছে এবং তার পরিপূরক হিসাবে কৃষি বা শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়নি। বাজেটের আয় ও ব্যয়ের মধ্যকার ফাঁক পূরণ করার জন্য সরকার রিজার্ভ ব্যাংক থেকে কর্জ নেওয়ায় দেশে টাকার যোগান বেড়ে গেছে। অন্য দিকে, মূলধন নিয়োগের বহরের তুলনায় উৎপাদন আনুপাতিকভাবে বাড়েনি। এবম্প্রকার কারণে যে সব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলির কাজ শেষ করা এখন জরুরী। আর্থিক ব্যবস্থায় যে উৎপাদন-ক্ষমতা নির্মিত হয়েছে তার পূর্ণতম ব্যবহারের দিকে উপযুক্ত মনোযোগ দিতে হবে।

না বললেও চলে যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সমস্যা নিরসনের আসল চাবিকাঠি হচ্ছে খাদ্যশস্য উৎপাদনের যথেষ্ট সম্প্রসারণ। গড়ে একটি গৃহস্থের মোট ব্যয়ের অর্ধেক থেকে দুয়ের তিন ভাগ খাদ্য সামগ্রীর উপর খরচ করা হয়ে থাকে, যার আবার প্রায় তিনের পাঁচ অংশ হল খাদ্যশস্য বাবত ব্যয়। (ভোগের মান যেখানে নিম্ন—জীবনধারণের পক্ষেও যথেষ্ট নয়—সেখানে ছোট ছোট চাষীদের আয় সামান্য বৃদ্ধি পেলে একই ধরনের মোটা শস্যের ভোগ তৎক্ষণাৎ বেড়ে যায়।) মুশকিল হয়েছে এই, খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন চাহিদা সম্প্রসারণের সমান অনুপাতে বাড়েনি। (উৎপাদনের বৃদ্ধি যে আদৌ ঘটেনি তা নয়। ১৯৫২-৫৩ থেকে ১৯৫৬-৫৭ এই সময়ের সংগে তুলনা করলে, দেখা যাবে যে, ১৯৬৩-৬৪ ও ১৯৬৪-৬৫ সনে মাথা পিছু প্রধান শস্যের উৎপাদন শতকরা ৯ ভাগ বেশী হয়েছিল।)।

খাদ্য সংকট

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বছরগুলি ছিল ফলনের দিক থেকে সবচেয়ে অনুকূল; পরের পাঁচ বছর অগ্রগতি মন্দীভূত হয়ে এসেছিল। তৃতীয় যোজনাকালে এই অবনতি প্রকট হয়ে উঠেছিলঃ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পরিকল্পনায় নির্ধারিত সম্প্রসারণের অনেক পিছনে পড়ে ছিল। আক্ষেপের বিষয়, ভারতীয় শিল্প কৃষি অংশের প্রসারশীল চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়নি। জলসেচের ক্ষেত্রে নির্মাণকর্মের উপকরণ, যেমন ইস্পাত, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির অনটন অগ্রগতি ব্যাহত করেছে। আবার, দেশে যে পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্ধেকের বেশী বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক খাদ্য সংকটের জন্য একাধিক কারণ দায়ীঃ—খাদ্য উৎপাদন জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাইতে যথেষ্ট বেশী হারে বাড়েনি; মাথা পিছু আয় ও খাদ্যের চাহিদার সম্প্রসারণ ঘটেছে (শহর ও শিল্পাঞ্চলের জনসংখ্যার অপেক্ষাকৃত দ্রুত বৃদ্ধি চাহিদা সম্প্রসারণকে প্রভাবান্বিত করেছে—তাতে খাদ্য পরিস্থিতির জটিলতা বেড়েছে); মূল্য ঊর্ধ্বগামী থাকায় ফাটকা লাভের উদ্দেশ্যে শস্য মজুত করে রাখা বা সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং ১৯৬৫ সনের শেষ অর্ধ থেকে দেশে পর পর খরা বা জলাভাব।

বাণিজ্য ঘাটতি

খাদ্যের পর বিশেষ উদ্বেগের ব্যাপার হল ভারতের বাণিজ্য-উদ্বৃত্তে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ (১৯৫২ সালের কথা ছেড়ে দিলে) এই সময়ের ভেতর আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ১ ভাগের কম ছিল, কিন্তু ১৯৫৬ ও ১৯৬৩ সালের মধ্যে ঐ ঘাটতি বেড়ে জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ২ থেকে ৩ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ১৯৫৫-১৯৬৪ এই সময়ে ভারতের রপ্তানি যেখানে বছরে শতকরা ৩·৬ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, আমদানি সেখানে শতকরা ৫·৫ হারে বেড়েছে।

আভ্যন্তরিক উৎপাদনের অনুপাত হিসাবে শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি সবচেয়ে বেশী হয়েছিল ১৯৫৭ সালে (শতকরা ৪৪·১ ভাগ) কিন্তু ১৯৬৪ সালে, দেখা গেল, তা শতকরা ৪২·৮ ভাগে নেমে এসেছে। এটা অবশ্য শিল্পোন্নয়নের মন্থর গতির প্রতিফলন নয় (প্রকৃতপক্ষে, শিল্প অংশ থেকে উৎপন্ন আয় সন্তোষজনক না হওয়ার জন্য অংশত দায়ী শিল্পোন্নয়নসংক্রান্ত নীতি, যাতে বেশী মূলধন-নির্ভর দীর্ঘমেয়াদী ভারীশিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়)—বরং দেশের ভেতর উৎপন্ন শিল্পসামগ্রীর আভ্যন্তরিক ভোগের সম্প্রসারণ নির্দেশ করে, যার সমর্থন পাওয়া যায় একই সময়ে মোট আমদানির অনুপাত হিসাবে শিল্পদ্রব্য আমদানির হ্রাস (শতকরা ৩৭·৬ হতে ১৯·৩) থেকে। ১৯৫৭ সনে শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি যেখানে আমদানির শতকরা ৯১ ভাগের সমান ছিল, ১৯৬৪ সনে তা আমদানিকে শতকরা ৪২ ভাগ ছাড়িয়ে গেছে।

কৃষি উৎপাদনের মতো বহির্বাণিজ্য দেশের আর্থিক অগ্রগতি অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করে। রপ্তানি থেকে উপার্জন যত বেশী হবে এবং ভোগের উদ্দেশ্যে আমদানির উপর দেশ যত কম নির্ভর করবে, ততই উন্নয়নের সম্ভাবনা প্রসারিত হবে।

শান্তিকুমার ঘোষ

যে কোনো একটি দিন

শংকর চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণার চাবি বাঁধা আঁচল অসাবধানে বুকের উপর এসে পড়লে ঘুম ভাঙে আমার। চোখ খুলে দেখি আমার উপর দিয়ে ধনুকের মত নুয়ে আছে ওর শরীর, দু' হাত বাড়িয়ে মাথার দিকের জানলাটা বন্ধ করছে ও। কিছু সময় লুটিয়ে থাকে বলে আমি আঁচলের সাদা মিহি বুনোটের ভেতর থেকে ওর শরীরটা বেশ দেখতে পাই। সকালে বড় কোমল আর লাবণ্যময় দেখায় বলে দু' হাত বাড়িয়ে ওকে বুকের উপর টেনে নিতে লোভ হয়। তখন কী করে যেন আমার জেগে ওঠাটা টের পায় কৃষ্ণা, সরে গিয়ে আঁচলটা গুছিয়ে তোলে কাঁধে।

'জেগে গেছো যখন জানলাটা তবে খোলা থাক।'

'আজ ইস্কুলে যাও নি?'

'বন্ধ আছে...স্পোর্টস দুপুরে।'

বলে খাটের পাশ থেকে সরে যেতে চাইলে আমি হাত বাড়িয়ে ওর হাতটা ধরে ফেলি। অনেকক্ষণ কাছে আসে কৃষ্ণার সুগন্ধ শরীর। শীত গ্রীষ্মে ও ভোর বেলা স্নান সেরে নেয় বলে শরীরে আমি এক ধরনের সজল প্রাকৃতিক গন্ধ পাই। এই সময় কৃষ্ণা চোখের কোণ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললে বুঝতে পারি কাল রাত্তিরে প্রচন্ড নেশা করে বাড়ি ফেরার জন্য আমার উপর এখন আর ওর কোনো রাগ নেই। যদিও কখনও কোনো কারণেই কৃষ্ণা আমার উপর রাগ দেখায়নি বা অভিমান করেনি কিন্তু তবু মাঝে মাঝে ওর শান্ত ঠান্ডা মুখ দেখলে আমি কেমন ভয় পেয়ে যাই। মনে পড়ে, কাল রাত্তিরে ও যখন সদর দরজা খুলে, রিকশার ভাড়া মিটিয়ে, আমায় ঘরে টেনে আনছিল আর আমি ধুলোলাগা জামাকাপড়ে, এলোমেলো চুলে ওকে কী একটা জরুরী বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম, তখন এক পলক ও ওর কেমন এক ধরনের শান্ত ঠান্ডা মুখ তুলে তাকিয়েছিল আমার দিকে। নেশাটা ফিকে হয়েছিল, চুপচাপ আর একটিও কথা না বলে আমি বালিশে মুখ গুঁজে তারপর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ও হেসে উঠলে আমি ভালো করে তাকিয়ে ওর হাসিটা লক্ষ করি। তারপর এক সময় কৃষ্ণা আমার হাত ছাড়িয়ে অন্য ঘরে চলে গেলে আমি চোখ খুলে রেখে বিছানায় পাশ ফিরে শুই।

বাইরে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে টাটকা রোদ, ভেতরটা ঝরঝরে নিখুঁত এবং তাজা লাগে। এই ধরনের সকালগুলোয় মনের ভেতর একজাতীয় উষ্ণতার বোধ জেগে ওঠে, বড় কিছু একটা করতে ইচ্ছে হয়, নিজের আয়তন ; শরীরের কাঠামো ছাড়িয়ে বিশাল হয়ে যায়, বুকের ভেতর কেমন এক ধরনের পবিত্র গন্ধ ভেসে বেড়ায়। এজাতীয় সকালে বহু দিনের জমানো ঋণ শোধ করতে ইচ্ছে হয়, কোনো কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা মনে পড়ে। লোভ হয় যে, কোনো মানুষের পায়ের তলায় হাঁটু ভেঙে বসে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে, কোনো জঘন্যতম শত্রুকেও দয়া দেখাতে সাধ জাগে। সমস্ত শরীরে এই বোধ কাজ করে বলে আমি টানটান করে বিছানায় মেলে দিই নিজেকে। পা বিছানা ছাড়িয়ে, খাটের সীমানা ছাড়িয়ে, বেরিয়ে ঝুলতে থাকে। বাঁ পায়ের গোড়ালির দিকের পুরনো ব্যথাটা

একবার চিন চিন করে উঠে মিলিয়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে পারুলের স্মৃতি জেগে ওঠে আমার বুকের মধ্যে। অন্য কোনো দিনের সকাল হলে পারুলের স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভেতরটা দারুণ রাগে পুড়ে যেত। কিন্তু আজ, আশ্চর্য, রাগের পরিবর্তে কেমন মায়া হয় আমার ওর জন্য। পারুল, তুমি যেখানেই থাকো না কেন, আজ এই মুহূর্ত থেকে, আমি তোমায় চিরকালের মত ক্ষমা করে দিলাম। যদিও ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য নও তুমি। মনে পড়ে কী, একটা এক মুগ্ধ লাজুক ভীরু কিশোরের দীর্ঘকালের গোপন ভালোবাসার দিকে আঙুল তুলে কী ভয়ংকর হেসে উঠেছিলে তুমি আর তোমার সেই বাবরি-চুল নাচের মাস্টার। তার সাকরেদের দলটা ছুটে গিয়ে ঘিরে ধরেছিল ছেলেটিকে। ওদের চীৎকার হল্লার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভয়ে, বিস্ময়ে, লজ্জায়, ছেলেটি থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। তারপর ওরা বিনা কারণে যথেচ্ছাচারে নির্যাতন চালিয়েছিল ওর উপর। ওদের লাথি, চড়, ঘুঁষির ঝড়ের মধ্যে ছেলেটি দুহাত তুলে নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে দিশেহারার মত ছুটেছিল রাস্তা দিয়ে, একবার খোয়া ওঠা মিউনিসিপালিটির গর্ত-খোঁড়া রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। মচকে গিয়েছিল বাঁ পায়ের গোড়ালিটা। অথচ তুমি তো ভালো করেই জানতে পারুল, কোনো অন্যায় ছিল না ছেলেটির; ও কেবল বিকেলের দিকে তুমি যখন বাবরি-চুল সাকরেদ পরিবৃত মাস্টারের কাছে নিত্য নতুন নাচের তালিম নিতে ও শুধু তখন তোমার খোলা জানলার ও-পাশে রাস্তায় মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ঐ সময়টুকু ছাড়া ছেলেটিকে দিনের মধ্যে আর কখনও দেখতে পেতে না তুমি। অথচ বৃথাই পারুল, তুমি ওর দিকে আঙুল তুলে নিষ্ঠুর হাসি হেসে উঠেছিলে সেদিন।

পারুলকে চিরকালের মত সেই মুহূর্তে ক্ষমা করে দিয়ে আমি প্রফুল্ল মনেই বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমে যাই। আমাদের এক-তলার ছিমছাম ফ্ল্যাটের বাথরুমের আয়নায় কোমর পর্যন্ত নিজের আকৃতির দিকে তাকিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নতুন লাগে আমার। ফর্সা রঙের শক্ত কাঁধের উপর লম্বা চুল, ঘাড়, বুকের পাশ দিয়ে নেমে যাওয়া লাবণ্যময় পেশী, পোকায় খাওয়া কালচে অসমান দাঁতে ব্রাশ ঘষতে থাকা ভারী আঙুল, চওড়া কব্জি, নিষ্প্রভ এক জোড়া দুর্বোধ্য চোখ, চাপা নাক ইত্যাদি সব মিলিয়ে নিজের কেমন এক ধরনের নতুন চেহারা মনে হয়। আমি নিজের দিকে তাকিয়েই স্নিগ্ধ পবিত্র কোনো হাসি হাসবার চেষ্টা করি। হাসিটা পেস্টের ফেনা মেখে পুরু ঠোঁটের উপর বেশ খানিকটা ছড়িয়ে যায়, চোখের দৃষ্টিটাও কেমন স্বচ্ছ দেখায়। [illegible] বিনা [illegible], একটুও চেষ্টা না করেই অমন হাসি হাসতে পারব [illegible]। আজ আমি সেই মানুষ, যার পৃথিবীর কারো উপর কোনো রাগ, বিদ্বেষ বা ঘৃণা নেই, [illegible] আমি [illegible] সকলকে ক্ষমা করে [illegible] কারো [illegible] না [illegible]। এই সব কথা [illegible] পরিষ্কার করে নিই। এই সময় [illegible] ফ্ল্যাটের গ্রামোফোনে [illegible] একটা গান। [illegible] বেশ পবিত্র [illegible]।

[illegible] অনায়াসেই আমি [illegible] কলাপাতা রঙের আকাশ ও [illegible] দৃশ্যাবলী দেখে নিয়ে [illegible] দরজা দিয়ে ঢুকতে গেলেই একটা চিঠি [illegible] হাত আচমকা আমাকে বাধা দেয়। আমি এক পা পিছিয়ে যেতেই [illegible] থেকে ঝুমকার পরিষ্কার গলার স্বর।

'কাল বিকেলে এসেছিল।'

আমি হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলি, 'কার?'

'পড়েই দেখো না।'

ওর গলাটা শেষ দিকে কেমন অন্যরকম শোনালেও আমি কোনো উদ্বেগ বোধ করি না। বরং ধীরে সুস্থে পরিপাটি করে আয়নায় চুল আঁচড়ে, চেয়ারে বসে, চায়ে চুমুক দিতে দিতে, চিঠিটা পড়তে শুরু করি। অন্য দিন হলে এই ধরনের চিঠির বেলায় ইতির নামটি দেখে নিতুম আগে কিন্তু আজ প্রথম থেকেই পড়া শুরু করি। সংক্ষিপ্ত চিঠির খুদে খুদে অক্ষরগুলো বেশ সহজেই পড়া যায়।

সন্তু,

দুশোটা টাকা পাওনা আছে তোমার কাছে দীর্ঘকাল। এতদিন ভুলে ছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ল। টাকাটা এখন পেলে ভালো হয়। আমাকে মনে আছে তো? কী করছ আজকাল? ইতি। প্রবীর।

ওঃ প্রবীর, কী করে ভুলব তোমাকে। তুমি যে শেষ পর্যন্ত সুষমাকে বিয়ে করেছিলে সে জন্যে গোপনে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে আছি চিরকাল। যদিও তোমার বা সুষমার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর মত মনের জোর আমার হয়নি কখনও। তবু দূরে থেকে, আমি মনে মনে তোমাকে, প্রবীর, নমস্কার করেছি বহুবার।

আমি বেশ সহজ গলায় কৃষ্ণাকে ডেকে প্রবীরের কথা বলি তারপর।

'আজ দুপুরে বেরুব, দিয়ে আসব টাকাটা।'

'কিন্তু দুপুরে কেন?'

বলতে গিয়ে ওর গলার স্বরটা কেঁপে যায়। আমি বুঝতে পারি ভয় পাচ্ছে কৃষ্ণা আমার হটকারিতার জন্য। ওর কাছে কিছু গোপন নেই বলে আতঙ্কটা স্বাভাবিক লাগে আমার। একথা ঠিক দিনের আলোয় কিছুদিন যাবৎ শহরের রাস্তায় বেরুনো আমার পক্ষে তেমন নিরাপদ নয়। দুষ্কৃতিকারী, সমাজ বিরোধী, জুয়াড়ী গগন চৌধুরীর জন্য বিভিন্ন রাস্তায় শত্রু পক্ষের লোকেরা ওত পেতে আছে সব সময়, এ-কথা কৃষ্ণা ভালো করেই জানে। আর সে এও জানে, একবার ওরা যদি আমাকে ধরতে পারে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তবু বুকের মধ্যে যে অসম্ভব বোধ আজ জেগে উঠেছে আমার তার কাছে সমস্ত বিপদকেই তুচ্ছ লাগে। আমি হেসে উঠে বলি, 'ভয় নেই আমি সাবধানে থাকবো।'

বলে আবার চিঠিটা দেখতে থাকি। এই-বার ভালো করে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে টের পাই চিঠিতে প্রবীর তার অফিসের ঠিকানা নিশ্চিত আমাকে দেখে ঘৃণায় সমস্ত শরীর দিয়েছে। তবে কী ও বা সুষমা এখনও আমার দুষ্কর্মটাকে ভুলতে পারে নি, নাকি ওরা ভয় পায়, ঘেন্না করে আমাকে? এতদিন বাদে, এখনও। নিজের প্রতি ক্ষুদ্রতার ভাব জাগা স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু কেন যেন মনে হয় আমার আসলে হয়ত সুবিধাজনক বলেই প্রবীর চিঠিতে তার অফিসের ঠিকানা দিয়েছে। হয়ত বাড়ির ঠিকানাটা তাদের জটিল, গোলমেলে। বুকের ভেতর পবিত্রতার ভাব জেগে উঠলে যা হয়, আমিও প্রবীরকে আমার প্রতি অহেতুক সন্দেহ বা ঘৃণার জন্য ক্ষমা করে দিই। তা ছাড়া সত্য কথা বলতে কি, সুষমা বা প্রবীরের কাছে আন্তরিক ঘৃণাই তো আমার প্রাপ্য। আমি ঘটনাটা ভুলে যেতে চাইলেও সুষমার পক্ষে তা কী ভোলা সম্ভব? তবু আজ আমি একবার গিয়ে দাঁড়াবো ওদের দুজনের সামনে, প্রবীরের ঋণ শোধ করব, সুষমার কাছ থেকে ভিখারীর মত চেয়ে নেবো ক্ষমা।

খুলতে যাবে সুষমার, আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলবে, ফ্যাকাশে দেখাবে মুখ, ঠোঁটের উপর বসে যাবে সামনের পাটির দাঁত, বলা যায় না হয়ত মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ভয়ংকর গলায় বলবে, পশু, পশু, চলে যাও তুমি এখান থেকে, এই মুহূর্তে। তখন কী করার থাকবে আমার, কী করব আমি? প্রবীর আমাদের দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকবে আমার দিকে। তখন কী আর সাহস বা দৃঢ়তা অবশিষ্ট থাকবে আমার, আমি কী নতজানু হয়ে সুষমার পায়ের তলায় বসে পড়ে আন্তরিক দুঃখিত গলায় বলতে পারবো, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো আমাকে।

ওর ক্ষমা যে পেতেই হবে আমাকে, যে কোনো উপায়ে হোক। ওটুকু ছাড়া যে চলবে না আমার। কতকাল আর আমি এমন অভিশপ্ত, অশুচি হয়ে থাকবো। তোমার অভিশাপে কিছুই এসে যায় না আমার, সুষমাকে বলেছিলাম মনে আছে, কিন্তু যায় যে তা কী এতদিনেও বুঝিনি আমি। কিন্তু আজ সুষমা যদি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দয়াহীন থেকে যায়, তাহলে। আমাকে আন্তরিকভাবে বেদনায় ভেঙে যেতে দেখলেও কী ওর মায়া হবে না এতটুকু। এতখানি হৃদয়হীন কী হতে পারবে তুমি সুষমা? আমি নিশ্চিত জানি ও শেষ মুহূর্তেও আমাকে বিশ্বাস করবে না, কারণ সুষমা জানে আমি একটা পশু। ওর ধারণা পশুত্ব আর নোংরামি ছাড়া আমার আর কিছু নেই। যে আমাকে হৃদয়ের গভীর পর্যন্ত পশু বলে জানে তার কাছে কী দিয়ে, আমি, নিজের মনুষ্যত্ব প্রকাশ করব? তুমি কেন আমাকে এমনভাবে নষ্ট করেছিলে?

মনে আছে, গোড়ালিতে ব্যথা নিয়ে আমাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল কয়েক মাস। পারুলের প্রতি দারুণ অভিমান নিয়ে আমি শুয়ে থাকতাম, মাঝে মাঝে ওর নাচের মাস্টার আর তার সাকরেদদের জব্দ করার বিভিন্ন সব প্ল্যান আমার মনের মধ্যে কাজ করত। তারপর একটু একটু করে সেরে উঠে আবার যখন সুস্থভাবে চলাফেরা শুরু করলাম ততদিনে কেমন যেন পরিবর্তন হয়ে গেছে আমার। যেন যা পারুল তার নিষ্ঠুরতা দিয়ে আমার চরিত্রের সবচেয়ে সুকুমার ও কোমল দিকটা কালি মাখিয়ে নোংরা করে দিয়েছিল। আমি ভীষণ ক্রোধী, সাহসী আর বকাটে হয়ে যাচ্ছিলাম ক্রমশ। একটা চোরা ঘূর্ণি যেন তার বুকের মধ্যে টেনে নিচ্ছিল আমাকে। আমি ভেসে যাচ্ছিলাম বল্গাহারা হয়ে। নেশা, যাবতীয় নষ্টামী ও চরিত্রহীনতার মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলাম। এই সময় খবর পেলাম পারুল তার নাচের মাস্টারের সঙ্গে কলকাতায় পালিয়ে গেছে। সংবাদটা আমাকে সেই অবস্থায়ও দিন দুয়েকের জন্য বিমর্ষ করে রেখেছিল। কী গভীর আর পবিত্র ছিল সেই বয়সের মুগ্ধ ভালবাসা, এখন মনে করতেও গা সিরসির করে ওঠে!

সুষমা গগনের যে পরিচয় পেয়েছিল সে সময়ে ততখানি অমানুষ কিন্তু হয়ে যেতে পারিনি তখনও। কিন্তু হচ্ছিলাম। পারুলের প্রতি তীব্র অভিমান বলে আমি তখন কিছুকাল শহরের মধ্যে ওদের পাড়াটাকে এড়িয়ে চলতাম। তাই টের পাইনি পারুলের সেই ফ্রক পরা লাজুক মিষ্টি চেহারার বোনটি কবে ধীরে ধীরে যুবতী হয়ে উঠেছিল। যেদিন টের পেলাম, সেদিন থেকে একটা ভয়ংকর চক্রান্ত নিয়ে আবার যাতায়াত শুরু করলাম ওদের পাড়ায়। ছুটন্ত সাইকেলের সিটে বসে আমি দেখতে পেতাম সুষমাকে। আমার দুরন্তপনার দিকে তাচ্ছিল্য ও গর্বভরে সুষমা একঝলক তাকাতো। সুন্দর কপাল, গুচ্ছ গুচ্ছ নরম চুল, ঈষৎ বাঁকা সুন্দর ঠোঁট ও টানা ভ্রূর তলায় উজ্জ্বল চোখ ইত্যাদি সব মিলিয়ে অসহ্য সুন্দর একটি মুখ। যতবারই ওর দিকে তাকাতাম মুগ্ধতার পরিবর্তে আমার বুকের ভেতর ফুঁসে উঠত চাপা রাগ, দাঁতে দাঁত ঘষে যেত, আমি দিনরাত্রি ধরে ঐ সুন্দর চেহারার মেয়েটির সর্বনাশের কথা ভাবতাম। যদি শোধ তুলতেই হয় তবে পারুলের অন্তর্ধানে সুষমার ওপরেই তুলতে হবে। ও ছাড়া নষ্ট করার মত আর কীই বা সম্পদ ছিল ওদের সংসারে। একজন যুবতীর স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধ থেকেই সুষমা আমার উদ্দেশ্যটা টের পেয়েছিল বলে আমাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলছিল। কিন্তু একদিন আর পারল না কিছুতেই।

সন্ধ্যে থেকেই টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল সেদিন, রাত দশটা নাগাদ টাউন হলে বাৎসরিক থিয়েটার দেখে একদল বন্ধুর সঙ্গে সুষমা দ্রুত রাস্তায় হাঁটছিল বাড়ি ফেরার জন্য। আমি ছায়ার মত লুকিয়ে ওকে অনুসরণ করছিলাম। সুষমার বন্ধুরা

[illegible] বাড়ির [illegible] কাছে এসে [illegible] আমি দেখতে পেলাম ও একা একা মাঠের রাস্তায় [illegible]। আমি আর একমুহূর্তও অপেক্ষা না করে ওর [illegible] পেছনে চলতে শুরু করলাম। মাঠটা নির্জন, টিপটিপ বৃষ্টি, অন্ধকার আর হাওয়ার ঘূর্ণি। সুষমাকে অনুসরণ করতে গিয়ে আমার শরীরটা কেমন অস্থির অস্থির লাগছিল, কাঁপছিল উত্তেজনায়। আমি বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে ও আমার আগে আগে। অন্ধকারের মধ্যে থেকেও আমি সুষমার হাঁটবার ভংগীর সংগে পারুলের পা ফেলার অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছিলাম। সেই ঈষৎ লঘু গা দোলানো চলার ভংগী। আমার বুকের ভেতর গরম বাতাস বইছিল, পুড়ে যাচ্ছিল। আমি স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার পায়ে শব্দ হয়ে থাকবে। সুষমা দ্রুত পেছনে একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। আর সংগে সংগে আমি পা চালিয়ে একেবারে ওর গা ঘেঁষে শক্ত হয়ে দাঁড়ালাম।

'সুষমা দাঁড়াও।' অদ্ভুত শোনাল আমার গলার স্বরটা নিজের কানেই। 'কথা আছে।'

'কী।' প্রচণ্ড অন্ধকারের ভেতর ঘুরে দাঁড়িয়ে সুষমা কথা বললে হুহু হাওয়ায় ওর গলার স্বরটা উড়ে গেল।

আমি কেবল কানের পর্দায় ঝোড়ো হাওয়ার গর্জন শুনতে পেলাম। কিছুতেই মনস্থির করে উঠতে পারছিলাম না ওকে নিয়ে সেই অবস্থায় কী করব আমি। কেবল 'প্রতিশোধ, প্রতিশোধ' বলে বুকের মধ্যে খালি খালি শব্দ হচ্ছিল আমার।

'তোমাকে আমার চাই যে সুন্দরী।' কোনো নাটকের খল নায়কের সংলাপ চুরি করে আমি তখন ছুঁড়ে মারলাম ওর মুখের উপর। জ্ঞানশূন্যের মত নিজের সম্পূর্ণ অজান্তেই আমি উচ্চারণ করলাম কথাগুলো। 'অসভ্য, বর্বর।' বলতে বলতে ঘাড় ফেরাল সুষমা আর সংগে সংগে দাউ দাউ করে যেন আগুন ধরে গেল আমার শরীরে। আমি লাফ দিয়ে ওর পথ আটকে

দাঁড়ালাম তারপর, দুহাত বাড়িয়ে আচমকা ওকে বুকের উপর টেনে আনলাম জোরে।

'খবরদার, ছেড়ে দাও আমাকে।' সুষমার রাগী সাহসী গলার স্বরটা কানে গেল না আমার।

হা হা করে উন্মাদের মত হেসে উঠলাম একবার। ওর শরীরের গরম হলকা আমার চোখে মুখে এসে ঝাপটা দিল। আমার আলিঙ্গনের মধ্যে সুষমার শরীর ছটফট করে উঠল। ওর চুড়িপরা একটা হাত আমার বুকের উপর কিল মারছিল জোরে জোরে। আমি একসময় প্রবল ভাবে সুষমাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আমার মুখটা নামিয়ে আনলাম। হিংস্র একটা উল্লাসে আমার দাঁতে দাঁতে শব্দ হতে লাগল। মুখটা দ্রুত ওর মুখের ওপর নামিয়ে আনতে আনতে শুনলাম ওর গলার স্বর।

'শয়তান, শয়তান কোথাকার, ছেড়ে দে আমাকে।'

সুষমা পাগলের মত চীৎকার করছিল। আমার ঠোঁট ভীষণভাবে ওর মুখের উপর বিঁধে যাচ্ছিল, আমি দাঁত দিয়ে ওর গালের মাংস কামড়ে ধরছিলাম তারপর। সুষমা দারুণভাবে মুখটা সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল আর একসময় আচমকা সুযোগ পেয়ে মুখটা সরিয়ে নিয়ে ও আমার একটা হাত কামড়ে ধরল। ওর দাঁত ভয়ংকরভাবে আমার হাতের চামড়া ভেদ করে হাড়ের উপর বসে গেল। আমি যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠে এক ঝটকায় সরিয়ে দিতে গেলাম ওকে। হাতের ঝটকায় ও নিজেকে সামলাতে পারল না, মাটিতে ছিটকে পড়ল, আমার কব্জি থেকে তখন রক্ত পড়ছিল। আমি এত হাতের মুঠোয় কব্জিটা চেপে ধরে নিজেকে সামলে নিতে গেলে সুষমা দ্রুত উঠে দাঁড়াল মাটি ছেড়ে, তারপর আর কোনো দিকে না তাকিয়েই ছুটতে লাগল মাঠের ভেতর দিয়ে। আমিও ওর পেছন পেছন ছুটলাম কিছুক্ষণ। প্রবল অস্থিরতার পর আমার শরীরটা কেমন খালি খালি লাগছিল তখন। সুষমার সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দিয়ে উঠতে পারলাম না আমি। তারপর একসময় আর দেখা গেল না ওকে।

সেদিন রাত্রেই চুপি চুপি শহর ছেড়ে পালালাম আমি। সেই সুষমার কাছে আজ এতদিন বাদে যদি গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাই, তাহলে...?

আমার বুকের মধ্যে বিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞা যুগপৎ কাজ করে বলে আমি আর ওই কঠিনতম প্রশ্নটির মুখোমুখি দাঁড়াই না বেশীক্ষণ। স্নান করে চটপট খাওয়া সেরে নিই। নিতান্তই অপছন্দ তবু গায়ে আজ একটা সাদা শার্ট চাপিয়ে, প্রবীরের ঋণ শোধের টাকাটা পকেটে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে গেলে কৃষ্ণা এসে দাঁড়ায়। কেমন অদ্ভুত দেখায় ওর মুখ চোখের চেহারা। আমি হেসে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে কোমল গলায় বলি, 'ভয় নেই, সাবধানে থাকবো আমি।'

মনুষ্যত্ব স্পর্শ করবো বলে আমি কার্তুজ, চোরাই পিস্তল, চিহ্নিত তাসের প্যাকেট ও কালো চশমা ফেলে রেখে বহুদিন বাদে নিরস্ত্র রাস্তায় নামি ও বেশ সহজেই বুঝতে পারি ঋণ শোধ বা ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়ার ব্যাপারটায় অনেক দেরি হয়ে গেছে আমার। এতকাল তবে আমি কোন মানসিকতার মধ্যে ছিলাম, কীসের জন্য আজ সকাল পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হল? ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারি না কেন, তবে এটা বুঝতে পারি আজ সকালের বোধটা খুব সহজে পাওয়া যায়

না। হয়ত এর জন্য অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘকাল। আর অবচেতনায় সেই অপেক্ষাই বুঝি করেছি আমি এতকাল।

কোনো চিন্তা ভাবনাই আর আমাকে পরাজিত বা পীড়িত করতে পারে না বলে আমি ভিড়ের বাসে এতটুকুও বিরক্ত না হয়ে হাসিমুখেই উঠে পড়ি। আশ্চর্য হয়ে এতক্ষণ পর লক্ষ করি সকলের থেকে নিজেকে যেন ভিন্ন ধরনের লাগে আমার। বড় মায়া দিতে ইচ্ছে হয় সকলকে। ক্ষমার ভাবে জেগে ওঠায় যথেচ্ছাচারে মনুষ্যজন আমাকে মাড়িয়ে চলে যায়। শরীরের বিভিন্ন অংশে অহেতুক চাপ ও ব্যথা সহ্য করে নিয়ে শনিবারের দুপুরে বারোটায় [illegible]পাড়ায় এসে নামি। প্রবীরের অফিসটা খুঁজে বের করতে তেমন অসুবিধা হয় না। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পেয়ে যাই। গম্ভীর বনেদী প্রাচীন চেহারার অফিস বাড়ি[illegible] পা [illegible] হঠাৎ [illegible] ওঠা [illegible] চেহারার একটা বাড়ির তেতলায় উঠতে হয় আমাকে। শৌখিন করিডোর পেরিয়ে [illegible] প্রবীরের নাম [illegible] মুচকি একটু হেসে তার দীর্ঘ আঙুল [illegible] একটা ঘর দেখিয়ে দেয়। [illegible] পড়ল।'

আমি [illegible] একটা ঘরের [illegible] [illegible]

[illegible] পিঠ টান করে বসে প্রবীর। [illegible] মাঝে আমার একটা হাসি [illegible] আমার দিকে তাকিয়ে দ্রুত গলায় বলে, 'আরে সন্তু, এসো, এসো।'

আমি [illegible] বসতে বসতে ভালো করে খুঁটিয়ে লক্ষ করি প্রবীরকে। প্রথমে একটু খটকা লাগে। অচেনা মানুষের চেহারার সঙ্গে মেলে না সামনে বসা, চোখ তুলে তাকানো মানুষটার। দু এক পলক তাকিয়েই আমি প্রবীরের বর্তমান চরিত্রটা বুঝে ফেলি। একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে ও। সেই উনিশ চৌত্রিশের আদর্শবাদী, বন্ধু-বৎসল মানুষের সঙ্গে আজকের চোখে-মুখে দাগ ধরা, শৌখিন পোশাকের, মানুষটির অনেক তফাত। মনে পড়ে, সুষমার সঙ্গে কেলেঙ্কারিটার পর শহর ছেড়ে পালানোর রাতে, বিনা দ্বিধায়, চাওয়া মাত্র ধার করে দু শো টাকা এনে দিয়েছিল ও আমাকে।

চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসলে পর প্রবীর নকল একটা হাসি হাসে।

'কী ব্যাপার, এতকাল পর হঠাৎ উদয় তোমার?' বড় দ্রুত গলায় কথা বলে ও। আর কথা বলার ধরনে আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টাটাও ধরা পড়ে।

'কী আর, এমনি পথে পড়ল।'

উঠে যেতে ইচ্ছে হয় আমার। কেমন বিশ্রী লাগতে থাকে প্রবীরকে।

'আজকাল কী করছ-টরছ?'

'এই টুকিটাকি ব্যবসা।'

'আরে বাবা, স্বাধীন তো! বেশ আছো, নিজের কাজ যখন হয় করলে, অন্যের দাসত্ব তো আর করতে হচ্ছে না, হলে ঠেলা বুঝতে। হেঃ হেঃ...' কথা বলার সময় আমি লক্ষ করি, প্রবীরের চিবুকের তলায় বাড়তি মাংসের থরটা কাঁপছে। ওর ঐ অদ্ভুত ধরনের হাসিটা আচমকা শেষ করে জিভ দিয়ে সামনের পাটির দাঁতটা চেপে ধরে, বুঝতে পারি নতুন দাঁত বাঁধিয়েছে ও।

এই সময় তীব্র শব্দে টেবিলের উপর ফোনটা বেজে ওঠে। জিভ দিয়ে সামনের পাটির দাঁতটা চেপে ধরে দ্রুত হাত বাড়িয়ে ফোনটা তুলে নেয় প্রবীর। তার হাতের দ্রুত ভঙ্গী দেখলে বোঝা যায়, ঐ ফোনটা বেজে ওঠার অপেক্ষায় সে এতক্ষণ ওত পেতে বসে ছিল টেবিলে।'

'ঘোষ স্পীকিং।' ওপাশ থেকে কি যেন

শুনতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ মুখ উজ্জ্বল করে তারপর বলতে থাকে। 'না, না, মশাই, আর বিশ্বাস নেই আপনার ওপর... একটাও মিলল না গত শনিবার...অ্যাঁ, কী বলছেন...আজকের খবরটা পাকা...কাল... কোথায় দেখা হল...ও বুঝেছি, বুঝেছি... হ্যাঃ ঠিক আছে...তা ২-৩-৫ ঠিক আছে, আমার ক্যালকুলেশানেও তাই বলছে...তা লিখে নিন পঞ্চাশ—হ্যাঁ টাকাটা সোমবার সকালে অফিসেই পাবেন...অ্যাঁ কী বলছেন, আগে কখনও মার গেছে কী আপনার টাকা ...তবে সেই কথাই রইল।' বলতে বলতে সাদা কাগজের ওপর ডট-পেন্সিলে কী যেন একটা দ্রুত লিখে নিয়ে তারপর ফোনটা নামিয়ে রেখে একটু হাসল প্রবীর।

'আর বল কেন, যত বাজে সব।' বিরত গলায় অথচ যেন সত্যি সত্যিই বলছে এমন ভাবে বলল, 'একদম মেলে না।'

স্থিরভাবে আমি যে ওর দিকে চেয়ে আছি দেখে 'চা খাবে তো' বলে যেন কোনোরকমে আমার সামনে চায়ের প্রস্তাবটা গছিয়ে দিয়ে নিস্তার পেয়ে বেল বাজাতে গেলে আমাকে জোর করেই তাকে বাধা দিতে হয়।

প্রবীরের উপস্থিতিটা সহ্য হয় না বলে আমি ওর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে মাথা নামিয়ে টেবিলটা খুঁটিয়ে দেখি। দোয়াতদানি, টেবিল ক্যালেন্ডার, পেন-হোল্ডার, তারপর বাঁকা কাগজ-কাটা ওর শৌখিন প্লাস্টিকের বিচিত্র নকশা করা ছুরিটা তুলে নিয়ে দেখতে থাকি। প্রবীর গলগল করে কী যেন বলে যেতে থাকে, তার একটিও বাক্য কানে ঢোকে না আর হঠাৎ সেই সময় পাশের জমিতে কনস্ট্রাক-শনের মেশিন বিকট শব্দ করে চলতে শুরু করে। সেই শব্দে সব কিছু চাপা পড়ে যায় একসময়। হঠাৎ প্রবীরের কথা থেমে গেলে আমি ওর দিকে চোখ তুলে তাকিয়েই অবাক হই। ফ্যাকাশে মুখে আমার হাতের দিকে তাকিয়ে আছে প্রবীর, ওর ঠোঁটটা অদ্ভুতভাবে কাঁপছে, বিনবিন করে ঘাম ফুটেছে ওর কপালে। ওর হঠাৎ ভয় পাওয়া মুখের চেহারাটা লক্ষ করতে গিয়ে আমার নিজের হাতের দিকে খেয়াল পড়ে। চোখ নামিয়ে দেখি, খেলার ছলে কাগজ-কাটা ছুরিটা নাড়াচাড়া করতে করতে কখন যেন সেটা আমার মুঠোয় হিংস্র ভঙ্গীতে প্রবীরের হৃৎপিণ্ড লক্ষ করে উঁচু হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ছুরি ধরা মুঠোটা ঠিকভাবে রেখে আমি শান্ত স্থির গলায় বলি, 'বাড়ির ঠিকানাটা কী তোমার ?'

'কেন ?' হঠাৎ আতংকগ্রস্তের মত অস্ফুটে বলে ও।

'সুষমার সঙ্গে আমার একটা ভীষণ জরুরী প্রয়োজন আছে। একবার দেখা করব।' নিজের গলাটা নিজের কানেই কেমন

শীতল শোনায়। ছুরির বাঁটে ধরা মুঠোটা শক্ত হয়ে চেপে বসে। নিজেরই অজ্ঞাতে সম্পূর্ণ রহস্যময় বাক্যালাপ শুরু হয় আমার।

'তা আজকে তো আমি এখন বাড়ি যেতে পারছি না, যদিও আমাদের শনিবার সাড়ে বারোটায় ছুটি, তবে বুঝলে কিনা, আমায় অফিসের পর আজ একটা জায়গায় যেতে হবে।' বলতে বলতে হৃদাতার সুরেই চোখটা একটু সরু করে ফেলে প্রবীর, বিবর্ণ ঠোঁটে হাসে।

'দরকারটা সুষমার সঙ্গে, আমার ঠিকানাটা দাও, আমিই খুঁজে নেবো।' নির্বিকার শীতল গলায়ই কথাগুলো বলি আমি। প্রবীরের মুখটা আরো ফ্যাকাশে দেখায়। তারপর ঝুঁকে পড়ে একটা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে দ্রুত হাতে ঠিকানাটা লিখে অস্বস্তির মত বাড়িয়ে দিতে দিতে বলে, 'বাড়িটা একটু গোলমেলে জায়গায় কিনা, তাই বলছিলাম...।' প্রবীরের কপাল চুঁইয়ে ঘামের ফোঁটাগুলো শুরু হয়ে গালের ওপর নামে, আমি লক্ষ করি। ঠিকানাটা মুড়ে পকেটে রেখে উঠে দাঁড়াই, আমার হাতের মুঠো থেকে প্লাস্টিকের ছুরিটা অবহেলায় টেবিলের উপর পড়ে যায়।

তারপর সুইং ডোরটা ঠেলে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে হঠাৎ কী যেন একটা মনে পড়ে যায় আমার, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলি, 'আমাকে ক্ষমা করো, প্রবীর।'

বড় আন্তরিক আর দুঃখিত শোনায় আমার গলার স্বর তখন।

রাস্তায় বেরিয়ে আমি এক প্যাকেট ভালো সিগারেট কিনে নিই পানের দোকান থেকে, ঘষা-আয়নায় এক ঝলক নিজের হঠাৎ-লাল হওয়া অন্যরকম মুখ দেখতে পাই। ভীষণ জলতেষ্টা পায় আমার সেই সময়। একটা সিগারেট ধরিয়েই তৃষ্ণাটা উপেক্ষা করে তারপর ব্যস্ত হয়ে রাস্তায় ছোটাছুটি করে অফিস-ফেরত জনতার ভিড়ের মধ্য থেকে অসম্ভব চেষ্টায় একটা খালি ট্যাক্সি পেয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে উঠে বসি। সিটে হেলান দিয়ে বসতে গেলে আমার সাদা শার্টের পকেটে প্রবীরের ঋণ শোধের টাকাটা খরখর করে ওঠে।

ট্যাক্সিটা অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত রাস্তা হ্

হু হু করে পার হয়ে যেতে থাকলে আমি চাপা গলায় বুঝি বা সম্পূর্ণ বিস্মৃতপ্রায় অবস্থার মধ্য থেকে ড্রাইভারের পিঠে নাড়া দিয়ে বলে উঠি, 'একটু তাড়াতাড়ি যাবেন, বড় জরুরী।'

তারপর ট্যাক্সিটা সরু একটা গলির মুখে থেমে পড়লে আমি ভাড়া মিটিয়ে রাস্তায় নামি। জটিল আর এ'কেবেঁকে গলিটা যেখানে শেষ হয়েছে, প্রবীরের হাতে লেখা ঠিকানাটার সঙ্গে একটা বাড়ির ঠিকানা মেলে।

দরজার কড়া নাড়তে ভেতর থেকে দরজাটা খোলে সুষমা আর সঙ্গে সঙ্গে জোরে হাওয়া দিয়ে অসময়ে বৃষ্টি নামে। খোলা দরজার একটা পাল্লা ধরে দু-এক মুহূর্ত স্থিরভাবে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুষমা। দু এক মুহূর্তেই আমি দেখি কেমন কৃশ আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ওর চেহারাটা। শরীরে সেই তেজী, ঝকঝকে ভাবটা আর নেই। স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সুষমা বলে, 'ও, আপনি!' অস্ফুটে আর উদাসীন গলায় কথা বলে ও। আমার শরীরটা শক্ত হয়ে যায়, বুকের ভেতরটা কাঁপতে থাকে।

'তোমার সঙ্গে ভীষণ প্রয়োজন আমার, সুষমা। দু-একটা কথা বলবার সুযোগ দেবে?' ওর নির্লিপ্ত দৃষ্টিটা একবার আমার মাথার ওপর দিয়ে বৃষ্টির তোড়জোড়টা দেখে নিয়ে আমাকে ঘরে ঢুকবার জায়গা করে দিতে সুষমা একটু সরে যায় কপাটের ওপাশে।

'বেশ, আসুন।'

আমি ঘরের ভেতর ঢুকে আর কোনো দিকে তাকাই না, নীচু মাথায় সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ি। চোখ না তুলেও আমি বেশ টের পাই, সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সুষমা আমার মুখোমুখি বসে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'কেমন আছো, সুষমা?'

'ভালো।'

চুপচাপ কাটে আমাদের। কী কথা যে বলব আমি সুষমার সঙ্গে, মনে আসে না; শুধু নীরবতার ভারী মুহূর্তে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা হয়, এই

বুঝি ও আতঙ্কগ্রস্তের মত চীৎকার করে উঠবে।

'কী জরুরী কথা আমার সঙ্গে?' নেহাৎ উদাসীন স্বরে সুষমা কথা বললে আমি ছটফট করে উঠে বলি, 'তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ, সুষমা।'

'তা হবে।'

মাথার ভেতরটা ভারী হয়ে [illegible] আমার, বুকের ভেতর এলোমেলো [illegible] পড়ে। প্রচণ্ড শব্দে [illegible] বৃষ্টির শব্দের ভেতর [illegible]

'তোমার মা বাবা এখন কোথায় [illegible]'

'নেই।' একটু থেমে [illegible] শব্দ করে সুষমা বলে, 'অনেক দিন হল মা মারা গেছেন, বাবা তো আগেই [illegible] ছিলেন।' উদাসীনতার সঙ্গে ক্লান্তি [illegible] ওর কথাগুলো কেমন জড়িয়ে যায়।

অসহ্য লাগে আমার সুষমার ঐ নির্লিপ্ত ভঙ্গীটা। ভয়ংকর কিছু একটা ঘটুক [illegible] মনে মনে প্রার্থনা করি আমি। চীৎকার করে গলা ফাটিয়ে লোক জড়ো করুক [illegible] আমাকে ও অপমান করুক, [illegible] মারতে মারতে আমাকে [illegible] পুলিসের হাতে। কিংবা [illegible] যদি না চায় ও, [illegible] আঘাত করুক, ছিন্নভিন্ন করে দিক আমাকে।

'কী হয়েছে তোমার, সুষমা—এমন [illegible] কেন তোমাকে?' আমি পাগলের মত বলে উঠি হঠাৎ। ইচ্ছে করে, ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দিই ওকে। ফিরে আসুক আবার ওর সেই দর্পিত ভঙ্গী, ও নিজে থেকে কিছু বলুক আমায়।

'কই, কিছু হয়নি তো আমার।'

'তুমি জানো না, নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে তোমার, ভীষণ কিছু একটা হয়েছে।'

আমার উন্মত্ত প্রলাপের উত্তরে সুষমা শুধু স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে। আর পারি না আমি। ছটফট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। আমার সঙ্গে সঙ্গে সুষমাও উঠে দাঁড়ায়।

'চললেন?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি।' বলতে বলতে দাঁতে দাঁত ঘষে যায় আমার, অভ্যাসবশে আমার পকেটে ঢোকানো হাতটা প্রবীরের ঋণ শোধের টাকাটা খিমচে ধরে। আর এক পা বাড়িয়েই আমি দ্রুত হাতে নোটগুলো পকেট থেকে বের করে এনে সুষমার দিকে বাড়িয়ে ধরলে ও এক পা পিছনে হটে বিস্ময়ে হাত দুটো তোলে বুকের ওপর।

'প্রবীরের পাওনা ছিল আমার কাছে।'

'তা আমাকে কেন?'

'তুমি প্রবীরকে দিয়ে দিও।' বলতে বলতে কোনোরকমে নোটগুলো টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে দরজা ঠেলে বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় নেমে আসি। তারপর অদ্ভুত একটা অবস্থায় কী করে যে নিজের বাড়ির স্টপে বাস থেকে নামি তা বুঝে উঠতে পারি

না। শুধু একটা ধাঁধার মত লাগে সব কিছু। বুকের ভেতর ফাঁপা শূন্য হয়ে যায়। কিছু সময় পর বাস্তবতা ফিরে এলে দেখি, পাড়ার [illegible] দাঁড়িয়ে আছি আমি, [illegible] দাঁড়িয়ে গেছে, বৃষ্টিটা টিপ-টিপ [illegible] বাড়লে চোখে পড়ে [illegible] আলোগুলো নিবে [illegible] প্রায়শই এমন হয় এ-[illegible] কুঁচকে যায়। আর [illegible] নিয়ে একটা [illegible] বাচ্চা ছেলেকে [illegible] আমার পাশে। [illegible] নীল চৌকো [illegible]

[illegible]

[illegible] ও [illegible] আমার [illegible]

[illegible] ও [illegible] আর [illegible] সঙ্গে কান্নাটা [illegible]

রাস্তায় [illegible] বৃষ্টিটা থেমে [illegible]। অবস্থা [illegible] বাচ্চাটা আমার পা ঘেঁষে চলতে থাকে। তারপর [illegible] পা এগিয়ে যাবার পরই আচমকা [illegible] থেকে একটা হাত মুঠো করে আমার শার্টের কলার চেপে ধরে, 'আজ পেয়েছি [illegible]—একটা হিংস্র গলা চীৎকার করে ওঠে। আর ঘুরে তাকানোর আগেই প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুঁষি এসে পড়ে আমার নাকের ওপর, হাত থেকে [illegible] হাতটা খসে যায়। এক মুহূর্তে [illegible] দৃষ্টিতে সব কিছুকে ঝাপসা দেখায়, তারপরই শরীরের বিভিন্ন অংশে নির্মম আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই আমি চিনে নিতে পারি আক্রমণকারীদের। চেনা মানুষ দেখে আর আমি বাধা দিই না, আমার ওপর রাগের কারণটা চকিতে মনে পড়ে যায়। নিষ্ঠুরভাবে ওদের আঘাতে আমি মাথা পেতে নিই। একসময় [illegible] লোকজনের পায়ের শব্দ পেয়ে ওরা আমাকে ফেলে পালিয়ে যায়। কোনরকমে রাস্তা থেকে নিজেকে খাড়া করে তুলি; টের পাই, নাকটা কেটে গিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। সকাল-বিকেলের কোনো বোধ আর বুকের মধ্যে কাজ করে না আমার। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণার ভেতর মাথাটা পরিষ্কার হয়ে যায় বলে, মনে হয়, বুথাই আমি চোরাই পিস্তল, কার্তুজ, চিহ্ন-করা তাসের প্যাকেট ও কালো চশমা বাড়িতে ফেলে রেখে [illegible] রাস্তায় পা বাড়িয়ে ছিলাম আজ।

এক সাহিত্য-পাঠকের চিঠি :

সবিনয় নিবেদন,

'মিত্র ও ঘোষের' তিরিশ বৎসর পূর্তির জন্য আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। নীচের ঠিকানায় সদ্য প্রকাশিত একটি পুস্তক তালিকা পাঠিয়ে দেবেন। যে কোন সাপ্তাহিকের বিজ্ঞাপন দেখে আপনাদের প্রকাশিত বই কিনতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু আপনাদের পুস্তক তালিকাটি বড়ই লোভনীয়। শুধু লোভনীয়ই নয়—সুচিন্তিত এবং সুরুচিপূর্ণ আপনাদের প্রকাশিত গ্রন্থের মতোই লোককে দেখাবার—সযত্নে সাজিয়ে রাখবার। ও থেকে বই বেছে কেনা যেন একগুচ্ছ লোভনীয় ফুল থেকে নিজের পছন্দসই ফুলটিকে সযত্নে খোঁপায় (কোটের পকেটে শোভা বৃদ্ধিও বলতে পারেন) স্থাপন করা।

নমস্কারান্তে
ভবদীয়
শ্রীপতিতপাবন সিংহ
৮০বি বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

*

আমাদের
নূতন
ক্যাটালগের
জন্য
পত্র
লিখুন—

বাংলা সাহিত্যের এক অসামান্য উপন্যাস

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রণীত

ইস্ট বাক্‌ল্যাণ্ড রোড

"হাজার লোকের হাজার কামনা, নিজের কামনা, ব-কলমা কামনা উপবীতের আকার নিয়ে বামন অবতারের গা থেকে ঝুলছে। উপবীত। সুতোর বাঁধা একটি খোলামকুচি। কামনা পূর্ণ করেই বামন দেবতা টুক্ করে পৈতেটি গা থেকে ছিঁড়ে ফেলে দেবে। তারপর আর দেখতে হবে না। ইচ্ছে যদি হয়, সময় যদি পাও এক ঘটি গঙ্গাজল এনে তাঁর পায়ে ঢেলে দিও। তা তুমি হিন্দুই হও আর মুসলমানই হও—শাক-পাতা খাও কি ষাঁড় গরু খাও তাতে কিছু আসে যায় না। তিনি দেবতা, যদি সময় হয়, যদি প্রাণ চায় সোমবার সন্ধ্যায় এসে তাঁর পায়ের কাছে একটি প্রদীপ জেলে দিও। কিম্বা দিল যদি চায় শুক্রবার জুম্মা নমাজ পাঠের শেষে বিকেলের কাজ চুকিয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে ভেলিগুড়ের শরবৎ খেয়ে সন্ধ্যা নাগাদ এসে একটি চেরাগ তাঁকে দেখিয়ে যেও। এর বেশী তিনি কিছু চান না। এসবও চান না—তিনি শুধু তোমাদের দেখতে চান।..."

এই বামন অবতারের মন্দির যে পথে সেইটেই

ইস্ট বাক্‌ল্যাণ্ড রোড

"হয়তো সময়ের সরল পথটা হঠাৎ একটা খাদে পড়ে গেছে, ওঠবার চেষ্টা করছে আপ্রাণ, তাই আজকের মানুষ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না। অন্ধের মতো হাতড়াচ্ছে চতুর্দিকে। নিমেষে দিক বদল করছে নীতি বদলাচ্ছে, কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছে না কিছুতেই। হয়তো এরা যা করছে সব ভুল, ভুল করে অন্তরাগুনে পুড়ছে। তবু মনে হয় এদের ভুলটুকুও পূর্বাচলের স্রোত, টেনে নিয়ে চলেছে সকলকে। সামনেই চলেছে। সামনে চলেছে।..."

ইস্ট বাক্‌ল্যাণ্ড রোড

পৃথিবীর সব শহরেই আছে। বাক্‌ল্যাণ্ড রোড মানব জাতির ইতিহাসে সমস্ত জনপদেরই প্রতীক। এই রাস্তাকে কেন্দ্র করে যে সুখদুঃখের মালা—জীবনমরণের পালা গেঁথেছেন নবীন লেখক—তা যে কোন দেশের যে কোন জাতিরই ইতিহাসেই অমর সাহিত্য রচনা করত। লেখকের দৃষ্টি যেমন অন্তঃপ্রেরিত তেমনি বহু বিস্তৃত।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য প্রণীত

ইস্ট বাক্‌ল্যাণ্ড রোড

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে এক স্থায়ী সংযোজন

॥ আট টাকা ॥

কালিকারঞ্জন কানুনগো প্রণীত

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত

রাজস্থান কাহিনী

ইতিহাসকে সাহিত্যের পর্যায়ে উত্তীর্ণ করে তুলেছেন

॥ আট টাকা ॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

একদা কী করিয়া

আসন্ন প্রকাশিতব্য

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

চীন-যুদ্ধে পরাজয়ের দায়িত্ব

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

[চার]

উহাদের উদ্যোগ-পর্ব

জবাহরলাল নেহরুর ঘোষণার পর চীন-যুদ্ধের উদ্যোগ সম্বন্ধে কি আয়োজন প্রত্যাশা করা যাইত, সে সম্বন্ধে গত সপ্তাহে আলোচনা করিয়াছি। উহা পড়িয়া পাঠক বলিয়া থাকিতে পারেন, "এই ধরনের ব্যাপক ও বিরাট উদ্যোগ কি সত্যই হয়, না লেখক শুধু ওকালতি করিবার জন্য আসামীর বিরুদ্ধে একটা কল্পিত এমন কি একেবারে মিথ্যা ও সাজানো মকদ্দমা খাড়া করিতেছেন?" আমাদের দেশের বুদ্ধিমান ও ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের একটা অভ্যাস আছে—তাঁহারা স্বভাবত আরামপ্রিয় ও কর্মকুণ্ঠ, সুতরাং যাহারা পরিশ্রম করা সম্বন্ধে পীড়াপীড়ি করে তাহাদের উদ্দেশে "পারফেকশ্যানিস্ট" বলিয়া একটা অত্যন্ত উঁচু স্তরের গালি প্রয়োগ করেন। আমি এই গালি অনেক খাইয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে কাঁচুমাচু-মুখ না হইয়া তর্কও করিয়া থাকি, এই প্রসঙ্গেও করিব। যে ধরনের উদ্যোগের কথা আমি বলিয়াছি তাহা যে কার্যক্ষেত্রে হইয়া থাকে তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিব—উহা ১৯৪২ সনের অক্টোবর মাসে এল-আলামেন যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে।

এই যুদ্ধটা আরম্ভ হয় ২৩শে তারিখে। উহার পূর্বে কি করা হইয়াছিল তাহার একটা সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি আগের প্রবন্ধের দফা অনুযায়ী দিব।

১। নির্দেশ। এটি আসিয়াছিল স্বয়ং চার্চিলের কাছ হইতে; উহাও আবার তাঁহার নিজের হাতে লেখা পত্রে। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার বাংলা অনুবাদ দিতেছি।

"জেনারেল গোর্ট..."

"মধ্য-প্রাচ্যের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আলেকজাণ্ডারের প্রতি নির্দেশ।

১। আপনার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইবে, সুযোগ যত শীঘ্র সম্ভব পাওয়া যায়, ফিল্ড-মার্শাল রমেল দ্বারা পরিচালিত মিশর ও লিবিয়ার ইটালিয়ান-জার্মান বাহিনীকে সমস্ত মালপত্র গুদাম-কারখানা সমেত বন্দী বা বিনষ্ট করা।

২। প্রথম প্যারাগ্রাফে বিবৃত কাজের ত্রুটি না করিয়া—কারণ উহাকেই রাজার স্বার্থের দিক হইতে চরম মনে করিতে হইবে—আপনার নেতৃত্বাধীনে অন্য যা কৃত্য আছে তাহা সমাপন করিবেন বা করাইবেন।

ডাব্লিউ এস্ সি

(উইনস্টন স্পেন্সার চার্চিল)

১০ই আগস্ট, ১৯৪২"

ইহার পর জেনারেল আলেকজাণ্ডার জেনারেল মনগমারীকে আর একটা নির্দেশ দেন।

২। যুদ্ধের প্ল্যান। এই প্ল্যান সবিস্তারে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করা হইয়াছিল। যুদ্ধের ছক প্রথমে করেন মনগমারী, তারপর তিনি উহা সাক্ষাৎভাবে অধস্তন সেনাপতিদের কাছে ব্যাখ্যা করেন, এবং উহারও পরে এই সেনাপতিরা ক্রমশ নিম্নতম সেনানী ও সৈন্যদের কাছে উহার পরিচয় দেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার দুই দিন আগে অর্থাৎ ২১শে অক্টোবর তারিখে ঊর্ধ্বতন সেনাপতি হইতে অধস্তন পদাতিক জানিতে পারে, তাহার কি কর্তব্য, তাহাকে কি করিতে হইবে।

এই প্ল্যান যে কিরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করা হইয়াছিল তাহার আভাস দিবার জন্য আমি জেনারেল মনগমারীর বক্তৃতার পেন্সিলে লেখা নোট হইতে খানিকটা বাংলায় দিতেছি।—

"উচ্চতম সেনাপতিদের কাছে ১৯।২০ অক্টোবর তারিখে বিবৃতি দিবার জন্য আমি যে সংক্ষিপ্ত খসড়া করিয়াছিলাম তাহা এইরূপ—

*...........

৫। বাহিনীর কার্যকলাপের মূল সূত্র—

তিন অঙ্ক—
৩০নং কোরের আক্রমণ ও শত্রুর ব্যূহে প্রবেশ।
১০নং কোরের শত্রু-ব্যূহ ভেদ।
১৩নং কোরের শত্রুর ব্যূহে প্রবেশ।
—অবস্থান ও যুদ্ধের সুবিধার জন্য লড়াই।
হাতাহাতি যুদ্ধ ও শত্রুর ব্যূহ "চূর্ণ-বিচূর্ণ" করা।
শত্রুর ব্যূহের চরম ভেদ।

৬। শত্রুর বল—
সৈন্যদের মধ্যে অসুস্থতা ও ব্যাধি, সংখ্যালঘিষ্ঠতা; পেট্রোল, গোলা-গুলি ও খাদ্যসামগ্রীর অভাব।
শত্রুর যুদ্ধের সাহস—সম্ভবত ইটালিয়ানদের মধ্যে ব্যতিক্রম হইতে পারে, কিন্তু জার্মানদের অবিচলিত।"

৩। **অধিনায়কত্ব**। এই অঞ্চলে দুইজন সেনাপতি ছিলেন, প্রথমত সর্বোচ্চ সেনাপতি, জেনারেল আলেকজাণ্ডার (কায়রোতে); দ্বিতীয়, এল-আলামেনের যুদ্ধক্ষেত্রে অষ্টম আর্মির সেনাপতি মনগমারী। "জেনারেল আলেকজাণ্ডারের উপর সমগ্রভাবে পরি-

চালনার ভার থাকিলেও যুদ্ধ কিভাবে করা হইবে ও যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যসমাবেশ কি-ভাবে হইবে উহার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত ছিল মন্টগমারীর উপর। ই'হারা দুইজন একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ সেনাপতি ছিলেন। আলেকজাণ্ডার অভিজাত, সংযত, এবং অতিভদ্র; মন্টগমারী মধ্যবিত্ত ঘরের একরোখা, এবং কঠিন। মন্টগমারী খানিকটা সত্য কথা বলিয়া খানিকটা রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন—"সেনাবাহিনীতে কৃতিত্ব লাভ করিতে হইলে কিছু ছোটলোক হইতে হয়, আমি কিছু ছোটলোক।" কিন্তু এই দুইজনের মধ্যে তাহার কর্তব্য কি, কাহার স্থান কোথায়, কাহার কৃতিত্ব কতটুকু তাহা লইয়া কখনও মতান্তর বা মনান্তর হয় নাই।

মধ্যপ্রাচ্য সেনাপতিদের কার্যকলাপের উপর লন্ডনেরও তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। সেখানে প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও চীফ অফ দি ইম্পিরিয়্যাল জেনারেল স্টাফ জেনারেল অ্যালান ব্রুক বিজয়ে প্রত্যয়শীল হইলেও একই সঙ্গে চিন্তান্বিত এবং উত্তেজিত ছিলেন—পাছে কোনও বিপর্যয় হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে অষ্টম বাহিনীর আক্রমণ আরম্ভ হইবার সংবাদ পাইয়াই জেনারেল ব্রুক ডায়েরীতে লিখিলেন: "যদি ইহা ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে ইহা আমি কি করিয়া সহ্য করিব ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না।"

জয়ের জন্য পূর্ণ আয়োজন থাকিলেও জয় অবধারিত থাকিলেও, যাঁহারা যুদ্ধ পরিচালনা করেন তাঁহারা উহাকে নিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লন না। এখানে একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলিতে পারি। তখন আমি এ-আই-আরের তরফে যুদ্ধ সম্বন্ধে টীকাটিপ্পনী করি। ২৪ তারিখের কমেণ্টারী সবে শেষ করিয়াছি, তখন টেলি-প্রিণ্টারে খবর আসিল মিশরের প্রান্তে আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। লেখা কমেণ্টারী ফেলিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি নূতন কমেণ্টারী লিখিলাম—এবারে জয় হইবেই, এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকাতে আমি কমেণ্টারীর শেষ ছত্রে এই সম্ভাবনা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করিলাম। কিন্তু আমার ইংরেজ উপরওয়ালা বলিতে দিলেন না—জিতিবার পর বড়াই করিবার সুযোগ অনেক ঘটিবে, এই মত প্রকাশ করিলেন। আমরা সাধারণত জিতিবার আগে বড়াই করি, ও হারিবার পর সাফাই গাই।

৪। সৈন্য-সংখ্যা। এল-আলামেনের যুদ্ধ-ক্ষেত্রের বিস্তার উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত ছিল মাত্র ৩৮ মাইল। এই ক্ষেত্রে শুধু আক্রমণের জন্য তিনটি ট্যাঙ্ক ডিভিসন ও সাতটি সাধারণ ডিভিসনের সমান অন্য সেনা ছিল। দুই পক্ষের সংখ্যাবলের হিসাব এই-রূপ—ব্রিটিশ পক্ষে ২৩০,০০০ সৈন্য; জার্মান ও ইটালিয়ান পক্ষে ৭৭,০০০; ১,২০০ ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক, অন্য পক্ষে ৫০০ ট্যাঙ্ক; ৮৯২টি ফিল্ড ও মিডিয়ম কামান ব্রিটিশ পক্ষে, ৫৫২টি কামান অ্যাক্সিস পক্ষে; ব্রিটিশ ১,৪৫০টি অ্যাণ্টি-ট্যাঙ্ক কামান, অন্য দিকে ১,০০০ এই ধরনের অস্ত্র; ব্রিটিশ ৮৮০ এরোপ্লেন, অ্যাক্সিস ৩৪৫টি।

তবু ব্যর্থকাম বা পরাজিত হইবার সম্ভাবনা হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছিল। সৈন্যদের শিক্ষা যতটুকু নিখুঁত ও কঠোর করা যায় তাহা মন্টগমারী করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি ট্যাঙ্ক-সেনার শিক্ষা সম্বন্ধে খুব নিশ্চিত ছিলেন না; সেজন্যে পদাতিক-দের শিক্ষা আরও ভাল বলিয়া প্রথম আক্রমণের ভার নূতন প্রথানুযায়ী ট্যাঙ্কের উপর না দিয়া, পুরাতন ধরনে পদাতিকের উপর দিয়াছিলেন।

৫। দ্রব্যসামগ্রী ও গোলাগুলি। এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। কামানের গোলাগুলি এত ছিল যে, প্রথম পনেরো মিনিটের গোলাবর্ষণ চিরদিনের মত 'আলামেন বারাজ' বলিয়া বিখ্যাত হইয়া আছে।

৬। সেনা-সমাবেশ। আক্রমণের জন্য ব্রিটিশ পক্ষে ও আত্মরক্ষার জন্য অ্যাক্সিস পক্ষে সেনা-সমাবেশ গভীর ব্যূহ রচনা করা হইয়াছিল। ব্যাপারটার একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের মাঝা-মাঝি কাল হইতে দেখা গিয়াছে যে, শুধু সারি বাঁধিয়া যুদ্ধ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। সুতরাং দক্ষিণে-বামে যুদ্ধক্ষেত্রের বিস্তার যাহাই হউক না কেন, সমস্তটা অঞ্চলে ঘনভাবে সৈন্য সাজাইবার পরও পিছনের দিকে গভীরভাবে সৈন্য-সমাবেশ থাকা একান্ত প্রয়োজন। নহিলে একবার লাইন ভাঙিয়া গেলে আর সামলানো সম্ভব হয় না। তাই এল-আলামেনের যুদ্ধে প্রথম লাইনে শুধু ছয় মাইলব্যাপী যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণের জন্য চারটি ডিভিসন থাকা সত্ত্বেও উহাদের পিছনে দুইটি ট্যাঙ্ক ডিভিসন রাখা হইয়াছিল, যাহাতে শত্রুর ব্যূহ ভাঙার পরও আক্রমণকারীদের [illegible]ত অব্যাহত থাকে। এল-আলামেনের যুদ্ধ সম্বন্ধে যে-কোনও বই পড়িলেই এই সেনা-সমাবেশের ধরনটি বোঝা যাইবে। জার্মান পক্ষ নিজের আত্মরক্ষার লাইন পদাতিক, ট্যাঙ্ক, কামান, মাইন ইত্যাদি দিয়া আরও গভীর করিয়াছিল।

৭। বিমানবাহিনীর সহিত সহযোগিতা। যাহাতে ব্যাপক আক্রমণে এবং বিশেষ স্থানীয় আক্রমণে স্থলবাহিনী ও বিমান-বাহিনী একযোগে যুদ্ধ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত ও পরিকল্পনা অতি সক্ষ্মভাবে করা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে মন্টগমারী যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিয়াই তাঁহার শিবির অষ্টম আর্মির সহিত সংশ্লিষ্ট বিমানবাহিনীর সেনাপতি এয়ার ভাইস মার্শাল কানিংহামের শিবিরের পাশেই স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সহযোগিতার জন্যই যে ব্রিটিশ বাহিনীর জয় হইয়াছিল সে বিষয়ে সকলেই একমত। ব্রিটিশ বিমান-বাহিনীর একটা কৃতিত্বের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অ্যাক্সিস্ বাহিনীর পেট্রোলের অভাব ছিল, সুতরাং ট্যাঙ্কারে করিয়া তেল না আনিলে উহাদের ট্যাঙ্ক বা অন্য মোটর-চালিত যান ব্যবহার করিবার উপায়ই ছিল না। ব্রিটিশ বিমানবাহিনী দুইটি ট্যাঙ্কার ডুবাইয়া দিয়া এমনই তেলের অভাব ঘটাইয়াছিল যে, রমেল তাঁহার ট্যাঙ্ক দিয়া নিরবচ্ছিন্ন ও প্রচণ্ড বেগে যুদ্ধ করিতে পারেন নাই।

৮। যুদ্ধক্ষেত্রের পশ্চাতে রক্ষার ব্যবস্থা। এর পর এল-আলামেনের যুদ্ধে আর একটা ব্যবস্থার কথা বলা দরকার। যুদ্ধক্ষেত্রে যথেষ্ট সৈন্য থাকা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সেনাপতিরা বা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট একবারও মনে করেন নাই যে, এই বাহিনীর পিছনে মিশর রক্ষার উপযুক্ত আয়োজনের জন্য আরও সৈন্যের, অস্ত্রশস্ত্রের বা সন্নি-বেশের প্রয়োজন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে দৈবক্রমে

পরাজয় হইলে রমেলের বাহিনী মিশরে প্রবেশ করিতে পারে, এই সম্ভাবনার কথা সকলে ভাল করিয়া মনে রাখিয়াছিলেন, এবং এই বিপদ হইতে রক্ষার জন্য অতিরিক্ত সৈন্যসমাবেশ করা হইয়াছিল।

আলেকজান্ডার এবং মন্‌টগমারী যখন আগস্ট মাসে নূতন সেনাপতি হইলেন তখনও ব্রিটিশ পক্ষের আয়োজন মোটেই সম্পূর্ণ হয় নাই। ইতিমধ্যে যদি রমেল আক্রমণ করিয়া বসেন তাহা হইলে হার হইতে পারে ও মিশর বিপর্যস্ত হইতে পারে, ইহা মনে রাখিয়া মিশরের সীমান্তে আরও ব্যবস্থা রাখা হইয়াছিল।

প্রথমত, নীল নদীর খাল হইতে মিশরের সীমান্ত জলপ্লাবিত করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করা হইল, ইহার উপর অতিরিক্ত সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র, বিশেষ করিয়া বিখ্যাত ব্রিটিশ ৫১নং ডিভিসনকে পিছনে রাখা হইয়াছিল, যাহাতে অষ্টম বাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া অগ্রসর হইলেও রমেলের বাহিনীকে বাধা দিবার জন্য কিছু সৈন্য থাকে।

চার্চিল নিজে তখন কায়রোতে। তিনি

ব্রিটিশ দূতাবাসের বাগানে বসিয়া সম্মুখে নীল নদীর দিকে চাহিয়া স্মরণ করিলেন, রমেল যদি আবার তাঁহার দুর্দম আক্রমণ করিয়া কায়রোর দিকে অগ্রসর হন তাহা হইলে ঠেকাইবার জন্য একটি খাল ভিন্ন আর কোনও বাধা নাই। চার্চিলের পাশে মিশরে ব্রিটিশ দূতের শিশুপুত্র ঠেলা-গাড়িতে বসিয়াছিল। তাহার দিকে তাকাইয়া তিনি শিশুর মাতা লেডী ল্যাম্পসনকে বলিলেন, "ছেলেকে লেবাননের ঠান্ডা হাওয়ায় পাঠাইয়া দিলে হয় না?" লেডী ল্যাম্পসন অবশ্য কথাটা শোনেন নাই। তিনি এরকম কোনও বিপদের আশংকা মনে স্থান দেন নাই।

কিন্তু বিপদ যে ছিল, সে বিষয়েও সন্দেহ ছিল না। ব্রিটিশ সেনাপতিরা আগস্ট মাসের ২৫শে তারিখের কাছাকাছি পূর্ণিমার সময়ে রমেল আক্রমণ করিতে পারেন তাহা ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের সৈন্য-সমাবেশের এদিক ওদিক করেন নাই, ধীর-ভাবে রমেলের প্রথম আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য দক্ষিণ দিকে একটি স্বতন্ত্র বাহিনী রাখিয়াছিলেন, উহাতে দুইটি ট্যাংক ব্রিগেড ও একটি সাধারণ ডিভিসন ছিল। রমেল আক্রমণও করেন ৩০শে তারিখে। ৫ দিন দেরি হয় পেট্রোলের অভাবের জন্য। কিন্তু তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছিল। ইহার পর জার্মান বাহিনী আর আক্রমণ করিতে পারে নাই। তবু ব্রিটিশ পক্ষে রক্ষার ব্যবস্থা এতটুকু নড়চড় করা হয় নাই।

আগের প্রবন্ধের ৯ ও ১০ দফা, অর্থাৎ পিছনের রিজার্ভ ও মালপত্র এবং চলাচলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলিবার দরকার নাই। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, এইসব ব্যাপারে এতটুকু ত্রুটিও ছিল না। সমস্ত উত্তর মিশরকে একটা শিবির ও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছিল।

আগামী সপ্তাহে আমাদের অনুদ্যোগ পর্ব সম্পর্কে বলিব।

(ক্রমশ)

ভিক্তোয়ার পাহাড়ের ছবি

পল সেজান : কিউবিজমের জনক

১৮৭৬এর গ্রীষ্মে সেজান 'লেস্তাকের সমুদ্র' চিত্রটি আঁকেন, বলা যায় এই চিত্র থেকেই পল সেজান সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করলেন নিও-ক্লাসিসিজমের চিত্রাদর্শ, কারণ এই ছবিতে এবং অবিলম্ব পরবর্তী পোর্ট্রেটগুলোতে দেখা যায় ছোট-ছোট তুলির আঁচড় আর একদম নেই, নেই বর্ণ নিয়ে সঙ্গীতময় খেলা—চিত্রে বস্তুর বস্তুত্ব অনেক বেড়েছে, বিন্যাসের দিকে চিত্রকরের নজর খুব বেশী। সেজানের এখনকার ছবি অনেক বেশী চিন্তালব্ধ, আঁটো, এবং গভীর।

এই সময় সেজান মানুষটি বড় অমিশুক, সি..ক প্রকৃতির হ'য়ে পড়েছিলেন, মানুষের সঙ্গে অহেতুক সামাজিক মেশামেশি অসহ্য ঠেকত তাঁর, সহজেই বিরক্ত হয়ে উঠতেন, জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে গিয়েছিল। মানুষ হিসেবে দয়ালু এবং উদার প্রকৃতির ছিলেন তিনি, কিন্তু অবিরাম অবহেলায়, শত্রুতায়, সমসাময়িক চিত্রকরদের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি মানুষকে আর বিশ্বাস করতেন না, সন্দেহ করতেন সবাইকে। ১৮৭৪এ তাঁর ছবিকে সাল' থেকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, একোল দ্য বোসার্তের ছাত্ররা তাঁর ছবির বিরুদ্ধে চিৎকার করে প্রতিবাদ করে, জনতা বুঝতে চেষ্টা করে না তাঁর ছবি—এই প্রতিকূল পরিস্থিতি অসম্ভব এক ব্যর্থতা আনে তাঁর জীবনে। এই ব্যর্থতাবোধ প্রায় পাগলামির সামিল হ'য়ে উঠল ১৮৭৬এ ইম্প্রেসনিস্ট চিত্র প্রদর্শনীতে সেজানের ছবি দেখে যখন সমগ্র প্যারিস নাক কুঁচকোলো। ইতি-মধ্যে তাঁর পিতা যে হাতখরচা পাঠাতেন দেশ থেকে তার অঙ্ক কমিয়ে দিলেন। একেই পুত্র চিত্রকর হয় তা তাঁর ইচ্ছে ছিল না, তার ওপর যখন শুনলেন অর্তেন্স ফিকুইয়ের সঙ্গে ছেলের ভাব হ'য়েছে তখন ব্যাপারটা একটু অধিক বাড়াবাড়ি ঠেকল তাঁর কাছে।

সেজানের সঙ্গে মন্তিচেল্লির ঘনিষ্ঠতা হয় ১৮৮৩তে। এই দুই শিল্পী ঠিক করেন বেরিয়ে পড়বেন রঙ তুলি নিয়ে, ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন প্রভঁসের গ্রামে গ্রামে, কাঁধের ঝোলা নামিয়ে ছবি আঁকবেন পাশাপাশি—দুজনেই শহুরে জীবনে ক্লান্ত হয়েছিলেন, সতেজ হাওয়া তাঁদের দরকার ছিল। এ'রা প্রভঁসের দক্ষিণে, এক্সাঁতপ্রভঁসের কাছে গার্দান গ্রামে এই ভ্রমণের বেশীর ভাগ সময় কাটান, প্রচুর ছবি নিয়ে ফেরেন সেখান থেকে। ১৮৮৪তে সেজান অর্তেন্সকে বিবাহ করেন, কিন্তু বিয়ের আগেই তার সঙ্গে এত প্রেম করেছিলেন যে বিয়ের পর তাকে একটু পুরোনো পুরনো লাগত সেজানের।

১৮৮৬তে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়, তিনি পলের জন্য কুড়ি লক্ষ ফ্রাঁ রেখে গিয়েছিলেন; আর্থিক ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সেজান গভীরভাবে ছবি আঁকায় মনোনিবেশ করলেন। বসবাস আরম্ভ হ'ল এ'ইসে।

১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫এর মধ্যে সেজান তাঁর শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলি আঁকেন। এই সময়েই তিনি 'নীল ফুলদানি', গুস্তাভ জিওফ্রের পোর্ট্রেট, 'লাল কোটের বালক', প্রভৃতি ছবিগুলি শেষ করেন। তা ছাড়া স্নানের ছবিগুলিও এই পর্যায়েই তাঁর আঁকা। ও, বলতেই ভুলে গেছি, সেই বিখ্যাত তাসখেলার ছবিও এই সময়ে।

১৯০৬এর ১৫ই অক্টোবর সেজান মারা যান। ঠান্ডা দিন ছিল, শরীর দুর্বল, আকাশ ভরা মেঘ, আকাশের তলায় ছবি আঁকছিলেন, হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যান, নিউমোনিয়া জাতীয় রোগ তাঁকে আঁকড়ে ধরে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়।

*

চিত্রকলায় সাম্প্রতিক ধারা বলতে যা বুঝি তার জনক পল সেজান। তিনিই প্রথম যিনি জগতের দিকে সম্পূর্ণ **বস্তুভিত্তিক** দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিলেন। জগৎটা তাঁর

কাছে ছিল প্রথমতম এবং প্রধানতম একটি বস্তু যা তার বস্তুর দিয়ে শূন্যতা পূরণ করছে। ইম্প্রেসনিস্টরা বস্তুকে দেখেছিলেন বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টি নিয়ে—অর্থাৎ কোনো বিশেষ অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে বস্তুর তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতা চক্ষু ইন্দ্রিয়ের ওপর কীভাবে কাজ করছে তাই তাঁরা ধরার চেষ্টা করেন। তাঁরা সাদরে গ্রহণ করেছিলেন আলোকে তাঁদের বিপথগামী করার জন্য, বস্তুর চেয়েও বস্তু থেকে ঠিকরে আসা আলো তাঁদের প্রিয় ছিল।—ধরা যাক—সেজান এবং ক্লোদ মোনে পথ দিয়ে হাঁটছেন, একজন ইম্প্রেসনিস্ট দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছেন জগতের দিকে, আরেকজন সম্পূর্ণ অবজেক্টিভ। মনে করা যাক সেটা একটা খুব উজ্জ্বল দুপুর; এত উজ্জ্বল চোখ কুঁচকে তাকাতে হয় জগতের দিকে, এত গরম ভুরু থেকে ঘাম তাদের চোখের ওপর পড়ছে এসে। তাঁরা হাঁটতে-হাঁটতে এমন একটা জায়গায় এলেন যেখান থেকে—ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখা যাচ্ছে, দুজনেই সেটা দেখলেন সেই উজ্জ্বল দিনে, দুজনেই ছবি আঁকবেন স্থির হ'ল তার। মোনে কী আঁকলেন?—মাঝ দুপুরের উজ্জ্বল আলোয় সাদা ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধ চোখ-ধাঁধানো। এক রুপোলী পাতের মতো মনে হ'য়েছিল তাঁর, সমস্ত পার-স্পেক্টিভ হারিয়ে, বায়বীয় সাদা রঙের উচ্ছ্বাস যেন, তাতে কোনো শক্ত মার্বেল নেই, নেই কোনো ভার, একটা সাদা উজ্জ্বল গ্যাসের পিণ্ডের মতো দিগন্তের কিছুটা অংশে ব্যাপ্ত এই বাড়ি। কিন্তু সেজান কী করলেন? --তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করলেন প্রথমে, চোখের পাতায় ঘাম, সেটা না-মুছে দেখলে জিনিসকে আবছা দেখায়। তারপর মনে এ কথাটা পরিষ্কার রাখলেন যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল তো একটা মার্বেলে তৈরি বাড়ি, তাও বহু পুরোনো, এই সূর্যের আলোয় ওটাকে রুপোলী দেখাচ্ছে, তা হওয়াতো এর উচিত না, আসলে ম্যাটমেটে সাদা এর রঙ। তারপর উনি ভাবলেন বাড়িটার বিস্তারের কথা, বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে মনে হচ্ছে, পুরো বাড়িটার প্রচণ্ড ওজন হবে মনে হচ্ছে, আলোর জ্যোতি একটু না-কমলে এবং আরো দু'চারবার এসে এর ফর্ম, ভল্যুম, ম্যাস; ডেনসিটি এই সব-গুলো ভালোভাবে না খেয়াল করলে কিছু আঁকা যাবে না—এই সূর্যের ঔজ্জ্বল্যে দেখারও কি জো আছে কিছু! —মোনে, কিন্তু সেজান যখন এসব ভাবছেন এ'কে ফেলেছেন তাঁর ছবি, তাড়াতাড়ি করতে হয়েছে, কারণ, আলোর জ্যোতি কমে গেলে, চোখের ঘাম শুকিয়ে গেলে, পাছে একটা নিরেট বাড়ি দেখে ফেলেন!

সব বিদ্রোহী শিল্পীরই বলবার কথা থাকে অতি সরল, তাঁরা সেটার ওপর ক্রমাগত পরীক্ষা চালিয়ে, প্রচার ক'রে, নিষ্ঠা আরোপ ক'রে, করে তোলেন তাকে ছুরির মতো ধারালো ও পরিষ্কার। সেজানও তাই করেছিলেন তাঁর শিল্পাদর্শকে, যা পূর্ববর্তী সমস্ত যুগের প্রভাব কেটে বুকে বিঁধেছিল ভবিষ্যৎ শিল্পীদের। সেজানের শিল্পাদর্শ বুঝতে হলে দু'টি শব্দ মনে রাখা প্রয়োজন—প্রথমটি **বাস্তবীকরণ** (realisation), দ্বিতীয়টি **নিয়মিতকরণ** (modulation)। কোনো কিছুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনাই বাস্তবীকরণ; সেই বস্তু-অস্তিত্বকে বর্ণ আরোপ ক'রে ঈপ্সিত অভিজ্ঞতার স্তরে নিয়ে যাওয়াই নিয়মিতকরণ। সেজানের শিল্পসৃষ্টির এই-ভাবে ধাপ নির্ণয় করা যায়—তিনি বহু বস্তুর মধ্য থেকে একটিকে বাছলেন, মোটামুটি যেই নির্বাচিত হ'ল, মনের মধ্যে তার বাস্তবীকরণ ঘটল, এবং তারপর তার জন্য রঙ এবং বিন্যাস আরম্ভ হল, যখনই পাওয়া গেল সেই বর্ণ এবং সেই বিন্যাস, যা বাস্তবের অভিজ্ঞতার এবং অস্তিত্বের সম্পূর্ণ গাঢ়তা রাখতে সক্ষম, তখনই ফেলে দেওয়া হ'ল তাকে ক্যানভাসের ছকে।

ভিক্টোরিয়ার পাহাড়ের ছবিটি যেটি মুদ্রিত হয়েছে, তার দিকে একটু চোখ ফেলা যাক। এই দৃশ্য তিনি দেখেছিলেন কোনো মোটামুটি উঁচু জায়গা থেকে, কারণ মাঝের সমভূমিটা ওপর থেকে আঁকা হয়েছে। তিনি কী দেখছেন—সমভূমিটি গৃহে অধ্যুষিত। একটুও ফাঁক নেই, তবে চোখে পড়ছে শুধুমাত্র বাড়ির চালাগুলোতে, চৌখুপি বাংলো বাড়ির ছাত, দূরের পাহাড়। সমস্ত ছবিটিতে লক্ষ করুন বরফি নকশা ছাড়া আর কিছু নেই (Cubes) যদি শুধুমাত্র বিন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, পাহাড়টিও একখণ্ড ক্রিস্টালের মত। সেজানের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল বাস্তবীকরণ কোন মোটিফটিকে করবেন সেটার নির্বাচনে। কারণ, সে দৃশ্য তাঁর পক্ষে অসম্ভব যেখানে তিনি কোনো স্থাপত্যিক নিয়ম খুঁজে পাচ্ছেন না। ইম্প্রেসনিস্টরা কোনো জিনিসের ওপর নিজের আবেগ উপুড় করে ফেলে কিছু একটা তৈরি করে নিতে দ্বিধা করতেন না, কিন্তু সেজানের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না কারণ আবেগ সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছিলেন তিনি শিল্প থেকে। তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না বিষয়কে "বাস্তবে" অনুবাদ করা যতক্ষণ না বিষয় নিজের মধ্যেই রঙ এবং রেখার সামঞ্জস্য রক্ষায় সক্ষম হচ্ছে। সেজান এই দৃশ্য বেছেছিলেন ছবির বিষয় হিসেবে, কারণ এই ল্যান্ডস্কেপ একটি নিখুঁত সামঞ্জস্য পূর্ণ কিউবিক স্ট্রাকচার, এবং তাতে নীল আকাশ, সবুজ পাহাড়, লাল টালি, কালো গাছ এক নিখুঁত রঙমিলান্তি খেলা। রঙ ও স্ট্রাকচারের এমন আত্মিক মিলন দৃশ্যটিকে সম্পূর্ণ শিল্পের বিষয় করে তুলেছে—যা দেখে সেজান মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সেজান বিষয়ে আসলে আরো গভীর আলোচনা প্রয়োজন, কিন্তু পরিসরের কথা ভেবে এখানেই থামা সমুচিত।

শুদ্ধশীল বসু

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার

ব্যথা-বেদনা তাড়াতাড়ি দূর করবার আধুনিক উপায়

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাস্প্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে!

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যা: 'অ্যাস্প্রো' রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাস্প্রো'—আরো তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়!

মাইক্রোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাস্প্রো'-তে মেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশী সূক্ষ্ম করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ করবার শক্তি দ্বিগুণেরও বেশী সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়—অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাস্প্রো'-র ব্যথা দূর করবার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুবই তাড়াতাড়ি শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘন্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইজন্যেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাস্প্রো' আরও তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর ক'রে দেয় এবং তার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

অতি সহজেই আপনি খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাস্প্রো' আপনি যেভাবে খুশী খেতে পারেন—শুকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের যন্ত্রণায় নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাস্প্রো' খাবেন: ব্যথা-বেদনা . মাথাধরা . গা-ব্যথা . দাঁতব্যথা . গাঁটে বেদনা . জ্বর-জ্বর-ভাব . ফ্লু ডেঙ্গু জ্বর . গলাব্যথা।

মাত্রা: প্রাপ্তবয়স্ক: দুটি ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার খাবেন। শিশুদের জন্য: একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাস্প্রো' কিভাবে কাজ করে দেখুন

ট্যাবলেটের কণাগুলির আকার যত বড় হয়, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেরী হয়—আপনার আরাম পেতেও সময় লাগে।

'অ্যাস্প্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাস্প্রো'-র প্রতিটি ট্যাবলেটে প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। তাই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে-সঙ্গে মিশে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি ব্যথার উপশম হয়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাস্প্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাস্প্রো'

তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করে

নিকোলাস-এর তৈরী

A.G.I.67 BN

প্যারীর বিখ্যাত স্থাপত্যকীর্তি নত্র্‌দাম গীর্জা

প্যারীর সক্রিয় সাংস্কৃতিক জীবনের মান আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিঃসন্দেহে চিত্ত এবং চিন্তার খোরাক যথেষ্ট পরিমাণেই মেলে। অসংখ্য নাটক, কনসার্ট, চিত্র-প্রদর্শনী এবং আলোচনা ও বিতর্ক সভা আয়োজিত হয় নিয়মিতভাবে। বলা বাহুল্য, প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষতা যে সবেতেই বিদ্যমান তা নয়, তবে নাড়া দেবার মতো মানসজাত বস্তুর অভাব কখনোই বোধ হয় না। প্রায় তিন মাসব্যাপী পিকাসোর চিত্র-প্রদর্শনী এই সমাপ্ত হলো, এখন চলেছে বোনারের (L'orangerie-তে) এবং (Petit Palais-এ) ঈজিপশিয়ান শিল্পের প্রদর্শনী। শিল্প-প্রীতি, অনুরাগই বলা ভালো, ফরাসীদের আন্তরিক, এ তাদের গভীর সৌন্দর্য-তৃষ্ণারই স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী অভিব্যক্তি।

সুন্দরের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সর্বদাই চলেছে, এবং, তা বলে তা যে সর্বদাই উল্লেখযোগ্য, যুগান্তকারী তা নয়; কিন্তু এই গতিশীলতার যদি অন্য কোন মূল্যও না থাকে, তবে অমরতা, স্থবিরতা এবং নিষ্ক্রিয়তার উত্তম প্রতিষেধক হিসেবে তার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এদের কোন বিশেষ শিল্পান্দোলন যদি দীর্ঘায়ু না হয়, তবুও তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ নয়। তারুণ্যের সজীবতা, সৃষ্টিশীল, সংবেদনশীল মানুষের তাগিদটুকু টের পাওয়া যায়। সে সৃষ্টির যথার্থ মূল্য কি, সে বিচার পরে, তবে শিল্পীর সাহস বা দুঃসাহসের পরিচয়টুকু মেলে, তাঁর ক্ষমতাও সে-সঙ্গে —তা, চিত্র বা সাহিত্য, যে ক্ষেত্রেই হোক।

যা নজরে পড়ে, ভালো লাগে তা এই যে, ফরাসী সরকার ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক পথ যাতে দুর্গম না হয়, সে দিকে খেয়াল রেখেছেন। ছাত্রদের জন্য কেবল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেস্তোরাঁয় অল্পমূল্যে খাবার বন্দোবস্ত আছে তাই নয়, ফিল্ম নাটক, আলোচনা সভা ইত্যাদিতে অর্ধমূল্যে বা জনসাধারণের চাইতে কম মূল্যে প্রবেশের উপায় আছে। শুধু সাহিত্য এবং রাজনীতির আলোচনা-সভাতেই নয়, জটিল দার্শনিক বিতর্ক সভাতে ছাত্রসমাগম এতো প্রচুর পরিমাণে হয় যে, তা বিস্মিত করে।

সিটে ইউনিভার্সিতে প্যারীর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান। একটি বিরাট জমিতে নানা জাতির একটি করে বাসগৃহ আছে। বেশ আন্তর্জাতিক আবহাওয়া। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ছাত্রদের একটি মিলন-কেন্দ্র। ভারতের বাসভবনটি তৈরি হয়েছে। আশা করা যায়, অনতিবিলম্বেই সেখানে তারুণ্যের পতাকা উড়বে—জাতিধর্মনির্বিশেষে। এ ব্যতীত, বিদেশীরা হয়তো ভারতবর্ষকে ঘনিষ্ঠতরভাবে জানবার সুযোগ পাবেন। সে সুযোগ যত শীঘ্র আসুক, তাই কাম্য।

কেননা, প্যারীর সাংস্কৃতিক জীবনের অংশভাক্ হয়ে আমরা যখন সমৃদ্ধ হচ্ছি, সেই সঙ্গে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে আমরা এ-ও লক্ষ করছি যে, ভারতবর্ষ সম্পর্কে ফরাসীদের যে সশ্রদ্ধ কৌতূহল আছে, তা যথাযোগ্যভাবে নিবৃত্ত করবার সুযোগ নেই। আজকের ফরাসী রাজধানীতে যথার্থ পণ্ডিত লোক, যাঁরা ভারতবর্ষের মুখপাত্র হবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন—যাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতির মহীরুহের সামনে দাঁড়িয়ে মূঢ়ের মতো অসার, অগভীর উক্তি এবং মন্তব্যের ভেতরেই তাঁদের শক্তি নিঃশেষ করেন নি—তাঁরা সর্বকালের মতো একালেও দুর্লভ। যাঁরা ভারত-জিজ্ঞাসা মেটাবার জন্য সরাসরি ভারতভূমিতে যেতে বা গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে পুঁথিপত্রের ভেতর থেকে চুন-বালি-সুরকি সংগ্রহ করে কল্পনায় ভারত-ইমারতের একখানি মোটামুটি ধারণা করতে সক্ষম, তাঁদের সংখ্যা নগণ্য।

জনসাধারণের পক্ষে ভারতবর্ষকে

ঘনিষ্ঠভাবে জানবার মাধ্যম হলো টেলিভিশন, সংবাদপত্র, বেতার এবং নানা-বিধ পত্রিকা। এ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ভারতবর্ষ অনন্ত দুর্দশা এবং রহস্যের দেশ দুর্ভিক্ষ এবং ধর্মান্ধতার দেশ। শুধু কেবল রাজনীতির এলাকায়ই নয়, অন্যান্য জমিতেও ভারত-বিরুদ্ধ লেখা প্রায়ই ছাপা হয়।

আবার, ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যকে মূলধন ক'রে বাণিজ্য-লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করছেন, তেমন কিছু ভারত-ফেরতা বিশেষজ্ঞও আছেন। বিচিত্র ছবি, ভারতীয় দর্শনের অসাধারণ ব্যাখ্যা, ইঙ্গিতময় নানা রচনার মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের বিখ্যাত ক'রে তুলছেন।

আমাদের সংস্কৃতি, জীবন, ধর্মের প্রতি কটাক্ষ-করা বহু লেখা চোখে পড়েছে, তবে এবং তা উল্লেখযোগ্য, ভারতীয় সরকারী মহলের তরফ থেকে কোন প্রতিবাদ চোখে পড়েনি। এবিষয়ে এঁদের ঔদাসীন্য এবং অবহেলা এমনি অসাধারণ যে, তা কেবলমাত্র বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ নয়, রীতিমতো ক্রুদ্ধ ক'রে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট।

অনিন্দিতা নিয়োগী

ত্রিলোচন কলমচি

শিকারোক্তি

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে গিয়েছিল। আলো নিবিয়ে বাইরে বালির মধ্যে পা ডুবিয়ে ক্যাম্প চেয়ার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আয়েস করে বসেছিলাম আমরা। ন্যাড়া দিগন্তের ঢাউস চাঁদটি কখন টাঁকশালের চকচকে টাকার মত স্বাভাবিক চেহারায় মাথার ওপর ফিরে এসেছে। আমাদের তাঁবুর পিঠ ঘেঁষে একটি বৃহদাকার বাবলা গাছ আছে। তার চিকের ফাঁক দিয়ে একটু আগেও থমকানো চাঁদকে অপূর্ব মায়াময় লাগছিল। শীত ফুরিয়ে গেছে, ফাগুনী হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকে।

আমাদের কবিবন্ধু বললেন, 'দেশোয়ালী মেয়ের বুকের বিশাল গিরিখাতের মধ্যে লটকানো রুপোর লকেট দেখেছেন কখনো। ঠিক এই রকমের অবৈধ রোমাঞ্চে ভরা। আমি এতক্ষণ চুরি করে দেখছিলাম।'

হেসে উঠলেন মধ্যবয়সী বুনোবাবু অর্থাৎ ডি এফ ও সাহেব. বললেন. 'কবি-মশাই যেন তিতিরের মাংসটাংস খেয়ে কথা বলছেন।'

তিতিরর মাংস নাকি শুধুই সুস্বাদু নয়. উত্তেজক। আমি বুঝলাম, এই জ্যোৎস্না প্লাবিত ধবল চরের মধ্যে এই মুহূর্তে শিকার কাহিনী যত জমবে ভূতের উপন্যাসও তেমন জমজমাট হবে না। পাইপে আরামপ্রদ টান চড়িয়ে ডি এফ ও তখন ক'ক ক'ক করে হাসছিলেন।

আমি বললাম, 'আপনি তো পাখি-শিকারী ছিলেন বলে মনে হচ্ছে।'

চমকে উঠে বুনোবাবু বললেন, 'আশ্চর্য! আপনি কি করে জানলেন?'

খাবার টেবিলে মাংস ছুঁলেন না অথচ পাখির মাংস আপনার দাঁতের মধ্যে ঢুকে রসিকতায় পর্যন্ত পাখি আসচে।'

'রাইট!' পাইপটাকে দাঁতনের মত চিবুতে চিবুতে আলগোছে আমার জীপবাহন সরকারী বন্ধুটি বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ ব্রাদার, পাখিশিকারী শেষ পর্যন্ত পাখির মাংস ছাড়তে বাধ্য।'

'তা যদি বলেন, কবিরাই সবচেয়ে বেশী পাখি-শিকারী।' বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের উদ্ভিদ্যমান অধ্যাপক বকের মত গলা উঁচিয়ে বললেন, 'ও'দের পদ্যে যত পাখি এযাবৎ মারা পড়েছে তার অর্ধেকেরও মাংস খাওয়া দূরে থাক, চেহারাও ও'রা দেখেছেন কিনা সন্দেহ।'

কবিবন্ধুটি বললেন, 'আপনি ভুল করছেন অধ্যাপক, দুনিয়ার সব পাখিই ভক্ষ্য নয়।'

'বিশেষত সাহিত্যের পাখি।' আমি টিপ্পনী কাটলাম।

জীপবাহন বললেন, 'এনি হাউ, পাখির ব্যাপার-ট্যাপার গভীর অধ্যয়নের বিষয়। বার্ডস আর রিয়্যালি ইনটারেস্টিং।'

এমনি করে পক্ষী শিকারের গল্প এসে পড়লো এবং আঁচেয়েই এমন জমে উঠল যে, স্থির হল পরদিন ভোরবেলাতেই আমরা কয়েক মাইল দূরবর্তী লাল খাদিয়ার চরে বেরিয়ে পড়ব পাখি মারতে।

কিন্তু এতগুলি বন্দুক যোগাড় হবে কোথা থেকে? তাছাড়া গুলি চাই, আনাড়ি শিকারীর জন্যে চাই অপর্যাপ্ত গুলি। ছোটবেলায় মার্বেল খেলা ছাড়া গুলি দিয়ে যারা হাত পাকায়নি, তাদের জন্য অন্তত। সুতরাং সেই মধ্য নিশীথে জীপ গর্জন করে উঠলো লোকালয়ের উদ্দেশ্যে। বুনো-বাবুর নিজের বন্দুক ছিল দুটি। স্থানীয় শিকারী ভদ্রলোক আরো কয়েকটি বন্দুকের হদিস দিলেন। লোক পাঠাতেই সেগুলো অতি প্রত্যূষে পৌঁছে গেল। গুলির জন্যে অবিশ্যিই ভাবতে হয়নি। কারণ গান লাই-সেন্স রিনিউয়্যালের সময় আমাদের গুলি-খোর এস ডি ও সাহেবকে গান হোল্ডার গ্রামবাসীরা সকলেই দু চারটি করে কার্তুজ দিয়ে কুর্নিশ করে গেছে। লাইসেন্স টাটকা করার সময় বন্দুকের সংগে টোটা আনতে কেন বলা হয় এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছেন।

কিন্তু আগের মত আর পাখি নেই, আগের মত পাখির বন্যা আসে না আর হেমন্ত শীত বসন্ত জুড়ে। সেইসব বিদেশী টুরিস্ট বিহঙ্গের দল ক্রমশই কমে আসছে। কয়েক সহস্র মাইল দূরবর্তী এরোড্রম শূন্য করে যে হংসবলাকার দল চলে আসতো ভারত খণ্ডে, রচনা করত কয়েক মাসের অস্থায়ী উপনিবেশ এবং তারপর ফেলে চলে যেত বালু দিয়ে গড়া ক্ষণকালের খেলাঘর। সেই লক্ষ লক্ষ মাই-গ্রেটরী বার্ডস কোন দুঃসাহসী নেশায়

টানে দেশ ছাড়তো। সেই সুদক্ষ নেভি-গেটরের দল তাদের ওভারসীজ লং ফ্লাইট কি করে মহাসমুদ্র-মহাদেশ পাড়ি দিয়ে চলে আসে নির্ভুল পথ ধরে, ভাবতে আশ্চর্য লাগে। কেউ কেউ ডিঙোয় অ্যান্ডিজ হিমালয়ের মত পর্বত। প্রায় চোদ্দ হাজার ফিট উঁচু দিয়ে পর্যন্ত এই ফ্লাইট ওয়েভ বয়ে যায় ঘণ্টায় পঞ্চাশ ষাট মাইল বেগে।

ওসব কেতাবী তথ্য থাক, মোদ্দা কথা এই, পাখি এবং পাখি শিকার ক্রমশই কমে আসছে যেন। পৌরাণিক মৃগয়া যেমন কিংবদন্তীর অদৃশ্য পাতা আলো করে আছে, অদূর ভবিষ্যতে পাখি শিকারও হয়ত তেমনি স্মৃতিতর্পণে বেঁচে থাকবে মাত্র। আপনারা যারা কাটিহার পূর্ণিয়ার শৈশব কৈশোর কাটিয়েছেন তাঁরা কি টাকায় ৩০।৪০টা করে বগেরী পাখি কেনার কথা ভুলে গিয়েছেন এরই মধ্যে? খাঁচায় করে সেই রাশিরাশি বগেরী বিকতে আসতো যারা তারাই বা কোথায় গেল! বগেরীর বড়া খাওয়া ছেলেবেলা, সেও কোথায় হারিয়ে গেল!

জংগীপুরের বালুচরে বসে আজ সেই পাখির স্বর্গপুরীর কথা মনে পড়ছে।
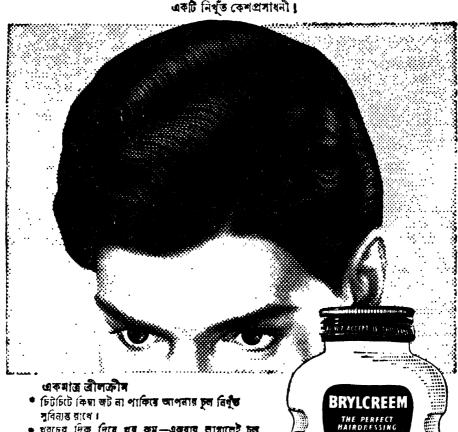
উত্তরে রাজমহল থেকে ভাগীরথীর ডাউন স্ট্রীম ধরে ফারাক্কা, সেখান থেকে জংগীপুর পর্যন্ত নদীকূলবর্তী ভূভাগ একদিন পক্ষী-মহাল ছিল। ছিল কেন এখনো আছে। ফরাক্কাতে অবশ্য দু-নদীতে ফারাক শুরু হয়নি, সে অর্থে ফরাক্কা ফারাক্কা নয়। আরো নিচে নেমে গিরিয়ার ছাড়াছাড়ি, তারো নিচে জঙ্গীপুর। নদী পকিস্তানে প্রস্থানের পূর্বে আঁচল উজাড় করে যেন পাখি পাখালি ঝেড়ে ফেলে গেছে লাল-খাঁদিয়ার প্রায় ত্রিভুজাকৃতি চরের উপর। নদীই ছিল একদিন আই বি মানে ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার, কিন্তু কালক্রমে সেও উদ্বাস্তু স্বভাবে পাকিস্তান ছেড়ে এদিকে চলে আসছে, ফলে ওপারেও হিন্দুস্তানী চরের দেখা মিলছে ইদানীং।

পরদিন যতটা প্রত্যূষে আমরা শিকারে বেরিয়ে পড়বো ভেবে রেখেছিলাম কার্যকালে তা হল না। ইয়ার-বকসী জড়ো হতে, লটবহর গাড়িতে তুলতে বিলম্ব হয়ে গেল। চরে যখন গিয়ে পৌঁছালাম, ততক্ষণে পাখিদের ব্রেকফাস্ট পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে প্রায়। সুতরাং প্রভাতী আলস্য কাটা চরের ওপর পাখির সন্ধানে আমরা যখন ছটি চরিত্র রওনা দিলাম তখন খুব কিছু আশা রাখিনি। আমাদের মধ্যে সুখী শৌখিন শিকারী দুজন ছিলেন, তাঁদের একজন কবিবন্ধু, অন্যজন জুলজির অধ্যাপক। একজনের পরনে ধুতি পাঞ্জাবি এবং চরণে কোলাপুরী চপ্পল, অন্যজনের টেরিলিন স্যুট, চোখে মাইনাস সেভেন পাওয়ারের চশমা। এঁদের দুজনের জন্য দুজন বন্দুকবরদার জোটাতে পারলে ভালো হত, গলফ ক্লাবে যেমন পিঠে তূণবাহী অনুচর ঘোরে।

আমাদের যিনি লীড করছিলেন তিনি স্থানীয় শিকারী, অথবা প্রাক্তন শিকারী বলাই ভালো। এককালে পাখি শিকারে তিনি 'বয়েল্ড হ্যান্ড' মানে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যে-কোনো উড়ন্ত পাখিকে তিনি বুলেটে বিঁধে ভূমিস্থ করাতে পারতেন। ছররা ব্যবহার করতে হত না। বুনোবাবুও একজন জাঁদরেল গানার। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার ঝুলি তিনি আজ উজাড় করে দিচ্ছিলেন আমাদের মধ্যে। একবার ফায়ার করে তিনি নাকি উনিশটি হাঁস মেরেছিলেন, একদিনে তাঁর সর্বোচ্চ রেকর্ড চুয়াত্তরটা হরিয়াল পাখি, আর ছটি মারতে পারলে শত পূর্তির আনন্দ থেকে তিনি এভাবে মিনিংলেসলি বঞ্চিত হতেন না। কবে কোথায় ময়ূর মেরেছিলেন, কোথায় কোন দুষ্প্রাপ্য পাখি, সব সবিস্তার বর্ণনা করছিলেন। সত্যি বলতে কি, ভদ্রলোক সুন্দর গল্প ফাঁদতে পারেন। আমাদের সমস্ত সময়টা তিনি কথা দিয়ে ভরে রাখছিলেন,

সাপুড়ে কর্তৃক নলরাজার সাপমোচন

ভারী বন্দুক বয়ে বেড়ানোর কষ্ট আমরা ভুলে গিয়েছিলাম বুনোবাবুর রংদার গল্পে।

একবার নাকি তাঁর গ্রীনার সিংগল ব্যারেল এই বন্দুকটির মধ্যেই রাতের বেলায় একটি বিষধর সাপ ঢুকে বসেছিল। নদীর চড়ায় ছইয়ের মধ্যে রাত কাটিয়ে সকালে বন্দুক তৈরি করতে গিয়ে আক্কেল-গুড়ুম। ঠান্ডায় ঠান্ডায় নলের মধ্যে সাপটি তো ঢুকেছে, আর বেরোতে পারে না।

'দুমুখো সাপ হলে অবিশ্যি ব্যাক করতে অসুবিধে হত না।' ফোড়ন কাটলেন আমাদের সরকারী বন্ধুটি।

কবি বন্ধুটি চোখ বড়ো বড়ো করে শুধোলেন, 'তারপরে কি হল?'

স্থানীয় শিকারী নিচু গলায় বললেন, 'তারপর হইহই কাণ্ড রইরই ব্যাপার নিশ্চয়ই! সাপুড়ে বাঁশি বাজাচ্ছে আর বুনোবাবু বন্দুক সম্প্রদানের ভঙ্গীতে সশস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নলটি সাপুড়ের দিকে বাড়ানো। ভিড়ে ভিড়াক্কার। সবাই কাছে গিয়ে দেখলো, নল-দময়ন্তী সংবাদ নয়, তখন অন্য পালা শুরু হয়েছে,—সাপুড়ে কর্তৃক নলরাজার সাপমোচন।'

মাইলের পর মাইল বালিভেঙে, জল পেরিয়ে শরবনের পাশ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আমরা যতই পাখিদের নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করি, পাখির ঝাঁক উড়ে রেঞ্জের

ভাল স্পোর্টসম্যান, কিন্তু গেমস্-এ নেই

বাইরে চলে যায়। অথচ জেলের দল, মাটি-কাটা মজুর আর চাষীরা দিব্যি মাথায় গামছা জড়িয়ে কোদালটোদাল হাতে নিয়ে গান গেয়ে পাখির গা ঘেঁষে চলে যায়। পাখি আসলে শিকারী মানুষের ইস্টাইল দেখে চিনে ফেলে। কাপ্তেন বাবুদের ধড়াচুড়ো দেখে, নিপাট ভদ্দরলোকী পোশাক দেখে উড়াল দেয়। নাচতে নেমে ঘোমটা দিয়ে লাভ নেই। অবশেষে ধেত্তেরি বলে আমরা ধুতি প্যান্ট খুলে নীট অন্তর্বাস সম্বল করলাম। আন্ডার উইয়ার আর গেঞ্জি পরে দ্বিতীয় দফা বালিতে ঝাঁপ দিলাম। বিগ্‌গেমস-এ নবীশজনের যেমন পিছন হলদে হয়ে যায়, বালিতে বুকে হাঁটতে গিয়ে বুকপেট হলদে হয়ে গেল আমাদের।

কিছুক্ষণ এইভাবে এগিয়েছি, হঠাৎ খেয়াল হল, আমাদের মধ্যে একজন নেই। সকলের শেষে আমাদের কবিবন্ধু ছিলেন, তিনি নেই। কাহিল চেহারার আয়েসী মানুষ, কোথাও বসে পড়ে ধুঁকছেন ভেবেছিলাম। নাম ধরে ডাকলাম, সাড়া নেই। তবে কি চোরাবালির মধ্যে জীবন্ত সমাধি হল নাকি! ভয়ে আমরা পিছু ফিরলাম। কিছু দূরে একটি বালির ঢিবির অপর পিঠে তাঁর দেহ পড়ে আছে দেখতে পেলাম। ছুটে গিয়ে দেখি, দু-হাত সামনে রেখে বুকে হাঁটতে হাঁটতে কখন তিনি ঠান্ডা বালির ওপর আরামে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বন্দুকের কুঁদোয় মাথা রেখে।

অবশ্য সকলেই শিকারী নয়, কেউ কেউ শিকারী। বাকি সবাই ক্রলার, বুকে-হাঁটিয়ে। আমাদের বুনোবাবুও আমাদের দলের মধ্যে ক্রলিং-এ বেস্ট প্রাইজ পাবার যোগ্য। তিনি ভালো স্পোর্টসম্যান, কিন্তু গেমস-এ নেই। আমাদের সকলের আগে এগিয়ে যান। বন্দুকে টন্দুক তাঁর কাছে এহ বাহ্য, আগে কহ আর। এমনি ভাব। দু-দুবার তিনি পাখির ঝাঁকের মধ্যে প্রায় সেঁধিয়ে গেলেন, অফসাইড হবার দশা, কিন্তু বন্দুক থেকে গুলি আর নিকলায় না। এবার তো আর নলের মধ্যে নাগপত্তন ঘটেনি, তবে? তবে আর কি গুলিই ভরতে ভুলে গেছেন তিনি। আমরা যখন লোডেড বন্দুক নিয়ে বুকে হাঁটছি তিনি তখন সেফটি বজায় রাখতে খালি নলচে উঁচিয়ে চলেছেন। কারণ হিসেবে গল্পের ঘাটতি নেই। কীভাবে বন্দুক থেকে গুলি ছুটে গিয়ে মানুষ মারা গিয়েছে, তার মর্মান্তিক কাহিনী। তবে সেফটি ক্যাচ হিসেবে কার্তুজও যে অনেক সময় কম যায় না, তার প্রমাণস্বরূপ দ্বিতীয়বার বুনোবাবুর ট্রিগার ফেল করলো। এবার অবিশ্যি আই ও এফ কার্তুজ। সকলেই জানেন ইছাপুরী টোটায় ইচ্ছাপূরণ অনেক সময়ই হয় না। এই ভারতীয় অহিংস কার্তুজ অনেক সময়ই কাটে না, ফলে নিরাপত্তার জন্য জলে ফেলে দিতে হয়। বিদেশী গুলির এখন অনেক দাম, ডিভাল্যুয়েশনের পরে প্রায় ছোঁয়া যায় না। সেই নীলের ওপর রুপোলী হাঁস আঁকা জার্মান কার্তুজ, বিরল-প্রায় হয়ে এসেছে। দু-একটি হাতে থাকলে প্রাইজের মত জমিয়ে রাখতে ইচ্ছে যায়।

গুলি এবং গুলি দুই-ই খুব তাগ করে মারতে হয়, নইলে ফসকালেই গেরো: দ্বিতীয়বার মারবার চান্স আসে না। আমাদের বনোবাবু দুটোই অল্পক্ষণের মধ্যে প্রমাণ করে ফেললেন। গুল তো গেলই গুলিও গাঁথলো না। মাঝ থেকে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ে আশপাশ পাখিশূন্য করে ফেললেন অচিরেই। ইচ্ছাপূরী বুলেটে ব্যর্থ হয়ে তিনি উড়োনচণ্ডীর মতন তাঁর সমস্ত ওল্ড স্টক কাবার করে আনলেন। ফলে স্যান্ড পাইপার, হুপার যা দেখেন ফায়ার করেন, বকের বকেয়া চুকে তেই অ্যালফাম্যাক্স লংরেঞ্জ, এল জি, বি বি সব ফুঁকে দিলেন।

আমি অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বললাম, 'আপনি মশাই এরকম ফায়ার উঠলেন যে!'

আমার মনের কথা আমার সরকারী বন্ধুটি বলে দিলেন খোলসা করে 'শাস খোলটোল মেরে আপনার এই বেহাত কিছুদিন ঝালিয়ে নিয়ে তারপর এলেই ভালো করতেন।'

আমি ফোড়ন দিলাম, 'হংস আপনার পক্ষে অনাথায় উপহংস হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

কবি কাতরোক্তি করলেন, 'উপহংস! আহা ভারি সুন্দর শব্দ। কিন্তু মানে?'

সরকারী বন্ধুটি নিরীহগলায় বললেন, 'উপহাসিটাস হবে আর কি।'

স্থানীয় শিকারী সহ্যের সীমা পার হয়ে গিয়েছিলেন ইতিমধ্যেই, ক্রুদ্ধগলায় বললেন, 'বাঁড়ুজ্জাবাবু, শাসখোলটোলও আপনার সাবজেকট নয়, আপনার হাতেখড়ি হওয়া উচিত পাখি কুড়িয়ে। বন্দুক আপাতত বন্ধক রেখে দিন আমাদের কাছে।'

পাখি কুড়োনোর কথায় মনে পড়লো বগেরী পাখির কথা। জিরো নম্বর কার্তুজের মামলা। গাছে ঝাঁক ধরে বসে আছে, ব্ল্যাংক ফায়ার করুন, টুপটাপ পাকা কুলের মত গাছতলায় খসে পড়বে। মুচ্ছো কাটার আগেই দু'-হাতে কুড়িয়ে জালের থলিতে ভরুন। শিকারের গৌরব এবং পাখি দুই-ই লাভ হল, যাকে বলে, গাছেরও খাওয়া, তলারও কুড়োনো।

বনো সাহেব আমাদের ওপর মর্মান্তিক চটে গিয়েছিলেন, কোনো কথা বললেন না।

কবিবন্ধু ফিসফিসিয়ে মশকরা করলেন, 'হাতের দোষ নয়, ও'র চোখের দোষ। উনি ক্যায়সা ট্যারা লক্ষ করেছেন কেউ। ভলো চোখ বুজে বাঁকা চোখে তাগ করলে কি আর পাখি বন্দুক স্ট্রেট রেখায় আসে কখনো!'

আনাড়ি শিকারী অবশ্য আমি আরো অনেক দেখেছি। ফায়ার করবার আগে হাত কাঁপতে থাকে, দেওয়ালীর রাতে শ্যালিকার অনুরোধে পটকা ফোটাতে গিয়ে কারো কারো যেমন হয়। কানে তুলো গুঁজে শিকারে যেতেও দেখেছি একজনকে,

পাখি কেন উড়ে-এ-এ যায়

বন্দুকের শব্দে কোমল হৃদয় সেই ভদ্রলোকের হার্ট নাকি যাবো যাবো করে। হাতে এম না থাক, চাকুরির এলেম থাকলেই হল, ছোট-সাহেব মেজসাহেবকে নিয়ে অনেক অধস্তনের দল শিকারে গিয়ে সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গুলি ছোঁড়েন, যাতে করে কুলমান দুই-ই বজায় থাকে। পরে মেরে এনেও কেউ কেউ সাহেবের ইজ্জত রক্ষা করেছেন, 'স্যার, আপনার মারা হাঁসটা জলের মধ্যে পড়েছিলো, গাঁয়ের লোক কুড়িয়ে এনেছে।'

সরকারী সাহেবদের শিকারের আপাদ-মস্তক চিরকালই পরস্মৈপদী ব্যাপার। নিজের বন্দুকে খুব কম সাহেবই হাত সাধেন। অবিশ্যি অনেক গ্রাম্য গৃহস্থই কলঙ্কী কুলবধূর মত বন্দুককে সংগোপনে শয়নাগারে শয্যাশায়ী রাখেন, অন্যরূপে ব্যবহার করেন না। সুতরাং তাদের বন্দুক এবং গুলি কেড়ে নিয়ে নিতান্ত আনাড়িও যদি ডাংগুলি খেলেন তাতে আখেরে ভালোই হয়।

জড়ো করা বাঘ বা হরিণের ডামীর ওপর পা রেখে স্টুডিও-মার্কা শিকারীর ছবি আপনারা অনেকেই শিকার কাহিনীসহ কখনো কখনো গলাধঃকরণ করেছেন। দিনান্তে শ্যালদা স্টেশনে নেমে বৈঠকখানার বাজারে টাটকা মাছের সন্ধান করছেন এমন হুইলার-ব্যক্তির সংখ্যাও বিরল নয়। আমাদের বনোবাবুর চরবৃত্তি, ক্রমশ জানা গেল, অনেক নিস্পৃহ শিকারীর গোপন ডেনেশনে পুষ্ট।

আমাদের কবিবন্ধু বাল্মীকি প্রথায় কবিত্ব শক্তি উন্মেষের জন্য কোঁচবক শিকারে এসেছিলেন কিনা জানি না। তাঁর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। বারুদের গন্ধে সমস্ত পাখি তাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয় সীজ ফায়ার আই বি-র দিকে উড়ে গিয়ে থাকবে।

দিনান্তে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরছিলাম আমরা, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় এবং বিফলতায় সারা দিনের ফালগুন রোদ্দুরে অনেকের মুখই যখন অত্যন্ত করুণ দেখাচ্ছিল, সেই বিষণ্ণ মুহূর্তে আমাদের কবিবন্ধু শেষ পর্যন্ত বন্দুকটি তানপুরার মত ধরে লালন ফকিরের একটি চরণ ধরে বসলেন, 'পাখি কেন উড়ে-এ-এ যায়'—

গানের একটা টান আছে, পাখি কেন উড়ে যায়, ওই একটি লাইন আমাদেরও শেষ পর্যন্ত ধরলো। পথ সংকীর্তনের দলের মত আমরা নেচে নেচে চললাম।

হঠাৎ সকলকে চমকে দিয়ে আমার সরকারী বন্ধুটির হাতের বেলজিয়ান ডি বি ব্রীচ লোডিং গর্জে উঠলো। পরের মুহূর্তেই শূন্যে ডিগবাজি খেতে খেতে দুটি পাখি গিয়ে পড়লো একটু দূরে বালুর চড়ায়।

আমি পাখি কুড়াবার জন্যে দৌড় মেরেছিলাম, স্থানীয় শিকারী আমাকে হাতে-নাতে ধরতে না পেরে ল্যাং মেরে কুপোকাত করে যুক্তকরে মার্জনা চাইলেন। বললেন, 'অমন কর্মও করবেন না, ওইখানটায় চোরাবালি আছে। দেখলেন না চিহ্ন দেওয়া রয়েছে।'

'তাহলে উপায়?' আমরা সবাই অস্থির হয়ে উঠলাম।

একটি গাঁয়ের ছেলে এগিয়ে এল। ভাবটা এই পয়সা না পেলেও সে এনে দিতে পারে। বছর দুই আগে জলের মধ্যে থেকে নিজের কৃতকীর্তি তুলে আনার জন্য একজন ঈষৎ জাঁদরেল অফিসার তাঁর অনিচ্ছুক, সাঁতার না জানা অর্ডারলিকে কোমরে দড়ি বেঁধে জলে নামিয়েছিলেন। আর্দালীটির মৃত্যু ঘটেছিল। এই নিয়ে যে কেচ্ছা হয়েছিল নিকটবর্তী একটি জেলায় সেকথা ভেবে আমি বাধা দিতে গিয়েছিলাম। ছেলেটি কিন্তু একটি মাটির হাঁড়ি উপুড় করে অনায়াসে সেই চোরাবালির ভেতর থেকে হাঁস দুটোকে সাঁতার তুলে নিয়ে এলো। জলে যেমন করে গাঁয়ের বউ-ঝিয়ের দল পেতলের কলসী বুকে চেপে সাঁতার কাটে।

আমি শুধু রক্তক্ত মুমূর্ষু সেই হাঁস দুটির দিকে তাকিয়ে এই নিষ্ঠুর নেশার কথাই ভাবছিলাম।

নেতৃ নির্বাচনে ঐকমত্য আদায়ে সচেষ্ট কামরাজ

দিল্লির ডায়েরি

কাল্পনিক কথোপকথন, তথা নাটকীয় দৃশ্যাদির অংশবিশেষ। প্রধান চরিত্রে : ইন্দিরা গান্ধী, কামরাজ, মোরারজী দেশাই, অতুল্য ঘোষ, দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র, যশওয়ান্ত চ্যবন, নিজলিংগপ্পা ইত্যাদি। স্থান রাজধানী দিল্লীতে চার নম্বর যন্তরমন্তর রোড, সাত নম্বর ত্যাগরাজ রোড, এক নম্বর সাফদার-জংগ রোড। বাস্তবের সংগে যদি কোনো মিল থাকে তাহলে তা অত্যন্ত কাকতালীয়।]

*

[সময় মারচ মাসের ৯, ১০ ও ১১ তারিখ। চরিত্রের সকলে একই সময়ে একই স্থানে উপস্থিত নন; এই তিন দিনের স্থান ও সময়ের কোথাও না কোথাও :]

কামরাজ (স্বগত) : কী যে করি। হা হতোস্মি, হায় বিরুধনগরের শ্রীনিবাসন। সমস্ত চাল হল মাটি। আমি কোথায়? আমাকে হয়তো কয়েকটি মুখ্যমন্ত্রী একত্রে মনোনয়ন করত ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, যদি না আমার ভাগ্য হত মন্দ। কিন্তু এ অবস্থায় কী করা যায়?...এস্রে চালু, ইংগোবা, চালু!

'চালু' নামক মদ্রবাসীর প্রবেশ। চেহারা অনেকটা কলিকালের শকুনি। মাদরাজে ছিলেন কামরাজের একান্ত সচিব।

কামরাজ : চালু কী করি?

চালু : কিন্তু মুখ তো রাখতে হবে।

কামরাজ : মুখ? বিরুধনগরের পরে? যাক্‌গে, ওই দুজনকেই আনতে হবে মন্ত্রিসভায় যাতে একজন আরেকজনের খবরদারি করতে পারে। ব্যালেন্স? তাতেই আমার রাজনৈতিক ক্ষমতা। নান স্যারিয়া? (আমি কি ঠিক?)

[দ্বারকাপ্রসাদের প্রবেশ। সাদা খদ্দরের পোশাক। চলন ধীরস্থির।]

আইয়ে আইয়ে, বলিয়ে। ক্যায়সা হ্যায়?

মিশ্র : না, এ চলবে না। আমি ইন্দিরাজীকে চাই, সে ঠিক এবং আপনি জানেন। কিন্তু গত ন' তারিখে আমি তাঁকে বলেছি, ইন্দিরাজী, দেশাইকে মন্ত্রিসভায় ভাল আসন দিয়ে নিয়ে নাও। কেননা ভবিষ্যৎ দেখতে হবে। শুধু সামনের পাঁচ বৎসর তো নয়, কংগ্রেসকে ভারতের জনজীবনে রাখতে হবে সামনে। আমাদের চাই একতা।

[স্বগত : না, না, আসলে আমি চাই ওই মহারাষ্ট্রের মাথা-তোলা মানুষ চ্যবনের শিক্ষা। চ্যবনকে রাখতে হবে তৃতীয় স্থানে। একমাত্র লোক তাঁর উপরে থাকার হলেন মোরারজী।]

কামরাজ : আমিও তো তাই চাই। সুতরাং মোরারজীকে একটা স্থান দিতেই হবে।

মিশ্র : আমি ইন্দিরাকে স্পষ্ট বলেছি। দেখি উনি কী করেন। জানেন তো, জুটেছে কয়েকটা উপদেষ্টা ইন্দিরার আশেপাশে যতো সব চ্যাংড়া ছোঁড়া।

[এক নম্বর সাফদারজংগের বাড়ি। পুলিস প্রহরা। সাংবাদিকদের ভিড়। ভিতরে প্রবেশ নিষেধ।]

দিনেশ, অশোক : না, না মোটেই নয়। মোরারজীকে নয়। জানেন ওটার কী মানে? গিলে খাবে। আপনি কী করে চালাবেন ওই লোকটার সংগে? প্রতিক্রিয়া-শীল, একগুঁয়ে, কী নয়?

ইন্দিরা : ওয়েল ওয়েল! আমাদের পারটিকে দেখতে হবে, দেশকে দেখতে হবে। ঠিক যে, আপনাদের সাহায্যে আমার জিত অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভেবে দেখুন, আরও অনেকে আছেন, যাঁদের কথা আমি অমান্য করতে পারি না।

সমস্বরে : তারা কারা? আমরা জানতে চাই।

ইন্দিরা : (একটু হেসে) তাঁরা হলেন দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র, চন্দ্রভান গুপ্ত, নিজলিংগপ্পা, ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি, অতুল্য-বাবু......। এঁরা সকলে আমাকে কাম-রাজের সামনে প্রস্তাব দিয়েছেন মোরারজীকে দ্বিতীয় স্থান দিয়ে গ্রহণ করতে। কী করে তাঁদের অপমান করি?

[সাত নম্বর ত্যাগরাজ রোড-এর বাড়ি। মোরারজী বসে। চারদিকে অনেক দ্বিতীয় সারির নেতা : তারকেশ্বরী সিংহ, ললিত সেন, পুত্র কান্তিভাই; কে সি পন্থ ইত্যাদি।]

তারকেশ্বরী : না না হয় না। ওঁকে শিক্ষা দিতে হবে। দেশ আপনাকে চায়।

আর কে দিতে পারে নেতৃত্ব? আপনি হবেন প্রধানমন্ত্রী, সন্দেহ নেই। আমরা গণনা করে দেখেছি।

কে সি পন্থ : তা ঠিক। কিন্তু কামরাজ নিজে আমাকে ডেকে বললেন গিয়ে মোরারজীকে বুঝাও। উনি গ্রহণ করুন দ্বিতীয় স্থান, সহপ্রধানমন্ত্রী হিসেবে...

মোরারজী : সহপ্রধানমন্ত্রী? তা বেশ, তা বেশ। কিন্তু কোন্ মন্ত্রিত্ব? যা হোক হলে তো চলবে না। আমি তো জিততামই, তবে পার্টির খাতিরে ও জনগণের মঙ্গলের জন্যে যদি আমাকে স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়......

ললিত সেন : নো, নো, নো স্বার্থ-ত্যাগ। তাতে আমাদেরও যে স্বার্থ যাবে ত্যাগের পথে। মন্ত্রী না হলে জনগণকে কী করে সেবা করব? আপনিই হবেন প্রধানমন্ত্রী।

মোরারজী (কয়েক ঘণ্টা পর, সাংবাদিকদের সঙ্গে) : আমি প্রতিযোগিতায় নামছি। সন্দেহ নেই। আমিই হতে পারি উৎকৃষ্ট নেতা। (স্বগত : হে ভগবান। আমাকে ক্ষমা কর হে স্বর্ণকারেরা। আমাকে তোমরা ক্ষমা কর।)

প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ

[ফ্লাশব্যাক : সাত নম্বর ত্যাগরাজ রোড।]
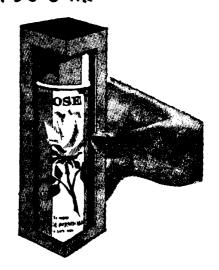
ইন্দিরা : মোরারজী, আপনি বয়স্ক, আপনি অভিজ্ঞ। আসুন, আমরা একত্রে গড়ি দেশ আর পারটিকে। নতুবা দেশ যাবে কমিউনিস্টদের হাতে, জনসংঘের হাতে, স্বতন্ত্রের হাতে। আমাদের জীবনের সমস্ত শপথ হবে বৃথা।

মোরারজী : তাহলে আমাকে সহ-প্রধানমন্ত্রিত্ব দিতে কী আপত্তি? শুধু তাই নয়, আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিত্ব চাই। তাতেই দিতে পারব নেতৃত্ব। চেয়ে দ্যাখ, তোমার নেতৃত্বে পারটিকে কোথায় এনেছ : মুদ্রা-মূল্য হ্রাস, আমেরিকা, পি এল ৪৮০, খাদ্যদ্রব্যের আকাল। দেশজোড়া হিংসা, আন্দোলন......তুমি কি চাও সশস্ত্র বিপ্লব? বেশ, যদি সম্মত না হও প্রতিযোগিতা হোক।

ইন্দিরা : তাতে আমি ভীত নই। কিন্তু কামরাজ আর অন্যান্যরা? আমাদের উচিত তাঁদের সম্মান রাখা। আসুন...

ওয়ার্কিং কমিটির সভার পর। চার নম্বর যন্তরমন্তর রোড।

মিশ্র+রেড্ডি+নিজলিংগপ্পা+অতুল্য+নায়েক+চন্দ্রভান গুপ্ত (সমস্বরে) : কামরাজজী! আপনি ইন্দিরা বহেন্‌কে বলুন। আমরা সবাই চাই একতা। মোরারজীকে সহ-প্রধানমন্ত্রীর পদ দেওয়া হোক। তবে হ্যাঁ স্বরাষ্ট্র দপ্তর নৈব নৈব চ। তাহলে যে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে যাবেন, আর কালক্রমে সকলকে তাড়িয়ে নিজে হবেন একেবারে প্রধান।

কামরাজ : পারকালম্‌! মোরারজী কামিং। আই সে টেক ইট অর গো। (স্বগত) : গত্যন্তর নেই। ইন্দিরা আমাকে দেখতে পারে না, জানি; আমিও কি তাঁকে পছন্দ করি?

অন্যান্যরা : তাহলে ঐ কথাই রইলো?

[এক নম্বর সাফদারজংগ রোড। রাত অনেক]

অশোক মেহতা : মোরারজীকে নয়। আমার বাড়িতে বাটজন মেম্বর এসে বলেছে, তাঁরা সবাই আপনার পক্ষে। ও এলে সর্বনাশ! (স্বগত : গড্‌! আমার কী হবে? আমি যে হতে চাই অর্থমন্ত্রী। মোরারজী এলে সব গুড়ে বালি।)

ইন্দিরা : লুক্‌। আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। তুমি যা আছ বেশ আছ। চলো একসংগে কাজ করি। তা না হলে অদূর-ভবিষ্যতে মন্ত্রিত্বের কাজ আর করতে হবে না।

[উনিশ নম্বর ক্যানিং লেন। সন্ধ্যে।]

অশোক মেহতা : অতুল্যদা আমার কী হবে?

অতুল্য ঘোষ : কেন বাবা বেশ তো আছ। মোরারজীকে মানতেই হবে। বেস্টওয়ে। আমি ইন্দিরাকে চাই, কিন্তু চাই ঐক্য এবং সহমত।

অশোক : আমার দিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন দাদা।

[এক নম্বর সাফদারজংগ রোড। সকাল। বাইরে বেজায় ভিড় সাংবাদিক আর সাদা-পোশাক গোয়েন্দা।]

চাবন+কোরেশী+ভগবৎ ঝা আজাদ+জগজীবনবাবু+ফকরুদ্দিন+অন্যান্য : তা হয় না। মোরারজীকে দেওয়া হোক শুধু দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ পদ ক্যাবিনেটে, তার বেশি কিছু নয়। প্লিজ্‌।

দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্র+নিজলিংগপ্পা+ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি : আশ্চর্য! প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়ে ফেলেছেন মোরারজীকে। নাউ ইটস টু লেট। ক্যায়সা হোগা? আদারওয়াইজ...

ইন্দিরাজী : আদারওয়াইজ?

পূর্বোক্তরা : (কেসে) মানে তাহলে আমাদের আবার ভেবে দেখতে হবে কাকে নেতা করা যায়।

ইন্দিরাজী : বেশ, বেশ, তাই হবে। আমি যাচ্ছি কামরাজের কাছে। আমি মেনে নিচ্ছি মোরারজীকে। আপনারাই হলেন আসল সমর্থক, আর দেশ ও পারটির জন্যে যে-কোনো ত্যাগের জন্যে আমি প্রস্তুত।

চন্দ্রভান গুপ্ত : (বাইরে এসে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে) সুখবর। প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর হবে না। মোরারজী হচ্ছেন ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার। উনি সম্মত হয়েছেন এবং তাঁরা উভয়েই কামরাজকে জানিয়েছেন।

ইন্দিরাজী : হাঁ, সব কিছুর জন্যে আমাদের ধন্যবাদ কামরাজকে। তাঁর ধৈর্য ও নেতৃত্ব প্রশংসনীয়। দেশ ও জনগণের সেবায় (বাকিটুকু কোলাহলে শোনা গেল না)।

[চার নম্বর যন্তরমন্তর রোড।]

কামরাজ : এয়ে চালু? তাহলে কী হল?

চালু : আজ্ঞে, সব ভাল যার শেষ ভাল।

(১১-৩-৬৭)

খগেন দে সরকার

॥ ৪ ॥

শেষ অতিথিকে বিদায় দিয়ে দেবাশিস ওপরতলায় গিয়ে দেখল, সব ঘরে বড় বড় আলো জ্বলছে; বসবার ঘরের একটা চেয়ারে দীপা শক্ত হয়ে বসে আছে। দেবাশিস তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেবাশিসের স্বভাব, যা সম্ভাব্য তাই তার মন স্বীকার করে নেয়, বিলক্ষণতার দিকে সহজে তার দৃষ্টি পড়ে না। সে দীপার দিকে দু' হাত বাড়িয়ে স্নিগ্ধ হেসে বলল—'এস।'

দীপা চকিতে একবার চোখ তুলল: তার চোখে ভয়ের ছায়া। দেবাশিস ভাবল, কুমারী মনের স্বাভাবিক লজ্জা। সে দীপার পাশের চেয়ারে বসে তার হাতের ওপর হাত রাখল, বলল—'বারোটা বেজে গেছে, আর কতক্ষণ বসে থাকবে। চল, শোবার সময় হল।'

দীপা হাত সরিয়ে নিল। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, তবু যা বলবার তা বলতে হবে, আর দেরি করা চলবে না। সে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল—'আমি—আমি আলাদা শোব।'

দেবাশিসের মনে কৌতুকের সঙ্গে একটু বিস্ময় মিশল। কথাগুলো যেন একটু বেসুরো, ঠিক লজ্জার মত নয়। তবু সে হাসিমুখেই বলল—'তুমি আলাদা শুলে ফুলশয্যা হবে কি করে?'

দীপার শরীর কেঁপে উঠল: সে শরীরের সমস্ত স্নায়ু পেশী শক্ত করে বলল—'না—না—আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আমি—'

এবার দেবাশিসের মন থেকে কৌতুকের ভাব একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। সে কিছুক্ষণ স্থির চোখে দীপার পানে চেয়ে থেকে বলল—'কি কথা বলতে চাও?'

দীপার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল, সে কোনোমতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমি অন্য একজনকে ভালবাসি।'

কথাটার ভাবার্থ দেবাশিসের মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে বেশ খানিকক্ষণ সময় লাগল, তারপর তার মনে যে দীপ জ্বলেছিল, তা আস্তে আস্তে নিবে গেল; তার মনে হল, ঘরের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোটাও যেন ক্রমে ক্রমে পিদ্দিমের চেয়েও নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। সে দীপার পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শুষ্ক প্রশ্ন করল—'তবে আমাকে বিয়ে করলে কেন?'

দীপা ঘাড় গুঁজে বসেই রইল, কেবল তার অন্তরের ব্যাকুলতা কণ্ঠস্বরে ব্যক্ত হল—'আমি দোষ করেছি, কিন্তু আমার উপায় ছিল না। বাড়ির লোক জোর করে আমার বিয়ে দিয়েছে।'

'যাকে ভালবাস, তাকে বিয়ে করলেই পারতে।'

'জাত আলাদা, তাই—'

'জাত!' একটা কঠিন হাসি দেবাশিসের মনের মধ্যে হিল্লোলিত হয়ে স্থির হল—'তা এখন কি করা যেতে পারে?'

দীপা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ব্যগ্র মিনতির কণ্ঠে বলল—'আমাকে আপনার বাড়িতে থাকতে দিন, আমি আপনাকে বিরক্ত করব না, আপনার সামনে আসব না—' তার গলা কান্নায় বুজে এল।

ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে দেবাশিস্ নিজের চুলের মধ্যে আঙুল চালাল, বলল—'এর জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। সব কথা ভেবে দেখতে হবে। তুমি যাও, শোও গিয়ে।' সে ফুল দিয়ে সাজানো শয়নঘরের দিকে আঙুল দেখাল—'আমি অন্য কোথাও শোব।'

দীপা আর দাঁড়াল না, দ্রুত ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। তার চুলে তখনো ফুলের মালা জড়ানো, গলায় হাতে ফুলের গয়না। সেই অবস্থাতেই সে ফুল-ঢাকা বিছানার ওপর আছড়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এত সহজে পরিত্রাণ পাবে, তা সে আশা করেনি।

দোতলায় আর একটি শয়নকক্ষ ছিল, দেবাশিসের বাবা যে ঘরে শুতেন; নকুল সে ঘরও পরিষ্কার করেছিল, খাটের ওপর বিছানা পেতে সুজনি ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। বিয়ের শুভদিনে বাড়িতে কোথাও সে অপরিচ্ছন্নতা রাখেনি। দেবাশিস্ দীর্ঘকাল অব্যবহৃত এই ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ খাটের পাশে বসে রইল। মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে, সে কক্ষ-

সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে কল খুলে মাথাটা কলের তলায় রাখল। তারপর ভিজে মাথায় ফিরে এসে আলো নিভিয়ে বিছানার সুজনির ওপরেই শুয়ে পড়ল।

রেল গাড়ি প্রচণ্ড বেগে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ যখন লাইনের বাইরে লাফিয়ে পড়ে, তখন কাউকে নোটিস দেয় না; দেবাশিসের জীবনে তেমনি আজ এই মহাদুর্যোগ এসেছে অপ্রত্যাশিতভাবে; দু' মিনিট আগেও এই দুর্যোগের কোনো আভাস সে পায়নি। কিন্তু আত্মহারা হয়ে বিপথে কুপথে ছুটোছুটি করলে চলবে না, মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভেবে চিন্তে সুবুদ্ধির পথ বেছে নিতে হবে।

দেবাশিস জটিল চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল। সে শান্ত ধীর প্রকৃতির মানুষ, অন্য কেউ হলে আজ রাত্রেই একটা কাণ্ড করে বসত।

দীপা অন্য একজনকে ভালবাসে, এইটেই হচ্ছে মূল কথা। দীপা কাকে ভালবাসে সে লোকটা কে, তা জানবার আগ্রহ দেবাশিসের নেই; সে যেই হোক না কেন, দীপা তাকে ভালবাসে। তবু দীপা পারিবারিক চাপে পড়ে দেবাশিসকে

বিয়ে করেছে। কিন্তু এই বিয়েকে সে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্কে পরিণত করতে চায় না। ......প্রেমাস্পদের সঙ্গে দীপার ঘনিষ্ঠতা কত দূরে অগ্রসর হয়েছিল? জল্পনা নিষ্ফল।

দীপার বাড়ির সকলেই অবশ্য দীপার অসবর্ণ প্রণয়ের কথা জানে, নিজয়মাধব জানতো। জেনে-শুনে তারা এই কাজ করেছে। হয়তো ভেবেছে, বিয়ের পর দীপা ক্রমে তার প্রণয়ীকে ভুলে যাবে। কিন্তু দীপা ভুলবে বলে মনে হয় না, প্রণয়ীর প্রতি তার একনিষ্ঠা আছে। ......নৃপতি কি জানে? বোধ হয় জানে না, জানলে দেবাশিসের এমন অনিষ্ট করত না; নৃপতিকে সজ্জন বলেই মনে হয়। ......কিন্তু যা হবার তা তো হয়েছে এখন এই জট ছাড়াবার উপায় কি? ডিভোর্স?

একটা বেজে গেল, দুটো বেজে গেল। এতক্ষণ পরে দেবাশিস লক্ষ করল, বসবার ঘরে তীব্র শক্তির আলোটা জ্বলেই চলেছে। সে উঠে আলোটা নেবাতে গেল। দীপার ঘরের দরজা বন্ধ; দরজার পাশ দিয়ে যাবার সময় সে একটু থেমে কান পেতে শুনল, কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে কোনো শব্দ এল না; দীপা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বসবার ঘরের আলো নিবিয়ে ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়ল।

ঝাঁ ঝাঁ রাত্রি। কলকাতা শহর নিঃঝুম হয়ে আছে। দূরে একটা রেলের ইঞ্জিন একটানা বাঁশী বাজাতে বাজাতে আরো দূরে গিয়ে মিলিয়ে গেল। দেবাশিস অন্ধকারে চোখ মেলে শুধু ভাবছে—

তিনটে বেজে গেল। দেবাশিসের মনে হল, নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে এক বিন্দু জোনাকি-আলো জ্বলছে আর নিবছে...... একটা অর্ধ-পরিণত সংকল্প...তার বেশী আজ রাত্রে আর কিছু সম্ভব নয়......

দেবাশিস আবার বাথরুমে গিয়ে মাথায় জল ঢালল, তারপর ফিরে এসে বিছানায় শোবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু বেশীক্ষণ ঘুমোতে পারল না, শরীরের ক্লান্তি কেটে যাবার পর ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতেই তার ঘুম ভেঙে গেল। সে মুখ ধুয়ে নীচে নেমে গেল। নকুল তখনো ওঠেনি, কাল রাত্রের খাটা-খাটুনির পর আজ বোধ হয় একটু বেশী ঘুমিয়ে পড়েছে। দেবাশিস নিঃশব্দে সদর দরজা খুলে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। শুকনো বাগানে ফুল নেই, কিন্তু ভোরের বাতাসটি বেশ মিঠে। সে সদর দরজা থেকে ফটক পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল।

একটু একটু করে দিনের আলো ফুটছে, কিন্তু এ রাস্তায় এখনো লোক চলাচল আরম্ভ হয়নি। দেবাশিস পায়চারি করতে করতে একসময় ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল। বন্ধ ফটকের ওপর কনুই রেখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল, বাঁ দিক থেকে একজন লোক হন্‌হন্ করে আসছে। কাছে এলে সে চিনতে পারল—বিজয়মাধব।

বিজয়মাধবের সঙ্গে এই কয় দিনে দেবাশিসের বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, উপরন্তু সে এখন তার শ্যালক। কিন্তু বিজয়কে আসতে দেখে তার মনটা গরম হয়ে উঠল। তাই বিজয় যখন মুখে হাসি ফুটিয়ে ফটকের ওপারে এসে দাঁড়াল তখন দেবাশিসের মুখে সে হাসির প্রতিবিম্ব পড়ল না, সে গম্ভীর চোখে বিজয়ের পানে চেয়ে বলল—'আবার কি জন্যে এসেছেন? কর্তব্য-কর্ম কি এখনো শেষ হয়নি?'

বিজয়ের হাসি মিলিয়ে গেল, সে থতমত খেয়ে বলে উঠল—'দীপা কিছু বলেছে নাকি?'

দেবাশিস নীরস কণ্ঠে বলল—'সবই বলেছে। সে অন্তত আমায় ঠকায়নি।'

বিজয় কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত চেয়ে থেকে হঠাৎ ফটক খুলে ভিতরে এল, তারপর দেবাশিসের হাত চেপে ধরে ব্যগ্র মিনতির স্বরে বলল,—'ভাই দেবাশিস, তুমি দীপার স্বামী, তুমি আমার পরমাত্মীয় আমার ছোট ভাইয়ের সমান। আমি একটা কথা বলব, শুনবে?'

'কি বলবেন বলুন।'

'দীপা একেবারে ছেলেমানুষ, সবে সতেরো পেরিয়ে আঠারোয় পা দিয়েছে, ওর মনে কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছু নেই। ওইটুকু মেয়ের বুদ্ধিই বা কতখানি? তুমি ভাই ওর কথায় কান দিও না। দু' চার দিন ঘর করলেই আগের কথা সব ভুলে যাবে। কম বয়সের একটা খেয়াল বই তো নয়!'

'ওর কথা শুনে তা তো মনে হয় না।'

'মেয়েমানুষের কথার কি কোনো দাম আছে? ওরা আধুনিক কায়দায় বড় বড় কথা বলে, ভিতরে কিন্তু ফক্কিকার। দীপা স্কুলে পড়েছে, স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে মিশে পাকামি শিখেছে। ওর মনটা ভাবি ভাব-প্রবণ; সিনেমা থিয়েটার নাচগানের দিকে টান আছে, যদিও আমরা তাকে কোনোদিন আশকারা দিইনি। আমি জোর গলায় বলছি, আমাদের বংশের মেয়ে কখনো বিপথে কুপথে যাবে না।'

দেবাশিস শান্ত গলায় বলল—'আপনার ভয় নেই, এ নিয়ে আমি ঝোঁকের মাথায় কেলেঙ্কারি কাণ্ড করব না, যা করবার ভেবে-চিন্তে করব। এ কথা বাড়ির বাইরে আর কেউ জানে?

'না।' বিজয় আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় বাড়ির দোরের কাছে নকুলকে দেখা গেল। নকুল এগিয়ে এসে বলল—'দাদাবাবু চা তৈরী হয়েছে।'

বিজয় খাটো গলায় তাড়াতাড়ি বলল—'আচ্ছা ভাই, আজ আমি যাই। শিগ্গির আবার আসব।' বলে সে দ্রুতপদে চলে গেল।

দেবাশিস বাড়ির দিকে ফিরে যেতে যেতে বলল—'নকুল, তুই আমাদের চা ওপরের ঘরে দিয়ে আয়।'

নকুল মুচকি হেসে বলল,—'তাই দিয়েছি দাদাবাবু।'

দেবাশিস দোতলায় উঠে গেল। দেখল, বসবার ঘরে নীচু টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম সাজানো রয়েছে, আর দীপা তক্তপোশের পাশে চুপটি করে বসে আছে। কাল রাত্রে যেমন বসে ছিল। অবশ্য কাল রাত্রের বাসি জামাকাপড়, ফুলের গয়না আর নেই, তার বদলে পাট-ভাঙা সাদা শাড়ি ব্লাউজ। দেবাশিস আসতেই দীপা একটু আড়ষ্টভাবে উঠে দাঁড়াল।

দেবাশিস দোর বন্ধ করে দিয়ে দোরের সামনে ফিরে দাঁড়িয়ে দীপার পানে তাকাল। খোলা জানলা দিয়ে সকালের নরম আলো দীপার ওপর পড়েছে। বিজয় যা বলেছিল তা মিথ্যে নয়, দীপার ছিপছিপে শরীরে কৌমার্যের অপরিণত কোমলতা এখনো লেগে আছে, ভারি ছেলেমানুষ মনে হয়। কিন্তু তার মুখে পরিণত মনের দৃঢ়তা, মুখের লাবণ্য যেন দৃঢ়তার উপাদানে তৈরী।

দেবাশিস কাছে এসে চায়ের সরঞ্জামের দিকে দৃষ্টি নামাল; টি-পটে চা, দুটি পেয়ালা, গরম দুধ, চিনির কিউব, প্লেটে স্তূপীকৃত টোস্ট, মাখনের পাত্রে মাখন, অন্য একটি পাত্রে মরমালেড এবং চারটি সিদ্ধ ডিম। নকুল দুজনের জন্যে প্রচুর প্রাতরাশ করেছে, একলা দেবাশিসের জন্যে এত করে না।

দেবাশিস দীপার দিকে চোখ তুলে সহজ গলায় বলল—'তুমি চা ঢালবে?'

দীপাদের বাড়িতে সাবেক রেওয়াজ,

পেয়ালায় চা ঢালা হয়ে সকলের কাছে যায়। প্রাতরাশ খাওয়ার কোনো বিধিবদ্ধ রীতি নেই। সে একটু ইতস্তত করল। তাই দেখে দেবাশিস বলল,—'আচ্ছা, আমিই চা ঢালছি।'

দু'টি পেয়ালায় চা ঢেলে সে একটি পেয়ালা দীপার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল,—'বসো। তোমার সঙ্গে কথা আছে, চা খেতে খেতে কথা হবে।'

দীপা সংকুচিতভাবে চেয়ারে বসল। তার সংকোচ মনের জড়ত্ব নয়, অপরিচিত এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সংকোচ। তার জীবনে অভাবনীয় ওলটপালট আরম্ভ হয়েছে।

দেবাশিস নিজের চায়ে একটি ছোট চুমুক দিয়ে পেয়ালা নামিয়ে রাখল, বলল—'তোমার দাদা বিজয়মাধব আজ ভোর হতে না হতে এসেছিল।'

দীপা চকিত চোখ তুলে আবার চোখ নত করল। দেবাশিস এক টুকরো টোস্টে মাখন লাগাতে লাগাতে বলল—'তার কথা শুনে মনে হল তোমার গুপ্তকথা বাড়ির সবাই জানে। বাইরের কেউ জানে নাকি?'

দীপা মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'না—না—' আর কোনো কথা তার শুকনো গলা দিয়ে বেরুল না।

দেবাশিস বলল,—'তা সে যাই হোক, সব কথা বিবেচনা করা দরকার। একটা ব্যাপার ঘটেছে। আমার জীবনে হঠাৎ একটা বেয়াড়া সমস্যা এসে হাজির হয়েছে। যথাসাধ্য কেলেঙ্কারি বাঁচিয়ে তার নিষ্পত্তি করতে হবে। আমার কথা বুঝতে পারছ?'

দীপা ঘাড় নাড়ল, অস্ফুট স্বরে বলল—'পারছি।' সে কিন্তু দেবাশিসের ধরনধারণ কিছুই বুঝতে পারছে না। এরকম অবস্থায় মানুষ কি এমনিভাবে কথা বলে?

দেবাশিস টোস্টে কামড় দিয়ে বলল—'তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

দীপা তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিল, কিন্তু হাতের পেয়ালা হাতেই রইল, ঠোঁট পর্যন্ত উঠল না।

দেবাশিস শান্তভাবে বলল—'সমস্যার সোজাসুজি নিষ্পত্তি হচ্ছে—ডিভোর্স।'

দীপার হাতের পেয়ালা কেঁপে উঠল। আর একটু হলেই পড়ে যেত। সে সামলে নিয়ে রুদ্ধস্বরে বলল—'না।'

দেবাশিস ভুরু তুলে বলল—'না কেন? তোমার বাড়ির লোক ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে না দিয়ে অন্যায় করেছেন, সে অন্যায় সংশোধন করা উচিত।'

দীপা নত চোখে বলল—'আমার দাদু—তিনি তাহলে বাঁচবেন না।'

দেবাশিস কিছুক্ষণ কথা কইল না, কতকটা যেন অন্যমনস্কভাবেই দীপার পানে চেয়ে রইল। তারপর নিজের ঈষদুষ্ণ পেয়ালাটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে নিঃশেষ করে আবার রেখে দিল।

উদয়মাধবকে দেবাশিস দেখেছে, বৃদ্ধের চারিত্রিক প্রবলতা অনুভব করেছে, নাতনী ডিভোর্স-কোর্টে গিয়েছে শুনলে তিনি হয়তো আত্মহত্যা করবেন না, কিন্তু নাতনীকে খুন করতে পারেন।

'ডিভোর্স যদি সম্ভব না হয় তাহলে দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে—তুমি বাপের বাড়ি ফিরে যাও, সেখানে যেমন ছিলে তেমনি থাকো।'

'না, ওরা আবার আমায় ফেরত পাঠিয়ে দেবে। মাঝ থেকে জানাজানি হবে।'

'তাহলে তৃতীয় পন্থা হচ্ছে এখানেই থাকা। আলাদাই থাকবে, আমি তোমার কাছে যাব না। কিন্তু আমারো তো লোকলজ্জা আছে। বাইরের লোকের কাছে ভণ্ডামি করতে হবে। তুমি পারবে?'

দীপা ঘাড় নেড়ে জানাল, সে পারবে।

দেবাশিস বলল—'বাড়ির চাকরও বাইরের লোক। তার সামনেও ধোঁকার টাটি খাড়া রাখতে হবে।'

দীপা আবার ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

দেবাশিস নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল—'বেশ। কিন্তু এভাবে কত দিন চলবে?'

দীপা চুপ করে রইল, এ প্রশ্নের উত্তর সে নিজেই জানে না। দেবাশিস আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা খুবই অল্প; কিন্তু তার মনে হল, এরা বড় স্বার্থপর, নিজের স্বার্থই বোঝে, আর কারুর কথা ভাবে না।

কাল দেবাশিস ভেবেছিল, এখন দু তিন দিন সে ফ্যাক্টরিতে যাবে না, সারা দিন বাড়িতে থেকে বউয়ের সঙ্গে ভাব করবে। কিন্তু সব ভণ্ডুল হয়ে গেল। সে খানিকক্ষণ বিমনাভাবে ঘরে বেড়াল, কাল রাত্রে যে বিছানায় শুয়েছিল সেটা ঝেড়েঝুড়ে ঠিক করে রাখল, মকুল না সন্দেহ করে যে, তারা আলাদা শুয়েছে। তারপর রান্নাঘরে গিয়ে

বলল—'নকুল, আমার খাবার তৈরি কর, আমি ন'টার সময় ফ্যাক্টরি যাব।'

স্নান করতে গিয়ে দেবাশিসের একটা কথা মনে এল। সে দেখল, দীপা তখনো বসবার ঘরে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, সে তার কাছে গিয়ে বলল—'নকুলের চোখে যদি ধুলো দিতে হয় তাহলে তোমার ঘরের লাগোয়া বাথরুমে আমাকে স্নান করতে হবে। অন্য বাথরুমে আমার ভিজে কাপড় দেখলে নকুলের মনে সন্দেহ হবে। আমি তোমার বাথরুমে স্নান করতে পারি?'

দীপার মনে হল দেবাশিস তাকে ব্যংগ করছে। সে চোখ তুলে চাইল, কিন্তু দেবাশিসের মুখে ব্যংগবিদ্রূপের চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না। সে তখন একটু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

দেবাশিস স্নানাহার করে ন'টার সময় কাজে চলে গেল।

অতঃপর সংসারের সব ভার পড়ল নকুলের ওপর। নতুন বউকে বাড়ির কাজকর্ম শেখাতে হবে, বউয়ের খাওয়াদাওয়ার ওপর নজর রাখতে হবে। বাড়িতে দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নেই: সাময়িকভাবে নকুল হয়ে উঠল বাড়ির গিন্নী। (ক্রমশঃ)

ইংরেজী শব্দের বাংলা বানান প্রসঙ্গে

সুবোধ চৌধুরী
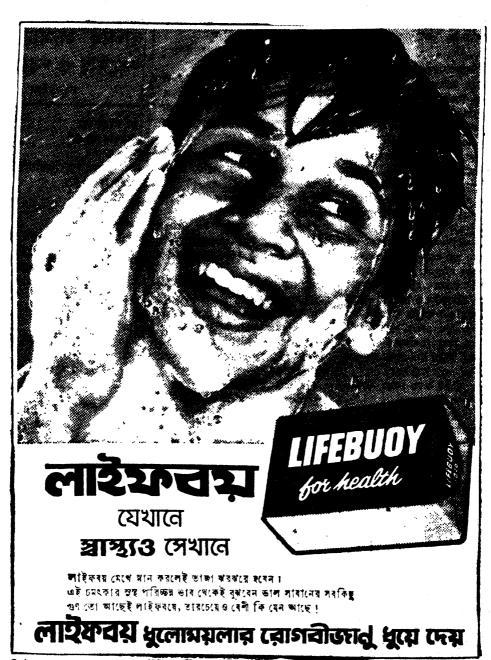
২১শে মাঘের দেশ পত্রিকায় জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ এবং তার পরের সংখ্যায় শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী লিখিত উত্তর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছি। চৌধুরী মশায়ের উত্তরে প্রায় সর্বত্র যে অসৌজন্য এবং অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে, তা তাঁর যুক্তির দুর্বলতাই সূচনা করে। অমিতাভ-বাবু তাঁর প্রবন্ধে উনিশ শতকের খ্রীষ্টান পাদ্রী মারডকের একটি পরিত্যক্ত মতবাদের উপর তাঁর মতকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এ ছাড়া আনন্দবাজারের বানান সংস্কারকে অভিনন্দিত করে শ্রদ্ধেয় প্রবোধ সেন মশায় যে একটি অসতর্ক সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, এটিই তাঁর বড় পুঁজি। কিন্তু মারডকই হোন আর প্রবোধ সেনই হোন, তাঁদের মতের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন না করে, শুধু এগুলোকে জয়পত্রের মত ললাটে স্থাপন করে বানান-সংস্কারের দিগ্বিজয়-যাত্রা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

মারডক সাহেব সম্পর্কে মনে রাখতে হবে, তিনি বাংলা ভাষার বিশেষজ্ঞ নন; একজন বিদেশী শিক্ষার্থী, তাও অমনোযোগী শিক্ষার্থী মাত্র। বাংলা অক্ষর ও বর্ণমালা সম্পর্কে মারডক প্রশ্ন তুলেছিলেন—

(১) বাংলা শব্দে স্বরলোপ, অর্থাৎ ব্যঞ্জনের হসন্ত উচ্চারণ সর্বত্র চিহ্নিত হয় না কেন? এবং ঠিক উচ্চারণ অনুযায়ী স্বরচিহ্ন দেবার বেলায় বাংলা লিখন-রীতিতে ঔদাসীন্য কেন? যেমন মত, তত ইত্যাদি মতো, ততো উচ্চারিত হয়, এবং বরমালা, নূপবর ইত্যাদিতে বর প্রথমটায় স্বরান্ত এবং দ্বিতীয়টায় হসন্ত উচ্চারণ।

(২) মারডক সাহেবের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলায় স্বরবর্ণের হ্রস্বদীর্ঘ ভেদের প্রয়োজন কি? ই-ঈ, উ-ঊ, এসব বর্ণকে একটা সাধারণীকরণের পর্যায়ে এনে ফেলা যায় না কি?

(৩) এবং তৃতীয়ত, বাংলা বর্ণমালায় বহুল সংযুক্ত অক্ষরকে যথাসম্ভব কমিয়ে বা বর্জন করে কোন সহজ সরল উপায় কি উদ্ভাবিত হতে পারে না?

মারডকের আপত্তিগুলিকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, বাংলা লিখন ও উচ্চারণের সামঞ্জস্যহীনতা; এবং দ্বিতীয়, বাংলা সংযুক্ত বর্ণের জটিলতা।

প্রথমটি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কারকালে দেবপ্রসাদ ঘোষ মশায়ের রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একটি চিঠির রসিকতার কথা মনে পড়ে। ঘোষ মশায় একজন হিন্দুস্থানী অধ্যাপকের গল্প (অবশ্য গল্পই) উল্লেখ করে বলেছিলেন, উক্ত অধ্যাপক নাকি ইংরেজী বানান ও উচ্চারণের অসঙ্গতি সম্পর্কে বড় বিপন্ন বোধ করতেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, "আংরেজী বাত্ বহুত তাজ্জব বাত্ হৈ; আংরেজ লোগ বোলতে হৈ নালিজ, ঔর লিখতে হৈ কুনাউলেড্গে (know-ledge)।" বলা বাহুল্য, ইংরেজীর মত এমন গুরুতর তালাক (ভাষা দেবপ্রসাদ-বাবুর) বাংলা বানানে এখনো সম্ভব হয়নি—মারডক সাহেব বেঁচে থাকলে এ কথা স্বীকার না করে তাঁরও উপায় থাকত বলে মনে হয় না।

বস্তুত কোন জীবন্ত ভাষাকেই তার phonetic কাঠামোর মধ্যে বাঁধা যায় না; কিন্তু তা হলেও উচ্চারণ এবং লেখনের বৈসাদৃশ্যকে ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়।

মারডক সাহেব বাংলা স্বরবর্ণের হ্রস্বদীর্ঘ ভেদের যে আপত্তি তুলেছেন, তা মানলে বাংলার সংস্কৃত-মূল ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করে দেওয়া হবে। এবং এ সম্পর্কেও এটা লক্ষ্য করতে হবে, স্বরের ধ্বনি ও লিপিতে পার্থক্য রোমান বর্ণলিপিতে যতটা বিষম, বাংলা অর্থাৎ সংস্কৃতানুসারী লিপিতে তার চেয়ে অনেক কম—আমাদের লিপি অনেক সুশৃঙ্খল এবং যথাযথ। ইংরেজীর সবচেয়ে সহজ উচ্চারণের স্বরবর্ণ হয়ত O (ও), কিন্তু তারই কত অজস্র রকমের উচ্চারণ দেখা যাক—

সঠিক ও উচ্চারণ, যেমন no, so; উ উচ্চারণ to; accented উ উচ্চারণ do; ঊর্ধ্বাকৃষ্ট ও উচ্চারণ note, tone; হ্রস্ব আ উচ্চারণ dove, love; accented ও উচ্চারণ bold, cold; accented অ উচ্চারণ top, hot; প্রায় অর্ধ dipthon-gised ঊর্ধ্বাকৃষ্ট ও উচ্চারণ noble ইত্যাদি। তার উপর O (ও) যখন double হচ্ছে—দীর্ঘ আ উচ্চারণ flood, blood; দীর্ঘ উ উচ্চারণ food, root; দীর্ঘ ও উচ্চারণ door; উঅ উচ্চারণ poor ইত্যাদি। তারপর অন্য স্বরের সঙ্গে যুক্ত হলে, উদাহরণ স্বরূপ শুধু U স্বরের সঙ্গে উচ্চারণই ধরুন— tour (টু), pour (পো), sour (সাউআ), courage (কা) কত বিচিত্র, কত জটিল। এর সঙ্গে oe, oea ইত্যাদির যোগাযোগ যে আরো কিরূপ বিভীষিকাময় একথা বলে বোঝাতে হয় না। তাই জিজ্ঞাসা, যে-মারডক সাহেব বাংলা বর্ণমালায় ই ঈ দেখে মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন, তাঁর নিজের ভাষার স্বরবর্ণের উচ্চারণটি কিরূপ? আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীতে যদি এর জন্য কোন নির্বোধ সরলীকরণের প্রয়োজন না হয়ে থাকে, তবে বাংলার বেলায় এই হঠকারিতা কেন প্রশ্রয় পাবে বুঝতে পারছি না। অমিতাভবাবু কি তাঁর বানান সংস্কারের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত এই দেড়শ বছরের মধ্যে মারডকের চেয়ে কোন যোগ্যতর গুরু খুঁজে বের করতে পারেন না?

মারডকের অন্যতর আপত্তি বাংলার সংযুক্ত বর্ণের বাহুল্য সম্পর্কে—এখানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বাংলা লিপির ব্রাহ্মীমূল trdition এবং বাংলায় সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ উচ্চারণে তার উপযোগিতা। অবশ্য নবীকরণের দিক থেকে typogra-

phic নজীর অবশ্যই এখানে উপস্থিত করা যাবে—কিন্তু বাংলা linotype প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা সে সংস্কার পূর্বেই সাধন করেছে। বাংলা দেশের অন্যান্য পত্রপত্রিকায় এবং মুদ্রণ সংস্থায়, এবং টাইপরাইটারে তা শ্রদ্ধার সংগে স্বীকৃতি পেয়েছে। এ বিষয়ে, বলতে গেলে, বাংলার অনেকে আদর্শের কাজ করেছে আমরা লিপিমালার সংযুক্তাক্ষর গ্রথনের রীতিটি। নাগরীতে ট, ড প্রভৃতি বর্তুল অক্ষরে মাত্র সংযুক্তবর্ণ উপরে নীচে যুক্ত হয়, অন্যত্র প্রথম অক্ষরের অর্ধের্র সংগে পরবর্তী সম্পূর্ণ অক্ষরের যোগ ঘটে। এ নিয়ম লিপি-শিক্ষার্থীর পক্ষে যেমন অনায়াসসাধ্য, press, typewriter-এর বেলায়ও ঠিক তেমনি। মোটামুটি এই আদর্শ ঘা নিয়মই বাংলা যুক্তাক্ষরের typographyতে গৃহীত হয়েছে—এবং তা সর্বজনস্বীকৃত রূপে চলছে, অবশ্য তার একটু-আধটু উন্নতি-বিধানও হচ্ছে না তাও নয়।

এবার মূলে নিয়ে যাবার আগে অমিতাভ-বাবুর অন্যতম নির্ভর শ্রীযুক্ত প্রবোধ সেন মশায়ের বক্তব্যের আলোচনা করা যাক। সেন মশায় আনন্দবাজারের ইংরেজী বানানে রেফ্

বর্জন এবং স্থানে স্থানে সংযুক্তবর্ণ বিশ্লেষণকে একটি বিপ্লবাত্মক কাজ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, বাংলা ভাষার ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশ-নন্দিনীর আবির্ভাব যেমন স্মরণীয়, আনন্দবাজারের এই নূতন বানানও তেমনি স্মরণীয় ব্যাপার। কোন পণ্ডিতব্যক্তি যখন উচ্ছ্বাসবেগে চালিত হয়ে এমন অতিশয়িত উক্তি করে বসেন, তখন সাধারণ পাঠকের অসহায় বোধ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

আনন্দবাজারের ইংরেজী বানানে রেফ্ বর্জন এবং যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণকে সমর্থন করতে গিয়ে প্রবোধ সেন মশায় একটি নূতন তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। পারক (park), আরক (arc), মারকিন প্রভৃতি বানানে রেফ্ (পার্ক, আর্ক, মার্কিন) বা হস্‌চিহ্ন (পার্‌ক্, আর্‌ক্, মার্‌কিন্) না থাকাকে তিনি বাংলা ভাষায় দুর্গেশ-নন্দিনীর আবির্ভাবের মত বিপ্লবাত্মক বলে মনে করেছেন। প্রবোধ সেন মশায় বলেছেন, এতে যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রাবল্য বর্জিত হওয়ায় অল্প বয়স্ক শিক্ষার্থী, অবাঙালী শিক্ষার্থী এবং টাইপরাইটার প্রভৃতির সুবিধা হবে। এ সম্পর্কে আমাদের কথা মারডকের সিদ্ধান্তের আলোচনা প্রসঙ্গে সামান্য বলা হয়েছে, এবং পরেও কিছু বলা হবে। এখানে সেন মশায়ের নূতন তত্ত্বটির কথাই আলোচনা করা যাক।

প্রবোধ সেন মশায় হস্ বর্জন সম্পর্কে বলেছেন, বাংলা উচ্চারণে অ বর্ণ প্রায়ই লোপ পায়—আনন্দবাজার যদি পারক (park), নারস (nurse) লেখে তবে তাকে বাংলা উচ্চারণ প্রবণতার অনুসারী বলেই ধরতে হবে। মনে করতে হবে পারক-এর র ক বর্ণদ্বয়ে অধ্বনি silent বা লুপ্ত—এখানে অকার হীনতার প্রতীক হস্‌চিহ্ন দানের কোন সার্থকতা নেই। প্রবোধবাবু উদাহরণ দিয়েছেন পাগলা, পাতলা ইত্যাদি।

যাই হোক, রেফ্ বা হস্ বর্জনের তর্কে প্রবেশের পূর্বে প্রথমেই যা আলোচনার যোগ্য তা হল, পাগলা পাতলা ইত্যাদিতে গ ত ইত্যাদির অ-কে কি silent বলব? না বলব একেবারে নেই? ইংরেজীতে psalm শব্দে pl silent, কিন্তু লিপিতে দেখানো হচ্ছে। সংস্কৃতে ততোঽধিক শব্দে ঽ (লুপ্ত অ) silent, কিন্তু লিপিতে বর্তমান। এখানে প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইংরেজী উদাহরণটিতে দুরুচ্চার্য বলে pl silent; এবং দ্বিতীয় উদাহরণটিতে euphony বা সহজ সন্ধির জন্য অ লুপ্ত হয়েছে। তাই ইংরেজী silent বা সংস্কৃত লুপ্ত অ কার পারিভাষিক অর্থে প্রবোধ সেন মশায় যা বলেছেন তা বোঝায় না। এবং প্রবোধ সেন উদাহৃত লুপ্ত অ কারের কারণও ইংরেজী silent-এর দুরুচ্চার্যতা বা সংস্কৃতের মতন euphonic combination নয়। এখানে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করলে স্বরলোপ বা apocope (কিংবা syncope) of vowel sound বলতে হবে—silent অ বা লুপ্ত অ-কার বললে পারিভাষিক বিভ্রাট সৃষ্টি হতে বিলম্ব হবে না।

বাংলা উচ্চারণে বর্ণ লোপের কারণ ও প্রকৃতি উপরিউক্ত দুটি উদাহরণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক—বাংলা উচ্চারণে বর্ণলোপ হয় পূর্ববর্ণে accent বা শ্বাসাঘাত পড়ার জন্য, এবং শ্বাসাঘাতহীন বর্ণ লোপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাত্রাসাম্যের জন্য পূর্বস্বর দীর্ঘ হয় (পরিপূরক দীর্ঘতা বা compensatory lengthening)। যেমন সংস্কৃত ব্যাঘ্র, প্রাকৃতে বগ্‌ঘ, বাংলায় বাঘ—প্রাকৃতের বগ্‌ঘ যখন বাংলায় বাঘ হল, তখন ঘ-এর স্বরহীন উচ্চারণের জন্য পূর্বস্বর ব না থেকে বা হল। ব্যাপারটা ভাষাতত্ত্বে ও ব্যাকরণে silent অ বা লুপ্ত অ-কার নয়, অ ধ্বনির লোপ।

অবশ্য প্রবোধ সেন মশায়ের বক্তব্য আমরা

বুঝতে পেরেছি, আমাদের পূর্বোক্ত আপত্তি শুধু তাঁর পরিভাষাগত জটিলতা নিয়ে। কিন্তু অমিতাভবাবু এটা লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনা, প্রবোধ সেন মশায়ের লুপ্ত অ কারের সিদ্ধান্তটি আনন্দবাজারের স্বপক্ষে যাচ্ছে না। বাংলা উচ্চারণে অ স্বর লোপেরও একটা সাধারণ রীতি আছে—বাংলা তিন অক্ষরের শব্দে তৃতীয় বর্ণ, চার অক্ষরের শব্দে দ্বিতীয় চতুর্থ বর্ণ, পাঁচ অক্ষরের শব্দে তৃতীয় পঞ্চম বর্ণ স্বরহীন হয়। যেমন চমক, টহল, রকম; মখমল, বুলবুল, ঝনঝন; টহলদার, চমৎকার, জহরলাল। এর মধ্যে যদি বিশেষ উচ্চারণের খাতিরে তিন অক্ষরের শব্দে দ্বিতীয় বর্ণের স্বরলোপ হয়, তবে তৃতীয় বর্ণ স্বরান্ত হবেই —শুকনো, মুক্তো, আড্ডা, চিম্‌নি। বলা বাহুল্য এই উচ্চারণ রীতি অনুসারে পারক, নারস, হারট ইত্যাদির উচ্চারণ দাঁড়াবে pa-rok, na-ros, ha-rot কিংবা par-ka, nar-sa, har-ta. তাহলে এটা স্পষ্ট যে বাংলা শব্দের উচ্চারণে অ স্বর লোপের সূত্র দিয়ে আনন্দবাজারের নূতন বানান সংস্কারকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। তার উপর ইংরেজী উচ্চারণে স্বর-নির্ভরতাহীন দুটি অন্ত্য ব্যঞ্জনের পাশাপাশি অবস্থানের কথা এখানে এসেই পড়ছে যা বাংলা স্বরলোপ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল নয়।

সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মশায় তাঁর প্রবন্ধে আনন্দবাজারের বানান সংস্কারকে দুটি দিক থেকে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বাংলা উচ্চারণে দ্বিমাত্রিকতা এবং অন্ত্য যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রকৃত পক্ষে এই দুটি প্রশ্নই এই নূতন বানান সংস্কার বিষয়ে একান্ত প্রাসঙ্গিক এবং এর মধ্যেই নূতন বানানের রীতিকে বিধিবদ্ধভাবে আলোচনা করা যায়। অথচ দ্বিমাত্রিকতার ফলে বাংলা ও ইংরেজী উচ্চারণে যে একটা প্রভেদ এসে যায় সেটা লক্ষ্য না করে অমিতাভবাবু বিষয়টাকে এমন শ্লেষ কটূক্তি করে তাচ্ছিল্য ভরে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন কেন বোঝা গেল না। শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মশায় বসুমতীর সম্পাদকীয় রচনার সময় কতকগুলো stock গল্প (তা প্রায় অর্ধ শতাধিক হবে) ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করতেন। তার মধ্যে একটা চমৎকার গল্পের কথা মনে পড়ছে—স্কটল্যাণ্ডের এক চাষী তার মেয়েকে লণ্ডনে পড়তে পাঠিয়েছিলেন। মেয়েটি কিছুদিন পর বাড়ি গিয়ে বাপের উচ্চারণের খুঁত ধরতে লাগল। একদিন বাপকে মেয়েটি বললে, বাবা তুমি deffrence (ডেফ্রেন্স্) বল কেন? বাপ বললেন, কেন ওটা কি হবে? মেয়ে সপ্রতিভ ভাবে জবাব দিলে—ওটা difference (ডিফারেন্স্)। বাপের কানে পার্থক্যটা ধরা পড়ল না, অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, but darling, I find no deffrence between deffrence and deffrence.

প্রবোধ সেন মশায় যে বিষয়টিকে লুপ্ত অ-কার বা silent অ বলেছেন, তা প্রায়শঃই বাংলা উচ্চারণে দ্বিমাত্রিকতার ফল। ত্রিবর্ণ শব্দকে পা-গল্, পাগ্-লা প্রভৃতি রূপে উচ্চারণ করে আমরা তিন বর্ণকে দুই মাত্রায় দুটি syllable-এ ভাগ করে নিই। জল্, ফল্ প্রভৃতিতে শেষ বর্ণের স্বরলোপহেতু মাত্রাসাম্যের জন্য ঈষৎ দীর্ঘ করে দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ করি জ-ল্, ফ-ল্। এই উচ্চারণ প্রভাবে দু ভাগে বিশ্লিষ্ট চতুর্বর্ণিক শব্দকে আমরা দুটি দ্বিমাত্রিক syllable-এর যোগ বলে ধরি। তাই বোমবাই, মাদরাজ ইত্যাদি আনন্দবাজারী বানানের উচ্চারণকালে বাংলা উচ্চারণ প্রকৃতি অনুযায়ী একটা ব্যবচ্ছেদ এসে যায়। এইরূপ শ্লথ উচ্চারণের ফলে ভাষাতত্ত্বে যাকে metanalysis বা বিষমচ্ছেদ বলে, ঐ রকমের একটা অর্থ-বিপর্যয়ও কোন কোন শব্দে এসে পড়া সম্ভব। Churchill যদি চার/চিল হয়, Marx মার/কস, century সেন/চুরি, তবে নাম বা শব্দের মর্যাদায় নূতন অর্থ উঁকি-ঝুঁকি মারতে পারে—হয়ত এ রকম করে শব্দের নূতন নূতন লোকার্থ (folk etemology) বেশি সৃষ্টি হবে না, কিন্তু

স্বিমাত্রিক যথার্থতার ফলে ইংরেজী উচ্চারণ ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

তারপর যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট করে কোন-স্থানেই যদি হস্‌ ব্যবহার করা না হয়, তবে পারক (park), মারক (mark), আরক (arc) এবং চতুর্বর্ণিক ও পঞ্চবর্ণিক শব্দে উচ্চারণ বিভ্রাট ঘটবেই। তাই রেফ্‌ বা যুক্ত-বর্ণকে বাংলা লিপি থেকে যখন বর্জন আমরা করছি না, তখন শুধু ইংরেজী শব্দে কোন কোন স্থানে তা বর্জন করে কি মহাবিপ্লব সাধিত হচ্ছে বোঝা দুষ্কর। বিশেষত আনন্দবাজার ছাড়া বাংলা দেশের অন্য পত্রপত্রিকা প্রবোধ সেন মশায়ের গুরুতর সার্টিফিকেট সত্ত্বেও এই নবীনত্বকে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেনি। সাধারণ পাঠকপাঠিকা এবং ভাষা-শিক্ষার্থী ও একে বিভ্রান্তিকরই মনে করেছে, বঙ্কিমের প্রথম দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের মত ভাষা বা সাহিত্যক্ষেত্রে একে মহা আবির্ভাব বলে স্তুতিবাদ জানাবার কোন উৎসাহই প্রদর্শন করেনি।

সংযুক্ত বর্ণকে অযথা বিশ্লিষ্ট করার আর একটি মুশকিল হচ্ছে এই যে, তাতে দীর্ঘ শব্দের অতিব্যাপিত রূপ হাস্যকর হয়ে উঠবে। যেমন জরজ বারনারড শ—আনন্দ-বাজারের সম্পাদকীয় বিভাগে ত ইংরেজী সাহিত্যের কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তিও রয়েছেন, কিন্তু ঐ বানানের শিরোনাম-লাঞ্ছিত কোন বাংলা প্রবন্ধ লিখতে তাঁরা উৎসাহী হবেন কি? এতে যে অযথা বর্ণ-বৃদ্ধি করা হবে, তাতে বাংলা typography-র কি শোভাবর্ধন বা উপযোগিতা ঘটবে তা বুঝে ওঠা কষ্টসাধ্য। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে অসম্পূর্ণ গুরুমুখী বর্ণমালার পরাপত (প্রাপ্ত), অতিয়াশচরজ (অত্যাশ্চর্য) প্রভৃতি জাতীয় লেখন প্রণালীর উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—বাংলা লিপিকে 'পিছু হটো' করে প্রগতির নামে পশ্চাৎ-মুখী করে দেবার প্রয়োজন কি?

লক্ষ্য করছি, এখানে একটা উল্টা প্রশ্ন করা হচ্ছে, এবং সে প্রশ্নের প্রশ্রয় এসেছে শ্রীযুক্ত প্রবোধ সেন মশায়ের কাছ থেকেই। প্রবোধবাবু আনন্দবাজারের যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ সমর্থন করতে গিয়ে বলেছেন, আমরা পাগলা লিখি, পাগ্লা কখনো লিখি না—বরং তা লেখাই পাগলামি হবে। বুঝলাম, কিন্তু এর সঙ্গে মূল প্রশ্নের সম্পর্ক কি? বাংলায় অযুক্ত ব্যঞ্জনকে যুক্ত করছি না বলে যুক্ত ব্যঞ্জনকে বিযুক্ত করে দিতে হবে—এ কথা কি খুব প্রাসঙ্গিক? অথচ এই উল্টা (converse) তর্কের প্রশ্রয় পেয়ে অমিতাভবাবু রসিকতায় একেবারে ফেটে পড়েছেন—'ন্যাকার ছোক্রা ঢুক্রে কেঁদে উঠল', 'কর্পূর লিখি ভর্পুর লিখি না' ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে 'উল্টা বুঝলি রাম' ছাড়া আমাদের আর কি-ই বা বলবার থাকতে পারে?

অবশ্য এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে আনন্দবাজার সংস্কৃত শব্দকে বিশ্লিষ্ট করতে চান না—শুধু অসংস্কৃত এবং ইংরেজী শব্দ নিয়েই তাঁদের সংস্কার চলবে। তার উপর ইংরেজী শব্দেরও আদিতে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে তা তাঁরা বিশ্লিষ্ট করবেন না। তা হলে সংস্কৃত যুক্তব্যঞ্জনে এবং ইংরেজীর আদ্যক্ষর যুক্ত হলে লাইনো কিংবা টাইপরাইটার কিংবা টেলিপ্রিণ্টার কিছুই বাধাপ্রাপ্ত হবে না—হবে শুধু ইংরেজীর আদ্যব্যতিরিক্ত যুক্তাক্ষরে এবং অসংস্কৃত শব্দের যুক্তাক্ষরে। বাংলা লাইনো টাইপের অন্যতম পথপ্রদর্শক এবং নির্মাতা আনন্দবাজারের শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়; তিনি কিন্তু সংস্কৃত শব্দের যুক্তাক্ষরকে এবং ইংরেজীর আদ্য যুক্তাক্ষরকে সুসহ মনে করে অন্য যুক্তাক্ষরকে দুঃসহ মনে করেন নি। অর্থাৎ অমিতাভবাবুর প্রবন্ধে linotype, typewriter বা teleprinter এসব যন্ত্রপাতির দোহাই বারংবার উচ্চারিত হলেও যন্ত্র একক্ষেত্রে পারগ অন্যক্ষেত্রে অপারগ এ কথা কেউ মানবে না।

আসলে যুক্তি যখন দুর্বল হয়, তখন তাকে প্রমাণ করবার জন্য নানা সার্টিফিকেট, নানা দোহাই উপস্থিত করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। অমিতাভবাবু তাঁর যুক্তির প্রতি-পাদনে একটা খুব চটকদার analogy ব্যবহার করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে analogyটা ভুল। অমিতাভবাবু ঠাট্টা করে বলেছেন, বাংলায় যুক্তাক্ষর হচ্ছে 'বাহাত্তর ইঞ্চি বহরের আঠারো হাত ধুতি', তাকে নিয়ে 'ট্রামে বাসে চলা' নিতান্তই হাস্যকর। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য আঠারো হাত ধুতি কোনটা? জর্জ বার্নার্ড শ না জরজ বারনারড শ? বার্ট্রাণ্ড রাসেল না বারটরানড রাসেল? আঠারো হাত ধুতি কোন দুজন পরে আছেন, যে কোন পাঠকই সে সম্পর্কে রায় দিতে পারবেন, আমাদের মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

প্রসঙ্গক্রমে ইংরেজী শব্দের অন্ত্য বর্ণে রেফ্‌ এবং রফলা ছাড়া অন্য রকমের যে সব যুক্তবর্ণ আছে তা নিয়েও সুনীতি চট্টো-পাধ্যায় এবং অমিতাভবাবুর প্রবন্ধে আলো-চনা হয়েছে। যেমন bond, list, milk ইত্যাদি শব্দকে সুনীতিবাবু বণ্ড, লিস্ট, মিল্ক ইত্যাদি রূপে লেখার পক্ষপাতী এবং অমিতাভবাবু বনড, লিসট, মিলক ইত্যাদি রূপের সমর্থক। অমিতাভ বলেছেন, bondকে বণ্ড লিখলে খণ্ড, ভণ্ড, ষণ্ড ইত্যাদির অনুকরণে বণ্ডো উচ্চারণের প্রবণতা দেখা দিতে দেরি হবে না। তবু ভালো, অমিতাভবাবু বানান সংস্কারের ব্যাপারে বাংলা উচ্চারণপ্রবণতার কথা অন্তত এই একটি জায়গায় স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নি যে পূর্বে যে স্বিমাত্রিককতাকে তিনি

[illegible] উদ্ধৃত দিয়েছিলেন, এখনো [illegible] অভিধান দখল করে বসেছে? [illegible] উচ্চারণ বস্তুতো এই দুই নিয়মেরই [illegible] বিশ্লেষণের ফলেই হয়। যাই হোক এখানে এ কথাটা প্রাসঙ্গিক যে বাংলা বা সংস্কৃত শব্দের আদিতে ইংরেজীতে ব্যবহৃত অনেক যুক্ত ব্যঞ্জন নেই—এবং ইংরেজী শব্দ বাংলা হরফে লেখবার সময় আদি যুক্তবর্ণকে আনন্দবাজার বিশ্লিষ্ট করছেন না। কিন্তু ইংরেজীর মত স্বরহীন [illegible] সংস্কৃতে একেবারেই নেই—অমিতাভবাবু তিনিই বলেছেন লন্ড, ফন্ড, বন্ড ইত্যাদিতে শেষে স্বরধ্বনি উপস্থিত। তাই হসন্তহীন করে বন্ড (bond), লিসট (list), মিলক (milk) লিখে সন্নিহিত অন্ত্য ব্যঞ্জনস্বরের স্বরহীন উচ্চারণ অমিতাভবাবু আশা করেন কি করে? বস্তুত বন্ড লিখলে banda(o) পড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে, এবং শুদ্ধ-ভাবে bond পড়ার সম্ভাবনাও থাকে, অর্থাৎ এখানে ভুলের সম্ভাবনা একটি। [illegible] band, banda, banda(o) পড়ার সুযোগ থাকে, এবং শুদ্ধভাবে bond পড়ার সুযোগও থাকে, অর্থাৎ এখানে ভুলের সম্ভাবনা তিনটি। তাই একরকম ভুলের সম্ভাবনার দুগুণই যায়, এবং ভুলের সম্ভাবনাই থাকে না যদি বণ্ড লেখা যায়।

ইংরেজী nd যুক্ত ব্যঞ্জনকে বিশ্লিষ্ট করার যুক্তি রূপে অমিতাভবাবু খুব সাংঘাতিক ব্যাকরণগত স্পর্শকাতরতার পরিচয় দিয়েছেন। অমিতাভবাবু বলেছেন, Londonকে লনডন না লিখে লণ্ডন কেন লিখব? কোন পাণিনির বিধানে আছে যে ইংরেজী nd মূর্ধন্য ণ দিয়ে লিখতে হবে? না—মূর্ধন্য ণ দিয়ে লেখার প্রশ্ন মোটেই নয়, অমিতাভবাবু তাঁর পূর্ব পূর্ব অন্যান্য ভুলের মত এখানেও ভুল করেছেন। বাংলায় যে যুক্তাক্ষর আছে, তাতে ইংরেজী nd ণ্ড দিয়েই প্রকাশ হয়, এখানে ণ ন এর বিচার আসেই না। আমরা আলতা, উলটা দুটো শব্দেই ল ব্যবহার করছি; কিন্তু আলতাতে যে ল তা দন্ত্য আর উলটাতে যে ল তা মূর্ধন্য—অথচ দুটোই ল। এর জন্য পৃথক বর্ণ না থাকা বাংলা বর্ণলিপির কোন মারাত্মক ত্রুটি নয়। ধ্বনি বিজ্ঞানে এই ধরনের রূপান্তরিত ধ্বনিকে পূরকধ্বনি (allophone) বলা হয়, অর্থাৎ এদুটি উচ্চারণে ল-এর উচ্চারণগত পরিধি বাড়ছে। এই ধরনের কিছু কিছু বর্ণের ব্যাপকতর উচ্চারণ সব ভাষায় সব লিপিরই আছে। তাই Londonকে চোখ বুজে লণ্ডন লিখলে, অমিতাভবাবু আশ্বস্ত হোন, পাণিনির অসম্মান হবে না।—আর ইংরেজী n যে সব সময়ই দন্ত্য ন এ কথা গুরুবাদী অমিতাভবাবু কোন গুরু থেকে পেলেন? ইংরেজত আমাদের দন্ত্যবর্ণ (ত বর্গ) উচ্চারণই করতে পারে না, আমাদের ত তাদের t (টুমি), আমাদের দ তাদের d (Veda)। ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন, প্রকৃত দন্ত্যবর্ণ নাকি ইংরেজীতে নেই-ই। Continentএ সে উচ্চারণ শুনতে হলে অমিতাভবাবুকে কষ্ট করে ফরাসী, ইতালীয়, স্প্যানিশ ইত্যাদি শুনতে হবে। আর ভগবান্ পাণিনিও ড এর সঙ্গে যুক্ত ন কে ধ্বনিসঙ্গতির জন্য মূর্ধন্যই বলতে চাইবেন, কারণ ড মূর্ধাউচ্চারিত বর্ণ। কিন্তু মাদরাজ, বোমবাই, মারকস, কিংবা পারক, নারস, চানস যখন পাণিনিসূত্রের অপেক্ষা রাখেনি, শুধু ndর বেলায় সে নজীর কেন? আসলে অমিতাভবাবু ডুবন্ত ব্যক্তির খড় ধরে বাঁচবার চেষ্টার মত এদিকে ওদিকে যা পাচ্ছেন অসহায়ভাবে তাই আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে আনন্দবাজারের পারক নারস ইত্যাদি বানান সম্বন্ধে শ্রীযুত সুধাংশু ভূপ্য ১২ ফাল্গুনের 'দেশ'-এ একটি নূতন দিক

থেকে আলোচনা করেছেন। সুধাংশুবাবু দেখিয়েছেন, বাংলায় র ধ্বনির ব্যবহার তিন প্রকার—একটি শুদ্ধ (অর্থাৎ অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে অযুক্ত), একটি রেফ, অন্যটি র-ফলা—কিন্তু এ তিনের উচ্চারণ এক নয়। শুদ্ধ র-এর উচ্চারণ স্বরযুক্ত (কিংবা শব্দের বা syllable-এর শেষে হস্ যুক্ত); আর রেফের উচ্চারণে র্ ও আক্রান্ত বর্ণের মধ্যে ঈষৎ বিরতি বর্তমান; এবং র-ফলার র পূর্ববর্ণের সঙ্গে প্রায় যুগপৎ উচ্চারিত হয়। বাংলা র-এর সমতুল ইংরেজী r ধ্বনিতেও এই তিন রকম উচ্চারণই—শুদ্ধ উচ্চারণ run, ram, root; রেফাক্রান্ত park, mark, bird; রফলাযুক্ত break straight, street ইত্যাদি।

সুধাংশুবাবু ঠিকই লক্ষ্য করেছেন, শুদ্ধ র আর র-ফলার উচ্চারণে বাংলা আর ইংরেজী শব্দে কোন তফাত নেই। তবে ইংরেজী রেফ্-এর উচ্চারণ বাংলা থেকে বেশ একটু স্বতন্ত্র—ইংরেজীতে রেফ্ জাতীয় r স্বরবর্ণ দ্বারা অনুসৃত না হলে প্রায়ই mute কোন স্থানে একেবারে অনুচ্চারিত (thirty, fourteen), কোথাও অর্ধ-উচ্চারিত (mark, park)। সুধাংশুবাবু বলেছেন, আনন্দবাজারের পারক, মারক, ডারক-এ ইংরেজী park, mark, dark-এর উচ্চারণ না এসে আসছে parak, marak, darak-এর উচ্চারণ; অবশ্য এ সব উচ্চারণ সম্পর্কে পূর্বে স্বিমাত্রিকতার দিক থেকেও আলোচনা হয়েছে, তাই শুধু প্রাসঙ্গিক একটি কথা মাত্র যোগ করা দরকার।

সুধাংশুবাবু পারক, মারক লেখাকে ইংরেজী r-এর mute উচ্চারণের দিক থেকে আপত্তি করেছেন। কিন্তু r (এখানে র) যদি অনুচ্চারিতই হয়, তবে পারক, মারক হলে আপত্তি কি? সুধাংশুবাবু এভাবে কথা বললে অমিতাভবাবু কিন্তু পেয়ে বসবেন, তাই পরিভাষা যাই ব্যবহার করুন, স্বিমাত্রিকতার ব্যাপারেই আসতে হবে—বলতে হবে বাংলা ত্রিবর্ণ শব্দে দ্বিতীয় বর্ণ স্বরযুক্ত হয়, না হলে তৃতীয় বর্ণ অবশ্যই হবে। এবং এই উচ্চারণে শব্দ দুই সিলেবলে বিশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে মাঝে একটা ব্যবচ্ছেদ এসে যায়। তাতে ইংরেজীর সন্নিহিত দুটি ব্যঞ্জনের স্বরহীন উচ্চারণ পাওয়া যাবে না। তাই পার্ক, মার্ক লিখলে ইংরেজীতে রেফ্ যদি এখানে অনুচ্চারিত বা অর্ধ-উচ্চারিত হয় তাহলেও কারো অসুবিধা হচ্ছে না—যিনি জানেন, তিনি বরং উচ্চারণ করবেন না, একেবারে খাঁটি সাহেব; আর অজ্ঞাতে যদি উচ্চারিত হয়ে যায়—হোক, একটু বাঙালিয়ানায় দোষ কি?

কিন্তু সুধাংশুবাবু আনন্দবাজারের বানানে র-এর উচ্চারণগত বিভ্রান্তি সম্পর্কে যা বলেছেন, তার সঙ্গে আর একটি কথাও সবিনয়ে যোগ করতে চাই। আনন্দবাজার ফোরস, হরস লিখে force, horse ইত্যাদি রেফের উচ্চারণ প্রত্যাশা করছেন—কিন্তু ইংরেজীতে এমন শব্দও অজস্র আছে, যেখানে র-এর পর অ-ধ্বনি আসে। সে সব ক্ষেত্রে আনন্দবাজারের লিপ্যন্তরণ কিভাবে হবে? Eros-এর বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ হবে এরস· আনন্দবাজারের নারস (নার্স)-এর সাদৃশ্যে তা এরস (এর্স) পড়া হবে না ত? Heron-কে বাংলায় হেরনই লিখতে হবে, কিন্তু তাকে নূতন অভ্যাসবশে র-কে রেফ্ করে হেরন (হের্ন) পড়ার বাধা কি থাকবে? তেমনি হরসকোপ (horoscope) হর্সকোপ, ভারসিটি (versity)র সাদৃশ্যে ফেরসিটি (ferocity) ফের্সিটি, করবরেট (corroborate) কর্বরেট? তার উপর যদি র-ফলাকেও বিশ্লিষ্ট করা হয়, যেমন এখন তাও মাঝে মাঝে হচ্ছে, তাহলে matron মেটরন মেট্র্ন, abroad অ্যাবরড অ্যাবর্ড, microscope মাইকরসকোপ মাইকর্সকোপ হয়ে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়বে।

সুধাংশুবাবু আনন্দবাজারের নক্সা বানান সম্পর্কে calligraphy বা লিপিবিজ্ঞানের দিক থেকেও আপত্তি করেছেন—এ বিষয়টি বিশেষ করে প্রণিধানযোগ্য। আনন্দবাজার ইংরেজীর আদ্য যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট না করে লিখছেন স্ট্রীট, ব্রেক, ড্রু, কিন্তু মধ্য ও অন্ত্য যুক্তব্যঞ্জনে লিখছেন কনসতরো, উডরো ইত্যাদি—এবং তাতে হস্ চিহ্নও বসাই হচ্ছেন না। সুধাংশুবাবুর জিজ্ঞাসা, একই ধ্বনিকে str একবার স্ট্র (street) আর একবার সতর (Castro) লেখার মধ্যে ধ্বনিগত বা লিপিগত যৌক্তিকতা কি?

মোটের উপর কথা হচ্ছে, বাংলায় ইংরেজী শব্দের বানানেরও একটা রীতি দাঁড়িয়ে গেছে, এবং তা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে। তাতে অহেতুক কোনো পরিবর্তন সাধন নিষ্প্রয়োজন, এবং বাংলা উচ্চারণপ্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে কোন হঠকারী ফ্যাশানের প্রবর্তন নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়। যে যুক্তাক্ষর বাংলা বা সংস্কৃতে নেই, ইংরেজী শব্দের লিপ্যন্তরীকরণের জন্য বাংলা লাইনো টাইপের প্রবর্তকেরা এমন দু-একটি বর্ণসমাবেশ সৃষ্টিও করেছেন। এগুলি সংখ্যায় এতই নগণ্য যে, অমিতাভবাবুর পক্ষে তা তেমন মারাত্মক না হবারই সম্ভাবনা। যেমন ক-এর সঙ্গে সংস্কৃতে নেই এমন যুক্তবর্ণ মাত্র দুটি—ক্ট (অক্টোবর) এবং ক্স (বাক্স); ট আর ড-এর সঙ্গে রেফ্ আর র-ফলার যোগ হয়েছে—র্ট (কোর্ট), ট্র (ট্রাম), র্ড (বোর্ড), ড্র (ড্রাম); অবশ্য টড-এর পূর্বে ল-ও যুক্ত হচ্ছে, যেমন ল্ট (গিল্টি), ল্ড (গোল্ড); তেমনি ট-এর আগে যুক্ত হচ্ছে স—স্ট (স্টেশন) তার সঙ্গে রেফ্ র-ফলা যোগ করে র্স্ট (আমহার্স্ট), স্ট্র (স্ট্রাইক); থ-এর সঙ্গে রেফ্ সংস্কৃতেও আছে, নূতন হয়েছে শুধু র-ফলা—থ্র (থ্রেড), প-এর সঙ্গে ট যুক্ত হয়েছে, তা অবশ্য বাংলায়ও আছে—প্ট (চ্যাপ্টা); ফ-এর সঙ্গে রেফ্ সংস্কৃতে আছে, নূতন র-ফলা আর ল-ফলা যোগ হয়েছে—ফ্র (ফ্রাই), ফ্ল (ফ্লাই)।

এইটুকু ত ব্যাপার, অর্থাৎ রেফ্, র-ফলা বাদ দিলে মাত্র চার-পাঁচটি নূতন যুক্তবর্ণ প্রয়োজন হচ্ছে—তার বেশী নয়; এবং এগুলো বাংলা লাইনোতে এসেই গেছে; সুধাংশুবাবু দেখিয়েছেন, একটি জটিল যুক্তবর্ণকে টাইপে তুলতে লাইনো অপারেটরকে চাবি টিপতে হয় পাঁচ-ছয়বার, কিন্তু তাকে অযুক্তবর্ণে বিশ্লিষ্ট করে যে অক্ষরবৃদ্ধি হচ্ছে, তাতেও ওই একই পাঁচ-ছয়বার চাবিতে হাত দিতে হচ্ছে। অর্থাৎ এতে সময় বা শ্রম-সংক্ষেপ কিছুই হচ্ছে না, বরং সুধাংশুবাবু যা বলেছেন, শব্দের আকার বেড়ে যাচ্ছে, তাতে কালি এবং কাগজের

অপচয় হচ্ছে প্রচুর। এ বিষয়টির দিকে লাইনো প্রিন্টারের খ‍ুটিনাটি সম্পর্কে অভিজ্ঞ শ্রীযুত প্রসূন দত্তও ২৬শে ফাল্গুনের 'দেশ'-এ আলোচনা করেছেন। শ্রীযুত দত্তও আনন্দবাজারী বানান-পদ্ধতিতে ইংরেজী শব্দের মুদ্রণে পাশাপাশি বা horizontal space বেশী লাগবে এবং তাতে সময় ও কাগজের অযথা অপব্যয় হবে বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, বাংলা মুদ্রণে ই-কার উ-কার ইত্যাদির জন্য এমনিতেই খাড়া বা vertical space-এর কিছু অপচয় হচ্ছে, তার উপর আবার এ অনর্থ ঘটলে, সে ক্ষতি অসামান্য হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই বানান সংস্কারের পশ্চাতে অমিতাভবাবুর মূল নির্ভর যে মারডকী থিওরি তা ভুল। শ্রীযুত প্রবোধ সেন মশায় এ সম্পর্কে যে অভিনন্দনবাণী প্রচার করেছেন, তাও একটি সংকীর্ণ সমীক্ষার ফলশ্রুতি মাত্র। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মশায় এ-প্রসঙ্গে বাংলা উচ্চারণ-প্রবণতার ভিত্তিতে যে আলোচনা করেছেন, অমিতাভবাবু তা বুঝতেই পারেন নি—

I find no deffrence between deffrence and deffrence।

(৭)

কলকাতায় শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লার মুখে কংগ্রেসের বিকল্প না থাকায় যে ক্ষোভের ধ্বনি শোনা গেল, তার প্রতিধ্বনি উঠতে দেরি হল না। ১৯৬৫ এবং ১৯৬৬ সালে ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর বার্ষিক সভায় বিভিন্ন বক্তৃতায় এবং প্রস্তাবে কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা শোনা গেল। সভাপতি শ্রী কে পি গোয়েঙ্কা ১৯৬৫ সালের অধিবেশনে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, সরকারপক্ষ থেকে প্রায়ই ব্যবসায়ীদের সমালোচনা করা হয়; অথচ খাদ্য, মূল্য ও করভার সব সমস্যাই সৃষ্টি করেছে এই সরকার।

ঐ সভায় নির্বাচিত পরবর্তী সভাপতি শ্রী এস এল কির্লোসকার বলেন, সুযোগ পেলেই সরকারপক্ষ ব্যবসায়ীদের চাবুক মেরে থাকেন। সময় সময় চাবুকের ঘা-টা প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। সরকারকে ঠিক পথে চালাবার জন্য তিনি 'ছায়া ক্যাবিনেট' গঠন করার জন্য ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দেন।

স্বভাবত সুরটা চরমে উঠেছিল। তাই প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীও তাঁর মেজাজটা ঠিক রাখতে পারেননি। ব্যবসায়ীদের তিনি খেলার রীতিনীতিগুলো মেনে চলার পরামর্শ দেন। খুশী হয়নি ব্যবসায়ী মহল। তাই পরের বছর বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে শুনতে হয় কিছু সমালোচনা, কিছু কটূভাষণ।

স্পষ্টতই সরকারপক্ষ তথা কংগ্রেস এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক তালে তালে চলছিল না। সেটাই প্রকাশ্যভাবে জানিয়ে দিলেন কংগ্রেসের কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅতুল্য ঘোষ, চতুর্থ নির্বাচনের মাসখানেক আগে। পশ্চিম ভারত সফর শেষ করে কলকাতায় এসে সাংবাদিকদের বলেন, এই নির্বাচনে কংগ্রেস ও শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও রাজন্যবর্গের সংগে ছাড়াছাড়ি পাকাপাকিভাবে হয়ে গিয়েছে। তাঁর বক্তব্য সমর্থন করে তিনি জানান যে, গত নির্বাচনে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিলে জমা পড়েছিল প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা। এবার জমা পড়েছে ৮ লক্ষের মত।

এই ছাড়াছাড়িটা এক দিনে হয়নি। হয়েছে ধীরে ধীরে ঠান্ডা লড়াইয়ের মাধ্যমে। এই ঠান্ডা লড়াই সুরু হয় ১৯৬৪ সালে ভুবনেশ্বরে। কংগ্রেস অধিবেশনে।

ভুবনেশ্বর অধিবেশনের মূল প্রস্তাবের শিরোনাম ছিল 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'। সমাজবাদ কথাটা কংগ্রেসের কাছে নতুন কিছু নয়। বেশ পুরোনো। আবাদী অধিবেশন থেকে সমাজবাদী ধাঁচের কথা কংগ্রেস প্রচার করে আসছে। এই সমাজবাদী ধাঁচটা প্রচার করা হলেও তার কোন স্পষ্ট রূপ নিশ্চয়ই ছিল না। যদি থাকত তা হলে ভুবনেশ্বরে 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'-এর নামে নতুন কোন বক্তব্য দেশের সামনে রাখার কোন প্রয়োজন হত না।

উল্লেখযোগ্যভাবে ভুবনেশ্বর প্রস্তাব কংগ্রেস সরকারের নীতি নির্ধারণের নির্দেশ। আগেও যে এমন নির্দেশ দেওয়া হয়নি তা নয়, যেমন দেওয়া হয়েছিল কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাবে যৌথ খামার প্রবর্তনের জন্য। কিন্তু সে প্রস্তাব কার্যকরী করা হয়নি বা সম্ভব হয়নি। তবু নাগপুর প্রস্তাব কোন ব্যাপকতর নীতি নির্ধারণের নির্দেশ নয়। হয়ত সে কারণেই ভুবনেশ্বরে সমাজবাদ সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত বোঝাপড়ার প্রয়োজন ছিল। কারণ, বাইরের প্রতিকূল জনমতের চাপে কংগ্রেসের ভিতরে তখন একটা প্রত্যক্ষ চাপ আসছিল নতুন ধাঁচে সরকারের নীতি নির্ধারণ করার জন্য। যাঁরা চাপ দিচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রী কে ডি মালব্য, শ্রীকৃষ্ণ মেনন, শ্রীবিজু পট্টনায়ক। কংগ্রেস নেতাদের মধ্যেও এমনি একটা তাগিদ ছিল; কারণ, তখন ধীরে ধীরে নেহরুবাদের বিরুদ্ধে গুঞ্জন চারিদিকে মুখর হয়ে উঠেছিল। নেহরু তখনও কংগ্রেসের প্রাণপ্রদীপ।

তা ছাড়া নেহরু তখন ভগ্নস্বাস্থ্য। তাই তাঁরই উপস্থিতিতে আনা হল ভুবনেশ্বরের 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ' সম্পর্কিত প্রস্তাব। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনসাধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন ১৯৭৫ সালের মধ্যে মেটান হবে। ধনসম্পদের কেন্দ্রীকরণ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য হ্রাসের জন্য কয়েকটি ব্যবস্থারও উল্লেখ ছিল এ প্রস্তাবে। আরও ছিল ধান-কলগুলোর আশু রাষ্ট্রীয়করণের নির্দেশ।

প্রস্তাবটা ছোট নয়। আরও যে-সব অংশ ছিল তার মূল কথা হ'ল, শস্যব্যবসায় রাষ্ট্রীয়করণ করে সমবায় মারফত শস্য বিক্রয়, 'দালালদের অতি মুনাফা প্রতিরোধ এবং উৎপাদক ও ক্রেতার স্বার্থ বজায় রাখা', ব্যক্তিগত আয় ও সম্পত্তির সীমা বেঁধে দেওয়া, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এবং অসৎ লোকের হাত থেকে মজুতে কালো টাকা বের করে আনা'। একচেটিয়া ব্যবসায়কে ভেঙে দেওয়ারও পরামর্শ দেওয়া হয় এই প্রস্তাবে।

প্রস্তাবটি গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু জনসাধারণের বিরাট অংশের মনে খুব যে একটা আশা এনে দিয়েছিল, তা-ও নয়। কারণ, এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য যে-সব ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন তার কতটা গ্রহণ করা হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নিশ্চয়ই ছিল। তবু কিছুটা যে হবে সেটা বুঝতে দেরি হয়নি।

তার প্রধান কারণ, কালো টাকা। কালো টাকা সম্বন্ধে সারা দেশে একটা [illegible] যাচ্ছিল। কালো টাকা [illegible] নিয়ন্ত্রণ [illegible] বা [illegible]। তাই সরকার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চলে, ব্যবসায়ী [illegible] [illegible] কমিশন যে সব ব্যবস্থা [illegible] করেছিল [illegible] সরকার [illegible] কোন আগ্রহ দেখায়নি।

তবু [illegible] যেমন, [illegible] করা। এই [illegible] [illegible] মেনে নেবে না, [illegible] না। এ [illegible] হয়নি; কিন্তু [illegible] পক্ষে যথেষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে [illegible] অংশই [illegible] এ পর্যন্ত হয়নি। [illegible] মধ্যে দু-একটা ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা যে হয়নি, তা নয়। যেমন, শস্যের ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করা। এ ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হলে প্রয়োজন ছিল সারা দেশের জন্য একজাতীয় খাদ্য নীতি নির্ধারণ করা। তা এ পর্যন্ত হয়নি। তবু, পশ্চিম বাংলায় গত বছর একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল। সে প্রচেষ্টা নানা কারণে হয়ত ব্যর্থ হয়েছিল, তবু নীতিগতভাবে সে প্রচেষ্টা সফল করার চেষ্টা হয়েছিল। বলা হয়েছিল, ধানকলগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে হবে। তা করা হয়নি বলেই হয়ত শস্য ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করা সম্ভব হয়নি।

আরও একটা প্রচেষ্টা ছিল—শিল্পের জন্যে লাইসেন্স প্রথার আমূল পরিবর্তন সাধন করা। নূতন শিল্প স্থাপনের জন্য যে প্রথায় লাইসেন্স দেওয়া হত, তাতে দেখা যেত, বেশির ভাগ লাইসেন্সই বড় বড় শিল্পপতিদের হাতে জমে যাচ্ছিল। ফলে, শিল্পোৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করে মুনাফার হার বৃদ্ধি করার কোন অসুবিধা ছিল না। তাই, প্রস্তাব হয়েছিল শিল্পের উদ্যোগ বিকেন্দ্রীভূত করা। এ প্রস্তাবও কার্যকরী হয়নি, হয়ত আশঙ্কা ছিল। তাই ব্যবসায়ী মহল এবং শিল্পপতিরা খুব স্বস্তি বোধ করার সুযোগ পাচ্ছিল না। সরকারবিরোধী মনোভাবটা তীব্র হবার পথে কোন বাধাও ছিল না। ফলে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবার তাগিদটা ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠছিল।

কংগ্রেসী শাসন যেমন জনসাধারণের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান করতে পারেনি তেমনি সক্ষম হয়নি অপরপক্ষকে শান্ত

করতে। বরং প্রতিকূলে আবহাওয়ায় ধনিক-শ্রেণীর পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া সহজ হয়ে উঠেছিল। এটা আরও সহজ হয়েছিল নেহরুর তিরোধানে।

(৮)

নেহরুর তিরোধানের পরেই কংগ্রেসের ভিতরকার দুর্বলতা বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পায়। এই দুর্বলতার লক্ষণগুলো দেখা দেয় নেহরুর অবর্তমানে কার হাতে দেশের নেতৃত্বের ভার দেওয়া হবে এই প্রশ্ন নিয়ে। নেহরুর উত্তরকালে প্রথম নেতা হলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। তিনি কংগ্রেস দলের সর্বসম্মত নেতা হলেন; কিন্তু নেতা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে দল উপদল সৃষ্ট হয়ে গেল।

নতুন একটা নাম শোনা গেল, 'সিন্ডিকেট'। অর্থাৎ জোট। জোটের প্রশ্ন যেখানে ওঠে, স্বভাবতই পাল্টা জোটের কথাটাও সেখানে শোনা যায়। তাই শাস্ত্রীজীর আকস্মিক মৃত্যুর পর জোট বনাম পাল্টা জোট অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই দ্বন্দ্ব বাইরের লোকের কাছে অজানা রইল না; কারণ, শ্রীমোরারজী দেশাই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে নির্বাচনের লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করলেন।

কেন্দ্রে নেতৃত্বের লড়াইয়ে পক্ষ-প্রতিপক্ষ প্রবল হয়ে উঠল। জনসাধারণের চোখের সামনে নেতৃত্বের বিবাদটা পরিস্ফুট হয়ে উঠল। কংগ্রেস সংগঠনে নেহরু নেতৃত্বের বাঁধনটা শিথিল হয়ে গেল। সংগঠনের দুর্বলতাটা বিভিন্ন রাজ্যে ধীরে ধীরে প্রকট হতে লাগল। নির্বাচন যতই এগিয়ে এল, ততই বিস্তৃতি লাভ করল ভাঙনের মুখটা।

দেখা গেল, বিভিন্ন প্রদেশ কংগ্রেসের এক এক অংশ নির্বাচনে মনোনয়নের সূত্রে ধরে দল ভাঙ্গার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হ'ল, যেমন হল ওড়িশায়, পশ্চিম বাংলায়। গত বছরের মাঝামাঝি সময় দেখা দেয় একটা দুটো রাজ্যে নয়, বেশ কয়েকটা প্রদেশ কংগ্রেসের এক একটা অংশ দলের বাইরে চলে গিয়েছে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কাজ করতে আরম্ভ করেছে।

গুজরাটে ঝগড়াটা লাগল প্রাদেশিক সংগঠন এবং শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে। প্রকাশ্যভাবে ডাঃ জীবরাজ মেহতার দল অসহযোগ করতে লাগল। শ্রীরসিকলাল পারিখ এবং শ্রীরতিভাই আদানি সংগঠন থেকে সরে এলেন। তাঁরা কংগ্রেস মনোনয়নের কাজে উৎসাহ দেখালেন না। সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে কংগ্রেসের সংগঠন ক্ষুন্ন হল। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীত্রিভুবনদাস প্যাটেল প্রার্থী হলেন না। গুজরাটে ধনিক ও বণিক শ্রেণী নিজেদের নির্বাচনী সংগঠনকে জোরদার করে তুলল।

মধ্যপ্রদেশে সামন্তপ্রথা অত্যন্ত প্রবল। এখানে রাজন্যবর্গ যেমন সংগঠিত হল তেমনি মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি মিশ্রর নেতৃত্বকে অস্বীকার করে একদল কংগ্রেস নেতা ও কর্মী নতুন সংগঠন গড়ে তুলল জনকংগ্রেস নাম দিয়ে। যে রাজন্যবর্গ জনসঙ্ঘের সঙ্গে মিশে গেল তাদের সঙ্গেই হাত মেলাল নবগঠিত জনকংগ্রেস এবং এস-এস-পি।

মহীশূরে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা সর্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতা। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস সংগঠন এবং শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ছিল তা অনেকাংশে নির্মূল হয়ে যায়। তার প্রধান কারণ তাঁকে সাহায্য করার জন্য তরুণ কংগ্রেস নেতারা এগিয়ে এসেছিল। তবু মনোনয়নের সময় অন্তর্বিরোধ আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। ফলে, মহীশূরের প্রবীণ নেতা শ্রী এইচ কে ভীরাপ্পা গাউধ নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস সংগঠন থেকে সরে আসেন। তিনি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে কংগ্রেস ছেড়ে দেন। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে আসেন আরও কয়েকজন নেতা ও কংগ্রেস-কর্মী। এঁদের অভিযোগ 'লিংগায়েৎ রাজ' কায়েম করা হচ্ছে। এঁরা ছাড়া আর যিনি কংগ্রেস ছেড়ে আসেন, তিনি হলেন শ্রী এইচ এম চন্নবাসাপ্পা। ইনি সংগঠন করলেন জনকংগ্রেস। এই জনকংগ্রেসও বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্বাচনের আসরে নামল।

ঠিক এমনিভাবে জনকংগ্রেস গড়ে উঠল ওড়িশায়। বেশ কিছু দিন ধরেই ডঃ হরেকৃষ্ণ

মহতাব প্রভৃতি প্রবীণ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে ওড়িশা কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে বিশেষভাবে শ্রীবিজু পটুনায়কের সঙ্গে বিবাদ চলছিল। এই বিবাদের পরিণতি হিসাবে দেখা গেল, ১১ জন বিধানসভার কংগ্রেস সদস্য এবং ২ জন লোকসভার সদস্য কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন। এ'দের নেতৃত্বে গঠিত জনকংগ্রেস ওড়িশার স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জোট বাঁধল। ওড়িশার স্বতন্ত্র পার্টি রাজন্য-বর্গের নেতৃত্বে পরিচালিত।

রাজস্থানে রাজন্যবর্গ এবং ধনিকবণিকের আধিপত্য বহু দিনের। তাই কোন দিনই কংগ্রেস এখানে প্রতিপত্তি প্রসার করতে সক্ষম হয়নি। গত নির্বাচনের (১৯৬২) পরেও কংগ্রেসের অবস্থা ভাল ছিল না। একজনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কংগ্রেস এখানে নতুন সরকার গঠন করে। তারপর ধীরে ধীরে শক্তিবৃদ্ধি করে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ১৭ হয়। কিন্তু বর্তমান নির্বাচনের কিছু দিন আগে শ্রীকুম্ভরাম আর্যের নেতৃত্বে বেশ কিছু কংগ্রেস সমর্থক দল ভেঙেগ বেরিয়ে আসেন।

উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের ঘরোয়া ঝগড়া বহু দিনের পুরোনো। ঝগড়াটা বর্তমানে শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত এবং শ্রীকমলাপতি ত্রিপাঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের মুসলমান সম্প্রদায় এবারের নির্বাচনে কংগ্রেসকে সমর্থন করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তাদের মূল অভিযোগ, উর্দু ভাষাকে মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এই দাবিকে কেন্দ্র করে তারা মুসলিম মজলিস নামে একটি নতুন দল গঠন করে।

রাজন্যবর্গ আরও একটি রাজ্যে কংগ্রেস দলকে দুর্বল করতে সক্ষম হয়। সেটি বিহার। এখানেও কংগ্রেসের মধ্যে অন্ত-র্বিরোধ ছিল। তবু সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে

কখনও মাথা ঘামাতে হয়নি। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি পায় ঝাড়খণ্ড দলের কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাবার পর। রামগড়ের রাজার নেতৃত্বেও একদল রাজন্যবর্গ কংগ্রেসকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে বিবাদ শুরু হলে এরা বিরোধীপক্ষ হিসাবে জনক্রান্তি দল সংগঠন করে। রামগড়ের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সংযুক্ত বিরোধী দল সংগঠিত হয়। কম্যুনিস্ট দল এবং অন্যান্য প্রগতিবাদী দলও এই বিরোধী দলের সঙ্গে হাত মেলায়।

মহারাষ্ট্রের মত সুসংগঠিত কংগ্রেস দলও বিরোধমুক্ত ছিল না। এই বিরোধের প্রধান উৎস শ্রী এস কে পাতিল। তিনি শ্রী ভি কে কৃষ্ণ মেননকে কংগ্রেস মনোনয়ন দেবার বিরোধিতা করেন। এই বিরোধের পরিণতি আজ সর্বভারতে সুবিদিত। তবু একটা কথা বলে রাখা ভাল যে, বেশ কিছুসংখ্যক কংগ্রেস সদস্য এবারের নির্বাচনে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে কংগ্রেস-বিরোধিতা করেছিলেন।

আর পশ্চিম বাংলায় যে পরিস্থিতিতে এবং যে ঘটনা সংঘাতে বাংলা কংগ্রেসের সৃষ্টি তা সুবিদিত। পশ্চিম বাংলায় শুধু কংগ্রেস সংগঠন নয়, কংগ্রেস শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে মুখ্যত বাংলা কংগ্রেসের বিরোধিতার ফলে।

(৯)

বিভিন্ন মহলে একটা আলোচনা শোনা যায় যে, এবারের নির্বাচনে ধনিক-বণিকের হস্তক্ষেপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ছিল। এ অভিযোগের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রমাণ উত্থাপন করা সম্ভব নয়। কিন্তু এবারের নির্বাচনের আগে হঠাৎ যে-ভাবে বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের ভিতরে ভাঙন ধরে তা নিশ্চয় লোকের মনে গুঞ্জন তুলবে। তা ছাড়া, পশ্চিম বাংলা ছাড়া অন্যান্য রাজ্যে দেখা গিয়েছে, এই কংগ্রেস-ভাঙা দলগুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নির্বাচনী সমঝোতা করেছে চরম দক্ষিণপন্থী দলগুলোর সঙ্গে। পশ্চিম বাংলায় যিনি বাংলা কংগ্রেসের পত্তন করেন তিনি শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি, বর্তমানে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় এবং কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠাও সর্বজনবিদিত। একমাত্র এই পশ্চিম বাংলায় তাঁর নেতৃত্বে বাংলা কংগ্রেস চরম দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে হাত মেলায় নি।

পশ্চিম বাংলাকে বাদ দিলে অন্যান্য রাজ্যে দেখা যাবে, চরমপন্থী দলগুলো এবং জন-কংগ্রেসগুলো এক দিকে কংগ্রেসের যেমন বিরোধিতা করেছে, অপর দিকে কম্যুনিস্টদের প্রতি তাঁরা [illegible] করেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নির্বাচনী [illegible] [illegible]

বর্তমান রাজনীতিতে নতুন পরিস্থিতি। এই নতুন পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই হয়ত এই জোট বিপুলভাবে চেষ্টা করেছিল বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের শক্তিকে ক্ষুণ্ণ করে চরম দক্ষিণপন্থী শাসনব্যবস্থা কায়েম করা। এই কারণেই জনসঙ্ঘ বা স্বতন্ত্র পার্টির ঘাঁটিগুলো যে-সব রাজ্যে বিশেষভাবে সক্রিয় সেইসব রাজ্যে এরা বহু প্রার্থী নিয়ে নির্বাচনের আসরে নেমেছিল। দেখা যাবে, প্রত্যক্ষভাবে এদের স্ট্র্যাটেজি সফল হয়নি। কংগ্রেসের শক্তি যা ক্ষুণ্ণ হয়েছে তা মুখ্যত কংগ্রেস-ভাঙা দলগুলোর জন্য।

এটা সম্ভব হয়েছে নির্বাচনী আবহাওয়া কংগ্রেসের অনুকূলে ছিল না বলে। এই আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে যারা প্রকৃতই রাজ্যের রাজনীতিকে নতুনভাবে মোড় ফিরিয়ে দিতে পারত, তারা কম্যুনিস্ট দলগুলো এবং অন্যান্য প্রগতিপন্থী পার্টিগুলো। কিন্তু এই দলগুলো দেখা গেল, নির্বাচনী সম্ভাব্যতাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে গেল।

নির্বাচনের বেশ কয়েক মাস আগে এস-এস-পি নেতা ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতায় তিনি

বামপন্থী জোটের প্রস্তাব করেন। তিনি সেই সময় যেটা স্পষ্ট করে বোঝাতে চেয়েছিলেন তা হল এই যে, কংগ্রেসকে পরাস্ত করার সুযোগ উপস্থিত। কিন্তু এমন কোন বামপন্থী দল নেই, যার সংগঠন দিয়ে কংগ্রেসকে সারা ভারতে ক্ষুণ্ণ করা সম্ভব। তাই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, আসন ভাগাভাগির ভিত্তিতে বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে একটা নির্বাচনী সমঝোতা করা হোক।

যে কথাটা ডাঃ লোহিয়া খোলাখুলি আলোচনা করতে নারাজ ছিলেন তা বামপন্থী দলের মধ্যে জোটের অসম্ভাব্যতা। রাজনৈতিক কারণেই এটা সম্ভব ছিল না। প্রধান কারণ, ১৯৬২ সালের নির্বাচনের পর কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। তেনালীর সিদ্ধান্ত দুই পার্টির মধ্যে সমুদ্রের ব্যবধান এনে দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, ১৯৬২ সালের চীনের ভারত আক্রমণের পর দু-একটি ছোটখাট দল ছাড়া কোন বামপন্থী দলের পক্ষে কম্যুনিস্ট মার্কসিস্ট পার্টির সঙ্গে নীতি বা আদর্শের ভিত্তিতে হাত মেলান সম্ভব ছিল না।

সম্ভব ছিল না বলেই ডাঃ লোহিয়া আসন ভাগাভাগির ভিত্তিতে সমঝোতার প্রস্তাব করেছিলেন। প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠেছিল যে, এই সমঝোতার ভিত্তিতে যদি কংগ্রেসকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়, তা হলে বিকল্প সরকার সম্ভব হবে কিসের ভিত্তিতে। তারও উত্তর ছিল—সর্বদলস্বীকৃত ন্যূনতম কর্মপন্থার ভিত্তিতে।

উত্তরটা সব কটি বামপন্থী দলের জানা ছিল। তবু দিল্লীতে যে কনফারেন্স হয় সেখানে সমঝোতার প্রস্তাব সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গৃহীত হয়নি। যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তার মূল কথা ছিল, বিভিন্ন রাজ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলের মধ্যে সমঝোতা। এই সিদ্ধান্ত থেকেই বোঝা যায় যে, আসনের ভাগাভাগিটা সব রাজ্যে সর্বদলসম্মতভাবে হবে না।

হলও না। যেমন হয়নি পশ্চিম বাংলায়। এখানে মূল দল দুটো অর্থাৎ মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি এবং কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া ভিন্ন রকমের নির্বাচনী স্ট্র্যাটেজীর উপর নির্ভর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। নির্বাচন উপলক্ষে দলগত আদর্শগত বিভেদ নিশ্চয়ই ছিল। যেমন, মার্কসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি নির্বাচনের আসরে নেমেও ঘোষণা করতে দ্বিধা করেনি যে, পার্লামেন্টারী ডেমক্র্যাসি বা পরিষদীয় গণতন্ত্রে তারা আস্থাবান নয়। কম্যুনিস্ট পার্টি সে কথা বলতে নারাজ।

কিন্তু প্রধান যে কারণে পশ্চিমবাংলায় এই দুই দলের মধ্যে সমঝোতা হয়নি, তাহল পোলাইজেসনের নীতি। পশ্চিমবাংলা কম্যুনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান ঘাটি এবং সি-পি (এম) এটাই চাইছিল যে, এবারের নির্বাচনে ছোটখাট দলগুলোর সঙ্গে সি-পি-আই রাজনৈতিক সংস্থা হিসাবে নির্মূল হয়ে যাক। কেরলে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে তাই হয়েছিল। পশ্চিমবাংলায়ই বা তা হবে না কেন।

অথচ অন্যান্য যে-সব রাজ্যে এই স্ট্র্যাটেজীর উপর সি-পি (এম) আস্থাশীল ছিল না, সে-সব রাজ্যে সি-পি-আই'র সঙ্গে জোট বাঁধতে কোন অসুবিধা হয়নি। কেরলে জোট বেঁধেছিল সি-পি (এম) নেতা শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে। এই জোট এমনভাবে বাঁধা হয়েছিল যে, কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে কেরলে পরাস্ত হয়েছে। অথচ এই কেরলেই নির্বাচনের আগে মুসলিম লীগের এক প্রভাবশালী অংশ জোট ভেঙে চলে যায় এবং কেরল কংগ্রেসকে হাত মেলাতে হয়েছিল দক্ষিণপন্থী দলের সঙ্গে।

অন্যান্য আরও কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচনের ভিত্তিতে আসন ভাগাভাগি করে সমঝোতা হয়েছিল সব কটি বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে। হয়নি পশ্চিমবাংলায়।

স্পষ্ট বোঝা যায়, কম্যুনিস্ট দলগুলো নির্বাচনী আবহাওয়াটা যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে পারেনি। বুঝতে পারেনি যে, কংগ্রেসকে এমন উল্লেখযোগ্যভাবে ঘা দেওয়া যাবে। বুঝলে হয়ত নির্বাচনের চেহারা অন্য রকম হত। হয়ত হত; কিন্তু, এটাও ঠিক যে [illegible]

চালোনো করার সংগঠনও কোন বামপন্থী দলের ছিল না, বা নেই। মিলিতভাবেও সে সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। ছিল না বলেই বিভিন্ন রাজ্যের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নভাবে বামপন্থী দলগুলো সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল। এই বিচ্ছিন্ন সঙ্ঘবদ্ধতা স্বভাবতই নির্বাচকদের মনে দাগ কাটতে পারেনি। তাই পশ্চিম বাংলা ও কেরলকে বাদ দিলে দেখা যাবে, বামপন্থী দলগুলোর সাফল্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। চরম দক্ষিণপন্থীদের সঙ্ঘবদ্ধতার কাছে পরাজিত।

পরাজয়ের গ্লানিটা সবচাইতে বেশী সহ্য করতে হয়েছে কম্যুনিস্টদের অন্ধ্রপ্রদেশে। এই অন্ধ্রপ্রদেশে কম্যুনিস্টদের সংগঠন অত্যন্ত জোরদার ছিল। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে সম্মিলিত কম্যুনিস্ট পার্টি ৫১টি আসন দখল করে। কিন্তু তারপর এই অন্ধ্রের মাটিতেই কম্যুনিস্ট পার্টিকে দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এখনেও দুই দলে কোন সমঝোতা ছিল না; কারণ, দু দলই আশা করেছিল, এবারের নির্বাচনে তারা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে পারবে। বিশেষ করে কংগ্রেসের মধ্যেও যখন পূর্বেকার [illegible] ছিল না [illegible]। কিন্তু এবারের নির্বাচনে কম্যুনিস্টরা শুধু নিজেরাই হারেনি, [illegible] দিয়েছে। দুই দল মিলিয়ে [illegible] এবং [illegible] কম্যুনিস্ট পার্টি [illegible] নিজেদের [illegible] দুই [illegible] নীতিগত [illegible] নিজেদের [illegible] [illegible] দিয়েছে [illegible] হয়েছে।

(২০)

[illegible] নির্বাচনের ফলাফল দেখা যাবে, [illegible] ভারতের রাজনীতি এক [illegible] দিয়েছে। [illegible] আছে; কিন্তু বামপন্থী দলগুলো সে [illegible] অস্বীকার করতে পারবে না।

[illegible] প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়, সেটা [illegible]। গত তিনটে নির্বাচনের সময় সাধারণ আবহাওয়া কিছুটা কংগ্রেসের অনুকূলে থাকলে যে ব্যক্তিত্বের প্রভাব স্পর্শ নির্বাচকরা অনুভব করত, সে নেহরু। ভুবনেশ্বর কংগ্রেস অধিবেশনে গৃহীত গণতান্ত্রিক সমাজবাদ হয়ত নির্ভুল-ভাবে এখনও প্রভাবশালী ধনিক-বণিক গোষ্ঠীকে কংগ্রেস-বিরোধী করেছে। ঠিক তেমনি নির্ভুলভাবে ভুবনেশ্বরেই নেহরুর জীবনে শেষ অঙ্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল। সেই শেষ অঙ্কের শেষে যে ছায়াটা নেমে এসেছিল সেটাও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্বের লড়াইয়ে সে ছায়াটা মিলিয়ে যেতে বেশী সময় লাগেনি।

নেহরু বেঁচে থাকলেও বর্তমান অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে হয়ত কংগ্রেসকে ঘা খেতে হত; কিন্তু বোধ হয় এমন নির্মম-ভাবে নয়। নেহরুর ছায়াটা যথার্থভাবে সরে গিয়েছে বলেই কংগ্রেসকে আজ নিজস্ব দাবি ও সংগঠন নিয়ে নির্বাচনের লড়াই লড়তে হয়েছে।

সে লড়াইয়ে নিঃসন্দেহে কংগ্রেসকে বিপর্যস্ত হতে হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ধস নেমে গিয়েছে শুধু কংগ্রেসের মধ্যেই নয়, ভারতের রাজনৈতিক জীবনেও। এই ধসের বেগ রোধ করতে পারেনি বামপন্থী দলগুলো। হয়ত রোধ করা সম্ভব ছিল না, এবং সে কারণেই হয়ত ধনিক-বণিকের সংগঠন এত সক্রিয়ভাবে নির্বাচনের আসরে নেমেছিল। তবু বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে লাভ নেই। ধসের মুখে রাজনৈতিক চেহারাটা সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছে।

(সমাপ্ত)

এরিন বন্দরে সমুদ্রের জলে বাঁধ দিয়ে মাছের চাষ করার ব্যবস্থা হয়েছে

আধুনিক মাছ-ধরা

আমরা বাঙালীরা মাছভক্ত বরাবর। মাছ না হলে আমাদের পেট ভরে না। আজকাল অবশ্য ভাত আর মাছ, কোনটা দিয়েই পেট ভরাবার উপায় নেই। সে যাই হোক, মাছের ব্যাপারে আমাদের আবার বাছবিচার আছে। অনেকে আঁশবিহীন মাছ খায় না। কারো আবার সমুদ্রের মাছে গন্ধ লাগে। এই রকম নানা বাছবিচার থাকার ফলে যে-মাছ একটু সস্তায় মেলে, তা আর কেনা হয় না। কিন্তু এই বাছবিচার ও রুচির, এমন কি, কিছু কিছু কুসংস্কারের বালাই অন্য দেশেও আছে। উত্তর অতলান্তিকে প্রচুর মাছ থাকা সত্ত্বেও কেউ সে মাছ ধরে না, কারণ, সে মাছের নাকি বাজার নেই। লোকের সেই সব মাছের সঙ্গে পরিচয় নেই, সেগুলির চেহারা নাকি কিম্ভূতকিমাকার, এইসব কারণে কেউ সেগুলি খেতে চায় না। অথচ মাছগুলি প্রোটিনে ভরপুর। আফ্রিকার হ্রদগুলিতে একরকম হাতি-শুঁড় মাছ আছে (মর্মিরাস)। কিন্তু সেখানকার মেয়েদের সে মাছ খেতে দেওয়া হয় না এই কুসংস্কারের জন্য যে, সে মাছ খেলে মেয়েরা বন্ধ্যা হয়ে যায়। এই রকম আরো কত ধারণা আছে।

প্রোটিন খাদ্যের অভাবগ্রস্ত দুনিয়ায় সংজাত প্রোটিনের কিন্তু অভাব নেই। পৃথিবীর মৎস্য সম্পদ হচ্ছে প্রোটিনের এক অফুরন্ত উৎস। অথচ দুনিয়ার শতকরা ৮০ জন লোকের ভাগ্যে দিনে ৩০ গ্রাম প্রোটিনও জোটে না। শতকরা ১০ জন দিনে ১০ গ্রামের চেয়েও কম প্রোটিন খেতে পায়। এই প্রোটিনের অভাবগ্রস্ত মানুষদের অধিকাংশ বাস করে বিষুবরৈখিক অঞ্চলে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে, অর্থাৎ তথাকথিত অনুন্নত দেশগুলিতে। মাছ ছাড়া তাদের সহজে প্রোটিন পাবার আর কোন জিনিস নেই। শুধু এইসব দেশ কেন, ব্রিটেনের মত দেশ মাছের আস্তায় পরিবেষ্টিত থেকেও মৎস্য সম্পদ ততটা কাজে লাগায় না, যতটা লাগানো তার পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়। ব্রিটেনের উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রচুর মাছ। উত্তর মহাসাগরের অগভীর জলেও মাছের অভাব নেই। তারপর পশ্চিমে গ্রীনল্যাণ্ড ও গ্রেট ব্যাংকের কিনারা থেকে আরম্ভ করে, আইসল্যাণ্ড পার হয়ে উত্তরে নরওয়ে এবং পূবে বারেন্ত্স্ সাগর পর্যন্ত গভীর জলের মাছের ছড়াছড়ি। তবে সরবরাহের সঙ্গে চাহিদার এই অসামঞ্জস্য কেন? তা হলে কি মৎস্য-শিল্পের সেরকম কোন ভবিষ্যৎ নেই?

প্রশ্নটা তোলা যত সহজ, জবাব তত সহজ নয়। কারণ, মাছ-ধরা ব্যাপারটা অনেকগুলি ব্যাপারের উপর নির্ভরশীল, যেমন স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ, ঝড়-বাদল, জোয়ার-ভাটা, জলের স্রোত তাপ ও গভীরতা ইত্যাদি। জায়গাবিশেষের উপযুক্ত মাছ-ধরা জাহাজ ও মাছ মারবার-ধরবার সাজ-সরঞ্জামের প্রশ্ন আছে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে শন ও সুতা ছাড়াও জাল বোনার জন্য নাইলন ও টেরিলিন ব্যবহার হচ্ছে। এসব ছাড়াও জাহাজাদি তৈরি করা ও কেনার জন্য প্রচুর টাকা চাই, অভিজ্ঞ নাবিক ও ধীবর চাই, পাকা ক্যাপ্টেন চাই, বন্দর ও ডক চাই, মাছ দেশের সর্বাংশে চালান দেবার জন্য রাস্তা ও যানবাহন চাই, মাছ মজুত করার জন্য হিমঘর, টিনে ভর্তি করার ও প্রোসেস করার কল-কারখানা চাই। এত রকম ব্যাপার সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার সামর্থ্য ও সংগতি থাকলে তবেই মৎস্য-শিল্পের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা সম্ভব।

প্রোটিন উৎপাদনের যত-রকম কৌশল আছে, সেগুলির মধ্যে বোধ হয়, প্রাচীনতম হচ্ছে মাছ-ধরা। গত ২০০০ বছরের মধ্যে তার সেরকম উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি বলাই চলে। এখনো লোকে কত মাছ আছে না আছে, সেদিকে পরোয়া না করে বেধড়ক মাছ ধরে। অবশ্য হালে মাছের চাষ কিছু কিছু শুরু হয়েছে, কিন্তু তাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পুকুরের মাছ নিয়ে। সমুদ্রের মাছ নিয়ে কাজ যা হচ্ছে, তা এখনো ধর্তব্যের মধ্যে নয়, অথচ এই সামুদ্রিক মাছই হবে ভবিষ্যতে প্রোটিন-খাদ্যের এক প্রধান উৎস।

হালে পৃথিবীতে চারটি মৎস্য-সমৃদ্ধ

এক ব্রিটিশ মাছ-ধরা জাহাজের যন্ত্রচালিত জাল
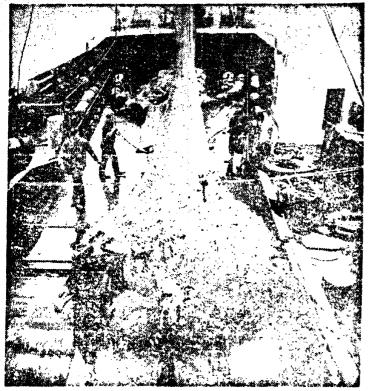
এলাকার হদিস পাওয়া গিয়েছে এবং চারটিই প্রোটিনের অভাবগ্রস্ত অঞ্চলে অবস্থিত। সেই চারটি এলাকার একটি রয়েছে ভারতের মালাবার উপকূলের কাছে, একটি দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে, একটি আফ্রিকার পশ্চিমে এবং বিষুবরেখার দক্ষিণে আরবের কাছে। এগুলির মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকার মৎস্যক্ষেত্র থেকে মাছ ধরা হচ্ছে, তাও ১৯৫৮ সাল থেকে। সেখানে বছরে প্রায় ৭০ লক্ষ টন মাছ ধরা হয়, যা ঐ মহাদেশের মানুষকে দৈনিক ৩০ গ্রাম প্রোটিন যোগাতে পারে। অন্য তিনটি এলাকার প্রত্যেকটি থেকে বছরে অন্তত ৫০ লক্ষ টন মাছ পাওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর পুরাতন ও এই চারটি নতুন মৎস্যক্ষেত্র ভালভাবে কাজে লাগাতে পারলে আগামী কুড়ি বছরে দুনিয়ায় মাছ-ধরার পরিমাণ দ্বিগুণ করা অসম্ভব হবে না বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের পুরানো মৎস্যক্ষেত্রগুলিতে মাছ-ধরার হিড়িক যে-ভাবে বাড়ানো হচ্ছে, তার ফলে ক্ষেত্রগুলিতে কিছুকাল বাদে মাছের অভাব দেখা দেওয়া আশ্চর্য নয়—এটা হচ্ছে আর একটি মত।

মাছ-ধরার ব্যাপারে কর্মদক্ষতার উন্নতি করাটাই হচ্ছে বড় কথা। জাহাজ থেকে জাল ফেলায় যন্ত্রীকরণ হচ্ছে। মাঝ দরিয়ায় গভীর জলে মাছ ধরার জন্য এক রকম প্যারাস্যুটের মত জাল তৈরি হয়েছে উত্তর ইউরোপে। সেগুলি জলের মধ্যে নামতে নামতে প্যারাস্যুটের মত খুলে যায়। হেরিং, ম্যাকারেল প্রভৃতি মাছ ধরার পক্ষে এগুলি বিশেষ উপযোগী। ইংলণ্ডে এমন সব মাছ-ধরা জাহাজ তৈরি হয়েছে, যেগুলি বন্দর থেকে হাজার মাইল দূরে চলে গিয়ে মাছ ধরতে পারে। তবে এই ধরনের জাহাজের কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমত, জাহাজগুলি এত দূরে চলে যায় বলে ফিরতে অনেক দিন লেগে যায়। সেইজন্য ধরা মাছ জাহাজেই 'প্রোসেস' করতে হয়, না হলে সে মাছ পচে যাবে। ফলে জাহাজে অনেক কাজের লোকের দরকার হয়। সে-জন্য পড়তা খরচা বাড়ে। দ্বিতীয়ত, এই কাজের জন্য লোক পাওয়াও একটু শক্ত, কারণ এক্ষেত্রে ডাঙার কাজের চেয়ে দৈনিক কাজের ঘণ্টা বেড়ে যায়।

সমুদ্রে গিয়ে তারপর মাছের সন্ধান করার রেওয়াজ ক্রমশ চলে যাচ্ছে। মাছ ধরতে যাবার আগে আজকাল ছোট ছোট এরোপ্লেন ও হেলিকপ্টার পাঠিয়ে কোথায় মাছ রয়েছে, সেই খবর আনানো হয়। এই কাজে র‍্যাডার ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্রও ব্যবহার হচ্ছে, যার পর্দায় শুধু মাছের ঝাঁকের গতিবিধি কেন, সেগুলি কোন্ জাতীয় মাছ, তাও প্রতিফলিত হয় এবং সেই মাছ ধরবার বিশিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

এ ছাড়া হালে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে মাছ ধরার নানা কল-কৌশল উদ্ভাবন করা হচ্ছে। এক রকম কৌশলের নাম ইলেকট্রো-ট্যাক্সিস, যাতে দুটি তড়িদ্দ্বারের মাঝখান দিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত করে মাছগুলোকে তাদের আস্তানায় যেতে প্ররোচিত করা হয়। সেখানে গেলে তখন তাদের জাল বা ছিপ দিয়ে ধরা হয়। আর একটি কৌশলের নাম ইলেকট্রোনার্কোসিস, যাতে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ দিয়ে মাছগুলিকে অসাড় করা বা মারা হয়। এ ছাড়া ভ্যাকুয়াম হোজ পাইপ দিয়ে মাছ শুষে নেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

আমাদের ভারতের মত গরীব দেশে জনসাধারণের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব মেটাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মাছ। কিন্তু দেশে আজ সেই মাছেরই আকাল। তাই কর্তৃপক্ষ ভারতের আশপাশে মৎস্য-সমৃদ্ধ সমুদ্র থেকে মাছ সংগ্রহ করার দিকে যদি আরো বেশি নজর দেন, ব্যবসায়ীদের সেই ব্যাপারে উৎসাহিত করার (প্রয়োজনবোধে অর্থসাহায্য করেও) চেষ্টা করেন, তা হলে প্রোটিন সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়
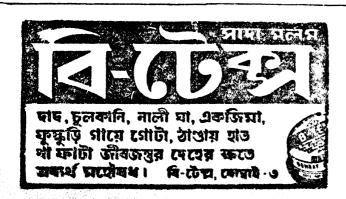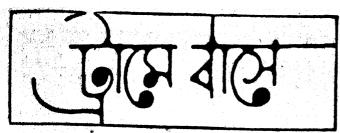
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করিয়াছেন, নূতন কেন্দ্রীয় সরকার "বাম-ঘেঁষা নীতি" অনুসরণ করিবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"করতেই হবে। নূতন পরিবেশটা অঙ্কের অভ্রান্ত হিসেব দুয়ে আর দুয়ে চার-এর মতোই হয়ে গেল এবং আমরা শুনেছি—অবস্থা বামা গতি।"

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নেতা নির্বাচিত হইবার পর শ্রীমোরারজী দেশাই সাংবাদিকদের বলিয়াছেন—আমরা তাঁহার মাথায় কণ্টকমুকুট পরাইয়া দিয়াছি। শ্যামলাল বলিল—"নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হওয়ার কারণটা তা হলে কাঁটার ভয়।।"

ফরোয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীঅমিয়নাথ বসু এম পি বলিয়াছেন, খাদ্য ছাড়া নূতন সরকারের

অন্যতম প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত রাজ্যের বিশুদ্ধ এবং সৎ প্রশাসন প্রবর্তন। জনৈক সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"অর্থাৎ আগ মার্ক প্রশাসন।।"

নেতা নির্বাচনের পর দেশ-বিদেশ হইতে অনেকেই ইন্দিরাজীকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন। তবে, পাক প্রেসিডেন্ট জনাব আয়ুব খাঁ বলিয়াছেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় পাকিস্তান সম্পর্কে (অর্থাৎ কাশ্মীর সম্পর্কে) ভারতের মনোভাব পরিবর্তিত হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না।—"অর্থাৎ জনাবের কথাটা হল, মেন যে কাম অ্যান্ড মেন মে গো, বাট আই গো অন ফর এভার"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ বলিয়াছেন, ভারতের চতুর্থ নির্বাচনই হইল শান্তিকালের নির্বাচন।—"আমের [illegible]

কথা অবশ্য তিনি খোলসা করে বলেন নি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

সংবাদে প্রকাশ, এত দিন পরে সুকর্ণকে গদিচ্যুত করা সম্ভব হইল।—"কথায় বলে, কান ধরে টানলে মাথা আসে, কিন্তু

সু-কর্ণ হলে মাথা সহজে আসে না"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাজেট বিতর্ক প্রসঙ্গে সরকার পক্ষ (গুলাইয়া ফেলিবেন না, যুক্ত ফ্রন্ট সরকার) অভিযোগ করিয়াছেন, বিরোধী দল (অবশ্য কংগ্রেস, হিসেবে ভুল করবেন না) নানা অবান্তর কথার অবতারণা করিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"সেড় দিনের বৈরাগী ভাতকে অন্ন বললে ক্ষমা ঘেন্না করে নিতেই হয়।"

বাজেট বিতর্কে সভার আবহাওয়ায় কালবৈশাখীর ইঙ্গিত থাকিলেও মাঝে মাঝে রঙ্গ-রসিকতার দুই-এক পশলা বৃষ্টিতে উত্তপ্ত আবহাওয়া কতটা শীতল হয়। শ্রীপ্রশান্ত শূর গায়েন বলেন—কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের পাউডার এবং গণতন্ত্রের ক্রীম মাখিয়া মনোহর হইতে চাহিয়াছিলেন, পারেন নাই। বিশুখুড়ো বলিলেন—"পরস্পরের প্রতি কটূক্তির চেয়ে (যা এই কিছুদিন আগেও আমরা শুনেছি) 'রঙ্গোক্তি' অনেক ভালো। গায়েন মশাইয়ের কথার উত্তরে বিরোধী পক্ষ রসিকতা করে বলতে পারতেন, "আমরা অপেক্ষা করে আছি দেখব বলে গণ-ঘানির তৈলমর্দনে কতটা মনোহর হওয়া যায় এবং ভবী তাতে ভোলে কি না।।"

চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একটি জরুরী বিজ্ঞপ্তিতে চীনের কৃষি বিভাগগুলিতে অবিলম্বে সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রত্যাহার বা স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়াছেন।—"মানে তাঁরা বুঝেছেন কালচারের চেয়ে অ্যাগ্রিকালচারই কাম্য"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কেরালা হইতে একটি অদ্ভুত সংবাদ পাওয়া গেল—সেখানকার নূতন মন্ত্রীর মধ্যে স্বামী সি পি আই-এর সদস্য এবং স্ত্রী সি পি (এম)। কেরালা সরকার হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা আর এক বাড়িতে বসবাস করিতে পারিবেন না, ফলে স্বামী এবং স্ত্রী একটি রাস্তার দুই ধারে বাড়ি ভাড়া করিয়া বাস করিতেছেন—"এবং হয়ত বারবার আবৃত্তি করছেন—'আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি, সেই আমাদের সুখ'—মন্ত্রী হলে কী হবে, দম্পতি তো, পার্টির আদর্শগত সংঘাতেও মনে রাখতে হবে, সেটা অজানুস্থেরই শামিল।"—বলেন সহযাত্রী।

এক সংবাদে শুনিলাম, রক্তপান করে শুধু স্ত্রী জাতীয় মশা। শ্যামলাল বলিল—"মহিলা মশকের রক্তলোলুপতা রহস্যজনক, মন্তব্য মারাত্মক।"

সংবাদে শুনিলাম, পুলিস কোন "পেলে" সেনসর করিতে পারে না। বিশুখুড়ো বলিলেন—পেলে শব্দটা এ ক্ষেত্রে নাটক হিসেবেই বলা হয়েছে, কিন্তু 'পেলে' যদি টেস্ট ক্রিকেট হয় সে ক্ষেত্রেও কি পুলিসের সেনসর করার ক্ষমতা সীমারিত।।"

সোনার দাম কমিয়াছে—একটি সংবাদ; —"কিন্তু গিন্নী আর কন্যার বায়নাক্কা বেড়েছে সেটি শুধু সংবাদ পদবাচ্য হলো না।"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাতে পূর্বে ও রাষ্ট্র-মন্ত্রীর সংখ্যা ছিল তেত্রিশ, এবারেও

সেই তেত্রিশই আছে খুড়ো বলিলেন—"পূর্ণ পরিবার পরিকল্পনা।।"

কলকাতার ডায়েরি

সেদিন এক পুরানো অফিস-বাড়ির সীলিঙে জীর্ণদীর্ণ এক টানা-পাখা দেখে অবাক হয়েছিলাম।

অবাক হবারই কথা, এই বিজলীপাখার যুগে ওই টানা-পাখা প্রায় মহেনজোদারোর স্মৃতি। সহমরণ, সন্তান-বিসর্জনের মত এই-সব জিনিসও আজ আমাদের জীবন থেকে পুরোপুরি বরবাদ। অথচ এমন একদিন ছিল, যখন এই কলকাতার অফিসে-অফিসে, বাড়িতে-বাড়িতে হাজার হাজার টানা-পাখা গ্রীষ্মের ক্লান্তি দূর করত। এক কোনে 'পাঙ্খাপুলার' যন্ত্রের মত একটানা দড়ি টেনে চলেছে আর গোটা ঘর লম্বা-চওড়া পাখার তাড়নায় হাওয়ায় উড়ছে—এমন দৃশ্য আমরা বাল্যকালে মফস্বলেও কত দেখেছি।

এই টানা-পাখার আবিষ্কর্তা কে? দ্য পেনিং নামে এক সাহেব। তাঁর আবিষ্কারকে তিনি পেটেণ্ট করান ১৮৫৬ সালে। এটাই ভারতের প্রথম পেটেণ্ট। এই উপলক্ষে ঠিক এগারো বছর আগে এই কলকাতা শহরে পেটেণ্ট সেনটেনারি উদ্‌যাপিত হয়।

কিন্তু প্রশ্ন, তার আগে কি টানা-পাখা কলকাতা শহরে ছিল না? পুরাতন কলকাতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বাস্টীড সাহেবের মত হচ্ছে—ছিল। তাঁর ধারণা, টানা-পাখার প্রচলন হয় ১৭৮৪ থেকে ১৭৯০ সালের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৭৮৯ সালে লেখা 'ভয়েজ টু বেঙ্গল' বইয়ের উল্লেখ করেন। তাতে টানা-পাখার একটি চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। একজন বিদেশীর কাছে এই ধরনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। গ্রন্থকার লিখছেন—

"To chase away the flies and occassion a free circulation over the eating table, of a square form, and balanced on an axle fitted to the upper part of it. A servant standing at one end of the room puts it in motion by means of a cord which is fastened to it, in the same manner as he would ring a bell."

আবার করনেল ইউল এবং মিস্টার বারনেল-এর লেখা 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান টার্মস' নামক সংগ্রহ গ্রন্থে লেখা আছে, এই টানা-পাখার প্রচলন আরব দেশে ছিল, তারও হাজার বছর আগে, অষ্টম শতাব্দীতে।

তাই যদি হয় তা হলে দ্য পেনিং সাহেবের কৃতিত্ব কীসে? নাকি তিনি শুধু এই চলতি যন্ত্রকে প্রথম পেটেণ্ট করান। কিন্তু তাতেও তো আবিষ্কারের গৌরব মেলে না। এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা কী বলেন?

*

এয়ারকণ্ডিশন ঘরে বসে অনাহারে মৃত্যুর বিবরণ শোনা বড় মর্মান্তিক, বড় হাস্যকর। শুধু শোনা নয়, বিবরণ দেওয়াও।

পেয়েছেন এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা দিগ্বিজয়ী চলচ্চিত্রশিল্পী মারলোন ব্রানডো। বিহারের খরাক্লিষ্ট এলাকা ঘুরে এক দিনের জন্যে তিনি গত সপ্তাহে এসেছিলেন কলকাতায় এবং এক বিলাসী হোটেলের এয়ারকণ্ডিশন-করা ঘরে বসে সাংবাদিকদের কাছে যখন বলছিলেন বিহারের গ্রামাঞ্চলে তাঁর সফরের কথা, মনে হচ্ছিল, অনাহার ও অর্ধাহারের সঙ্গে অপরিচিত ব্রানডো বর্ণনার পদে পদে বিভীষিকায় কেঁপে কেঁপে উঠছেন। বললেন, 'এমন যে হতে পারে ভাবিনি, এমন অভিজ্ঞতা কোন দিন হয়নি। আর ঠিক তার পরেই এখানকার এই

হোটেলের থার্নাপনা, নাচ-গান, আরাম-বিলাস সব যেন আমার কাছে কেমন অবাস্তব, অত্যদ্ভুত বলে ঠেকেছে।'

ব্রানডো এ দেশে নবাগত, তাই তিনি বিস্মিত বিমূঢ়। কিন্তু এ আমাদের গা-সহা। দূরে বিহারে যাবার দরকার নেই, এই কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে অর্ধাহার-অনাহার এবং তারই পাশাপাশি প্রাচুর্যের প্লাবন। বিয়েবাড়িতে প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের পাতে স্তূপীকৃত হয় জবর-দস্তি করে তৃতীয় বা চতুর্থবার দেওয়া চর্বচূষ্যলেহ্যপেয়ের অবশেষ। আর ঠিক তারই অনতিদূরে ওই অবশিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করে ভিখারী ছেলেরা ও পথের কুকুর।

এ-ও বোধ হয় আর-এক ধরনের ভারতীয় 'বৈচিত্র্য' এবং অনেকে হয়ত তার মধ্যে 'ঐক্য' খুঁজে পেয়ে সনাতন ভারতবর্ষের চিরন্তন ধারাবাহিকতার জয়গান করবেন।

আমি সর্বাংশে ভারতীয় হয়েও এদের দলে নই। অনাহার অর্ধাহারের পাশাপাশি রাজভবনের রাজভোগ মানায় না। এমন কি, রবীন্দ্রসদনে শুভলক্ষ্মীর গান শোনার টিকিট কেটে যাঁরা মনে করেছেন, বিহারের খরাপীড়িতদের প্রতি আমাদের কর্তব্য শেষ হল, আমি তাঁদের সংগেও নেই।

*

পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়েই নানা রকম আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। আমার বক্তব্য, তাঁরা যদি কলকাতাবাসীর একটিমাত্র দাবি পূরণ করতে পারেন, তা হলে আর বিশেষ কিছু না করলেও সবাই তাদের জয়ধ্বনি দেবে, গোটা পশ্চিমবংগ বলবে—'সাধু সাধু সাধু।'

এই দাবিটি দীর্ঘ দিনের এবং দশ-বারো বছর ধরে খুড়োর কলের মত আমাদের নাকের ডগায় ঝুলে আছে। আমি স্টেডিয়ামের কথা বলছি। এই স্টেডিয়াম নির্মাণ নিয়ে কত জল্পনাকল্পনা, কত রকম স্থান নির্বাচন, সলা-পরামর্শ, বৈঠক ইতালীয় স্থপতি ভিটটেলোজিকে ডেকে পাঠানো—কত কিছু। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেই র‍্যামপার্ট, সেই লাইন, সেই গ'তোগুতি।

ভিটটেলোজির তৈরি স্টেডিয়ামের মডেল কিছু দিন রাইটার্স বিল্ডিং-এর একটি অলিন্দ উজ্জ্বল করে রেখেছিল, অনেকে তাই দেখে পুলক বোধ করে-ছিলেন। এখন মডেলের অন্তর্ধানে অলিন্দ অন্ধকার এবং স্টেডিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনাও অন্ধকারের গর্ভে।

রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভার কাছে নিবেদন, তাঁরা যেন অবিলম্বে ওই স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজে হাত দেন, দেখিয়ে দেন, ইচ্ছে থাকলে সবই করা যায়।

*

কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক বহু-গুণান্বিত শ্রীত্রিগুণা সেন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন, তার জন্যে শহরে আনন্দের সীমা নেই। প্রত্যেকেরই বক্তব্য, যোগ্য হাতেই শিক্ষা দফতর পড়েছে।

এই আনন্দের সংগে সংগে শোক-সংবাদ। গত সপ্তাহেই পরলোকগমন করেছেন কলকাতার আর-একজন বিশিষ্ট নাগরিক—শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ। চলনে-বলনে, সুরুচিতে-আভিজাত্যে এমন অপূর্ব চরিত্র লাখে না মিলয়ে এক। তাঁর আত্মার শান্তি হোক, তাঁর স্মৃতি অক্ষয় থাক।

চাণক্য

নূতন সরকারে নূতন নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
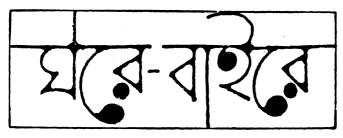
নূতন সরকারের নূতন নেত্রী আবার শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

এক বিদগ্ধ ভারতীয় সাংবাদিক একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, কংগ্রেস উচ্চমহলে শ্রীমতী গান্ধীই একমাত্র পুরুষোচিত চিত্ত। বিশিষ্ট ভারতীয়ের মুখের কথাটি কেড়ে নিয়ে বিদেশী সংবাদপত্র মহল অনেক ভাবে লোফালুফি করেছেন। অনেকে বিচিত্র তার ব্যাখ্যা বের করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য যাই থাকুক, শ্রীমতী গান্ধীর দৃঢ়সংকল্প, অটুট আত্ম-বিশ্বাস, অবিচলিত আন্তরিকতা, রাজনীতিতে দুর্লভ অকৃত্রিম, ছলনাহীন ব্যক্তিত্ব আবার তাঁকে এই সমস্যাসংকুল দেশের কর্ণধার করেছে। সাম্প্রতিক জগতের ইতিহাসে এরকম মহিলার নজীর আর আছে কিনা, আমাদের জানা নেই। নেহরুর ভারতবর্ষ নয়। জটিলতম আর্থিক ও রাজনৈতিক সংকটকালে এত বড় দায়িত্বে তাঁর সার্থক সাফল্য ভারতীয় নারীসমাজ কামনা করে। কংগ্রেস রাজ-শাসনের বিশ বছরে এবারের চেয়ে বড় বিপর্যয় আসেনি, এতটা আসতে পারে, কেউ কল্পনা করেনি। ২৫০,০০০,০০০ ভোটার সংখ্যার ১৫০,০০০,০০০ ভোট এমনভাবে কংগ্রেস ভাগ্যাকাশকে আচ্ছন্ন করে তুলবে, এ কথা নৈরাশ্যবাদীরাও বলেননি। পাঁচটি ক্যাবিনেট মন্ত্রী, চারটি প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, সহ কংগ্রেস সভাপতি কামরাজ পরাজিতের তালিকায়। পার্লামেন্টে এবার প্রায় ১০০টি আসন কম। তবু শ্রীমতী গান্ধী নিরাশার কথা বলেননি, বরং বলেছেন, "We have proved to the world that we have free and fair elections. That is the whole idea of having a democracy."

ক্ষুধার্ত, বিপর্যস্ত ভারতবর্ষের অন্তরের মর্যাদা তাই আজও অক্ষুণ্ণ আছে। স্বর্গীয় লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর তের মাস শ্রীমতী গান্ধীর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের শেষে এ উক্তি সাহসিকতার উক্তি সন্দেহ নেই।

শ্রীমতী গান্ধীর সম্বন্ধে নূতন করে কিছু বলতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। যে-পরিবারে জন্ম তাঁর, সে-পরিবার দ্বারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচিত, স্বাধীনতার ইতিহাস রচিত। তাঁর রাজনীতির হাতেখড়ি থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত শিক্ষা হয়েছে অবলীলাক্রমে পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রেরণায়। সুন্দরী মহিলার অন্তরে লুকোনো সব দৃঢ়তার আজ চরম পরীক্ষা। দায়িত্বের গুরুত্ব ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সেই দায়িত্বের সুষ্ঠু সম্পাদনার উপর সাধারণের জীবন নির্ভর করছে। দেশের আগামী দিনের সব ভাল-মন্দ নির্ভর করছে। শ্রীমতী গান্ধীর কাছে তাই অনেক আশা সবাই করে। আমরাও উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করবো। নারী যে আর অবলা নয়, তার প্রমাণ হয়ে যাক। আপন ভাগ্য মাত্র নয়, এক বিরাট উপমহাদেশের ভাগ্যও তাঁর কোমল করে গড়ে উঠবার অপেক্ষায় দিন গুনবে।

সমাজ কল্যাণের দায়িত্বে সমাজ-সেবিকা

১৩ মার্চ। সম্ভাবনাপূর্ণ সকাল। নূতন মন্ত্রিদল গঠিত হবার খবরের আশায় সবাই ব্যগ্র। নূতন দিল্লির ওয়েস্টার্ন কোর্টের ১৫ নম্বর কামরায় দুজন মহিলা প্রাতরাশ শেষ করে একটু দোকান বাজারে ঘুরে আসবার কথা ভাবছিলেন। দশটা বাজতে তখনও মিনিট পাঁচেক বাকী। দশটায় দোকানের দরজা সব খুলবে। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো, - প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে বলছি। শ্রীমতী গান্ধী রাষ্ট্রপতি ভবনে চলে গেছেন। তিনি বড্ড ব্যস্ত, তাই নিজে ফোন করতে পারেননি। সাড়ে দশটায় রাষ্ট্রপতি ভবনের অশোক হলে আপনাকে আসতে অনুরোধ করেছেন। সমাজ কল্যাণের মিনিস্টার অফ স্টেট হিসাবে আপনাকে শপথ নিতে হবে। নূতন মন্ত্রিসভার নামের তালিকা সম্বন্ধে ডঃ ফুলরেণু গুহের কাছে এর আগে কোন খবর পৌঁছায়নি। অন্য মহিলা মালদহের নবনির্বাচিত এম পি শ্রীমতী উমা রায়। শ্রীমতী গুহের অক্লান্ত সমাজকল্যাণ কর্মের সহযোগী, বর্তমানে অতিথি। শ্রীমতী রায়কে ফুলরেণুদি বললেন, "কেউ ঠাট্টা তামাশা করার চেষ্টা করেনি তো! ঘুরে আসি একবার রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে। কোন খবর যদি কোন লোক জানতে চায় তো কিছু বলো না।"

ঠাট্টা যে সে আহ্বানে ছিল না আজ ভারতবর্ষের সবাই জানে। নবগঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিদলে যেন যেখানে যতটুকু কর্মদক্ষতার সন্ধান আছে তাকে তুলে আনবার চেষ্টা করেছেন শ্রীমতী গান্ধী। '৬৭ সালের লোক-সভা তো সেই পূর্বের গতানুগতিক লোক-সভা নয়। এবারে প্রতিপক্ষ প্রবল। শুধু মাত্র রাজনৈতিক চাপের হিসাব করলে দেশের লোকও প্রতিবাদে পশ্চাৎপদ হবে বলে মনে হয় না। ভোটের বাক্সই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

ডঃ শ্রীমতী ফুলরেণু গুহও সেই আসামান্য কর্মদক্ষ গোষ্ঠীর একজন। আগামী দিনের আশায় নূতন শাসকগোষ্ঠী কতটা সাফল্য প্রমাণ করতে পারবেন আমাদের জানা নেই; কিন্তু গোষ্ঠী চয়নের সাফল্য অস্বীকার করবার নয়।

প্রথমটা অবশ্য মন্ত্রিদলের লম্বা তালিকায় মহিলা নামের একান্ত অভাবে মনটা খারাপই লাগছিল। ১৯ জনের ক্যাবিনেটে প্রধান-মন্ত্রী ভিন্ন মহিলা নেই। ১৪ জন উপমন্ত্রীর মধ্যে একমাত্র ফুলরেণুদির নাম। তবু শ্রীমতী গুহর অসীম কর্মক্ষমতার খবর সংগ্রহ করে যোগ্যের যোগ্য দায়িত্ব দিয়েছেন বলে মনে মনে প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দিত না করেও পারলাম না। যখন বসে লিখছি তখনও ডেপুটি মিনিস্টারদের তালিকা প্রকাশিত হয়নি। আশা করি, সেখানে অন্ততঃ মহিলার নাম কিছু খুঁজে পাবো।

১৩ তারিখই সারাদিন চেষ্টা করলাম ফুলরেণুদিকে আমাদের আনন্দ ও গৌরবের খবর পৌঁছে দেবার। সকালে রাষ্ট্রপতিভবন। দুপুরে দুটি খাবার সময় মুহুর্মুহু টেলিফোন। শ্রীমতী উমা রায় বলছিলেন, ধরবেন কি করে তাকে সে এক দারুণ অবস্থা। ১৪ তারিখ সকাল সকাল গিয়ে দেখি ফুলের রাশি আর অভিনন্দন-কারীদের মাঝে বসে আছেন ফুলরেণু গুহ। সেই সাধারণ, সরল, অনাড়ম্বর সাজপোশাক, একইরকম আপন করা সহজ কথাবার্তা। একটুকু পরিবর্তন নেই। বুঝলাম রাজ-নৈতিক জীবনে ভারতবর্ষে যুগান্তর এসেছে।

অনেক দিন আগে ফুলরেণুদির কথা আমরা একবার আলোচনা করেছিলাম। আপনাদের হয়তো মনেও আছে। ফুলরেণু গুহ তখন পশ্চিমবঙ্গের স্টেট সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। আজ বলছিলেন, দিনকতক আগে সে-পদে ইস্তফা দিয়েছেন পড়াশুনো নিয়ে থাকবেন মনস্থ করে। তা আর হল না। যে দায়িত্ব-ভার তাঁর উপর এসেছে, তাতে এতটুকু ত্রুটি করবার মেয়ে তিনি নন।

পারিবারিক জীবনে স্বর্গীয় ডঃ বীরেশ-চন্দ্র গুহর পত্নী শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ। স্বামীর কাছেও কর্মজীবনের প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়েছেন প্রচুর। বীরেশ গুহ বলতেন, সমাজ থেকে সবাই কিছু পায়, সেই সমাজকে কিছু ফিরে দেওয়া প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। কি ফললাভ হবে, তাই বড় কথা নয়। নিষ্ঠা ও অনুরক্তি নিয়ে সাধ্যমত কাজ করাই বড় কথা। ডাঃ বীরেশ গুহ তাঁর মাকে বলেছিলেন, 'তোমার তো অনেক ছেলে, অনেক বউ। দাও না একটিকে দেশের কাজে।' ফুলরেণুদিকে তাঁর শাশুড়ী কর্মক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ পরিধিতে কখনও বাধা দেওয়া তো দূরের কথা সর্বদা উৎসাহই দিয়েছেন। পিত্রালয়ের তরফেও প্রেরণার অভাব ছিল না। রামকৃষ্ণ মিশন-ভক্ত সহৃদয়, বদান্য, উদার পরিবারে তাঁর জন্ম। ছাত্রীজীবনেও সেই উদারতার ছাপ রেখেছিল। কলেজে পড়ার সময়ই ফুলরেণু গুহ যুগান্তর দলে যোগ দিয়ে রাজনীতির প্রথম পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছিলেন। পাঠরতা মেয়ের কর্মী হিসাবে মুক্ত মনের সাহস দেখানো সেকালে সাধারণ বাঙালী সংসারে বিরল না হলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। ডাঃ গুহ প্যারিসের সরবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ-বিজ্ঞান বা সোসিওলজির ডক্টরেট পান। লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজের লেকচারার ছিলেন কিছু দিন।

ডঃ ফুলরেণু গুহ

লণ্ডন থাকাকালীন ইটালী ও আবিসিনিয়া যুদ্ধে দলে দলে স্প্যানিশ ও আবিসিনিয়ান বাস্তুহারা ইংলণ্ডে এসে পড়ছিলেন। আশ্রয় চাই, খাদ্য চাই, যেমন চায় সর্বকালের সব বাস্তুহারার দল। ফুলরেণু গুহ বাঙলার মেয়ে, কিন্তু সাহায্যের যেখানে সত্য প্রয়োজন, সেখানে তিনি বিশ্বের নাগরিক। সাহায্য-প্রার্থীদের জন্য যত আয়োজন, তার মধ্যে বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন। দেশে ফেরার পরে আবার সেই বাস্তুহারা সমস্যা। ১৯৪৩ সাল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বর্মা থেকে দলে দলে ভারতীয় জলপথে, পায়ে হেঁটে অসীম দুর্দশাপন্ন অবস্থায় এসে পৌঁছতে লাগলেন। তাদের জন্যও ফুলরেণুদির কর্মব্যস্ত জীবনে বেদনার অন্ত ছিল না। ঘরে বসে দুঃখে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলবার মানুষ তো নন তিনি। কাজ করে ঘোচাতে হবে বিপর্যস্ত মানুষের দুর্দশা দুর্গতি। কংগ্রেসের বাস্তুহারা সাহায্য সমিতির সভ্য হিসাবে তাই তুলে নিয়েছিলেন দায়িত্বভার। পরীক্ষা কি একটা? তারপর এল ১৯৪৩-এর দারুণ দুর্ভিক্ষ, '৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা। সমাজসেবীর ভূমিকায় শ্রীমতী গুহর জীবন কানায় কানায় পূর্ণ। নোয়াখালিতে গিয়েছেন নির্যাতিতের সাহায্যে, আবার পশ্চিম বাংলার গভর্নরের United Council of Relief and Welfare-এর হিসাবে কলকাতায় বসে বাস্তুহারাদের জন্য করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম।

অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স-এর সংগে ডঃ গুহর সম্বন্ধ বহু দিনের। বর্তমানে তিনি A I W C-র ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। ভারতীয় নারীর সম্পত্তিতে অধিকার নিয়ে যে আন্দোলন চলেছিল, তাতে ডঃ গুহর দান অনেক। তিনি মনে-প্রাণে শিক্ষাব্রতী। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ফ্যাকাল্টির সভ্যও ছিলেন। শিশুমঙ্গলে Save Children কমিটি ডঃ গুহর অন্যতম কীর্তি। পশ্চিমবঙ্গে Association of Social and Moral Hygiene-এরও বর্তমান প্রেসিডেণ্ট তিনি।

একটি একটি করে তাঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র বা পর্যায়ের তালিকা তৈরি করতে গেলে শেষ করা কঠিন হবে। তাই বলছিলাম যে, ডঃ ফুলরেণু গুহ অসাধারণ কর্মপটুতা ও সহজ মানবতায় সজীব একটি পূর্ণ মানুষ এবং অনন্যা মহিলা। রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ও সমাজ-সেবায় আত্মদান, সবটাই সেই মানবতার অভিব্যক্তি। অভিভাবকত্বের ঘটা, বাহুল্য বা জাঁক-জমক কোথাও নেই। বারবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কি বাঙলার মেয়েদের কিছু বলবেন? এই স্বাভাবিক নম্রতা নিয়ে প্রত্যেক বারই বলেছিলেন, 'যদি সে সৌভাগ্য কোন দিন হয়, যদি সেরকম কাজ করতে পারি, সেদিন বলবো আমার মনের কথা বাঙলার মেয়েকে। আজ নয়, কাজের শেষে। হয়তো বা মন্ত্রিসভার বাইরে বসে।'

ভ্রম সংশোধন—গত ২৬ ফাল্গুন সংখ্যায় 'ঘরে বাইরে'তে একটি ভুল-এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। গোয়ালিয়রের রাজমাতা সিন্ধিয়ার নাম ইন্দিরা নয়। তাঁর নাম বিজয়া রাজে সিন্ধিয়া।
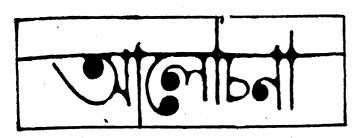
শ্রীজয়তী

বাংলা বানান

বাংলা বানানে রেফ এবং যুক্ত বর্ণের যে আলোচনা অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় করেছেন তার প্রতিবাদে শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী এক জায়গায় বলেছেন : "জানি না কেন পাণিনির বিধানে আছে যে, ইংল্যাণ্ডের রাজধানীর নামের ড-য়ের সংগে মূর্ধণ্য ণ অবশ্যই বসবে।" এই ণ্ড-এর ব্যাপার নিয়ে পাণিনি পর্যন্ত যাবার যে কি দরকার তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। যে কোন স্কুল-পাঠ্য ব্যাকরণেই এই নিয়ম পড়ুয়াদের শেখান হয় যে মূর্ধণ্য বর্ণের সংগে দন্ত্য বর্ণের যোগ ধ্বনিবিজ্ঞানের বিরোধী। 'ড' মূর্ধণ্য বর্ণ বিধায় তার সংগে দন্ত্য ন সনাতন নিয়ম অনুসারেই অচল। সেইজনাই অক্ষরটি আদৌ ণ্ড, 'ন্ড' নয়। কিন্তু আজকাল আমরা 'স্ট'-কে স্বীকার করছি। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ও ধ্বনিবিজ্ঞানের এই বৈচিত্র্য নিয়ে তাঁর প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন। আসল কথা হল এই যে, সংস্কৃতে যে 'ট' ধ্বনি খাঁটি মূর্ধণ্য বর্ণ সেই 'ট' ধ্বনিকে আমরা 'পোস্ট' শব্দের 'ট'-এর মধ্যে পাচ্ছি না। এই 'ট' ধ্বনি আরও soft বা মৃদু—এটি উচ্চারিত হচ্ছে soft palate থেকে। তাই এই 'ট'-এর সংগে 'স' যুক্ত হওয়ায় ধ্বনিবিজ্ঞানেরও কোনো ব্যত্যয় ঘটছে না। লণ্ডন শব্দের 'ড' উচ্চারণ স্থানভেদে মৃদুতা প্রাপ্ত হলে তার সংগেও 'ন' যোগে আপত্তি হওয়ার কথা নয়, কেন না এ সব ত গায়ের জোরের কথা নয়, ধ্বনির স্বাভাবিক উচ্চার্যমানতার কথা। মানুষের মুখের ধ্বনির বৈচিত্র্যের সীমা নেই; তবে এক অঞ্চলের উচ্চারিত ধ্বনির সীমা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেই অঞ্চলেই কোনো বহিরাগত ধ্বনির উচ্চারণে সেই অঞ্চলের উচ্চারণরীতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আবার বহিরাগত ধ্বনির assimilation বা সমীকরণও সম্ভব। যেমন master শব্দে। 'পোস্ট' শব্দে 'ট'-এর সংগে দন্ত্য স যুক্ত হলেও 'মাস্টার' শব্দে 'ট'-এর সংগে মূর্ধণ্য ষ যোগ করতে অনেকে পক্ষপাতী কেননা ঐ শব্দে আমরা 'সাধারণত দন্ত্য স উচ্চারণ করি না। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ও এই মত পোষণ করেন। তবে এখানে মতভেদের সম্ভাবনাকে স্বীকার করতে হবে এই জন্যে যে কলকাতা অঞ্চলের উচ্চারণে ঐ শব্দ 'মাস্টার' আর নদে-শান্তিপুরে 'মাশ্টার'—'মাষ্টার' নয়—তালব্য শ, মূর্ধণ্য ষ নয়। তবু এখানে standard বা আদর্শ উচ্চারণের প্রশ্ন আছে এবং এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, বানান সব সময় phonetics বা ধ্বনিবিজ্ঞানকে অনুসরণ করে না এবং ধ্বনিরও এত আঞ্চলিক বৈচিত্র্য যে সেই সব বৈচিত্র্যকে বানানে রূপ দিতে গেলে সাধারণ-গ্রাহ্য বানান বলে আর কিছু থাকবে না। বানানে তাই একটা norm বা পরিপাটি মেনে চলতে হয়। এই কারণে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের master সম্পর্কে মতটি শ্রদ্ধার সংগে বিচার্য।

আর একটি উদাহরণ নেওয়া যাক: চৌধুরী মশাই তাঁর প্রতিবাদে চতুর্থ অনুচ্ছেদের শেষে সংগীত শব্দে 'ং' সমর্থন করতে গিয়ে একটা ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়মের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু নিয়মটিকে নিজের মত করে বলতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলেছেন একেবারে। তিনি লিখছেন: "ক খ গ ঘ যদি পরে থাকে, তবে পদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার বিধানে সংগীত" ইঃ। চৌধুরী মশায় এখানে সজ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, আসল সূত্রটির সংকোচ ঘটিয়েছেন। সূত্রটি হল এই: যদি স্পর্শবর্ণ পরে থাকে তাহলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার বা যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে, সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। সিদ্ধান্তকৌমুদীর মূল সূত্র হল 'বা পদান্তস্য'। স্পর্শবর্ণ বলতে শুধু ক খ গ ঘ বোঝায় না, ক বর্গ থেকে প বর্গ পর্যন্ত সমগ্র বর্গীয় বর্ণকে (২৫টি) বোঝায়। এবং সূত্র থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, পঞ্চম বর্ণের প্রাপ্তি ঘটে বিকল্পে। অতএব অনুস্বার প্রয়োগে ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত কোনো বাধা যে ছিল এ কথা লেখক কেন যে কল্পনা করছেন তা তাঁর কপোলই জানে।

ছাপার সৌকর্যই চৌধুরী মশায়ের প্রধান যুক্তি। সেই ছাপার সৌকর্যের খাতিরে আমরা এক বিদ্যাসাগর মশায়ের বর্ণপরিচয় ভিন্ন আর কোথাও তীক্ষ্ম শব্দে ণ পাই না। সব ক্ষেত্রেই তীক্ষ্ম তীক্ষ্মতা হারিয়ে দন্ত আশ্রয় করেছে। লাইনোতে ণ ফিরে এসেছে অবশ্য, কিন্তু পঞ্জাব, নিপীড়িত নাসিকা ধ্বনি (half-articulated nasal) হারিয়ে পুরোপুরি দাঁতে এসে ঠেকে 'পানজাব' হয়ে বসেছে। এই পরিবর্তন যে সংস্কার নয়, অজ্ঞানতা-প্রসূত, এ কথা অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধে সবিস্তারে দেখিয়েছেন।

প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় আনন্দবাজারের এই বানান সংস্কারকে দুর্গেশ-নন্দিনী-প্রকাশের সমপর্যায়ের epochal বা ক্রান্তিকারী ঘটনা কেন বলেছেন সে কথা সেন মহাশয় জানেন, কিন্তু বাংলা

বানানের বিজ্ঞানসম্মত সরলীকরণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তাঁর এবং অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতের ত কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু সে সরলীকরণের প্রধান তাগিদ ছাপার সৌকর্য হতে পারে না, বিনা আয়াসে ভাষা শিক্ষার শিশু-সুলভ আবদারও হতে পারে না, ভাষাতত্ত্ব ত নয়ই। বিজ্ঞান ঐতিহ্য এবং চলমান জীবন—সব কিছুই চিন্তা করে দেখতে। আর শেখার ব্যাপারটা হল মনকে অহেতুক ভারাক্রান্ত না করে ক্রমশ তাকে বিস্তার ও জটিলতায় অভ্যস্ত করা। কিন্তু এই যে process of assimilation (integration through observation of similarities), এটি ঘটে জটিলতার মধ্যে বিধি বা uniformity-র বোধের মাধ্যমে। যদি তৎসম শব্দে রেফ থাকে, কোনো কোনো তদ্‌ভব এবং অর্ধ-তৎসম-তে থাকে আর কিছু বঙ্গীকৃত বিদেশী শব্দে রেফ বর্জন করা হয় তাহলে এই বিধির বোধ ব্যাহত হবে; ফলে শেখা অনায়াস হবে না। দ্বিতীয়ত দ্বিমাত্রিকতার ঝোঁকের সঙ্গে দ্বন্দ্বের ফলে নানা বিকৃতির সৃষ্টি হবে—হবে কেন, এখনই হচ্ছে। কেন না কোথায় 'অ' অনুচ্চারিত আর কোথায় নয় তার যখন বিধি নির্ধারিত হচ্ছে না এবং সে বিধির মূলে যখন রয়েছে বিদেশী ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতি (যা অশিক্ষিতদের কাছে অজ্ঞাত) তখন এই আংশিক এবং উচ্ছৃংখল রেফ-বর্জন একান্তভাবেই বর্জনীয়। তারও পরে কথা হল, ধ্বনি-বিজ্ঞানের। রেফ-যুক্ত বর্ণ আর পূর্ণ 'র'-কার (অ-বর্জিত হিসেবে কল্পিত হলেও) পৃষ্ঠে নিয়ে যে বর্ণ—এদের মধ্যে লিপিঘটিত এই পার্থক্যের ফলে যুক্তবর্ণের উচ্চারণে বিকৃতি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা। বর্ণের আগে 'র্' আর পরে 'র্'—অর্থাৎ রেফ আর র-ফলা—এদের অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এই রকমঃ মারকিন (মার্কিন নয়) এবং আম্‌-র (আম্র নয়)। যুক্তাক্ষর বর্জনের একটি পরিপাটী উদাহরণ মিলল এই সেদিন আনন্দবাজার পত্রিকাতেঃ কনসটেবল। এই ক্ষেত্রে কিন্তু বানানে বিপ্লবকারীরা নিজেদের অজ্ঞাতে সেই দ্বিমাত্রিকতার ওপরেই নির্ভর করছেন, যথা— কন্‌স্‌+টেব্‌ল্‌। তাই যদি করেন, তাহলে 'পার্ক'-এর ক্ষেত্রেই বা 'পারক' লিখছেন কেন? ঐ নিয়ম অনুসারেই, ইংরেজি-অনভিজ্ঞের কাছে 'পারক' হবে 'পা+রক্‌'।

চৌধুরী মশাই কি ক'রে আবিষ্কার করলেন যে, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় তাঁর Roman Script-এর দাবি ছেড়ে দিয়েছেন? এই কিছুদিন আগেও Statesman পত্রিকাতে অধ্যাপক চট্টো-

পাধ্যায় তাঁর আগের মতেরই সমর্থন করেছেন।

শীতাংশু মৈত্র
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

দুই

দেশ পত্রিকার আলোচনা বিভাগে বাংলা বানানের সরলীকরণ সম্বন্ধে এযাবৎ প্রকাশিত সমস্ত আলোচনা আগ্রহ সহকারে পড়ে আসছি। শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী মহাশয়কে আমার জিজ্ঞাস্য যে বানান সরলীকরণ করতে গিয়ে উচ্চারণের ক্ষেত্রে কি জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে না? এতে করে সত্যিই কি বাংলা ভাষা শেখায় আগ্রহী বিদেশীদের বা ছোট শিশুদের বাংলা ভাষা শেখা সহজতর হবে? কি করে তারা পারদ এবং পারক (পার্ক) অথবা আনারস এবং অনারস-এর উচ্চারণের ক্ষেত্রে পার্থক্য উপলব্ধি করবেন? কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও প্রতিটি ভাষারই উচ্চারণের ব্যাকরণ আছে এবং সেই ব্যতিক্রমগুলো আয়ত্ত করাও কঠিন হয় না। কিন্তু আদৌ যদি এ জাতীয় কোন ব্যাকরণ না থাকে (প্রকৃতপক্ষে থাকছেও না বানান সরলীকরণ করতে গিয়ে) তাহলে বানান সরলীকৃত হলেও ভাষা জটিলতর হবে সন্দেহ নেই, কেননা উচ্চারণকে বাদ দিয়ে ভাষা নয়।

অপূর্ব সাহা
চাতরা (নেপাল)।

বাংলায় আর একটি হরফ চাই

অ-তৎসম কিছু বানানের নতুন আনন্দবাজারী রীতি নিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় সম্প্রতি যে সব আলোচনা চলছে, তার পক্ষে বা বিপক্ষে বলবার মত যোগ্যতা আমার নেই। তবে, আমার মত যাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়, তাদের এই ভাষা সহজভাবে শিখতে আনন্দবাজার যথেষ্ট সাহায্য করছে। সেজন্য আমাদের কাছ থেকে আনন্দবাজারের এ চেষ্টা প্রশংসা পাবে।

বাংলা ভাষা শিখবার সময় একটা বর্ণ নিয়ে প্রথম প্রথম আমার ভয়ানক অসুবিধা হত। আমার শাশুড়ী ঠাকুরানীর কাছে প্রথম বাংলায় চিঠি লিখতে ব'সে প্যাডের উপরে গোয়ালপাড়া লিখতে গিয়ে হোঁচট খাই। অনেক চিন্তার পর, উচ্চারণ অনুযায়ী লিখি গোআলপাড়া। শেষের দিকে 'মুড়ির মোয়া বানাইয়াছিলাম' লিখতে গিয়ে মোয়া বানান লিখলাম মোআ। পরে জানতে পারি আমার দুটো বানানই ভুল—একটি হবে গোয়ালপাড়া ও অন্যটি মোয়া। কিন্তু সেদিন আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না, একই 'য়া' দিয়ে গয়া ও গোয়ালপাড়া বা মোয়ার উচ্চারণ কেন আলাদা হয়? Jawaharlal নামও বাংলায় পরিষ্কারভাবে লেখা যায় না। এর পরে অভ্যাসের ফলে মনে হয়েছে, ও-কারের পর 'য়া' থাকলে উচ্চারণ 'wa' হবে। তাই আনন্দবাজারে জোয়ান অব আরক পড়তে গিয়ে যেমন আরককে A-rok পড়িনি, তেমনই 'জোয়ান'কেও আর Joyan পড়িনি, Joanই পড়েছি।

ইদানীং আমার মারাঠী প্রতিবেশিনীকে বাংলা শিখাতে গিয়ে আবার বিপদে পড়েছি। 'সোয়া (সওয়া) সাতটা বেজেছে'র সোয়া বানান তাঁর কিছুতেই মনঃপূত হচ্ছে না। আমার বাংলা ভাষার জ্ঞান যা, তা দিয়ে প্রতিবেশিনীকে বিশেষ কিছু বলতে পারিনি।

বাংলা বর্ণমালায় দুটো 'ব' থাকলেও একটির উপস্থিতি যেন মানবদেহের appendix-এর মত, কোন কাজে লাগে না। হিন্দী, মারাঠী, উড়িয়া বা অসমীয়া ভাষায় একটি 'ব'-এর উচ্চারণ 'wo', তাই এ সব ভাষায় মোয়া, সোয়া, মাড়োয়া, গোয়ালপাড়া, খড়ক্ ওয়াস্‌লা লিখতে বা উচ্চারণ করতে গেলে কোন রকম অসুবিধায় পড়তে হয় না। তেমনই জওয়াহরলালও সহজেই লেখা যায়।

বাংলা ভারতের প্রথম শ্রেণীর ভাষা। তা ছাড়া এ ভাষার লেখকরা—বিশেষ করে আনন্দবাজার পত্রিকা—বাংলা ভাষাকে 'গতিশীল এবং প্রাণবান' করে রেখেছেন। ২৮ মাঘ সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন—'ভাষাকে যদি সচল করতে হয়, যদি আধুনিক প্রয়োজনের উপযোগী করতে হয়, তাহলে যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে'—অর্থাৎ শব্দের বানানকে সরলতর করতে হবে। বাংলা ভাষাকে সচল ও সহজপাঠ্য করতে যাঁরা অগ্রণী তাঁদের কাছে আমার মত অখ্যাত, অবাঙালী, কিন্তু বাংলা ভাষার অনুরাগী একজন পাঠিকার বিনীত প্রস্তাব জানাচ্ছি—বাংলার একটি ব-এর উচ্চারণ হিন্দী বা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার মত 'wo' করা যায় কিনা ভেবে দেখবেন। বাংলা একটি ব-এর উচ্চারণ 'wo' করলে সেই যায়গায় অসমীয়া হরফের 'ব' বর্ণটি নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে একটি বিরাট অঞ্চলে—বাংলা, আসাম ও মণিপুরে—একই টাইপ-রাইটারও ব্যবহার করা সম্ভবপর হবে। তাছাড়া, এক অঞ্চলের বর্ণ অন্য অঞ্চলে ব্যবহৃত হলে জাতীয় সংহতিও বৃদ্ধি হবে বলে আমার ধারণা।

অণিমা গুহ।
পুনা

বানান-রাজ

আমার মোনে হয় যার যেমোন সুবিধা বানানের শ্বাধিনতা থাকা উচিৎ। এতে ঝামেলা নেই। ছাপাখানার কাজ তাড়াতাড়ী হবে; প্রুফরীডার কম লাগবে; পোরিক্ষায় পাস বেষি হবে। বাংলা, ইংরেযী, শংষ্কৃতো সব বানানে এই শ্বাধিনতা চাই।

আমাদের দুরভাগ্গে এ শ্বাধিনতা ছেলেবেলাএ পাইনী। এখন জুগের ন্যাজ্জ দাবি শেক্‌স্‌ থেকে সেক্‌পীর সরবত্রো বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও।

রামগোরুড় ষরমা

পূর্বগামীদের কাজের তুলনায় দেখা যাবে যে, সাদৃশ্যের মোহ থেকে এরাই সদ্য মুক্ত—সবে ছাড়া পাওয়া শিল্পী। এরাই অনেকটা সাক্ষাৎ ভগবানের মত, এরা তাদের প্রেরণাবশে, আপনার খুশি অনুযায়ী পৃথিবীকে ঢেলে সাজাতে—সৃষ্টি করতে পারে।

এখন, এক কথায় প্রশ্ন উঠবে, প্রেরণা কিরকম? কথাটা কি শুধু আপনাদের জন্যই, তার অস্তিত্ব কি আপনাদের জন্যই আছে? যথাযথভাবেই, এবং সেইটা আজকের শিল্পীদের চোখের সামনেও খুব শুদ্ধ একটি রূপ নিয়ে আছে যা চিরকালই থাকবে, থেমে যাবে না।

অবশ্য সাধারণত বেশির ভাগ লোকদের কাছেই, একজন অনুপ্রাণিত শিল্পী বলতেই, একটি ঝাকড়া বার্কার চুলওয়ালা, চোখে যার উদাস ভাব, সূর্যাস্ত দর্শনে যে মন কেঁদে কঁকিয়ে উঠে, এমন এক লোক—যদি সে কবি, তা হলে সে জাতীয়-সংগীত রচয়িতা; যদি সে সংগীতকার, তবে সে নির্ঘাত লোক-গাথার সুরকার; আর যদি সে চিত্রকর, তা হলে সে সূর্যাস্তকে চাঁদের আলোর মত করে আঁকবেই; যদি তার প্রেরণা এবং সঠিক রঙের জ্ঞান কিছু কমতি থাকে।

কিন্তু অন্য পক্ষে, যদি সে তুলি-চালনায় সত্যই পাকা হয়, তবে খুবই অনায়াসেই সে জানে, ঐ চিত্রকর তার ক্যানভাসে তার নিজস্ব তাৎক্ষণিক মেজাজ অর্থাৎ বিশেষ কোন মুহূর্তের মেজাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই নিছক একটা আত্মবাদী, সাবজেকটিভ সংস্থান গঠন করে তুলতে সক্ষম হবে।

পিকাসোর মত একজন শিল্পী (আমি পিকাসোর কথা প্রথমেই তুললাম, কারণ, তিনিই হচ্ছেন চিত্রভাবের বিস্ময়কর অজস্র জটিলতার সূক্ষ্মতার আবিষ্কারক) নিজের স্মৃতির গভীরতাকে দেখা যাবে, তোলপাড় করছেন। সে স্মৃতি বিশাল, যা তাঁর কাছে অসংখ্য রকমারি একীভূত অবয়ব-আঙ্গিকের (ফোরম ক্রিসতালিজে) ভাঁড়ার খুলে দিয়েছে।

এবং পিকাসো তাঁর নিজের অনুপ্রাণিত খেয়ালের নির্দেশ অনুযায়ী তার মধ্যে থেকে, সেই ভাঁড়ার থেকে পছন্দমত বাছাই করে নেন। এবং সেইগুলিকে তিনি নিখুঁত বুদ্ধিমত্তা আর স্বাধীন চেতনায়, নিকোলাস পুঁসা যেমন বলেছিলেন, তেমনিভাবেই সংগঠন করেন। এই সূত্রে বলা যায়, জর্জ ব্রাক যে অন্যভাবে এগিয়েছেন এমন নয়—তাঁর সুচতুর ও স্ফটিক-উজ্জ্বল নাতিবৃহৎ অর্থাৎ স্টিল লাইফগুলি আপনারা জানেন। এঁরা দুজনেই কিউবিজমের প্রবর্তক এবং এঁরাই চিত্রভাব বিমূর্তিকে অনেক দূর পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে গেছেন। যদি তাঁরা সাধারণত যেমন ধারণা করা হয় যে, আপন খুশিতেই তা করে থাকেন, তা হলে মানতেই হয় যে, সে কাজ তাঁরা বিশেষ দক্ষতার সঙ্গেই করতে পেরেছেন। এই ভগবানদত্ত ক্ষমতা, জন্মগত দক্ষতা বাস্তবতার দান।

মঞ্জরী বোস-এর চিত্রপ্রদর্শনী ঃ ফাইন আর্ট ভবন

এই প্রদর্শনীই শ্রীমতী বোসের প্রথম। এখানে তাঁর নানান ছবি থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, তাঁর উৎসাহ যথেষ্ট আছে, এবং তিনি রঙের উজ্জ্বলতা পছন্দ করেন। কিন্তু প্রায় ছবিতেই যদি আমরা তার নিয়ত-অভ্যাসের কিছু পরিচয় পেতাম তা হলে নিশ্চয়ই খুশি হতাম। মনে হয় মাত্র দুটি ছবি তিনি মন দিয়ে করেছেন, যথা নং ৩—এখানে লেমন ইয়ালোর ছোঁয়া বেশ মনোজ্ঞ এবং নং ১৩—এটি একটি আলেখ্য, এখানে

বাজারের পথে শিল্পী ঃ বিবেক সাহা

হাইলাইট এবং সবচেয়ে সমতল সকলের ভাল লাগবে।

কুমকুম মুন্সীর চিত্রপ্রদর্শনী ঃ বাঙ্গুর কলোনি

কুমকুম মুন্সী একজন তরুণ শিল্পী এবং সকলেই ওঁকে চেনেন। এতাবৎ তাঁর যে কাজের সাথে আমরা পরিচিত, তার সঙ্গে এখানকার ২৩টি ছবিতে সমস্ত দিক নিয়েই অনেক পার্থক্য আছে। ছবিগুলি ফুলের। ফুলের চেহারার সোজা-সুজি অর্থাৎ কোন ফুলকে কেমন দেখাতে তারই। এখানে প্রত্যেক ছবিতে যেটা চোখে পড়ে, তা হল, তিনি নিশ্চিন্ত মনে দারুণ রেখার খেলা দেখাতে পারেন, রঙকে তিনি সব সময়েই একটু আবছা রেখেছেন। অর্থাৎ আলোর সঙ্গে কোন আধুনিক সম্পর্ক আঁকতে বা দেখাতে চাননি। তা হলেও প্রত্যেকটি ছবিই কি ছোট, কি বড়, বেশ নয়নসুখকর। তাঁর ১৪নং-এর ছায়া-বেগুনীর ব্যবহার এবং ১৩নং-এর নীল ও গোলাপীর ঘটনা দর্শকের ভাল লাগে।

অ্যাটকিনস আর্ট ক্লাব ঃ ফাইন আর্টস ভবন

অ্যাটকিনস আর্ট ক্লাবকে তাদের প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা না করে পারা যায় না। এই আর্ট ক্লাব ডবলিউ এস অ্যাটকিনস (পার্টনারস) লিঃ কর্মী-বৃন্দের দ্বারা পরিচালিত। আর পাঁচটা অফিসে যেমন তাস-পাশার বৈঠক আছে, তেমনি এখানে একটি আর্ট ক্লাব গড়ে উঠেছে। নিত্য ছুটির পর এঁরা ছবি আঁকার চর্চা করেন।

এঁদের এই প্রথম প্রদর্শনী। এখানে সর্বসমেত ৪১টি ছবি ছিল। শিল্পীরা সংখ্যায় সাতজন। গৌতম সরকার ও বিবেক সাহা ছাড়া আর সকলের হাত এখনও তেমন পাকা নয়, তবে সকলেরই অনুপাতবোধ, সামঞ্জস্যের ধারণা বর্তমান। বসন্ত সেনগুপ্তের ২ ও ৩ নং স্কেচে জোরাল রেখায় চমৎকার সংস্থান তৈরী হয়েছে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নং ৫ একটি শান্ত ছবি। গৌতম সরকারের নং ১১ ও ১৪-র মধ্যে ক্র্যাফটম্যানশিপ অর্থাৎ মুন্সীয়ানার চিহ্ন ও রঙবিচার আছে। রবি দাসের ১৬নং একটি সুষ্ঠু ঘটনা। তড়িৎ সরকারের নং ২১ ও নং ১৬তে আলোর বিন্যাস মনোজ্ঞ। বিবেক সাহা একজন রঙ-বিশ্বাসী, তাঁর ৩৫ ও ৩৩ নং-এ সে পরিচয় পাওয়া যায়। লছমী দাস, বয়স ৭, এর প্রত্যেকটি ছবিই বেশ দেখবার মত হয়েছে।
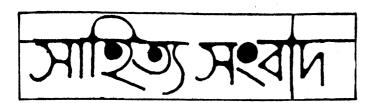
প্রতিভাবানদের শৈশব

শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে কি অসীম নিষ্ঠা ও খুঁতখুঁতুনি ছিল গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের, তাতো সবারই জানা। শব্দের প্রতি এই মোহ ও সন্দেহ ছিল তার অতি কৈশোর বয়েস থেকেই। সম্প্রতি ফ্লবেয়ারের কৈশোর বয়েসের ডায়েরির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন ফ্রান্সিস স্টিগম্যুলের, সেই ডায়েরিতে ফ্লবেয়ার লিখছেন, ভাষা বড় দরিদ্র, একশো রকমের চিন্তার জন্য ঠিক মতো একটা শব্দও খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কিশোর লেখক নিজের কাছে প্রশ্ন করছেন, একটা সম্পূর্ণ বাক্য আমরা যে-রকম ভাবি, বলার সময় কি ঠিক সেই রকম বলি? একটা উপন্যাস যে-রকম লেখার কথা ভাবা হয়, ঠিক সেই রকম কি লেখা হয়?

এই বইটির সঙ্গে সঙ্গে, আর একটি সমধর্মী বই-ও বেরিয়েছে। জোসেফ এবং ডরোথি বার্জারের সম্পাদনায়, 'স্মল ভয়েসেস'— পরবর্তীকালে যাঁরা কোনো না কোনোভাবে বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের শৈশবের দিনলিপি, চিঠিপত্র ইত্যাদির সংকলন। এই সব লেখার মধ্যে—সব শিশুর মধ্যেই শিশুর ঘুমন্ত পিতাকে নির্ভুলভাবে খুঁজে পাওয়া যায়। বই দুটি দেখে মনে হয়, সব পিতামাতা অভিভাবকেরই উচিত, ছেলেমেয়েদের ডায়েরি লিখতে উৎসাহিত করা এবং লুকিয়ে সেগুলো পড়া (দু' চারটে ছোটখাটো প্রেমের ঘটনা দেখলে রাগ করা চলবে না কিন্তু)—তাহলে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ শিক্ষা কী ধরনের হওয়া উচিত, তা বুঝতে খুব সুবিধে হয়।

ফ্লবেয়ারকে তাঁর বাপ-মা চেয়েছিলেন উকিল তৈরি করতে, কিন্তু ফ্লবেয়ার লিখছেন, দশ বছর বয়েসের আগে থেকেই আমি লিখতে শুরু করি। আমি তখন থেকেই আমার প্রতিভার বিচ্ছুরণের স্বপ্ন দেখতাম, আলোয় সাজানো হল ঘর, আমাকে দেখে সবাই করতালি দিচ্ছে, আমার গলায় এসে মালা পরিয়ে দিচ্ছে...জানেন তো আমার অহংকার কী-রকম, একটা হিংস্র শকুনের মতো অহংকার আমার হৃদয় কুরে কুরে খেতো।

হ্যাঁ, অহংকারী ছিলেন বটে ফ্লবেয়ার, সেই কৈশোর থেকেই, তিনি লিখছেন, আমি যা কিছু করি সবই নিজেকে খুশী করার জন্য, যদি আমি কিছু লিখি—তা শুধু আমারই পড়ার জন্য, যদি কখনো ভালো সাজ-পোশাক করি তবে তা শুধু আমার নিজের চোখেই নিজেকে সুন্দর দেখাবার জন্য। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি হাসি—আমারই প্রফুল্ল মুখ দেখার লোভে—আর আমার অহংকার, আমার অহংকার! সেই অহংকারেই তিনি বলছেন, পৃথিবীর ইতিহাস, সে তো শুধুই ভাঁড়ামো!

সবাই শৈশবে অহংকারী থাকে না। 'স্মল ভয়েসেস'এ আমেরিকান লেখিকা আনেনিন তাঁর কিশোরী বয়েসে লিখেছেন আমি একা, আমি নিঃসঙ্গ, আমায় কেউ ভালোবাসে না।......আমার ডায়েরি, তুমি আমায় দয়া করো, তুমি আমার কথা শোনো! আমার ডায়েরি, তুমিই আমার নেশা!—যদিও সুপ্ত অহংকার তাঁর মধ্যেও রয়েছে, তিনি লিখছেন, সবার থেকে নিজেকে আমার আলাদা মনে হয়। আমি লক্ষ করেছি আমার ক্লাসের অন্য ছাত্রছাত্রীরা কেউ-ই আমার মতন ভাবে না।

বিখ্যাত লোকেদের ছেলেমেয়েদের ডায়েরিতেও অনেক মজার তথ্য পাওয়া যায়। মার্ক টোয়েনের মেয়ে সুজি ক্লিমেনস ১৩ বছর বয়েসে লিখছে, বাবা গির্জাতে যাওয়া একদম পছন্দ করেন না।..... বাবা একদিন বললেন, তিনি নিজের ছাড়া অন্য কারুর বক্তৃতা শুনতে একটুও ভালোবাসেন না।—থিয়োডোর রুজভেল্টের কৈশোর-ডায়েরিতে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। ন্যাথানিয়েল হথর্নের লেখায় তাঁর পরবর্তী জীবনের গল্প-উপন্যাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন, ফ্লবেয়ারের ডায়েরিতেও মার্কুইস দ্য পোমেরো'র প্রাসাদে একটি উৎসবের বর্ণনা আছে, সেটা ম্যাদাম বোভারি উপন্যাসের এমা বোভারির সেই বিখ্যাত নাচের সঙ্গে অনেকখানি মেলে।

স্মল ভয়েসেস-এ কিছু কিছু ছোট ছোট প্রেমের কাহিনীও আছে। একটি বারো বছরের মেয়ে লিখছে, কাল একটি মিষ্টি চেহারার যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হলো। সে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছে। আমি রাজী হইনি।

আর, প্রায় সবার লেখাতেই আছে, ইস্কুল জীবনের বিরক্তির বর্ণনা।
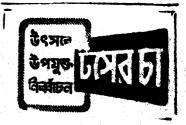
কলকাতায় আমেরিকান লেখিকা

শ্রীমতী ক্যারোলিন গ্রেহাম একইসংগে শিল্পী ও লেখিকা। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো ও ফ্রান্সে শিল্প শিক্ষা সেরে তুরস্কে চাকরিসূত্রে কিছুকাল কাটিয়েছেন এবং তুরকী সাহিত্য থেকে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য রচনা অনুবাদ করেছেন। তাঁর নিজস্ব রচনাও প্রকাশিত হয়েছে নানা বিখ্যাত পত্রিকায়। সেই সংগে তাঁর ছবি আঁকাও চলেছে।

তাঁর আঁকা ছবির একটা প্রদর্শনী এখন চলছে, কলকাতার আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সেণ্টারে। ঐখানেই গত বুধবার তিনি আবৃত্তি করে শোনালেন, টি এস এলিয়ট ও রবর্ট ফ্রস্টের অনেকগুলি কবিতা। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, নরেশ গুহ ও আরও কয়েকজন বাঙালী কবি ও বুদ্ধিজীবী।

শ্রীমতী গ্রেহাম বয়েসে তরুণী, বেশ রূপসী, গাত্রবর্ণ নরম সাদা, চক্ষুদ্বয় ঘোর কালো, চুলের গুচ্ছ খাঁটি সোনালী। এবম্প্রকার যুবতী যখন আবেগময়, মৃদুকণ্ঠে ফ্রস্ট ও এলিয়টের কবিতা পড়ে শোনাচ্ছিলেন, তখন ফ্রস্ট ও এলিয়টকে নিশ্চিত যথেষ্ট সৌভাগ্যবান মনে হয়।

আবার কবিতা দৈনিক?

২৫শে বৈশাখ ঐ অদূরে। ঐ সময়ে এ বছরেও আবার কবিতা দৈনিকের হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে কিনা—এই ভেবে কেউ এখনই উৎফুল্ল, কেউ কেউ শংকিত। শোনা যাচ্ছে, গতবারের উদ্যোক্তাদের উৎসাহের সম্পূর্ণ ভাটা পড়েনি, আড়ালে প্রস্তুতিপর্ব চলছে।

গতবারে অনেকগুলি দৈনিকের মধ্যে বেশী সাড়া তুলেছিল 'দৈনিক কবিতা'। সেই দৈনিক কবিতার একটি বিশেষ সংকলন বেরিয়েছে সম্প্রতি, 'দৈনিক কবিতা সংকলন'। গতবারের দৈনিক কবিতা সম্পর্কে অনেকের অভিযোগ ছিল যে, তাতে হই হই যেমন ছিল, আসল কবিতা তেমন ছিল না। কিন্তু এই সংকলনে অনেকগুলি নতুন কবিতা ও কবিতা বিষয়ক নিষ্ঠাপূর্ণ আলোচনা স্থান পেয়েছে। সংকলনটি সুমুদ্রিত, সংগ্রহযোগ্য, সম্পাদনা করেছেন বিমল রায়চৌধুরী ও প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।

শান্তি লাহিড়ীর সম্পাদনায় 'বাংলা কবিতা'র একটি বিশেষ সংকলনও সম্প্রতি বেরিয়েছে। এই সৌষ্ঠবময় সংকলনটির বৈশিষ্ট্য এতে স্থান পেয়েছে শুধু তরুণ লেখকদের দীর্ঘ কবিতা।

এই দুটি সংকলকদের পক্ষ থেকেই রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পক্ষে আবার কবিতা দৈনিক বেরুবে বলে শোনা যাচ্ছে।

হাংরি জেনারেশনের কিছু কিছু নতুন কাগজপত্রও সম্প্রতি আবার বেরুচ্ছে। সম্প্রতি আমাদের হাতে এসেছে, ক্ষুধার্ত প্রতিরোধ, জঠর এবং ফুঃ নামের তিনটি সংকলন। সবকটির রচনাই বেশ উপভোগ্য, পড়ে মনে হয়, এঁদের মধ্যে যদি কেউ ভবিষ্যতে সার্থক লেখক হতে পারেন, তবে এসব রচনা তখন নিশ্চিত তাঁর কিশোর বয়েসের ডায়েরি হিসেবে আদৃত হবে।

সনাতন পাঠক
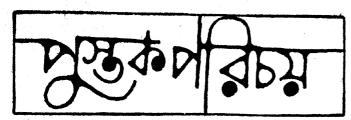
ধর্ম

Divine Light: Srimat Swami Yatiswarananda study circle, 11 D. S. Road (Charu Market), Calcutta-33. Price Rs. 5/- only.

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের অন্যতম প্রধান শিষ্য স্বামী যতীশ্বরানন্দের বাণী ও পত্রাবলী এই গ্রন্থে সংকলিত। যতীশ্বরানন্দজীর ত্যাগপূত জীবনকাহিনী বইটিতে রয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা রূপে তিনি সর্বজন-পরিচিত ও পূজিত ছিলেন। আধ্যাত্মিক জীবনের কিছু নিগূঢ় তথ্য তাঁর পত্রাবলী, বক্তৃতা ও বাণীতে পাওয়া যায়। গুরুবাদ সম্পর্কে যতীশ্বরানন্দজীর মতামত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। গুরুবাদের সার্থকতা ও বিপদ কোথায় তা তিনি প্রাঞ্জলভাবে বলে গিয়েছেন। ভক্তদের কাছে লেখা তাঁর চিঠিগুলি পড়বার সময় পাঠকের মন-প্রাণ আধ্যাত্মিক ভাবনা ও জীবপ্রেমের আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। যতীশ্বরানন্দজী সম্পর্কে কয়েকজন ভক্তের স্মৃতিকথা ও রচনা এই গ্রন্থে যোগ করে দেওয়া হয়েছে। রামকৃষ্ণ-ভক্তদের কাছে পুস্তকটি অপরিহার্য। শুধু ভক্তি ও প্রেরণালাভের জন্যই নয়, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের সঙ্গে অতরঙ্গ পরিচয়লাভের জন্যও বটে।

(৪০।৬৭)

শিশুসাহিত্য

নীল ঝিল। অজয় চক্রবর্তী। অ্যালফা বিটা পাবলিকেশন. পোস্ট বক্স ২৫৩৯. কলকাতা-১। আড়াই টাকা।

নীল ঝিল ছোটদের জন্য লেখা ছড়ার সংকলন। ছড়া লেখা সহজ নয়. বিশেষ করে ছোটদের ছড়া। পূর্বসূরীরা এই কাজটাকে বড়ই শক্ত করে রেখে গেছেন। অজয় চক্রবর্তী কিন্তু পেরেছেন। তাঁর মেজাজটাই ছড়ার, ফলে যেগুলো পুরোপুরি উতরায় নি, সেগুলিও অনেকাংশে ভাল লাগে। বইটি ছোটদের ভাল লাগবে। বড়দেরও খারাপ লাগবে না। ৪৪১।৬৬

পত্রিকা

বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ পত্রিকা। সম্পাদক: শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দেব।

ছাত্রদের চিন্তাধারাকে সুসংবদ্ধ করার একটি উপায় হচ্ছে, তাদের মনের ভাবকে প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া। এ বিষয়ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত পত্রিকা একটি প্রশস্ত মাধ্যম। আলোচ্য পত্রিকার লেখকদের অধিকাংশই ছাত্র। তাঁরা প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প লিখেছেন। সাহিত্যের মূল্যায়নে সেগুলি খুব উচ্চ পর্যায়ের না হলেও প্রতিভার সামান্য যেটুকু নিদর্শন পাওয়া যায়, তারও একটা দাম আছে। ভবিষ্যতে কবি ও লেখক হিসেবে এ'দের মধ্যে কতকজন যে নাম করতে পারবেন, সে প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনুষ্টুপ। সম্পাদক: অনিল আচার্য। ১৬৭, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭। মূল্য ৬০ পয়সা।

"অনুষ্টুপ" একটি নতুন ত্রৈমাসিক পত্রিকা, যার লেখকদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া কাউকে সুপরিচিত বলা যায় না। কিন্তু প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প প্রভৃতি প্রতিটি রচনাতেই সম্ভাবনাময় প্রতিভার স্বাক্ষর পরিস্ফুট। সে হিসেবে পত্রিকাখানির প্রকাশ সার্থক বলা যায়।

প্রাপ্তি স্বীকার

অন্য এক নাম। প্রেমেন্দ্র মিত্র। রূপা: ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৪.০০।

অনভিজাত। সুদর্শন সাহা। পাক্ষিক কবিতা প্রকাশনী: ১৪/৫ পঞ্চাননতলা রোড, কলিকাতা-১৯। মূল্য ৩.০০।

লিপিচিত্রে সংগীত সাধক। অমরেন্দ্রকুমার দত্ত। হসন্তিকা প্রকাশিকা: ৩৯-বি মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। মূল্য ৩.০০।

নিজের সঙ্গে সংলাপ। সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। নান্দীমুখ সংসদ: ৩৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯। মূল্য ২.০০

হীরের পাহাড় ক্ষীরের নদী। শ্রীঅরুণাংশুবিকাশ সেনগুপ্ত। প্রগতি প্রকাশনী: ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ১.৫০।

মহম্মদ ইলিয়াস বলেন। পরিতোষ সান্যাল। ব্রজশ্যাম সাহা: ৫৯, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ২.৫০।

হট্টগোলের দেশ। শক্তি ঘোষ। বৈকুণ্ঠ বুক হাউস: ১৮৩, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মূল্য ২.০০।

মুর্শিদাবাদ কাহিনী। কমল বন্দ্যোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদ জেলা সংস্কৃতি পরিষদ : ৭, টেমার লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪·০০।

পিতার প্রীতিমাপন্নে। পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। নবান্ন প্রকাশনী: ১০/১, ঘোষপাড়া লেন, কলিকাতা-৩৬। মূল্য ০·৫০।

অমরতার সন্ধানে আমি ও অন্যান্যরা। নিমাই মান্না। সংস্কৃতি: চাকপোতা, আমতা, হাওড়া। মূল্য ২·০০।

পলাতকা ছায়া। সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ : ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ৩·০০।

বাউরি বাতাস। প্রশান্ত চৌধুরী। শ্রীমতী উমা চৌধুরী : ১৩৯, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য ৩·০০।

শিখাময়ী। রাখাল নাহা। আর কে প্রকাশন : ২, শ্রীকিষণ ভকত লেন, হাওড়া-১। মূল্য ২·৫০।

সাংখ্যদর্শন। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। সংস্কৃত কলেজ: ১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ১৫·০০।

"তীরভূমি" (পরিচালনা : গুরু বাগচী) ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও বিকাশ রায়
ফটো—দেশ

চিত্র-সমালোচনা

অভিশপ্ত চম্বল

মঞ্জু দে অসাধ্য সাধন করেছেন। তরুণ ভাদুড়ীর "অভিশপ্ত চম্বল" নিয়ে বাংলা ছবি হতে পারে সেটা কখনো ভাবিনি। ছবি হয়ত হতে পারত। কিন্তু "অভিশপ্ত চম্বল"-এর সেই রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চ, প্রচণ্ড "অ্যাকশন", সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে ডাকাত-দলের অবিচ্ছিন্ন রক্তক্ষয়ী "এনকাউন্টার" বা সংঘর্ষ এবং যমপুরী বেহড়ের বিভীষিকা বাংলা ছবিতে দেখানো বুঝি অসম্ভব ছিল। মঞ্জু দে'র প্রযোজনা-পরিচালনায় তা সম্ভব হয়েছে।

শ্রীমতী দে "অভিশপ্ত চম্বল" ছবি তৈরির কাজ সম্ভবত একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছিলেন। তাঁর অপরিসীম নিষ্ঠা ও দুর্ধর্ষ প্রতিজ্ঞার পরিচয় ছবির প্রতি দৃশ্যে প্রতিফলিত। পরিচালিকা তাঁর ইউনিট নিয়ে বিপদসঙ্কুল চম্বল উপত্যকায় এবং বেহড়ের রহস্যময় অভ্যন্তরে গিয়েছিলেন। কাহিনীর বাস্তব ও পরিপূর্ণ পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার কাজে তিনি কোন কৃত্রিম উপায়ের সঙ্গে আপস করেননি। ফলে বাংলা ছায়াচিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে কষ্টসহিষ্ণুতা, পরিশ্রম ও

ভারতের ফিল্ম সেন্সর সম্পর্কে ডেভিড লীন

ডেভিড লীন ভারতের ফিল্ম সেন্সর নীতির সমালোচনা করেছেন। যৌন-উপকরণ বিশিষ্ট দৃশ্যের বিরুদ্ধে এদেশে জেহাদ চলছে। লীন রসিকতার সঙ্গে মন্তব্য করেন, এ সব কিছু ঘটছে এমন একটি দেশে যেখানে জন্মের হার খুব বেশী—তাঁর ভাষায়, population explosion। তিনি আরও বলেন, বিদেশী ছবি থেকে এই অজুহাতে অনেক দৃশ্য বাদ দেওয়া হয় যে, ভারতের চিত্রনির্মাতারা তাঁদের ছবিতে সেই সব দৃশ্যের অনুকরণ করতে পারেন। লীন মনে করেন, এই দৃষ্টিভঙ্গি ভাল নয়। অবশ্য যদি শুধু উত্তেজনা সৃষ্টির জন্যই কোন দৃশ্য তৈরি হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে সেন্সর বোর্ড নিশ্চয়ই দাঁড়াতে পারেন।

"ডাঃ ঝিভাগো"-র মুক্তি উপলক্ষে ডেভিড লীন সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এসেছিলেন। সেই সময়েই তিনি এই সব উক্তি করেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক কারণেই "ডাঃ ঝিভাগো"-র উপর সেন্সরের অস্ত্রোপচার হয়েছে। নৈতিক কারণে ততটা নয়। তিনি আরও জানান, অন্যান্য কয়েকটি দেশেও "ডাঃ ঝিভাগো"-কে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে। তাইওয়ানে ছবিটি প্রথমে নিষিদ্ধ হয়েছিল। কারণ, ছবিটি নাকি "প্রো-কম্যুনিস্ট"। পরে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে।

ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্র দফতর প্রথমে ছবির ৩৬টি জায়গায় সেন্সরের কাঁচি চালাতে চেয়েছিলেন। ডেভিড লীন তাই ভারতে ছবিটির মুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন না। পরে ৩৬টি স্থানের বদলে ৫টি স্থানে কাঁচি চালানো হয়েছে। এর সব কয়টাই সংলাপের ক্ষেত্র।

ভারতের ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের হাতে ডেভিড লীনের "সামার টাইম" ছবির যে হাল হয়েছিল তা তিনি এখনো ভুলতে পারছেন না। প্রথমে ছবিটি সেন্সরের ছাড়-পত্র পায় নি। কয়েক বছর পর অবশ্য সংশোধিত "সামার টাইম" মুক্তি পেয়েছিল।

দেবেন্দ্র গোয়েলের "দশ লাখ" ছবিতে ববিতা—এ সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাবে

আন্তরিকতা এবং এক কথায়, দুঃসাহসিকতার একটা অতুলনীয় নজির তৈরি হল। এবং ভাবতে অবাক লাগে, এই দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করেছেন একজন মহিলা।

"প্রোডাকশান ভ্যালু" বা আঙ্গিক মূল্য এবং টেকনিক্যাল কাজের দিক থেকে "অভিশপ্ত চম্বল" স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পুলিশ ও ডাকাতের গুলি বিনিময়, সংগ্রামের রীতি, কখনও পাহাড়ের গায়ে আত্মগোপন কখনও বা মুখোমুখি সংঘাত, হত্যাকাণ্ড, ঘোড়ায় চড়ে ডাকাতদলের অভিযান ও পশ্চাদপসরণ প্রভৃতি সব কিছুই নিখুঁত ভাবে দেখানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে চিত্র-সম্পাদক অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের অদ্ভুত বাহাদুরিরও প্রমাণ রয়েছে। এমন উঁচুদরের সম্পাদনা খুব অল্পই দেখা যায়। অতি তুচ্ছ বস্তুও ছবি থেকে বাদ যায় নি। এবং স্বাভাবিকতার জন্য শিল্পীদের প্রচুর কষ্টবরণ করতে হয়েছে। সুলতান সিংকে হত্যা করে 'বেইমান ডাকু' যেখানে পুতলীকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই দৃশ্যটি লক্ষণীয়। ডাকাতদের নৃশংসতা ও মারণ-যজ্ঞ দেখাবার কাজে কোথাও পরিচালিকা বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখেন নি। বরঞ্চ এর পরিমাণ একটু বেশীই। অনেক ক্ষেত্রে তা কাহিনীর লজিক বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এই আতিশয্য দর্শকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। শ্রীমতী দে এ-ক্ষেত্রে গল্পের পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের প্রতি যত্নবান হতে পারতেন। হয়ত তরুণ ভাদুড়ির রিপোর্টাজ-এর

"অভিশপ্ত চম্বল"-এ মঞ্জু দে (পুতলী) ও পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায় (রূপা)

অবিকল চিত্ররূপ তৈরি করতে গিয়ে তাঁকে পুলিশ-ডাকাতের সংঘর্ষের প্রাধান্য দিতে হয়েছে। তবে সুখের কথা এই, এই সংগে ডাকাতদের অবসরবিনোদন এবং ভ্রান্ত মূল্যবোধ, প্রেম, অন্তরের জ্বালাও দর্শকদের কাছে তিনি পেশ করেছেন। অর্থাৎ, চম্বলের তাণ্ডবের সংগে পুতলী ও ডাকু সুলতানের প্রণয়োপাখ্যানের নাটকীয় রস সমান্তরালভাবে চলেছে। সুলতান ও পুতলীর প্রণয়, পরিণয়, বাৎসল্য এবং সুলতানের মৃত্যুর পর পুতলীর জিঘাংসার নাট্যকাহিনী ছবির রক্তক্ষরা ঘটনা-ঘূর্ণির সংগে সুগ্রথিত। মানসিংয়ের কাহিনীও যথাসম্ভব ছবিতে সংযোজিত। পুতলীর নিজের পরিবারের ঘটনাও বাদ যায়নি। তার মা ও বোনের করুণ উপাখ্যানও ছবিতে বিন্যস্ত। এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে মঞ্জু দে'র চিত্রনাট্যরচনার কৃতিত্বই প্রকাশ পায়। যদিও এই চিত্রনাট্য নাট্যসংবেদনের দিক থেকে আরও মর্মস্পর্শী ও উপভোগ্য হতে পারত।

পুলিশ-ডাকাতের "এনকাউণ্টা"রের পৌনঃপুনিকতা কিছুটা ক্লান্তিকর লাগলেও সেই ক্লান্তি বা বিরক্তি চিত্তবিনোদনের অন্যান্য উপকরণে চাপা পড়ে। নাচ-গানই এর মধ্যে প্রধান। সেগুলি ডাকাতদের পরিবেশের সংগে অদ্ভুত খাপ খেয়ে গেছে। কোমল ও কঠোরের সমন্বয় আরও সুষ্ঠু হলে দর্শকের প্রাপ্তিযোগ ষোল কলায় পূর্ণ হত। তবু বলি, বিষয়বস্তু, সুপ্রযোজনা, উন্নত চিত্রপরিচালনা ও বলিষ্ঠতার বিচারে "অভিশপ্ত চম্বল" বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে।

ছবিতে মঞ্জু দে'র অভিনয় যেন আরও বিস্ময়কর। পুতলীর বেশে ডাকাতদলের নেতৃত্ব তিনি যেভাবে করলেন তা তো দর্শককে মুগ্ধ করবেই। একজন অভিনেত্রীর পক্ষে এমন "অ্যাডভেঞ্চার" কী করে সম্ভব তা ভাবাই যায় না। তার চেয়েও উল্লেখ্য, প্রণয় ও বিরহে, অন্তর্জ্বালার ক্ষণে শ্রীমতী দে'র অসাধারণ অভিনয়। চরিত্রসৃষ্টির এই ক্ষমতা বাংলা ছবিতে এর আগে দেখেছি বলে মনে হয় না।

প্রদীপকুমারের সুলতানও বিশ্বাসযোগ্য। প্রণয়ী হিসাবে তাঁকে ভাল লাগবে। মান সিংয়ের চরিত্রের প্রতি সুবিচার করেছেন সুনীলেশ ভট্টাচার্য। রূপা সেজেছেন পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয়ও প্রশংসনীয়। এক কথায়, শিল্পীরা সকলেই তাঁদের অভিনীত চরিত্রের সংগে মিশে গিয়েছেন। এঁদের মধ্যে রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সরযূ দেবী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, শেখর চট্টোপাধ্যায়, জহর রায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ছবির অন্যতম আকর্ষণ সংগীত। লঘু ও লোকসংগীতের সুর কাহিনীর পটভূমির সংগে বিরোধিতা করেনি। গানগুলির সুররচনায় সুধীন দাশগুপ্ত তো প্রশংসা পাবেনই। মান্না দে ও আশা ভোঁসলে চমৎকার গেয়েছেন। সুরকার সাধুবাদার্হ আরও একটি কারণে। আবহসংগীত রচনায়। ডাকাতদলের অ্যাকশন শুরু হবার আগের এফেক্ট মিউজিক সুকল্পিত। ছবির প্রারম্ভিক সংগীত কাহিনীর ভাব পরিমণ্ডল রচনায় অদ্ভুত সাহায্য করেছে।

ক্যামেরার কাজে রামানন্দ সেনগুপ্ত অভাবনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর ক্যামেরা দ্রুতগতি অ্যাডভেঞ্চারের সংগে সমান তালে পা ফেলে চলেছে। তার চেয়েও বড় কথা, ছবির 'মুড' তাঁর ক্যামেরায় বিধৃত।

অনুপমা

গোড়াতেই বলে রাখি, হিন্দী ছবির রাজ্যে "অনুপমা"-র (এল বি ফিল্মস) উপমা খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন। কথার অর্থ এই নয় যে, সামগ্রিক শিল্প-কৃতিত্বের বিচারে হিন্দী চিত্রজগতে "অনুপমা" অনুপম কিংবা তুলনারহিত। কিন্তু হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের এই ছবিতে এমন কিছু চরিত্র বা "সিচুয়েশন" আছে যার সংগে হিন্দী চিত্রের নিয়মিত দর্শকের প্রত্যক্ষ পরিচয় সম্ভবত এর আগে ঘটেনি। অন্তত তিনটি চরিত্রের কথা বলতে পারি যাদের হিন্দী চিত্রপটে এর আগে দেখা যায়নি। উমা, তার পিতা ও ডেভিড। উমার জন্মের সংগে সংগেই তার মা মারা গেছেন। তাই উমাকে তার বাবা কখনও সহজভাবে নিতে বা ক্ষমা করতে পারেন নি। গভীর পত্নীশোকে পিতৃস্নেহ তার অন্তরে সদা আচ্ছন্নই রয়ে গেছে। এর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলেও বলতে পারি, এই পিতৃচরিত্রকল্পনা হিন্দী সিনেমায় নতুন। সাধারণত সব সিনেমায়ই

বি কে প্রোডাকশন্স-এর "মহাশ্বেতা" (পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়) ছবিতে শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস ফটো-দেশ

এক্ষেত্রে পিতারা অতিমাত্রায় স্নেহপ্রবণ।

আশৈশব পিতার অবহেলা ও উপেক্ষায় বড় হয়েছে উমা। পিতাকে সে শুধু ভয় করতেই শিখেছে। পরবর্তীকালে তার মনে জেগেছে অপরাধবোধ। যেহেতু, সে-ই তার মায়ের মৃত্যুর কারণ। শংকা ও আত্মগ্লানিতে উমার কণ্ঠ রুদ্ধ। নিজের মধ্যে নিজেকে সে গুটিয়ে রাখতে চায়। কথা বলতে গেলে পাছে সে ধরা পড়ে তাই সে নীরব। উমার বাক্‌নিরোধ যদি কোন মুহূর্তে বাক-শক্তিহীনতা বলে মনে হয়ে থাকে তবে এর কারণ, পরিচালক রুদ্ধবাক উমার নীরবতার অর্থ দর্শকের হৃদয়ংগম করার জন্য কিছুটা পরিমিতিবোধ হারিয়েছেন। প্রথম অংশে উমাকে মূক বলে ভ্রম হওয়াটা দোষের নয়। অস্ফুট, কিংবা সামান্য কথা এই চরিত্রকে ক্ষুণ্ণ করত না।

অপেক্ষাকৃত অপ্রধান চরিত্র ডেভিড সদানন্দ, সদারসিক, সংস্কারমুক্ত। যদিও পার্টিতে কন্যাপ্রতিম অনীতার সংগে তার নাচ খুবই বিসদৃশ। তবে হিন্দী চিত্রের বেলায় হয়ত স্বাভাবিক। এই চরিত্রকে ঘিরে পরিচালক-কাহিনীকার যে রঙ্গসৃষ্টি করেছেন তা হিন্দী সিনেমায় নিশ্চয়ই একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

এই চরিত্ররাজি আর যাঁদের কাছেই অভিনব মনে হোক না কেন, এই অঞ্চলের দর্শকের কাছে নিশ্চয়ই নয়। নায়ক অশোক আমাদের, আর সকলের, অতি পরিচিত চরিত্র। সিনেমার যে নায়করা গল্প লেখে, জহরকোট পরে তাদের মূল্যবোধ বিচিত্র। চাকুরি তাদের ধাতে সয় না, ধনবানের (যদি সে কুচক্রী নাও হয়) সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতি তার অকারণ অনীহা, তাকে বাক্যবাণে আঘাত করাই তার স্বভাব। "উদয়ের পথে" সম্ভবত এই ধরনের একটি মূল্যবোধের প্রেরণা পরবর্তী কালের পরিচালকদের মনে সঞ্চারিত করেছে। এই ছবির নায়ক সেই "ইমেজ"-এ তৈরি। মিলের মধ্যে নায়কের লেখা উপন্যাসটিও আছে—যার নাম "অনুপমা"। "অনুপমা" পড়ে ধনীকন্যা উমা মনে সাহস ফিরে পেয়েছে। পিতাকে প্রণাম করে ও তাঁর অনুমতি নিয়ে স্পর্ধিত অথচ বিনীত বিদ্রোহের মুহূর্তে সে যখন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে নায়ক অশোকের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণের জন্য, তখন সিঁড়ির উপর থেকে নায়িকার বাবা "উদয়ের পথে"-র নায়িকার বাবার মতই বলেছে, ওকে যেতে যাও। সেই একই আঙ্গিক, একই পরিস্থিতি।

ফুল, গাছ, পাখির সংগে যার মিতালি, প্রকৃতির ভাষা বোঝে যে উমা তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের "সুভা"-র প্রচ্ছন্ন আভাস পাই। যৎসামান্য ত্রুটি সত্ত্বেও এই চরিত্র বিন্যাসে পরিচালক রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। অশোক ও উমার অব্যক্ত প্রণয় ও তার পরি-ণামের উপাখ্যানে রুচি ও কল্পনাশক্তির প্রসাদগুণ আছে। দর্শকের মনকে এই উপকাহিনী প্রায় স্তব্ধ, অবশ করে। পুরো গল্পটাই পরিচালক-কাহিনীকার দরদের সংগে বলেছেন। এর হার্দ্যরস প্রকাশ পেয়েছে কয়েকটি সুন্দর সংলাপে (যেখানে অশোক উমাকে বলছে, তোমার মনে ইচ্ছা জেগেছে, এই ইচ্ছাই সুন্দর), সকলের প্রতি অনীতার (দ্বিতীয় রোমান্টিক নায়িকা) আন্তরিকতায়, অনীতার প্রণয়ী অরুণ ও অশোকের বন্ধুত্বে। অনীতা বেশী কথা বলে, সর্বক্ষণ বক বক করে; সে পিতার স্নেহের দুলালী অনীতা যেন উমার 'কনট্রাস্ট'। নায়িকার এই বিপরীত চরিত্র-চিন্তার জন্যও পরিচালককে সাধুবাদ দিতে হয়। কয়েকটি বুদ্ধিদীপ্ত ও শিল্পসম্মত মনস্তাত্ত্বিক মুহূর্ত (যেখানে সবাই পিকনিক যাচ্ছে ও উমা আড়াল থেকে ওদের কথা শুনছে এবং এমন আরও অনেক) এবং বাস্তব পরিস্থিতি ও পরিবেশের জন্য "অনুপমা" শিল্পকৌলীন্য অর্জন করেছে। অনুমানসাধ্য ও সাজানো পরিস্থিতিও অবশ্য আছে। যেমন, নায়কের বাড়িতে তার ঘরে উমার চা নিয়ে যাওয়া, উমার গান ইত্যাদি। তবে গুণের সুচীপত্রই বেশী। এবং সব মিলিয়ে "অনুপমা" যে একটি বিরল সুখভোগ্য চিত্র তা সোচ্চারে বলতে দ্বিধা নেই।

প্রত্যেকের অভিনয়ই উন্নত স্তরের। শর্মিলা ঠাকুর উমার চরিত্রের নিরুদ্ধ বেদনা অনির্বচনীয় অভিব্যক্তিতে ফোটাতে পেরেছেন। শশীকলা একটি নতুন ধরনের চরিত্রে সপ্রাণ। প্রথম দিকে চরিত্রটির শিশুসুলভ চপলতা প্রকাশে একটু আতি-শয্য অবশ্য আছে। ধর্মেন্দ্র (অশোক) ও তরুণ বসুর (নায়িকার বাবা) চরিত্রচিত্রণ স্বাভাবিক, মর্যাদাসম্পন্ন। এঁরা ছাড়া চরিত্রোচিত ও স্বচ্ছন্দ অভিনয় করেছেন দেবেন বর্মা (অরুণ), নয়না (গৌরী), দুলারী (সরলা) ও দুর্গা খোটে। ডেভিডের অভিনয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

"অনুপমা"-র আবহসংগীত ও গানের সুর যেমন হওয়া উচিত, সুরকার হেমন্ত-কুমার তেমনভাবেই সব রচনা করেছেন। গানের প্রয়োজন এ ছবিতে না থাকলেও গান দুটি শুনতে ভাল লাগে। বিশেষ করে সংগীত পরিচালকের নিজের গাওয়া গানটি।

জয়ন্ত পাথারে তাঁর ফোটোগ্রাফির জন্য বিশেষ প্রশংসা পাবেন।

শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে থিয়েটার সেন্টার গত সপ্তাহে হিন্দী হাইস্কুলে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন—শ্রীরায়ের হাতে মানপত্র তুলে দেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র—ওই অনুষ্ঠানে থিয়েটার সেন্টারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সারা বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার-বিজয়ীরা শ্রীরায়ের হাত থেকে পুরস্কার নেন

নেপথ্যে

বিশ্বজিৎ গত সপ্তাহে সাংবাদিকদের সংগে এক প্রীতি সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন। খুবই "ইনফরম্যাল" পার্টি ছিল সেটা। নানা কথার মধ্য দিয়ে শিল্পী তাঁর কাজকর্মের কথা বললেন। সত্যেন বসুর 'আসরা' ('মধ্যরাতের তারা' ছবির হিন্দী রূপ) ছবিতে কাজ করে বিশ্বজিৎ খুশি। চিত্রপরিচালনা কিংবা ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্বজিৎ তাঁর নিজস্ব মত প্রযোজকের উপর চাপাতে রাজী নন। কারণ সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিককে তিনি বলেন, "চিত্রপরিচালনার

ব্যাপারে কথা বলার বাতিক আমার নেই। 'রাজ' নিয়েও বিশেষ কোন শর্ত আমি আরোপ করি না। করেই বা লাভ কী। বোম্বাইয়ের একজন খুব বড় অভিনেতা তো নিজের হাতেই প্রায় পরিচালনার দায়িত্ব নিতে শুরু করেছিলেন। কাহিনীর ব্যাপারেও তিনি মতামত ব্যক্ত করতেন। এর ফল তো সুখের হয়নি। ছবি চলল না। অভিনেতার মধ্যে চিত্রপরিচালনার কাজ জানেন রাজ কাপুর। অন্যের ছবির বেলায় তিনিও পরিচালনার কাজে হস্তক্ষেপ করেন না।"

অনেক হিন্দী ছবিতেই বিশ্বজিৎ এখন কাজ করছেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজে। সম্প্রতি কলকাতায় এসে কয়েকটি বাংলা ছবির জন্য তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। ঋত্বিক ঘটকের একটি ছবিতে তিনি অভিনয় করবেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রর "সংসার সীমান্তে" গল্প অবলম্বনে ছবিটি তৈরি হবার কথা। নায়িকার চরিত্রে সম্ভবত মাধবী মুখোপাধ্যায় অভিনয় করবেন। "গড় নাসিমপুর"-এ বিশ্বজিৎ নায়ক চরিত্রে থাকবেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে এ ছবিতে 'ভিলেন'-এর চরিত্রে দেখা যাবে। "ঝিন্দের বন্দী"র পর সম্ভবত এই ধরনের চরিত্রে শ্রীচট্টোপাধ্যায় আর অভিনয় করেননি। অজিত লাহিড়ী জানিয়েছেন, এ মাসেই ছবির শুটিং আরম্ভ হচ্ছে।

ছোট্ট জিজ্ঞাসা ছবি সম্পর্কে বিশ্ববিজৎ জানালেন, ছবির পরিচালকরূপে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের নাম থাকবে না। অন্য কারো নাম থাকবে, না কোন ইউনিটের নাম—এ বিষয়ে বিশ্বজিৎ পরিষ্কার কিছুই বলেননি। হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় ছবির সম্পাদনার ভার নিয়েছেন।

আরো জানা গেল, অজয় বিশ্বাস বোম্বাইয়ে "অশ্রুমুকুল" নামে একটি বাংলা ছবি তৈরি করছেন। বিশ্বজিৎ সে ছবির নায়ক হবেন। অজয় বিশ্বাস বোম্বাইয়ে এখন তাঁর "প্রথম প্রেম" ছবির হিন্দীরূপ তৈরি করছেন।

বিশ্বরূপায় অজয়-মন্ত্রিসভা সংবর্ধিত

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় "জাগো" নাটকের অভিনয়ের পূর্বে বিশ্বরূপা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ, কর্মী ও শিল্পীরা পশ্চিম বাংলার নতুন মন্ত্রিসভাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। "আমাদের যাত্রা হল শুরু" গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এবং যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যারা মঞ্চে উপস্থিত হন। তাঁদের মাল্যভূষিত করেন শ্রীরাসবিহারী সরকার, শিল্পী সুমিতা সান্যাল ও জয়শ্রী সেন এবং থিয়েটারের প্রবীণ কর্মী শ্রীরামচরণ। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া মন্ত্রীদের মধ্যে শ্রীহেমন্ত বসু, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার, শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, শ্রীজাহাঙ্গীর কবির, শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য ও শ্রীননী ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও যুক্ত ফ্রন্টের চীফ হুইপ শ্রীকমল গুহ মন্ত্রীদের সঙ্গে ছিলেন। শ্রীগুহ উপস্থিত মন্ত্রীদের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেন।

শ্রীরাসবিহারী সরকার থিয়েটারের পক্ষ থেকে মন্ত্রিসভাকে অভিনন্দন জানান। নাট্য ও শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি সরকারকে একটি পৃথক মন্ত্রি-দফতর সৃষ্টির জন্য অনুরোধ করেন। এবং রবীন্দ্র-সদন পরিচালনা-কমিটিকে অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক করার জন্যও আবেদন জানান।

সংবর্ধনার উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখোপাধ্যায় থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ ও শিল্পিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জাপানী চলচ্চিত্র অধিবেশন

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা কলকাতাস্থ জাপানী দূতাবাস ও ইন্দো-জাপানিজ অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় আগামী ২৮শে মার্চ থেকে চার দিনব্যাপী একটি জাপানী চলচ্চিত্র অধিবেশনের (প্রদর্শনীর) আয়োজন করেছেন লোটাস ও সোসাইটি প্রেক্ষাগৃহে। আলোচ্য জাপানী চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে আকিরা কুরসোয়া পরিচালিত "সেভেন সামুরাই" এবং "হাই অ্যান্ড লো" ও আকিরা ইনুয়ে পরিচালিত "মিস ব্লু স্কাই" প্রদর্শিত হবে। এ ছাড়া জাপানী পাপেট চিত্র "দি ওয়ান্ডারফুল গিফ্‌ট অব দি ক্রেন" ও "ফোর সিজন্‌স ইন জাপান" এবং কয়েকটি অল্প দৈর্ঘ্য চিত্র এই উৎসবসূচীর অন্তর্গত। জাপানে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পর ভারতে এই প্রথম সিনে ক্লাবই জাপানী চলচ্চিত্র অধিবেশনের আয়োজন করেছেন। কলিকাতাস্থ জাপানী দূতাবাসের কনসাল জেনারেল সন্ধ্যা ৬টায় এই জাপানী চলচ্চিত্র অধিবেশনের উদ্বোধন করবেন।

ইউনিসেফ-এর লোকহিতকর দায়িত্ব নিয়ে মারলোন ব্র্যান্ডো সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন—বিহারের খরা অঞ্চলের দুর্গতদের দেখে তিনি কলকাতায় আসেন—দমদম এয়ারপোর্টে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী

ফটো-দেশ

নবদম্পতি শচীন ভৌমিক ও অভিনেত্রী কল্পনা—তাঁরা গত সপ্তাহে কলকাতায় তাঁদের শুভপরিণয় উপলক্ষে এক প্রীতিসম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন ফটো—দেশ

পরিতৃপ্তির নতুন জগতে পাড়ি দিন

মন-মেজাজ চাঙ্গা করতে হলে চাই ব্রুক বণ্ড রেড লেবেল চা। প্যাকেট পিছু ঢের বেশী কাপ মনের মত চা পাবেন। ব্রুক বণ্ড রেড লেবেলের অপূর্ব স্বাদগন্ধ আপনাকে পরিতৃপ্তির এক নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাবে।

BB 3675 A

অরণ্যদেব

লী ফক

দুজন ডাকাত গুহার দিকে ফিরে চলছে---
ফিরছি!
আমরা অপেক্ষা করব। তোমরা তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

বোকার মতন কোটটা ফেলে এসেছ। তোমার জন্যেই এত হয়রান হতে হচ্ছে!
থাম!

ওদিকে রাজা আর টমটম .....
শুধু কাগজ?

মাটি খুঁড়ে কোটের বাক্সটা বার করেছে!
নিশ্চয়ই দামী কাগজ। তা নইলে মাটির নীচে লুকিয়ে রাখবে কেন?
ঠিক বলেছিস রাজা! এই দ্যাখ!

একজনে কোট ফেলে গেছে। তাহলে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। চেহারা দেখে মনে হয়, লোকগুলো ভাল নয়।
কোটের পকেটে এই ব্যাগটা রয়েছে!

টমটম, এই কাগজগুলো আর এই ব্যাগটা বরং *ওয়াকার-কাকাকে দেব। যা করবার হয় তিনিই করবেন।
রাজা, শুনতে পাচ্ছিস?
* অরণ্যদেবকে রাজা বলে ওয়াকার-কাকা!
10/9

চিঁ-
চিঁ-
চিঁ-
চিঁ
হারামজাদা ঘোড়া! আবার পাগলামি শুরু করেছে!
নিশ্চয়ই সিংহের গন্ধ পেয়েছে ঘোড়াটা!

ঘোড়ার ডাক! ডাকাতরা তাহলে ফিরে আসছে।
আয়, বাক্সটা আবার তাড়াতাড়ি মাটির নীচে চাপা দিয়ে রাখি! কাউকে না, এখন চুপচুপি কর!

চল, ঘোড়া দুটোকে এখানে বেঁধে রেখে বাকী পথটা হেঁটে যাওয়া যাক।

টমটম, তাড়াতাড়ি কর!
তাড়াতাড়িই তো করছি!
?!!

সাপ্তাহিক সংবাদ
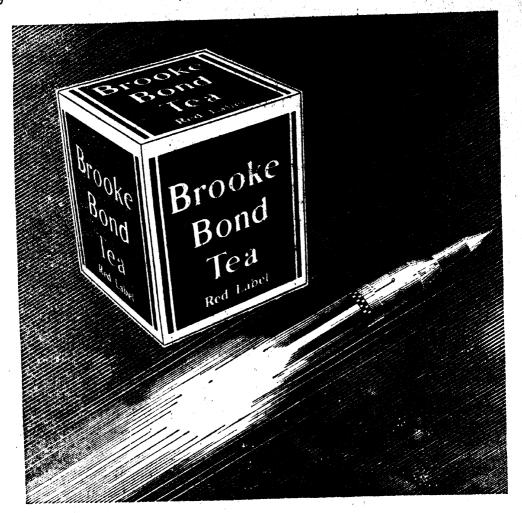
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভা গঠন এবং সংসদের বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন আলোচ্য সপ্তাহের মুখ্য আলোচনার বিষয়। ইন্দিরা মন্ত্রিসভা ১৯ জন পূর্ণ মন্ত্রী, ১৭ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ১৬ জন উপমন্ত্রী নিয়ে গঠিত হয়েছে। নতুন লোকসভা ৭১ ভোটের সংখ্যাধিক্যে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডিকে অধ্যক্ষ পদে বরণ করেছেন। রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ১৮ মারচ সংসদ-ভবনের কেন্দ্রীয় হলে উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে ১৫ মিনিটব্যাপী ভাষণ দিয়ে নতুন সংসদের উদ্বোধন করেন। রাজস্থানে রাষ্ট্রপতির শাসনের প্রতিবাদে স্বতন্ত্র ও কিছু নির্দল সদস্য ছাড়া সমস্ত বিরোধীরা অধিবেশন বর্জন করেন। এই মন্ত্রিসভার বিশেষত্ব হলো এই যে, মন্ত্রিসভা গঠিত হবার ছয় দিনের মধ্যে জনসংঘের শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ী মন্ত্রি-সভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সরকারের রাজস্থান নীতি বিরোধীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। অধ্যক্ষ সঞ্জীব রেড্ডি অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার জন্য গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের দিনে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপনের নজির ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে এই প্রথম।

দেশী সংবাদ—

১৩ মারচ—স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন আজ ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রপতি রাজস্থানের শাসনভার গ্রহণ করেছেন এবং নবনির্বাচিত আইন সভা সাময়িকভাবে বাতিল করে দিয়েছেন। শ্রীচ্যবন বলেন, সংবিধান অনুযায়ী আইন সভা প্রথম দফায় দু মাসের জন্য বাতিল হবে। প্রয়োজন বোধে এই বাতিলের মেয়াদ তিন বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

১৪ মারচ—আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন পর্বের আলোচনাকালে বিভিন্ন দলভুক্ত সরকার পক্ষের সদস্যগণ সঙ্কট-সংকুল বাংলার জনসাধারণের কষ্ট মোচনে সর্ব-শক্তি নিয়োগের দৃঢ়সংকল্প পুনরায় ঘোষণা করেন। সেই সঙ্গে পশ্চিম মানুষের সামনে কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করে দেবার শপথ নেন।

খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ শ্রীঅপূর্বকুমার চন্দ আজ দিল্লিতে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। আসামের শিলচর শহরে শ্রীঅপূর্ব চন্দের জন্ম। তিনি শান্তিনিকেতনের ছাত্র। ১৯১২ সালে তিনি অকসফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং ইংরেজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে ফিরে আসেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার বহু কলেজে অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তা ছাড়া তিনি রবীন্দ্রনাথের কানাডা ও জাপান সফরকালে তাঁর সেক্রেটারী ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি শিক্ষা বিভাগে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ হিসাবে অপূর্ব চন্দ শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও সুপরিচিত ছিলেন।

১৫ মারচ—রাজস্থানের বিরোধী সংযুক্ত দল রাজ্য বিধানসভায় তাঁদের নিরংকুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য আজ তাঁদের দলভুক্ত ৯৩ জন সদস্যকে রাষ্ট্রপতির কাছে হাজির করেন। তাঁরা সদলবলে রাষ্ট্রপতি ভবনে যান এবং রাজস্থানে রাষ্ট্রপতির শাসনকে 'অগণ-তান্ত্রিক' বলে উল্লেখ করেন।

লোকসভার আসন্ন অধিবেশন যাতে নির্বিবাদে চলে সেজন্য আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী আজ বিরোধী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। বৈঠক সফল হয়েছে বলা চলে না। মতানৈক্য দেখা দেয় লোকসভার অধ্যক্ষপদ নিয়ে। বিরোধী নেতৃবৃন্দ বলেন, অধ্যক্ষ কংগ্রেসী হোন তাতে আপত্তি নেই, তবে তাঁকে নির্বাচিত হতে হবে সর্বসম্মতিক্রমে। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী ইতি-মধ্যেই শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীকে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। শ্রীরেড্ডি তা গ্রহণও করেছেন।

১৬ মারচ—আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে বাজেট বরাদ্দগত ব্যয় অনুমোদন বিলের আলোচনাকালে উপমুখ্যমন্ত্রী ও অর্থ-মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ঘোষণা করেন যে, বিগত বাস-ট্রাম ধর্মঘটের সময় যেভাবে বেসরকারী বাসগুলির মধ্যে 'পারমিট' বিলি করা হয়েছে সে সম্পর্কে তাড়াতাড়ি তদন্ত করা হচ্ছে এবং শীঘ্রই তদন্তের ফলাফল জনসাধারণকে জানানো হবে। অর্থমন্ত্রীর অভিযোগ: প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী যা বলেছেন তা 'সর্বৈব অসত্য'।

১৭ মারচ—বস্তার জেলার জগদলপুরে যে হাঙ্গামায় বস্তারের গদিচ্যুত শাসক শ্রীপ্রবীরচন্দ্র ভঞ্জদেও এবং আরও ১১ জন আদিবাসী পুলিসের গুলিতে মারা যান সে সম্পর্কে তদন্তের জন্য পানডে কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ওই ঘটনায় পুলিস অসংগত এবং অত্যধিক শক্তি প্রয়োগ করেছিল। তা ছাড়া মধ্য প্রদেশের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার—বিশেষ করে জেলা কালেকটর অতিরিক্ত জেলা শাসক, পুলিস সুপার এবং জগদলপুরের সিভিল সারজন কর্তব্যচ্যুতির অপরাধে অপরাধী।

১৮ মারচ—চার বৎসর পর আগামী ১ জুলাই থেকে দেশের সর্বত্র জরুরী অবস্থার অবসান ঘটবে। ১৯৬২ সালের নবেম্বর মাসে চীনা আক্রমণের পর জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয়ে-ছিল। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চ্যবন আজ লোকসভায় এই ঘোষণা করেন।

রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ডঃ জাকির হোসেন বিরোধী দলের সঙ্গে এই ব্যাপারে একমত হন যে, সরকারের সংসদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার প্রথম দিনেই রাজস্থানে রাষ্ট্রপতি শাসন সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র সংসদে পেশ করা উচিত ছিল।

১৯ মারচ—পন্ডিচেরীর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভেঙ্কট সুব্বা রেড্ডিয়ার আজ রাত্রে সাংবাদিকদের কাছে তাঁর পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। তাঁর মন্ত্রিসভার দু'জন সহকর্মী কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করায় তিনি মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন।

সংযুক্ত দলের নেতা মহারাওয়াল লক্ষ্মণ সিং আজ এই বলে দাবি করেন যে, কংগ্রেস বা সংযুক্ত দল কোন্ পক্ষ রাজস্থানে সরকার গঠনে সক্ষম তা ঠিক করার জন্য রাজস্থান বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হোক।

বিদেশী সংবাদ

১৩ মারচ—ফ্রানসের সাধারণ নির্বাচনে দ্যগল পন্থীরা জাতীয় পরিষদে কোনক্রমে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছেন। ৪৮৬টি আসনযুক্ত জাতীয় পরিষদে তাঁরা ২৪৪ আসন পেয়েছেন। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ তাঁরা এই সামান্য গরিষ্ঠতাও হারাতে পারেন। কেননা করসিকার একটি ব্যালট বাক্সে তালিকাভুক্ত ভোটার-সংখ্যার চাইতে দুইশত বেশি ভোটপত্র পাওয়া গিয়েছে।

১৪ মারচ—চীনের মুক্তি ফৌজ প্রতিদিন মাও সে-তুং-এর সমর্থকদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সর্বহারাদের বিপ্লবের পথে আত্মনিয়োগ করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। চীনের সৈন্যবাহিনীর এক মুখপাত্র কর্তৃক প্রচারিত এই বাণী রেডিও পিকিং থেকে ঘোষণা করা হয়।

১৫ মারচ—কানডিতে এশীয় সংবাদপত্র সম্মেলনে আজ সাতটি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নিউজ প্রিনটের (সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ) আমদানি ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কমিটি অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৬ মারচ—১৯৬৫ সালের কমিউনিস্ট সাহায্যপুষ্ট ব্যর্থ অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করার অভিযোগে একটি বিশেষ সামরিক আদালতে ইনদোনেশিয়ার প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমেদ সুপারজোকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

১৭ মারচ—ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ: অয়ন মণ্ডলের বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য আজ ভারত ও আমেরিকার যুক্ত উদ্যোগে একটি রকেট মহাকাশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ৯৬ পাউনড ওজনের যন্ত্রপাতি নিয়ে 'নাইক-আপাচে' রকেটটি মহাকাশে ওঠে।

১৮ মারচ—নিউ অর্লিয়েন্স-এর তিনজন বিচারক নিয়ে গঠিত একটি প্যানেল রুলিং দিয়েছেন—প্রেসিডেনট কেনেডিকে হত্যার ষড়যন্ত্রের দায়ে শ্রী ক্লে এল শ-কে কাঠগড়ায় দাঁড়াতেই হবে। শ্রী শ এখানকার একজন ব্যবসায়ী। প্যানেল এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, ষড়যন্ত্র প্রমাণ করার মত যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

১৯ মারচ—দুটি জাপানী সংবাদপত্র পিকিং থেকে জানিয়েছে, চীনের গণফৌজ ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ধীরে ধীরে সংবাদপত্র, কারখানা ও করপোরেশনগুলিকে দখল করছে।

আপনার
বাড়িতে
প্রয়োজন সবার সেরা
উৎকর্ষ এবং নিখুঁত কারিগরীর জন্য পৃথিবীর চল্লিশটি দেশের লক্ষ লক্ষ লোক উষা পাখাই পছন্দ করেন।
বিশ্বের বৃহত্তম পাখা তৈরীর কারখানায় দক্ষ কারিগরের দ্বারা প্রস্তুত উষা পাখাই ভারতে সবচেয়ে বেশী বিক্রী হয়।
পাখা কেনার সময় আপনি নিশ্চিন্ত মনে উষা কিনতে পারেন—উষাই আজকালকার সবচেয়ে জনপ্রিয় পাখা।
প্রত্যেকটি উষা সিলিং ফ্যান-এ ডবল বল-বেয়ারিং থাকায় ইহা অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী
উষা পাখা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রী আই ভৌমিক

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

চাকুরির নোটিস নং ৩/৬৭

নিম্নোক্ত পদগুলির নিমিত্ত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে; পদগুলি প্রথমত অস্থায়ী, তবে যথাসময়ে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। অনুমোদিত বেতনক্রমে বেতন ছাড়াও সমস্ত পদগুলিতেই প্রচলিত ভাতাদি, বিনা খরচায় ডাক্তারি চিকিৎসা, রেলওয়ে পাস/পি-টি-ও এবং সময়ে সময়ে প্রবর্তিত রুল অনুযায়ী প্রদেয় অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থা আছে। অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ/ট্রেনিং-এর সময়কালে অনুমোদিত স্কেলে স্টাইপেণ্ড সহ কেবলমাত্র দুর্মূল্য ভাতা (অন্য কোনরূপ ভাতা নহে) প্রদেয় হইবে।

২। দরখাস্ত এই রেলওয়ের বা যে-কোন রেলওয়ে সার্ভিস কমিশনের নির্ধারিত ফরমে করিতে হইবে, এই ফরম ২, টাকা আদায় দিয়া (তফসিলী জাতি/তফসিলী উপজাতি, ১-১-৬৪ তারিখে বা তৎপরে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে ভারতে আগত উদ্বাস্তু এবং দৈহিক দিক হইতে অসুবিধাগ্রস্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫০ পঃ) ভারতের প্রধান প্রধান রেলওয়ে স্টেশন হইতে পাওয়া যাইবে। ইংরেজিতে যথাযথভাবে পূরণ করা এবং খামের উপরে পদের নাম এবং পর্যায় উল্লেখিত দরখাস্ত নিম্নবর্ণিতের নিকট ১২ই এপ্রিল, ১৯৬৭ তারিখ বেলা ৪-৩০টার পূর্বেই পৌঁছা চাই। ইহার পরে প্রেরিত কোন দরখাস্ত **(যথাযোগ্য অফিসারের মারফতে প্রেরিত দরখাস্ত সহ)** কোন ক্ষেত্রেই বিবেচিত হইবে না:

দি চীফ্ পার্সোনেল অফিসার
(রিক্রুটমেণ্ট),
পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে।
মালিগাঁও রেলওয়ে হেড কোয়ার্টার্স,
গৌহাটি-১১, কামরূপ (আসাম)

৩। ভুল দরখাস্ত ফরমে দাখিল করা দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবে।

৪। যাঁহারা ইতিমধ্যেই সরকারী চাকুরিতে (রেলওয়ে সহ) স্থায়ী বা অস্থায়ী হিসাবে কর্মরত আছেন, যথাযোগ্য অফিসারের মারফত প্রেরিত তাঁহাদের দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখের মধ্যে (অর্থাৎ ১২-৪-৬৭ তারিখের মধ্যে) অবশ্যই এই অফিসে পৌঁছা চাই। তাঁহারা যদি মনে করেন যে, তাঁহাদের বিভাগীয় প্রধানের মারফত প্রেরিত দরখাস্ত পৌঁছিতে বিলম্ব হইতে পারে, তাহা হইলে তাঁহারা নির্ধারিত ফরমে তাঁহাদের দরখাস্ত (সমস্ত দিক হইতে পূরণ করা) সরাসরি পাঠাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের নিয়োগকর্তার নিকট হইতে প্রাপ্ত **"নো অবজেকশন সার্টিফিকেট"** দেখাইলেই তবে তাঁহাদিগকে লিখিত পরীক্ষা / ব্যবহারিক পরীক্ষা/ সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া হইবে।

৫। দরখাস্ত সমস্ত দিক হইতে নির্ভুলভাবে পূরণ করা না হইলে এবং উহার সঙ্গে দরখাস্তে উল্লেখিত মত বয়স, যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতার সমর্থক প্রশংসাপত্রের এবং উত্তীর্ণ সমস্ত পরীক্ষার মার্কশীট প্রভৃতির প্রত্যায়িত (প্রত্যয়নকারী কর্তৃপক্ষের পদমর্যাদা উল্লেখিত এবং অফিসের সীলমোহরযুক্ত) নকল না থাকিলে উহা বিবেচিত হইবে না।

৬। উর্ধ্বতন বয়ঃসীমা (সমস্ত বয়ঃসীমা ১লা মার্চ, ১৯৬৭ তারিখে পরিপূরিত হওয়া আবশ্যক) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে নিম্নোক্তরূপে শিথিলযোগ্য:—

(ক) তফসিলী জাতি এবং তফসিলী উপজাতির প্রার্থী এবং ভারতে পূর্বতন ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলের প্রার্থীদের মধ্যে যাঁহারা ফরাসী ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে ৫ বৎসর;

(খ) সিংহল-প্রত্যাগত ভারতীয় নাগরিক এবং ভারতের পূর্বতন পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়া, দমন, দিউ-এর বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে ৩ বৎসর;

(গ) যুদ্ধ চাকুরিয়া প্রার্থীদের ক্ষেত্রে, যতদিন যুদ্ধ চাকরি এবং পরে সামরিক চাকুরি করিয়াছেন ততদিন;

(ঘ) রিজার্ভিস্টদের ক্ষেত্রে ৪০ বৎসর পর্যন্ত;

(ঙ) সাময়িক শ্রমিক বাদে ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর রেলওয়ে কর্মীদের ক্ষেত্রে উর্ধ্বে যথাক্রমে ৩ এবং ১০ বৎসর সাপেক্ষে যতদিন নিয়মিত চাকুরি করিয়াছেন ততদিন;

(চ) **যে-সব উদ্বাস্তু ১-১-১৯৬৪ তারিখ বা তাহার পরে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে ভারতে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে:**

(১) ৪৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত; তফশীলী জাতি/উপজাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আরও ৫ বৎসর শিথিলযোগ্য;

(২) অ্যাপ্রেণ্টিস পর্যায়ে নিয়োগের জন্য ৩০ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

দ্রষ্টব্য—দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টের ট্রানজিট সেণ্টারের ক্যাম্প কমাণ্ডেণ্ট অথবা বিভিন্ন রাজ্যের রিলিফ ক্যাম্পের ক্যাম্প কম্যাণ্ডেণ্ট অথবা প্রার্থী বর্তমানে যে-এলাকার বাসিন্দা সেখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেটই শুধু বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৭। প্রার্থীকে অবশ্যই তাঁহার সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের একটি ফটোগ্রাফ এই রেলওয়ের দরখাস্তের ফরমের ডানদিকে নীচের কোণে (এতদুদ্দেশ্যে একটি খালি জায়গা দেওয়া আছে) অথবা ২ (দুই) নং পৃষ্ঠায় আঁটিয়া দিতে হইবে। **ফটোগ্রাফ ব্যতীত কোন দরখাস্ত কোন ক্ষেত্রেই বিবেচিত হইবে না।**

৮। কোন প্রার্থী যদি মনোনয়নের ফলাফল তাঁহার (পুরুষ/মহিলা) নিকট ডাকযোগে জানাইয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে দরখাস্তের সঙ্গে নিজের নাম ঠিকানা লেখা ১৫ পঃ মূল্যের ডাকটিকিটযুক্ত একটি লেফাফা পাঠাইয়া দিবেন।

৯। তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীর ক্ষেত্রে যোগ্যতাবলী **এন এফ রেলওয়ে রিক্রুটমেণ্ট কমিটির** বিচার-বিবেচনায় শিথিলযোগ্য হইতে পারে। তফসিলী জাতি/উপজাতির প্রার্থীর জন্য **সংরক্ষিত** শূন্য পদগুলি, **ঐ ঐ সম্প্রদায় হইতে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না** গেলে অসংরক্ষিত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১০। **প্রার্থীদিগকে একটি লিখিত পরীক্ষা/ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে হইবে এবং পরে সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইতে হইবে। দূরত্ব ২৪ কিমি-এর বেশী হইলে পরীক্ষা/সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত উপস্থিত** হওয়া এবং ফিরিয়া যাইবার জন্য ফ্রি রেলওয়ে পাস নিম্নোক্তদের দেওয়া হইবে—

(ক) যোগ্য তফসিলী জাতি/উপজাতির প্রার্থী এবং প্রাক্তন মিলিটারি পার্সোনেল, ১-১-১৯৬৪ তারিখ বা উহার পরে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে ভারতে আগত প্রকৃত উদ্বাস্তু;

(খ) যে সকল পর্যায়ের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার প্রয়োজন সেইসকল পর্যায়ের প্রার্থিগণ;

(গ) (১) মেডিক্যাল পর্যায়ের প্রার্থিগণ যাঁহাদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা মেডিক্যাল ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার প্রয়োজন; (২) নার্স (মেট্রনসহ), ফার্মাসিস্ট, এক্স-রে টেকনিসিয়ান ও রেডিওগ্রাফার।

১১। অ্যাপ্রেণ্টিস হিসাবে নির্বাচিত প্রার্থীকে একজন জামিনদার সহ এই মর্মে একটি বণ্ড/এগ্রিমেণ্ট সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে যে, সফলতার সহিত অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ সমাপ্তির পর তিনি অন্তত ৫ বৎসরকাল রেলওয়ের অধীনে চাকরি করিবেন, অন্যথায় তাঁহাকে (পুরুষ/মহিলা) ট্রেনিং-এর খরচ (ট্র্যাভেলিং বা রানিং ভাতা বাদে স্টাইপেণ্ড বা বেতন এবং ভাতার ১২½ পারসেণ্ট) এবং অ্যাপ্রেণ্টিসশিপ-এর সময়ে তাঁহাকে (পুরুষ/মহিলা) প্রদত্ত সমস্ত টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকিতে হইবে।

১২। ট্রেইনী হিসাবে মনোনীত প্রার্থীকে একজন জামিনদারসহ এই মর্মে একটি বণ্ড/চুক্তি সম্পাদন করিয়া দিতে হইবে যে, ট্রেনিং সাফল্যের সহিত শেষ করার পর তাঁহাকে অন্ততঃ ৫ বৎসরকাল রেলওয়ের অধীনে চাকরি করিতে হইবে। ট্রেইনী যদি সরকারের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে ট্রেনিংকালে বা তাহার পর চাকরি ত্যাগ করেন অথবা অসদাচরণ বা কোন দোষণীয় কাজের জন্য চাকরি হইতে অপসারিত হন তবে সরকার দাবি করিলে ট্রেইনীকে সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত ট্র্যাভেলিং ও রানিং ভাতা বাদে ট্রেনিং-এর সমগ্র ব্যয় বা অন্য কোন পরিমাণ অর্থ ফেরত দিতে হইবে।

১৩। এই অফিস কোন ব্যক্তি বা সংস্থার সঙ্গে রিক্রুটমেণ্ট সম্পর্কে (উপরে ৮নং প্যারায় যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে উহা বাদে) কোন পত্রালাপ করেন না।

১৪। **এই অফিসে দরখাস্তের ফরম পাওয়া যায় না এবং ফরমের জন্য কোন অনুরোধ এই অফিস কর্তৃক বিবেচিত হইবে না।**

১৫। **কেন্দ্রীয় কোন চাকুরি বা পদে নিয়োগেচ্ছু প্রার্থীকে অবশ্যই নিম্নোক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে:—**

(ক) ভারতের নাগরিক বা (খ) সিকিমের প্রজা, বা (গ) নেপালের প্রজা বা (ঘ) ভুটানের প্রজা বা (ঙ) ভারতে স্থায়ি-

৮৪৯ পৃষ্ঠায়

৮৪৮ পৃষ্ঠার পর

ভাবে বসবাসের ইচ্ছায় ১লা জানুয়ারী, ১৯৬২ তারিখের পূর্বে ভারতে আগত তিব্বতী শরণার্থী, বা (চ) ভারতে স্থায়িভাবে বসবাসের ইচ্ছায় পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল এবং কেনিয়া, উগান্ডা ও তাঞ্জানিয়ার সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র (পূর্বতন টাঙ্গানাইকা ও জাঞ্জিবার) প্রভৃতি পূর্ব আফ্রিকার দেশসমূহ হইতে আগত ভারতীয় পিতামাতার সন্তান, অবশ্য (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ) পর্যায়ে উল্লেখিত প্রার্থীকে ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যোগ্যতাগত এড-হক সার্টিফিকেট পেশ করিতে হইবে এবং প্রার্থী (স্ত্রী বা পুঃ) যদি (চ) পর্যায়ভুক্ত হন, তবে তাঁহাকে (স্ত্রী বা পুঃ) ভারতীয় নাগরিকত্ব অর্জন সাপেক্ষে চাকুরিতে রাখা হইবে।

১৬। **কোন রকমের তদ্বির-তদারক প্রার্থীর অযোগ্যতার পরিচায়ক হইবে।**

পর্যায় নং ১ঃ কেমিক্যাল অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট-এর দুইটি (২) পদ। **ন্যূনতম যোগ্যতাঃ** (১) কেমিস্ট্রি বা মেটালার্জিসহ বি এস-সি (প্রথম বিভাগ) এবং লেবরেটরির কাজে তিন বৎসরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, **অথবা** (২) ফিজিকস বা ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রিতে এম এস-সি বাঞ্ছনীয় এবং লেবরেটরির কাজে এক বৎসরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। বয়ঃসীমাঃ ২২ এবং ৩০ বৎসরের মধ্যে। মনোনীত প্রার্থিগণকে মাসিক ২১০, টাকা বেতনে এক বৎসরের ট্রেনিং লইতে হইবে এবং ট্রেনিং সাফল্যের সহিত শেষ করার পর ২১০-৪২৫, টাকা বেতনক্রমে চাকরিতে লওয়া হইবে।

পর্যায় নং ২ঃ হেড ড্র্যাফটসম্যানের (মেকা.) একটি (১) পদ। **ন্যূনতম যোগ্যতাঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এ গ্র্যাজুয়েট বা সমতুল যোগ্যতা। মনোনীত প্রার্থীকে মাসিক ৩৩৫, টাকা স্টাইপেন্ডে এক বৎসরকাল ট্রেনিং লইতে হইবে। ট্রেনিং সাফল্যের সহিত শেষ করার পর এবং উহার টেস্ট উত্তীর্ণ হওয়ার পর শূন্য পদ পাওয়া সাপেক্ষে ৩৩৫-৪৮৫, টাকা বেতনক্রমে **হেড ড্র্যাফটসম্যান** হিসাবে নিয়োগের তিনি যোগ্য হইবেন। **বয়ঃসীমা** ২০ এবং ৩০ বৎসরের মধ্যে।

পর্যায় নং ৩ঃ ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের জন্য **অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেকট্রিকাল ফোরম্যানের** দুইটি (২) পদ। **ন্যূনতম যোগ্যতাঃ** প্রার্থিগণকে (ক) দুই বৎসরের কার্যকরী অভিজ্ঞতাসহ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রী, অথবা (খ) কোন সরকারী সংস্থা বা প্রখ্যাত কোন বেসরকারী ফার্মে ইলেকট্রিক্যাল জেনারেটিং স্টেশন, এইচ টি/এল টি ওভারহেড লাইন ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমের নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজে অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের কার্যকরী অভিজ্ঞতাসহ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এ (৩ বৎসরের কোর্স) স্বীকৃত ডিপ্লোমা/লাইসেন্সিয়েটধারী হইতে হইবে। **বয়ঃসীমাঃ** ২০ এবং ৩০ বৎসরের মধ্যে। **বেতনক্রমঃ** ৩৩৫-৪২৫, টাকা। **উচ্চতর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে বেতনক্রমের ভিতর কয়েকটি উপযুক্তসংখ্যক বেতনবৃদ্ধি মঞ্জুর করা হইবে।**

পর্যায় নং ৪ঃ ফার্মাসিস্টের পাঁচটি (৫) পদ। একটি পদ তপসীলী উপজাতির প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। **ন্যূনতম যোগ্যতাঃ** প্রার্থিগণকে (ক) ম্যাট্রিকুলেশন বা সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে, (খ) কোন স্বীকৃত স্কুল (সরকারী) হইতে বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন পরীক্ষকের নিকট হইতে সার্টিফিকেট অফ প্রফিসিয়েন্সি ইন ডিসপেনসিংধারী হইতে হইবে, (গ) রেজিস্টার্ড হইতে হইবে, এবং (ঘ) তাঁহাদের হস্তাক্ষর স্পষ্ট হওয়া চাই ও যে এলাকায় তাঁহারা নিযুক্ত আছেন তথায় প্রচলিত এক বা একাধিক সাধারণ দেশীয় ভাষা (যথা হিন্দী, বাংলা বা অসমিয়া) পড়িতে ও লিখিতে সক্ষম হওয়া চাই। নন-ম্যাট্রিকুলেটও দরখাস্ত করিতে পারেন, তবে টেকনিক্যাল কাজে তাঁহাদিগকে অন্যভাবে সম্পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন হইতে হইবে এবং ১৯৪৮ সালের ফার্মাসি অ্যাক্ট অধীনে রেজিস্টার্ড হইতে হইবে। **বয়ঃসীমাঃ** ২০ ও ৩০ বৎসরের মধ্যে। **বেতনক্রমঃ** ১৩০—২৪০, টাকা।

পর্যায় নং ৫ ঃ স্যানিটারী ইনসপেক্টর গ্রেড ৩-এর আটটি (৮) পদ। তপসিলি জাতি/উপজাতি প্রার্থীদিগের জন্য একটি করিয়া পদ সংরক্ষিত। **ন্যূনতম যোগ্যতা ঃ** প্রার্থীদিগকে হইতে হইবে ঃ (ক) ম্যাট্রিকুলেশন অথবা সমতুল পরীক্ষায় পাশ (খ) কোন সরকারী স্বীকৃত শিক্ষায়তন হইতে ইস্যু করা স্যানিটারী ইনসপেক্টরের ডিপ্লোমা সার্টিফিকেটধারী (গ) প্রার্থীদিগকে স্যানিটারী সায়েন্সে এমন এক যোগ্যতার অধিকারী হইতে হইবে, যাহা স্টেট মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে রেজিস্টারীযোগ্য অথবা হেলথ অফিসার্স এগজামিনেশন সার্টিফিকেটধারী অথবা স্যানিটারী বা হেলথ ইনসপেক্টর হিসাবে নিয়োগের জন্য স্ব স্ব রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যোগ্যতাবলীর অধিকারী (ঘ) স্যানিটারী ইনসপেক্টর হিসাবে অন্ততপক্ষে এক বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। **বেতনক্রম ঃ** ১৩০-২১২, টাকা। বয়ঃসীমা ঃ ১৮ ও ২৫ বৎসরের মধ্যে।

পর্যায় নং ৬ ঃ হেলথ ভিজিটরের (চেস্ট ক্লিনিক) চারটি (৪) পদ। **সর্বনিম্ন যোগ্যতা ঃ** (১) প্রার্থীদিগকে অবশ্যই ইংরেজির যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন ম্যাট্রিকুলেট হইতে হইবে (২) মিড-উইফারি পরীক্ষায় পাশ এবং অবশ্যই রেজিস্টার্ড হইতে হইবে (৩) টিউবারকুলোসিস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া কর্তৃক আয়োজিত স্বীকৃত ট্রেনিং ভিজিটর (টিউবারকুলোসিস)-এর নিকট হইতে একটি স্বীকৃত কোর্স অধ্যয়নের পর হেলথ ভিজিটর হিসাবে যোগ্যতা অর্জনকারীকে ইস্যু করা ডিপ্লোমার অধিকারী হইতে হইবে। নার্স (জেনারেল নার্সিং) হিসাবে ট্রেনিং আছে, এইরূপ প্রার্থী বাঞ্ছনীয়। **বেতনক্রম ঃ** ১৫০-২৮০, টাকা। রুল অনুযায়ী প্রদেয় ভাতাদি ছাড়াও, নির্বাচিত প্রার্থিগণ নিম্নোক্ত ভাতাদি পাইবেন ঃ

(১) লণ্ড্রী ভাতা মাসিক ৫, টাকা
(২) ইউনিফর্ম ভাতা বার্ষিক ১১০, টাকা

বয়ঃসীমা ঃ ২০ ও ৩০ বৎসরের মধ্যে।

পর্যায় নং ৭ ঃ ল্যাবরেটরী অ্যাসিস্টেন্টের তিনটি (৩) পদ। **ন্যূনতম যোগ্যতা ঃ** কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বোর্ড হইতে ম্যাট্রিকুলেশন অথবা সমতুল পরীক্ষায় পাশ। ব্যাকটিরিওলজিক্যাল এবং কেমিক্যাল, উভয় প্রকার ল্যাবোরেটরী টেকনিকে কাজ করিয়া থাকা এবং জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার সমর্থনে ডিপ্লোমা অথবা সার্টিফিকেটধারী প্রার্থীদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। **বেতনক্রম ঃ** ১১০,-২০০, টাকা। **বয়ঃসীমা ঃ** ২৫ ও ৩৫ বৎসরের মধ্যে।

পর্যায় নং ৮ ঃ স্টাফ নার্সের আটষট্টিটি (৬৮) পদ। সাতটি পদ তপসিলি জাতি ও নয়টি পদ তপসিলি উপজাতির প্রার্থীদিগের জন্য সংরক্ষিত। **ন্যূনতম যোগ্যতা ঃ** প্রার্থীদিগকে অবশ্যই জুনিয়র নার্সিং মিডউইফারি ডিপ্লোমা অথবা সার্টিফিকেটের অধিকারী হইতে হইবে এবং কোন একটি ভারতীয় রাজ্য মেডিকেল রেজিস্টারে অবশ্যই তাঁহাদের নাম থাকা চাই। তাঁহাদিগকে অবশ্যই ইংরেজি এবং হিন্দি অথবা অসমিয়া অথবা বাংলায় কথা বলিতে সক্ষম হইতে হইবে। **বেতনক্রম ঃ** ১৫০-২৮০, টাকা। রুল অনুযায়ী প্রদেয় ভাতাদি ছাড়াও, নির্বাচিত প্রার্থিগণ নিম্নোক্ত ভাতাদি পাইবেন ঃ

(১) মেসিং ভাতা মাসিক ৪৫, টাকা
(২) লণ্ড্রী ভাতা মাসিক ৫, টাকা
(৩) ইউনিফর্ম ভাতা বার্ষিক ১১০, টাকা

বয়ঃসীমা ঃ ২০ ও ৩৫ বৎসরের মধ্যে।

পর্যায় নং ৯ ঃ নার্সিং সিস্টারের আটটি (৮) পদ। একটি করিয়া পদ তফসিলভুক্ত জাতি/উপজাতির প্রার্থির জন্য সংরক্ষিত। **নিম্নতম যোগ্যতা ঃ** প্রার্থিগণের সিনিয়র নার্সিং সার্টিফিকেট এবং সিনিয়র নার্সিং মিড-উইফারি ডিপ্লোমা থাকা চাই এবং তাঁহাদের নাম কোনো ভারতীয় রাজ্যের একটি মেডিক্যাল রেজিস্টারে লিখিত থাকা চাই। প্রার্থী ইংরেজি এবং হিন্দি অথবা অসমিয়া অথবা বাংলায় কথা বলিতে পারা চাই। **বেতনক্রম ঃ** ২১০-৩২০, টাকা। রুল অনুসারে প্রদেয় সমস্ত প্রকার ভাতা ব্যতীত মনোনীত প্রার্থী উপরে ৮নং পর্যায়ে লিখিত সমস্ত প্রকার ভাতা পাইবার যোগ্য। **বয়ঃসীমা ঃ** ২০ এবং ৩৫ বৎসরের মধ্যে।

পর্যায় নং ১০ ঃ মিড-ওয়াইফের চারটি (৪) পদ। **নিম্নতম যোগ্যতা ঃ** প্রার্থী মিড-ওয়াইফস ডিপ্লোমা পরীক্ষা অথবা মেটার্নিটি সার্টিফিকেট পরীক্ষা পাস করিয়া থাকা চাই এবং তাহাদের নাম কোনো ভারতীয় রাজ্যের কোন একটি মেডিক্যাল রেজিস্টারে রেজিস্টারিভুক্ত হইয়া থাকা চাই। **বয়ঃসীমা ঃ** ১৮ এবং ৪০ বৎসরের মধ্যে। **বেতনক্রম ঃ** ১১০-১৫৫, টাকা। রুল অনুসারে প্রদেয় ভাতা ব্যতীত মনোনীত প্রার্থী নিম্নরূপ ভাতাগুলি পাইবার যোগ্য ঃ—

(১) লণ্ড্রি ভাতা মাসিক ৫, টাকা
(২) ইউনিফর্ম ভাতা বার্ষিক ১১০, টাকা

পর্যায় নং ১১ ঃ এক্স-রে টেকনিশিয়ান (রেডিওগ্রাফার)-এর একটি (১) পদ। নিম্নতম যোগ্যতা ঃ (ক) অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়/বোর্ড হইতে বিশেষ বিষয়রূপে ফিজিক্স সহ ম্যাট্রিকুলেশন বা তত্তুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। অন্যতম বিষয় ফিজিক্স

৮৫০ পৃষ্ঠায়

৮৪৯ পৃষ্ঠার পর

সহ ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে (খ) নির্ধারিত সিলেবাস অনুযায়ী অনুমোদিত বিদ্যায়তনে ট্রেনিংপ্রাপ্ত এবং কোর্সের শেষে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ। **বেতনক্রম :** ১০৫-১৩৫, টাকা। **বয়ঃসীমা :** ১৯ এবং ২৮ বৎসরের মধ্যে।

পর্যায় নং ১২ : ট্রেনী গার্ড গ্রেড 'সি'এর কুড়িটি (২০টি) পদ। তফসিলভুক্ত জাতির জন্য ২টি পদ এবং তফসিলভুক্ত উপজাতির জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত। নিম্নতম যোগ্যতা : অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়/বোর্ড হইতে ম্যাট্রিকুলেশন বা তত্তুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। **ট্রেনিং-এর কাল :** মাসিক ১৩০, টাকা স্টাইপেণ্ড ও তদুপরি দুর্মূল্য ভাতায় ৭ সপ্তাহ। **দৃষ্টিশক্তি :** চশমা ব্যতীত স্বাভাবিক। **বেতনক্রম :** ১৩০-২২৫, টাকা। **বয়ঃসীমা :** ১৮ এবং ২৫ বৎসরের মধ্যে। **পরীক্ষার মান :** পরীক্ষার মান ম্যাট্রিকুলেশনের সমতুল এবং বিষয়গুলি যথা ইংরেজি, গণিত (প্রাথমিক) এবং সাধারণ জ্ঞান-এর জন্য ২½ ঘণ্টা সময়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে মৌখিক পরীক্ষার জন্য ডাকা হইবে।

পর্যায় নং ১৩ : ট্রেন ক্লার্ক-এর বাইশটি (২২টি) পদ। তপসীলী জাতির জন্য ২টি পদ ও তপসীলী উপজাতির জন্য ৩টি পদ সংরক্ষিত। স্থায়ী পদগুলির এক-তৃতীয়াংশ পদ আসাম, নাগাল্যাণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের রাজ্য সরকারের কর্মচারিগণকে (রাজ্য সরকারের অধীনে অন্যূন ৫ বৎসর কাজ করিয়াছেন এবং ১-৩-৬৭ তারিখে বয়স ৩৫ বৎসরের অধিক নহে) বদলি করিয়া পূরণ করা যাইতে পারে। রাজ্য সরকারের কর্মচারিগণকে অবশ্যই তাঁহাদের স্ব স্ব রাজ্য সরকার মারফৎ নির্ধারিত আর এস সি দরখাস্ত ফরমে তাঁহাদের দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে, অন্যথা তাঁহাদের দরখাস্ত বিবেচিত হইবে না। **ন্যূনতম যোগ্যতা :** ম্যাট্রিকুলেশন বা ইহার সমতুল পরীক্ষা উত্তীর্ণ। **বয়ঃসীমা :** ১৮ ও ২১ বৎসর মধ্যে। **বেতনক্রম :** ১১০,-১৮০, টাকা। **পরীক্ষার মান :** উপরোক্ত পর্যায় নং ১২'তে উল্লিখিতমত একই রূপ।

দ্রষ্টব্য : ট্রেন ক্লার্ক বা **ট্রেনী গার্ড গ্রেড 'সি'** পদের জন্য আবেদনকারী প্রার্থীকে দরখাস্তের সহিত অবশ্যই দুইটি সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট আকারের ফটোগ্রাফ পশ্চাদভাগে যথাযথভাবে নাম স্বাক্ষর করিয়া পাঠাইতে হইবে—একটি নির্ধারিত স্থানে ভালভাবে লাগাইয়া দিতে হইবে, অন্যটি দরখাস্ত ফরমের সহিত সার্টিফিকেটের নকলের সহিত গাঁথিয়া দিতে হইবে। দুই কপি ফটোগ্রাফ ব্যতীত দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

পর্যায় নং ১৪ : মেশিন কাটারের একটি (১টি) পদ। **ন্যূনতম যোগ্যতা :** (ক) প্রার্থীর অবশ্যই যেকোন ধরনের পুরুষের পোষাক (সার্জ ও সুতী উভয় প্রকার) সেলাই করিতে সক্ষম হওয়া চাই; (খ) মাপ অনুযায়ী যেকোনরূপে পোষাক কাটিতে (মিতব্যায়িতার সহিত ব্লক প্যাটার্ণে) অবশ্যই সক্ষম হওয়া চাই; (গ) ব্যাণ্ড স এবং স্ট্যাণ্ডার্ড হ্যাণ্ড কাটিং মেশিন চালনায় অবশ্যই সক্ষম হওয়া চাই; (ঘ) ইংরেজি ও মাতৃভাষা পড়িতে ও লিখিতে অবশ্যই সমর্থ হওয়া আবশ্যক। **বেতনক্রম :** ১৩০,-২১২, টাকা। **বয়ঃসীমা :** ১৮ ও ৩৫ বৎসর মধ্যে। বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ও অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি ইত্যাদিতে কাজ করিয়াছেন এইরূপ প্রার্থিগণের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।

পর্যায় নং ১৫ : প্রিণ্টিং প্রেসের জন্য **এসিস্ট্যাণ্ট ফোরম্যান-এর** একটি (১টি) পদ। **ন্যূনতম যোগ্যতা :** (১) ম্যাট্রিকুলেশন বা ইহার সমতুল পরীক্ষা উত্তীর্ণ; (২) প্রিণ্টিং টেকনোলজিতে স্টেট ডিপ্লোমা বা অল ইণ্ডিয়া সার্টিফিকেট বা ইহার সমতুল, (৩) অটোম্যাটিকস, বাইণ্ডিং ও স্টিরিও-টাইপিং সহ প্রিণ্টিং মেশিন ও মেকানিক্যাল কম্পোজিং-এ ন্যূনপক্ষে ৪ হইতে ৬ বৎসরের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং (৪) ফ্যাক্টরি এ্যাক্ট, পেমেণ্ট অব ওয়েজেস অ্যাক্ট, জব কস্টিং ও এস্টিমেটিং-এ কার্যকরী জ্ঞান। **বেতনক্রম :** ৩৩৫,-৪২৫, টাকা। **বয়ঃসীমা :** ২৫ ও ৪০ বৎসর মধ্যে।

ডি ৫।২পি।১
১৬-৩-৬৭

দেশ

৩৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২২

শনিবার ১৮ চৈত্র ১৩৭৩

সম্পাদক
শ্রীঅশোককুমার সরকার
সহকারী সম্পাদক
শ্রীসাগরময় ঘোষ

টেলিফোন

চাঁদার হার
কলিকাতায়

বার্ষিক	২৫.০০
ষাণ্মাসিক	১২.৫০
ত্রৈমাসিক	৬.২৫

Saturday, 1 April 1967

কলকাতায় বসন্ত

মাসটা চৈত্র, পাঁজির হিসেবে বসন্তকাল। অবশ্য মানুষের স্বভাব এই যে, বসন্ত বলতে ফাল্গুনের যতটা সমাদর করে চৈত্রকে ততটা নয়। হয়ত বেচারী চৈত্র বছর-ফুরানোর মাস বলেই কেমন একটু উপেক্ষা পায়, বা হতে পারে তার আবহাওয়ায় আসন্ন গ্রীষ্মের তাপ থাকে বলেই তার প্রতি মানুষ ততটা প্রীত নয়। যাই হোক বসন্ত এসেছে বেশ কিছু আগেই এবং এখন তার যাবার বেলা, দোলোৎসবও শেষ হল, তবু আমাদের তরফ থেকে বসন্তের অভ্যর্থনা গাওয়া হল না।

কলকাতায় বসন্ত অনেকটা দূরপ্রবাসিনীর মতন, স্বপ্নে তাকে দেখতে হয়। তবু যতটুকু চোখে পড়ে ততটুকু আমাদের চোখে যে না পড়েছে এমন নয় কিন্তু গত এক দেড়টা মাস নির্বাচন নিয়ে অন্দর-বাহিরে যে উত্তেজনা গিয়েছে তাতে ঋতুরাজ বসন্ত নিয়ে কারুর পক্ষেই মাথা ঘামানোর অবসর হয়নি। বলা বাহুল্য, বসন্তের দিকে চোখ কান না ফিরিয়ে লোকে খবরের কাগজের পাতার দিকেই চোখ রেখেছে বেশি, কান পেতেছে রেডিয়োয়। আপাতত নির্বাচন-পর্বের সমস্ত উত্তেজনা শান্ত, রাজ্য থেকে শুরু করে কেন্দ্রে পর্যন্ত মন্ত্রিসভা গঠিত হয়ে গেছে; কাজেই চোখ ফিরিয়ে যাই-যাই বসন্তকে দেখার সুযোগ বুঝি হয়েছে।

কলকাতায় বসন্ত আসে নিজের খেয়ালে। তার আসা বড় সন্তর্পণে। কচিৎ কদাচিত বিকেল এবং সন্ধ্যের দিকে হঠাৎ ফুরফুরে বাতাস এসে গায়ে লাগে, মনে হয় বুঝি এ বাতাস বসন্তের। পথ চলতে সহসা চোখে পড়ে রাস্তার ধারে সারা বছরের শুকনো গাছটা কেমন যেন সজীব সজীব কোথাও কোন ফুল বা কুঁড়ি ধরেছে গাছে, সন্দেহ হয় বসন্ত এসেছে। তরিতরকারির বাজারে হঠাৎ আসে নিমপাতা আর সজনে ডাঁটা, বাড়ির কর্তার খেয়াল হয় বসন্ত এসেছে। আর বসন্ত আসার সবচেয়ে বড় ঘোষণা পাওয়া যায় কলকাতা কর্পোরেশনের দেওয়ালে লটকানো সাবধান-বাণীতে 'বসন্তের টিকা নিন'।

শহরের মানুষের কাছে ঋতুপতি বসন্ত তাই স্বপ্নের জিনিস, প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। অলিগলিতে বসন্তের এক ঝলক বাতাস কোনোদিন যদি বা আসে কিন্তু কে কবে এই চাপা গলিতে নিদেনপক্ষে একটি শিমুল ফুল দেখল? না ফুল না পাখি না বা বসন্তের সেই মৃদুমন্দ সমীরণ। তবু দশ বারো বছরের মেয়েটিও রেডিয়োয় শুনে শুনে কিংবা পাড়ার গানের ক্লাসে শুনে শুনেই গান শিখেছে 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে...।'

কলকাতার পার্কগুলো যে কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন করে জানি না, বেশীর ভাগ পার্কই নেড়া, কিছু মামুলি গাছ, কিছুবা কাঁটাগাছের ঝোপ। সকাল সন্ধ্যে এই পার্কটুকুই দমবন্ধ শহরে মানুষের একটু ফাঁকা বাতাস নেবার জায়গা। ধুলো ধোঁয়া ভরা শহর কলকাতার পার্কই যে বিশুদ্ধ বাতাস বিলোয় এমন ধারণা অনেকের আছে। এ-ধারণা ভেঙে লাভ নেই। তবে একথা আমাদের মনে হয়েছে চেষ্টা থাকলে কলকাতার নেড়া পার্ককে কিছুটা সজীব করা চলে—অর্থাৎ ততটুকু সজীব যাতে শহুরে মানুষ একটু প্রাকৃতিক পরিবেশের স্পর্শ পায়। বসন্ত যে জাগ্রত এর পরিচয় কলকাতার পার্কে রাখা যায়, বাহুল্য না করেও। কিন্তু শহরটাকে যাঁরা চালান তাঁদের দৃষ্টি এ-সব ছোটখাট ব্যাপারে কোনোদিনই পড়ে না। কেন পড়ে না জানি না। শুনেছি, বিদেশে বড় বড় শহরে পার্ক একটা দর্শনীয় বিষয়—কেননা প্রতি শহরের পার্ক সেই অঞ্চলের মানুষের রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞানের বড় রকম একটা পরিচয়। কলকাতার বেশির ভাগ পার্কেই শুকনো ধুলো ওড়ে, সেখানে শরৎ, শীত, বসন্তে কেবল ধুলোই একমাত্র বস্তু যা দেখা যায়, পাওয়া যায়।

এই যে বসন্ত ঋতুটি কলকাতায় চুপিসাড়ে এল এবং যাই-যাই করছে—এর কোনো চিহ্নই কলকাতার বুকে ক্ষণিকের জন্যও ফুটে উঠল না। অথচ পৌরপিতারা সামান্য চেষ্টা করলেই শহর কলকাতার মধ্যে পার্কগুলোকে এই প্রকৃতি পরিচয়ের জন্য ব্যবহার করতে পারতেন। নিতান্ত একটা শিমুল, নিদেনপক্ষে একটি কাঠ-চাঁপাও তো থাকতে পারত, থাকতে পারত কলাঝোপ। কোথাও কোথাও যে এ-রকম চোখে পড়ে না তাও তো নয়, অবশ্য কর্পোরেশনের চোখে এলাকা অভিজাত হলে তবেই তার দিকে নজর। যাই হোক, কলকাতার পার্কগুলিকে যদি আমাদের ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে কিঞ্চিৎ সজ্জিত করা যায়, আশা করি তাতে শহরের মান বা ইজ্জত যাবে না।

[চতুর্থ নির্বাচনের ফলে পশ্চিম বাংলায় শাসনব্যবস্থার রাজনৈতিক চেহারাটা বদলে গিয়েছে সম্পূর্ণ-ভাবে। বদলের পালা শুরু হলে আয়নায় মুখ দেখা প্রয়োজন হয়। 'দেশ দর্পণ' সেই আয়না। এটা রোজনামচা নয়। আলোচনা। সমগ্র পটভূমির সুবিন্যাস।]

দুই দশকের কংগ্রেসী শাসন ব্যবস্থা বদলে গেল কয়েক সপ্তাহ আগে। যেদিন যুক্ত ফ্রন্টের সরকার গঠন করে পশ্চিম বাংলার নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি এবং তাঁর সঙ্গে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু, অথবা শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা রাজভবন থেকে শপথ নিয়ে বেরিয়ে এলেন, সেদিন সদর গেটে অপেক্ষা করছিল জনতা। নূতন সরকারকে অকুণ্ঠ চিত্তে সেদিন জনতা সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিল। সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিল। সমর্থন জানিয়েছিল ফুলের মালা দিয়ে।

জনগণের অভিনন্দনের মধ্যে ছিল নূতন সরকারের প্রতি অনুচ্চারিত 'ম্যানডেট'। দুই দশকের কংগ্রেসী শাসনে জনসাধারণের মনে যে আশাভঙ্গের ক্ষোভ জমে উঠেছিল, তারই প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি ছিল নির্বাচনের ফলাফলে। তাই কংগ্রেসী শাসনের অবসানে সম্মিলিত বামপন্থীদলের যুক্ত ফ্রন্টের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে জন-সাধারণের মনে নূতনভাবে আশা ও আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হয়েছে। তাদের আশা, নূতন সরকার খাদ্য, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি মূল সমস্যাগুলো সমাধান করতে সক্ষম হবে। নূতন সরকারের কাছে নূতন করে পাওয়ার আশা। এটাই জনসাধারণের 'ম্যানডেট'।

সে ম্যানডেট নূতন সরকার উপেক্ষা করতে পারে না। পারে না বলেই শাসন-ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করা হল। সম্মিলিতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হল এই নবগঠিত যুক্ত ফ্রন্ট। সে অঙ্গীকার ১৮ দফা কর্মসূচীর মাধ্যমে জনসমক্ষে রাখা হল। এই কর্মসূচী সব কয়টি বামপন্থী দলের সম্পূর্ণ সমর্থনে রচিত হয়েছে। অবশ্য এ কথা কোন দল বা যুক্ত ফ্রন্ট বলেনি যে, এই কর্মসূচীকে রূপায়িত করা খুব সহজ হবে। একথাও বলেনি যে, এই ১৮ দফা কর্মসূচীকে রূপায়িত করতে পারলেই জনসাধারণের সকল সমস্যার সমাধান হবে।

আঠার দফা কর্মসূচী আজ সুবিদিত। এর মূল কথা, মূল সমস্যাগুলোর সঙ্গে মোকাবিলা করা। যেমন, খাদ্য, বেকারি, ছাটাই, ভূমিবণ্টন, দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি রোধ, অর্থ-নৈতিক দুর্গতদের সাহায্য করা, দুর্নীতি দূর করা ইত্যাদি। কর্মসূচীতে প্রতিটি সমস্যার কথা উল্লেখ করা আছে। এবং প্রতিটি সমস্যাই অত্যন্ত জটিল। যেমন, ধরা যাক খাদ্যের কথা। বিধানসভায় কংগ্রেস বিরোধী দলের নেতা শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছেন, পনের দিনেও নূতন সরকার তাদের নূতন খাদ্যনীতি ঘোষণা করতে পারেনি।

খাদ্যনীতি যদি পরিবর্তন করতে হয়, তাহলে ১৫ দিনে বা তিন সপ্তাহের মধ্যে তা করা সম্ভব নয়। সরকারের খাদ্যনীতি যাই হোক না কেন, মূল কথাটা স্বীকার করে নিতে হবে যে, পশ্চিম বাংলায় যথেষ্ট খাদ্য নেই। যা প্রয়োজন, তার চাইতে আছে অনেক কম। এই কমের পরিমাণ যা-ই হোক না কেন, সরকারকে চাহিদা মেটাতে হলে পশ্চিম বাংলার বাইরের থেকে শস্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিম বাংলা সরকারের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। কারণ, প্রতিটি রাজ্য খাদ্যের ব্যাপারে স্বয়ং-শাসিত এলাকা। সংগ্রহ করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার।

তাই বণ্টননীতি নির্ধারণের আগে সরকারকে পরিষ্কারভাবে জেনে নিতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের ভাণ্ডার থেকে কতটা পরিমাণ চাল ও গম পশ্চিম বাংলার পক্ষে পাওয়া সম্ভব। বণ্টন নীতি ঠিক করার আগে এই চাওয়া-পাওয়ার ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। অবশ্য পাওয়ার ব্যাপারেও পশ্চিম বাংলার ভাণ্ডার থেকে কতটা শস্য আহরণ করা সম্ভব, তা-ও সরকারকে জেনে নিতে হবে। এখানে শস্য আহরণের ভার বর্তমানে ফুড কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার হাতে। এ বছর কংগ্রেসী সরকারের পরিবর্তিত নীতির ফলে শস্য আহরণ তেমন সুবিধাজনক হয়নি। হয়ত আহরণ করার জন্য যে মূল্য নির্ধারিত ছিল তা নিয়ে বিভিন্ন মত থাকতে পারে এবং এই মূল্য-হার বৃদ্ধি করা সম্ভব কিনা তা-ও বিচার্য বিষয় হতে পারে। কিন্তু বাস্তব কথাটা হল, শস্য আহরণ পর্যাপ্ত হয়নি। পাওয়া যায়নি।

এই আহরণ করা শস্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়ার প্রতিশ্রুতির যোগ বিয়োগের উপরই খাদ্য বণ্টনের নীতি নির্ভর করছে। স্বভাবতই, বণ্টননীতির বড় অংশের দায়িত্ব পড়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। কেন্দ্রের খাদ্যনীতিও তাই এর সঙ্গে বিশেষভাবে সংযুক্ত। অথচ কেন্দ্রের নীতি এখনও খুব স্পষ্ট নয়। উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু বাজেট ভাষণে বলেছেন, কেন্দ্রের কোন জাতীয় নীতি নেই বলেই আজ জনসাধারণকে উপোস করে থাকতে হয়। এমন কি, খাদ্যের বাজেটও আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি।

খাদ্যের বাজেট রচনা করাও খুব সহজ কথা নয়। খাদ্যের বাজেট বলতে বোঝায়— কতটা পাওয়া যাবে, কতটা খরচ হবে। পাওয়ার ব্যাপারেও অনেক বাধা। যেমন, উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলো কতটা দেবে, বা দেবে কিনা, সে প্রশ্নও আছে। কারণ, উদ্বৃত্ত রাজ্য-গুলো মূল্যবৃদ্ধির আতঙ্কে কখনো শস্য হাতছাড়া করতে রাজী হয়নি। তা ছাড়া আছে বিদেশ থেকে কতটা পাওয়া যাবে ঘাটতি মেটাবার জন্য। এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে ইণ্ডিয়া এইড ক্লাবের বৈঠক বসছে প্যারিসে। এই বৈঠকে হয়ত বিদেশ থেকে শস্য পাওয়ার একটা প্রতিশ্রুতি নির্ধারিত হতে পারে। মোট কথা, সবটাই নির্ভর করছে এপ্রিল মাসে দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রীদের যে বৈঠক বসছে তার উপর।

তবু যুক্ত ফ্রন্ট সরকার সর্বভাবে চেষ্টা করছে পশ্চিম বাংলার খাদ্য বাজেটের একটা কাঠামো দাঁড় করাবার। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখার্জি, উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এবং খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ দিল্লি গিয়েছিলেন কেন্দ্রের মনোভাব জানবার জন্য। খাদ্যমন্ত্রী ডঃ ঘোষ পৃথকভাবে

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সকাশে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে কথাও বলেছেন। এ'রা মনে করছেন যে, আশানুরূপ না হলেও কেন্দ্রের মনোভাব বিরূপ কিছু নয়। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, কেন্দ্রের সঙ্গে কথাবার্তার ফলে হয়ত অবস্থাটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। তা যদি হয়, যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের খাদ্যনীতির চূড়ান্ত রূপ দিয়ে কার্যকরী করতে দেরি হবে না। তবু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, খাদ্য সমস্যা অত্যন্ত জটিল বলেই তার সমাধানের পথও অত্যন্ত পিচ্ছিল।

খাদ্য সমস্যার মত অন্যান্য সমস্যা-গুলোও খুব সহজ নয়। প্রতিটি সমস্যায় জটিলতার অন্ত নেই। তবু কতকগুলো ব্যাপারে যুক্ত সরকার নূতন নূতন পন্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। ভূমি রাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার ইতিমধ্যেই ভূমি সংস্কারের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন আমূল সংস্কার হয়ত এখনই সম্ভব নয়; তবু যতটা সম্ভব ততটা তিনি করবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁর প্রধান চিন্তা হল গরীব ও মধ্যবিত্ত কৃষকদের বিত্তবান কৃষকদের হাত থেকে রক্ষা করা। সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি সেচের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের দিকে নজর রেখে সমগ্র রাজ্যের সেচ পরি-কল্পনা ঢেলে সাজাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে-ছেন। আর শ্রমমন্ত্রী শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি জটিল কাজে হাত দিয়েছেন।

শ্রীব্যানার্জি মনে করেন যে, প্রগতিশীল শ্রমিকনীতি চালু করার প্রয়োজন—যদি শ্রমিক ও উৎপাদনের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে হয়। তিনি তাঁর মূল বক্তব্য ইতিমধ্যেই শ্রমিক-মালিক প্রতিনিধিদের সামনে রেখেছেন। তাঁদের বক্তব্য শোনার পর শ্রীব্যানার্জি নীতি হিসাবে যেটা গ্রহণ করেছেন, তার মূল কথা হল শ্রমিক মালিক বিরোধে পুলিস হস্তক্ষেপ করবে না এবং বিরোধের মীমাংসা ত্বরান্বিত করা হবে।

সর্বতোভাবে যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের পক্ষ থেকে জনসাধারণের 'ম্যানডেট'কে রূপায়িত করার একটা প্রত্যক্ষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের রাজনৈতিক চেহারা সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই নানারকম জল্পনাকল্পনা যে শোনা যাচ্ছে না এমন নয়। যে সরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে আস্থাশীল দলের সমর্থন নিয়ে গঠিত, সে সরকার সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা হবেই। সেটা যাঁরা নূতন সরকার গঠন করেছেন তাঁরাও জানেন। সে কারণেই যুক্ত ফ্রণ্ট সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রন্টের তরফ থেকে দলগতভাবে সরকারকে নীতিগত বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

এই কমিটিকে অনেকে বলেন, 'কিচেন ক্যাবিনেট' বা 'সুপার ক্যাবিনেট'। এই ধরনের 'কিচেন ক্যাবিনেট' এই প্রথম নয়। আমেরিকার স্বর্গত জন কেনেডি যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন, তিনিও তাঁর কাজের সুবিধার জন্য একটি 'কিচেন ক্যাবিনেট' গঠন করে নিয়েছিলেন। কেনেডির 'কিচেন ক্যাবিনেটে' নাম-করা পরামর্শদাতারা ছিলেন। তাঁরা পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি ব্যাপারে দিক্‌পাল। এ'দের পরামর্শ কেনেডি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতেন। উদ্দেশ্য ছিল—যাতে নিজে কোন ভুল নীতি না নিয়ে ফেলেন।

এ ক্ষেত্রেও তাই। প্রকৃতপক্ষে, যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক চেহারা নেই। পরিষদীয় গণতন্ত্রে পার্টি বা দল সরকার গঠন করবে এবং সরকারী নীতি চালু করবে এটা রীতি। যতদিন কংগ্রেস ক্ষমতাসীন ছিল, তত দিন সরকারী নীতির দায়িত্ব নিতে হত পার্টিকে। কিন্তু যখন কয়েকটি বিভিন্ন মতাবলম্বী দল একসঙ্গে মিলে সরকার গঠন করে, তখন সরকারী নীতির দায়িত্ব সব কয়টি পার্টিকে সমানভাবে স্বীকার করে নিতে হয়। অথচ সরকারের নিজস্ব কোন রাজনৈতিক পরিচয় নেই।

অবস্থাটা যুক্ত ফ্রণ্টের কোন দলের পক্ষেই খুব সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তাই সরকারের যে-সব নীতির রাজ-নৈতিক প্রতিক্রিয়া থাকা সম্ভব সেইসব নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখার মধ্যে কোন অশোভনতা নেই। বরং দলসমষ্টি হিসাবে যে পরামর্শ সরকারের সামনে রাখা যায় তাতে সরকারের দিক থেকে কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। তাই যুক্ত ফ্রণ্টের দল-গুলোর বে-সরকারী প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয়েছে বর্তমান পরামর্শদাতা কমিটি বা

'কিচেন ক্যাবিনেট'। এই 'কিচেন ক্যাবিনেট' মামুলি কোন ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায় না। খাদ্য বা অনুরূপ কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়েই এদের মন্ত্রণা।

সর্বতোভাবে, সক্রিয় ও সুষ্ঠুভাবে যুক্ত ফ্রন্টের সরকারকে পরিচালিত করাই এই 'কিচেন ক্যাবিনেট'-এর উদ্দেশ্য। কারণ জনসাধারণের 'ম্যানডেট'-এর গুরুত্ব এরা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করে। সে 'ম্যানডেট'কে ক্ষুণ্ণ করা বা উপেক্ষা করার ক্ষমতা নিশ্চয় কোন রাজনৈতিক দলের নেই। তবু প্রশ্নটা বিভিন্ন মহলে উচ্চারিত হচ্ছে—'টি'কবে ত?' স্বভাবতই মনে হবে, এ প্রশ্নটা কেন উঠছে; যখন দেখা যাচ্ছে, সব দলের নেতারাই প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সরকারের কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রশ্নটা উঠেছে হয়ত কোন কোন দলের দ্বিধাকে লক্ষ করে। যুক্ত সরকার গঠনের গোড়ার দিকে অনেকেই লক্ষ করেছে যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে একটা দ্বিধা ছিল। দ্বিধার কারণ মুখ্যত তাদের প্রকাশ্য উক্তি পরিষদীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে। নির্বাচনের আগে এই পার্টির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, পরিষদীয় গণতন্ত্রে এরা আস্থাশীল নয়। তবু নির্বাচনে যখন কংগ্রেস পরাস্ত হল তখন এই পরিষদীয় গণতন্ত্রের দায়িত্ব মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের উপর বিশেষভাবে ন্যস্ত হল; কারণ, দলগতভাবে যুক্ত ফ্রন্টের মধ্যে এদেরই সংখ্যা সর্বাধিক। দ্বিতীয় কারণ—নির্বাচনের আগে কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে বিরোধ। কম্যুনিস্ট পার্টি পরিষদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলেই কংগ্রেসের পাল্টা সরকার গঠনের জন্য বামপন্থী দলের সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনী ফ্রন্ট গঠনের দাবি করেছিল। সে দাবি উপেক্ষিত হয়েছিল।

এ ছাড়াও যুক্ত ফ্রন্ট সরকার সম্বন্ধে দলগতভাবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে একটা ভিন্ন সুর শোনা যাচ্ছে। গুঞ্জনটা ওঠে পার্টির প্রভাবশালী নেতৃত্বের এক অংশ থেকে। প্রকাশ্যে শ্রী বি টি রণদিভে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার গণতান্ত্রিক সদস্যদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অতিরঞ্জিত হতে পারে; তবু ন্যূনতম আশাকে বাস্তবে রূপায়িত দেখার অধিকার তাদের আছে। "আর বাকী আশা সম্পর্কে তাদের এ-কথা বুঝতে হবে যে, বর্তমান কাঠামোর এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ারগুলির আমূল পরিবর্তন না করে গণতান্ত্রিক পার্টিগুলো আর এক পা-ও অগ্রসর হতে পারে না।" নির্বাচন, শ্রীরণদিভের মতে জনসাধারণের সংগ্রামের "সাময়িক বিরতি মাত্র"। সেই কারণে তিনি মনে করেন, "মন্ত্রীদের সাহায্যে আবার সেই সংগ্রাম শুরু করতে হবে" এবং "আজকের দিনে জরুরী কাজ হলো আমাদের পার্টিকে সবরকমের আত্মসন্তুষ্টি বিসর্জন দিতে হবে।"

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মনীষী প্রাবন্ধিক শ্রীআবু সয়ীদ আইয়ুব রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কবিতাপ্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁর 'অমঙ্গলবোধ ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে। আগামী সপ্তাহ থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।

পার্টির পশ্চিম বাংলার শীর্ষ স্থানীয় নেতারা যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের "গণতান্ত্রিক নীতির স্পষ্টতর বিবৃতি"কে অভিনন্দিত করেছে; কারণ, জনসাধারণকে কায়েমী স্বার্থের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু একথাও বলা হয়েছে যে, যদি মন্ত্রিসভার অন্তর্গত পার্টিগুলির মধ্যে এবিষয়ে পরিষ্কার বোঝাপড়া না থাকে তবে রাষ্ট্রের দমনমূলক যন্ত্রকে সংগ্রামী জনতার বিরুদ্ধে চলে যাবার সুযোগ দেওয়া হবে, "কিংবা অচিরে তারা বিভক্ত হয়ে যাবে এবং এই প্রশ্নে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে যাবে।"

দেখা যাচ্ছে, পার্টির তরফ থেকে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে না। উপেক্ষা না করার হয়ত প্রচ্ছন্ন একটা কারণও আছে। দলের মধ্যে কিছু সংখ্যক সদস্য মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে সরকারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত হওয়াটা মেনে নিতে পারেনি। তারা বিদ্রোহের সুরে কথা বলতে শুরু করেছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার কথাও উঠেছে। এমনকি, পার্টির পরবর্তী কংগ্রেস আহ্বান করার দাবিও উঠেছে।

এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখা কমিটি কলকাতায় মিলিত হয়েছিল। এই কমিটির সভায় শ্রীরণদিভে, শ্রীসুন্দরাইয়া এবং শ্রীবাসবপুন্নিয়া উপস্থিত ছিলেন। এ'দের উপস্থিতিতেই কমিটি সিদ্ধান্ত করে যে, যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে ঠিক পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে পার্টির সংগঠনগুলিকে সক্রিয় সহযোগিতা দেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে। তা ছাড়া, পার্টির পক্ষ থেকে গণ-আন্দোলনও চালিয়ে যাওয়া হবে—যাতে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার জনগণের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। তবে এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, নিজস্ব নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার পার্টির সব সময়ই থাকবে।

রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। কারণ, অনেকের ধারণা, পার্টিকে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের আরও কাছে নিয়ে যেতে এরপর আর অসুবিধা হবে না। এপ্রিল মাসে পার্টির পলিট ব্যুরো যখন কলকাতায় মিলিত হবে তখন অবস্থাটা হয়ত আরও সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। তবু জনসাধারণের 'ম্যানডেট' নিশ্চয়ই পার্টির কাছে উপেক্ষণীয় নয়।

যুদ্ধ-মাহাত্ম্য

ভিয়েতনামের যুদ্ধ আপাতত থামবার লক্ষণ দেখা যায় না। আমেরিকার বিরোধী যাঁরা, তাঁরা বলেন, এটা হল সবচেয়ে নোংরা যুদ্ধ, 'ডার্টিয়েস্ট ওয়র'। তার প্রমাণ হিসেবে বলা হয়, আমেরিকা ছোট্ট একটি দেশে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করছে, আর ব্যবহার করছে সেই বীভৎস নরঘাতী বোমা—নাপ্‌লাম—যা মানুষকে এক ঘায়ে মেরে ফেলে না, সারা দেহের চামড়া পুড়িয়ে খসিয়ে ফেলে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে মারে। বাস্তববাদীরা এর জবাবে বলেন, এতে দোষ কোথায়? যুদ্ধমাত্রেই ভয়াবহ, শত্রুকে ঘায়েল করতে পারাই একমাত্র লক্ষ, কাজেই কোন্ যুদ্ধাস্ত্র কতখানি যন্ত্রণাকর সে বিচার অর্থহীন। হিরোশিমায় পরমাণু বোমায় বিধ্বংসী বীভৎসতা যখন দুনিয়ার রণনৈতিক আচরণের জাতে উঠে গেছে তখন নাপ্‌লাম বোমায় আর দোষ কী? যুক্তি আরও আছে, ভিয়েতনামের এই "নোংরা যুদ্ধে" অপর পক্ষ ভিয়েতকং গেরিলাও তো দক্ষিণ ভিয়েতনামের গ্রামবাসীদের উপর নানারকম নৃশংস অত্যাচার চালাচ্ছে। উপরন্তু তাদের মতলব খারাপ, তারা কম্যুনিস্ট, দক্ষিণ ভিয়েতনামকে তারা কম্যুনিস্ট শাসনে আনতে চায়। এ পক্ষের উদ্দেশ্য সে তুলনায় অনেক ভাল, আমেরিকা রক্ষা করতে চায় দক্ষিণ ভিয়েতনামের স্বাধীনতা। উদ্দেশ্যটা যখন সাধু তখন দক্ষিণ ভিয়েতনামকে রক্ষার জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে নাপ্‌লাম বোমা এবং এমন কী, দরকার মনে হলে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করা অন্যায় হবে কেন?

মার্কিন পক্ষের এসব সৎ-যুক্তিতে আমেরিকাতেও অনেকে সায় দিচ্ছেন না। তাঁদের অভিযোগ, প্রেসিডেণ্ট জনসনের জিদই ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় বাধা। জনসন-নীতির মার্কিন সমালোচকরা অনেকে ধুরন্ধর রাজনীতিক, সাংবাদিক এবং অভিজ্ঞ কূটনীতিক। সেনেটার ফুলব্রাইট, রবার্ট কেনেডী, ওয়াল্টার লিপম্যান, জর্জ কীনান, জেমস রেস্টন, আর্থার শ্লেসিঙ্গার প্রভৃতি সমালোচকরা বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক মহলে সুপরিচিত; এঁরা নির্বোধ অথবা দিক্‌ভ্রান্ত অথবা প্রচ্ছন্ন কম্যুনিস্ট, এমন অভিযোগ এ পর্যন্ত শোনা যায় নি। ভিয়েতনামের ভূগোল, ইতিহাস সম্পর্কে এঁদের কিছু জ্ঞান নেই, পরীক্ষায় দেখা গেছে এঁরা একদম ফেল, সে-রকম প্রমাণ কেউ দিতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। বড় জোর মেনে নিতে পারা যায় যে, ভিয়েতনামের যুদ্ধ সম্পর্কে নানা পক্ষের নানা মত। স্বাধীন দুনিয়াকে কম্যুনিজমের হাত থেকে রক্ষার উপায় সম্পর্কে ডালেস, ম্যাকার্থীর একটা বিশিষ্ট মত ছিল, কিন্তু সেটাই একমাত্র অভ্রান্ত মত বলে কখনও স্বীকৃত হয় নি।

প্রেসিডেণ্ট জনসনের নিজের মতই কি আগাগোড়া ঠিক থেকেছে? ১৯৬৪ সনে প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হওয়ার সময় জনসন ঘোষণা করেছিলেন, ভিয়েতনামের সমস্যা যুদ্ধের মারফত মীমাংসা-চেষ্টায় তাঁর উৎসাহ নেই। এখন অবস্থা এই যে, ভিয়েতনামের যুদ্ধে প্রেসিডেণ্ট জনসন নিয়োগ করেছেন ৪ লাখ সৈন্য, হয়তো এই সৈন্যসংখ্যা শীঘ্রই হবে ৫।৬ লাখ। এ ছাড়া আছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ৭ লাখ সৈন্য। উপরন্তু স্বাধীন দুনিয়া রক্ষার ডাকে এসেছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে কিছু সৈন্যবাহিনী। অপর পক্ষে, ভিয়েতকং গেরিলাদের দিকে এ পর্যন্ত চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্যদের টিকি দেখা যায় নি। পিকিং-এর অতি বিপ্লবীদের হাঁকডাকের জোর যত, ভিয়েতনামের লড়াইয়ে নামবার গরজ ততটা নয়। খাস উত্তর ভিয়েতনামের সৈন্যই বা কতজন অনুপ্রবেশ করেছে দক্ষিণ ভিয়েতনামে? মার্কিন সেনানায়করা সে সম্পর্কে সঠিক হিসেব দিতে নারাজ, তাঁদের মতে ভিয়েতকং গেরিলাবাহিনীর অধিকাংশই দক্ষিণ ভিয়েতনামের লোক, উত্তর থেকে আমদানি নয়।

ভিয়েতকং-এর অস্ত্রশস্ত্র রসদ বেশীর ভাগ অবশ্য আসে উত্তর ভিয়েতনাম থেকে। সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তেমনই দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধসম্ভার সবটাই আমেরিকার। ১৯৫৪ সনের জেনিভা চুক্তির শর্ত ছিল, ভিয়েতনামের উত্তর বা দক্ষিণ কোন অংশেই বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র অথবা সৈন্য আমদানী করা হবে না। এই শর্ত যথাযথ প্রতিপালিত হচ্ছে কি না সেটা দেখাশোনার জন্য গঠিত হয় আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন। জেনিভা চুক্তিতে আমেরিকা সই দেয় নি, দক্ষিণ ভিয়েতনামও না। তারপর কেন কীভাবে বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র, সামরিক পরামর্শদাতা ইত্যাদি ভিয়েতনামে জমায়েত হয়েছে সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। জেনিভা চুক্তির আর একটি শর্ত ছিল, আন্তর্জাতিক তদারকীতে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মিলন ঘটানোর ব্যবস্থা এবং সাধারণ নির্বাচনের মারফত সংযুক্ত ভিয়েতনামের গভর্নমেণ্ট গঠন। ১৯৫৬ সনেই এই শর্তের দফা রফা হয়। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাউয়ার স্পষ্ট বলেন, ভিয়েতনামে ভোট নেওয়া হলে জিতবে হো-চি মিনের দলবল, গোটা ভিয়েতনামই হবে কম্যুনিস্ট কবলিত, স্বাধীন দুনিয়ার পক্ষে, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার, এতে সর্বনাশ। কাজেই জেনিভা চুক্তির শর্তমত স্বাধীন নির্বাচনের প্রস্তাব নাকচ হল। এরপর থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক তদারকীর তৎপরতা বৃদ্ধি এবং অপরপক্ষে ভিয়েতকং গেরিলাদের।

দুর্গতি গোটা দেশটার। ভিয়েতকং গেরিলাদের দখলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ, মার্কিন সৈন্যবাহিনী এই ভিয়েতকংদের কবে উৎখাত করতে পারবে তার নিশ্চয়তা নেই। প্রেসিডেণ্ট জনসন ও তাঁর বিশেষজ্ঞদের ধারণা, উত্তর ভিয়েতনামকে শায়েস্তা করা গেলে দক্ষিণে ভিয়েতকং গেরিলাদের ক্রমশ ঘেরাও এবং উৎখাত করা সহজ হবে; তবুও কাজটা শেষ করতে লাগবে সম্ভবত আরও ২।৩ বছর। উত্তর ভিয়েতনামকে শায়েস্তা করবার জন্য থাইলাণ্ডে আমেরিকার বড় রকমের বোমারু বিমানের ঘাঁটি তৈরী হয়েছে। থাইল্যাণ্ডের মিলিটারীরাজ আমেরিকাকে এই ঘাঁটি বসানোর অনুমতি দিয়েছেন; স্বাধীন দেশের সরকার স্বাধীনভাবেই অনুমতি দিয়েছেন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য থাইল্যাণ্ডে মার্কিন বিমান ঘাঁটি বসাতে। রণনৈতিক ভূগোলে সাধারণ বুদ্ধিতেও বোঝা যায়, বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবীর সাহায্য লাগে না। আর ইতিহাস? থাইল্যাণ্ডের ইতিহাসে এ ব্যাপারটা নতুন, কারণ থাইরা নাকি বিদেশী শক্তির উপস্থিতি পছন্দ করে না—সে বিদেশী শক্তির রাজনৈতিক রংটা যাই হোক না কেন। এরপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বর্মাতেও মার্কিন ঘাঁটি গড়বার দরকার হতে পারে শোনা যাচ্ছে; তেমনই ভারত মহাসাগরে। কম্যুনিস্ট বিপদের অস্তিত্ব অথবা সূক্ষ্ম তত্ত্ব চুম্বকের মত আকর্ষণ করে মার্কিন সামরিক অভিভাবকত্ব, সাম্প্রতিককালের ইতিহাসের এই মহাসত্য না মেনে উপায় নেই।

২৭।৩।৬৭

আরেকটি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হল।
শেয়াল---শেয়াল---শেয়াল
বিরোধী দল
হরিয়ানা
মধ্যবর্তীকালীন বাজেটে বিপুল ঘাটতি।
'মোরারজী হইতে সাবধান।'
মধ্যবর্তীকালীন বাজেট
এস কে পাটিল উপস্থিত কোনো উপ-নির্বাচনে দাঁড়াতে চান না।
কিছুকাল শূন্যে বিচরণ করাই তাঁর ইচ্ছা।
Kutty

সুনন্দর জার্নাল

'তত্ত্ব এবং সত্য'

বেশ উত্তেজিত আলোচনা চলছিল। যাঁরা তর্ক করছিলেন, তাঁরা সকলেই বুদ্ধিজীবী। সেই রাজহংসদলের একান্তে একটি বকের মতো আমিও সমাসীন ছিলুম।

তর্কটা চলছিল বাংলা-ইংরিজী মিশিয়ে। উত্তাপের পারা চড়ে উঠলে ইংরিজীর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল, ক্রোধের আধিক্য ঘটলে যেমন অবধারিতভাবে হিন্দী এসে পড়ে। আমি যথাসম্ভব বিতর্কটির বঙ্গানুবাদ করে দিচ্ছি।

শুরু হয়েছিল বেশ নিরীহভাবেই। একজন খানকয়েক চিঠি বিতরণ করেছিলেন আমাদের ভেতরে। তাঁর ছেলের উপনয়ন। চিঠিতে যথানিয়মে একটি দণ্ডধারী ব্রাহ্মণ-বটু চিত্রিত ছিল, লাল কালি দিয়ে আমাদের নাম লেখা হয়েছিল, আমন্ত্রণ বাণীর নীচে বিজ্ঞপ্তি ছিল : 'অতিথি-নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে প্রী তি ভো জে র আয়োজন সীমায়িত।'

আমরা সকলেই ভদ্রতাসম্মত মৃদু হাসিতে চিঠিগুলো নিয়েছিলুম। কিন্তু বেসুরো গাইলেন একজন। হঠাৎ মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে আমন্ত্রণ-কর্তাকে জিজ্ঞেস করলেন : 'আপনি বিলেত থেকে ডক্‌টরেট্ পেয়েছিলেন, তাই না?'

প্রশ্নটা প্রথমে বেশ খাপছাড়া মনে হল। জিজ্ঞাসিত ভদ্রলোকটি টাক চুলকে বললেন, 'হাঁ—তা—ও-রকম একটা ঘটেছিল বটে।'

'যে বিষয়টি আপনি পড়ান, সেটি বোধ হয় বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে?'

'তা-ও পড়ে।'

'তা হলে এ-সব উপনয়ন-টুপনয়ন কেন? আপনি মানেন এগুলো? আপনি মনে করেন, আপনার ছেলে সারা জীবন গলায় পইতে রাখবে, সন্ধ্যে-আহ্নিক করবে, ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক জীবন যাপন করবে, মুরগি-পেঁয়াজের গন্ধে নাক টিপে ছুটে পালাবে?'

'খেপেছেন!' —ভাবী ব্রাহ্মণের পিতৃদেব হাসলেন : 'দিন তিনেক যদি গায়ত্রী জপ করে—'

'তাহলে এই প্রহসন কেন? কেন এ-সব অপচয়? কী হবে গায়ত্রী দিয়ে? আপনি যদি ভট্‌চায-বামুন হতেন, আমার কিছু বলবার ছিল না। আমি জানি, বিলেতে গিয়ে আপনি পরমানন্দে বীফ্ খেয়েছেন—আপনার ছেলে দু'দিন বাদে এখানেই তা খাবে। দেন্ হোয়াই—'

ভদ্রলোক আবার টাক চুলকোলেন : 'মানে একটা সামাজিক প্রথা—মানে চিরকাল চলে আসছে — মানে আত্মীয়-টাত্মীয় — আচ্ছা, আমি উঠি, আমাকে আরো কয়েক জায়গায়—'

রেজিস্ট্রি করা বিয়ে

পরে শুদ্ধি করে নেওয়া হয়

তিনি উঠলেন, অর্থাৎ সোজা বাংলায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলেন। তারপরেই তর্কের ঝড় উঠল।

'সামাজিক প্রথা! ওইটেই হচ্ছে চমৎকার একটা স্কেপ-গোট। অর্থাৎ আমরা নিজেরা কাপুরুষ, সত্যকে জানি, অথচ—'

'আপনিও তো মশাই শালগ্রাম-শিলার সামনে বিয়ে করেছিলেন।' — আর একজন ফোড়ন কাটলেন।

'নট্ মী। আমি সিভিল ম্যারেজ করেছিলুম।'

'কালীঘাটে পুজো দিতে যান?'

'নেভার।'

'আপনার স্ত্রী?'

সত্যব্রতী ব্যক্তিটি থেমে গেলেন হঠাৎ। নেবা চুরুটটাকে ধরিয়ে নেবার জরুরী দরকারটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর।

কিন্তু আলোচনা থামল না। ব্রাহ্মণ-তত্ত্ব এগিয়ে গেল অ্যান্‌থ্রোপলোজিতে—শুরু হল আর্যরক্তের বিশুদ্ধিতা নিয়ে গবেষণা। বাঙালীর কৌলীন্য-প্রথার ফলে কি পরিমাণ ভেজাল তার শিরায় এসে ঢুকেছে, সেটি নির্ধারিত হতেই ব্রাহ্মণত্ব হাওয়ায় উড়ে গেল।

তারপর তর্কের শাখা থেকে শাখায়, তা থেকে নানা প্রশাখায়।

'আসলে আমাদের মজ্জায় মজ্জায় কন্‌ট্রাডিক্‌শ্যন। আমরা বড় জোর স্কেপ্‌টিক হতে পারি। অ্যাগ্‌নস্‌টিকও হতে পারি—কিন্তু একটা অজ্ঞাত রহস্য সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল এবং বিশ্বাস কিছুতেই যায় না।'

'যেমন ভূত মানি না—অথচ গা ছমছম করলে ভালো লাগে।'

'ঠাট্টা নয়, ব্যাপারটা তাই। বাড়িতে সিরীয়স অসুখ করলে বড়ো ডাক্তার ডাকি, আবার কালীবাড়ি পুজোও পাঠাই। বিলীভ্ ইট্ অর্ নট্ — এম-ডি ডাক্তার নিজের ছেলেকে জলপড়া খাইয়েছেন, এমন ঘটনাও আমি জানি।'

'কারো যদি ধর্মবিশ্বাস থাকে—'

'যদি থাকে, কালীবাড়ীতেই পুজো দিক না — ডাক্তার কেন? না হয় কবরেজই ডাকুক। কিন্তু চিকেন-স্যুপ খাওয়ায় কেন তার সঙ্গে? কেন খাওয়ায় সেই টনিক যাতে ষাঁড়ের লিভার থাকে?'

প্রোমোশন দে মা,

আর একটা প্রমোশন দে মা

ছিঃ এই সব ঠাকুর দেবতায় আপনারা এখনও বিশ্বাস করেন

'আতুরে নিয়মো নাস্তি।'

'ছেঁদো কথা রেখে দিন, মশাই। আসলে এই হচ্ছে আমাদের চরিত্র। আমরা মেটিরিয়্যালিস্টিক ফিলসফিও পড়ব, আবার ঠনঠনের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কপালে হাতও তুলব। কাউকেই আমরা ছাড়তে চাই না। কিসে কী হয় যখন জানা নেই, তখন সব দেবতার পায়েই নৈবেদ্য সাজিয়ে দেওয়া যাক। এই সুবিধেবাদী মনোবৃত্তির জন্যেই আমাদের কোনো ন্যাশনাল ক্যারাকটার গড়ে ওঠে না—এই ফাঁকিবাজির জন্যেই আমরা কোনোদিন দাঁড়াতে পারব না—এমন কি, দেশে সেন্ট পারসেন্ট লিটারেসি এলেও না।'

একজন মহিলা এতক্ষণ নিঃশব্দে চা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'ওরাও কি একেবারে সংস্কারমুক্ত? তেরোজন টেবিলে বসে? একটা দেশলাইয়ের কাঠিতে তিনজন সিগ্রেট ধরায়? ক্রিস্টাল গ্লোব নিয়ে যাঁরা ভবিষ্যৎ বলে দেন, তাঁরা কি অনাহারে থাকেন?'

'আহা, কিছু কিছু লোক তো থাকবেই। হাই তুলে তারা বুকে ক্রস আঁকবে, পাছে মুখের ভেতরে শয়তান ঢুকে যায়। কিন্তু আমাদের মতো—'

গলা শুকিয়ে গেলে আলোচনায় সাময়িক বিরতি পড়ল। চা এল আর এক প্রস্থ। ঠিক সেই সময় আমরা দেখলুম, ঘরের এক কোনায় আমাদেরই এক বন্ধু আর একজনের হাত টেনে নিয়ে গভীর মনোযোগে ভাগ্যরেখা পরীক্ষা করছেন।

আমরা কী করলুম? কেন, প্রত্যেকেই সেদিকে নিজেদের হাতগুলো বাড়িয়ে দিলুম। না—বিশ্বাস আমরা কেউই করি না, তবুও!

ইন্দ্রজিৎ

সাহিত্য বিষয়ক কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই আধুনিক সাহিত্যের রীতি-প্রকৃতি নিয়ে কথা ওঠে। এ বিষয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে, এখনও বলা হচ্ছে এবং আরো বলা হবে। এর কারণ চলতি বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত কেউ দিতে পারেন না, দিতে চানও না। বলা বাহুল্য, চূড়ান্ত মতামত দেবার অধিকার সাধারণ মানুষদের নেই. সে অধিকার পন্ডিতদের এবং বিশেষজ্ঞদের। মুশকিল হয়েছে যে, আজকের ব্যাপার সম্পর্কে অর্থাৎ অর্বাচীন বিষয়ের প্রতি পন্ডিত ব্যক্তিদের আগ্রহ নেই, তাঁদের ঝোঁক প্রাচীনের প্রতি। যতক্ষণ কোন জিনিসের ধড়ে প্রাণ আছে ততক্ষণ তার প্রতি তাঁরা উদাসীন। এ'রা পোস্ট মর্টেমে বিশ্বাসী। পাণ্ডিত্য জিনিসটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভূতগ্রস্ত। কালের ব্যবধানে যা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে তার ওপরে তাঁরা আলোকপাত করবার চেষ্টা করেন। অবশ্য সে আলোকে অন্ধকার দূরীভূত হয় কি ঘনীভূত হয়, সেটা বিবেচনাসাপেক্ষ। পরীক্ষার্থী ছাত্রদের যদি বা কোন কাজে লাগে, রসগ্রাহী—সাধারণ পাঠকের খুব কাজে লাগে বলে মনে হয় না।

আধুনিক সাহিত্যের স্বভাবধর্ম সম্পর্কে আধুনিক লেখকরাই নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে আগ্রহী। নিজ নিজ ব্যবসায় সম্পর্কে সকলকেই ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। ব্যবসায়ী মাত্রই নিজ নিজ সামগ্রীর চাহিদা সম্পর্কে যতখানি সজ্ঞান, সাহিত্য ব্যবসায়ীও ঠিক ততখানি। উন্নত দেশ মাত্রেই পাঠকের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। অল্প-সংখ্যকের জন্যে যখন লেখা হত তখন লাভক্ষতির প্রশ্ন অর্থাৎ ব্যবসায়ের প্রশ্নটা বড় ছিল না। তখন কাব্য সাহিত্য রচনা অনেকটা শখের ব্যাপার ছিল; লেখকরা হয় রসিকজনকে আনন্দ দেবার জন্যে লিখতেন, না-হয় তো নির্বোধজনকে জ্ঞানবৃদ্ধি দেবার জন্যে লিখতেন। এখন সাহিত্যিকরা বুঝে নিয়েছেন যে, সকল রকম জ্ঞানবৃদ্ধি রসের মধ্যেই নিহিত আছে। যাকে আমরা নির্বোধ মনে করি, সে আসলে রসজ্ঞানহীন ব্যক্তি। আজকের লেখকের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে আজকের মানুষের মনকে জানা এবং চেনা। লেখার আবেদন পাঠকের মনে পে'ৗছে দিতে হয়—এরই নাম চাহিদা মেটানো। চাহিদা মেটাতে হবে তার অর্থ এই নয় যে, পাঠকের মন রেখে তাঁরা কথা বলবেন। মন জেনে কথা বলতে হবে। মন জানা আর মন রাখা এক কথা নয়। আজকের মানুষের মনকে জেনে বুঝে যিনি লিখছেন তিনিই আধুনিক লেখক। যিনি না জেনে না চিনে না বুঝে লিখছেন তিনি আজকের হয়েও আজকের নন।

মানুষের জীবনকথা নিয়ে সাহিত্য; কাজেই মানুষের স্বভাবে আর সাহিত্যের স্বভাবে মিল থাকা খুবই স্বাভাবিক। কালের গতির সংগে সংগে মানুষের যেমন আকৃতি এবং প্রকৃতি বদলায়, সাহিত্যেরও তেমনি। কালের গতিতে সমগ্র সমাজের Physical aspect-এ বিরাট পরিবর্তন এসেছে। একমাত্র লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির দরুনই দেশের, সমাজের চেহারা আশ্চর্যরকম বদলে গিয়েছে। পঁচিশ ত্রিশ বছর আগেও রাস্তায় ঘাটে যানবাহনে এমন অসম্ভবরকম ভিড় আমরা দেখিনি। এমন ঘেঁষাঘেঁষি ধাক্কাধাক্কি করে পথ চলতে হত না, ট্রামে-বাসে এমন ঝুলতে ঝুলতে মানুষ চলত না। এমন হইচই চেঁচামেচি মানুষ আগে শোনেনি। গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ, এঞ্জিনের শব্দ, কল-কারখানার শব্দ, মাইকের কর্ণবিদারক ধ্বনি—এতটা আগে কে শুনেছে? এই যে ঘেঁষাঘেঁষি ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি, তাতেই মানুষের মন মেজাজ খিঁচড়ে থাকে। এর উপরে নিত্য-দিনের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব—তাতে মানুষের চিত্ত আরো তিক্ত হয়ে আছে। সমগ্র সমাজের চেহারাটি এবার কল্পনা করুন—তার কপালে ভ্রূকুটি, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখে বক্রোক্তি। এক জেনারেশন আগের সমাজে আর আজকের সমাজে যে আকৃতিগত পার্থক্য সেটি তার প্রকৃতিকেও প্রভাবিত করেছে, করতে বাধ্য। মনে রাখা কর্তব্য যে, Angry Young-men-রা কেবল পশ্চিম দেশেই বাস করে না, সকল দেশেই আছে। অবশ্য মন মেজাজ খারাপ থাকার দরুন যে স্নেহ প্রেম দয়া মায়া দাক্ষিণ্য সমাজ থেকে সম্পূর্ণ-রূপে অন্তর্হিত হয়েছে এমন নয়। তবে

এ কথা নিশ্চিত, এইসব কোমল প্রবৃত্তির চর্চার অবকাশ ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। দাম্পত্য প্রেম এককালে যতখানি টেঁকসই ছিল, এখন আর ততখানি নয়, এখন তার পরমায়ু অনেক হ্রাস পেয়েছে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই চাকরি করতে হয়; টানাটানির সংসারে একের প্রতি অন্যের টান বেশী দিন থাকে না। যে স্ত্রী একদিন ছিলেন পতি-অন্ত প্রাণ, তিনি এখন চাকুরি-অন্ত প্রাণ। সন্তানরা বড় হয়েই বুঝতে পারে, পিতামাতার সম্পর্কটা একেবারে নিঃস্বার্থ নয়। স্বার্থগন্ধ প্রবেশ করলে নিকষিত হেমও কলুষিত হয়ে যায়। ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে খিটিমিটি লেগেই থাকে। এটি ছেলেপেলের মনে অজ্ঞাতসারে কাজ করতে থাকে। ক্রমে পিতামাতা এবং পুত্রকন্যাদের সম্পর্কটাও ঢিলে হয়ে আসে। সকল রকম সম্পর্কের মধ্যেই একটা শিথিলতা এসেছে। আজকের যুবকদের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ কম, কাউকেই তারা আপনজন বলে মনে করে না। এ কথা নিশ্চিত যে, আগে যতটা মনের আদান-প্রদান ছিল, এখন ততটা নেই। এত হইচই ঘেঁষাঘেঁষির মধ্যেও মানুষ কতকটা যেন নিঃসঙ্গ। স্বামী-স্ত্রীতে, পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে ভাইয়ে, ভাই-বোনে, বন্ধুতে বন্ধুতে, প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে যে সম্পর্ক, তারই উপরে সমাজ প্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য এই সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। সম্পর্ক-গুলোর বাঁধন ঢিলে হয়ে যাওয়ার দরুন সমস্ত সমাজেরই বাঁধন আলগা হয়ে গিয়েছে। আজকের সাহিত্য ঐ বাঁধন-ছেঁড়া সমাজের চিত্র অর্থাৎ Disintegration-এর চিত্র। পাশ্চাত্ত্য সমাজে এর উপরে আছে যুদ্ধের করাল ছায়া। জীবন অনিশ্চিত, আজ আছে তো কাল নেই। প্রত্যেকে জানে, কেউ কাউকে রক্ষা করতে পারবে না। প্রত্যেকটি মানুষ ভয়ংকর রকম একলা। আমাদের দেশে আর্থিক দুর্গতি অনুরূপ অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। আজকের মানুষের মনে দুটি জিনিসের ক্রিয়া সর্বাধিক — একটি Anger, অপরটি Anxiety। সাহিত্য মেজাজের সৃষ্টি, সেটাকে মোটামুটি খোশমেজাজ বলা যেতে পারে। এখন ভয়ে ভাবনায় রাগে বিরাগে মানুষের মেজাজ যদি যায় বিগড়ে তা হলে সাহিত্যের মেজাজও যাবে বদলে। বেশীর ভাগ মানুষ এখন বদ-মেজাজী, ফলে সাহিত্যও তাই। সাহিত্যের চেহারাই বদলে যাচ্ছে। এখন সেও কুঞ্চিত-ভ্রূ, রক্তচক্ষু, রূঢ়ভাষী।

উপরে যে সব সম্পর্কের কথা বলেছি, সামাজিক জীবনে যেমন এর মূল্য, ব্যক্তিগত জীবনেও তেমনি। এসব গ্রন্থি শিথিল হওয়ার দরুন প্রত্যেকটি ব্যক্তি আজ নড়বড়ে—একে অন্যের থেকে আলাদা এবং আলাদা বলেই নিঃসহায়। নিঃসহায় মানুষ কারো কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না। প্রত্যাশা করবার স্থান নেই, জন নেই বলেই তার আত্মীয়তাবোধও নেই। সে যেমন অপরের কাছে আমল পায় না, সে নিজেও কাউকে আমল দেয় না—এর ফলে জীবন সম্বন্ধে তার কোন আদুরেপনা নেই। এটা এক দিকে ভাল—আগের দিনের মানুষের চাইতে সে ঢের বেশী শক্ত। তাকে বাধ্য হয়ে শক্ত হতে হয়েছে। আগেকার মানুষ যা নিয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিত, এখনকার মানুষ তা হেসে উড়িয়ে দেয়। এটা দোষের কথা না হলেও এই যে নিঃসম্পর্ক অবস্থা এরও প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। ক্ষমতা-হীন মানুষ ক্রমেই আরো বেশী নির্মম হয়ে উঠছে। সাহিত্যেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

সাহিত্য মানুষে মানুষে সাহচর্য বা নৈকট্য স্থাপন করে। অর্থাৎ মানবিক সম্পর্ক-গুলোকে দৃঢ়তর করে, কিন্তু যেখানে সে সম্পর্কের বন্ধন আলগা হয়ে এসেছে সেখানে সাহিত্য একে অন্যকে নিকটে টানে না, দুই-য়ের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে। সামাজিক সম্পর্কগুলির মস্ত বড় একটা মূল্য আছে, সে কথা আগেই বলেছি। যে জিনিস মূল্য-বান তার একটা sanctity আছে, মানমর্যাদা আছে সেই মান-মর্যাদার অবমাননাকে ইংরেজীতে বলে blasphemy। সেদিন যখন এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল, তখন আমি বলেছিলাম যে, সাম্প্রতিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য যদি এক কথায় প্রকাশ করতে হয়, তবে বলব, আধুনিক সাহিত্যের আচরণ প্রধানত blasphemous। যুগ পরিবর্তন মানেই মূল্যবোধের পরিবর্তন। এক যুগের মূল্যবান জিনিস অপর যুগে মূল্যহীন হয়ে যায়, আবার মূল্যহীন জিনিস মূল্য লাভ করে। এই দুই-ই ব্লাসফেমির অন্তর্গত স্নেহ প্রেম করুণা ইত্যাদি যেসব মানবিক হৃদয়বৃত্তির এককালে যথেষ্ট মর্যাদা ছিল, ইদানীং কালের কাব্যে, সাহিত্যে তা উপহাসের বস্তু হয়ে উঠেছে। অতিশয় স্পর্শকাতর সম্পর্কগুলির প্রতিও অত্যন্ত রূঢ় আচরণ করা হচ্ছে। আজ-কালের গল্প-উপন্যাসে দেখা যায়, পিতা-মাতার সম্পর্কে পুত্র-কন্যার মনোভাব আদৌ সম্মানসূচক নয়। পিতা-পুত্রের মধ্যে মতবিরোধ কিংবা বৈরীভাব থাকাও অসম্ভব নয়, কিন্তু কথায় এবং আচরণে অবজ্ঞা বা অমর্যাদা প্রকাশ করা খুব স্বাভাবিক নয়। অথচ এ-জাতীয় জিনিস আজকাল গল্প-উপন্যাসের পাতায় হামেশাই দেখা যায়। "দরজা খুলেই দেখলাম শ্রীমতী অনসূয়া দেবী দাঁড়িয়ে, যাঁর একমাত্র দাবি হল তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন। ভগবান জানে, কিসের দাবি এবং কে সেই দিব্যি দিয়েছিল—" কিংবা ডাক্তারকে "অনসূয়া দেবীর স্বামী সম্পর্কে একটা খবর দেবার ছিল"—ইত্যাদি কথার মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি অবজ্ঞা প্রচ্ছন্ন নয়, সুস্পষ্ট। ভ্রাতা-ভগিনী সম্পর্কেও অনুরূপ অবজ্ঞা-সূচক উক্তি যথেষ্ট দেখা যায়। ভারতীয় শিষ্টাচারমতে এসব উক্তি আপত্তিকর মনে হতে পারে কিন্তু সাহিত্যে একে ঠিক শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলা চলে না। সমাজ এবং সাহিত্য হাত ধরাধরি করে চলে, কিন্তু দুয়ের মধ্যে একটু তফাত আছে। সামাজিক মানুষকে বহু মানুষের মন জুগিয়ে চলতে হয়, এজন্য তার ব্যবহার সব সময়েই একটু আড়ষ্ট। সাহিত্যিক মানুষ কারো মন জুগিয়ে চলেন না; তিনি একমাত্র রসের দাবিকে মেনে চলেন। সমাজের দাবির চাইতে রসের দাবি অধিকতর বিস্তীর্ণ। কাজেই সাহিত্যিককে একটু স্বাধীনতা দিতেই হয়।

পৃথিবীর সাত সমুদ্রের জল যেমন একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত, প্রধান প্রধান সাহিত্যের স্রোতও তেমনি একে অন্যের মধ্যে অনু-প্রবিষ্ট। উপরে যে কথার উল্লেখ করেছি তার খানিকটা অবশ্যই বিদেশের আমদানি। সামাজিক এবং পারিবারিক সম্পর্কগুলি নিয়ে তির্যক উক্তি বিদেশী সাহিত্যে যত্রতত্র দেখা যায়—শুধু গল্প-উপন্যাসে নয়, অন্যবিধ গ্রন্থেও। এ যুগের সব চাইতে নামজাদা লেখক জাঁ পল সার্ত্র তাঁর আত্মচরিত লিখেছেন। তাতে বলেছেন—

"For want of more precise information, nobody, beginning with me, knew why the hell I had been born." পূর্বোল্লিখিত অনসূয়া দেবীর পুত্রের উক্তিতে আর সার্ত্রের উক্তিতে কিছুমাত্র তফাত নেই। উক্ত গ্রন্থ থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করছি, তাতে সার্ত্র-পরিবারের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পাওয়া যাবে। ঠাকুরদা-ঠাকুরমা থেকে শুরু করে বাপ-খুড়ো, মা-পিসী সকলেরই উল্লেখ এখানে আছে:

". . . . a country doctor married the daughter of a rich landowner from Perigord and settled down with her on the dreary mai street of Thiviens. The day after the wedding, it was discovered that the father-in-law did not have a penny. Dr. Sartre, outraged, did not speak a word to his wife for forty years. At the table he expressed himself by signs; she ended by referring to him as "my boarder." Yet he shared her bed and, from time to time, made her pregnant. She gave him two sons and a daughter; these children of silence were named Jean-Baptiste, Joseph and Helene. Helene married a cavalry officer who went mad. Joseph did his military service in the Zouaves and retired at an early age. He had no occupa-

tion. Caught between the stubborn silence of one parent and the shouting of the other, he developed a stammear and spent his life fighting words. Jean-Baptiste wanted to prepare for the Naval Academy, to see the ocean. In 1904 the young naval officer, who was already wasting away with the fevers of Cochin-China, made the acquaintance of Anne Marie Schweitzer, took possession of the big, forlorn girl, married her, begot a child in quick time, me, and sought refuge in death." এই বর্ণনা পাঠ করে অনেকেরই মনে হতে পারে যে, এর মধ্যে বাপ-ঠাকুরদা এবং অন্যান্য গুরুজনদের মর্যাদা রক্ষা করে কথা বলা হয়নি। অথচ সাহিত্যের অমর্যাদা হয়েছে, এমন কথা বলা কঠিন। একে খাঁটি সাহিত্য হিসাবে গ্রহণ করতে কোন রসিক পাঠকই বোধ করি আপত্তি করবেন না। এমন কথাও বলেছেন যে, আমার যদি একটি বোন থাকত, then I would be her lover। বলেছেন, I liked incest if it remained platonic। বাস্তবিকপক্ষে, তাঁর কোন কোন গ্রন্থে তিনি ভ্রাতা-ভগিনীর প্রেমকে বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন (The Flies; The paths of Freedom; Altona প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। কোন কোন পাঠকের কাছে এসব আপত্তিকর মনে হতে পারে; কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, সমাজের চাইতে সাহিত্য অধিকতর উদার। সামাজিক ব্যবহার অনেক সময় আর্টের দাবিকে উপেক্ষা করে, সাহিত্য তা করতে পারে না। সমাজের চোখে যা নিন্দনীয়, আর্টিস্টের হাতে তা-ও আর্টে পরিণত হতে পারে। আধুনিক সাহিত্য ব্লাসফেমিকে নিঃসন্দেহে আর্টের পর্যায়ে এনে দিয়েছে।

বলা বাহুল্য, এসব ব্যাপারে শ্লীলতা-অশ্লীলতা কিংবা নীতি-দুর্নীতির প্রশ্ন ওঠে না। তবে সমাজের সঙ্গে সাহিত্যে যতটা সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়, সেদিকে লক্ষ রাখা প্রয়োজন। পশ্চিমী সমাজে যে আচার-ব্যবহার চালু হয়েছে, আমাদের সমাজে তা এসে পৌঁছতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে। কাজেই কোন পশ্চিম দেশীয়ের মুখে যে কথা অসঙ্গত ঠেকে না, আমাদের মুখে তা অসঙ্গত শোনাতে পারে। কচি ছেলের মুখে পাকা বুড়োটে কথা যেমন অশোভন, এ-ও তেমনি। সাহিত্যে প্যাকামির স্থান নেই।

ব্লাসফেমি কথাটাকে সাধারণত নিন্দা-সূচক অর্থেই ব্যবহার করা হয়, কিন্তু জিনিসটা মূলত নিন্দনীয় নয়। ব্যাপারটার ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। ব্লাসফেমি এ যুগের সৃষ্টি নয়, প্রাচীন যুগ থেকেই চলে আসছে। সাধারণ অর্থে, কোন সর্বজনমান্য, সর্বজনগ্রাহ্য বিষয় সম্পর্কে উপেক্ষা প্রদর্শন কিংবা সে বিষয়ে মর্যাদাহানিকর উক্তিকেই ব্লাসফেমি বলা চলে। অবশ্য আদি যুগে প্রধানত প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতাকেই ব্লাসফেমি আখ্যা দেওয়া হত। সমাজের চোখে এটি গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য ছিল এবং সে-জন্যে কঠোর দণ্ডেরও ব্যবস্থা ছিল। ইহুদীদের আদি গুরু মোজেস-এর নির্দেশমতে এদের শাস্তি ছিল death by stoning। রোমান সম্রাট জাস্টিনিয়ানও (৪৮৩—৫৬৫) এদের মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইংলণ্ডে রেস্টোরেশন যুগ অবধি এদের বিচার হত ধর্মীয় আদালতে (ecclesiastical

Court); পরে এসব অপরাধ সাধারণ আদালতের এলাকায় আসে। এককালে বহু লোককে এই অপরাধে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। পরবর্তী কালে দণ্ড হ্রাস করে এদেরকে সদর রাস্তায় সর্বসমক্ষে পিলোরিতে (Pillory) আটক রাখা হত। মধ্য যুগে এবং তার পরেও যাঁরা খৃষ্টীয় মতবিরোধী নতুন কোন বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন, তাঁদেরও বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে প্রাণও গিয়েছে। খৃষ্টীয় ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার খুব বেশী দিনের কথা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও শেলীকে স্বাধীন মতামতের জন্য অক্সফোর্ড থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। বলতে গেলে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ধর্মজীবনে এবং সামাজিক জীবনে মানুষ স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার লাভ করেছে। উপর্যুক্ত ইতিহাস থেকেই প্রমাণিত হবে যে, প্রাচীন সমাজের বহু অন্ধ সংস্কার এবং বিশ্বাস ব্লাসফেমির আঘাতেই দূরীভূত হয়েছে। সেকালের যাঁরা মনীষী, তাঁদের স্বাধীন চিন্তা প্রধানত ব্লাসফেমিরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। আদিম সমাজকে এ'রাই সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করেছেন এবং তা করতে গিয়ে প্রাণও দিয়েছেন। আজকের সমাজে স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার বহুল পরিমাণে বেড়েছে। তথাপি এখনও যে অল্পবিস্তর গঞ্জনা সইতে না হয় এমন নয়। এদিক থেকে এ যুগের ব্লাসফেমাররাও যৎকিঞ্চিৎ বীরত্বের অধিকারী।

আজকের দিনে ধর্ম এমনিতেই ওষ্ঠাগতপ্রাণ। যাঁরা বীরপুরুষ, তাঁরা অযথা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারতে চান না। এখন ধর্ম যে পরিমাণে নির্জীব, সমাজ সে পরিমাণে সজীব। আঘাত যদি করতে হয় তো সমাজকেই করা উচিত। আজকে যাঁরা দেশে দেশে স্বাধীন চিন্তার অধিনায়ক, তাঁরা ধর্ম ছেড়ে অর্থনীতি এবং রাজনীতির মাধ্যমে নিজ নিজ সমাজ পুনর্গঠনে নিযুক্ত। সামাজিক শৃংখলা রক্ষার জন্য এককালে সমাজপতিরা নানা অলিখিত আইনের দ্বারা সমাজকে বাঁধবার চেষ্টা করেছেন। এখন সেই বাঁধন ছেঁড়ার সাধন চলছে। আগেই বলেছি, সামাজিক সম্পর্কগুলোকে ঢিলে করে দিয়ে সেই বাঁধনকে আলগা করা হচ্ছে। তা-ও সেখানেই ক্ষান্ত নয়, এখন ব্লাসফেমি এমন সর্বব্যাপী যে, সংসারে কোন জিনিসই আর Sacrosanct নয়, অর্থাৎ পার্থিব কোন জিনিসেরই অপার্থিব কোন মহিমা নেই; অতএব সমীহ করবারও প্রয়োজন নেই। এখানে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, প্রচলিত মতের বিরোধিতা করলেই ব্লাসফেমি হয় না। বিরোধিতা যখন আর্টে পরিণত হয়, তখনই তাকে ব্লাসফেমি বলা চলে। রাজনৈতিক জীবনে—রাজশক্তি কিংবা শাসকগোষ্ঠীর যাঁরা বিরোধিতা করেন, তাঁরা অবশ্যই বীরপুরুষ, কিন্তু তাঁরা ব্লাসফেমার নন; কারণ, এ'রা সম্মুখসমরে অবতীর্ণ। এ'রা বীর-চূড়ামণি বীরবাহু হতে পারেন, কিন্তু মেঘনাদের মতো (ইন্দ্রজিতের মতোও বলতে পারেন) এ'রা আর্টিস্ট নন। মেঘনাদ মেঘের অন্তরালে থেকে লড়াই করতেন। আর্টের মধ্যে খানিকটা অন্তরাল থাকতে বাধ্য। পলিটিক্সের বিরোধিতা অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ইঙ্গিতের অভাবে জিনিসটা স্থূল। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে অনেকেই বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু আর্টের পরিচয় দেননি। পলিটিক্সে ব্লাসফেমির স্থান সংকীর্ণ; গলাবাজিতে যতখানি কলাকুশলতার স্থান, ততখানি নয়। এলিজাবেথের যুগে যাঁরা রাজশক্তির বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরা বীরত্ব দেখিয়েছেন, এমন কি, প্রাণও দিয়েছেন। কিন্তু শেক্সপীয়র যে বলেছিলেন—There's such divinity doth hedge a King—এটি সে যুগের একটি অত্যুৎকৃষ্ট ব্লাসফেমির দৃষ্টান্ত। শেক্সপীয়র রাজশক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু রাজাকে দৈবী মহিমা দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সেটি প্রচ্ছন্ন পরিহাসের সুরে অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। লক্ষ করবার বিষয়, যার মুখে ঐ বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছে, সে খাঁটি রাজা নয়, জবরদখল করে সিংহাসনে বসেছে। তার মুখে কথাটা আরো বেশী হাস্যকর শোনাচ্ছে।

সব দেশেরই অলংকারশাস্ত্রে Sarcasm এবং Irony একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। Sarcasm একটু উগ্র আকার ধারণ করলেই Blasphemy-তে পরিণত হয়। Sarcasm লোকে উপভোগ করে, কিন্তু Blasphemy এমনি পিলে-চমকানো ব্যাপার যে, সে জিনিস লোকে উপভোগ করবার অবকাশ পায় না, শোনবামাত্রই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। আধুনিক কাব্যে সাহিত্যে ব্লাসফেমিই প্রধান অলংকার। এই কারণেই আধুনিক সাহিত্য এত Controversial) পাঠকসমাজ এখনও এতে ঠিক অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। কোন কোন গ্রন্থ সম্পর্কে যে অত্যন্ত বিরূপ আলোড়ন দেখা দেয়, তার মূলে লেখকের Blasphemous বাক্যভঙ্গি। বলা বাহুল্য, বাক্যভঙ্গি মনোভঙ্গিরই বাহ্যিক প্রকাশ। ব্লাসফেমি অর্থাৎ প্রকারান্তরে সবকিছুকে উড়িয়ে দেওয়া এ যুগের ধর্ম। এটিকে মেনে নিতে হবে। আমাদের দেশে পাঠক সমাজের পিলে এখনও অত্যন্ত দুর্বল। অভ্যাসে এর পরিবর্তন হবে। দেখে দেখে, শুনে শুনে, পড়ে পড়ে পিলে যখন সবল হবে, তখন এরও রস তাঁরা উপভোগ করবেন। তখন আর আপত্তি শোনা যাবে না। সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি। তাতে কার মান গেল কিংবা প্রাণ গেল, সেটা বড় কথা নয়। রস হচ্ছে সেই জিনিস, যার জন্যে মানী সঁপিয়াছে মান, ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ। সর্বাগ্রে রস, সব শেষেও রস। এর জন্যে ধন প্রাণ মান সমস্তই বলি দেওয়া যেতে পারে।

লোকটাকে মনে পড়লেই হাসি পায়। এই যে এখন খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে দিব্যি খোশমেজাজে ওকে মনে করতে পারছি, তখন ঠিক এমনটি পারা যেত না। রোজ সন্ধ্যায় দেখা যেত মহুয়া-গাছের তলাটিতে লোকটি (যাকে আমরা ডাকতাম 'মনুদা') এসে এক পায়ে দাঁড়াবে, আর এক পা সাইকেলের প্যাডেলে; তারপর একটি সিগারেট বার করে আগুন জ্বালাবে। অতঃপর সেই প্রজ্বলিত সিগারেট-খণ্ড ওষ্ঠে ধারণ করে সারখেলদের কম্পাউণ্ডের শেষ লাইনে একতলা বাড়িটির চাতালে এসে হাজির হবে। চাতালে কেউ না থাকলে 'বেল' বাজাবে। আর থাকলে কথাই নেই, এক গেলাস জল চেয়ে বসে পড়বে।

সিগারেট ধরানো আর জল চাওয়ার মধ্যবর্তী সময়টুকু এতই অল্প যে, অনেকের এ বিষয়টি এককালে গবেষণার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

মনুদা এসব খেয়াল টেয়াল বড় একটা করত না; কেননা জানত, রোজ সন্ধ্যায় তাকে আসতে হবে, আসার আগে সিগারেট ধরাতে হবে, আর এসে জল চাইতে হবে।

কয়েক মাস আগেও যখন যূথিকারা এ বাড়িতে আসেনি, তখন বাড়িটা খালি ছিল। যূথিকারা আসার আগে যারা থেকেছিল, তাদের ছেলেটা শেষ পর্যন্ত মারা গেল. কিন্তু মনুদা বলে, 'এ বাড়িটা পয়া।' হয়ত তাই। কেননা ছেলেটা যে মারা গিয়েছিল, সেটি এ বাড়ির দীর্ঘ ইতিহাসে প্রথম। মনুদা বলে : 'এবং তা অ্যাকসিডেণ্ট! ছেলেটার যা রোগ তাতে ও মারাই যেত।' তা যাক। কিন্তু অন্য যারা ভিন্ন রোগ সারাতে এসেছিল, তারা ফিরে গেছে সুস্থ দেহে এবং মস্তিষ্কে।

নদীর ধারে এই বাড়িটি যূথিকার পছন্দ হয়ে গেল। ধারে ঠিক নয়, কাছাকাছি। কয়েক মিনিট হাঁটলে পরেই নদীর ধারে গিয়ে পড়তে পারে।

প্রথমে যূথিকারা ভেবেছিল এখানে উঠে প্রয়োজনমতো একটা বাড়ি খুঁজে নেবে পরে। কিন্তু তা আর শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। যা হয়ে থাকে। তাই হল।

কিন্তু কি উচিত ছিল, বা ছিল না, এ নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। যূথিকা যা বুঝেছে তা করেছে। তার ছোট ভাই আর মাকে নিয়ে এসে উঠেছে।

মনুদার রোজ সন্ধ্যায় এখানে আসার হেতু কি, আমাদের তা অনেককেই চিন্তিত করে তুলেছিল। অনেকের মধ্যে 'পাড়ায় কি ছেলে নেই'—এমন একটা ভাব যে ছিল না, তা নয়; ছিল। কিন্তু কি জানি কেন, মনুদার ভাগ্যরবি অত্যুজ্জ্বল হওয়ায় আমরা সবাই নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিলাম।

চাকরি যখন পাকা হয়েছে তখন পাকা-পাকিভাবেই শেকড় গেড়ে যে বসে যাবে যূথিকার এ আশঙ্কা ছিল। এবং হলও তাই। নড়বার নাম পর্যন্ত করলে না। অবশ্য যূথিকা-পরিবার যদি ফস করে বাড়ি বদল করে বে-পাড়ায় উঠে যেত, তাতে আমাদের মতো পরিজনদের বলার কিছু থাকত না। এবং যেহেতু কারোর আসা এবং যাওয়ায় আমাদের মাথাব্যথা প্রায় নেই বললেই হয়,

তখন তা নিয়ে আমাদের কোন মাথা ঘামানোর প্রয়োজন দেখি না। তবে মনুনেদার প্রতিনিয়ত যূথিকা-সকাশে যাওয়া-আসাটা আমাদের নেহাত অলক্ষ্যে তখন ঘটত—এটাই যা।

মনুনেদা এ পাড়ায় অপরিচিত নয়। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি। মালকোঁচা মেরে, দু' পাশের কোন দুটিকে ঈষৎ ফুলিয়ে, পুরো-হাতা জামার হাত গুটিয়ে
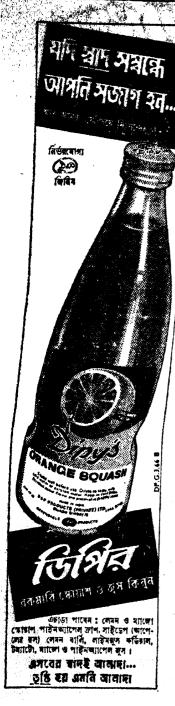
কলারের ভাঁজ কিঞ্চিৎ তুলে চিরকালই মনুনেদা এসেছে। কিন্তু অধুনা এতে রঙ চড়েছে। এই পরিবর্তন সামান্য লক্ষণীয় হয়ে উঠল। যা আগে ছিল, এখনো তাই, তবে ধোপদুরস্ত জামাকাপড়ে অনভ্যস্ত মনুনেদা আমাদের কাছে নতুন নতুন ঠেকতে লাগল।

যূথিকাদের একতলা বাড়ির সামনে চাতাল। সামনে অনেকটাই ফাঁকা, তারপর পাঁচিল। চাতালটার দক্ষিণে যেখানে পাঁচিলটা অল্প একটু ফাঁক হয়ে গেছে, একটি ফটক। তাতে গেট-টেট ছিল না কিছু। তার সামনে আমাদের সদর। মনুনেদা পশ্চিম দিকের ফটক দিয়ে সাধারণত প্রবেশ করে মহুয়াগাছের তলায় খানিক দাঁড়িয়ে সিগারেট ইত্যাদি পর্যায় শেষ করে চাতালে এসে উঠলে আমরা সবাই হো হো শব্দে হেসে উঠলাম।

আমাদের হাসির একটি বিশেষ ভঙ্গিমা ছিল। আমরা কোরাসে হাসতাম। এবং তা ছন্দোবন্ধ। এতকাল হাসিনি। সংযত, ভব্য, মার্জিতরুচি ছিলাম, আমাদের বলায়-করায় তার প্রকাশ ঘটতো। কিন্তু—

মনুনেদা আর যূথিকার পরস্পরের সম্বন্ধ একদা একটি বৃহৎ 'কিন্তু'র খপ্পরে পড়ে গেলে আমরা দুঃখিত হলাম। কি বা করার আছে। শুধু ঘটনাটিকে সাজিয়ে ঈষৎ রঙচঙ করে বাজারে ছাড়তে পারলেই সুদে আসলে উঠে আসতে পারত। আমরা তা করিনি, কারণ 'তুরুপের তাস' হাতে রাখব স্থির করেছিলাম।

'যূথিকা, তোমায় না পেলে মরে যাবো'—মনুনেদা।

গোটা কয়েক পোস্টার এভাবে লিখে যূথিকাদের দেয়ালে কেউ লটকে দিয়েছিল। ইস্কুল থেকে ফেরার পথে বাড়ি ঢুকতে গিয়ে যূথিকার নজর পড়ায় কয়েকটা টান মেরে ছিঁড়ে দিলে। পশ্চিম দিকে আরো কয়েকখানি দেখে জ্ঞানগম্যি প্রায় হারিয়ে ফেলতে বসেছিল। কিন্তু হারায়নি। আমরা জানি, এই পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে প্রথমে যার কথা মনে পড়েছিল—সে মনুনেদা। নতুবা আমাদের কারোকে ডেকে তো বলতে পারতো! তা বলেনি। বরং মনুনেদার যথারীতি সন্ধ্যেবেলা আগমন ঘটলে বিস্তৃত খবরটি বিবরণ সহ পরিবেশিত হয়েছিল। এবং তদ্‌জনিত দুঃখে ও ক্ষোভে মনুনেদা অতঃপর একটু ওপরপড়া হয়ে আমাদের বলেছিল : এসব কি হচ্ছে?

আমরা ঠিক করলাম : মনুনেদাই হও আর যেই হও বাবা, টেঁকের জালে যখন পড়েছো বাছাধন, তখন নট ছাড়ান-ছোড়ন। বেনিয়াডি থেকে উজান বেয়ে বেপাড়া বারগান্ডায় এসে প্রেম করে যাচ্ছ, কিছু বলিনি; রোজ সন্ধ্যায় সাঁঝের পিদিম জ্বললে তোমার সিগারেটের ডগায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে ওঠে, কিছু বলিনি; নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে ফেরার মুখে যূথিকার কোমরে হাত রেখে চলেছিলে, কিছু বলিনি; কিন্তু এবার যখন বেমক্কা কিছু বলে বসেছো তখন সহজে ছেড়ে দেবার পাত্তর আমরা নই। তা সে যেই হও। মনুনেদাই হও আর পচম্বার মুনশিই হও।

মনুনেদাকে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিইনি। এক হাত বেশ নিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'দাদা বলি, সম্মান করি; ঘরে যান, ঘরে যান।' সোজা যূথিকাদের বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলাম। আবার বলেছিলাম, 'জাতিকা নীরব প্রেমিকা, আপনি এত সবাক কেন?' পরে অবশ্য আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কিঞ্চিৎ অনুতাপ করেছিল। বলেছিল—এতটা করা ঠিক হয়নি! আমরাও বুঝেছিলাম সে কথা। কিন্তু নারীঘটিত ব্যাপারে উচিতানুচিত বোধ সর্ব ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না। আমাদের বন্ধু হচগুপ্ত অফসোস করে বলেছিল, 'মাইরি, পাড়ার মেয়েটা বে-হাত হয়ে গেল!'

হচগুপ্তের দুঃখে আমরা অবশ্য সেদিন মরে যাইনি। তবে যূথিকার এমন বৌদ্ধিসেবী কাজের যে কোন হদিস পাইনি তা ঠিক নয়। পরে অবশ্য সার বুঝেছিলাম : প্রেমের ব্যাপারে 'ফার্স্ট' কাম ফার্স্ট সার্ভ' বিধেয়।

আমাদের মধ্যে হচগুপ্তই একমাত্র 'চীফ আরকিটেক্ট' যার মধ্যে দিবানিশি প্রেমের আগুন জ্বলত। অথচ দুর্ভাগ্য আমাদের কম নয়, সে আদৌ কোন হাদা বিনিময়ে লিপ্ত হতে পারেনি। অথচ ওরই নাকের ডগায় মনুনেদা নামক ভাগ্যবান যূথিকার প্রসাদ পাওয়ায় হচগুপ্তের ক্ষুব্ধ ও কুপিত হওয়ার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। আমরা তা বুঝেছিলাম। এবং সে কারণে যূথিকা-সন্নিধানী পোস্টারে আশানুরূপ ফল প্রাপ্তি না হওয়ায় আমরা দুঃখিত। যদিচ উপযুক্ত পোস্টার আমাদের অনুমোদন ব্যতিরেকেই লিখিত হয়েছিল। হচগুপ্তের প্রসঙ্গ আপাতত এখানে ইতি করলে আমাদের মনুনেদা বনাম যূথিকা নিবন্ধের অবতারণার প্রয়োজন ঘটে। এবং সেই সুবাদে মনুনেদা সম্পর্কে যে দু' একটি কথা এ প্রসঙ্গে অবশ্যজ্ঞাতব্য তা সবিনয়ে নিবেদন করি।

সবচেয়ে যেটি আকর্ষণীয় তা হল মনুনেদার সরু পাতলা গোঁফ। চিক্কন চেহারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যেন গোঁফ জোড়া বেঁচে ছিল। স্মার্ট এক জোড়া গোঁফ নিয়ে মনুনেদা যখন হাসত, তখন সত্যি তা আকর্ষণীয় বটে। বাঁ পায়ে একটি কিক্ এ গোলের জালকে ভেদ করা এ তল্লাটে আর কাকেও করতে বড় একটা দেখা যায়নি। কিন্তু ইদানীং মনুনেদার খেলা পড়ে গেছে। লোকে বলে, যূথিকারা এ মুলুকে আসার পর থেকেই নাকি—

তা যাক। মন্নেদার তাতে আফসোস কিছুমাত্র আছে বলে তো মনে হয় না। সে জানে, খেলা একদিন পড়তোই, আজ না-হয় কাল। তা নিয়ে মাথাব্যথার প্রয়োজনটা কোথা।

—'তা বলে খেলা ছেড়ে দেবে?' যূথিকা রাগ করেই বলত।

—তা আর কি করা যাবে। খেলতে না পারলে ছেড়ে দিতে হবে। মন্নেদা এক ঝলক হেসে দিলে। মন্নেদা হাসলে ওর সাদা দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠত। আর কালো চিকন গোঁফ জোড়া সে হাসির প্রসাদ পেয়ে ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তারপর মন্নেদা চাতালে বসে যূথিকার আরো একটু কাছে সরে আসত। আর বলত : শুধু খেলা কেন? তোমার জন্যে আমি দুনিয়া ছেড়ে দিতে পারি।

যূথিকার প্রচণ্ড ভাল লাগতো, আর প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে একটা মিছে কথা বলত : ছি! তুমি এত স্বার্থপর!

মন্নেদা চোখ জোড়ায় মাতালের আবেশ এনে বলত : কেন? প্রেমের জন্যে রাজ্য ছেড়ে দেয়। আর আমি সামান্য খেলা ছাড়তে পারব না।

যূথিকা সোহাগে মন্নেদার চুলগুলো উসকো করে দিত। আর ফিকে পাতলা হাসিতে মন্নেদার অদম্য একটা লোভকে বাড়িয়ে তুলে বলত, ব্যাপারটি তা তো না। আসলে প্রেমিকাকে পাওয়ার জন্যেই রাজ্যকে যৌতুক দিয়েছিল। প্রেমিকাকে না পেলে রাজ্য নিশ্চয় ছাড়ত না।

চাঁদ উঠলে মন্নেদার খারাপই লাগত। গরমকাল। ঘরের ভেতর বসা চলে না। ঘরে পাখা নেই। কিন্তু চাতালে ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস। তৃপ্তির অভাব হত না। চাতালটি খোলামেলা। অদূরেই পাঁচিল ঘেঁষে একটি আতাগাছ। এই মুহূর্তে ফুলের অথবা ফলের আশা না থাকলেও জল দিচ্ছে যূথিকা আখেরে ফল মিলবে তাই।

বিষ্টুবাবুর বড় মেয়ে বড়কির সঙ্গে মন্নেদার একটু লটঘটের ব্যাপার কে না জানত। ব্যাপারটা ফাঁস করে দেবার জন্যে অনেক দিন ধরেই চেষ্টা চলছিল; শুধু আমাদের প্রবল আপত্তিতে থেমে ছিল। আমরা বলেছিলাম : আহা, বর্তমান ঘটনা আরো মজুক না, অত তাড়াহুড়োর কি আছে?

কারোর চাওয়ার অপেক্ষা না রেখেই চাঁদটা শেষ পর্যন্ত উঠেছিল। আর তার হাল্কা হলুদ আলো করবী গাছটার পাতায় লাগছিল। সেদিকে চেয়ে এক মুহূর্ত থেমে ছিল যূথিকা। তারপর মন্নেদার দিকে ফিরে কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল। তখন মন্নেদা যূথিকার হলদে আলোর উদ্ভাসিত মুখের দিকে চেয়ে বললে, দেখেছো, একটা জিনিস লক্ষ করেছ? যূ

দেশ

বিশেষ সাহিত্য-সংখ্যা ১৩৭৪

স্বাধীন ভারতবর্ষে আজ একটি প্রবলতম সমস্যা, বিভিন্ন অঙ্গরাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যচেতনার অভাব, যার ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের খণ্ডস্বার্থবোধ সমগ্র ভারতের মঙ্গলচিন্তার চেয়ে প্রধান হইয়া উঠিবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

আমরা যে যে কর্মে নিবিষ্ট আছি আমাদের কর্তব্য নিজ নিজ চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে এই নিখিলভারতচেতনাকে জাগ্রত করিয়া রাখা। এই কথা স্মরণ করিয়া দেশ পত্রিকার আগামী সাহিত্য-সংখ্যা (২৫ বৈশাখ ১৩৭৪) এই বিষয়ের আলোচনায় নিয়োজিত করা স্থির হইয়াছে।

রামমোহনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালী চিন্তানায়কগণের অনেকেই বাংলাদেশের প্রতি গভীর প্রীতি রক্ষা করিয়াও সমগ্র ভারতের ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন এবং নিজ নিজ কর্মে ও চিন্তায় তার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য ও কর্মের বিভিন্ন বিভাগে বাঙ্গালী মনীষীদের এই ভারতচিন্তার বিবরণ আমরা আগামী সাহিত্য-সংখ্যায় গ্রথিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। দুই শতাধিক পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যায় বাংলার বিশিষ্ট মনীষী প্রাবন্ধিকদের রচনা বহু চিত্রে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবে।

এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ হইতেছে রবীন্দ্রনাথের প্রায় ৪০টি দুষ্প্রাপ্য কবিতা ও গান মূল পাণ্ডুলিপির প্রতিকৃতিসহ পুনর্মুদ্রিত হইবে।

গত এক বৎসরে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যগ্রন্থের একটি সুনির্বাচিত তালিকা উক্ত সংখ্যায় অনুমোদন করা হইবে। তালিকায় গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম, রচনার বিভাগ (যথা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, প্রবন্ধ) ইত্যাদির উল্লেখ থাকিবে।

সাহিত্য-সংখ্যার বিজ্ঞাপনের হার বর্ধিত হইবে না। সাধারণ সংখ্যার ন্যায় এই বিশেষ সংখ্যারও হার প্রকাশকদের ক্ষেত্রে প্রতি সেণ্টিমিটার কলমের জন্য কণ্ট্রাক্ট রেট ৪·৮৮ টাকা ও শতকরা ১০ টাকা অতিরিক্ত এবং ক্যাজুয়াল রেট ৬·০০ টাকা ও শতকরা ১০ টাকা অতিরিক্ত ধার্য হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের কপি, ব্লক ইত্যাদি আগামী ৪ বৈশাখ ১৩৭৪ (ইংরাজি ১৮ এপ্রিল, ১৯৬৭) তারিখের মধ্যে আমাদের অফিসে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। ইতি

ব্যবস্থাপক, দেশ

কিছুই করো না কেন, অবশেষে ক্লান্তি আসে। কিন্তু কখনো শুনেছ, প্রেম করতে করতে কেউ 'টায়ার্ড' হয়ে পড়েছে!

যূথিকা হাসল। সে ওই চিঠিটার কথাই ভাবছিল। তারপর বললে, 'আর কেউ হয় কিনা জানা নেই, তবে তুমি হও না! তা জানি।'

মনেদা হাসল। হাসি থামলে যূথিকা বলল, কই বললে না?

—কি?

—বড়কির কথা!

—তুমিও যেমন; খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। পাড়ার ছোঁড়াগুলো কে কি লিখেছে তাই নিয়ে—

—পাড়ার ছোঁড়া? নাম দেয়নি তো!

—উড়ো চিঠিতে আবার নাম থাকে নাকি? আমি খোঁজ নিয়েছি। ওসব ওই রকবাজ ছোঁড়াদের কাজ।

—কিন্তু বিষ্টুবাবুর মেয়ে বড়কি—সেটাও কি যাচ্ছে? সে খোঁজ করোনি?

—সে খবর জানি। তার সংগে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল। মত দিইনি, ভেস্তে গেছে।

—তুমি কিন্তু গোপন করছ।

মনেদা সে কথার জবাব না দিয়ে চাঁদের স্বল্প আলোয় যূথিকাকে আদর করতে চাইল। যূথিকা সরে গিয়ে বললে, 'আদর করার অনেক লোক আছে, তাদের কাছে যাও।' উঠে পড়ল যূথিকা। শাড়ির ভাঁজে কাপড়টা টেনে বললে, 'মাকে ওষুধ দিতে হবে। রাত হয়েছে।'

মনেদাকে ক'দিন দেখতে পাওয়া যায়নি। ভাবলাম, হচগুপ্তের বাণ কাজ করেছে। সে কথা হলফ করে কিছু বলা না গেলেও অনুমান লক্ষ্যভেদ হয়েছে।

ইতিমধ্যে হচগুপ্ত একটি কাজ করে বসল। যথারীতি সন্ধ্যার আসর জমার আয়োজন হয়েছে। বাইরের ঘরে যূথিকার ভাই পড়ছে। আর বাইরের চাতালে বসে যূথিকা একটি হ্যারিকেনের আলোয় পরীক্ষার খাতা দেখছে। অনেক খাতা জমা হয়ে গেছে। সেগুলি আজকালের মধ্যে না শেষ করলে চলবে না। নম্বরগুলি বসাতে হবে, লিস্ট করতে হবে। অনেক কাজ। যূথিকা মনো-যোগ দিয়ে খাতা দেখছিল। আর মাঝে মাঝে ডান দিকে ঘাড়টা ফিরিয়ে মহুয়াতলার দিকে নজর ফেরাচ্ছিল।

বলা নেই কওয়া নেই, হচগুপ্ত হাজির। চাতালে উঠেই ধাপিটাতে বসে পড়ল। যূথিকা অবাক চোখে চাইল। হচগুপ্ত হেঁ হেঁ করে বিনীত হাসির ছটায় তার এবড়োখেবড়ো দাঁতগুলো বার করে বললে, মাপ করবেন, চিঠি পেয়েছেন?

যূথিকা আকাশ থেকে পড়ে বলল, 'চিঠি?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার চিঠি।

যূথিকা বিনীতভাবে জিগ্যেস করল, আপনি কোত্থেকে আসছেন?

—এ পাড়া থেকেই।

যূথিকার ভ্রূযুগল সামান্য কুঞ্চিত হল। তারপর অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে, কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

—চিনতে পারলেন না? আমি হচগুপ্ত।

যূথিকা হকচকিয়ে গিয়ে খানিক বিমূঢ় হয়ে গেল। নামটা টেনে টেনে আর একবার উচ্চারণ করলে, হ—চ—গুপ্ত!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে হারাণচন্দ্র গুপ্ত।

যূথিকা প্রায় জোরেই হেসে ফেলেছিল। যে বিস্ময় যূথিকাকে এতক্ষণ ঘিরে ছিল, মনে হল সেটা সরে গিয়ে ও এখন খানিক সহজ হতে পারছে। হাসি থামলে বললে, 'না, আপনার কোন চিঠি পাইনি।'

—পাওয়া উচিত ছিল।

—কেন বলুন তো?

—হেঁ হেঁ, তাই বলছিলুম। মানে আমাদের বড়কি বললে, তাই লিখে দিলুম।

এতক্ষণ যূথিকা হচগুপ্তের দিকেই তাকিয়ে ছিল। এখন চোখ দুটো নামিয়ে নিলে। মুখ চোখ লাল হয়ে উঠছে, অপমানিত বোধ হচ্ছে। গাল গলা ঘেমে উঠছে; গম্ভীর হয়ে জিগ্যেস করলে, 'বড়কি?'

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে, আপনার মনেদা—এই মনেদার সংগে বড়কির একটু ইয়ে হয়েছিল তো।

সোজা তাকালো যূথিকা। হচগুপ্ত যেন সংবিৎ ফিরে পেল।

—বুঝলাম, আপনি এখন আসতে পারেন।

হচগুপ্ত বিদায় নিলে খাতাপত্তর গুটিয়ে আলোটা আধো-নিবু করে শুয়ে পড়ল। খাতা দেখা শেষ হল না। এবং তা আজ হবার নয়। শুয়ে শুয়েই যূথিকা ডাকল : সন্তু—

সন্তুর সাড়া না পাওয়ায় একটু জোরেই ডাক দিল। সন্তু এলে বললে, মার জ্বরটা দেখে নে তো!

রাত এমন কিছু নয়। সাতটা পেরিয়ে গেছে। ভীষণ রাগ হচ্ছে যূথিকার। নিজের ওপরে। ভীষণ অপমানিত মনে হচ্ছে। কিছু ভাল লাগছে না। ভাবছিল, আজ যদি কোন পুরুষমানুষ এ বাড়িতে থাকত! মাঝে মাঝে বিষণ্ণতায় মনটা ভরে ওঠে তার। আর এক অসীম অভিমানে ওর বাবাকে স্মরণ করে। বাবা মারা যাওয়ার পরেই যেন নানা গঞ্জনা, নানান ঝড়-ঝঞ্ঝার সূত্রপাত। তবু যূথিকা নিজের পায়ে আজ দাঁড়িয়েছে। আর পেরেছে বলেই আজকের এ অপমানে ওর গায়ে ফোসকা পড়ছে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, সংসারটার পায়ে দুটো ঠেকনা দিতে হবে। আর তাই আকাঙ্ক্ষিত অনেক কিছুকে কবর খুঁড়ে পুঁতে দিতে হয়েছে। মনে পড়ে সেইসব কলেজের দিনগুলোর কথা। ট্রেনিং কলেজের কথা। কিন্তু

যূথিকা পারেনি শেষ পর্যন্ত। অথচ সে জানত, তার এতটুকু ইঙ্গিতে অনেক বড় কিছু পাওয়া তার হতো। হল না, সম্ভব হল না। কিন্তু কেন? সকলকে বাঁচিয়ে নিজে বেঁচে থাকার একটা সংস্থান? না, সন্তু? ঠিক তাই! এতকাল এটাই ওর জীবনের চরম পাওয়া ও লক্ষ্য বলে প্রতীত হতো। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছে কোথায় যেন সবটা মিলিয়ে একটা ফাঁক রয়ে গেছে। আর তখনই তার মনে হয়েছে, অনেক পেছনে ফেলে আসা ললিতা, মলিনা, গৌরী এদের কথা। জানে না যূথিকা, এরা সবাই সুখী কিনা। কারো কারো খবর তার কাছে আছে। হয়তো সুখের, কিংবা হয়তো না। তবু এমন মুহূর্তে ওদের কথাই বেশী করে ভাবায়, বেশী করে টানে।

সাইকেলের বেলটা বেজে উঠলে যূথিকা চমকে উঠে শুয়ে রইল। যেমন ছিল, শুধু হাতটা বাড়িয়ে আধো-নিবু আলোটাকে একটু উজ্জ্বল করে দিলে। মনেদা সাইকেলটা রেখেই চাতালে উঠতে উঠতে বললে, আলোটা কমানো থাকলেও থাকতে পারত; আশঙ্কার কারণ ছিল না।

সে কথার জবাব দিলে না যূথিকা। যেমন চোখ দুটি ঢেকে শুয়ে ছিল তেমনি রইল।

মনেদা আবার বললে, 'কি? রাগ পড়লো না আজও।' মনেদা দূরত্ব কমিয়ে বসল। জ্বলন্ত সিগারেট ফেলে দিয়ে বললে, 'জানো, কাজে ভীষণ গোলমাল। সেন্ট্রাল পিটে দুটো লোক মারা গেছে। কয়লা ধসে।'

যূথিকা হাত সরিয়ে মনেদাকে দেখলে। মনেদা যূথিকার চোখে অশ্রু দেখে গলার স্বর নরম করে জিগ্যেস করলে, 'কাঁদছো! কি হয়েছে?'

যূথিকা নিশ্চুপ।

—আমায় বলবে না?

যূথিকা উঠে বসল। তারপর বললে, কেমন আছ?

—তুমি রাগ করেছ?

—রাগ!

—হ্যাঁ।

—কার ওপর?

—আমার ওপর।

—কেন? কোন অধিকারে?

মনেদা যেন কিসের একটু গন্ধ পেলে। তারপর বললে, 'কদ্দিন আসিনি বলে রাগ করেছ খুব, না?'

—না। ছোট জবাব দিলে যূথিকা।

—তবে কাঁদছিলে?

—এমনি। ভাল লাগছিল। একটু থেমে আবার বললে যূথিকা, 'কি যেন বলছিলে, কজন মারা গেছে?'

মনেদা চুপ করে গেল। চুপচাপ দুজনেই। অনেক, অনেকক্ষণ। মনেদা ঘড়িটা দেখলে। তখনও ন'টা বাজে নি। তারপর বললে, 'জানো, আজকে ভেবেছিলাম, তোমায় অনেক কিছু বলব। কিন্তু হল না; বিধি বাম। সুযোগ হল না। সুযোগ দিলে ভাল করতে। জানি না, কোন দিন দেবে কি না।'

মনেদা একটু থামল। তারপর বললে, 'করবীগাছে আর কিছু দিন পরে ফুল ফুটবে। আর আমাদের কয়লাখনিতে দুটো নতুন লোক ভর্তি হবে। কিন্তু তুমি আর আমি— যাক গে। চললাম।'

মনেদা চলে গেল। ওর চলে যাওয়ার দিকে স্তম্ভিত বিস্ময়ে যূথিকা তাকিয়ে রইল। মহুয়াগাছের গোপন অন্ধকারে

ক্ষণেকের জন্যে মিলিয়ে গিয়ে সাইকেলটা বড় রাস্তায় উঠে পড়ল। যূথিকা সেই দিকেই চেয়ে ছিল। আর করবী গাছের দিকে চেয়ে একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস বুক ঠেলে বার হয়ে এল।

এ এলাকায় বর্ষার জল দাঁড়ায় না। সাদা পাথুরে রাস্তা। গড়ানে। ফলে জলে ধুয়ে জমে থাকা বালিগুলো রাস্তার পাশের ড্রেনে হুড়হুড়িয়ে গিয়ে পড়ে। ড্রেন দিয়ে জল যায়; বালি থাকে। সেই বালি বেড়ে বেড়ে আবার রাস্তার কাঁধ বরাবর এসে পড়ে। এই রাস্তার পাশে বরাবর যে পাঁচিল তা হল চৌধুরীদের। যদিও যূথিকাদের বাড়ির ভেতরে একটুখানি জমি পতিত হয়ে পড়ে আছে, সেখানে কিছু গাছগাছালি লাগানো চলতে পারত। যেমন লাগিয়েছে চৌধুরীরা। কিন্তু এসব করে কে? কুয়োতলার জল চৌধুরীদের বাগানে পড়ে। যূথিকার বাড়ির মানুষ রূপনার ভারি শখ, সে এক চিলতে জমিতে কিছু ফসল ফলায়। কুয়োতলার অকেজো জল তা হলে কিছু কাজ পায়। তাই এক কোণে কিছু কুমড়ো-চারা আর এ দিকে জিনিয়া লাগিয়েছে রূপনা। জিনিয়া গাছগুলো বেশ বেড়ে উঠেছে। যূথিকা নিচু হয়ে ওদের তেজী পাতার বাহার দেখছিল। খানিক আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। তখনও বিকেল হয়নি। আজ রোববার। ক'দিন যা গেল না, ঘরের বার হওয়া যায় নি। ঝড় আর জলে চতুর্দিক ভেসে গেছে। আবার খানিক পরে শুকিয়ে ঝরঝরে। এসব দেখে যূথিকা বেশ মজা পায়। ও যদি এমন হতে পারত। খানিক বাদেই শুকিয়ে ঝরঝরে। তা পারে না। পারে নি। ওর মা সেদিন জিগ্যেস করলেন, 'তোর কি হয়েছে রে?'

—কই, না তো! যূথিকা পালিয়ে এসেছে। আবার লুকিয়ে কেঁদেছে।

কাঁদবেই তো। মুনেদা সেই যে চলে গেছে আর আসেনি। তা আজ কম দিন নয়। গরম কেটে গিয়ে বর্ষা। চিঠি দিয়েছে; খোঁজ নিয়েছে। কিন্তু কিছু হয় নি। শেষে যূথিকা বেনিয়াডী গেছে; মুনেদার ঠিকানা নিয়েছে; জেনেছে, মুনেদা ওখানে নেই।

যূথিকা আজ সকালে চিঠি পেয়েছে। দু' লাইন। আজকালের মধ্যেই দেখা হচ্ছে। চিঠিটা যূথিকার চিঠির একটা উত্তর। যত্ন করে রাখার মত কিছু না। মামুলী চিঠি। যা দশজন বিশজনকে দেয়। মুনেদাও দিয়েছে। তবু কি জানি কেন, যূথিকার চিঠিটা রেখে দিতে সাধ গেল। চিঠিটা বার কয়েক পড়েও শান্তি পাচ্ছিল না। দুটো লাইন; তার মধ্যবর্তী কিছু অলিখিত কথাকে পড়ার চেষ্টা করছিল। নানা ভাবে, আর বারবার নানান আকারে তার কাছে ধরা দিচ্ছিল।

এক মাস যে যূথিকার কিভাবে কেটেছে, তা সে নিজেই জানে না। যদিও এর জবাবদিহি তাকে করতে হবে না। কোন বিবরণ না দিলেও চলবে। তবু হতচ্ছেদের দলের টিটকিরি—"বলেছিলুম না! ও পাখি উড়বে। কেমন? হল না?" অসহ্য! বারে বারে মনে হয়েছে, যদি একটিবার ও ঘুরে যেত। তা ছাড়া আসবে নাই বা কেন? শুধু নিজের অভিমানেই সে মরে গেল। মাঝে মাঝে যূথিকার মনে হয়েছে, ভালবাসলে এভাবে কেউ থাকতে পারে! যূথিকা কেঁদেছে, রাগ করেছে। আবার কাজ করেছে।

আজ ক'মাস পর মুনেদা আসছে। ভাবতে বেশ ভালই লাগছিল। সকাল থেকে মনটি বেশ প্রফুল্ল। খুশমেজাজে খুনসুটি করেছে সন্তুর সঙ্গে। কিন্তু বিকেল পড়তে না পড়তে মনটা ভীষণ ভারী হয়ে উঠল। সময় যতই এগোয়, যূথিকা কেমন একটা প্রতি-ক্রিয়ায় বিষণ্ণ হয়ে পড়ে।

তাই মুনেদা যখন বেলা থাকতেই এসে হাজির হল, তখন যূথিকা কোন কথা না বলে একটি মোড়া এগিয়ে দিলে বসতে। হাতের টুকিটাকি কাজ সেরে অতঃপর বললে, 'সময় হলো এত দিনে?'

মুনেদা জানলা দিয়ে আকাশটা একবার দেখে নিলে, তারপর বললে, 'চলো, বেড়াতে যাবো।'

আকাশে মেঘ নেই। পরিষ্কার। মুনেদা ও যূথিকা পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে আমাদের আড্ডাখানার পাশের রাস্তা দিয়ে বড় রাস্তায় এসে উঠল। আমরা দেখলাম। এবং হুমড়ি খেয়ে ভূত দেখার মতো কজন ঝাঁপিয়ে পড়ল জানলায়। সবাই হইহই করে উঠলাম। কঠিন চোখে যূথিকা আমাদের দিকে চেয়ে হনহন করে এগিয়ে গেল।

চলতে চলতে যূথিকাই কথা তুলেছিল, এভাবে বনবাসে কাটানোর মানে? জানো না, কিভাবে আমার দিন কেটেছে? আচ্ছা, তোমরা বোধ হয় সব এইরকমই, না?

মুনেদা হাসলে। স্বচ্ছ হাসি ঝরে পড়ল।

—এমন করে হাসবে না তো!

আবার হাসলে মুনেদা। বললে, খু—ব রাগ করেছ তো। আসলে এটি আমি চেয়েছিলাম।

—নিষ্ঠুর।

—না, তা নই। শুধু জানতে চেয়েছিলাম, আমার জন্যে তোমার মনে এতটুকু ঠাঁই আছে কিনা!

—খুব হয়েছে। আর কাব্যি করতে হবে না। কেন আসোনি তাই বল।

—বদলি হয়েছি কলকাতায়। তোমায় জানাবার ইচ্ছে ছিল—কিন্তু হয়ে ওঠেনি।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে গিয়ে

পৌঁছাল। তারপর বাঁ দিকে বেঁকে বড় বাড়িটার পাশ দিয়ে উঠে পাড়ে গিয়ে বসল। বিকেলে জল হয়নি। দুপুরে এক পশলা হয়ে গেছে। বেশ একটা ভিজে-ভিজে হাওয়া। ওদের মন দুটোও কেমন যেন স্যাঁতসেঁতে। যূথিকা বললে—আরো খানিক আগে এলে ওপারে যেতাম। ওই পাহাড়টায় আমার ওঠার ভারী শখ। কিন্তু দেখছি, কিছুতেই তা যেন হবার নয়।

যূথিকা চশমাটি খুলল। বাতাসে চুলগুলো এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। বিকেল পড়ে গেছে। সন্ধ্যার আবছা ইঙ্গিত। যূথিকা কানের পাশের চুলগুলি ফিরিয়ে দিয়ে আরো একটু সরে বসল।

তারপর সন্ধ্যা নেমে এলে, অন্ধকার আবছা হলে, আশপাশ নজরের আড়াল হলে, আজ এই প্রথম এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটল যূথিকার জীবনে। পুরুষের কঠিন বাহুর বন্ধনে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ও চুম্বনে বিহ্বল হওয়া ছাড়াও সব মিলিয়ে কেমন এক আবেগে ও ভেসে গেল।

যূথিকা প্রথম কথা বললে, 'আর কাউকে এমন করে আদর করতে না?'

হাসলে মনুদা। তারপর বললে, 'তুমি দেখছি কিছুতেই ভুলতে পারছো না। হ্যাঁ শোন, তোমার জন্যে সুন্দর একটা জিনিস এনেছি।'

—কোথায়?

—সঙ্গেই আছে।

—বাড়িতে দিলে না কেন?

—বাড়িতে দেবার নয়।

—কেন?

—এ হল তোমার মন-গড়া সতীনের চিঠি। বড়কির।

যূথিকা এক মুঠো চিঠি হাতে নিলে। অন্ধকারে দেখা যায় না। কি যেন ভাবলে, পরে কিছু ভেবে চুপ করে বসে থেকে নিজের মাথাটি আস্তে করে মনুদার কাঁধে রাখলে।

মনুদা বললে: চলো, যাবে না?

—কটা বাজলো।

—তা অনেক হবে।

—আর একটু বসো।

উগ্রী নদীর জল এ-কূল ও-কূল ছুঁয়ে যাবে এ দেখার ভাগ্য এখানের লোকদের বড় একটা হয় না। আজ দেখল ভরা নদী; কাল দেখলে মাথার চাঁদি ফাটছে এক চিলতে জলের জন্যে। তবু পাহাড়ী এ নদী প্রাণের প্রাচুর্যে ভরা। আজ বিকেলে অনেক সকাল সকাল আসতে বলেছে যূথিকা।

কাল সন্ধ্যায় যখন বাড়ি ফিরছিল, মনুদা তখন যূথিকার পিঠে বাঁ হাতের তালুটি রেখে গুটিগুটি হাঁটছিল। হাতগুপ্ত টর্চের আলোটা নিচু করে রাস্তার দিকে ফেলে ওদের পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, অধুনা মনুদার সাহস কিঞ্চিৎ বর্ধিত হয়েছে। নতুবা প্রকাশ্য রাজপথে, তা যত অন্ধকারই হোক, হচগুপ্ত না হয় ভদ্রতার খাতিরে আলোটা মাটিতে ফেলেছে, অন্য কেউ হলে সরাসরি ওদের গায়ে গতরেও তো ফেলতে পারত; তখন বাছাধন পীরিত রাখতে কোথায়! যাই হোক, ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরে ভাল মেয়েটির মতো যূথিকা পড়তে বসেছিল। সন্তু পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে। আর যূথিকা চিঠির ঝাঁপি নিয়ে একের পর এক খুলে চলেছে।

গত রাত থেকে বৃষ্টি নেমেছে। কাল রাতে যখন বৃষ্টি নেমেছিল, যূথিকার ভালই লেগেছিল ঠান্ডা আমেজে ঘুমটা মন্দ হবে না ভেবে। চিঠিগুলো পড়তে বসার পরেই বৃষ্টি শুরু হয়েছিল।

ছেড়ে ছেড়ে আজ সকাল থেকেই বৃষ্টি চলছে। আজ সকাল থেকেই যূথিকা মনে মনে অনেকবার বলেছে—'ঠাকুর, বিকেলে যেন বৃষ্টি না হয়।' সত্যি তো, আজ বিকেলে বৃষ্টি হলে একেবারে বসিয়ে দেবে। কেননা, কাল ভোরের গাড়িতে মনুদা কলকাতা যাবে। তবু ভাল, কিছু বেলা হতেই বৃষ্টিটা ধরে এলে সন্তু ও যূথিকা বই খাতাপত্তর নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তেঁতুলতলা পেরিয়েই দুজন দুদিকে।

আজ একটু তাড়াতাড়ি হাঁটছিল যূথিকা। যদিও ছাতি একটি ছিল।

ঠিক মোড়ের মাথায় বোসেদের বাড়ির কাছ বরাবর একটা ধাপিতে বসেছিল হচ-

গুপ্ত ও তার দল। দেখতে পেয়েই যূথিকার ভুরু দুটি কুঁচকে গেল। যদিও এখন বৃষ্টি পড়ছে না, মেঘলা, তবু মনে হল ছাতিটা খোলা থাকলেই যেন ভাল হতো। মুখটা নিচু করে যূথিকা পথ হাঁটছিল। জোর করেই চোখ দুটোকে শাসনে রেখেছে। এই শাসন বস্তুটি এতই স্বাভাবিক যে, এর নাম আর-এক প্রকৃতি।

হচগুপ্ত দূরে থেকেই তৈরি হচ্ছিল। যূথিকা সামনাসামনি এসে পড়লে হচগুপ্ত দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর বললে—'চললেন?' যূথিকা নির্বিকার ওদের ছাড়িয়ে গেল। হচগুপ্ত দ্রুত হেঁটে এসে বললে, 'মাপ করবেন, একটু দরকার ছিল।' যূথিকা সে কথার জবাব দেওয়া অনাবশ্যক মনে করে হেঁটে চলল। হচগুপ্ত জোরেই চেঁচিয়ে উঠল, 'বাব্বা! কুইন এলিজাবেথ!'

ছোট আরশিটার সামনে দাঁড়িয়ে কুমকুমের টিপ পরছিল যূথিকা। টিপটা কয়েকবারই গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। অনভ্যাস। টিপ বড় একটা পরে না সে। আর একটু পরে মুনেদা এসে পড়বে। কাল ভোরের গাড়িতে কলকাতা ফিরবে। খুব রাগ হল মনে মনে। বদলির খবরটা পর্যন্ত দেওয়া দরকার মনে করেনি। যেন আজকেই এ ঘটনার সত্যাসত্য তার কাছে ধরা পড়ল। এবং তা এ মুহূর্তে।

একবার পরা নতুন ছাপা শাড়িটা পরেছে। বেশ পেঁচিয়ে, বুকের কাছে পাতলা করে দিয়ে। আজ শাড়িটা বেশ মানিয়েছে যূথিকাকে। যত্ন নিয়েই পরেছে বলে হয়তো।

মুনেদা যথারীতি এলে যূথিকা চশমার কাচ দুটি শাড়ির আঁচলে মুছে বসার মোড়াটা এগিয়ে দিলে। মুনেদা বসলে যূথিকা জিগ্যেস করলে, 'চা?'

চাপা হাসির ঠেলায় ঠোঁটটা কিঞ্চিৎ লম্বা হলে মুনেদা বললে, 'এই খেয়ে আসছি।'

ওরা পাশাপাশি পথ হাঁটছিল। আজ সকালে হচগুপ্তের কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণটুকু দিতে দিতে যূথিকা এগোচ্ছিল। শেষে রেগে বলেছিল, 'এভাবে অপমান করত ওরা সাহস পায় কোত্থেকে!' যেন এর জবাবদিহি করবে মুনেদা। তাই হল। বুদ্ধিমান মুনেদা নিশ্চুপ থেকে যূথিকার আহত অভিমানকে সামলে নিল।

হাঁটতে হাঁটতে আজ ওরা দক্ষিণে এগোচ্ছিল। ঝুলন্ত পুলটার দিকে। আজ সকালেই খবর পেয়েছে উগ্রী নদীর জল বেড়েছে। দু কূল ছাপিয়ে সে বেগবতী। এ খবরে অনেকে নদীর এ রূপ দেখতে আসছিল।

যূথিকা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েই আচমকা বলে উঠলো, 'ওই দেখো! সেই হতভাগা-গুলো!' বোধ করি যূথিকার উত্তেজনার মাত্রা পরিমিত ছিল না। এবং সে কারণে ওর ওষ্ঠ-নির্গত শব্দ কয়টি ঈপ্সিত ব্যক্তির কর্ণে প্রবেশ করেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে উঠলো: 'সুন্দরি, কাহে কহসি কটু বাণী!' যূথিকা আর মুনেদা দ্রুত ওদের পেরিয়ে গেল।

নদীর ধারে লোকের অন্ত নেই। কিন্তু ঝুলন্ত এই পুলটিতে লোকের ভিড় নেই। শুধু পারাপার যারা করে তারা ছাড়া। আজ সকাল থেকে তারের এই পুলটি ডুবে ছিল। দুপুরে জেগে উঠে জল ছাড়িয়ে মাথাচাড়া দিয়েছে।

যূথিকা বললে—ওপারে যাবো।

মুনেদা বললে, —যদি জল বাড়ে—

—ভালই হবে। থেকে যাব।

মুনেদা কি যেন ভাবল। তারপর ঘাড়টা নেড়ে বললে, 'না, জল আর বাড়বে না। কি বল?'

—বাড়লেই বা!

মুনেদা হাসলে। তারপর হাতটি বাড়িয়ে যূথিকাকে সাহায্য করলে। পুলে পা দিতেই পুলটা দুলে উঠল। ঘোলা জল হু হু শব্দে ছুটে পালাচ্ছে। একটু ভয়, খানিক সংশয় যূথিকার হচ্ছিল। একটু থেমে এদিক ওদিক দেখছিল। পিছন ফিরে দেখল একবার। তারপর আর একবার পিছু ফিরে চাইল। অদূরেই যেন কারা। চেনা চেনা। মনে হল হচগুপ্ত ও তার সাঙ্গোপাঙ্গো। যূথিকা মুনেদার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাতটা টেনে বললে, 'ওই দেখো!' মুনেদা বললে, 'থাকুক!'

ওরা প্রায় মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল। নীচে জলের স্রোত। সাংঘাতিক সে স্রোত। এমন স্রোত এর আগে দেখেনি যূথিকা। কে যেন ওপার থেকে আসছে! পুলটা নাচছে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। শ্লেটের রঙে রঙীন।

মাঝে মাঝে পেঁজা তুলোর আদলে ভাব। নদীটা বাঁক খেয়ে একটা ভারী ভালো লাগার ছবি তৈরী হয়েছে। সেদিকেই যূথিকা চেয়ে ছিল। আসন্ন সন্ধ্যায় এই আবছা আলোয় ওরা দাঁড়িয়ে ছিল। এক পুরুষ, আর এক নারী, আর সেই সন্ধ্যা। যূথিকা

মনুদোর অনেক কাছে সরে এলো। বললে, ভারী ভাল লাগছে, না! তুমি আবার কবে ফিরছো? চিঠি দেবে তো!

দেবো, রোজ একখানা করে।

আনন্দে আবেশে নিজেকে খুব হালকা মনে হল যূথিকার।

যূথিকা হাতের ছোট্ট ব্যাগটা তারপরে খুলে চিঠির তাড়া বার করলে। একটু থেমে বললে, 'পড়লাম। কাল রাত্তিরে। ভাল লাগলো।' যূথিকা চিঠিগুলো মনুদোকে ফিরিয়ে দিলে।

মনুদো যূথিকাকে একবার দেখলে, তারপর মিষ্টি করে হেসে হাতটা বাড়িয়ে দিলে।

মনুদো চিঠিগুলো ছিঁড়তে ছিঁড়তে যূথিকাকে লক্ষ করলে। পরে মুঠো মুঠো হাওয়ায় ছুঁড়ে দিলে। টুকরো টুকরো নীল সাদা কাগজগুলো ভিজে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে দুলতে দুলতে নামতে লাগলো। যূথিকা সেদিকে চেয়ে ছিল।

যূথিকা ভাবছিল, উস্রী নদীর জল বেড়েছে। বৎসরান্তে এই উদ্দাম জলের ঢেউয়ে ছেঁড়া চিঠির রহস্যগুলো ছেঁড়া অতীতের মতো কোথায় মিলিয়ে যাবে, হয়তো সে কিনারা কোনদিনও পাবে না।

এক ঝলক উড়ো হাওয়া নীল চিঠির একটি টুকরোকে মনুদোর ঠিক কলজে বরাবর আলতোভাবে সেঁটে দিয়েছিল।

যূথিকা সেটি এক মুহূর্তে দেখল। তারপর বাঁ হাতের দুটি আঙ্গুলে অযত্নে তাকে তুলে নিঃসীম শূন্যে উড়িয়ে দিলে। ছেঁড়া টুকরোটি কাগজের প্রজাপতি হয়ে উড়তে উড়তে ক্রমে ছোট্ট হয়ে মিলিয়ে গেল। যূথিকা সেদিকে চেয়ে ঠোঁটটা ঈষৎ বেঁকিয়ে তির্যক হাসলে; আর আশ্চর্য এক চেতনায় মনুদোর প্রশস্ত বুকে মাথাটি নুইয়ে দিলে।

অতঃপর হৃতগন্ধ সুদীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ফেলে অপরিসীম যাতনায় বলে উঠলে, 'পাড়ার মেয়েটা মাইরি নেহাতই বেহাত হয়ে গেল।'

আকাশের মাঝখানে

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আকাশের মাঝখানে নানা পথ আছে
সেই পথ তোমার আমার,
বাতাসের মাঝখানে নানা দেহ আছে
সেই দেহ তোমার আমার।

ফাল্গুনের মাঝখানে গাছগুলি আশ্চর্য বিহ্বল
রাশিরাশি ঝরাপাতা কী করবে বুঝতে পারে না
ইতস্তত ঘোরে, ঝাড়ুদার ঝাঁট দিয়ে
জমা করে এক পাশে।
এখনো রয়েছে ঠাণ্ডা। রাতে তাই
তাদের জ্বালানো হয়।
ভিখিরিরা ভিড় করে হাত সেঁকে।
এই সব ঝরাপাতা তোমার আমার
তাদের আগুনে
সেঁকে নেবে—বল কী সেঁকবে?

আকাশের নানা পথে হয়তো কখনো
এক-একটি তারা তুলে চুলে গেঁথে নাও
কিংবা চাঁদ দিয়ে টিপ পরে
হতে চাও বাতাসের দেহ।

রাশি রাশি ঝরাপাতা রাতে পুড়ে যায়
গাছগুলি ঝলমলে নতুন পাতায়।
সিল্কের মতো এই তরুণের দল
জীবনের কত ছোটো কত বড়
অদল-বদল?

রোদ্দুর

রাজলক্ষ্মী দেবী

যদিও দশটার তুমি কথা রেখে পথে দাঁড়াও নি,—
আমার পুষ্পিত হ'তে বাধা নেই। সহস্র শব্দের
পত্রাবলী ছিঁড়ে ফেলো,—উড়ে ফেলো সঞ্চিত সৌরভ।
দশটার রোদ্দুরে তবু ডানা মেলে নাছোড় প্রত্যয়।

অন্তরাত্মা শেষ জেনে কী যে শান্ত! সহস্র শব্দের
পত্রাবলী ছিঁড়ে প্রতি শব্দ জাগে নির্ভুল স্পন্দ।
অন্য কোনো চন্দ্রাতপে ছায়া নেই। নাছোড় প্রত্যয়
দিগন্তে ঝাপটায় পাখা দশটার বেতালা রোদ্দুরে।

শব্দ,—ওরে শব্দমধু! আদরিণী পৃথিবী আমার!
সমস্ত সুস্বাদে এক বিকল্প, প্রতীকপুঞ্জ। আমি
একাধারে মূল, দ্রুম, শাখা। দৃঢ় চিত্তের ঝংকারে
দশটার রোদ্দুর কাঁপে। কামড়ে-থাকা নাছোড় প্রত্যয়

দেহে-মনে ফুল ফোটায়। এক আশা, এক মোক্ষ, তাই
পত্রাবলী-ছেঁড়া শব্দ গুণে গেঁথে পেটিকায় তুলি,
অলৌকিক স্মৃতি-মন্ত্র হৃদয়ে দোলাই। শেষ জেনে
নিশ্চিন্ত চরণে হাঁটি দশটার বিমনা রোদ্দুরে॥

স্বপ্নের কবিতা

তারাপদ রায়

আশেপাশে জ্ঞাতি-পড়শী ঘুমানোর পরে,
স্বপ্নবদলের হাওয়া এসে ক্ষণতরে
দুপুর রাতের ঘরে ঢুকে যায় পরীর মতন,
বলে, 'আর কতক্ষণ?
তাড়াতাড়ি, এবার বদলাও গাড়ি,
এই ঘর, এই-ই তো জংশন।'

একদা স্বপ্নের সঙ্গে ছিলো লুকোচুরি
অহরহ কবিতার চোর-চোর, বুড়ি-বুড়ি খেলা।
এখন শব্দের সঙ্গে খেলা
এখন শব্দই স্বপ্ন,
চৌমাথার ভিড় থেকে ফুসলিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে
একটি শব্দকে ধরে কোনোভাবে ঘরে নিয়ে আসা।

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

আঠার

ইন্দির নামে সেই শিল্পী যেন জাদুকর। সকালবেলায় শীতের রোদে যখন দিগ-দিগন্তের কলাই-মটরের ক্ষেত শিশিরে ঝিকিমিকি করে, ঝোপে ঝোপে বেতগাছের কালো সবুজের পাতা চিকচিক করে, বিশাল হিজল-জিয়লের ঝুপ্সিতে পাখিরা ডাকে, খেজুরগাছের চাঁছা কপালে কাঁড়র ঠিলির কাছে মৌমাছিরা গুনগুনায়, তখন ইন্দির তাকে তৈরি করে তোলে এক মস্ত ব্রহ্মদৈত্যের রাজ্য, প্রেতিনীর তেপান্তর, যত অশরীরী আত্মাদের ঘাড় মটকানো তাণ্ডবের প্রকাণ্ড কারখানা। ছেলেটি অনুভব করে, চারদিকে ভূত পেত্নীতে গিজ্‌গিজ্‌ করছে। কেননা, ইন্দিরই তাকে জানিয়েছে, 'অই যে দ্যাখ খুঁটায় বান্দা গরুটা ঘাস খাইতে আছে, অইটাই হয়তো পেত্নী। যেই তুমি কাছে যাইবা, দ্যাখবা, গরু-টরু কিছু নাই, ভুঁইয়াগো বাড়ির এক সোন্দর বউ খাড়াইয়া রইছে।'

শহরের ছেলেটি ইন্দিরের লম্বা লম্বা শক্ত হাত আরো জোরে কষে ধরে। আর বুক ধুকুধুকু আশা ও কৌতূহলে খুঁটোয় বাঁধা গরুটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে, এই বুঝি গরুটা সত্যি সত্যি ভুঁইয়াদের বাড়ির সুন্দর বউ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। রোদে পিঠ দিয়ে, ল্যাজ নেড়ে মাছি তাড়িয়ে তাড়িয়ে সে যেমন ঘাস খাচ্ছিল, তেমনি খেতে থাকে। তবু সে জিজ্ঞেস করে যায়, 'তারপর?'

'তারপর?...তারপর যত তুমি কাছে যাইবা, দ্যাখবা, সোন্দর বউটা কান্দে। কান্দে, আর কান্দে। দেইখ্যা তোমার মন গইলা যাইব। তুমি গিয়া কইবা, "কোন্‌ বাড়ির বউ তুমি, কোন্‌ গেরামে বাড়ি, তুমি কান্দো ক্যান?" তখন সেই বউ কইব, অমুক গেরামে বাড়ি তার, অমুক বাড়ির বউ। ডাকাইতে তারে চুরি করছে, এইখানে ফালাইয়া গেছে। অখন তারে পোঁছাইয়া দিতে হইব।'—

'তারপর?'

তারপর... তারপর... তারপর? এই 'তারপরের' আর শেষ নেই। জাদুকরের গল্পও আর, তাই ফুরোয় না। ইন্দির জানায়, যে মানুষ সে বউকে দেখে ভুলবে, তারই মরণ। কারণ, আসলে তো সে বউ না, পেত্নী। সে পথ ভুলিয়ে নিয়ে যাবে কোন শ্যাওড়ার জঙ্গলে, নিশিন্দার বনে, বেতের ঝোপে, হিজলের জটায়। তারপর ঘাড় মটকে রক্ত শুষে খেয়ে ফেলবে। তবুও 'তারপরে' থাকে। আর জাদুকরের বাঁশী ভিন্ন ভিন্ন সুরে বাজতে থাকে। যে সুরে কাল-মহাকাল সবই হারিয়ে যায়, তাল মান মাত্রা তো কোন ছার।

ছেলেটি যে শুধু শোনে, তা নয়। ইন্দিরের মুখের দিকেও হাঁ করে দেখে। হতে পারে, ইন্দিরের সবে তখন গোঁফ উঠেছে। তবু সেই ইন্দির যেন ছেলেটির চোখে তখন হাজার বছরের সব কিছু দেখা-শোনা জানা এক আদ্যিকালের লোক। যদিও ইন্দিরের ঘাড়-কামানো লম্বা লম্বা কালো চুল, বড় বড় চোখ দেখেও সে মুগ্ধ। ইন্দির আর তার কাছে ইহজগতের লোক থাকে না। সে যেন অন্য এক জগতের আগন্তুক। অন্য জগতের কথা শুনিয়ে নিয়ে যায়।

চুম্বক যেমন লোহা টানে, তেমনি করে ছেলেটিকে নিয়ে ইন্দির পৌঁছে যায় ব্রজেরহাটে। সে জায়গার নাম কেন ব্রজেরহাট, ছেলেটি তার খবর জানতো না। আজও জানে না। ব্রজেরহাট নয়, বেজেরহাট। দূরে দূরান্তে গ্রাম, চারদিকে মাঠ। মাঠের মাঝখানে হঠাৎ গুটিকয় বড় বড় বট আর হিজলগাছ। তাকে ঘিরে অনেকগুলো ঘর। ছেঁচা বাঁশের বেড়া, টিনের চাল। হাটের দিনে এত লোক, যেন ঠাঁই নেই কোথাও।

ইন্দিরের সঙ্গে গোটা হাটে চক্র দেবার পর গৃহকর্ত্রীর হুকুম অনুযায়ী ছেলেটিকে গিয়ে বসতে হয় কুতুদাসের চালের গদিতে। স্বয়ং কুতুদাস নিচু চৌকির ওপরে শীতল-পাটির ওপর বসে। কাছে তার কাঠের বাক্স। সামনে লম্বা খতিয়ান, খতিয়ে লেখা হিসাবের অজস্র অংকে ভরা। আর চুন-সুরকির মত ভূর করা চাল। ওজন-দাঁড়িতে চাল মাপা আর বিক্রি চলছে। রামে রাম, রামে দুই, রামে তিন। যতই হোক, রাম ছাড়া কথা নেই। ইন্দির দাস মশাইকে দণ্ডবৎ করে জানিয়ে যায়, ভুঁইয়াদের নাতি রইল, ঠাকরুন বলে দিয়েছেন। সে বাজার করে আবার নিয়ে যাবে।

দাস মশাইয়ের টাকে যত ঝলক, দাঁতেও তেমনি ঝলক। গদির ওপর জায়গা নির্দেশ করে ভুঁইয়াদের নাতিকে বলেন, 'বইয়ো, বইয়ো বাসী। কী খাইবা কও...অ্যাঁ, হ' কও, বরিশাইল্যা চিকন বালাম, এক নম্বইরা দুই মন সাঁইত্রিশ সের...।'

এক কথা বলতে গিয়ে, অন্য দিকেও তাল সামলান। হিসাব লেখেন, টাকা গোনেন, আবার ভুঁইয়াদের নাতিকে আপ্যায়নও করেন। তার সঙ্গে নানান বাতপুছু—শহর, ইস্কুল পড়াশুনো...। তার মধ্যেই, কে যেন ঠোঙায় করে এনে দেয় জিলিপি আর জিভে-গজা। ছেলেটির লজ্জা করে, সংকোচ হয়, জানায়, তার খিদে পায় নি। কুতুদাস ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হেসে বলেন, 'খাইতে খাইতে খিদা লাগবো, খাইয়া দ্যাখ কেমুন বেজেরহাটির জিলাপি।'

বলতে বলতেই আবার অন্যমনস্ক, হিসাব লেখা টাকা গোনা চলে। আর ছেলেটি দেখে, খেতে খেতে সত্যি খিদে পায়। খেতে খেতে ঠোঙাও শূন্য হয়ে যায়। গদির এক কর্মচারী তাড়াতাড়ি কাঁসার গেলাসে জল দেয়। ছেলেটি জল খেতে খেতে সিরাজদিঘার কথা শোনে। দোকানে ক্রেতাদের ভিড়ে দুজন

[illegible] বন্দর, তারা এখান থেকে বেরিয়ে [illegible] সিরাজদিঘা। ধলেশ্বরী নদীর ধারে মস্ত এক গঞ্জ, নাম তার সিরাজদিঘা। ছেলেটি সিরাজদিঘার [illegible] দেখেছে, আর দূরে থেকে দেখেছে [illegible], যার কোন শেষ নেই। ঘরের শেষ নেই, নৌকোর শেষ নেই, মানুষের শেষ নেই। আর ধলেশ্বরী, তার যেন পার নেই, কূল নেই। তার অনেক দিনের সাধ, একদিন সে সিরাজদিঘায় যাবে।

লোক দুটোর কথা শুনে ছেলেটির বুকের রক্ত চলকে ওঠে। মনেতে ঝড় ওঠে, যেন তাকে ঠেলে নিয়ে যেতে চায়। প্রাণে প্রাণে বলে, 'আমি সিরাজদিঘায় যাব।'...তারপরে সে আরো শোনে, লোক দুটি বলাবলি করে, বিকেল হতে না হতে আবার তারা ব্রজের-হাটে ফিরবে। তৎক্ষণাৎ ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়। কুতুদাসের কালো মুখে সাদা দাঁতের ঝিলিক হানে। জিজ্ঞেস করেন, 'কই যাও গো বাসী?'

ধরা পড়ার ভয়ে ছেলেটির বুক ধড়াসে যায়। মুখ দিয়ে রা সরে না। কেবল ঘাড় নেড়ে জানায়, সে কোথাও যায় না। কুতু-দাসের মনে জেজাল নেই। কী ভেবে যেন সে হেসে বলে, 'বাজার দেখতে ইচ্ছা করে? বাজারের ভিতরে গেলে তো তুমি হারাইয়া যাইবা। বারিন্দায় গিয়া বইসা দেখ।'

বারিন্দা অর্থাৎ গদিঘরের বাইরে দাওয়ায় বসে দেখতে বলেন। দাসের মনে কোন অবিশ্বাস নেই, সন্দেহ নেই। আহা, এমন মানুষকে ঠকায় ছেলেটা।

ছেলেটা কি ঠকায়! ধলেশ্বরীর স্রোত যে তাকে টেনে নিয়ে যায়। সিরাজদিঘার তুফান যে তার প্রাণে। সেই তুফানে উড়িয়ে নিয়ে যায়। সে গিয়ে বাইরের দাওয়ায় দাঁড়ায়। সবাই কাজে ব্যস্ত, ছেলেটির দিকে কেউ তেমন নজর করে না। ছেলেটি ভাবে, লোক দুটো বেরিয়ে আসবে কখন।

ভাবতে হয় না, লোক দুটো বেরিয়ে আসে তখনই। সিরাজদিঘার পথ জানা নেই। দাওয়া থেকে নেমে ছেলেটি তাদের পিছু পিছু যায়।...ওরে ভোলা, আত্মহারা, ধলেশ্বরীর নিশিপাওয়া, সিরাজদিঘার হাতছানি দেখা, বুড়ী ঠাকুমার কথা কি তোর মনে নেই? আহা, ভুঁইয়াদের নাতি হারিয়ে [illegible] যে তারপরে ফিরে আর মুখ দেখাতে পারবে না, সে কথা কি তোর মনে নেই? সে যে [illegible] মাটিতে মাথা কুটে মারবে, তা কি একটু ভাবিস না! এই অচেনা গাঁয়ের মতো, বিদেশের ছেলে তুই, আত্মীয়রা যে বুক চাপড়ে মরবে।

না, সে খেয়াল আর তখন ছেলেটির নেই।

সে খেয়াল না থাকুক, গোঁসাইদত্তর কথা কি তার মনে নেই? তার কি মনে নেই, পথের ধারে খুঁটোয় বাঁধা গরুটাও ছদ্মবেশী পেত্নী হতে পারে? এই তামাম দেশ জুড়ে যে থাড় ঘটকাবার জন্যে কারা অদেখায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে কথা কি সে ভুলে গিয়েছে?

ভুলে গিয়েছে। অশরীরী আত্মাদের থেকেও ধলেশ্বরী সিরাজদিঘার মায়াডাক যে আরো তীব্র। তাকে সব ভুলিয়ে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু ওরে অস্নাত, অভুক্ত, সিরাজদিঘার পথ কত দূরে, তাও তোর জানা নেই। কোন সাহসে যাস্।

যে টানে ভেসে যায়, তার ভয় ডর থাকে না। ছেলেটি তখন ব্রজেরহাট ছাড়িয়ে অনেক দূরে। গ্রাম্য লোক দুটো ফিরেও চায় না, কে একটা ছেলে আসে তাদের পিছু পিছু। তারা এক হাটে সওদা করে, আর এক হাটে বেচে দেয়। তারা বেচাকেনার কথায় মশগুল হয়ে চলে। ছেলেটি ধরা পড়ার ভয়ে তাদের কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারে না। কেবল পিছু পিছু চলে, আর চোখ তুলে ব্যগ্র হয়ে দেখে, কোথায় ধলেশ্বরী, কোথায় সিরাজদিঘা।...

কতক্ষণ চলে ছেলেটি, তার হিসাব করতে পারে না। সূর্য যখন মাথার ওপরে, তখন সে দেখতে পায়, ধলেশ্বরী রুপোর মত ধারায় বয়ে যায়। ধলেশ্বরী, ধলেশ্বরী। দুই ওপারে দেখা যায় এক কালো রেখা। একটু-খানি বাঁক নিয়ে, কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। কেবল ধলেশ্বরী ঢেউয়ে ঢেউয়ে চলকায়। রোদে ঝলক দেয়। এত ঝলক দেয়, আর নদীতে চোখ রাখাই দায়। নদীতে কত ডিঙ্গা, কত নৌকো যায়। দেখতে দেখতে ব্রজেরহাটের লোক দুটো কখন হারিয়ে যায়, তার খেয়াল থাকে না। সে সিরাজ-দিঘার বন্দরের দিকে চায়। কত ঘর, কত বাড়ি, তার শেষ নেই। উঁচু পাড় ধরে সেই যেন দূরের আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। কত নৌকো মাল তোলে, কত নৌকো খালাস করে, তার যেন লেখাজোখা নেই। এখানে আবার আকাশের গায়ে এখানে-ওখানে চোঙা, তাতে ধোঁয়া ওড়ে। মানুষের পায়ে পায়ে ওড়ে ধুলো। হাট নয়, গঞ্জ নয়, ছেলেটির মনে পড়ে, এ সিরাজদিঘার বন্দর। বন্দরের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে। এত দোকান, এত পসার। কেবল যে বেচাকেনাই হয়, তা নয়। কত কি তৈরী হয়। বিস্কুট রুটি বাতাসা

মিষ্টি, পাটি মাদুরে বোঝাই, যা বলবে।

ছেলেটি এক দিক দিয়ে যায়, আর এক দিকে হারায়। হারিয়ে আবার আর একদিকে যায়। না মেটে কৌতূহল, না সাধ। ঘুরতে ঘুরতে আবার আসে ধলেশ্বরীর ধারে। শোনে, সেখানে খেয়াঘাটের মাঝি হাঁকে, 'নাও যায় লতব্দীর চর, যাওনের লোক আছেন।'

লতব্দীর চর। ছেলেটির মনে পড়ে যায়। লতব্দী গ্রামে পিসীমার বাড়ি। তাড়াতাড়ি জামার পকেটে হাত দিয়ে দেখে, দেড়খানি পয়সা, পঞ্চম জর্জের ছাপ মারা। চেয়ে দেখে, যাত্রীরা অনেকেই ছইবিহীন খেয়া নৌকায় জায়গা নিয়েছে। সে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'পার করতে কয় পয়সা।'

মাঝি একবার চেয়ে দেখে। বলে, 'পোলা-পানের আধ পয়সা।'

ছেলেমানুষের আধ পয়সা, বড় মানুষের এক পয়সা। ছেলেটি আর কিছু ভাবে না। নৌকায় গিয়ে উঠে বসে। কেবল নাম শুনেছে সিরাজদিঘার ওপারে লতব্দীর চরগ্রাম, সেই গ্রামে পিসীমার বাড়ি। চোখের সামনে ভাসে শুধু পিসীমার ঝাপসা মুখ-খানি। ফরসা মুখ, ঝকঝকে চোখ, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। কিন্তু মুখখানি বড় গম্ভীর। মাঝি নৌকা ভাসিয়ে দেয়।

কেন, এ ছেলে কি নোঙর ছেঁড়া নৌকা? কে তাকে টেনে নিয়ে যায়, কিসের টানে? পিছনে যারা রয়ে গিয়েছে, তাদের কথা কি তার একবারও মনে পড়ে না! সে যে এমন করে অচিন দেশে হারিয়ে যায়, তার কি একটুও বুক কাঁপে না!

কাঁপে। যখন ঢল খেয়ে যায় রোদ, তবুও লতব্দীর কালো রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না, ধলেশ্বরীর পাড়ি শেষ হয় না, আর ক্ষুধা তার স্বভাববশে হাঁক দিয়ে ওঠে, তখন বুক কেঁপে যায়। যদি অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, তবে সে পিসীমার বাড়ি খুঁজে পাবে কেমন করে। এ পাড়ি শেষ হবে কখন।

যাত্রীরা যারা বেচাকেনা সেরে ফেরে, তারা নিজেদের মধ্যে নানান কথা বলাবলি করে। ছেলেটির দিকে কেউ ফিরে চায় না। জিজ্ঞেস করে না কিছু। তারা কেমন করে জানবে, এ ছেলে অকূলে ভেসেছে। কেউ-ই জানে না, এতক্ষণে ব্রজেরহাটে কী ধুম লেগে গিয়েছে।

সূর্য যখন পশ্চিমের কোলে গিয়ে ঠেকে, তখন খেয়া নৌকা নোঙর করে লতব্দীর চরে। ছেলেটি চেয়ে দেখে, ধারে কাছে কোন গ্রাম নেই। সামনে ধু ধু মাঠ, মাঠের ওপারে গ্রাম। তখন ছেলেটির চোখে ভয় আর হতাশা। চোখে ভাসে জল। কোথায় পিসীমার বাড়ি, সে জানে না। যাত্রীদের এবার নজর পড়ে তার ওপর। একজন জিজ্ঞেস করে, সে কোথায় যাবে, কাদের বাড়ি। ছেলেটি তার পিসেমশায়ের নাম করে।

লোকটি হাত ধরে বলে, 'আয় আয়, চল আমার বাপে। মহারাজের কাছে দিয়া আসি তোমারে।'

ছেলেটি ভয় পেয়ে বলে, সে মহারাজের কাছে যেতে চায় না। সে পিসেমশায়ের কাছে যেতে চায়। তার কথা শুনে হাট থেকে ফেরা যাত্রীরা হাসাহাসি করে। যে-জন নিয়ে যাবে বলে, সে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার পিসামশয়রে চিন না?'

ছেলেটিকে স্বীকার করতে হয়, সে পিসীমাকে দু-একবার দেখেছে, কিন্তু পিসেমশায়কে না। তখন সবাই আরো হাসা-হাসি করে। লোকটি বলে, 'আইচ্ছা চল, তোমার পিসার কাছে লইয়া যাই।'

ছেলেটির হাত ধরে লোকটি হাঁটা দেয়। দু পাশে রবিশস্য, মাঝে মাঝে কুমড়োর হলুদ ফুলে ভরা কাঠা কাঠা জমি। তার মাঝখান দিয়ে সরু পথ। সূর্য যখন ডুবু-ডুবু, তার ছটায় যখন সারা আকাশ লাল, তখন ছেলেটি এসে পৌঁছোয় গ্রামের এক প্রান্তে। বড় এক বটের জটায় ঝাড়ে অজস্র পাখি ডাকাডাকি করে। তার পাশেই আগল খোলা এক গোবর নিকানো উঠোন। উঠোনের তিন দিকে তিন ঘর। ঘরের ধারে ধারে অজস্র গাঁদা ফুল। সামনের ঘরটির দরজার দু পাশে মাধবী লতা। লতা দিয়ে মাথার ওপরে গোল করে তোরণের মত করা হয়েছে। তাতে মাধবী ফুল ফুটে আছে। সেই ঘরের মাথার ওপরে টিনের চালে একটি নিশান উড়ছে। সবই যেন নিশ্চুপ, শান্ত, গম্ভীর। কী এক গভীরতা যেন সেখানে বিরাজ করছিল। খোলা আগলের সামনে, দুটি বাঁশের মাঝখানে, টিনের ওপরে পরিচ্ছন্ন করে লেখা রয়েছে, 'রামকৃষ্ণ আশ্রম।'

অভুক্ত অস্নাত ছেলেটির ধুলো-মুখে চোখের জলের দাগ আঁকা। সে টিনের ওপর লেখা পড়ে, লোকটির দিকে অবাক হয়ে চায়। লোকটি তখন তার ফিতে বাঁধা, তালি মারা জুতো জোড়া খুলতে খুলতে বলে, 'চল, ভিতরে যাই।' কেন? ছেলেটি ভাবে, সে তো কোন আশ্রমে আশ্রয় চায় নি। লোকটা কি তাকে আশ্রমে দিয়ে যেতে চায় নাকি।

লোকটি ছেলেটির হাত ধরে উঠোনে ঢোকে। ঢুকতে ঢুকতেই ডাকে, 'সাধু মহারাজ আছেন নাকি?'

ডাকতে ডাকতেই পাশের ঘর থেকে একজন বেরিয়ে এলেন। শ্যামলা রঙ, শান্ত গভীর দুটি চোখ। বয়স পঞ্চাশ হবে। মুখে কাঁচা পাকা দাড়ি। মাথার কাঁচা পাকা চুল বড় বড় ঘাড়ের কাছে যেন জট পাকিয়ে

গিয়েছে। পরনে গেরুয়া, গায়ে গেরুয়া কাপড়, গায়ে একটু মেদ নেই। দীর্ঘ শরীর, হাত দুটি যেন একটু বেশী লম্বা। বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। একবার লোকটির দিকে, আর একবার ছেলেটির দিকে। কোন কথা না বলে আরো কাছে এলেন।

লোকটি নিচু হয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে। বলে, 'এই পোলা আপনার নাম কয়—কয় যে, আপনে নাকি তার পিসামশয়।'

ছেলেটি মনে মনে মাথা নাড়ে। ভাবে, একজন সাধু তার পিসেমশায় হতে পারেন না। কিন্তু গেরুয়াধারী যেন অবাক হন। আরো কাছে এসে ছেলেটিকে তার নাম জিজ্ঞেস করেন। ছেলেটি নাম বলে। কিন্তু তার চোখে তখন আবার জল এসে পড়ে।

সাধু তখন ছেলেটির বাবার নাম জিজ্ঞেস করেন। বাবার নাম শুনেই বাড়ি কোথায় জানতে চান। জবাবের আগেই তিনি ছেলেটির হাত ধরে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কার সঙ্গে আইলা তুমি, কোইথেইকা আইলা?'

ছেলেটি তখন চারগ্রামের নাম বলে। সাধু বলে ওঠেন, 'হ হ, সে তো তোমার মামার বাড়ির গ্রাম।'

তারপরেই তিনি ছেলেটির আপাদমস্তক দেখে ঘরে ডেকে নিয়ে যান। লোকটিকে বলেন, 'এই পোলা এইখানে কেমনে আইল জানি না। তবে আমার কাছে দিয়া খুবেই ভাল কাজ করলেন। ভগবান আপনারে সুখী করবেন।'

লোকটি নমস্কার করে চলে যায়। সাধু ছেলেটিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে আবার তার মুখের দিকে তাকান। তারপরে মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের এক পাশ থেকে একটি পেতলের রেকাবিতে কয়েকটি নারকেলের নাড়ু আর দুটি প্যাঁড়া খেতে দেন। নিজের হাতে গেলাসে জল গড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'এইবার খাইতে খাইতে কও তো বাবা, লতব্দীতে কেমনে আইছ?'

উদ্বেগে তখন ছেলেটির গলায় খাবার যেতে চায় না। তবু খাবার পেয়ে জিভে জল এসে পড়ে। সেই সঙ্গে চোখেরও। একটু একটু খায়। আর ব্রজেরহাট থেকে কেমন করে চলে এসেছে, সেই বার্তা চলে। যদিও বার্তা বলতে তার ঠেক খেতে হয় বারে বারে। লজ্জা করে, সংকোচ হয়। তবু সিরাজদিঘার বন্দর আর ধলেশ্বরী নদী দেখার কথা না বলে পারে না।

সাধু শোনেন, আর একটু একটু ঘাড় নাড়েন। ছেলেটির মনে হয়, তাঁর বড় বড় চোখ দুটিতে যেন হাসি। দাড়ির জটায়ও যেন হাসি চিকচিক করে। ছেলেটির যে চোখে জল, গলা ডুবে যায় কান্নায়, তা যেন দেখেন না, শোনেন না। খালি একবার বলেন, 'খাইয়া লও।'

ছেলেটির উদ্বেগে মন অস্থির, কিন্তু খাবার শেষ হয়ে যায় নিমেষেই। ঢকঢক করে জল খায়। এত তৃষ্ণা, কষ বেয়ে জল পড়ে যায়। ছেলেটি হাতের চেটোয় তা মুছে নেয়। কিন্তু চোখের জল সমান ধারায় বহে। চোখ তার লাল হয়ে ওঠে।

সাধু শুধু শোনেন, একটি কথা জিজ্ঞেস করেন না। চুপচাপ খানিকক্ষণ ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। থাকতে থাকতে তাঁর চোখ দুটি যেন আরো ঝলক দিয়ে ওঠে। হাসিতে তাঁর দাঁত দেখা যায়। তেমনিভাবেই হঠাৎ উঠে দাঁড়ান। একটা কুলুঙ্গির কাছে গিয়ে দেশলাই জেলে প্রদীপ ধরান। মাথা নামিয়ে ছোট একটি নমস্কার করেন। তারপরে ছেলেটির সামনে এসে গায়ের গেরুয়া কাপড়ের টুকরো দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দেন। চিবুক ধরে বলেন, 'চল, তোমারে দিয়া আসি তোমার আত্মীয়ের কাছে।'

ছেলেটির হাত ধরে বাইরে এসে ঘরের শিকল তুলে দেন। একবার মাধবী লতায় ঘেরা সামনের ঘরটির দিকে তাকান। তারপরে আগল ঠেলে গ্রামের পথে এগিয়ে যান।

ইতিমধ্যে অস্ত্যছটায় সারা আকাশের রক্তিমায় কালির ছোপ লেগেছে। ঈষৎ রক্তাভ পশ্চিমের আকাশে গাছের আড়ালে-আবডালে চোখে পড়ে। সন্ধ্যা নেমেছে। পাখিদের ডাকাডাকি শেষ হয়েছে। চারদিকেই একটা স্তব্ধতা। কেবল ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়। তার মধ্যেই দু একটা পাখির চকিত ডাক যেন ভীরু জিজ্ঞাসার মত বেজে ওঠে।

সাধু এঁকেবেঁকে গ্রামের নানান পথ ধরে প্রায় আর এক প্রান্তে আসেন। এসে একবার দাঁড়ান একটি বড় পাকা কোঠার সামনে। বড় কোঠা একতলা। উঁচু বারান্দা, কয়েক ধাপ লম্বা সিঁড়ি। সেইখানে দাঁড়িয়ে সাধু একবার কপালে হাত ঠেকান। তারপর সেই কোঠার শেষে টিনের চাল দেওয়া কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো টিনের বেড়া এক ঘরের সামনে দাঁড়ান। ঘরের দরজা এদিকে নয়। সামনেই একটা উঠোন দেখা যায়। উঠোনে তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বলছে। একটু আগেই সন্ধ্যা দেখানো হয়েছে। উঠোনের এক পাশে একটা লাউমাচা দেখা যায়। সাধু আর অগ্রসর না হয়ে সেখানেই দাঁড়ান। ডাক দেন, 'সুরবালা! সুরবালা!'...

ছেলেটির মনে পড়ে যায়, এই তার পিসীমার নাম। বাবার মুখে সে অনেকবার শুনেছে। কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু একটু পরেই পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। আলোর রেশ চোখে পড়ে। হ্যারিকেন হাতে কপাল অবধি ঘোমটা ঢাকা এক বউ দাঁড়ায়। বউটির কপালে সিঁদুর, সিঁথেয় সিঁদুরের রক্তাভা, পরনে লালপাড় শাড়ি, হাতে শাঁখা ও নোয়া। ফরসা রঙ, ঝকঝকে চোখ। ছেলেটির বুকের ভিতর নিঃশব্দে বেজে ওঠে, 'পিসীমা, পিসীমা!'...

কিন্তু এ পিসীমা যেন সেরকম নন, যেমন তাঁকে অন্য সময় দেখা গিয়েছিল। এ মুখ যেন অন্যরকম। গম্ভীর নয়, অথচ গম্ভীর। সন্ধ্যাবেলার মতই ছায়া-ছায়া, নিশ্চুপ, স্তব্ধ। তিনি এসে একবারও ছেলেটির দিকে তাকান না। সাধুর দিকে চোখ তুলে দেখেন।

সাধু বলেন, 'এই তোমার দাদার পোলা, একজন দিয়া গেল, চারগ্রাম থেইকা আইছে। এর মুখেই সব শোনবা।'

পিসীমা যেন চকিত হয়ে ছেলেটির দিকে তাকান। তার নাম ধরে ডেকে ওঠেন, 'এ কি, তুই?'

ছেলেটির চোখেও তখন আবার জল এসে পড়েছে। সে সাধুর হাত ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে পিসীমাকে জড়িয়ে ধরে। পিসীমা তাকে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে সাধুর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কী ব্যাপার, কিছুই তো বুঝি না?'

গলায় তাঁর উদ্বেগ। সাধু কিন্তু হাসেন। বলেন, 'পোলাপানের মন, স্বপ্নের মধ্যে ডাক শুইনা দৌড় দেয়। সব কথাই ওর মুখে শোনবা। আইজ রাত্রে আর হইব না, কাইল সকালেই আমি লোক পাঠাইয়া চারগ্রামে খবর দিয়া দিমু।'

বলেও তিনি কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। পিসীমাও নীরব। ছেলেটি পিসীমার কোলের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে একবার সাধুর দিকে দেখে। দেখে, সাধু তাকিয়ে আছেন পিসীমার দিকে। তাঁর চোখে যেন সেইরকমই একটু হাসি। হ্যারিকেনের আলোয় তাঁর চোখের মণি দুটো আকাশের তারার মত দেখায়। পিসীমা মাথা নামিয়ে মাটির দিকে চেয়েছিলেন। সাধু বললেন, 'সুরবালা, আমি তা হইলে যাই?'

পিসীমা কোন কথা বলেন না। হাত থেকে হ্যারিকেনটা নামিয়ে রাখেন। ছেলেটিকে হাত ধরে কোলের কাছ সরিয়ে আঁচল টেনে গলবস্ত্র হন। সাধু বলে ওঠেন, 'না, তোমারে তো কতদিন কইছি, এইরকম কইরো না। আমি যাই।'

তারপরেই প্রসঙ্গ বদলান। জিজ্ঞেস করেন, 'পোলা মাইয়ারা সব ভাল আছে তো?'

পিসীমা বলেন, 'আছে।'

শুধু এই একটি কথা। তারপরে মাটিতে জানু পেতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করেন। কিন্তু সাধু তখন পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করেছেন। পিসীমা মাথা তুলে দেখেন না। সেই অবস্থাতেই কিছুক্ষণ থাকেন।

ইতিমধ্যে ছেলেটির লক্ষ্য পড়ে, ঘরের কোণে তিনটি ছায়া এসে দাঁড়িয়েছে। একটি বছর তেরোর মেয়ে। বেড়া-বিনুনি বাঁধা, একটা শাড়ি জড়ানো তার রোগা গায়ে। তার চেয়ে ছোট একটি ছেলে। আর একজন মেয়েটির থেকে বড়। তারা সবাই ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি ফিসফিস করে ছেলেটির নাম ধরে ডেকে বলে, 'তুই অমুক না?'

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তার পিসতুতো দাদা এবং ভাইবোনদের চিনতে পারে। সে তাদের দিকে এগিয়ে যায়। তারা সবাই তাকে জড়িয়ে ধরে। ছেলেটি প্রথমেই জিজ্ঞেস করে, 'ওই সাধুটা কে?'

ছোট পিসতুতো ভাইটি বলে ওঠে, 'আমাগো বাবা।'

ছেলেটি অবাক হয়ে ভাবে, কেন, তার পিসেমশাই সাধু কেন? তিনি কেন গ্রামের এক প্রান্তে আশ্রমে সাধু হয়ে থাকেন।... কিন্তু ছেলেটি তার সারা জীবনেও কখনো জানতে পারে নি কেন তার পিসেমশাই সাধু হয়েছিলেন—সংসার ছেড়ে আশ্রমে বাস করতেন। সারা জীবনে সে পিসেমশাইকে দু একবারই দেখেছে। পিসীমাকে অনেকবার। পিসীমার শান্ত স্বল্পবাক উজ্জ্বল গভীর চোখের দিকে তাকিয়ে তার চিরদিনই মনে হয়েছে, বিশ্বসংসারের সব কিছুকে হয়তো চেনা যায় না, দেখা যায় না। কিন্তু কী একটা যেন অনুভব করা যায়, যে অনুভূতিকে ব্যাখ্যা করা যায় না, কোন নাম দেওয়া যায় না। সেই নামহীন ব্যাখ্যাহীন অনুভূতি দিয়ে শুধু এইটুকু সে বুঝেছে, লতবৃদীর সেই দম্পতির মাঝখানে যে বিচ্ছিন্নতা, তার মধ্যে কোথায় যেন একটা সেতু আছে। যে সেতুতে, মনে হয়, চোখের জল এবং হাসি দুই-ই আছে, আর আছে এক অনাবিষ্কৃত রহস্যের সম্পর্ক।

এই ঘটনার সাত দিন পরে পিসীমার বাড়িতে একদিন ঠিক দুপুরে এল একদল লোক। যে দলের মধ্যে ছিল ছেলেটির বাবা মা দিদি মেজদা আর দিদিমা, সঙ্গে ইন্দির। তারা এল যেন একদল ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ ব্যাধের মত। যে পাখিটা খাঁচায় বাঁধা পড়েছে তাকে ধরবার জন্যে। চোখে তাদের ব্যগ্র জিজ্ঞাসা, অথচ শিকার পাবার কঠিন উল্লাস। ছেলেটির এইরকমই মনে হয়েছিল। তাই সে তখন দৌড়ে গিয়ে পিসীমার খাটের তলায় অন্ধকার কোণে গিয়ে আশ্রয় নেয়। কেবল মেজদার তীব্র গলা শোনা যায়, 'ওই যে, খাটের তলায় গেছে।'...

ক্রমশঃ

বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার ব্যথা-বেদনা তাড়াতাড়ি দূর করবার আধুনিক উপায়

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'

এখন আমাদের দেশে পাওয়া যাচ্ছে!

যে কোনো ব্যথা-বেদনাই আমাদের সমস্যাঃ 'অ্যাসপ্রো' রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকরা অনেক গবেষণার পর ব্যথা-বেদনা দূর করার জন্য আবিষ্কার করেছেন নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'—আরো তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর করার নতুন উপায়!

মাইক্রোফাইণ্ড বলতে কি বোঝায়? মাইক্রোফাইণ্ড বলতে বোঝায় যে, ব্যথা-বেদনা দূর করার যে উপাদানগুলি 'অ্যাসপ্রো'-তে মেশানো হয়, তা ৩০ গুণ বেশী সূক্ষ্ম করা হয়েছে। এক বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরী এই নতুন ট্যাবলেটে এখন প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। এর ফলে বেদনা নাশ করবার শক্তি দ্বিগুণেরও বেশী সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যথা-বেদনা দূর করে।

মুহূর্তের মধ্যে কাজ শুরু হয়ে যায়—অনেকক্ষণ ধরে কাজ চলতে থাকে: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র ব্যথা দূর করবার সক্রিয় উপাদানটি অতি সহজেই এবং খুবই শীগগির শরীরের সঙ্গে মিশে গিয়ে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকে। সেইজন্যেই মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আরও তাড়াতাড়ি ব্যথা-বেদনা দূর ক'রে দেয় এবং তার ফল অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

অতি সহজেই আপনি খেতে পারেন: নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' আপনি যেভাবে খুশী খেতে পারেন—শুকনো, জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা এক গ্লাস জল বা যে কোনো গরম পানীয়ের সঙ্গে।

নিম্নোক্ত প্রকারের যন্ত্রণায় নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' খাবেন: ব্যথা-বেদনা • মাথাধরা • অঙ্গ-ব্যথা • বাতব্যথা • গাঁটে বেদনা • জ্বর-জ্বর-ভাব • ফ্লু • ডেঙ্গু জ্বর • গলাব্যথা।

মাত্রা: প্রাপ্তবয়স্ক: দুইটি ট্যাবলেট। প্রয়োজন হলে আবার খাবেন। শিশুদের জন্য: একটি ট্যাবলেট বা আপনার ডাক্তারের নির্দেশমত।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' কিভাবে কাজ করে দেখুন

ট্যাবলেটের কণাগুলির আকার যত বড় হয়, ততই শরীরের সঙ্গে মিশে যেতে দেরী হয়—আপনার আরাম পেতেও সময় লাগে।

'অ্যাসপ্রো' মাইক্রোফাইণ্ড হওয়ার ফলে নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো'-র প্রতিটি ট্যাবলেটে প্রায় ১৫ কোটি সূক্ষ্ম কণা রয়েছে। তাই শরীরের সঙ্গে সঙ্গে-সঙ্গে মিশে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি ব্যথার উপশম হয়।

নতুন মাইক্রোফাইণ্ড 'অ্যাসপ্রো' ব্যথা-বেদনা দূর করার সর্বাধুনিক উপায়।

নিয়েণ্ডার্থ্যাল মানবের কংকাল এক্স-রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করা হচ্ছে রোগ নির্ণয়ের জন্য

প্রাগৈতিহাসিক মানবের উপর নতুন আলোকপাত

"এই অজ্ঞাত লোকটির উচ্চতা ছিল মাঝামাঝি—১৭০ সেণ্টিমিটারের মত। তার বয়েস ৫০ থেকে ৫৫ বছর হলেও তাঁকে দেখলে অতটা বয়েস হয়েছে বলে মনে হত না। লোকটি ছিল উত্তেজনাপ্রবণ, তার কল্পনাশক্তি ছিল প্রবল, সামান্য ব্যাপারেও তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। একদল আততায়ী ছোরা, তলোয়ার আর সড়কি দিয়ে তাঁকে খুন করে।"

উপরের অনুচ্ছেদটি পড়লে মনে হবে যেন শার্লক হোমস-এর কাহিনী পড়ছি। কিন্তু এটি স্যর আর্থার কন্যান ডয়েলের কোন উদ্ধৃতি নয়, আচার্য রখ্লিন নামে এক বিশিষ্ট রুশ বিজ্ঞানীর লেখা। আচার্য রখ্লিন লেনিনগ্রাদের প্রথম চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের রণ্টজেন-রশ্মি বিভাগের অধ্যক্ষ। মঃ ভরোনিন নামে এক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ১৯৩৪ সালে তাঁর কাছে এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির কংকাল নিয়ে গিয়ে বলেন, "দেখুন তো, এই কংকালটি যার তার বিষয়ে কি কি আপনি বলতে পারেন?"

এক্স-রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কংকালটির বহু পূর্বে মৃত মালিক সম্পর্কে আচার্য রখ্লিন যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান তারই কিছুটা উপরে আমরা উদ্ধৃত করছি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভরোনিন ঐ সিদ্ধান্ত থেকে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন যে, তিনি যা ভেবেছিলেন, সেটা ঠিক অর্থাৎ জিনিসটি এক রুশ রাজবংশের কুলতিলকের কংকাল, যার নাম ছিল প্রিন্স বোগোলুবস্কি যিনি ছিলেন অত্যন্ত উত্তেজনাপ্রবণ ছিলেন। তাঁকে [illegible] ছোরা, তলোয়ার আর সড়কি দিয়ে হত্যা করেছিল।

এইভাবে আচার্য রখ্লিন আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক মানবের বিভিন্ন রহস্য উদ্ঘাটনের এবং সেই সময়কার পার্থিব পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুশীলনের সুযোগ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর প্যালিওপ্যাথলজিক্যাল মিউজিয়ামে আজ প্রাচীন কালের বহু বিশিষ্ট মানবচরিত্রের আলেখ্য সংগৃহীত রয়েছে।

আমাদের আদিম উত্তরপুরুষরা কিরকম পার্থিব পরিবেশে বসবাস করতেন, তাঁদের আচার-বিচার কি ধরনের ছিল, তাঁদের আহার এবং আহার্য কি ছিল, কাজকর্মই বা তাঁরা কি করতেন, এইসব প্রশ্ন নিয়ে রুশ, ব্রিটিশ ও অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিকরা কাজ করছেন আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে।

সেকালের মৃৎশিল্প, পাথরের দীপ শলাকা, মোহর প্রভৃতি উদ্ধার-করা জিনিসের সাহায্যে আমরা সে যুগের মানুষের বুদ্ধি ও কর্মকুশলতা যাচাই করে নিতে পারি। কিন্তু তাঁরা কিরকম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করতেন এবং নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে সেই প্রকৃতিকে কিভাবে তাঁরা গড়ে-পিটে নিজেদের মনের মত তৈরি করে নিতেন, তার উপর লণ্ডন ইনস্টিটিউট অফ আর্কিওলজির বৈজ্ঞানিকরা হালে নতুন আলোকপাত করেছেন।

আবহের রূপান্তর ও কালের গতির প্রভাব থেকেই পৃথিবীতে পরিবেশের উদ্ভব ও রূপান্তর ঘটে। সুতরাং জীব-

লেনিনগ্রাদ মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটে এই রোগিণীর অঙ্গসংস্থানের এক্স-রশ্মির ছবি নেওয়া হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক রোগীর কংকালের ছবির সঙ্গে তুলনা করার জন্য
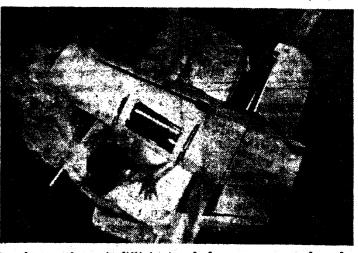
৫টি প্রাগৈতিহাসিক জীবের অস্থি

বিষয়ের খবরাখবর পেতে পারি। কেশর-গুলির এই ব্যাপারে বোধ হয় উপযোগিতা সবচেয়ে বেশি। সেগুলির উদ্ভব সম্পর্কে আমরা জানতে পারি, জানতে পারি সে সময়ে মানুষ চাষ করত কিনা, প্রকৃতি কতটা খোলামেলা ছিল।

জীবজন্তুর দেহাবশেষ, বিশেষ করে কংকাল পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকরা বলে দিতে পারেন, কালবিশেষে তাদের বাস-স্থান অরণ্যাকীর্ণ ছিল না খোলা মাঠ ছিল, আবহ শুষ্ক ছিল না আর্দ্র ছিল, তখনকার মানুষ পশুপালন করতে শিখেছিল কিনা, তার শারীরিক গঠন কেমন ছিল, এমন কি তার কোন্ কোন্ অসুখবিসুখ হত। আদিম জীবজন্তুর ও জন্তু ও মানুষের যুগবিশেষের বসবাসের ধরনধারন জানতে পারলে তাই থেকে সেই সময়কার প্রাকৃতিক পরিবেশের চরিত্রও ধরা হয়ে আসে।

প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানগুলি সাধারণত দেখা যায় যে, কোন-না-কোন দৃঢ় বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেগুলি পরীক্ষা করে বোঝা যায়, সেই সময় প্রাকৃতিক অবস্থাটা কেমন ছিল। সেখানকার মাটি, বালি ও জল—যা দিয়ে গঠন কার্যগুলি আচ্ছাদিত থাকে—সেগুলিই দেখিয়ে দেয় যে, মানুষ সেখানে আস্তা গাড়ার ফলে কি কি পরিবর্তন ঘটেছিল। যেমন বলা যায় যে, হালকা নরম মাটির উপর তখনকার লোকে যদি লাঙল দিয়ে চাষবাস করে থাকে, তা হলে বাতাসে সেখানে ভূমিক্ষয় হয়ে ক্রমে জায়গাটি ধুলোচাপা পড়ে যাবে। তার মানে নরম ধুলোমাটির নিচে খনন-কার্যের ফলে যদি কোন বসতি আবিষ্কৃত হয়, তা থেকে বলা যায় যে, সেখানে সম্ভবত চাষবাসের রেওয়াজ ছিল এবং সেখানকার জমি নরম ছিল।

মাটি আমাদের অনেক কাহিনী শোনাতে পারে, কারণ, মাটির সংগে জলবায়ুর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। আদিম কালে জমির গঠন সম্ভবত তাড়াতাড়ি হয়েছিল, কিন্তু পৃথিবী স্থিতিলাভ করার পরে জমির পরিণতি লাভের প্রক্রিয়ার গতিবেগ মন্দায়িত হয়ে যায়। তখন এক-একটি মাটির পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে কয়েক হাজার বছর লেগে যেত। স্থান-বিশেষে যে পুরনো জমির উপর আদিম মানব তার উপনিবেশ রচনা করেছিল, সেই জমির চরিত্র আশপাশের জমি থেকে একেবারে অন্য রকম হতে পারে, কারণ, সেই আশপাশের জমিকে বসতিকারী মানুষ নিজের স্বার্থে রূপান্তরিত করে থাকবে। তাম্র যুগের বসতির আশপাশে বাদামী রঙের জমি উর্বরাশক্তির পরিচায়ক। সেই সব জমি আজ অম্লধর্মী হয়ে গিয়েছে, কারণ, মাঝখানের ৩।৪ হাজার বছরে লোকে সেখানে পশু চরিয়েছে আগুন জেলে মাটি পুড়িয়েছে এবং আবাদ স্থানান্তরিত করেছে।

জলমগ্ন, মরুভূমি ও চিরতুষারাবৃত এলাকার জমিতে এবং গাছপালায় ব্যাক্টেরিয়ার দ্বারা কোন ভাঙনক্রিয়া ঘটে না। সেই জন্য ঐসব জায়গায় গাছের পাতা, বীজ, কেশর পরাগ—এইসব অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। এমনকি, রং পর্যন্ত চটে যায় না। সেগুলি থেকে আমরা আদিম মানবের পরিবেশ, উৎপাদিকা কার্যকলাপ, কৃষি ইত্যাদি অনেক কিছু

প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভিদের পরাগ ও কেশর

মানুষের কংকাল পরীক্ষা করে আচার্য রথ্‌লিন এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, আজকাল আমরা যে-সব রোগে ভুগি তার অনেকগুলির উদ্ভব হয়েছিল পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের বহু আগে। যেমন তিনি বলছেন যে, প্রাগৈতিহাসিক জীব ডাইনোসরেরা এমন এক মেরুদণ্ডের ব্যাধিতে আক্রান্ত হত, যা অনেকটা আজকালকার বেথ্‌তেরেফ ব্যাধির মত। বহু আদিম রোগী পরীক্ষা করে আচার্য বলছেন যে, সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত ব্যাধির তালিকা প্রায় অপরিবর্তিতই আছে। যা বদলেছে, তা হচ্ছে ব্যাধির প্রকারণ ও ভৌগোলিক সংস্থান। মাইয়ো-সাইটিস অসিফিকেশন নামে এক রোগ তিনি আদিম মানবের দেহে পেয়েছেন, যা আজকাল কদাচিৎ দেখা যায়, কারণ রোগটি হলেও নাকি এমন ছদ্মবেশে থাকে যে, তাকে চেনা ভার। কিন্তু যে কৌশলে তিনি আদিম নরদেহে রোগটি আবিষ্কার করেছেন সেই কৌশল প্রয়োগ করে আজ হয়ত ছদ্মবেশ ছিঁড়ে রোগটি ধরা যাবে।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

॥ ৫ ॥
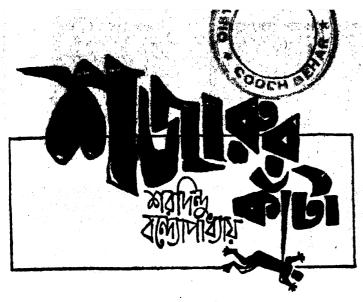
দুপুর বেলা দীপাকে ভাত খাইয়ে নকুল ওপরে পাঠিয়ে দিল, বলল—'যাও, একটু ঘুমিয়ে নাও গিয়ে।'

কিন্তু দীপার দিনের বেলা ঘুমোনো অভ্যেস নেই। সে ঘুরে ঘুরে ওপরতলাটা দেখতে লাগল......এই ঘরে কাল রাত্রে দেবাশিস শুয়েছিল...নকুল যেন জানতে না পারে, সে ওপরে আসবার আগেই রোজ বিছানা ঝেড়ে ঠিকঠাক করে রাখতে হবে... বাড়ির পাশের ব্যাল্‌কনি থেকে বাগানটা দেখা যায়, বাগানের ছিরি নেই। যেন কত কাল কেউ বাগানের দিকে তাকায় নি। দেবাশিসের বাগানের শখ নেই। দীপার খুব বাগানের শখ আছে! সে বাপের বাড়ির খোলা ছাদে টবের বাগান করেছিল।

ঘণ্টাখানেক ঘুরে ফিরে সে বসবার ঘরে এল। রেডিওগ্রামের ওপর নজর পড়ল। দীপা রেডিও শুনতে ভালবাসে...বাপের বাড়িতে তার একটি ট্র্যান্‌জিস্‌টার ছিল, সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে গান শুনত, ফুটবলের কমেন্টারি শুনত, নাট্যাভিনয় শুনত। ট্র্যান্‌জিস্‌টারটা আনা হয়নি। তার অনেক নিজস্ব জিনিস বাপের বাড়িতে পড়ে আছে।

দীপা রেডিওগ্রামের কপাট সরিয়ে কলকব্জা নাড়াচাড়া করতে করতে গানের সুর বেজে উঠল। দুপুর বেলার শান্ত স্বরাহীন প্রোগ্রাম। সে রেডিওর পাশে একটা গদিমোড়া আরাম চেয়ারে বসে শুনতে লাগল।

কাল রাত্রে দীপা অল্পই ঘুমিয়েছে, যেটুকু ঘুমিয়েছে তাও যেন আড়ষ্ট হয়ে। এখন রেডিওর মৃদু গুঞ্জন শুনতে শুনতে তার চোখ বুজে এল।

হঠাৎ তার চমক ভাঙল টেলিফোনের শব্দে। সে চোখ মেলে দেখল, ঘরের কোণে ছোট টেবিলের ওপর টেলিফোন বাজছে। দীপা রেডিও বন্ধ করে দিল। নিশ্চয় দেবাশিসের টেলিফোন। একটু ইতস্তত করে সে উঠে গিয়ে ফোন তুলে নিল।

'হ্যালো'

অপর প্রান্ত থেকে আওয়াজ এল—'দীপা, আমার গলা চিনতে পারছ?'

দীপার বুক ধড়ফড় করে উঠল, সে অবরুদ্ধ স্বরে বলল—'পারছি।'

'ঘরে কেউ আছে?'

'না, আমি একা।'

'বেশ। তোমার স্বামীকে বলেছ?'

'বলেছি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কিছু না।'

'রাত্রে তোমাকে বিরক্ত করেনি?'

'না।'

'তুমি একলা শুয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। এইভাবে চালিয়ে যাও।'

'কত দিন?'

'একটু সময় লাগবে। তুমি ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। শপথ মনে আছে তো?'

'শপথ!'

'শপথ করেছ, আমার নাম কাউকে বলবে না। মা কালীর নামে শপথ করেছ, মনে আছে?'

'আছে।'

'তোমার স্বামী হয়তো নাম জানবার জন্যে পীড়ন করতে পারে।'

'নাম জানতে চায়নি। চাইলেও আমি বলব না।'

'বেশ। আমি মাঝে মাঝে তোমাকে ফোন করব। দুপুর বেলা তোমার স্বামী যখন বাড়িতে থাকবে না তখন ফোন করব।'

'আচ্ছা।'

সে ফোন রেখে দিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসল। মনে হল, তার শরীরের সমস্ত জোর ফুরিয়ে গেছে।

বিকেল পাঁচটার সময় দেবাশিস ফ্যাক্টরি

কারুর মুখে কথা নেই—

থেকে ফিরে এল। নকুল দোর খুলে দিল। দীপা ওপর থেকে ঘণ্টির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল, সে উৎকর্ণ হয়ে রইল।

দেবাশিস উপরে উঠে এসে দেখল, দীপা নীরব—রেডিওগ্রামের সামনে বসে আছে। সে ঢুকতেই দীপা চকিতে একবার তার দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়াল। দেবাশিস দ্বিধা-মন্থর পায়ে তার সামনে এল। কারুর মুখে কথা নেই। কিন্তু শুধু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা কতক্ষণ চলে। শেষে দেবাশিস বলল, 'নকুল তোমার দেখাশুনো করেছিল তো?'

দীপা ঘাড় নেড়ে বলল—'হ্যাঁ।'

দেবাশিস প্রশ্ন করল—'চা খেয়েছ?'

দীপা মাথা নাড়ল—'না।'

অতঃপর আর কি বলা যেতে পারে, দেবাশিস ভেবে পেল না। ওদিকে দীপা প্রাণপণে চেষ্টা করছে সহজভাবে যা হোক একটা কিছু বলতে। কিন্তু কী বলবে? বক্তব্য কী আছে? শেষ পর্যন্ত একটা কথা মনে এল, সে ঘাড় তুলে বলল—'আপনি দুপুরে বেলা কোথায় খাওয়া-দাওয়া করেন?'

দেবাশিস বলল—'আমার ফ্যাক্টরিতে খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা আছে। ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে সকলেই দুপুর বেলা ক্যানটিনে খায়। আমিও খাই।'

দীপা শুধু বলল, 'ও।'

দেবাশিস বলল, 'আচ্ছা, আমি কাপড়-চোপড় বদলে নিই, তারপর নীচে গিয়ে চা খাওয়া যাবে।'

সংশয়স্খলিত স্বরে দীপা বলল, 'আচ্ছা।'

দেবাশিস দীপার ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, 'আমি তাহলে তোমার বাথ-রুমই ব্যবহার করছি।'

দোর পর্যন্ত গিয়ে দেবাশিস থমকে দাঁড়াল, তারপর আস্তে আস্তে দীপার সামনে ফিরে এসে গলা খাটো করে বলল, 'একটা কথা। তুমি আমাকে 'আপনি' বললে ভাল শোনায় না। অবশ্য আড়ালে আপনি বলতে পার, কিন্তু নকুল কিংবা অন্য কারুর সামনে 'তুমি' বলাই স্বাভাবিক। নইলে ওদের খট্‌কা লাগতে পারে।'

দীপা মুখ নীচু করে নীরব রইল।

দেবাশিস প্রশ্ন করল, 'কি বলো?'

দীপা অনিচ্ছা-ভরা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আচ্ছা।'

দেবাশিস বাথরুমে চলে গেল। দীপা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, প্রকাশ্যে 'তুমি' বলা এবং আড়ালে 'আপনি' বলা কি খুব সহজ কাজ? রঙ্গালয়ের নটনটীরা বোধ হয় পারে। তার মনে হল সে আস্তে আস্তে অতলস্পর্শ চোরাবালির মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে।

দশ মিনিট পরে দেবাশিস পাঞ্জাবির বোতাম লাগাতে লাগাতে বেরিয়ে এল, বলল,—'চল, নীচে যাই।'

দেবাশিসের পিছু পিছু দীপা নীচে নেমে গেল, দুজনে টেবিলের দুপ্রান্তে বসল। নকুল তাদের সামনে রেকাবি-ভরা লুচি তরকারী রাখল। দেবাশিস খেতে আরম্ভ করল কিন্তু দীপা হাত গুটিয়ে বসে রইল।

নকুল জিগ্যেস করল—'দাদাবাবু ডিম ভেজে দেব?'

দেবাশিস দীপার পানে চাইল। দীপা একটু মাথা নাড়ল; বাপের বাড়িতে তার ডিম খাওয়া বারণ ছিল। আইবুড়ো মেয়েদের ডিম খেতে নেই।

দেবাশিস বলল—'থাক, দরকার নেই।'

চায়ের পেয়ালা টেবিলে রাখতে এসে নকুল বলল—'ও কি বউদি, তুমি খাচ্ছ না?'

দীপা মাথা হেঁট করল, তারপর কাতর

দৃষ্টিতে দেবাশিসের পানে তাকাল। দেবাশিস বুঝতে পারল দীপার সংকোচের কারণ কি। সে একটু হেসে বলল—'নকুল, ওর বোধ হয় পুরুষের সামনে খাওয়া অভ্যেস নেই।'

দেবাশিস তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর নকুল দীপার কাছে এসে বলল,—'বউদি এ সংসারে মেয়েপুরুষ সবাই একসঙ্গে খায়. কর্তাবাবুর আমল থেকে এই রেওয়াজ দেখে আসছি। তুমি যখন এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছ তখন তোমাকেও তো এ বাড়ির রেওয়াজ মেনে চলতে হবে। ভাবনা নেই, আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে যাবে। নাও, খেতে আরম্ভ কর। তোমার বাপের বাড়িতে কি ডিমের চলন নেই?'

দীপা বলল—'পুরুষেরা হাঁসের ডিম খান। মুরগির ডিমের চলন নেই।'

নকুল বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বলল, 'হাঁসের ডিমও যা মুরগির ডিমও তাই, সব ডিমই সমান।'

দীপা নকুলের তদারকিতে চা-জলখাবার খেয়ে ঘরের বাইরে এসে দেখল দেবাশিস সিঁড়ির হাতলের ওপর কনুই রেখে দাঁড়িয়ে আছে। দীপাকে দেখে সে বলল, —'বেড়াতে যাবে? সারা দিন তো বাড়িতে বন্ধ আছ, চল না মোটরে খানিক বেড়িয়ে আসবে।'

অভিনয় চলছে চলুক, কিন্তু কোথাও একটা সীমারেখা টানা দরকার। দীপা সোজা দৃষ্টিতে দেবাশিসের পানে চেয়ে দৃঢ় স্বরে বলল,—'না।'

দেবাশিসের মুখ দেখে মনে হল না যে সে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে, সে সহজভাবে বলল—'আচ্ছা, আমি তাহলে একটু ঘুরে আসি। বেশী দূর নয়, নৃপতিদার আড্ডা পর্যন্ত।'

সে বেরিয়ে পড়ল। অর্ধেক পথ গিয়েছে দেখল, কপিল বোস পায়ে হেঁটে তার দিকেই আসছে। কপিলের একটি ছোট মোটর আছে, বেশীর ভাগ তাইতেই সে ঘুরে বেড়ায়। মুখোমুখি হলে দেবাশিস বলল,—'এদিকে কোথায় চলেছেন?'

কপিল একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল,—'আপনার দিকেই যাচ্ছিলাম।'

মনে মনে বিস্মিত হলেও দেবাশিস মুখে বলল। 'আমার দিকে? তা—চলুন ফেরা যাক।'

কপিল তাড়াতাড়ি বলল,—'না না, তার দরকার নেই। আপনি আড্ডায় যাচ্ছেন তো? চলুন, আমারও শেষ গন্তব্যস্থান সেখানেই। আপনার কাছে যাচ্ছিলাম একটা জিনিসের খোঁজে।'

দুজনে নৃপতির বাড়ির দিকে চলল, দেবাশিস জিগ্যেস করল,—'কিসের খোঁজে?'

কপিল দ্বিধাভরে বলল,—'আমার সিগারেট-কেসটা আজ সকাল থেকে খুঁজে পাচ্ছি না। যত দূর মনে পড়ে কাল বিকেল পর্যন্ত ছিল; তারপর আপনার বাড়িতে গিয়ে আপনার সিগারেটই খেয়েছি, আমার পকেটে সিগারেট-কেস্ আছে কিনা খেয়াল করিনি। আজ সকালবেলা দেখি নেই। বাড়িতে খুঁজলাম, পাওয়া গেল না। তাই ভাবলাম, খোঁজ নিয়ে আসি আপনার বাড়িতে, পকেট থেকে পড়ে গেছে কিনা।'

দেবাশিস বলল,—'আমার বাড়িতে যদি পড়ে থাকে এবং কেউ তুলে না নিয়ে থাকে তাহলে নকুল নিশ্চয় সরিয়ে রেখেছে। আমি তাকে জিগ্যেস করব। কিসের সিগারেট-কেস —সোনার?'

কপিল তাড়াতাড়ি বলল,—'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ভাববেন না, আমি প্রায়ই জিনিস হারিয়ে ফেলি, তবে বেশীর ভাগ সময়েই পাওয়া যায়। হয়তো বাড়িতেই আছে, কিংবা নৃপতিদার আড্ডায়।'

নৃপতির আড্ডা ঘরে তখন আলো জ্বলেছে; ঘরে কেবল নৃপতি আর প্রবাল বসে গল্প করছে। এরা ঘরে ঢুকলে নৃপতি সমাদরের সুরে বলে উঠল,—'আরে এস এস।'

দুজনে নৃপতির কাছে বসল। নৃপতি দেবাশিসকে নিবিষ্ট চোখে দেখতে দেখতে চাপা কৌতুকের সুরে বলল,—'আমি তো ভেবেছিলাম, এখন কিছু দিন তুমি বাড়ি থেকে বেরুবেই না। যা হোক, দাম্পত্যজীবন কেমন লাগছে?'

প্রশ্নের জন্যে দেবাশিস তৈরী ছিল না. একটু দম নিয়ে মুখে সলজ্জ হাসি এনে বলল—'মন্দ কি, ভালই লাগছে।'

প্রবালের গলার মধ্যে হাসির মত একটা শব্দ হল, সে বলল,—'প্রথম প্রথম ভালই লাগে। তারপর—' সে উঠে গিয়ে পিয়ানোর সামনে বসল, টুংটাং শব্দে একটা বিষাদের সুর বাজাতে লাগল।

কপিল ভ্রূকুটি করে কিছুক্ষণ তার পানে চেয়ে রইল, তারপর বিস্বাদসূচক মুখভঙ্গী করে দেবাশিসকে বলল,—'এক জাতের লোক আছে তারা কেবল চাঁদের কলঙ্কই দেখে. চাঁদ দেখতে পায় না। নৃপতিদা, একটা সিগারেট দিন, আমার সিগারেট-কেসটা হারিয়ে ফেলেছি।'

কপিল সিগারেট ধরিয়েছে এমন সময় চিত্রনক্ষত্র সুজন মিত্র প্রবেশ করল। বোধহয় সোজা ফিল্ম স্টুডিও থেকে আসছে, পরনে করডুরয়ের লম্বা প্যান্ট এবং টকটকে লাল রঙের সিল্কের শার্ট। দেবাশিসকে দেখে ধড় করে কৌতুকের ভঙ্গিতে হাসল, তারপর বলল—'নৃপতিদা, আজ কাগজে খবর দেখেছেন?'

সকলেই উৎসুক চোখে তার পানে চাইল, প্রবালের পিয়ানো বন্ধ হল। নৃপতি বলল —'কি খবর? কাগজ অবশ্য পড়েছি, কিন্তু গুরুতর কোনো খবর দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।'

সুজন পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বলল,—

'গুরুতর খবর না হতে পারে কিন্তু ঘরোয়া খবর। আমাদের পাড়ার খবর। খবরের কাগজের এক কোণে ছোট্ট একটি খবর। গোল পার্কের কাছে কাল ভোরবেলা একজন ভিখিরি মারা গেছে।' এই বলে সুজন নাটকীয় ভঙ্গিতে চুপ করল। সবাই অবাক হয়ে মুখের পানে চেয়ে রইল।

সুজন তখন আবার আরম্ভ করল,—'ভাবছেন, একটা ভিখিরির মৃত্যু এমন কী চাঞ্চল্যকর খবর! কিন্তু ভিখিরির মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, কোনো অজ্ঞাত ঘাতক তাকে খুন করেছে। এবং তার চেয়েও বিস্ময়কর খবর, অজ্ঞাত আততায়ী ভিখিরির পিঠের দিক থেকে তার বুকের মধ্যে একটা শজারুর কাঁটা ঢুকিয়ে দিয়ে তাকে বধ করেছে!'

সুজনের বক্তৃতার মাঝখানে প্রবালও পিয়ানো থেকে উঠে কাছে এসে বসেছিল। শ্রোতারা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। শেষে নৃপতি বলল, 'ছোট খবর বলেই বোধহয় চোখে পড়েনি। তোমরা কেউ পড়েছ?'

কেউ পড়েনি। দেবাশিস এবং প্রবাল খবরের কাগজ পড়ে না। নতুন খবরের প্রতি তাদের আসক্তি নেই। কপিল কেবল খেলা-ধুলোর পাতাটা পড়ে।

প্রবাল বলল—'শজারুর কাঁটা কি মানুষের শরীরে বিঁধিয়ে দেওয়া যায়। ভেঙে যাবে না?'

নৃপতি পণ্ডিত ব্যক্তি, সে বলল,—'না, ভাঙবে না। নরম কাঁটা হলে দুমড়ে যেতে পারে কিন্তু ভাঙবে না। শক্ত কাঁটা লোহার শলার মত সটান মাংসের মধ্যে ঢুকে যাবে।'

প্রবাল জিগ্যেস করল—'শজারুর কাঁটা কোথায় পাওয়া যায়? বাজারে বিক্রি হয় নাকি?'

নৃপতি বলল—'সব জায়গায় পাওয়া যায় না। শুনেছি নিউ মার্কেটে দু একটা দোকানে পাওয়া যায়। তাছাড়া বেদেরা গড়ের মাঠে বিক্রি করতে আসে।'

দেবাশিস বলল,—'কিন্তু ছোরাছুরি থাকতে শজারুর কাঁটা দিয়ে মানুষ খুন করবার মানে কি?'

কেউ সদুত্তর দিতে পারল না। কপিল নতুন প্রশ্ন করল—'কিন্তু ভিখিরিকে কে খুন করবে? কেন খুন করবে?'

নৃপতি একটু ভেবে বলল—'ভিখিরিদের মধ্যেও কৃপণ এবং সঞ্চয়ী লোক থাকে। এমন শোনা গেছে, ভিখিরি মারা যাবার পর তার কাঁথা-কানির ভেতর থেকে দু'শো চারশো টাকা বেরিয়েছে। এই লোকটাও হয়তো সঞ্চয়ী ছিল, তার টাকার লোভে কেউ তাকে খুন করেছে।'

কপিল বলল—'আমার মনে হয় ও একটা উন্মাদ পাগলের কাজ। নইলে শজারুর কাঁটার কোনো মানে হয় না।'

সুজন বলল—'তা বটে, প্রকৃতিস্থ মানুষ শজারুর কাঁটা দিয়ে খুন করবে কেন? প্রবাল, তোমার কি মনে হয়?'

প্রবাল অবহেলা ভরে বলল, 'যে-ই খুন করুক সে সাধু ব্যক্তি, ভিখিরি মেরে সমাজের উপকার করেছে। যারা কাজ করে না তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।' সে উঠে গিয়ে আবার পিয়ানোর সামনে বসল।

তারপর খড়্গ বাহাদুর এল। তার আজ মাঠে খেলা ছিল; সে খেলার কথা তুলল, আলোচনার প্রসঙ্গ বিষয়ান্তরে সঞ্চারিত হল। কিছুক্ষণ পরে কফি এল। কফি খেয়ে আরো কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পর দেবাশিস বাড়ি ফিরল।

দেবাশিসের জীবনযাত্রা বিয়ের আগে যেমন ছিল বিয়ের পরেও প্রায় তেমনি রয়ে গেল। বাড়িতে একজন লোক বেড়েছে এই যা। কেবল নকুল এবং বাইরের অন্যান্যদের সামনে ভণ্ডামি করতে হয়। দেবাশিসের ভাল লাগে না।

আড়ালে দীপার সঙ্গে দেবাশিসের সম্পর্ক বড় বিচিত্র। ঘনিষ্ঠতা না করে যতটা সহজভাবে একসঙ্গে বাস করা যায় দু'জনে সেই চেষ্টা করছে। কিন্তু কাজটি সহজ নয়। দীপার মনের নিভৃত আতঙ্ক তার চোখের চাউনিতে হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ে। দেবাশিসের মন অশান্ত; সে জানে দীপা অন্যকে ভালবাসে, তবু দীপা তার মনকে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করছে। বিজয় বলেছিল, দীপা ছেলেমানুষ, দু' চার দিন স্বামীর ঘর করলেই আগের কথা ভুলে যাবে। কিন্তু দীপার ভাবভঙ্গী দেখে তা মনে হয় না। দীপা আর যাই হোক, তার মন চপল নয়।

এইরকম শঙ্কা-দ্বিধার মধ্য দিয়ে কিছুদিন কেটে যায়। একদিন বিকেলবেলা

ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এসে দেবাশিস দীপাকে বলল, 'একটা কথা আছে। ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে তাদের ইচ্ছে, তুমি একদিন ফ্যাক্টরিতে যাও, ওরা তোমাকে পার্টি দিতে চায়। যাবে?'

দীপার মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, এ আবার এক নতুন ঝঞ্ঝাট! সে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না গেলেই কি নয়?'

দেবাশিস বলল, 'তুমি যদি না যেতে চাও আমি জোর করতে পারি না। তবে না গেলে খারাপ দেখায়।'

শুকনো মুখে দীপা বলল, 'তা হলে যাব।'

দু'তিন দিন পরে দেবাশিস একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরল, তারপর কোট প্যান্ট ছেড়ে ধুতি পাঞ্জাবি পরে দীপাকে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে ফিরে গেল।

প্রজাপতি প্রসাধন ফ্যাক্টরির কারখানাটি ব্যারাকের মত লম্বা, তাতে অসংখ্য ঘর, দু' পাশে চওড়া বারান্দা। বাড়ির চার ধারে অনেকখানি খোলা জমিও আছে। কেমিস্ট এবং কর্মী মিলিয়ে আন্দাজ ষাটজন লোক এখানে কাজ করে। ফ্যাক্টরি হিসাবে বড় প্রতিষ্ঠান বলা যায় না; কিন্তু এখান থেকে যে শিল্পদ্রব্য তৈরী হয়ে বেরোয় তার চাহিদা সর্বত্র।

আজ ফ্যাক্টরির পুরোভূমিতে একটি ছোট মণ্ডপ তৈরী হয়েছে। দেবাশিসের মোটর মণ্ডপের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ফ্যাক্টরির প্রবীণ কেমিস্ট ডক্টর রামপ্রসাদ দত্ত এসে দীপাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিলেন। ডক্টর দত্তর পিছনে আরো কয়েকজন কর্মী ছিল, সকলে হাসিমুখে দীপাকে অভ্যর্থনা করল।

ডক্টর দত্ত দীপাকে বললেন—'চল, আগে তোমাকে তোমার ফ্যাক্টরি দেখাই।'

ডক্টর দত্ত বয়সে দীপার পিতৃতুল্য, তাঁর সস্নেহ ঘনিষ্ঠ সম্বোধনে দীপার মনের আড়ষ্টতা অনেকটা কেটে গেল। দেবাশিস তাদের সঙ্গে গেল না; সে জানতো, সে সঙ্গে না থাকলে দীপা বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করবে।

ফ্যাক্টরির কাজের বেলা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তবু কয়েকটা ঘরে কয়েকজন লোক তখনো কাজ করছে। কোথাও সারি সারি জালার মতন কাচের পাত্রে কেশতৈল রাখা রয়েছে, কোনো ঘরে স্নো ক্রীম, কোনো ঘরে ল্যাভেণ্ডার অডিকলোন প্রভৃতি নানা জাতের তরল গন্ধদ্রব্য। সব মিশিয়ে একটি চমৎকার সুগন্ধে বাড়িটি ম-ম- করছে।

ডক্টর দত্ত ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন। দেখতে দেখতে নিজের অজ্ঞাতসারেই দীপার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল। এটা কি, ওটা কেমন করে তৈরী হয়, ক্রীম স্নো ইত্যাদিতে কি কি উপকরণ লাগে এইসব প্রশ্নের উত্তর শুনতে শুনতে সে যেন একটা নতুন রাজ্যে প্রবেশ করল। নতুন তথ্য আবিষ্কারের একটা উত্তেজনা আছে, কৌতূহলী মন সহজেই মেতে ওঠে।

ফ্যাক্টরি পরিদর্শন শেষ করে ডক্টর দত্ত দীপাকে মণ্ডপে নিয়ে গেলেন। মণ্ডপের একপাশে অনুচ্চ মঞ্চ, তার ওপর কয়েকটি চেয়ার; মঞ্চের সামনে দর্শকদের চেয়ারের সারি। ফ্যাক্টরিতে যারা কাজ করে সকলেই মণ্ডপে উপস্থিত। ডক্টর দত্ত দীপাকে মঞ্চের ওপর একটি চেয়ারে বসালেন, দেবাশিস তার পাশে বসল। ফাংশন আরম্ভ হল।

ফ্যাক্টরির কর্মীরা শুধু কাজই করে না, তাদের মধ্যে শিল্পী রসিক গুণিজনও আছে। একটি কোট প্যাণ্ট পরা ছোকরা প্রেক্ষাভূমি থেকে উঠে এসে রবীন্দ্রনাথের গান ধরল—তোমরা সবাই ভাল, আমাদের এই আঁধার ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো। ছোকরার গলা ভাল; গান শুনতে শুনতে শ্রোতাদের দন্ত বিকশিত হয়ে রইল। দীপার মুখেও একটি অরুণাভ হাসি আনাগোনা করতে লাগল। সে একবার আড়চোখে দেবাশিসের পানে তাকাল; দেখল, তার ঠোঁটে লোক-দেখানো নকল হাসি। দীপা এখন দেবাশিসের হাসি দেখে বুঝতে পারে আসল হাসি কি নকল হাসি। তার মন হোঁচট খেয়ে শক্ত হয়ে বসল।

গানের পালা শেষ হলে আর এক যুবক এসে গম্ভীর মুখে একটি হাসির গল্প শোনাল। সকলে খুব খানিকটা হাসল। তারপর ডক্টর দত্ত উঠে ছোট্ট একটি বক্তৃতা দিলেন। চা কেক দিয়ে সভা শেষ হল।

(ক্রমশ)

বাটার এই স্যান্ডাল চটকদার, ফুলবাবু চপ্পলসুলভ
নয়। অথবা পল্কা, গা-হাল্কা সৌলিমসুলভ জুতোও নয়।
আবার, এমনও নয় যে কোনো মহিলা সহজে পরবেন।
(পছন্দ হবে নিশ্চয়, তবে চরণসেবায় লাগবে কিনা সন্দেহ!)
সুগঠিত
পুরুষালি
বাটার স্যাণ্ডাল
বাটার এই পুরুষালি স্যান্ডাল দৃঢ়,
সমর্থ, নতুন যুগের পুরুষের জন্য পরিকল্পিত।
জুতো নির্মাণে বাটার অভিজ্ঞতা অদ্বিতীয়।
এরই ফলে বাটার নাম আজ উৎকর্ষ, আরাম
সুরুচির প্রতিনাম। বাটার জুতো পায়ে দিয়ে
এমন অপরিসীম আরাম!
দীনেশ
২০.৯৫
Bata
এয়ারলাইট
১৮.৯৫
এয়ারকুল
১৬.৯৫
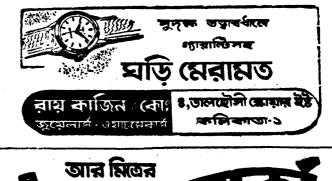
রাজধানী আক্রায় মেলা বসেছে। আর সারা দেশে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। পথে-ঘাটে কিংসওয়েতে জিনিস কেনার ফাঁকে কিংবা এল-মিনোয় সমুদ্রস্নানের অবসরে সবাই সবাইকে জিজ্ঞেস করছে, "দেখেছেন ট্রেড ফেয়ার? দেখবেন না?" না বলবার উপায় নেই। ইজ্জত ঢিলে হয়ে যাবে। মেয়েরা ফিরিস্তি বানাচ্ছে, কী কী জিনিস কিনবেন। অজুহাতঃ দাম নাকি সস্তা হবে। স্বামী-বেচারারা পয়সা ও প্রমাদ গুনছেন। কত গচ্চা যাবে কে জানে। যাঁরা শহর থেকে দূরে তাঁরা রেস্ট হাউস আর বন্ধু বাড়ি অগ্রিম বুকিং-এর ব্যবস্থা করছেন। যাঁরা রাজধানীতে আছেন তাঁরা অতিথিবৎসলতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। এদেশে ভারতীয়দের প্রায় সকলের গাড়ি আছে। তাই শনি-রবিবারে কেপকোস্ট (দূরত্ব ৯০ মাইল), টাকোরাডি (১৫০ মাইল) আর কুমাসি (১৭৫ মাইল) থেকে দলে দলে লোক আসছে আক্রায়। উদ্দেশ্য উইক-এন্ড কাটানো, ট্রেড ফেয়ার দেখা আর আক্রার সিন্ধি ব্যবসায়ীদের দোকান ঢুঁড়ে মসলা, ডাল আর পাঁপড় কেনা। রেকর্ড করেছেন সর্বজনপ্রিয় ডক্টর মুখার্জি বলগাটাঙ্গা থেকে এসে। আক্রা থেকে বলগাটাঙ্গার দূরত্ব ৫০০ মাইলেরও বেশি। শুধু আমরাই নাকি? আমীর-গরীব, গোরা-কালো, নারী-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো বাদ কেউ নেই। রাস্তায় সারি বেঁধে চলেছে বাস আর মামী ট্রাক স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়ে ভর্তি করে। কোথাও কোথাও নাকি দু'একদিন ক্লাস বন্ধও দেওয়া হয়েছে। আর ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বলে কী হবে? আমরা বুড়োরাই অনেকে কি ক্যাসুয়াল লীভ নিইনি? এমনি যখন ব্যাপার, তখন যেতেই হয়। অতএব ভোরে বেরিয়ে পড়া গেল।

মেলা বসেছে আক্রার উপকণ্ঠে, আটলান্টিকের অফুরন্ত, অতলান্ত ঢেউ যেখানে লাবাডির নারকেলগাছ ঘেরা উপকূলে আছড়ে পড়ছে। প্রকাণ্ড একটা জায়গা ঘিরে গড়ে উঠেছে হরেক ডিজাইনের বাড়িঘর, চওড়া রাস্তা, আর পথের পাশে ফান্টা-কোকাকোলার দোকান। সবশুদ্ধ এসেছে ২৯টি দেশ ঃ আফ্রিকার ৯টি ও ইওরোপের ১৩টি দেশ (যার মধ্যে ৫টি হল পূর্ব ইওরোপের সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র), পশ্চিম গোলার্ধ থেকে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিল আর এশিয়া থেকে মাত্র ৫টি দেশ (জাপান, তাইওয়ান, লেবানন, ইসরায়েল আর ভারতবর্ষ)।

ভিড় দেখে যদি বিচার করেন, তবে সর্বসাকুল্যে রায় হবে, আফ্রিকা প্যাভিলিয়নের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। নয়াদিল্লীর গোলমার্কেটের মত আকার ও আয়তনে এই প্যাভিলিয়ন। কিন্তু এর মাথা সমুদ্রের ঢেউ ছাড়িয়ে উঠেছে ১০০ ফিট ওপরে। একতলায় ঘানার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি তাদের বেসাতি সাজিয়ে বসেছে। দোতলায় দেখবেন ঘানার ছোটবড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পণ্যসামগ্রী। আর ছাতের ওপর প্যাভিলিয়নের মাথা যেখানে ছত্রাকারে মিশেছে আকাশের গায়ে, সেখানে বসেছে ঘানার মিলিটারী ব্যান্ড জনমনোরঞ্জনে।

আফ্রিকা প্যাভিলিয়নের পাশে ঘানা প্যাভিলিয়নের তিনতলা বাড়ি ঃ এদেশে বিশ বছরের শিল্পায়ন প্রচেষ্টার ইঙ্গিত। এইখানে ছোট ছোট জায়গা ঘিরে স্টল বসেছে ঃ পাইওনীয়ার টোব্যাকো কোম্পানীর সিগারেট, নুসোরামের কারখানার তৈরী টিনে ভর্তি আনারস টোম্যাটো আর কমলা-লেবুর রস, রাষ্ট্রীয় বস্ত্র-উদ্যোগের তৈরী রেডিমেড শার্ট, প্যান্ট আর মেয়েদের ব্লাউজ, ইউনাইটেড পারফিউমারী কোম্পানীর আতর ও অন্যান্য জিনিস। ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ি মিষ্টি চামেলীর গন্ধে। পাশের দোকানে নজর পড়ে। সাইনবোর্ডে বড় বড় অক্ষরে লেখা 'ঘানা ইন্সেন্স ফ্যাক্টরী'। ভেতর থেকে আসে সাদর আহ্বান, "আইয়ে, ভাইসাহেব।" কারখানার মালিক জনৈক সিন্ধি ব্যবসায়ী। বছর পাঁচেক হল এদেশে ধূপ তৈরি শুরু করেছেন। কিন্তু এখানে ধূপ কিনবে কে? ভদ্রলোক বলেন, "কেন, এদেশের লোকে?" ঠিক। মনে পড়ে গেল, কোন কোন ঘানীয়ের বাড়িতে, দোকানে ও দেশী গির্জায় ধূপ

দেখেছি বটে। এমনকি একবার ট্যাক্সি আরোহী হয়ে, ট্যাক্সির আরশির ফ্রেমে লাগানো চন্দন আগরবাতির গন্ধে আপ্যায়িতও হয়েছি। ঘানার প্যাভিলিয়নে ঘানা ইসেন্স ফ্যাক্টরীই একমাত্র ভারতীয় শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান নয়। এদেশে বেশ কিছু ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি আছেন। এঁদের অনেকে (যেমন, চেলারাম, চণ্ডীরাম, গ্ল্যামার গার্মেন্ট ফ্যাক্টরী, কমল গার্মেন্ট ফ্যাক্টরী, উত্তম্‌স্‌ ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানী প্রভৃতি) মেলায় স্টল দিয়েছেন।

অবশ্য আসল ভারতীয় উদ্যোগ দেখতে হলে যেতে হয় ভারতীয় প্যাভিলিয়নে। এখানে পাবেন বোম্বাই-এর শাড়ি, মোরাদাবাদী পেতল, কাশ্মিরী কার্পেট আর জয়পুরের হাতের কাজ। এর সংগে যোগ হয়েছে গত দুই দশকের শিল্পায়নের নমুনা, বাইসিক্‌ল, মটরসাইকেল, ডিজেল এঞ্জিন, ড্রিলিং যন্ত্র, বৈদ্যুত পাম্প ও পাখা। ব্যাটারী ফ্লাস্ক, ক্যামেরা, ব্লেড আর ইছাপুরে কারখানার তৈরি শটগান। যেসব প্রতিষ্ঠান এসেছে তাদের শতকরা পঞ্চাশভাগ হল মহারাষ্ট্র রাজ্যের (বোম্বাই ও পুনা) আর মাত্র বিশশতাংশ বাংলা দেশের (পশ্চিম-বংগের নিরুদ্যম স্থানুত্বের আর একটি প্রমাণ)। বাকীরা প্রধানত এসেছে দিল্লী, পাঞ্জাব, কানপুর, ব্যাংগালোর আর মাদ্রাজ-কয়ম্বাটোর থেকে।

ব্যবস্থাপনার অভাব যে হাজার জিনিসেও মেটানো যায় না তার প্রমাণ ভারতীয় প্যাভিলিয়ন। এখানকার অনেক ভারতীয় অভিযোগ করেছেন, দেশ থেকে ভাল জিনিস আনা হয়নি। কথাটা আংশিক সত্য। অবশ্য, যা এসেছে, তার থেকে অনেক ভাল জিনিস আনা যেত। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, যেটুকু এসেছে, সেটুকু, সাজিয়ে গুছিয়ে পরিপাটি করে পরিবেশনের যোগ্যতা আমাদের নেই। প্যাভিলিয়ন ঘরে ধুলো জমে আছে, আলোগুলি মিটমিট করছে, তার ওপর এমন কয়েকটি জিনিস চোখের সামনে রাখা হয়েছে যেগুলিতে মরচে ধরে গেছে। কিন্তু দেখে আসুন তাইওয়ান কি জাপান প্যাভিলিয়ন। জিনিস যে ওরা খুব এনেছে তা নয়। কিন্তু ওদের অদ্ভুত বিন্যাস-নৈপুণ্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। ফলে তাইওয়ান ও জাপান প্যাভিলিয়নে লোক ধরে না, যেখানে ভারতীয় প্যাভিলিয়ান প্রায় ফাঁকা পড়ে আছে।

বাণিজ্যমেলা উপলক্ষে এক বুধবার ভারতদিবস ঘোষিত হল। ঘানার দৈনিক কাগজগুলি সেদিন ভারতবর্ষের গণতন্ত্র ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা সম্বন্ধে দু'চার কলম লিখল। আর আক্রায় আয়োজিত হল ভারতীয় নৃত্য ও সজ্জা প্রদর্শনী। কাশ্মীর থেকে কেরালা পর্যন্ত ভারতীয় নারীদের বেশবৈচিত্র্য দেখালেন কয়েকজন মহিলা। এর মধ্যে জনৈকা বঙ্গবালাও ছিলেন। সনাতন বেনারসী শাড়ি পরে ইনি আঁচলে চাবি বাঁধতে ভোলেন নি। তারপর হল নাচ, গুজরাটের গরবা, বাংলার শান্তি-নিকেতনী আর উত্তর ভারতের কথক। বহুদিন অনভ্যস্ত, অপেশাদার শিল্পীরা যেরকম হাততালি কুড়োলেন তাতে মনে হয় পণ্যরপ্তানির সাথে সাথে ললিতকলা রপ্তানির কথাও ভারত সরকারের মনে রাখা উচিত।

ভারতীয় প্যাভিলিয়নের পাশে আক্রার বিখ্যাত ভারতীয় রেস্তোরাঁ 'মহারাজা'র মালিক একটা চায়ের দোকান খুলেছেন। সেখানে চা, সিংগাড়া আর আলুর টিকিয়ার সদ্ব্যবহার করা গেল। রেস্তোরাঁর দেওয়াল-ভর্তি ভারতীয় চা'-এর ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপন। তবে সেসব ছবির শিল্প-নৈপুণ্য বা পরিবেশিত চা'এর স্বাদ-গন্ধ কোনটাতেই ভারতীয় চা'এর বাজার সম্প্রসারণের কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

শুধু চা কেন, কোন্‌ ভারতীয় পণ্যের কতটুকু চাহিদা এখানে আছে? আমরা পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বস্ত্র উৎপাদক, কিন্তু জাপানী কাপড়ে এদের বাজার ছেয়ে গেছে। সেলাই কল, বৈদ্যুত পাখা, বাইসিকল, কার্পেট এসব আসে অন্য দেশ থেকে। জুতো, রেডিমেড শার্ট, টিনের মাছ-মাংস আর ফল আসে চীন আর পূর্ব ইওরোপ থেকে (নক্রুমা আমলে)। আর যন্ত্রপাতির তো কথাই নেই, সবই আসে ইওরোপের দেশগুলি থেকে। এককালে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের টুকিটাকি আরো অনেক কিছু আসত বিদেশ (সে যুগে প্রধানত ইংল্যান্ড) থেকে। গত সার্ধদশকে দেশী-বিদেশী মালিকানায় ঘানায় অনেক ছোট ছোট কারখানা স্থাপিত হয়েছে, যারা আজ তৈরি করছে প্ল্যাস্টিকের জিনিস, চীনামাটির বাসন, দেয়াশলাই, ফাইবার সুটকেস, আরশি, সাবান, টুথপেস্ট, প্রসাধন সামগ্রী আর আসবাব। আজকের আক্রার আন্তর্জাতিক মেলা হল পৃথিবীর বাজারে ঘানার শিল্পায়ন প্রচেষ্টার নমুনা পরিবেশন।

চা খেতে খেতে সন্ধ্যা হয়ে এল। আর বিনা নোটিসে হাজারটা বৈদ্যুত আলো মেলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অনতিদূরে আফ্রিকা প্যাভিলিয়নের ছত্রাকৃতি ছাত আটলান্টিকের কালো ঢেউ-এর পটভূমিকায় বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল এইটেই হচ্ছে আফ্রিকার অতীত-বর্তমান বৈপরীত্যের ব্যঞ্জনা। ওই আটলান্টিক হল অতীত, যার আদি নেই, যার রহস্য আজও অজ্ঞাত। আর এই প্যাভিলিয়ন হচ্ছে আজকের আফ্রিকা, প্রাণচাঞ্চল্যে যা ঝলমল করছে।

২১শে ফেব্রুয়ারী,

অংশু দত্ত

নৃত্যের তালে তালে—তান্ডববিধি

প্রতি বৎসর কালবৈশাখীর দিন যখন ঘনিয়ে আসে মনে জাগে রবীন্দ্রনাথের নটরাজ বন্দনা—"নৃত্যের তালে তালে"। দোলপূর্ণিমা পেরিয়ে গেল। এই তিথিতেই শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয়েছিল "নটরাজ"। মুখবন্ধে কবিগুরু বলেছিলেন:

"নটরাজের তান্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখন্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।"

নটরাজ শংকর একদিকে ভয়াল ধ্বংসের দেবতা, অপরদিকে সুন্দর-রসলোকের পরম বিস্ময়। ভুবনবিধ্বংসী প্রচন্ড রূপ প্রদর্শনের পরও তিনি যে নৃত্যে মেতে উঠেছিলেন তাতে ছিল তাল, লয়। তাঁর অনুচরেরা তার সংগে বাজিয়েছিল পণব, দর্দুর, মৃদংগ। তারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে সুন্দরভাবে যোগ দিয়েছিল সেই নৃত্যে। বহু পুরুষের সুসম্বন্ধ সমাবেশে রচিত হল একটি শ্রেষ্ঠ যৌথ নৃত্য। এটিই তান্ডবের প্রথম পরিকল্পনা যদিচ ভগবান শংকর সেই ধ্বংসের ক্ষণে একটি নব সৃষ্টির বিষয়ে জাগ্রত ছিলেন না। তথাপি এই সুন্দর ভয়াল নৃত্য রসজগতে একটি সংবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেব, দৈত্য, মানব—সকলেরই সুপ্ত ইচ্ছা মহাদেবের এই মহানৃত্যকে কেমন করে রসের জগতে চিরস্মরণীয় করে রাখা যায়।

এই সুযোগ এল যখন দেবদানবের শান্তি কামনায় ব্রহ্মা নাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন। নাটকের পরিকল্পনায় ছিলেন ব্রহ্মা, প্রযোজনায় ছিলেন শতপুত্র সহ ভরত, সংগীতে ছিলেন নারদ এবং বাদ্যে ছিলেন স্বাতি। নাট্যশালা নির্মিত হল। তাতে অভিনীত হল ব্রহ্মার রচিত সমবকার শ্রেণীর নাটক "অমৃত মন্থন"। দেবাসুর উভয়ের ভূমিকা ছিল এই নাটকে। সার্থকতার সঙ্গে এই নাটক অভিনীত হলেও নৃত্যগীতের দিক থেকে নাটকের বোধ হয় তেমন শ্রীবৃদ্ধি হয় নি। ব্রহ্মার উদ্দেশ্য ছিল নটরাজের আনুকূল্যে নাটকে নৃত্যগীতের সমারোহ আনবেন। তিনি তার সুযোগ খুঁজছিলেন। মহাদেবকে দেবলোকে আনা সম্ভব নয়। দেবতাদেরই তাঁর কাছে যেতে হয়। অতএব যাবার একটি উদ্দেশ্য স্থির করা প্রয়োজন। ব্রহ্মা আর একটি নাটক রচনা করলেন—"ত্রিপুরদাহ"। এই নাটকটি 'ডিম' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এতে বীররসেরই প্রাধান্য। বলা বাহুল্য, মহেশ্বরের নিজের কীর্তি ত্রিপুরাসুর বধের বৃত্তান্তটি তাঁর সম্মুখে অভিনয় করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে উদ্দীপ্ত করা এবং তাঁর চিত্তে পূর্ব স্মৃতি জাগিয়ে তোলা। সুচিন্তিত পদ্ধতিতে এই নাটকটি রচনা করবার পর তিনি মুনিবর ভরতকে ডেকে বললেন—"চল আমরা মহাদেবকে দেখিয়ে আসি আমাদের নাটক।" দেবতাদের ডেকে নিয়ে সবাই মিলিত হয়ে উপস্থিত হলেন কৈলাসধামে। যথোচিত অর্চনার পর পিতামহ ব্রহ্মা শিবকে বললেন—"সুরোত্তম আমি একটি সমবকার রচনা করেছি, এটি দর্শন এবং শ্রবণ করে আমাদের প্রতি কৃপা করুন।" মহাদেব সম্মতিপ্রদান করলেন। হিমালয়ে শিবসমক্ষে এই প্রথম অভিনয়টি অনুষ্ঠিত হল। ভরত উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন—

ততো হিমবতঃ পৃষ্ঠে নানানগসমাকুলে।
বহুভূতগণাকীর্ণে রম্যকন্দর নির্ঝরে॥
পূর্বরংগঃ কৃতঃ পূর্বং তত্রায়ং দ্বিজসত্তমাঃ।
তথা ত্রিপুরদাহশ্চ ডিমসংজ্ঞঃ প্রযোজিতঃ॥

প্রথমে সমবকার অমৃতমন্থন অভিনয়ের পর যথোচিত পূর্বরংগ রচনা করে ত্রিপুরদাহ নাটক অনুষ্ঠিত হল। এই পূর্বরংগটি অনেকটা কীর্তনের আগে গৌরচন্দ্রিকার মত। এই পূর্বরংগে পূজোবিধির মত কয়েকটি সুললিত প্রক্রিয়া সম্পাদিত হত।

মহাদেব এবং তদীয় অনুচরবর্গ নাটক দেখে খুবই প্রীত হলেন। নাটকের বিবিধ নৃত্যকর্ম দেখে তাঁর নিজের নৃত্যের কথা মনে পড়ল। ত্রিপুরদাহ নাটকের বীর-রসাত্মক অভিনয়ে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বললেন—"ময়াপীদং স্মৃতং নৃত্যং সংধ্যাকালেষু নৃত্যতা। নানা করণ সংযুক্তৈরঙ্গহারৈর্বিভূষিতম্॥" এই সেই দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর সন্ধ্যাকালীন নৃত্যের স্মৃতি। তিনি প্রস্তাব করলেন: নানা রকম করণ এবং অংগহার-সমন্বিত সেই নৃত্যবিধি নাটকের পূর্বরংগে প্রযুক্ত হোক, আর তার সংগে থাকুক "আসারিত" নামক তৎকাল প্রচলিত গীত। এই নতুন পূর্বরংগের নাম হল 'চিত্র'। মহাদেবের কাছ থেকে অংগহার, করণ প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ শুনে ব্রহ্মা এই প্রক্রিয়াগুলির পরিচয় জানতে চাইলেন। মহাদেব তখন তাঁর পার্শ্বচর তণ্ডু মুনিকে এইগুলির প্রয়োগ বুঝিয়ে দিতে বললেন। তণ্ডু একশো আট প্রকার করণ, বত্রিশ প্রকার অংগহার এবং চার প্রকার রেচকের পরিচয় প্রদান করলেন। এগুলি সবই নৃত্যকর্মের অন্তর্গত।

এই পরিচয় যখন প্রদান করা হচ্ছিল তখন ভগবান শংকর নিজেও তাতে যোগ দিচ্ছিলেন এবং তাঁর নৃত্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে পার্বতীও "সুকুমার" নৃত্য প্রদর্শন করেছিলেন; সংগে বেজেছিল মৃদংগ, ভেরী, পটহ, পণব, দর্দুর প্রভৃতি নানাপ্রকার বাদ্যভান্ড। এই সুকুমার নৃত্যই লাস্য নামে পরিচিত হয়ে এসেছে। মহেশ্বর নাকি দক্ষযজ্ঞ বিনাশের পর সন্ধ্যাকালে এইভাবে নানা অংগহার প্রদর্শন করে লয় তাল সহকারে নৃত্য করেছিলেন।

দক্ষযজ্ঞে বিনিহতে সংধ্যাকালে মহেশ্বরঃ॥
নানাঙ্গহারৈঃ প্রনৃত্যল্লয়তালবশানুগৈঃ।

সম্মেলক নৃত্য হিসাবে একে পিন্ডীবন্ধ নৃত্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। নাট্যানুষ্ঠানের পর এই যে নৃত্য সম্পাদিত হল এতে শিবানুচর ব্যতীত চন্ডিকা, সিংহবাহিনী, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কার্তিকেয়, লক্ষ্মী, জাহ্নবী, যম, বরুণ, কুবের, বলরাম প্রভৃতি অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন।

বিবিধ করণ, রেচক এবং অংগহারসমন্বিত এই যে নৃত্য সেটি সম্পূর্ণ ভগবান শংকরের সৃষ্টি। এই নৃত্যকে তিনি আরও চিত্তাকর্ষক উন্নতশিল্পে পরিণত করবার জন্য তণ্ডু বা তান্ডীমুনিকে নির্দেশ দিলেন। তণ্ডু তখন শিবপ্রযোজিত এই নৃত্যের সংগে গীত এবং বাদ্যকে সুসমন্বিতভাবে যুক্ত করলেন। এই সংগীতসমন্বিত নৃত্যের প্রয়োগই তান্ডব নামে খ্যাত।

সৃষ্টা ভগবতা দত্তাস্তন্ডবে মুনয়ে তদা।
তান্ডিনাপি ততঃ সম্যগ্গানভান্ড সমন্বিতঃ॥
নৃত্যপ্রয়োগঃ সৃষ্টো যঃ স তান্ডব ইতি স্মৃতঃ।

এই বর্ণনা থেকে এটি স্পষ্ট যে শংকরের স্বভাবপ্রেরণায় যে নৃত্য একদা ত্রাস এবং বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল তাতে গীত ছিল না। কিন্তু তণ্ডু মুনি এই নৃত্যকে গীতের উপযোগী করে যে সংস্কৃত রূপ প্রদান করলেন তাই হচ্ছে তান্ডব। তান্ডবে গীতের প্রয়োগ আবশ্যিক এবং এই নৃত্য নাট্যধর্মী। শংকরের উপদেশেই তান্ডবের উদ্ভব কিন্তু

যখন মন্নিসমাজে বিবৃত হল তখন তাঁরা এর স্রষ্টা বলেই এর নাম তাণ্ডব। এই উপলক্ষে এ কথাও বলা প্রয়োজন যে তাণ্ডবে স্ত্রীলোকেরও ভূমিকা রয়েছে যদিচ লাস্যের সঙ্গে এর পার্থক্য বর্তমান।

নৃত্যের মধ্যে গীতের প্রয়োগ কেন হল তারও বিচার হয়েছে। তাণ্ডববিধির বৃত্তান্ত যখন মন্নিসমাজে বিবৃত হল তখন তাঁরা ভরতকে প্রশ্ন করলেন—"নর্তন যা অভিনয়ের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আসলে নাট্যসংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুকে পরিস্ফুট করবার জন্যই নৃত্যের প্রয়োজন হয়; কিন্তু এই যে উপলক্ষহীন গীতের সঙ্গে নৃত্য এর উপযোগিতা কি?" ভরত এর উত্তরে মন্নিদের বললেন, "নৃত্য যে সব সময়েই কোনও অর্থ অপেক্ষা করবে এমন নয়। নৃত্য শোভা বর্ধন করে। স্বভাবতই লোকসমাজে নৃত্য প্রিয়। সর্বপ্রকার শুভকর্মেই নৃত্যের বিধি আছে। যে "আসারিত" গানের প্রয়োগ নৃত্যে হয়েছে তার গোড়ায় কতকগুলি অর্থহীন শব্দের আবৃত্তি আছে—একে বলে "উপোহন"। বাদ্যভাণ্ডের সঙ্গে তালে তালে "ঝণ্টুং ঝণ্টুং দিগেল দিগেল ঝুচঝল তিতিঝল ঘা"—এই জাতীয় কতকগুলি

সনৃত্য আবৃত্তি শিবানুচর ভূতগণের অত্যন্ত প্রিয় এবং এর মধ্যে একটি নাট্যভাবও আছে। অতএব শঙ্কর এই অংশটি তণ্ডুকে তদীয় তাণ্ডব নৃত্যে প্রয়োগ করবার উপদেশ দিয়েছেন।" এ ছাড়া আর এক প্রকার গানও নৃত্যে ব্যবহৃত হত তার নাম ছিল "ছন্দক"।

তাণ্ডববিধি সর্বক্ষেত্রে দেবতাদের স্তুতি বা বীররস উপলক্ষে প্রযুক্ত হত, আর পার্বতী প্রবর্তিত "সুকুমার প্রয়োগ" ছিল শৃঙ্গার রসে প্রযোজ্য। পূর্বরঙ্গ, অর্থাৎ নাটক শুরু হবার আগে যে অনুষ্ঠান তা প্রধানত দেবস্তুতিমূলক হওয়ায় সে ক্ষেত্রে তাণ্ডববিধিকেই অনুসরণ করা হত। নেপথ্যে বিশুদ্ধ রীতিতে বাজত মুরজ, পণব, দর্দুর, বীণা আর বাঁশী—গায়ন সম্প্রদায়ের কণ্ঠে উচ্চারিত হত "উপোহন" আর সেই সঙ্গে নর্তকী রঙ্গপীঠে প্রবেশ করে এক একটি নৃত্যের অনুষ্ঠান করে যেত। পূর্বরঙ্গে "আসারিত" গীত একাধিকবার অনুষ্ঠিত হত। দেবীকৃত সুকুমার প্রয়োগ বা লাস্য মূল নাট্যানুষ্ঠানে কেবলমাত্র শৃঙ্গারের পটভূমিকায় রচিত হত। এর সঙ্গেও যুক্ত ছিল নানা রকমের গান, যেমন চতুষ্পদা, পরিগীতিকা প্রভৃতি। সহস্রাধিক বৎসর আগেই এই সব গান লুপ্ত হয়ে গেছে অথবা অন্যান্য বিবিধ গীতিরীতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সেই অর্থহীন শব্দের আবৃত্তি সহযোগে এখনও তো গান হয় কিন্তু "তারানা" শোনবার সময় আমরা কি কখনও অতীত যুগের উপহোনের কথা স্মরণ করি?

আমাদের সঙ্গীতের কোন আদি যুগে শঙ্কর এবং পার্বতী এনেছিলেন নৃত্যে গীতে রসের প্রস্রবণ। যুগে যুগে কবি, ঋষি, শিল্পীগণ তাঁদের প্রভাবে ধন্য হয়েছেন। এ যুগের মহাকবিও তাই স্মরণ করে রচনা করেছেন অমর শৈবস্তোত্র। আজ এই কালবৈশাখীর রুদ্র নৃত্যের পূর্বাভাসে সেই পার্বতী-পরমেশ্বরকে বন্দনা করি।

ভীষ্মদেবের প্রতি অমর্যাদায় কার অসম্মান?

মহাশয়,

বাংলার শিল্পসঙ্গীত তথা সংস্কৃতি নিয়ে আমরা গর্ব বোধ করি। কিন্তু, যখন দেখি যে, বাংলার সঙ্গীতজগতের প্রধান পুরুষদের প্রতি অসম্মান ও অমর্যাদা প্রদর্শনই এখনকার কায়েমী স্বার্থ মহলের এক উৎকট রেওয়াজ হয়ে গিয়েছে, তখন কি করে আমরা বলি যে, এই গর্ব আমাদের অকৃত্রিম, এর মধ্যে ভেজাল নেই?

কথাটা আমাদের মনে উঠেছে খুব সম্প্রতি কালের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বিষয়টি সত্যিই দুঃখবহ এবং বোধ হয় তার থেকেও কিছু বেশী, কারণ, যাঁর প্রতি এই অশ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে, তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন বাংলার সংগীত জগতের জীবিত শ্রেষ্ঠতম প্রতিভাধর শিল্পী পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

আমরা জানতে পেরেছি যে, ভীষ্মদেবকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এই মাসেরই গোড়ার দিকে শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ সংগীত সম্মেলনে অনুষ্ঠান পরিবেশনের জন্য। তাঁর নামে টিকিটও বিক্রয় হয়েছিল প্রচুর, বিজ্ঞাপনও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যে কর্তৃপক্ষ কলকাতা থেকে তাঁকে প্লেনে নিয়ে যাবার ব্যস্ততা দেখিয়েছিলেন, তাঁরাই ফেরার পথে তাঁকে রেলের টিকিট কেটে দিয়ে অতি নিশ্চেষ্টভাবে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। ঘটনাটা ছিল এই:—

গত ৩, ৪ এবং ৫ মার্চ শিলিগুড়িতে এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় এবং কলকাতা থেকে এ-জন্য অনেক উচ্চাঙ্গ সংগীতশিল্পীকে নিয়ে যাওয়া হয়। ভীষ্মদেবের প্রোগ্রামের কথা ছিল ৪ মার্চ তারিখে। সেদিন সম্মেলনে বৃহৎ জনসমাবেশও হয়েছিল তাঁর গান শোনবার আগ্রহে; কিন্তু পরে ঘোষণা করা হল যে, ভীষ্মদেব "অসুস্থ হয়ে পড়ায়" ঐদিন তিনি আসরে আসতে পারছেন না।

বহু শ্রোতা অধীর আগ্রহ নিয়ে পরের দিন তাঁর গান শোনার অপেক্ষায় রইলেন। পরের দিন গিয়ে ভীষ্মদেবের দেখা পাওয়া গেল; কিন্তু সম্মেলনের মণ্ডপের মধ্যে নয়। অনেকে দেখলেন, তিনি বাইরে বেড়াচ্ছেন। উদ্যোক্তাদের কাছে অনুরোধ গেল, তাঁকে এবার প্রোগ্রাম দেওয়া হোক। কিন্তু, কী রহস্যময় কারণে জানা গেল না, ভীষ্মদেব বহুক্ষণ সেখানে উপস্থিত থাকলেও এবং বন্ধুজন ও স্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে অনেকটা সময় অতিবাহিত করলেও উদ্যোক্তারা সেদিন আর ভীষ্মদেবকে আসরে গাইবার প্রোগ্রাম দিলেন না। উদ্যোক্তাদের মহল থেকে শোনা গেল যে, সেদিন এমনই "ঠাসাঠাসি" প্রোগ্রাম হয়ে গেছে যে, আচার্য ভীষ্মদেবকে আর অনুষ্ঠানের অবকাশ দেওয়া যায় না। অথচ সেদিনই ছিল সম্মেলনের শেষ দিন।

এর পর ভীষ্মদেব সবান্ধবে শিলিগুড়ি শহর দেখে বেড়ালেন, ঘুরলেন এবং তারপর প্রীতি সম্ভাষণ জানিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে গেলেন।

উত্তরবঙ্গ সংগীত সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের কাছে আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, তাঁকে যখন গাইতেই দেওয়া হল না, তখন কলকাতা থেকে তাঁকে এত দূর টানাটানি করে নিয়ে আসবার কি প্রয়োজন ছিল? সে কি তবে শুধু মাত্র ব্যবসায়িক প্রয়োজনে? যাতে তাঁর নামে সম্মেলনের ব্যবসা ভাল জমে ওঠে, টিকিট বেশী বিক্রি হয়? মাত্র এই-ই? সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে যে, ভীষ্মদেবের মত শান্ত ও মহৎ শিল্পীকেই তাঁরা পেয়েছিলেন এই রকম অবহেলা প্রদর্শনের জন্য। নইলে হয়ত অন্য রকম অনর্থ ঘটতে পারত এবং এটাও তাঁদের বহু ভাগ্যের কথা যে, শ্রোতৃসাধারণ এতে দারুন অসন্তুষ্ট হলেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেননি।

এই ব্যাপারটি আপনার ও আপনার পত্রিকা মারফত বাংলার সংগীতানুরাগী নরনারীর কাছে জানাবার জন্যই এই পত্র দিলাম। এই বিষয়ে যে প্রধান প্রশ্নটি আমাদের মনে জাগে, তা হল এই—ভীষ্মদেবের অমর্যাদায় কার অসম্মান হয়, তাঁর না সংগীতপ্রেমী গোটা পশ্চিম বাংলার?

বাদল চট্টোপাধ্যায়
শিলিগুড়ি

চীন-যুদ্ধে পরাজয়ের দায়িত্ব

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

[পাঁচ]

আমাদের অনুদ্যোগ

এইবার চীন বাহিনীকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত হইতে তাড়াইবার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা করিয়াছিলাম তাহা দেখা যাক। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে কোনও ব্যবস্থাই করা হয় নাই। বাড়ির দরজায় বা উঠানে ভিখারীরা গন্ডগোল করিলে যেমন দরোয়ানকে "নিকাল দো" বলিয়া হুকুম দেওয়া হয় তেমনই হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। এমন কি হয়ত আমাদের গভর্নমেণ্ট ভাবিয়াছিলেন, হুস্ হুস্ করিয়া যেমন বাগান হইতে চড়াই তাড়ানো যায়, তেমনই চীনাদেরও উড়াইয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু চীনারা ত চড়াই নয়। যাহা হউক, হিসাবটা সম্পূর্ণ করা দরকার।

১। নির্দেশ। চীন সেনাকে যখন সমস্ত নেফা বা ঢোলা অঞ্চল হইতে হঠাইয়া দেওয়ার হুকুম আমাদের সেনাপতিদের উপর দেওয়া হয়, তখন প্রথমে কোনও লিখিত নির্দেশই ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে ছোট বড় সেনাপতিরা সকলেই বলাবলি করিতেছিলেন যে, আক্রমণের আদেশ আসিয়াছে। এই মৌখিক আদেশও আসিয়াছিল, দিল্লী হইতে নয়, লক্ষ্ণৌ হইতে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের ঈস্টার্ন কমাণ্ডের প্রধান সেনাপতির কাছ হইতে। এই আদেশ পালন করিবার মত শক্তি নাই, কথাও স্থানীয় সেনাপতিরা তেমনই মৌখিক রাখিলেন। এই অনিশ্চিত অবস্থার কোন পরিবর্তন না করিয়া সমর বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মেনন অভিনয় করিবার জন্য নিউ-ইয়র্কে ইউ এন-এ চলিয়া গেলেন। সুতরাং যাঁহার দায়িত্ব সব চেয়ে বেশী ছিল, তিনি দায়িত্বমুক্ত হইয়া বিদেশে আত্মপ্রচার করিতে গেলেন।

কিন্তু দিল্লীর প্রধান সেনাপতি (অর্থাৎ চীফ অফ দি আর্মি স্টাফ) জেনারেল থাপার ইহাতে সন্দেহমুক্ত হইলেন না, নিজের বিবেচনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুকুম দিতেও অগ্রসর হইলেন না। ২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৬২) তারিখে সকালে একটা পরামর্শ সভাতে নেফাতে আক্রমণ সম্বন্ধে আলোচনা হয়, উহার সভাপতিত্ব করেন সহকারী সামরিক সচিব (ডেপুটি ডিফেন্স মিনিস্টার) শ্রীযুক্ত রঘুরামিয়া। এই সভায় জেনারেল থাপার এই কথা জানান যে, তিনি গভর্নমেণ্টের লিখিত আদেশ না পাইলে আক্রমণের হুকুম দিবেন না। ইহাতে সহকারী সমর-সচিব হতবুদ্ধি হইয়া নিউইয়র্কে তাঁহার কর্তার কাছে টেলিফোন করিলেন। আমি শুনিয়েছি যে, ইহার উত্তরে শ্রীযুক্ত মেনন কোনও ইতস্তত না করিয়া লিখিত আদেশ দিয়া দিতে বলেন। তাই ২২শে তারিখে বিকালে জেনারেল থাপার একটি টাইপকরা পত্র পান। পত্রটি এবং পত্রটির ভাষা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে, তাই ইংরেজীতেই উদ্ধৃত করিতেছি। (তবে ইংরেজীটাও একেবারে অক্ষরে অক্ষরে দিতে পারিলাম না, কেন সকলেই বুঝিবেন। কিন্তু মোটামুটি উহার ভাষার কোনও ব্যতিক্রম করা হয় নাই।) চিঠিটি এইরূপ—

"With reference to our discussion this morning the Government has decided that the Chinese should be evicted from the Thaga-Dhola area. The Chief of the Army staff should take necessary action".

এইরূপ বাজে নিম্নস্তরের ইংরেজীতে কেউ যুদ্ধের হুকুম দিতে পারে তাহা আমার ধারণার অতীত। যিনিই মুসাবিদা করিয়া থাকুন ইহা সেক্রেটারিয়েটের কেরানীর ইংরেজী। আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই চিঠিটিও সহকারী সমর-সচিবের স্বাক্ষরযুক্ত নয়, সমর বিভাগের সেক্রেটারিরও স্বাক্ষরিত নয়, এটি সই করিয়াছিলেন, শ্রী এইচ সি সারিণ, জয়েণ্ট সেক্রেটারী।

সারিণ সাহেব পুরাতন আই সি এস-এর সর্বজ্ঞ রাজপুরুষ, নহিলে তিনি বুঝিতেন যে ,ইহা স্বাক্ষর করা তাঁহার উচিত হয় নাই। তাঁহার বলা উচিত ছিল, এই ব্যাপার তাঁহার অধিকারের বাহিরে, তাঁহার পক্ষে অব্যাপার।

চীফ অফ দি আর্মি স্টাফ জেনারেল

থাপারেরও উচিত ছিল এই হুকুম গ্রাহ্য না করিয়া চিঠিটিকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া দেওয়া। ইহাতে সামরিক কর্তব্যের ত্রুটি হইত না। লণ্ডনের গভর্নমেণ্ট এবং স্বয়ং চার্চিল যখন আয়োজন সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে নিজের বিবেচনার বিরুদ্ধে শত্রুবাহিনীকে আক্রমণ করিবার জন্য জেনারেল মনগমারীকে পীড়াপীড়ি করেন, তখন তিনি পদত্যাগ করিবেন বলিয়াছিলেন। তবে জেনারেল থাপার এই আদেশের প্রত্যুত্তরে আপত্তি জানাইয়া সমর বিভাগে চিঠি লিখিয়াছিলেন। সেই চিঠির কোনও উত্তর তিনি পান নাই।

২। যুদ্ধের প্ল্যান। কোনও প্ল্যান ছিল না, এবং করিবার কোনও চেষ্টাও হয় নাই। একদিকে সকলেই অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করা যাইবে এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। অপরপক্ষে যে যেখানে পারেন সেখানেই ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা করিতেছিলেন—সে ব্যবস্থাও অতি তুচ্ছ, এখান হইতে ওখানে সৈন্য সরাইবার ব্যাপার মাত্র। সমগ্র-ভাবে একটা অভিযান চালাইবার কোনও প্ল্যানই কেহ করে নাই, এরূপ যুদ্ধের ধারনাও কাহারও ছিল না।

৩। অধিনায়কত্ব। যুদ্ধটা চালাইবার পুরাপুরি দায়িত্ব কাহার, তাহা কখনই বলা হয় নাই। ইহার জন্য যুদ্ধপরিচালনার বিশেষ কম্যাণ্ড সৃষ্টি করা হয় নাই। প্রথমে তো স্থানীয় সেনাপতিরা, তা তাঁহারা কোরের সেনাপতিই হউন, বা ডিভিসনের, ব্রিগেডের, ও ব্যাটালিয়নের সেনাপতিই হউন, সকলেই বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করিতেছিলেন। পরে

যখন জেনারেল কলকে এই অভিযানের জন্য কোরের অধিনায়ক হিসাবে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইলেন তখনও তাঁহাকে দিল্লীর অধীনে আনা হইল না, রাখা হইল লক্ষ্ণৌ-এর ইস্টার্ন কমাণ্ডের সেনাপতির অধীনে। জেনারেল কলকে কোনও স্টাফও দেওয়া হয় নাই

লক্ষ্ণৌ-এর সেনাপতির পক্ষে এই যুদ্ধ-পরিচালনার তত্ত্বাবধান করা সম্ভব ছিল না। তাই কার্যক্ষেত্রে এক অবস্থায় এক ধরনের কার্যকলাপ ও অন্য অবস্থায় বিপরীত কার্যকলাপ দেখা গিয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, চীন সেনা যখন ২০শে অক্টোবর তারিখে আক্রমণ আরম্ভ করে এবং আমাদের বাহিনী বিপর্যস্ত হয়, তখন জেনারেল কল দিল্লীতে। স্থানীয় সেনাপতির অনুপস্থিতিতে ইস্টার্ন কমাণ্ডের সেনাপতিরই উচিত ছিল, যুদ্ধপরিচালনার ভার নিজে নেওয়া। কিন্তু তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও কিছু করেন নাই, ডিভিসনের সেনাপতির উপর সব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এমন কি ডিভিসনাল সেনাপতি যখন বিশেষ পরামর্শের জন্য তাঁহার সহিত পূর্বদিন সন্ধ্যায় দেখা করিতে চাহিলেন, তখন পরদিন সকাল পর্যন্ত তাঁহার সহিত কথাও বলিলেন না। দশ বারো ঘণ্টার দেরিতে যে একটা বাহিনীর সর্বনাশ হইতে পারে তাহা ভাবিলেন না। জেনারেল কল ফিরিয়া আসিবার পর তিনিই আবার কলের হুকুমের উপর হুকুম দিতে গেলেন।

ইহারও উপর দিল্লীর উপর-চালাকী ছিল। ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ডিভিসনের সেনাপতি মেজর জেনারেল নিরঞ্জন প্রসাদ আপত্তি করেন যে, দিল্লী হইতে ব্যাটালিয়নের কর্নেলের উপরও সাক্ষাৎ হুকুম আসিতেছে। আরও পরে ১৭ই অক্টোবর তারিখে স্বয়ং মেনন আসামে গিয়া জেনারেল কলকে বলিলেন যে, রাজনৈতিক কারণে সাঙ্গলি অধিকার করিয়া থাকা প্রয়োজন। ইহাকেই অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট করা বলে।

৪। **সৈন্যবল।** প্রত্যেক অভিযানের জন্যই একটা বিশিষ্ট বাহিনী তৈরি করা হয়, তাহাতে সবরকমের অস্ত্র ও সৈন্য থাকে। এ-রকম কোনও বাহিনী পূর্ব সীমান্তে তৈরি করা হয় নাই। সাধারণভাবে পাহারা দিবার জন্য যে ধরনে ছাড়া ছাড়া ঘাটি বসান থাকে, সেই অঞ্চলে এর বেশী কিছু ছিল না।

জেনারেল কল যখন ৪ঠা অক্টোবর তারিখে নবগঠিত চতুর্থ কোরের সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন, তখন এটুকু অন্তত তিনি প্রত্যাশা করিতে পারিতেন যে, পুরা কোর গঠিত না হইলেও, আক্রমণের আগে কোর পূর্ণগঠিত হইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এখানে বলিয়া দেওয়া দরকার যে, পুরা কোরের অন্তত দুইটি ডিভিসন থাকে, অর্থাৎ সবরকমের সৈন্য মিলাইয়া অন্ততপক্ষে চল্লিশ হাজার সৈন্য সমাবিষ্ট হয়। পদাতিক ছাড়া, কামান ও গোলন্দাজ যে উপযুক্ত সংখ্যায় থাকে তাহা বলাই বাহুল্য।

যখন জেনারেল কল পূর্বসীমান্তে সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন তখন বিদেশী সংবাদদাতারাও এই ধরনের একটা বাহিনী গঠিত হইয়াছে ইহা ধরিয়া লইয়াছিল। টাইম ম্যাগাজিন লিখিয়াছিল যে, জেনারেল কলকে একটা বিশিষ্ট "টাস্ক ফোর্সে"র সেনাপতি হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আমেরিকান সামরিক ভাষায় "টাস্ক ফোর্স" কথাটার অর্থ ও গুরুত্ব কি তাহা সকলেই জানে। এ রকম কোনও বাহিনী সমাবেশ করা দূরে থাকুক, ইহার চেষ্টাও হয় নাই।

জেনারেল কল যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাকে দুইটি মাত্র ব্রিগেড দেওয়া হইয়াছে, পুরা একটি ডিভিসন পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। মোটা হিসাবে তাঁহার অধীনে তখন মাত্র হাজার ছয়েক সৈন্য ছিল। হওয়ার উপরও [illegible] গুরুত্বের [illegible] ছিল। প্রত্যেক ডিভিসনের সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের মত মিডিয়ম (তিনটি তিন ব্যাটারী বা ১২টি) কামান থাকিত। জেনারেল কলের অধীনে এক ডিভিসন মাত্র থাকিলেও অন্ততপক্ষে পুরো ডিভিসনের ২৫ পাউণ্ডার কামান থাকা উচিত ছিল। ইহার অতিরিক্ত কোর হিসাবে তাঁহার হাতে ৫ ইঞ্চ হাউইটজার কামানও থাকা উচিত ছিল। কিন্তু তাঁহার সমস্ত ফিল্ড আর্টিলারীও যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল না, ছিল ৬০ মাইল পিছনে। ডিভিসনের গোলন্দাজদের জন্যে গোলা সরবরাহ করিবার বাহিনী বা ডিভিসনাল অ্যামুনিশান কলাম্ থাকে। উহার কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই।

সুতরাং জেনারেল কলের অধীনস্থ সৈন্যদের সহায়তা করিবার জন্য কোনও কামানই ছিল না। বিপন্ন হইবার পর উহাদের জন্য চারিটি হাল্কা ৩.৭৫-ইঞ্চ হাউইটজার এরোপ্লেন হইতে প্যারাশুটে

দিয়া ফেলা হয়। ইহাতে দুইটি ভাঙিয়া যায়, মাত্র দুইটি দিয়া যুদ্ধ করিতে হয়। ইহারই আবার বড়াই কত। হার হইবার পর কয়েকদিন পরে পড়িলাম যে, আমাদের সৈন্যদের আর্টিলারী দিয়া সহায়তা করা হইতেছে। আমি শুধু অবাক হইয়া ভাবিলাম, আর্টিলারী ছাড়া উহারা কি করিতেছিল?

অকর্মণ্য লোকের ছুতার অভাব হয় না। সুতরাং আমি এ-যুক্তিটা শুনিয়াছি যে, হিমালয়ের এত উচ্চ প্রদেশে ভারী কামান লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়। প্রথম মহাযুদ্ধে ইটালীতে যুদ্ধ করিবার জন্য জার্মানরা ৮-ইঞ্চ স্কডা হাউইটজার পর্যন্ত আল্‌প্‌সের উপর দিয়া লইয়া আসিয়াছিল। উহারও শতাধিক বৎসর আগে নেপোলিয়ন তাঁহার কামান আল্‌প্‌স পর্বতে সেণ্ট বার্নার্ড-এর উপর দিয়া আনিয়াছিলেন। হানিবাল হাতী লইয়া আল্‌প্‌স্ পার হইয়াছিলেন। যুদ্ধে ভৌগোলিক বাধা দুরতিক্রম্য হইলে অনতিক্রম্য নয়—অতিক্রম করা শুধু সময় ও ব্যবস্থা সাপেক্ষ, দূরদৃষ্টির ব্যাপার।

৫। গোলাগুলি ও সাজসরঞ্জাম। ইহাদের পরিমাণ এত কম ছিল যে, তাহা বিপজ্জনক না বলিলে হাস্যকর বলিতে হয়। একটি জায়গায় মেসিনগানের জন্য মাত্র ১২,০০০ গুলি ছিল। একটি মেসিনগান মিনিটে ৪০০—৬০০ গুলি ছাড়িতে পারে, সুতরাং বিশ-ত্রিশ মিনিট মাত্র গুলি চালাইবার উপায় ছিল। মর্টার-এর গোলা ছিল না বলিলেই চলে। অন্য জিনিসপত্রের অতিশয় অভাব যে ছিল, তাহা তো পরে জানা গেল।
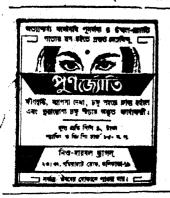
৬। সেনা-সমাবেশ। চীনের মত দেশের সহিত সীমান্ত লইয়া লড়াই করিতে গিয়া আমাদের সেনাপতিরা যে-ধরনের সেনা-সমাবেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমার কাছে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। একটা বড় যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছেন, এ রকম কোন ভাবনাই তাঁহাদের মনে জাগে নাই। তাঁহারা যে-ভাবে সৈন্য মোতায়েন করিয়াছিলেন উহা চৌকি-দারির ব্যাপার। কোথাও আক্রমণ বা প্রতি-আক্রমণের জন্য সংগঠিত সেনাদল রাখা হয় নাই। অল্পসংখ্যক সৈন্য যাহা ছিল, তাহাদিগকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে ঘাটিতে ঘাটিতে বসাইয়া রাখা হইয়াছিল। ইহার অপেক্ষা অবিবেচনার কাজ আর কিছু হইতে পারে না—প্রথমে তো দুই ব্রিগেডকে অনেকটা জায়গা জুড়িয়া ছড়াইয়া রাখা হইয়াছিল, তাহার পর নূতন সেনাদল পৌঁছিলেও তাহাদিগকে "খই-ছড়ানো" হইয়াছিল।

ইহার কারণ আমাদের গভর্নমেণ্টের সীমানা সম্বন্ধে মায়া ও সীমানার ঘাটি সম্বন্ধে জেদ। পূর্ববঙ্গে সম্পত্তি লইয়া মারামারি হইলে জিউলি গাছ যেমন স্বত্ব ও ইজ্জতের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়, তেমনই ঘাটিও আমাদের গভর্নমেণ্টের কাছে হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাই ঘাটি যুদ্ধের জন্য স্থাপিত না হইয়া, সীমানার ঘাটি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে বলা হইয়াছিল।

ইহার অপেক্ষাও আশ্চর্য ব্যাপার যে, ঘাটিগুলিকে অনেক ক্ষেত্রেই উপত্যকার মধ্যে নিম্নভূমিতে বসান হইয়াছিল। চীনসেনা যে পর্বতের উপর হইতে আমাদের সৈন্যদের উপর গুলি চালাইতে পারে তাহা ১২ই অক্টোবর তারিখে নেহরু পর্যন্ত বলিয়াছিলেন। এই বিবরে ঢুকিবার ঝোঁক যে কেন হইল বুঝিতে পারি না, কারণ ভারত-বর্ষে সীমান্ত যুদ্ধের জন্য ১৯২৫ সনেও যে নিয়মাবলী সংকলিত হইয়াছিল, তাহাতেই নিম্নলিখিত নির্দেশ ছিল।—

"The leading consideration is to deny to the enemy the most important points from which he can bring effective fire to bear." (*Manual of operations on the North-West Frontier of India, 1925, p. 19.*)

আমাদের সেনানীরা ও সেনাপতিরা কি ছাত্রাবস্থায় পড়া পাঠ্যপুস্তকও ভুলিয়া গিয়াছিলেন?

৭। ভারতীয় বিমানবাহিনী এই যুদ্ধে কোনও সহায়তা করে নাই। হার হইবার পর মালপত্র নিবার জন্য আমেরিকান বিমান-বাহিনীর এরোপ্লেন ও সেনা আনা হয়। আমি কিছুদিন আগে প্রফেসার গ্যালব্রেথের একটি উক্তি পড়িয়াছি। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনিই নাকি ভারতবর্ষের গভর্নমেণ্টকে চীনাদের বিরুদ্ধে বিমান-বাহিনী নিয়োগ না করিতে বলিয়াছিলেন, কারণ, চীনারা প্রতি-আক্রমণ করিয়া ভারত-বর্ষকে অত্যন্ত বিপন্ন করিতে পারে। অথচ নেহরু ভারতবর্ষকে বিমান আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট কেনেডির কাছে আবেদন করেন। এই ব্যাপারটার ইতিহাস সুধীর ঘোষ দিয়াছেন।

৮। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে পার্বত্য অঞ্চলে যে সৈন্যবল ছিল, তাহার অতিরিক্ত সৈন্যবল আসামে ছিল না। আমি এই কথা বলিব যে, চিন গভর্নমেণ্ট যদি ১৯৬২ সনের নভেম্বর মাসের শেষে আসাম অধিকার করিতে চাহিতেন তাহা হইলে সাত দিনে তাহা পারিতেন। এই উদ্দেশ্য চীন গভর্নমেণ্টের মোটেই ছিল না, কারণ তাঁহারা জানিতেন এই চেষ্টা করিলে আমেরিকার সহিত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

নয়-দশ দফা সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না, কারণ এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই ছিল না।

১৯৬২ সনের অক্টোবর মাসে চীনাদের নেফা হইতে বাহির করিয়া দিবার যে বড়াই করা হইয়াছিল তাহার পূর্ব-ইতিহাস ও উদ্যোগ এই প্রকার। অনেকে আপত্তি করিবেন এই যুদ্ধের উদ্যোগের সহিত এল আলামেনের যুদ্ধের উদ্যোগের তুলনা করা উচিত নয়। কেন নয়? যুদ্ধের উদ্যোগের মাপকাঠি একটি মাত্র—প্রতিপক্ষের শক্তি ও দৃঢ়তা কত। যুদ্ধক্ষেত্র দশ মাইলব্যাপীই হউক বা ১০০ মাইল ব্যাপীই হউক, আয়োজন করিতে হইবে এই যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষ কি পরিমাণ সৈন্য রাখিয়াছে ও কি করিতে প্রস্তুত তাহার মাপে। নেফাতে যখন চীন চার ডিভিসন মত সেনা রাখিয়াছে তখন তাহার সহিত দুইটি ব্রিগেড লইয়া যুদ্ধ করিতে যাওয়া অন্যায় হইয়াছিল।

আয়োজনের এই অসম্পূর্ণতার জন্য পরবর্তী হারের দায়িত্ব কাহার ইহা বিচার করিবার কোনও অর্থই হয় না। হার অনিবার্য ছিল। নেপোলিয়ন স্বয়ং আসিলেও ইহার প্রতিকার করিতে পারিতেন না। তাই আমি ২০শে অক্টোবরের পর কি হইয়াছিল তাহার আলোচনা করিতে প্রস্তুত নই, এবং করি নাই। হয়ত ইহা সত্য যে, পরে কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলে হারটা এত লজ্জাজনক হইত না। কিন্তু আমার মনে হয় না যে, পরের ব্যবস্থায় এমন কিছু ইতরবিশেষ হইত।

তাই যে প্রশ্নটার বিস্তারিত আলোচনা হওয়া দরকার তাহা অন্য রকমের—পূর্বেকার আয়োজনের অভাব, অবিবেচনা ও অবিমৃষ্য-কারিতার দায়িত্ব কাহার? আগামী সপ্তাহে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিব।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ত্রিলোচন কলমচি

আড্ডা প্রসঙ্গে

সেই রসিকা ভদ্রমহিলার আক্ষেপোক্তি দিয়েই শুরু করি, কাঁদুনে ছেলেটি অবশ্য সান্ত্বনা পেয়েছিল কিনা, সঠিক জানা নেই, 'ছিঃ খোকন, কাঁদতে নেই, তোমাদের বাবা মরেন নি, ও-পাড়ার তাসের আড্ডায় যোগ দিয়েছেন।'

যাঁরা তাস-পাশা-দাবা নিয়ে শরীর চর্চা করেন কিংবা নিরিবিলিতে গায়ের জামা খুলে ঘামাচি গালার মত ঘন আনন্দে পাঁচ ইয়ারে মিলে (Lip-ইয়ার নিশ্চয়ই) বোতল খোলেন, কি বিদগ্ধ চিত্তে কল্কে চড়ান, সেই স্লিম্-ফিগারদের আড্ডার কথা এখন থাক। তাঁরা অবশ্যই দিন-কাবার রাত ভোর করে দিতে পারেন, এমনকি, ক্যালেন্ডারের ডেট বদলে বাড়ি ফিরে আসতে পারেন। বিশেষত, জুয়া জমলে থানায় ডায়েরী লেখানো এবং বেতারের নিরুদ্দিষ্ট ঘোষণায় নাম পাঠানো কিছু বিচিত্র নয়। আমি ফ্রি-হ্যান্ড বৈঠকের কথা বলছি, যে আড্ডায় আমরা সবাই কখনো না কখনো জমে গিয়েছিলাম। যে আড্ডা আমাদের আশ্রয়, কখনো বা শেষ আশ্রয়, যে যেখানে রয়েছি। লেকের বেঞ্চে, পার্কের ছাউনির তলায় শীতে বর্ষায় শরতে মংকি-ক্যাপ, কমফোর্টার র‍্যাপার ফুলমোজা আর ছড়ি-ছাতার দল পয়লা বিকেল থেকে পয়লা রাত অবধি যাঁরা জমায়েত হন, তাঁদেরও কোথাও কোথাও ঘনীভূত আড্ডা জমে। রিটায়ার্ড আড্ডা সব সময়েই অসুখের নয়। কিংবা রকে বসে যে টেরি-টেরিলিনের দল আধলা সিগারেট ফুঁকে জেনানা জানালায় আই কিউ দিয়ে, চিটিচিরকুট আর সিটি দিয়ে দিন গুজরান করছে, বাজার ফিরতি চায়ের দোকান আর সেলুনের একপ্রস্থ চেয়ারে বসের রগরগে আলোচনায় সুদ উসুল করছে, তারাও কিছু খারাপ নেই।

কিন্তু তবু কোথায় যেন সুর মিলছে না, কোথায় যেন তাল কেটে গেছে ইতিমধ্যেই। আমাদের ছোটবেলায় যে-সব জমজমাট আড্ডা দেখেছি দূর থেকে, বিড়ি-তামাকের মুখরোচক ধোঁয়ায় ঘনীভূত প্রহরগুলি, তারা আজ শূন্যে মিলিয়ে গেছে। গড়গড়ার নলের সেই কবুতরী বোল কই আর যেন ফোটে না। 'হাথক জরুপন' তাস, 'মাথক ফুল' দাবা অনায়াসে বগলদাবা করে কোথায় চলে গেল অতীতের দিনগুলি রাতগুলি। এমন কি আমাদের কিশোর-যৌবনে যে শ্রোণীভারাদলস-গমনা ইউনিভার্সিটির মধ্যাহ্ন ছিল, যে জলতরঙ্গ বিকেল, ধূসর পাণ্ডুলিপির মত প্রাচীনাক্ষর সন্ধ্যা, তারাও পিকপকেট হয়েছে অনেক দিন।

সেই সকালবেলার চারমিনার ভাঁজা জমায়েত, সস্তা চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে কোনো অমানুষ মাঠের মধ্যে গড়াগড়ি দিয়ে আকাশ দেখা, গানের কলিতে চিৎকার দিতে দিতে শক্ত মলাটের দুর্লভ বই বগলে করে অবেলায় বাড়ি ফেরা সব ভুলে গেছি গত জন্মের মত। হয়ত বা চিরজন্মের মত। মধ্য বয়সে এখন আমরা ব্যস্ততা-স্তম্ভিত, সময়-ফুরোনো কাজের মানুষ; আমাদের সামনে শুধু বহুলাঞ্ছিত নীরব ফাইল, আর অনড় 'কিউ' সাত আর পাঁচের অমিল অঙ্ক, কচিৎ কদাচিৎ পুরোনো বন্ধুর 'একইরকম বেঁচে আছি' পোস্টকার্ড। এখন তাই মনে হয়, এই বয়সে আর একবার পাঁচজনের বুকের আঁচে নিজের হাত-মুখ সেঁকে নিতে পারলে ভালো হত।

আসলে এ শুধু আমার মত একজনের কি এক দলের স্বগত আক্ষেপ নয়, গোটা বাঙালী জাতেরই সম্ভবত সাম্প্রতিক জবানবন্দী। বঙ্গদেশ থেকে অনেক কিছু সচ্ছলতাই মুছে গেছে—যাচ্ছে ধীরে ধীরে, অনেক কিছুই এখন স্মৃতিবাহন অতীত

রিটায়ার্ড আড্ডা সব সময়েই অসুখের নয়

যায়। গ্যাসবাতি-বেলফুল-কুলপির সংগে সংগে ফেরিওলার মত মুক্ত স্বাধীন সুরেলা দুপুরে চলে যাচ্ছে পায়ে পায়ে। শুধু কিছু জাঙা বোলচাল পড়ে থাকছে এখনো এখানে-সেখানে বঙ্গসংস্কৃতির কিছু অরক্ষিত সঠিক ঘরে বসেও না; এমনকি মানুষ বাছতে গেলেও আড্ডা উজাড় হবার ভয়। আড্ডা অতি মেজাজী ব্যাপার, অতি শৌখিন এবং বিশুদ্ধ ব্যাপার। নিটোল আড্ডা প্রায় নিখাদ স্বপ্নের মত, সাবান জলে ফুঁয়োনো বেলুনের

পুরোনো বন্ধুজন আবার এমনি ঘন হয়েছিলাম

অংশাংশ। যেন কিছু বাঁয়া তবলা কিছু চাপা ঘুঙুর।

যে নিমিতি দিয়ে আড্ডার অবয়ব গঠিত সেই স্থানকালপাত্রের অনটনই বাঙালীর বর্তমান আড্ডাহীনতার জন্য দায়ী। জায়গা নেই, সময় নেই, মানুষ নেই। তাই আড্ডা এই ব্যস্তবাগীশ দুরন্ত দিনগুলোর মুগুর ভাঁজার চেয়ে কঠিন এবং কসরতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘাড় ধরে আড্ডা হয়না, মত, একটু নড়েছ কি নষ্ট! আড্ডাকে ঘরোয়ানা বলা চলে যদিও আড্ডা জিনিসটা আক্ষরিক অর্থে ঘরোয়া নয়। আড্ডা অযথ-পন্থী, তার জন্যে চাই অনিয়ম। মানুষের ব্যক্তিত্ব আড্ডায় যতখানি ফোটে, সমূহ স্পষ্ট হয়, কর্মক্ষেত্রে প্রায় তার কিছু ধরা পড়ে না। তার কারণ কর্মক্ষেত্র মানেই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ দীর্ঘকালীন একটি প্যাটার্ন, পাতা লাইনের ওপর দিয়ে এক তরফা চলে যাওয়া, ওয়ানওয়ে ট্রাফিকের মত, ফিরে আসার ব্যাপার নেই। অথচ আড্ডায় নিজের কাছেই ফিরে ফিরে আসা, নিজের মেজাজকে, মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কথা বলা।

আমরা কতক্ষণ এইভাবে আড্ডা দিয়েছি মনে নেই। ক্রমশই সবাই ঘন হয়ে এসেছি শরীরে মনে। সুবিধে মত স্থানে অস্থানে ঠ্যাং তুলে, তাকিয়ায়-বালিশে কনুই পেতে, সম্ভ্রান্ত রকমে চিবুক স্থাপন করে আমরা তখন সবাই ফিজিক্যালি জমে গিয়েছিলাম। বহুকাল বহু বছর পরে আবার আমরা পুরনো বন্ধুজন আবার এমনি ঘন হয়েছিলাম। আহত ব্যাহত, সিদ্ধ প্রসিদ্ধ নানা অবস্থায় নানা পরিণামে পৌঁছানো মানুষ আমরা ফিরে এসেছি যেন কয়েক প্রহর আগের পুরনো জামগাছতলায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পরস্পরের ঘ্রাণ নিচ্ছি, আমরা এত কাছের মানুষ ছিলাম একদিন যে, আশ্চর্য হয়ে দেখছি, আজও তেমনি ঘনিষ্ঠ রয়ে গেছি। তাই পরস্পরের খবর কি জানবার প্রয়োজন হয়নি। যেন ওয়ারফ্রন্ট জঙ্গলে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে ফিরে এসেছি আমরা নিজেদের গ্রাম্যকৈশোরে, জীবনের ওপর দিয়ে অনেক ঝড়ঝাপটা অনেক ঢেউ বয়ে গেছে: দু' পকেট ভর্তি অনেক কুটিল অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসে দেখছি, আমরা সবাই নেই, অন্ততঃ অক্ষত নেই। এ নিয়ে আক্ষেপ করার কিছু নেই, সান্ত্বনা বিনিময়ের কোনো মানে হয় না, শুধু এই নিরবয়ব সান্নিধ্যই আজ আমাদের কাছে বড় কথা। তাই আলোচনা ফলিত রাজনীতি থেকে অ্যাস্ট্রোনমি, আর্কটিক বার্ডস থেকে প্লাস্টিক সার্জারি, ভিয়েৎকং, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, ড্রাগ কনট্রোল, শঙ্করাচার্য, কোবাল্ট বীম থেরাপি থেকে মায় বাংলা সাহিত্যের অগ্নিমান্দ্য পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

আসলে আড্ডার আলোচনা এমনিই লাফিয়ে লাফিয়ে চলে, কোথাও তার থেই নেই ক্লান্তি নেই, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, অন্য রাজ্যে অন্য প্রসংগে অনায়াসে সে লম্ফ প্রদান করে থাকে। তারপর এক সময় ল্যাজা আর মুড়ো মিশিয়ে বর্তুল আকৃতি ধারণ করে। সমস্ত বৈষয়িকতার বাইরে চলে যায়।

আজ আড্ডার কথা ভাবতে গিয়ে কত বিচিত্র মানুষের কথা মনে পড়ছে। তাদের অনেকের সংগেই বন্ধুত্ব ঘটে নি। শুধু বসতি ঘটেছে। আড্ডাখানায় তারা চুপি চুপি এসে বসেছে, আবার আড্ডা ভাঙার আগেই চুপি চুপি উঠে গিয়েছে এমন কত মানুষ। তাদের সকলের পুরো চেহারাও মনে নেই। দু'একটি কথা, মুদ্রাদোষ, রসিকতা এবং গল্পের টুকরো স্মৃতির টাকরায় আটকে আছে আজও। সত্যি বলতে কি অনেক জাতের আড্ডার কবলে পড়েছিলাম আমি, অনেক স্তরের মানুষ অনেক রকমের সংগ-

প্রসঙ্গের মানুষ। দু'চারটে খুনজখমজীবী থেকে শুরু করে বাক্‌জীবী বুদ্ধিজীবী বিদ্যাজীবী নানা রকমের মানুষ তারা।

তিনটি মেয়ের কথা এখনো মনে আছে, যারা বান্ধবী না হয়ে বন্ধু হয়ে গিয়েছিল ছাত্রজীবনে। রাতের পর রাত জেগে পড়েছে, পাল্লা দিয়ে সিগারেট খেয়েছে, গায়ে পড়ে একনাগাড়ে ভজন দেড়েক গান গেয়েছে। আর ভয়াবহ রকম তর্ক করেছে, হাতাহাতি হয়ে গেছে কখনো কখনো। তাদের একজন কি জোলুসে জানি না অ্যামবাসাডরনী হয়েছে, অন্যজন সামান্য কেরানী এবং অসামান্য ম্যাজিসিয়ান। তিসরি জন সেলুলয়েডে নিজেকে ট্র্যানস্প্লেট করে করে যাচ্ছে সগৌরবে। মনে আছে সেই ছেলেটির কথা, আত্মহত্যা করার কয়েক ঘণ্টা আগেও যে চুটিয়ে আড্ডা দিয়ে গেছে। মফস্বলী একটি যুবকের কথা মনে পড়ে যে একটানা আড়াই বছর রবিবার সুদ্ধ প্রতিদিন অর্থাৎ প্রতি রাত্রে লাস্ট ট্রেনে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। এমন ডেলি-প্যাসেঞ্জার হয়ত বিরল নয়, কিন্তু আমি আর দেখিনি। কিংবা মসৃণ রকে-বসা কন্দর্পকান্তি সেই মানস মল্লিক ওরফে সর্বজনীন মানুদা, সর্ব বিষয়ে পারঙ্গম অভিজ্ঞ পুরুষ, উঠতি ছেলে ছোকরারা ধারাবাহিকভাবে, প্রায় জেনারেশন পরম্পরায়

যিনি পুজোর সিজন এলে আমাদের মধ্যে গল্প খুঁজতে আসতেন

তাঁকে ঘিরে বসে আছে। 'লাইফ' মার্ডার হয়ে গেল গুরু, শুধু একটু 'টিপ্‌স্' বলে দাও। তিনি কোমরের কসি আলগা করে ভুঁড়ি খেলিয়ে বসে বরাভয় দিচ্ছেন। যার যেমন শেকড়বাকড় দরকার। দাম্পত্যজীবনের অতি বাস্তব ক্রিয়াকাণ্ড থেকে, সাসপেন্সে ঝোলা লভ অ্যাফেয়ার সব কিছুতেই তিনি রায়-বাহাদুর। পান চিবুতে চিবুতে কাউকে হয়ত চোখের ইশারায় নিরিবিলির অপেক্ষায় বসিয়ে রেখেছেন, কাউকে হয়ত ঋষিসুলভ নির্লিপ্তি নিয়ে বলছেন, 'ক্ষ্যাপা, তোর যা সুনুদ্দম, অবে (হবে) লেগে থাক। ট্যান্ডল তুম্ কর্ক বন্ যাও মাস্টার'—

কিংবা সেই রুগ্ন সাহিত্যিক, যিনি পুজোর সীজন্ এলে আমাদের মধ্যে গল্প খুঁজতে আসতেন।

আড্ডা যেখানে চুমুকে চুমুকে প্রায় জমে এসেছে সেখানে গেলে আত্মপরিচয় দিতে নেই, চুপচাপ বসে যেতে হয়। কথার খিলি যখন হাত ফেরতাই হয়ে কাছে আসে তখন নিজের মুখে ফেলতে হয় শুধু। এই রকমই একটা আড্ডায় গিয়ে পড়েছিলাম সেদিন। আড্ডাধারীরা প্রত্যেকেই বিবাহিত, প্রতিষ্ঠিত এবং কর্মক্ষেত্রে বেশ জাঁদরেল মানুষ। প্রত্যেকেরই বয়স ঠিক ততটাই এগিয়েছে যতটা এগোলে অনায়াসে নিজের নিজের বিবাহিত জীবন নিয়ে আলোচনা করা চলে। অত্যন্ত লঘু ভঙ্গিতে জীবনের একটি সুচিন্তিত সমীকরণ কষতে চাইছেন সবাই।

কি পেয়েছেন, কি পান নি, কি পাওয়া যায় না তারই মানসাঙ্ক। পাপ-পুণ্যের লাল-তামামি নয়, শুধু মানুষের বুকের গভীর থেকে যে অতৃপ্ত অন্বেষণ জীবনের সব কিছু ভালো লাগা, মন্দ লাগা, রমণী এবং রমণীয়তা হাতড়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। নারীর কাছে আমরা সত্যি করে কি চাই, কতটুকু চাই—কত রকমের রুগ্না-অরুগ্না, গভীর, মন্থর, নিঃশেষিত এবং নিষ্কাম নারীত্ব আছে, বিশুদ্ধ যৌনতা আছে, আত্মার মত পরিশীলিত আদিমতা আছে, কত প্রাকৃত রমণী সমস্ত সংস্কার-চিহ্নহীন সত্যের কত কাছে পৌঁছেছে এ কথা সবাই জানে না। বোহিসেবী বন্য নিঃসঙ্গ যৌবনের চাবিতে অকস্মাৎ কোনো কোনো অন্ধকারের ম্যাজিক বাক্স খুলে যায়। এক মুহূর্তে তখন অনেক কিছু পেয়ে যাই আমরা।

শিশিরকুমার চৌধুরী

বর্ধমানের প্রান্তসীমায় অজয় তীরবর্তী অযোধ্যা গাঁ থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল বেলা ন'টায়। গৌরাঙ্গপুরে 'ইছাই ঘোষের' দেউলের নাতিউচ্চ টিলার পাদদেশে এসে জীপ অচল হল। যান্ত্রিক গোলযোগ নয়, রথের পথ ফুরিয়েছে। সঙ্গীরা সকলেই এদিককার অধিবাসী। বললেন, শীতের সময়ে যন্ত্রযান আরো কিছুটা এগুতে পারতো। কিন্তু বর্ষাশেষে পথ দুর্গম। অতএব আমাদের মূল গন্তব্যস্থল 'শ্যামারূপার গড়'-এ পৌঁছতে হলে এবার পদযুগলকেই সম্বল করতে হবে।

খানিকটা চড়াই বেয়ে অচিরেই দেউলের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম। ঘুমন্ত ঘন অরণ্যানীর মধ্যে উচ্চশির অতন্দ্র প্রহরীর মত দণ্ডায়মান এই বিশাল রেখ-দেউলটি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল বহু দূর থেকেই। এবারে মুখোমুখি হলাম।

কিংবদন্তী বিশ্বাস করতে হলে, ইষ্টকনির্মিত এই স্থাপত্যের বয়ঃক্রম প্রায় হাজার বছর। কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। কারণ, এত দীর্ঘদিনের কালের প্রভাব মন্দিরগাত্রে নেই। বিশেষ করে চার দেওয়ালে পোড়ামাটির কাজ প্রাচীনত্বের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। দেউল উচ্চতায় আনুমানিক সত্তর ফুট এবং প্রস্থে কুড়ি ফুট। অভ্যন্তরে কোন বিগ্রহ নেই। তবে স্থানীয় অধিবাসীদের মতে এটি শিবমন্দির। শ্যামারূপা ভক্ত ইছাই ঘোষ দেবাদিদেবের মন্দির স্থাপনে আগ্রহান্বিত হবেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মতান্তরে, এই মন্দির দেবী ভগবতীর।

এই দেউলকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কিংবদন্তীর অন্ত নেই। সঙ্গীরা বললেন, বছরের এক বিশেষ দিনে মন্দিরচূড়ায় একটি বড় সাপের আবির্ভাব হয়। দেউল অভ্যন্তরে উৎসর্গীকৃত নৈবেদ্যের বিস্ময়কর অন্তর্ধানের প্রচলিত নানা কাহিনীও এই সঙ্গে শোনা গেল। কিছুদিন আগে অগম্য দেউলশীর্ষে একটি বানরের আবির্ভাব ও তিলে তিলে তার মৃত্যুবরণ এ অঞ্চলে প্রভূত আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

দেউলের পাদদেশ থেকে অজয় অববাহিকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল গোচরীভূত হয়। দেউলশীর্ষে পৌঁছবার কোন ব্যবস্থা এখন নেই, কিন্তু শত্রুর গতিবিধি লক্ষ করবার কাজে একদিন এর ব্যবহার ছিল এ কথা অনায়াসেই কল্পনা করা চলে।

দেউলের চারপাশে টিলার ধারে ধারে এক ধরনের বাঁশ লক্ষ করবার মত। এগুলি দেউড় বাঁশ। সাপের মত আঁকাবাঁকা এবং অসংখ্য কাঁটায় ভরা। ঘন সন্নিবেশিত হলে এই বাঁশের ঝোপ ভেদ করে চলা, মানুষ দূরে থাক, জন্তু-জানোয়ারের পক্ষেও প্রায় অসম্ভব। দুর্গরক্ষায় প্রথম ব্যূহ রচনা করতে প্রয়োজন হত এই বাঁশের ঝোপ।

সীমায়িত সময়ের শাসনে দেউল পরিক্রমা শেষ করতে হল অল্পকালের মধ্যে। পাশের সাঁওতালপল্লীর একটি পরিবারের হেফাজতে জীপটিকে রেখে অতঃপর শুরু হল আমাদের পদযাত্রা।

(২)

আমাদের পথপ্রদর্শক মধ্যবয়সী ভদ্রলোকটি পেশায় শিক্ষক ও নেশায় কথক। একটা ছোট চাদর মাথায় জড়িয়েছেন। গাছের ডাল ভেঙে কাজ চলার মত একটা লাঠিও তৈরি করে নিয়েছেন। তাঁর প্রাণপ্রাচুর্য ও অফুরন্ত সরস গল্পভাণ্ডার সকলেরই মনে এনে দিয়েছে খুশির জোয়ার।

পদযাত্রার কিছু পরেই শুরু হল প্রকৃত বনভূমি। অজয় তীরবর্তী এই অসমতল ভূভাগ গভীর অরণ্য অধ্যুষিত না হলেও অবশ্যই সুগম নয়। এতক্ষণ যা হোক পায়েচলা একটা পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলাম, কিন্তু অচিরেই তা হারিয়ে গেল। শরতের আবির্ভাবে অরণ্যভূমির শুষ্ক ও বালুকাময় অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর গতিপথ

দেউড় বাঁশের ঝোপ

ইছাই ঘোষের দেউল

এবার পথের নির্দেশ দিচ্ছে। এর হদিস জানা আছে শুধু মাস্টার মশাই-এর এবং আমরা তাঁর অন্ধ অনুসরণ করে চলেছি।
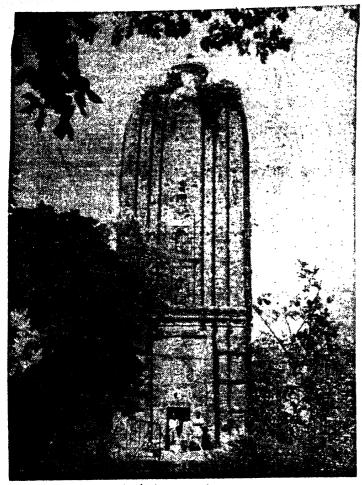
মাস্টার মশাই-এর গল্পসংগ্রহে প্রচলিত কিংবদন্তীর সংখ্যা কম নয়। ঐকান্তিক শ্রোতা সকল বক্তারই কাম্য এবং আমাদের মধ্যে সেই আগ্রহশীলতা লক্ষ করে একের পর এক কিংবদন্তী উপহার দিচ্ছিলেন তিনি। কথকতার ইন্দ্রজালে ইতিহাস সজীব হয়ে উঠছিল। কাঁদুনে ডাঙ্গা আর রক্তনালার পাহাড়ে আবার বেজে উঠছিল রণদামামা। লাউসেন তালাও-এর ধারে মরণপণ যুদ্ধে মেতে উঠছিলেন ইছাই-লাউসেন।

গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে মাস্টারমশাই দেবী শ্যামারূপাকে স্মরণ করছিলেন উদাত্ত কণ্ঠে 'মা' 'মা' ডেকে। অরণ্যের আলো-আঁধারি পটভূমিকায় ভাবগম্ভীর কণ্ঠের সেই মাতৃ-আহবান স্বতঃই আমাদের দেহে শিহরন সৃষ্টি করছিল।

মাস্টারমশাই বলছিলেন, শ্যামারূপার গড়ের আশেপাশে বর্তমানে কোন লোকালয় নেই। কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয়, এখনও এখানে মহাষ্টমী পূজার দিনে কোথা থেকে জেগে ওঠে অসংখ্য ঢাক-ঢোলের আওয়াজ আর সেই সঙ্গে শুনতে পাওয়া যায় ঘন ঘন তোপধ্বনি।

অতর্কিতে আমার মুখে প্রশ্ন জাগল, স্বকর্ণে এইসব আওয়াজ শুনেছেন, এমন কোন লোকের সন্ধান আপনি পেয়েছেন কি?

বিস্মিত মাস্টার মশাই এক লহমার জন্য আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আমি নিজেই এই আওয়াজ শুনেছি।

বলা বাহুল্য, সংশয়াতীত মনে তাঁর এই উত্তর তখন আমি মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু সব কিছুরই যে বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলে না, সেদিনেরই অন্য একটা ঘটনা তাই প্রমাণ করে দিলে।

ইছাই ঘোষের দেউল থেকে শ্যামারূপার গড়ে পৌঁছতে এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগবে না, পদযাত্রা শুরু করার আগে এরূপ আশ্বাস পেয়েছিলাম। কিন্তু একটানা প্রায় দু' ঘণ্টা চলেও যখন গন্তব্যে পৌঁছান গেল না তখন স্বতঃই 'ডাল ভাঙ্গা ক্রোশের' কাহিনীটি মনে পড়তে লাগল। গড় আর কতদূর, এতক্ষণ এই প্রশ্নের উত্তরে মাস্টারমশাই বলেছেন, এই এলাম বলে। এবারের প্রশ্নে কিন্তু ভিন্নতর জবাব পেলাম। তাই তো, এতক্ষণে তো পৌঁছে যাবার কথা। কাজেই তাঁর উক্তি আমাদের কিছুটা চিন্তান্বিত করে তুলল।

আরো আধ ঘণ্টা চলার পর বোঝা গেল, পথ আমরা সত্যিই হারিয়েছি। ফিরে গিয়ে স্বচ্ছন্দে দ্বিপ্রাহরিক আহার সারা যাবে, এরূপ ভরসা পাওয়াতে পানীয় জল পর্যন্ত সঙ্গে আনা হয় নি।

এতক্ষণ ক্ষুৎপিপাসার কথা মনেও উদয় হয় নি। কিন্তু এখন মনে হতে লাগল, কিছু পানীয় না পেলে সত্যি অচল হয়ে পড়ব। অন্তত বিশ্রাম নেবার জন্যে সকলেই আমরা একটা বড় গাছের ছায়ায় বসে পড়লাম।

অপ্রতিভ মাস্টারমশাই বললেন, আপনারা বিশ্রাম করুন, আমি একটু এগিয়ে দেখি, পথের নিশানা করতে পারি কিনা।

এ কথায় কিন্তু আমরা রাজী নই। বললাম, তা হতে পারে না। কারণ, পথ খুঁজে পেলেও আমাদের আবার আপনি খুঁজে পাবেন কি করে?

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার পথ চলা শুরু হল। এবারে গতি মন্থর।

একজন সঙ্গী প্রস্তাব করলেন, একটা বড় গাছে চড়ে তিনি পথের সন্ধান করবেন।

তথাস্তু।

কিন্তু এতটা পরিশ্রম করে এবং বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তিনি গড়ের কোন সন্ধানই পেলেন না।

ইতিমধ্যে কিছু আমলকি ফল সংগৃহীত হয়েছিল। পিপাসার্ত রসনায় সেই ফলগুলোতে আমরা যেন অমৃতের আস্বাদ পেলাম।

বেলা দুপুর গড়িয়ে চলেছে। আমরা অরণ্যের সেই গোলকধাঁধার মধ্যে দিশাহারার মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোন হিংস্র জন্তুর সাক্ষাৎ এ পর্যন্ত অবশ্য মেলেনি, কিন্তু এই অরণ্যে তাদের উপস্থিতি নিতান্তই স্বাভাবিক।

হাস্য পরিহাস আগেই বন্ধ হয়েছিল। এখন সাধারণ কথাবার্তাও। সকলেই ভাবছেন, এখন কি কর্তব্য। এক সঙ্গী হঠাৎ বলে উঠলেন, এখন যদি একদল ডাকাত এসে আমাদের খুন করে সর্বস্ব নিয়ে চলে যায়, তবে কেউ জানতেও পারবে না।

কথাটা যে আগে মনে পড়ে নি তা নয়। তবে পরিষ্কার উচ্চারিত হতেই শরীরটা শিউরে উঠল। এবং তারপরই আমরা দেখতে পেলাম, কিছু দূরে অরণ্যের ছায়ান্ধকারে প্রায় মিশে, মিশকালো দীর্ঘদেহী একটি লোক দাঁড়িয়ে। হাতে তার বড় একটি লাঠি।

মুহূর্তে হৃদস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গেল। প্রস্তরীভূত আমরা দেখতে পেলাম, পায়ে পায়ে লোকটা এগিয়ে আসছে। এই তবে শেষ।

কিন্তু লোকটা আরো একটু এগুতেই আমরা যেন সংবিৎ ফিরে পেলাম। মাভৈঃ। আমাদের ভীতির কারণ একটি তরুণ সাঁওতাল। বয়স অতি অল্প, বোধ হয় সাবালকও নয়। মুখখানি সুকুমার সুন্দর। দেহ অসাধারণ দীর্ঘ। এই ছেলে আর যা হোক ডাকাত হতে পারে না। আমরা মুখ খোলার আগেই সে প্রশ্ন করল, বাবু তোরা কি পথ হারিয়েছিস? তোরা কি গড়ে যাবি?

নবকুমার কি কপালকুণ্ডলার প্রথম প্রশ্নে এর চেয়েও অধিক আশ্বাস লাভ করেছিল?

ব্যাকুল কণ্ঠে আমরা বলে উঠলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই কি আমাদের পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে যেতে পারবি?

জবাব পেলাম, হ্যাঁ, সেইজন্যেই তো আমি এসেছি।

আশ্চর্য উত্তর, সন্দেহ নেই। তাই আবার প্রশ্ন করলাম, তুই থাকিস কোথায়, আর আমাদের গড়ে নিয়ে যেতে এসেছিস, এ কথারই বা মানে কি?

বিস্ময়ের চরমে পৌঁছে দিয়ে কিশোর জানাল, তার বাস এখান থেকে অনেক দূরের এক গাঁয়ে। কাল রাতে সে স্বপ্নে দেখেছে, গড়ে যাবার রাস্তা হারিয়ে এই গভীর বনে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাই সে এসেছে আমাদের সেখানে পৌঁছে দিতে।

লোকচরিত্রে আমার যদি কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা থাকে তবে বলতে পারি, সেই সাঁওতাল তরুণ সেদিন সম্পূর্ণ সত্য কথাই বলেছিল। ব্যাপারটি কাকতালীয় কিনা তা নিয়ে পরে অনেক ভেবেছি, কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, সেই মুহূর্তে আমার অবিশ্বাসী মনের সকল দ্বিধা ঘুচে গিয়েছিল, সবল প্রতিরোধ চূর্ণ হয়ে ধুলায় লুটিয়ে পড়েছিল।

নতুন পথপ্রদর্শকের সাহায্যে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা শ্যামারূপার গড়ে পৌঁছে গেলাম। সেখানে ঝরণার শীতল জলের স্পর্শ আমাদের দেহমনকে অচিরেই সুস্থ করে তুলল।

শ্যামারূপার আদি মন্দির আজ নেই। নেই দেবীর সেই বিখ্যাত স্বর্ণবিগ্রহ। হতশ্রী মন্দিরে বর্তমান বিগ্রহের মধ্যে তাঁর অতীত ঐশ্বর্যের কোন চিহ্নই মিলবে না। কিন্তু তবু তিনি রয়েছেন, সেনপাহাড়ি, কেন্দুবিল্ব অঞ্চলের শত সহস্র ভক্তের মনের মধ্যে। দূর গ্রাম থেকে পূজারী এসে নিত্যই মায়ের পূজো সেরে আবার দুপুরের আগেই ফিরে যান।

গভীর জঙ্গল ও বাঁশের বনের ভিতর দিয়ে ঐ সাঁওতাল কিশোরই আমাদের গড়ের

দেবী শ্যামারূপা

ধ্বংসাবশেষগুলো দেখাল। নতুবা আমাদের সাধ্য ছিল না সেগুলি খুঁজে বার করি।

এই ধ্বংসস্তূপ দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু এরই মাঝে লুকিয়ে আছে যে ইতিহাসের উপাদান তা অবশ্যই উপেক্ষণীয় নয়।

(৩)

যে সামান্য উপকরণের উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিকগণ শ্যামারূপার গড়ের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন তার মধ্যে স্থানীয় কিংবদন্তী এবং কবি ঘনরাম রচিত 'শ্রীধর্মমঙ্গল'ই প্রধান। শ্রীধর্মমঙ্গল ইতিহাস নয়, কাব্য। অতএব শ্যামারূপার গড়ের এই ইতিহাস বহুলাংশেই অনুমানভিত্তিক বলা চলে। তথাপি কিংবদন্তী ও কাব্যের ক্ষীণ সূত্র ধরে গড়ের যতটুকু অতীত ইতিহাস বর্তমানের গোচরীভূত হয়েছে, তা বাঙ্গালীর অতীত শৌর্যের এক অনুপম চিত্র এবং সে কারণেই উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলবার আগে গড় ও দেউলের প্রাচীনত্ব, তথা লাউসেন ও ইছাই ঘোষের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যে বিভিন্ন মতামত প্রচলিত আছে, তারই সংক্ষেপ উল্লেখ করব।

শ্রীঅশোক মিত্র আই সি এস মহাশয় District Hand-book—Burdwan (1953)-এ এই দেউল সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন:

"Gorangapur—a village in the Asansol sub-division situated on the Ajay in paragana Senpahari ..... The village contains a beautifully built brick temple, a landmark for miles far and wide, still in fine preservation though deserted, and evidently more than two hundred years old. The building is known as the temple of Ichhay Ghosh and tradition says that Ichhay Ghose was a devout person, who constructed the temple in honour of the goddess Bhagabati. He is said to have been killed in the battle by a Raja called Lau Sen who according to tradition was a descendant of Ballal Sen, the King of Bengal. It is very probable however that this supposed Lau Sen is no other than the Burdwan Raja Chitra Sen Rai, who conquered Gopbhum in the

ধ্বংসস্তূপের পাশে ছোট সাঁওতাল বালক

middle of the 18th Century. Close to Gorangapur, on a small table land overlooking the Ajay, on the very confine of Birbhum and Panchet (Shergarh), stands the fort constructed by Chitra Sen Rai to over awe Gopbhum and Senpahari . . . . ."

দেউলের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে প্রশ্বেয় মিত্রের সংগে একমত হয়েও লাউসেনকে চিত্রসেন ভেবে নিতে আমাদের আপত্তি আছে। বর্ধমানরাজ চিত্রসেনের রাজত্বকালের (১৭৪০-৪৪) বহু পূর্ব থেকেই গড় সেনপাহাড়ি ও শ্যামারূপার গড়ের উল্লেখ আমরা পেয়েছি। এ বিষয়ে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ধমান অধিবেশনে মহারাজকুমার মহিমারঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর অভিভাষণে বলেছেন:

'কিঞ্চিন্ন্যুন প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে পালবংশীয় গৌড়েশ্বরগণের সেন উপাধিধারী সামন্তরাজগণ শ্যামারূপার গড়ের অধিশ্বর ছিলেন। ইহার অপর নাম ত্রিষষ্ঠীগড় ও ঢেকুর। সেন রাজগণের অধিকৃত ও পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকায় 'গড় সেনপাহাড়ি' নামেও অভিহিত হইত। গড়ের নামানুসারে অজয়ের উভয় তটবর্তী কিয়দংশ ভূভাগ সেনপাহাড়ি পরগনা নামে বিখ্যাত হইয়াছে।'

এই গড়ের নামাকরণ সম্বন্ধে মহারাজকুমারের মন্তব্য বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন, "শ্যামারূপা নাম সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। নামটি একটু অদ্ভুতরকমের হইলেও ইহার মধ্যে একটি অর্থসংগতি থাকা বিশেষ সম্ভব, এই অনুমানেই তাহা বিবৃত করিতেছি।

"খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিরচিত বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতা হইতে পৌণ্ড্র, বঙ্গ, উপবঙ্গ, সমতট, বর্ধমান, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, বঙ্গদেশের এই কয় বিভাগের নাম প্রাপ্ত হইতেছি। এখন অন্বেষণ করিতে হইবে, 'সুহ্ম' বলিতে কোন স্থানকে বুঝাইত? অজয়ের উভয় তটভূভাগই তো রাঢ়ের অন্তর্গত, রাঢ়দেশ সুহ্ম হইলে ইহারই মধ্যে তাহার রাজধানী থাকিবে। আমাদের মনে হয় শ্যামারূপার গড়ই সুহ্মের রাজধানী ছিল এবং কর্ণসেন লাউসেন প্রভৃতি হর্ষবর্ণিত দেবসেন বা তদ্-ভ্রাতাদেরই বংশসম্ভূত। সুহ্মাধিষ্ঠাত্রী দেবী সুহ্মারূপাই কালে শ্যামারূপা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তদনুসারে গড়ও শ্যামারূপার গড় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।"

গড় সেনপাহাড়ি সম্বন্ধে আলমগীর বাদশাহের একটি ফরমান উল্লেখ করে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বর্ধমান রাজবংশানুচরিত' গ্রন্থে লিখেছেন—

"(আবুলজাফর মহী-অদ্দিন আলমগীর বাদশা গাজী) মোহরাঙ্কিত। বাবুরায়ের পৌত্র কৃষ্ণরাম রায়কে বর্ধমান ওগয়রহ পরগনা জমিদারি, সেনপাহাড়ি গড় এবং চৌধুরাই খেতাব দেওয়া গেল ইত্যাদি।"

গড়ের ইতিহাস সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় আরো লিখেছেন—

"পশ্চিমে অজয় নদ ও অপর তিন দিকে গভীর পরিখাবেষ্টিত সেনপাহাড়ি গড় সুদৃঢ় ক্ষুদ্র দুর্গ। কথিত আছে, শ্রীধর্মমঙ্গলোক্ত ইছাই ঘোষ উক্ত দুর্গ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে শ্যামরূপা নামে একটি দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতঃ উহার নাম শ্যামরূপার গড় রাখেন। কৃষ্ণরাম রায়ের বংশধর রাজা চিত্রসেন রায় দুর্দান্ত মারহাট্টা দস্যুদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য উক্ত সুদৃঢ় দুর্গেই অনেক সময় অবস্থিতি করিতেন, অদ্যাবধি (পারসী
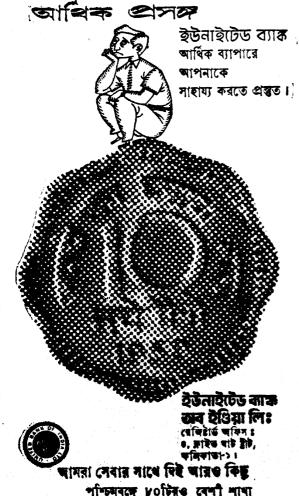
অক্ষরে) তাঁহার নাম খোদিত কয়েকটি কামান তথায় বর্তমান আছে। কৃষ্ণরাম রায়ই প্রথমে বাদশাহের নিকট হইতে উক্ত দুর্গ ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

অতএব আমরা প্রমাণ পাচ্ছি যে, সেনপাহাড়ি গড়ের অস্তিত্ব রাজা চিত্রসেনের আমলের বহু পূর্ব থেকেই ছিল. তিনি এটি নির্মাণ করেন নি। তবে গোপভূমের যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে এবং মারাঠা বর্গীদের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য তাঁকে প্রায়ই গড়ে গিয়ে বাস করতে হতো। হয়ত এজন্য তিনি গড়ের আমলে সংস্কার করেছিলেন। বস্তুত চিত্রসেন মাত্র চার বছর রাজত্ব করেছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ একটি দুর্গ নির্মাণ অসম্ভব না হলেও কষ্টসাধ্য। তা ছাড়া, এই দুর্গ তাঁর আমলে নির্মিত হলে দুর্গের অপর নাম 'ঢেকুরের' কোন সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

উপরের সিদ্ধান্ত থেকে এ কথা অনুমান করা চলতে পারে যে, ইছাই ঘোষের দেউল বর্তমান স্থানেই ছিল এবং চিত্রসেন গড়ের সংস্কারকালে এই দেউলেরও আমূল সংস্কার করেছিলেন। কারণ, গড়ের অনতিদূরে একটি ভগ্ন দেউলের অস্তিত্ব অবশ্যই তাঁর সম্মানের পরিপন্থী ছিল। এ কথা মেনে নিলে ইছাই ঘোষের প্রাচীনত্ব এবং তাঁর দেউলের অপেক্ষাকৃত আধুনিকতার একটা বিশ্বাসযোগ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

ইছাই ঘোষ সম্ভবত গৌড়েশ্বর ত্রিভুবন পালের সমসাময়িক ছিলেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক অবশ্য তাঁকে প্রথম মহীপালের সমকালীন বলে অনুমান করেন। কিন্তু তা সম্ভব বলে মনে হয় না; কারণ, রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়গিরি লিপিতে ইছাই ঘোষের কোন উল্লেখ নেই।

সেনপাহাড়ি অঞ্চলের 'লোহাটার পুরীর' (বর্তমান নাম লোয়াগড়ি) 'সরকার' উপাধিধারী কায়স্থগণ বলেন, তাঁদের পূর্বপুরুষ রাধানাথ সরকার গৌড়েশ্বরের শ্যালক মহাম্মদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে গৌড় থেকে পালিয়ে এসে ইছাই ঘোষের আশ্রয় নেন। রাধানাথের কাছ থেকে ইছাই গৌড়ের অনেক গুপ্তরহস্য অবগত হন। বিনিময়ে তিনি তাঁকে কিছু জায়গীর দান করেন এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন সেনাপতি লোহাটা বজ্জরের হাতে। সরকারেরা প্রায় ২৫ পুরুষ ধরে লোয়াগড়িতে বসবাস করছেন। এ থেকেও ইছাই ঘোষের রাজত্বকাল সম্বন্ধে মোটামুটি একটা অনুমান করা চলে।

(৪)

গড় সেনপাহাড়ির অতীত ইতিহাসের যে সামান্য উপজীব্যের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, তা থেকে এই অনুমান করা চলে যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত গৌড়েশ্বরের অধীনে 'কনকসেন', 'কর্ণসেন', 'লবসেন বা লাউসেন' এবং 'চিত্রসেন' এই চারজন সামন্তরাজ সেনপাহাড়িতে রাজত্ব করেছিলেন।

নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গোপভূমে সোম ঘোষ নামে গোপ বংশীয় এক পরাক্রমশালী জননায়কের আবির্ভাব হয়। গৌড়েশ্বরের শ্যালক স্বেচ্ছাচারী মহাম্মদ স্বাধীনতাকামী এই সোম ঘোষকে বন্দী করে অপমানিত করেন। পরে অবশ্য গৌড়েশ্বরের আদেশে মহাম্মদ তাঁকে মুক্ত করে দিতে বাধ্য হন।

সোম ঘোষের পর তাঁর পুত্র ইছাই ঘোষ অধিকতর তেজস্বী, শক্তিমান ও স্বাধীনচেতা নেতারূপে দেখা দিলেন। তিনি গড়ে তুললেন সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেদের নিয়ে এক শক্তিশালী বাঙালী সেনাদল এবং তাদেরই সাহায্যে পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে গৌড়েশ্বরের সামন্তরাজ কর্ণসেনকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করে নিজেই ত্রিষষ্ঠীগড়ের রাজা হয়ে বসলেন। তিনি এই গড়ের নতুন নামাকরণ করলেন 'ঢেকুর'। 'ঢেকা' মেরে কর্ণসেনকে তাড়িয়েছিলেন বলে গড়ের নাম ঢেকুর হয়েছিল, এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

বিতাড়িত কর্ণসেন অগত্যা গৌড়েশ্বরের আশ্রয় নিলেন। কর্ণসেনের পত্নী ত্রিভুবনপালের শ্যালিকা ছিলেন।

কালক্রমে কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন এক অমিত বিক্রমশালী যোদ্ধা হয়ে উঠলেন এবং পিতৃরাজ্য উদ্ধার করতে গৌড়েশ্বরের বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইছাইকে আক্রমণ করলেন।

লাউসেন তালাও-এর ধারে ভীষণ যুদ্ধের পর লাউসেনের হাতে ইছাই ঘোষ নিহত হলেন। প্রভুকে রক্ষা করতে গিয়ে ইছাই-এর সেনাপতি লোহাটা বজ্জরও লাউসেনের সেনাপতি কালুবীরের হাতে প্রাণ হারান। কিংবদন্তী এই যে, ভক্ত ইছাইকে দেবী শ্যামারূপা যুদ্ধযাত্রা করতে বারণ করে বলেছিলেন,

> 'শনিবার সপ্তমী
> সম্মুখে বার বেলা
> আজি রণে যেও না রে
> ইছাই গোয়ালা।'

ইছাই সে নিষেধ শোনেন নি। ছড়াটি আজো এই অঞ্চলের লোকমুখে শুনতে পাওয়া যায়।

তারা আরো বলে, ১৩ই বৈশাখ এই যুদ্ধ হয়েছিল, কিন্তু সে কোন সালের ১৩ই বৈশাখ, ইতিহাস এ সম্বন্ধে নীরব।

সংসদের যুক্ত অধিবেশনে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন যে ভাষণ দেন উহার সম্পর্কে বিরোধী সদস্যেরা বলেন—তাঁহার ভাষণে সরকারী নীতির

কোন সুস্পষ্ট চিত্র নাই।—"চিত্র আছে বইকি, কিন্তু সেটা 'স্টাইলাইজ' বলে সবাই ধরতে পারেন নি"—বলেন বিশুখুড়ো

রাষ্ট্রপতি তাঁহার ভাষণে মন্তব্য করেন, ভারতের জনসংখ্যা ৫০ কোটি ছাড়াইয়া গিয়াছে, ইহা একটি বিপদ সঙ্কেত. এই সংকেত উপেক্ষা করার অর্থ নিজেদের ধ্বংস ডাকিয়া আনা।—"মন্ত্রীদের সংখ্যা কতটা বেড়েছে এবং বেড়ে থাকলে সেটা বিপজ্জনক কিনা তেমন কোন মন্তব্য অবশ্য তাঁর ভাষণে নেই"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ (ফ-ব) বলেন, কংগ্রেসের উচিত যুক্তফ্রন্ট কোয়ালিশন সরকারের সঙ্গে যোগ দেওয়া. উহাতে গণতন্ত্রের পথ সুগম হইবে।—"পথ সুগমের আগে 'গমের' কথাটাই আমরা আগে ভাবছি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সমস্যার কথাটা কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সহযাত্রী বলিলেন "শ্রীজগজীবন রামের বিবেচনায় অবস্থা কী দাঁড়াবে বলতে পারছিনে: তবে আমরা শুধু বলতে পারি. খেতে না পেলে আমাদের অবস্থা যা—দাঁড়াবে তা হলো—রাম নাম সত্ হ্যায়!!"

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নবাগত কতিপয় সদস্য "বন্ধুগণ" বলিয়া সম্বোধন করিলে স্পীকার শ্রীবিজয় ব্যানার্জি মহাশয়কে নাকি স্মরণ করাইয়া দিতে হইয়াছে—আমায় সম্বোধন করুন, এখানে বন্ধু কেহ নাই।—"এটা হলো সভার নিয়মানুগ প্রশ্ন, ভাবগত অর্থেও বন্ধু এখানে বিরল, অত্যাগসহন ব্যক্তির সংখ্যা এখানে কি খুব বেশি"—বলে শ্যামলাল।

সংবাদে প্রকাশ, যুক্তফ্রণ্ট সরকারের জনৈক মন্ত্রী মহাশয় নাকি বলিয়াছেন,—লোকেও কাজ চান, আমরাও কাজ করিতে চাই। কিন্তু দুই সপ্তাহ ধরিয়া যেভাবে সম্বর্ধনা ও মালা দেওয়া হইতেছে এইবার তা বন্ধ হওয়া দরকার—আগে কিছু কাজ করি। খুড়ো বলিলেন—"অতি অপূর্ব কথাটি বলেছেন তিনি। কিন্তু বলে লাভ কী, মন্ত্রী মশাই নিশ্চয়ই জানেন সেই আপ্ত বাক্যটি......প্রকোপায় ন শান্তয়ে!!"

সরকারী কর্মচারীদের বেতন এবং ভাতা বৃদ্ধি প্রসঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয় নাকি বলিয়াছেন যে, এখন কিছু করা হইবে না, যাহা করিবার তাহা নতুন বাজেটের সময়েই করিব।—"কিল খাইয়া আইলাম দাদার ঘর, দাদা কিলায় সারা প'র (প্রহর)"—সহযাত্রী একটি পূর্ববঙ্গীয় ছড়া শুনাইলেন।

সংবাদে শুনিলাম, অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভায় ৩০জন সদস্য—এবং ৩জন মন্ত্রীও—মুণ্ডিত মস্তকে অধিবেশনে যোগদান করেন। সেখানে চিরাচরিত সংস্কার : কোন মহৎ সংকল্প গ্রহণ করিলে তিরুপি-তে

অধিষ্ঠিত দেবতা ভেঙ্কটেশ্বরের চরণে চুল ডালি দিতে হয়। সহযাত্রী বলিলেন—"দেশের অন্যান্য স্থানে মহৎ কর্ম সম্পাদনে ত্রুটি হলেই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মুণ্ডন করাতে হয়, কথায় বলে প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা, পাপী থাক যথাতথা। এবং সেদিক থেকে কর্তব্য চ্যুতির জন্য মুণ্ডন-প্রায়শ্চিত্তের পাঁতি কেহ গ্রহণ করিবেন কিনা জানিনে, করলে নেড়ায়-নেড়ায় দেশ ছেয়ে যাবে।"

শ্রীরাজাগোপালাচারী নাকি বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস হইল চিড়িয়াখানার বাঘ, লোকদের আনন্দবর্ধনের জন্যই তাকে ওখানে রাখা হইয়াছে। এবং এই কথাও নাকি তিনি বলিয়াছেন যে চিড়িয়াখানার বাঘও

হিংস্র হইয়া উঠিতে পারে, সুতরাং উহার সম্বন্ধে সতর্ক থাকাই ভাল। বিশুখুড়ো বলিলেন—"একদিন রাজাজী নিজেকেই বাঘের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, বলেছিলেন, আমি বৃদ্ধ হইলেও বাঘ। আজ তাঁরই মুখে বাঘের এই প্রসঙ্গ শুনে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম।"

কেরল হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ সেখানকার কোন এক স্থানে কনে দেখিতে গেলে বরপক্ষ মুখের আগে কনের পা দেখেন।—"তাঁরা দেখছি দেহি পদ পল্লবমুদারম-এ বিশ্বাস করেন"—বলেন সহযাত্রী।

কেরলের অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, সেখানে মাদকদ্রব্য বর্জন আইন বর্জন করার পরামর্শ কেহ কেহ দিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"আশা করব, হোয়াট কেরল থিংকস টুডে ইণ্ডিয়া উইল থিঙ্ক টুমরো!!"

একটি সংবাদ শিরোনামা—'হরিয়ানাও কংগ্রেসের হাত ছাড়া হইয়া গেল'। সহযাত্রী সংবাদটির উপর কোন মন্তব্য না করিয়া শুধু গান ধরিলেন—"সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে।"

ক্যালিফোর্নিয়াতে বিজ্ঞানীরা নাকি একটি কৃত্রিম মানুষ আবিষ্কার করিয়াছেন। সে রোগীর কাজ করিবে। তার মানবিক বৈশিষ্ট্য : শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিবে, চক্ষু পিটপিট করিবে, চোয়াল উন্মুক্ত করিবে ইত্যাদি।—"তা জানিনে, তবে 'কৃত্রিম' মানুষ আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্যের প্রয়োজন নেই, কৃত্রিমতার দিক থেকে দেশের কোন অঞ্চলই ঘাটতি অঞ্চল নয়"—মন্তব্য করেন সহযাত্রী।

"টায়কুনড" কনক চাকী
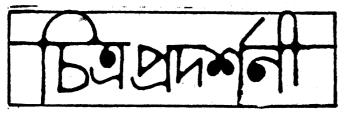
পিকাসো এবং ব্রাক, এ'রা দুজনেই তাঁদের জন্মগত ক্ষমতার বলে, অর্থাৎ তাঁদের বিশেষ রকমের প্রবণতার জন্যই, অনায়াসেই যে-কোন অবয়ব বা রঙ আবিষ্কারকেই আরোপ করতে পটু।

তাঁরা দুজনেই, আমাদের লোকপ্রসিদ্ধ প্রকৃতিতে—যা একমাত্র তাঁদেরই কাছে ধরা দেয়, তাঁদেরই আজ্ঞাবহ যারা তাকে সঠিক হুকুম করতে জানে, তাকেই তাঁদের একান্ত নিজস্ব মন্ত্রগুপ্তির দ্বারা অভ্রান্তভাবেই উদ্ঘাটিত করতে পারেন।

যে দুজনের নাম করলাম, তাঁদের ব্যাপারে সাধারণত সকলেরই একটা শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু কিউবিজমের ধ্যানসিদ্ধি প্রবর্তনা যে তাঁদের দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এমন ভাবলে অন্যায় হবে। দেখা যাবে এই সূত্র যে, বাস্তবতা সম্পর্কে যে-বোধের তাঁরা অধিকারী এবং একটা কিছু না ভেবেই যে মানবতার সুবাসকে তাঁরা উন্মোচিত করেছেন—তা শুধু তাঁদের নিজেদের সামনে রেখে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

তাঁদের সৃষ্টিক্ষম মানস যাতে করে পুরোপুরি উদ্দীপ্ত হতে পারে, তার জন্য বাইরেটা নিয়ে তাঁরা কোন প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন মনে করেননি। যতটা তাঁরা চোখ খোলা রেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, ঠিক ততখানিই তাঁরা হয়েছেন চোখ বন্ধ করে।

বিশেষ ক্ষমতার অধিকার তাঁদের এই জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, আর আর প্রবর্তকদের মতই, তাঁদেরও অন্যান্য চিত্রকরদের থেকে আলাদা করে ফেলেছে।

তাঁদের কাছ থেকে বেশ কিছু দূরে, তাঁদের ডাইনে ও বামে আরও দুটি শ্রেণীর, ধরনের চিত্রকরদের কথাও ধরা যেতে পারে। প্রথমত, তাঁদের বামে যাঁদের ধরা যায়, তাঁরা হলেন গিইয়ম আপোলাইনের নামকরণে—ওর্ফিসং, যাঁরা কোন কিছুই বাস্তব বলে দেখেন না, যাঁরা স্বাভাবিকভাবে কোন কিছুই, এতটুকুও মনুষ্য প্রকৃতি অনুযায়ী করতে আকাঙ্ক্ষা করেন না।

তাঁদের বিষয়ে, তাঁদের উদ্দেশ্য কোন-মতেই খর্ব করা হবে বলে আমার মনে হয় না, যদি বলি যে, তাঁদের চিত্রসত্তা নিখুঁত ডাইনামিক, তা ছাড়া খানিক সংগীত-ধর্মী। এ'দের মধ্যে আছেন, লেজে (লেজের) প্লোইজ ও দ্যলোনেই। এই চিত্রকররা সকলে নিখাদ রঙ ব্যবহার করেন, এ'রা যান্ত্রিক ছন্দকে স্বীকার করেন। ছবির সমস্ত কিছু বস্তু বা অংশ দিয়ে এ'রা একটা নিজস্ব দুর্ভেদ্য রাজ্য গড়তে যা সৃষ্টি করতে চান, যেটা নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।

প্রগ্রেসিভ পেইন্টারস-এর চিত্রপ্রদর্শনী: আর্টিস্ট্রী হাউস

এবার প্রগ্রেসিভ গোষ্ঠীর সভ্যদের অনেক পরিবর্তন দেখলাম। এ'দের মধ্যে তিনজন, যথা দিলীপ কুণ্ডু, গোপা চ্যাটার্জি এবং উজ্জ্বল দাস নিজেদের ধরনেই যথেষ্ট মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আর দুজন অরুণ দত্ত ও কনক চাকী হাত ভাল হওয়া সত্ত্বেও খানিক সংকল্পবিহীন, আর শুভেন্দু নন্দী এখনও ভরসা পাচ্ছেন না বলা যায়।

অরুণ দত্তর ছয়টি ছবি ছিল। এ'র অযথা কালো রঙের ব্যবহার দেখে স্পষ্টতই মনে হয়, ইনি অনেক ক্ষেত্রে আর ভাবতে চাননি, অথচ অবয়বের গঠনের দিকে তাঁর মন যে আছে, তা বোঝা যায়। এ ছাড়া দুয়েক স্থানে রঙের বর্ণনা তিনি

[illegible] করেছেনও, কিন্তু আবার কোথাও শুধু সামঞ্জস্য রাখার জন্য কতক ফোঁটা লাগান, যাতে স্পষ্টতই প্রমাণ হয় আলোর ক্রিয়া নয়। অথচ অনায়াসে এগুলি এড়াতে পারতেন, সম্ভবত ইনি তাড়াহুড়া করার জন্য ভালভাবে সব কিছু বিচার করে দেখতে পারেননি। তবু তাঁর নং ১ ও ৭ মনোজ্ঞ।

আগেই বলেছি, দিলীপ কুণ্ডুর কাজ অনেক পরিচ্ছন্ন হয়েছে। তাঁর কাজে রৌদ্র পরিদৃশ্যমান; যে-তত্ত্ব অনুযায়ী ইনি তা আরোপ করেছেন, সেটা অত্যন্ত পুরাতন। এর শুদ্রের সম্পর্কে ব্যদলেয়ারও ইঙ্গিত করেন।

"কার দু ভুলো লা নুয়াঁস আংকার,
পা লা কুলার, রিয়াঁ কা লা নুয়াঁস*
....
য়ে তু দু রেসং এ লিতেরাতিউর।"

যেহেতু আমরা আগে বর্ণাভাস চাই, রঙ নয়, বর্ণাভাসের মত অন্য কি যা আছে/আর বা কিছু বাকি থাকে, তা নেহাত সাহিত্য। তবু সেই তত্ত্ব একজন হাতে-কলমে যে পরখ করে দেখছেন, এ কথা শুনলে প্রত্যেকেরই আনন্দ হবে। আমরা তাঁর ছবিতে দেখলাম রেখা-বিবর্জিত একটি সুঠাম রমণীর, এদেহ নগ্ন, রোদে যে দেহ বাংসল। ১৩নং ছবিটি রঙ বাছাইয়ে দিলীপ কুণ্ডু বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন।

গোপা চ্যাটার্জি'র ছবি ছয়টি। এখনও ইনি সোজাসুজি অবয়বধর্মী নন, তিনি যে আগে সম্পূর্ণ নিরবয়ববাদী ছিলেন, তার পরিচয় কিছু কিছু আছে। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, তাঁর নিজের কাজের মধ্যে অনেক সরলতা দেখা দিয়েছে। রঙ পছন্দে মাত্র এক জায়গায় তিনি একটু বেশি দূরে গেছেন, না হলে প্রায় ক্ষেত্রে সংযম বর্তমান। ১৭ ও ১৮নং ছবি অনেকেরই ভাল লাগবে।

কনক চাকীর ছবি সাতটি। কনক চাকীর হাত ভাল, কিন্তু একাধিক মাধ্যমে তিনি যে কিছুটা অস্থির, তা বোঝা যায়। এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে ঐ মোম ইত্যাদির কৌশল ছেড়ে তাঁর তেলরঙই ভাল; যেটা তিনি ঐ মাধ্যমে করতে চাইছেন, সেটা সাধারণভাবে করতে পারলে আরও ভাল হয়, কেননা তাঁর নিজের বর্ণিকাভঙ্গে টেকসচার আনার মত ক্ষমতা আছে। তাঁর ২২নং ছবিটি উল্লেখ করা যায়।

শুভেন্দু নন্দীর মাত্র তিনটি ছবি। ইনি নিজের সীমা ছাড়াতে কোথাও চেষ্টাই করেননি, সাধারণভাবে ছবি শেষ করেছেন। তাঁর ৩০নং ছবিটি তাঁর কাজ হিসাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উজ্জ্বল দাসের ছবি ছয়টি। এঁর যা কিছু বিষয়বস্তু দিয়ে ছবি গঠন করার দিকে ঝোঁক খুব সহজেই লোকের চোখে পড়বে, প্রায়গুলি এক-একটি গল্প, অবশ্য গ্রন্থচিত্রণ যে এমন নয় এবং তা হতে দেননি যেহেতু তাঁর নিজস্ব একটি রীতি আছে। সমস্ত বিষয়ের মধ্যে কেয়ারির প্রবণতা আছে সত্য, তবু ছবিগুলি বেশ অবিকলবাদী নয়নসুখকর। যথা ৩৩ ও ৩৪নং। ইনি যদি রঙ সম্পর্কে একটু স্বাধীনতা নিতেন, তা হলে বড় ভাল হত অর্থাৎ আর একটু আলো চাই।

* (প্রকাশ থাকে, নুয়াঁস অর্থে আলোছায়ার তারতম্য অবস্থা, অর্থাৎ টোন)।

ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু

কেউ যদি অত্যন্ত আপন হয়, তার সম্বন্ধে লিখতে গেলে মনে হয় তাকে আপন বলেই জেনেছি কিন্তু আর কোনও সম্বন্ধ সত্যিই সবটা জানা নেই। মৈত্রেয়ী বসুর বেলায় আমার ঠিক তাই মনে হয়েছে। ডাঃ বসু ডাক্তার হিসাবে, রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে স্বনামধন্যা অথচ আত্মীয়ের মত নিকট বলে, নিজের জন বলে জেনেছি, ভেবে দেখিনি আমার সেই আপন জনের অন্য দিকটা আরও অনেকের জানবার মত। কাজেই যতটুকু খবর পেয়েছি ততটুকুই বলতে চাই।

ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু এবারের নির্বাচনে দার্জিলিং থেকে লোকসভায় মনোনীত হয়েছেন। সারা জীবন কংগ্রেসকর্মী হিসাবে কাজ করেছেন তবে নির্বাচনের আগেই কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

ডাঃ বসু ১৯২৯ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম বি পাশ করেছিলেন। প্যাথলজিতে তাঁর অনার্স ছিল এবং সার্জারিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। পরীক্ষার ফল বের হবার আগেই চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। সেবাসদনে কাজ করবার সময়ই জার্মানীর ডয়েচে একাডেমির এক্সচেঞ্জ পরিকল্পনায় মিউনিকে উন্নততর চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য যান। ১৯৩৩ সালে ডক্টরেট অফ্ মেডিসিন পান। সে সময় কজন ভারতীয় মেয়ের এত উচ্চ সম্মান লাভ হয়েছিল তা হাতে গুণে বলা যেত। চিকিৎসক হিসাবে ডাঃ মৈত্রেয়ী বসুর নাম অল্পদিনেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল, আজকাল যেখানে নীলরতন সরকার হাসপাতাল তাঁকে শিশু চিকিৎসার ভার দেয়। বস্তুত ডাঃ মৈত্রেয়ী বসুর হাতেই তদানীন্তন ক্যাম্পবেল হাসপাতালের শিশু বিভাগটি গড়ে ওঠে। এর পরে রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানে এক বছর তিনি সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। কিন্তু '৪২ সালের "ভারত ছাড়" আন্দোলনে তিনি সুনাম, প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি অর্থ সব সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে বিলিয়ে দেন। সেদিন থেকে আজকের মৈত্রেয়ী বসুর কর্মজীবনের বর্তমান অধ্যায়ের সূত্রপাত। আন্দোলনের কর্মীর শাস্তি হিসাবে '৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁকে কিছুদিনের জন্য গৃহবন্দী বা home interned রাখা হয়েছিল। ডাঃ বসুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম

ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু

রাজনীতি আর চিকিৎসা কেন একসঙ্গে করেন নি। আমাদের দেশের রাজনীতিতে বহু চিকিৎসকই তো তাই করেছেন। ডাঃ বসু বলেছিলেন "আমার যে দিকে যখন ঝোঁক যায়, আমার মন সম্পূর্ণভাবে সেখানে আবিষ্ট হ'য়ে থাকে। তবে চিকিৎসা করেছি বই কি। পুরোনো রোগী এসে দাঁড়ালে হয়তো ফিরিয়ে দিতে পারি নি। কিন্তু নিয়মিত ডাক্তারী আর হয়নি।"

'৫২ সালের নির্বাচনে লোকসভার প্রার্থী হিসাবে তিনি সফলতা লাভ করতে পারেন নি কিন্তু '৫৪ সালের বাই-ইলেকশনে কাঁচড়াপাড়ার বীজপুর কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় মনোনীত হয়েছিলেন। '৫৭ ও '৬২ সালে বিধানসভায় ফোর্ট নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় মনোনীত হন। ফোর্ট কেন্দ্র কলকাতার পোর্ট এবং ডক এলাকা নিয়ে। মৈত্রেয়ী বসু ট্রেড ইউনিয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এখানেও সেই একরোখা ঝোঁকের কথা ওঠে। ডাঃ বসু আজকের রাজনৈতিক জগতে ট্রেড ইউনিয়নের বিশিষ্ট কর্মী হিসাবে গণ্য। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেকেই ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, বিশেষত বামপন্থীদের মধ্যে। এবারে লোকসভায় অনেক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এসেছেন। তাঁরা একেও একটা trend বা প্রবণতা বলতে চান। কংগ্রেস বিরোধিতার মত এও একটি লক্ষণ। শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু সর্বান্তঃকরণে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং সারা ভারতে তিনি একমাত্র মহিলা যিনি ট্রেড ইউনিয়নের মত ঘোরালো রাজনীতির প্রাঙ্গণে এতটা মর্যাদা অর্জন করেছেন। মালিক-শ্রমিক-সরকার ত্রিকোণ মীমাংসা ক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে যা দেখেছেন মেয়ে-শ্রমিকের ব্যাপারে সেকথা ওঠায় শ্রীমতী বসু বললেন আমাদের দেশে শুধুমাত্র মেয়েদের ট্রেডইউনিয়ন কোথাও নেই। তবে মেয়েদের জন্য আলাদা সেক্‌শন কোথাও কোথাও আছে। মহিলা শ্রমিকের জন্য আইনে যা কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি রাখা ঐ সেক্‌শনের কাজ। আমাদের দেশের মেয়েরা সাধারণত লাজুক প্রকৃতির। কাজেই হয়তো আলাদা করে নিজেদের দাবি সামলানো তাদের পক্ষে কঠিন কাজ হ'তো।

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু বিশিষ্ট ট্রেড্ ইউনিয়ন কর্মী হিসাবে ১৯৪৯ ও ১৯৫৬ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার কমিটি মিটিংএ উপস্থিত হবার জন্য জেনিভা যান। ১৯৫১ সালে ঐ সংস্থার সাধারণ অধিবেশনে গিয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালে ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা ICFTU-র অধিবেশনে ভিয়েনা এবং মিউনিকে গিয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে পরমাণু বোমা বিরোধী সম্মেলনের বৈঠকে জাপানে উপস্থিত ছিলেন।

ডাঃ বসুর ১৯৩৭ সালে বিখ্যাত স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ স্বদেশ বোস-এর সঙ্গে বিবাহ হয়। ডাঃ বসুর পিতা সে যুগে বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ছিলেন। গিরিধির যে বাঙ্গালী উপনিবেশ উত্তর কালে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে মস্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল তার পত্তন বলতে গেলে শশীভূষণ বসুর হাতে। ডাঃ নীলরতন সরকার সত্যানন্দ বসু ও শশীভূষণ বসু গিরিধির শালবনে, উস্ত্রী নদীর প্রাণ জুড়োনো পরিবেশে বাঙ্গালীর কৃষ্টিকে নূতন পারিপার্শ্বিক দিয়েছিলেন। সে কৃষ্টি পরে অভ্র খনির অর্থগর্বে ধনী ব্যবসায়ীর হাতে কিছু খর্ব হয়েছিল সত্য কিন্তু তার অঞ্জলিভরা দানও উপেক্ষা করবার নয়। ডাঃ মৈত্রেয়ী বসুই তার প্রমাণ। ডাঃ বসুর 'রাঙ্গাদি' শ্রীমতী সুজাতা রায়ও বাংলার মহিলা সমাজের গৌরব। তিনি বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও নিঃস্বার্থ সমাজসেবী।

শিক্ষা, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও মাতা পিতার [illegible]

কয়েক বছর আগে একটি জাতীয় সংস্থা রূপে National Parent Teacher association-এর পত্তন হ'য়েছে। এই সংস্থা সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজখবর নিয়ে আবার আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে। এই সংস্থা সংঘবদ্ধভাবে সারা ভারতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাতা-পিতা বা অভিভাবকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছেন। এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের বহু স্থানে শাখাও পত্তন করা হ'য়েছে। পূর্ব ভারতে বা কলকাতার শাখা স্থাপন করার চেষ্টা চলছে। সংস্থার অংশ হিসাবে না হ'লেও যেখানেই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন সেখানে ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ যোগা-যোগের জন্য আয়োজনের অভাব নেই। এই যোগাযোগ আজকের সমস্যাবহুল জগতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। পিতা-মাতা সন্তানের সুস্থ ভবিষ্যতের জন্য সক্রিয় ভাবে শিক্ষাসংস্থার সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অংশ গ্রহণ করবেন তবেই না আগামীদিনের ভারতবর্ষে বিশৃংখল ও ব্যর্থজীবন নারী-পুরুষের সংখ্যা কমে অসবে। এই বিষয়টি সম্বন্ধে কিছুদিন আগে ডাঃ ভি. কে. আর. ভি রাও একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। হায়দরাবাদে জাতীয় Parent Teacher Convention-এর সভাপতিত্ব করেছিলেন ডাঃ রাও। সেই সভাতেই ভাষণটি দেন। ভাষণটির মধ্যে দু একটি কথা মাতা পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। আজ কর্মব্যস্ত পিতার চেয়েও মাতার দায়িত্ব সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য বেশী হয়েছে। মায়েদের তাই যোগাযোগ [illegible] বিদ্যালয় ও গৃহ-দুয়ের সহযোগিতায় ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ সার্থক করা সহজ। দুয়েরই লক্ষ্য এক।

প্রথম কথাই হচ্ছে সহযোগিতার প্রয়োজন সম্বন্ধে কারও মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নিশ্চয়ই নেই, কিন্তু কার্যকরী সহ-যোগিতার কথা ক'জন ভাবেন? এমন কি কতগুলি সাধারণ ব্যাপারেও আমরা বিশেষ অমনোযোগী। বহু মাতা পিতা অন্য ছেলে-মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলে-মেয়েকে তুলনা করে তাকে সচেষ্ট ও সচেতন করে তুলতে চান। অমুকের ছেলে ক্লাসে এত ভাল ফল দেখিয়েছে, আর তুমি? লজ্জার কথা! এতে কি শিশু বা কিশোরের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে না? প্রতি-যোগিতার ভাব আসা দূরে থাকুক মন তাতে দমে যায়। সমালোচনা করা বা নিন্দা করার চেয়ে মাতা পিতা বা অভিভাবকের সন্তানের কোথায় অসুবিধা, কেন সে আশানুরূপ এগিয়ে যেতে পারছে না একথা জানা দরকার। শিক্ষকের বেলায়ও তাই।

মাতা পিতা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপ বা কর্মতৎপরতায় আগ্রহ প্রকাশ করলে বা অংশ গ্রহণ করলে ছেলেমেয়েরা বিশেষ উৎসাহিত হয়। এমন কি বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা বা যোগাযোগ রক্ষা করাতেও মাতা পিতা সন্তানের শিক্ষাজীবনে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। তার কোথায় কি অসুবিধা সম্যক উপলব্ধি করারও এই উপায়। বিদেশে বহু মহিলা সংস্থা আছে যাঁরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে গিয়ে দেখেন কেন কোন ছেলে পড়াশুনোয় উদাসী, কেন বা কেউ কলহপরায়ণ, আবার কেনই বা একজন ভীরু আর লাজুক। সব সময় সব খবর শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর কাছে পাওয়া যায় না। তখন তাঁদের কেউ শিশু বা কিশোর কিশোরীর গৃহ ও পারি-পার্শ্বিক সম্বন্ধে সন্ধান নেবার চেষ্টা করেন। দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই পারি-পার্শ্বিক বা পরিস্থিতির দরুন ছেলে-মেয়েদের মনের জটিলতা নানাভাবে প্রকাশ পায়। নিয়ত কলহপরায়ণ পিতামাতার সন্তান হয়তো তার অবচেতন মনের প্রতিবাদ প্রকাশ করে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম উপেক্ষা করে। হয়তো বা দরিদ্র সংসারের অবহেলায় মানুষ হওয়া শিশু হ'য়ে ওঠে দুরন্ত, দুর্নিবার। আর ছোট্ট মনের সমাজদ্রোহিতা ছড়িয়ে যায় তার দৈনন্দিন ব্যবহারে। অনেক ক্ষেত্রে সন্তানের এই রূপ পিতামাতার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, তখন যদি বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে তবে হয়তো পিতামাতা অল্পবিস্তর ত্রুটি বেশী কষ্ট না করেই সংশোধন করে নিতে পারেন।

ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যাপারে অভিভাবক-এর আগ্রহ যে শুধু ছেলে বা মেয়েকে উৎসাহিত করে তা নয়। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীও এতে বিশেষ উৎসাহিত হন। তাঁদের শ্রমের মর্যাদা যে স্বীকৃত হচ্ছে সেটা সম্যক উপলব্ধি করেন। দিনকতক আগে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী বলছিলেন যে সকাল সকাল স্কুল বসালে মায়েরা হয়তো বা লক্ষই করবেন না ছেলেমেয়েরা কি খেয়ে স্কুলে গেল। কেউ বা ঘুম থেকেই উঠবেন না! কি সাংঘাতিক কথা। শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর হাতে পার করে দিতে পারলেই কি মায়ের দায়িত্ব শেষ? সন্তানের জীবন গঠনে এ যে যুক্ত দায়িত্ব। আপনারা হয়তো অনেকে একথাকে অতিশয়োক্তি মনে করবেন কিন্তু এরকম ব্যবস্থা বহু গুণে দৈনন্দিন ঘটনা। আবার শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর কাজে আগ্রহ দেখাতে গিয়ে অনেকে অধিকারের সীমানা ছাড়িয়ে যান। সেও কম দুঃখের ব্যাপার নয়। এতেও শিশু-মনের ক্ষতিই হয়। শিক্ষার মূলেই আঘাত লাগে।

শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর কাজে আগ্রহ দেখালে যেমন তাঁদের কাজে উৎসাহ আসে, পিতা-মাতা অভিভাবককেও বিদ্যালয়ের সব ব্যবস্থায় উপযুক্ত অংশের জন্য আহ্বান করলেও ঠিক সেই রকম সাড়া পাওয়া যায়। চাঁদা দিয়ে, বই খাতার খরচা বয়ে ক্লাসের মইনে গুণে পিতামাতা শুষ্ক কর্তব্য সমাপ্ত করেন কিন্তু প্রয়োজন তার চেয়ে আর একটু বেশী। মাদ্রাজে নাকি কোথায় এক স্কুলে দুপুরে ছেলেমেয়েদের খাবার ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা হয়। কিন্তু কোথায় টাকা? ঠিক হ'লো প্রত্যেক শিশু মায়ের কাছ থেকে চেয়ে আনবে একটি দেশলাই-এর বাক্সভরা চাল। তাই দিয়ে গড়া হবে তহবিল। মায়েরা উৎসাহে ভরে দিতেন ছোট্ট দেশলাই এর বাক্সটি রোজ সকালে। ক্রমশ চাষী বাপেরও চোখ পড়লো। বললেন ফসল উঠলে আমিও দেবো। বাক্সটুকু ভরে নয়, অঞ্জলি ভরা ভরা সঞ্চয়। দেখতে দেখতে সেই গ্রামের স্কুলের ছেলেমেয়ে ভালকরে দুপুরে রোজ খেয়ে পড়ায় বেশী মনোযোগী হ'য়ে উঠলো। খেলার মাঠে, আনন্দে হাসিতে তারা হ'য়ে উঠলো ভরপুর। এ শুধু তণ্ডুল দানের কথা নয়। সবাই যে অংশ গ্রহণ করেছে সেই আনন্দ ধারার প্রত্যক্ষ ফল। বাপমা, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, ছেলে-মেয়ে সবাই মিলে একই উদ্দেশ্যে এক হ'তে পারলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয়ের অনেকটাই হয়তো সমাধান হবে। বিশেষ করে শিশু ও কিশোর জীবনে এর একান্ত প্রয়োজন আছে।

শ্রীমতী

অন্তর্বর্তী বাজেট
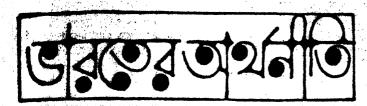
আগামী হিসাবের বছরে প্রথম চার মাসের জন্য আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ অন্তর্বর্তী বাজেটে পেশ করা হয়েছে। এতে করের কোনো পরিবর্তন অথবা নতুন কোনো প্রস্তাব করা হয়নি। বর্তমান বছরের ৩৫০ কোটি টাকার মতো বড়ো রকমের ঘাটতি দূর করার জন্য অতিরিক্ত কর আরোপ করা হবে কি না, সেটা জানা যাবে ১৯৬৭-৬৮ সালের চূড়ান্ত বাজেট উপস্থাপিত হলে।

ঘাটতি বৃদ্ধির কারণ

বাজেটের সংশোধিত হিসাব অনুসারে বর্তমান আয়-ব্যয় বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের ৩৫০ কোটি টাকা ঘাটতি দেখা দেবে। বর্তমান করের হারে আগামী বছর রাজস্ব সংগৃহীত হবে ৩,০৭১ কোটি টাকা, যা বর্তমান বছরের সংশোধিত নির্ণয়ের চাইতে ২১৪ কোটি টাকা বেশী। রাজস্বের এই উন্নতি আশা করা হয়েছে প্রধানত আমদানি বৃদ্ধি এবং শিল্প-উৎপাদনের সম্প্রসারণের সম্ভাবনা থেকে। বর্তমান বছরে আমদানির বহর কমে যাওয়ায় আমদানি শুল্ক থেকে আয় হ্রাস অবশ্য রপ্তানি শুল্ক হতে বর্ধিত আগম দ্বারা পূরণ করা গেছে। ভারতীয় টাকার আকারে বৈদেশিক সাহায্য থেকে অর্থাগম বেশ বেড়েছে। তা সত্ত্বেও, খাদ্যশস্য ও সার বাবদ সরকারী অর্থসাহায্য, কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে কর্জদান, মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের পর পরিকল্পনা-সংক্রান্ত ও পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয় বৃদ্ধি—এসব কারণে ঘাটতি অনিবার্য হয়েছে। বিশেষ করে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে রাজ্য সরকারগুলি অতিরিক্ত কর্য নেওয়ার জন্য ১৯৬৬-৬৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারকে ১১৩ কোটি টাকা সাহায্য করতে হয়েছে। অন্য দিকে, বাজেটে ব্যয়-সংকোচের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছে, কিন্তু দেশরক্ষা খাতে প্রস্তাবিত খরচ বেড়ে ৯৬৯ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা-বহির্ভূত ব্যয় বেড়ে ১৮৩ কোটি টাকা হবে, যার মধ্যে প্রশাসনিক ব্যয় দাঁড়াবে ১৬৪ কোটি টাকা।

চতুর্থ যোজনার প্রথম বছর শেষ হতে চললো। পরিকল্পনার দ্বিতীয় বছরের জন্য ১,৭৯১ কোটি টাকার বেশী অর্থসংগতির ব্যবস্থা করা যাবে না। তার মধ্যে কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ৪০৫ কোটি টাকা এবং পরিবার পরিকল্পনার জন্য ২৮ কোটি টাকা ধার্য করা হবে। সরকারী ব্যবস্থার শিল্পগুলি থেকে ১৮৯ কোটি টাকা যোগাড় করা যাবে, আশা করা হয়েছে। ৮৩৫ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ পাওয়া যাবে, ধরা হয়েছেঃ ১৯৫ কোটি টাকার মতো ঋণ শোধের প্রয়োজন মিটিয়ে ৬৪০ কোটি টাকা অবশিষ্ট থাকবে, মনে হয়।

আর্থিক পরিস্থিতি

আর্থিক পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে একাধিক কারণেঃ উৎপাদন কম হয়েছে; বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের অবস্থা সংকটের কাছাকাছি পৌঁছেছে; তার উপর, অর্থ সম্প্রসারণ খানিকটা মন্দীভূত হওয়া সত্ত্বেও দ্রব্যমূল্য হু হু করে বেড়ে চলেছে।

১৯৬৬ সনের এপ্রিল থেকে নভেম্বর এই সময়ের ভেতর কার্পাস বস্ত্র, বনস্পতি, পাট প্রভৃতি কৃষি-ভিত্তিক শিল্পগুলির উৎপাদন সত্যসত্য কমে গেছে। ভালো বর্ষণ না হওয়ায় দেশের শিল্পোন্নয়ন নানাভাবে ব্যাহত হয়েছে। প্রথম, কৃষিজাত কাঁচামালের অনটন দেখা দিয়েছে এবং তাদের মূল্য বেড়েছে। দ্বিতীয়, গ্রামদেশে লোকের আয় কমে যাওয়ায় কারখানা-শিল্প সামগ্রীর চাহিদা পড়ে এসেছে। তৃতীয়, খাদ্যমূল্য বৃদ্ধির দরুন শহর অঞ্চলের ক্রয়ক্ষমতা শিল্পদ্রব্যের জায়গায় খাদ্য কেনায় নিয়োজিত হয়েছে। চতুর্থ, সরকারের ব্যয়-সংকোচ প্রচেষ্টার ফলে রেল ওয়াগন, কলকব্জার মতো কয়েক শ্রেণীর শিল্পদ্রব্যের চাহিদার অবনতি ঘটেছে। ইঞ্জিনীয়ারিং, মূলধন দ্রব্য এবং পরিবহণ-সংক্রান্ত শিল্পগুলি চাহিদা সংকোচনের সম্মুখীন হচ্ছে।

১৯৬৬ সনের এপ্রিল-ডিসেম্বর এই সময়ে রপ্তানি থেকে বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন (১৯৬৫ সালে অনুরূপ সময়ের তুলনায়) শতকরা প্রায় নয় ভাগ কমে গেছে। যদিও আমদানি আগের চাইতে বেশ কিছু কমানো হয়েছিল, রপ্তানির অবনতি এবং অতীতের ঋণ পরিশোধ ও সুদ দানের প্রয়োজন, দুটো কারণে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণের ক্ষয় ঘটেছে।

কৃষির অবস্থা কেবল শিল্পোন্নয়নের অগ্রগতি, রপ্তানি-ক্ষমতার হ্রাস এবং খাদ্য আমদানির উপর ব্যয় বৃদ্ধির জন্য দায়ী নয়, দ্রব্যমূল্য স্ফীতি সমস্যাকেও তা দুরূহ করে তুলেছে।

দেখা যাচ্ছে, অনটন ও বাজেটের ঘাটতি প্রথমে দ্রব্যমূল্য এবং অনতিবিলম্বে মজুরী ও মহার্ঘ ভাতার বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। তাতে আবার বাজেট-সংক্রান্ত অসুবিধা বা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে—যা আরো মূল্যবৃদ্ধির কারণ হয়েছে। এক কথায়, দ্রব্যমূল্য ধারাবাহিকভাবে উপরের দিকে বেড়ে গেছে।

বাজেট নীতির অভীষ্ট

অর্থনৈতিক স্থিতি রক্ষা করাই এখন প্রাথমিক কর্তব্য। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি না ঘটিয়ে দেশের বৈষয়িক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা, আগের মতো, এখন আমাদের সমস্যা। বর্তমান অবস্থা অবশ্য পুরোপুরি নৈরাশ্যজনক নয়, কেননা, চাহিদা উজ্জীবনের লক্ষণগুলি এবং মূলধন দ্রব্য ও পরিবহণের মতো শিল্পে উদ্বৃত্ত উৎপাদন-ক্ষমতার উপস্থিতি উন্নয়ন ব্যয় বাড়িয়ে দেবার পক্ষে অনুকূল মনে হয়। আমদানি কিছুটা উদার করলে এবং কোনো প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত নয়, এরকম বৈদেশিক সাহায্য বেশী করে পেলে কাজটা সহজ হবে, সন্দেহ নেই। অন্তর্বর্তী বাজেটে এসবের যাথার্থ্য স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু সরকারের বৈষয়িক ও টাকাকড়ি-সংক্রান্ত নীতি কিভাবে প্রয়োগ করা হবে, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।

শান্তিকুমার ঘোষ

কিউবিজম্

পিকাসো, ব্রাক্, লেজের, গ্রি, প্রভৃতির বিষয়ে আলোচনার পূর্বে কিউবিজম চিত্রান্দোলনের ওপর সামান্য ভূমিকা বোধ হয় প্রয়োজন। ১৯০৭ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত এই চিত্রাদর্শ ফ্রান্সের সব শিল্পীকেই গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সেজানকে বলা যেতে পারে ভবিষ্যৎবাণী এই রীতির, পিকাসোকে আরম্ভ, ব্রাক্‌কে পূর্ণ প্রকাশ।

নামকরণের ইতিহাস সব কটি আন্দোলনের চেয়ে ভিন্ন নয়, সমালোচকের বিদ্রূপাত্মক রচনা থেকে কিউবিস্ট কথাটি আসছে। খানওয়েইলের চিত্রপ্রদর্শনীতে মাতিসের একটি ছবি দেখে ১৯০৮ সালে সমালোচক লুই ভোসেল ছবির মধ্যে বরফি-আকৃতি নানা নক্‌শা দেখে হাসাহাসি করেছিলেন, এবং কিছুদিন পরে ব্রাকের ছবিতেও যখন বরফি দেখলেন তখন তিনি এই তরুণ দলকে ডেকে বসলেন "কিউবিস্ট" বলে। কিউবিজমের জন্ম হল।

ইতিপূর্বে ইম্প্রেশনিজম্, এক্সপ্রেশনিজম্ প্রভৃতির ভূমিকায় আমরা চেষ্টা করেছিলুম সরলভাবে তাদের আদর্শ বা থিয়োরিটা বুঝতে, কিন্তু পিকাসো যখন বলেই দিয়েছেন যে, আমরা থিয়োরিস্ট নই, কিউবিস্টিক ছবি যাকে বলা হয় তা কোনো নতুন কথা বলতে চাইছে না, নতুন শৈলী-পরিচিত করছে, তখন এই আলোচনা সম্পূর্ণ অন্যভাবে শুধুমাত্র ছবি সামনে রেখে করতে হবে। হার্বার্ড রীড কিউ-বিজমের আরম্ভ হিসেবে পিকাসোর লে ডিমোয়াজেল দ্যাভিনিয়' চিত্রটিকে নির্দিষ্ট করেছেন, আমরাও তাঁর অনুসরণে ছবিটির মধ্যে কিউবিজম্ লক্ষ করার চেষ্টা করে দেখি তার পূর্ণাঙ্গ রূপ কীভাবে আসছে পরের ছবিতে।

এই চিত্রটি পিকাসো আঁকতে শুরু করেন ১৯০৭ এর সেপ্টেম্বর মাসে; ছবিটি আঁকতে আরম্ভ করবার আগে তিনি আইবেরিয়ান মূর্তি কিছু দেখেছিলেন প্যারিসের একটি প্রদর্শনীতে এবং সুস্পষ্টভাবে তার প্রভাব লক্ষণীয় ক্যানভাসে।। কিন্তু চিত্রটির বাঁদিকের তিনটি মূর্তি আঁকার পর তিনি পরিচিত হন আফ্রিকান স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে এবং লক্ষণীয়, পরবর্তী যে দুটি নারী মূর্তি তিনি এঁকেছেন ক্যানভাসের ডান দিকে, তাদের অঙ্কনশৈলী সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচে। এবং চিত্রটিতে এই দুই মূর্তিই কিউ-বিস্টিক—তাহলে দেখা যাচ্ছে আফ্রিকান শিল্পের অভিজ্ঞতা বা প্রভাবপ্রসূত মূর্তি দুটি কিউবিস্টিক। পিকাসো আফ্রিকান শিল্পে যুক্তিবাদ দেখেছিলেন (পিকাসোর নিজের কথায় রেইস্‌নার) এবং এই প্রাচীন শিল্পের প্রত্যয় তিনি মিশিয়েছিলেন সেজানের আদর্শ "realisation of the motif" এর সঙ্গে। এই দুইয়ের মিলনই বোধ হয় কিউবিজম্।

যদিও পিকাসোর ওপর প্রভাব ছিল অনেকের সে-সময়ে, নির্যাস শুষে নিয়ে-ছিলেন রোমানেস্ক আর্ট থেকে, পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে ষোড়শ শতকে হিস্পানি শিল্পের মরমী শৈলী, অবিলম্ব পূর্বসূরি ইম্প্রেশনিস্টদের ভালো জিনিস খুঁটে বের করেছিলেন, ফোভদের থেকেও লাভবান হয়েছেন প্রচুর—কিন্তু যাঁর প্রভাব সর্বোপরি এবং আজ পর্যন্ত হাল্কা পর্দার মতো তাকে ছেয়ে রেখেছে তিনি পোল সেজান।

সেজানের প্রভাবের সঙ্গে আফ্রিকান শিল্পের দার্ঢ্য যখন মিলল তখনই আরম্ভ হল কিউবিজম্, তখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক আফ্রিকান শিল্প সব কিউবিস্টরাই দেখেছিলেন কিনা। ১৯০৭ থেকে ১৯০৯ এর মধ্যে আমরা লক্ষ করি প্যারিসের সবার ছবিতেই আফ্রিকান শিল্পের প্রভাব। নতুন চিত্রকরদের ছবি নিয়ে কানওয়েইলের প্রদর্শনীতে জর্জ ব্রাক্ নামক শিল্পীর মধ্যেই দেখা গেল সেজান ও নিগ্রো আর্টের সবচেয়ে ফলপ্রসূ মিলন সম্ভব হয়েছে এবং যার ফলে বেরিয়ে এসেছে সম্পূর্ণ মৌলিক এক চিত্রশৈলী। ব্রাক্ ও পিকাসোকে ঘিরে ১৯০৮-এ মঁমার্তে বিরাট এক আড্ডা জমে উঠল, বাদ গেল না তা থেকে কোনো তরুণ প্রতিভাবান, কিউবিস্ট আন্দোলন ফেঁপে উঠল ইয়ুরোপে। মাক্স জাকব, মারি লাভেনাইন, গিয়োম আপোলিনেয়ার, অঁদ্রে সালমো, মরিস রেনাল, হুয়ান গ্রী, জেরত্রুদ্, লিয়ো স্টাইন, সবাই ছিলেন এই আন্দোলনে। তা ছাড়া ১৯১০-এ এসে যোগ দিলেন দ্যলোনি, হেরব্যাঁ, ফকোনিয়েরে, অঁদ্রে লোৎ, জাঁ মেৎসিঙ্গার, পিকাবিয়া, আর্কিপেঙ্কো (স্থাপত্যশিল্পী)। ১৯১১তে এসে দেখা গেল পিকাসোর "দ্যমোয়াজেল দাভিনিয়'র" যে শৈলী প্রারম্ভে ম্যানারিজম ছিল তা সমকালের একমাত্র স্টাইলে পরিণত হয়েছে।

কিউবিস্টরা বলতেন, পিকাসো আর ব্রাক্‌কে মূলপাত্র ধরে বলছি যে, এই চিত্রশৈলী বুদ্ধি ও থিয়োরি প্রসূত আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও তা আসলে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা প্রসূত। কিউবিস্ট ছবির গাণিতিক স্থাপত্যধর্মিতা "মডি-উলেশনের" সাহায্যে আসছে, অনুভূতির দ্বারা বিভিন্ন তলের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা হচ্ছে, তা কোনো থিয়োরি অনুসরণ করে হচ্ছে না। চিত্রশিল্প যেহেতু চোখে দেখার এবং ফ্রেমে বন্ধ সেহেতু তা ফর্ম ছাড়া আর কিছু নয়, ফর্মের যখন বাস্তবীকরণ হল, তখনই তা চিরন্তন। পিকাসোর ভাষায়, চিত্রে ফর্ম ছাড়া আর কিছুই নেই; তাতে যদি আমরা গণিত, জ্যামিতি, ভেষজবিদ্যা, মনোবিকলন, সংগীত, কবিতা এইসব দেখতে যাই তাহলে মস্ত ভুলের দিকে অগ্রসর হব।

যেহেতু কিউবিস্টরা শুধুমাত্র ফর্মকে ধরতে চেয়েছিলেন সেহেতু তাদের সমস্ত জগৎকে গোল এবং চৌকোনার বিভিন্ন সম্মেলন ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি—সত্যিই ভাবুন পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই তো হয় গোল নয় বরফি ধাঁচে, তারা বিভিন্ন নক্‌শায় পরস্পর সহ অবস্থান করে বলে ভিন্ন-ভিন্ন লাগে। কবিতা তো মনের স্মৃতি নিয়ে রচিত, ছবি চোখের—মনের স্মৃতি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব অনুসংগ হারিয়ে শুধুমাত্র অনুভূতির নির্যাসে ঠেকে এসে; তাই কবিতা, তাই চিরন্তর। কিন্তু চোখের স্মৃতি যখন সব অনুসংগ হারিয়ে ফেলে তখন তার যে নির্যাস বেরোয় তা অনুভূতি নয়, কয়েকটি বরফি আর গোল মাত্র; তাই ছবি এবং চিরন্তন। আমি কোনো একজন মানুষকে দেখেছিলুম, বহুদিন আগে, তার বিষয়ে সব ভুলে গেছি, কোথায়, কবে, কেমন মেজাজে কিছুই মনে নেই— শুধু এইটুকু মনে আছে, একটা খুব সুন্দর শরীর। আজ যখন সেই চোখের স্মৃতি ভাবি, মুখ মনে পড়ে না, নাম মনে পড়ে না, কী রঙের জামা তাও ভুলে গেছি, শুধু দেখতে পাই স্মৃতি থেকে উঠে আসা একটা কাঠামো, যার বিষয়ে কোনো অনুভূতি নেই, গন্ধ নেই, গল্প নেই, চরিত্র নেই, শুধু একটি অপূর্ব নক্‌শা কতগুলো বরফি, কতগুলো গোল। —আমি এই স্মৃতি যদি আঁকতুম তাহলে বোধ হয় তা কিউবিস্ট ছবি হত। বোধ হয়, ঠিক জানি না।

শুদ্ধশীল বসু
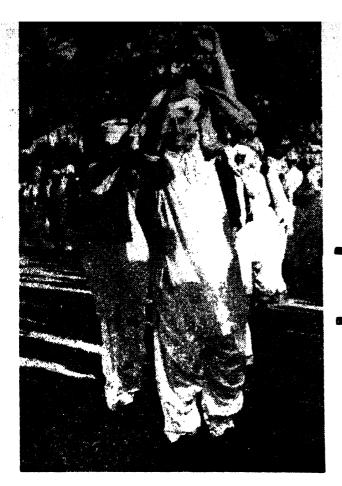
কলকাতার ডায়েরী

কাবুলীরাও গান গায় শুনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিস্মিত হয়েছিলেন, ইদের দিনে কলকাতার ময়দানে এলে তিনি হয়ত মনুমেন্টের ডগা থেকে উলটে পড়তেন। দেখতেন, কাবুলীরা নাচেও।

প্রতি বারই হয়, এবারও বকরী ইদের সময় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের পুব দিকটা কয়েক শ কাবুলী তিন-চার দিন নাচে-গানে মাতিয়ে রেখেছিলেন। লম্বা দশাসই এক-একখানা চেহারা, ইয়া ইয়া গোঁফ, শালোয়ার কামিজের উপর কায়দাদুরস্ত পাগড়ি—ওঁরা যখন হাতে হাত দিয়ে কোমর বাঁকিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচছিলেন, মনে হচ্ছিল খাইবার পাস পেরিয়ে খাস পাঠানমুলুকে গিয়ে হাজির হয়েছি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের নাচ দেখছিলাম। প্রতি পদক্ষেপে পৌরুষ, প্রতিটি ভঙ্গীতে উল্লাস। পানজাবের ভাংরা আর সিংহলের কানডি নাচ বাদ দিলে এমন জমাটী আর কিছুই নয়। কাবুলীদের একদল নাচছে, একদল দেখছে পালা করে করে। অ-কাবুলী দর্শকও আমার মত কিছু জড় হয়েছিল। তবে বড় কম।

মনে হচ্ছিল, কলকাতার সব কাবুলীই এই নাচের আসরে হাজির। সংখ্যায় প্রায় চার-পাঁচ শ। এদিন তাঁদের অন্য রূপ। অফিস বা বাড়ির সামনে কর্জের টাকা উসুলের অপেক্ষায় লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে নির্বিকার গোঁফ চুমরানোর ভঙ্গী এ নয়, এমন কি 'হিং সুরমা' বলে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ানোর চেহারাও নয়, সেদিন তাঁরা টাকাকড়ির কথা সব ভুলে গিয়ে উত্তাল উদ্দাম।

পাশের মাঠে শর্টপরা এংলো ইন্ডিয়ান মেয়েদের বাসকেট বল খেলা দেখতে যত লোকের ভিড় হয়, তার চেয়ে অনেক অনেক কম লোক এই 'কাবলী নাচ' দেখতে যান। বিনিপয়সার এমন চমৎকার আনন্দ-অনুষ্ঠান দেখতে কলকাতাবাসীর এত অনাগ্রহ কেন? নাকি শহরের বেশীর ভাগ লোকই কাবুলী-দের কাছে অধমর্ণ এবং তাঁদের ভয়, এই ইদের দিনেও না আবার আগাসাহেবরা সুদের টাকা চেয়ে বসেন?

তাঁদের অভয় দিয়ে বলি, ভাবনার কোন কারণ নেই। আমার সঙ্গী ভদ্রলোক এক কাবুলীকে দেখে পালাই-পালাই করছিলেন। কাবুলীটি কিন্তু তাঁকে চিনতে পেরেও টাকার কথা তোলে নি। তাঁর দিকে হাত বাড়িয়েছিল ঠিকই, তবে টাকার জন্যে নয়, নাচে যোগ দেবার জন্যে।

*

চিড়িয়াখানা ও জাদুঘর দেখার পর মফস্বলবাসীদের কাছে বর্তমানে শহর কলকাতার প্রধান আকর্ষণ কী? মন্ত্রিদর্শন। না, এই আবিষ্কার আমার নয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনৈক মন্ত্রীর। সেদিন এক

আসরে তিনি বলছিলেন, "আরে ভাই, চেহারা দেখিয়ে দেখিয়ে প্রাণ গেল। মফস্বল থেকে অনবরত লোক আসছে আর বলছে, 'মন্ত্রী দেখব।' সেদিন বর্ধমান জেলা থেকে এক দল ছেলে এসে বাঘ সিংহ দেখা শেষ করে আমাকে দেখে গেল। যেন আমিও একটা জীব।"

তিনি হাসছিলেন, আমি বললাম, 'এটা আপনাদের জনপ্রিয়তার পরিচয়।'

মন্ত্রীদের দেখায় আগ্রহ আমি নিজেই সেদিন লক্ষ করলাম ক্যালকাটা ক্লাবে এক পার্টিতে। পাকিস্তানের ডেপুটি হাই-কমিশনারের আয়োজিত পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে সেখানে গত সপ্তাহে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল নানা পেশার, নানা শ্রেণীর কয়েক শত লোককে। সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সরকারী অফিসার, অধ্যাপক, অভিনেতা, সংগীতজ্ঞ, মিলিটারি অফিসার, ব্যারিস্টার, এমনকি বহু সুন্দরী রমণীও ছিলেন সেই আসরে; কিন্তু দেখলাম সবাইকে উপেক্ষা করে বেশীর ভাগ লোকেরই নজর রাজ্যের নতুন মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যের দিকে। তাঁদের কাছাকাছিই ভিড় এবং তাঁদেরও নতুনদের সঙ্গে পরিচিত হতে এবং পরিচিতদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে সমান আগ্রহ।

*

সেই আসরেই আর একটি জিনিস দেখে বড় ভাল লাগল। পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশনে কাজ করেন, এমন কয়েকজন অফিসার তাঁদের নিজের নিজের জেলার লোকদের সঙ্গে জড়ো হয়ে 'দেশোয়ালী' ভাষায় সেদিন আড্ডা জমিয়ে তুলেছিলেন।

ফার্স্ট সেকরেটারি কিব্‌রিয়া সাহেবের বাড়ি কুমিল্লায়। একজন ভারতীয় এগিয়ে গিয়ে বললেন—'আপনার বাড়ি কুমিল্লায়, আমার বাড়িও কুমিল্লায় ছিল।' লেবার এটাশে আবদুস সোভান চৌধুরীর স্ত্রীর বাড়ি সিলেটে। আর একজন ভারতীয় ভদ্রমহিলার কথায় 'সিলেটী টান' লক্ষ করেই বললেন, 'নিশ্চয়ই আপনি সিলেটের লোক, আমিও।' ঠিক তেমনই এখন পাকিস্তানী এমন কয়েকজন প্রাক্তন পশ্চিমবঙ্গবাসীও পেয়ে গিয়েছিলেন তাঁর আগের জেলার লোককে। সব মিলিয়ে যেন একটা পুনর্মিলন উৎসব।

আরও আশ্চর্য, কলকাতা শহরে যখন দুই বঙ্গ সব রাজনীতি ভুলে ব্যক্তিগত সম্বন্ধে একে অন্যের কাছাকাছি, ঠিক সেই-দিনই দূর পিকিং-এ ওই 'পাকিস্তান দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানেই চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত-বিরোধী কটূক্তির জন্যে ভারতীয় প্রতিনিধিদের বাধ্য হয়েই অনুষ্ঠান ছেড়ে আসতে হয়েছে।

ভাগ্যিস, কলকাতার অনুষ্ঠানে তৃতীয় কোন পক্ষ ছিল না এবং রাজনৈতিক কোন বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হয়নি।

*

ভারতবর্ষের সংবাদপত্র জগতে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক এভান চার্লটনের অবসর গ্রহণ। তিনিই ছিলেন এদেশে শেষ ইংরেজ সম্পাদক, একত্রিশ বছর ভারতে কাটিয়ে গত সপ্তাহে কলকাতা থেকে বিদায় নিলেন। এমন একদিন ছিল, যখন ভারতে কিছু ইংরেজী কাগজে ব্রিটিশ সম্পাদকদেরই প্রাধান্য ছিল। এদেশে সাংবাদিকতারও শুরু বিদেশীদের হাতে।

চার্লটনের বিদায়ে একটি যুগের অবসান ঘটল।

—চাণক্য

দিল্লির ডায়েরি

আর বাসার উলটো দিকে মাঠে একটা পাঠশালা। খোলা মাঠে খোলা আকাশের নিচে পাঠশালা। শীতের দিনে গায়ে রোদ লাগিয়ে তারা সুর করে নামতা শেখে। গরম পড়ল যখন, তখন টিকটিকে বাঁশের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একখণ্ড সতরঞ্চি মাথার উপর।

ছাত্রছাত্রীরা স্বভাবতই নিম্ন-রোজগারি পরিবারের, ঝাড়ুদার, মেথর, রাজস্থানী ঝি আর বস্তিবাসী মজুরদের ছেলেমেয়ে। দুটি অল্পবয়সী শিক্ষিকা। পড়ানোটা সমাজসেবার অংগ। আশপাশে ইমারত-ওয়ালা অনেক ইস্কুল, কোনোটা চালায় খৃীষ্টান মিশনারীরা, কোনোটা ভারতীয় সংস্থার অধীনে। ছাত্রছাত্রীদের পোশাক আছে, বাস আছে, অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা, অনেকের নিজেদের গাড়ি, মাসিক ফি ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ।

খোলা মাঠের পাঠশালার বাচ্চারা ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থাকে পাশের ইস্কুলের পোশাক-পরা ছেলেমেয়েদের দিকে। পাঠশালার চৌহদ্দি পাথরের টুকরো রেখে আলাদা করা। ছাত্রদের অনেকের গায়ে জামা থাকে না। আশপাশ সব খোলা, মাথার উপর সতরঞ্চি দু-একটা গরু-ছাগল, মাঝে মাঝে মেথরদের পাড়া থেকে আসা শুয়োরের বাচ্চা (মা সমেত) ঘোরাফেরা করছে, কুকুররা আসছে ঘেউ ঘেউ করে, আর খোলা মাঠের পাঠশালার বাচ্চারা সুর করে নামতা পড়ে।

এই তো নমুনা ভারতের তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর শিক্ষাদান। এই চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা, বৈষম্যের এই ছড়াছড়ি বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে, আপনাদের অনেকের আছে। আছে আমাদের নতুন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেনেরও। সেদিন একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ডক্টর সেন শিক্ষার বৈষম্যের কথা বলছিলেন, যদিও আমার পাড়ার খোলা মাঠের পাঠশালা তাঁর দৃষ্টিতে এখনো আসেনি।

কিন্তু শিক্ষাবিদ্ হিসেবে উনি এই সমস্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত জাগ্রত। বললেন, আমি দেখেছি আমাদের গ্রামের পাঠশালা আর ইস্কুলগুলোর কী দুর্দশা। ঘর নেই, বেঞ্চি নেই, বই-খাতা নেই, অতি দরিদ্র শিক্ষক।

একজন সাংবাদিকঃ "স্যর! অনেক পাঠশালায় মাস্টারও নেই।"

ভারতে রাজনীতির এমন প্যাঁচালো খেলা যে কুড়ি বছরে এই প্রথম একজন সত্যিকারের শিক্ষাবিদ্ কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের ভার নিয়েছেন। একবার ভেবে দেখুন, কুড়ি বছরে এই প্রথম। সুতরাং, আশ্চর্য কী, ডক্টর সেন শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ে এসে বস্তাবন্দি ফাইলের মাধ্যমে হাতে পাবেন এই কুড়ি বৎসরের সরকারী শৃংখলাহীনতা, বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ, খুব বড় বড় বক্তৃতা আর শিক্ষা ক্ষেত্রে এক হ-য-ব-র-ল।

প্রায় ৬২ বছর বয়েস। সুন্দর স্বাস্থ্য। মাথার টাকে হাত বুলিয়ে বলেন, "আমাকে চিনতে আপনাদের মোটেই কোনো কষ্ট হবে না। আমার টাকটি চমৎকার।" মিষ্ট গলার স্বর। স্বভাব সহজ ও সরল। এমন একটি ব্যক্তিত্ব, যেটি পাঁচ মিনিটে অপরিচিতকেই আপনার করে নেয়।

বলেছেনঃ "যদি ছ' মাসের ভিতর কোনো কাজ না করতে পারি, তা হলে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে আবার নিজের কাজে চলে যাব।"

আমরা অনেক মন্ত্রী দেখে থাকি, চমৎকার ইস্ত্রি-করা গলাবন্ধ কোট, হয় চোসত, না-হয় পাতলুন কিংবা মিহি খদ্দরের দামী ধুতি, খাদি সিল্কের পাজাবি, হাতে-বোনা দুর্মূল্য পশমিনার গলাবন্ধ স্যুট, মস্ত বড় বিদেশী গাড়ি, তকমা-আঁটা ড্রাইভার আর বেয়ারা, আর অন্তত একটি ক্যাবিনেট মন্ত্রী, যার কানে গোঁজা থাকে আতর-ভোবা একটু তুলো। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এটাই স্যাম্পল।

এঁদের সঙ্গে ডক্টর ত্রিগুণা সেনের কোনো মিল নেই। জামা-কাপড় মোটা খদ্দরের, ধুতি-পাঞ্জাবি জওহর কোট। অনেকটা পুরোনো আমলের (প্রাক-স্বাধীনতা) কংগ্রেসম্যানদের মতো। সবচাইতে বড় প্রভেদ এই যে, উনি কোনো রাজনৈতিক দলের লোক নন, যদিও থিয়োরি মতে উনি কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সভ্য হিসেবে কংগ্রেস সংসদীয় দলের একজন।

একদা স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ১৯২৯ সনের পরে, যখন উনি জার্মানীর মুনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ডক্টরেট নিয়ে এলেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। সুতরাং ১৯৩২ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত কয়েকবার ইংরাজ সরকারের কয়েদ-খানাতেও যেতে হল। তদানীন্তন বেঙ্গল রেগুলেশ্যান আইনে তাঁকে বাঙলা দেশ থেকে বহিষ্কারও করা হয়েছিল।

তাঁর জীবনে যদি কোনো চাহিদা থেকে থাকে, তা হল পরের উপকার করা, বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের। নিজে হাতে গড়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যা আজ ভারতের সেরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। ডক্টর সেনের দান ছাত্রদের অপূর্ব শৃঙ্খলায়, ও শিক্ষক ও ছাত্রদের ভিতর মিত্রতাপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনে। যাঁরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দেখেছেন এবং বাৎসরিক কনভোকেশন ও ছাত্রদের প্রদর্শনী দেখেছেন, তাঁরা ত্রিগুণা সেনের গুণকীর্তন না-করে পারবেন না। আর এটা ক-বছরেই বা হয়েছে। উনি অধ্যক্ষ হয়ে এলেন ১৯৪৪ সনে; ছিলেন ১৯৫৫ অবধি, যখন হলেন কলকাতার মেয়র। ভাইস-চ্যান্সেলর (যাদবপুরের) হলেন ১৯৬৩ সনে।

অনেক কমিটি কমিশন ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত আছেন অনেক কাল। অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন। সব সত্ত্বেও একলা মানুষ। স্ত্রী মারা গেছেন অনেক বছর হল। দুটি মেয়ে, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের একজনকে জানি (সুহৃতা) ভাল রবীন্দ্র সংগীত করেন। সুতরাং, রাজধানীতে অত্যন্ত একা মানুষ।

আলাপ করতে করতে বলছিলেন: "আমার একটা ছোটখাটো বাড়ি হলেই চলে। বড় বাড়িতে অত্যন্ত অসুবিধে। যেমন ছিল বেনারস হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে (যেখানে হালে উনি উপাচার্য ছিলেন)। তারা আমাকে এমন বাড়ি দিল যে, বাড়ি তো নয়, প্রাসাদ। আমি একলা মানুষ, ভয় করতো, তাই বাতি জ্বালিয়ে রাখতাম সারা রাত।"

ইনি অনেকটা মুক্ত মানুষ, যাঁর ব্যক্তিগত চাহিদা প্রায় নেই বললেই চলে, ক্ষমতা যাঁকে দুরাচারী করতে পারেনি, খ্যাতি যাঁকে দিতে পারেনি ঘূর্ণিত-মস্তক (অধিকাংশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা যা পেয়েছেন, খ্যাতি না-পেয়েও)। তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, কী করে শিক্ষার উন্নতি করা যেতে পারে, ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ হতে পারে।

"আমার ক্ষেত্র এখন অনেক বড়। আত্মবিশ্বাস আমার ক্রমশ হচ্ছে যে, কিছু ভাল অন্তত করতে পারব" আমাদের বললেন।

ছাত্রসমাজ ও যুবকদের প্রতি ডক্টর সেনের অসীম স্নেহ ও মমতা, এবং দৃষ্টি তাঁর দলীয় রাজনীতির দোষে দুষ্ট নয় মোটেই। শুনে শুনে আমাদের কান ঝালাপালা হয়ে গেল, ছাত্ররা কেন রাজনীতিতে আসে। "সাবধান, রাজনীতিতে এসো না। খালি পড়া নিয়ে থাকো বাপু। রাজনীতিতে সরদারি করব শুধু আমরা।" এই ধরনের উপদেশামৃত কোন্ মন্ত্রীমশায় না দিয়ে আসছেন? কিন্তু ডক্টর সেন তার উল্টো।

বলেন: "কেন করবে না রাজনীতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা? তারা আলোচনা করুক, জানুক, নানা রাজনৈতিক দলের নেতাদের ডেকে তারা জিজ্ঞেসবাদ করুক। কেন নয়? দেশ তো তাদেরই ভবিষ্যৎ তো তাদেরই। আমরা তো সব বুড়ো, যাওয়ার পথে। তারা তো সবেমাত্র আসছে। সরকারকে সমর্থন করাই একমাত্র রাজনীতি নয়।"

কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মুখে এমন কথা, যা আমরা শুনেছি আমাদের কলেজে প্রাক্-স্বাধীনতাকালে। চোখের দিকে চেয়ে আর ভারি মিষ্টি হাসি দেখে মনে হল, অসাধারণ মানুষ ত্রিগুণা সেন।

"হ্যাঁ, আমি চাই গ্রামের ইস্কুলের উন্নতি করতে। ইস্কুলঘর বইপত্র, আর শিক্ষকদের যথোপযুক্ত মর্যাদা।" বললেন এবং মহারাষ্ট্রের স্কুলের খুব প্রশংসা করলেন।

পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট থেকে এসেছেন অনেক বড়ো মানুষ। তাঁদেরই একজন ডক্টর সেন। তাঁর জন্মদিন ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯০৫। এমন তাঁর যাদু যে, কয়েক মাসেই উনি বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এনেছেন শান্তি ও শৃঙ্খলা, সৃষ্টি করেছেন শিক্ষার আবহাওয়া।

আজ ছাত্রসমাজ ও যুবকদের প্রতি তাঁর উপদেশ: "সাহসী হও। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর, যেই সে অন্যায় করুক, যেখানেই করুক।"

খগেন দে সরকার

নেতাজীর কণ্ঠস্বর নেই কেন?

গত ২৮শে জানুয়ারীর 'দেশ'-এ 'দিল্লীর ডায়েরী' এবং ৪ঠা মার্চের 'দেশ'-এর সেই সম্পর্কে প্রদীপকুমার দের পত্রটি পড়লাম। লালকেল্লার উক্ত বিখ্যাত অনুষ্ঠানে নেতাজীর কণ্ঠস্বর বাদ দেওয়াটা ভারত সরকারের ঔদাসীন্যের আর একটি বেদনাদায়ক দৃষ্টান্ত।

নেতাজীর কণ্ঠস্বরের রেকর্ড এমন কিছু দুর্লভ নয়। তাঁর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সিঙ্গাপুর ইত্যাদি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত নানা বেতার-ভাষণ রেকর্ড করা আছে। এমন কি গত চৌষট্টি সালেও কয়েকটি রেকর্ড প্রকাশিত হয়েছে। গত ১৯৬৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী যখন কলকাতায় নেতাজী-মূর্তির আবরণ উন্মোচন করতে এসেছিলেন, তখন লক্ষ লক্ষ লোক নেতাজীর সেই অগ্নিবর্ষী উদাত্ত বক্তৃতা স্বকর্ণে শুনেছিলেন। সেদিন সেখানে যে রেকর্ড বাজিয়েছিলেন কলকাতার "নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো"। "প্রকাশ-ধ্বনি"তে ব্যবহারের জন্য "নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো" থেকে সে রেকর্ড অনায়াসে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

'দিল্লীর ডায়েরী'তে প্রকাশ, যে সরকার বলেছিলেন যে, যাঁরা লালকেল্লার সঙ্গে সরাসরি জড়িত, তাঁদের কণ্ঠস্বরই শোনানো হয়। কিন্তু ওই অনুষ্ঠানে গান্ধীজীর কণ্ঠস্বরও যখন শোনানো হয় তখন সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোনাতে বাধা কোথায়! গান্ধীজীর চেয়ে নেতাজীর সম্পর্ক কি লালকেল্লার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেশী নয়? এত বেশী যে, এই সম্পর্ককে প্রত্যক্ষ সম্পর্কও বলা চলে। আজাদ হিন্দ ফৌজ ও তার সর্বাধিনায়ক সুভাষ বসুর ধ্যান, জ্ঞান, সাধনা সবই ছিল লালকেল্লা। এই ভারত-প্রেমিকদের হৃদয়ে ভারতবর্ষের যে মূর্তি ছিল সে লালকেল্লারই। তাঁদের কাছে তখন ছিল ভারত মানেই লালকেল্লা, লালকেল্লা মানেই ভারত। তাঁরা দিল্লী যেতে চেয়েছিলেন, সে তো লালকেল্লার জন্যই। তাঁদের নেতাজী, তাঁদের হৃদয়ে যে লালকেল্লার ছবি এঁকেছিলেন, সেই লালকেল্লাকেই স্থির লক্ষ্য করে তাঁরা 'জীবন-মৃত্যুকে 'পায়ের ভৃত্য' করে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের কণ্ঠের যে গান, তাতেও ছিল, "অব দিল্লী চলো, দিল্লী চলো, দিল্লী চলেংগে... / ঝাণ্ডা তিরংগা লালকিলে পে উড়ায়েংগে"। কিংবা "চলো দিল্লী পুকারকে/ কৌমী নিশান সমহালকে / লালকিলে পে গারকে / লহরায়ে যা লহরায়ে যা"।—"চলো দিল্লী মানেই তো 'চলো লালকেল্লা'।

নেতাজীর অসংখ্য বেতার-বক্তৃতাতেও ধ্বনিতে হয়েছে ওই একই কথা: "আমাদের এই অভিযান তখনই শেষ হবে, যখন স্বাধীন ভারতীয় সৈন্যদল লালকেল্লার অভ্যন্তরে তাদের সামরিক প্রদর্শনী পরিচালনা করবে।" কিংবা "আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত থামব না যতক্ষণ না লালকেল্লার শীর্ষে আমাদের জাতীয় পতাকা সগৌরবে উড়তে থাকবে।" অথবা "বন্ধুগণ, দিল্লী চলো, দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ" ইত্যাদি। সুতরাং লালকেল্লার ইতিহাস থেকে নেতাজীকে বাদ দিলে এ অনুষ্ঠান কখনোই সার্থক বা ত্রুটিহীন হবে না, হতে পারে না।

'দিল্লীর ডায়েরী'-এর লেখক খগেন দে সরকার লিখেছেন, "...কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর কেন আনলেন না?... সেই স্বদেশ-প্রেমের কিছুটা আজ প্রয়োজন ভারতের মাটিতে। কিন্তু একচোখো ভারত সরকার সে দিকে অন্ধ।" ভারত সরকার প্রকৃতপক্ষে অন্ধ নন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে নেতাজীর অনবদ্য এবং অপরিসীম অবদান তাঁরা বুঝতে পারেন না, এতবড় নির্বোধ তাঁরা কখনোই নন। তাঁরা দেখতে পান সবই, তবে নেতাজীর ক্ষেত্রে তাঁরা বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারেন।

"প্রকাশ ধ্বনি"র অনুষ্ঠানে নেতাজীর কণ্ঠস্বর নেই কেন, এ সম্পর্কে কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি, এটা যেমন লজ্জাজনক, ভারত সরকার নেতাজীর আত্মত্যাগকে স্বীকার করতে চান না, সেটাও তেমনই লজ্জাকর। যে সরকার 'আকাশবাণী'র বার্ষিক অনুষ্ঠানসূচী থেকে নেতাজীকে বাদ দিতে পারেন, যে সরকার নেতাজীর 'মৃত্যু' [তথাকথিত] সম্পর্কে তদন্তের প্রহসন করেন, যে সরকারের সংসদ ভবনে নেতাজীর কোন প্রতিকৃতি থাকে না, যে সরকারের কর্ণধারেরা তাঁদের অধিবেশনে বা অন্যান্য স্থানে ভুলেও নেতাজীর নামোচ্চারণ করেন না, যে সরকারের সৈন্যদলের সামরিক বিভাগ, ভারতের সামরিক স্বনির্ভরতার পথিকৃৎ নেতাজীর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানায় না, যে সরকারের পরিকল্পিত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক-মূর্তিতে নেতাজীর স্থান থাকে না, সে সরকার যে অম্লানবদনে 'প্রকাশ ধ্বনি' অনুষ্ঠানে নেতাজীর কণ্ঠস্বর প্রচারের ব্যবস্থা রাখবেন না, তাতে আর বিচিত্র কি।

শ্রীঅলকরঞ্জন বসু চৌধুরী
জামশেদপুর-১

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন

১৮ মার্চের 'দেশে' শ্রী[illegible] সেনগুপ্তের নির্বাচনী সমীক্ষাটি পড়লাম। এ প্রসঙ্গে আমার কিছু বক্তব্য আছে। অনুগ্রহ করে প্রকাশ করলে বাধিত হব।

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পরাজয় সম্পর্কে যে সব আলোচনা ইদানীং হচ্ছে, শ্রী সেনগুপ্তের বক্তব্য অবশ্য তারই একটু এপিঠ-ওপিঠ—অর্থাৎ নতুন কোন আলোকপাত ঘটেনি। তবে এই উপলক্ষ্যে একটা কথা আমার কাছে বেশ কৌতুকপ্রদ ঠেকছে। 'মুসলমান ভোট'—এর মানে কী? যে অর্থে 'মুসলমান ভোট' বলা হয়, ঠিক সেই অর্থে 'হিন্দু ভোট', 'খৃষ্টান ভোট', কিংবা 'সাঁওতাল ভোট' বলা যায় কি না? জন্ম-সূত্রে আমি মুসলমান এবং আমার অভিজ্ঞতায় গত তিনটি নির্বাচনে যা বুঝেছি—তাতে ওই ধরনের বিশেষণ ব্যবহারের কোন কারণ দেখি না। বরং চাষী ভোট, ভাগচাষী ভোট, ক্ষেতমজুর ভোট, 'বাবু ভোট' অথবা বড় জোর 'মিয়া ভোট', 'সেখ ভোট' ইত্যাদিগুলো ব্যবহার করা চলে। নির্বাচনকালে সাম্প্রদায়িক অপপ্রচার সত্ত্বেও দেশবিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে ধর্মের জিগিরে সাড়া দেবার মত উৎসাহ খুব কম লোকেরই আছে বলে আমার ধারণা। এবং আমার অভিজ্ঞতাও ভিন্ন কথা বলে না। এর কারণ সম্ভবত দেশ বিভাগের পর মানুষের নিজ নিজ ক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামের তীব্রতা সম্পর্কে সচেতন হওয়া। বর্তমানে এটা আরও বেড়েছে।

শ্রী সেনগুপ্ত 'মুসলমান ভোটদাতাদের কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার' 'বড় কারণ' হিসেবে 'চাঁই চাঁই লীগ নেতাদের' কংগ্রেসে ঠাঁই পাবার কথা বলেছেন। ব্যাপারটা ঠিক নয়। দেশ বিভাগের পর যে মুসলমানেরা এদেশে রয়ে গেল—তাদের অধিকাংশই হচ্ছে চাষী শ্রেণী। এবং কে না জানে চাষী শ্রেণী চিরদিনই 'যার মাটিতে বাস করি, তারেই গড় করি' এই নীতিতে আস্থাশীল। কংগ্রেস গদিতে এলে এরা সেই প্রথাতেই তাকে সেলাম বাজিয়েছিল। তা ছাড়া এদের মধ্যে বিরাট অংশ ভাগচাষী। জোতদার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই হিন্দু—অবশ্য সেজন্যেও নয়, কংগ্রেসে জোতদারদের

নির্বাচনে দলছুটি প্রত্যক্ষ ঘটনা। সুতরাং ওইসব জোতদারদের রাজনৈতিক মতই তাদের মত হয়ে উঠতে বাধ্য। প্রসঙ্গত মুস্লিম লীগ নেতাদের কংগ্রেসভুক্তির পর যদি কোথাও কোন (প্রাক্তন) লীগ নেতার প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের আনুগত্য দেখা গিয়ে থাকে, তার পিছনেও উপর্যুক্ত মনস্তত্ত্ব কাজ করেছে। এই নেতারা ছিলেন হয় নবাব-জমিদার, নতুবা শাসক শ্রেণীর অন্যতম স্তম্ভ। তাই অন্তত দেশ ভাগের পর এসব ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভাব খোঁজবার চেয়ে কৃষক মনস্তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখা যুক্তিসঙ্গত। প্রয়োজনবোধে অর্থাৎ তথাকথিত শ্রেণী স্বার্থে সংঘাত ঘটলে এরাই দেখেছি দলে দলে বামপন্থীদের (কম্যুনিস্ট বা আর এস পি) পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। গত নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি কেন্দ্রের ফলাফলের প্রতি লক্ষ করলে তা বোঝা যায়।

শ্রী সেনগুপ্ত বলেছেন, নদীয়া-চব্বিশ পরগনায় 'অধিকাংশ আসনেই মুসলমান ভোট ব্যালেনসিং ফ্যাক্টর'। আমার মতে—এ ধরনের সিদ্ধান্তে আসা আর কোন জমির একগাছি ধানের শীষ হিসেব করে বছরে ধান উৎপাদনের হিসেব কষে ফেলা—একই বিভ্রান্তি। কবীর ভ্রাতৃদ্বয় আসলে নিমিত্ত-মাত্র—এবং আমার ধারণা, এ নিমিত্তকে গুরুত্ব দেওয়া মানে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত গ্যাসকুম্ভকে অকারণ খেলার ছলে টেনে আনা। মুর্শিদাবাদ (আমার জন্মস্থান) বা উত্তরবঙ্গে কংগ্রেস জয়ী হয়েছে—এর কারণ কবীর ভ্রাতৃদ্বয়ের তথাকথিত সংগঠনশক্তির অনুপস্থিতি নয়, বামপন্থীদের দুর্বলতা। আমার বক্তব্য হচ্ছে, উত্তরোত্তর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন দাঁড়াচ্ছে, যেখানে কোন সাম্প্রদায়িক জিগিরের ছলে পানি পাবার কথা নয়। দেশের সকল মানুষই রাজনীতি তথা নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন এবং অপরপক্ষে কোন দিকে পা বাড়াবে, এই দুই ঘাত-প্রতিঘাতে এবার নিরন্তর পীড়িত ছিল। অবশেষে চরম মুহূর্তে একটা কিছু করে ফেলেছে মাত্র। একমাত্র এ কারণেই 'সাম্প্রদায়িকতা' খুব বড় ফ্যাক্টর নয়।

শ্রী সেনগুপ্ত কর্ডনিং এবং ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভের কথা বলেছেন। কর্ডনিং ছিল গ্রামাঞ্চলে। সেখানে কর্ডনিং করে বহু লোকের হাতে পয়সা এসেছিল। চাষীরা তো খুশীই ছিল। রাগের কারণ ছিল খুবই অল্প সংখ্যক মানুষের এবং তারা শহরবাসী প্রধান অংশে। ব্যবসায়ীরা কোথাও অবশ্য সামান্য হয়রান হয়েছেন। কিন্তু তাও আঙুলে গুনে বলা যায়। এ'দের মধ্যে যাঁরা প্রকাশ্যে কংগ্রেস বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের প্রভাবও তেমনি নগণ্য। অবশ্য, আমার ধারণা, ডি আই রুলের জন্য নয়; উত্তরোত্তর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রশাসনিক ঝঞ্ঝাটের জন্যই এ'রা বিরক্ত হয়েছিলেন। তবে গ্রামাঞ্চলে লেভী সম্পর্কে শ্রী সেনগুপ্তের বক্তব্য সম্পর্কে আমি একমত।

সে যাই হোক, আমার মূল বক্তব্যের জের টেনে পরিশেষে জানাই যে, যত্রতত্র যেভাবে 'এবার মুসলমান ভোটই কংগ্রেসকে ডুবিয়েছে' এই সিদ্ধান্তটা বিঘোষিত হচ্ছে—তাতে মনে হয়, কংগ্রেসকে গদিচ্যুত করার পরোক্ষ কৃতিত্ব একমাত্র মুসলমানদের। এটা হাস্যকর কথা। পশ্চিমবঙ্গে তথা সারা ভারতবর্ষের গণমানসে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষই আজকের ঐতিহাসিক সত্য।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কলিকাতা—১৪

পশ্চিম বাংলার শিক্ষামন্ত্রী

দেশ পত্রিকায় পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রি-সভার যে পরিচয় বেরিয়েছে তাতে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম-এ পাস করেন। এই তথ্যটি সম্পূর্ণ ভুল। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৮ সালে ইংরেজীতে এম-এ পাস করেন, আর সেই বছর প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন।

সঞ্জীবকুমার রায়চৌধুরী
গড়িয়া

কোল-ইয়ারী কথা প্রসঙ্গে

সম্প্রতি কয়েকজন কোলিয়ারী সংশ্লিষ্ট পাঠকপাঠিকার পত্র পেলাম। তাঁদের বিভিন্ন অভিযোগগুলির একটা সদুত্তর দেওয়ার প্রয়োজনবোধে এই পত্র লিখছি।

(১) গল্পচ্ছলে একটি কোলিয়ারীতে অবতরণের ইতিহাস লিখিত হলেও দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কোলিয়ারীর বিবিধ ব্যাপারে নানা সূত্রে সংশ্লিষ্ট থাকায় যা কিছু দেখেছি এবং শুনেছি তারই একটি সমষ্টিচিত্র কোল-ইয়ারী কথায় এ'কেছি। কেউ যাতে নিজের হুবহু-মূর্তি দেখে আহত না হন, অথচ সামগ্রিকভাবে সত্যতা বজায় থাকে এই ইচ্ছাই ছিল এর পিছনে। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ করলাম, কেউ কেউ নিজের হুবহু ছবি দেখতে পাননি বলে, এবং কেউ কেউ তা পেয়েছেন বলে সমভাবেই ক্ষুণ্ণ এবং ক্ষুব্ধ হয়েছেন, চিঠিগুলির বক্তব্যে এবং অশালীন ভাষায় তা অনুমিত হল।

(২) অন্যায়, অবিধি এবং অরুচিকে তামাশার ছলে টার্গেট হাইটে তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। যেখানে যা ভালো আছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই, কিন্তু খারাপ এবং পচনশীল পাপ থেকে ব্যাধি সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে বলেই তাকে নিয়ে ভাবিত হবার এবং তাকে আলোকিত করার প্রয়োজন আছে। এতদ্‌কারণে যদি কেউ আমার বিকৃতরুচির পরিচয় পেয়ে থাকেন তবে আমি নাচার।

(৩) কোলিয়ারীর কথা বলতে গিয়ে শুধু সেখানকার (অন্যত্র সেই ব্যাপার থাকলেও) ঘুষ এবং দুর্নীতির কথা বলব এটাই তো স্বাভাবিক। তবে 'ঘুষ সবাই খায়' কথাটা প্রথমত লেখকের মন্তব্য নয়; দ্বিতীয়ত, সবাই বলতে প্রত্যেকটি মানুষ নিশ্চয়ই বোঝায় না (ভালোমানুষ অনেক আছেন, এবং তাঁদের কাছ থেকেই শোনা), খনি-চাকুরির সর্ব স্তরেই ঘুষখোর ব্যক্তিরা রয়েছেন এইরকমই বোধ হয় বক্তব্য ছিল; নতুবা কলমচির মাথাব্যথার প্রয়োজন হত না। কোলিয়ারীর অফিসারদের প্রতি ব্যক্তিগত ঈর্ষা বা আক্রোশ আমার থাকবার কোনো কারণ নেই, অন্য স্থানের মতই সেখানকার মা বোন স্ত্রীদের প্রতিও সম্যক শ্রদ্ধাই আমি মনে মনে বহন করি। এবং একটি কৌতুক কাহিনী কখনোই সমস্ত অফিসারদের চর্ম ও বর্ণ নিয়ে শ্লেষ নয়। আহতদের জ্ঞাতার্থে বলি, কলমচির বন্ধুবান্ধব এবং নিকটাত্মীয় বেশী মাত্রায়ই চিকিৎসা-ক্ষেত্রে এবং কয়লা-ক্ষেত্রে ছড়ানো।

(৪) ডাক্তারদের বিদ্যার দৌড়, কোথাও বলিনি, বলেছি, দৌড় আলকালি মিকসচার ইত্যাদি পর্যন্ত। কারণ, কোলিয়ারীর নিজস্ব হাসপাতালে তাঁরা ওষুধপত্রে অনেক সময়ই এবং অনেকখানিই হাত-পা বাঁধা। যে কোনো কারণেই হোক, অন্যতর মূল্যবান ওষুধপত্র অনেক হাসপাতালেই শেষ পর্যন্ত থাকতে দেখিনি। এজন্য ডাক্তারদের আক্ষেপ করতে শুনেছি।

(৫) অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারদের আড়ালের সম্বোধন সম্বন্ধে (আমাদের কানের বাইরে, কি কি বিশেষ্য বিশেষণ এবং ক্রিয়াবিশেষণ যোগ করে আমাদের ডাকা হয় আমাদের পক্ষে তার সবটুকু জানা কি সম্ভব?) কারো কারো দৃঢ় নিশ্চয়তা, তাঁরা কখনো নাকি সাইকেলে চাপেন না, মদ্য পান করেন কিন্তু মাতাল হন না। ওয়াটার-কোয়ার্টার-কোল-কারেন্ট ইত্যাদি নাকি সত্যিই পুরোপুরি ফ্রি নয় ইত্যাকার প্রতিবাদ যে কত হাস্যকর, কোলফিল্ডের বহু সংখ্যক পাঠকই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় নিশ্চয় সে কথা জানেন। ভারত-বর্ষে এন সি ডি সি ছাড়াও বহু বেসরকারী কোম্পানীর কোলিয়ারী আছে এবং সেইসব খনিতে যেসব নিয়মকানুন সুযোগ সুবিধে চালু এবং রহস্যময় ব্যাপার ঘটমান, এ পর্যন্ত তার সামান্যই আমি লিখেছি।

(৬) সর্বোপরি, নিকট-দূর তথ্যমূলক গুরু প্রবন্ধ নয়, জীবনমুখী ভ্রাম্যমাণের রস-রচনা, এই কথাটি ভুলে গেলেই লেখক এবং লেখা 'টেকনিক্যালি সীরিয়াস' পাঠকদের কাছে পুরোপুরি মাটি হবে তাতে

সন্দেহ নেই। বর্তমান সাহিত্য-বিদ্‌ষেকের এই নিবেদন স্মরণে রাখলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

আমার বক্তব্য স্পষ্ট জানালাম, এতদ্‌সত্ত্বেও এ বিষয়ে আরো চিঠি এলে আমার পক্ষে নীরবতাই একমাত্র ধার্য হবে।

ত্রিলোচন কলমচী

আকাশবাণীর রবীন্দ্র সংগীত

৪ চৈত্র, ১৩৭৩ তারিখের দেশ পত্রিকায় 'আকাশবাণীর রবীন্দ্র সংগীত' সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শ্রীশান্তিদেব ঘোষ মহাশয়ের যে পত্র প্রকাশিত হয়েছে, তার এক জায়গায় প্রসঙ্গক্রমে লেখা হয়েছে, 'সায়গল যখন "এইচ এম ভি-র রেকর্ডের জন্য রবীন্দ্র-সংগীত গাইতে শুরু করলেন, তখন গুরুদেব তাঁকে গাইতে বারণ করেননি।" আমরা কিন্তু জানি, এইচ এম ভি থেকে 'সায়গল কোন দিনই কোন রবীন্দ্র সংগীত রেকর্ড করেননি। 'জীবনমরণ' এবং 'পরিচয়' এই দুখানি চলচ্চিত্রে মোট ছ'খানি রবীন্দ্র সংগীত তিনি গেয়েছিলেন, সেগুলি "নিউ থিয়েটার্স রেকর্ড"-এ প্রকাশিত হয়েছিল, এ ছাড়া আর কোন রবীন্দ্রসংগীত সায়গলের কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, সায়গল এইচ এম ভি থেকে শুধু রবীন্দ্র সংগীত কেন, কোন গানই রেকর্ড করেননি। পরে তিনি হিন্দুস্থান রেকর্ডে যোগ দেন।

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
কলকাতা ১৪

বিলীয়মান বাঙালী

গত ৪ ফেব্রুয়ারী, 'দেশে' প্রকাশিত "বিলীয়মান বাঙালী" প্রবন্ধটিতে 'রঞ্জন' বহির্বঙ্গে বাংলা ভাষার অবক্ষয়ের কথা আলোচনা করেছেন।

বাংলা ভাষা বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির বাহন, কিন্তু কি বাংলাদেশে কি বাংলাদেশের বাইরে, সর্বত্রই সেই ভাষা কিরূপ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে সে সম্বন্ধে বাঙালী উদাসীন; কারণ বাঙালী আজ "ভারতীয়" হয়ে পড়েছে! ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ-রক্ষা সম্বন্ধেও বাঙালী নেতারা ও জনসাধারণ নীরব।

বাংলা ভাষার সহিত প্রবাসী বাঙালীর সংযোগ শিথিল হয়ে এসেছে—এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু কি প্রতিকূল অবস্থার সহিত তাকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে, 'রঞ্জনে'র প্রবন্ধটিতে তার কোন পরিচয় পাই না। ইংরাজ-শাসনে বাংলার বাইরে বাংলা শিক্ষার যে সুযোগ ছিল আজ তা অপসৃয়মান। এলাহাবাদ শহরে প্রায় ৩০০০০ বাঙালীর বাস—এখানে সরকার বা করপোরেশন পরিচালিত কোন বাংলা প্রাইমারী স্কুল নাই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষার মাধ্যমরূপে স্বীকৃত নয়। বাঙালী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতেও যেখানে অধিকাংশ ছাত্র ও শিক্ষক বাঙালী, শিক্ষার মাধ্যম একমাত্র হিন্দী। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর কোন স্তরেই বাংলার স্থান নাই। সরকারী ভাষা হিন্দী, জীবিকার জন্য শিখতেই হবে। "প্রাদেশিকতার" অপবাদের ভয়ে উচ্চমহলের বাঙালীরাও মাতৃভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্য কোন আলোচনা করেন না।

কিন্তু এরূপ প্রতিকূল পরিবেশেও প্রবাসী বাঙালী যথাসাধ্য মাতৃভাষার সহিত সংযোগ রক্ষা করছে। প্রতি বড় শহরেই বাংলা সাহিত্যসভা ও পাঠাগার আছে। নাট্যাভিনয়, গানের মজলিসও এই সংযোগ-রক্ষার সহায়তা করে। অন্যান্য ভাষাভাষীরা ২/৩ পুরুষের মধ্যেই নিজ মাতৃভাষা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। কিন্তু বাঙালী ছেলেমেয়েরা নিজ মাতৃভাষা অন্তত কথ্যভাষা ভোলে না। অবশ্য কথ্যভাষার উপর হিন্দীর প্রভাব ঠেকান যায় না। বাংলা সাহিত্যের সহিত অনেক বাঙালীর সংযোগ ক্ষীণ কিন্তু মাতৃভাষা উত্তরপ্রদেশের বাঙালীর কাছে অতি প্রিয়। এই প্রীতিই বাঙালী-বিদ্বেষের একটি প্রধান কারণ।

'রঞ্জন' প্রবাসী বাঙালী সম্বন্ধে কয়েকটি অনুদার ও বেদনাজনক মন্তব্য করেছেন। প্রবাসী বাঙালীরা যে অনেকেই অর্থনৈতিক কারণে, জীবিকার জন্য দেশ-ছাড়া হয়েছেন তাতে সন্দেহ নাই। জনসাধারণের প্রধান সমস্যাই অর্থনৈতিক। সাহিত্য, সংস্কৃত সভ্যতায় কোন্ সম্প্রদায়ের কি অবদান, তার সন্ধান সেই সম্প্রদায়ের নীচুতলায় করা নিরর্থক। দেখতে হবে এই জনগোষ্ঠীর মনীষীরা কি করেছেন। প্রবাসী বাঙালীর মধ্যেও এরূপ অনেক মহাত্মা ছিলেন ও আছেন, শিক্ষা সংস্কৃতি ও জনকল্যাণের জন্য যাঁদের দান অসামান্য। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সভাটি প্রবাসী বাঙালীরই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। সুতরাং প্রবাসী বাঙালীকে "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের লাঙুলবাহী", "তন্ডুল-বাহী"রূপে চিত্রিত করা অযৌক্তিক ও অশোভন।

লেখক আরও বলেছেন, প্রবাসী বাঙালী "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তল্পীবাহক" হওয়ার জন্যই অন্য প্রদেশে অপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। বাঙালী-বিদ্বেষের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক সংঘাত কিন্তু তার দায়িত্ব শুধু প্রবাসী বাঙালীরই উপর চাপান অসঙ্গত। বাংলা-দেশেই একশ্রেণীর বাঙালী আছেন, যাঁরা ভিন্ন-দেশীয়দের অপমানসূচক পদবীতে ভূষিত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। প্রবাসী বাঙালীও তাঁদের উন্নাসিক মনোভাবের আওতায় পড়েন। এই অনুদার মনোভাবই বাঙালী-বিদ্বেষের অন্যতম কারণ। এই বিদ্বেষের ঝড়ঝাপটা প্রধানত প্রবাসী বাঙালীকেই সহ্য করতে হয়।

পরিশেষে এই বলি, বঙ্গে ও বহির্বঙ্গে বাংলা ভাষার অবক্ষয় সম্বন্ধে সকল বাঙালীকেই সচেতন হতে হবে। এ বিষয়ে পূর্ববঙ্গের উদ্যম আমাদের অনুকরণীয়। মনে রাখতে হবে, "ভূয়া ভারতীয়ত্বের" মধ্যে "বাঙালিত্ব" বিলীন করতে গেলে বাঙালী হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কিন্তু সেইসঙ্গে "মহামানবের সাগরতীরে" মহাভারতের প্রতিষ্ঠাও অলীক স্বপ্নে পরিণত হবে।

জ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায়
এলাহাবাদ-২

এই শিল্পীরা

২০ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় সুনন্দবাবু তাঁর 'এই শিল্পীরা' শীর্ষক জার্নালে কোন "একটি ছিমছাম কেজো তরুণ"-এর বিবরণ দিয়েছেন। প্রায় দু মাস আগে আমার কাছেও একটি 'তরুণ', মনে হয় জার্নালের উক্ত 'তরুণ'ই, এসেছিলেন। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই কারণে যে, এই দু' মাসের মধ্যেও তিনি কিছুই বদলাননি। কেবল জার্নালে তাঁর পায়ের চটির কথা আর হাফ শার্টের রঙ সাদা এরই শুধু উল্লেখ নাই। আর সেবার তিনি এসেছিলেন হাজরা রোড হ'তে (নম্বর উল্লেখ করলাম না) আর পরিচয় দিয়েছিলেন একজন চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্টের—যাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু সেই মুহূর্তে আমিও ঠিক তাঁকে মনে করতে পারছিলাম না বলে 'তরুণ'টি আশ্চর্য হয়ে একই কথা ('বলেন কি—' ইত্যাদি) বলেন।

যাই হোক, তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলাম আমার সাধ্যমত সাহায্য করবার; আরও বলেছিলাম, "রাউরকিল্লায় আমার এক আত্মীয় থাকেন, তাঁর নামে আপনাকে একখানি চিঠি দেব—যাতে করে ওখানে পৌঁছিয়েই আপনাকে কোন অসুবিধায় না পড়তে হয়। আর হ্যাঁ, আমি প্রায়ই সন্ধ্যায় হাজরা মোড়েই এক বন্ধুর কাছে যাই, ওই সময় আপনার 'প্যাসেজ মানি' যতটা পারি দিয়ে আসবো আপনার ঠিকানায়। বাসায় থাকবেন যেন, আপনার ট্রেন তো সেই রাত্রিতে, কোন অসুবিধা হবে না।"

তরুণটি বিমর্ষ মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—"স্যার, আপনি আবার শুধু শুধু কষ্ট করবেন!" আমি "না না ঠিক আছে" বলতেই একটু হেসে বললেন—তা হলে চলি।

কিছুটা সংশয়াচ্ছন্ন এবং কিছুটা কৌতূহলবশেও বটে, যথানির্দিষ্ট সময়ে উক্ত ঠিকানায় খোঁজ করে তাঁকে পাই নি।

দিলীপ মিত্র
কলকাতা ১২

সাহিত্য সংবাদ

৪ঠা মার্চ সংখ্যায় 'সাহিত্য সংবাদ' নামের লেখায় সনাতন পাঠক 'পানি' শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে যা বলেছেন সে সম্পর্কে আমার ভিন্ন মত। লিখেছেন, "সংলাপে 'পানি' চলতে পারে, কিন্তু বর্ণনায় 'পানি' ব্যবহার অসাহিত্যিক, এবং জোর করা।"

এটা ওঁর অসাহিত্যিক লাগলেও অনেকের কাছে হয়ত লাগবে না। চণ্ডীমঙ্গল, শূন্যপুরাণ ইত্যাদিতে মধ্যযুগে 'পানি'/'পানী' শব্দের বহুল ব্যবহার আছে। বহুলোকের কাছে সাহিত্যে ব্যবহৃত 'পানি' শব্দ আদৌ খটকা লাগায় না।

আর একটি কথা। উনি লিখেছেন, এই শব্দটির ব্যবহারে 'যেন হিন্দু মুসলমানে একটা আলাদা করার ব্যাপার আছে' এবং 'আরবী-ফারসী' শব্দ আলোচনা প্রসঙ্গে শব্দটির কথা পেড়েছেন। বহু হিন্দু 'পানি' শব্দ ব্যবহার করেছেন। তার ওপর শব্দটি হিন্দু দেবভাষা সংস্কৃত থেকে জাত তদ্ভব— সং পানীয় বা পানি/পানী।

রনেন বসু
বনগাঁ

বাংলা বানান

শ্রীচৌধুরী বলেছেন যে, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তৎসম শব্দের বানানে হাত দেবেন না। কথাটার মানে তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, যেসব তৎসম শব্দের বানানে যুক্তাক্ষর চলছে তাতে হস্তক্ষেপ করা হবে না।

তৎসম শব্দ বাদ দিলে বাংলা ভাষায় থাকে এমন সব শব্দ, যাদের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নেই, আর থাকে বিদেশী শব্দ।

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী এইসব শব্দের বানান সংস্কার করার পক্ষে। তাঁর যুক্তি হচ্ছে এই যে, বানান সংস্কারের ফলে ছাপার কাজে, টাইপের কাজে বা যদি বাংলা টেলি-প্রিণ্টার চালু হয় তবে তার কাজে সুবিধে হবে।

কিন্তু যুক্তাক্ষর যখন উঠে যাচ্ছে না, তখন ছাপাখানা থেকে যুক্তাক্ষরের হরফ উঠে যাবে না, তৎসম শব্দের জন্য যুক্তাক্ষর থাকবেই, আর তা লিখতে হবে আর লেখা ছাপতেও হবে। ছাপাখানার তাই বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। তাই পুরোপুরি যদি বানান না পরিবর্তন করা যায়, তৎসম ছাড়া অন্য শব্দের বানানকে যুক্তিহীনভাবে এক ধার থেকে 'সিধে' করার চেষ্টা করে লাভ কি?

তার মানে এ কথা বলছি না যে, কিছু কিছু পরিবর্তন করতে হবে না; কিন্তু সেই পরিবর্তন আস্তে আস্তে করতে হবে— উচ্চারণ, ব্যাকরণ আর ভাষার ইতিহাসের সঙ্গে সংগতি রেখে।

শুধু ছাপাখানার দিকে চেয়ে পরিবর্তন করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না।

আর টেলিগ্রাফ বা টেলিপ্রিণ্টারের কাজের জন্য বাংলা বানান সংস্কার করার দরকার কি? সোজাসুজি রোমান হরফ ব্যবহার করলেই চমৎকার কাজ চলে যাবে।

বিদেশী শব্দের ব্যাপারে অমিতাভবাবু খড়্গহস্ত বলে মনে হচ্ছে। না হলে এত দিনের চেনা 'লণ্ডন' শব্দটিকে লণ্ডভণ্ড করবার বাসনা কেন? দেশের পাতায় এখন 'লনডন' লেখা হচ্ছে। এ কথা ঠিক যে, ইংরেজরা তাদের রাজধানী London-কে যেভাবে উচ্চারণ করে, আমরা সেরকম করতে পারব না। কেননা, সেরকম উচ্চারণ আমাদের জিভে, টাকরায় সয় না; কিন্তু তার যতটা কাছাকাছি "বাঙালী উচ্চারণ" করা যায় তার বানান লিখলে হয় 'লণ্ডন' 'লনডন' নয়। 'লনডন' উচ্চারণ করলে উচ্চারণ হয় লন(অ) ডন(অ)-এর মত। আমরা 'লণ্ডন' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত, তার উচ্চারণও আমাদের কানে চেনা; কাজেই আমরা যখন 'লনডন' শব্দটি দেখি তখন আমরা মনে মনে 'লণ্ডন' শব্দটি ভাবি আর 'লনডন' শব্দটি উচ্চারণ করবার সময় আগেকার উচ্চারণের যতটা কাছাকাছি পারি ততটা কাছাকাছি করি।

কিন্তু লণ্ডন শব্দটি যখন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, তখন থাকবে শুধু লনডন। যারা আমাদের পরে বাংলা শিখবে তাদের সামনে শুধু থাকবে 'লনডন' শব্দটি এবং সেটি তারা উচ্চারণই করবে 'লনোডনো' করে।

শ্রীচৌধুরী এখানে প্রশ্ন তুলেছেন যে, যদি চনচন শব্দটি আমরা চনোচনো করে উচ্চারণ না করি তবে 'লনডন' কথাটিকে 'লনোডনো' করে উচ্চারণ করব কেন? মনে হচ্ছে, তিনি কড়া নিয়মে বিশ্বাসী। কিন্তু কথা হচ্ছে, বানানে আর উচ্চারণে মাঝে মাঝে তফাত থাকে, সব ভাষাতেই থাকে—আমাদের বাংলা ভাষাতেও আছে। ইংরেজী But, Put-এর কথা তো সকলেরই জানা। আমাদের বাংলা ভাষাতেই দেখুন, টনটন, ঘনঘন, শনশন আমরা একরকম করে উচ্চারণ করি (টনটন-এর মত), আবার ঘন ঘন শব্দটির উচ্চারণ করি 'ঘনো ঘনো'র মত করে। তাই ঘন ঘনকে যদি আমরা স্বচ্ছন্দে 'ঘনো ঘনো' উচ্চারণ করতে পারি, তা হলে 'লনডন'কে লনোডনো উচ্চারণ করতে আমাদের বাধাটা কোথায়?

শেষকালে একটা কথা বলি। প্রবন্ধে শ্রীচৌধুরী বলেছেন যে, এই বানানের সংস্কার আস্তে আস্তে আমাদের সয়ে যাবে। সয়ে হয়ত যাবে ঠিকই, যেমন আজকাল অনেক কিছুই আমাদের সইতে হচ্ছে আর সয়েও যাচ্ছে, কিন্তু এই ধরনের মন্তব্যে হয়ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভার আছে কিন্তু যুক্তির ধার কোথায়?

বিজয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
বোম্বাই

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটি প্রকাশ করে আপনারা উদারতা এবং বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধারই পরিচয় দিয়েছেন। এবিষয়ে পরবর্তী আলোচনাগুলিও প্রয়োজনীয় হয়েছে। এবিষয়ে আমার বক্তব্য খুব সামান্য।

আমরা যখন 'Form' শব্দটিকে বাংলায় 'ফরম' লিখি, তখন ঠিকই লিখি। কারণ, বাংলায় আমরা Form-কে Forom উচ্চারণ করি। এরকম অনেক ইংরেজী শব্দকেই আমরা বিকৃত করে অথবা বাংলায় স্বকৃত করে উচ্চারণ করে থাকি। সে-ক্ষেত্রে Form-কে বাংলায় 'ফর্ম' না লিখে 'ফরম' যথার্থ কারণেই লিখি। কিন্তু Park বা Card ইত্যাদি শব্দকে আমরা বাংলায় যেহেতু বিকৃত উচ্চারণ করি না, ইংরেজী উচ্চারণই করি, তখন 'পার্ক' বা 'কার্ড' না লিখে 'পারক' বা 'কারড' লিখব কেন? রেফ (ʼ) এবং 'র' যদি একই কাজ করতে পারত, তা হলে তাদের দুটোই সৃষ্টি হত না। 'র্' এবং 'র' মধ্যে যে পার্থক্য আছেই, তা তর্কের বিষয় নয়। কিন্তু রেফ (ʼ) বা 'র্'-কে বিসর্জন দিয়ে যখন আমরা সরলীকরণ করতে চাই, তখন বস্তুত আমরা ভাষাকে আরও সস্তা করে ফেলি। Colour-কে মার্কিনরা Color লেখেন। এই বিকৃতির কারণ তাঁদের উচ্চারণের বিকৃতিকেই সমর্থন করেন। এই কারণ দেখিয়ে আমাদের পক্ষে 'পার্ক'-কে 'পারক' লেখা হাস্যকর ভাবাবত্তা। আরেকটি কথা, ভাষার বিকাশের, পরিবর্তনের একটা নিয়ম আছে—একটা ধারা আছে। হঠাৎ ভাষার পরিবর্তন করা যায় না, বিকৃতি করা যায় মাত্র।

কালীকৃষ্ণ গুহ
কলিকাতা-২৭

গঙ্গায় জাহাজের ভীড়

তরুণ রুশ চিত্রীর চোখে কলকাতা

আরন আপ্রিল তাঁর নাম। বেশ নাম। অনুপ্রাস আছে। পঁয়ত্রিশ বছরের যুবা। কলকাতার পথেঘাটে ঘুরতে দেখা যায়। হাতে একটা স্কেচবই।

যখন তখন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পড়ে একমনে পেন্সিল—স্কেচ করে খাতার পাতা ভর্তি করতে দেখা যায় এই রুশী-যুবাকে।

আরন আপ্রিল

এই সেদিন কলকাতার বন্দরে এসে ভিড়েছিল এক জাহাজ, মাল নিয়ে। আসছে সুদূর কৃষ্ণসাগরের এক সোভিয়েত বন্দর থেকে। এই জাহাজে কলকাতায় এসে নেমে পড়লেন তরুণ সোভিয়েত শিল্পীটি। তারপরই চলল কলকাতায় জীবন খোঁজা আর সেইসব দৃশ্যপটে নিজের স্কেচ করার খাতাটি ভরিয়ে তোলা।

কলকাতায় যা পাবার আশা নিয়ে এসেছিলেন, তা মিটেছে? আরনের মুখে একটু হাসি লেগে থাকে। হ্যাঁ, তা বইকি। মস্কো থাকতেই শহর কলকাতা আর তার সদা চলমান জীবন-স্রোত সম্পর্কে শুনে

বাঙালী পরিবারের গৃহিণী

ধর্মতলার মোড়ে মসজিদের সামনে পথচারী
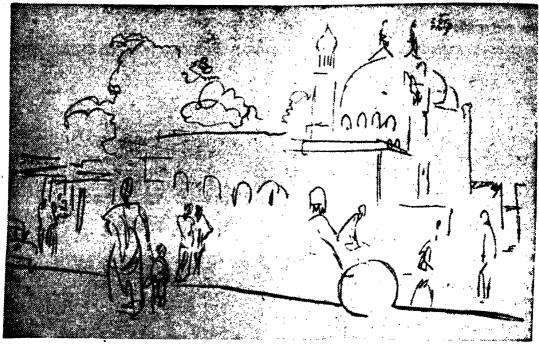
তাঁর শিল্পী মনে টান লেগেছিল। ভেবেছিলেন বন্ধু কলকাতাবাসীর জীবনের নানান ছবি এঁকে নিজের দেশের মানুষের কাছে উপহার দেবেন। সে কাজে তিনি আনন্দ পেয়েছেন। কলকাতা তাঁর আশ মিটিয়েছে।

আরনের চোখে যে কলকাতা ধরা পড়েছে সে হল মানুষের কলকাতা, জাহাজঘাটার সামনে বন্দরের শ্রমিক বিশ্রাম করছে, মাঝি-মাল্লারা নৌকোর গলুইয়ের ওপর, গঙ্গায় জাহাজের ভিড়ের মাঝ থেকে উঁকি দিচ্ছে, হাওড়ার ব্রিজ, পার্কে হেঁটে বেড়াচ্ছে ছেলেমেয়েরা, ধর্মতলার মোড়ের সেই মসজিদের সামনে পথচারী, ময়দানের দিক থেকে দেখা যাচ্ছে মাথাতোলা চৌরঙ্গীর প্রাসাদ, কফির দোকানে দুই বন্ধু মশগুল হয়ে বসে, বাঙালী পরিবারের গৃহিণীর প্রতিকৃতিও।

আরনের জন্ম ১৯৩২-এ। ১৯৫৮-য় মস্কোর সুরিকফ আর্ট ইন্সটিটিউট থেকে পাশ করে বেরোন। তরুণবয়সী সোভিয়েত কৃতি শিল্পীদের অন্যতম। ইতিমধ্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নে ও বিদেশে তাঁর কাজের প্রদর্শনী হয়ে গেছে। একটি অ্যালবামও বেরিয়েছে। দেশে ফিরে গিয়ে এইসব টুকরো স্কেচ থেকে করার ইচ্ছে বড় বড় তেলরঙের কাজ। যার নাম হবে "কলকাতায় ক'দিন"। তারপর, রাজধানী মস্কোয় একটি একক প্রদর্শনী। হাসিমুখে আরন তাই জানালেন।
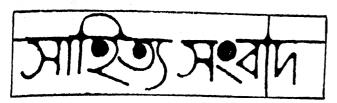
বাংলা ছোট গল্পের অস্বস্তি

কোনো বইয়ের দোকানে কিংবা পাব্লিক লাইব্রেরীতে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেই টের পাওয়া যাবে, ক্রেতা বা পাঠকদের সাম্প্রতিক রুচি কিরকম। যাঁরা কবিতা বা প্রবন্ধ গ্রন্থের পাঠক—তাঁরা অবশ্যই এক বিশেষ ধরনের, তাঁদের জন্য সংরক্ষিত আসন। গদ্য-গল্পের পাঠকদেরই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ যে-কোনো বইতেই হাত দিয়ে প্রথমেই দেখে নেন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাত্র-পাত্রীদের নাম মোটামুটি এক কিনা। লাইব্রেরী কিংবা দোকানে এই প্রশ্ন প্রতিনিয়ত শোনা যায়, ওটা কি বই? টানা গল্প তো? টুকরো টুকরো গল্প না তো? যদি দৈবাৎ তাই হয়, তা হলে বিরক্তিপ্রসূত উক্তি, ছোট গল্প? দূর ছাই!

ছোট গল্প সম্পর্কে এই সাম্প্রতিক 'দূর ছাই' মনোভাবের কারণ কি, কিছুতেই বোঝা যায় না। সম্ভবত এর কোনো সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু এর ফলে বাংলা ছোট গল্প এখন গোলক-ধাঁধার মধ্যে পড়েছে।

এ কথা অনেকেই মানেন, এ পর্যন্ত বাংলায় সত্যিকারের উপন্যাস লেখা হয়েছে কয়েকটি মাত্র, কিন্তু বাংলা ছোট গল্প সত্যিকারের গর্ব করার মতো। বাংলা কবিতা এবং ছোট গল্পই পৃথিবীর যে-কোনো ধনী ভাষার সমশ্রেণীভুক্ত হবার যোগ্য। বাংলা কবিতার অগ্রগতি থেমে থাকেনি, কবিতা যে-হেতু পৃষ্ঠপোষকদের মুখাপেক্ষী নয় বা সে-রকম আশাও কখনো করে না, তাই বাংলা কবিতার সৃষ্টিপ্রাচুর্য এখনো সমান বা বেশী। কিন্তু বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে অনেক প্রতিভাবান নবীন লেখকের আগমন সত্ত্বেও ছোট গল্প যেন কিছুটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে আছে।

এখনকার যাঁরা প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ লেখক তাঁরা যদিও অনেকে এখন বছরে দু তিনটি উপন্যাস রচনা করছেন, কিন্তু তাঁদের প্রতিভার সবচেয়ে উজ্জ্বল রশ্মি পড়েছে তাঁদের ছোট গল্পেই। শুধু কল্লোল পত্রিকার নয়, ব্যাপকভাবে যাঁদের বলা যায় কল্লোল যুগের লেখক, তাঁদের অনেকগুলি ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যে বহু কাল সম্মানিত হয়ে থাকবে। কিন্তু, এ কথাও ঠিক, স্মরণযোগ্য গল্প ইদানীং তাঁরা প্রায় কেউ-ই লেখেননি। ছোট গল্প লেখায় আর কারুর বিশেষ মন নেই, এবং এর কারণটাও সম্ভবত খুবই বস্তুতান্ত্রিক। ছোট গল্পের আদর নেই।

ছোট গল্পের বই সহজে আজকাল ছাপা হয় না, প্রকাশকদের ওতে উৎসাহ নেই। খুব নাম-করা লেখকদের দু চারখানা উপন্যাস ছাপার পর কিংবা ছাপতে পারার লোভে তাঁর দু একখানা ছোট গল্পের বইও উপরোধে ছাপা হয় বটে, কিন্তু সাধারণ-ভাবে ধরে নেওয়া যায় যে, ছোটগল্পের বই ছাপা প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। ছোট গল্পের এখন একমাত্র চাহিদা পুজোর সময়। পুজোয় বহু পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বেরোয়, সেইসব বিশেষ সংখ্যার দু' তিনখানা উপন্যাসের আশেপাশে পাতা সাজাবার জন্য কিংবা বিজ্ঞাপনে খ্যাতিমান লেখকের নাম ব্যবহার করার জন্য কয়েকটি ছোট গল্পও রাখতে হয়। পুজোর সময় যে বিখ্যাত লেখকের দুটি ছোট গল্প দেখতে পাওয়া যায়, সেবার তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা চার কি পাঁচ। এসব ক্ষেত্রে, ছোট গল্পগুলির ক্ষেত্রে সুবিচার করা ঐসব লেখকদের পক্ষে সম্ভব না হওয়াই সম্ভব। একটা ছোট গল্প যদি ছাপা হবার পর পত্রিকার পাতাতেই কবরস্থ হয়ে থাকে, পুস্তকাকারে প্রকাশের সম্ভাবনা না থাকে, তবে ছোট গল্প রচনার জন্য যত্ন,

মনোযোগ বা আগ্রহ কত দিনই বা থাকবে! লেখকরাও তো মানুষ।

আর এক রকম ছোট গল্প বেরোয়, ছদ্মবেশী। উপন্যাসের মারাত্মক লোভে অনেক হঠাৎ ফেঁপে ওঠা পত্রিকার (অধিকাংশই সিনেমা-পত্রিকা) সম্পাদকরা স্থানাভাব কিংবা লেখকদের সময়াভাব সত্ত্বেও অনেক কুড়ি-পঁচিশ পাতার গল্পকেও উপন্যাস বলে বিজ্ঞাপিত করেন। এসব গল্পগুলো আকারে ছোট হলেও ছোট গল্প নয়, মাটির তলার টেলিফোন কানেকশনের মতন এসব ছোট গল্পেরও নানা দিকে অনেক গোপন ফ্যাকড়া বেরিয়ে থাকে—পরে লেখকরা সেইসব ফ্যাকড়া টেনে টেনে সেগুলোকে মাঝারি সাইজের উপন্যাসে রূপান্তরিত করেন। বস্তুত, খ্যাতিমান লেখকদের ইদানীংকার প্রায় সব ছোট গল্পের মধ্যেই উপন্যাস কিংবা সিনেমা হবার উচ্চাশা লুক্কায়িত থাকে—অর্থাৎ নেহাত শুধু ছোট গল্প হওয়া ছাড়াও সে যেন আর কোনো যোগ্যতা দেখিয়ে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। বোঝাই যাচ্ছে, দোষ লেখকদের নয়, কার্যকারণের সম্বন্ধ পাঠক-দের আকস্মিক রুচি পরিবর্তনের সঙ্গে। বাংলা ছোট গল্পের এত সুনাম, কিন্তু এ পর্যন্ত একটিও বাংলা ছোট গল্পের বই কি আকাদেমি পুরস্কার কিংবা রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে? পাঁচ সাত বছর আগেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু কিংবা বিমল কর যে-রকম সব আশ্চর্য ঝকঝকে ছোট গল্প লিখছিলেন, এখন কি তাঁরা সে-রকম মনোযোগ দিতে পারছেন?

ছোট গল্পের এই দুর্দিনে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তরুণ লেখকরা। সমালোচকদের এ কথা মোটেই ঠিক নয় যে, এখনকার তরুণ লেখকরা ভালো ছোট গল্প লিখতে পারছেন না। সাহিত্য কোনো একটা জায়গায় এসে থেমে থাকে—এ কথা সত্যি হতেই পারে না। বরং বলা যায়, এখনকার তরুণ গদ্য-লেখকরা উপন্যাসের বদলে ছোট গল্পেই নতুনরকম ও অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিচ্ছেন। উপন্যাস লেখার জন্য কিছুটা বেশী অভিজ্ঞতা বা বেশী মানুষকে চেনার জন্য সাধারণত একটু বেশী বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, কিন্তু ছোট গল্পে তরুণ লেখকরা তাঁদের আলাদা ধরনের পর্যবেক্ষণ, সমকাল, নিজের জীবন ও বক্তব্য প্রকাশ করার সুযোগ পান। যাঁদের বলা হয় পঞ্চাশের দশকের লেখক, যে-সব লেখকের বয়েস তিরিশের কাছাকাছি বা বেশী, এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রকমের নতুন ছোট গল্প লিখেছেন দীপেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, মতি নন্দী, দেবেশ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যো-পাধ্যায়, শংকর চট্টোপাধ্যায়, কবিতা সিংহ, মিহির মুখোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে-- এঁদের সমস্ত ভালো গল্পই ছড়িয়ে-ছাড়িয়ে আছে পত্র-পত্রিকায়। এঁদের মধ্যে মাত্র দুজন ছাড়া আর কারুরই ছোটগল্পের বই বেরোয়নি। বাংলা সাহিত্যে অনেক উল্টো-পাল্টা ব্যাপার তো আছেই—তিরিশ বছর যে লেখকের বয়েস, অন্তত দশ বছর ধরে লিখছেন—সমস্ত পাঠকরা তাঁর নাম জানেন, সমস্ত পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রকাশিত হয় —অথচ এ পর্যন্ত তাঁর একটিও বই বেরোয়নি—এরকম ভয়াবহ ঘটনাও বাংলা দেশেই সম্ভব।

পাঠকদের অবহেলা সত্ত্বেও তরুণ লেখকরা বাংলা ছোটগল্প নিয়ে নানান পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে একথাও ঠিক, যে-সব ছোটখাটো সাহিত্য-পত্রিকায় দুঃসাহসিক পরীক্ষামূলক গল্প সাধারণত প্রকাশিত হয়—বাংলাদেশে এখন তারও অভাব খুব।

*

ছোটগল্পের প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প মনে পড়লো। শোনা গল্প, গল্পটি অল্ডাস হাক্সলির নামে প্রচলিত, সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত নই। একবার একটি খুব হাল্কা, রুচিপূর্ণ কিন্তু অত্যন্ত জনপ্রিয়, বহু লক্ষ কপি সার্কুলেশন একটি পত্রিকার সম্পাদক অল্ডাস হাক্সলির কাছে এসে একটি ছোট গল্প চাইলেন। পত্রিকাটায় শুধু অশ্লীল ছবি আর রগরগে ঘ্যানভেনে জ্যাবজেবে লেখাই ছাপা হয়—সুতরাং সেই কাগজের পক্ষ থেকে তাঁর লেখা চাইতে আসায় হাক্সলি স্বাভাবিকভাবেই আশ্চর্য হলেন। কিন্তু গল্পের জন্য তাঁকে দাম দেওয়া হবে দশ হাজার টাকা এবং লেখার কোনো শর্ত নেই, তাঁর ইচ্ছেমতো নিজস্ব লেখাই লিখতে পারবেন। তবু হাক্সলি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা আমার কাছেই বা লেখা চাইছেন কেন?

উত্তরে সম্পাদক বললেন, আমরা গল্পটার জন্য দশ হাজার টাকা এক্ষুনি অগ্রিম দিতে রাজী আছি।

একটিমাত্র ছোটগল্পের জন্য দশ হাজার টাকা, সুতরাং হাক্সলি দু'তিনদিনের মধ্যেই গল্পটা লিখে দিলেন।

পরের মাসেও সেই সম্পাদক এসে বললেন, আপনার গল্পে আমাদের পাঠকদের মধ্যে খুব সাড়া পড়েছে। আর একটি গল্প দিন, সেই দশ হাজার টাকা। এবারও অগ্রিম।

আবারও হাক্সলি গল্পটা লিখে দিলেন। কিন্তু তার পরের মাসে সেই সম্পাদক এলেন না। আর কোনোদিনই এলেন না। ব্যাপারটা নিয়ে হাক্সলির মনে একটা খটকা রয়ে গেল।

দু'তিন বছর বাদে একটি পার্টিতে হাক্সলি সেই সম্পাদককে দেখতে পেলেন। কৌতূহলী লেখক তখন লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আপনাদের ঐ পত্রিকার জন্য হঠাৎ আমার কাছ থেকে অত দাম দিয়ে দুটো গল্প কিনলেনই বা কেন, আর তারপরে আর এলেনই বা না কেন?

সম্পাদক : আমাদের কাজ হয়ে গেছে।

হাক্সলি : কী কাজ হয়েছে?

সম্পাদক : শুনবেন? ব্যাপারটা হলো কি, সেই সময়ে আমাদের কাগজের সার্কুলেশন খুব বেড়ে যাচ্ছিল। প্রতি মাসে হাজার হাজার লোক গ্রাহক হবার জন্য টাকা পাঠাচ্ছিল। এদিকে, দেখেছেন হয়তো, আমরা পত্রিকা ছাপি এক ধরনের হাল্কা আর্ট পেপারে। সেই সময় ঐ কাগজটা বেশী পাওয়া যাচ্ছিল না, তাছাড়া অত বেশী কপি ছেপে আমরা কুলোতেও পারছিলুম না। কিন্তু গ্রাহকদের তো আর ফিরিয়ে দিতে পারি না। তাই পর পর দু' সংখ্যায় আপনার ঐ খটমটে, ইন্টেলেকচুয়াল দু'খানা ছোটগল্প ছাপতেই বহু গ্রাহক আমাদের কাগজ নেওয়া বন্ধ করে দিল। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

সনাতন পাঠক
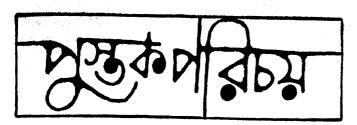
ভ্রমণ

একই গংগার ঘাটে ঘাটে। দ্বিতীয় পর্ব। শ্রীদেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত। এ মুখার্জি অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। মূল্য ১২·০০ টাকা।

এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তটি আকারে বৃহৎ। গংগার ঘাটে ঘাটে মানুষের বসতি, ঘাটে ঘাটে তীর্থ। এই তীর্থ পরিক্রমারই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল এই গ্রন্থ। ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে নানা ছোটো ছোটো কাহিনী, নানা চরিত্র, স্মৃতিকথা, উদ্ধৃতি—ঠিক যেমন হলে বৃহত্তর পাঠক সাধারণের রুচিকর হয়—ঠিক তেমনই সন্নিবেশিত হয়েছে। হয়তো বা একটু অতিরিক্তই হয়েছে। ফলে গ্রন্থের আকার বেড়েছে। কেবল মাত্র দ্বিতীয় পর্বেরই পৃষ্ঠা সংখ্যা সাড়ে পাঁচশোর কাছাকাছি।

বাংলা সাহিত্যের ভ্রমণ-কাহিনীর শাখাটি এখন দ্রুত প্রসার লাভ করছে। ফলে ঐ শাখার রচয়িতার সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান। এবং এইভাবে ভ্রমণ-কাহিনী রচয়িতাদের মধ্যে একটি অলক্ষ্য প্রতিযোগিতার আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। ভ্রমণকারীরা সকলেই তাদের অভিজ্ঞতার কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করুন, ক্ষতি নেই; কিন্তু বাজার দখলের চেষ্টায় একে অন্যকে টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যে ঠেলা ধাক্কার সৃষ্টি হচ্ছে তার ফলে ভ্রমণ-কাহিনীর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং আরো বেশী পাঠক-মনোরঞ্জনার্থে আরো বেশী রঙ ও মসলার মিশ্রণে তা ক্রমে বিবর্ণ, বিস্বাদ ও বুদ্ধিজীবী পাঠকের অপাঠ্য হয়ে যাচ্ছে। লেখকরা আর কেবল ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ওপরেই নির্ভর করছেন না, তাঁরা স্মৃতি থেকে কল্পনা থেকে নানাধরনের অবাস্তব ঘটনা, চমক সৃষ্টি করার জন্য কিম্ভূত চরিত্র, জোলো ভাবপ্রবণ প্রেম-কাহিনী, নীতি কথা প্রচারক জীবনদর্শন ইত্যাদির আমদানি করে গ্রন্থের যত্রতত্র তা প্রয়োগ করে চলেছেন। এই অস্বাস্থ্য ও অরুচিকর প্রচেষ্টা বন্ধ না হলে ক্রমে বাংলা ভ্রমণ-কাহিনী অপরিণতবুদ্ধি পাঠক-সাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। সাহিত্যেরও পুষ্টি ঘটবে না। লেখক প্রকাশকের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত চক্রান্ত ধরা পড়ে গেলে ক্রমে বুদ্ধিমান পাঠক এইসব গ্রন্থ ক্রয়ে বিরত হবেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানিও গতানুগতিক ধারার ব্যতিক্রম নয়। লেখকের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আছে, জীবনের প্রতি অনুরাগও আছে, এবং উদ্ধৃতির বহর দেখে মনে হয় বেশ কিছু গ্রন্থও তিনি পাঠ করেছেন। কিন্তু সম্ভবত তাঁর লোকচরিত্র অনুধাবনের ক্ষমতা সন্দেহাতীত নয়, গল্প-কথনেও তাঁর নৈপুণ্য প্রশংসাযোগ্য বলা যায় না মিতভাষিতায় তিনি একেবারেই অনভ্যস্ত। তাঁর গতি-মন্থর, অতিবিস্তারী বর্ণনাভঙ্গী এবং মাঝে মাঝেই স্মৃতিকথা কিংবা ঘটনার মাধ্যমে বিরক্তিকর কাহিনী-উপাদানের অনভিপ্রেত সমাবেশ তাঁর গ্রন্থটির আকার বৃদ্ধিতেই সাহায্য করেছে, গুরুত্ব বৃদ্ধিতে নয়। ধর্মপ্রাণ নরনারীর কথা ভেবে তিনি অবশ্য তীর্থস্থান, মন্দির এবং দেবদেবীদের মাহাত্ম্য পৌরাণিক শ্লোক উদ্ধৃত করে বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক বিবর্তনকে প্রায়ই উপেক্ষা করেছেন। তবু ঐসব বিশ্লেষণের জন্যই এই গ্রন্থ রচনার তাঁর পরিশ্রমকে প্রশংসা করা যায়।

৩৬৩/৬৬

জীবনী

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবন-কথা। আদি খণ্ড। শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়। সৎসঙ্গী মিলনী। কলিকাতা-৪০। মূল্য ২ ৭৫ পয়সা।

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবন কথা সাধারণ্যে প্রচার করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থটি রচনা করেছেন তাঁর এক ভক্ত শিষ্য। কিন্তু ভক্তের আকুতি যতটা আছে প্রকাশ ক্ষমতা সম্ভবত ততদূর নেই। শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য কর্মমুখর জীবন, গভীর জীবনবোধ, অনন্য সাধারণ প্রজ্ঞা এবং স্বচ্ছ দূরদৃষ্টি সম্পর্কে অনেকেই অবহিত আছেন; তাঁর যুক্তিনির্ভর, বাস্তবানুগ ধার্মিকতা—যা একদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতো বিশাল ব্যক্তিত্বকে উদ্বুদ্ধ করেছিল—তার পরিচয়ও অনেকে পেয়েছেন। কাজেই তাঁর জীবন-কথা যিনি রচনা করবেন, তাঁকে সর্বপ্রথম ভাবালুতা ও অকারণ আবেগ সংবরণ করে যুক্তি বিচার সহ আধুনিক জীবন-বোধের সঙ্গে সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। এ কাজ সহজ নয়, বহুদিনের প্রস্তুতি ছাড়া মহাপুরুষদের জীবন বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেক ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে।

আলোচ্য গ্রন্থখানি আগাগোড়া পদ্যে রচিত, এবং এই পদ্য রচনাকারের কবিত্বশক্তির পরিচয় বহন করে না। এবং যে পুরাতন পয়ারে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাও একালে পরিত্যক্ত। তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও আদর্শের কিছু কিছু এই গ্রন্থে প্রক্ষিপ্তভাবে উৎকলিত হয়েছে—যাতে এই গ্রন্থের কিছুটা গৌরববৃদ্ধি হয়েছে বলা যায়। ভক্ত সম্প্রদায়ের কিছু অংশ হয়তো এই গ্রন্থ পাঠ করে খুশী হবেন, কিন্তু সাধারণ পাঠক তৃপ্ত হবে বলে মনে হয় না। ছাপার ভুল অসংখ্য রয়েছে, গ্রন্থটির চেহারায়ও সুস্পষ্ট হেলাফেলা ও অযত্নের ছাপ।

৪৪৯/৬৬

প্রাপ্তি স্বীকার

স্বর্গকেনা। আশাপূর্ণা দেবী। শ্রীমতী সন্ধ্যারানী সাহা। ১২৮/২০, হাজরা রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য ৩·০০।

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে 'কেন্দ্রের নতুন মন্ত্রিসভা' প্রবন্ধে শ্রীচাগলার পরিচয় সূত্রে তাঁকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীচাগলা পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী।

২

বর্তমান সংখ্যায় বিশ্ব-বিজ্ঞানের প্রথম পাতার স্কেচটি ৯০২ পৃষ্ঠায় বসবে এবং উক্ত পৃষ্ঠার হাফটোন ছবিটি বসবে বিশ্ব-বিজ্ঞানের প্রথম পাতায়। নজরে পড়ামাত্র সংশোধন করা হয়েছে কিন্তু কিছু সংখ্যক কাগজে তা সম্ভব হয়নি বলেই অসংশোধিত সংখ্যাগুলির পাঠকদের এই ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল।

৪০ বছর ধরে আমরা পৃথিবীর পুরোভাগে আছি কিভাবে?

এর উত্তরও খুঁজে পেয়েছি আমাদের ক্রিকেটের মধ্যে। সারা ভারতের তুলনায় বোম্বাইয়ের সীমা কতটুকু? অথচ নিঃসন্দেহে বাকি ভারতের তুলনায় ক্রিকেটে বোম্বাই শক্তিশালী।

তা হলে খেলার ক্ষেত্রে কি স্থানমাহাত্ম্য কার্যকারণ? নাকি এমন একটা সময় আসে যখন এক একটি কেন্দ্র প্রতিভার মহাদানে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে? জ্ঞানবিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এর বহু নজির আছে। আবার খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও নজিরের অভাব নেই। বিশ্ব ক্রীড়াক্ষেত্রের সবচেয়ে বড় নজির বোধ করি 'বারবাডোজ'—সদ্য পরলোকগত বিশ্ববন্দিত ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলের জন্মভূমি।

আজ বেসরকারী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বেশীর ভাগ খেলোয়াড়ই বারবাডোজের অধিবাসী। গত বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যে দল টেস্ট-যুদ্ধে ইংলণ্ডকে ৩—১ ম্যাচে হারিয়ে 'রাবার' পেয়েছে, অধিনায়ক সোবার্সকে নিয়ে সেই দলের ৮ জন খেলোয়াড়েরই জন্মস্থান বারবাডোজের ঐ ছোট্ট দ্বীপ। ঐ দ্বীপেই জন্মগ্রহণ করেছেন ওরেল, উইকস, ওয়ালকট, সোবার্স, হান্ট, নার্স, হারমান গ্রিফিথ, চার্লি গ্রিফিথ, ওয়েসলী হল, এম মার্টিনডেল প্রভৃতি স্মৃতির রাজারা।

অথচ বারবাডোজের আয়তন অতি ক্ষুদ্র —মাত্র ১৬৬ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা সাড়ে তিন লাখের মত।

আগেই বলেছি, এমন একটা সময় আসে, যখন প্রতিভার মহাদানে এক একটি কেন্দ্র সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। ওরেল, উইকস, ওয়ালকট —বিশ্ব ক্রিকেটের স্মরণীয় ত্রয়ী — 'তিন ডবলিউ' নামে যাঁদের পরিচয়-পতাকা, তাঁদের জন্ম আবার বারবাডোজের একটি কেন্দ্রের এক মাইল পরিধির মধ্যে এবং তিনজনই পৃথিবীর আলো দেখেছেন মাত্র ১৮ মাস সময়ের মধ্যে। এ'দের মধ্যে ওরেলের স্যার খেতাব, উইকস ও ওয়ালকটের ও বি ই —ক্রিকেট খেলার জন্যই তিনজনের এই সম্মান।

এই প্রসঙ্গে তিন 'ডবলিউ'-এর টেস্ট অ্যাভারেজটা খতিয়ে দেখা যাক।

	টেস্ট	মোট রান	অ্যাভাঃ	সেঞ্চুরি
উইকস	৪৮	৪৪৫৫	৫৮·৬১	১৫
ওয়ালকট	৪৪	৩৭৯৮	৫৬·৬৮	১৫
ওরেল	৫১	৩৮৬০	৪৯·৪৮	৯

তিন 'ডবলিউ'-এর মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান খেলোয়াড় ওরেল আর ইহজগতে নেই। উইকস ও ওয়ালকট খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন ওরেলেরও আগে। কিন্তু এখনো যাঁরা খেলছেন, তাঁদের কীর্তিও হয়তো পূর্বসূরিদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাবে। সোবার্স ইতিমধ্যে অনেক এগিয়ে গিয়েছেন এবং তাঁর খেলায় এখন মধ্যাহ্নসূর্যের দীপ্তি। একজন ওরেল, একজন উইকস, একজন ওয়ালকট বা একজন সোবার্সই একটি দেশকে সুনামের সোপানে পৌঁছে দিতে যথেষ্ট। আর যে জায়গাটুকুর মধ্যে প্রায় সমপ্রতিভার সঙ্গী সহ এ'দের একত্র সমাবেশ, সে জায়গা ক্রিকেটে কত সমৃদ্ধ, সহজেই অনুমেয়।

বারবাডোজ দ্বীপের উপর ক্রিকেট-দেবতার এত আশীর্বাদ ঝরে পড়ল কেন? যুক্তি দিয়ে কি এর কোনো ব্যাখ্যা চলে? চলে না। এই পরিবেশ এবং প্রতিভার সমন্বয় প্রকৃতিরই দান বলে ধরে নিতে হবে।

*

অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় গতবারের বিজয়ী বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড় হিসাবে মালয়েশিয়ার তান আই হুয়ং-এর পরাজয় রীতিমত অপ্রত্যাশিত ঘটনা ৩০ বছর বয়সী প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আরল্যাণ্ড কপস ফাইন্যালে ২১ বছর বয়সী তান আইকে ১৫—১২ ও ১৫—১০ পয়েন্টে হারিয়ে আবার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছেন। এবার নিয়ে ৭ বার আরল্যাণ্ড কপসের অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ। অপরদিকে গত ১৫ মাসের মধ্যে বিশ্ব ব্যাডমিণ্টনে তান আইকের প্রথম পরাজয়।

ব্যাডমিণ্টনে অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের সম্মান টেনিসের উইম্বলডন জয়েরই মত। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সংস্থার আয়োজনে যেমন টেনিসে বিশ্বপ্রাধান্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নেই, তেমন ব্যাডমিণ্টনেও নেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যবস্থা। সম্ভবত উইম্বলডন এবং অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপের আকর্ষণ ক্ষুণ্ন হবার ভয়েই ইংরেজ প্রভাবান্বিত আন্তর্জাতিক সংস্থা এ দুটি খেলায় ব্যক্তিগত বিশ্বপ্রাধান্য বিচারের ব্যবস্থা করেননি। তাই উইম্বলডন এবং অল ইংলণ্ড বিজয়ীর অলিখিত বিশ্বজয়ীর সম্মান।

যাই হোক, শুধু মালয়েশিয়ার তান আইক হুয়াং-এর পরাজয়ই নয়, এশিয়ার কোন খেলোয়াড়ই এবার অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপের কোন পুরস্কার পাননি। অথচ ব্যাডমিণ্টনে এশিয়ার খেলোয়াড়দের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। বিশেষ করে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর ও জাপানের খেলোয়াড়দের। দীনেশ খান্নাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টনে ভারতের সুনামও কম নয়। অনেকেরই আশা ছিল দীনেশ খান্না কিছু করলেও করতে পারেন। কারণ ৮টি দেশের প্রতিনিধিদের হারিয়ে তিনিই লাভ করেছেন প্রথম এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। গতবছরও অল ইংলণ্ডের সেমি-ফাইন্যালে উঠেছিলেন। কিন্তু খান্নাকে এবার দ্বিতীয় রাউণ্ডেই হার স্বীকার করতে হয়েছে।

ভারত থেকে এবার দীনেশ খান্না, সুরেশ গোয়েল এবং গৌতম ঠক্কর অল ইংলণ্ড প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। এদের মধ্যে সুরেশ গোয়েলের দুর্ভাগ্য যে, প্রথম খেলাতেই তাঁকে বে-সরকারী বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তান আইক হুয়াংয়ের সঙ্গে খেলে ১৫—১১ ও ১৫—৩ পয়েন্টে হার স্বীকার করতে হয়েছে।

দীনেশ খান্না দক্ষিণ আফ্রিকার ডাউটকারকে প্রথম রাউণ্ডে ১৭—১৬ ও ১৫—৪ পয়েন্টে হারাবার পর দ্বিতীয় রাউণ্ডে সুইডেনের অখ্যাত খেলোয়াড় কার্ট জনসনের কাছে হেরে গিয়েছেন ১৫—১০ ও ১৫—৯ পয়েন্টে।

ভারতের উঠতি তরুণ গৌতম ঠক্করও প্রথম রাউণ্ডে ইংলণ্ডের ডি টালবটকে ৯—১৫, ১৫—৬ ও ১৫—৫ পয়েন্টে পরাজিত করেন। কিন্তু পরের রাউণ্ডে পরাজিত হন সুইডেনের অপর অখ্যাতনামা খেলোয়াড় উইলি লাণ্ডের কাছে ১৫—১০ ও ১৫—১১ পয়েন্টে। খান্না ও গোয়েলকে ডাবলসের খেলাতেও তৃতীয় রাউণ্ডে বিদায় নিতে হয়েছে। সুতরাং অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপে এবার এশিয়ান খেলোয়াড়দের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় খেলোয়াড়দেরও রীতিমত ব্যর্থতার ছবি ফুটে উঠেছে।

নীচে ফাইন্যাল খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল:

পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল—আরল্যাণ্ড কপস (ডেনমার্ক) ১৫—১২ ও ১৫—১০ পয়েন্টে তান আইক হুয়াংকে (মালয়েশিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস ফাইন্যাল—মিসেস জুডি হ্যাসম্যান (আমেরিকা) ৫—১১, ১১—৮ ও ১২—১০ পয়েন্টে নোরিকো তাকাগিকে (জাপান) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল—আরল্যাণ্ড কপস ও এইচ বর্ক (ডেনমার্ক) ১৫—৮ ও ১৫—১২ পয়েন্টে পরাজিত করেন ডেনমার্কেরই এস অ্যাণ্ডারসন ও পি. ওয়ালসকে।

মহিলাদের ডাবলস ফাইন্যাল—আই রিটভেল্ড (হল্যাণ্ড) ও মিসেস উল্লা স্ট্র্যাণ্ড (ডেনমার্ক) ১৫—৮ ও ১৫—৪ পয়েন্টে মিসেস জুডি হ্যাসম্যান (আমেরিকা) ও মিস ব্রেনানকে (ইংলণ্ড) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল—এস এণ্ডারসন ও মিসেস উল্লা স্ট্র্যাণ্ড (ডেনমার্ক) ১৫—২ ও ১৫—১০ পয়েন্টে মিস পি ওয়ালস ও মিস পি হ্যানসেনকে পরাজিত করেন।

একলব্য

শক্তি ও উৎসাহের জন্য!
দুগ্ধ
কোকো
চিনি
মণ্ড
Bournvita
THE IDEAL FOOD DRINK FOR STRENGTH AND VIGOUR
Bensons/1-CP/579 A Ben
বোর্নভিটা পরিপূর্ণ পুষ্টিতে ভরা। এতে আছে দেহের মাংসপেশী ও টিস্যু (সূক্ষ্ম কোষ) গড়ে তোলার জন্য প্রোটিন, শক্তি ও উৎসাহের জন্য কার্বোহাইড্রেট, দেহের অস্থি মজবুত করে তোলার জন্য খনিজ লবণ এবং স্বাস্থ্যের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ভিটামিন। বোর্নভিটা সহজেই তৈরী করা যায় এবং খেতেও সুস্বাদু!
ক্যাডবেরির
বোর্নভিটা

"পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" চিত্রে এন টি রামারাও ও এল বিজয়লক্ষ্মী—এ সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে

রূপজগৎ

ছাত্রদের তৈরি চলচ্চিত্র

সম্প্রতি আমেরিকার নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে যেসব চলচ্চিত্র তৈরী করা হয় সেগুলি জাতীয় ছাত্র চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

লস এঞ্জেলসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে প্রথম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবারকার প্রতিযোগিতায় ১২টি উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে ৭৫টি চলচ্চিত্র পাঠানো হয়েছিল। নিউ ইয়র্কের লিংকন সেণ্টার ফর পারফরমিং আর্টসের ফিলহারমনিক হলে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ছাত্র চলচ্চিত্র নির্মাতাদের উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালে লিংকন সেণ্টার ফর পারফরমিং আর্টস এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশকদের প্রতিনিধি-স্বরূপ আমেরিকার চলচ্চিত্র সমিতি একত্রে এই পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করেন। মোট ৩৪টি ছবি শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পায়। বিচারকদের মধ্যে ছিলেন সমালোচক আর্থার নাইট। তিনি বলেন, 'প্রদর্শিত চলচ্চিত্রসমূহের এক-তৃতীয়াংশে আমরা নতুন আবিষ্কারের স্বাদ অনুভব করেছি। কলেজ ছাত্ররা যেসব চলচ্চিত্র নির্মাণ করছেন, তাতে শিল্পগত নৈপুণ্যের প্রমাণ মিলেছে।

প্রতিযোগিতায় চারটি চলচ্চিত্র শ্রেষ্ঠ বিজয়ীর সম্মান লাভ করে: আমেরিকার চলচ্চিত্র সমিতি প্রতিটি ছবির নির্মাতাকে ৫ শ' ডলার পুরস্কার দেন।

সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হল বারউড তৈরী করেছেন 'শিশুদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচিতি' নামক ছয় মিনিটের একটি ছবি। এটা সবচেয়ে বেশি প্রাণবন্ত ছবি।

বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ড্রু মেয়ার-এর তৈরী 'ম্যাচ গার্ল' সর্বোৎকৃষ্ট নাটকীয় চলচ্চিত্র হিসাবে পুরস্কার পেয়েছে। এর উপজীব্য : এক তরুণী অভিনেত্রীর কল্পনার জগৎ। ১৯৬৬ সালে ইতালীর স্পোলেটো চলচ্চিত্র উৎসবে এটি দেখান হয়েছিল।

সানফ্রান্সিস্কো স্টেট কলেজের স্কট বার্টলেট তৈরী করেছেন পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র 'মেটানামেন'—মাত্র আট মিনিটের ছবি।

কয়েকটি দ্বিতীয় স্থানাধিকারী চিত্র দু শ' ডলার করে পুরস্কার ও নৈপুণ্যের প্রশংসাপত্র পেয়েছে।

গত এক দশকে আমেরিকার এক শ'টি অগ্রণী উচ্চ বিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ পাঠ-সূচীর সংখ্যা ৬০ শতাংশ বেড়েছে। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬০ সালে চলচ্চিত্র নির্মাণের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে মাত্র তিনজন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল; কিন্তু ১৯৬৭ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১০-এ।

চলচ্চিত্র জনসাধারণের কাছে যেরূপ সমাদর পেয়েছে, কলেজগুলোতে চলচ্চিত্র নির্মাণের নতুন কদর তারই অংগ।

যে ছাত্ররা উচ্চাংগ চলচ্চিত্র ও সমকালীন শিল্পের অনুরাগী তাঁরা এখন নিজেদের ভালমন্দ নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরী করতে উৎসুক।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনয়-

"প্রস্তর স্বাক্ষর" (পরিচালনা : সলিল দত্ত) ছবিতে গীতালি রায় ফটো—দেশ

কলা শাখার চলচ্চিত্র বিভাগের স্নাতক ছাত্র স্টার্লিং নরিসের 'ফরোয়ার্ড' ভয়েজার' নাটকখানি নাট্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কেন তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণে আত্মনিয়োগ করতে চান, সে সম্পর্কে নরিস বলেছেন, 'চলচ্চিত্র সম্ভবত আমাদের এই শতকের শিল্পকলার সর্বোত্তম মাধ্যম।'

তবে ১৯৬৩ সালের জাতীয় ছাত্র চলচ্চিত্র পুরস্কার-বিজয়ীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমেরিকার সমালোচক ও চলচ্চিত্রানুরাগীরা আশাবাদী। তাঁরা নতুন যুগ আনতে পারবেন বলে অনেকেরই ধারণা।

দশ লাখ

অবাস্তবতার এক নতুন এক্সপেরিমেণ্ট "দশ লাখ" (গোয়েল সিনে করপোরেশন) কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। তথাকথিত হিন্দী চিত্রে হরেক রকমের অবিশ্বাস্য ব্যাপার দেখা যায়। লক্ষ্য ঃ লঘু ও উত্তেজক আমোদ বিতরণ। "দশ লাখ" সেদিক থেকে যে-ধরনের অবাস্তব ক্রিয়া-কান্ড হাজির করেছে তার বুঝি তুলনা নেই। একালের কাহিনীতে অসিযুদ্ধ (সোর্ড ফাইট) দ্বারা দর্শকের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাও করেছেন পরিচালক দেবেন্দ্র গোয়েল। শেষের সেই সংঘাত বেধেছে নায়ক সঞ্জয় ও ভিলেন প্রাণের মধ্যে। প্রাণ এ-ছবিতে নতুন ধরনের ভিলেন। কথাবার্তা ও বেশভূষাতেও তাই। কামিনীর চেয়ে কাঞ্চনের প্রতিই তার বেশী আকর্ষণ। তার শিকার এক বৃদ্ধ (ওম প্রকাশ) যে শেষ জীবনে হঠাৎ প্রচুর টাকা পেয়ে (লটারিতে নয়) এক বয়স্কা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের (মনোরমা) মোহে পড়ে নিজের পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনীকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। পরে অবশ্য সময়মত সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। বৃদ্ধের ভুল করা ও ভুল বুঝতে পারা এই দুটো ঘটনাই সমান উদ্ভট।

অর্থের মোহ কী কী অনর্থ ঘটাতে পারে তা পরিচালক বিশদভাবেই দেখিয়েছেন। এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য বক্তব্য ও কৃত্রিম মেলোড্রামা উপস্থিত করেছেন। সুখের কথা এই, তিনি রোমাণ্টিক নায়ক-নায়িকার (সঞ্জয় ও ববিতা) মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দেখাননি। নানা কষ্টের মধ্যেও তারা পরস্পরের প্রতি আসক্ত রয়েছে। এবং এই দুজনের অভিনয়ও বেশ ভাল। নবাগতা ববিতা ভাল নাচতেও পারেন। তাঁর বড় স্টার হতে সময় লাগবে না।

ছবিতে নাচ-গান অনেক। ইস্টম্যান কালারও ভাল। আমোদ-পিপাসু দর্শকের কাছে (যারা যুক্তি-বিচারের ধার ধারেন না) এ-ছবির মূল্য আছে। সংগীত পরিচালক রবি কিছু ভাল গান উপহার দেবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছেন।

ছবির পর ছবি

বি এম ডি মুভিজ-এর "জীবন মৃত্যু" অনতিবিলম্বেই মুক্তি পাবে। ডাঃ বিশ্বনাথ

জীবন মৃত্যু

রায় রচিত পাপ ও প্রেমের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন হীরেন নাগ। উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী ছবির নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় রয়েছেন কমল মিত্র, তরুণকুমার, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, শমিতা বিশ্বাস, প্রশান্তকুমার, অমর মল্লিক, দীপক মুখোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য প্রভৃতি। গোপেন মল্লিক সংগীত পরিচালক।

লতার স্বপ্ন

কল্পনা প্রোডাকশন্স-এর "লতার স্বপ্ন" ছবির নিয়মিত শুটিং চলছে। কল্পনা ব ন্দ্যো পা ধ্যা য় চিত্র পরিচালনা ক র ছে ন। কাহিনী ও চিত্রনাট্য তাঁরই রচনা। বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল,

"রুক্মিকর সুবচনী" নামে একটি অল্প-দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরি করছেন এডুকেশ্যনাল ফিল্ম ক্লাব অব ওয়েস্ট বেঙ্গল; ছবিটি পরিচালনা করছেন শৌভিকগোষ্ঠী—ছবির মুখ্যচরিত্রের শিল্পী মণিকা

উপমন্যু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা সান্যাল, নির্মলকুমার, ভারতী দেবী, চন্দ্রাবতী দেবী, বিপিন গুপ্ত প্রভৃতি ছবির বিশিষ্ট শিল্পী। বিমলভূষণ সংগীত পরিচালক।

আরোগ্য নিকেতন

অরোরার "আরোগ্য নিকেতন" ছবির বহির্দৃশ্য তোলার জন্য পরিচালক বিজয় বসু তাঁর ইউনিট নিয়ে বীরভূম অঞ্চলে গিয়েছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে পরিচালক শ্রীবসু নিজেই চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। কয়েকটি প্রধান চরিত্রের রূপদান করেছেন বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, দিলীপ রায়, রুমা

জাপানের ছবি 'মিস রু স্কাই'—সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা আয়োজিত জাপানী চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি দেখানো হচ্ছে

"তিন ভুবনের পারে" (পরিচালনা ঃ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়) ছবির মহরৎ দৃশ্যে কমল মিত্র, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় ফটো—দেশ

গুহঠাকুরতা, রবি ঘোষ, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি। রবীন চট্টোপাধ্যায় সংগীত পরিচালক। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া দুটি গান রেকর্ড করা হয়েছে।

দি শ্যাডো সিনে প্রোডাকশন-এর প্রথম ছবি "সমান্তরাল"-এর (কাহিনী ঃ প্রশান্ত চৌধুরী) নিয়মিত শুটিং আরম্ভ হয়েছে। পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন নির্মল দে। অনেকদিন পর তিনি চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ফিরে এলেন। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য এ পর্যন্ত যাঁরা নির্বাচিত তাঁরা হলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, কমল মিত্র, রবি ঘোষ, কালী সরকার, বাণী গাঙ্গুলী, মিতা মুখোপাধ্যায় ও বাণী।

সমান্তরাল

মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবে "নায়ক"

আসন্ন মেলবোর্ন চলচ্চিত্র উৎসবে (জুন ২ থেকে ১৭) "নায়ক" দেখানো হবে। এই উৎসবে ছবির প্রযোজক আর ডি বনসাল, পরিচালক সত্যজিৎ রায় এবং প্রধান শিল্পী উত্তমকুমার ও অন্যান্যরা আমন্ত্রিত হয়েছেন।

স্পেনের ভালাডলিডে "ইণ্টারন্যাশনাল উইক অব রিলিজিয়াস ফিল্মস অ্যান্ড ফিল্মস অব হিউম্যান ভ্যালুজ"-এ (ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যের চিত্রপ্রদর্শনী) সত্যজিৎ রায় পরিচালিত এবং আর ডি বনসাল প্রযোজিত "নায়ক" চিত্রটি দেখানো হবে। অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য প্রযোজক শ্রীবনসাল বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়েছেন।

শঙ্কর প্রেজেনটেশনস-এর উপহার

লণ্ডনে শঙ্কর প্রেজেনটেশনস-এর বীরেন্দ্রশঙ্কর পর পর কয়েকটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। পিকাডেলি থিয়েটারে তাঁর ব্যবস্থাপনায় ওস্তাদ আলী আকবর খানের সরোদ-অনুষ্ঠান এর মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়া, রয়েল অ্যালবার্ট হলে ভারতীয় লঘু সংগীত ও লোকনৃত্যের আসর বসে। স্কালা থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হয় "ড্যান্স অ্যান্ড মিউজিক অব ইণ্ডিয়া"। তারপর বীরেন্দ্রশঙ্কর শিল্পীদল নিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় যান। সর্বত্রই শিল্পীদের নৃত্যগীত উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। শিল্পী-দল সম্প্রতি ভারতে ফিরে এসেছেন। কলকাতায় নিউ এম্পায়ারে ২৯ ও ৩০ মার্চ শঙ্কর প্রেজেনটেশনস্-এর নৃত্যের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। এতে যোগ দেবেন ইন্দ্রাণী রহমান, জাভেরি ভগিনীদ্বয়, উমা শর্মা ও শেখরন। সংগীতশিল্পীদের পুরোভাগে থাকবেন পরাশর দেশাই।

পাদপ্রদীপের আলোয়

শৌভনিক অভিনীত "অমৃতস্য পুত্রাঃ"

শৌভনিক গোষ্ঠীর নতুন নাট্যোপহার "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। নাট্যবস্তু কিংবা নাটকের গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনার আগেই একটি কথা বলে রাখা দরকার। শৌভনিকের নতুন অভিনয় বরাবরই নাট্যামোদী মহলে সাড়া জাগিয়েছে। নাট্যরসিকরা জানেন, শৌভনিক যা দেবেন তা উপেক্ষা করার মত নয়। এই সুনাম ও মর্যাদা তাঁরা অর্জন করেছেন দলগত অভিনয় ও সুপরিচালনার গুণে। "অমৃতস্য পুত্রাঃ" শৌভনিকের এই গৌরব ক্ষুন্ন করেনি।

তরুণ নাট্যকার রতনকুমার ঘোষের "অমৃতস্য পুত্রাঃ" পুরোপুরি "অ্যাবসার্ড" নাটক নয়। যদিও এই নবনাট্যরীতির ছায়া এতে প্রতিফলিত। আঙ্গিকের চেয়ে বক্তব্যই নাটকে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। নামকরণেও কিছুটা শ্লেষ লক্ষ করা যায়। অমৃতের পুত্রদের বর্তমান কলুষিত জীবনের উপর আলোকপাত নাটকের মূল উদ্দেশ্য। অধঃপতন ও মূল্যবোধহীনতার প্রতীক কয়েকটি চরিত্রের আনাগোনা রয়েছে নাটকটিতে। দুর্বৃত্ত, মুনাফাখোর ও খলচরিত্রের ব্যবসায়ী, আত্মসুখপরায়ণ স্ত্রী, প্রবঞ্চক ও উচ্ছৃঙ্খল মদ্যপায়ী তরুণ প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্র ও তাদের ঘটনা চিত্রকল্পের মত নাটকে উপস্থাপিত। সৎ শ্রমিক ও নাগরিকের পরিচয়ও আছে। চরিত্র হিসাবে এরা কেউ নতুন নয়। বাইরে সম্ভ্রান্ত আসলে পাপিষ্ঠ এবং সংসার-সমাজের অবিচার সহ্য করতে না পেরে পথভ্রষ্ট দুরাচারীর সাক্ষাৎ আধুনিক নাটকে হামেশাই মেলে। বরঞ্চ 'অ-দস্তুপর্বে' একাধিক আদর্শবাদী আছে নাটকে। এদের কথা বোঝা ভার। বাস্তবের ভাষায় তারা কথা বলে না। কথার মধ্যে একটা হেঁয়ালি আছে। একে "মিস্টিসিজম" বলা কঠিন। তেমনি রয়েছেন

অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত "ছুটি" চিত্রে নন্দিনী ও মৃণাল মুখোপাধ্যায়

একজন অপ্রকৃতস্থ প্রায় অধ্যাপক। তিনি মানুষের অঙ্ক মেলাতে ব্যস্ত। আসল কথা, নাট্যকার তাঁর 'সিনিসিজম', সমালোচনা, রূঢ় অভিযোগ এবং আদর্শহীন দর্শককে জানাবার জন্যই নাটকটি লিখেছেন। শুধু কথা, কথা আর কথা। এককালে বাংলা নাটক ছিল "টিয়ার গ্যাস", এখন "ব্ল্যাংক ফায়ার"—ফাঁকা আওয়াজ। "অমৃতস্য পুত্রাঃ" সম্পর্কে কথাটি প্রযোজ্য। যদিও নাট্য-রচনার আঙ্গিক খুবই প্রশংসনীয়, এবং কয়েকটি মুহূর্তের সংলাপ সত্যি ভাল।

নাটকের ত্রুটি যাই থাকুক, সুষ্ঠু পরিচালনা (গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়-কৃত) ও সম্মিলিত অভিনয়ের জন্য "অমৃতস্য পুত্রাঃ" প্রথম থেকে শেষ অবধি দর্শককে নিবিষ্ট করে রাখে। নাট্য পরিচালক ক্লাইম্যাক্স-এ নাটকের সব চরিত্রের পরিচয় সংবলিত একটি "ফ্রিজ"-দৃশ্য রচনা করেছেন। সভ্যতার থেমে থাকার দৃশ্যব্যঞ্জনা। সভ্যতার আদিযুগে গুহাবাসী মানুষের আধ্যাত্মিক আসপৃহার দৃশ্যও নাট্যকাহিনীর পটভূমি হিসাবে রাখা হয়েছে। এবং নাটকের 'চিত্রকল্প'-রূপটি পরিচালক "জোনাল লাইট"-এর সাহায্যে চমৎকার ফুটিয়েছেন।

প্রত্যেক শিল্পীর অভিনয়ই উঁচুদরের। তবুও এঁদের মধ্যে টাইপ চরিত্রসৃষ্টির অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়েছেন অশোক মিত্র (সুন্দরলাল নামে মারোয়াড়ী ব্যবসায়ী), নিমু ভৌমিক (চালিয়াত ও পানাসক্ত এক যুবক) এবং গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় (গুণ্ডা)।

অগ্রদূতের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ "কখনো মেঘ" ছবিতে উত্তমকুমার ফটো—দেশ

মানুষের অবক্ষয়ের সাক্ষী আদর্শবাদী সনাতন সেজেছেন কৃষ্ণ কুণ্ডু। তাঁর চরিত্র-চিত্রণে নির্লিপ্ত ও দ্রষ্টার ভাবটি সুন্দর ফুটে উঠেছে। তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটিও লক্ষণীয়। অন্যান্য বিশেষ চরিত্রে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন সুকুমার ঘোষ, বিমল
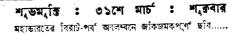
"বালিকা বধূ" (পরিচালনা : তরুণ মজুমদার) চিত্রে মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার ও পার্থ মুখোপাধ্যায়

[illegible] সমস্যা নিয়ে নির্মীয়মাণ বিতর্কমূলক কমেডি "[illegible] অ্যান্ড পিল" ছবিতে ডেভিড নিভেন ও ডেবোরা কের নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

হলিউডের ফরেন প্রেস অ্যাসোসিয়েশন-এর গোল্ডেন গ্লোব পুরস্কার প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ফ্রেড জিনেম্যান পরিচালিত "এ ম্যান ফর অল সীজনস্"। এ ছবির পরিচালক, অভিনেতা পল স্কোফিল্ড এবং চিত্রনাট্যকার রবার্ট বোল্ট নিজেদের বিভাগে সর্বোচ্চ পুরস্কার পেয়েছেন। ছবিটিও ১৯৬৬ সনের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে স্বীকৃত। মিউজিক্যাল অথবা কমেডি ছবিতে অভিনয়ের জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার

চক্রবর্তী, পান্নালাল মৈত্র, অমল মুখোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি তালুকদার, অনুরাধা দাশগুপ্তা ও ইন্দু চট্টোপাধ্যায়।

মঞ্চসজ্জা পরিচ্ছন্ন। আলোকসম্পাতের কৃতিত্বের জন্য বিশেষ প্রশংসা পাবেন স্বরূপ মুখোপাধ্যায়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ফিল্ম সোসায়েটি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ফিল্ম সোসায়েটির উদ্যোগে সম্প্রতি চতুর্থ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হল। ১ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত দেখানো হল পশ্চিম জার্মেনী, পোলাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, রাশিয়া ও আমেরিকার কয়েকটি ছবি। বাংলা ছবি একটি ছিল। নাম : "কোমল গান্ধার"। ৬ মার্চ ওয়াল্ট ডিজনে দিবস পালিত হয়। ওইদিন কয়েকটি অল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল। উৎসব উপলক্ষে আধুনিক চলচ্চিত্রের উপর একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল।

এন সি এন্টারপ্রাইজ

নবগঠিত এন সি এন্টারপ্রাইজ তাঁদের প্রথম অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন গত ১৪ মার্চ মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ছবি দাশগুপ্তার নৃত্য। তিনি তিনটি পর্যায়ে (বসন্তরাস, অভিসার ও লোকনৃত্য) মণিপুরী নৃত্য পরিবেশন করে দর্শকদের আনন্দ দেন। পরে সবিতাব্রত দত্ত পরিচালিত-অভিনীত "ব্যাপিকা বিদায়" মঞ্চস্থ হয়। প্রারম্ভে সংস্থার কর্ণধার অভিনয়-শিল্পী নিমু ভৌমিক সকলকে স্বাগত জানান।

হীরেন নাগ পরিচালিত "জীবনমৃত্যু" ছবিতে সুপ্রিয়া চৌধুরী ফটো—দেশ

রাজেন তরফদার পরিচালিত "আকাশছোঁয়া" ছবিতে দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী

করেছি। অসাধারণ অভিনেত্রী হবার সম্ভাবনা জুলির মধ্যে তখনই দেখতে পেয়েছিলাম। পরে তার প্রমাণ পেলাম "ডারলিং" ছবিতে।"

ডেভিড লীন স্বীকার করেছেন, "ঝিভাগোর স্ত্রী টোনিয়ার জন্য তিনি জেরাল্ডিন চ্যাপলিনকে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু স্ক্রীন টেস্ট হয়ে যাওয়ার পর আমি ঠিক করলাম, ওঁকেই নেব। আমি নিঃসন্দেহ, জেরাল্ডিন বড় স্টার হতে চলেছেন।"

রড স্টেইগার (কোমারভস্কি), টম কোর্টনে (পাশা), রালফ রিচার্ডসন (আলেকজান্ডার গ্রোমেকো), অ্যালেক গিনেস ও রিটা টুশিংহামের কথাও লীন বলেন। "অ্যালেক আমার গুড লাক চার্ম" —লীন মন্তব্য করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, "আমি সবজান্তা নই। তবে আমার বিশ্বাস, পাস্তেরনাক বেঁচে থাকলে আমার শিল্পী নির্বাচন নিশ্চয়ই অনুমোদন করতেন।"

পেয়েছেন "জার্জি গার্ল"-এর নায়িকা লিন রিগ্রেভ। শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্র হিসেবে সম্মানিত ফরাসী ছবি "এ ম্যান অ্যান্ড এ ওম্যান"। এই ছবির নায়িকা আনুক আইমি শ্রেষ্ঠ নাটকীয় অভিনয়ের পুরস্কার পেয়েছেন। মিউজিক্যাল অথবা কমেডি ছবিতে অভিনয়ের জন্য পুরস্কৃত "দি রাশিয়ানস্ আর কামিং"-এর অ্যালেন আরকিন। রিচার্ড অ্যাটেনবোরো (দি স্যান্ড পেবলস) এবং জোসিলিন ল্যাগার্ড (হাওয়াই) যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা ও সহ-অভিনেত্রীর মর্যাদা পেয়েছেন।

অভিনেতৃ সংঘের নতুন কার্যকরী সমিতি

অভিনেতৃ সংঘের কার্যালয়ে সম্প্রতি শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সংঘের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅনুপকুমার সংঘের নানাবিধ সমস্যার কথা উল্লেখ করে বক্তৃতা করেন।

সভায় আগামী তিন বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত সভ্যদের নিয়ে কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়েছে।

সভাপতি—শ্রীবিকাশ রায়। সহ সভাপতি—শ্রীউত্তমকুমার, শ্রীঅজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মলিনা দেবী। সাধারণ সম্পাদক শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। যুগ্ম সহ-সম্পাদক —শ্রীঅনুপকুমার। শ্রীসুশীল দে। কোষাধ্যক্ষ —শ্রীশ্যাম লাহা। কার্যকরী সমিতির সভ্য—শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদীপক মুখোপাধ্যায়, শ্রীমৃণাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীসতীন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীতরুণকুমার, শ্রীকার্তিক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী জয়শ্রী সেন ও শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র।

ডেভিড লীনের শিল্পী নির্বাচন

"বরিস পাস্টারন্যাক তাঁর 'ডাঃ ঝিভাগো' উপন্যাসে এমন কয়েকটি অবিস্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যে, তাদের ছবির পর্দায় জীবন্ত করে তোলার সব রকম চেষ্টা করা না হলে খুবই অন্যায় হত। আমার একমাত্র মাথাব্যথা ছিল চরিত্রগুলির সঙ্গে শিল্পীদের খাপ খাইয়ে নেওয়া, শিল্পীর জন্য চরিত্র পালটানো নয়। রবার্ট বোল্ট-এর চিত্রনাট্যে প্রায় ছটি চরিত্রের সমান প্রাধান্য।"

"ডাঃ ঝিভাগো" চিত্রের পরিচালক ডেভিড লীন সম্প্রতি এই কথা বলেন। শিল্পী নির্বাচনের সময় বক্স-অফিসের ভাবনা তাঁকে প্রভাবান্বিত করেনি।

"ডাঃ ঝিভাগো আসলে প্রেমের কাহিনী। পাঠকরা উপন্যাসটির রাজনৈতিক ভাবধারার উপর অকারণে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। সত্যি বলতে কী, ঝিভাগো একটি নিষ্ক্রিয় চরিত্র। অন্তত পাস্টারন্যাক যেভাবে ঝিভাগোকে এঁকেছেন। সে যাতে গল্পে উপেক্ষিত না থাকে এই কারণে শক্তিমান ও ব্যক্তিত্বপূর্ণ অভিনেতা ওমর শরিফকে নেওয়া হয়েছে। কাহিনীকার উপন্যাসের কোথাও ঝিভাগোর চেহারার বর্ণনা দেননি। তাই তার দৈর্ঘ্য কিংবা তার চুল বা চোখের রঙ সম্পর্কে আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না।"

ডেভিড লীন আরও বলেন, "বিলি লায়ার ছবিতে জুলি ক্রিস্টির পাঁচ মিনিটের অভিনয় দেখেছিলাম। তা দেখেই আমি জুলিকে লারার চরিত্রের জন্য মনোনীত

বিখ্যাত জার্মান মূকাভিনেতা রলফ শারে সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে কলকাতার মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত

অরণ্যদেব

লী ফক

ওরা আমাদের লুকোনো টাকার খোঁজ পেয়েছে! এখন কী করা যাবে, ম্যাক!
ওদের বাঁচতে দেওয়া যাবে না, ওরা বাঁচলে আমরা মরব!

হেই ছেলেরা, তোরা ওখানে কী করছিস?
!!

রাজা আর টমটম চমকে উঠল ....
মাছ ধরবার জন্যে মাটি খুঁড়ে কেঁচো খুঁজছিস নাকি?
লোকটার গলা কী বাজখাঁই!

মাটি খুঁড়ে আমরা একটা বাক্স পেয়েছি! তাতে কাগজ ঠাসা! বাক্সটা কার, আমরা জানি না---
বটে?
ঝোপের আড়াল থেকে কাটিনা সব দেখছে!

কার বাক্স তুমি জান না? ন্যাকা! বাক্স থেকে কিছু কাগজ তুই নিশ্চয়ই সরিয়ে ফেলেছিস! ব্যাটা খুদে চোর!
রাজা চোর নয়!
চুপ কর, ব্যাটা!
10/16

আমি কিছু চুরি করিনি! বাক্সটা আমি ওয়াকার বাবার কাছে নিয়ে যাচ্ছিলুম!
তা আর তোকে যেতে হচ্ছে না!

ওরে বাবা!

ব্যাটা আমাকে কামড়ে দিয়েছে!
ওকে পালাতে দিও না!
রাজা আমি গিয়ে অরণ্যদেবকে সব জানাচ্ছি!
!

তার আগেই তোকে খতম-- উঃ...
দুম!
৩০

সাপ্তাহিক সংবাদ

গত নবেম্বর মাসে পাঞ্জাব ভেঙে হরিয়ানাকে পৃথক করার সময় রাজনৈতিক মহলের ধারণা ছিল যে, হরিয়ানায় এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস নিশ্চিতই সরকার গঠন করবে। নির্বাচনে কংগ্রেস বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাও অর্জন করে এবং কংগ্রেস পারটি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভগবৎদয়াল শর্মার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু স্পীকার নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই সরকার পক্ষে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিল। মুখ্যমন্ত্রীর মনোনীত প্রার্থীকে পরাজিত করে বিরোধী দল কর্তৃক প্রস্তাবিত বিদ্রোহী কংগ্রেসী সদস্য নির্বাচিত হলেন স্পীকার পদে। এর পরেই কংগ্রেস পক্ষের ১৩ জন সদস্য দলের সংস্রব ত্যাগ করে বিরোধী সংযুক্ত দলে যোগ দেন। কংগ্রেস হাই কম্যানডের নির্দেশে শর্মা-মন্ত্রিসভার সদস্যরা পদত্যাগ করলেন এবং তার স্থান দখল করলেন সংযুক্ত দল নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে। স্পীকার পদে নির্বাচিত রাও বীরেন্দ্র সিং হয়েছেন হরিয়ানার অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার নতুন মুখ্যমন্ত্রী। এই মন্ত্রিসভার ১৭ জন সদস্যের মধ্যে ১৫ জন সদস্য এ পর্যন্ত শপথ গ্রহণ করেছেন। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর রাজস্থানে কংগ্রেসদল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাবি করেও মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারে নি এবং হরিয়ানায় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করেও শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে নি।

দেশী সংবাদ—

২০ মারচ — 'মুদ্রাস্ফীতির ঝোঁক আর না বাড়িয়ে' উন্নয়ন উদ্যমের গতিবেগ বাড়াতে হবে। মুদ্রাস্ফীতির কারণ না ঘটিয়ে যে সম্পদের সন্নিবেশ সম্ভব — তারই বস্তুনিষ্ঠ হিসাবের ভিত্তিতে ওই উদ্যমে গতিসঞ্চার করতে হবে। ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য সহকারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই যে পূর্ণ বাজেট পেশ করবেন, ওই বক্তব্য হল তারই সারাৎসার।

আজ লোকসভায় প্রশ্নোত্তরের জন্য যেটুকু সময় বরাদ্দ ছিল তার অধিকাংশ ব্যয়িত হয় সিয়ার (মারকিন গোয়েন্দা সংস্থা) কাজকর্ম ও তার সঙ্গে ভারতীয় সংস্থার যোগাযোগ সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে। বহির্বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী চাগলাকে বেশ ধকল সহ্য করতে হয়। শ্রী চাগলা অবশ্য ঘোষণা করেন, সরকার সব সময় তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখছেন।

২১ মারচ — কলকাতা ট্রাম কোম্পানী ২৪ তারিখ থেকে ট্রামের ভাড়া বাড়িয়ে দেবার সংকল্প করেছেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত : ওই দিন থেকে ট্রামে উঠলেই প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের পনের পয়সা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের দশ পয়সার টিকিট কাটতে হবে।

জমিদারি দখল আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকারের হাতে যেসব জমি ন্যস্ত হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৬৭-৬৮ সালের মধ্যে তা চিরস্থায়ীভাবে বণ্টনের সিদ্ধান্ত করেছেন। এত দিন পর্যন্ত ওইরূপে এক বিঘা জমিও বণ্টন করা হয়নি বলে ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার জানান।

২২ মারচ — কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করলেও অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যের বরাদ্দ তাঁরা বৃদ্ধি করতে অক্ষম বলে বিনীতভাবে জানিয়েছেন। আগামী জুন মাসের পর খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা সম্পর্কেও তাঁরা আশ্বাস দিতে অস্বীকার করেছেন।

হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভগবৎদয়াল শর্মা আজ সকালে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের নিকট তাঁর মন্ত্রি-পরিষদের পদত্যাগ-পত্র পেশ করেন। রাজ্যপাল পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত শ্রী শর্মাকে কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন।

২৩ মারচ — মজঃফরপুরে পাওয়া সংবাদে প্রকাশ, এই জেলার বৈরাগনিয়াতে কোন চাউল কলে তল্লাসী করে পুলিশ ৪৪ হাজার মণ ধান ও চাউল (বেশীর ভাগই চাউল), চারশত মণ সরষের তেল ও ৮ শত মণ তেলবীজ উদ্ধার করেছে। আটক করা সেই সব জিনিসের মূল্য হবে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা।

কলকাতা ট্রাম কোম্পানী ২৪ মারচ থেকে ট্রামভাড়া বৃদ্ধির যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা যাতে কার্যকরী না হয়, তার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীশম্ভুচরণ ঘোষ ট্রাম কোম্পানির উপর একটি ইনজাংশন জারি করেন। এ সম্পর্কে 'ম্যানডামাস' ধরনের বা অন্য কোন যথোপযুক্ত আদেশ কেন জারি করা হবে না তার কারণ দেখানোর জন্যও বিচারপতি ট্রাম কোম্পানি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে রুল জারি করেছেন।

২৪ মারচ—সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ সাংবাদিকদের কাছে বলেন, মূল্যমানের ঊর্ধ্বগতি রোধের উপায় হিসাবে তিনি ডিভিডেন্ড ও বেতন স্থিতিশীল রাখার বিষয় পরীক্ষা করে দেখবেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে এক ঘরোয়া বৈঠকে শ্রী দেশাই বলেন, আরও মুদ্রাস্ফীতি না ঘটলে মূল্যমানের ঊর্ধ্বগতি রোধ করা এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা তাঁর অর্থনৈতিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য।

মাস দুয়েকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় কোটি টাকার চিড়া বিহারে পাচার হয়ে গিয়েছে। এই পাচারের কারবারে জনা-দশেক ব্যবসায়ী, জনা-বিশেক সরকারী কর্মচারী প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মুনাফা কামিয়ে নিয়েছেন। পরিমাণে কম হলেও চিড়া পাচার এখনও অব্যাহত।

জনসাধারণের সহযোগিতায় পঃ বঙ্গ পুলিশ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ধান-চাল, গম প্রভৃতি লুকানো খাদ্যদ্রব্য তল্লাসী করে বের করবার অভিযান শুরু করেছেন। নবদ্বীপ ও হাবড়ায় নানা স্থানে তল্লাসী চালিয়ে পুলিশ প্রচুর চিনি, আটা, চাল, ধান ও গম উদ্ধার করে।

২৫ মারচ—পশ্চিম বাংলা সরকার ধানের সংগ্রহ-মূল্য বাড়ানোর প্রস্তাব করেছেন। যদি এই প্রস্তাব কার্যকরী করা হয়, তা হলে হয় রেশন দোকানে চালের খুচরা দর বাড়াতে হবে, না হয় সরকারকে নিজের তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য দিয়ে তা পূরণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার নাকি পশ্চিম বাংলাকে বলেছেন : তাঁরা ধানের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেন না—তবে সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য তা একান্ত দরকার হলে তাতে তাঁরা আপত্তি করবেন না।

জমিদারি উচ্ছেদ আইন অনুসারে যে পরিমাণ জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হাতে এসেছে, তা বণ্টনের ব্যাপারে নানা আইনগত অসুবিধা এবং মামলা-মোকদ্দমা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার সাংবাদিকদের জানান যে, হাইকোর্টের নির্দেশে এক লক্ষ একুশ হাজার কৃষি জমির বিলি-ব্যবস্থা আটকে আছে।

বিদেশী সংবাদ

২০ মারচ—আমেরিকা ভিয়েতনামে যুদ্ধের তীব্রতা যথেষ্ট বাড়িয়ে তুলবে। গুয়াম দ্বীপে আমেরিকার ভিয়েতনাম যুদ্ধ পরিষদের প্রথম দফার বৈঠকের পর প্রেসিডেনট জনসনের উপদেষ্টাগণ এই ঘোষণা করেন। তাঁরা বলেন, যুদ্ধবিস্তারের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে।

২১ মারচ—রয়টার খবর দিয়েছে যে, প্রেসিডেনট জনসন ওয়াশিংটন থেকে বিমানে যাত্রা করে, দুদিনব্যাপী ভিয়েতনামে রণকৌশল নিয়ে আলোচনা এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য এখানে পৌঁছেছেন।

২২ মারচ—মারকিন কম্যানড আজ ঘোষণা করেছেন যে, গতকাল ভিয়েতনাম লড়াইয়ের এক প্রচণ্ডতম যুদ্ধে বিধ্বস্ত কমিউনিসট রেজিমেনটের অন্তত ৫৯৬ জন নিহত হয়েছে —এ খবর জানাচ্ছেন এ পি।

২৩ মারচ—আজ রাত্রে পিকিং-এ পাকিস্তান জাতীয় দিবস উপলক্ষে সম্বর্ধনা সভায় চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী চেন ঈ ভারতকে সম্প্রসারণবাদী প্রতিক্রিয়াশীল বললে ভারতীয় কূটনীতিকগণ সভা ছেড়ে বেড়িয়ে যান। এই ঘটনা দেখতে দেখতে চীনা প্রধানমন্ত্রী চু এন লাই হেসে ওঠেন।

২৪ মারচ—প্রায় চার টন (চার হাজার কেজি) ওজনের একটি উল্কা পিণ্ড গতকাল সালটিলো (মেকসিকো) থেকে ২৪ মাইল দূরে নির্জন সর্বত্র গায়ে পড়েছে। বৈজ্ঞানিকদের একটি দল সালটিলো থেকে এই উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করার জন্য গিয়েছেন।

২৫ মারচ—গতকাল রাত্রে করাচীর উপর দিয়ে ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে ঝড়ে বয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে প্রবল বর্ষণও হয়। ঝড়ের ফলে ১০ জন নিহত এবং ১০০ জন আহত হয়েছে। বহু বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে এবং দেওয়াল পড়ে গিয়েছে।

সূচীপত্র

রান্না করার সময় বাঁচে সব প্রেশার কুকারেই

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীনৃপেন সেনগুপ্ত

গাত্রবর্ণ নির্মল রাখতে হলে আপনার ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন

নিকো

পার্ক ডেভিস উৎপাদন

নিকো-শ্যাম্পু হিসাবে
নিয়মিতভাবে শ্যাম্পু হিসাবে ব্যবহার করলে নিকো সাবানের বীজাণুনাশক ফেনা মরামাস যা মাথায় খুস্কির একটি ভাল প্রতিষেধক... অন্যান্য ছোটখাট রোগ থেকেও মাথাকে মুক্ত রাখে।

নিকো-দুর্গন্ধনাশক হিসাবে
নিকো সাবান মেখে স্নান করলে ঘামের দুর্গন্ধ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। নিকো সাবান অন্যান্য সাধারণ সাবান ও দুর্গন্ধনাশকের মত নয় বলেই, দুর্গন্ধ সৃষ্টিকারী বীজাণুগুলিকে সার্থকভাবে হ্রাস করে আপনাকে স্নিগ্ধ ও নির্মল রাখতে সাহায্য করে।

নিকো একটি পরীক্ষিত গুণসম্পন্ন আসল বীজাণু-নাশক সাবান। নিকো সাবান একই সঙ্গে তিন রকমের উপকার দেয়—পরিষ্কারক, বীজাণুনাশক, রক্ষাপ্রদ...আপনার ত্বক পরিষ্কার ও সুস্থ রাখে এবং ফুস্কুড়ি, মেচেতা ও অন্যান্য ছোটখাট ত্বকের রোগ থেকে আপনাকে মুক্ত রাখে। আর নিকো সাবান মেখে স্নান করলে ঘামাচির উপদ্রব থেকে একটা স্বস্তিদায়ক আরাম পাওয়া যায়।

প্রতিদিনেই—আপনার ত্বকের প্রয়োজনীয় যত্ন নিন... নিকো দিয়ে— পার্ক-ডেভিস উৎপাদন

দেশ

৩৪ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৩

শনিবার ২৫ চৈত্র ১৩৭৩

Saturday 8 April, 1967

কলকাতার হাঙ্গামা

সম্প্রতি কলকাতায় যা ঘটে গেল তা যেন দুঃস্বপ্নের মতনই মনে হয়। বুধবার কলকাতার কোনো কোনো এলাকা, বিশেষ করে হ্যারিসন রোডের মতন একটি জনপূর্ণ অতিব্যস্ত রাজপথের কিছু অংশে অকস্মাৎ যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখা গিয়েছে তার স্মৃতি দীর্ঘকাল নগরবাসীকে পীড়িত করবে। বেদনার কথা, স্বল্পস্থায়ী এই হিংস্র ও উন্মত্ত সংঘর্ষে প্রাণহানি ঘটেছে কিছু লোকের, বেশ কিছু মানুষ আহত; দোকানপাট লুঠের চেষ্টা হয়েছে, গাড়ি পুড়েছে এবং যথারীতি টিয়ার গ্যাস, গুলি চলেছে ও শেষাবধি সৈন্যবাহিনী তলব করাও হয়েছে। কলকাতা শহরে হাঙ্গামা বিরলদৃষ্ট ঘটনা নয়, কিন্তু গত বুধবার মাত্র তিন চার ঘণ্টায় যতটা ক্ষয়ক্ষতি, বিশেষত জীবনহানি ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে তাতে সর্বশ্রেণীর মানুষই অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছেন। ঘটনাটি সরকারকেও এত বিচলিত করে যে অনতিবিলম্বে সৈন্যবাহিনী তলব করে অশান্ত এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এটি যে খুবই উপযুক্ত ও সুবিবেচনার কাজ হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তা ছাড়া, বর্তমান রাজ্য মন্ত্রীরা প্রায় সকলেই হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা যাতে আয়ত্তে আনা যায় তার জন্য উপদ্রুত এলাকায় ঘোরাফেরা করে জনতাকে শান্ত করতে চেষ্টা করেছেন।

সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে কয়েকটি প্রশ্ন আপাতত এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেগেছে। প্রথমত অনেকেই বুঝতে পারছেন না বাগমারি অঞ্চলে যে ঘটনা পূর্বে ঘটে গিয়েছিল তার জের ধরে এ-রকম ঘটনা ঘটতে পারে এই আশঙ্কা কি ছিল না? কোনো সম্প্রদায় যদি ধারালো অস্ত্রশস্ত্র লাঠি এমনকি অধিকতর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিছিল করতে চান তবে কি সরকার তার অনুমতি দেবেন? বা অনুমতি দিলেও এই ধরনের মিছিল যে সামান্য কারণে বিপথচালিত হতে পারে, তার আশংকা কি থাকে না? তবে কেন উপযুক্ত পুলিশ পাহারার মধ্যে এই মিছিল পরিচালিত হয়নি? দ্বিতীয়ত বাগমারিতে যা ঘটেছিল তাকে কেন্দ্র করে যে একটা সাম্প্রদায়িক গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে, এই সন্দেহ আগে-ভাগে করে একটু বেশি সতর্ক হলে তো কোনো ক্ষতি ছিল না। তৃতীয়ত হাঙ্গামা ঘটার সংগে সংগে এবং পরে যে ধরনের অভিযোগ পালটা-অভিযোগ ও স্বপক্ষ-বিপক্ষ প্রচার রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে চলছে এটা কি সঙ্গত?

এসব প্রশ্নের জবাব সাধারণভাবে হয়ত দেওয়া যায় কিন্তু নির্ভুলভাবে দেবার মতন ওয়াকিবহাল আমরা নই। যতদূর মনে হয় এবং শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় যা বলেছেন তাতে অনুমান করা যেতে পারে এই রকম ভয়াবহ একটি ঘটনা ঘটতে পারে এমন আশংকা কারও হয়নি কেননা যাঁরা মিছিল করতে অনুমতি চেয়েছিলেন তাঁরা শান্তিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, সরকার এমন কোনো গোপনীয় আভাস পূর্বে পাননি যাতে তাঁরা অধিকতর সতর্ক থাকতে পারেন। তৃতীয়ত, পুলিস যা ছিল তাদের পক্ষে সহসা এমন কিছু করার ছিল না যাতে অবস্থা ঘোরালো হয়ে ওঠে। আর হাঙ্গামা ঘটার সংগে সংগে ও পরে যে-ধরনের বিভ্রান্তিমূলক প্রচার ও অপপ্রচার চলছে তাতে আর বলার কি থাকতে পারে, যা এর ওপর কারই বা হাত আছে!

এই ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িকতার চেহারা দেওয়া হয়েছে বলে আমরা শুনেছি দুঃখের বিষয় এই হাঙ্গামার সঙ্গে কখনও ধর্ম, কখনও প্রাদেশিকতা কখনও রাজনৈতিক দলের স্বার্থকেও জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। দায়িত্বহীন কথাবার্তা এবং গুজব যথেষ্ট ছড়ানো হয়েছে, হচ্ছে। কোনো একটি সম্প্রদায়ের পক্ষে সমস্ত ঘটনাটি এখনও অস্বস্তির বিষয় হয়ে থাকলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমরা মনে করি, ভারতীয় নাগরিক হিসাবে প্রাথমিক দাবিটা যদি আমরা ভুলে গিয়ে ধর্ম ও সম্প্রদায়ের দাবিটা প্রাথমিক করি, তবে যে-কোনো বিরোধকে যে-কোনো সময় সাম্প্রদায়িকতার ও প্রাদেশিকতার রঙ দিতে পারি। কলকাতার সাম্প্রতিক হাঙ্গামাকে সাম্প্রদায়িক অথবা অন্য কোনো নামে অভিহিত করার পেছনে হয়ত কতকগুলি লক্ষণ আছে, কিন্তু এ কথা ভুলে গেলে চলবে না—যে কোনো সম্প্রদায়েরই সকল মানুষ অজ্ঞান অন্ধ অবিবেচক নয়, নৃশংসও নয়। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই অশিষ্ট উন্মত্ত ক্রোধান্ধ গোঁড়া কিছু মানুষ থাকে। এদের অবিবেচনায় সর্বত্রই কোনো না কোনো গণ্ডগোল প্রায়ই সৃষ্টি হয়। আমাদের বিবেচনায় এই দুষ্কৃতকারীদেরই বিচার প্রয়োজন, কেননা তারা সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করে।

রাজ্য সরকার হাঙ্গামা সম্পর্কে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করতে মনস্থ করে ভালই করেছেন। এর ফলে সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়বে।
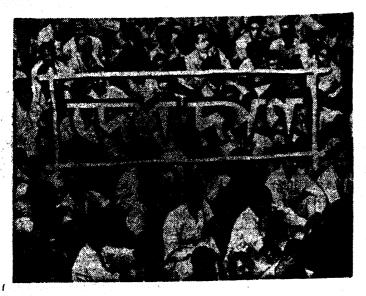
বাগমারীর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতায় ২৯শে মার্চ স্বল্পকালের জন্য যে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি হয়েছিল, তা যুক্ত সরকারের প্রথম অগ্নি পরীক্ষা। কোন দ্বিধা না রেখে বলা চলে সরকার সে পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

ঘটনার প্ররোচনা যা-ই থাক না কেন, বাগমারীর বিবাদ জাতীয় জীবনের একটা অশুভ দিককে স্মরণ করিয়ে দেয়। সাম্প্রদায়িকতার বিষ জাতীয় জীবনে বহু আঘাত হেনেছে। অনেক ক্ষতি করেছে। অনেক নিরীহ প্রাণ উৎসর্গিত হয়েছে। তবু এই বিষ থেকে থেকে প্রবল হয়ে ওঠে। আগে এই বিষ সীমাবদ্ধ ছিল হিন্দু ও মুসলমান প্রশ্নে। পাকিস্তান হবার পরও সাম্প্রদায়িকতা প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের নানা স্থানে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই উন্মত্ততা ভিন্ন ভিন্ন আকারে জাতীয় জীবনে ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছে।

আসামে ভিন্ন ভিন্ন আকারে দেখা দিয়েছে। পশ্চিম বাংলায়ও তার অশুভ ইঙ্গিত যে দেখা যায়নি তা নয়; তবু বিস্ফোরণ ঘটেনি, যেমন ঘটে গেল বাগমারির বিবাদকে কেন্দ্র করে। মূল প্রশ্নের বিচার করা সম্ভব নয়; কারণ, দুপক্ষেরই হয়ত কিছু না কিছু বক্তব্য আছে এবং তার যথার্থতা নির্ধারণ করবে যুক্ত সরকার-প্রতিশ্রুত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন। কিন্তু হিন্দু ও শিখের মধ্যে বিবাদটা নূতনভাবে দেখা দিয়েছে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে।

তাই, ২৯শে মার্চ বড়বাজার শিখ গুরুদ্বার থেকে এক শোভাযাত্রা যখন বেরিয়ে এল গ্রন্থ সাহেব নিয়ে তখনই বোঝা গেল অবস্থা দ্রুত আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। তার আগের দিনও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি মধ্যরাত্রি পর্যন্ত শিখ সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছেন ব্যাপারটা ভালভাবে মিটিয়ে ফেলার জন্য। বাগমারী (মানিকতলা) অঞ্চলের নির্বাচিত বিধানসভা সদস্য শ্রীমতী ইলা মিত্র আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন শান্তি কমিটি বসিয়ে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু পরদিনের ঘটনা থেকে দেখা গেল কোন প্রচেষ্টাই সফল হয়নি।

*শিখদের শোভাযাত্রা বেরিয়ে আসার আগে মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন বড়বাজার গুরুদ্বারে। সেখানে এবং তার আগে বাগমারীতে তিনি যখন গিয়েছিলেন তখনই আবহাওয়াটা ছিল থমথমে। কিন্তু তিনি যখন বুঝেছিলেন, তখন শোভাযাত্রা বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই অল্প কাল পরেই যখন কলেজ স্ট্রীটের কাছে হাঙ্গামা শুরু হয়, তখন অবস্থাটা পুলিসের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন সত্যি; কিন্তু সেখানেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তিনি এবং উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ও অন্যান্য মন্ত্রীরা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন সকলের সামনে উন্মত্ততা প্রশমিত করার জন্য। নিজের উপর সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ও সেচমন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি শিখ শোভাযাত্রাকে পরিচালিত করেছিলেন বাগমারী পর্যন্ত। এই ঝুঁকি নিয়েছিলেন বলেই হাঙ্গামা চার ঘণ্টার মধ্যে থেমে যায় এবং তা অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েনি। এটা নিশ্চয়ই যুক্ত সরকারের কৃতিত্ব। কারণ, এর আগে কোন হাঙ্গামাই এত তাড়াতাড়ি প্রশমিত হতে দেখা যায়নি।

কিন্তু এই হাঙ্গামাকে উপলক্ষ করে কিছু রাজনীতির কথা ও কটূক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শোনা যাচ্ছে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগুরনাম সিং বিধানসভায় বলেছেন, এর মধ্যে কংগ্রেসের হাত আছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেছেন, কোন নির্ভরযোগ্য মহল থেকে তিনি একথা শোনেননি। এখানকার বিধানসভা ও পরিষদেও এর প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে। অবশ্য এই অভিযোগ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ হাঙ্গামা দমনে সরকারের প্রচেষ্টায় প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা ও আস্থা প্রকাশ করেছেন।

অভিযোগ যথার্থ কিনা তা এখানে বিচার্য বিষয় নয়। প্রশ্নটা কংগ্রেস সম্পর্কে। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায়, কংগ্রেসের প্ররোচনা ছিল, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, উদ্দেশ্যটা কি। বলা হয়েছে, উদ্দেশ্য ছিল যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে অপদস্থ করা এবং রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা চালু করা। এটাও ধরে নেওয়া যাক যে, রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা চালু করা হল। সে অবস্থায় একটিমাত্র সিদ্ধান্ত হতে পারে,—পুনর্নির্বাচন, ছয় মাস বা এক বছর পর। এই রকম একটা নির্বাচনে, অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, কংগ্রেস শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হতে বাধ্য। তাহলে এই রকম একটা শোচনীয় পরিস্থিতি ডেকে আনাই কি কংগ্রেসের উদ্দেশ্য? সে ত আত্ম-হত্যার সামিল।

মনে হয়, যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী সদস্যরাও এটা উপলব্ধি করেন। কারণ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমুখার্জি এই ঘটনা সম্বন্ধে তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া আর কোন মন্তব্য করেননি। বিধান সভায় কংগ্রেস পক্ষ থেকে আনা মুলতুবী প্রস্তাবের সময়ও কোন মন্ত্রীর মুখ থেকে এই অভিযোগ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য শোনা যায়নি। তবু মুলতুবী প্রস্তাবের আলোচনা উভয় পক্ষ থেকেই প্রয়োজন ছিল, সমস্ত ব্যাপারটার উপলব্ধি করার জন্য।

মুলতুবী প্রস্তাব আলোচনার সময় পরিষদীয় নিয়মে সীমাবদ্ধ। দু' ঘণ্টা। বিধানসভায় স্পীকার শ্রীবিজয় ব্যানার্জি দু' ঘণ্টা সময় নির্ধারিত করেছিলেন। পরিষদীয় রীতি অনুসারে মুলতুবী প্রস্তাব অনাস্থা প্রস্তাবের সামিল এবং অনুরূপ গুরুত্ব-পূর্ণ। অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করার সময় কেবল নির্দিষ্ট সংখ্যক [illegible]

অনুমতি নিতে হয়, মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপনের সময়ও সেই অনুমতি নিতে হয়।

কাজেই মুলতুবী প্রস্তাব একদিকে যেমন বিরোধী কংগ্রেস দলকে সুযোগ দিয়েছে হাঙ্গামাকে উপলক্ষ করে যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের অনাস্থামূলক সমালোচনা করার, তেমনি সরকার পক্ষকেও সুযোগ দিয়েছে তার নীতির প্রতি বিধানসভার পরোক্ষ অনুমোদন লাভ করতে। দু'ঘণ্টা আলোচনার পর স্বাভাবিক রীতি অনুসারে প্রস্তাবটির সমাপ্তি ঘটে। এতে সরকারের প্রতি আস্থাই প্রকাশ পেয়েছে সম্পূর্ণরূপে।

যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারকে আরও একটি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এটা হয়েছে সরকারের নূতন নীতিকে কেন্দ্র করে। এই নূতন নীতি হল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিসকে হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হবে না। এই আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলন হতে পারে, কৃষক আন্দোলনও হতে পারে। এক কথায় দমননীতি চালান হবে না।

শ্রমিক নীতি ও ভূমি নীতি সম্পর্কে এটাই হল যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ। এই নীতিকে কেন্দ্র করে খুব স্বাভাবিক কারণেই কোন কোন মহল থেকে প্রতিবাদ জানান হয়েছে। বণিক মহলের অভিযোগ যে, এই নীতির ফলেই শ্রমিক মহলে তীব্র অশান্তি দেখা দিয়েছে। নানা কারখানায়, অফিসে শ্রমিকরা 'ঘেরাও' নীতি গ্রহণ করে চাপ দিচ্ছে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে।

এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে শ্রমিক সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, যে এই অবস্থা মালিকপক্ষই সৃষ্টি ক'রেছে বেপরোয়াভাবে ছাঁটাই নীতি প্রয়োগ করে। এই ছাঁটাই নির্বাচনের আগে বন্ধ রাখা হয়েছিল কংগ্রেসী সরকারকে বিপন্ন না করার উদ্দেশ্যে এবং নির্বাচনের পরে কংগ্রেস হেরে যাওয়ায় সে-নীতি পূর্ণ উদ্যমে চালু করা হ'চ্ছে বামপন্থী সরকারকে বিপন্ন করার জন্য।

শ্রমিক সংস্থাগুলির এ-অভিযোগও অস্বীকার করেছেন মালিকপক্ষ থেকে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি শ্রী এস এস কানোরিয়া। মালিকের উদ্দেশ্য যদি হয় মুনাফা করা, তাহলে সে কেন অশান্তি ডেকে এনে উৎপাদন বন্ধ রাখবে তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। অথচ ঘেরাও নীতি অনুসরণ ক'রে শ্রমিকরাই উৎপাদন বন্ধ করে তাদের উপার্জনের পথ সঙ্কুচিত করছে। কংগ্রেসী আমলে কংগ্রেস সরকারের প্রতি শ্রমিকদের আস্থা ছিল না বলেই শ্রমিক আন্দোলন তীব্র আকারে দেখা দিত। তা যদি হয়, তাহলে বর্তমান বামপন্থী সরকারের কাছেও কি শ্রমিকরা সুবিচার আশা করে না? এই প্রশ্নই তুলে ধরেছেন শ্রীকানোরিয়া।

মোট কথা, শ্রমিক নীতি এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে যা বেশীদিন চলা উচিত নয়। শ্রীকানোরিয়া তাই প্রস্তাব করেছেন, দু পক্ষের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনা হোক, যাতে উৎপাদন অব্যাহত থাকে এবং শ্রমিক নিয়োগের পথ সুগম হ'তে পারে।

কিন্তু পশ্চিম বাংলার শ্রমনীতি যুক্ত ফ্রণ্টের কোন কোন সরিকের মনে দেখা যাচ্ছে দাগ কাটেনি। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এটা সুস্পষ্টভাবেই বলা হ'য়েছে। তাদের বক্তব্য পশ্চিম বাংলার শ্রমনীতির বিবৃতি খুবই সংক্ষিপ্ত এবং তাতে সাধারণ কথাবার্তাই আছে। একে "বিশদ রূপ" দেবার জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে "মন্ত্রিসভার সপক্ষে শ্রমিকদের দাঁড়াতে উৎসাহিত করার জন্য এবং ধনিকদের আক্রমণকে পরাস্ত করার জন্য বিবৃতির শ্রমসংক্রান্ত অংশকে বিকশিত ও বাস্তব করা প্রয়োজন।" মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মতে 'যে কোনদিন সংকটের (ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে) বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।" কাজেই মন্ত্রিসভার যদি কোন কর্মধারা না থাকে, তাহলে শ্রমিকদের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করা যাবে না, উদ্যোগ হারিয়ে ফেলবে এবং বড় বড় ধনিকদের ক্রীড়নক হয়ে পড়বে। কেরালার শ্রমনীতিকে এই প্রসঙ্গে প্রশংসা করা হয়েছে। শ্রীকানোরিয়াও প্রশংসা করেছেন। কিন্তু শ্রমমন্ত্রী শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি বলেছেন, কেরালায় যা পারেনি "আমি তা করে দিয়েছি।"

ভূমি নীতি সম্পর্কেও মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির বক্তব্য আছে। ভূমি-নীতির দায়িত্ব প্রধানত মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের হাতে। তিনি নিজে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট। তবু তাঁর নীতি সম্বন্ধে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তাদের বক্তব্য কৃষক ফ্রণ্টে অনেক স্পষ্ট হওয়ার প্রয়োজন আছে। 'আশ্চর্যের বিষয় যে কৃষক সমাজের পক্ষে যা প্রধান প্রশ্ন সেই ভূমি বণ্টনের প্রশ্নে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের কার্যসূচীতে কেবলমাত্র প্রগতিশীল ভূমি সংস্কারের উল্লেখ আছে, কিন্তু ভূমি পুনর্বণ্টনের কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি।'

অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের সঙ্গে ফ্রণ্টের শরিক-দের মতপার্থক্য স্পষ্টরূপ নেবার চেষ্টা করছে। হয়ত তারই ইঙ্গিত আছে শ্রীকোঙারের বিধান সভার বিবৃতিতে। এই বিবৃতির ফলে একটা আশংকাও দেখা দিয়েছে। বর্গাদার ও জোত-দারের মধ্যে যদি সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করে পুলিশ তা উপেক্ষা করবে। গ্রাম্য জীবনে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে খুব দেরী হবে না।

কয়েকদিন আগে শ্রীকোঙার পশ্চিম বাংলা কিষান সভাকে জোরদার করার জন্য এক সভা ডেকেছিলেন। সে-সভার উদ্দেশ্য ছিল কৃষক সমাজ ও কৃষক আন্দোলনকে জোরদার করা, সঙ্ঘবদ্ধ করা। এই প্রচেষ্টার পরি-প্রেক্ষিতে যদি শ্রীকোঙারের বিধানসভার বিবৃতি আলোচনা করা যায়, তাহ'লে এর একটা অর্থও খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না। অনেকের ধারণা ভূমি নীতির নূতন রূপটা ধীরে ধীরে গ্রামে গ্রামান্তরে নানা-ভাবে আত্মপ্রকাশ করবে। কারণ বর্গাদারের জমির উপর অধিকার এর আগে কখনও স্বীকৃত হয়নি।

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ যে খাদ্যনীতির কাঠামো বিধানসভায় ঘোষণা করেছেন, তা মুখ্যত বণ্টননীতি। কিন্তু তাঁর বিবৃতিতে কোথাও বলা হয়নি যে, সে-নীতি ক্যাবিনেটের সম্মতি লাভ করেছে। তিনি যেটুকু বলেছেন, তার অর্থ হল বিস্তারিত-ভাবে ক্যাবিনেটে আলোচিত হয়েছে। তার বেশী নয়। হয়ত সে কারণেই তিনি 'খোলা মন' নিয়েই নীতির চূড়ান্ত রূপ দিতে চান। তিনি খাদ্য বিতর্কের মাধ্যমে জানতে চান যুক্ত ফ্রণ্টের শরিকদের মনোভাব ও বক্তব্য। কংগ্রেসেরও নিশ্চয়ই; কিন্তু প্রধানত ফ্রণ্টের নানা দলের মূল বক্তব্য। মনে হয় তিনি দ্বন্দ্বকে এড়িয়ে চলতে চান।

তবে এক জায়গায় সব শরিকই একমত হবে যে, কেন্দ্র তার দায়িত্ব পুরো পালন করছে না। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। গত বছর যদি পশ্চিম বাংলা ১৫·৯ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পেয়ে থাকে এবার তাহ'লে ১৫ লক্ষ টন পাবে না কেন। খাদ্য দিয়েই বোঝা যাবে কেন্দ্রের কি মনোভাব হবে নূতন বামপন্থী সরকারের প্রতি।

উগ্রতর রাজনীতি

সদাচার-দর্পণ

দুর্নীতি সম্পর্কে সোরগোল আমাদের দেশে বেশী, অনেকের এই ধারণা। এ-ধারণা সম্ভবত যথার্থ নয়। দুর্নীতি সব দেশে, সব সমাজেই কম বেশী আছে সন্দেহ নেই। দুর্নীতি সম্পর্কে আলোচনা, বাদবিতণ্ডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও কম নয়, সম্ভবত আমাদের দেশের চাইতে বেশী। তার একটা কারণ দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্ত-ব্যাপারে মার্কিন সংবাদপত্রের প্রখর দৃষ্টি এবং অসাধারণ তৎপরতা। রবার্ট বেকার, অ্যাডাম ক্লেটন পাওয়েল এবং সেনেটর ডড-এর নানারকম দুর্নীতিমূলক আচরণ সম্পর্কে আমেরিকায় কিছুকাল ধরে তোলপাড় চলেছে। রবার্ট ওরফে ববি বেকার ছিলেন মার্কিন সেনেটের ডেমক্র্যাট দলের একান্ত সচিব, প্রেসিডেন্ট জনসন যে-সময় সেনেটে ডেমক্র্যাট দলের মুখপাত্র তখন ববি বেকার ছিলেন তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র। ববি বেকার তাঁর প্রভাব ও ক্ষমতা খাটিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের একাধিক দপ্তর থেকে নানারকম অন্যায় সুবিধা আদায় করে দেন বড় বড় কারবারীদের স্বার্থে। এই তদ্বির-তদারক বাবদ ববি বেকার মোটা রকম দক্ষিণা নিয়েছিলেন। তদন্ত এবং বিচারের ফলে ববি বেকার দণ্ডিত হয়েছেন। অ্যাডাম ক্লেটন পাওয়েল মার্কিন হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস-এর নাম-করা সদস্য; কিন্তু সরকারী টাকা বেহাত করার অভিযোগে হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস অর্থাৎ মার্কিন সংসদের নিম্ন পরিষদে তাঁর সদস্য পদ খারিজ হয়েছে। সেনেটর ডড আরও প্রভাবশালী, এক সময় কথা ছিল তিনিই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট হবেন। তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর দলের এবং সরকারী তহবিলের টাকাকড়ি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার বহু অভিযোগ। মার্কিন সেনেটের সদাচার কমিটির তদন্তে কিছু কিছু অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, তদন্ত এখনও শেষ হয়নি।

নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় জেমস রেস্টন সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন, "আমেরিকা কী পরিমাণ দুর্নীতিগ্রস্ত?" রেস্টন বলেন, প্রশ্নটা নীতিবাগীশ গোঁড়ামির আতিশয্য বলে এখন আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর কারণ হিসেবে রেস্টন একাধিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন—কেনেডী হত্যা, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ সংঘর্ষ, বড় বড় শহরে হাঙ্গামা, নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলোযোগ, ববি বেকার, অ্যাডাম পাওয়েল, সেনেটর ডডের মামলা, প্রেসিডেন্ট জনসনের সত্যভাষণ সম্পর্কে সন্দেহ, টেলিফোনে আড়িপাতা, সি আই এ-র কাণ্ড ইত্যাদি। রেস্টন বলেন, সকলের মুখেই দুর্নীতির অনাচারের অভিযোগ, তবে দোষারোপটা এক পক্ষ অন্য পক্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। তবুও স্বস্তির কথা, সকলেই একবাক্যে মানছে যে কোন না কোন জায়গায় মারাত্মক গলদ ঘটছে, ন্যায় অন্যায়, ভাল এবং মন্দ সম্পর্কে মার্কিন সমাজে যেন কোন সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি নেই।

এই নৈতিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনমত সব সময়েই প্রবল, কোন অন্যায় বা অনাচার তাই সহজে একেবারে চেপে রাখা যায় না। রেস্টনও সে কথা বলেছেন। সরকারী শাসনব্যবস্থার উপর জনমতের চাপ পড়ে নানাদিক থেকে। সি আই এ-র কার্যকলাপ, বিশেষ করে ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয় মহলে, সে কারণে প্রখর সমালোচনার বিষয় হয়েছে। এই সমালোচনায় রাখ-ঢাক নেই, সি আই এ-র বিপক্ষে এবং পক্ষেও সমানে তর্কবিতর্ক চলেছে। এটা এক দিক দিয়ে পরিচ্ছন্ন চিন্তার পরিচয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও ব্যক্তি অথবা কোনও প্রতিষ্ঠানই নিয়মবিরুদ্ধ কাজকর্ম চালালে সহজে রেহাই পায় না। সে যেমন সি আই এ সম্পর্কে তেমনই ববি বেকার, অ্যাডাম ক্লেটন পাওয়েল, সেনেটর ডডের মত ক্ষমতাধরদের দুর্নীতিমূলক আচরণ সম্পর্কেও।

মার্কিন রাজনৈতিক মহলের দুর্নীতি দূর করা অবশ্য কম্বলের রোঁয়া বাছবার মত দুঃসাধ্য ব্যাপার। মার্কিন সংসদের উচ্চতর পরিষদ সেনেট এবং নিম্ন পরিষদ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভসের সদস্যদের ক্ষমতা প্রচুর। সেনেটরদের ক্ষমতাই সর্বাধিক। বার্ষিক ত্রিশ হাজার ডলার মাইনে ছাড়া এঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অফিস চালানো, কর্মচারী পোষণ ইত্যাদি বাবদ লক্ষাধিক ডলার পেয়ে থাকেন। উপরন্তু নানা উপলক্ষে বা অছিলায় রাহাখরচ ইত্যাদি। এরপর যাকে বলা হয় লবি-ইং অর্থাৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির স্বার্থে সরকারী মহলে তদ্বিরতদারক এবং বিশেষ সুবিধা আদায়। সে-বাবদ সব সেনেটরই মোটা উপরি পেয়ে থাকেন। এটা জানা কথা যদিও নিয়মবিরুদ্ধ এবং এই উপরি লেনদেনের কারচুপিতে অসাবধান হলে, বিপক্ষের প্যাঁচে পড়ে বিপত্তির সম্ভাবনা। কনেটিকাটের প্রবীণ মহামান্য সেনেটর ডড, যিনি খুব নীতিজ্ঞানী বলে খ্যাত ছিলেন, তিনিই কিনা এই রকম ফ্যাসাদে পড়েছেন।

সেনেটর ডডের বিরুদ্ধে খবর-কাগজে, টেলিভিশনে নিত্যনূতন কেলেঙ্কারীর প্রচারে তিনি কাহিল হয়ে পড়েন, শেষ পর্যন্ত সেনেটের সদাচার কমিটির সঙ্গে ডডের রফা হয়েছে, দফায় দফায় নিতনূতন অভিযোগ প্রচার না করে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগগুলির একটা চূড়ান্ত তালিকা উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে সাব্যস্ত করা হোক। তাই হয়েছে। সে তালিকাও ছোট নয়, অন্তত মোট অর্থের নয়-ছয় ব্যাপারে। সেনেটের সদস্য পদে নির্বাচনে ভোটাভুটির জন্য খরচ বাবদ ডড পেয়েছিলেন, চাঁদা ও দান হিসেবে সাড়ে তিন লক্ষ ডলারেরও বেশী। দেখা গেছে এর অর্ধেক তিনি নিজের নামে ব্যাঙ্কে জমা রেখেছেন, আর কিছু অর্থ গেছে ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধে, তারপর সংসার খরচে, সপরিবারে বহু নামকরা প্রমোদ কেন্দ্র পর্যটনে। সেনেটর ডডের জবাব, এ-সমস্ত অর্থ তিনি পেয়েছেন ব্যক্তিগত দান বা সাহায্য হিসেবে; কাজেই তিনি তাঁর খুশীমত খরচ করায় দুর্নীতি কোথায়? সরকারী অর্থের অপব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ অবশ্য আরও গুরুতর, সে-অভিযোগ প্রমাণও হয়েছে। সেনেটর ডড সরকারী কাজের অছিলায় রাহাখরচের বিল করেছেন আবার সেই রাহাখরচ অন্য প্রতিষ্ঠান থেকেও আদায় করেছেন, এইভাবে চৌদ্দটি দফায় তিনি ডবল অথবা তিন প্রস্থ রাহাখরচ পকেটস্থ করেন। নানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তরফে তদ্বির বাবদ দক্ষিণা প্রাপ্তিও তাঁর কম নয়, এই আর একটি অভিযোগ।

সেনেটের অন্যান্য সদস্যদের উভয়সংকট। সুনীতির কঠোর বিচারে সেনেটর ডড দোষী হতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য সেনেটররা তাহলে দাঁড়ান কোথায়? সরকারী মহলে তদ্বির তদারক করে সুবিধা আদায়ের কাজটা প্রায় প্রত্যেক সেনেটরই করে থাকেন; সেটা তাঁদের উপার্জনের চোরাগলি। সেনেটরদের আয়ব্যয়, উপার্জন, গোপন তদ্বিরতদারক সম্পর্কে নিয়মকানুনে আরও কড়াকড়ির প্রস্তাব উঠেছে, কিন্তু সেনেটররা আপাতত সেটা চাপা দিয়েছেন। তাঁদের কথা, আগে সেনেটর ডডের কী শাস্তি দেওয়া যায় কী না যায় সাব্যস্ত হোক, তারপর সেনেটরদের সদাচারবিধির ভাবনা। ভাবনা অবশ্য একেবারে চাপা দেওয়া যাবে না। কারণ রাজনীতিব্যবসায়ীদের অনাচারের বিরুদ্ধে মার্কিন জনমত সজাগ হয়েছে।

৩/৪/৬৭

পনেরো দিন অন্তর

ভাস্কর চক্রবর্তী

পনেরো দিন অন্তর মনে হয় পৃথিবীর সব কিছু ভেঙেচুরে আমি
তোমার সামনে এসে হা হা করে হেসে উঠি।
পনেরো দিন অন্তর বুকের ভিতরে অবিরল চীৎকার ভেঙে পড়ে
যেন প্রকাণ্ড বাড়ির সদর দরজা হাওয়ায় খোলে আর বন্ধ হয়
তখন ঘাসের দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় ঘাসগুলো দাউদাউ
জ্বলছে, সেদিন
পৃথিবীর সব কিছু ভেঙেচুরে মনে হয় তোমার সামনে এসে আমি
হা হা করে হেসে উঠি।

তোমার চৌকাঠে এসে প্রতিদিন ক্লাউনের মতো গড়াগড়ি খাই শূন্যে
পিঠ বেঁকিয়ে হঠাৎ হাততালি দিই কোনদিন
তুমি হেসে ওঠো
সে-হাসির শব্দে শব্দে ঘরের দেয়াল বেঁকে যায়
সুদৃশ্য তাকের থেকে অবনীন্দ্রনাথ উঁকি মারে, আমি শূন্যে
ঝুলে থাকি
প্রতিদিন ঝুলে থাকি, শুধু পনেরো দিন অন্তর
মেঘ গর্জনের মতো শরীর ভেঙে পড়তে চায় মাটিতে ও মনে হয়
পৃথিবীর সব কিছু ভেঙেচুরে আমি তোমার সামনে এসে
হা হা করে হেসে উঠি।

অভাবিত মধ্যযাম

দেবারতি মিত্র

চাঁদ নিবে গেছে তবু বিশাল নির্জন জলে
এখনও কোমল আভা ঝরে,
অভাবিত মধ্যযাম;
এই মুহূর্তেও হিম জলের ভিতরে
আমার বাহুতে অক্টোপাস,
উরুদেশে জলজ সবুজ সরীসৃপ,
আগ্নেয় পর্বত থেকে সহসা নির্গত
অতর্কিত বুকে ঠোঁটে—ঘূর্ণী আগুনের চাপ
অবয়বশূন্য, অন্ধ, ভূতগ্রস্ত;
হৃৎপিণ্ড ফেটে যায় প্রতিহত বুদ্বুদের মত।

হে ঈশ্বর, হে ঘুমন্ত নির্বিকল্প জলের আকর,
মূর্তিময় শীতলতা,
এক মুহূর্তও তুমি জলস্তম্ভ হও,
অনেক গভীর থেকে বিশ্রামে নিথর
স্তূপ স্তূপ জলগাছা, বিচিত্র পেখমী মাছ
ঝিনুক, শামুক, নুড়ি, পাখামেলা সাপ,
মূর্ছিত শৈবাল নিয়ে ডুবন্ত আমাকে।

এখন দুপুররাত

শংকর দে

এখন দুপুর রাত, লালটেক্কা ম্যাজিকের মতো আমি
উল্টোদিকের পকেটে হাত দিয়ে দেখছি সব কিছুই ফাঁকা—
মাথার ওপরে চুলের বেড়ে ওঠা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে তখনই
হাতের মুঠোয় ধরতে চেয়েছি শিকড়সুদ্ধ নিজেকেই
ছুঁড়ে ফেলতে চেয়েছি এরকমই ঝরে পড়ার সময় আমি রক্তবর্ণ—
এখন দুপুর রাত, আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখছি লাফিয়ে ওঠা খড়্গ
নীল কিংবা হলুদঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখছি দু'একজন
দাঁতদুঃখী মানুষের হেঁটে যাওয়া অতীতের অনেক কিছুরই
ভেঙে-যাওয়া অস্পষ্ট জলের দাগ, এরকমই পকেটের উল্টোদিকে
আমি হাত দিয়ে ভাবছি সবদিকেই সমান দূরত্ব—

চন দিকের ছায়ায় তিনজন মানুষের ভাঙা মাথায় ঝরে পড়ছে
দেবতার হাসি ও বিদ্যুৎ—
কোনো গলায় ফুঁপিয়ে উঠছে আমার দীর্ঘশ্বাস, অতিদূর
দূরের দিকে চেয়ে রয়েছি শূন্যচোখ, কাঁটাতারে বিঁধে-যাওয়া
ই অতিঘোর একচক্ষু যা আমার সামনে কিংবা পিছনের ছায়ায়
মি শূন্যে লাফিয়ে পড়ার আগেই, প্রতিটি মুহূর্তেই অন্ধকার

প্রতিটি মুহূর্তেই স্থির অসুখের সামনে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি
কঙ্কালের মতো
হিম পায়ের নিচেই সেই কেঁপে ওঠা দীর্ঘসমাধির
ক্রমশই ঝুঁকে পড়ছি আমি যা কিছু আমার শাস্তি শাসনের
যা কিছু ভুলে কাছে দয়াময় অজ্ঞানতা ছাড়া আমি কিছুই জানি না।

এখন দুপুর রাত, ঘুমিয়ে-পড়া মানুষের কাছে গিয়ে আমি
শেষবারের মতো ক্ষমাভিক্ষা চাইছি, আমি অভিমানী
জ্বলতে জ্বলতে নিবে যাবো, প্রতিটি মুহূর্তের চোখেই অন্ধকার
কালো টেক্কা হাতে নিয়ে চলে যাবো এরকমই ফাঁকা রাস্তায় আমি
দাঁড়িয়ে দেখছি সবকিছু ম্যাজিকের মতোই ফাঁকা—

এক মুহূর্তের বেঁচে থাকা কতো কষ্টকর জেনেও এখন আমি
কবিতা লেখার দিকে এরকমই চোখ মুছতে মুছতে
অন্ধ হয়ে যাবো।
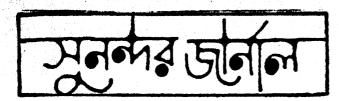
‘একটি মহান ভবিষ্যৎ’

শিবমন্দির, গুরুদ্বারা, লাঠি, খোলা তলোয়ার, টাঙি, বল্লম, হকিস্টিক নিয়ে শোভাযাত্রা—তারপরেই ঘণ্টা তিন চার ধরে রক্তারক্তি এবং ভূতুড়ে তাণ্ডব। কপালে দুঃখ থাকলে যা হয়—কিছুক্ষণের জন্যে এই ঘূর্ণির মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়েছিল, যে অভিজ্ঞতা লাভ হল সেটা না বলাই ভালো।

আধ মাইল দূরের বাড়িতে ফিরতে গিয়ে মধ্য কলকাতার নানা জটিল এবং রহস্যময় গলিতে মাইল পাঁচেক ঘুরে যখন যথাস্থানে পৌঁছুনো গেল, তখন সমস্ত মন বিধ্বস্ত, পা ক্ষত-বিক্ষত। না, দাঙ্গার শিকার হতে হয়নি, তা হলে এই জার্নাল লেখা সম্ভব হত না। পায়ের জুতোয় গোটা কয়েক ফোসকা উঠে গলে গিয়েছিল। এমন প্রবল চারণিক ব্যায়াম বহু দিন করা যায়নি।

বিস্বাদ মন আর ফোসকার যন্ত্রণা সমস্ত রাত ঘুমুতে দিল না। জানালা দিয়ে এক-মুঠো তারা, ভাঙনধরা চাঁদ আর গোটা কয়েক গাছের মাথা দেখতে দেখতে কোনো আধ্যাত্মিক উপলব্ধি তো এলই না, বরং একটা দারুণ কুচিন্তা আমাকে পেয়ে বসল। ধর্মপ্রাণদের কাছে সভয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি : ধর্ম ব্যাপারটাকে ঠিক বিড়ালের ল্যাজের মতো মনে হল আমার। কোনো কাজে লাগে কি না জানি না, কিন্তু ধ্বজা-পতাকার মতো উঁচু করে বয়ে বেড়ালে বেশ মনোরম দেখায়, আর ভুল করে কেউ একটুখানি মাড়িয়ে দিলেই ‘ক্যাঁচ্’ করে এক দারুণ চিৎকার, তারপরেই আঁচড়ে কামড়ে রক্তারক্তি কাণ্ড।

সকালে উঠে চায়ের পেয়ালা এবং খবরের কাগজ—দুই-ই সমান খারাপ লাগছিল। কাগজটা পড়ব না ভেবেও অভ্যাসে পাতা উল্‌টে যেতে যেতে এক জায়গায় চোখ থমকে গেল। হুঁ, এখনো আমাদের আশা আছে। একটি সামান্য খবরের সূত্র ধরে একটা বিপুল সম্ভাবনা রোদে ভরা সকালটির মতোই আমাকে উদ্‌ভাসিত করে তুলল।

বার্তাটি আসছে সুইডেন থেকে। খুব সম্ভব আপনারা সবাই-ই সেটি পাঠ করেছেন, তবু নতুন করে আর একবার স্মরণ করুন। ভয়ঙ্কর বৈজ্ঞানিকেরা মশক-নিয়ন্ত্রণের এক অপূর্ব পন্থা আবিষ্কার করেছেন। না, সংহারযোগে নয়, বংশ-বিস্তার রোধ করে।

প্রক্রিয়াটি চমকপ্রদ। বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, মশা-মাছি-পোকামাকড় ইত্যাদির স্ত্রী-জাতীয়ারা বিশেষ বিশেষ সময়ে এক ধরনের গন্ধ ছড়াতে থাকে, ফলে পুরুষের দল আকুল হয়ে ধাবিত হয় এবং কীট-পতঙ্গের সংসার পুত্রকন্যায় জমাট হয়ে ওঠে। তাদের এই পারিবারিক শ্রীবৃদ্ধি মানুষের পক্ষে আদৌ সুখকর হয় না—বলাই বাহুল্য।

অতএব পুরুষ জাতির এই আদিম দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পণ্ডিতেরা তাঁদের ল্যাবরেটরিতে ওই উন্মাদক গন্ধটি কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন। আপাতত মশা-ই তাঁদের টারগেট। অচিরেই তাঁরা সিদ্ধিলাভের আশা রাখেন। তারপরে কী হবে? ওই গন্ধটি ছড়িয়ে ছড়িয়ে যত পুরুষ মশাদের তাঁরা ভুলিয়ে নিয়ে যাবেন দূরে, বহু দূরে—লোকালয়ের সীমানা ছাড়িয়ে ট্যুরিস্টদের এলাকা থেকে বহু মাইলের ব্যবধানে। স্ত্রী মশারা নিজেদের গন্ধ বুঝতে পারে না—ঘটনাটা তারা টেরও পাবে না। পুরুষ মশারা বাধ্যতামূলক সন্ন্যাস যাপন করবে, আর স্ত্রী মশারা ব্যর্থ মধুমাসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে ভাবতে থাকবে : হায়—কোথায় গেল সেই তরুণেরা—ক্ষুরধার যাদের শুঁড়, যাদের বলিষ্ঠ ডানায় জেট-বিমানের মতো আওয়াজ ওঠে?

খবরে কাব্য করে বলা হয়েছে : ‘কিন্তু কোনোদিনই তা তারা জানতে পারবে না।’

পড়তে পড়তে আমি অনুপ্রাণিত হলুম, ঠাণ্ডা চায়ে সজোরে একটা চুমুক দিলুম, এমন কি, সাময়িকভাবে পায়ের ফোসকার কথাও আমাকে ভুলে যেতে হল। ঠিক এই-রকম কীর্তির কথা এর আগেও যে না শুনেছি তা নয়—ব্রাউনিঙের কবিতার সেই স্বনামধন্য বংশীধর তার মুরলীতানে মুগ্ধ করে হ্যামলিন শহরের সব ইঁদুরকে ডুবিয়ে মেরেছিল। কিন্তু সে তো শুধুই গল্প। এ হল খাঁটি সুইডেনের খবর, এখানে গাল-গল্পের ব্যাপার নেই, এই দেশ থেকেই নোবেল-পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। ও'রা আরো বলেছেন, শুধু এই-খানেই থামবে না—এর পরে মাছি-পোকা-আরশোলা ইত্যাদিকেও এইভাবে ব্রহ্মচর্য-ক্যাম্পে চালান করবেন।

মশা-মাছি-আরশোলা-ইঁদুর পরিসেবিত এই কলকাতার উক্ত জীববৃন্দ কোনো এক-দিন দূরে বঙ্গোপসাগরের কোনো দ্বীপে নির্বাসিত হয়ে আমাদের দিন-রাত্রি নিশ্চিন্ত করবে, এই স্বপ্নে আমি বিভোর হয়ে উঠছি না। বিশ্বনাগরিকতার বিরাট পটভূমিতে নিজেকে ব্যাপ্ত করে আমার মনে হচ্ছে, এর তাৎপর্য আরো গভীর। মশা থেকে বোধ হয় ব্যাং, ব্যাং থেকে গিনিপিগ-ইঁদুর, অতঃপর বাঁদর, তারও পরে বাঁদরের পার্শ্বশাখা সমুদ্ভব—

না-না, গন্ধ কিংবা ধ্বনি, কিংবা অন্য-বিধ কোনো মোহিনী-মায়া রচনা করে পৃথিবীর জনসংখ্যা হ্রাসের কথা বলছি না। সাহারার মরুভূমি কিংবা অ্যামাজনের জঙ্গলেও কি এমন কোনো নির্জনতা আছে, যেখানে জননী ইভার আত্মজারা বসে নেই? ওদিকটা আমি ভাবছি না। মনে হচ্ছে, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ, শান্তি-পূর্ণ সহাবস্থান কিংবা “শেষ মোক্ষম লড়াইয়ের যুদ্ধবাজদের খতম করে পরমা শান্তির প্রতিষ্ঠা”—এ সব কিছুরই আর দরকার হবে না। গন্ধের এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট আরো চলুক, চলতেই থাকুক; এবং অতঃপর—

অতঃপর রক্তের গন্ধ, লুটের গন্ধ, শোষণের গন্ধ, দুর্নীতির গন্ধ, মারমুখো ধর্মের গন্ধ—ইত্যাদি বিবিধ সুরভি-নির্যাস তৈরি করে—এইসব ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহী, তাঁদের হ্যাম্‌লিনের সেই বাঁশি-ওলার সুরমুগ্ধ বালক-বালিকাদের মতো আফ্রিকার কোনো জঙ্গলে, মেরু অঞ্চলের কোনো সুশীতল আবহাওয়ায় (যুদ্ধবাজ কিংবা দাঙ্গাওয়ালাদের মাথা ঠাণ্ডা করবার পক্ষে বেশ উপযোগী, নাপোলেঁয় থেকে হিটলার পর্যন্ত অনেকে সেটা টের

পেয়েছেন) কিংবা অস্ট্রেলিয়ার কোনো তৃণ-প্রান্তরে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। এক-বারে নিশ্চয় জায়গা হবে না—ব্যাচ্ বাই ব্যাচ্। তারপরে ধীরে ধীরে তাঁদের চিত্ত-শোধন করা যাক।

কী উপায়ে? কাগজে আর একটা বার্তা দেখছি—অস্ট্রেলিয়ার টকিং-চেয়ার। তাতে বসে সুইচ্ টিপলেই নাকি চেয়ার দু-কান জুড়িয়ে দেশের ইতিহাস-ভূগোল-সাংস্কৃতিক বিবরণ এইসব শোনাতে থাকে। এই চেয়ারগুলোকে কাজে লাগানো হোক। এদের ওপরে দুর্মতিমানদের বসিয়ে তাদের কানে কানে শোনানো হোক: অহিংসাই সত্য, সহিষ্ণুতাই ধর্ম, পরের দ্রব্যে লোভ করিয়ো না। শ্রীমুসার দশটি অনুজ্ঞা মানিয়া চলিয়ো, ডান গালে চড় মারিলে বাঁ গাল—

গৃহিণীর চিৎকারে এইখানেই থেমে যেতে হল: 'আজ খেতে হবে না? বাজারে যাবে কখন?'

উঠে পড়বার আগে মনে হল, লাঠি-তলোয়ারধারী শোভাযাত্রীদের জন্যেই শুধু নয়—বাজারমত্তা গৃহিণীদের জন্যেও মাছ-তরকারির সৌরভ এবং খানকয়েক চেয়ার দরকার॥

অমঙ্গলবোধ ও রবীন্দ্রনাথ
শেষপর্বের কবিতা

আব্দু সয়ীদ আইয়ুব

চিরপ্রশ্নের বেদী-সম্মুখে চিরনির্বাক রহে
বিরাট নিরুত্তর

পরিশেষ আর পুনশ্চ প্রকাশিত হয় এক মাসের ব্যবধানে, দুটোরই রচনাকাল ১৩৩৮-৩৯। পরিশেষ নাম শুনলে মনে হয় বইখানা যেন তৎপূর্ববর্তী কাব্যধারার সমাপ্তি-ঘোষণা; রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ বোঝাতে চেয়েছিলেন যে এটাই তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ, এর পর কবিকর্ম থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করবেন। মুখবন্ধ-স্বরূপ 'প্রণাম' কবিতাটিতে সেই ইঙ্গিত রয়েছে—"এই গীতিপথপ্রান্তে, হে মানব, তোমার মন্দিরে/দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে/আরতির সান্ধ্যক্ষণে।" নৈঃশব্দ্যের তীরে এসে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করলেন নতুন এক ভাবসমুদ্র।

নতুন এক রীতিরও (কবি যার কাব্যিক নাম দিয়েছেন "গদ্যকাব্য রীতি") প্রবর্তন হয় ঐ দুখানি বইতে, কিন্তু ভাবের দিক থেকে পরিবর্তন আরও লক্ষণীয়। সংশয়, প্রশ্ন, "নৈরাশ্যের তীব্র বেদনা", মানসিক দ্বন্দ্ব, তিক্ততা (রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যতখানি তিক্ত হওয়া সম্ভব), সেই সঙ্গে 'সন্ন্যাসী মহাকালের কাছে দীক্ষা-গ্রহণ একদিকে এবং অন্যদিকে পুরোদস্তুর মানবিকতাবাদ—এ সবেরই সূত্রপাত ঐ দুখানি পর্বান্তকারী কাব্যে। এর কিছুই হয় তো একেবারে নতুন নয়, প্রথম পর্বেও এ সব ভাবের সাক্ষাৎ মেলে। কিন্তু তখনকার কিঞ্চিৎ অপরিণত মনের সে উপলব্ধি সম্পূর্ণ স্বকীয় ছিল না, পাশ্চাত্ত্য রোম্যাণ্টিক অ্যাগনির অল্প-বিস্তর সংক্রমণ দেখা যায় মানসী-চিত্রার যুগে, তৎপূর্বে তো বটেই। প্রকাশভঙ্গি শিথিল না হলেও শক্ত হয় নি মাংসপেশি, শব্দের যাদুকরি ছিল, গৃহস্থালি ছিল না; ভাবালুতার দোষও চোখে পড়ে—অবশ্য সে-যুগে তা দোষ বলে গণ্য হতো না। পূর্বোক্ত ভাবপুঞ্জকে মাত্রায় ও গুণে, অনুভবে ও অভিব্যঞ্জনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পর্বের কাব্যে এমন এক স্তরে তুলে দিয়েছেন যাকে নতুন বলে অভ্যর্থনা করতেই হয়।

বলাকা রচনাকালে প্রথম মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ "দুঃখের বিরাট স্বরূপ" দেখে বলেছিলেন বটে "তুফানের মাঝখানে/নূতন সমুদ্রতীর-পানে/দিতে হবে পাড়ি", কিন্তু ঠিক তখনই নতুন সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়নি, চেনা সাগরেই তরী বাওয়ার নতুনতর কৌশলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলল আরো কিছু কাল। যে অজানা দেশের ইঙ্গিত ছিল বলাকাতে, তার সাক্ষাৎ পাই না পূরবী কিংবা মহুয়ায়, বরঞ্চ মনে হয় আমরা যেন মানসীর ভাবলোকেই ফিরে গেছি, তফাত মোটের উপর কলাকৌশলেই। নতুন পর্বারম্ভের স্বাক্ষর পরিশেষ-পুনশ্চ-এর আগে স্পষ্ট নয়।

পূরবী-মহুয়াতে কবি যেন ভাষা ও ছন্দের প্রোৎকর্ষের দিকেই অধিকতর মনোযোগী। সে মনোনিবেশ শিথিল হয় নি সেঁজুতি, আকাশপ্রদীপ, নবজাতক পর্যন্ত, যদিও তার পূর্বেই রবীন্দ্রকাব্যের ঋতুপরিবর্তন ঘটে গেছে। তার পরে কঠিন পীড়া ও দেহযন্ত্রণার মধ্যে নতুনতর সৃষ্টির পালা আরম্ভ হল। আমরা সেই অন্তিম পর্বে এসে পৌঁছই যখনকার রচনাকে বৈদিক মন্ত্রকাব্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, শিশিরকুমার ঘোষ যার আরও সঠিক সংজ্ঞা দিয়েছেন "সারাৎসার কাব্য" এবং সেই কাব্যের চরিত্র-বর্ণনায় ডি এইচ লরেন্স-এর পত্রাবলি থেকে উদ্ধৃত করেছেন:

"Everything can go but the stark, bare, rocky directness of statement that alone makes poetry to-day."

কিন্তু এই পর্যায়ের শেষেও ভাবের গতি কিংবা আঙ্গিকের বিবর্তন থামত এমন তো মনে হয় না। 'শেষ লেখা'র অপ্রত্যাশিত বাঁকে এসে আমরা যখন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি নতুন এক কাব্যদিগন্ত দেখতে পাওয়ার প্রত্যাশায়, ঠিক তখনই এই চিরপথিকের পথ চলা অকস্মাৎ থেমে গেল একটি বাহ্য কারণে। রোগশয্যা, আরোগ্য, শেষ লেখার লেখনী ক্লান্ত নয় মোটেই; এ কাব্যগুলির অক্ষরে অক্ষরে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা আছে, জরা নেই, মানসিক

ভরা একেবারে অনুপস্থিত। যিনি "অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস" তাই দেখছেন "অনন্ত আকাশে", তাঁর সেই স্বচ্ছ নির্ভীক দৃষ্টিশক্তি ও রচনাভঙ্গিকে অসুস্থ বা ক্লিষ্ট বলবে কে?

আধুনিক সমালোচকরা যথার্থই বলেছেন. যে-কবিতায় একই বা এক-জাতীয় অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে তার চেয়ে উঁচু দরের বলে গণ্য হবে সেই কবিতা যাতে একাধিক বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ ঘটেছে (অবশ্য যদি অনুভূতির প্রকাশ দুটোতে সমান রূপ-দক্ষতার সঙ্গে হয়ে থাকে।) আরও উঁচু দরের কবিতায় আমরা পাই বিপরীতের সন্নিপাত, যেমন কীটসের নাইটিংগেলে, হপ্‌কিনসের ভক্তিকাব্যে, এলিয়টের ফোর কোয়ার্টেটস-এ। রিলকে বলেছিলেন টেরিব্‌লনেস এবং ব্লিস একই সত্তার এপিঠ-ওপিঠ—এই উপলব্ধিটি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পাওয়া যাবে তাঁর শেষ দুখানি কাব্য-গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ প্রান্তিকের ১০ সংখ্যক কবিতায় আক্ষেপ করছেন যে, তাঁর পরমায়ু শেষ হয়ে এল অথচ 'চরমের কাছে মর্যাদা' তিনি পান নি, কারণ "জাগেনি না মর্মতলে ভীষণের প্রসন্ন মুরতি"।

ভীষণের প্রসন্ন মূর্তি যে দুর্লভ ধ্যান-দৃষ্টির সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হবে তাঁর জন্য সর্বান্তঃকরণের আকূতি তাঁর শেষ পর্বের কাব্যকে—পরিশেষ থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত—আশ্চর্য সার্থকতা দান করেছে। প্রথম পর্বের কাব্যেও 'ভীষণ' একেবারে অনুপস্থিত নন, কিন্তু ভীষণ সেখানে ভীষণই (যেমন ছবি ও গান-এর 'আর্তস্বর' ও 'নিশীথ জগত'-এ, মানসীর 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' ও 'সিন্ধুতরঙ্গ'-এ), এবং মধুর মধুরই—তার উদাহরণ অজস্র। তবে সে পর্বের কবিতা মোটের উপর মধুর রসেরই কবিতা। মাঝে মাঝে অভিজ্ঞতা ও কল্পনা অন্য পথে গিয়েছে, কিন্তু তা কচিৎ, এবং সে কচিৎ-আভাসিত অসুন্দরের বা অশুভের ছায়া পড়ে নি কবির সমস্ত হৃদয়-মনের উপর। মানসী, সোনার তরী, চিত্রার কাব্যরসে বৈচিত্র্যের অভাব নেই, এমন কি একই কবিতায় অনেক সময় বিবিধ রসের সমাবেশ ঘটেছে। কিন্তু বিপরীতের টানে কবির মন দীর্ণ হয় নি তখন। নৈরাশ্য ও বিষাদের যতটুকু ধুলো-বালি দেখা দিয়েছিল মানসীর যুগে, তাও মুছে গেল গীতাঞ্জলি পর্বে এসে। ভক্তিরসে আপ্লুত এই মধ্য পর্বের কাব্যে ভীষণের চেহারা দেখা যায় না তা নয়, কিন্তু তাকে আর ভীষণ ব'লে চেনাই যায় না। হোক সে 'ভীষণ তরবারি' তবু সে যে প্রিয়তমের অভিসার-রাত্রির দান, তাকে বুকে চেপে ধরতে হবে যদিবা বুক কেটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। মোটের উপর তখন রুদ্রের দক্ষিণ মুখই দেখা গিয়েছিল, তবে সেই প্রসন্ন মুখের 'আনন্দ-আবেশ'-ভরা প্রকাশ খেয়া থেকে গীতালি পর্যন্ত গূঢ় ও বিস্রম্ভ ব্যঞ্জনায় অতুলনীয়।

অবশ্য ঐ একই সময়ে তিনি রচনা করেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতীকী নাটক রাজা। রাজার প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে সহচরী সুরঙ্গমার সঙ্গে রাণী সুদর্শনার সংলাপে পড়িঃ

সুদর্শনা। রাজাকে তখন তোর কী মনে হত?

সুরঙ্গমা। উঃ কী নিষ্ঠুর, কী নিষ্ঠুর, কী অবিচলিত নিষ্ঠুরতা!

সুদ। সেই রাজার 'পরে তোর এত ভক্তি হল কী করে?

সুর। কী জানি মা! এত অটল, এত কঠোর বলেই এত নির্ভর, এত

ভরসা। নইলে আমার মতো নষ্ট আশ্রয় পেত কেমন করে।

সুদ। তোর মন বদল হল কখন?

সুর। কী জানি কখন হয়ে গেল। সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তখন দেখি যত ভয়ানক, ততই সুন্দর।
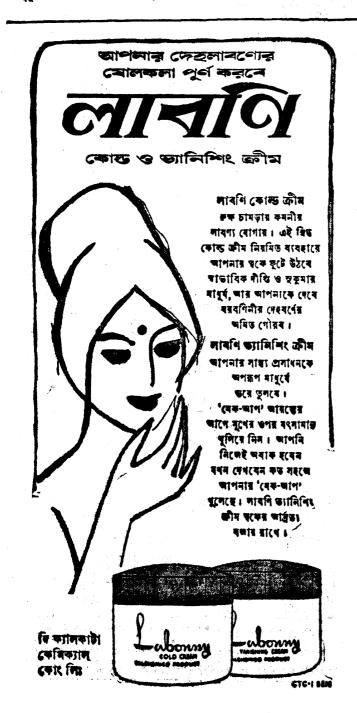
এবং শেষ দৃশ্যে সুদর্শনা রাজার কাছে আত্মনিবেদন করে বলছেন: "তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও। তুমি অনুপম।... যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আমার ভয়ানককে প্রণাম করে যাই।" কিন্তু রাজা কিসে ভয়ানক, কোথায় নিষ্ঠুর, তার প্রকাশ নাটকে স্পষ্ট নয়। যা স্পষ্টরূপে ফুটেছে তা রাজার আত্মগোপন করে থাকার ইচ্ছা—যতদিন রাণীর চোখ কেবল সুন্দরকে খুঁজছে ততদিন রাজা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে থাকবেন। মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ অনুমানে জেনেছিলেন কোথায় যেন ভয়ানক কিছু আছে, নিষ্ঠুর কিছু ঘটছে, কিন্তু সেই নিষ্ঠুর-ভয়ানকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি তখন।

ভয়ানককে আবার দেখা গেল—অন্ধকারে নয়, আলোতেই দেখা গেল—বলাকা কাব্যে, প্রথম মহাযুদ্ধের বিরাট পটভূমিকায়। বলাকা রবীন্দ্রকাব্যের ইতিহাসে একটি সন্ধিস্থল। মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কা লেগে রবীন্দ্র-কবিপুরুষ খানিকটা দিশাহারা বোধ করেছিল। এত বড় নিদারুণ অভিঘাতকে সহজভাবে গ্রহণ করার যথোপযুক্ত প্রস্তুতি ছিল না গীতাঞ্জলির কবির চিন্তায় বা অনুভূতিতে। তাই নৈবেদ্য-এ যেমন, বলাকাতেও তেমনি জগত-জোড়া দুঃখ ও পাপের চেহারাটাকে কবি সহনীয় করে নিতে চাইলেন তাকে ঈশ্বরকৃত শাস্তি-বিধানরূপে দেখে—একথা আগের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এই সহজ সমাধানের ব্যর্থতা তাঁর ধর্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত করলো, তাঁর সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি গেল পালটে।

বলাকা প্রকাশিত হয় ১৩২৩ সালে, পরিশেষ ও পুনশ্চ ১৩৩৯-এ। অবশেষে এই ষোলো বছর পরে আমরা সেই অজানা সমুদ্রতীর'-এর কাছে পৌঁছলাম যার স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল বলাকার ৩৭ সংখ্যক কবিতায়। কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতার মাঝখানে একটু তাকিয়ে দেখলে এই নতুন তীরের পরিচয় পেতে আমাদের সুবিধে হবে। প্রগতিসাহিত্যবাদীদের কল্যাণে পরিশেষ-এর 'প্রশ্ন' কবিতাটি বহুল খ্যাতি লাভ করেছে। মার্কসবাদী অর্থে এর মধ্যে বৈপ্লবিক কিছু নেই, কিন্তু রবীন্দ্রমানসের বিকাশে এই কবিতার ভূমিকা [illegible]। এ [illegible] [illegible], [illegible]। এ [illegible] [illegible] এমন পীড়ন পাপ অনেক ঘটে যা কোনো-মতেই ক্ষমার যোগ্য নয়, এমন মনুষ্যত্ব-বর্জিত পাপী আছে আমরা যাদের কিছুতে ভালোবাসতে পারি না। অথচ ঈশ্বরের প্রেরিত দূতেরা বলে গেলেন, ক্ষমা করো সবে, বলে গেলেন ভালোবাসো। ইতিহাসের পাতায় এঁদের নাম লেখা রইল, এঁদের অনুগামীদের সংখ্যা অনেক, কিন্তু কবি তাঁদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেবল একটি ব্যর্থ নমস্কার জানিয়ে। তাই কবিতার শেষ পংক্তিতে যে-ব্যথিত প্রশ্নটি উচ্চারিত হল—"তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?"—তার অন্তরালে একটি অনুচ্চারিত প্রশ্ন রয়েছে: তোমার প্রেরিত দূতেরা কেন এমন অন্যায় উপদেশ দিলেন? আরো উহ্য প্রশ্ন: তোমার সৃষ্টিতে এমন পাপ কেন যা ক্ষমার যোগ্য নয়, এমন মানুষ

কেন যাদের ভালবাসা যায় না কিছুতেই। এ-সব উচ্চারিত ও অনুচ্চারিত প্রশ্ন 'নতুন সমুদ্র তীর'-এর দিক-নির্দেশক।

পরিশেষ-এর আর একটি কবিতা 'ছোটো প্রাণ'-এ কবি মেনে নিচ্ছেন যেখানে "সৈন্যবাহিনী বিজয়কাহিনী/লিখে ইতিহাস জুড়ে" সেখানে আঘাত-সংঘাত, হিংস্রতা ও বর্বরতা অনিবার্য, সেখানে "ভাঙা চোরা যত হোক্/তার লাগি বৃথা শোক।" কিন্তু মেনে নিতে পারছেন না যখন সহসা ঝঞ্ঝার বা বোমার আঘাতে আর্ত বিলাপ ওঠে নিভৃত কোনো পল্লির ছোটো একটি কুটির থেকে মায়ের কোলে শিশু যেখানে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছে। কবিতাটি শেষ হয় এমন একটি বিক্ষুব্ধ প্রশ্নে আস্তিকের মনে যার কোনো উত্তর নেই, সান্ত্বনা নেই।

হে রুদ্র, কেন তারো 'পরে হানো,
কেন তুমি নাহি জানো
নির্ভয়ে ওরা তোমাকে বেসেছে ভালো।
বিস্মিত চোখে তোমারি ভুবনে
দেখেছে তোমারি আলো।

এই কাব্যগ্রন্থে একই রূপকল্পের তিনটি কবিতা রয়েছে—তার মধ্যে দুটির নামও একই,—'সান্ত্বনা'; তৃতীয়টির নাম 'চিরন্তন'। তিনটে কবিতাই মানুষের ('নিখিল মানবের') দুঃসহ দুঃখ ও ঘৃণ্য পাপের তীব্র চেতনায় সংরক্ত:

প্রতারণার ছুরি
পাঁজর কেটে করে চুরি
সরল বিশ্বাস

....

নিরাশ দুঃখে চেয়ে দেখি
পৃথ্বীব্যাপী মানব-বিভীষিকা।

কিম্বা,

যে-দুঃখ নিহিত আছে
অপমানে শংকায় লজ্জায়,
কোনো কালে যার অন্ত নাই,
আজ তাই
নির্যাতন করে মোরে।

দুঃখের কথা রবীন্দ্রনাথ অনেক বলেছেন, কিন্তু কোনো কালে যে-দুঃখের অন্ত নেই সে-দুঃখের কথা কি আগে বলেছেন? মানুষের পাপের সঙ্গে পরিচয় তাঁর যথেষ্ট ঘটেছিল, কিন্তু পৃথিবীব্যাপী মানব-বিভীষিকা কি ইতিপূর্বে এমন মুক্ত চোখে দেখেছেন তিনি? সোনার তরীর একটি সনেটে—তখনকার রচনাধারার কতকটা প্রতিকূলভাবে—বলেছিলেন বটে:

জানি না কী হবে পরে সবই অন্ধকার
আদি অন্ত এ সংসারে—নিখিল দুঃখের
অন্ত আছে কি না আছে।

কিন্তু সোজাসুজি কখনো বলেন নি যে, নিখিল দুঃখের কোনোকালেই অন্ত নেই।

এই নির্যাতন থেকে মুক্তি খোঁজা, কোথাও কোনো কণ্ঠে একটু সান্ত্বনার বাণী শুনতে চাওয়া স্বাভাবিক, উক্ত কবিতাত্রয়ে তার প্রকাশও আন্তরিক। যেটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকে সেটা এই যে, এমন নিদারুণ দুঃখের বিভীষিকায় তিনি সান্ত্বনা খুঁজে পান এত সহজে—একটি পাখির ডাকে বা একটি বনস্পতির পত্রমর্মরে। রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্বে এটা অস্বাভাবিক ঠেকত না, কিন্তু শেষ পর্বে ঠেকে। অন্ধকার যত ঘন হোক, ঝড়-তুফান যত ভয়ংকর হোক, ডাকলেই কাণ্ডারি এসে হাল ধরবেন—বলাকা ও তৎপূর্ববর্তী যুগে এমন প্রত্যয় ছিল মনে। কিন্তু আজ যখন কবি জানেন, "সহায় কোথাও নাই" এবং সকল প্রার্থনাই ব্যর্থ হবে, তখন আকাশ থেকে অকস্মাৎ মানবোত্তীর্ণ আনন্দ ও শান্তির বার্তা বহন ক'রে আনে মানবেতর প্রাণী-বিশেষ—এটা কি বিচিত্র নয়?

'সান্ত্বনা' নামের দ্বিতীয় কবিতাটিতে এবং 'চিরন্তন'-এ কীট্‌স্‌-এর Ode to a Nightingale-এর ভাবচ্ছায়া পড়েছে। কীট্‌স্‌ কিন্তু অবগত ছিলেন যে, এই জগতের—

> Where youth grows pale, and spectre-thin and dies;
> Where but to think is to be full of sorrow
> And leaden-eyed despairs—

প্রতিকারহীন অন্তহীন বেদনা কেবল মুহূর্তের জন্য ভুলে থাকা যায় বুলবুলির গান শুনে, কিন্তু সে-গানে জগৎ-যন্ত্রণার কোনো স্থির চূড়ান্ত সান্ত্বনা খোঁজা বৃথা। তাই তাঁর কবিতা শেষ হয় বিদায়-সম্ভাষণে; গান আর শোনা যায় না, বুলবুলিটি কি উড়ে গেল মাঠ নদী পাহাড় পেরিয়ে দূরের কোনো উপত্যকায়, না কি যে গানের মধুরিমায় কবি তাঁর সব দুঃখ ভুলেছিলেন, তা কেবল দিবাস্বপ্নই ছিল, একটি করুণ শব্দের ('forlorn') আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল?

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাঙের রাস্তা দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে যেতে যেতে পীড়িত কল্পনার চোখে চেয়ে দেখছেন 'পৃথ্বীব্যাপী মানব-বিভীষিকা', ভেবে পাচ্ছেন না, "কে বাঁচাবে আপন-হারা অন্ধ মানুষেরে", তখনই পার্শ্ববর্তী কোনো অশোক শাখা থেকে একটি কোকিল ডেকে ওঠে, আর সেই কোকিলের ডাক

> পরশ করে প্রাণে
> যে শান্তিটি সব প্রথমে
> যে শান্তিটি সবার অবসানে
> যে শান্তিতে জানায় আমায়
> অসীম কালের অনির্বচনীয়
> 'তুমি আমার প্রিয়'।

কবিতার এই বাঁক ফেরাটা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি অবাস্তব। 'সান্ত্বনা' নামক দ্বিতীয় কবিতাটির পরিণামও তদ্রূপ। মানুষের জীবনের অন্তবিহীন দুঃখ যখন তাঁকে 'নির্যাতন' করছে, তখন সহসা অদৃশ্য কোন্ এক পাখির গান এল কানে, আর রবীন্দ্রনাথের মনে হল—

> আদিম আনন্দ বাহা এ বিশ্ব মাঝে,
> যে আনন্দ অন্তরে বিরাজে,
> আমারে দেখালে পথ তুমি তারি পানে
> এই তব অকারণ গানে।

এ কেমন করে সম্ভব হল?

মানুষের জীবনে—ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে—দুঃখ পাপ মূঢ়তা ও হিংস্রতার অন্ত নেই; অথচ প্রকৃতি শান্ত সুন্দর নিষ্কলুষ। তাই কি মনুষ্যলোকে কোনো আশা, কোনো সান্ত্বনা খুঁজে না পেয়ে কবি মানুষ থেকে দৃষ্টি ফেরান প্রকৃতির দিকে, 'সান্ত্বনার চির-উৎস' খুঁজে পান তারি বর্ণে গন্ধে গানে? অনেক সময়ে তাই—যেমন পূর্বোক্ত দুটি কবিতাতে। রবীন্দ্র-রচনাবলী ঘেঁটে তার আরো সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করা যায়, এমন কি, একেবারে শেষ দিককার রচনা থেকেও। সেঁজুতির 'যাবার মুখে' কবিতাটাই ধরা যাক। কবি যখন বেশ খানিকটা উত্যক্ত হয়ে বলছেন:

> যাক এ জীবন, পুঞ্জিত তার জঞ্জাল নিয়ে যাক
> ....
> নিয়ে যাক যত দিনে-দিনে-জমা-করা
> প্রবঞ্চনায়-ভরা
> নিষ্ফলতার সযত্ন সঞ্চয়।

তখন সহজেই অনুমেয় যে, এই পুঞ্জিত জঞ্জালটা মানবিক। অথচ যখন 'সকল-কিছুর অবশেষেতেই' অক্ষয় মূল্য বহন করে বাকি যা রয় তার কথা বলছেন, তখন দেখা যায়, তালিকাটি সম্পূর্ণই প্রাকৃতিক:

> আমার দুয়ারে আঙিনার ধারে ঐ চামেলি লতা
> কোনো দুর্দিনে করে নাই কৃপণতা

ওই যে শিমুল ওই যে সজিনা
আমারে বেঁধেছে ঋণে
কত যে আমার পাগলামি-পাওয়া দিনে
কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মৈতালিতে
নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে।

....

যে মন্ত্রখানি পেয়েছি ওদের সুরে
তাহার অর্থ মৃত্যুর সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে দূরে।

কিন্তু এটাকে কি পলায়নী মনোবৃত্তি (এস্কেপিজ্‌ম) বলা যায় না? কোকিলের আলো-ভরা কণ্ঠে বা বনের রহস্যময় পত্র-মর্মরে যদিবা আমরা শুনতে পাই "যে-শান্তিটি সব প্রথমে, যে শান্তিটি সবার অবসানে"—তারি স্নিগ্ধ বার্তা, তবু সে বার্তা কি ছাপিয়ে উঠতে পারে মনুষ্যসমাজ থেকে যে আর্ত চিৎকার ওঠে তার বিরূপ সাক্ষ্যকে? প্রাকৃতিক সুষমা আর মানবিক বিভীষিকা যদি বিপরীত সুর যোজনা করে বিশ্বের ঐকতানে, তবে তার মধ্যে একটি সুরকেই শুদ্ধ বা মূল সুর ভাববার কি কোনো কারণ আছে? মানুষের কানে মানুষের সুরেই যদি বেসুর বাজে তবে প্রকৃতির বসন্তবাহার কি তাকে শেষ সান্ত্বনা দিতে পারবে? প্রমথনাথ বিশী ঠিকই বলেছেন : "ভগবদ্‌বিশ্বাসীগণের মধ্যে যাঁহারা ভক্তের হৃদয়কেই ভগবৎ-লীলার একমাত্র আসর মনে করেন, ইতিহাসের মধ্যে তাঁহার পদক্ষেপ স্বীকার করেন না বা সে পদক্ষেপ সম্বন্ধে উদাসীন, তাঁহাদের কর্তব্য সহজ। কিন্তু যাঁহারা ভগবানকে ভক্ত ও ভগবানের খেলাঘরেই আবদ্ধ রাখেন না, মনে করেন যে বৃহৎ ইতিহাসের উত্থান-পতনেও তাঁহার লীলা তরঙ্গিত, কবিবর্ণিত সর্বজনীন বীভৎসা ও ব্যভিচারের মধ্যে কী ভাবে ভগবদভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে তাহা ব্যাখ্যা করিবার দায় তাঁহাদের। কিন্তু কাজটি সহজ নয়।" (১) প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিকে মনোনিবেশ করলেও কাজটি মোটেই সহজ হয় না। যে-সব কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মানব-বিভীষিকাকে সহনীয় করে নিতে চেয়েছেন চামেলি-সজনের সবুজ বৈতালিতে বা পাখির কণ্ঠে প্রিয়-সম্বোধন শুনে, সেখানে তাঁর কল্পনা কবিত্বমণ্ডিত হলেও দৃষ্টি স্বচ্ছ নয়।

এর চেয়ে অকুতোভয়, সত্যের কঠিনতম রূপকে মেনে নিতে অকুণ্ঠিত নয় কি আলবের কামুর শিল্পদৃষ্টি? কামুও প্রাণ দিয়ে প্রকৃতিকে ভালবাসতেন, তার রূপলাবণ্যে অনাধুনিক মাত্রায় মুগ্ধ ছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে জানতেন যে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য এমন কোনো পরম কল্যাণময় অনন্ত শান্তির সাক্ষ্য দেয় না যার মধ্যে মানুষের চূড়ান্ত পরিত্রাণের লেশমাত্র অঙ্গীকার আমরা খুঁজে পেতে পারি। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, মানুষের জীবন অসুন্দরই থাকবে যতদিন না আমরা তাকে সুন্দর করে তুলতে পারি, দুঃখ ও পাপে মগ্ন থাকবে যতদিন না আমরা তার দুঃখমোচন ও কলুষহরণ করতে সক্ষম হই। এ কাজ মানবোত্তীর্ণ কোনো মঙ্গলবিধানকর্তার সাধ্য নয়, তেমন বিধানকর্তা নেই কোথাও।

শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথেরও স্থায়ী এবং মৌলিক বিশ্বাস অনুরূপ ছিল। তার পরিচয় আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে পাব। মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁর বিগত দিনের পিতানোহিসি-বোধ, ভক্তিপর্বের "দুঃখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা/তোমারে যেন না কাঁর সংশয়" ভাব ছিটকে এসে পড়ে শেষ পর্বেও। পড়বেই তো, বহুকাল যে প্রত্যয় মনে দৃঢ় ছিল, যে হৃদয়াবেগ প্রবল ছিল, তা জীবনের শেষ দশকে একেবারে ধুয়ে-মুছে যাবে—এমন প্রত্যাশা আমরা করতে পারি না। তবে রবীন্দ্রনাথই বারে বারে বুঝিয়েছেন যে, তাঁর ধর্ম-বিশ্বাস একটা সজীব, সচল পদার্থ, তার উপর টিকিট মেরে জাদুঘরে রেখে দেওয়ার মতন অটল রূপ, সে কখনও ধারণ করে নি। আর মৃত্যুর মাত্র সাতদিন আগে লেখা তাঁর দীর্ঘ কাব্য-জীবনের শেষ জবানবন্দীতে প্রকৃতিকে বলেছেন 'ছলনাময়ী' :

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;

রবীন্দ্রনাথের মহৎ প্রতিভাও কি প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্যের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয় নি, মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদে পড়ে নি? আমার তো মনে হয় কবিতায় সেই বেদনাই প্রকাশ পেয়েছে।

বলাকার ১৯ সংখ্যক কবিতার ("আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে") ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "যদি বিশ্ব এতদিন এত বড় প্রবঞ্চনাকে বহন করে এসে থাকে, যদি মৃত্যুর নিরর্থকতায় সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তার কোনো চিহ্ন এই পৃথিবীতে কেন দেখছি না? তা হলে তো বিশ্বের প্রকাশের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য থাকত না। পুষ্পকে কীট কাটলে তা যেমন শুকিয়ে যায়, তেমনি যদি একটি মৃত্যুও সত্য হত তবে সব মৃত্যু বিশ্বে তার দংশনের চিহ্ন ফুটো রেখে দিয়ে যেত। তবে মৃত্যুকীট অনায়াসে পৃথিবীকে শুকিয়ে কালো করে দিত। অথচ কেন এই পৃথিবী সদ্য-ফোটা ফুলের মতো আমার সামনে রয়েছে? এই সৌন্দর্যের emphasis-এর মানেই হচ্ছে যে, মৃত্যুই সর্বগ্রাসী abyss নয়, মৃত্যুই চরম সত্য নয়। কারণ, যদি তাই হত তবে তার প্রত্যেক দংশন ভুবনকে ছিন্ন আচ্ছন্ন করে কালো করে শুকিয়ে ফেলত।"

সমস্ত পৃথিবীটা যদিবা সদ্যফোটা ফুলের মতো সুন্দর হয়, যাহা প্রাকৃতিক দৃশ্যে সৌন্দর্যের উপর emphasis যদিবা স্পষ্টতই পড়ে থাকে, তাতে কি প্রমাণ হয় যে মানুষের ব্যক্তিসত্তা তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে না? সুন্দরতম পরিবেশে কুৎসিততম পাপ ও দুর্বিষহতম অভিশাপ ঘটেই থাকে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পটভূমিকারও প্রত্যেকটি মানুষের পরমায়ু শেষ হতে পারে "অসীম রহস্য নিয়ে মুহূর্তের নিরর্থকতায়"। প্রকৃতির মনোহারিতা কিছুই প্রমাণ করে না; তার মধ্যে এত বড় প্রমাণ দেখতে পাওয়া মানেই হচ্ছে প্রকৃতির নিপুণ হাতে পাতা বিচিত্র ছলনাজালে ধরা দেওয়া। ফুল্ল অশোক শাখায় বসে কোকিল যত বিমল সুরেই ডাকুক, তার "গভীর রমণীর" বাণী কবিকে বলতে পারে "তুমি আমার প্রিয়", কিন্তু এ আশ্বাস দিতে পারে না যে, মানব-বিভীষিকার পরপারে বিশ্বের আদিতে ও অন্তে পরম শান্তি বিরাজমান। এমনতর কবিকল্পনা ছোটো অর্থে সুন্দর হতে পারে কিন্তু কোনো মহৎ অর্থে নয়, কারণ তাতে জগতের কঠিন সত্যকে একটু মোলায়েম করে নেওয়ার দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

পূর্বোদ্ধৃত কবিতার পরবর্তী পংক্তি-গুলিতে কবি বলছেন :

তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে সমুজ্জ্বল।

প্রকৃতি বিষয়ে পর পর দুই আপাত-বিপরীত উক্তিতে (ছলনাময়ী ও পথ-প্রদর্শক) সত্যিই কিন্তু কোনো বিরোধ নেই। প্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষকে মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদে ফেলে তখনই যখন তাতে মুগ্ধ হয়ে মানুষ ভাবে বিশ্বের বিধানে সব কিছুই সুন্দর, আপাতত না হলেও বস্তুত মানব-ভাগ্যের অনুকূল। কিন্তু জ্যোৎস্না রাতে চামেলির গন্ধ-জাতীয় সহজ মনোহারিতা থেকে চোখ তুলে জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলির দিকে যখন সে তাকায় তখন "মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ" থেকে মুক্ত হয়। কারণ নাক্ষত্রিক জগত কেবল সীমিত অর্থে সুন্দর নয়; শুধু তার কল্পনাতীত দূরত্ব ও আকারই নয়, তাতে যে অভাবনীয় শক্তি-সমূহের আঘাত-সংঘাত সৃষ্টি-প্রলয় নিরন্তর চলছে তা আমাদের জানিয়ে দেয় যে, অনন্ত অনাদ্যন্ত বিশ্ব সেই বিরাট অর্থে সুন্দর —'নির্ঝর' ও 'আলোক'ও যার অভিব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ এই নির্ঝর ও আলোককে প্রণাম জানিয়েছিলেন বহুকাল পূর্বে বাণী

---

(১) প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্র সরণী, পৃঃ ৩১১।

সুদর্শনার মুখে, আজ মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে আবার তাকে প্রণাম জানাচ্ছেন। ভয়ালকে এবং সুন্দরকে একত্র দেখতে পাওয়া তাঁর জীবনের "শেষ পুরস্কার"। এই পুরস্কার যে পেয়েছে—

> সত্যেরে সে পায়
> আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
> কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে।

রবীন্দ্রপ্রতিভার শেষতম অভিব্যক্তি থেকে ফেরা যাক্ পরিশেষ-এর 'সান্ত্বনা' নামক অন্য কবিতাটিতে ("যে বোবা দুঃখের ভার")। ঐ বইয়ের সান্ত্বনা-বিষয়ক পূর্বোল্লিখিত অন্য দুটি কবিতা থেকে বেশ একটু আলাদা এর সুর, রোম্যান্টিক ভাবাবেগের সঙ্গে মিশেছে আইরনির বোজ। মানুষের অসহায় অপ্রতিকার্য দুঃখকষ্টের কথা ভাবতে ভাবতে কবি কল্পনা করছেন, "সর্ব দুঃখ সন্তাপ" যখন "উদার মাটির বক্ষোদেশে" নেবে যাবে তখন সেই মাটিতে

> বনস্পতি প্রশান্ত গম্ভীর
> সূর্যোদয়-পানে তোলে শির।
> পুষ্প তার পত্রপুটে
> শোভা পায় ধরিত্রীর মহিমা মুকুটে।

একে প্রকৃতির পরিহাস ছাড়া আর কী ভাবা যেতে পারে? সে পরিহাসকে মেনে নিয়ে কবিতার শেষে "সুন্দরের ভৈরবী রাগিণী"র কথা বলেছেন কবি।

> বোবা মাটি, বোবা তরুদল
> ধৈর্যহারা মানুষের বিশ্বের দুঃসহ কোলাহল
> স্তব্ধতায় মিলাইতেছে প্রতি মুহূর্তেই—
> নির্বাক সান্ত্বনা সেই
> ....
> দেখিলাম সব ব্যথা প্রতিক্ষণে লইতেছে জিনি
> সুন্দরের ভৈরবী রাগিণী।

(ক্রমশ)

জংশন-স্টেশন

মনুজেশ মিত্র

জংশন-স্টেশনে কাঁপে রকমারি ট্রেনের আওয়াজ,
হাজার বালক যেন যুদ্ধ করে বলের উপরে—
স্পন্দ যায়......হাজার মেজাজ..
শব্দহীন ছুটে চলে শব্দের ভিতরে।
ইঞ্জিনচালক নির্বিকার,
সঠিক ঠিকানা কেউ এখনো জানে কি।
নাকি বৃথা ক'রে মরে ট্রেনের বিচার।
তাহলে সবাই যাবে, শব্দ মিলাবে কি।

বাস্তবতার শেষে
কে কোথায় বলতে পারে পৌঁছাবেই আকাঙ্ক্ষিত দেশে।

জংশন-স্টেশন ছোঁয় দূরের সীমানা—
দিনের গাড়িতে গার্ড উড়িয়েছে সবুজ নিশানা।

সময়ের নদী

মনোরমা সিংহ রায়

তুমি যে কোথায় কতদিন আমি
তোমাকে খুঁজবো, সে কথা বলো না।
জীবনের দিন কেটে কেটে যায়
শুধু বসে বসে যেন ঢেউ গোনা।
সময়ের নদী ধীরে বয়ে যায়
ফিরেও দেখে না পারে বসে বসে
কে যে গান গায়।

শুধু একদিন দেখেছি তোমাকে।
সে-দেখাও ভুল কোথা কিছু নেই
এই কথা যদি বলো কাছে এসে
প্রতিবাদ আমি কিছু করবো না।
জেনো চিরদিন তবু তোমাকেই
খুঁজে খুঁজে সারা এ হৃদয় হবে
ভোলবার কোনো অবকাশ নেই।
বসন্ত গত এইবার বুঝি
হেমন্ত যায়॥

ঠিক কত দূর গেলে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

'যাও' বললেই যাওয়া যায় না; তার আগে স্পষ্ট
জানা চাই যে কোথায় যাবো, আর কেনই বা যাবো।
তুমি বুক থেকে দূরে দূরে করে তাড়িয়ে দিলেই কি প্রকৃতি
'এসো'—ব্যগ্র দু হাত বাড়িয়ে ডাকবে? শহরের ধারাবাহিক
ধুলোর চেনা
সাম্রাজ্যে হঠাৎ জেগে উঠবে রামের বনবাসের সমান তপোবন।
নির্বাসন, তবু পঞ্চবটী ছিল, প্রেম ছিল; আমি
পাখি তো নই যে প্রতিটি শীতের শেষে গাছ চিনে
নদী শিখে, বসন্তের অগ্নিপরীক্ষায় ফিরে এসে বলবো
পিতৃসত্য পালিত হয়েছে।
নিশ্বাসে যে ক'টি সদা-সহচর শব্দ ছিল, খানিকটা কাক-ডাকা
সূর্য
কিছু ব্যক্তিগত জ্যোৎস্নালোক—সব, সব তুমি অহল্যা-শরীরে
অভিশপ্ত
প্রতি প্রত্যঙ্গের মৌন এক, দুই, তিন ক্রমে ভাঙাবার জন্যই
নিয়েছো।
অথচ শস্যের সুসমাচারে সমস্ত মাঠ আজ
যখন ডাগর, কেন তখনি বলছো কর্ষণে আমার কোন
স্পৃহাই ছিল না; সম্ভাব্য বৃষ্টির আগে চাষীর যেমন থাকে!
কিন্তু এখনো মাঠের ভিতর নেমে গেলে শস্যের সাহসে
আমার বুকনঘেলা ডুবে যায়, মাথার দ্বিগুণ ঊর্ধ্বে প্রকৃতির
নিজস্ব বাতাসে
স্বাভাবিক দুলতে থাকে আমনের সোনালী যোগ্যতা,
সে কি মানুষেরই পোষা বীজে ক্ষুধার স্বরূপ ফিরে আনা নয়।
এই প্রত্যাবর্তনেই সৃষ্টিপরবর্তী রূপ থেকে
যৌবনের দূরে চলে যাওয়া।
আমি অশ্রুজলে ছিলাম না, কুমারীর মত সহজে
টলোমলো সামাজিক ফোঁটায় মাটিতে ঝরিয়ে বলবে 'যাও'
আর স্মৃতির অলক্ষ্যে হয়তো তাকেই দু পায়ে মাড়িয়ে আমি
ঘাতকের মতো ফিরে আসবো। অথচ
যাও বললেই যাওয়া যায় না, তার আগে স্পষ্ট জানা চাই
ঠিক কত দূর গেলে আমার যে কোন শব্দ, লিখনভঙ্গীর
থেকে বড় হয়ে ওঠা কোনো লাইন তোমার মনে পড়বে না।

সীমানা ছাড়িয়ে

প্রলয় সেন

কামরায় উঠেই জানলার কাছের একটা সীট দখল করল গোপা। রমেন তখন মনিব্যাগ খুলে কুলির পাওনা চুকিয়ে দিচ্ছে। গোপা প্রয়োজনমত শাড়ি টেনেটুনে আঁট করে বসল। জানলায় কনুই বিছিয়ে তাকাল বাইরের দিকে। ওদিকে রমেন মালপত্তরের হিসেব মেলাচ্ছে। একবার গোড়ালি উঁচু করে বাঙ্কের দিকে গলা বাড়াচ্ছে, আর এক-বার হাঁটু মুড়ে বসে সীটের তলা দেখছে। ট্রাঙ্ক-সুটকেস হোল্ড-অল বেতের ঝুড়ি ফ্লাস্ক—গোনাগুনতি শেষ করে এসে বসল গোপার মুখোমুখি। পকেট থেকে সোনা-রঙের সিগারেট-কেসটা বের করে বলল, উফ, বাইরে বেরুনোর যা ধকল, আগে জানলে—। রমেনের কণ্ঠস্বরে বিরক্তির লেশমাত্র ছিল না, বরং আত্ম-প্রসাদের। গোপা তখন বাইরের দিকে পলকহীন তাকিয়ে। সেই পুরোন ছবি। নানা মাপের লোকজন। কেউ চলছে, কেউ বা অলস ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। একটা ফেলে-আসা স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে।

কামরায় তৃতীয় প্রাণী বলতে এক বুড়োমত ভদ্রলোক। দূরের সীটে উলটো দিকে মুখ করে বসে। সচিত্র বিলিতী ম্যাগাজিনের পাতা খুলে মগ্ন। এটা ঠিক বেড়াবার সীজন নয়। চেঞ্জারেরা সব ফিরে আসছে। রমেন অনেক দিন ধরে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। হঠাৎ ছুটি মিলে গেল, তাই এই অসময়বিহার।

রমেন গলার কাছের বোতামটা খুলে দিল। তারপর সোনা-রঙের কেসের মসৃণ পিঠে আলতো করে সিগারেট ঠুকতে শুরু করল। এমন সময় ঘণ্টি বেজে উঠতে মুহূর্তে সব কোলাহল নিবে গেল। একটু পরেই হুইসল দিয়ে ট্রেন নড়েচড়ে উঠল। রমেন তখন বুক শূন্যে করে ধোঁয়া ছাড়ছে। দু' পাশের মন্থর ছবিগুলি ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে। ট্রেন প্ল্যাটফরমের বাইরের আলোয় এসে পড়তে গোপা রমেনের দিকে ফিরে তাকিয়ে চাপা ধমকের সুরে বলল, এই, হাঁ করে অসভ্যের মত দেখছ কি?

রমেন লক্ষ করল, ওর গোলাপী রঙের মুখখানা খুশিতে টলমল করছে। সে চড়া গলায় জবাব দিল, বারে! নিজের বিয়ে করা বউকে দেখব না তো কি—আব্দার।

গোপা চোখ মটকে দূরের ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বোঝাতে চাইছিল। রমেন মাস্তানের মত ঠোঁট উল্টে বলে উঠল, বয়েই গেছে—

গোপা কপট রাগে জানালার দিকে মাথা সরিয়ে নিতে গিয়ে ঘোমটা গেল খসে। ওর বেলকুঁড়ি দুলটা ঈষৎ নড়ে উঠল। নরম চিবুকে ভাঙা বিকেলের রোদ গড়িয়ে পড়ে চিকচিক করে উঠল। বিয়ে হয়েছে সেই কবে। বৈশাখের শুরুতে। ছ' সাত মাস হয়ে গেল। এতদিনে দুজনে বেরুতে পারল। খবরটা শুনে অফিসের সাবরডিনেটেরা আড়ালে বলা-বলি করেছে, ছোট সাহেব হনিমুনে চললেন। বাবা গররাজী ছিলেন। ছেলের ওপর বিশ্বাস কম। তাঁর আশঙ্কা, শেষটায় বউকে ফেলে রেখেই না ফিরে আসে। বড়দা অবশ্য হাঁ-হু করেনি। বড় বউদি হেসে বলেছে, বুঝি নে, ঠাকুরপো, আজকালকার হালচাল। একদিন আমাদেরও তো বিয়ে হয়েছে। ঝুনু, বড়দার ছোট মেয়ে, বায়না ধরেছিল সঙ্গে যাবে। ভাগ্যিস সামনে ওর পরীক্ষা, তাই নিস্তার পাওয়া গেছে। একমাত্র মা গরজ ছিল মার। এইজন্যেই তো কবি বলে-ছেন, তুমিই ধন্য, ধন্য হে। মা বলেছে, ওদের দুজনের একটু নিরিবিলি হওয়া দরকার। কলকাতায় তার সুযোগ কই। গোপা কিন্তু আগাগোড়া ভাবলেশহীন ছিল। এখন দেখে মনে হচ্ছে, তলে-তলে ও-ও খুব খুশী।

গাড়ি গতি নিচ্ছে। এক একটা দৃশ্য

গড়ে উঠতে না উঠতে মিলিয়ে যাচ্ছে। বড় বাড়ির মাথায় ওষুধের বিজ্ঞাপন, চিমনির ধোঁয়া, চোঙখোলার বস্তি লেভেল ক্রসিং। রমেন হাত বাড়িয়ে দগ্ধ শেষ সিগারেটের টুকরো বাইরে ছুঁড়ে দিল। তারপর ঘড়ির ব্যাণ্ড আলগা করতে করতে বলল, কি ভাবছ?

রমেনের কথায় চমক ভেঙে নড়েচড়ে উঠে গোপা বলল, না। এমনি—

বাড়ির কথা মনে পড়ছে বুঝি? এ ক'মাসে দিব্যি লক্ষ্মী বউটি সেজে খ। পপুলারিটি তোমার,—বলতে বলতে রমেন রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে শুরু করল।

বাইরে হেমন্তের আকাশ। মানষের বহু যত্নে তৈরি ঘরবাড়ি পুকুর বাগান ভেদ করে গাড়ি ছুটছে। গোপা ছোট করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। শ্বশুরবাড়ির কথা মনে পড়তে গায়ে জ্বর এল। সকাল থেকে গভীর রাত অবধি কেবল কাজের জাল বুনে যাওয়া। প্রতিদিন একই নিয়মে। এখন বিকেল ক'টা। চারটা হবে। সুইনহো স্ট্রীটের ফ্ল্যাট বাড়িতে এতক্ষণে অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। দুপুরের খাওয়া শেষ করে পা মুড়ে দু দণ্ড বসবার পর্যন্ত ফুরসুত মেলেনি। মলি এলেন কলেজ থেকে। ওর জলখাবারের বন্দোবস্ত চাই। সুখাদ্য না হলে ধিঙ্গি মেয়ে নাকিসুরে কান্না জুড়ে বসবে। বড়দির চলাফেরা বারণ। আট ন' বছর বাদে ছেলে-পুলে হতে চলেছে। মা নড়তে-চড়তে পারেন না। দু' চোখে ঘসা কাচের ঠুলি। আর একটু শীত পড়লেই ছানি কাটারেন। ও-দিকে ভোলাকে দিয়ে শ্বশুরমশায় ঘন ঘন তলব পাঠাচ্ছেন। দ্বিপ্রহরিক নিদ্রান্তে হাতমুখ ধুয়ে অনেকক্ষণ হল অপেক্ষা করছেন। ঝুলবারান্দায় ডেক চেয়ারে গা এলিয়ে পড়ে আছেন। বিকেলে ওঁর সুজির পায়েস বরাদ্দ। বাটি নিয়ে ছুটতে হবে দোতলায়। পায়েসের বাটিটা হাতে তুলে দিতেই দাঁড়াতে বলবেন। তারপর কিছুক্ষণ চলবে বাক্যবর্ষণ। সংসার বিষয়ে উপদেশ-দান। ওঁর সার' দেহে তখন অতিরিক্ত বিশ্রাম-জনিত আলস্য। বকে বকে ঝরঝরে হবেন। ওদিকে রান্নাঘরে উনুনে গরম দুধ উথলে পড়ে যাচ্ছে বুঝি। দিন কতক হল ফ্রিজটা চলছে না। ঠিকে-ঝি কামাই করছে। ধোপা এসে সদর দরজায় বসে আছে। এমন সময় নিচ থেকে খোকা হাঁক পাড়ল। ওর ক্লাবে যাবার সময় হয়েছে। বাবু চা চাইছেন।

বাইরের দৃশ্যে চোখ পড়তে অবাক হল গোপা। শহরের শেষ চিহ্নটুকু কখন মুছে গেছে। গাড়ি এখন প্রান্তরের মাঝখানে। বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে গোপা বুকের ভার হাল্কা করতে চাইল।

নতুন বাড়িতে এসে গোপা খুব খুশী। ঠিক যেমনটা চেয়েছিল। স্টেশন থেকে খানিক দূরে। কাছাকাছি লোকালয় নেই। বাড়িটা রমেনের অফিসের এক মালিকের। মাঝে মধ্যে সপরিবারে বেড়াতে আসেন। ফলে ছোটখাট সংসার পাতবার মত জিনিস-পত্র সবই আছে। বাড়িটা দেখাশুনা করার জন্যে একজন লোক আছে। নাম কাদু। জাতে মাহাতো। দশাসই চেহারা। ছোট বাড়ি, একটা টিলার ওপরে, বাংলো ধরনের। দুটো ঘর। একটা বেশ বড়। ছোট ঘরটা ড্রইংরুম হিসেবে চমৎকার। ঘরের চারদিক ঘিরে বারান্দা। পিছনের বারান্দার এক কোনা থেকে প্যাসেজমত খানিকটা চলে গিয়েছে রান্নাঘর বাথরুমের দিকে। প্যাসেজের পাশেই মস্ত চৌকোনা উঠোন। উঠোনের শেষে এক সার আতাগাছ। বাড়ির সীমানা ঘিরে কিছু ইউক্যালিপটাস আর ঘোড়ানিম গাছ।

সামনের বারান্দায় দাঁড়ালে ভারি সুন্দর একটা ছবি ফুটে ওঠে। বাড়ির সীমানা ছাড়ালেই উঁচু নিচু জমির সার। স্থানীয় লোকেরা জমিকে বলে ডাহি। ডাহির শেষে দূরে শালবনের নিবিড় জড়াজড়ি। তার পিছনে আদিগন্ত পাহাড়। হঠাৎ চোখে পড়লে মেঘমালা বলে ভ্রম হবে। দুপুরবেলা অনেকক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে থাকলে উজ্জ্বল রেশমী রোদ্রে মনে হয়, পাহাড়গুলো একটু একটু করে এগিয়ে আসছে।

দুটো দিন যেতে না যেতে সব কিছু নিখুঁত করে সাজাল গোপা। একটু নড়চড় হবার জো নেই। উঠতে বসতে রমেন এখন গোপার নিয়মের অধীনে। আলনা-হ্যাংগারে জামাকাপড় ঠিক ঠিকমত সাজানো। ছোট ঘরের দেয়াল-আলমারীতে রাইটিং প্যাড বই কালিকলম রয়েছে। বেতের চেয়ার দুটো মুখোমুখি বসানো, অবসর সময়ে গল্প করার জন্যে। ড্রেসিং টেবিলটা বড় ঘরে এমন জায়গায় আছে যাতে বারান্দার সিঁড়িতে পা দিয়েই চোখে পড়ে যায়। বাথরুমের দেয়ালে হোয়াইট নটে পেস্ট টুথব্রাশ তেল সাবান সাজিয়ে রাখা হয়েছে। শোবার ঘরের কাচের শার্সি আঁটা জানালায় পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। খুঁজে করে দুটো পেতলের ভাস নিয়ে আসা হয়েছিল। ও দুটো শিয়রের কাছের টেবিলে রাখা হয়েছে। সকাল বেলা বাজার ফেরতা কাদু কোত্থেকে চমৎকার কিছু ফুল নিয়ে আসে। পাহাড়ী মল্লিকা মুচুকুন্দ হিমঝুরির ডাঁটি। সারারাত মিষ্টি গন্ধ ছড়ায়। গোপার শুধু একটাই আফসোস, তানপুরাটা আনা হল না। কত করে মলি বলেছিল। শুক্লপক্ষের শুরুতে ওরা এসেছে। অনেক রাত করে জ্যোৎস্না ওঠে। তখন বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে গলা ছেড়ে গান গাওয়া যেত। একদিন মাঝরাতে ওদের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কাচের শার্সি গলে ঘরে একরাশ জ্যোৎস্না ঢুকে পড়ে-ছিল। ওরা দুজন আর ঘুমোতে পারেনি। দরজা খুলে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল। হাত ধরাধরি করে অনেকক্ষণ পায়চারি করেছিল। ওদের কারুর মুখে কথা ছিল না। দূরে সাঁওতাল পল্লীতে মাদল বাজছিল। ডাহি থেকে তিতির কেঁদে কেঁদে উঠছিল।

শেষ রাতে গোপার ঘুম ভাঙে। একটু বাদেই বাইরে সকাল ফুলের মত ফুটে উঠবে। ঘরের ভেতর তখনও আবছায়া। গোপা চোখ মেলতে দেখে, রমেনের বিশাল লোমশ বুকের মধ্যে ওর মুখ ঢাকা পড়ে আছে। সারা রাত তাপ দিয়ে দিয়ে রমেন এখন শান্ত, নিদ্রামগ্ন। গোপা জানে, এখন ওকে জাগিয়ে তুললে অনর্থ ঘটবে। শেষ রাতের দিকে ওর ঘুম গাঢ় হয়। ডেকে তুললে শিশুর মত হাত-পা ছুঁড়ে অস্ফুট চেঁচাবে।

খুব আস্তে খাট থেকে নেমে দরজা খুলে পিছনের বারান্দায় এসে দাঁড়ায় গোপা। থামে পিঠ রেখে অর্থহীন তাকিয়ে থাকে। আকাশে তখনও গুটিকয় তারা, বাদামী রঙের আলো ছিটোচ্ছে। একটু একটু করে চারদিক ফর্সা হতে থাকে। আতাগাছের সার ঘাসঝোপ ঘোড়ানিমের ঝাপসা স্পষ্টতর হয়ে উঠে। এমন সময় গেটের সামনে গরুর গাড়ির চাকার বিশ্রী আওয়াজে গোপার ঘোর কাটে। এ দেশে জলের বড়ই অভাব। দূর গ্রামের ইঁদারা থেকে একটা লোক জল দিয়ে যায়। কয়েক ড্রাম জল। সারা দিনের স্নান-রান্নার মত। গোপা কয়েকটা হাই তুলে আলস্য তাড়ায়। তারপর ঘর থেকে দরকার মত শাড়ি ব্লাউজ নিয়ে বাথরুমে চলে যায়।

নিরিবিলিতে এসে গোপার শুচিতা যেন বেড়ে গেছে। ইঁদারার হালকা টলটলে জল। সুগন্ধি সাবান ঘসে শরীরটা ঝরঝরে করে নেয়। সকালের দিকে বেশ শীত। তবু স্নান করে নিলে সারাটা দিন চমৎকার কাটে। রমেন বলে, আচ্ছা, তোমার এখানে এসে এত ভাল লাগছে কেন বলো তো? গোপা উত্তর করে না। শুধু টসটসে দু ঠোঁটের পাতা ভেঙে হাসে। ওদিকে কাদু উঠোনে দাঁড়িয়ে। হাতে থলি ভর্তি বাজার। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। উজ্জ্বল রৌদ্রে চারদিক ঝকমক করছে। বাজারের থলিটা হাতে নিয়ে গোপা দু-চারটে বৈষয়িক কথাবার্তা বলে। তারপর কিছুক্ষণের জন্যে কাদুর ছুটি, চলে যায় ডাহিতে। ধানকাটা শুরু হয়ে গেছে।

এরপর কাজ শুরু হল। প্রথমেই স্টোভ ধরানো। গোপা প্রতিদিন অভিনব একটা কিছু করে রমেনকে অবাক করে দেয়। গাজরের হালুয়া, কড়াই শুঁটির সিঙাড়া, শালগম লেটুস টোম্যাটোর স্যালাড। ব্রেক-ফাস্টের বহর দেখে রমেন থ' বনে যায়। এ ছাড়া ডিমসেদ্ধ, গরম এক বাটি দুধ তো রয়েছেই।

সসপ্যানে জল ফোটে। ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ কাটতে কাটতে বাইরের দিকে চোখ পড়ে। নিকোনো উঠোনে আতাগাছের ছায়াদের চঞ্চল মাতামাতি। আকাশটা কি ঝলমলে। কেউ যেন গুঁড়ো গুঁড়ো সোনা

ছড়িয়ে দিয়েছে। সতেজ হাওয়া বইছে। ইউক্যালিপটাসের শিরাশিরানি শব্দ হয়ে গেল। এতক্ষণে হলুদ পাখিটা ঘোড়ানিমের পাতার আড়াল থেকে শূন্যে ঝাঁপ দিল। রোদ্দুরের শুভ্র স্রোত কেটে চলেছে শালবনের দিকে। ধীরে ধীরে গোপার স্মৃতি লোপ পেতে থাকে। একটা ভাব পেয়ে বসে ওকে। অনেক করেও সুইনহো স্ট্রীটের কর্মচঞ্চল বাড়িটার ছবি গড়ে তুলতে পারে না। দোতলার শোবার ঘর ডাইনিং টেবিল শ্বশুরে ঠাকুরের মুখ—সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যায়।

ওদিকে রমেনের ঘুম ভেঙে গেছে। হাত বাড়িয়ে দেখেছে গোপা নেই। অথচ আশ্চর্য, জেগে উঠবার আগে, অর্ধচেতনায়, তার কেবলই মনে হচ্ছিল, গোপা বুক জুড়ে উষ্ণতা দিচ্ছে। মাছের পাখনার মত চিকন পায়ের পাতা ঘসছে ওর পায়ে। আর সেই মিষ্টি গন্ধ রাতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। চীনে লণ্ঠনটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিয়ে কম্বলের ভেতর ঢুকবার আগে দু হাত দিয়ে মস্ত খোঁপাটা খুলে দিয়েছিল গোপা। অর্ধনিমীলিত চোখে রমেন দেখেছিল রাশি রাশি চুল ঝাঁপিয়ে পড়ছে

অন্ধকারে, আর সেই নেশা ধরিয়ে দেওয়া গন্ধ। রমেন পাশ ফিরল। একটু বাদেই গোপা আসবে প্রভাতী চা নিয়ে। চোখ মেলতে ইচ্ছে করছে না। খানিকক্ষণের ইচ্ছাকৃত অন্ধত্ব রমেনকে মনোরম কিছু ভাববার সুযোগ দেবে।

পাথুরে মাটিতে পা দিয়েই গোপা যেন অন্য মানুষ। মাত্র সাত দিন হল ওরা এসেছে। এর ভেতরেই গোপাকে আর চেনা যাচ্ছে না। নতুন বলে মনে হচ্ছে। বাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। ওখানে সব সময় কাজের ভিড়ে। আড়ালে আবডালে। আর এখানে এসে, এই আলো হাওয়া নির্জনতা জ্যোৎস্নায়। জমাট-বাঁধা মেঘ ফিকে হয়ে যেন ঝিরঝির করে বৃষ্টি নামল। ঘরময় সে সারাদিন ছুটোছুটি করছে। আতাগাছের ছায়াদের হিলিবিলি শুরু হল, ইউক্যালিপটাস তানপুরায় মত বাজছে, মহুয়াগাছতলায় রাখাল ছেলেদের কলগুঞ্জন, দূরের পাহাড়ে রেশমী শূন্যতা কাঁপছে—এ সব কিছুর মধ্যে কার উপস্থিতি।

চায়ের কাপ নিয়ে গোপা আসছে। বারান্দায় পদশব্দ জেগে উঠতে রমেন সচকিত হল। সাতসকালে উঠে গোপার এতটা তৎপরতা অসহ্য। মোটে তো দুটি প্রাণী। উপরন্তু কাদ্রু রয়েছে। রমেন সবেগে দেয়ালের দিকে পাশ ফিরল। কম্বলটা গলা অবধি টেনে নিয়ে নিঃসাড় পড়ে রইল। গোপা ঘরে ঢুকেছে। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে শিয়রের কাছের টেবিলে চায়ের কাপটা রাখল। ও মিটিমিটি হাসছিল। আশ্চর্য অলস হয়ে গেছে রমেন। সারা দিন রাত শুয়ে বসে কাটাচ্ছে। এ ক'দিনে একবারের জন্যে ঘর থেকে নড়ানো গেল না। ধূর্ত বেড়ালের মত শুধুই ওত পেতে আছে। গোপাকে কাছে পেল কি দৃশ্যের পর দৃশ্য নাটক জমিয়ে তুলছে।

এই—ই—ই,—বলে মিষ্টি করে ডাকতে গিয়ে গোপা খাটের কাছে এল। তারপর ঝুঁকে পিঠে ধাক্কা মারল। রমেন তখনো নিঃসাড়। এবার গোপা খাটের প্রান্তে বসে পড়ল। কম্বলের ভেতর ঠাণ্ডা হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে গলায় সুড়সুড়ি কাটতে রমেন চকিতে পাশ ফিরল। অব্যর্থ ভঙ্গীতে গোপার কোমর জড়িয়ে ধরে আধো আধো গলায় বলে উঠল, হু-উ-ম্।

গোপা ওকে ঝাঁকুনি দিতে দিতে গলার স্বর চড়ালো। আচ্ছা মানুষ তো। কখন আটটা বেজে গেছে। ওঠো!—রমেন গোপার কথা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে ওর ঠাণ্ডা হাতটা ধরে টানতে লাগল, প্লীজ, ভেতর এসো না, লক্ষ্মীটি। রমেন বিলক্ষণ জানে, প্রতিদিনের মত আজও গোপা ওর কিছু আদর পাবার আশায় নাগালের ভেতর ধরা দিয়েছে। আর এখন, সবে স্নানঘর থেকে এল, ওর ভেজা চুলে কি মিষ্টি গন্ধ, সারা শরীরে কি মাদকতা।

গোপার ঠাণ্ডা হাতটা রমেনের লোমশ বুকে চলাফেরা করছে। গোপা বলল, না, আজ আর কোনো দুষ্টুমি নয়। ওঠো দেখি। ভাবছি আজ নদীটা দেখতে যাব।—রমেন ওর কোলে মাথা রাখল। বলল, আজ নয়। আর একদিন যাব। শরীরটা তেমন ভাল লাগছে না।—কাদ্রুর মুখে গোপা শুনেছিল, শালবনের ওপাশে ছোট একটা নদী আছে। পাহাড়ের গা ঘেঁসে। শান্ত নির্জন জলধারা। গাছে কত রকমের পাখিদের ভিড়। কথাটা শোনা অবধি রমেনকে তাড়া দিচ্ছে গোপা। রমেন কেবলই এড়িয়ে যাচ্ছে। আর গোপা নাছোড়বান্দা। ও সজোরে মাথা নেড়ে বলল, না, আজই যাব। আর ক'দিনই বা আছি। শেষে দেখাই হবে না—

রমেন এবার নড়েচড়ে উঠে বলল, তার মানে! আমরা এখনও বেশ কিছুদিন থাকব। কাল যে চিঠি পাঠিয়ে দিলাম অফিসে—গোপার জায়গাটা খুব ভাল লেগে গেছে। বোধ পরিবার। বাইরে বেরুনোই এক সমস্যা। গোপা এসে থেকে পীড়া-পীড়ি করছে। সেইমত রমেন আরো দিন পনের ছুটির কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। গোপা রমেনের কথার কোন উত্তর না করে টেবিল থেকে কাপটা তুলে ওর হাতে দিল। রমেন কাপটা নিতে না নিতেই গোপা উঠে দাঁড়াল। দু পা পিছিয়ে গিয়ে হেসে ফেলল। বলল, ওসব কথা বুঝি না বাবু। আজই যাব। চটপট দাড়ি কামিয়ে স্নান করে নাও তো। অনেক দূরের পথ—। রমেন কিছু বলার আগেই ও বড় বড় পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

ডাহির পথে নামতে বেশ বেলা হল। রোদ্রের তাত মরে গিয়ে তখন চারিদিক নিঝুম হয়ে আসছে। প্রস্তাবটা ছিল গোপার। কার্যত দেখা গেল গরজটা রমেনেরই বেশী। বারোটার মধ্যে ও জামাকাপড় পরে তৈরি। গোপার আর হয় না। সব ব্যাপারে ওর সতর্কতা সত্যই পীড়াদায়ক। পাগলামি শুরু করে দিল। ওয়াটারবটল্, ফ্লাস্ক ভর্তি চা, তিন ব্যাটারির টর্চ, টিফিন কেরিয়ারে শুকনো খাবার ডিম-সেদ্ধ রুটি। এ ছাড়া চাদর লং কোট ডিকেন্সের বাড়ি ইত্যাদি তো আছেই। দেখে মনে হবে, ওরা বুঝি এক ভয়ংকর অভিযানে বেরুচ্ছে।

ডাহির মাঝখান দিয়ে পায়ে-চলা পথ গিয়েছে এঁকেবেঁকে। কোথাও এক এক-খণ্ড ধানজমি। দু একটা মহুয়াগাছ চোখে পড়ছে। উঁচু নিচু পথে ঠিকমত এগুনো যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ হাঁটতে এক সাঁওতাল-পল্লীর কাছে এল ওরা। গোপা একটা ঘরের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ধান ঝাড়াই হচ্ছিল ওখানে। এক ঢিবির ওপর দেখা গেল এক বুড়ো বসে, আনমনে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। পাখি ধরবার আশায় সুতো জাল বিছিয়ে রেখেছে। কোথাও ঝোপের আড়ালে রাখাল ছেলেদের জটলা। ওদের সাড়া পেয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছে।

গোপা আগে আগে চলছিল। রমেন অনেক পিছনে। ওকেই যাবতীয় জিনিস-পত্র বইতে হচ্ছে। এক একবার গোপা ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল। আঁচল উড়িয়ে পশ্চাদ-বর্তী রমেনকে ইশারায় ডাকছিল। রমেন মনে মনে গজরাচ্ছে, দাঁড়াও, একবার শাল-বনের কাছে পৌঁছোই, মজা দেখাচ্ছি তোমার—। মাথার ওপরে হেমন্তের সংকেতহীন আকাশ, অকরুণ। যেন একটা প্রকাণ্ড গম্বুজের খোল। মুখ তুলে তাকালে মাথা ঘুরতে শুরু করে। সামনের দিকে চোখ মেললে সেই একই দৃশ্য। উঁচু নিচু পথে চলতে দূরে শালবনের এক লুকোচুরি খেলা। আর ধু ধু ব্যঞ্জনা-বিহীন প্রান্তরে অবিরল মাঠপোকার ডাক। ক্ষীণ, মন্থর। চেতনা ধূসর করে তোলে।

শালবনের কাছে পৌঁছোতে বেলা পড়ে এল। রৌদ্রে এতক্ষণ খানিক আতা ছিল। দেখতে দেখতে চারিধার মলিন হয়ে আসছে। দিনশেষের বাতাসে শালবন কাঁপছে। পাতা ঝরার মত শীত পড়েনি তখনো। ফলে শালবনের নিচের দিকটা বেশ পরিষ্কার। লম্বা লম্বা গাছের অবকাশে ওপাশের অনেকটা দেখা যাচ্ছে। শালবনের পরেই খোয়াই-মত বেশ খানিকটা জায়গা। তার প্রান্তে নদীর উঁচু পাড়। পিছনে বিস্তীর্ণ পাহাড়।

শালবনের ভেতরে ঢুকতেই বুকের ভেতরটা ছলাত করে উঠল। অসংখ্য পাখির এলোমেলো চিৎকার। অতর্কিত আততায়ীর মত অকস্মাৎ চেতনাকে স্তব্ধ করে দিল। বনের ভেতরটা ছায়াছায়া। দিনের সঞ্চিত তাপটুকু জুড়িয়ে মাটি শীতল হয়ে আসছে। গাছের ডগায় রক্তিম আলো শেষবারের মত ছটফট করছে। গোপা অনেকটা এগিয়ে গেছে। ওকে দেখা যাচ্ছিল না। রমেন চেঁচিয়ে ডাকল, গোপা, দাঁড়াও না। কোথায় গেলে—

গোপা ততক্ষণে খোয়াইতে নেমে পড়েছে। রুক্ষ খোয়াই। শুধু কাঁটা গাছ আর ঘাসঝোপ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। উঁচু নিচু ভূখণ্ড। যেন স্তব্ধ ঊর্মিমালা। দেখে মনে হয়, বহু যুগ আগে, দূরে পাহাড়ের জলধারায় নিমগ্ন ছিল এই খোয়াই। চকিতে দিনের শেষ আলোটুকু নিবে যাচ্ছিল। অন্ধকার থাবা বসাচ্ছে মাটিতে। চারিধার কি শব্দহীন। আর শব্দহীন বলেই সব কিছু অন্ধকারে দ্রুত

বিবর্ণ হয়ে পড়ছে। এমন সময় শালবনের ভেতর থেকে রমেনের আকুল ডাক শোনা গেল। গোপা মুখ তুলে তাকাল সামনের দিকে। দেখল, নাতিদূরে নদীর উ'চু পাড় ঘে'ষে অকম্পিত বৃক্ষের সার, অন্ধকারে সমুদ্ধত। যেন এক প্রাচীন দুর্গপ্রাকারে সারিবন্ধ প্রহরীর দল। বর্শা হাতে অচঞ্চল দাঁড়িয়ে, শত্রুর অপেক্ষায় আর বৃক্ষরাজির ঠিক পিছনে, দুই পাহাড়ের খাঁজে ন্যাপথলিনের মত বিবর্ণ এক চাঁদ, নিটোল। গোপা আর এগুতে পারছে না। গোপা ঘুরে দাঁড়াতে চাইছিল।

একটু পরেই রমেন খোয়াইতে নেমে এল। ও গোপাকে দেখতে পেয়েছে। টর্চের আলো জেবলে সতর্ক পায়ে রমেন গোপার কাছে এল। অন্ধকারে মুখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছিল, ও খুব অখুশী। গম্ভীর গলায় বলল, একা একা চলে এলে! শেষে যদি তোমায় খুঁজে না পেতাম—।—গোপা ওর ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। ওর কনুই স্পর্শ করল। কোন কথা বলল না। রমেনকে ধরে চলতে লাগল অন্ধের মত।

নদীর পাড়ে এসে ঝোলাঝুলি নামাল রমেন। বলল, সতরঞ্জিটা পাত দেখি, বসি একটু আরাম করে।—তারপর ও বিশ্রী হাই তুলে হাত পায়ের গি'ঠ ছাড়াতে লাগল। পাহাড়ী নদী, অনেকটা খাড়ি। নিচের আলোর সাহচর্যহীন জলধারা চোখে পড়ে না। একটা বড় গাছকে শুইয়ে দিতে পারলে পারাপার করা যায়। ওপারে কিছুটা পরিত্যক্ত প্রান্তর। তারপর দিগন্ত-ব্যাপী উ'চু নিচু পাহাড়ের মৌন। বিবর্ণ চাঁদ এখন অনেকটা উঠে এসেছে। একটু একটু করে আলো ফুটছে। গোপা নিঃশব্দে সতরঞ্জি পাতল। তারপর মুখ তুলে তাকাতে দেখল, গাছের ফাঁক দিয়ে চেরা চেরা আকাশ দেখা যাচ্ছে। কোথাও একটু বাতাস নেই, শাখা প্রশাখায় আন্দোলন নেই। এমন কি নিচের অন্ধকারে নিমগ্ন জলধারায় ক্ষীণতম শব্দও শোনা যাচ্ছে না।

রমেন জুতো সুদ্ধ সতরঞ্জির ওপর গা এলিয়ে দিল। অন্য সময় হলে গোপা প্রতিবাদ করত। এখন করল না। বরং ওর শরীর ছু'য়ে বসল। রমেন একটা সিগারেট ধরাল। অন্ধকারে সিগারেটের আগুন জোনাকির মত জবলে জবলে উঠছে। বারকয়েক নির্বিকার ধোঁয়া ছেড়ে রমেন বলে উঠল, ফ্লাস্কটা খোলো দেখি, চা খাই। গলাটা শুকিয়ে গেছে।—এতটা পথ হে'টে আসবার সময় গোপাকে নিবিড় করে পাবার সংকল্প বুকের ভেতর জমাট বে'ধে ছিল। কিন্তু এখন একটা পথশ্রমের পর রমেন ক্লান্ত। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে ওর হাতে তুলে দিতে দিতে গোপা নিচু সুরে বলল, আর কিছু খাবে?—

রমেন মাথা নাড়ল, না, এখন নয়। ভাল করে জ্যোৎস্না উঠুক, তারপর—।—চাঁদটা ধীরে ধীরে রুপোলী হয়ে উঠছে। জ্যোৎস্নার সর পড়ছে আকাশে। গাছের অন্ধকার শামিয়ানা থেকে রমেন চেঁচিয়ে উঠল, একটা গান ধরো দেখি। শুনি—। মাটি থেকে ঠাণ্ডা ভাপ উঠছে। আলো-ছায়ায় মৌন পাহাড় ভয়ংকর হয়ে উঠছে। গোপা বলল, না, গান-টান নয়। একটু বাদেই উঠব। এতটা পথ ফিরে যেতে,—

বলতে বলতে ওর গলার স্বর জড়িয়ে এল। তাহিরু দীর্ঘপথের ছবি চোখে সামনে ভেসে উঠতে গোপা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। রমেন কেন্ন চেঁচিয়ে উঠল, তোমার আর কি! দিব্যি তো এলে খোলা হাত-পায়ে। আর আমি, এক গাদা মাল পত্তর নিয়ে। ইম্‌পসিবল, এখন কিছুতেই যাওয়া হচ্ছে না।

রমেন অহেতুক চেঁচিয়ে কথা বলছে। গোপার অসহ্য বোধ হচ্ছিল। কেননা সেই শব্দমালা চারদিকের গভীর নীরবতায় বেসুরো হয়ে পড়ছিল। এমন সময় রমেন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে দিল জলের দিকে। নিঃশব্দে জুতোর স্ট্র্যাপ খুলল। গোপা হাত উঁচিয়ে ওর পাঞ্জাবির এক অংশ ধরে ফেলেছে। দম বন্ধ করে বলল, একি! উঠলে কেন?—অন্ধকার শাখা প্রশাখার নিচে টান-টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিরাট রমেনের মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। ও ততক্ষণে পাঞ্জাবির আস্তিন গুটোচ্ছে। একসময় গম্ভীর গলায় বলল, বসো একটু। নদীতে নামছি। এখ্‌খুনি ফিরে আসব। —গোপার কিছু বলার ছিল, সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। ও শুধু ককিয়ে উঠল, মুন্না—। —রমেন হাঁটু ভেঙে নদীর দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। এবার শরীরের ভারসাম্য রাখার জন্য হাত দুটো দু পাশে ছড়িয়ে দিল। তারপর এক পা এক পা করে নামতে শুরু করল। গোপা জড়ানো গলায় ডাকল, যেয়ো না। লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোনো, রমেন—। —এই প্রথম গোপা ওর নাম ধরে ডাকছে। পায়ের তলায় কুচি কুচি নুড়ি বিঁধছে। শাখাপ্রশাখার আবছায়ায় সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রমেনের একবার ঘুরে দাঁড়াতে ইচ্ছা করছিল। ওর ধারণা, গোপা এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। হাত দুটো বুকের মধ্যে জড়ো করে কাঁপছে। ভয় পেলে ওকে অদ্ভুত দেখায়। কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে সাহস হল না। খাড়িপথ। মুহূর্তে পা হড়কে গড়িয়ে গভীরে নেমে যাবার সমূহ আশঙ্কা। ওপারের কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। পিছনে পাহাড়, অন্ধকারে নিবিড় হয়ে আছে। মাঝখানে শূন্যতার ব্যবধান। নিচে কোথাও নদী, শব্দহীন। শুধু অন্ধের মত অনির্দেশ পথ হাঁটা।

এভাবে কিছুটা নেমে আসার পর ভিজে ভিজে শীতলতার স্পর্শ পেতে রমেন বুঝল, সে জলধারার কাছাকাছি চলে এসেছে। আরো দু পা এগুতে জলের হদিস মিলল। এতক্ষণে ছায়ার শাসনের বাইরে আসা গেল। এখন চন্দ্রালোকে তটভূমি স্পষ্ট। অদূরে রুপোলী জলধারা চকচক করছে। রমেন অবাক চোখে দেখল এক শান্ত, ঘুমন্ত নদীকে। ওর তর সইছে না। পা চালিয়ে নেমে এল জলের কাছে। তাড়াতাড়ি একটা পা ডুবিয়ে দিল জলের ভেতর। আর সঙ্গে সংগে বুকের ভেতরকার শূন্যতা ভীষণভাবে স্পন্দিত হয়ে উঠল। সাদা চোখে তাকালে নদী শান্ত, নিস্তরঙ্গ। অথচ তলে তলে কি তীব্র স্রোত। জলের টানে ঠিকমত পা রাখা যাচ্ছে না। আর কি ঠাণ্ডা, বরফের কুঁচির মত বিঁধছে। ন্যাপথলিনের মত বিবর্ণ চাঁদটা মাথার উপরে উঠে এসেছে। রমেন ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকাল। মরা জ্যোৎস্নায় জড়ানো আঁকাবাঁকা একফালি আকাশ, অনেক উঁচুতে। চাঁদটা এখন উজ্জ্বল। মস্ত রুপোর থালার মত। ওপার থেকে একটা পাহাড়ের শুণ্ড অতিকায় জিরাফের মত লম্বা গলা বাড়িয়েছে চাঁদটার দিকে। যেন গিলে ফেলতে চাইছে চাঁদকে। আর ভয়ার্ত চাঁদ খুব আস্তে আস্তে নেমে আসছে। লুকোতে চাইছে নদীজলে। রমেন ডাইনে তাকাল। অন্ধকার গাছের নিবিড়তায় গোপাকে দেখা যাচ্ছে না। নামবার সময় টের পায়নি। এখন এই তীব্র শীতল নদীজলে পা ডুবিয়ে রমেন বুঝতে পারছে, সে নিজের অগোচরে, নিতান্ত খেলাচ্ছলে, পৃথিবীর প্রান্ত থেকে কতটা গভীরে নেমে এসেছে। জলের ভেতরকার পা-টা ধীরে ধীরে নুড়ি-পাঁকের মধ্যে গেঁথে যাচ্ছে। শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। রমেন বুঝল, এইভাবে আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে তার চোখের সামনে দিয়ে কত অনায়াসে ভয়ার্ত চাঁদ পাহাড়ের শুণ্ড বৃক্ষের অন্ধকার—সব কিছু একটু একটু করে করে যাবে। আর সে একসময় জলের নিচেকার আলোড়নের ভেতর শীতলতার ভেতর শব্দহীনতার ভেতর ডুবে যাবে।

এমন সময় দূরে বৃক্ষরাজির অন্ধকার থেকে গোপা 'র-মে-ন, র-মে-ন' বলে আর্ত চেঁচিয়ে উঠল। সেই চিৎকার বুকের ভেতর বিঁধে যেতে রমেন সচকিত হল। তীব্র হিম জলধারার মধ্যে নিমজ্জমান রমেনের কাছে ওই মানুষী শব্দোচ্চারণই একমাত্র অবলম্বন। এবং সেই শব্দের টানে সমস্ত নিম্নগ আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে ও উঠে এল তটভূমিতে। তারপর, বন্যজন্তুর মত চার হাত পায়ে ভর করে অতটা খাড়ি পথ ভেঙে ভেঙে রমেন ঠিক উঠে এল বৃক্ষের অন্ধকার শামিয়ানার কাছে। গাছের নিচে এসে দেখল, দুহাত বুকের মধ্যে জড়ো করে গোপা থরথরিয়ে কাঁপছে। রমেন এগিয়ে এসে ওর শরীর ছুঁয়ে ডাকল, গোপা, গোপা—। —কিছু বলবার আগেই গোপা এলিয়ে পড়ল ওর বুকে।

একটু পরেই রমেন নিঃশব্দে সতরঞ্চি ফ্লাস্ক লংকোট—সবকিছু গুছিয়ে নিল।

তারপর ওরা দুজন ধীরে ধীরে নদীতীর থেকে খোয়াই শালবন বিস্তীর্ণ ডাহি অতিক্রম করল। এতটা পথ, ওরা সুখ-দুঃখ-চেতনার অতীত এক বোধে ভর করে যেন স্বপ্নের ভেতর পথ হেঁটে, অনেক ঘুরে, গভীর রাতে ঠিক সেই টিলার ওপরকার বাংলো-বাড়িতে এসে পৌঁছুল।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে পাশ ফিরে গোপা দেখল, রমেন নেই। আলোয় ঘর ভেসে যাচ্ছে। বেলা আটটার কম হবে না। গোপার উঠতে ইচ্ছা করছিল না। শরীরের ভাঁজে ভাঁজে অবসাদ জড়িয়ে আছে। তবু উঠতে হল। বিছানা থেকে উঠে টলতে টলতে পিছনের বারান্দায় এসে দেখল, রমেন ইউক্যালিপটাস গাছতলায় দাঁড়িয়ে। রোদ্রের দিকে পিঠ রেখে সিগারেট টানছে। একবার ইচ্ছা হল ওকে ডাকবে। কিন্তু ডাকল না। বাথরুমে চলে এল। কাল রাতে ফিরে আসার পর ওরা উল্টো দিকে মুখ করে শুয়ে পড়েছিল। ও যে কখন পাশ থেকে উঠে চলে গেছে, গোপা টেরও পায়নি। এমনও হতে পারে, ওর ঘুম আসেনি। খানিক বিছানায় শুয়ে থেকে একসময় উঠে পড়েছে। দরজা খুলে বাইরে এসেছে। সারারাত বারান্দায় পায়চারি করেছে।

চোখে জল দিতে জ্বালা করতে শুরু করল। শীত শীত করছে। অন্যান্য দিনের মত প্রভাতী স্নানের কোনো প্রেরণাই পেল না গোপা। তবু, অভ্যাসবশত গায়ে জল ঢালতে শুরু করল। এক একবার আয়নার দিকে চোখ পড়তে থেমে যাচ্ছে গোপা। চোখের কোণে কালি পড়েছে। মুখভর্তি বুটি বুটি হলুদের ছোপ, যেন জ্যোৎস্নার আঁশ জড়িয়ে আছে। গোপা তাড়াতাড়ি সাবান তুলে নিয়ে মুখে ঘষতে লাগল। এমন সময় উঠোন থেকে রমেন বিশ্রী চেঁচিয়ে ডাকল, গোপা, এই গোপা। একবার বাইরে এসো তো, শিগ্‌গীরই—

রমেনের অতর্কিত চিৎকারে বিরক্ত গোপা সাবানমুখেই দরজা খুলে বাইরে এল। ওর সারা কাপড়ে জল। ব্লাউজটা ভিজে জবজব করছে। কপাল থেকে বুকের অনেকটা পর্যন্ত চুল এলোমেলো লেপ্টে আছে। গোপা তাকিয়ে দেখল, রমেন উঠোনের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে। ওর পিছনে একটু দূরে কাদ্রু। রমেনের দু হাতে দুটো মুরগি ঝুলছে। মুরগি দুটোর গলার কাছে গভীর ক্ষত। সেই ক্ষত চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে নিকোনো উঠোনে। টাটকা, গাঢ় লাল। বোঝা গেল, কিছুক্ষণ আগে আতাগাছের পিছনকার ঘাস-জংগলে মুরগি দুটো কাটা হয়েছে। এখনও ওরা প্রাণপণে হাত-পা ছুঁড়ছে। গোপা ধমকের সুরে বলল, তুমি কাটলে? আশ্চর্য! কেন, কাদ্রুকে দিলে হত না!—রমেন দুপাটি দাঁত বের করে বিভ্রান্ত গোপার দিকে তাকিয়ে শরীর কাঁপিয়ে হাসতে শুরু করল। গোপা তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে সজোরে দরজা বন্ধ করল। তখনও রমেনের অট্টহাসি থামেনি।

রান্না শেষ করে খেতে বসতে বেলা আড়াইটা বেজে গেল। টাটকা মুরগি। অনেকক্ষণ ধরে সেদ্ধ করেও বুনো গন্ধ ছাড়ানো গেল না। অজ জায়গা। ভিনিগার জাফরানের কথা এখানে ভাবাও যায় না। আতাগাছের ছায়ায় পাশাপাশি বসে খাবার প্রস্তাবটা ছিল রমেনের। কাদ্রু ভাল করে উঠোন ধুইয়ে দিয়েছিল। থালায় ভাত-মাংস সাজিয়ে দেবার পর রমেন বায়না ধরল, নিজের হাতে করে গোপা ওকে খাইয়ে দেবে। এতে গোপার ভীষণ আপত্তি। কাদ্রু বারান্দায় বসে। ও কি ভাববে। রমেন গম্ভীর হয়ে গেল, কোন কথা বলল না। মাথা নিচু করে চটপট খাওয়া শেষ করল। শুধু উঠে যাবার সময় বলল, লজ্জাটজ্জা বাজে কথা। আসলে আমার চেয়ে কাদ্রুকেই তোমার বেশী পছন্দ। সে কথাটা স্পষ্ট বললেই তো পারতে—। তারপর হন্‌হন্ করে বাথরুমের দিকে চলে গেল। গোপা কিছু বলার সুযোগ পেল না। ওর গলায় তখন ভাত আটকে গেছে।

হাতমুখ ধুয়ে রমেন ছোট ঘরে গিয়ে বসেছে। একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছে। কাদ্রুকে খেতে দিয়ে গোপা রান্নাঘরে এল। অবেলায় খাওয়া হল। মাংস রয়েছে প্রচুর। কিছু ভাত রেঁধে নিলে ঝামেলা চুকে যায়। ভাত হতে সন্ধ্যা হয়ে

গেল। ওদিকে কাঙ্গু চীনে লণ্ঠন দুটো ঝেড়েমুছে পরিষ্কার করে জ্বালিয়ে দু ঘরে টাঙিয়ে দিয়ে এসেছে। চায়ের কাপ নিয়ে ছোট ঘরে ঢুকতে গোপা দেখল, বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে রমেন বাইরের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে আছে। চায়ের কাপটা হাতে তুলে দেবার সময় ও কোন কথা বলল না। গোপা যখন ফিরে যাচ্ছে তখন ডাকল, শোনো—। —গোপা ঘুরে দাঁড়াল। থমথমে গলায় রমেন বলল, আজ রাতে আর কিছু খাব না কিন্তু। খিদে নেই—। —গোপা বলল, সে কি! অনেকটা মাংস রয়েছে। তা ছাড়া ভাত রাঁধলুম—। —রমেন বলল, কাঙ্গুকে দিয়ে দাও। ওর ছেলেপুলেরা পেলে খুশী হবে।—গোপা এ কথার কোন জবাব দিল না। কেননা, ও জানে, কিছু বললেই অনর্থ ঘটে যাবে। বিশেষ করে রমেনের বিশ্রী চেঁচিয়ে কথা বলা গোপার ভয় হয়।

এর পর কয়েক ঘণ্টা, যতক্ষণ না ভাল করে জ্যোৎস্না ফুটল, মস্ত রুপোর থালার মত চাঁদটা মাথার ওপরে চলে এল, ইউ-ক্যালিপটাসের শিরশিরানি থামল, ততক্ষণ গোপা ঘর বারান্দা উঠোনময় উদ্দেশ্যহীন ঘুরতে লাগল। শোবার ঘরে ঢুকে অনেক-ক্ষণ ধরে বিছানা পাতল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি করে চুল বাঁধল, ফ্লাওয়ার ভাসের জল পাল্টালো, পাপোশটা একবার ঘরের ভেতর ফের বাইরে রাখল। কাঙ্গুকে পোটলায় করে ভাত মাংস দিয়ে ফিরে আসতে দেখল, রমেন বড়ঘরে চলে গেছে। গোপা এবার ছোটঘরে তালা লাগিয়ে পিছনের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। গোপা খানিকটা সময় কাটাতে চাইছিল, যাতে রমেন ঘুমিয়ে পড়ে।

একসময় পা টিপে টিপে বড়ঘরে ঢুকতে গোপা দেখল, চীনে লণ্ঠনটা নেবানো। জানালার পর্দাটা তোলা। ঘরের কিছু অংশ জুড়ে চাঁদের আলো ছড়িয়ে আছে। খাটের দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল রমেন ঘুমোয়নি। দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে সিগারেটের আগুন জ্বলছে। গোপা দরজায় খিল দিয়ে জানালার কাছে এল। পর্দা নামিয়ে দিতে ওদিক থেকে রমেন বলে উঠল, পর্দাটা ফেলছ কেন? বেশ তো আলো আসছে। —গোপা বিছানার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, কালরাতে ভাল ঘুম হয়নি। কি বিশ্রী জ্যোৎস্না!—রমেন কোন জবাব দিল না। সিগারেটের শেষাংশ দেয়ালে ঘষে নিবেয়ে দিয়ে গুটিসুটি মেরে পড়ে রইল। গোপা কম্বলের ভেতর ঢুকে পড়েছে। রমেন নিঃসাড়। গোপা এপাশ থেকে ফিসফিসিয়ে উঠল, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?—রমেন উত্তর করল না। ভাবল, ঘুমুতে পারলে বেঁচে যেত সে। গোপা এবার চওড়া পিঠে হাত রাখল। আঙুলের নখ দিয়ে আঁক কাটতে কাটতে বলল, একটা কথা বলব?—কোন সাড়াশব্দ নেই। গোপা নড়েচড়ে রমেনের কাছে চলে এল। ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, আমি বলছিলাম কি, চল ফিরে যাই। আর ভাল লাগছে না এখানে—।—রমেন এবার ওপাশ থেকে স্পষ্ট বলল, সে কি! তুমিই তো বললে ছুটি বাড়িয়ে নিতে। আর এখন—। গোপা ওর পিঠে মুখ লুকিয়ে বলে উঠল, কতদিন হল এসেছি। আর ভাল লাগছে না। বাবার জন্যে মন কেমন করছে। মার ছানি কাটাবার সময় হয়ে এল। বড়দির শরীর ভাল নেই। ঋনুকে দেখি না কত দিন—। —গোপার কথা শেষ হবার আগেই পাশ ফিরে রমেন ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বলল, আমারও তাই ইচ্ছে—

তারপর আর কোন কথা হল না। ওরা ক্রমশ নিবিড়তর হয়ে একাকার হতে চাইল। ওরা পরস্পর পরস্পরের বুকের ওম্ পেতে চাইল। আর তখন বাইরে মস্ত চাঁদ একটু একটু শব্দ করে ভেঙে যাচ্ছে। জ্যোৎস্নায় কুয়াশার রঙ লাগছে। ইউক্যালিপটাস আর যোতানিমের পাতায় আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে। আতাগাছের পিছনকার ঘাসজঙ্গল থেকে মুরগির পালকগুলো হাওয়ায় উড়ে উড়ে আসছে। একটা দারুণ ঝড়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে পৃথিবী।

কোয়াসারের বিস্ফোরণশীল দুনিয়া
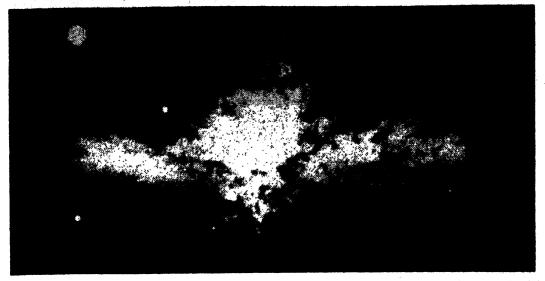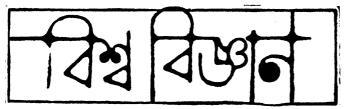
মহাজগৎ ও পরমাণুজগতে নতুন নুড়ি সঞ্চয়

"ইতিহাসের এক অনন্যসাধারণ মুহূর্তে বাস করার সৌভাগ্য লাভ করেছি আমরা।"

এই মন্তব্য করেছেন সদ্যোত্তীর্ণ ১৯৬৬ সাল সম্পর্কে, আমেরিকার প্রখ্যাত বিজ্ঞান-পত্র 'সায়েন্স'-এর সম্পাদক ও ওয়াশিংটনের কার্নেজি ইন্সটিটিউশনের ভূপদার্থ-বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের অধ্যক্ষ ডঃ ফিলিপ আবেল্‌সন। ১৯৬৬ সনে মহাবিশ্বসাগরের বেলাভূমি থেকে মানুষ বিজ্ঞানের যেসব নতুন নুড়ি আহরণ করেছে সেইগুলির কথা ভেবেই বৈজ্ঞানিকের এই মন্তব্য।

প্রতি বছরের মত ১৯৬৬ সালের বিশ্ব-বিজ্ঞানের শব্দকোষে 'স্পুতনিকের' মত বহু নতুন শব্দের আবির্ভাব হয়েছে। 'অ্যাপোজি' এবং 'পেরিজি' এই দুটি শব্দের সঙ্গে সাধারণ পাঠকের ১৯৫৭ সালের আগে পরিচয় ছিল না। কৃত্রিম উপগ্রহের ভূপ্রদক্ষিণ এই শব্দ দুটিকে অভিধান থেকে তুলে এনে খবরের কাগজের পাতায় চালু করে দিয়েছে। এখন পাঠকরা জানেন যে, ভূকেন্দ্রিক ডিম্বাকার কক্ষপথের সর্বোচ্চ বিন্দুকে বলে 'অ্যাপোজি' আর সর্বনিম্ন বিন্দুকে বলে 'পেরিজি'। ১৯৬৬ সালে লুনা ও অর্বিটারের চন্দ্রকেন্দ্রিক কক্ষপথে আবর্তনের দৌলতে যে দুটি নতুন শব্দ চালু হয়েছে সে দুটি হল 'স্পোসেলেনিয়াম' (সেলেনিয়াম মানে চাঁদ), এবং 'পেরিসেলে-নিয়াম'। আরও দুটি নতুন শব্দ হচ্ছে 'কোয়াসার' ও 'এক্সটার'। কোয়াসার নিয়ে কাজ করছেন হয়েল ও নার্লিকার। এক্সটার বলে সেই নক্ষত্রগুলিকে যেগুলি সাধারণ আলোকরশ্মির বদলে কিংবা উপরে এক্স রশ্মি বিকীর্ণ করে। আরো আছে যেমন 'অ্যাস্ট্রোনট' বা 'কসমোনট', 'অ্যাকোয়ানট' ইত্যাদি। ১৯৬৬ সালে হাড্রন নামে এক অবপারমাণবিক বস্তুকণার সন্ধান মিলেছে, এমন এক রকম কাঁচ তৈরি হয়েছে, যা সূর্যের আলোয় কালো হয়ে যায় এবং ছায়ার মধ্যে চকচকে হয়ে আলোর খেলায় মেতে যায়।

একটি দুশ [illegible] ইউনিট

রাশিয়ার দুবনায় দুনিয়ার এক বৃহত্তম পরমাণুবিভাজন যন্ত্রের একাংশ

আজ থেকে বছর কুড়ি আগে মেট্রো সিনেমায় চোখে এক রকমের চশমা লাগিয়ে আমরা প্রথম ত্রিমাত্রিক ছবি দেখেছিলাম। ১৯৬৬ সালে ত্রিমাত্রিক চিত্রকৌশল বা হলোগ্রাফির বিশেষ উন্নতি হয়েছে লেসার রশ্মির দৌলতে। এই কৌশল ছায়াচিত্র ও টেলিভিশন-জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে।

ভূকম্পনের পূর্বাভাস ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ১৯৬৬ সাল চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ঐ বছরে ওয়াশিংটনের উপকণ্ঠবর্তী রকভিল শহর থেকে দুনিয়ার ৪০০টি ভূকম্পন পরীক্ষা-কেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।

মহাবিশ্বের কণ্ঠস্বর শোনবার যন্ত্র রেডিও-দূরবীনের কল্পনাতীত উন্নতি হয়েছে ১৯৬৬ সালে। ভার্জিনিয়ার গ্রীন ব্যাংক শহরে এমন এক প্রচণ্ড শক্তিশালী রেডিও দূরবীন বসানো হয়েছে যা দিয়ে চাঁদের আয় ১ মাইল পরিমিত জায়গা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা যেতে পারে। তার রেকাবির মত দেখতে অ্যান্টেনাটির ব্যাস ১৪০ ফুট। মেরিল্যান্ড পয়েণ্ট মানমন্দিরের রেডিও দূরবীন মহাবিশ্বে বিক্ষিপ্ত ৬ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের বেতারতরঙ্গ ধরতে পারে। ক্যালিফর্নিয়ার গোল্ডস্টোন ট্র্যাকিং স্টেশনে আর একটি ২১০ ফুট রেডিও দূরবীন বসানো হয়েছে। প্লুটো গ্রহের মত দূরে ভ্রাম্যমাণ মহাকাশযানের সঙ্গে সেটি বার্তাবিনিময় করার ক্ষমতা রাখে। সৌর-জগতের দূরতম গ্রহ প্লুটোর সূর্য থেকে দূরত্ব পৃথিবীর তুলনায় ৪০ গুণ বেশি।

একদিকে বৈজ্ঞানিকরা যেমন যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে মহাবিশ্বের দূর দূরান্তরের পর্দা সরিয়ে ভিতরে দৃষ্টিপাত করছেন তেমনি অন্য দিকে বস্তুর অণুপরমাণুর গভীরতম অন্দরমহলের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করছেন। ১৯৬৬ সালে সানফ্রান্সিস্কোর কাছে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাট এক পরমাণু ভাঙ্গন যন্ত্র নির্মিত হয়েছে যার মধ্যে ইলেকট্রনগুলিকে আলোকের বেগে পরমাণুর উপর আঘাত হানতে বাধ্য করা হয়, যার ফলে কেন্দ্রীণগুলি হয়ে যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ। তখন সেই কেন্দ্রীণের খণ্ডগুলির ফটো তুলে সেগুলি পরীক্ষা করা হয়।

বহির্মুখী রেডিও দূরবীন ও অন্তর্মুখী পারমাণবিক যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ মহাবিশ্ব ও বস্তুপরমাণু সম্পর্কে যা জ্ঞান সঞ্চয় করতে পেরেছে, ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তা থেকে আমরা পৃথিবীর বয়েস সম্পর্কে একটা আন্দাজ করতে পারি।

গ্রহ-উপগ্রহগুলির সৃষ্টি হয়েছিল প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের ফলে এবং সেই সঙ্গেই সৃষ্টি হয়েছিল ইউরেনিয়াম ধাতুর—এই হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক মতবাদ। মহাকালের গতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরেনিয়ামের 'পচন' হতে থাকে অর্থাৎ বিকিরণের মাধ্যমে ইউরেনিয়াম ক্রমশ সীসায় রূপান্তরিত হয়। ইউরেনিয়াম পৃথিবীতে গোড়ায় কত ছিল এবং এখন কমতে কমতে কতটা আছে, সীসাই বা কত, এইসব হিসাবপত্র করে বৈজ্ঞানিকরা ১৯৬৬ সালে অনুমান করেছেন যে, পৃথিবীর বয়েস হবে ৭০০ কোটি থেকে ১৩০০ কোটি বছরের মধ্যে। পৃথিবীর বয়েস মাপবার এই প্রকৃতিজাত ঘড়ি লুকিয়ে আছে ইউরেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে।

পৃথিবীর বয়েস সম্পর্কে ইউরেনিয়াম ঘড়ির হিসাব যাচাই করে দেখেছেন বৈজ্ঞানিকরা আর এক রকমের ঘড়ির সাহায্যে। ৬০টি নীহারিকাপুঞ্জ তাঁরা পরীক্ষা করেছেন যেগুলি থেকে পৃথিবীতে আলোকরশ্মি এসে পৌঁছাতে বহু কোটি বছর লাগে। সেই পরীক্ষার ভিত্তিতে তাঁরা মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ বা স্ফীতির বেগ হিসাব করে বলছেন যে, সেই হিসাবেও দেখা যাচ্ছে, বিশ্বসৃষ্টিকারী বিস্ফোরণ ঘটেছিল ৭০০ কোটি থেকে ১৩০০ কোটি বছর আগে।

আমাদের ছায়াপথের প্রাচীনতম তারাগুলির বয়েসও তাদের ঐ হিসাবের সঙ্গে মিলে যায়।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

চীন-যুদ্ধে পরাজয়ের দায়িত্ব

✳ নীরদচন্দ্র চৌধুরী

[ছয়]

চীনযুদ্ধে পরাজয়ের দায়িত্ব বিচার করিতে গিয়া প্রথমেই বলিতে হয়, যুদ্ধ বাধিবার পর কাহার দোষ কতটুকু এই আলোচনার বিশেষ সার্থকতা নাই। ব্যক্তি-বিশেষের দোষ-ত্রুটি যে নাই একথা কখনও বলিব না। কিন্তু হার ইহার জন্য হয় নাই, উদ্যোগপর্বের অসম্পূর্ণতার জন্য জিত অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই হারটা প্রায় অদৃষ্টের ফলের মত। যুবক বঙ্কিমচন্দ্র "অদৃষ্ট" সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"পাঠক মহাশয় 'অদৃষ্ট' স্বীকার করেন? ললাটলিপির কথা বলিতেছি না, সে ত অলস ব্যক্তির আত্মপ্রবোধ জন্য কল্পিত গল্পমাত্র। কিন্তু, কখন কখন যে, কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার জন্য পূর্বাবধি এরূপ আয়োজন হইয়া আইসে, তৎসিদ্ধিসূচক কার্য সকল এরূপ দুর্দমনীয় বলে সম্পন্ন হয় যে, মানুষিক শক্তি তাহার নিবারণে অসমর্থ হয়, ইহা তিনি স্বীকার করেন কি না? সর্বদেশে সর্বকালে দূরদর্শিগণ কর্তৃক ইহা স্বীকৃত হইয়াছে।"

চীনের যুদ্ধে হার সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে ইহা ভারতবর্ষের জনগণের অদৃষ্টে ছিল। তাই এই কাহিনী সম্বন্ধে যদি আমি হার্ডির "ডাইনাস্টে"র মত কোন বই লিখিতে বসিতাম, তাহা হইলে পরাজয়ের অনিবার্যতা নাসি-রূপিণী ভারতবর্ষের উপর আরোপ করিতাম। চীনযুদ্ধের পূর্বে তিন চার বৎসরের মধ্যে সেই সূত্রে যেসব ব্যাপার ঘটিতেছিল তাহার প্রকৃত সংবাদ জানা থাকিলে নিশ্চয়ই বলিতাম, "তদা নাশংসে বিজয়ায়, সঞ্জয়।" নেহরু ব্যাপারগুলি জানিতেন, তাই তিনি "যদা শ্রৌষং —"-এর বিলম্বিত সুর দিয়াও ধৃতরাষ্ট্রের মতই বলিয়াছিলেন, "তদা নাশংসে বিজয়ায়, রাজ্যসভে।"

জেনারেল হেণ্ডারসন-ব্রুকসের রিপোর্ট পেশ হইবার পর নেহরু রাজ্যসভায় যে উক্তি করিয়াছিলেন তাহা আমি সেই সময়ে বুঝিতে পারি নাই। ১৯৬৩ সনের ২রা সেপ্টেম্বর শ্রীযুক্ত চবন পার্লামেণ্টে একটি বিবৃতি পাঠ করেন। তাহাতে তিনি জেনারেল হেণ্ডারসন-ব্রুকসের সহিত একমত হইয়া বলেন যে, যুদ্ধের ব্যাপারে গভর্নমেণ্টের উচ্চতম স্থানে ও কার্যকলাপে, তা সে সামরিক বা অসামরিক বিভাগই হউক, যে ত্রুটি ছিল তাহাতেই হারটা হয়। হেণ্ডারসন-ব্রুকসের রিপোর্ট সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ হইয়াছে, তাহা হইতে মনে হয় এই রিপোর্টে এক সাধারণ সেনানী ও সৈন্য ছাড়া প্রায় সকলকেই যুদ্ধচালনায় অপটু বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে। সমর-সচিব ইহা অযথার্থ অভিযোগ মনে করেন নাই।

কিন্তু পরদিন নেহরু রাজ্যসভায় বলিলেন যে, হারটা হইয়াছিল সম্পূর্ণ "compulsion of events"-এর জন্য, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে ভবিষ্যৎ ঘটনার জন্য পূর্বাবধি আয়োজনের দুর্দমনীয় বলের জন্য। তাই নেহরু ইহাও বলিয়াছিলেন, এই অবস্থায় অন্য কোনও গভর্নমেণ্ট বিশেষ কিছু (anything vastly different) করিতে পারিত না। ইহা প্রায় ধৃতরাষ্ট্রী বিলাপের মত—তদা নাশংসে বিজয়ায়..."

এই অকর্মণ্যতা যে কত গভীর তাহা পরবর্তী ব্যাপারেও প্রমাণ হয়। অন্য কোনও দেশে এইরূপ পরাজয় হইলে একটা কমিশন বসিত, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান হইত, সকলের সাক্ষ্য লওয়া হইত। আমি ইংরেজ জাতির তিনটি সামরিক অসাফল্য সম্বন্ধে তিনটি রিপোর্ট পড়িয়াছি—এক, বোয়ার যুদ্ধের উপর; দ্বিতীয়, মেসোপটামিয়াতে হারের উপর; তৃতীয়, গ্যালিপলিতে হারের উপর। এই তিনটি কমিশনের রিপোর্টের মধ্যেও আবার বোয়ার-যুদ্ধের রিপোর্টটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিশাল-কলেবর রিপোর্টে ইংরেজ সেনানী ও সেনাপতিদের যুদ্ধ পরিচালনায় অকর্মণ্যতার তীব্র সমালোচনা পড়িয়াই আমি আমার প্রথম সামরিক লেখায় ইংরেজের সামরিক অযোগ্যতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিবার জোর পাই। কার্যতও ইহার ফল ভাল হইয়াছিল। তখন হইতে যেসব পরিবর্তন

[illegible] হইয়াছিল তাহার পরিণতি হয় [illegible] সময় [illegible] সময়ে। এইসব পরিবর্তনের জন্য ১৯১৪ সনে ফ্রান্সে ইংরেজ বাহিনী পাঠান সম্ভব হইয়াছিল।

এদেশের জনসাধারণের যদি কোন সামরিক বিবেকবুদ্ধি ও জ্ঞান থাকিত তাহা হইলে তাহারা চীনযুদ্ধের পর এইরূপ একটা কমিশন বসাইবার জন্য আন্দোলন করিত: জেনারেল কলের বই প্রকাশিত হইবার পর আরও করিত। কিন্তু তাহার কোনও লক্ষণই নাই।

ইহার ফল কি হইয়াছে তাহা এখনও প্রকাশ হয় নাই, ভবিষ্যতে চীনের সহিত কোনও গণ্ডগোল বাধিলে বুঝা যাইবে। তবে এখনই একটা কথা অন্তত বলা যাইতে পারে। আমাদের গভর্নমেণ্ট যাহাই বলুন না কেন, [illegible] সীমান্তে চীনারা [illegible] করিয়াছিল, সেই জায়গা দখল করিয়াই আছে। উহাদিগকে সেখান হইতে হটাইবার কোনও চেষ্টাই ১৯৬২ সনের পর করা হয় নাই, কখনও হইবে কি না সন্দেহ। আমাদের পূর্বতন সামরিক ব্যবস্থার যদি সংশোধনই হইয়া থাকে তাহা হইলে এই নিষ্ক্রিয়তা কেন?

আপিসারকে কেন যে সেনাপতিদের উপর খবরদারী করিবার জন্য বসান হইয়াছে তাহা আমি বলিতে পারি না। ইহাতে ভারতীয় ব্যুরোক্রেসী যত কিছু অকর্মণ্যতা সমর-বিভাগেও, যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারেও সংক্রামিত হইয়াছে। নিম্নতম কেরানী সামরিক ব্যাপারে নোট লেখে, আর একজনের পর একজন সেকশন অফিসার আণ্ডার সেক্রেটারী, ডেপুটি সেক্রেটারী, জয়েণ্ট সেক্রেটারী ও সেক্রেটারী হয় আরও নোট লেখেন, কিংবা সই করেন। ইহাতে শুধু কাজের দেরিই যে হয় তাহা নয়, কাজ পণ্ডও হয়। আমি বলিব, এই ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্টকে তুলিয়া না দিলে সামরিক ব্যাপারে ভারতবর্ষের কোনও উন্নতি হইবে না।

তারপর আমাদের সেনাপতিদের অর্থাৎ সমগ্রভাবে আর্মি হেডকোয়ার্টার্সেরও গুরুতর ত্রুটি বা অবহেলা আছে। প্রথমত, আয়োজনের অসম্পূর্ণতা জানিয়া জেনারেল থাপার ও জেনারেল কল কেন যে যুদ্ধে স্বীকৃত হইলেন, ও যুদ্ধের ভারই গ্রহণ করলেন তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তাঁহারা যদি গভর্নমেণ্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিতেন, তাহা হইলে দেশের প্রতি প্রকৃত কর্তব্য পালন করিতেন, অবশ্য তাহা হইলে চাকুরি ছাড়িতে হইত। কিন্তু চাকুরির জন্য দেশের অনিষ্ট করা উচিত হয় নাই।

দ্বিতীয়ত, আমাদের সেনাপতিদের কেহই যুদ্ধের জন্য ঠিকভাবে প্ল্যান করেন নাই। কিছু করিতে পারা যাক আর নাই যাক, প্ল্যান পুরাপুরি করিয়া রাখিতে কি বাধা ছিল? এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বলিব। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে জেনারেল হেগ ভারতবর্ষের চীফ অফ্ স্টাফ। তিনি জানিতেন, জার্মেনীর সহিত যুদ্ধ বাধিলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর টান পড়িবেই, তাই তিনি এবিষয়ে নিম্নতন সেনাপতিদের দিয়া কিছু কিছু কাজ করাইয়াছিলেন।

অথচ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ভারতবর্ষের বাহিরে যুদ্ধ করিতে পাঠান তখনকার দিনে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পলিসির বিরুদ্ধে ছিল। তাই ভারতীয় বিভাগের মন্ত্রী লর্ড মর্লী যখন একটা কানাঘুষা শুনিতে পাইলেন তখনই আদেশ দিলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ইউরোপে পাঠাইবার কোন প্ল্যান করা যাইবে না, যে প্ল্যান হইয়াছে তাহা যেন নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। হেগ তাহার অধস্তন সেনানীকে ডাকিয়া এই আদেশ দিলেন বটে, কিন্তু এই সেনানী তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন যে, প্ল্যানগুলি বাস্তব নষ্ট না করিলেও চলিবে। তাই তিনি এইগুলি একটা আলমারিতে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। সেগুলি ১৯১৪ সনের আগস্ট মাসে আবার বাহির করা হইয়াছিল।

আমাদের সেনাপতিরাও এইভাবে সমস্ত প্ল্যান করিয়া আলমারিতে রাখিয়া ১৯৬২ সনে বাহির করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা কোন বিষয়ে কোন প্ল্যান করেন নাই। আমি শুনিয়াছি চীনের সহিত যুদ্ধ বাধিলে কি করিয়া সে যুদ্ধ চালানো হইবে, সে বিষয়ে ভারত গভর্নমেণ্টের দুইজন পূর্বতন সেনাপতি প্ল্যান করিয়াছিলেন, সেটি আলমারিতেও তোলা ছিল। কিন্তু ১৯৬২ সনে বাহির করা হয় নাই।

আমার মনে হয়, নূতন সেনাপতিরা শ্রীযুক্ত মেননের দাপটে ভীত হইয়া ক্লৈব্যগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদের উচিত হয় নাই। সুতরাং আমি সেনাপতিদেরও চীনযুদ্ধে পরাজয়ের জন্য দায়ী করিব।

[সমাপ্ত]

॥ ৬ ॥
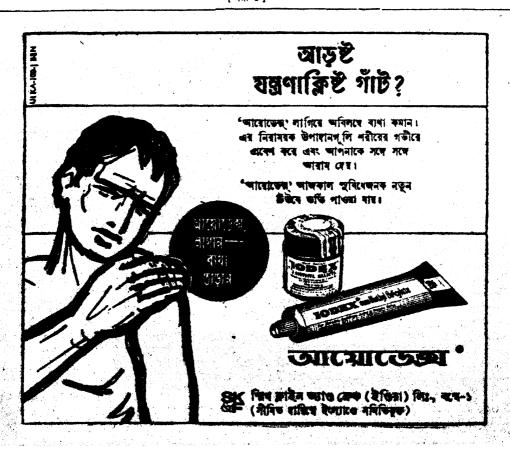
দেবাশিস দীপাকে নিয়ে নিজের মোটরের কাছে এসে দেখল মোটরের পিছনের সীট একরাশ গোলাপফুল এবং আরো অনেক উপহারদ্রব্যে ভরা। দেবাশিস স্নিগ্ধকণ্ঠে সকলকে ধন্যবাদ দিল, তারপর দীপাকে পাশে বসিয়ে মোটর চালিয়ে চলে গেল। সন্ধ্যে তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

সাবধানে গাড়ি চালাতে চালাতে দেবাশিস বলল—'কেমন লাগল?'

পাশের আলো-আঁধারি থেকে দীপা বলল—'ভাল।'

গাড়ির দু'পাশের ফুটপাথ দিয়ে স্রোতের মত লোক চলেছে, তারা যেন অন্য জগতের মানুষ। গাড়ি চলতে চলতে কখনো চৌমাথার সামনে থামছে, আবার চলছে; এদিক ওদিক মোড় ঘুরে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে।

'ডক্টর দত্তকে কেমন মনে হল?'

এবার দীপার মনে একটু আলো ফুটল, 'খুব ভাল লোক। এত চমৎকার কথা বলেন। উনি কি অনেক দিন এখানে, মানে ফ্যাক্টরিতে আছেন?'

দেবাশিস বলল, 'বাবা যখন ফ্যাক্টরির পত্তন করেন তখন থেকে উনি আছেন। আমি ফ্যাক্টরির মালিক বটে কিন্তু উনিই কর্তা।'

গাড়ির অভ্যন্তর গোলাপের গন্ধে পূর্ণ হয়ে আছে। দীপা দীর্ঘ আঘ্রাণ নিয়ে বলল, 'ফ্যাক্টরির অন্য সব লোকেরাও ভাল।'

দেবাশিস মনে মনে ভাবল, ফ্যাক্টরির সবাই ভাল, কেবল মালিক ছাড়া। মুখে বলল, 'ওরা সবাই আমাকে ভালবাসে।' একটু থেমে বলল—'ফ্যাক্টরি থেকে বার্ষিক যে লাভ হয় তার থেকে আমি নিজের জন্যে বারো হাজার টাকা রেখে বাকি সব টাকা কর্মীদের মধ্যে মাইনের অনুপাতে ভাগ করে দিই।'

'ও—' দীপার মনে একটা কৌতূহল উঁকি মারল, সে একবার একটু দ্বিধা করে শেষে প্রশ্ন করল, 'ফ্যাক্টরি থেকে কত লাভ হয়?'

দেবাশিস উৎসুকভাবে একবার দীপার পানে চাইল, তারপর বলল, 'খরচ-খরচা বাদ দিয়ে ইনকাম্ ট্যাক্স শোধ করে এ বছর আন্দাজ দেড় লাখ টাকা বেঁচেছে। আশা হচ্ছে, আসছে বছর আরো বেশী লাভ হবে।'

আর কোনো কথা হবার আগেই মোটর বাড়ির ফটকে প্রবেশ করল। বাড়ির সদরে মোটর দাঁড় করিয়ে দেবাশিস বলল, 'গোলাপ-ফুলগুলোর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।'

দীপা বলল, 'আমি করছি।'

নকুল এসে দাঁড়িয়েছিল, দীপা তাকে প্রশ্ন করল, 'নকুল, বাড়িতে ফুলদানি আছে?'

নকুল বলল—'আছে বইকি বউদি, ওপরের বসবার ঘরে দেয়াল আলমারিতে আছে। চাবি তো তোমারই কাছে।'

'আচ্ছা। আমি ওপরে যাচ্ছি, তুমি গাড়ি থেকে ফুল আর যা যা আছে নিয়ে এস।' দীপা ওপরে চলে গেল।

ওপরের বসবার ঘরে কাঠের কাবার্ডে অনেক শৌখিন বাসন-কোসন ছিল, তার মধ্যে কয়েকটা রুপোর ফুলদানি। কিন্তু বহুকাল অব্যবহারে রুপোর গায়ে কলঙ্ক ধরেছে। দীপা ফুলদানিগুলোকে বের করে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর নকুল এক বোঝা গোলাপ নিয়ে উপস্থিত হলে তাকে প্রশ্ন করল, 'নকুল, ব্রাসো আছে?'

নকুল বলল, 'বাসন পরিষ্কার করার মলম? না বউদি, ছিল, শেষ হয়ে গেছে। কে আর রুপোর বাসন মাজাঘষা করছে! আমি তেঁতুল দিয়েই কাজ চালিয়ে নিই।'

দীপা বলল, 'তেঁতুল হলেও চলবে। এখন চল, ফুলগুলোকে বাথরুমের টবে রেখে ফুলদানি পরিষ্কার করতে হবে।'

দীপার শয়নঘরের সংলগ্ন বাথরুমে জল-ভরা টবে লম্বা ডাঁটিসুদ্ধ গোলাপ ফুল-গুলোকে আপাতত রেখে দীপা তেঁতুল দিয়ে ফুলদানি সাফ্ করতে বসল। এত-দিন পরে সে একটা কাজ পেয়েছে যাতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও ভুলে থাকা যায়।

দেবাশিস একবার নিঃশব্দে ওপরে এসে দেখল, দীপা ভারি ব্যস্ত। আঁচলটা গাছ-কোমর করে জড়িয়েছে, মাথার চুল একটু এলোমেলো হয়েছে; ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে

তাকে। দেবাশিস দোরের কাছে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট চোখে দেখল, কিন্তু দীপা তাকে লক্ষই করল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেবাশিস আস্তে আস্তে নীচে নামল, তারপর নৃপতির বাড়িতে চলে গেল।

কিন্তু আজ আর তার আড্ডায় মন বসল না। ঘণ্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল। ওপরের বসবার ঘরে দীপা রেডিও চালিয়ে বসে ছিল, দেবাশিসকে দেখে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে রেডিও নিবিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'ফুলগুলোকে ফুলদানিতে সাজিয়ে ঘরে ঘরে রেখেছি। দেখবে?'

দেবাশিসের মনের ভিতর দিয়ে বিস্ময়ানন্দের বিদ্যুৎ খেলে গেল। দীপা এতদিন তাকে প্রকাশ্যে 'তুমি' এবং জনান্তিকে 'আপনি' বলেছে, আজ হঠাৎ নিজের অজান্তে জনান্তিকেও 'তুমি' বলে ফেলেছে।

দেবাশিস মুচকি হেসে বলল, 'চল, দেখি।'

দীপা তার হাসি লক্ষ করল; হাসিটা যেন গোপন অর্থবহ। সে কিছু বুঝতে পারল না, বলল—'এসো।'

নিজের শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে আলো জেলে দীপা দেবাশিসের মুখের পানে চাইল; দেবাশিস দেখল, ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে ঝকঝকে রুপোর ফুলদানিতে দীর্ঘবৃন্ত একগুচ্ছ গোলাপ শোভা পাচ্ছে। লাল, গোলাপী এবং সাদা, তিন রঙের গোলাপ, তার সঙ্গে মেডেন হেয়ার ফার্নের জালিদার পাতা।

ফুলদানিতে ফুল সাজানোর কলাকৌশল আছে, যেমন তেমন করে সাজালেই হয় না। দেবাশিস খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে উঠল, 'বাঃ, ভারি চমৎকার সাজিয়েছ! মনে হচ্ছে, যেন ফুলের ফোয়ারা।'

ঘর থেকে বেরিয়ে বসবার ঘরে এসে দেবাশিসের নজর পড়ল রেডিওগ্রামের ওপরে একটা ফুলদানিতে গোলাপ সাজানো রয়েছে। এর সাজ অন্য রকম; চরকি ফুলঝুরির মতন ফুলগুলি গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেদিকে আঙুল দেখিয়ে দেবাশিস বলল, 'এটাও ভারি সুন্দর। আগে চোখে পড়েনি।'

এই সময় নকুল নীচে থেকে হাঁক দিল, 'বউদিদি, তোমরা এস। ভাত বেড়েছি।'

দুজনে নীচে নেমে গেল। রান্নাঘরের টেবিলেও গোলাপগুচ্ছ। সে দীপার পানে প্রশংসাপূর্ণ চোখে চেয়ে একটু হাসল।

সে রাত্রে নিজের ঘরে শুতে গিয়ে দেবাশিস দেখল, তার ড্রেসিং টেবিলের ওপরেও গোলাপের ফোয়ারা। দীপা তার ঘরে ফুল রাখতে ভোলেনি। দেবাশিসের মন মাধুর্যপূর্ণ হয়ে উঠল।

দীপা নিজের ঘরে গিয়ে নৈশ দীপ জেলে শুয়েছিল। কিন্তু ঘুম সহজে এল না। মনের মধ্যে একটি আলোর চারপাশে বাদলা পোকার মতন অনেকগুলো ছোট ছোট চিন্তার টুকরো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলোটি স্নিগ্ধ তৃপ্তির আলো আজকের দিনটা যেন গোলাপজলের ছড়া দিয়ে এসেছিল... ক্যাণ্টিনে অনুষ্ঠান...ডাক্তার দত্ত...সভা-মণ্ডপে গান—তোমরা সবাই ভাল...ক্যাণ্টিনের সবাই যেন প্রাণপণে চেষ্টা করছে তাকে খুশী করতে...রাশি রাশি গোলাপফুল... ঘরে সাজিয়ে রাখতে কী ভালই লাগে... দেবাশিসের ভাল লেগেছে...সে অমন মুখ টিপে হাসল কেন?...যেন হাসির আড়ালে কিছু মানে ছিল—কি!

শুয়ে শুয়ে দীপার মুখে উজ্জ্বল হয়ে

উঠল। সে মনের ভুলে দেবাশিসকে আড়ালে 'তুমি' বলে ফেলেছিল, তখন বুঝতে পারেনি। দেবাশিস তাই শুনে হেসেছিল।

দীপা বিছানা থেকে উঠে খোলা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে রাস্তা চলে গেছে, রাস্তার ওপারের তিন চারটে বাড়ির সদর এই জানলা থেকে দেখা যায়। বাড়িগুলির আলো নিবে গেছে; রাস্তার দু' সারি আলো নিষ্পলক জ্বলছে। রাস্তা দিয়ে দু'একটি লোক কদাচিৎ চলে যাচ্ছে, পাঁচশ গজ দূরে থেকে তাদের জুতোর খট্‌খট্ শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আধ-ঘুমন্ত রাত্রি।

জুয়াচুরি করা, মিথ্যে অভিনয় করে মানুষকে ঠকানো, এসব দীপার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তবু ঘটনাচক্রে সে দেবাশিসের সঙ্গে লোক ঠকানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে খানিকটা মানসিক ঘনিষ্ঠতা অনিবার্য। সেজন্যে দেবাশিসের কোনো দোষ নেই; সে স্বভাব-ভদ্রলোক, তার প্রকৃতি মধুর। কিন্তু শুচিধা যতই ঘনিষ্ঠ হোক, দীপা তাকে ভালবাসে না, অন্য একজনকে ভালবাসে। কতকগুলো অভাবনীয় ঘটনা-সমাবেশের ফলে দীপা আর দেবাশিস একত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এ অবস্থায় দীপা যদি দেবাশিসের সঙ্গে সহজ সম্বন্ধে বাস করে তাতে দোষ কি? তাকে আড়ালে 'তুমি' বললে অন্যায় হবে কেন? কাউকে 'তুমি' বললেই কি তার সঙ্গে ভালবাসার সম্বন্ধ বোঝায়!

মনের অস্বস্তি অনেকটা কমল। সে আবার গিয়ে বিছানায় শুল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। সে লক্ষ করেনি যে যতক্ষণ সে জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল ততক্ষণ একটি লোক রাস্তার ল্যাম্প-পোস্টে ঠেস দিয়ে একদৃষ্টে তার পানে তাকিয়ে ছিল। লক্ষ করলে এত সহজে ঘুম আসত না।

পরদিন সকাল বেলা ওপরের বসবার ঘরে চা খেতে খেতে দেবাশিস বলল, 'তুমি সারাদিন একলা থাকো, সময় কাটে কি করে?'

দীপা চুপ করে রইল। সময় কাটবার তাই কাটে, সময়ের যদি দাঁড়িয়ে পড়বার উপায় থাকত তাহলে বোধহয় দীপার সময় দাঁড়িয়েই পড়ত।

দেবাশিস বলল, 'তোমার বই পড়ার শখ নেই? বাড়িতে কিছু বই আছে কিন্তু সেগুলো বিজ্ঞানের বই। তুমি যদি চাও বইয়ের দোকান থেকে গল্প-উপন্যাসের বই এনে দিতে পারি। মাসিক সাপ্তাহিক কাগজের গ্রাহকও হওয়া যায়।'

দীপা এবারও চুপ করে রইল। বই পড়তে সে ভালবাসে, ভাল লেখকের ভাল

গল্প উপন্যাস পেলে পড়ে, কিন্তু বই মুখে দিয়ে তো সারা দিন রাত কাটে না।

'কিংবা তোমাকে বইয়ের দোকানে নিয়ে যেতে পারি, তুমি নিজের পছন্দ মতন বই কিনো।'

দীপা সংশয় জড়িত স্বরে বলল, 'আচ্ছা।'

দেবাশিস বুঝল বই সম্বন্ধে দীপার বেশি আগ্রহ নেই। তখন সে বলল, তোমার বান্ধবীদের বাড়িতে ডাকো না কেন? তাদের সঙ্গে গল্প করেও দু'দণ্ড সময় কাটবে।'

দীপা বলল, 'আচ্ছা ডাকব।'

চা শেষ করে দেবাশিস জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নীচে অনাদৃত বাগানের পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ঘরের দিকে ফিরে বলল, 'তুমি ফুল ভালবাস। বাগান করার শখ আছে কি?'

'আছে।' দীপা সাগ্রহে উঠে দাঁড়াল, এক পা এক পা করে দেবাশিসের কাছে এসে বলল, 'বাপের বাড়িতে ছাতের ওপর বাগান করেছিলুম, টবের বাগান।'

দেবাশিস হেসে বলল, 'ব্যস, তবে আর কি, এখানে খাটিতে বাগান কর। বাবা মারা যাবার পর বাগানের বন্দোবস্ত নেওয়া হয়নি। আমি আজই ব্যবস্থা করছি। আগে একটা

শুভ্রা সিঁড়ির মাথায় দীপাকে জড়িয়ে ধরল

মালী দরকার, তুমি একলা পারবে না।'

পরদিন মালী এল, গাড়ি গাড়ি সার এল, কোদাল খন্তা খুরপি গাছকাটা কাঁচি এল, নার্সারী থেকে মৌসুমী ফুলের বীজ, গোলাপের কলম, বারোমেসে গাছের চারা এল, ছোট ছোট সুপুরিগাছ ঝাউগাছ এল। মহা আড়ম্বরে দীপার জীবনের উদ্যান পর্ব আরম্ভ হয়ে গেল।

তারপর কয়েকদিন প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কাটল। প্রৌঢ় মালী পদ্মলোচন অতিশয় বিজ্ঞ ব্যক্তি, তার সঙ্গে পরামর্শ করে কোথায় মৌসুমী ফুলের বীজ পোঁতা হবে, কোথায় গোলাপের কলম বসবে, কীভাবে সুপুরি আর ঝাউ-এর সারি বসিয়ে বীথি-পথ তৈরি হবে, দীপা তারই প্ল্যান করছে। ঘুমে জাগরণে বাগান ছাড়া তার অন্য চিন্তা নেই।

দেবাশিস নির্লিপ্তভাবে সব লক্ষ করে, কিন্তু দীপার কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করে না, এমনকি তাকে বাগান সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেও যায় না। দীপা যা করছে করুক, তার যাতে মন ভাল থাকে তাই ভাল।

দিন কাটছে।

একদিন দুপুর বেলা দীপা রেডিওর মৃদু গুঞ্জন শুনতে শুনতে ভাবছিল, অরোকোরিয়া পাইন-এর চারাটি বাগানের কোন জায়গায় বসালে ভাল হয়, এমন সময় ঘরের কোণে টেলিফোন বেজে উঠল। দীপা চকিতে সেই দিকে চাইল, তারপরে উঠে গিয়ে ফোন তুলে নিল—'হ্যালো।'

টেলিফোনে আওয়াজ এল, 'আমি। গলা চিনতে পারছ?'

দীপার বুকের মধ্যে দুবার ধক্ ধক্ করে উঠল। সে যেন ধাক্কা খেয়ে স্বপ্নলোক থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এল। একটু দম নিয়ে একটু হাঁপিয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'খবর সব ভাল?'

'হ্যাঁ।'

'কোনো গোলমাল হয়নি?'

'না।'

'তোমার স্বামী মানুষটা কেমন?'

'মন্দ মানুষ নয়।'

'তোমার ওপর জোর জুলুম করছে না?'

'না।'

'একেবারেই না?'

'না।'

'হুঁ। আরো কিছুদিন এইভাবে চালাতে হবে।'

'আর কত দিন?'

'সময়ে জানতে পারবে। আচ্ছা।'

ফোন রেখে দিয়ে দীপা আবার আরাম চেয়ারে এসে বসল, পিছনে মাথা হেলান দিয়ে চোখ বুজে রইল। রেডিওর মৃদু গুঞ্জন চলছে। দু' মিনিট আগে দীপা বাগানের কথা ভাবছিল, এখন মনে হল বাগানটা বহু দূরে চলে গেছে।

বিকেল বেলা আন্দাজ সাড়ে তিনটের সময় নীচে সদর দোরের ঘণ্টি বেজে উঠল। দীপা চোখ খুলে উঠে বসল। কেউ এসেছে। দেবাশিস কি আজ তাড়াতাড়ি ফিরে এল? কিন্তু আজ তো শনিবার নয়—

দীপা উঠে গিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াল। নকুল দোর খুলেছে। তারপরই মেয়েলী গলা শোনা গেল। 'আমি দীপার বন্ধু, সে বাড়িতে আছে তো?'

নকুল উত্তর দেবার আগেই দীপা ওপর থেকে ডাকল, 'শুভ্রা, আয়, ওপরে চলে আয়।'

শুভ্রা ওপরে এসে সিঁড়ির মাথায়

দীপাকে জড়িয়ে ধরল, বলল, 'সেই ফুলশয্যের রাত্রে তোকে সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিলুম। তারপর আসিনি, তোকে হনিমুন করবার সময় দিলুম। আজ ভাবলুম, দীপা আর কনে-বউ নেই, এত দিনে পাকা গিন্নী হয়েছে, যাই দেখে আসি। হ্যাঁ ভাই, তোর বর বাড়িতে নেই তো?'

'না। আয়, বসে আয়।'

শুভ্রা মেয়েটি দীপার চেয়ে বছর দেড়েকের বড়, বছর খানেক আগে বিয়ে হয়েছে। তার চেহারা গোলগাল, প্রকৃতি রঙ্গপ্রিয়, গান গাইতে পারে। প্রকৃতি বিপরীত বলেই হয়তো দীপার সঙ্গে তার মনের সান্নিধ্য বেশী।

বসবার ঘরে গিয়ে তারা পশ্চিমের খোলা জানলার সামনে দাঁড়াল। শুভ্রা দীপাকে ভাল করে দেখে নিয়ে মৃদু হাসল, বলল—বিয়ের জল গায়ে লাগেনি, বিয়ের আগে যেমন ছিলি এখনো তেমনি আছিস। কিন্তু গায়ে গয়না নেই কেন? হাতে দু'গাছি চুড়ি, কানে ফুল আর গলায় সরু হার; কনে বউকে কি এতে মানায়!'

দীপা চোখ নামালো, তারপর আবার চোখ তুলে বলল—'তুই তো এখনই বললি আমি আর কনে-বউ নই।'

শুভ্রা বলল,—'গয়না পরার জন্যে তুই এখনও কনে-বউ। কিন্তু আসল কথাটা কী? 'আভরণ সৌতিনি মান?' '

'সে আবার কি!'

'তা জানিস না। কবি গোবিন্দদাস বলেছেন, সময়বিশেষে গয়না সতীন হয়ে দাঁড়ায়।' এই বলে দীপার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে গাইল—

'সখি, কি ফল বেশ বনান
কানু পরশমণি পরশক বাধন
আভরণ সৌতিনি মান।'

দীপার মুখের ওপর যেন এক মুঠো আবীর ছড়িয়ে পড়ল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল—'যাঃ, তুই বড় ফাজিল।'

শুভ্রা খিলখিল করে হেসে বলল—'তুইও এবার ফাজিল হয়ে যাবি, আর গাম্ভীর্য চলবে না। বিয়ে হলেই মেয়েরা ফাজিল হয়ে যায়।'

দীপা কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। কিন্তু যেমন করে হোক সত্যি কথা লুকিয়ে রাখতে হবে, মিথ্যে কথা বলে শুভ্রার চোখে ধুলো দিতে হবে। শুভ্রা যেন জানতে না পারে।

দীপা আকাশ পাতাল ভাবছে শুভ্রার ঠাট্টার কি উত্তর দেবে, এমন সময় নেপথ্যে কাছ থেকে নকুলের গলা এল—'বউদি, চা জলখাবার আনি?'

দীপা যেন বেঁচে গেল। বলল—'হ্যাঁ নকুল, নিয়ে এস।'

নকুল নেমে গেল। দীপা বলল—'আর ভাই, বসি। তারপর হিমানী সুপ্রিয়া কেমন আছে বল। মনে হচ্ছে যেন কত দিন তাদের দেখিনি।'

শুভ্রা চেয়ারে বসে বলল—'হিমানী সুপ্রিয়ার কথা পরে বলব, আগে তুই নিজের কথা বল। বরের সঙ্গে কেমন ভাব হল?'

দীপা ঘাড় হেঁট করে অর্ধস্ফুট স্বরে বলল—'ভাল।'

শুভ্রা বলল—'তোর বরটি ভাই দেখতে বেশ। কিন্তু দেখতে ভাল হলেই মানুষ ভাল হয় না। মানুষটি কেমন?'

দীপা বলল—'ভাল।'

শুভ্রা বিরক্ত হয়ে বলল—'ভাল আর ভাল, কেবল এক কথা! তুই কি কোনো দিন মন খুলে কিছু বলবি না?'

[illegible] তো, আর কি বলব?'

'এইটুকু বললেই বলা হল? আমার যখন বিয়ে হয়েছিল আমি ছুটে ছুটে আসতাম তোর কাছে, সব কথা না বললে প্রাণ ঠাণ্ডা হত না। আর তুই মুখ সেলাই করে বসে আছিস। গা জ্বলে যায়।'

দীপা তার হাত ধরে মিনতির স্বরে বলল—'রাগ করিস নি, ভাই। জানিস তো, আমি কথা বলতে গেলেই গলার কথা আটকে যায়। মনে মনে বুঝে নে না। সবই তো জানিস।'

শুভ্রা বলল,—'সবারের কি এক রকম হয়? তাই জানতে ইচ্ছে করে। যাক গে, তুই যখন বলবি না তখন মনে মনেই বুঝে নেব। আচ্ছা, আজ উঠি, তোর বিয়ে পুরনো হোক তখন আবার একদিন আসব।'

দীপা কিন্তু শক্ত করে তার হাত ধরে রইল, বলল—'না, তুই রাগ করে চলে যেতে পাবি না।'

শুভ্রার রাগ অমনি পড়ে গেল, সে হেসে বলল—'তুই ছন্দ করলি। বরের কাছেও যদি এমনি মুখ বুজে থাকিস বর ভুল বুঝবে। ওরা ভুল-বোঝা মানুষ।'

নকুল চায়ের ট্রে নিয়ে এল, সঙ্গে স্তুপাকৃতি প্যাসট্রি। দীপা চা ঢেলে শুভ্রাকে দিল, নিজে নিল; দুজনে চা আর প্যাসট্রি খেতে খেতে সাধারণভাবে গল্প করতে লাগল। শাড়ী ব্লাউজ, গয়নার নতুন ফ্যাশন, সেণ্ট স্নো পাউডার-এর দুর্মূল্যতা, এই সব নিয়ে গল্প। শুভ্রাই বেশী কথা বলল, দীপা সায় উত্তর দিল।

আধ ঘণ্টা পরে চা খাওয়া শেষ হলে নকুল এসে ট্রে তুলে নিয়ে গেল, দীপা তখন বলল—'শুভ্রা, তুই এবার একটা গান গা, অনেক দিন তোর গান শুনিনি।'

[illegible] বলল—[illegible] কানে কানে গান শুনাবি। [illegible] শুনবি? মম যৌবননিকুঞ্জে গাহে পাখি, সখি জাগো?'

'না না, ওসব নয়। আধুনিক গান।'

'আধুনিক গানের কথায় মনে পড়ল, পরশু গ্রামোফোনের দোকানে গিয়েছিলুম, প্রবাল গুপ্তর একটা নতুন রেকর্ড শুনলাম। ভারি সুন্দর গেয়েছে। রেকর্ডখানা কিনেছি। তুই শুনেছিস?'

দীপা অলসভাবে বলল—'শুনেছি। রেডিওতে প্রায়ই বাজায়। সিনেমার গানের কোনো নতুন রেকর্ড বেরিয়েছে নাকি?'

শুভ্রা বলল—'শুনিনি। কিন্তু একটা নতুন ছবি বেরিয়েছে, 'দীপ্তি' সিনেমায় দেখাচ্ছে; ছবিটা নাকি খুব ভাল হয়েছে। সুজন হিরো, জোনাকি রায় হিরোইন।'

দীপা একটু নড়ে চড়ে বসল, কিছু বলল না। শুভ্রা বলল—'দীপা, ঘরে বসে কি করবি, চল ছবি দেখে আসি। আমার সঙ্গে যদি ছবি দেখতে যাস, তোর বর নিশ্চয় রাগ করবে না।' কব্জির ঘড়ি দেখে বলল—'সওয়া চারটে বেজেছে। তোর বর কাজ থেকে ফেরে কখন?'

'পাঁচটার সময়।'

'তবে তো ঠিকই হয়েছে। তুই সেজে গুজে তৈরী হতে হতে তোর বর এসে পড়বে, তখন তাকে জানিয়ে আমরা ছবি দেখতে চলে যাব। আর তোর বর যদি সঙ্গে যেতে চায় তাহলে তো আরোই ভাল।'

দীপার ইচ্ছে হল শুভ্রার সঙ্গে ছবি দেখতে যায়। দেবাশিস কোনো আপত্তি তুলবে না তাও সে জানে। তবু তার মনের একটা অংশ তার ইচ্ছাকে পিছন থেকে টেনে ধরে রইল, তাকে যেতে দেবে না। সে কাঁচুমাচু হয়ে বলল,—'আজ থাক ভাই, আর একদিন যাব।'

শুভ্রা আরো কিছুক্ষণ পীড়াপীড়ি করল, কিন্তু দীপা রাজী হল না। শুভ্রা তখন বলল,—'বুঝেছি, তুই বর-হ্যাংলা হয়েছিস, বরকে ছেড়ে নড়তে পারিস না। বিয়ের পর কিছু দিন আমারও হয়েছিল।' সে নিজের বর-হ্যাংলামির গল্প বলতে লাগল। তারপর হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল,—'পাঁচটা বাজে, আমি পালাই, এখনই তোর বর এসে পড়বে। আমি থাকলে তোদের অসুবিধে হবে। আবার একদিন আসব।' শুভ্রা হাসতে হাসতে চলে গেল।

তাকে সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে দীপা ভাবতে লাগল, 'কি আশ্চর্য, মনের কথা মুখ ফুটে না বললে কি কেউ বুঝতে পারে না! সবাই ভাবে যা গতানুগতিক তাই সত্যি।—

ক্রমশ

ত্রিলোচন 'কলমচি'

বরবাদ

রাত পৌনে বারোটায় রাজধানী কলকাতা হয়ত কোথাও কোথাও দ্বিতীয় দফা প্রসাধন সারছে, আয়নায় মুখ ঘষছে, কিন্তু আমাদের গাঁও-বাংলা আলো-টালো নিবিয়ে অনেকক্ষণ যখন ঘুমে হজম, এ-হেন সময়ে একটি বিশুদ্ধ ট্রাঙ্ক-কল এলো, আমি মন্ত্রী-সান্ত্রী কেষ্ট-বিষ্টু কেউ নই, দিনের বেলাতেই অ্যালার্ম দেওয়া ঘড়ির মত ক্বচিৎ কদাচিৎ যার টেলিফোন বাজে, তার ঘরে এরকম নিশির ডাক।

নার্ভাস হয়ে কানে যন্তর তুলতেই ভবানীর গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এল, 'ডিসটার্ব করলাম?'

বললাম, 'কিছু না, ঘুমটা সামান্য মচকে গেল মাত্র। তা বস্তুটি কে, ভবানী?'

'হ্যাঁ আমি ভবানী। মনকে একটু শক্ত করো, তোমাকে একটা দুঃসংবাদ দেবার আছে।'

'দিয়ে ফেল, টেলিফোনের তারে ঝুলে থাকতে ভাল্লাগে না।' আমি হাই তুলে বললাম।

আসলে এই দুঃসংবাদ-টংবাদ নিয়েই তো দিব্য আছি, নইলে জীবনে ঘটবার মত আর কিছুই তো প্রায় অবশিষ্ট নেই। আমার মত মফস্বল প্রবাসী একটি নষ্ট-চরিত্রের মানুষ, চতুর্থ শ্রেণীর ভাড়াটে কলমচি, ফি হপ্তা যে ফিচারের ফল্‌স্‌ পেনে ভোগে, তার কাছে ঝলসানো দিন-রাত্তিরের ওপর দুঃসংবাদের মতন একটু-খানি নুন-মরিচ ছাড়া আর কি-ই বা চাইবার আছে; বিশেষত সেই ঝাল যদি আবার পরের মুখে হয়। জিবে জল এসে গেল।

বললাম, 'বলো, অশ্লীলভাবে চুপ করে গেলে কেন?'

ভবানী ওরফে বাণী শুধলো, 'আজ মাসের কত তারিখ খেয়াল আছে কিছু? এই ফাল্গুনের মত খেলা ফিনিশ, এর পর মরা চত্তিরের স্টেশন ইয়ার্ড পেরিয়ে গোটা চুয়াত্তর সাল বিশুদ্ধমতে তামাম ফাঁকা, কোথাও সিগন্যাল ডাউন নেই।'

'বিবাহের কথা বলছ?'

'এতক্ষণ তবে বলছি কী! মুখ্যু কোতায় আচো?' ভবানীর ক্ষুব্ধ কণ্ঠের নেপথ্যে মশক রাগিণীতে সানাইয়ের ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল।

যবে বিবাহে চলিলা ত্রিলোচন—কবিতার লাইন আউড়ে ভবানীকে বললাম, 'তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক শুনেই বোঝা উচিত ছিল...তা সানাইটা কোথায় বাজছে হে?'

ভবানী, আমাদের চিরকেলে ব্যাচিলার বন্ধু (মানে ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে সে একই রকম এবং অবিশ্রাম ব্যাচিলার রয়েছে), যদিও রীতিমত ছিটগ্রস্ত রসিক ব্যক্তি তবু তার কাছ থেকে আমার প্রশ্নের এত ভালো জবাব আশা করিনি। প্রায় ড্রামাটিক রিলিফ মনে হল। ব্রুট্‌! আমার হাতের মরা রিসিভার অগত্যা ব্র্যাকেটে রেখে প্রাণভরে একচোট হেসে নিলাম।

মশারির ভেতর থেকে আমার জাগ্রত গৃহিণী হেয়ার পিন দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে অত্যন্ত ডেলিকেট গলায় শুধোলেন, 'কি হল?'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, 'তোমার কাছে আর ফেরা হল না, বউ! গুড্‌-নাইট —মানে যেটুকু রাত এখনো আছে।'

'মাথা খারাপ হল নাকি তোমার?'

একটা স্বরচিত নাচে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গায়ে দ্রুত হাতে জামা চাপাবার গান গাইলাম: 'সোহাগ চাদ্‌ বদনী' ধ্বনি, নাচো তো দেখি'—বালা নাচো তো দেখি—'

'আঃ হচ্ছে কি!' নিজের কান বাঁচিয়ে স্ত্রী সুমধুর ঝংকার দিলেন।

'হচ্ছে কি? আমি স্ট্রেট্‌ বিবাহে চললাম, ইচ্ছে হলে এই অবেলায় একটা হাল্কা ফেয়ার ওয়েল-টোয়েল দিতে পারো। আমার ফ্রেন্ড আমার মাথা খারাপ করে দিয়ে গেছে'—

আলো নিবিয়ে দিয়ে পাশের ঘরে পৌঁছতে না পৌঁছতে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক শুরু হয়ে গেল। সেই কমা-সেমিকোলনহীন ঝাঁঝালো স্ত্রীবাক্যে পিঠ রেখে আমি লেখার টেবিলে বিবাহরহস্য নিয়ে পড়লাম।

মেহনতী মানুষের দল আসছে

মনে পড়লো, আজই যখন একটি লাল-টুকটুকে বাসে চেপে কলকাতা থেকে পুরুলিয়ায় আসছিলাম, প্রায় সাড়ে পাঁচখানা জেলার পাঁজর ছুঁয়ে ছুঁয়ে, তখন পথের ধারের অনেক বাড়িতেই ম্যারাপ বাঁধা শেষ, ডেকরেটার ফ্লুরেসেণ্ট টিউব লাগাতে ব্যস্ত। কোথাও কোথাও সানাই সুর ধরেছে। আয়োজনে কোথাও প্রায় ত্রুটি নেই, বিশুদ্ধ ঘৃতের মত দরজায় শুভবিবাহ ঘোষণা করা হয়েছে—কোথাও কোথাও পাপোশ 'কোট' করে—স্বাগতম। প্রায় দু'শো মাইল রাস্তায় এতগুলো অরক্ষণীয়া বাড়ি ছিল সেকথা এতদিন জানতাম না। গোটা বাংলা দেশই বলতে গেলে বিবাহ বিশারদ হয়ে উঠেছে। লাস্ট বাসের মত, ফাল্গুনের শেষ বিবাহার্তিথির ফুট-বোর্ডে ঝুলতে ঝুলতে বাংলা দেশের বহু যুবক-প্যাসেঞ্জার | এবং যুবকম্মন্য | ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ভয়ে-ভাবনায় কোথায় এস্পার-ওস্পার হয়ে গেল।

কয়েক বছর আগে কলকাতায় গঙ্গাভিমুখী একটি বিখ্যাত রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে প্রায় হাফ্ ডজন অসংস্কৃত বালক-বালিকার সোল্লাস চিৎকারে কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

ঃ ও বাবা, ও মা, ও দিদি, শিগগীর এসো গো—কেমন সাজিয়ে বর বেসক্জন যাচ্ছে দেখবে এসো—

তাকিয়ে দেখলাম অনতিদূরে জবর বরযাত্রা আসছে। গোলাপজলের ইলশেগুঁড়িতে পথ প্যাচপেচে কাদা করে, গ্যাসবাতিদানের উজ্জ্বল বাঁক কাঁধে করে, ব্যাগপাইপে গাল-গলা ফুলিয়ে মেহনতী মানুষের দল আসছে। তার মধ্যে দিয়ে একটি অন্ত সংখী সচ্ছল অর্থপূর্ণ সমাজ হেঁটে যাচ্ছে—কয়েকটি গাড়িতে বেনারসী আর জড়োয়া প্রসাধন হাস্যকলোজ্জ্বল—মধ্যবিন্দুতে একটি ফুলপাতায় গাঁথা হুডখোলা লাল টুকটুকে এক-লক্ষী গাড়ি—তাতে নির্মমভাবে সজ্জিত, স্থাবর মূর্তির মত নিতবর সহ প্রণীতবর বসে আছে।

'এই বয়েসে গেল, আহা কেদের ঘরের বাছা গা—' চোখে কানে খাটো এক বৃদ্ধা ছল-ছল গলায় বললেন। আমার সংগে সংগে মনে হল, এই বালকবালিকা এবং বৃদ্ধা অজান্তে, প্রায় তত্ত্বের শামিল একটি গূঢ় সত্য কথা বলে ফেলেছে। ঠিকই; এই ছেলে সত্যিই বিসর্জন গেল, আর ফিরবে না। দি ওয়ে অব নো রিটার্ন'—এই পথ দিয়ে ঠিক এই ছেলেটি নিশ্চয়ই আর ফিরবে না। কেউ ফেরে নি। আমাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়জনের মধ্যে ক্যাজুয়েলটি বড় কম হয়নি।

প্রাকবিবাহ কথা থেকেই আরম্ভ করতে হয়। যে পর্বে দর্শনী-প্রদর্শনী, ফটোস্ট্যাট আলোচনা, মনোনয়ন ইত্যাদি ব্যাপার আছে।

তবে একথা ঠিক, বিবাহ ভারতবর্ষে একটি বিরাট ব্যবসায়। এমন একটি অন্তর্বাণিজ্য ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নেই। স্বজন-পবজন এবং লক্ষ লক্ষ দুর্জন এই ব্যবসায় ব্যাপৃত। কোটি কোটি টাকা এই উপলক্ষে খাটছে।

এই লোকোবাণিজ্যে ইদানীং পাণ্ডার মতই ঘটকের মার্কেটও যেতে বসেছে। এখনকার মানুষ খবরের কাগজের উপরে সর্বতোরকমে নির্ভরশীল বলে অনেক ঘটক এবং ঘটক লিমিটেড বিবাহ-পাইকাররূপে অফিস সাজিয়ে বসে কাগজে নিয়মিত প্রজাপতির নির্বন্ধের বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেছে। তবে আপনি এই হোলসেলারের স্বারস্থই হন কিংবা পড়শিনীর, খবরের কাগজের বক্স নম্বরে টিপ করুন অথবা পরিচিত টেলিফোন নম্বর চড়ুন, কোনটা যে সেফটি ম্যাচ হবে অন্তত সেফটি ক্যাচ, কেউ জানে না। এবং জানে না বলেই হয়ত পরীক্ষার খাতার ওপরে দুর্বল মুহূর্তে লেখা গড্ ইজ গুড্-এর মতই নিমন্ত্রণপত্রে শুভ-বিবাহ কথাটা জ্বলজ্বল করে।

কিন্তু কন্যা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সপরিবারে সরেজমিনে তদন্ত প্রয়োজন। এই উপলক্ষে যে ম্যারেজ বোর্ড গঠিত হয়, তেমন একটি বোর্ডে আমি কিছু দিন জুনিয়ার এক্সপার্ট ছিলাম। সিলেকশন কমিটি তথা এক-জিকিউটিভ বডিতে সাধারণত পারিবারিক এক্স-অফিসিও-রা বর্তমান থাকেন। এইটেই রীতি। যেমন বরের পিসেমশাই, জ্যাঠা-মশাই, এন্ডারলি জামাইবাবু, বড় পিসীমা প্রভৃতিরা পদাধিকারবলে। এ ছাড়া অ্যাডিশনাল হিসেবে পাড়ার দু'-একটি পাকা-মাথা এবং এক্সপার্ট হিসেবে পাত্রের বিবাহিত বোন এবং বন্ধুরা। নীরসগোল্লা আর নিঃসন্দেশ কলকাতায় এই জলযোগ-পার্টি (লার্জ স্কেলে মেয়ে দেখার ফাঁকফাকি অনেকেই ধরে ফেলেছেন) কিছুকাল ম্রিয়মাণ ছিল একথা সহজেই অনুমেয়।

একাধিকবার ইণ্টারভিউ নিতে গিয়েছি বন্ধুর জন্যে, বন্ধুর ভাইয়ের জন্যে। বিশ্ব-সুন্দরী নির্বাচনের চেয়েও পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রথায় সর্বাঙ্গীণ স্ক্রুটিনী দেখেছি। ইলাস-ট্রেটেড উইকলি অনুসরণে বাঁধা বেশ মেহনতী খোঁপাও অনায়াসে খুলতে বলে, চলিয়ে-বলিয়ে, হাফমোজা পরিমাণে কাপড় তুলিয়ে, টেরিয়ে তাকাতে বলে, দন্ত-বিকশিত করিয়ে, অপ্রত্যাশিত রকমের প্রশ্নাবলী বর্ষণ করে অতি অল্প সময় মধ্যেই বিলকুল পাত্রীপক্ষকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে পাত্র-পর্ষৎ চলে গিয়েছেন, এও যেমন দেখেছি তেমনি মেয়েকে সামনে এনে বসানোর সংগে সংগে নানারকম কথোপ-কথন মুখস্থ করে আসা সপাত্রবন্ধুগোষ্ঠী অধোবদনে অবাক সাক্ষীগোপালের মত অনেকক্ষণ বসে থেকে 'আমরা আর কিছু প্রশ্ন করতে চাই না।' বলে উঠে এসেছে তাও দেখেছি।

একজন কড়া অধ্যাপক পিসেমশাই আমাদের লীডার ছিলেন একটি পার্টিতে। তিনি আবার বিনা নম্বরে কিছু ভাবতে যা

দেখতে পারেন না। সুতরাং কালাজকলম নিয়ে বসেছিলেন, আমাকে ডেকে এক সময় বললেন, 'বুঝলে হে ত্রিলোচন, মেয়ের স্বাস্থ্য যা দেখছি অ্যা টোয়েণ্টি ফাইভ পার্সেণ্টের বেশী দেওয়া চলতে পারে না, কি বল? বিহেভিয়ার, অ্যাপিয়ারেন্স, ন্যাচারাল বিউটি সাড়ে তিন-আড়াই-সাড়ে তিন দিলাম, কনভার্সেশন—'

মেয়েটিকে আমাদের পছন্দ হয়েছিল কিন্তু তিলোত্তমাটি পিসেমশাইয়ের তিল তিল নম্বর কুড়িয়েও দেখা গেল টোটালে ডুবেছে। এগ্রিগেট প্রমোট করছে না। মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম, 'নীট-নেসের জন্যে চার নম্বর কিন্তু এখনো দেওয়াই হয় নি।'

পিসেমশাই চমকে উঠলেন, 'অ্যাঁ! একে তোমরা নীটনেস বলো? ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, ওই-রকম জমকালো জামাকাপড়, সর্বাঙ্গে রংচং,

টাঁশখিচুড়ী মেয়ে

বাহির করেছে পাগল মোরে

মোচলমানী ফেজটুপির মত ধিঙ্গি খোপা, ওরকম টাঁশ-খিচুড়ি মেয়েকে আমি নীট্-মার্ক দেবো, ক্ষেপেছ?'

ট্রান্সপারেন্সি আর স্পেশাস মার্জিন মানেই নীটনেস নয়, হয়ত সেই কথাই তিনি আসলে বলতে চেয়েছিলেন।

এক রাত্রির, না পুরো এক রাত্তিরেরও নয়, বিবাহের লগ্নটুকু পেরোলেই ঘণ্টা কয়েকের বাদশাহ বরযাত্রীদের বরবাদ অবস্থা সকলেই জানেন।

পয়লা অনুপ্রবেশের সময় যারা গোলাপ-ফুল পেয়েছিল, ক্যাপস্টানের প্যাকেট হাতিয়েছিল, পরিবেশনের কঠোর সমালোচনা করেছিল, দ্বিতীয় দফায় ছাদনাতলার ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিতীয় স্বয়ম্বর সভা স্থাপনের চেষ্টায় ছিল, গাটছড়া বেঁধে বর রমণীয় লোকে অন্তর্হিত হবার পর যে অবর্ণনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়েছে তেমন কাহিনীও বিরল নয়। বিদেশ বিভুঁইয়ে, বসার জায়গা নেই, শোবার জায়গা নেই এক গ্লাস জল চাইলেও কেউ কানে তোলে না, এমনি অপরিচিত, অবাঞ্ছিত অবস্থার গল্প অনেক শুনেছি।

সু-love বিবাহই হোক আর দুর্লভ বিবাহই হোক, ছেলেরা বদলাবেই। প্রায় ফুলটাইম আড্ডাবাজ ছোকরা, কফিহাউসের টেবলে টরেটক্কা বাজিয়ে যে লাস্ট ফাগুনেও গেয়েছে: বাহির করেছে পাগল মোরে—সেই বাহির-বাউণ্ডুলে কিংবা পাঁড় পলেটি-শান কবে কখন নির্দলীয় হয়ে পড়েছে, সুইট-হোম সিকনেসে ভুগছে, অফিস-টাইমের পর যেন সমস্ত শহর জুড়ে কার্ফ্যু জারি হয়েছে—এমন দ্রুত সন্ত্রস্ত পায়ে গৃহস্থ হতে দেখা যাচ্ছে। যে এতদিন শস্তা হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবি আর কোলাপুরী স্যাণ্ডেলে লোক-লৌকিকতা দু ধার সামলেছে সেও যখন অবধারিত মানবন্দমীর মতই আজানুলম্বিত সিল্কের চুড়িদার পরে কব্জিতে নতুন টাকার মত চকচকে ঘড়ি বেঁধে, চওড়া জরিপাড় কোঁচাটি ফুলের তোড়ার মত হাতে নিয়ে, পায়ে হলুদ গ্রীসিয়ান মস্‌মসিয়ে করিডোর থেকেই সমস্ত অফিস চমকিত করে তোলে তখন তার মানসিক পরিবর্তন কি আর গোপন থাকে?

আমি একজন কৃপণতম সহকর্মীকে জানতাম, যিনি দাম বাড়বার পর থেকে ছ' পয়সার পোস্ট-কার্ডেও কখনো চিঠি লেখেন নি, বরং নিরুপায় হলে বেয়ারিং ছেড়েছেন, তাঁকেও দেখি একদা লুকিয়ে লুকিয়ে বলু-রঙের পেটমোটা খামের ওপর থুথু দিয়ে নগদ পনর পয়সা আটছে, তখন সত্যিই পিত্রালয়বাসিনীর দৈবী ক্ষমতায় মুগ্ধ না হয়ে পারি না।

এই বিবাহের কল্যাণেই কোথাও আর নিশ্চিন্ত মামাবাড়ি কি খাঁটি কাকার বাড়ি অবশিষ্ট নেই। অন্তত আমার জীবনে এটি ফলিত ট্র্যাজেডি। সব দেখি আমার শ্বশুর-বাড়ি আর কাকার শ্বশুরবাড়ি হয়ে গিয়েছে। কিংবা সবটাই আমার ছানিপড়া চোখের দোষেও হতে পারে।

অনেক কাল পরে আমার এক পুরোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে সেদিন হতভম্ব। দেখি বন্ধুটি বেজায় ব্যস্ত। বহু বাজার সেরে গলদঘর্ম হয়েও আবার পত্রপাঠ বাজার কারেকশন করতে দোকানে ছুটলো। শ্বশুর শাশুড়ী এসেছেন জানতাম।

শুধোলাম, 'কি হে, আজ বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান আছে নাকি?'

'আরে না না', বন্ধুটি ঘাম মুছতে মুছতে সহাস্যে বলল, 'অনেকদিন পরে বাবা-মা এসেছেন কিনা, ভাই। ও কি, উঠে পড়লি যে বড়?'

বললাম, 'ইস, না ভাই উঠি, তোর কথা শুনে মনে পড়ে গেল, আজ বাড়িতে আমার স্ত্রীর শ্বশুরমশাই-এর আসার কথা আছে।'

আফ্রিকার চিঠি

সলোমন যদি আফ্রিকান হতেন, তবে তাঁর ন্যায়বিচারের অমন গল্পটা মাঠে মারা যেত। হ্যাঁ, সেই গল্পটার কথা বলছি, সেই যেখানে দুটি নারী একই ছেলেকে নিজের বলে দাবি করে আর সলোমান বুদ্ধি খাটিয়ে বলেন, ছেলেটিকে কেটে দুখানা করে এক এক খণ্ড এক একজন দাবিদারকে দিতে। প্রকৃত মা তখন আর্তনাদ করে জানায়, তার ভাগ চাই না, ছেলেটি বাঁচুক। এবং সকলে তাতে জানতে পারে কে আসল মা। সলোমন এবং গল্পটির অন্য পাত্রপাত্রী যদি আফ্রিকান হতেন, তবে রাজদরবারে আসার আগেই কেউ না কেউ নিশ্চয়ই বলত, "দেখ তো, ছেলেটার ট্রাইবাল মার্ক আছে কিনা।" থাকলে বোঝা যেত সে কোন উপজাতির সন্তান। নারী দুটির কোন একজন যদি অন্য উপজাতির লোক হয়, তবে সহজেই তাকে বাতিল করা যায়। আর দুজনে একই উপজাতির লোক হলে অবশ্য দেখতে হবে ছেলেটির গায়ে কোন গোষ্ঠী বা পরিবারের নিশানা আছে কিনা। এবং তাতেই ছেলেটির পরিচয় ও সলোমনের বিচার সম্পূর্ণ হত। কিন্তু এইভাবে সনাক্তীকরণে সলোমনদের ঝঞ্ঝাট কমলেও বাপমাদের তাতে বাড়ে। শিশুর জন্মের পরে কিংবা বয়ঃসন্ধিকালে আয়োজন করতে হয় উপজাতির এবং অনেক ক্ষেত্রে গোত্র, গোষ্ঠী কি পরিবারের বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্নাঙ্কনের। তাতে খরচ যেমন আছে, বিপদ আছে বুঝি তার চেয়ে বেশি। কারণ প্রাচীন কায়দায় শস্ত্রপ্রয়োগে শিশুদেহের ক্ষত অনেক সময় বিষাক্ত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

তবু আফ্রিকার অধিকাংশ উপজাতির এমন সনাক্তচিহ্ন আছে। বেশিরভাগ চিহ্ন দেওয়া হয় মুখেঃ গালে, চোখের নীচে কিংবা কপালে। জন্মের কিছুদিন পরে ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে চামড়া কেটে এমন চিহ্ন দেওয়া হয়। কাটা অংশে নানাবিধ প্রলেপ লাগিয়ে ক্ষত শুকানো এবং দাগ পাকা করা হয়। কোন কোন উপজাতির মধ্যে শিশুদের যৌবনোদ্গমেও দরকারমাফিক চিহ্নদানের ব্যবস্থা আছে। তখন যতই বাধা লাগুক না কেন, উদ্ভিন্ন যৌবন উদ্ভিন্ন যৌবনাদের হাসিমুখে এমন অস্ত্রোপচার সহ্য করতে হয়। সনাতন সমাজে ক্লোরোফর্ম ছিল না। আর থাকলেও তার ব্যবহার হত বে-আইনী। কারণ বয়ঃসন্ধির চিহ্নীকরণ অংশত কষ্টসহিষ্ণুতার পরীক্ষা, ছোটদের সাবালকত্ব প্রাপ্তিতে বড়দের আইনসঙ্গত র‍্যাগিং।

উপজাতি ও গোষ্ঠী চিহ্নে শুধু নিশানদিহি হয় না। অনেকের এমন বিশ্বাস আছে, শরীরে বিশেষ রকমের দাগ থাকলে ভূতপ্রেত দূরে থেকে প্রণাম ঠুকে পালাবে। আবার যেখানে লোকদের ধরে ধরে ক্রীতদাস করে চালান দেওয়া হত, সেখানে অনেক সময় ইচ্ছা করে শিশুদের মুখ বিকৃত ও বীভৎস করার রেওয়াজ ওঠে, যাতে দাসব্যবসায়ীদেরও বিতৃষ্ণা জাগে। এমন ক্ষেত্রে অবশ্য কাটাকুটি একটু বেশিই হত। কিন্তু অন্যত্র দেহের ওপর মিনে করা আলপনা সৌন্দর্যের বাহার বলে আদৃত, খানিকটা আমাদের মেয়েদের পুষ্পচন্দনে সাজার মত। শুধু ওদের সজ্জা আমৃত্যু, আর আমাদেরটা নিত্যনৈমিত্তিক।

য়োরুবা মেয়েদের চোখের নীচে ছুরি বা ক্ষুর দিয়ে উল্লম্ব রেখা টানা হয়। তারপর টিরো বা স্থানীয় সুর্মার গুঁড়ো কাটা জায়গায় ঘষে দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় কালো চোখের নীচে তামাটে কি চকোলেট

কিকুয়ু সম্প্রদায়ের এক যোদ্ধা। মুখে রঙ দিয়ে সম্প্রদায়ের প্রতীক নকশা আঁকা

উত্তর নাইজিরিয়ায় প্রাপ্ত ব্রোঞ্জ-মূর্তির মুখে অলংকরণের দৃষ্টান্ত। মূর্তিটিতে গ্রেকো-রোমান প্রভাব লক্ষণীয়

রঙের পটভূমিতে পড়ে নীলাভকৃষ্ণ দাগ, ভারতীয় নারীর প্রিয় নীলাঞ্জনের মত, তবে আঁখির কোলে আনুভূমিক নয়, ঊর্ধ্বমুখে নয়নবাণের দিকনির্দেশ। অন্য অনেক উপজাতির মধ্যে মুখ ও দেহের বিভিন্ন অংশ ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে কাটা হয়। তারপর তাতে নানাবিধ প্রলেপ লাগানো হয় যাতে সেই সব অংশ স্থায়ীভাবে ফুলে ওঠে। এমন স্ফীতায়ন আবার হরেক রকমের ছাঁচে ঢালার রীতি আছে। এতে নাকি তাঁদের যৌন-আবেদন বাড়ে।

ছুরি দিয়ে চামড়া খোদাই ছাড়া অলঙ্করণের অন্যান্য উপায়ও বর্তমান। আমাদের দেশে সুপরিচিত উল্কি তাদের অন্যতম। পশ্চিম এশিয়ার অনেক সুপ্রাচীন ধর্মে মেয়েদের উদর ও বক্ষে উল্কির নকশা অঙ্কন ছিল নারী ও মাটিকে ফলবতী করার অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ। নাইজেরিয়ার অনেক অঞ্চলেও এ আচার সুপ্রচলিত। সেখানেও যুবতীদের ঊর্ধ্বাঙ্গে উল্কির সৌকুমার্য নারীর সর্বপ্রধান ভূমিকার পরিচায়ক। এছাড়া উল্কির সাহায্যে অনেকে নিজ নাম স্বদেহে ধারণ করে। আবার কোন কোন পতিসোহাগিনী স্বয়ং উল্কিতে স্বামীর নাম নিজের বুকে এঁকেছেন। উল্কি-বিলোপ বিবাহবিচ্ছেদের অনেক হাঙ্গামে অতিরিক্ত একটি ঝক্কি। বোঝার ওপর প্রখ্যাত শাকের আঁটি, যদিও অন্য ঝঞ্ঝাটের চেয়ে উল্কিলোপনে হাঙ্গামা বেশি বলে এখানে শাকের আঁটির ওপর বোঝা বলাই শ্রেয়।

অস্ত্রোপচার আর উল্কির তুলনায়

'অহিংসতর' অলঙ্করণ-রীতি হল লতা-পাতার রসে-দেহসজ্জা। এ যেন একেবারে নিরামিষ পর্ব। এতে রক্তপাত নেই, নেই মাংস খুবলে নেওয়া, কি চামড়া কেটে পুড়িয়ে দেওয়া। অন্যদিকে এর সজ্জা চিরজীবন বহনীয় নয়, কারণ এর স্থায়িত্ব কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত। উল্কির মত উদ্ভিজ্জ রসে দেহাঙ্কন হয় হরেক রকমের নকশায়। যে কোন নকশা যত্রতত্র ব্যবহার্য নয়, কারণ একটা একটা নকশা এক এক উপজাতি ও গোষ্ঠীর ট্রেডমার্ক। প্রতিটির মানে আছে, আছে সংকেতার্থ। এছাড়া পুরাকালে বিশেষ উপজীবিকার জন্য বিশেষ রকম দেহাঙ্কনেরই ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন [illegible] হয় যে, [illegible] ব্যবহৃত হত।

সেকালে পশ্চিম আফ্রিকায় ক্যামউড দিয়ে দেহ-অলঙ্করণের প্রথা প্রচলিত ছিল। পরে উদ্ভব হয় নব নব কৌশলের। আমাদের বিয়ের কনেকে যেমন চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজানো হয়, তেমনি পূর্ব নাইজেরিয়ার ইবো নববধূকে ক্যামউড-রঞ্জক ও নীল রঙে প্যাটার্নায়িত করা হত। কখনও কখনও আবার গর্ভধারণের পর মেয়েদের সহ্য করতে হত আর এক প্রস্থ অলঙ্করণের ধাক্কা। এক এক দেহাঙ্কনের সনাতন দক্ষিণা ছিল আড়াই শিলিং।

কাজ চটপট সারার জন্য ওস্তাদ ইবো কারিগরেরা তাল-তন্তু ও বাঁশ দিয়ে নানা ডিজাইনের ছাপ তৈরি করে বিক্রি করে। এগুলিকে বলা হয় ওগুদুওগুদু। এখনও আপনি অনেক ইবো শহরে ওগুদুওগুদু কিনতে পাবেন। দামে সস্তা—চার আনায় ছোট বড় মিশিয়ে ৫টি।

অবশ্য যে কোন নকশা ও রং যে কোন উপলক্ষে ব্যবহার অননুমোদিত। বিয়ের সময় লাল, অসুখ হলে হলদে, আর সাধারণ অলঙ্করণের জন্য কৃষ্ণ ও নীল রং-এর ব্যবহার রীতিসম্মত। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে ইবো প্রাচীনেরা বলেন, রং-এর প্রভাব শরীর ও মনের ওপর পড়ে। বিশেষত হলদে রং রোগনিরাময়করণের উপযোগী।

যে যুগে যে সে লোক এমন খোদাই ও অলঙ্করণের কাজে হাত দিতে পারত না। এর জন্য ছিল পেশাদার শিল্পী, যারা বংশানুক্রমে এ বিদ্যায় হাত পাকিয়েছে। মানবদেহে অস্ত্রোপচারে শিল্পসৃষ্টি এক দুরূহ নৈপুণ্য। এর রহস্য পিতা দিয়ে যেতেন উপযুক্ত পুত্রকে। অনেকদিন ধরে পিতা তথা গুরুর তত্ত্বাবধানে কঠোর শিক্ষা-নবিশী চলত। শিল্পী পরিবার কি গোষ্ঠী জীবিকার্জনে ঘুরত শহর থেকে শহরান্তরে। পুরুষেরা করত মুখ ও দেহে চিহ্নখোদাই, আর মেয়েরা আঁকত উল্কি আর লতাপাতার রসে দেহের উপর আল্পনা। পেশাদার শিল্পীদের ছিল সংগঠিত গিল্ড— যে গিল্ড শিল্পীদের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণ করত এবং আভ্যন্তরীণ বিবাদ আপসে মিটিয়ে দিত।

আজকাল শিল্পীদের পসার কমে এসেছে। অস্ত্রোপচারে স্থায়ী চিহ্নীকরণ এখন সবার মনঃপূত নয়। অবশ্য প্রাচীনকালেও সকলে উপজাতীয় চিহ্ন বহন করত না। বেনিন রাজ পরিবারের ছেলেমেয়েদের মুখে কোন চিহ্ন দেওয়া বারণ ছিল। কিন্তু তেমন ব্যতিক্রমের সংখ্যা নেহাতই কম ছিল। পক্ষান্তরে সম্প্রতিকালে বহু আফ্রিকান দেহ-অলঙ্করণ ও দেহ-চিহ্নকরণের ঘোরতর বিরোধী। উপজাতির বেড়া ডিঙিয়ে মিশ্র বিবাহের সন্তানদের সমস্যা—কোন্ উপজাতির চিহ্ন বহনীয়। অন্যদিকে আমার মত দেশে বিভিন্ন ভিন্ন লোকের কাছে উপজাতির সংকীর্ণ আনুগত্যের চেয়ে রাষ্ট্রিক চেতনা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন উপজাতির চিহ্ন ধারণ হবে সেই উপজাতির প্রতি আনুগত্যজ্ঞাপন। সর্বোপরি পাশ্চাত্যভাবে দীক্ষিত অনেক আফ্রিকানের কাছে উপজাতীয় চিহ্ন ধারণ সনাতন জীবনের প্রতীক বলে মনে হয়। বর্তমান পুরুষ যে এ বোঝা ঝেড়ে ফেলে দেবে তাতে আশ্চর্য কী? তাই শিক্ষিত আফ্রিকানরা সাধারণত তাদের সন্তানদের শরীরে এমন চিহ্নীকরণের অনুমতিদানে নারাজ। শুধু তাই নয়, অনেকে নিজ নিজ শরীর থেকেও এমন চিহ্ন মুছে ফেলতে প্রয়াস পায়। এ কাজ বড় সহজ নয়। আমাদের জনৈক সহকর্মীর স্ত্রীর কপোল-চিহ্ন অপসারণে অপারেশনের প্রয়োজন হয়েছিল।

তাছাড়া, দাস ব্যবসায় দূর হয়েছে এবং ধনপ্রাণ আজ অনেক বেশি নিরাপদ। এখন হারানো শিশুকে সনাক্তীকরণের প্রয়োজন সীমিত ও তার উপায়ও ভিন্ন। তার ওপর ইওরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির আওতায় সৌন্দর্যের বিচার ও মানদণ্ড পাল্টাচ্ছে। ইওরোপ, জাপান, হংকং আর ভারতবর্ষ থেকে আসছে রঙবেরঙের পোশাক : ফ্যাশানের নিত্য নববৈচিত্র্য। সারাজীবন এক ডিজাইনের কারুকার্য নিজ দেহে লেপ্টে বেড়াবার কী দরকার? আবার উল্কি-পরার যন্ত্রণাও আছে যেখানে বস্ত্রাভরণে পরম সুখাবেশ। খরচটা হয়তো একটু বেশি। কিন্তু উল্কি পরে যেমন অন্যের চোখ ধাঁধানো যায়, দুহাতে পয়সা উড়িয়ে জমকালো পোশাক পরেও তাই করা চলে। সমাজবিজ্ঞানীরা একেই বলেন কনস্পিকিউয়াস কনসাম্পশান বা লক্ষণীয় উপভোগ : যেখানে সনাতন সমাজ-বন্ধন শিথিল হয়েছে সেখানে পুঁজিবাদী মূল্যমানের মরা দিয়ারে ব্যক্তিবিশেষের পদ-মর্যাদার প্রতীক।

আংশু মজুমদার

॥ দুটি স্মরণীয় উপন্যাস ॥

প্রমথনাথ বিশীর

বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

বঙ্কিম সরণী

প্রমথনাথ বিশী—সাহিত্য সমালোচনা ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমান নাম। তাঁর ওপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সর্বজনবিদিত। এবার তিনি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে একটি বিরাট অভাব দূর করলেন। —বঙ্কিমচন্দ্রের এমন একটি সামগ্রিক অথচ নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে দিক্‌-দর্শন—ইতিপূর্বে আর কারও রচনায় আমরা পাইনি।

আগাগোড়া কাপড়ে বাঁধাই

॥ দশ টাকা ॥

বিমল করের

সীমারেখা ৪॥

প্রশান্ত চৌধুরীর

আলোকের বন্দরে ৪॥

প্রফুল্ল রায়ের

মুক্তো ৫,

চিত্রগুপ্তের

যদিদং হৃদয়ং মম ৪॥

[সত্যকার কাহিনী, উপন্যাসের চেয়েও বিস্ময়কর]

মন্মথনাথ ঘোষের

বনরাজীনীলা ৭,

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলধ্বনি ৪॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

ঐতিহাসিক পৃষ্ঠপটে রোমান্টিক উপন্যাস

একদা কী করিয়া

ঐতিহাসিক কাহিনী রচনায় সিদ্ধহস্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবার নূতন এক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় হাত দিয়েছেন। এ উপন্যাসের পৃষ্ঠপট ইতিহাস, কিন্তু কাহিনী কাল্পনিক, নায়ক-নায়িকার চরিত্রও তাই। চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে লেখা এ কাহিনী সে প্রয়োজনকে অতিক্রম করে গেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের আকর্ষণ এতে আছে — কিন্তু কাঠিন্য নেই। ইতিহাসে কল্পনায় এমন আর কোন উপন্যাসে মিশেছে কিনা সন্দেহ। রুদ্ধশ্বাসে শেষ করার মতো একখানি বই — অথচ পড়ে ভুলে যাওয়ার মতো নয়। সামান্য গ্রাম্য এক পাঠান তরুণ ভাগ্যস্রোতে ভাসতে ভাসতে এসে স্থান পেয়েছিল দিল্লীর লালকেল্লায়, আশ্রয় পেয়েছিল শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শা জাফরের — প্রশ্রয় পেয়েছিল এক বাদশাজাদীর। সেই ভাগ্যস্রোতই সিপাহী-বিদ্রোহের রক্তবন্যার মধ্যে এই দু'টি তরুণ-তরুণীকে পথে টেনে বার করেছিল। তারই বিস্ময়কর কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য।

॥ তেরো টাকা ॥

আশাপূর্ণা দেবীর

নবতম সুবৃহৎ উপন্যাস

সুবর্ণলতা

আশাপূর্ণা দেবী বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা লেখিকা, হয়ত-বা শ্রেষ্ঠতমাই। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস হ'ল 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'। এই গ্রন্থ রবীন্দ্র পুরস্কার পাওয়ার বহু পূর্বেই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, গুণী-জ্ঞানী পাঠক-সমালোচকদের কাছ থেকে পেয়েছে অকুণ্ঠ প্রশংসা ও অশ্রান্ত অভিনন্দন। এই গ্রন্থের নায়িকা 'সত্যবতী' বিশ্বসাহিত্যেই অতুলনীয়া। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' গ্রন্থেও কিন্তু সত্যবতীর জীবন-কথা শেষ হয়নি — লেখিকার বক্তব্যও না। সেই জন্যই তিনি তাঁর এই গ্রন্থে সত্যবতীর কন্যা সুবর্ণলতাকেই বেছে নিয়েছেন—নূতন নায়িকা হিসাবে। ...সুবর্ণলতা একটি বিশেষ কালের আলেখ্য। যে কাল সদ্যবিগত, যে কাল হয়তো বা আজও সমাজের এখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে, সুবর্ণলতা সেই বন্ধন-জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক।

॥ তেরো টাকা ॥

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

অমৃত সমান ৪॥

মিত্র ও ঘোষ : ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ফোন : ৩৪ ॥ ৩৪৯২ ৩৪-৮৭৯১

সারাদিন স্নিগ্ধ ও ঝরঝরে রাখবে…
পণ্ড্স
ড্রিমফ্লাওয়ার
ট্যাল্ক
পণ্ড্স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্ক বাড়ির ছেলেবুড়ো সবাই বছরে বারোমাসই মাখতে পারবেন। শরীর জুড়োয়, মন তাজা রাখে…যেমন মোলায়েম, তেমনি আরামদায়ক…প্রচণ্ড গরমে, ভ্যাপসা আবহাওয়ায় ঘাম শুষে নিতে অদ্বিতীয়। পণ্ড্স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্ক ব্যবহার করুন, এর মিষ্টি গন্ধ বহুক্ষণ গায়ে লেগে থাকবে—সারাদিন শরীর-মন ঝরঝরে রাখবে।
Pond's
Dreamflower talc
Dreamflower talc
সব পরিবারের পক্ষেই
সুলভ সুন্দর
সুবাসিত ট্যাল্ক
চীজব্রো-পণ্ড্স ইন্‌ক
(সীমাবদ্ধ দায়ে যুক্তরাষ্ট্রে সমিতিবদ্ধ)

পাবো তারে

কালকূট

উনিশ

ছেলেটিকে খাটের তলা থেকে গাদাখানেক ঝুল-কালি-ধুলো মেখে শেষ পর্যন্ত বেরোতেই হয়েছিল। আর বেরিয়েই, সামনে সারবন্দী দাঁড়িয়ে বাবা, মা, দিদিমা, দিদি, মেজদা। তার সঙ্গে আর এক পাশে পিসীমা, তাঁর ছেলেমেয়েরা। ইন্দির নিশ্চয়ই বাইরের উঠোনে ছিল, কারণ ঘরে ঢোকবার অধিকার ওর ছিল না। ছেলেটি চোখ তুলে তাকায় নি। কেবল তার গাল দুটো আর পিঠটা সুড়সুড় করছিল। কখন শাস্তি নেমে আসবে।

কিন্তু তার বদলে প্রথমেই বাবার হুংকার শোনা গিয়েছিল, 'দেখ, গরু চোরটাকে দেখ।'

গরু-চোর! ছেলেটি একবার চকিতে সকলের দিকে না তাকিয়ে পারে না। তার মধ্যেই সে দেখতে পায় পিসীমার গম্ভীর বিষণ্ণ মুখেও একটু হাসির ঝিলিক খেলে যায়। তিনি আঁচল চেপে দেন মুখে। তাঁর ছেলেমেয়েদের মুখও হাসি হাসি। এমন কি, মায়ের চোখে জল থাকা সত্ত্বেও ঠোঁটের কোণ দুটো টিপে ধরেন। যেন তাঁর হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। তার চেয়ে অবাক, দিদির ঝলসানো চোখ, পাকানো থাকলেও মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু শব্দ পাওয়া যায় না। শরীরটা কাঁপতে থাকে। কেবল মেজদার ডগলাস ফেয়ার-ব্যাংকস-এর ক্যাপাচণ্ডী মুখে হঠাৎ একটা অবাক জিজ্ঞাসা দেখা দেয়। সেও বাবার দিকেই তাকায়। কারণ, ছোট ভাইয়ের জিজ্ঞাসাটা তার মনেও ঝলক দেয়, বাবার গরুচোর বলার অর্থ কী। ছেলেটি ভাবে, সে আবার গরু চুরি করলো কবে। কখন, কাদের গরু। আর গরু চুরি করে সে করবেই বা কী। কিন্তু দশ বছরের ছেলেটি প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। আবহাওয়া মোটেই সুবিধার নয়। এমনিতেই কী শাস্তি তার কপালে আছে, সে আন্দাজ করতে পারছিল না। তার ওপরে গরু চুরি করে নি, এ কথা বলতে গিয়ে বাবাকে ক্যাপাতে সাহস পায় না। তবে পিসীমা, সাধু পিসেমশাই, সবাই জানেন, গরু সে চুরি করে নি।

তারপরে শুরু হয় জেরা। কিন্তু আশ্চর্য, বাবার দিক থেকে নয়। জেরা শুরু করে দিদি। বাকীরা সব শোনেন। কেবল মেজদারই হাত নিসপিস, একটা 'ফাইট' না ঝাড়তে পারলে ওর শান্তি হচ্ছিল না। তবে বড়দের সামনে সে স্বাধীনতা ওর ছিল না। কিন্তু জেরার জবাবে ছেলেটি যা বলছিল, তার কার্যকারণ মাথামুণ্ডু কেউই বুঝতে পারছিল না। 'কেন সে ওরকম করে চলে এসেছিল' এর জবাবে ছেলেটির সেই এক কথা, 'এমনি ইচ্ছা হয়েছিল। কেন, তা সে জানে না।'

মায়ের আর ধৈর্য থাকে নি। তিনি ঠাস্ করে এক চড় কষিয়েছিলেন, বলেছিলেন, 'জানিব কেমনে, তরে যে ভূতে ধরছিল।'

বলে আর একটি চপেটাঘাত, আর তার সঙ্গে শপথ, 'তর ঘাড়ের থেইক্যা আমি ভূত ঝাড়াইয়া দিমু।'

আর একটি চপেটাঘাতের আগেই, পিসীমা মায়ের হাত ধরে ফেলেন। আর মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলেন, 'না ঠাকুরঝি, হুতাশে আইজ চার দিন আমার গলা দিয়া ভাত নামে নাই, চক্ষের পাতা বুজি নাই।'

পিসীমা মাকে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করেন। দিদিমা ছেলেটির গায়ের ঝুল-কালি পরিষ্কার করেন, আবার তার মধ্যে দু-চার ঠোনাও লাগান। দাঁতহীন মাড়িতে মাড়ি ঘষে গালাগাল দেন, 'শহইরা বান্দর।'

অর্থাৎ 'শহুরে বাঁদর'। আবার থান কাপড়ের ঘোমটা খসে যায় বলে সেটাও তাড়াতাড়ি টেনে দেন। জামাই যে কাছেই দাঁড়িয়ে! আশ্চর্য এই, বাবা তখন একে-বারেই নিস্পৃহ, জামা ছাড়তে ব্যস্ত হন। ওদিকে পিসীমা তাঁর কন্যাকে নির্দেশ দেন মামার জন্য একটু তামাক সাজতে। তার-পরেই এক হ্যাঁচকায় দিদি টেনে নিয়ে যায় ছেলেটিকে। উদ্দেশ্য নাকি, ছেলেটিকে স্নান করিয়ে পরিষ্কার করবে। যার অর্থ, আরো কয়েক প্রস্থ ঠোনা ও চুল টানা। মেজদা ওত পেতেই ছিল। কিন্তু সুযোগ পেতে পেতে সেই বিকেলে, দল বেঁধে খেলতে বেরিয়ে একখানি মোক্ষম 'ফাইট' না দিয়ে ও ছাড়ে

নি। অথচ, মা বাবা দিদিমা, সবাইকে পিসীমা বলেছিলেন, 'থাউক, তবু ছ্যামড়াটা পলাইয়া আইছিল, তাই সকলের লগে একটু দেখা হইল।'......কেবল গরুচুরির অভিযোগটা আর ওঠে নি।

গাজীর কথায় আমি সেই ছেলেটিকেই দেখতে পাই। যাকে আমি কোনদিন ছাড়িয়ে যেতে পারি নি। সেই যে অবুঝ, অচিনের টানে কোথায় চলে যায় জানে না। যে ঘর পালিয়ে খেলতে যায়, খেলতে গিয়ে হারায় অকূলে। জানে না, কার টানে, কিসের সন্ধানে। কেবল অবাক লাগে গাজীর কথা শুনে। চোখে ওর দুষ্টামি, ও গাজী না, পাজী। কিন্তু ও কি অন্তর্যামীও? ও কি আমার পিছু পিছু আসে সেই জন্মলগ্ন থেকেই? আর এই আঙুরি-আঙুর, মাহাতো বউটি: তার কাজলকালো হাসি চলকানো ডাগর চোখেও কি সেই ছেলেটিকে দেখতে পায়? যার চোখে সকলই খেলা, সকলই বিস্ময়। কেন, কে আমাকে এমন অবাক কাজল পরিয়েছে। যা দেখি, সবই বিচিত্র, সবই অসামান্য।

'অ গাজী, তোমার বাবুর ভর হল নাকি?'

কথার সঙ্গে হাসির ঝঙ্কার। পাশে তাকিয়ে দেখি, আঙুরির মুখ। ধান কাটা মাঠের আল পথ পেরিয়ে কখন উঠে এসেছি বড় সড়কে। এখন আমার এক পাশে আঙুরি, আর এক পাশে গাজী। মাহাতো চলে আগে আগে ব্যাগ ঝুলিয়ে। ন্যাজাটের আকাশের পশ্চিম কোণে রক্তাভায় কালি পড়তে আরম্ভ করেছে। যে দূরগামী পথকে দেখেছিলাম অস্তছটায় সধবার সিঁথির মত লাল, সেই নাক বরাবর পথকে এখন ছায়া মাখা ধূসর দেখি। বনচড়াইয়ের ঝাঁক চোখে পড়ে না আর। পাখিগুলোর ডাক থেমে এসেছে। আঙুরির কথায় সংবিৎ ফিরে পাই। তার দিকে ফিরে চাই। সে চোখের এক কোণে চেয়ে কালো তারা সরিয়ে নিয়ে যায় অন্য কোণে। গাজী বলে, 'ভর তো বাবুর হরিই আছে, চাচী। এ যে ঘোরের মানুষ।'

আঙুরি কথা চালায় গাজীর সঙ্গে, নজর চালে অন্য দিকে। ঘাড় বাঁকিয়ে একবার আমার দিকে দেখে বলে, 'কেন, মানুষ তো কাঁচা, তার এত ভর ঘোর কিসের?'

'তা বললি কি হয়, চাচী। ভর যাঁনাদের হয়, তাঁদের কাঁচা পাকা নাই।'

আঙুরি ঘাড় দুলিয়ে বলে, 'তা নয় বুঝলাম, কাঁচা পাকা নাই। তোমার বাবুর হয় কেন?'

মাহাতো ঘাড় নেড়ে বলে ওঠে, 'দ্যাও, এখন জব দ্যাও, হয় কেন, নইলি ছাড়ান নাই।'

গাজী হাসে, আমি হাসি। স্বামীর ঠাট্টায় আঙুরি জিভ দেখিয়ে ভেংচি কাটে। 'অ্যা হ্যা হ্যা, তোমাকে বলেছে ছাড়ান নাই। তুমি চুপ কর দিকিনি।'

মাহাতো মুখ ফেরায় না। চলতে চলতে সামনের দিকে মুখ রেখেই বলে 'অই দেখ, আমি তোর হরিই তো বলি। কথার জব চাই না? এমনি এমনিই কথা নাকি।'

বুকতে পারি। মাহাতো জশাইয়ের উল্টো দিকে ফেরানো কালো প্রকাণ্ড মুখে বিটলে হাসি ঝলকায়। সাহস করে ফিরে তাকাতে পারে না। পাছে গিন্নীর চোখে হাসি ধরা পড়ে যায়।

আঙুরি বলে, 'এমনি হোক অমনি হোক, তোমাকে কথা বলতে বলেছে কে?'

মাহাতোর সেই এক ভাব। মুখ ফেরাবার নাম নেই। ঘাড়ের কাছে মাংসের চাপে ঘাড় গর্দান প্রায় এক। যেন জাম্বুবান চলেছে। আওয়াজ আসে, 'তা কেউ বলে নাই। তা অই কথা শুনলি কথা কইতি ইচ্ছা করে কি না, তাই। আচ্ছা, চুপ করলাম।'

ভেবেছিলাম, আঙুরি বুঝি আবার ঝামটে উঠবে। মাহাতোর কথার মধ্যে হাস রহস্যের সুরটুকু তো ছিল। কিন্তু আঙুরি নিশ্চুপে হাসে গাজীর দিকে চেয়ে। আবার কর্তার দিকেও তাকায়। তাকিয়ে ইশারা দেয় গাজীকে। যেন বলতে চায়, 'তোমার মাহাতো চাচাটি ভারি পাজী, খুব চিনি।' তারপরে একবার নজর চালিয়ে দেখে নেয় আমাকে।

গাজী বলে, 'বাবুকে তুমি নিজিই পুছ কর ভর, ভর ঘোর কেন হয়।'

কিসের ভর, কিসের ঘোর, তাই বুঝি না। কী মনে হয় আঙুরির, কী বলতে চায় সে। কী কথা বা বলাবলি করে তারা, কে জানে। দেখি, আঙুরি হাসে। হাসে আর দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে হাসি চাপে। আর ঘন ঘন দৃষ্টি চালে। তারপরে হঠাৎ শুনি, 'কই গো বাবু, বল না কেন?'

এবার সরাসরি, সোজাসুজি। ঘাড় কাত করে কয়েক মুহূর্ত চোখে চোখ রেখে মুখোমুখি কথা। অবাক লাগে, চমক খাই। হেসে বলি, 'কী বলব, তাই তো বুঝি না। কিসের ভর, কিসের ঘোর।'

আঙুরির বিশ্বাস হয় না, ধন্দ লাগে। তাই অবিশ্বাসে ঘাড় বাঁকায়। ঝিলিক হানা চোখ দুটো কেমন করে যেন পাকায়। পান রাঙানো ঠোঁট ফুলিয়ে গাজীকে বলে, 'শুনলে তো কথা? তোমার বাবু ঘোর ভর বোঝে না।'

গাজীর ফাটা ঠোঁট হাসিতে এ গাল ও গাল ছড়িয়ে যায়। লাল দাঁত দেখিয়ে বলে, 'বুইতি পারলেন না বাবু। চাচী জিগেস করে, বাবু আমার এমন কাঁচা, ভর কেন দেওয়ানা হরি ঘোরেন।'

'দেওয়ানা কোথায় দেখলে? আমি ঘুরতে বেরিয়েছি।'

গাজী তাড়াতাড়ি বলে, 'তাই দেখি কি কথা বাবু। ভাব দেখি কথা হয়, কথা শুনি কথা হয়।'

আঙুরিও তার সঙ্গে জোড়ে, 'দেখে বিবাগী বিবাগী লাগে।'

গাজী আরো যোগান দেয়, 'চোখ মুখ-গুলোন ত আর রোধ আসতে পারেন নাই।'

আঙুরি বলে, যেন ঠাঁইনাড়া মানুষ, ঠাঁই কোথায় জানে না। কেন?'

এত কথা তো ভেবে দেখি নি। এমন জিজ্ঞাসাবাদের জবাবও তাই জানা নেই। কী এক টানে যেন চলি, যে টানের নাম জানা নেই। সেই চলার নির্দেশ কী, তার খবরও পাইনি। তবে দেওয়ানা নই, এইটুকু জানি। বিবাগী নই, তাও জানি। ঠাঁইনাড়া হয়ে ঠাঁই খুঁজে ফেরার মানুষও আমি নই। সংসারেতে দানা খুঁটে অন্ন পাই। জীবনযাপনের ভাবনা আমার পাকে পাকে জড়ানো। নিরাপত্তার চিন্তা আমাকে কখনো ছেড়ে যায় না। জগৎজনের সকলের সঙ্গে আমি একাকার, সকলের সঙ্গে আমার পা পড়ে। দেওয়ানী বিবাগী আমি নই। তবু, সেই যে এক নাম না-জানা টান, যার নাম হদিস কিছুই জানা নেই, তার ব্যাখ্যা করি, সে ভাব আমার অজানা। অতএব, এদের কথার কী জবাব দেব, বুঝতে পারি না।

আঙুরি তখনও বলে, 'লোকে বলে, "জানাও মনে মনে জানা"। তা, তোমার তো দেখি, চোখ দুখানি ঠিক আছে, মনের যেন ঠিক ঠিকানা নাই। কেন, ঘর গিরস্তি বসত সম্পত্ত নাই নাকি?'

বলে আঙুরি একটু চোখ ঘুরিয়ে ভুরু নাচায়। আমি যেন দেখি, সব মিলিয়ে আঙুরির শরীর ঘিরে অপরূপ এক নাচের ছন্দ। কিন্তু কথা বলবার আগেই ওদিক থেকে মাহাতোর আওয়াজ আসে, 'হ্যাঁ, জব দিতি হবে, জব চাই।'

শুনে আমার হাসি সামলানো দায় হল। দেখি, মাহাতোর কাঁধের ব্যাগটা পর্যন্ত কাঁপে। হাসিতে সেও ফুলছে। এদিকে ভুরু কুঁচকে আঙুরি চায় গাজীর দিকে। গাজীও হাসি চাপতে পারে না। বলে, 'চাচার যে কথা।'

আঙুরি বলে, 'অ, সবাই মিলে আমাকে ঠাট্টা করছ?'

মাহাতো এবার ফেরে। যদিও হাসিতে তার কালো মস্ত মুখখানি ঝকমকিয়ে রয়েছে। হাসি চাপতে চাপতে বলে, 'কেন, মন্দ কী বলিছি। অ মশাই, জব দেন না।'

আঙুরি অমনি ঝামটা দিয়ে ওঠে, 'কের তুমি কথা বলছ?'

মাহাতো তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যায়। যেতে যেতে বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা, আমি আর কিছু বলব না।'

মাহাতোর মধ্যে যে এমন একটি দুষ্টু, রসিক লুকিয়ে আছে, এতক্ষণ বুঝতে পারি নি। ভেবেছিলাম, বংশধরের কথায় একটা লোক, দলে মিলে চলে। আসলে কোথায় যেন একটা ক্লান্তিতে সে নত, বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন। কিন্তু সে যে এমন [illegible] [illegible], বলতে পারিনি। আঙুরির [illegible] [illegible] [illegible] পারি নাই। [illegible]

ফুলে ফুলে উঠি। গাজীর অবস্থাও সেই প্রকার। হাসি চাপতে গিয়ে সে দাড়ি ঝাড়া দিয়ে ডাক দিয়ে ওঠে, 'জয় মুরশেদ!'

আঙুরি যেন রেগে বলে, 'দু চোখে দেখতে পারি না।'

অথচ দেখতে না পেরেও ব্যাগ কাঁধে, কোমরে চাদর বাঁধা, আগে আগে চলা, ঘাড়ে গর্দানে মাংসল কালো লোকটার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে। তারপরে আমার দিকে ফিরে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ছিটিয়ে দেয়। কপট রাগ, বিষ নেই, এই কথাটা জানতে পারি। এবার আমার জবাবটা তার পাওয়া উচিত। তাই বলি, 'সে সব কিছু নয়, আমার সবই আছে।'

আঙ্‌রি অমনি বলে ওঠে, 'তাই কি মানি নাকি। মিছে কথা।'

'না, সত্যি বলছি।'

'তবে কি আমরা চোখের মাথা খেয়েছি নাকি?'

অবাক হয়ে বলি, 'কেন?'

আঙ্‌রি বলে, 'সব থাকলে কাউকে এরকম দেখায় নাকি। যেন দিশ দিশা নাই, ঘরছাড়া, মানুষের ঠিক নাই।'

এতটা মেনে নেব না। কিন্তু এই যে আঙ্‌রি, এর চোখ আর মন আমার নয়। ওর দেখা বোঝাটাকে আমি সহসা বদলাতে পারি না। তাই যুক্তি তর্কে যাব না। হেসে বলি, 'সেটা তা হলে আমার কপালের দোষ।'

অমনি গাজী আওয়াজ দেয়, 'অই শোন, কথা কাকে বলে।'

আঙ্‌রি ঘাড় ফিরিয়ে চায়, হঠাৎ কিছু বলতে পারে না। বলতে পারে না, কিন্তু চোখ সরিয়ে নেয় না। তার কালো ডাগর চোখে যেন কুলুপকাঠি। আমার মুখের দরজায় তালা খুঁজে ফেরে। দৃষ্টি দিয়ে, বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে খোঁজে। খুলবে, ধন্দ ঘুচিয়ে দেখবে।

ওদিকে মাহাতো দাঁড়িয়ে পড়েছে। দুকেও কমিয়ে সকলের সঙ্গ ধরে আমাকে বলে, 'উইটি মশাই আপনার ঠিক কথা নয়। তখন থেকি আমারো মন বলছে, এ লোকের ছাঁদন বাঁধন নাই।'

ভেবেছিলাম, আর একবার হাসির জোয়ার লাগবে। কিন্তু মাহাতো মশাইয়ের ভাব-ভঙ্গিতে তার হদিস নেই। আমার থেকে সেটা আঙ্‌রি বেশী বোঝে। তাই সে স্বামীর সঙ্গে তাল দিয়ে বলে ওঠে, 'আমি তো সে কথাই বলছি গো। বয়সের বেলা দেখলে বোঝা যায় না। তা, এই বেলাতে কেউ ঠিকেনা ছাড়া ঘোরে।'

বলে আঙ্‌রি হাসে। নিছক হাসি নয়, তাতে সপ্রশ্ন গাম্ভীর্যেরও ছোঁয়া আছে। কী বলবে বল। বলার কিছু নেই। সকলেরই নিজের নিজের মন আর স্বভাব বলে কথা আছে।

মাহাতো বলে, 'তবে অই যে শুনলি, সব নাকি ওনার কপাল দোষ।'

আঙ্‌রি বলে, 'সে দোষ তা হলে কাটিয়ে দিই আমরা।'

সে ওষুধও জানা আছে নাকি আঙুর-লতার? অবাক হয়ে চেয়ে দেখি, তার ডাগর কালো তারায় কী এক গুপ্ত কথা চিকচিক করে।

মাহাতো বলে, 'কী করি?'

'ঘরে নিয়ে ধরে রাখব।'

সর্বনাশ! ভেড়ি-বাঁধের নোনা কূলে এইটুকু কি বাকী নাকি আমার! মাহাতোর লাল চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে। বলে, 'অই বাবা, ঘরে নিয়ি ছোঁড়া ধরি রাখবার মন তোর?'

কথা শুনে আঙ্‌রি হঠাৎ লজ্জা পায়। হাসতে গিয়ে ভুরু কোঁচকায়। ঘাড়ে দোলা দিয়ে ঘোমটা টেনে ধমক দেয়, 'আহ্‌ ছি, কী মুখ গ! আমি ধরে রাখব বলেছি নাকি?'

মাহাতো যেন অসহায় হয়ে একবার গাজীর দিকে চায়। বলে, 'তয়?'

'কেন, আমার মেয়ে নাই? আমার চাঁপা নাই ঘরে?'

শুনে মাহাতো আর গাজী একযোগে অট্ট হেসে মাঠ কাঁপায়। আমি ভাবি, ছোঁড়া ধরবার ফাঁদ যে মেয়ে, সে বিষয়ে আঙ্‌রির নিজস্ব মতে ভুল নেই। কিন্তু সন্তানের মানত করে যে ফেরে সেই রাঢ়ের তারকেশ্বর থেকে, তার আবার চাঁপা নামের মেয়ে কোথায় থাকে।

হাসি শুনে আঙ্‌রি বলে, 'তা অত হাসবার কী আছে। মেয়ে কি আমার ফ্যাল্‌না নাকি। এমন একটা ছেলে কি পাওয়া যাবে না?'

যাক্‌, সে মেয়ে যেই হোক, এটা জানা গেল, আঙ্‌রি শাশুড়ী হয়ে আমাকে ধরে রাখতে চায়। এমন নির্যাস ঠাট্টা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখব, ভাবতে পারি না। মাহাতোও সেই কথাই বলে, 'তাই বল্‌, তোর চম্পাবতীকে দিয়ি ছেলে ধরবি। তা, মেয়েকে আমাদের কেউ ফ্যাল্‌না বলতি পারবে না।'

আঙ্‌রি আবার বলে, 'আর আজকাল জাতের কথা অত কেউ ভাবে না।'

এতখানিও আঙ্‌রির জানা আছে। সে আরো বলে, 'ঘর দেব, জমি দেব, মেয়ে দেব, কোন কিছুতে ফাঁক রাখব না। দেখ, রাজী আছ?'

আমাকেই জিজ্ঞেস করে। এমন দুর্দিনে এরকম ঘর-জামাই ব্যবস্থা মন্দ কী। হাসতে হাসতে বলি, 'আর আমি চোর না ডাকাত, সে ভাবনা নেই?'

আঙ্‌রি বলে, 'তা আমরা বুঝব।'

তাও তো বটে। আঙ্‌রির তাতে থোড়াই ডর। ডাকাতের রক্ত আছে তার হাতে। বেশী এদিক ওদিক করলে তার ব্যবস্থা সে নিজেই করতে পারবে। জিজ্ঞেস করি, 'কিন্তু মেয়ে এল কোত্থেকে?'

আঙ্‌রি জবাব দেয়, 'যেখান থেকে আসে। বাপ মায়ের মেয়ে। দু বছরের মেয়ে যখন, বাপ মা দুটোই গেল ওলাওঠায়, সেই থেকে আমার কাছে। এখন বয়স তের বছর।'

তা কম নয়, উপযুক্ত বয়স বটে। আজ ও বেলাতেই তার নমুনা দেখেছি। লগে উঠতে গিয়ে সাঁকো থেকে পাঁকে পড়ে-যাওয়া সেই ভোট জড়ানো বউ। কিন্তু

অনন্যসাধারণ

অথচ কত সহজে তৈরী করা যায় দেখুন,

ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ

এই মিষ্টি-মধুর পানীয়

এক গ্লাস জলে শুধু একটা প্যালট্যাব ট্যাবলেট ফেলে দিন। চিনি মেশাবার দরকার নেই। দেখতে দেখতে চমৎকার সুস্বাদু পানীয় তৈরী হ'য়ে গেল। নিন, এবার প্যালট্যাব খেয়ে দেখুন। প্যালট্যাবের চমৎকার স্বাদ আপনি সহজে ভুলতে পারবেন না। বাড়ীতে লোকজন এলে, বিয়ে, পার্টি বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে এবার থেকে প্যালট্যাব পরিবেশন করুন। আর কি জানেন, এখন থেকে আপনার আর লেমনেড কিংবা স্কোয়াশের বোতল কিনে বাড়ীতে রাখতে হবে না। হাতে কিছু প্যালট্যাব থাকলেই হল।

প্যালট্যাবের মিষ্টত্বে কিন্তু চিনি নেই। ছোট বড় সবাই যত ইচ্ছে খেতে পারেন। বেড়াতে বেরোচ্ছেন? পিকনিকে চলেছেন? ভারী বোতল বোঝাই করে সরবৎ সঙ্গে নিয়ে যাবার দরকার নেই। সঙ্গে কিছু প্যালট্যাব নিয়ে চলুন।

প্যালট্যাব

মিষ্টি-মধুর সুস্বাদু পানীয় তৈরী করবার ট্যাবলেট

আপনার কাছাকাছি যে-কোনো বড় দোকানে পাবেন

বুটস্-এর তৈরী [illegible] [illegible] নির্ভরযোগ্য

এদিকে সন্ধ্যার ছায়া কখন অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। কতক্ষণ চলেছি, তার হিসাব নেই। খেয়াল হল, মাটিতে ছায়ার নড়াচড়া দেখে। দেখি, মাথার ওপর প্রায় আধখানা চাঁদ, অন্ধকারের সঙ্গে লড়ে। তাতে আলোও আছে, অন্ধকারও দূর হয় না। দূরের এ ভাগাভাগিতে সকলই স্পষ্ট-অস্পষ্টের মাঝামাঝি খেলা করে। দূরে গাছের অস্পষ্ট অবয়ব দেখা যায়। চেনা যায় কেবল মাঝে মধ্যে দু একটি নারকেল-সুপারি গাছ। ঝিঁঝির ডাক সহসা যেন চড়া সুরে বেজে ওঠে।

আঙুরি তখনও বলে, 'মেয়েও আমাদের দেখতে সুন্দর, তাই না? কি বল গো?'

মাহাতোর জবাবে আবার একটা হাসির জোয়ার লাগবে, সেই আশাতে থাকি। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে শুনি, মাহাতোর গলায় কেবল শব্দ বাজে, 'হুম্।'

এতক্ষণে সহসা আমার সন্দেহ হয়, আঙুরি ঠাট্টা করে না। একে সারল্য বলে না অজ্ঞানতা বলে, বলতে পারি না। কিন্তু নিজের ভাগ্যের দিকে চেয়ে মনে মনে না হেসে পারি না। কোন এক মাহাতো বউয়ের কল্পনাকে যে আমি এতখানি উসকে দিতে পারি, ধারণা ছিল না। আঙুরি কথা বলে না, প্রস্তাব করে। বলে চলে, 'ফরসা রঙ, এক পিঠ চুল, এত বড় চোখের ফাঁদ...।'

আঙুরি কথা শেষ করতে পারে না। মাহাতো বলে ওঠে, 'এই দেখ্ আঙুরি, এবার থাম্। পাগল হলি নাকি।'

অস্পষ্ট আলোয় দেখি, আঙুরি আমার দিকে একবার চায়। আবার স্বামীর দিকে। মাহাতো তখন তার স্ত্রীর পাশে। আবার বলে, 'সোম্‌সারটা ভগমান তোর মতন গড়ে নাই। যাকে তোর ভাল লাগবে, তাকেই তুই ধরি রাখতি চাইবি, তাই কি হয় নাকি। উনি এলেন কোত্থেকি, যাবেন কমনে, তুই চাঁপা দিয়ি ধরবি ওনাকে।'

বলে একটু থামে। তারপরে আবার বলে, 'অনেক দূরে আসা হয়িছে, আর না। এবার এরা ফিরি যাক। ফিরতি হবি তো আবার।'

বলে সে নিজেই দাঁড়িয়ে পড়ে। আমরা সবাই দাঁড়াই। আমাদের পাশেই একটা নাম না জানা ঝাড়ালো বেঁটে গাছ। এমন ঝাড়ালো, একেবারে নিশ্ছিদ্র। তাকে ঘিরে ঝিকিমিকি জোনাকি জ্বলে। আকাশে জ্বলে মিটি মিটি তারা। অস্পষ্ট আলোয় তাকাই আঙুরির দিকে। আঙুরি আমার দিকেই চেয়ে রয়েছে। যদি ঠিক দেখে থাকি, তবে তার চেয়ে থাকার মধ্যে তখনও জিজ্ঞাসা। আমি বলি, 'এবার তবে ফেরা যাক।'

তবু একবার আমার বলতে ইচ্ছা করে, আমি যে তার ফরসা রঙ, এক পিঠ চুল, বড় চোখের ফাঁদ চম্পাবতীকে নিয়ে ধরা দিয়ে থাকতে পারব না তার জন্যে দুঃখিত। বলতে গেলে পাছে এই নিরর্থক প্রলাপ আরো দীর্ঘতর হয়, তাই বলতে পারি না। কিন্তু আঙুরিও আর তা বলে না। আসলে ভর আর ঘোর, আমার নয়, আঙুরির। তার মধ্যে কোন বাস্তব-অবাস্তবের প্রশ্ন নেই। স্বামীর কথায় তার সংবিৎ ফেরে। কেবল বলে, 'তবে বাপু, এ বেলাতে এমন ঠিক ঠিকানা ছাড়া ভাল নয়, এই বলে দিলাম। আমাদের ভোলাখালিতে আসবে কবে?'

বলি, 'সময়ের কথা ঠিক করে বলতে পারি না। এক সময়ে ঠিক এসে পড়ব।'

আঙুরি বলে, 'যার নিজের কোন ঠিক নাই, সে কি ঠিক করে কিছু বলতে পারে?' এ কথার কোন জবাব দিতে পারি না। কেন না, জানি, একথা দেওয়াও অবাস্তব। আজ, এই মুহূর্তে যে আমি এখানে, তাও যেমন হিসাবের বাইরে, কথা দেওয়াটাও তেমনি হবে। কিন্তু মনে মনে বলি, ভোলাখালিতে একদিন আমি আসব। যেন আসতে পারি।

এই সময়ে মাহাতো ফস্ করে একটা বিড়ি ধরায়। আঙুরি সেদিকে তাকিয়ে দেখে বলে, 'অ মা, একটা বিড়ি ধরালে? আমাকে একটা দিলে না?'

মাহাতো প্রায় ধমক দিয়ে বলে, 'না। বিড়ি খাওয়া না তোর্‌ন্বারণ! ডাক্তার ইস্তক বলিছে, তবু নিশা ছাড়তি পারে না।'

বলেই আমার দিকে ফিরে বলে, 'অ মশাই, আপনাকে তো জামাই করতি চায়। আপনি একটু বারণ করেন তো।'

অমনি আঙুরি ঝামটা দেয়, 'দেখ, মিছা কথা বলো না। এখন কি দু-তিনটার বেশী খাই নাকি। তাই বা বল, আমাকে নিশা ধরালে কে? রোজ একটু একটু করে খাইয়ে তুমিই তো ধরিয়েছ।'

গাঙ চলছিল ডাইনে। একবারে মোড় ফিরে বাঁকা স্রোতে বাঁয়ে। কথা ছিল কোথায়, আসে কোথায়। ভাবলাম বুঝি, এই নিয়ে লাগে। কিন্তু মাহাতো তাড়াতাড়ি সুর নরম করে বলে, 'আচ্ছা, এটাই থাক। চল, আর দেরি করিস না।'

আঙুরির রোষটা তখনই যায় না। বলে, 'দেখ না, অমনি দুষতে আরম্ভ করেছে।'

মাহাতো আমাদের উদ্দেশে একবার হাত তোলে। বলে, 'চলি। সময় করতি পারলি ভোলাখালি আসবেন।'

খোলা প্রাণের নিমন্ত্রণ। জবাবের প্রত্যাশা নেই। সে পিছন ফিরে চলতে আরম্ভ করে। আঙুরি আর একবার তাকায়। বলে, 'কথাটা মনে রেখো গো, গাজীর বাবু। একবার এস।'

গাজীর দিকে ফিরে বলে, 'তুমি তাড়াতাড়ি একদিন এসো।'

বলে সে চলে যায়। গাজী বলে, 'আসব, চাচী।'

আমি আর গাজীও ফিরি। কয়েক পা গিয়ে দুজনেই ফিরে চাই। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায়, মনে হয়, আঙুরিও যেন ফিরে দাঁড়িয়েছে। তার হাত ওঠে, না আঁচল ওড়ে, বুঝতে পারি না। একটা অস্পষ্ট গলার ডাকও যেন শুনতে পাই, 'আয় গো বউ, দেরি করিস্ না।' তারপর দুটি ছায়া ক্রমে মিলিয়ে যায়। আমরা আবার ফিরতে থাকি। গাজীর গলায় একবার শোনা যায়, 'চাচী বড় ভাল লোক।'

সে কথায় কোন জবাব দিই না। আমার কথা বলতে ইচ্ছা করে না। কেবল আঙুরির মুখখানিই চোখের সামনে ভাসতে থাকে। সে ভাল না মন্দ, সে ভাবনা আসে না মনে। ভাবি, সাহিত্যের থেকে জীবন কত বড়। তুমি যখন কলম নিয়ে ভাবো, কলম দিয়ে রচো, তখন তোমার বিধিবিধান সামঞ্জস্য যুক্তি কলমের চালে চলে। জীবন তার চেয়ে অনেক বিস্ময়কর, বিচিত্রতর। সে এমনি অমানিত, যুক্তিতে অথই। সে কোন কিছুর অধীন নয়। এই অধর অথইকে সাধনা কর কলমের হিজিবিজি কেটে। হিজিবিজির নানান ছক, নানান ছাঁদন বাঁধন। আঙুরি সেখানে নেই। সে তোমার মন ভুলানো নিটোল গল্পে বাঁধা নয়। কিছুতে সে বাস্তব নয়। কিসেই বা তার যুক্তি। কেবল তার সেই মুখখানির সঙ্গে মাহাতোর কথাগুলো কানে বাজে, 'ভগমান তোর মনের মতন করি সোম্‌সার গড়ে নাই। যাকে তোর ভাল লাগে, তাকেই তুই ধরি রাখতি চাস...।' যেন, 'কেন রে তুই যেথা সেথা পরিস্ প্রেমের ফাঁদ।' এ কী রেয়াজ, বল। যুক্তি কী দেবে হে!

যুক্তি কেবল সেখানে, যেখানে আঙুরি এখনও শুধুই মেয়ে। আপন রক্ত সঞ্চারে আজও যার ফসল ফলে নি। তবু দেখ, কত না ফুল যেন তাকে ঘিরে ফুটেছে। যেন গন্ধ পাই। দেখ, কত না ফলে যেন সে ফলবতী। ক্ষুধা যেন মিটে যায়। অতএব, বুঝে দেখ মন, সংসার যার নিজের মত গড়া নয়, তবু হাত বাড়িয়ে ফেরে, কত আঘাত তাকে সইতে হয়। তাই সে মানুষ দেখে চিনতে পারে।

আর একবার পিছন ফিরি। কিছুই দেখা যায় না। নোনা গাঙের কূলে, অস্পষ্ট কুহেলী জ্যোৎস্নায় অবাধ নিঝুম প্রকৃতি। মনে মনে বলি, যা খুঁজে ফিরি নিরুদ্দেশে, সেই চলাতে, একবার আসব। এমন 'নেমন্তন্ন' কি কখনও ভুলি।...

(ক্রমশ)

চিত্রপ্রদর্শনী

এখন যাদের কথা বলা বাকি, তা হচ্ছে দক্ষিণপন্থীদের কথা। এবার এ'দের কাজের সঙ্গে, বামপন্থী কিউবিস্টদের, যাঁরা সমস্ত রকম বাস্তবতার বাহ্য বিচার থেকে মুক্ত, তাঁদের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার করে দেখা যাক।

আমরা নিশ্চয় খুশি হব দেখলে যে, এখানে কিউবিজমের সংজ্ঞা একেবারে অন্য অর্থাৎ বিপরীত প্রচেষ্টা বুঝার, অসম্ভব বিরুদ্ধভাব প্রতিপাদন করে থাকে।

ভগবানকে ধন্যবাদ! কিউবিজম একটা ধারা নয় (স্কুল নয়)।

যদি ঐ ব্যাপারে আমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তাহলে দুজন কিউবিস্টকে, বরং দুজন অন্তরঙ্গ বলা ভাল, বেছে নেওয়া যাক। এই সূত্রে তাঁদের প্রশ্ন করা যদি হয় তাহলে দেখব যে, প্রত্যেকেই তাঁর শিল্প রীতি, (আর্ট) সম্বন্ধে সর্বৈব আলাদা ব্যাখ্যা দেবেন।

একজন সমগ্র পৃথিবীকে, দৃশ্যমানতাকে, নূতন করে সৃষ্টির কথা বলবেন, অবশ্য কোন কোন দিক দিয়ে তাঁর অভিপ্রায় যুক্তিসংগত; অন্যজন সোজাসুজি চতুর্থ বোধের কথা (ফোর্থ ডাইমেনসন) তুলবেন—এ'র ব্যাপারটা খুব কাছ থেকেই বিচার্য।

অবশ্য এটা বলা ঠিক হবে যে, যে-আর্টকে খোঁজা হচ্ছে, তার খুব যে একটা নিশ্চয়াত্মকতা (সেরটিটিউড) আছে, তা নয় এবং দেখা যাবে কিয়ৎ পরিমাণে এমপিরিজমকে আসতে যদি দরকার হয়, স্বীকার করতেই হয়।

এবং ঠিক যথাযথ হবার জন্যে, হয়ত বলতেই হবে যে, বাহ্যত রূপের সঙ্গে যেসব কাজের কোন যোগসূত্র নেই, এই সব কাজকেই বুঝাবার জন্যে কিউবিজম সংজ্ঞাটি ব্যবহৃত হতে পারে

এটা হচ্ছে এমন একটা যান বা আওতা যেটা বিভিন্ন মেজের অভিব্যক্তি তার রঙের বর্ণে মিলিত করে—সহজ সাধারণ একটা কল্পরূপ যাতে করে একীভূত হয়ে খেলে উঠে।

এতে করে একটি সুনির্দিষ্ট অভিলাষ—চিত্র বৈভব-সম্প্রসারিত হয়, যাকে একমাত্র কাজ পদ্ধতিই রূপায়িত করতে পারে। তাও বলা যায়।

সান্ত্বনা কুমার গোস্বামী-র চিত্র প্রদর্শনী : ফাইন আর্টস ভবন

সান্ত্বনাকুমার গোস্বামীর এই দ্বিতীয় প্রদর্শনী। এখানে ৬১ খানি নিদর্শন ছিল। সবগুলি যে আঁকা ছবি এমন নয়, অনেকই ছিল যেগুলি মোনাপ্রিন্ট। মোনাপ্রিন্টে খুব কৌশলের দক্ষতা প্রয়োজন হয় না, যেমন

জন কিডিং

লাইট —সান্ত্বনা গোস্বামী

হয়ে থাকে আর পাতচা গ্রাফিক কাজে। তবু এখানে রঙের আন্দাজ ও জাঁক দেওয়ার একটা ব্যাপার আছে তাতে করে ছাপা ছবিতে বহু মাধুর্য টেকসচার দেখা দেয়। ঠিক এই দিক থেকে সান্ত্বনাকুমার ১৯ ও ৬নং-এ খুব চাতুর্য দেখিয়েছেন। ফলে এগুলিও ছবির আখ্যা পায়।

তাঁর টেকসচার সম্পর্কে জ্ঞানের পরিচয় আমরা অন্যত্রও দেখি, তাতে আমাদের ধারণা, ভবিষ্যতে ইনি আমাদের মান রাখবেন।

সব থেকে বড় ব্যাপার হয়েছে যে, তিনি আলোকে কখনই ভুলে যান নি, একইভাবে কমলার উপর বেগুনীর পর্দা দিয়ে তাকে অর্থাৎ সেই কমলা বা সোনালোকে ঘনীভূত আলোতে পরিণত করেছেন, যেটা অপ-ব্যয়ণীয়া লেখ, ছন্দ আর সবুজের পাশা-পাশি আরোপ করে। এটা দেখা যাবে ২৫নং প্যাঁচার বাঁ চোখে। যতদূর মনে পড়ে ৩১নং-এও খানিক বর্তমান।

এই আলোকে খুব সহজেই শিল্পী ভুলে যেতে পারতেন, কেন না তাঁর ছবির আপাতত দৃষ্টি অনেকটা কেরানি ব্যঞ্জক, অনেক ক্ষেত্রে যেন মনে হবে ঘটনার নাটকীয়তা আছে, কিন্তু আসলে ঐ নাটকীয়তার কোন ব্যক্তিগত সুশৃংখলিত প্রতীকায়ত ব্যাপারে নেই, বস্তুটা থেকে গেছে শীষটান ও আনুভূমিক চেতনার যা চিত্র গঠনের সূত্রেই এসেছে; যাকে সাধারণভাবে বলা যায় বিভিন্ন রেখার সম্বন্ধ।

এবং এই দিক থেকে ২৫নং ছবিতেই প্যাঁচার চোখ যেরূপ স্পষ্ট, ঠিক তেমন অনুপাতে রমণী-অবয়বটি ভাবলে ভাল লাগত; যেমন সরল হয়েছে ২৬নং ও ৩৭নং-এ। বিশেষত ৩৭নং-এ উত্তমাঙ্গার এক পাশ দিয়ে গাছটি বেশ উঠেছে। সাধারণ

[illegible] কিন্তু কোথাও কোথাও [illegible] ইত্যাদি এগুলি ভাল থেকে উঠেনি। তাঁর নিজস্ব রঙ তৈয়ারি চেষ্টা যেমন আমাদের খুব জোর দেয়, তেমনি সেটা সংযত ব্যবহার করলে অনেকেই যথেষ্ট বাঁচিয়ে পেত। ধরা যাক কাগজের উপর দুয়েক ক্ষেত্রে বড্ড সাদাটে হয়েছে, অনেকে হয়ত বলবেন কিছুটা [illegible] লাগছে—আমাদের অবশ্য তা বোধ হয় না।

তবু আমাদের বলা উচিত সনৎকুমার সমস্ত কাজেই আমাদের আনন্দিত করেছেন।

মিস কারমিন গ্রাম-এর চিত্র প্রদর্শনী : ইউনিভারসিটি সেন্টার

মিস গ্রামের একটি চিত্র প্রদর্শনী হয়, তবে তিনতলা ভেঙে উঠে দেখার মত কিছুই ছিল না। আমাদের দেশের যে কোন অল্প বয়সী যে যে-কোন আমেরিকানদের থেকে ভাল কাজ করে তা আবার বিশ্বাস হল। এ'র ইসলামীয় চিত্রগুলি এখানে দেখান উচিত ছিল না, এগুলি রীতিমত রুচিবিরুদ্ধ।

গৃহিণীপনা কি একটি পেশা ?

প্রত্যেক বছর নেদারল্যান্ডস্-এর গৃহিণীদের সংস্থা Federation of Housewifes সভ্যদের আলাপ, আলোচনা ও গবেষণার জন্য কোন কোন বিষয়ের অবতারণা করেন। সংস্থার বিভিন্ন শাখার আলাপ করে তাঁরা মতামত পাঠান কেন্দ্রীয় অফিসে। গৃহিণীদের এই আলোচনা বা গবেষণা দারুণ একটা বৈজ্ঞানিক তথ্য খুঁজে বের করে এমন নয় তবে ঘরনীদের মনের ভাব বোঝার একটি চমৎকার পথ এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। ঘরনীদের মতামতের খসড়াগুলি তারপর একত্র করে একটি রিপোর্ট তৈরি করাও হয়।

১৯৬৩-৬৬ সাল পর্যন্ত গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের বিষয় ছিল "Is housewife an occupation" গৃহিণীপনা কি পেশা? তার সঙ্গে অবশ্য আরও দুটি আলোচ্য বিষয় ছিল। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর দায়িত্ব ও যত্নে গৃহিণীর ভূমিকা এবং জীবনযাত্রার রুচি ও প্রকারে পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যের স্থান।

এক সময় অবশ্য এই সব আলোচনা আমাদের জীবন ধারার জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে হতো। মেয়েদের জন্য পেশা বা জীবিকা সন্ধান করার প্রশ্নই উঠতো না। 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'। যে গৃহ জগতের সকল দেশের সকল সভ্যতার প্রথম ও প্রধান একক তার সব সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধার ভার যে নিয়েছে, যাকে ঘিরে গৃহকল্পনা করা হয় সেই গৃহিণীপনার কোনও সংজ্ঞা বা অর্থের প্রয়োজন হয় নি। ক্লান্ত দিনের কাজে বিভ্রান্ত পুরুষ যে আশ্রয় ও আরামে আগামী দিনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হতো, ঘরের শিশু আদরে, যত্নে প্রীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতো তার কি মূল্য কম হতে পারে? কাজেই মূল্য যাচাই-এর প্রশ্নই ছিল না। আজ পাশ্চাত্য মহিলা সমাজের মত গৃহিণীপনার দর ক্ষাকষির কথা আমাদেরও মনে আসে। টাকার ইকনমিকসে ঘরনীর বিনামূল্যে পরিশ্রম যেন পাল্লা হাল্কা ঠেকে। সমাজনীতির কোন স্রোতে এমন হয়েছে ভেবে লাভ নেই। যে যাকে যে পরিস্থিতি তাকে মেনে নিতেই হবে। কাজেই বিদেশিনীরা কি রায় দিয়েছেন উলটে পালটে দেখা মন্দ কি?

গৃহিণীপনার মূল্য নিয়ে যাচাই করেছিলেন নেদারল্যান্ডস্-এর ঘরনী সংস্থার ৬০টি শাখা। তার মধ্যে ১১টি বলেছেন গৃহিণীদের কাজ পেশা। ২০টি বলেছেন পেশা নয়। আর বাকী ২৯টি বহু তর্ক-বিতর্ক করেও মন ঠিক করতে পারেন নি কি বলবেন। যারা বৃত্তি বলে মেনেছেন তাঁদের একটি শাখার মত বিয়ের সময় স্বামীর সঙ্গে ভাল করে দর কষে নেওয়া দরকার। মালিক আর কর্মচারীর সঙ্গে শর্ত যেমন হয় নানা রকম তেমন করে পতি-পত্নীর মধ্যে দেনা পাওনার বিধি থাকবে। কড়ার হবে কড়া রকমের। সারাদিনের খাটুনির পরে স্বামী পুত্রের তৃপ্ত মুখচ্ছবি মাত্র নয়, রীতিমত পরিশ্রমের পারিশ্রমিক চেক লিখে বা গুণে হিসেব করে দিতে হবে স্ত্রীকে! হলই বা ঘরের কাজ, তার কি আর অর্থনীতি নেই? এরকম আর একটি সংস্থা আবার বলেছেন ছেলেমেয়েদের মাথা পিছু একটা ভাতা তাঁদের সরকার যে স্বামীদের দেন সেটা দিতে হবে স্ত্রীকে, সন্তানদের মাকে যেমন দিয়ে থাকে ব্রিটিশ সরকার। তার উপর গৃহিণীর নিজস্ব একটি ভাতা হওয়া দরকার। আমাদের অবশ্য ভাতা নেই কাজেই এ আলোচনা আমাদের স্পর্শ করে না। বরং অল্প আয়ের সংসারে গৃহিণীরা ভাতা চাইলে স্বামীরা কি করবেন সেটাই ভাববার কথা।

মালদহ হইতে নির্বাচিত এম পি
শ্রীমতী উমা রায়

যাঁরা বলেছেন গৃহিণীপনা বৃত্তি নয় তারা কেউ বা আদর্শের কথা তুলে বলেছেন পত্নী বা মা সংসারকে যা দেয় সে শুধু কায়িক পরিশ্রম নয় তার চেয়ে অনেক বেশী। দেয় তার মন, দেয় তার স্নেহ প্রেম ভালবাসা, আত্মিক অনেক কিছু। নইলে তো তার

সংগে আর মাইনে করা হাউসকিপারের সংগে কোনই ভেদ থাকতো না। ধরুন যদি কোন ডাক্তার বা ব্যারিস্টার বাগান সাজিয়ে তোলেন ফুলে ফলে তবে কি আমরা তাঁকে মালী বলবো? এখানে অবশ্য তাঁরা প্রচ্ছন্নভাবে বলতে চাইছেন, ঘরনীপনার সংগে সংগে ঘরনীদের একটা বৃত্তি থাকলে ভালই হয়। কাজেই দুই বৃত্তি নিয়ে মেয়েদের বিব্রত করা যায় না আর ব্যাপারটা বেমানানও হয়। অধুনিক বিবাহ একরকমের 'পার্টনার-শিপ'। এই অংশীদারিত্বের ব্যাপারে স্বামী এবং স্ত্রী সহযোগী তো বটেই, সহকর্মীও। দরকার হলে উপায় করে সংসারের আয়ব্যয়ের খাতে গৃহিণীরা দু' পয়সা সাহায্য করবেন। জীবনের এই সহধর্মী সহমর্মিতার মাঝে বৃত্তি, পেশা টেনে আনা নেহাত লজ্জার কথা। অপর ৩৩টি শাখা মত দিয়েছেন অন্য রকম। তাঁদের মতে গৃহিণীপনার এমন কোন বিশেষ গুরুত্ব নেই যাতে তাকে উপজীবিকা বলা চলে। তবে গৃহিণীদের একটি আলাদা ইনস্যুরেন্স বা বীমা হওয়া দরকার। যে বীমা করা না করা গৃহিণী-দের ইচ্ছা অনুসারে হবে। এক দল ঘরনী বলেন, সরকারী কাগজপত্রে গৃহিণীদের যে

"no occupation" বলে লিখতে হয় এটা ক্ষোভের কথা। তাতে তাদের মর্যাদার হানি হয়।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দায়িত্ব নিয়ে ৪৩টি সংস্থা বিচার করেন। বিচারের সুবিধার জন্য এ বিষয় কয়েকটি প্রশ্নও ধরে দেওয়া হয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রয়োজন ও সম্ভব স্থলে বৃদ্ধ পিতামাতাকে অর্থ সাহায্য করা পুত্র-কন্যার কর্তব্য কি না। বেশীর ভাগ উত্তরই সাহায্য করার পক্ষে এসেছিল। ওলন্দাজের দেশে এখন প্রত্যেক নাগরিকের প্রয়োজন হলে সরকারী সাহায্যের দাবি আছে। তার উপর পুত্র কন্যার সাহায্য নৈতিক দাবি মাত্র। এই ভালবাসার দান দৈনন্দিন অপরিহার্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উপরের স্তরের সাহায্য। টেলিভিশন, বিজলীপাখার কাপড়-শুকোবার ব্যবস্থা, টেলিফোন ইত্যাদি দিয়ে বার্ধক্যের জরাজর্জরিত দিনকটা সহজ করার সামান্য আয়োজন। ছেলেমেয়েরা মাঝে মধ্যে টাকা পাঠিয়ে দায়মুক্ত হবার উপরও আর কোন দায়িত্ব হতে পারে কিনা তাও অবশ্য প্রশ্ন ছিল। ৪৩টি শাখা আলোচনা করেন। মাত্র তিনটি বলে বাড়তি ঘর একখানা ব্যবস্থা করতে পারলে, অসমর্থ অক্ষম পিতা-মাতাকে আশ্রয় দিতে বাধা কি? চাই কি তাতে একটু আধটু সুবিধা অপরপক্ষেরও হতে পারে। অসমর্থ মানুষও নেহাত দরকার হলে কোন সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু ৪০টি শাখা একেবারে বাতিল করেছে প্রশ্নটি। কিছুতেই চলতে পারে না। বিবাহিত, সংসারী ছেলেমেয়েদের জীবনযাত্রার ব্যাঘাত ঘটাতে বুড়ো বাপমাকে আনা অন্যায়। তাদের জন্য আছে কত শত Old people's home, নার্সিং হোম, এমনকি হাসপাতাল।

এখানে আমাদের তথাকথিত প্রগতিপ্রাপ্ত পরিবেশেও যেন একটু আঘাত দেয়। যৌথ পরিবার ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সঙ্গে সংসারের সেই সুন্দর সম্পর্কে কোথায় যেন একটু ঘুণ ধরেছে আমাদেরও। তবুও এমন করে খোলাখুলিভাবে নার্সিং হোমের বিধি ব্যবস্থা সমাজ আজও দিতে সংকোচ অনুভব করবে। ঘরনী যেমন হাউস-কিপার নয়, পিতামাতার প্রতি কর্তব্যও তেমন তাঁদের গতানুগতি বেঁচে থাকার সামান্য সাহায্য নয়। আধুনিক সভ্যতার প্রতিপদক্ষেপে পরিবার ও পারিবারিক আদর্শের দ্রুত পরিবর্তন যেন ক্রমশ সমস্যা-রূপেই দেখা দিচ্ছে, সমস্যার সমাধানরূপে নয়। যেখানে ব্যক্তিগত সামঞ্জস্যে সমাধান হয়েছে, সেখানেই মাত্র সার্থক হয়েছে নিষ্পত্তি।

পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যের কথায় অবশ্য ঘরনীরা ঘাড় নেড়ে সবাই বলেছেন ঐতিহ্যের যতটুকু ভাল, ততটুকু বজায় রাখা দরকার। তবে ঐতিহ্য বলতে কি বোঝায় তা তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় যথাযথভাবে নির্ধারণ করেন নি। সেটা জামাকাপড়ে না আসবাবে না খাবার সাজাবার পদ্ধতিকে বোঝা যাচ্ছে না। আমার মনে হয় তাঁরা নিজেরাও বুঝতে পারেন নি।

টুকিটাকি

পাকা কলার খোসার ভিতরের দিকটা রুপোর বাসনে ঘষে তারপর নরম কাপড় দিয়ে ভাল করে পালিশ করলে রুপোর বাসন উজ্জ্বল হয়।

ফুল সাজাবার সময় গাদাগাদি করে না রেখে একটু ফাঁক রাখবেন যাতে হাওয়া খেলতে পারে। তাতে ফুল বেশীদিন টাটকা থাকবে।

বই-এর বেলাতেও তাই। শেলফে ঠেসে বই রাখলে সহজে বই নষ্ট হবে, পোকা মাকড় ধরবে। একটু সামনের দিকে এগিয়ে বই রাখবেন যাতে বইয়ের পিছনেও আলো হাওয়া লাগে।

সাজাতে গেলে গোলাপ ফুল বেশীর ভাগ সময়ই নেতিয়ে ওঠে। ফুলদানিতে রাখবার সময় পাতাগুলি ছেঁটে ফেললে এত সহজে নরম হয়ে যাবে না, কারণ পাতা বড্ড জল টেনে নেয় বলে গোলাপফুল তার খাদ্য পায় না। পাতা ছাঁটলে যদি মন না ওঠে তবে অন্য কোন পাতা দিয়ে সাজাবেন কিন্তু গোলাপ পাতা নয়।

সাদা উলের বোনা জিনিস ধুলে অনেক সময় একটু হলদেটে ভাব হয়। যদি সাবানে ধোবার পর সামান্য লেবুর রস অথবা সিরকা জলে দিয়ে ঐ বোনা জিনিস ডুবিয়ে নেন তবে হলদে ভাব হবে না। বাইরে শুকোতে দেবার সময় একটি পরিষ্কার কাপড় চাপা দেবেন তবে ধুলো লাগবে না।

*

বিখ্যাত চিত্র পরিচালক আলফ্রেড হিচকক নাকি বলেছেন মেয়েরা মুখ বন্ধ করে রাখলে সুন্দর দেখায়। কেন? তাতে তাকে রহস্যময়ী মনে হয় যা মুখরা মেয়েকে মনে হয় না। যৌন আবেদনের চেয়ে এই মাধুর্য বেশী আকর্ষণীয়। ধারালো জুতো, কুণ্ঠিত জামাকাপড়, চুলের পরা সাদা মাটা মেয়ে কেবল মাত্র মুখের কথা 'র‍্যাশন' করে মারাত্মক মোহিনী হয়ে উঠতে পারেন।

শুধু কি তাই? উৎকণ্ঠাপূর্ণ ছায়াছবির মত তার সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে উঠবে লোক। কল্পনার মায়াজাল বুনবে। কাজেই কম কথা বলাই মেয়েদের লক্ষ্য হওয়া দরকার। পুরুষ তাকে আবিষ্কার করুক, তার মনের ঠিকানা খুঁজে নিক। প্রগলভা হয়ে সে যেন ছড়িয়ে না পড়ে।

শ্রীমতী

পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা

দেশে আজ যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে সেগুলির হচ্ছে আর্থিক উদ্যোগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে এবং বৈষয়িক নীতির ক্ষেত্রে সরকারের অতীতের ব্যর্থতার ফল। সন্দেহ নেই, গত দু বছরে সমস্যা জটিল ও দুরূহ হয়েছে দেশরক্ষা খাতে অতিরিক্ত ব্যয়, খরা এবং অন্য অস্বাভাবিক বা অপ্রত্যাশিত কারণে।

প্রথমত, আমদানির উপর মাত্রাতিরিক্তভাবে নির্ভরশীল নয় এরকম একটি খাদ্যশস্য বণ্টন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারার দরুন দেশের মধ্যে যোগানের সুষম বণ্টন সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্পগুলিতে (যেমন রাসায়নিক সার, যন্ত্রপাতি নির্মাণ) অভীষ্ট হিসাবে আগে যে উৎপাদন নির্ধারণ করা হয়েছিল সেই পরিকল্পিত উৎপাদনে পৌঁছানো যায় নি। সেইরকম, যেসব শিল্প অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়ে থাকে সেগুলির সম্প্রসারণ বন্ধ করা হয় নি। তৃতীয়ত, পরিমিত উপাদানরাশি (বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রা) অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য দামী উচ্চ আয়-শ্রেণীর আয় সংকোচনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত এবং শক্তিশালী একটি কর-ব্যবস্থা গড়ে ওঠে নি।

কৃষি উন্নয়নের তাৎপর্য

দেশের বৈষয়িক উন্নয়নের হার কৃষি অংশের অগ্রগতির হারের মুখাপেক্ষী। কেননা, সামগ্রী উৎপাদন হতে যে মোট আয় অর্জন করা হয় তার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ আসে কৃষি অংশ থেকে। আর্থিক ব্যবস্থার সঞ্চয়-হার বাড়িয়ে তোলা এবং খসড়া-লিপিতে প্রস্তাবিত মূলধন নিয়োগ করা যাবে কিনা সেটা কৃষি অংশের কাজকর্মের ধারার উপর নির্ভর করবে।

স্পষ্টত, বৃষ্টিপাত কৃষিকর্মের অনুকূল হবে এরকম একটা আশার উপর ভিত্তি করে চতুর্থ পরিকল্পনার আর্থিক উদ্যোগের বহর স্থির করা হয়েছে। কিন্তু আগামী কয়েক বছরে কৃষির অগ্রগতির হার কি হবে সে সম্বন্ধে জোর করে এখন কিছু বলা সম্ভব নয়। আগের পর পর দু বছরের মতো এবারও ফসল ভালো হবে না, মনে হয়।

আবার পাট, কার্পাসবস্ত্র, চিনি ও উদ্ভিজ্জ-তেলের মতো কয়েকটি শিল্প প্রত্যক্ষভাবে কৃষিজাত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। কৃষি অংশে উপযুক্ত চাহিদার উপস্থিতির সঙ্গে আরো কয়েকটি শিল্পের বিকাশ অন্তত পরোক্ষভাবে যুক্ত।

যে আর্থিক ব্যবস্থার রপ্তানি অনেকখানি কৃষি-ভিত্তিক, কৃষির উন্নয়নের হার কম হলে সেখানে রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সেই সঙ্গে শিল্পোন্নয়নের জন্য আবশ্যক বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জন হ্রাস পাবে।

শিল্প ও রপ্তানির উপর প্রভাব

কৃষির অগ্রগতি সন্তোষজনক হয়নি বলে দেশের শিল্প ও রপ্তানির উপর তার অনভিপ্রেত প্রভাব দেখা দিয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে, চতুর্থ যোজনায় যে পরিমাণ পাট রপ্তানির সংকল্প নেওয়া হয়েছে তা উপযুক্ত কাঁচা পাট না পাওয়া গেলে সম্ভব হবে না। সেইরকম, ইক্ষুর একর প্রতি উৎপাদন কম হয় বলে রপ্তানি সম্ভাবনার পূর্ণ সুযোগ নেওয়া হচ্ছে না। গত বছর ফসল ভালো না হওয়ার ফলে ভারতের চা রপ্তানি ১৯৬৪-৬৫ সনে ২১ কোটি ২০ লক্ষ কে জি থেকে ১৯৬৫-৬৬ সনে ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ কে জিতে নেমে এসেছে। প্রতি একরে অপেক্ষাকৃত অল্প কাঁচা তুলা উৎপন্ন হওয়ার জন্য ভারতের কার্পাস বস্ত্র শিল্প আন্তর্জাতিক বাজারে যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক হতে পারে নি।

বৈদেশিক সাহায্যের অনিশ্চয়তা

অন্য দিকে, চতুর্থ পরিকল্পনার মূলধন নিয়োগের যে প্রস্তাব করা হয়েছে তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গেলে তবে কার্যে পরিণত করা যাবে। উৎপাদন-ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের জন্য আমদানিজাত উপকরণের উপর নির্ভরশীল শিল্পগুলি এবং বিশেষ বিশেষ প্রকল্প, উভয় ক্ষেত্রে ঐ অনিশ্চয়তা থাকবে।

প্রয়োজন অনুযায়ী বছরে যখন বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না, সে সময় সাহায্যের উপর অনেক কম নির্ভরশীল উন্নয়ন নীতি বা কৌশল অবলম্বন করলে ভালো হয়। এই উদ্দেশ্যে উচ্চপ্রান্তিক হারে কর আরোপ এবং সরকারী উদ্যোগের উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি দুটোর মাধ্যমে সরকারী ব্যবস্থার অর্জিত সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলতে হবে।

যেহেতু কৃষির অগ্রগতির হার বেড়ে গেলে আভ্যন্তরিক অর্থসম্পত্তি আরো বেশী সংগ্রহ করা যাবে, কৃষি অংশে (সেই সঙ্গে রাসায়নিক সার শিল্পে) প্রস্তাবিত মূলধন নিয়োগ মোটামুটি বজায় রাখা দরকার। বৈষয়িক উন্নয়নে লাগে এরকম যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম যাতে আমদানি না করে দেশে শীঘ্র উৎপাদন করা যায় সেই উদ্দেশ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের সম্প্রসারণও বাঞ্ছনীয়।

মোট কথা, এখন এমন একটা কার্যক্রম প্রস্তুত করতে হবে যা কেবল উচ্চাশা বা সদিচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—প্রতিকূল পরিস্থিতি অথবা বিপরীত সম্ভাবনা দেখা দিলেও যাতে পরিকল্পনা পুরোপুরি প্রয়োগ করা যায়। কেবল উচ্চ পরিকল্পিত উৎপাদন নির্ধারণ নয়, বিভিন্ন বিকল্প উদ্যোগ কৌশলের মধ্য থেকে এমন একটা বাস্তবনিষ্ঠ এবং যথেষ্ট নমনীয় নীতি বেছে নিতে হবে যা অনুকূল অবস্থা এলে তার সুযোগ নিতে পারবে। এই অর্থে ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক যোজনা ভালোভাবে পুনর্বিবেচনা করে দেখার সময় এসেছে।

শান্তিকুমার ঘোষ

আঁরি মাতিস

আঁরি মাতিস

১৯০০ সাল; প্যারিসে এসে নেবেছি সবে। কে কোথায় কেমন আছে কিছুই জানি না ধরা যাক; কার নতুন শতকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, গত শতকের শেষভাগের বাবুরা কোথায়; সেজানকে কি নতুন ছেলেরা গ্রহণ করল, নাকি এখনো উপেক্ষার জবা যুঝতে হচ্ছে তাঁর; এইসবের কিছুই না জেনে, কিন্তু প্রচুর কৌতূহল নিয়ে, ধরা যাক আমরা প্যারিসে নাবলুম।

মুজে দার্ত মদের্ন-এ ঢুকেই অবাক হলুম, যে সেজান প্যারিসের সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত শিল্পী ছিলেন দশ বছর আগেই, তাঁকে নমস্কার (বা প্রণাম) জানাচ্ছে মরিস ডেনিসের ক্যানভাসে সমকালীন যুবকবৃন্দ—সেজান মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়ে, ঘিরে আছে তাঁকে বোনার্দ, ভুইয়ার, রেদঁ, রুসে, সেরুসিয়ের, ডেনিস প্রভৃতি নবি-সম্প্রদায়ের চিত্রকররা। কিন্তু কোথায় গোগ্যাঁ এখন? ভ্যান গ, টুলুস লোত্রেক, দ্যগা? মোনের খবর কী? খবর নিয়ে জানলুম গোগ্যাঁ বাকি জীবনের জন্য মারকেসা দ্বীপে, কে বলল সেখানে তিনি মৃতপ্রায়। ভ্যান গ এবং সিউরার মৃত্যু হয়েছে—তুলুস লোত্রেকের অন্ধকার বিছানা যে-কোনো সময় খালি হবে—দ্যগা আর চোখে দেখতে পান না—রেনোয়া অসুস্থ।

কিন্তু অন্যদিকের দিগন্তে নতুন সূর্য উঠছে। সারা ইয়োরোপ থেকে তরুণ চিত্রকররা জমায়েত হচ্ছেন ফ্রান্সে। মুরো, পিকাবিয়া, দ্যলানি, উত্রিলো, দেরেইন, ভ্লামিঙ্ক এঁরা এখন প্যারিসে। এই সবে আরেক দল এলেন—এ দলে আছেন ব্রাক, লেজের, আরপ, দুশাম্প, পিকাসো। ১৯০৪-এ মুনিখ হয়ে নাবলেন ব্রাংকুসি, ১৯০৮-এ আর্চিপেঙ্কো, ১৯১০-এ শাগাল, কান্ডিনস্কিও এর মধ্যে ঘুরে গেছেন প্যারিস দুবার। হুয়ান গ্রী আর পল ক্লে এলেন একই সময়ে—বেকার আর ফ্রানৎস মার্কও বাদ পড়লেন না। ইটালী থেকে সোজা চলে এসেছেন প্যারিসে সেভ্রিনি আর মদিলি-য়ানি। জন মারিন আটলান্টিক পার হয়ে আমেরিকা থেকে। প্যারিস নতুন যুগে জমজমাট, ডাকে নতুন আত্মার সুখের।

কিন্তু যে 'চিত্রণ' নতুনদের অত প্রবল তা কী? ফোবিজম নিয়ে বলেছি আগেই; সেই ফোভিজমের নেতা আঁরি মাতিস পূর্বসূরী ইম্প্রেশনিস্টদের এবং নতুনদের মধ্যে যাঁরা নিও-ইম্প্রেশনিজমকে আদর্শ করলেন তাদের তীব্র ভাষায় নস্যাৎ করতে দ্বিধা করলেন না। তাঁর কথাতেই বলি-"নিও-ইম্প্রেশনিজম বা ডিভিশনিজমের সঙ্গে ইম্প্রেশনিজমের কোনো তফাত নেই। যে-সংহতি এঁরা ক্যানভাসে আনতে চেয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ শরীর-ইন্দ্রিয়-নির্ভর এবং তাই অত্যন্ত যান্ত্রিক। বর্ণভঙ্গন ফর্ম এবং সীমারেখাকে ভাঙে যার ফলে ক্যানভাসের ভূমিতেও কম্পন দেখা যায়। সমস্ত কিছুই আনতেন ক্যানভাসে, এঁরা রেটিনাকে আঘাত করার জন্য, যার ফলে চিত্র থেকে ভূমি, ফর্ম এবং সীমারেখার দ্বারা যে সংগীতময় আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তা বাদ পড়ে যেত। বস্তু তার বস্তুত্ব দ্বারা নির্দিষ্ট না হয়ে শুধুমাত্র ফাঁকা আলোর পিণ্ড হিসেবে চোখ জুড়োতো। সব কিছুই তাঁরা একইভাবে আঁকতেন এবং ছবিগুলি বেহালার মূল রাগ প্রকাশ না-করে অনুরণন-টুকু ধরত মাত্র। শুধু অনুরণনে কি বাজনা সম্পূর্ণ হয়?"

১৮৯১-এর শীতকাল, আঁরির বয়স তখন বাইশ, তরুণ যুবক, ল' ইস্কুল ভালো লাগল না, প্যারিসে চলে এলেন ছবি আঁকা শিখবেন বলে—কিছুদিন বুগুয়েরোর কাছে চিত্র-

হারমনি ইন রেড

ল্লার পাঠ নিয়ে গ্স্তাভ মোরোর কাছে লে এলেন। সেই সেখানেই তাঁর আলাপ রো, মার্কুয়ে প্রভৃতির সঙ্গে, যাদের নিয়ে কছুকাল পরে আরম্ভ হল ফোভিজম্ চিত্র-বপ্লব। মোরোর কাছে সত্যি বলতে াতিসের শেখার তেমন কিছু ছিল না যা চবিষ্যতে তাঁর স্বতন্ত্র শিল্পাদর্শ নির্মাণে সাহায্য করতে পারে; যেখানে আর সত্য কিছু পেয়েছিলেন তা পিসারোর সান্নিধ্য। ইম্প্রেশনিজমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আরম্ভ হয় ওয়েরি নামক চিত্রকরের সঙ্গে পরিচিত হবার পর—তাঁর সঙ্গে ব্রিটেনীর গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করেন এবং স্বাধীন কিছু ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকেন যার বর্ণোচ্ছ্বাস রোমাণ্টিক শিল্পী দ্যলাক্রোয়ার কথা মনে করায়। রঙ নিয়ে খেলা মাতিসের আরম্ভ তখনই, যার ভবিষ্যৎ প্রকাশ ফোভিজম। ফোভিজমের ধারায় ছবি মাতিস ১৮৯৭ থেকেই আঁকতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ফোভিজম তো বর্ণে, কাঠামোর—তিনি কোন ধারায় এগচ্ছেন প্রশ্ন উঠতে পারে। অর্থাৎ, মাতিসের ওপর কার প্রভাব সবচেয়ে বিধ্তে এখন।

১৮৯৯-এ পিসারোর পরামর্শে সেজানের একটি ছবি ১৩০০ ফ্রাঁ দিয়ে মাতিস ক্রয় করলেন। মাতিসের এই ১৩০০ ফ্রাঁ দিতে দম বেরিয়ে গিয়েছিল—ছবিটি ছিল সেই তিন স্নানরতা রমণীর। এই ছবি মাতিসের কাছে ছিল সাঁইত্রিশ বছর, তারপর ১৯৩৬ সালে তিনি সেটি একটি চিত্র-গ্যালারিতে দিয়ে দেন। মাতিসকে সেই ছবি বিষয়ে জিগ্যেস করা হলে তিনি বলেন, "আধ্যাত্মিকভাবে এই ছবি আমাকে জীবনের অনেক শিল্পী হিসেবে ঠেকে যাওয়া মুহূর্ত থেকে বাঁচিয়েছে; আমি এই চিত্র থেকে অনুপ্রেরণা ও আত্মবিশ্বাস পেয়েছি বছরের পর বছর। আজ মনে হচ্ছে এ-ছবি বোধ হয় জনসাধারণ দেখতে পারে এমন কোনো জায়গায় আমার দিয়ে দেওয়া উচিত, কারণ হয়তো এই ছবি বহু ঠেকে যাওয়া শিল্পীর, কিংবা জীবনে ঠকে যাওয়া মানুষের নতুন অনুপ্রেরণা হতে পারে।"

সেজানের কাছে মাতিস কী পেয়েছিলেন? সেজানই তাঁকে প্রথম সচেতন
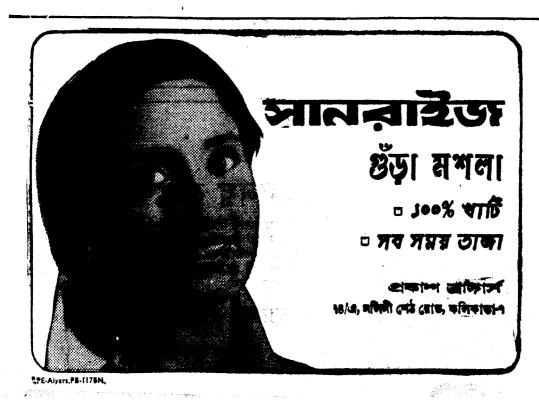
করেন যে বর্ণের কাঠামো থাকা প্রয়োজন, কিংবা হার্বার্ড রীডের ভাষায় বিভিন্ন রঙের মধ্যে কাঠামোগত সংহতি চিত্রে আবশ্যক। রঙের কাঠামো কিন্তু ফর্মের কাঠামোর সঙ্গে ভিন্ন করলে চলবে না—রঙ তার "প্লেনিটিউড" রক্ষা করে, পরস্পরের (রঙের সঙ্গে রঙের), এবং ফর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে।

মজা লাগে ভাবতে ঠিক একই সময়ে জর্মান এক্সপ্রেশনিস্টরাও একই কথা ভাবছিলেন ম্যুনিখে বসে। কিন্তু মাতিস এ'দের থেকে আরেক ধাপ অগ্রসর হয়েছিলেন—বর্ণের দ্বারা মোহ সৃষ্টি করব না, হাল্কা হাওয়ার ওড়না হবে না ছবি, ছবি হবে আঁটো, গভীর এবং ঋজু। অবিলম্বে বর্ণ-অভিজ্ঞতা থেকে চোখ-ধাঁধানো অংশটা ছেঁটে ফেলে নিরেট বস্তুরীতিকে ধরতে হবে ক্যানভাসে, শিল্প তো মুহূর্তের বিলাস নয়, শাশ্বত, তাতে মুহূর্তের বিস্ময় রাখার কোনো মানে হয় না। মাতিস বলেছিলেন—"আসলে যা আমি চাইছি আমার ক্যানভাসে তা হল আত্মপ্রকাশ (মনোবিকলন নয়), আমি আমার জীবনের প্রতি অনুভূতির সঙ্গে, আমার তা প্রকাশ করার মাধ্যমের কোন তফাত পাই না...আত্মপ্রকাশ আমার মতে আবেগকে কোনো মানুষের মুখের ওপর আরোপ করার নয়, সমস্ত ছবিটির প্রতিটি বস্তু, ছক, কাঠামো, তল থেকে তা বেরিয়ে আসবে। কম্পোজিশন হল তাই যা শিল্পীর অনুভূতিকে বস্তুকে সজ্জিতকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করে।

মাতিস যে আত্মপ্রকাশের কথা বলছেন তা সম্ভব দুই উপায়ে—স্থূলভাবে তা সম্ভব, আবার অত্যন্ত শিল্পিত করেও তাকে ধরা যায়। জর্মান এক্সপ্রেশনিস্টরা ইচ্ছে করেই তাদের অনুভূতিকে প্রকাশ করার সময়, শিল্প তার প্রলেপ লাগান নি, অমসৃণভাবে তা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু মাতিস যেহেতু জাপানী এবং ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁর কাছে স্টাইলাইজেশন ছিল আবশ্যক। গ্রীক, "সিরিনিটি" আনতে চেয়েছিলেন তিনি তাঁর ছবিতে, কেন না নন্দনতত্ত্বের দিকে নজর ছিল তাঁর প্রায় রবীন্দ্রনাথের মতো। নন্দনতত্ত্বের দিকে অত্যধিক নজর রাখার জন্য যে অভিজ্ঞতা বন্দুকের গুলির মতো তীর এবং যন্ত্রণাময় তাকে মোলায়েম ভাবে প্রকাশ করার সবচেয়ে সফল উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের কবিতা। এই প্রসঙ্গে আমার আরো একটু বলতে ইচ্ছে করছে, পাঠক আমাকে অনুমতি দিন।

আজকের দিনের কোনো পাঠক বা দর্শকের সামনে যদি এরকম কোনো প্রশ্ন তুলে ধরা যায়—শিল্প থেকে তুমি সৌন্দর্য-অভিজ্ঞতা চাও, না নিরেট অভিজ্ঞতা চাও, তার কী উত্তর হবে? আমি নিজেকে এই প্রশ্ন করে উত্তর পেয়েছি; সৌন্দর্য দিয়ে দরকার নেই, অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। কোনো কবিতা বা ছবিতে যদি আতঙ্কের স্থান অত্যধিক থাকে তা যে-রকম একদিক থেকে মেনে নেওয়া যায় না, কারণ শিল্পী সেখানে আমাদের আঘাতের দ্বারা এবং শুধু আঘাতের দ্বারাই তাঁর কাজের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন, ঠিক তেমনি চিত্রে বা কবিতার অত্যধিক সৌকুমার্য বা মসৃণতাও কাম্য নয়, কারণ সেখানে আবার সব কিছুকেই বড় বেশি মনোরম করে তোলা হচ্ছে যার ফলে আমাদের বেঁচে থাকার সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকছে না কোনো। রবীন্দ্রনাথের সেই গান ভাবা যাক—'আমার একটি কথা বাঁশি জানে বাঁশিই জানে/ভরে রইল বুকের তল/কারো কাছে হয় নি বলা/কেবল বলে গেলাম বাঁশির কানে কানে।' পংক্তি কটি পড়ে প্রথমেই আমাদের মনে হয় 'কী সুন্দর!' কিন্তু ভেবে দেখুন যে তীব্র অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই কবিতা তার তীব্রতা, গুমরে-ওঠা যন্ত্রণা, অত্যধিক সৌকুমার্য আনতে গিয়ে কবিতার কেমন মসৃণ হয়ে সুরেলা বেদনায় পরিণত হয়েছে। এই কবিতা শুধু তো সৌন্দর্য-অভিজ্ঞতাই, কিন্তু আমাদের জীবনের যন্ত্রণার মুহূর্তগুলো একবারও কি এই লাইন কটি উন্মোচন করে? বড় বেশি আমাদের কাছ থেকে দূরে, বড় বেশি বায়বীয়, আঘাত নেই, যন্ত্রণা নেই, শুধুমাত্র সৌন্দর্য আছে। মাতিসের ছবিও অনেকটা এইরকম, তাঁর ছবির সঙ্গেও আমাদের বেঁচে থাকার, ব্যক্তিগত দুঃখ বা সুখ অভিজ্ঞতার কোনো যোগাযোগ হয় না—সৌন্দর্য মাঝে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু উল্টোদিকে ভেবে দেখুন রুয়োর ছবি কী ভীষণভাবে নিজের কথা মনে করায়, কেমন সোজা তীরের মতো প্রবেশ করে আমাদের মধ্যে; ভেবে দেখুন জীবনানন্দর কবিতা, গোন্ডের ভেবে দেখুন জীবনানন্দর কবিতা, গোন্ডের ছবি, পিকাসোর ক্লাউন।

মাতিস বিষয়ে লিখতে গিয়ে আমি বড় বেশী লোকের নাম করে ফেললুম, সেটা বোধ হয় ঠিক হয় নি, আমার মাতিসের জীবন এবং আলাদা-আলাদা ছবি নিয়ে আরো আলোচনা করা উচিত ছিল—কিন্তু এই চিত্রকরের সঙ্গে আমি ঠিক কোনো হার্দ্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারি না। আমারই অক্ষমতা। তাঁর ছবির থিওরির দিকটা বুঝতে চেষ্টা করেছি, উপলব্ধি করেছি তিনি একজন বিরাট শিল্পী, কিন্তু কোনো ছবিই তাঁর আমাকে অভিভূত করে না। তাই অধিক লিখে বাচালতার প্রয়োজন নেই।

আমার আলোচনার উদাহরণ হিসাবে "হারমনি ইন রেড" ছবিটি মুদ্রিত করলাম লক্ষ করুন, মাতিস কীভাবে ছবিটির কাঠামোর মধ্যে সংগীতময়তা আনছেন সজ্জিতকরণের মাধ্যমে। তাঁর ছবি বুঝতে হলে রঙে ছাপা প্রিন্ট দেখা প্রয়োজন—কেন না রঙ ও রেখার মিলনই তো তাঁর প্রধান আদর্শ।

শুদ্ধশীল বসু

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর এবার নব্য খাদ্যনীতি ঘোষণা করিয়াছেন—"দোকার সংখ্যা বাড়িয়ে বারো করা উচিত ছিল এবং স্মরণ সংখ্যাতে নির্ধারিত খাদ্যনীতি—

'ঊনো ভাতে দুনো বল, অধিক ভাতে রসাতল' কথাটি ঘোষণা করলে খুবই ভালো হতো" বলেন বিশু খুড়ো।

বাগমারির উন্মত্ততা লইয়া পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার হাওয়া উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং স্পীকার বাধ্য হইয়া অধিবেশনের কাজ মুলতুবি রাখেন। সহযাত্রী বলিলেন—বাগমারির ঘটনা নিঃসন্দেহে মর্মান্তিক কিন্তু এই ঘটনার ওপর ভাষণ দানের জন্য যাঁরা পাঁয়তারা কষছিলেন তাঁদের এই সুযোগ হাতছাড়া হওয়াটাও কম মর্মান্তিক নহে, এটা ঠিক বাগমারি না হলেও বাক্‌মারিতো বটেই।"

কলিকাতায় 'পথ-নিরাপত্তা সপ্তাহ' শুরু হইয়াছে।—"খুবই ভালো কথা। কিন্তু গৃহ-নিরাপত্তা সপ্তাহের মতো কোন সপ্তাহের প্রবর্তন না হলে আর স্বস্তি কোথায় পাচ্ছি অথচ সবাই জানেন পথ-দুর্ঘটনার চেয়ে গৃহ দুর্ঘটনা আরো ভয়াবহ, একটায় মৃত্যু, অন্যটায় জ্যান্তে মরা।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গে নাটক মঞ্চস্থ করবার পূর্বে নাটক সেনসরের আর কোন আইনগত প্রয়োজন নাই।—"সাসপেন্সের এবম্বিধ সুবর্ণসুযোগে অতঃপর নাটক খুব জমজমাট হবে বলেই আশা করা যায়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাগলার এক বিবৃতিতে প্রকাশ, আমেরিকার কোন একটি বেসরকারী নাট্যদল ভারতীয়দের লইয়া কুরুচিপূর্ণ নাটকাভিনয় করিতেছেন।—"মনে হয় এই অভিনয় স্রেফ ইনসপেক্টারস রিপোর্ট বা মিস মেয়ো রচিত 'মাদার ইণ্ডিয়ার'ই নাট্যরূপ"—বলেন বিশু খুড়ো।

সিনেমায় কী কী ধরনের চুম্বন চলিতে পারে বা চলিতে দেওয়া উচিত তাহা নাকি বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে।—"অতঃপর 'চিনির চেয়ে চুমো মিঠে' জাতীয় পাঠ্য চলতে দেওয়া উচিত কি না তা-ও বিবেচনা করে দেখা উচিত"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বলিয়াছেন—ঋণ করিয়া খরচ মিটাইবার নীতি ত্যাগ করিতে হইবে।—"কিন্তু ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ নীতি যে

আমাদের অস্থিমজ্জায় জড়িত রয়েছে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

সংবাদে প্রকাশ, ঝোলাগুড়ের অভাবে ভেষজ শিল্প সংকটের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে।—"শুধু কি তাই? সম্প্রতি শুনিয়াছিলাম, ভারত সরকার ভারতে ন'টি পাঁউরুটির কারখানা খুলেছেন। সংবাদ শোনা মাত্র স্বর্গত সুকুমার রায়ের—'কিন্তু সবার চাইতে ভাল পাঁউরুটি আর ঝোলাগুড়' মনে পড়ে গেল এবং কাজে কাজেই মনের সুখে বগল বাদ্য বাজাচ্ছিলাম, কিন্তু এখন দেখছি আমাদের কপালে ঝোলা গুড়েও বালি"—সখেদে বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

এক সংবাদে শুনিলাম, সিমেন্টের অভাবে ফরাক্কার কাজ বন্ধ হবার উপক্রম হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হয়ত কথাটা ভেবেই দেখছেন না যে, ফরাক্কা অক্কা পেলে ভারতের গঙ্গাপ্রাপ্তি অনিবার্য!!"

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাগলা নাকি বলিয়াছেন যে, বৃটিশ বেতার প্রতিষ্ঠান বি বি সি নাকি পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাত দোষ দুষ্ট।—"কিন্তু বলা যায়

এটা বহু পুরাতন ভাব নব আবিষ্কার। মনে পড়ে বহুদিন আগেকার কথা; ভারতে প্রেরিত একজন নবীন সিভিলিয়ানকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ভারতের মুসলমানদের প্রতি তাঁর ব্যবহার যেন একটু পৃথক ধরনের হয়। সেই কথা মনে করে উক্ত সিভিলিয়ান কোন এক সভায় বক্তৃতা শুরু করেন: লেডিজ, জেন্টেলম্যান অ্যাণ্ড দি মোহামেডানস! ভারতের কট্টর বৃটিশতুতো ভায়েরা এখন পাকিস্তানবাসী, সুতরাং কাজে কাজেই"—বলেন বিশু খুড়ো।

কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণমন্ত্রী ডঃ ফুলরেণু গুহ টালিগঞ্জে আঞ্চলিক মহিলা হস্তশিল্প শিক্ষণ কেন্দ্রে বলেন, আমাদের দেশে মহিলাদের মধ্যে স্বাবলম্বী হওয়ার আগ্রহ ক্রমেই বাড়িতেছে। তাঁহাদিগকে সেই সুযোগ দিতে হইবে।—"আমাদের তরফ থেকে সেই সুযোগ দিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, অবশ্য যদি মহিলারা অতঃপর নিত্যি তিরিশ দিন ট্রামে-বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে দশটা-পাঁচটা অফিসের কাজ করেন এবং স্বাবলম্বী হবার পরেও 'পরম গুরুর' প্রতি প্রথা-পোষণ করেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য মহাশয় বলিয়াছেন: কলিকাতার বাহির হইতে আগত ছাত্রদের কলিকাতার প্রথম দর্শনীয় তিনটি—চিড়িয়াখানা, যাদুঘর এবং মন্ত্রী। সহযাত্রী বলিলেন—"হয়ত তাই। কিন্তু চিড়িয়াখানা-যাদুঘরের প্রবেশ-মূল্যের সঙ্গে মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে দর্শনীর কোন ব্যবস্থা নেই বলেই জানি, হলে ভালো হয় এবং আরো ভালো হয় তা গরীব শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে, কেননা তাঁদের প্রণামীটা 'যৎকিঞ্চিৎ' কাঞ্চন মূল্যে এসে দাঁড়িয়েছে।"

কলকাতার ডায়েরি

কলকাতার ব্যাপারই এই। কখনও গলাগলি, কখনও গালাগালি। এবং তার পরিণামে হয়ত বা গোলাগুলি। এইতো কিছুদিন আগে গুরুগোবিন্দ সিংহের ত্রিশত জন্মবার্ষিকী উৎসব নিয়ে শহরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল, তার কয়েক মাস পরেই ছোট্ট একটি ঘটনা থেকে তুলকালাম কাণ্ড। নগরবাসীর মনে ত্রাস, সারাভারতে উদ্বেগ এবং এগারোটি জীবন এক দিনের উন্মত্ততার নিঃশেষ। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত উত্তর কলকাতার জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত এবং পরদিনই আবার সব স্বাভাবিক, আবার যে-কে-সেই। কে বলবে, একদিন আগে এইসব জায়গাতেই ঝড় বয়ে গিয়েছে।

গত সপ্তাহের এই অপ্রীতিকর ঘটনা নিয়ে শহরের নানা আড্ডায় নানা রকম আলোচনাও চলেছে কয়েক দিন। একটি আড্ডায় বসে শুনতে পেলাম, জনৈক উত্তেজিত বক্তা 'জ্বালাময়ী ভাষায়' বলছেন, "কী মশাই, আপনাদের যুক্ত ফ্রন্ট সরকার তো খুব বড়াই করে বলেছিলেন, গুলি চালাবেন না। কিন্তু সে-ই তো চালাতে হল। কংগ্রেসী হোন, আর অকংগ্রেসী হোন, প্রয়োজনে সব করতে হয়, বুঝলেন।"

"এতে বোঝাবুঝির কী আছে"—যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের সমর্থক পাশের ভদ্রলোক নিস্পৃহ গলায় তৎক্ষণাৎ জবাব দেন—"সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বা গুণ্ডামি চললে গুলি চালানো হবে না এমন কথা কেউ বলেনি। এক্ষেত্রেও শান্তি রক্ষার জন্য তাই করতে হয়েছে। এতো আর আপনাদের কংগ্রেসী সরকার নয় যে, খাদ্য আন্দোলনের বুভুক্ষু জনসাধারণের উপর অকারণে বন্দুকবাজী করবে।"

"রাখুন মশাই রাখুন"—প্রথম বক্তার গলা আরও চড়া—"খাদ্য আন্দোলনের নামে লুটতরাজ চললে, বাড়িঘরে আগুন দিলে তাকেও গুণ্ডামি বলে এবং আগেকার সরকার ওই শান্তিরক্ষার জন্যেই গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছেন। সব সমান, সব সমান।"

দ্বিতীয় ভদ্রলোকের কণ্ঠে এবার উত্তেজনা প্রকাশ পায়, কথাবার্তাও ততটা নিস্পৃহ নয়। তাকিয়াটা দূরে ঠেলে সোজা হয়ে বসে বলেন, "আজ্ঞে না, সব সমান নয়, আপনারা প্রতিক্রিয়াশীলরা খাদ্য আন্দোলনকে গুণ্ডামি বলতে পারেন, কিন্তু বাংলা দেশের জনসাধারণ তা বলে না। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এই শহরে আগেও হয়েছে, গুলিও চলেছে, আমরা কিছু বলিনি। তবে আন্দোলনকারীর উপর কথায় কথায় গুলি চালানোর রেওয়াজ কংগ্রেস সরকারই চালু করেছে—"

ভদ্রলোকের কথা কেড়ে নিয়ে তৃতীয় একজন বলেন—"ঠিকই বলেছেন, কিন্তু কয়েক বছর আগে কেরলে কম্যুনিস্ট

সরকারের আমলে হাতদের উপর গুলি চলেছিল, সেটাকে কি বলবেন? গণতান্ত্রিক আন্দোলন, না প্রতিক্রিয়াশীল গুণ্ডামি?"

"নিশ্চয়ই গুণ্ডামির ব্যাপার ছিল, নইলে গুলি চালাবে কেন—আর একজনের উত্তর।"

প্রথম বক্তাটি এবার চটে উঠলেন। বললেন—"বাঃ রে বাঃ, অকংগ্রেসীরা গুলি চালালে গুণ্ডামি, আর কংগ্রেসীরা চালালে গণতান্ত্রিক আন্দোলন! —এতো বড় মজার কথা। তাছাড়া আমার আর একটি জিনিস বলার আছে, সেদিন ওই এতবড় মিছিলটা বের করতে দেওয়াই অন্যায় হয়েছে।"

"কেন, অন্যায় হবে কেন"—পালটা জবাব —"ধর্মীয় শোভাযাত্রায় বাধা দেবার কোন অধিকার নেই এবং মিছিলের উদ্যোক্তারা সরকারকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, কোন অশান্তি হবে না।"

"এই আশ্বাসের দাম কী? দেখলেন তো, মিছিল না বেরোলে কত সহজে ব্যাপারটা মিটে যেত!"

"সবই দেখেছি, সবই বুঝেছি"— আবার জবাব—"একটা ব্যাপার শুধু আপনিই দেখেননি, এত বড় হাঙ্গামা কত অল্প সময়ের মধ্যে যুক্ত ফ্রণ্ট সরকার মিটিয়ে দিলেন। তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই শান্তি। পরদিন ময়দানের সভায় দুই সম্প্রদায়ের লোকরাই জড় হয়েছিলেন আবার দুই পক্ষ ভাই ভাই।"

কথা কাটাকাটির এইখানেই শেষ। লক্ষ করলাম, মতের যত ফারাকই থাকুক, অল্প সময়ের মধ্যে অবস্থা আয়ত্তে আনার ব্যাপারে দুই পক্ষই একমত। আমিও।

*

কলকাতার ট্যাক্সি ড্রাইভারদের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁদের অনেকেই চুপচাপ স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকতে পারেন না। পাশে সঙ্গী যদি একজন থাকে, তাহলে পেছনের যাত্রীদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাঁরা বকবক চালিয়ে যান। সুখ দুঃখের কথা, বন্ধুবান্ধবদের ফস্টিনস্টির কথা, সিনেমার কথা। শুধু তাই নয়, অনেক সময় তাঁরা আবার যাত্রীদের কথায়ও ফোড়ন কাটেন।

আপনি হয়ত সাম্প্রতিক কোন ঘটনা নিয়ে তর্ক জুড়েছেন পাশেবসা বন্ধুটির সঙ্গে। হঠাৎ কথার মাঝখানে ট্যাক্সি ড্রাইভারের মন্তব্য সামনের সীট থেকে নিক্ষিপ্ত হবে। আপনি হয়ত বললেন—"বুঝলি অজিত, মনে হচ্ছে ইন্দিরাই আবার প্রাইম মিনিস্টার হবেন।" অজিতের বাক্য-স্ফূর্তির আগেই সিগারেটে সুখটান দিয়ে ড্রাইভার ভদ্রলোকটি বলে উঠবেন, "আমার কিন্তু বিশ্বাস মোরারজীই হবে।" এই "সুচিন্তিত" মতামতে আপনি এবং আপনার বন্ধু আলোচনাটি তখনই স্থগিত রাখতে বাধ্য হবেন।

কিংবা হয়ত বললেন, "বাজারে আজ মাছ পেলাম না রে।" তৎক্ষণাৎ সামনের সীট থেকে অযাচিত মন্তব্য—"কোন বাজার স্যার, আমাদের এন্টালি মার্কেটে তো আজ প্রচুর মাছ উঠেছিল—পোনা, কই, আড়, পাবদা। তবে কি জানেন স্যার, যা দিনকাল পড়েছে—"

ব্যস, কথা আর থামে না, আপনি এবং আপনার সঙ্গী নামতে পারলে বাঁচেন।

এই ধরনের কথাবার্তায় অনেকের আগ্রহ আছে, অনেকের নেই। ট্যাক্সি ড্রাইভারদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন সেটা আগে যাচাই করে পরের আলোচনায় 'অনুপ্রবেশ' করেন। যাচাই কী করে করবেন? খুব সোজা। কোন কথা বলে তার উত্তর না পেলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে, আর এগোনো উচিত নয়।

—চাণক্য

মোহম্মদ মোসাদ্দেক

দরবেশ

তেহরানের রাজপথে কুচকুচে কালো রঙের একটা মারর্সিডিজ বেনজ চলে গেল, আগে পেছনে সশস্ত্র পুলিসের গাড়ি। শুনলাম, যাচ্ছেন রাজবন্দী মহম্মদ মোসাদ্দেক।

পারস্য দেশের এমন একজন জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন মোসাদ্দেক, যিনি রাজনীতিতে না নামলে গোটা মধ্যপ্রাচ্যের আধুনিক ইতিহাস চাল-বোল ভিন্নতর হত। আর সেইজন্যেই পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিতে উনি ছিলেন "ভাঁড়", "ধেড়ে ষাঁড়", "ডন কুইকসট", "মোটা মাথার মানুষ"। তিয়াত্তর বছর বয়সে ১৯৫১ সনে যখন ইনি ইরানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন, তখন লণ্ডন নুইয়র্ক প্যারিসে গেল-গেল সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তিনটে বছর ঘুরতে না-ঘুরতে কয়েদখানার অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হলেন মোসাদ্দেক। তারপর যদিও চার বছর বাদে ফের আলোর মুখ দেখেছিলেন, কিন্তু আমৃত্যু এই মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত নজরবন্দী ছিলেন তিনি সুদীর্ঘকাল।

শিরাজি গোলাপ আর তাব্রিজি কারপেট। ওমরখৈয়াম হাফিজ শাদি আর জালাল-উদ্দিন রুমির দেশ ইরান। এ'দের নাম বাদ দিলে আজকের ইরানে মোসাদ্দেক, মহম্মদ মোসাদ্দেকের নাম ঘরে ঘরে। একদিন ছিল যখন ইরান আর ভারতবর্ষ খুবই পাশাপাশি ছিল, অন্তরে এবং দৈহিক দূরত্বে। ভারতের ব্রিটিশ ভূতগ্রস্ততায় ইরানকেও তার কতক স্বাধীনতা খোয়াতে হল ওই গ্রেট ব্রিটেনেরই কাছে। তারপর ওদেশের আবাদান অঞ্চলে, শিরাজি গোলাপবাগানের অপর দিকে সেই ভয়ংকর তরল পদার্থ বেরুল, যার মৌতাতে ইউরোপের ঘরে ঘরে বসল গ্যাসচুল্লি, পথে পথে চলল মোটর গাড়ি, দ্রুততর হল বাষ্পীয় পোত, অনতিকালে আকাশে উড়ল বিমান বাহিনী। আবাদানের তৈলাঞ্চল জলের দরে কিনেছিল ইংরেজরা আর এই কিনেওলাদের সর্বাগ্রে ছিলেন ব্যারন পল জুলিয়াস রয়টার। ইনি সেই প্রতিভাশালী পুরুষ, যিনি রয়টার সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের অধিনায়ক। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না, রয়টার প্রতিনিধিরা ইরানী সত্যকে কেন বরাবর কবর দিয়ে এসেছেন।

শুধু তেল নয়, ক্রমশ ইরানের সমস্ত অর্থনীতির গোড়ায় ঘাঁটি হয়ে বসল লণ্ডন। ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য কোনো ব্যাঙ্ক রইল না একদার এই মহাপ্রাচীন সভ্য দেশে। সেক্রেটারিয়েটের প্রতিটি বিভাগে জেঁকে বসল ইংরেজ পরামর্শদাতা। অ্যাডভাইসার।

এইসব জবরদখলের আগে মহাত্মা গান্ধীর জন্মের দশ বছর পরে জন্মেছিলেন মহম্মদ মোসাদ্দেক। বাপ মির্জা হিদায়েত ছিলেন জবরদস্ত জমিদার। মা নাদিম, নীলরক্তের রাজকুমারী। তেহরান থেকে মাত্র ষাট মাইল দূরে অহমেদাবাদে ও'দের জমিদারি। বাড়িতে প্রায় এক শো-টা পেল্লায় পেল্লায় শোবার ঘর। আর এক শো-জন বাঁদী। মেয়ে-মহলের শোবার ঘরের দরজায় দরজায় খোজাদের পাহারা। পারস্য দেশটা আরব নয়, কিন্তু "আরব্য উপন্যাসের" সত্তরভাগ কাহিনী এই ইরানের; বিখ্যাত ঘুমপাড়ানো-কাহিনীর আলিবাবা ইসপাহানের। অহমেদাবাদ থেকে সকালে বেরিয়ে মুড়ি চিবোতে চিবোতে আমি ইস্পাহানে পৌঁছেছিলাম; সঙ্গে আর কেউ ছিল কি না ও কথা কেউ জিজ্ঞেস করবেন না।

মোহম্মদ মোসাদ্দেক

নিজের বালকাবস্থা সম্বন্ধে মোসাদ্দেক লিখেছেন, 'তখন আমি বড় একলা ছিলাম।' ও'র বড় ছেলে ডঃ গুলাম হুসেন মোসাদ্দেক আমাকে বলেছিলেন, 'আমার বাবাকে ইংরেজরা পাগল বলত, কিন্তু কে পাগল তার সাক্ষী আজকের ইরান।'

মোসাদ্দেক যা যা চেয়েছিলেন অল্প-বিস্তর তার সবই বাস্তবে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছে ইরানে; অথচ যাঁর জন্য ইরানের নবজাগরণ, সেই তিনিই কড়া পাহারায় থেকে ৮৮ বছর বয়সে গত হলেন।

মোসাদ্দেকও লেখাপড়া সেরে এক রাজ-

কুমারীকে শাদি করেছিলেন, জলজ্যান্ত রাজকুমারী। এবং যথাসময়ে সরকারী চাকরি নিয়েছিলেন। টাকার প্রয়োজনে নয়। সময় কাটানোর জন্য।

এর পরে যা ঘটল তা নিয়ে আধুনিকতম আরব্য উপন্যাস।

জুড়িগাড়িতে করে আপিস করতেন তেহরানে, সে জুড়িগাড়ি ছেড়ে পয়দল যাওয়া-আসা শুরু করলেন মোসাদ্দেক। ধনী সাঙ্গোপাঙ্গদের বিদায় দিলেন, ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বস্তিবাসীদের সঙ্গে দোস্তানায় সুবিধে হবে বলে।

তারপর দশ বছর চাকরির পর একদিন আপিসের বড়কর্তাকে বলে বসলেন, 'আমাকে ফারিস্থানে বদলি করে দিন; নইলে এই রইল আমার ইস্তফা।

ফারিস্থান প্রদেশে আবাদান। সে এলাকায় তখন ইংরেজদের ভবিষ্যৎ এবং ভাগ্যলক্ষ্মীর আরাধনা চলেছে।

বদলি হল না। সুতরাং পত্রপাঠ চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরে পরীর মতন সুন্দরী স্ত্রীকে রেখে মোসাদ্দেক চলে গেলেন প্যারিসে। ব্রাসেলস-এ। সুইজারল্যান্ডে। শেষোক্ত দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের

ডক্টরেট নিয়ে স্বদেশে ফিরলেন। তখন অর্থনৈতিক ব্যাপারের আইন-কানুন সম্পর্কে একটা কমিটি বসেছিল সেই কমিটিতে কাজ করলেন বছরখানেক। পরে নিযুক্ত হলেন মিনিস্ট্রি অব জাস্টিসে। আবাদানের কি একটা কেস নিয়ে মতানৈক্য হয়। চলে গেলেন মোসাদ্দেক ছুটি নিয়ে ইউরোপ। ফিরে এলেন আজারবায়জানের গভর্নর জেনারেল হয়ে। কিছুকালের মধ্যে গেলেন সেই ফারিস্থানে। গভর্নর-জেনারেল হয়ে। নিজ চক্ষে দেখলেন চিচিং ফাঁকের গুহা। স্বর্ণকুম্ভের সরোবর। নিজের চোখে দেখা জিনিসও বিশ্বাস হয় না। আলাদিনের প্রদীপ ঘষে দানব বেরিয়ে কি মহাযজ্ঞ বাধিয়েছে কে জানত, বিংশ শতাব্দীর পারস্যেও কাঁড়ি কাঁড়ি এত এত নিষ্কর পিদিম, আর এই গলিত সোনার অতল কালো সমুদ্র!

অথচ পিদিমের তলায় অলক্ষ্মীর দশা!

এইখান থেকে শুরু হল ইংরেজী কারবারীদের সঙ্গে মোসাদ্দেকের মোলাকাত।

এবার মোসাদ্দেক নিযুক্ত হলেন অর্থ-মন্ত্রী। হয়ে তলে তলে তেল কোম্পানির লাভের হিসেব দেখলেন। আইনত তেল কোম্পানি ইরানী রাষ্ট্রের মধ্যে আর একটা স্বাধীন রাজ্য। এমন কি, কোম্পানির ত্রি-সীমানায় খুনজখম গুম ইত্যাদির তদারক করার ক্ষমতাও পারস্য সরকারের নেই। ইনকাম ট্যাক্স? সেটা কী বস্তু?

১৯২৭ সনে মোসাদ্দেক হলেন আইন-মন্ত্রী। তখন ও'র বয়স মাত্র চুয়াল্লিশ। ইতিমধ্যে উনি ইরানের অর্থনীতি বিষয়ে খানকতক গ্রন্থাদিও লিখে ফেলেছেন। তাতে ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক আর তেল বাণিজ্য নিয়ে গুটিকয়েক মন্তব্য ছিল। দেশের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে মোসাদ্দেক রাতারাতি একটা স্মরণীয় নাম হয়ে গেল। তখন আইন-মন্ত্রীকে তলব করে বাদশাহ বললেন, 'তোমার ভালোর জন্যই বলছি, তুমি ইস্তফা দাও, গিয়ে নিজের গ্রামে গিয়ে থাকো।'

শাহানশাহের পবিত্র হুকুম। সুতরাং এলেন মোসাদ্দেক আপন জমিদারিতে।

এলাহি জমিদারি। দেশে তখন মানুষ হয় জমিদার, নয় চাষী প্রজা। যাদের প্রায় ক্রীত-দাসের হাল। মাঝখানে কিছু ছুটকো ব্যাপারী, কিছু কেরানী, আর দাসদাসী। হিন্দুস্থানের মতন সাধুসন্ত-ভিখিরির সংখ্যা নেহাত কম নয়।

জমিদারির প্রায় অর্ধেকটা প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

এ এক চাঞ্চল্যকর বুক-ফাটা ঘটনা। এমন কাণ্ড করেছিলেন রাশিয়াতে টলস্টয়।

তাঁর সংস্পর্শে [illegible] মোসাদ্দেক। মাথায় [illegible] টাক। [illegible] মুখ। [illegible] চোখ। [illegible]। নাক আর্য।

টলস্টয়েরই মতন সংক্ষেপে থাকতে শিখে নিয়েছেন ডক্টর মহম্মদ মোসাদ্দেক।

গ্রামে এসে উনি একদম গ্রামীণ মানুষের মতন থাকতে লাগলেন। গুটিকয়েক ইংরেজ "বন্ধু" এখন ও'র কাছে যাওয়া-আসা শুরু করে দিল। ফলে হঠাৎ যে উনি কি অসুখে পড়লেন কেউ বুঝতে পারল না। রাজধানী তেহরানে যাওয়া নিষেধ। কাজেই মোসাদ্দেক ইউরোপে গেলেন চিকিৎসার জন্য। যখন ফিরে এলেন তখন হাতে পড়ল হাতকড়া।

কারাবাস।

ব্রিটিশ আঁতে ঘা দিলে এই হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলাফলের প্রসারে ইরানী মানুষও জাগতে লেগেছে। ইংরেজ পরামর্শদাতাদের [illegible] এবার সরকারী বিভাগে বিভাগে আমেরিকান অ্যাডভাইসরের পালা। ডলারও দানা আছে। আমেরিকান ফিন্যানশিয়ারের [illegible] তখন তেহরানে ঘাটি গেড়ে বসেছে। সালটা ১৯৪৫ সন। ডক্টর মহম্মদ মোসাদ্দেক জেলখানা থেকেই সরকারকে চিঠি পাঠালেন, 'আমেরিকান মিশনের অধিকর্তা আর্থার মিলস্পকে সরাতে হবে।'

ইংরেজ তো মহাখুশী।

তাই মুক্তি পেলেন মোসাদ্দেক। হলেন পার্লামেন্টের সদস্য। ১৯৪৫, ৬ই মার্চ তারিখে পার্লামেন্টে উনি বললেন, 'এই পার্লামেন্ট হল গিয়ে ডাকাতদের আস্তানা। আমি এটা হাতে হাতে প্রমাণ করব।'

তেল কোম্পানির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। তার দুধ সব এল পি-রাই চেখে চেখে যায়। এটা ওদের প্রাপ্য।

আর একদিন মোসাদ্দেক বললেন, 'ব্রিটিশ তেল কোম্পানিকে ন্যাশন্যালাইজ করতে হবে। যতদিন ন্যাশন্যালাইজ না হবে ততদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় লোকসান দৈনিক তিন লক্ষ পাউন্ড।'

আর যায় কোথা!

কিন্তু কে কার তোয়াক্কা করে। রাষ্ট্রের সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদার শাহেনশাহকেও ঘা দিয়ে বসলেন মোসাদ্দেক। 'জমিদারি প্রথা সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে। জমি তার, যে চাষ করবে।'

দেশের এক-চতুর্থাংশ জমিই বাদশার। মাথার উপর আশমানে দিলদুনিয়ার মালিক, জমিন রাজাদেরও—রাজা শাহেনশার। এমন কি তেলের কোম্পানিও দরবারে ঝাঁকড়-ঝাঁকড় মণিমুক্তা নজরানা দেয়। পরে নতুন বাদশার বিয়েতে কোম্পানি ৫০০,০০০ পাউন্ড নগদ টাকাই সোনার গিনিতে থেকে থোকে দিয়েছিল। পাঁচ লক্ষ পাউন্ড।

মোসাদ্দেকের এই সব [illegible] পর ইরানের রাজনৈতিক ও [illegible] এখন থেকে [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] ইরান [illegible] [illegible] [illegible] এখন

থেকে আর সে আগেকার পুরোনো ভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না। গামাল নাসের তখনও সামান্য এবং অখ্যাত সৈনিক ব্যভিচারী ফারুকের রাজ্যে। কুয়েতে কোয়াতের শেইখ-এর চক্ষু ছানাবড়া। শিগ্গিরি উনি ফুলেফেঁপে উঠবেন অর্বুদ-অর্বুদ টাকার বৃষ্টিতে। ইরাকের নুরি সাইদ তখনও জানেন না ও-দেশে আসবে কংলে-আম; সাউদি আরবের দাসবাজারে তখনও হল্লা ওঠেনি যে, ওদের বাদশা সলামত এবার হয়ে উঠবেন ধনকুবেরের চাচা। তখনও কেউ জানে না ইংরেজ তেলবণিকের অবস্থা কীচকবধের মত হবে, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ইংরেজী রাজ্যে নামবে সন্ধ্যা।

নামল সন্ধ্যা। মোসাদ্দেক-এর মুখ দুধের টাকা [illegible] বন্ধ করা গেল না। "[illegible] বাড়ী" যে। ইস্পাহানের রাস্তায়, তেহরানের পথে পথে, [illegible] [illegible] চায়খানায় তখন [illegible] ইরানী [illegible] মানুষের জোরজৌর আরম্ভ হয়ে গেছে, 'ওজিরে মালেক। ওজিরে মালিক...।'

তিরাশির [illegible] [illegible] [illegible]

মোসাদ্দেককে অবশেষে "মস্ত্রে খাজির", প্রধানমন্ত্রী করতেই হল। নইলে যে বসে গদিতে তাকেই কোতল।

এর পরের ঘটনা অত্যন্ত হালের। তাই আর লিখলাম না। কিভাবে নববধূ সুরাইয়াকে নিয়ে শাহেনশা দেশ ছেড়ে পালাতে পর্যন্ত বাধ্য হলেন, কিভাবে মোসাদ্দেককে বিশ্বাসঘাতকতা করল জেনারেল জাহেদি, কি করে রাজা আবার দেশে ফিরে এলেন, কেন রানী সুরাইয়া স্বামী-পরিত্যক্তা হলেন এসব অন্য কাহিনী।

মোসাদ্দেকের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। রানী সুরাইয়া বাদশাকে জিজ্ঞেস করেন, 'সত্যিই কী ওঁকে ফাঁসি দেবে?'

ফাঁসি হলো না।

পরিত্যক্তা অপূর্ব সুন্দরী রানী লিখিত-ভাবে জানিয়েছেন, উনিও প্রচণ্ড গুজব শুনেছেন, আমেরিকান ইনটেলিজেন্স, সি আই এ মোসাদ্দেক-উচ্ছেদের মূলে ছিল।

পরিত্যক্তা রানীকে রোমের এক হোটেলে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, ফাঁসিকাঠে মোসাদ্দেককে কেন ঝোলালেন না বাদশাহ?

তাতে সুরাইয়া বলেছিলেন, 'বাদশাও ওঁকে ভালোবাসতেন।'

চীনযুদ্ধে পরাজয়ের দায়িত্ব

গত ২৬ ফাল্গুনের দেশ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর "চীন-যুদ্ধে পরাজয়ের দায়িত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্যায় পড়িয়া অত্যন্ত অসহায় বোধ হইতেছে। লেখক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক। অথচ নেহরু সম্বন্ধে তিনি যেসকল মন্তব্য করিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠা হয়। তাই এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি করিতে হইল।

জেনারেল কলের 'আনটোল্ড স্টোরী' পড়িয়া লেখকের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, ১। চীনের সহিত ভারতের কি সম্পর্ক হইতে পারে তাহা স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া তিনি (নেহরু) কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, যখন যাহা সুবিধা তাহাই করিয়াছেন, ২। চীন-যুদ্ধের আয়োজন-উদ্যোগ সম্বন্ধে তিনি কোন সংবাদ লইবার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, ৩। নিজে চীনের সহিত মিত্রতা রাখার সপক্ষে হইলেও জনপ্রিয়তা অর্জন করিবার জন্য বিনা বিচারে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছেন।

আন্তর্জাতিক সমস্ত সমস্যা বিনা যুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে মিটাইয়া ফেলিবার প্রবল প্রবণতা নেহরুর মধ্যে ছিল—বিশেষ করিয়া চীনের সংগে। চীন বলপূর্বক ভারতের জমি দখল করিতে পারে এই বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। তাঁহার বৈদেশিক দূতগণ, বৈদেশিক বন্ধুগণ এবং মন্ত্রীরা অনেকে তাঁহার এই বিশ্বাসে সহায়তা করিয়াছিল। এমন কি, জেনারেল কলও ১৯৬২-র প্রথমার্ধে বিশ্বাস করিতেন না যে, চীন ভারত আক্রমণ করিতে পারে। প্রেসিডেন্ট কেনেডির বিশেষ দূত চেস্টার বোলসের নিকট তিনি এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। ১৯৬২-র পূর্ব পর্যন্ত চীনের সহিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই তাঁহার দৃঢ় সিদ্ধান্ত ছিল। জনমতের ভয়ে তিনি তাহা বিসর্জন দেন নাই। তখনই তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত বর্জন করিয়াছিলেন যখন সমস্ত বিশ্বাস, বন্ধুত্ব এবং আলোচনা ভাঙিয়া দিয়া চীন ভারতের মধ্যে শিবির স্থাপন করিয়া ভারতীয় চেকপোস্টগুলি অবরোধ করিয়াছিল এবং "ইয়ে জমি হামারা হ্যায়" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। নেহরুর আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ ঘোষণা চীনের এই কার্যেরই অনিবার্য এবং গত্যন্তরহীন পরিণতি। ইহার মধ্যে বিবেকবুদ্ধি হারাইবার প্রশ্ন নাই। সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টাও নাই। বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হইবার দুঃসাহস আছে।

যুদ্ধের আয়োজন ও উদ্যোগ সম্বন্ধে সংবাদ লইতে নেহরু উৎসাহ বোধ করেন নাই—এই কথার সত্যতা অন্তত জেনারেল কলের বই হইতে প্রমাণ করা যায় না। সেখানে আমরা দেখি, প্রধান সেনাপতি থাপার সহ অন্যান্য সেনাপতিদের সঙ্গে, বিশেষ করিয়া জেনারেল কলের সঙ্গে নেহরু যুদ্ধ ও যুদ্ধের গতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। প্রাইভেট সেক্টারে যুদ্ধসরঞ্জাম প্রস্তুত করা উচিত কিনা, বিদেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করা উচিত কিনা, মিত্র বিমান বাহিনী হইতে আনা যুক্তিযুক্ত কিনা প্রভৃতি সমস্যা সম্বন্ধে তিনি অনুসন্ধিৎসা ও মতামত প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে; কিন্তু যুদ্ধ-প্রস্তুতির ব্যাপারে তাঁহার আগ্রহ নাই, এমন অভিযোগ টিঁকিতে পারে না।

সেনাপতি কলের আর একটি মন্তব্য তুলিয়া নীরদবাবু নেহরুকে অপদস্থ করিয়াছেন। ১১ অক্টোবর রাত্রিতে নেহরু কলকে বলেন—চীনাদের আক্রমণ করিতে হইবে না; ভারতীয় ঘাঁটিগুলিকে আপাতত রক্ষা করতে হইবে। কয়েক ঘণ্টা পরে সিংহল যাইবার প্রাক্কালে নেহরু ঘোষণা করেন—চীনাদের ভারত হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য আমি আমার সেনাবাহিনীকে আদেশ দিয়াছি। এই দুই আদেশের মধ্যে গুরুতর অসামঞ্জস্য আছে মনে করিয়া নীরদবাবু নেহরুকে অস্থিরমস্তিষ্ক এবং মিথ্যা দ্বারা জনপ্রিয়তালিপ্সু সস্তা রাজনৈতিক নেতা বলিয়া কটূক্তি করিয়াছেন। ইহাও যুক্তিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

চীনাবাহিনীকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দিবার সিদ্ধান্ত ১২ অক্টোবরের বহু পূর্বে লওয়া হইয়াছিল। ৯ সেপ্টেম্বর হইতে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে একাধিকবার এই আদেশ জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৮ সেপ্টেম্বর একটি প্রেস কনফারেন্সেও এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছিল। অতএব ১২ অক্টোবর নেহরু যাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা নূতন কিছু নহে; [illegible] চীনা [illegible] যায়। ১১ অক্টোবর রাত্রিতে যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা অবস্থা বিবেচনায় একটি সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। কল কর্তৃক বর্ণিত নেহরুর কথার মধ্যেই ইহার আভাস পাওয়া যায়।

If odds were against us and if I (General Kaul) as the commander of the spot felt as I did he (Nehru) agreed that instead of attacking the Chinese under the circumstances we should hold on to our present positions.

সামরিক দৃষ্টিকোণে লক্ষ্য করিয়া [illegible] নীরদবাবু [illegible] ভুল করিয়াছেন।

এইবার নীরদবাবুর "কনটিনেন্ট অব সার্স"'র মন্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। স্টেটসম্যানে ১২ অক্টোবরের ঘোষণা পড়িয়া হতভম্ব নীরদবাবুর মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল: ১। ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী আক্রমণ করিবার আদেশ পাইবার পরও চীনাদের আক্রমণে বিস্মিত হইল? ২। এই অবস্থায় চীনাদের বিরুদ্ধে কি করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা যায়? ৩। সেনাবাহিনী কেন নির্দেশ মানিয়া আক্রমণ করে নাই? ৪। ভারতের প্রধানমন্ত্রীই বা কেন নির্দেশের উপর কার্য হইবার পূর্বেই সেই নির্দেশ সাধারণে প্রকাশ করিয়াছিলেন?

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ভারতীয় সেনাবাহিনী যদি আদৌ চীনা আক্রমণে বিস্মিত হইয়া থাকে তবে তাহা হইয়াছিল ১২ অক্টোবরের অনেক পূর্বে, এবং অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে। আকসাই চীনের কথা বাদ দিলেও ১৯৬২ সালের ১০ জুলাই চীনারা লাডাকে আমাদের গালোয়ানস্থিত চৌকি পরিবেষ্টন করিয়া যাহা করিয়াছিল, সেনাপতি কল স্বয়ংই তাহাকে আক্রমণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নেফাতে নামকাচু নদীর দক্ষিণ তীরে ভুটান-ভারত সীমান্তে আমরা ধোলাতে যে ঘাটি তৈয়ার করিয়াছিলাম, ৮ সেপ্টেম্বর চীনারা তাহা আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ দ্বারা ঘেরাও করিয়াছিল। নদীর উত্তর তীরে থাগলা অঞ্চলে ইতিমধ্যেই তাহারা প্রচুর সৈন্য-সমাবেশ করিয়াছিল। ধোলার নিকটবর্তী পুলগুলি তাহারা ধ্বংস করিয়াছিল। ২০ সেপ্টেম্বর চীনা প্রহরীরা গ্রিনেড নিক্ষেপ করিয়া আমাদের প্রহরী সৈন্যদিগকে আহত করিয়াছিল এবং প্রথম অস্ত্রনিক্ষেপের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। এই অবস্থায়ও কি চীনাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনয়ন করা যায় না অথবা তাহাদিগকে আক্রমণকারী বলিয়া অভিযুক্ত করা যায় না? ১৩ তারিখের স্টেটসম্যান পত্রিকায় যে সংবাদ বাহির হইয়াছিল তাহাতেও যাহাদিগকে ধাক্কা দিয়া ভারত হইতে বাহির করিয়া দিবার হুকুম নেহরু দিয়াছিলেন তাহারা "চীনা আক্রমণকারী"। নেহরুকে কটাক্ষ করিবার প্রয়াসে নীরদবাবু "আক্রমণকারী" কথাটির অর্থ অনুধাবন করেন নাই।

আক্রমণের জন্য নহে, চীনাদের তাড়াইবার জন্য সরকারী আদেশ ভারতীয় সেনাবাহিনী একেবারেই পালন করে নাই এ কথা ঠিক নহে। জেনারেল কলের নেফায় আবির্ভাবের পূর্বেই ভারতীয় বাহিনী নামকাচু নদীর উত্তর তীরে [illegible] চলিয়া গিয়াছিল এবং [illegible] ও [illegible] অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু [illegible] স্টোরী' পড়িয়া এই ধারণাই হয় যে, সেনাপতি কল, উমরাও সিং, নিরঞ্জন প্রসাদ এবং সেনের অতিরিক্ত স্বাতন্ত্র্য-[illegible] হইয়াছিল, [illegible] ভারতীয় বাহিনীর অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হইয়াছিল।

[illegible] অভিযোগটি একান্তই অবান্তর। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, ১২ অক্টোবর নেহরুর ঘোষণার অনেক পূর্বেই [illegible] অনুরূপ ঘোষণা সেনাবাহিনীতে প্রচার করা হইয়াছিল এবং ঐ আদেশ কার্যকরী করার প্রচেষ্টাও ঘোষণার পূর্বেই যথা-সীমিতভাবে চলিতেছিল।

মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়
মানিকপাড়া, মেদিনীপুর

[দুই]

গত কয়েক সপ্তাহব্যাপী "দেশ" পত্রিকায় নিয়মিতভাবে চীন-যুদ্ধে পরাজয়ের দায়িত্ব সম্বন্ধে পড়ছি। পড়ে খুব ভাল লাগছে।

লেখক নীরদচন্দ্র চৌধুরী যেভাবে নেহরুর যুদ্ধ ব্যাপারে অব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন তা সত্যিই অভূতপূর্ব; আমাদের কাছে এক অজানা অমূল্য তথ্য উন্মোচন করেছেন। এজন্য লেখক ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ভাবতেই পারিনি, নেহরুর মত একজন আন্তর্জাতিক রাজ-নৈতিক বিশারদ যুদ্ধ সম্বন্ধে এরকম অনভিজ্ঞ ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করবেন। লেখক এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, 'এ ধরনের প্রবন্ধ লেখা বা তর্ক করার জন্য অনেক জায়গায় গালাগালি খেতে হয়েছে।' আমি এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি, যাঁরা গালাগালি দিয়ে থাকেন বা তর্ক করেন, তাঁদের কোন সুষ্ঠু চিন্তাধারা বা কোন কিছু সম্বন্ধে দোষ গুণ বিচার করবার শক্তি নেই, তাঁরা হুজুগে মেতে ওঠেন।

পরিমল বিশ্বাস
গৌহাটি-১১

ওয়াশিংটনের চিঠি

(১৮ মার্চ) 'দেশ' পত্রিকার জহুরী সদাশয়ের 'ওয়াশিংটনের চিঠি' পড়ে আমি তাঁকে একটি প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক। উপর্যুক্ত রচনায় তিনি এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন:

"ভারত সম্পর্কে এই হাফজান্তা গ্রন্থ রচনা আর অর্ধসত্য প্রচারই, আমার মতে, ভারতের প্রতি বিদেশের ধারণা খারাপ করে দিচ্ছে। আর কিছু কিছু [illegible] ভারতীয় লেখক এ ব্যাপারে [illegible]। [illegible] দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

ভারতে সদ্য অনুষ্ঠিত গোহত্যা-পাগলামিকে কেন্দ্র করে লিখে 'নিউ ইয়র্ক টাইমসে'র এক সংখ্যায় বাজিমাত করেছেন।"

শ্রীসদাগরকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, তিনি ওয়াশিংটনে বসে এই "ব্যঙ্গাত্মক" রচনাটি পড়ার পর 'নিউইয়র্ক' টাইমস্ পত্রিকায় 'ভারত দর্শন' (তাঁর মতে) তুলে ধরার জন্য 'নিউইয়র্ক' টাইমসে কোনো প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন কিনা। যদি না পাঠিয়ে থাকেন তা হলে সুদূর ওয়াশিংটন থেকে কলকাতায় একটি বাংলা পত্রিকায় এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করারই বা তাঁর অধিকার কোথায়?

ঐ রচনার অন্যত্র তিনি বলছেন:

"কাগজে, টি ভি-তে, মুভিতে, ভারত বলতেই কেবল রাজস্থানের মরুপল্লীতে একটা টিউবওয়েল, আবক্ষলম্বিত ঘোমটায় কুণ্ঠিতা, বিড়ম্বিতা নারী, খাপরার চালের নিচে আধমরা গরু, অসহায় অর্ধনগ্ন শিশুর বোবা চাউনি, আর খিদে...গম...অনাবৃষ্টি...মার্কিন দান...আর কাঁহাতক সহ্য হয়।"

সহ্য না হবারই কথা। উচ্চবিত্ত পরিবারের যেসব সন্তান আজ প্রবাসী, শ্রীসদাগরের মত তাঁরা হয়তো বুঝতে চাইবেন না যে, দিল্লি-বোম্বে-কলকাতা-মাদ্রাজ-এর চেহারাটাই সত্যিকারের ভারতবর্ষের চেহারা নয়। কিন্তু আমরা যারা শ্রীসদাগরের মতো সৌভাগ্যবান নই, তারা জানি, "রাজস্থানের মরুপল্লীর একটি টিউবওয়েল, খাপরার চালের নিচে আধমরা গরু অথবা অসহায় অর্ধনগ্ন শিশুর বোবা চাউনি আর খিদে... অনাবৃষ্টি" কত সত্যি।

আসাম বাংলা বিহার রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে আমার এ সত্যের উপলব্ধি হয়েছে বলেই আজ এ চিঠির অবতারণা।

অসিতাভ ঘোষ
বিকানীর, রাজস্থান

ইছাপুরী টোটা

'দেশ' পত্রিকা ত্রিলোচন কলমচির "নিকট-দূর" ধারাবাহিকরূপে বের হচ্ছে। নিয়মিত পাঠকগণের মধ্যে আমিও একজন। কিন্তু ২১নং সংখ্যায় তিনি "ইছাপুরী টোটা"র (?) সম্বন্ধে তাঁর যে বিশেষ (?) অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখেছেন তা পড়ে আমার মত অর্বাচীন পাঠকও লজ্জিত। তাঁর বক্তব্য থেকেই কিছুটা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। "...এবার আবিষ্কার আই ও এক কার্তুজ। সবাই জানেন, ইছাপুরী টোটার ইছাপুরের অনেক সময়েই হয় না। এই ভারতীয় আইনে কার্তুজ অনেক সময়েই ফাটে না, ফলে নিরাপত্তার জন্য অনেক ফেলে দিতে হয়।" (পৃঃ ৭৮৪) আবার "ইছাপুরী বুলেটে ব্যর্থ হয়ে তিনি উড়নচণ্ডীর মতন তাঁর সমস্ত ওলন্ড পৌঁক কাবার করে আনলেন।" (পৃঃ ৭৮৫), লেখক দূরে রসিকজনের মতনই "ইছাপুরী টোটা"কে (?) উপহাস করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর জানা উচিত ছিল যে, "ইছাপুরী টোটা" বা "ইছাপুরী বুলেট" বলে কিছু নেই, এবং ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে ওটা কখনই তৈরী হয় না।

অরুণিমা সান্যাল
ব্যারাকপুর

বানান সংস্কার

বাংলা ভাষায় বৈদেশিক শব্দের বানানে আনন্দবাজার পত্রিকা এক নূতন রীতি প্রবর্তন করিয়াছেন। আচার্য সুনীতিকুমার এই বানান-রীতি সমর্থন করিতে পারেন নাই। দেশ পত্রিকার ৩৪ বর্ষ, ১৪ সংখ্যায় এই বিষয়ে তিনি তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিয়াছেন। 'নিবেদন' শব্দটি আমরা বিশেষ অর্থেই ব্যবহার করিতেছি। কারণ, বাক্-তত্ত্ব আলোচনায় যে তাঁহার কিঞ্চিৎ অধিকার আছে, এই কথাটিই জ্ঞাপন করিবার জন্য এক দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া প্রয়োজনাতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন। সুনীতিকুমার বিশ্ববিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক—শিক্ষিত বাঙালীর কাছে তাঁহার পরিচয় অনাবশ্যক। তথাপি তিনি নিজ পরিচয় ব্যক্ত করিয়া ভূমিকা করিতেছেন, 'এই নূতন পদ্ধতির সমালোচনায় আমার বিনীত প্রতিবাদ নিবেদন করিতেছি।'

দেশ পত্রিকার ঠিক পরবর্তী সংখ্যাতেই (৩৪ বর্ষ—১৫ সংখ্যা) সুনীতিকুমারের প্রবন্ধের এক সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সমালোচক শ্রীযুক্ত অমিতাভ চৌধুরী। সমালোচনার ভাব, ভঙ্গি, ভাষা এবং প্রবন্ধ প্রকাশের আশাতীত দ্রুতি দেখিয়া অনুমান করি, শ্রীযুক্ত অমিতাভ চৌধুরী আনন্দবাজার পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট এক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং এই বানান-সংস্কারেও তাঁহার বিশিষ্ট ভূমিকা থাকিতে পারে।

ভাষাতাত্ত্বিকরূপে সুনীতিকুমার কেবল বিশ্ববিখ্যাত নহেন, বিশ্ববরেণ্য। এই শ্রদ্ধেয় বর্ষীয়ান আচার্যের সহিত ভাষা-বিচারে প্রবৃত্ত ব্যক্তি যত বড় পণ্ডিতই হউন, তাঁহার ভাষায় সম্ভ্রমবোধ ও সংযম থাকিবে, ইহাই সাধারণ লোকে আশা করে। আমরা শ্রীযুক্ত চৌধুরীর ভাষায় সেই শালীনতার অভাব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছি।

আনন্দবাজার পত্রিকা নাকি ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি সময়ে নূতন বানান প্রবর্তন করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামত আহ্বান করিয়াছিলেন। সুনীতিবাবু

উপর তেমন আস্থা রেখে নাই, এই অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন। তখন বোধ হয় কেহ কেহ প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। অমিতাভ-বাবুর বিচারে সে-সমস্ত সাধারণ কিছু লোকের মুখে ইইচই এবং কয়েকটি কাগজের চ্যাঁচামেচি। 'একমাত্র ব্যতিক্রম অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন'—কারণ, বোধ হয় তিনি বানান-সংস্কারে আনন্দবাজারের নূতন চেষ্টাকে অভিনন্দন' করিয়াছিলেন।

মূল বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ—অতএব আলোচনাযোগ্য। আলোচনার কারণ সুনীতিবাবুর ভাষায় পরিষ্কার ব্যক্ত হইয়াছে। "'আনন্দবাজার পত্রিকা' বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য, এবং বহু বৎসর ধরিয়া 'আনন্দবাজার' পত্রকারিতার মাধ্যমে বাংলা ভাষার অতন্দ্র সেবা করিয়া আসিয়াছে।" অর্থাৎ বাংলা ভাষাভাষীর উপর আনন্দবাজার পত্রিকার প্রভাব বিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ আছে। সুনীতি-বাবু যদি আনন্দবাজারের বানান-সংস্কার সমর্থন না করিয়া "এই নূতন রীতি চালু হওয়ার দীর্ঘ দেড় বছর" পরই তাঁহার সুচিন্তিত মতামত জানাইয়া থাকেন, তিনি এমন কিছু অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি না। বাংলা একটি জীবন্ত ভাষা। সুতরাং ইহার প্রকাশভঙ্গিতে অহরহ পরিবর্তন ঘটিবে—এ কথা সুনীতিবাবু ভূমিকাতে জানাইয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "মানুষের মধ্যে উদ্ভূত কোনও কিছু পরিপূর্ণ বা নির্দোষ নহে।" এই-সমস্ত কথার মধ্যেই স্বীকৃতি আছে যে, যুগে যুগে সংস্কারক আসিবেন এবং সংস্কার-প্রচেষ্টা করিবেন। সংস্কার-প্রচেষ্টা নিন্দনীয় নহে। বাংলা বানানে হ্রস্ব-দীর্ঘ, এ-কার ও-কার, জ-য, ণ-ন, শ-ষ-স প্রভৃতি লইয়া আলাপ-আলোচনা শত বৎসর ধরিয়া চলিতেছে, নানা প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হইতেছে। ধ্বনি-তত্ত্ব বিচার করিয়া আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় 'আজ, কাল'-এর বানান লিখিতেন 'আজ, কাল'। সে বানান কেহ গ্রহণ করে নাই। সম্পাদক-প্রবর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কিছুকাল যাবৎ প্রবাসীতে 'খাওয়া, যাওয়া' লিখিতেন স্বরবর্ণ ও-কারের সঙ্গে স্বরবর্ণ আ-কার সংযুক্ত করিয়া 'খাওা, যাওা'। সে বানান চলে নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার নাটকে 'কর্ম্ম, ধর্ম্ম, মর্ত্তে, পার্ত্তে' প্রভৃতি বানানের চমক লাগাইয়া দুই-চারিটি তরুণের মনে 'বোতুন কিছু করো'র নেশা ধরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। এই-সমস্ত সংস্কারকের প্রচারক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ। কিন্তু আনন্দবাজারের প্রচার-পরিধি ব্যাপক—তদ্ব্যতীত সে-যুগ অপেক্ষা এ-যুগে নূতনত্বের মোহ হয়তো বা কিছু বেশীই। এইজন্য আনন্দবাজার-প্রবর্তিত বানান সমর্থনযোগ্য না হইলে বিলম্বেও তাহার প্রতিবাদ আবশ্যক। যদিও এখন পর্যন্ত আনন্দবাজারের নূতন পদ্ধতি বাঙালী লেখকেরা গ্রহণ করেন নাই, তথাপি বিনা প্রতিবাদে এই বানান বেশী দিন চলিতে থাকিলে ব্যাধি সংক্রামক হইতে পারে।

আনন্দবাজারের সংস্কার ঠিক বানান-সংস্কার নহে, ইহা একপ্রকার লিপি-সংস্কার। বাংলা ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য যুক্তাক্ষর। আনন্দবাজার এই যুক্তাক্ষর ভাঙার কাজে লাগিয়াছেন। সব যুক্তাক্ষর ভাঙিতেছেন না—সম্প্রতি অতৎসম শব্দের অক্ষর ভাঙিতেছেন। অমিতাভবাবু ইঙ্গিত করিয়াছেন, "শুধু অতৎসম নয়, ভবিষ্যতে দু-একটি সংস্কৃত শব্দেরও যুক্তাক্ষর ভাঙা যেতে পারে।" অর্থাৎ মনোগত অভিপ্রায় সমস্ত শব্দের যুক্তাক্ষর ভাঙা। পূর্ব-প্রস্তুতি ব্যতীত এই কাজ সহজসাধ্য নহে—সুতরাং প্রথমে অতৎসম শব্দে হাত দেওয়া হইয়াছে, ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া যাইবে। তবে কাজটিকে যতটা সম্ভাবনাপূর্ণ বলিয়া মনে করা হইতেছে, ইহা ততটা সম্ভাব্য নহে। এখন পর্যন্ত সমস্ত তদ্ভব ও অর্ধ-তৎসম শব্দেই হাত দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এমন কি, বৈদেশিক শব্দেরও আদ্যক্ষরটি যুক্তবর্ণ হইলে তাহা ভাঙা যাইতেছে না, শব্দাভ্যন্তরে র-ফলা থাকিলে তাহাও সর্বত্র ভাঙা হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় যাবতীয় অতৎসম তথা য-ফলা, র-ফলা, ব-ফলা সমন্বিত সন্ধিসমাসবহুল দীর্ঘায়ত তৎসম শব্দ যুক্তাক্ষরবর্জিত হইতে পারে এইরূপ কল্পনার মূলে কী যুক্তি থাকিতে পারে, জানি না। সম্পূর্ণ নূতন ভাষা সৃষ্টি না করিলে তৎসম শব্দকে যে কদাপি যুক্তাক্ষরমুক্ত করিতে পারা যাইবে না, দুই-একটি অতি পরিচিত ক্ষুদ্রাকৃতন শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়াই তাহা দেখানো যাইতে পারে। নূতন নিয়মে 'অত্যন্ত' শব্দের বানান হইবে 'অতযনত'; 'হ্রস্ব' হইবে 'হরসব'। ক্ষুদ্র শব্দেরই যদি এই দশা হয়, বৃহৎ শব্দের অবস্থা কী হইবে সহজেই অনুমেয়! সর্বাধিক শব্দের যুক্তাক্ষর ভাঙা যদি সম্ভবই না হয়, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শব্দে যুক্তাক্ষর আর পঞ্চাশ ভাগ শব্দে অযুক্তাক্ষর রাখিলে মুদ্রাযন্ত্রেরই বা কী সুবিধা হয়, বুঝিতেছি না। কেবল টাইপ-রাইটারের সুব্যবস্থার চিন্তায়ই কি ভাষাপ্রকৃতিকে আমূল উৎপাটিত করিয়া বাংলা ভাষাকে ঢাকী সুদ্ধ বিসর্জন দিতে হইবে?

যাহাদের জন্য ভাষা, যুক্তাক্ষর ভাঙায় তাহাদের লাভ হইতেছে কী? 'আস্তে, কার্পেট, শর্ত, মজুর, পিস্তল, বন্দুক, বন্দোবস্ত, মর্মর, (পাথর), মাস্তুল' এগুলি সবই বিদেশী শব্দ। এগুলিকে যখন লিখি 'আসতে, কারপেট, শরত, মজদুর, পিসতল, বনদুক, বনদোবসত, মরমর, মাসতুল', তখন বুঝিতে সুবিধা হয়, না পড়িতে সুবিধা হয়? 'রাসেল' (রাসেল) না লিখিয়া 'বারটরানড' লিখিতে সময়সংক্ষেপ হয়, না স্থানসংক্ষেপ হয়? যুক্তাক্ষর-ভাঙা শব্দ পড়িতে কষ্ট হয়, বুঝিতে বেগ পাইতে হয়, লিখিতে সময় বেশী লাগে। এই বানান-ব্যবস্থায় পাঠক, লেখক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, মুদ্রাকর সকলেরই অযথা শক্তিক্ষয় হইতেছে। সর্বোপরি, ভাষার একটা বিজ্ঞানভিত্তিক প্রণালী নষ্ট হইতেছে। ইংরেজী ভাষার consonant-এর সঙ্গে বাংলা ভাষার ব্যঞ্জনবর্ণের মিল নাই। ইংরেজীতে b, c, d, g সর্বাংশে consonant। বাংলা বর্ণমালায় খাঁটি ব্যঞ্জনাক্ষর একটিও নাই। ক, খ, গ, ঘ ব্যঞ্জনবর্ণ নহে। ব্যঞ্জনের সহিত স্বর মিশ্রিত হইলে রূপ হয় ক, খ, গ, ঘ। স্বর বাদ দিলে ইহাদের রূপ হইবে ক্, খ্, গ্, ঘ্। এত হস্-চিহ্ন দেওয়া সম্ভব হয় না বলিয়াই সম্মিলিত একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি প্রকাশের জন্য যুক্তাক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে। 'শ্রী' বানান 'শ্ র্ ঈ' বা 'স্ত্রী' বানান 'স্ ত্ র্ ঈ' লেখা যাইতে পারিত বটে কিন্তু তাহাতে বাংলা ভাষায় শ্রী থাকিত না। বাংলায় সন্নিহিত একাধিক ব্যঞ্জনের ধ্বনি প্রকাশের জন্য যেরূপ যুক্তাক্ষর সৃষ্ট হইয়াছে, ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরধ্বনি যোগের জন্যও অন্য উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। অ-বর্ণ তো ব্যঞ্জনাক্ষরের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে; আ হইতে ঔ পর্যন্ত বর্ণগুলি সংক্ষিপ্ত নূতন প্রতীকে ব্যঞ্জনাক্ষরের গা ঘেঁষিয়া বসিতেছে। রোমান লিপির সঙ্গে বাংলা লিপির এইখানে বিরাট্ পার্থক্য। যুক্তধ্বনি প্রকাশ করিতে রোমান লিপিতে consonantগুলি পাশাপাশি বসাইয়া পূর্বে বা পরে একটি vowel বসাইয়া দিলেই চলে, কিন্তু বাংলা লিপিতে হস্-চিহ্ন না দিয়া ব্যঞ্জনবর্ণগুলি পাশাপাশি বসাইলে ঈপ্সিত যুক্তধ্বনি মেলে না, যেহেতু বর্ণগুলি অ-কারান্ত। তথাপি যে বর্ণগুলিকে পাশাপাশি বসাইয়া যুক্তধ্বনি প্রকাশের চেষ্টা হইতেছে, তাহার কারণ সংস্কৃত ব্যঞ্জনবর্ণের মতো বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ সব সময়ে অ-ধ্বনি রক্ষা করে না। তবে ইহাও মনে রাখা উচিত, বাংলা শব্দে ক্ষেত্রবিশেষে বর্ণের অ-ধ্বনি লুপ্ত হইলেও সর্বত্রই অ-ধ্বনি লোপ পায় না; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ-ধ্বনি বজায় থাকে—কোথাও বিবৃত, কোথাও সংবৃত। এরূপ স্থলে কতকগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ পাশা-পাশি সাজাইলে তাহার উচ্চারণ স্বাভাবিক কারণেই অসুবিধাজনক হয়। তৎসম শব্দের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। ইংরেজী Goldsmith একটি অতি সুপরিচিত নাম—বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে 'গোল্ডস্মিথ' সুপাঠ্য, না সুবোধ্য? Huxleyকে 'হাকসলি' লিখিলে কি সকলেই স্বচ্ছন্দে পড়িতে

পারিবে? এ-সমস্ত ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষর ব্যবহার না করিলে হস্-চিহ্ন অত্যাবশ্যক।

দুঃখের বিষয়, হস্-চিহ্নের প্রতি অমনোযোগিতা বা তাচ্ছিল্য কেবল আনন্দবাজারের নহে, সমগ্র লেখক সমাজের। হস্-বর্জনের কারণ লেখকদের অরুচি, না আয়েশ, না এখানেও বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করা হইবে, জানি না। সংস্কৃত 'বণিক্, সম্রাট্, বুদ্ধিমান্, ষড়ঋতু' আধুনিক বাংলা লেখকের হাতে হইয়াছে 'বণিক, সম্রাট, বুদ্ধিমান ষড়ঋতু'। ঐ একটু হস্-চিহ্ন দেওয়ার শ্রম স্বীকার না করায় বিপর্যয় সৃষ্টি হইতেছে। 'পৃথক্, বিপদ্' প্রভৃতি শব্দে হস্ চিহ্ন না থাকিলে 'পৃথগন্ন, বিপদুদ্ধার' শব্দগুলি নব রূপে পৃথকান্ন, বিপদোদ্ধার' হইবেই 'অন্তরিন্দ্রিয়' 'অন্তরেন্দ্রিয়' হইয়া যাইবেই—পণ্ডিতের চোখরাঙানিতে ইহা বন্ধ হইবে না। হস্-চিহ্ন না থাকিলে 'বিরাট' ও 'বিরাট্' যে দুইটি পৃথক্ শব্দ তাহা বোঝা যাইবে না; 'যজমান' আর 'হনুমান্' যে ভিন্ন শ্রেণীর শব্দ তাহা সহজে উপলব্ধি করা যাইবে না। এদিকে সানুনয়ে সহৃদয় লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

আনন্দবাজারের বানান সম্বন্ধে সুনীতিকুমার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞেরা অনেক কথা বলিয়াছেন—আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে লিখিত সুনীতিকুমারের প্রবন্ধেও বানান সম্পর্কে তাঁহার দুই-একটি সিদ্ধান্ত তর্কাতীত বলিয়া মনে করি না। সে-আলোচনার স্থান যদিও বর্তমান প্রবন্ধে নহে, তথাপি এদিকেও, অন্ততঃ, দৃষ্টি-আকর্ষণ আবশ্যক মনে করি।

সুনীতিকুমার 'মাস্টার' বানান সমর্থন করেন নাই, কিন্তু স্বয়ং রাজশেখর বসুর চলন্তিকায় ও রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'মাস্টার' বানান স্বীকৃত। 'খৃষ্ট' বানান অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার-সমিতিও দিয়াছেন, কিন্তু বিশ্বভারতী প্রকাশিত বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকে বানান আছে 'খৃস্ট', রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'খৃষ্ট'। সুনীতিকুমার 'কার্য, আর্য' বানান সমর্থন করেন না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সমিতি যদি রেফের পর দ্বিত্ববর্জন প্রসঙ্গে এই ব্যতিক্রমটি উল্লেখ করিতেন, আমরা অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার বিড়ম্বনা হইতে নিষ্কৃতি পাইতাম। রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ববর্জনের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি দিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, "এখন থেকে 'ভট্টাচার্য' শব্দের থেকে য-ফলা লোপ করতে নির্বিকার চিত্তে নির্মম হতে পারব; কারণ, নব্য বানানবিধাতাদের মধ্যে দুজন বড়ো বড়ো ভট্টাচার্যবংশীয় তাঁদের উপাধিকে য-ফলা বঞ্চিত করতে সম্মতি দিয়েছেন। এখন থেকে আর্য এবং অনার্য উভয়েই অপক্ষপাতে য-ফলা মোচন করতে পারবেন।"

কথাটা যখন উঠিলই, বানান সম্বন্ধে আরও দু-একটি দিকে মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বানান-সংস্কার-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, সেই সমিতির নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ মান্য করিতেছেন, তৎকালে ইহাই আমাদের জানানো হইয়াছিল। বানান-সমিতির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ মে মাসে। ১৯৩৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাভাষা-পরিচয়'। গ্রন্থখানি 'ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়' মহাশয়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। অতএব এই পুস্তকে যে মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার গুরুত্ব কম নহে।

অতৎসম শব্দে হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ সম্বন্ধে বানান-সমিতির নিয়ম পাইতেছি—"স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ বাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে, যথা—'ধোবানী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, হিন্দী, বিলাতী, দাগী, রেশমী ইত্যাদি।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষা-পরিচয়ে লিখিতেছেন—"সংস্কৃত ভাষার নিয়মে বাংলার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ে এবং অন্যত্র দীর্ঘ-ঈ-কার বা ন-এ দীর্ঘ ঈ-কার মানবার যোগ্য নয়। খাঁটি বাংলাকে বাংলা বলেই স্বীকার করতে যেন লজ্জা না করি, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যেমন আপন সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করে নি। অভ্যাসের দোষে সম্পূর্ণ পারব না, কিন্তু লিঙ্গভেদসূচক প্রত্যয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ কতকটা স্বীকার করার দ্বারা তার ব্যভিচারটাকেই পদে পদে ঘোষণা করা হয়। তার চেয়ে ব্যাকরণের এইসকল স্বেচ্ছাচার বাংলা ভাষারই প্রকৃতিগত এই কথাটা স্বীকার করে নিয়ে যেখানে পারি সেখানে খাঁটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হ্রস্ব ই-কারকে মানব। 'ইংরেজি' বা 'মুসলমানি' শব্দে যে ই-প্রত্যয় সেটা যে সংস্কৃত নয়, তা জানাবার জন্যই অসংকোচে হ্রস্ব ই-কার ব্যবহার করা উচিত।"

শুধু এই কয়েকটি নিয়মই নহে, বানান-সংস্কার-সমিতির অন্যান্য নিয়মগুলিও পুনরায় যাচাই করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানপদ্ধতি ও বিশ্বভারতীর বানানপদ্ধতি সর্বত্র এক নহে বলিয়া এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিলাম।

মণীন্দ্রকুমার ঘোষ
কলিকাতা-৯

(২)

বাংলা বানানের সংস্কার প্রসঙ্গে 'দেশ' পত্রিকার আলোচনা বিভাগে প্রচুর চিঠি বেরিয়েছে। বেশীর ভাগ চিঠিতেই আমার উপর কিছু কটাক্ষ আছে। যাঁরা আমার লেখায় "অসহকৃতা ও অসৌজন্যে" ক্ষুব্ধ, তাঁরাই আবার অসহিষ্ণু হয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ চালিয়েছেন নানা ভঙ্গীতে। তাতে অবশ্য আমি ক্ষুব্ধ নই, শুধু এইটুকুই জানিয়ে দিতে চাই যে, দেশিকোত্তম শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে আমি অন্য দশ জনের মতই সমান শ্রদ্ধা করি। উপরন্তু তিনি আমার পূজনীয় অধ্যাপকও। আমার লেখায় যদি অধৈর্য ও অশালীনতা প্রকাশ পেয়ে থাকে, তবে তা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত।

পাঠকদের সব চিঠিই আমি আগ্রহ সহকারে পড়েছি। তবে তাঁরা কোন কোন ক্ষেত্রে কোন যুক্তিতে আমার বক্তব্যের বিরোধী, তার কোন স্পষ্ট পরিচয় পাইনি। 'মস্কো' কেন 'মসকো' হবে না, 'ভর্তি' কেন 'ভরতি' নয়, কেউই ভাল করে বুঝিয়ে দেননি। শুধু দেখতে পাচ্ছি প্রায় প্রত্যেকেরই প্রধান আপত্তি 'নার্স'কে 'নারস', 'পার্ক'কে 'পারক' লেখা সম্পর্কে। অথচ মজার ব্যাপার এই, আমি আমার প্রবন্ধে পরিষ্কার লিখে দিয়েছিলাম যে,—"সুনীতিবাবুর সঙ্গে আমি একমত যে, 'নার্স'কে 'নারস', 'পার্ক'কে 'পারক' লিখলে উচ্চারণ বিভ্রাট দেখা দিতে পারে। 'পার্ক সার্কাস'-কে 'পারক সারকাস', না 'পার্ক সারকাস' লিখব, প্রশ্ন তোলা যেতে পারে।"

বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি 'পারক্' নয়, 'পার্ক সারকাস' লেখার পক্ষপাতী।

তা ছাড়া অনেকে বলেছেন, দু রকম বানান চললে বিভ্রান্তি বাড়বে। ঠিকই, কিন্তু এখনও তো অনেকে 'বললেন' ও 'বললেন' দুটোই লিখছেন এবং 'হল', 'হলো', 'হোল', 'হোলো' এই চার রকম বানানই চালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে তো বাংলা ভাষার সর্বনাশ হয়ে যায় নি! শুধু তাই নয়, বাংলা উচ্চারণের ঝোঁক যে যুক্তাক্ষর ভাঙার দিকে তার আর একটি দৃষ্টান্ত 'রত্ন' শব্দকে 'রতন' করার মধ্যে।

মোট কথা, জোর করে যুক্তাক্ষর ভাঙার যেমন প্রশ্ন ওঠে না, তেমনি 'হায়দরাবাদ'কে 'হায়দ্রাবাদ' এবং 'লখনউ'কে 'লক্ষ্ণৌ' লেখার মধ্যেও যৌক্তিকতা নেই। 'চাক্তি' না লিখে আমরা যেমন হস্ চিহ্ন ছাড়াই 'চাকতি' লিখি, 'নাগ্রী' না লিখে লিখি 'নাগরী', তেমনই 'মোক্তার' বা 'আগ্রা' লিখলে অন্যায় কোথায়? ইতি বিনীত

অমিতাভ চৌধুরী
কলিকাতা ৪০

বাংলা মুদ্রণ

শ্রীঅসিতবরণ চৌধুরী মহাশয়ের পত্রাঘাতের পর (দেশ সংখ্যা ২০) আনন্দবাজার ও বাংলা মুদ্রণ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। অ-তৎসম বানান রচনায় শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী যে ফরমুলা চালু করার প্রয়াসী তার যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। শ্রী চৌধুরী একথা ঘোষণা করেছেন যে, তাঁদের এই সংস্কারের একটা প্রধান উদ্দেশ্য হল বাংলা মুদ্রণকে সহজ করা। উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নাই। এ যেন বিপ্লবের নবজাগরণ। আমার সবিনয় নিবেদন, জাগরণ ভালো, কিন্তু অনিদ্রা স্বাস্থ্যের পরিপন্থী।

১। মুদ্রণশিল্পের সঙ্গে যাঁরা জড়িত রয়েছেন তাঁরা জানেন, কম্পোজিটারগণ ৪৮৩টি হরফকে হেরফের করে বসিয়ে লেখকের ভাষাকে মুদ্রণের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। যান্ত্রিক অক্ষর যোজনায় মনোটাইপে ৩১৯টি হরফ, লাইনোটাইপে ২৯২টি। পাশাপাশি বিচার করুন ইংরেজীর হরফ সংখ্যা। সেখানে সংখ্যা মাত্র ৮০টি।

অভিজ্ঞেরা জানেন, হরফের সংখ্যাধিক্য বাংলা অক্ষরযোজনার পথে বিরাট বাধা। দুঃখের বিষয়, আনন্দবাজারের প্রচলিত পদ্ধতি এই বাধা অপসারণে সাহায্য করতে পারেনি। কারণ, শুধু অ-তৎসম শব্দের ব্যবচ্ছেদে বাংলা বর্ণমালায় আয়তন হ্রাস হয়নি।

২। মুদ্রণ-বিশেষজ্ঞরা প্রমাণ করেছেন, ইংরেজীতে মুদ্রিত এক পাতার বক্তব্য হুবহু বাংলায় মুদ্রিত হলে প্রায় দেড় পাতা লাগে। এবং বাংলার মুদ্রণ-ব্যয় ইংরেজীর প্রায় দ্বিগুণ। এর কারণস্বরূপ বলা যায়, বাংলা হরফের পার্শ্ববিস্তৃতি (horizontal expansion) এবং তার ঊর্ধ্ব ও নিম্ন গতির জন্য (ফলা, আকার-ইকার প্রভৃতি) vertical space অযথা ব্যয়িত হয়। এর ফলে কাগজ ইত্যাদির অপচয় হেতু বাংলা মুদ্রণের মুদ্রণ-ব্যয় অত্যধিক। আনন্দবাজারের প্রচলিত নিয়মে উপরি-উক্ত vertical space-এর সমস্যা তো মিটলোই না, উপরন্তু horizontal space-এর সমস্যা আরো বেড়ে গেল।

৩। বানানের বিকল্প প্রয়োগ এবং যতি-চিহ্নের অত্যধিক ব্যবহার বাংলা মুদ্রণকে শ্লথ করে দেয়। অথচ লেখকেরা ইচ্ছে করলে যতিচিহ্নের ব্যবহার সীমায়িত করতে পারেন। যত দূর মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে লিখেছেন, ভাষা যদি গতিশীল হয়, যতিচিহ্নের মশারি খাটানোর প্রয়োজন কি?

আনন্দবাজার তাঁদের ফরমুলায় যতি-চিহ্নের ব্যবহার সীমায়িত করবার কিংবা বিকল্প প্রত্যাহার করবার কোন নির্দেশ দেন নি।

৪। ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে বাইবেল মুদ্রণের প্রয়োজনে বাংলার প্রথম মুদ্রণ ব্যবস্থা করলেন সুবিজ্ঞ কেরী, মার্শম্যান প্রমুখ মিশনারীরা। তাঁরা বাংলা অক্ষরডালা (Type case) সাজাবার জন্য বৈজ্ঞানিক চিন্তা করেন নি। বিদেশী ভাষায় মুদ্রণ চালু করে তাঁরা কৃতিত্বের অধিকারী। বাংলা হরফের পৌনঃপুনিকতা সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান ছিল না। ফলে, ইংরেজী অক্ষরডালার অনুকরণে বাংলা অক্ষরডালা সাজিয়ে ফেললেন। নাম দিলেন "বিদ্যাসাগরী" ছক। তাঁরা a-স্থানে অ, c-স্থানে ক d-স্থানে ন, t-স্থানে ত দিয়ে বাংলা ছকের সমস্যা রাতারাতি সমাধান করে দিলেন। লাইনো বা মনোটাইপের ছকগুলিও বাংলা শব্দের পৌনঃপুনিকতার ভিত্তিতে নিরূপিত হয়নি। এগুলির সংস্কার প্রয়োজন। অতীব দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আনন্দবাজার এই ছক-গুলির পরিবর্তনের কথা চিন্তা না করে শব্দব্যবচ্ছেদে আত্মনিয়োগ করেছেন।

প্রসঙ্গত মন্তব্য, পত্রলেখক শ্রীঅসিতবরণ চৌধুরী যে লাইনো অপারেটরের কথা বলেছেন সেই ভদ্রলোক মিথ্যে বলেন নি। দিল্লীর জন্য বেচারাকে দিল্লী দিল্লী ঘুরতে হতো। তাঁকে 'দিল্লী'র সন্ধান দিলে তার দিল্-এ আনন্দ হবেই। আমার বিনীত প্রশ্ন, এটা কি একটা মীমাংসা হল? "দিল্লী" কথাটির পৌনঃপুনিকতা যদি প্রতিনিয়ত এই অপারেটর ভদ্রলোককে বিরত করে তবে লাইনোটাইপ মেশিনারী কোম্পানির সহযোগিতায় "ল্ল" চাবিটির স্থান side board থেকে সরিয়ে front board-এ নির্ধারিত করলেই ভাল হতো।

কিন্তু তাঁরা সে পথে যাবেন না। যন্ত্রের সংস্কার তাঁদের পছন্দ নয়। যন্ত্রের সংস্কার নয়, শব্দের (তা আবার শুধু অ-তৎসম) ব্যবচ্ছেদ। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে?

৫। যান্ত্রিক অক্ষরযোজনার হরফের ছাঁচ (Type matrix) সংস্কার করতে হবে এ কথা অভিজ্ঞ মুদ্রক মাত্রেই স্বীকার করবেন। কেননা, লাইনো বা মনোতে ছাপা বাংলা হরফের দুরবস্থা হাস্যকর। ছোট পয়েন্টে ছাপা হলে তা দৃষ্টিভ্রমের (defects of vision) জন্য অতটা চোখে পড়ে না সত্য, হরফের উচ্চতা বাড়ালে এই ত্রুটি প্রায় অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। বাহাত্তর পয়েন্ট (এক ইঞ্চি) লাইনো বাংলা মুদ্রণের কথা এক দুঃসহ কল্পনা।

চৌধুরী মশায় জানেন না যে, লাইনোর টাইপ-ফেস (Type face) এবং লাডলোর টাইপ-ফেস (Type face) এক নয়। লাডলোতে অক্ষরবিস্তৃতি অনেক ক্ষেত্রে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য layman-এর কাছে তা একই মনে হবে। দুটো তিনটে উদাহরণ দিচ্ছি—লাইনোতে যেখানে ন্থ, ন্দ, ন্ত, লাডলোতে সেখানে ন্থ, ন্দ, ন্ত মুদ্রিত হয়।

উপসংহারে দুটো কথা বলতে চাই।

সরলীকরণ অবশ্যই কাম্য। কিন্তু সরলী-করণ মানে কি? যদৃচ্ছ আচরণ? যদি তা না হয় তবে মুদ্রণ-বিজ্ঞানের নীতিগুলি মেনে নিয়েই চলতে হবে।

প্রসূন দত্ত
কলিকাতা-৪০।

দিল্লির ডায়েরি

' সিনেমার স্কাই : শিল্পী রোজেনকুইস্ট

এক অভাবনীয় কাণ্ড! এখানকার রবীন্দ্র ভবনের হলে সাত সমুদ্রের ওপার আমেরিকা থেকে আসা একটি চিত্র প্রদর্শনী। মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার যোগার। ভাষায় প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব।

ঘণ্টা দেড়েক দেখে বেড়ানোর পরে যখন বেরুলাম, তখন আমার মাথা ঘুরছে এবং আন্দাজ করলাম আমার মতো অনেকের মাথাই ঘুরছে। বিগত ২০ বৎসরের আমেরিকার চিত্রশিল্পের নমুনা, এবং তা' থেকে শুধু মনে হয়, "হা হতোস্মি! চিত্রশিল্পে আমরা কোথায়, আর তারা কোথায়! অনেকটা আমাদের শাড়ি-ব্লাউজ পরা মেয়েরা, আর টপলেস্ আমেরিকান মেয়েরা যেন—দুই জগতে যেন কোনো সাঁকো নেই। যেন দুই বিভিন্ন জগত—একটি আমার-আপনার, অন্যটি অন্য সভ্যতার।

কিন্তু যদি আপনার শিল্পরসে আসক্তি থাকে, যদি ছবি নামক জিনিসটি আপনার মনে দোলা দেয়, তাহলে নিশ্চয়ই একবার ঘুরে যাবেন রফি মার্গে রবীন্দ্র ভবনের এক তলায় আর দোতলায়। দেয়াল ভরে সাজানো তুলি আর রঙের মহিমা যা প্রসবিত হয়েছে আধুনিক আমেরিকার আধুনিক মানুষের আঙুল আর মাথা থেকে। মানুষের একান্ত সৃষ্টি। প্রশ্ন করবেন না এটার মানে কী? ওটার কী অর্থ? কিম্বা কেন এই বাস্তব আর নির্বাস্তবের কলহ কোলাহল। শুধু চোখে দেখে যান; যদি ভাল লাগে বেশ; যদি না লাগে, কিছু আসে যায় না, না আপনার, না তাদের যারা জাহাজ ভরে নিয়ে এসেছেন আমেরিকার শিল্প-পণ্য।

পুরো বিশ বৎসরের শিল্পসম্ভার আমেরিকা থেকে, যা' আগে আর কোনোদিন আসেনি এই দেশে। অর্থাৎ আমেরিকার যুদ্ধোত্তর চিত্র-শিল্প। এখানে ৩৫ জন শিল্পী এনেছেন ৯৭টি চিত্র। তাদের বোঝা যায় না। কিন্তু ভালো লাগে; যাদের অর্থ বোঝা খুব মুশকিল কিন্তু না বুঝলেও চলে, যাদের নির্বাক ভাষা নিহিত আছে শুধু রঙের মহিমায়, আর স্থান আবিষ্কারে। কথায় বলা মুশকিল এরা এমনি যে, সামনা-সামনি না দেখলে দেখা হয় না। যেমনি হয় না বিয়ের কনে।

আধুনিক চিত্রকর, নির্বাস্তব-ধর্মীয় চিত্রকর আমাদের দেশেও আছে। কিন্তু আমেরিকার আধুনিকতা একেবারে মার্কিনী, যেমন মার্কিনী হল নিওন লাইট, হাইওয়ে, ষাট-তলা দালান, মোটর রেস, ডোদভেল, রকেট, জেমিনী, পি-এল ৪৮০ আর সি-আই-এ। আমাদের আধুনিকরা একেবারে শিশু। তারা কথা বলতে চায় শুধু রঙ দিয়ে, রঙের চাতুর্য আর ব্যবহারের শৈলীতে। কোনোটি ২৪ ফুট লম্বা, কোনোটি ২০, কোনোটি ১৪। ডলার যেমনি তাক লাগায় দুনিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তেমনি তাক লাগায় নরম্যান বিয়ুম, ফ্রানস্, ক্লাইন, রবার্ট মাদারওয়েল, জেসপার জন, রশেন্-বার্গ, মরিস লুইস আর আল হেলড।

আরো আছেন তাদের অপূর্ব সম্ভার নিয়ে আ্যারশিল গর্কি, মার্ক টবি, জ্যাকসন পোলক, মার্ক রোতকো, বারনেট নিউম্যান। জোসেফ আলবের, রাইনহারড। কেউ

টিক্‌টঙ্গনবরো

শিল্পী : ফ্রাঙ্ক স্টেলা

ল্যান্ডস্কেপ টেবল শিল্পী : আরশিল গাকী
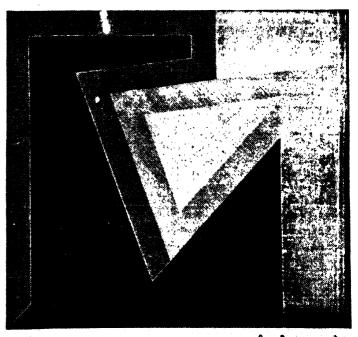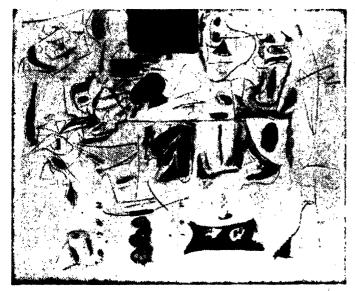
বলেছেন, "এই আমার আর্ট, তোমাদের বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে, তোমাদের সমস্ত মানব-ঐতিহ্যের বাইরে। আমরা নতুন মানুষ, নতুন আমাদের সৃষ্টি।" আবার রাইনহারডদের মতো শিল্পীরা বলেছেন : আমাদের বিদ্রোহ সমস্ত শিল্পের বিরুদ্ধে, আমাদের আর্ট হল "নন-আর্ট"। কারোর কাছে তা একেবারে "নিস্তব্ধ শিল্প", সাইলেণ্ট আর্ট।

প্রশ্ন করলাম শ্রীপ্রদোষ দাশগুপ্তকে। ইনি রাজধানীর আধুনিক চিত্রশালার অধ্যক্ষ। তাঁর সংগে নামকরা আমেরিকান শিল্প-সমালোচক গ্রিনবার্গ মহাশয়ের সংগে টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার হয়েছে, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। "সব কি আর বুঝি? কিছু ভাল কিছু অবান্তর। কিছু এক উন্মাদনা। কিন্তু আমরা জানতে পারি অনেক কিছু, লিখতে পারি রঙ-বিন্যাসের আংগিক, এবং সামগ্রিক চিন্তা-বিকাশ।

"কিন্তু গ্রীনবার্গকে বলেছিলাম : ন্যাখ, তোমাদের শিল্প পপ আর্ট থেকে গেছে সপ আর্টে। সাবধান, স্টপ আর্টে যেন না-যাও।" রাইনহার্ড আর রথকো হয়তো প্রদোষবাবুকে তখন বলবে, "গো টু হেল! আমরা আর্টের নিধন চাই, তাতেই হবে নতুনের আগমন, নতুন সমাজের নব সৃষ্টি।"

প্রশ্ন করি শ্রীসুশীল মুখার্জিকে, যিনি অনেক বছর চিত্র-শিল্প ঘেঁটে এলেন আমেরিকা দেশে, প্রায় ৭।৮ বৎসর। তিনি নিজেও শিল্পী, মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরীর ছাত্র। ইনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই জগতের মানুষ একাধারে। কিন্তু তাঁরও অভিমত এই যে, আমেরিকার আধুনিক শিল্প একান্ত আমেরিকার সমাজের, তার নিজের সভ্যতার রূপ, এবং দৌলতসম্পন্ন, বিজ্ঞান-চালিত সমাজের প্রতিভূ। কিন্তু আমাদের? আমাদের সমাজ ও সভ্যতার রূপ অন্য-প্রকারের। আমাদের মানসিক নিদর্শন অন্য ধরনের। তাদের আংগিক হয়তো আমরা নেব, কিন্তু আমাদের বজায় রাখতে হবে ভারতের নিজস্বতা। আধুনিক হয়েও কি আমরা ভারতীয় থাকতে পারি না?

বললাম, ঠিক। আমরা কোট-প্যাণ্ট পরি, তাই বলে শুক্তো খাব না, মাছের ঝোলে ভাত খাব না, কিম্বা মেয়েকে বলব না, 'মা, লক্ষ্মী, সোনা?'

"প্রায় তাই, যদি সামাজিকতাকে আর্টে নিয়ে যাই। তবে আমি চাই আমাদের শিল্পীরা করুক অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অবন ঠাকুর আর নন্দলাল আর যামিনী রায়ের নামেতে সন্তুষ্ট থাকলেই চলবে না। আরো এগিয়ে যাবো, কিন্তু জানি না কীভাবে।"—সুশীল মুখার্জি।

ভারতে এই প্রদর্শনী এনেছে আমেরিকার মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্ট, যা স্থাপিত হয়েছে ১৯২৯ সনে। মিউজিয়ম ১৯৩৮ থেকে আরম্ভ করল দেশের বাইরে প্রদর্শনী পাঠান। আমেরিকায় আরো একটি সংস্থা হল আন্তর্জাতিক কৃষ্টি বিনিময় পরিষদ। এর সহায়তায় মিউজিয়ম এ যাবত ১৫০টি প্রদর্শনী সংগঠিত করেছে পৃথিবীর ৬৮টি দেশে। ভারতবর্ষে এই প্রথম হচ্ছে "দুই দশকের শিল্প প্রদর্শনী।"

এর জনক বলা যায় ওয়ালডো রাসমুসেন। যিনি এ-অবধি প্রায় ৪০টি মার্কিন শিল্প প্রদর্শনীর ছবি মনোনীত করেছেন, যেমন করেছেন যেটি এবার এসেছে দিল্লিতে। উনি বলেছেন : "একদা আমেরিকার সংস্কৃতি জগতে প্রভাব ছিল সাহিত্য, নাটক আর ফিল্মের। আজ সেখানে স্থান নিয়েছে চিত্রকলা।"

"এই প্রদর্শনীতে আমরা জোর দিয়েছি সাম্প্রতিকতায়। প্রায় একশোজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর ভিতর থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে এই প্রদর্শনীর ছবিগুলো। তারাই আমেরিকার সব নয়, কিন্তু তারা আধুনিক এবং সাম্প্রতিক, তারা নতুন, তারা স্রষ্টা, আপনার ভাল লাগুক কি না লাগুক।

সন্দেহ নেই। রবীন্দ্র ভবনে একবার এসে দেখে যাবেন। প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারবেন না। তবে কিনা, অ্যাসপ্রো জাতীয় দু একটা বড়ি পকেটে রাখবেন।

খগেন দে সরকার
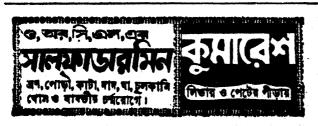
সাহিত্য সংবাদ

আপটন সিনক্লেয়ারের পূর্বস্মৃতি

গত মাসে নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা করতে এসেছিলেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক আপটন সিনক্লেয়ার। সিনক্লেয়ারের বয়েস এখন ৮৮, এই বয়েসেও তিনি কিছুক্ষণ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, কিছুক্ষণ চেয়ারে বসে স্পষ্ট গলায় বক্তৃতা করলেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাপ্তাহিক মুখপত্র থেকে আমরা সম্পূর্ণ বিবরণটি সংগ্রহ করেছি।

পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রায় নিয়মিতই কোনো-না-কোনো লেখককে আহ্বান জানানো হয়। সাহিত্যের ছাত্ররা শুধু নীরস গ্রন্থপাঠের বদলে জীবিত লেখকদের সংগেও সাক্ষাৎ-যোগাযোগের সুযোগ পান। নবীন-প্রবীণ সব উল্লেখযোগ্য লেখককেই আহ্বান জানানো হয়, অনেক সময় বক্তৃতা বা রচনা পাঠের জন্য লেখকদের কিছু সম্মান-দক্ষিণা দেওয়ারও প্রথা আছে। নবীন লেখকদের কাছে ঐ অর্থ কিছুটা লোভনীয় ও জীবিকার খানিকটা অংশ হলেও, যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ লেখকদের কাছে ঐ সামান্য অর্থের তেমন মূল্য নেই, তাঁরাও নবীন যুব-সমাজের সংগে মেলামেশায় খুব আগ্রহী, নবীনকালের হৃৎস্পন্দন তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে চান।

অতগুলি ঝকঝকে যুবক-যুবতীর সামনে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধ সিনক্লেয়ার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আজ আমার বয়েস ৮৮, আমার কাছ থেকে আর আপনারা বেশী কিছু আশা করবেন না। তবে, আপনাদের দেখে, আমারও যৌবনকালের কথা মনে পড়ছে। আমার যৌবনকাল—সে তো এই শতাব্দীর গোড়ার কথা......।

সিনক্লেয়ারের মনে পড়লো, এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে—তিনি যখন একজন উদীয়মান ঔপন্যাসিক, কয়েকজন বন্ধুর সংগে তিনি নিউইয়র্ক শহরে জন ডি রকেফেলারের অফিস-বাড়ির সামনের রাস্তায় বসে পিকেটিং করেছিলেন। তাঁদের হাতে বাঁধা ছিল কালো ব্যাজ, কলোরাডোতে রকেফেলারদের লোহার খনিতে তখন ধর্মঘট চলছিল, সেই ১৯১৩, গুন্ডারা ধর্মঘটীদের তাঁবু আক্রমণ করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়—তাতে পুড়ে মরে অসংখ্য শ্রমিকের স্ত্রী-পুত্রকন্যা। সেই ধর্মঘটীদের সমর্থনে সিনক্লেয়ার পিকেটিং করছিলেন, শেষ পর্যন্ত রকেফেলার নমনীয় হতে বাধ্য হন, ইউনিয়ন স্বীকার করে ধর্মঘটীদের দাবি মেনে নেন। ঘটনাটির বর্ণনা করে সিনক্লেয়ার তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, তারপর থেকে এ পর্যন্ত রকেফেলারদের ব্যবসায় আর ধর্মঘট হয় নি।

সিনক্লেয়ারের এ পর্যন্ত প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা ৯০। এর মধ্যে অনেকগুলিই জনপ্রিয় হলেও, তাঁর নিজের কাছে এখনো প্রিয় বই 'জাঙ্গল'। এ পর্যন্ত ৬০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে 'জাঙ্গল' এবং বিক্রি হয়েছে বহু লক্ষ। ১৯০৬ সালে এই উপন্যাসটি বেরোয়—শিকাগো অঞ্চলের শ্রমিকদের এই মর্মান্তিক অসহনীয় চিত্র প্রকাশিত হবার পর—আমেরিকার সরকার এই নিয়ে বিস্তৃত তদন্ত শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত পাস হয় 'ফেডারাল পিওর ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাক্ট'। সিনক্লেয়ার বললেন, আমিও শ্রমিকদের পোশাক এবং খাবারের থালা হাতে নিয়ে সেইসব শ্রমিকদের সংগে লাইনে দাঁড়াতাম—শিকাগোর পশু জবাই কেন্দ্রে......আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, বইটা লিখতে লিখতে টপটপ করে চোখের জল পড়ে আমার লেখার কাগজ ভিজে যেতো। বইখানা পড়ার পর প্রেসিডেন্ট

আপটন সিনক্লেয়ার

থিয়োডোর রুজভেল্ট তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং ব্যক্তিগত সমবেদনা জানান।

'জাঙ্গল' বইটা প্রকাশের পরই অসম্ভব জনপ্রিয় হয়, লেখকের হাতে প্রচুর টাকা আসতে থাকে। কিন্তু, সিনক্লেয়ার বললেন, সেই টাকা পেয়ে আমার মাথা ঘুরে যায় নি। টাকার নেশা আমি শিগগিরই কাটিয়ে উঠেছিলাম। সেইসব দিনে আমি ছিলাম আন্তরিকভাবে সোস্যালিস্ট।

বক্তৃতা দিতে দিতে সিনক্লেয়ার হাঁপিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়েন। তখন তাঁর ৬৫ বৎসর বয়স্ক বৈজ্ঞানিক পুত্র পিতার পূর্বজীবনের কথা বর্ণনা করতে থাকেন। একটু বাদেই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে সিনক্লেয়ার বসা অবস্থায় মাইকের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, আমি এখন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

'আটলান্টিক' মাসিকে
তারাপদ রায়

ফেয়ী লেভাইন নামে একটি তরুণী ফুলব্রাইট শিক্ষিকা এসেছিলেন কলকাতায়। দেশে ফিরে তিনি আমেরিকার বিখ্যাত পত্রিকা 'আটলান্টিক' মাসিকের মার্চ সংখ্যায় "নতুন কলকাতা" নামে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। কলকাতা সম্পর্কে হঠাৎ নতুন করে প্রচুর নিন্দামন্দ শুরু হয়েছে নানা বিদেশী পত্রিকায়। শ্রীমতী ফেয়ী-র রচনায় কোথাও সত্য গোপন নেই, কলকাতার দুঃখ-দুর্দশার চিত্রও অনুপস্থিত নয়, কোথাও অযথা স্তুতি নেই—কিন্তু কলকাতা সম্পর্কে কোনো বিদেশীর এমন প্রীতিপূর্ণ লেখা কখনো চোখে পড়ে নি।

শ্রীমতী ফেয়ী বলেছেন, কলকাতার আসল গৌরব তার সাংস্কৃতিক জীবনে। এই সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি তরুণ কবি তারাপদ রায়কে বেছে নিয়েছেন এবং পাতার পর পাতা জুড়ে তারাপদ রায়ের ব্যক্তিগত জীবন, সাংসারিক অবস্থা, চাকরি, নাগরিকত্ববোধ, তাঁর দুঃখ-দারিদ্র্য-হতাশা নিয়ে হাসিঠাট্টা, তাঁর কবিতার জন্য পাগলামি এবং পাগলামি নিয়ে কবিতা —এই-সমস্ত বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ তারাপদ রায়ের দেখা ও উপলব্ধির কলকাতার কথাই তিনি বর্ণনা করেছেন। প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, আমাদের দেশের ইংরিজী-বাংলা সংবাদপত্র-পত্রিকায় এই ধরনের কাঁচামি এখনো আছে যে দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী বা অবস্থা সম্পর্কে তরুণ লেখক-শিল্পী সমাজের কোনো মতামত গ্রহণ করার প্রয়োজনই বোধ করেন না। অর্থাৎ তরুণদের ইচ্ছা বা রুচির কথা কোথাও ব্যক্ত হয় না। যেসব সাংবাদিকের আচার-আচরণ বহুলপরিমাণে বিলেতী বা মার্কিনী—তাঁরাও বিলিতী বা মার্কিনীদের কাছ থেকে এ শিক্ষাটুকু গ্রহণ করেন নি। কলকাতা সম্পর্কে একজন তরুণ কবি—তারাপদ রায়ের দৃষ্টি বা উপলব্ধি জানতে হলে—আমাদের এখন ঐ মার্কিন পত্রিকা পড়তে হবে।

কোচবিহারে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

উত্তরবঙ্গের তরুণ এবং আধুনিক সাহিত্যিকদের উদ্যোগে একটি সাহিত্য সম্মেলন গত ২৪শে মার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে কোচবিহারে। অনুষ্ঠানে নিছক হোমরা-চোমরাদের না ডেকে স্থানীয় তরুণ সাহিত্যিকরাই ছিলেন সভার বক্তা। সভাপতিত্ব করেছেন অমিয়ভূষণ মজুমদার। কবিতা, উপন্যাস, ছোট গল্প, শিশুসাহিত্য প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন অমিতাভ দাশগুপ্ত, সুরজিৎ বসু, সমরেশ রায়, ডঃ বৃন্দাবন বাগচী, রণজিৎ দেব, প্রভৃতি। আলোচনার পর একটি কবি-সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়।

সনাতন পাঠক

বাংলা ছন্দ

ছন্দ পরিক্রমা। প্রবোধচন্দ্র সেন। জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯। চার টাকা।

বাংলা ছন্দের সঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রায় নাড়ির টান। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী কাল যাবৎ তিনি ছন্দ-চর্চায় ব্যাপৃত। তাঁর চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফসল এতকাল ধরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সাময়িক পত্রাবলীর অতলে; ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-বিষয়ে দুখানি গ্রন্থ ও সম্পাদিত 'ছন্দ' গ্রন্থটি বেরিয়েছে বটে, কিন্তু সেগুলি ছন্দ-ব্যাকরণ রূপে চিহ্নিত করা যায় না। এই প্রথম বাংলা ছন্দের কাঠামো ও অন্যান্য জরুরী বিষয় নিয়ে তাঁর প্রবন্ধাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। প্রবোধচন্দ্রের সমগ্র রচনার বিচারে এই গ্রন্থখানির কলেবর নিতান্তই গৌণ, সন্দেহ নেই। তবু 'ছন্দ-পরিক্রমা' একদিক থেকে বিশিষ্ট এবং বৈপ্লবিক। ছন্দ সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্রের সামগ্রিক চিন্তার বিন্দুতে সিন্ধু-আভাস যেমন পাওয়া যায়, এই গ্রন্থে তেমনই ছন্দ-জিজ্ঞাসুর প্রাথমিক প্রতিটি প্রশ্নের সদুত্তর মিলবে ছন্দপরিক্রমায়।

ছন্দপরিক্রমা গ্রন্থটিকে বৈপ্লবিক বলা যায় প্রধানত তিনটি কারণে। প্রথমত, বাংলা ছন্দের বহু প্রচলিত তিনটি নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন প্রবোধচন্দ্র সেন। দ্বিতীয়ত, নতুন নামকরণের মধ্য দিয়ে বাংলা ছন্দ-ব্যাকরণকে বিজ্ঞানভিত্তিক সজীব সচল ও সহজ করে ঢেলে সাজিয়েছেন। তৃতীয়ত, 'পয়ার' সম্বন্ধে এ যাবৎকাল প্রচলিত যাবতীয় ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়েছেন। বাংলা ছন্দ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ ঘটনা নিঃসন্দেহে আলোড়ন-কারী।

বাংলা ছন্দের তিনটি ধারার কথা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এই তিন রীতির ছন্দের নামকরণের ব্যাপারে বহু তর্কবিতর্ক আপত্তি অনুযোগ চলে এসেছে। সাধু (পয়ার জাতীয়), সংস্কৃত ভাঙা ও বাংলা প্রাকৃত রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত এই তিনটি নাম অমূল্যধনে তানপ্রধান, ধ্বনিপ্রধান ও শ্বাসাঘাতপ্রধান। প্রবোধচন্দ্র এই তিন রীতির নাম রেখেছিলেন যথাক্রমে অক্ষরবৃত্ত (যৌগিক), মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত (মৌলিক)। [illegible] বহু প্রবোধচন্দ্র সেনের [illegible] 'সূচারু' বলে মেনে নিয়েও মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের বিকল্পে 'তিন মাত্রার ছন্দ' ও 'ছড়ার ছন্দ' রাখার পক্ষে অভিমত দিয়েছিলেন। তাঁর আপত্তি ছিল যৌগিকে, সে যাই হক, প্রবোধচন্দ্র এখন তাঁর পূর্বের নাম তিনটি রূপান্তরিত ক'রে 'মিশ্রকলাবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত' রাখার পক্ষপাতী।

এই নামকরণ হয়তো প্রথমে অনেকেরই অনুমোদন পাবে না। তার কারণ, এতদিন পর নতুন নামকরণ চালানো সম্ভবপর কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকতে পারে। তা ছাড়া, মূল ছন্দ-রীতির পরিবর্তন যখন ঘটছে না তখন নামে কী এসে যায়.. ইত্যাদি। কিন্তু এর বিরুদ্ধেও যুক্তি রয়েছে। বাংলা ছন্দের নাম এতকালও সুনির্দিষ্ট ছিল না। দ্বিতীয়ত, সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবার খাতিরে নতুন নামকরণের পিছনে বিজ্ঞাননির্ভর যুক্তির প্রাবল্যকে অস্বীকার করা অনুচিত হবে। নতুন নাম একদিনেই শ্রুতিসহন হবে এ-কথা মনে করারও কারণ নেই। প্রবোধচন্দ্রের এই নতুন নামকরণে বাংলা ছন্দের ব্যাকরণ সহজতর হবে এটা কম লাভ নয়।

প্রবোধচন্দ্রের বিচারে বাংলা ছন্দো-রীতির প্রধান দুটো ভাগ: দলবৃত্ত (Syllabic) ও কলাবৃত্ত (Moric)। প্রতি সিলেবল (দল) এক-এক মাত্রার মূল্য পায় যে-ছন্দোরীতিতে তা হল দলবৃত্ত (পুরনো স্বরবৃত্ত)। কলাবৃত্তে মাত্রা গণনার পদ্ধতি দু রকম। এই হেরফের ঘটে রুদ্ধ দলের (closed syllable) ক্ষেত্রে। রুদ্ধ দল—আভ্যন্তর (অপ্রান্তিক'-এর বদলে আভ্যন্তর চলে কিনা প্রবোধচন্দ্র সেন ভেবে দেখতে পারেন) ও অন্ত্যপ্রান্তিক। কলাবৃত্ত ছন্দে আভ্যন্তর রুদ্ধ দল কখনো এক মাত্রা কখনো বা দু মাত্রার মূল্য পায়। দু-মাত্রার মূল্য পেলে সরল কলাবৃত্ত (মাত্রাবৃত্ত) এক মাত্রার মূল্য পেলে মিশ্র কলাবৃত্ত (অক্ষরবৃত্ত)। মাত্রামূল্য অনুসারে তিন রীতির ছন্দকে এ-রকমভাবে ছকে ফেলা যায়:

	আভ্যন্তর রুদ্ধদল	প্রান্তিক রুদ্ধদল
মিশ্রকলাবৃত্ত	১	২
কলাবৃত্ত	২	২
দলবৃত্ত	১	১

যেমন 'অন্ধকার' এই ত্রিদল শব্দটি মিশ্র কলাবৃত্তে ৪ কলামাত্রা, কলাবৃত্তে ৫ কলামাত্রা ও দলবৃত্তে ৩ মাত্রা। বাংলা তিন

রীতির ছন্দের মূল পার্থক্য এই ছক থেকেই পাওয়া যাবে।

অক্ষরবৃত্ত নাম সম্পর্কে প্রধান আপত্তি—যা সত্যেন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকেই তুলেছেন—ছন্দের মূলতত্ত্ব ধ্বনি, অক্ষর নয়। অক্ষর গণনা করে মাত্রামূল্য নির্ধারণ এই কারণেই অবৈজ্ঞানিক। এবং এই জন্যেই অক্ষর সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি করলেও এই ছন্দ অব্যাহত থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, রুদ্ধদলের উচ্চারণগত রূপকে আশ্রয় করেই এই রীতির ছন্দে মাত্রামূল্য নির্ধারণ করা সঙ্গত। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে, আধুনিক কয়েকজন কবি এই মূল তত্ত্বটিকে অনুধাবন করে মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের মধ্যে সার্থকভাবে বৈচিত্র্য এনেছেন। এবং এই পদ্ধতিতেই 'অক্ষরবৃত্তের' বহু গোলমালের (পর্বত/শরবত, ভরপুর/কর্পূর ইত্যাদি) সুমীমাংসা সম্ভবপর।

মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র লিখেছেন, 'সব ছন্দই মাত্রাবৃত্ত' সুতরাং কোনো বিশেষ ছন্দোরীতির নাম 'মাত্রাবৃত্ত' রাখা সমীচীন নয়; সিলেবল-এর প্রতিশব্দ-রূপে 'দল' গ্রহণ করেছেন বলেই 'স্বরবৃত্ত' নাম 'দলবৃত্তে' রূপান্তরিত করা অধিক সঙ্গত।

'পয়ার' নামটি বাংলা সাহিত্যে বিশেষ ভ্রমাত্মক ও শিথিল রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। তথাকথিত 'অক্ষরবৃত্ত' ও 'পয়ার' সমার্থক—এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য মিশ্রকলাবৃত্তে রচিত বহু কবিতার (প্রবোধচন্দ্র বেশ কয়েকটির আলোচনা করেছেন ২৫—২৭ পৃষ্ঠায়) ছন্দ-নিরূপণ দুষ্কর হয়েছিল। এমন কি বুদ্ধদেব বসু তো মিশ্রকলাবৃত্তের (পূর্ব নাম যৌগিক) নাম পয়ার রাখতেই চেয়েছিলেন একদা: "এ ছন্দের নাম প্রবোধচন্দ্র দিতে চেয়েছেন যৌগিক। কিন্তু আমাদের চিরকালের চেনা পয়ার কথাটা দোষ করল কী।" (সাহিত্যচর্চা, পৃঃ ১০২)। প্রবোধচন্দ্র তাই প্রথমেই সতর্ক করে দিয়েছেন: 'পয়ার একটি ছন্দ-আকৃতির নাম, ছন্দ-প্রকৃতির নাম নয়।' সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন

> 'আট-ছয় আট-ছয়
> পয়ারের ছাঁদ কয়।' (ছন্দ সরস্বতী)

এখানে ছাঁদের অর্থ মাত্রা-বিন্যাস, ছন্দ নয়। প্রবোধচন্দ্র বাংলা তিন রীতির ছন্দ থেকেই এই 'আট-ছয়ের ছাঁদ' উদ্ধার করে দেখিয়েছেন যে, পয়ারের ছন্দোবন্ধ তিন রীতিতেই সম্ভবপর। এরপর দৈর্ঘ্যভেদে পয়ারের বিভিন্ন রূপ (মহাপয়ার, মুক্তক) তিন রীতির ছন্দের কবিতায় কিভাবে প্রযুক্ত তার অজস্র উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন তিনি। পয়ার-সম্বন্ধে দীর্ঘ বিশ্লেষণকারী ও অনন্য এই আলোচনার পর এ-সম্পর্কে যাবতীয় ভুল ধারণার অপনোদন ঘটবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ছন্দপরিক্রমা সব মিলিয়ে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বাংলা ছন্দে উৎসাহী প্রত্যেকেরই এই বইটি অপরিহার্য। শুধু তাই নয়, ছন্দ-পরিক্রমা অনতিবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত পাঠ্যগ্রন্থরূপে প্রবর্তিত হওয়াও কাম্য মনে হয়। গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে পরিভাষা পরিচয় নামে যে-অধ্যায়টি রয়েছে সেটিও বিশেষভাবে সুলিখিত। প্রবোধচন্দ্র সেন পরিভাষাগুলির ব্যবহার-যোগ্যতা সম্পর্কে সব দিক থেকে আলোচনা করেছেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে যুক্তি পাওয়া কঠিন।

পরিশেষে একটি নিবেদন। আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দ ব্যবহার নিয়ে সুধী-মহলেও বহু তর্কবিতর্ক রয়েছে। প্রবোধচন্দ্র সেনের কাছ থেকে এ-বিষয়ে কিছু জানতে পারলে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। কাজটি হয়তো সহজ নয়। কিন্তু প্রবোধচন্দ্র সেনের মতো আধুনিক মনের ছন্দসিক পাওয়া যে আরও কঠিন।

৩৭৪।৬৬

স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেল, এভার্টন উইকস, ক্লাইড ওয়ালকট, গ্যারি সোবার্স, ওয়েসলী হল, চার্লি গ্রীফিথ প্রভৃতি বিশ্ব-বরেণ্য ক্রিকেট খেলোয়াড়ের জন্মস্থান বারবাডোজের উপর ক্রিকেট দেবতার অপার আশীর্বাদের কথা বলতে গিয়ে গত সপ্তাহে ভারতীয় ক্রিকেট-ক্ষেত্রে বোম্বাইয়ের পর্যাপ্ত প্রাধান্য সম্বন্ধে দু'চার কথা বলেছি। সেই বোম্বাইয়ের এবার রনজি ট্রফি লাভ এমন কিছু বড় কথা নয়। রনজি প্রতিযোগিতার ৩৩ বছরের খেলার ইতিহাসে মোট ১৮ বার এবং উপর্যুপরি ৯ বার জয়ের সম্মানও সম্ভবত বোম্বাইয়ের সম্মিলিত ক্রিকেট-শক্তির সম্যক পরিচয়। কিন্তু এবারের ফাইনালে রাজস্থানের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের সরাসরি জয়লাভ না করার ঘটনাটা উল্লেখ্য। পরাজয়ের মুখে পড়েও রাজস্থানের খেলোয়াড়রা শক্তিশালী বোম্বাইয়ের সঙ্গে যে দৃঢ়তা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে সেই ঘটনাই অন্যান্য দলের কাছে প্রেরণা-সংবাদ। পরাজিত রাজস্থান দল পাঁচ দিন সমানে যুদ্ধে "বোম্বাই আতঙ্ক" কথাটির অসারতা প্রমাণ করেছে। তাই বিজয়ী অপেক্ষা পরাজিতের প্রশংসা সহস্র মুখে। সব কিছু ছাপিয়ে প্রশংসা পেয়েছেন রাজস্থানের বানসওয়াদার দুই রাজতনয় অধিনায়ক হনুমন্ত সিং ও তাঁর অগ্রজ সূর্যবীর সিং।

পাঁচ দিনের খেলায় ফলাফল সম্বন্ধে তৃতীয় দিনেই সন্দেহের নিরসন, বোম্বাইয়ের প্রথম ইনিংস এগিয়ে থাকার সূত্রে। তবুও পুরো পাঁচ দিনই খেলা উপভোগ্য হয়েছে ব্যাট-বলের নতুন নজিরে যা চোখে দেখার মত, মনে রাখার মত। এবং সংখ্যা-তথ্যে আগ্রহীদের কাছে খেলার স্কোর বোর্ডটিও আকর্ষণীয়।

ব্যাটসম্যানের এককালের মৃগয়া-ভূমি ব্রাবোর্নের উইকেটে এখন রান তোলা বেশ শক্ত। কিন্তু ফাইনালে রান উঠেছে বে-হিসাবী ভাবে। তার জলজ্যান্ত প্রমাণ ২৬টি উইকেটের পতনে মোট ১৩৬৭ রান। গড়ে প্রত্যেকের ভাগে পঞ্চাশেরও বেশী। ৬ জন করেছেন সেঞ্চুরী। এর মধ্যে একজনের ডাবল সেঞ্চুরী। আর একজন এক রানের জন্য ডাবল সেঞ্চুরী লাভে বঞ্চিত।

এই প্রতিযোগিতায় "একাই এক শো"র আবির্ভাব হলেন রাজস্থানের তরুণ অধিনায়ক হনুমন্ত সিং। নতুন কিছু সৃষ্টির দিক থেকে তাঁকে এ খেলার নায়ক বলা যেতে পারে। তিনি ব্যাট হাতে বোম্বাইয়ের বোলারদের নিয়ে সমানে ছেলে-খেলা করেছেন। গত কুড়ি বছরের ইতিহাসে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরি করার কৃতিত্ব একমাত্র তিনিই দেখিয়েছেন এই খেলায়। এজন্যে রনজি ট্রফির ক্রমপর্যায়ে তাঁর স্থান এগারোজনের পরে। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ইনিংসে অপরাজিত থেকে দ্বি-শতাধিক রান করার দিক থেকে তিনিই একমাত্র উদাহরণ। আবার রনজি ট্রফির এ মরসুমে ৮৬৯ রান করার জন্য সর্বোচ্চ রানকারীর পঙ্‌ক্তিতে হনুমন্তই প্রথম নাম। গড় ১২৪·১। সহোদর সূর্যবীর ও তিনি রাজস্থানের দু দফার মোট ৭২৭ রানের মধ্যে ৫৩৩ রান করেছেন। তাঁর এই ক্রীড়াশৈলীকে তারিফ করার জন্যে খেলার শেষে বোম্বাইয়ের দর্শকগণ দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে করতালিধ্বনিতে স্টেডিয়াম মুখর করে তোলেন, যা অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি বললেই চলে। অতীত প্রসঙ্গে বলা যায়, ইন্দোরের মাঠে তাঁরই দক্ষ দলনায়কত্বে ওয়েস্ট ইনডিজ দল এ সফরের প্রথম পরাজয় বরণ করেছিল। তারই পরিণত রূপের সন্ধান পেয়েছে বোম্বাইয়ের দর্শককুল।

হনুমন্ত তাঁর এই অসাধারণ ক্রীড়া-কীর্তি দেখাতে যোগ্য সাহচর্য পেয়েছেন বড়ভাই সূর্যবীরের কাছ থেকে। বলতে দ্বিধা নেই, সময় সময় সূর্যবীর হনুমন্তকে ছাপিয়ে গেছেন। তিনি যোগ্য হাতে প্রথম ইনিংসে ৭৯ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩২ রান করেছেন। রনজি ট্রফির খেলায় এইটি তাঁর তৃতীয় শতাধিক রান। সর্বোপরি এই রাজভ্রাতৃদ্বয়ের প্রশংসনীয় ক্রীড়াধারা ভারতীয় ক্রিকেটের অতীত খনেদীয়ানার অনস্বীকার্য দিকটিকে তুলে ধরেছে। ভারতীয় ক্রিকেটে রাজ-রাজড়ার স্মৃতি-চারণের যোগ্য উপমা হিসেবে এই ম্যাচটি চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

বিজয়ী বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংসের পাঁচ শতাধিক রানের মধ্যে অধিনায়ক হারদিকার, সারদেশাই ও নাদকারনী প্রভৃতির তিন সংখ্যার ইনিংসগুলিও বিশেষ স্মরণীয়। এঁদের মধ্যে সারদেশাইয়ের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, মাত্র একরানের জন্যে ডাবল সেঞ্চুরী করতে পারেননি। ভারতীয় ক্রিকেটে এঁদের সুনাম বহু দিন ধরেই, সেজন্যে ভূমিকা আশ্চর্যজনক কিছু নয়। তবে নতুন রেকর্ডের দিক থেকে উইকেট-রক্ষক ফারুক ইঞ্জিনীয়ারের দু ইনিংসে মোট ৮টি ক্যাচ ধরার ঘটনা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। এই খেলা শেষ হওয়ার সাথে সাথে বোম্বাই দলের দিওয়াদেকার অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি ১৯৫৭ সালে বোম্বাই দলের হয়ে প্রথম রনজি ট্রফি খেলেন এবং বোম্বাইয়ের ক্রিকেটে তাঁর দানও অসামান্য।

সবশেষে বলি, বারবাডোজের মত ভারতীয় ক্রিকেটে বোম্বাইয়ের যেমন বৈশিষ্ট্য আজ রাজস্থানও সেই বৈশিষ্ট্যের আংশিক অংশীদার। কারণ, গত ৭ বছরের মধ্যে ৬ বছরই রাজস্থান রনজি প্রতিযোগিতায় ফাইনালে খেলছে—যদিও এখন পর্যন্ত তারা রনজি ট্রফি লাভ করতে পারেনি। এ বছর তারা প্রবল শক্তিশালী বোম্বাইয়ের সরাসরি জয়লাভ আটকে রেখেছে। বোম্বাই জিতেছে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে। হয়তো অচিরে এমন দিন আসবে যেদিন বোম্বাইকেও তারা পরাজিত করবে। ক্রিকেট খেলায় রাজ-স্থানের আগ্রহ এবং খেলোয়াড়দের আন্ত-রিকতার নজিরে এ আশা অমূলক নয়।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ডঃ—

রাজস্থান—প্রথম ইনিংস ২৮২ (হনুমন্ত সিং ১০৯, সূর্যবীর সিং ৭৯; ভার্দে ৩৪ রানে ৩ উইঃ, দেশাই ৪২ রানে ৩ উইঃ)।

বোম্বাই—প্রথম ইনিংস (৭ উইঃ) ৫৮৬ (সারদেশাই ১৯৯, নাদকারনী ১০৩, এম এস হারডিকার ১০৮ অপরাজিত)।

রাজস্থান—দ্বিতীয় ইনিংস (৭ উইঃ) ৪৪৫ (হনুমন্ত সিং ২১৩ অপরাজিত, সূর্যবীর সিং ১৩২, পি শর্মা ৭৪)।

বোম্বাই—দ্বিতীয় ইনিংস (২ উইঃ) ৫৪ (অশোক মানকড় ২৫ অপরাজিত)।

*

সর্ব ক্ষেত্রে, বিশেষ করে খেলাধুলোর ক্ষেত্রে, দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের উৎকট

বর্ণবিদ্বেষের কথা সর্বজনবিদিত। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত সরকার কোন মতেই কৃষ্ণকায়দের নিয়ে একসঙ্গে খেলাধূলো করার কথা ভাবেননি। এই বর্ণবিদ্বেষের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে অলিম্পিকের দ্বার রুদ্ধ। এই বর্ণবিদ্বেষের ফলেই দক্ষিণ আফ্রিকার ইম্পিরিয়াল ক্রিকেট কনফারেন্সে (এখন কমনওয়েলথ ক্রিকেট কনফারেন্স) সদস্যপদ বাতিল হয়েছে। এই বর্ণবিদ্বেষের জন্যই আজ দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংলণ্ডের ক্রিকেট সফরও বানচাল হবার মুখে। সুতরাং দক্ষিণ আফ্রিকার নীতি কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। কত দিন আর একা একা চলা যায়?

ঠিক হয়েছে, এর পর আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার দল গড়া হবে মিশ্র প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে। অর্থাৎ দলে শ্বেতকায় অ্যাথলীটও থাকবেন, কৃষ্ণকায় অ্যাথলীটও থাকবেন। তাঁদের মনোনীত করবেনও শ্বেত-কৃষ্ণ দুই সম্প্রদায়ের কর্মকর্তারা। দক্ষিণ আফ্রিকা আশা করছে, এই নীতির ফলে তাদের জন্য অলিম্পিকের দ্বার খুলে যাবে, মেক্সিকো অলিম্পিকে অংশ গ্রহণের ডাক আসবে। আগামী মে মাসে তেহেরানে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির যে অধিবেশন হচ্ছে সেখানে ব্যাপারটি আলোচনা হবারও কথা আছে।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত সম্প্রদায় ভাঙছেন, তবু মচকাচ্ছেন না। আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকসে দেশের বাইরেই তাঁদের এই মিশ্র প্রতিনিধিত্বের সিদ্ধান্ত। দেশের মধ্যে কিন্তু সেই সাম্প্রদায়িক উগ্রতা। দক্ষিণ আফ্রিকা অলিম্পিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ফ্রাঙ্ক ব্রাউন দ্বিধাহীন ভাষাতেই বলেছেন—'আমরা বিদেশের নিয়মনীতি মেনে চলবো; সুতরাং আমরাও আশা করব, বিদেশীরা আমাদের দেশে মেনে চলবেন আমাদের দেশের নিয়মনীতি।'

এর অর্থ—দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা ও কালো চামড়ার খেলোয়াড়দের একসঙ্গে খেলাধূলো করার ক্ষেত্রে যে বাধা আছে সেটা থেকেই যাচ্ছে।

মিশ্র প্রতিনিধিত্বের সংবাদে যারা আস্থা করছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী শ্রীভোরস্টার খেলাধূলার ক্ষেত্রে বর্ণবিদ্বেষের বিলোপ করবেন, শ্রীব্রাউনের মন্তব্যে এখন তাঁরা প্রমাদ গুনছেন।

তবে হয়তো মাসতুতো ভাই ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার জন্যই শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে ভাঙতেও হবে, মচকাতেও হবে। কারণ, এম সি সি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, যদি তাদের দলে নির্বাচিত কোন খেলোয়াড়ের সংগে খেলতে দক্ষিণ আফ্রিকা আপত্তি করে, তবে ১৯৬৮ সালের ক্রিকেট সফর বাতিল হবে।

বলা বাহুল্য, ইংলণ্ডের কৃষ্ণকায় ক্রিকেট খেলোয়াড় বেসিল ডি'অলিভেরাকে নিয়েই এই আপত্তির প্রশ্ন। পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ডি'অলিভেরার ইংলণ্ড দলে নির্বাচন নিশ্চিত। আর জল যেভাবে ঘোলা হয়েছে তাতে ডি'অলিভেরাকে বাদ দিলে খেলাধূলার জগতে ইংলণ্ডের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠাও ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। দেখা যাক, শ্বেতের সংগে সম্পর্ক রাখার জন্যই সাউথ আফ্রিকার উৎকট বর্ণবিদ্বেষের জোয়ার ভাটার টান আসে কিনা!

*

ইউরোপ সফর এবং মাদ্রিদে আয়োজিত আন্তর্জাতিক হকি উৎসবে অংশ গ্রহণের জন্য ভারতীয় হকি ফেডারেশন যে ৩০জন সম্ভাবিত খেলোয়াড়কে বাছাই করে জলন্ধরের শিক্ষা শিবিরে পাঠিয়েছেন তাঁদের যোগ্যতার প্রশ্নে সন্দেহ না করেও বলা যায়, নীতি ও নৈপুণ্যের প্রশ্নকে বড় করে না দেখে খামখেয়ালীপনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

এমন-অনেক খেলোয়াড়ের নাম বাদ পড়েছে যাঁরা ভারতের হকি-ক্ষেত্রে তো বটেই, আন্তর্জাতিক হকি ক্ষেত্রেও সুনামের অধিকারী। মহীন্দার লাল, হরিপাল কৌশিক, গুরুবক্স সিং, পৃথ্বীপাল সিং, ধরম সিং, ইনাম-উর-রহমান—কার নৈপুণ্য ও যোগ্যতা নির্বাচিত-দের চেয়ে কম? তারুণ্যের প্রশ্ন যদি ওঠে, তবে জাতিপাল সিং এবং তেজীন্দার মোহন্তী বা বাদ পড়লেন কেন?

অলিম্পিক খেলোয়াড় মহীন্দার লাল, যাঁর একমাত্র গোলের ফলে টোকিও অলিম্পিক ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের জয় এবং যাঁর ক্রীড়াদক্ষতা আজও সন্দেহাতীত তাঁকে নির্বাচিত না করার কোন সংগত কারণ নেই। বিশেষ করে রাইট হাফ ব্যাকের খেলোয়াড় মহীন্দার লাল তাঁর নতুন জায়গা সেন্টার হাফে অদ্ভুত ভাল খেলেছেন। আর চরঞ্জিতের অবসর গ্রহণের পর এই সেন্টার হাফ নিয়েই ভারতের সমস্যা। অথচ মহীন্দার দলে স্থান পাননি। সংবাদপত্রে বলা হয়েছে, বেশী বয়সই মহীন্দারের প্রতিবন্ধক। তাই যদি হবে তবে মহীন্দারের চেয়েও বয়সে বড় খেলোয়াড়দের কেন নির্বাচিত করা হল? মহীন্দার লালের বয়স ৩০। ৩৩ বছর বয়সী শংকর লক্ষ্মণ কিন্তু দলে আছেন। গোলরক্ষক হিসাবে লক্ষ্মণের বয়স প্রতিবন্ধক না হলেও অন্যান্য খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না।

বলা হয়েছে, মাদুরাইয়ের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় যাঁরা যোগ দেননি তাঁদের কথা বিবেচিত হয়নি। নানা কারণে অনেকেই অনেক খেলায় যোগ দিতে পারেন না। যেমন জাতীয় প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারেন নি হরিপাল, পৃথ্বীপাল, ইনাম-উর প্রভৃতি। কিন্তু পাঞ্জাবের বলবীর সিং জাতীয় প্রতিযোগিতায় যোগ না দিয়েও অন্তর্ভুক্ত হলেন কোন যুক্তিতে? ব্যাংককের এশিয়ান গেমসে যে যোগীন্দার সিংকে যোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়নি সেই যোগীন্দারই আবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। তাঁর বয়সই বা কত?

বাংলার অধিনায়ক ও ব্যাক গুরুবক্স সিংকে বাদ দেবার কারণ সম্ভবত তাঁর কাঁধের আঘাত। কিন্তু চোট লাগা খেলোয়াড় ফ্রাংককে শারীরিক সুস্থতার সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে, যোগ্যতা ও নীতি অনুযায়ী দল গড়া হয়নি।

দল গড়া অর্থে—আমি নির্বাচিত ৩০ জনকেই বোঝাতে চাইছি। পাকাপাকিভাবে এ'দের মধ্য থেকে বাছাই করা হবে ১৬জন খেলোয়াড়কে, যাঁরা ইউরোপ সফর করবেন।

অবশ্যই নির্বাচক সমিতির তারুণ্যের উপর জোর দেওয়া ভারতীয় হকির পক্ষে শুভলক্ষণ। নির্বাচিত ৩০ জনের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই নবাগত, যাঁরা প্রতিনিধিমূলক খেলায় এর আগে ভারতের জামা গায়ে পরেন নি। মেক্সিকো অলিম্পিকের জন্য দল গড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ'দের নৈপুণ্য পরখের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। তবু দল গড়ার ব্যাপারে যোগ্যতাই প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত।

একলব্য

বি-এফ-জে-এ'র বিচারে বছরের শ্রেষ্ঠ

বেংগল ফিল্ম জার্নালিস্টস অ্যাসো-সিয়েশন-এর সভ্যদের বিচারে ১৯৬৬ সনের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবি "তিসরী কসম"। এই হিন্দী চিত্রটি পরিচালক বাসু ভট্টাচার্যের প্রথম প্রয়াস। সত্যজিৎ রায়ের "নায়ক" দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।
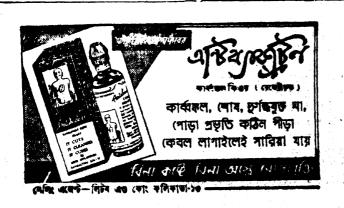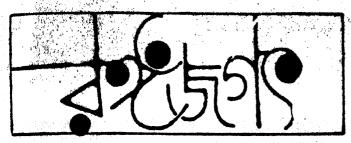
ব্যালট পদ্ধতিতে সভ্যদের ভোট নেওয়া হয়। ভোটের ফলাফল নিচে প্রকাশ করা হল।

১৯৬৬ সনের প্রথম দশটি ভারতীয় ছবি (গুণানুক্রমে) : তিসরী কসম, নায়ক, শহীদ, গাইড, গল্প হলেও সত্যি, মমতা, কাঁচকাটা হীরে, গাবান, সুভাষচন্দ্র, আশমান-মহল।

বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠ

পরিচালনা : বাংলা—সত্যজিৎ রায় (নায়ক); হিন্দী—বাসু ভট্টাচার্য (তিসরী কসম)। **চিত্রনাট্য :** বাংলা—সত্যজিৎ রায় (নায়ক); হিন্দী—নবেন্দু ঘোষ (তিসরী কসম)। **সংলাপ :** বাংলা—সত্যজিৎ রায় (নায়ক); হিন্দী—ফণীশ্বরনাথ রেণু (তিসরী কসম)। **প্রধান পুরুষ চরিত্রে অভিনয় :** বাংলা—উত্তমকুমার (নায়ক); হিন্দী—রাজ কাপুর (তিসরী কসম); **প্রধান নারী চরিত্রে :** বাংলা—মাধবী মুখোপাধ্যায় (জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার); হিন্দী—ওয়াহিদা রহমান (তিসরী কসম); **সহ-অভিনেতা :** বাংলা—বিকাশ রায় (কাঁচকাটা হীরে); হিন্দী—প্রাণ (শহীদ); **সহ-অভিনেত্রী :** বাংলা—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (কাল তুমি আলেয়া); হিন্দী—কামিনী কৌশল (শহীদ)। **সংগীত পরিচালনা :** বাংলা—হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (মণিহার); হিন্দী—শচীন দেব বর্মন (গাইড)। **গীত রচনা :** বাংলা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় (নতুন জীবন); হিন্দী—শৈলেন্দ্র (তিসরী কসম)। **নেপথ্য গায়ক :** বাংলা—মান্না দে (শংখ-বেলা); হিন্দী—শচীন দেব বর্মন (গাইড) ও মুকেশ (তিসরী কসম); **নেপথ্য গায়িকা :** বাংলা—আরতি মুখোপাধ্যায় (গল্প হলেও সত্যি; হিন্দী—আশা ভোঁসলে (তিসরী কসম)। **চিত্রগ্রহণ :** বাংলা—কৃষ্ণ চক্রবর্তী (স্বপ্ন নিয়ে); হিন্দী—সুব্রত মিত্র (তিসরী কসম)। **সম্পাদনা :** বাংলা—দুলাল দত্ত (নায়ক); হিন্দী—জি জি মায়েকর (তিসরী কসম) **শিল্পনির্দেশনা :** বাংলা—কার্তিক বসু (কাঁচকাটা হীরে), হিন্দী—রাম য়াদেকর (গাইড)। **শব্দ-গ্রহণ :** বাংলা—নৃপেন পাল, অতুল চট্টো-

"হু'জ অ্যাফ্রেড অব ভার্জিনিয়া উলফ": এলিজাবেথ টেলর: এ-সপ্তাহে বহু বিতর্কিত ছবিটি এলিটে মুক্তি পাচ্ছে

"খেয়া" পরিচালনা করছেন রূপক-গোষ্ঠী: রূপক-গোষ্ঠীর অন্যতম এবং প্রযোজক-সুরকার শ্যামল মিত্র ছবির একটি দৃশ্য গ্রহণের আগে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও শিশু-শিল্পীকে নির্দেশ দিচ্ছেন। ফটো—দেশ

পাখায়, সুজিত সরকার (নায়ক); হিন্দী—জি এম বায়োট (গাইড)।

১৯৬৬ সনের শ্রেষ্ঠ তিনটি বিদেশী চিত্র (গুণানুক্রমে) : লরেন্স অব অ্যারেবিয়া, লাভ অ্যাট টোয়েন্টি, ইয়েস-টারডে, টুডে, টুমরো। প্রথমোক্ত চিত্রের ডেভিড লীন শ্রেষ্ঠ পরিচালক রূপে নির্বাচিত। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর গৌরব অর্জন করেছেন যথাক্রমে পিটার ওটুল (লরেন্স অব অ্যারেবিয়া) এবং সোফিয়া লোরেন (ইয়েসটারডে, টুডে, টুমরো)।

চিত্রসমালোচনা

মিস ব্লু স্কাই

জাপানী ছবি "মিস ব্লু স্কাই" কলকাতার দর্শকদের ভাল লাগত। বেশ কিছুটা প্রসাদ-গুণ, কখনও-সখনও আবেগের স্থূল প্রলেপ এবং শেষের সেই বাহ্যাপূরণ (উইশ ফুল-ফিলমেণ্ট) এখানকার ছায়াছবির দর্শকরা দেখতে অভ্যস্ত। পরিচালক ইনুয়ে যে মেয়েটির গল্প তাঁর ছবিতে বলেছেন তার মনের সম্বন্ধ দূরের নীল আকাশের সঙ্গে। আকাশকে সে কাছে ডাকে, বিদায় জানায়। মেয়েটি অবৈধ সন্তান বলেই হয়ত পরিচালক তার উপর প্রায় সব রকম মহৎ গুণ ও অপরিসীম সহনশীলতা আরোপ করেছেন। এবং সে দেখতে সুন্দর। তা ছাড়া ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ'-এর লুসির মত প্রকৃতির সন্তান। পরিচালকের এই পক্ষপাত আমাদের দেশের ছবিতেও দেখা যায়। অন্ত্যজ কিংবা অবৈধ সন্তান মহৎ অথবা মহীয়সী হয়।

যেখানে মিস ব্লু স্কাই অর্থাৎ মেয়েটি তার মায়ের দেখা পেয়েছে সেখানে পরিচালক তাঁর ক্যামেরা একাধিক শিশুর উপর ন্যস্ত করেছেন। এবং বাৎসল্যরসের বিস্তার করেছেন। এমন মোটা দাগ ছবিতে আরও আছে। সূক্ষ্ম রসবোধেরও অভাব নেই। মা ও মেয়ের সাক্ষাতের মুহূর্তটি চমৎকার, খুবই পরিমিত। এখানে পরিচালক মেলো-ড্রামা বর্জন করেছেন। তা ছাড়া কয়েকটি দৃশ্যের 'হিউমার' বেশ ভাল—একটি কিশোরকে কেন্দ্র করে। ছবিটি আদ্যোপান্ত সুখভোগ্য, বহু অংশে নাটকীয় এবং বেগ-সম্পন্ন।

সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা আয়োজিত জাপানী চলচ্চিত্র অধিবেশনে আর যে দুটি ছবি ছিল, তা কলকাতার আগে দেখানো হয়েছে। ছবি দুটি কুরোসাওয়ার "সেভেন সামুরাই" এবং "হাই অ্যাণ্ড লো"।

বোকাচিও সেভেণ্টি

তিনজন বড় পরিচালকের তিনটি ছোট ছবির সমষ্টি 'বোকাচিও সেভেণ্টি'। দৈর্ঘ্যেও ছোট, গুণেও বটে। ফেলিনির ছবিটিতে (দি টেম্পটেশন অব ডঃ অ্যান্টোনিও) সিনেমার নিজস্ব পরিচয় আছে। এবং এক স্ববিরোধী নীতিবাগীশের চরিত্র ফেলিনি যে-ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে তাঁর বাস্তবিকতাও প্রশংসনীয়। এক বিরাট পোস্টারে আঁকা এক সুন্দরীর দেহ এবং ডঃ অ্যান্টোনিওর পিউরিটান মন—এই দুটি অদ্ভুত ফেলিনির অ্যান্টোনিওর সম্বল। এর মধ্য দিয়ে দর্শককে অবচেতনের সত্যে পৌঁছিয়ে দিতে ফেলিনির বেগ পেতে হয়নি। এখানেই শিল্পী হিসাবে ফেলিনির সার্থকতা। যদিও ফেলিনির প্রতি-ভার সামান্য পরিচয় এই ছবিতে আছে।

ভিসকন্তির ছবির (দি জব) দুটি চরিত্র। স্ত্রী জানতে পারে, তার বিত্তবান স্বামী কল-গার্লদের জন্য প্রচুর টাকা নষ্ট করে। স্ত্রীও এই সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ। টাকার দরকার তারও। ভিসকন্তি সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনীটি ব্যক্ত করেন। ক্লাইম্যাক্সে সব কথা ছাপিয়ে ওঠে কঠিন নীরবতা। প্রাচুর্যের মধ্যে শূন্যতা সুন্দর-ভাবে দেখিয়েছেন ভিসকন্তি।

ডি-সিকার কাহিনী সহজ, সরল। হয়ত বেশী উপভোগ্য। তবে সূক্ষ্ম মননের অবকাশ এতে নেই। ছবির নায়িকা সোফিয়া লোরেন। নায়িকার একটি শুটিং গ্যালারি আছে। গোলমাল বাধে যখন সে এমন এক লটারীর ব্যবস্থা করে যার পুরস্কার সে নিজেই। শেষ পর্যন্ত নায়িকা মনের মত এক বলিষ্ঠ যুবক খুঁজে পেয়েছে—যাকে 'মাথা ধরেছে' বলে সে এড়িয়ে চলেনিনি।

অনিতা

রাজ খোসলার "উয়হ্ কোন্ থী"-র কথা ক্রাইম-চিত্রামোদীরা ভুলতে পারছেন না। সম্ভবত শ্রীখোসলা নিজেও নয়। দর্শকের আশা, "উয়হ্ কোন্ থী"-নির্মাতার কাছ থেকে আরও বেশী চমকপ্রদ কিছু পাওয়া যাবে। এদিকে শ্রীখোসলাও সেই একই রহস্যের জালে নতুন উপকরণ খুঁজেছেন। অতএব "অনিতা", শ্রীখোসলার নতুন ছবি, দর্শকের সামনে নতুনতর কোন রহস্যের দরজা খুলে দিতে পারেনি।

ছবির প্রারম্ভে জ্যোতিষ অনিতার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছেন (বাবা কেন মেয়ের ঠিকুজি নিয়ে গণকের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন তা বোঝা দুষ্কর), তোমার মেয়ের কপালে কী লেখা তা শোনবার শক্তি আছে? আমাদের কাছে কিন্তু অনিতার কপালের লিখন অসহ্য মনে হয়েছে। মানুষের অদৃষ্ট নাকি সম্ভব-অসম্ভবের ধার ধারে না। এখানেই বোধ হয় শ্রীখোসলার সান্ত্বনা। তাই তিনি এত আজগুবী ব্যাপার দেখাবার ভরসা পেয়েছেন। তবু আসলে একই, সেই পুরোনো কথন। অনিতা (সাধনা) বাবার অমত উপেক্ষা করে চেয়ালপনার নায়িককে (মনোজ) নিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গেছে। সইও নাই করে ফেলেছে, অনিতা করতে যাবে এমন সময়েই

শ্যাম চক্রবর্তী পরিচালিত ললিত চিত্রম-এর "দুষ্টু প্রজাপতি" ছবিতে কিশোরকুমার ও তনুজা

তার বাবার আবির্ভাব। এবং বাবার কথা অবজ্ঞা করে অনিতা আর সই করতে পারেনি। যে এত সাহসে ঘর ছাড়ল সে আবার কিসের ভয়ে ঘরে ফিরে গেল এবং প্রেমিককে ফিরিয়ে দিল তা যদি শ্রীখোসলা খোলসা করতে বলতে না চান তবে দর্শকের কী-ই বা করবার আছে। একে সাসপেন্স ভাবা ছাড়া উপায় নেই। 'স্টোরি আইডিয়া' যখন তাঁর এবং পরিচালকও তিনি, তখন একটার পর একটা ঘটনা নিজের খেয়াল-খুশিমত সাজাবার অধিকার তাঁর আছে। তা যতই কার্য-কারণ-সম্বন্ধ-রহিত হোক না কেন, অনিতাকে তিনি অশরীরীও মনে করাতে পারেন, আবার মানবী রূপেও দেখাতে পারেন। অর্থাৎ দর্শককে ধোঁকা দেবার কোন ত্রুটি তিনি রাখেন নি। এমন কি নীরজ যখন অনিতাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে তখন অনিতা বাধা দিয়েছে, রিভলবার দেখিয়ে প্রেমিককে শাসিয়েছে (আত্মহত্যা করবে বলে), সে যেন পুলিসকে টেলিফোন না করে। এ ধরনের অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনাই ছবিতে দেখা যাবে। তবে ধোঁকা আর সাসপেন্স এক নয়—ছবি দেখতে দেখতে এ কথাই মনে হয়েছে। অবশ্য শ্রীখোসলা আগে থেকে দর্শককে যা জানাতে চাননি তা এখানে প্রকাশ না করাই ভাল। এটুকু বলাই যথেষ্ট, "অনিতা" একটি পুরোপুরি ক্রাইম ছবি, যাতে পুরনো বস্তুই নতুন করে সাজানো হয়েছে।

সকলের অভিনয়ই চিত্রনাট্যানুগ। রঙের ব্যবহারও ভাল। লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল সাসপেন্স-মুহূর্তের এফেক্ট-সাউন্ড তৈরির কাজে কল্পনার পরিচয় দিয়েছেন। গানের সুরও ভাল।

নেপথ্যে

এবারকার **বি-এফ-জে-এ** অ্যাওয়ার্ড নিয়েও আলোচনা-সমালোচনার ঝড় উঠেছে। উঠবেই। শিল্পের বিচারে সবাই একমত হতে পারেন না। কেউ কেউ বিশেষ করে একজন চিত্র সমালোচক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, "তিসরী কসম" কেমন করে "নায়ক"-এর উপরে স্থান পেল। বিস্মিত হবারই তো কথা। সম্ভবত বি-এফ-জে-এ এই প্রথম একটি হিন্দী চিত্রকে সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ ছবি বলে চিহ্নিত করলেন।

"তিসরী কসম"-এর প্রধান দোষ বোধ হয় এই যে, ছবিটি হিন্দী। হিন্দীতেও যে একটি উঁচুদরের এক্সপেরিমেন্টাল ছবি হতে পারে, এই সম্ভাবনাই বা আমরা উড়িয়ে দিতে চাইছি কেন। শুধু আঞ্চলিক ভাষাতেই 'আর্ট-ছবি' তৈরী হতে পারে এই বদ্ধমূল ধারণাই কি পোষণ করতে হবে? বাসু ভট্টাচার্য যদি বোম্বাইয়েই এক্সপেরিমেন্ট-এর আলোড়ন আনতে চান তবে ক্ষতি কী। তা ছাড়া, "তিসরী কসম" তো উঁচুদরের আর্টের সব শর্তই পালন করেছে। প্রথমত, ছবিটি বক্স-অফিসে সাফল্য পায়নি। দ্বিতীয়ত, এ ছবিতে ওয়াহীদা রেহমান স্টার নন, শিল্পী। রাজ কাপুর সম্বন্ধেও তা প্রযোজ্য। তৃতীয়ত, "তিসরী কসম" ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট-এ তৈরী। চতুর্থত, বোম্বাইয়ের কোন ক্যামেরাম্যানকে এ ছবিতে নেওয়া হয়নি। সুব্রত মিত্র এই ছবির আলোকচিত্রশিল্পী। অতএব ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন-এর অধিকারীদের মনঃক্ষুণ্ণ হবার কারণ নেই।

আর্ট-ছবির যে-সব বিধিবন্ধ প্রকৃতি বা ফরমুলা স্বীকৃত (এটাও কম অযৌক্তিকতা নয়), "তিসরী কসম" তার সব ক'টাই সযত্নে রক্ষা করেছে। তবে প্রশ্ন হতে পারে, ছবিতে এত গান কেন? উত্তর সহজ। গানের প্রয়োজন আছে। ছবিতে কোন 'আপস' নেই কি? আছে। কোন্ আর্ট-মার্কা ছবিই বা নিখুঁত?

বি-এফ-জে-এ'র এবার বড় অন্যায় বোধহয় এই যে, তাঁরা 'কনভেনশন' ভেঙেছেন। এবং উন্মুক্ত মন নিয়ে ছবির সামগ্রিক ভাল-মন্দ বিচার করেছেন। ব্যক্তির জায়গায় ছবিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এই বিচার উক্ত সমালোচকের ভাল লাগেনি। তাঁর বক্তব্য এই, সত্যজিৎবাবুর "মাইনর ওয়ার্ক"-ও (তিনি 'নায়ক'-কে

ফিল্ম ক্র্যাফট-এর "পঞ্চশর"-এর মুক্তি আসন্ন; আউটডোরে পরিচালক অরুণ গুহ-ঠাকুরতা, রুমা গুহঠাকুরতা ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ফটো-দেশ

"মাইনর ওয়ার্ক" মনে করেন) অন্য যে-কোন ভারতীয় ছবির চেয়ে ভাল। কোন একজন ইংরেজ সমালোচক বলেছিলেন, কোন একজন "ফিল্ম মেকার"-এর ছবি সমালোচককে বারবার এমন অভিভূত করতে পারে যে, তার মনে কোন একটি সময়ে "ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন"-এর বদলে "পার্সোন্যালিটি কাল্ট" এসে যেতে পারে। অতএব উক্ত সমালোচকের মন্তব্য সম্বন্ধে নীরবতাই শ্রেয়। তবে প্রসংগত বলতে পারি, "চারুলতা" যে-বার শ্রেষ্ঠ চিত্রের মর্যাদা সমেত প্রায় এক ডজন পুরস্কার পেয়েছিল তখন ওই সমালোচকের কাগজে বলা হয়েছিল সত্যজিৎ রায়কে সম্মান দেওয়া বি-এফ-জে-এর "রিচ্যুয়াল" হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উক্তিতে বি-এফ-জে-এ তখনও সম্ভবত লজ্জাবোধ করেন নি। আজ এর উল্টো বিরূপ মন্তব্যেও হয়ত করবেন না। গুণের কদর যাঁরা দেন তাঁদের মনে প্রত্যয় থাকে। বি-এফ-জে-এ অ্যাওয়ার্ড মানেই সত্যজিৎ-বাবুর পুরস্কার—এমন সহাস্য উক্তি প্রায়ই চলচ্চিত্রমহলে শোনা যেত। সাংবাদিকদের এতে বিচলিত হতে দেখিনি। সত্যজিৎ রায়কে তাঁর গুণের স্বীকৃতি কলকাতার চিত্রসমালোচকরা বরাবরই দিয়ে এসেছেন। এবারেও দিলেন—যে কারণে শ্রীরায় শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার ও শ্রেষ্ঠ সংলাপ-রচয়িতার সম্মানের অধিকারী।

*

নেপথ্য সংবাদ এই, যে তিনটি বিভাগে শ্রীরায় শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কারের অধিকারী, সেই-সব বিভাগে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না বললেই চলে। অর্থাৎ প্রায় সব সভ্যদের ভোটই শ্রীসত্যজিৎ রায় পেয়েছেন। চার-পাঁচটি ভোট হয়ত অন্যের নামে পড়েছে। এ ব্যাপার ঘটেছে নাকি আরও কয়েকজনের ক্ষেত্রে। যেমন উত্তমকুমার (নায়ক), হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (মণিহার), মান্না দে (শংখবেলা), সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (কাল তুমি আলেয়া) প্রভৃতি।

এবং হিন্দী চিত্রের শ্রেষ্ঠ শম্ভু ভট্টাচার্য (তিসরী কসম), রাজ কাপুর (তিসরী কসম), প্রাণ (শহীদ), কামিনী কৌশল (শহীদ), শৈলেন্দ্র (তিসরী কসম), এস ডি বর্মন (গাইড—সংগীতপরিচালক) প্রভৃতি।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা বিকাশ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দিলীপকুমার (পাড়ি)। দু'জনের মধ্যে তীব্র ভোট-যুদ্ধ হয়েছে। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়ের জয়লাভও সহজে ঘটেনি। "জোড়াদীঘির..." মাধবীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে 'শংখ-বেলা'-র মাধবী এবং "শুধু একটি বছর"-এর সুপ্রিয়া চৌধুরীর। শেষ সময়ে ওয়াহীদা রেহমান (তিসরী কসম) "মমতা"-র সুচিত্রা সেনের উপর জিতে গেলেন। আলোকচিত্রশিল্পী কৃষ্ণ চক্রবর্তীর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সুব্রত মিত্র (নায়ক)। এবং সুব্রত মিত্রকে (তিসরী কসম) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে ফলি মিস্ত্রীর (গাইড) সঙ্গে। কার্তিক বসুও (কাঁচ-কাটা হীরে) শেষ পর্যন্ত হারিয়ে দিলেন বংশী-চন্দ্র গুপ্তকে (নায়ক)। পুলক বন্দ্যো-পাধ্যায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হননি। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত হলে "মণিহার"-এর পুলকের কাছেই পরাজিত হতেন। শেষের দু'একটি ব্যালট গোনার আগেও বোঝা যায়নি লতা মঙ্গেশকার (মণিহার) ও আরতি মুখোপাধ্যায়ের (গল্প হলেও সত্যি) মধ্যে কে জিতবেন। মান্না দে ও আরতির জয় উল্লেখযোগ্য—যেখানে "মণিহার"-এর গান এত 'হিট'। বিশেষ করে মান্না দে'র জয়। তাঁকে মোটেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়নি।

সব দেখে মনে হয়, সাংবাদিকরা তাঁদের বিচারে "কমনপ্লেস ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন"-এর পরিচয় দেননি। এর প্রধান প্রমাণ, "লাভ অ্যাট টোয়েণ্টি" শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্রের তালিকায় দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে। ছবিটি প্রথম স্থানেরই অধিকারী। ছবিটি পুরো এক সপ্তাহও কলকাতায় চলেনি। অনেক সভ্য দেখবার সুযোগ পাননি। তবুও ছবিটি এতখানি সম্মান পেল। রক্ষণশীল ও বদ্ধমূল ধারণা যে সাংবাদিকদের প্রভাবিত করেনি, আবারও তার প্রমাণ মিলেছে।

চিত্তাকর্ষক নৃত্যানুষ্ঠান

বিদেশে ভারতীয় নৃত্যকলা পরিবেশন করে শঙ্কর প্রেজেনটেশন-এর শিল্পীরা কলকাতায় ফিরে এসেছেন। সেখানে কী তাঁরা দেখালেন এবং কেন এত প্রশংসা পেলেন এই শহরের শিল্পরসিকরা তা জানলেন গত সপ্তাহে। "এবার শিল্পীরা ঘরে ফিরে যাবেন, যাবার আগে আপনাদের মন তাঁরা রাঙিয়ে দিয়ে যাক এটাই চেয়ে-ছিলাম," বললেন শঙ্কর প্রেজেনটেশন-এর বীরেন্দ্রশঙ্কর।

মন রাঙাতে তাঁরা পেরেছিলেন। তার চেয়েও বেশী কিছু যেন দিলেন শিল্পীরা, একের পর এক যখন এসে তাঁরা নাচলেন নিউ এম্পায়ার মঞ্চে। ইন্দ্রাণী রহমানের কুচিপুড়ি প্রথমটা দর্শকের মনে খুব মোহ বিস্তার করতে না পারলেও শেষের দিকে শিল্পী ভরতনাট্যম ও ওড়িশীর দেহভঙ্গিমায় যেন সহজেই ভাস্করের মূর্তিতে পরিণত হলেন। অভিনয়, মুদ্রা, পদছন্দ মিলে যেন সৌন্দর্যের প্রতিমা তৈরী হল। উমা শর্মার কথকে মোগল দরবারের মেহ্‌ফিলের রূপটি চমৎকার ফুটে উঠেছে। প্রাণপ্রাচুর্যের সঙ্গে লাবণ্য উমার নাচে সহজেই মিশে গিয়েছিল। উমা ও দেবীলালের দ্বৈত-নৃত্যেরও (মোগল দরবারের নাচ) সেই বৈশিষ্ট্য। ঝাভেরি ভগ্নীদের (নয়না রঞ্জনা, দর্শনা ও কলাবতী) মণিপুরী নৃত্যের কমনীয়তাও ভাল লাগল। শেখরনের ময়ূর-নাচ ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। নাচের সঙ্গে সংগীতের ঐকতান লক্ষণীয়।

অনুষ্ঠানের বিরতির সময় শিল্পীরা সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করেন। বলেন, "বিদেশে যে সংবর্ধনা পেয়েছি তাতে আমরা অভিভূত।"

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত "এণ্টনি ফিরিঙ্গি" ছবিতে উত্তমকুমার ও তনুজা ফটো—দেশ

আগামী সপ্তাহে

বি-এম-ডি মুভীজ-এর "জীবনমৃত্যু" আগামী সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে। ডাঃ বিশ্ব-নাথ রায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরি-চালনা করেছেন হীরেন নাগ। উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী ছবির নায়ক-নায়িকা। গোপেন মল্লিক সুরকার।

পূর্ণিমা পিকচার্স-এর "ছুটি" মুক্তি লাভ করবে আগামী সপ্তাহে। বিমল করের "খড়কুটো" অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন অরুন্ধতী দেবী। মৃণাল মুখো-পাধ্যায় ও নবাগত নন্দিনী ছবির দুই মুখ্য শিল্পী। সংগীত পরিচালনাও অরুন্ধতী দেবীর।

বিশ্বনাট্য দিবস

সম্প্রতি থিয়েটার সেণ্টারে কলকাতার বিভিন্ন নাট্য সম্প্রদায় ষষ্ঠ বিশ্ব নাট্যদিবস পালন করেন।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপিকা শ্রীমতী প্রতিভা আগরওয়াল সভাপতির আসন অলংকৃত করেন এবং প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

শ্রীমিত্র এ দেশের নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি সেণ্টারের নাট্য বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

শ্রীমতী আগরওয়াল ব্রেখটের বাণী পাঠ করেন।

অনুষ্ঠানে গুজরাটি সাহিত্য মণ্ডল ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রজনীগন্ধা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন এবং সংগীত পরিবেশন করেন শশাঙ্ক ঠাকুর।

আনন্দবাজার ভবনে বসন্তোৎসবে যোগ দানকারী শিল্পীদের মধ্যে (উপরের সারি, বাঁ দিক থেকে) উৎপলা সেন, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় (নিচের সারি) নির্মলেন্দু চৌধুরী, হিমাংশু বিশ্বাস, মানসকুমার, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সৌরেন পাল, অমর পাল ও সলিল মিত্র। ফটো—দেশ

আনন্দবাজারে বসন্তোৎসব

আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার বার্তাজীবীদের ব্যবস্থাপনায় আনন্দবাজার ভবনে দোল-পূর্ণিমার দিন বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সময়োচিত ভাষণ দেন হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের সম্পাদক শ্রীসুধাংশুকুমার বসু। গত বছর এমনি দিনে আনন্দবাজার সংস্থার দুইজন কর্মী শ্রীঅতুল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত সমাজবিরোধী লোকদের হাতে প্রাণ হারান। তাঁদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন।

অনুষ্ঠানে গান করেন সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, শ্যামল মিত্র, নির্মলেন্দু চৌধুরী, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, অমর পাল, চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, সৌরেন পাল ও মানসকুমার। এ'দের প্রত্যেকের গানই শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। কৌতুক পরিবেশনে হাসির স্রোত বইয়ে দেন জহর রায়। যন্ত্রসংগীতে শ্রোতাদের আনন্দ দেন হিমাংশু বিশ্বাস ও তাঁর সম্প্রদায়।

বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করেন বিমল সেনগুপ্ত, বাবু সরকার, নীলকান্ত নন্দী, শেখর ভট্টাচার্য, তারাপদ মোদক ও লাবু বিশ্বাস। নির্মলেন্দু চৌধুরীর সহশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন গীতা চৌধুরী, পূরবী চট্টোপাধ্যায়, নীরেন চৌধুরী, দিলীপ ব্রহ্ম ও কালী চক্রবর্তী। চার ঘণ্টার এই মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের শিল্পীরা উপস্থিত সাংবাদিক ও অন্যান্য অতিথিদের ধন্যবাদার্হ হন।

বিশ্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাব-উৎসব

বিশ্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৩২তম আবির্ভাব উৎসব এবং নটগুরু গিরিশচন্দ্রের ১২৪তম জন্মজয়ন্তী গত ২৫ মার্চ ভাবগম্ভীর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের ১৩২ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৩২টি প্রদীপ জ্বালানো হয়। বিশ্বরূপার পক্ষ থেকে শ্রীরাসবিহারী সরকার সময়োচিত ভাষণ দেন। পরে "জাগো" নাটক অভিনীত হয়।

ব্রিটিশ চলচ্চিত্র উৎসব

ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের সহযোগিতায় সিনে সেণ্ট্রাল, কলকাতা; ৮ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিল অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস প্রেক্ষাগৃহে ও সরলা রায় মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলে ব্রিটিশ চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছেন। সাতটি ছবি—'ব্রিফ এনকাউণ্টার', 'গ্রেট এক্সপেক্টেশনস', 'রেড সুজ', 'দি ইম্পর্টান্স অব বিইং আরনেস্ট' 'দি ব্রাউনিং ভার্সন', 'অলিভার টুইস্ট', 'জেনেভিয়েভ' ও কয়েকটি তথ্যচিত্র এই উৎসবের অন্তর্ভুক্ত।

অপারেশন ফাউসটাস

পাভলভ ইনসটিটিউট নাট্যসংস্থা ১৩ এপ্রিল, সন্ধ্যায় মুক্ত অংগন মঞ্চে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "অপারেশন ফাউস্টাস" নাটক অভিনয় করবেন। একজন আমেরিকান পরমাণুবিজ্ঞানীকে নিয়ে নাটক। রূপারোপ করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত এবং মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন সন্তোষ বসু।

অরণ্যদেব লী ফক

পালা টমটম, পালিয়ে যা!
@!!☆!
!

ঝোপের আড়াল থেকে বাঘটিনা সব দেখছে।

অল্পের জন্য গুলি ফসকে গেল।
যেমন করেই হোক, খতম করতে হবে···ওঃ···
পালা টমটম!
!
10/23

কেলে ছোঁড়াটা যে পালিয়ে গেল ম্যাক! ওর পিছু নেব?
দরকার নেই। একটাকে তো আটকে রেখেছি!

এই খুদে শয়তানটাকে খতম করে দেওয়া যাক, ম্যাক।
না, এটাকে দিয়ে কাজ হবে।

জো আর এডকে ভাগ দিয়ে কী লাভ? এটাকা আমরা দুজনেই ভাগাভাগি করে নিই। কী বলো?
নিশ্চয়ই!

ওদিকে···অন্য দুজন
দ্যাখো জো, আমার মনে হয়, ম্যাকের মতলব খুব খারাপ।

ম্যাক হচ্ছে অতি পাজী। ব্যাটা এখন কী করছে কে জানে!
চলো, ফিরে যাওয়া যাক!
২৪

কলকাতায় গুরুতর দাংগা হাংগামা:—বাগমারী রোডে শিখদের গুরুদ্বারার প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি প্রাচীন শিবমন্দিরে পূজার্থীদের প্রবেশাধিকার নিয়ে ২৭ মারচ শিখদের সংগে স্থানীয় অধিবাসীদের এক সংঘর্ষ ঘটে। শিখরা শিবমন্দিরে প্রবেশার্থীদের মারধোর করে তাড়িয়ে দেয়। এর পরে একদল লোক জোর করে গুরুদ্বারার প্রাংগণে ঢুকে ইমারতাদিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন ডেপুটি পুলিস কমিশনার একদল পুলিস সহ গুরুদ্বারা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলে শিখরা পুলিস দলকেও আক্রমণ করে। বহু কষ্টে পুলিস দুই দলের প্রচন্ড সংঘর্ষ রোধ করতে সমর্থ হয়। ২৮ মারচ পশ্চিমবংগের মুখ্যমন্ত্রীর সংগে শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের এক সাক্ষাৎকারে স্থির হয় যে, ২৯ মারচ বুধবার সম্পূর্ণ অহিংস এক শোভাযাত্রা মহাত্মা গান্ধী রোডের বড়া শিখ সংঘ থেকে বের হয়ে বাগমারী গুরুদ্বারায় যাবে এবং এই শোভাযাত্রায় শিখরা কোন রকম মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করবে না। কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভংগ করে ৭ সহস্রাধিক শিখ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেলা ৯টার পরেই শোভাযাত্রার নামে রাস্তায় বের হয়ে ইতস্তত ইটপাটকেল, সোডার বোতল ইত্যাদি ছুঁড়তে আরম্ভ করে এবং বহু দোকান-পসার লুঠ করে। রাস্তার উভয় দিকে সমবেত জনতার সংগে শিখদের সংঘর্ষ যখন চরমে ওঠে তখন পুলিস বাধ্য হয়ে কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। শেষ পর্যন্ত মানিকতলার মোড়ে মিলিটারির সাহায্যে শোভাযাত্রার গতি রোধ করা হয় এবং পশ্চিমবংগের উপ-মুখ্যমন্ত্রী একদল শোভাযাত্রীকে বাগমারী গুরুদ্বারায় পৌঁছে দেন। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য উপদ্রুত এলাকায় মিলিটারী তলব, ১৪৪ ধারা এবং কারফু জারি করতে হয়। এই সংঘর্ষে মোট ১৩জন নিহত এবং প্রায় দুই শতাধিক লোক আহত হয়। ৩০ মারচ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের কথা ঘোষণা করেন।

দেশী সংবাদ—

২৭ মার্চ—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কৃষকের কাছ থেকে বেশী দরে চাল কিনে সাধারণ ক্রেতার কাছে কম দরে বিক্রি করবেন। সুপার ক্যাবিনেট নামে পরিচিত যুক্তফ্রণ্ট কমিটির বৈঠকের পর একজন মুখপাত্র সরকারের এই সিদ্ধান্ত জানান। সুপার ক্যাবিনেট উৎপাদককে "খুব ন্যায্য মূল্য" দিতে চান।

২৮ মার্চ—শ্রমমন্ত্রী শ্রীসুবোধ ব্যানার্জি আজ বিধানসভায় ঘোষণা করেন যে, ন্যূনতম মজুরী আইন অনুসারে শ্রমিকদের বেতন বাড়ানো হবে। ঠিকাদারী শ্রমিক-প্রথা বিলোপের কথাও সরকার বিবেচনা করছেন। শিল্পে শান্তিরক্ষার প্রশ্নে শ্রমমন্ত্রী বলেন, সরকার শ্রমিক ও মালিকের ন্যায়সংগত অধিকার রক্ষা করবেন।

২৯ মার্চ—পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আজ বিধানসভায় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের এগারো দফা খাদ্যনীতি ঘোষণা করেন। এই নীতি অনুসারে জেলার অভ্যন্তরে ও আন্তঃজেলা করডন তুলে দেওয়া হবে। কলকাতা ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় এখনকার মত রেশন-ব্যবস্থা চালু রাখা হবে। ধান ও চালের সংগ্রহ-মূল্য বাড়বে। ধানের দর মণপ্রতি ২১, ২২ ও ২৩ টাকা এবং চালের দর মণপ্রতি ৩৫, ৩৬.৫০ এবং ৩৮ টাকা ধার্য হবে।

শান্তিপুরে শ্যামবাজার পুলিস ফাঁড়ির কাছে ১২ বছর বয়স্ক একটি ছেলে লরি চাপা পড়ে মারা যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ সকালে জনতা-পুলিসে সংঘর্ষ হয়। পুলিস কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। মহকুমা হাকিম ও কয়েকজন পুলিস সমেত কুড়িজনের মত আহত হয়। পুলিস ফাঁড়িতে পুলিসের জীপে ও মহকুমা হাকিমের জীপেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। কয়েকজন নাকি পুলিসের রাইফেল ও গুলি ছিনিয়ে নেয়। শান্তিপুর পৌর-এলাকায় কারফু জারি করা হয়।

৩০ মার্চ—পশ্চিমবংগ থেকে কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে লোকসভায় নির্বাচিত শ্রীকৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জি আজ লোকসভায় অভিযোগ করেন: তাঁর রাজ্য কেন্দ্রের কাছ থেকে খাদ্যের ব্যাপারে প্রাপ্য সহানুভূতি পায় নি। শ্রীচ্যাটার্জি কলকাতায় রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধিরও দাবি জানান।

কাল ওড়িশা বিধানসভায় জানা যায় যে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পট্টনায়ক ও মিত্রের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের জন্য রাজ্য সরকার যে তদন্ত কমিশন গঠনের প্রস্তাব করেছেন—একজন মাত্র সদস্যকে নিয়ে সেই কমিশন গঠিত হবে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই কেন্দ্র ও সুপ্রিম কোর্টের সংগে যোগাযোগ করেছেন।

৩১ মার্চ—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আজ ভূমিরাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার ঘোষণা করেন, বিভিন্ন চা-বাগানের প্রায় ২ হাজার একর হুকুম-দখলকরা জমির মালিকরা বেনামীতে বিলি করেছেন সরকার সেই জমি উদ্ধার করে শ্রমিক চাষীদের মধ্যে বিলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, বর্গাদার উচ্ছেদ-বন্ধ লড়াইয়ে সরকার বর্গাদারদেরই পাশে দাঁড়াবেন। জোতদারদের সাহায্যে পুলিসও দেওয়া হবে না।

১ এপ্রিল—আজ সাংবাদিকদের সংগে ঘরোয়া আলোচনাপ্রসংগে কেন্দ্রীয় শিল্পোন্নয়নমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলী আমেদ বলেন যে, দেশের অচল-প্রায় অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনয়নের সমন্বয় চেষ্টার অংগ হিসাবে সরকার খুব সম্ভব শিল্পে লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে অধিকতর *বিনিয়ন্ত্রণের পথে অগ্রসর হবেন।*

২ এপরিল—ভারত সরকারের প্রশাসন যন্ত্র এবং তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সমীক্ষা দলের অন্তবর্তী রিপোরটে কয়েকটি সুপারিশ—কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের আকার সীমিত হওয়া উচিত। ১২ জনের বেশী পুরামন্ত্রী না থাকাই ভালো (এখন আছেন ১৯ জন) বিজ্ঞান ও কারিগরি সম্পর্কে একটি পৃথক মন্ত্রক প্রয়োজন। দফতরগুলির দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি।

উত্তর প্রদেশে সংযুক্ত আইনসভা দলের নব-নির্বাচিত নেতা শ্রীচরণ সিং আগামীকাল সকাল ন'টায় রাজ্যের অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করবেন। সি বি গুপ্তের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করায় এই রাজ্যে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে কুড়ি বছর ধরে কংগ্রেসী প্রশাসনের অবসান ঘটেছে।

বিদেশী সংবাদ

২৭ মার্চ—টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিরোতাৎসু ফুজিয়ারার একটি নিবন্ধ আজ সোভিয়েত সরকারের মুখপাত্র ইজভেসতিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। এশিয়ায় সীমান্ত-বিরোধে উসকানি না দেওয়ার জন্য অধ্যাপক ফুজিয়ারা এই প্রবন্ধে চীনকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

২৮ মার্চ—মাও-সে-তুং-এর পক্ষের ও বিপক্ষের লোকদের মধ্যে ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে তিব্বতে একটা প্রচন্ড আলোড়ন চলেছে। রাজধানী লাসায় বহু লোক সংঘর্ষে নিহত হয়েছে এবং গ্রেপ্তারের সংখ্যাও খুব বেশী।

২৯ মার্চ—রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থানট ভিয়েতনামে যুদ্ধ-বিরতির জন্য তাঁর সর্বশেষ প্রস্তাবটি আজ সকালে এক সাংবাদিক-সম্মেলনে প্রকাশ করেন এবং তার মিনিট কয়েক পরেই প্রেসিডেণ্ট জনসন জানান: উত্তর-ভিয়েতনাম খারিজ করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবটি মেনে নিয়েছে।

৩০ মার্চ—মসকো রেডিওর খবরে প্রকাশ, সারা তিব্বত জুড়ে চীনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ চলছে। বিদ্রোহ দমনের জন্য পিকিং থেকে বাছাই-করা মাও-পন্থীদের পাঠানো হয়েছিল। বিরোধীদের হাতে তাঁরা প্রত্যেকে কোতল হয়েছেন।

৩১ মার্চ—আজ মসকোতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী মারশাল ম্যালিনোভস্কি পরলোকগমন করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রুশ সৈন্যদের নিয়ে বার্লিনে প্রবেশ করে ম্যালিনোভস্কি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কর্কট (ক্যান্সার) রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

১ এপ্রিল—ওয়াশিংটনের এক খবরে প্রকাশ: চলতি বছরের শেষের দিকে যে ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পাঠাবার কথা আছে তা' ছাড়া মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভারতকে অতিরিক্ত খাদ্য-সাহায্য পাঠাবার আশু কোন পরিকল্পনা নেই, তবে সরকারী মহলের মতে, অন্তর্বর্তিকালীন কিছু ব্যবস্থার সম্ভাবনা আছে।

২ এপরিল—আমেরিকা ভিয়েতনামে সাময়িক-ভাবে পুরোপুরি যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব করেছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল উ থানট কাল আমেরিকাকে তার এই প্রস্তাব এক তরফাভাবে কার্যকর করার আহ্বান জানান। সেই প্রস্তাব কার্যকর করার পর গুলির জবাবেই শুধু আমেরিকা গুলি করতে পারবে।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

অঙ্গে-অঙ্গে অপরূপ সৌন্দর্য্য...
চলার ছন্দে অপরূপ ভঙ্গিমা...

সুঠাম গড়ন···সুঠাম অঙ্গসৌষ্ঠব···অতি সুন্দর—র‍্যালিফ্যান! যে কোন দিক থেকেই দেখতে চমৎকার, দিব্যি স্ট্রীমলাইনড্। শান্ত সহজ ছন্দে চলে···ঘরের সবাইকে শীতল রাখে। দিব্যি হাল্কা···বেশ সহজেই ঘোরানো-ফেরানো যায়···ওর বিশেষধরণের হাতলটি দিয়ে। অপরূপ স্টাইলের র‍্যালিফ্যান আপনি চাররকমের আরামের রঙে পাবেন—নীল, সবুজ, হাতীর দাঁতের মত সাদা ও ধূসর।

আপনাকে অনেক বেশী শীতল রাখে!

র‍্যালি গ্রুপের তৈরী

র‍্যালিফ্যানের রকমারিতে পাবেন সিলিং, পেডেস্টেল, দেয়ালে লাগাবার ও এক্সহস্ট ফ্যান।

র‍্যালিফ্যান সম্বন্ধে **বিনামূল্যে** বর্ণরঞ্জিত সচিত্র পুস্তিকার জন্য সঙ্গের কুপনটি ভ'রে এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন—
র‍্যালিস ইণ্ডিয়া লিমিটেড, ২১ র‍্যাভেলিন ষ্ট্রীট, বোম্বাই-১।
নাম ________________
ঠিকানা ________________
মনে রাখবেন, প্রত্যেক র‍্যালিফ্যানের জন্য তৈরীর খুঁত সম্পর্কে ২ বছরের গ্যারান্টি দেওয়া হয়।

Bensons 278 A-24 Ben.

বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরার ডিস্ট্রিবিউটর: **র‍্যালিজ ইণ্ডিয়া লিমিটেড,** ১৬ হেয়ার স্ট্রীট, পোস্ট বক্স নং ১৯৮, কলিকাতা।
আসামের ডিস্ট্রিবিউটর: **কিলবার্ন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড,** উলুবাড়ি, গৌহাটী এবং তেজপুর।

প্রচ্ছদ : শ্রীসুরেন দে

জমিয়ে বসতে হলে চাই কিসান স্কোয়াশ

কিসান প্রোডাক্টস লিমিটেড, ব্যাঙ্গালোর

আজকের আধুনিকদের কিসান স্কোয়াশ না হলে চলে না। পাঁচজনের আসরে ফূর্তির হাওয়া জমিয়ে তুলতে কিসানের জুড়ি নেই। চুমুক দিলেই চনমনে করে তোলে মন-মেজাজ··· ভিটামিন থাকায় স্বাস্থ্যের পক্ষেও চমৎকার।

অরেঞ্জ, লেমন, ম্যাঙ্গো বা অন্য কোনো ভ্যারাইটি যা আপনি ভালোবাসেন বেছে নিন।

ফলের খাঁটি স্বাদ পাবেন কিসানে—ভারতে এই স্কোয়াশই সবচেয়ে বেশী বিক্রি হয়।

ব্রিটানিয়ার ক্রীম ক্র্যাকার ও চীজলেট বিস্কুটের সঙ্গে কিসান স্কোয়াশ খেয়ে দেখুন— মুখে লেগে থাকবে।

KP 4019A

পরম লাবণ্যময়ী হয়ে উঠবেন —পণ্ড্‌স

ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন !

আপনার মুখখানি রাখুন মসৃণ, সুন্দর ও সুকুমার

মুখশ্রীতে আনুন লাবণ্যভরা রমণীয় আভা। রমণীর রূপচর্চার এইটেই গোড়ার কথা। হালকা, তুষারোপম পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখুন। মুখের ত্বক হবে নির্মল, কমনীয়। রোদে হাওয়ায় মুখশ্রী থাকবে অম্লান। পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীমে ত্বকের তেল-চকচকে ভাব দূর হয়। ব্রণ বা মেচেতা হতে দেয় না। পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মাখলে ত্বক হয় মখমল মসৃণ—তার ওপর পাউডার লাগালে মেক-আপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিখুঁত থাকবে।

চীজব্রো-পণ্ড্‌স ইনক (সীমিত দায়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

॥ দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল ॥

"বিবর"-এর পরিপূরক উপন্যাস

স্বীকারোক্তি ॥ সমরেশ বসু

নিরন্তর নিরীক্ষায় বিশ্বাসী সমরেশ বসু "স্বীকারোক্তি" উপন্যাসে নায়কের জবানীতে উত্তমপুরুষে এক আশ্চর্য পাপের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। সত্যের খাতিরে বলতেই হবে, এর রচনা-শৈলী ও বক্তব্য উভয়ই বাংলা সাহিত্যে নতুন। এখন এর ভালো বা মন্দ, মেনে নেওয়া বা না মেনে নেওয়া বিতর্কের বিষয়। কিন্তু সন্দেহ নেই, যে-কোনও পাঠককেই এ উপন্যাস ভাবিয়ে তুলবে।

'স্বীকারোক্তি', 'অস্বীকার' ও 'পাপ' তিনটি অধ্যায়ে উপন্যাস শেষ হয়েছে। তবু মূলে, এটি একটি ভয়ংকর স্বীকারোক্তি। পাপবোধ থেকেই এ স্বীকারোক্তির উদ্ভব। অথচ সমাজে সবাই যা করছে, সেও তাই করছে। কিন্তু

পাপ-চেতনাই তাকে সকলের পরিপ্রেক্ষিতে রুদ্ধ ও কিম্ভূত করে তুলেছে। এবং একই সঙ্গে তাকে মহৎ ও করুণও করে তুলেছে।

'বিবর' সমরেশ বসুর যে মানস-পর্বের ফসল, 'স্বীকারোক্তি'ও সেই পর্বের। উপলব্ধি, মনন, রচনাভঙ্গি, বক্তব্য—সব দিক থেকেই 'বিবর'-এর সঙ্গে এর আশ্চর্য আত্মীয়তা। এই মানস-পর্বের যে উপলব্ধিটুকু 'বিবর'-এ বলা হয়ে ওঠেনি, কিংবা বলা যায়নি, তা-ই যেন পরিশীলিত রূপ পেয়েছে 'স্বীকারোক্তি'তে। সে হিসেবে এই গ্রন্থটি 'বিবর'-এর পরিপূরক উপন্যাস তো বটেই, বাংলা উপন্যাসে এক উল্লেখযোগ্য দিক্‌চিহ্নও। দাম ৫·০০

॥ এই লেখকের অন্যান্য উপন্যাস ॥

বিবর ৫·০০ ॥ দুই অরণ্য ৬·০০ ॥ ফেরাই ৩·০০

॥ সদ্য প্রকাশিত দুখানি অসাধারণ উপন্যাস ॥

পিয়ামুখচন্দা ॥ প্রবোধকুমার সান্যাল ॥ ৬-০০

জল দাও ॥ সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ ৩-০০

পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হল | বিমল করের খড়কুটো

ভ্রমর আর অমল। সতেরো বছরের জীবন-পরিক্রমা-শ্রান্ত অসুস্থ একটি মেয়ে, আর বিশ-বসন্ত-অতিক্রান্ত স্বভাবখুশী প্রাণোচ্ছল একটি ছেলে। অসুস্থ, অনাদৃত এবং অসুখী ভ্রমরকে দেখে তার প্রতি মায়া, মমতা, সহানুভূতি এবং প্রীতিতে ভরে গিয়েছিল অমলের মন। আর, নিঃসঙ্গ, বন্ধুহীন ভ্রমরের আত্মীয়ের মতন, বন্ধুর মতন সুন্দর ও নিবিড় লেগেছিল অমলকে। তারপর একদিন একটি মমতা সিক্ত সহানুভূতি আর একটি প্রীতিকামী উন্মুখতা মিলে গিয়েছিল একটি অভিন্ন বিন্দুতে এসে। "খড়কুটো" এক সামান্য প্রেমের অসামান্য জন্মকথা। এই কাহিনীটি "ছুটি" নামে চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে বর্তমানে প্রদর্শিত হচ্ছে। দম ৪·০০

॥ এই লেখকের আরও উপন্যাস ॥

পরিচয় ৪·০০ ॥ বালিকা বধূ ৩·০০ ॥ গ্রহণ ৪·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯
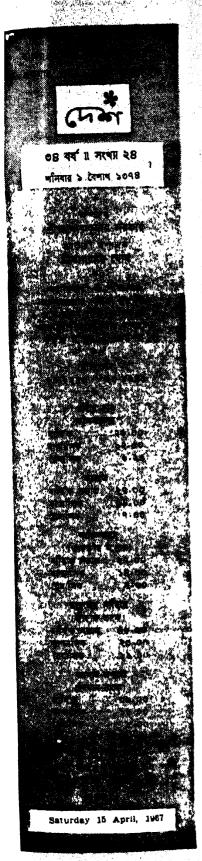
প্রফুল্লকুমার স্মরণে

বছরের শেষ দিন, ৩১ চৈত্রের সঙ্গে আমাদের এক দুঃখের স্মৃতি জড়ানো রয়েছে। দিনটি আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনের দিন। প্রফুল্লকুমার এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হিসাবে আমাদের নিকট আত্মীয় হলেও তদ্‌কালীন বাঙলা দেশের অন্যতম কৃতি সন্তান। সাংবাদিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ছিল প্রথম শ্রেণীর। বস্তুত তিনি 'স্বদেশী'-বাঙলার ঐতিহ্যে লালিত ছিলেন। রাজনীতিই শুধুমাত্র তাঁর উপাস্য বিষয় ছিল না, তিনি সমাজ ও সাহিত্য চিন্তাতেও জীবনের অনেকখানি ব্যয় করেছেন। তাঁর সমাজ-চিন্তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর অসামান্য গ্রন্থ 'ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু'। এই মূল্যবান গ্রন্থে তিনি হিন্দু সমাজের যে ক্ষয় ও ব্যাধি লোকচক্ষুর গোচর করেন তাতে তাঁর উদার মনোভাব ও দুঃসাহস সেকালে অনেককে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করেছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর রুচি ছিল আদর্শবাদের প্রতি, দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াই ছিল তাঁর সাহিত্যের মুখ্য উপাদান। মানুষ হিসেবে তিনি বৈষ্ণবজনোচিত গুণের অধিকারী ছিলেন। বিনয়, কোমলতা সহিষ্ণুতা তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল। প্রশান্ত চিত্ত এই মানুষটি তাঁর বন্ধু, সহকর্মী ও প্রতিষ্ঠানের সকলের কাছে হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তাঁর ত্রয়োবিংশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি।

নতুন খাদ্যনীতি

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর নতুন খাদ্যনীতির কথা ঘোষণা করেছেন। গত উনত্রিশে মার্চ বিধানসভায় তিনি প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের খাদ্যনীতির কথা সবিস্তারে জানান। দু দিন বিতর্কের পর সেই নীতিই খানিকটা সংশোধন করে সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

নতন খাদ্যনীতিতে রেশন সম্পর্কে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করা হয়নি, অর্থাৎ বিধিবদ্ধ রেশন এলাকায় যেমন রেশন পাওয়া যেত তা পাওয়া যাবে, তার পরিমাণও আপাতত যথারীতিই থাকছে। রেশন-এলাকা এবং রেশন বহির্ভূত অঞ্চলের মধ্যে কর্ডন ব্যবস্থাও বজায় রাখা হচ্ছে। তবে রেশন বহির্ভূত এলাকার মধ্যে খাদ্যশস্য চলাচলে কোনো বাধানিষেধ থাকছে না।

গ্রামাঞ্চলের মানুষ যাতে তাদের খাবার জন্যে কিছু ধান চাল রাখতে পারে সেজন্যে নতুন নীতিতে বলা হয়েছে, পরিবার পিছু পঞ্চাশ মণ ধান বা সেই অনুপাতে চাল রাখা যাবে। ভবিষ্যতের সংস্থান হিসেবে গ্রামাঞ্চলের মানুষের খাদ্যটুকু রাখা প্রয়োজন বলেই আমরা মনে করি। উদ্বৃত্ত ধানচালও এক্ষেত্রে সরকারের কাছে বেচে দেওয়ার মনোভাব দেখা যাবে বলেই মনে হয়।

উদ্বৃত্ত ফসল সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিদ্ধান্তটি এই : সেচ এলাকায় যাদের দশ একরের বেশী এবং সেচহীন এলাকায় যাদের বারো একরের বেশী জমি আছে তাদের সরকারকে জানাতে হবে কতটা জমিতে চাষ হয়েছে। নিজে খাওয়ার জন্যে একর প্রতি নয় মণ ধান এবং বীজ ও মুনিশদের খোরাকি বাবদ কিছু ধান রেখে বাকি ধান সরকারকে বিক্রী করে দিতে হবে। এই ব্যবস্থাটি সম্পর্কে বলা যায়—এ যাবৎ যাঁরা লেভির নামে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন বা মনে করেছিলেন সরকার জোর জবরদস্তি করছেন তাঁরা হয়ত এবার খানিকটা নরম হবেন। তাছাড়া সরকার তো বেশী দাম দিয়েই ধান চাল কিনছেন। উদ্বৃত্ত ধান চাল বিক্রি করতে আপত্তি হবার সঙ্গত কোন কারণ নেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রয়োজন দু লক্ষ টনের মতন চাল। এই চাল যে সহজে সংগ্রহ হবে তা অবশ্য মনে করলে বেশী মনে করা হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকারও বোধ হয় মনে করেন না—সরকারী নীতি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী ভাণ্ডারে চাল এসে যাবে। এই কারণেই মন্ত্রিসভা স্থির করেছেন চাল সংগ্রহের অভিযানে মন্ত্রীরা জেলায় জেলায় ঘুরবেন। এটা যে ভাল কথা তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মন্ত্রীরা যদি তেমন সাফল্য লাভ না করেন তবে কি হবে? এ সম্পর্কেও সরকারের নীতি খুব স্পষ্ট, সহজে না পেলে আইনের আশ্রয় নেওয়া হবে।

যাই হোক, সরকারী নীতি বেশ কিছুটা সফল হলেও পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যাভাব মিটবে না। কেন্দ্রের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন। কেন্দ্র আমাদের প্রয়োজন যে সবটা মেটাবেন এমন মনে হয় না। উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি যদি কেন্দ্রের নির্দেশে আমাদের সাহায্য করেন তবে সমস্যার অনেকটাই সমাধান হতে পারে। চলতি মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে এ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে মনে করি।
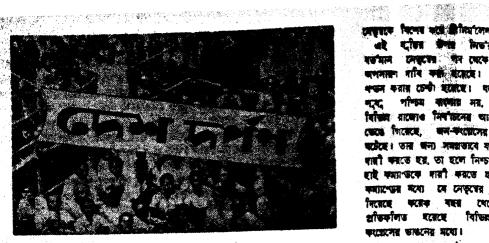
একটি শিরোনামা ঃ আত্মপ্রবঞ্চনা নয়, আত্ম সমালোচনা। শিরোনামাটি দক্ষিণ কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্রের। অবশ্যই গত নির্বাচন সম্বন্ধে এবং বাম কম্যুনিস্টদের উদ্দেশ্যে। এই দুই দলের ঝগড়াটা পুরোনো এবং এখনও তার রেশ চলছে। হয়ত চলবে।

কিন্তু নূতনভাবে একটা রাজনৈতিক বিবাদ দেখা দিয়েছে পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের মধ্যে। এক হিসাবে এটাও পুরোনো ঝগড়ার জের; তবে নির্বাচনের পরে তার একটা নূতন রূপ দেওয়া হয়েছে মাত্র। এই বিবাদের মূল কথা ঃ পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের নেতৃত্বে যাঁরা আছেন তাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার যোগ্য নন। কারণ হিসাবে দেখান হয়েছে যে, পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসের অসাফল্যের জন্য মূলত এঁরাই দায়ী। যাঁদের সরিয়ে নূতন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। কিন্তু প্রধানত সম্পাদক শ্রীনির্মলেন্দু দে-র বিরুদ্ধেই বর্তমানে কংগ্রেসের ভিতরে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

কিছু কিছু কংগ্রেস কর্মী দমদম এলাকা থেকে এসে কংগ্রেস ভবনে বিক্ষোভ জানিয়ে গিয়েছেন। অন্যান্য অঞ্চল থেকেও এই রকম বিক্ষোভ মিছিল আসার কথা ছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘরোয়া আলোচনার পরে তা মুলতবী রাখা হয়েছে। এই বিক্ষোভ উপলক্ষ করে নয়, নির্বাচন উপলক্ষ করে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সদস্যরা এবং বিভিন্ন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদকরা মিলিত হয়েছিলেন সমস্ত বিষয়টা আলোচনা করার জন্য। এই আলোচনার যেটুকু জানা গিয়েছে, তা থেকে বোঝা যায় প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন।

এঁদের মতে, মূলত জনসাধারণের কংগ্রেস বিরোধী মনোভাবই কংগ্রেসের অসাফল্যের জন্য দায়ী। কোন বিশেষ কারণকে সামনে তুলে ধরা যায় না, যার জন্য কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে। দেখান হয়েছে মেদিনীপুরে যে-কারণে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে, ২৪ পরগনায় ভিন্ন কারণে কংগ্রেস প্রার্থীরা নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেনি। আবার ২৪ পরগনায় যে কারণকে মুখ্যত দায়ী করা হয়, তা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত মুর্শিদাবাদ জেলায়। আবার দেখা যাবে, বর্ধমান জেলায় যে-সব জায়গায় কম্যুনিস্টদের ঘাঁটি ছিল সেইসব এলাকায় কংগ্রেস অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করেছে।

এই সব কারণগুলো বিশ্লেষণ করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে, একমাত্র নেতৃত্বই যদি দায়ী হত তাহলে এই বৈষম্যগুলো চোখে ধরা পড়ত না। তাছাড়া অন্য যে কথাটা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে, তা হল প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির শূন্য পদ আজও পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। সভাপতি ছিলেন শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি। তিনি কংগ্রেস ছেড়ে চলে যাবার পর শূন্যপদ পূর্ণ করার পথে বাধা ছিল, কারণ হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল। যে-মামলার অংশ হিসেবে হাইকোর্ট থেকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তার নিষ্পত্তি আজও হয়নি। কাজেই, বলা হচ্ছে যে, নির্বাচনের ফলাফলের সমস্ত দায়িত্ব শ্রীনির্মলেন্দু দে-র উপর চাপিয়ে দেওয়ার মূলে কোন যুক্তি আছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।

অপর পক্ষে বলা হচ্ছে যে, যেহেতু কংগ্রেসপ্রার্থী নির্বাচন এবং নির্বাচনের কাজগুলো চালাবার ভার ছিল শ্রীঅতুল্য ঘোষ এবং শ্রী দে-র উপর, সেই হেতু নির্বাচনের ফলাফলের দায়িত্বও তাঁদের নিতে হবে। এঁদের আরও বক্তব্য যে, প্রধানত শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি'র কংগ্রেস পরিত্যাগ নির্বাচকদের মনে ক্রোধের সঞ্চার করেছিল এবং তারই ফলে কংগ্রেসকে এভাবে অসাফল্যের গ্লানি সহ্য করতে হয়েছে। শ্রীমুখার্জি'র পক্ষে কংগ্রেস পরিহার করার মূলে কারণ হিসাবেও দায়ী করা হয়েছে বর্তমান নেতৃত্বকে বিশেষ করে শ্রীনির্মলেন্দু দে-কে।

এই যুক্তির উপর নির্ভর ক'রেই বর্তমান নেতৃত্বের পদ থেকে শ্রীদে-র অপসারণ দাবি করা হয়েছে। এ-যুক্তিও খণ্ডন করার চেষ্টা হয়েছে। বলা হয়েছে, শুধু পশ্চিম বাংলায় নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও নির্বাচনের আগে কংগ্রেস ভেঙে গিয়েছে, জন-কংগ্রেসের আবির্ভাব ঘটেছে। তার জন্য সমগ্রভাবে যদি কাউকে দায়ী করতে হয়, তা হলে নিশ্চয়ই কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডকে দায়ী করতে হয়। হাই-কম্যাণ্ডের মধ্যে যে নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে কয়েক বছর থেকে তা-ই প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের ভাঙনের মধ্যে।

তা ছাড়া আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে উঠে পড়ে। কংগ্রেসের সাংবিধানিক নির্দেশ অনুসারে, প্রদেশ কিংবা জেলায়, কোন কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হিসাবে একবারের বেশী কারও পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। কাজেই সম্পাদক হিসাবে শ্রী দে-র কার্যকাল শেষ করতেই হবে, যদি না হাই কম্যাণ্ড অন্যরূপ নির্দেশ দেয়। কিন্তু এই মুহূর্তে শ্রী দে-কে অপসারণ করার একটা প্রবল বাধাও হয়ত আছে। হাইকোর্টের মামলা যতদিন না নিষ্পত্তি হচ্ছে, ততদিন নূতন সভাপতি নিয়োগ করা সম্ভব নয় এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে আর কারও পক্ষে সম্পাদক মনোনয়ন করা নীতিবিরুদ্ধ। কোন কংগ্রেস কমিটি সম্পাদক এবং সভাপতি দুজনের অনুপস্থিতিতে চলতে পারে না।

এ-যুক্তিকে অকাট্য বলে মেনে নিতে হয়ত বাধা নেই। কিন্তু তার চাইতেও বড় যুক্তি, কংগ্রেস কর্মীদের মনে দ্বিধা এসেছে বর্তমান নেতৃত্ব সম্বন্ধে। কর্মীদের মনে অনাস্থার মনোভাব থাকলে কোন নেতৃত্বের পক্ষে রাজনৈতিক দলকে সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালিত করা সম্ভব নয়। অনাস্থার আবহাওয়ায় বিদ্বেষ ও অশান্তিরই ইন্ধন যোগান সম্ভব। এই কথাটা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে ২৪-পরগনা কংগ্রেস কমিটির এক কর্মী-সভায়। নেতৃত্বের সমালোচনা নিশ্চয়ই করা হয়েছে এই সভায়; কিন্তু এ-কথাও বলা হয়েছে যে, শুধু প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বের সমালোচনা করেই কর্তব্য শেষ করা যায় না। কারণ হিসাবে দেখান হয়েছে যে, নির্বাচনের আগে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীর কোন সংযোগ ছিল না। ফলে, মন্ত্রীদের বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে জনসাধারণের মনে যদি কোন প্রশ্ন দেখা দিত, তা কর্মীদের পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। দলাদলি ও অন্যের মধ্যে এইভাবে যে বিরাট ব্যবধান ঘটে

উঠেছিল, তা বিপুলভাবে ক্ষুন্ন করেছে কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মধারাকে।

মোট কথা, বিভিন্ন জায়গায় কর্মীর কাছ থেকে যে সমালোচনা শোনা যাচ্ছে বা যে-সব পোস্টার ছাড়া হয়েছে কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে, তা কংগ্রেস নেতাদের কাছে অবিদিত নয়। বর্তমান দাবি সম্বন্ধেও তাঁরা উদাসীন নয়। কারণ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জানিয়ে দিয়েছেন, কংগ্রেসের সংস্কার সাধন সম্ভব হতে পারে আগামী সংগঠনের নির্বাচনের মাধ্যমে। আগামী জুলাই মাস থেকে প্রদেশ কংগ্রেসে এবং প্রদেশ কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচন হবে। তিনি বলেছেন, এই নির্বাচনেই সংস্কার-সাধন করা সম্ভব হবে।

হয়ত হবে, এবং যদি সংস্কার করা সম্ভব হয়, তাতে কর্মীদের চাহিদা হয়ত কিছুটা মিটবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তাতে কংগ্রেস সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছে এবং যা প্রতিফলিত হয়েছে নির্বাচনের ফলাফলে তা দূর হবে কি না। এ-প্রশ্নটা উঠছে এই কারণে যে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোন আত্ম-সমালোচনার চেষ্টা করা হয়নি। একমাত্র আত্মসমালোচনার দ্বারাই কোন সংগঠনের দুর্বলতাগুলো দূর করা সম্ভব। না হলে আত্মতুষ্টির আবহাওয়া সংগঠনকে আচ্ছন্ন করতে পারে। প্রদেশ কংগ্রেসের সভায় একটি অনুসন্ধান কমিটি নিযুক্ত হয়েছে সত্য; কিন্তু তার কাজ কতটা এগিয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। কমিটির আহ্বায়ক শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্য তোড়জোড় করছেন; কিন্তু অনুসন্ধান সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ যে নেই, তা জোর করে বলা যায় না। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে যখন কোচবিহারে কংগ্রেস বিপুলভাবে পরাজিত হয়, তখনও অনুসন্ধানের কথা উঠেছিল, কিন্তু তার সরকারী কোন ফলাফল এ পর্যন্ত জানা যায়নি।

মূল কথা আত্মসমালোচনার প্রয়োজন। সে-প্রয়োজনটা স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে কোন দুর্বলতার সুযোগ নেই। তাই সাম্প্রতিক একটা দলিলে দেখা যাচ্ছে যে, পার্টির তরফ থেকে আত্মসমালোচনা করা হয়েছে। দলিলটি গৃহীত হয়েছে কলকাতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত মারকসিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পশ্চিম বাংলা রাজ্য কমিটির সভায়। এই দলিলে প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, নির্বাচনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তবু কংগ্রেসকে সম্পূর্ণ-রূপে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি। এখনও দেখা যাচ্ছে যে, কংগ্রেসের সংগঠন অত্যন্ত সক্রিয় ও সবল এবং জনসাধারণের উপর কংগ্রেসের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। এ থেকে বোঝা যায় যে, মার খেয়েও মার ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কংগ্রেসের আছে।

এখানেই শেষ নয়; দলিলে পার্টির আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যতটা সাফল্য পার্টি আশা করেছিল, ততটা সফল হওয়া সম্ভব হয়নি। এই অসাফল্য খুঁটিয়ে বিচার করা প্রয়োজন। বিচারের সিদ্ধান্তও এই দলিলে প্রকাশ করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে দলিলে রাজ্য কমিটির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। নির্বাচনের পূর্বেই শ্রী দাশগুপ্ত ঘোষণা করেছিলেন যে, ঢাকুরিয়া কেন্দ্রে ডান কম্যুনিস্ট প্রার্থী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। এটা উল্লেখ করে দলিলে বলা হয়েছে যে, শ্রী দাশগুপ্ত অত্যন্ত ভুল করেছিলেন। এবং আরও ভুল করেছিল এই কেন্দ্রে নির্বাচনের সব ভারটা স্থানীয় সংগঠনের উপর ছেড়ে দিয়ে।

এ থেকেই বোঝা যায় যে, সমগ্রভাবে নির্বাচনে পার্টির দুর্বলতাকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে।

মোট কথা, দলিলটি নিঃসন্দেহে আত্ম-সমালোচনার নজির হিসাবে তুলে ধরা যায়। অবশ্য এই আত্মসমালোচনার মধ্যেও এমন কিছু ইঙ্গিত আছে, যা থেকে বোঝা যায় যে, বর্তমান কংগ্রেসবিরোধী মনোভাবকে ভিন্ন পথে পরিচালিত ও ভিন্ন আদর্শে দীক্ষিত করার প্রবল প্রচেষ্টা হবে। এক কথায় পার্টির রাজনৈতিক কাঠামোকে আরও সবল করার প্রচেষ্টা নিশ্চয় থাকবে। এই প্রচেষ্টার উৎসাহ যোগাবে নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের দুর্বলতা এবং যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। কারণ, ইতিমধ্যে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির ভিতরে এক অংশ যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়াটা খুব প্রীতির চোখে দেখতে পারছেন না। তাঁরা তাঁদের মতামত অন্যান্য সদস্যদেরও জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের মতে, পার্টি যুক্ত ফ্রন্ট সরকারে যোগ দিয়ে দলের মধ্যে নূতন আকারে সংশোধনবাদ আমদানি করেছে। এঁরা মনে করেন যে, পার্টির কমরেডরা যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী হিসাবে যত ফুলের মালা কুড়োবেন, ততই তাঁরা সংশোধনবাদের দিকে ঝুঁকে পড়তে চাইবেন।

এই আভ্যন্তরীণ মতবিরোধকে লক্ষ করেই হয়ত মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে আজ চিন্তা করতে হচ্ছে সকলের সঙ্গে একত্রিত হয়ে আত্ম-পর্যালোচনা করা। তাই কথা উঠেছে পার্টির কনভেনশন ডাকা উচিত; যদিও উগ্র বামপন্থীদের দাবি কনভেনশন নয়, পার্টি কংগ্রেস ডাকতে হবে। হয়ত এদিকে লক্ষ রেখেই পার্টির দলিলে নূতন করে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে।

তারই জের টেনে ডান কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে বলা হয়েছে যে, সংশোধনবাদীরা যাদের সঙ্গে রাজনৈতিক আঁতাত করে এসেছে, তাদের আদর্শমূলক চেহারাটা পূর্বতন শাসকগোষ্ঠীর অনুরূপ। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের ক্ষমতা ও সংগঠনকে ক্ষুন্ন ও দুর্বল করার উদ্দেশ্যেই সংশোধনবাদীরা এইসব দলের সঙ্গে আঁতাত করে।

অন্য দিকে, ডান কম্যুনিস্ট পার্টি পশ্চিম বাংলা শাখার রাজ্য কমিটি এক প্রস্তাবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে 'গোঁড়া এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর ধারক ও বাহক বলে অভিযুক্ত করেছে। নির্বাচনের আগে সমগ্র বামপন্থী দল-গুলোর মধ্যে ঐক্য না হওয়ার জন্যও মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদেরই দায়ী করা হয়েছে। 'নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি' সংক্রান্ত প্রস্তাবে এই দোষারোপের সুরটা প্রতিধ্বনিত হয়েছে। 'আত্মসমালোচনার প্রয়োজন' বলে যে শিরোনামায় পার্টির পক্ষ থেকে বাম কম্যুনিস্টদের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, 'মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নির্বাচনী প্রচারের লক্ষ ছিল, ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিকে খতম করা। তাদের কুৎসিত প্রচার কম্যুনিস্ট ও বাম-পন্থী মনোভাবাপন্ন জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পেরেছে। তার ফলে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি তার শক্তি অনুযায়ী আসন লাভ করতে পারেনি।

দেখা যাচ্ছে যে, যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের অংশীদার হয়েও দুই শরিকের বিবাদ আরও তীব্র হচ্ছে আত্মবিশ্লেষণের নামে। যদি এটাই যুক্ত ফ্রন্ট-এর আদর্শ হয়ে থাকে যে, জনগণের মধ্যে কংগ্রেসবিরোধী মনোভাবকে সমাজতান্ত্রিক অনুপ্রেরণার পরিণত করা, তবে নিশ্চয়ই বিবাদের মধ্য দিয়ে তা সার্থক করা সম্ভব নয়। অন্য দিকে এটাই যদি যুক্ত ফ্রন্ট-এর শরিকদের মনোগত উদ্দেশ্য হয়, তা হলে কংগ্রেসের দিক থেকেও নিশ্চেষ্ট থাকার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। আত্মসমালোচনার প্রসঙ্গটা তাই এমন প্রত্যক্ষভাবে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি জনসমক্ষে তুলে ধরেছে। ফরোয়ার্ড ব্লকও আংশিকভাবে সে কাজ হাতে নিয়েছে অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করে।

কারণ, এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, রাজ-নৈতিক চেতনা যত সংগঠিত হবে, আত্মসমালোচনা দলকে ততই সুদৃঢ় করতে সাহায্য করবে।

উত্তর প্রদেশেও অবশেষে অ-কংগ্রেসী সরকার।
ক্ষয়িষ্ণু বনেদী বংশের উত্তরাধিকারীর হাতে নড়বড়ে আসবাবের পরিণতি।
চন্দ্রভান গুপ্ত
ইউ. পি কংগ্রেস
কংগ্রেসীদলের গোপন আশা, একাধিক অ-কংগ্রেসী সরকারের অচিরে পতন ঘটবে।
কাল-বৈশাখী ঝড়ে আর দু-চারটে আম কি পড়বে না?
অ-কংগ্রেসী সরকার
আয়ুবের রাজনৈতিক চিন্তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।
মস্তিষ্ক ধোলাইকারী কি মাও?
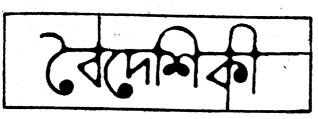
এডেন ও ব্রিটেন

আমেরিকার দক্ষিণ ভিয়েতনাম, ব্রিটেনের দক্ষিণ আরব ফেডারেশন। আমেরিকাকে যদি শুধাই, দক্ষিণ ভিয়েতনামের ভাবনা ছাড়তে দোষ কী, আমেরিকা বলবে, তা-ও কী সম্ভব, উত্তরে কম্যুনিস্ট চীন রয়েছে যে! ব্রিটেনকে যদি শুধাই, দক্ষিণ আরব ফেডারেশন চালু করার জন্য ব্রিটেনের অত গরজ কেন, ব্রিটেন জবাব দেবে, উত্তর শিয়রে প্রেসিডেন্ট নাসের খাড়া রয়েছেন যে। অতএব রক্তারক্তি কান্ড যেমন দক্ষিণ ভিয়েতনামে, তেমনই এডেন এবং দক্ষিণ ইয়েমেনে।

ইংরেজ যখনই কোন উপনিবেশ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয় তখনই সেখানে গোলমাল না বাধিয়ে সে ছাড়ে না। প্যালেস্টাইন যে-কালে হয়েছিল লীগ অব নেশনসের সনদ অনুযায়ী ব্রিটেনের রক্ষণাধীন, তখন থেকেই আরবদের সঙ্গে ইহুদীদের বিরোধ এবং সংঘাত শুরু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধশেষে ব্রিটেন যখন বেগতিক দেখে প্যালেস্টাইনের অভিভাগিরি ছেড়ে দিল তখন প্যালেস্টাইনে আরব-ইহুদী সংঘাতের চরম অবস্থা। সাইপ্রাসের স্বাধীনতা আন্দোলনেও ব্রিটেনের বিভেদ নীতি গ্রীকদের সঙ্গে তুর্কীদের প্রচন্ড বিরোধ সৃষ্টি করে গেছে। এটা হল সনাতন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কৌশল। বর্মায় এই কৌশল খাটিয়ে কাচিন, কারেন প্রভৃতি উপজাতিদের পৃথক পৃথক হিস্যা দাবি করায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। আরব মুলুকে এ-কৌশল সরাসরি প্রয়োগের সুযোগ হয়নি, তাই এখানে ব্রিটেনের চালটা অন্যরকম।

ভারতবর্ষে যেমন রাজারাজড়াদের জন্য ব্রিটিশরাজের ছিল উদার দাক্ষিণ্য, আরব মুলুকে তেমনই শেখদের উপর ব্রিটেনের বিষম দরদ। দক্ষিণ আরবের শেখদের রাজ্যগুলি এতদিন ছিল ব্রিটেনের রক্ষণাধীন অঞ্চল, আর এডেন হল "ক্রাউন কলোনী", সাম্রাজ্যিক উপনিবেশ। এখন পালাবদলের দিন; ব্রিটেনের সাম্রাজ্যিক ঐশ্বর্যের ভান্ডার নিঃশেষিতপ্রায়, আরব মুলুকে ব্রিটিশ ঘাটি বজায় রাখা বাবদ বছরে দু কোটি আশি লক্ষ পাউন্ড খরচ করা ব্রিটেনের সাধ্যে কুলিয়ে উঠছে না। সুয়েজ ছাড়তে হয়েছে প্রেসিডেন্ট নাসেরের কাছে; সুয়েজের পূব দিকে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যিক উপস্থিতি আরব জাতীয়তাবাদীরা সইতে নারাজ। অতএব এডেন এবং দক্ষিণ আরব থেকে ব্রিটেনকে বিদায় নিতেই হবে। সেই বিদায়ের পূর্ব লগ্নে দক্ষিণ আরবের ব্রিটিশ তাঁবেদার শেখদের "স্বাধীনতা" ও নিরাপত্তার জন্য ব্রিটিশরাজ নতুন ছক সাজাতে চেষ্টা করছেন।

ছকটা প্রথম তৈরি করেছিলেন ব্রিটেনের রক্ষণশীল গভর্নমেন্টের মন্ত্রী ডানক্যান স্যান্ডিস। এখন সেটা ঝুলছে ব্রিটিশ লেবার পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ ব্রাউনের গলায়। ছকটা এমনভাবে তৈরী যাতে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান হলেও এডেন এবং দক্ষিণ আরবের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে শেখদের কর্তৃত্ব অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজেরই বেনামী বন্দোবস্ত। আরব জাতীয়তাবাদীরা স্বভাবতই এই নতুন ফাঁসে গলা বাড়িয়ে দিতে চায় না। সেজন্যই ব্রিটিশ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ এডেনে প্রচন্ড বিক্ষোভ। আরব রাজনৈতিক বন্দীদের উপর এডেনের ব্রিটিশ পুলিশ এবং ফৌজের অকথ্য অত্যাচার সম্পর্কে তদন্তের বিস্তৃত বিবরণ বার হয়েছে। গোরা সৈন্যের বুটের তলায় আরব জাতীয়তাবাদীরা পিষ্ট হচ্ছে, তার ছবিও বহু কাগজে দেখা যাচ্ছে। ব্রিটিশ-রাজের মতে এরা সব সাংঘাতিক সন্ত্রাসবাদী; হয়তো তাই, কিন্তু সন্ত্রাসবাদী কারা হয় এবং কেন হয় সেটা ভারতবর্ষে ব্রিটিশরাজের আমলে আমাদের জানতে বাকী নেই।

আরব জাতীয়তাবাদীদের দাবি—শেখদের কর্তৃত্বে গঠিত দক্ষিণ-আরব ফেডারেশনকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা চলবে না। ব্রিটেন চায় শেখদের "স্বাধীনতা" ও নিরাপত্তার জন্য দক্ষিণ আরব ফেডারেশনের একটা সংযুক্ত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা। এই সৈন্যবাহিনী আরব জাতীয়তাবাদীদের ঠান্ডা রাখবে। সংযুক্ত সৈন্যবাহিনী গঠনের কাজে ব্রিটেন অনেক দূর এগিয়েছে। কিন্তু তাঁবেদার শেখদের তাতেও ভরসা নেই। শেখদের প্রার্থনা—দক্ষিণ আরব ফেডারেশন স্বাধীন হওয়ার পরও এডেনে যেন ব্রিটিশ ফৌজ মোতায়েন থাকে। ব্রিটেনের উভয় সংকট: শেখদের হারেম রক্ষার স্বাধীনতার ভাবনার চেয়ে ব্রিটেনের নিজের দেউলিয়া হওয়ার দুশ্চিন্তা অনেক বেশী প্রবল। লেবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রাউনের সংকল্প তাই এডেন ও দক্ষিণ আরব এলাকা থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদায় নেওয়া। ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন এগিয়ে আনা হয়েছে চলতি বছরের নভেম্বর মাসে।

দক্ষিণ আরব ফেডারেশনে ব্রিটেন ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবে কার কাছে? শেখরা, এডেনের জবরদস্ত ব্রিটিশ আমলারা আরব জাতীয়তাবাদীদের বেধড়ক পিটিয়ে চলেছেন, নেতাদের করেছেন দেশ-ছাড়া। ক্ষমতা ন্যায়ত কাদের প্রাপ্য, শেখদের, না আরব জনসাধারণের আস্থাভাজন প্রতিনিধিদের, শেখরা সেটা স্বাধীন নির্বাচনের মারফত নির্ধারিত হতে দিতে চান না। শেখদের এবং তাঁদের ব্রিটিশ মুরুব্বিদের অভিযোগ, এডেনে, দক্ষিণ ইয়েমেনে যারা রাজতন্ত্র এবং শেখ-শাহী উৎখাতের চেষ্টা করছে তারা সব প্রেসিডেন্ট নাসেরের সমর্থনপুষ্ট। অতএব দক্ষিণ আরব মুলুকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনটা সবই প্রেসিডেন্ট নাসেরের নষ্টামি। লেবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ ব্রাউন তাই ক্রমাগত প্রচার করছেন, প্রেসিডেন্ট নাসের হাত গুটিয়ে নিলেই এডেন ও দক্ষিণ আরব ঠান্ডা হয়ে যায়। অনুরূপ আমেরিকার প্রচার উত্তর ভিয়েতনামের ডঃ হো চি মিন সম্পর্কে। তবে ব্রিটেনের সম্বল সামান্য, আমেরিকার মত মহাবলীর ভূমিকায় সুয়েজের পূর্বে লড়াই চালিয়ে যাওয়া এখন ব্রিটেনের সাধ্যাতীত। তারপর পারস্য উপসাগরে বাহেরিন দ্বীপের ঘাটিও এখন মজবুত: অগ্নিগর্ভ এডেন ছেড়ে এলে ব্রিটেনের বিশেষ লোকসান হবে না।

১০।৪।৬৭

সময়, সময় নয়

দিনেশ দাস

সময় ঠিক সময়ের মত চলল না,
এক ঝট্‌কায় সময় যেন অনেক এগিয়ে গেল।
সেই দ্রুত লয়ে আমি কি এগুতে পেরেছি,
আমি শুধু গতিটি অনুভব করেছি মাত্র।

আমার মুখের ওপর আলো পড়ছে,
আমার ভাবনাগুলি ছুটছে পিছনের ছায়ায়
যে-ছায়ায় অন্ধকারের ফুল ফুটেছিল :
তবু মাঝে মাঝে হাওয়া শুঁকছি
কী যেন হারানো জিনিসের সন্ধানে।

যেমন ক'রে রুগ্ন পাতাগুলি গুহা থেকে বাইরে আসে
আমিও ছায়া থেকে বেরিয়ে এলাম
একেবারে নতুন পৃথিবীর ধারে:

সূর্য এক চোখে তাকায়,
গাছগুলো অবাক হ'য়ে দেখে,
পথ আমাকে ডাকে।

আমি হাঁটব সময়ের উপর দিয়ে, না মাটির ওপর ?
কুয়াশায় দূরদিগন্ত এখনও অদৃশ্য:
হয়তো কুয়াশার গুটি থেকে
বেরিয়ে আসবে আলোর প্রজাপতি।
হৃদয় যেন এতদিন গর্তের মধ্যে ছিল
এবার কচ্ছপের মত বাইরে মুখ বাড়ায়।
আকাশের নীল কাঁচ ঝক্‌ঝকে হ'য়ে উঠছে,
সূর্য কি আলোয় আলোয় ফেটে পড়বে,
যে-আলোয় মাটি সাঁতার দেয়·
আমি এবার আলোর
ধব্‌ধবে চাদরখানি বিছিয়ে শুয়ে পড়ব।

বিশ্রাম

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

মহাপূব থেকে মহাপশ্চিমে ঘোরা
মহাপশ্চিম থেকে ফের মহাপূবে—
এই ছিল মহাপৃথিবীর ঘরোয়ানা।

একদিন তিনি বললেন, 'মুখপোড়া!
যদি দেয় ধন নিঃশেষ ক'রে কুবের
এত ঘোরাঘুরি তবু আর পারবো না।'

ঈশ্বর ছিল উত্তর মরুদেশে
বলল, 'বেশ তো, এখন তা হলে থামো,
সূর্যকে বলি, এবার তোমার পালা।'
সেইদিন থেকে সূর্যই হেসে-হেসে
পূব-পশ্চিম ঘুরছে, এমন ব্যামো,
পৃথিবী আছেন শান্ত, বন্দীশালায়;

সেইদিন থেকে হারিয়েছি সব গতি,
শিলীভূত হয়ে গিয়েছে শোণিতকণা,
সকাল-বিকেল সূর্যই চোখ মারে—
ইচ্ছে করছে, বলি, 'কুন্তীর পতি
ফিরে যাও, আমি দেহদান করবো না,
বিশ্রাম। তুমি যাও পশ্চিম পারে।'

অকারণ এত উত্তাপ সইবো না।

শর্ত যুদ্ধ

বিজয়া দাশগুপ্ত

দরজা খোলা আছে
তোমরা এস
আমি অস্ত্রহীন, একা
আমাকে যুদ্ধ দাও
তারপর কথা।
পরীক্ষা এড়িয়ে যাও কেন
বীরের মত এস,
আমার তো তরোয়াল নেই
এবং বর্শা কি বন্দুক,
তোমরা সজ্জিত
কেন দ্বিধা কর ?
আমার সজ্জা নেই
তবুও প্রস্তুত,
এস যুদ্ধ দাও।

শর্ত যুদ্ধ
যুদ্ধ শর্ত,
এস, যে কোন কেউ
সূর্য সাক্ষী, আমি অস্ত্রহীন
অথচ প্রস্তুত
এস যুদ্ধ দাও—
তারপর কথা।

সুনন্দর জার্নাল

'বাংলা সাহিত্য এবং গ্র্যামোফোন রেকর্ড'

কোনো পত্রিকায় একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা দেখতে দেখতে মনে প্রশ্ন জাগল, সত্যিই তো—গ্র্যামোফোন রেকর্ডে বাংলা সাহিত্যেরও পরিচয় ফুটে উঠবে না কেন?

একেবারে যে ফোটে না, এমন কথা অবশ্য জোর করে বলতে পারি না—অতি আধুনিক গানের বাণী-বিন্যাস তো আছেই; জাত-গোত্রের বিচারে বোধ হয় তারা কাব্য-সঙ্গীত—এবং নিঃসন্দেহেই সঙ্গীত, তাদের দারুন জনপ্রিয়তাই তার পরিচয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'কাব্য' কি না এ প্রশ্ন তুলতেও উৎসাহ হয় না। একটি বিখ্যাত বচনে বলা হয়ে থাকে : 'ব্যর্থতম লেখকেরাই নির্দয়তম সমালোচক'—আমি অবশ্য এই অত্যুক্তিকে আর্ষোক্তি মনে করি না। কিন্তু অস্কার ওয়াইল্ড্ যেমন বলেছিলেন—'সব মহৎ ব্যক্তিরই শিষ্য বাহিনী থাকে, কিন্তু তাঁদের জীবন-চরিত লেখে কেবল জুডাসেরাই'—খুব সম্ভব সারস্বত-শিষ্যদের মধ্যেও তেমনি সব চাইতে অভক্তরাই প্রধানত এ-কালে কাব্য-সঙ্গীত রচনা করে থাকে। ব্যতিক্রম নেই, এ-কথা অবশ্যই বলছি না।

কিন্তু ধান ভানতে শিবের গীত এসে যাচ্ছে এবং আশঙ্কা হচ্ছে—অকারণেই অনেক অমিত্র যখন রয়েছেন, তখন সকারণে তাঁদের সংখ্যা আরো কিঞ্চিৎ বর্ধিত করতে চলেছি। অতএব পূর্ববর্তী মন্তব্যগুলো প্রত্যাহার করা গেল। আমি ভাবছিলুম, চলচ্চিত্রের পরেই যা প্রচারের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সহজ মাধ্যম, সেই গ্র্যামোফোন রেকর্ডের সাহায্যে বাংলা সাহিত্যের আর একটু প্রসারণ কি সম্ভব হয় না?

রবীন্দ্রনাথের ক'টি আবৃত্তি অবশ্য রেকর্ডে আছে, কিন্তু তিনি তো বিশ্ব-ভৌম পুরুষ। শিশিরকুমার-নির্মলেন্দু লাহিড়ীর আবৃত্তি শুনেছি, তাঁরাও স্ব-মহিমায় দীপ্ত। কিন্তু এইসব, এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরিক্ত, বাংলা-সাহিত্যের আর কি কোনো পরিচয় নেই?

সেই পরিচয় দিতে গেলে গ্র্যামোফোন কোম্পানিরা কি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন? আধুনিক কালের খ্যাতিমান আবৃত্তিকার, প্রেমেন্দ্র মিত্রের যে দুটি কবিতাকে রেকর্ডে বাণীবদ্ধ করেছিলেন, খুব সম্ভব সেটি ব্যবসায় গত সাফল্য আনে নি। কিন্তু প্রতি বৎসর বিভিন্ন মরসুমে যে-সব কাব্য-সঙ্গীত বাঙালী শ্রোতাদের শ্রুতিরঞ্জনের জন্যে নিবেদিত হয়, তাদের প্রত্যেকটিই কি অর্থকরী হয়? যতদূর জানি, হয় না।

তাই যদি, তা হলে বাংলা-সাহিত্যের জন্যে আরো একটু আর্থিক দায়িত্ব নিতে ক্ষতি কী?

ইয়োরোপ-আমেরিকায় দেখি, বিট্‌ল-ক্যালিপ্‌সোর জনপ্রিয়তার ঘূর্ণির ভেতরেও সাহিত্যের জন্যে একটি সম্ভ্রান্ত দ্বার খোলা রয়েছে। সেই কতকাল আগেও এলিয়টের কণ্ঠে 'ফোর কোয়ার্টেটস্' শুনেছি আমরা। উইলিয়ম ফক্‌নারের সেই উৎসব-বিধুর গলার নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁর মানবতাবাদী উদ্দীপ্ত ভাষণটি শুনে হৃদয় আমাদের ভরে গেছে। শুনেছি, অপরূপ সুরেলা গলায় লুই আরাগঁ পড়লেন নিজের কবিতা। শুধু স্বরচিত কবিতাই নয়—ক'দিন আগে একটি লং-প্লেয়িং রেকর্ডে ফরাসী সাহিত্যের ক'টি চিরন্তন কবিতা শোনা গেল : ভ্যিলন-এর 'মিদি', মুসের 'নুই'-এর কিছুটা অংশ, বোদ্‌ল্যারের 'ম্যাক্সাইমা'—ইত্যাদি।

কবিতাও বড়ো কথা নয়—চমক লাগল কাম্যুর 'আগন্তুক' (লেত্রাঁজে) উপন্যাসটির একটি সংক্ষিপ্তরূপ রেকর্ডে পরিবেষিত হয়েছে দেখে। বেশ ক'বছর আগের রেকর্ড, আমারই দুর্ভাগ্য যে এতদিন এটির সাক্ষাৎ

স্বয়ং কবি

মেলোন। আর তৎক্ষণাৎ মনে হল, ইয়োরোপে যদি উপন্যাসও গ্র্যামোফোন রেকর্ডে স্থান পায়, তা হলে দুটি একটি আধুনিক গল্পও কি বাঙালী শ্রোতার কাছে এইভাবে উপস্থিত করা চলে না?

কার লেখায় যেন পড়েছিলুম, শিক্ষিতের হারের তুলনায়—সাধারণ বাঙালী পাঠক ইয়োরোপ-আমেরিকার পাঠকের চাইতে সাহিত্যের বই বেশি ছাড়া কম পড়ে না। আমাদের দোষ অসংখ্য থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্য-প্রীতির দিক দিয়ে এখনো লজ্জিত হওয়ার কারণ ঘটেনি। তার প্রমাণ নানা দুঃখ-দুর্বিপাকের ভেতরেও বাংলা বইয়ের কাট্‌তি, বাঙালীর 'লিট্‌ল ম্যাগাজিনে'র আশ্চর্য সম্ভার—যা ক্ষণ-বিম্বিত হলেও আলোকিত, যার উদাহরণ দৈনিক কবিতা পত্রিকা প্রকাশের দুঃসাহস।

একটি গোটা উপন্যাস রেকর্ড করলে…

আমরা কি আশা করতে পারি না, প্রবীণতম থেকে আধুনিকতম কবি পর্যন্ত প্রত্যেকের স্বকণ্ঠে বাংলা কবিতার একটি পরিচিতি বাঙালীর কাছে উপস্থিত করা

১৪৪ ধারা জারী করে কাজ শুরু করতে হবে

হোক? উপন্যাসের দুরাশা এখনো রাখি না, কিন্তু এ দাবি কি করা যায় না যে, বাংলা সাহিত্যের আর এক উজ্জ্বলতা—তার ছোট গল্পের কয়েকটি নিদর্শন লেখকের কণ্ঠে বিধৃত থাকুক? সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—জীবনানন্দকে এইভাবে পাওয়ার সুযোগ আমরা হারিয়েছি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আর পাওয়া যাবে না (হয়তো কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের টেপগুলো থেকে এখনো তাঁদের পুনরুদ্ধার করা যায়); কিন্তু যাঁরা আছেন, তাঁদের নিয়েও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা এই মুহূর্তেই সম্ভব।

কবিতা, উপন্যাস কিংবা গল্প—ছাপার হরফে তাদের যে পরিচয়ই থাকুক, আর একটি পরিচয় তার ফুটে ওঠে রচয়িতার কণ্ঠে; ব্যক্তিত্ব সেখানে আরো সন্নিহিত হয়ে আসে, একটি বর্ণনা, একটি পংক্তি, কখনো কখনো একটি শব্দের বিশিষ্ট পঠন-রীতিতে রচনায় একটা নতুন তাৎপর্য সঞ্চারিত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকলি' আবৃত্তিটির কথাই মনে আসছে—'কালো হরিণ চোখ' কথাটিতে কবি এমন একটা মোচড় দিয়েছেন—যার ফলে ঘন মেঘে অন্ধকার আকাশের তলায় শ্যামা মেয়ের 'ত্রস্ত ব্যাকুল চোখ' শুধু আবৃত্তির সুরে মিশে গিয়ে নির্বিশেষ হয়ে যায়নি—মেঘ-ছায়া-বাতাস-মাঠ—সব ছাপিয়ে সেই চোখ সারা কবিতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ছাপা কবিতায় এই সৌন্দর্যটুকুর সন্ধান আমরা পাইনি।

এ কথা ঠিক যে জনপ্রিয় কাব্য-সংগীতের সমাদর এইসব সাহিত্যের রেকর্ড না-ও পেতে পারে। কিন্তু একেবারেই পাওয়া যাবে না—বাঙালীর সাহিত্যে রুচি সম্পর্কে এমন অন্যায় সন্দেহই কি করা উচিত? একটু সচেতনভাবে প্রচার করা—লাইব্রেরি-গুলোতে এই সব রেকর্ড সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা—ধীরে ধীরে বাঙালী শ্রোতাদের অভ্যস্ত করে আনা—আমার মনে হয় এই রকম বিবিধ উপায়ে কিছু সক্রিয় হলে সাহিত্যের বাণীরূপ অর্থকরী দিক থেকেও ব্যর্থ হবে না। এবং, আরো বড়ো লাভ জমা থাকবে ভবিষ্যতের জন্যে, লেখক যেদিন চলে যাবেন সেদিনই তাঁর সজীব ব্যক্তিত্ব একেবারে মুছে যাবে না—অনাগত কালের কাছেও তাঁর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ হয়ে থাকবে।

পয়সার জন্যেই যাঁরা গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবসা করেন, পঙ্গু বাণী এবং আধো আধো গলার গানই যাঁদের কাছে রসসৃষ্টির চরম—তাঁরা সুনন্দর কথায় কর্ণপাত করবেন না। কিন্তু সরকারও তো এ নিয়ে একটু ভেবে দেখতে পারেন। একদা লোকরঞ্জন এবং লোকশিক্ষার মুখ্য-উদ্দেশ্যে সরকারী পয়সায় বেশ কিছু আবর্জনা রেকর্ড করা হয়েছিল, তার কিছু কিছু ভয়ঙ্কর নমুনা আমার কাছেও আছে। নতুন জনপ্রিয় সরকার না হয় সাহিত্যের জন্যেই কিছু করুন। সামান্য কিছু অপব্যয় হয়তো হতে পারে, কিন্তু তাতে অন্তত অপযশ ঘটবে না।

প্রসঙ্গ শোকবোধ ও রবীন্দ্রনাথ

শেষপর্বের কবিতা ২
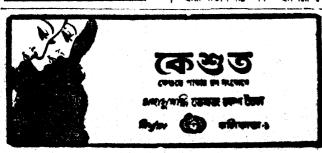
আবু সয়ীদ আইয়ুব

আরোগ্য-র ছোট্ট একটি কবিতা, ২৫ সংখ্যা তার শিরোনামাঃ

বিরাট মানবচিত্তে
অকথিত বাণীপুঞ্জ
অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে
মহাশূন্যে নীহারিকা সম।
সে আমার মনঃসীমানার
সহসা আঘাতে ছিন্ন হয়ে
আকারে হয়েছে ঘণীভূত,
আবর্তন করিতেছে আমার রচনা-কক্ষপথে।

চিত্রকল্পটি সুন্দর, সহজেই মনোযোগ আকর্ষণ করে, রবীন্দ্রনাথের মতো কবির রচনায় তার পৌনঃপুনিক উপস্থিতি অপ্রত্যাশিত নয়। নবজাতক-এর 'কেন' শীর্ষক কবিতায়ও এর প্রয়োগ সার্থক হয়েছে। চিত্রকল্পটি কিন্তু অনেক বেশি বেদনাময় ও মর্মগ্রাহী হয়ে ওঠে যখন 'বাণীধারা' রূপান্তরিত হয় 'অশ্রুধারায়ঃ

অশ্রুধারার ব্রহ্মপত্রে
উঠছে ফুলে ফুলে
তরঙ্গে তরঙ্গে;
সংসারের কূলে কূলে
চলে তার বিপুল ভাঙাগড়া
দেশে দেশান্তরে।
চিরকালের সেই বিরহতাপ,
চিরকালের সেই মানুষের শোক,
নামল হঠাৎ আমার বুকে;
এক প্লাবনে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিল
পাঁজরগুলো,(১)—
সব ধরণীর কান্নার গর্জনে
মিলে গিয়ে চলে গেল অনন্তে—
কী উদ্দেশে কে তা জানে।

(পুনশ্চ—'বিশ্বশোক')

অকথিত বাণীপুঞ্জ যেমন মহাশূন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানুষের দুঃখ-শোকের অশ্রুধারাও কি তেমনি দেশে দেশান্তরে তরঙ্গে তরঙ্গে ফুলে ফুলে উঠছে যুগ যুগ ধরে? কী উদ্দেশে? দুটি চিত্রকল্পের তাৎপর্য কিন্তু এক নয়, প্রশ্নের তীব্রতাও ভিন্ন। অকথিত বাণীপুঞ্জ যাযাবীর নেবুলার মতো আকাশে ভ্রাম্যমান— এই কল্পনাটি কৌতুকপ্রদ, তার বেশি কিছু নয়। কী উদ্দেশে তা কবিবিশেষের চিত্তে ঘণীভূত হয়ে রূপ পরিগ্রহ করে, আবার মহাশূন্যে হারিয়ে যায়—প্রশ্নটি সাহিত্যিক কৌতূহল প্রকাশ করে মাত্র। কিন্তু দেশে দেশে যুগে যুগে দুঃখের তরঙ্গ ফুলে ফুলে উঠছে—এটা কল্পনা নয়, নিষ্ঠুর বাস্তব। 'কী উদ্দেশে' প্রশ্নটিও নিছক কৌতূহল-ব্যঞ্জক নয়, একটি ধর্মনীতিক বিচার তাতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে—এমন তো হওয়া উচিত ছিল না তবু এমনটা হল কেন, কার কোন্ নিগূঢ় উদ্দেশ্য সাধন করছে এই অশ্রুধারার ফুলে ফুলে ওঠা ব্রহ্মপত্র?

প্রশ্ন ও বিচারের ইঙ্গিত আরো উঁচু পর্দায় ওঠে বীথিকার 'দুর্ভাগিনী' কবিতায়। 'বিশ্বশোক'-এর প্রশ্ন উত্তরের সম্ভাবনা-রহিত ছিল না, প্রশ্নকর্তার মনের কোণে একটুখানি আশা রয়েছে যে এই জাগতিক শোকের এবং সেই শোকতরঙ্গের দ্বারা একজন ব্যক্তির হৃদয়কে হঠাৎ প্লাবিত করে দেওয়ার কারণপরম্পরায় মধ্যে হয় তো কোনো মহাকল্যাণময় উদ্দেশ্য নিহিত আছে, যদিও সে উদ্দেশ্য আমাদের মানুষী বুদ্ধির কাছে মোটেই পরিষ্কার নয়। কিন্তু 'দুর্ভাগিনী'র 'কেন ওগো কেন' স্পষ্টতঃই সেই চিরপ্রশ্নসমূহের অন্যতম যার "বেদী সম্মুখে চিরনির্বাক রহে বিরাট নিরুত্তর।" কবির সব দিক থেকে দুর্ভাগিনী কন্যার শেষ ভরসা ছিল দীপ্তিমান তরুণ পুত্র নীতিশ। সেই নীতিশ জর্মানির এক হাসপাতালে যক্ষ্মারোগের অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় ভুগে ভুগে মারা গেল—তারি মৃত্যু-

---

(১) "বুঝতে পারছি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে সুরেন পেরে উঠবে না, এত কষ্ট পাচ্ছে। নানারকম কষ্টের ভিতর দিয়ে ওর জীবনটা গেল। অমন মানুষের ভাগ্যে এত কষ্ট ঘটতে পারে একথা ভাবলে অত্যন্ত ধিক্কার জন্মায় বিশ্ববিধানের উপর।" চিঠিপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, আষাঢ় ১৩৩৯। 'বিশ্বশোক' কবিতাটির রচনার তারিখ ১১ ভাদ্র, ১৩৩৯।

সংবাদ পেয়ে এই কবিতাটি রচিত। কিন্তু সেটা উপলক্ষ্য মাত্র, কবিতার বিষয়বস্তু একটি ব্যক্তির শোক নয়; অথবা সেই ব্যক্তির অশেষ দুঃখ জগতের দুঃসহতম দুঃখ ও হতাশার প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে ঐ কবিতায়। "দুঃখের স্তম্ভিত নীরন্ধ্র অন্ধকার"-কে মহিমান্বিত করে দেখানোই প্রারম্ভিক উদ্দেশ্য ছিল মনে হয়ঃ "তোমার সম্মুখে এসে দুর্ভাগিনী, দাঁড়াই যখন/নত হয় মন।" কিন্তু পরবর্তী পংক্তিতেই প্রলয়ের কথা বলা হয়েছে, "যেন ভয় লাগে/প্রলয়ের আরম্ভেতে স্তব্ধতার আগে"। কোন্ প্রলয়ের দিকে ইঙ্গিত করছেন কবি?

ফিরিছ বিশ্রামহারা ঘুরে ঘুরে,
খুঁজিছ কাছের বিশ্ব মুহূর্তে
যা চলে গেছে দূরে—

....

দেবতা যেখানে সেখানে জ্বালাইতে গেলে ধূপ,
সেখানে বিদ্রূপ।

এর পরবর্তী পংক্তিগুলিতে আর কোনো আড়ালই রইল না, শুধু বিশ্বই ভেঙে পড়ছে না, তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের দেবতার উপর বিশ্বাসও ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছেঃ

সর্বশূন্যতার ধারে
জীবনের পোড়ো ঘরে অবরুদ্ধ দ্বারে
দাও নাড়া;
ভিতরে কে দিবে সাড়া?
মূর্চ্ছাতুর আঁধারের উঠিছে নিঃশ্বাস,
ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে
ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস।

কবিতার শেষে যে বিদ্রোহী যন্ত্রণা চিৎকার করে ওঠে সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে, তা কি কেবল কবিতার নায়িকারই মনের কথাঃ

তুমি স্থির সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে
নির্বাক অপার নির্বাসনে।
অশ্রুহীন তোমার নয়নে
অবিশ্রাম প্রশ্ন জাগে যেন
কেন, ওগো কেন?

সীমাহীন নৈরাশ্যের তীরে নির্বাসিত শুধু দুর্ভাগিনী কন্যা নন, 'দুর্ভাগিনী'-রচয়িতাও: বহু দূরে ছেড়ে এসেছেন সেই ভক্তিশ্যামল মানস ভূমি "জীবন যেখানে ছিল ফুলের মতো", যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি সহজে বলতে পারতেন "দুঃখ যে তোর নয় রে চিরন্তন/পার আছে রে এই সাগরের বিপুল ক্রন্দন"।

'কেন' শব্দটি শেষ পর্বের কাব্যে বার বার আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নতুন এক কবিপুরুষের পরিচয় লাভ করছি। কেবল সংখ্যা গণনার দিক দিয়ে এই শব্দটি যে আগের চেয়ে খুব বেশি লক্ষণীয় তা নয়। "কেন তবে কেড়ে নলে লাজ-আবরণ", "কেন নিবে গেল বাতি", "কেন পান্থ এ চঞ্চলতা", "যদি প্রেম না দিলে প্রাণে/কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে", "নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে/তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না", "কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না/শুকনো ধুলো যত"—ইত্যাদি শত শত 'কেন'-সংবলিত কবিতা ও গান মনে আসে পূর্ব যুগের রচনা থেকে। কিন্তু এগুলোর সঙ্গে একটু আগে উদ্ধৃত 'দুর্ভাগিনী' কবিতার শেষ ছত্রের "কেন, ওগো কেন"-র তুলনা করলেই দেখা যাবে 'কেন' শব্দের অর্থব্যঞ্জনায় যুগান্তর এসেছে। 'প্রশ্ন' শীর্ষক একাধিক কবিতা পাওয়া যাবে শেষ পর্বে; নবজাতকের একটি কবিতার নাম 'কেন'। কবিতাটির বিষয়বস্তু কবির নবার্জিত জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে নেওয়া। জড়জগতে, প্রাণীলোকে, মানবেতিহাসে এমন প্রভূত, অপরিমেয় অপচয় ("আপন সৃষ্টির 'পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়") কেন? মহাযুদ্ধে, খণ্ডযুদ্ধে, গৃহযুদ্ধে মনুষ্যজাতির পৌনঃপুনিক মূঢ় আত্মজিঘাংসাই রবীন্দ্রনাথকে সবচেয়ে পীড়িত করছে, কিন্তু তার সঙ্গে মিশে আছে সমস্ত সৌর জগৎ এবং যাবতীয় নক্ষত্রলোকের অবধারিত 'তাপমৃত্যু'র

বিভীষিকা। সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে, ধর্মে-কর্মে মানুষ যদি বা উপরে উঠতে পারে এবং যতই উপরে উঠুক এমন দিন আসবেই যখন মানুষের তথা প্রাণীমাত্রের প্রাণধারণ আর সম্ভব হবে না—সূর্যের অবধারিত তাপক্ষয়ের পরিণামস্বরূপ। এ-বিষয়ে পদার্থবিজ্ঞানীদের সুদৃঢ় প্রাগুক্তি রয়েছে। তার পরে আবার যদি নীহারিকা সৃষ্টির পালা শুরু হয় তবে বৈজ্ঞানিক নিয়ম মতে আবারও সেই সার্বিক 'তাপমৃত্যু' ঘটবে।

নিত্য নিত্য এমনি কি
অফুরান আত্মহত্যা মানবসৃষ্টির
নিরন্তর প্রলয়বৃষ্টির
অশ্রান্ত প্লাবনে।
নিরর্থক হরণে ভরণে
মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূত খেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—
কিন্তু কেন।

পরবর্তী স্তবকে অনুরূপ আর একটি প্রশ্নের কথা বলা হয়েছে—"প্রথম বয়সে কবে ভাবনার আঘাত লেগে/এ প্রশ্নই মনে উঠেছিল জেগে"। তরুণ কবি জানতে চেয়েছিলেন, "বিশ্বের কোন্ কেন্দ্রস্থলে মিলিতেছে দণ্ডে পলে জীবনের মরণের নিত্য কলরব"। কিন্তু সেই প্রথম বয়সেরও কল্পিত নিরসন এই নয় যে "ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর-কন্দর মাঝে" অখণ্ড পূর্ণতা বিরাজিত।(১) সেখানে বিরাজ করে কেবল একটি 'প্রতিধ্বনিমণ্ডল', এবং সেই প্রতিধ্বনিমণ্ডলে "বাঁধে বাসা/চতুর্দিক হতে আসি জগতের পাখা-মেলা ভাষা"। কবিতার এই অংশে (কোনো অংশেই) অখণ্ড পূর্ণতা বা লাভক্ষতির হিসাব মেলাবার কোনো কথা নেই—যদি না আমরা অখণ্ডতা বা হিসেবের মিল খুঁজে পাই মানুষের চিত্ত নিয়ে "বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে" অনন্তকাল ধরে যে দ্যূতখেলা চলছে তার বিষয়ে কবি যে-কাব্যরচনা করেন সেই কাব্যের অক্ষয় সৌন্দর্যে। কারণ কবি বলছেন সেই প্রতিধ্বনিমণ্ডল থেকে—

বহু যুগযুগান্তের কোন্ এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।

কিন্তু মহাকালের নিরর্থক দ্যূতখেলার মধ্যে এই যে যুগযুগান্তের বাণীধারা এসে কবিচিত্তে সংহত হয়ে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর কাব্যের জন্ম দিল, তার মধ্যেও কি সৃষ্টির

---

(১) এই কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী লিখছেন, "এই লীলার সম্পাতি কোন্খানে? বলছেন 'ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর-কন্দর মাঝে' যা কিছু দেওয়া এবং হারানোর হিসাব মিলছে। সবশুদ্ধ ক্ষয় নেই, অখণ্ড পূর্ণতা বিরাজিত।"—সাম্প্রতিক, পৃঃ ১৯০।

আর্থ এবং সার্থকতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব? সম্ভব হত যদি সর্বত্যাগী অপব্যয়ের মধ্যে এইটুকু সঞ্চয়ও থাকত। কিন্তু এই বাণী-ধারার প্রতিও মহাকাল সমান নির্দয়। তাই নিয়ে কবির শেষ প্রশ্নঃ

প্রশ্ন মনে আসে আরবার,
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার—
রূপেহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্যে যাত্রাপথে?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয়পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার—
ভোজ-শেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন?
কিন্তু কেন?

প্রশ্নটা প্রকৃতপক্ষে এই নয় যে, এই বাণী-ধারার সূত্র ছিন্ন হয়ে যবে কি না। সে-আলংকারিক প্রশ্নের উত্তর উহ্য রয়েছে কিন্তু মোটেই অস্পষ্ট নয়—হয়ে যাবেই। ঐ উত্তর থেকেই আসল প্রশ্নের উৎপত্তি—"কিন্তু কেন?" এই রূপেহারা গতিবেগের প্রেতলোকে এইটুকু পাথেয়র পাত্রও কেন উজাড় করে দিতে হবে "আপন স্বল্পায়ু বেদনায়"? এ প্রশ্নও শূন্যে বাজতে থাকবে, "ধ্বনিবে না কোনো উত্তর"।

"ধ্বনিবে না কোনো উত্তর" যে-কবিতার শেষ পংক্তি, তা কিন্তু নবজাতকের ভিন্ন একটি কবিতা, নাম 'প্রশ্ন'। আরো গভীর, হতাশ, হৃতবিশ্বাস তার সুর। একজন তরুণ কবি-সমালোচক আপত্তি তুলেছেন—ঐ কবিতার অনেক অংশ একটি সম্ভাব্য কবিতার পদ্য-ভাষ্য মাত্র, কবিতা হয়ে ওঠেনি। 'কেন' সম্পর্কে এ ধরণের আপত্তি আরও সোচ্চার হতে পারত। পরবর্তী কোনো অধ্যায়ে তার বিস্তারিত উত্তর দেবার চেষ্টা করেছি। এখানে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথের কানেও এমনতর আপত্তির কথা পৌঁছেছিল—তাঁর শেষ দিককার কবিতা নাকি চিন্তাগর্ভ, হৃদয়-সঞ্জাত নয়, সেই কারণে বিশুদ্ধ কবিতা নয়। এই আপত্তির উত্তরে তিনি নিজে যে-সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাত্মক বাক্যটি ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখেছিলেন তা' স্মরণীয় এবং অবিস্মরণীয়:

"চিন্তাগর্ভ কথার মুখে কোনোখানে অচিন্ত্যের ইঙ্গিত কি লাগল না?" আমি শুধু যোগ করবো যে, মহৎ কবিতা আমরা তখনই পাই যখন কোনো গভীর চিন্তাগর্ভ কথা তদাশ্রয়ক ও তৎসম্ভূত হৃদয়ানুভূতির বিস্তৃত পরিমণ্ডল সমেত ব্যক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের অনেক কবিতা (নিশ্চয়ই সব নয়) এই মানদণ্ডে বিচার্য ও বরেণ্য।

রোগশয্যায়-এর ৭ ও ৮ সংখ্যক কবিতা পরস্পর সম্পূরক: একই কবিতার দুই স্তবকও বলা যেতে পারে। এই যুগ্ম-কবিতার শিরোনামা হতে পারত 'মনে হয়' —দুটি কবিতার মূলে রয়েছে ঐ 'মনে হওয়া'। মনে হয় যা তার মধ্যে প্রত্যক্ষতঃ পরম আশ্রয়ের স্বীকৃতি রয়েছে, অন্ধকার ছিন্ন করে আলোরই জয় হবে, অন্তহীন কাল ক্ষীণপ্রাণ মানুষের দায় স্বীকার করে নেবে—এমনতর ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্তু তারি মধ্যে আবার ঐ স্বীকৃতির বাণী নিস্তব্ধ হয়ে যাওয়ার, আকাশের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে ওঠার অনিবার্যতাও সুনির্দেশিত। প্রতীকী কাব্যের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই সংক্ষিপ্ত, ঘনসন্নিবদ্ধ যুগ্ম কবিতাটি; সমস্তটাই উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

১

গহন রজনী মাঝে
রোগীর আবিষ্ট দৃষ্টি তলে
যখন সহসা দেখি
তোমার জাগ্রত আবির্ভাব,
মনে হয়, যেন
আকাশে অগণ্য গ্রহতারা
অন্তহীন কালে
আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার,
তার পরে জানি যবে
তুমি চলে যাবে,
আতঙ্ক জাগায় অকস্মাৎ
উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা।

২

মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্ঝটিকা-পানে
আলোকের কী যেন ভর্ৎসনা
দিগন্তের মুক্তদ্বারে তুলিছে তর্জনী।
পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে সূর্যোদয়
আকাশের ভালে,
লজ্জা ঘনীভূত হয়,
হিমসিক্ত অরণ্যছায়ায়
স্তব্ধ হয় পাখিদের গান।

যুবতীর দ্যাবাপৃথিবী থেকে আশ্রয়ের শেষ চিহ্নটাও কি মুছে গেছে? নইলে বিনিদ্র গভীর রাত্রে প্রিয়জন কেউ অল্পক্ষণের জন্য শুশ্রূষার কাজে ঘরে এলে কেন মনে হয় গ্রহতারা সস্নেহে কথা ব'লে উঠেছে, আর চলে গেলেই সমস্ত জগত একেবারে উদাসীন হয়ে যায়? এমন উপলব্ধির তাৎপর্য কী? আশার রেশটুকু ধরে রাখার কী অপরিসীম ব্যাকুলতা; অথচ কবিতার মধ্যে আশার সুর একবার শুধু ঝংকার দিয়েই থেমে যায়, তার পরে কবির চারিদিকে রয় কেবল উদাসীন জগতের ভীষণ স্তব্ধতা—যে-স্তব্ধতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় পাস্কালের সেই বিখ্যাত উক্তি: "অনন্ত আকাশের স্তব্ধতা আমার চিত্তে আতংকের সঞ্চার করে।" দ্বিতীয় স্তবকে আলোর ভর্ৎসনা শুনে স্বভাবতই আশা জাগে—কুজ্ঝটিকা সরে যাবে। কিন্তু যায় না; বরঞ্চ সূর্যোদয়ই ফ্যাকাসে হয়ে আসে। ভোরের আলোর ক্ষীণাভাসটুকু দেখতে পেয়ে অরণ্যের পাখীরা গান গেয়ে উঠেছিল, সে গানও থেমে যায়, সারা পৃথিবীর স্তব্ধতা সব কিছুকে গ্রাস করে। এমনি এক সর্বগ্রাসী নিস্তব্ধতার মধ্যেই কি 'ডুইনো এলিজি'র প্রথম পংক্তিটি উচ্চারিত হয়েছিল—

Who, if I cried, would hear me
among the angelic orders?

রবীন্দ্রনাথ ও রিলকে এ-শতাব্দীর দুই মহান্ কবির সেই একই চূড়ান্ত ঘোষণা:

For beauty's nothing but beginning of Terror we're just able to bear, and why we adore it so is because it serenely disdains to destroy us.

অস্থির সত্তার রূপ ফুটে আর টুটে,
'নয় নয়' এই বাণী ফেনাইয়া মুখরিয়া উঠে।

মুক্তাকাশে দেখো চেয়ে প্রলয়ের আনন্দ স্বরূপ।
ওরে শোকাতুর, শেষে
শোকের বুদ্বুদ তোর অশোক সমুদ্রে যাবে ভেসে।

সানাই-এর বেশির ভাগ কবিতা প্রেমের, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা ও গান এ-বইয়ের অন্তর্ভুক্ত—"ভালবাসা এসেছিল/এমন সে নিঃশব্দ চরণে", "এসেছিলে তবু আসো নাই, তাই জানায়ে গেলে", "তব দক্ষিণ হাতের পরশ করো নি সমর্পণ", "তোমায় যখন সাজিয়ে দিলেম দেহ", "পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ যবে ভাবিনু মনে" ইত্যাদি। সানাই মধুর রসের শেষ কাব্যগ্রন্থ, কবির বয়স তখন আশির কাছাকাছি। এই শেষ দাক্ষিণ্যের মাঝখানে হঠাৎ চমকে উঠি একটি ছোট্ট কবিতায় এসে। কোনো (কোন্?) 'ব্যথিতা'কে নিয়ে ঐ নাম দিয়ে লেখা এ কবিতা:

জাগায়ো না, ওরে জাগায়ো না।
ও আজি মেনেছে হার
ক্রূর বিধাতার কাছে।
সব চাওয়া ও যে দিতে চায় নিঃশেষে
অতলে জলাঞ্জলি।
দুঃসহ দুরাশার
গুরুভার যাক্ দূরে
কৃপণ প্রাণের ইতর বঞ্চনা।

কী সে বঞ্চনা যার স্বরূপ বোঝাতে গেলে 'ইতর' শব্দটি ব্যবহার না করলেই নয়? কে তাকে ইতরভাবে বঞ্চিত করেছিল? তারই "কৃপণ প্রাণ"—গানের ভাষায় যা হয়েছে "অকিঞ্চন জীবন"? কিন্তু প্রাণকে ইতর বলা মানে তো প্রকৃতিকে

ইতর কথা? প্রকৃতি কি স্বয়ংসম্পূর্ণ অনীশ্বর? তৃতীয় পংক্তিতে বিধাতাকে স্পষ্ট অব্যর্থ ভাষায় 'ক্রূর' বলা হয়েছে। কেমন করে রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বসুদ্ধ লোক যাঁকে গীতাঞ্জলি-রচয়িতা ভক্ত কবি বলেই চেনে—এই শব্দগুলি এক বঞ্চিতার দুঃখ বর্ণনা করতে অসংকোচে ব্যবহার করলেন এবং তার একটি অন্তত সোজাসুজি ঈশ্বরের প্রতি আরোপ করলেন?(১) কোন্ কশাঘাততুল্য ব্যক্তিগত কিম্বা সমাজগত অভিজ্ঞতা (বা অভিজ্ঞতার স্মৃতি) তাঁকে শেষ জীবনে অন্তত একবারের মতোও ব্লাসফেমির আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল?

শেষ পর্বের কবিতার ফলশ্রুতি কি তবে এই যে, জীবনের অন্তিম দশকে রবীন্দ্রনাথের মন হয়ে উঠেছিল সর্বব্যাপী দুঃখ ও পাপ বিষয়ে অতীব চেতন, সত্য-শিব-সুন্দরের পরমতা বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ, মঙ্গলময় বিধাতার অস্তিত্ব সম্পর্কে হৃতবিশ্বাস, জীবন ও জগত সম্পর্কে সর্বতোভাবে নিরাশ, নিরুৎসাহ, নিরানন্দ? না।

(ক্রমশ)

---

(১) এই কবিতাটিতে সুর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে অনেকটা বদলে দিয়েছিলেন। "ও আজি মেনেছে হার ক্রূর বিধাতার কাছে" হয়েছে "ও যে বিরাম মাগে নির্মম ভাগ্যের পায়ে" এবং "কৃপণ প্রাণের ইতর বঞ্চনা"র সংস্কৃত রূপ হচ্ছে "অকিঞ্চন জীবনের বঞ্চনা"। অথচ সানাইয়ের কবিতাতে মেয়েটির নির্দোষ অসহায় ও অসহ ব্যথার যে অব্যর্থ প্রকাশ, গীতবিতানের গানের ভাষায় তার সিকি ভাগও সম্ভব হয়নি। গানের অধিক সংখ্যক শ্রোতার কথা স্মরণ করে কি এই ভাষাশুদ্ধি? না কি তাঁর মনে হয়েছিল কবিতার ছন্দ যতখানি জোরালো এবং অনাবৃত শব্দের আঘাত সইতে পারে, গানের সুর ততখানি পারে না, সুর চায় অপেক্ষাকৃত মোলায়েম, নিরীহ ভাষার বাহন?

জীবনতরী

সত্যেন্দ্র আচার্য

এই বিশাল আকাশের নীচে নক্ষত্রের ম্লান আলো একটু আগেই ঝরে গিয়েছিল। ঘনায়মান অন্ধকারের ভেতর নক্ষত্রের আলো ঝরে গেলে এই সমুদ্র আরো বীভৎস হয়ে উঠল।

ডেকের ওপর যাত্রীরা এখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ক্লান্তি এবং বিষণ্ণতা তাদের চোখের ওপর ফুটে উঠলে কেবিনমাস্টার একটা হাই তুলে আর দাঁড়ালেন না। কেবিনঘরগুলোয় তখনো আলো জ্বলছিল। কেবিনমাস্টার আলো দেখতে দেখতে ক্যাপ্টেনের ঘরে চলে এলেন।

জাহাজ চলছিল। জলরাশির উদ্দাম-গতিকে ব্যাহত করে বিপুল শক্তির এই বাষ্পীয়পোত উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলছিল। জাহাজ বন্দর ছেড়েছে তিনদিন। অবিরত জাহাজ চালনায় ক্যাপ্টেনের চোখে ক্লান্তি জমছিল। শরীরের দৃঢ়তা ক্রমশ যেন শিথিল হয়ে আসছিল। এক-সময় ক্যাপ্টেন অনুভব করলেন খুব যেন তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। একটা অসহায় যন্ত্রণার ভেতর স্বস্তি খুঁজে না পেয়ে আরো যেন দুঃখ পেলেন।

ক্যাপ্টেনের যত ভয় যেন ওই কেবিন-গুলো নিয়ে। পাঁচটি কেবিনে মূল্যবান ক'টি জীবন। ক্যাপ্টেনের যত দায়িত্ব, যত ভাবনা এবং দুশ্চিন্তা ওই ক'টি জীবনের জন্য। যেন পৃথিবীর যত সম্পদ ওই পাঁচ-পাঁচটি কেবিনে তুলে নিয়ে এই বাষ্পীয়পোত ছুটে চলেছে। যদিও খুচরো কিছু যাত্রী উঠেছে এই জাহাজের ডেকের ওপর, কিন্তু নিতান্ত খুচরো বলেই তাদের ব্যথায় কোন মাথাব্যথা নেই ক্যাপ্টেনের। কেবিনমাস্টারের। জাহাজ এক সময় ছেড়েছিল। স্বচ্ছ সুন্দর আব-হাওয়ার ভেতর জাহাজ এগোতে থাকল। সেই থেকে জাহাজ চলছিল। সেই থেকে অবলীলায় তিন-তিনটি রাত ক্যাপ্টেন নির্ঘুমে কাটিয়ে দিয়েছেন।

কেবিনমাস্টার হতাশায় মুষড়ে পড়ে বললেন, ঝড় উঠবে।

ঝড়? ক্যাপ্টেন আকাশ দেখলেন।

কেবিনমাস্টার আকাশে তারা দেখতে চাইলেন। তারা নেই। কখন উটের গ্রীবার নিটোল অন্ধকার এই জাহাজটির চারিদিকে মুখ উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে একে একে। ঘন অন্ধকারের ভেতর সারা সমুদ্রটা ডুবে এল, জাহাজটা ডুবে গেল। জলের ওপর সমস্ত চিহ্ন যা চোখের ওপর একটু আগেও বেঁচে-ছিল, তারা একে একে কখন সব ডুবেছে। বারবার আকাশে তাকালেও এই বিপুল পৃথিবীর কোথাও এতটুকু আলোর বিন্দু কেবিনমাস্টারের চোখে পড়ল না।

ডেক নিয়ে যেমন ক্যাপ্টেনের মাথাব্যথা নেই তেমনি মৃত্যু নিয়ে কোন যন্ত্রণা নেই। এই ডেকযাত্রীদের। কিন্তু ভয় কিংবা বিষাদ, হতাশা কিম্বা আশংকায় শুধু জেগে আছে কেবিনগুলো। একনম্বর কেবিনে চলেছেন এক প্রবীণ রাজদম্পতি। প্রবাসের প্রমোদ ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরছেন। এই সফর-সূচীতে প্রচুর আনন্দ কুড়িয়েছেন তাঁরা। শুধু সমুদ্র যাত্রার নামমাত্র ক্লান্তি ছাড়া এই বিলাসের ভেতর দ্বিতীয় কোন অস্বস্তি লক্ষ করা যাচ্ছিল না।

দু' নম্বরে চলেছেন এক লক্ষপতি। স্ত্রী-পুত্র ফেলে, স্বজনাদি ছেড়ে এতদিন তিনি ব্যবসায় বাইরে ছিলেন। সঞ্চিত অর্থ নিয়ে তিনি এখন ঘরে ফিরছেন। স্ত্রী, পুত্র, সুখ, শান্তি এবং ভালবাসা—এই সংসার-ধর্মের ভেতর ফিরে চলেছেন।

তিন নম্বরের যাত্রীকে এই মন্দভাগ্য জাহাজ তুলে নিতে পারেনি। ভাগ্যবান বলেই ভগবান তাকে তুলে নিয়েছেন এই জাহাজ 'বুক' করার তিনদিন পরেই। তাই তিন নম্বরটা খালি। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে সারারাত আলো জেলে রাখেন শূন্য কেবিন-ঘরে কেবিনমাস্টার।

চার নম্বর কেবিনে সবচেয়ে সুখী দম্পতি। একজোড়া যুবক-যুবতী। উজ্জ্বল এবং বিত্তবান। সুখ, সমৃদ্ধি এবং যশ-এর ভেতর এদের ভালবাসা বড় নিটোল। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনের হৃদয়ে পুরনো দিনের স্মৃতি ভীষণ মোচড় দিয়ে উঠেছিল। ভালবাসার কথা মনে পড়েছিল।

আর পাঁচ নম্বরে যিনি তিনি সম্মানীয়, কৃতিপুরুষ। সঙ্গে তাঁর বৃষ্টির ফরমুলা।

কেবিনমাস্টার খুব অবাক গলায় বিনীত জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বৃষ্টির ফরমুলা?

আবিষ্কারক স্মিত হেসেছিলেন। মধ্য-বয়সে এখনো পদার্পণ করেন নি। কিন্তু জ্ঞানের দ্যুতি যেন এখনো কপালের ওপর, চোখের ওপর। দ্বিতীয় কোন প্রশ্নের আগেই ভদ্রলোক বলেছিলেন, হ্যাঁ, বৃষ্টির ফরমুলা। জানেন, আমার দেশ এক অনাবৃষ্টির দেশ, দুর্ভিক্ষের দেশ। এই দেশকে বাঁচাব আমি। কী বলো?

স্ত্রীও স্মিত হেসেছিলেন।

কেবিনমাস্টার সেই খুশীভরা চোখের ভেতর তাকিয়ে থেকেছেন। বড় নিটোল শরীর মহিলার। ও'র চুল উড়ছিল। ও'র সাদা ঘাড়, চুলের গুচ্ছ আর গলার নিচেটা লক্ষ করলেন। যৌবন সারা শরীরটাকে বড় নিটোল করে সাজিয়ে রেখেছে। দেখতে দেখতে কেবিনমাস্টার বড় মোহাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ভদ্রলোক বলেছেন, ও'র সাহচর্য না পেলে জানেন, আমার এতবড় গৌরব সম্ভব ছিল না। ওর ভালবাসা আমাকে মহান করেছে। বড় তৃপ্ত আমি।

এতক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে পেয়ে যেন কেবিনমাস্টার স্মিত হেসেছেন।

জাহাজ চলছিল। সন্ধ্যার গাঢ় রং কখন মিশে গিয়েছিল জলে। অকূল সমুদ্রের ওপর এখন চাঁদের আলো নেই। কেবিনমাস্টার বৃথাই আকাশ দেখলেন।

অথচ আকাশ দেখলে মনে হয় একটু পরেই জ্যোৎস্না উঠবে। যেন ঝড়ের মেঘ আকাশের ওপর আর বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। মনে হয় একটু পরেই ঢেউ-এর ওপর ধবল জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়বে। জ্যোৎস্নার রেণু নিয়ে জলকণা খেলা করবে। কেবিনমাস্টার আর দাঁড়ালেন না। ডেকের ওপর ছড়ানো-ছিটোনো যাত্রীগুলোর ভেতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে গলে গিয়ে খোলা হাওয়ায় দাঁড়ালেন কিছুক্ষণ। জল কেটে কেটে এই বিপুল-কায় জাহাজটা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বন্দরের দিকে ছুটে চলেছে। অনেকক্ষণ দাঁড়ালেন কেবিনমাস্টার। এক সময় শীতের হাওয়া অনুভব করলেন। এঁকে বেঁকে সেই হাওয়ার ভেতর দিয়ে ওপরে উঠে এলেন। সামনেই এক নম্বর কেবিন। সুখী রাজ-দম্পতি চলেছেন।

কৌতূহলে কেবিনমাস্টার কান রাখলেন পর্দায়। ছোট্ট গোলাকার সমুদ্র দেখার দুটো জানালা। রঙীন রেশমী পরদা দেওয়া। চোখ রাখলেন কেবিনমাস্টার। ঘন কুয়াশার মত আবছা ভেতরটা। প্রৌঢ় রাজা খুব চাপা গলায় কথা বলছিলেন: তুমি যৌনাচার করেছ সারাজীবন। রাজার গলা খুব ভারী আর অস্পষ্ট শোনাচ্ছিল।

তুমি? রানীর গলায় ঝাঁঝ লক্ষ করলেন কেবিনমাস্টার। সারা জীবন কী দিলে আমায়?

না পেলে কি? খুব করুণ সুর যেন এবার রাজার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল। তুমি না রাজমহিষী?

রাখো তোমার রাজ্যপাট। সারাজীবন রাজ্যের লোভে কতটুকু আমায় মনে রেখে-ছিলে?

কী বলছ তুমি? রাজার গলা এবার বেশ স্পষ্ট শোনাল। তুমি না রাজ্যের—

কি? খানিকটা শোনায় যেন উঠে এল রাজ-মহিষীর গলা দিয়ে।

কিন্তু এই রাজ্যের যত উপচার, যত আয়োজন—

যত আয়োজন? যেন ওই কথাটাই লুফে নিয়ে উচ্চারণ করলেন রানী ভাঙা গলায়।

সে তো তোমাকে নিয়েই। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল রাজার গলা দিয়ে এবার। সেখানে আমাকে কর্তব্যচ্যুত দেখেছ কখনো?

সেই থেকে তোমার আমার চুল পাকল। রানী হাসলেন।

দুজনের গাত্রচর্ম কেমন লোল হয়ে গেল। রাজাও হাসলেন।

একটা একটা করে কেমন দাঁতগুলো সব ঝরে গেল চোখের ওপর। রানীর একক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

জাহাজ চলছিল। জাহাজের গাতটা এখন আরেকটু যেন বেড়েছে। জলরাশির এই উন্মত্ততা, বিপুলতা, এই অন্ধকার এবং আকাশ ওরা এখন কিছুই দেখছিল না। হঠাৎ কেমন মাতালের মত একটা অবসাদ অনুভব করলেন কেবিনমাস্টার, স্নায়ুতে,

---

মন্ত্রের ভেতর। খুব সন্তর্পণে আবার ভেতরে তাকালেন। দেখলেন, বৃদ্ধার দন্তহীন ঠোঁটের গহ্বরে একটা আপেলের সিকিভাগ পুরে দিচ্ছে রাজা। থুথু আর লালায় সিক্ত আপেলটা আবার বের করে নিচ্ছেন। এই অসহায় অবস্থায় রাজার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল।

জাহাজ চলছিল। ক্যাপ্টেনের ঘরে আলো জবলছে। এবং তা লক্ষ করতে করতে কেবিনমাস্টার খুব সন্তর্পণে এবার দু' নম্বর কেবিন ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

একটা প্রাণী উপুড় হয়ে ভেতরে শুয়ে আছে। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। বিরল কেশ এবং মেদবহুল। নাকি বেআইনী কিছু সোনার তাল নিয়ে পালাচ্ছে লোকটা—সংসারের ভেতর, স্ত্রী, পুত্র এবং স্বজনাদির ভেতর; মনুষ্যজীবনের স্থায়ী এবং চরমতম সুখের ভেতর। ক্যাপ্টেনের কাছে শুনেছেন, এই তিনদিন জলস্পর্শ করেনি লোকটা। আকাশ কি সমুদ্র দেখার জন্য একবার বাইরে পর্যন্ত আসেনি ও। কী একটা আঁকড়ে ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে এখন। অনেকক্ষণ দাঁড়াবার পর এক সময় লক্ষ করলেন কেবিনমাস্টার খুব সোহাগভরে যেন সেই পুঁটলিটায় চুমু খাচ্ছে লোকটি, কখনো নারীদেহের মত করে জড়িয়ে ধরছে বুকের ভেতর।

এই বিচিত্র লোকটার সম্বন্ধে গতকাল ডেকযাত্রীর একজন বলেছিল, ওর স্ত্রী খুব সুন্দরী ছিল। বলেছিল, একসময় ওর আমি ভৃত্য ছিলাম।

কেবিনমাস্টার শুনেছিলেন, কিছু নাকি ভাল লাগেনা লোকটার। হঠাৎ টাকা নামক বস্তুপিণ্ডের নেশা লোকটাকে কেমন পেয়ে বসল। সেই নেশায় স্ত্রী বরবাদ। পুত্র কন্যা দূরে চলে গেল। আত্মীয়-স্বজন সব ভেসে গেল। সেই থেকে লোকটা একা।

সেই লোকটা এখন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। এতদিন পরে এই ব্যবসায়ক্ষেত্র থেকে দেশে ফিরছে। সুদূর প্রবাসজীবন থেকে ঘরে চলেছে।

কেবিনমাস্টার আর দাঁড়ালেন না। জাহাজ

যেন খুব দ্রুত চলছে এখন। জল কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে। এবারে কেবিনমাস্টার এসে দাঁড়ালেন তিন নম্বরের সামনে। বহুক্ষণ কান রাখলেন। না, কেউ কথা বলছে না। হঠাৎ মনে পড়ল ভাগ্যবান বলেই ভগবান তাকে তুলে নিয়েছেন। মনে পড়ল, ক্যাপ্টেনের নির্দেশে তিনি আলো জেলেছেন শূন্য ঘরে আজও সন্ধ্যায়; তখন জাহাজের গতি এত দ্রুত ছিল না।

বহু দিন পরে কেবিনমাস্টারের হঠাৎ মনে হল, এই জাহাজের ওপর শূন্যতার মতই খুব নিরর্থক আর সংযমী জীবন কাটিয়েছেন কেবিনমাস্টার। তাঁর দস্যুবৃত্তি, কামপ্রবৃত্তি যেন এই মহাসমুদ্রের বুকে কখন সমর্পণ করে দিয়ে নিতান্ত অসহায়, অবহেলায় নিজেকে নিয়ে এতদিন তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সব আদিমতা ভুলে গেছেন। কেবিনমাস্টার এবার চার নম্বরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। খুব সন্তর্পণে আবার ভেতরে তাকালেন। এক জোড়া তরুণ-তরুণী। দুজনেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে।

বহু দিন পরে রক্তের ভেতর সেই পুরনো প্রবৃত্তিটা কেমন যেন চাড়া দিয়ে উঠল। কেবিনমাস্টার উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকালেন। লোকটা খুব বিশ্রীভাবে শুয়ে আছে। এবং কেবিনমাস্টারের হঠাৎ মনে হল, এই পৃথিবীর ওপর ওরাই এখন সত্য এবং আদিম। এই আদিমতাই পৃথিবীর ধ্রুবসত্য।

জাহাজ দুলছিল। লম্বা হাতদুটো দিয়ে টেনে নিল মেয়েটিকে এবার ছেলেটা বুকের ভেতর। ভীষণভাবে যেন প্রমত্ত হয়ে উঠেছে জাহাজটা। অন্ধকার আকাশ। নিঃসীম অন্ধকারে পরিব্যাপ্ত চরাচর। সমুদ্র। সমুদ্র তীরবর্তী পাহাড়গুলো জলে-স্থলে একাকার। যেন সব সীমারেখা মুছে দিয়ে খুব ভীত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ যেন খুব নির্দয় হয়ে পড়ছেন কেবিনমাস্টার। একটা লোভ, পৈশাচিকতা সেই ঘুমন্ত বৃত্তিটাকে বারবার নাড়া দিচ্ছে। খুব কঠোর করে তুলছে।

ছেলেটা তার উষ্ণ ঠোঁট বারবার মেয়েটির গলার নিচে রাখবার চেষ্টা করছিল। বলছিল, মেয়েদের শরীর আমি কত ভালবাসি বল ত?

মেয়েটি চোখ তুলেছে। পরিপাটি চুলের কিছু কিছু এখন অবিন্যস্ত। একটা ক্লান্তি এবং বিষাদ ওর চোখের চারপাশে এখন জমে আছে।

কি? মেয়েটি বলল।

তোমাদের এই শরীর কত ভালবাসি জান তো? কিন্তু দুঃখ কোথায় জানো? মেয়েটি এবার নিজেকে খুব শিথিল করে ছড়িয়ে দিল বিছানার ওপর।

মেয়েটি তাকিয়েছে এবার। ওর যে হাতটা এতক্ষণ গলাটা জড়িয়ে ধরেছিল, সে হাতটা নামিয়ে এখন বিছানার ওপর রাখল।

কোথায় দুঃখ হয় জানো? ছেলেটি খুব নিস্পৃহ গলায় এবারে বলল, জানো, ভালবাসার জন্যে আমি কোন দিন কাঁদতে শিখিনি।

হঠাৎ জাহাজের গতির দিকে লক্ষ পড়ল কেবিনমাস্টারের। কেবিন মাস্টার আকাশে তাকালেন। ক্যাপ্টেনের নিশ্চয়ই পুরো বেসামাল অবস্থা হয়েছে এতক্ষণে। জাহাজের ওপর দাঁড়িয়ে এই দুর্যোগপূর্ণ রাত্রির অন্ধকার ছাড়া আর কিছু লক্ষ করতে পারছিলেন না কেবিনমাস্টার। এই প্রমত্ত গতিকে শুধু ভয় কেবিনমাস্টারের। এই অশান্ত রাত্রিটা কোন উপায়ে কাটাতে পারলেই ভোরের কাছাকাছি হয়ত আকাশ কেটে যেতে পারে। আর কোন বিপদের মধ্যে না পড়লে মধ্যাহ্ন সূর্যের সঙ্গে সঙ্গেই বন্দরে।

কেবিনমাস্টার শেষ কেবিনে এসে দাঁড়ালেন। জাহাজ জল কাটছিল। বিক্ষুব্ধ জলরাশি এবং সহস্র তরঙ্গবেগ এক সঙ্গে ছিটকে ছিটকে জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়ছিল। ঠিক সেই সময় এই বিপত্তি ঘটল।

ক্যাপ্টেনের চোখে হতাশায় জল এসে গেল। ভীষণ একটা যন্ত্রণায় তিনি যেন চীৎকার করে কাঁদতে চাইলেন। গতি ক্রমশ শ্লথ হয়ে আসছে। অথচ এই মেশিন ঘরের কোথাও কোন অঘটন নেই। তিনি কাঁদতে চাইলেন। জাহাজটা ক্রমশ জলের ভেতর ডুবে যাচ্ছে। ভীষণ একটা শিহরণ অনুভব করলেন রক্তে। সমস্ত শিরায় শিরায়। এতক্ষণ পরে তিনি এখন বুঝলেন, বয়লার ঘরের সঙ্গে ডুবো পাহাড়ের ধাক্কা লেগেছিল। তিনি বুঝলেন, এই মূল্যবান জীবনগুলো, এত সম্পদ, জাতীয় সম্পদ, আই বৃষ্টির ফরমূলা, সব এখনি এই বিপুল জলরাশির ভেতর এই অতলান্ত মহাসমুদ্রের কোলে তলিয়ে যাবে। এই যে প্রাণীগুলো, যারা এখন আশা, আকাংখা, বিত্ত, সম্পত্তি, এই ভালবাসা, প্রেম এবং অমর সৃষ্টি নিয়ে ফিরে যাচ্ছে, তারা আর ঘরে ফিরবে না।

তিনি চীৎকার করতে চাইলেন। কিন্তু গলা দিয়ে যেন কোন শব্দই বের হতে চাইছে না। দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল। কারা যেন জাহাজটাকে টানতে টানতে একটা বধ্যভূমিতে নিয়ে চলেছে। সেই ভূমি তিনি দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু সেই অন্তিম পরিণতি তিনি অনুভব করছেন। হঠাৎ এতগুলো প্রাণীর চীৎকার এবং কোলাহল শুনতে শুনতে তিনি বিমূঢ় হয়ে গেলেন।

ততক্ষণে এই কেবিনমাস্টারের স্নেহ, মায়া, মমতা কোথায় উধাও হয়ে গেছে। প্রচণ্ড ধাক্কা খেতে খেতে এই উদ্দাম স্রোতের মুখে জাহাজের গতি থেমে যাচ্ছিল। কেবিনমাস্টার আরো নির্দয় হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর দৃষ্টি এই অন্ধকারে আরো

তাঁর আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলে, ত্বরিতে তিনি লাইফবোট খুলে জলে নামালেন। তিনি দাঁতে দাঁত ঘষে এই মৃত্যুতাণ্ডব দেখলেন। বারংবার এই মৃত্যুকে যেন উপেক্ষা করতে চাইলেন। কোলাহল, চীৎকার, আকুল ক্রন্দন, এই মিশ্রিত জটলা, এই অন্ধকারে, বাতাসের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, জলের ভেতর ডুবে যাচ্ছিল।

রাজদম্পতি হাতধরাধরি করে ততক্ষণে লাইফবোটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। রাগে, বিষাদে চোখ তুলে তাকালেন কেবিন-মাস্টার। দাঁতে দাঁত ঘষে খুব কর্কশ স্বরে উচ্চারণ করলেন না।

কাঁপতে কাঁপতে তাকালেন দুজনে।

কেবিনমাস্টার তাচ্ছিল্যে চোখ সরিয়ে নিয়েছেন। ওরা মরতে পারে না? আর কি লাভ বেঁচে থেকে!

লাইফবোটটা চোখের ওপর ভাসছে। এই মৃত্যু থেকে বাঁচবার জন্য একমাত্র অবলম্বন। অথচ এই বিরাটকায় জাহাজের পেট এখন জলে পূর্ণ। গতিহীন জাহাজটা স্রোতের মুখে কখনো কাঁপছে, কখনো পাক খাচ্ছে। সমস্ত মেশিনঘর থেকে কেমন একটা গোঙানির শব্দ উঠছে। এই ভরপেট জাহাজ ডুবছিল। তলিয়ে যাচ্ছিল। শুধু চোখের ওপর মৃত্যু-ত্রাণ জীবনতরীটি ভাসছিল।

বাঁচার প্রবৃত্তি দু' নম্বর কেবিনের পাথর কঠিন প্রাণটাকেও টেনে এনেছে। বাঁচার আশায় এই লাইফবোটটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

কেবিনমাস্টারের চোখ অত্যন্ত হিংস্র হয়ে উঠছিল। নির্দয় কেবিনমাস্টার ঠোঁট-বেঁকিয়ে হাসলেন।

হকচকিয়ে তাকিয়ে থাকল লোকটা। মৃত্যুভয়ে কেমন একটা সরলতা চোখের ভেতর, অথচ একটা পুঁটলি বড় প্রাণভয়ে যেন আঁকড়ে ধরেছে বুকের ভেতর।

লোকটা অসহায় চোখে তাকাল কেবিন-মাস্টারের নির্দয় চোখের ভেতর। কেবিন-মাস্টারের চোখ আরো বিস্ফারিত হয়ে উঠলে এক সময় তাচ্ছিল্যে চোখ সরিয়ে বললেন, বাঁচতে চান নাকি? কি দেবেন?

খুব সরল চোখে তাকিয়ে খুব ভয়ে ভয়ে লোকটি বলল, কী দিতে হবে বাবা? আমার তো কিছুই নেই।

এতক্ষণ যা বুকে চেপে শুয়েছিলেন, আরেকটু শুয়ে থাকুনগে।

তিন নম্বর শূন্য। ঠিক জায়গায় অনেক আগেই পৌঁছে গেছে সে। ফলে, এই নির্দয় কেবিনমাস্টারের আরেকটু ক্ষোভ হল, একটা যাত্রী হাতছাড়া হয়ে গেল বলে।

ডেকের যাত্রীরা প্রাণভয়ে চীৎকার করে চলেছে।

কেবিনমাস্টার চোখ খুলে কঠোর গলায় কৃতিপুরুষকে প্রশ্ন করলেন, কী দেবেন?

আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, এই ব্যক্তির ফরমুলা।

দিন। এক বাণ্ডিল কাগজ হাতে নিয়ে প্রমত্ত ঢেউ-এর ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কেবিনমাস্টার। অর্থ আছে?

অর্থ? একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণার ভেতর কথা-গুলো উচ্চারণ করলেন ভদ্রলোক।

দাঁত বের করে হাসলেন কেবিনমাস্টার। তবে মেয়েমানুষ?

মেয়েমানুষ?

হ্যাঁ। খুব সহজ গলায় উচ্চারণ করলেন কেবিনমাস্টার। এর বাইরে আমি নিই না কিছু।

সামনেই জীবনতরী। মৃত্যুকে উপেক্ষা করে চোখের ওপর ভাসছে। কৃতিপুরুষ তাকালেন সেদিকে। প্রচণ্ড সমুদ্র, এই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ লক্ষ করলেন।

কেবিনমাস্টার ভদ্রমহিলার শরীর দেখলেন। যৌবন এবং রূপ একসঙ্গে এত সুন্দর এবং এত স্পষ্ট করে বহুদিন দেখেন নি তিনি। কেবিনমাস্টার চোখ ঘুরিয়ে বললেন, ভাবুন তাড়াতাড়ি, বাঁচবেন না মরবেন?

জাহাজটা ডুবে যাচ্ছিল, এই অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে ওরা এখন বেশ বুঝতে পারল। এই নিঃসীম অন্ধকারের ভেতর দূরের আকাশ দেখা যাচ্ছে না। অথচ ওরা অনুভব করতে পারল, খুব দ্রুত মৃত্যুর দিকে ওরা এখন এগিয়ে চলেছে।

খুব অপরাধীর মত কৃতিপুরুষটি বললেন, তাই হবে চলুন।

হাসলেন কেবিনমাস্টার। উঠুন।

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে পাঁচ নম্বরের যুবতী। খুব বিনয়ে হাসলেন কেবিন-মাস্টার। অর্থ চাই এখন।

কত?

খুব হাসি পেল কেবিনমাস্টারের এত বিপদের মধ্যেও দরকষাকষি করতে দেখে। যা আছে সব। কেবিনমাস্টার আবার দাঁতে দাঁত ঘষে এখন উচ্চারণ করলেন, পারবেন?

পারব।

চোখের ওপর ডুবছে জাহাজটা। ডেক-যাত্রীদের করুণ আর্তনাদ অনেক আগেই জলের তলায় হারিয়ে গেছে। কেবিনমাস্টার লাইফবোট ছেড়ে দিলেন।

তুমি চলে যাচ্ছ?

কেবিনমাস্টার জোরে হাল মারতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে তাকালেন। লজ্জা, ভয় জলাঞ্জলি দিয়ে বড় অসহায় চোখে তেমনি উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

আমাকে ফেলে যাচ্ছ?

প্রণয়ীর চোখের ভেতর তাকিয়ে একটু হাসলেন কেবিনমাস্টার। না, সময় নেই। খুব জোরে লাইফবোটটা চালাতে চাইলেন। আর সেই চালাতে গিয়ে দেখলেন দু' নম্বর কেবিনের সেই পাষাণ মূর্তিটা কী যেন একটা বুকে চেপে ঝাঁপ দিল সমুদ্রের ভেতর।

কেবিনমাস্টার এই প্রথম মৃত্যুকে ভয় পেলেন, যেন মৃত্যুর চেয়ে সোনা দামী বলে জীবন দিয়ে লোকটা বেঁচে গেল। কিন্তু—

কিন্তু সারাজীবনের পরমার্থ এই নারী এবং অর্থ নিয়ে তিনি এখন কোথায় যাবেন? হঠাৎ মৃত্যুভয়ে এই প্রথম লাইফ-বোটটা খুব সন্তর্পণে চালাতে চাইলেন, খুব সন্তর্পণে। মৃত্যু। খুব ভয় পেলেন কেবিনমাস্টার। কোথাও পৌঁছবার আগে যদি মৃত্যু এসে কেড়ে নিয়ে যায়?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গণনা অনুসারে ১৯৬৭ সালে সূর্যের দেহ থেকে অগ্নুদগার ও সৌর কলংকের আবির্ভাব খুব বেশি হবার কথা যেগুলি চরমে উঠবে ১৯৬৯ সালে। অশান্ত সূর্যকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার এই হচ্ছে মাহেন্দ্রক্ষণ। সেই
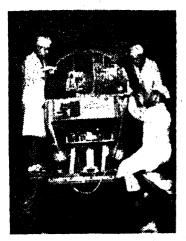
কক্ষপথে উৎক্ষেপের আগে যন্ত্রবিদ্‌রা সৌর মানমন্দিরটি পরীক্ষা করছেন

জন্য গত ৮ই মার্চ আমেরিকা মহাশূন্যে এক সৌর মানমন্দির উৎক্ষেপ করেছে যার মধ্যে আছে নয় রকমের পরীক্ষার যন্ত্রপাতি। এই কৃত্রিম উপগ্রহটির নাম 'ও এস ও-৩' (অর্বিটিং সোলার অবজার্ভেটরী)। মানমন্দিরটি মহাকাশ থেকে সূর্যের যেসব ছবি তুলবে এক অতিবেগুনী রশ্মির টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে সেগুলি মেরিল্যান্ডের গ্রীনবেল্ট কেন্দ্র হয়ে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌর বিজ্ঞানীদের হাতে পৌঁছাবে গবেষণার জন্য। মানমন্দিরের ইলেকট্রনিক সেন্সারগুলি সূর্য থেকে বিকীর্ণ বিভিন্ন রশ্মির চিত্র গ্রহণ করে পৃথিবীতে পাঠাবে।

সূর্যের গতিবিধির একটি একাদশ-বার্ষিক চক্র আছে। সেই ১১ বছরের মধ্যে সূর্যের ক্রিয়াকলাপ কিছুদিন এক নাগাড়ে জোরদার হতে থাকে, আবার কিছুকাল ঝিমিয়ে পড়তে থাকে। ১৯৬৭ সাল হচ্ছে সেই ক্রিয়াকলাপ জোরদার হবার বছর। সেই জন্য এই সময় [illegible] [illegible] বিস্ফোরণ বা অগ্নুদগারের চরিত্র বিশ্লেষণ করার সুবিধা। ঐ সব বিস্ফোরণ থেকে গোটা সৌরজগতে যে তেজ বিকীর্ণ হয় তা অনেক সময় পৃথিবীতে বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ হয়। হালে এই অসময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব ঝড় বৃষ্টি, শিলা ও তুষারপাত হচ্ছে তার সংগে সম্ভবত সৌর বিস্ফোরণের এবং ফলত সৌর ঝটিকার সম্পর্ক আছে। সৌর মানমন্দিরটি থেকে বৈজ্ঞানিক এমন সব তথ্য পাবার আশা করেন যেগুলির সাহায্যে ভবিষ্যতে হয়ত সৌর ঝটিকার পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে। তাছাড়া এই পূর্বাভাস দেবার মত জ্ঞান না থাকলে কোন মানুষকে চাঁদে পাঠাতে যাওয়াও বিপজ্জনক।

মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে যেসব তড়িচ্চৌম্বক বিকিরণ এসে পৌঁছায় তার অধিকাংশই আসে সূর্য থেকে। কতকগুলি আসে সূর্যের ওপারে বহু দূর-দূরান্ত থেকে। কিন্তু নিজের চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা সূর্য সেগুলিকেও প্রভাবিত করে। সেই চৌম্বক ক্ষেত্র সৌর কলংকের ক্রিয়াকলাপের সংগেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং গ্রহগুলির কক্ষপথের দ্বারা মহাশূন্যের যে অংশ পরিবেষ্টিত সেখানেও ঐ ক্ষেত্রের দোর্দণ্ড প্রতাপ।

তড়িতাবিষ্ট কণা বা আয়নগুলির গতির বেগ ও দিক সৌর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু সেই ক্ষেত্র সব সময় সমান থাকে না। সৌর কলংকগুলির

সৌর [illegible] [illegible] একটি বিস্ফোরণ [illegible] [illegible]
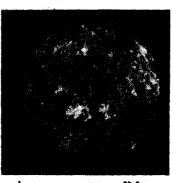
গতিবিধির যে দশ বার্ষিকচক্র আছে সেই অনুসারে সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি ও অনুপ্রবেশের তারতম্য ঘটে। সৌরক্রিয়া প্রতি ১০ বছরের মধ্যে সেই বছরে চরমে ওঠে (তাকে সূর্যের গ্রীষ্মকাল বলতে পারেন) যে বছর সৌর কলংকের সংখ্যা হয় সর্বাধিক। ১৯৫৭-৫৮ সাল (আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বৈজ্ঞানিক বৎসর) ছিল সেই রকম একটি বছর। আর সূর্যের কার্যকলাপে যে

আমাদের ছায়াপথেরই মত আর একটি নীহারিকা—অ্যান্ড্রোমেডা

বছর সবচেয়ে মন্দা দেখা যায় সে বছর সৌর কলংক প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। সূর্যের ঐ 'শীতকাল' আসে দুটি গ্রীষ্মকালের ব্যবধানের মাঝামাঝি সময়ে।

বিভিন্ন সৌরকলংকের ঘনীভবন কেন্দ্রগুলির মধ্যে যখন প্রচণ্ড তাপপারমাণবিক বোমার মত বিস্ফোরণ ঘটে তাই থেকেই উদ্ভূত হয় আগুন ও গ্যাসের দিগন্তপ্রসারী উদ্গার যার প্রধান উপাদান হচ্ছে অন্যান্য জায়গার মতই—হাইড্রোজেন। আয়নিত হওয়ার দরুন সেই গ্যাস থেকে ইলেকট্রন বার হয়ে গিয়ে থেকে যায় প্রোটন। তাছাড়া বেশ কিছু হিলিয়াম পরমাণু থাকে। আয়নিত গ্যাস সেকেন্ডে ২০০০ কিলোমিটার বেগে অগ্নুদগারের চৌম্বক ক্ষেত্র বয়ে নিয়ে মহাশূন্যে ছুটে চলে। একেই বলা হয় সৌরঝাড়া। শিলার উপর দিয়ে

যেমন ঝর্ণায় জল বয়ে যায় তেমনি সৌর-বাত্যা গ্রহগুলির উপর দিয়ে বয়ে যাবার সময় সেগুলির চৌম্বক ক্ষেত্রকে চাপ দিয়ে সংকুচিত করে এবং সেই সংগে কিছু কণা তাদের হাতে তুলে দিয়ে যায়। সেই সময় তড়িতাবিষ্ট কণাগুলির গতি কিছুটা রুদ্ধ হতে পারে, সেগুলির গতিদিক বদলাতে পারে এবং ভিতরে কিছু পারমাণবিক পরিবর্তন ঘটতে পারে। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, কারো মাথায় সেই সৌরবাত্যার ঝাপ্টা যত জোরেই লাগুক তাতে তার এক গাছিও মাথার চুল নড়বে না। সূর্যের বিস্ফোরণ থেকে উৎপন্ন এই যে সৌরবাত্যা, সৌর মানমন্দির তার চরিত্র অনুশীলন করবে।

এই সব কাণ্ডকারখানা থেকে পৃথিবীর চারিদিকের পরিবেশে কি সব ব্যাপার ঘটে দেখা যাক। সূর্যের ক্রিয়া যখন বাড়তে থাকে তখন তার চৌম্বক ক্ষেত্র সৌরজগতে সম্প্রসারিত হবার সময় মহাজগতের আরো বহু দূর থেকে আসা তড়িতাবিষ্ট কণা-গুলিকে সে প্রভাবিত করে এবং সেই সব কণার কিছু কিছু পৃথিবীর আশপাশে অনুপ্রবেশ করে। সেগুলিই হচ্ছে মহা-জাগতিক রশ্মি। সেই সব রশ্মির কিছু কিছু অবশ্য আসে আমাদের সেই ছায়াপথ থেকে যার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দৈর্ঘ্য ১ লক্ষ আলোক বৎসর এবং যার উপাদান হচ্ছে ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র। সেই ছায়াপথের মধ্যবিন্দু থেকে কিছুদূরে অবস্থিত সৌরজগত একটি বিন্দুমাত্র। আরো দূরে মহাজগতে আরো বহু ছায়াপথ আছে যেগুলি থেকেও কিছু কিছু মহা-জাগতিক রশ্মি এদিক পানে হানা দেয়। এই দুই রকম মহাজাগতিক রশ্মিরই সূর্য-গর্ভজাত পরমাণুকণার সংগে সাদৃশ্য আছে কিন্তু পৃথিবীর কাছে প্রথমগুলি দ্বিতীয়-গুলির চেয়ে আসে অনেক কম সংখ্যায়। তাছাড়া তাদের শক্তির পরিমাণগত পার্থক্যও আছে কারণ সৌর কণাগুলির শক্তি যেক্ষেত্রে নিযুত ইলেকট্রন ভোল্ট দিয়ে মাপা হয় সেক্ষেত্রে মহাজাগতিক রশ্মির শক্তি মাপা হয় শত কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট দিয়ে। অতখানি শক্তিধর না হলে অতদূর থেকে সেগুলির পক্ষে পৃথিবীতে এসে হানা দেওয়া সম্ভব হত না। সৌরক্রিয়া যখন বাড়ে তখন তার চৌম্বক ক্ষেত্র পৃথিবীর কাছে ছায়াপথের মহাজাগতিক রশ্মির কার্যকলাপ কিছুটা দুর্বল করে দেয়। সৌর বিস্ফোরণের সময় তাই পৃথিবীর আশপাশে ছায়াপথের মহাজাগতিক রশ্মির কাজে ভাটা পড়ে।

পৃথিবীর নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র মহাশূন্যে ৪০ হাজার মাইল দূর পর্যন্ত কার্যকরী আছে। এই এলাকায় তার শক্তি আন্তর্গ্রহ চৌম্বক ক্ষেত্রের চেয়ে বেশি। সেখানে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট একটা চেহারা আছে। এই সব কারণে বাইরে থেকে আসা কণাগুলির কিছু অংশ বাইরে বিকর্ষিত হয় এবং কিছু কিছু ভিতরে বন্দী হয়ে চৌম্বক মেরুর দিকে প্রবাহিত হয় যা দিয়ে তৈরি হয়েছে ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়। সৌর আবহের উপর নির্ভর করে ঐ বলয়ে তড়িতাবিষ্ট কণার সংখ্যা। সৌর মানমন্দির এই সব ব্যাপার সম্পর্কে বহু নতুন তথ্য উদ্ঘাটিত করবে বলে আমরা আশা করি। যেসব শব্দের চেয়েও দ্রুতগামী বিমানের যাত্রী ৬০।৭০ হাজার ফুট ওপর দিয়ে আকাশে উড়বেন তাঁরা এবং গ্রহান্তরের যাত্রীরা যাতে বিপদে না পড়েন তার জন্য বৈজ্ঞানিকদের সূর্যকে আরো অনেক বেশি চিনতে জানতে হবে। তাছাড়া পৃথিবীর আবহবিজ্ঞানও সেই জ্ঞানের আলোকে হবে অনেক বেশি সমৃদ্ধতর।

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা বানান-সংস্কার

প্রবোধচন্দ্র সেন

শ্রদ্ধেয় ভাষাচার্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজি শব্দের বাংলা বানান সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত প্রবন্ধটি 'দেশ' পত্রিকায় (২১ মাঘ) প্রকাশ করেছেন তা আমি পরম আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। বস্তুতঃ বিশ্বভারতীর বিগত সমাবর্তন-উৎসবের সময়ে (৮ পৌষ) তাঁকে যখন "দেশিকোত্তম' উপাধি দেওয়া হয় তখনই তিনি তাঁর এই সংকল্পিত প্রবন্ধটির সারমর্ম আমাকে জানিয়েছিলেন। সে সময় থেকেই আমি তাঁর এই লেখাটির জন্য উৎসুক হয়ে ছিলাম। অতঃপর আমার প্রাক্তন কৃতী ছাত্র শ্রীমান্ অমিতাভ চৌধুরী সুনীতিকুমারের মতামতের প্রতিবাদে যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছেন (২৮ মাঘ), সেটিও আমি যথোচিত আগ্রহ নিয়েই পড়েছি। এই লেখাটিতে তিনি যেসব যুক্তিতর্কের অবতারণা করেছেন তার গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু তাঁর লেখার শিরোনামে ও যুক্তিতর্কের মাঝে মাঝে কিছু অধৈর্য ও শ্রদ্ধাহীনতার সুর প্রকাশ পেয়েছে। তাতে আমি বিশেষ বেদনা অনুভব করেছি। শ্রীমান্ অমিতাভ আমার পরম স্নেহভাজন ও মেধাবী ছাত্র। তাঁর লেখনী থেকে দেশগৌরব সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তির প্রতি যথোচিত সম্মান প্রকাশ পেলে আমার পক্ষে আনন্দের বিষয় হত। তাঁর নিজের লেখার মর্যাদাও বৃদ্ধি পেত। শুধু তাই নয়, তাতে তাঁর যুক্তিতর্কগুলির উজ্জ্বলতাও বাড়ত। অবিচলিত স্থির-বুদ্ধিতে লিখলে তিনি হয়তো অধিকতর ও প্রখরতর যুক্তিবিন্যাসের সুযোগ পেতেন। শ্রীমান্ আমার স্নেহের পাত্র বলেই তাঁকে লক্ষ্য করে এ কথাগুলি বলতে হল। নতুবা এ ধরণের মন্তব্য করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তাছাড়া বাংলা বানান নিয়ে এই বিতর্কে জড়িত হবার কোনো অভিপ্রায়ই আমার ছিল না। কেননা এই বিষয়ে কোনো অভিমত-প্রকাশের যোগ্যতা আমার অতি সামান্যই। কিন্তু শ্রীমান্ অমিতাভ আমাকে সুনীতিকুমারের প্রতিপক্ষ হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাতে আমি বিশেষ-ভাবে কুণ্ঠিত হলেও পাঠক সমাজের তথা বাংলা ভাষা-অনুরাগীদের কাছে আমার একটা দায়িত্ব এসে গেছে। এই কর্তব্য-বোধেই আমি সবিনয়ে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে নিবেদন করতে চাই।

বাংলা বানান সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের পূর্বে জানানো দরকার এ বিষয়ে আমার সংকীর্ণ অধিকারের সীমা কোথায়। আজ বাল্যকালেই (তখন আমার বয়স আট-নয় বৎসর) যখন প্রথম শুনি

'মা তোর মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মতো।'

তখন থেকেই 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' আমার প্রাণে মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল। তারপরে বারবার শুনেছি দ্বিজেন্দ্রলালের

'জননী বঙ্গ-ভাষা এ জীবনে
চাহি না অর্থ, চাহি না মান।'

এবং অতুলপ্রসাদের

'আ মরি বাংলা ভাষা,
মোদের গরব মোদের আশা।'

ছেলেবেলাতেই এসব গান শুনে শুনে বাংলা ভাষার প্রতি একটা নিবিড় অনুরাগ যেন আমার মর্মে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। তারপরে ইস্কুল-জীবনে প্রবেশ করে পড়লাম মধু-সূদনের 'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' ইত্যাদি 'বঙ্গভাষা'-নামক কবিতা, ঈশ্বর গুপ্তের স্মরণীয় উক্তি 'মাতৃসম মাতৃ-ভাষা' এবং নিধুবাবুর বিখ্যাত রচনা

নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?

এসব রচনার প্রভাব তখনই আমার মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। আরও কিছু বড় হয়ে পড়লাম বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—'বাঙ্গালা সাহিত্য বাঙ্গালীর একমাত্র ভরসা।' রবীন্দ্র-সাহিত্যেও এই জাতীয় উক্তির অভাব নেই। মনস্বী সুনীতিকুমারও এই দুর্গতির দিনে বাঙালিকে এই কথাই নূতন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।—

"এখন আবশ্যক, কি করিয়া বাঙ্গালীকে নিয়মানুবর্তিতার দ্বারা শক্তিশালী করিতে পারা যায়। এই ভাঙ্গনের দশায় তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পৎ এখনও হইতেছে—তাহার ভাষা, তাহার সাহিত্য। এই দুইয়ের সংরক্ষণ বাঙ্গালীর পক্ষে বাঁচিবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা।"

যা হক, কবিমনস্বীদের এসব উক্তির প্রভাবে বাল্যকালেই বাংলা ভাষার প্রতি যে অনুরাগ অন্তরে সঞ্চারিত হয়েছিল তার প্রেরণা আমার জীবনে কখনও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়নি। এই প্রেরণার বশে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বাংলা ভাষার চর্চায় আগ্রহী হই এবং কর্মজীবনে কলেজে ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার ব্রত গ্রহণ করি। আজও কার্যতঃ তার বিরতি ঘটেনি। অথচ কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো শাস্ত্রসম্মত শিক্ষালাভের সৌভাগ্য আমার হয়নি। এইজন্যই বাংলা বানান-সমস্যা সম্বন্ধে মতপ্রকাশে আমি এমন কুণ্ঠা বোধ করি।

তবে এ বিষয়ে আমার যে সামান্য কিছু পরোক্ষ অধিকার জন্মেছে তাও বলা প্রয়োজন। ইস্কুলে আমার বাংলা শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয় বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস' বইটির দ্বারা। এ বই পড়েছিলাম একজন খুব ভালো সংস্কৃত-জানা পণ্ডিতের

কাছে। এই বহু পড়ানো উপলক্ষে তাঁর বাংলা ভাষার তৎসম অংশের ব্যাকরণ, বিশেষতঃ সন্ধি, সমাস ও কৃৎ-তদ্ধিত প্রত্যয় প্রভৃতি শব্দের গঠন ও ব্যুৎপত্তি-প্রণালী এমনভাবেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন যে, বাংলা ভাষাকে ঠিকমতো আয়ত্ত করে নেবার পক্ষে আর কোনো অন্তরায়ই রইল না। এমন কি, তার ফলে ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা শেখাও আমার পক্ষে অনায়াসসাধ্য হয়েছিল।

এ বিষয়ে আমার পরোক্ষ অধিকারের দ্বিতীয় উৎস হল ছন্দ-আলোচনা। বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে প্রবাসী পত্রিকায়। তখন থেকে প্রায় প'য়তাল্লিশ বৎসর ধরে এই ছন্দ-আলোচনার ধারা অব্যাহত আছে। প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের অন্ততঃ আট-দশ বৎসর আগেই এই চর্চায় সূত্রপাত হয়। অন্যূন অর্ধশতাব্দীর এই অভিজ্ঞতার ফলে বাংলা ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতি সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞানলাভ হয়েছে সেটুকু মাত্র সম্বল নিয়ে বাংলা বানান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে সাহসী হয়েছি। কেননা ছন্দ একটি ধ্বনিশিল্প। প্রত্যেক ভাষার বিশিষ্ট ধ্বনিপ্রকৃতির

উপরেই নির্ভর করে সে ভাষার ছন্দপ্রকৃতি। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত 'ছন্দের প্রকৃতি' সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

"প্রত্যেক ভাষার একটি স্বকীয় ধ্বনি-উদ্ভাবনা আছে।...ছন্দের তত্ত্ববিচারে ভাষার অন্তর্নিহিত ধ্বনিপ্রকৃতির বিচার অত্যাবশ্যক।"

ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতিজাত ছন্দোবোধ শুধু পদ্যরচনা নয়, গদ্যরচনার ক্ষেত্রেও কাজে লাগে। কেননা গদ্যভাষাতেও একটা অনতিস্ফুট ছন্দ প্রচ্ছন্ন থাকে। শব্দের ধ্বনিবিন্যাস তথা বর্ণবিন্যাসের মধ্যেও এই ছন্দের ক্রিয়া অনুভব করা যায়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমারও বাংলা বানান-সমস্যার আলোচনায় পরোক্ষে এই ছন্দপ্রভাবের প্রসংগ উত্থাপন করেছেন। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণে তার দ্বৈমাত্রিক প্রবণতার প্রসংগে তিনি বলেন—

"তিন মাত্রা বা তিন অক্ষরের শব্দ এখনও বাংগালায় প্রচুর আছে; কিন্তু তার প্রবণতা হইতেছে দুই মাত্রার দিকে।... চারি মাত্রা বা চারি অক্ষরের শব্দ বা পদকে আধুনিক চলিত বাংগালায় আমরা বিভাগ করিয়া বা ভাঙ্গিয়া লইয়া দুইটি করিয়া দুই মাত্রার শব্দাংশে বদলাইয়া লই।"

তাঁর এই উক্তির যাথার্থ্য অস্বীকার করার উপায় নেই। বাংলা ভাষার এই উচ্চারণ বিশিষ্টতার উপরেই বাংলা ছন্দ প্রতিষ্ঠিত। এইজনাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বোক্ত 'ছন্দের প্রকৃতি' প্রবন্ধে এক স্থানে বলেছেন—

"ধ্বনির দুই মাত্রা এবং তিন মাত্রা বাংলা ছন্দের আদিম এবং রূঢ়িক উপাদান।"

বানান-সংস্কারের কোনো প্রচেষ্টা যদি বাংলা উচ্চারণের এই মৌলিক নীতিকে মেনে চলে তাহলে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা থাকে না। বলা উচিত যে, বাংলা উচ্চারণবিশিষ্টতার আরও কিছু কিছু নিয়ম আছে। সেগুলিও মেনে চলা চাই। নতুবা বিভ্রান্তি ঘটার আশংকা দেখা দেবেই। যথেচ্ছ বানান-সংস্কারের অধিকার কারও নেই। সে রকম চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হতে বাধ্য, কেউ ত মেনে নেবে না। ইংরেজি ভাষার প্রয়োগপ্রণালী বিষয়ক একটি বইতে পড়েছিলাম—

"You have a right to coin new words, but you must get them coined in the public mint. If you do so in your private mint, you are liable to be punished for making counterfeit coins."

নূতন শব্দনির্মাণের যে বিধি নূতন বানানেরও সেই বিধি। সে ক্ষেত্রেও ভাষার প্রকৃতিসম্মত বিধান মেনে চলা চাই।

প্রশ্নটা হচ্ছে অ-সংস্কৃত (শুধু ইংরেজি নয়) শব্দে যুক্তাক্ষর বর্জন করা তথা হস্‌চিহ্ন উহ্য রাখা যায় কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে।

এই প্রশ্নের আলোচনায় অগ্রসর হবার পূর্বে সংস্কৃত শব্দের বানান সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য সংস্কৃত শব্দের বানান-সংস্কারের অধিকার কারও নেই। এসব শব্দ শুধু বাঙালির সম্পত্তি নয়, সর্বভারতের সম্পত্তি। সংস্কৃত বানানে পরিবর্তন ঘটালে বহু শতাব্দীর ঐতিহ্যের সূত্রও ছিন্ন হয়ে যাবে। সে কখনও কল্যাণকর হতে পারে না। কিন্তু বাংলায় এক্ষেত্রেও কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সেগুলি সর্বতোভাবে মেনে নেওয়া উচিত বলে মনে করি না। যেমন বণিক্, সম্রাট্, বিপদ্ প্রভৃতি শব্দে আমি হস্‌চিহ্ন রাখারই পক্ষপাতী। নতুবা এসব শব্দের স্বরূপ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। বর্ধমান এবং বুদ্ধিমান্ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত পার্থক্যবোধ লুপ্ত হয়ে যায়। এই দুই শব্দের স্ত্রীলিংগের রূপেই তাদের মূল পার্থক্য ধরা পড়ে। শিক্ষক হিসাবে বহু ছাত্রের মধ্যেই এই পার্থক্যবোধের অভাব দেখেছি। ক্রমশঃ সাধারণতঃ প্রভৃতি শব্দে বিসর্গ রাখি লেখায়, উচ্চারণে রাখি না। বিসর্গ বাদ দিলে ক্রমশ এবং লোমশ শব্দের পার্থক্য ঘুচে যাবে অর্থবোধে তথা উচ্চারণে। এই কারণেই বস্তুতঃ না লিখে 'বস্তুত' লিখতে আমি 'প্রস্তুত' নই। কিন্তু মন, যশ, ছন্দ, জ্যোতি, চক্ষু প্রভৃতি শব্দে বিসর্গ রাখি না বিশেষ কারণে। অথচ সমাস ও সন্ধির প্রয়োজনে ওসব শব্দের বিসর্গকে সাধারণতঃ স্বীকার করে থাকি। কিন্তু ছন্দশ্চিন্তা চক্ষুশ্চিকিৎসক লেখা সমীচীন মনে করি না। এসব ব্যতিক্রমের কারণ কি, এ স্থলে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সংস্কৃত শব্দের যুক্তাক্ষরও আমি অনেক সময় ভেঙে থাকি। যেমন, উদ্যম শব্দে য-ফলা রাখি, কিন্তু উদ্‌যোগ শব্দে রাখি না। বিদ্বান্ শব্দে যুক্তাক্ষর রাখি, উদ্‌বেগ শব্দে রাখি না। নতুবা বাংলা উচ্চারণে বিভ্রান্তি ঘটে। প্রাক্তন স্থলে প্রাক্‌তন এবং ঋগ্বেদ স্থলে ঋগ্‌বেদ লেখা ভালো মনে করি। তাতে অর্থবোধে সহায়তা হয়। এরকম আরও অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে সংস্কৃত নীতি লংঘন না করেও যুক্তাক্ষর ভাঙা যায়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে হস্‌চিহ্ন কখনও বর্জন করা যায় না। সঙ্ক্ষেপ, সঙ্গ্রহ, সঙ্গীত না লিখে সংক্ষেপ, সংগ্রহ, সংগীত লেখাই ভালো মনে করি। তাতে অর্থবোধের তথা লেখার সহায়তা হয়, অথচ সংস্কৃত নীতি অব্যাহত থাকে। কিন্তু বংগ, সংগ, বংকিম প্রভৃতি শব্দে অনুস্বার চলে না। কেননা তা সংস্কৃত নীতিবিরুদ্ধ।

ওই একই কারণে রেফাক্রান্ত বর্ণের দ্বিত্ব বর্জনও সংগত মনে করি। সুনীতিকুমার কার্য, সূর্য প্রভৃতি শব্দের য-ফলা রাখতে চান বাংলা উচ্চারণের খাতিরে। কিন্তু আমার মনে হয় তা নিষ্প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে য-ফলা না দিলেও আমাদের উচ্চারণ ঠিকই থাকবে। আধুনিক ভাষার বানান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উচ্চারণ অনুযায়ী হওয়া অত্যাবশ্যক নয়। বস্তুতঃ বাঙালির উচ্চারণে

ধর্ম পূর্ব গর্জন প্রভৃতি শব্দে ম ব ও জ-এর দ্বিত্ব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ আমরা ধর্‌-ম উচ্চারণ করি না, করি ধর্‌ম-ম। করব (কর্‌ব) এবং সর্ব শব্দের উচ্চারণের প্রতি একটু মন দিলেই এ দুএর পার্থক্য ধরা পড়বে। প্রথমটির উচ্চারণে দ্বিত্ব নেই, দ্বিতীয়টিতে আছে। বস্তুতঃ কোনো কোনো অঞ্চলের উচ্চারণে রেফাক্রান্ত বর্ণ দ্বিগুণিত হত বলেই পাণিনি ওসব স্থলে বিকল্পে দ্বিত্ব বিধান করেছিলেন।

রেফের প্রসঙ্গে আমার আর-একটি নিবেদন আছে। রেফ বসে আক্রান্ত বর্ণের মাথার উপরে। তাতে আপত্তির কারণ নেই। কারণ তাতে আক্রান্ত বর্ণের পূর্বেই রেফের উচ্চারণ সূচিত হয়। কিন্তু লাইনোতে আক্রান্ত বর্ণের মাথায় রেফ বসে না, বসে তার পরে। তাতে উচ্চারণ-গতির বিরুদ্ধতা ঘটে। রেফকে যদি আক্রান্ত বর্ণের পূর্বে বসাবার রীতি প্রচলিত হয় তাহলে তা উচ্চারণসম্মত হয়। যেমন গ রেফ ব র্গব, ত রেফ ক র্তক। অভিজ্ঞদের বিবেচনার জন্য এই সামান্য প্রস্তাবটুকু নিবেদন করলাম।

এবার অসংস্কৃত শব্দের বানান প্রসঙ্গে বলা উচিত যে, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের বানান-কমিটির সদস্য হিসাবে এবিষয়ে পরলোকগত রাজশেখর বসু মহাশয়ের সঙ্গে একাধিক বার আমার আলোচনা হয়েছে। তা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে কয়েকবার আলোচনা করেছি। তাতেই জানি তিনি বানান-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু রাতারাতি আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। অর্থাৎ এ বিষয়ে তিনি সুনীতিকুমারের মতোই evolutionary বা ক্রমিক সংস্কারের অনুমোদন করতেন, revolutionary বা আকস্মিক সংস্কার সমর্থন করতেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার কমিটি বাংলা বানানের যে নিয়মাবলী রচনা করেছিলেন, তিনি নিজে মোটের উপরে তাই অনুসরণ করতেন। এই নিয়মাবলী বহু বিভিন্ন মতের মধ্যে রফানিষ্পত্তির ফল।

তিনি নিজে আরও একটু অগ্রসর হবার পক্ষপাতী ছিলেন। যেসব বিষয়ে তিনি আরও একটু অগ্রবর্তী ছিলেন তার মধ্যে ছিল গা-সহা ভাবে অসংস্কৃত শব্দের যুক্তাক্ষর বর্জন। এই পথে তিনি কতখানি অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর 'চলন্তিকা' অভিধানে তথা তাঁর রচনাসমূহে। এ ক্ষেত্রে আমি অনেকাংশেই তাঁর অনুবর্তী। আমার লেখায় প্রায় সর্বতোভাবেই 'চলন্তিকা'র আদর্শ অনুসরণ করে থাকি। এই অভিধানে যেসব স্থলে বিকল্প ব্যবস্থা আছে, সেসব স্থলে যে বানানকে আমি সহজতর বা অগ্রগামী মনে করি, আমি তাই অনুসরণ করে থাকি। তা ছাড়া যেসব স্থলে অনতিলক্ষিত ভাবে যুক্তাক্ষর বাদ দেওয়া যায় সেসব স্থলে যুক্তাক্ষর বর্জন করে থাকি। যেমন—বাঙ্গালা, বাঙগলা, বাঙলা ও বাংলা, এই চার চার বিকল্পের মধ্যে শেষেরটাই আমি মেনে থাকি। আবার তর্জমা, ভর্তি বা উল্কি না লিখে তরজমা, ভরতি, উলকি লেখাই সংগত ('সঙ্গত' নয়) মনে করি।

রবীন্দ্রনাথও বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-পদ্ধতি মেনে নিয়েছিলেন। তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি একটু স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন—ইংরেজী, বাঙালী না লিখে ইংরেজি, বাঙালি লেখাই ভালো মনে করতেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে এই রবীন্দ্রস্বীকৃত পদ্ধতিই অনুসৃত হয়। রাজশেখর-স্বীকৃত পদ্ধতি ও এই পদ্ধতিতে পার্থক্য অতি সামান্যই। আমি কোনো কোনো বিষয়ে রবীন্দ্রনাথেরই অনুবর্তী। রাজশেখর দীর্ঘ ঈ-কার বেশি পছন্দ করতেন, কারণ তা বর্ণের ডান দিকে স্থাপিত হয়, তাতে লেখার এবং ছাপারও সুবিধা হয়। রবীন্দ্রনাথের টান ছিল হ্রস্ব ই-কারের প্রতি, কারণ তা উচ্চারণসম্মত। এসব ক্ষেত্রে আমিও হ্রস্বত্বেরই পক্ষপাতী।

এবার বানান-সংস্কার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য একে একে নিবেদন করছি।

এক ॥ লেখকের বক্তব্য পাঠকের জ্ঞান-গোচর করাই হল লেখার উদ্দেশ্য। ভাষাতে বা বানানে যদি এমন কিছু করা যায় যাতে তার ব্যাঘাত ঘটে তাহলে লেখার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। সুতরাং বানান-সংস্কার এমন হওয়া চাই যাতে পাঠকের উচ্চারণ-সৌকর্যে বা অর্থ গ্রহণে বাধা না ঘটে। বলাবাহুল্য ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণপ্রবণতার নীতি রক্ষা করে চললে পাঠকের উচ্চারণে তথা অর্থবোধে বাধা ঘটবার আশঙ্কা থাকে না। যেখানে ওরকম আশঙ্কা বা সংশয় থাকে সেখানে সংস্কারের আগ্রহ দমন করাই উচিত। সংস্কৃত শব্দের বানানের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। এজন্যই লেখা হয় উদ্যান, উদ্‌যান নয়; পক্ষান্তরে উদ্‌যাপনই লেখা হয়, উদ্যাপন নয়। ওই একই কারণে লেখা উচিত বিদ্বান্‌, বিদ্‌বান্‌ নয়; পক্ষান্তরে উদ্‌বিগ্নই লেখা উচিত, উদ্বিগ্ন নয়। খাঁটি বাংলার ক্ষেত্রেও আমি অর্থভেদে 'কোন্‌' বা 'কোনো' লিখি, 'কোন' লিখি না। 'কোন' লিখলে অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারণে ও অর্থে সংশয় দেখা দেয়। 'করিয়া' অর্থে সাধারণতঃ লিখি 'করে', কিন্তু সংশয়স্থলে লিখতে হয় 'ক'রে'।

দুই ॥ কেউ কেউ সজ্ঞানে বানান-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করেন না। অর্থাৎ তাঁদের মতে যেমন চলছে তেমনি চলুক, ভাষা কালক্রমে আপন বেগে যে পরিবর্তন ঘটাবে, শুধু সেটুকু মেনে চলাই যথেষ্ট। এই সচেতন বিচারবিশ্লেষণের যুগে এই মত সমর্থন করা যায় না। বাংলা বানান তার উৎপত্তির সময় থেকেই কালে কালে এবং মুখে মুখে বিবর্তিত হয়ে এসেছে। কিন্তু উনবিংশ শতক থেকেই এই অচেতন বিবর্তন সজ্ঞান সংস্কারের রূপে ধারণ করতে থাকে। কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচনার মধ্যেই তার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া

যায়। এখানে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

বাঙালী তোমার কেনা
একথা জানে কে না।......
যেন রাঙা অমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙে না।

বাঙালী, রঙা ও ভাঙে শব্দের ঙ বানান লক্ষিতব্য। পরবর্তী কালে বঙ্কিমচন্দ্রও ঙ-র স্থলে ঙ্গ ব্যবহার করেছেন। আধুনিক কালেও অনেকের রচনায় ঙ্গ-র আধিপত্যই দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঙ-কে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাকে আর স্বস্থানচ্যুত করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ যে আরও নানা ক্ষেত্রেই বানান-সংস্কার চালিয়েছেন তা সকলেই জানেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-কমিটিও তার অনেকগুলিই মেনে নিয়েছেন। এখন আর পাণ, কাণ, চূণ, সোণা বড় দেখা যায় না। মূর্ধন্য ণ এখন দন্ত্য হয়েছে। বাড়ি, পাখি, হাতি প্রভৃতি এখন দীর্ঘত্ব বর্জন করে হ্রস্ব হয়েছে। এমন কি, ইংরাজীও ইংরেজি হয়েছে সজ্ঞান প্রয়াসের ফলে। সংস্কার যা হবার হয়ে গিয়েছে আর দরকার নেই, আশা করি এমন কথা কেউ বলবেন না।

তিন ॥ আধুনিককালে কোনো চলতি ভাষার বানানই সর্বতোভাবে উচ্চারণ অনুযায়ী হয় না। হওয়া সম্ভব নয়, সে চেষ্টাও অনাবশ্যক। এ ক্ষেত্রে ইংরেজির দৃষ্টান্ত এত সুবিদিত যে, তার উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন। বাংলাতেও আমরা লিখি 'চলি'; কিন্তু পড়ি 'চোলি', লিখি 'হল' পড়ি 'হোলো'। অথচ 'হবে' ঠিক আছে। সুতরাং ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশী শব্দের বানানও অবিকল উচ্চারণসম্মত হবার দরকার নেই, তা বলাই বাহুল্য। ইংরেজি শব্দ সাহেবদের মুখ থেকে যেভাবে নিঃসৃত হয় বা ইংরেজি লিপিতে যেভাবে প্রকাশ পায়, বাংলায় তা পুরোপুরি রক্ষা করা সম্ভবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। বাঙালির মুখে ও বাংলা লিপিতে তা কিছু পরিমাণে বাঙালিত্ব লাভ করবেই। বঙ্গ তারে গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করে বাংলাভাষার মিলনক্ষেত্রে আপন বলেই গ্রহণ করবে, জাতে ঠেলে রাখবে না। কতো আরবি, ফারসি, পোর্তুগীজ প্রভৃতি বিজাতীয় ভাষা বেমালুম বাংলা হয়ে গিয়েছে। ইংরেজি শব্দও কালক্রমে তাই হবে। অর্থাৎ ওসব বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষার সঙ্গে এক দেহে হবে লীন।

চার ॥ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অ-সংস্কৃত শব্দে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয়। করতে গেলে অনেক বিভ্রাট ঘটবে। তাহলে 'করেন' ও 'বার্নিস' শব্দে মূর্ধন্য ণ এবং 'পিসি', ও 'হিসাব' শব্দে মূর্ধন্য ষ দিতে হবে। এক সময়ে 'রিপন' বা 'কর্নওয়ালিস' লিখতে মূর্ধন্য ণ দেওয়া হত। ২৪ পরগনা শব্দে এখনও প্রায়শঃ মূর্ধন্য ণ দেখা যায়। আমাদের পণ্ডিত মহাশয় 'হ্যারিষণ রোড' লিখতেন সংস্কৃত বিধান অনুসারে। আজকাল এসব ক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রভুত্ব, প্রায় লোপ পেয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। কর্নওয়ালিস কার্নিস প্রভৃতি শব্দের জন্য র্ন এবং স্টেশন স্ট্যাম্প প্রভৃতি শব্দের জন্য স্ট টাইপ বানাতে হয়েছে। কিন্তু ঘুণ্টি, লণ্ঠন, লণ্ডন প্রভৃতি শব্দে এখনও ণ রয়েছে। কারণ ট-বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে দন্ত্য ন-এর যুক্তাক্ষর-সূচক টাইপ নেই। উচ্চারণের দোহাই দিয়ে লাভ নেই। কারণ আগেই বলেছি আধুনিক বানান উচ্চারণ-অনুযায়ী হতেই হবে, একথা বলা চলে না। তাহলে 'আসে-যায়'-কে লিখতে হবে 'আসে-জায়' রূপে। 'টনটনানি' ব্যথা, 'টুনটুনি' পাখি কিংবা 'ঠুনঠুন' আওয়াজের ক্ষেত্রে যদি মূর্ধন্য ণ তথা যুক্তাক্ষর বর্জন করলে দোষ না হয়, তবে ঘুনটি, লনঠন বা লনডন লেখাতে খুব আপত্তির কারণ থাকে না। তবে প্রথার প্রভাব, দীর্ঘকালের অভ্যাস ও চোখের সংস্কারকে আমি অস্বীকার করি না। এগুলি কাটিয়ে ওঠা সকলের পক্ষে সম্ভব বা সহজ নয়। তবে যাদের ওরকম অভ্যাস ও সংস্কার এখনও গড়ে ওঠেনি তাদের পক্ষে এতখানি মানসিক বাধা হয়তো থাকবে না। উচ্চারণের মূর্ধন্যত্ব বজায় রাখতে হলে লিখতে হবে টণ্টন, ঠুণ্ঠুন ইত্যাদি। সেখানেও চোখের সংস্কারের বাধা। চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

পাঁচ ॥ এবার বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রবণতার কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমেই বলেছি দুই মাত্রা ও তিন মাত্রা বাংলা উচ্চারণের (সুতরাং ছন্দেরও) মৌলিক উপাদান। অর্থাৎ আমাদের মুখে দু-এর কম ও তিনের বেশি মাত্রা এক ঝোঁকে উচ্চারিত হয় না। এক মাত্রার শব্দ

পূর্ববর্তী বা পরবর্তী শব্দের সংগে যুক্ত হয়ে দুই বা তিন মাত্রার ধ্বনিগুচ্ছ তৈরি করে। যেমন—'তুমি-কি' যাবে: তুমি যদি 'না-যাও' তবে আমিও 'যাব-না': তুমি যাবে 'কি-না' বল ইত্যাদি। এরকম শব্দ যদি স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয় তবে তা দীর্ঘ হয়ে দুই মাত্রার স্থান দখল করে। যেমন—না—, সে-অর যাবে-না; মা-, খেতে দাও। কোনো শব্দে যদি তিনের বেশি মাত্রা থাকে তবে সেসব শব্দ দুই বা তিন মাত্রার একাধিক গুচ্ছে বিভক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়। যথা—ভার-তীয়, প্রচ-লিত, বিক-শিত, উপ-নিবেশ, অপরা-জেয়, অসহ-যোগিতা, অনু-কর-ণীয়। শব্দের এসব বিভাগকে আমি বলি 'শব্দপর্ব'।

বাংলা উচ্চারণের দ্বিতীয় নিয়ম এই যে দুই বর্ণ বা তিন বর্ণের শব্দে শেষের বর্ণটি যদি অকারান্ত হয় তবে সে অকার অনুচ্চারিত থাকে অর্থাৎ শব্দটি স্বরান্ত না হয়ে হসন্ত হয়। যেমন—জল, দিন, বিশেষ, নূপুর। এই নিয়ম বিদেশী শব্দেও প্রযোজ্য, অর্থাৎ বিদেশী ব্যঞ্জনান্ত শব্দকে অকারান্তরূপে লিখলেও তার ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণই হয়, সুতরাং হস্‌চিহ্ন দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। যেমন—খুব, খরিদ, বিলেত, তফাত, স্কুল, টিকিট, কলেজ, অফিস।

এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম আছে। বড়, ছোট ভাল, কাল (বর্ণ) প্রভৃতি কয়েকটি দ্বিবর্ণ বিশেষণ শব্দের হসন্ত উচ্চারণ হয় না।

দ্বিবর্ণ বা ত্রিবর্ণ উভয়বিধ শব্দের ক্ষেত্রেই শেষ বর্ণ যদি যুক্তবর্ণ বর্ণ হয় তাহলে তার হসন্ত উচ্চারণ হয় না। যথা—তর্ক, বংগ, কুঞ্জ, সমুদ্র, তরঙ্গ, অনন্ত। কতকগুলি নবাগত ইংরেজি শব্দে এই বিধানের ব্যতিক্রম দেখা যায়। একটু পরেই সে কথা বলা যাবে।

অকারান্ত দ্বিবর্ণ শব্দ যদি সংস্কৃত পদ্ধতিতে সমাসবদ্ধ হয় তাহলেও উক্ত অকার অনুচ্চারিত হয় না। যেমন—জলযান, দিনমণি। কিন্তু দ্বিবর্ণ শব্দের অন্ত্য অকার-লোপের প্রবণতা এত বেশি যে বহুপ্রচলিত সমাসবদ্ধ শব্দেও উক্ত অকার লুপ্ত হয়ে থাকে। যেমন—মেঘদূত, মেঘনাদ, পাঠশালা, জলতরঙ্গ, শিবমন্দির। তা ছাড়া আরও অনেক শব্দ আছে যাতে উক্ত অকার বিকল্পে লুপ্ত হয়। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে কারও কারও উচ্চারণ অকারান্ত কারও কারও অকারহীন। যেমন—গীত-গোবিন্দ, লোকশিক্ষা, বিষবৃক্ষ। অথচ গীতবিতান, দেশপ্রিয়, লোকনিন্দা, দেশবন্ধু, বিষক্রিয়া শব্দের অকার লুপ্ত হতে শুনিনি কারও মুখে। আমি এসব স্থলে অকার উচ্চারণ করতেই অভ্যস্ত। স্বয়ং শরৎচন্দ্রের মুখে শুনেছি বিষ্‌বৃক্ষ। রবীন্দ্রনাথকে অকারান্ত 'গীতগোবিন্দ' বলতেই শুনেছি বারবার। কিন্তু তাঁর রচনায় অন্ততঃ একবার অন্যরূপ উচ্চারণও স্বীকৃতি পেয়েছে। যেমন—

শাস্ত্র যদি নেহাত পড়তে হবে
গীতগোবিন্দ খোলা হক না তবে।
—'ক্ষণিকা', যুগল

এখানে স্পষ্টতঃই 'গীত্‌গোবিন্দ' উচ্চারণ কবির অনুমোদন পেয়েছে।

সমাসবদ্ধ হলেও অকারান্ত ত্রিবর্ণ শব্দের অন্ত্য অকার সাধারণতঃ লুপ্ত হয়েই থাকে। যেমন—ভারতবর্ষ, চরণকমল, নিয়মনিষ্ঠ, বিজনবিহারী, সাগরসংগম, আকাশচুম্বি, কুমারসম্ভব। এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুবই বিরল।

ত্রিবর্ণ বাংলা শব্দের শেষ বর্ণে যদি অভিন্ন অন্য স্বর যুক্ত থাকে তবে মধ্যবর্তী স্বরবর্ণের প্রবণতা, বিশেষতঃ অকারের, লুপ্ত হবার দিকেই। যেমন—পাগল—পাগলা, জানালা—জানলা, নাতিনী—নাতনী, বামুন—বামনী, গামোছা—গামছা। সংস্কৃত শব্দের ক্ষেত্রে এ নিয়ম চলে না। যেমন—চপলা, অশনি, যামিনী। কোনো কোনো বহুপ্রচলিত চতুর্বর্ণ শব্দের দ্বিতীয় স্বরটি এই নিয়মের প্রভাবে লুপ্ত হয়ে থাকে। যথা—চাকরানী, মেথরানী, ঠাকরুন, ভাগনে।

দ্বিবর্ণ ও ত্রিবর্ণ শব্দের অন্ত্য অকার ও ত্রিবর্ণ শব্দের মধ্যবর্তী অকারের উচ্চারণ-প্রবণতা সম্বন্ধে যা বলা হল, দীর্ঘ শব্দের দ্বিবর্ণ ও ত্রিবর্ণ 'পর্ব' সম্বন্ধেও তা অনেকাংশে প্রযোজ্য। যেমন—মস-জিদ, মুসল-মান, পিচ-কারি, আল-কাতরা, ফস-ফরস।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এগুলি শুধু খাঁটি বাংলা উচ্চারণেরই প্রবণতা, সংস্কৃতের নয়। তাই যেসব বহিরাগত শব্দ বাংলা ভাষায় এসে এক দেহে হল লীন, সেগুলি সম্বন্ধেও এই নিয়মগুলি অনায়াসেই খাটে। অর্থাৎ দ্বিবর্ণ ও ত্রিবর্ণ শব্দের বা শব্দপর্বের শেষ বর্ণ এবং ত্রিবর্ণ শব্দ বা শব্দপর্বের মধ্য বর্ণ অকারান্ত রূপে লিখিত হলেও সে অকার অনুচ্চারিতই থাকে। তাই মাদরাজ, কামরাজ, লনডন, মসকো, পাটনা প্রভৃতি শব্দের দ্বিতীয় বর্ণে হস্‌চিহ্ন না দিলেও বাঙালির মুখে স্বভাবতঃই ওই বর্ণের অকার লুপ্ত হয়। ফলে উচ্চারণভ্রান্তি না ঘটাই স্বাভাবিক। সংশয়স্থলে হস্‌চিহ্ন বা যুক্তাক্ষর প্রয়োগ করাই বিধেয়।

শব্দের দ্বিতীয় বর্ণের অকার বা অন্য স্বরের লোপ-প্রবণতা এতই প্রবল যে, যে-সব স্থলে অকার স্বভাবতঃ উচ্চার্য, অনেক ক্ষেত্রে তাও লুপ্ত হয়। যেমন—বড়দা, ছোড়দা, মেজদি। অকার ভিন্ন অন্য স্বরও এভাবে লুপ্ত হবার দৃষ্টান্ত আছে। যেমন—খুড়তুত, জেঠতুত, মাসতুত, পিসশ্বশুর, ভাগনে ঠাকরুন। যেসব সংস্কৃত শব্দ বহু ব্যবহারে চিরগত আভিজাত্য হারিয়ে সর্বজনীন অর্থাৎ খাঁটি বাংলার পর্যায়ভুক্ত হয়েছে, সেগুলিও অনেক ক্ষেত্রে এই নিয়ম মেনে চলে। যেমন—সাব্‌ধান (কিন্তু অবধান), অপ্‌রা-জিতা (কিন্তু অপরাজিত, অপরাজেয়), হর্‌তুকি (হরীতকী)। দেবতার দৈব মহিমা হ্রাস পেলেই হন দেব্‌তা। পূর্বোক্ত পাঠশালা, মেঘদূত, দেবদাসী প্রভৃতিও সংস্কৃত শব্দের বাংলা উচ্চারণেরই নিদর্শন। গীতগোবিন্দ, বাণভট্ট, বিষবৃক্ষ প্রভৃতি শব্দ এখন দু ভাবেই উচ্চারিত হয়। কালক্রমে হয়তো বাংলা উচ্চারণেরই একাধিপত্য হবে।

মোট কথা এই যে, বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রবণতাকে লঙ্ঘন না করে যদি অসংস্কৃত শব্দের যুক্তাক্ষর ভাঙা হয় এবং যথাস্থানে হস্‌চিহ্ন বর্জিত হয়, তা হলে বাংলা সাহিত্যে অরাজকতা দেখা দেবে বলে

মনে করি না। আফগান শব্দের উচ্চারণে যদি কারও কোনো সংশয় না ঘটে, তবে আফরিকা লিখলেও ঘটবে না। মোসকা যদি চলতে পারে তবে মসকো চলতেও বাধা হবে না।

বস্তুতঃ এই যুক্তাক্ষরবর্জন ব্যাপারটা নূতন কিছু নয়। বহু বাংলা শব্দই যুক্তাক্ষর-হীনরূপে চলছে। তার মধ্যে কতকগুলি অপেক্ষাকৃত পুরাতন, কতকগুলি কিছু নূতন। এই যুক্তাক্ষরহীনতার কারণ দ্বিবিধ। এক, কতকগুলি যুক্তাক্ষর কখনও উদ্ভাবিত হয় নি বলেই বিযুক্তভাবে লিখিত হয়। যেমন—টাটকা, পাতলা, আলতা, কালচার, লেকচার, মুশকিল, পিচকারি, ফিনকি, মসজিদ, আলনা, জানলা, গামছা। এ রকম বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যুক্তাক্ষর-হীনতার দ্বিতীয় কারণ অনভ্যাস। যেমন—আলপিন, আলমারি, আলকাতরা, চশমা (তুলনীয় কাশ্মীর), গামলা, হাসপাতাল। এসব শব্দে যুক্তাক্ষর না দেবার রীতি এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে, এখন ওসব শব্দে যুক্তাক্ষর কল্পনা করতেই কুণ্ঠা জাগে। 'আল্কাত্রা' বানান কি সকলেরই চক্ষুপীড়া ঘটাবে না? অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে এই রীতিটির অনেকখানি সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে। যেমন—উলটা, পালকি, ভরতি, হালকা, চ্যাপটা, পাদরি। কিছুদিন আগেও এসব শব্দে যুক্তাক্ষরই ব্যবহৃত হত। এখনও যে একেবারে হয় না তা নয়. অনেকের লেখাতেই এসব শব্দে যুক্তাক্ষর-প্রয়োগ এখনও অচল হয়ে অচলগড়ে করে বাস।

যা হক, এরকম যুক্তাক্ষরবর্জনের বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে রাজশেখরের চলন্তিকা অভিধানে এবং বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্রসাহিত্যে। আমি নিজেও বহুদিন যাবৎ এই আদর্শ অনুসরণ করছি। শুধু তাই নয়, সুযোগমতো এই নীতির সম্প্রসারণও করেছি। যেমন—নভেম্‌বর, ডিসেম্‌বর। (পাঠকদের অভ্যাস পাকা হয় নি বলে কোনো কোনো স্থলে হস্‌চিহ্ন দিয়ে থাকি।) কিন্তু কখনও কারও কাছ থেকে আপত্তির গুঞ্জন শুনিনি। আনন্দবাজার পত্রিকা এই নীতিরই আরও সম্প্রসারণে প্রয়াসী হয়েছে। তাতে আমি আপত্তির কারণ দেখি না, বরং আনন্দের কারণ আছে বলেই মনে করি। কেননা, আমি যেমন যুক্তাক্ষর-মাত্রেই বিরোধী নই তেমনি অকারণে যুক্তাক্ষর প্রয়োগেরও পক্ষপাতী নই।—

আমি মনে মনে ভাবি চিন্তা তো নাই,
কলকাতা যাক নাকো সোজা বোমবাই।
দিল্লি লাহোরে যাক, যাক না আগরা,
মাথায় পাগড়ি দেব, পায়েতে নাগরা।

এ রকম লেখাতে আমি কোনো দোষ দেখি না। তাতে পাঠকের উচ্চারণে বিভ্রান্তি ঘটবার আশঙ্কা আছে বলে মনে করি না।

তবে দুটি বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন মনে করি। প্রথমতঃ, পাঠকের চোখের সংস্কার ও অভ্যাসকে সহসা বেশী মাত্রায় আসতে না দেওয়াই ভালো মনে করি। তাতে পাঠকের মনে যে বিরুদ্ধতা জাগে তাতে পরিবর্তনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়তঃ, বাংলা উচ্চারণের যে স্বাভাবিক প্রবণতা তার বিরুদ্ধতা করা কখনও চলবে না। চলতে চেষ্টা করলে ব্যর্থতা অনিবার্য। ভাষার নিয়মও প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই অমোঘ। বাংলা উচ্চারণের স্বাভাবিক প্রবণতার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে। সে প্রবণতার মর্যাদা রক্ষা করে চললে এবং যথোচিত সংযম ও পরিমিতি রক্ষিত হলে বানান-সংস্কারের প্রয়াস ব্যর্থ হবার কারণ নেই বলেই মনে করি। অকসিজেন, ফসফরস, বোমবাই, দিল্লি (তুলনায় পাটনা) প্রভৃতি

বানান কালক্রমে পাঠকের অভ্যস্ত অর্থাৎ চোখ-সহা হয়ে যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ, এরকম বানান বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ-প্রবণতার বিরুদ্ধ নয়।

কিন্তু আনন্দবাজারের বানানের একটি বিষয়ে আমি সম্মতি দিতে পারি না। পূর্বেই বলেছি যুক্তবর্ণের হসন্ত উচ্চারণ বাংলার উচ্চারণরীতির বিরুদ্ধ। কাজেই আর্ট্, মার্চ্-এর বদলে আরট, মারচ লেখা সমীচীন নয়। পোসট কারড লিখলে বাংলার উচ্চারণ হবে পোসট্ কারড্, পোস্ট্ কার্ড্ হবে না। কোনো কোনো স্থলে বিভ্রান্তিও হবে। যেমন—রিজেনট পারক-এর বেলায় যদি ন্ট্ ও র্ক্ উচ্চারণ হয় তবে কনট প্লেস-এর বেলাতেও কন্ট্ পড়বার আশঙ্কা হবে। বস্তুতঃ, ত্রিবর্ণ শব্দের শেষ দুই বর্ণ অকারান্ত হলে শেষ বর্ণের অকারই লোপ পায়, মধ্যবর্ণের নয়। যেমন—উলট-পালট। তৃতীয় বর্ণে অ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে মধ্য-বর্ণের অ লুপ্ত হয়। যেমন—উলটো-পালটা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনু-মোদিত নিয়ম অনুসারে হস্‌চিহ্নহীন আর্ট, মার্চ, পার্ক, কার্ড চলতে পারে। কিন্তু তাতেও আমার মন সম্পূর্ণ সায় দেয় না। কারণ, এরকম বানান বাংলা উচ্চারণের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ইংরেজি-শিক্ষিত ব্যক্তিরা অবশ্য সহজেই এসব শব্দের হসন্ত উচ্চারণ করে থাকেন। কিন্তু নূতন শিক্ষার্থীদের পক্ষে তা প্রত্যাশিত নয়। তা ছাড়া নূতন অপরিচিত শব্দের বিষয়ে সংশয় থেকেই যাবে। শব্দান্তিক যুক্তাক্ষরের অ স্বরের উচ্চারণ করাই স্বাভাবিক বলে স্পঞ্জ (তুলনায় গঞ্জ, খঞ্জ), পাঞ্চ (তুলনায় পঞ্চ) প্রভৃতি শব্দের বিকৃত উচ্চারণই প্রত্যাশিত। এসব ক্ষেত্রে স্পন্‌জ্, পান্‌চ্ লেখাই আমি সংগত মনে করি। এরকম স্থলে যুক্তাক্ষর বর্জন করবার অন্য হেতুও আছে। ছন্দের আলোচনায় প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরেই আমাকে ইংরেজি 'সিলেব্‌ল্' শব্দটি ব্যবহার করতে হয়েছে। এ শব্দে যুক্তাক্ষর রাখলে সিলেব্ল বা সিলেব্‌ল্ লিখতে হয়। এর কোনোটাই আমার ভালো লাগে নি। তেমনি ফিল্ম বা ফিল্‌ম্ না লিখে ফিল্‌ম্ লেখাই ভালো। এই নীতি অনুসারে সিল্ক বা সিল্ক্ লেখার চেয়ে সিল্‌ক্ লেখাই সংগত। তা ছাড়া সব ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষর প্রয়োগ সম্ভবও নয়। যেমন—জেম্‌স্, ম্যাগনে-টিজ্‌ম্। এসব শব্দে হস্‌চিহ্ন দেওয়া অত্যাবশ্যক মনে করি।

শ্রীমান্ অমিতাভ তাঁর প্রবন্ধে আমার লেখা থেকে যে উদ্‌ধৃতি দিয়েছেন তাতে দেখলাম আমার অনুমোদিত বানানের মধ্যে 'পারক' (পার্ক্) শব্দটিও রয়েছে। আমার যে প্রবন্ধ থেকে ওই অংশটুকু উদ্‌ধৃত হয়েছে সেটি সাময়িক প্রয়োজনে দ্রুত লেখা। বোধ করি তাই অনবধানতাবশতঃ এই ত্রুটি ঘটেছে। তার জন্য পাঠকসমাজের কাছে মার্জনা প্রার্থনা করি। বর্তমান প্রবন্ধটিও হাসপাতালে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে লিখিত। সব কথা ঠিকমতো গুছিয়ে লেখা গেল না। বাংলা উচ্চারণের সূক্ষ্মতর অনেক কথাই বাদ দিয়েছি ইচ্ছে করেই। প্রয়োজন হলে পরে লেখা যাবে। বাংলা বানান সম্বন্ধে আমার বক্তব্য মোটামুটিভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছি। আশা করি তাতেই আমার মতামত পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না।

সর্বশেষে আবার বলি, বাংলা লিপি থেকে যুক্তাক্ষর বর্জন করা সম্ভব নয়, অন্ততঃ অদূর ভবিষ্যতে। তথাপি বাংলায় প্রচলিত অ-সংস্কৃত শব্দে যুক্তাক্ষরের সংখ্যা কমিয়ে আনবার চেষ্টাকে আমি অসাধু প্রয়াস বলে মনে করি না। যেমন—সংস্কৃত উল্কা শব্দে আমি যুক্তাক্ষর রেখে থাকি, কিন্তু বাংলা উর্লাক শব্দে রাখি না। তাতে বাংলা উচ্চারণ-রীতি লঙ্ঘিত হয় না বলেই আমার বিশ্বাস।

সংস্কৃত শব্দে আমি সাধারণতঃ যুক্তাক্ষর রক্ষা করেই চলি। কিন্তু তা বলে যুক্তাক্ষরের কোনো স্বতন্ত্র মহিমাও আমি স্বীকার করি না। আমি সংস্কৃত শব্দেও কোনো কোনো স্থলে যুক্তাক্ষর ভেঙে থাকি সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে হস্‌চিহ্ন অবশ্য-রক্ষণীয় বলে মনে করি। তা ছাড়া সংস্কৃত শব্দেও অনেক স্থলে স্বতন্ত্র যুক্তলিপির অভাবে যুক্তধ্বনিকে বিযুক্তভাবেই লেখা হয়ে থাকে। যেমন—উৎস, যুগ্‌ম, প্রগল্‌ভ, বল্‌গা। তা ছাড়া যুক্তাক্ষর যে সর্বত্রই উচ্চারণসম্মত তাও নয়। যেমন—ছন্দ বা বা নিশ্চিত শব্দের উচ্চারণ ছ·ন্দ বা নি·শ্চি·ন্ত নয়। এ দুই শব্দের উচ্চারণ যথাক্রমে ছন্‌·দ ও নিশ্‌·চিন্‌·ত। শব্দ, তুচ্ছ, পণ্ড, শঙ্খ শব্দকে আমরা শ·ব্দ, তু·চ্ছ, প·ণ্ড, শ·ঙ্খ রূপে উচ্চারণ করি না। যেভাবে করি তাতে যুক্তাক্ষরগুলি বিভক্ত হয়ে দুই সিলেব্‌ল্-এ স্থান পায়। তথাপি সংস্কৃত

শব্দে সাধারণতঃ যুক্তাক্ষর রক্ষা করাই আবশ্যক মনে করি নানান কারণে। সে আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

অনুলেখ

মূল প্রবন্ধ প্রায় শেষ হবার পরে ১১ চৈত্র তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত সুবোধ চৌধুরীর লেখাটি আমার হাতে এল। তাঁর লেখায় যথেষ্ট চিন্তনীয় বিষয় আছে। তাতে আমি আনন্দিত হয়েছি। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে যেসব আলোচনা বেরিয়েছে সেসবই আমি দেখেছি। সেগুলিতে চিন্তনীয়তার উপাদান খুব বেশী পাই নি। তাই কারও কোনো বিশেষ উক্তির জবাব দিতে চেষ্টিত না হয়ে বানান-সংস্কার সম্বন্ধে আমার মতামত বুঝিয়ে বলতে প্রয়াসী হয়েছি। দেখতে পাচ্ছি তাতেই সুবোধবাবুর উত্থাপিত প্রসঙ্গগুলি সম্বন্ধেও আমার বক্তব্য বলা হয়ে গিয়েছে। তবু বলা উচিত যে, শুধু ইংরেজি শব্দের নয়, সমস্ত অ-অসংস্কৃত শব্দের বানানই আমার বিবেচ্য বিষয়। সুবোধবাবুর লেখায় মুস্কিল, উল্টা, চ্যাপ্টা প্রভৃতি বানান দেখে মনে হল তিনি এরকম বানানই পছন্দ করেন। আমি লিখি মুশকিল, উলটা, চ্যাপটা। আশা করি চলন্তিকা অভিধানে ও বিশ্বভারতী-প্রকাশিত রবীন্দ্র-সাহিত্যে আমার বানানই সমর্থন পাবে।

পরিশেষে আরও দু'টি কথা নিবেদন করতে চাই। বাংলা বানান নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে যে আলোচনা চলছে তার অনেক-গুলিতেই ব্যঙ্গবিদ্রূপ বা রসিকতার অবতারণা করে প্রতিপক্ষকে খেলো করে দেবার একটা প্রয়াস লক্ষ করেছি। শ্রীমান অমিতাভর লেখার এটাই যে একটা বড় ত্রুটি সে কথা পূর্বেই বলেছি। দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে, শ্রদ্ধেয় সুনীতিকুমার ও সুবোধবাবুর লেখাও এই ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। এই দুর্বলতাটুকু না থাকলে এ বিষয়ে সত্যনির্ণয়ের পথ প্রশস্ত-তর বা সুগমতর হবার সুযোগ ঘটত।

সুবোধবাবু একাধিক বার বলেছেন যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষর ভাঙাকে আমি নাকি বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাবের মতোই স্মরণীয় ও বিপ্লবাত্মক বলে বর্ণনা করেছি। সাময়িক প্রয়োজনে দ্রুত লিখিত ও ১৯৬৫ সালে দৈনিক পত্রে প্রকাশিত সে প্রবন্ধটি আমার কাছে নেই। কিন্তু যত দূর আমার মনে আছে তাতে আমার বিশ্বাস আমি এরকম কথা বলি নি, অন্ততঃ সে অভিপ্রায় আমার ছিল না। দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের ঠিক এক শো বছর পরে আনন্দবাজার পত্রিকা যে সাধু-ভাষার পরিবর্তে চলতি ভাষার প্রবর্তন করল তাকেই আমি অভিনন্দিত করেছি। সেটাই আসল কথা। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বোধ হয় বলেছি যে, ওই বৎসরেই আনন্দ-বাজার যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বানান-সংস্কারেও সচেষ্ট হল সেটাও স্মরণীয় ওই বৎসরের গুণেই। সেটা অবশ্যই একটা গৌণ ব্যাপার। দুর্গেশনন্দিনী যুগান্তর এনেছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে। দৈনিক কাগজে চলতি ভাষার প্রবর্তন অবশ্যই একটা বৈপ্লবিক ব্যাপার এবং ভাষার ক্ষেত্রে তা নূতন যুগেরই সূচনা করে। আর এটা যে দুর্গেশ-নন্দিনীর ঠিক এক শো বছর পরে ঘটল, এটা অবশ্যই একটা স্মরণীয় বিষয়। তার ওই বছরেই যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বানান-সংস্কারের প্রয়াস দেখা দিল এটাও মনে রাখবার মতো। এই বানান যদি কোনো কালে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে যায়, তবে এবং তখনই আমার এ কথার সার্থকতা স্বীকৃত হবে, নতুবা নয় এবং তার পূর্বে নয়। কিন্তু আংশিক বানান-সংস্কারকে সাহিত্যে বা ভাষার নবযুগপ্রবর্তনের সমান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে আমি কখনও মনে করিনি এবং এখনও করি না। আশা করি আমার বুদ্ধি-বৃত্তি সম্বন্ধে পাঠকসমাজের এটুকু আস্থা আছে। আমার আশঙ্কা হয় বানান-সংস্কার সম্বন্ধে আমার অভিমতের বিরুদ্ধে মনোভাব নিয়ে পড়বার ফলে আমার বক্তব্যটা সুবোধ-বাবুর মনে ঈষৎ বিকৃতরূপেই প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু আমার লেখায় যদি বানান-সংস্কার সম্বন্ধে উক্তরূপ অপরিমিত গুরুত্ব সত্যই প্রকাশ পেয়ে থাকে তা হলে আমার ভাষাগত দুর্বলতা ও সাময়িক অনবধানতার জন্য লজ্জা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হব না।

তবু স্বীকার করব সুবোধবাবুর এই লেখাটিতে এমন অনেক বিষয় আছে যা বাংলা বানান ও উচ্চারণ সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি যে পরিবর্তনমাত্রেরই বিরোধী তা নন, তাঁর এই লেখাতেও তার অনেক প্রমাণ আছে। তিনি শুধু 'অহেতুক' পরিবর্তনেরই বিরোধী। তাঁর এই সতর্কবাণী সকলেরই স্মরণ রাখা কর্তব্য—

"অহেতুক কোনো পরিবর্তন-সাধন নিষ্প্রয়োজন এবং বাংলা উচ্চারণ-প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো হঠকারী ফ্যাশনের প্রবর্তন নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়।"

আমি বলি, শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, সে রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতেও বাধ্য। তবে হঠকারিতা না করে ও বাংলা উচ্চারণ-প্রকৃতির নির্দেশ মেনে নিয়ে বানান-সংস্কার করলে তাতে কল্যাণই হবে।

ভাষাতত্ত্ব বা উচ্চারণতত্ত্ব বিষয়ে বিধিবদ্ধ শিক্ষালাভের সৌভাগ্য আমার হয় নি। ছন্দ-তত্ত্বের আলোচনায় যদিবা কিছু অধিকার অর্জন করে থাকি, ভাষাগত বিশুদ্ধ ধ্বনি-তত্ত্ব সম্বন্ধে অধিকার দাবির কোনো তকমা বা ছাড়পত্র আমার নেই। তাই এসব বিষয়ের আলোচনায় আমি সবিনয়ে বিরত থাকি। কিন্তু এবার গ্রহের ফেরে বাংলা বানান-সংস্কারের আলোচনায় জড়িয়ে পড়েছি। তাই এ বিষয়ে সসংকোচে কিছু নিবেদন করতে বাধ্য হয়েছি। যদি এই অনধিকার-চর্চার ফলে কোথাও কিছু বেফাঁস বলে থাকি, আশা করি গুণী ব্যক্তিরা সেজন্য আমাকে মার্জনা করে ত্রুটিগুলি দেখিয়ে দেবেন, অকরুণ হয়ে শাসনদণ্ড উদ্যত করবেন না।

সর্বশেষে সংস্কারকামীদের কাছেও একটি নিবেদন করব। তাঁরা যদি বাংলা উচ্চারণ-রীতির মর্যাদা রক্ষা করে যুক্তাক্ষর ভাঙেন এবং সংশয়স্থলে যুক্তাক্ষর বা হসচিহ্ন প্রয়োগে দ্বিধা না করেন তা হলে তাঁদের প্রয়াস ব্যর্থ হবার কারণ দেখি না। প্রত্যেক সংস্কারকর্মেই যথেষ্ট সংযম ও ধৈর্য থাকা চাই। নতুবা ব্যর্থতা অনিবার্য। সেদিকে দৃষ্টি না রেখে বেপরোয়া সংস্কার চালাতে গেলে চিরাগত প্রথা ও অনভ্যাসের চোরা-বালিতে ঠেকে তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টার নৌকাডুবি হওয়া সুনিশ্চিত। তা ছাড়া, অভিধান-সংস্কার না করে বানান-সংস্কারের অন্য বিপদও আছে। তাতে নানা রকম বিভ্রান্তি ঘটবার আশঙ্কা থাকে, বিশেষতঃ নূতন শিক্ষার্থীদের পক্ষে। নূতন বানানে অনেক সময় শব্দের স্বরূপ ও তার অর্থ সম্বন্ধে সংশয় হতে পারে, সে ক্ষেত্রে অভিধান থেকে যদি সহায়তা না পাওয়া যায় তা হলে লেখক ও পাঠক উভয়েরই ক্ষতি হয়। যেমন—মার্জন না লিখে মারজন লিখলে যদি কারও সংশয় দেখা দেয় এবং অভিধানে যদি দ্বিতীয় শব্দটি না পাওয়া যায় তবে লেখার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সংস্কারকামীদের সতর্ক হওয়া অত্যাবশ্যক। মনে আছে অন্ততঃ ত্রিশ (বোধ হয় আরও কিছু বেশী) বৎসর পূর্বে আভি-ধানিক রাজশেখর বসুর কাছে বাংলা বানানের এই সমস্যা এবং অনুরূপ আরও কোনো কোনো সমস্যার কথা উপস্থাপন করেছিলাম। সে আলোচনা যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়েছিল তা নয়। এখানে শুধু বলতে চাই যে, কোনো সংস্কারই একাঙ্গীন বা একরোখা হতে পারে না। তাই বানান-সংস্কারও অভিধান-নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই এ দিক্‌টার প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকার বানান-সংস্কারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্তব্য মনে করছি।

১৫ চৈত্র ১৩৭৩

সেরা বাছাই-করা কমলালেবুর রসে তৈরী...

রেক্স

অরেঞ্জ স্কোয়াশ

আমরা শুধু চমৎকার চমৎকার কমলালেবু-গুলিই বেছে নিই—যেগুলি সূর্য্যের আলোয় পেকে উঠেছে, দেখতে সোনার বর্ণের মত এবং পরিপূর্ণ রসে-ভরা। তারপরে শুধু রস বের ক'রে নিয়ে বিশুদ্ধ আখের চিনির সিরাপ ও অন্যান্য বিশেষ উপাদানের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরী হয় অতি আরামের পানীয়—রেক্স অরেঞ্জ স্কোয়াশ !

বিনামূল্যে:

একটি সুন্দর 'প্রিন্সেস' কোস্টার পাবেন, রেক্স বোতলের প্রতি চারটি ঢাকনার বদলে।

কর্ণ প্রোডাক্টস্ কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

যেমন জিনিস তেমন দাম সেরা স্কোয়াশ—রেক্স নাম

Bensons, I-316 A3 Ben

॥ ৭ ॥

তারপর দিন কাটছে।

একদিন বেশ গরম পড়েছে। গুমোট গরম, বাতাস নেই; তাই মনে হয় শিগ্‌গিরই ঝড়বৃষ্টি নামবে। দেবাশিস বিকেলবেলা ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এসে দেখল দীপা আর পদ্মলোচন দড়ি ধরে বাগান মাপজোক করছে। দেবাশিসকে দেখে দীপা দড়ি ফেলে তাড়াতাড়ি তার গাড়ির কাছে এল, বেশ উত্তেজিতভাবে বলল,—ঈস্টার লিলিতে কুঁড়ি ধরেছে। দেখবে?'

দেবাশিস গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'তাই নাকি! কোথায় ঈস্টার লিলি?'

'এস দেখাচ্ছি!'

বাগানের এক ধারে গিয়ে দীপা আঙুল দেখাল। দেবাশিস দেখল, ভূমিলগ্ন ঝাড়ের মাঝখান থেকে ধ্বজার মত ডাঁটি বেরিয়েছে, তার মাথায় তিন চারটি কুঁড়ির পতাকা। স্নিগ্ধ হেসে দেবাশিস দীপার পানে চাইল—'তোমার বাগানের প্রথম ফুল।'

হাসতে গিয়ে দীপা থেমে গেল। 'তোমার বাগানের—' বাগান কি দীপার? হঠাৎ তার মনটা বিকল হয়ে গেল, প্রথম মুকুলোদ্‌গম দেখে যে আনন্দ হয়েছিল তা নিবে গেল।

সন্ধ্যের পর নৃপতির আড্ডায় গিয়ে দেবাশিস দেখল আড্ডাধারীরা প্রায় সকলেই উপস্থিত, বেশ উত্তেজিতভাবে আলোচনা চলছে। তাকে দেখে সকলে কলরব করে উঠল—'ওহে শুনেছ?'

সুজন থিয়েটারী পোজ দিয়ে বলল, 'আবার শজারুর কাঁটা!'

নৃপতি বলল—'এস, বলছি। তুমি কাগজ পড় না, তাই জান না। মাসখানেক আগে একটা ভিখিরিকে কেউ শজারুর কাঁটা ফুটিয়ে মেরেছিল মনে আছে?'

দেবাশিস বলল,—'হ্যাঁ, মনে আছে।'

পরশু রাত্রে একটা মজুর লেকের ধারে বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, তার হৃদ্‌যন্ত্রে শজারুর কাঁটা ঢুকিয়ে দিয়ে কেউ তাকে খুন করেছে।'

দেবাশিস বলল—'কে খুন করেছে, জানা যায়নি?'

নৃপতি একটু হেসে বলল—'না, পুলিস তদন্ত করছে।'

কপিল বলল,—'পুলিস অনন্তকাল ধরে তদন্ত করলেও আসামী ধরা পড়বে না। অবশ্য স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ভিখিরি এবং মজুরের হত্যাকারী একই লোক। এ ছাড়া আর কেউ কিছু বুঝতে পেরেছ কি?'

খড়্গ বাহাদুর বলল, দুটো খুনই আমাদের পাড়ায় হয়েছে, সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে হত্যাকারী আমাদের পাড়ার লোক।'

নৃপতি বলল, 'তা নাও হতে পারে। হত্যাকারী হয়তো টালার লোক।'

এই সময় কফি এল। প্রবাল এতক্ষণ পিয়ানোর সামনে মুখ গোমড়া করে বসে ছিল, আলোচনায় হল্লায় বাজাতে পারছিল না; এখন উঠে এসে এক পেয়ালা কফি তুলে নিল। কপিল তাকে প্রশ্ন করল, 'কি হে মিঞা তানসেন, তোমার কি মনে হয়?'

প্রবাল কফির পেয়ালায় একবার ঠোঁট ঠেকিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় হত্যাকারী উন্মাদ এবং তোমরাও বদ্ধ পাগল।'

সবাই হইহই করে উঠল, 'আমরা পাগল কেন?'

প্রবাল বলল, 'তোমরা হয় পাগল নয় ভণ্ড। একটা কুলিকে যদি কেউ খুন করে থাকে তোমাদের এত মাথাব্যথা কিসের? কুলির শোকে তোমাদের বুক ফেটে যাচ্ছে এই কথা বোঝাতে চাও?'

অতঃপর তর্ক উদ্দাম এবং উত্তাল হয়ে উঠল।

দেবাশিস তর্কাতর্কি বাগ্‌যুদ্ধ ভালবাসে না। সে কফি শেষ করে চুপিচুপি পালাবার চেষ্টায় ছিল, নৃপতি তা লক্ষ করে বলল, 'কি হে দেবাশিস, চললে নাকি?'

দেবাশিস বলল, 'হ্যাঁ, আজ যাই নৃপতিদা।'

নৃপতি বলল, 'আচ্ছা, এস। সাবধানে পথ চলবে। দক্ষিণ কলকাতার পথে-ঘাটে এখন দলে দলে পাগল ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

এক ধমক হাসির উচ্ছ্বাসের সঙ্গে দেবাশিস বেরিয়ে এল। সে দু'চার পা চলেছে, এমন সময় শুনতে পেল দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে গোঁ গোঁ মড়্‌মড়্‌ আওয়াজ আসছে। চকিতে আকাশের দিকে চোখ তুলে সে দেখল মেঘ ছুটে আসছে; গম্বুজ কেটে ঝড় বেরিয়ে এসেছে। দেখতে দেখতে এক ঝাঁক জেট্‌ বিমানের মতন ঝড় এসে পড়ল; বাতাসের প্রচণ্ড দাপটে চারদিক এলোমেলো হয়ে গেল।

দেবাশিস হাওয়ার ধাক্কায় টাল খেতে খেতে একবার ভাবল, ফিরে যাই, নৃপতিদার বাড়ি বরং কাছে; তারপর ভাবল, ঝড় যখন উঠেছে তখন নিশ্চয় বৃষ্টি নামবে, কতক্ষণ ঝড়বৃষ্টি চলবে ঠিক নেই; সুতরাং বাড়ির দিকে যাওয়াই ভাল, হয়তো বৃষ্টি নামার আগেই বাড়ি পৌঁছে যাব।

দেবাশিস ঝড়ের প্রতিকূলে মাথা ঝুঁকিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু বেশি দূর চলতে হল না, বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল;

বরফের মত ঠান্ডা জলের ঝাপ্‌টা তার সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিল।

বাড়িতে ফিরে দেবাশিস সটান ওপরে চলে গেল। দীপা নিজের ঘরে ছিল, বন্ধ জানলার কাঁচের ভিতর দিয়ে বৃষ্টি দেখছিল; দেবাশিস জোরে টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই সে ফিরে দাঁড়িয়ে দেবাশিসের সিক্ত মূর্তি দেখে সশঙ্ক নিশ্বাস টেনে চক্ষু বিস্ফারিত করল। দেবাশিস লজ্জিত-ভাবে 'ভিজে গেছি' বলে বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

দশ মিনিট পরে শুকনো জামাকাপড় পরে সে বেরিয়ে এল, তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে দেখল দীপা যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, 'নৃপতিদার বাড়ি থেকে বেরিয়েছি আর ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। চল, খাবার সময় হয়েছে।'

পরদিন সকালে গায়ে দারুণ ব্যথা নিয়ে দেবাশিস ঘুম থেকে উঠল। বৃষ্টিতে ভেজার ফল, সন্দেহ নেই; হয়তো ইনফ্লুয়েঞ্জায় দাঁড়াবে। দেবাশিস ভাবল, আজ আর কাজে যাবে না। কিন্তু সারা দিন বাড়িতে থাকলে বারবার দীপার সংস্পর্শে আসতে হবে, নিরর্থক কথা বলতে হবে; সে লক্ষ করেছে, রবিবারে দীপা যেন শঙ্কিত আড়ষ্ট হয়ে থাকে। কী দরকার? সে গায়ের ব্যথার কথা কাউকে বলল না, যথারীতি খাওয়া-দাওয়া করে ফ্যাক্টরি চলে গেল।

বিকেলবেলা সে গায়ে জ্বর নিয়ে বাড়ি ফিরল। জলখাবার খেতে বসে সে নকুলকে বলল, 'নকুল, আমার একটু ঠান্ডা লেগেছে, রাত্তিরে ভাত খাব না।'

নকুল বলল, 'কাল রাত্তিরে যা ভেজাটা ভিজেছ, ঠান্ডা তো লাগবেই। তা ডাক্তার-বাবুকে খবর দেব?'

দেবাশিস বলল, 'আরে না না, তেমন কিছু নয়। গোটা দুই অ্যাস্‌পিরিন খেলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

রাত্রে সে খেতে নামল না। খাবার সময় হলে দীপা নীচে গিয়ে নকুলকে বলল, নকুল, ওর খাবার তৈরী হয়ে থাকে তো আমাকে দাও, আমি নিয়ে যাই।'

নকুল একটা ট্রে-র ওপর সুপের বাটি, টোস্ট এবং স্যালাড্‌ সাজিয়ে রাখছিল, বলল, 'সে কি বউদি, তুমি দাদাবাবুর খাবার নিয়ে যাবে! আমি তা হলে রয়েছি কি কত্তে? নাও, চল।'

ট্রে নিয়ে নকুল আগে আগে চলল, তার পিছনে দীপা। দীপার মন ধুক্‌পুক্‌ করছে। ওপরে উঠে নকুল যখন দীপার ঘরের দিকে চলল, সে তখন ক্ষীণ কুণ্ঠিত স্বরে বলল, 'ওদিকে নয় নকুল, এই ঘরে।'

নকুল ফিরে দাঁড়িয়ে দীপার পানে তীক্ষ্ম চোখে চাইল, তারপর অন্য ঘরে গিয়ে দেখল দেবাশিস বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে। নকুল খাটের পাশে গিয়ে সন্দেহ-ভরা গলায় বলল, 'তুমি এ ঘরে শুয়েছ যে, দাদাবাবু!'

দেবাশিস কৈফিয়ত তৈরি করে রেখেছিল, বিছানায় উঠে বসে বলল, 'কি জানি, হয়তো ইনফ্লুয়েঞ্জা ধরেছে, তাই আলাদা শুয়েছি। ছোঁয়াচে রোগ, শেষে দীপাকেও ধরবে।'

সন্তোষজনক কৈফিয়ত। দীপা নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। নকুলও আর কিছু বলল না, কিন্তু তার চোখ সন্দিগ্ধ হয়ে রইল। সে যেন বুঝেছে, যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি হচ্ছে না, কোথাও একটু গলদ রয়েছে।

ঘণ্টা তিনেক পরে দীপা নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, দোরে ঠক্‌ঠক্‌ শব্দ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম চোখে উঠে দোর খুলেই সে প্রায় আঁতকে উঠল। দেবাশিস বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার শরীর ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। সে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'বুকে সাংঘাতিক ব্যথা, জ্বরও খুব বেড়েছে ...ডাক্তারকে খবর দিতে হবে।' এই বলে

সে টলতে টলতে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

আকস্মিক বিপৎপাতে মানুষের মন ক্ষণকালের জন্য অসাড় হয়ে যায়। তারপর সংবিৎ ফিরে আসে। দীপা স্বস্থ হয়ে ভাবল, ডাক্তার ডাকতে হবে; কিন্তু এ বাড়ির বাঁধা ডাক্তার কে তা সে জানে না, তাঁকে ডাকতে হলে নকুলকে পাঠাতে হবে; তাতে অনেক দেরি হবে। তার চেয়ে যদি সেন কাকাকে ডাকা যায়—

দীপা ডাক্তার সুহৃৎ সেনকে টেলিফোন করল। ডাক্তার সেন দীপার বাপের বাড়ির পারিবারিক ডাক্তার।

একটি নিদ্রালু স্বর শোনা গেল—

—'হ্যালো।'

দীপা বলল, 'সেনকাকা! আমি দীপা।'

'দীপা! কী ব্যাপার?'

'আমি—আমার—' দীপা ঢোক গিলল—'আমার স্বামী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এখনই ডাক্তার চাই। আমি জানি না, এ'দের ডাক্তার কে, তাই আপনাকে ডাকছি। আপনি এক্ষুনি আসুন, সেনকাকা।'

'এক্ষুনি যাচ্ছি। কিন্তু অসুখের লক্ষণ কি?'

'বৃষ্টিতে ভিজে ঠাণ্ডা লেগেছিল—তারপর—'

'আচ্ছা, আমি আসছি।'

'বাড়ি চিনে আসতে পারবেন তো?'

'খুব পারব। এই তো সেদিন তোমার বউভাতের নেমন্তন্ন খেয়েছি।'

মিনিট কুড়ির মধ্যে ডাক্তার সেন এলেন, ওপরে গিয়ে দেবাশিসের পরীক্ষা শুরু করলেন। দীপা দোরের চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল।

প্রথমে কয়েকটা প্রশ্ন করে ডাক্তার রোগীর নাড়ী দেখলেন, টেম্পারেচার নিলেন, তারপর স্টেথস্কোপ কানে লাগিয়ে বুক পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরীক্ষা করতে করতে তাঁর চোখ হঠাৎ বিস্ফারিত হল, তিনি বলে উঠলেন—'এ কি!'

দেবাশিস ক্লিষ্ট স্বরে বলল, 'হ্যাঁ ডাক্তার-বাবু, আমার সবই উল্টো।'

দীপা সচকিত হয়ে উঠল, কিন্তু দেবাশিস আর কিছু বলল না। ডাক্তার কেবল ঘাড় নাড়লেন।

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার বললেন, 'বুকে বেশ সর্দি জমেছে। আমি ইনজেকশন দিচ্ছি, তাতেই কাজ হবে। আবার কাল সকালে আমি আসব, যদি দরকার মনে হয় তখন রীতিমত চিকিৎসা আরম্ভ করা যাবে।'

ইনজেকশন দিয়ে দেবাশিসের মাথায় হাত বুলিয়ে ডাক্তার সস্নেহে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই, দু' চার দিনের মধ্যেই সেরে উঠবে। আচ্ছা, আজ ঘুমিয়ে পড় বাবাজি, কাল ন'টার সময় আবার আমি আসব। তোমার বাড়ির ডাক্তারকেও খবর দিও।'

ডাক্তার ঘর থেকে বেরুলেন, দীপা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ডাক্তার সেন দীপাকে বললেন, 'একটা বড় আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম—'

দিন দশেকের মধ্যে দেবাশিস আবার চাঙ্গা হয়ে উঠল। এই দশটা দিন অসুখের সময় হলেও দেবাশিসের পক্ষে বড় সুখের সময়। দীপা ঘুরে ফিরে তার কাছে আসে, খাটের কিনারায় বসে তার সঙ্গে কথা বলে; তার খাবার সময় হলে নীচে গিয়ে নিজের হাতে খাবার নিয়ে আসে, নকুলকে আনতে দেয় না। রাত্রে ঘুম থেকে উঠে চুপিচুপি এসে তাকে দেখে যায়; আধ-জাগা আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় দেবাশিস জানতে পারে।

একদিন, দেবাশিস তখন বেশ সেরে উঠেছে, বিকেলবেলা পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে বিছানায় আধ-বসা হয়ে একটা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছে, দীপা দুধ-কোকোর পেয়ালা নিয়ে ঘরে ঢুকল। দেবাশিস হেসে তার হাত থেকে পেয়ালা নিল, দীপা খাটের পায়ের দিকে গিয়ে বসল। বলল, 'দাদা ফোন করেছিল, সন্ধ্যের পর আসবে।'

দেবাশিস উত্তর দিল না, কোকোর কাপে ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে দীপার পানে চেয়ে রইল। বলা বাহুল্য, গত দশ দিনে দীপার বাপের বাড়ি থেকে রোজই কেউ না কেউ এসে তত্ত্বতল্লাশ নিয়ে গেছে। দীপার মা গোড়ার দিকে দু' রাত্রি এসে এখানে ছিলেন। কিন্তু দীপা তার মার এখানে থাকা মনে মনে পছন্দ করেনি।

দেবাশিস কাপে চুমুক দিচ্ছে আর চেয়ে আছে, দীপা একটু অস্বস্তি বোধ করতে

দীপা, তুমি আমাকে ভালবাস না, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি

লাগল। একটা কিছু বলবার জন্যে সে বলল, 'বাগানে বোধ হয় আরো কিছু ক্রোটন দরকার হবে।'

এবারও দেবাশিস তার কথায় কান দিল না। স্নিগ্ধ-মধুর স্বরে বলল, 'দীপা, তুমি আমাকে ভালবাস না, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।'

নির্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রপাতের মত অপ্রত্যাশিত কথা। দীপার মুখ রাঙা হয়ে উঠল, তারপরই ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে দোরের দিকে পা বাড়িয়ে স্খলিত স্বরে বলল, 'বোধ হয় মালী এসেছে যাই দেখি,—সে কি করছে।'

পিছন থেকে দেবাশিস ডাকল 'দীপা শোনো।'

দীপা দুরুদুরু বুকে ফিরে এসে দাঁড়াল। দেবাশিসের মুখের সেই স্নিগ্ধ-করুণ ভাব আর নেই, সে খালি পেয়ালা দীপাকে দিয়ে সহজ সুরে বলল, 'আমার কয়েকজন বন্ধুকে চায়ের নেমন্তন্ন করতে চাই। চার-পাঁচ জনের বেশি নয়।'

দীপা মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'কবে?'

'তাড়া নেই। আজ রবিবার, ধরো আসছে রবিবারে যদি করা যায়?'

'আচ্ছা।'

'বাজারের খাবার কিন্তু একটিও থাকবে না। সব খাবার তুমি আর নকুল তৈরি করবে।'

'আচ্ছা।'

তারপর দিন কাটছে। দেবাশিস আবার ফ্যাক্টরি যেতে আরম্ভ করল। শনিবার সন্ধ্যায় নৃপতির আড্ডায় গেল। অনেক দিন পরে তাকে দেখে সবাই খুশী। এমন কি প্রবাল পিয়ানোয় বসে একটা হাল্কা হাসির গত বাজাতে লাগল। নৃপতি বলল, 'একটু রোগা হয়ে গেছ।'

খড়্গ বাহাদুর বলল, 'ভাই দেবু, ঠেসে শিক কাবাব খাও, দু' দিনে ইয়া লাশ হয়ে যাবে।'

কপিল বলল, 'খড়্গ, তুই থাম। তুই তো দিনে দেড় কিলো শিক কাবাব খাস, তবে গায়ে গত্তি লাগে না কেন?'

খড়্গ বলল, 'আমি যে ফুটবল খেলি, যারা ফুটবল খেলে তারা কখনো মোটা হয় না। মোটা ফুটবল খেলোয়াড় দেখেছিস?'

সুজন বলল, 'কুস্তিগীর পালোয়ানেরা কিন্তু মোটা হয়। শুনেছি তারা হরদম বাদাম পেস্তা আর বেদানার রস খায়।'

এই সময় বিজয়মাধব এল। দেবাশিসকে দেখে তার কাছে এসে বলল, 'অসুখের পর এই প্রথম এলে, না?'

দেবাশিস বলল, 'হ্যাঁ।'

'এখন তাহলে একেবারে ঠিক হয়ে গেছ।'

'হ্যাঁ।'

দেবাশিসের কাছে কথা বলায় বিশেষ উৎসাহ না পেয়ে বিজয় বিরস মুখে তক্তপোশের ধারে গিয়ে বসল। দেবাশিস তখন সকলের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'তোমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করতে এসেছি। কাল রবিবার সাড়ে পাঁচটার পর যখন ইচ্ছে আসবে। কেমন, কারুর অসুবিধে নেই তো?'

কারুর অসুবিধে নেই। সবাই সানন্দে রাজী। কেবল খড়্গ বাহাদুর বলল, 'কাল আমার খেলা আছে। তবু আমি যত শিগগির পারি যাব। চায়ের সঙ্গে শিক কাবাব খাওয়াবে তো?'

কপিল বলল, 'তুই জ্বালালি। চায়ের

লাগে। কেউ শিক কাবাব খায়। শিক কাবাবের অনুপান হচ্ছে বোতল।'

দেবাশিস প্রবালের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি আসবে তো?'

প্রবাল বলল, 'যাব। বড়মানুষের বাড়িতে নেমন্তন্ন আমি কখনো উপেক্ষা করি না। কিন্তু উপলক্ষটা কি? রোগমুক্তির উৎসব?'

দেবাশিস বলল, 'আমার বউয়ের হাতের তৈরি খাবার তোমাদের খাওয়াব। বিজয়, তুমিও এস।'

'যাব।'

পরদিন সন্ধ্যেবেলা দেবাশিসের বাড়িতে অতিথিরা একে একে এসে উপস্থিত হল। এমন কি, খড়্গ বাহাদুরও ঠিক সময়ে এল, বলল, 'খেলা হল না, ওআক্-ওভার পেয়ে গেলাম।'

নীচের তলার বসবার ঘরে আড্ডা জমল। সকলে উপস্থিত হলে দেবাশিস এক ফাঁকে রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, দীপা খাবারের প্লেট সাজাচ্ছে, আর নকুল দুটো বড় বড় টি-পটে চা তৈরি করছে। দেবাশিস দীপাকে বলল, 'ওরা সবাই এসে গেছে। দশ মিনিট পরে চা জলখাবার নিয়ে তুমি আর নকুল যেও।'

'আচ্ছা।' দীপা জানত না, কারা নিমন্ত্রিত হয়েছে, তার মনে কোনো ঔৎসুক্য ছিল না। অস্পষ্টভাবে ভেবেছিল, হয়তো ফ্যাক্টরির সহকর্মী বন্ধু।

বসবার ঘরে আলোচনা শুরু হয়েছে, আজকের কাগজে নতুন শজারুর কাঁটা হত্যার খবর বেরিয়েছে তাই নিয়ে। এবার শিকার হয়েছে এক দোকানদার, গণেশময় দাস। এবারও অকুস্থল দক্ষিণ কলকাতা।

আলোচনায় নতুনত্ব বিশেষ নেই। হত্যাকারী হয় পাগল, নয় পাকিস্তানী, নয় চীনেম্যান। সুজন বলল, 'একটা জিনিস লক্ষ করেছ? প্রথমে ভিখিরি, তারপর মজুর, তারপর দোকানদার। হত্যাকারী স্তরে স্তরে উঁচু দিকে উঠছে। এর পরের বারে কে শিকার হবে, ভাবতে পার?'

প্রবাল গলার মধ্যে অবজ্ঞাসূচক শব্দ করল। কপিল বলল, 'সম্ভবত নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড়।'

খড়্গ বাহাদুর বলল, 'কিংবা নামজাদা সিনেমা অ্যাক্টর।'

সুজন বলল, 'কিংবা নাম-করা গাইয়ে।'

প্রবাল বলল, 'নাম-করা লোককেই মারবে এমন কী কথা আছে? পয়সাওয়ালা লোককেও মারতে পারে। যেমন নৃপতিদা কিংবা কপিল কিংবা—'

এই সময় দীপা খাবারের ট্রে হাতে দোরের সামনে এসে দাঁড়াল। প্রবালের কথা শেষ হল না, সবাই হাসিমুখে উঠে দীপাকে মহিলার সম্মান দেখাল। দীপা একবার ত্রাস-বিস্ফারিত চোখ সকলের দিকে ফেরাল, তার মুখ সাদা হয়ে গেল। প্রবল চেষ্টায় সে নিজের দেহটাকে সামনে চালিত করে টেবিলের ওপর খাবারের ট্রে রাখল।

কপিল মৃদু ঠাট্টার সুরে বলল, 'নমস্কার, মিসেস ভট্ট।'

দীপা বোধ হয় শুনতে পেল না, সে ট্রে রেখেই পিছু ফিরল। তার পিছনে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে নকুল ছিল, তাকে পাশ কাটিয়ে দীপা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দেবাশিস অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। সে আশা করেছিল, দীপা সকলকে চা ঢেলে দেবে, সকলেই বিয়ের আগে থেকে পরিচিত, তাদের সঙ্গে বসে কথবার্তা বলবে, তাদের খাওয়ার তদারক করবে। কিন্তু দীপা কিছুই করল না। দেবাশিস নিজেই সকলকে চা ঢেলে দিল। ট্রের ওপর থেকে খাবরের প্লেট নামিয়ে তাদের সামনে রাখল। দীপা আজ নকুলের সাহায্যে অনেক রকম খাবার তৈরি করেছিল: চিংড়ি মাছের কাটলেট, হিঙের কচুরি, ডালের ঝালবড়া, রাঙালুর পুলি, জমাট ক্ষীরের বরফি ইত্যাদি। অতিথিরা খেতে খেতে আবার তর্কবিতর্কে মশগুল হয়ে উঠল। দীপার ব্যবহারের সামান্য অস্বাভাবিকতা কেউ লক্ষও করল কিনা, বলা যায় না।

আলোচনা যখন বেশ জমে উঠেছে তখন দেবাশিস অতিথিদের দৃষ্টি এড়িয়ে রান্নাঘরে গেল। দেখল, দীপা টেবিলের ওপর কনুই রেখে আঙুল দিয়ে দুই রগ টিপে বসে আছে। দেবাশিস তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে হতাশ চোখ তুলে বলল, 'বড্ড মাথা ধরেছে।'

দেবাশিসের মন মুহূর্তমধ্যে হাল্কা হয়ে গেল। সে সহানুভূতির সুরে বলল, 'ও— আগুনের তাতে মাথা ধরেছে। তুমি আর এখানে থেকো না, নিজের ঘরে চলে যাও, মাথায় অ-ডি-কলোন দিয়ে শুয়ে থাকো গিয়ে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে মাথাধরা সেরে যাবে।'

দীপা উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে বলল, 'আচ্ছা।'

দেবাশিস বসবার ঘরে ফিরে গিয়ে বলল, 'দীপার খুব মাথা ধরেছে। আমি তাকে মাথায় অ-ডি-কলোন দিয়ে শুয়ে থাকতে বলেছি। আজ সারা দুপুর উনুনের সামনে বসে খাবার তৈরি করেছে—'

সকলেই সহানুভূতিসূচক শব্দ উচ্চারণ করল। বিজয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি যাই, দীপাকে একবার দেখে আসি।'

দেবাশিস বলল, 'যাও-না, সোজা ওপরে চলে যাও।'

বিজয় দোতলায় গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দীপার শোবার ঘরের দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দীপা চোখ বুজে শুয়ে ছিল, সাড়া পেয়ে ঘাড় তুলে বিজয়কে দেখল, তারপর আবার বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজল।

বিজয় খাটের পাশে এসে দাঁড়াল, কটমট করে দীপার পানে চেয়ে থেকে চাপা তর্জনে বলল, 'আমার সঙ্গে চালাকি করিস নে, তোর মাথাধরার কারণ আমি বুঝেছি।'

দীপা উত্তর দিল না, চোখ বুজে পড়ে রইল।

বিজয় তর্জনী তুলে বলল, 'আজ যারা এসেছে, তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে তোর ইয়ে।'

দীপার কাছ থেকে সাড়াশব্দ নেই।

'তার নাম কি, বল।'

দীপার মুখে কথা নেই, সে যেন কালা হয়ে গেছে।

'বলবি না?'

এইবার দীপা ঝাঁকানি দিয়ে উঠে বসল, তীব্র দৃষ্টিতে বিজয়ের পানে চেয়ে বলল, 'না, বলব না।' এই বলে সে বিজয়ের দিকে পিছন ফিরে আবার শুয়ে পড়ল।

দাঁতে দাঁত চেপে বিজয় বলল, 'বলবি নে! আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। যেদিন ধরব তাকে, চৌ-রাস্তার ওপর টেনে এনে জুতোপেটা করব।'

বিজয় নীচে নেমে গেল। ভাইবোনের ঝগড়ার মূলে যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন হাস্যকর হয়ে দাঁড়াল।—

তারপর আবার দিন কাটছে।

(ক্রমশ)

আপনার বাচ্চার গা কত কোমল আর কী তলতলে...
ওর গায়ে
যে-সে পাউডার চলবে না

বাচ্চার ভালো চান তো জনসন্স* বেবী পাউডার
ব্যবহার করুন

সুকোমল অতি মিহি উপাদানে তৈরী জনসন্স বেবী পাউডার ঘাম শুষে নেয় অথচ এতে রোমকূপের মুখ বন্ধ হয়ে যায় না। সাধারণ কোনো পাউডারের এই গুণটি নেই। এই পাউডার লাগালে কখনো জাঙিয়া বা জামার রগড়ানিতে ওর গা জ্বালা করবে না কিংবা ঘামেও গা চটচট করবে না। ভারি আরাম লাগবে ওর এই পাউডারে! আর এর মিষ্টি গন্ধটিও বড় চমৎকার লাগে!

জনসন অ্যাণ্ড জনসন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

*ট্রেডমার্ক

JJ 5711A

ক্যানাডার চিঠি

অনেকদিন লেখা হয়ে ওঠেনি। শীতের অজুহাত দেব কিনা ভাবছি। কারণ পৃথিবীর এই অঞ্চলে, যেখানে দীর্ঘ ছ-মাস সুতীক্ষ্ম শীত এবং তুষারপাত দৈনন্দিন জীবনের প্রধানতম অভিজ্ঞতা, সেখানে যে-কোনো কাজে গাফিলতি হ'লেই শীত ঋতুকে দোষারোপ করা হয়। এমন কি, ক্যানাডার লোকেরা তেমন মিশুক প্রকৃতির নয় কেন একথা জিজ্ঞেস করলে এরা বলে, বছরের অর্ধেকের বেশি বাইরে ঘোরাঘুরি না করতে পারলে সামাজিক উন্মোচন হবে কী ক'রে? বসন্ত আর গ্রীষ্ম এলে লোকেরা তাই লাজুকচিত্তে একা একা বাইরে ঘুরে বেড়ায়, চোখাচোখি হ'লে নিস্তরঙ্গ স্বরে বলে: আপনি কেমন আছেন? আমি ভালোই, ধন্যবাদ। ইতি।

আমার চিঠি লেখার আরেক সমস্যা আমি বল-পয়েন্ট লেখনী এখনো সহ্য করতে পারি না, তরল কালি-ভরা কলমে লিখতেই ভালো লাগে। অথচ শীতকালীন সেন্ট্রাল হীটিং ব্যবস্থায় ঘরের হাওয়া এমন শুকিয়ে যায় যে আধ মিনিটের জন্যও কলমটাকে খুলে পাশে রেখে ভাবা যায় না, অমনি নিবের অধর ও কণ্ঠ যাবে শুকিয়ে। গত-বারে ভারতবর্ষে ফিরে দেখেছিলাম কাগজপত্রে দস্তখতের ব্যাপারে বল-পয়েন্ট ব্যবহারে বারণ ছিল। এখনও কি সেকেলে সরস লেখনীর প্রতি আমাদের দেশে সেই শ্রদ্ধা বজায় রয়েছে? না হ'লে বিমর্ষ বোধ করব।

শীত এখানে যাই যাই করছে। শূন্যের উপরে তাপমাত্রা উঠে এসেছে। তুষার জমে কঠিন বরফ হয়ে ছিল, এখন তা গলে পথে-ঘাটে তিরতির ক'রে বয়ে চলেছে। একটি জাপানি হাইকুর কথা কেবলি আমার মনে আসে, কবিতাটি প্রায় পিটার ব্রুখেলের ছবির মতো মূর্ত:

> বরফ গলছে—
> হঠাৎ সারা গাঁও জুড়ে
> শিশুদের মেলা।

অবশ্য সে অপরূপ কাণ্ড এখানে বিরল। তবু আহরিং ঘাস জেগে উঠছে, শৌখীন পাখিরা ফিরে আসছে, সন্ধ্যার আকাশ অপরাজিতার নীল। ডিসেম্বর-জানুয়ারির নিরবচ্ছিন্ন তুষার প্লাবনের সঙ্গে কিন্তু এর মিল নেই। সে আরেক রূপ। তীব্রবেগে ছুটেছে ছিন্নভিন্ন কুচিকুচি তুষার, শূন্যের দিকে এক ঝলক তাকালে হঠাৎ মনে হয় আপেলমঞ্জরীতে ছেয়ে-যাওয়া এক অতিকায় গাছ। অথবা তারপর কোন শান্ত রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে অন্তহীন পাইনের শিখরে শিখরে কিংবা জুনিপারের ঘন সবুজ চুলে বাসা-বাঁধা সাদা ফুলের ভিড়। পারুল ফুল আমি কোনদিন দেখিনি, অথবা কাকে বলে ঠিক জানি না। কিন্তু তুষারের এই ফুল দেখে আমার রূপকথার পারুল মনে হয়।

সহস্রাধিক মাইল এই পারুলের পথ ধ'রে গত ডিসেম্বরে টোরোন্টো পর্যন্ত গিয়ে-ছিলাম। টোরোন্টো কিন্তু খাঁটি শহর, ট্রামের তারে আর পথচারীর ওভারকোটেই সেখানে তুষারের সমাধি। হাওয়া ভারি, অপ্রস্তুত ফুসফুসে হঠাৎ সে নাগরিক হাওয়া পুরে নিতে গিয়ে সজাগ হতে হয়। টোরোন্টো বেশ লেগেছে। রাতদুটো পর্যন্ত অসংখ্য পথচারীর স্বচ্ছন্দ আনা-গোনা, ফুটপাথের কোনে ছোট্ট চুল্লিতে গরম করা চেস্টনাটের ভারি গন্ধ, নাইট ক্লাবে হালের গো-গো মেয়েদের নাচ, বিবর্ণ গণিকার ক্লান্ত হতাছানি, পণ্যের ভারে নুয়ে-পড়া দোকানপসার, মাটির নিচে শহরের শিরা-উপশিরার মতো সাবওয়ে— সব মিলে নিঃসন্দেহে একটি শহর।

তখন বড়োদিন বলে নানা উৎসবের ভিড়ও ছিল। অন্যান্য অনেক-কিছুর মধ্যে, আমার প্রিয় ব্যালে নাটক্র্যাকার দেখেছিলাম মনে আছে। চাইকফস্কির এই ব্যালেটির সঙ্গে বড়োদিনের কেমন যেন এক অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ হয়ে গেছে কালক্রমে। অন্তত শিশু-দের জন্য ঐ সময়ে বোধ হয় এর চেয়ে ভালো কিছু দেখাবার থাকে না। আমাদের শিশুরা দুর্গাপুজোর আজকাল কি কোথাও যাত্রা দেখতে পায়? অথবা সাবেকি পুতুল নাচ? এমন কি গ্রামেও? নিরন্ন ঘরে ঘরে সেখানেও হয়তো মাইক্রোফোনের ধ্বনি। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেদের শখের নাটকও তো বোধ হয় আজকাল কমে এসেছে। আমাদের বাল্যকালও তো এমন কিছু সোনালী রুপালী ছিল না। কিন্তু পুজোয় আর কিছু না হ'লেও পথের মোড়ে মোড়ে বিনা পয়সায় টিপু-হায়দর-কাউণ্ট লালির কিংবা সিরাজ-দ্দৌলা-নিয়তির অপূর্ব কণ্ঠ সারারাত শোনা গেছে। আহা রে, সেই নারীবেশী, গুম্ফচিহ্নিত, পাড়াতুতো দাদার কেনুরো গলায় গাওয়া "পথহারা পাখি কেঁদে ফিরে যায়" কোথায় হারিয়ে গেল?

টোরোন্টোর একটি উল্লেখযোগ্য বস্তু সেখানকার নতুন সিটি হল অট্টালিকাটি। এদেশের অনেক ভালো জিনিসের মতোই এই অট্টালিকাটি একজন বিদেশীর তৈরী. নাম ভিহো রেভেল্। কিন্তু স্থপতির কাজকে ছাপিয়ে উঠেছে সিটি হলের চত্বরে দাঁড়-করানো ভাস্কর্য বস্তুটি, যার রচয়িতা

আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি দেয়াল চিত্র

নাট্‌ক্র্যাকার ব্যালের একটি দৃশ্য
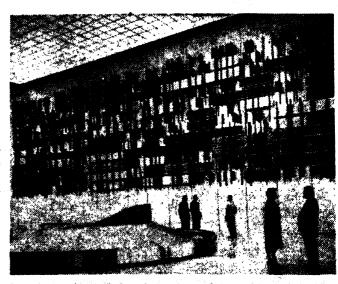
স্বয়ং হেন্‌রি ম্‌রে। ম্‌রে তাঁর এই বিরাট ধাতব কাজটির নাম দিয়েছেন 'তীরন্দাজ'। এর দ্‌টি ডানা অথবা শিং আত্মীয় অট্টালিকাটির দ্‌ই টাওয়ারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেন এক দৃশ্য-কথোপকথনে মগ্ন। মোটের উপর নিশ্চয়ই বলা চলে এই দ্‌ই শিল্পকর্মের মানবিক রীতিপ্রকৃতি টোরোণ্টো শহরকে নবতর মর্যাদা দিয়েছে। টোরোণ্টো আরো আত্মপ্রত্যয়ী শহর হয়ে উঠেছে।

শহরের আত্মপ্রত্যয়ের প্রকাশ তার অধিবাসীদের সামাজিক ব্যবহারে ও চিন্তায়। বলা বাহ্‌ল্য, প্রতিবেশী মার্কিন দেশের বড়ো শহরের পাশে টোরোণ্টোকে ম্লান মনে হয়, তার হীনমন্যতাও স্পষ্ট। উপরন্তু ম্‌রের কাজটির উদ্বোধনী অন্‌ষ্ঠানকে খোঁচা দিয়ে নিউইয়র্ক টাইম্‌স্‌ লিখেছিল টোরোণ্টো নাকি "a city known more for its hockey than for its art"

কিন্তু সে শহরের লোকেরাই বিশ্বাস করবেন না যে গত অক্টোবরে সেই অন্‌ষ্ঠানের রাত্রিতে দশ হাজার লোক জড়ো হয়েছিল। টোরোণ্টোতে দশ হাজার উৎসাহী লোক একটি বিমূর্ত ভাস্কর্যকে দেখতে এসেছিল, ব্যাপারটা প্রায় গ্রাম্য আদিখ্যেতাই মনে হয়েছে আত্মসচেতন দ্‌-চারজন শহরে সংস্কৃত ভদ্রলোকের। যেন ব্যাপটিস্ট বাপের চোখের সামনে কলেজের ছেলের মদ্যপান, অথবা হাটারাইট তরুণীর প্রথম লিপস্টিক পরা।

অবশ্য ক্যানাডায় ম্‌রের ভালো কাজ এই একটিই নয়। সরকারী অট্টালিকা সাজানোর জন্য বিমূর্ত শিল্পের ব্যবহারও এই প্রথম নয়—যানবাহন দপ্তর ইতিমধ্যে এ-সবের জন্য অনেক টাকা খরচ করেছেন, টোরোণ্টো, উইনিপেগ এবং এডমণ্টনের বিমানবন্দরে যার নিদর্শন পাওয়া যায়। তথাপি টাকার অঙ্কের দিক থেকে এবং অন্য অনেক কারণে 'তীরন্দাজের' প্রতিষ্ঠা একটি বিশিষ্ট ঘটনা। শহরের তৎকালীন মেয়র হয়তো প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন টোরোণ্টো শহরের শিল্পোৎসাহ হকির প্রতি তার আসক্তির চেয়ে কম নয়। ফলে সে বছরের নির্বাচনেই তাঁকে হেরে যেতে হয়। কিন্তু প্রচুর প্রতিবাদ এবং এমন কি ইহুদী-বিরোধী স্লোগান মিছিল সত্ত্বেও সৌভাগ্যত হেনরি ম্‌রে সে যাত্রা অক্ষত থেকেছেন। এখন নিঃসন্দেহেই বলা যায় হেনরি ম্‌রে টোরোণ্টোর নির্বাচনে জিতে গেছেন।

টোরোণ্টোকে আমি তার এই সাবালক হবার চেষ্টার দিক থেকে দেখেছি। মাঝে মাঝে আমাদের প্রথম যৌবনের কলকাতার কথা মনে হয়ে সহান্‌ভূতিও জেগেছে। তখনকার কলকাতার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল সন্ধ্যার কফি হাউস। সেখানে ব'সে আমরা কান পেতে থাকতাম, প্যারিস থেকে নতুন কোন্‌ কথাটি অস্পষ্ট স্বরে ভেসে আসে। বিষয় বিশেষে মস্কো থেকেও। তখনো কফিঘরে চেয়ার উল্টো ক'রে ব'সে ছেলেরা মাউথ-অর্গান বাজাত না, মার্কিন ম্‌ল্‌কের চালচলন সম্বন্ধে আধাখেঁচড়া খবরও কুড়োত না। তারা বিপন্ন আগ্রহে, এমন কি অপরকে অন্‌করণ করার লজ্জাবোধ সত্ত্বেও, সাবালক হবার চেষ্টা করছিল। টোরোণ্টোর হয়তো সেই ধরনের অবস্থা। মার্কিনবিরোধী স্বাদেশিকতা এবং লঘ্‌ বামপন্থী-আন্তর্জাতিকতার এক অস্থির মিশ্রণ ছাত্র সমাজে চোখে পড়ে। টোরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত "teach in" পর্যায়ে দ্‌-বছর আগে ভিয়েৎনামী বিপ্লব বিষয়ে এবং গত বছর চীন বিষয়ে যে বক্তৃতাদি হয় তা সে শহরের ছাত্রদেরই প্রশংসনীয় কীর্তি।

ইয়ং স্ট্রীট রাস্তাটিকে বলা যায় টোরোণ্টো ডাউনটাউনে মেরুদণ্ড। রাস্তার দ্‌-পাশে বড়ো দোকান, রেস্টুরেণ্ট ছাড়াও অনেকগ্‌লি ছোটবড়ো আর্টগ্যালারি। এসব গ্যালারির অধিকাংশেই দর্শনযোগ্য ছবি নেই, মাম্‌লি ব্যাপার। ইয়ং স্ট্রীটে বরং আরেকটি জিনিসের উল্লেখ করব—

একটি ভারতীয় রেস্টুরেন্ট। নিউইয়র্কের পর বিদেশে ভালো ভারতীয় খাবার এই দোকানেই খেলাম। চাপাটি, কাবাব, কোর্মা, কোফ্‌তা, নানা রকম ঝালঝোল, ডাল, চাটনি তো আছেই; তার উপর এত ভালো দেশী মিস্টি দেশে গিয়েও এবার সহজে পাইনি। এই দোকানটিতে সন্ধ্যার দিকে একবার ঘুরে এলে টোরোন্টোর ভারতীয় যুবক যুবতীরা কে কার সঙ্গে প্রেম করছে তারও বিস্তৃত তালিকা প্রস্তুত করা যায়। একটি ক্যানাডিয় মেয়ে খাবার পরিবেশন করে, কিন্তু রুটি-চাপাটির কল্যাণে তার ইংরেজী উচ্চারণ প্রায় ভারতীয়দের মতোই শোনায়। অসংখ্য বিদেশীও এখানে খেতে আসেন, এবং আমার ধারণা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহ মেটাবার যে অতি সামান্য ব্যবস্থা ভারত সরকার ঐ শহরে রেখেছেন তার তুলনায় এই খাবারের দোকানটি আমাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব অনেক বেশি করছে।

ইয়ং স্ট্রীট ধরে আরো এগোলে ক্রমে ইয়র্কভিল পাড়ায় পৌঁছন যায়। ইয়র্কভিল হল টোরোন্টোর গ্রীনিচ ভিলেজ। অবশ্য আবার সেই নাবালকত্বের কথায় ফিরে আসতে হয়, যেমন নিউইয়র্কের গ্রীনিচ ভিলেজে গিয়ে প্যারিসের লাটিন কো-অর্টর-বাসীর প্রায় হাসি পাবে। প্যারিসে দেখেছি ছেলেমেয়েরা অবিবাহিত অবস্থায় একত্র বসবাস করলে আত্মীয়স্বজনের কাছে সে-ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। কিন্তু নিউইয়র্কের তুখোড় বন্ধুদেরও দেখেছি এসব কথা বাপ-মার সামনে অন্তত উল্লেখ করে না। টোরোন্টোয় আরো অনেক বেশি ঢাকাঢাকির রেওয়াজ। সে যাই হোক, আর্টিস্ট ও লেখকদের পাড়া ইয়র্কভিলে গিয়ে কয়েকটি গ্যালারি দেখা হল এবং ভালোও লাগল। নিউইয়র্কের যেন একটু উচ্ছিষ্ট পাওয়া গেল, তবু ক্যানাডায় এরই দাম আছে। দেখলাম বীট্‌নিকতার আতিশয্য কমেছে। অনেকেই দাড়িগোঁফ কামাচ্ছে, অভিধান-বহির্ভূত কথাবার্তা নিয়ে আদিখ্যেতাও যেন চলে যাচ্ছে, এবং ছবি আঁকাটা যে ইয়ার্কির ব্যাপার নয় সে কথাও যেন পুনর্বার স্বীকৃত হচ্ছে। ভালোই লাগল এই সব স্বল্পক্ষম কিন্তু আন্তরিকচিত্ত শিল্পীদের কাজকর্ম দেখে।

টোরোন্টো শহর কিন্তু একটি সাংস্কৃতিক দ্বীপ। যেটুকু সাবালকত্বের চেষ্টা ও সাফল্যের আভাস দিলাম তা এই শহরেই সীমাবদ্ধ। কয়েক মাইলের মধ্যে বড়ো জায়গা হ্যামিল্টনে গিয়ে তা যেন টের পেলাম। হ্যামিল্টন অন্টেরিও হ্রদের উত্তর তটে, যার দক্ষিণ তটে আমার সুপরিচিত মার্কিনী শহর রচেস্টার। আয়তনে দুটি শহর প্রায় সমান, যদিও রচেস্টার নিউইয়র্ক শহর থেকে সাড়ে তিনশ মাইল দূরে। অথচ রচেস্টারের রক্ষণশীল সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশে নিউইয়র্কের ছোঁয়া স্পষ্ট; হ্যামিল্টন চল্লিশ মাইল দূরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে একেবারেই নিরেট মফঃস্বল। আমার সহকর্মী কেন্ সেখানে তার পিতৃগৃহে আমাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তার ছোটবোনেরাও পরদিন ক্রিসমাসের ছুটিতে বাড়ি এল। বিশেষত এই উপলক্ষে এদেশে ভাইবোনে দেখা হলে

'তীরন্দাজ' —হেনরী মূরে

পরস্পরকে চুমু না-খাওয়া যে কী অদ্ভুত ব্যাপার তা অনেকেই জানেন। তাই ওদের করমর্দন করতে দেখে আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। তরুণীদ্বয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার সময় মনে হল আমার পক্ষে বোধ হয় তাদের করস্পর্শ করাও অনুচিত হবে। সে যাই হোক, পরে কেনের কাছে শুনেছি হ্যামিল্টনে ওদের বয়সী ভাইবোনেরা নাকি এ-রকম আড়ষ্ট অভিব্যক্তির শাসনেই মানুষ হয়েছে এবং প্রেমসংশ্লিষ্ট মেলামেশাও তারা একটু আড়ালে আড়ালেই রাখতে শিখেছে। কেন্ তার বাপ-মার সাক্ষাতে সিগ্রেট পর্যন্ত খায় না এবং রাত্রিতে আমরা দুজনে মিলে যখন সরাবখানায় যেতাম তখনো আটাশ বছরের চাকুরে ছেলে কেন্ তার মা-কে অস্ফুটে বলে যেত, একটু বাইরে ঘুরে আসছি। আমাদের দেশের নেক-গলানো-স্বভাবের অভিভাবকদের সামনে ছাড়া এ-ধরনের ঢাকাঢাকি যে আরও কোথাও দেখতে হবে আগে ভাবিনি। অন্টেরিও হ্রদের মধ্যবিত্ত মার্কিনী তটে অন্তত এসব ব্যাপার চোখে পড়েনি। সেখানে অল্প-বয়সী মেয়েরা পুরুষ আত্মীয়-পরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাতে ওষ্ঠাধর বিষয়ে কিঞ্চিৎ রক্ষণশীল হলেও কপোলদ্বয় অকৃপণভাবেই এগিয়ে দেয়।

নিউইয়র্কের চাল অবশ্য আলাদা, কিন্তু সে-প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। চুম্বন বিষয়ে শুধু একটি প্রবল মানসিক বাধাই সেখানে আছে—পুরুষে-পুরুষে প্রকাশ্য চুম্বন। এটা অবশ্য একেবারেই অ্যাংলো-স্যাক্সন সংস্কার। কিন্তু সমাজের এমনই প্রবল ক্ষমতা, যাঁরা ধরুন রুশদেশে জন্মাবার অনেক পরে মার্কিনমুলুকে ঘর বেঁধেছেন তাঁরা পর্যন্ত এই ব্যাপারটিতে কালক্রমে সঙ্কোচ বোধ করেন। ঠোঁটে চুমু খাওয়া তো দূরের কথা। প্রসঙ্গত, মনে পড়ে গেল তরুণ রুশ কবি য়েভ্‌তুশেঙ্কো শেষবার যখন বরিস পাস্তেরনাকের সঙ্গে তাঁর শহরতলির বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলেন সে-বারের কথা। বৃদ্ধ কবি তরুণ অতিথিকে বিদায় দেবার সময় খানিক পথ সঙ্গে হেঁটে এলেন, তারপর তাঁকে গভীর আলিঙ্গনে ঠোঁটের উপর আবেগভরে চুমু খেলেন। য়েভ্‌তুশেঙ্কো লিখেছেন সেদিন বৃদ্ধ কবির ঠোঁটে ছিল লাইলাকের সুগন্ধ।

পাস্তেরনাকের নাম যখন এসে পড়ল তখন আমার সদ্য-দেখা ডক্টর জিভাগো ফিল্মটির কথা সংক্ষেপে বলি। মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ারের এই ১২০ লক্ষ ডলার পরিমাণ বিপর্যয়টি অচিরেই হয়তো কলকাতায় যাবে এবং কয়েক হাজার স্বল্পবিত্ত চিত্ররসিকের অর্থের অপচয় ঘটাবে। মূল "উপন্যাসের" সঙ্গে সামঞ্জস্যের কিংবা তার প্রতি বিশ্বস্ততার প্রশ্ন চলচ্চিত্রের উৎকর্ষের বিচারে প্রায়শই অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে দুটি আর্টফর্মের বিচ্ছেদের এক অর্থহীন পরিণতিই শুধু ঘটেছে, নতুন কোনো রূপসৃষ্টি হয়নি। মূল বইটিতে সহস্র প্রকার দুর্বলতাকে ছাপিয়ে তথাচ এক দৃঢ় ট্র্যাজেডি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, যে-কারণে বইটিকে ফেলে দেওয়া যায় না। পাস্তের-নাকের রক্ষণশীলতা তাঁর এক ধরনের গোঁড়া খৃষ্টান জীবনদর্শনের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। মূল্যবোধের ভিত্তিতে এই প্রচণ্ড বিশ্বাসের জোর না-থাকলে পৃথিবীতে কোন ট্র্যাজেডিই সম্মান পায় না। অথচ এই ব্যাপারটির বদলে চিত্রপরিচালক ভদ্রলোক যা তৈরি করেছেন তাকে বলা চলে "উদারনীতিক দর্শকের জন্য একটি উদারনীতিক ফিল্ম" —পাস্তেরনাকের ট্র্যাজিক রূপকল্পের মূলেই যা কুঠারাঘাত করে ডক্টর জিভাগো নামক একটি অপদার্থ অথবা অবান্তর চরিত্রসৃষ্টি করেছে। বইটিতে এক বিশেষ মানুষের হৃদয়ের এক অনস্বীকার্য বিষাদের কথা বলা হয়েছে, ফিলমটিতে আছে রাজনীতিসংলগ্ন মানুষের মামুলি এবং অগভীর অশান্তির চর্বিতচর্বণ। কলের পুতুলের মতো এক একটি স্ত্রী কিংবা পুরুষ চরিত্রকে পর্দায় টেনে এনে যেখানো হয়েছে তারা সবাই রুশ ইতিহাসের মঞ্চে নিবেদিত বলি। সাড়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী এই

তৃতীয় শ্রেণীর কাহিনীবিন্যাসের ধারায় হঠাৎ যখন দর্শককে জানান দেওয়া হয় যে জিভাগো একজন ডাক্তার এবং তদুপরি কবি, তখন, সত্যিই বলছি, বম্বে ফিল্মের সঙ্গে একমাত্র অর্থের অপচয় ভিন্ন তার অন্য কোন তফাত থাকে না। আর ক্যানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়েকে ধন্যবাদ, সাইবেরিয়ার দৃশ্যগুলি যে সাস্কাচুয়ান, অ্যালবার্টা এবং বৃটিশ কলম্বিয়ার রকি-অঞ্চল থেকে এলোমেলো তোলা হয়েছে সে-কথা কাউকে ব'লে দেবার দরকার হয় না। আশা করি সাইবেরিয়ার নিসর্গকে অমন গৃহপালিত জন্তুর মতো দেখতে নয়। একটি বিপ্লবী যুদ্ধের দৃশ্য আছে, তা দেখে সরলমতি শিশুরা হাততালি দিয়ে হেসে উঠবে, বড়োরা তা পারবেন না, কারণ তাঁরা জানবেন, সেখানে হাসা বারণ। তবে শিরোপা দিই শ্রীমতী জুলি ক্রিস্টিকে, এই অসম্ভব পরিবেশেও তাঁর অবিশ্বাস্য অভিনয় দক্ষতার জন্য।

সমীর দাশগুপ্ত

ত্রিলোচন কলমচি

দোলনা

'শঙ্খচিলের মত নিঃসঙ্গ দুপুর এখনো যেন বুকের মধ্যে তীক্ষ্ন ডাকে। এখনো যেন চারপাশে সবখোয়া যাওয়া খোয়াই আর খোয়াই; ছাদপেটাই মধ্যাহ্নে কাঠঠোক্‌রা রোদ্দুর শব্দ করছে শাল-সেগুনে। রূঢ়ভাষী লালমাটি, দেহাতী দাঁতনের মত মাথা ছ্যাতরানো তালযূথ, কামানো ঘাড়ে ঝাঁকড়া চুলের বাবড়ি নিয়ে তাড়িখোর খেজুর, দুগ্ধবতী ঘনছায়ায় নাড়িতে চিবুক রেখে দাঁড়ানো একপেয়ে রাখাল বালক কিংবা কাটালগাছের এ'টেল আশ্লেষে দুপুরের মত শ্রান্ত যুবতী। শান্তিনিকেতন এখনো আমার কাছে এই রকম, রূপকথার সবপেয়েছির দেশের মত। কল্কে-করবী-আকন্দর ঝোপ, মুচুকুন্দ-মাধবী, মউল-বউলের যৌন মদিরতা। এখনো চোখ বুজলে অনেক দুর্লভ বৃক্ষ-লতার মধ্যে নন্দলাল বসুর পেন্সিল স্কেচ আর রামকিঙ্করের অতিকায় স্টোন-লাইফ চোখে ভাসে, বাঁধের জলে অবাধ সাঁওতাল মেয়ে— তেপান্তর মাঠের বাইনোকুলার-স্তব্ধতা চোখে এসে লাগে......অ্যাম আই ক্লিয়ার? বাইনোকুলার-স্তব্ধতা কথাটা ধরতে পেরেছেন তো?'

কাব্যিক প্রলাপ থামিয়ে ঈজিচেয়ারে শায়িত আমার পৃথুল বন্ধুটি চোখ খুললেন।

'ঠিক অ্যারেস্ট করতে পারিনি', সবিনয়ে জানালাম, 'তবে প্রায় ধরেছি মনে হচ্ছে। দূরবীণে দূরের দৃশ্য চোখের চুম্বকে এসে ঠেকলেও কোনো রকম বীণ বাজেনা এই রকম মীন করছেন তো?'

'ইগ্‌জ্যাক্টলি সো! আপনার মধ্যেও পোয়েটিক টাচ ছিল গো। কবি-টবি হতে পারতেন চেষ্টা করলে। আসল ক—তা—'

আসল কথাটি প্রলম্বিত হয়ে থেমে যাওয়ায় আমিও ভদ্রলোকের চাউনি মাফিক তাকালাম। আমাদের বারান্দার সামনের পথ দিয়ে দুটি সাইকেল রিকশা যাচ্ছিল। পিছনের গাড়িটিতে গুটিদুই তনয়-তনয়া সম্বলিত হয়ে একজন প্রাক্‌-চল্লিশ শিথিল মহিলা অবাক হয়ে আমাদের দিকে দেখছেন মনে হল।

'কী মশাই?' রিকশাটি গেস্ট হাউসের দিকে এগিয়ে গেলে মুখোরোচক স্বরে সুধালাম।

'হু'! ঠিকই ধরেছেন...কিন্তু এক যুগ, বলতে গেলে যুগান্তরকাল পরে, বিশেষ বদলায় নি কিন্তু আশ্চর্য—'

'শুধু টোটালে বেড়েছে?' মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল আমার।

'কি বললেন?'

ঝাপসা কথাটাকে চেপে দিয়ে বললাম, 'ঠিক ধরতে পারলাম না কিন্তু। কে উনি?'

সোনার সিগারেট কেস থেকে একটি ডবল সাইজ বিড়ি বার করে বেশ নিবিষ্ট মনে সেটি ধরালেন। আমার কথা তাঁর কানে পেঁছেচে মনে হল না; ডুবো জাহাজের মত এখন তিনি হয়ত আর সারফেসে নেই। পূবপল্লীর মাঠের দিকে তাকালাম। দুপুরের ভরা বর্ষণের পর যেন শীতের গা-ধোয়া বিকেল নেমেছে।

স্যাটেলাইট সরেলের বিস্তীর্ণ ভূমিকার মধ্যে শান্তিনিকেতন যেন সত্যিই ওয়েসিস। দেশদেশান্তর জুড়ে যখন পেপার পয়জনিং, হোলটাইম ভিবেট আর রুদ্ধশ্বাস' সিলোয়েল, তখনও প্রায় আন্তর্জাতিক প্রশান্তি নিয়ে, নৈসর্গিক অনুকূলতায় গুটিকতক ছেলে-মেয়ে খোলা আকাশের নিচে বড় হচ্ছে, ভাবতেও ভালো লাগে। শুধু কি তাই? শান্তিনিকেতনে আসা এখন আউটসাইডার আমাদের কাছে রি-ইউনিয়মের মত। যারা অনেকদিন হল খোয়া গেছি, তামাদি হয়ে গেছি, সংসারের মধ্যে আকণ্ঠ প্রোথিত হয়ে গিয়েছি স্তব্ধ অভিজ্ঞতা আর মৃত প্রত্যয়ের মাইল স্টোনের মত। সেই আমাদের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয় এইখানে এসে, জীবনকে খোলার অজুহাতে বহু ব্যবহৃত চাবির মত যারা এখনো ঘুরছি।

'খাস যৌবনে আমার গুটি দুই মর্মভেদী কবিতার বইয়ের ইন্‌স্‌পিরেশন ছিলেন উনি', ঈজিচেয়ারে আধখাড়া হয়ে বসলেন

'ছেলো না কি?'
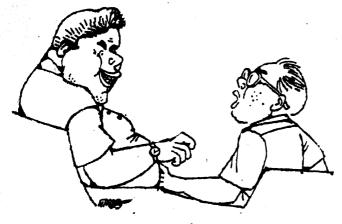
বন্ধুবর, "যাকে বলে fountain pain। কথা কিছু ধরা গেল?'

আনাড়ি হাসি হেসে বললাম, 'যাকে বলে পেইন-ফ্রেন্ড, তাই তো? বেদন বন্ধু।'

'আপনি মশাই—!' আনন্দের আতিশয্যে প্রায় হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে পড়ে আমার হাতে থামচা মারলেন, 'ছেলো নাকি?' হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাসলেন অনেকখানি।

আত্মচরিতে আর এগোলাম না। আমারও একদিন আমানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল সে কথা বলে আর লাভ কি। বললাম, 'আপনাকে দেখবামাত্র চিনেছেন, ভদ্র-মহিলাকে কিন্তু বাহাদুরিটা দিতে হয়।'

'চিনেছে বলছেন? হাই চিনেছে! আমাকে চেনা এখন প্রেটি ডিফিকাল্ট্! বিলীভ্ মি। এই চ্যায়রা ছেলো নাকি তখন্! বড় বড় বাবরি চুলের উল্টানী, দাড়ির উস্কানি সেসব এখন স্মৃতিকথা। তার বদলে উবুড় করা পেতলের কড়ার মত জাজ্বল্যমান টাক, এক নম্বর শিরীষ কাগজের মত গাল আর ডিংলাকৃতি ভুঁড়ি দেখে মহিলার পিতৃ-পুরুষেরও সাধ্যি নেই চেনে'—

আমার কনভার্ট বন্ধটি, কবি থেকে যিনি কনট্র্যাকটারিতে উন্নীত হয়েছেন, বিড়ির ধুনসী পার করে দিয়ে অভুক্ত সুক্ষ্যাংশটুকু ছুঁড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, 'চলুন ঘুরে আসা যাক।'

সত্যি বলতে কি, সেই মুহূর্তে বেরিয়েই টের পেলাম শান্তিনিকেতনের টান কি অসম্ভব টান। রিকশায় মোটরে জীপে কি অগুন্তি মানুষ পিলপিল করে তখনো আসছে, হোল্ডঅল, সুটকেশ, প্ল্যাডস্টোন ব্যাগ, ন্যাপস্যাক, বেতের ঝুড়ি, খবরের কাগজের পোঁটলা, ফ্লাস্ক-ওয়াটার বটল্ আরো কত আইটেম কাঁধে নিয়ে হাতে নিয়ে পায়ের কাছে ছড়িয়ে মানুষ আসছে। উদ্বাস্তুর মত পিলপিল করে পায়ে হেঁটেও মানুষ আসছে, এত মানুষ কোথায় বসবে, কোথায় শোবে, নিদেনপক্ষে খাবে দাবে, আদৌ আজ রাতে এদের পুনর্বাসন ঘটবে কিনা কিছুই আমার মগজে ঢুকলো না। শুধু ইনটিমেট ভাষাটাষা শুনে মুখ চোখ দেখে এইটুকুই মালুম হল, এ'রা কেবল নানা বয়সের নানা অবস্থার মানুষই নন, নানা রসের রসিকও বটে।

গেস্ট হাউস ডরমিটরি থেকে নিরিবিলি 'ডেরা' পর্যন্ত সব উত্তম-মধ্যম কুটীর অট্টা-লিকা মনুষ্য অধ্যুষিত, মনুষ্য-কবলিতও বলা চলে। গেস্ট হাউসের ডাইনিং হল, শুধু হল কেন, হলাহল সবই ক্ষুধার্ত মানুষের দ্বারা অবরুদ্ধ। তারই ফাঁকে ফাঁকে দু চারটে কুশল প্রশ্ন, কৃত্রিম বিস্ময়, আলগা আদর, অসংলগ্ন কথাবার্তা। এই যে দাদা, মনে আছে? আরে আপনি! খুকু, তুমি এখানে কার সংগে? বারে আমি যে এখানে কলা-ভবনে...সান্যাল দিদি এসেছেন নাকি আপনাদের সংগে? এই যে মশাই, উঠেছেন কোথায়? অ্যাঁ, জায়গা পেলেন। আমরা এখন কি যে করি! মশারি এনেছেন? যা রয়্যাল বেংগল মশা এখানে...বাবা, এযে পত্রকলত্রের একটি প্ল্যাটুন এনে হাজির করেছেন ভদ্রলোক। মিঃ গোস্বামী গুড্ ইভনিং, তা কোলে উটি? হেঁ হেঁ এই মানে নাতি না আর কি। অ্যাঁ? এখনো ডাইরেকট রিক্রুট চলছে মশায়।

ঘুরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। বোলপুর-সুরুল-শ্রীনিকেতন সর্বত্রই অথই কাণ্ড। বন্ধুবরকে বিদায় দিয়ে পূর্বপল্লীর মাঠ দিয়ে শর্ট কাট্ করছিলাম। জ্যোৎস্নার মশারির মধ্যে গোটা মাট রহস্য-ঝাপসা। মাঠের গভীরে এসে থমকে দাঁড়ালাম। বেশ বড়সরো একটি সার্কেল বসেছে যেন। প্রথমটায় ভেবেছিলাম ফাগুয়ার আগের রাতের নৃশংস সংগীত রসিকদের চক্র বুঝি। এখুনি মারাত্মক বাদ্যযন্ত্রটন্ত্র বাজিয়ে আসুরিক সাধনা শুরু হবে। কিন্তু না। জামাকাপড়ের চাকচিক্য, দু'চারজনের গলায় বৃহদাকার ফ্লাস্ক এবং ঘড়ি-চশমা ঝিকিয়ে উঠল। আরো কাছে যেতে তাদের মন্দ গলায় গান শুরু হল; বুঝলাম শ্যামবাজারে বনেদী-সন্তানদের কেউ কেউ এসেছেন। তাঁদের নিজস্ব সুরে এবং উচ্চারণে শান্তিনিকেতনকে এই একটা-রাত্তিরে আপন করে নিতে খুব বিলম্ব হয় নি : আঃ মদের সান্তিনিকেতন, মদের সহরতে আপন, আঃ—

কথার খেলাপও পয়েন্ট নয়, দূরে ইন্টার ন্যাশন্যাল গেস্ট হাউসের একতলার একটি গড়বর ফ্লুরেসেন্ট টিউব ওদের গানের তালে তালে চোখের খিঁচ্ দিচ্ছে মনে হল।

সকালবেলায় চরাচর জুড়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। গেস্ট হাউসের দুষমন সদৃশ উনুনে প্রভাতী আঁচ পড়েছে রাত থাকতে. কারণ ঘরে ঘরে বেড টী পোঁছানো চাই। ঘরে ঘরে রমণীয় জাগরণ ঘটেছে তারও বহু পূর্বে। গ্রীনরুম রূপী বাথরুমে কতজন দাঁড়াইবেক লেখা নেই. কিন্তু সেখানে লেডীজ প্যাসেঞ্জারে ছয়লাপ। সবাই সাজছেন, দ্রুত ক্ষিপ্র অধীর হাতে। প্রসাধন কুপিতাদের ঠেলায় পুরুষের দল ঘরের মধ্যেই ইতস্তত দাঁড়িয়ে গালে রেজার ঘষছেন। কেউ কেউ লাক্ষ্ণৌ পাঞ্জাবীর পাট ভাঙছেন. একজন তো লাউড কালারের অ্যাবস্ট্রাকট প্রিন্ট বুশশার্ট আর বারো ইঞ্চি ইরাণিক ট্রাউজ্ পরে চুল আঁচড়াতে গিয়ে বন্ধুজনকে শুনিয়ে শুনিয়ে উচ্চকিত হল : 'এটা দেখছ (এয়ার ইন্ডিয়ার সেই বিজ্ঞাপনের ছবির ভঙ্গিতে কুর্নিশ করে নিজের অধোদেশকে দেখালো) ফরেনে

কুর্নিশ করে নিজের অধোদেশকে দেখালো

এক্সপোর্ট হয়ে থাকে. ইটিও হট সেলার (রামকৃষ্ণ মুদ্রায় বুকের কাছে আঙুল বাঁকালো). সবার উপরে এই চিরুনী এ বাজার খাঁটি জার্মান মাল'—

বন্ধুদের একজন খিঁচিয়ে উঠলো, 'গুল্। ফলস্ মারিস না, অ্যাই চিরুনী আমি কাল মৌলালিতে সাড়ে চার আনায় কিনেছি।'

'তোমার মত অন্তত ফলস্ কেস্ নয়', সকালে সদ্য ধৃত বন্ধুর গলায় উষ্মা শোনা গেল, 'সকাল থেকে ব্লেড দিয়ে সাবানো ফানা চাঁচছো—শাক দিয়ে কি আর মাছ ঢাকা যায়'—

আম্রতলা ততক্ষণে আকুল হয়ে উঠেছে বসন্ত বন্দনায় : মউমাছি ফিরে যাচি ফুলের দখিনা। পাখায় বাজায় তার ভিখারির বীণা।

কিন্তু ভেতরে উঁকি মারা আমার সাধ্য নয়। সেই সুসজ্জিত নরনারীর ব্যূহ ভেদ করা আমার কর্ম নয়, ঘনলোকবৃত্তের বাইরেও অনেক জ্ঞানী গুণী মানুষ বেদীতে, মোড়ায় গাছের শেকড়ে বসে আছেন দেখলাম। এই নিশ্ছিদ্র ভিড়ের বাইরে থেকে ফলশ্রুতি লাভ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে কোনো কোনো গাছতলায় দাঁড়ানোও খুব নিরাপদ যুক্তি নয়, ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলাম বালখিল্যে ভর্তি। খেলার মাঠে fallন্ত বৃক্ষের তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকায় অবিলম্বে পা চালিয়ে দিলাম। ভিড়ের মধ্যে ভেড়ার থেকে কিংবা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিরমি খাওয়ার চেয়ে ভিড় প্রদক্ষিণ করা অনেক স্বাস্থ্যকর।

ক্যামেরাম্যান না বলে ক্যামেরা সাহেব বলাই বোধ করি ঠিক। কারণ ভেতরে বাইরে, বৃক্ষশাখে সর্বত্র সবচেয়ে মুভিংম্যান যাদের দেখলাম তারা সকলেই সাহেব, সকলেরই হাতে কিংবা ঘাড়ে ক্যামেরা, বেশীর ভাগই মুভী ক্যামেরা। ফিল্ম রীতিমত দাহ্য পদার্থ হয়ে ওঠায় বাঙালী বকসারদের দেখা এবার পেলাম না। সস্তায় বক্স ক্যামেরা হাতে ঝুলিয়ে সেই অ্যামেচার চিত্র-বিলাসীর দলকে দেখতে না পেয়ে মন কেমন করে উঠল। তবে উৎসবের ছবির সঙ্গে সঙ্গে ইতস্তত প্রাপ্ত ইণ্ডিয়ানাদের প্রতিও ক্যামেরার কটাক্ষ ছুটেছিল। বিলাতযাত্রার এমন সহজ পন্থা চোখে পড়ায় তরুণীর দলও ফিচার ফিল্মের হিরোইনের মত ক্ষণচঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন।

সম্ভবত একটি নকল শকুন্তলাকে দেখলাম, ছিপছিপে সাদা শাড়ি পরে একটি মিশকালো বঙ্গজকুত্তাকে কোলে নিয়ে আশ্রম বালিকার মত হাঁটছিল। কিন্তু কেন জানিনা এই কম্বিনেশন সাহেবী ক্যামেরায় চোখে ধরলো না।

বসন্তোৎসব শেষ হতে না হতেই ফাগ খেলা শুরু হয়ে গেল। সুবিধে এই এখানে নির্জলা হোলি, পানটা সিগারেটটা আনতে যাঁরাই বোলপুরে গেছেন তাঁরাই জানেন বোলপুরী হাঁন্দোল এখানে নিশ্চিহ্ন। বাঁদুরে রঙে মুখ বিকৃতি কিংবা নিকষ পিঠচাপড়ানির কোনো সম্ভাবনা নেই। অবিশ্যি মধ্যবিত্ত জীবনে দোল এবং দোলনা দুটোই শৈশবচারি ব্যাপার। গড়ের মাঠে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যাঁরা আজ আর ফুচকা-আলুকাবলী-দহিবড়া খেতে পারেন না, তাঁদের ইচ্ছাপূরণ করে অবাঙালী রেস্তোঁরা। তেমনি এখানেও অনেক মার্কেট ম্যাগনেট, ডেসপারেট পোয়েটস, অধ্যাপক, চিত্রনটনটী, পাত্রপক্ষ কন্যাপক্ষ এবং বহু হানিমুনারস এসেছেন নীরবে রঙ খেলতে।

একজন দুশো পাউণ্ডের সুটেড বুটেড নব্যবঙ্গ উঠে বসে আছেন

একটি আমগাছে দেখি কয়েকটি সাঁওতালনী উঠেছে। কিন্তু গাছের প্রথম হাড়িকাট সদৃশ প্রকাণ্ড ক্রসিং-এ একজন দুশো পাউণ্ডের স্যুটেডবুটেড নব্যবঙ্গ উঠে বসে আছেন। বন্যেরা বনে সুন্দর সাঁওতালনী আম্রবৃক্ষে, এরকম একটা মুগ্ধ দৃষ্টি চোখে ছড়ানো। ফলে ট্র্যাফিক জ্যাম, কেউ নামতে পারছে না। এদিকে বাবুর মনে রং ধরেছে—কিন্তু সাঁওতালনী ক্ষুব্ধ মার্জারীর মত ফুঁসছে—তার রং আইডিয়ায় বাধছে। তার সমাজে বোধ হয় রং দেওয়ার অন্য অর্থ হয়। ফলে বাবুর পিঠে গুটি কতক কিল পড়লো। একেই বোধ হয় গাছেরও খাওয়া তলারও কুড়নো বলে।

আমি আর দাঁড়ালাম না। আজানুলম্বিত টেরিলিনের আলখাল্লা পরা, মাথায় চুল-চুড়ো বাঁধা, বিশালবপু চৈনিক মহাদেওকে পাশ কাটিয়ে, বাঙালী ননদিনীর বিলাতী বউদিদের অঞ্চল এড়িয়ে, বীট্‌লমূর্তি তরুণ আমেরিকানকে পিছনে ফেলে আমি সিংহ সদনের দিকে এগোলাম। ঘণ্টাতলায় লাইব্রেরী কিনারে ইতস্তত তখন ছোট ছোট নাচগানের আসর বসেছে। অন্য দিকে লম্বা 'কিউ', চা-জলখাবার-সরবতের জনতা।

একটি বৃক্ষতলে কয়েকটি পাতিপ্রোডিসার, একস্ট্রা ক্যামেরাম্যান এবং কতিপয় মণ্ডকন্যা গোল হয়ে বসে বসন্তের গান ফেঁদেছে। খবরটা রটে যেতেই পিলপিল করে লোক দৌড়লো। একজনা তার মধ্যে রুপোলী পর্দার প্রাক্তন হিরোইন, তিনিই লীড করছেন। হাতে চাবির গোছা, নর্তকীর মত বাজাচ্ছেন। যে চাবির গোছা সারাজীবন খুঁজেও তিনি পেলেন না তাই মুঠো করে ধরেছেন তিনি এইবার। তথ্য থেকে যেন তত্ত্বে পেঁছে গেছেন। কিন্তু সকলকে হার মানালো সেই বিহারী নিঃসঙ্গ লোকটি, চীনাসিঁদুরের মত একটি ঝোলা কাঁধে। সকলের অগোচরে সকলকে রাঙিয়ে যাচ্ছে সে, চুপিচুপি তার সামনের মানুষগুলির পিঠে সে রঙ ছুঁড়ে মারছে। রঙের রহস্য সেই উদ্‌ঘাটন করেছে মনে হল।

পরিচিত এক পত্রিকা সম্পাদকের সঙ্গে দেখা। মুচকি হেসে বললেন, 'নতুন সংযোজন কি দেখলেন এবার?'

আমি সংক্ষেপে বললাম, 'পকেটমার শিশিবোতল কুড়ুনে আর ভিখারী।'

গ্লীম ক্যাণ্ডিড
গ্লীম কুইন

গানের আসর

বাগেশ্রী বনাম বাগেশ্রী কানাড়া

আমাদের একজন সুধী বন্ধু প্রশ্ন তুলেছেন "বাগেশ্রী কানাড়া" বলে কোনও রাগের বিশেষ তাৎপর্য আছে কিনা, কারণ বাগেশ্রী রাগটিই হচ্ছে কানাড়ার একটি বিশিষ্ট রূপ এবং এটিই শুদ্ধ কানাড়া বলে অনেকের বিশ্বাস। আমরা অবশ্য "বাগেশ্রী কানাড়া"কে একটি পৃথক রাগ হিসেবে নির্দেশ করতে দেখেছি এবং "গোরে গোরে মুখপর" গানটিকে অনেকে এই রাগ আখ্যা দিয়ে থাকেন। এটি বাগেশ্রীরই একটু মিশ্র-রূপ। চড়ায় যাবার সময় অনেকে এই রাগে পঞ্চম লাগান যা বাগেশ্রীর নিয়ম নয়।

কর্ণাট-রাগটির চলিত রূপেই যে কানাড়া সেটি আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এটি কতদূর সত্য তা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য, কারণ কর্ণাট থেকে কিভাবে কানাড়া শব্দটির উৎপত্তি হল তা জানা যায় না। তবে, কর্ণাট বহুকাল থেকেই অতি-প্রসিদ্ধ রাগ। কর্ণাট গৌড় নামেও একটি রাগ ছিল যা আমাদের গৌড়জন গাইতেন কিন্তু এটি গৌড়-কানাড়া নামে খ্যাতিলাভ করেনি। "কাহ্নরা" নামে যে একটি প্রসিদ্ধ রাগ ছিল এটি বিবিধ উল্লেখ থেকে জানা যায় এবং এর সঙ্গেও বহু রাগের মিশ্রণ ঘটেছে; যেমন কাহ্ন-গুর্জরী মধ্যযুগের একটি অতি প্রচলিত রাগ ছিল। এই "কাহ্নরা" বা কানহুরা' থেকেই সোজাসুজি "কানাড়া" শব্দটি চলে এসেছে। কানাড়ার স্বর-সংযোজনা এমন ছিল যে, তাতে বহু মিশ্রণের সুযোগ পাওয়া যেত। ক্রমে মিশ্ররূপগুলিই অস্তিত্ব রক্ষা করে রইল আসল কানাড়ার রূপ আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

অষ্টাদশ কানাড়ার কথাও আমরা সবাই জানি যদিচ এ সম্বন্ধেও মতভেদ বর্তমান। এই আঠারোটি কানাড়া হচ্ছে—

দরবারী, নায়কী, মুদ্রাকী, কৌশিকী, হোসেনী সুহা, সুঘ্রাই, নাগধ্বনি, কাফি, শ্যাম, গারা, কোলাহল (কোহল), টঙ্ক (টঙ্ক), জয়জয়ন্তী, আড়ানা, বাহার, শাহানা এবং বাগিশ্বরী (বাগেশ্রী)।

সম্ভবত এই কানাড়াগোষ্ঠী আকবরের সময়ে বা তাঁর অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ এর মধ্যে "দরবারী" রয়েছে যা তানসেন রচনা করেছিলেন। এর পরেই ওস্তাদদের মধ্যে গোলমাল লাগল কোনটি কানাড়ার শুদ্ধ রূপ? তানসেনের সমর্থকরা বললেন দরবারীকেই শুদ্ধ কানাড়া বলা সঙ্গত। অপরপক্ষ এটা মানলেন না, তাঁরা শুদ্ধ কর্ণাট বা "শুধ্ কর্ণাট" নামক আর একটি রাগের নজির দেখালেন। "মান-কুতূহল" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে "শুধ্ কানাড়া বা শুদ্ধ কানাড়া নামক রাগ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন কানাড়াকে ধনাশ্রী রাগের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তখনই তাকে শুধ্ কানাড়া বলা হয় এবং এরই অপর নাম বাগেশ্রী। এই গ্রন্থে পুরিয়াকেও কানাড়ার মধ্যে ধরা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কানাড়া যখন ধুলেশ্রী এবং মঙ্গলাষ্টকের সঙ্গে একত্রিত হয় তখনই সেটি হয় পুরিয়া। আমরা ধুলেশ্রী এবং মঙ্গলাষ্টকের কোনটাই শুনিনি—অতএব পুরিয়া যে কিভাবে কানাড়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল তা নির্ণয় করতে অক্ষম। তবে কোমল গান্ধার এবং কোমল নিষাদযুক্ত একপ্রকার ধনাশ্রীর প্রচলন বহু পূর্ব থেকে আছে। এর আরোহণে রেখাব এবং ধৈবত লাগে না কিন্তু অবরোহণে সবগুলি পর্দাই লাগে, কেবলমাত্র গান্ধারকে কিছু বক্রভাবে লাগান হয়। হয়তো এক সময়ে এই জাতীয় ধনাশ্রীর বিশেষ প্রচলন ছিল এবং এরই সঙ্গে কানাড়ার মিশ্রণ করা হয়েছে। কিন্তু মূল কানাড়ার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। মানকুতূহল গ্রন্থের অনুবাদক ফকীরুল্লাহ্ বলছেন কানাড়ার বিভিন্ন মিশ্রণ এনে তানসেন দরবারী কানাড়া রচনা করেন এবং আকবর নিজে এই নামটি অনুমোদিত করেন। তিনি এটিকে বিশুদ্ধ কানাড়া বলে স্বীকার করেননি বা এসম্পর্কে কোন মন্তব্যও প্রকাশ করেননি।

বর্তমান যুগেও "দরবারী কানাড়া" বা "বাগেশ্রী"র মধ্যে কোনটিকে বিশুদ্ধ কানাড়া বলা যাবে তার নিষ্পত্তি হয়নি। গোপেশ্বর-বাবু দরবারীকেই শুদ্ধ কানাড়া বলে স্বীকার করেছেন। তাঁর "সঙ্গীতচন্দ্রিকা" নামক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—"কেহ কেহ কানড়া এবং দরবারী কানড়া এই দুইটি পৃথক রাগিনী মনে করিয়া কানড়ার যাহা

গ ও নি কোমল ঠাট করেন তাহা সম্পূর্ণ ভুল, অর্থাৎ যাহা শুদ্ধ কানড়া উহাই দরবারী কানড়া অথবা মহাকানড়া নামে খ্যাত, ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দীর্ঘ এবং শুনিতে অতি মধুর তজ্জন্য সম্রাট আকবর বাদশাহ-এর অতি-প্রিয় থাকাতে দরবারী কানড়া নাম হইয়াছিল। কানড়ারই "ধ" সুর স্বাভাবিক করাতে সাহানার উৎপত্তি। আড়ানা, সাহানা, হোসেনী প্রভৃতি রাগিনীগুলি আধুনিক।" কেবলমাত্র অনুমান বা সাধারণ জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে এই ধরনের মতামত প্রকাশ করা অসমীচীন। শাহানা বা আড়ানা মোটেই আধুনিক নয়। বর্তমান দরবারী কানাড়াই যে তানসেন গাইতেন তারই বা প্রমাণ কি? মধ্যযুগের একাধিক গ্রন্থে বলা হয়েছে তানসেন কানাড়ায় মল্লার এবং কল্যাণ সংযোগ করে দরবারী কানাড়া রচনা করেন। এ মিশ্রণ কিভাবে সম্ভব হয়েছিল আমরা জানি না। তবে মনে হয় বর্তমান দরবারীও বোধ হয় যথার্থ তানসেনের দরবারী নয়।

কথা হচ্ছে শুদ্ধ রাগ আমরা কাকে বলব? যার মধ্যে মিশ্রণের ভাগ কম, ব্যক্তিত্ব প্রবল এবং যার একটি বলিষ্ঠ স্বকীয় রূপ আছে তাকেই শুদ্ধ রাগের পর্যায়ে ফেলা উচিত। বাগেশ্রীর মধ্যে আজও এই সব কটি গুণই বর্তমান। কিন্তু বাগেশ্রীর সঙ্গে তুলনা করলে দরবারী দুর্বলতর, কেননা এতে মিশ্রণের ভাগ অধিক, এতে মাদকতার পরিমাণ যতখানি বলিষ্ঠতার এবং স্বকীয়তার পরিমাণ ততখানি অধিক নয়। তাছাড়া বাগেশ্রী স্বনামেই মহিমান্বিত কিন্তু দরবারী আসলে "সেনী কানাড়া" "মহাকানাড়া" বললে বাড়িয়ে বলা হয়। রাজা মান সঙ্গীত বিষয়ে আকবরের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি নিজে এবং নায়ক বখশুর মত গুণী ব্যক্তি বাগেশ্রীকেই শুদ্ধকানাড়া বলে স্বীকার করে গেছেন। দরবারী কানাড়াই যে শুদ্ধ কানাড়া এমন দাবী তানসেন নিজে করেননি এবং পরবর্তী-কালের অথরিটিরাও অনেকেই এমন মত পোষণ করতেন না। বাগেশ্রী অঙ্গে শুদ্ধ-ধৈবত একটি প্রধান স্বর; দরবারীতে এটি কোমল ধৈবত হওয়ায় যে ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হয়েছে তা কানাড়ার সঙ্গে একজাতীয় নয়। অতএব এ বিষয়ে মতান্তরটা জীইয়ে রাখবার বোধ করি তেমন সঙ্গত কারণ নেই। এখন বাগেশ্রীকে শুদ্ধ কানাড়া বলবার বিপক্ষেও একটা যুক্তি আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, বাগেশ্রীতেও কিছু মিশ্রণ আছে এবং প্রাচীন শুদ্ধ কানাড়ার স্বরূপ আমরা জানি না। তথাপি মূল কানাড়ার রূপ যে কি ছিল তা যখন কেউ শপথ করে বলতে পারেন না তখন বাগেশ্রীকে শুদ্ধ কানাড়া বলে স্বীকার না করলেও মুখ্য কানাড়া বলে স্বীকার করাই বোধ হয় সমীচীন।

বাগেশ্রীকে একটু এদিক-ওদিক করে,

কীর্তনিয়া শ্রীনবকুমার পাল

কানাড়ার দু-একটি "কম্বিনেশন" যোগ করে "বাগেশ্রী কানাড়া" নামক একটি রাগসৃষ্টির প্রয়াস বিশেষ চিন্তাশীল উদ্ভাবনার পরিচয় দেয় না। এই রাগের পুঁজিও বেশী থাকবার কথা নয়; কেননা আসলে "বাগেশ্রী কানাড়া" একটি কৃত্রিম-ধুন যা বাগেশ্রীর প্রভাবে সৃষ্ট হয়ে থাকে।

অবশেষে একটি কথা। "বাগেশ্রী" শব্দটা বিকৃত। এটি "বাগীশ্বরী" নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং সেই নামেই এর প্রচলন হওয়া উচিত।

পদাবলী কীর্তন

অনেক আসরে আমাদের ডাক পড়ে, কিন্তু কীর্তনের আসরে কদাচিৎ। পদাবলী কীর্তনের প্রতি আমাদের এই অবহেলার সুযোগে শনৈঃ শনৈঃ প্রচলিত মনোহরশাহী ঢঙে যে সব পরিবর্তন আনা হচ্ছে সে বিষয়ে আমরা তেমন সচেতন নই। কোনও কোনও শিল্পী নিজেদের প্রতিষ্ঠার সুযোগ নিয়ে কীর্তনকে এমন একটা বস্তু করে আনছেন যাতে কীর্তন শুনলে ধাঁধা লেগে যায় আসলে সেটা ধ্রুপদের অপভ্রংশ না খেয়ালের অপভ্রংশ। ঠুংরীও যে মাঝে মাঝে চালিয়ে দেওয়া না হচ্ছে তা নয়। মাঝে মাঝে পদাবলী কীর্তনকে আধুনিক গান বলেও ভুল হয়। বলা বাহুল্য আকাশবাণীর আনুকূল্যে এই সব কীর্তনমাধ্যের মহাসমারোহে প্রচারিতও হচ্ছে। প্রথমটা এক-আধজন এই অরিজিন্যালিটি দেখাচ্ছিলেন। পরে আরও অনেকে যখন দেখলেন উক্ত ধোঁকাবাজিতে পণ্ডিতসভা থেকে উপাধি লাভ করা যায় এবং আকাশবাণীতে আসনটি পাকা হয় তখন তাঁরাও মহাজনপন্থা অবলম্বন করতে আরম্ভ করলেন। এইভাবে যাঁরা গুরুস্থানীয় তাঁদের অভিমত এই যে, কীর্তনে তাঁরা শুদ্ধ রাগ প্রদর্শন করছেন এবং গায়কীর যে ভ্রান্ত ঐতিহ্য চলে আসছে তাকে সংশোধন করে নিচ্ছেন। অতএব কোনও ক্ষেত্রে পদাবলী কীর্তন ধ্রুপদে পরিণত হচ্ছে, কখনও খেয়ালে, ঠুংরীতে। সংশোধন একটু অধিক অগ্রগামী হলে তা আধুনিকে পরিণত হচ্ছে। এঁদের সংশোধনস্পৃহা যতখানি বাংলার সঙ্গীত সম্বন্ধে ধারণাটা যদি ততখানি স্পষ্ট হত তাহলে দুঃসাহস এই পর্যায়ে আসত না। তা ছাড়া যে প্রতিভা থাকলে কীর্তনের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করেও সাংগীতিক দিক থেকে সমৃদ্ধিসাধন করা যায় তা এঁদের নেই। কিন্তু সাধ্য না থাকলেও সাধ আছে এবং সে সাধ পূর্ণ করবার মত প্রতিষ্ঠানের বা পৃষ্ঠপোষকের অভাব নেই। আর পদাবলী কীর্তনের বেলায় সঙ্গীত সংস্কৃতির রক্ষকবৃন্দ উদাসীন। এ তো আর সোসাইটির ব্যাপার নয়—ওসব খোল-করতাল নিয়ে মাথা ঘামানোর ইচ্ছে বা অবসর কোনোটাই তাঁদের নেই।

যাক, কীর্তনের এহেন পরিস্থিতিতে যখন যথার্থ রসসৃষ্টির প্রয়াস দেখতে পাই তখন অকুণ্ঠিত সাধুবাদ না জানিয়ে পারি না। দিন কয়েক আগে চালতাবাগানের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্মিলনীতে শ্রীমান নবকুমার পাল মহাশয়ের "রূপাভিসার" পদাবলী কীর্তন শুনে চমৎকার লাগল। ঘণ্টা দুয়েকের অনুষ্ঠানে তিনি কীর্তনের একটি যথার্থ রসসমন্বিত রূপ আমাদের কাছে তুলে ধরলেন। তাঁর প্রতি আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ এইজন্য যে কোথাও স্বকীয়তা প্রকাশের জন্য কোনও বিজাতীয় কলা প্রদর্শনের আগ্রহ তিনি দেখাননি। তাঁর গায়কীর মধ্যে কীর্তনের প্রচলিত ধারার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়েছে এবং পদাবলী কীর্তনের গাম্ভীর্যপূর্ণ বিন্যাসকেও তিনি সযত্নে রক্ষা করেছেন। এইটুকুও আজকাল দুর্লভ হয়ে পড়েছে। কীর্তনের অন্তর্বর্তী কথ-কতার ধারাটিও তাঁর মনোরম। প্রসিদ্ধ কীর্তনিয়া নন্দকুমার দাস মহাশয়ের কয়েকটি বিশেষ গুণ তাঁর মধ্যেও দেখা গেল এবং জানা গেল নন্দকুমারের কাছেও তিনি বেশ কিছুদিন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি কীর্তনের বহু প্রাচীন তালের পরিচয় দিয়েছেন এবং জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, শশিশেখর বসু, রায়ানন্দ, মাধবেন্দ্র পুরী প্রভৃতি পদকর্তাদের অংশগুলি সুললিতভাবে আখরসমেত গেয়ে শুনিয়েছেন। আমরা আশা করব তিনি নূতন পথ সাধনে ব্রতী হয়ে সুলভ জনপ্রিয়তা অর্জনের লোভ সম্বরণ করবেন। বৈষ্ণব সম্মিলনীর বিদগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলকেও আমাদের ভাল লেগেছে। এমন পরিবেশও দুর্লভ।

শার্ঙ্গদেব

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

বিশ

গাজীটা এতক্ষণ ধরে কী ভেবেছে, কে জানে। শুনি, গুনগুনিয়ে টেনে টেনে গান গায়;

'সুখে-দুঃখে যে ভাবে হে,
থাকি যেথা সেথা।
যেন তোমার নামের মালা
আমার প্রাণে থাকে গাঁথা।
ওহে, আমি তোরে ভুললে
তোর যায় না মমতা।
তবে কি না, তুমি আমারে ভুললে,
আমার সকলি বেরথা।'......

আমি যেমন করে শুনি, তেমনি করে গায় না গাজী। এই পুব-দক্ষিণা নোনা-কূলের উচ্চারণে গায়। কিন্তু প্রতিটি কথা এমন স্পষ্ট যেন আর একবারও তার গলায় শুনিনি। অথচ গলা তার চড়া নয় মোটে। সে আমার কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে দিয়ে চলে। অস্পষ্ট আলোয় দেখি, ঝোলা কাঁধে, পাগড়ি মাথায়, পেছনে বাবরি। এই আলোতে তার আলখাল্লার রঙ বোঝা যায় না। তার আর আমার দুজনেরই অস্পষ্ট ছায়া আমাদের পায়ে পায়ে চলে। তার মুখ নদীর দিকে ফেরানো, যেদিকে আমাদের গতি। যেখানে বাঁয়ের কোণে কয়েকটি মিটমিটে আলো দেখা যায়। নদীর ওপারে ন্যাজাটের দু-একটি আলোও চোখে পড়ে। কুয়াশা নয়, অথচ দেখা-না-দেখার কী এক হালকা আবরণে যেন সব ঢাকা পড়ে গিয়েছে। হয়তো আধখানা চাঁদের এই মায়া। ডাইনে বাঁয়ে সব যেন শূন্য, অশেষে হারানো। কেবল গঞ্জের যে কয়টি মিটমিটে আলো দেখা যায়, তার এক পাশে কোথায় যেন্ আগুন জ্বলে। যে আগুনের হাত যেন থেকে থেকে আকাশে হাত বাড়ায়। মাঝে মাঝে তার শিখা দেখতে পাই। যার আলোয় খানিকটা জায়গা জুড়ে রক্তিম আভা কাঁপে। যে আভাতে একটি গাছ ভেসে ওঠে। সব মিলিয়ে যেন এক আদিম ছবি। তার সঙ্গে গাজীর এই গান।

কেন, গাজী এখন এ গান গায় কেন। কার মনের কথা বলে সে। কাকে সে ভোলে, তবু যার মমতা যায় না। অথচ সে ভুললে তার সকলই বৃথা। আমি তো কেবল কাজল মাখানো ডাগর চোখ, পান খাওয়া লাল ঠোঁট, এমন কি বিঁড়ি টানা সেই আঙুরলতার মুখখানিই দেখি।...

গাজী যখন গান থামায়, তখন জিজ্ঞেস করি, 'এ গান কার?'

গাজী ফিরে চায়, কাছে এগিয়ে আসে। বলে, 'তা তো জানি না বাবু। মনে পড়ি গেল, তাই। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, 'কেন মনে পড়ি গেল?' কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারি না। আমি তখন তথ্যসন্ধানী হই। জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা, মাহাতো দেখলাম তোমার এত কথা বলে। কিন্তু মাহাতোরা তো এ-দেশের লোক নয়।'

গাজী বলে, 'সে কথা তো ঠিক বাবু, মাহাতো চাচারা এ-দেশির লোক না। তবু শুনিচি, তিন চার পুরুষ আগে এরা এসিছিল। তখন ত এসিছিল, বাবু, আবাদের চাষের মজুর হয়ি। আর এখন দ্যাখেন, কত জমির মালিক। এখন নামে মাহাতো। ঘরে গেলি দ্যাখবেন, সব এ-দেশির মতন। পুজো-পারণ ঘর-গেরস্থালি, যা বলেন।'

তা বটে। চার পুরুষ আগে যারা এই নোনা গাঙের কূলে এসেছে, মাটিকে মিষ্টি করেছে, তারা এই মৃত্তিকারই মানুষ। মাহাতো কুরমি, ওরাওঁ মুণ্ডা সাঁওতাল, এসব বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে, ভারতবর্ষের অন্য সীমান্ত। যেখানে মাটির রঙ ভিন্ন, বনের রূপ আলাদা। প্রকৃতি যেখানে উঁচু নিচু, পাথরে মাটিতে মেশানো।

তবু না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'তোমার চাচীর কথা তো আলাদা। সে কোন্ দেশের।'

অস্পষ্ট আলোয় দেখি, গাজীর মুখে হাসি চিকচিক করে। বলে, 'বাহ্ রে বাবু

দেখি বড় কান খড়খড়ি মানুষ। কোন কিছু ফাঁক যায় না।'

বলি, 'না, তোমাদের কথার সঙ্গে মিল পেলাম না কি না, তাই।'

গাজী বলে, 'পাবেন কেমন করি বাবু, চাচী তো এ-দেশির মেয়ে না।'

তবে কোন্ দেশের। নিশ্চয়ই সেই, 'উ'চা উ'চা পাবত' দেশের 'শবরীবালা' সে নয়। কারণ, তার কথার মধ্যে সে উচ্চারণও ছিল না।

গাজীই তার জবাব দেয়, 'সেও এক বিত্তান্তবাবু। অই যি দ্যাখলেন মাহাতো চাচাকে, ও'নার তিন বিয়া।'

'তিন বিয়া? মানে তিন বউ?'

'হ্যাঁ, ওর তিন বিবি কি আর আছে। পেথম বিবি ব্যামোয় মরে। দোসরা বিবি হারায়ি গেছে।'

'হারিয়ে গেছে? কেমন করে?'

'সে কথা বাবু কেউ বলতি পারে না। তর—'

গাজী সুর টানে, কথা শেষ করে না। তাকিয়ে তার মুখ ভাল দেখতে পাই না। মুখটা তার নিচু, মাটিতে নিজের ছায়ার দিকে। একটু চুপ করে থেকে বলে, 'তর শুনিচি, আমাদের সে চাচীর চরণ দুখানি নাকি বড় চঞ্চল ছিল। পথের মানামানি ছিল না।'

গাজীর নিচু অন্ধকার মুখের দিকে তাকাই। কথাটা ঠিক ধরতে পারি না। তবু মনে হয়, কিসের এক ইঙ্গিত যেন, আঁধারে চিকচিক করে।

গাজী নিজেই আবার সেটুকু স্পষ্ট করে তোলে, 'কথাখানি ধরতি পারলেন তো, বাবু। পথের মানামানি না থাকলি কি চলে। তা সে মেয়েলোক বলেন, আর পুরুষলোক বলেন, একদিন তুমি আঘাটায় যেয়ি পড়বে। তা, আমাদের সে চাচীও কোন আঘাটায় যেয়ি পড়িছে, কেউ জানে না। সে নিজিই হারায়ি গেছে।'

কথাটা আর অস্পষ্ট থাকে না। মাহাতোর দ্বিতীয় বউ স্বামিত্যাগিনী। আমার অবাক লাগে গাজীর বচনে। কুলত্যাগিনীর নামে সে কত বিশেষণ জুড়তে পারতো। বউয়ের নিজের ইচ্ছায় হারিয়ে যাওয়ার মধ্যে যেটুকু পাপের কথা আছে, 'চরণ দুখানি নাকি বড় চঞ্চল ছিল' এইটুকুতেই তার ধরতাই। এবার যা বোঝার তা বুঝে নাও। আর কোন কটুকাটব্য নেই। ক্ষোভে রোষে কোন ব্যঙ্গ বিদ্রূপ নেই। বরং দেখ, গাজী মুখ তোলে না। মাথার পাগড়ির ছায়ার তার মুখ সেই অন্ধকারেই ঢাকা। কুল ছেড়েছে মাহাতোর বউ, যেন তাতে গাজীর বড় লজ্জা। সে দুঃখিত। এই কি গাজীর মন, না কি শালীনতা, বুঝতে পারি না। যেটাই হোক, এমন মেলা দায়। তাও কি-না ঝুলি কাঁধে করে ফেরা এক গাজী দরবেশের কাছে।

এবার আমার চোখে ভাসে মাহাতোর মুখখানি। গাজীর মন তো তার নয়। তার যে মূর্তিখানি দেখলাম, তাতে যে সে সব কিছু ধুলোর মত উড়িয়ে দিয়েছে, মনে তো হয় না। তার ওই লাল চোখে কি আগুন জ্বলে নি। না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'মাহাতো কিছু করে নি? বউয়ের খোঁজ খবর করে নি?'

গাজী মুখ না তুলেই জবাব দেয়, 'খোঁজ খবর আর কী করবে, বাবু। অজানা তো কিছু না! তয়, মাহাতোর রক্ত তো চাচার শরীলি। খবর পেয়িছিল, বউ নসরতের সঙ্গি মোল্লা-খালির দিকি গেছে। চাচা মোল্লাখালি

দৌড়াইছিল। বউ ফিরিয়ি আনবার জনি্য না, দ্ইখান মুন্ডুর জনি্য। সেখানে যেয়ি শ্নলে, নসরত বউ নিয়ি জঙ্গলে চলি গেছে। চাচাও নাকি জঙ্গলে গেছিল, এক মাস ঘরে ফিরে নাই। চখে দেখি নাই, শুনিছি, হাতে একখান ভল্লা নিয়ি চাচাকে নাকি সেই পাথিরালা থেকি রাইমঙ্গল তক সবাই ঘুরতি দেখিছে।'
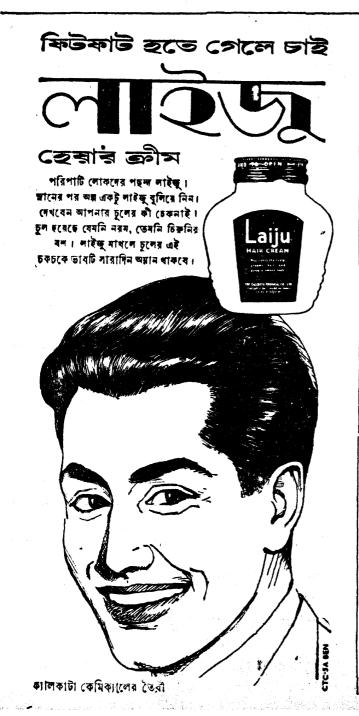
আমার চোখের সামনে আবার মাহাতো ভাসে। কিছু না হোক, বারো বছর আগের মাহাতো হবে, যে ভল্লা নিয়ে সুন্দরবনের জঙ্গলে জঙ্গলে বউ আর তার সঙ্গীকে খুঁজে ফিরেছিল। সেই মূর্তিকে দেখতে পাই যেন। কুচকুচে কালো এক ভয়ংকর মূর্তি। যার আহার নিদ্রা ভল। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে চোখে। হাতে ভল্লা, পরনে একখানি লজ্জা নিবারণের ত্যানি।

জিজ্ঞেস করি, 'তারপর?'

গাজী বলে, 'তারপরে আর কী, বাবু। চাচা ঘরে ফিরি এল, তাদের দেখা পায় নাই। তয়, মজা কী জানেন বাবু, বছর না ঘুরতি নসরত বান্দর ফিরি এল। তখন লড়াইয়ির সময়, আকাল। নসরতের যা একআধটুকু জমি, সবই তো ভোলা-খালিতে। এসি পড়ল একেবারে মাহাতো চাচার গোড়ে।'

জিজ্ঞেস করি, 'সেই বউ?'

'আসে নাই। চাচাও তো সে কথাই পুছ্ করিছিল, "সে কই।" নসরত বলিছিল, বউ তাকে ছেড়ি গেছে।'

আমিই অবাক হয়ে পুছ করি, 'ছেড়ে গেছে?'

'হ্যাঁ বাবু, সেটা মিছা না। নসরত তো তার সব ছিল না। নসরত ধরা তার স্বভাব ছিল যে। আবার আর এক নসরত ধরি সে চলি গেছে। আর এই বান্দর ফিরি এসিছে। যাবে কমনে। নিজির চাষবাস বিবি ছাওয়াল সব ফেলি গেছে না? আর ভোলাখালিতি থাকতি হলি, মাহাতো চাচার গোড়ে না পড়লি কী থাকা যায়?'

'মাহাতো কী করলে?'

এইবার গাজী মুখ তোলে। বলে, 'খুন করে নাই, বাবু। নিজির বউকে তো সে জানত। সব কথা শুনি-টুনি খালি বলিছিল, "যা নিজির চাষবাস দ্যাখ্ গা।" তা সেই বান্দরের হাল আজ দ্যাখেন।'

সেই বান্দর মানে নসরত। এই বান্দর বিশেষণের মধ্যে একটা সুর ছিল। যে সুরের মধ্যে রাগ বিদ্বেষ ছিল না, করুণা ছিল। জিজ্ঞেস করি, 'কী হাল?'

গাজী বলে, 'কর্ম' বলি একটা কথা আছে, বাবু। ভাল মন্দ জানি না, যেমন কাম, তেমন ফল তোমাকে পাতি হবে। সেই যে এক বছর, নসরত সব ছেড়ি গেল, তার ফল হল, হাওলাত করজায় জেরবার, জমিজমা বেবাক বেহাত। এখন দ্যাখেন গে, মাহাতো চাচার মুনিষের কাম করে সে। বিবিটাকেও মাঠে নামতি হয়িছে, তাও সেই চাচার জমিনেই।'

এ তো মেল দুসুরি চাচীর বৃত্তান্ত। ...র সঙ্গে নসরত-কিস্যা। তিসুরি চাচীর ব্যাপার কী। জিজ্ঞেস করি, 'তারপর, এই চাচী এল কোত্থেকে?'

এবার গাজী হাসে। বলে, 'ভাসতি ভাসতি।'

অর্থাৎ ভাসতে ভাসতে। সে আবার কেমন আগমন। জলে ভাসতে ভাসতে নাকি। তা হলে তো, এই নোনা গাঙের কামট কুমীরের পেটে যেতে হত। জিজ্ঞেস করি, 'সে কী রকম?'

[illegible] বলে, 'বললাম না বাবু, তখন আকালের সময়। পেটের জ্বালায় গাঁ ঘর ছেড়ে চলি যেতি লাগল একদল। আর একদল আসতি লাগল, সবাই তো আর শহরে যায় নাই। [illegible] চাল যত কেন গায়েব হোক, [illegible] আবাদ চাই তো। খেতি পাবার আশায় [illegible] অনেক মানুষ খাটতি এসিছিল। সেইরকম এক মজুরানী দলের সংগে আমাদের এই চাচী এসিছিল। আর বাবু, কী বলব বলেন, মন বড় ব্যাজ্। চাচার তখন সেই ব্যামো।'

কথার খেই ধরতে পারি না। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কী ব্যামো?'

'মনের, বাবু। অই যে সেই বলে না, "অ তোর ঝুলকালিতে মাখামাখি মনের আয়না। মন একবার ঘষে মেজে দ্যাখ্ রে মন মনা।" চাচার তখন সেই গোত্তর। আয়নায় ঝুলকালি, নিজিরে দেখতি পার নাই। বউ চলি যাবার পর থেকিই ব্যামো। না, জোর জবরদস্তি করে নাই, তর সেও ভাল বলি। কিন্তু দানা তোমার ঘরে, চিড়িয়া যাবে কমনে। তুমি দানা ছড়ালিই চিড়িয়া আসবে।'

বলে, গাজী যেন কেমন করে হাসে। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় যেমন কুহেলী, তার থেকে বেশী রহস্য দেখি তার দাড়ি চাঁচা মুখে। চাহনির রকম বুঝি না। কথার হদিস ধরতে পারি না। গাজী তেমনি হাসতে হাসতে আবার আমাকেই সাক্ষী মানে, 'না কী বলেন বাবু।'

বলি, 'কথাটা বুঝতে পারলাম না।'

গাজী এবার আওয়াজ দিয়ে হাসে। বলে, 'না বাবু, আপনি তো দেখি বড় সোজা, ফুটকচালি বোঝেন না। চাচার ব্যামো ধরতি পারলেন না?'

'না তো।'

গাজী এক মুহূর্ত আবার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজেই উচ্চারণ করে, 'না তো! কী বলব বল দিকি আমার বাবুকে।'

বলে হঠাৎ ঝুঁকে আসে আমার দিকে। এই তেপান্তরের ফিকে জ্যোৎস্নায়, যেখানে কাকপক্ষীটি নেই, সেখানে সে আমার কানের কাছে মুখ এনে, ফিসফিসিয়ে বলে, চিঁড়িরা বুইলেন না, বাবু। মেয়েমানুষ বুইলেন। চাচার গোলায় তখন ধান, সবাই তার কাছে হাত পেতি আছে। মরদ আর কটা তখন গাঁয়ে, সব আপন প্রাণ বাঁচা, পেটের জ্বালায় ঘরদোর ছেড়ি দৌড়। মেয়েমানুষগুলো সব যেতি পারে নাই। ভুখ তো বাবু খালি মরদের না, মেয়ে-মানুষেরও সমান, না কী বলেন, অ্যাঁ? তো চাচার তখন সেই দশা, যার মুরশেদ হাফিজ হয়িছে। মুরশেদ হল বাবু বিশ্বাস, দেল, আমার দেলবাস। তা সে যদি যায়, চক্ষি আন্ধার, আর কী থাকে বলেন। সে তখন নষ্ট হয়ি যায়। চাচাও নষ্ট হয়ি গেছিল। মেয়েমানুষে এলি ধান দিত...। এইবার বুইলেন তো। তা ওইতি কি আর প্রাণের ঘা শুকায়?'

এবার ধরতে পারি চাচার ব্যামোর ধরন। ক্ষুধার্ত ঝি-বউদের ধান দিত মাহাতো। শোধ নেবার পদ্ধতি ছিল আলাদা। সে নিজে নষ্ট হয়েছিল, তাই অপরকেও নষ্ট করতো। অথচ যে মাহাতোকে দেখেছি, তাতে একবারও মনে হয়নি, আঙুরের সেই স্বামীটি ধান দিয়ে, মেয়েদের ইজ্জত নিয়েছে। এ মানুষে সেই মানুষ আর নেই। গাজীর কথায় আরো বুঝেছি, তখন মাহাতোর প্রাণে ঘা। বিবাহ ঘা। দুস্‌রি চাচীর আমাটায় যাওয়ার ঘা। সেই তার ব্যামো। শোধ নিতে চেয়েছিল নিরপরাধ মেয়ে।

জিজ্ঞেস করি, 'সে ঘা শুকোল কেমন করে?'

গাজী বলে, 'এই নয়া চাচীকে পেয়ি। এই নয়া চাচীর বয়স তখন কাঁচা। সবাই হাত বাড়ায়ি, এই খায় তো, সেই খায়। দুচার থাবা এদিক ওদিক থেকি পড়ে নাই, তা বলা যাবে না। মাহাতো চাচাও তো থাবা দিতিই গেছিল। ব্যামো তো জবর।'

'তারপর?'

'তারপর থাবা দিতি যেয়ি চাচার হাত ভেঙি গেল।'

'হাত ভেঙে গেল?'

গাজী হা হা করে হেসে ওঠে। বলে, 'অই আর কী। সত্যি কী আর হাত ভাঙে। চাচা নিজিরে চিনতি পারে। এবার মনের দায়। চাচা যে কাঁচাখেকো দেবতা হয়ি উঠিছিল, সেই কাঁচাখেকো দেবতার নজর গেল আটকে। কাঁচা মেয়েটিকে দেখি বাতাস লাগল উজানি। ব্যামো ছিল বটে, নজরটা হারায় নাই। শেষমেশ দিল থাকবার জায়গা, কাজ দিল ঘরের। তখন দ্যাখে, মেয়েটি ঘরের ছিরি ফিরায়ি দিয়েছে। সেই থেকি আর ছাড়াছাড়ি হয় নাই।'

সমাজে বাস করি, সমাজের মন কথা বলে, 'বিয়ে থা হয়ে গেল?'

গাজী আরো হাসে। বলে, 'আর কত বে' করবে, বাবু। দু দুবার তো করিছিল। এবার বে না করিব ঘর। ত' দ্যাখেন, বে' করি যা হয় নাই, এবার তা হয়িছে। দুটিরে দ্যাখলেন তো। বে করলি কী আর এর থেকি বেশী কিছু হয়।'

সে কথা মানতে হবে। আর একবার আমার চোখের সামনে মাহাতো আর আঙুরি ভেসে ওঠে। বিবাহের চেয়ে মানুষ বড়। মানুষের জীবনধর্ম বড়। মানুষকে কি কেবল সাত পাকেই বাঁধা যায়? পুরোহিত আর মোল্লার মন্ত্রেই কি মানুষ মানুষের কাছে ধরা পড়ে? মরা কি আর মন্ত্রে জাগে? প্রাণের ধিকিধিকি চাই। যেখানে প্রাণ আছে, সেখানে সব আছে। তার চেয়ে বড় বল, আঙুরি হল আরোগ্যের ওষুধ। শাঁখের শব্দে, বাজনা বাজিয়ে, কপালে কুলোর ছোঁয়ায় আঙুরি স্বামী-ঘর করতে আসেনি। প্রাণের দায়ে দিশেহারা হয়ে এসেছিল। একে বলে আগমন। আসলে তার অসহায় চোখের জলে ছিল মাহাতোর আধিব্যাধি মন্ত্রৌষধি। এ কথা বলব না আঙুরিকে আশ্রয় দিয়ে মাহাতো মহৎ কাজ করেছিল। বরং উজান চালে বলি, সে মরা থেকে বাঁচায় ফিরেছে। তার কিসের অহংকার। সে কৃতজ্ঞ হোক আঙুরলতার কাছে। আমরা সকলে কৃতজ্ঞ থাকি আঙুরলতার কাছে। যে মরতে যায়, সে প্রাণ সঞ্চার করে না। যে বাঁচতে ছোটে, জীয়নকাঠি তার হাতে। সে-ই তো রব তোলে, প্রাণ দাও, প্রাণ দাও!

মনে মনে না বলে পারি না, 'বাহ আঙুরি, জীবনে তোমার জয়। তোমার আবার পরিচয় কী। কিসের বা বিবাহ! তুমি চির আয়ুষ্মতী চির সধবা।'...ঘর-ছাড়া ক্ষুধার্ত মেয়েটার চোখে ছিল ঘরের শ্রীর স্বপ্ন। হাত দিতেই সেই শ্রী ফুটে উঠেছিল। রুগ্নটা সংগে সংগে ওর বিস্বাদে স্বাদ পেয়ে সুস্থ হতে আরম্ভ করেছিল। এখন মনে হয়, একবার ভোলা-খালি না এলে পাপ হবে। চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পাই তাকে। কালো মুখে হাসির ঝলক। যেন তাকেই বলি, 'একবার আসব, আসবই।'...

ইতিমধ্যে কখন যেন, কোন্ পথে বাঁক নিয়েছি, খেয়াল ছিল না। মনে মনে আনমনা, গাজীর ছায়ায় ছায়ায় চলি। কিন্তু পথ বদল হয়েছে কখন, খেয়াল ছিল না।

দেখি, গায়ে আগুনের আভা কাঁপে। ময়লা লেলিহান শিখা যেন বড় কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। আগুন জ্বলে উঠোনের মাঝখানে, তার চারপাশে ছোট ছোট চালা-ঘর। সেই আগুনের চারপাশে নানান বয়সের নরনারী। মানুষ নয়, ছায়া যেন। দলে দলে, গুচ্ছ গুচ্ছ আগুন ঘিরে নানান জটলা। কার কথা কে শোনে, ঠাহর পাবে না। ঝগড়া করে, না বিবাদ করে; বিচার বৈঠক করে না, মজলিক করে, বোঝবার উপায় নেই। তার মধ্যেই শোন, কে যেন আবার বেসুরো গলায় গান করে। যে গানের ভাষা বোঝা দায়।

কে একজন মোটা আর জড়ানো গলায় হাঁক দেয়, 'কে যায় হে?'

গাজী দাঁড়ায়। আমিও দাঁড়াই। গাজী হেসে বলে, 'কে যায় না যায়, তা কি এখন চিনতি পারবে হে?'

'ক্যানে, চিনতে ক্যানে পারব না হে।'

বলতে বলতে আধ-ন্যাংটা খালি গা এক বুড়ো টলতে টলতে উঠে আসে উঁচু রাস্তার ওপর। গেঁজে-ওঠা রসের গন্ধ তার নিশ্বাসে। বোধ হয় সারা গায়ে। রক্তবর্ণ চোখের নজর ঢুলুঢুলু। না কামানো খাবলা খাবলা গোঁফ দাড়ি সারা মুখে। তাতে একটি আমেজের হাসি। বলে, 'চিনতে পারব না ক্যানে, তুই তো গাজী।'

বলতে বলতে নজর পড়ে আমার দিকে। কী মনে হয়, কে জানে। হঠাৎ দু হাত কপালে ঠেকিয়ে কোমর ভেঙে নিচু হয়। বলে, 'ই দ্যাখ, বাবুকে চিনতে পারি নাই। কবে এলি বাবু?'

গাজী আমার দিকে চেয়ে হাসে। বুঝতে পারি, দ্রব্য গুণে এখন সকলেই তার চেনা। অবাক হবার কিছু নেই। গাজী বলে ওঠে, 'বাবুকে চিন নাকি?'

মাথা ঝাঁকাতে গিয়ে লোকটার গোটা শরীরে এমন টাল খেয়ে যায়, ভাবি বুঝি গড়িয়ে পড়ে ঢালুতে। কিন্তু পড়ে না। বলে, 'ক্যানে, চিনতে লারব ক্যানে? ই তো আমাদিগের বাজারের মাহাজন ঠাকুর মশাইয়ের বিটা।'

এখন কী বলবে বল। কোথা থেকে কোথায় এলাম। এখন বলে, মহাজন ঠাকুর মশাইয়ের ব্যাটা।

গাজী হাসতে হাসতে বলে, 'খুব বুঝতি পেরিছ যাও, এখন যা করছিলে, তাই করগা।'

আবার সেই মাথা ঝাঁকানি। যেন ক্ষ্যাপা মোষে ঢুঁ মারতে আসে। বলে, 'ক্যানে, এই সিদিনে বাবুর বিয়া হল, আমরা খেতে পেলাম নাই। ইবারে কিন্তুক খাওয়াতে হবে।'

যাক, নববিবাহিত পর্যন্ত পৌঁছুতে পেরেছি। এখন সদ্য সদ্য খাওয়াবার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেলেই বাঁচি। ইতিমধ্যে উঠোনের ভিড় থেকে কে যেন কী বলে ওঠে। সে ভাষাটা হয়তো সাঁওতালী কিংবা অন্য কোন আদিবাসী। এখন বুঝতে অসুবিধা নেই, এরা যাদা অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষি-মজুর আদিবাসী। হয়তো মাহাতোর মত বংশপরম্পরা বাস নয় তাই ভাষা বদলায় নি। বাঙলা বুলির চালটা তাদের সবখানেই একরকম।

উঠোনের কথা শুনে বুড়ো তার নিজের ভাষায় ধমকে ওঠে। কী যেন বলে, বুঝতে পারি না। গাজীও যে পারে না, তা বুঝতে পারি। তবে সে তাড়াতাড়ি বলে, 'আচ্ছা, তা একদিন খাওয়ানো যাবে, এখন আমরা চলি।'

তা বললে তো হয় না। এখন পেটে আমার রস, মুখে আমার বুড়বুড়ি। আবার হাত জোড় করে বলে, 'বেশ, তবে বাবুটা আজ আমাদের সাথে খেয়ে যাক।'

উঠোনে তখন কেবল জটলা নয়, কিসের একটা বাদানুবাদে যেন, ঝগড়া লাগবার উপক্রম। গাজীও এবার ধমক দিয়ে বলে, 'অই গো, টংকো, তোমারও কি মাথা খারাপ হল। ঠাকুরমশাইয়ের ছেলে কি ওসব খায়?'

বলে সে আমাকে ইশারা দেয় তাকে অনুসরণ করতে। টংকোর তখন টনক নড়েছে। তাড়াতাড়ি জিভ বের করে কান মলে। বলে, 'ই দ্যাখ গ, ছি ছি ছি...।'

তার কথা শেষ হয় না, আমরা চলতে আরম্ভ করি। বিবাদের মধ্যেই আবার যেন কে হাঁক দেয়, 'অই গাজী, একটা গান গেয়ে যা।'

কথা শেষ হয় না, তার আগেই এই কুহেলী জ্যোৎস্না নিশ্চুপ তেপান্তর এক তীব্র আর্ত চীৎকারে যেন ফালা ফালা হয়ে যায়। গাজী বলে ওঠে, 'আহা মুরশেদ! চলি আসেন, বাবু।'

বলে সে কানে আঙুল দিয়ে এগিয়ে যায়। চকিতে একবার উঠোনের এক পাশে আধ-মরা বরাহটা আমার নজরে পড়ে। এতক্ষণ একটুও টের পাওয়া যায় নি, উঠোনের এক পাশে চার পা বাঁধা শেল-হানা জীব একটা পড়ে আছে। সম্ভবত পশুটা ওর মরণের ঘোরে আর একবার জীবনের ডাক ডাকে।

আমাকেও যেন একটা আচ্ছন্নতা ঘিরে ধরে। আমার বাস্তব থেকে হারিয়ে যাই। স্মরণ থাকে না, কোথায় চলেছি, এলাম কোথা থেকে। নিশি-পাওয়া ঘোরে যেন গাজীর পিছু পিছু চলতে থাকি। আর মনে হতে থাকে, প্রতিটি বাঁকে বাঁকে কত বিচিত্রের খেলা। জীবনের কোন কিছুই, একটার পর একটা সামঞ্জস্য করে কেউ সাজিয়ে রাখে নি। সকলই অসমঞ্জস। যখন তুমি হাসি-ঝলকানো ডাগর-চোখ সেই মুখ-খানি দেখ, তখনই তোমার চার পাশে ভিন্ন উৎসব, অন্য মানুষে। তোমার তৈরী বাস্তবের আলো, আগুনের [illegible] নেই। বাস্তব বড় স্বাধীন লীলা করে।

চলতে চলতে একসময়ে কানে আসে, 'বাবু।'

চেয়ে দেখি, গাজী আর আমার আগে আগে নেই। সে আমার পাশে পাশে চলে। ভাবি, সে হয়তো আধমরা পশুটার কথা বলবে। বলি, 'বল।'

কিন্তু গাজী সেদিক দিয়ে যায় না। আমার দিকে চেয়ে বলে, 'বাবু রাগ করেন নাই তো?'

হঠাৎ এ আবার কোন বাঁকে ফেরে। এখন আবার রাগের প্রসঙ্গ আসে কোথা থেকে। বলি, 'রাগ করব কেন?'

গাজীর মুখে দেখি বিকালের সেই অপরাধীর হাসি। বলে, 'না বাবু, আমার ভুলির জন্যি আপনাকে আটকি পড়তি হল।'

ধন্য গাজী, এতক্ষণে সেই অপরাধ ভঞ্জনের পালা। এতক্ষণ ধরে একবারও বুঝতে পারি নি, ভুলের অপরাধ এখনও সে বয়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ কী জবাব দেব, বুঝতে পারি না। তার আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করি। সেখানে তো রাগ বেজারের চিহ্ন দেখি না।

গাজী ততক্ষণে আবার ধরেছে, 'আগে যদি জানতাম বাবু, তা হলি আপনাকে কষ্ট দিতাম না। তয়, বাবু জানবেন, ভয়ের কিছু নাই। আমি সারা রাত আপনার দোরে বসি থাকব।'

ফিকে জ্যোৎস্নায় গাজীর মুখের দিকে তাকাই। কেন যেন তার সেই মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকটা টনটনিয়ে ওঠে। কথা বলতে পারি না। কেন এমন হয়, আমি জানি না। কেবল এইটুকু মনে হয়, আমার বুকে যেন কিসের এক মিলনের জোয়ার বইছে। সেই জোয়ারে আমার গলা বন্ধ হয়ে যায়।

গাজী আবার ডাকে, 'বাবু।'

আমি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলি, 'গাজী, রাগ করি নি। সবই আমার ভাল লাগছে।'

'সত্যি বাবু।'

পারলে যেন ছোট ছেলেটার মত কোমর দুলিয়ে নেচে দিত। তা না করে কেবল গুনগুনিয়ে দেয়, 'মন বুঝে দ্যাখ, মনে তোমার কার উদয়। নিন্দয় নিন্দয় এত বল, এবারে সদয়।'

এতটা আমার প্রার্থনা নয়। গাজী যেমন করে বলে, তেমন করে শুনতে চাই না। তার আনন্দ বুঝি। আর ভাবি, আজ এখানে এখন না-হয় গাজীকে দায়ী করব; কিন্তু সে না থেকেও যদি, এমনি বিপাকে পড়তে হত। তা হলে কোথায় পেতাম গাজী। তার ভুল হয়েছে, সে কথা মেনেছি। এবার মানি, আমি তাকেও পেয়েছি।

(ক্রমশ)

(বি-৭৫৩৮)

সাধনা বিউটি ক্রীম

প্রতিদিন ত্বক চর্যায় একান্ত প্রয়োজন। কুসুম কোমল পেলব তনু ও যৌবন সুলভ লাবণ্য এনে দেয়।

সাধনা টুথ পেষ্ট

দন্তরাজি মুক্তার মত শুভ্র ও উজ্জ্বল, মাড়ী সুস্থ ও সুদৃঢ় মুখ দুর্গন্ধমুক্ত ও স্বচ্ছ করে।

শীঘ্রই পাওয়া যাবে

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ—শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন) এম. সি. এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ এম. বি. বি এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য।

রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তা

Probably, no other country in the modern world would have produced a Gandhi; even Tagore, who was typicaly modern in his approach to life's problems, was, at the same time, steeped in India's old culture and thinking. His message is thus one of synthesis between these two.

[তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পৃষ্ঠা ১]

বৈষয়িক অগ্রগতির প্রধান যা অভীষ্ট, লোকের সেই জীবনযাত্রার মান উন্নীত করার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ অনেক কাল আগে উপলব্ধি করেছিলেন। সকলের ভালভাবে জীবনযাপন—তাদের সম্ভাবনা ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য শুধু ন্যূনতম ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলো মেটানো হবে না; আধুনিককালে মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকানির্বাহের জন্য যেসব সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে তা সর্বসাধারণের কাছে সহজলভ্য করে তোলা চাই। বিষয়টা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন এভাবে : "কোনোমতে খেয়ে-প'রে টি'কে থাকতে পারে এতটুকু মাত্র ব্যবস্থা কোনো মানুষের পক্ষেই শ্রেয় নয়, তাতে তার অপমান। যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বৃত্ত অর্থ, উদ্বৃত্ত অবকাশ মনুষ্যত্ব-চর্চার পক্ষে প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজন।"১

দেশের দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতা আগে থেকেই স্থির করে রাখা হয়নি অথবা সেটা অপরিবর্তনীয় নয়। উপযুক্ত কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা দেশের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে তাই বলেছিলেন, "অন্যান্য দেশের সৌভাগ্যের ইতিহাস আমাদের সামনে খোলা। তারা কেমন করে উন্নতির দিকে চলেছে সে-সমস্তই আমাদের জানা। কিন্তু তার থেকে আমাদের মনে কোনো আশার সঞ্চার হয়নি; উল্টে আমরা জেনেছিলুম যে, যেহেতু তারা প্রবল তাই তারা প্রবল, যেহেতু আমরা দুর্বল তাই আমরা দুর্বল, এর আর নড়চড় নেই। এই বিশ্বাস অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে অবসাদে আমাদের অকর্মণ্য করে তুলেছে। দেশ জুড়ে কাজের ক্ষেত্র অথচ আমরা উদাসীন।"২

বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার ভূমিকা

বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার সাহায্যে কৃষি, শিল্প তথা সমাজ-জীবনের কতখানি উন্নয়ন ও পুনর্গঠন সম্ভব তা রবীন্দ্রনাথ ভালো করে জানতেন। প্রাকৃতিক শক্তিসম্পদকে দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধি সাধনের কাজে প্রয়োগ করার ব্যাপারে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি মূল্যবান ভূমিকা আছে। প্রয়োজন রয়েছে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার। আর দেশ যখন দারিদ্র্য ও আর্থিক দুর্দশা থেকে মুক্তি চাইছে তখন অধ্যাত্মবাদের নামে আকাঙ্ক্ষার সংযমের উপর জোর দিলে অথবা বৃহৎ যন্ত্রপাতি ও বড় বহরের উৎপাদনের কুফল সম্পর্কে সাবধান করে দিলেই চলবে না। প্রশ্নটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে-ছিলেন রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ও সহজভাবে : "মানুষ যেমন একদিন হাল লাঙলকে, চরকা তাঁতকে, তীর ধনুককে, চক্রবাস যান-বাহনকে গ্রহণ ক'রে তাকে নিজের জীবন-যাত্রার অনুগত করেছিল, আধুনিক যন্ত্রকেও আমাদের সেইরকম করতে হবে। যন্ত্রে যারা পিছিয়ে আছে, যন্ত্রে অগ্রবর্তীদের সঙ্গে তারা কোনোমতেই পেরে উঠবে না। যে কারণে চার-পা-ওয়ালা জীব দুই-পা-ওয়ালা জীবের সঙ্গে পেরে ওঠেনি, এও সেই একই কারণ।"৩

কিন্তু সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যন্ত্র এবং তার মূলীভূত বিদ্যায় যে প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হয়, সেটা ব্যক্তি বা দল-বিশেষে সংহত না হয়ে যেন সর্বসাধারণে ব্যাপ্ত হয়। "আধুনিক কালে যন্ত্রের সহযোগে কর্মের শক্তি যেমন বহুগুণিত, তেমনি তার লাভ বহু অঙ্কের, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তার লোভ। এতে করেই ব্যক্তিস্বার্থের সঙ্গে সমাজস্বার্থের সামঞ্জস্য উজাড় করে উঠছে।" স্বল্প-বিক্রেতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা একচেটিয়া ব্যবসায়ে যে সমষ্টির কল্যাণের চাইতে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লোভের জন্য উৎপাদন করা হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্র-নাথ সচেতন ছিলেন। ভারতের গত পনেরো-কুড়ি বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, তাঁর আশঙ্কা অমূলক ছিল

না : বেসরকারী ক্ষেত্রে অর্থবল সম্প্রতি যে পরিমাণে ঘনীভূত হয়েছে তার সবটাই উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়ক বা আর্থিক উদ্যোগের জন্য অপরিহার্য ছিল বলে মনে হয় না।

ধনবল বা অর্থশক্তিকে সর্বদা নিজের সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করার জন্য আহ্বান জানালেও আয় ও সম্পদের বণ্টন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধারণা ছিল। যাতে সকলের মধ্যে ভাগ করে দেবার জন্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন দ্রব্য ও সম্পদ পাওয়া যায় সে উদ্দেশ্য বুঝেছিলেন মনে হয়। "কৃত্রিম উপায়ে ধনবণ্টন করে কোনো লাভ নেই, সত্য উপায়ে ধন উৎপাদন করা চাই। জনসাধারণে যদি নিজের অর্জন-শক্তিকে একত্র মেলাবার উদ্যোগ করে তবে এই কথাটা স্পষ্ট দেখিয়ে দিতে পারে যে, যে মূলধনের মূল সকলের মধ্যে, তার মূল্য ব্যক্তি-বিশেষের মূলধনের চেয়ে অসীমগুণে বেশী।"৪

পল্লীর উন্নতি

কবিকেও কাজের কথায় টানে। যাতে কয়েকটি গ্রাম নিজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক উন্নতি প্রভৃতির ভার সমবেত চেষ্টায় নিজেরা গ্রহণ করে, রবীন্দ্রনাথ সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। "দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজন-সাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কতকগুলি পল্লী নিয়ে এক-একটি মণ্ডলী স্থাপন করা দরকার; সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের ও অভাব মোচনের ব্যবস্থা করে মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করে তুলতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হয়ে উঠবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য পল্লী-বাসীদের শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করতে হবে। এমনি ক'রে দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব।" গ্রামগুলিকে আত্ম-শাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্‌বোধিত করে তোলার তাঁর এই পরিকল্পনার সঙ্গে এখনকার গ্রামের সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের মিল আছে। এখানে উল্লেখ্য যে, পঞ্চায়েত-গুলির মতো স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সমষ্টি উন্নয়ন-প্রচেষ্টাকে যুক্ত করার দিকে গত কয়েক বছরে একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। জনগণের স্তরে সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নমূলক কাজের প্রসারের জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করা এবং গ্রামাঞ্চলের পশ্চাদ্‌পদ অবস্থার পরিবর্তন সাধন হচ্ছে প্রাগুক্ত পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য।

সমবায় নীতি

আমাদের এই গ্রাম-প্রতিষ্ঠিত কৃষিপ্রধান দেশে রবীন্দ্রনাথ সমবায়তত্ত্বকে কাজে খাটাবার আয়োজন করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ যখন প্রজাদের মধ্যে সমবায়শক্তি জাগরূক করবার কথা ভাব-ছিলেন তখন বাংলা দেশে সরকারী কো-অপারেটিভ আন্দোলন আরম্ভ হয়নি। "ইহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যাহা একজনে না পারে তাহা পঞ্চাশজনে জোট বাঁধিলেই হইতে পারে। তোমরা যে পঞ্চাশ জনে চিরকাল পাশাপাশি পৃথক্ পৃথক্ চাষ করিয়া আসিতেছ, তোমরা তোমাদের সমস্ত জমি হাল-লাঙল গোলাঘর পরিশ্রম একত্র করিতে পারিলেই গরিব হইয়াও বড়ো মূলধনের সুযোগ আপনিই পাইবে। তখন কল আনাইয়া লওয়া, কলে কাজ করা, কিছুই কঠিন হইবে না।"৫

রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ আজও প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ দেশের আর্থিক অগ্রগতি শ্লথ হয়ে পড়ার আসল কারণ হল, উন্নয়নকার্য পরিচালনা করার জন্য আমরা এখনো একটি বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থা বা উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তুলতে পারিনি। তার উপর, বহির্বাণিজ্যে ক্রমাগত ঘাটতি এবং বৈদেশিক সাহায্যলাভের অনিশ্চয়তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নিজেদের সঙ্গতির মধ্যে যাতে সমস্ত কাজ-কর্ম চালানো যায় সেদিকে সত্যকার চেষ্টা করার সময় এসে গেছে। অধুনা স্বাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা নতুন করে অনুভব করা হচ্ছে। বহু বছর আগে রবীন্দ্রনাথ দেশের লোককে যথাসাধ্য নিজের উৎপন্ন দ্রব্যই নিজেরা ব্যবহার করবার জন্য যে ডাক দিয়ে-ছিলেন তা আবার অর্থময় হয়ে উঠছে।

শান্তিকুমার ঘোষ

১ সমবায়নীতি, ১৩৩৫, সমবায়নীতি
২ কর্মযজ্ঞ, ১৩২১, পল্লীপ্রকৃতি
৩ পল্লীপ্রকৃতি, ১৯৩৪, পল্লীপ্রকৃতি
৪ সমবায় ২, ১৩২৯, সমবায়নীতি
৫ সমবায় ১, ১৩২৫, সমবায়নীতি

গ্রামের বাড়ি

চিত্রপ্রদর্শনী

শিল্পী রমেন্দ্রনাথ

সম্প্রতি সরকারী কলাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিভিন্ন শৈলীতে আঁকা একটি চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেল। রমেন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প পদ্ধতির অনুশীলন করেছিলেন আচার্য নন্দলালের অধীনে। ভারতীয় শিল্প পদ্ধতিতে যখন তিনি সিদ্ধহস্ত সেই সময় পাশ্চাত্য শিল্প পদ্ধতির অনুশীলন তিনি শুরু করেন।

ঘনিষ্ঠভাবে দেখা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ করা ছিল রমেন্দ্রনাথের সহজাত প্রতিভা। বিষয়বৈভব অপেক্ষা সাধারণ বস্তু বা বিষয়কে আকর্ষণের বস্তু করে তোলার চেষ্টাই তিনি সকল সময় করেছেন। ছবিতে কোন কবিসুলভ ভাব প্রকাশ করার প্রয়াস তিনি করেননি। প্রত্যক্ষভাবে বস্তুগত উদ্দীপনা ছিল তাঁর লক্ষ্য। এক সময় জাপানী শিল্পী হোকোসাইকে তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। রেমব্রাণ্টের ড্রয়িং মুরহেড বোন-এর এচিং তিনি বিশেষভাবে অনুশীলন করেছিলেন।

মোগল শিল্পের সূক্ষ্ম ফিনিশ তিনি অধ্যবসায়ের সঙ্গে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই আদর্শ যে তাঁর প্রকৃতিগত নয়, এ কথা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয়নি।

গ্রাফিক আর্ট। এই ইংরেজী কথাটির প্রতিশব্দ আজও বাংলায় তৈরি হয়নি। চাপের ছবি ও ছাপের ছবি—এই দুই কথা নিয়ে আজও কাজ চালানো হচ্ছে। ছাত্র অবস্থায় ঠিক কি কারণে রমেন্দ্রনাথ উডকাট-এর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, আমার স্মরণ নেই।

কলাভবন সংগ্রহে স্টিফেন বোনের কিছু উডকাট ছিল এবং উড-এনগ্রেভিং-এর যন্ত্র ছিল যেগুলি তখনও কোন শিল্পী কাজে লাগাননি।

মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত ও রমেন্দ্রনাথ প্রথম ছাপা ছবি করতে উৎসাহী হন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে রমেন্দ্রনাথ নিজের চেষ্টায় উডকাট-এর আঙ্গিক আয়ত্ত করেন।

সম্ভবত ১৯২২ সালের কাছাকাছি উডকাট সম্বন্ধে তাঁর আত্মপ্রত্যয় দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি তৈল বর্ণের আঙ্গিক ও এচিং-এর করণ-কৌশল শিখেছিলেন। তৈল বর্ণ রমেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে আনতে পেরেছিলেন কি না, এবিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে। অপর দিকে এচিং-এর করণ-কৌশল তিনি যে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তে এনেছিলেন, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বলা যেতে পারে, উডকাট, এচিং, লিথোগ্রাফ রমেন্দ্রনাথের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

জলরঙ ও টেম্পেরা পদ্ধতিতে করা ছবির মত এক শ্রেণীর উডকাট বা এচিং-এ আলোছায়ার পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা তিনি করেননি। এই শ্রেণীর রচনাতে শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী সুস্পষ্ট। অপর দিকে তাঁর তৈলচিত্রের অনুরূপ আলোছায়ার পরিবেশ তাঁর শেষ দিকের রচিত কিছু এনগ্রেভিং মেজোটিণ্ট অ্যাকোয়াটিণ্ট ইত্যাদি করণ-কৌশলের সাহায্যে প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন।

খিদিরপুর ডক

শীতার্তভিজি (গ্রাফিক)

রমেন্দ্রনাথের চিত্রাবলী দুই ভাগে বিভক্ত। এক দিকে রূপ আর এক দিকে আলোছায়া ও বর্ণ। এই দুই গতির কার্যকারণ অনুসন্ধান করতে হলে তাঁর অসংখ্য স্কেচগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে হয়। এইসব স্কেচে বৈচিত্র্যের অভাব নেই।

বৈচিত্র্য সত্ত্বেও শিল্পী আকৃষ্ট হয়েছেন সব সময়ই অতি পরিচিত সেই সব দৃশ্য বা বস্তুতে, সচরাচর আমরা যার মধ্যে নতুনত্ব দেখি না। আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে, রমেন্দ্রনাথ সাধারণ বিষয়ের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়েছেন। এবং অতি ঘনিষ্ঠভাবে বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা থেকেই স্কেচগুলি তিনি করেছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

আঙ্গিকের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকলেও মূল বিষয় থেকেছে প্রায় একই। কেবল তিনি আকারের জগৎ থেকে আলো-ছায়ার জগতে তাঁর পরিচিত বিষয়কে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম ও শেষ জীবনের রচনার মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই দিক দিয়ে।

রমেন্দ্রনাথ নিপুণ কারিগর। আঙ্গিকের খুঁটিনাটি আয়ত্ত করতে কোনো ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হয়নি। তৎসত্ত্বেও সকল ক্ষেত্রেই শিল্পরূপে সার্থক হয়েছে এ কথা বলা চলে না। তাঁর শিল্পসৃষ্টির অসম্পূর্ণতা যদি কোথাও থাকে তার মূলে আছে শিল্পীর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। রমেন্দ্রনাথ মূলত রূপকার, বর্ণবৈভব অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাঁকে আয়ত্ত করতে হয়েছে। এই কারণে বর্ণপ্রধান চিত্রে তাঁর প্রতিভা অনায়াসে প্রকাশ পায়নি।

রমেন্দ্রনাথের রচিত প্রতিকৃতি দৃশ্যচিত্র ইত্যাদি পরবর্তী রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করা হল না। এবং অন্যান্য যে সব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়নি।

রমেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘ-কালের। বন্ধুরূপে তাঁর জীবনের শিল্প-সাধনার নানা সমস্যা আলোচনা করেছি। নিজের শক্তি ও দুর্বলতা যতটা জানতেন ও বুঝতেন, অকুণ্ঠিতভাবে তা তিনি আমায় জানিয়েছেন। এই কারণে রমেন্দ্রনাথকে ক্রিটিকের দৃষ্টিতে দেখা আমার পক্ষে সহজ নয়। তাঁর শিল্পপ্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েই এই আলোচনা শেষ করলাম।

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

এ[illegible] পর্যন্ত যে অধিকার যে স্বাধীনতা লোকে একমাত্র কবিদের দিয়ে এসেছে, ঠিক সেটাই—বর্তমান চিত্রকর্ম উদ্ভাবিত তার মধ্যে এই প্রথম—চিত্রকররা পাবার জন্যে সচেতন হয়েছে, দাবি তুলেছে।

আগেতে দেখা যাবে চিত্রকরকে লোকে উপন্যাসকারদের মতন বলে ভাবত, গল্পকে সে সঠিক গড়তে অর্থাৎ সাজাতে কতখানি চতুর এবং চরিত্র সকলের বিন্যাসে সে কেমন নিপুণ।

কিন্তু ইদানীং ঐ বাঁধাধরা ধারণা থেকে অব্যাহতি লাভে সে বদ্ধপরিকর।

এখন, কবি সংজ্ঞাটি বলতে যা কিছু বুঝায়, যত লক্ষণ তাতে জড়িয়ে আছে, সব শর্ত তা মেনে নিয়েই সে চায়, চিত্রকরের নামটি কবি আখ্যার সঙ্গে এক এবং অভিন্ন করতে।

এবং এতে করেই নিষ্পত্তি হয়েছে, শেষ হয়েছে রকমারি অযৌক্তিক ধারণার ঘোষণার; যথা উত্থাপন করা যায় 'চিত্রকর্ম' হচ্ছে প্রকৃতিকে নিছক করার আর্ট"।

কিন্তু আমরা ত দেখেছি, জানি যে, প্রিমিটিভরা যে-প্রকৃতিকে অনুকরণ করেছে তার বেশীর ভাগটাই হল, মনগড়া উপাখ্যান (ফাবল)। এবং রেনাইসাঁস কালে কি ঘটল তাও বুঝি যে, সেখানে লোকপ্রসিদ্ধ প্রকৃতির অনুকরণের নামে শুধুমাত্র প্রথানুগ বিধিকে (অর্থাৎ চাপকে) এমন-ভাবে মানা হয়েছে যার ফলে বস্তুর অনু-করণসূত্রে অবশেষে তার খুব খেলো বাজে দিকটাই ছবিতে দেখা দিয়েছে, থেকে গেছে।

এই প্রসিদ্ধ প্রকৃতিকে মান্য করতে, অনেক তত্ত্বজ্ঞই সেটা অনুশীলন করতে উপদেশ দেন। কিন্তু এ বিষয়ে অনেক কথা বলা যেতে পারে। এবং এই আলোচনা সম্পূর্ণ অন্য আর এক কনফারেন্সের ব্যাপার, আর আমার কপালে এমন না ঘটে যাতে তা নিয়ে কিছু বলতে হয়।

শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের আঁকা একটি চিত্র

একটি নূতন গ্যালারী

কলকাতায় আর একটি নূতন গ্যালারী খোলা হল। এটি একেবারে চৌরঙ্গীর বুকে, ঠিক নিউ এম্পায়ারের সামনে। নাম—গ্যালারী স্টুডিও এভারেস্ট। এই সংকাজের জন্যে স্টুডিও এভারেস্টের মালিক মিঃ চন্দ্রকে অসংখ্য ধন্যবাদ। কেননা এই বাজারে এই রকম একটা জায়গায় এতটা স্থান শুধু শিল্পের জন্য ছেড়ে দেওয়া কল্পনাতীত। এই স্থানে মনে হয় বড় বড় ১০ থেকে ১৫টি ছবি সাজান যাবে, আলোর ব্যবস্থাও চমৎকার। মিঃ চন্দ্রর ইচ্ছেও আছে, বড় প্রদর্শনীর জন্যে তাঁর দোতলার ঘরটিও দেওয়া। গ্যালারীর যাবতীয় ভার তিনি আমাদের বিশেষ পরিচিত শিল্পী শৈলেন মিত্র মহাশয়ের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। সব থেকে আকর্ষণীয় হল, এখানে ঘর ভাড়ার জন্য কিছুই দেয় নেই, শুধু কর্তৃপক্ষের ছবি মনোনীত হলেই হবে।

চৈতন্য কলা বিজ্ঞান কেন্দ্র আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনী : ফাইন আর্টস ভবন

চৈতন্য কলা বিজ্ঞান কেন্দ্র আয়োজিত এই চিত্র প্রদর্শনীতে পাঁচজন শিল্পীর ছবি স্থান পেয়েছিল। এ'দের মধ্যে শুকদেব চট্টোপাধ্যায় একটি বিশেষ হাত, অবশ্য সে পরিচয় তাঁর জল রঙের বড় কাজে পাবার নয়। তার কারণ, সেখানে ম্লান ভাব বড় বেশী করে পদ্ধতির কারণে দেখা দিয়েছে। এখানে তাঁর অসংখ্য ছোট পোস্টকার্ড বা তার থেকে কিছু বড় আকারের কাগজে যে আরোপ আমরা দেখেছি, তা সত্যই উল্লেখ-যোগ্য। এর বর্ণিকভঙ্গ চমকপ্রদ, তুলির টান সংযত, যথা ৪।৫।৬৬—এখানে হাঁসের আভাস, এবং রঙ খুবই নূতন। তাঁর

২৬।১১।৬৬-তে সবজে টোন মনোজ্ঞ। আমাদের মনে হয় তাঁর এই ফ্যানটাসী নিয়ে জল রঙে কিছু কাজ করা তাতে তাঁর গুণের পরিচয় সত্যিই পাওয়া যাবে।

এ ছাড়া পুষ্প্রিয়া সাহার ৩নং, দিলীপ [illegible]য়ের ১১নং, [illegible]দাসের ১৪নং, [illegible] ২৩নং কাজের মধ্যে নিষ্ঠা [illegible]।

দিলীপ দাশগুপ্তর চিত্র প্রদর্শনী : আর্টইস্ট্রী হাউস।

দিলীপ দাসগুপ্তর প্রদর্শনী ইতিপূর্বে দেখিনি। সম্ভবত এখানে যে কয়েকটি ছবি ছিল, তাতে করে তাঁকে সহজেই ভাববাদী বলা ঠিক হবে না। এখানে ছবিতে ছবিতে হাত, উত্তমাঙ্গ, পুষ্পাকৃতি ইত্যাদি নিয়ে যে সংস্থান খাড়া হয়ে উঠেছে তা চিত্রসত্তার বহিরঙ্গ; কিন্তু এই ব্যাপার ঘটিয়ে তুলবার জন্যে তিনি অনেক ছবিতে অবাক-করা স্থান ছেড়েছেন।

এর আগে দু'-একজনকে অনেকটা এই-ভাবে স্থান ছাড়তে দেখেছি। প্রধানুগ স্থান ছাড়া আমরা সকলেই মানি— তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সকলেই সচেতন, কিন্তু এখানে এই স্থান খুব যে কাজ করেছে বলে মনে
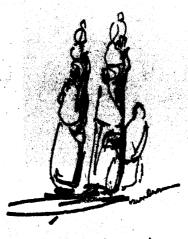
বোঝা —কুমকুম চট্টোপাধ্যায়

হয় না। দু'য়েকটি ক্ষেত্র বাদে, ল্যান্ডস্কেপ ও অবয়বধর্মী ছবির গঠন প্রায় একই হয়েছে। তবু নং ২৩-এ উত্তমাঙ্গ-পুষ্পাকৃতি কেয়ারি ও উপরে স্থান-ছাড় আমাদের ভাল লাগে। ১০নং ছবিতে লাল জমির উপর অবয়ব আরোপ, নং ৩—এটি একটি ছোট ল্যান্ডস্কেপ—লাল আকাশ আবহাওয়া ও গঠনের সরলতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

[illegible] ইনডিয়া এক্জিবিশন অব ফাইন আর্টস : আর্টইস্ট্রী হাউস

এই প্রদর্শনীতে শুধুমাত্র মহিলা শিল্পীদের আঁকা ছবিই স্থান পায়। এবার সর্বসমেত ৯৫টি ছবি এখানে ছিল। একমাত্র বাইরের এবং কলকাতার দুয়েকজন শিল্পী ছাড়া প্রায় ছবিই আমাদের দেখা। সুচিত্রা গুহর ৪৫নংটি বেশ ছবি, খানিক জাপানী ভাব আছে। তাঁর স্থান ভাগ করা সত্যিই বুদ্ধিসম্পন্ন। প্রেমা ডি পাথরের ৩৬নং ফুলের ছবিতে লেমন ইয়ালার উপর কমলা ছোঁয়া, অমৃত ধীরের ৫০নংটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এ'দের মধ্যে সবচেয়ে দুঃসাহসিক কাজচন্দনা ঘোষের। তাঁর ২০নং, নাম 'লেডী অন এ চেয়ার'-এর ডৌলত্ব বোধ এবং চেয়ারের কেয়ারি আমাদের ভাল লেগেছে।

এ ছাড়া ১৫, ৪১, এবং গ্রাফিক ও স্কেচে ৯১, ৮৮, ৯৩ ও ভারতীয় পদ্ধতিতে ৬৯, আর বাতিকে ৮১ বেশ নয়নসুখকর কাজ।
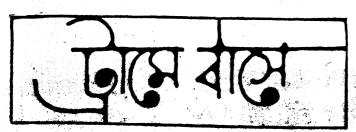
উত্তরপ্রদেশে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা হওয়ায় ফলে ১৬টি রাজ্যের মধ্যে ৯টি কংগ্রেসের হাত ছাড়া হইয়া গেল। এই প্রসঙ্গে জনৈক রাজনীতিবিদ বলিয়াছেন : কোন ব্যক্তি যদি আজ অমৃতসর হইতে হাওড়ার টিকিট কাটেন তবে তাঁহাকে যে-সব রাজ্যের মধ্যদিয়া যাইতে হইবে তার একটিও কংগ্রেস সরকারের নয়। খুড়ো বলিলেন—"হয়ত তাই। কিন্তু এখন পর্যন্ত পাসপোর্ট-ভিসার প্রশ্ন ওঠেনি!!"

সংবাদে শুনিলাম, পশ্চিমবঙ্গের সচিব মহোদয়গণ নাকি জিলায় জিলায় ধান-চাউল সংগ্রহে বাহির হইবেন।—"আশা করি

সেটা ঠিক 'মাধুকরী' হিসাবে নয়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

অন্য এক সংবাদে প্রকাশ, যুক্ত ফ্রন্টের মন্ত্রী মহোদয়গণ এখন পর্যন্ত তাঁহাদের প্রাপ্য বেতন পান নাই।—"এটা নিতান্তই পরিতাপের কথা। কিন্তু স্বস্তির কথা এই যে, তাঁরা 'চলবেনা-চলবেনা' মিছিল নিয়ে বেরোন নি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য মন্ত্রী মহাশয় নাকি কেরলের মৎস্য মন্ত্রী মহাশয় সমীপে পঃ বঙ্গে মৎস্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন।—"চিঠির খামের ওপর সাবেকী ঢঙে 'যাও পাখী বলো তারে সে যেন ভোলে না মোরে' লেখা ছিল কিনা বলতে পারব না"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

চাউলের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে পঃ বঙ্গের অনুরোধ রক্ষায় নাকি কেন্দ্র নারাজ। শ্যামলাল বলিল—"রাজ্যসমূহকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতির প্রথম কিস্তি!!"

প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের সমীক্ষা দলের 'রিপোর্টে' বলা হইয়াছে, কেন্দ্রে পুরো মন্ত্রী ১২জন থাকিলেই ভাল। খুড়ো সংক্ষেপে বলিলেন—"দাউ টু ব্রুটাস!"

ট্রাম-কোম্পানির তরফ হইতে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত একটি ঘোষণায় বলা হইয়াছে, কোম্পানি শহরে শান্তি রক্ষায় আগ্রহী।—"কিন্তু সময়ে-সময়ে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির হুমকি সম্বন্ধে অনাগ্রহী কিনা তা এই ঘোষণায় বলা হয়নি"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীত্রিগুণা সেন বলিয়াছেন যে, ভারতীয় প্রাক্-স্নাতকদের বিদেশ যাত্রা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।—"কিন্তু কাজটা কি এত সহজে সুসম্পন্ন হবে? 'উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা' জাতীয় বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গেলে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি থেকে প্রতিবাদ অনিবার্য"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

কেন্দ্রের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরী মহাশয় লণ্ডনে ভারতীয় হাই কমিশনার নির্বাচিত হইয়াছেন। আমাদের শ্যামলাল প্রশ্ন করিল—"ডি-

ভ্যাল্যুড"? আমরা জবাব দিতে পারিলাম না, এমন কি বিশুখুড়োও না।

এক সংবাদে শুনিলাম, গণ্ডারের শিং-এর দাম এখন কিলো প্রতি কুড়ি হাজার টাকা হইয়াছে।—"গণ্ডারের চামড়ার দামের কথা কিছু বলা হয়নি, নিশ্চয় সেটা দশ গুণ বেশি হবে, কেননা আমরা যদ্দূর জানি চামড়ার চাহিদাই বেশি"—বলেন সহযাত্রী।

বে-আইনী মদ্যশিল্পের জন্য পুলিস আর আবগারি বিভাগের কর্মচারী-দের যে-ঘুষ দিতে হয় তাহা হইতে অব্যাহতি পাইলে এই শিল্পের মালিকরা সানন্দে সরকারকে লাইসেন্স ফী বাবদ অর্থ দিবেন,—এই কথা মালিকরা জানাইয়াছেন আবগারী মন্ত্রী শ্রীঅময় চক্রবর্তী মহাশয়কে—"শুধু লাইসেন্স ফী? আইনানুগ হলে, পরবর্তী নির্বাচনে দুটি দুটি করে ভোট পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত"—সহযাত্রীর জড়িত কণ্ঠ শুনিয়া কেহ আর তাঁর বক্তব্যকে আমল দেন নাই।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় খাদ্য বিতর্ক সম্পর্কে খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ বলেন, বিজ্ঞানীদের মতে পুরুষে অপেক্ষা মেয়েরা কম খাদ্যশস্য খাইয়া থাকেন।—"বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কার প্রথম কবে করেন তা জানিনে, তবে হালে কাঁটা ছাঁচড়ার অভাব এবং সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব হবার ভাবই কম পরিমাণে খাদ্যশস্য খাবার কারণ। তা নইলে বেড়াল ডিঙোতে পারে না

ভাতের কাঁড়িও তো আমরা দেখেছি 'এই সেদিন পর্যন্ত"—বলেন বিশুখুড়ো।

আমেরিকায় কলেজের ছেলেমেয়েদের বর্তমান মাসের ফ্যাশন নাকি সাবেকী পোশাক পরা।—"আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাঁরা আমেরিকার ফ্যাশনের নামে মুচ্ছো যান তাঁরা (অর্থাৎ স্ত্রীং) যদি নথ-নোলক পরতে চান এবং তাঁরা (অর্থাৎ পুং) যদি চোগাচাপকান পরে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন তা হলেই তো কর্মচিত্তির"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

এই ফ্যাশনের ঢেউ নাকি বৃটেনকেও আলোড়িত করিয়াছে। সেখানে রেড গার্ডদের পোশাক পরিয়া মাও সে তুং-এর বই হাতে লইয়া রাস্তায় ঘোরা ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"অবশ্য মিলটন-শেকসপীয়রের বদলে মাও সে তুং-এর বই পাঠ্যের দাবিতে বিদ্যায়তনগুলিতে 'ঘেরাও' এখনো ফ্যাশন হয়নি!!"

লোকসভায় বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম বক্তৃতা দেন শ্রীভূপেশ গুপ্ত। বিশু-খুড়ো বলিলেন—"কে বলে ভূপেশ গুপ্ত, ব্যক্ত বঙ্গময়!"

শ্রীমতী সত্যবাণী মুথু

শ্রীমতী সত্যবাণী মুথু মাদ্রাজের দ্রাবিড় মুনেত্রা কজগম সরকারের একমাত্র মহিলা মন্ত্রী। তাঁর উপর দায়িত্বভার অনেক। হরিজন মংগল, তথ্য ও প্রচার, স্টেশনারী ও ছাপা, সরকারী প্রেস, সিনেমাটোগ্রাফ আইন এবং নারী ও শিশু মংগল নিয়ে তাঁর কার্যভার বা পোর্ট-ফোলিও।

শ্রীমতী সত্যবাণী মুথু

১৯২৪ সালে মাদ্রাজ সংলগ্ন চিংলেপুট জেলায় সত্যবাণীর জন্ম। আজ তাঁর বয়স ৪৩ বৎসর। এগমোরের সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রী জীবন আরম্ভ হয়। শ্রীমতী মুথু হোমিওপ্যাথীর ডাক্তার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত দ্রাবিড় কজগম পার্টির সভ্য ছিলেন। ১৯৪৯ সালে দ্রাবিড় মুনেত্রা কজগম গঠিত হয়। পুরোনো পার্টির অনেকে এই দলে চলে আসেন। শ্রীমতী সত্যবাণীও সেই সময় নূতন দলে যোগ দিলেন। নূতন দলে তিনি জেনারেল কাউন্সিল এবং কার্যকরী সভার সদস্য হন। হিন্দি বিরোধী আন্দোলন এবং মূল্য বৃদ্ধির বিপক্ষে বিক্ষোভ করে তিনি কারাবরণ করেছিলেন।

সমাজসেবায় তাঁর বহু প্রতিষ্ঠানের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষভাবে তিনি উন্নতি-মূলক কাজ করেছেন। ডি এম কে দলের মহিলা বিভাগের প্রচার বিভাগের ভার বর্তমানে তাঁর উপর ন্যস্ত। ১৯৫৭ সালে মাদ্রাজ শহরের পেরাম্বুর নির্বাচন কেন্দ্র থেকে শ্রীমতী সত্যবাণী বিধানসভার সভ্য হন কিন্তু ১৯৬২ সালে একই নির্বাচন কেন্দ্র থেকে পরাজিত হন। আবার গত সাধারণ নির্বাচনে সেই পেরাম্বুর কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছেন। শ্রীমতী মুথু তামিল সাহিত্য জগতেও অপরিচিতা নন। যোন অফ আর্ক এর জীবনী অবলম্বন করে তামিলে একটি রচনা তাঁর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বালগেরিয়ার মেয়ে

৮ই মার্চ সোস্যালিস্ট দেশগুলিতে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস পালন করা হয়। যে যেভাবে পারে সেদিনটার স্মরণে কিছু আয়োজন করে। ছেলেমেয়েরাও সেদিন মায়ের গৌরব মনে করে তাঁদের অভিনন্দিত করে। ৮ই মার্চ, ১৯১০ সালে কোপেনহাগেনএ এক সম্মেলনে ৮ই মার্চকে নারীর অধিকার দাবি করার দিন বলে সোস্যালিস্ট মহিলারা গ্রহণ করেছিলেন। এ বছর তার ৫৭ বছর পূর্তি। সব সোস্যালিস্ট দেশ নূতন করে নারীর প্রগতির ইতিহাস আলোচনা করবার সুযোগ উপস্থিত করেছেন। তার মধ্যে বহু দেশেই বিচিত্র এই নারী প্রগতির ধারা।

বালগেরিয়া এমনি একটি দেশ। এশিয়া যেখানে ইউরোপের সংগে মিশেছে সেখানেই তুর্কীর গায়ে গায়ে ঘেঁষা ছোট্ট দেশ। এশিয়া আর ইউরোপের মিলিত সংস্কৃতির ধারাতে রঙ্গীন তার আবহাওয়া। বাল-গেরিয়া মাঝখানে বয়ে গেছে ইউরোপের প্রাণ ড্যানিউব। উত্তরে রুমানিয়া, দক্ষিণে গ্রীস আর পূর্বে ব্ল্যাক সি। আয়তনে কাশ্মীরের অর্ধেক, লোকসংখ্যায় নেপালের কাছাকাছি। ৭০ লক্ষ আন্দাজ। ভারত-বর্ষের তুলনায় কিছুই নয় তবে ইউরোপের বহু দেশ যেমন হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম বা ডেন-মার্ক এর চেয়ে অনেক ছোট। বহুদিনের পরাধীনতা ও ফ্যাসিস্ট শাসনের শেষে বালগেরিয়া যখন এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখবার সময় পেয়েছে তখন দেখেছে দেশের মেয়েদের কি সাংঘাতিক দুরবস্থা। আইনের চোখে বালগেরিয়ান বালার কোনই মর্যাদা ছিল না। কবির কলমে আর লেখকের

জাপানী চায়ের খুশীতে উজ্জ্বল মুখ

বালগেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েদের পোশাক বিভিন্ন। এই সাজ একটি প্রদেশের উৎসব সজ্জা

কল্পনায় তাদের নিয়ে বহু রচনা হয়েছে কিন্তু বাস্তব জীবনে তারা কি ছিল? সন্তানের উপর দাবি পিতার ছিল মায়ের নয়। উপজীবিকার ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ বৃত্তিতে মেয়েদের বেলায় ছিল প্রকাণ্ড বাধা। নাবালকের অভিভাবকত্ব কোন মেয়ে কোনদিন পায়নি। শিক্ষা তাদের হতো

সামান্য অথবা একেবারেই নয়। পাঁচ শতাব্দীর অটোম্যান সাম্রাজ্য সবচেয়ে বড় বাঁধনে বেঁধেছিল মেয়েদের।

আজ বালগেরিয়ার মেয়েদের অধিকার পুরুষের সঙ্গে একেবারে এক। সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক, সমান ছুটি, আরাম সামাজিক সুখ সুবিধা দাবি। সব কিছুই অভিন্ন। গত মহাযুদ্ধের পর মেয়েরা প্রথম পার্লামেন্টের সভা হবার অধিকার পেয়েছিল। কিন্তু সর্বশেষ নির্বাচনে ৭০টি মহিলা পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়েছেন। বালগেরিয়ার অজ মহিলামন্ত্রী আছেন, মহিলা বৈজ্ঞানিক নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করছেন। উৎপাদনে, শিক্ষাক্ষেত্রে; ব্যবসায়ে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতিতে শীর্ষস্থানে মহিলা বিশেষজ্ঞরা কাজ করে যাচ্ছেন। এতটুকু দেশে সাড়া এসেছে সব দিক থেকে। তাই আজ কর্মচারী মহলে উচ্চ-পর্যায়ে অনেক মেয়ে কাজ করছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ৪৮০০ মহিলা এঞ্জিনিয়ার, ৪৪০০ ডাক্তার, ৩৭২২ কৃষিকর্ম বিশেষজ্ঞ মহিলার হিসাব করা হয়েছিল। ৭০ লক্ষ জনসংখ্যায় সে বড় কম কথা নয়। তার উপর পশু চিকিৎসা থেকে নিয়ে চিড়িয়া-খানার জন্তুদের তত্ত্বাবধান পর্যন্ত মেয়েরা করেন। আইনই যে শুধু সাম্য দিয়েছে তা নয়, আইনের বাইরে যে দুনিয়া তার কাছেও মেয়েরা সমান সুযোগ পেয়ে সার্থক জীবনযাপন করছেন। সামাজিক স্বীকৃতিই তার অবশ্য মুখ্য কারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ দলের শতকরা ২২ জনই মেয়ে। জনস্বাস্থ্য বিভাগে ২২,০০০ মহিলা কর্মী আছেন। স্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে এক লক্ষের মত মেয়ে কাজ করেন। শহর এবং গ্রামের পরিচালনা পরিষদগুলিতে হাজার বারো মেয়ে আছেন। চারুকলা তো বলতে গেলে মেয়েদের একচেটিয়া ব্যাপার। তাতে শিল্পী মেয়ের অনুপাত শতকরা ৪৩.৪৪। লেখিকা, কবি নাট্যকার, ভাস্কর, ছায়াচিত্র পরিচালিকা, গায়িকা নিত্য নূতন রূপে রসে সৃষ্টির দুনিয়াকে ভরে তুলছেন।

সর্বত্র অবাধগতি সত্ত্বেও বালগেরিয়ার মেয়ে আজও মুখ্যত মা ও ঘরণী। তবে প্রয়োজনের তাগিদে ঘরণীরা অনেকেই ঘরের বাইরে কাজ করেন। তাতে তাদের যাতে অসুবিধা বেশী না হয়, এজন্য ব্যবস্থার অভাব নেই। সন্তানসম্ভাবা মা যদি কর্মী হন তবে তাঁর পাওনা ছুটির উপর চার মাস ছুটি মঞ্জুর করা হয়। ৪৫ দিন সন্তান জন্মের আগে আর ৭৫ দিন পরে। এ সময় পুরো মাইনে দেওয়া তো হয়ই এবং তার উপর আয়কর নেওয়া হয় না সুযোগের সদ্ব্যবহারও তাই যথেষ্ট। কলকারখানা থেকে নিয়ে সরকারী দপ্তর, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সর্বত্র কর্মী মেয়ের সংখ্যা শতকরা ৪০। তবে শিক্ষাব্যবস্থার মহিলার অনুপাত আলাদা করে হিসাব করলে, তার চেয়েও অনেকটা বেশী। শতকরা ৫৫।

আজকের দুনিয়ার হিসাবে খুব একটা চমকপ্রদ পরিস্থিতি মনে হয় না বটে তবে অতীতের দিকে তাকিয়ে বিচার করলে অভাবনীয় উন্নতি একথা স্বীকার করতেই হবে। ১৩৯৬ থেকে ১৮৭৮। বলতে গেলে পুরো পাঁচ শতাব্দীকাল অটোম্যান সাম্রাজ্য অক্টোপাসের মত যাকে বেঁধে রেখেছিল তারপর হিটলারের ফ্যাসিস্টবাদ যে মহিলা সমাজকে বাইরের জগতে প্রবেশ করতে দেয় নি তার পক্ষে এ মাধ্যম যে মহৎ কীর্তি এ বিষয় সন্দেহ আছে কি?

শ্রীমতী

কলকাতার ডায়েরি

আপনি আছেন ওকলাহামায়। কিংবা উতকামণ্ডে। আপনার কঠিন অসুখ, কিছুতেই সারছে না। অসুখের সব বিবরণ দিয়ে একখানা চিঠি আর একটি ফটো পাঠিয়ে দিন ডাকে। না, এক্স-রে ফটো নয়, নিজের মুখের ছবি। আর ফটো যদি না থাকে, তবে ওই চিঠিই যথেষ্ট।

পাঠাতে হবে কোথায়? নৈহাটিতে, শাস্ত্রীভিলায়। কোন ভিষকশাস্ত্রীর নামে ভিলার নামকরণ নয়, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর একদা-আবাস এই ভিলা, তাঁর নামেই বাড়ি। এখানেই ছিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র ডকটর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য জ্ঞানজ্যোতি, রাজ্যরত্ন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। দেহরক্ষা করেছেন বছর তিন আগে, এখন সেখানে আছেন তাঁরই পুত্র ডাঃ বি ভট্টাচার্য।

পণ্ডিতের বাড়ি, কিন্তু ইদানীং এই বাড়িটি উল্লেখযোগ্য আর একটি কারণে। এখানেই আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন এক চিকিৎসাপদ্ধতি, আবিষ্কর্তা ডকটর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য স্বয়ং।

চিকিৎসাপদ্ধতিটি কী? টেলিথেরাপি। বাংলায় বলা যেতে পারে 'দূর-চিকিৎসা'। এই রীতিতে ফল পেয়েছেন এমন একজন ভদ্রলোক সেদিন আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে এসে বর্ণনা করছিলেন শাস্ত্রী-ভিলার কথা।

ডকটর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য খ্যাতিমান পুরুষ, বিবিধ শাস্ত্রে তাঁর অগাধ অধিকার, বরোদায় দীর্ঘকাল ছিলেন সেখানকার সরকারী জ্ঞান ভাণ্ডারের চাবি হাতে নিয়ে। আপাতদৃষ্টিতে এই ধরনের দূর-চিকিৎসা অবিশ্বাস্য, অসম্ভব মনে হলেও তার সঙ্গে ডকটর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের নাম জড়িত থাকায় একেবারে অবজ্ঞা করতে পারিনি, মন দিয়ে সব শুনতে হয়েছে।

ডকটর ভট্টাচার্য শুরুতে আকৃষ্ট হন 'রেডিয়েসথেশিয়া'-র। মারকিন দেশের মিসটার হাওয়ার্ড স্ট্যাংগল এই ব্যাপারে পথিকৃৎ। দীর্ঘকালের সাধনার পর ১৯৫০ সালে শুরু করলেন টেলিথেরাপি। সম্বলের মধ্যে ছিল একটি ছোট্ট ফ্যান মোটর, কয়েকটি ডিসক এবং অধ্যবসায়। একদা হোমিও-প্যাথিতে তাঁর হাতযশ ছিল প্রচুর। বরোদা থাকাকালে প্রায় তিন লাখ লোকের চিকিৎসা করেছেন তিনি। অনেকে বলেন, ডকটর ভট্টাচার্য গুজরাটে হোমিওপ্যাথির জনক। তাঁর পরিশ্রম ও চিন্তার পরবর্তী ফসল টেলিথেরাপি। তিনি দেখতে পেলেন, এই নতুন রীতির মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিজ্ঞান।

এখন প্রশ্ন, এই টেলিথেরাপি ব্যাপারটি কী? ভদ্রলোক আমাকে অনেক বিষয় বোঝালেন, তার কিছু হৃদয়ংগম হল, কিছু না। আবছা আবছা বুঝলাম এর সংগে রয়েছে রঙ আর আলোর সম্পর্ক। প্রত্যেক নাম ও আকারের উৎস মহাজাগতিক রশ্মি। একটি মানুষের পরিচয় তাঁর নাম এবং আকারে। তাঁর গড়নের মধ্যেই রয়েছে সেই রশ্মির কিছু গুণাগুণ ও বিন্যাস। প্রত্যেক মানুষ ও বস্তুর মধ্যেই মহাজাগতিক রশ্মির গুণ, পরিমাণ ও বিন্যাস পৃথক পৃথক। ওই রশ্মিই একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করে রাখে।

মহাজাগতিক রশ্মি দৃশ্য হয় মুখ্য সাতটি রঙে। ইংরেজীতে সংক্ষেপে বলে 'ভিবজী-ওর' বাংলায় 'বেনীআসহকলা' (বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল)। রামধনুতে সাত রঙেরই প্রকাশ। নানা আকারের মধ্যেও এই সাত রঙের সংকুচিত নির্যাস। আবার বেণীআসহকলা-র আলো গ্রহ-মণির মধ্যে বিধৃত। এই মণি-গুলি মহাজাগতিক রশ্মির অফুরন্ত উৎস। তাই এই মণিগুলি আবর্তিত হলে সৃষ্টি হয় চলমান মহাজাগতিক রশ্মি এবং তখনই তা আলোর গতিতে যে-কোন দূরত্ব পাড়ি দিতে পারে অনায়াসে।

সপ্তরশ্মি তিনটি ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী। তারা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্রবিদ্যমান। তার মধ্যে সর্বশক্তিমত্তাতেই তারা মানবিক অসুখ দূর করতে পারে এবং সর্বজ্ঞ বলেই নাম ও আকারের পরিচয় সহজে পেতে পারে। আর যেহেতু তারা সর্বত্রবিদ্যমান, তাই যে-কোন দূরত্বে পৌঁছে কার্যোদ্ধার করতেও সক্ষম।

টেলিথেরাপির মূলমন্ত্র এই তিনটি শক্তিকে কেন্দ্র করে। ল্যাবরেটরিতে একটি যন্ত্রের মাধ্যমে মহাজাগতিকরশ্মি সঞ্চার করে নির্দিষ্ট রোগীর নাম ও আলোকচিত্রের উপর দিয়ে তা দূরে প্রেরণ করা যায় এবং অসুখের মূলে ওই রশ্মির প্রলেপ দেওয়া সম্ভব।

জ্যোতির্বিদ্যায় রামধনুর সাতটি রঙকে উষ্ণ ও শীতল এই দু ভাগে ভাগ করা হয়। এটা সবাই জানে যে সাতটি দৃশ্য এবং দুটি অদৃশ্য রঙের সঙ্গে নবগ্রহের সম্পর্ক রয়েছে। কূর্মপুরাণে বলা হয়েছে, গ্রহ-গুলি মহাজাগতিক রশ্মির পিণ্ডমাত্র। এক একটি গ্রহের এক একটি রঙ। রবির লাল, চন্দ্রের কমলা, মঙ্গলের হলুদ, বুধের সবুজ, বৃহস্পতির নীল, শুক্রের বেগুনী-

নীল, শনির বেগুনী, রাহুর অতিবেগুনী (আলট্রা ভায়োলেট) এবং কেতুর অবলোহিত (ইনফ্রা রেড)।

নবগ্রহের দ্বিভাগ। তার মধ্যে রবি, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও কেতু পুরুষ এবং উষ্ণ গ্রহ। অর্থাৎ তাদের সঙ্গে জড়িত লাল, হলুদ, নীল ও অবলোহিত উষ্ণ মহাজাগতিক রঙ। চুনি, প্রবাল, পুষ্পরাগ এবং বৈদূর্য এই চারটি গ্রহের মণি এবং তদনুযায়ী উষ্ণ মহাজাগতিক রশ্মির উৎস। বাকি পাঁচটি গ্রহ নারী শ্রেণীর। চন্দ্র, বুধ, শুক্র, শনি ও রাহুর মণি হচ্ছে যথাক্রমে মুক্তা, পান্না, হীরক, নীলকান্তমণি ও গোমেদ এবং এরা শীতল মহাজাগতিক রশ্মির ভাণ্ডার।

ক্রমাগত আবর্তিত সৌরজগৎ এই উষ্ণ ও শীতল রশ্মি নানা রকম নাম ও আকারের ভিতর দিয়েই সৃষ্টি, সঞ্চয় ও বিনাশ করে চলেছে। আমরা মানুষেরা এক একটি ক্ষুদ্র সৃষ্টি বলেই আমরাও ক্ষুদ্রাকারে বোধগম্য নানা আকারের সৃষ্টি ও বিনাশ করতে পারি। ওই নবমণিকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রে আবর্তিত করে ক্ষুদ্রাকার একটি সৌরজগৎ চালনা করাও তাই সম্ভব। রোগ হচ্ছে একটি রশ্মিযুক্ত নামমাত্র এবং তার প্রতিকারও একটি রশ্মিযুক্ত নাম ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং টেলিথেরাপিতে একটি রশ্মি দিয়ে অন্য একটি রশ্মিকে বিনাশ করা অসম্ভব হবে কেন?

অনেকক্ষণ শুনলাম ভদ্রলোকের বিশদ ব্যাখ্যা। আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। উনি বললেন, "বিশ্বেস হচ্ছে না তো? শাস্ত্রীভিলায় গেলে দেখতে পাবেন ক্যানসার, যক্ষ্মা ইত্যাদি কত কঠিন অসুখ ওই টেলিথেরাপিতে ভাল হয়ে যাচ্ছে। শুধু নৈহাটিতে নয়, ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরেও অনেক জায়গায় দূর চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কলকাতায়ও আছে একটি, চালান ডাঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের শিষ্য শ্রীএ এস মণি। যদি দরকার পড়ে, আপনি নিজেও যেতে পারেন ওই কেন্দ্রে। না গেলেও ক্ষতি নেই, চিঠি আর ফটো পাঠালেই চলবে।"

ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। ভাবলাম, ব্যাপারটা কলকাতার ডায়েরি পাঠকদেরও জানাই। অ্যালোপ্যাথি— হোমিওপ্যাথি — কবিরাজী চিকিৎসায় ফেল পড়া কোন পাঠক-রোগী যদি টেলিথেরাপিতে ফল পেয়ে যান, তাহলে মন্দ কী।

—চাণক্য
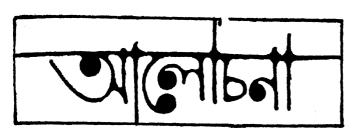
লিপ্যন্তর সমস্যা

ইংরেজী শব্দের বাংলায় লিপ্যন্তর বিষয়ে সুনীতিকুমারের মূল প্রবন্ধ ও তার সমর্থনে যে সব মূল্যবান আলোচনা (তন্মধ্যে সুবোধ চৌধুরীর প্রবন্ধ অন্যতম) অদ্যাবধি (১২-৩-৬৭) দেশে ছাপা হয়েছে, সেগুলি পাঠান্তে এ কথা নিশ্চয় বলা চলে যে, এই লিপ্যন্তর বিষয়ে আমাদের যে নিজস্ব রীতি অনুসৃত, তা ঐ সব আলোচনা যুক্তির দিক থেকে বিস্তারে ও সঙ্গতিতে কোথাও ফাঁক রেখেছে বলে মনে হয় না। সুনীতিকুমার প্রমুখ ভাষাবিদ্ ও ভাষা-প্রেমিকদের প্রবর্তিত বাংলা লিপ্যন্তরের রীতি ও তার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের চেষ্টা সব দিক থেকেই অসঙ্গত বোধ হয়।

আমি প্রথমে ইংরেজী শব্দমধ্যস্থ কনসোন্যান্টের পূর্বের "আর"-অক্ষরটির বিষয়ে কিছু বলছি। এরূপ স্থলে ইংরেজরা প্রায় সকল শব্দেই ঐ 'আর'-অক্ষরের উচ্চারণ করে না। (শেষে থাকলেও করে না, এবং ফরাসীরা এর বিপরীত, তারা শেষের যে চারটি মাত্র ব্যঞ্জন বর্ণ প্রায় সকল স্থলে উচ্চারণ করে তার মধ্যে 'আর' একটি। কিন্তু এটি নিতান্তই প্রসংগত।)

ইংরেজী উচ্চারণ সম্বলিত আধুনিককালে প্রকাশিত তিন খণ্ডে সমাপ্ত একটি অভিধান (নাম, দি বুক অব ওয়ার্ডস) আছে। তাঁতে শব্দমধ্যস্থ অনুচ্চারিত 'আর', উচ্চারণ-নির্দেশে একদম বাদ দিয়েছে। যথা Garden, Heart, March প্রভৃতির যথাক্রমে উচ্চারণ দেওয়া আছে Gahden, Haht, Mahch ইত্যাদি। অতএব বাংলায় লিপ্যন্তরে আমরা অবশ্যই গাডেন, হাট, মাচ লিখব না, কেননা, ঐ সব স্থলে 'আর' অক্ষরের আংশিক উচ্চারণে (প্রায় ছুঁয়ে যাওয়ার মত) বাধা নেই। এবং বাংলায় গারডেন, হারট, মারচ (যা অনেকে পড়বে গারোডেন হারোট ইত্যাদি) লিখলেও বাংলা উচ্চারণ রীতির উপর অযথা অত্যাচার করা হবে। (এ সব কথা আলোচনায় যাঁরা বিস্তারিতভাবে বলেছেন।) অর্থাৎ বাংলায় গার্ডেন, হার্ট, মার্চ ইত্যাদি লিখলে বাংলা বানান ও ইংরেজী উচ্চারণ রীতির মধ্যে সুন্দর একটা সামঞ্জস্য হয়।

অন্যান্য অক্ষরের বেলাতেও বৈপ্লবিক পরিবর্তনে ঐ একই বিপদ। প্রসঙ্গত বলি, লাইনোর যুগে, পূর্ব যুগের কথা তোলা অসংগত বোধ হলেও বলতে বাধা নেই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত ভাষার ভূগোল যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বিদেশী দেশ বা শহরের নামে বাংলা বানান রীতি ঠিক রেখেই তিনি তাতে সংস্কৃত বিভক্তি যোগ করেছেন, যথা 'লণ্ডনস্য' ইত্যাদি।

ইংরেজী এস্-অক্ষর ও এস্-এচ্ যুক্তাক্ষর এই দুটির লিপ্যন্তরে যে অনাচার চলছে সে বিষয়েও আলোচনা হওয়া উচিত। বাংলায় শষস আমরা একই রকম উচ্চারণ করি, কিন্তু অমার্জিত জিহবার বাংলা স ইংরেজী এস্ হয়, এবং ইংরেজী এস্ বাংলায় 'শ' হয়ে পড়ে। যেমন অনেকে সপ্তাহ বলতে স এর ইংরেজী এস্ উচ্চারণ করে, কিন্তু 'বাস্'কে 'বাশ্' বলে। যেমন আকাশবাণীর বাংলা সংবাদে একজন বলেন, যা ইংরেজীতে লিখলে এই রকম হত—Preshident, Congresh, Shoviet ইত্যাদি। কিন্তু মূল ইংরেজী এস বা এস্-এর উচ্চারণ বাংলায় সব সময় দন্ত্য স এবং এস্-এচ্ সর্বদা তালব্য শ লেখা উচিত। যেমন সুটকেস, ক্লাস, নোটিস (সি-ই হলেও এস-এর উচ্চারণ যেমন পুলিস)। যাঁরা সুটকেস ও ক্লাস বা নোটিসকে যথাক্রমে Sootkesh, Clash, ও Notish উচ্চারণ করেন, তাঁদেরও বাংলায় "স" ব্যবহার করা উচিত। তাতে মূল উচ্চারণ কি ছিল তার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

কিন্তু কেউ বেদনানাশক (অথচ অন্যভাবে বিপজ্জনক) ওষুধ—Pethidine-এর নানা কাগজে লিপ্যন্তর দেখেছেন? পুলিস চোরাই ওষুধ ধরতে হানা দিয়ে নানা স্থানে ঐ পেথিডিনও আবিষ্কার করে থাকে। কিন্তু বাংলা কাগজে রিপোর্ট বেরোয় নানা বানানে। আমি দু রকম দেখেছি—প্যাথেড্রিন এবং পেথিড্রিন। র-ফলা রিপোর্ট লেখকের বুদ্ধিজাত। মূলে 'আর' নেই—বিশুদ্ধ পেথিডিন। একটি ইংরেজী কাগজেও ইংরেজীতেই দেখেছি pethidrine, কিন্তু পি-ই পে হওয়া উচিত, প্যা হল কি করে? এ নিশ্চয় ম্যাঘমালা বা ক্যাথোদ্‌গাম উচ্চারণকারীর লেখা। ড-এ র-ফলাটা নতুন সংযোজন, র-এর অভাব ভুল মনে করে সদুদ্দেশ্যে কৃত। অনেকবার ঐ একই লিপ্যন্তর দেখেছি।

ঐ ২৫শে তারিখের দেশে অন্য একখানা চিঠিতে দেখলাম জোয়ান অব আর্ক। কিন্তু ওর উচ্চারণ 'জোয়ান' কদাপি নয়। উচ্চারণ, জোন—Joan of arc—জোন অব আর্ক। ইংরেজী loan বা moan এর মতো। অনেকেই জোয়ান লেখেন, লিপ্যন্তরে ভুল হয়।

ইংরেজী And এর শুদ্ধ এবং যুক্তিসঙ্গত লিপ্যন্তর অ্যান্ড। যুক্তিটা এই: আমরা যখন ক্যা লিখি তখন আসলে কি কি লিখি? লিখি—ক্+অ+য+আ। ঙ ঞ অনুস্বর বিসর্গ বাদে সব ব্যঞ্জন বর্ণই অ স্বরবর্ণ যুক্ত করে উচ্চারণ করি। ইংরেজীতে তা নয়। বি সি ডি (যদিও দীর্ঘ উচ্চারণে বী সী ডী লেখা উচিত), এফ্, এচ, জে, কে, প্রভৃতিতে বিভিন্ন স্বরসংযোগ। গ্রীক বর্ণমালাও তাই—বিটা থিটা...মু, নু ইত্যাদি। কিন্তু বাংলায় অ-যোগ। তাই ক্যা লিখতে কার্যত যখন ক্ বাদ দিয়ে অ-তে য-ফলা আকার দিচ্ছি, তখন অ্যা লিখতেও তাই, এ্যা বা য়্যা নয়। শেষেরটির উচ্চারণ ইআ, প্রথমটির এয়া। অতএব অ্যা এর স্থলে এ্যা বা য়্যা পরিত্যাজ্য।

আর এক বিপদ পরিচিত দেশী নামের ইংরেজী লিপ্যন্তর থেকে বাংলা লিপ্যন্তর। মূল বাংলাটা চোখের সামনে থাকলেও চোখ নিষ্ক্রিয় থাকে। যেমন আমাদের জাতীয় সংগীতের একটি লাইনে আছে "প ঞ্জা ব সি ন্ধু গুজরাট ম রা ঠা"...কিন্তু যেহেতু ইংরেজীতে Punjab ও Marhatta লেখা হয়, সেই হেতু সবাই মিলে রবীন্দ্রনাথের মূল রচনা বদল করে লিখতে আরম্ভ করেছে পাঞ্জাব...মারাঠা। এর প্রতিকার কি? যেমন গোখলে কে গোখেল লিখছে, বিজ্ঞানী রামনকে রমণ লিখছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের যুগ গত, তিনিই একমাত্র সাংবাদিক যিনি এ সব বিষয়ে কড়া ছিলেন। তাঁর কাগজে রামনকে রমণ এবং মালবীয়কে মালব্য লেখা হত না কখনও। ইংরেজীতে Malavya লেখা হয় না, Malaviya লেখা হয় তবু মালব্য কেন?, পঞ্জাবের 'নেটিভ'রা পঞ্জাবই বলে। এবং মহারাষ্ট্র উচ্চারণ করে তথাকার লোকেরা। মাহারাষ্ট্র নয়। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ যুক্তিসংগতভাবেই মরাঠা লিখেছিলেন, সে দেশে কিছুকাল বাস করে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও নিশ্চয় ছিল। অতএব জাতীয় সংগীতের বিকারকে দেশপ্রেমের দৃষ্টান্তরূপে স্বীকার করা কঠিন। (আমি আশা করি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ বদল করেন নি।)

এ সব বিষয়ে একটুখানি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়া উচিত। আমি সামান্য আলোচনা করতে গিয়েই দেখছি চেন-রিঅ্যাকশনের মতো এক বিষয় থেকে পাঁচ বিষয় এবং পাঁচ থেকে পঁচিশে চলে যাবার

দাখিল হয়েছি। কারণ 'কি ও কী' এবং "আণবিক ও পারমাণবিক', অথবা 'দান ও অবদান' এবং সর্বশেষ "ফলশ্রুতি" নিয়ে ক্রমেই উত্তেজিত হচ্ছি। তবু শেষ পর্যন্ত না বলে পারছি না যে "ফলশ্রুতি" আর "ফল" এক নয়। যেমন আম ও আমদরবার এক নয়। "ফলশ্রুতি"র লেখকেরা একটু চিন্তা করবেন এ নিয়ে।

পরিমল গোস্বামী
কলকাতা

ইতিহাস থেকে ইতিহাসে

দেশ পত্রিকায় সুনন্দ লিখিত 'ইতিহাস থেকে ইতিহাসে' শীর্ষক রচনাটি খুবই চিত্তাকর্ষক এবং সময়োপযোগী হয়েছে। এজন্য লেখককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কলকাতার উন্নয়ন সম্পর্কে বহু আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে। দিল্লীর কাছে আমাদের বক্তব্য পেশ করেছি। কিন্তু কিছুই হয়নি। একটা গুরুত্বপূর্ণ শহরের সমস্যা যে দৃষ্টি নিয়ে দেখা উচিত ছিল, কর্তারা তা দেখেননি। উপরন্তু তার উপর দোষারোপ করা হয়েছে। লেখক অতিবড় সত্য কথা একটা বলেছেন, সেটা হচ্ছে আমরা, অর্থাৎ বাঙালীরা কলকাতার স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন নই। আর এই মনোভাবের জন্যই বোধ হয়, অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা কলকাতার প্রতি বিরূপ। সরকারের অবশ্য পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিত নয়। কলকাতার মত একটা গুরুত্বপূর্ণ শহর যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সেটা বিশিষ্ট একটা প্রদেশের ক্ষতি নয়, ক্ষতি সমগ্র ভারতবর্ষের; এ কথা পূর্বে মন্ত্রীদের মুখে অনেকবার শুনেছি, নূতন প্রধানমন্ত্রীও কলকাতা বন্দর বাঁচানোর উপর জোর দিয়েছিলেন, কিন্তু আশানুরূপ ফল এখনও কোন পাওয়া যায়নি।

কলকাতাকে বলা হয়, ভারতের প্রাণকেন্দ্র। এর সংস্কৃতি একটা গর্বের জিনিস। সেই ভারতীয় রেনেসাঁসের জন্মস্থান এই কলকাতা এরূপে ঐতিহ্যপূর্ণ একটা নগরের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন হবার আশংকা দেখা দিয়েছে, তখন তাকে রক্ষা করবার প্রস্তাব নিতে কেন্দ্রীয় সরকার গড়িমসি করেছিলেন কেন বা এখনও করছেন কেন, তা সত্যিই দুর্বোধ্য। সবচেয়ে সচেতন হতে হবে বাঙালীদের। তাদের ন্যায্য দাবি আদায় করবার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করতে হবে।

গণেশ দত্ত
কলকাতা-৬

ভ্রমণ

কদমখণ্ডীর ঘাট। [illegible]। সুজাত প্রকাশনী। ১ কলেজ রো, কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

গতানুগতিক গল্প-উপন্যাস-নাটকের কলম দিয়ে সাহিত্যের বাজার ঠাসা। কিন্তু মনটা ভাল লাগছে, এই বইটির ভিন্ন স্বাদ, আর চরিত্রের সান্নিধ্যে এসে। কোনো সুদক্ষ সাহিত্যিক পালিশ হয়ত বইটিতে নেই, কিন্তু বিষয় এবং নিরলঙ্কার বর্ণনাভঙ্গির গুণে, লেখক অজ্ঞাতসারে পাঠকের চিত্ত জয় করে নিয়েছেন। [illegible] হঠাৎই একদিন এক সামরিক ঘটনার নিবিড় সংস্পর্শে নিজেকে সঁপে দিয়ে, এক অনিবার্য প্রেরণায় উপস্থিত হয়েছিলেন কবি জয়দেবের মেলায়। তাঁর চলার পথে সাথী হয়েছে যত চরিত্র—তাদের ভিতর থেকে লেখক কুড়িয়ে নিয়েছেন সুখ দুঃখের নানা কাহিনী, বৈরাগ্যের নানা ঐশ্বর্য, ভালোবাসার বহুমূল্য মণি-মুক্তো—সেগুলি একত্রে একসূত্রে মালা গেঁথে এই কদমখণ্ডীর ঘাট। যে-কোন পাঠকের কাছেই বইটির আকর্ষণ এক এক-দিক থেকে বিদ্যমান, প্রেম যে নেই তা নয়, আধ্যাত্মিক সুরেও ফুটেছে চমৎকার, আবার কিংবদন্তী-ঘেরা গল্প। সেই সঙ্গে ভ্রমণের ঘরছাড়া ইশারা, নানা মানুষের নানা চরিত্র, মনের উপর কেমন এক উদাস-বাউল ছাপ রেখে যায়। লেখকের নিরাসক্ত, নিরাভরণ সহজ দৃষ্টিভঙ্গিটি বড় ভাল লাগল। শুধু একা তিনি নন, তাঁর সঙ্গে আমরাও এক পুণ্যতীর্থে ঘুরে এসেছি। এবং এ বইটি পড়বার পর ঐ কদমখণ্ডীর ঘাট, ঐ জয়-দেবের মেলায় বাস্তবে উপস্থিত হবার এক অনিবার্য তাগিদ অনুভব করছি।

পত্রপত্রিকা

'কবি ও কবিতা' ত্রৈমাসিক। সম্পাদক : জগদীশ ভট্টাচার্য। ১·৫০।

'কবি ও কবিতা' ত্রৈমাসিক (২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা) সাহিত্যপত্রটি খুবই সুসম্পাদিত। সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকমাত্রেই বর্তমান সংখ্যাটি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে আমার উক্তির যথার্থতা স্বীকার করবেন। এই সংখ্যাটিতে বহু বিশিষ্ট লেখক কয়েকটি মূল্যবান নিবন্ধ, কবিতা এবং আলোচনা উপহার দিয়েছেন। দুটি এবং পূর্ব পাকিস্তানের উপর কাব্যালোচনা খুবই তৃপ্তিকর। 'মঙ্গলকাব্য ও রবীন্দ্রনাথ' এবং 'রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য' শীর্ষক নিবন্ধ দুটির জন্য কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং জগদীশ ভট্টাচার্য ধন্যবাদার্হ। সংখ্যাটি রুচিবান পাঠকের কাছে সমাদৃত হবে।

প্রাপ্তি স্বীকার

[illegible]। মহাকাল। [illegible] পাবলিশার্স : ৬/১ ডাঃ [illegible] মুখার্জী রো, কলিকাতা-৯। মূল্য ৪·০০।

[illegible]। [illegible] রায়। [illegible] : ১৭ ভুবনমোহন সরকার লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য ৭·০০।

[illegible]। [illegible]। দীপক প্রকাশনী : ২৪০/এক [illegible] রোড, কলিকাতা-[illegible]। মূল্য ২·৭৫।

বি এন টি [illegible]-এর "জীবনমৃত্যু" (পরিচালনাঃ হীরেন নাগ) ছবিতে উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, [illegible] বিশ্বাস ও [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়—এ-সপ্তাহে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে

কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রীর আশ্বাস

ভারতীয় ও বিদেশী ছবির ক্ষেত্রে সেন্সরের ভিন্ন নীতি অনুসরণ করা সমীচীন কিনা, তা নিয়ে বেশ কিছুকাল যাবৎই আলোচনা চলছে। এই সমস্যার উপর কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রী কে কে শাহ আলোকপাত করেছেন। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেছেন, ভারতীয় ও বিদেশী ছবির মধ্যে পৃথক নীতি কেন অবলম্বন করা হবে, আমি বুঝি না। সেন্সরশিপ সম্পর্কে তিনি বলেন, ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা যত বেশী সম্ভব দেওয়া উচিত। ভারতীয় ছবিতে চুম্বনের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে কিনা, এ বিষয়টি তিনি ভেবে দেখবেন বলেছেন। তিনি আরও জানান, পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ কমিটি ছায়াছবিতে অশালীনতা বা অশ্লীলতার বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখছেন, এবং কমিটির রিপোর্ট শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। 'বাই নাইট' শ্রেণীর ছবিগুলি এ দেশে দেখানোর পর কেন নিষিদ্ধ হয়েছে, সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, এই ছবিগুলির প্রদর্শনের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছে পরে।

বোম্বাইয়ে চলচ্চিত্রসেবীদের শ্রী শাহ আরও জানান, চলচ্চিত্র সংক্রান্ত সকল বিষয় কার্যকর করার দায়িত্ব যাতে একটি মন্ত্রকের হাতে অর্পিত হয়, চলচ্চিত্র মহলের এই প্রস্তাবটি তিনি বিবেচনা করে দেখবেন।

ছুটি

সমালোচক যখন অভিভূত, তখনই বুঝি তার কঠিন পরীক্ষা। যুক্তি দিয়ে একটি ছবির গুণের কথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায়। কিন্তু গুণের অতীত যে অনুভূতি সমালোচককে অবশ করে তা প্রকাশ পাবে

অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত পূর্ণিমা পিকচার্স-এর "ছুটি"-তে নন্দিনী ও মৃণাল মুখোপাধ্যায়—পয়লা বৈশাখ ছবির মুক্তি (ছবির সমালোচনা এ-সংখ্যায় দেওয়া হল)

কোন্ অবয়ব? আর যিনিই পারুন, সমালোচকের পক্ষে এই উপলব্ধি একান্তে সংগোপনে লালন করা সম্ভব নয়। এবং তা অপরকে জানাতে গেলে কিছুটা উচ্ছ্বাস আসবেই, যা সুবিচারেরই নামান্তর। উচ্ছ্বাসে যুক্তিবাদীর অনীহা থাকলেও আমার নেই। তাই অকপটে বলি, অরুন্ধতী দেবীর "ছুটি" (পূর্ণিমা পিকচার্স) দেখে আমি মুগ্ধ।

"ছুটি" অনাবিল আনন্দের স্বাদ কেন দিতে পেরেছে এই প্রশ্নের দুটি উত্তর। প্রথম, অরুন্ধতী দেবী তাঁর ফিল্ম মিডি-য়ামের জন্য একটি অসামান্য রচনা বেছে নিয়েছেন। সেটি বিমল করের "খড়কুটো", যার প্রতি পরিচালিকা-চিত্রনাট্যকার প্রায় সর্বাংশে বিশ্বস্ত। দ্বিতীয়, প্রথম চিত্র পরিচালনায় অরুন্ধতী দেবী হাল-আমলের হরেক রকম ফিল্ম-এক্সপেরিমেণ্ট-এর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে চিরকালের সেই শিল্পধর্মটি প্রকাশ করতে চেয়েছেন, যাকে বলি এসথেটিকস্ বা নন্দন-বিদ্যা। এ-কারণেই শিল্পী তাঁর ক্যামেরা নিয়ে ছুটেছেন মাঠে-প্রান্তরে, সুন্দরের সীমানা খুঁজতে। "ভিসুয়াল" বা দৃষ্টি-বাহিত লাবণ্য তো পেলামই। সেই সঙ্গে বাইরের প্রকৃতির মধ্যে কাহিনীর "মুডটি"ও ধরা পড়েছে। গল্পের অন্তর-বাহিরের এই মেলবন্ধনের কাজে পরিচালিকার

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত "নল-দময়ন্তী" ছবিতে দীপিকা দাস

রসবোধের পরিচয় মেলে। তা ছাড়া আলোকচিত্র শিল্পী বিমল মুখোপাধ্যায়ের ক্যামেরায় অদ্ভুত কৃতিত্বেরও প্রমাণ পাই। প্রসঙ্গত বলে রাখি, এমন উঁচুদরের ক্যামেরার কাজ খুব বেশী দেখা যায় না। এবং ছবির সৌন্দর্যকণার সুষ্ঠু বণ্টনে চিত্র সম্পাদক সুবোধ রায়ের কৃতকার্যতাও কম নয়।

এক কথায়, "খড়কুটো"-র রসতত্ত্ব অরুন্ধতী দেবী সহজেই প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। একটি অনুচ্চার প্রেমের জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানের যে অস্পষ্ট আকৃতি পাঠকের চেতনাকে নাড়া দেয়, এই ছবির দর্শকের অন্তরকেও তা সুখানুভূতিতে ভরে তোলে। ভ্রমর ও অমলকে আমরা ছবিতে পুরোপুরি পাই। তাদের পরস্পরের কাছে আসা, সমস্ত সত্তা দিয়ে একের অপরকে ঘিরে থাকা এবং ভালবাসার কথা বলতে না পেরে তা আরও বেশী করে পাওয়ার মুহূর্তগুলি পরি-চালিকা-চিত্রনাট্যকার সু ন্দ র ভা বে সাজিয়েছেন। এই সব চিত্রের মধ্যে এমন
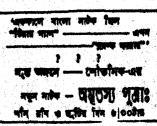
প্রসাদ প্রোডাকসন্স-এর ইস্টম্যান কালার ছবি 'মিলন'-এ (পরিচালনা: এ সুব্বা রাও) নূতন—এ-সপ্তাহে ছবিটি আসছে

এক অনিবার্য হার্দ্যগুণ প্রকাশ পেয়েছে যা আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এই রসসৃষ্টির মধ্যে পরিচালিকার পরিশীলিত শিল্পমন ও পরিমিতিবোধের প্রমাণ রয়েছে। ছবির আরম্ভ চমৎকার, ভ্রমরের কথা দিয়ে। তারপর চরিত্র পরিচয় ও ঘটনা-বর্ণনার প্রয়োগ-কল্পনাটিও সবিস্ময়ে লক্ষ করার মত। "সিনেমাটিক ফর্ম" ও ফিল্মের ভাষার চাবিকাঠি যে পরিচালিকার করায়ত্ত তা বেশ বোঝা যায়। দর্শকের হৃদয় ও বুদ্ধিকে প্রথম অধ্যায়টি সমানভাবে উদ্দীপ্ত করেছে।

তার পরের অংশ বা শেষার্ধ প্রায় সম্পূর্ণভাবেই হৃদয়ের রাজ্যে উপনীত। পরিচালিকা শেষ মুহূর্তে দর্শককে কাঁদিয়ে বিদায় দিয়েছেন। অর্থাৎ যখন জানা গিয়েছে ভ্রমর বাঁচবে না সেই মুহূর্ত থেকেই বিষাদ-যোগের শুরু। এই অধ্যায়ে মূল কাহিনীর পাঠকের মনে একটা বদ্ধ বেদনার ভার জমে উঠতে থাকে। অরুন্ধতী দেবীর ছবিতে তা চোখের জলে ঠিকরে বেরিয়ে আসে। দর্শককে আবেগের আঘাত দেবার জন্য পরিচালিকা বাড়ির ঝি'কে (যে ছোটবেলা থেকে ভ্রমরকে বড় করে তুলেছে) শোকে ভেঙে পড়ার সুযোগ দিয়েছেন ও তার কোলে ভ্রমরের খেলনা সেই ডলটি তুলে দিয়েছেন। হাসপাতালে যাবার আগে মেয়েকে বাবা শেষ উপহার একটি বই দিতে গিয়ে অতিরিক্ত যে কথাগুলি বলেছেন তার মধ্য দিয়ে ভ্রমরের মৃত্যুর নির্মম সম্ভাবনাটির কথাটিই দর্শককে বার বার জানাবার ব্যবস্থা। এক কথায়, শেষ খণ্ডে পরিচালিকা নাটকীয়তার আকর্ষণ একেবারে ছাড়তে পারেনি। হাসপাতালে ছবির শেষ দৃশ্যটিতেও সেই বাড়তি নাট্যক্রিয়া। অনতিব্যক্ত ভাবনাকে সুব্যক্ত করে তোলার আগ্রহ পরিচালিকা আরও একাধিক দৃশ্যে দেখিয়েছেন। যেমন, "আমার হাত ধরে নিয়ে চল সখা" গানের পর ভ্রমর ও অমলের পরস্পরের হাত ধরা। এমনি কিছু মুহূর্ত আছে যেখানে পরিচালিকা ভাবরসকে যেন "আণ্ডার লাইন" করে দিয়েছেন। "ছুটি"-র মত ছবি বলেই দাগগুলি একটু মোটা মনে হয়েছে। আর একটু পরিষ্কার করে বলি, শেষের দিকে নাটকের এই সব আঁচড়ের জন্য "ছুটি" একটি ক্লাসিক ছবি হতে পারল না। সেই রুদ্ধবাক বেদনার রঙে যা কাঁদায় না কিন্তু কান্নায় মন আলোড়িত করে এবং স্বল্পভাষ শিল্পের অস্পষ্টতায় "ছুটি" শেষ হলে একটি মহৎ আর্টের জন্ম হত। তবু বলি, দর্শককে কাঁদাবার জন্য যে-সব নাটকীয় ছবি তৈরি হয় "ছুটি" সেগুলির অনেক, অনেক উপরে। "খড়কুটো"'র গল্পে নাটকের সুর এসে গেলেও এবং ভ্রমরের সংঘাতকে কোন কোন সময় তথাকথিত অর্থে "বিমাতাসুলভ" মনে হলেও অরুন্ধতী দেবী তাঁর ছবিতে কোথাও মেলোড্রামা সৃষ্টি করেননি। যে পরিচ্ছন্নতার ভিতর দিয়ে এবং স্বল্পতম উপকরণে তিনি দর্শকের মন করুণ রসে আপ্লুত করে দিয়েছেন ছায়াছবিতে তা অনুশীলনযোগ্য। এবং প্রথম ছবিতে ব্যঞ্জনাধর্মী ও ভাবগত প্রয়োগের যে বৈশিষ্ট্য তিনি দেখালেন, তাতে চিত্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে অরুন্ধতী দেবীর আসন অনেক উঁচুতে নির্দিষ্ট হয়ে থাকল। প্রয়োগচিন্তার দিক থেকে একটি দৃশ্য স্মরণীয়—যেখানে ভ্রমর গানের পর বলছে অমলকে "(সখা) তুমিও"। ওই ক্ষণটিতে একটি কালো ছায়া তাদের ঢেকে দিয়েছে। বিস্ময়কর প্রয়োগকর্মের আরও অনেক চিহ্ন অরুন্ধতী দেবীর এই প্রথম ছবিটিতে ছড়িয়ে রয়েছে। সবকিছুর যোগফল এমন একটি ছবি যা একটি দুঃখের কবিতার মত দর্শকের মনে

জি পি সিপ্পির "রাজ"-এর নায়িকা ববিতা —ছবির মুক্তি বর্তমান সপ্তাহে

অবশিষ্ট রেখে যায় এবং যার মাধুর্য ও বিষণ্ণতা কোনদিন ভোলা যাবে না।

পরিচালিকা হিসাবে অরুন্ধতী দেবীর আর একটি বড় কৃতিত্ব ভ্রমর-চরিত্রের শিল্পী নির্বাচন এবং তাকে ভ্রমর করে তোলা। ভ্রমর সেজেছেন নন্দিনী, সেজেছেন বলব না, ভ্রমর হয়ে উঠেছেন। এই ছবিটি যেমনি দর্শকেরা ভুলবেন না, তেমনি নন্দিনীকেও নয়। প্রথম অভিনয়ে কোন শিল্পী যে তাঁর চরিত্রে এমন প্রাণের স্পর্শ নিয়ে আসতে পারেন তা "ছুটি"তে নন্দিনীকে না দেখলে বোঝা যায় না। তাঁর কথা বলার সুন্দর ভঙ্গি ও সুন্দর চাহনি দর্শককে আকৃষ্ট করে। রুচি ও অনুভূতির মধ্য দিয়ে তিনি ভ্রমরকে, শান্ত, ধীর এবং অন্তরে গভীর চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

অমল হয়েছেন মৃণাল মুখোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয়ও সপ্রাণ; অমলের মতই তিনি একটু রোমান্টিক, একটু লাজুক কখনও বা ছেলেমানুষ। চরিত্রটির অন্তর্দ্বন্দ্বও শ্রী মুখোপাধ্যায়ের অভিব্যক্তিতে বিধৃত। ভ্রমরের ছোট বোন কৃষ্ণার চরিত্রে রোমি চৌধুরী বেশ স্মার্ট, প্রাণোচ্ছল। অল্প বয়সের এই শিল্পীকে দর্শকদের ভাল লাগবেই। ভ্রমরের বাবা-মার চরিত্রগুলিও

শুক্রবার ১৪ই এপ্রিল শুভারম্ভ !
"...তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার..."

মিলন
ইস্টম্যানকালার
সুনীল দত্ত • নূতন • যমুনা • প্রাণ

সুঅভিনীত। এই দুই ভূমিকায় রয়েছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবারতি সেন। ডাক্তারের বেশে নির্মল চট্টোপাধ্যায় ও দীপালি চক্রবর্তীর অভিনয় বেশ প্রশংসনীয়।

ছবির সংগীত পরিচালনার কাজটিও অরুন্ধতী দেবী সম্পন্ন করেছেন। পরিবেশানুগ আবহ-সুর রচনার কৃতিত্ব তাঁর। তিনি বেশী রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন গানের সুরারোপে এবং গান নির্বাচনে। রবীন্দ্রনাথের গান ও একাধিক গানের কলিও ব্যবহৃত। গানের ব্যবহার সুকল্পিত। গানের মধ্যে দিয়ে আবেগসৃষ্টির প্রয়াসের ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। গানগুলি প্রধানত দরদভরা কণ্ঠে গেয়েছেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসাবে শ্রী চট্টোপধ্যায়ের খুবই সুনাম হবে। শ্রীমতী বন্দ্যোপধ্যায়ের গাওয়া "আমার হাত ধরে নিয়ে চল সখা" বার বার শোনবার মত। সংগীত আর একটি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন চিত্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ও বনশ্রী সেন।

মাটির মনিষ

ফিল্মের ভাষাটুকু জানা থাকলে মাতৃভাষার উপর সব সময় নির্ভর করতে হয় না। সংলাপের অতিরিক্ত কথন দর্শক উপরি-পাওনা হিসাবে পেয়ে যান। তাই ওড়িয়া ভাষাভাষী না হয়েও "মাটির মনিষ"-দের জানতে বুঝতে অসুবিধা হয় না। মৃণাল সেন ক্যামেরা দিয়ে তাঁর কাহিনী ও চরিত্রদের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। কখনও বা ধ্বনির সাহায্য নিয়েছেন। "মাটির মনিষ"-এর ছোট ভাইয়ের মানসিক নগর-যাত্রা বা উচ্চাশার মুহূর্তে উড়ন্ত প্লেনের শব্দের সঙ্গে মেশানো সেই এফেক্ট সাউণ্ড (এক্ষেত্রে এবং অন্যত্র সুরকার শ্রীকুমারের বিশেষ কৃতিত্ব লক্ষণীয়) সংলাপের চেয়ে অনেক বেশী কথা বলেছে। দুই ভাইয়ের পরস্পরবিরোধী মূল্যবোধের বিশ্লেষণে (কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর কাহিনীকাল ত্রিশ দশকের শেষের দিকে) পরিচালক-চিত্রনাট্যকার পক্ষপাতহীন। দুজনেরই কিছু বলবার আছে। বড় ভাই চায় মাটি আঁকড়ে ধরে থাকতে, ছোটজন নতুন যুগের হাতছানিতে প্রলুব্ধ। ক্লাইম্যাক্স-এ মোটা দাগের নাটক নেই। মেলোড্রামা এখানে তৈরি হতে পারত। শ্রীসেন সে জায়গায় প্রশংসনীয় সংযম দেখিয়েছেন। তবে ছোট ভাইয়ের দৌড়ে যাওয়ার মধ্যে (স্পষ্টত বড় ভাইকে ফেরাবার জন্য) একজনের জয়ের ইঙ্গিত -কিংবা দর্শকের ইচ্ছাপূরণের ব্যঞ্জনাত্মক ব্যবস্থা কি নেই? এই সংঘর্ষের মাঝখানে পরিচালক আর একটু বেশী নিরপেক্ষ হতে পারতেন (প্রথম থেকে তিনি যেমন ছিলেন) ছবিটি দু'-এক মুহূর্ত আগে শেষ করে দিয়ে।

আলো সরকার পরিচালিত "ছোটিসি মুলাকাত"এ বৈজয়ন্তীমালা—ছবির মুক্তি আসন্ন

কৃষকের ঘরের সুখ-দুঃখের এবং গ্রামের ভাল মানুষ ও খলচরিত্রের এই শরৎ-সাহিত্যঘেঁষা কাহিনী সিনেমায় রূপ দিতে গিয়ে মৃণাল সেন অনেক ক্ষেত্রেই কনভেনশন ভেঙেছেন। (যদিও জলের ঘাটে মেয়েদের চিরাচরিত সম্মেলন থেকে গেছে) খলব্যক্তিকে দিয়ে অকারণ অশান্তির সৃষ্টি করান নি, মহৎকে মহত্তর হবারও সুযোগ দেননি। এক কথায়, মাটির মানুষদের আসল পরিচয়টি ছবিতে দেখতে পেলাম। এবং গ্রাম্য সমাজের রূপটিও সুন্দর অঙ্কিত। তাদের জীবনযাত্রার অবকাশে শ্রী সেনের শিল্পী-মন লাবণ্য ও নন্দনতত্ত্বের উপকরণ খুঁজে বেড়িয়েছেন। পেয়েছেনও যথেষ্ট। "ভিস্যুয়াল" সৌন্দর্যের দিক থেকেও ছবিটি তাই রমণীয় হয়ে উঠেছে। এ কাজে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে শৈলজা চট্টোপাধ্যায়ের চমৎকার ফটোগ্রাফি। অনেক দৃশ্য শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, অর্থবহও বটে।

উন্মুক্ত আকাশ, আদিগন্ত গ্রামের মাঠ, গাছ, দূরের চলন্ত ট্রেন, শিশু এবং তার নানা রঙিন কল্পনা ও খেলা কোনও ছবিতে থাকলেই সে সব কিছু "পথের পাঁচালী"র অনুকরণ, এটা ভাবা অন্যায়। "পথের পাঁচালী" দর্শকের মনে ছাপ রেখে গেছে সত্যি। কিন্তু গ্রামজীবনের বর্ণনা বা বিশ্লেষণে এবং একই পটভূমিতে সেই একই লাবণ্যবোধ আবার অপরিহার্য হতে পারে। অবশ্য ছোট ভাইয়ের স্বভাব ও মানসিকতা অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের "অতিথি"র তারাপদকে মনে করিয়ে দিতে পারে। তবু এই অভিযোগ শেষ পর্যন্ত টেঁকে না। শ্রী সেন চরিত্রটির ক্রমবিকাশ, এবং ঘটনার প্রস্তুতির সঙ্গে পরিণতির সঙ্গতি নিজের বক্তব্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েই উপস্থিত করতে পেরেছেন। মাঝখানে তরুণ দম্পতির সুখতাড়নার যে কয়েকটি টুকরো মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন সেগুলি অপূর্ব। এবং অল্পবয়সী বর-বধূকেও পরিচালক স্মরণীয় করে রাখলেন। বিশেষ করে নববধূ নেত্রমণিকে। এই চরিত্রে সুজাতার অভিনয়ও ভোলবার নয়। তেমনি সপ্রাণ প্রশান্ত নন্দা (ছোট ভাই)। প্রায় সব ক'টি প্রধান চরিত্রই সুঅভিনীত।

[ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটি সম্প্রতি ছবিটির এক বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন।]

হুজ অ্যাফ্রেড অব ভার্জিনিয়া উলফ?

বহু আলোচিত, বিতর্কিতও বটে, "হুজ অ্যাফ্রেড অব ভার্জিনিয়া উলফ?" ছবিটি একটি "ফিল্ম ড্রামা"। কথাটা খোলাখুলি বলা দরকার। ফিল্মে নাট্যবস্তু সাধারণত থাকেই। ফিল্মের রীতিতে বা আঙ্গিকে তা উপস্থিত করা হয়। কিন্তু একটি 'স্টেজ-প্লে' যদি ফিল্মে স্থানান্তরিত (রূপান্তরিত) হয়—ফিল্ম মিডিয়ম যেখানে গৌণ—তবে তাকে ফিল্ম ড্রামা বলাই সমীচীন। চিত্রপরিচালক হিসাবে ব্রডওয়ের মাইক নিকলসের প্রথম চলচ্চিত্রকর্ম "হুজ অ্যাফ্রেড..." কি তাঁর নাট্যপরিচালনারই পুনরাবৃত্তি? নাকি সিনেমারই একটি নতুন এক্সপেরিমেণ্ট? শেষের কথাটি মেনে নিতে পারছি না। তবে ক্যামেরা ও এডিটিং-এর কাজ ছবিটিতে চলচ্চিত্রের ডাইমেনশন এনে দিয়েছে। এবং খুবই সার্থকতার মধ্য দিয়ে।

এডওয়ার্ড অ্যালবীর "অ্যাবসার্ড"-

রীতির নাটক সংলাপ-প্রধান। এতে অ্যাকশন কম। অথবা সংলাপের ভিতরেই এর যা কিছু অ্যাকশন—যা তীক্ষ্ম ফলকের মত চরিত্রের অবচেতনকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে। নির্জ্ঞান মনের অস্পষ্ট, অবদমিত ও অবিন্যস্ত ভাবনা ও চিন্তা-গুলোকে খুঁচিয়ে বার করে। মদের নেশার সঙ্গে মিশে গিয়ে মার্থা ও জর্জ এবং তাদের ঘরে রাত্রের অতিথি নিক ও হানির বিশ্রস্ত কথাগুলি আধুনিক যন্ত্রণাদগ্ধ দম্পতির অবচেতন মনোলোকের দরজা খুলে দেয়। এই রহস্য উন্মোচনের সময়টুকু নাট্যকার সুন্দর বেছে নিয়েছেন। রাত্রি-বেলায়, রাত দুটো থেকে ভোরবেলা পর্যন্ত। পৃথিবী যখন সুপ্ত তখনই শুরু হয় কথা আর কথার (নাকি প্রলাপ) দুঃসাহসিক সংঘাত। দিবালোকে শত কর্মের আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে অবচেতন মনের তরঙ্গ। নির্মম আত্মবঞ্চনা আর আত্মসমালোচনার ক্রীড়া-ভূমি কখনও ঘরে, অথবা বাইরে এবং 'বার'-এ। শুধুই মানস-পরিক্রমা, কোন নাট্যকাহিনী "হুজ অ্যাফ্রেড"...-এর সম্বল নয়। রাত্রির অস্থিরতার অলীক ক্লাইম্যাক্স এসেছে যখন জর্জ তাদের কল্পনার পুত্রকে মেরে ফেলেছে। কথা ছিল, অজাত পুত্রকে নিয়ে বচসা শুধু তাদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। মার্থা সে-শর্ত পালন করতে পারেনি। সত্যিকার পুত্রের হত্যা নিয়ে যে মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লব ঘটতে পারত, সবই ঘটেছে। অনস্তিত্বের ভিত্তিতে

অভিনয়ের ... প্রতীতিরা। "এ[illegible]"? অন্যদিক থেকে "[illegible]..."এর স্বরূপ যাই হোক, আধুনিক জীবনযন্ত্রণার এই খণ্ডিত চিত্র বা বিশ্লেষণ (নাকি বিন্দুতেই সিন্ধুর আভাস?) মননশীল মনকে উদ্দীপ্ত করে।

অন্তর্ভেদী এই নাটকে এলিজাবেথ টেলরের অভিনয় যেন বেশী স্পষ্ট, বেশী নাটকীয়। রিচার্ড বার্টন জর্জের অস্থির মনের শান্ত প্রতিমূর্তি। নাটকে মনস্তাত্ত্বিক গভীরতায় নতুন মাত্রা তিনি যোজনা করেছেন।

অরবো-ফিল্মের খবর
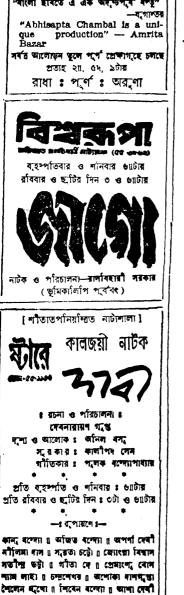
অরবো-ফিল্ম কম্পানি সংস্থার অন্যতম পরিচালক শ্রীবারজার এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কলাকুশলীদের সম্মানার্থে সংস্থার কলকাতাস্থ প্রতিনিধি শ্রী ভি এ পি আয়ার গত মঙ্গলবার এক ভোজসভার আয়োজন করেন। কলকাতার বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার, কলাকুশলী, চিত্রব্যবসায়ী এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে বিদেশী অতিথিরা মিলিত হন। অরবো কালার ফিল্মের কদর এ দেশে দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে বলে জনৈক অরবো প্রতিনিধি মন্তব্য করেন।

জেমিনি সার্কাস

এক মাসের উপর জেমিনি সার্কাসের খেলা দেখানো হল কলকাতায়। এখন শেষ হতে চলেছে। যাবার আগে জেমিনির কর্তারা খেলার সূচীতে কিছু নতুন আকর্ষণ যোগ করে দিয়েছেন। অন্ধকারে ট্র্যাপিজ এবং পোষ-মানা টিয়াপাখির চমকপ্রদ খেলা তো আছেই। তা ছাড়া এখন দেখা যাবে অবাক কাণ্ড "জীপ-লাফ"। ৮০ মাইল স্পীডে জীপ চালিয়ে কেরালার মুসা জীপসমেত এক লাফে ৩০ ফুট অনায়াসে পার হয়ে যাচ্ছেন। তরুণীদের কিছু খেলা যেন অলৌকিক ব্যাপার। সাতজনকে বসিয়ে এক তরুণীর দ্রুত সাইকেল চালানোই শুধু নয়, দড়ির উপর তাঁদের "ব্যালেন্স"-এর নানা খেলা খুবই চিত্তাকর্ষক। রুদ্ধশ্বাসে দেখবার মত অনেক কিছুই আছে। গোপালন ও তাঁর স্ত্রী লীলার আগুনের খেলা বিস্ময়কর। জেমিনির দলে এখন সিংহের বদলে রয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। একের পর এক খেলা পরিবেশনের রীতিও খুব সুন্দর। কর্মসূচীতে কোথাও মন্থরতার অবকাশ নেই। সার্কাসের সঙ্গে সংগীতের ব্যবহারও সুন্দর।

সিনেমার অনেক হিট গানের সুর বাজে। সার্কাসের ছন্দের সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে তা অদ্ভুত মিলে যায়। বাংলা 'দেওয়া-নেওয়া' ছবির গানও আছে। এক কথায়, আমোদের প্রতিমূর্তি সর্বাঙ্গে রঞ্জিত।

পরিচালক ত্রুফো কি কলকাতায় আসছেন?

আগামী সারা ভারত ফিল্ম সোসায়েটি সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ফ্রান্সের চলচ্চিত্রকার ত্রুফো কি কলকাতায় আসছেন? এই প্রশ্নটি ফিল্ম সোসায়েটি মহলে শোনা যাচ্ছে। যদিও এর সঠিক উত্তর মেলে নি। তবে তাঁকে বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। জাঁ-লুক গদারের "আলফাভিল" যে কলকাতায় আসছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ২১ এপ্রিল রবীন্দ্র-সদনে সম্মেলন শুরু হচ্ছে। ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসায়েটিজ অব ইণ্ডিয়া সম্মেলনের উদ্যোক্তা। সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। প্রধান অতিথিরূপে থাকবেন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রথম ভাষণ দেবেন ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীসত্যজিৎ রায়। ওইদিন কিছু অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো হবে। দ্বিতীয় দিনে (২২ এপ্রিল) প্রদর্শিত হবে (সন্ধ্যা ছয়টায়) গদারের "আলফাভিল"। ওইদিনকার প্রধান আলোচ্য বিষয়ঃ ভারতীয় সিনেমার উন্নতিতে সরকারের ভূমিকা। প্রশ্নকর্তাঃ শ্রীশান্তিপ্রসাদ চৌধুরী। উত্তরদাতাঃ শ্রীঅশোক মিত্র ও শ্রী জে এস ভাবনাগারী। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন শ্রীঅসিত চৌধুরী। সকালে শ্রী বি ডি গর্গ ও শ্রীকৃষ্ণস্বামী বলবেন "ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসের মৌলিক শিক্ষা" সম্পর্কে। সভাপতিত্ব করবেন শ্রীঅজিত বসু। দ্বিতীয় অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় "জাতীয় সিনেমার কার্যকর প্রভাব"। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত ডঃ অক্টাভিয়েস পাজ।

তৃতীয় দিনের (২৩ এপ্রিল) আলোচনার বিষয় "ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলনঃ বিকাশের সমস্যা"। দুটি অধিবেশনে বিষয়টি আলোচনা করবেন শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীঊষা ভগত এবং শ্রীভানুমেন শাক্তিথ। শ্রীবিজয়া মুলে দুই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করবেন। শেষ দিন শেষ ভাষণ দেবেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রী কে কে শাহ্।

"কাল সুবা" (পরিচালনাঃ জি এস মধুপ) হিন্দীচিত্রে প্লে-ব্যাক গান করেন কলকাতার তরুণ শিল্পী রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে চলচ্চিত্র বিনিময়

ইণ্ডিয়ান মোশান পিকচার্স এক্সপোর্ট করপোরেশন এবং সোভিয়েট রাশিয়ার সোভেক্সপোর্ট ফিল্মের মধ্যে সম্প্রতি এক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে বর্তমান বছরে চলচ্চিত্রের আদান-প্রদান চলবে। সোভেক্স-পোর্ট ফিল্ম এখন আই-এম-পি-ই-সি অথবা অন্য কোন সংস্থা কিংবা চিত্র প্রযোজকের কাছ থেকে ছবি কিনতে পারেন। রাশিয়ার ছবি আমদানী হবে একমাত্র আই-এম-পি-ই-সি'র মাধ্যমে।

জেমিনি সার্কাসে খেলা দেখাচ্ছেন এক তরুণী

সাপ্তাহিক সংবাদ

পাঞ্জাব বিধান সভার বর্তমান পরিস্থিতি এ সপ্তাহের প্রধান আলোচ্য বিষয়। গত ৫ এপ্রিল পাঞ্জাব বিধান সভায় রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কে বিরোধীদের একটি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় শ্রীগুরনাম সিং পরিচালিত যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পরাজয় ঘটে। প্রস্তাবটি ৫৩—৪৯ ভোটে গৃহীত হয়। এই মন্ত্রিসভার বয়স মাত্র ২৯ দিন। যুক্ত ফ্রন্টের চারজন সদস্য বিরোধী দলের সঙ্গে ভোট দেন। পাতিয়ালার মহারাজা বিরোধীদের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হলে বিরোধী পক্ষ যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করেন এবং পরাজিত মন্ত্রিসভার কাজে যোগদান করতে অস্বীকার করেন। পক্ষান্তরে মুখ্যমন্ত্রী গুরনাম সিং বলেন, আমার দলের চারজন সদস্য বিরোধীদের সঙ্গে ভোট দিয়েছেন কিন্তু তাঁরা যুক্ত ফ্রন্ট ছেড়ে চলে যান নি। কাজেই আমার দলের পরাজয় হয়েছে বলে আমি মনে করি না। বিরোধী পক্ষের চাপে গুরনাম সিং পদত্যাগ করতে অস্বীকার করায় পাঞ্জাবে সাংবিধানিক সংকট আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী বিধান সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখার প্রস্তাব করলে সভায় তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবী প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। বিধান পরিষদের অধিবেশনও মুলতবী থাকে। এ অবস্থায় পাঞ্জাবের রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে আস্থাসূচক ভোট চাইবার নির্দেশ দিতে পারেন অথবা বিরোধী দলনেতা শ্রীজ্ঞান সিং রারেওয়ালাকে বলতে পারেন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে।

দেশী সংবাদ—

৩ এপ্রিল—গতকাল বিশাখাপত্তনমের সেনট্রাল জেলের পাঁচশতাধিক কয়েদী জেল ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করায় জেলরক্ষীরা গুলি চালায়। গুলিতে দুজন কয়েদী নিহত এবং ৫৩ জন আহত হয়েছে। কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। কয়েদী ও জেলের ওয়ারডেনদের মধ্যে এক সংঘর্ষের পরেই জেল ভাঙার চেষ্টা হয়।

৪ এপ্রিল—ডঃ ঘোষ আজ বিধানসভায় খাদ্যনীতির তিন দফা সংশোধনের কথা জানান। ১। চালকলগুলিকে ধানি হিসাবে আড়াই টাকার জায়গায় দুই টাকা দেওয়া হবে। ২। উৎপাদকদের একশ মণ নয়, পঞ্চাশ মণ পর্যন্ত ধান অথবা সেই অনুপাতে চাল রাখতে দেওয়া হবে। ৩। সেচ এলাকায় দশ একর এবং সেচহীন এলাকায় বারো একরের বেশী যাদের জমি আছে, তাদের সরকারকে জানাতে হবে ঠিক কত একর জমিতে চাষ করা হলো। কৃষকদের খাওয়ার জন্য একর প্রতি নয় মণ ধান এবং বীজ ও মুনিষদের খাওয়া বাবদ একর প্রতি কিছু ধান বাদ দিয়ে মোট উৎপন্ন ধানের বাকী পরিমাণটা সরকারের কাছে বিক্রি করতে বলা হবে।

৫ এপ্রিল—আজ কংগ্রেস সংসদীয় পর্ষদের সভায় রাষ্ট্রপতি পদের জন্য ডঃ জাকির হোসেন ও উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য শ্রী ভি ভি গিরি সর্ব-সম্মতিক্রমে মনোনীত হন। সভা শেষে প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে মোরারজী দেশাই বলেন : এই পদ দুটির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবধারিত। কারণ বিরোধী দলগুলি একযোগে শ্রী কে সুব্বা রাও ও নবাব আলি ইয়ার জঙ্গকে যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনীত করেছেন।

৬ এপ্রিল—সামরিক ঘাটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্রিটেন কর্তৃক ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ ক্রয়ের বিষয়টি ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জে উত্থাপনের জন্য প্রস্তুত। আজ সংসদের উভয় সভায়ই সদস্যগণ এই ব্যাপারে কঠোর মন্তব্য করেন। তাঁরা বলেন, এশিয়ার দেশগুলির বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে অভিযান চালাবার জন্যই আমেরিকার সহযোগিতায় ব্রিটেন ভারত মহাসাগরের কয়টি দ্বীপে সামরিক ঘাটি স্থাপনের পরিকল্পনা করছে।

গত ১০ বছরে বিড়লাগোষ্ঠীর শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ৩৭৫টি শিল্প লাইসেনস মঞ্জুর করার ব্যাপার নিয়ে আজ রাজ্যসভায় ঘণ্টাখানেক ধরে তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলে। ওই লাইসেনসগুলির মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ আনুমানিক মোট ৩৮৪ কোটি টাকা। এর জন্য পণ্য আমদানির ব্যয় হবে ২৪৮ কোটি টাকার সমতুল্য বিদেশী মুদ্রা।

৭ এপ্রিল—অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের খোঁজে এবং গেরিলা যুদ্ধে তালিম নেবার জন্য শতিনেক বৈরী নাগা সম্প্রতি উত্তর ব্রহ্মের ভিতর দিয়ে কমিউনিসট চীনে গিয়েছে। উত্তর ব্রহ্মে বর্মী সৈন্যরা বাধা দিলে অনেক বৈরী নাগা হতাহত হয়। আজ ইমফলে বিশ্বস্তসূত্রে ওই খবর পাওয়া গিয়েছে।

৮ এপ্রিল—ভারতকে এ বছর অন্তত ২৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করতে হবে। ১০টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত ভারত সহায়ক সংস্থা এজন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। লোকসভায় একটি জরুরী প্রশ্নের উত্তরে একথা জানান সহকারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই।

ভারতীয় বণিকসভা সঙ্ঘের চল্লিশতম বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন করতে গিয়ে সহকারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ সরকারী করনীতির সমালোচনাকারীদের তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন।

৯ এপ্রিল—আজ ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে মারকসবাদী কমিউনিসট পার্টি আয়োজিত এক বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ওই-দলের নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন—পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের যে সব রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাঁদের "পতন ঘটানোর" জন্য তারা ভারতে পুঁজিপতি, জমিদার ও [illegible] স্বার্থের এক "ব্যাপক ষড়যন্ত্র" [illegible] হয়েছে। তাঁরা জনমত সৃষ্টি ও গণআন্দোলনের দ্বারা এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণন আজ রাত্রে ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রপতি পদে তাঁর বর্তমান কার্যকাল শেষ হলেই তিনি অবসর নেবেন। রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী মনোনয়নকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল, ওই ঘোষণায় তার নাটকীয় পরিণতি ঘটল। শ্রীসুব্বা রাও রাষ্ট্রপতি পদে বিরোধী তরফের মনোনয়ন গ্রহণ করে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই রাধাকৃষ্ণন অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত জানান।

বিদেশী সংবাদ

৩ এপ্রিল—তিব্বতের বেতার থেকে চীনা ভাষায় যে সংবাদ প্রচার করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে, মাও-পন্থীরা তিব্বতের রাজধানী লাসার অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনেছে [illegible] দাবি জানিয়েছে। সংবাদে আরও বলা হ[illegible]য়, বিপ্লবী জনগণ চীনা মুক্তি ফৌজের সমর্থনে তিব্বতের দৈনিক সংবাদপত্রের কর্তৃত্ব দখল করেছে।

৪ এপ্রিল—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি প্রেসিডেনট আয়ুব খাঁর উপদেশামৃত : —প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবি [illegible] পশ্চিম পাকিস্তানকে পৃথক ক[illegible] অপকৌশল ছাড়া আর কিছুই নয় [illegible] দেশের উভয় অংশই দুর্বল হয়ে [illegible]

৫ এপ্রিল—প্যারিসের এক [illegible] ভারত-সাহায্য-সংস্থা ১৯৬৬-৬[illegible] সালের জন্য ভারতকে ১২৮ কোটি ডলার সমমূল্যের বৈষয়িক ও খাদ্য সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত করেছেন। এই সাহায্যের মধ্যে ৯০ কোটি ড[illegible]র পাওয়া যাবে প্রকল্প বহির্ভূত খাতে এবং বাকী ৩৮ কোটি ডলার পাওয়া যাবে খাদ্য সাহায্য বাবদ। স্থির হয়েছে যে, খাদ্য সাহায্যের অর্ধেক দেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৬ এপ্রিল—পশ্চিম বার্লিন পুলিশ গতকাল রাত্রে এগারজন যুবকযুবতীকে আটক করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছে যে, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিউবার্ট হামফ্রে আজ কমিউনিসট পরিবেষ্টিত বার্লিন পরিদর্শনে এলে তারা তাঁকে বোমা, রাসায়নিক ও ডি[illegible] দিয়ে আক্রমণ করবে বলে ষড়যন্ত্র করেছে।

৭ এপ্রিল—বৃটেনের কাছে থে[illegible] আশানুযায়ী সহযোগিতা পাওয়া যায়নি ব[illegible] অভিযোগ জানিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের তিনজন সদস্যবিশিষ্ট তথ্যানুসন্ধানী মিশন আজ এডেন ত্যাগ করেছেন। তল্লাসী নিয়ে বিতর্কের জন্য মিশনের সদস্যদের ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট বিমানঘাটিতে আটক রাখা হয়।

৮ এপ্রিল—প্রেসিডেনট চার্লস দাগল আজ রাত্রে একটি নতুন ফরাসী সরকার নিয়োগ করেন। এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী জর্জ-পাঁপিদু এবং বিদায়ী মন্ত্রিসভার আরও অনেকে এই মন্ত্রিসভায় আছেন।

৯ এপ্রিল—আজ 'সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকার বিমানবন্দরে বেআইনী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা—এই শিরোনামায় দেওয়া এক সংবাদে বলা হয়, ভারতীয় ও পাকিস্তানীদের বে-আইনী অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে।

আশাপূর্ণা দেবীর

অমর উপন্যাস "প্রথম প্রতিশ্রুতি"

সেই গ্রন্থেরই পরবর্তী কাহিনী

সুবর্ণলতা

"সুবর্ণলতা সেই দুর্লভ মেয়েদেরই একজন—যারা তাদের কালকে অতিক্রম করে যায় — এগিয়ে দেয় প্রবহমান কালের ধারাকে, যে ধারা মাঝে মাঝে স্তিমিত হয়ে যায়, নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়। এরা বর্তমানের পূজো পায় কদাচিৎ, এরা লাঞ্ছিত হয়, বিরক্তি-ভাজন হয়। এদের জন্য কাঁটার মুকুট, জুতোর মালা। তবু এরাই একদিন স্মরণীয় হয়ে ওঠে—এদের নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি হয়।"

॥ তেরো টাকা ॥

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

নূতন রোমাণ্টিক উপন্যাস

একদা কী করিয়া

গজেন্দ্রকুমার মিত্র সেই দুর্লভ গল্পলেখকদের একজন, যিনি জমাট গল্প বলতে জানেন এবং গল্পকে কেমন করে round up করতে হয় তাও জানেন। এই উপন্যাসে তাঁর সেই অসামান্য শক্তির পূর্ণ পরিচয় বিদ্যমান। এর পাত্রপাত্রী চিরন্তন — এর প্রণয় পরিবেশও অতি পরিচিত — তবু এ কাহিনী আগাগোড়া নূতনত্বে ভরা — পাঠকদের মন সেই নূতনত্বের সরোবরে অবগাহন করবে সাঁতার দেবে। সে সরোবর রূপ ও রসের সরোবর। আশা ও আনন্দের সরোবর॥

॥ তেরো টাকা ॥

॥ পাঠকবর্গের প্রতি সবিনয় নিবেদন ॥

আমাদের সাম্প্রতিক প্রকাশিত চারখানি উপন্যাস:—"ইস্ট বাকল্যান্ড রোড", "সুবর্ণলতা" "নগর পারে রূপনগর" ও "একদা কী করিয়া"—সম্বন্ধে সহৃদয় পাঠকসাধারণের মতামত আহ্বান করিতেছি। বইগুলি সম্বন্ধে তাঁহাদের স্বাধীন ও সুচিন্তিত মতামত পাইলে কৃতার্থ বোধ করিব। তাঁহাদের মতামত আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সহায়ক হইবে।

প্রমথনাথ বিশীর

বঙ্কিম সমালোচনার
সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ

বঙ্কিম সরণী

॥ দশ টাকা ॥

ডাঃ কালিকারঞ্জন কানুনগোর

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ

রাজস্থান কাহিনী

— আট টাকা —

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

গঙ্গাবতরণ

গঙ্গার উৎস কালিন্দী খাল প্রভৃতি বহু নূতন অংশ সংযোজিত হয়েছে।

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ-কৃ-ব)-র

অভিনব নূতন উপন্যাস

ম্যারিনা ক্যাপ্টেন ১০৲

॥ এ উপন্যাস একমাত্র অ-কৃ-বই লিখতে পারেন ॥

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন উপন্যাস

অমৃত সমান ৪৷৷

দক্ষিণারঞ্জন বসুর
আন্তর্জাতিক পাত্রপাত্রী নিয়ে লেখা নূতন উপন্যাস

এক আকাশ অনেক তারা ৬৲

সুমথনাথ ঘোষের

বনরাজীনীলা ৭৲

তরুণকুমার ভাদুড়ীর

সন্ধ্যাদীপের শিখা ৪৷৷

নূতন সপ্তম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ ; ৩৪-৮৭৯৯

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
অমঙ্গলবোধ ও রবীন্দ্রনাথ—শেষ পর্বের কবিতা—	আবু সয়ীদ আইয়ুব	...	১১৮৯
বিশ্ববিজ্ঞান—	শ্রীতরুণ চট্টোপাধ্যায়	...	১১৯৫
আধুনিক চিত্রকলা—	শ্রীশুদ্ধশীল বসু	...	১১৯৯
শজারুর কাঁটা—	শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১২০১
দিল্লির ডায়েরি—	শ্রীখগেন দে সরকার	...	১২০৭
কোথায় পাব তারে—	কালকূট	...	১২০৯
নিকট-দূরে—	ত্রিলোচন কলমচী	...	১২১৭
চিত্রপ্রদর্শনী—		...	১২২১
আলোচনা—		...	১২২৩
ওয়াশিংটনের চিঠি—	জহুরী সদাগর	...	১২২৯
ঘরে-বাইরে—	শ্রীমতী	...	১২৩৩

প্রচ্ছদ : শ্রীবিমল রায়

বরবর্ণিনী

গয়া

মনোমোহিনী

সুবাসিত ট্যাল্কম প্রস্তুতকারক
গয়া
প্যারিস
লণ্ডন
নিউইয়র্ক
AGC-5 BEN

আপনি ফরমাইকা
দিয়ে আপনার বসবার
ঘরটিকে অপরূপ
পরিপাটি ক'রে
তুলতে পারেন!

৫৩ রকমের রঙ ও প্যাটার্ন থেকে আপনার পছন্দমত ফরমাইকা* ল্যামিনেট বেছে নিন!

অতি সুবিখ্যাত নাম

ফরমাইকা পৃথিবীর প্রথম ডেকোরেটিভ ল্যামিনেট··· পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে একই রকমের আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ভারতে তৈরী। কেনবার সময় প্রতিটি শিটের ওপর ফরমাইকা ছাপ দেখে নেবেন—তাহলে নিশ্চিত হতে পারবেন যে আপনি অতি নাম-করা জিনিসই কিনছেন! ওই ছাপ অবশ্যি ধুলেই উঠে যাবে।

দেখতেও সুন্দর, কাজেও ভালো

ফরমাইকা ল্যামিনেট খাবার টেবিল, সাইডবোর্ড, ঘরের মাঝখানের কাঠের আড়াল, কফির টেবিল, ক্যাবিনেট, লিখবার ডেস্ক, বইয়ের শেল্ফ ও দেয়ালের প্যানেলের জন্য চমৎকার উপযোগী। আপনার প্রয়োজনমত ম্যাট বা চকচকে ফিনিশ আপনি বেছে নিতে পারবেন। আর, খরচের কথা? আপনি যা ভাবছেন তার চাইতে কম!

দেখতেও ভালো, কাজেও ভালো, তাই ফরমাইকা ল্যামিনেটের বায়টা নিঃসন্দেহে সার্থক।

ফরমাইকা ইণ্ডিয়া লিমিটেড, পোঃ বক্স ৩৪, পুনা।

ডেকোরেটিভ ল্যামিনেটের মধ্যে ফরমাইকা সবচেয়ে সেরা!

*ফরমাইকা ফরমাইকা ইণ্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এর রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক এবং ভারতে ফরমাইকা ইণ্ডিয়া লিমিটেড উহার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবহারকারী।

Bensons/282-C-3 Beng

অনুমোদিত ডিলার : **লক্ষ্মীদাস ব্রাদার্স**, ৫৬ চিত্তরঞ্জন এভেনিউ কলিকাতা—১২; **রণবীর অ্যান্ড কোং**, ২৬২ বিপিন-বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা—১২; **স্টীলসওয়ার্থ স্টোর্স** স্টীলনগর, তিনসুকিয়া; **অ্যাডভান্স ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যান্ড সাপ্লাই কোং**, মুরলীধর শর্মা রোড, গৌহাটি—১; **টেক এজেন্সীজ**, জামসেদপুর; **ডি এন অগ্রবাল অ্যান্ড সন্স**, শিলিগুড়ি; **ডি এন অগ্রবাল অ্যান্ড সন্স**, শিলং; **ডি এন অগ্রবাল অ্যান্ড সন্স**, জোড়হাট।

গরমে চলুন
হালকা পায়ে
পা গলিয়ে খানিক এদিক-ওদিক চলুন, নিজেই
বুঝবেন বাটার স্যান্ডাল আর চপ্পল এদের বৈশিষ্ট্য কী।
কী আরাম এদের পায়ে দিয়ে। কী মসৃণ চামড়া।
এমন হাওয়া-খেলানো নকশা, নির্মাণশৈলী আর
মৌসুমী নকশার সমাবেশ দুর্লভ বলা যেতে পারে।
স্টাইলের বহুমুখী বৈচিত্র্য এদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য।
আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে স্যান্ডাল ও
চপ্পলের নতুন মনোজ্ঞ ক্যাশান।
শ্যামল ৭.৯৫
Bata
অলোক ৯.৯৫
প্রীতীশ ৭.৯৫
এয়ারলাইট ১৮.৯৫

প্রকাশিত হল

ক্যাবিনেট মিশন যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র রক্ষার জন্য একজন দক্ষ মানুষের দরকার হয়েছিল। সেই মানুষটি হলেন সদ্য পরলোকগত প্রাক্তন সংসদ-সদস্য সুধীর ঘোষ—যিনি ভারতে ও ভারতের বাইরে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং সর্বক্ষেত্রেই নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন। তাঁরই আত্মকথা "গান্ধীজীর দূত"।

"গান্ধীজীর দূত"-এর কয়েকটি নির্বাচিত অংশ সম্প্রতি ধারাবাহিকভাবে "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও, এই প্রথম সম্পূর্ণ গ্রন্থটি

সুধীর ঘোষের

স্বাধীনতা-প্রাপ্তি পর্বের অকথিত কাহিনী

গান্ধীজীর দূত

প্রকাশিত হল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তার কারণ, এই আত্মকথা বস্তুত ভারতবর্ষের অনতি-অতীতকালের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ; ক্ষমতা-হস্তান্তর পর্বের বহু নেপথ্য-ঘটনার চাঞ্চল্যকর কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে।

সেবাগ্রাম থেকে ডাউনিং স্ট্রীট, দিল্লি থেকে ওয়াশিংটন আর মস্কো—সর্বত্র যে কর্মব্রত মানুষটির অসংকোচ অবাধ গতিবিধি, তাঁর এই স্মৃতিচারণা যে পাঠকচিত্তে এক বিপুল আলোড়ন আনবে, তাতে সন্দেহ নেই।

দাম ১৫·০০

॥ এ বছরের রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস ॥

তুঙ্গভদ্রার তীরে ॥ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণ ভারতের তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে অবস্থিত ইতিহাসবিখ্যাত বিজয়নগরের মহিমান্বিত রাজা দ্বিতীয় দেবরায় আর তাঁর বাগ্‌দত্তা কলিঙ্গ-রাজকুমারী রূপসী বিদ্যুন্মালাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এই ঐতিহাসিক উপন্যাস। কলিঙ্গ-রাজকুমারী আসছিলেন সমুদ্রপথে বিজয়নগর—বিজয়নগরাধিপতিকে পতিত্বে বরণ করতে। পথে পরিচয় এক ক্ষত্রিয়কুমারের সঙ্গে। তারপর কত অকল্পনীয় ঘটনা, কত জটিল রহস্য, কত বীরত্বের কাহিনী, কত কৃতঘ্নতা-বিশ্বাসঘাতকতা, প্রেম-প্রণয়, যুদ্ধ-বিগ্রহের উত্তাল ঘটনাতরঙ্গ।

তৃতীয় মুদ্রণ । দাম ৬·০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল | বিমল করের পরিচয়

"পরিচয়" নিছক প্রেমের উপন্যাস নয়, বিষাদময় জীবনের নেপথ্যলোকের উপাখ্যান। এর শুরু এক আনন্দঘন পরিবেশে, শেষ সেই অনন্ত জিজ্ঞাসায়—জীবনে অন্তত একবার যা প্রত্যেককেই অসহায় ও বিমূঢ় করে তোলে। "খড়কুটো" ও "বালিকা বধূ"র পর বিমল করের নতুন উপন্যাস "পরিচয়" নিঃসন্দেহে পাঠকের অভিজ্ঞতায় নতুন সঞ্চয় হিসাবে গণ্য হবে। স্মরণীয় সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত এই গ্রন্থ; বস্তুত, এ রকম প্রাণবান রচনা ইদানীং দুর্লভ। দাম ৪·০০

॥ এই লেখকের আরও উপন্যাস ॥

গ্রহণ ৪·০০ ॥ বালিকা বধূ ৩·০০ ॥ খড়কুটো ৪·০০
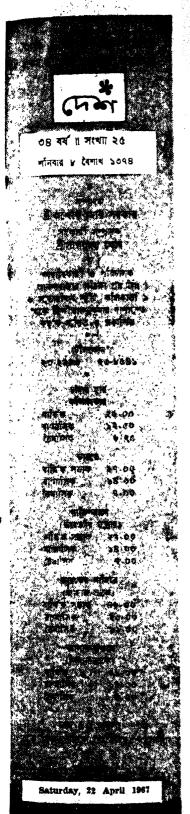
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ৫ চিন্তামণি দাস লেন । কলকাতা ৯

কেন্দ্র ও রাজ্য

দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন শেষ হয়েছে। এই সম্মেলনের এমন একটা গুরুত্ব ছিল যা আগে কখনও অনুভব করা যায়নি। এ-যাবৎ এ-ধরনের সম্মেলন ছিল অনেকটা যেন পোশাকী: কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও কংগ্রেসী, সুতরাং নীতি ও অন্যান্য বিষয়ে নির্দিষ্ট একটা মতামতের অংশীদার হতে কারও কোন বাধা ছিল না। এবারে যা ঘটেছে তা অন্যরকম : কেন্দ্রে কংগ্রেস-আধিপত্য থাকলেও রাজ্যগুলির প্রায় অর্ধেকই তার হাতছাড়া সেখানে অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা। অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন, এবারের মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অকংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের বোঝাপড়া হয়ত তেমন হবে না। মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে যা ঘটেছে তাতে বস্তুত সোচ্চারভাবে অকংগ্রেসী রাজ্য ও কংগ্রেসী কেন্দ্রের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি অন্তত সংবাদপত্রে তার আভাস পাওয়া যায় না। বরং খাদ্যের ব্যাপারে একই নীতি সমবেতভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। মনে হতে পারে, খাদ্য সমস্যা আজ দেশে এত তীব্র যে এ-ব্যাপারে বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কিছু করা সম্ভব নয় বুঝেই সমবেত প্রচেষ্টার প্রতিই সকলের আস্থা।

কিন্তু কিছুদিন যাবৎ—নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের পর—অকংগ্রেসী রাজ্যগুলির মনোভাব দেখে কখনও কখনও সংশয় জেগেছে, রাজ্য তার অধিকারকে কেন্দ্রের কাছে পূর্বের মতন সঙ্কুচিত রাখতে চায় না বরং তার নিজকর্তৃত্ব আরও বিস্তৃত করতে চায়। এটা ঠিক কতটা ভাল আর কতটা হলে বাড়াবাড়ি হবে—আর তাতে ঐক্যবদ্ধ ভারতের পক্ষে ক্ষতি হবে তার বিচার করার সময় এখনও আসেনি। তবে আমরাও মনে করি, ভারতীয় ঐক্য ও সংহতির দিকে দৃষ্টি রেখে যদি রাজ্য নিজের ক্ষমতা কাজে লাগাতে চায়, তবে মন্দ কিছু হবে না।

কিঞ্চিৎ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করলে মনে হয়, ভারতীয় ঐক্যের ঘোরতর শত্রু তার খাদ্যসঙ্কট। একসময় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী শ্রী এ পি জৈন বলেছিলেন, ভাষা আমাদের বিচ্ছিন্ন করবে না, যদি সেরকম বিচ্ছিন্নতা আসে তবে খাদ্য তা করতে পারে। তাঁর এই কথার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কোনো মিল না থাকলেও কেরলের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের সাম্প্রতিক একটি উক্তিও উল্লেখযোগ্য। শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ সেদিন বলেছেন কেরলকে খাওয়াবার দায়িত্ব কেন্দ্রের। তিনি একথাও তুলেছেন যে, রাজ্যসরকার তার উপার্জিত বিদেশী মুদ্রা কি খাদ্য আমদানির জন্য ব্যয় করতে পারে?—অর্থাৎ মনে হবে কেন্দ্র যদি রাজ্যের উপার্জিত বিদেশী মুদ্রায় ভাগ বসাবার অধিকার রাখে তবে খাদ্য আমদানি করে রাজ্যকে খাওয়াবার দায়িত্বও তার। যদি সে দায়িত্ব কেন্দ্র পালন না করে তবে রাজ্যকেই তার উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় খাদ্য আমদানি করার অধিকার দিতে হবে।

কেউ কেউ কেরল-মুখ্যমন্ত্রীর এই উক্তিকে শাসানি বলে মনে করছেন। নতুন বিহার সরকারও অন্য সুরে একটা সাবধান-বাণী শুনিয়েছেন। বিহার সরকারের কথা হল, উদ্বৃত্ত রাজ্য যদি বিহার সরকারকে তার সাম্প্রতিক খাদ্যসঙ্কট এড়াবার জন্যে সাহায্য না করে—তবে বিহার সরকার তার সীমানার বাইরে এ-রাজ্যের কয়লা, মাইকা ও অন্যান্য খনিজাত দ্রব্য রপ্তানি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে। ওড়িষ্যার সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনো তিক্ততা সৃষ্টি হয়নি। তবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রের মধ্যে ভাল সম্পর্ক কতদিন থাকবে সেটা সন্দেহের বিষয়। কংগ্রেস আমলেও পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের নজর বড় প্রসন্ন ছিল না। কয়েকটি ব্যাপারে এই দুই মায়ে-ঝিয়ে বনিবনাও হত না। আপাতত দেখা যাচ্ছে, অকংগ্রেসী আমলেও পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের বিশেষ কোনো অনুগ্রহ পাচ্ছে না, এমন কি পশ্চিমবঙ্গের ন্যায্য দাবিও কেন্দ্র তেমন মনোযোগ দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছেন না। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি গুরুতর সমস্যার কথা তুলেছেন এবং দাবি করেছেন যে, এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব কেন্দ্রের, যেমন উদ্বাস্তু সমস্যা। শ্রী বসু জনসংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য সঙ্গত অর্থ বরাদ্দের দাবিও তুলেছেন। কিন্তু কেন্দ্র তার বরাদ্দ অর্থ-সাহায্য বাড়াতে রাজী নন। শ্রীমোরারজী দেশাই যা বলেছেন তাতে বোঝা যায়, রাজ্যকে তার ইচ্ছা ও মনোমতন অর্থ ব্যয় করতে হলে সেই বাড়তি অর্থের বোঝা তাকেই বইতে হবে। অর্থাৎ রাজ্যকেই নিজের উদ্যোগে সেই অর্থ নিজের রাজ্য থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। আমরা মনে করতে পারি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের এই মনোভাবে প্রসন্ন নন।

রাজ্যের দাবিদাওয়া সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করে যদি কেন্দ্র তার অভাব মেটাতে না পারেন, তবে সন্দেহ হয়, অকংগ্রেসী রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ক্রমশই একটা তিক্ততা সৃষ্টি হবে।

শুভ হোক, নববর্ষে এই আশা বাঙ্গালী মাত্রেই করে। যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের পক্ষেও শুভ হোক নববর্ষ। যদিও নববর্ষের পথটা সুগম নয়। কন্টক-বিহীনও নয়। বেশী বড় কাঁটা যেমন, খাদ্য। কেন্দ্রের সঙ্গে প্রাথমিক বোঝাপড়া শেষ এবং তারই ভিত্তিতে খাদ্যমন্ত্রী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে তাঁর ভাঁড়ার সামলাতে হবে। বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে, যা পাওয়া যায়; দু' লক্ষ টন। বেশী হলে আরও ভাল। আরও আছে, শ্রমিক সমস্যা, গৃহসমস্যা, দুর্নীতি সমস্যা ইত্যাদি। কিন্তু বোধ হয় আরও একটা সমস্যা দেখা দেবার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। যদিও সেটা রাজনৈতিক এবং সরকারের চাইতে দলগতভাবে যুক্ত ফ্রন্টের জোট আরও বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

সমস্যাটা দেখা দিয়েছে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে উপলক্ষ করে। দিল্লিতে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়ন নিয়ে কংগ্রেস ও বিরোধীদলের মধ্যে যে রাজনৈতিক খেলা চলেছে তার জেরটা ওখানেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি। বরং বেশ জোরেই তার ধাক্কাটা লেগেছে পশ্চিম বাংলার যুক্ত ফ্রন্টের গায়ে। এই রাজনৈতিক জটিলতার সূত্রপাত অবশ্য দিল্লিতেই।

বেশ কিছুদিন ধরে দিল্লিতে লোকসভার বিরোধী দলগুলোর মধ্যে একটা প্রচেষ্টা চলছিল ঐক্যবদ্ধ হবার। একতাবদ্ধ হবার তাগিদটা স্বভাবতই আসছিল বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের বিপর্যয় লক্ষ করে এবং বিশেষভাবে নির্বাচনের পরে নূতন সরকার গঠন করার প্রশ্ন নিয়ে। আশা ছিল একতাবদ্ধ হলে ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় কংগ্রেসের সঙ্গে সমানে সমানে পাঞ্জা লড়া যাবে। এই পাঞ্জা লড়াইয়ের প্রথম দিকেই কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ লড়াইটা প্রকাশ পেল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের মধ্যে মতপার্থক্য কেন্দ্র করে। প্রধানমন্ত্রী গোড়া থেকেই প্রস্তাব করেছিলেন ডঃ জাকির হোসেনকে মনোনীত করার জন্য; কিন্তু শ্রীকামরাজের মত ছিল অন্যরূপ।

এরই সুযোগ নিয়ে সাতটি বিরোধীদল একমত হয়ে প্রস্তাব করলেন শ্রী কে সুব্বা রাওকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করার জন্য। সপ্ত বিরোধী দলের এই প্রস্তাব কংগ্রেস দলকে বেকায়দায় ফেলেছিল। কিন্তু অবস্থাটা হঠাৎ ঘুরে গেল অন্যান্য বিরোধী দলের ভিন্ন প্রস্তাবে। যে সাতটি দল শ্রীসুব্বা রাও-এর নাম প্রস্তাব করেছে এবং মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছে তাদের মধ্যে আছে স্বতন্ত্র পার্টি, জনসঙ্ঘ, বাম ও ডান কম্যুনিস্ট পার্টি ইত্যাদি। কিন্তু এই দলগোষ্ঠীর বাইরে যারা রইল, তাদের মধ্যে প্রধান দলগুলো হল বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি ইত্যাদি। এই কয়টি দল মিলে গঠন করল প্রগ্রেসিভ ব্লক, যার নেতা নির্বাচিত হলেন শ্রীহুমায়ুন কবীর।

প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল লোকসভার বিরোধী দলগুলোর দুটো পৃথক গোষ্ঠী সংগঠিত হয়েছে। দুই পৃথক গোষ্ঠী হয়েও যদি তাদের মধ্যে বোঝাপড়া থাকত এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে মতৈক্য থাকত তাহলে হয়ত বর্তমানে যে রাজনৈতিক প্রশ্ন পশ্চিম বাংলার যুক্ত ফ্রন্টে দেখা দিয়েছে তা উঠত না। কিন্তু মতৈক্যের পরিবর্তে দেখা দিল মতবিরোধ।

সপ্ত বিরোধী গোষ্ঠীর প্রধান দলগুলো এবং প্রগ্রেসিভ ব্লকের মূল পার্টিগুলো পশ্চিম বাংলার যুক্ত ফ্রন্টের সরিক। কাজেই সপ্ত বিরোধী গোষ্ঠীর মনোনয়ন যদি প্রগ্রেসিভ ব্লকের পছন্দ না হয়, তা হলে বিরোধ দেখা দেবার সম্ভাবনাই বেশী। প্রগ্রেসিভ ব্লকের পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ব্লকের দলগুলো কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী ডঃ জাকির হোসেনকেই সমর্থন জানাবে। এদের প্রথম প্রস্তাব ছিল যে, ডঃ রাধাকৃষ্ণন রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকুন। কিন্তু ডঃ রাধাকৃষ্ণন সে অনুরোধ রাখেন নি, কারণ, রাষ্ট্রপতির পদকে রাজনৈতিক দাবা খেলার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করায় তিনি বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত। কিন্তু ঘুঁটির চাল দেওয়া হয়ে গিয়েছে; ফিরিয়ে নেবার পথ তখন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ।

তাই প্রগ্রেসিভ ব্লককে ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে শ্রীহুমায়ুন কবীর সমর্থন জানিয়েছেন ডঃ জাকির হোসেনকে। কারণ, শ্রীকবির মনে করেন ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের পর ডাঃ জাকির হোসেন-ই শ্রেষ্ঠ প্রার্থী। সপ্ত বিরোধী দলের পক্ষে অবস্থাটা তাই বিশেষভাবে অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছে। তার প্রধান কারণ, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি শ্রীসুব্বা রাও-এর মনোনয়ন প্রবলভাবে সমর্থন করেছে। এবং দাবি করেছে শ্রীসুব্বা রাও, তাদেরই প্রস্তাবিত প্রার্থী।

এই মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিই পশ্চিম বাংলায় যুক্ত ফ্রন্টের প্রধান সরিক। সরিক হিসাবে ফ্রন্টের অন্যান্য সরিকদের সঙ্গে মতবিরোধ নিশ্চয়ই কাম্য নয়। কারণ রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন বা নির্বাচনে যুক্ত সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ নেই; কিন্তু রাজনৈতিক প্রশ্ন বাদ দিলেও পশ্চিম বাংলার ভোট বিভক্ত হবার আশংকা নিশ্চয়ই আছে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কে সংবিধানের নির্দেশ আছে যে, (১) সংসদের সকল সদস্য (রাজ্যসভা ও লোকসভার) এবং (২) সকল রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যরা (মনোনীত সদস্যরা নয়) এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। এই সদস্যরা, বা নির্বাচকমণ্ডলী এক বিশেষ পদ্ধতিতে ভোট দেবেন এবং প্রতি সদস্যের ভোটের সংখ্যা, নির্ধারিত হবে এক সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিও সংবিধানে নির্দিষ্ট করা আছে। বিধানসভা বা সংসদের সদস্যের ভোটসংখ্যা মোটামুটি নির্ধারিত হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে। সেই অনুপাতটা স্থির করতে হলে, রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে (সর্বশেষ সেন্সাস অনুসারে) রাজ্য বিধানসভার মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে যে ভাগফল পাওয়া যাবে, তাকে এক হাজার দিয়ে ভাগ করতে হবে। সর্বশেষ ভাগফল যা পাওয়া যাবে সেটাই হবে বিধানসভার প্রতি সদস্যের ভোট সংখ্যা। এই হিসাবে বিধানসভার মোট যে ভোট সংখ্যা পাওয়া যাবে, তাকে রাজ্য থেকে নির্বাচিত লোকসভা ও রাজ্যসভার মোট সদস্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে প্রতি সংসদ সদস্যের ভোট সংখ্যা পাওয়া যাবে।

বিধানসভার সদস্য সংখ্যা সংসদ সদস্য

সংখ্যার অনুপাতে অনেক বেশী। কাজেই বিধানসভার সদস্যদের ভোটের উপরই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল অনেকাংশে নির্ভরশীল। পশ্চিম বাংলা বিধানসভা থেকে যে ভোট প্রদত্ত হবে তার গুরুত্বও তাই অনেক বেশী। ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা ৩,৪৯,২৬,২৭৯। এই সংখ্যাকে বিধান-সভার মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ২৮০ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল থাকে, তাকে এক হাজার দিয়ে ভাগ করলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যায়, তা হল ১২৪·৭৪। এই সংখ্যাই হল পশ্চিম বাংলা বিধানসভার প্রতি সদস্যের ভোট সংখ্যা। মোটামুটিভাবে বলা চলে পশ্চিম বাংলা বিধানসভার প্রতি সদস্যের মোট ভোট সংখ্যা ১২৫। তা হলে পশ্চিম বাংলা বিধান সভার মোট ভোট সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৩৫ হাজার (২৮০টি সদস্যের হিসাবে)।

ঠিক এই হিসাব অনুসারে, ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, কংগ্রেসের ১২৭ জন সদস্যের কাছ থেকে প্রায় ১৫,১৪২টি ভোট পাওয়া যাবে ডঃ জাকির হোসেনের পক্ষে। প্রশ্ন, বাকী ১৯,৮৫৮টি ভোট কোন দিকে যাবে। শ্রীসুব্বা রাও-এর সমর্থক হিসাবে বড় যে দুটো দলকে পাওয়া যাচ্ছে তারা হল কম্যুনিস্ট (মার্ক্সিস্ট) এবং সি পি আই বা দক্ষিণ কম্যুনিস্ট। মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্টদের (৪৪টি আসন হিসাবে) মোট ভোট সংখ্যা হয় ৫,৪৮৯ এবং সি পি আই-র ১,৯৮৬। মোট ৭,৪৭৫।

অপর দিকে প্রগ্রেসিভ গোষ্ঠীর সমর্থক দলগুলোর আওতায় আছে বাংলা কংগ্রেসের ৪,৩৬৬টি ভোট, ফরোয়ার্ড ব্লকের ১,৪৯৭টি ভোট এবং আর এস পির ৭৪৮টি ভোট, মোট ৬,৬১১টি ভোট। যুক্ত ফ্রন্টের সামনে আজ প্রশ্ন ১৯,৮৫৮টি অ-কংগ্রেসী ভোটের মধ্যে এই ৬,৬১১টি ভোট কিভাবে ব্যবহৃত হবে। প্রগ্রেসিভ গোষ্ঠী সমর্থক তিনটি দলের পক্ষ থেকে এখনও কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পাকাপাকিভাবে জানান হয়নি। কিন্তু রাজনৈতিক মহলে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, এই তিনটি দল বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি হয়ত শ্রীসুব্বা রাওকে সমর্থন জানাবে না।

গত নির্বাচনে বাংলা কংগ্রেসের সাফল্যের মূলে ছিল কয়েকটি জেলায় মুসলমান নির্বাচকদের বিপুল সমর্থন। তা ছাড়া ডঃ জাকির হোসেনই সর্বপ্রথম কংগ্রেস মনোনীত মুসলমান যিনি ভারতের রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী। সে কারণে, বাংলা কংগ্রেসের পক্ষে ডঃ জাকির হোসেনকে সমর্থন করা ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। সেটা প্রগ্রেসিভ ব্লকের এবং বাংলা কংগ্রেসের নেতা শ্রীহুমায়ুন কবীর খোলাখুলিভাবেই বলে দিয়েছেন। ফরোয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি; কিন্তু এই দুই দলের নেতৃস্থানীয়দের কাছে শ্রীসুব্বা রাও-এর মনোনয়ন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য যে শোনা যায়নি তা নয়। এই পক্ষের প্রধান বক্তব্য শ্রীসুব্বা রাও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে হয়ত দিকপাল ছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক জীবনে প্রগতি-পন্থী হিসাবে তাঁকে কখনও দেখা যায় নি। দ্বিতীয় বক্তব্য, জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির সংগে সুর মিলিয়ে কোন প্রার্থীকে সমর্থন করতে তাঁরা রাজী নন। এবং তৃতীয় বক্তব্য বাংলা কংগ্রেসের মত তাঁরাও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের আস্থাকে ক্ষুণ্ণ করতে রাজী নন।

শ্রীসুব্বা রাও-এর প্রতি এই বিরূপ মনোভাব এঁরা প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করছেন না; বিশেষ করে শ্রীশীতলবাদের বিবৃতির পরে। সে-কারণে সমস্যাটা দাঁড়িয়েছে এই যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় পশ্চিম বাংলার যুক্ত ফ্রন্ট-এর তরফ থেকে কোন হুইপ বা নির্দেশ সদস্যদের দেওয়া হবে কিনা। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়-কুমার মুখার্জি মনে করেন হুইপ না দেওয়াই ভাল; কারণ, তাতে প্রকাশ্য কোন বিরোধ থাকবে না। দল হিসাবে সদস্যরা ভোট দিতে পারবেন। অন্য প্রস্তাবও শোনা গিয়েছে। প্রগ্রেসিভ ব্লকের সমর্থক দলের সদস্যরা অনেকেই হয়ত ভোট দেবেন না। এ প্রস্তাব যে সবাই মেনে নেবেন তা নয়; তবে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, পশ্চিম বাংলা বিধানসভার ৩৫০০০ ভোটের মধ্যে শুধু ১৫,১৪২টি কংগ্রেস ভোটই নয়, বাংলা কংগ্রেস, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং আর এস পি-র ৬,৬১১টি ভোটও শ্রীসুব্বা রাও-এর দিকে যাবে না। ডঃ জাকির হোসেনের দিকে যদি না-ও যায়, তবু এটা হবে পরোক্ষ সমর্থন। সর্বভারতীয় ভোটের ভিত্তিতে এই ভোটসংখ্যা হয়ত তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না। কিন্তু কংগ্রেস ও বিরোধীদলের মধ্যে ভোটের পার্থক্য যেখানে সামান্য সেখানে এর গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে।

এ অবস্থাটা রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি করতে বাধ্য। এমনকি দেখা যাচ্ছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট এবং সি পি আই-কে বিশেষ অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। অবশ্য মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি অবস্থাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। সেটা বোঝা গেল যখন পলিটব্যুরোর সভা বসল কলকাতায়। পলিটব্যুরো প্রসংগটা প্রত্যক্ষ-ভাবে তেমন আলোচনা করেনি। করেছে পরোক্ষভাবে, কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে। পলিটব্যুরোর মতে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনগণ নির্বাচনী সংগ্রামে বিরাট জয়লাভ করেছে বটে, কিন্তু বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী কর্তৃক দেশের নীতি এবং সরকার নির্ধারণ করার ক্ষমতা রয়েই গেছে; প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন, মন্ত্রিসভার গঠন এবং রাষ্ট্রপতির পদের জন্য ব্যক্তি মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবেই তারা হস্তক্ষেপ করছে।

তবু কথাটা উঠেছে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় অকংগ্রেসী সরকারের রাজনৈতিক চেহারা নির্ধারণের সময়। কেন্দ্রীয় কমিটির মতে স্বতন্ত্র পার্টি বা জনসঙ্ঘ-এর নেতৃত্বে গঠিত অ-কংগ্রেসী সরকারের চেহারা গণ-তান্ত্রিক নয়, যদিও বাংলা কংগ্রেস 'গণ-তান্ত্রিক'। তখনই প্রশ্ন ওঠে, তাহলে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি রাষ্ট্রপতি মনোনয়নে স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসঙ্ঘের সংগে হাত মেলাল কি করে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, ডঃ জাকির হোসেনকে প্রত্যাখ্যান করে শ্রীসুব্বা রাওকে সমর্থন করার মধ্যে কোন সম্প্র-দায়িকতা আছে কিনা।

দুটো প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছেন পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীসুন্দরাইয়া। তাঁর মতে, প্রশ্নটা সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট নয়। কারণ, এক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিরোধী দলের সংগে অসহযোগী মনোভাবই তাদের সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী। কংগ্রেস কোন 'কনসেনসাস' পদ্ধতিতে (একমত হওয়া) বিশ্বাসী নয়। আর স্বতন্ত্র পার্টির বা জনসঙ্ঘের সংগে রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের ব্যাপারে হাত মেলান সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য যে, মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি এখনও এইসব দক্ষিণপন্থীদের সংগে হাত মেলাবার পক্ষপাতি নয়; তবে বিশেষ বিশেষ 'ইস্যু' বা প্রশ্ন নিয়ে একমত হওয়া অসম্ভব নয়।

শ্রীসুন্দরাইয়ার বক্তব্য কিন্তু তাঁরই দলের একাংশকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। হয়ত সে কারণেই, দলের এম পি শ্রীনীরেন ঘোষকে যেতে হয়েছিল কংগ্রেসের কাছে বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে। শ্রীসুব্বা রাওকে উপরাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কংগ্রেস রাজী হয় নি।

সি পি আই-র মধ্যেও এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় সুর শোনা যাচ্ছে। কলকাতায় এদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভা বসবে, তখন হয়ত এ সম্বন্ধে কোন নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিম বাংলার যুক্ত ফ্রন্টের কাছে নববর্ষ নতুন রাজনৈতিক সমস্যারই বার্তা বহন করে এনেছে।

মোরারজীর বক্রোক্তিতে বিক্ষুব্ধ
জ্যোতি বসু বলেছেন—'আপনার
জায়গায় আমাকে একবার
বসতে দিন তাহলেই
সমুচিত জবাব পাবেন।'
বিনা যুদ্ধে নাহি দিব
সূচ্যগ্র আসন।
অর্থ মন্ত্রীত্ব
নাম্বুদ্রিপাদ বলেছেন যে আর্থিক
ও প্রশাসনিক সব শক্তিই
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।
তাঁর একমাত্র সম্বল
পরমার্থিক শক্তি !
কেরল সমস্যা
রাধাকৃষ্ণণ অবশেষে অবসর
নিলেন।
ইনিংস-এ টিঁকে ছিলেন ভালোই।
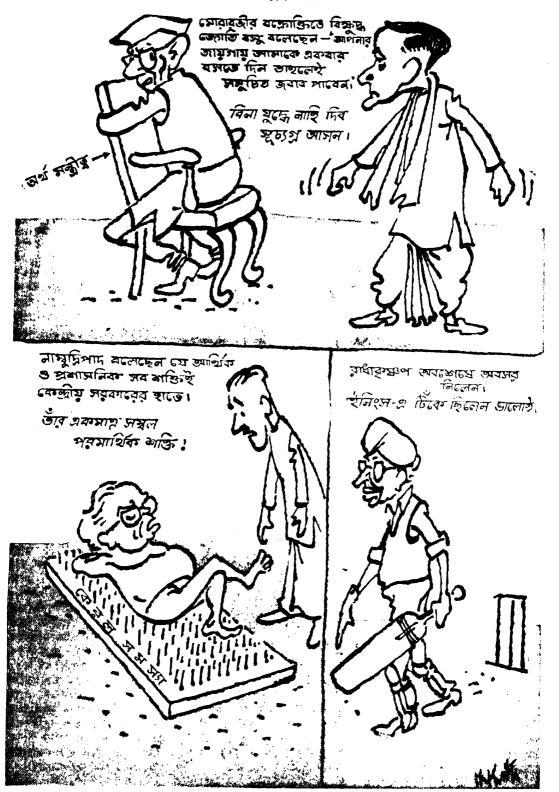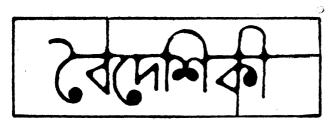
আমেরিকা কী চায়?

যে সব দেশের ঘরে নেই খাবার সংস্থান তাদের আবার জেট বোমারু বিমান বহর পোষার শখ কেন? কথাটা বলেছিলেন গত বছর রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রধান মার্কিন প্রতিনিধি গোল্ডস্বার্গ। শখটা চাগিয়েছে কিন্তু আমেরিকাই সবচেয়ে বেশী। গোল্ডস্বার্গ যে সময় গরীব দেশগুলির "ঘোড়া রোগ"কে ঠাট্টা করছিলেন ঠিক তখনই মার্কিন রাষ্ট্রকর্তারা দক্ষিণ আমেরিকার অখ্যাত একটি দেশ পেরুকে এক ঝাঁক জেট বোমারু বিমান সরবরাহ করেন। তখনই কোন কোন মার্কিন মহলে আপত্তি উঠেছিল—পেরুর দরকারটা কী এক ঝাঁক বোমারু বিমানের? পেরু নিশ্চয়ই কম্যুনিস্ট চীন থেকে অনেক অনেক দূরে, রাশিয়া থেকেও। তা ছাড়া সারা দক্ষিণ আমেরিকায় "স্বাধীনতা" ও "শান্তি" রক্ষার মহান কর্তব্যভার তো বহুকাল ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। কিন্তু এ-সব তো নিতান্ত সোজাসুজি সাধারণ যুক্তি। মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রের দুনিয়া-জোড়া কারবারের যুক্তিটা অত সোজা নয়। মার্কিন কর্তারা কখনও ডান হাতে একপক্ষকে অস্ত্রশস্ত্র দান খয়রাত করছেন, কখনও বাঁ হাতে আর একপক্ষকে মার্কিন অস্ত্র ভাণ্ডারের ঝড়তি পড়তি বাড়তি মাল বেচে দিচ্ছেন। যে-পক্ষের ভাগে বা ভাগ্যে কম মিলছে তার আক্ষেপ, অনুনয়: হে মহাজন! এই কী আপনার সুবিচার! কোন পক্ষই বলতে পারছে না অস্ত্রশস্ত্র লেনদেনের এমনধারা কারবারটাই সর্বনাশা।

আপাতত আমরা আমেরিকার উপর চটেছি। ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় আমেরিকা এই দুই দেশকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ থেকে হাত গুটিয়েছিল। সে হাত এখন আবার প্রসারিত হয়েছে, অবশ্য কতকগুলি শর্তে। সে-সব শর্ত স্রেফ উপরচালাকি। মার্কিন অস্ত্রভাণ্ডার থেকে ভারতবর্ষ জিনিসপত্র পেয়েছে সামান্যই। এমন কি হিমালয় সীমান্তে চীনা আক্রমণের পরেও ভারতের প্রতি মার্কিন দাক্ষিণ্য উপচে ওঠেনি। ওদিকে ১৯৫৪ সন থেকে মার্কিন খয়রাতী অস্ত্রশস্ত্রে পাকিস্তানের বিরাট সমরযন্ত্র গড়ে উঠেছে, প্রভূত শক্তিশালী হয়েছে। আমেরিকা কেন কী উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বাড়িয়েছে সে-প্রশ্ন এখন অবান্তর। আমেরিকা অন্যায় করছে, আমরা ক্ষুব্ধ বা রুষ্ট হয়েছি, এ-সব কথাও বলে লাভ নেই।

আমেরিকা ভারতবর্ষের অনুযোগ অনুরোধ, আপত্তি ও প্রতিবাদ সবই অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারে। কারণ আমেরিকার শক্তিসামর্থ্য বিপুল, আর ভারতের প্রায়-অসহায় পরনির্ভরতাও এখন সকলেরই জানা। কম্যুনিস্ট চীন যে সামরিক বলে খুব বেশী বলীয়ান তা নয়; উপরন্তু তার খাদ্য এবং শিল্পজাত সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষমতাও নানাভাবে অসুবিধাগ্রস্ত। উত্তর ভিয়েতনামের সামর্থ্য আরও কম, তার বর্তমান অবস্থাও নিশ্চয়ই আরামের নয়। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রকর্তাদের মরজি ও খেয়াল খুশীর বিরুদ্ধে চীন বা উত্তর ভিয়েতনাম যেভাবে রুখে দাঁড়াতে পারে ভারতবর্ষ তা পারে না। ভারতের পক্ষে আমেরিকাই অগতির গতি। পাকিস্তানকে সমর সরঞ্জাম সরবরাহ সম্পর্কে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মার্কিন রাষ্ট্রকর্তাদের উদ্দেশে আক্ষেপ জানিয়েছেন। তার বেশী আর কীই বা করা সম্ভব?

আক্ষেপ এবং আপত্তি এর আগেও বহুবার জানানো হয়েছে। ১৯৫৪ সনে আমেরিকা পাকিস্তানের সমরযন্ত্র গড়ে তুলতে এগিয়ে আসে তখনই ভারতের তরফ থেকে বলা হয়, আমেরিকার এই সিদ্ধান্তের ফলে ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের সামরিক ভারসাম্য নষ্ট হবে। সামরিক ভারসাম্য কথাটার অর্থ অবশ্য নানাজনের কাছে নানা রকম। ভারতবর্ষ এর মানে করেছে একরকম, পাকিস্তান এবং আমেরিকা করেছে এবং এখনও করছে অন্য রকম। আমেরিকা চায় পাকিস্তানের সমরশক্তি অন্ততপক্ষে ভারতের সমরশক্তির সমান-সমান হোক। পাকিস্তানের ব্রিটিশ-মুরুব্বিদেরও সেই কথা। অথচ ভারতবর্ষ পাকিস্তানের চেয়ে আয়তনে চার গুণ বড়, জনসংখ্যা এবং সীমান্তের দৈর্ঘ্যও বহু গুণ বেশী। ভারতের প্রতিরক্ষা সেই অনুপাতে পাকিস্তানের চেয়ে বেশী হবে এটাই স্বাভাবিক। হিমালয় সীমান্তে চীনা আক্রমণের আগে ভারতবর্ষ তার প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধিতে আদৌ মন দেয়নি। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে জনসাধারণের বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টাই প্রাধান্য পেয়েছে। পাকিস্তানের জঙ্গী শাসনে কামান বন্দুক বিমান ও ট্যাঙ্কের বহরই রাষ্ট্রের সৌভাগ্য-সূচক, প্রদীপের পিলসুজ জনসাধারণের দুর্গতি তো চিরকালের ব্যাপার।

মার্কিন রাষ্ট্রনেতাদের কাছে এ-সব কথাও বলে লাভ নেই। তাঁরা নাকি "মুক্ত দুনিয়ার" আদর্শ রূপায়ণে, রক্ষণাবেক্ষণে সমর্পিত-প্রাণ। আসলে এই "মুক্ত দুনিয়া" বলতে তাঁরা কেবল বোঝেন কম্যুনিস্ট প্রভাব থেকে মুক্ত, "ফ্রী ওয়ার্ল্ড, ফ্রী ওনলি অব কম্যুনিজম"; আর সবরকম অনাচার, স্বৈরাচার, কুশাসন, জনস্বার্থ-বিরোধী জবরদস্তির রাজত্ব মার্কিন রাষ্ট্রকর্তাদের দাক্ষিণ্যে পুষ্ট হতে পারে এবং তাই মার্কিনী "মুক্ত দুনিয়ার" দিকে দিকে নিষ্ঠুরতম অগণতান্ত্রিক শাসকমণ্ডলী অঢেল মার্কিন অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যে পরিপুষ্ট। মার্কিন উদারনৈতিক পর্যবেক্ষকরা দেখিয়েছেন, খয়রাতী মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র যে দেশেই গেছে সেখানেই খতম হয়েছে গণতন্ত্র। পাকিস্তান, তুর্কী, গ্রীস, ইরান, মার্কিন অস্ত্র সাহায্যপুষ্ট প্রত্যেকটি দেশেই তাই মিলিটারীর প্রাধান্য।

সমর সরঞ্জাম সরবরাহ ব্যাপারে পাকিস্তানকে মার্কিন রাষ্ট্রকর্তারা বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছেন, এটা মার্কিন রাষ্ট্রনীতিতে নুতন ব্যাপার নয়। শোনা যাচ্ছে, মার্কিন রাষ্ট্রকর্তারা এ বিষয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা কিছুকাল স্থগিত রাখেন। ভারতের সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করেছিলেন। সাধারণ নির্বাচনের সময় বা তার আগে ঘোষণা করা হলে ভারতবর্ষে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে, সাধারণ নির্বাচনের উপরও তার প্রভাব পড়বে, এই বিবেচনা করে নাকি মার্কিন রাষ্ট্রকর্তারা অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে ঘোষণাটা তখনকার মত স্থগিত রাখেন। অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে পাকিস্তানকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার আরও গূঢ় কারণও থাকা সম্ভব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে রাজনৈতিক ক্ষমতাদ্বন্দ্বে বামপন্থীরা যে সময় অগ্রণী ঠিক তখনই আমেরিকা তাড়াতাড়ি ফ্রাঙ্কো-স্পেনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ফেলে স্পেনের ঘাটি শক্ত করে দরকার হলে ফ্রান্সে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঠেকানোর জন্য। ভারতে কংগ্রেসের বিপর্যয় সম্ভাবনা দেখেই কি দরকারমত হস্তক্ষেপের জন্য মার্কিন রাষ্ট্রকর্তারা পাকিস্তানের ঘাটি আরও জোরদার করতে এগিয়েছেন?

১৭।৪।৬৭

কুমারীর মৃত্যু

শুভেচ্ছাসহ

এতদিন ছোটো ছিলো — সন্নিকট, উৎসুক, অস্ফুট;
মা তার সীমান্ত, আর অন্তরঙ্গ বাতাস, মেয়েরা;
ভাবনা, সংগ্রাম, ভয় — তার পক্ষে সব একমুঠো,
রঙিন কুয়াশা-রৌদ্রে অতি নম্র তাই চলাফেরা।

অথচ জীবন তাকে বিঁধেছিলো মৌলিক আক্রোশে:
দু-একটি বৃন্তে তার ফুটেছিলো সুগন্ধি গুজব;
দূর্বা ও শিশির তাকে জপিয়েছে স্বপ্নের সাহসে—
প্রেম, সুখ, সার্থকতা নিতান্তই সহজ, সম্ভব।

রুদ্ধ হ'য়ে গেলো দ্বার; পেঁছিলো না স্বামী ও সন্তান;
ভ্রষ্ট হ'লো ভবিষ্যৎ, যেন টুকরো বেলোয়াড়ি চুড়ি;
সর্বস্বের সমর্পণে হৃৎপিণ্ডে উন্মাদ হাতুড়ি —
কে এক অচেনা এসে নিলো তার নিগূঢ় সন্ধান।

কিন্তু সে হঠাৎ আজ কত বড়ো হ'য়ে গেছে, দ্যাখো!
বিছানায়, এই ঘরে, আর তাকে কেমনে ধরাবে?
তার সরু সিঁথি যেন দূরতম দিগন্তের সাঁকো,
এবং বিস্মিত বাহু, লজ্জা ভুলে, অবিশ্বাস্যভাবে

আলিঙ্গনে লিখে নিলো নক্ষত্রকে সবচেয়ে প্রিয়;
আর তার স্তন দুটি—ছোটো, ভীরু, অস্পৃস্ট, নূতন,
প'ড়ে আছে সমুদ্রে শিলার মতো উঁচু ও নির্জন,
অনাবৃত, অকুণ্ঠিত, শঙ্কাহীন, নির্জ্জর, নিস্পৃহ —

যাকে ঘিরে ব'য়ে যাবে তরঙ্গের অনন্ত প্লাবন,
চিরকাল-অসমাপ্ত ত্রিকালের প্রণয়চুম্বন।

সুনন্দর জার্নাল

'আজকের একটি প্রশ্নে'

কাগজ খুললেই প্রতি বছরের মতো আবার সেই বীভৎস খবরগুলোর ঐকতান। বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পর্ব আরম্ভ হয়েছে। অতএব বাংলা - বিহার - আসাম - ওড়িষ্যা - পূর্ব পাকিস্তান একসঙ্গে উত্তরোল। কোথাও পরীক্ষাকেন্দ্রে গোলযোগ, কোথাও ছাত্র-পুলিসে সংঘর্ষ, কোথাও প্রধান শিক্ষক আহত, কোথাও পরীক্ষার্থীর ছোরার ঘায়ে ইনভিজিলেটর নিহত। একটা কুৎসিত কালো হাওয়ায় চারদিক আবিল হয়ে আসে।

অনেকদিন পরে অধ্যাপক এসে হাজির হল। বললে, 'পেয়েছি।'

'কী পেয়েছ?'

'সলুশন।'

'বলে যাও।'

গার্ডকেও গার্ড দিতে হয়

'পরীক্ষার ছ' মাস আগে প্রশ্নপত্র স্কুল-কলেজে সার্কুলেট করো এবং ছাত্রদের সাজেশন চেয়ে পাঠাও। তাদের মতামত পাওয়া গেলে, সেইভাবে কোয়েশ্চেন-পেপার রিকাস্ট্ করে, আবার পাঠিয়ে দাও। তারা তিন-চার মাস ধরে সেগুলো তৈরি করুক। তারপর যখন তারা পরীক্ষা দিতে বসবে, তখন প্রতি ক্যাণ্ডিডেটের পাশে দু'জন করে টীচার বা প্রোফেসর বই-পত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকুন, তাঁরা ছাত্রদের ডিক্টেট্ করবেন, দরকার হলে লিখেও দেবেন। দেখবে, আর কোনো সমস্যাই থাকবে না।'

'কিন্তু তাতেও যদি কারুর অসুবিধা হয়?'

'তা হলে পরীক্ষা না দেবার জন্যেই তাকে জেনারেল স্কলারশিপ অফার করো।'

বোঝা গেল অধ্যাপক চটেছে, তাই এ সব উদ্ভট রসিকতা বেরিয়ে আসছে গড়গড়িয়ে।

কিন্তু রাগ করে বসে থাকলে তো চলে না। সময় এসেছে, যখন ব্যাপারটাকে আরো তলিয়ে দেখা দরকার।

প্রশ্নপত্র শক্ত হল কিংবা সিলেবাসের সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন তার জন্যে যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় কিংবা অরুচিকর অশোভনতা ফুটে ওঠে—সে সব যতই অবাঞ্ছিত হোক, তাদের একটা অর্থও বোঝা যায়। তখন তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ পরীক্ষার্থীর নয়, সেজন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য। কিন্তু পরীক্ষা শুরু হলেই কিছু সমাজ-বিরোধীর তাণ্ডব চলতে থাকবে, ছুরি-ছোরা-অ্যাসিড্ বাল্বের পালা আরম্ভ হয়ে যাবে—এই নৈরাজ্যবাদকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। প্রতীকারের জন্যে এখনই আমাদের তৎপর হওয়া উচিত।

পরীক্ষা আছে অথচ নকল নেই, পরীক্ষার্থীর দল কোনো দিকে না তাকিয়ে সুবোধ বালকের মত ঘাড় নামিয়ে লিখে যাচ্ছে—চার দশক আগেও বাংলা দেশের কোথাও কোথাও এইরকম ইউটোপিয়ার অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সেগুলো রূপকথার মতোই শোনায়, তা ছাড়া তারা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও বটে। পরীক্ষা থাকলেই নকল থাকবে—তা শুধু ভারতবর্ষের বিশেষত্ব নয়, একেবারে বিশ্বগত ব্যাপার। মানুষের মৌলিক উপাদানগুলো না বদলালে এরও বদল হওয়া শক্ত। আমার আপত্তি সেখানে নয়। কিন্তু অন্যায়টা যখন

বীর রসে আপ্লুত হয়, যখন ডাকাতের মতো এসে চড়াও হতে থাকে, তখন আত্মরক্ষার জন্যেও ব্যক্তিমানুষ এবং সমাজের রুখে দাঁড়ানো দরকার।

ইনভিজিলেটর কোনোদিনই অসাধু পরীক্ষার্থীর প্রীতিসিক্ত নন। এক-আধটা ঢিল-পাটকেল, কখনো দু-একবার লাঠির ঘা তাঁর অদৃষ্টে আবহমানকাল থেকেই জুটে আসছে। কিন্তু পাইকারী অ্যাসিড, ছোরা, প্রকাশ্যে উত্তম-মধ্যম—এগুলো গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের অবদান। সোজা কথায়, চুরির লজ্জা আজ খুনীর বীরত্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেই যে সব কৃতী শিল্পীরা দু হাতের তালুতে 'কমসে কম চার চারটে প্রশ্নের উত্তর লিখে নিয়ে আসত, টুকরো টুকরো কাগজে মাইক্রোস্কোপিক হরফ রচনায় যাদের কৃতিত্বের তুলনা ছিল না, শরীর এবং কাপড়জামার যত্রতত্র বই-খাতা-কাগজ লুকিয়ে রাখার কৃতিত্বে যারা প্রোফেসর গণপতিকেও লজ্জা দিত, দারুণ গরমে মোটা চাদর ছাড়া যাদের শীত কাটত না এবং পরীক্ষার হলের নিবিড় ছায়ার ভেতরেও

আধুনিক পরীক্ষার হল

যাদের কালো গগল্‌স নইলে চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হত না—তারা আর যাই হোক, নিজেদের বীরপুরুষ বলে কখনো মনে করত না। ধরা পড়লে হাতে পায়ে ধরত, কখনো কখনো সুযোগ পেলে কিছু প্রতিশোধও নিত; কিন্তু নকল করাটা যে তাদের জন্মগত অধিকার এবং সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ ঘটলেই খুনোখুনি—এই মহান উপলব্ধি তাদের ছিল না।

আগেকার দিনে নকল করাটা ছিল ব্যক্তিগত—অ্যাচিভমেন্ট কিংবা ফেলিয়োর দুই-ই ছিল পার্সোন্যাল। কিন্তু ঋষিরা বলেছেন: 'সংঘশক্তি কলৌ যুগে', একালের জ্ঞানীরা আরো অনেক ভালো ভালো কথা শুনিয়েছেন। অতএব ব্যাপারটা চলছে সমবেত প্রয়াসে। তিনজন বসে খাতা লিখছেন অদূরের কোনো নিরাপদ বাড়িতে, তিনজন যোগান দিচ্ছেন 'হলে', মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্যে ক'জন ছোরা ইত্যাদি বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—তা একমাত্র শ্রীভগবানই বলতে পারেন। যাঁরা আরো বেশী গণতান্ত্রিক, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ পরীক্ষার্থী সম্পর্কে যাঁদের কোনো মোহ নেই, তাঁরা সমবেতভাবে গণ-কল্যাণের পুণ্য ব্রত পালন করে চলেছেন। সন্নিহিত কোনো রেস্তোরাঁ অথবা ওই রকম কোনো ভালো জায়গায় মাইক্রোফোন এবং অ্যামপ্লি-ফায়ার বসানো হয়েছে, সেখান থেকে বিঘোষিত হচ্ছে আকাশবাণী: 'ইংলিশ, সেকেণ্ড পেপার। কোয়েশ্চেন নাম্বার টু। বন্ধুগণ, আমরা বলে যাচ্ছি, আপনারা লিখে যান।'

অতঃপর পরীক্ষা-কেন্দ্রের 'ইনচার্জ' নিজের ঘরে কানে তুলো দিয়ে বসে থাকতে পারেন; মান এবং প্রাণ—এই দুটির প্রতি যাঁরা কিঞ্চিৎ মমতাশীল, সেই 'গার্ড' ভদ্রলোকেরা 'হল'-এর বাইরে বেরিয়ে এসে করিডোরে সিগারেট খেতে পারেন। পুলিসে অবশ্য খবর দেওয়া যায়, কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন—আজকের পরে কাল আছে, কালকের পরে পরশু আছে। হাটে-বাজারে পথে-ঘাটে সর্বদাই পুলিস বডি-গার্ড হয়ে সঙ্গে ঘুরবে না। আমার এই পাড়াতেই একজন পণ্ডিতমশাই রয়েছেন, বিবেকের শাসন মানতে গিয়ে অ্যাসিডের কল্যাণে চোখ হারিয়েছেন তিনি।

লজ্জা কিংবা অপরাধবোধ দূরে থাক, সমস্ত ব্যাপারটাই যেন একটা হিংস্র আর উদ্দাম উল্লাসের রূপ নিয়েছে। এ যেন দাঙ্গার সুযোগে দোকান-লুটের র‍্যাভাডো, যেন মোটর গাড়ির পেট্রল-ট্যাঙ্কে দেশলাইয়ের কাঠি ফেলে দেবার আনন্দ। খবরের কাগজের পাতা খুলে শিউরে উঠতে হয়। এই মাৎস্যন্যায় দিয়ে যেখানে পালা শুরু, তার শেষ কোন্‌খানে তা কল্পনাও করা যায় না।

হয়তো মূল অনেক গভীরে। সমাজের জটিলতায়, অর্থনীতিতে, মনস্তত্ত্বে, সমগ্র শিক্ষা আর পরীক্ষাব্যবস্থার ভেতরেই। কিন্তু বড় পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ—রাতারাতি সব কিছু বদলে ফেলা যায় না। কিন্তু অন্তত আত্মশোধনের চেষ্টা করা যায়, অন্তত মনস্তাত্ত্বিক একটা অভিযানও চালানো সম্ভব। আমার মনে হয়, এর সব চাইতে যোগ্য নেতৃত্ব ছাত্র-সমাজই নিতে পারেন। একদা তাঁরা 'পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধে'র জন্যে সচেতন আন্দোলন চালিয়ে-ছিলেন—সে খুব বেশী দিনের কথা নয়। আজকে নানা দিক থেকেই ছাত্র-নেতৃত্বের দায়িত্ব যে ঢের বেশী বেড়ে গেছে, সে কথা কি তাঁরা ভেবে দেখবেন না?

মাননীয় মহাশয়, আপনার বহুমূল্য সময়ে আমার এই অনধিকার অনুপ্রবেশের জন্য আমি যারপরনাই লজ্জিত ও দুঃখিত। অনেক মুসাবিদার পর দরখাস্তের এই প্রথম বাক্যটি লিখে সুধন্য খুব তৃপ্তি পেল। সাধারণত চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে সুধন্য তৎপর ও দ্রুত। অফিসের নানাজনের নানাপ্রকার আবেদন অভিযোগ, এমনকি ব্যক্তিগত চিঠিও ওকে লিখে দিতে হয়। কারণ, সুধন্য লেখেও নাকি ভাল।

কিন্তু সেই ভাল নিশ্চয়ই খুব ভাল নয়। যদি হত, তা হলে নিশ্চয়ই বিগত সাত আট বছর ধরে এই একই ব্যাপারে তাকে ক্রমাগত চিঠি লিখে যেতে হত না। সাত আট বছর আগের সেই প্রথম কিংবা তার দু মাস পরের দ্বিতীয় চিঠিতেই কাজ হত। এবং তখনই সুধন্য এই দূরে, স্বজনহীন বিভুঁই ছেড়ে, কোম্পানীর দেওয়া বাধ্যতামূলক আবাসস্থল ছেড়ে চলে যেত হেড অফিসে, কলকাতায়, স্বগৃহে। বাবা ও মার সঙ্গে একসঙ্গে থাকত, সুন্দর ফরসা পোশাক পরে টুকটাক ট্রামেবাসে উঠে ছিমছাম অফিসে যেত। হয়ত বা এত দিনে, যা কিনা সুধন্য কলকাতায় ফিরে গিয়ে করবে বলে স্থগিত রেখেছে, সেই বিয়ে থা করে একটি দুটি ছেলেমেয়ের বাপ হত। এই সব কথা ভাবার সময় সুধন্যর মনে কলকাতা বড় স্পষ্ট হয়ে ছায়া ফেলছিল। সুধন্য যেন চোখের সামনে কলকাতা দেখতে পাচ্ছিল। গলির মোড়ে ট্রাম রাস্তায় শিস দিয়ে যাওয়া ট্রাম, দ্রুতগামী বাস ও লরি, চৌরঙ্গীর চৌরাস্তায় ট্রাফিক সাইনের সবুজ আশ্বাসধন্য গতিশীল মোটর ও ট্যাক্সি, নিবন্ত জ্বলন্ত নিয়ন সাইনের বর্ণালী আলো, খোঁপার বন্ধনে ও শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে জটিল রহস্যের ইশারা জানিয়ে যাওয়া চঞ্চল সুন্দর সুন্দর মেয়েরা, বাড়ির ছাদ থেকে দৃশ্যমান সৌধমালা ও পশ্চিম দিগন্তে জাহাজের মাস্তুল, প্রৌঢ় পিতার লোলচর্ম মুখ, মার কপালের উজ্জ্বল লাল সিঁদুরের টিপ—সব কিছু মিলেমিশে কোন কল্পনাপ্রবণ শিশুর আঁকা কলকাতার ছবির মত সুধন্যর চোখের সামনে যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল।

সুধন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। সেই অন্যমনস্কতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সুধন্য পুনরায় পত্ররচনায় মনোনিবেশ করল। চিঠিখানা তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার। শেষ করে সুধন্য চিঠিখানা তুলে দেবে ইউনিয়ন সেক্রেটারী বিকাশ মিত্রর হাতে, যে কিনা আজকের রাতের ট্রেনেই কলকাতা যাচ্ছে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইউনিয়নের দা বি দা ও য়া সম্পর্কিত আলোচনায় বসবার জন্য। হেড অফিসে বিকাশ মিত্র চিঠিখানা পৌঁছে দেবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের হাতে ও আশা করা যায় যে, সে কিছু ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারও করবে, যাতে করে এই সাত আট বছরের অবহেলিত প্রার্থনাটি এইবার যথেষ্ট অনুগ্রহ সহকারে পূরণ হয়।

পারবে। উপচীকির্ষু লোকেরা হতোদ্যম ও মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল।

সুধন্য একা একা স্টেশনের বেঞ্চিতে বসে রইল। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল এবং ঘাড়ে, গলায়, কপালে জল থাকায় সেই হাওয়াতে একটা শীতল শিহরন সর্বাঙ্গে খেলা করছিল। মাথার উপরে অনেক তারা, ডাইনে বাঁয়ে—দুদিকেই আপ ডাউন সিগন্যালের লাল আলো। সামনের অন্ধকারে ইস্পাতের একজোড়া লাইনে সামান্য আলোর আভাস। প্রাত্যহিকের চেনা পরিবেশের মধ্যে স্থির ভাবে বসে সারাদিনের বিশৃঙ্খল উত্তেজনার পর সুধন্য পরম শান্তি পেল। রোজই সন্ধ্যার পর সুধন্য স্টেশনে আসে ও একটা কাঠের বেঞ্চিতে বসে কলকাতা-গামী ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে। সেই ট্রেনের আরোহীদের মুখ চোখ দেখে তাদের মানসিক সুখ দুঃখ আন্দাজ করবার চেষ্টা করে। ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ একা একা স্টেশনে বসে থাকে ও তারপর কোয়ার্টারে ফিরে যায়। আজ সারাদিনের মানসিক চাপ ও পরিশেষে ছুটোছুটির পরিশ্রমের পর এই দৈনন্দিন অভ্যাসে ফিরে আসতে পেরে সুধন্য যেন মনে মনে ঘরে ফেরার শান্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করল।

এই সময় জনৈক ব্যক্তি সেই বেঞ্চিতেই অন্যমনস্ক সুধন্যর পাশে বসল। সুধন্য টের পেলেও লক্ষ করল না। একটু পরেই সেই ব্যক্তি কথা বলল,—"আরে। সুধন্যবাবু না। আপনি এখনও এখানে বসে আছেন। কোয়ার্টারে ফেরেন নি? আমিও ভাবলাম আপনার ঐ দুর্ঘটনার পর নিশ্চয়ই আপনার বন্ধুরা আপনাকে সঙ্গে করে কোয়ার্টারে পৌঁছে না দিয়ে ছাড়েন নি।"

সুধন্য তাকিয়ে স্থানীয় বৃদ্ধ পোস্ট-মাস্টারকে চিনতে পারল। অল্প হেসে বলল, "আজ্ঞে না। ভাবলাম কোয়ার্টারে ফিরে যাওয়ার চেয়ে এখানে এই ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে একটু বিশ্রাম নেয়াই ভাল। তাই—"

"বেশ করেছেন, বেশ করেছেন—" পোস্টমাস্টার বলল,—"ভালই হল। আপনার একটা চিঠি এসেছে। ভেবেছিলাম, আজ আর দেওয়া হল না। চলুন, যাওয়ার সময় নিয়ে যাবেন। সেই সঙ্গে এক কাপ গরম দুধ কি চা খেয়ে নেবেন। শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যাবে।"

—"না, না। আপনি ব্যস্ত হবেন না মাস্টারমশাই—" বিব্রতভাবে সুধন্য বলল,—"আমি একেবারে ফিট হয়ে গেছি।"

—"আরে মশাই, রাখুন ত আপনার ভদ্রতা—" পোস্টমাস্টার আপত্তি করল—"আজ আপনার প্রয়োজন বলেই বলছি। অন্যদিন বলি নাকি। অন্যদিন ত যান আর চিঠি নিয়ে চলে আসেন। ডেকে বসাইও না। নিন, উঠুন।"

স্টেশন বাড়ির লাগোয়াই পোস্ট আফিস। প্রথম প্রথম সুধন্য স্টেশনে বেড়াতে এলে চিঠিপত্রের খোঁজখবর নিত। তারপর ক্রমে ক্রমে সুধন্য আর পোস্টমাস্টারের মধ্যে একটা নিঃশব্দ বোঝাপড়া গড়ে উঠেছে। সুধন্যর চিঠি এলে পোস্টমাস্টার পিয়নের কাছে না দিয়ে রেখে দেয়, সন্ধ্যাবেলা সুধন্য হাতে হাতে নিয়ে নেয়। প্রথম প্রথম চিঠিপত্র আসত প্রচুর। বাবা মার চিঠি ত ছিলই, তা ছাড়া লিখত বন্ধুরা। এখন অধিকাংশ বন্ধুই বিবাহিত, সংসারী। খাম পোস্ট-কার্ডের দামে বোধহয় ছেলেমেয়েদের লজেন্স বিস্কুট কিনে দেয়। এখন চিঠি বলতে বাবা মার চিঠি মাসে দু' একখানা।

পোস্ট আফিসে ঢুকবার মুখে সুধন্য অভ্যাস মত আফিস ঘরের পাশে মাস্টার-মশাইর কোয়ার্টারের জানলায় তাকাল এবং নিয়ম মত জানলার একখানা ভেজানো কপাটের আড়াল থেকে উঁকি দেওয়া একটিমাত্র চোখ দেখতে পেল। এই চোখটি পোস্টমাস্টারের তরুণী ভার্যার। দীর্ঘকাল বিপত্নীক প্রৌঢ় পোস্টমাস্টার বছরখানেক আগে একবার ছুটিতে গিয়েছিলেন ও ফিরেছিলেন একটি সুদর্শনা যুবতী পত্নী নিয়ে। সুধন্য কোনোদিন সাক্ষাৎ দেখেনি, শুধু চিঠি নিতে এলে ঐ একটিমাত্র চোখ মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। প্রায়ই দেখে, কিন্তু আজ ঐ একটি মাত্র চোখে চোখ পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে যেন ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের সবুজ আলো দেখতে পেল সুধন্য।

পোস্টমাস্টার সুধন্যকে আফিস ঘরের ভিতর দিয়ে নিজের কোয়ার্টারে নিয়ে গেল, কিন্তু সুধন্যকে একটা বেতের চেয়ারে জমা রেখে অন্তঃপুরে চলে গেল।

চিঠি সম্বন্ধে সুধন্যর কোনো উৎসাহ ছিল না। কেন না, সে জানত বাবা বা মা ছাড়া তাকে চিঠি লেখার আর কেউ নেই। সুতরাং নিরাসক্তভাবেই সুধন্য পোস্ট-মাস্টারের হাত থেকে চিঠিখানা গ্রহণ করল ও চুপ করে বসে রইল। একটু পরেই দরজার ওপাশে হাতের চুড়ির ঠুনঠুন শুনতে পাওয়া গেল। পোস্টমাস্টার উঠে গেল ও একটু পরেই পিরিচে বসান একটি পেয়ালা সুধন্যর সামনে বেতের টেবিলে রাখল। পেয়ালায় উষ্ণ পানীয় ও পিরিচের ধারে শায়িত দুখানা ছিমছাম ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট। পোস্ট-মাস্টার বলল,—"নিন মশাই, খেয়ে নিন। দুধ নেই বাড়িতে। হরলিকস করে দিতে বললাম এক কাপ—"

সুধন্য নীরবে বিস্কুট ও হরলিকস খেল। আর খাওয়ার পরই বুঝতে পারল যে সে খুব—খুব ক্ষুধার্ত ছিল। হঠাৎ শরীরটা সুস্থ বোধ হতে লাগল। পোস্ট-মাস্টার বলল,—"কি মশাই, ভাল লাগছে না?"

সুধন্য স্বীকৃতিসূচক হাসি হাসল। পোস্টমাস্টার বলল,—"নিন, এবার সুস্থ শরীর আর মস্তিষ্ক নিয়ে চিঠি পড়ুন।"

সুধন্য বলল,—"ঠিক আছে। পরে পড়বোখন।"

—"সে কি মশাই।" পোস্টমাস্টার অবাক হল,—"আপনি চিঠি পাওয়া মাত্র না পড়ে থাকতে পারেন। আমি ত মশাই সারা জীবন এত চিঠি ঘাটলাম, তবু নিজের নাম লেখা চিঠি দেখলে স্থির থাকতে পারি না। বন্ধ চিঠি একটা রহস্য মশাই, আর রহস্য উদ্ঘাটন না করা পর্যন্ত—"

সুধন্য হাসল। বলল,—"এ চিঠিতে কোনো রহস্য নেই। বাড়ির চিঠি। কি লেখা আছে তা জানি। হয়, কিছু টাকা পাঠাও নয়ত, এবার বিয়ে কর—" বলেই থেমে গেল সুধন্য।

পোস্টমাস্টার কথাটা লুফে নিল কিন্তু,—"সে কি মশাই! আপনি এখনও অবিবাহিত!"

সুধন্য চুপ করে রইল। পোস্টমাস্টার আবার বলল,— "আপনাদের ইয়ংম্যানদের ব্যাপার বুঝি না মশাই। বিয়ে না করতে চান না কিছুতেই।—" একটু থেমে আবার বলল,— "এই জনাই ত আমাদের মত বুড়ো

হাসছালের আবার নতুন করে মাথার টোপর তুলতে হয়—" বলেই, যেন মস্ত রসিকতা করেছে এমনিভাবে হা হা করে হেসে উঠল।

সুধন্যা দায়সারা হাসি হাসল। একটু চুপ করে থেকে বলল,—"আচ্ছা মাস্টার-মশাই! আমি তা হলে উঠি এবার—"

সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠল পোস্ট-মাস্টার,—"উঠবেন? আচ্ছা, আচ্ছা। দাঁড়ান। বসুন, আমি একটা রিকশা ডেকে দিই আপনাকে।"

সুধন্যা বলল,—"আপনি অযথা ব্যস্ত হচ্ছেন মাস্টারমশাই। এটুকু রাস্তা আমি চলে যেতে পারব। না হয়, রাস্তা থেকে একটা রিকশা ধরে নেব এখন—"

—"কি দরকার মশাই রিকশা নেবার।" পোস্টমাস্টার বলল,—"শরীর খারাপ। শেষে একা একা রাস্তায়—" শেষ না করেই বেরিয়ে গেল পোস্টমাস্টার।

সুধন্যা ঘাড় গুঁজে বসেছিল। সেই অবস্থাতেই দেখল একজোড়া আলতা পরা সুগঠিত পা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। সুধন্যা ভিতরে ভিতরে ভীষণ চমকে উঠল।

সেই আলতা পরা দুই-পা এসে সুধন্যর পাশে থামল। একটুক্ষণের নীরবতা। সুধন্য খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। পরক্ষণেই শুনতে পেল,—"আপনাকে একটা কথা বলব।"

সুধন্য চুপ করে রইল। আবার শুনতে পেল,—"আমার নাম সুধা। আমাকে আপনি বাঁচান।"

সুধন্য চমকে পাশ ফিরে সুধার মুখের দিকে তাকাল। অপরিচিতের সামনে আসার স্বাভাবিক সংকোচ ও সহজাত লজ্জায় সুধা মাথার ঘোমটা একটু বেশী টেনে দিয়েছিল, যার দরুণ সুধার একটা চোখ সুধন্য দেখতে পাচ্ছিল না, এবং অপর চোখে সুধন্য সেই পরিচিত সবুজ আলো দেখতে পেল। আর সুধার কপাল জুড়ে বড় লাল সিঁদুরের টিপ জ্বলজ্বল করছিল।

সুধন্য তাকিয়ে ছিল। সুধাও চোখ নামায়নি। কয়েক পলক। তারপর, যেন সমস্ত সাহস জড়ো করে মরিয়া হয়ে সুধা বলে গেল,—"আমাকে বাঁচান আপনি। এখান থেকে নিয়ে চলুন। যেখানে হয়। আমি আপনার দাসী বাঁদী হয়ে থাকব। যা করতে বলবেন তাই করব—" আর এই সময় বাইরে সাইকেল রিকশার ঘণ্টা বাজল, আর সংগে সংগে সুধা থেমে গিয়ে দুশামান একটি চোখে অনেকখানি অনুনয় ফুটিয়ে তুলেই দ্রুত পায়ে অন্তঃপুরে চলে গেল। আর উত্তম মহলা শেষে অভিনীত নাটকের পাত্রের মত পোস্টমাস্টার এদিক দিয়ে প্রায় সংগে সংগে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল,—"আসুন সুধন্যবাবু। আপনার বাহন তৈরী।"

কোয়ার্টারে ফেরার পথে সমস্তক্ষণ, ফেরার পরেও, সেই সবুজ আলো ও লাল টিপ সুধন্যর সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করে রাখল। ঘরের কোণে ঢাকা রাখা ঠান্ডা হিম ভাত খেতে বা সংক্ষিপ্ত কৃপণ বিছানায় শুয়ে সুধন্য বার বারই কখনো সেই সবুজ আলো, কখনো উজ্জ্বল লাল সিঁদুরের টিপ, কখনো বা একসংগে দুই-ই যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, এবং সবুজ আলো দেখতে দেখতে স্টেশনের ট্রেন মনে পড়ছিল, লাল টিপ দেখতে দখতে মায়ের কথা মনে পড়ছিল আর দুই একসংগে দেখতে দেখতে একটা অব্যক্ত বিষাদে সমস্ত অস্তিত্ব আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল। তারপর যখন চোখ বুজল সুধন্য ও মুদিত নয়নের পত্রপটে প্রস্ফুটিত বিচিত্রবর্ণ সমারোহ স্থায়ী সবুজ ও লালে রূপান্তরিত হল, তখন সুধন্যর সেই বিষণ্ণতা বোধ অসহনীয় গভীর হল, ও ক্রমে সুধন্য সেই গভীরতার মধ্যে তলিয়ে গেল।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুধন্য একটা অর্থহীন স্বপ্ন দেখল। সুধন্য দেখল, সে ট্রেনের গার্ড হয়ে গেছে। তার পরনে সাদা প্যান্ট, সাদা কোট, মাথায় গাড়ি বারান্দাওলা কালো টুপি। সাদা কোটের সোনলী বোতামে দড়ি বাঁধা তীক্ষ্ম বাঁশী প্যান্টের পকেটে সযত্নে রক্ষিত। এই নিখুঁত পোশাকে সজ্জিত হয়ে সে একটা থেমে থাকা ট্রেনের সর্বশেষ কামরার জানলা দিয়ে প্রায় কোমর পর্যন্ত শরীর বার করে ঝুঁকে ইঞ্জিনের দিকের সিগন্যাল দেখার চেষ্টা করছে। একটা অচেনা অপ্রধান ছোট স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, যে স্টেশনের বাঁ দিকে খাড়াই পাহাড় ও ডান দিকে অকূল সমুদ্র। প্ল্যাটফর্মে একটাও লোক নেই, কেননা সকলেই ট্রেনে উঠেছে। যাত্রার জন্য প্রস্তুত। সামনের ইঞ্জিন অবিরল ধোঁয়া উদ্গীরণ করছে। যাত্রার জন্য উৎসুক। সুধন্যর প্যান্টের পকেটে তার হাতের মুঠোর মধ্যে বাঁশি, বাজাবার জন্য অধীর। অথচ সুধন্য—গার্ড—ট্রেনের সর্বাধিনায়ক দ্বিধাগ্রস্ত। কেননা সামনের সিগন্যালে সবুজ আলো ও লাল আলো একই সংগে দীপ্যমান। এবং সুধন্যর দ্বিধা-গ্রস্থতার জন্য ট্রেন ছাড়তে যতই দেরী হচ্ছে, ততই ট্রেনের বিভিন্ন কামরা থেকে একটা মিলিত অসন্তোষের চাপা গুঞ্জন ধ্বনি ক্রমে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। যদিও কেউই ট্রেনের কামরা থেকে প্ল্যাটফর্মে নেমে এসে বিক্ষোভ প্রকাশ করছে না; ভয়—পাছে ট্রেন ফেলে চলে যায়, তবুও, সুধন্য বুঝতে পারছে, কামরার কামরায় প্রতিটি যাত্রী এই অহেতুক বিলম্বে অসন্তুষ্ট, ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। ক্রমে সেই ক্ষোভের গুঞ্জন ধ্বনি কলরোলে পরিণত হল ও সামনের সুবিশাল সমুদ্রের প্রচন্ড কল্লোল গর্জনের সংগে মিশে একাকার হয়ে গেল। তখন সুধন্য দেখল, সামনের সমুদ্র তট অতিক্রম করেছে ও দিগন্ত থেকে দিগন্ত ছোঁয়া ঢেউ-এর ডানা মেলে সবেগে এগিয়ে আসছে। ক্লান্ত সুধন্য তখন বাঁশি বাজাতে চাইল, কিন্তু হায়, সিগন্যালের লাল আলো ও সবুজ আলো তখনও একসংগে

উজ্জ্বল প্রদীপ্ত। ভীত বিপন্ন, বিমূঢ় সুধন্যার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল ও ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভাঙার পর সুধন্য অনেকক্ষণ জড়ের মত নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইল। স্বপ্ন ও স্বপ্ন-ভঙ্গের মধ্যে অনেকক্ষণ ভাসমান থাকার পর সুধন্য আস্তে আস্তে বোধে ফিরে এল ও অনুভব করল যে সে তৃষ্ণার্ত। সুধন্য বিছানা থেকে উঠে অন্ধকারে আন্দাজে ঘরের কোণে গেল ও জলের কুঁজোটা তুলে মুখের উপর উপুড় করে ধরল। জল অল্প কিছু মুখে পড়ল ও অনেকখানি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পরনের সার্টপ্যান্ট ভিজিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি সুধন্য জলের কুঁজো স্বস্থানে রেখে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল ও তখন আবিষ্কার করল যে সে শার্টপ্যান্টপরিহিত অবস্থাতেই বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সুধন্য তাড়াতাড়ি ভিজে জামাটা খুলে ফেলল আর হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রাখতে গিয়ে বুকপকেট থেকে খানিকটা বেরিয়ে থাকা এনভেলপ-খানার দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আত্মধিক্কারে জর্জরিত হল সুধন্য। বাড়ির চিঠি সে এতক্ষণ না পড়ে রেখে দিয়েছে, পড়তে ভুলে গেছে—এ কথা ভেবে সুধন্যার নিজের উপরে খুব রাগ হল। সুধন্য তাড়াতাড়ি এনভেলপের মুখ ছিঁড়ে চিঠি-খানা বার করল ও চোখ খুলে খুব দ্রুত একবার পড়ে গেল। সদ্য ঘুম ভাঙা মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয়তা মানসিক বিক্ষিপ্ততা ও চিঠির বিষয়বস্তুর অস্বাভাবিকতা—সব কিছুর দরুণ প্রথম দফা পাঠে কিছুই বোধগম্য হল না সুধন্যর। তখন সুধন্য বসে বসে দ্বিতীয়বার পড়তে শুরু করল: স্নেহের বাপুধন, আশা করি পরম মঙ্গলময়ের কৃপায় ভালই আছ। দুঃখের সঙ্গে জানাই যে, গত কয়েকদিন হইল তোমার পিতাঠাকুরমহাশয় চক্ষে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। বড় ডাক্তারও জবাব দিয়া গিয়াছে। ইহার পরে জানাই যে, আমার শরীরও একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। দাঁড়াইলে পা কাঁপে ও মাথা ঘোরে। এখানে এখন আমরা একে-বারে পরের দয়ার উপরে বাঁচিয়া আছি। তোমার ত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার আর কোনো সম্ভাবনা দেখি না। অতএব তোমার পিতাঠাকুর স্থির করিয়াছেন, আমরা দুইজন তোমার নিকট চলিয়া যাইব। নাতির মুখ দেখিবার আশা তুমি ত মিটাইলে না, শেষ সময়ে অন্তত তোমার হাতের জল-টুকু পাইব। এই সান্ত্বনা। আমরা আগামী শনিবার রাত্রের গাড়িতে রওয়ানা হইয়া সকালে তোমার ওখানে পহুঁছিব।

ভাড়াটিয়াদের ছেলে সুধীর আমাদের গাড়িতে তুলিয়া দিবে। তোমার যেন স্টেশনে থাকিতে ভুল না হয়। আর কি। এখানকার খবর ভাল না। কলিকাতায় সদ সর্বদা হাঙ্গামা লাগিয়াই আছে। তুমি সর্বদা সাবধানে থাকিবা ও শরীরের উপর যত্ন লইবা। ইতি —আশীর্বাদিকা তোমার মা।

চিঠিখানা শেষ করে সুধনা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। অনেকক্ষণ কোনো কিছু ভাবতেই পারল না ক্লান্ত অবসন্ন সুধনা। তারপর অনেকক্ষণ পরে প্রথম যে কথাটা মনে এল, তা হল: হায়, চিঠির সন্ধানে আর পোস্ট অফিসে যেতে হবে না।

সুধনার বাবা মা ও ইউনিয়ন সেক্রেটারী বিকাশ মিত্র একই ট্রেনে এল। সুধনা কিন্তু প্রথমে বিকাশ মিত্রকে লক্ষ করেনি। কেননা সে তখন ট্রেনের জানলায় জানলায় উঁকি দিয়ে কামরায় কামরায় বাবা মাকে খুঁজতে ব্যস্ত ছিল। অবশেষে যে কামরায় খুঁজে পেল সে কামরায় সুধনা আগেও বার তিনেক উঁকি মেরে গেছে। প্রথমে খুঁজে পায়নি কারণ সুধনার মনে বাবা ও মার যে ছবি ছিল, সুধনা কামরায় কামরায় সেই ছবিই খুঁজে বেড়াচ্ছিল কিন্তু আসলে সে ছবির আর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। শুধু মার কপালে বড় সিঁদুরের টিপটা অম্লান ছিল এবং সেই টিপটাই মাকে চিনিয়ে দিয়েছিল। জীর্ণ লোলচর্ম মা ও অন্ধ শীর্ণ বাবাকে দেখে হঠাৎ সুধনার বুকটা মুচড়ে উঠল। সুধনা খুব দ্রুত কামরার মধ্যে উঠে মা ও বাবার কাছে চলে গেল ও ডাকল,—"মাগো!"

ডাক শুনে মা তাকালেন। দু এক পলকের দ্বিধা, তারপরেই [illegible] হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন—"ধন!" তারপর স্বামীর উদ্দেশে বললেন: "ওগো! ধন এসেছে!"

বাবার ভাবলেশ শূন্য দৃষ্টিহীন দুটি চোখ সুধনার দিকে ঘুরল ও একটুক্ষণ স্থির হয়ে রইল! তারপর তিনি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন ও ডান হাতখানা সামনের দিকে প্রসারিত করে দিলেন। সুধনা তাড়াতাড়ি হাতখানা ধরল। বাবা ডাকলেন,—"ধন!" ডাকের মধ্যে অনেকখানি ব্যগ্রতা ছিল। মনে হল বাবা যেন খুব জরুরী কিছু বলতে চান। সুধনা বলল,—"বলুন বাবা।" বাবার হাতের আঙুলগুলো সুধনার মুখের উপরে গালে, চিবুকে, নাকের পাশে, চোখের কোলে, কপালে অনেকক্ষণ খেলা করল, তারপর খুব আস্তে আস্তে বাবা বললেন নিশ্চিন্ত কণ্ঠে—"নারে, কিছু নয়রে, কিছু নয়।"

পরে সুধনা লক্ষ করেছিল বাবার এটা একটা মুদ্রাদোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যখনি তিনি সুধনার সাড়া পেয়েছেন, হয়ত কাজে যাবে বলে বেরুচ্ছে সুধনা অথবা ফিরছে কাজ থেকে, বারান্দায় ইজিচেয়ারে অর্ধ-শায়িত বাবা ডেকেছেন,—"ধন!—" তাঁর কণ্ঠস্বরে সব সময়ই থেকেছে একটা আকুল আগ্রহ, ব্যাকুলতা যেন খুব জরুরী কিছু সংবাদ দিতে চান, যা এখনি না জানালে খুব দেরী হয়ে যাবে, আর দেরী হয়ে গেলে খুব ক্ষতি হয়ে যাবে, আর যদিও সুধনা জেনে গিয়েছিল বাবা কিছুই বলবেন না, শুধু সাড়া পেয়েছেন বলেই ডাকছেন, তবুও সুধনার প্রতিবারই তাৎক্ষণিক প্রমাদ ঘটেছে, মনে হয়েছে নিশ্চয়ই কিছু বলবেন বাবা, সুতরাং সুধনা প্রতিবারই কণ্ঠস্বরে সমান আগ্রহ, কৌতূহল, জিজ্ঞাসা নিয়ে

বলেছে,—"বলুন বাবা।" আর বাবা তখন দৃষ্টিহীন চোখ দুটো সুধন্যার দিকে নিবন্ত সার্চলাইটের মত ঘুরিয়ে স্থাপন করে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকো. ইতস্তত করে, ভাঙাচোরা স্বরে বললেন—"নারে, কিছু নয়রে, কিছু নয়।"

কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে জরাগ্রস্ত বাবা মাকে সামলে স্টেশন দরজা দিয়ে সুধন্য যখন বেরুচ্ছে তখন ইউনিয়ন সেক্রেটারী বিকাশ মিত্র সঙ্গে দেখা হল। ওরই মধ্যে সুধন্য প্রত্যাশিত দৃষ্টিতে বিকাশ মিত্র দিকে তাকাল। উত্তরে বিকাশ মিত্র পরে ইউনিয়ন অফিসে দেখা করতে বলল।

সারাটা দিন সুধন্যার সময় হল না। এক-জনের কোয়ার্টারকে তিনজনের বাসোপযোগী করে তুলতেই সুধন্য ব্যস্ত রইল সারাদিন। দুখানা ছোট তক্তপোশ কিনে ঘরের মধ্যে বাবা ও মাকে প্রতিষ্ঠিত করে নিজে চলে এল বাইরের বারান্দার এক ধারে। ঝি কৌশল্যাকে সামান্য মাইনে বৃদ্ধির বিনিময়ে একজনের পরিবর্তে তিন-জনের রান্না ও বাসনমাজার কাজে রাজী করাতে হল। সমস্ত কাজকর্ম চুকিয়ে সন্ধ্যার আগে আর সময় হল না সুধন্যার ইউনিয়ন অফিসে যাবার।

সুধন্য দেখল ইউনিয়ন অফিসে যেন সাধারণ সভার ব্যাপার। বিকাশ মিত্রকে কেন্দ্র করে ইউনিয়নের সব চাঁই চাঁই লোকেরা গভীর আলোচনা ও বাদানুবাদে ব্যস্ত। সুধন্য একধারে বসে পড়ল। বিকাশ মিত্র বলছিল—"এখন আমাদের সামনে একটাই পথ খোলা আছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ। হেড অফিসের কর্তারা আমাদের কোনো কথাই শুনতে নারাজ। তাদের মতে আমাদের দাবি দাওয়ার সুবিধা অসুবিধা সমস্তই স্থানীয় ব্যাপার এবং স্থানীয় কর্তারাই যা ভাল বুঝবেন করবেন। হেড অফিসের কোনো দায়-দায়িত্বই নেই এ ব্যাপারে। এখন আপনারাই স্থির করুন কি করণীয়।"

একজন বলল,—"স্ট্রাইক।"

আর একজন বলল,—"কিন্তু...কিন্তু তার আগে আর একবার এখানকার কর্তাদের কাছে আমাদের দাবির খসড়াটা—"

একযোগে প্রতিবাদ করে উঠল সবাই, "না, না। মিথ্যে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। নরম আমরা অনেক হয়েছি। এবার শক্ত হতে হবে। এভাবে বাঁচা যায় না—"

একটু চুপ করে থেকে বিকাশ মিত্র বলল—"তাহলে স্ট্রাইকের নোটিশ দেওয়াই স্থির।"

সকলেই একসঙ্গে সায় দিল। যদি বা কারো আপত্তি ছিল, সম্মিলিত মতের স্রোতে তা ভেসে গেল। ঠিক হল বিকাশ মিত্রই দিন স্থির করে নোটিশের মুসাবিদা করবে ও সবাইকে দেখিয়ে সেই নোটিশ কোম্পানির কর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। আরো কিছু বিবিধ কথাবার্তার পর সভা শেষ হল।

তখন সুধন্য বিকাশ মিত্রের সঙ্গে দেখা করল। সুধন্যাকে দেখে বিকাশ মিত্র হাসল ও বলল,—"আপনি বুঝতে পারছেন না কেন সুধন্যবাবু যে এ অবস্থায় এখানকার কোনো স্টাফই হেড অফিসে বদলি পাবে না। হেড অফিসের চোখে এখানকার প্রতিটি স্টাফই এক একটি জ্যান্ত বোমা।

দাবি আর বায়না নিয়ে ওখানে গিয়ে ওখানকার সুস্থ আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলবে। কোম্পানী কি সে রিস্ক্ নিতে চায়?"

আশাহত সুধন্য রাস্তায় পা দিল। কেন যেন মনে হয়েছিল সুধন্যর এবারে একটা কিছু হবে। খুব আশা করেছিল। অথচ সে আশা একেবারেই নির্মূল হয়ে গেল। এখন আর কিছুই করার নেই। কিছুই না। আজীবন এই মফস্বল শহরের ছোট্ট খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে থাকা। কলকাতা, সুন্দর কলকাতা, আকাশের মত বিশাল উদার সুন্দর কলকাতা ক্রমশ স্মৃতি থেকে চলে যাবে স্বপ্নে, তারপর স্বপ্ন থেকে বিস্মৃতিতে। কিছুই থাকবে না জীবনে। শুধু ফ্যাক্টরি আর কোয়ার্টার। আর স্টেশনে এসে কলকাতার ট্রেনের আসা যাওয়া দেখা। কোনোদিন সে ঐ ট্রেনের যাত্রী হয়ে চলে যেতে পারবে না চিরতরে। ছোট শহরের রাত্রির নির্জন রাস্তা দিয়ে একা একা হাঁটতে হাঁটতে বুক ফেটে কান্না এল সুধন্যর।

আর এখন সুধন্যর মনে হল সে চাকরি ছেড়ে দেবে। কলকাতায় অন্য যে কোনো একটা চাকরি যোগাড় করে সে ছেড়ে দেবে এ চাকরি। তার এত বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে যাই-হোক ধরনের একটা যে কোনো কাজ কি পাওয়া যাবে না কলকাতায়? রোজ খবরের কাগজের কর্মখালি পাতায় ত কত রকমের চাকরির বিজ্ঞাপন থাকে। কত বছরের খবরের কাগজ ডাঁই হয়ে আছে তার কোয়ার্টারের তিন চারটে তাকে। কৌশল্যা পুড়িয়ে পুড়িয়েও শেষ করতে পারে না, জমে যায়।—অথচ একথাটা এত-দিনে মনে পড়ল ভেবে আশ্চর্য হল সুধন্য। দ্রুত পা চালাল। আজ থেকেই সে দরখাস্ত লিখতে শুরু করবে। পাঠাবে। আবার পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজ নেবে কোনো চিঠি এল কি না তার নামে। জানলায় দেখতে পাবে চোখে যার জ্বলছে সবুজ আলো আর কোনো এক সুযোগে ঘরের মধ্যে দেখবে সেই উজ্জ্বল লাল সিঁদুরের টিপ, শুনতে পাবে সকরুণ অনুনয়: আপনি আমাকে বাঁচান—। সুধন্য যেন উড়ে চলল নিজের কোয়ার্টারের দিকে।
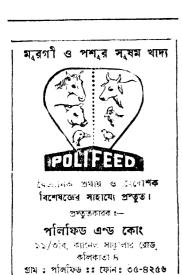
সেদিন সকাল থেকেই মা ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছিল,—"না বাপুধন, তোমাদের এখানে বড় হাড়কাঁপানো শীত—"

শুনে সুধন্য হাসল—"শীত কোথায় মা। মেঘলা হয়ে শীত ত প্রায় নেই।"

সত্যিই অন্য দিনের তুলনায় শীত আজ কম ছিল। কেন না কাল রাত থেকে আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, বৃষ্টিও নেই, হাওয়াও না। ফলে পৃথিবী যেন কম্বল মুড়ি দিয়ে শীতের বিরুদ্ধে সেজেছিল। সুধন্যর ত কিছুটা গুমোটই লাগছিল।

মা বললেন, "কি জানি বাপু! আমি ত হাত পা বার করতে পারছি না।" বলতে বলতে মা লেপের মধ্যে ঢুকে গেলেন। সুধন্য হেসে কাজে বেরিয়ে পড়ল। সবে ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে। মা এখনি এইরকম করছেন। এখনও ত সামনে সমস্ত শীতকাল।

দুপুরে বেলা কোয়ার্টারে খেতে এসে সুধন্য দেখল মা তখনও লেপের তলায়। বলল, "কি মা, শীত কমেনি?"

মা লেপের তলা থেকে মাথা বার করলেন। কপালের লাল সিঁদুরের টিপ। ম্লান হাসি হাসলেন। বললেন —"কোনোরকমে উঠে ওঁকে খাইয়ে আবার শুয়েছি। আমায় ঝাঁকছে—"

সুধন্যর কি রকম সন্দেহ হল, "তোমার জ্বর হয়নি ত মা?" মার কপালে হাত রেখে দেখল গা ঠাণ্ডা হিম। সুধন্য চিন্তিত মুখে হাত পা ধুতে গেল।

হাত মুখ ধুয়ে এসে দেখল মা উঠে ওর খাবার গুছোচ্ছেন। সুধন্য বলল, "তুমি আবার উঠতে গেলে কেন?"

মা বললেন, "নারে, যে কদিন আছি তোদের নিজের হাতে খাইয়ে যাই—"

সুধন্য খাচ্ছিল। মা চুপ করে বসে কিছুক্ষণ সুধন্যর খাওয়া দেখলেন, তারপর ডাকলেন,—"ধন!"

খেতে খেতে সুধন্য বলল, "কি মা!"

মা বললেন, "তুই ত বিয়ে থা করিল না ধন। বউ নাতির মুখ দেখালি না—" মা শীতে ঠকঠক করে কেঁপে উঠলেন।

সুধন্য মুখের মধ্যের গ্রাস গিলে বলল, "দেখ না মা, এইবার কলকাতার দিকে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই। তারপর—"

বলতে বলতে মাকে দেখল সুধন্য। মা ভাঁজ করা হাঁটুর উপর চিবুক রেখে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। মাথার সব চুল সাদ এলোমেলো। সমস্ত মুখে অজস্র রেখা, কপালে লাল সিঁদুরের টিপ সিঁথির কাছে সিঁদুর পরে পরে ক্ষয়ে গেছে। মার একচোখে হাসি, একচোখে বেদনা। অল্প অল্প কাঁপছেন শীতে। সুধন্য বলল— "এবার তুমি শুয়ে পড় মা।"

সুধন্য খেয়ে উঠে খবরের কাগজটা নিয়ে বসল। সকালের ট্রেনে খবরের কাগজ আসে। বিলি করতে করতে বেলা হয়ে যায়। এই সময় ছাড়া সুধন্য কাগজ দেখার সময় পায় না।

কর্মখালির পাতাটা বিস্তারিত দেখতে দেখতেই সময় হয়ে গেল। আর দেরি করা যায় না। স্ট্রাইকের দিন যতই এগিয়ে আসছে অফিসের কড়াকড়ি ততই বাড়ছে। সামান্য ছুতোনাতাতেই চার্জশিট হয়ে যাচ্ছে।

সুধন্য যখন বেরোচ্ছে তখন মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাবা আড়মোড়া ভেঙে উঠলেন দিবানিদ্রা থেকে। সুধন্যর সাড়া পেয়ে ডাকলেন,—"ধন!"

সুধন্য উত্তর করল,—"কি বাবা!"

একটু চুপ করে রইলেন বাবা, তারপর আস্তে আস্তে বললেন,—"না রে, কিছু নয় রে, কিছু নয়।"

অফিস ছুটির আগে আগে ইউনিয়ন কর্মীরা টেবিল থেকে টেবিলে বার্তা পৌঁছে দিতে লাগল: আজ ছুটির পর গেট মিটিংয়ে জমায়েত হবেন। ইউনিয়নের ভাবী কর্ম-পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা হবে। সুধন্য একটু মুশকিলে পড়ল। মার শরীর খারাপ, তা ছাড়া গত তিন-চার দিনের অনেকগুলো কর্মখালি বিজ্ঞাপনের উত্তরে দরখাস্ত লিখবে বলে আজ ঠিক করেছে। অগত্যা সুধন্য ছুটির পর কৌশলে সকলের অগোচরে কোয়ার্টারে ফিরে এল।

মা লেপের তলায় শুয়ে। সুধন্য লেপ তুলে মার কপালে হাত রাখল। কনকনে ঠাণ্ডা। সুধন্যর হাতের উষ্ণ স্পর্শে মা চোখ খুললেন। চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক। ঘোলাটে। সুধন্য ডাকল,—"মা। মাগো। কেমন আছ?"

মার ঠোঁট হাসির প্রয়াসে বিস্তৃত হল। একপাশে মাথা হেলালেন মা। ভাল। আবার চোখ বুজলেন। ও পাশের তক্তপোশ থেকে বাবা ডাকলেন,—"ধন!—"

—"বলুন বাবা।"

একটু নীরবতা। বাবা বললেন— "না রে। কিছু নয় রে। কিছু নয়—"

সুধন্য রাস্তার দোকান থেকে এক কাপ চা ও দুখানা বিস্কুট খেয়ে এল। জামা প্যান্ট পালটে আলো জ্বেলে বারান্দায়

নিজের তক্তপোশে এসে বসল সুধন্য। সংগে তিন চার দিনের খবরের কাগজ। পেন আর ভাল সাদা কাগজ। খবরের কাগজে চিহ্ন করা একটা বিজ্ঞাপনের উত্তরে দরখাস্ত লিখতে শুরু করল সুধন্য: বিজ্ঞাপনদাতা সমীপেষু,—তারিখের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী—। ফ্যাক্টরীর দিক থেকে গেট্ মিটিং-এ জমায়েত জনতার স্লোগান ভেসে এল।

একান্ত নিবিষ্ট মনে দরখাস্তের মুসাবিদা করছিল সুধন্য। ফলে, জানে না কতক্ষণ পরে, ঘরের মধ্য থেকে আর্ত চীৎকারটা শ্রবণে এল—"ধ—ন!" চীৎকারটা মার, সংগে সংগেই বুঝল সুধন্য, কিন্তু তবু সে চীৎকারে এমন একটা অপ্রাকৃততা, অপার্থিবতা ছিল, যেন সহসা কারো পিছন দিক থেকে কেউ একটা ছোরা আমূল বিদ্ধ করে দিয়েছে, যেন রাত্রের নিঃসঙ্গ পথিক সহসা ছেলেবেলার উপকথা উক্ত প্রেত বা পিশাচের সম্মুখীন হয়েছে, শুনে সুধন্য হিম হয়ে গেল, অনড় হয়ে বসে রইল কয়েক পলক, তারপর দ্রুত উঠে এক লাফে ঘরের মধ্যে চলে গেল। দেখল মার শরীর থেকে লেপ খসে গিয়েছে, তক্তপোশের কিনার থেকে মায়ের ঊর্ধাঙ্গ অনেকখানি ঝুঁকে এসেছে বাইরে, একখানি হাত প্রসারিত হয়ে আঙ্গুলগুলো মেঝে স্পর্শ করেছে। দেখেই বুঝল সুধন্য মা মারা গেছেন। সুধন্য দ্রুত মার তক্তপোশের কাছে চলে গেল। বসল। তারপর মার শরীরটা নিজের কোলের মধ্যে তুলে নিল। সেই সময় ওপাশের তক্তপোশ থেকে বাবা ডাকতে শুরু করলেন—"ধন। ও ধন। ধন—"

আর সেই সময় ঝড় উঠল। বিগত চব্বিশ ঘণ্টার জমাট আবহাওয়া ঝড় হয়ে ফেটে পড়ল সহসা। খোলা দরজা দিয়ে ঝড়ের হাওয়া ঘরের মধ্যে ঝলকে ঝলকে ঢুকে পড়তে লাগল। তারের প্রান্তে ঝোলান বাল্‌বটা পেন্ডুলামের গোলকের মত এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক দুলতে শুরু করল বৃহত্তম বৃত্তচাপ রচনা করে, ঘরের দেয়ালে দুলতে লাগল বাবার ছায়া, মৃত মা কোলে সুধন্যর ছায়া। ছোট বড়, আবার ছোট—। দেওয়ালে ক্যালেন্ডার ডানা ঝাপটাতে লাগল পিঞ্জর রুদ্ধ পাখির মত, আর দেওয়ালের তাকে জমান বহু বছরের খবরের কাগজ তাক থেকে খসে ঘরময় ছড়িয়ে গেল।

মাকে কোলে নিয়ে বসে বসে সুধন্য ঘরের মধ্যে ঝড় দেখতে লাগল। শুনল বাবা ডেকে চলেছেন,—'ধন, ও ধন, ধন—" ঝড়ের হাওয়ায় ভেসে আসছে গেট মিটিংএ জমায়েত জনতার সম্মিলিত স্লোগান, ঘরময় ছুটোছুটি করছে এলোমেলো খবরের কাগজ, কাগজের হেড্ লাইনগুলো চোখে পড়েই সরে সরে যাচ্ছে দ্রুত। ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম—। বাবা ডাকছেন: ধন ও ধন—। দেওয়াল থেকে ক্যালেন্ডারের পাতাগুলো ছিঁড়ে ছড়িয়ে গেল: এপ্রিল মে জুন—। স্লোগান কানে আসছে: আমাদের দাবি বাঁচার দাবি। আমরা সবাই বাঁচতে চাই—। বাবা ডাকছেন ধন ও ধন—। ছায়া দুলছে: ছোট বড়, ছোট বড়, ছোট—। সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর—। ইন্দোনেশিয়া, তাসখন্দ, নাসের, নেহরু, কঙ্গো, ঘানা—। ডিসেম্বর জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী। ক্রুশ্চেভ, লুমুম্বা, পুলিসের লাঠি, কাঁদানে গ্যাস, গুলি, বিক্ষোভ বিক্ষোভ বিক্ষোভ—। মার্চ, এপ্রিল, মে—। চন্দ্রে রকেট প্রেরণ, মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা—। এই যে লড়াই বাঁচার লড়াই, এই লড়াই জিততে হবে—। দক্ষিণ আফ্রিকা বার্লিন চীন তিব্বত ভিয়েৎনাম ভিয়েৎনাম ভিয়েৎনাম—। কোথায় যেন কোন ব্যর্থ অভ্যুত্থানের বিফল নায়ক ফাঁসির মঞ্চে উঠে গেল গান গাইতে গাইতে: আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে, ডাক দিয়ে যায় নতুন পাতার দ্বারে দ্বারে—

"দার্শনিকের মেরুদণ্ডের মত শহরের দেহের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে বাকল্যাণ্ড রোড — পূর্বাচলের পথ থেকে অস্তাচলের পথে। ময়না মাঝির তীরের কলা আর বাকল্যান্ড সাহেবের হৃৎপিণ্ডের রক্তধারায় সূচিত ইতিহাসে বহু অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে; কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠার ওপরও ঘুম নেমে আসে, ইতিহাসের স্মৃতি ম্লান হয়ে যায়। বিস্মৃতির আবরণ ঢেকে দেয় তাকে — পরিপূর্ণ ঈর্ষায় লিখিত অজস্র রুধিরাক্ত পৃষ্ঠাকে।.................

জীবনপথের সঙ্গে ইতিহাসের পথের এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক এই জায়গায়, অপূর্ব সামঞ্জস্য! অনেক রক্ত, অনেক অবিশ্বাস আর অনেক দৈন্যের পথসঞ্চয় নিয়ে দুই পথিক পথ চলে; ক্রমে সঞ্চয়ের ভারে থলি উপচে আসে, জীবনপথিক অবসন্ন বোধ করে। অগত্যা তাকে অকুণ্ঠ নির্বিচার স্মৃতি সঞ্চয়ের মোহ ত্যাগ করে বর্জনের মন্ত্র গ্রহণ করতে হয়। বিস্মৃতির ছাঁকনিতে ছেঁকে নিতে হয়।

যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেইটুকুই সত্য। সেইটুকুই খাঁটি সোনা।"

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য লিখিত "ইষ্ট বাকল্যাণ্ড রোড" সেই খাঁটি সোনা।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আশ্চর্য গ্রন্থ

ইষ্ট বাকল্যাণ্ড রোড ৮৲

সখী সমাচার সখী সমাচার সখী সমাচার

সাহিত্য পাঠকদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাচার

বিমল মিত্রের

নূতন উপন্যাস

সখী সমাচার

— ছয় টাকা —

সখী সমাচার সখী সমাচার সখী সমাচার

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

নবতম উপন্যাস

মৃগমদ

মৃগমদ-সুরভির মতোই সাহিত্য সৌরভ বিকীর্ণ করবে

॥ মূল্য সাড়ে আট টাকা ॥

মৃগমদ

বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

সুবৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস

নগরপারে রূপনগর

বাংলা উপন্যাস জগতে এক নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করল। ডিমাই সাইজে ছোট টাইপে ৮৭২ পৃষ্ঠার বই—কিন্তু এক নিঃশ্বাসে শেষ না করে পাঠক থামতে পারবেন না।

॥ আঠারো টাকা ॥

নগরপারে রূপনগর

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তি

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২ ফোন : ৩৪-৩৪৯২ || ৩৪-৮৭৯১

কলকাতার ডায়েরি

ব্রানডো যেতে মা যেতেই কাশফি। কাশফির বরাতই এই, ব্রানডোকে ছেড়েও তিনি ছাড়তে পারছেন না। বিবাহবিচ্ছেদ হল, তবু ছেলের জন্যে ঘুরতে হল তাঁর পেছন পেছন! আর এই যে কলকাতা আসা, হোক না ভিন্ন কারণ, তবুও সেই মারলোন ব্রানডোর পরে পরেই।

আনা কাশফির কথা বলছি। ওঁর সঙ্গে সেদিন দেখা গ্র্যান্ড হোটেলের বাগান-রেসতোরাঁয়। ফরসা দীঘল গড়ন, পরনে খয়েরী কাজ করা সাদা শাড়ি, হাফ হাতা সাদা ব্লাউজ। আঁটো চুল চূড়ায় বাঁধা, গলায় খয়েরী পাথরের হার।

এই সেই আনা কাশফি, হলিউডের হীরো মারলোন ব্রানডোর একদা-প্রণয়িনী, সেবী ক্রিশচিয়ান ব্রানডোর মা, যাঁর বিয়ে আর বিয়ের মামলা নিয়ে সারা দুনিয়ায় হইচই। এই সেই আনা কাশফি, দু বছর আগে যাঁকে অন্য বেশে অন্য রূপে দেখেছিলাম সানটা মনিকার আদালতে, দেখেছিলাম পূর্ব-প্রণয়ীর সঙ্গে লড়াই করতে নামা পুত্রলোভাতুর এক জননীকে।

আর এখানে? এখানে কলকাতার বসন্ত-সন্ধ্যায় ওই বাগান-রেসতোরাঁর চামেলি-বরন মৃদু আলোর তলায় মৃদুহাসিনী মৃদু-ভাষিণী আনা কাশফি অন্য জগতের মানুষ, যৌবনের উপান্তে জামা খাঁটি ভারতীয় রমণী। বেসামাল শাড়ির আঁচল কাঁধের কাছে বশে রাখতে ব্যতিব্যস্ত কাশফি যখন অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলছিলেন, মনে হচ্ছিল না, অচেনা কোন বিদেশিনীর সঙ্গে কথা বলছি।

কাশফির টেবিলে আছি আমরা আরও চারজন, আছেন অরুণ চৌধুরী। কাশফি যে কাজে এখন কলকাতায় তারই তদারকি করতে সঙ্গে এসেছেন লস এনজেলেস থেকে। টেলিভিশনে তোলা হচ্ছে কলকাতা, পুরী, মাদুরা, জয়পুর, এলাহাবাদ, বোমবাই, দিল্লির ছবি, কাশফি তার কমেনটেটার। প্রযোজক জর্জ এলস্টাইন।

সঙ্গী একজন বললেন, "শাড়িতে আপনাকে বেশ মানিয়েছে।"

"ও ইয়েস," কাশফির জবাব, "আই লাভ সা—রী।"

"আপনি তা হলে পার্টলি ইনডিয়ান।"

"হোআই পার্টলি, আই অ্যাম সেন্ট পারসেন্ট ইনডিয়ান।"

তাই তো, ভুল হয়ে গেল, কাশফি তো বরাবরই নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিয়ে এসেছেন। নিজের ছেলের নামও রেখেছেন 'দেবী'।

"কোন ভারতীয় ভাষা জানেন?"

"উঁহুঁ, শুধু ইংরেজী।"

"ও-ই হলো", আমি বলি, "সংবিধানমতে ইংরেজীও অন্যতম ভারতীয় ভাষা।"

কাশফি লেমন সিরাপের গ্লাসে আলতো চুমুক দিতে দিতে হাসেন।

রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী

দেশের সমস্ত বুদ্ধিশক্তি ও কর্মশক্তিকে সংহত আকারে কেমন করে দেশে নিয়োগ করা যেতে পারে, 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে ১৩১১ সনে রবীন্দ্রনাথ তার আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলেন। অন্য [illegible]টি গণতান্ত্রিক দেশে যে অনেকাংশে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র স্থাপন করতে পারা [illegible]—দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার [illegible] হাতে সমর্পণ করা হল সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু [illegible] আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি—[illegible] নয়, সমাজের মধ্যে। দেশ সম্পূর্ণ [illegible] অপেক্ষা করে আছে [illegible] শক্তিতে। সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। [illegible] সবল করবার স্বাধীনতাই [illegible]। আগে যেমন সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আত্মসর্বরূপে, [illegible]রূপে ভাগ করা ছিল, রবীন্দ্রনাথ [illegible], "স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব—তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম। এইবার সময় আসিয়াছে, যখন আমাদের সমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে।"

ভারতের সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীরা যুরোপীয় মতবাদের প্রভাবে [illegible] কারখানাশিল্পের সামান্য কর্মীদের সমস্যা নিয়ে চিন্তিত থাকে। কিন্তু ভারতের মতো কৃষিপ্রধান দেশে কেবল কলকারখানার শ্রমিকদের কথা ভাবলেই চলবে না; গ্রামদেশের সম্ভাব্য উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। পল্লীর উন্নতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। একদিন ভারতের সমাজটাই ছিল প্রধানত পল্লীসমাজ। গ্রামে একদিন অনেক মানুষ মিলেছিল; সকলে মিলে সংগ্রহ, সঞ্চয় ও ভোগ করবার জন্যে। এইরকম ঘনিষ্ঠ পল্লীসমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে সমাজগত সম্পত্তির সামঞ্জস্য ছিল। ধন তখন অসামাজিক ছিল না, তখন প্রত্যেকের ধনে সমস্ত সমাজ ধনী হয়ে উঠতো, লোকমতের প্রভাব ছিল এমন যে, ধনী আপনার ধন সম্পূর্ণ আপন ভোগে, লাগাতে অগৌরব বোধ করতো।

ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার

দেশের ভূমি-ব্যবস্থা বিশেষ করে জমির [illegible], সন্তোষজনক না হলে জমির উৎপাদন-শক্তির বৃদ্ধিসাধন তথা আর্থিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের দেশে জমিদারদের অধীন চাষীরা জমির উৎপাদন বাড়াবার জন্য কোনো উৎসাহ বোধ করেনি। জমির উন্নতি করবার সংগতিও তাদের ছিল না। এ বিষয়ে দুটো কথা রবীন্দ্রনাথের মনে সব সময় [illegible]—জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর; দ্বিতীয়ত, সমবায় নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। ১৯৩০ সালে রাশিয়া ভ্রমণের সময় তিনি সে দেশে কৃষিকর্মে একীকরণের কীরকম বিস্তার হয়েছে, তা দেখেছিলেন। স্পষ্টত, আমাদের দেশের কৃষিজীবীদের নিজস্ব কিছু জমি থাকার প্রতি একটা দুর্বলতা আছে। রবীন্দ্রনাথ জানতেন যে, "নিজের সম্পত্তির প্রতি নিজের মমতা আমাদের সংস্কারগত। নিজেকে আমরা প্রকাশ করতে চাই, সম্পত্তি সেই প্রকাশের একটা উপায়। ......সম্পত্তি যদি কেবল আপন জীবিকার জন্যে হত, আত্মপ্রকাশের জন্যে না হত, তা হলে যুক্তির দ্বারা বোঝানো সহজ হত যে, ওটা ত্যাগের দ্বারাই জীবিকার উন্নতি হতে পারে।" এর একটি মাঝামাঝি সমাধান ছাড়া উপায় আছে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন না—অর্থাৎ "ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে, অথচ তার ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ করে দিতে হবে। সেই সীমার বাইরেকার উদ্বৃত্ত অংশ সর্বসাধারণের জন্যে ছাপিয়ে যাওয়া চাই। ......এ কথা বলা চলে না যে, মানুষের স্বাতন্ত্র্য থাকবে না, কিন্তু বলা চলে যে স্বার্থপরতা থাকবে না। অর্থাৎ নিজের জন্যে কিছু নিজের না হলে নয়, কিন্তু বাকি সমস্তই পরের জন্যে হওয়া চাই।" (রাশিয়ার চিঠি, ১৩৩৮, পৃষ্ঠা ৩৮) প্রসঙ্গত সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা

প্রবল প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কারসাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে-সব আইন প্রবর্তন করা হয়েছে, তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, রাষ্ট্র ও কৃষকদের মধ্যবর্তী ব্যক্তিদের বিলোপ সাধন এবং প্রকৃত চাষীদের মধ্যে জমির মালিকানা স্বত্ব বণ্টন। দুঃখের বিষয়, দেশের একটা বড়ো অংশে ভূস্বামীরা ভূমি সংস্কার আইনগুলি এড়াতে সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে জমির ঊর্ধ্বতন সীমা নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও জমির হস্তান্তর বন্ধ করতে না পারায় ভূমি-ব্যবস্থার উন্নতি খুব কমই হয়েছে।

মেলার ভূমিকা

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী ও বাইরের বৃহৎ ভারতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের একটি প্রধান উপায়, রবীন্দ্রনাথের কাছে, ছিল মেলা। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়—তার হৃদয় খুলে দান করবার ও গ্রহণ করবার এই প্রধান উপলক্ষ্য। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, "প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নবভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন। ব্যয়নির্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকারপ্রাপ্ত হন তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন... ইঁহাদের দ্বারা যে কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।" (স্বদেশী সমাজ, ১৩১১)।

গ্রাম ও শহরের সম্পর্ক

ভারতে শহরের বিস্তার যেভাবে হয়েছে, তাতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা অসুবিধা ও সমস্যা দেখা দিয়েছে। এক দিকে গ্রামগুলির পতন শুরু হয়েছে, অপর দিকে বড়ো বড়ো নগর অধিকাংশ লোকের বসের অযোগ্য হয়ে উঠছে। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন যে, গ্রামের সঙ্গে শহরের একান্নবর্তিতা চলে গেছে, শহর গ্রামকে এখন কেবল শোষণ করে, কিছু ফিরিয়ে দেয় না। রাশিয়ায় তিনি গ্রামের সঙ্গে শহরের বৈপরীত্য ঘুচিয়ে দেবার যে চেষ্টা দেখেছিলেন, সেরকম চেষ্টা আমাদের দেশে যদি ভালো করে সিদ্ধ হয়, তা হলে শহরের অস্বাভাবিক অতিবৃদ্ধি নিবারণ হবে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন। ঐ নীতি কার্যকর হলে কালক্রমে সারা দেশে শিক্ষা ও কাজকর্মের উদ্যম ছড়িয়ে পড়বে। "গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে, যে প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনো দিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।" রাশিয়ায় যা দেখে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহিত হয়েছিলেন সেটা হচ্ছে এই, তারা কেবলই মজুর সেজে কারখানাঘরের সরঞ্জাম যোগাচ্ছে না, আর লাঙল চালাচ্ছে না, জ্ঞানের জন্য, আনন্দের জন্য মানবজীবনে যা কিছু মূল্যবান, সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে।

শান্তিকুমার ঘোষ

অমঙ্গলবোধ ও রবীন্দ্রনাথ
শেষপর্বের কবিতা ৩

আবু সয়ীদ আইয়ুব

উত্তাপ-সন্তপ্ত রবীন্দ্রনাথ ঐ বয়সের শারীরিক ক্ষয়ক্ষতি ও রোগযন্ত্রণা এবং ঐ সময়কার ঘোরতর 'সভ্যতার সংকট'-জনিত মানসিক গ্লানি সত্ত্বেও মনের গভীর তলে আদর্শনিষ্ঠা ও ধর্মবিশ্বাস (faith) বাঁচিয়ে রেখেছিলেন: তাঁর শেষ পর্বের বাণী সর্বময় প্রত্যাখ্যানের, বিতৃষ্ণার বা বিদ্রূপের বাণী নয়। দুটি কথা কিন্তু মনে রাখতে হবে এ প্রসঙ্গে। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস বলতে কোনো পূর্ব যুগাগত ধর্মমতের প্রতি আনুগত্য বোঝায় না।(১) বোঝায় তাঁর "আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে" পাওয়া কঠিন সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। দ্বিতীয়ত, তিনি যেমন কোনো প্রাচীন বা প্রচলিত ধর্মমতকে সম্পূর্ণ নিজের ব'লে স্বীকার করতে পারেন নি, তেমনি তাঁর জীবনের তথা কাব্যের কোনো এক পর্যায়ে অভিব্যক্ত ধর্মচিন্তা বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধিকে তাঁর সমস্ত জীবনের পক্ষে ধ্রুব ব'লে মেনে নিতে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল।(২)

ব্রহ্মসংগীতের 'নিখিলভারধারণ বিশ্ববিধাতা'র কিম্বা গীতাঞ্জলির 'পরাণ সখা'র সাক্ষাৎ মেলে না শেষ পর্বের কাব্যে। সে শূন্য আসন পূর্ণ করলেন যে দুই দেবতা তাঁদের কথাই বোধ করি কবি বলতে চেয়েছেন পত্রপুট-এর 'পনেরো' সংখ্যক কবিতার শেষ ভাগে :

সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হোলো
দেবলোক থেকে মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার
অন্তরতম আনন্দে।

মনের মানুষের কথা সাবস্তারে আলোচিত হয়েছে 'মানুষের ধর্ম' ও 'Religion of Man'—যথাক্রমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩৩) ও ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩০) প্রদত্ত বক্তৃতামালায়। 'শান্তিনিকেতন' নামক দুই খণ্ড পুস্তকে সংকলিত আশ্রম মন্দিরে প্রদত্ত (১৯০৮—১৯১৪) বক্তৃতাবলীর সঙ্গে 'মানুষের ধর্ম'-এর তুলনা করলে ঐ সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। 'মনের মানুষ' কথাটা বাউল গান থেকে নেওয়া, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করেছেন; সেই অর্থ বোঝাবার জন্য বলেছেন—'এক মানুষ', 'মহামানব', 'বিশ্বমানব', 'পূর্ণ পুরুষ', 'The Eternal Man' ইত্যাদি। শেষ পর্বের দ্বিতীয় আরাধ্য দেবতা 'মহাকাল', 'রুদ্র', 'ভীষণ', 'ভৈরব', নটরাজ', 'খেলার গুরু' প্রভৃতি নামে অভিহিত। এই দেবতার আবির্ভাব গদ্যে বিরল, কিন্তু শেষ পর্বের কাব্যে তাঁকে প্রায়ই পাওয়া যায়। অপর পক্ষে মহামানব যতখানি ভাবুক রবীন্দ্রনাথের ধ্যেয়, ততখানি কবি রবীন্দ্রনাথের নয়।

আমার এই শেষের উক্তিটির মহৎ ব্যতিক্রম 'শিশু-তীর্থ'—সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতা, নিঃসন্দেহে তাঁর শ্রেষ্ঠ গদ্যকবিতা (অথচ লিপিকার কয়েকটি ছোট লিরিক বাদ দিলে এটাই তাঁর প্রথম গদ্যকবিতা)। এতে লিরিকের সঙ্গে এপিকের ভেদ ঘুচে গেছে। এই দশ পৃষ্ঠার সংহত কবিতায় আছে মহাকাব্যের সুবিস্তৃত পটভূমি, আছে মহাকাব্যসুলভ মহোচ্চ ভাব ও অনুভব, আছে বলিষ্ঠ ভাষার গম্ভীর ঝংকার। এই উদাত্ত ভাব ও ধ্বনি ধারার সঙ্গে মিশেছে খণ্ডকাব্যের কোমল সুরের সূক্ষ্ম আবছা ইঙ্গিতময়তা। দুই বিপরীত ঠাটের রাগিণীর যুগলবন্দি শুধু নয়, তারই সঙ্গে তাল রেখে চলে চিত্রকল্পের দ্রুত পটপরিবর্তন—মানবিক ও প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপ-আঁকা ক্যানভাসগুলি একটার পর একটা চোখের সামনে আসে আর সরে যায়।

ভাবতে অবাক লাগে যে, এমন আশ্চর্য সার্থক কবিতা প্রথমে লেখা হয়েছিল ইংরেজি ভাষায়। মুনিকের নিকটবর্তী ওবেরামের্গান নামক গ্রামে যীশু খৃষ্টের জীবনলীলা অবলম্বনে রচিত একটি প্যাশন-

(১) "শাস্ত্রে যা লেখে তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারিনে, কিন্তু সে সমস্ত সত্য অনেক সময়ে আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী—বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বললেই হয়।"

রবীন্দ্র রচনাবলী ১১, পৃঃ ২৪১।

(২) "আমার ধর্ম আমার জীবনেরই মূলে; সেই জীবন এখনও চলছে, কিন্তু মাঝখানে কোনো এক সময়ে তার ধর্মটা এমনি থেমে গিয়েছে যে তার উপরে ডাকটিকিট মেরে তাকে জাদুঘরে কৌতূহলী দর্শকদের চোখের সম্মুখে ধ'রে রাখা যায়—এটা বিশ্বাস করা শক্ত।"

রবীন্দ্র রচনাবলী ১০, পৃঃ ১৮৬।

স্লে দেখে কবি তার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। পরে তা বাংলায় রূপান্তরিত হয়; অনূদিতও বলা যায়, কারণ দুটোর ভাব ও বিষয়বস্তু একই। কিন্তু শিল্পোৎকর্ষে আসমান-জমিন তফাৎ। মূল ইংরেজি মোটের উপর নৈরাশ্যজনক; পড়ে কোনো ধারণাই হয় না বাংলা ভাষায় এই কবিতাটি কী মহিমা লাভ করেছে। মালার্মের উক্তি মনে পড়ে,—"Poetry is written with words, not with ideas"। ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহৎ ভাবের যথাযোগ্য শব্দবাহন খুঁজে পাননি; বাংলায় তাঁর অতুলনীয় বাক্সিদ্ধি ঐ ভাবকে রসসৃষ্টির উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

আদিম বর্বরতায় মগ্ন কলিযুগ থেকে সেই সুদূর ভবিষ্যতের সত্যযুগ পর্যন্ত যখন 'মহামানব' জন্মলাভ করবে—মানবজাতির ইতিহাস-যাত্রা বিধৃত হয়েছে অল্প কয়েকটি বলিষ্ঠ রেখায়। কবিতার সূত্রপাত নাটকীয় এবং প্রতীকী :

রাত কত হল?
উত্তর মেলে না।
কেন না, অন্ধকাল যুগ-যুগান্তরের
গোলকধাঁধায় ঘোরে,
পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলীতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের
চক্ষুকোটরের মতো;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন,
মনে হয় নিশীথ রাত্রের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

মানুষের বিবর্তনী স্বভাব তামসিক পশু-শক্তির কবল থেকে কতখানি মুক্ত হয়েছে, মানুষ হতে আর কত দেরী—কোনো উত্তর নেই সে প্রশ্নের। পথ এখনো অনেক বাকী রয়েছে। প্রকৃতির (জীব ও জড় প্রকৃতির) রাক্ষসী মায়া বিভীষিকা বিস্তার করে। বিপুল সংখ্যক মানুষ পরস্পর বিদ্বেষে অন্ধ, হিংসায় উন্মত্ত; জড় প্রকৃতির, মূঢ় সংস্কারের, স্বার্থান্বেষী অধিনেতার দাস তারা :

সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের
ছেঁড়া পাতার মতো,
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্‌কি পরানো।
কোনো-এক সময়ে অকারণ সন্দেহে
কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশিকে হঠাৎ মারে,
দেখতে দেখতে নির্বিকার বিবাদ
বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।

শেষের পংক্তিগুলির উপর সেই সময়কার অতি জঘন্য হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার ছায়া পড়েছে। মাঞ্চুরিয়াতে আক্রমণকারী জাপানী ফৌজের বীভৎস আচরণের সংবাদও এসে পৌঁছেছিল বোধ হয়। স্মরণ থাকতে পারে যে, প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণও একটি হত্যাকাণ্ড, সম্ভবত কোনো-এক পাগলের হাতেই। পরবর্তী পংক্তিগুলির ইঙ্গিত মনে হয় আধুনিক সভ্যসমাজের চারিত্রনৈতিক বিনাশের দিকে :

কোনো নারী আর্তস্বরে বিলাপ করে,
বলে, হায় হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান
উচ্ছন্ন গেল,
কোনো কামিনী যৌবনমদবিলসিত
নগ্নদেহে অট্টহাস্য করে,
বলে কিছুতে কিছু আসে যায় না।

এই তমসাচ্ছন্ন, জড়বুদ্ধি মানবজাতির মধ্যেই দেশে দেশে যুগে যুগে দেখা দেন সক্রেটিস, গৌতম বুদ্ধ, যীশু খৃষ্ট মোহনদাস গান্ধীর মতো মহাপুরুষেরা; আসেন প্রজ্ঞা ও প্রেমের বাণী নিয়ে, জনসমাজে স্বীকৃতি, প্রতিষ্ঠা, আনুগত্য লাভও করেন তাঁরা। কিন্তু বেশিদিনের জন্য নয়। জনতা কিম্বা কুলপতিরা বিদ্রূপের অট্টহাস্য দিয়ে আঘাত করে তাদের শিক্ষাকে, কখনো বা হত্যা ক'রে বসে শিক্ষাদাতাকেই। তার পরে মূঢ়ের দল আবার নেমে যায় তাদের আদিম স্বভাবের নিম্ন ভূমিতে। অন্ধ কাল যুগ-যুগান্তরের

গোলকধাঁধায় ঘোরে। অমানুষিকতা যখন চরমে পৌঁছয় তখন 'বাতাসে যূথীর মৃদু গন্ধ'—সেই প্রকৃতির পরিহাস ঃ

জনতার মধ্য থেকে কে একজন
হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,
'মিথ্যাবাদী আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ।'
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে
উদগ্র হতে থাকল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ,
প্রবল হল পুরুষদের তর্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে
হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল,
আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।
ঝর্ণার কলশব্দ দূরে থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে।
বাতাসে যূথীর মৃদুগন্ধ।

তবু রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস হারান না,(৩) চেয়ে থাকেন সেই অনাগত কালের দিকে যখন মানুষ জয় করবে তার পশুস্বভাবকে; অবতার বা মহাপুরুষ নন, ঘরে ঘরে ভূমিষ্ঠ হবে পূর্ণ পুরুষ, পূর্ণ মনুষ্যত্বের চির-জীবিত আদর্শ। 'শিশুতীর্থ'-তে ত্রাণকর্তাদের(৪) মহিমান্বিত ব্যর্থতাই দেখতে পাই, যে-নবজাতকের অভ্যুদয় শেষ কয়েকটি ছত্রে ঘোষিত তিনি কোনো ত্রাণকর্তা, পীর-পয়গম্বর, ঋষি বা অবতার নন, তিনি চির-মানব ঃ

মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা;
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি
শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিল আপন বীণার তারে ঝংকার,
গান উঠল আকাশে—
জয় হোক মানুষের, ঐ নবজাতকের,
ঐ চিরজীবিতের।

"এই মাতা কে?"—প্রশ্ন করেছেন শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এবং ঠিকই উত্তর দিয়েছেন ঃ "মাতা বসুন্ধরা। সমস্ত সৃষ্টি আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া আছে কবে মাতা বসুন্ধরা তাঁহার তৃণশয্যায় মানবশিশু কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবেন; সেই মানবশিশুর মধ্যে ঘণীভূত হইয়া রূপ লাভ করিবে সৃষ্টির সকল অর্থ।"(৫) কিন্তু যে-মানবশিশুর মধ্যে সৃষ্টির সকল অর্থ দেখতে পাওয়া যাবে তিনি এখনো জন্মান নি, "পূর্ণ পুরুষ আগন্তুক; তাঁর রথ ধাবমান; কিন্তু তিনি এখনো এসে পৌঁছন নি।"(৬)

মানুষের ক্ষুদ্র দেহ
যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।
সৃষ্টি ও প্রলয় -সভাতলে
তার বহ্নিরসপাত্র
কী লাগিয়া যোগ দিল বিশ্বের ভৈরবীচক্রে—
বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা—কেন
এ দেহের মৃৎভাণ্ড ভরিয়া
রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোতে করে বিপ্লাবিত।
(রোগশয্যায়—'পাঁচ')

বিশ্বের ভৈরবীচক্রে মানুষের ক্ষুদ্র দেহ তার বহ্নিরসপাত্র নিয়ে কিসের জন্য যোগ দিল, শুধু কি অপরিমেয় যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য? সেই ক্ষুদ্র দেহের মৃৎভাণ্ড ভ'রে উপচে পড়ছে "রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোত"—এ সব কি "বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা" ছাড়া আর কিছু নয়, আর কোনো অর্থ নেই তার? কোনো অর্থই খুঁজে পাওয়া যাবে না মানুষের সত্তার বাইরে; সে অর্থ তো পাওয়ার জিনিস নয়, দেওয়ার জিনিস। মানুষ আপন অপরাজেয় সাধনার দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকে যদি অর্থবান করে তুলতে না পারে তবে সে সৃষ্টি বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততা রূপেই প্রতিভাত হতে থাকবে সুস্থ মূল্যবিচারে। একদিন রবীন্দ্রনাথ প্রেমের ভাষায় বলে-ছিলেন, "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর/ এ প্রেম হত যে মিছে।" আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বলছেন—আমায় নইলে এ সৃষ্টি হত মিছে। শুধু "আমায় নইলে" নয়, আমি যদি একে আপন তপস্যার মূল্যে সত্য না করতে পারি তবে এ সৃষ্টি মিথ্যাই থেকে যাবে। মানুষ জগৎ সৃষ্টি করেনি, কিন্তু জগতকে মূল্যযুক্ত ক'রে তুলবার দায়িত্ব মানুষেরই ঃ

প্রতিক্ষণে অন্তহীন মূল্য দিল তারে
মানবের দুর্জয় চেতনা
দেহ দুঃখ-হোমানলে
যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা আছে?

সবার উপরে মানুষ সত্য—এই কথাটা উপরে উদ্ধৃত কবিতায় এবং শেষ পর্বের আরো কয়েকটি কবিতায় যত উদ্দীপ্ত, যত জ্বালা-ময় ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, গদ্যে বা পদ্যে তেমন ক'রে আর কেউ বলেছেন ব'লে তো মনে করতে পারছি না।

ভগবান কোথায় প্রতিষ্ঠিত এই প্রশ্নের

---

(৩) অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির
সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।
('জয়ধ্বনি'—নবজাতক)

(৪) "তা ছাড়া, যেমন আগেই লক্ষ্য করেছি, তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) রয়েছে ত্রাণ-কর্তার বিশ্বাস, সে বিশ্বাস শেষ দিককার লেখায় অধিক স্পষ্ট।" —শিশিরকুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য, পৃঃ ২২২।

(৫) শশিভূষণ দাশগুপ্ত, উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ১২৫।

(৬) মানুষের ধর্ম, পৃঃ ১৪।

উত্তরে উপনিষদ বলেছেন—স্বে মহিম্নি, আপন মহিমায়। সেই ভাষায় রবীন্দ্রনাথও বলছেন মানুষের সত্যপ্রতিষ্ঠা তার মহিমায়, তার পূর্ণতায়। মনুষ্যজাতির দেবকল্পনার ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে তার আপন পূর্ণতার আদর্শকে গড়ে তুলবারই ইতিহাস; আপন পরিপূর্ণ বিকাশের চরম আদর্শকে মানুষ ভগবান বলে জেনেছে চিরকাল। যখন অখণ্ড প্রতাপকেই মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ স্তর ভেবেছে, তখন শক্তির পুজো করেছে, যখন শ্রেয়োনীতিক আদর্শ তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে তখন ভগবান হয়েছেন পরম মঙ্গলময়, প্রেমময়। অবশ্য ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায় এমন সব উপাদান দিয়েও দেবমূর্তি গড়া হয়েছে "শ্রেয়োনীতিতে যা গর্হিত, সৌন্দর্যের আদর্শে যা বীভৎস। তাকে বলব ভ্রান্ত উত্তর (আমার চরম মূল্য কোথায়—এই প্রশ্নের ভ্রান্ত উত্তর।) এবং মানুষের কল্যাণের জন্য সকল রকম ভ্রমকেই যেমন শোধন করা দরকার, এখানেও তাই।"(৭) অর্থাৎ দেবতা যে কেবল যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হচ্ছেন তাই নয়, যুগে যুগে
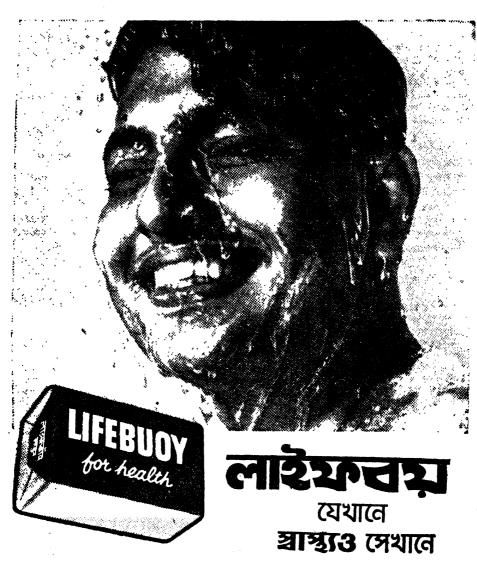
(৭) মানুষের ধর্ম, পৃঃ ১১।

স্বধামে সংশন্ধ বা সম্মত হয়েছেন—মানুষেরই ক্রমোন্নতির অব্যর্থ পরিণাম-স্বরূপে। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম—কোন্ দেবতা আমার যথার্থ দেবতা—এ প্রশ্ন সর্বকালের। কিন্তু কেমন ক'রে জানব আজকের দিনে কোন্ দেবতা সত্য, সত্যই পূজনীয়, আর কোন দেবতা ইতিমধ্যে হবিদানের অযোগ্য হয়ে পড়েছেন? তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "মানুষের দেবতার শ্রেষ্ঠতার বিচার মানুষেরই পূর্ণতার আদর্শ থেকে।" (৮)

পূর্ণ পুরুষের যে-চরম আদর্শ আমাদের মনে বিরাজিত, তাকে ভগবানের শত রূপের একটি রূপ মাত্র বলা যেতে পারতো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার চেয়েও বেশি বলতে চান, বলতে চান ভগবান শব্দ দ্বারা এ ছাড়া আর কিছুই বোঝায় না। এর বাইরে যদি কোনো অভিধা থাকে ঐ শব্দের তবে তা আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ অতীত, সুতরাং তাকে মানা না মানা দুই-ই সমান। দেশ-বিদেশের ধর্মশাস্ত্র ভগবানকে যত মানবোত্তীর্ণ বিশ্বাতিগ রূপেই কল্পনা করুক না কেন, বস্তুত, মনুষ্যত্ববিকাশের চরম আদর্শ ছাড়া ভগবানের আর কোনো মানে নেই।(৯) শেষ জীবনে মানবোত্তীর্ণ কোনো অধ্যাত্ম সত্তায় বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না এ-কথা একাধিকবার স্পষ্ট ভাষায় রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন: "আমার মন যে-সাধনাকে স্বীকার করে তার কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনাকে ত্যাগ না ক'রে আপনার মধ্যেই সেই মহান পুরুষকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র আছে—তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাঁকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই।"(১০) সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরম সত্য মানুষের মধ্যেই নিহিত; তার বাইরে যেমন কোনো পরম শ্রেয় নেই, তেমনি কোনো পরম সত্যও নেই: "জীবমানব কেবলই তার অহং-আবরণ মোচন ক'রে আপনাকে উপলব্ধি করতে চাইছে বিশ্বমানবে। বস্তুত সমস্ত পৃথিবীরই অভিব্যক্তি আপন সত্যকে খুঁজছে সেইখানে, এই বিশ্বপৃথিবীর চরম সত্য সেই মহামানবে।"(১১)

পৃথিবীর আরম্ভকালের বহু শত কোটি বৎসর পরে মানুষের সূচনা, তাই সে পরম মূল্য ও পরম সত্যের আধার হতে পারে না—এমন ভাবা ভুল। ক্ষুদ্রায়তন ও ক্ষণজীবী বলে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে তার তাৎপর্য সীমিত নয়। "মানুষের ক্ষুদ্রতা বিচার করে কোনো কোনো পণ্ডিত অভিভূত হয়ে পড়েন। পরিমাণকে অপরিমেয় সত্যের চেয়ে বড় করা একটা মোহ মাত্র।"(১২) মানুষের দুর্জয় চেতনা সেই অপরিমেয় সত্য।

'ভগবান' এবং 'মহামানব' শব্দদ্বয় যদি সমার্থবাচক হয় এবং মহামানব মানবিকতার চরম আদর্শ রূপেই সত্য হন, তবে কি একথা মানতে আমরা বাধ্য নই যে, ভগবান মানুষের মনের একটি ধারণামাত্র (সে ধারণার মূল্য যতই হোক), মনের বাইরে তিনি সত্য নন? কারণ আদর্শ আমরা তাকে বলি যা ইতিমধ্যেই সিদ্ধ নয়, মানুষের নিত্যনিয়ত সাধনার দ্বারা অল্পে অল্পে অনন্ত কাল ধরে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে চলেছে। ভগবানের সত্তা কি তবে আমাদেরই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার অক্ষম চেষ্টার উপর নির্ভরশীল, কাজেই সে-চেষ্টার সম্যক চরিতার্থতার পূর্বে তিনি পূর্ণ সত্য নন?

ভগবান বা পূর্ণ পুরুষ মানবোত্তীর্ণ কিছু নন, একথা ঠিক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি আমাদের মনগড়া বা মনোগত ব্যাপার মাত্র। আমরা এখানে একটি জটিল তত্ত্বে এসে পৌঁছচ্ছি। পরম মূল্য একাধারে বিষয়গত ও বিষয়ীগত ব্যাপার, মনের মধ্যেই সত্য, আবার মনের বাইরেও সত্য। কোনো দার্শনিক আলোচনায় না গিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক সমাধানটাই এখানে খুব সংক্ষেপে দেওয়ার চেষ্টা করবো:

মানুষের সত্তায় দ্বৈধ আছে। একদিকে সে জীব, জৈবধর্ম পালন করে, প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা চালিত হয়। অন্য দিকে সে জীববিজ্ঞানের বিধিনিষেধ মানতে বাধ্য নয়। স্বভাবের তাগিদকে অগ্রাহ্য ক'রে প্রেয়র উপর স্থান দেয় শ্রেয়কে, সহজেই আত্মরক্ষা করতে পারতো যে দিকে সে দিকে না গিয়ে পা বাড়ায় সেই দুরতায় ক্ষুরধার পথে যে-পথে তার ধনপ্রাণ প্রিয়জন সবই বিপন্ন। সচরাচর এমনটা ঘটে না, তবু ঘটে। কী সেই প্রবল শক্তি যা তাকে স্বাভাবিকের ইস্পাতে-বাঁধা মসৃণ সড়ক থেকে যেন ডিরেল্ করে নিয়ে যায় দুঃসাধ্য আদর্শের উপল-বন্ধুর অজানা ভূমিতে যেখানে কোনো পথই কাটা হয়নি? "জ্যোতির্বিদ দেখলেন কোনো গ্রহ আপন কক্ষপথ থেকে বিচলিত। নিঃসন্দেহ মনে বললেন, অন্য কোনো অগোচর গ্রহের অদৃশ্য শক্তি তাকে টান দিয়েছে। দেখা গেল, মানুষের মন আপন প্রকৃতি-নির্দিষ্ট প্রাণধারণের কক্ষপথে আবর্তিত করে চলছে না। অনির্দিষ্টের, স্বভাবের অতীতের দিকে ঝুঁকছে।"(১৩) মানুষের বেলা এ অগোচর গ্রহের নাম ভগবান এবং সংজ্ঞা পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ। এই গ্রহটি ইউরেনস নেপচিউনের মতো দূরবীনে-দেখা মাপজোখ-করা বাস্তব নয়, অথচ কাল্পনিক বা মনের ব্যাপার মাত্র বলে তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মনের বাইরেও তা সত্য, যদিও সেই সহজ অর্থে সত্য নয় যে-অর্থে প্রচলিত ধর্মমতগুলিতে অতিমানবিক ভগবানের অস্তিত্ব অবধারিত ও বিঘোষিত হয়ে থাকে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

---

(৮) মানুষের ধর্ম, পৃঃ ১১।

(৯) "Whatever character our theology may ascribe to him (God), in reality he is the infinite ideal of Man towards whom men move in their collective growth." Tagore—The Religion of Man, p. 165.

(১০) মানুষের ধর্ম, পৃঃ ৯১।

(১১) মানুষের ধর্ম, পৃঃ ৭১।

(১২) মানুষের ধর্ম, পৃঃ ৭১।

(১৩) মানুষের ধর্ম, পৃঃ ২৫।

উত্তর ক্যারোলিনায় অবস্থিত সাগর জল নির্লবন করার পরীক্ষা কেন্দ্র (দৈশ দৃশ্য)
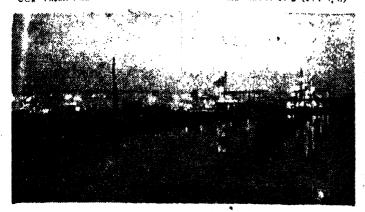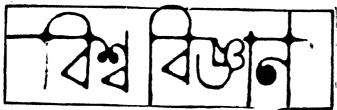
রাবণ রাজার স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ

অন্তিম শয্যায় শুয়ে লংকারাজ রাবণ দুঃখ করে বলেছিলেন যে, তাঁর অনেকগুলি বড় বড় স্বপ্নের মধ্যে একটি ছিল লবণসমুদ্রকে ক্ষীরোদসাগরে রূপান্তরিত করা। সে স্বপ্ন তিনি বাস্তবে রূপায়িত করে যেতে পারলেন না। রামায়ণের মধ্যে এই স্বপ্নের বিষয় পড়ে বোঝা যায় যে, সে ভারতে কৃষি-সভ্যতার দাক্ষিণায়নের যুগে পণ্ডিতরা সমুদ্রের নোনা জল থেকে মিষ্টি জল তৈরি করার কথা চিন্তা করতেন। যেমন ইন্দ্রজিতের রথের কথা পড়লে বোঝা যায় যে, আকাশে ওড়ার স্বপনও তাঁদের মনে ছিল। তারপর হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্ব পার হয়ে আজ ভারত আবার স্বাধীন হয়ে কৃষির জন্য মিষ্টি জলের তাগিদে সমুদ্রের জল নির্লবণ করার কথা ভাবতে পারছে পারমাণবিক শক্তি করায়ত্ত হবার দৌলতে। ট্রম্বের পারমাণবিক রিঅ্যাকটার এই কাজে আমাদের সাহায্য করবে। তার মানে আমি বলছি না যে, পারমাণবিক যুগের আগে কখনো নোনা জল বিশুদ্ধ জলে রূপান্তরিত করা হয়নি। হাজার হাজার বছর আগেকার সংস্কৃত সাহিত্যে জল ফুটিয়ে ও বালির মধ্যে ফিল্টার করে বিশুদ্ধ করার কথা লেখা আছে। পশ্চিমে খৃষ্ট পূর্ব ৩৫০ সালে অ্যারিস্টটল এবং ৪৯ সালে জুলিয়াস সীজারের রোম্যান সৈন্যরা পাতনের সাহায্যে নোনা জল থেকে নুন বার করেছিলেন। তা ছাড়া, সমুদ্রপোতেও বহুকাল ঐভাবে পানীয় জল উৎপাদন করা হত। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৌশলে ঐ কাজ করার ইতিহাস বেশী দিনের নয়—মোটে ১২।১৩ বছরের। এ পর্যন্ত ডজন খানেক কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে, যেগুলির মধ্যে ৫টি লাভ করেছে প্রাধান্য। যথা (১) ডিস্টিলেশন, (২) ফ্রীজিং, (৩) হাইড্রেটিং, (৪) রিভার্স অস্মোসিস এবং (৫) ইলেকট্রো-ডায়ালিসিস। প্রথম তিনটি হচ্ছে তাপীয় কৌশলে, অর্থাৎ তাপমাত্রা পরিবর্তনের দ্বারা জল বাষ্প করে দিয়ে বা জমিয়ে দিয়ে নুন আলাদা করার কৌশল। শেষের দুটিতে ঝিল্লির সাহায্যে জল থেকে নুন ছেঁকে বার করে নেওয়া হয়।

ডিস্টিলেশন পদ্ধতি খুবই সোজা—সমুদ্রের জল ফুটিয়ে বাষ্প তৈরী হলে সেই বাষ্প আবার ঠান্ডা করলেই বিশুদ্ধ জল পাওয়া যাবে, নুনটা পড়ে থাকবে তলায়। কিন্তু পদ্ধতিটা সোজা হলেও খরচ প্রচুর; কারণ, অনেক ইন্ধনের দরকার। তবে হালে ইঞ্জিনীয়াররা একই তাপকে বারে বারে ঘুরিয়ে ব্যবহার করার কৌশল বার করায় খরচ আগের চেয়ে কিছুটা কমবে সন্দেহ নেই।

আজকের দুনিয়ায় জল নির্লবণ করার কারখানাগুলির অধিকাংশেই ডিস্টিলেশন পদ্ধতি ব্যবহার হচ্ছে কিছু কিছু রকমফের করে নিয়ে। যে পদ্ধতি সবচেয়ে বেশী চালু, সেটির নাম মাল্টি স্টেজ ফ্ল্যাশ ডিস্টিলেশন প্রোসেস বা সংক্ষেপে 'এম-এস-এফ'। পৃথিবীর শতাধিক জায়গায় এই পদ্ধতি কাজে লাগানো হচ্ছে, যার মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান ডিয়েগো শহরের কারখানাটির নাম ছিল সবচেয়ে বেশী। সেটি এখন অবশ্য গুয়ান্টানামোতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

এম-এস-এফ পদ্ধতিতে জল পুরো ফুটাবার দরকার হয় না। গরম করে জল একটি চেম্বারে পরিচালিত করা হয়, যার মধ্যে আবহচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে কম বলে সেই কম গরম জল সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভূত হতে থাকে।

আর এক রকমের কৌশল আছে, যাকে
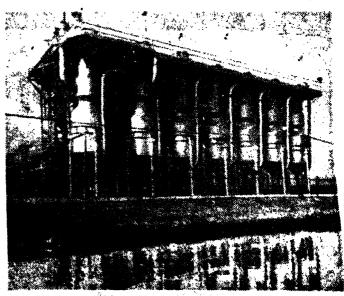
টেক্সাসের ফ্রীপোর্ট শহরের এই কেন্দ্রে পাতন পদ্ধতির দ্বারা জল লবণমুক্ত করা হয়

বলা হয় "মাল্টিপ্‌ল এফেক্ট লং-টিউব ভার্টিক্যাল ডিস্টিলেশন"। টেক্সাসের ফ্রী পোর্ট শহরে ঐরকম একটি কারখানায় দৈনিক প্রায় ১০ লক্ষ গ্যালন নোনা জল লবণমুক্ত করা হয়। ৪৫০টি খাড়া নলওয়ালা ১২টি জল-বাষ্পীভূত করার যন্ত্রের (ইভ্যাপোরেটার) সাহায্যে জল প্রথমে বাষ্পীভূত করে তারপর আবার জমিয়ে ভাল পানীয় জল উৎপন্ন হয়। ঐ ধরনেরই আরও একটি কৌশলে কাজ হয় নিউ মেক্সিকোর ছোট্ট শহর রসওয়েল-এ। ১৯৬৫ সালে ভারত ও অন্যান্য দেশ থেকে কিছু বৈজ্ঞানিক সেই কারখানাটি দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানেও প্রতি দিন ১০ লক্ষ গ্যালন পানীয় জল উৎপন্ন হয়, যার হাজার গ্যালন প্রতি খরচ পড়ে দেড় ডলারের মত। রসওয়েল-এ অবলম্বিত কৌশলের নাম "ফোর্সট্‌ সার্কুলেশন ভেপার- কম্প্রেসান ডিস্টিলেশন।" এ ক্ষেত্রে কারখানা একবার চালু হয়ে গেলে প্রথম বারের তাপই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বার বার ব্যবহার করা যায়, যার ফলে জ্বালানির খরচ অনেক কম পড়ে। সামান্য যেটুকু তাপ নষ্ট হয়, সেটুকু পুরিয়ে দিলেই চলে।
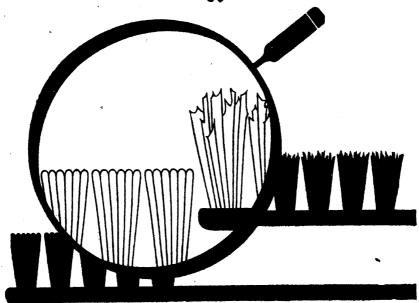
সৌর রশ্মির তাপ ব্যবহার করে জল 'ডিস্টিল' করার পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়েছে। শুকনো হাওয়ার সাহায্যে জলীয় বাষ্প শোষিত করে ঠান্ডা জিনিসের উপর সেই বাষ্প জমিয়ে জল পাওয়া যায়। একটি বিশাল চ্যাপটা পাত্রের গায়ে কালো রং করে তাতে নোনা জল ঢেলে দিলে সেই কালো রং সৌর তাপ গ্রহণ করে জল উষিয়ে দেবে। পাত্রটির উপরে কাচের ঢাকা থাকে। বাষ্প সেই ঢাকার ঠান্ডা গায়ে লেগে আবার জল হয়ে গড়িয়ে অন্য পাত্রে গিয়ে পড়ে। রোদ ভাল থাকলে প্রতিদিন ১ বর্গফুট জায়গার জল থেকে আধ সের করে পানীয় জল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এতে পড়তা খরচা অত্যন্ত বেশী বলে বৈজ্ঞানিকরা জল নির্লবণ করার সঙ্গে সঙ্গে একই ব্যবস্থা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কথা চিন্তা করছেন। পারমাণবিক শক্তির ভূমিকা হচ্ছে এইখানে। পারমাণবিক শক্তি একই সঙ্গে সমুদ্রের জল ফুটিয়ে বাষ্প করার তাপ যোগাবে এবং বিদ্যুৎ জেনারেটার চালাবে। প্রকান্ড প্রকান্ড শহরের পক্ষে, যেখানে জল ও বিদ্যুতের চাহিদা খুব বেশী, সেখানে পারমাণবিক রিঅ্যাকটার ব্যবহার করার সুবিধা; কারণ, পড়তা খরচ কম হবে উৎপাদন বেশী হবে বলে। চাহিদা অল্প হলে সুবিধা হবে না। এ দিক থেকে ব্রিডার রিঅ্যাকটারকে নিশ্চয়ই কাজে লাগানো যাবে, যদি রাজস্থানের বিরাট ঊষর মরুপ্রায় অঞ্চলকে জলের সাহায্যে আবাদযোগ্য করে তোলার এবং সেখানে বহু আধুনিক শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা থাকে।

হিমায়নের দ্বারা জল লবণমুক্ত করার কথা কিছু নতুন নয়। সবাই জানেন যে, বরফ মাত্রই হচ্ছে মিষ্টি জলের কঠিন অবস্থা এবং বরফ গলালেই ভাল জল পাওয়া যায়। কিন্তু বলা যতটা সহজ, কাজটা কিন্তু তত সহজ নয়। পাতনের চেয়ে হিমায়নে খরচ কম; কারণ, জল ফোটানোর চেয়ে বরফ করার জন্য অনেক কম শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু বরফের দানাগুলি নানারকম এবড়ো-খেবড়ো চেহারার হয় বলে অনেক সময় সেগুলির মধ্যে কিছু নুন আটকে যায়, যা আবার ভাল জল দিয়ে পরিষ্কার না করে বরফ গলালে সেই জল নোনা হবে। কিন্তু এই অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থাও হয়েছে, যার দ্বারা তৈরী বরফের দানাগুলির একটা নির্দিষ্ট আকার থাকবে, যার ভিতরে নুন আটকা পড়তে পারবে না। উত্তর ক্যারোলিনার রাইটসভিল বীচে সেইরকম একটি কারখানা তৈরী হচ্ছে, যেখানে দৈনিক ২ লক্ষ গ্যালন পানীয় জল পাওয়া যাবে।
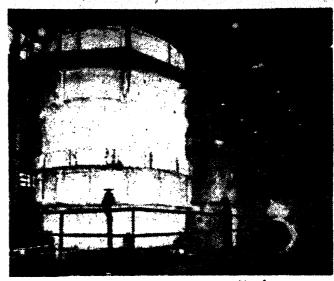
এখানে জল বরফ করে লবণমুক্ত করা হয় (উইসকন্সিন)

জল লবণমুক্ত করার আর একটি কৌশলের নাম হাইড্রেটিং, যাতে এমন রাসায়নিক পদার্থের সাহায্য নেওয়া হয়, যা নুনের সঙ্গে মেশে না। সেইরকম দুটি পদার্থ হচ্ছে প্রোপেন গ্যাস ও বুটেন।

স্বাভাবিক আবহচাপের তিনগুণ বেশী চাপে এবং ৪২° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় সমুদ্রের জলের মধ্যে প্রোপেন গ্যাসের বুদ্বুদ দিলে এক কঠিন কেলাসিত পদার্থ তৈরী হয়, যার মধ্যে জলের প্রতি ১৭টি অণু পিছু একটি করে প্রোপেন অণু থাকে, অথচ নুন থাকে না। তারপর সেগুলিকে অল্প গরম করলেই গ্যাস চলে গিয়ে বিশুদ্ধ জল থেকে যায়। যে তাপমাত্রায় জলের হিমায়ন হয়, তার চেয়ে সামান্য একটু কম তাপে বুটেন ফুটে ওঠে। ফলে, তরল বা বাষ্পীয় অবস্থার বুটেন ব্যবহার করে জল জমানো বা বরফ গলানো যেতে পারে। রাইটসভিল বীচে এই পদ্ধতির একটি পাইলট কারখানা স্থাপিত হচ্ছে, যেখানে দিনে ১০ হাজার গ্যালন পানীয় জল পাওয়ার কথা। হাইড্রেটিং পদ্ধতির জন্য খুব কম শক্তির দরকার হয় বলে এতে খরচ কম পড়ে।

ঝিল্লির সাহায্যে জল লবণমুক্ত করার পদ্ধতির অর্থনৈতিক সুবিধা অনস্বীকার্য; কারণ, ছোট ছোট জনপদ বা কলকারখানার সামান্য চাহিদা মেটাবার পক্ষে এই পদ্ধতির উপযোগিতা খুব বেশী। এতে অন্যান্য পদ্ধতির মত জলের অবস্থা বদলাতে হয় না, অর্থাৎ বরফ বা বাষ্পীভূত করতে হয় না, ঝিল্লির সাহায্যে জল থেকে নুন আলাদা করা হয়। একটি পদ্ধতি হচ্ছে ইলেকট্রোডায়ালিসিস। নুন জলে মিশালে দু ভাগে ভাগ হয়ে যায় —নেগেটিভ ক্লোরাইড আয়ন ও পজিটিভ সোডিয়াম আয়ন। সুতরাং নোনা জলে একটি করে পজিটিভ ও নেগেটিভ-ধর্মী ঝিল্লি রাখলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে এই দুই রকমের আয়নকে ঝিল্লি দুটির মধ্যে আকৃষ্ট করে বার করে দেওয়া যায় পড়ে থাকে বিশুদ্ধ জল। পৃথিবীর ১০।১২টি

দেশে এই পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা চলেছে, কাজও হচ্ছে। দক্ষিণ ডাকোটার ওয়েবস্টার শহরে ইলেকট্রোডায়ালিসিসের একটি সম্পূর্ণ স্বয়ংচালিত কারখানায় দৈনিক আড়াই লক্ষ গ্যালন করে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যাচ্ছে।

সবচেয়ে আধুনিক পদ্ধতিটির নাম 'রিভার্স অস্মোসিস'। যে ক্রিয়ার দ্বারা গাছে শিকড় থেকে পাতায় রস যায় বা দেহে অন্ত্র থেকে রক্তে পুষ্টি যায়, তারই নাম অস্মোসিস। সেই পদ্ধতির অনুকরণে এমন এক ঝিল্লির মধ্য দিয়ে জল চুঁইয়ে দেওয়া হয়, যার ভিতর দিয়ে নুন গলে যেতে পারে না।

সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা এখনো অনেক ক্ষেত্রে এক মহার্ঘ ব্যাপার। পড়তা খরচা বাড়া বা কমার প্রশ্নটি মূলত বেশী বা কম শক্তির (এনার্জি) প্রয়োজনের প্রশ্ন। কিন্তু বেচেল কর্পোরেশন মনে করেন যে, পরমাণবিক শক্তির সাহায্যে অদূরভবিষ্যতে মাত্র ২ সেণ্ট দামে ১০০০ গ্যালন জল পাওয়া যাবে।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

ককশ্‌কার আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপ : 'ড্রেসডেনের সাঁকো'

অস্কার ককশ্‌কা

আমরা এডভার্ড মুংখ-এর ছবি নিয়ে আলোচনা করেছিলুম; অস্কার ককশ্‌কাও চিত্রকলার এই মনস্তাত্ত্বিক ইস্কুলের আরেকজন। মনস্তাত্ত্বিক এই অর্থে যে, চিত্রকর তাঁর "বিষয়"-কে শুধুমাত্র দৃশ্য-অভিজ্ঞতার দিক থেকে প্রকাশ করছেন না, সাহিত্যিকের মতো তার মনোবিশ্লেষণ করছেন। অর্থাৎ, যখন ককশ্‌কা একটি পোর্ট্রেট আঁকবেন, তাঁর উদ্দেশ্য হবে সেই ব্যক্তিটির চরিত্র, লুকোনো ব্যথা, অভিজ্ঞতা ছবিতে ফুটিয়ে তোলা; তাতে যদি তিনি সফল হন, তাহলেই তিনি তৃপ্ত; কম্পোজিশন, ছবির দৃশ্যগত কাঠামো, সে-সব কেমন হল তা অপ্রয়োজনীয় আলোচনা তখন। প্রশ্ন উঠতে পারে, রুয়োর সঙ্গে ককশ্‌কার তফাত কোথায়? রুয়োর ছবিতেও মনস্তত্ত্বের অংশ খুবই বড়ো, কিন্তু ককশ্‌কা বা মুংখের সঙ্গে তাঁর তফাত এইখানেই যে, রুয়ো বর্ণ এবং ফর্মকে আঁটো রেখে তারপর মনবিশ্লেষণে যেতেন, যার ফলে সাহিত্যের দিকটা বাদ দিলেও বর্ণ এবং ফর্ম তাঁর ছবিকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম।

পোয়েকলার্ন শহরে ১৮৮৬ সালে জন্ম; অস্ট্রিয়ান শিল্পী অস্কার ককশ্‌কা। ১৯০৪-এর প্রথম দিকে তিনি ভিয়েনায় কিছুকাল পড়াশুনো করেন, ভিয়েনা তখন ছিল এক বিশালকায় ক্ষয়িষ্ণু রাজ্যের রাজধানী এবং সমগ্র ইয়ুরোপের অন্যতম শিল্পকেন্দ্র (আমি কিন্তু Industrial Centre বলতে চাইনি)। এই সময় ভিয়েনায় যে রীতি সবচেয়ে জনপ্রিয় তা হল য়ুগেণ্ডস্টিল শিল্পীদের এবং অস্কার কিছুদিন এই ধারায় ছবি আঁকেন। এই দলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও হয় এবং য়ুগেণ্ডস্টিল শিল্পাদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি রচনা করেন "বয় ড্রীমার্স" নামক পুস্তকখানি। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ হতে আরম্ভ করে ক্যানভাসে ও পাণ্ডুলিপিতে। তাঁর ছবি এবং যে-সব এক্সপ্রেশনিস্ট নাটক তিনি এই সময় রচনা করেন তা নিয়ে হই-চই পড়ে যায় ভিয়েনায়, তবে হই-চই-এর শব্দটা ঠিক বাহবাসূচক নয়, "ছি-ছি" জাতীয়। ১৯০৮ এবং ১৯১৪-র মধ্যে, প্রথমে ভিয়েনা, পরে সুইজারল্যাণ্ড এবং বার্লিনে তিনি প্রচুর প্রোট্রেট আঁকেন (বেশির ভাগই শিল্পী-সাহিত্যিকদের) যার প্রত্যেকটিকেই মনস্তাত্ত্বিক চিত্র বলে অভিহিত করা যায়—কোনো এক বিখ্যাত সমালোচকের ভাষায়, **They are Psychological documents of haunting accuracy.**

এই সব পোর্ট্রেটগুলোতে যে রঙ ব্যবহার করা হয়েছে তা অত্যন্ত গম্ভীর—কালো, ব্রাউন, মাঝে-মাঝে কোবাল্ট নীল, কিংবা জমে-যাওয়া রক্তের লাল, এই সব। এই সব রঙ ও রেখা আসলে তার মডেলের বাইরের মুখের কোনো ভাব প্রকাশের জন্য নয়, অন্তরের অনুভূতি-অভিজ্ঞতার প্রতীক হিসেবে আসছে।

ককশ্‌কার ছবি অত্যন্ত নাটকীয়; প্রকাশভঙ্গিও অত্যন্ত নাটকীয়। তাঁর ছবির মধ্যে উত্তাল চোখ-ধাঁধানো বারোক-শিল্পের প্রতিধ্বনি শোনা যায়, ১৯১৪-র আগে যা অস্ট্রিয়াতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ বিষয়ে ককশ্‌কার নিজের মুখ থেকে শোনা যেতে পারে তাঁর বক্তব্য। ককশ্‌কা বলছেন : "আমি ১৮ শতকের এক্সপ্রেশনিস্টদের সাহিত্য দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলাম; বুশনারের 'উৎসেক্', ক্লাইস্টের 'পেন্থিসিলিয়া', ফার্ডিনাণ্ড রেইমাণ্ড-এর নীতিমূলক নাটক, নেস্ট্রয়ের ব্যঙ্গরচনা, এই সব বই আমার ধ্যান-জ্ঞান ছিল। ১৯ শতকের শেষ ভাগে অস্ট্রিয়ায় যে জন্মেছে তার পক্ষে স্বাভাবিক নীতিগত এবং সামাজিক যে-বিপ্লব আসতে চলেছে তার অবশ্যম্ভাবিতা মেনে নেওয়া। আমি বারোক ঐতিহ্যের ধারা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হলুম, কিংবা এটুকুই বলা ভালো যে, আমি মুগ্ধ হলুম এই শিল্পের দ্বারা। অস্ট্রিয়ান গির্জার যৌথগীত গাইতে-গাইতে দেখতুম গ্রানের সেই উজ্জ্বল দেয়ালচিত্র, ক্রেমসের শ্মিড্-এর কাজ; আমার সবচেয়ে ভালো লাগত কিন্তু মাউল্পের্টস্, তাঁর ছবিতে কেমন একটা অদ্ভুত ঠোঁট-কাটা ভাব ছিল, যেটা সবচেয়ে আকর্ষণীয় মনে হত আমার কাছে। এঁদের ছবি দেখে আমি সচেতন হলাম বাস্তবতা সম্মোহকের জাদু, রঙের তুলনায় কত কুৎসিত—আমি অস্ট্রিয়ান বারোক শিল্পীদের বেছে নিলুম গুরু বলে, ভুলে যেতে চাইলাম ইটালিয়ান-দের হার্মনির আদর্শ।"

ককশ্‌কার এই উক্তি থেকে আমরা লক্ষ করি তিনি সচেতনভাবে গ্রুপদী ইটালিয়ান-দের হার্মনির ধারণাকে বর্জন করছেন এবং বেছে নিচ্ছেন আদর্শ হিসেবে বাস্তব-অতিক্রমকারী পাথিক চিত্রাদর্শ।

১৯০৮—১৪ পর্যায়ের ছবিগুলিতে তাঁর "গথিক বমবাস্ট" লক্ষণীয়; ক্যানভাস থেকে যেন ঝাঁঝ উঠে আসছে, উঠে আসছে আর্তনাদ, আশঙ্কা, ভয়। এই সময়ে আঁকা "ঝড়" চিত্রে তিনি সমগ্র যুগের একটি প্রতীক চিত্র দিয়েছেন। ছবিটি হাতের কাছে না থাকায় উপস্থিত করতে পারলাম না, একটু বর্ণনা দিলেই বোঝা যাবে কী রকম ভাবে আঁকা হয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে শিল্পী এবং তাঁর প্রেমিকা, একটা নৌকোর ওপর, যেটা ঝড়ে ভেসে যাচ্ছে। মেয়েটি নিশ্চিন্তে, এই বিপদের সময়ও, পুরুষটির গায়ে হেলান দিয়ে স্থির এবং শান্ত, অন্যদিকে পুরুষটির চোখে-মুখে উদ্বেগ কিন্তু একই সঙ্গে—এই উপলব্ধি ফুটে বেরুচ্ছে তার যে মানুষ অসহায়। এদের ভেসে যাওয়া দেখলে অবশ্যই মনে পড়ে বারোক ছবির সেই সন্ন্যাসীদের বা দেবদূতদের যারা কোনো এক অপ্রতিরোধ্য শক্তির দ্বারা বাতাসে ভাসমান। আধুনিক চিত্রকলায় আর কোনো ছবিতে এমন সোজাসুজি মানুষের নিয়তি নিয়ে কথাবার্তা শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

ককশ্কার যে ছবিটি মুদ্রিত করলুম সেটি একটি ল্যান্ডস্কেপ। তিনি যে আবেগ দিয়ে তাঁর চরিত্র আঁকতেন সেই আবেগ দৃশ্যচিত্রেও পাওয়া যায়। তিনি কোনো দৃশ্য আঁকতে হলে সাধারণত দূর থেকে একটি উঁচু জায়গা বেছে নিতেন যেখান থেকে তাঁর বিষয়ের মূল কাঠামোটার সম্পূর্ণ ছন্দটা ধরা যায়। এই রীতিতেই তিনি লিয়ঁ, মার্সেই, লণ্ডন, প্যারিস, জেরুসালেম প্রভৃতি শহরের ল্যান্ডস্কেপগুলি এঁকেছেন।

শুদ্ধশীল বসু

॥ ৮ ॥

প্রত্যেক মানুষের দুটো চরিত্র থাকে; একটা তার দিনের বেলার চরিত্র, অন্যটা রাত্রির। বেড়ালের চোখের মতঃ দিনে একরকম, রাত্রে অন্যরকম।

এই কাহিনীতে যে ক'টি চরিত্র আছে তাদের মধ্যে পাঁচজনের নৈশ জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। হয়তো অপ্রত্যাশিত নতুন তথ্য জানা যাবে।

একটি রাত্রির কথা :

সাড়ে দশটা বেজে গেছে। নৃপতি নৈশাহার শেষ করে নিজের শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল। জোড়া-খাটের ওপর চওড়া বিছানা; তার বিবাহিত জীবনের খাট বিছানা। এখন সে একাই শোয়। শুয়ে বই পড়ে, বই পড়তে পড়তে ঘুম এলে বই বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দেয়।

আজ কিন্তু বই পড়তে পড়তে তার মন ছটফট করছে, পড়ায় মন বসছে না। প্রায় আধ ঘন্টা বইয়ে মন বসাবার বৃথা চেষ্টা করে সে উঠে পড়ল, আলো নিবিয়ে জানলার নীচে আরাম-চেয়ারে এসে বসল। আকাশে চাঁদ আছে, বাইরে জ্যোৎস্নার প্লাবন। সে সিগারেট ধরালো।

আজ কোন্ তিথি? পূর্ণিমা নাকি? হপ্তা দুই আগে নৃপতি যখন গভীর রাত্রে বেরিয়েছিল তখন কৃষ্ণপক্ষ ছিল, বোধ হয় অমাবস্যা। মানুষের মনের সঙ্গে তিথির কি কোনো সম্পর্ক আছে? একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমাতে বাতের ব্যথা বাড়ে, একথা আধুনিক ডাক্তারেরাও স্বীকার করেন। নৃপতি গলার মধ্যে মৃদু হাসল। বাতের ব্যথাই বটে।

'বাবু!'

নৃপতির খাস চাকর দিননাথ তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। নৃপতি পাশের দিকে ঘাড় ফেরাল। দিনু বলল, 'আপনার ঘুম আসছে না, এক কাপ ওভালটিন তৈরি করে দেব?'

নৃপতি একটু ভেবে বলল, 'না, থাক। আমি বেরুব, তুই শেষ রাত্রে দোর খুলে রাখিস।'

সেই সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নীচে নেমে গেল

'আচ্ছা, বাবু।'

দিনু প্রভুভক্ত চাকর; সে জানে, নৃপতি মাঝে মাঝে নিশাভিসারে বেরোয়, কিন্তু কাউকে বলে না। বাড়ির অন্য চাকর-বাকর ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে না।

দিনু চলে যাবার পর নৃপতি উঠে আলো জ্বালল; ওয়াড্রোব থেকে এক সেট্ ধূসর রঙের বিলিতী পোশাক বের করে পরল, পায়ে রবার-সোল জুতো পরল; স্টীলের কাবার্ড থেকে একটা চশমার খাপের মত লম্বাটে পার্স নিয়ে বুক-পকেটের ভিতর দিকে রাখল। তারপর ছফুট লম্বা আয়নায় নিজের চেহারা একবার দেখে নিয়ে আলো নিবিয়ে দিল। বাড়ির পিছন দিকে চাকরদের যাতায়াতের জন্যে ঘোরানো লোহার সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি দিয়ে নিঃশব্দে নীচে নেমে গেল।

নৃপতি কোথায় যায়? সে বিপত্নীক, তার কি কোনো গুপ্ত প্রণয়িনী আছে?

•

আর একটি রাত্রির কথা।

গোল পার্ক থেকে যে ক'টা সরু রাস্তা বেরিয়েছে তারই একটা দিয়ে কিছু দূরে গেলে একটা পুরনো দোতলা বাড়ি চোখে পড়ে; এই বাড়ির একতলায় গোটা তিনেক ঘর নিয়ে প্রবাল গুপ্ত থাকে। পুরনো বাড়ির পুরনো ভাড়াটে; ভাড়া কম দিতে হয়।

বাসাটি মন্দ নয়। কিন্তু প্রবালের প্রকৃতি একটু অগোছালো, তাই তার স্ত্রী মারা যাবার পর বাসাটি শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। সদরের বসবার ঘরে মেঝের ওপর শতরঞ্চি পাতা। দেয়াল ঘেঁষে এক জোড়া বাঁয়া-তবলা, হারমোনিয়ম এবং তাল রাখার একটা ছোট যন্ত্র। প্রবাল যে সঙ্গীত-শিল্পী, বাসায় এ ছাড়া তার অন্য কোনো নিদর্শন নেই।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় প্রবাল সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে হারমোনিয়ম নিয়ে বসেছিল। আজ সে নৃপতির আড্ডায় যায়নি। একটা গানে সুর লাগিয়ে তৈরি করছিল, আসছে হপ্তায় দমদমে গিয়ে সেটা রেকর্ড করতে হবে। সে নিজেই গানে সুর দেয়; আজ গানটাকে ঠিক রেকর্ডের মাপে তৈরি করছিল। তিন মিনিট কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে গান গেয়ে শেষ করতে হবে।

তালের যন্ত্রটাতে দম দিয়ে সে চালু করে দিল, যন্ত্রটা ঘড়ির দোলকের মতন কট্‌কট্ শব্দ করে দুলতে লাগল। প্রবাল পকেট থেকে স্টপ্-ওয়াচ্ বের করে হারমোনিয়মের ওপর রাখল, তারপর স্টপ্-ওয়াচের মাথা টিপে চালিয়ে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে গাইতে আরম্ভ করল, তার আঙুল খুব লঘু স্পর্শে

তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল

হারমোনিয়মের চাবির ওপর খেলে বেড়াতে লাগল।

গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্টপ্-ওয়াচ্ বন্ধ করল, দেখল তিন মিনিট একত্রিশ সেকেন্ড হয়েছে। সে তখন তালের যন্ত্রটাকে চাবি ঘুরিয়ে একটু দ্রুত করে দিয়ে আবার স্টপ্-ওয়াচ ধরে গাইতে শুরু করল।

এইভাবে প্রায় আধ ঘন্টা চলল। নিঃসঙ্গ গায়ক আপন মনে গেয়ে চলেছে।

দোরে খট্‌খট্ করে টোকা পড়ল। প্রবাল উঠে গিয়ে দোর খুলে দিল; একটা চাকর এক থালা অন্ন-ব্যঞ্জন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রবালের বাসায় রান্নাবান্নার কোনো ব্যবস্থা নেই; কাছেই একটা হোটেল আছে, সেখান থেকে দু' বেলা তার খাবার দিয়ে যায়।

চাকরটা শতরঞ্চির এক কোণে থালা রেখে চলে গেল। প্রবাল দোর বন্ধ করে সেইখানেই খেতে বসল। এমনিভাবে সে যেন দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছে। হয়তো দূর ভবিষ্যতের ওপর দৃষ্টি রেখে সে চলেছে, তাই বর্তমান সম্বন্ধে তার মন সম্পূর্ণ উদাসীন।

নৈশাহার শেষ করে প্রবাল বাসায় তালা লাগিয়ে বেরুল। মোড়ের মাথায় একটা পানের দোকান আছে, সেখানে গিয়ে পান কিনে মুখে দিল, একটা গোল্ড ফ্লেক সিগারেট ধরালো। প্রবাল নিজের কাছে সিগারেট রাখে না, পাছে বেশী খাওয়া হয়ে যায়; প্রত্যহ রাত্রে দোকান থেকে একটি সিগারেট কিনে খায়। যারা পেশাদার গাইয়ে, গলা সম্বন্ধে তাদের সতর্কতার অন্ত নেই। বেশী ধূমপান করলে নাকি গলা খারাপ হয়ে যায়।

পানের দোকানে একটি ছোট ট্রান্-জিস্‌টার গুনগুন করে গান গেয়ে চলেছে। প্রবাল শুনল, তারই গাওয়া একটি গানের রেকর্ড বাজছে। সে ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ নিজের গাওয়া গান শুনল, তারপর সিগারেট টানতে টানতে এগিয়ে চলল।

সাদার্ন অ্যাভেন্যু তখন জনবিরল হয়ে এসেছে। প্রবাল রবীন্দ্র সরোবরের রেলিং-এর ধার দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলল। তার মগজের মধ্যে কখনও গানের কলি গুঞ্জন তুলছে...প্রেমের সাগর দুলে দুলে ওঠে সখি...। কখনও একটা ক্রুদ্ধ ভোমরা ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে...দুনিয়ায় যার টাকা নেই সে কিসের লোভে বেঁচে থাকে?...

রবীন্দ্র সরোবরের রেলিং অনেক দূর এসে যেখানে পূব দিকে মোড় ঘুরেছে তার কাছাকাছি একটা খিড়কির ফটক আছে। প্রবাল সেই ফটক দিয়ে লেকের বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করল।

ঝিলিমিলি আবছা আলোর কিছু দূরে যাবার পর একটা গাছের তলায় শূন্য বেঞ্চি চোখে পড়ল। প্রবাল বেঞ্চিতে গিয়ে বসল, তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। তার গলার মধ্যে অবরুদ্ধ হাসির মত শব্দ হল।...

সে রাত্রে প্রবাল যখন বাসায় ফিরল তখন বারোটা বাজতে বেশী দেরি নেই। কলকাতা শহরের চোখ তন্দ্রায় ঢুলুঢুলু।

আর একটি রাত্রের কথা।

খড়্গ বাহাদুর আজ আড্ডায় যায়নি; তার কারণ তার বাড়িতেই আজ আড্ডা বসবে। অবশ্য অন্যরকম আড্ডা; অতিথিরাও অন্য। এইরকম আড্ডা মাসে দু' তিন বার বসে।

খড়্গ বাহাদুর একটি ছোট ফ্ল্যাটে থাকে। ছোট হলেও ফ্ল্যাটটি তার পক্ষে যথেষ্ট। সে একলা থাকে, সঙ্গী একমাত্র স্বদেশী সেবক রতন সিং। রতন সিং একাধারে তার ভৃত্য এবং পাচক, ভাল শিক-কাবাব তৈরি করতে পারে।

সামনের ঘরটি পরিপাটিভাবে সাজানো, দেখলেই বোঝা যায় অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি। মাঝখানে একটি তাস খেলার টেবিল ঘিরে গোটা চারেক গদি-মোড়া চেয়ার, মাথার ওপর এক শো ওয়াটের দু'টো বাল্ব জ্বলছে। এই টেবিলের সামনে একলা বসে খড়্গ বাহাদুর এক প্যাক্ তাস নিয়ে ভাঁজছিল। আরো দু'টো নতুন তাসের সীল-করা প্যাক্ পাশে রাখা রয়েছে। খড়্গ বাহাদুর অলসভাবে তাস ভাঁজছিল, কিন্তু তার মুখের ভাব কড়া এবং রুক্ষ। নৃপতির আড্ডায় তার যেমন হাসিখুশী মিশুকে ভাব দেখা যায়, বাড়িতে ঠিক তেমন নয়। বাড়িতে সে প্রভু। মধ্যযুগীয় প্রভু।

পৌনে আটটা বাজলে খড়্গ বাহাদুর ডাকল, 'রতন সিং!'

রতন সিং রান্নাঘরে ছিল, বেরিয়ে এসে প্রভুর সামনে দাঁড়াল। বেঁটেখাটো মানুষ, খাঁটি নেপালী চেহারা; ভাবলেশহীন তির্যক চোখে চেয়ে বলল, 'জি।'

খড়্গ বাহাদুর বলল, 'আটটার পরেই অতিথিরা আসবে। শিককাবাব কত দূর?'

রতন সিং বলল, 'জি, আধা তৈরী হয়েছে, আধা তৈরী হচ্ছে।'

খড়্গ বলল, 'তিনজন অতিথি আসবে। তারা সকলে এলে প্রথম দফা শিককাবাব দিয়ে যাবে, এক ঘণ্টা পরে দ্বিতীয় দফা দেবে। যাও।'

রতন সিং-এর মুখ দেখে নিঃসংশয়ে কিছু বোঝা যায় না; তবু সন্দেহ হয়,

মালিকের অতিথিদের সে পছন্দ করে না। সে রান্নাঘরে ফিরে গিয়ে আবার শিক-কাবাব রচনায় মন দিল। মালিক যা করেন তাই অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে হয়, কিন্তু জুয়া খেলে টাকা ওড়ানো ভাল কাজ নয়। দেশ থেকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা আসে, অথচ মাসের শেষে এক পয়সাও বাঁচে না।

বাইরের ঘরে তাস ভাঁজতে ভাঁজতে খড়্গ বাহাদুর ভাবছিল—আজ যদি হেরে যাই, রক্তদর্শন করব।

গত কয়েকবার সে ক্রমাগত হেরে আসছে।

আটটার সময় একে একে তিনটি অতিথি এল। তিনজনেই যুবক, সাজ-পোশাক দেখে বোঝা যায়, তিনজনেই বড়মানুষের ছেলে। একজন সিন্ধী, দ্বিতীয়টি পাঞ্জাবী তৃতীয়টি পার্শী।

সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণের পর সকলে টেবিল ঘিরে বসল। রতন সিং চারটি প্লেটে প্রায় সের খানেক শিক কাবাব এনে রাখল; সঙ্গে রাইবাটা এবং ছুরি কাঁটা।

কথাবার্তা বেশী হল না, চারজন প্লেট টেনে নিয়ে ছুরি কাঁটার সাহায্যে খেতে আরম্ভ করল। রতন সিং-এর শিককাবাব অতি উপাদেয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই চারটি প্লেট শূন্য হয়ে গেল। সকলে রুমালে মুখ মুছে সিগারেট ধরাল। পার্শী যুবকও সিগারেট খায়, আধুনিক যুবকেরা ধর্মের নিষেধ মানে না।

তারপর সাড়ে আটটার সময় তাসের নতুন প্যাক্ খুলে খেলা আরম্ভ হল। তিন তাসের খেলা, জোকার নেই। নিম্নতম বাজি পাঁচ টাকা, উর্ধতম বাজি কুড়ি টাকা।

চারজনেই পাকা খেলোয়াড়। কিন্তু

খড়্গ বাহাদুর বেরিয়ে গেল

রানিং ফ্লাশ্ খেলায় ক্রীড়া-নৈপুণ্যের বিশেষ অবকাশ নেই, ভাগ্যই বলবান। কদাচিৎ ব্লাফ্ দিয়ে দু' এক দান জেতা যায়। আসলে হাতের জোরের ওপরেই খেলার হারজিত।

সাড়ে দশটার সময় আর এক দফা শিক-কাবাব এল। এবার মাত্রা কিছু কম। সঙ্গে কফি। পনরো মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ করে আবার নতুন তাসের প্যাক খুলে খেলা আরম্ভ হল।

খেলা শেষ হল রাত্রি সাড়ে বারোটায় সময়। হিসেবনিকেশ করে দেখা গেল, অতিথিরা তিনজনেই জিতেছে, খড়্গ বাহাদুর হেরেছে প্রায় সাত শো টাকা।

অতিথিরা হাসিমুখে সহানুভূতি জানিয়ে চলে গেল। খড়্গ বাহাদুর অন্ধকার মুখে অনেকক্ষণ একলা টেবিলের সামনে বসে রইল, তারপর হঠাৎ উঠে শোবার ঘরে গেল। বেশ পরিবর্তন করে মাথায় একটা কাউ-বয় টুপি পরে বেরিয়ে এল। রতন সিংকে বলল, 'আমি বেরুচ্ছি। যতক্ষণ না ফিরি, তুমি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জেগে থাকবে।'

রতন সিং বলল, 'জি।'

খড়্গ বাহাদুর বেরিয়ে গেল। রতন সিং-এর মঙ্গোলীয় মুখ নির্বিকার রইল বটে কিন্তু তার ছোট ছোট চোখ দুটি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। মালিক আজও হেরেছেন। তাস খেলায় হেরে মালিক কোথায় যান? ফিরে আসেন সেই শেষ রাত্রে। কখনও আটটার আগেই বেরিয়ে যান, ফিরতে রাত হয়। কোথায় থাকেন? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান? কিংবা—

আর একটি রাত্রির কথা।

কাঁপলের বাড়িতে নৈশ আহার শেষ হয়েছিল। কর্তা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন; কাঁপলের ছোট দুই ভাইবোনও নিজের নিজের ঘরে চলে গিয়েছিল। ড্রয়িং-রুমে এসে বসেছিল কাঁপল, তার দাদা আর বউদিদি এবং তার দিদি ও জামাই-বাবু। কর্তা বিপত্নীক, পুত্রবধূই বাড়ির গিন্নি। মেয়ে জামাই দার্জিলিঙে থাকে, জামাইয়ের চায়ের বাগান আছে; আজ সকালে কয়েক দিনের জন্যে তারা কলকাতায় এসেছে।

কাঁপলদের বাড়িটা তিনতলা। নীচের তলায় একটা বড় ব্যাঙ্কের শাখা, উপরের দু'টি তলায় কাঁপলেরা থাকে। সবার উপরে প্রশস্ত খোলা ছাদ।

ড্রয়িং রুমে যাঁরা সমবেত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কাঁপলের দাদা গোতমদেব বয়সে বড়। পৈতৃক সলিসিটার আফিসের তিনি এখন কর্তা। অত্যন্ত নির্লিপ্ত প্রকৃতির লোক; বাড়িতে কারুর সাতে-পাঁচে থাকেন না। তাঁর স্ত্রী রমলার প্রকৃতি কিন্তু অন্যরকম। তার বয়স ত্রিশের বেশী নয়, কিন্তু সে বুদ্ধিমতী, গৃহকর্মে নিপুণা, সংসারের কোনো ব্যাপারেই নির্লিপ্ত নয়। উপরন্তু তার বুদ্ধিতে একটু অম্লরস মেশানো। আছে, বাড়ির সকলেই তার কাছে একটু সতর্ক হয়ে থাকে।

কাঁপলের দিদি আলোকার বয়সও

আন্দাজ ত্রিশ। তার সাত বছরের একটিমাত্র ছেলে স্কুলের বোর্ডিং-এ থাকে। অশোকার চরিত্র সম্বন্ধে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সে বড়মানুষের মেয়ে, বড়মানুষের বউ। পৃথিবীর অধিকাংশ জীবকেই সে করুণার চক্ষে দেখে, কারুর সঙ্গে বেশী কথাবার্তা বলে না।' তার স্বামী শৈলেনবাবু কিন্তু মজলিসী লোক; আসর জমিয়ে গল্প করতে ভালবাসেন, তর্ক করার দিকে ঝোঁক আছে এবং সুযোগ পেলে অযাচিত উপদেশও দিয়ে থাকেন।

তিনি প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত একটি পাইপের মুণ্ড মুঠিতে ধরে ধূমপান করছেন। গৌতমদেব একটি মোটা সিগারেট ধরিয়েছেন। কপিলের নাকে তামাকের সুগন্ধ ধোঁয়া আসছে; কিন্তু সে গুরুজনদের সামনে ধূমপান করে না, তাই নীরবে বসে উস্‌খুস্‌ করছে। বাড়ির নিয়ম নৈশাহারের পর সকলে অন্তত পনেরো মিনিটের জন্যে একত্র হবে। আগে কর্তাও এসে বসতেন; এখন তাঁর বয়স বেড়েছে, খাওয়ার পরই শুয়ে পড়েন। বাড়ির অন্য সকলের জন্যে কিন্তু নিয়ম জারি আছে।

জামাই শৈলেনবাবু পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কপিলকে নিরীক্ষণ করছিলেন, গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন, 'কপিল, তুমি কি নাম-মাহাত্ম্যে সাধু সন্নিসি হয়ে যাবার মতলব করেছ?'

কপিল সমান গাম্ভীর্যের সঙ্গে উত্তর দিল, 'আপাতত সে রকম কোনো মতলব নেই।'

শৈলেন বললেন, 'তবে বিয়ে করছ না কেন? সংসার ধর্ম করতে গেলে বিয়ে করা দরকার। তোমার বিয়ে করার উপযোগী বুদ্ধি না থাকতে পারে কিন্তু বয়স তো হয়েছে।'

কপিল ভ্রূ একটু তুলে বলল, 'বিয়ে করার জন্যে কি খুব বেশী বুদ্ধি দরকার?'

রমলা হেসে উঠল। কপিল ও শৈলেনবাবুর মধ্যে গাম্ভীর্য-ঢাকা গূঢ় পরিহাসের সঙ্গে বাড়ির সকলেই পরিচিত। রমলা বলল, 'বিয়ে করার জন্যে যদি বেশী বুদ্ধির দরকার হত তাহলে বাংলাদেশে কারুর বিয়ে হত না। আসলে ঠিক উলটো। ঠাকুরপোর বড্ড বেশী বুদ্ধি, তাই বিয়ে হচ্ছে না।'

'তাই নাকি।' শৈলেনবাবু অবিশ্বাস-ভরা চক্ষু বিস্ফারিত করে কপিলের পানে চাইলেন, 'এত বুদ্ধি কপিলের! কিন্তু আর একটু পরিষ্কার করে না বললে কথাটা হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না।'

রমলা বলল, 'ওকেই জিজ্ঞেস করুন না। আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই, তবু ও বিয়ে করে না কেন।'

শৈলেনবাবু প্রতিধ্বনি করলেন, 'কেন?'

কপিল পকেটে হাত দিল, সিগারেটের কেস হাতে ঠেকল, কেসটা অজ্ঞাতসারে বার করে আবার সে পকেটে রেখে দিল।

গৌতমদেব উঠে পড়লেন, 'আমি উঠলাম, কাল ভোরেই আবার আমাকে—' কথা অসমাপ্ত রেখে তিনি প্রস্থান করলেন। নিজের উপস্থিতি দ্বারা কারুর অসুবিধা ঘটাতে তিনি চান না।

কপিল জামাইবাবুকে লক্ষ্য করে বলল—'বিয়ে করা একটা সিরিয়স কাজ এ কথা আপনি মানেন?'

শৈলেনবাবু নিজের গৃহিণীর প্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টিপাত করে বললেন—'মানি বইকি। খুব সিরিয়স কাজ।'

অশোকা সূক্ষ্ম হাস্যরস বোঝে না, কিন্তু খোঁচা দিয়ে কথা বললে যত সূক্ষ্ম খোঁচাই হোক ঠিক বুঝতে পারে। সে স্বামীর দিকে বিরক্তিসূচক কটাক্ষ হেনে বলল—'আমি শুতে চললুম। বাজে কথার কচকচি শুনতে ভাল লাগে না।'

অশোকা চলে যাবার পর কপিল পকেট থেকে সিগারেট বার করে রমলাকে বলল—'বউদি, সিগারেট খেতে পারি!'

রমলা বলল—'আহা ন্যাকামি দেখে বাঁচি না। অমার সামনে যেন সিগারেট খাও না।'

কপিল বলল—'খাই, কিন্তু অনুমতি নিয়ে খাই।'

রমলা বলল—'আচ্ছা, অনুমতি দিলুম, খাও।'

কপিল সিগারেট ধরাল। তারপর শালা-ভগিনীপতির তর্ক আবার আরম্ভ হয়ে গেল। রমলা ঠোঁটের কোণে কৌতুক-হাসি নিয়ে শুনতে লাগল।

কপিল বলল—'বিয়ে করা যখন সিরিয়স ব্যাপার তখন খুব বিবেচনা করে বিয়ে করা উচিত।'

শৈলেনবাবু বললেন—'অবশ্য, অবশ্য। কিন্তু কী বিবেচনা করবে?'

'বিবেচনা করতে হবে, আমি কি চাই।'

'কী চাও তুমি? রূপ? গুণ? বিদ্যা? বুদ্ধি?'

'রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি থাকে ভাল, না থাকলেও আপত্তি নেই। আসলে চাই—মনের মিল।'

'হুঁ, মনের মিল। কিন্তু বিয়ে না হলে বুঝবে কি করে মনের মিল হবে কিনা।'

'ওইখানেই তো সমস্যা। তবে আজকাল স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে মেয়েদের মন বুঝতে বেশী দেরি হয় না।'

রমলা বলল—'তুমি তা হলে মেয়েদের মন বুঝে নিয়েছ?'

কপিল বলল—'তা বুঝে নিয়েছি। কিন্তু বুঝলেই যে পছন্দ হবে তার কোনো মানে নেই।'

রমলা বলল—'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

শৈলেনবাবু বললেন—'তা হলে যতদিন মনের মতন মন না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন অনুসন্ধান চলবে?'

কপিল মুচকি হাসল, উত্তর দিল না।

শৈলেনবাবু সন্দিগ্ধস্বরে বললেন—'আসল কথাটা কি? ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ না তো?'

'তার মানে?'

'মানে কোনো সধবা কিংবা বিধবা যুবতীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়নি তো?'

কপিল চকিত চোখে চাইল, তারপর উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল, বলল—'বউদি, জামাইবাবুর মাথা গরম হয়েছে। ঠাণ্ডা দেশ থেকে গরম দেশে এসেছেন, হবারই কথা। তুমি ওঁর জন্যে আইস্‌-ব্যাগের ব্যবস্থা কর, আমি শুতে চললাম।'

হাসি-মস্করার মধ্যে রাত্রির মত সভা ভঙ্গ হল। কপিল নিজের ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করল।

(ক্রমশ)

পরিতৃপ্তির নতুন জগতে পাড়ি দিন
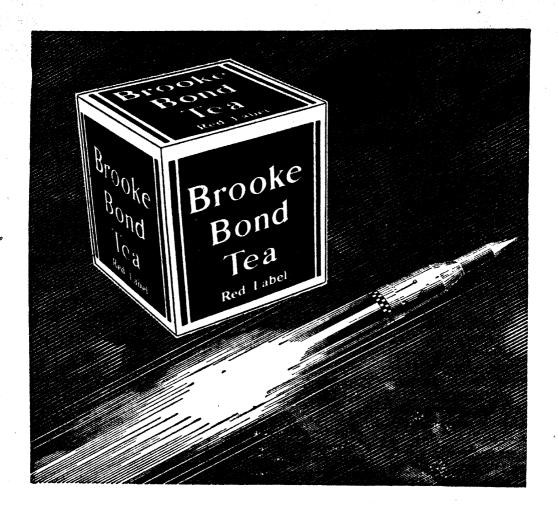
মন-মেজাজ চাঙ্গা করতে হলে চাই ব্রুক বণ্ড রেড লেবেল চা। প্যাকেট পিছু ঢের বেশী কাপ মনের মত চা পাবেন। ব্রুক বণ্ড রেড লেবেলের অপূর্ব স্বাদগন্ধ আপনাকে পরিতৃপ্তির এক নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাবে।

BB 3675 A

খদ্দেরদের টোকেন দিচ্ছেন মালিক বিশ্বনাথ শাস্ত্রী

দিল্লিতে জায়তে

আপনারাও খেয়েছেন কলকাতায়, যেমনি আমাদের অনেকেই তার স্বাদ পেয়েছেন দিল্লী শহরে—কিনা, তিন ফুট লম্বা কফি। একেবারে জিভ্-পোড়া গরম গরম কফি।

সন্দেহ নেই, এটা হল মাদ্রাজী কফি, গেলাস থেকে বাটিতে ক্রমাগত ঢালাঢালি করে ফেনা সমেত গ্রাহকের হাতে দিয়ে দেওয়া, ঠিক যেমনি ফেনাসমেত আপনারা-আমরা পান করি "এসপ্রেস্সো" (অর্থাৎ তুরন্ত) কফি।

"নালে ইড্লি কোড়ু" (চারটে ইড্লি দাও গো); "রেন্দো কফি" (দুটো কফি); "উক্মা ইড়িকা?" (উক্মা আছে?); "উক্মা ইল্লাই" (উক্মা নেই); "স্বামী। তান্নি, তান্নি" (ও মশাই, জল); "আরে ভাই! এক দোসা দেও জেরা জল্দি; "মিস্টার! ডু ইউ হেভ্ বড়াই?" এমনি কতো কোলাহল ছোট্ট একটি মাদ্রাজী রেস্তোরাঁয়, যেখানে আছে মাত্র গুটি কয়েক চেয়ার, একটা বেঞ্চি আর একটিমাত্র টেবিল। অথচ গ্রাহকের কী ভিড়! ডেপুটি সেক্রেটারি থেকে কেরানীবাবু, সাংবাদিক, সেলস্‌ম্যান্, চাপরাসী—কে নয়?

স্থানটি হল এখানকার প্রেস্ ট্রাসট্ অব্ ইন্ডিয়ার হেড্ অফিসের পেছনটায়। লম্বা লম্বা ইউকালিপটাস্, নিম্ আর একটি শিশুগাছ মাথা তুলে দিনের পর দিন দেখছে বৃদ্ধ বিশ্বনাথ শাস্ত্রীর রেস্তোরাঁ, যিনি স্বাধীনতার সংগে সংগে এসেছেন রাজধানীতে সুদূর তিনেভেলি জেলার কাল্লাক্কাড় গ্রাম থেকে, ইড্লি-দোসা-বড়া-উক্মা, বাদাম হালুয়া, ঝাংগুছি (অমৃতি), এবং পোংগাল্ (এক ধরনের শুক্‌নো খিচুড়ি) ইত্যাদি নিয়ে।

প্রথম ছিল তাঁর রেস্তোরাঁ জন্তর-মন্তর রোডে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পাশের জায়গায়। কিন্তু ১৯৬৫ সনে ঐ বাড়িটা সরকার বাহাদুর ভেঙে দেয় আরো বড় বাড়ি তৈরির উদ্দেশ্যে। শাস্ত্রী মশায় অকস্মাৎ বেকার। তখন পি-টি-আই সংবাদ সরবরাহ সংস্থা থেকে তাঁকে সাদর আহ্বান জানানো হয় এবং কিছুদিন বাদেই গাছের নিচে একটা টিনের চালায় উনি খুললেন তাঁর দোকান।

এতো হাতযশ রান্নার যে, দোকান জমতে দেরি হল না। মাদ্রাজীরা তো বটেই, পানজাবী, বাঙালী, মালয়ালী, উত্তর ভারতী সবাই এল ভিড় করে। অতি সামান্য রেস্তোরাঁ, আরো সামান্য তার মালিক, কিন্তু তার দোসার গন্ধ ছড়িয়ে গেছে যোজনা ভবনে, রিজার্ভ ব্যাংক ভবনে ও আশেপাশের সমস্ত অফিসে। বড়বাবুরা আসেন গাড়ি করে, অনেকে রেল ভবন আর কৃষি ভবন থেকে। এবং গাড়ির এতো ভিড়, বিশেষত একটা থেকে দুটোর ভিতর যে, পি-টি-আই কর্তৃপক্ষ নোটিস ঝুলিয়ে দিল: "দয়া করে গাড়ি বাহিরে রাখিবেন।"

দেবদ্বিজে বিশ্বাসশীল বিশ্বনাথ শাস্ত্রী, বামুনের ছেলে, একদা কাজ ছিল পুরোহিতের। হয়তো বামুন বলেই বরাবর খাবারের দিকে ছিল একটা অদম্য ঝোঁক এবং নিজেও হয়ে গেলেন রন্ধন-পারদর্শী। বয়েস আজ ৫৫, খোঁচা খোঁচা পাকা চুল মাথায় আর গালে। কপালে ফোঁটা, কানে কান পাথর। পরনে লুংগি, গায়ে পানজাবি আর চাদর। সারাদিন বসে একটা বেঞ্চিতে। পাশে ক্যাশ বাক্স, একটা পানের বাটি, আর অনেকগুলো প্ল্যাস্টিকের গোল গোল টোকেন্। মাথার উপর বাতাসে দোলে ইউকালিপ্টাসের গাছ—চামড়া-ওঠা হালকা বাদামী ঢ্যাঙা গাছ যার চিরল চিরল পাতায় বাসা বেঁধেছে হাওরা।

কথা বলার সংগে সংগে শাস্ত্রীজী পোঁটলা খুলে বের করলেন বহুকাল আগে লেখা একটা খবরের কাগজের কাটিং। কাচ দিয়ে বাঁধানো আর পর পর তিনটে প্ল্যাস্টিকের ঠোঙায় ঢোকান।

প্ল্যাসটিকের লাল টোকেন হল কফি, দাম ৩৫ পয়সা; গোলাপী ২৫ পয়সা, সবুজ ১৫ পয়সা, সাদা ১০ পয়সা। টোকেন কিনে নিয়ে পাঁচ হাত দূরে টিনের চালায় যান (যেখানে আগে থাকত সাইকেল্)
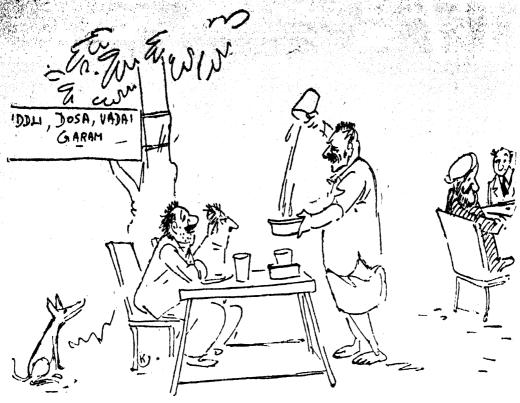
জিভ-পোড়া গরম তিন ফুট লম্বা কফি

চেঁচামেচি করে হাতে নিন আপনার খাবার, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে অনেক বক্‌বক্‌ করে খেয়ে যান পেটপুজোয়। পাঁচ পাঁচটি কর্মচারী খেটে ঘেমে যাচ্ছে।

দশবার না বললে তাদের কানে কথাই যায় না। এবং মাদ্রাজীরা কী পরিমাণ কাজ করতে পারে, এদের না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

ভাঁজ করে পরা লুংগি, একটি শার্ট। একটিক্ষণ বিশ্রাম নেই। একটানা একটা কাজ করছেই। দেখা শোনার ভার নিয়েছে শাস্ত্রীর ছেলে অনন্তনারায়ণম্। মাত্র ১৯ বছর বয়েস, ম্যাট্রিক পাস করে নিয়েছে বাবার কাজ। "হ্যাঁ, আমিও যাচ্ছি এই রেস্তোরাঁ ব্যবসায়। আরো বড় করব, ভাল করব, এই হল আকাঙ্ক্ষা। অনন্তনারায়ণম্ বাবার মতো নয়। সে প্যান্ট পরে, গায়ে তার টেরিলিনের বুশশার্ট, পায়ে জুতো।

বলে ঃ "আমরা চার ভাই এক বোন। আমি হলাম বড়। বাসা রাজেন্দ্রনগরে ছোট্ট দুটি ঘর নিয়ে। মা আছেন।"

"রান্না ভাল করে কে? বাবা, না মা?"

"নিঃসন্দেহে বাবা। তাঁর কী নাম আপনারা জানেন না। অদ্ভুত তাঁর ইড্‌লি, দোসা। না খেলে কী করে বুঝবেন? ওটা একটা আর্ট, হয়তো জানেন।"

সাদাসিধে ইড্‌লি-দোসা, যারা আজ ছড়িয়ে গেছে গোটা দেশে। তন্দুরি মুরগি নয়, রোগান্‌জোস্ নয়, জুম্মা মসজিদের শিক্‌কাবাব্ নয়। নেহাত আটপৌরে ইড্‌লি-দোসা। যেমনি আটপৌরে হল মাদ্রাজীদের চেহারা-ছবি। অথচ গুণে একেবারে মাদ্রাজী। আট-দশ আনার খাবার খেলে মনে হয়, এক হপ্তা আর না খেলেও চলবে। দেখুন না শাস্ত্রী মশায়ের দাম ঃ

ইড্‌লি ৩০ পয়সা; দোসা ঐ দাম; কফি ৩৫; চা ২০; উক্‌মা ৪০; দহি-বড়া ৪০। পায়সম্ নেই। দিল্লীতে চলে না। সপ্তাহে প্রতি মংগলবার হল ইড্‌লি দিবস শাস্ত্রীর রেস্তোরাঁয়। প্রায় হাজারখানেক বিক্রি হয় ঐ দিন।

বুড়ো শাস্ত্রী তামিলে বললেন (পি টি আই-এর এক বন্ধু তর্জমা করেন) ঃ "কী বলব বল? দিনকাল কী মন্দ! জিনিসের কী দাম? লোকে খাবে কী? আমিই বা কী দেব? চাল নেই, চিনি নেই...সব কিছুই নেই, নেই!"

পি টি আই সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিপক্ষ হল প্রতিযোগী ইউ-এন-আই। একই পাড়ায়। প্রতিযোগিতা এতো গভীর যে, ইউ-এন্‌-আই এই সেদিন ভাগিয়ে নিয়েছে শাস্ত্রীর পাচকপ্রধানকে। তারা নিজেরাও খুলেছে একটা ক্যান্‌টিন্।

বলে অনন্তনারায়ণম ঃ "তা হলে কী হবে? আমার বাবাকে তো আর ভাগিয়ে নিতে পারেনি?"

খগেন দে সরকার

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

একুশ

দেখতে দেখতে হাটের মধ্যে এসে পড়ি। রাতের ধন্দ আমার চোখে। বুঝতে পারি না, কোথা দিয়ে কোথায় আসি। দু একটা ঘর পেরিয়েই হাতের কাছে দেখি সেই গাছ। কালো ছায়া তার নিচে। সেখান থেকে সামনে নারায়ণ ঠাকুরের মহামায়া হিন্দু হোটেল। দাওয়া শূন্য। ঘরেও কেউ আছে বলে মনে হয় না। ঘরের মাঝখানে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে।

আমরা দুজনেই দাওয়ায় উঠে যাই। সেই সময়ে ঘরের দেয়ালের কাছে একটা ছায়া নড়ে উঠতে দেখি। ছায়া উঠে দাঁড়ায়। কায়ার গায়ে আলো; কায়ার মুখেও আলো পড়ে। কায়ার শিথিলবাস শাড়ি। তাড়াতাড়ি সাব্যস্ত করে। খোলা চুল দু হাতে টেনে ধরে, তাড়াতাড়ি পিছনে আঁটে। মনে হয়, এ মুখ যেন চিনি-চিনি। মুখখানি গম্ভীর। চোখ দুটি একটু খর বটে। এখন যেন একটা স্বপ্ন-ভাঙা চমকের মত অচেনা দৃষ্টিতে চোখাচোখি করে। আমি যে অচেনা ভিনদেশী, নজরে তার সেই খবর। আপাদমস্তক দেখে সে মুখ ফেরাতে যায়।

তখনই গাজীর গলা শোনা যায়, 'দুলি ঠাকরুন না!'

গাজী তার মুখ বাড়িয়ে আনে। মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে যেন একটু অবাক হয়, চমক খায়। তারপরে বলে, 'অ, তুমি।'

ততক্ষণে আমার মনে পড়ে যায়, এ সেই পুকুরধারের দুলি। এ সেই অনন্তর দুলি। কিন্তু সে তার ঘর ছেড়ে এই সময়ে নারায়ণ ঠাকুরের ভোজনালয়ে কেন।

গাজীও সেই কথাই বলে, 'তুমি যে এখন এখানে?'

দুলি চকিতে একবার ভিনদেশীকে দেখে নেয়। বারেক যেন নাকের পাটায় নাকছাবি কেঁপে যায়। অনেকটা নির্বিকার গলাতেই বলে, 'অই এসেছিলাম নারায়ণদাকে একটা কথা বলতে। রাত্রে মাংস আর ভাত রান্না করে পাঠাবার কথা ছিল। বলতে এসেছিলাম, পাঠাবার আর দরকার নেই।'

গাজী বলে, 'কেন গো ঠাকরুন, আজ কি খাওয়া-দাওয়া নাই?'

দুলি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'নাঃ, শরীরটা ভাল লাগছে না। আজ আর কিছু খাব না। তা ভাবলাম, বলে শুয়ে পড়ব গিয়ে। এসে দেখি, কেউ নেই।'

'কেউ নাই? ফোঁচা, ফোঁচার বউ?'

'কই, কারুরেই তো দেখি না। খালি দেখি, ফোঁচাদার একটা ছেলে বসে রয়েছে ভেতরে। জিজ্ঞেস করলাম, বলে, "কী জানি, জানি না।" তাই বসে আছি। না বলে গেলে ফোঁচাদাকে দিয়ে আবার কাঁড়ি খানেক ভাত মাংস পাঠিয়ে দেবে, সব ফেলে দিতে হবে।'

বলে দুলি আবার একবার ভিনদেশীর দিকে চায়। এবার শুধু নজরে তার অচেনার খবর নয়। এবার কৌতূহল, এবার জিজ্ঞাসা। সোজা নজরে নয়, একটু বাঁকা চালের নজর। তারপরে দেখ, মুখ ফেরাতে গিয়ে আলগা চুলের বাঁধন আবার খুলে যায়। আবার হাত তুলে টেনে চুল বাঁধে। তাতে শরীরে কেন দোলা লেগে যায়, পায়রার মত কেন ঊর্ধ্বাঙ্গে বাঁক লেগে ঢেউ খেলে যায়, তা জিজ্ঞেস ক'রো না। জীবনযাপনের একটা চাল আছে তো। পেশা বল, জীবিকা বল, তার একটা

ছাপ ফোটেই। তা সে যখন যেখানে যেমনভাবেই হোক। চোগা চাপকান না থাকলেও দেখলে উকিলের বাত বোঝা যায়। বুক দেখার নল না থাকলেও ডাক্তারের ধরতাই ধরতে পারবে। দারোগার চাল বুঝবে, পণ্ডিতের বুলি ধরতে পারবে। দুলিকে তার থেকে বাদ দেওয়া যায় না। গড়ে নয়া মানুষ, তার ভোজনালয়ে। জীবিকার ভাবভঙ্গি উঁকি না দিয়ে যায় কেমন করে। তা সে ঘণ্টা কয়েক আগে প্রাণের ঘরে জ্বলুনি পোড়ানি যতই হোক।

তবে যদি নজর করে দেখ, দেখবে, খর চোখের কোণ যেন কেমন উথলানো, ফোলা-ফোলা। চোখের অনেক জল গলেছে বুঝি। এখন যে একটু নজর করে, নজর কাড়ার ছল, তার ওপারে দেখ, পাখিটার চোখের সামনে যেন সন্ধ্যা। রাতের অন্ধকার নামে, তাই সুখ নেই, ডাক নেই, গান নেই। আছে শুধু বিবন্নতা।

তবু ভিনদেশীটার চোখ ফিরে আসে। দুলির চোখের নিঃশব্দ জিজ্ঞাসাবাদ বড় স্পষ্ট কিনা। যেন প্রায় গলার স্বরে শোনা যায়, 'অচেনা লাগে। ফিকির কী?'

গাজী তখন হেসে জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু মাংস আজ পাবে কমনে গো ঠাকরুন? হাটের দিন তো না, বসির কি খাসী পাঁঠা কিছু কেটেছে নাকি?'

দুলি হাসে না, ঠোঁট উলটায়। তাতে যেন মেয়েকে কেমন ঠ্যাকারে ঠ্যাকারে লাগে। বলে, 'না, খাসী পাঁটা নয় রামপাখির মাংস রাঁধতে বলা হয়েছিল।'

গাজী অমনি আওয়াজ দেয়, 'অই বাবা। ভর তো বেশ ভাল খ্যাটনের বাওস্থা ছিল আজ। তা অমন খ্যাটন ছেড়ি একেবারি উপোস কেন?'

দুলি ভুরু কোঁচকায়। নাকচাবি কাঁপে। মুখ ফিরিয়ে বলে, 'অই যে বললাম, শরীর খারাপ। কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না।'

বলে সে এগিয়ে গিয়ে ভিতর-দরজার দিকে যায়। গাজী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে 'অই গো ঠাকরুন, আমার তো ঘরের মধ্যে যাওয়া নিষেধ। একখান চ্যার দ্যাও দিনি বাবুকে বসতি দেই।'

এবার আমার টনক নড়ে। বলে উঠি, 'না না, থাক না, আমিই নিয়ে আসছি।' বলে ঘরে পা বাড়াতে যাই। দুলি ততক্ষণে একটা চেয়ার তুলে নিয়েছে। দরজার কাছে আসতে আসতে আবার চোখ তুলে চাওয়া। চোখে সেই অনুসন্ধিৎসা। চেয়ারখানি আনতে আনতে হাতে হ্যারিকেনটা তুলে নিতে ভোলে না। সে দরজার কাছে আসতেই তার হাত থেকে চেয়ার তুলে নেয় গাজী। দেওয়াল ঘেঁষে পেতে দিতে দিতে বলে বসেন, বাবু। ঠাকুরমশাই বা ফোঁচা এলি হাত মুখ ধোবার জল দিতি বলি।'

দুলি তখন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে, হাতের বাতি দিয়ে দাওয়ায় আলো ফেলে। গাজীর দিকে একবার জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। তারপর হ্যারিকেনটা দরজার কাছে রেখে ঠোঁট টেপে, ভুরু টান করে। ঘরের মধ্যে চলে যায়।

এমন সময় ভিতরের দরজার কাছে সেই ডিগডিগে শরীরের ভিতর থেকে মোটা গলা শোনা যায়, 'ওখেনে কে?'

আগে সাড়া দেয় দুলি, 'আমি গো, নারাণদা।'

নারায়ণ ঠাকুরের স্বর এগিয়ে আসে

ঘরের মধ্যে। শোনা যায়, 'কে, দুলি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'এই দেখ, আমি আবার তোমার ঘর থেকে ঘুরে এলাম।'

'ও মা কেন?'

'একটু মোচলমানপাড়ায় গেছলাম কিনা। টংকোদের বস্তিতে তো আজ শুয়োর মেরেছে, পচুই টচুই খেয়ে, সব যে যার তালে আছে। ভাবলাম, ও ব্যাটারা তো আজ আর মুরগি দিতে পারবে না। এদিকে সুস্থ না হলে মুরগি খোঁয়াড়ে ঢুকবে না। তাই বেলা পড়তে মোচলমান-পাড়ায় গেলাম। ভাল জিনিসই পেয়েছি। আসবার পথে তোমাকে দেখিয়ে আনব বলে গেলাম। তা দেখি ঘর বন্ধ, আবার যা শুনলাম—।' নারায়ণ ঠাকুর কথা শেষ করতে পারে না। দুলি বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, আমিও তোমাকে সেই কথাই বলতে এসেছি। মাংস-ভাতের আর দরকার নাই, নারায়ণদা।'

একটু চুপচাপ। তারপর নারায়ণ ঠাকুরের গলা শোনা যায়, 'তা বেশ তো, তোমার আর অনন্তর, দুজনের জন্যে বলেছিলে। সে না খায়, তুমি খাবে তো? এখন আবার ঘরে গিয়ে আথায় আগুন দেবার দরকার কী?'

দুলির গলায় এমনিতে যেন টানা তারের ঝংকার। সুর চড়া নয়, তীক্ষ্ণতা বাজে। এখন যেন কেমন একটু শিথিল হয়ে পড়ে সেই টানা তার। বলে, 'না নারাণদা, নিজের জন্যে রাঁধব না। খিদে-টিদে নাই। আমি আজ রাতে আর কিছু খাব না কো। পাখিটা কেটে-কুটে আন নাই তো?'

নারায়ণ ঠাকুরের মোটা গলার সুরটাও যেন কেমন বেসুরো বাজে। ঠেক খেয়ে খেয়ে বলে, 'না, তা মারা হয় নাই। পাখি তো ফোচাই মারে।'

দুলির গলা শোনা যায়, 'তবে আর মেরো না। তুমি যদি না রাখ, অন্য কারুকে বেচে দিও, না তো আমিই কাউকে বেচে দিতে পারি।'

নারায়ণ বলে, 'আহা না, সে কথা হচ্ছে না—।'

কথাটা যেন তার শেষ হয় না। তবু চুপ করে যায়। খানিকক্ষণ আর কোন কথা শোনা যায় না।

বিষয়টা এবার অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে যায়। বায়না ছিল দুলির, আজ রাত্রে তার আর অনন্তর জন্যে মাংস-ভাতের। আজ ছিল তার নিজের ঘরে অরন্ধন। খাবার আসতো বাইরে থেকে। ঘরে তাদের, কথা ছিল দুহুঁ দোঁহার রঙ্গে যাবে। কিন্তু অনন্ত প্রেমের থেকে দাদার মান দিয়েছে বেশী। যেজন প্রেমের ভাব জানে না, তার সঙ্গে কিসের লেনা-দেনা। গাজীর সেই গানের কথা মনে পড়ে যায়। তা না-হয় হল। নিজের পেটের সঙ্গে লেনা-দেনা বন্ধ কেন? আজ রাতে দুলির কেন খিদে-টিদে নেই?

সব কেন-র জবাব চেয়ো না। জবাব পাবে না। সেই হিসাবে মিলিয়ে নাও না, যে হিসাবে উপহারের দ্রব্য দাওয়ায় ফেলে দিয়েছিল। দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। যে উপহার দেয়, তার চেয়ে কি উপহার বড়? যার সঙ্গে খাবার কথা, সেই খাওয়া থেকে কি নিজের ক্ষুধা বড়?

বলতে পারে, পেট ছাড়া বারোবাসরের মেয়েটার আছে কী। নেই বলেই তো ও মেয়ে বারো স্বামীর ঘরে। কিন্তু বলো গিয়ে, সমাজ তোমাকে টাটে বসাবে। মনের বুঝ হবে তো?

আমার পাশে চুপচাপ গাজী বসে আছে। একটা দমকা নিশ্বাসের শব্দ পাই পাশে। সামনে গাছ আর গাছের ছায়ায় নিবিড় কালো। তার আশেপাশে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না। কাছাকাছি ঘরগুলোতে মানুষের গলার শব্দ শোনা যায়। মনে হয়, নদীর বুক থেকেই যেন কার ডাকের দূর চীৎকার ভেসে আসে।

ঘরের মধ্যে আবার নারায়ণ ঠাকুরের গলা শোনা, 'অনাদি পালও হয়েছে যেমন। ঝাল ব্যঞ্জনকে এখন শুক্তো করার জন্যে হাতা খুন্তি নাড়াচ্ছে।'

একেবারে পাকা পাচকঠাকুরের মত কথা। যে তরকারি আর মসলাতে ব্যঞ্জন বানানো হয়ে গিয়েছে, তাকে এখন আর শুক্তো করতে চাইলে কী হবে। অনন্ত ব্যঞ্জনকে কি আর শুক্তো করা যায়?

দুলি বলে, 'সে কথা থাক, নারাণদা। যে কথা—।'

নারাণের গলায় বিতৃষ্ণা। তার সঙ্গে ঝাঁজ। বলে ওঠে, 'না, থাকবে কেন, বল। অনন্তটার কথাও বলি। বারে বারে তোর ন্যাকামো করবার কী দরকার।'

এ সান্ত্বনা ভাল লাগে না দুলির। যে স্রোত চলে মনে মনে, তার ওপরে তুমি বইঠা চালালে কি চলে। এখানে সান্ত্বনা যার যার নিজের। অপরের হাতের ছোঁয়া কেবল জ্বালা। বলে, 'কে কী ন্যাকামো করেছে, সে খোঁজ আমি করি না, নারাণদা।'

তা বললে কি নারায়ণ ঠাকুরই থামে! তবে সে তার স্বভাব অনুযায়ী খেঁকিয়ে ওঠে না। বলে, 'না ভাই দুলি, খোঁজ কর না, সেটা কোন কাজের কথা নয়। অনন্ত এলেই তুমি আবার সব ভুলে যাও। এটা ভাল কথা নয়। তোমার হল, এস জন বস জন, দশজন নিয়ে কারবার। এসব তোমার বেশী পেশুরয় দেওয়া ঠিক নয়।'

শুধু হোটেল চালানোর ফন্দি ফিকিরই জানে না নারায়ণ ঠাকুর, দেহজীবিনীকেও উপদেশ দেয়। তবে, উপদেশ দেয় কিনা, জানি না। একটু যেন স্নেহের জোর শোনা যায় তার কথার সুরে।

দুলি বুঝি অস্বস্তিতে হাসে। বলে,

আহা, শুনবে ছোো! আমি তো সে কথাটাই তোমাকে বলতে এসেছি।'

'তাই নাকি। কী কথা?'

দুলির গলা একটু নিচু হয়। কিন্তু শোনা যায় সবই। বলে, 'আমার ঘরে তালা দিয়ে এসেছি। জানি তো মাঝরাত্তে এসে ডাকাডাকি করবে। তাই বলছিলাম কি, আজ আর এখান থেকে যাব না। ফোঁচাদার বউয়ের কাছেই রাতটা শুয়ে কাটিয়ে দেব।'

শুধু মাংস-ভাতের বায়না কারণ নয়, পাছে রাত্রে দেখাসাক্ষাৎ হয়ে যায়, সে পথ বন্ধ করার মতলব করেই দুলি এসেছে।

নারায়ণ ঠাকুর বলে, 'অ সেই কথা। তা বেশ তো, ফোঁচার বউয়ের কাছেই থাকবে। তাতে আর কী হয়েছে।'

দুলি বলে, 'তোমার আবার অসুবিধা হবে না তো?'

কথাটা শুনে আমার দুলির মুখখানি দেখতে ইচ্ছা করে। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। আর সেই সঙ্গে নারায়ণ ঠাকুরের গলা, 'না, না, আমার আবার অসুবিধা কী।'

সামনের কুহেলী আলো আর অন্ধকারের দিকে তাকিয়েও, বুঝতে পারি, দুলির সামনে নারায়ণ ভারী অস্বস্তি বোধ করে। তাই সামনে থেকে চলে যেতে যেতে কথা বলে। আর তখনই গাজীটা গুনগুনিয়ে ওঠে:

'অরে, ঘরের খিলে আঁটিসাঁটি
ওদিকে, গত্ত কাটে সিঁদকাটি
এ চোরা কালো বিড়াল মিশে থাকে
আন্ধারে।'...

সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণের গলা শোনা যায়, 'কে রে ওখেনে?'

'আপনাদের গাজী, ঠাকুরমশায়।'

যেন বড় গলগলানো গলায় বলে গাজী। আর সেই পরিমাণেই নারায়ণের পিত্তি-জ্বালানো কথা ভেসে আসে, 'আমাদের, না একেবারে তাবৎ সোনসারের। ন্যাকামো দেখলে গা জ্বলে যায়। কথা নাই বাত্তা নাই, উনি একেবারে গান ধরে দিলেন।'

গাজী বলে, 'গান একটা মনে এল কিনা।'

'আসুক গে, অত শোনাবার দরকার কী।'

বলতে বলতে তার স্বর আবার এগিয়ে আসতে থাকে। আসতে আসতেই জিজ্ঞেস করে, 'তা নিজে তো এসে বসে আছ, বাবুটিকে রেখে এলে কোথায়? ভোলাখালিতেই—'

দরজা পর্যন্ত এসেই নারায়ণের স্বরে ধাক্কা লাগে। দরজার কাছে রাখা বাতির একটু আলো আমার গায়েও পড়েছিল। তাতেই তার নজরে পড়ে যাই। তাড়াতাড়ি সুর ফিরিয়ে বলে, 'অ, এসে পড়েছেন

ভাবলাম, কী জানি, মাহাতোন্দার ব্যাপার তো। ভোলাখালিতেই টেনে নিয়ে গেল কিনা।'

আমি কোন জবাব দিই না। গাজী বলে, 'সে মতলবও হয়িছিল। চাচীটিকে জানেন তো। ছাড়বে না কিছুতেই। নেহাত বাবুর ভয়ে রাত পোহালি যেতি দেরি হয়ি যাবে, নইলি...।'

ওসব শোনবার অবসর নেই নারায়ণের। সে আমাকে বলে, 'ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে, বাইরে বসবার দরকার কী। ঘরের মধ্যে এসে বসেন।'

আবার গাজীই বলে, 'যাবেন। একটু জল দিতি বলেন, হাত পা ধুয়ি যাবেন একেবারে।'

ঠাকুর বলে, 'ফোঁচাকে পাঠিয়েছি চাপাকলে। জল তুলছে সে। হয়ে গেলেই এনে দেবে। ততক্ষণ ঘরে এসে বসেন আপনি।'

আমি বলি, 'থাক এখন, এমন কিছু শীত লাগছে না। একটু বাইরেই বসি।'

ঠাকুর আর কথা না বাড়িয়ে ভিতরে চলে যায়। আমি ভাবি, বাইরে ঠাণ্ডা তাই ঠাকুর আমাকে ভিতরে যেতে বলে। বারোবাসরের মেয়ে দুলিরও ভিতরে যাবার হক আছে। গাজীর নেই। আমার জন্যে দরজা আগলে সে সারা রাত বাইরের দাওয়ায় পড়ে থাকবে। কেন, তা জিজ্ঞেস করো না। মানুষের নিজের হাতে গড়া বিধান, যতদিন তারা নিজেরা না ভাঙে, ততদিন কেউ পারে না। একা ভাঙলে বিধর্মা। সকলে ভাঙলে ধর্ম। তাই না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'এই গাঁয়ে মুসলমানের কোন দোকানপাট নেই।'

গাজীর গলায় বিস্ময়। বলে, 'মেলাটি। কেন, বাবু?'

'তুমি সেখানে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে আসতে পার না?'

গাজী হেসে বলে, 'সেজন্যি ভাববেন না, বাবু। এমন কত রাত কত জায়গায় কেটিছে।'

'শীতে কষ্ট হবে তোমার।'

'ঝোলাতে একখান ক্যাঁথা আছে, বাবু। গায়ে যেটি আছে, সেটিও কম না। পেরায় আট-দশখান ছিঁড়া কাপড় আছে।'

আট-দশখানি ছেঁড়া কাপড়! ধন্যি আল্লখাল্লা! এর পরে তো কথা চলে না। তার ওপরে ঝোলায় আছে একটি কাঁথা। না জানি, ও ঝোলাতে আরও কত কিছু আছে। গাজীর ঝোলা কিনা।

গাজী তারপরেও হাসে। বলে, 'তা ছাড়া, একটা কথা কি বাবু, হিঁদু বলেন আর মোচলমান বলেন, এমন লোককে কি কেউ ঘরে থাকতি দেয়?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'কেন?'

'বিশ্বাস কি বাবু, যদি চুরি-চামারি করে?'

গাজীর দিকে ফিরে তাকাই। সে আমার চেয়ারের পাশে মাটিতে বসা। হ্যারিকেনের আলো তার মুখের যে পাশে পড়েছে, সে পাশটা দেখতে পাই না। যেদিকটা পাই, সেদিকটা অন্ধকার। গাজীও আমার

দিয়ে ফেরে। তাতে তার গোটা মুখটাই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়। তবু যেন আমি তার চোখে মিটিমিটি হাসি দেখতে পাই। আর কেবলই মনে হয়, সত্যি কথাটা তো ভেবে দেখিনি। এমন একটা পথে পথে হাত পেতে গান গেয়ে ফেরা চেনা লোকই যদি আমার দরজায় এসে রাত্রিবাসের ফরমান চাইতো, দিতাম নাকি?

পুছ করার দরকার কী? দিতাম না! তাই গাজীর কথায় কোথায় যেন নিজের ভিতরেও ঠেক লেগে যায়। আরও লাগে এই কারণে, সে যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা বলে, আমাদের গৃহস্থের মনে সেই কথাটাই আগে জাগে। তবে গৃহস্থের অবস্থাও যে ঘর-পোড়া গরুর সিঁদুরে মেঘ দেখার মত। কিন্তু গাজী যখন তার নিজেকে দেখিয়ে এরকম বলে, তখন কোথায় যেন বাধে। তখন যেন নিজের মুখে থাবাড়ি লেগে যায়। অবিশ্বাসের অবিচারে মন টাটিয়ে যায়। বলি, 'সে যে করে, সে করে। তোমাকে তো এখানে সবাই চেনে।'

গাজী তেমনি হেসে বলে, 'তা চিনে, বাবু। তয় কি জানেন, যার যেমন অবস্থা, তার তেমন বাওস্থা। যা সয়, তা রয়। গাজী দরবেশ মানুষ, গাছতলাতি তার দিন কেটি যায়। মাথার উপর যদি একখান আস্তরণের দরকার হয়, তবে এই হাটে তার কম নাই। দ্যাখেন যেয়ে, কত চালা পড়ি রয়িছে। ঘরের মধ্যি আমার থাকতি ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা করলি লোকে ব্যাজ দ্যাখে।'

লোকে বিপরীত দেখে এই গাজীর বচন। আমি তার অন্ধকারে ঢাকা মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। বুঝতে পারি, সেই হাসিটুকু লেগেই আছে মুখে। এর ওপরে কথা বলার কিছু নেই। সে সার বুঝিয়ে দিয়েছে। অবস্থা গুণে ব্যবস্থা। গাছতলাতে যার বাস, সে কেন ঘরের আশ্রয় চাইবে। চাইলে লোকে বিপরীত ভাবে। তোমার মন বিমর্ষ হলে কী হবে। বাস্তবে চল মন, তাতে স্বস্তি।

গাজী নিজেই আবার বলে, 'সে-সব চিন্তা করবেন না, বাবু। দাওয়ার মাথার উপর চাল আছে, তাতিই আমার হয়ি যাবে। তা ছাড়া..।'

কথাটা সে শেষ করে না। মুখটা যেন আমার দিকে আরও বেশী করে ফেরায়। বলে, 'গাজীকে আজ বেহেস্তে থাকতি দিলিও বাবুকে ছেড়ি সে যাবে না।'

এ যেন খোশামুদে, রামপেসাদে। কিন্তু বুঝতে পারি, তার কথার মধ্যে কপটতা নেই কোথাও। প্রাণের কথা বলে না কেবল। এ যেন তার শপথ, কসম খেয়ে বলে।

এ সময়ে আর একবার নারায়ণ ঠাকুরের আবির্ভাব হয়। তার আগে মনে হয়, ঘরের মধ্যে দুলি আর সে কী যেন বলাবলি করে। তারপরে নারায়ণ এসে দাঁড়ায়। দরজার কাছে দুলির ছায়াও দেখা যায়।

ঠাকুর বলে, 'বাবুর কি মুরগি চলে?'

জিজ্ঞেস করি, 'কেন?'

'তা হলে মুরগি রান্না করতাম। রামপাখি একটা রয়েছে কিনা।'

ঠাকুরের মুখ খোলাতেই বয়ান ধরেছি। এ রামপাখি যে কোন রামপাখি, তা জানি। যদি খাই, তা হলে কারুর মুখেরটা কেড়ে খাওয়া হবে না। তবু, কোথায় যেন আটকায়, প্রাণ বিমুখ হয়। যাদের জন্যে আয়োজন, তাদের একজন কাছেই দাঁড়িয়ে। ঠাকুর যে তার অনুমতি নিয়েই প্রস্তাব দিয়েছে, সন্দেহ নেই। কেন যে তার রামপাখি বিরাগ, ক্ষুধা মন্দ, তা-ও জানি। আমি না খেলেও ও রামপাখির জান খতম ধরে নিতে হবে। কিন্তু সদ্য-সদ্য যা ঘটেছে, তারপরে আর খেতে পারি না। তা ছাড়া, আমার গাজী রয়েছে। জানি, সে নিরামিষাশী। সে যে

আমার জবাবের জন্যে কান পেতে আছে, বুঝতে পারি। ঘাড় নেড়ে বলি, 'না, মুরগি খাই না।'

দুলি আত্মীয় নয়। বোধ করি, সে জানে না, এ ভিনদেশী তার পরিচয় জানে। সে বলে ওঠে, 'মুরগি খান না?'

একটু অবাক হয়ে ফিরে চাই তার দিকে। দরজার কাছে হ্যারিকেনের আলো তার শরীরের একপাশে পড়েছে। ঘোমটা খোলা, আঁচল-খসা আঙুরিকেও দেখেছি। সেখানে মধ্যঋতু আশ্বিনের ভরা ভরতিতে একটা বন্যতা দেখেছিলাম। সে দেখাতে মনের এক ভাব। দুলির হল খর স্রোতের চলকানো ঢেউ। চোখে যেন ছিটা লাগে। নজর ধাঁধিয়ে যায়। নাকে-মুখে জল ঢুকে হৃদে ধাক্কা লাগে। তার জন্যে দুলিকে দোষ দেব না। তার কথা বলার তাগিদ যে কোথায়, তাও অনুমানে আছে। মুরগির গতি হলে নারাণদার কাছে তার দায় চোকে। তবু আমাকে বলতে হয়, 'খাই, কিন্তু আজ খাব না।'

মুখ ফেরাতে গিয়ে বুঝতে পারি, দুলি আমার মুখটা একটু ঘাড় বাঁকিয়ে দেখতে চায়। বোধ হয়, কথার মধ্যে ভাব খোঁজে, কার্যকারণের সন্ধান। কিন্তু কিছু বলে না।

এবার গাজী যেন কী ভেবে বলে ওঠে, 'কেন বাবু, খান না।' এ হল তার আতিথেয়তা। নিজের ঘর না হোক, বাবুর সুখ-সুবিধা দেখা তার নিজের বিষয় করেছে।

বলি, 'না, ইচ্ছে নেই।'

নারায়ণ চলে যেতে যেতে বলে, 'তা হলে মাছ ভাতই করি গে।'

গাজী বলে ওঠে, 'তা হলি ঠাকুরমশাই, আপনি নিজিই সেবা করি ফ্যালেন।'

আর দেখতে হল না। তৎক্ষণাৎ ধমক ভেসে আসে, 'মেলা বাজে প্যাচাল পেড়ো না, বুঝলে? আমি মুরগি খাই, কেউ দেখেছে কোনদিন?'

গাজী সঙ্গে সঙ্গে ঘাট মেনে বলে, 'আ ছি-ছি, সে কথাখানি তো এয়াদ ছিল না।'

আমি ভাবি, ইয়াদ তার ঠিকই ছিল। গাজীর এটা ফাজিল-রঙ্গ নিশ্চয়। ওদিক থেকে নারায়ণ ঠাকুরের আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না। দুলিও দরজার কাছ থেকে সরে যায়। অন্য গলা শুনতে পাই ঘরের মধ্যে। বোধ হয়, ফোঁচার সেই কালো-কুলো বউটি কথা বলে দুলির সঙ্গে। বুকের ওপর বাচ্চাটি আছে সম্ভবত। ছোটখাটো ধমক শুনতে পাই। অস্পষ্ট বলাবলি শুনে বুঝতে পারি, তারা সুখ-দুঃখের কথা বলে। দুলি বলে, 'মরণ! মুখে আগুন অমন ভালবাসার।'

আর বউ বলে, 'মানুষের ধারা বোঝা যায় না।'......

এই হল কথার সার। একজন ভালবাসার মুখে আগুন দেয়। আর ফোঁচার বউ মানুষের ধারা বোঝে না। যে মানুষের কথা বলে, সে নিশ্চয় পুরুষ মানুষ। জানতে ইচ্ছা করে, সেই পুরুষ-মানুষটা কে? নারায়ণ ঠাকুর, না ফোঁচা? আর দুলি কোন্ ভালবাসার মুখে আগুন দেয়? অনন্তর না তার নিজের?

তারপরে এক সময়ে নিজের মনেই চমক লাগে। ভাবি, সবই বেয়াজ, সবই বিপরীত। দেখ, নগর ছানিয়া ফিরি। আর এখন বসে আছি কোথায়। অচেনা এক গাজী আমার পাশে। সে যে কী দিয়ে কী কেড়েছে, চেনা-অচেনার দাগ রাখলে না। ঘরের মধ্যে কথা বলে এক বিমুখ প্রেমিকা দেহজীবিনী। ফোঁচার বউকে কী বলব, বুঝতে পারি না। স্বৈরিণী? তাও বলতে পারি না। গৃহিণীই বলব। কার গৃহিণী, সে জবাব চাইব না। তবে নারায়ণ ঠাকুর তার গতি, ফোঁচা পতি। তারা সবাই মিলে সকলের সঙ্গে জড়ানো। একে বিচিত্র বলব কিনা, জানি না। হয়তো গঞ্জ-হাটের সমাজ এমনিই। তার রীতি-প্রকৃতির ধরনধারন এইরকম। জীবিকা আর পেশার দায়ে সবাই হেথা জড়ো। জনপদের নিয়মকানুন এখানে নয়।

একটু পরেই ফোঁচা আসে জলের বালতি নিয়ে। দাওয়ার ধারে বালতি বসিয়ে ঘটি রেখে সেই তার দম-আটকানো গলায় বলে, 'হাত-মুখ ধুয়ে নেন, বাবু।'

সারা দিনের ক্লান্তি এবার আমাকে ভারী করে তুলেছে। হাত-মুখ ধোয়া হতে হতেই ওদিকে ফোঁচা দড়ির চারপায়া পেতে দেয় ঘরের মধ্যে, দরজার কাছে। বিছানা দেখে নাক কোঁচকাবো না। নিচে যা-ই থাকুক, গোটা একখানি লালপাড় ধোয়া ধবধবে শাড়ি চাদর হিসাবে পেতে দেওয়া হয়েছে। হয়তো ওরই বউয়ের। ঠাকুরের এবার তাড়াহুড়া। খাওয়ার পাট চুকিয়ে দিতে দেরি করে না। গাজীর নিরামিষ খাওয়া সেই দাওয়ায় বসে।

দুলিকে খাবার জন্যে ঠাকুর আর বউ দুজনেই টানাটানি করে। কিন্তু মন থেকে যার ক্ষুধা গিয়েছে, তাকে খাওয়ানো যায় কেমন করে। অতএব, পাশের ঘরে গাজীদের খাওয়া মিটে যায়। পাশে ক'টি ঘর আছে, কিছুই জানি না। বুঝতে পারি, সেখানে হেঁশেলের পাট মিটে গিয়েছে। সকলে নিদ্রা যায় কিনা, জানি না। একটা নিঃঝুমতা নেমে আসে। ফোঁচার বাচ্চাদের গলা একটু-আধটু শোনা যাচ্ছিল। তাও নিশ্চুপ হয়ে যায়। এমন কি, একটু আলোর আভাসও যেখানে পাওয়া যায় না। তাতেই মনে হয়, হয় তো সবাই ঘুমোয়।

এ ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। হাত তুলে ঘড়ি দেখি। রাত্রি আর সাড়ে নটা। অথচ মনে হয়, রাত কেবল গভীর নয়। একটা আরণ্যক স্তব্ধতা যেন জগত গ্রাস করেছে।

আমার মাথার সামনেই খোলা দরজা। দরজার পাশে, গাজী এখনো বসে বসে বাবুর কাছে পাওয়া, ভারী মিঠে বাস-ওয়ালা ছিরগেট টানে। আমার মাথার ওপরে মশারি চাঁদা করা রয়েছে। পয়সা দিয়ে হয় তো অনেক সুখ পাওয়া যায়। এমন একটি সামান্য ব্যবস্থা অসামান্য হয়ে ওঠে না।

হ্যারিকেনটার কী ব্যবস্থা হবে। এই প্রশ্ন যখন মনে, তখন দেখি ফোঁচার উদয় হয়। ভিতর ঘরের অন্ধকার থেকে সে আসে। হাতে তার একটা হোগলা। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত বিড়ি। একদিকে হোগলা পেতে বসে সে বিড়ি খায়। তারপরে জিজ্ঞেস করে, 'বাবু, বাতি নেবানো থাকবে না কমানো থাকবে।'

আমি বলি, 'নিবিয়ে দাও।'

গাজী বলে, 'সারাদিন অনেক ঘোরা হইয়েছে, এবারে শুয়ি পড়েন বাবু।'

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মশারিটা টেনে নামিয়ে শুয়ে পড়ি। ফোঁচা বাতি নেভায়। ঘর অন্ধকার হয়ে যায়। আস্তে আস্তে খোলা দরজার কাছে বাইরের কুহেলী জ্যোৎস্নার অস্পষ্ট আলো দেখা দেয়। ঘরের নিচু চৌকাঠের ওপর গাজী তার ঝোলাটা পেতে, তাতে মাথা রাখে। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ ডাকে। মুহূর্তের মধ্যেই, ফোঁচার চাপা নাসিকা ধ্বনি বাজে। আর গাজীটা, কথাহীন সুর খুব আস্তে গুন গুন করে। এক সময়ে তাও থেমে যায়।

ঘুম আসে না এই নতুন জায়গায়। ক্লান্তিতে পাশ ফিরতে ইচ্ছা করে না। নিশ্চল নিঝুম হয়ে পড়ে থাকি।

হঠাৎ মনে হয়, একটা অস্পষ্ট চুপি চুপি ডাক যেন শুনতে পাই, 'সই। সই।'

পুরুষের চাপা গলা। কোন্ সইকে ডাকে। কার সই, কে কোথায় ডাকে, কে

জানে। একটু চুপচাপ। আবার ডাক। এবার যেন একটু জোরে, একটু স্পষ্ট। মনে হয়, আমার খোলা দরজার কাছেই, দাওয়ার নিচে থেকে ডাকে, 'সই, সই।'

থেমে থেমে কয়েকবার ডাকাডাকি চলে। তারপরেই হঠাৎ ঘরের মধ্যে কার যেন পায়ের শব্দ আস্তে বাজে। যদি ঠিক শুনে থাকি, যেন ঠিনঠিন শব্দও বাজে তার সঙ্গে। অন্ধকারেও দেখতে পাই একটি মূর্তি, ভিতর দিক থেকে দরজায় এসে দাঁড়ায়। দরজার কাছে আসতেই তার অবয়ব দেখে চিনতে পারি, দুলি। অতি সাবধানে সে গাজীকে ডিঙিয়ে যায়। নেমে যায় দাওয়ার নিচে।

তারপরে তাকে আর আমি দেখতে পাই না। কেবল এইটুকু শুনতে পাই, দুলির গলায় যেন কান্না ঠেকানো, স্বর নিচু। সে বলে, 'না না না, কখখনো না।'

আর ডাক দেওয়া সেই পুরুষের নিচু গলায় আবেগ, 'পায়ে ধরি সই।'

আবার 'না না না।' কিন্তু সেই না না না শব্দ ক্রমে দূরে মিলিয়ে যায়। কেবল ফোঁচার নাক ডাকানোর শব্দ বাজে।

(ক্রমশ)

ত্রিলোচন কলমচি

পাশবিক

মুখবান চকচকে, নতুন জামা-কাপড়-জুতোর দিকে তাকিয়ে মন একবাক্যে সদ্য-বিবাহিত বলে রায় দেবে। যুবকটি যাবার আগে আর একবার সলজ্জ অনুনয়ের সুরে বলল, 'ওকে রেখে গেলাম ডাক্তারবাবু, একটু দেখবেন কিন্তু। এর আগে কখনো হাসপাতালে আসেনি কিনা, বড্ড নার্ভাস হয়ে পড়েছে তাই।'

ডাক্তারবাবু স্টেথেস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে হাত তুলে বরাভয় দিলেন, 'আই শ্যাল লুক আফটার হার, ডোন্ট ওরি!'

'মিলি, লক্ষ্মীটি, আবার কাল আসবো, কেমন?' নিজের শৌখিন কেশরাশিতে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, 'দুষ্টুমি করো না কিন্তু, ওষুধ-টষুধ খেয়ো'—

কবি-কবি চেহারার যুবকটি পেশেন্টের উদ্দেশে বহুৎ মিনতি জানিয়ে স্টিকিং-প্লাস্টার ক্রস-করা গোড়ালিতে নতুন নাগরার গঞ্জনা সইতে সইতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে করিডোর পার হয়ে চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই ওপাশের সুইংডোর ঠেলে তরুণ অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনটি দুষ্টুমি করে গলা বাড়ালেন, 'কি দাদা, এই মিলিওনারটি কে? বেশ দর্শনীয় চেহারা—'

'মিলি-ওনার ওঃ!' ডাক্তার তাঁর ঝুঁটি গোঁফের তলায় তলায় হাসলেন, 'ওনার মিলি আজ সকালে ভর্তি হয়েছেন এখানে।'

'বেশ সুন্দর চেহারা। কোনো বনেদী ঘরের আদরিণী আর কি। আপনার দেখ্-ভালে থাকছে, ভাবনার কিছু নেই ভদ্রলোকের—

খুব বেশীক্ষণ কাটেনি। রস-রসিকতা চায়ের কাপে শেষ হয়েছে সবে। এমন সময় ইনডোরে গোলমাল শোনা গল। ধুপধাপ, দৌড়োদৌড়ি, জানলা দরজা খোলা বন্ধ। একটু পরেই ওয়ার্ড অ্যাটেনডেন্ট হাঁপাতে হাঁপাতে এসে জানালো, 'ছে নম্বরের পেশেণ্ট ভাগ গিয়া হুজৌর।'

'সব্বোনাশ!' ডাক্তার সগুম্ফ আঁতকে উঠলেন, 'বলিস কি? সকালে ভর্তি হয়ে বিকালে পালালো! ছ্যা ছ্যা, ডোবালি তোরা ডোবালি'—

'কি দাদা'; তরুণ সার্জন ফোড়ন কাটলো, 'আপনার মিলি ভেগেছে তো? অমন চ্যায়রা কখনো থাকে!'

হাসপাতালের আনাচে কানাচে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও মিলির কোনো ট্রেস পাওয়া গেল না। অবশেষে পুলিস-ডগটিকেই

হায় হায়, ম্যাও ধরবে কে?

বাঁধন খুলে কাজে লাগানো হল। কুকুরটি মাটি শুঁকতে শুঁকতে হাসপাতাল কম্পাউণ্ডের অন্য প্রান্তে এসে দরোয়ান-দের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগলো, আর গর্জাতে থাকলো। হঠাৎ সেই একতলা বাড়ির ছাদ থেকে সাদা পুঁটলির মত কি যেন লাফ দিয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে পড়লো।

ডাক্তারবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন, 'হায়, হায় এখন ম্যাও ধরবে কে?' বেড়াল তো গেলই, পেশেণ্ট কুকুরটিকে আর তিনি হাতছাড়া করতে রাজী নন। কারণ এটা শুধু পুলিস-ডগ নয়, পুলিসের ডগও বটে।

কলকাতা ভেটেনারি কলেজ হাসপাতালের সঙ্গে আমার যোগাযোগ এই নাটকীয় ঘটনার দিনটি থেকেই। দু নম্বর ডবল ডেকারের কল্যাণে কয়েক বছর পাকপাড়া-বাসী বা প্রবাসী মাত্রেরই সদীর্ঘিকা এই বাগানবাড়ি চোখে পড়েছে। আর জি কর হাসপাতাল, পরেশনাথ মন্দির, আর ভেটেনারি কলেজ এক লাইনের প্রায় এক নিঃশ্বাসের দ্রষ্টব্য ছিল এত দিন। টালা পুল সেরে উঠে সব গোলমাল করে দিল। শুধু কি টালা পুল। হাউসিং স্কীমের হিংস্র থাবায় শান্তিনিকেতনের মত এই সুরম্য বিশাল উদ্যানটি আজ দ্বিখণ্ডিত। বিরাট মাঠ আর চাষক্ষেত সাবাড় হয়েছে, গুটি দুই পুকুর আর একটি খেলার মাঠ বাদে প্রায় সবটুকুই বাস্তুভিটেয় পরিণত হয়েছে। অবিশ্যি এখানেই শেষ নয়, কলেজ হাসপাতালটি কল্যাণীতে স্থানান্তরিত হতে চলেছে, গত সাধারণ নির্বাচনের বহু আগেই এমন খবর আমাদের কানে এসেছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেদিনের পশুপালন দপ্তর এমনতর বিচিত্র ইচ্ছার বশবর্তী কেন হয়েছিলেন, সে রহস্য আমার অজ্ঞাত, তবে সেই ইচ্ছাচারিতা কার্যকর হলে যে অনেক-গুলি অসুবিধে দেখা দিত, সেটা মোটামুটি না-জানা নয়। আজকের ঘনীভূত কলকাতা জনসংখ্যায় যতই বেড়ে থাকুক, সে যে মোটেই পশুশূন্য হয়নি, সে-কথা সবাই জানেন। তাদের উপ-চিকিৎসার কোনো উপায় না থাকায় হাসপাতালেই তারা দুঃসময়ে শরণ নিয়ে থাকে। বেলগেছে কলেজ হাসপাতাল উঠে গেলে তাদের সমূহ বিপদ, আর শুধু কলেজ উঠে গেলে ছাত্রদের অনেক অসুবিধে। বহু রোগ ঘেঁটে ঘেঁটে যে বাস্তব জ্ঞান এতদিন তাদের হচ্ছিল, যে হাতে-কলমে শিক্ষার বিস্তৃত সুযোগে তারা অন্য প্রাদেশিক ভেটেনারি কলেজের

ছাত্রদের থেকে মজবুত হয়ে উঠছিল, তা শেষ হবে। পুঁথিগত বিদ্যায় মুখ থুবড়ে থাকা ছাড়া ভালো ছাত্র হবার দ্বিতীয় কোন উপায় থাকবে না তখন।

এমনিতেই পশুচিকিৎসকদের বেতন-হার এমন নিম্ন পর্যায়ে সীমাবদ্ধ আছে যে, হিউম্যান ডাক্তারদের সঙ্গে তাঁদের ফারাক অনেক। জেনারেল প্রাইভেট প্র্যাকটিসের রেওয়াজ না থাকায় তাঁরা স্বভাবতই হাসপাতালের মুখাপেক্ষী রয়েছেন। উপরন্তু প্রায় সমপরিমাণ শ্রম সাধ্য এই চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত করেও চিকিৎসা জগতে তাঁরা সাধারণ মানুষের ভ্রান্ত ধারণায় কিছুটা অন্তজ হয়ে রয়েছেন। ইত্যাকার কারণে ভালো ছাত্র ইদানীং এ লাইনে আসতে চাইছেন না। কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য এই, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আর কোনো প্রদেশে, যতদূর জেনেছি, পশুচিকিৎসকদের বেতনমানে এরকম অসাম্য নেই।

বাইরে পার্থক্য যাই থাক চিকিৎসা ক্ষেত্রে ওষুধপত্রে পার্থক্য যে খুব বেশী নেই, একথা আমাদের অনেকেরই অজানা। ওষুধের মাত্রাধিক্য কোনো কোনো পশুর

ক্ষেত্রে অবশ্যই ঘটে। আর জি করের ছাত্ররা অনেকেই সম্ভবত এখনো ভোলেন নি, ডোজ বেশী বলে ফেললে জনৈক অধ্যাপক কিভাবে স্মিতহাস্যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ উল্টিয়ে ছাত্রের যথাস্থান, অন্তত ওষুধের প্রয়োগ ক্ষেত্র দেখাতেন। সুতরাং ভেটেনারি কলেজকে রেফার করা একটি কমন রসিকতা ছিল। কিন্তু তার মধ্যে কোনোরকম ঝাঁজ ছিল না, যে ঝাঁজ আমরা পেয়ে থাকি ঘোড়ার ডাক্তার কথাটার মধ্যে। তামাম জীবন হর্স পাওয়ারে অতিবাহিত হয় এমন অভিজাত লোকের সংখ্যা তো কলকাতায় কম নেই, দৌড়ের মাঠে ঘোড়ার পূজারী হয়েছেন এমন মানুষ তো ঘরে ঘরে রয়েছেন, কিন্তু তাঁদের সামাজিক মর্যাদা তাতে কিছু কমেছে বলে তো মনে হয় না। শুধু চিকিৎসকদেরই বেলায় বদনাম। যদিও তাবৎ পশুপাখিই (কার্নিভোরাস, হারবিভোরাস, ওমনিভোরাস যে গালভরা নামেই ডাকি না কেন) তাঁরা চিকিৎসা করে থাকেন, কেবলমাত্র ঘোড়া নয়।

একজন হাস্যরসিক হিউম্যান ডক্টরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ছাত্রজীবনে। চেম্বারে বসে বসে চুরুট টানতেন আর গল্প ফাঁদতেন, কারণ রোগীদের প্রাদুর্ভাব বড় একটা ছিল না। ভেটদের নিয়ে মজার মজার গল্প বলায় তাঁর জুড়ি ছিল না। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম, হাতী অপারেশনের গল্প। কোদাল কুড়ুল খন্তা শাবল হামদা ইত্যাকার বৃহদাকার অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে সার্জন তো অপারেশনে নেমেছেন। মই কপিকল ইত্যাদিও নাকি হাতীর অ্যাবডোমেন ওপেন করতে হলে প্রয়োজন হয়। কয়েক ঘণ্টার অমানুষিক পরিশ্রমের পর যখন হাতীর পেটের ছাঁদাবাঁধা প্রায় শেষ, ইনস্ট্রুমেন্ট কাউন্টিং হয়ে গেছে, সার্জন চিৎকার করে উঠলেন, 'আমার ফার্স্ট অ্যাসিসট্যান্ট?'

অ্যাসিসট্যান্টকে যে পেটের গহ্বর থেকে তোলাই হয়নি সে খেয়াল এতক্ষণ নাকি কারোরই হয়নি।

তবু হাতী অপারেশন করতে কতকগুলো সুযোগ সুবিধে পাওয়া যায়। অ্যানেস-থেটিস্টকে গ্যাসমাস্ক যোগাতে হয় না, হাতীর শুঁড়টাকেই অনায়াসে তিনি ব্যবহার করতে পারেন।

চুরুটে টান দিতে দিতে বললেন, 'আরে, কাল বিকেলের কাণ্ডই তো বলিনি তোমাদের।

শ্যামবাজারে গত দশ বছরের মধ্যে এমন ট্র্যাফিক জ্যাম কেউ দেখেনি। হ্যাঁ তা এক রকম মিছিলই বলতে পারো। ব্যাপার হয়েছিল কি, বেলেগেছে পুলের ওপর দিয়ে হঠাৎ দলে দলে গণ্ডার—কিনা তাদের রিলেটিভ হাসপাতালে রয়েছেন—তাই, দেখতে চলেছে তারা সার বেঁধে! বোঝ কাণ্ড'—

'অবাক কাণ্ড, বলছেন কি, ডাক্তারবাবু!' আমরা সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সুধাই, 'কই আমরা ত কিছুই জানতে পারিনি?'

'আমিই কি জানতে পারতুম,' নানাবিধ ছন্দে হাসতে হাসতে ডাক্তার উপসংহার টানেন, 'ভ্যাগ্যিস কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছিলুম।'

ডিস্ট্রিক্ট প্যাথলজিস্ট মাইক্রোসকোপ থেকে চোখ তুলে বললেন, 'আসুন পেয়েছি'—

আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট?

আই পীসে চোখ দিয়ে হলদেটে ডিম্বাকৃতি চিহ্ন দেখলাম। কানের কাছে ডি ভি পি উচ্চারণ করলেন: Trematode। লিভার ফ্লুক্ নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল, যার স্থানীয় বাংলা নাম যথা। গরু বাছুরের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে দেখা যায় পুরুলিয়া অঞ্চলে।

ফলে এটি একটি পাইকারী ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। ভেটেনারি অ্যাসিসট্যান্ট সার্জন থেকে ফিল্ড অ্যাসিসট্যান্ট এবং তাদের থেকে পিওন মারফত পাইকাররা যথার দাওয়াই জেনে ফেলায় পুরুলিয়ায় কোথাও কোথাও পানের দোকানে পর্যন্ত সেই ওষুধ বিক্রি হয়। রোগগ্রস্ত গরু বাছুর জলের দরে কিনে এনে পাইকাররা নিজেরাই তাদের মেরামত করে তুলে সাবেক দরে বিক্রি করে। অনেক সময় ওষুধের ডোজ গোলমাল হয়ে যাওয়ায় সুদ আসল দুই-ই যায়।

কেবল মাত্র যথাই নয়, সোংড়া বা এক প্রকার নাসিকা ক্ষত রোগও পুরুলিয়া বাঁকুড়া অঞ্চলের ব্যাপক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। নিরক্ষর অনভিজ্ঞ গ্রাম্য চাষীর কাছ থেকে রুগ্ন গরু মোষ কিনে নিয়ে পাইকাররা হাসপাতালে চলে আসে। তারা জানে রোগটা সামান্য, মাত্র গোটা দুই ইঞ্জেকশনের ওয়াস্তা। তার জন্যে খরচ হবে বড়জোর পনের পয়সা, কারণ প্রথম দিনের টিকেট দশ পয়সা দ্বিতীয় দিনের পাঁচ। ইঞ্জেকশন ফ্রি।

হাসপাতালে ইঞ্জেকশন ফ্রি দেবার কথা। কিন্তু কোথাও কোথাও চিকিৎসক গ্রাম-বাসীর অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এক টাকা দু টাকা আদায় করে থাকেন। অন্য হাসপাতালের তুলনায় পশু হাসপাতালের নিয়মকানুন স্বতন্ত্র। যে কোনো প্রাণীকে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে আনলেই প্রথমে টিকেট করতে হয়। পাখি বেড়াল প্রভৃতি ছোট প্রাণীর জন্যে পাঁচ পয়সা (প্রতিবারের জন্য) গরু মোষ ইত্যাদি বড় প্রাণীর জন্য প্রথমবার দশ পয়সা, পরে পাঁচ পয়সা ক'রে। শুধু কুকুরের বেলায় এক টাকার টিকেট, অবিশ্যি ঐ টিকেটে একটানা চোদ্দ দিন চলবে। ইনডোর পেশেন্টদের জন্য চার টাকা চোদ্দ দিনের মেয়াদে, মেডিসিন, নার্সিং এবং লজিং ফ্রি, কিন্তু খাবার পেশেনেন্টর মালিককে যোগাতে হবে। অপারেশনের জন্য ফী লাগে, বড় অপারেশন দশ টাকা, মাইনর অপারেশন পাঁচ টাকা। প্রতি ক্ষেত্রেই এই টাকার অর্ধাংশ পেয়ে থাকেন সার্জন। হাসপাতাল ডিউটির পরে সার্জনরা কলে বেরোতে পারেন, দর্শনী অবশ্য সরকারের বেঁধে দেওয়া। ভেটেনারি ইন্সপেক্টর চার টাকা, এ ভি এস দু টাকা। এই টাকাই রাতের বেলা হলে ডবল হয়ে যায়।

ডিস্ট্রিক্ট ভেটেনারি প্যাথলজিস্ট ভদ্রলোক অবশ্য নন্ প্র্যাক্টিসিং অ্যালাউন্স বাবদ

পঞ্চাশ টাকা পেয়ে থাকেন। সুতরাং প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিসের ব্যাপার তাঁর নেই। কথা হচ্ছিল তাঁর সঙ্গে। অপারেটিং টেব্‌লকেই সেক্রেটারিয়েট বানিয়ে তিনি তখন রিপোর্ট লিখছিলেন।

ফ্রীজ, ডি-ফ্রীজ, ডিস্টিল্‌ড ওয়াটার প্ল্যান্ট ইত্যাদি অনেক কিছুই যন্ত্রপাতি ল্যাব্‌রেটরিতে পৌঁছে গেছে দেখলাম। শুধু লেখার টেবিল এখনো এসে পোঁছায় নি।

আলাপ জমাবার জন্যে শুধোলাম,

খুব কাজের লোক। অনেক স্কীম রয়েছে তাঁর মাথায়। কিন্তু সেগুলোকে শুধু মাথায় আর ফাইলে সীমাবদ্ধ রাখেন নি; একেবারে ফিল্ডে নেমে পড়েছেন। প্রথম বছর সারা পশ্চিমবঙ্গে দশটি ডিস্ট্রিক্ট ল্যাবরেটরী খোলা হয়েছিল, ১৯৬৭ সালে আরো ষাটটি খোলা হচ্ছে। আগে কলকাতা থেকে ডিজিজ ইনভেস্টিগেশনের কনকার্মেশন পেতে হত, এখন হচ্ছে জেলা ওয়ারি। ডিস্ট্রিক্ট ভেটেনারি

ভেটেনারি ইনস্পেক্টর ভদ্রলোক, রোগা টিঙ টিঙে চেহারা রিক্‌শা থেকে নেমে লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকলেন, 'উঃ বাপ্‌, আর কোনো ক্যাটস্‌কলে সাড়া দিচ্ছি না আমি।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই আঁচড়ে আঁচড়ে ক্ষত বিক্ষত হাত দুখানা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে, 'বেড়ালকে ইঞ্জেকশন দিতে গিয়ে কি হয়েছে দেখুন। ওরা সবচেয়ে আন্‌ম্যানেজেব্‌ল্‌।'

প্রবেশনার অ্যাসিসট্যান্ট সার্জন এসে খবর দিলেন, 'আপনার মহিষী তৈরি স্যার।'

'করাত টরাত নিয়ে যাও, যাচ্ছি।' ভদ্রলোক লাফাতে লাফাতে কোথায় অদৃশ্য হলেন।

গাছতলাটা জানলা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। দড়িকাছি দিয়ে বাঁধা, কাত করে শোয়ানো মোষের গলার ওপর বাঁশ রেখে দুদিকে দুজন চেপে দাঁড়িয়েছে। আর তার ভাঙা শিঙের ওপর কাঠ চেরাই করা করাত চালানো হচ্ছে। সে দৃশ্য আর দেখা যায় না। মোষের নাক মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, চাপা গোঙানিতে মোষ কাতরাচ্ছে।

প্যাথলজিস্টকে ডেকে দেখালাম দৃশ্যটা, 'প্রোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড কি বাড়ন্ত আপনাদের ভাঁড়ারে? একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে করনুয়াল ব্লক করে নিলে কি ক্ষতি হত মশাই?'

প্যাথলজিস্ট বললেন, 'কে আর অত ঝামেলা করে, মোষ তো আর মানুষের মত কথা কইতে পারে না!'

'শিঙ্‌ কাট্‌তির নজরানা কত?'

'পাঁচ টাকা দশ পয়সা।'

মেরা Bull Bull!

'ডিস্টিল্‌ড ওয়াটার ক-বোতল করে তৈরি হয় প্রতিদিন?'

'তা দশ বারো বোতল হয়।'

'ভ্যাকসিন নতুন কিছু করছেন নাকি আজকাল? আগে তো রানীক্ষেত আর গো-বসন্তের ভ্যাক্‌সিনও তৈরি হত শুনেছি।'

'ঠিকই শুনেছেন। তবে ইদানীং অন্যান্য ভ্যাক্‌সিনও তৈরি হচ্ছে। বাইরে থেকে আমদানি করা এক রকম বন্ধই।'

'যেমন?'

'ডাক্‌ প্লেগ তৈরি হচ্ছে। তাছাড়া ছ সপ্তাহের নীচের মুরগির বাচ্চাকে এতদিন রানীক্ষেত ইঞ্জেক্ট করা যেত না। ঐ বাচ্চাদের জন্য নতুন বীজ তৈরি হচ্ছে।'

কথায় কথায় জানলাম বর্তমান পরিচালক

প্যাথলজিস্ট ব্লকে ব্লকে প্রিভেণ্টিভ পাঠাচ্ছেন। মণিপুর, ত্রিপুরা, সিকিম প্রভৃতি জায়গায় ভ্যাক্‌সিন পাঠানো হচ্ছে আজকাল, এ ছাড়া স্লটার কনট্রোল অ্যাক্ট অনুযায়ী আরো দুটি স্লটার হাউস খোলা হবে দুর্গাপুর আর ডানকুনিতে।

অনেকক্ষণ কথাবার্তা কয়ে বুঝতে পারলাম সমাজের কল্যাণকর কাজেকর্মে এঁদের অন্যবিধ সহযোগিতা আমরা পেতে পারি, যদি এঁদের জীবিকার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করতে শিখি। যেমন অনেক হিউম্যান ডিজিজ সম্বন্ধে গবেষণা আরো সহজসাধ্য হয় যদি ভেটেনারি প্যাথলজির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখা যায়। অনেক শিশু-রোগে ক্যারিয়ার যেহেতু পশুরাই সে হেতু মিসিং লিংক সহজেই আবিষ্কৃত হতে পারে। বয়স্কদের ক্ষেত্রেও, যেমন ভেড়া ছাগলের দেহ থেকে অ্যান্থ্রাক্স বা তড়কা মানব দেহে সংক্রমিত হতে পারে সহজেই। মাংসের দোকানগুলি (মফস্বলে) যদি ভেটেনারি অফিসার মাঝে মাঝে তদারক করেন তাহলে সুস্থ স্বাভাবিক মাংস আমাদের ঘরে পোঁছতে পারে। আমি নিজেই কতদিন দেখেছি, অশিক্ষিত কসাই বেশ রসালো সরেস জিনিস মনে করে ছোট ছোট তালশাঁসের মত দেখতে Teniacyst চটকে দিচ্ছে মাংসের টুকরোর সঙ্গে। ওগুলো যে টেপ্‌ ওয়ার্মের ডিম এ কথা বিক্রেতা দূরে থাক ক্রেতারাও অনেকে জানেন না।

ক্রমে জানতে পারলাম, শিঙ ভেঙে এলে বিনি পয়সায় ব্যান্ডেজ করে দিতে হয় বলে কেউ কেউ সামান্য একটু উকো ঘষে কি করাত দিয়ে ভাঙা ধার সমান করে হাতের পাঁচ ফস্কাতে দেন না।

সব শেষে একটি মজার ঘটনা শুনলাম। একজন অ্যাসিসট্যান্ট সার্জনের নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। একবার এক অজ পাড়াগাঁয়ে Rinderpest Eradication Scheme সফল গিয়েছেন তাঁরা। মাঠের মধ্যে কৃষকরা গরু মোষ জড়ো করেছে। বৃহদাকার সিরিঞ্জ আর ব্র্যান্ডিং ইংকের শীলমোহর নিয়ে ফিল্ডে গিয়েছেন। ইতপূর্বে একবার কৃষকদের কাছ থেকেই তাড়া খেয়েছিলেন, কারণ তাদের ধারণা ঐ কালি থেকে গরুর গায়ে ঘা হয়ে যায় এবং ফলে চামড়ার দাম কমে যায়। কিন্তু এবার তাড়া নয় একেবারে গুঁতো। একটি ষণ্ডের যাঁরা নিকটবর্তী হয়েছেন ভি এ এস অমনি বুলফাইটের। হিট অবধি মোমেণ্টে প্রাণের দায়ে সার্জনের মুখ দিয়ে পুরোনো হিন্দী হিট সঙ্ বেরোলো—'মেরা Bull-Bull'—তাৎপর্য অব অ্যাপ্‌লো।

অবয়বে, আবার কোথাও নিজস্ব মনগড়া কল্পনায়, এখানে তিনি কিছু ভাবের দিক থেকে জটিল, একটু স্বভাব বহির্ভূত। হলেও ঐ দু ধরনের মধ্যে বিশেষ বৈষম্য নেই—যথা ২৩ ও ৬, দুটিতেই হাতের উল্লেখ আছে বলেই নয়—কারণ স্থানকে খা একটি বিশেষকে নিপট করার লক্ষ্য বর্তমান।

২৩নং অনেকটা কালো হলেও, এটি সাধারণের কাছে ভাল লাগবে, নং ৮-এ একটি রমণী দেহের টেরসো, খুবই মোটা লাইনে টানা, কিন্তু পার্শ্বস্থিত হাতটি খুবই ঐ অনুপাতে সরু লাইন দিয়ে নির্মিত। ফলে বেশ সুচিন্তিত বৈপরীত্যের খেলার আমেজ দেখা যায়।

৮নং-এর পর পর কয়েকটি বিবিধ ভঙ্গীতে আসীনা রমণী অবয়ব, এবং ৭নংএ কয়েকটি বিবসনার, এগুলি স্টাডি হিসাবে মন্দ না।

সব শেষে চিত্রম আর্ট গ্যালারীর কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ যে তাঁরা সম্পূর্ণ নূতন, যাদের নামের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় নেই, তাদের কাজের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করে দিচ্ছেন।
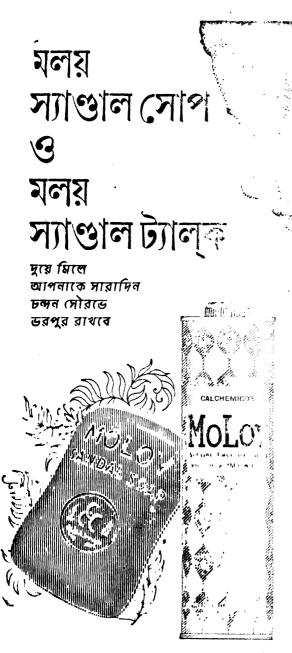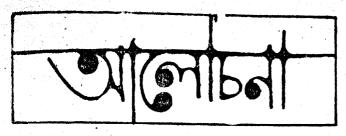
বানান সংস্কার

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "বাংলা অক্ষরে ইংরেজী নাম শব্দ" (২১ মাঘ, ১৩৭৩) এবং শ্রীযুক্ত অমিতাভ চৌধুরীর "বাংলা বানানে সু-নীতি কু-নীতি" (২৮ মাঘ, ১৩৭৩) প্রবন্ধ দুটি পড়লাম। আমি প্রবাসী, বাংলা দেশের নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় অনেক দিন নেই। নতুন বানান প্রবর্তিত হবার পর দু-একটি সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকায় অবশ্য দেখেছি। অন্যান্য পাঠকদের মত আমিও পড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়েছি, তবে যে-কোন পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার প্রতি সহনশীল এবং সহানুভূতিশীল হওয়া উচিত মনে করে নতুন বানান-রীতি দেখে বিচলিত হইনি। সম্প্রতি এই লেখা দুটি পড়ে, বিশেষ করে শ্রীযুক্ত চৌধুরীর প্রবন্ধটিতে এই নতুন বানান-রীতির নীতিগুলি এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা দেখে, কতকগুলি কথা নিবেদন করতে চাই।

নানা কারণেই বর্ণমালা সংস্কারের প্রশ্ন ওঠে। অন্যান্য ভাষাতেও বর্ণমালা সংস্কারের চেষ্টা হয়েছে। সংস্কার করার পেছনে থাকে প্রয়োজন বোধ। এবং বিভিন্ন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের প্রয়োজন বোধ আলাদা হতে পারে। কিন্তু যেহেতু ভাষা সামাজিক সম্পত্তি, তার প্রয়োজনটাও সমাজের অধিকাংশের হওয়া প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত চৌধুরী লিখেছেন, এই পরিবর্তন বা সংস্কার "প্রধানত মুদ্রণের প্রয়োজনে। প্রত্যেকটি শব্দের পিছনে রয়েছে ব্যাকরণ আর উচ্চারণ। ব্যাকরণ আর উচ্চারণ ঠিক রেখে যদি মুদ্রণের প্রয়োজনে শব্দের বন্ধন ভাঙা যায়, তা হলে শুধু এতদিনকার অভ্যাসের প্রশ্নকে আমল দেওয়া উচিত নয়।" মুদ্রণের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনের কথা তিনি উল্লেখ করেননি। তবে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের একটি প্রবন্ধ থেকে তিনি যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে অধ্যাপক সেন "অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থী, অ-বাঙালী শিক্ষার্থী" এবং মুদ্রণের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছেন।

বাংলা ভাষার বর্তমান যে বর্ণমালা বা যাকে সাধারণত ধ্বনিতত্ত্ববিদেরা Graphemics বলছেন, তার দ্বারা উপভাষার সব উচ্চারণ কখনই ঠিকমত প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মুখের কথা নিখুঁতভাবে লেখা অসম্ভব, মোটামুটি নিখুঁতভাবে লেখা যায় ধ্বনিগত লিপি বা Phonetic Script-এর সাহায্যে কিন্তু তা মুদ্রণের পক্ষে অচল, সাধারণ পাঠকের পড়ার পক্ষেও শ্রমসাধ্য। আমাদের বাংলা বর্ণমালা অনেক পরিমাণেই Phonemic, অর্থাৎ আমাদের মুখের প্রায় প্রত্যেক ধ্বনির জন্য একটি করে চিহ্ন আছে বর্ণমালায়। সব ধ্বনির নেই, এবং কয়েকটি অতিরিক্ত চিহ্ন আছে, যার Corresponding ধ্বনি আমাদের মুখে নেই। কাজেই সেদিক থেকে বর্ণমালা সংস্কারের চেষ্টা হলে সত্যিকারের কাজ হত।' কিন্তু আনন্দবাজার পত্রিকা তা করতে চাচ্ছেন না। তাঁরা যা করতে চাচ্ছেন, তাতে শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে সুবিধে হবে না—কারণ, তাঁদের যুক্তাক্ষর শিখতেই হবে। তৎসম এবং সংস্কৃত (নানা কারণে দুটি আলাদা শ্রেণী করতে চাই) শব্দের জন্য যুক্তাক্ষরের পরিচয় আনন্দবাজার স্বীকার করছেন। সংস্কৃত এবং তৎসম শব্দের যুক্তাক্ষর থাকছে, ইংরেজী শব্দের গোড়ায় যুক্তাক্ষরগুলিও থাকছে। কাজেই মুদ্রণের জন্য যুক্তাক্ষর থাকছে, টাইপরাইটার থেকে যুক্তাক্ষর বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত বাংলায় কোন তদ্ভব শব্দের গোড়ায় বা শেষে কোন যুক্তধ্বনি নেই, কাজেই যুক্তাক্ষরও নেই। আছে শব্দ মাঝখানে এবং যুক্তাক্ষর সেখানে সংস্কৃতের বা তৎসম শব্দের তুলনায় অত্যন্ত কম। কাজেই এই কয়েকটি শব্দের যুক্তাক্ষরকে ভেঙে লিখলে কাজ সত্যি-সত্যি কতটা সরল হবে বুঝতে পারছি না।

অমিতাভবাবু "এতদিনকার অভ্যাসের প্রশ্নকে আমল দেওয়া উচিত নয়" বলেছেন। কিন্তু ভাষার বানান বা উচ্চারণ—এই দুটি ক্ষেত্রেই বড় কথা হল সাধারণ মানুষের, বা সেই ভাষা বা সেই উপভাষা যাঁরা বলেন, তাঁদের অভ্যাস। আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিকেরা বরাবর এই অভ্যাসের ওপর জোর দিয়ে আসছেন। ভাষায় 'ভুল' বা 'ঠিক' বলে কিছু রায় দেবার আগে জানা দরকার মানুষ সেটাকে কতটা গ্রহণ করেছে। ভাষায় যেটা

চলে গেছে, যা মানুষ যেটাকে মেনে নিয়েছে সেটার পরিবর্তন করার চেষ্টা না করাই ভাল। কারণ ভাষার বানান বা উচ্চারণ জনসাধারণের ব্যবহারের বস্তু। সমাজ যদি সেটাকে গ্রহণ করে এবং সেই ভাষায় যাঁরা কথা বলেন বা লেখেন তাঁদের যদি ভাব বিনিময়ে কোন বাধা সৃষ্টি না হয় তাহলে তার পরিবর্তনের দরকার হয় না। আমরা জানি বহু শব্দ যেগুলি পঞ্চাশ বছর আগে অশুদ্ধ বলে পরিগণিত হত, আজ সেগুলি স্বাভাবিক এবং সেই কারণেই শুদ্ধ। এই কারণে আমি মনে করি যেসব ইংরেজী শব্দ বাংলা ভাষায় আজ স্থায়ী আসন পেতেছে, যাদের বানান আজ একশ দেড়শ বছরে স্থায়ী রূপ নিয়েছে তাদের পরিবর্তনে লাভ নেই—কারণ সেরকম শব্দের সংখ্যা কটা? যুক্তাক্ষর ত' আমরা উঠিয়ে দিতে পারছি না, সংস্কৃত এবং তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে রাখছি। ইংরেজী শব্দের গোড়াতেও রাখছি, শুধু 'লণ্ডন' 'বোম্বাই' 'মাদ্রাজ' লিখতে তাহলে কী ক্ষতি। তাছাড়া সুনীতিবাবু ঠিকই লিখেছেন যে, বাংলা উচ্চারণে 'বোম্বাই' ও 'বোমবাই' এক নয়। অমিতাভবাবুও বলেছেন যে "সূক্ষ্ম বিচারে তাঁর কথা হয়ত ঠিক।" অনেক ক্ষেত্রেই বাংলায় দুটি Syllable-এর মাঝখানে একটু বিরাম থাকে, ভাষাতাত্ত্বিকদের অনুসরণে বলতে পারি+juncture; বাংলায় অনেক সময় যুক্তাক্ষর এই juncture বোঝার সাহায্য করে। অমিতাভবাবু ঠিকই বলেছেন যে, "বানানের বেড় দিয়ে উচ্চারণকে পুরোপুরি বাগ মানানো যায় না।" কিন্তু যদি কোন বানান উচ্চারণের কাছাকাছি হয় তাহলে সেই বানানটি গ্রহণ করা ভাল নিশ্চয়ই।

অমিতাভবাবু লিখেছেন ভবিষ্যতে "দু"-একটি সংস্কৃত শব্দেরও যুক্তাক্ষর ভাঙা যেতে পারে।" যেমন "তদ্ভব" না লিখে "তদ্‌ভব", "উদ্যোগ" না লিখে "উদ্‌যোগ"। আমার মনে হয় তাতে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি হবে। "তদ্‌ভব"-এর ক্ষেত্রে তেমন সমস্যা নেই [যদিও অনেকে ব্যাকরণের সূক্ষ্মতার দিক থেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন], কিন্তু "উদ্‌যোগ" লিখলে "যোগ" অংশটির উচ্চারণ করতে চাইব "জোগ", যদিও "উদ্যোগ" লিখলে উচ্চারণ করব "উদ্‌দোগ"। এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষে এটাই সহজ—কারণ তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের নিয়মই হল এই: যেকোন ব্যঞ্জনধ্বনি+য/ব=ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব, যথা কল্য [কল্‌ল], বিশ্ব [বিশ্‌শ]। কিন্তু 'উদ্‌যোগ' লিখলে সমস্যা সরল হবে না বরং নতুন জটিলতার সৃষ্টি করবে।

আর একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। বানান সংস্কার করা যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে তৎসম, তদ্ভব ইত্যাদি জাতি বিভাগ করার কোন অর্থ আমি খুঁজে পাই না। ভাষার ইতিহাসের দিক থেকে তৎসম, তদ্ভব, বিদেশী ইত্যাদি বিভাগের একটি যৌক্তিকতা আছে, কিন্তু ভাষার ব্যবহারিক দিক থেকে সব শব্দই বাংলা শব্দ। এক জায়গায় বানান বদলাব যেহেতু সেগুলি সংস্কৃত শব্দ নয়, অন্য জায়গায় বদলাবো না যেহেতু সেগুলি সংস্কৃত শব্দ, যদিও বাংলায় কয়েক শ' বছর ধরে ব্যবহার হচ্ছে—এটি ঠিক বলে মনে করি না। বাংলা শব্দের ক্ষেত্রে যে আইন চালানো হবে তাতে জাতিভেদ রাখার পক্ষপাতী আমি নই। অমিতাভবাবু অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের প্রবন্ধ থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি আমেরিকান ইংরেজীর বানান সংস্কারের কথা তুলেছেন। আশাকরি অমিতাভবাবু অধ্যাপক সেনের বক্তব্য তাঁর নিজের বক্তব্যের সমর্থনেই তুলেছেন। প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছেন "Color, Favor, Center, Honor প্রভৃতি শব্দের বানান সংস্কারে যাঁরা দ্বিধাবোধ করেন নি—Know, Knight প্রভৃতি শব্দের বানান সংস্কারে তাঁরা অগ্রসর হন নি। কারণ শেষ দুটি শব্দ পাশ্চাত্য জগতের তৎসম (অর্থাৎ গ্রীক লাতিন) পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু Color শব্দ তা নয়, কাজেই সে ক্ষেত্রে বানান সংস্কার চলে।"

দুর্ভাগ্যবশত অধ্যাপক সেন ভুল করেছেন। Know বা Knight কোন গ্রীক বা ল্যাটিন শব্দজাত নয়। Know যে ইন্দো-ইউরোপীয় ধাতু থেকে জন্ম নিয়েছে গ্রীকে সাধারণত তা gnw এবং ল্যাটিন gno রূপে পুনর্গঠিত করা হয়। Knight শব্দটি জার্মানিক Knecht শব্দ জাত। আর Color, Favor, Center, Honor প্রত্যেকটি ল্যাটিন শব্দ জাত [Colorem, Favorare, Centrum, Honorem]। আর আমেরিকার ইংরেজীতে প্রকৃতপক্ষে বানান সংস্কার করা হয়নি। বৃটিশ ইংরাজীতে এই শব্দগুলি প্রধানত এসেছিল প্রাচীন ফরাসীর মধ্য দিয়ে [Couloarer, Centre, (h)onerer] এবং ইংরেজী ভাষায় বহুদিন পর্যন্ত Centre এবং Center, Color এবং Colour, honor এবং honour পাশাপাশি ব্যবহার হয়েছে। আমেরিকার ইংরেজীতে তার একটি রক্ষিত হয়েছে, অন্যটি বৃটিশ ইংরেজীতে। এবং আমেরিকান ইংরেজীর এই শব্দগুলির বানান অনেক বেশী ল্যাটিন অভিমুখী। এই কথাগুলি বললাম এই কারণে যে, আমেরিকান বানান সংস্কারের নজীর বাংলা বানান সংস্কার নীতির সমর্থন করছে না।

শিশিরকুমার দাশ
কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, ইথাকা, নিউ ইয়র্ক

আমায় দোষী কর

শার্ঙ্গদেবের 'আমায় দোষী কর' লেখাটির পরিপ্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত যতগুলো চিঠি আপনার কাগজে বেরিয়েছে, সব পড়লাম। বিশেষ করে ৪ চৈত্র 'দেশ'এ শ্রীযুক্ত কিরণশশী দের পত্রটি এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার বিষয় বলে মনে করি। যদিও তাঁর আলোচনাটি সমস্ত দিক দিয়ে নয়, তথাপি তাঁর পত্রে উল্লেখিত ১৩৭৩ সালের 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ' শ্রাবণ সংখ্যাটি অনুসন্ধান করে পড়লে যে-কেউ নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবেন, আমাদের 'আজকালকার' রবীন্দ্র-সংগীতে বিকৃত রূপ প্রণয়নের জন্য সর্বতোভাবে না হলেও অংশত বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তথা গ্রন্থন বিভাগ তো দায়ী বটেই। শ্রীযুক্ত দের সমস্ত বক্তব্য সুস্পষ্ট তথা এবং বহু প্রমাণসম্বলিত, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমরাও তাঁর সংগে একমত হয়ে অনুরোধ জানাই—কলিকাতা বেতার কর্তৃপক্ষ যদি যথার্থই মনে-প্রাণে নিরপেক্ষভাবে রবীন্দ্র-সংগীত প্রচারের উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করে থাকেন, তা হলে রবীন্দ্র-সংগীত বেতার শিল্পী-দের প্রতি অধুনা যে অনুচিত নির্দেশ তাঁরা জারি করেছেন, তা তুলে নিয়ে আসল সমস্যাটির মূলে অবিলম্বে প্রবেশ করুন। এই কর্তব্যে সামান্যতম অবহেলা দেখানো এঁদের পক্ষেই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না।

চম্পক দেবনাথ
কলকাতা-১০

আকাশবাণীর রবীন্দ্র সংগীত

১৮ই চৈত্র ১৩৭৩ ২২ সংখ্যা দেশ পত্রিকার পত্রলেখক শ্রীগোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় [illegible] [illegible] শ্রোতাদের অজস্রতা প্রকাশ করতে গিয়ে আরো কয়েকটি ভুল তথ্য নিজেই পরিবেশন করেছেন। সাইগল সাহেব গোড়া থেকেই হিন্দুস্থান কোম্পানীর রেকর্ড শিল্পী। তিনি পরে হিন্দুস্থান কোম্পানীতে যোগ দিয়েছিলেন এ সংবাদটি ঠিক নয়। "নিউ থিয়েটার্স রেকর্ড" আসলে বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানীরই রেকর্ড লেগুলোতে নিউ থিয়েটার্সের নাম এবং হাতি-মার্কা ছাপ এত বড় করে মুদ্রিত আছে যে ছোট করে ছাপা রেকর্ড কোম্পানীগুলোর নাম প্রায় চোখেই পড়ে না। নিউথিয়েটার্সের ছবিতে তখন যে সব শিল্পীরা গান গাইতেন তাঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। যেমন, সাইগল হিন্দুস্থানে, পঙ্কজ মল্লিক প্রথমে হিন্দুস্থানে পরে কলাম্বিয়ায়, কে সি দে এইচ এম ভিতে, কানন দেবী মেগাফোনে ইত্যাদি। নিউ থিয়েটার্সের ছবিতে এই শিল্পীরা যে সব গান গেয়েছেন সেগুলি সবই উপরোক্ত রেকর্ড কোম্পানীগুলো প্রকাশ করেছেন "নিউ থিয়েটার্স" নামটি সবার ওপরে রেখে। এবং একটু ভালো করে লক্ষ করলেই পত্রলেখক শ্রী মুখোপাধ্যায় বুঝতে পারবেন সাইগলের 'নিউ থিয়েটার্স' রেকর্ড আসলে হিন্দুস্থান কোম্পানীরই রেকর্ড, প্রতিটি রেকর্ডের নীচের দিকে ছোট্ট করে হিন্দুস্থান কোম্পানীর নাম মুদ্রিত আছে।

সাইগল এইচ এম ভি থেকে কোনও গানই রেকর্ড করেন নি এই তথ্যটি মারাত্মক ভুল। বাংলাদেশ ছাড়ার পর সাইগল বোম্বাই-এর বেশ কয়েকটি ছবিতে গান গেয়েছিলেন (যেমন তানসেন) এবং সেই সময়ে তাঁর সব গানই এইচ এম ভি থেকে প্রকাশিত।

অমিতাভ মিত্র॥
কলকাতা-২৫

ব্লাসফেমি

১ এপ্রিল তারিখের 'দেশ'এ ব্লাসফেমি প্রবন্ধটির জন্যে ইন্দ্রজিৎকে অভিনন্দন জানাই। ব্লাসফেমির অন্তর্নিহিত যে আর্টের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, সেই রসোত্তীর্ণতার প্রমাণ তাঁর রচনায় সর্বত্র। শুধুমাত্র পুরোনো সংস্কারগুলির বিরোধিতা করে তিনি আধুনিক সাহিত্যের ব্লাসফেমাস আচরণকে সমর্থন করেননি। [illegible] "প্রবল পরিহাসের সুরে" অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের সাহায্যে নিজের বক্তব্যকে সন্তর্পণে প্রতিষ্ঠা করেছেন। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আর্টিস্ট মেঘনাদের প্রসঙ্গে, নেহাতই পরিহাসচ্ছলে ইন্দ্রজিৎ নিজের যে গুণের উল্লেখ করেছেন সেটি বাস্তবিকভাবেই তাঁর নিজের লেখার প্রসঙ্গে প্রযোজ্য।

তবে একটি কথা, 'দুর্বলচিত্ত' পাঠক-সমাজের পক্ষ থেকে একটি আবেদন আছে। সত্যি বটে, ব্লাসফেমি-প্রধান আধুনিক সাহিত্য মাঝে মাঝে একটু কড়া ডোজের হয়ে পড়ে, তবুও আজকের পাঠক-সমাজের অভিযোগ প্রধানত ব্লাসফেমিহীন উগ্র বিরোধী পন্থার বিরুদ্ধে। 'মর্যাদা-হানিকর উক্তি' করার সুযোগ নিয়ে আজকের দিনের অসংখ্য 'আধুনিক' লেখক আর্টের অন্তরালের কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হতে বসেছেন। এবং সেইখানেই আমাদের আপত্তি।

এষা মুখোপাধ্যায়
কলকাতা

'কোল-ইয়ারী কথা'

ত্রিলোচন কলমচি লিখিত "নিকট দূরে"-র কোল-ইয়ারী কথা পড়েছিলাম ভীষণ আগ্রহ সহকারে। কয়লাখনির তথাকথিত কেলেংকারীর অন্ধকারের ওপর তিনি এমনভাবে তাঁর সুনিপুণ মনশীয়ানা আর স্বভাবসিদ্ধ হিউমারের তীব্র আলো ফেলেছেন যে, একজন কয়লাখনির কর্মী হয়েও তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে দুটো কথা বলতে গলার জোর খুঁজে পাচ্ছি না। ম্যানেজার থেকে মুনশী—সর্বস্তরের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগগুলো লজ্জায় অধোবদন হয়ে মেনে নিয়ে এ সম্বন্ধে চুপ করেই থাকতাম। কিন্তু তা করতে দিলে না কুয়াশিয়া কোলিয়ারী থেকে লেখা শ্রীমতী গুহর চিঠিখানা (দেশ ঃ ১৪ই মার্চ)। সুতরাং "কোল-ইয়ারী" সম্বন্ধে কিছু লিখতে হচ্ছে এবং সেটা যদি শ্রীমতী গুহর প্রতিবাদের বিপক্ষে যায় তবে পূর্বাহ্নেই তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি।

বিনিপয়সায় বলেই কিনা জানি না, কোলিয়ারীতে জল-আলো-কয়লার শ্রাদ্ধ চলেছে নিরন্তর। দরকারের চেয়ে বেশী ভাল্‌ব্‌ থাকা সত্ত্বেও কলের জল হাহাকার করে পড়ছে রাতদিন; বেলা বারোটা পর্যন্ত আলো জ্বলছে অধিকাংশ কোয়ার্টারে; বাড়ির গিন্নীদের উনুন অষ্টপ্রহর অনির্বাণ বলে রাত দুটোর সময়ও চা-সেবা করা মোটেই কঠিন নয়! বেশীর ভাগ মা-লক্ষ্মীরাই দুপুরে রান্না-বান্নার পাট-চুকিয়ে এক চাপ কাঁচা কয়লা গুঁজে দেন উনুনে। বিকেলে তোলা উনুনটা একটু ঝাঁকানি দিয়ে বৈকালিক চা-পর্ব সমাপনান্তে আবার এক চাপ কয়লা। রাতের রান্নার পর সেই কর্মের পুনরাবৃত্তি। এবার কয়লার পরিমাণটা একটু বেশী। সারা রাত "অলিম্পিক টর্চ" (কলমচি মশায়ের ভাষায়) বা "রাবণের চিতা" (শ্রীমতী গুহর ভাষায়) জাজ্বল্যমান রাখতে হবে তো! এক কথায় কোলিয়ারীর বেশীর ভাগ কোয়ার্টারের অধিকারীরা প্রত্যেক দিন নিয়মিতভাবে জলের ভাল্‌ব্‌ বা আলোর সুইচ্‌ বন্ধ করা প্রয়োজন মনে করেন না এবং উনুনের মুখাগ্নি করতে সারা মাসে একটি দেশলাই-কাঠির বেশী খরচ করেন না।

তা ছাড়া সায়েবদের বাংলোতে নিয়মিত সাপ্লাই হচ্ছে কেরোসিন তেল, সোডা, নারকেল ঝাঁটার কাঠি, ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল ইত্যাদি ইত্যাদি। ফালতু লোক-জনের কথা নাই বা বললাম। সায়েবদের বাংলোগুলোতে কত ম্যান-পাওয়ার যে বেঘোরে মারা পড়ছে তার লেখাজোখা কে করে? নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলছিঃ রাণীগঞ্জ ফিল্ডে একটি বড় কোলিয়ারীর ম্যানেজারের বাংলোয় চারজন লেবার কোন কাজ না থাকায় মেমসাহেবের নির্দেশে দু সপ্তাহ ধরে শুধু দরজা-জানালার শাশী ভিজে কটন্‌-ওয়েস্ট দিয়ে ঘষেছিল, অর্থাৎ শুধু বিড়ি খেয়ে আর খিস্তি-খেউড়-আড্ডা মেরে মোট ৩৮৪ ম্যান-আওয়ার বরবাদ করেছিল! তবুও তাদের কোলিয়ারীর অন্যত্র কোন কাজে নিয়োগ করা হয়নি।

তবে একটা কথা। কলমচিমশাই-উত্থাপিত অভিযোগগুলো জাতীয় কয়লা উন্নয়ন সংস্থার কোলিয়ারীসমূহ সম্বন্ধে পুরো-পুরি প্রযোজ্য নয়। শ্রীমতী গুহর প্রতিবাদটি এ বিষয়ে ভিত্তিহীন নয়। তাঁদের কোয়ার্টারে ইলেকট্রিক মিটার লাগানো আছে, কয়লার পরিমাণ বা জল সরবরাহের দৈনিক সময়সূচীও বাঁধা। বাড়ি ভাড়াও তাঁদের পারিশ্রমিক থেকে নিয়মিত কেটে নেওয়া হয়। কিন্তু, শ্রীমতী গুহকে আমার জিজ্ঞাস্য, সারা ভারতে প্রাইভেট ফার্মের তুলনায় জাতীয় কয়লা উন্নয়ন সংস্থা-পরিচালিত কোলিয়ারী ক'টা আছে? বাংলা দেশে তো একটিও নেই। এবং কলমচি মশাই বাংলা দেশেরই কোন একটা কয়লাখনি সম্বন্ধে "কোল-ইয়ারী কথা" লিখেছেন।

কলমচি মশাই ঘুষের প্রসংগে যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে না হলেও অনেকাংশে সত্যি। কোলিয়ারীতে ঘুষ-দেবতার দাক্ষিণ্য কয়েক শ্রেণীর কর্মচারীর ওপর অকৃপণভাবে বর্ষিত হয়ে চলে চলেছে। সারফেসে বড়বাবু, গুদামবাবু, লোডিংবাবু, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডবাবু ইত্যাদি এবং আণ্ডারগ্রাউণ্ডে মুনশীবাবুই এই দাক্ষিণ্য পান সবচেয়ে বেশী। এমনকি কোন কোন কোলিয়ারীতে কম্পাসবাবু (সার্ভেয়ার) ও ছোট সায়েবও কম যান না।

উপসংহারে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে ঘুষ-ঘাস ও কোলিয়ারীর জিনিসপত্র লুটপাট করার কতকগুলো চিত্র তুলে ধরছিঃ

(ক) আমার প রি চি ত একজন 'কোলিয়ারী স্টোর সাপ্লায়ার' ওয়াগন ওয়াগন টি এল ও কাঁগং স্লীপার এবং ব্যাম্বু ম্যাটিং রিজেক্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে প্রত্যেক গুদামবাবুদের (সাপ্লাই-এর পরিমাণ অনুসারে) সপ্তাহান্তে মোটা হাতে কিছু দিয়ে থাকেন। সেই কিছুটা দশ টাকা থেকে দুশো টাকা পর্যন্ত হয় (সপ্তাহে)।

(খ) জনৈক বড়বাবু ওয়াগন-লোডিং ও আণ্ডারগ্রাউণ্ড কন্ট্রাক্টরদের বিল পেমেন্টের জন্য এক মাসে প্রায় পাঁচ শো টাকা পকেটস্থ করেছিলেন।

(গ) জনৈক কোলিয়ারী ইঞ্জিনীয়ার গুদামবাবুর সহযোগিতায় এক মাসে শুধু ইলেকট্রিক বাল্‌ব বিক্রি করেছিলেন দুশো টাকার!

(ঘ) একজন ডাক্তারবাবুর ঘরে তুলো, ব্যাণ্ডেজ, গজ, সিরিঞ্জ, নিড্‌ল্‌ এবং ডেটল-আইডিন থেকে পেনিসিলিন-স্ট্রেপটো-মাইসিনের এত প্রাচুর্য দেখেছিলাম যে, তা দিয়ে অনায়াসে একটা "দাওয়াখানা" খোলা যায়।

(ঙ) জনৈকা ক্রেশ্‌-ইন-চার্জের কোয়ার্টারে দেখেছিলাম এক আলমারি ভর্তি লাইফ্‌বয় ও সানলাইট সাবান, সোডা, গুঁড়ো দুধ, মার্কিন কাপড়, কেরোসিন তেল ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, সব ক্রেশ্‌ থেকে ম্যানেজ করা। ভদ্রমহিলা নাকি চাকুরিজীবনে উক্ত জিনিসগুলোর জন্য এক পয়সাও খরচ করেন নি!

অলম্‌ ইতিবিস্তরেণ। পরিশেষে ত্রিলোচন কলমচি মশাইকে তাঁর কলমের সুক্ষ্ম খোঁচার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করছি, কয়লাখনির ইত্যাকার নিখুঁত চিত্র আঁকার জন্য প্রয়োজন হলে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সংগে কিছু চিত্তাকর্ষক কাহিনী সহ সংযোগ স্থাপন করতে প্রয়াসী।

নির্মাল্য রায়
তারাবাদ কোলিয়ারী
সাঁওতাল পরগণা

বাংলা ছোট গল্প

১ এপ্রিলের দেশ-এ সাহিত্য সংবাদ বিভাগে প্রকাশিত 'বাংলা ছোটগল্পের অস্বস্তি' শীর্ষক রচনাটি ছোটগল্পের সংশয়জনক অবস্থার উপর আলোকপাত করলেও, তথ্য ও তত্ত্বের দিক থেকে কিছু প্রমাদ সৃষ্টি করে। অবশ্যই এ-কথা ঠিক যে, ছোটগল্প সম্পর্কে কয়েক বছর আগে পাঠকের মনে যে আগ্রহ ছিল, এখন তা নেই এবং পাঠক গল্প অপেক্ষা উপন্যাস পাঠে অধিকতর আগ্রহ দেখান। গল্পের প্রতি আকর্ষণ ক্ষুন্ন হওয়ায় বিভাগীয় লেখক সনাতন পাঠক মহাশয় মোটামুটি সব দায়িত্বই পাঠকের উপর ন্যস্ত করেছেন, এটা ঠিক নয়। আমার মনে হয়, এটা কিছুটা দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টাও বটে, কারণ, পাঠকদের রুচির উপর দোষ চাপালে লেখকদের দায়িত্ব অনেক কমে যায়। সনাতনবাবু অবশ্য নতুন কিছুই বলেননি, এর আগেও অনেকে এ-রকম মন্তব্য করেছেন। কিন্তু, কেন পাঠকের রুচি পরিবর্তন হল, সেটা ভেবে দেখার প্রয়োজন অনেকেই মনে করেন না। আমি বাংলা ছোটগল্পের একজন ভক্ত পাঠক এবং একটি মাঝারি লাইব্রেরীর সঙ্গে যুক্ত, আমার এবিষয়ে কিছুটা ধারণা আছে। এখানে তাই লিপিবদ্ধ করলাম।

ছোটগল্পের চাহিদা বা ছোটগল্পের বইয়ের চাহিদা, উপন্যাসের চাহিদার তুলনায় শুধু বাংলায় নয়, সব ভাষাতেই কম এটা বিদেশী ভাষাগুলি সম্পর্কেও খাটে। ছোটগল্প অনেকেই পত্রিকায় পড়ে ফেলেন, স্বভাবতই বই বেরোলে অনেকের উৎসাহ থাকে না। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, গত কয়েক বছরে পত্রিকা প্রকাশের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি পত্রিকা পাঠের রেওয়াজও আশাতীত রকম বেড়েছে। আগে এটা ছিল না। অনেকেই তখন কিনে অথবা লাইব্রেরী থেকে এনে বই পড়তেন, কিন্তু পত্রিকা পড়তেন না। এখন পত্রিকা অনেকেই পড়েন, সেই অনুপাতে বই-পাঠকের সংখ্যা অনেক কম। ফলে ছোটগল্পের প্রয়োজন পত্রিকা পাঠেই ফুরিয়ে যায়। সম্পূর্ণ উপন্যাস একসঙ্গে কোন পত্রিকাতেই বেরোয় না, ধারাবাহিক উপন্যাস পড়ার ধৈর্য অনেকেরই থাকে না, এইসব কারণেও গ্রন্থাকারে উপন্যাসের চাহিদা বেশি। কিন্তু, আমার ধারণা, ছোটগল্প দেখে 'দূর ছাই' কেউই বলেন না, এই অসৌজন্যের ভঙ্গী সনাতনবাবু অনর্থক পাঠকের উপর ন্যস্ত করেছেন। প্রকাশকের দায়িত্ব সম্পর্কে প্রকাশকরাই বলবেন, পাঠক হিসেবে আমার কিছু বলার নেই।

আর, সনাতনবাবু লিখেছেন যে, পাঠকের চাপেই নাকি লেখকরা ছোটগল্প লিখছেন না, কুড়ি-পঁচিশ পাতায় সিনেমার উপযোগী বড়গল্প লিখছেন, যেগুলি না গল্প না উপন্যাস—এই বক্তব্যও হাস্যকর। পাঠক কোনদিনই লেখকের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে বসে থাকেন না, কিংবা বলেন না, মশাই, এটা লিখুন, ওটা লিখবেন না, তা সত্ত্বেও যদি লেখকদের মনোযোগ ওই ধরনের লেখার উপর থাকে, সে-দায়িত্ব কার? লেখকের না পাঠকের? আর, লেখক যদি সৎ হন, পাঠকের কুরুচি বা নিম্ন রুচির প্রতিই বা তিনি দৃকপাত করবেন কেন? সনাতনবাবু লেখার আগে এই সাধারণ যুক্তিগুলি ভেবে দেখলে পারতেন। আমার মনে হয়, লেখকরাই পরোক্ষে, যে-কোন কারণেই হোক, পাঠকদের রুচি পরিবর্তনে সাহায্য করেছেন।

সনাতনবাবু তাঁর রচনায় বিমল কর, সমরেশ বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রভৃতি আর 'ঝকঝকে' লেখা লিখছেন না, এমন একটি কথা বলেছেন। ঝকঝকে কথার কি অর্থ, তা সম্যক বোঝা গেল না। আমার ধারণা, কম লিখলেও, তাঁরা আগের চেয়ে অনেক পরিণত লেখা লিখছেন। সমরেশবাবুর ইদানীং লিখিত 'ভগবতী' বা বিমল করের 'সোপান' গল্পগুলি হয়তো আমার কথা প্রমাণ করবে। গত কয়েক বছরে নরেন্দ্র মিত্র, রমাপদ চৌধুরী, সন্তোষকুমার ঘোষ, অমিয়ভূষণ মজুমদার প্রভৃতি কয়েকটি প্রকৃত ভালো গল্প লিখেছেন। এক-একটা Phase আসে, যখন অনেকেই আর তেমন ভালো লিখতে পারেন না, কিন্তু, যখনই কেউ লেখেন, পাঠক এগিয়ে আসে তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে।

এ-কথা তরুণ লেখকদের সম্পর্কেও সত্য। তাঁদের বই প্রকাশিত হচ্ছে বা না হচ্ছে, আর না হলে কেন হচ্ছে না, তা বলবেন প্রকাশকরা। যদি উচিত গ্রন্থের প্রকাশনা প্রকাশকের অনিচ্ছার জন্য আটকে থাকে,

সেটা অবশ্যই দুঃখের। কিন্তু Formative perrod-এ এই দুঃখ তরুণ লেখকদের ভোগ করতেই হবে। কিন্তু, সেই সঙ্গে এই কথাও সত্যি যে, তরুণ লেখকরা কতখানি ভালো লিখছেন, তারও যাচাই হওয়া দরকার। এ সম্পর্কে সনাতনবাবুর ঢালাও আশ্বাসই যথেষ্ট নয়। লেখক, সমালোচক, সম্পাদক ও প্রকাশকগোষ্ঠীর বাইরেও একটা জগৎ আছে, বৃহত্তর পাঠকসমাজ, যাঁদের নিতান্তই আহাম্মক, নির্বোধ, সাহিত্য-বোধশূন্য ভেবে নেওয়া অনুচিত। তাঁরাই প্রকৃত পাঠক, যাঁরা বই পড়েন, মন্দ সমালোচনার ভ্রূক্ষেপ করেন না, তাঁরাই লেখক ও সাহিত্যিককে বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁরা লেখক হয়তো নন, কিন্তু তাঁদের কেউ চিকিৎসক, কেউ অধ্যাপক, কেউ এঞ্জিনীয়ার, কেউ সরকারী চাকুরে ইত্যাদি। মিনিমাম এডুকেশন ও বোধবুদ্ধি অন্তত তাঁদেরও আছে, নিজস্ব বিচারবুদ্ধিও আছে।

অবশ্য আমি এমন কথা বলছি না যে, তরুণ লেখকরা এই কয়েক বছরে ভালো গল্প লেখেননি। অনেকে লিখেছেন, অনেকেই লিখছেন। কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে, তরুণ লেখকদের আনপপুলারিটির জন্য পরোক্ষে তাঁরাই দায়ী। আমার বিশ্বাস, মূল দেশ, কাল, মানুষকে অবহেলা করে তাঁরা ফরাসী, আমেরিকান প্রভৃতি সাহিত্যের অনুকরণে এক ধরনের বিদেশীয়ানা সাহিত্যে আমদানি করতে চেয়েছেন যার কোন মূলে নেই এবং সেই জন্যেই পাঠকের মনোবেগে আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছেন। পাঠকদের দোষ না দিয়ে সনাতনবাবু যদি এই উঞ্ছবৃত্তি সম্পর্কে অবহিত হন ও কারণ অনুসন্ধান করেন, তা হলে খুশী হব।

অশোকচন্দ্র রায়
কলকাতা-৩৩।

এই শিল্পীরা

গত চৌঠা চৈত্র "দেশ"এ সুনন্দর জার্নালের এই "শিল্পীরা" বাস্তবে সত্যই অত্যন্ত জীবন্ত। বছরখানেক আগে দক্ষিণ কলকাতায় অবস্থান কালে এই প্রতিভাবান শিল্পীগোষ্ঠীর জনৈক অভিনেতার কবলায়িত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল, যদিও এই শিল্পীটির অভিনয় প্রক্রিয়া কিঞ্চিৎ ভিন্নধর্মী। গ্রীষ্মের এক নির্জন দুপুরে অতি মার্জিত চেহারার বুসশার্ট পরা বছর পঁচিশের একটি যুবক সামনে এসে অত্যন্ত বিব্রত সৌজন্যে জানতে চায় রোজকার পঠিত খবরের কাগজ আমরা কী উপায়ে সদ্ব্যবহার করি। পেপারওয়ালার কাছে নিশ্চয়ই বিক্রি করা হয়, তা যদি হয় তবে সে এসেছে একদা সম্ভ্রান্ত ও অধুনা বিধ্বস্ত পরিবার থেকে, ঐ পেপারগুলো যদি পেপারওয়ালার দামের আধা দামে তাকে বিক্রি করা হয়। যাদবপুর য়ুনিভার্সিটির ছাত্র হয়ে তাকে পড়া ছেড়ে পিতৃদেবের অকাল বিয়োগে মা ভাইবোনের দায়িত্ব নিয়ে চাকরির খোঁজ করতে হচ্ছে। প্রচুর কষ্টসাধ্য করে সে রাউরকেলায় একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে 'ইন্টারভিউ' লেটার পেয়েছে কিন্তু পথ খরচার অভাবে বুঝি তার এই সুযোগ হাতছাড়া হবার যোগাড়। অতএব সহৃদয় "দিদিভাই" (এই সম্বোধনে সে প্রথমেই আত্মীয়তার দাবি জানিয়েছিল) যদি পুরোনো জমানো কাগজগুলো দয়া করে স্বল্প দামে বিক্রি করেন তবে সে তাই দিয়ে পাথেয় সংগ্রহে কিছু সাশ্রয় করতে পারে। কথাগুলোর প্রায় অর্ধেকই সে চমৎকার ইংরেজীতে বলেছিল এবং তার কথাবার্তায় কোনও আড়ষ্টতা বা কৃত্রিমতা ছিল না। বলাবাহুল্য মাস ছয়েকের জমে ওঠা খবরের কাগজের একটি ছোটোখাটো গন্ধমাদন তাকে বিনে পয়সায় বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল এবং ঘরের জঞ্জাল সাফ ও সামান্য পরোপকারের পুণ্য লাভ এক সাথে হওয়ায় আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলাম।

এই ঘটনার মাসখানেক পর এমনই এক দুপুরে তার পুনরাবির্ভাব ঘটল। প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে "দিদিভাই"-এর আন্তরিক শুভ কামনা জানিয়ে শুভ সংবাদ পরিবেশন তার সেই রাউরকেলার চাকরিটা হয়েছে এবং এই দুঃসময়ে তার এই স্বল্প সংস্থানটুকু একমাত্র "দিদিভাই"-এর সহৃদয়তা ও শুভেচ্ছায় হতে পেরেছে বলেই তার বিশ্বাস। এটুকু নিবেদন করে আমার অনুরোধে সে বসবার ঘরের চেয়ারে একটু গুছিয়ে বসতে গিয়ে যেন একটু চমকে ওঠে। সেদিন দুর্ভাগ্যক্রমে কোনও পারিবারিক কারণে অফিস থাকা সত্ত্বেও বাড়ির কর্তাটি বাড়িতে ছিলেন ও যথাসময়ে দর্শন দান করলেন এবং তার এই কৃতজ্ঞতা বাড়ি বয়ে জানাতে আসার দরুন খুশী হবার ভান করলেন কিন্তু একটা অতি জরুরী প্রয়োজনে আমাদের এই মুহূর্তে বাইরে বেরোনো দরকার তাই নবলব্ধ শ্যালকটির সাথে আশ মিটিয়ে আলাপ হলো না বলে দুঃখ প্রকাশ করে তাকে অন্যদিন আসতে বললেন। শ্যালকটি তখন মরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে "কিন্তু আমার একটা অত্যন্ত দরকারী কথা ছিল দয়া করে যদি একটু শোনেন...বলতে বলতে আমার দিকে ঘনঘন সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। বাড়ির কর্তা দৃঢ় গাম্ভীর্যে তাকে বিদায় ক'রে এবারে যে সে নিছক খবরের কাগজের খদ্দের না হয়ে তার এই সংসারানভিজ্ঞা দরদী দিদিটির কাছে ছাপানো কাগজের খদ্দের হয়ে এসেছিল সে সম্বন্ধে নিজের গবেষণামূলক মতামত পেশ করে আমায় মর্মাহত করলেন।

শ্রদ্ধেয় সুনন্দ তাঁর "এই শিল্পীরা" শীর্ষক রচনায় এই ধরনের সতত সঞ্চরণশীল শিল্পীদের আক্রমণের ধারা সম্বন্ধে কিছু নমুনা দিয়ে অনভিজ্ঞ জনসাধারণকে সজাগ করতে যে প্রয়াস পেয়েছেন তার জন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নন্দাশ্রী রায়
টেলকো, জামসেদপুর-৪
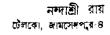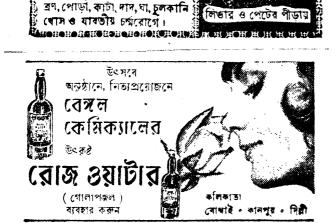
বরফ আর বিষাদের মধ্যে কিছু একটা সম্পর্ক আছে। বাদলা বাতাসের সঙ্গেও বেদনার মাখামাখি আছে। এটা আমার আবিষ্কার নয়। কবি মনীষী অনেকেই বলেছেন, অনেকবার। তবে আমিও বহুদিন থেকে লক্ষ করেছি। ধরুন, রবি ঠাকুর যেবার মারা গেলেন, সেই বছরের কথা। তখন আমার কতটুকুই বা বয়েস। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে ক'দিন ধরে সে কী হাওয়া, কী মেঘ, কী ব্যাকুল বিষণ্ণতা! স্নায়ুমজ্জাতন্ত্রী, সমস্ত চৈতন্য জুড়ে একটা অবশ-করা অবসাদ। কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই, তবু ভাবতে ভাল লাগে—পৃথিবীর অনেক মানুষের জমাট কান্না বাষ্প হয়ে হয়েই ঐ মেঘ; অনেক চাপা দীর্ঘশ্বাস হঠাৎ মুক্তি পেয়েই ঐ বিষদগ্ধ ঝড়......।

এখন আমার জানলার কাছে চোখ রেখে দেখতে পাচ্ছি, বাইরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বৈধব্যের মত তুহিন শুভ্রতা। এই নিথর সমাহিত বরফের নৈঃশব্দ্যে একটা শোকের ছায়া থমকে আছে। মনে পড়ছে সেই বছরের কথা। এমনি একটা বরফে বিধুর অপরাহ্ণ তাসখন্দের শোকবার্তা বয়ে এনেছিল।

এ বছর ঘন ঘন বরফ পড়ায় বেশ গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু জীবনের প্রথম তুষারসন্দর্শনকে মনে হয়েছিল একটা বহু প্রত্যাশিত উৎসব। গভীর রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেছে। জানলার অস্বচ্ছ শার্সিটা হাতের চেটোয় মুছে ফেলে বাইরে তাকিয়ে দেখেছি সামনের বাড়ির মাথায় মস্ত আলোর বাল্বের গায়ে আবছা বলয়, তা থেকে রঙীন ছটা বেরোচ্ছে। মাথার ওপরে ঘোলাটে আকাশের বোরখায় অ্যানিমিক্ প্রসূতির মত পাংশু, এক লহমার অপ্রস্তুত চাঁদ। এদিকে দুর্বার হিমপ্রপাত, ওদিকে তাকে নিয়ে বাতাসের অসহ আতিশয্য। ভোর হবার অনেক আগেই মাঠঘাট, নদী-নালা, রাস্তা টিলা বরফে ভরপুর। বাড়ির ছাত, গাড়ির চাল, গাছের মাথা সাদায় সাদা।

বেলা ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল হইহই করে বেরিয়ে পড়ল। প্রথম স্নো ফল্ উপলক্ষে ওদের স্কুল ছুটি। ফুটপাথে লনে, এক টিলা থেকে আর এক টিলায়, যাতায়াতের পথের পাশ দিয়ে বেপরোয়া ভোলানাথেরা স্লেজের ওপর হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চললো। তারপর এ ওর ঘাড়ে পড়ে, বরফের গোলা পাকিয়ে এ ওকে ছুঁড়ে মেরে, সোনালী চুলকে সাদা আর গোলাপী গালকে টকটকে লাল করে ওরা যখন ঘরে ফিরে গেল তখনও বরফ পড়ছে সমানে।

সেদিন রাত দশটায় কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে সহকর্মী আমায় বড় সড়কেই নামিয়ে দিলেন। সংকীর্ণ ও খাড়াই আমার বাড়ির রাস্তায় গাড়ি ঘোরাতে সাহস করলেন না। গাড়ি থেকে নেমে রাজপথে দাঁড়ালাম। আজানু তুষারনিমজ্জিত হলো। কোথাও কোনো নিশানা ঠাহর হল না। সার্জারি ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ হিমকণার স্পর্শে চোখ চলে না, নাক অসাড়। টুপির আড়ালে কান, দস্তানার নিচে আঙুল আর স্নোবুটের আস্তরণ ভেদ করে পায়ের গোছসুদ্ধ জমে পাথর হয়ে এল। সেখান থেকে আমার বাড়ির দূরত্ব নরম্যাল হিসেবে সাত মিনিট। সে রাত্রে আমার লেগেছিল পুরো সাতচল্লিশ মিনিট। বাড়ির সামনের লনে প্রমাণ সাইজের লোকের কোমর ডুবে যায়। আমার নেপোলিয়নী উচ্চতায় বুক বরাবর পৌঁছালো। সাঁতরে হাতড়ে, কোনোমতে অ্যাপার্টমেন্টের দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ালুম। দোরের গায়ে লম্বা আয়নায় আমার নয়, একটা শ্বেত ভল্লুকের ছায়া পড়লো।

পরদিন সকালে স্নো পড়া বন্ধ হলো। কিন্তু বাতাস থামল না। অভ্রের গুঁড়োর মতন কুচিকুচি হিমকণা, জানলার কাচের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে লাগল। বেলা বাড়লো। রাশি রাশি পেঁজা বরফের স্তূপের ওপর রোদ পড়ে হীরের মত ঝলকাতে লাগল। বেলা বারোটা নাগাদ ঝড়ের গতি তিরিশ মাইল হলো। দিনের আলো নিস্তেজ হয়ে এলো। জরুরী কাজে একবার বাইরে বেরোতে হয়েছিল; দরজার বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একসঙ্গে এক কোটি বনবেড়াল থাবা মারল মুখে। সামনে চেয়ে হাঁটা অসম্ভব, দম বন্ধ হ'য়ে আসে। সামনের দিকে মুখ ফিরিয়ে পেছু হাঁটতে লাগলুম। কতক্ষণ এমনি করে পেছু হেঁটেছি জানি না, একজনের গায়ে ধাক্কা লাগল। এক জোড়া তরুণতরুণী, রাস্তার ধারে টেলিফোনের বুথের দিকে এগোচ্ছে। বোধ হয় ওরা ট্যাক্সি ডাকবে। ভাবলুম, আমিও এগোই। কিন্তু নাঃ। বুথের দরজার ওপাশ থেকে ছেলেটি ইশারায় জানালো, ফোন বিগড়ে গেছে। ঝড়ের ঝাপটা খেতে খেতে আবার এগোলুম বাস স্টপের দিকে। পাশেই একটা গ্যাস স্টেশন। ওরা বললে, বাস চলছে বলে ওরাও শুনেছে, কিন্তু গত দেড়ঘণ্টার ভেতর কোনো চলতি বাস ওদের নজরে পড়েনি। রেডিওয় তখন ঘোষণা চলেছে—ভার্জিনিয়া অঞ্চলে সরকারী পরিবহন ব্যবস্থা স্থগিত হয়েছে। পথে বিপত্তির দায়িত্ব—ব্যক্তিগত। ওয়াশিংটনের পৌর কর্তৃপক্ষের হুকুম জারি হলো: চাকায় স্নো টায়ার কি তুষার শেকল নেই এমন

গাড়ি রাস্তায় বের করলে চালক জেল বা জরিমানায় দণ্ডিত হবেন। গ্যাস স্টেশনেরই একটা ক্যাব্ থেমেছিল। বললুমঃ ভাই, উদ্ধার করো। ট্যাকসিওয়ালা বললেঃ আমি অচল। রাস্তায় কুল্লে তিনখানা ক্যাব দেখেছিলুম। সবাই 'আউট অব সার্ভিস' নোটিস লাগিয়ে হাত নেড়ে হু-হু শব্দে চলে গেল। এমন সময় পেছনে একটা মুশকিল-আসানের শিঙে ফুঁকিয়ে উঠলো। মাথায় ঘোরানো বাতি জেলে একটা পুলিসের গাড়ি। হাত তুলে থামালুম। পুলিস পুঙ্গব আমার কর্মস্থলের পরিচিতিপত্র দেখে কাজের গুরুত্ব বুঝে গাড়িতে তুলে নিলেন। বললেনঃ এপাড়ায় আমার টহলদারির ডিউটি, তাই আমি আপনাকে বেশী দূর নিয়ে যেতে পারব না, তবে বাস ধরিয়ে দেব।......

সে রাত্রে বাড়ি ফিরে আধ ঘণ্টা যাবৎ নাক-কান মলেছি—প্র[illegible]গুলোর ওপর মমত্বচেতনা ফিরিয়ে আনতে।

তা দেখুন, আমি একা নই। প্রথম স্নো সন্দর্শনে অনেক অবোধহৃদয়ই শিখীনৃত্য করে থাকে। তা ব'লে তখন কি কেউ ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারে যে, শাবল

গলিয়ে গাড়ির তুষারস্তূপের জঞ্জাল ভাঙতে গিয়ে ...স হৃদয় অসুস্থ হয়ে যাবে? একজন-দুজন নয়, আট-আটজন হৃষ্ট জোয়ান, রাস্তার বরফ ভাঙতে গিয়ে ঠাণ্ডার চাপে হার্টফেল করেছেন।

*

রাস্তায় রাস্তায় নুনলালি ছিটোনো শুরু হলো। ধীরে ধীরে বিপর্যস্ত জীবনযাত্রা আবার সহজ, স্বাভাবিক হ'য়ে এলো। পথ-ঘাট সাফ হ'য়ে আবার কাতার দিয়ে গাড়ি ছুটলো। শুধু রাস্তার দু ধারে পাহাড়-প্রমাণ ধুলোমাখা বরফের স্তূপ রাত্তিরের আলো-আঁধারিতে অদ্ভুত মানসিক প্রতিক্রিয়া জাগিয়ে তুললো ক'দিন। হঠাৎ চলন্ত গাড়ির থেকে দেখে গা ছমছম করে ওঠে—এ কোন শহরে এলুম! এই কি রূপকথার সেই হিমপুরী?

আর কি, দিনে দিনে চাপ-বাঁধা বরফও কমে আসবে। অনেকটা জল হয়ে পথে গড়িয়ে পড়বে। খানিকটা রুক্ষ মাটির তেষ্টা মিটিয়ে দিয়ে পোড়া পোড়া ঘাসগুলোকে সাময়িক সজীবতা দেবে।

তারপর ক'দিন কুয়াশা হবে বেজায়। ঘোর কুয়াশায় পথঘাট আচ্ছন্ন থেকে থেকে—একদিন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামবে। ব্যাস! বরফের শেষ চিহ্নটুকুও ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। কেবল সড়কগুলো অর্ধ-বিস্মৃত তুষারপাতের ক্ষতচিহ্ন, কয়েক সপ্তাহ বুকে ধরে থাকবে।......

এ চিঠি যখন শুরু করেছি, তখনও বরফ ছিল। এখন আর নেই। এ বছরের মত বিদেয় হয়েছে ও পাপ। কাজেই বরফের কথা আর নয়। ইতিমধ্যেই পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছি নিশ্চয়ই, তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইছি। বরফ নয়, এবারে বসন্তের কথাই বলব। তার সময় এসে গেছে। মিশনারি পাখিগুলো এর মধ্যেই ডালে ডালে হানা দিয়েছে। সেদিন মেয়ের ডাকে ঘুম ভাঙল: 'বাপি, অ্যাত্তো পাখী, জানলায় নক্ করচে......!' কলকাতার পাঠকদের চুপিচুপি বলছি: হতাশ হবেন না। এখানেও সব আছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনশালী দেশের রাজধানীতেও পুরনো কলকাতার এ'দো-গলি, নোনা-ধরা দেয়াল, নোংরা বস্তি, উপচে-পড়া আবর্জনা, বর্ষায় প্যাচপেচে ফুটপাত...মায় গোটা চারেক কাঁচা পায়খানা পর্যন্ত, সবই বিদ্যমান। আর এসব নিয়ে খবরের কাগজে গালিগালাজও চলে আমাদের দেশের মতন। আমার যখন দেশের জন্যে মন কেমন করে, তখন ফাঁক পেলেই শহরের উত্তর-পশ্চিম পাড়ায় চলে যাই। ঐ মহল্লাতেই বড় বড় আপিসের ঝাঁক, ছোটবড় বাজার, সুপারমার্কেট, ডাউনটাউন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতাবাস, সরকারী দপ্তর......আবার ওরই আনাচেকানাচে কালো বাসিন্দাদের ঘিঞ্জি পাড়া, গেঞ্জি গায়ে খদ্দেররা সওদা করতে বেরোয়, রুক্ষ মাথা, ছেঁড়া প্যাণ্ট, চোখে পিচুটি নিয়ে নিগ্রো বাচ্চারা নিঃসংকোচে রাস্তায় জে-ক্রস করে ট্রাফিক্ সিগনালে দ্রূক্ষেপ না ক'রে।

বৈঠকখানা বাজারের মতনই বাজার বসে ফ্লোরিডা মার্কেটে, কোনো তফাত নেই। শাক, আলু, কুমড়ো, কাঁচালংকা, ভেড়ার গর্দান, শুওরের ঠ্যাং, মুরগির পাখনা, আস্ত কাঁকড়া, জ্যান্ত কবুতর, সবই পাবেন।

"রইলো তোমার অ্যাসপ্যারাগাস, এই ক'টার দাম উনিশ সেন্ট!" আপনি বেজার হয়ে বলবেন। ব্যাপারী আপসরফা করবে, "ঠিক আছে, দেন, ঐ আঠারো সেন্টই দেন, আপনার কথাও থাক, আমার কথাও থাক..." কিংবা—"এই যে একবারটি মুখ ফিরিয়ে দেখে যান, অ গিন্নীমা, এ একেবারে জ্যান্ত ট্রাউট, ধড়ফড় করছে...চলে গেল...চলে গেল..." অবিকল দেশের আবহাওয়া।

সেদিন সবান্ধবে সিনেমায় গিয়েছিলুম। ট্যাঁকে হাত দিয়ে দেখি, ঐ যাঃ! যথেষ্ট ডলার সঙ্গে নিয়ে বেরোইনি। পাঁচজন প্রাণী সিনেমা দেখব, নিদেন দশ ডলার দরকার। কাউন্টারে জিজ্ঞেস করলুম: চেক নাও কি? একবার দ্বিধা করলে না, পরিচয় জানবার চেষ্টা করলে না, চেকের গায়ে বাড়ির ফোন নম্বর দাগাতে বললে না। চেক্ নিয়ে পাঁচখানা টিকিট ধরিয়ে দিলে। দেশে এরকম রেওয়াজ আছে কিনা, আমার জানা নেই। আপনারা পরীক্ষা করেছেন? আমার অভিজ্ঞতায় খুব কেষ্টবিষ্টু লোক না হ'লে দোকানঘাটে চেক্ ভাঙানো মুশকিল। এ-দেশে চেক আর নগদ টাকায় খুব বেশী পার্থক্য করে না। অবিশ্যি সর্বত্রই নয়। তবে আমি বিদেশী মানুষ, সেদিন সিনেমা-হাউসে দাঁড়িয়ে আমি এই সহজ ভদ্রতার বিশ্বাস দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

টেলিফোনে ট্যাক্সি ডাকার ব্যাপারটায় এ-দেশে নবাগতরা অনেকেই নতুনত্বের বিস্ময় বোধ করেছেন। আমি করিনি। আমাদের দেশেও ও ব্যবস্থা আছে। কলকাতায় নেই, জানি। বম্বেতে আছে কিনা ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় নেই। দিল্লী কি মাদ্রাজে খুব কম দিনই থেকেছি, খবর রাখি না। আন্দামানে আছে। পোর্ট ব্লেয়ারে আমরা ফোন করে ট্যাক্সি আনাতুম। দেশের আর কোথাও আছে কিনা, জানি না। কোনো সহৃদয় পাঠক এ বাবদে জহুরীর অজ্ঞতা নিরসন করলে বাধিত হব। এখানে টেলি-ফোনের নির্দেশপত্রিকার দু'টি, জায়গা বিশেষে তিনটি খণ্ড। তার মধ্যে একটি হলো 'পীতপত্রক'—ইয়েলো পেজেস্। কেনা-কাটার জন্যে ইয়েলো পেজেস্-এর মতন নির্ভরযোগ্য গাইড আর হয় না। কোন্ জাতের পণ্য, কোন্ কোন্ দোকানে পাওয়া যায়—তার তালিকা, কোন্ পাড়ায় কোন্ রাস্তায়, কত টেলিফোন নম্বর সব কিছুর বিশদ নির্দেশ পাবেন এই বইয়ে। তা ছাড়া, হোটেল-মোটেল, হাসপাতাল, ইস্কুল, নাইট ক্লাব, থিয়েটার, শ্মশান-গোরস্তান, স—ব জায়গার ঠিকানা এতে থাকবে। সারা শহরে কমবেশী এক শো-টা ট্যাক্সি কোম্পানী। হলদে বই খুলুন, নম্বর নিয়ে ডাক দিন। দশ মিনিটের ভেতরে আপনার দোরগোড়ায় এসে ভেঁপু বাজাবে। কিন্তু বসতে গিয়ে যদি দেখেন, একান্ত অপরিচিতা এক ভদ্রমহিলা আপনার আগেই সীটে হেলান দিয়ে বসে আছেন, ঘাবড়ে যাবেন না। উনিও অন্যতমা সওয়ারী। হয়তো আপনার গন্তব্য আর্লিংটন, আর উনি ইউনিয়ন স্টেশনে ট্রেন ধরবেন। ক্যাব-চালক আপনাদের কাছে জানতে চাইবে, দুজনের মধ্যে কার তাড়া বেশী। তাড়ার নয়, তাড়ার তারতম্য অনুযায়ী যাত্রীরা আগে পরে নামবেন। তবে আপনি ট্যাক্সি ডেকে-ছেন, কাজেই নিরংকুশ একলা যাবেন, কারুর ঘেঁষ সইবে না (এমন কি, সুন্দরী আরোহিণী হলেও না) এমন বেয়াড়া আবদার আপনার থাকলে ক্যাব-চালক সবিনয়ে 'সরি, স্যার' বলে সপাটে গাড়ি ঘুরিয়ে হাওয়া হয়ে যাবার অধিকার রাখে। পথে চলমান ট্যাক্সির সঙ্গে তাদের আড্ডার যোগাযোগ রক্ষিত হয় বেতার মারফত। তাই দুপুরে, ভরা লাঞ্চের ঘণ্টাগুলোয় আর

জরুরী অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো সময় ট্রাফিক বিভ্রাট ঘটে না। সকাল-বিকেল অফিসের ভুল-ঘড়িকার একটু দেরি হলে, তা যে কোথায় না হয়। ওয়াশিংটন লোকজন ভুলভাবেও বাইরে থাক।

আপনারা যাঁরা এদেশে আসবার পরি-কল্পনা করছেন, তাঁদের কিঞ্চিৎ ভাষাজ্ঞানের পরীক্ষা দেবে, ধৃষ্টতা মাপ করবেন। আপনা-দের লেখা দু-চারটে ইংরিজী ভাষার বই বাজারে চলে, তা জানি। আদালতে সওয়াল জবাব, রোটারি ক্লাবে বক্তৃতা, ক্লাসে লেকচার আর ইন্‌টারইউনিভার্সিটি কম্পিটিশনে ডিবেটিং-এ আপনার সুনাম আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু টেনেসির বাসিন্দা বুড়ো মাছওয়ালার দোখনো উচ্চারণ যদি বুঝতে না পারেন; বেগুনের ইংরিজী 'ব্রিন্‌জেল' আর ঢেঁড়সের ইংরিজী 'লেডিস্ ফিংগার' বলে যদি বিভ্রাটে পড়েন, আর ঐ সব অপরিচিত শব্দ শুনে বিক্রেতা যদি চোখ ছানাবড়া করে, তখন আমায় দোষ দেবেন না। শুনুন, 'শিডিউল্' বলে কোনো শব্দ নেই মারকিন ভাষায়। Schedule শব্দটার যথার্থ উচ্চারণ হবে—'স্কেড্যুল'। বেগুনের নাম—এগ্‌প্ল্যান্ট, ঢেঁড়সকে বলতে হবে—ওকড়া। লেফ্‌টেনাণ্ট ভুল, ওটা হবে লিউটেনাণ্ট। সেমি-সারকেল বলবেন না, বলবেন, সেমাই-সারকেল। আমাদের নন্দী-গ্রামার এদেশে এলে এরা তাঁকে নন্দাই বলে ডাকবে খুব সম্ভব।......

"সিগারেট খেলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়"—আমার মত কিছু কিছু জ্ঞানপাপী ধূম-পায়ী এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী। তাঁদের সকলের মুখপাত্র হয়ে আমি ভাবছি মারকিন সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের নামে মামলা ঠুকে দেব। তাঁদের দাপটে সিগারেটের প্যাকেট হাতে পড়লেই বুক ছাঁত করে ওঠে। প্রত্যেক প্যাকেটের গায়ে জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা: সাবধান, সযত্নে যেটি তুলে নিচ্ছেন, সেটি আপনার মৃত্যুবাণও হতে পারে। আচ্ছা বলুন, আমরাও তো গণতান্ত্রিক দেশ, কই আমাদের দেশবন্ধু বিড়ির বাণ্ডিলের মোড়কে কেউ লেখান দিকি অমনধারা হুমকির কথা? নাঃ, এসব বড্ড বাড়া-বাড়ি। আমি বরং এবার থেকে বিলেতের আমদানী সিগারেট ধরব। কোকটের দেশ-লাইয়ের মায়া ত্যাগ করে আমেরিকান সিগারেট বর্জন করাই শ্রেয়।

*

ওয়াশিংটন-ভার্জিনিয়া মেরিল্যাণ্ডের বস-বসন্ত নন্দিনী স্প্রিং এসে গেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই আবহাওয়ার ভোল পালটে গেছে। এ যেন সেই অরক্ষণীয়া মেয়েটি, বিয়ের কথা হয় আর ভেঙে যায়। বাপ-মার মুখের অমাবস্যা ঘোচে না। তারপর সম্বন্ধ পাকা হলো। তখন দুর্ভাবনা, পণ যোগাড় করতে ভিটেমাটি বাঁধা......বিয়ের দু দিন আগেও গলগ্রহ মেয়েটা বুকে বিষাদ চোখে শরম, পায়ে সংকোচ নিয়ে ঘাট থেকে কলসী ভরে আনে, ওর হাসি অনেকদিন কেউ দেখেনি। তারপর গায়ে হলুদের শানাই বেজে ওঠে। এয়োরা বরণ করতে এসে গোপনে চমকে ওঠে—কোথায় ছিল এই মানিকপুরীর রাজকন্যে? এই রূপসায়রের উছলে-পড়া ঢেউ! এ মেয়ের পায়ে পায়ে নিঃশব্দ সৌরভের নিক্বণ। বাহুভঙ্গে হাজার আমন্ত্রণের কিংকিনী। সন্ধিলগ্নের একটি সপ্তাহে এই শহরের রূপসজ্জা আমূলে বদলে গেছে।

আপনাদের দেবার মতন আরো অনেক খবর ছিল। যেমন, রেডিও টেলিভিশন-জগতের ঐতিহাসিক ধর্মঘট নেশায় আসক্ত কিশোরকিশোরীদের গোপন চক্র আবিষ্কার, —এমনি অনেক কিছু। কিন্তু বসন্তের সগৌরব আবির্ভাবে সেসব খবর তলিয়ে গেল। স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের পুরোহিতদের সৌজন্যে ঋতুরাজের বাৎসরিক তিলক-অভিষেক সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হলো মাল্ এলাকায়। অর্ধ লক্ষ অতিথির পদরজে নান্দীমুখের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হলো। এখন বাকি রইলো সপ্তাহব্যাপী বিবাহ উৎসবের ঘটা।

ওদিকে টাইডাল বেসিনের সৈকতভূমিতে সদ্যপুষ্পিত চেরী শাখায় কাঁপন ধরেছে। প্রতীক্ষার বর্ষভোগ শেষ হয়েছে। কাল সকাল থেকেই জলসই। টিউলিপের মতন কুমারীরা ভোর থেকে ওখানে ভিড় করবে, শোভাযাত্রা হবে, শোভাযাত্রা হবে। মঞ্জুশিক্ত চেরীর ডাঁটার মহোৎসবে একে একে হাজির হবেন—তিপ্পান্নো জন চেরী-কুসুম প্রিন্সেস। আহূত অনাহূত রবাহূত অতিথিদের ভিড়ে এখন থেকেই শহর সরগরম।

আমাদের হাতে উৎসবের নির্ঘণ্ট পৌঁছে গেছে। চৌঠো এপ্রিল বেলা তিনটের টাই-ডাল বেসিনে জাপানী লণ্ঠন জ্বালাবেন রাষ্ট্রসংঘে জাপানী প্রতিনিধির মেয়ে।

রাত্রির নটায় আলোকোজ্জ্বল হর্ম্যে মুকুলিকা রাজকন্যাদের পরিচিতি অনুষ্ঠান। তারপর চারদিন যাবৎ নাগাড়ে নাচগান ক্রীড়াকৌতুকের পালা চলবে। শনিবার আটুই এপ্রিল বিকেলে সিলভ্যান থিয়েটারের গীতিবাদ্যমুখর উৎসবমণ্ডপে চেরীরানীর মুকুট অভিষেক নিষ্পন্ন হবে। রবিবার সকালে অভিষেকের পুনরভিনয়। বিয়ের পর বাসী বিয়ে আর কি। হুলুধ্বনি দিয়ে আমরা যে যার বাড়ি ফিরে আসব।

...ভেবেছিলুম, মধুঋতুর আগমনের মিষ্টি সন্দেশ দিয়েই চিঠি শেষ করব। কিন্তু পারলুম না। অনেক কথা মনে ভিড় করে এলো। দেড় বছর হল এ-দেশে এসেছি। বেশ কিছু উৎসব-পরবের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে। সেই সঙ্গে অনেক মানুষের মুখ চেনা হয়েছে; পর্বদিনের খুশির মুহূর্ত-গুলোর সঙ্গে সেই চেনা মুখগুলো জড়িয়ে গেছে। গত বছর খ্রীসমাসে একজন জোর করে বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে মিষ্টিমুখ করিয়েছে, গভীর রাত পর্যন্ত ছাড়তে চায়নি। আজ তাদের নিজেদের সংসারেই বাতি নিবেছে, দাম্পত্যে ফাটল ধরেছে। কচি বাচ্চা দুটো বাপের কাঁধে চড়ে এবারের ইস্টারে হোয়াইট হাউসে ডিম ছোঁড়া দেখতে যেতে পায়নি। জুয়ার আড্ডায়, বীয়রের ক্যান্ হাতে হতভাগা বাপটা হয়তো আজ কেবলই কল্ দিতে ভুল করছে।

সন্ধ্যার পর বাইরের উঠোনে ফুরফুরে হাওয়ায় দাঁড়িয়েছিলুম। তেতলার একটা নিকষ অন্ধকার জনশূন্য ফ্ল্যাটের ওপর চোখ পড়ল। গত বছর এমনই দিনে ঐ ফ্ল্যাটটা হাসিহুল্লোড়ে জমজম করতো।

ঘরে ফিরে এলুম। জানালার কারটেন তুলতেই কালো আকাশের চাঁদোয়ার নিচে ওয়াশিংটনের সাজানো শরীর ভেসে উঠলো। মনে হল, বছরে বছরে এই সুশোভিত বসন্ত-উৎসবে সত্যি কিছু নেই। এটা একটা লহমা রজনীর অভিনয়। ঘণ্টা বাজলেই এই পেশা-দারী বধূসজ্জা ঘুচে যাবে। কিন্তু হায়, আষ্টেপৃষ্ঠে আলোর শেকলে বাঁধা ওয়াশিং-টনের এমন কোনও নিরিবিলি সাজঘর নেই, যেখানে দাঁড়িয়ে ও স্নিগ্ধ হবে, একান্ত হবে, নিরাবরণ হবে।

জহুরী সদাগর
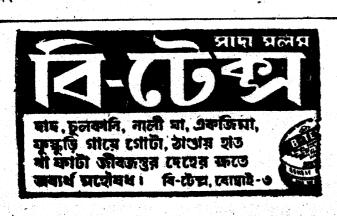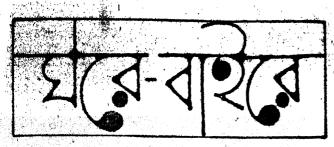
মানুষের তৈরী কৃত্রিম কাপড়

অন্নসংকট সামলানোর কোন লক্ষণই সামনে নেই, অথচ সংগে সংগে বস্ত্রসংকট মাথা তুলতে প্রস্তুত। বেশ কিছুদিন থেকে বাগ্‌বিতণ্ডা আর আলোচনার পর্যায় সাধারণ

জরির পাড় কিন্তু কৃত্রিম তন্তুর

অবধি সম্পূর্ণ না পৌঁছলেও সরকারী উপরওয়ালা, ব্যবসায়ী ও উৎপাদকের ত্রিভুজ পরিস্থিতিতে সম্যক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আজ সে আলোড়ন আপনার আমার সামনে সমস্যা হয়ে এগিয়ে আসছে। সমস্যাটি জটিল। তুলোর অভাব, কার্পাসের কার্পণ্য আরও কত কি। মিহি সুতোর জন্য কার্পাস আমদানী হয় বিদেশ থেকে। বৈদেশিক মুদ্রা কই? আবার দেশে যেখানে কার্পাসের ভাল ফসল হয় এমন উর্বর জমিতে খাদ্যশস্য দিয়ে খাদ্যাভাবের কিছুটা সাহায্য হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সমাধানের একটি বড় উপায় হিসাবে রাসায়নিক বস্ত্র-শিল্প অথবা man made fibre-এর বহুল প্রচলন অনেকে সুপারিশ করেন।

বাজারে গেলে আমরাও লক্ষ করি প্রচুর কৃত্রিম এবং রাসায়নিক প্রণালীতে তৈরী সুতোর কাপড়জামা ক্রমশ রেশম, পশম এবং বিশেষত কার্পাসবস্ত্রের স্থান নিয়ে চলেছে। আভিজাত্যে আজও কার্পাসবস্ত্র বা গরদরেশম তার মর্যাদা বজায় রেখেছে। সুরুচিপূর্ণ সাজসজ্জার জন্য সুন্দরীরা রেশম কার্পাসের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন না। তবে ঐতিহ্যই তো সব নয়। ক্রয়ক্ষমতা কমে এলে আরও পাঁচটা দিক ভেবে সকলকে কেনাকাটা করতে হয়। সেই কেনাকাটার বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে কৃত্রিম বস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় আমাদের অত্যন্ত অল্প দিনের। তাই আমরা জিনিসটিকে ভাল করে না বুঝেই অগ্রসর হই। হ্যারিকেন যেমন লণ্ঠনবাতির নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে তেমনই নাইলন মানুষের তৈরী কৃত্রিম বস্ত্রের সবচেয়ে লোকপ্রিয় নাম। গ্রামের মানুষও নাইলনের নাম জানে। অথচ নাইলন কৃত্রিম বস্ত্রের একটি মাত্র। এমন আরও বহু আছে; যেমন, টেরিলিন, ডেক্রন, অরলন ইত্যাদি। আবার একই জিনিসকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামও দেওয়া হয়; যেমন ডেক্রন নামটি মার্কিন। সেই ডেক্রন ব্রিটিশ নামের তালিকায় হয় টেরিলিন।

নাইলন গোষ্ঠীর অনেক আগে রেয়নের জন্ম। রেয়নই বলতে গেলে মানুষের হাতে তৈরী সুতোর সূত্রপাত। অভাবে ঠিক নয়, শখের খেয়ালে শিল্পীরা আজ থেকে বহু দিন আগে কার্পাসকে বাদ দিয়ে বস্ত্র হয় কিনা ভেবেচিন্তে দেখছিলেন। নেড়েচেড়ে নানা পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। হবেই বা না কেন? বল্কলবসনা রূপসীরা তো রোমান্টিক রমণীদের প্রথম শ্রেণীতে। গাছের পাতা, কাঠের মণ্ড এইসব দিয়ে প্রথম রেয়ন আরম্ভ হয়। যে মালবারী বা তুঁত গাছে রেশমকীট জন্মায় তা দিয়ে প্রথম রেয়নের পরীক্ষা চলে। পরে এল নাইলন জাতীয় জিনিসের গবেষণা। কাঁচ ইত্যাদি বহুরকম কাঁচামালকে চালানো হয়েছে। এই পর্যায়ে যে তন্তু তৈরী হয় তার রকম অনেকটা রেশমের মত। লম্বা লম্বা আঁশ টেনে বাড়ানো [illegible] কিন্তু [illegible] কার্পাসের মত ছোট ছোট আঁশ[illegible]। এই তন্তুকে ঠিক কার্পাস বা পশমের মত করে বোনা হয়। কাজেই রেয়নের ধর্ম কার্পাস-বস্ত্রের মত। ঠাণ্ডা এবং বায়ু চলাচল-যোগ্য। নাইলন গোষ্ঠীর বেলায় দুয়েরই অভাব। যদি নাইলনের বেলায় মুক্ত বাতাসের পথ রাখা দরকার হয়, তবে সেটা বুননের কায়দায় করতে হবে।

১৮৯০ সালে ব্যবসায় লক্ষ করে প্রথম রাসায়নিক তন্তু তৈরী হয়। তার বহু বছর আগে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক রবার্ট হুক

জরির আঁচল। রেয়নকে চিনতে পারেন কি?

মানুষের তৈরী রাসায়নিক তন্তুর কল্পনা করেছিলেন। সে প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। তার প্রায় শ'খানেক বছর বাদে এক রেশম তন্তুবায় কাঁচ থেকে কৃত্রিম সুতো বের করেন। কিন্তু তিনি খুশী হননি। কিছু বুনবার পদ্ধতিও প্রদর্শন করেন। তবে উন্নততর কাঁচামাল এবং ভাল একটি পদ্ধতি পাবার জন্য পরীক্ষা করতে অনুরোধ করেন বৈজ্ঞানিকদের। রেয়নেরও প্রথম পেটেন্ট এর অল্প দিন পরেই ১৮৫৫ সালে নেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। তখন রেয়নে মালবারী গাছের ভিতরের দিকের ছাল ইথার ও অ্যালকোহলে গলিয়ে বুনবার জন্য মিশ্রণ বা মণ্ড প্রস্তুত করা হতো। আজও রেয়নের মূল কাঁচামাল কাঠের

রেয়নের সাটিন

মত। আমাদের দেশে কেরালা, মহীশূর, হিমাচল প্রদেশ ইত্যাদিতে রেয়ন শিল্পের যোগ্য কাঠ নাকি প্রচুর পাওয়া যায়। রেয়নের কারখানাগুলি তাই কার্পাসের মত আমদানির অভাব বোধ করে না। সাধারণ মানুষও দরে সস্তা, দেখতে মোটামুটি ঝকঝকে রেয়ন পেয়ে খুশী হন। বাজারে আমরা অল্পদামের রেশমের মত দেখতে যত কাপড় দেখি, সবই প্রায় রেয়ন। মোটর-গাড়ীর টায়ার থেকে নিয়ে, পায়ে দেবার চটি জুতো, ফার কোট, নানা ধরনের শাড়ী, টেবিলে পাতবার ডয়াল, বিছানা-ঢাকনি, বাতির শেড ইত্যাদি সবই রেয়নে সুন্দর হয়। আমরা হয়তো টেরও পাই না। কিনে আনি। রেয়নের তৈরী বস্ত্র কখনও বা র্যাসিল্ক বলে ভুল হয়। ঠিক ঐরকম খসখসে অথচ রেশমী তার চেহারা। সাটিন বলে বাজারে আজকাল যা পাওয়া যায় তাও বলতে গেলে বারো আনাই রেয়ন। হায়দ্রাবাদের হিমরু এক ধরনের ব্রোকেড বা কিংখাব। রেশমী সুতোর দামে তার মূল্য প্রায় সাধারণের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। কিন্তু একই তন্তুবায়, একই শিল্পী অনেক সময় রেয়ন ব্যবহার করে কিংখাব এখন বাজারে দেন প্রায় অর্ধেক দামে। তাতে খুঁতখুঁতে ধনী ক্রেতা হয়তো আপত্তি করতে পারেন। কিন্তু সাধারণের সুবিধাই হবে। শাড়ীর বেলায়ও তাই। বেনারসের রেশমের অনুকরণে রেয়নের শাড়ী দেখে থাকবেন। খুব খারাপ কি? পছন্দ করে নিতে পারলে আর ফ্যাশনের দুনিয়ায় চালু করতে পারলে নেহাত ফেলে দেবার নয়। বিদেশে অবশ্য রেয়ন ও নাইলন ইত্যাদির শিল্প উৎকর্ষ লাভ করেছে বলে মহিলাদের সাজসজ্জায় নূতন নূতন পরিবেশনে প্রায় চমক লাগিয়ে দিতে পারে। শিশু ও কিশোরের পোশাক, পুরুষের পরিচ্ছদ সব কিছুতেই রেয়ন কাজে লাগছে, সৌন্দর্যবোধেও বাধা সৃষ্টি করছে না।

নাইলন অবশ্য আর একটু বেশী দামী এবং টেঁকসই। তবে এই পদ্ধতির সব বস্ত্রেই ভাঁজ পড়ে না সহজে। সেটা মস্ত বড় আকর্ষণ। Anticrease গুণের জন্য ইস্ত্রি করার হাঙ্গামা কম। কাচা ও শুকিয়ে নিতে ঝামেলা কম। রেয়ন সে ক্ষেত্রে সুতীর মত। কাচাকুচি ঠিক কার্পাসবস্ত্রের মত, ইস্ত্রির ব্যাপারেও তাই। এই অভাবটির জন্য আবার নাইলনের কদর বেশী। ১৮৮৯ সালে প্যারিসের এক প্রদর্শনীতে রেয়নের নমুনা দেখানো হয়েছিল। এই অভাবটি আজও তার ঘোচেনি। ব্যাপকভাবে বাজারে নাইলনের তন্তু আসে মাত্র ১৯২৭ সালে। তখন টুথব্রাশের কুচি নাইলনের সাহায্যে তৈরী হলো। তার পরের পদক্ষেপ '৩৮-৩৯ সালে। মেয়েদের নাইলনের মোজা, গেঞ্জি ইত্যাদির জন্য নাইলনের সূক্ষ্ম অথচ শক্ত তন্তু কাজে লাগানো হয়েছিল। তারপর তো দেখতে দেখতে বিদেশে সুতী বা সিল্কের মোজা প্রায় চলে গেছে হোসিয়ারীর দুনিয়া থেকে। আমাদের দেশে আসছে আস্তে আস্তে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে নাইলনের ও রেয়নের ব্যবহার আমাদের ঐতিহ্য ও গৌরবকে নূতন এক মোড়ে নিয়ে যাবে যেমন নিয়েছে খাদ্যের ব্যাপারে নানা সব পরিবর্তন। যে কার্পাসের বিশ্ববিজয়ী বস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষ প্রসিদ্ধ ছিল তার স্থানে আসবে কলের বা যন্ত্রের যুগের রাসায়নিক কৃত্রিম দান। আসবে পশ্চিমের ভাণ্ডার থেকে।

নাইলন জাতীয় জিনিস হয় সাধারণত পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পের সাহায্যে। কাঁচা-মালের জন্ম সেখানে, যেমন নাইলনের কাঁচামাল caprolactum। এই হিসাবে ধরলে রেয়ন কিছুটা প্রকৃতিদত্ত আর নাইলন, অরলন, টেরিলিন সব পুরোপুরি রাসায়নিক বা synthetic। নাইলন ও রেয়ন মিশিয়ে বস্ত্রও প্রচুর উৎপাদন করা হচ্ছে। নাইলনের জমি রেয়নের ফুল দেখতে অনেকটা লেসের মত নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন। আবার চটের সঙ্গে রেয়ন মিশিয়ে কোটের কাপড়, জরির

সাদার উপর সাদা। নরম, কোমল বুনো অথচ তন্তুটি পুরোপুরি রাসায়নিক

সুতোয় রেয়ন মিশিয়ে পাড় বা বুটি অনবরত দেখছি। রাসায়নিক তন্তু এসেছে প্রায় বন্যার মত। এই প্লাবন পেয়েছে কার্পাসের অভাবের সুযোগ, তাই সহজ হয়েছে ভাসিয়ে নেওয়া। এখানেও জয় হয়েছে সাধারণের। টেপেস্ট্রি অথবা কারুকার্যময় পরদা, চেয়ারের কাপড় ইত্যাদি অল্প দামে বেশী সংখ্যক সংসারে প্রবেশ করছে। ফুলতোলা যে বিছানা ঢাকা দেখে জরি বলে মনে হয় তাও অনেক সময় রেয়নের সুতোর কাজ। আমরা অনেক জিনিসের নাম জানি (যেমন জর্জেট) যেটা বুননের পদ্ধতি বা weaving process-এর নাম। সেই বুনন এখন অনেকাংশে রেয়ন বা নাইলন ইত্যাদির তন্তু দিয়ে রেশমকে প্রতিস্থাপন করছে। বুনছে হয়তো একই তাঁতী।

বাজারে যখন আমরা যাই তখন এই নাইলন, রেয়ন বা পশম, রেশমের পরিচয় ভাল করে জেনে যাওয়া দরকার। সব সময় যে দোকানী পসারী সব খবর রাখেন তাও নয়। আবার যা খবর তাঁরা জানেন তাও যে তাঁরা সবটা আপনাকে জানিয়ে দেবেন, তাও আশা করা যায় কি? মেয়েরা বৈজ্ঞানিক হয়ে নাইলন রেয়নের পদ্ধতি

মধ্যস্থ করবেন তা নয়, তবে জেনে রাখা দরকার, আজকের বাজারে পরিধেয় আর সুতী বা রেশমে সীমাবদ্ধ নেই। মখমল পর্যন্ত রেয়নের কিনছেন। কাজেই কি আছে আর তার গুণাগুণ কি, ভেবে নিয়ে অর্থব্যয় করা ভাল। সামান্য দামের তফাত অথচ দুটি জিনিস দেখতে অনেকটা এক, এ সমস্যা সবারই হয়। তখন ভাল করে বুঝে নেবেন, তফাত কি কেবল পসারীর মুনাফাবাজি, না সেই পার্থক্যটুকুর মূলে জিনিসের তারতম্য আছে যা আখেরে ফল বোঝাবে। বাজার করা আগে যত সহজ ব্যাপার ছিল আজ তা নেই। আজকের ছাত্রের পাঠের বোঝা বাড়ার মত আজকের গৃহিণীর সামনেও পণ্যের বিরাট ও ব্যাপক ভাণ্ডার খুলে ধরা হচ্ছে। বুঝতে না পারলেই পরীক্ষায় গোলমাল হবার সম্ভাবনা।

চিঠির উত্তর

কয়েকদিন আগে বেশ কয়েকখানা চিঠি পেয়েছিলাম প্রেসার কুকারে রসগোল্লা বানানো সম্বন্ধে। প্রেসার কুকার জিনিসটি ভারতীয় রান্না ঘরে অপেক্ষাকৃত নূতন আমদানী। কাজেই তার সঙ্গে ভারতীয় খাদ্যের পরিচয় নূতন নূতন আবিষ্কারের আনন্দ এনে দেবে। রসগোল্লার জন্য প্রেসার ব্যবহারে যাঁদের পরিশ্রম পণ্ড হয়েছে তার মধ্যে অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে, রসগোল্লা গোল না হয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু বার বার পরীক্ষা করে দেখলাম গোলই হচ্ছে। আপনাদের রান্নাঘরে নেমন্তন্ন করা যদি সহজ হতো তবে তাই করতাম! কিন্তু সে উপায় যখন নেই, তখন একটি প্রশ্ন কি জিজ্ঞাসা করতে পারি? যাঁদের প্রেসারে রসগোল্লা চ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে, তাঁরা কি সাধারণভাবে রসগোল্লা করতে গিয়ে ঐ ফলই পেয়েছেন। প্রেসারে একটু পাকা হাতের রসগোল্লা কখনই চ্যাপ্টা হবার কথা নয়। সাধারণভাবে রসগোল্লা করা এবং প্রেসারে করায় তফাত, শুধু আঁচের সময় সংক্ষেপ করা। তাতে তারতম্য হবার কারণ নেই। আপনারা খুব বেশী রসগোল্লা স্বল্প-পরিসর প্রেসার কুকারে দিচ্ছেন না তো? অল্প জায়গায় ভালভাবে রসগোল্লা খেলতে পারবে না। হয়তো তা থেকে এমন হতে পারে।

প্রেসারে ভাপা সন্দেশ খুব ভাল হয়। যাঁরা ছানা ব্যবহার করেন, অথবা যাঁরা ছানা ক্ষীর মিলিয়ে ভাপা সন্দেশ তৈরি করেন, সবাই সহজে প্রেসার ব্যবহার করে সন্দেশ করলে ভাল ফল পাবেন। প্রেসারে উপর নীচে সাজানো যে বাটি থাকে, তার একটি বাটিতে জল এবং অন্য বাটিতে সন্দেশের ছানা রাখবেন। বেশী সময় প্রেসার দেবেন না। সাধারণ নরম সন্দেশের জন্য যতক্ষণ পরে প্রেসার দেবার দরকার হয়, ততক্ষণেই বলতে গেলে কার্জ হয়। তবে প্রেসার দিয়ে দু-এক মিনিট রেখে নামিয়ে ফেলবেন। বেশী রাখলে শক্ত হবার ভয় থাকে।

প্রেসারে পায়েস করার কথা আবার আমরা আলোচনা করবো। এবার আর একটি সহজ মিষ্টির কথা বলেই শেষ করি। পান্তুয়া সেদিন এক বন্ধুর বাড়িতে খেলাম। চমৎকার স্বাদ। প্রশ্ন করায় জানলাম গুঁড়ো দুধের তৈরি। গুঁড়ো দুধ জলের সঙ্গে বেশ ঘন করে মেখে শুকনো ক্ষীরের মত করে পান্তুয়ার আকারে ভাজতে হয়। ছিঁড়ে যাবার আশঙ্কা থাকলে একটু ময়দা মিশিয়ে দেবেন। তবে ময়দা যত অল্প হয় ততই ভাল। ময়দা কেবলমাত্র বেঁধে রাখার উদ্দেশ্যে দেওয়া।

একইভাবে নারকেল-এর চিনি দিয়ে বানানো নাড়ু ভেজে রসে ফেলে দেখবেন অপূর্ব স্বাদের পান্তুয়া হবে। লম্বা করে গড়ে নিতে পারেন, গোল রাখতে পারেন। দুধ, ক্ষীর, ছানা, কিছুই দরকার নেই। তবে র‍্যাশনের চিনি বাঁচাতে হবে কষ্ট করে।
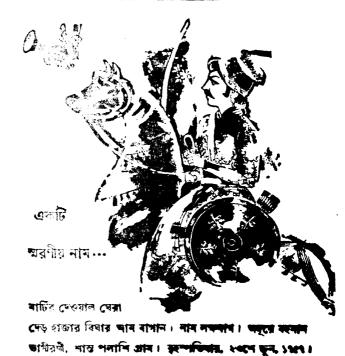
শ্রীমতী

মেয়েরা চাকরি করে কেন

আজকের নারী স্বাধীনতার দিনে, মেয়েদের চাকরি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রধানত, তাদের নিজেদের নিত্যকার প্রয়োজন ও তাদের পরিবারের নানাপ্রকারের অভাব মেটাতেই তারা চাকরি করে। অল্প-সংখ্যক মেয়ে অবশ্য নিছক শখের খাতিরে বা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কিংবা অর্জিত শিক্ষা কাজে লাগানোর তাগিদে চাকরি জীবন বেছে নেয়।

পাশ্চাত্যের মেয়েরা ও অন্যান্য উন্নতিকামী প্রগতিশীল দেশের মেয়েরাও তাদের এই ব্যাপারে যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছে।

ভারতবর্ষের সব প্রদেশে, বিশেষ করে বাংলা দেশে তাই দেখছি, শিক্ষা ও চাকরির ব্যাপারে মেয়েরা আজ ছেলেদের সংগে সমান তালে এগিয়ে চলেছে। কোনো দিক থেকেই তারা পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়। এবং তাদের উদাম বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে।

অতি রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরাও আজ সব লজ্জা, সব সংকোচ ও দ্বিধা প্রত্যাহার করে পরিবারের পুরুষদের সংগে হাত মেলাচ্ছে জীবিকানির্বাহের প্রাত্যহিক সংগ্রামে। জীবনধারণের সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী প্রচেষ্টায় তাদের অবদানও কিছু সামান্য নয়।

মন্ত্রী ও রাজ্যপাল থেকে নিয়ে, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, কেরানী, পার্সোন্যাল সেক্রেটারি, টেলিফোন অপারেটর, কলেজের অধ্যাপক ও প্রিন্সিপ্যাল, স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সব কিছুই আজকাল মেয়েরা হচ্ছে। সব রকম ব্যবসা ও বাণিজ্যে, সরকারী ও বেসরকারী পদে তারা অধিষ্ঠান করছে ও প্রতিনিয়ত নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করছে।

কতকগুলি চাকরিতে তো আজকাল শুধু মেয়েদেরই দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেমন : স্ত্রীরোগের চিকিৎসক হিসেবে, মেয়ে স্কুল বা কলেজের শিক্ষয়িত্রী

কর্মস্থল অভিমুখে

হিসাবে এবং সাধারণভাবে শিক্ষিত মেয়েদের জন্য নার্স, স্টেনো-টাইপিস্ট বা টেলিফোন অপারেটরের চাকরিতে।

তাই শুধু আপন পরিবারের নয়, রাষ্ট্রের ও সমাজের সব রকম আয়োজন ও ব্যবস্থায় মেয়েরা আজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের ছাড়া আজ দেশের ও সমাজের সব রকম পরিকল্পনা, সব রকম কার্যধারা অচল হয়ে পড়বে।

যার যে রকম রুচি, শিক্ষা ও পারিবারিক আবহাওয়া, পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকের প্রভাব, সে সেই অনুসারে তার জীবিকা নির্বাহের পথ বেছে নিচ্ছে। চাকরি জগতে এসে তারা অনেকেই এখন Dignity of Labour বা 'শ্রমের মর্যাদাবোধ' সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। তাদের এত দিনকার ভুয়ো আত্মমর্যাদার জ্ঞানকে উপেক্ষা করে তারা আজ যে কোনও কাজের ভার হাসিমুখে তুলে নিচ্ছে সমাজ ও পরিবারের প্রতিপালনে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, এই অভাবে নিষ্পেষিত সমাজে—যেখানে অতিরিক্ত লোকসংখ্যা, খাদ্যাভাব এবং অন্যান্য নিতান্ত-প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব, মেয়েদের বাইরের জগতে ঠেলে দিয়েছে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। সেইখানে এ সব ভাবধারা একেবারেই বেমানান।

গত কয়েক বৎসরে মেয়েদের চাকরি জীবনে একটা দারুণ সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে একান্নবর্তী পরিবারের যে প্রথা সমাজব্যবস্থার গোড়া থেকে চলে আসছে, আজ তাতে নিঃসন্দেহে ভাঙন ধরেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সামাজিক আদর্শ আজ আমাদের অন্য পথের প্রলোভন দেখাচ্ছে।

যৌথ পরিবারে আর পাঁচজনের সংগে মিলেমিশে যখন আমরা থাকতাম, তখন মেয়েরা নিশ্চিন্তে কাজে বেরিয়ে যেতে পারত। তাদের সন্তানদের দেখাশোনা করতেন পরিবারের অন্যান্য মহিলারা, যাঁরা শুধু গৃহকেই নিজেদের কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

কিন্তু এখন অবস্থা অন্য রকম। এখনকার স্বতন্ত্র পরিবারে, পিসিমা, কাকিমা ঠাকুমা বা জেঠিমার স্নেহচ্ছায়ায় আর চাকরিজীবী মায়েদের ছেলেমেয়েরা পরম নির্ভরতার আশ্রয় মেলে না। সংসারের সমস্ত ভারবহন ও গৃহস্থালীর সকল খুঁটিনাটির পরিচর্যাও এখন তাদের নিজেদেরই করতে হয়। এর ফলে তাদের চাকরিজীবন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

যে সব মেয়েদের নেহাত চাকরি না করে উপায় নেই, শুধু তারাই এখন এই অবস্থায় টিকে থাকতে পারে। সংসারপীড়িত মনে তারা ছেলেমেয়েদের রেখে যায় চাকর-বাকরের অনিশ্চিত দায়িত্বজ্ঞানের উপর বা প্রতিবেশীর সহানুভূতির উপর আস্থা রেখে। গৃহস্থালীও থাকে চাকরের জিম্মায়, তার সততা, যোগ্যতা ও দায়িত্বজ্ঞানের উপর নির্ভর করে।

এ এক অতি কঠিন পরিস্থিতি: কারণ, মাইনে করা চাকর রাখাও অনেকের সাধ্যের বাইরে।

পাশ্চাত্য দেশে যে Baby sitter-এর ব্যবস্থা আছে, সেটি যদি এখানে এমনভাবে প্রচলন করা যেত যে, অতি অল্পবিত্ত পরিবারের আয়ত্তের বাইরে না হয়, তা হলে অনেকেই উপকৃত হত।

কয়লাখনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চাকুরিজীবী মহিলাদের ছেলেমেয়েদের জন্য যে Creche ব্যবস্থা আছে, বিকল্পে সেটিও করা যেতে পারে। এইভাবে আমাদের দেশের সব শ্রেণীর ও সবপ্রকারের চাকুরিজীবী মেয়েদের জীবন অনেক নিশ্চিন্ত, অনেক সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলা যায়।

রত্না চক্রবর্তী
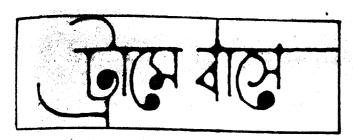
সংবাদে শুনিলাম : রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ২০ জনের মনোনয়নপত্র পেশ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিশুখুড়ো বলিলেন—

"আমরা অবশ্য রেনজারস বা বারব্যাট লটারির টিকিট ক্রেতাদের সংখ্যা জানিনে!!"

যুক্তফ্রন্ট সরকার শহর ও শহরতলির প্রত্যেকটি বাজারে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের লইয়া কমিটি গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছেন, শুনিলাম এই কমিটির হাতেই মাছ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।—"মাছ ধরা এবং তরকারি উৎপাদনের দায়িত্ব অবশ্য জেলে এবং চাষীদের হাতেই থাকবে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় রাজ্য সরকারের এগারজন বিভাগীয় কমিশনার ও সেক্রেটারিকে বিভিন্ন পদে বদলি করিয়াছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"এটা ঠিক লে-অফ নয় বলেই হয়ত এ পর্যন্ত ঘেরাও-র কোন সংবাদ পাইনি!!"

সংবাদে শুনিলাম বস্ত্র মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা আপাতত মুলতুবি রাখা হইয়াছে।—"এতে আমাদের কৌপীনবন্ত হবার সৌভাগ্যও ভাগ্য দোষে অযথা বিলম্বিত হল"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম ভারত ও পাকিস্তান এখন আবার আমেরিকা হইতে নগদে বা ধারে কিছু কিছু সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় করিতে পারিবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এতে লাভটা অবশ্য পাকিস্তানেরই হবে; আর যা হোক, তারা বউনির খদ্দের তো!!"

প্রসঙ্গত মনে পড়িল, চীনের রেড গারডদের অনুকরণে পাকিস্তানের মুসলিম লীগের মধ্যে নূতন তৈয়ার হইয়াছে গ্রীন গারড বা সবুজ সেনা। সহযাত্রী বলিলেন—"রবীন্দ্রনাথ যাদের—'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ' বলেছিলেন, তারা নিশ্চয়ই সেই অবুঝ নয়, জ্ঞানের নাড়ী এদের যথেষ্ট টন টনে!!"

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলিয়াছেন, দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি অনিবার্য।—"আমরা অবশ্য বরাবর দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের কথাই শুনে আসছি এবং এটাও শুনে আসছি "পশ্চাদপসরণ"ও একটি সর্বজন স্বীকৃত রণ কৌশল। তা ছাড়াও ইন্দিরাজী যে ছোটবেলায় শেখা সেই আপ্ত বাক্যটি অর্থাৎ 'সদা সত্য কথা কহিবে' স্মরণ করেছেন তাতেই আমরা পরমানন্দ লাভ

করলাম"—শ্যামলাল বিকৃত বদনেই বুঝি আনন্দ প্রকাশ করিল।

ঘোড় দৌড় তুলিয়া দিয়া স্টেডিয়াম নির্মাণের প্রস্তাব করিয়াছেন কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীশিবকুমার খান্না। ইহার সম্ভাব্য ফল সম্বন্ধে সহযাত্রী ছড়া শুনাইলেন—"ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাং, মাছ নিয়ে গেল চিলে।"

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে কৃচ্ছ্র-সাধন করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।—"ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ 'মিস এ মিল' কথাটা অবশ্য এখনো খোলসা করে বলা হয়নি"—বলে শ্যামলাল।

বিহার বিধানসভার সদস্যা শ্রীমতী শ্যামাকুমারী বিহারে দুর্ভিক্ষের হেতু বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে খাদ্য, শিক্ষা ও অর্থ এই তিনটি ক্ষেত্রে যাঁহাদের অধিষ্ঠান তাঁহাদের সবাই দেবী অর্থাৎ অন্নপূর্ণা, সরস্বতী এবং লক্ষ্মী। সুতরাং এই তিনটি দফতরের ভার দেওয়া উচিত ছিল তিনজন মহিলা-মন্ত্রীকে, কিন্তু তাহা দেওয়া হয় নাই বলিয়াই এই অঘটন ঘটিয়াছে। খুড়ো বলিলেন—"তিনজন মহিলা মন্ত্রী এই তিন ক্ষেত্রে নির্বাচিতা হলে বিহার রাজ্যের কী হত বলা শক্ত কিন্তু আমাদের ঘরে ঘরে মহিলাদের হাতে সচিবের দায়িত্ব তুলে দিয়ে ফল যা পাচ্ছি তা শ্রীমতী শ্যামাকুমারী নিশ্চয়ই জানেন!!"

জনৈক জ্যোতিষী নাকি মন্তব্য করিয়াছেন যে নূতন বৎসরে মহিলাদের প্রভাব আরও বৃদ্ধি পাইবে। সহযাত্রী বলিলেন—"এ আর এমন একটা নূতন কথা কী। শরৎচন্দ্র বর্ণিত টগর বোস্টমের কথা এখনো ভুলতে পারছিনে; নাম বলতে পারব না এমন একজনার" প্রভাব তো নিত্যিতিরিশ দিন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি!"

রাশিয়ার 'তাস' প্রচার করিয়াছেন : নারীর সুরূপিনী হওয়ার ইচ্ছাটা বুর্জোয়া সংস্কার নহে, সুতরাং নারীকে সুন্দর হইতে হইবে। সহযাত্রী বলিলেন—"আমরা বুর্জোয়া-ফুর্জোয়া বুঝিনে, নিজের তাগিদেই নজরুলের সুরে সুর মিলিয়ে গেয়েছিলাম—চেয়োনা সুনয়না, আর চেয়োনা এ নয়ন পানে।"

কেন্দ্রীয় এবং পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী উভয়েই এ বিষয়ে একমত যে, স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপর পাঠ্য পুস্তকের অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হইয়া থাকে, ফলে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে তাহা পড়িয়া আয়ত্ত করা দূরে থাকুক, স্কুলে যাতায়াতের সময় সেইগুলি বহন করাও কঠিন হইয়া

পড়ে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"অধীত বিষয় আয়ত্তের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমাদেরও আয়ত্তের বাইরে, তবে বহন করার ব্যাপারে পরিবহণ বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে টেম্পোর বা ঠ্যালার ব্যবস্থা করলেই সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় পাঠ্য পুস্তক প্রণেতাদের। তাঁদের এই মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ মানেই মৌচাকে ঢিল নিক্ষেপের সামিল। সুতরাং যা কর কেন খুঁচিয়ে!!"
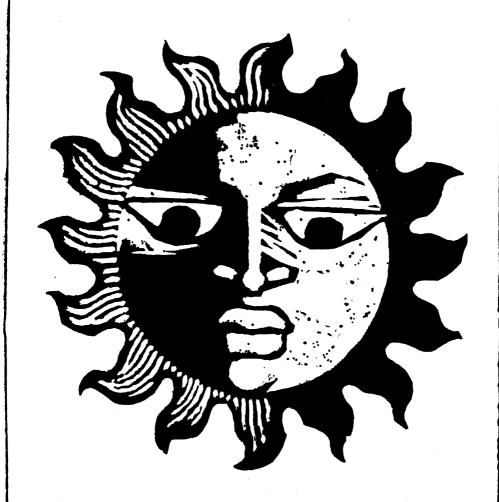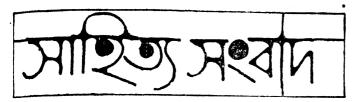
ভাষা ও বানানের শুদ্ধতা

বাংলা বানানের সংস্কার সম্পর্কে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ এবং সেই সম্পর্কিত বাদ-প্রতিবাদের পত্রাবলী দেখে স্পষ্ট বোঝা যায়, বাংলা বানানের শুদ্ধতা কিংবা শুদ্ধতা রক্ষা সম্পর্কে অনেকেই অতিশয় সচেতন। আলোচনাগুলি সব পড়েও মনে এই প্রশ্ন থেকেই যায় যে, এসব পত্রাবলী প্রকাশের ফলে সুফল কী হবে?

এ-কথা ঠিক, এদেশের বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে বিভিন্ন ধরনের বানানের ব্যবহার অতিশয় বিরক্তিকর ও ক্ষতিকর। একেই তো সাধু ভাষা ও চলতি ভাষার নামে দু' রকম ক্রিয়াপদে দু' রকম বাংলা লেখা হচ্ছে, এর পরেও যদি শব্দের বানানও আলাদা রকম হয়—পত্র-পত্রিকাগুলিতে ভাষার প্রতিচ্ছবি যদি হয় ভিন্নপ্রকার—তবে তো বাংলা ভাষাকে আর ভাষা না বলে অবিলম্বেই কিচির-মিচির বলতে হবে। আনন্দবাজার পত্রিকায় শুধু ইংরেজী ও সমস্ত বিদেশী শব্দকেই বিশ্লিষ্ট ও সরল করে লেখার চেষ্টা চলছে, কিন্তু এ ছাড়াও যে সর্বত্র হলো, হোলো, হল কিংবা কোরে, ক'রে করে ইত্যাদি বৈচিত্র্যের ছড়াছড়ি—সে সম্পর্কেও কিছুই করার নেই? কিন্তু, আগেই সন্দেহ প্রকাশ করেছি, এ সব বিষয়ে চিঠিপত্র বা প্রবন্ধ লেখালেখি করে বিশেষ সুফল পাবার আশা বোধ হয় নেই।

নানা কারণেই ভাষার চেহারা মাঝে মাঝেই বদলায়। ছাপার সুবিধের জন্য বানান সরল করার যুক্তি অগ্রাহ্য করা নিছকই গোঁড়ামি। বাংলা টাইপরাইটারেরও প্রচলন না-হবার কোনো মানে হয় না, এবং টাইপরাইটারের চাবি কমাবার জন্য বানানের কিছু পরিবর্তনও অবশ্যই উচিত। কিন্তু এ সব পরিবর্তন নির্দেশ করার অধিকারী কে? আনন্দবাজার বিদেশী শব্দকে ভাঙলেন—অন্যান্য পত্র-পত্রিকা যদি তা অনুসরণ না করে, কিংবা টাইপরাইটারে হয়তো তৎসম শব্দকেও ভাঙতে হবে—ছাপার অক্ষরে যদি তা না হয়—তবে নতুন বাংলা ভাষা শিক্ষার্থীকে তো চার রকম ভাষা শিখতে হবে! ভাষা ও বানানের পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত যদি কোনো একটি কেন্দ্র থেকে গ্রহণ করা হয়—এবং একসঙ্গে সমস্ত পত্র-পত্রিকা ও ছাপাখানায় অনুসৃত হয়—তা' হলেই ভাষার সৌকর্য বজায় থাকে। কিন্তু কেন্দ্রটি কি হতে পারে?

বাংলা ভাষা সম্পর্কে আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির উদাসীনতা তো অন্ধের কাছেও দৃশ্যমান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এই স্থান গ্রহণ করতে পারতো। কিন্তু এখন তো শুধু কোনো পুরোনো বই বা পুঁথির খোঁজ করতে হলেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম মনে পড়ে। জীবিত বর্তমান সাহিত্যের সঙ্গে ওই প্রতিষ্ঠানের কোনো যোগাযোগ আছে কিনা জানি না। এ বিষয়ে সরকারী মুখাপেক্ষী না-হওয়াই শ্রেয়। সুতরাং, আমাদের মনে হয়, প্রখ্যাত লেখক ভাষাবিদদের সমন্বয়ে যদি একটি বাংলা আকাদেমি জাতীয় কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়—তবে সেখানেই তাঁরা নানান আলোচনা ও বিচারের পর ভাষা ও বানানের একটি পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধ রূপ দিতে পারেন—যা সারা দেশে একসঙ্গে অনুসৃত হবে। বাংলা সংবাদপত্রগুলি একযোগে অনায়াসেই এ রকম কোনো আকাদেমির প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। পূর্ব-পাকিস্তানে এ রকম একটি 'বাংলা আকাদেমি আছে—সেই প্রতিষ্ঠানটি সেখানকার ভাষা সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ও সক্রিয়।

এ বিষয়ে ফরাসী আকাদেমির ভূমিকাও বহুবিদিত। এখনো সেখানে বিদেশী শব্দের ফরাসী বানান ও উচ্চারণ সম্পর্কে তর্কা-তর্কির ঝড় বয়ে যায়। আরেকটি ব্যাপারে ফরাসী আকাদেমি একটি আদর্শ স্থল। আকাদেমির সদস্য নির্বাচন। যদু-মধু সরকারী অফিসার-সাহিত্যিক কিংবা নিছক বয়েস ডিগ্রীর জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক হওয়াই সেখানে আকাদেমির সদস্য পদ পাবার যোগ্যতা নয়। আকাদেমির সদস্য হওয়া ওই দেশে একটি গৌরবের বিষয় এবং আকাদেমির সদস্যরা জনসাধারণের চোখে বিশেষ সম্মানীয়। এবং সদস্যদেরও সেই সম্মানের যোগ্য হতে হয়। (অবশ্য, নির্বাচনের ব্যাপারে দলাদলি কিংবা পেটোয়া লোকদের নির্বাচন করার দৃষ্টান্ত

যে ও-দেশে একেবারেই নেই, তা নয়। সে সব তালিকা এখানে উপস্থিত করা অবান্তর। এবং সকলের চোখেই যে আকাদেমির সদস্যপদ খুব গৌরবময়—তাও নয়। যে প্রতিষ্ঠিত-খ্যাতিমান লেখক আকাদেমির সদস্য হন—তাঁর সম্পর্কে ফরাসী তরুণ সাহিত্যিকদের ধারণা হয়, এবার ও'র বারোটা বেজে গেল, উনি এবার রক্ষণশীল দলে ঢুকে পড়লেন, আর ও'র পক্ষে 'নতুন' কিছু লেখা সম্ভব নয়! পল ভালেরির ক্ষেত্রে এই মত খুব প্রবল হয়েছিল। কিন্তু, এ সবও এখানে অবান্তর, কেননা, অন্তত বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে, তরুণ লেখকদের মতামতে কিছু যায়-আসে না। সে দায়িত্ব প্রবীণদেরই উপরে থাকা উচিত। তরুণরা নানান ভাঙ-চুরো করার চেষ্টা করবেনই—প্রতিষ্ঠান বিচার করবে—তার সবই গ্রহণযোগ্য কিনা।)

ছাপার ক্ষেত্রে সমতা আনার জন্য অন্তত এই রকম একটি বিচারক ও নির্দেশক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত সকলেই স্বীকার করবেন। আশা করি, সংবাদপত্র মহলও এ বিষয়ে ভেবে দেখবেন।

সনাতন পাঠক
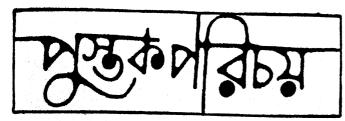
অনুবাদ সাহিত্য

বিআংকার রাজা। তরু দত্ত। অনুবাদ ও সম্পাদনা—পল্লব সেনগুপ্ত। সুবর্ণরেখা, ৭৭।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। দামঃ ৩·০০ টাকা।

তরু দত্ত, আজ থেকে এক শতক আগে যে বাঙ্গালী কিশোরী ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এবং তাঁর সে সাহিত্য সৃষ্টি ঐ দুই ভাষার রসিক ও সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে।

কলকাতা রামবাগানের সংস্কৃতিবান দত্তরা, যাঁদের বাড়ির বিদ্যা ও সাহিত্যচর্চার খ্যাতি এককালে ছিল দেশজোড়া—এমন কি দেশের বাইরেও—সাহিত্যজগতে দুটি অসাধারণ বিদুষী কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন—অরু ও তরু। তরুর দু বছরের বড়ো অরু। অরুর মৃত্যু ২০ বছর বয়সে ১৮৭৪ সালে: তরুর মৃত্যু ২১ বছর বয়েসে ১৮৭৭ সালে। এই দুই দত্ত-ভগিনীই কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ছাত্রী এবং এঁরা দুজনেই প্রথম ভারতীয় মেয়ে যাঁরা ইংরেজী ও ফরাসীতে সাহিত্য চর্চা ও সৃষ্টি করেছেন। সম্ভবত এশিয়ার মধ্যেও প্রথম।

আমরা, যারা চল্লিশ ছুঁই ছুঁই, ছেলেবেলা থেকেই তরু এবং অরুর নাম শুনেছি, পুরোনো পত্র-পত্রিকায় এঁদের ছবি দেখেছি, কিছু কিছু লেখা মূল (ইংরেজী) ও অনুবাদে পড়েছি। আমাদের পিতা ও পিতৃস্থানীয়দের কাছে শুনেছি তাঁদের বাল্যকালে—অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে—তাঁরা দত্ত-ভগিনীদের লেখা নিয়মিত পড়েছেন এবং ভগিনীদ্বয়ের কথা যতই ভেবেছেন ততই বিস্মিত হয়েছেন।

কিন্তু, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে তাঁরা তবু পড়েছেন ও মুগ্ধ বিস্ময়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। বিংশ শতাব্দীতে, অন্তত গত ত্রিরিশ বছরে, তরু দত্তের লেখা পড়া বা তাঁকে নিয়ে আলোচনা, বা তাঁর স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করা, বা অন্য কিছু—সাহিত্যাভিমানিনী, সংস্কৃতিমন্য বাংলা-দেশে কিছু হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। শ্রীপল্লব সেনগুপ্তের কথায়—একুশ বছর বয়সিনী এই বাঙালী মেয়েটির জন্য "কেম্ব্রিজ হিস্ট্রী অব ইংলিশ লিটরেচর" সশ্রদ্ধভাবে জায়গা করে দিয়েছে (এডমন্ড গসের ভবিষ্যৎবাণীকে সপ্রমাণ করে!), বিশ্ব-কবিতা-সংকলন জাতীয় একাধিক বইতে এঁর লেখা সাদরে প্রকাশ করা হয়েছে, এডমন্ড গস, আঁদ্রে থেরিএ, ক্লারিস বাদের প্রমুখ বিশ্ববিদিত সাহিত্য-সমালোচকরা এঁর প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন প্রায় এক শতাব্দী আগে—এই 'গেঁয়ো যোগিনীর' কিন্তু নিজের দেশে ভিখ মেলেনি বিশেষ! আজ পর্যন্ত এই বঙ্গদেশে তাঁর একটি বইয়েরও পুনর্মুদ্রণ হয় নি; সব মিলিয়ে তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে উননব্বই বছরে উননব্বই পাতা হয়তো বা!......মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

তরু শুধু কবিতাই রচনা করেন নি, প্রবন্ধ, আলোচনা ও উপন্যাসও রচনা করেছেন। উভয় ভাষাতেই। 'বিআংকা' উপন্যাসটি তাঁর ইংরেজী ভাষায় লেখা, যেটির সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত।

'বিআংকা' উপন্যাসটি তরু শেষ করে যেতে পারেন নি—তাঁর অকালমৃত্যু এ উপন্যাস শেষ হবার আগেই তার উপর যবনিকা টেনে দিয়েছে। তবে, অনুবাদকের সংগে আমরা সম্পূর্ণ একমত যে, ঘটনার অন্তর্নিহিত সুর—যা সারা বইতে অনুভূত—থেকে বোঝা যায় আর বেশিদূর এগোতেন না লেখিকা। "বিয়োগান্তিকতাতেই এর ভূমা পূর্বনির্দিষ্ট ছিল।"

স্বল্পপরিসর এই কাহিনীটিতে ইংল্যাণ্ড-প্রবাসী এক স্পেনীয় কবির কনিষ্ঠ ও একমাত্র জীবিত কন্যা বিআংকার সংগে অভিজাত ইংরেজ তরুণ, লর্ড কলিন মুরের প্রেম ও বিচ্ছেদ বর্ণিত হয়েছে। কলিনের মা বিআংকাকে পছন্দ করতেন না, কারণ সে স্পেনীয় এবং দরিদ্র। বিআংকার বাবাও চান না এই প্রেম ও পরিণয়—বিআংকাই যে তাঁর একমাত্র অবলম্বন। বিআংকা বুদ্ধিমতী, বিআংকা বাবার মুখ চেয়ে বলে, সে কাউকে বিয়ে করবে না। কিন্তু বিআংকার বাবা কলিনের বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে বিআংকা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে দীর্ঘদিন ভুগে বিআংকা সুস্থ হলে তার বাবা বিবাহে রাজী হন। কলিনের মা অবিশ্যি এ বিবাহে বাধা দেবার জন্য তাঁদের ও বিআংকাদের আত্মীয় কুটিল মিঃ আওএনের সাহায্যে চেষ্টা চালান। কিন্তু

তার আগেই বাধা আসে ভাগ্যের কাছ থেকে। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে লড়তে যাওয়ার নির্দেশ আসে কলিনের উপরে। দু'টি তরুণ-তরুণীর ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নের সমাধি রচিত হয়।

লেখাটি এখানেই শেষ করেছিলেন তরু। অনুবাদক এটাকে সামান্য একটু এগিয়ে শেষ করেছেন। বলেছেন—বিআংকার 'রাজা' ক্রিমিয়ার যুদ্ধ থেকে আর ফেরেনি। বিআংকা আজও বসে থাকে ওর জানলার পাশে ওর 'রাজার' অপেক্ষায়।...

খাটি রোমান্টিক একটি নভেল কিন্তু পট-ভূমি বর্ণনা ও চরিত্রসৃষ্টিতে যথেষ্ট শক্তি-মত্তার পরিচয় মেলে। লেখিকার কবি-প্রকৃতি লেখাটিকে আগাগোড়া এক অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত করেছে।

অনুবাদ সুন্দর। সম্পাদকীয়টি কেবল সুন্দর নয় তথ্যসমৃদ্ধ তথা মূল্যবান। তরু দত্ত সম্পর্কে জানবার ও বোঝবার জন্য অনুবাদক-সম্পাদকের এই প্রচেষ্টাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়-কৃত তরু দত্তের প্রতিকৃতি ও খালেদ চৌধুরী-অঙ্কিত প্রচ্ছদ এ বইয়ের আকর্ষণ বাড়ানোর সহায়ক হয়েছে। (৬৩।৬৭)

বিবিধ

রান্নার বই। সুলেখা সরকার। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড. ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ছ টাকা।

চটপট দু-চার পদ রান্না শিখে নিয়ে

যাঁরা 'টাইমের ভাত' বেড়ে দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে চান, আলোচ্য বইখানি তাঁদের কাজে লাগবে। উপকৃত হবেন তাঁরাও, নেহাতই দু-চার পদে যাঁদের মন ওঠে না, পরিবেষণের সময়ে যাঁরা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজিয়ে দেবার পক্ষপাতী। বস্তুত এই বইয়ে, পঞ্চাশ তো সামান্য কথা, পঞ্চশত প্রকার রান্নার প্রকরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। যাঁর যেটা খুশি, এবং যখন খুশি, বেছে নিতে পারেন।

লেখিকার ভাষা নিরলংকার; কোন্ খাদ্যে কতটা উপকার সেদিকে লক্ষ্য রেখে তিনি বেশ সহজ ভাষায় সুবিন্যস্তভাবে নানা-প্রকার আহার্যের পাক-প্রণালী জানিয়ে দিয়েছেন। বাজার আগুন, সব রকমের উপকরণ সর্বদা পয়সা দিলেও মেলে না, তবু ভাল-মন্দ কে না খেতে চায়। বাসনার সেরা বাসা যে রসনায়, কবির এই উক্তি অবশ্যই অগ্রাহ্য করা চলে না। সুতরাং, আশা করা যায়, ভোজনপ্রিয় বাঙালীদের মধ্যে এই গ্রন্থের সমাদর ঘটবে।

ধর্ম ও দর্শন

প্রীতি-শতদল ও ব্রজভাবভূষণাবলী— শ্রীহরিজীবন গোস্বামী প্রণীত। কবিরাজ শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন সেনশর্মা কর্তৃক ৯।১ কুমারটুলী স্ট্রীট, কলকাতা ৫ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার মধুর ভাবকে অবলম্বন করিয়া আলোচ্য কাব্যগ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। শ্রীরাধা এবং চন্দ্রাবলী এই দুইজনের মাধুর্যে এবং তাহার চিন্তার-চাতুর্যে এই লীলারস উচ্ছসিত এবং উদ্বেলিত হইয়া ওঠে। গ্রন্থকার সেই রসের বিলাস এবং ভাব বা ভঙ্গীটি কেমন, আমাদের আস্বাদ্যরূপে তাহা পুস্তকটিতে পরিবেশন করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সাধনার অতি গূঢ় এবং গভীর অনুভূতি তাঁহার প্রত্যেকটি লেখার ভিতর দিয়া আমাদের চিত্তে ঝলক খেলে এবং চমক সৃষ্টি করে। এ বস্তু প্রত্যক্ষ অনুভূতির জিনিস, বিস্তারিতভাবে আলোচনার দ্বারা বিষয় বুঝানো সম্ভব নয়, সংক্ষেপে তো কিছুই বলা চলে না।

পরম ভাগবত শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেনের অভিমত আমরা এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন—'গ্রন্থকার পরম কৃপাবান্ গুরুরূপক সখীর সঙ্গিনী হইয়া তিনি আমাকে ব্রজভূমির রসামৃত অজস্র ধারায় আস্বাদন করাইলেন। তাঁহার বোলে অপ্রাকৃত ব্রজধর্মের সান্ধ্য আরতিকে তালে তালে বৃন্দাবনের পরমার্থ ব্রজপুরবণিতাগণের কামসেববর্ধনকারী হরির কামকেলীর দোলাটি কামবীজতন্ত্রে এবং কামগায়ত্রীমন্ত্রে আমার অন্তরে খুঁদিয়া গেল।" বৈষ্ণবগণের পরমপণ্ডিত শ্রীমৎ রাধাগোবিন্দনাথ পুস্তকখানির ভূমিকায় লিখিয়াছেন—আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থকার মহোদয় তাঁহার সাধনালব্ধ অথবা শাস্ত্র-সমর্থিত অনুভবের কথা তাঁহার অপূর্ব গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া সময়োচিত কার্যই করিয়াছেন। তাঁহারে প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা শুনিয়া অনেক ধর্মপিপাসু লোক পারমার্থিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাইবেন। আমরা এমন পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার

Henry Derozio: Edited by Subir Ray Choudhuri. Metropolitan Book Agency: 93 Park Street, Calcutta-16. Price Rs. 5.00.

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা। শ্রীজ্ঞানচন্দ্র দাস। গৌড়ীয় মিশন: শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা-৩। মূল্য ১·৫০।

রূপালি রেখা। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সাহিত্য প্রকাশ: ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মূল্য ৪·০০।

একাঙ্ক নাটকের কথা। দিলীপকুমার মিত্র। স্টাডিজ: ২২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ৩·৫০।

কল্যাণপত্রিত ও আত্মা। তাপস শীল। শ্রীমতী মীরা দেবী: আগরতলা। মূল্য ২·৫০।

শ্রীনামতাপবত্ত। শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ ঠাকুর। শ্রীউদয়নারায়ণ ঘোষ ঠাকুর: ১।২৯, অরবিন্দনগর, পোঃ যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, কলিকাতা-৩২। মূল্য ৪·৫০।

The Complete Works of Sister Nivedita (Vol. I), Sister Nivedita girls' School: 5 Nivedita Lane Calcutta-3. Price Rs. 12.00.

শেষ দৃশ্য। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। মুকুন্দ পাবলিশার্স: ৮৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৪। মূল্য ৬·৫০।

কলকাতায়
মেয়েদের
প্রদর্শনী
হকি

খেলার মাঠে

হকি লীগের খেলা শেষ মুখে এসে পৌঁছেছে। বেটন কাপের খেলা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ক্রিকেটের শুধু একটি খেলাই বাকি—লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের মীমাংসা। গত সপ্তাহেই ক্রিকেটের নক-আউট ফাইন্যালে স্পোর্টিং ইউনিয়ন কালীঘাটকে পরাজিত করে পাঁচবার বিজয়ীর সম্মান পেয়েছে। কিন্তু হকি আর ক্রিকেটের চেয়ে ফুটবলের জন্যই কলকাতার ক্রীড়ামহল এখন বেশি উদ্‌গ্রীব। মাঠে ফুটবল পড়েছে, পাওয়ার লীগ ও অফিস লীগের খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। মে মাসের শুরু থেকে ক্যালকাটা ফুটবল লীগের চারটি ডিভিসনের খেলা শুরু হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এবারও উঠা-নামার বিধান-বিহীন লীগ প্রতিযোগিতা। কোনো কোনো মহল থেকে উঠা-নামার বিধান পুনঃপ্রবর্তনের দাবি উঠেছিল। কিন্তু ধামাচাপা পড়েছে। সে ধামা অপসারিত হবার সম্ভাবনা নেই।

তবু কলকাতা ময়দানে ফুটবল আসছে তার নিজস্ব উন্মাদনা ও মাতামাতি সঙ্গে নিয়ে। রামকৃষ্ণ পল্লীমঙ্গল সমিতি আয়োজিত রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে বি-এন-আর এবং ইস্ট বেঙ্গলের প্রদর্শনী খেলাকে কেন্দ্র করে দর্শক সমর্থকদের মধ্যে যে খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে তা দেখে ফুটবল মরসুমের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্পর্কে শঙ্কিত বোধ করছি। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের প্রদর্শনী খেলাটি পুরো সময় অনুষ্ঠিত হয়নি। ৭ মিনিট আগে খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রদর্শনী খেলা, বিশেষ করে মহৎ উদ্দেশে অর্থ সংগ্রহের আয়োজিত খেলায় যদি এমন উত্তেজনার সঞ্চার হয় তবে গড়ের মাঠের প্রতিযোগিতামূলক খেলায় উত্তেজনা আন্দাজ করা শক্ত নয়। তাই ফুটবল মরসুমের আগে সব পক্ষের কাছে আমাদের শালীনতা ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন, ধৈর্যশীল হবার অনুরোধ।

দুটি ক্রীড়া সংস্থার নতুন ভবনের উদ্বোধন গত সপ্তাহে ক্রীড়ামোদিদের কাছে দুটি সুখবর।

ফুটবলের রাজ্য সংস্থা আই এফ এ ১১।১ সুতারকিন স্ট্রীটে তাঁদের নতুন ভবনের উদ্বোধন করেছেন। কুমারটুলি পার্কের পাশে কুমারটুলি ইনস্টিটিউটের নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়েছে। আই এফ এ ভবনের উদ্বোধন করেছেন রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু, আর কুমারটুলি ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জী। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে এই দুটি ক্রীড়া ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে এসে মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী যেসব মন্তব্য করেছেন তাকে রাজ্যের খেলাধুলার ক্ষেত্রে সরকারী নীতি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

দু'জনই বলেছেন খেলাধুলার ক্ষেত্রে তাঁরা দলগত রাজনীতির প্রশ্ন আনতে চান না। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধে থেকে, দলমত নির্বিশেষে খেলাধুলার উন্নতি প্রচেষ্টাই তাঁদের নীতি এবং এই প্রচেষ্টায় ক্রীড়া-মহলের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহযোগিতাও কাম্য। কথাগুলি শুনতে ভাল লাগলেও বাংলার খেলাধুলার ক্ষেত্রে এটা নিশ্চয়ই নতুন নীতি নয়। কংগ্রেস সরকারও খেলাধুলার ক্ষেত্রে একই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য স্পোর্টস কাউন্সিল গঠনে কংগ্রেস সদস্যরাই ছিলেন দলে ভারী। কিন্তু তার জন্য কোন বৈষম্যমূলক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত নেই। সুতরাং আজ যুক্ত ফ্রন্টের কিছু সদস্য যদি স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য হন তাহলেই বা খেলাধুলার ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্যমূলক আচরণের প্রশ্ন আসবে কেন?

আসলে কংগ্রেস, কমুনিস্ট বা পি-এস-

বাংলার উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু ১১।১ সুতারকিন স্ট্রীটে [illegible] আই এফ এ-র নতুন ভবনের উদ্বোধন করছেন। শ্রী বসুর ডান দিকে আই এফ এ-র নতুন সভাপতি শ্রী[illegible] আচার্যকে দেখা যাচ্ছে

পূর্বাঞ্চল ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের বিজয়ী সার্ভিসেস দলের অধিনায়কের হাতে পুরস্কার দিচ্ছেন পশ্চিম বাংলা ভলিবল ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার

পি, এস-এস-পি-র নীতি নয়, চাকা ঘোরার সংগে সংগে স্বয়ংশাসিত ক্রীড়া সংস্থারই দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। নীতি বদলায় না। ক্রীড়া নীতি প্রায় একই থাকে। এবং বলা বাহুল্য, সে নীতি সবক্ষেত্রে প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, গঠনমূলকও নয়। আজ প্রয়োজন গঠনমূলক ও উন্নতিমূলক পরিকল্পনার। আজ সবচেয়ে আগে প্রয়োজন কলকাতায় একটি বড় আকারের ফুটবল স্টেডিয়ামের: গ্রামে গ্রামে স্কুলে, কলেজে খেলার মাঠের। নতুন সরকার সেই প্রয়োজন মেটাতে পারলেই সত্যিকারের কিছু কাজ হবে।

আমরা জানি, সারা বছর ফুটবল অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখার জন্য আই এফ এ সরকারের কাছে ময়দান এলাকায় একটি মাঠ চেয়েছিলেন। সে মাঠকে রাত্রিকালীন খেলা ও অনুশীলনের উপযোগী করতে অর্থ খরচেরও ঝুঁকি নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মাঠ পাওয়া যায় নি।। স্পোর্টস কাউন্সিলেরও এমন কিছু কিছু পরিকল্পনা আছে যার জন্য মাঠের প্রয়োজন। কিন্তু মাঠের অসুবিধা। নতুন সরকার যদি এই সব অসুবিধা দূর করতে পারেন, যদি ক্রীড়াক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থের দুষ্ট চক্র ভেঙে দিতে পারেন সেটাই হবে নীতির পরিবর্তন।

✻

পাতৌদির নেতৃত্বে ভারতের তরুণ ক্রিকেট, দল বোম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ বিমান বন্দর ছেড়ে ইংলণ্ড যাত্রা করছে ২৩শে এপ্রিল। উদ্দেশ্য ৩টি টেস্ট সমেত মোট ২১টি খেলার তিন মাসের সফর। এই মরসুমে আমাদের বড় খেলা ফুটবল। দিনের বেলা এই আলোচনার তুফান ছুটলেও গভীর রাত্রিতে আমরা উৎকর্ণ হব ব্রিটিশ কণ্ঠের জন্য। ক্রিকেটের সংবাদ পাবার আগ্রহে অনেকেই বি-বি-সি কেন্দ্রের ১৩-১৬-৩১ মিটার ঘোরাবেন।

এদেশের জনজীবনে ইউনিয়ন জ্যাক আর ক্রিকেট প্রায় একই সময়ে এসেছে। কিন্তু ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে টেস্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা ৩৫ বছরের। যাই হক ভারত-ইংলণ্ড ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ভারত থেকে প্রথম পার্শী দল ইংলণ্ড ভূমিতে গিয়েছিল ১৮৮৬তে। সব মিলিয়ে এবারের সফরকে ভারতের দশম ইংলণ্ড সফর বলা যেতে পারে। আর ইংরেজের প্রথম ক্রিকেট দল ভারত ভূমিতে এসেছিল জি এফ ভার্নোর নেতৃত্বে ১৮৮৯ সালে। সেই থেকে ইংলণ্ডের ৯টি দল ভারত সফর করে গেছে। ভারতীয় দলও ইংলণ্ডে গিয়েছে ৯ বার। এই দশম সফর।

১৯৫৯ সালে ভারতীয় দল শেষ বার ইংলণ্ড সফর করবার পর ৮ বছরের মধ্যে ৭টি টেস্ট সিরিজ খেলেছে। ৬টি দেশের মাটিতে, একটি বিদেশে। টেস্টের সংখ্যা মোট ৩২। এই ৩২টি টেস্টের মধ্যে ভারতের জয়ের সংখ্যা পাঁচ, পরাজয়ের আট। ১৯টি খেলায় জয়পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি।

ভারতের মোট টেস্ট হিসাব হচ্ছে : খেলা ৯৭, জয়—১০, পরাজয়—৩৭, ড্র—৫০। এবার ইংলণ্ডের এজবাসটন মাঠের তৃতীয় টেস্ট হচ্ছে ভারতের শততম টেস্ট খেলা।

একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। ভারত এ পর্যন্ত ১০টি টেস্ট খেলায় জিতলেও দীর্ঘ ৩৫ বছরের মধ্যে বিদেশের মাটিতে কোন টেস্ট জয়ের নজির নেই। ইংলণ্ডে এবার কি আমরা পারব অন্তত একটি টেস্ট জিততে?

ভারতের পক্ষে 'রাবার' সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই অগ্নি-পরীক্ষায় ভারতের সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। কেননা, ইংলণ্ড সফরের সময় গ্রীষ্ম-বর্ষা মেশানো প্রাকৃতিক পরিবেশই এর প্রধান বাধা। ইংলণ্ডে একই বছরে ভারত পাকিস্তানের দ্বৈত সফর ব্যবস্থায় একমাত্র দায়ী ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অবাস্তব সম্মতি। তাই ক্রিকেট অনুরাগী মহলে তাঁরা সমালোচনার পাত্র।

হয়তো এই খামখেয়ালি আবহাওয়ার কথা ভেবেই ইংলণ্ডের ক্রিকেট পরিবেশে অতি পরিচিত পাতৌদিকে আবার দল পরিচালনার গুরু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সহযোগী অধিনায়কের পদ পেয়েছেন চান্দু বোরদে। আশা করি পাতৌদি-বোরদে সমঝোতায় গড়ে ওঠা নেতৃত্ব ইংলণ্ডের মাঠে ভারতীয় ক্রিকেটকে নতুনভাবে উন্মোচন করবে।

একথা বলাই বাহুল্য, যে ম্যাচ জেতার আশা নিয়েই ভারতীয় তরুণ ক্রিকেট দল ইংলণ্ডের মাটিতে পা রাখবেন। এই আশার সার্থক রূপ দিতে দলগত ফিল্ডিং দক্ষতাই হবে সহজ সোপান। এ সম্বন্ধে ভারতীয় দলকে সর্বদাই সচেতন থাকতে হবে যে, ইংলণ্ডের মাটিতে ইংলণ্ড টিম মানেই একটি শক্তিশালী দল। এদের ব্যাটিং শক্তি দুর্বল করতে পারলেই ভারতের জয়ের আশা। ভারতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের প্রধান পন্থা হচ্ছে বেপরোয়া পিটিয়ে রান তোলা, এজন্য ইনিংসের শুরুতে তাঁদের ক্যাচ ফসকানোর অর্থই তাঁদের রানের ঝুলি ফাঁপিয়ে তোলা। এদিকে সতর্ক লক্ষ্য রেখে দলের প্রত্যেকেই শারীরিক দক্ষতায় ফিল্ডিংকে সার্থক রূপ দেবার বীজমন্ত্র নিয়ে মাঠে নামবেন আশা করব। এজন্যে নবাবের উচিত হবে তাঁর দলকে নিয়মমাফিক প্রত্যহ ফিল্ডিংয়ে অভ্যস্ত করে তোলা, এর সুফল আছেই। কেননা, ক্রিকেট কথামালার প্রথম ছড়াই হচ্ছে—'ক্যাচ ধরে যে, ম্যাচ জেতে সে।'

স্পিন-নির্ভর ভারতের বোলিং শক্তির ধার বিচার করতে ইংলণ্ডের ক্রিকেট কর্মকর্তারা চন্দ্রশেখরকে 'গোপন অস্ত্র' খেতাব দিয়েছেন, তাঁদের একমাত্র ভয় 'চন্দ্রকেই।' হয়তো তিনি নিপুণ যোগ্যতায় বল করে ভারতীয় ফিল্ডারদের সামনে সুযোগ সৃষ্টি করবেন ঠিকই। কিন্তু এই সুবিধা ফিল্ডিং পারদর্শিতায় কতদূর কাজে লাগানো যাবে সেটাই দেখার বিষয়। তবে চন্দ্রশেখরের স্পিন ফিংগারে পোলিও রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা যে কোন সময়েই রয়েছে। তাই সব কিছু বিচার করে চন্দ্রশেখরের ওপরে খুব একটা আশা করা যায় না। আর "চন্দ্রশেখর ভীতির" জন্যে ইংলণ্ডের ব্যাটস-

ম্যানেরা তাঁকে কড়া নজরে মনোযোগ দিয়ে খেলবেন। এ গুরুত্ব স্বাভাবিক। এই সুযোগে বিষেণ বেদীর ঝোলানো লেগ-ব্রেকই হবে ব্রহ্মাস্ত্র। দলের অন্য স্পিনার বেংকটরাঘবন রান আটকাতে কার্যকরী হলেও উইকেট পাবেন কম। কারণ, ইংলন্ডের ব্যাটসম্যানরা টিটমাস, অ্যালেন ও মর্টিমোরের মত উ'চু দরের অফ-স্পিনারের সংগে খেলতে বিশেষ অভ্যস্ত। অন্য দিকে ভারতের সীমিত সীম বোলিং সুব্রত গুহ ও মোহলকে নিয়ে গড়ে উঠবে। এ'রা দু'জনে যদি ওপেনিং জুটিদের কাৎ করে জয়লাভের রাস্তা সহজ করতে পারেন, অবশেষে স্পিনারদের পক্ষে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হতে পারে। তবু সব কথাই 'যদি'-নির্ভর। বোলারদের ব্যবহার সম্বন্ধে পাতৌদির কাছ থেকে সজাগ ভূমিকা আশা করতে পারি, এজন্যে কাউন্টি ক্রিকেট ম্যাচে চন্দ্রশেখর, বেদী ও সুব্রতকে পাতৌদি বেঁধে ঢেকে ব্যবহার করলেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবেন। কাউন্টি খেলা জেতার ঊর্ধ্বে টেস্ট বিজয়ে গুরুত্ব দেওয়াই হবে প্রধান কাজ।

ভারতের ব্যাটিংয়ের কথায় ইংলন্ডের স্যাঁতসেঁতে পাগলা পীচের কথা এসে পড়ে। এই জন্যেই বলা হয় ইংলন্ডের মাঠে ক্রিকেট না খেললে সে ক্রিকেট খেলোয়াড়ই নয়। এই পীচের স্বভাব হচ্ছে যে মাটিতে বল পড়ার অনেক দেরীতে কাজ হয়। অতএব ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের সমঝে বুঝে দেরীতে ব্যাট চালানোই হবে সফল পদ্ধতি। তাছাড়া এই ভিজে পীচে বলের চকচকানি অনেকক্ষণ থাকে সেজন্যে বিশেষজ্ঞের অভিমত, ব্যাক-ফুটে খেলাই হবে শ্রেষ্ঠ পন্থা। এ জন্যে অসীম ধৈর্যের দিকটাও উপেক্ষণীয় নয়। দ্রুত রান তোলার মনোবৃত্তি নিয়ে খেলতে হলে দুই উইকেটের মধ্যে দেখে শুনে শর্ট-রান নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। পীচে শেকড় নামানো খেলা খেললে আত্মহত্যা করারই সামিল হবে। অন্যদিকে ব্যাটিংয়ের শুরুতে সারদেশাইয়ের সহযোগী কে আসবেন তা নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। যদিও ওপেনিং জুটীই ব্যাটিং তালিকার মেরুদণ্ড তবুও এ সমস্যা ইংলন্ডেরও রয়েছে, তাই পেছনের সারির ব্যাটসম্যানেরা উপযুক্ত দায়িত্ব নিয়ে খেললে এ সমস্যার আংশিক সমাধান হবে।

প্রতিপক্ষ ইংলন্ড দলের নেতার দায়িত্বের ডাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সফল অধিনায়ক ব্রায়ান ক্লোজের নামই শোনা যাচ্ছে। অন্যান্য খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণার নির্বাচন কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে, "আগামী ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর করতে ইচ্ছুক প্রত্যেক খেলোয়াড়কেই ইংলন্ডের মাঠে ভারত ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একাদিক্রমে ছ'টি টেস্টে খেলবার অংগীকার সূচক সম্মতি পত্র দেখাতে হবে।" তাই ইংলন্ডের খ্যাতনামা খেলোয়াড়েরা বিশেষ চিন্তিত। যাহোক, খেলা আরম্ভ হলেই সব কিছু পরিষ্কার হবে। মোটামুটি একথা ঠিক যে, তাঁরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে মাঠে নামবেন।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের সম্পর্কে শেষ ঘোষণা যে, তাঁরা যেন দলগত সংহতির দিক থেকে মাঠের মধ্যে ও বাইরে আকর্ষণীয় ভূমিকা নেন। অতীত কলংকজনিত কীর্তি কলাপের অবতারণা এই নবীন ক্রিকেট খেলোয়াড়দের কাছে অবশ্যই আশা করি না। এ'রা সব সময়ে যেন মনে রাখেন তাঁরা শুধু ক্রিকেট দূত নয়—ভারতের ক্রীড়াদূত।

*

লন টেনিস দুনিয়ায় সাড়া জাগানো সংবাদ হচ্ছে পেশাদার ও অপেশাদার মিলে-মিশে অংশ গ্রহণ করবার জোরদার প্রস্তুতি। এর ফলে লন টেনিস প্রভাবিত সব দেশই সোচ্চার। কান পাতলেই শুনতে পাওয়া যাবে এ প্রস্তাবের সপক্ষ ও বিপক্ষের দ্বিবিধ আওয়াজ। 'টেনিসের মুক্ত অংগন' প্রস্তাবে অস্ট্রেলীয় টেনিস শিবির সমর্থন জানালেও টেনিসের অন্যতম কুশলী দেশ যুক্তরাষ্ট্র এতে সম্মতি দেননি। অস্ট্রেলিয়ার এই প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছেন ইংলন্ড ও পূর্ব ফ্রান্সের দেশগুলি। দানা বেঁধে ওঠা এই সকল সন্দেহের নিরসন হবে লাক্সেমবুর্গে আয়োজিত আগামী ১৩ জুলাইয়ের বিশ্ব লন টেনিসের বৈঠকে। অস্ট্রেলীয় টেনিস বিশেষজ্ঞের মতামত অনুযায়ী 'মুক্ত-অংগন' প্রস্তাবকে জাতে ওঠার ছাড়পত্র দেওয়ার আগে দু বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হলেও, অ্যামেচার লন টেনিসের বিশ্ব আসর উইম্বলডনকে এর আওতায় আনা হবে না।

কিন্তু এই প্রস্তাবের সমর্থনকারী দেশ অস্ট্রেলিয়াতেও দ্বিমতের অভাব নেই। সিডনীর ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ এফ ই খিস্টিন বলেছেন, "সব কিছুই হয়েছে, কিন্তু পেশাদারদের এই প্রস্তাবে আগ্রহ কতটা সেই দিকটা চিন্তা করা হয়নি।" এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার সময়ে দক্ষ পেশাদারী তারকা কেন রোজওয়েল বলেছেন, "অবাধ টেনিসে সায় দেওয়া ছাড়া অস্ট্রেলীয় এসোসিয়েশনের কোন গত্যন্তর ছিল না—আর দর্শকেরাও এইরূপ প্রস্তাবকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাথমিক স্তরে দেখতে চান—সবশেষের সিদ্ধান্ত নেবেন বিশ্ব টেনিসের পরিচালকরা।"

পেশাদারী টেনিস জগতের অনেকেই অবাধ-টেনিসকে আমল না দিয়ে নানারকম ধুয়ো তুলছেন। তাঁদের প্রথম অভিযোগ : আধা-অ্যামেচারদের বিরুদ্ধে। অবশ্য শৌখিন বা অ্যামেচারদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তাঁদের অনীহা নেই। আধা-অপেশাদারদের ওপর বীতরাগের কারণ টাকাকড়ির সমান ভাগ-বাঁটোয়ারার বা সমান মাপকাঠি। তাই আর্থিক ইজ্জতই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংলন্ড লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম সমর্থক হয়েও মুক্ত-অংগনে টেনিস ক্রিড়ায় উইম্বলডনকে বাদ রাখার প্রস্তাবটি বরদাস্ত করতে পারেননি। চেয়ারম্যান হারম্যান ডেভিড বলেছেন, উইম্বলডনকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব অযৌক্তিক, অবাস্তব ও অকেজো। এরও পেছনে একই আর্থিক প্রশ্ন।

আমাদের দেশেও টেনিসের সম্মিলিত প্রতিযোগিতাকে সমর্থন জানানো হয়েছে। সকলেই জানেন, বর্তমানের অ্যামেচারের ধ্বজাধারী খেলোয়াড়রা টেনিসের জন্য বিশ্ব চষে বেড়ানোর খরচ অবশ্যই নিজেদের গাঁট থেকে বের করেন না। এর পেছনে অর্থ জোগানো সংস্থা রয়েছে। এজন্যে সব দিক ভালভাবে আলোচনা করলে অবাধ-টেনিসে অনিচ্ছার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

স্পেনের ম্যানুয়েল সালতানা ও টেনিস পটিয়সী বিলি জিন কিং টেনিসের অবাধ-তীর্থে প্রতিযোগিতা করতে সব সময়ে রাজী বলে সম্মতি জানিয়েছেন। তবে সালতানার অভিমত খেলোয়াড়দের গুণাগুণে অনুযায়ী প্রতিযোগিতার স্তর বিভিন্নভাবে ভাগ করা উচিত।

যাই হোক, বর্তমানে মিশ্র টেনিসের আয়োজনে নানা পক্ষের জোরদার যুক্তি দেখে এই কথাই মনে হয়, প্রফেশনাল ও অ্যামেচারের মধ্যে সীমারেখার প্রাচীর এবার ভাঙতে বসেছে।
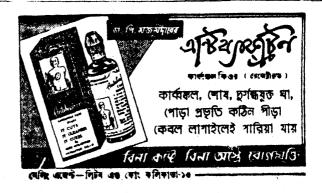
একলব্য

বৈদ্যনাথ নাথ

সিংহলের দুজন সাঁতারুর সাঁতার কেটে পক প্রণালী পার হয়ার দাবি আছে। দূরপাল্লার সাঁতারে ভারতের পথিকৃৎ সাগর-সংগ্রামী মিহির সেন বিধিবদ্ধ প্রথায় পক-প্রণালী পার হয়ে ভারতের সাঁতার ক্ষেত্রে সোরগোল তুলেছেন। কিন্তু ভারতের সুইমিং ফেডারেশন আয়োজিত পক-প্রণালীর প্রথম প্রতিযোগিতামূলক সাঁতারে প্রথম স্থান দখল করে বাংলার বাইশ বছর বয়সী সাঁতারু বৈদ্যনাথ নাথ সাগর-সংগ্রামের ভয়াবহতার ছবি মন থেকে অনেকখানি মুছে দিয়েছেন।

কারণ দুটি। প্রথম কারণ, পক-প্রণালীতে সাঁতার কাটার ব্যাপারে যে সব ভয়ের কথা শুনে এসেছি বৈদ্যনাথ নাথ তার বিশেষ কোন প্রমাণ পাননি। দ্বিতীয় কারণ, পক-প্রণালী পারের পর বৈদ্যনাথ শ্রমজনিত কাতরতায় ভেঙে পড়েননি। মোটের উপর বৈদ্যনাথের অভিজ্ঞতা বলে, পক-প্রণালী পার অসাধ্য সাধনের কৃতিত্ব নয়, পারাপারও হয়তো সম্ভব। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

ভারত মহাসাগরের সিংহল ও ভারতের মধ্যবর্তী দরিয়ার নাম পক-প্রণালী। সিংহলের তালাইমানারের তীর থেকে ভারতের ধনুষ্কোটির বেলাভূমি পর্যন্ত এই দরিয়ার দূরত্ব সওয়া উনিশ সাগরী মাইল। স্থলপথের মাইলের চেয়ে সাগরী মাইলের ব্যাপ্তি বেশি। ৬০৭৬ ফুট বা ২০২৫⅓ গজে এক সাগরী মাইল। সুতরাং সওয়া উনিশ মাইল দীর্ঘ পক-প্রণালীর প্রকৃত দূরত্ব সওয়া বাইশ মাইলের মত। কিন্তু সাঁতার কেটে পক-প্রণালী পার হতে হলে আরও কয়েক মাইল বেশী সাঁতার কাটতে হয়। কারণ স্রোতের টানে সোজাসুজি পাড়ি জমান সম্ভব নয়, প্রত্যেক সাঁতারুই বিপথগামী হতে বাধ্য।

যাঁর বাহুবল বেশি, হাতের টানে, পায়ের প্রক্রিয়ায় জল কেটে এগিয়ে যাবার গতি স্বচ্ছ, স্রোতের গতিপ্রকৃতি অধিগত তাঁর পক্ষে অবশ্য দূরত্ব কিছু কমিয়ে আনা সম্ভব। তবু মাপের ঠিক দূরত্ব বজায় রেখে পক-প্রণালী পাড়ি জমানো কোন সাঁতারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

তার উপর আছে সমুদ্রে সাঁতার কাটার অজানা আশঙ্কা। জানা আশঙ্কার মধ্যে হাঙর, সাপ, তুফান। অজানা আশঙ্কার কথা সবারই অজানা। কেউ বলেন, ভয়ঙ্কর সব জলপ্রাণী, কেউ বলেন, মানুষহন্তা বরাকুদা মাছ, কারো মতে, জেলি ফিশের বৃশ্চিক দংশন ইত্যাদি—সমুদ্রে সাঁতারুর বিপদের আকর। রত্নের আকর বলে সমুদ্রের এক নাম রত্নাকর। বোধ করি সমুদ্রগর্ভে

অজানা আশঙ্কার কালো অন্ধকার বলে এর অপর নাম 'কালাপানি'।

সুতরাং অসাধ্য সাধন না হলেও কালাপানিতে সাঁতার কাটা এবং সাফল্য অর্জন করা নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য কৃতিত্ব। যদি পক-প্রণালী পার সহজসাধ্যই হত তবে ৮ জনের মধ্যে ৬ জনই বা ব্যর্থ হলেন কেন? সবাই তো ভারতের দূরপাল্লার প্রখ্যাত সাঁতারু। কালাপানিতে আগে কোনদিন সাঁতার না কেটেও বৈদ্যনাথের পক্ষে কালাপানি জয় করা সহজ হয়েছে, কারণ, বৈদ্যনাথ দূরপাল্লার পাকাপোক্ত ও দৃঢ়চেতা সাঁতারু, নবযৌবনের উদ্দাম গতিতে গতিময়। সাঁতারই ওর জীবনের ব্রত। তাই বৈদ্যনাথের পক্ষে পক-প্রণালী জয় যেমন সহজ হয়েছে অপরের পক্ষেও তেমন সহজ হবে, এমন কথা বলা চলে না।

যাই হোক, বুঝতে কষ্ট হয় না, সাঁতারে কিছু করার উদ্দেশ্য নিয়েই উনি সাধনা করে চলেছেন। ২৪ পরগনার ভাঙড়ের উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলে। ঢাকুরিয়া লেকের অপর দিকে গোবিন্দপুরে উদ্বাস্তু পরিবারের পরিবেশের মধ্যেই বাস।

বারো তেরো বছরের ছেলে বৈদ্যনাথকে লেকের জলে সাঁতার কাটতে দেখে ওর মধ্যে সম্ভাবনার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সাঁতারের ট্রেনার বিমল দে। বিমল দে বৈদ্যনাথের সাঁতারগুরু, অভিভাবক এবং প্রেরণার উৎস। লেকের সাঁতার ক্লাব ক্যালকাটা স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনে ভর্তি করে বৈদ্যনাথকে সাঁতারে ট্রেনিং দেবার ভার নিজেই গ্রহণ করেছিলেন বিমলবাবু। কড়া ট্রেনার বিমল দে-র সদাজাগ্রত তৎপরতা আর কর্মঠ, ক্লান্তিহীন ট্রেনীর দৃঢ়সঙ্কল্পই বৈদ্যনাথের সাঁতার জীবনে সাফল্যের সোপান।

১৯৬০ সালে লেকের জলে জুনিয়র সাঁতারুদের এক মাইল সাঁতারে প্রথম হবার পর জাতীয় সাঁতারের জুনিয়র ফ্রি স্টাইলে বিজয়ীর সম্মান। অচিরেই ইণ্টারমিডিয়েটের গণ্ডি পেরিয়ে সিনিয়র সাঁতারে আত্মপ্রতিষ্ঠা। আনন্দ স্পোর্টিং আয়োজিত ব্যারাকপুরের গান্ধীঘাট থেকে বেনেটোলা ঘাট পর্যন্ত গঙ্গার বুকে ১০ মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথমবার ষষ্ঠ স্থান, দ্বিতীয়বার চতুর্থ, ১৯৬৫তে তিনবারের বার প্রথম স্থান। বিগত আগস্ট মাসে বহরমপুরে গঙ্গার বুকে ৪৫ মাইল সাঁতারে আগের দুবারের বিজয়ী বাংলার দেবী দত্ত প্রথম স্থান অধিকার করবে এ বিষয়ে সবাই প্রায় একমত ছিলেন, কেবল ছিলেন না বিমল দে। সাঁতারের আগে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন বৈদ্যনাথ প্রথম হবে। হয়েছিলেনও তাই। পক-প্রণালীর নির্বাচনী ট্রায়াল হিসাবে চিহ্নিত করা গঙ্গার বুকে ২২ মাইল সাঁতারেও বৈদ্যনাথের প্রথম স্থান কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। সুতরাং প্রায় তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছিল বৈদ্যনাথের পক-প্রণালী পারের উদ্যোগ আয়োজন। কিন্তু প্রতিযোগিতার মাত্র কয়েক মাস আগে বৈদ্যনাথ হারালেন তাঁর পথপ্রদর্শক ও গুরু বিমল দে-কে। জানুয়ারীর কুয়াশাচ্ছন্ন এক ভোরে লেকে যাবার পথে উল্টাডাঙ্গায় রেললাইনের উপর রেলের চাকায় কাটা পড়লেন বিমল দে। গুরুবিয়োগের আঘাত সামলে নিয়ে বৈদ্যনাথ পক-প্রণালী পারের প্রস্তুতি চালিয়েছেন নিরলস সাধনায়। তাই সিদ্ধি অনিবার্য ও সহজ হয়ে উঠেছে।

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নিরহঙ্কার সরলপ্রাণ সাঁতারু বৈদ্যনাথ নাথ। কৃতিত্বের বড়াই নেই, বাগাড়ম্বরের বালাই নেই। 'পক-প্রণালী পারের পর কেমন বোধ হচ্ছিল?'—এই প্রশ্নের উত্তরে বৈদ্যনাথ যখন বললেন, 'এমন কিছুই ক্লান্তি বোধ করিনি, হয়তো সাঁতার কেটে আবার তালাইমানার ফিরে যেতে পারতাম'। তখন তাঁর উক্তির মধ্যে আত্মবিশ্বাসই লক্ষ্য করেছি—অত্যুক্তি বলে মনে হয়নি।

মুকুল

রঙ্গজগৎ

কলকাতায় হলিউড-অভিনেত্রী আনা কাশফি

কিছুদিন হল হলিউড-অভিনেত্রী শ্রীমতী কাশফি ভারতে এসেছেন। একটি টি-ভি ছবি তোলবার ব্যাপারে। গত সপ্তাহে শ্রীমতী আনা কলকাতায় ছিলেন।

যে-ছবিটি তোলা হচ্ছে তার নাম 'প্রমিনেন্ট উইমেন অভ ইন্ডিয়া'। ভারতের অগ্রগতিতে (সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য নানা দিকে) এখানকার মেয়েদের দান কী এবং কতখানি তার একটি পরিচয় এতে থাকবে। কয়েকজন স্বনামধন্য মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে ছবিটিকে রূপ দেওয়া হচ্ছে। এই ইন্টারভিউ আর কমেন-টারির কাজটা করছেন শ্রীমতী আনা। জর্জ এলসটিন চিত্রটির প্রযোজক। আর চিত্র-সংস্থার নাম কেম প্রোডাকশনস।

কলকাতায় মাদার টেরেসাকে নিয়ে ছবির একটি অংশের কাজ হয়েছে। আপাতত কলকাতা শেষ। কেম প্রোডাকশনসের ইউনিট এর পর উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের নানা জায়গা ঘুরবেন, সুযোগমত ইন্টারভিউ নেবেন—ছবিতে ফুটিয়ে তুলবেন ভারতের একটি উজ্জ্বল দিক।

✽

গত ১৩ ও ১৪ এপ্রিল শ্রীমতী আনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। প্রথম দিন গ্র্যানড হোটেলে, দ্বিতীয় দিন আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে (কেম প্রোডাক-শনস দলের ম্যানেজার শ্রীঅরুণ চৌধুরীর সঙ্গে সেদিন তিনি আমাদের অফিস দেখতে এসেছিলেন)। আশ্চর্য মহিলা। কলকাতায় জন্ম, দার্জিলিঙে মাতৃভূমি—শ্রীমতী কাশফি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। অল্প বয়সে দেশ ছেড়েছিলেন। বিলাতে কিছুকাল শিক্ষার পর আমেরিকা—হলিউড। সাতটি হলিউডের ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন।

না, অভিনেত্রী হিসাবে তেমন নাম করেননি। আনা কাশফির নাম দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে প্রখ্যাত চিত্রতারকা মারলন ব্র্যানডোর সঙ্গে বিয়ের পর। ওঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং একমাত্র ছেলের (দেবী) কাসটডির প্রশ্নে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ এবং আইন-আদালতের পর্ব তো এক সময়ে সর্বত্র আলোচনার একটি মুখরোচক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সেই সব উত্তেজনার দিন এখন অতীত। নয় বছরের দেবী মায়ের কাছেই থাকে। মায়ের সঙ্গে এই সফরে আসা অবশ্য সম্ভব হয়নি। লস এনজেলসে স্কুলের ছাত্র, স্কুল-

কলকাতায় আনা কাশফি

কামাই করা তো চলে না।

শ্রীমতী কাশফির সঙ্গে কথা বলে মনে হল, অতীতের কিছু অংশ তিনি স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে চান। মারলন ব্র্যানডোর প্রসঙ্গে আলাপ করতে তাঁর রুচি নেই। ওই নামটা উচ্চারণ করতেও যেন অনীহা। তবু একবার হালকা হবার চেষ্টা করে বললেন : "আমার বিয়ের কাগজ-পত্র, ওই ঘটনার স্মারক দলিল আমি ছিঁড়ে কুচি কুচি করে জানালা গলিয়ে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছি। ওই সেদিন, যেদিন সব চুকে-বুকে গেল।"

এই হল তাঁর সজ্ঞান মনের কথা। অব-চেতনে কী আছে জানি না।

নিয়মমত ভারতের মেয়ে, আনা কাশফি শিশুকাল থেকে পাশ্চাত্য প্রভাবে পুষ্ট। পাশ্চাত্য তাঁকে দিয়েছেও অনেক কিছু। তবু মন ভরাতে পারেনি। হৃদয়ের একটি স্থলে যে-ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে তা-ই বোধ করি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অনেকখানি বদলে দিয়েছে।

শাড়ি-পরা আনা ভারতের মাটিতে পা

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ রাধারাণী পিকচার্স-এর "বালুচরী" ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

এ ভীম সিং পরিচালিত এ-ভি-এম'-এর "মেহেরবান" ছবিতে নূতন ও সুনীল দত্ত —ছবিটির মুক্তি আসন্ন

মিলন

বিশ্বাসে মিলায় সুখ তর্কে বহুদূর— কোন কোন হিন্দীচিত্র দেখার কালে এই তত্ত্বটি স্মরণ রাখতে হবে। যদি এমন দেখা যায় যে, দুই জন্ম ধরে নায়ক-নায়িকার একই চেহারা তবুও। অর্থাৎ সুনীল দত্ত ও নূতনের দুই জন্মের দ্বৈতভূমিকা এবং নায়কের জাতিস্মরতা সম্পর্কে মনে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকলে রঙিন চিত্র "মিলন"-এর (প্রসাদ প্রোডাকশন্স) উপভোগ্যতা থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন। এই ছবিতে ফ্ল্যাশ-ব্যাকে অতীত ঘটনা দেখানো মানে ওদের গত জন্মের কাহিনী বর্ণনা। এবং সেটাই ছবির মূল গল্প। নায়ক গোপী ছিল খেয়াঘাটের মাঝি, অশিক্ষিত কিন্তু সুগায়ক। নায়িকা রাধা জমিদারকন্যা, কলেজের ছাত্রী। ওদের নির্মল প্রেম বরাবর অনুচ্চারই থেকে গেছে। মৃত্যুর আগে (যখন ওরা পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে নদীর বানের পাকে তলিয়ে গেছে) বিধবা রাধার জীবন-বাসনা বুঝি মুহূর্তের জন্য প্রকাশ পেয়েছিল। গোপীকে ভালবাসত তার নিজের সমাজেরই মেয়ে গৌরী (যমুনা)। বলা বাহুল্য, গোপীর কাছ থেকে মমতা ও বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছু সে পায়নি। গৌরী নাটকের শেষ মুহূর্তে গোপীর প্রাণ বাঁচাতে খলচরিত্রের (প্রাণ) লালসার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু তবু নদীর ভীষণ বানের হাত থেকে গোপীকে বাঁচাতে পারেনি।

মজার কাণ্ড এই, পরিচালক এ সুব্বা রাও কিন্তু গৌরীর প্রতি শেষ পর্যন্ত

ফেলে, আকাশের দিকে তাকিয়ে—মনে হল —স্বস্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন। গর্বের সঙ্গে বললেন : "আমি তো এ-দেশেরই মেয়ে, এখানেই জন্মেছি। টি-ভির জন্য যে-ছবি করছি, তাতে এ-দেশকে আমরা বড় করেই দেখাব, দেখাব তার সত্যিকার রূপ।"

ভদ্রমহিলার আবেগে এতটুকু মিথ্যা ছিল না। তবু কোথায় যেন একটা ট্র্যাজিক আয়রনির ব্যাপার ছিল। আনা ইংরেজীতে কথা বলেন, কোনও ভারতীয় ভাষা তাঁর জানা নেই। বললেন, এ দেশের ফিল্ম তাঁর ভাল লাগে, কয়েকটি দেখেছেন; অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু কোনোটির পুরো নাম মনে করতে পারলেন না। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অশেষ; কিন্তু সেই সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা কতটুকু।

সম্ভবত খুবই সামান্য। তা হোক, ভারতকেই তিনি আঁকড়ে ধরতে চাইছেন। অন্তত মন থেকে। এ দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁর যোগ দৃঢ়মূল না হলেও রুচি এবং সৌন্দর্যবোধে তিনি ভারতীয়। মর্যাদা-বোধেও। শ্রীমতী আনার জন্মগত অধিকারকে, তাঁর গর্বকে তাই ছোট করে দেখব না। বরং স্বীকার করব তার মূল্যকে।

বোম্বাইয়ে রঞ্জিত পিকচার্স-এর "সাধু" ছবির গান-রেকর্ডিং: ছবির অন্যতম সংগীত-পরিচালক বাপী লাহিড়ীর (ডানদিকে দণ্ডায়মান) দেওয়া সুরে ছবির একাধিক গানের একটি গাইলেন আশা ভোঁসলে

অবিচার করেননি। গৌরী তখন অতি বৃদ্ধা, নদীর ধারে পাগলীর মত প্রলাপ বকে। জাতিস্মর নায়ক চিনে ফেলেছে গৌরীকে। নায়ক বৃদ্ধা গৌরীকে জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার হার হয়নি। এই তো আমি এসেছি। গোপী ও রাধা মরে গিয়ে আবার একই চেহারায় ঘুরে এসেছে, গৌরীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গৌরীকে আর কতকাল বাঁচিয়ে রাখা যায়। সে গোপীর (অর্থাৎ গত জন্মে যে গোপী ছিল) কোলের মাথা রেখে মারা যায়। জন্ম-জন্মান্তরের এই প্রেমকাহিনী বসে দেখতে বেশ ভালই লাগে, যদি না যুক্তি-তর্ক বাদ সাধে।

ছবির প্রথমে সুনীল দত্ত ও নূতন যে গান গেয়েছে, শেষেও, গত জন্মের কাহিনীর অবসানে, তাদের কণ্ঠে সেই একই গান উচ্চারিত, যার অর্থ—আমি-তুমি যুগ যুগ ধরে এই মিলনের গীত গেয়ে আসছি, গেয়ে যাব। তাদের পূর্বজন্মের এবং এ জন্মের সব কয়টি গানই সুশ্রাব্য। সুর দিয়েছেন সংগীতপরিচালক লক্ষ্মীকান্ত প্যারেলাল।

অর্ধেন্দু সেনের পরিচালনায় নির্মীয়মাণ ইকনমিক প্রোডাকশনের "পরিশোধ" ছবিতে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

অস্কার সমাচার

হলিউডের অস্কার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এবার বিখ্যাত কৌতুকশিল্পী বব হোপ শিল্পী ও কলা-কুশলীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার নেবার জন্য এলিজাবেথ টেলর (হুজ অ্যাফ্রেড অব ভার্জিনিয়া উলফ?) উপস্থিত থাকতে পারেননি। ফ্রান্সে তাঁকে নিয়ে একটি ছবির শুটিং চলছিল। এ নিয়ে শ্রীমতী টেলর দুবার আকাডেমি অ্যাওয়ার্ড পেলেন। প্রথমবার পেয়েছিলেন "বাটারফিল্ড এইট" চিত্রে অভিনয়ের জন্য। "হুজ অ্যাফ্রেড.."-এর স্যান্ডি ডেনিস শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন

"জীবনসংগীত" (পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়) ছবিতে সুমন মুখোপাধ্যায় ও নবাগতা মিতা সেনগুপ্ত

এ বছরের কয়েকটি বিশিষ্ট বিভাগের অ্যাকাডমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ব্রিটেনের ছবি। ১৯৬৬ সনের শ্রেষ্ঠ চিত্রের অস্কার পেয়েছে "এ ম্যান ফর অল সীজনস"। অষ্টম হেনরির মতলববাজ পার্ষদদের বিরুদ্ধে স্যার টমাস মুরের সংগ্রামের কাহিনী ছবিতে রূপায়িত। স্যার টমাসের চরিত্রের শিল্পী পল স্কোফিল্ড শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে পুরস্কৃত। ছবির পরিচালক ফ্রেড জিনেম্যান এবং চিত্রনাট্যকার রবার্ট বোল্ট তাঁদের নিজস্ব বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার অর্জন করেছেন। শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতার অস্কার পেয়েছেন ওয়াল্টার ম্যাথাউ (দি ফরচুন কুকি)।

শ্রেষ্ঠ বিদেশী চিত্র হিসাবে বিবেচিত হয়েছে ফ্রান্সের "ম্যান অ্যান্ড এ ওম্যান" (পরিচালক ক্লোদ লেলুশ)।

পরলোকে বিশিষ্ট কলাকুশলী যতীন দত্ত

অগ্রদূত গোষ্ঠীর শ্রীযতীন দত্ত ১লা বৈশাখ সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বৎসর, গত ৩৩ বছর ধরে তিনি বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সংগে যুক্ত আছেন। ১৯৩৪ সনে তিনি কালী ফিল্মস-এ যোগ দেন। শব্দযন্ত্রী হিসাবে তিনি যশস্বী ছিলেন। অগ্রদূত-পরিচালিত বহু চিত্রের সাফল্যের মূলে শ্রীদত্তের দান ছিল অসামান্য। মধুরস্বভাবের জন্য শ্রীদত্ত চলচ্চিত্রলোকের সকলেরই প্রিয়ভাজন ছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুতে বাংলা চলচ্চিত্র একজন কৃতী ও নিষ্ঠাবান কলাকুশলীকে হারাল। তাঁর মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ আগে অগ্রদূতের "কখনো মেঘ" শুরু হয়েছিল। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা রেখে গিয়েছেন।

ছবির পর ছবি

চারণ কবি

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা, কবি ও শিল্পী মুকুন্দদাসের জীবনী তৈরি হচ্ছে ফিল্ম ক্লাসিকের "চারণ কবি মুকুন্দদাস"।

মুকুন্দদাস

পয়লা বৈশাখে সংগীত-পরিচালক পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুরে ছবির কয়েকটি গানে কণ্ঠ দান করেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সবিতাব্রত দত্ত, নির্মলেন্দু চৌধুরী ও ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্মল চৌধুরী ছবিটির প্রযোজক-পরিচালক। ছবির নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন সবিতাব্রত দত্ত।

তিন অধ্যায়

অপ্সরা ফিল্মস-এর 'তিন অধ্যায়'-এর নিয়মিত শুটিং আরম্ভ হয়েছে। শৈলেশ দে'র কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন মঙ্গল চক্রবর্তী। কয়েক দিন আগে গোপেন মল্লিকের সংগীত-পরিচালনায় ছবির দুটি গান রেকর্ড করা হয়। গানগুলি গেয়েছেন মান্না দে। উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়, অনুপকুমার, ছায়া দেবী, জহর রায়, বিকাশ রায়, সুপর্ণা সেন, রবীন মজুমদার প্রভৃতি ছবির বিশিষ্ট শিল্পী।

জীবনসংগীত

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস 'এই তীর্থ' অবলম্বনে নির্মীয়মাণ 'জীবনসংগীত' ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় দক্ষিণ ভারত রওনা হয়েছেন। সন্ধ্যারাণী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়,

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত অপ্সরা ফিল্মস-এর "তিন অধ্যায়" ছবিতে অজয় গাঙ্গুলী, অনুপকুমার ও গঙ্গাপদ বসু

অনিল চট্টোপাধ্যায় ও রীণা ঘোষকে নিয়ে সেখানে দুই সপ্তাহ ধরে ছবির শুটিং চলবে। ছবির অন্যান্য প্রধান শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, নবাগতা মিতা সেনগুপ্ত প্রভৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরকার।

জে এস প্রোডাকশন্সের 'নল দময়ন্তী' ছবির চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। মান

নল দময়ন্তী

বর্মা রচিত চিত্রনাট্য ও সংলাপ অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন কালীপদ সেন। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, গঙ্গা দে ও গীতা দাস। প্রধান চরিত্রগুলির রূপদান করছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অসীমকুমার রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, কালীপদ চক্রবর্তী, গঙ্গাপদ বসু, দীপিকা দাস, রেণুকা রায়, পদ্মা দেবী প্রভৃতি।

'চারণ কবি মুকুন্দদাস' ছবির গান রেকর্ডিং : সংগীতপরিচালক পবিত্র চট্টোপাধ্যায় ও কণ্ঠশিল্পী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ফটো—দেশ

তরুণ কণ্ঠশিল্পীর লোকান্তর

জনপ্রিয় তরুণ কণ্ঠশিল্পী শ্রীমলয় মুখোপাধ্যায় আর নেই। গত রবিবার রাত্রে বাটানগরে (চেঙ্গাইল) আয়োজিত এক বিচিত্রানুষ্ঠান থেকে ফেরবার সময় এক নিদারুণ মোটর দুর্ঘটনায় শ্রীমুখোপাধ্যায় প র লো ক গ ম ন করেন। গাড়িতে শ্রীমুখোপাধ্যায় ছাড়া বিশিষ্ট মূকাভিনেতা শ্রীঅরুণাভ মজুমদার ও তাঁর দুইজন সহশিল্পী ছিলেন। শ্রীমজুমদারের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাকী দুইজন শ্রীসুশান্ত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরতন গঙ্গোপাধ্যায় মারা গেছেন। শ্রীমলয় মুখোপাধ্যায় দুই বছর আগে হিন্দী "বিদ্যাপতি" চিত্রে গান করে প্লে-ব্যাক শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর গাওয়া গানের রেকর্ড সবে বেরিয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায় সংগীতরসিক-মহলে অল্পকালের মধ্যে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ২৭। তিন মাস আগে তিনি বিয়ে করেন। তাঁর বাবা-মা এবং চার ভাই জীবিত।

ব্যক্তিগত স্বভাবের জন্য এই প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন শিল্পী সকলের প্রিয় ছিলেন। তাঁর অকালমৃত্যুর সংবাদ পেয়ে কলকাতার প্রবীণ শিল্পীরা এবং শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বহু অনুরাগী ব্যক্তি তাঁর বাসভবনে এবং শ্মশান-ঘাটে উপস্থিত হন।

গোপীকৃষ্ণর অল্পাধিক নয় ঘণ্টা-ব্যাপী নৃত্য

একটানা নয় ঘণ্টা ও বারো মিনিট নেচে গোপীকৃষ্ণ নতুন রেকর্ড স্থাপন করলেন। ইতিপূর্বে গোপীকৃষ্ণের ভগিনী সিতারা দেবী বিরামহীন নাচের রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি নেচেছিলেন পুরো ছয় ঘণ্টা। বোম্বাইয়ে তাঁর নয় ঘণ্টা বারো মিনিটব্যাপী নাচ শেষ হওয়ার পর প্রথম তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দন জানান শিল্পীর ভগিনী সিতারা দেবী। বোম্বাইয়ের ললিতকলা মন্দির এই নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। গোপীকৃষ্ণর নাচের সময় প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর বিভিন্ন সহশিল্পীরা. তাঁর সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রে সহযোগিতা করেন। গোপীকৃষ্ণর নাচের বিষয়বস্তু ছিল "সম্পূর্ণ রামায়ণ" (দুই ঘণ্টাব্যাপী ব্যালে), "দশাবতার" (দেড় ঘণ্টা), "রানী সতীমা" (এক ঘণ্টা), বারাণসী ঘরানার কথক (তিন ঘণ্টা) এবং অন্যান্য নৃত্য। বিরতিহীন নাচের সময় তিনি মাঝে মাঝে শুধু জলপান করেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীমোরারজী দেশাই এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি গোপীকৃষ্ণকে অভিনন্দনবাণী পাঠান।

নাচের পর গোপীকৃষ্ণকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। তিনি বলেন, "আমার স্বপ্ন পূর্ণ হয়েছে। অভূতপূর্ব কিছু করব, এই ইচ্ছাই আমি *ছোটবেলা থেকে পোষণ করে* আসছি।"

রেকর্ডে নিধুবাবুর টপ্পা

প্রাচীন বাংলা গানের ঐতিহ্য এযাবৎ যাঁরা বাংলার সংগীতজগতে প্রবহমান রেখেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই গত হয়েছেন। কালীপদ পাঠক মহাশয় আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন এবং আজও তাঁর গানে প্রাচীন বাংলায় টপ্পার একান্ত বৈশিষ্ট্যটুকু পাওয়া যায়। একদা তাঁর বলিষ্ঠ এবং মধুর কণ্ঠ বাংলার সংগীতসমাজে আকর্ষণের বস্তু ছিল। আজ তাঁর বয়স সাতাত্তর। তথাপি এই বার্ধক্যশ্লথ কণ্ঠেও সেই মনোহর আবেদন আমাদের চিত্তে একটা অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। গ্রামোফোন কোম্পানী সম্প্রতি দুটি সুবিখ্যাত প্রাচীন বাংলা টপ্পা কালীপদ পাঠক মহাশয়ের কণ্ঠে ঈ পি রেকর্ডে 7 EPE 1041 প্রকাশিত করেছেন। গান দুটি হচ্ছে—'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে' এবং 'মনোহরা নয়ন তোমার'। প্রথম গানটি অনেকে শ্রীধর কথকের রচনা বলে দাবি করেন। দ্বিতীয় গানটি নিধুবাবুর নামে চলে আসছে। ৮ই এপ্রিল সন্ধ্যায় একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁদের নলিন সরকার রোডের স্টুডিওতে এই সদ্যপ্রকাশিত রেকর্ডটি সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট অতিথিদের সম্মুখে

কালীপদ পাঠক

বাজিয়ে শোনান। গান দুটিতে প্রাচীন বাংলা টপ্পার আন্দোলিত তান, মনোহর বিস্তার এবং অপরাপর সুমধুর রূপবন্ধ-গুলি মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই উপলক্ষে গ্রামোফোন কোম্পানী পাঠক মহাশয়কে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন এবং তিনি দুটি বিখ্যাত টপ্পা গেয়ে শোনান। গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষ থেকে শ্রীসন্তোষ-কুমার দে এই রেকর্ড সম্বন্ধে একটি পরিচিতি প্রদান করেন। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র অনুষ্ঠানে শ্রীপাঠকের সংগীতপ্রতিভা সম্পর্কে বলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের রেকর্ড বিভাগের শ্রী এ সি সেন এবং শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত মহাশয়ও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। গ্রামোফোন কোম্পানী এই প্রবীণ গীতশিল্পীর একটি সুদৃশ্য আলোকচিত্র রেকর্ড-জ্যাকেটে মুদ্রিত করেও তাঁদের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। উপস্থিত সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং প্রযোজকদের সকলেই এই রেকর্ডের জন্য গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এই আশা প্রকাশ করেন যে, আমাদের দেশবাসী আমাদের প্রাচীন সাংগীতিক ঐতিহ্যের এই নিদর্শনটি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে রক্ষা করবেন।

পাঠকের চোখে

বি-এফ-জে-এ পুরস্কার

মহাশয়,

বি এফ জে এ-র এবারকার বিচারে হিন্দী ছবির ভিড় বেশী। এতে আপত্তির কারণ ছিল না, যদি ছবিগুলির প্রকৃতই পুরস্কার পাবার যোগ্যতা থাকত। অবশ্য কি হিন্দী, কি বাংলা—গত বছরে ভাল ছবি ছিলই না প্রায়। অন্তত প্রথম পুরস্কার কোন ছবিরই প্রাপ্য নয়।

'তিসরী কসম'কে 'নায়ক'-এর আগে স্থান দেওয়াতে আমি ক্ষুব্ধ নই। বাসু ভট্টাচার্য বক্স-অফিসকে উপেক্ষা করবার আর একটু সৎসাহস যদি দেখাতেন, ছবিটি মহৎ শিল্পকর্মে পরিণত হতে পারত। কিন্তু 'শহীদ' বা 'গাইড' কোন্ মহৎ গুণে 'গল্প হলেও সত্যি'র পক্ষে অনতিক্রম্য হয়ে উঠল? এবং 'শহীদ', 'গাইড' ইত্যাদি যদি পুরস্কার পায়, স্বপ্ন নিয়েই বা পাবে না কেন? বিচার-বিবেচনা নয়, প্রথার নিগড় ভাঙ্গাটাই বোধ হয় এবার বি এফ জে এ-র কাছে বড় কথা ছিল। আমার তো মনে হয় এবার 'তিসরী কসম', 'নায়ক' আর 'গল্প হলেও সত্যি'কে তিনটি স্বীকৃতিপত্র দিয়ে বিচার-কার্যটি সম্পাদন করলে ভাল করতেন বি এফ জে এ।

স্বীকৃতিপত্র বললাম এই কারণে, ছবি তিনটির কোনটিই শিল্পের প্রকৃত সার্থকতায় চিহ্নিত নয়। 'নায়ক'-এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল এই, নায়কের জীবনের বেদনা দর্শকচিত্তে একটুও রেখাপাত করতে পারে না। নায়কের জীবনে শূন্যতা আছে, এই কথাটি যেন স্পষ্টত জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, দর্শককে কোথাও তা বুঝে নেবার সুযোগ দেওয়া হয় নি। 'গল্প হলেও সত্যি' সম্বন্ধে বলতে পারি, বক্তব্যধর্মিতা এর শিল্পগুণকে কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছে। আর 'তিসরী কসম'ও অকারণ নাচ-গান-কৌতুক এবং কাহিনীর অতিবিস্তৃতির জন্য কোথাও কোথাও বিরক্তিকর। তবুও বলব, প্রয়োগ-নৈপুণ্যে 'নায়ক' এবং 'গল্প হলেও সত্যি' যথার্থই 'ফিল্ম' হয়ে উঠেছে: প্রয়োগ-কর্মের উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য 'তিসরী কসম'-এরও সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে। এখানে ছবিটির সমাপ্তি-দৃশ্যের কথা মনে পড়ে বিশেষভাবে; এবং এই রকম আরও অনেক দৃশ্য ছবিতে আছে, যা ভোলার নয়। সর্বোপরি, চিত্রকাহিনীর হার্দ্য গুণ মনের অন্তঃস্থল স্পর্শ করে। ভালবাসা ও বেদনা, দুই-ই এ ছবিতে অনতিব্যক্ত।

দেবীব্রত রায়,
প্রেসিডেন্সি কলেজ,
কলকাতা

"ডাঃ জিভাগো" প্রসঙ্গ

রাজ্যসভায় জনৈক সদস্যের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রী কে কে শাহ্ বলেন, সোভিয়েট দূতাবাস "ডাঃ ঝিভাগো" সম্পর্কে ভারত সরকারকে কোন উপদেশ দেন নি। ছবিটির প্রদর্শন যে সোভিয়েট য়ুনিয়নের কাছে অস্বস্তিকর হবে সে বিষয়ের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল মাত্র। রাজ্যসভায় সম্প্রতি এই তথ্য প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী বলেন, ব্যাপারটি গভীরভাবে বিবেচনা করার পর প্রয়োজনমত ছবির কিছু অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার-মন্ত্রী আরও জানান যে, "ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ" সম্পর্কে সোভিয়েট দূতাবাস ভারত সরকারকে জানান, এ ছবিতে সোভিয়েট জনসাধারণের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ পায় নি। ছবিটি অবশ্য একটি কাল্পনিক কাহিনীর ভিত্তিতেই তৈরি—যার কোন বাস্তবতা নেই। তবুও চিত্রটির নাম পরিবর্তন করা হয় (ফ্রম জিরো জিরো সেভেন উইথ লাভ) এবং "রাশিয়া" সম্পর্কে সব কথা বাদ দেওয়া হয়।

"আকাশছোঁয়া" (পরিচালনা : রাজেন তরফদার) ছবিতে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়

অরণ্যদেব
লী ফক

উঃ, আর দৌড়তে পারছি না। কিন্তু উপায় কী, অরণ্যদেবকে গিয়ে জানাতেই হবে যে, রাজা বিপদে পড়েছে।
অরণ্যদেবের গুহার দিকে ছুটেছে টমটম।

ওদিকে রাজাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে .....

রাজা এদিকে ভারী ব্যস্ত ---
চেপে ধর কাটিনা!

টমটম গিয়ে অরণ্যদেবের গুহার কাছাকাছি পৌঁছেছে -----
আর একটু এগোলেই অরণ্যদেবের গুহা --- আঃ ---
টমটম!

সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন অরণ্যদেব!
মূর্চ্ছা গেছে
একী, টমটমের এই অবস্থা কেন?

ওদিকে, দুই ডাকাতকে চেপে ধরে আছে কাটিনা -----
ছেড়ে দিস না কাটিনা!
!
!

ডাকাত দুজনের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়!
ওরে বাবা!
চক্ চক্...
চক্ চক্...

এইবার ছেড়ে দে কাটিনা!
নাও, এবারে তোমরা উঠে বোসো।
??

!!
চুপচাপ বসে থাকো, যতক্ষণ না ওস্তাদ-কাকা আসেন। নোড়ো না, নড়লেই গুলি করব।

বাকী দুজন ডাকাত এদিকে এগিয়ে আসছে ---
ম্যাক আর বার্ন নিশ্চয়ই আমাদের ফাঁকি দেবার তালে আছে -----
যা বলেছ!

সাপ্তাহিক সংবাদ

বর্তমান সপ্তাহের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো—রাজধানী দিল্লিতে পুলিস-বিক্ষোভ এবং তার মোকাবিলায় সরকারী তৎপরতা। দিল্লি পুলিসের মোট সংখ্যা ১৬০০০। তাঁরা দীর্ঘকাল যাবৎ আরও ভাল বেতন, চাকুরির শর্ত ও তাঁদের ইউনিয়নের স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন করছিলেন। কিছুকাল যাবৎ তাঁদের মধ্যে শৃংখলহীনতা লক্ষিত হয়। ইদানীং তাঁরা অফিসারদের অমান্য করতেও দ্বিধা করছিলেন না। কাজেই তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না। সম্প্রতি দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ স্থান থেকে প্রহরারত পুলিসদের অপসারণ করা হয়, স্থানীয় পুলিসের অস্ত্রশস্ত্র সরকারে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং পুলিস-কর্মচারী সঙ্ঘের ৩৯ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বরখাস্ত করা হয়। এর প্রতিবাদে গত ১৪ এপ্রিল বিক্ষুব্ধ পুলিস দল শোভাযাত্রা বের করলে তাঁদের ওপর কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করা হয় এবং দিল্লিতে ১৪ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। পুলিসের দায়িত্ব পালনের জন্য কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিস এবং সীমান্ত নিরাপত্তাবাহিনীকে তলব করা হয়। এ ছাড়া হোমগার্ডদের কাজে ডাকা হয়েছে এবং সৈন্যবাহিনীকেও প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ১৬ এপ্রিল শহরের বিভিন্ন স্থানে পুলিসরা ১৪৪ ধারা ভংগ করলে ৫৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ পর্যন্ত দিল্লি পুলিসের মোট ৮৪৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দেশী সংবাদ

১০ এপরিল—দেশের পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস বনাম বিরোধী দলগুলির মধ্যে শক্তি পরীক্ষার মঞ্চ আজ পাকাপাকিভাবে স্থির হয়ে গেল। এই ব্যাপারে ভোট নেওয়া হবে ৬ মে। রাষ্ট্রপতি পদে বিরোধী দলগুলির প্রার্থী শ্রীসুব্বা রাও-এর বিরুদ্ধে কংগ্রেস দাঁড় করিয়েছেন ডঃ জাকির হোসেনকে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিপুণা সেন ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য উভয়েই মনে করেন, স্কুলের পাঠ্য তালিকার বোঝা হ্রাস করা উচিত। বর্তমান পাঠ্য-পুস্তকের বোঝা খুব বেশী বলে উভয় মন্ত্রীই একমত হয়েছেন। তাই তাঁরা চান, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বোঝা কমিয়ে দেওয়া হোক।

১১ এপরিল—পুলিসী তদন্তে ধরা পড়েছে, বিহারে প্রচুর পরিমাণে চিড়া পাচারের অভিযোগ সত্য। বিস্তারিত তদন্তের পর রাজ্য পুলিস খাদ্য দফতরকে জানিয়েছেন : গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে রহস্যজনকভাবে প্রায় ৫০০০০ মণ চিড়া ট্রেনে করে বিহারে চালান হয়েছে। তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, এই ব্যাপারে কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর হাত ছিল।

সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম বিচারক শ্রীকৈলাসনাথ ওয়াংচুকে ভারতের প্রধান বিচার-পতি নিযুক্ত করা হয়েছে বলে আজ ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য শ্রীকে সুব্বা রাও পদত্যাগ করায় প্রধান বিচার-পতির পদ শূন্য হয়েছিল। শ্রীওয়াংচুর জন্ম ১৯০৩ সালে।

অকসফোরডে পড়াশুনা শেষ করে ১৯২৬ সালে তিনি ভারতীয় সিভিল সারভিসে যোগ দেন। ১৯৫১ সালে তিনি রাজস্থান হাই-কোরটের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। শ্রীওয়াংচু সুপ্রিম কোরটের বিচারক হিসাবে আছেন ১৯৫৮ সাল থেকে।

১২ এপরিল—আজ রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণন এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থানটকে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও মৈত্রীর উন্নতি বিধানে তাঁর অসামান্য কাজের জন্য প্রথম জওহরলাল নেহরু পুরস্কার প্রদান করেন। এই পুরস্কারের মূল্য নগদ এক লক্ষ টাকা।

১৩ এপরিল—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় আজ রাজ্য সরকারের এগারজন বিভাগীয় কমিশনার ও সেক্রেটারীকে বিভিন্ন পদে বদলি করেছেন। স্বাধীনতার পর আর কখনও একদিনে পশ্চিমবঙ্গে এতজন উচ্চপদস্থ অফিসার বদলি হননি। যুক্ত ফ্রনট ক্ষমতা হাতে নেওয়ার পর এই প্রথম উচ্চ পর্যায়ে ব্যাপক বদলি।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন কার্য পর্যালোচনার জন্য যে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় শ্রম, কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীজয়সুখলাল হাতি উক্ত কমিটির নিকট এক বক্তৃতা প্রসংগে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুদের সমগ্র পুনর্বাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি জানান।

১৪ এপরিল—কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন আজ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি জাতীয় নীতি উদ্ভাবনের আহ্বান জানান। শিক্ষা রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয় হলেও, এতে জাতীয় দায়িত্ব রয়েছে এবং সেজন্যই জাতীয় পর্যায়ে নীতি রচনা প্রয়োজন। আমাদের শিশুদের উন্নততর মানুষ ও নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

মিলগুলির উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধির দরুন নিয়ন্ত্রিত সকল শ্রেণীর কাপড়ের বর্তমান মূল্য ৩·৫ শতাংশ বৃদ্ধির কথা আজ ভারত সরকার ঘোষণা করেছেন। ১৯৬৪ সাল থেকে এই নিয়ে পাঁচবার মিলের কাপড়ের দাম বাড়ানো হলো।

১৫ এপরিল—ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই আজ গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভায় কংগ্রেস সদস্যদের বলেন, গত সাধারণ নির্বাচনের বিপর্যয় কংগ্রেসের ঘর সামলানোর শেষ সতর্কবাণী।

১৬ এপরিল—পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব রাজ্যমন্ত্রী জ্ঞানী করতার সিং এবং সেই সঙ্গে বিপুল সংখ্যক কংগ্রেসকর্মী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় পাঞ্জাব কংগ্রেস এখন গুরুতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। এঁরা সকলে সন্ত আকালী দলে যোগ দেবেন বলে ঠিক করেছেন।

স্বাধীনতার পর পুলিস ভারতের জনতার ওপর ২০৭৮ বার গুলি চালিয়েছে—অর্থাৎ গড়ে মাসিক প্রায় ৯টি করে। গুলিতে নিহতের সংখ্যা ১৮৭৫ জন, আহতের সংখ্যা মোট ৪৯৮৪ জন। স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে এ খবর জানা গিয়েছে।

বিদেশী সংবাদ

১০ এপরিল—মাও সে-তুং চীনের কমিউনিস্ট পারটির কেন্দ্রীয় পলিট ব্যুরো দখল করেছেন। কমিটির সাম্প্রতিক সভায় মোট ১১ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জন মাও সে-তুংকে সমর্থন করেন।

১১ এপরিল—গতকাল পিকিংস্থিত জাপানী সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, মধ্য চীনের সেচোয়ান প্রদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর চুংকিং এখন মাও বিরোধীদের হাতে। স্থানীয় পারটি ও স্থানীয় সরকারী অফিসারদের নিয়ে মাও-বিরোধী মোরচা গড়ে তোলা হয়েছে।

১২ এপরিল—মারকিন যুক্তরাষ্ট্র আজ ঘোষণা করে যে, তারা ভারত ও পাকিস্তানকে আর নতুন করে কোন রকম সামরিক সাহায্য দিবে না, তবে ইতিপূর্বে এই দুই দেশকে যে-সব মারকিন সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বিক্রয় করা হয়েছিল, তারা তার অধিকাংশ সম্পর্কে বিধিনিষেধ তুলে নেবে।

১৩ এপরিল—হংকং-এর ইংরেজী দৈনিক স্টার-এর এক খবরে জানা গেল—চীনের প্রধান-মন্ত্রী শ্রী চু এন লাই প্রেসিডেনট লিউ শাও চির স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। স্টার এই খবর পেয়েছে চীন থেকে প্রত্যাগতদের কাছে।

১৪ এপরিল—গতকাল পিকিং-এ নতুন এক প্রাচীরপত্রে এই ইংগিত দেওয়া হয়েছে, চেয়ার-ম্যান মাও সে-তুং এবং তাঁর উত্তরাধিকারী বলে উল্লিখিত প্রতিরক্ষামন্ত্রী লিন পিয়াও চীনা সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরাট ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছেন।

১৫ এপরিল—খাদ্যে স্বয়ম্ভর হবার জন্য ভারত যাতে ত্বরিৎ কৃষি কার্যক্রম চালু করতে বাধ্য হয়, সেজন্য দুজন আমেরিকান সেনেটর মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত-সাহায্য সংস্থা ও অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রকে দিয়ে ভারতের উপর চাপ দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন।

১৬ এপরিল—গতকাল নিউ ইয়রকে ভিয়েত-নাম যুদ্ধবিরোধী নানা মিছিল নানা দিক থেকে এসে রাষ্ট্রপুঞ্জ ভবনের সামনে এক বিশাল সমাবেশে মিলিত হয়। এই কারণে এত বড় জনসমাবেশ এদেশে আর কখনও হয়নি। পুলিশী সূত্রে জানা যায় অন্ততঃ ১ লক্ষ ২৫ হাজার লোক সমাবেশে যোগ দেয়।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

জি. ই. সি. এভারেষ্ট—সবচাইতে সুন্দর এবং লোভনীয় সিলিং ফ্যান
জি. ই. সি-র নিপুণ কারিগরি দক্ষতায় তৈরি এই সিলিং ফ্যানটি প্রচণ্ড গরমেও শীতল হাওয়ায় শরীর স্নিগ্ধ রাখে···ভবিষ্যতের দিকে নজর রেখে তৈরি এই ফ্যানটি বছরের পর বছর স্বচ্ছন্দে কাজ দিয়ে যায়।

১। ৪টি সাইজের পাওয়া যায়- ৩৬", ৪৮", ৫৬" এবং ৬০"
২। ব্লেডগুলি সঠিক মাপে বসানো
৩। বেয়ারিংগুলি একই খোপে থাকে—ঘূর্ণ্যমান অংশগুলি শক্ত ভাবে আঁটা
৪। ঝুলাবার দণ্ড খুবই মজবুত

GEC/G/122

জি. ই. সি. সিলিং ফ্যানের অনুমোদিত ডীলারগণ:

কলিকাতা: মেসার্স শ্রীনরসিংসহায় মদনগোপাল ইলেকট্রিক কোং প্রাঃ লিঃ, ৫৫, এজরা ষ্ট্রীট; মেসার্স জে. এন. ইলেকট্রিক কোং, ৫০, এজরা ষ্ট্রীট; মেসার্স খান্না ইলেকট্রিক কোং, ৩৪, এজরা ষ্ট্রীট; মেসার্স এস. বি. ইলেকট্রিক মার্ট (প্রাঃ) লিঃ, ২২, ব্রাবোর্ন রোড; মেসার্স চ্যাটার্জী ব্রাদার্স, ৭, পোলক ষ্ট্রীট; মেসার্স কন্টিনেন্টাল ইলেকট্রিক অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানী, ২৬/১, পোলক ষ্ট্রীট; মেসার্স টি. মদন অ্যান্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ, ১২, লোয়ার চীৎপুর রোড; মেসার্স এস. খৈতান অ্যান্ড কোং, ৬বি, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট; মেসার্স ইলেকট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউটরস, ৩ ম্যাঙ্গো লেন; মেসার্স ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোং, ২০, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট; মেসার্স প্রকাশ কমার্সিয়াল কোং, ১৮, রবীন্দ্র সরণি (শপ ১৮); মেসার্স কে. সি মোহতা, ১১, এজরা ষ্ট্রীট; মেসার্স সি. সি. সাহা লিমিটেড, ১৭০, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; আসানসোল: মেসার্স রামস্বরূপ আগরওয়াল, লেটন ষ্ট্রীট; মেদিনীপুর: মেসার্স এস. এন. কুণ্ডু অ্যান্ড সন্স, শিববাজার; দুর্গাপুর: মেসার্স লাইট হাউস, বেনাচিটি; বাঁকুড়া: মেসার্স গোয়েঙ্কা ষ্টোরস, সুভাষ রোড; চন্দননগর: শংকর ইলেকট্রিক ষ্টোরস, লক্ষ্মীগঞ্জ বাজার; শিলিগুড়ি: মেসার্স পুলক অ্যান্ড কোম্পানী, শ্রীভবন; ভুবনেশ্বর: মেসার্স ইলেকট্রিক্যাল সেলস অ্যান্ড সার্ভিস, বর্দ্ধনগর; আসাম: মেসার্স জেমস ওয়ারেন অ্যান্ড কোং, গৌহাটি ও ডিব্রুগড়; কটক: এস. বি. ইলেকট্রিক মার্ট। পরশুরাম ক্যাটোরাইজিক স্টোর্স, মেন রোড, জয়পুর, কোরাপুট জেলা।

প্রচ্ছদ : শ্রীবিপুল সেনগুপ্ত

BDH
nycil
FOR
PRICKLY HEAT
AND
SKIN PROTECTION

পণ্ডস কোল্ড ক্রীম তো নয়, যেন জাদু—লীলার মুখ দেখেই তা বোঝা যায়

মাত্র ৭ দিনেই মুখখানি কত পরিষ্কার, কত মসৃণ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে

মনে হয়েছিল, জীবনটা বুঝি একা-একাই কাটিয়ে দিতে হবে। বিয়ের স্বপ্ন ছিল আমার কাছে আকাশ-কুসুম।

আমার খুঁতটা ছিল কোথায়? টানা টানা চোখ, মুক্তোর মত দাঁত—কিন্তু হায়, মুখের ত্বক? একেবারে রুক্ষ, শুকনো শ্রীহীন। ভাবলাম, তাড়াতাড়ি একটা কিছু না করলেই নয়!

আমি পণ্ডস-এর ৭ দিনে সুন্দর হবার নিয়ম মেনে রোজ রাত্তিরে শুধু পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মাখতে লাগলাম। প্রথমবার মাখতেই দেখি মেক-আপ সম্পূর্ণ উঠে যায়।

দ্বিতীয় বারে, সাবানও নাগাল পায়না এমন সব লুকনো ময়লা বেরিয়ে আসে। পণ্ডস কোল্ড ক্রীমে এভাবে আমার ত্বক কোমল হতে লাগল—মুখের শ্রী ফিরতে লাগল।

অবাক হয়ে গেলাম! মাত্র ৭ দিনে কোথায় গেল সেই খসখসে ভাব? মুখখানি হয়ে উঠল কমনীয় সুন্দর, আর সেই সঙ্গে আমার কপালও খুলল:—বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল!

ভুলেও আর পায়ের এমন রত্নকে, এমন মুখশ্রীকে আমি মাটি হতে দেব না। পণ্ডস-এর ছোঁয়ায় এখন থেকে আমার মুখে জেগে থাকবে রমণীয় লাবণ্য আর আমার সৌন্দর্য থাকবে অটুট।

বিনামূল্যে '7 DAYS TO BEAUTY' পুস্তিকার জন্যে ১৫ পয়সার ডাকটিকিট সহ

এই ঠিকানায় চিঠি দিন:

চিজব্রো-পণ্ডস্ ইনক্, ডিপার্টমেন্ট ১৩, ১৩ গানবো স্ট্রীট, বোম্বাই-১

বিহারের দুর্ভিক্ষ

আমাদের ঘরের পাশে বিহার, তার অনেকখানিই আমাদের গায়ে-গায়ে ছোঁয়া, দু বেলা মানুষের নিত্য যাতায়াতেও তার সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিকের সম্পর্ক—তবু, হায়, প্রতিবেশী বিহারের আজ যে কত দুর্দিন আমাদের অনেকেই তার খোঁজ রাখেন না। এই দুর্দিন আচমকা আজই দেখা দেয়নি; লোকমুখে এবং কাগজে নিদারুণ খাদ্যাভাবে পীড়িত বিহারের মানুষের কথা আমরা অনেকদিন থেকেই শুনে আসছি, ভয়ঙ্কর খরায় বিহারের যে মর্মান্তিক অবস্থা দেখা দিয়েছে তার কথাও না শুনেছি এমন নয়, অথচ বিহারের জন্য আমাদের কর্তব্যটুকু পালন করতে তেমনভাবে এগিয়ে আসিনি। কেন আসিনি বা আসতে পারিনি তার হয়ত বিবিধ কারণ রয়েছে। এটা ঠিক যে, বিহারে গত দু বছর ধরে যে রকম অনাবৃষ্টি চলেছে আমরা তার কোনো সুরাহা করতে পারি না, এবং এই অনাবৃষ্টির অংশীদার আমরাও। জলাভাবে পরিত্যক্ত বিহারের গ্রামগুলিকে জলদান করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গেও খাদ্যাভাব যথেষ্ট, কাজেই বিহারের বুভুক্ষু মানুষকে খাওয়ানোও আমাদের সাধ্যাতীত। তবু, বিহারের প্রকৃত অবস্থা অনুভব করলে মনে হবে, আমাদের যত দুর্গতিই থাক, প্রতিবেশী শতসহস্র অসহায় দীন ও দুর্গত মানুষকে যথাসাধ্য সাহায্য করাই আমাদের কর্তব্য। শত বৎসরে এমন দুর্ভিক্ষ বিহারে দেখা দেয় নি।

আজ বিহারের যতগুলি জেলা এবং জেলার অংশবিশেষকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে তার দিকে নজর দিলে দেখতে পাব সারা বিহারের এক-তৃতীয়াংশই দুর্ভিক্ষ এলাকা। সরকারীভাবে আপাতত এই অঞ্চলের দুর্ভিক্ষ স্বীকার করা হলেও প্রকৃত দুর্ভিক্ষাবস্থা প্রায় সারা বিহার জুড়ে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহামায়াপ্রসাদ সিংহ স্পষ্টই বলেছেন খাদ্য এবং জলের তীব্র অভাব না মিটলে সমগ্র বিহারকেই দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা করতে হবে। সম্প্রতি শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ যে বিবৃতি দিয়েছেন তা থেকে বিহারের বর্তমান অবস্থার একটি ছবি আমরা পেতে পারি। জয়প্রকাশজী বলেছেন, বিহারের পাঁচ কোটি অধিবাসীর মধ্যে চার কোটিই দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের কবলে পড়েছেন। এই চার কোটির মধ্যে এক কোটি শুধুমাত্র শিশু, আর এক কোটি অসুস্থ ও সন্তানসম্ভবা নারী। বিহারের মুখ্যমন্ত্রীও চার কোটি মানুষের দুর্ভিক্ষাবস্থার কথা স্বীকার করেছেন। অনাহার-মৃতার সংখ্যাও মোটামুটি প্রায় পৌনে দু'শো। অবশ্য এটা বেসরকারী হিসেবের মতন, যথার্থ সংখ্যা আপাতত জানা যায়নি।

বিহারের সবচেয়ে দুর্গত এলাকা দক্ষিণ বিহার—অর্থাৎ পালামৌ ও হাজারিবাগ জেলা থেকে শুরু করে পাটনা, গয়া, সাহাবাদ, মুঙ্গের, ভাগলপুরের অংশবিশেষ একটি শোচনীয় অবস্থার মধ্যে রয়েছে। এই সব এলাকায় না খাদ্য না পানীয় জল : প্রায় আঠারো হাজার গ্রামের অধিবাসী আজ খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবে মরণাপন্ন। এই সব এলাকায় নদী নালা, কুয়ো শুকিয়ে গেছে। উত্তর বিহারে এতটা জলকষ্ট না থাকলেও তার খাদ্যাবস্থা সংকটজনক। বস্তুত সমগ্র বিহারের যে আটটি জেলা সর্বাপেক্ষা দুর্দশাগ্রস্ত তার তিনটি উত্তর বিহারের জেলা, এবং এই সব জেলাতেও কুয়োর জল শুকিয়ে যাচ্ছে। উত্তর বিহারে রবিশস্যের চাষও এ-মরশুমে ক্ষতিগ্রস্ত।

বিহারের খাদ্যাভাব মিটোনোর জন্যে প্রতি মাসে পাঁচ লক্ষ টন খাদ্যশস্য প্রয়োজন। রাজ্য সরকার চেয়েছিলেন চার লক্ষ টন। কেন্দ্র আপাতত আড়াই লক্ষ টনের বেশি দিতে পারছে না। ঘাটতি যে কেমন করে মেটানো হবে কে জানে। তবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী আবেদন জানিয়ে বলেছেন, অঞ্চল-প্রথা বিলোপ করে উদ্বৃত্ত রাজ্য থেকে খাদ্য কেনার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমরা মনে করি, সরকারীভাবে বিহারের দুর্ভিক্ষ-ক্লেশ নিবারণের জন্যে যা করা হচ্ছে তা আরও বেশি করে করা হোক। সমস্ত রাজ্যের সহানুভূতিও প্রয়োজন। বিশেষ করে আমরা, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ, প্রতিবেশী রাজ্য বিহারের দুর্ভিক্ষের দিনে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। বিহারে যাঁরা ত্রাণকার্য করছেন তাঁদের আজ অর্থের প্রয়োজন। কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর সদ্য কলকাতা-সফরে এই টাকার কথাটাও বলেছেন। আমাদের উচিত যথাশীঘ্র সম্ভব অর্থ দিয়ে ত্রাণ কমিটিকে সাহায্য করা। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে, বিদেশের জনকল্যাণমূলক সংস্থাগুলি বিহারের মরণাপন্ন বুভুক্ষু মানুষকে যতটা দরদ দিয়ে দেখছেন ও তাদের সেবা করছেন আমাদের তার বেশি করা উচিত।

মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরোর মিটিং-এর পর কেন্দ্রীয় কমিটির সাত দিনব্যাপী আলোচনাও শেষ হয়েছে। আলোচনান্তে পার্টির রাজনৈতিক চিন্তাধারার মূল সিদ্ধান্তগুলো সরকারীভাবে প্রচার করা হয়েছে। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত; কিন্তু পশ্চিম বাংলা ও কেরলে পার্টির রাজনৈতিক শক্তি যদি মনে রাখা যায়, তাহলে সিদ্ধান্তগুলোর গুরুত্ব আরও বেশী পরিষ্কার হয়ে যায়।

মূল সিদ্ধান্ত বা রাজনৈতিক মতামতকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক, ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের আশু প্রয়োজনীয়তা; এবং দুই, অ-কংগ্রেসী সরকারের মন্ত্রিসভায় যে-সব পার্টি সদস্যরা আছেন, তাদের ভাতা ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবশ্য পালনীয় নির্দেশ। পার্টির রাজনৈতিক কর্মধারার দিক থেকে দুটি সিদ্ধান্তই সুদূরপ্রসারী এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম বক্তব্য আলোচনা করলে দেখা যাবে, প্রধানত ভারতীয় সংবিধানকে আমূল সংস্কার করার উদ্দেশ্যে পার্টির তরফ থেকে একটি ব্যাপক কর্মসূচীর চিন্তাধারা দেশের সামনে রাখা হয়েছে। এই চিন্তাধারার মূল কথা রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসনকে (অটনমি) আরও জোরদার করা। বলা হয়েছে, কংগ্রেস শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের স্বাধিকারে ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করে চলেছে। তাই প্রয়োজন হয়েছে রাজ্য-কেন্দ্র সম্পর্ক এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা, যাতে ভারতের 'ফেডারেল' (সংযুক্ত রাষ্ট্র) রূপটি ঢেলে সাজা যায়। নবরূপের যে পরিকল্পনা দেশের সামনে রাখা হয়েছে, তাতে ভারতকে একটি "বহু জাতি"র সংযুক্ত রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। "বহু-জাতি"র (মাল্টি ন্যাশনাল) আয়নায় প্রতিটি রাজ্যের যে রূপটা প্রতিফলিত হওয়া সম্ভব, সেটা কিন্তু পার্টির পক্ষ থেকে খুব পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি।

স্বয়ংশাসিত রাজ্যগুলো প্রকৃতপক্ষে হবে সোভিয়েট কাঠামোর সামিল। সোভিয়েট কাঠামো যদি প্রতি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয় তাহলে অনুমান করে নিতে অসুবিধা হয় না যে, 'বহু জাতিত্বে' রূপান্তরিত ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের চেহারাটা কি হবে। মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির মূল রাজনৈতিক চিন্তাধারা যদি মনে রাখা যায়, তাহলে ভারতের সংযুক্ত সোভিয়েট রাষ্ট্রের চেহারাটাও কল্পনা করা অযৌক্তিক মনে হবে না।

সোভিয়েট কাঠামোর যে-সংবিধান সর্বজনবিদিত তার মূল কথা প্রতিটি সোভিয়েটের (ভারতের ক্ষেত্রে প্রতিটি রাজ্যের) শাসনাধিকার। সে-অধিকার সর্ব বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে একমাত্র বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা, আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে। স্বভাবতই এই সব বিষয়ে কোন সোভিয়েটের হাতে শাসনাধিকার দেওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন হয় ক্রেমলিনের কেন্দ্রীয় সংসদের। প্রয়োজন হয় পার্টির কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, যে ক্ষমতার বলে পার্টির পক্ষে সম্ভব হয় সংযুক্ত সোভিয়েটের স্বার্থসংরক্ষিত করা। সোভিয়েট পদ্ধতিতে কর্মধারার মূল সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করে দিতে হয় পার্টিকে। মোটামুটিভাবে প্রতিটি সোভিয়েটের হাতে শিল্প ও কৃষি ব্যাপারে পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু মূল নীতি নির্ধারণ করে দেবে পার্টি এবং ক্রেমলিন বা কেন্দ্রীয় সংসদ।

মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সংবিধানের সংস্কারের প্রস্তাবটি কোন অবাস্তব ভিত্তিতে করেনি। নির্বাচনের পরে বাস্তব ভিত্তিটা যদি পরিবর্তনের ইঙ্গিত হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে মার্কিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টিকে সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কর্মধারাকে পরিবর্তন করতে হবে। পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীসুন্দরাইয়া অবশ্য এ কথাটা খোলাখুলিভাবে বলেননি। তাঁর বক্তব্য, ভারত একটি বহু জাতির দেশ। সকল রাজ্যের অধিকার দেওয়ার পরেই দেশের সংহতি নির্ভর করে। কিন্তু বৃহৎ পুঁজিপতি ও কংগ্রেসীরা তা করতে দিচ্ছে না।

কমিটির রিপোর্টে অবশ্য এই প্রসঙ্গে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেন্দ্র-রাজ্য সম্বন্ধের অবস্থা বিকাশশীল সংকটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি। যে সংকট বিকাশের ধনতান্ত্রিক পথকে সম্পূর্ণভাবে কবলিত করেছে, সে সংকট এখন উপরের কাঠামোকেও গ্রাস করতে শুরু করেছে; এই উপর-কাঠামো যদিও গঠনের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয়, তবুও তার প্রধান লিভারগুলি কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত।

সংবিধান সংস্কারের মূলে প্রস্তাবের মূলে কথাটা এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। সে প্রস্তাবের একটা কার্যকরী অংশও আছে। সেটা সংগ্রামের কথা। তাই কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসনাধিকারের জন্য সংগ্রাম অনিবার্যভাবে দেখা দেবে এবং রাজ্যগুলির এই সংগ্রামের চরিত্র হবে গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল এবং এগুলি গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে। শ্রীসুন্দরাইয়াকে জিগ্যেস করা হয়েছিল, আন্দোলন কি হবে? তাঁর উত্তর ছিলঃ নিশ্চয়।

প্রশ্নটার দুটো প্রত্যক্ষ দিক দেখা যাচ্ছে। প্রথমত বর্তমান ভারতীয় সংবিধানকে নাকচ করা এবং দ্বিতীয়ত সোভিয়েট সংবিধান চালু করার জন্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে জোরদার করা। প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে সন্দেহের ছায়া দেখা দেবার সুযোগ যে নেই, একথা বলা দুষ্কর। কারণ সংবিধান নাকচ করার বা সংস্কার করার পক্ষে যে যুক্তি দেখান হয়েছে, তা প্রধানত কেন্দ্রের কংগ্রেস শাসনের সমালোচনার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই কংগ্রেসবিরোধী সমালোচনার ভিত্তিতে সংস্কারের দাবি স্বভাবতই দুর্বল হয়ে যায়, যখন দেখা যায় যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের এক সরিক বাংলা কংগ্রেসের নেতা শ্রীহুমায়ুন কবির জোর গলায় বলছেন যে, অতি শীঘ্রই কেন্দ্রে কংগ্রেসী শাসনের অবসান ঘটবে। শ্রীকবির অবশ্য তাঁর এই বিশ্বাসের মূল ভিত্তিটা সবিস্তারে আলোচনা করেননি; কিন্তু তাঁর যুক্তিটা কিছু বোঝা যায় যখন তিনি সংসদে কংগ্রেস পক্ষ ও বিরোধী দলের শক্তির মধ্যে সংকুচিত অসমতার উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, যদি ২০ জন সদস্য কংগ্রেস দল ছেড়ে বিরোধী দলে যোগ দেন, তাহলেই কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটান সম্ভব হয়।

সম্ভব হবার সম্ভাবনা হয়ত তিনি দেখেছেন উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানায় এবং সে-সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই তিনি আগামী মাসে অকংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ও বিভিন্ন রাজ্যের জন কংগ্রেস প্রতিনিধিদের পাটনা সম্মেলনকে স্বাগত জানিয়েছেন।

শ্রীকবীর-এর দৃঢ় বিশ্বাস নির্বাচনের আগে যা সম্ভব হয়নি, নির্বাচনের পরে তা সম্ভব করতে অসুবিধা হবে না। তাঁর ধারণা পাটনা সম্মেলনে এক নতুন কংগ্রেসবিরোধী সর্ব-ভারতীয় জন কংগ্রেস হয়ত গঠিত হবে।

প্রচেষ্টাটা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংগঠন সুসংবদ্ধ করা। এই সংহতির প্রচেষ্টা সংসদে এ-পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। তাই শ্রীকবীরকে গঠন করতে হবে প্রগ্রেসিভ ব্লক, যার সঙ্গে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পর্ক নেই। এই নিঃসম্পর্ক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাটনা সম্মেলন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, বাংলা কংগ্রেস বা জন কংগ্রেসের দিক থেকে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষে সংবিধান সংস্কার তেমনি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল হিসাবে শুধু সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, কার্যকর করতে হলে প্রয়োজন দলের সামনে রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে স্পষ্ট করে নেওয়া এবং সেই লক্ষ্যপথে চলার জন্য উপযুক্ত পন্থা বা পদ্ধতি বেছে নেওয়া। এই দুটো উদ্দেশ্যই স্থান পেয়েছে মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবে।

অন্য আর একটা কথাও এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন। গত দেড় মাসে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা দিল্লিতে কয়েকবার গিয়েছিলেন নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে। এই সব আলাপ-আলোচনার মধ্যে দুটি প্রধান বিষয় ছিল খাদ্য ও অর্থ। খাদ্য যা চাওয়া হয়েছিল, তা পাওয়া যায়নি। অর্থের যে দাবি ছিল, শ্রীমোরারজী দেশাই তা উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু যেটুকু ছিটে-ফোঁটা পাওয়া গেল, সে-সম্বন্ধে তাঁর কোন মন্তব্য কোন মন্ত্রীর কাছ থেকে এখনও শোনা যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি অবশ্য এ-কথা বলেননি যে, তাঁরা আলাপ-আলোচনা করে সন্তুষ্ট হয়েছেন; কিন্তু তিনি এটাও মনে করেন না যে, অসন্তুষ্ট হবার কোন কারণ ঘটেছে। অর্থাৎ এখনও ঘটেনি। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু অবশ্য একটু উষ্মা প্রকাশ করেছেন, শ্রীদেশাইর অনমনীয় মনোভাব দেখে। দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে শ্রীবসু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে কখনও নমনীয় হবার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন বলে শোনা যায়নি। তাই তিনি পাল্টা জবাবে একটা পাল্টা হুমকিও দিয়েছেন। তিনি শ্রীদেশাইকে হুমকি দিয়েছেন, প্রয়োজন হলে পশ্চিম বাংলায় পাট চাষ বন্ধ করে সব জমি ধান বা অন্যান্য শস্য উৎপাদনের কাজে লাগান হবে। হুমকিটা নিছক নিঃসার নয় কারণ পশ্চিম বাংলার পাট এবং চা ভারতের লক্ষ্মীর ঝাঁপি। কাজেই পশ্চিম বাংলার অদৃষ্টে লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি কেন পড়বে না শ্রীবসু সেটাই বুঝে উঠতে পারেন না। কৃপাদৃষ্টি পড়ার কোন নতুন সম্ভাবনাও তিনি দেখতে পাননি। তবু প্রকাশ্যভাবে সময় দেবার চেষ্টা এখনও করেননি। অর্থাৎ চেষ্টা করার সময় হয়ত এখনও আসেনি।

আসতে পারে না এমন কথাও কেউ বলছেন না। কিন্তু অনুভব করছেন নিশ্চয়ই। সেই অনুভূতির সঙ্গে হয়ত মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি পরিচিত। কারণ শ্রীবসু এই পার্টিরই উঁচু মহলের একজন নেতা। সম্ভাবনাটা তাই উড়িয়ে দেওয়া চলে না। রাজনৈতিক দল হিসাবে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে চিন্তা করাই স্বাভাবিক। তাই রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে শ্রীসুন্দরাইয়ার অভিমত বেশ স্পষ্ট। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট অর্থ সম্পদ রাজ্যগুলির প্রয়োজন। এখন অর্থের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কংগ্রেস ও বৃহৎ পুঁজির লোকেরা এমন সংবিধান করে রেখেছে যে, যুক্তরাজ্যের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। রাজ্য সরকারগুলি শুধু গরীব মানুষের উপর ট্যাক্স বসাতে পারেন। বৃহৎ পুঁজির লোকেদের উপর কর বসানোর ক্ষমতা রাজ্য সরকারগুলির নেই। "এই জিনিস সহ্য করা যায় না।" মন্তব্যটা শ্রীসুন্দরাইয়ার।

কিন্তু মূলে বক্তব্যটা পার্টিরও। তাই পার্টি মনে করে, কংগ্রেস ও বৃহৎ পুঁজিকে আক্রমণ করতে হলে সংবিধানকে আক্রমণ করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার কথা তোলা হয়েছে প্রসঙ্গত। কারণ সোভিয়েট রাজ্য ব্যবস্থায় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, পার্টির মধ্যে অথবা কেন্দ্রীয় পার্টিগত সংসদে। তাছাড়া, ভারতীয় সংবিধানে আগে কোন রাজ্যের পক্ষে ভারতের সংযুক্ত রাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে যাবার বিরুদ্ধে কোন বিধান ছিল না। এ-বিধানও এখন সংবিধানের অঙ্গীভূত করা হয়েছে। যার ফলে স্বাতন্ত্রের কথা তোলাও সংবিধান বিরোধী। কিন্তু সোভিয়েট সংবিধানে বেরিয়ে যাবার বিধান আছে। কাজেই ভারতীয় সংবিধানকে আমূল সংস্কার করার প্রস্তাবের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যেটা অন্তরঙ্গ হয়ে আছে, সেটা কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে দখল করার এবং আচ্ছন্ন করার রাজনৈতিক লড়াই। সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাবে তাই প্রচ্ছন্ন হুমকি যে নেই, তা বলা দুষ্কর। হয়ত সে-কারণেই প্রস্তাবে সোভিয়েট বিধানের উল্লেখ কোথাও করা হয়নি। স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে হয়ত অনেকে স্বাতন্ত্রের দাবী বলে ভুল বুঝতে পারে।

এই লড়াইয়ের মধ্যে একটা নীতির প্রশ্নও আছে। সে-নীতিটা আংশিকভাবে প্রকাশিত অন্য প্রস্তাবে যা অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের সম্পর্কে। যাঁরা পার্টির সদস্য, তাঁরা অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সদস্য হলে কতকগুলো রীতি মেনে চলতে হবে। একটা অবশ্য পালনীয় রীতি হবে যে, মন্ত্রিসভার সদস্য এবং সংসদের সদস্য হলে মাসিক মাহিনার পাঁচ শত টাকার বেশী নিজের জন্য খরচ করা চলবে না এবং বাড়তি অংশ পার্টিকে দিয়ে দিতে হবে। আর বিধানসভার সাধারণ সদস্য হলে মাসে তিন শত টাকা খরচ করতে পারবেন, বাকিটা দিতে হবে পার্টি ফাণ্ডে।

মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নির্দেশের মধ্যে অন্য একটা কথাও জড়িত আছে। সেটা পশ্চিম বাংলার যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের মাসিক মাহিনা সম্বন্ধে। যুক্ত ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করার পর মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, তাঁরা মাসিক পাঁচ শত টাকার বেশী মাইনে নেবেন না। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক ব্যয় কমান। মন্ত্রীদের মাসিক মাইনে কমিয়ে প্রশাসনিক ব্যয় সংকুচিত করা যে সম্ভব নয়, তা তাঁরাও জানেন। কিন্তু তাঁদের সৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় হিসাবেই তাঁরা পাঁচশত টাকার বেশী মাইনে নেবেন না বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাছাড়া মর্যালিটির (নৈতিক) প্রশ্নও জড়িত।

অথচ কার্যকালে দেখা গেল মাইনে কম নেওয়াটা মন্ত্রীদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। তার প্রধান বাধা সরকারের আইন। ১৯৫২ সালে মন্ত্রিসভা এবং বিধানসভা ও পরিষদের সদস্যদের মাস মাইনে সম্পর্কে একটা আইন গৃহীত হয়েছিল। সে-আইনে মুখ্যমন্ত্রী, ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, বিধানসভা ও পরিষদের সদস্যদের মাইনে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। শুধু মাইনেই নয়, মাসিক ভাতা ইত্যাদি সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট বিধান আছে। সে-আইন যতদিন বলবৎ থাকবে ততদিন, মাইনে বা ভাতা সম্বন্ধে মন্ত্রী বা অন্য কারো নির্দেশ গ্রাহ্য হবে না।

মার্ক্সিস্ট কম্যুনিস্ট পার্টি মনে করে পাঁচ শত টাকার বেশী মাইনে নেওয়া মন্ত্রীদের পক্ষে, বিশেষ করে যাঁরা এই পার্টির সদস্য, অনুচিত হবে। কারণ, বেশি মাইনে নিলে বা সেই অনুসারে খরচ করলে জনসাধারণের কাছে এদের অ-কংগ্রেসী চেহারাটা হয়ত তুলে ধরা অসম্ভব হবে। এই কথা বিবেচনা করেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাড়তি যে-টাকাটা পার্টির খাতায় জমা পড়বে, সেটার অঙ্কও বিশেষ কম নয়।
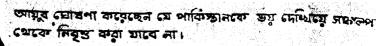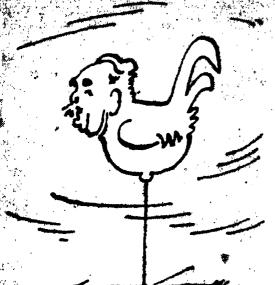
বিহার ও অন্যান্য অঞ্চলে চরম খাদ্যাভাব।

কিন্তু অশুভ কিছুই জগজীবনের চোখে পড়ে না।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডি-এম-কের সমস্যা ভোট দেবে কাকে!

কোন দিকে হাওয়া বইছে?

গ্রীক ট্র্যাজেডি
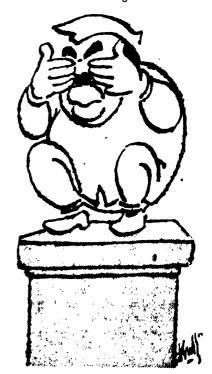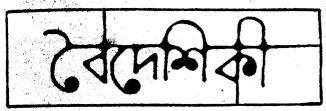
গ্রীস নাকি ডেমক্রেসির আদি পীঠস্থান; ট্র্যাজেডির জন্মও গ্রীসে। এখনকার গ্রীসে ডেমক্রেসির অভিনয়ে রাজার, ফৌজী কর্তাদের আর আমলাচূড়ামণিদের ভূমিকাই আসল। লোকসভা, মন্ত্রিসভা এ-সবও আছে বৈকি, তবে অনেক সময় থাকেও না। যেমন এখন খতম হয়েছে গ্রীসের লোকসভা; মন্ত্রীদের জেলে ভরতি করা হয়েছে, মিলিটারী কর্তাদের পছন্দ নয় যারা সেই সব রাজনীতিকদেরও। গ্রীসের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ঠাটটা এভাবে ভেঙে দেওয়ায় কার হাত? কেউ বলেন, রাজা কনস্টান্টাইনের, আবার আর এক খবর, মিলিটারী কর্তারাই রাজাকে এ-কাজে বাধ্য করেছেন। যিনি বা যাঁরাই করে থাকুন, গ্রীসে গণতন্ত্রের ট্র্যাজেডিটা পুরনো ধারায় যথারীতি অভিনীত হয়েছে। রাজার সঙ্গে মতবিরোধ চলছিল সেন্টার ইউনিয়ন পার্টির প্রবীণ নেতা ও প্রধানমন্ত্রী পাপানদ্রিওর। পাপানদ্রিওকে রাজা বরখাস্ত করেন; তাঁর জায়গায় প্রধানমন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন ন্যাশনাল র‍্যাডিকাল ইউনিয়ন দলের নেতা কেনেলোপুলোস। নামে র‍্যাডিকাল দল, রাজনীতিতে গোঁড়া দক্ষিণপন্থী; তারপর গ্রীসের লোকসভায় এ-দল লঘিষ্ঠ। সেন্টার ইউনিয়ন পার্টির জনপ্রিয়তা বেশী, পাপানদ্রিওর বক্তৃতার জোরও কম নয়। রাজা এবং মিলিটারী কর্তাদের সঙ্গে পাপানদ্রিওর বিরোধের কারণ পাপানদ্রিওর ছেলে অ্যানড্রিয়াস। এই অ্যানড্রিয়াস কিছুদিন ছিলেন আমেরিকায় এক প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক; গ্রীসের রাজনীতিতে রাজা ও মিলিটারীর প্রভুত্ব অ্যানড্রিয়াসের পছন্দ নয়। তিনি চেষ্টা করছিলেন মিলিটারী কর্তাদের প্রাধান্য খর্ব করতে। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেও তাঁর এবং সেন্টার ইউনিয়ন দলের তরুণ সদস্যদের আন্দোলন দানা বাঁধছিল। কাজেই রাজা ও মিলিটারী কর্তারা গ্রীক গণতন্ত্রের ঠাটবাট সব আপাতত ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছেন।

কোন কোন সূত্রের খবর মিলিটারীর শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা দখলের পর মারা গেছে মাত্র ন'শো লোক। এরকম ব্যাপার গ্রীসে গত একশো বছরে ঘটেছে অনেকবার। এর পর নাকি গণতান্ত্রিক নির্বাচন, নতুন লোকসভা, নতুন মন্ত্রিসভা গ্রীসে আবারও হবে। মিলিটারীর খবরদারীতে সাধারণ নির্বাচনের ভোটাভুটি এর আগেও হয়েছে, তার ফলাফল রাজা, মিলিটারী এবং আমলাকুলপতিদের হতাশ করেনি। এ-কালের গ্রীসের মাথার উপর রাজা থাকা চাই-ই। "ডেমসের" জন্মভূমি গ্রীসে রাজবংশ পাওয়া যায় না। তাই ১৮৩০ সনে গ্রীস স্বাধীন হলে পর জার্মানি থেকে ব্যাভেরিয়ার প্রিন্স অটোকে এনে রাজতক্তে বসানো হল। গ্রীসের রাজারা অনেকেই বেশী দিন টিকে থাকতে পারেন না। রাজা অটো বিতাড়িত হন। এর পর গ্রীসে আমদানী হল ডেনমার্কের রাজকুল থেকে একজন। রাজা প্রথম জর্জ নিহত হন, তাঁর ছেলে কনস্টান্টাইন হন দু'বার গদিচ্যুত, দ্বিতীয় জর্জ নির্বাসিত হন দুই-দুইবার; ১৯২৩ থেকে ১৯৩৫ সন পর্যন্ত গ্রীস হয়েছিল প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। দ্বিতীয় জর্জের পর রাজা প্রথম পল, তাঁরই ছেলে বর্তমান রাজা কনস্টান্টাইন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং ডিউক অব এডিনবরার জ্ঞাতি এই গ্রীক রাজবংশ।

বিদেশ থেকে ধার করে আনা কিংবা চাপিয়ে দেওয়া গ্রীসের রাজবংশকে টিকিয়ে রাখা সহজ নয়। কাজেই গ্রীক রাজনীতির পর্বে পর্বে মিলিটারীর প্রাধান্য, ডিক্টেটরের আবির্ভাব। গরীব দেশ, ভারতবর্ষের চেয়েও গরীব, পাথুরে জমিতে বাজরা ও গমের সামান্য চাষবাস; তামাক, জলপাই আর কিছু শৌখীন ফলমূল হল গ্রীসের রপ্তানি বাণিজ্যের সম্বল। এ-দেশে জবরদস্ত শাসন ছাড়া রাজবংশের মহিমা, আইন-শৃঙ্খলার মর্যাদা টিকিয়ে রাখা আর কী উপায়েই বা সম্ভব? ভেনিজেলস, প্যাংগালোস, কনডাইলিস, মেটাক্সাস, প্লাস্টিরাস, পাপাগোস, একের পর এক সকলেই ডিক্টেটরী শাসন চালিয়েছেন। গ্রীসের বিদেশী বন্ধু বা মুরুব্বিও বিস্তর। সে-ও এক ট্র্যাজেডি। ইতালি সম্পর্কে প্রাচীন কবি হোরেস খেদ করেছিলেন, ইতালি! তোমার সৌন্দর্যই তোমার কাল হয়েছে। গ্রীসের বিপত্তির কারণ তেমনই তার ভৌগোলিক অবস্থান। য়ুরোপের মানচিত্রের উপরে নজর দিলে দেখা যাবে গ্রীস যেন বলকানের বোতলের ছিপি; এই ছিপি যে হাত করতে পারবে, ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল, কৃষ্ণসাগরে তারই আধিপত্য দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হবে অনায়াসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে ব্রিটেন ছিল গ্রীসের মুরুব্বি; আর গ্রীসের উপর লুব্ধদৃষ্টি তখন ইতালির, ফ্যাসী জার্মানির।

১৯৪০ সনে ইতালি এগিয়ে এল গ্রীস দখলে, ব্রিটেন এগিয়ে এল গ্রীসকে রক্ষা করতে। তারপর জার্মানি কেড়ে নিল গ্রীস ব্রিটেনের হাত থেকে। এর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই গ্রীসে গৃহযুদ্ধ—একদিকে ব্রিটেনের সমর্থনপুষ্ট রাজতন্ত্রীরা আর একদিকে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট সমর্থিত গ্রীক গেরিলা বাহিনী। যা হোক ব্রিটিশ ফৌজের চেষ্টায় গ্রীসের কম্যুনিস্ট বিপদ কেটে গেল। রাজা দ্বিতীয় জর্জ লণ্ডনের মেফেয়ার পাড়ার বিলাসভবন থেকে ফিরে এলেন এথেন্সে। লণ্ডনের ইকনমিস্ট পত্রিকা লিখল, রাজা দ্বিতীয় জর্জ এথেন্সে ফিরে যাওয়ায় আর কিছু না হোক, মেফেয়ার পাড়ায় বাড়ীর সমস্যা মিটল।

এর পর গ্রীসের স্বাধীনতা রক্ষার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করলেন তাঁর বিখ্যাত ট্রুম্যান ডক্ট্রিন তথা ট্রুম্যান-নীতি। ১৯৪৭ সনের মার্চ মাসে বরাদ্দ হল গ্রীস ও তুর্কীর জন্য ৪০ কোটি ডলার; আমেরিকার তরফ থেকে ঘোষণা করা হল, গ্রীস বা তুর্কীকে পদানত করার চেষ্টা হলে আমেরিকা সাহায্য করবে এই সব দেশের জনসাধারণকে। আমেরিকা সে প্রতিশ্রুতি রেখেছে, এখনও রাখছে। এই সেদিনও মার্কিন প্রতিরক্ষা-সচিব ম্যাকনামারা গ্রীস, তুর্কী এবং ইরানের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কয়েক কোটি ডলার সামরিক সাহায্য বরাদ্দ করেছেন। মিলিটারীর জোর বজায় রাখাই সবচেয়ে ভাল ব্যবস্থা। ১৯৪৬-৪৭ সন থেকে এ-পর্যন্ত গ্রীস মাথাপিছু যত ডলার সাহায্য পেয়েছে তত আর কোন দেশের লোক পায়নি। ট্র্যাজেডি এই যে গ্রীসের দারিদ্র্য, জনসাধারণের দুর্গতি তাতে বিশেষ কিছু কমেনি। খয়রাতি মিল্ক পাউডারের কৃপায় চোরাকারবারী রাজনীতির সমৃদ্ধি কিছু কিছু আমরাও দেখেছি। গ্রীসের শাসনব্যবস্থা আরও বেশী স্বৈরাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত। মার্কিন বিশেষজ্ঞ যাঁরা গ্রীসের চাষবাস ব্যবস্থা, যন্ত্রশিল্পের উন্নতিতে আগ্রহী, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন দুর্গতি উপশমের জন্য বাস্তব উদ্যোগের পক্ষপাতী তাঁরাও দেখেছেন মিলিটারী-পুলিস-আমলাবাহিনীকে ডিঙিয়ে গ্রীসে ভাল কিছু করবার উপায়ই নেই। মার্কিন বদান্যতায় বলকান বোতলের গ্রীক মিলিটারী ছিপিটা বেশ আঁটসাঁট হয়েছে, ট্রুম্যান-জনসন-ম্যাকনামারা নীতির সাফল্য ওই পর্যন্ত।

২৪।৪।৬৭

তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই, যেমন ভাবো—
দুই-চোখে দুই জন্দ ঠুলি কোন গগনে খুঁজলে পাবো
গন্ধবিহীন দ্বন্দ্ববিচার? সেই সুযোগে কিয়দ্দূরে
দশ বারোটি মন-মরা বুক সাধ করে আজ রাখছি খুঁড়ে
কোন গোপনে মুখ লুকোবে, সেইখানে কৌশলে যাবো
তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই, যেমন ভাবো—

দু এক পশলা বৃষ্টি পড়ছে গাছের ও কদমের শাখায়
আমার উড়োনচণ্ডি চলা থমকে যাবে ভিজলে পাখা?
অঙ্গভঙ্গি কেদার রাজার, ভেতরে বাক 'ভিক্ষা পাবো'?
তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই, যেমন ভাবো—

উপর থেকে নিচতে চোখ কেনই বা যায় শকুনপাখির
চরিত্রে টান? কিংবা সত্যি দোষ ছিলো তার সজল আঁখির
বলতে পারো মাংসাশী জিভ অমৃত-আস্বাদী তৃণে
সুখের স্বর্গ পাচ্ছে খুঁজে? কোন নারী চরিত্র বিনে
খায় পর-পুরুষের রক্ত? উচিত কথা বললে যাবো
তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই, যেমন ভাবো—

ও হলেও হতে পারত ঐশ্বর্যবাহী ময়ূরপঙ্খী....

গিরিজা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রশান্ত মহাসাগর থেকে বয়ে আনতে পারত
শুভ্র শুক্তি রক্তিম প্রবাল আর উজ্জ্বল মণি চুনি পান্না।
সুদূর সুমাত্রা হতে অহংকৃত পালে ভেসে আসতে পারত
এলাচি লবঙ্গ দারুচিনির দৌলত নিয়ে।

মালয়ের রবার বর্মার সেগুন আর আসামের চা নিয়ে
নারিকেল-শ্রেণী-প্রান্তিক বঙ্গোসাগরের তীর ঘেঁষে ঘেঁষে
মাদ্রাজ সৈকতের তাল কজেরিনার দৃশ্য দেখতে দেখতে
সিংহলের পাশ কাটিয়ে
পশ্চিমঘাটের কফি-সৌগন্ধ-মুগ্ধ হাওয়ায়
দোদুল্যমান হস্তিনীর মত
চলে যেতে পারত আরব সাগরের মধ্য দিয়ে
লোহিত সাগরে—
তারপর ভূমধ্য সাগরের বন্দরে বন্দরে
উজাড় করে দিতে পারত মূল্যবান পণ্য।

কিন্তু ও দেখছি ছোট গ্রাম্য নদী পারাপার করছে
এক কড়ি দু কড়ি নিয়ে।
সওদা টানছে—খড়ের গাদা
ফাটো কেরোসিনের টিন
চিটে গুড়ের কাঁদি
কাঁচকলার কাঁদি
অথবা বড়জোর ধামা-ভর্তি গোখাদ্য খৈল।

একটি দুঃসাহসিক যুবক

শামশের আনোয়ার

ঘাতকের খড়্গের মত এক-একটি উদ্যত সংগীত
হঠাৎ ভয়ংকর আবেগে বেজে উঠে
যুবকদের দুঃসাহসের অভিযানের দিকে টেনে নিয়ে যায়
তোমার শরীরের সংগীত ও-রকম আবেগে বেজে উঠে
আমাকেও টেনে নিয়ে গেছে দুঃসাহসের মারাত্মক অভিযানে
অই বিপদ-সংকুল শরীরের উথাল-পাথাল সমুদ্রে
আমি তাই ছুড়ে ফেলেছি বাইশ বছর
আমি তোমার শরীরের হত্যাকারী ঘূর্ণি ও চোরাবালির
গম্ভীর ষড়যন্ত্র এড়িয়ে আকাংখার প্রবাল দ্বীপে নেমে যাব
শরীরের সমস্ত নিষ্করুণ মরুভূমি ও পর্বতশৃঙ্গগুলির
দম্ভ জয় করে আমি উঠে যাব বাসনার উগ্র চূড়ায়
আমি অই শরীরের উন্মুখ কাঁটাগুলির ভিতর হতে
ছিঁড়ে নেব উজ্জ্বল ফুলের মত তোমার প্রগাঢ় হৃৎপিণ্ড।
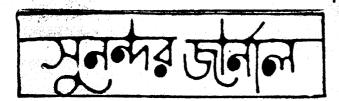
'ভারতবর্ষ'

আসানসোলের একান্তে একটু নিরিবিলি আর ছিমছাম ধরনের হোটেল দেখে ঢুকে পড়া গিয়েছিল। চা খেতে খেতে হিন্দী ভাষায় কিছু সংলাপ কানে এল। হোটেলের মালিক গল্প করছিলেন কটি তরুণের সঙ্গে। খুব সম্ভব তাঁরা আমাকে লক্ষ করেননি, কিংবা বাঙালী বলে অনুমান করেননি, অথবা ভেবেছিলেন তাঁদের মৃদু গলার আলোচনা আমার কান পর্যন্ত পৌঁছুবে না।

একজন বলছিলেন, আসানসোলের বিহারের মধ্যেই চলে আসা উচিত।

হোটেলওলা বললেন, আসানসোল তো আগে বিহারের ভেতরেই ছিল।

—হ্যাঁ?

—হা তো। আপলোগ জরা কোশিস করে তো ফিন বিহারমে আ জায়।

চা খেতে খেতে আমার একটা বিষম লাগল। কৌতুকও বোধ করা গেল খানিকটা। আসানসোল একদা বিহারের মধ্যে ছিল কোন ভূগোলে এই তথ্যটা আছে সে আমার জানা নেই; এবং এই তরুণেরা কোশিস করলে ফিন বিহারে চলে যাবে কিনা তা-ও ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে তাঁদের ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হল, আপাতত তাঁরা কোশিস করুন আর না-ই করুন, ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবেন।

চিন্তা করুন, চেষ্টা করুন—কিছুতেই আমার আপত্তি নেই। নিজের প্রদেশকে কে না ভালোবাসে? বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ।' 'অসমা নিরুপমা জননী।' 'ইয়ে বিহার হ্যায়—হমারা জনম-ভূম হ্যায়।' মাতৃভূমির জন্যে আমরা সবাই গর্বিত। আসানসোলের মতো এমন একটা ইনডাসট্রিয়াল এরিয়াকে নিজের প্রদেশের মধ্যে পেলে কে না সুখী হয়?

এই সুখের সাধনা এখন সারা ভারত-বর্ষে। জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ মহা-রাষ্ট্রের সঙ্গে মহীশূরের, বিহারের সঙ্গে ওড়িষ্যার; পাঞ্জাব-হরিয়ানা চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছে চণ্ডীগড়ের দিকে: গোয়া আপাতত স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে আছে—সে কারুর ঘরেই যেতে নারাজ।

'আমার জন্মভূমি, আমার প্রদেশ।' কে না চায় তার বিস্তার?

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠলুম। মোটর চলল কলকাতার দিকে। বেলা দশটা হবে, এরই ভেতরে ঝাঁ-ঝাঁ করছে রোদ। ঢেউ-খেলানো শ্রীহীন মাটি, সরু ব্রীজের নীচে কুদর্শন একটা ছোট নদীর কালো পঙ্কিল জল, কয়েকটা চুনের ভাঁটা, পোড়া গ্যাসোলিনের গন্ধে বিষাক্ত গরম হাওয়া। আমার চোখ বুজে এল।

ছবির পরে ছবি ফুটছে। অন্ধ্র। দুপুরের রোদে কতগুলো তালগাছ হা-হা করছে পাগলের মতো। আশেপাশে মানুষের বস্তি। তালপাতায় গড়া কটা অতিকায় টোকার মতো অদ্ভুত ধরনের ঘর, গুঁড়ি মেরে ঢুকতে হয় তার ভেতরে। সেই সঙ্গে কত-গুলো শুকনো শীর্ণ মুখ। দারিদ্র্য।

পশ্চিম ঘাট পাহাড়ের ছায়ায় কারা যেন জমি চাষ করতে চাইছে। রোগা কালো কালো পাগুলো দেখতে পাচ্ছি। কঠিন নিষ্ঠুর মাটিতে লাঙলের ফলা বসে না। এই জমি কোনোদিন খুশি হয়ে এক মুঠো ফসল তুলে দেবে? বিশ্বাস করা শক্ত।

ওড়িষ্যার বুকের ভেতর দিয়ে তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে সেই নদীটা। নাম চন্দ্র-ভাগা। বোধ হয় কিছু পৌরাণিক গৌরবও আছে তার। সেইখানে এক পাঠশালার পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। 'আপনার বিশ্বাস হবে না, কিন্তু এমন লোকও আছে যারা আজ পর্যন্ত আলু খেতে পায়নি; এমন মানুষও আছে—যাদের কাপড় জোটে না, কেয়াপাতা সেলাই করে পরতে হয়।'

আমার মনে পড়ল, বাংলা দেশে কটি আদিবাসী শ্রেণীর মানুষকে দেখেছিলুম। বনের ভেতরে কী যেন খুঁড়ে খুঁড়ে তুল-ছিল তারা।

'কী তুলছ ওগো?'

'বুনো ওল।'

'কী সর্বনাশ! খাওয়া যায়?'

তারা হাসল। বুঝতে পারলুম, কথাটা জিজ্ঞেস করবার কোনো দরকার ছিল না।

'কী করে খাও?'

'ন্যাকড়ায় বেঁধে নদীর সোঁতায় ডুবিয়ে রাখি। জলে ধুয়ে ধুয়ে কষটা বেরিয়ে যায়,

তারপরে আমরা খাই। কী করব বাবু, এখন কসল নেই, কাজ নেই—এইসব খেয়েই তো বেঁচে থাকতে হবে।'

মোটর ছুটেছিল রানীগঞ্জের ভেতর দিয়ে। বাতাস আরো গরম—মনে হচ্ছিল, মাটির তলায় সব অঙ্গার বুঝি এখনো শীতল হয়ে যায়নি—নানা ফাটল দিয়ে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে তাদের উত্তাপ। চিন্তায় ফিরে এল বিহার। দুর্ভিক্ষ চলছে সেখানে। মাত্র ক'দিন আগেই সেই বিহারকে দেখেছি।

এই গাড়িটাতেই চলেছিলুম। ছেলেবেলা থেকে বাংলা গল্প-উপন্যাসে পড়া রূপকথার দেশ—পাহাড়ী টিলা-শাল মহুয়া-পলাশের নেশা; বাঙালী কবির অকৃপণ আকুলতা : সাঁওতাল মেয়ে চাই আর চাই মহুয়ার মদ!

সাজানো শহরের ভালো হোটেলে খেয়ে সেই নিরঙ্কুশ রূপকথার জগতে পাড়ি দিয়েছি। রোদে পোড়া পাথর আর ছোট ছোট পাহাড়গুলোর দিকে চাইলে চোখ জ্বালা করে; ধুলো মাখা রুক্ষ চুলের মতো বিবর্ণ শালবন; একটির পর একটি পাহাড়ী নদী পেরিয়ে চলেছি—নুড়িতে নুড়িতে কলতান তুলে নূপুরপরা মেয়েদের মতো ছুটে যাচ্ছে না, শুকনো কঙ্কালের মতো বালি জেগেছে, কারো বা এক আঁজলা জলের পাশে এসে ভিড় করেছে কয়েকটা বুভুক্ষু অস্থিসার গোরু-মোষ; ফসলহীন মাঠ—একজন বুড়ো সাঁওতাল দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর স্কেচের মতো দাঁড়িয়ে—নিষ্করুণ নির্জল আকাশের দিকে তাকিয়ে কী ভাবছে সে-ই জানে।

এমন বন্ধ্যা—এমন নির্মম মাটি কোনোদিন দেখিনি। মাইল চল্লিশেক এগিয়ে এই শ্মশান পাড়ি দিতে আর সাহস হল না। ফেরার পথে সন্ধ্যা নামল, কিন্তু একটি কুটিরে আলো দেখা গেল না, একটি শঙ্খ বাজল না, একটি শিশুর হাসি-কান্না শোনা গেল না। মনে হচ্ছিল প্রেতলোকের পথ পাড়ি দিচ্ছি, একটা বীভৎস ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল বুকটা।

আসানসোল নিয়ে কেউ কৌশিস করবে কিনা জানি না; চণ্ডীগড় কোথায় যাবে? মহারাষ্ট্র আর মহীশূরের বিরোধই বা কবে মিটবে? কিন্তু সব ছাপিয়ে আমি শুধু অনন্ত ক্ষুধা আর দুঃখের ভূগোলে এক ভারতবর্ষকে দেখতে পাচ্ছিলুম। এই ভারতবর্ষই আমাদের—অথচ এই ভারতবর্ষকে আমরা কেউই দাবি করি না।

রবীন্দ্রনাথের গান

সাহানা দেবী

"শৈশব হতে তব গীতসুধাপানে
শুনেছি গানের মর্মের কথা কানে,
শিখেছি তাহারে গভীর প্রাণের ভাষা,
চিনেছি সুরের সুষমার মাঝে
কি তার নিভৃত আশা।"—

রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে এই হল আমার প্রথম কথা। আমার প্রাণের কথা।

সংগীত বলতেই বোঝায় সুর আর তার প্রকাশের অনন্ত সম্ভাবনাকে। সুরের গভীরে রয়েছে তার অতলের বারতা—কখনও তা মূর্ত হয়ে থাকে গুণীর হাতে যন্ত্রের মাধ্যমে কখনও গুণীজনের কণ্ঠে। সংগীতজ্ঞ, সুরজ্ঞ সব শিল্পীই রূপকার। এ'রাই আমাদের এনে দেন সুরের অন্তহীনতার স্পর্শ. এ'রাই ব্যক্ত করেন অব্যক্তকে, রূপের মাঝে রূপাতীতকে। সুরের একাধিপত্যের মাঝখানে যখন বাণী এসে দাঁড়ায় তার প্রকাশের ব্যঞ্জনা নিয়ে, দাবি নিয়ে কিছু বলার উদ্দেশ্যে, তখন তাকে বরণ করে নিয়ে সুরকে তার জন্যে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিতে হয় তার সে দাবি মেটাতে। সুর তখন আর একা নয়। তখনই হয় গানের জন্ম।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সংগীত সৃষ্টিতে আমাদের দেশের ক্লাসিক্যাল সংগীতের কিছু প্রভাব লক্ষ করা যায়। প্রথম দিকে কবি যেসব গান লিখতেন, তার অধিকাংশ গানেরই সুর হত রাগপ্রধান—ধ্রুপদাঙ্গই বেশি, টপ্পাও কিছু কিছু। আমরা ছোটবেলায় ব্রহ্মসংগীত থেকে তাঁর রচিত যেসব গান গাইতাম বা শুনতাম, সে সবও দেখতাম, প্রধানত রাগপ্রধানই। রবীন্দ্রনাথের কাছে শুনেছি তাঁর বাল্য-জীবন ক্লাসিকাল সংগীতের পরিবেশে। সে সময়কার অনেক গল্প আমরা কবির মুখে শুনতাম। বেশ রসিয়ে আর জমিয়ে তিনি সে সব গল্প বলতেন। প্রসিদ্ধ গায়ক যদুভট্টের নাম তাঁর মুখে খুব শোনা যেত। শুনেছি যদুভট্ট নাকি ছিলেনও তাঁদের বাড়িতে। যত দূর মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কাছেই বোধ হয় শুনেছিলাম যে, বাল্যকালে তিনি সংগীতশিক্ষাও কিছু করেছিলেন। তাঁদের বাড়িতে প্রায়ই সংগীতের আসর বসত, সমাগম হত কত সব গুণীদের। সেই সময় বহু গুণী এবং ওস্তাদদের গানবাজনা তিনি শুনতেন। কাজেই সে সব সংগীতের প্রভাব তাঁর সংগীত রচনায় শুরুর দিকে থাকা কিছু আশ্চর্য নয়। এবং ধরে নিলেও বোধ হয় ক্ষতি হয় না যে তাঁর সংগীতের মূল রাগসংগীতের ভিত্তিভূমি থেকে কিছু রস আহরণ করে নিয়েছে। কবি বলতেন, প্রথম দিকে তিনি নাকি আগে গান লিখে পরে তাতে সুর সংযোগ করতেন। এইভাবেই সাধারণত দেখা যায় গীতিকারেরাও গীত রচনা করে থাকেন। যাই হোক আমরা যখন দেখেছি তখন কিন্তু কবির গীতরচনার পদ্ধতি অন্যরকম দেখেছি। গান রচনাকালে গানের কথা ও সুর তাঁর একই সঙ্গেই আসত। আলাদা করে আর আগে গান লিখে পরে সুর বসাবার দরকার হত না। আমি এইরকমই দেখে এসেছি তাঁর গীত-রচনার রীতি। এবং তাঁকেও বলতেও শুনেছি এইটেই তাঁর স্বাভাবিক ধারা। শান্তিনিকেতনে গিয়ে একবার আমি তাঁর ঘরের পাশেই কিছুদিন বাসা বেঁধে ছিলাম। প্রায়ই শুনতে পেতাম কবি গুনগুন করে গাইছেন। গুনগুন করার ধরনটি শুনেই বুঝতাম তিনি নতুন গান বাঁধছেন। মনটিও আমার সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ত তার উপর—একাগ্র হয়ে উঠত

যতটা শুনতে পাওয়া যায় তার চেষ্টায়। আমি পণ্ডিচেরী চলে আসবার পরে তাঁর গীতিরচনার ধারায় আর কোনও পরিবর্তন হয়েছিল কি না তা জানি না। তবে তিনি তাঁর আগেকার অনেক কবিতায় সুর দিয়ে গান করে দিয়েছেন সে খবর এখানে বসেই পাই। সেরকম একটি গান—"কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি"—শুনেছিলাম শান্তিদেব গেয়েছিলেন যখন তিনি একবার আশ্রমে বেড়াতে আসেন। পরে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্য-নাট্যের অনেক গান গাইতে শুনি কবির আগেকার রচিত কোনও কোনও গানের সুরে সন্তোষ সেনগুপ্ত যখন তাঁর দলবল নিয়ে এসে আমাদের 'চিত্রাঙ্গদা' দেখিয়ে যান সেই সময়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর সংগীত-রচনাবলীর মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব সম্পদ কীর্তন, বাংলার প্রাণ বাউল ভাটিয়ালী এসব লোকসঙ্গীতের সুরও বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেছেন। অনেক গান তাঁর আছে ওই সব সুরের উপর। বিশেষ করে বাউল সুরের। বাউল গানের চিরদিনই তিনি খুব বেশি ভক্ত ছিলেন। শেষ জীবনের গানেও তাঁর দেখা যায় বাউল সুরের যথেষ্ঠ প্রভাব। তাঁকে 'বাউল কবি' বলতে শুনেছি। আর একটি জিনিস কবি শুরু থেকেই করতেন, সেটি হচ্ছে আমাদের নানান দেশের . ত বটেই, বিদেশেরও অনেক গান ভেঙে তাতে বাংলা কথা বসিয়ে দিতেন। তাঁর রচিত 'কাল-মৃগয়া' গীতনাট্যে দেখেছি বিদেশী সুরের অনেক গান আছে। "বাল্মীকি প্রতিভা"তেও কিছু হয়ত পাওয়া যেতে পারে। এইভাবেই তাঁর সংগীতে নানা সুরের স্থান পেয়েছে। কোনও একটা বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকেনি, বা আবদ্ধ হয়ে পড়েনি। পরে অবশ্য গড়ে ওঠে তাঁর নিজস্ব সংগীত তার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য নিয়ে—যা আজ পরিচিত "রবীন্দ্র-সংগীত" বলে।

একবার মনে আছে খুব বড় গায়ক রাধিকা গোস্বামীকে দেখেছিলাম রবীন্দ্র- [illegible] বাড়িতে, গাইছেন রবীন্দ্রনাথের সামনে বসে। সে অবশ্য বহুদিনের কথা। আমার বয়স তখন অল্পই। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বোধ হয় সবে যাওয়া আসা শুরু করেছি। রাধিকা বাবুকে দেখে মনে হল তাঁর বয়স হয়েছে। তাঁর মুখে সেদিন রামকেলী রাগে রচিত রবীন্দ্রনাথের —"স্বপন যদি ভাঙিলে"—গানটি শুনবার সৌভাগ্য লাভ করি। দেখলাম কবি আমার গানের বিষয় কিছু বলে আমার সম্বন্ধে ওঁর বেশ একটা ঔৎসুক্য জাগিয়ে দিলেন। এখনও কানে বাজে—'স্বপন' এর 'ন'-এর উপর ওঁর সেই দানাবাঁধ গিটকিরির কাজ। আর মনে পড়ে—'ভাঙিলে' এর 'ভা' এর উপর। মীড়ের ঠিক আগেই, ঝোঁকটি ফেলার কায়দার কথা। এই গানটি কারও মুখে শুনলেই রাধিকা বাবুর কণ্ঠে শোনা গানটির সেই সব স্মৃতি ভেসে ওঠে। কি সব উদাত্ত, পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠস্বরই ছিল তখন। এখনও হয়ত আছে ওস্তাদমহলে কিম্বা অন্যত্রও, জানিনা। কিন্তু আমরা আজকাল সাধারণত যেসব শিল্পীর গান শুনতে পাই, তাদের গলা শুনে আমাদের মন ভরেনা। আমি বলছি বিশেষ ছেলেদের কথা। তাদের কারও কণ্ঠেই ওজস্, পৌরুষ—এসব পুরুষোচিত শক্তি সম্পদের যে আবেদন তার কোনও পরিচয়ই পাই না। তাদের কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয় শক্তিহীন, দুর্বল, শুধু মিষ্টত্বেরই যেন পূজারী। অথচ গাইয়ে তারা সত্যই ভালো। সেবিষয় বলার কিছুই নেই। এখনকার এই সব চাপা চাপা অস্বাভাবিক কণ্ঠ শুনে আমাদের যারা আজীবন স্বাভাবিক খোলা গলায় গান গেয়ে এসেছি, প্রাণ এক এক সময় কেমন যেন হাঁপিয়ে ওঠে। মাইক আমাদের একদিক দিয়ে যেমনই উপকার করেছে তেমন এদিক দিয়ে কত যে ক্ষতি করেছে তাই ভাবি। মাইকের যুগে স্বাভাবিক গলায় কেউ আর বড় গায় না, তার মূল্যও কেউ ধরে বলে মনে হয় না। মাইকে আবার সকলের গলা সমান আসেনা। কারও কারও খুবই ভালো আসে অন্যদের তুলনায়। এইজন্যে প্রায়ই বলতে শোনা যায়—'অমুকের খুব ভালো মাইকের গলা,' কিম্বা 'অমুকের মাইকের গলা নয়'। কারোরই আর আসল গলা শোনা আমাদের ভাগ্যে হয় না।

রবীন্দ্রসঙ্গীত, . সঙ্গীত জগতের একটা নতুন স্তরের দ্বার খুলে দিয়েছে। সঙ্গীত-জগতে রবীন্দ্রসঙ্গীত একটা যুগ। এই সঙ্গীত অন্য পর্যায়ে পড়ে। এর জাত আলাদা, অভিব্যক্তি অন্যভাবের, উপাদান ভিন্ন, গঠন গায়কী সবই তার বৈশিষ্ট্য বহন করে। রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের নিয়ে যায় এমন এক জায়গায়, এমন এক জিনিসের আস্বাদ দেয় যে মনে হয় কি এক অনুভূতির

মধ্যে বাস করি যেন—ভরে যায় সব.—এসব ব্যক্ত করার নয়, বোঝানোও যায় না, শুধু অনুভব করার, যে পারে সেই পারে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতেই বোধ হয় প্রথম প্রতিভাত হয় কথা সুর ও ভাব কি ভাবে এক হয়ে যায়, আর ব্যক্ত করে এই এক হয়ে ওঠাকে। তাঁর গানের বৈশিষ্ট্যই এইখানে। এই হল রবীন্দ্র-সঙ্গীত, তার পরিচয়ের বিশেষ দিক। এই এক হয়ে ওঠার মধ্য দিয়েই ধ্বনিত হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভিতরকার আসল সুর আর তার মাঝে ধরা পড়ে সুরের অতীত যা তা-ই, যার স্পর্শে মুক্তি পায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং মূর্ত হয়ে ওঠে তাঁর সৃষ্টি। সেই জন্যেই রবীন্দ্রসঙ্গীতকে বিচ্ছিন্ন করে না দেখে—এক হয়ে সে কি হয়ে উঠেছে—সেইটি ঠিকমতন দেখতে পারলে তাকে অন্তরে গ্রহণ করা যায় সহজেই। আমার মনে হয় আমাদের মনে যতক্ষণ প্রশ্ন যাওয়া আসা করে ততক্ষণ কোনও কিছুরই আসল মর্ম গ্রহণ বা উপলব্ধি করা যায় না। আজ রবীন্দ্রসংগীতের জনপ্রিয়তা কত বেড়ে গেছে। ঘরে ঘরে এখন রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া হয়ে থাকে। সর্বত্রই তার চাহিদা, তার আদর। আমাদের দিনে রবীন্দ্র-

সঙ্গীতের এতটা প্রচলন ছিল না। সুধী সমাজে বিশেষ কোনও কোনও গোষ্ঠীতে, কোনও সম্প্রদায়ের মাঝে ছিল তার সমাদর। তখনও জনসমাজ তাকে এই ভাবে নিতে পারেনি। বোধ করি রবীন্দ্রনাথ নিজেও ঠিক এমনটি দেখে যেতে পারেননি। আজ দেশব্যাপী তাঁর সঙ্গীতের প্রচলন দেখে একদিকে যেমন আনন্দ বোধ করি, তেমন অন্যদিকে আবার নিবিড় বেদনা বোধ করি যখন দেখি রবীন্দ্রনাথ আমাদের যে গান দিয়ে গিয়েছিলেন, সে গান আর নেই, যা শুনি তাতে খুশি হতে পারিনা এ সত্য গোপন করব না। সবচেয়ে দুঃখ পাই স্বরলিপির নিগড়ে বাঁধা তার এই বন্দীদশা দেখে। চারিদিকে আটঘাট বেঁধে তাকে এমন করে রাখা হয়েছে যে গায়ক তার নিজের অনুভূতিকে ফোটাবার কোনও স্বাধীনতা পায় না। গানে গায়কের এ স্বাধীনতা অস্বীকার করা যায় না। নিজেকে না দিতে পারলে, নিজেকে না ফোটাতে পারলে গানও ফোটেনা। গান ত শুধু স্বরলিপির মুখস্থ বুলি বা তার অনুকরণ মাত্র নয়। গানে গায়কের নিজেরও দেবার আছে। গানে যতখানি রচয়িতার থাকার কথা ততখানি গায়কের,—এ রবীন্দ্রনাথেরই কথা, আমাকে একবার লিখেছিলেনঃ—

—"তুমি যখন আমার গান করো, শুনলে মনে হয় আমার গান রচনা সার্থক হয়েছে—সে গানে যতখানি আমি আছি ততখানি তুমিও আছে—এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে সেটার জন্যে রচয়িতার সাগ্রহ প্রতীক্ষা আছে।" —তাই বলছিলাম কথা, সুর, তাল, লয় সব ঠিক হুবহু স্বরলিপিকে অনুসরণ করে গেলেও তা গান হয়ে ওঠে না যদি না গানের ভিতরকার আসল জিনিসটি গায়কের উপলব্ধির মধ্যে এসে থাকে, এবং তার স্পর্শ গানে ফুটে ওঠে। আবার সমস্ত কিছু বজায় রেখেও গান গান হয়ে ওঠে গায়ক গানে যা দেবার তা দিতে জানলে এবং পারলে।

রবীন্দ্রনাথের গান মনে হয় সিম্‌প্লিসিটির (Simplicity) প্রতিমূর্তি যেন। এতে নেই কোনও রকম আড়ম্বর, কোনও বাহুল্য। একেবারে সাদাসিদে রকমের—সহজ, সংযত, সুসম্বদ্ধ। এক একটি গান মনে হয় যেন সরল রেখায় ফুটে আছে একটি শুভ্র সুন্দর ফুল। তাই চলে না তার উপর হস্তক্ষেপ। তিনি তাঁর সঙ্গীত-প্রতিমাকে অলংকার দিয়ে সাজাননি। সাজিয়েছেন অন্তরের পূজার ফুলে, তাই তা এমন শুভ্র সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি। তাঁর গানের বিষয় বলতে গেলে মনে পড়ে যায় তাঁর নিজের উক্তি তাঁর গান সম্বন্ধেঃ "আমার গানকে আমি মনে করি ক্ষুদ্র জুঁই ফুল, আপন সুগন্ধ বুকে নিয়ে আপনার সৌন্দর্যে সে আপনি বিকশিত।" —কথাগুলি আমাকেই বলেছিলেন এক সময়। তখন তাঁর গান সম্বন্ধে চলেছে নানা রকম সমালোচনা।

রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে দিয়ে প্রকৃতিকে আমরা দেখতে শিখেছি নতুন করে, নতুন ভাবে। পেয়েছি তাকে আপন করে, শুনেছি তার ভাষা, তার মনের কথা। সংগীতের মধ্যে এনে কবি তার অবগুণ্ঠন তুলে সামনে ধরে দেখিয়েছেন তার স্বচ্ছ স্বরূপ, তার রূপের আলো। ঋতুর ভান্ডার ভরে দিয়েছেন গানে গানে। কত ঋতু-উৎসব সংগীত রচনা করেছেন। প্রতিটি ঋতুকে তিনি কত ভাবরূপ দিয়েছেন নৃত্যে, গানে নাট্যাকারে। কত উৎসব সভা জমিয়ে দিয়েছেন, রাঙিয়ে দিয়েছেন গানের রঙে রঙে। রবীন্দ্রসংগীতের গুণে আর রবীন্দ্র-রচনাবলীর গুণে প্রকৃতিকে উপভোগ করি আমরা কত ভাবেই, আমাদের জীবনের মাঝে সে এসে দাঁড়িয়েছে আজ। তাই যখন বর্ষা নামে, মুসলধারে বৃষ্টি পড়ে, শুরু হয় মেঘের গুরু গুরু গর্জন—একের পর এক কত গানই যে আমাদের মনের মধ্যে যাওয়া আসা শুরু করে। আমরা কখনও গেয়ে উঠিঃ—

—"ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে"—
কখনও বা শুরু করে দিঃ—
—"আজ বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা বাদরে
আকাশভাঙা আকুলধারা কোথাও না ধরে।"—
ঘুমভাঙা চোখে যখন ভোরের আলোর পানে চোখমেলে তাকাই, কানে বাজেঃ—
—"প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বজে যেই
নীড়বিবাগী হৃদয় আমার উধাও হল সেই।"
—তেমনি, গভীর অন্ধকারে নিস্তব্ধ নিশীথে নিদ্রাহীন চোখে কত সময়ই আকাশের দিকে চেয়ে থাকি, গাইতে ইচ্ছে জাগেঃ—
—"আমার চোখে ঘুম ছিলনা গভীর রাতে
চেয়েছিলাম চেয়ে-থাকা তারার সাথে।"—
গাইতে ইচ্ছে জাগেঃ—
—"রজনীর তারা উঠেছে গগন ছেয়ে
আছে সবে মোর বাতায়ন পানে চেয়ে"—
জ্যোৎস্নাধোওয়া মনোহরণ রাত যখন আমাদের মনকে প্রাণকে কোথায় যেন টেনে নিয়ে যেতে চায়, তখন পথিক মন গান গেয়ে চলেঃ—
—"পূর্ণ চাঁদের মায়ায় ভাবনা আমার
পথ ভোলে"—

কি অপূর্ব এসব অনুভূতি। কত অনুভূতিই লাভ করেছি তাঁর গান গেয়ে। ভাবলে অবাক না হয়ে পারিনা যে, কি নিবিড় যোগাযোগই আমাদের আজ এসবের সঙ্গে। সবই যেন অমাদের জীবনের সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। চেষ্টা করে মনে আনতে হয় না। তারা আসে আপনা আপনি, সঙ্গে সঙ্গে, যেন আমাদেরই ভিতরের জিনিস, মিশে আছে রক্তে। তাই বলছি—ভোরের আলোয়, রাতের অন্ধকারে, দিনের তাপে, সন্ধ্যার স্নিগ্ধতায়, ঝড়ে ঝঞ্ঝায়, ভাঙা গড়ায়—সবকিছুতে সবের মাঝেই আমরা শুনি তাঁর গান বাজে আমাদের প্রাণে, আমাদের কানে। কত সহজ হয়ে গিয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ, আমাদের অন্তরের লেনদেন।

রবীন্দ্রসংগীতের আর একটি অমূল্য অবদান হচ্ছে তাঁর ভগবানের বিষয় রচিত গানগুলি। গভীরতার অতলস্পর্শী এই গানগুলির সত্যই তুলনা খুঁজে পাই না। অবশ্য কোন্ গানেরই বা কবির তুলনা আছে। তবু মনে হয় এ যেন অন্য আরও কিছু। যখনই শুনি, যতবারই গাওয়া যায় ততবারই প্রতিটি গানই নতুন করে প্রেরণা দেয়। নিভৃত অন্তরে জেলে দেয় পূজার প্রদীপ, দেখায় পথ আপনার গভীরে প্রবেশের। গাইতে গাইতে এমন হয় যে গান তখন আর গান মনে হয় না, হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এই শ্রেণীর গানগুলির মধ্যে দিয়ে দেখা যায় ভগবানের সঙ্গে কবির সম্বন্ধের নানাদিক। ভগবানের প্রতি তাঁর বিশ্বাস, ভক্তি ভালোবাসার অসাধারণত্ব আমাদের বার বার দেখিয়ে দেয়, স্মরণ করিয়ে দেয় তিনি কত ভিন্নস্তরের মানুষ। তাই জীবনে যা যখন এসেছে, ঘটেছে, তা যতই সঙ্গীন হোক, যত চরমেই উঠুক, প্রতিটি ঘটনাকে তিনি যে দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন, গ্রহণ করেছেন, তার কোনওটাই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর পর্যায়ে পড়ে না। সাধনা নইলে যে জ্ঞান, যে দৃষ্টি লভ্য নয়, সেই জ্ঞানের সেই দৃষ্টির আলোকপাত দেখতে পাই তাঁর বহু গানে। তাই তা আমাদের অন্তরে আলো জ্বালাতে পারে। পারে আমাদের মর্মে এমন দাগ দিয়ে যেতে। আজও যখন গাইঃ—

"যেদিন গেছে তোমা বিনা
তারে আর ফিরে চাহিনা
যাক্ সে ধুলাতে,
এখন তোমার আলোয় জীবন মেলে
যেন জাগি অহরহ।"

দেখি গাইতে গাইতে তলিয়ে গেছি। প্রাণের ভিতর থেকে শুধু ওই প্রার্থনাই ধ্বনিত হচ্ছে। এমন একটা আকুলতা জেগে ওঠে যে তন্ময় হয়ে ঘুরে ফিরে কেবলই গাইতে থাকিঃ—

"কত কলুষ কত ফাঁকি
এখনও যে আছে বাকি
মনের গোপনে,
আমায় তার লাগি আর ফিরায়োনা
তারে আগুনে দিয়ে দহ।"

এ গান আগে কতই গেয়েছি, আজও গাই, আজ আরও কত যে গভীর ভাবে তার মর্ম উপলব্ধি করি, আরও কত গভীরতার স্পর্শ

যে পাই। আমাদের ভিতরের, চেতনার পরিবর্তনের সঙ্গে, এসবের আবেদনও আমাদের কাছে কতই যে বদলে যায়। তাই এখন যখন গাই:—

"হৃদয় যাহার শতখানে ছিল
শত স্বার্থের সাধনে
তাহারে কেমনে কুড়ায়ে আনিলে
বাঁধিলে ভক্তি বাঁধনে।

....

করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে,
আমি সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে
এনেছ তোমারি দুয়ারে।"

বুঝতে পারি কেন চোখের জল বাধা মানে না। লুটিয়ে পড়ে সত্তা কার চরণতলে। বুঝতে পারি কোন্ অবস্থায় পৌঁছালে এই কথা এমন করে বলতে পারা যায়:—

"সুখদুখ সব তুচ্ছ করিনু
প্রিয় অপ্রিয় হে
তুমি নিজ হাতে যাহা সঁপিবে
তাহা মাথায় তুলিয়া লব
(আমি মাথায় লব) (সুখদুখ তব
পদধূলি বলে মাথায় লব)"

বলতে পারা যায়:—

"আমার হাতে তোমার হাত
রয়েছে দিনরজনী
সকল দুখে বিপথে সুখে অসুখে"

এমনিতর কত গানেই জ্বলে সেই আলোর শিখা। দুঃখের সার্থকতা কোথায় কবি দেখিয়েছেন তাঁর গানে। দুঃখ পাওয়ার অর্থ তাঁর কাছে ভিন্ন। তিনি গেয়েছেন:—

"যখন থাকে অচেতনে এ চিত্ত আমার
আঘাত সে যে পরশ তব
সেই ত পুরস্কার।"

"যাক্ না পায়ের তলার মাটি
তুমি তখন ধরবে আঁটি
তুলে নিয়ে দুলাবে ওই
বাহু দোলার দোলে।"

"সুখের আশা আঁকড়ে লয়ে
থাকিস নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভরে নিতে
মরণ আঘাত খেতেই হবে।"

"এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার
পার হল যে পার হল,
তোমার পায়ে এসে ঠেকল শেষে
সকল সুখের সার হল।"

মৃত্যু এসেছে তাঁর দুয়ারে কতবারই, নিয়ে গেছে তাঁর পত্নী পুত্র কন্যাদের অকালে। আঘাত গুরুতর হলেও তিনি কি ভাবে মৃত্যুকে দেখেছেন তা তাঁর গানের এই পংক্তিগুলি থেকে বোঝা যায়ঃ—

"তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি ধাই
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু,
কোথা বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু যে ধরে মৃত্যুর রূপ,
দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ
আপনার পানে চাই।"
"ফুরোয় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চ'লে আলোকে।"
"মরণকে তুই পর করেছিস ভাই
জীবন যে তোর তুচ্ছ হ'ল তাই।"

ভগবানের উপর বিশ্বাসের পাল তুলে দিয়ে জীবনতরীতে বসে কবি গানের পর গান গেয়ে গেছেন, আর সেই গানের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন তারি আলো, তারই আনন্দ। সেই আলোই জ্বলে যখন গাইঃ—

"আমার মরণ-বাঁচন ঢেউ-এর নাচন
ভাবনা কি যা তার,
তোমারে করি নমস্কার,
এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক
ফিরব না গো আর।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ভাণ্ডার ত আর ছোট নয়, সে এক বিরাট ব্যাপার। এই বিরাট ভাণ্ডারে রয়েছে কত অসংখ্য রকমের গান অসংখ্য ব্যঞ্জনা নিয়ে। এ যেন অন্তহীন পারাবারে এসে মিশেছে শত শত নদ-নদীর স্রোতধারা। এ এক অভিনব সৃষ্টি কবির। তাঁর গানে আমরা পাই জীবনের অনন্ত-দিকের সন্ধান, পাই কত না-জানাকে জানার সুযোগ। তাঁর সৃষ্টির মাঝে নেই কোনও সস্তার কারবার। আভিজাত্যের ঐশ্বর্যভরা তাঁর রচনা। জীবনের যাত্রাপথে রবীন্দ্র-নাথের গানকে আমরা সাথী রূপে পাই পাশে। আমাদের আনন্দে যে চলে আনন্দের ভরডালি নিয়ে। দুঃখে চলে সান্ত্বনার বার্তাবহ হয়ে, ব্যর্থতার শূন্য বুকে জাগিয়ে তোলে ফসল ফলাবার আশা। বন্ধনের মঝে এনে দেয় মুক্তির আস্বাদ, সংকটে শংকায় তুলেধরে তার শংকাহরণ জয়ধ্বজা, মৃত্যুর ভালে আঁকে অমৃতের জ্যোতির্লিখা। শেষের মাঝে শোনায় আমাদের অশেষের মহাবাণী। তাঁর গানে বার বার শুনি বাজে আহ্বানের সুর এগিয়ে চলার, শুনি সেই ডাক যে ডাকে রুদ্ধ-দুয়ার খুলে যায় অন্তরের অজানা ঘরের, প্রকাশ দেখি অপ্রকাশের...এমনতর আরও কত...কত যে আছে, তাঁরই গানের চরণ তুলে দিয়ে বলতে ইচ্ছে হয়—"শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে"—সঙ্গীতের রস-বৈচিত্র্যের আনন্দমেলায় গানে গানে নিজেকে বিকিয়ে দেবার মূল্যে পেয়েছি যা, তা রয়েছে এ জীবনের মণিকোঠায়। তার আলো নিবে যায় না। আমার সঙ্গীত-জীবনের যাত্রা পথে আলো দিয়েছে তার আলোকশিখা।

মানুষের সাধারণ জীবনের যতদিক আছে আর তার যত রকম অবস্থার অভিজ্ঞতা হতে পারে সে সমস্ত সম্বন্ধেই গান আছে রবীন্দ্রনাথের। বাদ পড়েনি তার একটিও। প্রত্যেকটিকে দেখা যায় যথা সময়, তার যথাস্থানে। তাই আমাদের মন সকল অবস্থায় আশ্রয় পায় তাঁর গানে। জীবনকে গানের মধ্য দিয়ে এমন করে উপলব্ধি করার অভিজ্ঞতা আর কোনও রচয়িতার গানে আমাদের হয়নি। আমাদের যুগে, আমাদের জীবনে এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। গান সম্বন্ধে তিনি আমাদের ধারণা বদলে দিয়েছেন।

বিধাতার বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ সকল দিকেই তিনি অসামান্য, বরেণ্য। কত গিয়েছি তাঁর কাছে। বসে গান শিখেছি, সেসব দিনের কত কথাই মনে পড়ে। তাঁর সান্নিধ্যে, কথাবার্তায়, হাসি গল্প রঙ্গ-রসিকতায়, অন্তরঙ্গতার কত অকৃত্রিম স্পর্শের মধ্য দিয়ে দিনের পর দিন কতভাবেই তাঁর কত পরিচয় পেয়েছি। দেখেছি ওই বিরাট ব্যক্তিস্বরূপের কত রূপই—এমন মার্জিতরুচির মূর্ত অভিব্যক্তি আর দেখলাম না। দেখিনি আর এমন একখানি সৌন্দর্যময়তার পরিপূর্ণ ছবি। ওঠা বসা থেকে আরম্ভ করে তাঁর চলা বলা, ভাবভঙ্গী আকার ইঙ্গিত, আচরণ, আহার বিহার—কোনও কিছুর মধ্যেই কোথাও এতটুকু কুরুচিকর, অশোভন, অসুন্দর বা অমার্জিত ইত্যাদি কুশ্রী শ্রেণীর কোনও জিনিস কখনও দেখা যায়নি—এ যে কতখানি অভাবনীয় ব্যাপার, ভাবলে তলিয়ে যেতে হয়। এতই আশ্চর্য রকমের সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন তিনি। এতই সৌন্দর্যপ্রিয় ছিল প্রকৃতি তাঁর। রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্র রচনা সবেতেই দেখতে পাই এই জিনিসটি—এই মার্জিতরুচির অপরূপ সুকুমার রূপটি। আর দেখতে পাই তাঁর সৌন্দর্যময় দৃষ্টি-ভঙ্গী। বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না যে, সুন্দর করে দেখতে রবীন্দ্রনাথই আমাদের শিখিয়েছেন। যেদিক দিয়ে তাঁকে দেখতে যাই—এমনকি অতি সাধারণ ছোটখাটো তুচ্ছ বিষয়েও যা সচরাচর মানুষের চোখে পড়ার কথা নয়, সে সব প্রত্যেকটিতেই এবং প্রত্যেক দিকেই তাঁর অসামান্যতা মনকে নাড়া দেয় অবাক করে দেয়। রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য বহুমুখী প্রতিভা যেমন আমাদের কাছে এক অপার বিস্ময়, তেমনি, মানুষ হিসেবে তাঁর বহুমুখী অসাধারণত্বও আমাদের আর এক বিস্ময়। কতবারই মন বলে ওঠে—

—তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি যে মহৎ—

ব্যভিচারিণী

হীরেন্দ্র নাথ দত্ত

বিয়ে হয়েছে সবে বছর খানেক, এরই মধ্যে স্বামী-স্ত্রীতে কয়েক দফা ঝগড়া হয়ে গেল। ঝগড়াটা অবশ্য শখের ঝগড়া। আসলে দুটিতে দিব্যি মিল, হাসি-খুশিতেই দিন কাটে। ঝগড়ার কোন সংগত কারণও নেই। নিত্যদিনের সংসারে কোন সমস্যা নেই। সংসার যেমন সচ্ছল, জীবনযাত্রা তেমনি মসৃণ। আয়-ব্যয়ের হিসাব নিয়ে খিটিমিটি বাধে না; একের ইচ্ছায়, অপরের অনিচ্ছায় সংঘাতও ঘটে না। তবু ঝগড়া বাধে। সুবিমলেরই দোষ বলতে হবে (অবশ্য আমি বলি গুণ)। ও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঝগড়া বাঁধায়। এক-আধটু খিটিমিটি না থাকলে জীবনে স্বাদগন্ধ থাকে না। অতিরিক্ত মিল গরমিলের মতই বিরক্তিকর।
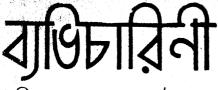
সুবিমল ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, কলকব্জা নিয়ে ওর কারবার। আমরা যারা কলকব্জার মর্ম বুঝিনে তাদের কাছে এর আকৃতি-প্রকৃতি এত বেশী জটিল যে, একে বাগ মানিয়ে, তোয়াজ করে একে দিয়ে কাজকর্ম করানো আমাদের কাছে অসম্ভব মনে হয়। কিন্তু যারা এর স্বভাব একবার বুঝে নিয়েছে তাদের কাছে কলকব্জার মত এমন সহজ সরল একান্ত বশংবদ আর কিছু নেই। কারণ, এর ক্রিয়াকলাপ একেবারে বাঁধাধরা, এতটুকু এদিক-ওদিক হবার জো নেই। অবশ্য সময় সময় যন্ত্রও যে না বিগড়ায় এমন নয়, কিন্তু ওর রহস্য যন্ত্রবিশারদের জানা আছে বলেই ওর মান ভাঙাতে বেশী বেগ পেতে হয় না। কিন্তু রত্নমালাকে ঘরে আনার পর থেকে সুবিমল বুঝেছে, এ যদি একবার বেঁকে বসে তবে তার মন পাওয়া বড় কঠিন। এটা তার কাছে খুব অদ্ভুত ঠেকেছে। কল যদি বিকল হয়, তাকে সচল করার কাজে ইঞ্জিনিয়ারের স্বাভাবিক উৎসাহ, সেখানে তার নৈপুণ্যের প্রকাশ। কিন্তু ঘরে অভিমানিনী যখন বেঁকে বসেন তখন ইঞ্জিনিয়ারের যান্ত্রিক-নৈপুণ্য কোন কাজে লাগে না। অথচ এর মধ্যেও একটা রোমাঞ্চ আছে; কারণ, যেখানে বিঘ্ন সেখানেই বৈজ্ঞানিকের আগ্রহ। সুবিমল অবাক হয়ে ভাবে 'লৌহগলন শৈলদলন অচলচলন' মন্ত্র তার জানা আছে, কিন্তু ঘরে ওই কুসুমকোমলাকে বাগ মানাবার শক্তি তার নেই! ব্যাপারটা যতই অদ্ভুত ঠেকে, অভিমানিনীর অভিমানকে সে ততই উদ্দীপ্ত করে দেয়। অবশ্য এ রাগারাগির খেলায় প্রথম দিকে রত্নমালারও প্রশ্রয় ছিল অর্থাৎ যত সহজে রাগত তত সহজে রাগ মিটাতে চাইত না।

কারখানার কলকব্জা, ঘরে ডিটেকটিভ গল্প—এতকাল এই ছিল সুবিমলের নেশা। ডিটেকটিভ গল্প পড়ে পড়ে ওর ধারণা হয়েছিল, কলকব্জার স্বভাবে আর মানুষের স্বভাবে খুব একটা তফাত নেই। দুটোতেই জট পাকায় কিন্তু ফন্দি-ফিকির জানা থাকলে জট ছাড়ানো কঠিন নয়। প্লটের জট ছাড়ানো আর বিকল কল শোধরানো—দুটোতেই তার সমান উৎসাহ। রত্নমালা এসে অবধি ওর ডিটেকটিভ গল্প পড়া নিয়ে খুব হাসছে। ও নিজে সবে কলেজ ছেড়ে এসেছে, দেশী-বিদেশী গল্প-উপন্যাসের নামাবলী ওর মুখস্থ। সুবিমলকে বলে, ওসব ছাইপাঁশ ছেড়ে এ কালের জিনিস এক আধটু পড়ে দেখ। কোন নেশাই সহজে কাটে না, এমন যে নিরীহ নেশা—ডিটেকটিভ গল্প—তাও কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। তথাপি স্ত্রীর আগ্রহে সুবিমল এখন মাঝে মাঝে অন্যবিধ গল্পের রসাস্বাদন করে দেখছে। কিন্তু হাল আমলের ইংরেজী বাংলা বইয়ে নমুনা দেখে বেচারী একেবারে বিভ্রান্ত। ডিটেকটিভ গল্পে ক্ষণে ক্ষণে ভয়ংকর রকম রোমাঞ্চকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তা হলেও সেখানে মানুষগুলো খুব একটা জটিল

স্বভাবের নয়। কিন্তু এখানে?—এই যেসব লোক ঘরে বসে গল্পগুজব করছে, রাস্তায় ঘাটে, ট্রামে বাসে চলছে, হাট বাজার, আপিস আদালত করছে এরা যে দেখছি ঢের বেশী জটিল প্রকৃতির মানুষ। স্ত্রী পুরুষ সবাই সমান—এদের মতিগতি বোঝা দায়। বাইরে থেকে দেখতে দিব্যি স্বাভাবিক কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঠিক স্বাভাবিক নয় অর্থাৎ এরা নিজ নিজ স্বভাব অনুযায়ী চলে না। যা ভাবে তা বলে না, যা বলে তা করে না, যা করে তার দায়িত্ব স্বীকার করে না। এতকাল যেসব মানুষকে সে দেখে এসেছে, যাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছে এখন তাদেরও কেমন অপরিচিত মনে হচ্ছে। এই যে রত্নমালা—হাসি-খুশী উজ্জ্বল প্রকৃতির মেয়েটি, অতিশয় সরল-প্রাণ, দেখলে মনে হয় না কোনরকম ঘোরপ্যাঁচ আছে। কিন্তু সত্যি কি তাই? সুবিমলের মনে খুব একটা খটকা লেগেছে। এসব বইতে যা লিখেছে তাই যদি সত্য হয় তবে তা কাউকেই চিনবার জো নেই। প্রত্যেকটি মানুষই এককেটি মুখোশ পরে বসে আছে। মেয়েদের বেলায়ও তাই। বোকা মানুষদের মত সেও ভাবত রমণীর রূপে প্রসাধনের সৃষ্টি, এখন বুঝেছে রমণীর রূপে গোপন সাধনার সৃষ্টি। প্রত্যেক রমণীর একটা কিছু গোপন রহস্য আছে। কেউ সে রহস্যটি স্বামীর কাছ থেকে সযত্নে গোপন রেখেছে, কারো বা গোপন রহস্য স্বামী হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছে। কিন্তু তাই বলে এদের প্রতি তার যে কোনপ্রকার বিতৃষ্ণা জন্মেছে এমন নয়, বরং মনে মনে স্বীকার করতে হয়েছে, এর ফলে এদের আকর্ষণ একটু যেন বেড়েছে অর্থাৎ গোপনতা এদের রমণীয়তাকে বাড়িয়েছে। লোকে নারীকে বলেছে ছলনাময়ী—সে কি নিন্দের কথা? নিন্দে হবে কেন? ছলনাই নারীর শ্রেষ্ঠ ভূষণ। নারী যদি ছলনাময়ী না হত তবে সে ভালোবাসার অযোগ্য হত। আগে কোন কালে এসব কথা ভাবে নি, এখন সুবিমল প্রায়ই ভাবে—এই যে সুন্দরী রমণীটি তার ঘরে এসেছে, বলতে গেলে এর গোটা জীবনের ইতিহাসই তার কাছে অজানা। ওর জীবনে কি কোন গোপন রহস্য নেই? সুবিমলের ভারি জানতে ইচ্ছে করে।

এখন তা হলে বলি, ওদের ঝগড়াটা আসলে এই নিয়েই। সুবিমল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে নানা কথা জিজ্ঞেস করে। রত্নমালা প্রথম প্রথম রাগত না, বেশির ভাগ সময় হেসে হেসেই জবাব দিত। মাঝে মাঝে কথনো ভুরু কুঁচকে, কপট ক্রোধ প্রকাশ করে বলত, কি সব আজে-বাজে বকছ। সুবিমল বলত, কেন, এতকাল ইস্কুলে কলেজে পড়লে—কারো সঙ্গে ভাবটাব হয় নি? হওয়াই তো স্বাভাবিক। রত্নমালা বলত, তাই যদি হত তা হলে তোমার ঘরে না এসে তার ঘরেই যেতাম। ...মিনিট কথা কাটাকাটি হয়েই থেকে যেত, বিতন্ডা বেশী দূর এগোতো না। কোন কোন দিন রত্নমালা একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলে উঠত, নিত্য এক কথা, তোমার কি আর কোন কথা নেই? প্রসঙ্গটা ওখানেই চাপা পড়ত।

কিন্তু দু দিন আগে ঐ পুরোনো কথা নিয়েই দুজনের মধ্যে সত্যি সত্যি ঝগড়া হয়ে গেল। রত্নমালা রীতিমত রাগ করেই বলল, তোমাকে কতদিন না বলেছি ওসব ছাইপাঁশ কক্ষনো আমার কাছে বলবে না।

এসব রসিকতা আমার ভালো লাগে না। ওর রাগ দেখে সুবিমল একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। বললে, বেশ, ভাল না লাগলে বলব না; কিন্তু ভাল লাগাবার জন্যেই বলেছিলাম। সত্যি বলছি, তোমাকে, এক আধটু গোপনতা না থাকলে মেয়েদের মাধুর্য ঠিক খোলে না। রত্নমালা বলে, হ্যাঁ, তোমাদের জানতে আর বাকি নেই। সত্যি সত্যি গোপন কিছু যদি থাকত তা হলে আর মধুর ঠেকত না। পুরুষ মাত্রই কাপুরুষ। সুবিমল বলল, আমি বীর-পুরুষও নই, কাপুরুষও নই। আমি লোভী পুরুষ। কথাটা কি জান, আমি যাকে গোপনতা বলছি ওটা মেয়েদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সের মতো. এতে তোমাদের মূল্য বাড়ে। ঐ মূল্যটুকুর প্রতি আমার লোভ। রত্নমালা বলে, থাক আমার আর মূল্য বাড়াতে হবে না। দুর্মূল্য মেয়ে—তোমরা যাকে বল woman with a past—তা বেশ, যেমন চেয়েছিলে তেমনটি খুঁজে পেতে আনলেই পারতে। সুবিমল বলল, past তো সবারই আছে—তোমারও আছে, আমারও আছে। রত্নমালা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, আছে বই কি, তোমার কথা জানিনে; নিজের কথা বলতে পারি, আমার অতীতে আর বর্তমানে কোন বিরোধ নেই। বলে রাগের মাথায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবার সত্যি সত্যি চটেছে।

স্বামীর সঙ্গে কথা বন্ধ। সুবিমলের কথার জবাব হয় নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে না হয়তো হুঁ হাঁ ইত্যাদি ক্ষীণতম শব্দ প্রয়োগে সম্পন্ন হচ্ছে। রাত্তিরে অনেক করেও সুবিমল অভিমানিনীর মান ভাঙ্গাতে পারে নি। সুবিমল যথার্থই অনুতপ্ত; স্থির করেছে এ প্রসঙ্গ আর কোন দিন সে উত্থাপন করবে না। পরদিন চায়ের টেবিলে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ। বলল, স্বীকার করছি, ঘাট হয়েছে, এবার প্রসন্ন চিত্তে মার্জনা কর। যাকে রূপ রসের ভাণ্ডার করে ঘরে এনেছি সে যদি বিরূপ হয়, বিরস মুখে বসে থাকে তবে তো ঘরে থাকাই দায়। রত্নমালা ঠেস দিয়ে বলে, ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, রস আর রসিকতা যে এক নয়, সেটা বুঝতে সময় লাগবে। সুবিমল হেসে বলল, অপবাদটা শিরোধার্য করে নিচ্ছি। বুঝতে পেরেছি, অরসিকের কাছে রসের নিবেদন যতখানি হাস্যকর, অরসিকের মুখে রসের চর্চা ততখানি বিপত্তিকর। এই হলপ করে বলছি, ঐ দুঃসাধ্য চেষ্টা কোন কালে আর করব না। হাস্য বিনিময়ে শান্তি স্থাপিত হল। পরে রত্নমালা নিজেই লজ্জিত বোধ করেছে, অতটা না করলেও হত।

ঝগড়া মিটিয়ে নিয়ে গৃহশান্তি কায়েম করবার জন্যে সুবিমল প্রস্তাব করেছে কারখানা অঞ্চল ছাড়িয়ে কোন নির্জন বনাঞ্চলে গিয়ে সারা দিন কাটিয়ে আসবে। ভোজ্যবস্তু সঙ্গে থাকবে, দুজনে হাত মিলিয়ে রান্না করবে, খাবেদাবে, গল্প করবে। রত্নমালা রাজী, ঝগড়া মিটে যাওয়াতে সেও খুশী। চানটান সেরে গাড়ি নিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। লোকালয় ছাড়িয়ে বহু দূরে যেখানটায় এসে থামল সেখানে বিস্তীর্ণ শালবন। জায়গাটা ওদের চেনা, আগেও দু' একবার এখানটায় ওরা ঘুরে গিয়েছে। অতি মনোরম স্থান। শালবনের পাশ ঘেঁষে পাহাড়ী নদীর ক্ষীণ স্রোত বয়ে যাচ্ছে। চারিদিক স্তব্ধ, তারই সঙ্গে তাল রেখে চঞ্চলা তটিনীরও গতি শিথিল হয়ে এসেছে। রত্নমালা বলল, কী ভয়ংকর নির্জন। সুবিমল বললে, এই ভালো, যেখানে জন-মানব নেই অর্থাৎ সমাজ নেই সেখানে কোন গোপনতা নেই, কাজেই ঝগড়াও নেই। রত্নমালা বলল, হ্যাঁ, গোপনতা নেই তার মানে স্ক্যাণ্ডেল নেই। সুবিমল বলে, ঠিক বলেছ, কিন্তু স্ক্যাণ্ডেল নেই বলে মাধুর্যও নেই। দুজনেই হেসে উঠল। তোমার ঘুরে ফিরে ঐ এক কথা। নাও, এবার জিনিস-পত্তরগুলো গাড়ি থেকে নামাও, আমি রান্নার যোগাড় দেখি, বলে রত্নমালা ঘুরে ফিরে চারদিকটা একবার দেখে নিলে। পছন্দমত একটা জায়গা বেছে নিয়ে রত্নমালা কেরোসিন স্টোভে রান্না চাপিয়ে দিলে। সুবিমল পাশে বসে এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে, গল্প করছে। তাতে কাজ যে খুব এগোচ্ছে এমন নয়। রত্নমালা বলে, ফোড়ন যা দরকার আমি সঙ্গেই এনেছি, তোমার আর ফোড়ন দিতে হবে না। সুবিমল বলে, স্বাদ যদি হয় তো আমার ফোড়নেই হবে। বনভোজনে ভোজনটা উপলক্ষ্য, আয়োজনের আনন্দটাই বড়। রান্না সংক্ষিপ্ত; কিন্তু মনে যখন তাড়া থাকে না, হাতের কাজ তখন গড়িমসি করে চলে। তাইতেই যা সময় লাগল, নইলে কখন শেষ হয়ে যেত। তাও শেষ হয়ে এল। রত্নমালা বললে, নাও, ঢের কাজ করেছ, এবার নদীর জলে মুখ হাতটা গিয়ে ধুয়ে এস। আমি বাকিটুকু করে ফেলি।

সুবিমল ফিরে এসে বলল, যাও, এবার তুমিও একটু মুখে চোখে জল দিয়ে ঠাণ্ডা

গরম লাগছে, গাটা মুছে আসি। বলে রত্নমালা উঠে পড়ল। ততক্ষণ তুমি একটু নজর রেখো, পাখিটাখিতে খাবারগুলো নষ্ট না করে। আমি এই এলাম বলে—

পূর্ববঙ্গের মেয়ে, ওদিকে সে যে সব নদী দেখেছে এ নদী একেবারেই সেরকম নয়। তার সঙ্গে তুলনা করতে গেলে একে নদী বলাই চলে না, নদীর অপভ্রংশ। দু ধারে পাথুরে মাটি, তারই মাঝখান দিয়ে শীর্ণ স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ক্ষীণকায় কিন্তু তাই বলে ক্ষীণপ্রাণ নয়। ভারি জীবন্ত মূর্তি। এর বিশেষ একটি রূপ আছে—একটি যেন আটসাঁট, সবলপেশী, দীর্ঘদেহী পাহাড়ী বালকের মত দেখতে। তার পরিচিত সব নদীর এমন বিশাল মূর্তি, তাদের সঙ্গে সখ্য চলে না কিন্তু এর সঙ্গে দিব্যি ভাব করা যায়। ঢালু পাড় বেয়ে রত্নমালা নিচে নেমে এল। এমন টলটলে জল, দেখেই রত্নমালার লোভ হয়েছে। কত কাল সে জলে নেমে চান করে নি। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল—পুকুরে নেমে ঝাঁপাঝাপি করে সাঁতার শিখেছিল। আজ কত বছর সে বিদ্যের আর পরীক্ষা হয় নি। এখন ভয়ংকর রকম শহুরে কেতা-দুরস্ত মেয়ে। জলের নামে ভয় পাবার কথা। সে ভয় অবশ্য ওর নেই, আর জলও বেশী নয়। অগভীর জলের তলাটুকু দেখা যায়। রত্নমালা খানিকক্ষণ জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে রইল। চারিদিক নিঝুম, শুধু মৃদুগতি নদীস্রোতে একটি অস্ফুট আমন্ত্রণ উচ্চারিত। হঠাৎ রত্নমালা এক কাণ্ড করে বসল। শাড়ি ব্লাউজ সায়া খুলে ফেলে এলো চুল মাথায় জড়িয়ে নিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শীতল জলের স্পর্শে শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাত পা ছুঁড়ে একটু সাঁতার কাটবে কিনা ভাবছে, হঠাৎ এক গভীর লজ্জায় তার সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এমন ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে কে তাকে জড়িয়ে ধরেছে! তার সম্পূর্ণ নিরাবরণ দেহটিকে কার হাতে সে একান্তভাবে সমর্পণ করেছে? নিস্তরঙ্গ জল সর্বদেহ ঘিরে তাকে যেভাবে অধিকার করেছে তার স্বামীও কোন দিন এমনভাবে তাকে অধিকার করে নি। প্রতি রোমকূপে কার অনুপ্রবেশ! কি এক আবেশে তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এসেছে। কী লজ্জা, কী লজ্জা! পরমুহূর্তে যেন কার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে ও জল থেকে উঠে এল। তীরে ওঠা মাত্র আলো বাতাসের আলিঙ্গন। রত্নমালা আরেকবার সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল। উঃ, সকলে মিলে ওকে যেন লুটে নিতে চাইছে। আলো বাতাস জলকে সে শ্রান্তি ক্লান্তি গ্লানিহর বলেই জানত, এদের যে এমন আসঙ্গলিপ্সা কে কবে ভেবেছিল। চটপট গা মুছে নিয়ে নিরাবরণ দেহকে আবৃত করে নিল। তবু তার লজ্জা যায় না; এ লজ্জা সে কি দিয়ে ঢাকবে। শুধু লজ্জা নয়, ভয়। গোপনে কী যেন এক বিষম অপরাধ করে ফেলেছে।

বেশ বুঝতে পারছে তার বিলম্ব দেখে সুবিমল এতক্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তথাপি দ্রুত চলতে পারছে না, খুব আস্তে আস্তে ভাবতে ভাবতে চলেছে। দূরে থেকে দেখেই সুবিমল চেঁচিয়ে বলতে লাগল, এ কি, কত দেরি করলে, খাবার-টাবার সব যে ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল। তোমার খিদে পায় নি, আমার তো পেয়েছে। রত্নমালা অপরাধীর মত কাছে এসে বলল, হ্যাঁ, বড্ড দেরি হয়ে গেল। সুবিমল হঠাৎ কি ভেবে খানিকক্ষণ ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। রত্নমালা চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, অমন করে কি দেখছ? সুবিমল হাসিমুখে তেমনি একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, তোমাকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে। রত্নমালার সারা মুখে কে যেন আবীর ছড়িয়ে দিলে, মনে হল অভিসারিণীর গোপন রহস্য, তার আসঙ্গলীলা, স্বামীর চোখে ধরা পড়ে গিয়েছে।

নব জর্মানীর নির্মাতা

পশ্চিম জার্মানীর প্রাক্তন চ্যান্সেলর কনরাড আডেনাওয়ার গত ১৯ এপ্রিল মারা গিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর।

ডাঃ কনরাড আডেনাওয়ারের সম্বন্ধে স্যার উইনস্টন চার্চিল বলেছিলেন যে, "এই গ্র্যান্ড ওল্ড ম্যানটি বিসমার্কের পরেই জার্মানীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ।" তাঁকে দেখে স্বর্গীয় কেনেডী বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁরই মধ্যে রাষ্ট্রপতি দ্য গল পেয়েছিলেন একাধারে বন্ধু ও ফ্রান্স-জার্মান মৈত্রীর প্রতিষ্ঠাতার পরিচয়। দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধরে পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৯৬৩ সালে ডাঃ আডেনাওয়ার অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর বিদায়কালীন সম্ভাষণে সম্মিলিত জার্মান সংসদ, বুন্ডেস টাগের অধ্যক্ষ গ্যারস্টেন মায়রার বলেন, "ডাঃ আডেনাওয়ার জার্মানীর পুনর্জন্ম দিয়েছেন। জার্মানীর ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্থায়ী স্বাক্ষর রাখবে।"

এই ব্যক্তির নামের সংগে পশ্চিম জার্মানীর গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও ঔদ্যোগিক বিকাশ ও জার্মানীর বহুমুখী প্রগতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সেখানে তাঁর নাম চিরস্থায়ী হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভস্মীভূত জার্মানীতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে পুনর্জীবিত তিনিই করেন। বলা বাহুল্য যে, এই মহান প্রচেষ্টার ফলে বিরোধী দলও তাঁকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হত। এ কথাও বলা চলে যে, আডেনাওয়ার-নীতির জন্যই পশ্চিম জার্মানী আজ শুধু অর্থনৈতিক ও ঔদ্যোগিক ক্ষেত্রেই বিস্ময়জনক উন্নতি করে নি, সে বিশ্বরাজনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে।

"আত্মার ও দেহের সম্পূর্ণ শক্তিকে কর্মে প্রয়োগ করা এবং আদর্শকে সামনে রেখে ব্যক্তিত্ব বিকাশের চেষ্টা করাই হল মানব-জীবনের লক্ষ্য।" এই উক্তির দ্বারাই ডাঃ আডেনাওয়ার তাঁর জীবনাদর্শ পরিস্ফুট করেছেন। তাঁর অদম্য ইচ্ছা ও কর্মশক্তির বলে রাজনৈতিক সংগ্রামের সম্মুখীন হতে তিনি কোনো দ্বিধা করেন নি। বস্তুত বিরোধী দলের মীমাংসা-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে তিনি কখনই পশ্চাৎপদ হন নি। তিনি জানতেন, পারস্পরিক সমালোচনার দ্বারা জ্ঞানের ক্ষেত্রই উন্মোচিত হয়। বিরোধী দলের বাক্যবাণ তাঁকে বড় বিদ্ধ করতে পারত না, বরং তাঁর বাকচাতুর্য ও বাগ্মোক্তিতে বিরোধীরাই অপ্রতিভ হতেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য হল এই যে, রাজনৈতিক শক্তির ব্যবহার তিনি উপযুক্তভাবে করেছেন। প্রায়ই দেখা গেছে যে, রাজনীতিজ্ঞের কর্মক্ষেত্রের সংগে আন্তরিক যোগ নেই, শাসনক্ষমতা হাতে পেলেও তাঁর সাফল্য পূর্ণতা পায় না। আডেনাওয়ার সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। যদিও তিনি প্রায়ই স্বীয় মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যুক্তিতর্কের কঠোরতা অবলম্বন করতেন, কিন্তু তিনি কোনো ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি।

১৮৭৬ সালের ৫ই জানুয়ারী কোলন নগরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে আডেনাওয়ার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ন্যায় বিভাগের সাধারণ কর্মচারী। বন, ফ্রাইবুর্গ ও মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আডেনাওয়ার আইন ও অর্থনীতি অধ্যয়ন করেন। সহকারী বিচারক হিসাবে তিনি কোলনের নাগরিক আদালতে প্রবেশ করেন। ১৯০৬ সালে তিনি কোলন পৌরপ্রতিষ্ঠানের সদস্য ও ১৯১৭ সালে মেয়র নির্বাচিত হন। তৎকালীন ক্যাথলিক সেন্ট্রাল পার্টিরও তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন। জার্মান সাম্রাজ্যের যখন পতন হয়, তখন ইনিই বলেছিলেন, "রাজনৈতিক দুর্দিন নবীন পথেরই প্রদর্শক।" ত্রিশ বছর পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানীর পতনেও আডেনাওয়ারের উক্ত উক্তি ভবিষ্যৎবাণীর মতই শোনায়।

জার্মানীতে যখন হিটলারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আডেনাওয়ার প্রথম শ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে গণ্য হতেন। তখনকার দিনে তিনি শুধু কোলন পৌর-

নেহরু ও আডেনাওয়ার বন, ১৯৬১

প্রতিষ্ঠানের মেয়রই ছিলেন না, জার্মান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বার্লিনের শাসকদের চেয়েও প্রভাবশালী, তৎকালীন প্রুশীয় রাষ্ট্রীয় সংসদের অধ্যক্ষ এবং জার্মান প্রধানমন্ত্রীর পদের একজন প্রার্থী হিসাবে গণ্য হতেন। জার্মানীর সর্বত্র তাঁর সুনাম ছিল। ১৯৩৩ সালে হিটলার আডেনাওয়ারকে "অবিশ্বাসী ও অযোগ্য" আখ্যা দিয়ে তাঁর সমস্ত পদগুলি থেকে বিচ্যুত করেন। আডেনাওয়ার কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে বলেছিলেন, "জার্মানীর মতো সংস্কৃতিসম্পন্ন বিশাল দেশের জন্য গণতন্ত্রই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা।" পদচ্যুত রাজনীতিবিদ আডেনাওয়ারের রাজনৈতিক জীবনই যে অশান্ত ছিল তা নয়, সেই সঙ্গে বিপন্নও ছিল। নাৎসী গোয়েন্দা তাঁর প্রতিটি গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখত। ১৯৩৪ সালে হিটলারের বিরোধীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আডেনাওয়ার বন্দী হন। দ্বিতীয়বার ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে হিটলারকে হত্যা করার পরিকল্পনা সফল না হওয়ায় অসংখ্য জার্মান রাজকোপে পড়েন। ঐ সময় তাই আডেনাওয়ার আবার বন্দী হন হিটলারের যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধ মনোভা

তিনি গোপন করেন নি। ফলে, দ্বিতীয়বার বন্দী হবার পর তাঁর মৃত্যুদণ্ডই ছিল অবধারিত। কিন্তু তিনি কোনোপ্রকারে বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত মারিয়ালাখের গির্জায় আত্মগোপন করেন।

যুদ্ধের পর কনরাড আডেনাওয়ার খৃষ্টধর্মের উভয় শাখার বিশিষ্ট বিশ্বাসীদের মিলিত করে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন পার্টির স্থাপনা করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্টদের মিলনকে পশ্চিম জার্মানীর সকল স্তরের মানুষই স্বাগত জানিয়েছিল। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, পশ্চিম জার্মানীর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আডেনাওয়ারের নেতৃত্বে উক্ত দলটি নিরঙ্কুশ বহু মত অর্জন করে। পশ্চিম জার্মানীতে সঙ্ঘীয় জার্মান গণরাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ছিলেন সংসদীয় কাউন্সেলের সভাপতি। ১৯৪৯ সালে ১৫ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম জার্মানীর সঙ্ঘীয় সংসদ বুণ্ডেস টাগ ৭৩ বর্ষীয় ডাঃ কনরাড আডেনাওয়ারকে সঙ্ঘীয় জার্মান গণরাজ্যের প্রথম প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করেন। সেদিন বিধ্বস্ত জার্মানীর পটভূমিকায় আডেনাওয়ার এক কিংকর্তব্যবিমূঢ় জাতির ভাগ্যের পুনর্নির্মাণের যে গুরুভার গ্রহণ করেছিলেন তা দীর্ঘ চোদ্দ বছর ধরে নিষ্ঠা ও পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পালন করেছেন।

গৃহনীতির ক্ষেত্রে আডেনাওয়ার যেখানে খৃষ্টধর্মের উভয় শাখার মিলন সাধন করেছিলেন, বিদেশনীতিতেও তেমনি একটি স্পষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, গণতান্ত্রিক পশ্চিম জার্মানী পুনরায় বিশ্বের স্বতন্ত্র দেশগুলির সঙ্গে সমান ও সম্মানের স্থান অধিকার করে। সেদিনের পক্ষে এ কাজ খুবই কঠিন ছিল। এই লক্ষ্য পূর্তির জন্য প্রথমে প্রয়োজন ছিল গণতান্ত্রিক মূলাধারে প্রতিষ্ঠিত দেশের আভ্যন্তরীণ স্থিরতা। কিন্তু দীর্ঘ ১২ বছর ধরে হিটলার জার্মানীর যুবকদের যেভাবে পথভ্রষ্ট করেছিলেন তার প্রভাবে বিদেশে জার্মান ও জার্মানীর নামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সাহস ও ধৈর্যসাপেক্ষ ছিল। সেইজন্য নাৎসীবিরোধী ডাঃ আডেনাওয়ার তাঁর ব্যক্তিগত সুনামকে একটি নতুন রাষ্ট্রের নির্মাণের জন্য "মূলধন" হিসাবে ব্যবহার করেন। নিজের প্রতিভা ও ধৈর্যের বলে তিনি তখনকার জার্মান-বিজেতাদের সঙ্গে জার্মানীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করে আস্থা অর্জন করেন। ক্রমশ মিত্রশক্তির সহযোগে তিনি সঙ্ঘীয় জার্মান গণরাজ্যের রূপরেখাকে বাস্তবে পরিণত করেন। ১৯৫৫ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘীয় জার্মান গণরাজ্য সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করে। প্রতিরক্ষার খাতিরে পশ্চিম জার্মানী পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে থাকা স্থির করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মান রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ডাঃ আডেনাওয়ারের মস্কো সফর। এই ভ্রমণের ফলে দশ হাজার জার্মান যুদ্ধবন্দী সোভিয়েত দেশের থেকে স্বদেশে ফিরতে সক্ষম হন।

পশ্চিম জার্মানীতে আডেনাওয়ারের শাসনকালকে স্বর্ণযুগ বলা চলে। তাঁর নেতৃত্বে এই দেশ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যে প্রগতি করেছে, তা শুধু বিস্ময়জনকই নয়, বিশ্ব-ইতিহাসে বিরল। এই কীর্তির মধ্যেই নব-জার্মানীর নির্মাতা ডাঃ আডেনাওয়ারের নাম চিরস্থায়ী হয়েছে।

১৯৬৩ সালে ৮৭ বর্ষীয় আডেনাওয়ার চ্যান্সেলার পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাজনীতি থেকে অবসর নেন নি। তাঁর মতে, পশ্চিম জার্মানী এখনও বহু সমস্যায় জর্জরিত; এখনও মূলে সমস্যারই সমাধান হয় নি। এইজন্য তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন।

রাধেশ্যাম পুরোহিত
বন, জার্মানী

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জন্মদিনের কথায় বলেন : তাঁর জন্মদিনে কেউ যেন কোন উপহার না দেন, একান্তই যদি কেহ কিছু দিতে চান তবে সেটা যেন হয় শুধু

ফুল। শ্যামলাল কবিতায় মন্তব্য করিল—"পুষ্প দিয়ে মার যারে চিনল না সে মরণকে!"

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জী নববর্ষের দিনে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন : এই ধরনের যে-কোন দিন হইল আদর্শের প্রতি আনুগত্য জানাইবার দিন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"ট্রামে বাসের সাধারণ যাত্রীরা কিন্তু বছরের প্রথম দিনটায় একটু ভালো-মন্দ খাওয়ার প্রতি আনুগত্যই এতদিন জানিয়ে এসেছেন কিন্তু সেটা যখন আর সম্ভব নয়, তখন সুতরাং কাজে কাজেই!!"

সংবাদে শুনিলাম চীন নাকি আত্মগোপনকারী নাগাদের হইয়া ওকালতিতে প্রকাশ্যে নামিয়াছেন।—"অপ্রকাশ্যে ব্যারিস্টারিতে পাকিস্তান অনেক আগেই নেমেছে"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

রাষ্ট্রপতি পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে ডঃ রাধাকৃষ্ণনের আদর্শের অনুসরণ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইবার জন্য নাকি কেহ কেহ ডঃ জাকির হোসেনকে অনুরোধ করিয়াছেন। অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"বুঝলাম ডঃ রাধাকৃষ্ণনের আদর্শটা সর্বজনগ্রাহ্য নয়!!"

দিল্লীতে পুলিসরা সম্প্রতি ধর্মঘট করিয়াছেন।—"পুলিস ধর্মঘট করলে সাধারণ ধর্মঘট ভাঙবার জন্য অতঃপর ডাকতে হবে আরক্ষকদের, সে-ও পুলিস তবে চামড়ায় বাঁধাই সংস্করণ"—বলে শ্যামলাল।

খাদ্যে স্বয়ম্ভর হইবার জন্য দুইজন মার্কিন সেনেটর ভারত সাহায্য সংস্থা ও অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রকে দিয়া ভারতের উপর চাপ দেওয়ার পরামর্শ দিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"অন্ন স্বয়ম্ভর হওয়ার জন্য অবশ্য স্বয়ংবর প্রস্তাবটা পাকিস্তান আগেভাগেই করে রেখেছে!!"

পরীক্ষার খাতার নম্বর যোগ এবং পরীক্ষা বিভাগের অন্যান্য কাজের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ষাট হাজার টাকা দিয়া একটি 'কমপিউটার' ভাড়া করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা কাজের পক্ষে সুবিধাজনক বিবেচিত না হওয়ায় ফেরত দিতে হইয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে ষাট হাজার টাকা গচ্চা দিতে হইয়াছে—"অর্থাৎ স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ই পরীক্ষায় ফেল করলেন।"

ডঃ রামমনোহর লোহিয়া কিছু সংখ্যক পুলিস এবং জনগণকে দিয়া চারটি শপথ বাক্য গ্রহণ করান, সেগুলি হইল : (১) আমরা পরস্পরকে পীড়ন করব না, (২) ঘুষ নেবো না, (৩) অপরাধীকে

ধরতে সাহায্য করব, (৪) সৎ ও নিরীহ ব্যক্তিদের সহজ জীবন যাপনে সাহায্য করব। শ্যামলাল বলিল : "শপথ বাক্যের মধ্যে অন্য একটি সংযোজন হলে ভালো হত, সেটি হল—আমরা আংরেজী হটাও আন্দোলনে যোগদান করব না!!"

রেল সপ্তাহ সমাপ্তি দিবসে রেলওয়ে দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপরিমল ঘোষ মহাশয় বলেন—রেলওয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার পক্ষে জনসাধারণের শুভেচ্ছা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, রেলওয়ের উচিত সকল প্রকারে এই লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য কাজ করা।—"কিন্তু জনসাধারণের সর্বাগ্রে দাবি হলো রেল স্টেশনে সময়মত পৌঁছানোর লক্ষ্য"।

বিদেশী চাটনি রপ্তানি করিয়া ভারত নাকি অনেক বিদেশী মুদ্রা অর্জন করিয়া থাকে। সহযাত্রী বলিলেন—"এবার চাট রপ্তানি করে দেখুন। চাট

যে-বস্তুর অনুপান তার তো নাভিশ্বাসই এখানে উঠেছে, সুতরাং ওটা বিদেশে চালান দেওয়াই ভালো।"

ট্রেন লেট বা অন্যান্য অনেক রকম অজুহাতে আজকাল প্রায়ই ট্রেন আটকের সংবাদ পাইতেছি। সহযাত্রী গল্প শুনাইলেন: জনৈক মুসলমান কবিয়াল হিন্দু জমিদারের বাড়িতে খেতে বসেছেন। চিরচরিত সংস্কার অনুযায়ী তাঁকে উল্টো কলাপাতায় ভাত বেড়ে দেওয়া হয়। কবিয়াল বললেন—বাবু, এত মা কালী তার হরির নাম করছি, কিন্তু আমার কপালে পাতাটা উল্টোই থেকে গেল। আমরাও বলি, জনগণের প্রতি এত অভিনন্দন জানালাম, কিন্তু আমাদের কপালে কথায় কথায় ট্রেন আটকটা আগের মতোই থেকে গেল।

ধান সংগ্রহের জন্য একটি নাটিকা লেখার নিমিত্ত নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহিত্যিকদের আহ্বান জানাইয়াছেন। সহযাত্রী বলিলেন—"নাটকের নাম 'ধোনা' রাখা যায় কিনা তা যেন সাহিত্যিকরা ভেবে দেখেন।"

সংবাদে প্রকাশ পাটনাতে মাধ্যমিক পরীক্ষার একজন গার্ডকে খুন করা হইয়াছে। সহযাত্রী বলিলেন—"মারি ত হাতী, লুটি ত ভাণ্ডার"।

অমঙ্গলবোধ ও রবীন্দ্রনাথ
শেষপর্বের কবিতা ৪

আবু সয়ীদ আইয়ুব

শেষ দশকের অন্য ধ্যেয় দেবতা রুদ্রনট-রাজ। গীতাঞ্জলি পর্বের কবিতাকে বলা হয়েছে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন; প্রতিতুলনায় শেষ পর্বের কবিতাকে বলা যেতে পারে শৈব-ভাবাপন্ন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ-সব উক্তি স্পষ্টতই শর্তাধীন। প্রথমত, গীতাঞ্জলি পর্বে যতখানি ভাবৈক্য পাওয়া যায় শেষ পর্বে (পরিশেষ থেকে শেষ লেখা পর্যন্ত) তা অনুপস্থিত ঃ সেই পর্বের শৈবত-সাধনার কথাই বর্তমান অধ্যায়ে আমার আলোচ্য। দ্বিতীয়ত, গীতাঞ্জলির ভাব বৈষ্ণব-ঘেঁষা হ'লেও ঠিক বৈষ্ণবীয় নয়। পদাবলীর সঙ্গে গীতাঞ্জলির সাদৃশ্য যতখানি, বৈসাদৃশ্য তার চেয়ে বেশি। তেমনি শেষ পর্বের ভাবের সঙ্গে কোনো প্রচলিত শৈব মতের মিল খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। বৈষ্ণবই হ'ন আর শৈবই হ'ন, রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই।

এই সময়ে যে-চিত্রটি রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে ফিরে ফিরে আসছে তা' অপ্রকাশ থেকে প্রকাশে উচ্ছ্রিত এবং প্রকাশ থেকে অপ্রকাশে বিলীন হ'য়ে যাওয়ার চিত্র—নীহারিকাপুঞ্জের সৃষ্টি ও প্রলয়ে যেমন, সভ্যতার উত্থান-পতনে তেমনি, তেমনি কোনো মহাকবির দেশজোড়া প্রতিষ্ঠা ও নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তিতে। নক্ষত্রসভায় এবং মানবসমাজে এ অন্তহীন বিরতিহীন চক্র-গতির কেন্দ্রবিন্দুটি কিন্তু স্থির ঃ

> মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।
> তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
> উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি,
> আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে।
> প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত-অব্যক্তের চক্রনৃত্য,
> তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
> তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে।
> হে নির্মম, দাও আমাকে ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।
> (শেষ সপ্তক—'সাত')

যে-দেবতার কাছে কবি দীক্ষা চাইছেন তিনি মানুষের প্রতি মমতাশূন্য; সৃষ্টিতে তাঁর যেমন আনন্দ বা নিরানন্দ, প্রলয়েও তেমনি। জড়জগতে ও প্রাণলোকে যে বিপুল 'অপচয়' ঘ'টে আসছে চিরকাল ধ'রে তাকে বলেছেন, "আপন সৃষ্টির 'পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়" নবজাতকের একটি কবিতায়।

এই দীক্ষার আর-এক রূপ প্রকাশ পেয়েছে শেষ সপ্তকের ২২ সংখ্যক কবিতায়। কবি নিজের রক্তমাংসের প্রাত্যহিক স্বরূপের প্রতি নির্মম হ'তে চান; তাঁর দেহ-মনকে অধিকার ক'রে আছে যে অনেক কালের বুড়ো, "কত যুগের ক্ষুধা ওর, কত তৃষ্ণা", তার গ্লানি-কর অস্তিত্বটাকে দূরে ঠেলে দিতে চান ঃ

> আমি আজ পৃথক হব।
> ও থাক ঐখানে দ্বারের বাইরে—
> ঐ বৃদ্ধ, ঐ বুভুক্ষু।
> আমি দেখব ওকে জানলায় ব'সে
> ঐ দূরপথের পথিককে * * *
> দেখব যেমন ক'রে পুতুল নাচ দেখি।

এখানে সন্ন্যাসী শিব এক হয়ে গেছেন নিজেরই অন্তরতম শুদ্ধতম সত্তার সঙ্গে—বেদান্তের পরিভাষায় যাকে 'সাক্ষী চৈতন্য' বলা যেতে পারে, কারণ একটু পরে ঐ কবিতায় 'আমি'র পরিচয় দিচ্ছেন পাকা বৈদান্তিকের মতো ঃ

> মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
> নিত্যকালের আলো আমি
> সৃষ্টি-উৎসের আনন্দধারা আমি,

কিন্তু তার পরেই যে কথাটা যোগ করলেন, কোনো বৈদান্তিক 'পরম-আমি' সম্বন্ধে সে কথা ভাবতে পারেন না। বলছেন—"অকিঞ্চন আমি"। 'আমি' যা কিছু ভালবাসি, ভোগ করি, যাতে আহত ও পীড়িত হই, পুড়ে মরি—সব কিছুই ছাড়ব, ছেড়ে একেবারে মুক্ত পুরুষ হ'য়ে যাব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বোধ করব—"অকিঞ্চন আমি আমার কোনো কিছুই নেই"। যে-কবি পরিপূর্ণ জীবনের ও সুন্দর ভুবনের জয়গান করেছেন বাল্য-কাল থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত, "এ দ্যুলোক
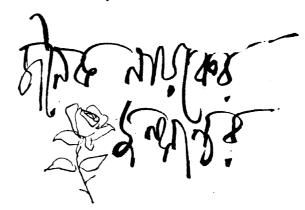
মধুময়, মধুময় এ পৃথিবীর ধূলি” যাঁর আদি ও অন্তিম মন্ত্র, তাঁর মুক্তি দূরে স'রে গিয়ে নয়। “অহংকারের প্রাচীর” ভাঙতে চাইবেন তিনি স্বভাবতই, কিন্তু বৈদান্তিক অর্থে নয়, বিশুদ্ধ বিমুক্ত আত্মা হয়ে যাওয়ার জন্যে নয়। “আমার কোনো কিছুই নেই”-এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে—সব কিছুই আমার, সব কিছু ভালোবাসি আমি, সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত হতে চাই, এক হয়ে যেতে চাই। সব কিছুকে ধ'রে রাখার এবং ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে, অনুরাগ ও নির্বেদের মধ্যে, রক্তমাংসের মানুষ ও শুদ্ধাত্মার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, সে দ্বন্দ্বের বোধ ও বেদনা, কবির, দার্শনিকের নয়। দ্বন্দ্ব এবং দ্বন্দ্বের জ্বালাই হয়ে ওঠে কবিতা; নৈর্ব্যক্তিক, নিরাসক্ত অনুসন্ধিৎসা থেকে জন্মলাভ করে দর্শন।

উপরে উদ্ধৃত কবিতাটি শুধু গদ্য ছন্দে নয়, প্রায় গদ্যেই লেখা। বন্ধন ও মুক্তির, অনুরাগ ও বৈরাগ্যের দ্বন্দ্ব সংশয়াতীত কবিতা হ'য়ে উঠেছে আকাশপ্রদীপের 'পঞ্চমী'-তে।—

ভাবি ব'সে ব'সে
গত জীবনের কথা
কাঁচা মনে ছিল
কী বিষম মূঢ়তা।
শেষে ধিক্কারে বলি হাত নেড়ে,
যাক গে সে-কথা যাক গে।

কবিতার একেবারে গোড়াতেই পরম বৈরাগ্য, যে বৈরাগ্যের কাছে তরুণ প্রেমের সব সুখ-দুঃখ নিছক মূঢ়তা ব'লে ঠেকবার কথা। কিন্তু কবিতার বক্তব্য মোটেই তা নয়। মূঢ়তা ব'লে নিন্দিত তরুণ বয়সের প্রেম নয়; প্রিয়াকে সম্পূর্ণ পাই নি ব'লে দুঃখ করাটা, যখন যেটুকু পেয়েছিলাম তাই নিয়ে খুশী না হওয়াটাই বিষম মূঢ়তা হয়েছিল।

তরুণ বেলাতে যে খেলা খেলাতে
ভয় ছিল হারবার,
তারি লাগি, প্রিয়ে, সংশয়ে মোরে
ফিরিয়েছ বার বার।

তখন এ ছলনাটা বড়ো দুঃখের মনে হয়েছিল, প্রচণ্ড নালিশ ছিল সেদিন—তুমি নিজের সবটুকু ভালবাসা অসংকোচে দাও নি কেন, কেন অহংকারের দেওয়াল ভাঙতে পারলে না। কিন্তু আজ—

পরিতাপে জ্বলি আজ আমি বলি,
সিকি চাঁদিনীর আলো
দেউলে নিশার অমাবস্যার
চেয়ে যে অনেক ভালো।

অথচ কবিতার শেষে কবি জানাচ্ছেন—বয়স গিয়েছে, এ সব ভেবে হাসিই পাচ্ছে এখন; একটু যেন অহংকার ক'রেই বলছেন :

দীর্ঘ পথের শেষ গিরিশিরে
উঠে গেছে আজ কবি।
সেথা হতে তার ভূতভাবিষ্য
সব দেখে যেন ছবি।
ভয়ের মূর্তি, যাহার সঙ,
মেখেছে কুশ্রী রঙ।
দিনগুলি যেন পশুদলে চলে
ঘণ্টা বাজায়ে গলে।
কেবল ভিন্ন ভিন্ন
সাদা কালো যত চিহ্ন।

কিন্তু এ অহংকারের ভিত বড়ো কাঁচা, ফ্রয়েডীয়রা যাকে বলেন 'ইচ্ছাপূরক কল্পনা', অনেকটা তাই। দর্প কিন্তু কবি নিজের হাতেই চূর্ণ করেছেন পূর্ববর্তী স্তবকে মুক্তকণ্ঠে মেনে নিয়ে যে বিগত দিনের কথা ভেবে আজো তাঁর অনুতাপ-পীড়িত হৃদয় হায় হায় ক'রে ওঠে :

আজ খুলিয়াছি
পুরানো স্মৃতির ঝুলি
দেখি নেড়েচেড়ে
ভুলের দুঃখগুলি।
হায় হায় একি, যাহা কিছু দেখি
সকলি যে পরিহাস।

আজো মন উতলা হয়ে ওঠে সেই বোকামির দিনগুলিকে ফিরে পাওয়ার জন্য—

"এসো ফিরে এসো সেই ঢাকা বাঁকা হাসি,
পালা শেষ করো আসি।

যদিবা—

মূঢ় বলিয়া করতালি দিয়া
যাও মোরে সম্ভাষি,

তবু আর একবার ফিরে এসো। যিনি উঠে গেছেন বৈরাগ্যের শেষ গিরিশিরে, যেখান থেকে গত জীবনের দিনগুলিকে কেবল সাদা-কালো পশুদলের মতো দেখাচ্ছে—এ তো তাঁর মনের কথা নয়।

এ সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও শেষ পর্বের রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক সাধনা ছিল সেই 'নির্মম' দেবতাকে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করার, যিনি পরম দ্রষ্টা, পরম সাক্ষী, অবিচলিত আনন্দপূর্ণ ধ্যানদৃষ্টি দিয়ে দেখছেন নক্ষত্ররাশির ভাঙাগড়া, মানবজাতির উত্থান-পতন—যেন সারা বিশ্ব জুড়ে অনাদ্যন্ত কাল ধ'রে এক সংঘাতমুখর সুখ-

দুঃখময় মহানাটকের অভিনয় চলেছে তারই সম্ভোগের জন্য। "অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল; সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্বানুভূতির অনবচ্ছিন্ন ধারা, নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করছি, যা ভোগ করছি, চারদিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্তে মুহূর্তে যা-কিছু উপলব্ধি চলেছে, সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে। অভিনয় চলেছে নানা নটকে নিয়ে, সুখদুঃখের নানা খণ্ডপ্রকাশ চলছে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবন-যাত্রায়; কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটা নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরম দ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্বানুভূঃ। এতকাল নিজের জীবনে সুখদুঃখের যে-সব অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলুম দ্রষ্টারূপে এক নিত্যসাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে। এমনি ক'রে আপনা থেকে বিবিক্ত হয়ে সমগ্রের মধ্যে খণ্ডকে স্থাপন করা মাত্র নিজের অস্তিত্বের ভার লাঘব হয়ে গেল। তখন জীবনলীলাকে রসরূপে দেখা গেল কোনো এক রসিকের সঙ্গে এক হয়ে।"(১)

এই একই অনুভূতির প্রকাশ আরোগ্য-এর ৯-সংখ্যক কবিতায়, সেখানেও কবি জীবন-লীলাকে দেখছেন কোনো রসিক পরম দ্রষ্টার সঙ্গে এক হয়ে। সেই পরম দ্রষ্টা নটরাজ; এবং লীলা শুধু মানব-জীবনেই আবদ্ধ নয়, "আতসবাজীর খেলা আকাশে আকাশে / সূর্য তারা লয়ে / যুগ-যুগান্তের পরিমাপে।" এই আতসবাজির খেলায় কবিও এসেছিলেন "ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে / একপ্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে"। কবিতার মধ্যে কিন্তু কবির ভূমিকায় একটা রূপান্তর ঘটে, অভিনেতা থেকে তিনি হয়ে ওঠেন দর্শক, নট থেকে নটরাজ :

দেখিলাম যুগে যুগে নট নটী বহু শত শত
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।
দেখিলাম চাহি
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্র প্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।

দর্শক-সুলভ নির্লিপ্তির আরো সার্থক রূপায়ণ পরিশেষ-এর 'খেলনার মুক্তি'। গভীর দার্শনিক উপলব্ধি প্রকাশ করা হয়েছে ছেলে-ভুলানো রূপকথার ছলে, ভাষা আবেগের নয়, বরঞ্চ লঘু পরিহাসের, অথচ হৃদয়ের গভীর তলে অলক্ষ্যে নাড়া দেয়। কবিতাটি আর কিছু নয়, একটি পুতুলের বিয়ে না-হওয়ার গল্প :

এক আছে মণি দিদি,
আর আছে তার ঘরে জাপানী পুতুল,
নাম হানাসান—
সেই জাপানী পেশোয়াজ-পরা হানাসানের
সঙ্গে বিলেত থেকে আনা কোমরে তলোয়ার
বাঁধা জাঁদরেল এক রাজপুত্রের
কাল হবে অধিবাস পর্শু হবে বিয়ে।

কিন্তু বিয়ের আগের রাত্রে কোথা থেকে এলো চামচিকে, ঘরময় ঘুরে ঘুরে ওড়ে আর "সঙ্গে তার ঘোরে ছায়া"। তারপরে হানাসানকে নিয়ে যথারীতি চম্পট দিল মেঘের দেশে "যেখানে খেলনার স্বর্গ"। কাণ্ডকারখানা দেখে স্বভাবতই পলাতকা কনের মাতৃস্বরূপিণী মণির কান্না, আঙিনায় বটগাছতলায় গিয়ে ব্যাঙগমার কাছে কাকুতি-মিনতি—"হেই দাদা, হেই ব্যাঙগমা" আমাকেও নিয়ে চলো, হানাসানকে ফিরিয়ে আনিগে। কিন্তু হানাসানকে কি আর পাওয়া যায়, সে যে মেঘে মেঘে রঙে রঙে ছড়িয়ে পড়েছে "নানাখানা" হ'য়ে। কী হবে তাহ'লে?

মণি বলে, 'ব্যাঙগমা দাদা
এদিকে বিয়ে যে ঠিক,
বর এসে কী বলবে শেষে?'
ব্যাঙগমা হেসে বলে,
'আছে চামচিকে ভায়া,
বরকেও নিয়ে দেবে পাড়ি।
বিয়ের খেলাটা সেও
মিলে যাবে সূর্যাস্তের শূন্যে এসে
গোধূলির মেঘে।'
মণি কেঁদে বলে, 'তবে
শুধু কি রইবে বাকি কান্নার খেলা?'
ব্যাঙগমা বলে, 'মণি দিদি,
রাত হয়ে যাবে শেষ,
কাল সকালের ফোটা বৃষ্টিধোয়া মালতীর ফুলে
সে খেলাও চিনবে না কেউ।'

জীবনভরা সর্বজনীন ব্যর্থতার আর একটি আশ্চর্য চিত্রণ সেঁজুতি-র 'তীর্থযাত্রিণী'। এক বৃদ্ধা হাতে নামজপ-ঝুলি নিয়ে "জীবনের পথে শেষ আধক্রোশটুকু" পার হওয়ার জন্য সারাদিন ধ'রে ব'সে আছে ইস্টেশনে কোনো তীর্থগামী ট্রেন ধরবার জন্য। তারি রিক্ত জীবননাট্যের অকিঞ্চন কাহিনীটি কয়েকটি রেখায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই দু' পৃষ্ঠার কবিতার মধ্যভাগে :

যে যৌবনখানি
একদিন পথে যেতে বল্লভেরে দিয়েছিল আনি
মধুমদিরার রসে বেদনার নেশা,
দুঃখে সুখে মেশা
সে রসের রিক্ত পাত্রে আজ শুষ্ক অবহেলা—
মধুপগুঞ্জনহীন যেন ক্লান্ত হেমন্তের বেলা।

(১) মানুষের ধর্ম, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৮৯।

সে রিক্তপায় আজ বহুদূরে প'ড়ে আছে। কোনো পূর্ণ কুম্ভের দুর্মূর আশায় আজ অন্য এক বহুদূরের জন্য ভোর থেকে সে ব'সে আছে, ব'সে ব'সে ভাবছে অতীতের রিক্ততার কথা, কিন্তু ভবিষ্যতের পূর্ণতার আভাসে মন আছে ভরপুর ঃ

পরিত্যক্ত একা বাঁস ভাবিতেছে, পাবে বুঝি দূরে
সংসারের গ্লানি ফেলে স্বর্গঘেঁষা দুর্মূল্য
কিছুরে।

হায় সেই কিছু
যাবে ওর আগে আগে প্রেতসম, ও চলিবে পিছু
ক্ষীণালোকে: প্রতিদিন ধরি-ধরি করি তারে
অবশেষে মিলাবে আঁধারে।

এ-সব কবিতার মূল সুর বৈরাগ্যের, যে চিত্ত প্রকাশ পেয়েছে তাকে বিবাগী চিত্ত বলা যেতে পারে।(২) কিন্তু মনে রাখা ভালো যে, রবীন্দ্রনাথ প্রথমত এবং শেষতও অনুরাগেরই কবি। তবে তাঁর অনুরাগের রঙ গৈরিক এবং বিবাগী চিত্ত বিশ্বপ্রেমিক। কাব্যে এই দুই বিপরীত ভাবের পরস্পর সম্পূরণ বিষয়ে তিনি যে খাঁটি কথাটি বলেছেন সেটিও এখানে স্মরণীয় ঃ "কবির কাজ এই অনুরাগে মানুষের চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করা...কবির কাব্যে সুরের অসংখ্য বৈচিত্র্য। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে।"(৩) এই কথাটাই গানের ভাষায় একদিন বলেছিলেন ঃ

---

(২) ক। "এই 'বিবাগী-রাগিণী'ই রবীন্দ্র-কবিপুরুষের প্রাণের রাগিণী—ইহাই রবীন্দ্র-কাব্যের আদি ও অন্ত্য সুর।" —মোহিতলাল মজুমদার, রবি-প্রদক্ষিণ, পৃঃ ৫৭।

খ। "রবীন্দ্র কবিপুরুষের বাণী বৈরাগ্যের বাণী, তাহার সুর বিবাগী চিত্তের সুর। এই বিবাগী বৈরাগী চিত্তই শেষ পর্যন্ত নিজের আজীবন সাধনাকেও কোনো আসক্তি কোনো মোহবন্ধনে বাঁধিল না, দিল ধরণীর গৈরিক ধূলায় অসীম বৈরাগ্যের দিকচিহ্নহীন পথে উড়াইয়া।" —নীহাররঞ্জন রায়, রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, (৫ম সং), পৃঃ ২৫০।

(৩) রবীন্দ্ররচনাবলী, ১০, পৃঃ ২১৫।

চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে রঙের খেলাখানি,
চেয়ো না, চেয়ো না তারে নিকটে নিতে টানি।
রাখিতে চাহ বাঁধিতে চাহ যারে
আঁধারে তাহা মিলায় বারে বারে—
বাজিল যাহা প্রাণের বীণা-তারে
সে তো কেবলি গান, কেবলি বাণী।

সবই চলে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে কালের স্রোতে, তবু মুহূর্তের জন্যেও যে-দৃশ্য ফুটে ওঠে চোখের সামনে তার একটি রসরূপ আছে, সেটি আনন্দস্বরূপ। তা-ই ধ্রুব, তাই ধ'রে রাখার যোগ্য, আর কিছু নয়।

এই কথাটা বিশুদ্ধ কবিমনেরই কথা। কিন্তু ভাবুক কবি জানেন যে, ক্ষণিকতম ঘটনাও মহাকালের মধ্যে বিধৃত, সব কিছুর ক্ষয় আছে তবু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনাদ্যন্তকাল-ব্যাপী যে-সত্তা (the universe viewed sub specie aeternitatis), তা অক্ষয়। সেই মহাকালের কাছে দীক্ষা নিয়েছেন যে কবি, তিনিও চলমানের মাঝখানে ধ্রুব কেন্দ্রবিন্দুটির সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর মনের মধ্যে আর একটি মন আছে, নয়নের পিছনে আর একটি নয়ন যার কথা উপনিষদকারেরা ব'লে গেছেন। কিন্তু শেষ পর্বের কাব্যে যেটা সবচেয়ে লক্ষণীয় তা ধ্রুব ও ক্ষণিকের মধ্যে রবীন্দ্রমানসের টানা-পোড়েন, তাঁর দ্বিধাবিভক্ত মূল্যবোধ: কখনো মহাকাল পান পুষ্পার্ঘ্য, কখনো অমৃতভরা মুহূর্তগুলি।

শেষ সপ্তক-এর 'একুশ' সংখ্যক কবিতা আরম্ভ হয়েছে "অযুত নিযুত কোটি কোটি বৎসরের মাপে" যে-কাল মাপা হয় তারই নিঃসীম পটে আঁকা "ঝাঁকে ঝাঁকে জ্যোতিষ্ক পতঙ্গ"-এর আসা-যাওয়ার চিত্ররূপে। দ্বিতীয় স্তবকে দৃশ্যাবলী হয় দেখা যায় "ছোট ছোট কালের পরিমণ্ডলে" একের পর এক দর্পান্ধপ্রতাপ কত সভ্যতা দেশ-দেশের মাথা উঠল জেগে। সেই সব যুগের "আকাঙ্ক্ষার বেদনাকে" অমর করবার চেষ্টা ছিলেন তখনকার কবিরা। কিন্তু আজ সে বুদ্বুদগুলি যেমন "মহাকালের সমুদ্রে নিঃশব্দে" মিশে গেছে, তেমনি "নীরব হয়েছে কবির মহাকাব্য"।

মনে হয় এইখানে কবিতা শেষ হবে। "নক্ষত্রলোকের নিমেষহীন আলোকের নিচে" লতাবিতানে ব'সে কবি বললেন, "নমস্কার করি মহাকালকে" ('মহাকাল' শিব ও অনাদ্যন্ত কাল—উভয় অর্থদ্যোতনা বহন করছে)। কিন্তু কবিতা এখানেই শেষ হ'ল না। 'নমস্কার' যেন মহাকালের চরণ এড়িয়ে চ'লে গেল ধাবমান মুহূর্তের [illegible]। সন্ন্যাসী মহাকালের কাছে যিনি দীক্ষা চেয়েছিলেন, তিনি খুশী হলেন অমৃতভরা মুহূর্তগুলির অপরিমেয় ঐশ্বর্য পেয়ে :

অমরতার আয়োজন
শিশুর শিথিল মুষ্টিগত
খেলার সামগ্রীর মতো
ধুলায় প'ড়ে বাতাসে যাক উড়ে।
আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা
মুহূর্তগুলিকে—
তার সীমা কে বিচার করবে?
তার অপরিমেয় সত্য
অযুত নিযুত বৎসরের
নক্ষত্রের পরিধির মধ্যে
ধরে না।

মহাকালের ভক্তকবি শেষ পর্বের একাধিক কবিতায় নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন ক্ষণিকের পায়ে "অনিত্যের বুকে অসীমের হৃৎস্পন্দন" শুনতে পেয়েছেন। গতি ও সমাপ্তি, ধ্রুব ও ধাবমান, শাশ্বত ও পরিবর্তমানের দ্বন্দ্ব কোথায় যেন মিলেছে এক পরম ঐক্যে—কবি বুঝেছেন অথচ বোঝাতে পারছেন না, অথবা বুঝেছেন কিনা তাও ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না, কিন্তু একটা অস্পষ্ট বোধ তাঁকে একাধারে তৃপ্ত ও ব্যাকুল ক'রে রেখেছে। তার আরো দু'-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক :

এ চিকন তব লাবণ্য যবে দেখি
মনে মনে ভাবি, এ কি
ক্ষণিকের পরে অসীমের বরদান,
আড়ালে আবার ফিরে নেয় তারে
দিন হ'লে অবসান।
একদা শিশির রাতে
শতদল তার দল ঝরাইবে
হেমন্তে হিমপাতে,
সেই যাওয়ায় তোমারো মাধুরী
প্রলয়ে লভিবে গতি।
এত সহজেই মহাশিল্পীর
আপনার এত ক্ষতি
কেমন করিয়া সয়,
প্রকাশে বিনাশে বাঁধিয়া সূত্র
ক্ষয়ে নাহি মানে ক্ষয়।
(সানাই—'ক্ষণিক')

প্রেয়সীকে মনে হয় সে আমার জন্মান্তরের জানা,
যে কালে স্বর্গ, যে-কালে সত্যযুগ,
যে-কাল সকল কালেরই ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।
তেমনি এই যে সোনায় পান্নায় ছায়ায়
আলোয় গাঁথা
অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন,
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর
ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে,
এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে তবু নেই,
এ আকাশ-বীণায় গৌড়-সারঙের আলাপ,
সে আলাপ আসচে সর্বকালের নেপথ্য থেকে।
(পুনশ্চ—'সুন্দর')

ক্ষণকাল থেকে আবার দৃষ্টি ফেরানো যাক মহাকালের দিকে। যে সন্ন্যাসী মহাকাল, যে নিস্তব্ধ একাকী নটরাজের কথা রবীন্দ্রনাথ অন্তিম পর্বে বার বার বলেছেন, তাঁকেও মানবোত্তীর্ণ ঊর্ধ্বগগনচারী কোনো দেবতা ব'লে আমার মনে হয় না। এঁর সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত বাক্যটি প্রযোজ্য—"...কোনো অমানব বা অতিমানব সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সেকথা বোঝবার শক্তি আমার নেই।"

আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের গভীরে একটি ধ্যানী শিব রয়েছেন, যিনি রাত্রির আকাশে সংখ্যা গণনার অতীত নক্ষত্র-নীহারিকাকে এবং অনন্ত দেশকালের মধ্যে অবস্থিত সমগ্র মনুষ্যজাতির ভূতভবিষ্যৎকে নির্লিপ্ত অথচ তন্ময় চোখে দেখছেন। অন্তর্যামী বৃহৎ 'আমি'-র চোখে আমার ক্ষুদ্র 'আমি'-কে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দেখাবে। তবু এই ক্ষুদ্র 'আমি'-র পক্ষে সম্ভব কোনো দুর্লভ রসোত্তীর্ণ বা জ্ঞানোত্তীর্ণ মুহূর্তে সেই অনাসক্ত অনন্ত দৃষ্টিলাভ করা। কিন্তু সেই শাশ্বত মুহূর্তে ধাবমান; তাকে ধ'রে রাখার জন্য আজীবন তপস্যার প্রয়োজন।

কর্মেও মানুষ পূর্ণ হয়, ধ্যানেও পূর্ণ হয়। আমাদের মধ্যে দু'টি ভিন্ন সত্তা রয়েছে, কর্মী ও ধ্যানী (জ্ঞানী ও শিল্পী উভয়ই ধ্যানী পুরুষেরই ঈষৎ ভিন্ন প্রকাশ; প্রতিতুলনায় কর্মী মানুষের ব্যক্তিস্বরূপের উপাদান ও সংগঠন আলাদা)। সাধনার এই দু'টি ভিন্ন মার্গ আমাদের সামনে খোলা আছে; দু'টি কতকটা সম্পূরক হ'তে পারে, কিন্তু ঠিক সুসমঞ্জস নয়। ধ্যানদৃষ্টি সুপ্রতিষ্ঠিত হ'লে কর্মোদ্যম ক'মে আসে; বৈদান্তিকেরা কর্মসন্ন্যাসের কথা বলেছেন। পক্ষান্তরে, কর্মে নিবিষ্ট হতে হলে দৃষ্টিকে গুটিয়ে নিয়ে আসতে হয় উপস্থিত কর্মক্ষেত্রের পরিধিতে। গীতাও জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পেরেছেন ব'লে তো মনে হয় না; শ্রীঅরবিন্দের গীতাভাষ্য প'ড়ে আমার ধারণা হয়েছে যে তিনি ওই মার্গদ্বয় দুই ভিন্ন পার্সনালিটি টাইপের জন্য নির্দেশ করেছেন। একই মানুষের মধ্যে দুই বিষম টাইপ সহবাস করতে পারে, তবু দু'টি পথ এক নয়। কর্মী ও জ্ঞানীর (তথা শিল্পীর) অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা ইতিপূর্বে বলেছি, আবারও বলব। আপাতত যা বলতে চাই সেটা এই যে, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের দুই আরাধ্য দেবতা মানবিক সাধনার দুই ভিন্ন পথের দু'টি চরম গন্তব্যস্থল।

শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথের শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ যেমন অত্যধিক ছিল, জাগতিক দুঃখ ও পাপের মাত্রাও তেমনি দুর্বিষহ হ'য়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে। তখন যদিও তাঁর মন বহু নিরুত্তর প্রশ্নে বিক্ষুব্ধ ও হতাশায় ভারাক্রান্ত ছিল তবু তিনি তাঁর সহজাত মানসিক স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য হারান নি—যেমন হারিয়েছিলেন বোদলেয়র কিংবা কাফ্কা। নটরাজের ধ্যান তাঁকে এক প্রকার বৈরাগ্যমাখা স্থিতপ্রজ্ঞ প্রশান্তি দিয়েছিল; এবং চিরন্তন মানবে অটুট প্রত্যয় দিগন্তব্যাপী অন্ধকারকেও মসীকৃষ্ণ (বোদলেয়র-কথিত 'grimy black sky, shadows denser than pitch') হ'তে দেয় নি। "নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে" যেমন তিনি দেখতে পেয়েছিলেন "নটরাজ নিঃসঙ্গ একাকী", তেমনি দুই মহাযুদ্ধে নির্বাপিত-প্রায় মনুষ্যত্বের ভস্মস্তূপে দেখতে পেয়েছিলেন এবং দেখতে চেয়েছিলেন—

এমন উপেক্ষা মরণেরে,
কেন জয়যাত্রা
বহ্নিশিখা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে
নামহীন জ্বালাময় কী তীর্থের লাগি।

এ দৃশ্য সমগ্র ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো কালে কোনো দেশে একজন মানুষও যদি "নিজ মর্ত্যসীমা" চূর্ণ ক'রে থাকে তবে সেইখানে আমরা দেখতে পেয়েছি "নক্ষত্রের ইঙ্গিত" ভুল হয় নি, সেই একটি মানুষ মনুষ্যত্বকে রক্ষা করেছে দ্বিপদবিশিষ্ট পশুত্বের গ্রাস থেকে, ব'লে গেছে—এ জগৎ স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন নয়, কাফ্কার উপন্যাস নয়।

(সমাপ্ত)
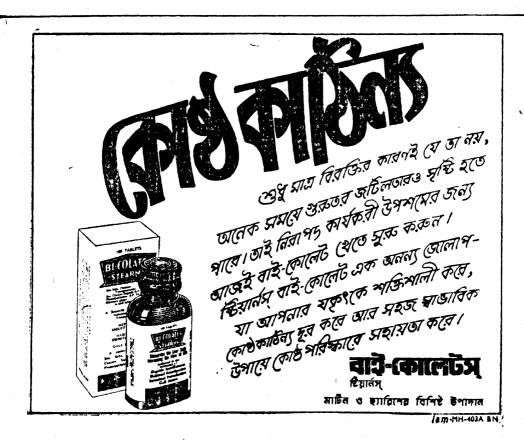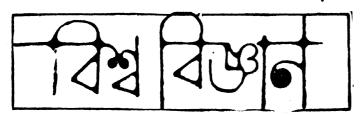
কি করে হাঁটতে হয়

আজকের যন্ত্রযুগ মানুষকে ক্রমশ 'অপ্রয়োজনীয়' অংগচালনা থেকে রেহাই দিচ্ছে। স্বয়ংচালিত কলকারখানা, যান্ত্রিক শাবল গাঁইতি, কোদাল কুড়ুল, যন্ত্রচালিত ট্রাকটার ও শস্যচয়নের কল, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ও কাপড় ধোয়া কল, এসবই আমাদের হাত-পা-পেট-পিঠের মাংসপেশী চালনা বন্ধ করে আনছে। তারপর পথেঘাটে ট্রাম-বাস ইত্যাদির দৌলতে আমরা আর হাঁটতেই চাই না।

কিন্তু শরীরের কি তাতে কোন উপকার হচ্ছে? নিশ্চয়ই না। স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য শরীর নামক যন্ত্রটির শক্তিসাম্য রক্ষা অপরিহার্য। শরীরকে নিষ্ক্রিয় রাখলে সেই শক্তিসাম্য নষ্ট হয়। সেজন্য শরীরকে কিছু মেহনত করাবার জন্য সময় করে নিতেই হবে, খেলাধুলো ক্রীড়া-কসরত করতে হবে। এগুলো কিছু নতুন কথা নয়, কিন্তু তবু আজকে আমরা এগুলি মেনে চলছি না।

পায়ে হাঁটা একটি অতি চমৎকার ব্যায়াম। হাঁটতে শিখে অবধি অন্তিম দিনটি পর্যন্ত আমরা হাঁটি। হাঁটি বটে কিন্তু অনেক সময় স্বাস্থ্যের কথা খেয়াল রেখে হাঁটি না। বিশুদ্ধ মুক্ত বাতাসে অল্পক্ষণ হাঁটলেও উপকার আছে। কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে জোরে নিয়মমাফিক হাঁটলে উপকার হয় বহু গুণ বেশী।

দিনে দুই তিন কিলোমিটার হাঁটলে বছরে হাঁটা হয় হাজার কিলোমিটারের মত। তার মানে ৩৫।৪০ বছরে যতটা হাঁটা হবে, তাতে সারা পৃথিবীটা একবার চক্কর দিয়ে আসা যায়। সেই হাঁটা যদি নিয়মমত হয় তা হলে স্বাস্থ্যের দিক থেকে কত উপকার হয় একবার ভেবে দেখুন।

কিভাবে পা ফেলছি, কিভাবে আমার হাঁটু মুড়ছে, কিভাবে পাটা মাটিতে পড়ছে, মাথা, কাঁধ ও শরীরটা তখন কোনভাবে রয়েছে, নিঃশ্বাস কিভাবে নিচ্ছি, কদমগুলি কত লম্বা হচ্ছে, কত জোরে হাঁটছি, এসব কথা কি হাঁটবার সময় চিন্তা বা খেয়াল করি? বোধ হয় না।

কেউ হাঁটেন পকেটে হাত দিয়ে, মুখে সিগারেট দিয়ে, ঘাড় হেলিয়ে। তাঁর নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে বিশুদ্ধ বায়ু যায় না, যায় সিগারেটের ধোঁয়া। সেইরকম অনেকে আবার ঢিলা পায়ে হাঁটেন। এরা কেউই হাঁটতে জানেন না।

কিন্তু এমন লোকও রাস্তায় দেখা যায়, যাঁরা চমৎকার হাঁটেন বেশ সোজা হয়ে হাত দুলিয়ে। তাঁরা জোরে হাঁটেন অথচ মনে হয় না যে, জোরে হাঁটছেন। পায়ের আঙুল সোজা সামনের দিকে এগিয়ে থাকে এবং পা ফেলেন গোড়ালির উপর ভর করে। তাঁর প্রতিটি কদম অন্তত ৮০ সেন্টিমিটার লম্বা হবে। বুক উঁচিয়ে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে তিনি হাঁটেন। প্রতি ৩০ সেকেন্ডে তিনি ৬২।৬৩ বার পা ফেলছেন এবং গভীরভাবে নিঃশ্বাস টেনে নিচ্ছেন। একেই বলে হাঁটার মত হাঁটা। সবাই যদি এইরকম হাঁটতে পারেন, তা হলে তো কথাই থাকে না।

কিন্তু তাই বলে সারা দিনে সব সময়ই কি ঐরকম চলন দরকার? না, তা নয়। খাওয়া-দাওয়ার পর বা শুতে যাবার আগে বেশী জোরে হাঁটবার দরকার নেই। কিন্তু প্রতিদিন ঘণ্টাখানেক অন্তত ঐরকম জোরে হাঁটা দরকার যাতে মিনিটে ১২২ থেকে ১৩০টি কদম পড়ে (বয়েস অনুসারে)। ধরুন সকালে আধ ঘণ্টা, বিকালে আধ ঘণ্টা। আমাদের দেশে আমরা ভাত খেয়ে অফিস যাই। তাই বেড়ানোটা সকালে-বিকালেই ভাল। ইউরোপের লোকে অফিস যাবার সময় এবং মধ্যাহ্নভোজের আগে আধ ঘণ্টা করে হাঁটতে পারে। কারণ, তারা মধ্যাহ্নভোজ খায় অফিসে ১টা অবধি কাজ করে। অভ্যাস হয়ে গেলে একসংগে প্রথমে ৪৫ মিনিট এবং তারপর ১ ঘণ্টা জোরে হাঁটা যেতে পারে। প্রথমে মিনিটে ১১৬ কদম। তারপর বাড়িয়ে ১২০। এইভাবে সময় বাড়াতে হবে এবং প্রতি মিনিটে কদমের সংখ্যা ১২২ থেকে ১৩০ পর্যন্ত করতে হবে।

জোর পায়ে হাঁটা কেন দরকার? অনেকে হাঁটবার উপদেশ দেন, কিন্তু জোরে হাঁটবার কথাটা বলেন না।

অনেকে শুধু ছুটির দিনে বেড়াতে বার হন। কিন্তু বেড়ানোটা রোজ দরকার এবং জোরে বেড়ানো দরকার। কারণ, মন্থর গতিতে হেলে দুলে হাঁটলে মাংসপেশীর বিশেষ উন্নতি হয় না, রক্তসঞ্চালনে সাহায্য হয় না বা জোরে জোরে শ্বাসপ্রশ্বাস পড়ে না, বিপাকক্রিয়াতেও সেরকম কোন সাহায্য হয় না।

সুতরাং জোর কদমে হাঁটতে হবে। তাতে শরীর মজবুত হবে, শক্ত হবে, স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। একটু অভ্যাস করলেই মিনিটে ১২২—১২৪ কদমে আধ ঘণ্টা, ৪৫ মিনিট হাঁটা যায়। তারই ফাঁকে আবার ২।১ মিনিট আরো জোরে হাঁটা যায়।

যে-কোন সুস্থ লোকের দিনে ৯।১৩ কিলোমিটার হাঁটা দরকার এবং তার অর্ধেকটা জোর কদমে হাঁটতে হবে।

—তরুণ চট্টোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

কপিলের ঘরটি বেশ বড়, লম্বাটে ধরনের। এক পাশে খাট বিছানা, অন্য পাশে টেবিল চেয়ার। কাঁচে ঢাকা টেবিলের ওপর কাঁচের নীচে আকাশের একটি মানচিত্র; নীল জমির ওপর সাদা নক্ষত্রপুঞ্জ ফুটে আছে। কপিল রাত্রিবাস পরল, ঢিলা পাজামা আর হাত-কাটা ফতুয়া। তারপর একটা বই নিয়ে টেবিলের সামনে পড়তে বসল।

ইংরেজী গণিত জ্যোতিষের বই, লেখকের নাম ফ্রেড্ হয়েল। পড়তে পড়তে কপিল ঘড়ি দেখছে, আবার পড়ছে। বিশ্ব-রহস্য উদ্‌ঘাটক জ্যোতিষগ্রন্থের প্রতি তার গভীর অনুরাগ; কিন্তু আজ তার মন ঠিক বইয়ের মধ্যে নেই, যেন সে সময় কাটাবার জন্যেই বই পড়ছে।

কব্জির ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজল। কপিল বই বন্ধ করে উঠল, দেয়ালের একটা আলমারির কপাট খুলে একটি দূরবীন যন্ত্র বার করল। যন্ত্রটি আকারে দীর্ঘ নয় কিন্তু তিন পায়ার ওপর ক্যামেরার মত দাঁড় করানো যায়, আবার ইচ্ছামত পায়া গুটিয়ে নেওয়া যায়। কপিল দূরবীনটি বগলে নিয়ে ঘরের আলো নেবালো তারপর সন্তর্পণে বাইরে এল।

ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েক পা গেলেই ছাদে ওঠবার সিঁড়ি। কপিল পা টিপে টিপে সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত গিয়েছে এমন সময় সামনের একটা দরজা খুলে রমলা বেরিয়ে এল। তার মুখে খরশান ব্যঙ্গের হাসি। কপিল তাকে দেখে থতমত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। রমলা বলল, 'কী ঠাকুরপো, এত রাত্রে দূরবীন নিয়ে কোথায় চলেছ?'

কপিল চাপা গলায় বলল, 'আস্তে বউদি, বাবার ঘুম ভেঙে যাবে।'

রমলা গলা নীচু করল, 'তোমার মতলব ভাল ঠেকছে না ঠাকুরপো।'

কপিল বলল, 'কি মুশকিল। আমি তো প্রায়ই আকাশের তারা দেখবার জন্যে ছাদে উঠি। তুমি জান না?'

রমলা বলল, 'জানি। কিন্তু সে তো সন্ধ্যের পর। আজ রাত দুপুরে কোন্ তারা দেখবে বলে ছাদে উঠছ?'

কপিল বলল, 'আজ রাত্রি পৌনে বারোটার সময় মঙ্গলগ্রহ ঠিক মাথার ওপর উঠবে। মঙ্গলগ্রহ এখন পৃথিবীর খুব কাছে এসেছে, তাই তাকে ভাল করে দেখবার জন্যে ছাদে যাচ্ছি।'

রমলা মুখ গম্ভীর করে বলল, 'হুঁ, মঙ্গলগ্রহ। কোন্ গ্রহ-তারা তোমার ঘাড়ে চেপেছে তুমিই জান। কিন্তু একটা কথা বলে দিচ্ছি, আমাদের বাড়ির চার পাশে যাদের বাড়ি তারা গরমের সময় জানলা খুলে শুয়েছে, তুমি যেন তাদের জানলা দিয়ে গ্রহ-তারা দেখতে যেও না।'

কপিল মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে হাসল, বলল, 'বউদি, তোমার মনটা ভারি সন্দিগ্ধ। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তুমি এত রাত্রি পর্যন্ত ঘুমোও নি কেন?'

রমলা বলল, 'তোমার দাদা বিছানায় শুয়ে আইনের বই পড়ছেন, হঠাৎ তাঁর কফি খাবার শখ হল। তাই কফি তৈরি করতে চলেছি। তুমি খাবে?'

'আমার সময় নেই।' কপিল চুপি চুপি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

হয়তো মঙ্গলগ্রহই দেখবে।

আর একটি রাত্রির কথা।—

সিনেমার শিল্পক্ষেত্রে যারা কাজ করে তারা সাধারণত দল বেঁধে থাকে, নিজেদের শিল্পিগোষ্ঠী নিয়ে একটা সমাজ তৈরি করে নিয়েছে, বাইরের লোকের সঙ্গে বড় একটা সম্পর্ক রাখে না। সুজন মিত্র কিন্তু দলে থেকেও ঠিক দলের পাখি নয়। যতক্ষণ সে স্টুডিওর সীমানার মধ্যে থাকে ততক্ষণ সকল শ্রেণীর সহকর্মী ও সহকর্মিণীর সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে। তরুণী অভিনেত্রী-দের মধ্যে অনেকেই এই সুদর্শন নবোদিত অভিনেতাটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সুজন কারুর কাছে ধরা দেয় নি। পাঁকাল মাছের মত হাত পিছলে বেরিয়ে যাবার কৌশল তার জানা ছিল।

সিনেমার গণ্ডীর বাইরে তার প্রধান বন্ধু-গোষ্ঠী ছিল নৃপতির আড্ডার ছেলেরা; এখানে এসে সে যেন সমভূমিতে পদার্পণ করত। তার বংশপরিচয় কেউ জানে না, তার জ্ঞাত-গোষ্ঠী কেউ আছে কিনা সে পরিচয়ও

কী ঠাকুরপো, এত রাত্রে দূরবীন নিয়ে কোথায় চলেছ?

কেউ কোনো দিন পায়নি, কিন্তু তার বন্ধু-নির্বাচন থেকে অনুমান করা যায় যে তার বংশপরিচয় যেমনই হোক, সে নিজে উচ্চ-মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষিত মার্জিত চরিত্রের মানুষ।

একদিন স্টুডিওতে তার শুটিং ছিল, কাজ শেষ হতে সন্ধ্যে পেরিয়ে গেল। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে মুখের রঙ পরিষ্কার করে বেরুতে আরো ঘণ্টা খানেক কাটল। সুজনের একটি ছোট মোটর আছে, তাইতে চড়ে সে যখন স্টুডিও থেকে বেরুল তখন রাত্রি হয়ে গেছে।

মাইল দেড়েক চলবার পর মোটর একটি হোটেলের সামনে এসে থামল। সুজন হোটেলেই খায়। তার বাসায় রান্নার আয়োজন নেই। কিন্তু রোজ একই হোটেলে খায় না। যখন যা খাবার ইচ্ছে হয় তখন সেই রকম হোটেলে যায়, কখনো বা মিষ্টান্নের দোকানে গিয়ে দই-সন্দেশ খেয়ে পেট ভরায়। যেদিন শুটিং থাকে সেদিন দুপুরে স্টুডিওর ক্যান্টিনে খায়।

হোটেলের পাশে গাড়ি পার্ক করে সে যখন হোটেলে ঢুকল তখন তার নাকের নীচে এক জোড়া শৌখিন গোঁফ শোভা

পাচ্ছে। গোঁফ জোড়া অকৃত্রিম নয়, সুজন কোনো প্রকাশ্য স্থানে গেলেই মুখে গোঁফ লাগিয়ে ছদ্মবেশ পরিধান করে। তার মুখখানা সিনেমার প্রসাদে জনসাধারণের খুবেই পরিচিত, তাকে সশরীরে দেখলে সিনেমা-পাগল লোকেরা বিরক্ত করবে এই আশঙ্কাতেই হয়তো সে গোঁফের আড়ালে স্বরূপ লুকিয়ে রাখে।

হোটেলে আহার শেষ করে সুজন মোটর চালিয়ে নিজের বাসার দিকে চলল। বাসাটি পাড়ার এক প্রান্তে একটি সরু রাস্তার ওপর; ছোট বাড়ি কিন্তু গাড়ি রাখার আস্তাবল আছে।

গারাজে গাড়ি রেখে সুজন চাবি দিয়ে দরজা খুলে বাড়িতে ঢুকল, ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে শোবার ঘরে গিয়ে আলো জ্বালল। একসঙ্গে গোটা তিনেক দ্যুতিমান বাল্‌ব জ্বলে উঠল।

চৌকশ ঘরটি বেশ বড়। তাতে খাট বিছানা আছে, টেবিল চেয়ার আলমারি আছে, এমন কি স্টোভ চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতিও আছে। মনে হয়, সুজন এই একটি ঘরের মধ্যে তার একক জীবনযাত্রার সমস্ত উপকরণ সঞ্চয় করে রেখেছে।

একটি লম্বা আরাম-কেদারায় অঙ্গ ছড়িয়ে দিয়ে সে পকেট থেকে সিগারেট বার করল, সিগারেট ধরিয়ে পিছনে মাথা হেলিয়ে দিয়ে উজ্জ্বল একটা বাল্‌বের দিকে দৃষ্টি রেখে মৃদুমন্দ টান দিতে লাগল। এখন আর তার মুখে গোঁফ নেই, নগ্ন মুখখানা ছুরির মত ধারাল।

সিগারেট শেষ করে সুজন কব্জির ঘড়ি দেখল—ন'টা বেজে কুড়ি মিনিট। সে উঠে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল; সাড়ে ছ' ফুট উঁচু আয়নায় তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। সে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিজের দেহ মুখ পরীক্ষা করল; একবার হাসল, একবার ভ্রূকুটি করল, তারপর আড়ামোড়া ভেঙে আলমারির কাছে গেল।

আলমারি থেকে সে দুটি জিনিস বার করল; একটি হুইস্কির বোতল এবং বড় চৌকো আকারের একটি পুরু লাল কাগজের খাম। প্রথমে সে গেলাসে ছোট পেগ্ মাপের হুইস্কি ঢেলে তাতে জল মেশালো, তারপর গেলাস আর খাম নিয়ে আবার চেয়ারে এসে বসল। গেলাসে ছোট একটি চুমুক দিয়ে চেয়ারের হাতার ওপর রেখে আগ্‌ফা'র খাম থেকে একটি ফটো বার করল।

ক্যাবিনেট আয়তনের ফটো, একটি যুবতীর আ-কটি প্রতিকৃতি, যুবতী হাসি-হাসি মুখে দর্শকের পানে চেয়ে আছে। মনে হয়, সে সিনেমার অভিনেত্রী নয়, মুখে বা দেহভঙ্গিতে কৃত্রিমতা নেই। কিন্তু সে কুমারী কি বিবাহিতা, ফটো থেকে বোঝা যায় না।

সুজন থেকে থেকে গেলাসে চুমুক দিতে দিতে ছবিটি দেখতে লাগল। চোখে তার প্রগাঢ় তন্ময়তা, পলকের তরেও ছবি থেকে চোখ সরাতে পারছে না। এক ঘণ্টা কেটে গেল, গেলাসের পানীয় নিঃশেষ হল; কিন্তু সুজনের চিত্রদর্শন-পিপাসা মিটল না। সে ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে আবার সিগারেট ধরালো। তার ঠোঁট নড়তে লাগল, যেন চুপি চুপি ছবির সঙ্গে কথা কইছে। তারপর ছবিটি নিজের গালের ওপর চেপে ধরে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

পৌনে এগারোটার সময় সে ছবিটি আবার খামে পুরে আলমারিতে তুলে রাখল, আয়নার সামনে কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আলো নিবিয়ে আবার বাড়ি থেকে বেরুল। মোটর নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা দক্ষিণ কলকাতার নগর-গুঞ্জনক্লান্ত পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে শেষে রবীন্দ্র সরোবরের ঘেরার মধ্যে রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর গাড়ি দাঁড় করাল। গাড়ি থেকে যখন নামল, দেখা গেল নকল গোঁফ তার নাকের নীচে ফিরে এসেছে। গাড়ি লক করে সে লেক থেকে বেরুল, বড় রাস্তা পার হয়ে একটা সরু রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল।

রাস্তার দু' পাশে বাড়ির আলো নিবে গেছে। সুজন একটি ল্যাম্প-পোস্টের নীচে এসে দাঁড়াল। রাস্তার ওপারে একটা বাড়ি, তার দোতলার একটা জানলা দিয়ে নৈশ-দীপের অস্ফুট আলো আসছে। সুজন সেই দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ল্যাম্প-পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে রইল। ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়ালে মাথার ওপর আলো পড়ে, মানুষটাকে দেখা যায় বটে কিন্তু মুখ চেনা যায় না।

কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও জানলায় কাউকে দেখা গেল না। সুজন যাকে চোখের দেখা দেখতে চায় সে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা অন্য একজনের বাহু-বন্ধনের মধ্যে শুয়ে জেগে আছে।
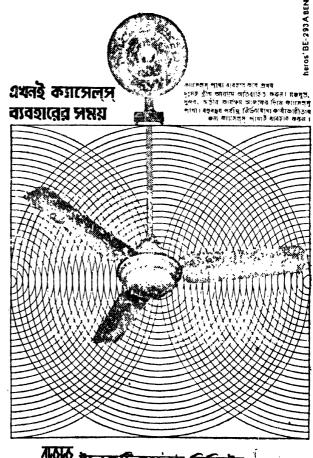
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্। সুজন আগুনের হলকার মত তপ্ত নিশ্বাস ফেলল, তারপর ফিরে চলল।

আর একটি রাত্রির কথা।—

দেবাশিস আর দীপা একসঙ্গে টেবিলে বসে রাত্রির আহার সম্পন্ন করল। নকুলকে শুনিয়ে দীপা বাগানের কথা বলল; মালী পদ্মলোচন বুগেনভিলিয়া লতাকে বাইগন-বিল্লি বলে শুনে দেবাশিস খানিকটা হাসল, তারপর ফ্যাক্টরির একটা মজার ঘটনা বলল। বাইরের ঠাট বজায় রইল। খাওয়া শেষ হলে দুজন ওপরে গিয়ে নিজের নিজের ঘরে ঢুকল। তৃতীয় ব্যক্তির সামনে স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় করতে তারা বেশ অভ্যস্ত হয়েছে; কিন্তু যখন তৃতীয় ব্যক্তি কেউ থাকে না, যখন অভিনয় করার দরকার নেই, তখনই বিপদ।

দীপা ঘরে গিয়ে নৈশ দীপ জেলে খানিকক্ষণ খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। আজ বাইরে হাওয়া নেই, গ্রীষ্মের রাত্রি যেন নিশ্বাস রোধ করে আছে। দীপা পাখা চালিয়ে দিয়ে ব্লাউজ খুলে শুয়ে পড়ল। ঘুম কখন আসবে তার ঠিক নেই কিন্তু যথাসময় বিছানার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর তো কোনো কাজও নেই। শুয়ে শুয়ে সে মাথার মধ্যে দেবাশিসের একটা কথা প্রতি-ধ্বনির মত শুনতে লাগল—দীপা, তুমি আমাকে ভালবাস না কিন্তু আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

দেবাশিস নিজের ঘরে খাটের পাশে পড়ার আলো জেলে একখানা ইংরেজী বিজ্ঞানের বই নিয়ে শুয়ে ছিল। তার গায়ে জামা নেই, পাখাটা ছাদ থেকে বনবন করে ঘুরছে। দেবাশিস বইয়ে মন বসাতে পারছিল না, মনটা যেন তপ্ত বাষ্প হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। মাথায় ঠাণ্ডা জল থাবড়ে দিয়েও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হল না। আধ ঘণ্টা পরে সে বই রেখে আলো নিবিয়ে দিল। উজ্জ্বল আলোটাই যেন ঘরের বাতাসকে আরো গরম করে তুলেছে।

অন্ধকার ঘরে দেবাশিস চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে আছে। পাখার হাওয়া সত্ত্বেও বিছানাটা যেন রুটি-সেঁকা তাওয়ার মত তপ্ত। এ-পাশ ও-পাশ করেও নিষ্কৃতি নেই, বালিশের ওপর মাথাটা গরম হয়ে উঠছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনও গরম হচ্ছে, কিন্তু সেটা অগোচরে। শেষে হঠাৎ গভীর রাত্রে এই মানসিক উষ্মা মাটি ফুঁড়ে আগ্নেয়গিরির মতন উৎসারিত হল। দেবাশিস ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে চাপা গর্জনে বলল, 'God damn it, she is my wife!'

অন্ধকারে দেবাশিস কিছুক্ষণ স্নায়ু-পেশী শক্ত করে বসে রইল, তারপর বিছানা থেকে নেমে ঘর থেকে বেরুল। বসবার ঘরের আলো জ্বালতেই সুইচে কটাস করে শব্দ হল, মনে হল ঘরটা যেন চমকে উঠল। দেবাশিসও একটু চমকালো, হঠাৎ জ্বলে-ওঠা আলোর দীপ্তি চোখে আঘাত করল। সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে দীপার বন্ধ দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

দরজায় খিল দেওয়া কি শুধুই ভেজানো, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। হয়তো একটু ঠেললেই খুলে যাবে। দীপা নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। দেবাশিস কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দরজায় টোকা দেবার জন্যে হাত তুলল, ঘুমন্ত দীপার ঘরে অনাহূত দোর ঠেলে প্রবেশ করতে পারল না। তারপর টোকা দিতেও পারল না, তার উদ্যত হাত নেমে পড়ল। 'কাপুরুষ!' মনের গভীরে নিজেকে কঠোর ধিক্কার দিয়ে সে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

দীপা তখনো ঘুমোয় নি, জেগেই ছিল। কিন্তু সে কিছু জানতে পারল না।

দেবাশিস আর দীপার বিয়ের পর দু' মাস কেটে গেল। যেদিনের ঘটনা নিয়ে কাহিনী আরম্ভ হয়েছিল, সেই যেদিন দেবাশিস ফ্যাক্টরি থেকে ফিরে এসে দীপাকে সিনেমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু দীপা যায় নি, দীর্ঘ পশ্চাদ্দৃষ্টির পর আমরা সেইখানে ফিরে এলাম।

দেবাশিস পায়ে হেঁটে নৃপতির বাড়ির দিকে যেতে যেতে মাঝরাস্তায় থমকে দাঁড়াল। তার মনটা তিক্ত হয়েই ছিল, এখন নৃপতির বাড়িতে গিয়ে হালকা ঠাট্টা তামাশা, উদ্দেশ্যহীন গল্পগুজব করতে হবে, প্রবালের পিয়ানো বাজনা শুনতে হবে ভাবতেই তার মন বিমুখ হয়ে উঠল। অনেক দিন পড়াশুনো করা হয়নি, অথচ তার যে কাজ তাতে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে পৃথিবীর কোথায় কি কাজ হচ্ছে তার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। তার কাছে কয়েকটা বিলিতী বিজ্ঞান-পত্রিকা নিয়মিত আসে, কিন্তু গত দু' মাস তাদের মোড়ক পর্যন্ত খোলা হয়নি। দেবাশিস আবার বাড়ি চলল। আজ আর আড্ডা নয়, আগের মতন সন্ধ্যেটা পড়াশুনো করেই কাটাবে।

দীপা রেডিও চালিয়ে দিয়ে চোখ বুজে আরাম-চেয়ারে বসে ছিল, দেবাশিসকে ফিরে আসতে দেখে রেডিও বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল, উদ্বিগ্ন প্রশ্নভরা চোখে তার পানে চাইল। দেবাশিস যথাসম্ভব সহজ গলায় বলল, 'ফিরে এলাম। অনেক দিন পড়াশুনো হয়নি, আজ একটু পড়ব।'

টেলিফোন টেবিলের নীচের থাকে বিলিতী পত্রিকাগুলো জমা হয়েছিল, দেবাশিস সেগুলো নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল; সেখানে পত্রিকার মোড়ক খুলে তারিখ অনুযায়ী সাজাল, তারপর বিছানায় শুয়ে পিঠের নীচে বালিশ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করল।

ও ঘরে দীপা আস্তে আস্তে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গ্রীষ্মের দ্রুত সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে আসছে। পদ্মলোচন বাগানে জল দিচ্ছে। আজ দীপা বাগানে যায় নি। বিকেলবেলা সে সিনেমায় যাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর দেবাশিস আহত লাঞ্ছিত মুখে চলে গেল, দীপার মনটাও কেমন একরকম হয়ে গেল। যত দিন যাচ্ছে তার জীবনটা এমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে যে, মনে হয় কোনো দিনই এ জট ছাড়ানো যাবে না। মনের মধ্যে একটা নতুন সমস্যা জন্ম নিয়েছে, তার কোনো সমাধান নেই।

বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে, পদ্মলোচন বাগানের কাজ শেষ করে চলে গেল। দীপা তখন জানলা থেকে ফিরে নিঃশব্দে দেবাশিসের ঘরের দিকে গেল। দেবাশিস তখন আলো জেলেছে, বিছানায় বালিশ ঠেসান দিয়ে পড়ায় নিমগ্ন। দীপা কিছুক্ষণ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল; কিন্তু দেবাশিস তাকে দেখতে পেল না। দীপা তখন একেবারে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দেবাশিস চমকে চোখ তুলল।

দীপা বলল, 'চা খাবে?'

দেবাশিস একটু হাসল। দীপা বিকেলবেলার রূঢ়তার জন্যে অনুতপ্ত হয়েছে। সে বলল, 'তুমি যদি খাও আমিও খাব।'

'এক্ষুনি আনছি।' দীপা হরিণীর মত ছুটে চলে গেল। দেবাশিস কিছুক্ষণ দোরের দিকে চেয়ে থেকে আবার পড়ায় মন দিল।

দীপা রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, নকুল রান্না চড়িয়েছে। সে বলল, 'নকুল, তুমি সরো, আমি চা তৈরি করব।'

নকুল বলল, 'চা তৈরি করবে? দাদাবাবু খাবেন বুঝি? তা তুমি কেন করবে বউদি, আমি করে দিচ্ছি।'

'না, আমি করব। তুমি সরো।'

নকুল মনে মনে খুশী হল, 'আচ্ছা বউদি, তুমিই কর।'

নকুলের ছ্য়াচ্ছন্ন মন অনেকটা পরিষ্কার হল। এই দু' মাস দেখেশুনে তার ধারণা জন্মেছিল, গোড়াতে কোনো কারণে এদের মনের মিল হয়নি, এখন আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে আসছে। ঘি আর আগুন একসঙ্গে কত দিন ঠান্ডা থাকবে!

দীপা চা তৈরি করে ট্রে-র ওপর টি-পট, দুটি পেয়ালা প্রভৃতি বসিয়ে ওপরে উঠে গেল, বসবার ঘরে ট্রে রেখে দেবাশিসের দোরের কাছে এসে বলল, 'চা এনেছি।'

দেবাশিস তৎক্ষণাৎ উঠে এসে চায়ের টেবিলে বসল। দীপা চা পেয়ালায় ঢেলে একটি পেয়ালা দেবাশিসের দিকে এগিয়ে দিল, নিজের পেয়ালাটি হাতে তুলতে গিয়ে খানিকটা চা চলকে পিরিচে পড়ল।

আজ দেবাশিস হঠাৎ ফিরে আসার পর দীপার শরীরটাও যেন শাসনের বাইরে চলে গেছে। থেকে থেকে বুকের মধ্যে আনচান করে উঠছে, মাথার মধ্যে যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, কান্নায় গলা বুজে আসছে। সে কাঁদুনে মেয়ে নয়, এত দিনের দীর্ঘ পরীক্ষা সে পরম দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। তবে আজ তার এ কী হল?

এক চুমুক চা খেয়ে দেবাশিস বলল, 'আঃ! খাসা চা হয়েছে। কে করল—নকুল?'

'না— আমি।' দীপার গলাটা কেঁপে গেল, মনে হল শরীরের অস্থিমাংস নরম হয়ে গেছে। সে আস্তে আস্তে বসে পড়ল।

দেবাশিস আর কিছু বলল না, কেবল একটু প্রশংসাসূচক হাসল। দীপা দু' চুমুক চা খেয়ে নিজেকে একটু চাঙ্গা করে নিল, তারপর যেন গুনে গুনে কথা বলছে এমনিভাবে বলল, 'কাল তুমি আমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবে?'

দেবাশিস চকিত চোখে তার পানে চাইল, ক্ষণেক নীরব থেকে বলল, 'তোমার যদি ইচ্ছে না থাকে, আমার মন রাখার জন্যে সিনেমা দেখার দরকার নেই।'

'না, আমি দেখতে চাই।'

চায়ের পেয়ালা শেষ করে দেবাশিস উঠে

দাঁড়াল, 'বেশ, তা হলে নিয়ে যাব।'

দেবাশিস নিজের ঘরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে এমন সময় ঘরের কোণে টেলিফোন বাজল।

দীপার বুক আশঙ্কায় ধক্‌ধক্‌ করে উঠল। কার টেলিফোন।

দেবাশিস গিয়ে টেলিফোন ধরল—'হ্যালো।'

অন্য দিক থেকে কে কথা বলছে, কী কথা বলছে, দীপা শুনতে পেল না, কেবল দেবাশিসের কথা একাগ্র হয়ে শুনতে লাগল, 'ও...কী খবর?...না, আজ বাড়িতেই আছি... না, শরীর ভাল আছে...এখন?...ও বুঝেছি, আচ্ছা, আমি যাচ্ছি...না না, কষ্ট কিসের... আচ্ছা—'

টেলিফোন নামিয়ে রেখে দেবাশিস কব্জির ঘড়ির দিকে তাকালো, আটটা বেজে গেছে। 'আমাকে একবার বেরুতে হবে। হেঁটেই যাব। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।'

সে বেরিয়ে গেল। দীপা কোনো প্রশ্ন করল না; সে জানতে পারল না, দেবাশিস কোথায় যাচ্ছে। [illegible] বসে বসে ভাবতে লাগল, কে দেবাশিসকে টেলিফোন করেছিল?

(ক্রমশ)

লণ্ডনের চিঠি

লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্‌স্‌

গত কয়েক মাস ধরে লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্‌স্‌-এ যা ঘটেছে, ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে তা অভূতপূর্ব। প্রায় সপ্তাহ-কালাবধি প্রতিদিন খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় যে রকম ফলাও করে এল এস ই-র ঘটনার বিবরণ বেরিয়েছে তাতেই বিষয়টির গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। 'টোরি কেনিয়ান'-এর তেল এবং ইস্টারের ছুটি ব্যাপারটাকে চাপা না দিলে এর জের আরও চলত। এবং ভবিষ্যতে চলবে। এল এস ই-কে উপলক্ষ্য করে অনেক টাকের নীচে অনেক চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে এবং তার কিছু কিছু আমরা জানতেও পেরেছি। তবে এখন সে-প্রসঙ্গ থাক। এল এস ই-র ব্যাপারে ফিরে যাওয়া যাক। সাম্প্রতিক ঘটনা বুঝতে হলে আগের ইতিহাস জানা দরকার। সে বৃত্তান্ত সম্ভবত সকলেই জানেন। তবু বলি।

স্কুলের ডিরেক্টর স্যার সিডনী কেইন এই বছরের শেষাশেষি অবসর নেবেন। সাত আট মাস আগে তাঁর জায়গায় নোতুন ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন ডঃ ওয়ালটার অ্যাডামস। এই নিয়োগ স্কুলের একদল ছাত্র সমর্থন করেন না। তাঁদের আপত্তির কারণ এই, এল এস ই-তে সাদা কালো বাদামী রং-এর বিভিন্ন জাতির ছাত্র পড়তে আসে। এই রকম মালটি-রেসিয়াল স্কুলের ডিরেক্টর পদে ডঃ অ্যাডামস অনুপযুক্ত। ডঃ অ্যাডামস যখন রোডেশিয়ার রাজধানী সলসবেরীর ইউনিভার্সিটি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন সেই কলেজের তিনজন অধ্যাপক স্মিথের নির্দেশে বিতাড়িত হয়েছিলেন। ডঃ অ্যাডামস বাধা দেননি। প্রতিবাদস্বরূপ কলেজ বন্ধ করে দেননি। বিতাড়িত অধ্যাপকদের আর কোন দোষ ছিল না, শুধু তাঁরা স্মিথের ইউ ডি আই স্বীকার করেননি এবং রোডেশিয়ার কৃষ্ণকায়দের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। কলেজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরকারের অভিভাবকত্ব নিষ্ক্রিয়ভাবে এবং অপ্রতিবাদে মেনে নিয়েছিলেন বলেই প্রমাণ হয় ডঃ অ্যাডামস নিজে সাদা-কালো বৈষম্য সমর্থন করেন এবং সম্ভবত স্মিথের রাজনীতিতেও তাঁর প্রচ্ছন্ন সমর্থন আছে। এই কারণে এল এস ই-র ডিরেক্টর পদে তিনি অযোগ্য।

গোলমালের শুরু এই নিয়ে। পরে অবশ্য এক বিষয় থেকে আর বিষয়ে গড়িয়ে গিয়ে গোলমাল জটিলতর হয়ে উঠেছে। তবে গোলমালের মূল কারণটা একবার ভেবে দেখা দরকার। ডঃ অ্যাডামস স্কুলের ডিরেক্টর পদে যোগ্য বা অযোগ্য সে-বিচার বাইরের লোকে —বিশেষ করে ছাত্ররা—কি করে করতে পারে তা অনেকের কাছে সমস্যা। ডঃ অ্যাডামস প্রতিবাদস্বরূপ হয়ত কলেজ বন্ধ করে দিতে পারতেন। তাতে কি ফল হত? একটি ফল হত, সেটা কুফলই। রোডেশিয়ায় এই একটি-মাত্র কলেজে কৃষ্ণকায় ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ আছে। সেই কলেজটি বন্ধ করে দিলে রোডেশিয়ায় কৃষ্ণকায়দের উচ্চশিক্ষার পথ বন্ধ করে দেওয়া হত। তাতে ডঃ অ্যাডামস এল এস ই-র ছাত্রদের চিত্ত জয় করতে পারতেন। ডিরেক্টর হতে গিয়ে এত বিপত্তি ঘটত না। কিন্তু রোডেশিয়ায় কৃষ্ণকায়দের তিনি গুরুতর ক্ষতি করতেন। নিজের সুনাম রক্ষা না করে তিনি যে একটি নিপীড়িত জাতির মঙ্গল-চিন্তা করেছিলেন এতেই কি ডঃ অ্যাডামস-এর মহানুভবতা প্রকাশ পায়নি?

আরো একটু ভাববার আছে। ডঃ অ্যাডামস যদি সাদা-কালোর বৈষম্য সম্বন্ধে সচেতন হন, তাহলে যে কমিটি তাঁকে ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত করেছে, সে কমিটিও সাদা-কালোর বৈষম্যে বিশ্বাসী। তাহলে অপরাধ ডঃ অ্যাডামস-এর যতটা, কমিটির তদপেক্ষা বেশী। কিন্তু কমিটিকে পদত্যাগ করতে কেউ ত বলছে না। কমিটির সিদ্ধান্ততে আপত্তি, কিন্তু কমিটিতে আপত্তি নেই—এর যুক্তি বোঝা শক্ত। এল এস ই-র ছাত্রদের এটুকু বোঝা উচিত ছিল যে, গলদ যদি কোথাও থেকে থাকে, তা কমিটিতে। ডঃ অ্যাডামস-এর পরিবর্তে অন্য কেউ ডিরেক্টর নিযুক্ত হলে তাঁকেও কমিটির নির্দেশে কাজ করতে হত। সুতরাং উপযুক্ত ডিরেক্টরও অনুপযুক্ত কমিটির নির্দেশে খারাপ কাজ করতে পারে। তাই প্রতিবাদ যদি কারও বিরুদ্ধে করতে হয়, তা কমিটির বিরুদ্ধে, কমিটির মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে নয়। তাছাড়া ডঃ অ্যাডামস-এর যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়ার মত কোন প্রমাণ নেই। টাইমস-এর পাতায় একাধিক ব্যক্তি—যাঁরা ডঃ অ্যাডামস-এর সঙ্গে কাজ করেছেন এবং তাঁকে ভালো করে জানেন—বলেছিলেন সাদা-কালোর পার্থক্যে ডঃ অ্যাডামস-এর মন খণ্ডিত নয়। তাঁর মন বিরাট। কৃষ্ণকায়দের মঙ্গলের জন্য তিনি কি করেছেন তার সব প্রমাণ লুপ্ত হয়ে যায়নি। এল এস ই-র ছাত্রদের সংশয় তাতেও যায়নি। এতেই মনে হয় ডঃ অ্যাডামস-এর নিয়োগ উপলক্ষ্য মাত্র। এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে ১৯৬৬ সালের বার্কলে-র ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এল এস ই-তে। সে-কথা এখন থাক।

HUNGER STRIKE BY STUDENTS

Girls among vo… for L.S… …st

L.S.E. SIT-DOWN GOES ON AFTER CONCESSIONS

STUDENTS DEFY DIRECTOR

S… …TS IN ALL …GHT PROTEST

L.S.E. director jeered after suspensions

বিলেতী সংবাদপত্রে হেডলাইন

এরপর ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৬৬ ডঃ অ্যাডামস-এর নিয়োগের প্রতিবাদ জানিয়ে ছাত্ররা একটা সভার আয়োজন করে। স্কুলের ওল্ড থিয়েটার-এ সভা হওয়ার কথা। কিন্তু ডিরেক্টর সভা করবার অনুমতি দিলেন না। ছাত্ররা ডিরেক্টরের নিষেধ অগ্রাহ্য করে সভা করবে স্থির করল। সভা করতে গিয়ে স্কুলের পোর্টারদের সঙ্গে ছাত্রদের ধস্তাধস্তি হল। তার ফলে একজন পোর্টার মিঃ পুল মারা গেল। পুল-এর মৃত্যু আকস্মিক। সেজন্য কেউ কাউকে দায়ী করল না। পুল-এর হার্ট ভালো ছিল না ধস্তাধস্তিতে মারা গেছে বটে না হলেও মারা যেতে পারত। কিন্তু ডিরেক্টরের আদেশ অমান্য করবার জন্য দুটি ছাত্রের শাস্তি হল। অ্যাডেলস্টিন এবং ব্লুম-কে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হল। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ৮০০ ছাত্র সম্মিলিতভাবে ঠিক করল শাস্তি প্রত্যাহার না করলে তারা ধর্মঘট করবে। ছাত্রদের পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রকাশ্যে কোন কোন অধ্যাপকও এগিয়ে এলেন।

১৩ই মার্চ, সোমবার থেকে স্কুলের দরজায় ছাত্রদের সত্যাগ্রহ শুরু হল। রাত্রি দশটার সময় ডিরেক্টর ছাত্রদের উদ্দেশে বাণী দিতে গেলেন। ছাত্ররা শিস দিয়ে, চীৎকার করে ডিরেক্টরকে থামিয়ে দিল। মঙ্গলবার থেকে অনশন ধর্মঘট শুরু। স্কুলের দরজা দিয়ে যাওয়া-আসা বন্ধ। বুধবার ছাত্রদের কাছে ডিরেক্টর আবার ব্যক্তিগত আবেদন জানালেন। অবস্থার পরিবর্তন হল না।

ইতিমধ্যে স্কুলের গভর্নিং বডির মিটিং হয়ে গেছে। সে মিটিং-এ ছাত্রদের দাবি সম্পূর্ণভাবে মেনে নেওয়া হয়নি বটে, তবে বলা হয়েছে যে, অ্যাডেলস্টিন এবং ব্লুম-এর শাস্তির ব্যাপার পুনর্বিবেচনা করা হবে। এবং পুনর্বিবেচনা না হওয়া পর্যন্ত অ্যাডেলস্টিন এবং ব্লুমকে স্কুলের ছাত্র হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হবে। ১৫ই মার্চ ডিরেক্টর আবার ছাত্রদের কাছে আবেদন জানালেন। এবার তিনি ছাত্রদের আশ্বাস দিলেন যে, বোর্ড অফ ডিসিপ্লিন-এর সভায় যখন অ্যাডেলস্টিন এবং ব্লুম-এর শাস্তির ব্যাপার পুনর্বিবেচনা করে দেখবেন, তখন ডিরেক্টর নিজে লর্ড ব্রিজেস এবং মিঃ এল ফারের-ব্রাউন সে-সভায় উপস্থিত থাকবেন না (সম্ভবত এই তিনজন সদস্য সম্বন্ধে ছাত্রদের আপত্তি ছিল)। এবং ডিরেক্টর আর একটি আশ্বাস দিলেন, সেটি বিশেষ গুরুত্বের—স্কুলের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেই স্কুল পরিচালনা ব্যাপারে ছাত্রদের পরামর্শ-নির্দেশ গ্রহণের কথা কমিটি সহানুভূতির সঙ্গে চিন্তা করে দেখবেন।

"When the school returned to normal functioning, the Standing Committee would be happy to meet students' representatives to carry further the discussions which had already started for improvements in the arrangements for consultation with students on the school's affairs."

এল এস ই-র ঝড় এতেও থামেনি। আগেই বলেছি, ডিরেক্টরের নিয়োগ নিয়ে গোলমাল শুরু। অ্যাডেলস্টিন এবং ব্লুম-এর শাস্তি নিয়ে গোলমালের জটিলতা। কিন্তু এ দুটি কারণই বাহ্য। আসল কারণ, শিক্ষা পরিচালনা ব্যাপারে ছাত্রদেরও কিছু বক্তব্য আছে—এই নীতিতে স্বীকৃতি দেওয়া বা না দেওয়া। এই গোলমাল শুধু এল এস ই-র নয়, শুধু বার্কলে-র নয় (ইন্দোনেশিয়ার ছাত্র ধর্মঘট এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র অশান্তি এ-প্রসঙ্গে বিবেচ্য নয় বলে মনে করি) এ-সমস্যা প্রায় পশ্চিমের সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের। শিক্ষা ব্যাপারে দুটি পক্ষ। এক পক্ষ দাতা এক পক্ষ গ্রহীতা। দাতা-গ্রহীতার যে সম্পর্ক মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আজ পর্যন্ত সে-সম্পর্কই অটুট আছে। কিন্তু সম্প্রতি মাত্র চার-পাঁচ বছর আগে থেকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, মধ্যযুগে প্রতিষ্ঠিত সে-সম্পর্ক আর কার্যকরী নয়, এর কিছু অদল-বদল প্রয়োজন। বিশেষ করে পশ্চিমী দেশে ছাত্র শুধুমাত্র গ্রহীতা-রূপে আর সন্তুষ্ট থাকছে না। কিন্তু এ-ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার। দাতা-গ্রহীতার সঙ্গে রফা করে কি করে? ডাক্তার রোগীর পরামর্শ অনুসারে কি চিকিৎসা করতে পারে? সমস্যা সেইখানে। এই অসম্ভবকে সম্ভব করাই এ দেশের শিক্ষা ব্যাপারে গুরুতর সমস্যা।

এই সমস্যা সমাধানের কথা যাঁরা চিন্তা করছেন, তাঁদের মধ্যে দুটি দল। একদল নরমপন্থী, আর এক দল উগ্রপন্থী। এল এস ই-র গোলমাল সম্পর্কে ঐ স্কুলের দু জন অধ্যাপকের মন্তব্য উদ্ধার করছি। পলিটিক্যাল সায়ান্সের রীডার ডঃ রাল্ফ মিলিব্যাণ্ড বলেছেন,

"It is meet and proper for students at this school, which was once great, to express their solidarity with thir elected leaders in any way they think will be effective."

উগ্রপন্থী প্রফেসর বি সি রবার্টস ছাত্রদের আচরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে—

"They are opposed to the State, to the school as an institution. All they want is a completely free society where there are no constraints or restrictions, and no discipline of any kind."

এই খানে সমস্যা আরও জটিল হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংঘশক্তিকে কেউ কেউ 'ট্রেড ইউনিয়ন'-এর সঙ্ঘশক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন

the emergence of a self-conscious student class is reminiscent of the emergence of a self-conscious working class in the nineteenth century.

ছাত্রদের এই "নিউ প্যাওয়ার" প্রথম বিরোধ ঘটিয়েছে শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে, দ্বিতীয় বিরোধ ঘটিয়েছে শিক্ষক-শিক্ষকের মধ্যে। এই ত্রিভুজাকৃতি বিরোধ সমস্যাকে জটিলতর করেছে। ডঃ মিলিব্যাণ্ড এবং প্রফেসর রবার্টস দুজনেই চরমপন্থী। এবং দু জনেই ছাত্রদের আচরণকে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন। একজন যাকে সঙ্গত দাবি বলেন, অপরে তাকে উচ্ছৃংখলতা বলেন। স্বভাবত দু জনেই অতিশয়োক্তি করেছেন। রবার্টস গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করেই বোধ হয় স্যার রবার্ট আইটকিন—বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেছেন

"staff who do not understand the new generation of students."

স্যার রবার্ট-এর মূল বক্তব্য এল এস ই-র কর্তৃপক্ষ 'স্টুডেন্টস পাওয়ার'-এর গুরুত্ব বুঝতে পারেননি, বুঝলেও স্বীকার করেননি। ছাত্র সম্বন্ধে তাঁদের মনোভাব মধ্যযুগীয়। সে মনোভাবের পরিবর্তন না হলে পদে পদে সংঘর্ষ দেখা দেবে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়—সাসেক্স, ম্যাঞ্চেস্টার, ব্রিস্টল—নবজাগ্রত ছাত্রশক্তিকে স্বীকার করে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ব্যাপারে অংশ দিয়েছেন। তাতে কাজের অসুবিধা হয়নি, ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক ভালো হয়েছে।

শিক্ষার ইতিহাসে এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। যাঁরা এইভাবে সমস্যার সমাধান করেছেন, তাঁরা শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বনামধন্য ব্যক্তি। আমার মন কিন্তু সংশয়মুক্ত নয়। আজ অংশের জন্য দাবি, কাল বৃহত্তর অংশের জন্য দাবি গড়ে উঠবে না ত?

১২।৪।৬৭

[শনিবার (১৫।৪।৬৭) তারিখের গভর্নিং বডির মীটিং-এ ব্লুম এবং অ্যাডেলস্টিন-এর শাস্তি প্রত্যাহার করা হয়েছে। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্ এখন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।]

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

বিধবাবিবাহ সম্পর্কে রাখালদাস হালদার

পশুপতি শাশমল

॥ ১ ॥

রাখালদাস হালদার উনবিংশ শতাব্দীর একজন স্বনামধন্য পুরুষ। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর (১৭৫৪ শক ৮ পৌষ) তারিখে 'ভাটপাড়ার নিকটবর্তী জগদ্দল গ্রামে' তাঁর জন্ম হয়। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রাখালদাসের একটি নোটবই থেকে এই তারিখটি সংগৃহীত। রবীন্দ্রকথার সংকলক খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একটি প্রসঙ্গে বলেছেন, "'রাখালদাস হালদার বাংলার প্রথম এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার 'বেচারাম হালদারের পুত্র (বঙ্গদর্শন, ষষ্ঠ খণ্ড ১২৮৫ সাল, ১৯৬ পৃষ্ঠা, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'গঙ্গাধর শর্ম্মা' ওরফে 'জটাধারীর রোজনামচা' দ্রষ্টব্য)। মহর্ষির আত্ম-জীবনীতে রাখালদাসের অনেক কথা আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার পুত্র অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রাঁচির স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয় A Mid-Victorian Hindu নামক পুস্তকে স্বীয় পিতার জীবনী লিখিয়াছেন।" (১) পূর্বোক্ত নোটবইয়ের এক স্থানে রাখালদাস স্ববংশ পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "আমার পিতামহ ইন্দ্রনারায়ণ হালদার শালিবাহনের সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি প্রায় ৯৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। চরমাবস্থা পর্যন্ত তাঁহার বিলক্ষণ দৈহিক শক্তি ছিল।...ইন্দ্রনারায়ণ হালদার ফরাশীশ জাতির অতিশয় গোঁড়া ছিলেন; ফরাশীরদের প্রশংসা করিলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন; প্রত্যুত যে ব্যক্তি ইংরেজদের প্রশংসা করিয়া ফরাশীশের নিন্দা করিত, তিনি তাহার অনাদর করিতেন॥" সুকুমার হালদার তাঁর A Mid-Victorian Hindu গ্রন্থের আরম্ভে রাখালদাস-বিরচিত পারিবারিক বিবরণী থেকে এক বৃহৎ অংশ উদ্ধার করেছেন। তা থেকে জানা যায়, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ জনার্দন হালদার এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা; তিনি নদীয়া জেলার শ্রীনগর-সিমুলিয়ার অধিবাসী ছিলেন। পিতামহ ইন্দ্রনারায়ণ সম্বন্ধীয় উপরিউক্ত তথ্যাবলী রাখালদাস রচিত পারিবারিক বিবরণীর মধ্যেও স্বীকৃত হয়েছে। ইন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু সম্পর্কে রাখালদাস মন্তব্য করেছেন যে, তাঁর জন্মের কয়েক বৎসর পূর্বে পিতামহের মৃত্যু হয়। ইন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র বেচারামের জন্ম হয় ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ নভেম্বর তারিখে। বেচারামের দ্বিতীয় পত্নী দ্রবময়ী (রাখালদাসের জননী) দেবীর মৃত্যুকথা নোটবইয়ের মধ্যে আছে; পারিবারিক বিবরণী থেকে জানা যায়, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ নভেম্বর তারিখে এই রমণী দেহরক্ষা করেন।

রাখালদাস-প্রণীত 'শ্রীরামচরিত' (২) নামক পুস্তিকায় যে 'গ্রন্থকারের জীবন-চরিত' পাওয়া যায় তা পুত্র সুকুমার

রাখালদাস হালদার

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৫৪ শক ফাল্গুন, প্রথম ব্রাহ্মবিবাহের বিবরণ—বিলাতী সংবাদপত্রে, ৩০২, পা. টী.।

২। শ্রীরামচরিত, '২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত'; কলিকাতা, ১৩০৮।

হালদার কর্তৃক 'কান্দি—মুর্শিদাবাদ' থেকে ১৩০৮ সালের চৈত্র মাসে লিখিত। ঐ সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে প্রয়োজনীয় অংশ-সমূহ উদ্ধৃত হল ঃ

"বেচারাম হালদার নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তৎপুত্র রাখালদাস মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবর্তী সংস্কারকদলে উৎসাহের সহিত যোগ দেন। তিনি খিদির-পুর ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন ও জগদ্দলে শাখাসমাজ স্থাপন করেন। তিনি সমাজে ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা করিতেন ও অল্প বয়সেই বাঙ্গালা রচনা অভ্যাস করেন। সংবাদ-প্রভাকর, সমাচারচন্দ্রিকা, সোমপ্রকাশ প্রভৃতিতে তাঁহার রচনা বাহির হইত। ল্যাম্বের লিখিত সেক্সপীয়রের কতিপয় উপাখ্যান বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন ও রাজা রামমোহন রায়ের **Precepts of Jesus** গ্রন্থের বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। উপরিতন কর্মচারীর সহিত অনৈক্য ঘটায় তিনি কটকের স্কুল ইনস্পেক্টরের কর্ম ত্যাগ করিয়া ১৮৬১ অব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখে নেমেসিস জাহাজে বিলাতযাত্রা করেন। ঐ জাহাজে বিখ্যাত আমেরিকান পাদরি ডল সাহেব তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। বিলাতে

লণ্ডন ইউনিভার্সিটি হলে অবস্থিতিকালে ডল সাহেব তাঁহাকে ইউনিটারিয়ান খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করায় ডলের সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটে। অবসরগত সিবিলিয়ান হজসন প্রাটের আনুকূল্যে নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী ভাষার শিক্ষকতাকার্য লাভ করেন। এই সময়ে তিনি চার্লস ডিকেন্সের All the year Round পত্রিকায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জুরিসপ্রুডেন্স বিষয়ে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়া তিনি কিছুদিন আয়র্লণ্ড ও ফ্রান্স দেখিতে যান। তৎপরে ১৮৬২ অব্দে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। বিলাতে অবস্থান সময়ে তিনি সোমপ্রকাশে পত্রাদি পাঠাইতেন ও বাঙ্গালী পাঠককে মার্কিন দেশের বিখ্যাত গৃহযুদ্ধের সংবাদ দিতেন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতে অধিকারী হইয়াছিলেন, কিন্তু অবস্থাক্রমে চাকরি গ্রহণে বাধ্য হন। তদানীন্তন ছোটলাট সার সিসিল বীডন তাঁহাকে বর্ধমানের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করেন। এই নিয়োগের পর আর তিনি বাঙ্গালা রচনায় অবসর পান নাই। জীবনের শেষ ছয় বৎসর তিনি ছোটনাগপুর কোর্ট অব ওয়ার্ডস এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন।" এই শেষোক্ত কার্য যে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদন করেছিলেন তা 'চীফ সেক্রেটারী এডগার সাহেবের পত্র' পাঠে জানা যায়। (৩) সুকুমার হালদারের প্রদত্ত বিবরণ থেকে জানা যায়, '১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসে রাখালদাস হালদার পরলোকগমন করেন।' তৎকালীন Reis and Rayyet পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায় বলেন, He died on the 23rd inst., under circumstances particularly trying to friends, after a sharp illness of ten days from what we should call acute brain fever leading—and led perhaps by a miserable system pretending to good—to apoplexy.' (৪)

পূর্বোক্ত নোটবইয়ের মধ্যে রাখালদাস নিজের জীবনের ঘটনাপঞ্জী ব্যবহার করেছেন; ঐ তালিকা থেকে সেকালের বাঙলা দেশের সঙ্গে তাঁর চিত্তের সুগভীর যোগাযোগের এক সুন্দর ইতিহাস পাওয়া যায়। সেই ঘটনাপঞ্জী থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল, এই নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলীর উপরেই বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

"১৭৫৪ ৮ই পৌষ জন্মগ্রহণ। day 21 days। 1832

শ্রীমন্মহামহো[illegible] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়েষু—

সাদর নিবেদনমিদং

আমি যদিও মহাশয়ের পরিচিত নহি, তথাপি [illegible]

[illegible]

[illegible]

শ্রীরাখালদাস হালদার

[illegible]

রাখালদাস হালদারের স্বহস্ত লিখিত বিদ্যাসাগরকে লেখা একটি চিঠির প্রতিলিপি

16 March 37—4ঠা চৈত্র বিদ্যারম্ভ।

13 Feb. 40 ১৭৬১—২রা ফাল্গুনে উপনয়ন।

24 Oct. 45 ১৭৬৭—৯ই কার্তিকে ভবানীপুরে আগমন।

28 Apl 46 ১৭৬৮—১৭ই বৈশাখ বেহালায় বাস।

7 Dec 46—২৩ অগ্রহায়ণ খিদিরপুরে বাস

১৭৬৯—পৌষ মাসে প্রথমতঃ বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ করা যায়।

17 Janr 48—২৮এ পৌষ আমার লিখিত একটি পরমার্থ বিষয়ক পদ্য সাধুরঞ্জনে প্রকাশিত হয়।—শেষাংশে সর্বদা সাধুরঞ্জন পত্রে প্রস্তাবাদি প্রকাশ করিতাম।

10 May 48—১৭৭০-২৯এ বৈশাখে বর্ধমানের নিকটস্থ চণ্ডীপুর গ্রামনিবাসী কেনারাম রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কিরণময়ীর পাণিগ্রহণ করা হয়।—শীতকালে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে ও হিন্দুদের সপক্ষে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা।

১৭৭১—ভূগোল বিদ্যার ইতিহাস বিষয়ে এক অনতিক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রস্তুত করা হয়। নষ্ট হইয়াছে।

১৭৭২—বৈশাখে বাবু অনঙ্গমোহন মিত্র, উদয়চন্দ্র দেব, দ্বারকানাথ...একত্র হইয়া দূরবীক্ষণিকা পত্রিকা প্রকাশ করা যায়।

১৭৭৩—৭৪—বাবু উদয়চন্দ্র আঢ্যের অর্থ সাহায্যে ল্যাম্ব কৃত শেকসপীয়রের গল্পমধ্যে ওথেলো, পেরিক্লিস, সেম্বিলিন, এজ ইউ লাইক ইট, কিং লিয়র এবং রোমিও জুলিএট বাঙ্গালায় অনুবাদ করা হয়। পূর্ণচন্দ্র পত্রে নানা প্রস্তাব প্রকাশ করা হয়।

3 Jary 54 ১৭৭৫—২০এ পৌষ উপবীত ত্যাগ।

মাঘের পূর্বে উপবীত গ্রহণ"

অতঃপর দু একটি প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে মাত্র। বলা বাহুল্য, তাঁর বিলাত গমনের পূর্ববর্তীকালের ঘটনাসূচী নোট খাতায় দেওয়া হয়েছে এবং সেই তালিকা থেকে বর্তমান নির্বাচিত অংশসমূহ সংগৃহীত। তাঁর পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলীর পরিচয় পাওয়া যায় A Mid-Victorian Hindu গ্রন্থে; বিশেষত বিলাতপ্রবাসের জীবনকথা পাওয়া যাবে The English Diary of an Indian Student (৫) গ্রন্থে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, তাঁর উপবীত পরিত্যাগ ও পুনর্গ্রহণের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত নোট খাতার মধ্যে লেখক পরিবেশন করেছেন। এই উপবীত বর্জন উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা দেশের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অবশ্য তাঁরও পূর্বে ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী রামতনু লাহিড়ী ১৮৫১ সালে উপবীত পরিত্যাগ করেছিলেন। (৬) সে যাহোক, ১৭৭৫ শকের ১৮ পৌষ (১৮৫৪, ১ জানুয়ারী) রবিবার দিবসে গোরিটি বা 'পলতা'র বাগানে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্ম সম্মেলনের (৭) দু দিন পরে রাখালদাস উপবীত

৩. Letter to Commissioner, Chota Nagpur Division, No. 51J, dated the 9th January, 1888.

৪. Reis and Rayyet, 1887, 26 November.

৫. The English Diary of an Indian Student 1861-62, being the Scribbling-Journal of the late Rakhal Das Haldar etc., with an introduction by Harinath De, M.A., The Asutosh Library, Dacca 1903.

৬। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ ১৯৫৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৬।

৭। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পত্রাবলী', ৩৭ সংখ্যক পত্র, 'কলিকাতা ২৭ পৌষ', রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত।

পরিত্যাগ করেন। রাখালদাসের পূর্বোক্ত নোটখাতার অংশবিশেষ অবলম্বনে সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। (৮) মহর্ষির আত্মজীবনীতেও এই উপবীত ত্যাগের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। (৯)

॥ ২ ॥

রাখালদাসের মৌলিক চিন্তাপূর্ণ রচনাবলী পরবর্তীকালের সমালোচকের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী শ্রীরামচরিত নামক পুস্তিকাটির গদ্যরীতিকে
an excellent example of the chaste classical Bengali in vogue in the middle of the nineteenth century
হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। (১০) শ্রীরামচরিতের নূতন সংস্করণের (১৩০৮) ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর মন্তব্য করেছেন, "গ্রন্থের ভাষা তৎকালিক সাধুভাষার উৎকৃষ্ট উদাহরণ মনে করিয়া গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রিত করিতে অনুরোধ করি। কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চিন্তাপ্রণালীর আদর্শ এই গ্রন্থ হইতে অনেকটা পাওয়া যাইবে, তজ্জন্য গ্রন্থখানি আদৃত হইবে।"

সে যাই হোক, বর্তমান প্রস্তাবে রাখালদাস হালদার রচিত বিধবা বিবাহ বিষয়ক একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া হল। প্রখ্যাত শিল্পী অসিতকুমার হালদার প্রদত্ত এবং বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র ভবনে সুরক্ষিত রাখালদাসের পূর্বকথিত নোটবইটির মধ্যে (৯২‌"×৬") বর্তমান রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। উক্ত নোটবইয়ের মধ্যে এমন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ 'প্রস্তাব' আছে যার সাহায্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্যক অনুধাবন করা যায়; দু একটি রচনা 'বগত শতাব্দীর সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের উপর অভিনব আলোকসম্পাতে সমর্থ। এই নোটবইতে তাঁর প্রকাশিত অপ্রকাশিত বিবিধ-বিষয়ক রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। অপ্রকাশিত রচনার কোন কোনটি পুনর্লিখিত কিংবা অন্য কোথাও থেকে কপি করা; এমন কয়েকটি রচনা আছে যা পুনঃ পুনঃ সংশোধিত। কয়েক'টি প্রবন্ধের খসড়াও পাওয়া যাবে।

নোটবইয়ে প্রাপ্ত বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত প্রবন্ধটির শিরোনাম হল 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া অবশ্য উচিত'। প্রবন্ধটির শিরোনামের নীচে '২৮এ ফাল্গুন ১৭৭৬ শক। 10 March 1855' এই তারিখটি পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, রাখালদাসের নোটবইয়ের রচনাবলীর প্রায় সর্বত্র সন তারিখ নির্দেশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি পাঠকালে জানা যায় যে, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় বিরচিত বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক একটি পুস্তিকা পাঠ করার পর রাখালদাস তাঁর প্রবন্ধ রচনা করেন; প্রসন্নকুমারের পুস্তিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা ১২—রাখালদাসের প্রবন্ধে এ ইঙ্গিত আছে। আলোচ্য প্রবন্ধের মধ্যে প্রসন্নকুমারের বক্তব্য কিছু পরিমাণে উদ্ধৃত হয়েছে। পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের কথোপকথনাকারে রাখালদাসের প্রবন্ধটি নির্মিত; প্রসন্নকুমারের বক্তব্যের সারাংশ উল্লেখ করে তার 'উত্তর' দিয়েছেন রাখালদাস, প্রয়োজনবোধে বক্তব্য বিশ্লেষিত ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্য সংযোজিত। সর্বশেষে রাখালদাস এমন একটি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যার সঙ্গে মূল প্রবন্ধ-বিষয়ের কোন সম্পর্ক না থাকলেও মন্তব্যটি প্রবন্ধের গুরুত্ব অসামান্য করে তুলেছে। তিনি বলেছেন, "উপরের লিখিত প্রস্তাব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বীয় ব্যয়ে মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে নিজে এক পুস্তক প্রকাশ করিলেন বলিয়া বোধহয় ইহা মুদ্রিত করিবেন না।" রাখালদাসের প্রবন্ধটি যে বিদ্যাসাগরের অনুমোদন লাভ করেছিল তা অনুমান করা চলে। রচনার কিছুকাল পরে এইরূপ মন্তব্য করা হয় এবং মন্তব্য প্রকাশকাল পর্যন্ত তিনি যে বিদ্যাসাগরের আনুকূল্য সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েননি তা বেশ বোঝা যায়।

এ সম্পর্কে আর একটি তথ্য দেওয়া হল। A Mid-Victorian Hindu গ্রন্থের ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠায় সুকুমার হালদার লিখেছেন,
In March 1855 R.D.H. (Rakhal Das Halder) wrote an essay in defence of widow-marriage, in reply to a pamphlet written by Babu Prasanna Kumar Mukherji, who defended the existing prohibition from the orthodox point of view. The following entry in his Diary under Sep. 26, 1855, is interesting: "Made the acquaintance of the American Unitarian Missionary, Mr. C.H.A. Dall, who has arrived recently at Calcutta for spreading unitarian Christianity. Conversed with him for an hour at Mountain's Hotel. Thence went to the Tattwabodhini Society, where chatted for a while with Akshay Kumar Dutt. Passed on to the Sanskrit College and met Iswar Chandra Vidyasagar. The second part of his book on widow-remarriage is now in an advanced stage of preparation; Vidyasagar said he would embody my reply to Prasanna Kumar Mukharji's pamphlet in his book".

বিধবাবিবাহ সংক্রান্ত বিদ্যাসাগরের রচনাটি 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' এই শিরোনামে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৭৬ শকের ফাল্গুন সংখ্যায় (১১) মুদ্রিত হয়; পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে (১৯১১ সংবৎ, ১৬ মাঘ)। এর প্রতিবাদে যে সকল পুস্তক-পুস্তিকা প্রণীত হয় প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনাটি তার অন্যতম। প্রসন্নকুমারের প্রবন্ধের উত্তরে রাখালদাসের প্রস্তাবটি রচিত হয় সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। উপরের আলোচনা থেকে জানা যায়, বিদ্যাসাগর একদা রাখালদাসের রচনাটি 'স্বীয় ব্যয়ে মুদ্রিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ' করেছিলেন; কিন্তু তিনি 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রণয়ন করেন (১২) এবং তার মধ্যেই প্রসন্নকুমারের বক্তব্যসমূহের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। ১৮৫৫ সালের মার্চ মাসে রাখালদাসের প্রবন্ধ প্রস্তুত হয় এবং অক্টোবরে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব প্রচারিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর রাখালদাসকে জানিয়েছিলেন যে প্রসন্নকুমারের পুস্তিকার যে প্রত্যুত্তর রাখালদাস রচনা করেছেন তাকে তিনি আপনার প্রস্তাবের দ্বিতীয় পুস্তকে স্থান দিতে ইচ্ছুক; রাখালদাসের ডায়েরী থেকে যে অংশ আগে উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে এইরূপ ধারণা করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকের ষষ্ঠ অধ্যায়টিতে 'ভবানীপুরনিবাসী শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়'-এর প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর দেওয়া হয়েছে। (১৩) কথিত অধ্যায়টির বিষয়বস্তুর সঙ্গে রাখালদাসের প্রবন্ধের বিষয়সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, কিন্তু

৮। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪৯ শক বৈশাখ, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী—পলতার বাগানের মেলা ও তথায় উপবীত পরিত্যাগের প্রস্তাব, ৬—১০।

৯। আত্মজীবনী, বিশ্বভারতী ১৯৬২, ১৬৮। সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক লিখিত 'পরিশিষ্টে'র ৫৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১০. Sukumar Haldar, A Mid-Victorian Hindu—A sketch of the Life and Times of Rakhal Das Haldar, Ranchi 1921, 35.

১১। চতুর্থ ভাগ ১৩৯ সংখ্যা, ১৬৬—১৭৪।

১২। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ ১৯১২ সংবৎ, ৪ কার্তিক; ১৮৫৫ অক্টোবর।

১৩। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিধবা-বিবাহ, শাস্ত্রপ্রকাশ কার্যালয় থেকে শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা ১৩২৯, ৮০—৮৫; অধ্যায়টির শিরোনাম 'বিবাহবিধায়ক বচন পরাশরের, কৃত্রিম নহে'।

অধ্যায়টির মধ্যে বা গ্রন্থের কোথাও রাখালদাস হালদারের নামোল্লেখ নেই।

প্রাগুক্ত নোটখাতার মধ্যে রাখালদাস রচিত বিধবাবিবাহ-বিষয়ক আর একটি বৃহৎ প্রবন্ধ আছে, এটি কিন্তু মৌলিক রচনা নয়। প্রবন্ধটির শিরোনাম 'বিধবাবিবাহের প্রতি পোষকতায় ব্যবস্থাপক সমাজে গ্রান্ট সাহেবের বক্তৃতা'। প্রবন্ধ শেষে মন্তব্য করেছেন রাখালদাস, "১৮৫৫ সালের নবেম্বর মাসে গ্রান্ট সাহেব উপরোক্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বাবু চন্দ্রনাথ দেবের অনুরোধে আমি উহা অনুবাদিত করিয়াছি।"

॥ ৩ ॥

রাখালদাসের নোটবইয়ের মধ্যে 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া অবশ্য উচিত' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ:

"বাবু প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় মতের পোষকতায় যে সকল তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমারদের বিবেচনার সহিত ঐক্য হয় নাই। আপনারদের বিশ্বাসবিরুদ্ধ হইলেই কোন মতকে অগ্রাহ্য করা আমারদের ধর্ম নহে। আমি পক্ষপাতশূন্য হইয়া প্রসন্নবাবুর পুস্তক পাঠ করিয়াছি, এবং তাঁহার তর্ক সকলকে নিতান্ত সত্যের বিরুদ্ধ জানিয়া তাঁহার সহিত অনৈক্য হইয়াছি। প্রসন্নবাবু বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে লিখিতেছেন, শুনিয়া আমরা প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। তিনি কেবল যুক্তিবর্ত্মান অবলম্বন করিবেন। এক্ষণে দৃষ্ট হইল যে, তিনি স্বীয় মতের সাহায্যে নিমিত্ত শাস্ত্র ও লৌকিক ব্যবহারকেও আমন্ত্রিত করিয়াছেন। তিনি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন, পশ্চাল্লিখিত বিচার দ্বারাই প্রতিপন্ন হইবে।

প্রসন্নবাবুর মতে বিধবাবিবাহ ধর্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। আমরা আপনারা তাদৃশ ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ নহি; সুতরাং বিধবাবিবাহের বিধায়ক নূতন প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া তাঁহা হইতে জয় প্রত্যাশা করি না। কিন্তু তথাপি তদ্বিষয়ে আমারদের বিবেচনা কি, তাহা সাধারণকে অবগত করা কর্তব্য।

তিনি লিখিয়াছেন—মনুস্মৃতি সর্বকালে সর্বস্মৃতির অপেক্ষা প্রধান, তদনুসারে 'বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ'। মনুতে যাহা লিখিত থাকিবে, তাহাই যে সকল কালে ধর্ম বলিয়া মানিতে হইবে তদপেক্ষা কোন সন্দেহ নাই।

উত্তর। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ পুস্তকে ইহা বাহুল্যরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মনু নিরূপিত ধর্ম কেবল সত্য যুগের ধর্ম; অতএব বিধবা বিবাহ যদি মনুর মতে নিষিদ্ধই হয়, তবে সে নিবিদ্ধ কেবল সত্যযুগের উপরেই বর্তে। আর যদি সর্বকালেই মনুর মত মান্য করা উচিত হয়, তবে আমারদের জিজ্ঞাস্য এই, আমরা এক্ষণে কোন বিষয়ে মনুর মতে চলিতেছি? মনুর হিন্দুর সহিত এই ক্ষণকার হিন্দুর তুলনা করিলে উভয়কে বিভিন্ন জাতীয় বোধ হয়। যদি বিবিধ বিষয়ে মনুর বিধানের বিরুদ্ধ ব্যবহার এক্ষণে দূশ্য না হয়, তবে অন্যান্য কারণে বিধবা বিবাহ কর্তব্য বোধ হইলে মনুর নিষেধে তাহা হইতে কি ক্ষান্ত হওয়া উচিত?

পূর্বপক্ষ। পরাশরের যে বিবেচনানুসারে মৃতস্বামিকা পুনর্বিবাহ করিতে পারে, তদনুসারে তাহার পতি অনুদ্দিষ্ট, ক্লীব, সংসারত্যক্ত বা পতিত হইলে সে পুনর্বিবাহ অধিকারিণী হয়। বচনের এক ভাগের ন্যায় সমস্ত ভাগ মান্য করা উচিত।

উত্তর। অবশ্য উচিত।

পূর্বপক্ষ। ক্লীবের স্ত্রীর অন্য পতিগ্রহণে পরাশরের মত থাকিলে তিনি ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান করিতেন না।

উত্তর। পরাশর বচনে 'ঔরষঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব' এই পাঠ আছে বটে, কিন্তু নন্দপণ্ডিত দত্তকমীমাংসা গ্রন্থে তিন প্রকার পুত্রকে পরাশরের অভিপ্রেত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর আর বিষয়ে টীকাকার গ্রন্থকারের যেরূপ অর্থ প্রতিপাদন করেন, তাহা যদি গ্রহণ করা বিহিত হয়, তবে এবিষয়ে তাহার অন্যথা করা উচিত নহে।

পূর্বপক্ষ। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের পরাশরোক্ত বিধি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা বাস্তবিক বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি নহে; বাগদত্তা কন্যার প্রতি বিবেচনা করিতে হইবে। বাগদান বিবাহ মধ্যে গণ্য। যে বাগদত্তা হইয়া বিধবা হয়েন, তাঁহার বিবাহের নাম বিধবা বিবাহ।

উত্তর। যদি ইহাই যথার্থ হইত, তবে সেই হতভাগিনীকে মুখকল্পে সহমৃতা বা ব্রহ্মচারিণী হইতে হইত; কারণ পরাশর লিখিয়াছেন যে, বিধবা স্ত্রী হয় পুনর্বিবাহ করিবেক, নয় ব্রহ্মচর্যাবলম্বন কিংবা স্বামীর সহগমন করিবেক। প্রসন্নবাবু কি এতদূর সম্মত হয়েন?

পূর্বপক্ষ। বিধবাবিবাহ পরাশরের অভিমত সিদ্ধ হইলে তিনি বৈধব্যদশাকে দণ্ড বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন না।

উত্তর। বৈধব্যদশাকে দণ্ডস্বরূপে ব্যাখ্যা করাতে বিধবাবিবাহ পরাশরের মত বিরুদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি বৈধব্যদশাকে আহ্লাদজনক বলিয়া মানিবেন? বিধবা হওয়া অবশ্য দুর্ভাগ্যজনক—বন্ধু-বিয়োগ অবশ্য অসহ্য শোকজনক ব্যাপার। কিন্তু তজ্জন্য দ্বিতীয় পতি দ্বিতীয় বন্ধু গ্রহণে কি নিষেধ বুঝায়?

পূর্বপক্ষ। যদি বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইত, তবে তদ্বিষয়ের দায়ভাগাদি বিবিধ প্রকার স্পষ্ট বিধান না থাকিত কেন?

উত্তর। এই প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দিতে

আমি উপযুক্ত নহি; তবে প্রসন্নবাবুর এক যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, সেসকল বিধি লুপ্ত হইয়া থাকিবেক।

পূর্বপক্ষ। অষ্টপ্রকার বিবাহের মধ্যে বিধবাবিবাহের কোন বিধি দৃষ্ট হয় না।

উত্তর। মৃতস্ত্রীক পুরুষের বিবাহও অভিহিত অষ্টপ্রকার মধ্যে স্পষ্টরূপে লিখিত নাই। যদি তাহা ব্রাহ্মবিবাহের অন্তর্গত হয়, তবে বিধবাবিবাহও গান্ধর্ব-বিবাহের অন্তর্ভূত হইবে।

পূর্বপক্ষ। বিধবাকে পাত্রে কে দান করিবে? পূর্বে যে ইচ্ছাবরী হওনের প্রথা ছিল, তাহাতেও দান ভিন্ন আর কিছু ছিল না। কন্যা আপন ব্যক্তি ইচ্ছা করিতেন, পিতৃ আদি সেই বরে কন্যাদান করিতেন।

উত্তর। আমারদের ভয় হয়, বুঝি প্রসন্নবাবু স্ত্রীলোকদিগকে জড়ের মধ্যে গণ্য করেন; কিন্তু তাহারা জড় নহে; তাহারা চেতন পদার্থ; সামান্য চেতন হইতে শ্রেষ্ঠ পদার্থ; মনুষ্যের ন্যায় চেতন পদার্থ অন্যকে দান করা পরমেশ্বর প্রণীত ধর্মশাস্ত্রের বিধিসিদ্ধ নহে। প্রসন্নবাবু কৃতবিদ্য ব্যক্তি; আমরা ভরসা করিয়াছিলাম, স্ত্রীলোকদিগকে মনুষ্যজাতীয়া বলিয়া তাঁহার সম্বোধন আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তিনি স্বীয় পুস্তকে তাহা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার কি এই মত যে, যেমন ভূমিদান ও গোদান করা যায়, কন্যাদানও সেইরূপ? ইহারদের মধ্যে কি বিশেষ নাই? পিতা কন্যাকে জন্মদান ও প্রতিপালন করেন বলিয়া কি স্বীয় ইচ্ছায় নৈসর্গিক বিধিবোধিত মতে তাহাকে অন্য পাত্রে দান করিতে পারেন? যদি তিনি কন্যাকে স্বীয় ইচ্ছায় দান করিতে পারেন, তবে তাহাকে বধ করিতেও পারেন। এ নিয়ম কদাপি পরমেশ্বর প্রণীত ব্যবহার অন্তর্ভূত নহে। বিবাহের পূর্বে কন্যার উচিত যে, পিতার সম্মতি গ্রহণ করে। কন্যা যদি অবিবেচনাপূর্বক অযোগ্য পাত্রে হস্তার্পণ করিতে ব্যগ্র হয়, পিতার তাহাকে সদুপদেশ দেওয়া কর্তব্য। কিন্তু তিনি স্বীয় ইচ্ছায় অন্যকে কন্যাদান করিতে পারেন না। আমারদের দেশীয় লোক যে কন্যা দান করা মহৎ কর্ম জ্ঞান করেন, তাহা আমি আশ্চর্য জ্ঞান করি না; আমারদের দেশে অদ্যাপি অনেকে পুত্রকন্যাকে বিক্রয় করে; কিয়ৎকাল পূর্বে সুকুমার সন্তানগণকে সাগরে নিক্ষেপ করা এদেশের রীতি ছিল।

পূর্বপক্ষ। এতদ্দেশের দুরবস্থা সময়ে শাস্ত্রমধ্যে বিস্তর কৃত্রিম বচন প্রবিষ্ট হয়; পরাশরোক্ত বিধবাবিবাহ বিধায়ক বচনও সেইরূপ কৃত্রিম। যদি তাহা পরাশর প্রণীত হইত, তবে পূর্বাবধি প্রচলিত না থাকিত কেন?

উত্তর। আমরা প্রসন্নবাবুর ন্যায় স্বীকার করি যে, শাস্ত্র মধ্যে বিস্তর কৃত্রিম বস্তু (?) প্রবিষ্ট হইয়াছে; আমরা অধিকন্তু ইহাও স্বীকার করি যে, বিস্তর বচন লুপ্তও

হইয়াছে। কিন্তু পরাশরের অভিহিত বচনকে কৃত্রিম বলিয়া আমারদের বোধ হয় না। বরং অনুমান করা যাইতে পারে যে, উত্থাপিত বিষয়ের নিষেধক বচন সকলই অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তনকালে কল্পিত হইয়াছে। অনুমান করিতে প্রসন্নবাবুর যেরূপ অধিকার, আমারদের ও অপরাপর ব্যক্তিরও সেইরূপ। বিধবাবিবাহ যে সাধারণ রূপে প্রচলিত নাই, তাহা আশ্চর্য নহে; কারণ, পরাশরের আর আর অনেক বিধানও অদ্যাপি চলিত হয় নাই। যাঁহারা ধর্মশাস্ত্রে আস্থা রাখেন, তাঁহারদের সমস্ত বিধানই পালন করা কর্তব্য। পরন্তু পরাশরোক্ত বচন যদি প্রসন্নবাবুর কৃত্রিম বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তবে তিনি বহু বিচার করিয়া কেন এত ব্যর্থশ্রম স্বীকার করিলেন? পরাশরের বচনকে কৃত্রিম বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলেই তো যথেষ্ট হইত।

পূর্বপক্ষ। পূর্বকালের শাস্ত্রকর্তারা ইদানীন্তনদের অপেক্ষা সামান্য পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান ছিলেন না। তাঁহারা কি দেশের হিতজনক কর্মে অত্যুৎসাহী ছিলেন?

উত্তর। তাঁহারা বিলক্ষণরূপে তর্কবিতর্ক করিতে পারিতেন, ইহা যথার্থ বটে। কিন্তু তাঁহারদিগকে ইদানীন্তনদের তুল্য যথার্থ তত্ত্বদর্শী ও বিদ্বান বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যে এক বিষয়ে উভয়কালীয় পণ্ডিতেরা মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পরীক্ষা করিলে পরস্পর বিস্তর তারতম্য বোধ হইবে। পরন্তু প্রাচীনদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও স্বদেশহিতৈষণার কথা আর কি কহিব? তাঁহারা এমত ব্যবস্থা-সকল সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন যে, তদনুসারে লোকে চিরকালের নিমিত্ত জ্ঞানবর্ত্ম পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞানকূপে আত্মবিসর্জন দিতে কিছুমাত্র সংকুচিত হইতেছে না।

প্রসন্নবাবু লিখিয়াছেন যে, আমারদের 'ক্ষীণ বুদ্ধিতে' প্রতীত হয় না, প্রাচীনেরা কি কারণে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ করিয়াছেন; তথাপি তাহার কারণ দর্শাইয়া তিনি ১২ পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু আমি ভুলিতেছি; আপনাকে ক্ষীণ বুদ্ধি বলা প্রসন্নবাবুর অভিপ্রায় নহে; যাহারা বিধবা বিবাহের পোষকতা করিতেছে, তাহারাই প্রাচীনদের অপেক্ষা ক্ষীণ বুদ্ধি। লোকে যদি কলিকাতার অক্টরলনি কীর্তিস্তম্ভ দেখিয়াও পাণ্ডুয়ার মন্দিরকে বিশ্বকর্মা নির্মিত বলে, তবে তাহার আর ঔষধ কি?

বাবু প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় বিধবাবিবাহ ব্যবহারবিরুদ্ধ বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, এক্ষণে তদ্বিষয়ক বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

তিনি লেখেন—'প্র চ লি ত আচার-ব্যবহারকেই শাস্ত্র বলিয়া মান্য করিতে হইবে'। বিধবাবিবাহ কলিতে প্রচলিত নাই। যে আচার পূর্বাপর চলিতেছে, তাহার অন্যথা করিবে না।

উত্তর। প্রসন্নবাবু একবার বলিয়াছেন যে, অনন্যথারূপে কেবল মনুবাক্যই শাস্ত্র; আবার তদ্বিরুদ্ধ লৌকিক ব্যবহারকে শাস্ত্র বলিয়া প্রচার করিতেছেন। যদি লৌকিক ব্যবহারই শাস্ত্র হয়, আর বিধবা বিবাহ এক্ষণে চলিত হয়, তবে দুই পুরুষ পরে তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ হইয়া উঠিবে। লৌকিক ব্যবহার প্রতি দশ বর্ষে কিছু কিছু পরিবর্তিত হইতেছে। প্রসন্নবাবু যে লৌকিক ব্যবহারের তর্ক উত্থাপন করিবেন, যথার্থ বলিতেছি, ভ্রমেও একবার আমরা বিবেচনা করি নাই। কোন কার্য যুক্তিসিদ্ধ হউক আর না হউক, পূর্বাপর চলিত বলিয়াই কি তাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে? যে সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি শাস্ত্রের মর্ম ও লোকাচার তত্ত্ব উত্তমরূপে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সদ্‌যুক্তিসিদ্ধ কার্য অনুষ্ঠানের সময় (এবং) সদ্‌যুক্তি বিরুদ্ধ কার্য পরিত্যাগের সময় শাস্ত্র ও লোকাচারের বিধি-নিষেধ গ্রাহ্য করেন না। সদ্‌যুক্তি প্রদর্শিত পথে সকলেরই ভ্রমণ করা উচিত। আমারদের দেখা আবশ্যক, প্রসন্নবাবু বিধবা বিবাহ বিষয়ে কিরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন।

তিনি লেখেন, বিধবাবিবাহ যে যে দেশে চলিত আছে, তত্তদ্দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ আছেন। তাঁহারা তাহাকে ঘৃণা করেন। সম্ভ্রান্ত মুসলমান ও ইংরেজেরা স্ব স্ব দেশে বিধবা বিবাহ বিধিসিদ্ধ হইলেও আপনারদের বিধবা কন্যাদের বিবাহ দেন না, ও আপনারাও বিধবা বিবাহ করেন না! যে কার্যকে সভ্য জাতীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা ঘৃণা করেন, তাহা অবশ্য যুক্তিবিরুদ্ধ।

উত্তর। এ সকল যুক্তি নহে, দৃষ্টান্ত প্রদর্শন মাত্র। দৃষ্টান্তও কিয়দ্ভাগে অসত্য। ইংরেজদের দেশে বিধবা বিবাহ চলিত আছে; তাঁহারা তাহাকে ঘৃণা করেন না। তাঁহারদের দেশীয় সম্ভ্রান্ত বিধবারা অবিদূষ্য রূপে পুনর্বিবাহ করেন। আমি কোন সম্ভ্রান্ত ইংরাজকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি প্রসন্নবাবুর উক্তি-গুলিকে মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান করিয়াছেন। কিন্তু যদি তাঁহারদের দেশে ইহা নিষিদ্ধ থাকিত, তাহা হইলেই কি আমারদের বিধবা বিবাহ নিষেধ করা উচিত? আমরা কি কেবল দৃষ্টান্ত অনুসারেই চলিব? সৎ কি অসৎ দৃষ্টান্ত, তাহা কি বিবেচনা করিব না? প্রসন্নবাবুর অতি আশ্চর্য তর্ক! ইউরোপের সম্ভ্রান্ত লোকেরা প্রসন্নবাবুর ধর্মকে ঘৃণা করেন, অতএব তিনি তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ জানিয়া পরিত্যাগ না করেন কেন?

পূর্বপক্ষ। যে যে দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে তত্তদ্দেশীয় স্ত্রী-পুরুষেরা

বিবাহবন্ধন হইতে মুক্ত হওনারে সর্বদা রাজদ্বারে নানা অভিযোগ উপস্থিত করে। অনেক স্ত্রী অমনোনীত স্বামীকে বিনাশ-পূর্বক অন্য পতি গ্রহণ করে।

উত্তর। প্রসন্নবাবু কোথায় একটি কদাচিৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহা সাধারণ স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। আমারদের দেশে যদি ব্যবস্থাসিদ্ধ বিচ্ছেদের বিধান থাকিত, তবে তাহা ঘটিবার কত শত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইত। ইউরোপে অমনোনীত স্বামী বা অমনোনীতা স্ত্রীর সহিত অল্পই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

পূর্বপক্ষ। আমারদের দেশীয় স্ত্রী-পুরুষে যেমন 'অসাধারণ প্রণয়' হয়, যে যে দেশে বিধবাবিবাহ চলিত আছে, তত্তদ্দেশে সেরূপ হয় না।

উত্তর। একথা বলিতে প্রসন্নবাবুর অধিকার কি? বরং বিবেচনা করিলে বোধ হইবে যে, আমারদের দেশীয় স্ত্রী-পুরুষের অপেক্ষা ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষদের পরস্পর অসাধারণ প্রণয় হয়। আমারদের দেশীয় স্ত্রী-পুরুষেরা প্রতিনিধির চক্ষে মনোনীত করিতে বাধ্য হয়; ইউরোপীয়রা আপনারদের চক্ষে মনোনীত করে।

পূর্বপক্ষ। যে যে দেশে বিধবা বিবাহ চলিত আছে তথাকার স্ত্রীরা অধিকাংশ অসতী; ভারতবর্ষীয় স্ত্রীদিগের অধিকাংশ সতী।

উত্তর। প্রসন্নবাবু কি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন? ইংরেজেরাও বলিতে পারে যে, ভারতবর্ষীয় স্ত্রীরা অধিকাংশ অসতী। বস্তুত এরূপ কথা ভদ্রলোকের পক্ষে নিষিদ্ধ।

পূর্বপক্ষ। আমারদের দেশে বিধবা বিবাহ চলিত হইলে স্ত্রীরা অমনোনীত স্বামীদিগকে বিনাশপূর্বক অন্য পতি গ্রহণ করিবে।

উত্তর। প্রসন্নবাবুর অত্যন্ত ভয় দেখা যাইতেছে। তিনি ভয়ে ব্যাকুল হইয়া স্ত্রীদিগকে স্বামী-হননের এক প্রকার দেখাইতেছেন। এত কষ্ট কল্পনা না করিয়া তাঁহার এ বিষয়ে তূষ্ণীম্ভূত থাকাই বিধেয় ছিল।

পূর্বপক্ষ। যে স্ত্রীরা অনায়াসে ভ্রূণ-হত্যা করে, তাহারদের স্বামী-হননে বিচিত্র কি?

উত্তর। ভ্রূণহত্যা আর পতিহত্যার বিস্তর প্রভেদ। ভ্রূণ উদরে থাকে, স্ত্রীরা পতির সহবাস করে। যাহার সহবাস করা যায়, যাহাকে প্রতিপালন করা যায়, তাহার প্রতিই স্নেহ জন্মিয়া থাকে।

পূর্বপক্ষ। যে স্ত্রীরা সন্তানমায়ায় ও স্বামীর মৃত্যুশোকে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যরহিত না হয়, তিনি স্বামী বর্তমানেও কুপথগামী হইতে পারেন।

উত্তর। এ কথায় প্রসন্নবাবুর কি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে? স্বামী বর্তমানে স্ত্রী কুপথগামিনী হইতে পারুন আর না পারুন, সন্তানমায়ায় বা স্বামীর মৃত্যুশোকে তাঁহার ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য রহিত হয় না; সুতরাং তিনি পুনর্বিবাহ করিবেন। শোক চিরকাল বর্তমান থাকে না। কিন্তু কাম আমরণ স্ত্রী-পুরুষকে অধিকার করে।

পূর্বপক্ষ। স্ত্রীলোকদের যৌবন এক-প্রকার ক্ষণকালস্থায়ী, অতএব পুনর্বিবাহে কি প্রয়োজন?

উত্তর। আশ্চর্য তর্ক! জীবনও চিরস্থায়ী নহে; তবে বহুকাল মধ্যে সাংসারিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়ায় কি ফল? বস্তুত কত শত স্ত্রী-পুরুষ সচরাচর দৃষ্ট হয়, পঞ্চাশের ঊর্ধ্ববয়স্ক হইয়াও যাহারদের ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য রহিত হয় নাই।

আমরা প্রসন্নবাবুর সমস্ত তর্ক বিচার করিয়া দেখিলাম। একটিকেও সুযুক্তি-সম্পন্ন বোধ হইল না। যে দুই একটি শাস্ত্রীয় তর্কের উপযুক্ত উত্তর দিতে পারি নাই, তাহাতে কিছুমাত্র হানিবোধ হইতেছে না। যাহারা যুক্তির অপেক্ষা শাস্ত্রকে বলবত্তর জানে, তাহারাই আমাকে তজ্জন্য না-হয় পরাভূত বলিয়া বোধ করুক। কিন্তু আমি এবং বোধ করি, প্রসন্নবাবু শাস্ত্রকে তাদৃশ মান্য করেন না। প্রসন্নবাবু বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে একটিও সদ্যুক্তি উপস্থিত করিতে পারেন নাই। অতএব তিনি যে লিখিয়াছিলেন 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকায় উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না' এ কথা সম্যকরূপে ব্যর্থ হইল।

হায়! তিনি বিধবাদের যথার্থ অবস্থা বোধ করি একবারেও স্মরণ করেন নাই; নচেৎ এত কঠোরতা কেন প্রকাশ করিবেন? কত বলবৎ কারণে বিধবাবিবাহ রহিত থাকা সর্বতোভাবে গর্হিত বোধ হয়, পশ্চাতে দৃষ্টি করিলেই তাহা জানিতে পারিবেন।

প্রথমত, বিধবা হওয়াতে স্ত্রীলোকদের কোন অপরাধ নাই; অতএব তাহারদিগকে যাবজ্জীবন দারুণ যাতনা দেওয়া অত্যন্ত অনুচিত। অত্যন্ত অপরিমিতাচার করিয়া এক স্ত্রীর পতি মৃত্যু হইল, কি নিমিত্ত সে চিরকাল দুঃখভোগ করিবে?

দ্বিতীয়, পরমেশ্বর আমারদিগকে যেসকল মনোবৃত্তি দিয়াছেন, সেসকলের অপব্যবহার করা যেমন পাপ, এককালে রহিত করাও সেইরূপ পাপ।

তৃতীয়ত, অনেক বিধবা অক্ষমতাপ্রযুক্ত কামকে চরিতার্থ করিয়া কত শত ভ্রূণহত্যা করিতেছে—অনেকে গৃহ পরিত্যাগ করিতেছে—কেহ কেহ বিষপানপূর্বক জীবন নষ্ট করিতেছে।

চতুর্থত, পরমেশ্বর লোকবৃদ্ধির নিমিত্ত স্ত্রী-পুরুষের সৃষ্টি করিয়াছেন; বিধবা-বিবাহ রহিত থাকাতে তাহা সম্পন্ন হইতেছে না।

পঞ্চমত, মনুষ্য মৃত হইলে তাহার আর কোন পার্থিব পদার্থের উপর স্বত্বাধিকারী থাকে না। বিশেষত, স্ত্রী কদাপি গৃহ, ভূমি প্রভৃতির মধ্যে গণ্য নহে। যে নিয়মপ্রযুক্ত বিধবাবিবাহ এ দেশে প্রচলিত নাই, তাহা অতি নিষ্ঠুর নিয়ম; তাহা কদাপি করুণাময় পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত নহে। সেই নিয়ম স্থাপনকারীরা ও তাঁহারদের অনুবর্তী লোকেরা যে বিধবাদিগের মনুষ্যের ন্যায় সুখদুঃখবোধ আছে তাহা স্মরণও করেন না। কি জন্য বিধবাদের প্রতি চিরজীবন দুঃসহ যাতনাভোগ করিবার আদেশ আছে? তাহারা কি পরলোকে সুখভোগ করিবে? নির্বোধ মনুষ্য! যাহা অবলম্বন করিলে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হয়, তাহা কি পরলোকের নিমিত্ত সহায়তা করিবে? পরমেশ্বর কি স্বীয় সৃষ্ট জীবদিগকে কষ্ট না দিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। কষ্ট না দিয়া তিনি কি আমারদিগকে সুখ প্রদান করিতে অসমর্থ? আমরা দেখিতেছি, পরমেশ্বর বিধবাবিবাহ নিষেধ করিতেছেন না; মনুষ্য তবে কেন তাহা নিষিদ্ধ বোধ করে?

হে স্বদেশীয় লোকসকল! কতকাল আর তোমরা পরের চক্ষু দ্বারা দর্শন করিবে—পরের কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করিবে? কতকাল আর অজ্ঞানকূপে পড়িয়া শাস্ত্র শাস্ত্র বলিয়া চীৎকার করিবে। আপনারদের চক্ষুকর্ণকে ব্যবহার কর; যুক্তিশাস্ত্রের আদেশানুযায়ী কর্ম কর। যুক্তি ঈশ্বর প্রণীত, এবং সর্বত্র সমান। যদি ভ্রমমলায় মলিন না হয়, তবে সমস্ত মনুষ্যের যুক্তিই এক প্রকার হয়। লিখিত শাস্ত্র মনুষ্যকৃত, এবং তাহা ভ্রম-প্রমাদ ও বিরোধে পরিপূর্ণ। লিখিত শাস্ত্র তোমারদিগকে সুখ দিবে, তাহার কোন প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রমাণ নাই; কেবল ভাবী সুখের গল্প শুনিয়া উপস্থিত নির্দোষ সুখকে কি পরিত্যাগ করা উচিত? হে বন্ধুগণ! আমি পুনর্বার উচ্চারণ করিতেছি, তোমরা যুক্তিশাস্ত্র অবলম্বন কর, এবং হতভাগিনী বিধবাদিগের পুনর্বিবাহে বিধান কর।"

প্রবন্ধ শেষে "শ্রীরাখালদাস শর্মা" এই নাম স্বাক্ষর করা আছে। তারপরেই বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে পৃথকভাবে।

[বিশ্বভারতীর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নোটবইয়ের অংশসমূহ ব্যবহৃত।]
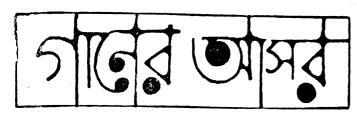
সম্মেলক গীতি

একটি সঙ্গীতসংস্থার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁরা সম্প্রতি একটি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছেন। কিন্তু, মুশকিল হয়েছে সম্মেলক গানগুলি নিয়ে। এ বিষয়ে তাঁরা নাকি তাঁদের সদস্যদের সহযোগিতা পান না। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই একটা বড় অংশ খুব সাধারণ গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে গঠিত। গান করাটা এঁদের একটা শখ। হয়তো বা গানবাজনার পরিবেশটা পছন্দ করেন বলেই এঁদের অনেকে এই রকম প্রতিষ্ঠানে আসা-যাওয়া করেন। এঁরাই সম্মেলক গানটাকে বাঁচিয়ে রাখেন। তথাপি এঁদের ওপর নির্ভর করা যায় না। অনেক সময় দেখা গেল গোড়ার দিকে সম্মেলকের দল বেশ ভারি, কিন্তু ক্রমেই ভিড় কমতে শুরু হল। কেউ কেউ গানগুলি তোলা হয়েছে মনে হবামাত্র দল থেকে সরে পড়লেন কারণ তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। কেউ কেউ রোজ রোজ অভ্যাস করাটাকে একটা একঘেয়ে কাজ মনে করেন—অতএব তাঁদের আসা-যাওয়াটা ইচ্ছামতই বলা যায়। কেউ কেউ নিয়মিত আসেন, গল্পগুজব করেন কিন্তু গানের দলে ভিড়তে চান না। অথচ মজা হচ্ছে এই, টীকা, টিপ্পনী, সমালোচনা এঁদের কাছ থেকে সব সময়েই কর্তৃপক্ষকে সহ্য করতে হয়। যাঁরা নিয়মিত গানের দলে থাকেন তাঁদেরও অনেকের আচরণ স্বাভাবিক নয়। গান সম্বন্ধে এঁদের এক একটি বিশেষ ধারণা আছে সেটা থেকে বিচ্যুত করা সহজ নয়। যেটা তাঁদের গলায় একবার উঠল কার সাধ্য তাকে আর বদলায়—শতবার দেখিয়ে দিলেও ঠিক সেই ভুলই তাঁদের হয়ে যাবে। এই দল থেকে একজন একজন করে যদি গাওয়ানো যায় তা হলে দেখা যাবে একই গানের কত বিচিত্র সুর এবং বিচিত্র ভঙ্গী হতে পারে। কিন্তু সেইগুলিই একত্রে এক রকম দাঁড়িয়ে যায় এবং তাই দিয়েই অনেক সংস্থাকে কাজ চালিয়েও নিতে হয়। এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সাধারণ স্তরের অ[illegible]ও অনেকে থাকেন যাঁরা মোটামুটি মন্দ গান করেন না এবং তাঁদের সম্মেলক প্রচেষ্টাই আসলে 'একটি সম্মেলক-গীতিকে সার্থক করে তোলে।

এদিকে যাঁরা একটু ভাল গান করেন বা "রেডিও আর্টিস্ট" তাঁরা একক অনুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারেন না। সম্মেলক অনুষ্ঠানে তাঁদের যোগদান করতে বলা মানে অপমান—অন্ততঃ এইরকমই তাঁদের ধারণা। এঁরাই প্রতিষ্ঠানের প্রেস্টিজ রক্ষা করেন;—অতএব কর্তৃপক্ষ তাঁদের জোর করে সম্মেলক অনুষ্ঠানে যোগদানের কথা বলতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত সমস্যাটা সমস্যাই থেকে যায় এবং সম্মেলকগুলি যেনতেন প্রকারেই সম্পাদিত হয়ে থাকে। এর ফলে, সব উপাদান সত্ত্বেও একটা অনুষ্ঠান রসোত্তীর্ণ হয় না। সবই ভাল হল, কিন্তু কোথায় যেন কি একটা কারণে অনুষ্ঠানটা মরা মরা হয়ে রইল। এর মূল কারণটা অনুসন্ধান করলে অনেক সময় দেখা যাবে অপটু সম্মেলকগীতিই এই রসহীনতার কারণ।

সম্মেলক গীত সম্বন্ধে আমাদের গায়ক-গায়িকাদের বেশ কিছু চিন্তা করবার আছে কারণ তাঁদের অসহযোগিতাই একটি অনুষ্ঠানকে পঙ্গু করবার জন্য দায়ী। প্রকৃতপক্ষে সম্মেলকগীতির ওপরেই একটা অনুষ্ঠান অবস্থিতি করে। একক গানে বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়, মাধুর্য সৃষ্টি হয়—সত্যি কথা, কিন্তু সমস্ত সাঙ্গীতিক পরিবেশটি ঘন হয়ে ওঠে সম্মেলক গীতির বলিষ্ঠ এবং সার্থক প্রকাশে। রবীন্দ্রনাথের বর্ষামঙ্গলে একটিও যদি সম্মেলক না থাকে, ঋতুচক্রের গানগুলিও যদি সম্মেলক বর্জিত হয়,—অথবা নৃত্যনাট্যগুলিতে যদি সম্মেলক না রাখা যায় তাহলে সে সব অনুষ্ঠান আপনাদের ভাল লাগবে কি? পরন্তু এই অনুষ্ঠানগুলি যত উদাত্ত এবং রসঘন হবে ততই কি আপনাদের চিত্তে পুলকের শিহরণ জাগবে না? যে কোন প্রযোজক এটি উপলব্ধি করেন তাই তিনি সম্মেলকের ওপর একটা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্মেলক গান নিবিড়ভাবে ভালবাসতেন। ভাল সম্মেলক যে কত শ্রুতিমধুর হয় শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠান তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। কবির জীবিতকাল থেকে আজ পর্যন্ত সম্মেলকের এই ট্র্যাডিশন শান্তিনিকেতনে অক্ষুণ্ণ আছে। স্মরণ করুন এই বৈশাখে সুপরিচিত সম্মেলকগীতি "এসো এসো এস হে বৈশাখ" অথবা এই খরার দিনে সেই মিলিত কণ্ঠের গান "এসো এসো হে তৃষ্ণার জল"। উত্তম শিল্পীদের সহযোগিতায় এই সব গানের আবেদন কি অনেক বেশী উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না? অতএব প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তাঁরা যদি তাঁদের অনুষ্ঠানে [illegible]-গুলিতে গলা না দেন তাহলে সামগ্রিকভাবে যে অসাফল্য ঘটবে তার জন্য দায়ী হবেন একমাত্র তাঁরাই। একথা তাঁদের সব সময়েই মনে রাখতে বলব যে, সম্মেলকগীতি দুর্বল হলে প্রথম শ্রেণীর এককও কোনও অনুষ্ঠানকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করতে পারে না। রসের জগৎ কখনো আপনাকে নিয়ে নয়—সেখানে সবাইকে একত্র মিলতে হবে;—নিজের ব্যক্তিত্ব কখনো হারাবার নয় কিন্তু অনেকের মাঝখানে নিজেকে খুঁজে পাওয়াও একটা বড় সাধনা এবং তার আনন্দ আরও মহৎ।

সম্মেলকে গাইলেই যে শিল্পীদের দর কমে যাবে বা প্রেস্টিজের হানি হবে এমন ধারণা হাস্যকর, এমনকি ছেলেমানুষীও বলা চলে। যিনি বেতার শিল্পী বা রেকর্ডশিল্পী সাধারণ্যে তাঁর প্রচার তো আছেই—কিন্তু কোনও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করছেন তখন এই মনোবৃত্তি কেন কাজ করবে? কেন তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠানের সত্তার সঙ্গে নিজেকে এক করে দেবেন না? যদি দিতে পারেন দেখবেন শান্তি পাবেন অনেক বেশী এবং শিল্পী হিসাবে সার্থকতাও অর্জন করবেন যথার্থ। প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষও তো তাঁদের খ্যাতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। —তথাপি তাঁরা যে তাঁদের সম্মেলক গানে পেতে চান তার কারণ তাঁরা দেখছেন একটা অখণ্ড অনুষ্ঠান বা উত্তম শিল্পীদের সহযোগিতায় একটি অখণ্ড রসসৃষ্টি করতে সক্ষম। যিনি শিল্পী তাঁকেও ঠিক এই ভাবে তাঁর একক পরিধির বাইরে চিন্তা করতে হবে নতুবা কোনও গোষ্ঠী বড় বা সার্থক হতে পরে না।

তা ছাড়া, খ্যাতিমান শিল্পীরা যদি এই ধারণা করে থকেন যে সম্মেলকগানে যোগ্যতার বিশেষ কোনও পরিচয় দিতে হয় না তাহলে সেটাও সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। এমন অনেক সম্মেলক গীত আছে যেখানে আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর আর্টিস্টদেরও বেশ ভাল ভাবে প্রস্তুত হতে হবে সুর এবং প্রকাশভঙ্গীকে আয়ত্ত করতে। সম্মেলক গীতি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটা কঠিন শিক্ষার ব্যাপার। এর অনেক দিক থেকে অনেক ডিসিপ্লিন। একক গানে যে সুযোগ সুবিধা আছে, সম্মেলক গানে তা নেই, কিন্তু সংযম এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এই ডিসিপ্লিন অনেক সহায়তা করে। যে সব প্রকৃত শিল্পী ভাল সম্মেলক গানে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে থাকেন তাঁরা সকলেই প্রত্যেক শিল্পীকে সম্মেলক গানে যোগদান করবার উপদেশ দেবেন কারণ এতে তাঁরা নিজেরাও কম উপকৃত হননি।

অপরপক্ষে যে সব সাধারণ গায়ক-গায়িকা

সম্মেলকগানে যোগদান করেন তাঁরা যেন কখনো এমন কথা মনে না করেন যে তাঁরা একটা দায় উদ্ধার করছেন। একক সঙ্গীতের যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে তেমনি সম্মেলকগীতও রসসৃষ্টির পক্ষে আবশ্যিক উপাদান। পূর্বেই বলেছি সম্মেলকগীতি না হলে কোন অনুষ্ঠানই রসোত্তীর্ণ হয় না। এই সম্মেলকগানের আর্ট যাঁরা আয়ত্ত করতে পারবেন ভবিষ্যতে যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করবার সুযোগ তাঁদের থেকে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, একটা গোষ্ঠীর সংগঠনে তাঁদের অকুণ্ঠ সহ-যোগিতার দান থেকে যাচ্ছে। আমাদের দেশে এইরকম আনন্দপরিবেশক সংস্থার খুবই প্রয়োজন, কারণ সরকারী বেতার নিয়মিত কর্তব্য পালন করে চলে আর ব্যবসায়ী রেকর্ড কোম্পানীগুলি অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়--কোনটাই বিশুদ্ধ আনন্দের খোরাক জোগায় না। এই সব ছোটখাটো সংস্থাগুলিরই একটা সাংস্কৃতিক আদর্শ আছে এবং প্রকৃত অনন্দের পরিবেশ তাঁরাই রচনা করতে চেষ্টা করেন। অতএব এঁদের মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা নিজের স্বার্থকে বড় করে না দেখে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করলেই প্রকৃত হিতৈষীর কাজ করবেন।

সম্মেলক গীতি আমাদের ভারতেরই সঙ্গীতসাধনার একটি ধারা। এটি যে কেবল পাশ্চাত্ত্য আদর্শ থেকে নেওয়া হয়েছে এমন নয়। সুপ্রাচীন শাস্ত্রগুলিতে বৃন্দ-গায়নের চর্চা কিভাবে করতে হবে তার বিস্তৃত আলোচনা আছে এবং কোন কোন বৃন্দের জন্য কিরকম কণ্ঠ নির্বাচন করতে হবে, তার ব্যাপক আলোচনা আছে। এবিষয়ে শাস্ত্র একটি খুব ভাল কথা বলেছেন। সেটি হচ্ছে এই যে, উপযুক্ত এবং পরিমিত শিল্পীই সম্মেলকগানের পক্ষে উপযুক্ত। এর আতিশয্য হলে যে দলটি তৈরি হবে তার আখ্যা "কোলাহলবৃন্দ"। বলাবাহুল্য, এই কোলাহল শব্দে এইটাই বোঝান হয়েছে যে অধিক কণ্ঠের অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাসে যে ধ্বনি উত্থিত হয় তা কোলাহলের সামিল। আমাদের সম্মেলনগুলি যাতে এই "কোলাহল-বৃন্দ"-এ পরিণত হতে না পারে সেই জন্যই ভাল গায়ক গায়িকাদের কাছে এই আবেদন। তাঁদের সহায়তা পেলে সম্মেলকগীতি যথার্থ রসসৃষ্টিতে ধন্য হয়ে উঠবে।

—শার্ঙ্গদেব

শিলিগুড়ি সম্মেলনে ভীষ্মদেব

মহাশয়,

গত ১লা এপ্রিল সংখ্যা সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় উত্তরবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনে শ্রদ্ধেয় সঙ্গীত সাধক শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে যে পত্র প্রকাশিত হয়েছে তা দেখে খুবই মর্মাহত হলাম। আমি একজন নগন্য সঙ্গীত শিক্ষার্থী এবং আমার সঙ্গীত গুরুর সহকারী হিসাবে আমারও শিলিগুড়ির যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল এবং উত্তরবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেইজন্য প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে প্রকৃত ঘটনা যতটুকু জানি তা না জানালে শিলিগুড়ির শ্রোতৃবর্গের কাছে অপরাধী থেকে যাব।

গত ৩রা মার্চ আমরা ভোর বেলার প্লেনে শিলিগুড়ি যাই। আমাদের সহযাত্রী হিসাবে প্রখ্যাত বেহালাবাদক শ্রী ভি জি যোগ, এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও ছিলেন। প্লেন ছাড়ার আগেই শ্রী চট্টোপাধ্যায় তার সঙ্গীকে বলছিলেন যে তিনি অসুস্থ বোধ করছেন এবং তার যাওয়ার ইচ্ছা নাই। তাঁর সঙ্গী সে কথা হয়ত ভালভাবে উপলব্ধি কোরতে পারেননি কারণ তিনি খুব মৃদু কণ্ঠে কথাগুলো বার তিনেকে বলেন। যা হোক আমরা যাত্রা কোরলাম। কিন্তু উক্ত প্লেনটি পুরানো হওয়ার দরুণ অমাদের যাত্রা খুব কষ্টদায়ক হয়। ব্যক্তিগত ভাবে আমি, ওস্তাদ আমীর খাঁ এবং শ্রী যোগ একথা বলাবলি কোরছিলাম, এই কারণেই আমাদের সকলের ট্রেনে কলিকাতায় ফেরার ব্যবস্থা হয়েছিল। শিলিগুড়িতে নেমে শ্রী চট্টোপাধ্যায় পুনরায় অনুযোগ করে বলেন যে, তিনি অসুস্থ বোধ কোরছেন এবং ঐদিন রাত্রি থেকেই তিনি সত্যিই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা শুনলাম এরকম অসুস্থতা হোলে তিনি সাধারণতঃ তিনদিন কষ্ট পেয়ে থাকেন।

৪ঠা মার্চ শ্রী চট্টোপাধ্যায় খুবই অসুস্থ হোয়ে পড়েন ফলে সম্মেলনে অংশ গ্রহণ কোরতে পারেন না। সেই হেতু উদ্যোক্তারা বিশেষকোরে শ্রীহাবু সরকার মহাশয় আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে চান যে প্রয়োজন হলে ওস্তাদ্ আমীর খাঁ সাহেব, ভীষ্মদেব বাবুর পরিবর্তে গাইতে পারবেন কিনা।

ওস্তাদ্ আমীর খাঁ তাঁর অক্ষমতা প্রকাশ করেন, কারণ এমনিতেই তাঁর দুদিন প্রোগ্রাম ছিল। তিনি তিনটি প্রোগ্রাম কোরতে চান না। সুতরাং উদ্যোক্তারা যে বলেছিলেন ভীষ্মদেববাবু অসুস্থ, এটা সত্য ঘটনা, আশাকরি পত্র লেখক অনুসন্ধান কোরে এ তথ্য জেনে নেবেন।

৫ই মার্চ আমরা একটা চা বাগানে বেড়াতে যাই সেখানেই শ্রীভীষ্মদেব ছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা থাকলেও সফল হয়নি কারণ তখনও তিনি অসুস্থ। ইত্যাদি ঘটনার আমি প্রত্যক্ষদর্শী, সুতরাং আমার মনে হয় ভীষ্মদেববাবুকে অসম্মান করার কোন অসৎ উদ্দেশ্য বোধহয় উদ্যোক্তাদের ছিল না।

শিলিগুড়িতে আমরা যেরকম আদর-আপ্যায়ন পেয়েছি তার তুলনা সত্যিই বিরল। আমার মনে হয় সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী বিখ্যাত শিল্পীবৃন্দের মধ্যে সর্বশ্রী কেরামতউল্লা খাঁ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, আফাক্ হুসেন, শঙ্কর ঘোষ প্রভৃতি এক বাক্যে এ কথা স্বীকার কোরবেন। পরিশেষে আমি উত্তরবঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের পরিচালক গোষ্ঠীর এবং শ্রোতৃবর্গের সহযোগিতার মনোভাবকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এটা আমার কোনো প্রতিবাদপত্র নয়, হয়ত কোনো ভুল বোঝা-বুঝির ফলেই কিছু সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে, উদ্যোক্তাদের উচিৎ ছিল সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই সত্য ঘটনা শ্রোতৃবর্গকে অবহিত করা। সাধক ভীষ্মদেবের সঙ্গীত প্রতিভাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁর মত শিল্পী বাংলা দেশের গৌরব, তাঁকে অপমান করার অসৎ উদ্দেশ্য কারও থাকতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না কারণ শিলিগুড়ি বাংলা দেশের বাইরে নয়।

শ্রীভীষ্মদেবের দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করে আমি এখানেই এই পত্রের ইতি টানলাম। আশা করি প্রকাশ করে বিভ্রান্তি দূর কোরবেন।

কমল বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৭নং মহানির্বাণ রোড,
কলিকাতা—২৯।

কোথায় পাবো তারে

কালকূট

বাইশ

কেমন একটা অস্বস্তি হয়। তবু উঠে বসতে পারি না। কৌতূহলের বেড়ায় পাড়ি। যেন অনুমান করি কিছু, তবু বুঝতে পারি না। সেই মুহূর্তেই গাজীর নিচু স্বর শোনা যায়, 'বাবু, ঘুমলেন নাকি?' জবাব দিতে গিয়ে এক মুহূর্ত ভাবি। কিন্তু গাজীর সঙ্গে আমার কিসের লুকোচুরি। বলি, 'না।'

সে বলে, 'বুইতি পারলেন কিছু?'

বলি, 'দুলি বেরিয়ে গেল মনে হল।'

'কার ডাকে জানেন তো?'

'অনন্ত?'

'তয় আর কার।'

বলে সে একটু হাসে। আমার চোখের সামনে ভাসে দুলির মুখ। খর চোখের তারায় আগুন। উপহার ফেলে দেয় ছড়িয়ে ছিটকে। দিব্যি দেয় আর না আসতে। পাছে সে আসে, তাই নিজের ঘর ছেড়ে যায় পরের ঘরে। আর বলে, 'অমন ভালবাসার মুখে আগুন।'

হায় গো চিন্তামণি! এখন একবার ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, মুখে যে আগুন দেবে, সে কোন্ ভালবাসার। তোমার, না অনন্তর।

আমার অস্বস্তি যায়। নিঃশব্দ এক হাসির ধারা যেন টলটলিয়ে ওঠে। কে এক অনন্ত পাল আর এক বারো বাসরের দুলি। সমাজ যাদের অবৈধ ঘোষণা করেছে, নিষিদ্ধ বলেছে, তারা আমার প্রাণে আবেগের মুখ খুলে স্রোত বহিয়ে যায়। সংসারে এমন ঘটনা নিত্য অহরহ ঘটে। কিন্তু তা সংসারে। সংসারের সীমান্তেও যে এমন ঘটে, তা জানা ছিল না। প্রান্তে, যেখানে বিধি নিষেধ, যেখানে সকলই নিষিদ্ধ, অচ্ছুত, সেখানেও যে এমন সাংসারিক লীলা, তা কখনো দেখি নি।

আমার আবেগের কথা কাউকে বলতে যাব না। কিন্তু এমন ঘটনায় আবেগ ধরা যন্ত্র আমার নেই। সংসার আর সংসারের সীমান্ত, দুয়েতেই দেখি মন একাকার। এবার কি মন দুষবে? তবে মানুষের কথাটা ভুলো না। তাকে যে এত ভাগে ভাগ করে রেখেছে, তবু দেখ সে মানুষ। সবখানে সেই এক মানুষ, এক সমান। সেই কারণে বিধিনিষেধ অমর নয়, ভাগ বাঁটোয়ারা নয়, মানুষ অমর।

কে জানে, এই দুলি-অনন্তর কী ভবিষ্যৎ। কোন দিন জানা হবে না, জানতেও আসব না। জীবনপ্রবাহে, স্রোতে, বাঁকে নানা রঙ, নানান রংগ দেখে যাই। করেও যাই। এই দেখে যাওয়া, করে যাওয়ায় কার দেনা শোধ হয়, জানি না। চলি সবাই আপন আপন তাগিদে।

তবু আমার হাসি-ঝরা আবেগধারা অবাক মেনে ভাবে, এত দেখা ছিল আমার একটা দিনের নিরুদ্দেশের ফেরায়! যখন আপন সুখে হাসি কাঁদি, তখন ভাবি, জীবন এত ছোট কেন। ভুলে যাই, সে আমার নজরবন্দী নয়। ধরা দিয়ে নেই আমার চোখের সীমায়। সে আমার বুঝ-বন্দী নয়। আমার বোঝার সীমা ছাড়িয়ে সে বিরাজ করে। আমার সত্য-মিথ্যায় তার কিছুই যায় আসে না। তার চেয়ে বলি, মন যেন না বিচারে যায়। মন খুলে রাখুক। যেখানে তার চক্ষুকর্ণ আছে।

গাজীর সাড়াশব্দ নেই। হয়তো মুরশেদের নামের মজুর এবার ঘুমোয়। আমার ঘুম আসে না। প্রহর কেটে যায়। একটা আচ্ছন্নতা জড়িয়ে আসে। তারপরেই বেড়ার এক পাশ ঘেঁষে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে ওঠে। ফোঁচা একটা বিড়ি ধরায়। সে উঠে বসেছে। কাঠির আলোয় তার মুখটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে দেখতে পাই। তার চোখ দুটো সম্পূর্ণ খোলা। নজর সামনের দিকে। কাঁটা মুখে ভাবের ছায়া চোখে পড়ে না। তারপরে কাঠি নিবে যায়। অন্ধকারে শুধু বিড়ির আগুন থেকে থেকে জ্বলে ওঠে।

কী ভাবে লোকটা। কী চিন্তা করে। সেই এক দিনের কথা নাকি, যেদিন হয়তো শুভদিনের লগন দিয়েছিলেন পুরুত মশাই। হয়তো সেই লগ্নে 'ফোঁচার ঘরে হ্যাজাক বাতি জ্বলেছিল। ঢোলক কাঁসি বেজেছিল। তার গলায় ছিল ফুলের মালা। গায়ে ছিল নতুন জামা। আর স্বজনে ঘেরা কালো একটি কাঁচ কলাবউ।

সে কি সেই কথা ভাবে। তার কি কাঁটা লোমশ মস্ত বুকটা খালি খালি লাগে নাকি। পাশের ঘরে যারা ঘুমোয়, সেইখানে কি চোখ ফেরে তার।

বিড়ি নিবে যায়। অন্ধকারে ডুবে যায় সব। আর কোন কিছুই দেখা যায় না। কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। কোন প্রশ্নেরই জবাব নেই। অন্ধকারের তলে সব হারিয়ে যায়।

হয় তো একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কী এক শব্দ যেন দূর থেকে আসে। আসতে আসতে কানের কাছে বাজে। সহসা চোখ মেলি। কয়েক মুহূর্ত সবই অচেনার চমকে অস্পষ্ট লাগে। স্থান কাল পরিবেশ মনে থাকে না। তারপরে সব চেনা দেখি। দেখি, অন্ধকার নেই। আবছায়া অস্পষ্ট আলো ঘরের মধ্যে। চোখ ফিরিয়ে ফোঁচাকে দেখতে যাই। সে নেই, তার হোগলার চাটাইও নেই। দূর থেকে যে শব্দ আসছিল, তা আসলে গাজীর গুনগুনানি। শিয়রের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি, সে আর সামনে নেই। দরজার কাছেই বাইরের দিকে মুখ করে বসে আছে। ডান হাতে দাড়ি মুঠো করে ধরা। গুন-গুনানির কথা শুনি,

'ওহে দীনদরদী, বল না কেন।
তুমি যদি মন্দিরতে কর অবস্থানো
তবে এ জগত সোমসার কার নিকেতনো।

কেউ বলে তুমি রাম, থাকো পূবে,
আর পশ্চিমে আলী।
তবে কেন হিদয়সুরে খালি।
ওহে দীনদরদী—
কেউ জানে না, তুমি মনের মানুষ,
মনে অবস্থানো।'...

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গুনগুনায়। কাল থেকে শুনে শুনে এখন বুঝতে পারি, সব গানেতেই এক কথা। গাজী এক কথার মানুষ। তার জাত নেই, ঈশ্বর নেই, খোদা নেই। একমেবাদ্বিতীয়ম, মনের 'মানুষ। কখনো সে মুরশেদ, কখনো দীনদরদী। এ ধর্মের নাম কী। কে বা সেই মনের মানুষ। মুরশেদ আর দীনদরদী বা কে।

গাজী হঠাৎ গান থামিয়ে ঘরের দিকে ফিরে তাকায়। মশারির দিকে নজর চালিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে চায়। আমাকেই দেখতে চেষ্টা করে। আমার চেয়ে থাকা যেন তাকে নীরবে ডাক দিয়েছে। বলে, 'বাবু কি জাগলেন নাকি।'

জবাব না দিয়ে মশারি সরিয়ে মুখ বের করি। গাজী বলে, 'জয় মুরশেদ। আর একটু

ঘুমালি পারতেন বাবু। এখনো তেমন সকাল হয় নাই।'

আমি বলি, 'দেরিও আর নেই। দেখতে দেখতেই আলো ফুটবে।'

গাজী আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসে। একটু যেন লজ্জা পেয়ে হাসে। বলে, 'ঘুমের কথা আর পুছ করব না। একে নতুন জায়গা, তায় যে ঢপের পালা।'

ঢপের পালা আবার কী। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি, 'সেটা আবার কী।'

গাজী বলে, 'ঢপ গানের পালা হয় না বাবু। সেই কথাই বলি। আমাদের অনন্ত-বাবু আর দুলি ঠাকরুনের কথা বলছি।'

সে প্রসঙ্গে আমার আর যেতে ইচ্ছা করে না। আমি তাকে ডাক দিই, 'মামুদ গাজী।'

গাজী অনেকখানি ঝুঁকে পড়ে ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে আনে। যেন মুগ্ধ হয়ে হেসে বলে, 'বাবু দেখি আমার নামখানু মনে করি রেখিছেন। কী বলেন বাবু।'

স্মৃতিশক্তির প্রশংসা সেটা নয় যে, গতকাল শোনা একটা নাম ভুলে যাব। আসলে গাজীটার বিনয় এই রকম। এমন তুচ্ছ নামটাও কেউ মনে রাখে নাকি। জিজ্ঞেস করি, 'তোমার ধর্মটা কী।'

গাজী ভুরু কুঁচকে তাকায় অনুসন্ধিৎসু চোখে। তবু দাড়ির ভাঁজে ভাঁজে হাসি। বলে, 'সে আবার কী বাবু। কোন্ ধম্মের কথা বলেন।'

'তোমার। তোমার গান শুনে তো কিছু বুঝি না।'

গাজীর হাসিতে যেন রহস্যের ঝিলিক লাগে। বলে, 'কেন বাবু, অবুঝ কথা তো কিছু বলি না।'

আমি বলি, 'বুঝতে পারি না।'

তেমনি হেসে গাজী বলে, 'গান দিয়ি যদি না বুঝোতি পারি, তয় আর কেমন করি বুঝোবো বাবু। ধম্মো মম্মো যা বলেন, সব তো ওই গানে।'

তা বটে। এ যেন সেই কবির কথা, লিখে যা বোঝাতে পারি নি, মুখের কথায় তা কী বোঝাবো। ডালে পাতায় ফুটে, গন্ধ ছড়িয়ে যদি পরিচয় না দিতে পারি, তবে কেমন করে জানাবো, আমি কোন ফুল, কী নাম।

তবু কথা থেকে যায়। অবুঝ বোঝানোর দায় নেবে কে। তাই জিজ্ঞেস করি, 'তোমার রাম নেই, আলীও নেই।'

গাজী যেন চোখ ঘুরিয়ে মস্করা করে। বলে, 'না বাবু, রাম নাই, আলী নাই। কাশী গয়া মক্কা মদিনা, কিছুই নাই।'

'তবে কী আছে, কে আছে?'

হাত মেলে ধরে ঘুরিয়ে নিয়ে 'তর্জনী দিয়ে নিজের বুক দেখায়। ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, 'বাবু, এই ঘরখানি আছে।'

কাকে বলে ঘর। শরীর, না প্রাণ। গাজী নিজেই ঝুঁকে আসে আরো। যেন চুপিসারে গুপ্ত কথা বলে, 'অই যে সেই বলে না বাবু,

"ক্ষ্যাপা এই বেলা তোর মনের মানুষ চিনি ভজন কর। যখন পলাবে সেই রসের মানুষ, পড়ি রবে শুধুই ঘর।" এই ঘরেতে সব আছে বাবু।'

মরণের কথা বলে, না আর কিছু, বুঝতে পারি না। কে বা সেই রসের মানুষ। কার বা ভজন কেমন বা তার ধরনধারণ, সকলই হেঁয়ালি। দেহ কেবল দেহ নয়, তার নাম আবার ঘর। জিজ্ঞেস করি, 'আর কিছু নেই?'

বুকের কাছে দু' হাত রেখে চোখ আধ বোজা করে বলে, 'আর আছেন, দীনদরদী মুরশেদ।'

জিজ্ঞেস করি, 'মুরশেদটি কে?'

'তিনি গুরু। গুরু সত্য, মুরশেদ সত্য।'

দুর্বোধ্য লাগে, বুঝতে পারি না। গুরুর নাম নিয়ে চলাই ধর্ম নাকি। এদের আর কিছু নেই। মনে পড়ে যায় গাজীর গত-কালের গান, "আমি এসে এই ভুবনে, মন মুরশেদ না নিলাম চিনে।" আরো মনে পড়ে, "মুরশেদ আমার কোনখানে বিরাজে। মুরশেদ আমার কোন শিয়রে জাগে।"

'গুরু কি তোমাদের সব নাকি?'

গাজী মাথা দুলিয়ে বলে, 'নিশ্চয়। গুরু ছাড়া আর কে আছে বাবু। তিনি যে সব পথ দেখায় দ্যান।'

'কিসের পথ?'

'মনের মানুষের।'

'মনের মানুষের?'

'আজ্ঞা, অই যে সেই রসের মানুষের কথা আছে।'

'সে আবার কে?'

'কেন বাবু, যাকে বলে অধর মানুষ।'

যেন অন্ধকার দিয়ে তৈরী কথা। হাতড়ানো কথা। তার এদিক-ওদিক দেখা যায় না। গাজীর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। দেখি, তার ফাটা মুখে যেন এক ভাবের খেলা। স্বপ্নের ঘোর নামে তার আরশি চোখে।

জিজ্ঞেস করি, 'সে থাকে কোথায়।'

গাজী হাত নেড়ে বলে, 'মন্দিরে না বাবু, মসজিদে না। আশমানেও না।'

আবার তর্জনী দিয়ে বুকে ঠেকিয়ে বলে, 'এই ঘরে, এই ভাণ্ডে।'

অবুঝের মত জিজ্ঞেস করি, 'দেখতে কেমন?'

'রূপ নাই বাবু, তিনি নেরাকার।'

নেরাকার যে নিরাকার, তা বুঝতে পারি। নিরাকার ব্রহ্মের সাধন নাকি। বলি, 'ঘরের কথা বলছ, আবার নিরাকার হল কেমন করে।'

গাজী বলে, 'আকারের মধ্যি নেরাকার।'

সেই অন্ধকারের কথা। কেবল রহস্যের জাল ছড়ানো। প্রায় হতাশ হয়ে বলি, 'ধরতে পারলাম না।'

গাজী বলে, 'আমিই কি পেরিচি বাবু। তা হলি আর অধর ধরা বলচে কেন।'

'ধরা যায় না?'

'যায় বই কি। না হলি আর সাধন-ভজন কিসির। তবে বড় কঠিন কাম বাবু, সবাই ধরতি পারে না।'

'কী করে ধরতে হয়? মন্ত্রতন্ত্র আছে নাকি?'

'না বাবু, মন্ত্র নাই তন্ত্র নাই, জপ নাই, তপ নাই।'

আবার সেই রহস্য। সন্দেহ হয়, গাজী বলতে নারাজ। হয়তো বলতে নেই, তাই কেবল কথায় ধাঁধা। বলি, 'তোমরা তো জাত মানো না।'

'না বাবু, জাতিপাতি নাই।'

'তবে নিরামিষ খেতে হয় না?'

গাজী হেসে বলে, 'না বাবু, খানাপিনার কোন বারণ নাই। ইস্তক মদ মাংস যা বলেন, কোনটাই হারাম না।'

সে আবার কেমন কথা। মদ মাংসও নিষেধ নয়। তবে যে গাজীকে দেখেছি নিরামিষ খেতে। কথা বলবার আগে গাজী নিজেই আওয়াজ দেয়, 'আমার কথা আলাদা বাবু, আমি মাছ মাংস খেতি পারি না। তয়, এই সাঁই দরবেশ যা বলেন, তাদের কোন কিছুতি বারণ নাই। সকলের হাতে সব খেতি পারে।'

গাজীর কথা শুনে এইটুকু বুঝেছি, সব কিছু বোঝা যায় না। ভারতবর্ষ একে-তে নেই, বহুতে। সব কিছু তার বুঝতে পারব, এমন আশা নেই। একবার মনে হয়, নিরীশ্বরবাদের কথা বলে। আবার মনে হয়, এর নাম রহস্যবাদ। কিন্তু সে খোঁজে আমার দরকার নেই। রহস্য যাই থাক, এইটুকু বুঝেছি, মানুষ সে যেমন হোক, গাজীর ধর্মে, সে আছে সব কিছুতে। ধর্ম থাক, তার গান শুনেছি, সেই ভাল।

বিছানা ছেড়ে উঠতে যাব, গাজী ডাক দেয়, 'বাবু।'

আমার মুখ থেকে সে চোখ সরায় নি। ডাক দেয় যেন স্বপ্নের ঘোরে। গাঙের জলে রোদের মত গোটা মুখটা চিকচিক করে। তার দিকে তাকাই। বলে, 'বলেন তো বাবু, সোমসারে সবার বড় কে?'

তার কাছে হয়তো সেই রসের মানুষ, যার নাম মনের মানুষ। তাই জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকি। গাজী নিজেই বলে, 'মানুষ। সবার বড় মানুষ, না কী বলেন বাবু। ত, সেই মানুষের দুই ভাগ, নর আর নারী। মরদ আর অওরত, ঠিক ত?'

মানুষ দেখে, মানুষে যার সাধ মেটে নি, সে 'না' বলে কেমন করে। এমন অহঙ্কার কবে করতে পেরেছি, মানুষ বাদ দিয়ে জীবনযাপন চলে। নিজেকে বাদ দিয়ে আর সব ধরি কেমন করে। কিন্তু গাজী আমার জবাব চায় না। সে নিজের কথা নিজের ঢঙে বলে। বলে, 'তা, এই জানবেন বাবু, এনাদের এই দুজন ছাড়া কোন কিছু মিলে না। অই যে সেই অধর মানুষের কথা, তা একলা ধরা যায় না। সোমসার করতি হলি

যেমন মিয়াবিবি ছাড়া হয় না, মনের মানুষ পেতি হলি তেমনি দুজনার যোগ চাই, বুইলেন?'

এবার ভুরু কুঁচকে নজরে পুছ করি। কোন দিকে নিয়ে যায় গাজী। কী কথা বলতে চায়। যেন বহু দূরে শুনি এক পায়ের শব্দ। যে শব্দ আমার প্রত্যক্ষের অভিজ্ঞতায় নেই, শুধু তার কথা শুনেছি। সে কথা এক সাধন পদ্ধতির।

গাজী বলে চলে, 'তয়, আসল কথা হল, সোমসারে মিয়া বিবি, আর এখেনে পুরুষ-পিকিতি বুইলেন ত?'

পিকিতি যে প্রকৃতি, সেটা বুঝতে পেরেছি। অধর ধরার সাধন যে কী, তাও এবার কিছু অনুমান হয়। গাজী আবার বলে, 'আর মিয়া বিবি সোঁতে চলে। পুরুষ-পিকিতি উজানে চলে। সেই বাবু কঠিন কাম, উজানি যাওয়া। ওতি আপনার বেহ্মচায্য চাই।'

বলে গাজী একটু দাড়ি ঝাড়া দিয়ে চোখ বুজিয়ে হাসে। অনুমানে ভুল করিনি। এ বিষয়ে কম বেশী কিছু যে শুনি নি তা নয়। তার ধর্ম কী, মর্ম বা কী, তা জানি না। কিন্তু গাজীর সম্পর্কে সহসা যেন মনেতে আমার নতুন কৌতূহল ঝলকায়। গতকাল সকাল থেকে সেই যে অধর মাঝিকে ডাক দিয়ে নৌকায় উঠেছিল, তারপরে আর ছাড়াছাড়ি হয় নি। শুধু এইটুকু জেনেছি, বসিরহাট শহরের ধারে কোথায় যেন তার বাস। ঝোলা কাঁধে করে কেবল নামের মজুরি করে বেড়ায়। এবার কথা শুনে গাজীকে যেন আমার একটু কেমন কেমন লাগে। জিজ্ঞেস করি, 'তোমারও পিকিতি আছে নাকি?'

গাজী যেন হঠাৎ চমক খায়, অবাক হয়। তারপরে দেখ, এই যে হা হা করে হাসি শুরু করে, তা আর শেষ হতে চায় না। কী ব্যাপার! মাতাল নাকি হে। চড়া হাসিও যেন ঘোরের হাসি।

বেশ খানিকক্ষণ বাদে হাসি যদি বা থামে, এবার গাজীর মুখখানি দেখ। এ যেন সেই গাজী নয়। এ যেন ছোকরা ডাগরা, শরমে মোচড় দেয় শরীরে। মুখ নিচু করে। বলে, 'তা বাবু অই যা বলেন, একজন আছে।'

বটে। অমন রঙ ফেরানো দেখেই বোঝা গিয়েছিল, পিকিতি একজন আছেন। কিন্তু তাতে সাধকের অমন গৃহী জোয়ানের মত লাজে লাজানো ভাব কেন। জিজ্ঞেস করি, 'বিয়ে করেছিলে বুঝি।'

গাজী তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বলে, 'তোবা তোবা, গাজী দরবেশের আবার বে' কী বাবু? এ সোমসারে কে বা কার সোয়ামী, কে বা কার ইস্তিরি।'

তাও তো বটে। সব পুরুষ আর প্রকৃতি। কিন্তু পিকিতিটি আসেন কোথা থেকে। তাকে কি মুরশেদ পাঠিয়ে দেন। জিজ্ঞেস করতে হয় না, গাজী নিজেই জবাব দেয়, 'এ সব কিছু ছিল না বাবু। সময় হলি সবেরই খোঁজ পড়ে। তা সময় টময়ের কথা কখনো ভাবি নাই। ঝোলা নিয়ি একা একাই বেড়াতাম। এই ধরেন পেরায় দশ এগারো বছর আগে হাড়োয়ার মেলায় যেয়ি এক কান্ড হল। হাড়োয়ার মেলা জানেন তো বাবু।'

ঘাড় নেড়ে জানাই, জানি না। গাজী চোখ বড় করে বলে, 'সে এক পেকান্ড মেলা হয় বাবু। পিতি বছর ফাল্গুন মাসের বারো তারিখে পীর গোরাচাঁদের মেলা হয়।'

পীর আবার গোরাচাঁদ। কী দিয়ে মিলজুল হয়, সে খোঁজে যেও না। পীরের দরগায় গিয়ে হিন্দু সিন্নি দেয়। মুসলমানে গোরা ভজে। কার্যকারণ জটিল, ভেদ করতে যেও না। নাম কী হে? আজ্ঞে, দুলাল-আলী। ঠাকুর নয়, মানুষের নাম। দুলাল পাবে, আলীও পাবে। জিজ্ঞেস করি, 'তিনি কে?'

গাজী বলে, 'মস্ত এক সাধক ছিলেন বাবু। ওখেনে উনি দেহরক্ষা করিছেন। হিন্দু মোচলমান, সব ও'নার ভক্ত। তা, অই পিতি ফাল্গুনের বারো তারিখে ও'য়ার দরগায় মেলা হয়। হাড়োয়ার হাটের নাম শুনিছেন বাবু?'

ঘাড় নেড়ে জানাতে হয়, শুনি নি। গাজী বলে, 'সে এক পেকান্ড হাট বাবু, বিদ্যেধরী গাঙের ধারে। বেড়াচাঁপা থেকি যেতি হয় দক্ষিণে। যদি কোনদিন যান বাবু, দেখতি পাবেন।'

গেলে দেখতি পাব, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ গাজী যেরকম সবই পেকান্ড বলছে, প্রায় ব্রহ্মাণ্ডের মত মনে হচ্ছে। দেখতে সাধ হয় বই কি।

গাজী কয়েক মুহূর্ত চৌকাঠে নখ দিয়ে দাগ কাটে। তারপরে বলে, 'তা সেই এগার বছর আগের কথা বলছি বাবু, সে বছরই ইনি দেখা দিলেন হাড়োয়ার মেলায়।'

জিজ্ঞেস করি, 'কে, প্রকৃতি।'

গাজী কয়েকবার ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ। যদিও লজ্জার ভাবটি ঘুচতে চায় না কিছুতেই। আমার তখন কিস্যার কৌতূহল। না জিজ্ঞেস করে পারি না, 'কী করে?'

গাজী যেন কেমন একটু মনোভঙ্গভাবে বলে, 'সে আর বলেন কেন বাবু। পিতি বছর যেমন যাই, সে বছরও তেমনি গেছি। তা, সকালের দিকি যেয়ি দরগার লুটের বাতাসা খান কয়েক যোগাড় করি একটু বেড়ারি বেড়ারি নিলাম। তারপর ভাবলাম কি বে, কমনে আর ঘুরি বেড়াব। এক জায়গায় বসি, একটু গান করি। দু চার পয়সা যা পাই, না-হয় চাল ডাল সন্ধেবেলা সেবা করা যাবে। তা যাব আর কমনে, দরগার উঠোনে এক পাশে বসি ডুপকি ধরলাম।'

গাজীর বয়ান এই রকম : উঠোনে এক বটগাছের ছায়ায় সে ডাব্বা হয়ে বসে গান ধরেছিল। ডুপাক আর ঘুংগুরের তাল ছিল। তার ধারণা, লোকজনের ভাল লেগেছিল, তাই পয়সা চাল ডাল মন্দ পায় নি। সে যেখানে বসেছিল, তার কাছেই, একটা নাকি দল বসেছিল। দেখে মনে হয়েছিল, ন্যাড়া নেড়ী ভাবেরই কোন দল। দলের তো অভাব নেই। যদি জানতে চাও তবে গাজী তোমাকে শত নাম শুনিয়ে দিতে পারে।

যাই হোক, সেই দলের কেউ কেউ কাছে বসে তার গান শুনেছিল। সেই দলেই ছিল এক মেয়ে। তা বয়স প্রায় পঁচিশ তিরিশ হবে। গায়ে পাড় ছাড়া গেরুয়া, কপালে রসকলি, আতেলা চুল ছড়ানো। 'বুইলেন বাবু, দেখি মনে হল, গাজীর গান তারই সব থেকি ভাল লেগিছে।' তাই, সে তো আর কাছ-ছাড়া হয় না। লজ্জার মাথা খেয়ে গাজী আর কী বলবে। যতবার চোখ তোলে, দেখে সেই বোষ্টমী আর চোখ ফেরায় না। আবার নাকি চোখ ঘুরিয়ে হেসে বলে, 'বাবাজীর গান শুনে যে মরণ ধরে গো।'

কিন্তু তা বলে, সে সব কী আর দলের লোকের ভাল লাগে। তাদের মুখ ভার, রাগ রাগ ভাব। বোষ্টমীর সেদিকে খেয়াল নেই। যত শোনে, তত শুনতে চায়। গাজীই বা করে কী। গান নিয়ে কথা। শুনতে চাইলে না শুনিয়ে কি পারা যায়? 'না কী বলেন বাবু।'

তারপরে সেই বোষ্টমীর পাগলামি দেখ, দলের সবাই যখন খিচুড়ি অন্ন খেতে বসেছে, সে তখন কলাপাতা ভরে গাজীকে খেতে দিলে। গাজীর তো ভারী লজ্জা লজ্জা করতে লাগল। কিন্তু ওরকম করে দিলে না খেয়ে কি পারা যায়। আর গাজীর কী-ই বা যায় আসে। আজ মৌত, কাল ফৌত। পরদিন ভোরবেলাই তো সে চলে যাবে। তখন এসব কোথায় থাকবে। সে পরিতোষ করেই খেয়েছিল। তবে হ্যাঁ, একটা কথা বলতে হবে, মানুষটার মন ভাল। প্রাণখানিও বেশ তাজা। মেজাজ একটু ঝাঁজালো।

এ সময়ে একবার না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, 'আর দেখতে?'

গাজীর আবার সেই হাসি, যে হাসি শেষ হতে চায় না। বলে, 'বাবুর যে কথা। তা বাবু, কালোর ওপরি খারাপ বলতি পারব না। সোমত্ত মেয়েছেলে, ছাওয়াল-পাওয়াল হয় নাই। বেশ শক্ত পোক্ত ডাটোসাঁটোটি ছিল। রঙটা একটু কালো, তা বাবু, তাতে একটু ছিরি ছিল। ওইরকম কালো মুখে রসকলি বড় মানায়।'

তা বলে, বাবু যেন মনে না করেন, গাজীর সেদিকে কোন খেয়াল ছিল। এদিকে যত সন্ধ্যা ঘনায়, ভিড় তত বাড়ে। সারা রাত্রের মেলা তো। রাত্রে কত কবিগান, ঢপ, যাত্রা, তার সঙ্গে ম্যাজিক 'সার্কেস'—রাজ্যের ফূর্তি। তাতে আর গাজীর কী করার আছে। তবে একটু ঘুরে ফিরে দেখতে ইচ্ছা করে।

গাজী ভাবল, যাই, একটু হাত মুখ ধুয়ে দু এক দণ্ড নদীর ধারে বসি গিয়ে। তারপরে ঘোরা যাবে।

নদীর জল তো মুখে দেবার উপায় নেই। নোনা জল। দরগার পাশেই চাপা কল। গাজী সেখানে হাত মুখ ধুয়ে নদীর ধারে যাবার আগে সেই দলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যদি তাকে দেখা যায়। এত গান শুনল, খুশী হয়ে পেট ভরে খাওয়াল আবার দেখা হয় কি না হয়, একটু দেখা করে যাওয়া উচিত। কিন্তু দলের কোথাও তাকে দেখা গেল না। গাজী তাই আস্তে আস্তে বিদ্যাধরীর ধারে গেল। মেলাই লোকজন। নিরিবিলি খোঁজবার জন্যে হাঁটতে হাঁটতে একটু ফাঁকায় গিয়ে বসল।

আকাশে সে সময়ে চাঁদ। তবে বড় নয়, জোৎস্না একটু ফিকে। নদীর মাঝখানে এক চড়া। তাতে গোমাকেওড়ার জঙ্গল। গাজী সেদিকে চেয়ে বসে আছে। সে সময়ে কে যেন পিছন থেকে এসে ডাক দিল, 'কী হল সাঁইবাবাজী, বিরাগী হয়ি এখানে চলি এলে যে? গাজী দেখে, সেই বোষ্টমী। বলে, 'না, বিবাগী হব কেন। সারা দিন লোকজনের মধ্যি ছিলাম। এবার একটু নিরালায় এসিছি।' কিন্তু, গাজী কী বলবে, সেই মেয়ে একেবারে তার পাশে এসে বসল। বসে বলে, 'আমার জ্বালায় পলায়ি আস নাই ত?' গাজী হেসে বাঁচে না। বলে, 'তোমার জ্বালায় কী কেউ পলায়। তোমার কাছে থেকি জুড়ায়।'

সে বলে, 'কই, সাঁইকে দেখি তো সেরকম মনে হয় না। তা হলি তো একবার কাছে ডাকতি হয়, বসতে বলতি হয়, নিদেন নামখান জানতি মন করে।'

হ্যাঁ, মিথ্যে বলবে না, তখন যেন গাজীর মনটা একটু কেমন কেমন করে। একটু যেন মন ব্যথায়, নিশ্বাস পড়ে। জিজ্ঞেস করে, 'নাম কী?'

সে বলে, 'তারা।'

তখন গাজীর একটু ঠাট্টা করতে ইচ্ছা করে। বলে, 'কোন তারা? নয়নতারা, না আশমানতারা?'

তারা বলে, 'যে যেমন দেখে। সাঁইজী কেমন দেখে?'

'সাঁই না, লোকে আমাকে গাজী বলি ডাকে।'

তারা বলে, 'বেশ গাজীই না-হয় হল। গাজী কেমন দেখে?'

তা এতে মানুষের মন একটু মজে কি না, বাবুই জবাব দিক। গাজীর তাই নিশ্বাস পড়ে। বলে, 'আমার তো মনে হয়, আশমানতারা।'

'কেন?'

'চোখ চাইলি দেখা যায়, হাত বাড়ালি ধরা যায় না।'

তারা তখন খিলখিল করে হাসে। গাজীর মনে হয়, বিদ্যাধরীর জলে বুঝি জোয়ার আসে। তারা বলে, 'আর নয়নতারা?'

'সে তো সঙ্গে সঙ্গে থাকে, নিজির মধ্যি।'

তারা একটু চুপ করে থাকে। তারপরে বলে, 'তা যদি নাও তো থাকতে পারি।'

গাজী কী বলবে বাবুকে। তার যেন মনে হল, ভিতরে তার কোটালের বান ডাকে। ভাবে, এ বুঝি মুরশেদের লীলা। অধরধরার ফাঁদ তুলে দেয় হাতে। গাজী জিজ্ঞেস করে, তোমাদের লোকজনেরা কী বলবে?'

তারা বলে, 'কী আবার বলবে। আমি কারুর দাসী না। কাউকি কিছু বলবও না।'

তখন গাজী তাকে নয়নতারা নামে ডেকে বলে, 'তবে নয়নতারা তোমাকে নিয়ি আমি মনের মানুষ ভজব।'

তারা বলে, 'যে তোমার মনের মানুষ, সেই আমার ছিকেষ্ট।'

গাজী বলে, 'কবে যাবে?'

'আজই যাব, এখুনি।'

'তোমার জিনিসপত্তর?'

'কিছুই নেব না।'

গাজী যে কী বলবে বাবুকে। এ যেন সমুদ্র থেকে আসা জোয়ার। যতক্ষণ তার কাল, ততক্ষণ সে পিছন ফিরে তাকায় না। সেই তার নিয়ম। বেশ, তবে তাই চলুক নয়নতারা, এখান থেকেই সোজা হাঁটা ধরা যাক।

এই পর্যন্ত বলে গাজী চুপ করে। আর ভুরু কুঁচকে ঠোঁট টিপে আমি ভাবি, 'বাঃ গাজী, এর নাম প্রকৃতি-প্রাপ্তি।'

(ক্রমশ)

অস্থায়ী বিবাহ বা trial marriage

প্রস্তোক্ত দ্বিতীয় আশ্রমে অংশীদারিত্বের সংগী পতি ও পত্নীর চিরন্তন দায়িত্ব-ভার দুটি হল পতির উপার্জন করা ও পত্নীর সংসারের সকল ঘরোয়া দিক সামলানো। তাতে পতি যে জীবিকা সন্ধান করেন তাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে 'কেরিয়ার' বলে। অথচ উদয়াস্ত বিরামহীন চাকা চালিয়ে শ্রান্ত, ক্লান্ত গৃহিণীর শ্রম-মর্যাদার এমন একটি প্রয়োগগত পরিভাষা নেই, নেই কোন অর্থকরী আয়। গৃহিণীপনার পরিশ্রম তবে কি কিছুই নয়? অর্থমূল্যে দর দাম করে মেহনতের বেতন বা মজুরি যাচাই করা জিনিসটি ভাগ্যে আজও পশ্চিমের দুনিয়ায় সীমাবদ্ধ, না হলে আমাদের কোটি কোটি গৃহিণী যদি বিক্ষুব্ধ আন্দোলনের মাথায় ঘর দোর সামলাতে পয়সাকড়ি দাবি করতেন তবে বিপর্যস্ত, ক্লিষ্ট স্বামীদের উপায় কি হত? যাক, এ আলোচনা আমরা আগেই করেছি। আজকের অবতারণা আর একটি সমধর্মী সমস্যার। এটি আরও বিপ্লবকারী সঙ্কট, কঠিন এ প্রশ্ন জটিলতর। কর্তব্য নিরূপণ শক্ত কাজ। ব্যাপারটি আমাদের বিশ্বাসের মূল, চিরাচরিত সংস্কার বিবাহ বিষয় নিয়ে। Marriages are made in Heaven অথবা সাত জন্মের সাথী পতি ও পত্নী এ সমস্ত কথা আজকের বাজারে অচল। বিবাহ বিচ্ছেদ মেনে নেওয়া মানেই এ জন্মেই বিবাহবন্ধনকে সীমায়িত সময় দেবার পাসপোর্ট। বিচ্ছেদ যে সব দেশে আবার কথায় কথায়, উঠতে বসতে ঘটে তাদের তবে পাণিগ্রহণ পর্বটা নেহাত টেম্পর‍্যারি, সামান্য সময় স্থায়ী।

এ অস্থায়িত্ব ভাবিয়ে তুলেছে পশ্চিমের অনাধ্যাত্মিক চিন্তাশীলদের অনেক দিন থেকেই। মঠ, গির্জা বা ধর্মের শাসনের বাইরে মুক্ত মনের মানুষ আরও উদ্বিগ্ন হয়েছেন, হয়রান হয়েছেন। ভালমন্দের হদিস খুঁজে পান নি। সর্বশেষ পর্বটি কিন্তু সেই গির্জার উদ্বিগ্ন হওয়া। দারুণ সত্যকে আর বিধিনিয়মের আড়ালে আটকে রাখা চলে না। চোখ বন্ধ করে সরে থাকাও সম্ভব নয়।

ক্যাথলিক ফাদার Toronto Star নামক এক ক্যানাডিয়ান পত্রিকার প্রতিনিধির সংগে সাক্ষাৎকারে বলে ফেলেছিলেন যে, কোন দিন হয়তো চার্চই অস্থায়ী বিবাহ সমর্থন করবে। তাতে হয়তো বিচ্ছেদ ঘটার সংখ্যা কমবে। পূর্বরাগের পালার পরেই probationary পরিণয় হবে। পরীক্ষাধীন পরিণয়ের শিক্ষানবীস স্বামী পার্মানেন্ট পতিপত্নী তখনই হবেন যখন এই পরীক্ষাকালে পরস্পরের সংগে মানিয়ে থাকার যোগ্য প্রমাণিত হবেন। Toronto Star পত্রিকা তো ফলাও করে খবর ছেপে ছিলেন। সংবাদের দুনিয়ায় যুগান্তরকারী মন্তব্য! এদিকে গির্জা চেপে ধরলো ফাদারটিকে। কি সাংঘাতিক কথা, তাও আবার রোমান ক্যাথলিক পাদ্রির মুখ থেকে। খৃষ্টীয় ধর্মযাজক সমাজের আর মুখ থাকে না। পাদ্রি সাহেব যা বলে ফেলেছেন ফিরিয়ে নেওয়াও যায় না। থতমত খেয়ে তিনি আবার কিছু কথা সংযোগ করে প্রথমোক্ত সাক্ষাৎকারকে সামলে নেবার চেষ্টা করলেন। বললেন, বিয়ের প্রোবেশন চলন করতে হলে অনেক কণ্ট্রোল চাই। সবার উপর birth control! তারপর গির্জার কণ্ট্রোল, স্টেট-এর কণ্ট্রোল। ছেলেমেয়েদের বিবাহের বয়সের কণ্ট্রোল। আশা করা যায় সব কণ্ট্রোল কাটিয়ে আসা দম্পতির উদ্বাহবন্ধন সম্বন্ধে উদ্বেগ কম থাকবে। আমেরিকার ঈশ্বরতাত্ত্বিক বা Theologianদের কেউ কেউ সাহস করে পাদ্রি সাহেবকে সমর্থন করতে চেষ্টা করলেন। আমতা আমতা করে বললেন, অনেক বিবাহ, অনেক বিচ্ছেদ তার চেয়ে trial বিবাহ কি মন্দ? বেশীর ভাগ অবশ্য ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। কি জানি কি ঠিক? স্যান ফ্রান্সিসকোর ডাঃ লি অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি করলেন, বাগ্‌দানের পর থেকে যৌনসহবাস তো প্রায় মেনে নেওয়া হয়েছে আজকের সমাজে, কাজেই বাগদানের পরবর্তী কালই বলতে গেলে পরীক্ষামূলক কাল। ইহুদী সম্প্রদায় এককালে এ ব্যবস্থাই করেছিলেন। বাগ্‌দত্ত নারীপুরুষ প্রয়োজন হলে বাগ্‌দান ফিরিয়ে নিতেন। বিচারের অধিকার ছিল ধর্মসংক্রান্ত আদালতের।

এত বিচার বিতর্কসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত বেশীর ভাগই রায় দিলেন বিরুদ্ধে। ভাবনা এক অল্প বয়স্কদের নিয়ে। আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ ছিল সামাজিক ঘটনা। শিশুরও বিবাহ হতো। কিন্তু দায়িত্ব থাকতো পিতা-মাতা ও অভিভাবকের। পশ্চিমী দুনিয়ায় আজ যা ভয়াবহ অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে অপরিণত বুদ্ধি কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে। বাঁধন হারা সমাজের যুব গোষ্ঠী যৌনজীবনে দীক্ষিত হয় অল্প বয়সে। বিবাহের মত এতবড় দায়িত্ব সাময়িক উচ্ছ্বাসের মাথায় তারা নিয়ে বসে। হাই-স্কুলের ছেলেমেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ

হয়, কলেজের তো কথাই নেই। বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে বিবাহিত ছাত্রছাত্রী তো প্রায় সাধারণ ব্যাপার। বরং আলোচনা হচ্ছে বিবাহিত শিক্ষার্থীদের সুখ-সুবিধার আয়োজনের। সমস্যা সেখানে নয়, সমস্যা এই সব বিবাহের পরিণামকে নিয়ে। প্রথম মোহ কাটে কিছুদিন পরে। ততদিনে হয়তো তারা সন্তানের জনক-জননী। তারপর তাদের কচি কিশোর মনের ক্ষণিক আকর্ষণ কোন কোন ক্ষেত্রে অসহ্য হয়ে যায়। বিচ্ছেদ ভিন্ন গতি থাকে না। অবিবেচিত প্রেমের বোঝা কত নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে। অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের বিবাহে এমন সব ভ্রান্তি হয় না তা নয় তবে অল্প বয়সে ভুলের ভয় বেশী। এদের জন্যই অস্থায়ী বিবাহ চালানোর কথা সমাজ কল্যাণকামীরা ভাবছেন।

বিবাহ বিচ্ছেদের বিষময় পরিণাম আমাদের দেশেও নেই তা নয়। তবে আশার কথা যে সমাজের খুব বিশেষ স্তরেই মনকষাকষির সঙ্কটজনক অবস্থা সীমাবদ্ধ। সাধারণের জন্য ভাববার আরও অনেক বড় বড় বিষয় আছে।

কলাগাছের সুতোর কাপড়

এর্নাকুলমের একটি সকাল। যাত্রী-বাসে চড়ে শহর দেখতে বেড়িয়েছি। সঙ্গে স্থানীয় মহিলারা আছেন। তাঁদের তৈরি প্রোগ্রাম হিসাবে বাস এসে দাঁড়ালো ছায়া-ঘেরা মস্ত এক বাড়ির ফটকে। ফটকের গায়ে লেখা "বিমলালয়ম।" বিমলা কার নাম? কার এই বিশাল প্রাসাদ ভাবছি, এমন সময় স্বাগত অভ্যর্থনা কানে এল "আসুন।" পরে বুঝলাম বিমলা কোন বিশেষ মেয়ের নাম নয়, বিমলা সব অকলঙ্ক, পবিত্র দুঃখিনী কন্যার নাম। এই রকম আর একটি নাম শুনেছিলাম "নির্মলা নিকেতন" বোম্বাই শহরে। সেদিন জানলাম যে মিশনারী সম্প্রদায় 'নির্মলা নিকেতন' চালাচ্ছেন, তাঁদেরই প্রতিষ্ঠান বিমলালয়।

বিমলালয়ের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে নানা বয়সের মেয়েরা জমা হয়েছে। ১০।১২ থেকে নিয়ে ১৮।২০ তো হবেই তাদের বয়স। প্রত্যেকের হাতে এনামেলের একটি পাত্র। জিজ্ঞাসা করে জানলাম পাত্র তাদের প্রাতরাশের জন্য। ঘর থেকে আসে তারা সকালে, সারাদিন পড়াশুনো ও নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। অনেকেরই এমন অবস্থা নয় যে কিছু খেয়ে কাজে আসে। তাই কাজ আরম্ভ হবার আগেই প্রাতরাশ। একটু ঠাহর করে দেখতেই নজরে এল পাত্রভরা প্রাতরাশ আর কিছুই নয়, ভাতের ফেন। মধ্যাহ্নে তারা যে ভাত পাবে তারই ফ্যান নুনের ছিটে দিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে। সঙ্গিনী বললেন, কেরালায় অসচ্ছল সংসারের মেয়ের

এরা বাঙ্গালী মেয়েকে মনে পড়িয়ে দেয়

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড়, পরিপাটি করে বাঁধা চুল, কারও বা এলানো ঘন কৃষ্ণ কেশদাম আমার দেশের মেয়েদের মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। দক্ষিণ ভারতের কাট ওয়ার্ক বিখ্যাত। কোথাও দেখলাম মেয়েরা বসে কাট-ওয়ার্ক করছে, কোথাও বা তারা পাঠ বুঝে নিচ্ছে, কোথাও বা চিকন মাদুর দিয়ে ব্যাগ, টুপি তৈরি করছে। বেশী দূর ওদের পড়ানো সম্ভব হয় না কারণ, মুখ্য উদ্দেশ্য সামান্য কিছু উপার্জনের সুযোগ দেওয়া। হাতের কাজ যথেষ্ট হয়ে বাজারে পৌঁছোবে তবেই তো তারা দু' পয়সা নিয়ে ঘরে ফিরবে। অভাবের এতটুকুও যদি কমে তাই বা উপেক্ষা করা যায় কি? শিক্ষয়িত্রী বললেন, এদের অনেকের ঘরেই একটি-দুটি টি-বি রোগী আছে। বিমলালয়মের তরফ থেকে তাদেরও পথ্য, চিকিৎসা ইত্যাদি চলে। হয়তো এমন সংসার আছে যেখানে বিমলালয়মই একমাত্র ভরসা।

ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় লক্ষ করলাম কয়েকটি মেয়ে বসে কলাগাছের ছাল থেকে কি যেন বের করছে। এগিয়ে গিয়ে দেখি ছাল থেকে তার লম্বা লম্বা আঁশ বা তন্তু টেনে যাচ্ছে। খুব আশ্চর্য হলাম। কি হবে এই তন্তু দিয়ে? শুনে অবাক হয়ে গেলাম যে এই তন্তু থেকে তাঁতে বোনা সুন্দর কাপড় হয়। অবশ্য সামান্য সুতো বা রেশম সংযোগ করতে হয়। যে কলাগাছে ফল ধরে না সেরকম কলাগাছের গুঁড়ি পাঁচেক দু' দিক থেকে দুটি মেয়ে আঁশ টেনে এক কিলো আঁশ অনায়াসে ৫।৬ ঘণ্টায় বের করে। ৫০ গ্রাম এ রকম তন্তু ছ'টি প্রমাণ মাপের ববিনে ভরা চলে। একদিকে রেশম বা সুতি দিলে এই ৫০ গ্রাম কলাগাছের আঁশের মিশ্রণে ১½ মিটার কাপড় হয়।

খাদি বোর্ড বহুদিন থেকে কলার গাছ এভাবে কাজে লাগানো চলে কিনা তাই পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। এক ধরনের মোটা শক্ত পাকানো সুতো বা টোনসুতো প্যাকিং হয়েছিল। তা থেকে মোটা-সোটা কার্পেট জাতীয় জিনিস বোনাও পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু শেষ উৎকর্ষ হলো এই নাম না জানা গরীব ঘরের ছোট ছোট মেয়েদের হাতে এসে। বিমলালয়ম খাদি বোর্ডের সাহায্যে যে পরীক্ষা চালালেন তাতেই পাওয়া গেল নরম রেশমতুল্য তন্তু। মেয়েরা লক্ষ করেছিল কলাগাছের উপরের দিকের খোল থেকে কর্কশ সুতো হয় কিন্তু যত তলায় যাওয়া যায় ততই নরম ও চকচকে তন্তু মেলে। সে তন্তুতেও একটু অনমনীয়ভাব যা থাকে গরম জলে সিদ্ধ করলে সেটা চলে যায়। এমন কি রং করার জন্য যে গরম জল ব্যবহার হয় তাতেও তুলতুলে হয়ে যায়।

বিমলালয়মের মেয়েদের এই দানের খবর অনেকেই রাখেন না কিন্তু কলাগাছের তন্তুতে বস্ত্র উৎপাদনের নানা পরিকল্পনা চলছে। কেরালায় ১,১৬,০০০ একর জমি কলার চাষে আছে। কলার খোল ফেলে দেবার জিনিস। আশা করা যায় এভাবে কাজে লাগাতে পারলে ৫০,০০০ লোকের জীবিকা হবে এবং তারা অনায়াসে দৈনিক টাকা দুয়েক উপার্জন করতে পারবে। কাজটি মেয়েদের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। অবসর সময়ে করতে পারার মতও। কেরালার বাইরেও বহু পরীক্ষা চলছে। বাংলা দেশেও তো কলার চাষ প্রচুর। আমাদের সরকার ও সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলি এদিকে নজর দেবেন না কি?

শ্রীমতী

মণীষার অপচয়

সম্প্রতি মার্কিন দেশে পত্র, পত্রিকাতে, সভা, সমিতিতে মনীষার অপচয় সম্বন্ধে জোর আলোচনা শুনছি। ছেলেরা উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশে আসে; শিক্ষা শেষ করে তাদের দেশে ফিরে সে শিক্ষাকে কাজে লাগান উচিত সে বিষয় কারো দ্বিমত থাকতে পারেনা। দেশ থেকে যেসব সুধীজন এদেশে নানা কার্যোপলক্ষে এসে থাকেন তারা উচ্চগ্রামে ছেলেদের দেশে ফিরতে উপদেশ দেন। আমাদের সরকারী প্রচার বিভাগের পক্ষে অন্যকিছু বলা সম্ভব নয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উপরোক্ত উপদেশ কতটা কাজে লাগান সম্ভব সে বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

প্রথমেই বলা প্রয়োজন আমি ছাত্রী নই, এদেশে কোন বৃত্তিও আমার নেই, নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র। গত চার বছর এদেশে বাস করে, এখানে এবং ইংলণ্ডে বহু ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে আমার ধারণা হয়েছে ছেলেদের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও প্রকৃত তথ্য নির্দেশের বিশেষ প্রয়োজন।

ছাত্ররা জানে এবং দেশে ফিরে পছন্দমত বা যোগ্য কর্মের সংস্থান করা প্রায় অসম্ভব জেনেই তারা ফিরতে সাহস পায়না। যারা বিদেশে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পেরেছে, তাদের ওপর দোষারোপ করা হয় যে এদেশের সহজ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হওয়ার ফলে তারা দেশে ফিরে কোনরকম কষ্ট স্বীকার করতে নারাজ। এ দোষারোপ আমার মতে সত্য নয়। বিদেশে যে অবস্থাতে সে থাকুক সকলেই দেশে ফেরার স্বপ্ন দেখে। জীবনটা স্বপ্ন নয় এবং জীবন যাত্রা দিনে দিনে কঠিন হচ্ছে, নিশ্চিত জীবনের পথ থেকে অনিশ্চিতের দিকে পা বাড়াতে দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক।

এদেশ থেকে যেসব ছাত্ররা দেশে ফেরেনি বা ফিরতে পারেনি, তাদের তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।—

প্রথম শ্রেণীর ছাত্র—যারা ছাত্রসমষ্টির একাংশ মাত্র। এরা এদেশে নিজেদের পঠনীয় বিষয় গবেষণার যে সুযোগ পায়, দেশে তা আশা করেনা। আপন মেধা ও বুদ্ধির বলে এরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের স্থান করে নেয়। এদের এদেশে বাস করার কারণ ব্যক্তিগত সাফল্য। এরা যে কোন দেশের গৌরব। অনেকে বলবেন এসব ছেলেরা দেশে ফিরে নিজেদের ক্ষেত্রে কাজ করে দেশকে নানা বিদ্যায় সমৃদ্ধ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে দেশের বর্তমান অবস্থায় মুষ্টিমেয় ধীমান ছাত্রকেও তাদের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত আত্মারামের এ বিষয়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি বিশেষ সময়োপযোগী।

এদেশে প্রথম শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ ডি ডিগ্রীধারী ছাত্র তার পছন্দমত বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নিজের বিষয়ে গবেষণার সুযোগ পায় এবং আর্থিক সাহায্য যা পায় তাতে পরিবার প্রতিপালন করতে পারে। আমাদের দেশের যে যুবক এ সুযোগ পায়, তাকে সে সুযোগ অবহেলা করে দেশে যেতে উপদেশ দেব কোন ভরসায়। দেশে ফিরে বড় জোর সে কোন বি এ ক্লাসের ছাত্রদের পড়াবার সুযোগ পাবে এবং গবেষণার পরিবর্তে শহরের রাজপথে শোভাযাত্রার অংশীদার হবে। ব্যক্তিগত সাফল্যের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে, তার বুদ্ধি বিকাশের পথ রুদ্ধ হবে, কফি হাউসের গরম কফির ধোঁয়ায় আর ততোধিক গরম আলোচনায় সে তার রুদ্ধ উচ্চাশার আক্রোশ মেটাবার পথ খুঁজবে। এখানে যশস্বী হবার ফলে সে যদি দেশে গৌরবের আসন পায়, সে স্বেচ্ছায় ছুটে যাবে, বিদেশের কোন প্রলোভন তাকে আটকাতে পারবেনা। এমন তো অনেকেই ফিরে গেছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্ররা আসে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রির উদ্দেশ্যে। এঁদের মধ্যে অনেকেই ফুলব্রাইট বা অন্য কোনরূপ স্কলারশিপ নিয়ে এদেশে আসে এবং চাকুরির সুযোগ পেলে থেকে যায়। দেশে থাকলে এরা কেউ শিক্ষক, কেউ ইঞ্জিনীয়ার কিম্বা সরকারী চাকুরে হত। আমাদের দেশে এসব কাজের জন্য কি যোগ্য লোকের অভাব? বিভিন্ন ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে যেসব ছাত্র উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে তারা প্রমাণ করেছে যে আমাদের দেশের শিক্ষার মান এদের টেকনিকাল ইনস্টিটিউটের নীচে নয়।

প্রতি বছর কয়েক হাজার যুবক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পার হয়ে কর্মপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছে. তাদের মধ্যে কজন বিদেশে কাজের সুযোগ পায়? আর যারা পায় তারাই যে শ্রেষ্ঠ ছাত্র তারও কোন প্রমাণ দেখিনা। দেশে যারা রইল তারা দেশের কাজ চালাবার অনুপযুক্ত একথা মনে করবার কোন কারণ নেই। সুলেখক নারায়ণ ছাত্রদের দেশে ফিরবার উপদেশ দিয়ে চলেছেন —দেশের ধীমানরা বিদেশে চলে আসছে দেশ কি তবে অশিক্ষিতরা চালাবে? বিদেশে এ ধরনের উক্তি শুনলে মনে হয় দেশে শিক্ষিত ধীমান ব্যক্তির নিতান্ত অভাব। ধীশক্তির অভাব দেশে নেই, অভাব সে শক্তিকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাবার।

এদেশে আমাদের মত গাত্রবর্ণের অধিকারী বিদেশীরা যতদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয়ে কাজ করে, তারা প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের সবরকম সুবিধা ভোগ করে; সেজন্য অনেকে ডক্টরেটের কাজ হয়ে গেলেও ডিগ্রি নিতে দেরি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতা থেকে বেরিয়ে যেদিন কোন কর্মপ্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়, তারা সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে বিদেশে পরিবার প্রতিপালন করে। ভারতীয় দূতাবাস বা এদেশী সরকার কেউ তাদের সাহায্য করেনা, স্থানীয় সহকর্মীরা অনেকে বিদেশী প্রতিযোগী বলে সুনজরে দেখেনা। এরা দেশে বেকার সমস্যা না বাড়িয়ে, মামা বা জেঠার সুহৃদের তদ্বির না করে নিজেদের উদ্যোগে ও যোগ্যতায় যে স্থান করে নিয়েছে সেটা তাদের শক্তি ও সাহসের পরিচয়। এদেশে জীবনযাত্রা এখনও দেশের তুলনায় তিনগুণ ব্যয়বহুল; দক্ষিণার অংক শুনতে ভারী হলেও সকলে যে খুব আরামে থাকে তাও নয়। দেশে পদের সংগে মর্যাদা যুক্ত থাকে, সেটাও এদের ভাগ্যে জোটে না। তবু নিশ্চিন্ত জীবন, খাদ্যের জন্য রাশনের দোকানে ধরনা দিতে হয় না, ছেলে স্কুলে ভর্তি করবার এক বছর আগে অধ্যক্ষের বন্ধুর খোঁজ করতে হয়না।

তৃতীয় শ্রেণীর যেসব ছাত্র দেশে ফেরে না, তারা জানে দেশে ফিরে কাজ করবার মত যোগ্যতা তারা অর্জন করতে পারেনি। এরা নানা উপায়ে বিদেশে এসেছে। বুদ্ধি বা বিদ্যা অর্জনের ক্ষমতা এদের সাধারণ পর্যায়ের নীচে। এই বিরাট দেশে নানা ধরনের বহু বিশ্ববিদ্যালয় তার কোন একটাতে ঢুকে একটি ডিগ্রি সংগ্রহ করা অতি সাধারণ ছাত্রের পক্ষেও অসম্ভব নয় এবং টেকনিকাল ক্ষেত্রে কাজ যোগাড় করাও কঠিন নয়। এদের মধ্যে বেশীর

জাগ এমিগ্রেশন ভিসা সংগ্রহ করে এদেশে স্থায়ীভাবে বাস করে, কেউ কেউ স্থায়ী বাসিন্দা হবার সুবিধার জন্য বিদেশী সঙ্গিনীর ব্যবস্থা করে। ইংরেজ আমলে ভারতে এরূপ বহু শ্বেতাঙ্গ স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রার মানসে আসত, এখনও সে আশা একেবারে বন্ধ হয়নি। এই চলাটা উল্টো পথেও হচ্ছে এই যা তফাত। আনন্দের বিষয় কোন ভারতীয় চলায় বলায় বিশেষ কোন উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করে অন্তত এদেশে আমাদের লজ্জার কারণ হয়নি। দেশের কোন যুবককে যখন ট্যাক্সি চালাতে কিম্বা 'লণ্ড্রী বয়ের' কাজ করতে দেখি অনেকের মত আমার তাতে লজ্জা হয় না আনন্দ হয়। ঘরে বসে বেকারের দল না বাড়িয়ে কিম্বা বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গুণ্ডার দলে যোগ না দিয়ে এরা নানা উপায়ে বিদেশে জীবিকা নির্বাহ করছে, অনেকে সান্ধ্য কলেজে কাজ শিখে নিজের অবস্থার উন্নতি করছে। এ পর্যায়ের ছাত্রদের নিশ্চয়ই মনীষী বলা চলে না। দেশদ্রোহী নাম দিয়ে এদের অভিযুক্ত করার কোন কারণ নেই। প্রকারান্তরে এরা দেশের উপকার করছে। একমাত্র পারিবারিক কারণ ছাড়া এদের পক্ষে দেশে ফিরবার কোন যুক্তি নেই। আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে পারিবারিক কারণ উপেক্ষণীয় নয়। যে ছেলে দেশে পাঁচশ টাকা আয় থেকে অন্তত পঞ্চাশ টাকা বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য বরাদ্দ করে, সে বিদেশে বাসের ফলে পাঁচশ ডলার আয় থেকে পঞ্চাশ ডলার দেশে পাঠায় না। কেউ পারে না, আবার অনেক বহু দূরে থাকার দরুণ স্নেহ এবং দায়িত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকে। বহু পরিবার এ অবস্থায় মানসিক এবং আর্থিক ক্লেশ স্বীকার করে।

ভারতের মত বৃহৎ দেশের যে সামান্য সংখ্যক ছাত্র বিদেশে পাঠের বা জীবিকার্জনের সুযোগ পায়, তা শিক্ষিত লোকসংখ্যা অনুপাতে অতি নগণ্য। দেশের পক্ষে এই মুষ্টিমেয় মিতবুদ্ধি-জীবির অনুপস্থিতি লক্ষণীয় হবার কথা নয়। এত ঢাকঢোল বাজিয়ে 'মনীষীর অপমরণ' আখ্যা দিয়ে বিদেশাগত যুবকদের আত্মম্ভরিতা বাড়াবার কিম্বা দেশদ্রোহী বলে তাদের বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্য কি?

বিদেশ যাত্রার পূর্বে প্রত্যেক ছাত্র ও তার অভিভাবকের বিদেশের পাঠ্যসূচী, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এদেশের শিক্ষা দেশে কার্যকরী হবে কিনা তাও জানা দরকার। যে ছাত্র এদেশের ডিগ্রি সংগ্রহের পুরস্কার দেশে পাবে না জানে, সে যে ফিরবে না সে তো জানা কথা। এ সব প্রশ্ন পারিবারিক। একে সামগ্রিক সমস্যা বলে গণ্য করা হচ্ছে কেন? ভারতের এবং বিলেতের অর্থনৈতিক বা লোকসাংখ্যিক অবস্থা এক নয়। সমস্যা সমাধানের পথও ভিন্ন।

মুখে যতই আস্ফালন করি, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বহু দূরে; প্রতিটি যুবকের তার নিজের ভবিষ্যত চিন্তা করে চলতে হয়। যেখানে সে গ্রাসাচ্ছাদনের সুযোগ করে নিতে পারে সেই তার ঘর, সেই তার পথ। উচ্চ যে আদর্শ দেশ ও সমাজ ব্যবস্থায় স্থান পায় না, বৃথা সে আদর্শ সামনে ধরে তাকে বাধা দেওয়া উচিত কি?

প্রভা ঘোষাল
ওয়াশিংটন

ত্রিলোচন কলমচি

দিন যায়

গোপেশ্বর সম্মিগ্রাহী মাথা নাড়তেই মনে হল শুভ্রকাশের শ্বেত দুলে উঠল, 'কলকাতা এখন আমাদের সম্পূর্ণ অচেনা হয়ে গিয়েছে'—

'কি ঘরে কি বাইরে, দেখছি তো'— বিপত্তারণ চাটুজ্জে গোলা পায়রার মত অ্যাজমায় গোঙাতে থাকলেন।

হাঁটুর কাপড় তুলে নী-ক্যাপ ঠিক করতে করতে একদা কালের স্পোর্টসম্যান জগন্ময়-বাবু বললেন, 'এখন আর কেউ আমাদের গলায় মেডেল ঝোলাতে আসবে না। কাপ শীল্ড হাতে তুলে দেবে না। এখন আমরা শুধু বাতিল নয়, বিস্মৃত মানুষ হে'—

'ওহে ছোকরারা!' সহসা দুপাটি ফল্‌স্‌টীথ্‌ খিঁচিয়ে উঠলেন বিপত্তারণ, 'এখানে বসছ যে?'

কিশোর দুটি বেঞ্চের খালি দিকটায় চিনেবাদামের ঠোঙা আর ঝালনুনের মোড়ক নিয়ে বসে পড়েছিল। অবাক হয়ে বলল, 'কেন কি হয়েছে। খালি আছে তাই বসেছি।'

'খালি থাকা কি অত সহজ'! দুনিয়ায় কোথাও কিছু খালি নেই, অন্তত খালি-খালি নেই, মানে শুধু শুধু নেই, তা কি জানো?' রিটায়ার্ড হেড মাস্টার ভূতনাথ-বাবু যেন দাক্ষিণ্যবশত ক্লাস এইটের গ্রামার ক্লাস নিচ্ছেন এমনভাবে কথাটা বোঝালেন।

'এখানে তোমাদের জায়গা না, এই বেঞ্চ দুটো আমাদের। তোমরা পার্কে নতুন নাকি হে—আমাদের দ্যাকোনি অ্যাদ্দিন?'

'ইস আব্দার! আপনাদের কেনা নাকি এই বেঞ্চ? নাম লেখা আছে কোথাও?' অবদমিত ভঙ্গিতে অম্লানবদনে কিছুটা ঝালনুন ফেলে একটি কিশোর শুধালো।

আঁ, আবার তক্ক!' জগন্ময়বাবু লাঠি উঁচালেন শক্ত হাতে, 'অ্যাইবার মারবো, যাও ভাগো'—

'বিশ বছর ধরে অমরা এখানে বসছি, বুঝলে খোকা', ভূতনাথবাবু ফের বোঝাবার চেষ্টা করলেন, 'তোমরা হয়ত কলকাতায় নতুন এসেছো—হয়ত পৃথিবীতেও নতুন।'

ছেলে দুটি লাঠির ভয়েই লাফিয়ে উঠেছিল, এবার যেতে যেতে একজন ভেংচি কেটে বলল, 'উঁহু, অ্যাইবার মারবো! ঢিল মেরে টাক ফাটিয়ে দিতে হয়'—

'বুড়ো মানুষ বুড়ো মানুষের মত থাকবেন'—দ্বিতীয় জন উপদেশ ছুঁড়ে দিয়ে ভিড়ে মিশে গেল।

'তাই তো আছি বাবা।' ভূতনাথবাবু স্বগতোক্তি সহ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন।

'কালে কালে কি হল দাদা? কি অশিক্ষা! অসভ্যতা! অশ্রদ্ধা, অসহিষ্ণুতা'—

'সে ছিল আমাদের সময়'—

অন্যদিন হলে 'আমাদের সময়ের' গোল্ডেন ট্রেজারী উজাড় হত মুখে মুখে। পাঁঠা মুরগী চালডাল কত শস্তা ছিল, রসগোল্লার কি বিগ্‌ সাইজ, সন্দেশের কি দশাসই বপু, দইয়ের কি ঘনীভূত অবস্থা, সে-সব ছাড়াও সন্ধ্যার পর শেয়ালডাকা নির্জন কলকাতার রাস্তা, মিড্‌ডে টিকেট, ছুটির দিনের অলডে, বাঈজী, বোবা বায়োস্কোপ, ঢাকুরে লেক তখন বিশহাত মাটির তলায়, কাঠের পুলওভার তখন গঙ্গার গায়ে উঠেছে এইসব কত কি। কিন্তু আজ সামান্য একটা ব্যাপারেই মেজাজ খিঁচরে গেল সকলের, তথা আর জমলো না।

গোপেশ্বর ভাবলেন, পুরনো বন্ধুরা অনেকেই কেটে পড়েছে উত্তর পঞ্চাশেই। বাকিরা কে কোথায় পুত্রপৌত্র বধূদের সংসারে অন্তরীণ সব জানা নেই, দু এক জনের কাছ থেকে বিলম্বিত পোস্টকার্ড চলাচল করে। চিঠি এখন আর এই বয়সে, এই অবস্থায়, এই সময়ে বন্ধুদের মধ্যে হাইফেন নয়—সে যেন ড্যাশের কাজ করে।

তার থেকে এই বৈঠকের আলগা বন্ধুরাই ভালো। দু চারটে সুখ-দুঃখের কীর্তি-কলাপের গল্প বরাবরই পরস্পরের কাছে নতুন থেকে যায়। বাল্য কৈশোর যৌবন

সে ছিল আমাদের সময়

অজানা থাকার, কর্মজীবন যবনিকার অন্তরালে থাকার অনেক তারিয়ে তারিয়ে সুখস্বপ্ন রোমন্থন করা যায়। কেউ কারো বাড়ির অবস্থা খুলে জানায় না হয়ত, বাড়ির ঠিকানাও সম্পূর্ণ দূরে থেকে জানা। কিন্তু একজায়গায় সকলেই এক বার্ধক্যের প্রচণ্ড স্পর্শকাতরতায় ঐক্যবদ্ধ।

অটলবিহারী এলেন লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে—পাকা আমটির মত চেহারা, কবে টুক ক'রে খ'সে পড়বেন কে জানে।

'এত দেরি কেন? ভাবিয়ে তুলেছিলেন যে আপনি'—

সোনালী ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে একজোড়া তালশাঁসের মত তাকালেন অটলবিহারী। কচি-কচি হাসলেন, প্রথম দর্শনে মনে হয় লাজুক হাসি।

অটলবাবু তো আর আমাদের মত লক্ষ্মীছাড়া মানুষ নয়কো! ওনার বেটার-হাফ্ এখনো বর্তমান, আমরা তো সবাই লেটার হাফ্। তা মিসেস কি বললেন আসার সময়? তাড়াতাড়ি ফিরো, দ্যাখো কেমন ডাগর চাঁদ উঠেছে, হ্যাঃ হ্যাঃ হে'। কেয়াবাত! আমরা তো ব্যাটা-র হাফের হাতে নাকাল হচ্ছি। এমনিতর ল্যাঠার
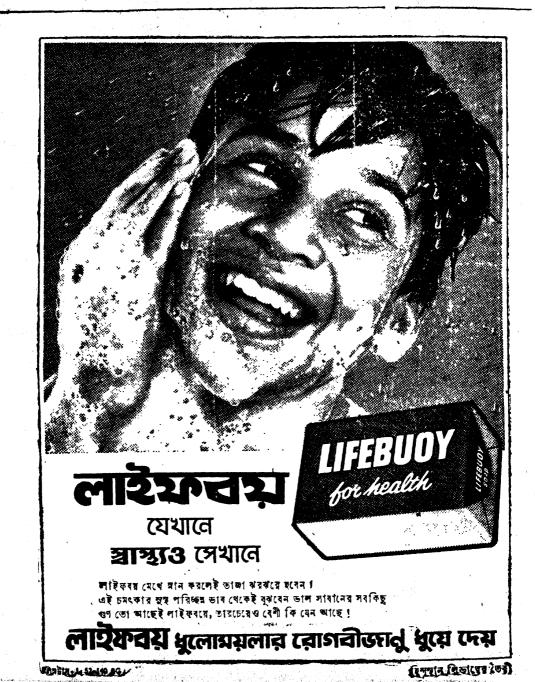
হাফ্‌ আমরা [যতদূর অনুমান হয় দুজনে উকিল কিংবা মুক্তার ছিলেন]। কিন্তু কমাসুন্দরকে দেখছি না যে আজও, বাড়ুজ্জার হল কি? ওই তো সকলের আগে আসতো, যেতো সকলের পরে, চোখে কম দেখতো কিনা। নাতি-নাতনি কেউ এসে নিয়ে না গেলে—। কেউ এসে একেবারে নিয়ে গেল কিনা তাইবা কে জানে। একটু খোঁজ নিতে পারলে হত, বাড়ি চেনেন কেউ (সবাই মাথা নাড়লেন)। অটলবাবু ভাবলেন, কি রকম দজ্জাল স্ত্রী আমার তা তো আর জানোনা, বন্ধুরা, তাই বলছ; সারা লাইফ ট্রাবল দিয়ে চলেছে। গোপেশ্বরবাবু মনে মনে নিজের বিগত তৃতীয় স্ত্রীর কথা স্মরণ করলেন। ঝামেলা পোহাতে হত ঠিকই, কিন্তু বেশ আহ্লাদী ভাবসাব ছিল মনরমার। প্রথমা দ্বিতীয়া দুজনকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন তারপর, সব মনে পড়ে না, ছবির রঙ্‌ চটে গেছে স্থানে স্থানে। একেই স্মৃতিভ্রংশ বলে হয়ত। তবু ওদের দাম্পত্যজীবন, মৃত্যু, আকাঙ্ক্ষা পৃথক পৃথক রকমের ছিল। জগন্ময়বাবু দেড়-খানা ঘরের ফ্ল্যাটের ঘন গঞ্জনার মধ্যে আছেন, বিপত্তারণবাবুর কাছে কলকাতা ক্রমশ ফাঁসির রজ্জু হয়ে আসছে।

তবু এই ভিড়ই ভালো। এই চক্রচারণরত নরনারী, ডিনার টেবুলের মত কোর্সে কোর্সে নানা সুখাদ্য টুকরো কথা, কিশোরী হাসি, যৌবনের জল্পনা। রেলিং ঘেরা সজলদীঘি। যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ, গোলদীঘির গর্তে চাঁদ ধরা পড়ে গেছে। হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকে, মুখে বুকে ভিজে গামছা বুলোনোর মত। গুঞ্জন, গান, হাসি। পার্স থেকে ঠিকরে যাওয়া পয়সার মত দুচারটে অর্থপূর্ণ চকিত কথা। ফেরিঅলা আর ফেরির মানুষ! তবু এই ভিড়ই ভালো, এই ফেরিঘাট।

নতুন একজন বন্ধু জুটেছেন সম্প্রতি, তিনি এলেন। স্থায়ী বন্ধু অবশ্য নন, মেয়ের বাড়িতে মা নাতনীর বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন, মাসখানেক থাকবেন। অবিশ্যি এই বয়সে কেই বা স্থায়ী বন্ধু!

অনেক বিষয় আশয় করেছেন মফস্বলে। কয়েক একর জায়গা নিয়ে বাড়িঘর, পুকুর, গরু-ছাগল, হাস-মুরগী। বেশ কর্মিকর্মা মানুষ ছিলেন যৌবনে। সরকারী লুঠেরা আর কি! অফিসের ফেয়ারওয়েলে পাওয়া আইভরি রিং বসানো দামী ছড়ি মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে হুঙ্কার দিয়ে কথা বলেন। হুঙ্কারগুলি এখন সামান্য চেনা যায় মাত্র। গোপেশ্বরবাবু, বছর সাতেক আগে যখন দক্ষিণ পাড়ায় ছিলেন, প্রতিদিন সকালে

বিকালে লেকে বেড়াতে যেতেন। সেখানে অনেক আমাদি রায়বাহাদুর, রিটায়ার্ড আই সি এস দেখেছেন। ডিস্ট্রিক্ট জাজ থেকে শুরু ক'রে আরো অনেক দূর পর্যন্ত। তাঁদের অনেক প্রফেশনাল বাতচিৎ শুনেছেন, অনেক অক্ষয় কীর্তির কথা। এইসব জোর গলার গল্প এই বয়সে আর ভালো লাগে না, স্বরচিত আত্মজীবনীর মত শোনায়।

দ-ঘোষ মাটিতে লাঠি ঠুকে বললেন, 'কিন্তু আমার স্ত্রী আজ বাইশ বছর বিধবা' —কথাটা শেষ হতে পারেনি গোপেশ্বরবাবু অন্যমনস্কতা ভেঙে চমকে উঠে বললেন, 'তার মানে? আপনি তো দেখছি জলজ্যান্ত'—

দ-ঘোষ হাসতে হাসতে কবুল করলেন তাঁর স্ত্রী যথার্থ বিধবা হননি, বিধবার মত জীবন যাপন করছেন মাত্র। মাছ মাংস ছোন না, দীক্ষা নিয়েছেন কিনা! অ, এই ব্যাপার! সবাই নিজের নিজের স্ত্রীলোকে ডুবে গেলেন, প্রথম যৌবনে। বাইরের কথা অকারণেই থেমে গেল। শুধু দ-ঘোষ তাঁর অশ্রুত উপাখ্যান সগৌরবে ব'লে চললেন।

গোপেশ্বরবাবুর মনে পড়ল, বিয়ের পরেই গাজীপুরে বেড়াতে গিয়েছিলেন সস্ত্রীক। অর্থাৎ সেই প্রথমবার। আত্মীয়তার সুদূর-সূত্রে কোনো উত্তরপ্রবাসী বাঙালীর বাড়িতে। সেদিনের আতিথেয়তা, তাঁর ডায়েরীতে বর্ণে বর্ণে লেখা আছে, সাধু ভাষায়। বেশ ঘন করে। আসার সময় এক বোতল গোলাপজল উপঢৌকন পেয়েছিলেন। সেই গোলাপ জলের গন্ধ কত অন্ধকার রাত্রির সংগে মাথামাখি হয়ে আছে।

বিপত্তারণ উঠে পড়লেন। কি হল? না, সন্ধ্যা হয়ে এলো, এবার যাই। যাই বলতে নেই, কে যেন বলেছিল সেই কথা। ঘরে ফিরবেন চাটুজ্জে মশাই, সেই ঘর, বারান্দায় এখনো যেন গাড়ু আর গামছা নিয়ে ললিতামণি দাঁড়িয়ে আছে। দিনান্তে ক্লান্ত হয়ে ফিরতেন তখন, গাড়ু গামছায় সম্পূর্ণ রোমান্স উপভোগ করার মত মনের অবস্থাও থাকতো তাঁর। কিন্তু আজ তো অখণ্ড অবসর এসেছে। অফুরন্ত রাত্রি। মনে হয়, ললিতামণিকে আজ সত্যি করে মূল্য দেওয়া যেত। ঘরের এক কোণে ললিতামণির সাধের আয়নাখানা এখনো ঝোলানো আছে। ধুলো জমা, সোনার জল ধুয়ে যাওয়া সেই আয়নায় বিনিদ্ররাতে বিপত্তারণবাবু উঁকি দিতে ভরসা পান না, গা ছমছম করে, 'যদি তাহার মুখ বা দেখা যায়।' নাম ধরে ডাকতে ভয় ক'রে; সেদিনের যৌবন গায়ে নিয়ে ললিতামণি যদি ঘরে এসে ঢোকে!

সন্ধ্যার ট্রামে ভিড়ে ঠাসা চ্যাপটা হয়ে ফিরতে ফিরতে জগন্ময়বাবুর সহসা ইডেন-গার্ডেনের দুপুর গড়ানো বিকেলের কথা মনে পড়লো। নাগকেশর গাছের তলায় শুয়ে শুয়ে নির্জনতা অনুভব করতে সেই সুদূর কলকাতায়। গঙ্গার ছলছল শব্দে প্যাগোডার ছায়া ভাঙতে যেন। সে সব দিন কোথায় গেল আজ।

কেউ ছিলেন শিকারী, কেউ খেলোয়াড়, কেউ দানীবাবুর আমলের অভিনেতা, কেউ জলসাঘরের দেওয়ালে বাইজীর ছুঁড়েমারা ফাগ এখনো মুছতে দেন নি। কিন্তু সবাই তারপর দীর্ঘ তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে কিছু না কিছু করেছেন। দু দুটো মহাযুদ্ধ মন্বন্তর আর দেশভাগ, স্বাধীনতা। কিন্তু একটানা কেরানীগিরি, মাস্টারী আর মোকদ্দমা ঘে'টে ঘে'টে ক্লান্ত হয়ে তিরিশ চল্লিশ বছর পর আবার সেই গোলাপজল, গাড়ু গামছা আর অদৃশ্য প্যাগোডার ছায়ার কাছে মিউড়ে টিকেট কেটে যেন ঢিলেঢালা ফিরে এসেছেন সবাই। যদিও কলকাতা বদলে' গেছে একেবারে। মানুষের মুখের দিকে আর একদম তাকানো যায় না এখন।

অ্যাকাডেমী স্কেচিং ক্লাব স্টুডিও

চিত্রপ্রদর্শনী

অ্যাকাডেমী স্টুডিও স্কেচিং ক্লাব-এর প্রদর্শনী : একাডেমী অফ ফাইন আর্টস

অনেকদিন হল অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টসের এই স্কেচিং ক্লাবটির পত্তন হয়েছে। ছবি আঁকতে যারা ইচ্ছুক অথচ অন্যত্র কোথাও যারা সুযোগ পান না, বেশীর ভাগ তাঁদের কাছেই এই সংস্থা লোভনীয়। এখানে বহু লোকেই আঁকা অনুশীলন করে থাকেন, কিন্তু কতদিন তাঁদের ঐ ঝোঁক থাকে তা আমরা জানি না।

প্রতিবারই পাকা হাতের থেকে কাঁচা হাতের সংখ্যাই যে বেশী তা আমাদের চোখে পড়ে—অথচ এমনও নয় যে প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। এবার এখানে মাত্র ২১ জন শিক্ষার্থীর ৪৫টি কাজ ছিল।

নিদর্শনগুলি প্রায়ই নগ্ন রমণী দেহ; কচিৎ একটি পশু, স্টীল লাইফ বলতে গেলে নেই।

পেন্সিলের রেখা টানতে যখন আদৌ দক্ষ নয় তখন হঠাৎ রমণী দেহ অনুশীলনের সার্থকতা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি না; গাছে না উঠতেই এতটা আমরা ভাল বিবেচনা করি না। হয়ত শিক্ষার্থী নগ্ন রমণী দেহ মিনিটের পর মিনিট স্টাডি করতে খুব উৎসাহী তবু তাঁকে প্রথমেই অন্ততঃ সে সুযোগ দেওয়া ঠিক নয়।

রীজম্যানের অ্যানাটমিও যেমন আছে তার থেকে বেশী সত্য ছবির নিজস্ব অ্যানাটমি। রেখার টোনাল তারতম্য ও স্থান ভাগ। রঙ আলোর কথা নয় না-ই তুললাম।

কিন্তু প্রদর্শনীতে কোথাও একটা সাধারণ স্ট্রীট লাইফ দেখলাম না যেখানে রূপের সঙ্গে রূপের সুসংবদ্ধ অবস্থা খেলে উঠে, তথা সুচিন্তিতভাবে স্থানভাগ করা হয়েছে।

শুধুই আন্দাজ করা যায়, একটা ড্রইঙের কিছুক্ষণের মধ্যেই শিক্ষার্থীর হাত ব্যথা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাজও নির্জীব হয়ে পড়ছে।

সস্তার মডেলের যা অবস্থা হয় এখানেও তাই হয়েছে। সব সময়ই মডেলকে, রমণী দেহকে, ভেঙেচুরে নিয়ে অনুশীলন করার নিদর্শনই বেশী, ফলে অনুপাত-বোধ নেই, মাথার গোল, ছোট-হওয়া হাত, আলগা-বক্ষদেশের প্রতি উত্তর উরুদ্বয় সবই তালগোল পাকান। ডৌলত্ব-বোধ উরুদ্বয়েই কখনও বা নিতম্বেই রয়ে গেছে।

আমাদের অনুরোধ, শিক্ষার্থীরা যাতে ওল্ড মাস্টারের ড্রইং করতে পারে তার ব্যবস্থা এবং স্টিল লাইফকে প্রাধান্য যেন দেওয়া হয়। সস্তা মডেল না এনে সুঠাম মডেল আনানো হয়।

শিল্পায়ন আর্টইস্টস সোসাইটি-র প্রদর্শনী : অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস

এ পর্যন্ত যতগুলি শিল্পালয় গোষ্ঠী আয়োজিত প্রদর্শনী দেখেছি তাতে একথাই মনে হয়েছে, এঁরা একটি নিষ্ঠাবান গোষ্ঠী। বোধ হয় এইটি একমাত্র সংস্থা যাঁরা একাধারে আঁকা এবং তার মুদ্রণ এই দুই ব্যাপার নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকেন।

বিশেষত এঁদের বৃহৎ আকারে সিল্ক প্রিনটিঙ দেখলে অনেকেই বিস্মিত হবেন। রঙের আরোপ অত্যন্ত সংযত, কোথাও এতটুকু অসমতল নয়, খুঁত নেই।

এই প্রদর্শনীতে শুধু তাঁদের পরিকল্পিত, অঙ্কিত ক্যালেন্ডারের নিদর্শন ছিল। প্রায় প্রত্যেকটি ক্যালেন্ডার এক এক রকম পদ্ধতিতে আঁকা। অবশ্য পদ্ধতি বলতে যেমন আঙ্গিকের কথা বলা হল, তেমন বিবিধ মাধ্যমের ব্যাপারও এতে ধরা হল। মাধ্যম অর্থাৎ পেপার কাট, পেপার ফোল্ড।

পেপার কাটগুলিতে আগেই রঙ আরোপ করা, তারপর তাকে কল্পনা অনুযায়ী আকারে কাটা হয়েছে, এইভাবে একটি ক্যালেন্ডার সিরিজ ছিল। যাতে মুরগী ময়ূর জাতীয় পাখী দেখা যায়। এই সিরিজটি সমস্ত দিক দিয়ে একটি চমৎকার কাজ।

এ ছাড়া ফুলের ছবি দেওয়া, যেটি আর্ট পেপারের উপর করা, এবং মোজাইক আঙ্গিকেরটিও খুব মনোজ্ঞ। সিল্ক প্রিনটিঙে করা ক্যালেন্ডারগুলি বেশ ভাল হয়েছে।

রমেন্দ্র চক্রবর্তী-র চিত্রপ্রদর্শনী : গভর্মেণ্ট আর্ট কলেজ

ইদানীংকার আর্ট মহল অনেক একদার-প্রিয় নামগুলি ভুলে যেতে বসেছিল, ঠিক সেই সময় এমন একজনের প্রদর্শনী

ঘরের পথ (লিনোকাট) —রমেন্দ্র চক্রবর্তী

আমাদের বহু স্মৃতি জাগিয়ে তুললে। রমেনবাবুর থেকে তাঁর কাজের সঙ্গে পরিচয় আমাদের বহুকালের। আজও মনে পড়ে প্রবাসীতে তাঁর প্যারিসে-থাকার সময়ে করা ছবিগুলি দেখতাম।

সেইসব ছবির এতদিন বাদে আসলগুলি একথা হয়ত বললে অন্যায় হবে না যে, আধুনিক শিল্পধারা তাঁর মধ্যেই বিশেষ করে দেখা দিল, অথচ আদতে তিনি ছিলেন বঙ্গীয় ধারার অনুগামী। কিছু পরিবর্তন তিনি এনেছিলেন।

এমন কি এখানে যে দু একটি ঐ আঙ্গিকের ছবি আছে, ২নং শায়িত রমণীর মুখে, তাস খেলোয়াড়ের টুপিতে ৫নং ওকার ধোঁয়ার আলোর তারতম্য ঘটান দেখা যাবে। অবশ্য আলোর ব্যাপারটা এসেছে তাঁর উড-কাট করার নেশায়। আমাদের মনে হয়। ফলে আধুনিক ধারা তাঁর কাছে দুর্বোধ্য ঠেকেনি।

তাঁর এটমসফিয়ার বোধ যে কি পরিমাণে ছিল তা যেমন অয়েলের কাজে বুঝতে পারি তেমনই গ্রাফিকগুলি দেখলে বিশ্বাস করতে পারি। ১১নং ছবিটি তার একটি চমৎকার নিদর্শন।

প্রদর্শনীর ক্যাটলগে পুলিনবিহারী সেনের লেখা জীবনীতে জানতে পারলাম, রমেনবাবু আঁদ্রে কারপেল-এর কাছে উডকাট শেখেন।

আর্ট কলেজের কর্তৃপক্ষকে এরূপ একটি প্রদর্শনী করার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তা সম্বন্ধে আরো

বিজ্ঞানকে এক পাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য যে দূরে করা যাবে না সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ-নিশ্চিত ছিলেন। এখানে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর মতের বা কার্যপ্রণালীর ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। গান্ধী দারিদ্র্যকে ঘৃণা করলেও বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পিছনে ধাবমান হওয়াকে সমর্থন করতেন না। তিনি জোর দিয়েছেন গ্রামীণ শিল্পের উপর, কাজ করতে চেয়েছেন পল্লীর স্বয়ং-সম্পূর্ণতার জন্য, সাবধান করে দিয়েছেন বৃহৎ যন্ত্রপাতি ও বড়ো বহরের উৎপাদনের কুফল সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথের কাছে সমস্যাটি আর শুধু নৈতিক ছিল না। 'দেশের বারো আনা লোক চাষী. তারা আরও ভালো করে চাষ করবে এ কথা না বলে তারা জড়যন্ত্রের মতো চরখা চালাবে এ উপদেশ মানুষের অবমাননা। অবশ্য, এই চাষের উন্নতির কথা বলার মানেই এই উদ্দেশে দেশব্যাপী ব্যবস্থা করা।......এর জন্যে চাষীদের মধ্যে ফসল-উৎপাদনের সমবায় প্রণালী প্রবর্তন করতে হবে. প্রদেশে প্রদেশে উৎকৃষ্ট বীজের ভান্ডার স্থাপন করতে হবে, জমির প্রকৃতি-পরীক্ষার ও উপযুক্ত সার যোগাবার প্রতিষ্ঠান গড়তে হবে।'১

যন্ত্রীভবনে পঙ্গুতা

আধুনিক কলের নানা প্রকার মিত-শ্রমিক যন্ত্রের উপযোগিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু যন্ত্রীভবনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার একটা আশঙ্কা আছে সে বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। যন্ত্র সকল মানুষকেই ন্যূনাধিক সমান করে দেয়। তাতে স্বাধীন নৈপুণ্য খাটাবার বিশেষ স্থান নেই। যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি-সহকারে যন্ত্র যতই সম্পূর্ণ হবে তা চালনা করতে মানুষের বুদ্ধির আবশ্যক ততই কমে আসবে। এই প্রক্রিয়ায় 'সমাজে ধনী সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং নির্ধন একান্ত পরাধীন হইয়া পড়ে। এমন কি, সে যে-কাজ করে সে-কাজের মধ্যেও তাহার স্বাধীনতা নাই। পেটের দায়ে সে পৃথিবীর লোকসংখ্যার অন্তর্গত না হইয়া যন্ত্রসংখ্যার মধ্যে ভুক্ত হয়। পূর্বে যাহারা শিল্পী ছিল এখন তাহারা মজুর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে যাহারা ওস্তাদ কারিগরের অধীনে কাজ করিত এখন তাহারা বৃহৎ যন্ত্রের অধীনে কাজ করে।......ইহাতেই নির্ধনের আন্তরিক অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে।'২

আবার, যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রয়োগ অথবা মূলধন নিয়োগ করলেই বৈষয়িক অগ্রগতি অর্জন করা যায় না, তার জন্য চাই সংগঠন, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা। 'বর্তমান কালের প্রকৃতির সহিত আমাদের দেশের অবস্থার সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে আমাদিগকে বিলুপ্ত হইতে হইবে। বর্তমানের সেই প্রকৃতিটি—জোট বাঁধা, ব্যূহবদ্ধতা, অর্গানিজেশান।'৩ বহুকাল আগে রবীন্দ্রনাথ গ্রামগুলিকে সত্বর ব্যবস্থাবদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। আক্ষেপের কথা, ভারতের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাগুলি রচনা করার সময় দেশের আর্থিক সম্ভাবনা অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধির তাগিদের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, দেশের প্রশাসন-ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার দিকে তেমন দৃষ্টি রাখা হয়নি।

শিক্ষার সাম্য

কেবল বস্তুগত মূলধন নয়, আর্থিক উদ্যোগে মানবসম্পদের সম্যক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা আজকের দিনে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সমৃদ্ধ দেশসমূহের বৈষয়িক উন্নয়নে, দেখা গেছে, মানুষের কর্মকুশলতা মূলধনের চাইতে বৃহত্তর ভূমিকা নিয়েছে। মানবসম্পদের সম্যক বিকাশ বলতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উপর বেশী গুরুত্ব দান বোঝায়। দেশের অধিকাংশ মানুষ যেখানে আত্মবিকাশের অধিকার থেকে বঞ্চিত সেখানে বৈষয়িক সমৃদ্ধি—জাতীয় আয় বৃদ্ধি—অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথ এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। যে সব স্বাচ্ছন্দ্য-সুবিধা মুষ্টিমেয় লোক ভোগ করে সেগুলির প্রয়োজন বা ব্যবহার করার যোগ্যতা জনগণের আছে। পল্লীগ্রাম চিত্ত ও দেহের খাদ্য থেকে আজ বঞ্চিত হয়েছে। সেখানে এই উভয় খাদ্যের সরবরাহ করতে হবে। 'যে শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন তা শুধু শহরবাসীদের জন্য নয়, সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে।...... মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার। গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিক্ষার সাম্য।'৪ দুঃখের বিষয়, ভারতের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে বস্তুগত সম্পদ ও মূলধনের প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়েছে—শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের উপর উত্তরোত্তর কম গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে

সামাজিক সামঞ্জস্য

গ্রামে অন্ন উৎপাদন করে বহুলোকে, শহরে অর্থ উৎপাদন ও ভোগ করে অল্প-সংখ্যক মানুষ; অবস্থার এই কৃত্রিমতায় অন্ন এবং ধনের পথে মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রকান্ড বিচ্ছেদ ঘটেছে। ধন-উৎপাদক এবং অর্থসঞ্চয়িতার মধ্যে যে সাংঘাতিক বিচ্ছেদ বৃহৎ হয়ে উঠছে রবীন্দ্রনাথ তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন। 'মানুষ যেখানে ব্যক্তিগতভাবে বিচ্ছিন্ন, পরস্পরের সহযোগিতা যেখানে নিবিড় নয়, সেইখানেই বর্বরতা। বর্বর একা একা শিকার করে, সেই জীবিকার ভোগ অত্যন্ত ছোটো সীমার মধ্যে। বহুজনের চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষ-সহযোগে নিজের চিত্তের উৎকর্ষ, বহুজনের শক্তিকে সংযুক্ত করে নিজের শক্তি, বহুজনের সম্পদকে সম্মিলিত করার দ্বারা নিজের সম্পদ, সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হল সভ্য মানবের লক্ষ্য।......সভ্যতা-বিনাশের কারণ সন্ধান করলে একটি মাত্র কারণ পাওয়া যায়, সে হচ্ছে মানবসম্বন্ধের বিকৃতি বা ব্যাঘাত। যারা ক্ষমতাশালী ও যারা অক্ষম তাদের মধ্যেকার ব্যবধান প্রশস্ত হয়ে সেখানে সামাজিক সামঞ্জস্য নষ্ট হয়েছে। সেখানে প্রভুর দলে, দাসের দলে—ভোগীর দলে, অভুক্তের দলে—সমাজকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে সমাজদেহে প্রাণপ্রবাহের সঞ্চরণকে অবরুদ্ধ করেছে তাতে এক অঙ্গের অতিপুষ্টি এবং অন্য অঙ্গের অতি শীর্ণতায় রোগের সৃষ্টি হয়েছে।'৫

স্পষ্টত, উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এরকম প্রকল্প ছাড়াও, দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে সেই সব কার্যক্রমের প্রয়োজন আছে যাদের সুফল পেতে দেরি লাগে অথচ ন্যায়নীতির দিক থেকে সেগুলি

১। পত্র ১, ১৯২৯, পল্লীপ্রকৃতি, পৃষ্ঠা ১৪০

২। কর্মের উমেদার, ১২৯৮, সমাজ

৩। সভাপতির অভিভাষণ, ১৩১৪, পল্লীপ্রকৃতি

৪। পল্লীসেবা, ১৯৪০, পল্লীপ্রকৃতি

৫। পল্লীসেবা, ১৩৩৭, পল্লীপ্রকৃতি

একান্ত বাঞ্ছনীয়। ধনী ও দরিদ্রদের জীবন-যাত্রার মানের মধ্যে যে বৈষম্য আছে তার দূরীকরণ, দেশের অনুন্নত অঞ্চল ও অনুন্নত শ্রেণীর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা; অল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য গৃহনির্মাণ; জরাজীর্ণ শহরে বস্তি তুলে দেওয়া অথবা বস্তির উন্নতি সাধন; গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা, শহর-বাজারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য রাস্তা নির্মাণ ও বিদ্যালয় স্থাপন—এ সবই লোকহিতকর একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হবার দাবি রাখে।

কর্মব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করেন নি, কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘতাকেও স্বীকার করেছেন। দেশ নানা চেষ্টায় আপন শক্তিকে সার্থক করতে পারে কেবল বণিকে মতো পণ্য উৎপাদনে নয়, বিদ্যা-অর্জ বুদ্ধির আলোচনায়, লোকহিতে, শিল্প সাহিত্য সৃষ্টিতে, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে আর দেশের সেই ঐশ্বর্য কেবল বিশি সাধারণের জন্যে নয়, সর্বসাধারণের জন্যে

শান্তিকুমার ঘো

দিল্লির ডায়েরি

একটি অতিশয় বিতর্কমূলক ব্যক্তিত্ব। হয় তাঁকে লোকে ভালবাসে, না হয় তো অপছন্দ করে; মুষ্টিমেয় লোক এমন কি ঘৃণাও করে। কিন্তু তাঁকে স্বীকৃতি না-দিয়ে গত্যন্তর নেই, পছন্দ কি অপছন্দ।

ইনি হলেন ডক্টর রামমনোহর লোহিয়া। অধিকাংশ পরিচিতরা ডাকেন "ডক্টর সার" অথবা শুধু "ডাক্টার"। গোলাকৃতি মাথায় রুক্ষ কাঁচা-পাকা চুলের ঊর্ধ্বমুখী গোছা, দেশের কার্টুনিস্টরা যাকে দিয়েছে বিশ্ব-খ্যাতি; পুরু চশমায় আরো পুরু লেনস্; সাদা খদ্দরের জামাকাপড় আর চপ্পলে অতি সাধারণ। কিন্তু মুখ খোলা মাত্র বেরিয়ে আসে লোকটির অসাধারণত্ব। যেমনি রাজনীতিতে তেমনি বাইরে। তাঁর দুর্বার বিরোধ ও দ্বন্দ্বমূলক রাজনীতি, তাঁর দলের নেতাদের অপ্রিয় সত্যভাষণের রাজনৈতিক কৌশল, এবং বড় বড় নেতা ও নেত্রীদের দয়ামায়াহীনভাবে টেনেহিঁচড়ে নীচে নামিয়ে আনা—এ আজ অতি পরিচিত।

কতো গোলমাল, কতো হইচই আর কোলাহলের ভিতর দিয়ে আমরা দেখেছি শুনেছি লোকসভা আর রাজ্যসভার অধিবেশন। এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, ডক্টর লোহিয়া আর শিষ্যরা সংসদীয় বিরোধীতাকে এক নতুন স্তরে এনেছেন, তা কারোর ভাল লাগুক কি না-লাগুক। তার রাজনৈতিক ফল কী হচ্ছে, কী হবে, ভাল কি মন্দ—রাজনৈতিক জ্যোতিষীরা বিচার করবেন। আমি এই বিতর্কমূলক ব্যক্তিটিকে রাজনীতির বাইরে থেকে দেখতে চেষ্টা করছি, যদিও রাজনীতিকে বাদ দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে দেখা যায় না।

ডক্টর সাহেবের আক্রমণাত্মক রাজনীতির পেছনে যে একটা মানবিকতার প্রভাব আছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না, যদিও অনেক সময়ে তাঁর ভাষার জংগীবাদিত্বে ও কর্কশতায় সেই আবেদনের নম্রতা ও চারু-ময়তা ঢেকে যায়। ঠিক ওরই যেন একটা দিক যখন ডক্টর রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেন পাইনগাছের নিচে কাঠবেড়ালীকে আর পাখীদের, এখানকার সাত নম্বর গুরুদ্বার রেকাবগঞ্জ রোডে। অত্যন্ত রাজনৈতিক ব্যস্ততার ভিতরেও এসে খোঁজ করেন: "ওদের খাবার দেওয়া হয়েছে?"

জিজ্ঞেস করেছিলাম : কার প্রভাব আপনার উপর সব চাইতে বেশি?

বললেন : মহাত্মা গান্ধীর। তারপর তাঁরা যাদের বই গোগ্রাসে গিলেছি। হ্যাঁ, কার্ল-মার্কস তো বটেই। ডাস্ কাপিটাল পড়েছি মূল জার্মান ভাষায়। লিও টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, টুরগেনেফ্। ফ্রান্সের ভিক্টর হুগো আর আনাতোল ফ্রাঁস্। আর আমাদের গীতা ও উপনিষদ। পৃথিবীতে এমন দেশ আর দুটি নেই যেখানে গীতের মাধ্যমে, কাব্যের ভিতরে গাওয়া হয়েছে জীবনদর্শন।

"কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে আই-এ পড়ার সময়। রোজ যেতাম গঙ্গার ঘাটে। আর শুনতাম বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ, ঘাটে, মন্দিরে, চত্বরে। গীতা ও উপনিষদকে উড়াতে পারলাম না। এড়াতে চাইও নি।"

"কিন্তু কী পেলেন?"

"কী পেলাম? আনন্দ। ওটার ইংরাজী নেই (তখন কথা বলছিলেন ইংরাজীতে, আবার কখনও বাংলায় অথবা হিন্দীতে)। না "ব্লিস্" ঠিক আনন্দ নয়, কারণ 'ব্লিস্'কে খৃষ্টানরা ভগবানের সঙ্গে জড়িত রেখেছে। ভগবানে অবিশ্বাসীরাও আনন্দ পেতে পারে। আরও পেয়েছি। জীবনের আত্মীয়তার সন্ধান পেয়েছি, যার সন্ধানপথ আছে উপনিষদে : জল এক, কিন্তু তার প্রকার অনেক; বায়ু এক, কিন্তু তার প্রকার অনেক...।"

"হ্যাঁ, আরও অনেকের প্রভাব আছে। চার্লস্ ডিকেনস্; বার্নার্ড শ', রবীন্দ্রনাথ। জানো, রবীন্দ্রনাথের উপর আমার ভীষণ রাগ। (মনে মনে প্রমাদ গুনলাম!) উনি কেন ও'র বই দেবনাগরী হরফে বের করলেন না? যদি করতেন, তা হলে আজ বাংলার বাইরে কয়েক কোটি লোক বাংলা ভাষা জানতো।"

"কিন্তু রোমান হরফ?"

"না, নৃ, নো রোমান হরফ। ও চলে না।"

ডক্টর লোহিয়ার জন্মদিবস ২৩শে মার্চ, ১৯১০। স্থান উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার আকবরপুরে। প্রথম পড়াশোনা আকবরপুরে। আর ম্যাট্রিক পাশ করেন বোম্বাই থেকে। পিতা শ্রীহীরালাল মারা যান ১৯১৯ সনে। কাশীতে আই-এ, কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ইংরিজীতে অনার্স নিয়ে পাশ করেন। তারপর লণ্ডনে। কিন্তু এতো ব্রিটিশ-বিরোধী যে তাঁকে যেতে হল বার্লিনে। সেখানকার হুমবোলট বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট নিলেন অর্থশাস্ত্রে (১৯২৯-৩৩)। হিটলার তখন মাথা তুলেছেন।

"বাঙলা দেশে রাজা রামমোহনের কাল থেকে দেখে আসছি দুটো ধারা। একটি ধারা স্বাদেশিকতার, অন্যটি পৃথক হওয়ার (কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে স্বাধীন হওয়ার)। বাঙলায় যখন প্রথম ধারাটি শক্তিশালী হয়েছে, তখনই সে নেতৃত্ব দিয়েছে গোটা দেশকে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে সুভাষের পরে আর কোনো বড় নেতা জাগেনি বাঙলা দেশে। যাঁরা আছেন তাঁরা সব 'মিজেট', বেঁটেবামন।"

ডক্টর সাহেব একটা গভীর দুঃখের কথা বললেন। "আমার অত্যন্ত পরিতাপ আজ যে, সুভাষ থাকতে তাঁকে আমি নেহরুর চাইতে বড় করে দেখিনি। তিনি সত্যই বড় ছিলেন।"

কলকাতায় আরো একজনের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। উনি হলেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন বসু। "তাঁর মধ্যে আছে বিজ্ঞান আর মানবিকতা। একটা এমন কিছু, যার প্রভাব পারিপার্শ্বিককে পরিবর্তিত করতে পারে।"

নিজে পুরোপুরি নিরামিষাশী, যদি ডিমকে আমিষ না ধরা হয়, যেমন বার্নাড শ' ছিলেন। অত্যন্ত স্বল্পাহারী। ডাল তরকারি, দুটো রুটি, একটু ভাত। ফল। রাত্রে সুপ, ডাল রুটি। বিকেলে ছোলা মিশিয়ে মুড়ি খুব ভালবাসেন। আর বাসেন গান। সিদ্ধেশ্বরী দেবীর ক্লাসিকাল, আর অতুলপ্রসাদ। জোর করে কেউ নিয়ে গেলে থিয়েটার সিনেমায় যান, সেটাও সংগীতপ্রিয়তার জন্যে।

বলছিলেন এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মিস রমা মিত্র যিনি ওঁকে খুব ভাল জানেন। রাজনীতিতে একই দলের মানুষ, একদিকে ডক্টর সাহেবের বাড়ি দেখাশোনা করেন, অন্যদিকে একান্ত সচিবের কাজও—চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া, এনগেজমেণ্ট করা ইত্যাদি।

"জানেন, দু' চোখে উনি দেখতে পারেন না দুর্বলের উপর অত্যাচার অবিচার। কিছুতেই সইতে পারেন না মিথ্যা কথা, তা রাজনীতিতেই হোক, কি ব্যক্তিগত ব্যাপারেই হোক। এগুলো ওঁকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়।"

যাঁরা ডক্টর সাহেবের শুধু বক্তৃতা শুনে ও পড়ে আসছেন, তাঁদের পক্ষে বিশ্বাস করা মুশকিল যে উনি অত্যন্ত আমুদে ও আড্ডাপ্রিয়। কোনো কথাতেই হো হো করে হেসে ওঠেন, প্রায় পিলচমকিয়ে। সুতরাং, চা ও কফি এই রাজনৈতিক নেতার প্রিয় হবে সন্দেহ নেই।

ঘুম থেকে এখনো দেরিতে ওঠার অভ্যেস বেশি রাত অবধি পড়ো বলে। সেই ছাত্রবেলকার অভ্যেস। এর দরুন একবার (সম্ভবত ১৯৩০) গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার কথা থাকলেও পারেন নি। সুদূরে প্যারিসে। ভোর সাড়ে চারটেয় গিয়ে দেখা করার কথা ছিল রেল স্টেশনে। কয়েক বছর পর, ডক্টর সাহেব বললেন, "আমি গান্ধীজীকে এই কথাটা বলি। উনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তা এ-ব্যাপারটা তোমারই মনে রাখার কথা, আমার নয়।'"

বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার কালে নানা ছাত্র আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। গর্বের সঙ্গে এখনো বলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে "আমাদের বিদ্যাসাগর কলেজ ছিল সকলের পুরোধায়", ডক্টর সাহেব উত্তেজিতভাবে বলতে থাকেন নানা ঘটনায় সাক্ষ্য দিতে দিতে। অত্যন্ত অন্যায় যে, কলকাতায় অন্যান্য কলেজের নাম নিতেই যেন সকলে ব্যস্ত, প্রেসিডেন্সি, স্কটিশচার্চ, সেণ্ট-জেভিয়ার। বিদ্যাসাগর কলেজের তুলনা হয় না। আমরাই ছিলাম 'সেপারস অ্যাণ্ড মাইনারস', উনি বললেন, এবং আবেদন করলেন "ইতিহাসকে যেন বিকৃত না করা হয়।"

খগেন দে সরকার

কলকাতার ডায়েরি

পৃথিবীর সবচেয়ে অকুতোভয় কে?—কলকাতার রাস্তায় যে সাইকেল চালায়।
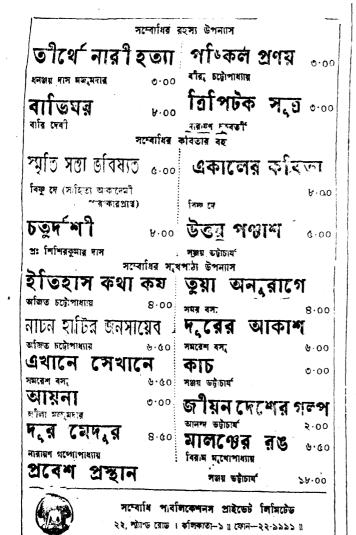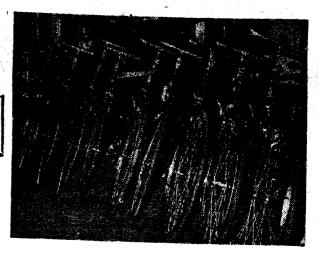
কথাটা আমার নয়, জনৈক বিদেশীর। লরির গায়ে হাত রেখে ময়দানের ভিতর দিয়ে লরির স্পীডেই ছুটে যাওয়া কিংবা ধর্মতলা-চিৎপুরে ট্রাম-বাস-রিকশা-গরুর ফাঁকফুকুর দিয়ে চলন্ত সাইকেলটিকে বের করে আনা কী দুঃসাহসের ব্যাপার না দেখলে আন্দাজ করা যায় না।

বিদেশী পর্যটক তাই দেখে থ হয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন, তার চেয়ে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়া আর এভারেস্টের চূড়ায় ওঠা অনেক সহজ ব্যাপার।

সত্যিই তাই, কলকাতার রাস্তায় কাউকে সাইকেল চালাতে দেখলে আমার হৃদ্‌কম্প হয়। আবার মনে মনে ভাবি, দিল্লির মত যদি এই শহরেও সাইকেল চালানোর আলাদা ব্যবস্থা থাকত, তা হলে এতটা দুঃসাহস দেখানোর প্রয়োজন হত না এবং ট্রাম-বাসের ভিড় থেকে আমরা অনেকেও বাঁচতাম। বেশ কিছু লোক যদি সাইকেলে করে অফিসে কারখানায় পাড়ি দিতে পারে, তা হলে বাস বাড়ানো কিংবা রুট ছড়ানো নিয়ে সরকারকে এত মাথা ঘামাতেও হত না।

রাস্তার যা অবস্থা, তাতে বাড়তি গাড়ির ভার সহ্য করা আর সম্ভব নয়। এবং শহরে লোকের ভিড় দিন দিন এমন বাড়ছে যে, শুধু ট্রাম আর বাস দিয়ে পাল্লা দেওয়াও অসম্ভব। মাঝে মাঝে টিউব, সারকুলার রেল আর মনোরেলের কথা শুনি বটে, কিন্তু তা যখন আর হবেই না, অগত্যা সাইকেল চলার ব্যাপক ব্যবস্থা করে দিলেই সমস্যাটা খানিক সহজ হয়।

নেহরু বলেছিলেন, আমরা বাইসিকেলের যুগে এসেছি। তাই সই, টিউব আর সারকুলার রেল শিকেয় তুলে ওই সাইকেল নিয়েই এগোতে থাকি।

কিন্তু আমরা যারা অকুতোভয় নই, অথচ যারা সাইকেল ভরসা করে ট্রাম-বাসের ভিড় থেকে বাঁচতে চাই, তাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা কই? নগর-পিতা আর সরকারের কাছে নিবেদন, অন্য কিছু হোক আর না হোক, চৌরঙ্গী বা ডালহৌসি পৌঁছার বড় বড় রাস্তায় সাইকেল চলার আলাদা একটা ট্র্যাক করে দেওয়া হোক।

*

সিনেমাপাড়ার লোক দেখলে সিনেমা নিয়ে আলাপ হবে তাতে আর আশ্চর্যের

কী? কিন্তু তার ব্যতিক্রম বসন্ত চৌধুরী আর হরিদাস ভট্টাচার্য। দুজনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে গুণী, খ্যাতিমান, অথচ বসন্ত চৌধুরীর আগ্রহ সিনেমার চেয়ে বেশী পুরাতত্ত্ব সংগ্রহে। তাঁর সংগে দেখা হলেই অনিবার্য কথা উঠবে চতুর্দশ শতকের কাশ্মীরী শাল কিংবা শেরশাহের আমলের মুদ্রা কিংবা কম্বোডিয়ার গণেশ মূর্তি নিয়ে।

মার্জিতরুচি সুদর্শন এই চিত্রাভিনেতার বাড়িতে যদি কোনদিন যান, দেখবেন নানান রকম পুরাতত্ত্ব সংগ্রহে বৈঠকখানা ঘর আস্ত একটা জাদুঘর হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন আকারের গণেশ মূর্তির এক অসাধারণ সংগ্রহ রয়েছে শ্রী চৌধুরীর বাড়িতে।

ইদানীং তাঁর আগ্রহ বেড়েছে প্রাচীন মুদ্রাতত্ত্বে। অবসর পেলেই চলে যান প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক জনৈক মুদ্রাবিশেষজ্ঞের বাড়িতে। সংগ্রহের কাজও চলছে।

শ্রী চৌধুরীর ব্যতিক্রম যেমন পুরাতত্ত্ব সংগ্রহে, চিত্রপরিচালক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্যের তেমনি আগ্রহ রাজনীতি, সমাজনীতি আর অর্থনীতিতে। তিন নীতিতেই তাঁর কাজের পরিধি বিরাট এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাই নিয়ে আলোচনায় তিনি মেতে থাকতে পারেন।

একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, সিনেমা লাইন ছেড়ে রাজনীতিতে আপনি নামলেন না কেন? হেসে জবাব দিলেন, রাজনীতি করি না বলেই বোধ হয় তাই নিয়ে এত ভাবি।

*

রবীন্দ্র-সাহিত্যবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের সংগে কিছুদিন আগে দেখা কলকাতায়। না, তাঁর সংগে রবীন্দ্রসাহিত্য, ছন্দ কিংবা বাংলা বানান নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি, হয়েছে বর্তমান ভারতের অবস্থা আর নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয় নিয়ে।

আর দশটা কারণ বলতে বলতে বিপর্যয়ের একটি ব্যাখ্যা তাঁর কাছে শুনে মনে ধরল। তিনি বললেন, বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ কংগ্রেসের একটানা শাসন। একই দল যদি অন্য নাম নিয়ে শাসন চালাত এমন অঘটন হয়ত ঘটত না। গান্ধীজী ছিলেন এই ব্যাপারে বাস্তববাদী। ইংরেজ তাড়াতে দীর্ঘকাল তিনি একই আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন নানান সময়ে। কিন্তু প্রত্যেকবারই নাম দিয়েছেন পালটে। নতুনত্বের স্বাদ পেয়ে প্রত্যেকবারই লোক ভিড় করেছে তাঁর পেছনে। প্রথম আন্দোলন অসহযোগ, দ্বিতীয়বারে নাম পালটে আইন-অমান্য এবং তৃতীয়বার একই জিনিস হয়ে গেল 'ভারত ছাড় আন্দোলন'। মূলগত তফাত কোনটিতেই নেই, তফাত শুধু নামে। এবং দূরদর্শী বাস্তববাদী বলেই স্বাধীনতা লাভের পর গান্ধীজী প্রস্তাব দিয়েছিলেন কংগ্রেস দল ভেঙে দিতে। অন্য নামে সেই একই লোক থাকলেও সাধারণ লোক নতুনত্বের স্বাদ পেত।

অধ্যাপক সেনের কথা যে অসত্য নয়, তার প্রমাণ বাংলা কংগ্রেস, জন কংগ্রেস, জনক্রান্তি দল। নতুনত্বের স্বাদ জনসাধারণ তাতেই অনেকটা পাচ্ছেও।

*

দু হপ্তা আগে 'টেলিথেরাপি' নিয়ে লিখেছিলাম। অসংখ্য চিঠি আসছে ঠিকানা জানাতে। তাঁদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন, খোঁজ নেবার একমাত্র জায়গা—"ডাঃ এ ভট্টাচার্য, শাস্ত্রীভিলা, নৈহাটি।"

চাণক্য

মার্ক শাগাল : ভূমিকা

আমাদের স্বপ্নে সে-সবই তো ঘটে যা আমাদের ইচ্ছে ঘটুক। এরোপ্লেন বাড়ির উঠোনে পড়ে যায়, লোকেরা বেরিয়ে আসে তা থেকে: কিংবা রেলগাড়িটা ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ উড়তে আরম্ভ করেছে: যে মানুষ হারিয়ে গেছে, হঠাৎ দরজা খুলে দেখি সে দাঁড়িয়ে; যে দেশে যাবার ইচ্ছে সে দেশেই আজ যাবার দিন, স্যুটকেস গুছোচ্ছে বাড়ির লোক—এইরকম ইচ্ছের খেলাতো স্বপ্নেই হয়। অন্য ধরনের অনেক স্বপ্নও আছে কিন্তু অলৌকিক বা অসম্ভবের স্বপ্নই দেখতেই তো আমাদের সবচেয়ে মজা লাগে, মনে হয় এরকম যদি হ'ত!—যেহেতু মার্ক শাগালের ছবি আমাদের স্বপ্নের লজিক মেনে চলে, বাস্তবের আইন ভেঙে, সেহেতু তার ছবি যে আমাদের অবিলম্বে আকর্ষণ করবে তাতো জানা কথাই—এবং সেই কারণেই নিতান্ত শিশু বয়স থেকেই শাগালকে আমি ভালোবেসেছিলুম। সব চিত্রকরকে গ্রহণ করারই একটা সময় আছে, এই যেমন আজ মেঘলা দিন, ঠান্ডা-ঠান্ডা, মনটা আধমরা হয়ে আছে, কেমন যেন অনীহা হ'ল আমার অত্যন্ত প্রিয় কিউবিস্ট চিত্রকরদের ছবির প্রতি, ব্রাক্ বিষয়ে লিখব ভেবেছিলুম, কিন্তু তার ছবি দেখতে ভালো লাগল না, অর্থাৎ আজ কিউবিস্টদের মন নেবে না—কিন্তু শাগালের বিষয়ে বোধ হয় একমাত্র বলা যায় এই সেই শিল্পী যিনি সর্বদাই সমান আকর্ষণীয়, যার কোনো সময় নেই; কিংবা সব সময়ই যিনি গ্রহণযোগ্য, উপভোগ্য।

কিন্তু নিছক ইচ্ছাপূরক স্বপ্নতো রঙিন ধোঁয়ার মতো মুহূর্তের আনন্দ মাত্র, পরের পলকেই হারিয়ে যায়; ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে আমি দেখলুম আমি উড়ছি আকাশের মেঘেদের মধ্য দিয়ে, যতক্ষণ এই স্বপ্ন দেখছিলুম ততক্ষণ তো আমি উড্ডীন কিন্তু যখন জেগে উঠে স্বপ্নটার কথা ভাবলুম তখন সামান্য মজা লাগল মাত্র, বিকেলেই কী দেখেছিলুম ভুলে গেলুম। শাগালের ছবিও কি তাই? যতক্ষণ দেখি ততক্ষণ স্বপ্নে, বইটা হারিয়ে গেলেই নিছক পীরপূরক স্বপ্নের মতো তা হারিয়ে যায় মন থেকে?—উত্তর ভীষণভাবে 'না', কারণ শাগালের ছবি একবার দেখলে ভোলা যায় না। কিন্তু প্রশ্ন—যদি তার ছবি স্বাভাবিক ইচ্ছাপূরণের স্বপ্নই হবে তা হলে তা কেন এমন গেঁথে থাকে? এই প্রশ্নেরই উত্তর দেবার চেষ্টা করব আজকের আলোচনায়, হয়তো এই উত্তর পাঠকের মনে দাঁড়াবে না, কিন্তু শাগাল বিষয়ে তথ্যমূলক আলোচনা একদম করতে ইচ্ছে করছে না, কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়ে যেতে চাচ্ছি তাঁর ছবির সঙ্গে। আর কার সঙ্গেই বা আমরা ঘনিষ্ঠ হব শিশু বয়স থেকে যাকে ভালোবাসি—তাঁর সঙ্গে ছাড়া?

স্বপ্ন মোটা ভাষায় বলা যায় দুই শ্রেণীতে ভাগ করা সম্ভব : প্রথম স্বপ্ন হ'ল তাই যা প্রকৃতিগত, সব মানুষের বিষয়েই প্রযোজ্য, চাপা ইচ্ছেগুলো প্রকাশ করে ঘুমের মধ্যে, ছিন্ন করে লজিক বা বাস্তবের আইন; দ্বিতীয় স্বপ্নে আমাদের নিজেদের অনেক অজানা দিক প্রকাশিত হয়, স্বপ্নের স্মৃতি বা স্বপ্নে কোনো ঘটনার অনুভূতি থেকে আমরা নিজেদের বুঝতে পারি, আত্ম-উপলব্ধি হয়, কোলরিজের ভাষায় হয়ে উঠি "বিষণ্ণতর এবং প্রাজ্ঞতর" মানুষ। এই দ্বিতীয় স্বপ্নের স্মৃতি আমরা ভুলিনা, এবং তার অভিজ্ঞতা আমাদের শিল্প অভিজ্ঞতার তুল্য। শাগালের ছবি এই দ্বিতীয় স্বপ্ন। এবং যেহেতু, সব স্বপ্নের ভিতরেই অবাস্তবের দিকটা আছে, যার ফলে সব স্বপ্নই কিছুটা বাস্তব মানুষের

প্রার্থনারত ইহুদী

কাছে কৌতুকাবহ, সেহেতু কৌতুকের এবং ইচ্ছাপূরণের দিকটাও তাঁর ছবিতে সুস্পষ্ট এবং অধিক প্রকট—এবং গভীর বিষন্নতার উপর সুখের বা মজার প্রলেপ।

একটা বিরাট ফাঁকা জায়গা, ঝোপঝাড় ধুলো প'রে ফ্যাকাশে সবুজ, হু হু ক'রে শুকনো বিকেলের বিষণ্ণ আলো-অন্ধকারে হাওয়া বইছে, দেয়াল নেই অথচ একটা গেট, যদিও ঝাপসা তথাপি কয়েকটা আলো হাওয়ায় উড়ছে যেন, সুসজ্জিত কয়েকটি মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই ভিড়ের মধ্যমণি সাদা অদ্ভুত ধরনের একটা পোশাক পরে—অনেকটা বিলিতী বিয়ের পোশাকের মত—দাঁড়িয়ে, তাকে ঘিরে মেয়েদের জটলা, বিষন্নতা মেশানো একটা মৃদু হাসাহাসি করছে সবাই, হাসাচ্ছি তাদের আমি, আমারও অদ্ভুত পোশাক পরা, বিয়ে বিষয়ে রসিকতা করছি, কিন্তু বড্ড শুকনো হাওয়া, বড্ড বিশাল জমি, ক্লাউনের মতো ক্রমশ আমার মজার কথা ফুরিয়ে আসছে, মধ্যমণি মেয়েটি এমন একজন যে আমার খুব চেনা, কিন্তু অন্য এক পোশাক পরে অনেক দূরে চলে গেছে, তার বিয়েটায় আমরা তার বন্ধুরা খুব আনন্দিত, আমরা সবাই অপেক্ষা করছি একটা আলোর মিছিল আসবে, ঘোড়ায় চড়ে বর আসবে, বিয়ে ক'রে এই মাঠ শূন্য করে তারা চলে যাবে—এই বিয়েটা এতই আনন্দের আমরা লাফাচ্ছি সব, কিন্তু ধূসর সন্ধে, অন্ধকার হয়ে আসছে, হুহু বাতাস। হঠাৎ এই মেয়েরা চলে গেল হাঁটতে হাঁটতে, মধ্যমণি মেয়েটি ছোট, পায়রার মত উত্তেজনা বুকে নিয়ে চলে যাচ্ছে, আমার খুব চেনা। আমি অদ্ভুত পোশাক পরে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলুম একা, হঠাৎ আমার বুকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হ'ল, এরকম কেন হ'ল আমি বুঝতে পারছিনা, অসম্ভব যন্ত্রণায় আমি—দেখলুম একটা অ্যাম্বুলেন্স গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে তাতে আমি, জানলা দিয়ে লম্বা রাস্তা, একটা আলোর মিছিল আসছে, উড়তে উড়তে আসছে একটা ঘোড়া, তার ভেতরে সুসজ্জিত বর, চলে যাচ্ছে অন্ধকার সেই মাঠের দিকে বিয়ের আসরে। প্লেনে উড়তে উড়তে বহু নিচে দেখা যাচ্ছে অন্ধকার মাঠ, লোহা সড়কি নিয়ে, মশাল নিয়ে ডাকাতেরা সেই পরিচিত মেয়েটিকে তাদের গাড়িতে তুলে নিল, কিন্তু পাইলট আরো উপরে তুলে নিচ্ছে, নামা অসম্ভব...

—বর্ণিত স্বপ্নটির ছবি পুরোটা একসঙ্গে ক্যানভাসে যদি এঁটে দেওয়া যেত আপাত-দৃষ্টিতে কী মজারইনা পাগলামির একটা ছবি হত তা। একটা ধূসর জমি, দূরে একটা গেট দেখা যাচ্ছে, দেয়াল নেই, কতগুলো অদ্ভুত মেয়ে পুরুষ মাঠের মাঝে আরো অদ্ভুত পোশাক পরে দাঁড়িয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে, কেউ বা উড়ছে, শূন্যে পা তোলা, মাঝে বিলিতী পোশাক বিয়ের, একটা লোক বর্ফি পোশাকে ক্লাউনের মতো রসিকতায় মত্ত, আবার সেই একটু পাশে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, একটা অ্যাম্বুলেন্স, দূরে থেকে মিছিল, এরোপ্লেনের জানলা দিয়ে আবার সেই ক্লাউনই কোণায় আরেকটা দৃশ্য দেখছে—কতগুলো ডাকাত মেয়েটাকে হরণ করছে—এইরকম সব আজগুবি ব্যাপার ক্যানভাসে, মাথা নেই মুণ্ডু নেই, কিন্তু দেখতে মজা লাগে। শাগালের ছবি এই স্বপ্নের দৃশ্যের মতোই আপাত দৃষ্টিতে আজগুবি, "ফ্যান্টাসি"—আবার এই স্বপ্নের মতোই গভীর অর্থবহ। স্বপ্নটির বিশ্লেষণ দরকার নেই, বোঝাই তো যাচ্ছে তা একজন মানুষের ভালোবাসার হঠাৎ উপলব্ধি, হঠাৎ কাউকে হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণা, কেউ দূরে চলে যাওয়ার অপার নিঃসঙ্গতা। এই স্বপ্নটি যে দেখেছিল সে জেগে উঠে তা বারবার ভাববে, উপলব্ধি করবে তার গোপন বাসনা, ত্যাগের বা দুঃখের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ মানুষ হবে, যে মানুষকে ঘিরে এই স্বপ্ন, তার সঙ্গে সম্পর্কের নতুন দিগন্ত হবে প্রস্ফুটিত। অন্য অনেক স্বপ্ন ভুলে গেলেও আপাত-অবাস্তব কিন্তু গভীরে বাস্তবতর এই স্বপ্ন কখনো সে ভুলবেনা। মার্ক শাগালের ছবি আসলে এই গভীর-বাস্তব স্বপ্ন, যে সব স্বপ্ন আমাদের জীবনের, সত্তার সঙ্গে জড়িত তারই চিত্ররূপ।

শাগাল বিষয়ে সামান্য ভূমিকা দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলুম, কারণ, তিনি এমন একজন যাকে কোনো থিওরি বা কোনো চিত্রাদর্শের মাপকাঠিতে নির্দিষ্ট করা যায় না, একা স্বতন্ত্র এক মেজাজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যে-কোন দলের ঊর্ধ্বে তার শিল্পী-সত্তা। ইচ্ছে রইল সামনের সপ্তাহে তাঁর জীবন ও শিল্প নিয়ে তথ্যমূলক আলোচনায় হয়তো পাঠক সামনের সপ্তাহে একটি শাগাল দেখে নেবেন, এ সপ্তাহে তাঁর প্রথম পর্যায়ে আঁকা ছবি "প্রার্থনারত ইহুদী" চিত্রটি প্রকাশ করলুম। চিত্রটিতে লক্ষণীয়, শিল্পী এখনো সম্পূর্ণ বাস্তবতার নিয়ম ভেঙে দেননি কিন্তু সাদা-কালোর বিন্যাসে এমন এক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন যা প্রায় স্বপ্নের। তাছাড়া চিত্রটিতে কিছুটা কিউবিজমের ধাঁচও রয়েছে, কারণ প্রথম প্যারিস ভ্রমণের পরে আঁকা হয়েছে এই চিত্র এবং তখন প্যারিসে রাজত্ব করছেন বর্ফি-শিল্পীরা। এই চিত্র বিষয়ে শাগালের স্মৃতিচারণ তাঁর আত্মজীবনী থেকে তুলে দেওয়া যেতে পারে : "একটা বুড়ো ভিখিরি আমাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যায় রোজ। ধূসর চুল, বিধুর মুখের ভাব। পিঠে তার ঝুলি।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করলুম : আচ্ছা, এই লোকটির পক্ষে কি মুখ খোলা সম্ভব, ভিক্ষার জন্য?

সত্যিই সে কিছু বলেনা। দরজার পাশে দাঁড়ায় শুধু। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সেই ভাবে। যদি কেউ তাকে কিছু না দেয় সে মুখ ফুটে চায় না, শান্ত ভাবে চলে যায়।

একদিন আমি তাকে বললুম, শোনো, একটু বিশ্রাম করো দাওয়ায়। তোমার বিশ্রাম দরকার, ক্লান্ত তুমি। ভেবোনা আমি তোমাকে যাবার সময় পয়সা দেব।

—আমার বৃদ্ধ উপাসকের যে ছবি আছে, সেই ছবি এই বৃদ্ধকে দেখেই আঁকা।

শুদ্ধশীল বসু

কয়েকটি পুরস্কার

আনন্দবাজার ও অমৃতবাজার পত্রিকা-গোষ্ঠী প্রতি বছর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের জন্য চারটি পুরস্কার দেন। আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও দেশ-এর পক্ষ থেকে দুটি পুরস্কারের মধ্যে প্রফুল্লকুমার-স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। সুরেশচন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীবিমল কর। সূক্ষ্ম ছোট গল্প এবং বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল উপন্যাস-কার হিসেবে শ্রী বিমল কর বাংলা সাহিত্যের শীর্ষসারিতে অধিষ্ঠিত।

অমৃতবাজার ও যুগান্তর পত্রিকার পক্ষ থেকে শিশিরকুমার পুরস্কার দেওয়া হয়েছে খ্যাতনামা অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়কে। মতিলাল পুরস্কার পেয়েছেন দীপক চৌধুরী। পুরস্কারগুলির প্রতিটির অর্থমূল্য এক হাজার টাকা।

মৌচাক পত্রিকার পক্ষ থেকে এ বছরের শিশু সাহিত্যের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছে অন্নদাশংকর রায়কে। নাটক ও কবিতার জন্য উল্টোরথ পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে মন্মথ রায় ও রাম বসু। এই পুরস্কারগুলির অর্থমূল্য প্রতিটি পাঁচ শো টাকা। নাটকের জন্য পুরস্কার এ বছরই প্রথম।

প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথের দেশে কবিতাকে শিশুসাহিত্যের সমশ্রেণীভুক্ত করা কি একটু কেমন কেমন নয়? অথবা শিশু-সাহিত্য ও সচরাচর শিশু নন যাঁদের জন্য হাফ টিকিটের মতন হাফ প্রাইজ। যে উল্টোরথ পত্রিকার সঙ্গে কবিতার কোনো সংশ্রব নেই বলা যায়—ওঁদের পক্ষ থেকে কবিতার জন্য পুরস্কার ঘোষণা নিশ্চিত প্রশংসার্হ, কিন্তু সব কটি শাখার পুরস্কারের সম্মান ও অর্থমূল্য সমান হওয়াই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়।

সাহিত্যের জরীপ

পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন তরুণ লেখক 'আলোড়ন' নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলে একটি নতুন ধরনের জরীপ কার্য শুরু করেছেন ১লা বৈশাখ থেকে। পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের এখন ঠিক কী অবস্থা—তা নির্ধারণ করাই এঁদের উদ্দেশ্য। এঁদের প্রশ্ন জাতীয় সভ্যতার মেরুদণ্ড সাহিত্য। স্বাধীনতা লাভের বিশটি বছর পার হতে শুরু করেছে; কিন্তু আমাদের সাহিত্য আর কতকাল হামাগুড়ি দিয়ে চলবে। বিভাগ-পূর্ব কালের প্রবীণ লেখক-লেখিকাগণ কি বিভাগোত্তর কালে নতুন কোনো প্রেরণা আমাদের দিয়েছেন? বিভাগোত্তর কালের লেখক-লেখিকাগণ কি মৌলিক কিছু রচনার প্রয়াস পেয়েছেন? আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের রুচিই বা কোন দিকে?"

এই সব প্রশ্ন নিয়ে এঁরা দেখা করবেন প্রায় ১০০০ জন ব্যক্তির সঙ্গে। এই হাজার জনের মধ্যে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা ছাড়াও আছেন দেশের সর্বস্তরের শীর্ষ-স্থানীয় নারী-পুরুষ। যেমন, দশজন বিশিষ্ট নাগরিক—যাঁদের মধ্যে আছেন দেশের প্রধান বিচারপতি, শিক্ষা অধিকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রভৃতি। দশজন পত্রিকা সম্পাদক—যাঁদের মধ্যে আছেন জনাব আক্রাম খাঁ (আজাদ), আবুল কালাম সামসুদ্দীন (দৈনিক পাকিস্তান), মুজিবর রহমান খাঁ (পয়গাম), জনাবা নুরজাহান বেগম (বেগম) প্রভৃতি। দশজন প্রবীণ সাহিত্যিক—যাঁদের মধ্যে আছেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি জসীমউদ্দীন প্রভৃতি, দশজন তরুণ সাহিত্যিক, তিনজন চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং পাঁচজন পুস্তক প্রকাশক।

এই জরীপের ফলাফল এঁরা পুস্তিকাকারে প্রকাশ করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ-যোগ্য, এই কাজ কোনো সরকারী উদ্যোগে নয়, কয়েকজন তরুণ লেখকেরই উদ্যম-প্রসূত, যাঁদের নেতৃত্ব নিয়েছেন শফিকুর কবির।

কবিকণ্ঠ

কয়েক সংখ্যা আগে সনন্দ'র জার্নালে সনন্দ গান ও বাজনার মতন কবিতা পাঠেরও রেকর্ড প্রচারের প্রস্তাব করেছিলেন। খবর পাওয়া গেল, সেই রকম একটি লং প্লেয়িং রেকর্ড গ্রামোফোন কোম্পানি অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক শীঘ্র প্রচারিত হবে। এতে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, সমর সেন, বুদ্ধদেব বসু, এবং অমিয় চক্রবর্তীর কবিতা ও কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। এ ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা আবৃত্তি করবেন খ্যাতনামা অভিনেতা ও আবৃত্তি-কারেরা। এটি সংগঠন ও উপস্থাপনা করেছেন 'বাংলা কবিতা'র পক্ষে শান্তি লাহিড়ী।

কবিতা পরিচয়

কবিতা পরিচয় একটি বিশিষ্ট ধরনের পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তী কবিদের দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষা ব্যবহার, ছন্দ ও চিন্তা বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ সাহিত্যিক ও তাত্ত্বিক আলোচনাই শুধু এতে প্রকাশ পায়। এ ধরনের একটি গুরুত্বময় নিষ্ঠাপূর্ণ পত্রিকা কবিতা নিয়ে হইচই পত্রিকাগুলির বিপরীতে থাকার খুব প্রয়োজন ছিল। পত্রিকাটির ছাপা নির্ভুল ও সুসমঞ্জস—তাও কম কথা নয়। কিন্তু সম্প্রতি পত্রিকাটি অনিয়মিত হয়ে পড়েছে ও নতুন সংখ্যাটির আয়তন যথেষ্ট কৃশ। সম্পাদক অমরেন্দ্র চক্রবর্তী জানালেন যে প্রতি সংখ্যার সৌষ্ঠব ও মান ঠিক রাখার জন্য যে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে তার ফলে পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা এসে পড়েছে। এই রকম পত্রিকার এই পরিণতিই হয়তো স্বাভাবিক—তবু কিছুটা খেদময়।

সনাতন পাঠক

অরণ্যদেব ✫ লী ফক

আঘাত লাগেনি; পরিশ্রমে মূর্চ্ছা গেছে......
ওর কোমরে ওটা কী ?
কাগজ!
মামুলী কাগজ নয়। পঞ্চাশ ডলারের নোট। এটা ও কোথায় পেল ?
50

আঃ- আঃ-
জ্ঞান ফিরে আসছে। টম টম, কী হয়েছে? রাজা কোথায় ?
গুপ্তধন পাইনি! বাক্সের মধ্যে শুধু এই রকমের কাগজ ঠাসা ছিল! ডাকাতেরা রাজাকে ধরে রেখেছে। আমি পালিয়ে এসেছি।
নিশ্চয়ই ওরা সেই 'ব্যাঙ্ক'-ডাকাত!
জায়গাটা অনেক দূরে। বলে বোঝাতে পারব না। তবে সঙ্গে গেলে দেখিয়ে দিতে পারব।
সঙ্গেই নেব তোমাকে। তুমি পথ দেখিয়ে দেবে। রাজা বিপদে পড়েছে। তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার।

রাজা অবশ্য বিপদে পড়বার ছেলে নয়। তার দাপটে ডাকাতরাই বিপদে পড়েছে।
নোড়ো না। নড়লেই গুলি চালাব!
চুপচাপ বসে থাকাই ভাল। দেখা যাক, ছেলেটা কী করে।
কীরে কাটিনা, অমন করছিস কেন?
11/13
চিঁহিহিহিহিঁহি
ঘোড়ার ডাক। বাকী দুজন ডাকাত নিশ্চয়ই ফিরে আসছে!

ইস, ঘোড়াগুলো আবার বন্য জন্তুর গন্ধ পেয়েছে। নেমে পড়াই ভাল, কী বলো জো?
না, ঘোড়া থেকে নামা নিরাপদ হবে না। প্রায় এসে পড়েছি। বন্দুক তৈরী রাখো।

!!
ওই তো ওরা। মাটি খুঁড়ে ডলারের বাক্স তুলে এনেছে।
নিশ্চয়ই আমাদের ফাঁকি দেবার মতলব!

কোট নিতে ফিরে এসেছিলি না? বদমাস! উঃ, ঘোড়াটা আবার খেপে গেল কেন?
বসে আছিস কেন? উঠে দাঁড়া তোরা।

বড় গল্প
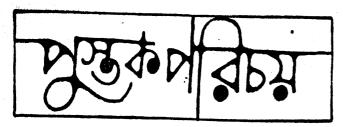
স্বর্গকেনা। আশাপূর্ণা দেবী। প্রকাশক : শ্রীমতী সন্ধ্যারানী সাহা। ১২৮।২০, হাজরা রোড, কলকাতা ২৬। দাম তিন টাকা।

'আলোর ফুল' ও 'স্বর্গকেনা' দুটি নাতিবৃহৎ গল্পের সংকলন "স্বর্গকেনা"। "আলোর ফুলের" কাহিনী একালের, "স্বর্গকেনা"র সেকালের।

মধ্যবিত্ত ঘরের এক সন্তানবতী বাল-বিধবার সঙ্গে অনুরূপ পরিবারের এক তরুণ অধ্যাপকের রাস্তায় কদিনের দেখা, প্রেমসঞ্চার ও আত্মীয়স্বজনের স্বাভাবিক আপত্তি সত্ত্বেও বিবাহ, এবং তারপরে বাল-বিধবার প্রথম পক্ষের বালিকা কন্যাকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ ও ভুল বোঝাবুঝি: সৎ মেয়ের জন্য বি-পিতার অতো স্নেহ-সুধারস মায়ের অসহ্য।

"জীবনের কতো সুর, কতো গান, কতো কাব্য এমনি করেই রূপ হারায়, ছন্দ হারায়, বিকৃত মূর্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।"

আয়তনে মেজোগল্প (অন্নদাশংকরের ভাষায়) হলেও ছোটোগল্পের মূল সুরটি —শেষ হয়ে হইল না শেষ—এ গল্পে প্রকট।

"স্বর্গকেনা"ও মেজোগল্প, কিন্তু আদল প্রকৃত উপন্যাসের। যখন কলকাতার লোক সবে রেলগাড়ি দেখতে শুরু করেছে, সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের এক অন্তর্বর্তী গ্রাম এর পটভূমি। সে গ্রামের জাগ্রত ভৈরবকালীর মন্দিরের প্রধান সেবাইতের কিশোরপুত্র সর্বেশ্বর ও একদিনের সেবাইত নোটো হালদারের ন' বছরের মেয়ে স্বর্ণর প্রেম এ কাহিনীর মূল বস্তু। এ বাল্যপ্রেমের বহিঃ-প্রকাশ আবার ওই জাগ্রত দেবস্থানে। কাজেই, ফলস্বরূপ স্বর্ণর বাবার মৃত্যু ও স্বর্ণদের ভিটে-ছাড়া হওয়া। তারপর বহু-দিন পরে স্বামী-ত্যাগিনী স্বর্ণ ফিরে এসে পুরোনো প্রেমকে যাচাই করে ব্যঙ্গের হাসি সম্বল করে ফিরে চলে যায়। কী অদ্ভুত একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন লেখিকা সেকালিনী, অশিক্ষিতা স্বর্ণের মধ্যে।

আশাপূর্ণা দেবীর কলম ক্রমাগতই আমাদের আশা পূর্ণ করে চলেছে।

(৬০।৭০)

ধর্ম

শ্রীনাম-ভাগবতম্—শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন ঘোষ ঠাকুর প্রণীত। শ্রীউৎসবানন্দ ঘোষ ঠাকুর কর্তৃক ১।২৯ অরবিন্দনগর পোঃ যাদবপুর ইউনিভারসিটি হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৪·৫০ পয়সা।

পুস্তকখানিতে শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যলীলা দেশ এবং কাল অনুসারে বিভক্তভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টির সহিত সংস্কৃত ভাষায় পরিকীর্তিত হইয়াছে। কীর্তনের পদের আকার গ্রন্থকার লীলাকে ছন্দোরূপে দিয়াছেন। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, গর্গসংহিতা হরিবংশ—বিশেষভাবে মহাভারত হইতে গ্রন্থকার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। লীলার আলোচনা করা হইয়াছে ব্যবহারিক ভিত্তিতে। শ্রীমৎ জীব গোস্বামী তাঁহার পদাবলীতে কিংবা শ্রীল সনাতন গোস্বামী তৎপ্রণীত দশম স্তবে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাকে ব্রজবধূগণের পরিকল্পিত উপাসনার পথে কীর্তন করিয়াছেন। গ্রন্থাকারের ধারাটি ঠিক সেরূপ বলিয়া মনে হয় না; কারণ, দ্বিতীয় খণ্ডের এই আলোচনায় দ্বারকা-লীলা হইতে সূচনা করা হইলেও বৃন্দাবন-মাধুর্যে সংশ্লেষ কিছু-না-কিছু আসিয়াই পড়িত। অন্তত দুইটি স্থলে আসিয়াও পড়িয়াছে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে লোক-ধর্ম, বেদ-ধর্ম, গৃহ-ধর্মকর্মের প্রতিই গুরুত্ববোধ গ্রন্থকারের বিশ্লেষণ ভঙ্গিতে পাওয়া যায় এবং লীলার প্রীতিভাজক অর্থাৎ রসবস্তুর দিক গৌণ হইয়াছে দেখা যায়। আলোচ্য খণ্ডের উপক্রমণিকা পাঠে মনে হয় গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণকে যোগীশ্বর এবং সার্বভৌম মানব-ধর্মের উপদেষ্টারূপে দেখিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে পরব্রহ্ম তত্ত্ব হইলেও তাঁহার স্তুতি-গীতির ভাবে এবং ভাষায় সর্বত্র পরিস্ফুট। গ্রন্থকার পরম পবিত্র এবং শুধু তাহাই নহে, তিনি ভক্ত। সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ-লীলাকে কীর্তন-ছন্দে আমাদের আস্বাদস্বরূপে উপস্থিত করিয়া তিনিও দেশের সংস্কৃতির একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছেন। শুধু বাংলা দেশে কেন, এমন পুস্তকের মূল দেবনাগরী অক্ষরে

ছাপা হইয়া সমগ্র ভারতে প্রচার হয়, আমরা ইহাই কামনা করি।

ছাত্রপত্রিকা

অন্বীক্ষণ। সম্পাদক : সোমেন ঘোষ। ৯১।১।বি মল্লিক লেন, কলকাতা ২৫। মূল্য এক টাকা।

মনে রেখাপাত করার মতো নব-প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে আলোচ্য ত্রৈমাসিকখানি অন্যতম। নির্ভেজাল এবং পরিচ্ছন্ন এই সাহিত্য পত্রিকাখানির লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে অধিকাংশই নতুন নাম। কিন্তু প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতার মানের বিচারে অনেকেরই প্রতিভা সম্ভাবনাপূর্ণ। প্রকৃত সাহিত্য-রসিকদের কাছে এই নিছক সাহিত্য-পত্রিকাখানি সমাদর লাভ করবে।

পূর্বমেঘ। সম্পাদক : শ্রীসমীপেন্দ্র লাহিড়ী। কুলটি, বর্ধমান।

কুলটির লৌহ কারখানার কর্মীদের রসানুভূতি যে নিরেট হয়ে যায় নি, আলোচ্য পত্রিকাখানি তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রবন্ধ, রম্যরচনা ও কবিতা রচনার মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যানুরাগ বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। রচনাগুলির অধিকাংশেই মুনশীয়ানার অভাব লক্ষ করা গেলেও সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সেইটাই পত্রিকাখানি প্রকাশের সার্থকতা।

প্রাপ্তি স্বীকার

মেঘলা আকাশ। হরিপ্রসাদ মেহ্তা। আরামবাগ সাহিত্য ও শিল্প পরিষদ: আরামবাগ, হুগলী। মূল্য ২·২৫।

গীতিকা। ভেসেলিন খানচেভ। অনুবাদ : অসিত চক্রবর্তী। সুবর্ণরেখা : ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ২·৫০।

কত কথা মনে পড়ে। শৈলেন্দ্র ভট্টাচার্য। বাক সাহিত্য : ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪·০০।

রাতের সূর্য। গোপেন দত্ত। শ্রীঅণিমা মিত্র: ১৯ডি, নীলমণি মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৬·০০।

বিজ্ঞাংকার রাজা। তরু দত্ত। অনুবাদ: পল্লব সেনগুপ্ত। সুবর্ণরেখা: ৭৭/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·০০।

মহানগরীর স্টেশন। বিনয় মুখোপাধ্যায়। প্রজ্ঞাতীর্থ : ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ৪·০০।

Monograph on Lac Ornaments, Investigation, Tabulation & First Draft: Dipankar Sen; Editing, Final Draft, Supervision & Guidance: Sukumar Sinha, Manager of Publication: Civil Lines, Delhi, Price Rs. 7.50.

প্রীতি-শতদল ও ব্রজভাব ভূষণাবলী। শ্রীহরিজীবন গোস্বামী। কবিরাজ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসন্ন সেনশর্মা: ৯/১, কুমারটুলি স্ট্রীট, কলিকাতা-৫। মূল্য ৫·০০।

মহানগরীর রানী। সুকুমার রায়। চক্রবর্তী অ্যান্ড কোং : ১২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। মূল্য দশ টাকা।

জার্মানীর ছোটগল্প। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড : ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২। মূল্য ছয় টাকা।

শৈবত ভাবনা। তনুশ্রী ভট্টাচার্য, প্রভাতকুমার দত্ত। প্রকাশ প্রকাশনী : ৩৬বি বকুলবাগান রোড, কলকাতা ২৫। মূল্য দু' টাকা।

বাংলার লোকগীতি। বুদ্ধদেব রায়। লোক সংস্কৃতি পরিষদ : ৭৯।১৩বি লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা ১৪। মূল্য দু' টাকা পঁচিশ পয়সা।

যে কোন যুবতীর মন। বেণু চক্রবর্তী। শৈলশ্রী : ১।১।১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অথবা নির্বিন্ধ মৃত্যু। শিপ্রা পাল। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড : ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা।

সামরিক আবহাওয়ায় নিত্য শরীরচর্চাই এর মুখ্য কারণ। এদের মধ্যে স্বাস্থ্য-সম্পদ থাকলেও ভলিবল-মেধা একমাত্র ঐ যাদবেরই। তাই যাদবই ছিলেন বাংলা দলের সামনে বিরাট বাধাস্বরূপ। তিনি আক্রমণ ও আত্মরক্ষার দু দিক থেকেই দলকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এক কথায়, বাংলা দলের বিপক্ষ কোর্টে বল যেখানেই গেছে—যাদব তার আগেই হাজির। তিনি স্পাইকিং—লিফটিং ও সার্ভিস সব বিভাগেই সমান ছলাকলা দেখিয়ে বাংলা দলের হাতের মুঠোর জয়কে হাতছাড়া করেন। এজন্যে কলকাতার দর্শক যাদবকে বহু দিন মনে রাখবে।

স্থানীয় রাজ্যের পরাজয়ের মূলে কারণ স্ট্যামিনার অভাব এবং অগোছালো ভূমিকা। ২-১ সেটের অনুকূল অবস্থায় থেকেও সার্ভিসেসের পক্ষে ম্যাচ জেতার ঐ একই কারণ। দলগত শক্তির দিক থেকে বাংলা দলে যাদবের সমকক্ষ খেলোয়াড় ছিল না ঠিকই—কিন্তু প্রথম সেটের দলগত সংহতির আংশিকও চতুর্থ ও পঞ্চম সেটে দেখাতে পারলে বাংলার বিজয় সম্ভব ছিল। এ ছাড়া আরও কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করছি। বাংলা দলের কোন খেলোয়াড় যখনই স্পাইকিং করতে উঠেছেন—অন্যান্য সহযোগীরা এই দৃশ্য অলসভাবে উপভোগে ব্যস্ত থেকে বাধা-প্রাপ্ত ফিরতি বল বিপক্ষ কোর্টে পাঠাতে অক্ষম হয়েছেন। অন্য দিকে বিপক্ষ দলের স্পাইকিং শট ফেরত পাঠাবার সময়ও অধিকাংশ খেলোয়াড়ই নিজের জায়গা ছেড়ে সরে যাওয়ার ফলে সেনাদলের সুবিধা হয়েছে বেশী। তা ছাড়া, খেলা চলাকালীন বাংলা দলের খেলোয়াড় পরিবর্তনের বিষয়েও বিচক্ষণতার অভাব দেখা গিয়েছে। এজন্যে অনেক সময় অযোগ্য খেলোয়াড় দলের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

বাংলা দেশের ছোট্ট ভলিবল-ইতিহাসে এইরূপ আঞ্চলিক অনুষ্ঠান সর্বপ্রথম। সেদিক থেকে এর সর্বাঙ্গসুন্দর পরি-সমাপ্তিতে পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডারেশন দক্ষতা দেখিয়েছেন। ভলিবলের মত সহজ-জনপ্রিয় খেলার এমন বড় অনুষ্ঠান শুধু কলকাতার মাঠে সীমাবদ্ধ না রেখে বাংলার অন্য প্রধান শহরে ছড়িয়ে দিলে বাংলা দেশের ভলিবলের প্রসার সন্তোষ-জনক হবে।

*

জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ আয়োজিত নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসবে বিভিন্ন পার্কে ও মাঠে হাজার হাজার বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীর কণ্ঠে শনিবার ১ বৈশাখে ধ্বনিত হয় নববর্ষের সংকল্প—"আমি বিশ্বাস করি ভারতের গৌরবময় অতীতে এবং ততোধিক গৌরবময় ভবিষ্যতে। চরিত্র, বীর্যে, ঐক্যে, নিয়মানুবর্তিতায়, জাতির উন্নতিসাধনে ও ভারতবর্ষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিমান দেশরূপে প্রতিষ্ঠায় আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।"

নিখিলবঙ্গ নববর্ষ উৎসবে উত্তর শহরতলী কেন্দ্র বরাহনগরের অনুষ্ঠানে জাতীয় ক্রীড়াসংঘের সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার এবং পূর্বাঞ্চলের সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল এ এন রায় কুচ কাওয়াজ পরিদর্শন করছেন

মল্লিকস হেলথ হোমের সভ্য এহসানুল করিম, 'মিঃ জুনিয়ার কলিকাতা' ছাড়াও বহু দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতায় খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছে

উত্তর শহরতলি কেন্দ্রের বরাহনগরের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মেজর-জেনারেল এ এন রায় সামরিক পোশাকে মিলিত কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করার পর বলেন, "আগে জানতাম, সেনাবাহিনীর লোকই এইভাবে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কুচকাওয়াজ করতে পারেন। কিন্তু এই উৎসবে জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ উত্তর শহরতলি কেন্দ্রের ছেলে-মেয়েদের দেখে সে ধারণা পালটে গেল।" উৎসবের সভাপতি শ্রীঅশোককুমার সরকার মহাশয় বলেন, যে বছর চলে গেল, তার স্মৃতি উৎসাহব্যঞ্জক নয়। আশা করি, নূতন বৎসরে সেই সমস্যার সমাধান হবে। শিশু-ভবনের ছেলেমেয়েদের লেজিম অঙ্গ-প্রদর্শনী এবং সম্মিলিত কুচকাওয়াজ ও সমষ্টিব্যায়ামের প্রশংসা করে তিনি বলেন, আজকের দিনে সবচেয়ে প্রয়োজন নিয়মানুবর্তিতা। সংকল্প যা গ্রহণ করা হল, তা যেন ছেলেমেয়েরা আগামী দিনে কার্যক্ষেত্রে গ্রহণ করে। উৎসব অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সেন স্বাগত ভাষণে বলেন, উত্তর শহরতলির বিভিন্ন বিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের মিলিত প্রচেষ্টায় এই উৎসব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে—প্রার্থনা করি, জাতির দৃঢ় সমাজ-বন্ধনের উদ্দেশ্যে যেন এইভাবে সকলে মিলিত হতে পারি।

একলব্য

জর্জ ভন ওপেল

পশ্চিম জার্মানীর স্পোর্টস মহলে ডঃ জর্জ ভন ওপেল এক বিশেষ পরিচিত নাম। শুধু পশ্চিম জার্মানী কেন, জার্মানীর সীমা পেরিয়ে ভন ওপেলের নাম আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত। কিন্তু তিনি একজন উঁচুদরের ফুটবল খেলোয়াড় বা অলিম্পিক জয়ী অ্যাথলীট নন। তবে সর্ববিদ্যাবিশারদ স্পোর্টসম্যান।

খেলাধুলোর নানা বিষয়ের মধ্যে রোয়িং অর্থাৎ নৌকা বাইচে তাঁর বেশী অগ্রহ। ১৯২৮ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৌ-চালক। এই সময়ের মধ্যে ভন ওপেল ১২৭ বার প্রথম শ্রেণীর নৌ-চালনায় বিজয়ীর সম্মান পেয়েছেন। সিংগলস স্কালস অর্থাৎ একক নৌ-চালনা প্রতিযোগিতা, চার দাঁড় ও আট দাঁড়ের নৌ-চালনায় সাতবার পেয়েছেন জার্মানীর চ্যাম্পিয়নশিপ। সিংগলস স্কালসে ১৯৩৩ সালে ক্যানাডার এবং ১৯৩৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছেন। পৃথিবীর সব চেয়ে অভিজাত এবং জাঁক-জমকপূর্ণ নৌকা বাইচের আসর হেনলী রেগাট্টায় প্রথমবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ১৯৩২ সালে, শেষবার ১৯৫৩তে। ১৯৩৬ সালে জার্মানীতে অয়োজিত বিশ্ব অলিম্পিকে ভন ওপেল দুটি বিষয়ে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। নৌকা বাইচ ও লক্ষ্যভেদ, অর্থাৎ শুটিং।

কিন্তু অলিম্পিকের ফল ভাল হল না। অলিম্পিকের পর নানা বিষয়ে তাঁর প্রতিভার পরিচয় মিললেও সে প্রতিভা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বারুদের ধোঁয়ার মধ্যেই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। মহাযুদ্ধের পর লণ্ডনে আয়োজিত প্রথম অলিম্পিক আসর—যেখানে ভন ওপেলের অন্তত দু তিনটি স্বর্ণপদক লাভের সম্ভাবনা ছিল, সে আসরে জার্মান দলের অংশ গ্রহণের অধিকার মেলেনি। ফলে, ভন ওপেলের অলিম্পিক-বিজয়ী হবার আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

কিন্তু খেলাধুলোয় তিনি সহজাত প্রতিভার অধিকারী, নানা দিকে যাঁর দক্ষতা, কীর্তি তাঁর জন্য অপেক্ষা করে থাকে। ভন ওপেল অটোমবাইল স্পোর্টসে মেতে ওঠেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে ৫০০ এবং ৩৫০ সি সি এম ক্লাসে পাঁচটি বিশ্ব রেকর্ডের প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে তিনটি রেকর্ড আজও অম্লান।

এমন কোন খেলাধুলো নেই যাতে জর্জ ভন ওপেল কিছু কিছু দক্ষতার পরিচয় না দিয়েছেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে জুনিয়র স্কী রেস জয় করেছেন। শো জাম্পার এবং শুটার হিসাবে সুনাম কিনেছেন। কিছু কিছু টেনিস খেলেছেন। ফ্রাংকফুর্টের রিং-এ বক্সিং লড়েছেন। এবং একক প্রচেষ্টায় পাহাড়ের চূড়োয় উঠেছেন। ১৯৫৬ সালে আফ্রিকার 'কিলিম নজারো' পাহাড়ে তাঁর একক সাফল্য পর্বত অভিযানের ক্ষেত্রে অসাধারণ কীর্তি। এ ছাড়া আণ্ডার-ওয়াটার সুইমার এবং ফটোগ্রাফার হিসাবেও তাঁর সুনাম আছে।

প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলোর পর ভন ওপেলের ঝোঁক দেখা যায় শিকারে এবং বন্য প্রাণী সংগ্রহে। খেলাধুলো এবং নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ডঃ জর্জ ভন ওপেল ৬খানি বই লিখেছেন। 'ইন ফাস্ট আউট-টিলেন' (পাঁচ মহাদেশে) তাঁর শেষ সংকলন ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত। বইয়ের ভূমিকায় ভন ওপেল লিখেছেন, 'প্রকৃতির মধ্য দিয়েই আমরা নিজেদের জানতে পারি এবং প্রকৃতির মধ্য দিয়েই আবিষ্কার করতে পারি আপন সত্তা।'

রোয়িং-এর পরই ওপেলের শিকারের নেশা। শিকার সম্পর্কে তাঁর অভিমত : প্রকৃতির আসল সৌন্দর্য এবং স্বকীয়তা নষ্ট না করে এবং অতীত সংস্কৃতি বজায় রেখে শিকার করাই হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষার পথের সন্ধান।

জর্জ ভন ওপেল বিশ্ববিখ্যাত মোটর শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক 'ওপেল' পরিবারের সন্তান। সুতরাং সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম। ১৯২৯ সালে ওপেল অটোমোবাইল ফ্যাক্টরী জেনারেল মোটরস কোম্পানী কিনে নিলেও ভন ওপেল এখনো কয়েকটি ফ্যাক্টরীর মালিক। ওঁর তৈরী মোটর একসেসরি ইণ্ডাসট্রি থেকেই প্রথম বের হয় প্রোন কক্সোয়েইন রোয়িং বোট।

শিল্পক্ষেত্রে পারিবারিক ঐতিহ্যের মত খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও পারিবারিক ঐতিহ্যের নজির। ভন ওপেলের বাবাকাকারা ছিলেন পাঁচ ভাই—জার্মানীর ক্রীড়াক্ষেত্রে যাঁদের পরিচয় ছিল 'ফাইভ ওপেল'। হাই বাই-সাইকেল, থ্রি-হুইল বাইসাইকেল ও স্লো-সাইকেলে পাঁচ ভাইয়ের সংগৃহীত পুরস্কারের সংখ্যা পাঁচশ ষাট। জর্জ ভন ওপেলের ছেলে ২৪ বছর বয়সী হেনজ ভন ওপেল শো জাম্পে ইউরোপের জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন।

আগেই বলেছি, বন্য প্রাণী সংগ্রহে জর্জের অপরিসীম আগ্রহ। ফ্রাংকফুর্টের কাছে ওঁর বিরাট বাড়িতেই রয়েছে এক বিরাট পশুশালা। পৃথিবীর সব দেশের প্রাণী দেখা যায় এখানে এলে। খেলাধুলোর নানা নেশা এবং নানা খেয়ালের মধ্যেও জর্জের চিন্তাধারা অলিম্পিক আদর্শকে কেন্দ্র করে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সদ্য নির্বাচিত সদস্য অলিম্পিক আদর্শ রূপায়ণের জন্য জার্মানীর যে 'গোল্ডেন প্ল্যান' তৈরী করেছেন তাতে ১৫ বছরের মধ্যে পশ্চিম জার্মানীতে নতুনভাবে গড়ে উঠবে ৫০৫০টি জিমন্যাসিয়াম, ৪৬৫০টি খেলার মাঠ, ৪১৯০টি ওপেন এয়ার বাথ এবং ৭৪০টি সুইমিং পুল।

মুকুল

ফিল্ম সোসায়েটি সম্মেলন

সারা ভারত ফিল্ম সোসায়েটি সম্মেলন যে অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেটাই বোধ হয় সম্মেলনের বড় সাফল্য। ১৯৫৯ সনে ফেডারেশন অব দি ফিল্ম সোসায়েটিজ অব ইণ্ডিয়া গঠিত হয়েছে। সেদিন সারা দেশে ফিল্ম ক্লাব বা সোসায়েটির সংখ্যা ছিল ছয়। আজ তেষট্টি। সব কয়টি ক্লাব নিয়ে সদস্য-সংখ্যা ছিল তিন হাজার, আজ ত্রিশ হাজার।

এই কয়েক বছরে ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলনের যে যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং সোসায়েটি বা ক্লাব-গুলির নিখিল ভারত সম্মেলন এই প্রথম। ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলনের উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলন যতটা উল্লেখযোগ্য হবে আশা করা গিয়েছিল তা হয়নি। সম্মেলনের সার্থকতা অবশ্য বাইরের জাঁকজমকে নয়, অন্যত্র। প্রতিনিধিদের মধ্যে অদ্ভুত উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ করেছি। ওঁরা বড় কিছু করছেন এই বোধ তাঁদের চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে। বিভিন্ন ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতাও বিশেষভাবে দেখা গেছে। সম্মেলনের বৈশিষ্ট্য বুঝি আরও ফুটে উঠতে পারত। সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি ছিল অনুজ্জ্বল। ফিল্ম আনা ও দেখার মধ্য দিয়ে বিদেশের সিনেমার সঙ্গে সভ্যদের পরিচয় যত ঘনিষ্ঠই হয়ে উঠুক না কেন, ফেডারেশনের সঙ্গে বিদেশী চলচ্চিত্রবিদ বা চলচ্চিত্রকারদের যোগাযোগ কতখানি গড়ে উঠেছে তা বোঝা গেল না। ভারতের ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলনের ইতিহাসে এই সম্মেলন একটি বড় ঘটনা। এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে বিদেশের একাধিক, কিংবা অন্তত একজন চলচ্চিত্র-চিন্তানায়ক বা চলচ্চিত্রকার যোগ দেবেন এবং তাঁর মুখ থেকে মূল্যবান কথা কিছু শুনব এই আশা আমাদের ছিল। তা পূর্ণ হয়নি। সম্মেলন উপলক্ষে বিদেশের বিখ্যাত কয়েকটি চলচ্চিত্র দেখানো যেতে পারত। তা সম্ভব হয়নি। পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি একটি বা দুটি যা এসেছে তা যে কোন ক্লাবের সাধারণ মাসিক প্রদর্শনীতে স্থান পাবার যোগ্য। সম্মেলনে তাত্ত্বিক আলোচনার অবকাশ অবশ্যই আছে। তা তিনদিন ধরে সকাল-সন্ধ্যায় প্রায় সমগ্র কর্মসূচী জুড়ে না থাকলেই ভাল ছিল।

উদ্বোধন-অনুষ্ঠানটি (২১ এপ্রিল) ছিল খুবই সাধারণ, সাদাসিদে। প্রথমে শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত ভারতে ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলনের প্রসারের কথা বললেন। "ক্রিয়েটিভ ফিল্ম-মেকার"-দের অনেক সময় চলচ্চিত্র-নির্মাণের "ম্যানেজারিয়াল" কাজে কতখানি ব্যস্ত থাকতে হয় এবং সিনেমার বাণিজ্যিক ভূমিকা আর্টের নিজস্ব অধিকারের সঙ্গে কী-ভাবে বাদ সাধে এই সমস্যার ইঙ্গিত শ্রীদাশগুপ্তের ভাষণে পাওয়া যায়। ভাষণ-শেষে তিনি ঘোষণা করেন, শুটিংয়ের কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন শ্রীসত্যজিৎ রায় (ফেডারেশনের সভাপতি) উপস্থিত থাকতে পারলেন না। তিনি বলেন, "শিল্পীর কাছে তাঁর কাজই বড়, ফিল্ম-মেকার-এর কাছে তাঁর ছবি। এই নিষ্ঠা বা ইনটিগ্রিটি-র পরিচয় শ্রীরায়ের ছবিতে থাকবে বলেই আমরা আশা করি।" শ্রীসত্যজিৎ রায় অবশ্য সম্মেলনের তৃতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন, তবে অসুস্থতার দরুন প্রথম দিন আসতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করেন।

শ্রীরায়ের পরিবর্তে শ্রীখাজা আহমেদ আব্বাস সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, মজার কথা এই যে, প্রথম ফিল্ম সোসায়েটি স্থাপিত হয়েছিল বোম্বাইয়ে অর্থাৎ "কমার্শিয়াল সিনেমার হেডকোয়ার্টারস"এ। শ্রীআব্বাস শিল্পসম্মত ছবি তৈরি ও তার প্রদর্শনের সমস্যার কথা আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এখন ভারতের প্রধান শহরে আর্ট থিয়েটার-এর 'চেন' তৈরির জন্য আন্দোলন করতে হবে। তিনি বলেন, এখন নানা রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমরা আশা করি, আর্ট থিয়েটার স্থাপনের ব্যাপারে সরকারী আনুকূল্য পাওয়া যাবে। এক কথায়, শ্রীআব্বাসের বক্তব্য সম্ভবত এই যে, নানা রাজ্যে ফিল্ম আর্টের পথের প্রতিবন্ধকতা এখন দূর হবে। এই আশা আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, এই রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটার আগেই শ্রীআব্বাসের "শেহর ঔর সপনা" (যদি অবশ্য সেটা আর্ট ছবি হয়) শ্রীসত্যজিৎ রায়ের ছবি ডিঙিয়ে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছিল।

শ্রীমতী মারি সীটন তাঁর বক্তৃতায় আর্টের প্রকাশমাধ্যম হিসাবে ফিল্মের অগ্রগতির

"ছোটিসি মুলাকাৎ"-এর একটি দৃশ্যে নৃত্যভঙ্গিমায় উত্তমকুমার ও বৈজয়ন্তীমালা

সংগে ফিল্ম সোসায়েটি আন্দোলনের পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা ব্যক্ত করেন। কয়েকটি দেশের কথা তিনি এই প্রসংগে উল্লেখ করেন। যেমন ইটালি, ফ্রান্স, ব্রিটেন, কানাডা ও আমেরিকা।

প্রদর্শিত ছবি

বক্তৃতা শেষ হয়ে যাবার পর দুয়েকটি অল্পদৈর্ঘ্যের চিত্র, শ্রীমৃণাল সেনের 'মাটির মনিষ'-র কিছু অংশ এবং রুমানিয়ার একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি দেখানো হয়।

ভারতের প্রথম কাহিনীচিত্র (১৩১২) 'রাজা হরিশচন্দ্র'-র সামান্য অংশ প্রদর্শিত হল। ছয় হাজার ফুটের এই ছবির একটি রীলই মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। এই চিত্রের নির্মাতা, ভারতীয় ছায়াছবির জনক শ্রী ডি জি ফালকের ফিল্ম তৈরির (কী-ভাবে তিনি সট নিয়েছেন, 'ফিল্ম কাটিং' সম্পন্ন করে-

ছেন ইত্যাদি। কিছু 'শট'ও দেখানো হয়। ছবিগুলি দেখাবার কালে ধারাভাষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য পরিবেশন করেন পুনার ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন-এর অধ্যাপক শ্রীসতীশ বাহাদুর। ভারতের ন্যাশনাল ফিল্ম আর-কাইভস-এর ব্যবস্থাপনায় ছবিটি দেখানো সম্ভব হয়েছে। শ্রীবাহাদুর জানান, যে-কালে শ্রীফালকে 'হরিশ্চন্দ্র' তৈরি করেন তখন স্ত্রী-ভূমিকার জন্য অভিনেত্রী পাওয়া কঠিন ছিল। যে-কারণে শ্রীফালকে নিজের মেয়ে মন্দাকিনীকে ফিল্মে অভিনয় করিয়েছিলেন। তাঁর ছেলেও ছোটবেলায় 'হরিশ্চন্দ্র'তে রাজার ছেলের চরিত্রে অভিনয় করেন। শ্রীফালকের ছবিতে পুরুষদেরই নারী-বেশ ধারণ করতে হয়েছিল। স্ত্রী-বেশে পুরুষদের একাধিক দৃশ্যে দেখা গেল। ভারতের প্রথম কাহিনীচিত্রে ক্যামেরার যে কাজ এবং 'ট্রিক-শট' রয়েছে তা আমাদের অবাক করেছে। এবং ছবির 'সেট'-ও উল্লেখ্য। শ্রীফালকের ছবি দেখানোর জন্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের কাছে সভ্য ও নিমন্ত্রিত দর্শকরা নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকবেন।

অল্পদৈর্ঘ্যের আর যে-সব ছবি দেখানো হয়েছে সেগুলি অনুল্লেখ্য। শ্রীফালকের অপর কয়েকটি ছবির অংশ ছাড়া সম্মেলনে আরও কিছু পুরোনো ছবির অংশ দেখালে ভাল হত। ভারতীয় সিনেমার আদি যুগ সম্বন্ধে দর্শকরা নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করতেন।

পুণা ফিল্ম ইনস্টিটিউট-এর জনৈক শিক্ষার্থীর তৈরি 'নেভার অন এ সানডে' ছবির চারটি চরিত্র। এক নবদম্পতি তাদের গাড়িতে শহরের বাইরে যাচ্ছে। পথে তারা দুজনকে 'লিফট' দিয়েছে। প্রথমে একজন তরুণীকে, পরে একজন তরুণকে। তরুণীকে গাড়ীতে তোলার জন্য স্বামীর বেশী আগ্রহ, তরুণকে নেওয়ার গরজ স্ত্রীর। তরুণীকে দেখে স্বামীর মন একটু চঞ্চল, তরুণকে দেখে স্ত্রীর মন। এবং যথাক্রমে তরুণ-তরুণীর উপস্থিতিতে স্বামী ও স্ত্রীর অস্বস্তিও লক্ষণীয়। বাস্তবের আভাস ছবিতে আছে। তবে শিক্ষার্থীর হাতে তা সুষ্ঠু রূপ নেয়নি।

তরুণ চলচ্চিত্রকার দুবের 'অপরিচয় কী বিন্ধ্যাচল' (প্রাপ্তবয়স্কের জন্য) কি নব্য-রীতির এক্সপেরিমেন্ট? তাঁর ছবির উপজীব্য আধুনিক তরুণ-তরুণীর অবদমিত যৌন-বাসনা, ক্লান্তি, নিঃসঙ্গতা। বিশেষ মুহূর্তে হঠাৎ করে যুবতীর নিরুদ্ধ কামনার (এবং যুবকেরও) অশান্ত প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু সমাজে বাস করতে গেলে অবচেতনকে নির্মম শাসনে শান্ত করে শালীনতার মুখোস পরে নিতে হয়। এই [illegible]

আওয়ার মুভীজ-এর "ছোটিসি মুলাকাৎ" এ-সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—আলো সরকার পরিচালিত ছবির তিনটি দৃশ্যে উত্তমকুমার, বৈজয়ন্তীমালা ও শশীকলা

সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী নাতালি উড (মাঝখানে), রীতা সাহানি (বাঁয়ে) এবং চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবির পরিসমাপ্তি। কিছু শিল্পসম্মত ও বুদ্ধিদীপ্ত মুহূর্ত ছবিতে আছে আধুনিক হিন্দী ছবি নিয়ে শ্লেষও লক্ষণীয়। তবে ছবিতে পরিমিতি-বোধের অভাবই বেশী। একটি সমস্যা বা ধারণা বেশী স্পষ্ট করে দেখাবার ঝোঁক পরিচালক ত্যাগ করতে পারেননি। তিনি আরও সংযম দেখাতে পারতেন। অবশ্য বাইরের কৃত্রিমতা ও ভদ্রতার অন্তরালে একালের মানুষের গোপন ও অবরুদ্ধ বাসনা এবং যন্ত্রণার প্রতি দর্শকের ক্ষণিক দৃষ্টিপাতের সুযোগ ছবিটি দিয়েছে। এখানে চলচ্চিত্রকারের অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনার সার্থকতা।

সম্মেলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনের কর্মসূচীতে আলোচনার স্থানই ছিল বেশী। আলোচনায় স্থানীয় এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের চলচ্চিত্রবিদ, চলচ্চিত্রকার ও সমালোচকরা যোগ দিয়েছেন। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রী কে কে শাহ, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য বিভিন্ন দিনে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রী কে কে শাহ তাঁর ভাষণে সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার কাজে সিনেমার ভূমিকার কথা বলেন। শ্রীসত্যজিৎ রায়কে তিনি বিশেষ অভিনন্দন জানান। বলেন, তিনি নিজেই একজন 'ইনস্টিটিউশন'। অনেক ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নিয়ে আমি আমার বোঝা হাল্কা করতে পারি।

সম্মেলন উপলক্ষে শেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন চলচ্চিত্রম সংস্থা। শ্রীরামমূলায় ভবনে রবিবার রাত্রে এক প্রীতিসম্মেলনে তাঁরা কনফারেন্স-এ যোগদানকারী কয়েকজন বিশেষ প্রতিনিধিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীসত্যজিৎ রায়, শ্রী খাজা আমেদ আব্বাস, শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীপ্রমোদ লাহিড়ী প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রূপসী নির্বাচন

রূপের প্রতিযোগিতায় কলকাতার অনেক কিশোরীকেই সেদিন দেখা গিয়েছিল। রূপসী নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন ফেমিনা ও ব্রুকস ল্যাকটো-ক্যালামাইন সংস্থা। গ্র্যান্ড হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট রুমে রূপসীরা এসে দাঁড়ালেন। বিজয়িনীর সম্মান পেলেন ক্যালকাটা গার্লস কলেজের ছাত্রী শ্রীমতী নাতালি উড। হলিউডের অভিনেত্রী নাতালি উডের নামের অনুকরণে কলকাতার রূপসীর নামকরণ নয়। শ্রীমতী উড বললেন, হলিউডের অভিনেত্রীর নাম ছড়িয়ে পড়ার আগেই তো আমার নাম রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করলেন যথাক্রমে শ্রীমতী চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী রীতা সাহানি। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিক হওয়ার খুব ইচ্ছা। খেলাধূলায় প্রীতিও তাঁর আকর্ষণ। শ্রীমতী সাহানির শখ বিদেশভ্রমণ।

মোট আঠারোজন কিশোরী এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন। সকলেরই বয়স চোদ্দ থেকে আঠারোর মধ্যে। হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরে এই ধরনের প্রতিযোগিতা ইতিপূর্বেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। সব শহরের বিজয়িনীদের আবার প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে হবে বোম্বাইয়ে, মে মাসে। সেখানে "ভারতের রূপসী কিশোরী" নির্বাচন সম্পন্ন হবে। তারপর চিকাগোতে আন্তর্জাতিক রূপসী কিশোরী প্রতিযোগিতা। ফেমিনা-এর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবেন। যদি ভারতের শ্রেষ্ঠ রূপসী কিশোরীকে বিদেশে পাঠানো সম্ভব না হয় তবে তাঁকে এখানেই ফেমিনা এক বছরের জন্য প্রতি মাসে আড়াইশো টাকা বৃত্তি দেবেন।

বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন শুরু হচ্ছে পঁচিশে বৈশাখ, মারকাস স্কোয়ারে। প্রতিবারের মত এবারেও বিরাট মণ্ডপে প্রতিদিন বাংলা সংস্কৃতির পরিচয়বাহী নৃত্য, সংগীত ও নাটকের ব্যবস্থা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রখ্যাত সংস্থা সম্মেলনে যোগ দেবেন। মেলাপ্রাঙ্গণেও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলার লোকসংগীত, লোকনৃত্য, পাঁচালী, যাত্রা ও কবিগান এবারকার কর্মসূচীতেও রয়েছে। এ বছরের প্রধান আকর্ষণ একাঙ্ক অভিনয় প্রতিযোগিতা। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের ঐতিহ্যপূর্ণ মেলা ও প্রদর্শনীর তোড়জোড় চলছে।

সুরেশ সংগীত সংসদের গুণী-সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

সুরেশ সংগীত সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে রবিবার, ৩০ এপ্রিল। উত্তরা সিনেমায় সকাল ৮-৪৫ মিনিটে অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে। এই অনুষ্ঠানে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত সংগীতশিল্পী ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ ও সংসদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক শ্রীঅশোককুমার সরকারকে বিশেষ সংবর্ধনা জানানোর আয়োজন করা হয়েছে।

সেদিনের সংগীত-আসরে যাঁদের সংগীত পরিবেশন করবার কথা তাঁরা হলেন: ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ (সরোদ), শ্রীশঙ্কর ঘোষ (তবলা), খলিফা ওয়াজিদ হোসেন খাঁ (তবলা-লহরা), শ্রীচিন্ময় লাহিড়ী (বাংলা খেয়াল)।

পরলোকে শিল্পী কার্তিক মিত্র

গত ১৬ই এপ্রিল অল্পদিন রোগভোগের পর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শ্রীকার্তিক মিত্র পরলোকগমন করেন। তিনি গত দশ বছর যাবৎ স্টার থিয়েটারের নিয়মিত শিল্পী ছিলেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সাহচর্যে তাঁর নাট্য অভিনয়ের শুরু। মঞ্চে নাট্যাচার্যের সহিত বহু নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন।

চিত্র-সমালোচনা

জীবন-মৃত্যু

ছবিতে উত্তমকুমারকে দেখতে পেলেই "ফ্যান"রা খুশী। তার উপর "ম্যাটিনি আইডল"কে যদি নতুন বেশে দেখা যায়, তবে তো অনুরাগীদের উল্লাসে ফেটে পড়বারই কথা। ঘটছেও তাই। "জবীন-মৃত্যু" (বি এম ডি মুভীজ) দেখার কালে এর প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। ভিতরে সরব উচ্ছ্বাস, বাইরে ভিড়—টিকিটের জন্য লাইন। অর্থাৎ টিকিট-ঘরের অকৃপণ আনুকূল্য অর্জনের ক্ষমতা "জীবন-মৃত্যু"র আছে। এ ক্ষেত্রে লাভ লোকসান অর্থে বাঁচা-মরা বা জীবন-মৃত্যু প্রযোজকের পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন। ভাবনা দূর করার পক্ষে শিখ-যুবকের বেশে উত্তমকুমারের উপস্থিতিই যথেষ্ট। এ ছাড়া বক্স-অফিস জয়ের অন্য অস্ত্র তো আছেই।

ছবির দ্বিতীয়ার্ধে উত্তমকুমারকে শিখ তথা শান্তাপ্রসাদ সিং সাজতে হয়েছে প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে। নায়ক অশোক শান্তাপ্রসাদের বেশে মোট পাঁচটি খলচরিত্রকে শায়েস্তা করেছে—যারা ষড়যন্ত্র করে ব্যাংক থেকে টাকা চুরির মিথ্যা দায়ে তাকে জেলে পাঠিয়েছিল। প্রতিশোধ-পর্ব শেষ হবার পর অশোক তার ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছে, প্রণয়িনী গোপার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

শান্তাপ্রসাদের সাজে অশোকের দুষ্ট দমনের ব্যাপারটি দর্শকের কৌতূহল বেশ সতেজ করে তোলে। এই অংশে কিছুটা সাসপেন্স ও রোমাঞ্চের ব্যবস্থাও আছে। জেলে যাওয়ার আগে অশোকের ছাত্রজীবন, প্রণয় ও চাকুরির কাহিনী ফ্ল্যাশ-ব্যাকে উপস্থিত করা হয়েছে। অর্থাৎ অশোকই তার জীবনের ঘটনা বলছে এক শিল্পপতিকে। এমন সব ঘটনা অশোক বলেছে যা ওর জানবার কথা নয়। ফ্ল্যাশ-ব্যাক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই ত্রুটি বাংলা ছবিতে প্রায়ই দেখা যায়। এ ছবিতেও আছে। তা-বাদে, অশোকের জেলে যাওয়ার ঘটনাটিও গোঁজামিলে ভরতি। যেন অশোককে জেলে পাঠানোটাই বড় কথা। সেটা বিশ্বাসযোগ্য হল কিনা সে বিষয়ে পরিচালক হীরেন নাগ আরও মনোযোগী হতে পারতেন। অশোককে অ্যপক্ষ সমর্থন করতে দেখা গেল না, কাউকে সে সন্দেহ করে না (যদিও কোন সহকর্মীকে সে স্বচ্ছন্দে সন্দেহ করতে পারত) এবং এমন বুদ্ধিমান কর্মচারীর একবারও মনে হল না যে, ক্যাশের নকল চাবি তৈরী হতে পারে (যখন অপর একটি চাবি দিয়ে সে সিন্দুক খুলতে পারছিল না এবং পরক্ষণে তার সহকর্মী আসল চাবি নিয়ে এল) এবং একবারও তার মনে এই প্রশ্ন জাগল না যে, জনৈক সহকর্মী কেন তার কাছে অপর চাবিটি রেখে যাবার জন্য ব্যস্ত। এ ধরনের বেশ কিছু ফাঁক কাহিনী-বিন্যাসে রয়েছে, সাজানো ঘটনারও অন্ত নেই। আসল কথা গল্পটিই (বিশ্বনাথ রায়) সিনেমা দর্শকের তাৎক্ষণিক মনোরঞ্জনের জন্য লেখা; জীবনবোধ ও বাস্তবতাবর্জিত। এর নামটিই শুধু গুরুগম্ভীর। তবে সুখের কথা, এই কাহিনীতে বড় কথা বলার বা বড় কিছু দেবার কোন "প্রিটেনশন" বা ভনিতা নেই। পরিচালক বা কাহিনীকার কারো তরফ থেকেই নয়। আবেগ, কৌতুক, প্রেম, ভিলেনি ও তার পতনের মধ্য দিয়ে তাঁরা দর্শককে নিছক আমোদই দিতে চেয়েছেন এবং দিতে পেরেছেন। দর্শকের চিত্তবিনোদনের দায়িত্ব পালনে এখানেই উভয়ের সাফল্য। বিরাট দর্শকগোষ্ঠীর কাছে এই শ্রেণীর আমুদে ছবির কদর আছে। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের ব্যবসায়িক সংকটের বিচারে এই ধরনের ছবির মূল্যও কম নয়। গল্পবস্তু কিংবা তার বিন্যাসের দুর্বলতা যা-ই থাকুক, ছবিতে শ্রী নাগের কাহিনী উপস্থাপনার প্রয়োগ-নৈপুণ্য লক্ষণীয়। ছবির আরম্ভ থেকে ক্লাইম্যাক্স পর্যন্ত পর পর দৃশ্য সাজানো চমৎকার। কোন দৃশ্যই অকারণে দীর্ঘ নয় এবং পুরো ছবিটাই গতিসম্পন্ন।

ছবির প্রধানতম আকর্ষণ উত্তমকুমারের অভিনয়। রোমান্টিক নায়ক হিসাবে তো তাঁর জুড়ি নেই। তিনি অসাধারণ অভিনয়-ক্ষমতা দেখিয়েছেন শান্তাপ্রসাদের বেশে, আচারণ-

সরকার প্রোডাকশন্স-এর "অজানা শপথ" (পরিচালনা: সলিল সেন) নবাগত সৌমেন চক্রবর্তী ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

আচরণে, কথা বলার ভঙ্গিতে। উদ্দেশ্য সাধনের পর গোপার কাছে ছদ্মবেশ খুলে ফেলে যখন অশোক মনের শূন্যতা প্রকাশ করছে, ওই মুহূর্তে উত্তমকুমারের অভিনয় অতুলনীয়।

নায়িকা গোপার রূপসজ্জায় সুপ্রিয়া চৌধুরীর চরিত্রচিত্রণ স্বচ্ছন্দ, সপ্রাণ এবং শেষাংশে, প্রেমিকের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর, সংবেদনশীল। ছবিতে চমৎকার অভিনয় করেছেন আরও কয়েকজন শিল্পী। তাঁদের মধ্যে তরুণকুমার, বঙ্কিম ঘোষ, মিহির ভট্টাচার্য, দীপক মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার, এস বিশ্বনাথন, অপর্ণা দেবী, প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শর্মিতা বিশ্বাসের নাম উল্লেখযোগ্য। নবাগত মণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায় সুঅভিনয় করেছেন। চরিত্রানুগ অভিনয়ের জন্য আর যাঁরা প্রশংসা পাবেন তাঁদের মধ্যে সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত সেন, মিণ্টু দাশগুপ্ত, অশোক মিত্র, বুবু গাঙ্গুলী, দেবদাস, অমর মল্লিক প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

সংগীত পরিচালক গোপেন মল্লিককে সাধুবাদ, তিনি মান্না দে ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে এমন সুন্দর রাগাশ্রয়ী সুরের গান করিয়েছেন যেটি শুনতে ভাল লাগে। শিল্পীরা গানটি অদ্ভুত দরদ দিয়ে গেয়েছেন। এই গান জনপ্রিয় হবে। একটি রবীন্দ্র-সংগীত (বাণী ঠাকুরের কণ্ঠে) ছবিতে সুগীত। আবহসংগীত পরিমিত ও সুকল্পিত।

কানাই দে'র ফটোগ্রাফি এবং বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনা উন্নতমানের।

নতুন সিনেমা হল "জয়া"

কলকাতার সিনেমা হাউসগুলির তালিকায় একটি নতুন নাম : "জয়া"। সুসজ্জিত এবং আধুনিক সব উপকরণে সমৃদ্ধ এই প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হয়েছে পাতিপুকুর লেক টাউনে। "জীবন-মৃত্যু" ছবিটি নিয়েই "জয়া"-র উদ্বোধন। সিনেমা হলটির স্বত্বাধিকারী শ্রী জি বণিকের আমন্ত্রণে সাংবাদিকরা গত সপ্তাহে "জয়া"-তে উপস্থিত হয়েছিলেন।। এবং "জীবন-মৃত্যু" ছবিটি তাঁরা ওই হলেই দেখেন। আসন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অলংকরণের দিক থেকে "জয়া" প্রথম শ্রেণীর চিত্রগৃহের সারিতে গণ্য হবার যোগ্য।

নাট্য সম্মেলনের চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী রবীন্দ্রানুষ্ঠান

গতবারের মত এবারেও চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী বিরতিহীন রবীন্দ্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন নাট্য সম্মেলন। মহাজাতি

সমরেশ বসুর কাহিনী এবং সলিল দত্তর পরিচালনায় নির্মীয়মাণ আর ডি প্রোডাকশন্স-এর "অপরিচিত" ছবির মহরৎদৃশ্যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ফটো—দেশ

সদনে ২৫ বৈশাখ ভোর পাঁচটা থেকে অনুষ্ঠানের শুরু, সমাপ্তি ২৬ বৈশাখ ভোর পাঁচটায়। অনুষ্ঠানে থাকবে কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত, একক নৃত্য, নৃত্যনাট্য, আবৃত্তি, পাঠ, চলচ্চিত্র, প্রদর্শনী, আলোচনা ও নাটকাভিনয়। যে-কোন শিল্পী ও সংস্থা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন।

রবীন্দ্র-মেলা

আগামী পঁচিশে বৈশাখ থেকে রবীন্দ্র-কাননে রবীন্দ্র মেলার পক্ষকালব্যাপী বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতদুপলক্ষে আলোচনা, আবৃত্তি, নৃত্যগীত ও অভিনয়-সমৃদ্ধ এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানসূচী প্রণয়ন করেছেন রবীন্দ্র-মেলার কর্তৃপক্ষ।

প্রতিদিন রবীন্দ্র-মেলায় বিভিন্ন নাট্য-সম্প্রদায় নাটক ও নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করবেন। তাঁদের মধ্যে অমলাশংকরের পরিচালনায় উদয়শংকর ইণ্ডিয়া কালচার সেণ্টার কর্তৃক 'পরিচয়' এবং মহিলা শিল্পী মহলের 'শেষরক্ষা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া বাংলার নব-জাগরণের সূচনাকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত দেশের সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরার কাজেও মেলার কর্তৃপক্ষ যত্নবান।

মেলা ও প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণে এবারেও প্রত্যহ যাত্রাগান, পাঁচালী, কবিগান, ম্যাজিক ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে।

রবীন্দ্র-ভারতী রঙ্গমঞ্চে "ক্ষুধিত পাষাণ"

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয়েছে গত মঙ্গলবার। উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর সময়োচিত ভাষণে এই আশা প্রকাশ করেন যে, এই দৃষ্টান্ত অন্যত্র অনুসৃত হবে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন রবীন্দ্র-ভারতীর উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। উভয়ের ভাষণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য, সংগীত ও ললিতকলা আকাদমীর প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা নতুন মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ" অভিনয় করেন। সাধনকুমার ভট্টাচার্য কাহিনীর নাট্যরূপ দিয়েছেন। এবং সম্পাদনা ও পরিচালনার কৃতিত্ব তরুণ রায়ের। সংগীত নির্দেশনা ও পরিচালনায় রয়েছেন যথাক্রমে রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণ গাঙ্গুলী। বালকৃষ্ণ মেনন নৃত্য-পরিচালক। প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় সাধারণের জন্য "ক্ষুধিত পাষাণ" অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নাট্য, ছায়াচিত্র ও সংগীতজগতের উন্নতিকল্পে সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গের নাট্য, চলচ্চিত্র ও সংগীত-জগতের শিল্পী, কলাকুশলী ও কর্মীরা মনে করেন, এই রাজ্যে সংস্কৃতি প্রসারের ক্ষেত্রে কিছু অন্তরায় ছিল। এবং সেগুলি অনতিবিলম্বে দূর হওয়া উচিত। তাঁদের কিছু দাবি আছে। ওই সব দাবির এক স্মারকলিপি ২৮ এপ্রিল তাঁরা বর্তমান যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের কাছে পেশ করবেন। এর আগে ২৬ এপ্রিল রবীন্দ্রসদনে শিল্পী ও কর্মীদের এক সম্মেলনে নানা সমস্যা ও উপায় সম্পর্কে আলোচনা হবে। ওই সম্মেলনের সিদ্ধান্তের স্মারকলিপিও এক সঙ্গে রাজ্যসরকারের কাছে পেশ করা হবে। যে গণডেপুটেশনের মাধ্যমে স্মারকলিপি পেশ করা হবে তা যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের সমর্থনেই আয়োজিত হয়েছে।

গত মঙ্গলবার লাইট হাউস মিনিয়েচারে এক সাংবাদিক বৈঠকে কর্মী ও শিল্পীদের এই "কনভেনশন"-এর প্রস্তুতি কমিটির তরফ থেকে শ্রীউৎপল দত্ত, শ্রীঅজিত লাহিড়ী ও শ্রীসুধীপ্রধান মোট তেইশটি দাবির কথা উল্লেখ করেন। শ্রী দত্ত সাংবাদিকদের দাবিগুলি পাঠ করে শোনান। প্রয়োজনে তাঁদের বক্তব্য ব্যাখ্যাও করেন। প্রথম দাবি, ১৮৭৬ সনের ড্রামাটিক পারফরমেনসেস্ অ্যাক্ট চিরকালের জন্য রদ করতে হবে। দ্বিতীয়, নাটক, যাত্রা এবং সংগীতানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমোদকর

প্রত্যাহার করতে হবে। দাবিগুলির মধ্যে রবীন্দ্রসদন, রবীন্দ্র-ভারতী, মহাজাতি সদন, সংগীত-নাটক-আকাদমি রেডিও অ্যাড-ভাইসরি বোর্ডের পুনর্গঠন, সিনেমাগৃহে এই রাজ্যে তৈরি চিত্রের বাধ্যতামূলক প্রদর্শন, ফিল্ম প্রোডাকশন ফান্ড গঠন, সংগীতের জন্য কলকাতায় কনসার্ট হল স্থাপন, বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক সংগীত-শিক্ষা প্রবর্তন, কলাকুশলী ও কর্মীদের প্রাপ্য টাকা আদায়ের ব্যাপারে সিনে টেকনি-শিয়ান্স ও ওয়ার্কারস ইউনিয়নের বিজ্ঞপ্তি সাপেক্ষে ছবির সেন্সর সার্টিফিকেট প্রদান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। প্রারম্ভে শ্রীঅজিত লাহিড়ী বলেন, চলচ্চিত্রশিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে আরও যে-সব গলদ রয়েছে সেগুলি কী ভাবে দূর করা যায় সে-বিষয়েও তাঁরা ভাবছেন। প্রসঙ্গক্রমে উদ্যোক্তারা এই রাজ্যের সকল সাংস্কৃতিক কর্মীদের "কনভেনশন"-এ যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

ছবি তোলার ছবি: (উপরে) "হাটে বাজারে" ছবির শট নেওয়ার আগে বৈজয়ন্তীমালা ও পরিচালক তপন সিংহ; (নিচে) "কখনও মেঘ"এর সেটে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অগ্রদূত-গোষ্ঠীর বিভূতি লাহা ও অঞ্জনা ভৌমিক ফটো—দেশ

সাংস্কৃতিকী

কালচারাল সেমিনারের নাটক

বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা কালচারাল সেমিনার দক্ষিণ কলকাতায় মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চে তাঁদের তিনটি সফল নাট্যাভিনয় নিয়মিত উপস্থিত করার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। নাটকগুলির নাম: "বিষ", "জীবনের বালুচরে" এবং "চুপ"। প্রথম অভিনয়: "বিষ", ২৮ এপ্রিল, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। নাটকগুলি রচনা ও পরিচালনা করেছেন সমর মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা তথ্য কেন্দ্রে **'সুধীরলাল** স্মৃতিবাসরের ষোড়শতম বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন ডঃ যামিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায় অলংকৃত করেন। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, অপরেশ লাহিড়ী, অমরেশ রায়চৌধুরী, প্রণব দাশগুপ্ত, সুধীর মুখোপাধ্যায়, মৃণাল গঙ্গোপাধ্যায়, সলিল মিত্র, গদাধর ভট্টাচার্য, শান্তিকমল ধর, দেবব্রত দত্ত, ভোলানাথ বিশ্বাস, নীতা সেন, বাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, লীনা বটব্যাল, স্বাগতা ঘোষ রায়, দেবী মিত্র, পার্পাড়ি সেনগুপ্ত, ছন্দা সেনগুপ্ত প্রভৃতি। উদীয়মান শিল্পী মণিলাল নাগের সেতারবাদনে শ্রোতারা তৃপ্ত হন।

সম্প্রতি তিন দিনব্যাপী **"মধ্য ইণ্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন"** অনুষ্ঠিত হল অন্নপূর্ণা-অঙ্গনে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় বাণী ঠাকুর ও শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে। হিমাংশু বিশ্বাসের পরিচালনায় যন্ত্রসংগীতে "বীরপুরুষ" কবিতা অবলম্বনে অনুষ্ঠানটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল। মণিলাল নাগ সেতারে 'মাঝ খাম্বাজ' রাগ পরিবেশন করেন। গৌতম রায়ের কৌশিক কানাড়া ও ঠুংরি উপভোগ্য। শিশিরকণা ধর চৌধুরী পরিবেশন করেন বেহালায় যোগ ও বসন্তবাহার। ফাল্গুনী মিত্র রাগেশ্রী রাগে ধ্রুপদ গেয়ে শোনান। হাসি বিশ্বাসের বাঁশী সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা পায়। অনুষ্ঠানের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্পী ছিলেন শিপ্রা বসু, দিলীপ চক্রবর্তী, অরুণাভ মজুমদার, অনিল রায়চৌধুরী, দ্বিজেন ঘোষ ও কেদার মিশ্র।

বিবিধ প্রসঙ্গ

'এ প্যাচ অব ব্লু'-খ্যাত পরিচালক গাই গ্রীন 'প্রেটি পলি' নামে যে ছবিটি পরিচালনা করছেন তাতে হেলি মিলস প্রথম একটি 'খারাপ' মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। তাঁর জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসবে এক য়ুরেশিয়ান যুবক। এই চরিত্রের অভিনেতা শশী কাপুর। সিঙ্গাপুরেই ছবির বেশির ভাগ দৃশ্য তোলা হচ্ছে। কাহিনীর পটভূমি সিঙ্গাপুর। ট্রেভর হাওয়ার্ড ছবির অন্যতম শিল্পী।

পুনার ফিল্ম ইনস্টিটিউটে অভিনয় সম্পর্কে সম্প্রতি আলোচনা করেন কামিনী কৌশল। অভিনয়ে কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা কী তা শিক্ষার্থীদের বোঝাবার সময় শ্রীমতী কৌশল একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। নয় বছর বয়সে তিনি মঞ্চে এই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন। শ্রীমতী কৌশল আরও বলেন, প্রতিদিন চোখের সামনে কী ঘটে তা শিল্পীর বিশেষভাবে লক্ষ করা উচিত, যাতে অনুরূপ ঘটনা তিনি অভিনয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের পরলোকপ্রাপ্তি আলোচ্য সপ্তাহের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১২ এপ্রিল শনিবার শ্রীভট্টাচার্য ৭৩ বৎসর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি তাঁর স্ত্রী, তিন পুত্র, তিন কন্যা, এবং নাতিনাতনী রেখে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে বৈপ্লবিক যুগের সাংবাদিকতার সঙ্গে বর্তমান যুগের সাংবাদিকতার এক নিবিড় যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। ওই শনিবারই পুষ্পমাল্যে ভূষিত হয়ে আড়িয়াদহ শ্মশানঘাটে যথাশাস্ত্র যতীন্দ্রনাথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড, দেশ, অমৃতবাজার, যুগান্তর এবং অন্যান্য বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁর শবাধারে সশ্রদ্ধ পুষ্পমাল্যাদি অর্পিত হয়। যতীন্দ্রনাথের জন্ম ময়মনসিং জেলায়। কলকাতায় এম-এ ক্লাসে পাঠরত অবস্থায় তিনি ১৯২১ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। তা' ছাড়া তিনি বাংলার বিপ্লববাদী সংস্থার শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর (মহারাজ) সাহচর্যও লাভ করেছিলেন। ১৯২২ সালে স্বর্গীয় প্রফুল্লকুমার সরকারের সম্পাদনায় আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশিত হলে সাংবাদিক হিসাবে তিনি তাতে যোগদান করেন। এর পরে যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশিত হলে তিনি তার সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে তিনি আর্থিক জগৎ নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯৫৪ সালে যতীন্দ্রনাথ আবার আনন্দবাজার পত্রিকায় ফিরে আসেন এবং সহকারী সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদেই অবস্থান করেছিলেন।

দেশী সংবাদ

১৭ এপ্রিল—ভারত এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের দু'টি সংস্থার মধ্যে আজ ভারতীয় স্কুলগুলিতে বিজ্ঞানশিক্ষার পুনর্গঠন এবং সম্প্রসারণ সম্পর্কে ২১ লক্ষ ৮২ হাজার ডলারের একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তির দ্বারা একটি পঞ্চবার্ষিকী যুগ্ম প্রকল্প রচিত হবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের এই সংস্থা দু'টির নাম—ইউনেসকো এবং ইউনিসেফ।

১৮ এপ্রিল—সরকারীভাবে জানা গিয়েছে যে, বিহার সরকার দু'টি সম্পূর্ণ জেলা এবং অপর পাঁচটি জেলার অংশবিশেষ-সহ কয়েকটি এলাকায় দুর্ভিক্ষ ঘোষণা করেছেন। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বলে ঘোষিত দু'টি জেলা হচ্ছে পালামৌ এবং হাজারীবাগ, আর আংশিকভাবে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত জেলা হচ্ছে সাহাবাদ, মুঙ্গের, ভাগলপুর, গয়া এবং পাটনা।

১৯ এপ্রিল—বিগত ১৫ বছরের মধ্যে সরকার-বিরোধী কাজ করার অভিযোগে যে ২৮ জন কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়েছিল সম্প্রতি পশ্চিমবাংলা সরকারের স্বরাষ্ট্র-দপ্তর তাঁদের পুনরায় কাজে ফিরিয়ে নেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তবে যাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চালু রয়েছে সরকার তাঁদের চাকুরিতে যোগদান করতে আপাতত দিচ্ছেন না।

২০ এপ্রিল—গতকাল নদীয়া জেলার ধুবুলিয়ায় দ্বিপ্রহরে একেবারে প্রকাশ্য দিবালোকে একদল সমাজবিরোধী, স্থানীয় উদ্বাস্তু নেতা শ্রীসত্যরঞ্জন মজুমদারের গৃহ আক্রমণ করে পুরুষ ও মহিলা সকলকে নির্মমভাবে প্রহার করে এবং সর্বশেষে গৃহে অগ্নিসংযোগ করে ও গৃহের জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে যায়। শ্রীমজুমদারের অপরাধ, তিনি একদল ছুরোডাকে ধরিয়ে দেবার জন্য পুলিসকে সাহায্য করেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের বিভিন্ন প্রকল্পের বিরাট লোকসান সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য রাজ্য সরকার ছয় সদস্যের একটি কমিটি নিয়োগ করেছেন। পুনর্গঠিত পর্ষদের প্রথম দিনের বৈঠকেই ধরা পড়ে যে, সর্বভারতীয় খাদি কমিশনের কাছে পশ্চিমবঙ্গের ওই পর্ষদের ঋণের বোঝা দাঁড়িয়েছে ৮৫ লক্ষ টাকা।

২১ এপ্রিল—বিহার ত্রাণ কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ পাটনায় সাংবাদিকদের বলেন যে, বিহারের পাঁচ কোটি অধিবাসীর মধ্যে চার কোটিই দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাবের কবলে পড়েছেন। এই চার কোটির এক কোটি শিশু ও আরও এক কোটি অসুস্থ ও সন্তানসম্ভবা নারী। বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর মতেও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সংখ্যা ৪ কোটি।

ছাপরা জেলার সিওয়ান শহরে একটি ট্রাক-দুর্ঘটনায় গতকাল ১৭ জন নিহত ও ৪৯ জন আহত হয়েছেন। একটি মিছিলের উপর হঠাৎ একটি ট্রাক এসে পড়ায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। ট্রাক-চালক দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে উধাও। আহতদের মধ্যে অন্তত ১২ জনের অবস্থা সংকটজনক।

২২ এপ্রিল—গতকাল রাজকোট থেকে ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি রেয়ন কারখানার বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা কারখানাটি পুড়িয়ে দিয়েছে। সরকারীসূত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ক্ষতির পরিমাণ এক কোটি টাকারও বেশী হবে। এই ব্যাপারে পুলিস ৪৬ জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করেছে।

নির্ভরযোগ্যসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, শিবসাগর জেলায় নাগাভূমি সীমান্তে অনুগত ও বৈরী উভয় শ্রেণীর নাগা আটটি ফরেস্ট রিজার্ভের শতকরা প্রায় ৮ ভাগ-সহ মোট ১৪ লক্ষ একর জমির ভিতর ঢুকে পড়েছে। ইহা ছাড়া, নাগারা সীমান্ত-সংলগ্ন ৪০ মাইল বরাব কয়েকটি গ্রাম ও চা-বাগানেও ঢুকে পড়েছে।

২৩ এপ্রিল—শিক্ষার জন্য বৈদেশিক মুদ্র দেওয়া সম্পর্কে একটি নতুন নীতি নির্ধারণে ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন শীঘ্রই উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই-এ সঙ্গে আলোচনা করবেন। ডঃ সেন প্রাক্ স্নাতক পরীক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়া পক্ষপাতী নন। তাঁর ধারণা, এই ধরনের শিক্ষা দেশের কোন উপকার হয় না। দেশের কল্য হয় এমন ধরনের উচ্চশিক্ষার জন্যই কেবলম ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করা উচিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যে সব বিষ শিক্ষা দেওয়া হয় না, কেবল সেই সব বিষ শিক্ষা গ্রহণের জন্যই বিদেশী মুদ্রা দেও উচিত।

বিদেশী সংবাদ

১৭ এপ্রিল—আজ ঘানায় একদল তর সামরিক অফিসারের অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্য করে দেওয়া হয়েছে। ঘানা সেনাবাহিন অফিসার কম্যান্ডিং এবং অভ্যুত্থানের নেতা জেনারেল ই কে কোতোকা এই অভ্যুত্থানে নি হয়েছেন বলে নির্ভরযোগ্য মহলের খব প্রকাশ।

১৮ এপ্রিল—উভয় ভিয়েতনামের মধ্য মাইল বিস্তৃত যে সৈন্যমুক্ত এলাকা রয়ে সেখান থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে আসার জ দঃ ভিয়েতনাম আজ প্রস্তাব করেছে। ক্যানাড পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে চার দফা শান্তি-প্রস্ত করেছেন, দক্ষিণ ভিয়েতনাম এই প্রস্তাব দ্বা তাতেই সারা দিয়েছে।

২৯ এপ্রিল—জাপান থেকে প্রেরিত সংবা বলা হয়েছে : পিকিংস্থ কূটনৈতিক মহলে মতে চীনের ছাব্বিশটি প্রদেশের দশটি মাত্র এ লাল ফৌজের দখলে। এই তালিকায় তিব্বতে নাম অবশ্য নেই। বিদ্রোহী জেনারেল কুয়া হ পিকিং কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করে এখানে নিজে খুশিমত তাঁর কর্তৃত্ব চালাচ্ছেন।

২০ এপ্রিল—আজ সকালে নিকোসি বিমানবন্দরের দক্ষিণে এক পর্বতশীর্ষের সা একটি বিমানের সংঘর্ষ হওয়ায় ১২৪ জ নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে অধিকাং সুইস ও জার্মান পর্যটক। বিমানটিতে ১১ জন যাত্রী ও ১০ জন ক্রু ছিল।

২১ এপ্রিল—চীনা শান্তি কমিটি শান্তি জন্য আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার কমি থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন। তাঁদে মতে, লেনিন পুরস্কার কমিটি শোধনব অনুসরণ করে চলেছেন।

২২ এপ্রিল—আজ সাঁজোয়া গাড়ি-সহ ইন্দো নেশিয়া সৈন্য ও পুলিশ জাকার্তায় চী টাউন ঘেরাও করে রাখে। এর আগে হাজ হাজার ইন্দোনেশীয় তরুণ ক্ষিপ্ত হয়ে চী সম্পত্তি ধ্বংস করে। বৃহস্পতিবার চী ব্যবসায়ীরা সরকার-বিরোধী বিক্ষোভ দেখানে প্রতিশোধেই যুবকদল চীনা দূতাবাসে অভিয চালায়।

২৩ এপ্রিল—সোভিয়েত সরকারী সংব সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'তাস' আজ জানিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি নতুন মানুষ-চা মহাকাশযান মহাকাশ-পরিক্রমায় পাঠিয়েছে মহাকাশযানটির নাম 'সয়ুজ'। মহাকাশচারী নাম শ্রীভ্লাডিমির কোমারভ।